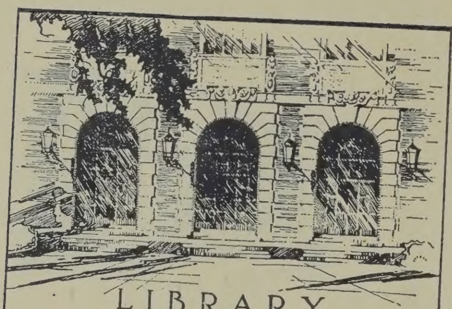


বঙ্গভাষার বিশ্ববিশ্রুত বৃহদভিধান

বিশ্বকোষ

ENCYCLOPÆDIA INDICA

ইহাতে ব্যুৎপত্তি সমেত সমস্ত বৈদিক ও সংস্কৃত শব্দ, প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসম্প্রদায় এবং তাহাদের মত ও বিশ্বাস, আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বিবরণ, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, জ্যোতিষতত্ত্ব, বিজ্ঞানতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, গণিততত্ত্ব, চিকিৎসাতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব এবং ইন্দ্রজাল, পাকবিদ্যা প্রভৃতির সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমে বর্ণিত আছে।

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রথম ভাগ

প্রথম হইতে পঞ্চবিংশ সংখ্যা

[অ—অদ্বৈধ]

বঙ্গের প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দের সহযোগিতায়

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি, তত্ত্বচিন্তামণি, শব্দরত্নাকর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

ও

৮নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার—বিশ্বকোষ-কার্য্যালয় হইতে
প্রকাশিত

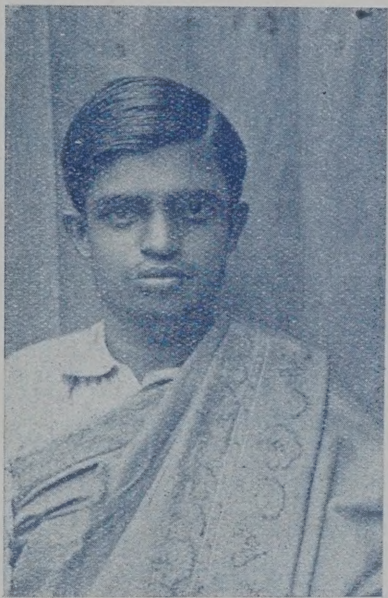
৯নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা
বিশ্বকোষ প্রেসে
শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সেন দ্বারা মুদ্রিত।

১৩৪২

প্রতি সংখ্যার নগদ ৷৹ আনা
১২ সংখ্যার অগ্রিম ৫৲ টাকা

প্রতি ভাগের মূল্য ১২৷৹ টাকা।
স্বর্ণাক্ষরে নামযুক্ত কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ১৩৲ টাকা।

স্মৃতি-লেখ



জন্ম—২০শে অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩১৮ সাল।

মৃত্যু—২৬শে চৈত্র মঙ্গলবার, ১৩৪১ সাল।

৺বিশ্বনাথ বসু

বিশ্বনাথ, এখন কোথায় তুমি? আজ কোন্ লোকে তোমাকে আমার অন্তরের ব্যাকুলতা জানাইব? বিশ্বকোষ-সম্পাদনরূপ মহাতপস্থার সিদ্ধিকালে অনেক সাধনার ফলে তুমি দেখা দিয়াছিলে! দীর্ঘকাল তুমি আমার জীবনসঙ্গী ছিলে। সর্ব্বত্রই আজ তোমার স্মৃতি বিজড়িত। প্রিয়দর্শন, তোমার নয়নরঞ্জন মূর্ত্তি কি আর দেখিতে পাইব? বিশ্বকোষের অধিকার তোমারই হইবে ভাবিয়া আমি তোমার নাম রাখিয়াছিলাম বিশ্বনাথ।

হিন্দী বিশ্বকোষের প্রকাশকরূপে তোমার বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের কিয়দংশ অতিবাহিত হইয়াছিল। যে দিন পূতচরিত্র মহাত্মা গান্ধী ও স্মরণীয়-কীর্ত্তি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য অসুস্থাবস্থায় আমাকে দেখিতে এবং হিন্দী বিশ্বকোষের সংবাদ লইতে আমাদের কুটীরে পদার্পণ করেন, সেদিন তোমার কি আনন্দ! তোমারই একান্ত যত্নে গত বড়দিনে বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের শ্রদ্ধেয় প্রতিনিধিগণের যে সম্মেলন হয়, সেদিনের তোমার সেই বিনয়-মধুর আদর-আপ্যায়নের মোহন-চিত্র আজিও অনেকে ভুলিতে পারেন নাই। তোমার যে বড় সাধ ছিল, নব সংস্করণের ১ম ভাগ সম্পূর্ণ হইলে এবার বাঙ্গালার সাহিত্যিকগণকে লইয়া সেইরূপ একটী সম্মিলনের আয়োজন করিবে। কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তার কোন্ মহা-সম্মেলনের আহ্বানে সে সঙ্কল্প বিস্মৃত হইলে!

বিশ্বকোষ-সঙ্কলনে আমার সহায়করূপে তুমি যে অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছ, আজ তাহাই আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা পীড়াদায়ক হইয়াছে। কেন সকল দিকে সকল রকমে তোমার কৃতিত্ব ও ব্যবহার-মাধুর্য্য মুদ্রাঙ্কিত করিয়া গেলে? যেখানে গিয়াছ, নিশ্চয়ই সেখানে শোকতাপ, জরামরণের ভয় নাই! কিন্তু মায়া-মমতাও কি নাই? আমাকে তুমি ভুলিতে পার, কিন্তু তোমার বিশ্বকোষকে তুমি ভুলিলে কেন? বিশু, তোমার আরব্ধ ব্রত আমি উদ্‌যাপন করিতে চাই। তোমার স্মৃতি আমার পাথেয় হউক। তোমার ভক্তি ও প্রীতি আমার শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখুক। বিশ্বকোষের সঙ্গে তোমার নাম অক্ষয় হউক। তোমার পরমাত্মার নিকট ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

তোমার শোকসন্তপ্ত পিতা

বক্তব্য

বিশ্বকোষের ২য় সংস্করণের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল। ৯ম সংস্করণের প্রথম সংখ্যা ৫৭ বর্ষ পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক ডাঃ রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার অনুজ খ্যাতনামা বহুদর্শী ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিজ জন্মভূমি রাহুতা গ্রাম হইতে ৯২৯৯ সালে ৯ম সংস্করণের ৯ম সংখ্যা প্রকাশ করেন এবং ৯২৯৩ সালে উভয়ের যত্নে প্রথম ভাগ সম্পূর্ণ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে—৯ম সংস্করণের প্রথমভাগ প্রায় পঞ্চাশবর্ষ পূর্ব্বে সঙ্কলিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য—এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে জ্ঞানরাজ্যের পরিধি অভাবনীয়রূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে নব নব গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলে অসাধারণ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। সেই নব নব আবিষ্কার ও জ্ঞানসাধনার ফল সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এই ২য় সংস্করণের আয়োজন হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য প্রথম সংস্করণের অধিকাংশ শব্দ আমূল পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থের কলেবর অনেক বাড়িয়া যাইতেছে; তাহা উভয় সংস্করণ মিলাইলে সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।*

৯২৯৪ সালে প্রথম সংস্করণের ২য় ভাগ হইতে সঙ্কলনভার আমার উপর ন্যস্ত হয়, এবং ভগবদিচ্ছায় ৯৩১৮ সালে ২২শ ভাগে এই সংস্করণ সম্পূর্ণ হয়। ৯৩২১ সাল হইতে বিশ্বকোষের হিন্দী সংস্করণ আরম্ভ এবং ৯৩৩৮ সালে আশ্বিন মাসে তাহা সম্পূর্ণ হয়। যদিও বর্ত্তমান নব সংস্করণ বিশ্বকোষের ২য় সংস্করণ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দী সংস্করণই বিশ্বকোষের ২য় সংস্করণ এবং এই নবোদ্যম বিশ্বকোষের ৩য় সংস্করণ হইতেছে।

* এখানে জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে স্বর্গীয় রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও স্বনামধন্য ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে সকল বিশেষ বিশেষ শব্দ লিখিয়াছেন, তাহা অবিকল রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

হিন্দী বিশ্বকোষ সমাপ্তির কিছু পূর্ব্বে বাঙ্গালা বিশ্বকোষের একখানি নব সংস্করণ প্রকাশের আশা জাগিয়া উঠে। আমার প্রিয় সুহৃদ্ রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুত্র অধ্যাপক শ্রীমান্ অরুণচন্দ্র সেন এম-এ এবং শ্রীমান্ বিমানবিহারী মজুমদার এম-এ, পি-আর্-এস্ প্রমুখ কএকজন উদ্যোগী অধ্যাপক নব সংস্করণের ভার গ্রহণ করেন এবং পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হন। কিন্তু আমার পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায় ও নানা বৈষয়িক কারণে তৎকালে এই মহাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হই নাই।

৯৩৩৯ সালে পৌষমাসে বড়দিনের বন্ধে আমার একান্ত হিতৈষী পরম সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন ও আমার পরমাত্মীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ মহাশয় বিশ্বকোষের একটী নব সংস্করণ প্রকাশের উপদেশ দিয়াছিলেন। এই সময় কএকজন সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী আমার জন্মকুণ্ডলী আলোচনা করিয়া বিশ্বকোষ প্রকাশের অনুমোদন করেন। এ সময় আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা না থাকিলেও প্রিয় পুত্র বিশ্বনাথের একান্ত আগ্রহে আমি নবসংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগী হইলাম। বিশ্বনাথেরই উপর প্রকাশভার পড়িল।

৯৩৩০ সালে বৈশাখ মাসে শুভ অক্ষয়তৃতীয়ার দিন হোমাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের পর,নবোদ্যমে নবসংস্করণের কার্য্য আরম্ভ হইল। জ্যৈষ্ঠমাসে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিচালনভার গ্রহণ করেন। ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত তাঁহার উপর পরিচালনভার ছিল। এই সময় মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হয়। পাণ্ডুলিপি সংশোধন ও ছাপাখানার বন্দোবস্তের কারণ তৎপরে দুইমাসকাল সঙ্কলনকার্য্য বন্ধ থাকে। কথা থাকে, দুই মাস পরে পূর্ব্ববৎ কার্য্য চলিবে। কিন্তু বিদ্যাভূষণ মহাশয় ও তিন জন সহকারী আর কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন না। আমাকেই পরিচালনভার গ্রহণ করিতে হইল। অপরাপর সকলে যথারীতি কার্য্য করিতে লাগিলেন। প্রথম হইতে

বিশেষ বিশেষ শব্দ যাঁহারা লিখিয়াছেন, শব্দ ও লেখকের তালিকায় তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা হইল। বলা বাহুল্য, পাণ্ডুলিপি-সংশোধনকালে অনেক শব্দ আমূল সংশোধন এবং অনেক শব্দ বাদ দিতে হইয়াছে। এ কারণ সেই সেই শব্দের লেখকগণের নাম প্রকাশ করা হইল না।

১৩৪১ সালে উত্থানৈকাদশীর দিন মুদ্রণ শেষ হইলেও ৫ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার প্রথম সংখ্যা বাহির হইল। প্রথম প্রথম এই কার্য্যে নানা বাধা বিঘ্ন ও অসুবিধা ঘটিয়াছিল। কিন্তু বিশ্বনাথের কার্য্যতৎপরতা ও অধ্যবসায়গুণে আমি কোন অসুবিধা বুঝিতে পারি নাই। প্রিয় পুত্র শত শত বাঙ্গালী বিশেষজ্ঞ কৃতী বিদ্বান্‌গণের দ্বারস্থ হইয়া বিশ্বকোষের সহায়ক ও লেখক হইবার অনুমতি গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে। সেই সকল মহোদয়ের নাম পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত হইল। এই সকল লেখক ও প্রধান সহায়কগণের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ মনীষী বহুশাস্ত্রবিৎ ডাক্তার একেন্দ্রনাথ ঘোষ মহোদয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমাদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ হইবে না। তিনি বিশ্বকোষের ৩য় সংখ্যা হইতে প্রয়োজনীয় বহু শব্দ লিখিয়া দিয়াছেন—তাহা শব্দসূচী ও লেখকগণের তালিকায় প্রকাশিত হইল, তাহা হইতে তাঁহার কৃতীত্ব ও বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাইবেন। বলিতে কি তাঁহার স্থান পূরণ করিবার লোক বাঙ্গলায় অতি বিরল। এই নবসংস্করণ বিশ্বকোষের সহিত তাঁহার নাম চিরদিন জড়িত থাকিবে।

প্রিয় পুত্র বিশ্বনাথ অল্প বয়সে এই বিশ্বকোষ সম্পর্কে যেরূপ অভিজ্ঞতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছে, তাহা প্রকৃতরূপে যাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছেন। বিশ্বনাথ অল্প দিনের মধ্যে মরাঠী, গুজরাটী, পালি ও বৈদিকগ্রন্থ আয়ত্ত করিয়া উপযুক্ত প্রবন্ধ লিখিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাহার এই বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাইয়া আমরা অনেক সময় ভাবিয়াছিলাম যে ইহা কি পূর্ব্বজন্মের সংস্কার? না কোন যোগভ্রষ্ট মহাত্মা আমাকে ছলনা করিবার জন্য জন্ম লইয়াছে? আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে আমার এই মহা অনুষ্ঠানের প্রধান সহায় অকালে চলিয়া গেল! বিশ্বনাথ শয্যাগত অবস্থাতেও বিশ্বকোষের তত্ত্বাবধান করিত। ১৮শ সংখ্যা পর্য্যন্ত তাহার যত্নে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার বড় ইচ্ছা ছিল, প্রথম ভাগ সম্পূর্ণ হইলে বিশ্বকোষের সহায়ক ও কৃতী লেখকগণকে আমন্ত্রিত করিয়া উৎসব করিবে। আমার দুর্ভাগ্য তাহার জীবনকালে প্রথমভাগ সম্পূর্ণ করিতে পারি নাই। তাহার জীবনের প্রধান আদরের রত্ন তাহার জীবদ্দশায় তাহারই নামে প্রকাশ করিয়াছি। এই নব সংস্করণ তাহারই আরব্ধ ব্রত। এই ব্রতসমাপ্তিই তাহার স্মৃতিরক্ষা। পুত্রই পিতার স্মৃতি রক্ষা করিয়া থাকে, এখানে তাহার বিপরীত! স্নেহাশ্রুসিক্ত পিতাকেই পুত্রের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। তাই আমাকেই প্রকাশকের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইল। আশা করি বঙ্গজননীর কৃতী সন্তান আমার দেশবাসী নরনারী সকলেই আমার সহায় হইবেন।

বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়
৮ বিশ্বকোষ লেন, কলিকাতা
২০এ শ্রাবণ, ১৩৪২ সাল

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক

প্রথম ভাগের বিশেষ বিশেষ শব্দ ও তাহার লেখকগণের নাম

শব্দ	লেখক
অ	শ্রীত্রিদিবনাথ রায় এম্ এ, বি-এল্
অইহোল	ঐ
অংশ	অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম্ এ, পি আর এস্
অংশু	শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্
অংশুবর্ম্মা	„ ত্রিদিবনাথ রায় এম্ এ, বি এল্
অকলকোট	৺বিশ্বনাথ বসু
অকিঞ্চন দাস	শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল্
অকোলা	„ অজিতনাথ ঘোষ
অক্বর	„ ত্রিদিবনাথ রায় এম্ এ, বি এল্
অক্রিয়াবাদী	„ চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্
অক্ষ, অক্ষক্রীড়া	„ ত্রিদিবনাথ রায় এম্ এ, বি এল্
অক্ষপাদ	ঐ
অক্ষমালা	„ চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্
অক্ষয়কুমার ঘোষ	„ ঐ
অক্ষয়কুমার দত্ত	„ ঐ
অক্ষয়কুমার বড়াল	„ ঐ
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়	„ ঐ
অক্ষয়চন্দ্র সরকার	„ অজরচন্দ্র সরকার
অক্ষর	„ ত্রিদিবনাথ রায় এম্ এ, বি এল্
অক্ষশালা	ঐ
অক্ষাংশ	„ অধ্যাপক রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ
অক্ষান্তর	„ ঐ
অক্ষি	ডাঃ ৺একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্ সি, এফ্ জেড এম্, এফ আর এম্ এস্
অক্সফোর্ড	শ্রীত্রিদিবনাথ রায় এম্ এ, বি এল্
অক্সফোর্ড প্রগতি	„ চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্
অক্সিজেন	ডাঃ ৺একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি
অক্সু	শ্রীঅজিত ঘোষ
অগথোক্লেশ	„ ত্রিদিবনাথ রায় এম্ এ, বি এল্
অগাদে	„ বিভূতিভূষণ বসু বি এ
অগামেমনন্	„ অনাথনাথ বসু
অগম্যা	„ ত্রিদিবনাথ রায় এম্ এ বি এল্
অগর	৺বিশ্বনাথ বসু
অগরবাল	শ্রীবিভূতিভূষণ বসু বি এ
অগষ্টাস্	অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম এ, পি আর এস্

শব্দ	লেকথ
অগস্ত	৺বিশ্বনাথ বসু
অগস্ত্য	শ্রীত্রিদিবনাথ রায় এম্ এ, বি এল্
অগস্ত্বার্গ	„ অনাথনাথ বসু
অগ্নি	৺বিশ্বনাথ বসু ও শ্রীঅনাথনাথ বসু
অগ্নিকার্পাস	শ্রীঅনাথনাথ বসু
অগ্নিকুল	„ বিভূতিভূষণ বসু বি এ
অগ্নিক্রীড়া	„ ত্রিদিবনাথ রায় এম্ এ বি এল
অগ্নিচূর্ণ	„ ত্রিদিবনাথ রায় ও শ্রীবিভূতিভূষণ বসু বিএ
অগ্নিদগ্ধ	ডাক্তার ৺একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্ সি এফ জেড এস্, এফ আর এম্ এস্
অগ্নিপর্ব্বত	শ্রীঅনাথনাথ বসু
অগ্নিপ্রস্তর	„ বিভূতিভূষণ বসু বি এ
অগ্নিমান্দ্য	ডাক্তার ৺একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি
অগ্নিমিত্র	শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম এ বি এল্
অগ্নিযন্ত্র	„ অনাথনাথ বসু
অগ্নিবংশ	ঐ
অগ্নিষ্টোম	পণ্ডিত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ
অগ্নিহোত্র	„ „ „
অগ্ন্যস্ত্র	শ্রীবিভূতিভূষণ বসু বি এ
অগ্ন্যুৎপাত	„ অনাথনাথ বসু
অগ্রদ্বীপ	সম্পাদক
অগ্রিগেণ্টাম্	শ্রীঅনাথনাথ বসু
অগ্রিপা	ঐ
অঘমর্ষণ	পণ্ডিত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ
অঘোর	সম্পাদক
অঘোর মূর্ত্তি	শ্রীঅনাথনাথ বসু
অঘোরী, অঘোরপন্থী	শ্রীবিভূতিভূষণ বসু বি এ
অঙ্কন	„ যামিনীকান্ত সেন বি এল্, তত্ত্বারিধি
অঙ্কুরোদ্গম	ডাঃ ৺একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্সি,
অঙ্কুশক্রিমি	ঐ
অঙ্কুশক্রিমিরোগ	ঐ
অঙ্কুশশক্তি	রাজরত্ন ডাঃ শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, পি এচ্ ডি
অঙ্কুশা	ঐ
অঙ্কোরথোম	৺বিশ্বনাথ বসু
অঙ্কোরবট	শ্রীত্রিদিবনাথ রায় এম্ এ, বি এল্

শব্দ	লেখক
অতিকায় জীব অতিকায় সর্প অতিকায় হস্তী	শ্রীঅনাথনাথ বসু
অতিগণ্ড	অধ্যাপক শ্রীরাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ
অতিচার	ঐ
অতিচারদণ্ড	শ্রীবিভূতিভূষণ বসু বি এ
অতিচ্ছত্র	অধ্যাপক শ্রীগিরিজাভূষণ মজুমদার এম্ এস্ সি ও শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
অতিথি	অধ্যাপক শ্রীঅরুণচন্দ্র সেন এম্ এ ও কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণপদ কাব্যব্যাকরণতীর্থ
অতিদেশ	পণ্ডিত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ
অতিরহস্যযোগিনী	রাজরত্ন ডাঃ শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, পি এচ ডি
অতিরিক্ত	অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম্ এ
অতিবিরলতা	শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি এস্ সি
অতিবিষা	অধ্যাপক শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার এম্ এস্ সি
অতিবৃদ্ধি (বা অতিপুষ্টি)	ডাঃ ৺একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি
অতিবৃষ্টি	ডাঃ শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন এম এস সি, পি এচ্ ডি ও শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম্ এস্ সি
অতিশয়োক্তি	৺রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়
অতিসার	কবিরাজ শ্রীরাখালদাস সেন কাব্যতীর্থ, ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ, ও ডাঃ কুঞ্জবিহারী দেব (হোমিও)
অতীন্দ্রিয়	পণ্ডিত শ্রীতারানাথ ন্যায়তর্কতীর্থ
অতীশ (অতিশা)	শ্রীক্ষীরোদকুমার রায় এম্ এ
অতুলকৃষ্ণগোস্বামী	„ চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্
অতুলকৃষ্ণমিত্র	„ শিবরতন মিত্র
অত্যন্তাভাব	অধ্যাপক শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য
অত্রি	ডাঃ শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ এম্ এ, পি এচ ডি ও কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণপদ কাব্যব্যাকরণতীর্থ
অথর্ব	ডাঃ শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ এম্ এ, পি এচ ডি
অথর্ববেদ	ডাঃ ঐ ও সম্পাদক
অথর্ববেদ$_2$	রাজরত্ন ডাঃ শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, পি এচ ডি
অদাহ্য	শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি এস্ সি
অদিকল	„ বিভূতিভূষণ বসু বি এ
অদিতি	সম্পাদক ও কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণপদ কাব্যব্যাকরণতীর্থ
অদিমগ	৺ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়
অদীননগর	৺রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়
অদৃষ্ট	মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণীভূষণ তর্কবাগীশ ও অধ্যাপক শ্রীশরৎকমল স্মৃতিন্যায়তীর্থ
অদৃষ্টবাদ	শ্রীনৃত্যগোপাল রুদ্র এম এ, বেদান্তভূষণ
অদ্ভুত	কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণপদ কাব্যব্যাকরণতীর্থ
অদ্ভুতাচার্য্য	শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন
অদ্বয়	পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বেদান্তভূষণ
অদ্বয়বজ্রপাদ	শ্রীঅনাথনাথ বসু
অদ্বয়বাদ	পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বেদান্তভূষণ
অদ্বৈতদাস পণ্ডিতবাবাজী	অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম্ এ, পি আর এস্
অদ্বৈতপ্রভু	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্ ও শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন
অদ্বৈতবাদ	পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বেদান্তভূষণ
অদ্বৈতসিদ্ধি	ঐ

নবসংস্করণ বিশ্বকোষের সহায়ক ও কতিপয় লেখক-লেখিকার নাম

বেদান্তদর্শন

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্-এ, পি-আর্-এস্
" রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বেদান্তভূষণ
" অশোকনাথ ভট্টাচার্য্য বেদান্ততীর্থ, শাস্ত্রী, এম্-এ, পি-আর্-এস্
" নৃত্যগোপাল রুদ্র এম্-এ, বেদান্তরত্ন

ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শন

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ফণীভূষণ তর্কবাগীশ, [কাশী]
মহামহোপাধ্যায় " যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ
মহামহোপাধ্যায় " কুঞ্জবিহারী তর্কসিদ্ধান্ত
মহামহোপাধ্যায় " রামব্রহ্ম ন্যায়তীর্থ
" কালীপদ তর্কাচার্য্য
" নিবারণচন্দ্র তর্কস্মৃতিতীর্থ
" রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বেদান্তভূষণ

মীমাংসা ও স্মৃতি

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, [কাশী]
" নিবারণচন্দ্র তর্কস্মৃতিতীর্থ

সাংখ্যদর্শন

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ

সর্ব্বদর্শন

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ
" বিধুশেখর শাস্ত্রী
ডাঃ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার এম্-এ, পিএচ্-ডি
ডাঃ " সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এম্-এ, পিএচ্-ডি
" " সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এম্-এ, পিএচ্-ডি
" " প্রবোধচন্দ্র বাগচী এম্-এ, ডি-লিট্ (পারি)

পাশ্চাত্ত্যদর্শন

ডাঃ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার এম্-এ, পিএচ্-ডি
" " সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, এম্-এ, পিএচ্-ডি
" " প্রবোধচন্দ্র বাগচী এম্-এ, ডি-লিট্ (পারি)
রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন এম্-এ, [দিল্লী]

বেদ ও বৈদিক সাহিত্য

ডাঃ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাক্লাদার এম্-এ, পিএচ্-ডি
" ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্-এ
ডাঃ " বটকৃষ্ণ ঘোষ এম্-এ, পিএচ্-ডি, [ঢাকা]
" সুকুমার সেন এম্-এ, পি-আর্-এস্

পুরাণ

ডাঃ শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য রাজরত্ন, এম্-এ, পিএচ্-ডি, [বরোদা]
শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ, এম্-এ
" গোপালপদ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
কবিরাজ " কৃষ্ণপদ সাহিত্যশাস্ত্রী, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ সিদ্ধান্তভূষণ

তন্ত্র

পণ্ডিত জানকীনাথ শাস্ত্রী
ডাঃ শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য রাজরত্ন, এম্-এ, পিএচ্-ডি, [বরোদা]
ডাঃ " প্রবোধচন্দ্র বাগচী এম্-এ, ডি-লিট্ (পারি)
" চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ, এম্-এ
" যতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বৌদ্ধশাস্ত্র

পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী
ডাঃ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া এম্-এ, পিএচ্-ডি
ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী এম্-এ, ডি-লিট্ (পারি)
ডাঃ " নলিনাক্ষ দত্ত এম্-এ, পিএচ্-ডি, ডি-লিট্ (লণ্ডন)
" প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এম্-এ, [শান্তিনিকেতন]
" বি. আর্. বড়ুয়া বি-এস্‌সি (এডিন্)

জৈনশাস্ত্র

ডাঃ শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এম্-এ, পিএচ্-ডি
" পূরণচাঁদ নাহার এম্-এ, বি-এল্

বৈষ্ণবশাস্ত্র

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল গোস্বামী ভাগবতভূষণ
" সত্যানন্দ গোস্বামী
" রাধাবিনোদ গোস্বামী
ডাঃ শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ
পণ্ডিত রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী, [শ্রীখণ্ড]
" গৌরগুণানন্দ ঠাকুর, [শ্রীখণ্ড]
শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ
" সত্যেন্দ্রনাথ বসু এম্-এ, বি-এল্
" সুকুমার সেন এম্-এ, পি-আর্-এস্
" নৃত্যগোপাল রুদ্র বেদান্তরত্ন
" হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ, এম্-এ, [কাশী]
ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্-এ, পিএচ্-ডি, [ঢাকা]
" " হারাণচন্দ্র চাক্লাদার " "
" " নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় " "
" " নলিনীকান্ত ভট্টশালী " " [ঢাকা]
" " রাধাগোবিন্দ বসাক " "
" " কাশীপ্রসাদ জৈস্‌বাল [পাটনা]
রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি-এ
শ্রীযুক্ত কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত এম্-এ
ডাঃ " হেমচন্দ্র রায় এম্-এ, পিএচ্-ডি
" অরুণচন্দ্র সেন এম্-এ
" " বিনয়চন্দ্র সেন " "
" ক্ষীরোদকুমার রায় এম্-এ, [পাটনা]
" " বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ, পিএচ্-ডি (পাঞ্জাব)
" নির্ম্মলকান্তি মজুমদার এম্-এ
" যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ পুরাতত্ত্ব-বিশারদ
" বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্-এ, বি-এল্
" অতুলকৃষ্ণ সুর এম্-এ,
চৌধুরী আমানতুল্লা আমেদ, [কোচবিহার]

ইতিহাস (মধ্যযুগ)

স্যর্ শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্-এ
ডাঃ " সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্-এ, পিএচ্-ডি, ডি-লিট্
" " কালিকারঞ্জন কানুনগো এম্-এ, পিএচ্-ডি, [ঢাকা]
" " বিমানবিহারী মজুমদার এম্-এ, পি-আর্-এস্, [পাটনা]

শিলালিপি ও তাম্রশাসন

" " রাধাগোবিন্দ বসাক এম্-এ, পিএচ্-ডি
" " নলিনীকান্ত ভট্টশালী " " [ঢাকা]

লিপিতত্ত্ব

ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, ডি-লিট্ (লণ্ডন)
" " রাধাগোবিন্দ বসাক এম্-এ, পিএচ্-ডি
" " রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্-এ, পিএচ্-ডি, [ঢাকা]

মূর্ত্তিতত্ত্ব

ডাঃ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্-এ, পিএচ্-ডি, [ঢাকা]
ডাঃ „ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য রাজরত্ন, এম্-এ, পিএচ্-ডি,
রায়বাহাদুর „ রমাপ্রসাদ চন্দ বি-এ
„ হরিদাস মিত্র এম্-এ,

শিল্প ও ললিতকলা

ডাঃ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
” অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ
” নীহাররঞ্জন রায় এম্-এ, পি-আর্-এস্
” মুকুলচন্দ্র দে
” যামিনীকান্ত সেন বি-এল্
” দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, [মান্দ্রাজ]
” অরুণচন্দ্র সেন বার-এ্যাট্-ল, বি-এ (কান্টাব)
„ দেবপ্রসাদ ঘোষ এম্-এ
„ নির্ম্মলকুমার বসু এম্-এ

অর্থশাস্ত্র ও অর্থনীতি (বার্ত্তাশাস্ত্র)

ডাঃ কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্-এ, পিএচ্-ডি
ডাঃ „ ভানুভূষণ দাসগুপ্ত এম্-এ, পিএচ্-ডি, [সিংহল]
„ বিনয়কুমার সরকার এম্-এ
ডাঃ „ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, পি এচ্-ডি, [লক্ষ্ণৌ]
ডাঃ „ উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্-এ, পিএচ্-ডি
ডাঃ এচ্. কে. দেব ডি-এস্‌সি, [ঢাকা]
ডাঃ „ নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, পিএচ্-ডি
„ বিমানবিহারী মজুমদার এম্-এ, পি-আর্-এস্
„ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম্-এ, বি-এল্
„ নির্ম্মলকান্তি মজুমদার এম্-এ
„ লোকেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্-এ, [আগ্রা]

রসায়ন ও পদার্থ-বিজ্ঞান

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ
„ প্রশান্তকুমার মহলানবিশ এম্-এ, বি-এস্‌সি, আই-ই-এস্
„ সত্যেন্দ্রনাথ বসু এম্-এস-সি, [ঢাকা]
ডাঃ „ বিমানবিহারী দে এম্-এ, ডি-এস্‌সি, [মান্দ্রাজ]
ডাঃ „ সর্ব্বাণীসহায় গুহ সরকার এম্-এ, ডি-এস্‌সি (লণ্ডন), [ঢাকা]
ডাঃ „ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম্-এ, ডি-এস্‌সি, [ঢাকা]
ডাঃ „ সুরেশচন্দ্র দেব এম্-এ, ডি-এস্‌সি
„ সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি-এস্‌সি
„ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি-এস্‌সি
„ অরবিন্দ ঘোষ এম্-এ

জীব-বিজ্ঞান

ডাঃ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার এম্-এস্‌সি
„ শম্ভুশরণ চৌধুরী এম্-এ, [পাটনা]

নৃ-তত্ত্ব

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি-এ
রায়বাহাদুর „ শরচ্চন্দ্র রায় এম্-এ, [রাঁচি]
ডাঃ ” ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম্-এ, পিএচ্-ডি
” শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য এম্-এ

পক্ষী-তত্ত্ব

ডাঃ ” সত্যচরণ লাহা এম্-এ, পিএচ্-ডি

উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান

” অমূতোষ দাশগুপ্ত এম্-এ
” গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার এম্-এস্‌সি
” শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ

মনোবিজ্ঞান

ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এম্-এ, এম্-ডি
ডাঃ ,, গিরীন্দ্রশেখর বসু এম্-এ, পিএচ্-ডি
,, রঙীন হালদার এম্-এ, [পাটনা]

আবহ-বিজ্ঞান

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেন এম্-এ, পিএচ্-ডি [আলীপুর মানমন্দির]
,, নৃসিংহপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম্-এস্-সি; [আলীপুর মানমন্দির]

শিক্ষা-বিজ্ঞান

স্যর্ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্-এ, ডি-এল্, সূরিরত্ন
শ্রীযুক্তা তটিনী দাশ এম্-এ, পি-আর্-এস্
রায়সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্-এ
ডাঃ ” সুবিমল সরকার এম্-এ, ডি-ফিল্ (লণ্ডন), [পাটনা]
” অনাথ বসু এম্-এ
” জিতেন্দ্রমোহন সেন এম্-এ

গণিতশাস্ত্র

ডাঃ শ্রীযুক্ত নিখিলরঞ্জন সেন এম্-এস্‌সি, ডি-এস্‌সি (কলি), পিএচ্-ডি
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম্-এ
ডাঃ „ সুকুমাররঞ্জন দাশ এম্-এ, পিএচ্-ডি
„ করুণাময় খাস্তগীর এম্-এ

জ্যোতির্বিজ্ঞান

শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ
” বিপিনবিহারী জ্যোতিঃশাস্ত্রী
ডাঃ ” সুকুমাররঞ্জন দাশ এম্-এ, পিএচ্-ডি
” গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
” প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্-এ

ভৈষজ্য-বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্র

কবিরাজ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মল্লিক কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ
রাজবৈদ্য „ প্রভাকর চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, ভিষগাচার্য্য
কবিরাজ ” রাখালদাস সেন কাব্যতীর্থ, শাস্ত্রী
কবিরাজ ” বিমলানন্দ তর্কতীর্থ
কবিরাজ ” অমিয়ানন্দ সরস্বতী, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
কবিরাজ ” কৃষ্ণপদ ভট্টাচার্য্য সরস্বতী, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
ডাঃ ” সরসীলাল সরকার এম্-এ, এম্-ডি
ডাঃ „ হেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, এম্-বি
ডাঃ „ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম্-বি
ডাঃ „ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এফ্-আর্-ই-এস্ (লণ্ডন)
ডাঃ „ কুঞ্জবিহারী দে এম্-বি (হোমিও)

স্বাস্থ্যতত্ত্ব

ডাঃ ” রমেশচন্দ্র রায় এল্-এম্-এস্

কৃষিতত্ত্ব

রায়সাহেব ” দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

ভূতত্ত্ব

” নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্-এ,

মিউনিসিপালিটী

শ্রীযুক্ত অমল হোম এম্-এ
” ভাস্কর মুখোপাধ্যায় বি-এস্‌সি (কলি), বি-এ (কান্টাব)

চলচ্চিত্র

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব
” শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
” শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বেতার

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার এম্-এ
[illegible]

ভাষাতত্ত্ব

ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ,ডি-লিট্(লণ্ডন)
ডাঃ ,, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্-এ, ডি-লিট্(পারি),[ঢাকা]
,, সুকুমার সেন এম্-এ, পি-আর্-এস্
,, মনোমোহন ঘোষ এম্-এ
ডাঃ ,, বটকৃষ্ণ ঘোষ এম্-এ, পিএচ্-ডি, [ঢাকা]

সংস্কৃত-সাহিত্য

পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্-এ
" সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্-এ, [রঙ্গপুর]
" চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ, এম্-এ
" সুকুমর সেন এম্-এ, পি-আর্-এস্
" মনোমোহন ঘোষ এম্-এ

নাট্যশাস্ত্র

শ্রীযুক্ত অশোকনাথ ভট্টাচার্য্য বেদান্ততীর্থ, শাস্ত্রী, এম্-এ, পি-আর্-এস্
শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ এম্-এ
ডাঃ " জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত এম্-এ, পিএচ্-ডি
" মন্মথমোহন বসু এম্-এ
" শিশিরকুমার ভাদুড়ী এম্-এ
,, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অলঙ্কারশাস্ত্র

ডাঃ শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এম্-এ, পিএচ্-ডি
" মনোমোহন ঘোষ এম্-এ,

উৎকল-সাহিত্য

,, গোপালচরণ প্রহরাজ এম্-এ, বি-এল্, [কটক]
,, কুমুদবন্ধু সেন এম্-এ, [পুরী]
,, প্রিয়রঞ্জন সেন এম্-এ, পি-আর্-এস্

অসমীয়া-সাহিত্য

শ্রীযুক্ত বাণীকান্ত কাকতী এম্-এ, [আসাম]

গুজরাটী ও মরাঠী-সাহিত্য

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দে, [অকোলা]
,, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য এম্-এ

ইস্‌লামধর্ম্ম ও সাহিত্য

ডাঃ শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্-এ, ডি-লিট্ (পারি), [ঢাকা]
ডাঃ ,, আব্দুল গফুর সিদ্দিকী
ডাঃ ,, কালিকারঞ্জন কানুনগো এম্-এ, পিএচ্-ডি, [ঢাকা]
ঃ ,, এনামুল হক এম্-এ, পিএচ্-ডি

চীনা ও তিব্বতী-সাহিত্য

ডাঃ ,, নলিনাক্ষ দত্ত এম্-এ, পিএচ্-ডি, ডি-লিট্ (লণ্ডন)
ডাঃ ,, প্রবোধচন্দ্র বাগচী এম্-এ, ডি-লিট্ (পারি)

পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্য

ডাঃ শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঘোষ বি-এস্‌সি, ডি-লিট্, [জেনেভা]
,, ,, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, পিএচ্-ডি
ডাঃ ,, কানাইলাল গাঙ্গুলী এম্-এ, পিএচ্-ডি (মিউনিক্)
,, তারাপদ মুখোপাধ্যায় এম্-এ
ডাঃ ,, কালিদাস নাগ এম্-এ, ডি-লিট্

বাঙ্গালা-সাহিত্য

রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি-এ, ডি-লিট্
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
রায়বাহাদুর " খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্-এ
,, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, [কাশী]
,, পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর
ডাঃ ,, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, ডি-লিট্ (লণ্ডন)
ডাঃ শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, পিএচ্-ডি
,, প্রিয়রঞ্জন সেন এম্-এ, পি-আর্-এস্
,, সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, [ঢাকা]
ডাঃ ,, তমোনাশ দাশগুপ্ত এম্-এ, পিএচ্-ডি
,, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী এম্-এ, বি-এল্
,, বিভূতিভূষণ বসু বি-এ
,, সুকুমার সেন এম্-এ, পি-আর্-এস্
,, শিবরতন মিত্র, [বীরভূম]
,, মোহিতলাল মজুমদার বি-এল্, [ঢাকা]
,, হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন
,, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্-এ, [রঙ্গপুর]

সহজিয়া-সাহিত্য

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম্-এ

পদাবলী ও কীর্ত্তন

পণ্ডিত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর, [শ্রীখণ্ড]
শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী
রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্-এ
,, সুধীর রায় বার-এ্যাট্-ল
,, সুকুমার সেন এম্-এ, পি-আর্-এস্
,, হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন

জীবনী

,, শিবরতন মিত্র, [বীরভূম]
,, সুকুমার সেন এম্-এ, পি-আর্-এস্
,, চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ, এম্-এ
,, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন

রাজনীতি

,, দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ
,, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
,, প্রফুল্লকুমার সরকার

ব্যবহার-শাস্ত্র

স্যর্ ,, দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সূরিরত্ন, এম্-এ, ডি-এল্
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, [কাশী]
স্যর্ শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায়, [আলাহাবাদ]
ডাঃ ,, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্-এ, বি-এল্
,, অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্-এ, বি-এল্
,, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্-এ, ডি-এল্

আলোকচিত্র

,, পরিমলচন্দ্র গোস্বামী এম্-এ

মল্লক্রীড়া

,, গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্
,, পুলিনবিহারি দাস
,, বনগোপাল মিত্র

খাদ্যতত্ত্ব

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম্-এ
ডাঃ ,, রমেশচন্দ্র রায় এল-এম্-এস্

স্ত্রীশিক্ষা

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী
" তটিনী দাশ এম্-এ, পি-আর্-এস্
" কল্যাণী দেবী

সঙ্গীত

সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বকোষ

প্রথম ভাগ

অ

অ[১] ভারতীয় বর্ণমালার প্রথম অক্ষর। শুধু ভারতীয় নহে ইরাণীয়, ইটালীয়, হেলেনিক, টিউটনিক, কেল্টিক, স্লাভনিক ও সেমেটিক বর্ণমালাসমূহের আদ্যক্ষর "অ"। উপনিষদে লিখিত আছে "অকারঃ প্রথমাক্ষরো ভবতি" (রামোত্তরতা° উপ° ২)। অ, ই, উ এই তিনটী মূল ধ্বনি। যখন আমরা শরীরের ভিতর দিয়া স্বর উচ্চারণ করিতে যাই, তখন বায়ুকোষ (lungs) হইতে বায়ু মুখ-বিবর (mouth) দিয়া বাহির হইবার উপক্রম করে। এই প্রচেষ্টায় ইহা বাগ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আঘাত করে। এই আঘাত বাগ্‌যন্ত্রের যে অংশে যে ভাবে হয়, তদনুসারে শব্দের উচ্চারণের পার্থক্য হইয়া থাকে। এই প্রকারে বিভিন্ন শব্দ উৎপন্ন হয়। প্রথমে বায়ু কণ্ঠে আহত হয়, তাহাতে "অ" উচ্চারিত হইয়া থাকে; তারপর তালুতে আহত হইয়া "ই", পরে ওষ্ঠে আহত হইয়া "উ" উচ্চারিত হইয়া থাকে। অকার প্রথমেই উচ্চারিত হয় বলিয়া তাহাই আদ্যক্ষর হইয়াছে। সংস্কৃত বা অন্যান্য প্রাকৃত ভাষায় অকারের ব্যবহার অন্যান্য সকল স্বরবর্ণ অপেক্ষা অধিক। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"অক্ষরাণাম্ অকারোঽস্মি" (গীতা ১০.৩৩)—অক্ষর সকলের মধ্যে আমি অ-কার। ইহাতে অকারের শ্রেষ্ঠত্ব ও ব্যাপকত্ব সূচিত হইতেছে।* সকল ব্যঞ্জনবর্ণই অকারের সহযোগে উচ্চারিত হইয়া থাকে।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই অকারের প্রকৃত উচ্চারণ লইয়া যথেষ্ট গোলযোগ রহিয়া গিয়াছে। অ, ই, উ এই তিনটী হ্রস্ব স্বর। "ই"র দীর্ঘ "ঈ", "উ"র দীর্ঘ "ঊ"; কিন্তু "অ"র দীর্ঘ একটী দীর্ঘ "অ" না হইয়া "আ" হইল কেন? দুইটী "ই"কার ও দুইটী "উ"কারের মিলন বা সন্ধি হইলে যথাক্রমে ঈ ও ঊ হয়; কিন্তু দুইটী অকার মিলিত হইলে হয় "আ"। সুতরাং দেখা যাইতেছে এই "আ"কারের হ্রস্ব উচ্চারণই "অ"-কারের প্রকৃত উচ্চারণ। প্রাতিশাখ্যসমূহে অ এবং আ "সমানাক্ষর" এবং "সবর্ণ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে অর্থাৎ তাহাদিগের উচ্চারণ-স্থান ও উচ্চারণ-প্রণালী একই। বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতের অধিকাংশ দেশের পণ্ডিতগণ সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ করিতে গিয়া "অ"-কারের ঐরূপ উচ্চারণই করিয়া থাকেন।

যে সমস্ত বর্ণের উচ্চারণ-স্থান ও প্রযত্ন সমান তাহারা

---

* "অক্ষরাণামকারস্ত্বং স্ফোটস্ত্বং বর্ণসংশ্রয়ঃ"—হরিব° ১৬.৫২ ; 'অকারো, বৈ সর্বা বাক্'—শিষ্টসম্মতশ্রুতি (মাণ্ডূক্যভাষ্যের টীকায় আনন্দগিরি কর্তৃক উদ্ধৃত এবং গীতায় ১০.৩৩ শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীধরাদি-ধৃত)।

পরস্পর সবর্ণ। স্বরবর্ণের অষ্টাদশ প্রকারভেদ সত্ত্বেও সাবর্ণ্যের কোন বাধা হয় না। কিন্তু প্রযত্ন-ভেদ থাকিলেও হ্রস্ব অকার ও দীর্ঘ অকারে সাবর্ণ্যের বাধা হইয়া থাকে। পাণিনীয় শিক্ষায় আছে, প্রযত্ন চারি প্রকার—স্পৃষ্ট, ঈষৎস্পৃষ্ট, বিবৃত ও সংবৃত। স্বরবর্ণের উচ্চারণে বিবৃত প্রযত্নেরই আবশ্যক; কেবল হ্রস্ব অকারের প্রয়োগাবস্থায় সংবৃত এবং প্রক্রিয়া অবস্থায় বিবৃত উচ্চারণ হইয়া থাকে। শব্দের দুইটী অবস্থা—একটী প্রক্রিয়া অবস্থা আর একটী সিদ্ধাবস্থা বা প্রয়োগ। প্রক্রিয়াবস্থায় অ-কারের বিবৃত উচ্চারণ স্বীকৃত হইয়াছে। বাঙ্গলায় হ্রস্ব অবর্ণের প্রয়োগে এই প্রক্রিয়াবস্থার অস্তিত্ব দেখা যায় না।

হ্রস্ব অবর্ণের সংবৃতরূপে উচ্চারণ করিবার সময় ওষ্ঠ সংবৃত করিতে হয়। তাহাতে কণ্ঠ্য অবর্ণ কণ্ঠৌষ্ঠ্যে পরিণত হয়। দীর্ঘ অবর্ণ উচ্চারণ করিবার সময় ঐরূপ করিতে হয় না। এই জন্য উহা কণ্ঠ্যই থাকিয়া যায়।

অকারের বিবৃত উচ্চারণ বাঙ্গলা ভাষায় নাই। সেরূপ উচ্চারণ করিতে হইলে হ্রস্ব আ উচ্চারণ করিতে হয়। বেদে এইরূপ উচ্চারণই অধিক। বাজসনেয়ী ও অথর্বপ্রাতিশাখ্যে পাওয়া যায় যে, অকারের সংবৃত অর্থাৎ একটু ও-ঘেঁসা বাঙ্গলা ধরণের উচ্চারণও ঋগ্বেদের সময়ে ছিল। পশ্চিমাঞ্চল ও মহারাষ্ট্রে বিবৃত উচ্চারণ খুব প্রচলিত। তেলেগু ও তামিলেও তাই। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ অকারের বিবৃত উচ্চারণ করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশে দীর্ঘ-অ উচ্চারণ করিবার সময় বিবৃত উচ্চারণই হইয়া থাকে। এই উচ্চারণ আরও একটু দীর্ঘ করিলে আ হইয়া যায়। প্রাচীন ইরাণী ভাষায় সংবৃত উচ্চারন নাই—শুধুই বিবৃত।

অকারের প্রযত্ন সংবার। আকারের প্রযত্ন বিবার; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অকার এবং আকার এই উভয় প্রযত্নের পার্থক্য আছে; কাজেই "অইউণ্" এই মাহেশ্বর-সূত্রে অকারের বিবৃত উচ্চারণ উপদেশ করা হইয়াছে। তাহা না করিলে অকার কোনও প্রকারেই আকারকে সবর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারে না।

দেখা যাইতেছে, অকার দুইভাবে উচ্চারিত হয়—(১) কণ্ঠনালী সংবৃত অর্থাৎ সঙ্কুচিত করিয়া ও (২) উহা বিবৃত অর্থাৎ প্রসারিত করিয়া। আমরা বাঙ্গলা ভাষায় "পট" উচ্চারণ করিতে প-সংযুক্ত যে অকার উচ্চারণ করি তাহা অনেকটা ইংরেজী potএর ন্যায়। ইহাই অকারের সংবৃত উচ্চারণ। বাঙ্গলা ভাষায় আমরা "পটু" শব্দটীতে প-সংযুক্ত যে অকার উচ্চারণ করি তাহা ঐ সংবৃত উচ্চারণের পরিণতি। "পট" উচ্চারণ করিতে অকারের ভিতর যে ওকারের ইঙ্গিত আছে তাহাই এই "পটু" শব্দে স্পষ্টতঃ হ্রস্ব ওকারে পরিণত হইয়াছে। বহু পূর্ব্বকাল হইতেই অকারের এই বিবৃত উচ্চারণ হইত। পাণিনির শেষ সূত্র "অ অ" (৮.৪.৬৮) হইতে ইহা বেশ বুঝা যায়। এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, ব্যাকরণের প্রক্রিয়ার সময় অকারের বিবৃত (open) ও প্রয়োগের সময় উহার সংবৃত (close) উচ্চারণ করিতে হয়। পাণিনির প্রথম সূত্রের আলোচনায় বার্ত্তিককার ও ভাষ্যকার ইহা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন।

প্রাতিশাখ্যসমূহ হইতে বেশ বুঝা যায় যে, তৎকালে অকারের সংবৃত ও বিবৃত উচ্চারণ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত (অ° প্রা° ১.৩৬ ; বা° প্রা° ১.৭২, ১.৪৩-৪৪ ; আ° প্রা° ১.১১ ; তৈ° প্রা° ১.২৩)। পাণিনীয় শিক্ষার "সংবৃতং মাত্রিকং জ্ঞেয়ং বিবৃতং তু দ্বিমাত্রিকম্" এই বচন হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সংবৃত উচ্চারণ অপেক্ষা বিবৃত-উচ্চারণকাল দীর্ঘ। "Leberbuch der Phonetik" গ্রন্থে গ্রন্থকার Jespersen সাহেব লিখিয়াছেন যে, বৈজ্ঞানিক শব্দ-পরিমিতি-যন্ত্র দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, সংবৃত স্বর অপেক্ষা বিবৃত স্বর উচ্চারণ করিতে অধিক সময় লাগে।

গ্রীক বা চৈনিক ভাষায় সংস্কৃত শব্দগুলি লিখিবার সময় বৈদেশিকগণ অকারের ব্যাবহারিক উচ্চারণ গ্রহণ করিয়াছেন অর্থাৎ অকার-স্থলে ওকার ও আকার লিখিয়াছেন। আবার গ্রীক আ ভারতীয় ভাষায় অকার দ্বারা লিখিত হইয়াছে। বৈদিক যুগেও অকারের এই বিবৃত উচ্চারণ যে বর্ত্তমান ছিল তাহা ষোড়শ (ষট্+দশ), বোঢ়ম্ (বহ্+ক্ত) ইত্যাদি বহু শব্দ হইতে ইহা বেশ বুঝা যায়।

অবেস্তার বোহু (বসু), মোষু (মক্ষু) প্রভৃতি শব্দ হইতে বুঝা যায় যে, এই সকল ভাষাতেও এই বিবৃত উচ্চারণ বর্ত্তমান ছিল।

ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত প্রাদেশিক ভাষাতেই অকার-স্থানে ওকারের ব্যবহার দেখা যায়। যথা, বাঙ্গলায় মোড়ল (মণ্ডল), ভোমরা (ভ্রমর), বোন (ভগিনী), মরাঠী ভাষায় বোকড় (বর্কর), বোকল (বকুল) ইত্যাদি। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, অকারের ওকারের ন্যায় উচ্চারণ বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম প্রাদেশিক ভাষাতেও প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

ভারতের সকল প্রাদেশিক ভাষাতেই অকারের বিবৃত উচ্চারণের যথেষ্ট প্রচলন আছে। প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গভাষার আঙ্গার, আকাটা, আকাল, আভাগী বা আবাগী, আবস্থা, আনল, আধিকার, আতিশয়, আতি,

কাঁকণ, বাঁধ প্রভৃতি বহু শব্দ অকারের বিবৃত উচ্চারণই জ্ঞাপন করিতেছে।

অশোকের প্রাদেশিক ধর্ম্মলিপিগুলির শব্দ তুলনা করিলে তৎকালে বিভিন্ন প্রদেশে অকারের কিরূপ বিবৃত ও সংবৃত উচ্চারণ প্রচলিত ছিল তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। শাহাবাজ্‌গঢ়ি ও মন্‌সেরা লিপিতে কিন্তু সর্ব্বত্রই আ, ঈ, ও উ স্থলে যথাক্রমে অ, ই ও উ ব্যবহৃত হইয়াছে।

ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ অপেক্ষা স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিতে অধিকতর সময় লাগে; এই জন্য দ্রুত উচ্চারণ করিতে গিয়া অনেক স্থলে স্বরবর্ণকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পদান্তস্থিত ও পদমধ্যস্থিত অকার অনেকস্থলে উচ্চারিত হয় না—যথা, গাছ, জল, মানুষ, অভিমান, ভগ্নী (ভগিনী), অম্নি (অমনি), ছুট্‌ল (ছুটিল), চল্ল (চলিল) ইত্যাদি। অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাতেও ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। অতি প্রাচীনকালেও এইরূপ উদাহরণ বিরল ছিল না। যথা, রাজন্+অস্= (রাজ্—নস্=রাজ্নস্)=রাজ্ঞঃ (ঋক্ ১.৯১.৩; ১.২২.১৫); লোম্নঃ (ঋক্ ১০.১৬৩.৬); নাম্না (ঋক্ ৬.১৮.৭); ধাম্না, সাম্না, কুমুদ্বৎ, বেতস্বৎ প্রভৃতি অকারের লোপহেতু সাধিত বহু শব্দ বৈদিক সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। এইরূপ অকারের লোপকে গ্রস্ত* অকার বলে। ফরাসী ভাষার e muteএর মত ইহার উচ্চারণ হয় না। এইরূপে বৈদিককাল হইতে প্রাদেশিক ভাষাসমূহে অকারের গ্রস্ত ভাব আসিয়া পড়িয়াছে।

অকারের উচ্চারণ-কালভেদে তিনটী বিভাগ আছে—হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত; তাহাও আবার দুইভাগে বিভক্ত—সানুনাসিক ও অননুনাসিক। আবার স্বরগ্রামের ক্রমানুসারে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত তিনটী বিশেষ বিভাগ আছে; সুতরাং দেখা যাইতেছে বিবৃত ও সংবৃত; হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত; উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এবং সানুনাসিক ও অননুনাসিকভেদে অকারের উচ্চারণ ৩৬ প্রকারে হইয়া থাকে।

সন্ধির ফলে অনেক সময় অকারের লোপ হইয়া থাকে। সংস্কৃত সাহিত্যে ঐ অকারের একটী 'ऽ' চিহ্ন থাকে; বাঙ্গলার আধুনিক বর্ণমালায় ঐ চিহ্ন কতকটা মাত্রাহীন হ(২)র মত। বঙ্গভাষায় লুপ্ত অকারের প্রয়োগ নাই।

বঙ্গভাষায় যেখানে যেখানে অকার গ্রস্ত হয় বা হয় না তাহা নিম্নে বিবৃত হইল† :—

পদান্তে

১। (ক) একাধিক অক্ষর-সমন্বিত অকারান্ত শব্দের অন্ত্যস্থ অকার গ্রস্ত হয়। (খ) কিন্তু অন্ত্য ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে ঋকার, ঐকার বা ঔকার থাকিলে হয় না। যথা—(ক) পাপ, বিবাদ, মহাভারত; (খ) বৃষ, শৈব, সৌধ।

২। অন্ত্য অকারের পূর্ব্বে যদি য থাকে এবং তাহার পূর্ব্বে অকার, আকার বা ওকার ভিন্ন স্বর থাকে, তাহা হইলে অন্ত্যস্থ অকার গ্রস্ত হয় না। যথা—পুণ্য, দেয়; কিন্তু উপায়, হয়, কালোয়।

৩। অন্ত্য অকারের পূর্ব্বে হ থাকিলে তাহা গ্রস্ত হয় না। যথা—বিরহ।

৪। (ক) সংস্কৃত ক্ত-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ শব্দের অ গ্রস্ত হয় না, (খ) কিন্তু বিশেষ্য হইলে হয়। যথা—(ক) হত; (খ) ভূত।

৫। সংস্কৃত তর ও তম প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রায়ই হয় না। যথা—প্রিয়তর ও প্রিয়তম।

৬। অন্ত্য অকারের পূর্ব্বে অনুস্বার, বিসর্গ বা সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে হয় না। যথা—বংশ, দুঃখ, তীর্থ।

৭। আন ও আম-অন্ত ক্রিয়াবাচক তদ্ভব শব্দসমূহের অন্ত্যস্থ অ গ্রস্ত হয় না। যথা—দেখান, ভাঁড়াম।

৮। প্রাকৃতের আল-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণের অন্ত্য অ গ্রস্ত হয় না। যথা—ঘোরাল।

৯। নিম্নলিখিত ক্রিয়াপদগুলির অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয় না।

(ক) অতীতকালের ক্রিয়াপদ; যথা—বলিল।

(খ) ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াপদ; যথা—ধরিব।

(গ) অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষের আদরসূচক ক্রিয়াপদ; যথা—তুমি বল।

(ঘ) বর্ত্তমানে মধ্যমপুরুষের ক্রিয়াপদ; যথা—তুমি কর (অর্থাৎ করিয়া থাক)।

১০। দুই অক্ষরের তদ্ভব বিশেষণ-শব্দসমূহের অন্ত্য অকার প্রায়ই গ্রস্ত হয় না। যথা—বুড় (বৃদ্ধক), মেজ (মধ্যক), খাট (ক্ষুদ্রক)। কিন্তু দুইয়ের অধিক অক্ষর হইলে এই নিয়ম খাটে না। যথা—চিকন।

১১। যে সকল তদ্ভব শব্দ সাধারণ বাঙ্গলায় আকারান্ত কিন্তু কলিকাতার বিভাষায় অকারান্ত, তাহাদের অন্ত্য অ গ্রস্ত হয় না। যথা—কুঁজ (কুঁজা), খুড় (খুড়া)।

১২। পরিমাণবাচক যত, তত, কত প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য অ গ্রস্ত হয় না।

* "জিহ্বামূলে সংযমিতস্বরোঽব্যক্তস্বরো গ্রস্ত ইতি কথ্যতে।"
"গ্রস্তং নিরস্তমবিলম্বিতং নির্হতমম্বুকৃতং ধ্মাতমথো বিকম্পিতম্।
সন্দষ্টমেণীকৃতমর্দ্ধকং দ্রুতং বিকীর্ণমেতাঃ স্বরদোষভাবনাঃ।"—মহাভাষ্য।

† সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (১৩২৫, পৃঃ ২২-৬২)।

১৩। সংখ্যাবাচক ১১ হইতে ১৮ পর্য্যন্ত শব্দগুলির অন্ত্যস্থ অকার গ্রস্ত হয় না।

পদমধ্যে

১৪। দুইয়ের অধিক অক্ষর-বিশিষ্ট যে সকল শব্দের শেষে অকার ভিন্ন স্বর থাকে, তাহাদের উপান্ত্য বা তাহারও অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর অকার হইলে, এই অকার গ্রস্ত হয়। যথা—পাগলী, নাপতিনী।

১৫। অন্ত্য স্বরের পূর্ব্বে য থাকিলে উপান্ত্যস্থিত অ গ্রস্ত হয় না। যথা—বিজয়া।

১৬। যে সকল শব্দের অন্ত্য অ সাধারণ নিয়মে গ্রস্ত হইয়া থাকে, তাহাদের উত্তর তা, তর, বৎ প্রভৃতি তদ্ধিত প্রত্যয় হইলে ঐ অকার গ্রস্ত হয় না। যথা—ভাবুকতা, দূরতর, জলবৎ।

১৭। কিন্তু টা, টী প্রভৃতি প্রত্যয় বা বিভক্তির যোগে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। যথা—একটা।

১৮। সংযুক্তবর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী অকার গ্রস্ত হয় না। যথা—মানবত্রয়।

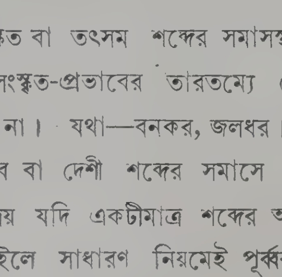
১৯। সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের সমাসস্থলে বিশেষ কোন নিয়ম নাই। সংস্কৃত-প্রভাবের তারতম্যে কোথাও গ্রস্ত হয়, কোথাও বা হয় না। যথা—বনকর, জলধর।

২০। তদ্ভব বা দেশী শব্দের সমাসে বা দ্রুত উচ্চারণে সমস্যমান পদদ্বয় যদি একটীমাত্র শব্দের আকারে প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে সাধারণ নিয়মেই পূর্ব্ববর্ত্তী পদের অকার গ্রস্ত হয়। যথা—মেজদা, বড়দা।

২১। পদ্যে এই সকল নিয়ম বৈকল্পিক।

সুপ্রাচীন ব্রাহ্মীলিপি হইতে উত্তর-ভারতের যাবতীয় বর্ণ-মালার উদ্ভব হইয়াছে। ব্রাহ্মী 𑀅 অকার ক্রমে ক্রমে বিকৃত হইয়া অন্যান্য প্রাদেশিক বর্ণমালার ন্যায় বাঙ্গলার আধুনিক অকারে পরিণত হইয়াছে। [বর্ণমালা দ্র°]।

চীন ও জাপানে অকার বৈরোচন-বীজ বলিয়া কল্পিত। পদ্মোপরি সংস্থিত এই বৈরোচন-বীজের চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।



বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে অকারের রূপ এই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে—দক্ষিণদিক্ হইতে কুণ্ডলী হইয়া কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হইবে; তৎপরে বামভাগ হইতে একটী রেখা আসিয়া দক্ষিণদিক্ হইতে উপরে মাত্রার সঙ্গে মিশিয়া যাইবে। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, যে সময় উক্ত তন্ত্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তখন বাঙ্গলা অকার বা গুজরাটী অকার আধুনিক রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

তন্ত্রসমূহে অকারের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে; যথা—অকার শরৎকালের ন্যায় উজ্জ্বল। ইহার পঞ্চ কোণ আছে—তাহাতে শিব, দুর্গা, সূর্য্য, বিষ্ণু ও গণেশ এই পঞ্চ দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন; ইহা নির্গুণ অথচ ত্রিগুণাত্মক ও মূর্ত্তিমান্ মুক্তিস্বরূপ।

(বর্ণোদ্ধার ও কামধেনু-তন্ত্র)

ভারতচন্দ্র অকারকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন,—"অকার কেবল ব্রহ্ম একাক্ষরকোষে" (অন্নদামঙ্গল) তন্ত্রের মন্ত্রাভিধানে অকারের নাম কথিত হইয়াছে শ্রীকণ্ঠ, সুরেশ, ললাট, একমাতৃক, পূর্ণোদরী, সৃষ্টি, মেধা, সারস্বত, প্রিয়ংবদ, মহাব্রাহ্মী, বাসুদেব, ধনেশ, কেশব, অমৃত, কীর্ত্তি, নিবৃত্তি, বাগীশ, নরক-রিপু, হর, মরুৎ, ব্রহ্মা, বামাক্ষজ, হ্রস্ব, করস্থ, প্রণবাত্মক, ব্রহ্মাণী, কামরূপ, কামেশী, বাসিনী, বিয়ৎ, বিশ্বেশ, শ্রীবিষ্ণু, কণ্ঠ, প্রতিপদ, অংশিনী, অর্কমণ্ডল, বর্ণাদ্য, ব্রাহ্মণ, কামকর্ষিণী।

অকার প্রণবের তিন বীজবর্ণের আদ্যবর্ণ এবং সেইজন্য অকার বিষ্ণুর প্রতীক [ওঙ্কার দ্র°]।

[অথর্বপ্রাতিশাখ্য, বাজসনেয়ী-প্রাতিশাখ্য, ঋক্‌প্রাতিশাখ্য, তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্য, রামোত্তরতাপনী উপনিষৎ, পাণিনি, পাণিনীয়শিক্ষা; Critical studies in the Phonetic observations of Indian Grammarians by Siddheswar Varma; অকার-তত্ত্ব—বিধুশেখর শাস্ত্রী (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৫, পৃঃ ১৩-৬২); ভারতবর্ষের বর্ণমালা—বিজয়চন্দ্র মজুমদার (ঐ, ১৩১৯, পৃঃ ৩৯-৪০); অ—দুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী (ঐ, ১৩১৯, পৃঃ ১৫৯-১৬৩); বঙ্গভাষায় বর্ণযোজনা ও উচ্চারণ—প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ঐ, ১৩১৮, পৃঃ ২৫৩); Vedic Grammar—A. Macdonell (পৃঃ ৬-৭); Hobogirin (পৃঃ ১-৬)]

অ$_2$—(অব্য) নিষেধ, অভাব, অল্প। নঞ্ তৎপুরুষ সমাসে নকারের লোপ হইলে অকার থাকে। শব্দভেদে এই নঞ্‌এর ছয় প্রকার অর্থ হয়। যথা—

"তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা।
অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (দুর্গাদাস)

১। কোন জিনিসের সাদৃশ্য বুঝাইলে, যথা—অব্রাহ্মণ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সদৃশ অন্য কোন জাতি।

২। অভাব বুঝাইলে, যথা—অকর্ণ।

৩। অপর জিনিস বুঝাইলে, যথা—অঘট।

৪। অল্পতা বুঝাইলে, যথা—অনুদরী।

৫। অপ্রাশস্ত্য বুঝাইলে, যথা—অকাল।

৬। বিরোধ বুঝাইলে, যথা—অসুর।

অ, —সম্বোধনকালে অনেকস্থলে সংস্কৃত এবং বঙ্গভাষায় "অ" ব্যবহৃত হয়। যথা, অ গোপাল! অ রাম!

অই, (বা গভরু)—ভুটানের পাহাড় হইতে নির্গত একটী নদী। ইহা প্রথমে দক্ষিণে ও পরে দক্ষিণ-পূর্ব্বে প্রবাহিত হইয়া আসামে খুন্টাঘাট পরগণার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে মানসনদে পতিত হইয়াছে। ইহার দুইটী প্রধান শাখা—বুড়ী অই ও কাণামুক্র। দুইটী শাখাই ইহার বাম তীরে যুক্ত হইয়াছে। এই নদী দিয়া চাউল, সরিষা, ঘাস এবং কাষ্ঠ রপ্তানী হইয়া থাকে এবং দেশের অভ্যন্তরভাগে পণ্যদ্রব্যাদি লইয়া যাওয়া হয়।

অই, —মিশরের এক নৃপতি [মিশর দ্র°]।

অইংকালোং—রেঙ্গুন জেলার একটী নগর। ইহার ভূভাগ সমতল ও নিম্ন বলিয়া অধিকাংশ স্থানই বন্যায় জলপূর্ণ থাকে। এই বন্যাধিকৃত স্থানের সমস্তই প্রসিদ্ধ এঙ্‌তারা অরণ্যে পূর্ণ; কেবল-মাত্র যে উচ্চ ভূভাগে বন্যার জল থাকিতে পারে না, সেখানে অরণ্য নাই—সেস্থানে চাউল, তূলা ও তামাকের চাষ হয়। অইং-কালোংএর পাঁচটী প্রধান জলাভূমির নাম অলাওবৎ, তখারা, কলাওকুন, মথা ও মেঙ্‌লা। ইহার কয়েকটী গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী মৎস্য শিকার করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে।

অইংগী—ব্রহ্মদেশের হেনজাদা জেলার একটী সুবৃহৎ গ্রাম। ইহা দুরা দীঘির উত্তরে অবস্থিত। এখানে প্রচুর চাউল উৎপন্ন হয় ও এস্থানের অধিবাসীরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী।

অইকোট—মান্দ্রাজের একটী নগরী [অয়কোট্ট দ্র°]।

অইজল,, **আইজল**,—আসামের পার্ব্বত্য-লুসাই জেলার সদর মহকুমা। ইহা অক্ষা° ২৩°১′ হইতে ২৪°১৯′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯২°১৬′ হইতে ৯৩°২৬′ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। আয়তন ৪,৮০৬ বর্গমাইল। ১৯৩১ সালের গণনা অনুসারে ইহার জনসংখ্যা ৮৯৩৭৬। তন্মধ্যে পুরুষ ৪২৫৫৩ এবং স্ত্রীলোক ৪৬৮২৩। সমগ্র মহকুমায় মোট ৩৩৯টী গ্রাম আছে।

অইজল, (**গ্রাম**)—আসামের লুসাই জেলার সদর। অক্ষা° ২৩°৪৪′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯২°৪৪′ পূঃ। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৫০০ ফুট উচ্চে পর্ব্বতের এক সঙ্কীর্ণ অধিত্যকায় অবস্থিত। এই স্থান হইতে শিলচর সহর পর্য্যন্ত (১২০ মাইল) একটী সঙ্কীর্ণ পথ আছে, কিন্তু আহারীয় ও পণ্যদ্রব্যাদি ধলেশ্বরী নদী বাহিয়া ইহার ১৩ মাইল দূরবর্ত্তী সৈরাঙ্গ নামক স্থানে লওয়া হয়। ১৯৩১ সালে ইহার লোকসংখ্যা ২৭৪৫ ছিল। আসামের তুলনায় এই স্থানের বারিপাত অধিক নহে এবং সাধারণ আবহাওয়া শীতল ও মনোরম। অইজল স্থানীয় সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণের বাসস্থল। এখানে একজন ইউরোপীয় সেনানায়কের অধীনে একদল মিলিটারি পুলিস থাকে। একটী হাঁসপাতালও আছে। প্রথম প্রথম এই স্থানে জল সরবরাহের অত্যন্ত অসুবিধা হইত, পরে বহু ব্যয়ে বৃষ্টির জল ধরিয়া তাহা হইতে জল সরবরাহের সুবিধা করা হইয়াছে। বাজারে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু ব্যবসায়ী সমবেত হয়।

অইতোন—শ্যাম-চীনশাখার 'তাই' জাতির ভাষা [তাই দ্র°]।

অইয়নবর—দাক্ষিণাত্যের শিবোপাসক সম্প্রদায় (অইয়ন+অবর, অর্থাৎ অইয়নের বা অইয়াননের উপাসক। অইয়ন বা অইয়ানন পঞ্চানন শিবের নাম)। পূর্ব্বে ইহারা অল্‌-কনাডু বা বর্ত্তমান আর্কট নামক স্থানের অধিবাসী ছিল। ১৯০১ সালের মান্দ্রাজের সেন্সস রিপোর্টে ইহারা একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়-ভুক্ত বলিয়া লিখিত হয়। ইহারা গ্রামে বাস করিত না, দুর্গই ইহাদের বাসস্থান ছিল। আম্বুর, বল্লূর প্রমুখ স্থানের দুর্গে ইহারা বসবাস করিত। পরে ইহারা দক্ষিণভারতের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। অবশেষে ইহারা দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কুরে গিয়া এবং তথা হইতে পল্লিবৈকলের নিকট গিয়া অবস্থান করিতে থাকে। বর্ত্তমানে কলকুলম্‌, বিলমনকোড়, নেয্যাতিঙ্কর ও নেতুমঙ্গল তালুকে ইহাদের বসবাস দেখা যায়। ইহারা এখন প্রায় সমস্তই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। গত তিনপুরুষ ধরিয়া ইহাদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রসারিত হইতে আরম্ভ হয়। এত অধিকসংখ্যক অইয়নবর খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে যে, স্বধর্ম্মী অইয়নবর এখন প্রায় বিলুপ্ত। ১৯৩১ সালের সেন্সস্‌-রিপোর্টে দেখা যায় যে, অইয়নবরদের মধ্যে বর্ত্তমান খৃষ্টানদের সংখ্যা ৬৪১৪। উহারা মরুথায়ন্‌ দায়ভাগ মানিয়া চলে।

অইয়নার, —দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ গ্রাম্যদেবতা। ইনি ক্ষেত্রপাল বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত। দক্ষিণদেশের অধিকাংশ গ্রামেই ইঁহার দেউল বর্ত্তমান। আকৃতি মনুষ্যের মত—মুকুট ও রাজদণ্ডধারী। কোথাও কোথাও আবার অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন দেখা যায়। কেহ পীড়িত হইলে বা বিপদে পড়িলে সর্ব্বাগ্রে এই দেবতার পূজা দিয়া থাকে। স্যর্‌ মনিয়র উইলিয়মস্‌ পরমগুডীর অইয়নারমন্দির দেখিয়া তাঁহার "Brahmanism and Hinduism" নামক গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই দেবতার পূজার সময় পশুযাগ ও তর্পণ করা হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও মতে অইয়নার 'হরি-হর' এই দুই নামের সন্ধিজাত বা অপভ্রংশ। অতি

প্রাচীনকাল হইতে এই দেবতার পূজা চলিয়া আসিতেছে। ইনি দ্রাবিড় দেবতা না হইয়া আর্য্য দেবতা হওয়াই সম্ভব। দক্ষিণ-ভারতের বহু তাম্রশাসনে এই দেবতার উল্লেখ আছে। অনেকস্থলে ইনি 'অইয়ন্' নামেও অভিহিত হইয়াছেন।

[South Indian Inscriptions, Vol. II, pp. 48, 49, 61, 63, 65.]

অইয়নার২—কন্নড় প্রদেশের একটী পরগণা। অইয়নার দেবের নাম হইতেই পরগণার নাম অইয়নার হইয়াছে।

অইয়পরাজ—দক্ষিণ কোঙ্কণের শিলাহার বংশের তৃতীয় নৃপতি। ইঁহার পিতার নাম ধম্মিয়র।

[Epigraphia Indica, Vol. III, p. 294 ; Bom. Gaz. Vol. I, pt ii., p. 537.]

অইয়র—মান্দ্রাজের শালেম প্রদেশের একটী নদী। অক্ষা° ১২°৭′ হইতে ১২°৩৯′৪৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৪৯′ হইতে ৭৭°৪৯′১৫″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

অইয়াবেজ—বোম্বাই প্রদেশান্তর্গত কাঠিয়াবাড়ের উন্দ্‌সরিয়া নামক স্থানে অবস্থিত ক্ষুদ্র করদ রাজ্য। ইহাতে অইয়াবেজ ও বীরপুর নামে দুইটী গ্রাম আছে। অইয়াবেজ গ্রাম খোদিয়র মাতের মন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ। এই গ্রামের অক্ষা° ২১°২৪′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৪৭′ পূঃ।

অইয়ূব (আয়ুব)—তুর্কীদেশীয় একজন দরবেশ। হিন্দুস্থানের সুলতান মুইজুদ্দীন বহরম শাহের প্রাসাদস্থিত হৌজে ইনি ফকিররূপে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তথায় ইঁহার সহিত মুইজুদ্দীনের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ঘটিয়াছিল। সুলতান ইঁহার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। অতঃপর ইনি রাজকীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। সুলতানের হৌজে আসিবার পূর্ব্বে ইনি মিহির নগরে বাস করিতেন। তথায় ইনি কাজী সমসুদ্দীন কর্ত্তৃক অপদস্থ হ'ন। তখন ইনি সুলতান মুইজুদ্দীনের সাহায্যে সমসুদ্দীনকে হস্তিপদতলে নিহত করান।

[Tabaqāt-i-Nāsirī, p. 657.]

অইয়ূব (আয়ুব) বিন্-শাদী—সম্পূর্ণ নাম অইয়ূব বিন্-শাদী মলিক-উল্ অফ্‌জল নজ্‌মুদ্দীন অবূ লস্কর। ইনি সামদেশস্থ কুর্দ্দিস নায়কদের অন্যতম শাদীর পুত্র [শাদী দ্র°]। মলিক অসদুদ্দীন ইঁহার ভ্রাতা [অসদুদ্দীন দ্র°]। অইয়ূব ও ইঁহার ভ্রাতা বহুকাল সুলতান নূরুদ্দীনের অধীনে কার্য্য করিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই বহু মহৎ কার্য্য এবং অধর্ম্মের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অইয়ূবএর চারি পুত্র—মলিক শলাহুদ্দীন য়ূসুফ, মলিক আদিল-ই-অবূ-বিকর, শাহন্ শাহ্ ও সইফ-উল্-ইস্‌লাম।

অইয়ূব সামের স্বাধীন অধিপতি ছিলেন। অসদুদ্দীনের মৃত্যুর পর অইয়ূব মিশরে পুত্র শলাহুদ্দীনের সহিত যোগদান করেন। শলাহুদ্দীন তথায় তাঁহার খুল্লতাত অসদুদ্দীন কর্ত্তৃক উজীর পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। শলাহুদ্দীন পিতাকে নিজপদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু অইয়ূব অস্বীকার করিয়া পুত্রকেই উহার যথার্থ অধিকারী নির্দ্দেশ করেন। জি হিজা নামক স্থানে করক'এর বিরুদ্ধে অভিযান-কালে (৫৬৭ হিজরায়) অইয়ূব অশ্ব হইতে পড়িয়া গিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

[Tabaqāt-i-Nāsirī, pp. 207, 208, 215.]

অইরী—মধ্যপ্রদেশের মণ্ডলা জেলান্তর্গত অরণ্যবিভাগ। ইহা সেগুন বৃক্ষে পরিপূর্ণ। ইহাকে বুরনের ও হালোন নামক স্থানের মধ্যভাগেও অবস্থিত বলা যাইতে পারে। আয়তন ৫ বর্গমাইল মাত্র। অক্ষা° ২২°৩৮′ হইতে ২২°৪০′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৪৩′৪৫″ হইতে ৮০°৪৬′৪৫″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

অইবল্লি—[অইহোল্ দ্র°]।

অইহর—অযোধ্যার রায়বরেলি জেলান্তর্গত একটী নগরী। দালমউ হইতে ইহা পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। অইহর গ্রামকে স্থানীয় অধিবাসীরা হুনিয়াগাঁও বলিয়া থাকে।

অইহোল, ঐহোল্—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বিজাপুর জেলার হুন্‌গুন্দ্ তালুকের অন্তর্গত প্রাচীন গ্রাম। ইহার ভৌগোলিক অবস্থান অক্ষা° ১৬°১′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৫৭′ পূঃ। এই গ্রামের প্রাচীন নাম অয্যাবোল, অধুনা ইহাকে অইবল্লি বা অইহোল্ বলে। অইহোল্ হুন্‌গুন্দ্ হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মালপ্রভা বা মলাপহারী নদীর তীরে অবস্থিত। এই গ্রামের জনসংখ্যা প্রায় ২০০০। নদীর তীরে গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটী কুঠারাকৃতি নাতিউচ্চ পর্ব্বত আছে। লোকে বলিয়া থাকে যে, ভার্গব পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া এই স্থানে তাঁহার কুঠার ধৌত করিয়াছিলেন। নদীমধ্যে একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ে এখনও লোকে পরশুরামের পদচিহ্ন দেখাইয়া থাকে। নদীতীরস্থ কুঠারাকৃতি পর্ব্বতের উপর একটী প্রাচীন মন্দির আছে, তাহার নাম মেগুটি বা ম্যাগুটি (মে-গুড়ি, মেল-গুড়ি বা মেলু-গুড়ি) অর্থাৎ "উচ্চস্থানে অবস্থিত মন্দির"। এই পর্ব্বতের উপর অনেকগুলি সমাধিস্তম্ভ রহিয়াছে। পর্ব্বতের পূর্ব্বপ্রান্তে একটী জৈন গুহামন্দির আছে।

মেগুটি মন্দিরের পূর্ব্বদিকের দেওয়ালের বহির্ভাগে একটী শিলালিপি আছে ; তাহা হইতে জানা যায় যে, মন্দিরটী খৃষ্টীয় ৬৩৪ অব্দে পাশ্চাত্ত্য চালুক্যরাজগণের শাসনকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরটী পূর্ব্বে জিনমন্দির ছিল, কিন্তু পরে

ইহাতে শিবলিঙ্গ স্থাপনা করা হইয়াছে। অধুনা মন্দিরটী সংস্কারাভাবে জীর্ণ ও ধ্বংসপ্রায়।

পূর্ব্বোল্লিখিত মেগুটি মন্দিরে যে শিলালিপির উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা ভারতযুদ্ধের ৩৭৩৫ বৎসর পরে ৫৫৬ শকাব্দে চালুক্যসম্রাট্ ২য় পুলিকেশী সত্যাশ্রয়ের শাসনকালে তাঁহার প্রিয় কর্ম্মচারী কালিদাস ও ভারবির ন্যায় খ্যাতনামা কবি রবিকীর্ত্তি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া জৈনদিগের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছিল। এই দানলিপি হইতে আমরা পাশ্চাত্ত্য চালুক্য-রাজবংশের অনেক বিষয় জানিতে পারি। [চালুক্য দ্র°]

অইহোল্ গ্রামটী চালুক্য নৃপতিগণের রাজধানী বাদামী বা বাতাপিপুরের অতি সন্নিকটেই অবস্থিত। খৃষ্টীয় ৭ম ও ৮ম শতকে ইহা খুব সমৃদ্ধিশালী ছিল। এই গ্রামে এখনও অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির ও দুইটী গুহামন্দির আছে।

দুর্গ বা দুর্গামন্দির অইহোলের সমস্ত মন্দিরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উল্লেখযোগ্য। ইহার গঠনপ্রণালীতে একটু বিশেষত্ব আছে। বৌদ্ধ চৈত্যের আকারে এই মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। সাঁচীর বৌদ্ধ চৈত্য-মন্দিরের নক্সার সহিত এই মন্দিরের নক্সার তুলনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, এই দুইটী মন্দিরের কতটা সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। গুহা-চৈত্যের সহিত ইহার কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইলেও স্থাপত্য-চৈত্যের সহিত ইহার বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। হয়দ্রাবাদের নলদুর্গ জেলার টের নামক স্থানের স্থাপত্য-চৈত্যের সহিতও ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত কারণে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, এই মন্দিরটী বৌদ্ধ-স্থাপত্য হইতে হিন্দু-স্থাপত্যের রূপান্তর সূচনা করিতেছে। এই মন্দিরের এক প্রান্ত অর্দ্ধ বৃত্তাকার। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে যে বারান্দা আছে তাহাতে চতুষ্কোণ স্তম্ভসকল বারান্দার ছাদটীকে ধরিয়া রাখিয়াছে। বারান্দার পর মন্দিরের বহির্ভাগের প্রান্তভাগও অর্দ্ধবৃত্তাকার। বহির্গৃহের দেওয়ালের ভিতর গর্ভগৃহ আছে, তাহার মধ্যে দেবতার পীঠ। এই গর্ভগৃহটী বৌদ্ধচৈত্যের স্তূপের স্থান অধিকার করিয়াছে। গর্ভগৃহের সম্মুখে বহির্গৃহের ভিতর দুই পার্শ্বে চারিটী করিয়া আটটী চতুষ্কোণ স্তম্ভ মন্দিরের ছাদটীকে রক্ষা করিতেছে। গর্ভগৃহের উপরে ছাদের একপ্রান্তে মন্দিরের চূড়া। গর্ভগৃহের চতুর্দ্দিকে গর্ভগৃহ ও বহির্গৃহের দেওয়ালের মধ্যে প্রদক্ষিণ-পথ।



অইহোলের দুর্গ বা দুর্গামন্দির

মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপর গরুড়ের মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। ইহাতে অনুমান হয় প্রথমে ইহা বৈষ্ণব মন্দির ছিল। মন্দিরটী একটী ভগ্ন দুর্গ-প্রাকারের ন্যায় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে দুর্গা-মন্দির। পার্ব্বতীর সহিত এ মন্দিরের কোন সংশ্রব নাই। এ মন্দিরের একস্থানে একটী কন্নড় ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপি দেখিয়া অনেকে ভ্রমক্রমে ইহাকে

জৈন মন্দির মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু মন্দিরে চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য সত্যাশ্রয়ের সময়ের একটী শিলালিপি দেখিয়া মনে হয় উহা হিন্দু-মন্দির। চালুক্য-রাজবংশে দুইজন বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিয়াছিলেন। একজন ৬৫৫ হইতে ৬৮০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত, অপরজন ৭৩৩ হইতে ৭৪৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত। এই শিলালিপিটী মন্দির নির্ম্মিত হইবার পর কোন একটা দান উপলক্ষে উৎকীর্ণ; সুতরাং এই লিপির অন্ততঃ অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন, এই মন্দিরটী অন্ততঃ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। এই মন্দিরের স্তম্ভে, প্রবেশদ্বারে ও অন্যান্য অনেক স্থলে অতি উত্তম ভাস্কর্য্যের নিদর্শন আছে।



অইহোলের ভাস্কর-শিল্প (হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি)

অইহোল্ গ্রাম ও তাহার চারিদিকে ন্যূনাধিক ৫০।৬০টী ছোটবড় মন্দির আছে। এ ছাড়া দুইটী গুহামন্দিরও আছে; উহাদের একটী জৈন ও অপরটী শৈব। যে পর্ব্বতে মেগুটি মন্দির আছে সেই পর্ব্বতেই জৈনগুহা অবস্থিত। ঐ গুহার বড় ঘরটী ১৭½ ফুট দীর্ঘ এবং ১৫ ফুট প্রস্থ; তাহার পশ্চাতে একটী ছোট সমচতুষ্কোণ মন্দিরের ভিতর মহাবীরের উপবিষ্ট মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের সম্মুখে দুইটী কারুকার্য্যময় বিশাল স্তম্ভ আছে ও প্রবেশদ্বারের দুই পার্শ্বে দেয়ালে দুইটী দ্বারপাল-মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। মন্দিরটীর ভাস্কর্য্য দেখিয়া তাহা খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে ক্ষোদিত বলিয়া মনে হয়।

শৈব গুহামন্দিরটীর ভিতরেও বহু শিবমূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। এই গুহাটীর নির্ম্মাণকাল জৈনগুহার অনেক পরে বলিয়া মনে হয়। এই গুহার নিকট হুচ্ছিমল্লি-গুডি নামে একটী মন্দির আছে। এই মন্দিরটীর অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা কে ছিলেন নির্ণয় করা কঠিন। মন্দিরের প্রবেশদ্বারে কার্ত্তিকেয়মূর্ত্তি ও গর্ভগৃহের কাঠের উপর গরুড়-মূর্ত্তি দেখিয়া অনেকে মনে করেন উহা বৈষ্ণব-মন্দির। এই মন্দিরের ভিতর কন্নড় ভাষায় লিখিত একটী বৃহৎ শিলালিপি আছে, উহাতে চালুক্যরাজ বিজয়াদিত্যের শাসনকালের ত্রয়োদশ বর্ষে (৭১৮ খৃঃ অঃ) ও তৃতীয় মাসে আশ্বিনপূর্ণিমার দিন তৈল-দানের কথা লিপিবদ্ধ আছে। এই নৃপতি খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রথমদিকে রাজত্ব করিতেন। মন্দিরটীর চূড়া দেখিলে ভুবনেশ্বরের পরশুরামেশ্বর মন্দিরের কথা মনে পড়ে।

এই সমস্ত মন্দির ও গুহামন্দির দেখিলে মনে হয়, এই স্থানে পূর্ব্বে কোন সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। স্থানীয় লাডখাঁর মন্দিরের একটী শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই স্থানটীর নাম ছিল আর্য্যপুর এবং উহা একটী শ্রেষ্ঠ "অধিষ্ঠান" ছিল। [পুলিকেশী ও চালুক্য দ্র°]

[Archæological Survey of Western India, Vol. I. pp. 37-40; Epigraphia Indica, Vol. VI, p. 1 ff; Indian Antiquary, Vol. VIII, p. 67 ff., 237 ff, 285 ff. Indian & Eastern Architecture, Vol. I, pp. 319, 320, 321, 356 & Vol. II, pp. 18, 70, 119; Ancient and Medieval Architecture of India—E. B. Havell, pp. 67-69, pp. 176-177; Chalukyan Architecture—A. Rea.]

অও—দামোদর নদের শাখা; বরাকরের উপশাখা।

অওঘর—দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী ব্রহ্মগিরি কর্ত্তৃক গুজরাট প্রদেশে স্থাপিত এক শৈব সম্প্রদায়। ব্রহ্মগিরি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে গোরক্ষনাথ নামক শিবাবতার বলিয়া পূজিত সাধুর কৃপাপাত্র ছিলেন। ইঁহারা ইচ্ছানুরূপ কাহাকেও শিষ্যশ্রেণীভুক্ত করেন না। কোনও মঠের মহান্তের মৃত্যু হইলে অপর কোন সন্ন্যাসীকে অভিষেক করিয়া উক্ত পদ দেওয়া হয়। কথিত আছে যে, গোরক্ষনাথ ব্রহ্মগিরিকে তাঁহার কর্ণাভরণ ও অন্যান্য দ্রব্য সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। ব্রহ্মগিরি আবার গুদর, সুখর, রুখর, ভূখর ও কুকর নামক পাঁচজন শিষ্যের মধ্যে তাহা ভাগ করিয়া দেন। এই পাঁচজন শিষ্য পাঁচটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। গোরক্ষনাথেরই আর একটী নাম অওঘর। তাঁহারই নাম হইতে এই সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে। কুকর ও ভূখর সম্প্রদায়ীরা অন্য তিনটী সম্প্রদায়ের মত ভিক্ষাপাত্রে ধূনা পোড়ান না। কুকর সম্প্রদায়ীরা নূতন

হাঁড়িতে ভিক্ষা করিয়া তাহাতেই রন্ধন করিয়া আহার করেন।

অওন্‌লা,—বরেলি জেলান্তর্গত একটী তহশীল। অক্ষা° ২৮°১০′ হইতে ২৮°৩১′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৫৮′ হইতে ৭৯°২৬′ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। আয়তন ৩১৮ বর্গমাইল; তন্মধ্যে অধিকাংশই কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই তহশীলে অওন্‌লা, বালিয়া, সনেহা এবং শিরৌলী নামক চারিটী পরগণা, তিনটী নগর ও ৩৪৩টী গ্রাম আছে। ১৯৩১ সালের গণনায় লোকসংখ্যা ২০৫৫৭৩। রামগঙ্গা নদী ইহার উত্তর ও পূর্ব্ব এবং অরিল নদী দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্ দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় এইস্থান খুব উর্ব্বর হইয়া উঠিয়াছে।

অওন্‌লা, **আম্‌বলা**—বরেলি জেলান্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। অওন্‌লা তহশীলের সদর। অক্ষা° ২৮°১৬′২৫″ উঃ; দ্রাঘি° ৭৯°১২′২৫″ পূঃ। আয়তন ১২৮ একর। বরেলির ১৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অরিল নদীর একটী শাখার তীরে অবস্থিত। খৃষ্টীয় ১৪শ ও ১৫শ শতকে নিকটবর্ত্তী আম্‌লার (Phyllanthus Emblica) জঙ্গলে কাঠুরিয়াগণের বাসস্থান ছিল। আম্‌লা গাছ হইতেই সম্ভবতঃ এই নগরের নামকরণ হইয়াছে। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে রোহিলা-নায়ক আলি মুহম্মদ কাঠুরিয়ারাজ দূজা সিংহকে নিহত করিয়া স্বয়ং অওন্‌লায় বাস করিতে থাকেন। ইহাতে অওন্‌লা সমগ্র রোহিলখণ্ডের রাজধানী বলিয়া গণ্য হইল। আলি মুহম্মদ ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। তাঁহার শিল্পকার্য্য-যুক্ত সুবৃহৎ কবরস্থান এখনও বর্ত্তমান।

অও-পই (Ao-pai)—চীনদেশীয় সম্রাট্ স্থন্-সি'র মন্ত্রী। কাঙ্-সি যখন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন, তখন ইনি চারিজন নিযুক্ত রাজ-প্রতিনিধির মধ্যে অন্যতম ছিলেন। রাজকীয় অসন্তোষের জন্য ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে ইনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হ'ন।

অওরনস্—প্রাচীন নগর। বর্ত্তমান নাম রাণীগৎ। জেনারল কানিংহামের মতে ইহা পঞ্জাব জেলান্তর্গত পেশাবরের ওহিন্দ্ নামক স্থানের ১৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। কাপ্তেন জেমস্ আবট্ নির্দ্দেশ করেন যে, ইহা পেশাবরের ৭০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধুনদের পশ্চিমপারে অবস্থিত মহাবল পর্ব্বতের শাহকোট নামক স্থান। সম্ভবতঃ ইহা পাণিনির 'বরণ' (পা ৪.২.৮২) নামক স্থানের অপভ্রংশ। এই বরণ নগর সিন্ধুনদের পশ্চিমতীরে এখনও বর্ত্তমান।

[Indian Antiquary, Vol. I, p. 22; Smith's Early History of India, p. 68; Cunningham's Ancient Geography of India, p. 58.]

অওস্—নাগ জাতি-বিশেষ। নাগগণ আসামের পূর্ব্বসীমান্ত পর্ব্বতশ্রেণীতে বাস করে। ইহাদের মধ্যে অওস্ একটী শাখা।

অংশ,—[অন্‌শ্ (ভাগ করা)—অচ্ (ভা°)। তু°—প্রা°জর্মন ahsala; আ°জর্মন achsel; লা° axilla। স্কন্ধ অর্থে তু°—গ্রী° umos; লা° humerus, ansa; গথি° amsa; আর্মে° us], ১ ভাগ। ২ বিভাগ; বণ্টন। ৩ স্থান; নির্দ্দিষ্ট স্থল। ৪ একদেশ; অঙ্গ; অবয়ব। ৫ খণ্ড; টুকরা। ৬ শরীর বা যন্ত্রাদির প্রত্যঙ্গ। ৭ রূপ; মূর্ত্তি; অবতার। ৮ অক্ষাংশ। ৯ [অঙ্কশা°] ভগ্নাংশ (fraction)। ১০ রাশিচক্র বা বৃত্তপরিধির ৩৬০ ভাগের এক ভাগ (degree)। ১১ রাশিচক্রের ত্রিংশভাগের এক ভাগ; এই অর্থে 'অংশক'ও হয়। ১২ উষ্মার এক ভাগ (degree of temperature)। ১৩ পক্ষ; বিষয়; সম্বন্ধ; প্রকার। ১৪ স্কন্ধ; কাঁধ (অথর্ববেদ ২.১.১০.) [অংস দ্র°]। ১৫ তেজঃ; বীর্য্য; প্রভাব। ১৬ ভাজ্যাঙ্ক। ১৭ ভগ্নাংশের লব (Numerator)। ১৮ [বঙ্গীয় কুলগ্রন্থ-পরিভাষায়] বৈবাহিক আদানপ্রদান বা দানগ্রহণ সম্বন্ধ। ১৯ [বেদে] আদি মাতা অদিতির ছয় পুত্রের অন্যতম। এই ছয় পুত্র আদিত্য নামে প্রসিদ্ধ। ২.২৭.১ ঋকে ছয়জন আদিত্যের নাম—মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ। ৯ম মণ্ডলের ১১৪ সূক্তে ও ১০ম মণ্ডলের ৭২ সূক্তে বৈদিক আদিত্য সাতজন। পরে আদিত্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া অথর্ববেদে (৪.৯.২১) ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১. ১. ৯. ১) আট হয়। এই আটজন আদিত্যের নাম—ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান্। শতপথব্রাহ্মণেও মার্ত্তণ্ডকে লইয়া আটজন আদিত্যের কথা আছে। পরে আদিত্যের সংখ্যা হইল দ্বাদশ। এই দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ মাস (১১.৬.৩.৮)। তারপর মহাভারত (আদি ১২১ অঃ) ও পুরাণে (বিষ্ণুপু° ১.১৫.১০) দ্বাদশ আদিত্যের নাম পাওয়া যায়। বিষ্ণু-পুরাণমতে, এই দ্বাদশ আদিত্য চাক্ষুষ মন্বন্তরে তুষিত নামে অভিহিত ছিলেন, পরে বৈবস্বত মন্বন্তরে আদিত্য নাম লাভ করেন। মহাভারত মতে অংশ ষষ্ঠ আদিত্য ও হরিবংশ মতে নবম ও একাদশ। ২০ [বেদে] অগ্নির নামান্তর (ঋক্ ২.১.৪)। ২১ সূর্য্যের নামান্তর [মহাভা°, সহস্রনাম]। ২২ পুরুহোত্রের এক পুত্র। অংশের পুত্র সত্বত হইতে প্রসিদ্ধ সাত্বতবংশ (বিষ্ণুপু° ৩.১২)। ২৩ সোমপায়ী ক্রতুসুতগণের অন্যতম (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৬৮.১১)। ২৪ খাণ্ডবদহনকালে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধকারী (মহাভা°, আদি ২২৭ অঃ)। ২৫ স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় একজন প্রজাপতি (পদ্মপু°, সৃষ্টি ৮ অঃ)।

অংশ₂—[অর্থশা°] কোন যৌথ কারবারের প্রস্তাবিত মূলধনকে কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়া প্রত্যেক ভাগকে অংশ বা 'শেয়ার' (Shares) নামে অভিহিত করা হয়। কোন ব্যবসা বা শিল্পকার্য্য চালাইবার জন্য যৌথ কারবার গঠন করিয়া অংশ বিক্রয় দ্বারা তাহার মূলধন সংগ্রহ করা হয়। যত টাকার অংশ বিক্রয় হয়, তত টাকা কারবারের মূলধন। যৌথকারবার স্থাপনে যাঁহারা উদ্যোক্তা তাঁহারা পূর্ব্বেই স্থির করেন যে, এই ব্যবসা চালাইবার জন্য এত টাকা প্রয়োজন; তারপর সেই পরিমাণ টাকা তুলিবার জন্য তাঁহারা কারবারকে কতকগুলি অংশে বিভক্ত করেন ও প্রত্যেক অংশের একটী মূল্য স্থির করিয়া দেন। মনে করা যাউক, একটী চিনির কারখানা স্থাপন করিতে ও চালাইতে দশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। উদ্যোক্তৃগণ কারবারকে এক লক্ষ অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশের মূল্য দশ টাকা নির্দ্ধারণ করিলেন। যাহাতে অংশ বিক্রয়ের সুবিধা হয় তাহার জন্য প্রতি অংশের সম্পূর্ণ মূল্য (যথা দশ টাকা) এক সঙ্গে না লইয়া ক্রমে ক্রমেও লওয়া হয়। ধরা যাউক, প্রথমে প্রতি অংশের জন্য পাঁচ টাকা লওয়া হইল। এক বৎসর পরে আড়াই টাকা লওয়া হইল ও আর আড়াই টাকা কোম্পানী যখন ইচ্ছা অংশীদারদের নিকট হইতে লইতে পারিবেন, এরূপ সর্ত্ত রহিল। এরূপভাবে অংশক্রয়ের যেমন সুবিধা আছে, তেমনি বিপদ্‌ও আছে। সমগ্র মূল্য না দিলেও, ক্রেতা যত টাকা দামের অংশ লইবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন তত টাকা দিবার জন্য তিনি আইনতঃ দায়ী হইলেন। উদাহরণস্বরূপ চায়ের ব্যবসা ধরা যাইতে পারে। চায়ের ব্যবসা যখন খুব ভাল চলিতেছে, তখন এক ব্যক্তি প্রতি অংশের দশ টাকা মূল্য, এরূপ দুইশত অংশ আপাততঃ একহাজার টাকা নগদ দিয়া ও পরে কোম্পানীর দাবীমত একহাজার টাকা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া ক্রয় করিলেন। যদি ব্যবসা ভাল চলে, তাহা হইলে কোম্পানী হয়তো অবশিষ্ট টাকা তখন আর দাবীই করিলেন না এবং প্রত্যেক অংশের উপর কিছু কিছু লভ্যাংশ দিতে লাগিলেন; কিন্তু এরূপ হইতে পারে যে, অংশ ক্রয়ের পাঁচ বৎসর পরে চায়ের বাজার খুব খারাপ হইয়া গেল—এমন কি সেই কারবারই উঠিয়া গেল। তখন ক্রেতা লাভ তো কিছু পাইলেন না, অধিকন্তু তাঁহাকে প্রতিশ্রুত একহাজার টাকা কারবারের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য দিতে বাধ্য করা হইবে। এইজন্য কোন কারবারের অংশ খরিদ করিবার সময় আপাততঃ দুই টাকা বা চারি টাকা দিয়া দশ টাকার অংশ পাইতেছি এরূপ বিবেচনা করা উচিত নহে; সেই কারবারের লাভ-নোকসানের সম্ভাবনা কিরূপ সে সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তবে অংশ ক্রয় করা কর্ত্তব্য। বিজ্ঞাপনে মুগ্ধ হইয়া বা দালালের কথায় বিশ্বাস করিয়া অনেকে বাজে কারবারের অংশ খরিদ করিয়া বিপন্ন, এমন কি, সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। অংশক্রেতার দায়িত্ব কিন্তু কেবলমাত্র অংশের বিজ্ঞাপিত মূল্য সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করা পর্য্যন্ত। কেহ যদি অংশের পূর্ণ মূল্য প্রদান করেন, তবে আর তাঁহার কোন দায়িত্ব রহিল না। যদি কেহ পাঁচ শত টাকা দিয়া প্রতি অংশের দাম দশ টাকা এরূপ পঞ্চাশটী অংশ ক্রয় করেন, তারপর যদি কোন সময়ে সেই কারবার নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে তাঁহার ঐ পাঁচ শত টাকাই জলে গেল। ঐ কারবারের যতই ধার থাকুক না কেন, তিনি তাহার জন্য বিন্দুমাত্র দায়ী হইবেন না।

বহু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ব্যাঙ্কে টাকা রাখা অপেক্ষা অংশ ক্রয় করা পছন্দ করেন। ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিলে তিনি নির্দ্দিষ্ট শতকরা পাঁচ টাকা বা সাত টাকা সুদের চেয়ে এক পয়সাও বেশী পাইবেন না; কিন্তু লাভজনক কারবারের অংশ ক্রয় করিলে এক শত টাকায় এক শত টাকা বার্ষিক আয় হইয়াছে এরূপ দেখা গিয়াছে। বিবেচক ব্যক্তি এক প্রকার কারবারের অংশ ক্রয় করিয়া নিজের সমস্ত টাকা ব্যয় করেন না; বিভিন্ন ধরণের কারবারে যথা :—চা, পাট, তূলা, কাপড়ের কল প্রভৃতিতে—কিছু কিছু টাকা খাটাইয়া থাকেন। তাহাতে সুবিধা এই যে, এক প্রকার ব্যবসায় মন্দা পড়িলে, অন্য ব্যবসা হইতে লাভ হইতে পারে।

আইন হিসাবে, অংশ বা 'শেয়ারকে' অস্থাবর সম্পত্তিরূপে গণ্য করা হয়। যদি কেহ চা-কোম্পানীর অংশ কিনিয়া মনে করেন যে, যখন ঐ কোম্পানীর জমী আছে তখন তিনি উহার অংশ খরিদ করিয়া স্থাবর সম্পত্তিই ক্রয় করিলেন, তাঁহার এরূপ ধারণা বিষম ভ্রম।

প্রত্যেক অংশের কত মূল্য বিজ্ঞাপিত হইবে তাহার সম্বন্ধে এদেশে বা ইংলণ্ডে কোন আইন নাই। প্রতি অংশের মূল্য এক টাকা বা এক হাজার টাকা হইতে পারে। কিন্তু প্রতি অংশের মূল্য বেশী হইলে, গরীব বা মধ্যবিত্ত লোকে একটী অংশ ক্রয় করিতেই তাহার যা' কিছু সম্বল ব্যয় করিয়া ফেলিবে, এই আশঙ্কায় ফ্রান্স, জর্ম্মনী প্রভৃতি দেশে প্রতি অংশের মূল্য কত কম হইতে পারে তাহা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রস্তাবিত মূলধনকে কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশ নির্দ্ধারিত মূল্যে বিক্রয়

করা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রতি অংশের পূর্ণ মূল্য একসঙ্গে সাধারণতঃ আদায় করা হয় না। যে পরিমাণ টাকা আদায় করা হয়, তাহাই সেই কারবারের যথার্থ মূলধন। প্রস্তাবিত মূলধনকে ইংরেজীতে **Authorised capital** বলে; নির্দ্ধারিত মূল্যের যত টাকার অংশ বিক্রয় হয় তাহাকে **Subscribed capital** ও যথার্থ যত টাকা অংশের আংশিক মূল্যস্বরূপ আদায় করা হয় তাহাকে **Paid-up capital** বলে। কোন কারবারের অংশ সাধারণের মধ্যে কিরূপ আদৃত হইয়াছে বুঝিতে হইলে প্রস্তাবিত মূলধনের সহিত আদায়ী টাকার অনুপাতের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

কোন কোম্পানী সর্ত্তসম্বলিত বিজ্ঞাপনপত্র (Prospectus) বাহির করিবার পর যে কেহ সেই কোম্পানীর অংশ ক্রয় করিতে পারেন। অংশ ক্রয় করিবার জন্য বিশেষ বাজার আছে; সেখানে অথবা ব্যক্তিগত চুক্তির দ্বারা অংশ ক্রয় করা যায়। যদি নাবালক বা নাবালিকা কোন অংশ ক্রয় করে তাহা হইলে সে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া অংশের অপরিশোধিত মূল্য দিতে অস্বীকার করিতে পারে। (Steinberg V. Scala, Leeds, 1923, 2ch, 452)।

অংশ ক্রয় করিবার পর কোম্পানী ক্রেতাকে একখানি নিদর্শনপত্র বা সার্টিফিকেট দিতে বাধ্য। ঐ পত্রে ক্রেতার নাম, ঠিকানা, অংশের সংখ্যা (যথা পাঁচটী কি দশটী); অংশের ক্রমিক সংখ্যা (যথা ১৫৩১ হইতে ১৫৩৫ বা ১৫৪০), কত টাকা দেওয়া হইল ও কত টাকা পরে দেওয়া হইবে এই সব লেখা থাকে। প্রত্যেক নিদর্শনপত্রে কোম্পানীর শিলমোহর ও কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে কাহারও স্বাক্ষর থাকা প্রয়োজন। যদি কয়েক ব্যক্তি মিলিয়া একটী অংশ-ক্রয় করেন, তবে সর্ব্বাগ্রে যে ব্যক্তির নাম লেখা থাকে তাহার নিকট নিদর্শনপত্র প্রেরিত হয়। অংশক্রয়ের নিদর্শনপত্র হারাইয়া গেলে বা নষ্ট হইলে সামান্য কিছু দর্শনী লইয়া কোম্পানী পুনরায় উহা প্রদান করেন; কিন্তু তৎপূর্ব্বে প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দিয়া ঘোষণা করেন যে, অমুক সংখ্যক অংশের নিদর্শনপত্র নষ্ট হইয়াছে। কোন ব্যক্তির কোন অংশে স্বত্ব আছে কি না তাহার মুখ্য প্রমাণ নিদর্শনপত্র দেখাইয়া হয়।

অংশ বিক্রয় করিবার জন্য স্বতন্ত্র দালাল থাকে। যদি কেহ অংশের সম্পূর্ণ মূল্য দিয়া থাকে, তবে সে নিজের অংশ বিক্রয়ের সুবিধার জন্য কোম্পানীর নিকট হইতে Share Warrant to Bearer নামে পরিচিত একপ্রকার নিদর্শনপত্র লইতে পারে। উহাতে কাহারও নামধাম থাকে না ও উহা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কোনও দলিলের প্রয়োজন হয় না। উহাতে অংশের ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টের নোটের মত উহা যাহার অধিকারে থাকে, সেই উহার মালিক বলিয়া গণ্য হয়।

অংশের নিদর্শনপত্র জমা দিয়া বা বাঁধা দিয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার পাওয়া যায়। অবশ্য সুপরিচিত কোম্পানীর অংশেরই এইরূপ আদর হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা পরিশোধ করিতে না পারিলে ব্যাঙ্ক অংশ বিক্রয় করিয়া টাকা উসুল করিয়া লয়।

প্রতিবৎসর বা কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর প্রত্যেক কোম্পানী তাহার লাভ-লোকসান খতাইয়া দেখে। যদি কোম্পানীর লাভ হয়, তাহা হইলে অংশক্রয়কারিদিগকে লভ্যাংশ বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। প্রতি একশত টাকার অংশে কয় টাকা লভ্যাংশ দেওয়া যাইতে পারে, তাহা কোম্পানীর সাধারণ সভায় স্থির হয়। কোন কোন কোম্পানী একাধিক প্রকার অংশ বিক্রয় করিয়া থাকে। লভ্যাংশ বিতরণের সময় কোন্ প্রকারের অংশ-ক্রেতাকে কি প্রকার লভ্যাংশ দেওয়া যাইবে স্থির হয়।

অংশ তিন প্রকারের হইতে পারে। প্রথম প্রেফারেন্স সেয়ার (Preference shares)। অন্য প্রকারের অংশক্রেতা কিছু লাভ পান বা না পান, এই প্রকারের ক্রেতাকে চুক্তি-অনুসারে নির্দ্দিষ্ট লভ্যাংশ দিতেই হইবে, কিন্তু যদি কোম্পানীর কার্য্য-পরিচালনের জন্য সেই বৎসরের আয়ের টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে জমা রাখা কর্ত্তব্য বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ বিবেচনা করেন, তাহা হইলে এরূপ অংশের ক্রেতাও সে বৎসর লভ্যাংশ হইতে বঞ্চিত হ'ন। কিন্তু এক প্রকারের প্রেফারেন্স শেয়ার আছে (Cumulative preference shares) যাহাতে এক বৎসরের লভ্যাংশ না পাওয়া গেলেও পরবৎসর উহা চুক্তি মত বাকী শোধ করিয়া দিতে কোম্পানী বাধ্য থাকেন।

এইরূপ অংশখরিদকারিদিগের দাবী মিটাইয়া যাহা বাকী থাকে, তাহা সাধারণ অংশের গ্রাহকদিগকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। তৃতীয় প্রকারের অংশকে Deferred ordinary বা Founder's shares কহে। এরূপ অংশ যাঁহারা কোম্পানী স্থাপনে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তাঁহারা গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রথম দুই প্রকার অংশের গ্রাহকের দাবী মিটাইয়া তবে এই শ্রেণীর গ্রাহককে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়া থাকে।

অংশ-খরিদকারীরা সাধারণতঃ কোম্পানীর বার্ষিক সভায় উপস্থিত হইয়া কার্য্য-পরিচালনে যোগ দিবার অধিকারী।

তবে কোন কোন কোম্পানী নিতান্ত অল্প মূল্যের অংশ খরিদকারীকে সভায় উপস্থিত হইবার অধিকার দেন না।

প্রতি বৎসর, অন্ততঃ প্রতি পনর মাসের মধ্যে অংশ-ক্রেতাদের সভা আহ্বান করা নিয়ম। এই সভায় কত লভ্যাংশ দেওয়া হইবে, হিসাব-পরীক্ষককে কি পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে তাহা স্থির করা হয়। অংশক্রয়কারিগণ নিজেদের মধ্য হইতে কার্য্যনির্ব্বাহক-মণ্ডলী বা ডিরেক্টার-গণকে নির্ব্বাচন করেন। ঐ সভায় হিসাবপত্র ও ডিরেক্টারদিগের প্রদত্ত কার্য্যবিবরণ বিবেচিত হইয়া থাকে। সভার আহ্বান-পত্র অংশক্রয়কারিগণের নিকট সাধারণতঃ সভার নির্দ্দিষ্ট দিনের সাতদিন পূর্ব্বে পৌঁছান চাই। সভা কোন্ সময়ে বা কোন্ স্থানে হইবে তাহা ডিরেক্টরগণ স্থির করেন বটে, কিন্তু যদি কোন অংশক্রেতা এরূপ প্রমাণ করিতে পারেন যে, ডিরেক্টরগণ তাঁহাকে বা তাঁহার মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে বাধা পাইবেন এই আশঙ্কায় এমন সময় স্থির করিয়াছেন যে তাঁহাদের পক্ষে উক্ত স্থানে ঐরূপ সময়ে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব, তাহা হইলে ঐ সভার কার্য্য আদালত হইতে নাকচ করিয়া দেওয়া হয়। প্রায়ই দেখা যায়, অংশ ক্রয় করিয়া খরিদকারী কোম্পানীর কোনও সভায় উপস্থিত হ'ন না, এমন কি ঐ কোম্পানীর সম্বন্ধে কোন খোঁজখবরও ল'ন না। তাঁহাদের এইরূপ ঔদাসীন্যের সুবিধা লইয়া কোন কোন কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ যথেচ্ছভাবে কার্য্যপরিচালন করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করেন ও কোম্পানীর টাকাপয়সা নষ্ট করিয়া ফেলেন। বিশেষতঃ, ম্যানেজিং এজেণ্টস্ বা পরিচালক কর্ম্মিবৃন্দও অনেক সময় যুগপৎ ডিরেক্টর ও অংশীদের চোখে ধূলা দিয়া কোম্পানীর ক্ষতি করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে অজ্ঞ, বিধবা ও অপ্রাপ্তবয়স্ক অংশের মালিক অনেক আছেন। সেইজন্য শিক্ষিত অংশক্রেতাদের কর্ত্তব্য কোম্পানীর বার্ষিক সভায় উপস্থিত হইয়া সকল বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা। অংশখরিদকারিদিগের ঔদাসীন্যের জন্য বহু যৌথ কারবার দুষ্টলোকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

[প্রাচীন ভারতের যৌথকারবারে অংশ সম্বন্ধে সম্ভূয়-সমুত্থান দ্র°]।

অংশবলি—মানবের রাশির কোন বিশেষ অংশের 'শান্তি' সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ।

অংশসবর্ণন—অসমরাশির সমবিভাগ করণ। "অংশয়োঃ অতুল্যচ্ছেদয়োঃ রাশ্যোঃ সমচ্ছেদকরণম্" (বাচস্পত্যধৃত লীলাবতী)।

অংশবান্—[বৈদ্যক] সোমলতা (The moonplant or Acid Sarcostema) (S. Viminalis) [সোম দ্র°]।

অংশা—নন্দের ঔরসে ও যশোদার গর্ভে জাত কন্যা। শ্রীকৃষ্ণ জন্মিলে বসুদেব তাঁহাকে নন্দালয়ে রাখিয়া অংশাকে দেবকীর ক্রোড়ে রক্ষা করেন। বসুদেবের অনুরোধে কংস কর্ত্তৃক ইনি নিহত হ'ন নাই। পরে বসুদেব দুর্ব্বাসাকে এই কন্যা দান করেন। (ব্রহ্ম-বৈ°, শ্রীকৃষ্ণজন্ম ৭.১৩০)

অংশাংশিত্ব—[দর্শন°] দর্শনশাস্ত্রে জীবকে 'অংশ' এবং ব্রহ্মকে 'অংশী' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধকে 'অংশাংশিত্ব' বলে। ভেদবাদীরাই অংশাংশিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে। অদ্বৈতদৃষ্টিতে অখণ্ড একরস ব্রহ্মের অংশ কল্পনা হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদিগণ নিরুপাধিক ব্রহ্ম ও জীবরূপ সোপাধি ব্রহ্মের সম্বন্ধ মহাকাশ ও ঘটাকাশের ন্যায় বুঝিয়া থাকেন। স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির অংশ, জীবও সেইরূপ ব্রহ্মের অংশ। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত চরম সিদ্ধান্ত হইতে পারে না; তাহা হইলে অভেদ-প্রতিপাদক শাস্ত্রবচন ব্যর্থ হইয়া যায়। ব্রহ্মের প্রকৃত কোন অংশ না থাকিলেও কল্পিত অংশ হিসাবে জীবকে ব্রহ্মের অংশই বলিতে হয়। অধিকারিভেদ হিসাবে শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মে অভিন্নতা-প্রতিপাদক বচনও যেমন আছে, সেইরূপ ভেদজ্ঞাপক উক্তিও দেখিতে পাওয়া যায়।

মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি সাত্বত-সম্প্রদায়ের ভেদবাদিগণ অংশ শব্দ দ্বারা ব্রহ্মের সহিত জীবের সেব্যসেবক সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (গীতা ১৫.৭); "পুত্রভ্রাতৃসখিত্বেন যতো হরিঃ। বহুধা গীয়তে বেদৈর্জীবাংশ-স্তস্য তেন তু॥" (বরাহপু° ৭.৯.৬) এই সমস্ত শাস্ত্রোক্তি তাঁহাদের মত-সমর্থক। বিজ্ঞানভিক্ষু বেদান্তের "অংশো নানা-ব্যপদেশাৎ" (২.৩.৪৩) সূত্রের উপর ভিত্তি করিয়া দ্বৈততত্ত্ব প্রতিপাদন-পরায়ণ হইয়াছেন। ঔডুলোমি-মতাবলম্বী ভেদাভেদ-বাদিগণ "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমাংসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী"... ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের (৪.৩) বচন-প্রমাণে ২.৩.৪৩ বেদান্ত-সূত্রের সার্থকতা প্রমাণিত করেন। আশ্মরথ্য-মতাবলম্বী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ ভোক্তৃ-ভোগ্য-নিয়ামকের সম্বন্ধহেতু অবশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে আবির্ভূত বিশিষ্ট পদার্থের ত্রিত্ব কল্পনা করেন এবং তাঁহারা বেদান্তের ২.৩.৪৩ সূত্রের ব্যাখ্যা এইরূপ করেন—"ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থ-ত্রিতয়ং হরিঃ। ঈশ্বরশ্চিদিতি প্রোক্তো জীবো দৃশ্যমচিৎ পুনঃ"। পক্ষান্তরে কাশকৃৎস্নীয়-মতাবলম্বী অভেদবাদিগণ বলেন, ব্যবহারদশায় উপাধি-কল্পিত ভেদ অবলম্বন করিয়া ঐ সূত্রে জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়াছে; সুতরাং পদার্থের বাস্তবভেদ প্রতিপন্ন করা সূত্রের

তাৎপর্য্য নহে। বস্তুতঃ অধিকারিভেদে সাধনার ক্রম অনুসারে এইরূপ বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ব্যবস্থা।

অংশিত্ব—[দর্শন°] কার্য্যত্ব effect. চিৎসুখাচার্য্য মিথ্যাত্বের হেতু প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"অয়ং পটঃ এতৎ তন্তু নিষ্ঠাত্যন্তভাবপ্রতিযোগী অংশিত্বাৎ ইতরাংশিবৎ।" অর্থাৎ তন্তু উপাদান, উপাদাননিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। তাঁহার মতে অংশিত্ব অর্থাৎ কার্য্যত্ব মিথ্যাত্বের হেতু। ব্যাস-রাজ স্বামী ইহা স্বীকার করেন না; তিনি বলেন, অংশিত্ব অর্থাৎ কার্য্যত্ব মিথ্যাত্বের হেতু হইতে পারে না। কেন না, কার্য্যকারণ অভিন্ন। কারণে কার্য্যের ও অভাবের সিদ্ধি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; সুতরাং সিদ্ধ-সাধন-দোষ অনিবার্য্য। অনাশ্রিত বলিলে অন্যোন্যাশ্রিতত্বে অর্থান্তরের উদ্ভব হয়। মধুসূদন সরস্বতী বলেন, অংশিত্বও মিথ্যাত্বের হেতু। তিনি কার্য্যকারণ অভিন্ন বলিয়াও কথঞ্চিৎ ভেদও স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং সেরূপ স্থলে কার্য্যের কারণে কার্য্যভাব অসিদ্ধ; অতএব সিদ্ধসাধনতা প্রভৃতি দোষ উৎপন্ন হইতে পারে না।

[বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস; পৃঃ ৭৩৮, ৭৭২]

অংশী, অংশীদার—[অর্থশা°] লাভ করিবার উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যদি ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকার্য্য চালাইতে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহাদিগকে অংশী বা অংশীদার (partners) বলে। কোনও ব্যাঙ্ক চালাইতে হইলে অংশীদারের সংখ্যা দশের বেশী হইতে পারিবে না এবং অন্যান্য ব্যবসা প্রভৃতিতে অংশীদারের সংখ্যা কুড়িজনের অধিক হইবে না। সাধারণের নিকট নির্দ্দিষ্ট মূল্যের অংশ বিক্রয় করিয়া যে কারবার চালান হয় তাহাকে যৌথকারবার বা 'জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী' বলে। আর দুই হইতে বিশজন ব্যক্তি নিজের মূলধন দিয়া নিজেদের মধ্যে নিরূপিত সর্ত্তানুসারে যে ব্যবসা চালায় তাহাকে অংশীদারী কারবার বলে। যৌথকারবারের অংশ-ক্রেতা যদি ক্রীত অংশের পূর্ণমূল্য প্রদান করে তবে আর কারবারের ঋণ প্রভৃতির জন্য সে দায়ী হয় না। কিন্তু অংশীদার (partner) সাধারণতঃ কারবারের ঋণের জন্য দায়ী হয়। যদি কারবারের বেশী ধার হয়, তবে যে টাকা বা সম্পত্তি সে কারবারে লাগায় নাই তাহাও ঋণের দায়ে বিক্রীত হইয়া যাইতে পারে। অংশীদারী ব্যবসার এইটী যেমন অসুবিধা, তেমনি অনেক সুবিধাও আছে। প্রথমতঃ, যৌথকারবারের লাভ বহুলোকের মধ্যে বিভক্ত হয়, আর অংশীদারী কারবারের লাভ কেবলমাত্র অংশীদের মধ্যে বণ্টিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, যৌথকারবারে প্রত্যেক অংশীদারই কার্য্যপরিচালন-বিষয়ে বাধা দিতে পারে, অংশীদারী কারবারে অংশিগণ নিজেদের ইচ্ছামত কার্য্য পরিচালন করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ, যৌথকারবারে প্রত্যেক অংশীদারেরই দায়িত্ব সীমাবদ্ধ বলিয়া ব্যবসাদাররা ঐরূপ কারবারকে বেশী ধার দিতে চাহে না; অংশীদারী কারবারে প্রত্যেক অংশীদার ঋণশোধ করিবার জন্য দায়ী থাকায় ধার পাওয়ার সুবিধা হয়।

অংশীদার দুই প্রকারের হইতে পারে—নামে মাত্র অংশীদার ও কার্য্যতঃ অংশীদার। যাহারা নামে মাত্র অংশীদার হয়, তাহারা কারবারের কাজে হস্তক্ষেপ করে না—তাহারা টাকা দিয়াই খালাস—অন্য এক বা ততোধিক অংশীদার কার্য্য পরিচালন করে। অনেক কারবারে এমন অংশীও দেখা যায় যে, তাহারা টাকাও দেয় না, কাজও দেখে না; কিন্তু বাজারে তাহাদের যথেষ্ট সুনাম থাকায় তাহাদের নাম লইয়া কারবার চালাইবার সুবিধা হইবে বলিয়া তাহাদিগকে অংশী করিয়া লইয়া, প্রায়ই পরিচালক-সমিতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়; কিন্তু যিনি যে প্রকারের অংশীই হউন না কেন, কারবারের লাভনোকসানে সকলেই সমানভাবে ফলভোগী। যে অংশী নিজে কাজ দেখে না তাঁহাকে ইংরেজীতে sleeping partner অর্থাৎ 'অলস অংশী' বলা হয়।

অংশীদারীর চুক্তি মৌখিক কথাবার্ত্তার দ্বারা বা লিখিত দলিলের দ্বারা হইতে পারে। কোনও ব্যক্তি কোনও কারবারের অংশী কি না তাহা তাহার কথাবার্ত্তা বা আচরণের দ্বারা স্থির করা হয়। কেহ যদি অপরের সহিত এক সম্পত্তির ভাড়াটিয়া বা মালিক হয় ও সেই সম্পত্তি লইয়া কারবার চালান হয় তাহা হইলেই যে সে ব্যক্তিকে অংশীদার বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে এরূপ কোনও আইন নাই। সাধারণতঃ কোনও ব্যক্তি কোনও কারবারের লভ্যাংশের ভাগী হইলে তাহাকে সেই কারবারের অংশীদার বলিয়া ধরা যায়; কিন্তু যদি এমন হয় যে, এক ব্যক্তি সেই কারবারে কিছু টাকা ধার দিয়া চুক্তি করিয়াছিল যে, লাভের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ প্রতি বৎসর তাহার ধার শোধের জন্য দিতে হইবে, তবে তাহাকে অংশীদার বলা হইবে না। আবার কারবারের কোনও কর্ম্মচারীর সহিত যদি এমন চুক্তি থাকে যে, সে লভ্যাংশের একটা নির্দ্দিষ্ট ভাগ পাইবে, তাহা হইলেও তাহাকে অংশীদার বলা যাইবে না; কেন না, কারবারের নোকসানের জন্য সে দায়ী নহে।

কে অংশীদার ও কে অংশীদার নহে এ সম্বন্ধে আইনে নানা রকম মারপ্যাঁচ আছে বলিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা অংশীদারী কারবার খুলিবার আগে নিম্নলিখিত বিষয়ে আইনজ্ঞের সাহায্য লইয়া পরিষ্কারভাবে লেখাপড়া করিয়া লইবেন। (১) কিরূপ

কারবার হইবে—কোন্ কোন্ জিনিস লইয়া ব্যবসা করা হইবে ; (২) কারবারের নাম কি হইবে, যথা, কার-মহলানবীশ, রায়-মজুমদার অথবা ভিনিসিয়া-বণিক্সঙ্ঘ প্রভৃতি ; (৩) কোন্ স্থানে কারবার চালান হইবে ; (৪) কোন্ সময় হইতে কারবার আরম্ভ করা হইবে—কতদিন পর্য্যন্ত অংশীদারী চুক্তি বলবৎ রহিবে ; (৫) কারবারের মূলধন কত হইবে, কোন্ অংশীদার কত টাকা দিবে ; সাধারণতঃ অংশীদারদিগকে মূলধনের জন্য শতকরা পাঁচ টাকা সুদ দেওয়া হয় ; সুদের হার ইহা অপেক্ষা কম কি বেশী হইবে ; (৬) লাভ ও নোকসানের অংশ কি হারে কে কত পাইবে ; (৭) কতদিন অন্তর অংশীদারেরা লভ্যাংশ গ্রহণ করিবে ; (৮) কোন্ কোন্ অংশীদার কি কি কাজ করিবে ; (৯) হিসাব কি ভাবে রাখা হইবে ; অবশ্য যেরূপ হিসাবই থাকুক না কেন প্রত্যেক অংশীদার উহা পরীক্ষা করিতে ও উহার নকল লইবার অধিকারী ; (১০) কারবারের কর্ম্মচারীদিগকে কে নিয়োগ বা বরখাস্ত করিবে ; (১১) কোন্ কোন্ ঘটনায় অংশীদারকে বিতাড়িত করা চলিবে ; আইনতঃ কোনও অংশীদার উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইলে বা অংশীদারের কর্ত্তব্য সম্পাদনে চিরতরে অনুপযুক্ত হইয়া গেলে বা কারবারের ক্রমাগত অনিষ্টসাধন করিলে আদালত হইতে তাহাকে অংশীদারী হইতে বিদূরিত করা হয় ; (১২) কোনও অংশীদার মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার অংশ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে ; (১৩) কারবার কোনও সময়ে বন্ধ করিতে হইলে কি ভাবে উহা বন্ধ করা হইবে ও (১৪) অংশীদের মধ্যে কোনও বিষয়ে মতান্তর বা বিবাদ উপস্থিত হইলে কি ভাবে কাহাদের নিকট সালিসী-বিচার দ্বারা উহার মীমাংসা হইবে—এই সমস্ত বিষয় অংশীদারীর দলিলে লেখা থাকিলে ভবিষ্যতে কোন বিরোধ হয় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অংশীদারী কারবারে প্রত্যেক অংশীদার কারবারের ঋণের জন্য দায়ী এবং তাহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে সেই ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য। কিন্তু আর এক প্রকার অংশীদার আছে—যাহাতে অধিকাংশ অংশীদার এরূপ চুক্তি করিতে পারে যে, তাহারা অংশ গ্রহণের জন্য যত টাকা দিবে তাহার অধিক কিছুর জন্য দায়ী হইবে না। এইরূপ কারবারেও কিন্তু দুই একজন এমন অংশীদার থাকা চাই যাহারা কারবারের সমস্ত ঋণের জন্য দায়ী থাকিবে।

কারবারের সম্পর্কে কোনও কাজ করিতে গিয়া কোনও অংশীদার যদি কিছু খরচ করেন বা তাঁহার নোকসান হয়, তবে কারবার হইতে তিনি ক্ষতিপূরণ পাইয়া থাকেন। যদি কোন অংশীদার কারবারের বাহিরের কোনও লোকের নিকট হইতে কিছু টাকা আদায় করিয়া বা ধার লইয়া সেই টাকা আত্মসাৎ করেন, তবে কারবার হইতে উহা পূরণ করিয়া দেওয়া নিয়ম। ঐরূপ কারবারের নিকট গচ্ছিত কোনও টাকা কোনও অংশীদার নষ্ট করিয়া ফেলিলে তাহাও কারবার হইতে দিতে হইবে। কারবারের নাম লইয়া কোনও একজন অংশীদার কোনও কিছু করিলে অন্যান্য সকল অংশীদার তাহার ফলভোগী হইয়া থাকেন ; সুতরাং কারবারে অংশীদার নির্ব্বাচন করিবার সময় তাহার স্বভাবচরিত্র ও সাধুতা সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। দশজন ভাল লোকের মধ্যে একজন জুয়াচোর অংশীদার থাকিলেও সে কারবার নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে।

অংশু—(অন্‌শ-উ) কিরণ ; রশ্মি। ২ দীপ্তি ; প্রভা। ৩ সূত্রাদির সূক্ষ্মাংশ ; তন্তু ; আঁশ (fibre)। ৪ সূর্য্য। ৫ বেশ ; পরিচ্ছদ। ৬ লেশ। ৭ বস্ত্র। ৮ বেগ। ৯ প্রকাশ। ১০ সূক্ষ্মাংশ। ১১ [বৈদিক] সোমলতার যে অংশ প্রস্তর দ্বারা নিপীড়িত করা হয় (ঋক্ ৯.৬৭.২৮)। [প্র, সহস্র, হিম, সুধা প্রভৃতির সঙ্গে সর্ব্বদা ইহার সমাস হয়। যথা—প্রাংশু, সহস্রাংশু, হিমাংশু, সুধাংশু। অপভ্রংশে আঁশ, এঁসো]। ১২ [বেদে] ধনের জন্য অশ্বিদ্বয় কর্ত্তৃক রক্ষিত (ঋক্ ৮.৫.২৬)। ১৩ [বংশব্রাহ্মণমতে] অমাবাস্য শাণ্ডিলায়নের শিষ্য ধানঞ্জয্যের নামান্তর। ১৪ পুরুহোত্রের পুত্র (বিষ্ণুপু° ৩.১২)। ১৫ যদুবংশীয় পুরুকুৎসের পুত্র (কূর্মপু° ২৪.৩১)। ১৬ চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরুত্বানের পুত্র। ইঁহার মাতা বিদর্ভরাজকন্যা ভদ্রাবতী (লিঙ্গপু°, পূর্ব্ব ৬৮ অঃ)।

অংশুক—[বৈদ্যক] (অংশু-কন্) তেজপাত [তেজপাত দ্র°]।

অংশুকায়—[বৈদ্যক] প্রবালাদি।

অংশুতাপন—বিরোচনের শত পুত্রের অন্যতম। (পদ্মপু°, সৃষ্টি, ৬ অঃ)।

অংশুধর—সূর্য্য। ২ কিরণসমূহ যিনি ধারণ করেন। ৩ সূর্য্য-বংশীয় সগর রাজার পুত্র অসমঞ্জ (পদ্মপু°)। ৪ একজন কবি।

অংশুপট্ট—সূক্ষ্মসূত্রের পট্টবস্ত্র। সরু রেশমের কাপড়। বঙ্গদেশে তিন প্রকার রেশমের বস্ত্র প্রচলিত আছে—১ গরদ, ২ তসর ও ৩ মট্‌কা। এই শেষোক্ত কাপড় অতিশয় নিকৃষ্ট, কিন্তু দীর্ঘকাল-স্থায়ী। রেশম ও তসরের ঝুট্ ও ছিনা হইতে একপ্রকার মোটা ছিলা রেশম প্রস্তুত হয়। তাহারই ভরণা এবং কার্পাস-সূত্রের টানাতে মট্‌কা কাপড় নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কখন

টানা ও ভরণায় ছিলা রেশম থাকে। গৃহস্থেরা দেবার্চ্চনার সময় এবং অষ্টপ্রহর পরিবার জন্য মট্‌কাধুতি ব্যবহার করেন।

তসর কাপড় তসরের গুটী হইতে প্রস্তুত হয় [তসর শব্দ দ্র°]। পট্টবস্ত্র রেশমের গুটীর সূতা হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। বানকে সূতা তুলিবার সময় দুই তিনটী কোয়া এক এক বারে ঘুরাইলে এবং সেই সঙ্গে যত্নপূর্ব্বক আগাগোড়ার ফেঁসো বা শোঁয়া তুলিয়া ফেলিলে উৎকৃষ্ট সূতা হয়। তদ্ভিন্ন কোয়াও ভাল হওয়া চাই। যে সময় গুটীপোকাতে গুটী বাঁধে তৎকালে কিংবা তাহার পূর্ব্বে বাদল করিলে কিংবা পূর্ব্বদিক্ হইতে বায়ু বহিলে গুটী ভাল হয় না। তাহাতে সূতা কাটিলে নিকৃষ্ট রেশম জন্মে, তাহার কাপড়ও নিকৃষ্ট হয়।

উৎকৃষ্ট পট্টবস্ত্রের টানা ও ভরণার সূতা সমান সরু হওয়া আবশ্যক। কিন্তু তাঁতীরা প্রায় টানা সরু ও ভরণা মোটা দেয়, সেজন্য উত্তম কাপড় হয় না। উত্তম বস্ত্রে ২৮০০ সানা থাকে। ৩২০০ সানা দিলে উৎকৃষ্ট বস্ত্র হয়। সচরাচর বাজারে ১৪০০, ১৮০০, ২২০০ ও ২৪০০ সানার বস্ত্র পাওয়া যায়। ২২০০ ও ২৪০০ সানার বস্ত্রই উৎকৃষ্ট বলিয়া বিক্রীত হয়, কিন্তু বাস্তবিক সে কাপড় উৎকৃষ্ট নহে। রেশম-ব্যবসায়ীরা বস্ত্রে একপ্রকার কৃত্রিম পারিপাট্য করে যে, সহজে তাহা চিনিতে পারা যায় না। নিতান্ত অধম কাপড়ও উত্তম বলিয়া বোধ হয়। এই কৃত্রিম পারিপাট্যের নাম আহার। তাঁতীর গৃহে কাপড় বোনা হইলে রেশম-ব্যবসায়ীরা ঐ সকল বস্ত্র ধোপার বাটীতে খাড়াই করিবার জন্য দেয়। নূতন রেশম ধৌত করার নাম খাড়াই করা। বস্ত্র ধৌত করা হইলে টানা দিতে হয়। এক এক খানি বস্ত্রের দুই অঞ্চলে স্থূল ছিলা থাকে। যাঁহারা বাজারে ধৌত বস্ত্র ক্রয় করেন, তাঁহারা ঐ ছিলা দেখিতে পান না। রজকেরা ছিলায় খোঁটা মারিয়া রৌদ্রে কাপড় টানিয়া বাঁধে। তৎপরে চিনি ও ময়দা জলে গুলিয়া সেই কাপড়ে মাখাইয়া দেয়। ইহাই আহার। আহার মাখাইবার জন্য বুরুশের মত মার্জ্জনী আছে। বস্ত্রে আহার মাখাইয়া ঐ মার্জ্জনী দ্বারা অনেকক্ষণ ঘষিলে দেখিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় এবং রৌদ্রে শুকাইলে সে পারিপাট্য কৃত্রিম বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। রেশমী বস্ত্রের সৌন্দর্য্য কাল্পনিক কি না, তাহা জানিবার উপায় এই—বস্ত্রখানির এক অঞ্চল সাজিমাটির জলে ৪।৫ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিতে হয়, তাহার পর ধৌত করিলে সমস্ত মাড় উঠিয়া যায়। তখন কাপড়খানি ভাল কি মন্দ তাহা জানিতে কষ্ট হয় না।

চৈত্রমাসে এক প্রকার শ্বেতবর্ণ রেশমের গুটী জন্মে। তাহার সূত্র দেখিতে অতি চমৎকার চিক্কণ, শুভ্রবর্ণ,—যেন সন্ধ্যাতারার উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যটুকু গলিয়া পড়িতেছে। সেই সূত্রে যদি ৩২০০ সানার বস্ত্র হয়, তবে তেমন অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ জগতে আর নাই। সুরঞ্জিত তসর ও রেশমী বস্ত্রের নাম চেলী [চেলী দ্র°]। বঙ্গদেশের মধ্যে বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি স্থানে রেশম ও রেশমের বস্ত্র প্রস্তুত হয় [রেশম দ্র°]। বাঙ্গলার তুঁতে রেশম বম্বিক্স ক্রিসী (Bombyx croesi) জাতীয় কীট হইতে উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষে রেশমের কীট সর্ব্বসমেত ৫৭ প্রকার দেখা যায়। [তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ গুটী শব্দে দ্র°]।

অংশুপর্ণিকা, অংশুপর্ণী—[বৈদ্যক] সালপর্ণী বৃক্ষ [অংশুমতী দ্র°]।

অংশুবন্নম্—এক প্রাচীন নগর। ইহার যথার্থ অবস্থান জানিতে পারা যায় না। দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণানূর প্রদেশের ইহা একটী অংশ ছিল।

[Indian Antiquary, Vol. III, 1874, p. 334.]

অংশুভদ্র—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম সখা (পদ্মপু°, পাতাল ৩৯ অঃ)।

অংশুমৎফলা—[বৈদ্যক] কদলীবৃক্ষ Musa Paradisiaca.

অংশুমতী,—বিণ, প্রভাবিশিষ্টা। বি, ২ [বৈদ্যক] সালপর্ণী বৃক্ষ Hedysarum Gangeticum. [সালপাণী গাছ দ্র°]। ৩ নদীবিশেষ (৮.৯৬.১৩-১৫ ঋগ্‌ভাষ্যমতে—কুরু প্রদেশের নিকট; অমরকোষ ২.৪.৪৩)। রুষ-শব্দকোষ (Worterbuch) ও মনিয়র উইলিয়মসের অভিধানে অংশুমতীকে স্বর্নদী বলা হইয়াছে। রুষ-শব্দকোষে ঋগ্‌ভাষ্যের মতে ইহাকে 'যমুনা' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কিন্তু ঋগ্‌ভাষ্যে স্পষ্ট 'কুরূন্ প্রতি' আছে—যমুনা নাই। ৪ সুব্রত মুনির পত্নী। ৫ দ্রবিক নামক গন্ধর্ব্বরাজকন্যা। ইনি শৈবমতাবলম্বী বিদর্ভরাজকুমার ধর্ম্মগুপ্তের পত্নী ছিলেন। ধর্ম্মগুপ্ত হৃতরাজ্য ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া শ্বশুরের সাহায্যে ও মহাদেবের বরে পুনরায় স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। (স্কন্দপু°; ব্রহ্মবৈ° পু°)।

অংশুমতীফলা—[বৈদ্যক] কদলীবৃক্ষ [অংশুমৎফলা দ্র°]।

অংশুমান্—বিণ, প্রভাযুক্ত। বি, ২ সূত্রের সূক্ষ্মাংশযুক্ত (fibrous)। ৩ সূর্য্য। ৪ চন্দ্র। ৫ সূর্য্যবংশীয় রাজা অসমঞ্জের পুত্র এবং সগর রাজার পৌত্র। দিলীপ ইঁহার পুত্র (রামায়ণ, আদি ৪৩ অঃ; পদ্মপু°, সৃষ্টি ৮ অঃ; ব্রহ্মবৈ°পু°, প্রকৃতি ১০ অঃ; লিঙ্গপু° ৬৬ অঃ)। মহারাজ সগর শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ৯৯টী নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইলে অবশিষ্ট যজ্ঞীয় অশ্বটী ছাড়িয়া দেন এবং ষষ্টিসহস্র সন্তান ও অসংখ্য সৈন্যসামন্ত উহার রক্ষার্থ

নিযুক্ত করেন। এই যজ্ঞটী নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন করিতে পারিলেই তিনি শতক্রতু অর্থাৎ শত অশ্বমেধযজ্ঞ-সম্পাদনকারী হইয়া ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করিবেন এই আশঙ্কায় দেবরাজ ইন্দ্র সেই যজ্ঞীয় অশ্বটী চুরি করিয়া পাতালপুরে যেখানে মহর্ষি কপিল ধ্যানমগ্ন ছিলেন সেখানে ছাড়িয়া আসেন। সগর-সন্তানেরা নানাস্থানে অশ্বের অন্বেষণ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; পরে তাঁহারা অশ্বের পদচিহ্ন ধরিয়া পাতালপুরে যেখানে মহর্ষি কপিল ধ্যানমগ্ন ছিলেন সেইখানে অশ্বটীকে চরিতে দেখিলেন। দেখিয়া তাঁহারা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই ব্যক্তিই আমাদের অশ্ব চুরি করিয়া কপট যোগাসনে বসিয়া রহিয়াছে। ইহার উপযুক্ত শাস্তি-বিধান আবশ্যক মনে করিয়া ইঁহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া ইঁহার ধ্যানভঙ্গ হইলে ক্রোধবশে ইনি সসৈন্য সগর-সন্তানগণকে একেবারে ভস্মীভূত করেন।*

এদিকে মহারাজ সগর যজ্ঞীয় অশ্ব ও সন্তানগণের আসিতে অতিরিক্ত বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া পৌত্র অংশুমান্‌কে অশ্বের অনুসন্ধানে পাতালে পাঠান। তিনি মহর্ষি কপিলকে সন্তুষ্ট করিয়া পিতামহের যজ্ঞীয় অশ্ব আনয়ন করেন এবং মহর্ষি তাঁহার পিতৃব্যগণের উদ্ধারের এই উপায় বলিয়া দেন—'যে সময় পৃথিবীতে গঙ্গা আগমন করিবেন তাঁহার জলস্পর্শে তোমার পিতৃগণ মুক্ত হইবেন। আর ইহাও তোমায় বলিয়া দিই তোমার পৌত্রই এ কার্য্যে ব্রতী হইয়া স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোকে গঙ্গাকে আনয়ন করিবেন।' মহারাজ সগর যজ্ঞ শেষ করিয়া পৌত্র অংশুমান্‌কে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া স্বর্গধামে গমন করেন। ইঁহার পুত্র দিলীপ ও দিলীপের পুত্র ভগীরথ। ইনি বহুদিবস রাজধর্ম্ম পালন করিয়া পুত্র দিলীপের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং গঙ্গা আনিবার জন্য তপস্যায় রত হ'ন। কিছুকাল পরে তপোবনেই ইনি দেহত্যাগ করেন। দিলীপের পুত্র ভগীরথই গঙ্গাকে আনয়ন করিয়া পূর্ব্ব-পুরুষদের উদ্ধার সাধন করেন (মহাভা°, বন ১০৭ অঃ)। [গঙ্গাশব্দে বিশেষ বিবরণ দ্র°]

৬ সগরের পুত্র পঞ্চধন, তৎপুত্র অংশুমান্। ইঁহার পত্নীর নাম যশোদা (পদ্মপু°, সৃষ্টি ৯ অঃ)।

৭ শ্রাদ্ধের অংশভাগী ৬৪ জন বিশ্বদেবগণের মধ্যে ইনি অন্যতম (মহাভা°)। ৮ বসুবংশীয় বিদর্ভের পুত্র ক্রথ। এই ক্রথবংশীয় অংশুমান্ জরাসন্ধের পক্ষাবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে বসুদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। (হরিব° ৯১, ৯৩ অঃ)। ৯ ঋষিবিশেষ (হরিব°)। ১০ ভোজরাজ, ইনি দ্রোণ কর্ত্তৃক নিহত হন (মহাভা°, কর্ণ ৬ অঃ)। ১১ এক নৃপতি, কৃষ্ণার স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত ছিলেন (মহাভা°, আদি ১৮৬ অঃ)।

* ভাগবতে লিখিত আছে সত্যগুণাশ্রয়ী সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ মহর্ষি কপিলের ক্রোধের উদয় হইতে পারে না। দেবরাজ ইন্দ্র সগর-সন্তানগণের শক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা আপন আপন তেজেই ভস্মীভূত হন।

অংশুমালী—সূর্য্য। ২ (সূর্য্যের সংখ্যানুসারে) দ্বাদশ সংখ্যা। ৩ চন্দ্রবংশীয় মণ্ডন নামক রাজার পুত্র (সহ্যাদ্রি° ৩৩.৬৭)।

অংশুল—চাণক্য পণ্ডিত (ত্রিকাণ্ড° ২.৭.২২)। ২ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। ৩ মুনি।

অংশুবর্মা—ঠাকুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা লিচ্ছবিবংশোদ্ভব একজন রাজা। ইনি এক সময়ে নেপালের পশ্চিমভাগে রাজত্ব করিতেন। পূর্ব্বনেপালের লিচ্ছবিরাজ প্রথম শিবদেবের সমসাময়িক। কথিত আছে, তিব্বতের মহাপরাক্রান্ত অধীশ্বর স্রং-শান-গম্‌পোর সহিত অংশুবর্মার কন্যা ব্রিবিস্নুনের বিবাহ হয়। কেহ কেহ বলেন, খৃষ্টীয় ৫৯৫ অব্দ হইতে ইনি একটী অব্দ প্রচলন করেন।

বিভিন্ন পুরাবিদ্‌মতে ৬৩৫ হইতে ৬৪৯ বা ৬৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিভিন্ন গুপ্ত ও হর্ষ অব্দের বর্ষে খোদিত লিপিতে অংশুবর্মার নাম পাওয়া যায়।

কিন্তু ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ৫ই ফেব্রুয়ারী চীনপরিব্রাজক য়ুয়ন্ চোয়াঙ্ নেপালে গমন করিয়া অংশুবর্মার সুখ্যাতি শুনিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে অংশুবর্মার মৃত্যু হইয়াছিল। এ অবস্থায় নেপালের শিলালিপিতে অংশুবর্মাপ্রসঙ্গে যে '৩৪', '৩৯' ও '৪৮' সংবৎ দৃষ্ট হয় তাহা হর্ষসংবৎ হইতে পারে না।

য়ুয়ন্-চোয়াঙ অংশুবর্মাকে (**An-chu-fa-mo**), পণ্ডিতপ্রবর ও 'শব্দবিদ্যাশাস্ত্র'-রচয়িতা বলিয়াছেন (**Beal's Si-yu-ki**, Vol. II, p. 81)।

[Lé Nepal—M. Sylvain Lévi; Bodyoul on Tibet—L. de Miloué; Early History of India—V. A. Smith; Indian Antiquary, Vol. XIV, p. 97; *Ibid* Vol. IX, p. 169-171—Bendall; Journey in Nepal & Northern India, p. 74 pe ix; Wright's History of Nepal, p. 133ff.; Fleet's Gupta Inscriptions, (Corpus, Vol. III,) pp. 96ff.]

অংস—[অংশ দ্র°]।

অংসকূট—ককুদ, ষাঁড়ের ঝুঁট, ষাঁড়ের ঝুঁট পুরুষত্বের লক্ষণ। যেমন ছাগলকে খাসী করিলে অধিক শৃঙ্গবৃদ্ধি ও গায়ে গন্ধ হয় না, তদ্রূপ ষাঁড়ের কোষ কাটিয়া লইলে ঝুঁটবৃদ্ধি হয় না।

অংসপারিক—[বৈদ্যক] মহানিম।

অংসফলকাস্থি—স্কন্ধের অস্থি। পৃষ্ঠোপরি মেরুদণ্ডের দুই দিকে স্কন্ধের সন্ধিস্থলে অস্থিময় স্থান (scapula)।

অংসশোষ—[বৈদ্যক] স্কন্ধস্থ কফধাতুশোষক বাতরোগ।

অংহসস্‌-পতি—[বৈদিক] বাজসনেয়-সংহিতায় (৭.৩০; ২২.৩০,৩১) মলমাস বা অধিমাসের (intercalary month) নাম। তৈত্তিরীয় (১.৪.১৪.১) ও মৈত্রায়ণী সংহিতায় (৩.১২.১৩) মলমাসের নাম সংসর্প। কাঠকসংহিতায় (৩৮.৪) ইহার নাম মলিম্লুচ; সংসর্পও পাওয়া যায় (৩৫.১০)। অথর্ব-বেদে (৫.৬.৪) মলমাস 'সনিস্রস' নামে বর্ণিত। [মাস দ্র°]

[A. MacDonell's Vedic Index, Vol. I, p. 1 & Vol. II, p. 162.]

অক—পাণিনি-গৃহীত কৃতপ্রত্যয়স্থানে জাত প্রত্যয়বিশেষ। যে সকল প্রত্যয়ের বু ইৎ হয়, তাহার স্থানে অক আদেশ হইয়া থাকে। *। যুবোরনাকৌ। পা ৭.১.১। প্রত্যয়ের যু স্থানে অন এবং বু স্থানে অক হয়। যথা—ণ্বুল্, ষ্বুন্, ক্বুন্, বুন্ ইত্যাদি। এই সকল প্রত্যয়ের স্থানে অক হইবে। যেমন—ণ্বুল্ কারকঃ। *। ণ্বুল্‌তৃচৌ। পা ৩.১.১৩৩। ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ণ্বুল্ ও তৃচ্ প্রত্যয় হয়। ষ্বুন্ নর্ত্তকঃ। *। শিল্পিনি ষ্বুন্। পা ৩.১.১৪৫। শিল্প অর্থাৎ ক্রিয়াকৌশল বুঝাইলে ধাতুর উত্তর ষ্বুন্ প্রত্যয় হয়। *। নৃতিখনিরঞ্জিভ্য এব। নৃতি খনি ও রঞ্জি ধাতুর উত্তর ষ্বুন্ প্রত্যয় হয়। ক্বুন্ রজকঃ নকারে লোপ হয়। *। রঞ্জেস্তু শিল্পসংজ্ঞয়োরপি ক্বুন্। পতঞ্জলির মতে রঞ্জ ধাতুর উত্তর ক্বুন্ প্রত্যয় হইবে। বুন্ সরকাঃ। *। প্রুস্‌ল্বঃ সমভিহারে বুন্। পা ৩.১.১৪৯। পটুতা বুঝাইলে প্রু স্থ ও লু ধাতুর উত্তর বুন্ প্রত্যয় হয়।

কর্ত্তৃ-অর্থে অক প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হয় না। *। তৃজকাভ্যাং কর্ত্তরি। পা ২.২.১৫। যথা—অন্নস্য পাচকঃ। প্রজানাং পালকঃ ইত্যাদি। এস্থলে অন্নপাচকঃ প্রজাপালকঃ, এ প্রকার সমাস হইবে না। কিন্তু ক্রীড়া কিংবা জীবিকা বুঝাইলে অক প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হয়। *। নিত্যং ক্রীড়াজীবিকয়োঃ। পা ২.২.১৭। যথা—ক্রীড়ায়, উদ্দালকপুষ্পভঞ্জিকা। বারণপুষ্প-প্রচায়িকা। জীবিকায়—দন্তলেখকঃ। নখলেখকঃ। অক-প্রত্যয়ান্ত যাজকাদি শব্দের সঙ্গেও ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হয়। *। যাজকাদিভিশ্চ। পা ২.২.৯। যথা, ব্রাহ্মণযাজকঃ। দেব-পূজকঃ। [যাজকাদি দ্র°]। 'উদ্দালকপুষ্পভঞ্জিকা' এটী ক্রীড়াবিশেষের সংজ্ঞা। ভঞ্জনং ভঞ্জিকা। উদ্দালকস্য পুষ্পাণি ভজ্যন্তে যস্যাং ক্রীড়ায়াং সা উদ্দালকপুষ্পভঞ্জিকা।

অক প্রত্যয়ান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ পরে থাকিলে প্রত্যয়স্থিত ককারের পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণের অকারের স্থানে ই বিধান হইয়া থাকে; কিন্তু সুপের পর আপ্ বিহিত হইলে হয় না। *। প্রত্যয়স্থাৎ কাৎ পূর্বস্যাত ইদাপ্যসুপঃ। পা ৭.৩.৪৪। যথা—কারক শব্দ অক প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। এখানে কারক+আ (আপ্) এই স্ত্রীপ্রত্যয় প্রয়োগ করিলে কারকা হইল। তাহার পর, ককারের পূর্ব্ববর্ত্তী রকারের অকার ইকার হইল; অতএব কারক ইহার স্ত্রীলিঙ্গে কারিকা হইবে। উপরে অকার স্থানে ই হইবে—এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, অকার ভিন্ন অন্য স্বর থাকিলে হইবে না। যথা—নৌক ইহার স্ত্রীলিঙ্গে নৌকা হইল; কিন্তু ককারের পূর্ব্বস্থিত ঔকার স্থানে ইকার হইল না। আবার সুপের পর আপ্ বিহিত হইলে হয় না, এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বহুপরিব্রাজকা নগরী। এ স্থলে, বহুপরিব্রাজিকা হইল না। কারণ, এখানে সর্ব্বপ্রথমে সমাস করিবার সময় সুপের লুক্ হইয়াছে, তাহার পর স্ত্রী প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। যথা, বহবঃ পরিব্রাজকাঃ বিদ্যন্তে যস্যাং নগর্য্যাং সা বহুপরিব্রাজকা নগরী।

। *। ন যাসয়োঃ। পা ৭.৩.৪৫। পাণিনির এই সূত্রের উপর কাত্যায়ন অনেকগুলি নিষেধবিধির বার্ত্তিক করিয়াছেন। যথা—। *। পাচকাদীনাং ছন্দস্যুপসংখ্যানম্। বেদবিষয়ে পাচকাদি শব্দের পর স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ হইলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ইকার হয় না। পাচকা হিরণ্যবর্ণ শুচি। অন্যত্র পাচিকা। *। আশিষি চোপসংখ্যানম্। জীবতাদ্ জীবক, জীবকা। এস্থলে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগে ইকার হইল না। *। উত্তরপদলোপে চোপসংখ্যানম্। দেবদত্তিকা, লোপে দেবকা। *। তারকা-জ্যোতিষ্যুপসংখ্যানম্। তারকা শব্দে দৃষ্টি ও নক্ষত্র বুঝাইলে ইকার হয় না। তারকা। অন্যত্র, তারিকা দাসী। *। বর্ত্তকা শকুনৌ প্রাচ্যমুপসংখ্যানম্। পক্ষী বুঝাইলে প্রাচ্য পণ্ডিতদের মতে বর্ত্তকা হইবে। অন্যত্র বর্ত্তিকা।

অকচ—কেশশূন্য, টাকরোগী, নেড়া। ২ কেতুগ্রহ; কারণ ইহার কেশও নাই, মস্তকও নাই। দেবগণ সম্মিলিত হইয়া যখন অমৃত পান করিতেছিলেন, তখন শক্তিমান্ রাহু নামে এক দানব ছদ্মবেশে দেবতার রূপ ধারণ করিয়া দেবতাদের সহিত অমৃত পান করিতে বসে। তাহার আকণ্ঠ যখন সুধা প্রবিষ্ট হইয়াছে তখন চন্দ্র ও সূর্য্য তাহার প্রকৃত পরিচয় দেবতাদের নিকট বর্ণন করিলে নারায়ণ তাঁহার সুদর্শনচক্র দ্বারা ঐ অসুরকে দ্বিখণ্ড করেন। উহার দেহের উর্দ্ধভাগ রাহুরূপে পরিগণিত হইয়া গগনমার্গে চন্দ্র ও সূর্য্যের শত্রুতা করিতে থাকিল এবং অধোদেহ 'অকচ' বা 'কেতু' নামে গ্রহগণের অন্যতম গ্রহরূপে খ্যাতিলাভ করিল।

অকটেনহাং—দার্জিলিঙের লিম্বুজাতির চারখোলা শাখার

একটী গোষ্ঠী। ইহাদের গৃহে পূজিত দেবতার নামও অকটেনহাং।

অকড়ম—একটী দীক্ষাচক্র। প্রথমে অকড়ম আছে বলিয়া এই চক্রের এইরূপ নাম হইয়াছে। দীক্ষাকালে এই চক্রদ্বারা গুরু

অকড়ম চক্র



শিষ্যের সিদ্ধি প্রভৃতি গণনা করেন। রুদ্রযামলে এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। ইষ্টমন্ত্র শিষ্যের পক্ষে শুভফলপ্রদ হইবে কি না তাহাই স্থির করা এই চক্রের উদ্দেশ্য। রুদ্রযামলের মতে ইহা গোপালমন্ত্রে প্রশস্ত। কিন্তু অন্য তন্ত্রে অন্য মন্ত্রেও ইহার ব্যবস্থা আছে। গণনা করিবার প্রক্রম এই,—ধরা যাউক শিষ্যের নাম অমরনাথ এবং বীজমন্ত্র হ্রীং। তাহা হইলে অমরনাথ নামের আদ্যক্ষর অকারের প্রকোষ্ঠ হইতে বামদিকে গণনা করিয়া আসিবে। প্রথম প্রকোষ্ঠে—সিদ্ধ। দ্বিতীয়—সাধ্য। তৃতীয়—সুসিদ্ধ। চতুর্থ—অরি। যতক্ষণ না বীজমন্ত্রের ঘর পাওয়া যাইবে, সে পর্য্যন্ত এইরূপে কোষ্ঠে-কোষ্ঠে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ, অরি, যথাক্রমে গণনা করিয়া আসিবে। বীজমন্ত্রের ঘরে সিদ্ধ, সাধ্য কিংবা সুসিদ্ধ হইলে মন্ত্রোদ্ধার হয় এবং গুরু সেই মন্ত্রে শিষ্যকে দীক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু সুসিদ্ধ মন্ত্রের ফল অধিক, কারণ তদ্দ্বারা সাধক অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারেন। সিদ্ধাদির ফল তেমন নয়।

এ প্রকার গণনায় বীজমন্ত্রের ঘরে 'অরি' পড়িলে মন্ত্রোদ্ধার হয় না। তাদৃশস্থলে গুরু শিষ্যের আর একটী নূতন নাম রাখিয়া মন্ত্রোদ্ধার করেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যাঁহাদের অচলা ভক্তি আছে, সে সকল লোক বালকদের নামকরণকালেই বিশেষ সতর্ক হ'ন। যে নাম রাখিলে গণনায় মন্ত্রোদ্ধার হয় না, তাঁহারা সন্তানদের কখনও তেমন নাম রাখেন না।

সিদ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত হইলে শিষ্য অনেক সময় সিদ্ধ হইতে পারেন। সাধ্যমন্ত্র লইলে তিনি জপ ও হোমাদি দ্বারা সিদ্ধ হ'ন। সুসিদ্ধদ্বারা মন্ত্রগ্রহণমাত্র সিদ্ধ হ'ন; কিন্তু অরিমন্ত্র সাধককে বিনষ্ট করে।

ভ্রমক্রমে গুরু কাহাকেও অরিমন্ত্র দান করিলে শিষ্য যদি তাহা জানিতে পারেন, তবে সে মন্ত্র ত্যাগ করা আবশ্যক। মন্ত্রত্যাগের দুইটী প্রকরণ আছে। তন্ত্রকৌমুদীর মতে, বটপত্রে অরিমন্ত্র লিখিয়া স্রোতের জলে ভাসাইয়া দিলেই মন্ত্র ত্যাগ করা হয়। তন্ত্ররাজের মতে, দ্রোণপরিমিত গোদুগ্ধে একশত আটবার অরিমন্ত্র জপ করিয়া স্রোতের জলে তাহার কিঞ্চিৎ পান করিবেন। পরে পুনর্ব্বার মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অবশিষ্ট দুগ্ধ পরিত্যাগ করিলে মন্ত্র ত্যাগ করা হয়। এই চক্রের নিয়ম তন্ত্রসারেও লিখিত আছে (তন্ত্রসার, ২০ পৃঃ)।

অকৎখাঁ (সুলেমান শাহ্)—আলাউদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি নিজেকে সম্রাট্ ঘোষণা করিয়া আলাউদ্দীন্‌কে হত্যা করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে আলাউদ্দীন্ কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হ'ন, (১৩০০ খৃষ্টাব্দ, ৬৯৯ হিজরা)।

[Elliot's History of India, Vol. III, p. 171ff; Elphinstone's History of India, p. 292; Brigg's Ferishtá, Vol. I, p. 337ff.]

অকথহ—দীক্ষাকালে শিষ্যের সিদ্ধাদি গণনা করিবার এক প্রকার চক্র; অর্থাৎ ইষ্টমন্ত্র শিষ্যের নামের সঙ্গে সুমেলন হয় কি

অকথহ চক্র

অ ক থ হ	উ ঙ প	আ খ দ	ঊ চ ফ
ও ড ব	৯ ঝ ম	ঔ ঢ শ	ৠ ঞ য
ঈ ঘ ন	ঋ জ ভ	ই গ ধ	ৠ ছ ব
অঃ ত স	ঐ ঠ ল	অং ণ ষ	এ ট র

না এবং সেই ইষ্টমন্ত্র শিষ্যের পক্ষে কি প্রকার শুভফলপ্রদ হইবে, ইহাদ্বারা তাহাই নিশ্চিত হয়। প্রথমে 'অকথহ' আছে বলিয়া এই চক্রের এইপ্রকার নাম হইয়াছে। এই চতুরস্র ক্ষেত্রটী প্রথমে চারিটী প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। তৎপরে ঐ এক একটী প্রকোষ্ঠ আবার চারিটী করিয়া প্রকোষ্ঠে বিভক্ত; সুতরাং ইহাতে সর্ব্বসমেত ১৬ ষোলটী ঘর আছে। গণনার প্রণালী এই,—ধরা যাউক, শিষ্যের নাম আনন্দচন্দ্র এবং বীজমন্ত্র হ্রীং। তাহা হইলে, আনন্দচন্দ্র নামের আদ্যক্ষর আকার হইতে দক্ষিণদিকে

হ্রীং মন্ত্রের আদ্যক্ষর হকার পর্য্যন্ত গণনা করিয়া যাইতে হইবে। প্রথম আকার প্রকোষ্ঠে—সিদ্ধ। ২য়—সাধ্য। ৩য়—সুসিদ্ধ। ৪র্থ—অরি। এখানে হকার বীজ-মন্ত্রের ঘরে অরি পড়িল; সুতরাং মন্ত্রোদ্ধার হইল না।

মন্ত্রের ঘরে অরি না পড়িলে পুনর্ব্বার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠগুলি এক একটী করিয়া গণনা করিতে হইবে। যথা—অকারের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ১ম—সিদ্ধ-সিদ্ধ। ২য়—সিদ্ধ-সাধ্য। ৩য়—সিদ্ধ-সুসিদ্ধ। ৪র্থ—সিদ্ধ-অরি। তাহার পর, নিম্নের বৃহৎ প্রকোষ্ঠের চারিটী ঘর ঐরূপে গণনা করিতে হইবে। পুনশ্চ, আর একটী বৃহৎ প্রকোষ্ঠের ঘর গণনা করিয়া ক্রমে হকারের প্রকোষ্ঠ পর্য্যন্ত গণনা করিয়া যাইবে। এই চক্রের নিয়ম তন্ত্ররাজ ও তন্ত্রসারে (পৃঃ ১৯) লিখিত আছে। [অকড়মচক্র ও মন্ত্রশব্দ দ্র°]।

অকনিষ্ঠ, অকনিথ, অঘনিষ্ঠ—বৌদ্ধদ্বাবিংশ স্বর্গ। বৌদ্ধমতে সমগ্র বিশ্ব অসংখ্য চক্রবালে বিভক্ত। প্রত্যেক চক্রবালের সূর্য্য, চন্দ্র, স্বর্গ ও নরক আছে। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেকটী তিনটী লোক বা 'ধাতু'তে বিভক্ত—কামলোক, রূপলোক ও অরূপলোক। ইহাদের মধ্যে কামলোক সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন; তাহার উপর রূপলোক এবং সর্ব্বোপরি অরূপলোক অবস্থিত। কামলোকে তেত্রিশ দেবতা, যম, তুষিত, নির্ম্মাণ-রতি ও পরিনির্মিত বশবর্ত্তিগণ ছয়টী দেবলোকে অবস্থান করেন। এই ছয়টী দেবলোকে মনুষ্যজগৎ, অসুরজগৎ ও প্রেতজগৎ নামে পশুলোক এবং নরক নামে একাদশটী কামলোক বর্ত্তমান।

রূপলোক বা রূপব্রহ্মলোকে ষোড়শটী বিভাগ আছে; তন্মধ্যে অকনিষ্ঠ ষোড়শ বা শেষ লোক। উত্তরাঞ্চলের বৌদ্ধশাস্ত্রে রূপলোকসমূহের একই নাম পাওয়া যায়। তাহাতে অকনিথ স্বর্গকে অকনিষ্ঠ স্বর্গ বলা হইয়াছে। বায়ুপুরাণে ইহাকে অঘনিষ্ঠ বলা হইয়াছে এবং ঐ পুরাণমতে ইহা মহামহেশ্বরায়তন। ২ বুদ্ধ (শব্দার্ণব)। ৩ বৌদ্ধ গণভেদ।

অকনিষ্ঠগ—বুদ্ধ (ত্রিকাণ্ড° ১.১.৮)।

অকপী—তাপস মন্বন্তরের কবি, পৃথু, অগ্নি, অকপী, কপি, জল্প ও ধীমান্ নামক সপ্তর্ষির অন্যতম (মৎস্যপু° ৯.১৫-১৬)।

অকপীবান্—তাপস মন্বন্তরের কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জহ্নু, ধাতা, কপীবান, অকপীবান্ নামক সপ্তর্ষির অন্যতম (হরিব°)।

অকম্পন—রাবণের সেনাপতিগণের অন্যতম। ইঁহার পিতার নাম সুমালী, মাতার নাম কেতুমতী। জনস্থানবাসী খরানুচর রাক্ষসগণের মধ্যে একমাত্র ইনিই রামশর হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। ইনি দ্রুতবেগে লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া রাবণের নিকট খরদূষণাদির মৃত্যু-সংবাদ দেন এবং বলেন যে, রামশরে জনস্থান রাক্ষসশূন্য হইয়াছে। আর ইনিই রাবণকে সীতা-হরণের পরামর্শ দিয়াছিলেন। লঙ্কাসমরে বজ্রদংষ্ট্র নিহত হইলে, রাবণ ইঁহাকে প্রহস্তের সহিত বানর-সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে পাঠান। ইনি কিছুকাল প্রবল পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে কপিশ্রেষ্ঠ হনুমানের হস্তে নিহত হ'ন (রামা° ৩.৩১; ৬.৫৫-৫৬)। ২ খশার পুত্রদিগের মধ্যে অন্যতম (বায়ুপু° ৬৯.১৬৭)। ৩ প্রাচীন নৃপতিবিশেষ। ইঁহার পুত্রের নাম হরি। এক সময় অকম্পন শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অনন্যোপায় হইয়াছিলেন, কিন্তু মহাবিক্রম পুত্র হরির যুদ্ধ-কৌশলে অব্যাহতি লাভ করেন (মহাভা°, দ্রোণ ৫২-৫৪ অঃ)। ৪ জৈন গণধরগণের অন্যতম [জৈন হরিব° ১২.৪০]।

অকম্পিত—একজন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজা। যখন ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মকে দূর করিবার জন্য শঙ্করাচার্য্য অবতীর্ণ হ'ন, তখন যাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন অকম্পিত তাঁহাদের মধ্যে একজন। ২ জৈনদিগের একাদশ গণাধিপ (হেম° ৩২)। ৩ একজন বৌদ্ধ স্থবির।

অকর—সিন্ধুনদের মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র দ্বীপস্থিত দুর্গ। সুলতান জালালুদ্দীন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সিন্ধুদেশের শাসনকর্ত্তা এই দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

[Tabaqāt-i-Nāsirī—Raverty, p. 294n.]

অকর আলী—আসাম প্রদেশের শিবসাগর জেলার সমতল ভূমি হইতে উচ্চ রাস্তা। ইহা ২০ মাইল লম্বা ও গোলাঘাট হইতে নেগহেরিতিং পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

অকরণ-সংবরণ—[বৌদ্ধতান্ত্রিক পরিভাষা]—তার সাধনপদ্ধতিতে অন্যায় কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে আত্মসংবরণ। পণ্ডিত-স্থবির-অনুপরমরক্ষিত-কৃত "কিঞ্চিৎ-বিস্তরতারাসাধনে" লিখিত আছে, সাধক "....ইত্যনেন বিধিনা প্রতিদেশ্য পুনঃ অকরণ-সংবরণং প্রতিগৃহ্য পুণ্যামনুমোদনাং কুর্য্যাৎ।"

অকরবলে—আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে ব্যবহৃত অসভ্য জাতির ভাষা। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে যে সমস্ত ভাষা ব্যবহৃত হয় তাহাদিগের মধ্যে একটা বৈয়াকরণিক ঐক্য আছে। অকরবলে ভাষায় ভগবান্‌কে বলে "পুলুগ"।

[J. R. A. S. 1899, p. 574.]

অকরমফৈজ—একজন প্রাচীন হিন্দী কবি। জনশ্রুতিমূলে জানিতে পারা যায় যে, ৭০০ হইতে ১১৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে সকল চারণ, ভাট, সেবক ও পঞ্চোলী হিন্দী গান গাইয়া গিয়াছেন ইনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ইঁহার রচনা আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই; সুতরাং ইনি প্রাকৃত কিংবা হিন্দী ভাষায়

গান রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই।

অকরমাসে—খান্দেশ ও ঠানা জেলার মরাঠী কৃষক-সম্প্রদায়। পূর্ব্বকালে ধনী মরাঠাগণ তাঁহাদের কন্যার বিবাহ সময়ে জামাতাদিগকে কুন্‌বিজাতীয়া একটী সুন্দরী রমণী উপহার দিতেন। তাহাদের গর্ভে উৎপন্ন সন্তান অকরমাসে নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা কডু, সিন্দে এবং লেকাবলে নামেও অভিহিত হয়। ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—আসল ও কম আসল। পূর্ব্বে ইহারা প্রভুগৃহে ভৃত্যের কাজ করিত; এখন ইচ্ছানুসারে যে কোন কার্য্য করিয়া জীবনধারণ করিতে পারে। ইহারা মরাঠী ভাষায় কথোপকথন করে। একটু অলস প্রকৃতির হইলেও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ইহারা কামার, ছুতার, কৃষক ও ঘরামির কাজ করিয়া জীবিকার্জ্জন করে; আয় যৎসামান্য। মৃত্যু হইলে ইহাদের শবদেহ পোড়ান হয়। কিন্তু কখনও কখনও গোর দিতে দেখা যায়। বিধবাদের পুনর্বিবাহের প্রথা প্রচলিত আছে। ইহারা স্মার্ত্ত বা ভগীরথপন্থী এবং মরাঠী ব্রাহ্মণেরাই ইহাদের পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। সামাজিক গোলযোগের নিষ্পত্তি পঞ্চায়ৎগণই করেন।

অকরা—[বৈদ্যক] আমলকী। ২ হস্তশূন্যা; নুলা।

অকরাকরভ—[বৈদ্যক] স্বনামখ্যাত পণ্যদ্রব্য [আকরকরা দ্র°]।

অকরান্—য়ামান্ দেশের একজন নৃপতি। ইনি তুব্বা-যব বংশের নবম রাজা। ইঁহার পিতা শমর একজন বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন। অকরান্ ৫৩ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

[Tabaqāt-i-Nāsirī—Raverty.]

অকরান্ খাঁ—নাম কদর খাঁ [কদর খাঁ দ্র°]।

অকর্কর—কদ্রুর গর্ভে কশ্যপের ঔরসে জাত এক মহানাগ (মহাভা°, আদি ৩৫ অঃ)। ২ [বৈদ্যক] স্বনামখ্যাত পণ্যদ্রব্য [আকর্‌করা দ্র°]।

অকর্ণ—বধির; কর্ণহীন। ২ ব্রহ্ম। ৩ সর্প। সর্পের কর্ণ নাই, চক্ষু দ্বারা সর্পজাতি শুনিতে পায়, এইরূপ জনপ্রবাদ। তজ্জন্য সর্পের এই নাম [সর্প দ্র°]।

অকর্‌রহ—একটী প্রাচীন শহর। ঝিলাম ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। এখানে বহু প্রাচীন কূপের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান।

অকল—শিব। (মহাভা°, সহস্রনাম)।

অকলকোট, অক্কলকোট—বোম্বাই প্রদেশের শোলাপুর তালুকের অন্তর্গত একটী করদ রাজ্য। অক্ষা° ১৭°১৮′ হইতে ১৭°৪৪′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৫৬′ হইতে ৭৬°২৮′ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। মালশিরা তালুকের ৬টী গ্রাম এবং খটাব তহশীলের কুর্লা গ্রাম এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। উত্তর সীমায় মালশিরা ও খটাব তহশীলের ৭টী গ্রাম বাদে নিজাম রাজ্য; পূর্ব্বে পটবর্দ্ধন ও নিজাম রাজ্য; দক্ষিণে বিজাপুর রাজ্যের ইন্দী তালুক ও নিজাম রাজ্য এবং পশ্চিমে শোলাপুর তালুক। ভূপরিমাণ ৪৯৮ বর্গমাইল; তন্মধ্যে আসল অকলকোট রাজ্যের আয়তন ৪৪৪ বর্গমাইল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের গণনায় লোকসংখ্যা ৯২৬০৫ হইয়াছে।

সমগ্র অকলকোট প্রদেশ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২০০ শত ফুট উচ্চ অধিত্যকায় অবস্থিত। ইহার সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর বৃক্ষাদি রহিত, তবে গ্রামের সন্নিকটে মধ্যে মধ্যে আম্রবীথিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাজ্যে অনেকগুলি স্রোতস্বিনী প্রবাহিত। ভীমা নদী ইন্দে হইতে এবং সীনা নদী শোলাপুর তালুক হইতে এই রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। বোরী নদী উত্তর দিক্ হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে আসিয়া হরণী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে; পরে আরও ৩০ মাইল দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া অকলকোট শহরের দুই মাইল পশ্চিমে ভীমা নদীর সহিত মিশিয়াছে। এখানে অনেকগুলি নদী প্রবাহিত হওয়ায় এবং অসংখ্য কূপতড়াগাদি থাকায় জলকষ্ট একেবারে নাই। সমগ্র প্রদেশটী প্রস্তরময় এবং কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকায় পূর্ণ। খনিজ পদার্থ নাই বলিলেই হয়। স্থানীয় জলবায়ু বড়ই মনোরম।

অকলকোট রাজ্যে একটীমাত্র শহর ও ১০২টী গ্রাম আছে। অধিবাসিগণের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান প্রধান; তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, লিঙ্গায়ৎ, বাণী, মরাঠী, কোলী, ধাঙ্গড়, পাঞ্চাল, মাহার, মাঙ্গ, চামার প্রভৃতি আছে এবং মুসলমানেরা সেখ বলিয়া পরিচিত। কৃষিকার্য্যই এখানকার অধিবাসিবর্গের প্রধান উপজীবিকা। এতদ্ব্যতীত অনেকে বস্ত্রবয়ন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে বজরা, জোয়ার, চাউল, অড়হর, ছোলা, গম, তিসি, কার্পাস এবং ইক্ষুই প্রধান। অকলকোট শহরের রাজোদ্যানে প্রচুর নারিকেল ও তাল বৃক্ষ আছে। এই রাজ্যের ১৩ বর্গমাইল পরিমিত ভূমি জঙ্গলময় এবং ৩৯ বর্গমাইল স্থান কৃষিকার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে খদ্দর, পাগড়ী ও সাড়ী উল্লেখযোগ্য। বিক্রয়ার্থ বৎসরে প্রায় ৫ লক্ষ টাকার মাল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ পেনিনসুলার রেলপথ এই রাজ্যের উত্তর-

পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বে প্রায় ১৮ মাইল বিস্তৃত রহিয়াছে। এই রেলপথের অকলকোট রোড ষ্টেশন হইতে অকলকোট শহর পর্য্যন্ত ৭ মাইল লম্বা একটী সুন্দর পাকা রাস্তা আছে। দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলপথও রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। উক্ত রেলপথের তাড়বল ষ্টেশন হইতে একটী পাকা রাস্তা আছে; এই দুইটী পথে জিনিসপত্র লইয়া যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা। জোয়ার ও কার্পাসবস্ত্র এখান হইতে বহুল পরিমাণে রপ্তানী হয়। শোলাপুর ও নিজাম রাজ্য হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গম, কলাই, তুলা, লবণ, নারিকেলতৈল, লোহা ও তামার তার, রেশম, সুপারী, খর্জ্জুর, লঙ্কা ও নীল, বিজাপুর হইতে মাখম এবং কল্যাণ হইতে চামড়া আমদানী হইয়া থাকে।

শোলাপুরের কলেক্টরই এখানকার পলিটিক্যাল এজেণ্ট; ইনি সিভিল ও সেসন জজের সমান ক্ষমতাপ্রাপ্ত। ইংরেজের আইন সর্ব্বত্র বলবৎ। ১৮৬৬-৭১ খৃষ্টাব্দে সমগ্র প্রদেশটীর জরিপ হয়। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ৩০ বৎসর কালস্থায়ী নূতন হারে বন্দোবস্ত হয়। রাজ্য মধ্যে বেতনভোগী ৫০ জন সৈনিক এবং ৬৭ জন পুলিশ আছে। ১৯০৩-৪ খৃষ্টাব্দে সমগ্র রাজ্যে ৩৫টী স্কুল স্থাপিত হয়। অকলকোট শহরের হাঁসপাতাল ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সংস্থাপিত হয়।

অকলকোট এই রাজ্যের একমাত্র শহর। অন্যান্য গ্রামের মধ্যে চপলগাঁ, করজোগী, মগ্রুল, নাগনসর, তোলনর, এবং বাগদরী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইতিহাস।—অকলকোট রাজ্যের স্বতন্ত্র ইতিহাস খৃঃ ১৮শ শতকের প্রথমপাদ হইতে আরম্ভ। খৃঃ ১৬শ শতকে ইহা শোলাপুর তালুকের অধীন ছিল। এজন্য ইহার অধিকার লইয়া বিজাপুর ও অহ্মদ্নগরের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিত। খৃঃ ১৭শ শতকের প্রথমে ইহা অহ্মদ্নগরের অধীনে আসে এবং ঐ সময়ে দেশমধ্যে মালিক অম্বরের জমাবন্দী পদ্ধতি প্রচলিত হয়।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, শিবাজীর পৌত্র শাহু মুক্তিলাভ করিয়া দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া আসেন। এখানে আসিয়া ঔরঙ্গাবাদ রাজ্যের শিবরী উপবিভাগের পারদ গ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তৎকালে রাজারামের বিধবা পত্নী তারাবাঈয়ের পক্ষীয় সয়াজী নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে আক্রমণ করে। যুদ্ধে সয়াজী নিহত হইলে তদীয় পত্নী শিশুপুত্রগণের সহিত শাহুর শরণাপন্ন হ'ন। তিনি তাঁহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাণোজীর ভার নিজেই গ্রহণ করেন। ক্রমে বালক রাণোজী শাহুর খুবই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। কয়েকটী যুদ্ধে জয়লাভ করায় শাহু বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহাকে 'ফতেসিং' উপাধি দান করেন। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে শাহু তাঁহাকে ভোঁসলে উপাধি এবং অকলকোট-রাজ্য জায়গীরস্বরূপ প্রদান করেন। নানা স্থানে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিবার পর ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে শাহুর মৃত্যু হইলে তিনি অকলকোটে ফিরিয়া আসেন। এখানেই ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপরে তাঁহার দত্তকপুত্র শাহ্জী অকলকোট রাজ্যের রাজা হ'ন। অল্পদিন পরেই শাহজী অকালে পরলোকগমন করিলে তৎপুত্র ফতেসিংহ রাজা হ'ন (১৭৬০ খৃঃ)। ইঁহার অপর নাম অব্বা সাহেব। এই সময়ে কনিষ্ঠ তুলজাজীর সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে তুলজাজীই খটাব তহশিলের অন্তর্গত কুর্লা গ্রাম ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হ'ন।

১৮২০ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত চুক্তি সর্ত্তে সাতারার অধীন অন্যান্য রাজ্যের সহিত ইহাও ইংরেজ শাসনাধীনে আসে। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ফতেসিংহের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র মালোজী রাজা হ'ন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় অষ্টম বর্ষীয় পুত্র শাহজী রাজসিংহাসন লাভ করেন; কিন্তু তিনি নাবালক থাকায় সাতারা-রাজ শাসন-কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হ'ন। শাসনাধিকার লইয়া ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কতকগুলি নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন, তাহাতে প্রজাবর্গের মনে বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। পরবৎসর বিচলিত প্রজাবৃন্দ সরদেশমুখ শঙ্কর রাওয়ের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তখন বাধ্য হইয়া রাজাকে পুনরায় তাহাদের সহিত আপোষ করিতে হয়। এই গোলমালের পর সাতারা-রাজের ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং শাহজী সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত কাপ্তেন জেমিসন রাজ্য-পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে যখন সাতারা ইংরেজ সরকারের হস্তগত হয়, সেই সঙ্গে অকলকোট ভারত-সরকারের অধীনে করদরাজ্যরূপে পরিগণিত হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে শাহজীর মৃত্যু হইলে তৎপুত্র মালোজী রাজা হ'ন। রাজ্যশাসনে অনভিজ্ঞতাহেতু ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পদচ্যুত হ'ন এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন। তৎকালে তাঁহার পুত্র শাহজীর বয়স মাত্র তিন বৎসর। এজন্য সেই সময় হইতে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারত সরকারই রাজ্যের সকল প্রকার শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। ঐ বর্ষে শাহজী সাবালক হইয়া স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন। উহার কয়েকবৎসর পরে (১৮৯৮ খৃঃ) অপুত্রকাবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার

বিধবা পত্নী ভারতসরকারের অনুমতি লইয়া প্রথম শাহজী-বংশীয় কুর্লার জায়গীরদার গণপৎজী ভোঁসলের পুত্র ফতেসিংহকে দত্তক ল'ন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার কর্তৃত্বলাভ করেন। দুঃখের বিষয় ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে পুণা শহরে অস্ত্রোপচারকালে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। তৎপুত্র বিজয়সিংহ বর্ত্তমান রাজা। তিনি বর্ত্তমানে ভারত-সরকারকে বাৎসরিক ১৪৫১২৲ টাকা কর দিতেছেন।

অকলকোট, —বোম্বাই প্রদেশান্তর্গত অকলকোট রাজ্যের প্রধান শহর। অক্ষা° ১৭°৩১'৩০" উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬°১৫' পূঃ। গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ পেনিনসুলার রেলপথের অকলকোট-রোড (পূর্ব্ব নাম কড়বগাঁ) ষ্টেসন হইতে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। এই শহরে একটী সুন্দর মসজিদ আছে। এতদ্ব্যতীত পুরাতন ও নূতন রাজপ্রাসাদ এবং পূর্ব্বতন রাজগণের সমাধিমন্দির উল্লেখযোগ্য।

অকলঙ্ক, অকলঙ্কচন্দ্র, অকলঙ্কদেব—প্রসিদ্ধ জৈন গ্রন্থকার ও দার্শনিক। ইনি দিগম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত এবং খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে বিদ্যমান ছিলেন। পম্প, পোন্ন প্রভৃতি প্রাচীন কন্নড় (কাণাড়ী) লেখকগণ ইঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। তর্কশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলিয়া প্রাচীন লেখমালায় ইঁহার উল্লেখ আছে। ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে শ্রবণ-বেল্-গোল্-বাসী অকলঙ্কদেব কাঞ্চীরাজ হেম-শীতলের সম্মুখে বৌদ্ধদিগের সহিত তর্কযুদ্ধ করেন। অতঃপর পরাস্ত বৌদ্ধগণ রাজাদেশে সিংহলে নির্ব্বাসিত হ'ন। কন্নড়-গ্রন্থকার পোন্ন ইঁহাকে 'জয়-বাদী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কমলভব নামক কন্নড়কবি তাঁহার বাগ্মিতার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন ও নাগচন্দ্র অকলঙ্কের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

অকলঙ্করচিত নিম্নোক্ত কএকখানি গ্রন্থ অতি প্রসিদ্ধ: ১ দেবাগমস্তোত্রন্যাস ; ২ "প্রমাণ-রত্ন-প্রদীপ" ; ৩ 'তত্ত্বার্থ-বার্ত্তিকটীকা' ; ৪ জৈনবর্ণাশ্রম ; (কন্নড় পাণ্ডুলিপি) ৫ অকলঙ্কস্তোত্র ; ৬ অষ্টশতী (এখানি জৈনসম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আপ্তমীমাংসার' সর্ব্বপ্রধান টীকা)।

[**Mysore** Inscriptions translated, Bangalore, 1879, pp. 32-34—Lewis Rice ; J. R. A. S., Vol. XV, p. 299.]

অকলঙ্কচরিত—যাঁহার চরিত্রে কোন দোষ নাই। ২ দাক্ষিণাত্যের চালুক্যবংশীয় রাজা সত্যাশ্রয়ের উপাধি বা বিরুদ। রাজা ২য় তৈলের পর সম্ভবতঃ ৯৯৭ খৃষ্টাব্দের শেষে তিনি সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

অকলজ—বোম্বাই প্রদেশের শোলাপুর জেলান্তর্গত মালশিরা নামক স্থানে অবস্থিত একটী গ্রাম। অক্ষা° ১৭°৫৩'৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৪' পূঃ।

অকল্কা—জ্যোৎস্না [জ্যোৎস্না দ্র°]।

অকল্মষ, অকল্মাষ—তামস মনুর পুত্রদিগের অন্যতম। অকল্মষ, ধন্বী, তপোমূল, তপোধন, তপোরতি, তপস্য, তপোদ্যুতি, পরন্তপ, তপোভোগী ও তপোযোগী এই ১০টী মনুপুত্র (মৎস্যপু°, ৯.১৭)।

অকল্ল—[বৈদ্যক] স্বনামখ্যাত পণ্যদ্রব্য [আকর্‌করা দ্র°]।

অকসারিয়া—বিহারের বাড়লজাতির একটী শাখা।

অকা, (**জাতি**)—আসামের উত্তরসীমাস্থিত পর্ব্বতবাসী এক অসভ্য জাতি। ইহাদের মুখ গোল ও চেপ্টা ; নাক স্থূল ; চক্ষু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। গালের অস্থি উচ্চ ; দেহ মধ্যমাকার ; দেখিতে খুব মলিন নয়, অথচ তাম্রবর্ণও নয়। স্ত্রীলোকেরা সুশ্রী নহে ; তাহাদের গড়নেরও লাবণ্য নাই। পর্ব্বতের উপর ভরলী নদীর জলোচ্ছ্বাসের উর্দ্ধভাগে এই জাতির বাসস্থান। সেখানকার পথ অত্যন্ত দুর্গম ; তরাই হইতে উঠিতে হইলে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হয়। অকাজাতি দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এক সম্প্রদায়ের নাম হাজারী-কোয়াদ। এই শব্দের অর্থ—হাজার রন্ধনশালার খাদক। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের নাম—কূপচোর। কূপচোর শব্দে কার্পাসক্ষেত্রের চোরকে বুঝায়। এই দুটী শব্দই আসামীভাষার অপভ্রংশ। পূর্ব্বে ইহারা পর্ব্বতের নিম্নে নামিয়া জনপদের মধ্যে মহা উৎপাত করিত। ব্রহ্মপুত্রনদে নৌকা ও তীর্থযাত্রীদের দ্রব্যসামগ্রী লুটপাট করিয়া বেড়াইত। কৃষকদের ক্ষেত্র হইতে কার্পাস ও শস্যাদি অপহরণ করিত ; সেই জন্য অকাদের মধ্যে দুইটী সম্প্রদায়ের এই প্রকার নামকরণ হইয়াছে।

অকাদের উত্তরে মিশ্‌মী জাতি। তাহারাও অসভ্য। অকাদের সঙ্গে মিশ্‌মী কন্যার আদান-প্রদান চলে। মিশ্‌মীরা পর্ব্বতের নিম্নে আসে না, কেবল অকারা বিপদে পড়িলেই আত্মীয়-স্বজনকে উদ্ধার করিবার জন্য তাহারা পর্ব্বত হইতে নামিয়া পড়ে। অকাদের সর্ব্বসমেত ২৩০ ঘর পরিবার, এবং মিশ্‌মীজাতির ৪০০ ঘর।

অসভ্যাবস্থায় সকল জাতিই কেবল বাহ্য জগতে ঐশী শক্তি দেখিতে পায়। সৃষ্টির মধ্যে যাহা কিছু অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর, যাহা হইতে বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা,—দেবতা সেইখানে, সেইখানেই ঈশ্বরত্ব বিদ্যমান আছে। প্রাচীন ঋগ্বেদ হইতে আমরা ইহাই দেখিয়া আসিতেছি। অকারা পর্ব্বতে থাকে। পর্ব্বতের ভয়ঙ্কর উচ্চ চূড়া, কল্লোলিনী নদী, বন্যপশুপূর্ণ নিবিড় জঙ্গল, এইগুলিকেই তাহারা দেবতা বলিয়া মানে। ফুক্ক—জঙ্গলের ও জলের দেবতা। যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—

ফিরন ও সিমন্। সতু—ক্ষেত্রের ও গৃহের দেবতা। অকাদের পুরোহিতের নাম দেবরী। দেবরীকে পূজাদি কয়েকটী দৈবক্রিয়া করিতে হয়। এক একটী কুটীরে জঙ্গলাদি দেবমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। পুরোহিত সেই সকল দেবতার পূজা করেন। শস্য কাটিলে তিনি দেবতাদিগকে তাহার অগ্রভাগ উৎসর্গ করিয়া দেন। বিবাহের সময় আমাদের হাতে সূতা বাঁধিতে হয়। অকারা অসভ্য, কিন্তু তাহাদের মধ্যেও এই মঙ্গলাচরণটী প্রচলিত আছে। বিবাহের পূর্ব্বে পুরোহিত গিয়া বর-কন্যার হাতে সূতার গ্রন্থি বাঁধিয়া দেন। কাহারও পীড়া হইলে ঔষধের ভরসা কেহ করে না। ওঝারা মন্ত্র পড়িয়া রোগীকে ঝাড়াইতে থাকে এবং পুরোহিত ফুক্ষদেবতার কাছে কুক্কুটাদি বলি দিয়া স্বস্ত্যয়ন করেন।

অকাদের গৃহ প্রায় কাষ্ঠ ও প্রস্তরে নির্ম্মিত, ঘরের মেজেতে তক্তা বিছান। তাহারা প্রায় ধনুঃশর লইয়া সর্ব্বদা ভ্রমণ করে। হস্তী প্রভৃতি বৃহৎ জন্তু শিকার করিতে হইলে তাহারা তীরের ফলায় কাষ্ঠবিষ মাখাইয়া দেয়।

ইহারা পর্ব্বতজাত নানা প্রকার দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া তিব্বতদেশে, ভুটানে, সিকিমে, এবং পাহাড়ের নিম্নে বাণিজ্য করিতে আসে। তদ্ভিন্ন আপনাদের প্রয়োজনমত তাম্র ও কাঁসার পাত্র এবং বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া লয়।

অকারা আসামের নিকটবর্ত্তী জনপদের ভিতর মধ্যে মধ্যে অতিশয় অত্যাচার করে। ১৮২৮ খৃঃ অব্দে তাহাদের সর্দ্দার টগীরাজকে ইংরেজেরা গ্রেপ্তার করিয়া গৌহাটীর জেলে আবদ্ধ রাখেন। এইখানে তিনি জনৈক হিন্দু গুরুকে পাইয়া তাঁহার নিকট হরিভক্তি ও হরিমন্ত্রে দীক্ষিত হ'ন। গুরুকে শিষ্য ভালবাসিতেন, শিষ্যও গুরুকে শ্রদ্ধা করিতেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ অনুরাগ জন্মিল। ১৮৩২ খৃঃ অব্দে টগীরাজ আপনার গুরুকে জামিন রাখিয়া মুক্তি পাইলেন। কিন্তু যখন পুনরায় পর্ব্বতের স্বাধীন বায়ু তাঁহার গায়ে লাগিল, সেই হরিভক্তি ও গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা আর কিছুই থাকিল না। পূর্ব্বে যে সকল লোক ষড়্যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছিল, তিনি প্রথমেই তাহাদিগকে নষ্ট করিলেন। নিকটের ইংরেজদিগের চৌকি লুট করিয়া লইলেন। ইংরেজদের যে সকল কর্ম্মচারী তাঁহার সম্মুখে পড়িয়াছিল, তন্মধ্যে অনেকেই হত ও আহত হ'ন।

এই সকল অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য বৃটিশসৈন্য প্রেরিত হইল। অকারাজ কোথায় থাকেন, কোন্ পর্ব্বত হইতে কোন্ পর্ব্বতে পলাইয়া যান, তাহা নির্ণয় করা দুর্ঘট হইল। ইংরেজেরা অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিলেন, কিন্তু কোন সন্ধান পাইলেন না। পরিশেষে টগীরাজ বুঝিলেন, চিরকাল এমন উদ্বিগ্ন থাকা অপেক্ষা মৃত্যু কিংবা কারাবাস ভাল। যুদ্ধের উপকরণ নাই যে, ইংরেজের গোলাবৃষ্টির সম্মুখে স্থির থাকিতে পারিবেন, সুতরাং তিনি আপনিই আসিয়া ধরা দিলেন। এখন সন্ধির কথা। যেমন রাজা তাঁহার বার্ষিক তঙ্কার ব্যবস্থাও তদ্রূপ হইল। ইংরেজেরা বলিলেন,—আপনি শান্ত শিষ্ট হউন, লোকের প্রতি আর উৎপীড়ন করিবেন না, আপনাকে বৎসর বৎসর ৩৬০৲ টাকা করিয়া পেন্সন দেওয়া যাইবে। কিন্তু আপনি কাহারও উপর অত্যাচার করিবেন না, সেজন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা চাই। টগীরাজ তাহাতেই সম্মত হইলেন। এখন অঙ্গীকারের নিমিত্ত পবিত্র দ্রব্য আবশ্যক। কুক্কুট আসিল, ভল্লূক ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম আসিল। তোমার আমার কাছে যাহা পবিত্র নয়, জগতে আর কাহারও চক্ষে তাহা পবিত্র হইবে না, এমন কোন কথা নাই। হিন্দুর পবিত্র গো-বিষ্ঠা, অকার পবিত্র হস্তিবিষ্ঠা। শপথের জন্য রাশি রাশি হস্তিবিষ্ঠা আনা হইল। প্রথম সত্যপাঠে মুর্গী বলি। তাহার পর অকারাজ এক হাতে ভল্লূকচর্ম্ম ও অন্য হাতে ব্যাঘ্রচর্ম্ম লইয়া বলিলেন,—'যা হবার হইয়াছে; এবার সাবধান হইলাম,—কখনও ইংরেজের বাক্য লঙ্ঘন করিব না।' পরিশেষে অঞ্জলি পুরিয়া হস্তীর বিষ্ঠা লইলেন, লইয়া বলিলেন,—ইংরেজের সঙ্গে বিরোধ, এ জন্মের মত ফুরাইল; জীবন থাকিতে আর কখন বিবাদ করিব না।' শেষে, একবার হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া প্রতিজ্ঞা সমাপ্ত হইল।

অকা এবং মিশ্‌মীদের আকৃতি-প্রকৃতি, বেশভূষা, লোক-



লৌকিকতা, আহার-ব্যবহার সকলই একপ্রকার। এখানে মিজুমিশ্‌মী সর্দ্দারের প্রতিমূর্ত্তি দেওয়া হইল। অকা এবং মিশ্‌মীরা কিপ্রকার সভ্যবেশ-ভূষা পরিয়া থাকে, এই চিত্র-পট তাহার প্রমাণ। বিগত ১২৯১ সালের কলিকাতার প্রদর্শনীতে অনেক অসভ্য জাতির প্রতিমূর্ত্তি দেওয়া হইয়াছিল। প্রতিমূর্ত্তি গড়িবার সময় অকাদের আকৃতিও দিবার কল্পনা হয়। সেজন্য আসাম গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা নমুনাস্বরূপ একজন অকাকে কলিকাতায় পাঠাইতে চেষ্টা করেন। এই প্রস্তাবে সমস্ত অকাজাতি একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। প্রতিমূর্ত্তি গড়াইবার জন্য জীবিত মানুষকে কলিকাতায় যাইতে হইবে, ইহার চেয়ে অসঙ্গত

কথা আর কি হইতে পারে? এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য অকারা কয়েকজন বৃটিশ প্রজাকে আপনাদের পর্ব্বতে ধরিয়া লইয়া যায়। তজ্জন্য ইংরেজদের সঙ্গে সামান্য যুদ্ধ হইয়াছিল। অবশেষে অকারা পরাস্ত হইয়া পর্ব্বতের উপরিভাগে পলায়ন করে।

অকারাজের মূর্ত্তি ভাবিলে সেকালের শিবদূত মনে পড়ে। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ উল্কীতে চিত্রিত, কণ্ঠভরা প্রস্তর ও হাড়মালা; মাথায় পাখীর পুচ্ছ; ধড়া করিয়া কাপড় পরা। তিনি পাহাড়ের বনের মধ্যে সর্ব্বদা বনফুলের হার পরিয়া বেড়ান এবং ধনুর্ব্বাণ লইয়া মৃগয়া করেন। ইহাদের তীরে কি বিষ মাখান থাকে, তাহা ঠিক নিশ্চিত হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মিঠা বিষ (**Aconitum ferox**)। কেহ কেহ বলেন, আসামীরা যাহাকে বিথ্ অর্থাৎ বিষ (**Coptis Teeta**) বলেন, অকারা তাহাই তীরের ফলাতে মাখায়। ঐ বিষাক্ত অস্ত্রদ্বারা শরীরে আঘাত লাগিলে শীঘ্রই মৃত্যু হয়। কথিত আছে, কাহাকে আঘাত লাগিলে অকারা ক্ষতস্থানে কুড় (**Sausseria Lappa**) ঘষিয়া প্রলেপ দেয় এবং উহার ক্বাথ সেবন করায়। কুড়ের যথার্থ বিষনাশক শক্তি আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করা উচিত।

সন্ধির পর দেশে আসিয়া অকারাজ স্বজাতির মধ্যে হরিভক্তি প্রচার করিলেন। এখন প্রায় সমস্ত অকাই বৈষ্ণব হইয়াছে। প্রত্যেক অকা-গৃহস্থের বিস্তর গোরু আছে। তাহারা গো-মাংস ভোজন করে, কিন্তু গো-মাংস ভোজন করে বলিয়া গোরুর দুগ্ধ কখন পবিত্র হইতে পারে না। অকারা কণ্ঠাগত প্রাণ হইলেও গো-দুগ্ধ স্পর্শ করে না। সংসার বিচিত্র স্থান; কেবল কার্য্য-বৈপরীত্য লইয়াই জগতের ব্যাপার। অকারা গো-মাংস খায়, কিন্তু গো-দুগ্ধ স্পর্শ করে না। শুনিয়া আমরা পরিহাস করি। আবার আমরা গো-দুগ্ধ খাই, কিন্তু গো-মাংস স্পর্শ করি না, সে জন্য অরণ্যের সেই প্রাকৃত লোকেরা আমাদের দেখিয়া হাসে। অকারা শূকর, কুক্কুট এবং কপোত পোষে। এই সকল জীবের মাংসই তাহাদের প্রধান খাদ্য। তাহারা প্রায় সকল জন্তুই ভোজন করে। কেবল পাতী ও রাজহাঁস এবং কুকুর প্রভৃতি যে সমস্ত পশুমাংস সচরাচর মানুষের খাদ্য নয়, তাহাই খাইতে নিষিদ্ধ। মৃত্যুর পর ইহারা শবদাহ করে না, মৃত্তিকায় পুতিয়া ফেলে। এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রণালী মিশ্মী-দিগের মত [মিশ্মী শব্দ দ্র°]।

অকা$_{2}$—ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তবর্ত্তী পার্ব্বতপ্রদেশ। ইহা আসামের দরঙ্গ জেলার উত্তরে অবস্থিত। উহার পূর্ব্বে দফলা পাহাড় ও পশ্চিমে ভূটিয়া জাতির আবাস। এই দেশে যাতায়াত করা বড়ই অসুবিধাজনক; কেবলমাত্র ভরলী নদীর একটী শাখার ধার দিয়া একটী রাস্তা আছে। এখানকার অধিবাসিগণ অকা নামে পরিচিত [অকা (জাতি) দ্র°]।

অকা$_{3}$, **অক্কা**—পালেস্তাইনের একর্ (**Acre**) নগরী।

অকাখেল—সিন্ধুনদের উত্তরপশ্চিমপারে কোহাটের নিকটবর্ত্তী আফ্রিদী নামক পাঠান জাতির এক শাখা। অন্যান্য পাঠানদের মত ইহারাও অতিশয় বীর্য্যবান্ ও দুর্দ্দান্ত। দস্যু-বৃত্তি, নরহত্যা এবং যুদ্ধ প্রভৃতি আসুরিক কার্য্যই ইহাদের ব্যবসায়। অকাখেলদের মধ্যে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আছে। যথা,—মারফ্‌খেল, মর্গব্ খেল, শের খেল, সন্দল খেল, মুণ্ডা খেল ইত্যাদি। পূর্ব্বে ইংরেজাধিকারের মধ্যে আসিয়া ইহারা সর্ব্বদাই উপদ্রব করিত। তজ্জন্য ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ইংরেজেরা ঐ জাতিকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া দেন। ইহাতে অকাখেলদের সম্পূর্ণ ক্ষতি হইতে লাগিল। একদিনের নয়, ভারতবর্ষে আসিয়া বাণিজ্য করিতে না পাইলে চিরকালের ক্ষতি। কাজেই তাহারা ২৬৭০৲ টাকা অর্থদণ্ড দিয়া হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিবার অনুমতি লইল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কেবল অর্থ পাইয়া ভুলিয়া যান নাই। অকা-খেলদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ইংরাজ অধিকারে আসিয়া অত্যাচার করিবে না, তাহাদিগকে এরূপ প্রতিজ্ঞাও করাইয়াছিলেন। সেই অবধি আফ্রিদীজাতির দৌরাত্ম্য অনেকটা কম হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও এককালে ক্ষান্ত হয় নাই।

অকাজ়ই—ভারতের উত্তর-পশ্চিমসীমান্তে হাজারা ও কৃষ্ণ-পর্ব্বতবাসী এক পাহাড়িয়া জাতি। ইহারা পাঠানদেরই একটী শাখা [য়ুসুফ্‌জ়ই দ্র°]।

অকাপর্ব্বত—[অকা$_{2}$ শব্দ দ্র°]।

অকায়—দেহশূন্য। ২ রাহু। রাহুর শরীর দ্বিখণ্ডিত। ঐ খণ্ডদ্বয়ের এক অংশ মস্তক, তাহাই রাহু; সুতরাং রাহুর শরীর নাই [অকচ দ্র°]। ৩ ব্রহ্ম (বাজ° ৪০.৮)।

অকার—বর্ণাৎ কারঃ। (কাত্যায়ন)। এক একটী বর্ণের উল্লেখ করিতে হইলে তাহার উত্তর 'কার' প্রত্যয়ের প্রয়োগ করিতে হয়। যথা, ককার, বকার, ইত্যাদি। কিন্তু র বর্ণের উল্লেখ করিতে হইলে (ইফ্) প্রত্যয় বিহিত হয়। *। রাদিফঃ; যথা, রেফ।

অকারণগুণোৎপন্নগুণ—[ন্যায়মতে] অকারণ হেত্বাভাবগুণ হইতে উৎপন্ন গুণ অর্থাৎ বৃত্তি বা ধর্ম্ম। বুদ্ধ্যষ্টক (বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম) ভাবনা ও শব্দ—এই কয়টী বিভুবিশেষগুণ অকারণগুণোৎপন্নগুণ। 'অকারণগুণোৎ-

পন্নগুণাস্ত বুদ্ধ্যষ্টকম্ ভাবনা শব্দশ্চেতি। এতে চ বিভুবিশেষ-গুণা ইত্যুচ্যন্তে।' (পদার্থমালা, ভাষাপরিচ্ছেদ)। এখানে কারণগুণোৎপন্নত্ব বলিলে স্বাশ্রয়-সমবায়ি-সমবেতগুণজন্যত্ব বুঝাইবে। যেমন স্ব—পটের রূপ, তাহার আশ্রয়—পট, তাহার সমবায়ী—তন্তু, সেখানে সমবেতগুণ—তন্তুর রূপ, তদ্দ্বারা জাত যে পটের রূপ তাহা কারণগুণোৎপন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অকারাদিনিঘণ্টু—একখানি সংস্কৃত কোষগ্রন্থ।

অকাল,—অসময়। ২ দুর্ভিক্ষ। ৩ অপ্রশস্ত কাল। জ্যোতিষ-মতে উপনয়ন বিবাহাদি শুভকর্ম্মের অযোগ্য কাল। অকাল অনেক, তন্মধ্যে স্থূল স্থূল বিবরণগুলি এখানে লিখিত হইতেছে। বৃহস্পতি অস্ত যাইবার পূর্ব্বে বৃদ্ধত্বে ১৫ দিন কালাশুদ্ধি এবং তাহার পরে ৩২ দিন। বৃহস্পতির উদয়ের পর বালত্বে ১৫ দিন। বৃহস্পতি এবং সূর্য্যের যোগে ১০ দিন। সিংহরাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে স্থূল এক বৎসর। ইহার বিশেষ এই, যদি মাঘ মাসের পূর্ণিমাতে মঘানক্ষত্রের যোগ থাকে, তবেই এপ্রকার কালাশুদ্ধি হইবে, নচেৎ হইবে না। বৃহস্পতির একরাশিতে স্থিতিকাল সমাপ্ত না হইতে যদি তিনি পূর্ব্বরাশিতে গমন করেন, তবে এই বক্রাতিচারের জন্য ২৮ দিন অশুদ্ধ। বৃহস্পতি যদি পূর্ব্বরাশিতে একবৎসর ভোগ না করিয়া অন্য রাশিতে গমন করেন এবং পরেও আর পূর্ব্বরাশিতে না আসেন, তবে এই মহাতিচারকে লুপ্তসংবৎসর কহে। লুপ্ত-সংবৎসর একবর্ষ অশুদ্ধ। বৃহস্পতির একরাশিতে ভোগকাল পূর্ণ না হইলে যদি পররাশিতে গমন করেন এবং পুনরায় পূর্ব্বরাশিতে ফিরিয়া আসেন, তবে এই অতিচার হেতু ৪৫ দিন অশুদ্ধ। বৃহস্পতি রাহুগ্রস্ত হইলে স্থূল একবৎসর অকাল।

শুক্রের মহাস্তের পূর্ব্বে বৃদ্ধত্বে ১৫ দিন। তাঁহার মহাস্তের পর ৭২ দিন। শুক্রের উদয়ে বালত্বে ১০ দিন। শুক্রের পাদাস্তে ১২ দিন অকাল। তাঁহার বৃদ্ধত্বে ১০ দিন এবং বালত্বে ৩ দিন। ভানুলঙ্ঘিত মাসে, ক্ষয়মাসে এবং মলমাসে একমাস অশুদ্ধ। ভূকম্পনাদি অদ্ভুত ঘটনায় সপ্তাহ। পৌষাদি চতুর্মাসের মধ্যে একদিন চরণাঙ্কিত বর্ষণে সেই দিন অশুদ্ধ। দুই দিন সেইরূপ বৃষ্টি হইলে ৩ দিন। আর ৩ দিন সেইরূপ বৃষ্টি হইলে বৃষ্টির শেষ দিন হইতে সপ্তাহ অকাল এবং পূর্ব্ব ২ দিন সমেত ৯ দিন অশুদ্ধ। হরিশয়নে চারি মাস। চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণে কর্ম্মবিশেষে কোথাও একদিন, কোথায় তিন দিন, কোনস্থলে এক সপ্তাহ।

অকাল,—শিব (মহাভা°)।

অকালকুষ্মাণ্ড—অসময়ে জাত কুমড়া। ২ গান্ধারী কুষ্মাণ্ডাকার একটী মাংসপিণ্ড অকালে প্রসব করিয়াছিলেন। তাহাতে দুর্য্যোধনাদির জন্ম হয়। সেই সকল সন্তান কুরুকুল বিনাশের কারণ। তজ্জন্য এখন কেহ সমাজের বা স্বীয় পরিবারের অনিষ্টকর কার্য্য করিলে তাহাকে 'অকালকুষ্মাণ্ড' বলা হয়। এটী সুষ্ঠু প্রয়োগ নহে।

অকালগড়—পঞ্জাবের গুজ্‌রানবালা জেলান্তর্গত উজীরাবাদ তহসীলের একটী নগর। অক্ষা° ৩২°১৬′ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৩°৫০′ পূঃ। এই স্থানের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। শিখশাসনের শেষভাগে মূলরাজ মুলতানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইঁহারই বংশধরগণ এক্ষণে অকালগড়ে বাস করিতেছেন।

অকালজলদ—এক প্রসিদ্ধ কবি; রাজশেখরের প্রপিতামহ।
[Peterson 2,6▪]

অকালভাস্কর—একখানি জ্যোতিষগ্রন্থ। ১৬৩৬ শকাব্দে রঘুনাথ সিদ্ধান্ত-বাগীশ ইহা রচনা করেন। মলমাসের কি করিয়া গণনা করিতে হয় ও মলমাসে করণীয় কি—সেই বিধিসমূহ ইহাতে সংবদ্ধ হইয়াছে। [রঘুনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ দ্র°]

অকালবর্ষ কৃষ্ণ—গুজরাটের রাষ্ট্রকূটবংশীয় শেষ নৃপতি। ইঁহার পিতার নাম দন্তিবর্ম্মা। ৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত এই নরপতির একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত এই তাম্রশাসনের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। ইঁহার অপর একখানি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তাপ্তীর দক্ষিণের কিয়দংশ ইনি পুনরুদ্ধার করেন।
[Bom. Gaz. Vols. I & IV.]

অকালবর্ষ শুভতুঙ্গ—রাষ্ট্রকূটবংশীয় গুজরাট রাঠোর (দ্বিতীয় পর্য্যায়) বংশসম্ভূত চতুর্থ পুরুষ। ইনি প্রথম ধ্রুবের পুত্র। পিতার মৃত্যু হইলে ৮৫০ খৃষ্টাব্দে ইনি সিংহাসন অধিকার করেন। ইঁহার পুত্রের নাম দ্বিতীয় ধ্রুব নিরুপম ধারাবর্ষ। দ্বিতীয় ধ্রুবের কামুরা লিপিতে লিখিত আছে যে, প্রথম ধ্রুবের মৃত্যু হইলে বল্লভবংশীয় সৈন্যগণ রাষ্ট্রকূটগণের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। দুষ্ট রাজ-কর্ম্মচারিগণের উৎপাতে রাজ্যের অতি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল। অকালবর্ষ সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর সেই বিদ্রোহ দমন করিয়া রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করেন।
[Indian Antiquary, Vol. XII, p. 179; Bom. Gaz Vol. 1, pt i, p. 126 & Vol. I, pt. ii, New Series.]

অকালী, অকালপুরুষ—নিহঙ্গ। পঞ্জাব অঞ্চলের এক মহা-বল শিখসম্প্রদায়। ইহারা ঈশ্বরারাধনার সময় অকাল-

পুরুষকে ডাকিতে থাকে, তজ্জন্য এই শিখদের নাম অকালী হইয়াছে। 'অকালী' শব্দে বুঝায় যাহারা মরণশীল নয়—অমর। পৃথিবীতে এমন দুঃসাহসী ও পরাক্রান্ত জাতি অল্পই আছে। গুরুগোবিন্দ এবং মহারাজ রণজিতের সময় অকালীদের প্রতাপে পঞ্চনদ প্রদেশ কম্পিত হইয়াছিল। অন্যান্য শিখদের সহিত ইহাদের পার্থক্য এই যে ইহারা রণনিপুণ দুর্ম্মদ জাতি। হিন্দু সন্ন্যাসীদের ভিতর নাগা বা গোঁসাইদের মত ইহারা অত্যন্ত কোপনস্বভাব। ইহারা বিপদ্‌কে বিপদ্ বলিয়া জানিত না, মৃত্যুকে ভয় করিত না, তা'ই দেখিয়া গুরুগোবিন্দ ইহাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ গুরুই অকালী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। কথিত আছে, গুরুগোবিন্দের প্রথমপুত্র অজিতসিংহ সর্ব্বপ্রথম অকালীমতে দীক্ষিত হ'ন। দোষের মধ্যে অকালীরা নিতান্ত ধর্ম্মান্ধ এবং সর্ব্বদাই লুঠ করিয়া বেড়াইত। তাহাদের পা হইতে মাথার কেশ পর্য্যন্ত অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিত। হাতে দুইটী তোড়াদার বন্দুক, দুইখানি তলবার; বক্ষস্থলে কবচ; কটীতে পিস্তল, কিরিচ এবং চক্র ও ফিঙ্গেকল, বামভাগের কটীতে বর্শা; পৃষ্ঠে ঢাল; পদতল হইতে হাঁটুপর্য্যন্ত লৌহাবরণে মণ্ডিত। কাণে কুণ্ডল, বাহুতে লৌহ বাজু। সর্ব্বদাই চিত্রবিচিত্র নীল রঙ্গে ভূষিত। ইহারা পঞ্চ 'কক্ক' [কেশ (অকর্ত্তিত কেশ), কচ্ছ, কর (লৌহবলয়), খন্দ (ইস্পাতের ছোট কর্ত্তরী) ও কঙ্ঘ (চিরুণী)] রক্ষা করিতে বিশেষ যত্নশীল। ইহাদের প্রধান দেবালয় অকালবুঙ্গা অমৃতসরে। তদ্ভিন্ন পঞ্জাবের অন্যান্য স্থানেও অনেক মন্দির আছে। ইহারা নানাস্থানে মিলিত হইয়া থাকে। অমৃতসরের 'অকালবুঙ্গা', আটকের 'পীরসাহেব', পাটনা ও অপচলনগরের গুরুগোবিন্দমন্দির ইহাদের সাধারণ মিলন-ক্ষেত্র। হুসিয়ারপুর জেলার অন্তর্বর্ত্তী কিরাতপুরে ইহাদের প্রধান আড্ডা। কিরাতপুরই ফুলাসিংহের পবিত্র স্থান। আনন্দপুরে গুরুদ্বার আনন্দপুর সাহেব অকালীদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। ইহাই গোবিন্দের গৃহ ছিল। রণজিৎসিংহের মৃত্যুর পর ইহাদের প্রধান দেবালয় আনন্দপুরে অবস্থিত হইয়াছে। জগতের মধ্যে তামাকুই ইহাদের চক্ষে অপবিত্র। মদ্য ও আফিম অপবিত্র নয়,—শিখজাতি এই দুই মাদকদ্রব্য সুখে সেবন করেন।

শৌর্য্যবীর্য্যে ইহারা নিহঙ্গ বা বেপরোয়া এবং শিখদের ইতিহাসে ইহাদের কীর্ত্তিচিহ্ন সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। ইহারা শহিদ বলিয়া পরিচিত। ১৯১৮ সালে মূলতান অবরোধকালে কয়েকজন অকালীর বীরত্বে দুর্গ অনায়াসে ইহাদের করতলগত হয়। ইহাদের বীরত্বকাহিনী ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রচারিত হয়। ফুলাসিংহের অধিনায়কত্বে ইহারা মেটকাফের পৃষ্ঠরক্ষী সেনাদিগকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছিল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ফুলাসিংহের অকালী সৈন্যের সাহায্যে রণজিৎসিংহ 'তরাই'এ পরাক্রমশালী য়ুসুফ্‌জ়ইদিগকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে বীরের মত ফুলাসিংহ মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন এবং নৌশেরায় তাঁহার যে স্মৃতিচিহ্ন আছে, তাহার প্রতি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

রণজিৎসিংহও অকালীদের ভয় করিয়া চলিতেন। দুই তিনবার তিনি ইহাদের হাতে বিপদ্‌গ্রস্তও হইয়াছিলেন। পরে ইহারা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। মহারাজের এত বিক্রম কেবল অকালীদের বলে। এই সম্প্রদায়ের আনুকূল্যে ইংরেজেরাও একবার কাবুল-যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন। যখন শিখদের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ হয়, তখন অকালীরা সোব্রাওন্, মহারাজপুর, চিলীয়ান্‌বালা প্রভৃতি স্থানের যুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল।

[Khazān Singh—Philosophic History of the Sikh Religion, 2 Vols, Lahore, 1914; M. A. Macauliffe—The Sikh Religion, Oxford, 1909; Sewarām Singh Thapar—Sri Guru Nanak Dev, Rawalpindi, 1904; Rūp Singh—Sikhism, A Universal Religion, Amritsar, 1911; Monier Williams—Brāhmanism and Hinduism, London, 1891, p. 175; A. Barth—Religions of India; J. C. Oman—Mystics, Ascetics, and Saints of India, London, 1903. pp. 153, 198-201.]

অকালীম্—(আরব্য) 'ইক্‌লীম্' শব্দের বহুবচন। দেশসমূহ (মুসলমান ভূগোলবেত্তাদিগের মতে পৃথিবীর সিকিভাগ) কেবল মনুষ্যের বাসোপযোগী। এই চতুর্থাংশকে তাঁহারা রুব-ই-মস্কূন্ কহিয়া থাকেন, এবং ইহাকে তাঁহারা সপ্ত 'অকালীম্' অর্থাৎ রাজ্য বা দেশে বিভাগ করিয়াছেন।

"দহ্ দরবেশ দর্ গলীমে বখুস্পন্দ্।
ও দো বাদশা দর্ অকালীমে ন গুজন্দ্॥"

অর্থাৎ দশজন ফকীর এক কম্বলে শয়ন করিতে পারে, কিন্তু দুইজন বাদশার সপ্ত সাম্রাজ্যেও সম্পোষণ হয় না।

অকি—জাপানের একজন সুপ্রসিদ্ধা রাণী। ইনি খৃষ্টীয় ১১শ শতকে জাপানীগ্রন্থ রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

অকিঞ্চন—(দেওয়ান রঘুনাথ রায়)—শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীতরচয়িতা। সঙ্গীতগুলি 'অকিঞ্চন' ভণিতাযুক্ত। ইঁহার প্রকৃত নাম দেওয়ান রঘুনাথ রায়। বর্দ্ধমানজেলার অন্তর্গত কাল্‌নার নিকট চুপি গ্রামে ১১৫৭ সালে (খৃঃ ১৭৫০) রঘুনাথ রায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ব্রজকিশোর রায়। ইনি বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন।

দেওয়ান ব্রজকিশোরের দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষের তিন পুত্রের ভিতর রঘুনাথ মধ্যম। রঘুনাথ বর্দ্ধমানে পিতার নিকট থাকিয়া সংস্কৃত ও পার্‌সী ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর ইনি মহারাজ তেজচন্দ্রের দেওয়ান হ'ন এবং তাঁহারই অনুগ্রহে দিল্লী ও লক্ষ্মৌ-নিবাসী সঙ্গীতাচার্য্য কালোয়াৎগণের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন।

দেওয়ানী কাজ ইনি বেশী দিন করেন নাই। বিষয়-কর্ম্মে ইনি বড় অনুরক্ত ছিলেন না। কিছুদিন রাজ-সরকারে কাজ করিবার পর কাজ হইতে অবসর লইয়া ইনি পরমার্থ চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। প্রবাদ, ইনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে একটী শ্যামা-বিষয়ক এবং অপরাহ্ণে একটী কৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিতেন। ইঁহার রচিত অনেক সঙ্গীত আছে। অন্যান্য সঙ্গীতও ইনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। ১২৪৩ সালের ১৯এ ভাদ্র (১৮৩৬ খৃঃ) দেওয়ান রঘুনাথ দেহত্যাগ করেন।

অকিঞ্চনতা—যোগাভ্যাসে সংযত যোগীর অর্থস্পৃহাশূন্যতা।

অকিঞ্চন দাস$_1$—শ্রীচৈতন্যভক্তিতত্ত্ববিলাস ও শ্রীচৈতন্যভক্তি-রসাত্মিকা গ্রন্থের রচয়িতা। 'শ্রীচৈতন্যভক্তিরসাত্মিকা' গ্রন্থ প্রশ্নোত্তর-ছলে রচিত। তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু প্রশ্ন করিতেছেন, আর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব উত্তর দিয়া তাঁহার সন্দেহ নিরসন করিতেছেন।

অকিঞ্চন দাস$_2$—সহজিয়া গ্রন্থ 'বিবর্ত্ত-বিলাস' রচয়িতা। 'বিবর্ত্ত-বিলাসে' অকিঞ্চন তাঁহার দুই জন গুরুর নামোল্লেখ করিয়াছেন—একজন রসিকচাঁদ ও অপর বিহারী। এই দুইজনের মধ্যে একজন দীক্ষাগুরু ও আর একজন শিক্ষাগুরু ছিলেন। অকিঞ্চন তাঁহার 'বিবর্ত্ত-বিলাসে'র একস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন, রঘুনাথ তাঁহার গুরুর গুরু। রঘুনাথের নিকট হইতে তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ রঘুনাথ বিহারীর গুরু। রঘুনাথের মৃত্যুর পর অকিঞ্চন তাঁহার স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন। এখানে আসিবার পর তৃতীয় দিবসে স্বপ্নে রঘুনাথ তাঁহাকে 'বিবর্ত্ত-বিলাস' রচনা করিতে উপদেশ দেন। অকিঞ্চন তাঁহার 'বিবর্ত্ত-বিলাসেই' লিখিয়াছেন—

"এই স্বপ্ন প্রাতে মোর প্রভুকে কহিল।
শুনিয়া আমার প্রভু কান্দিতে লাগিল॥
কান্দিতে কান্দিতে মোরে করিলেন আজ্ঞা।
প্রভু যাহা কহিলেন সেই সে প্রতিজ্ঞা॥
করহ পালন তাঁর আজ্ঞা যে নিশ্চিত।" (১৪৯ পৃঃ)

অকিঞ্চন তাঁহার গ্রন্থে মুকুন্দকে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবরূপে দেখাইয়াছেন। 'রসতত্ত্বসার' গ্রন্থে জানা যায় যে, এই মুকুন্দের শিষ্য মথুরাদাস। মথুরাদাসের রসিকদাস নামে এক শিষ্য ছিলেন। এই রসিকদাসই অকিঞ্চনের গুরু হওয়া সম্ভব। সেই উদ্দেশ্যেই বোধ হয় তিনি মুকুন্দের বিশেষ গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। সিদ্ধটীকা ও কর্ণানন্দে জানিতে পারা যায় যে, শ্রীনিবাসের শিষ্য রঘুনাথ। অন্যদিকে কৃষ্ণদাসের তৃতীয় শিষ্যের নাম অকিঞ্চন দেখা যায়। অতএব অকিঞ্চন নিশ্চয়ই সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন।

[M. Bose's 'Sahajia Cult']

অকিতু—য়িহুদীদিগের একটী প্রাচীন উৎসব। মর্দকদেবের পূজোপলক্ষে ইহা বসন্তকালে বাবিলনীয় বর্ষারম্ভে অনুষ্ঠিত হইত। [পেন্‌টিকস্‌ট্‌ দ্র°]

অকিনোয়োনগ-নো-মোনোগতরি—"দীর্ঘ শারদরজনীর উপাখ্যান"। প্রসিদ্ধ জাপানী উপাখ্যান। ইহাতে রাজা দ্বিতীয় হোরিকবের (খৃঃ ১২২২-৩৪) শাসনকালে পুরোহিত কীকৈএর অবৈধ প্রেমের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। এই পুরোহিত শেষজীবনে অনুতপ্ত হইয়া উক্যো মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

[J. R. A. S. 1887, p. 44.]

অকিবা বেন জোসেফ্—(Akiba Ben Joseph) ইহুদীদের প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত-পণ্ডিত (৫০-১৩৫ খৃষ্টাব্দ)। জেরুজালেমের ধ্বংসের পর ইহুদীদের চিন্তার ধারা ইনি অনেকটা পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ; এমন কি, প্রথম যুগের খৃষ্টমতাবলম্বীদের উপরও ইঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তন্নইম (Tannaim)-দিগের মধ্যে ইনি অত্যন্ত প্রতিভাবান্ ও শক্তিশালী ছিলেন। ইনি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ৯৫ খৃষ্টাব্দের শরৎ কালে ইনি জনৈক রাজদূতস্বরূপ রোমে গমন করিয়াছিলেন। ইঁহার উদ্দেশ্য ছিল সম্রাট্ ডোমিটিয়ানের (Domitian) নিষ্ঠুর ঘোষণাপত্র প্রচার রহিত করা ; কিন্তু সম্রাটের মৃত্যু হওয়ায় সে কার্য্য সফল হয় নাই। ইঁহার সহিত গমলিয়েল, এলিয়েজার বেন আসারিয়া ও জশুয়া ছিলেন। জাহাজে যাইবার সময় ইনি তন্মধ্যে একটী অস্থায়ী উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রবল ঝড়ে তাহা উড়িয়া গেলে, ইঁহার সঙ্গীরা ইঁহাকে অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। রোমের সম্রাট্ নারভার রাজদরবারে অকিবা সমধিক আদর পাইয়াছিলেন। এখানে সম্রাট্ ডোমিটিয়ানের ভ্রাতুষ্পুত্র ও কন্‌সাল ফ্লেভিয়াস ক্লেমেন্স, ডোমিটিলা এবং অকিলাস (বা আকুইলা) ইঁহার নিকট ইহুদীধর্ম্মে দীক্ষিত হ'ন। আকুইলা পরে ইঁহার ছাত্রও হইয়াছিলেন। কিন্তু সম্রাট্ ট্রাজান যখন রোমরাজ্যের অধিপতি হইলেন, তখন ইহুদীরা রাজার সুনজরে পড়িতে পারে নাই। অগত্যা ইঁহাকে পালেষ্টাইনে ফিরিয়া

যাইতে হয়। তথা হইতে ইনি বাবিলনে গিয়া ইহুদীধর্ম্ম প্রচার করেন এবং নেহারদিয়ায় লোকশিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। পরে ইনি গজাখায় গিয়া বাস করেন।

বার কথ্‌বার বিদ্রোহের পূর্ব্বে অকিবা পার্থিয়া ও এশিয়া-মাইনর ভ্রমণের জন্য শেষবার বাহির হ'ন। ইনি যখন যে স্থানে গিয়াছেন সেই খানেই ইহুদীদের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। হাদ্রিয়ান ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দের মতের বিরুদ্ধেও ইনি মত প্রচার করেন। ফ্রিজিয়া, গালাতিয়া, গালিসিয়া এবং কাপ্‌পাডোকিয়ায় ইনি ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন।

ভূমিকম্পে সিজারিয়ার ধ্বংস হইলে অকিবা ও ইহুদী বিদ্রোহীরা উৎসাহিত হ'ন। ইঁহারা ভাবিয়াছিলেন, এই আন্দোলনের আরম্ভের সহিত জেরুজালেমের যখন পতন হইয়াছে, তখন উহার অবসানে পুনরায় ইহুদীদিগের রাজধানীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইবে।

বার কথ্‌বার বিদ্রোহ বিফল হওয়ায় অকিবাকে বন্দী হইতে হয়; রোমকগণ তাঁহাকে ফাঁসি দিয়াছিল।

অকিবার মৃত্যু হইলে ইঁহার সম্বন্ধে কিংবদন্তীর অন্ত ছিল না। ইঁহার কবরের সহিতও রহস্য জড়িত আছে। কথিত আছে, ইঁহার হত্যাকাণ্ডের পর এলিজা ইঁহার বিশ্বস্ত শিষ্য জশুয়ার সহিত যে কারাগারে ইঁহার প্রাণশূন্য দেহ পতিত ছিল, সেই স্থানে প্রবেশ করেন এবং বহু স্বর্গীয় দূতসহ ইঁহাকে সিজারিয়ায় লইয়া আসেন। তাঁহারা তৎপরে এক গুহার মধ্যে অকিবার মৃতদেহকে লইয়া যান ও তথায় এক শয্যার উপর শায়িত করান। সেই গুহার মধ্যে ঐ শয্যা ছাড়া একখানি টেবিল ও চেয়ার ছিল; একটী বর্ত্তিকাও জ্বলিতেছিল। তাঁহারা গুহা হইতে বাহিরে আসিবামাত্র গুহাদ্বার আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায় এবং কোন মানবেই আর অকিবাকে দেখিতে পায় নাই।

[Encyclopædia of Religion and Ethics, Vol. I, p. 274.]

অকিমিনিস্—(Achæmenes; অখমনিস্ = হখামনি) পারস্য-দেশীয় হখামনি রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ। হিরোদোতসের মতে ইনি কুরুসের (Cyrus) বৃদ্ধ প্রপিতামহ এবং ইঁহার পুত্রের নাম চিস্‌পেস্ (Teispes)। বাবিলন্ অধিকারের পর কুরুস্ যে ঘোষণাবাণী প্রচার করেন, তাহাতে জানা যায়, চিস্‌পেস্ এবং তাঁহার বংশধরগণ মিডিয়-রাজগণের সামন্তনৃপতিরূপে অন্‌সন্ প্রদেশে রাজত্ব করিতেন; পরে খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৫০ অব্দে কুরুস্ পারস্য সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই ঘোষণাপত্রে অকিমিনিসের নামোল্লেখ নাই। কাহারও কাহারও মতে অকিমিনিস্ পৌরাণিক নাম মাত্র। ইলিয়নের মতে অকিমিনিস্ ঈগল পক্ষী হইতে জাত। কম্বুজীয়ের (Cambyses) মৃত্যুর পর কুরুসের ভ্রাতা দরায়ুস্ (Darius) পারস্যের রাজা হ'ন। কুরুস্ ও দরায়ুস্ এবং তাহাদের বংশধরগণ অখমনিস্ বা হখামনি নামে পরিচিত। ৩৩০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে তৃতীয় দরায়ুসের পতনের সহিত এই রাজবংশের পরিসমাপ্তি হয়।

প্রথম দরায়ুসের এক পুত্রের নামও অকিমিনিস্ ছিল। এই অকিমিনিস্ ক্ষয়ার্ষার (Xerxes) ভ্রাতা। মিশর বিদ্রোহের পর ৪৮৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ইনি মিশরের অধিপতি হ'ন। ৪৬০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে সালামিসের যুদ্ধে ইনি পারস্য-নৌবাহিনী পরিচালন করিয়াছিলেন। [বিশেষ বিবরণ পারস্য শব্দে দ্র°]।

অকিয়ম—(Akiyama) একজন প্রসিদ্ধ পদার্থ-বিজ্ঞানবিদ্। ইনি বায়ুমণ্ডলে আলোকরশ্মির সংঘাত ও আণবিক বিকীরণের আলোক-চিত্র (Photograph) গ্রহণ করিয়া বৈজ্ঞানিক জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

অকিয়াব—[আকিয়াব দ্র°]।

অকিল—মহম্মদের জামাতা আলীর ভ্রাতা। হিজরা ৪০ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

অকীক—একরূপ প্রস্তর। এদেশে অনেক রকম পাথর অকীক নামে বিখ্যাত। তাহাদের ইংরেজি নাম কর্ণেলিয়ান (Cornelian), আগেট্ (Agate), ওনিক্স্ (Onyx) ইত্যাদি। পালিশ করিলে পাথরগুলি দেখিতে অতি সুন্দর হয়। জলভরা মেঘের মত শ্যামল পাণ্ডুরবর্ণ; তাহাতে একটু শ্বেত, শ্বেতের সঙ্গে অল্প অল্প নীলের আভা মাখান। আবার এই সকল বর্ণের সঙ্গে কত রকম জড়িত ঝাড় লতা কাটা। এত গুণ থাকিলেও এ প্রস্তর বহুমূল্য নয়। ইহাতে ছোট ছোট বাটী, বোতাম, কাগজকাটা ছুরী, ছুরীর বাঁট প্রভৃতি অনেক প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়। বঙ্গ-দেশের মধ্যে রাজমহলে, ছোটনাগপুরে এবং অন্যান্য পর্ব্বতীয় স্থানে ইহা পাওয়া যায়। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে বাঁদায়; মধ্য-প্রদেশের মধ্যে জব্বলপুরে; বোম্বাই অঞ্চলের মধ্যে রেবাকাঁথায়, রতনপুরে, রাজপিপলায় এবং কাম্বেতে ইহা প্রচুর জন্মে। ভারত-বর্ষের আরও অন্যান্য স্থানেও ইহা যথেষ্ট পাওয়া যায়।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবাসীরা অকীক পাথরের নানা প্রকার দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করিয়া আসিতেছেন। সেকালে গ্রীক এবং রোমকেরা বোম্বাই হইতে এই পাথরের নানাবিধ সামগ্রী কিনিয়া লইয়া যাইতেন। হিন্দুরা এই সামান্য প্রস্তর হইতে এমন উৎকৃষ্ট দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতেন যে, কেবল কারিগরির জন্য এক একটী সামগ্রী লক্ষ টাকায় বিক্রীত হইত। রোমকসম্রাট্ নীরো অকীক পাথরের একটী সামান্য বাটী ৬,৬১,৫০০৲ টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন। এখনও অকীক-

নির্ম্মিত অনেক প্রকার দ্রব্য প্রতিবৎসর চীন, আরব, কাবুল এবং ইউরোপে প্রেরিত হয়।

অকীলিস্, একিলিস্ (Achilles)—হোমারের কাব্যে বর্ণিত ট্রয়যুদ্ধের একজন প্রসিদ্ধ মহাবীর। ইঁহার পিতা পিলীউস্ থেসেলী দেশের একজন রাজা ছিলেন এবং ইঁহার মাতা থিটিস্ জলদেবী ছিলেন। হোমারের মতে সুররাজ জীয়ুস্ ইঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ। অকীলিসের বাল্যজীবন সম্বন্ধে বিবিধ উপাখ্যান প্রচলিত আছে। হোমারের গল্পে আছে, বাল্যকালে ইনি এবং ইঁহার মাতা স্বগৃহে পরমবন্ধু ও আত্মীয় পেট্রোক্লাস্ কর্ত্তৃক লালিতপালিত হইয়াছিলেন। কাহারও মতে থিটিস্ ইঁহাকে প্রতিরাত্রে জলন্ত অঙ্গারমধ্যে রাখিয়া প্রাতে ইঁহার গাত্রে অমৃত সেচন করিয়া ইঁহাকে অমর করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন। পিলীউস্ এক রাত্রে তাহা দেখিতে পাইয়া পুত্রকে কাড়িয়া ল'ন ও থিটিস্ ক্রোধে সাগরগর্ভে গমন করেন। ষ্টাটিয়াস্ বলেন, থিটিস্ ইঁহার গুল্‌ফদ্বয় ধরিয়া ষ্টীক্‌স্ বা বৈতরণী নদীতে ইঁহাকে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন, তাহাতে গুল্‌ফ ছাড়া ইঁহার দেহের অপরাপর অংশ অস্ত্রের অভেদ্য হইয়াছিল। ট্রয়যুদ্ধের প্রাক্কালে ইঁহার মাতা যুদ্ধগমনে বাধা দিবার আশায় নারীবেশে ইঁহাকে রাজা লিকোমিডীসের অন্তঃপুরে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন। সুচতুর ওডিসীয়ুস্ ছদ্মবেশে ঢাল ও বর্শা হস্তে অনুসন্ধান করিতে করিতে তথায় গিয়া হুঙ্কার ছাড়িলেন। রাজার অন্তঃপুরবাসিনীরা ভয়ে পলাইলেন, কিন্তু নারীবেশধারী অকীলিস্ কিছুমাত্র চঞ্চল না হইয়া ঐ অস্ত্র ধারণ করিলেন। তখন অকীলিস্‌কে যুদ্ধে গমন করিতেই হইল।

হোমারের বর্ণনায় আছে, অকীলিস্ অতিশয় বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া ট্রয়বাসিদিগকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। যুদ্ধের শেষ ভাগে গ্রীক্ অভিযানের নায়ক অগামেম্‌ননের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। নিজ সৈন্যদলের মধ্যে মহামারী উপস্থিত হওয়াতে সম্রাট্ অগামেম্‌নন্ আপোলোদেবের সন্তোষার্থ বন্দীকৃতা এক নারীকে তাহার পিতার কাছে ফিরাইয়া দেন, কারণ ঐ নারীর পিতা আপোলোর পুরোহিত ছিলেন। এই প্রত্যর্পণকার্য্যে অকীলিস্ বিশেষ প্ররোচনা দিয়াছিলেন। ফলে অকীলিসের দাসকে অগামেম্‌নন্ স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। ইহাই বিবাদের কারণ। অকীলিস্ তখন যুদ্ধাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার অভাবে ট্রোজানরা গ্রীক্‌দিগকে এরূপ শোচনীয়ভাবে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল যে অবশেষে অকীলিস্ ক্রোধ পরিহার করিয়া পেট্রোক্লাসকে আপন যুদ্ধবেশ ও অস্ত্রাদি দিয়া গ্রীক্‌দের পক্ষে যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন। প্রিয়বন্ধু পেট্রোক্লাস ট্রয়সৈন্যাধ্যক্ষ হেক্টর কর্ত্তৃক হত হইলে অকীলিসের ক্রোধাগ্নি শতগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি নিজে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া দারুণ নৃশংসতার সহিত হেক্‌টরকে বধ করিলেন ও তাঁহার দেহ শকটে বন্ধন করিয়া রাজপথ দিয়া টানিয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পরে ঐ দেহ হেক্‌টরের বৃদ্ধ পিতা প্রায়ম্‌কে প্রত্যর্পণ করেন।

ইলিয়দ্ কাব্যে অকীলিসের মৃত্যুর কোন প্রসঙ্গ নাই। ওডিসীয়ুস্ কাব্যে ইঁহার মৃত্যুর পরবর্ত্তী দৃশ্য দেখান হইয়াছে মাত্র। ভার্জ্জিলের কাব্যে লিখিত হইয়াছে যে হেক্টরের ভ্রাতা পারিস্ অকীলিস্‌কে বধ করেন। পারিসের নিক্ষিপ্ত শর আপোলোদেবের বলে অকীলিসের গুল্‌ফে বিদ্ধ হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে গুল্‌ফ ব্যতিরেকে অকীলিসের অপর অঙ্গ অস্ত্রের অভেদ্য। হোমারের অডিসীয়ুসে আছে, ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার পরিচ্ছদ ও অস্ত্র কাহার অধিকারে আসিবে এই লইয়া আজাক্‌স্ ও ওডিসীয়ুসের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়াছিল; ইঁহার এবং পেট্রোক্লাসের ভস্মাবশেষ এক সঙ্গে এক স্বর্ণভাণ্ডে রক্ষিত হইয়া সমাহিত হয়। কোন কোন লেখকের মতে অকীলিসের মাতা চিতা হইতে ইঁহার দেহ হরণ করিয়া একটী দ্বীপে লইয়া যান এবং ঐ স্থানে অকীলিস্ অগামেম্‌ননের কন্যা ইফিজিনীয়াকে পত্নীরূপে লইয়া অবস্থান করেন। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, অকীলিস্ পরজন্মে মিডিয়া বা হেলেন্‌কে পত্নীরূপে লাভ করেন। গ্রীসের অনেক স্থানে অকীলিসের মন্দির আছে, তথায় তিনি পূজিত হ'ন।

অকুত, (১০৬৯-১১২৩ খৃষ্টাব্দ)—চীনের লিয়াও বংশের অধীন চীনতাতার-নায়ক ইয়াঙ্-কো-এর পুত্র। ১১০০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার পিতার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি বিদ্রোহের উদ্যোগ করিতেছিলেন। ১১১৪ খৃষ্টাব্দে অকুত বিদ্রোহী হ'ন ও চীন-সম্রাট্‌কে পরাজিত করেন। লিয়াও-বংশীয় সম্রাট্ পলায়ন করিলেন। অতঃপর অকুত পিকিন্ জয় করিয়াছিলেন। অকুতের বংশ ওয়ান্-ইয়েন্ নামে পরিচিত। ইনি 'গীন' নাম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। চীনের অপর একখানি ইতিহাসে লিখিত আছে—খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে নিউচিহ্ তাতারগণ উত্তরচীন-দেশে 'কিন' নামে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। এই কিন রাজবংশের স্থাপয়িতার নাম অকুত। নিউচিহ্ তাতারগণের ভাষার কোন বর্ণমালা ছিল না, তাহারা ক্ষমতাশালী হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার অভাব সম্যক্‌ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিল। তাহাদের পূর্ব্বে খিতানগণেরও প্রথম অবস্থায় কোন বর্ণমালা ছিল না, পরে তাহারা নূতন বর্ণমালার সৃষ্টি করে। সুতরাং অকুত এই অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে

চীন এবং লীউ ভাষাবাদী বন্দিগণের সাহায্যে এক নূতন বর্ণমালা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিলেন। রাজাদেশে উয়ে, মৌসিয়ান্‌হো এবং কুহ্‌শিন্ নামক তিনজন ব্যক্তিকে এই কার্য্যের ভার দেওয়া হইল। ইহার ফলে যে বর্ণমালার সৃষ্টি হইল (১১১৯ খৃঃ) তাহার নাম বৃহৎ নিউচিহ্‌ বর্ণমালা।

অকুতশ্চল—শিব।

অকুনকুনা—পশ্চিম-আফ্রিকার দক্ষিণ-নাইগেরিয়া প্রদেশের আদিম অধিবাসী। ইহারা ক্রশ নদী সন্নিহিত প্রদেশে বসবাস করে। ইংরেজ শাসনাধীনে থাকিয়া ইহারা অনেক সভ্য হইয়াছে এবং কৃষিকার্য্য করিয়া দিনযাপন করে।

অকুয়—আফ্রিকার ফরাসী-কঙ্গোর অধিবাসী এক খর্ব্ব-কায় জাতি।

অকুলি—অসুরদিগের জনৈক পুরোহিতের নাম। শতপথ-ব্রাহ্মণে এই অকুলিসম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা আছে;—মনুর একটী বৃষভ ছিল। তাহার গর্জ্জন শুনিলেই অসুর ও রাক্ষসেরা প্রাণত্যাগ করিত। দৈত্যগুরু কিলাত এবং অকুলি দেখিল, তবে তো আর নিস্তার নাই। এখন শীঘ্র বৃষটাকে বধ করা চাই। এই স্থির করিয়া তাহারা মনুকে বলিল—আপনার পূজার্থ আমরা কিছু বলি দিতে ইচ্ছা করি। মনু সম্মত হইলেন। অসুরেরা সেই বৃষভটা আনিয়া বলি দিল। বৃষভ মরিল, কিন্তু অসুরবংশ-বিনাশের কাল গর্জ্জন ঘুচিল না,—তাহা মনুপত্নী মনায়ীর দেহে প্রবেশ করিল। মনায়ী কথা কহিলেই অসুরেরা মরিতে লাগিল। পুনর্ব্বার কিলাত ও অকুলি মনায়ীকে বলি দিতে চাহিল। মনু তাহাতেও সম্মত হইলেন। কিন্তু সে গর্জ্জন গেল না, এবার তাহা যজ্ঞে ও যজ্ঞপাত্রে প্রবিষ্ট হইল। (শতপথ-ব্রাহ্মণ ১.৪.১৪)।

অকূট—[বৈদ্যক] ফলবৃক্ষবিশেষ (বৈদ্যক শব্দসিন্ধু)।

অকৃতব্রণ—কশ্যপবংশোদ্ভব মুনি। ইনি প্রসিদ্ধ লোমহর্ষণের শিষ্য এবং পরশুরামের বিশ্বস্ত প্রিয়বন্ধু ছিলেন। পরশুরাম যে প্রকারে ক্ষত্রিয়দিগকে পরাজিত করেন, ইনি সেই সমস্ত কাহিনী মহেন্দ্রাচলে যুধিষ্ঠিরের নিকট বর্ণনা করেন (মহাভা°, বন ১১৫-১৭ অঃ)। উক্ত গুরুর নিকট বিদ্যাধ্যয়ন করিবার পর ইনি বিষ্ণুপুরাণের ভাবার্থ লইয়া একখানি পুরাণ-সংহিতা রচনা করেন (বিষ্ণুপু°)।

অকৃতাশ্ব—সূর্য্যকুলোদ্ভব সংহতাশ্বের পুত্র (হরিব° ; মৎস্যপু° ১২.৩৪) [অকৃশাশ্ব দ্র°]।

অকৃতি—বিদর্ভরাজ ভোজবংশীয় ভীষ্মকের এক ভ্রাতা। ভীষ্মক বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের শ্বশুর এবং রুক্মিণীর পিতা। অকৃতি সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র ভোজরাষ্ট্রের নৃপতি ছিলেন (মহাভা°)।

অকৃশাশ্ব, অকৃষাশ্ব—সূর্য্যবংশীয় সংহতাশ্বরাজের পুত্র। (হরিব°) [অকৃতাশ্ব দ্র°]।

অকৃষ্ট—ব্রহ্মা মনুষ্যদিগকে রক্ষা করিবার জন্য 'অসি' সৃষ্টি করিয়া রুদ্রকে প্রদান করেন; রুদ্র উহা বিষ্ণুকে, বিষ্ণু মরীচিকে, মরীচি ভৃগু, অত্রি প্রভৃতি ২২ জন মহর্ষিকে লোকহিতার্থে দান করেন। ইঁহাদের মধ্যে অকৃষ্ট অন্যতম। (মহাভা°, শান্তি ১৬৬ অঃ)

অকৃষ্টপচ্য—ন-কৃষ্ট-পচ্‌-ক্যপ্। কর্ষণাদি বিনা যে শস্য স্বয়ং ক্ষেত্রে জন্মিয়া পক্ব হয়। নীবার, তৃণধান্য, উড়ী। "অকৃষ্টপচ্যাঃ পশ্যন্তৌ ততো দাশরথী লতাঃ।" (ভট্টি)।

অকের—উত্তর মিশরের এক সিংহমূর্ত্তি ভূ-দেব। ইনি প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক প্রাচীন দেবতা।

[Egyptian Myth Legend by D. A. Mackenzie.]

অকোক্‌তুঙ্—ব্রহ্মদেশের হেনজাদা জেলার অন্তর্গত আরাকান যোম পর্ব্বতমালার পূর্ব্বদিকের একটী পাহাড়। অক্ষা° ১৮°২৯′ ৪৫″ উঃ; দ্রাঘি° ৯৫°১০′৪৫″ পূঃ। ইরাবতী নদী এই পাহাড়ের উপর দিয়া একটী বদ্বীপের উপর আসিয়া কতকগুলি শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়াছে। পাহাড়টী তিনশত ফুট উচ্চ। এই পাহাড়ে কতকগুলি বৌদ্ধ গুহা আছে—তজ্জন্য ইহা প্রসিদ্ধ। এই গুহাগুলির ভিতরে বুদ্ধের মূর্ত্তি বর্ত্তমান। দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের সময় বৌদ্ধদিগের দুই তিনবার এখানে সংঘর্ষ হইয়াছিল।

অকোট$_{১}$—বেরারের অকোলা জেলার উত্তরাংশে একটী তালুক। অক্ষা° ২০°৫৫′ হইতে ২১°১৫′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°৪৭′ হইতে ৭৭°১৫′ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৫৫০ বর্গমাইল। এই তালুকের মধ্যে ২৪৯টী গ্রাম এবং অকোট ও হিবরয়খেড়্ নামে ২টী সহর আছে। ১৯৩১ সালের গণনায় লোকসংখ্যা ১৫৩৫০৭ হইয়াছে। গাবিলগড় পাহাড় হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী বাহির হইয়া পূর্ণা নদীতে আসিয়া মিলিত হওয়ায় এই তালুকে সুন্দর জলসরবরাহ হইতেছে। অকোট হইতে ৭ মাইল পশ্চিমে অরগাঁও নামক স্থানে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর স্যর্ আর্থার ওয়েলেশলী মরাঠাদিগকে পরাজিত করেন।

অকোট$_{২}$—বেরারের অকোলা জেলার একটী গ্রাম। অকোলা নগর হইতে ৩০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ২১°৫′ ৪৫″ উঃ; দ্রাঘি° ৭৭°৬′ পূঃ। বেরারের বস্ত্রব্যবসায়-কেন্দ্রের মধ্যে অকোট অন্যতম। স্থানীয় বণিক্‌সম্প্রদায় ও ইউরোপীয়

ব্যবসায়িগণ কাপড়ের ব্যবসা করিয়া থাকেন। স্থানীয় অধিবাসিগণ কার্পেট বুনিয়া থাকে, তজ্জন্য তাহারা বিখ্যাত। এই স্থানে প্রচুর আম্রও জন্মিয়া থাকে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এখানকার মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপিত হয়।

অকোট,—[বৈদ্যক] গুবাকবৃক্ষ, শুপারিগাছ (**Areca catechu**) [গুবাক দ্র°]।

অকোনা—অযোধ্যার বহরাইচ জেলার একটী গ্রাম। ইহা বহরাইচ নগর হইতে ২২ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৩৩′১১″ উঃ; দ্রাঘি° ৮১°৫৯′৩৮″ পূঃ। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এই গ্রামের ভূম্যধিকারী বিদ্রোহী হ'ন। তখন এই গ্রাম তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া কতকাংশ বলরামপুরের মহারাজকে ও কতকাংশ কপূরথলার মহারাজকে প্রদান করা হয়।

অকোপ—মহারাজ দশরথের ধৃষ্টি, বিজয়, জয়ন্ত, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপাল ও সুমন্ত্র নামে যে আটজন ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিলেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। (রামা° ১.৭)।

অকোর (মালিক)—একজন খট্টক সর্দ্দার। ইনি মুগল সম্রাট্ অক্‌বরের নিকট কাবুল নদীর দক্ষিণস্থ প্রদেশসমূহ রক্ষা করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হ'ন। এজন্য তিনি দানসূত্রে এইস্থানের কিয়দংশ ও অকোর খেয়ার শুল্ক আদায়ের ক্ষমতা প্রাপ্ত হ'ন। পরে তিনি তাঁহার স্বজাতীয়দিগের সর্দ্দার বলিয়া গণ্য হ'ন এবং পরবর্ত্তী বংশধরগণও তাঁহার নামানুসারে স্থাপিত 'অকোর' নামক স্থানের শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করেন। প্রসিদ্ধ যোদ্ধকবি খুশাল খাঁ ইঁহার বংশধরগণের অন্যতম।

অকোলা,—বেরার প্রদেশের একটী জেলা। অক্ষা° ২০°১৭′ হইতে ২১°১৬′ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬°২৪′ হইতে ৭৭°২৭′ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে সাতপুরা পাহাড়, দক্ষিণে সাতমাল বা অজণ্টা গিরিমালা, পূর্ব্বে এলিচপুর জেলা, এবং পশ্চিমে বুলদানা ও খান্দেশ জেলা। আয়তন ৪০৯১ বর্গমাইল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের গণনায় এই জেলার লোকসংখ্যা ৮৭৬৩৬২ হইয়াছে। এই জেলায় ১১টী নগর ও ১৪৯২টী গ্রাম আছে।

অকোলা নগর ইহার রাজধানী। এই নগর মর্ণা নদীতীরে অবস্থিত। অকোলা জেলার প্রায় ৪৫ বর্গমাইল বাবলা গাছের জঙ্গলে পূর্ণ। এই দেশের পূর্ণা একটী ছোট নদী। এই নদী দিয়া বাণিজ্যাদির বিশেষ অসুবিধা। অকোলার পর্ব্বতীয় জঙ্গলে হায়েনা নেকড়ে, ভল্লুক ও বন্য কুকুর বাস করে। কখনও কখনও বাঘ দেখিতে পাওয়া যায়। পাতুর নামক স্থানে পাহাড় খুঁদিয়া একটী মন্দির করা হইয়াছে। ঔরঙ্গজেবের অন্যতম প্রধান সেনাধ্যক্ষ রাজপুতরাজ রাজা জয়সিংহ বালাপুরে একটী ছত্রী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, উহা এখনও বর্ত্তমান। পূর্ণা নদীর দুই পার্শ্বেই লবণের খাদ অবস্থিত। উহা পাতুর গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বে প্রায় নন্দ নামক স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত। প্রকৃতির সাহায্যেই জল শুখাইয়া লবণ প্রস্তুত হয়।

স্থানীয় প্রবাদ, মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে এলিচপুরে যে সমস্ত স্বাধীন রাজা রাজত্ব করিতেন, তাঁহারা সকলেই জৈন ছিলেন। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দীন দাক্ষিণাত্য-অভিযানকালে অকোলায় তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর হিন্দুরা পুনরায় স্বাধীন হ'ন; কিন্তু দেবগিরির শেষ রাজা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করেন এবং অকোলা মুসলমানদের হস্তগত হয়। তৎপরে যথাক্রমে বাহ্‌মণীবংশ, ইমাদশাহী শাসনকর্ত্তৃগণ ও আহ্‌মদনগরের নৃপতিগণ ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সম্রাট্ অক্‌বর অকোলা করায়ত্ত করিয়া নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ল'ন। অক্‌বরের মৃত্যুর পর হাবসী মালিক অম্বর বেরারের কিয়দংশ অধিকার করেন। কিন্তু তাঁহার সে শক্তি অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে অকোলা আবার মুগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৬৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে টোডরমলের প্রবর্ত্তিত রাজস্বপদ্ধতি এইস্থানে প্রচলন করা হইয়াছিল। তখন হইতে অকোলায় ফসলি অব্দ চলিয়া আসিতেছে। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীর সেনাপতি প্রতাপ রাও পূর্ব্বে অমরাবতী জেলার প্রায় কারঞ্জ পর্য্যন্ত তাঁহার ধ্বংসলীলা চালাইয়াছিলেন ও গ্রামস্থ রাজকর্ম্মচারীদের চৌথ প্রদানে বাধ্য করিয়াছিলেন। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে মরাঠাগণ সম্রাট্ ফরুকশিয়রের মন্ত্রীর নিকট হইতে এই চৌথ গ্রহণের রাজকীয় আদেশপত্র পাইয়াছিল। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা চিংক্লিজ খাঁ নিজাম-উল্-মুল্‌ক্ উপাধি গ্রহণ করিয়া ফরুকশিয়রের সেনাদলকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেন। এই সময় হইতে বেরার প্রদেশ হায়দ্রাবাদের নিজামের অধীনে আসে। অষ্টাদশ শতকের প্রায় একশত বৎসরই নিজাম ও মরাঠাদের মধ্যে রাজস্ব লইয়া বিবাদ চলিয়াছিল। অকোলার ৩২ মাইল দূরে অবস্থিত অরগাঁও যুদ্ধে স্যার্ ওয়েলেশলীর নিকট মরাঠানায়ক রঘুজী ভোঁসলে পরাজিত হ'ন। ইহার পর পিণ্ডারী যুদ্ধের পর ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে বেরার নিজামকে প্রদান করা হয়। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ভোঁসলে-বংশীয় মোগলরাও অকোলার উত্তরে জানোদে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে অপ্পা সাহেবের নেতৃত্বে কয়েকবার বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। কিন্তু ইংরেজেরা তাহা দমন করেন।

তূলা, তিল, তামাক, নীল, রবিশস্য, ছোলা, মটর, কড়াই, আফিম প্রভৃতি এখানকার উৎপন্ন দ্রব্য। এতদ্ব্যতীত ইক্ষু, পান, পিঁয়াজ, মিষ্ট আলু, কলা প্রভৃতিও প্রচুর পাওয়া যায়। এখানকার অশ্ব খর্ব্বাকৃতি। এখানে অত্যধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে; সেজন্য এই দেশের অধিবাসীদের বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়। কলেরার উৎপাত এস্থানে লাগিয়াই আছে; মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষও হয়।

অকোলার প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই কাপড় প্রস্তুত হয়। অকোট ও বালাপুর কার্পেট ও পাগড়ীর জন্য প্রসিদ্ধ। এখানকার প্রধান আমদানী দ্রব্য—চিনি, লবণ, লৌহের জিনিস, গম, তৈল, চাউল প্রভৃতি এবং প্রধান রপ্তানী দ্রব্য—তুলা, ঘৃত, নীল, পশু প্রভৃতি। গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলার রেলপথ এই জেলার উত্তর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই জেলায় এক্ষণে ৬টী তালুক আছে এবং প্রত্যেক তালুকে একজন করিয়া তহশীলদার নিযুক্ত আছেন।

অকোলা₂—অকোলা জেলার প্রধান তালুক। অক্ষা ২০°২৫′ হইতে ২০°৫৫′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°৫৫′ হইতে ৭৭°২৫′ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৭৩৯ বর্গমাইল। এই তালুকের মধ্যে ২৯৭টী গ্রাম ও ১টী সহর আছে। পূর্ণা নদীর উর্ব্বর উপত্যকায় এই তালুক অবস্থিত।

অকোলা₃—অকোলা জেলার প্রধান নগর। অমরাবতী জেলার প্রায় ৫৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মর্ণা নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২০°৪২′১৫″ উঃ; দ্রাঘি° ৭৭°২′ পূঃ। বোম্বাই হইতে ৩৮৩ মাইল ও নাগপুর হইতে ১৫৭ মাইল দূরে গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান্ পেনিন্‌সুলার রেলপথের ভুসাবল-নাগপুর লাইনের একটী ষ্টেশন। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এস্থানের উচ্চতা ৯৩০ ফুট। ১৯৩১ সালে অকোলা মিউনিসিপালিটির লোকসংখ্যা ৪৭৬৩২ হইয়াছে।

অকোলা নগরে বহুকাল ধরিয়া নিজাম-সরকার বাস করিতেন। এখনও উঁহার দুর্গ ও প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীর তাহার পরিচয় দিতেছে। এইস্থানেই নিজামের সৈন্য-বাহিনীর সহিত মরাঠা সৈন্যবাহিনীর সংঘর্ষ হইয়াছিল। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে পিণ্ডারী গাজী খাঁ ভোঁসলের সেনাপতির নিকট ইহারই প্রাচীরের সন্নিকটে পরাজিত হ'ন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে স্যর্ ওয়েলেশলী মাত্র একদিনের জন্য এখানে বাস করিয়াছিলেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীনে এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হইয়াছে এবং অধুনা ইহা পশ্চিম বেরারের কমিশনারের কর্ম্মকেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

অকোলা নগর মর্ণা নদীদ্বারা দুইভাগে বিভক্ত। নদীর পশ্চিমদিকের অংশই অকোলা নগররূপে পরিচিত। অপর পারের অংশের নাম তাজনাপেট। তাজনাপেট য়ুরোপীয়গণের বাসস্থানরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। বহু সরকারী গৃহ এখানে নির্ম্মিত হইয়াছে।

অকোশ—ব্রহ্মদেশের কেঙ্গতুঙ্ নামক সান রাজ্যের অংশ-বিশেষবাসী একটী জাতি। শারীরিক গঠনে, পোষাক-পরিচ্ছদে এবং ভাষায় 'অখা' [অখা দ্র°] হইতে কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও ইহাদের জাতিগত পার্থক্য নাই বলিয়াই মনে হয়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ইহাদের সংখ্যা ১৫০৬ ছিল।

অকোহ্রি—অযোধ্যার অন্তর্গত উনাও জেলার প্রাচীন নগরী। ইহা পুরবা হইতে ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে ও উনাও হইতে ৩১ মাইল দূরে অবস্থিত। স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্যে অধি-কাংশ ক্ষত্রিয়।

অক্কণ্ণা (অখনা)—কুতবশাহী রাজবংশের শেষ রাজা আবূ হুসেনের মন্ত্রী। রাজকীয় কাগজপত্রে ইঁহার একনাথ পন্থ নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহার পিতার নাম ভানুজী পিঙ্গলে। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ইনি ও ইঁহার ভ্রাতা মদন পন্থ ওরফে মাদণ্ণা প্রথমে সৈয়দ মুস্তাফা নামক একজন গোলকুণ্ডা সর্দ্দারের অধীনে চাকুরী লন। তৎপরে ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে গোলকুণ্ডারাজ আবদুল কুতবশাহের মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা আবূ হুসেন রাজা হইলে অক্কণ্ণা ও মাদণ্ণা উভয়েই তাঁহার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার রাজকীয় ক্ষমতা হস্তগত করিয়া ফেলিলেন। আবূ হুসেন তাঁহাদের হস্তের ক্রীড়নকমাত্র হইয়া পড়িলেন। রাজ্যসংক্রান্ত ব্যাপারে মাদণ্ণারই অধিক সংশ্রব ছিল এবং এ বিষয়ে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া গিয়াছেন [মাদণ্ণা দ্র°]।

অক্কতিমন্‌হলী—বঙ্গলরের অন্তর্গত একটী গ্রাম। স্থানীয় অধিষ্ঠাত্রীদেবীর পূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর একবার ভোজের উৎসব হয়। এই উৎসব বঙ্গলুরে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

অক্কদ্ (**Akkad**)—বাবিলনিয়ার এক অতি প্রাচীন স্থান। বাইবেলের প্রাচীন অংশে (**Old Testament**) অক্কদ, বাবেল, এরেচ্ ও কালনেহ্ এই ৪টী শহরের উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অক্কদ্‌কে অনেকে বাবিলনের উত্তরাংশ বলিয়া মনে করেন। এই প্রাচীন শহরই কাহারও কাহারও মতে বাবিলনের পূর্ব্বতন নৃপতি ১ম সারগনের রাজধানী অগদে (**Agade**)

সেমিতিক শিলালিপিতে 'অক্কদ্' নাম দৃষ্ট হয়। ইহার অর্থ 'শ্রেষ্ঠ' বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। অগদে শব্দের অর্থ "অগ্নিমুকুট" ধরিয়া বলেন, অক্কদ্ হইতে ঈষ্টর দেবীর নাম

স্মরণ করাইয়া দেয়। অগদে সহরে এক সময় ঈষ্টর দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। সিপ্পরে তাঁহার সুপ্রাচীন মন্দির ছিল। এই সিপ্পরের পার্শ্ব দিয়া ইউফ্রেতিস্ নদী প্রবাহিত। তাহারই অপর পারে অগদে বা অক্কদ্ শহর বিদ্যমান ছিল।

অসুরী-বাবিলনীয় সাহিত্যে 'অক্কদূ' শব্দ সুমের্-প্রসঙ্গে রাজোপাধিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'সর্-মাত্-সুমেরি উ অক্কদী' অর্থাৎ সুমের্-অক্কদের বা সমস্ত বাবিলনের রাজা। কেহ কেহ অক্কদ্‌কে বাবিলনের উত্তরাংশ ও সুমের্‌কে দক্ষিণাংশ বলিয়া মনে করেন, তাহা ঠিক নহে। কারণ দক্ষিণ বাবিলনের রাজাও পূর্ব্বকালে সুমের্ ও অক্কদের অধিপতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

সুমের্-অক্কদী ভাষাকে কেহ কেহ সেমিতিক আবার কেহ কেহ অসেমিতিক বলিয়া মনে করেন। ['সুমের্' শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্র°]

অক্কল্‌কর—[বৈদ্যক] স্বনামখ্যাত পণ্যদ্রব্য। [আকর্‌করা দ্র°]

অক্কলরাজ—(বালক কাময়) সম্ভবতঃ প্রথম বিজয়নগর বংশের একজন রাজা। ইঁহাকে চোলবংশীয় রাজা বলিয়া দাবী করা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তৎপক্ষে কোন যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

[Epigraphia Indica, Vol. III, p. 72.]

অক্কশালা বা অগশালা—মহিসুরের স্বর্ণকারগণের নাম। অন্যান্য পাঁচটী শিল্পকর্ম্মী বা পঞ্চশালার মধ্যে ইহারা প্রধান বলিয়া গণ্য।

অক্কা,—তুর্কী শব্দ, অর্থ—শ্বেতাভ। তুর্কদেশে রৌপ্যমুদ্রা ও তাম্রমুদ্রাকেই অক্কা বলে—বিশেষতঃ ক্ষুদ্র মুদ্রাকেই এই নামে অভিহিত করিতে দেখা যায়। রুশ দেশে অক্কা অর্থে 'কোপেক' (kopecks) বা 'অৰ্দ্ধ কোপেক' (half **kopecks**)। তুর্কদেশে ইহা এক অস্‌পারের (asper) সমান।

অক্কা$_2$—আফ্রিকার কঙ্গো প্রদেশের গভীর জঙ্গলময় স্থানসমূহের অধিবাসী এক খর্ব্বকায় জাতি। হিরোদোতসের বর্ণনায় যে "ক্ষুদ্রকায় জাতি"র উল্লেখ আছে, তাহারা বোধ হয় ইহারাই। বামন বলিয়া ফারাও রাজগণের সভায় ইহাদের বেশ আদর ছিল। শিকারই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা।

অক্কাদি—আসিরীয় নৃপতি খমুরবির কতকগুলি লিপিতে অক্কাদি নামক এক স্থানের উল্লেখ আছে। লিপিগুলিতে অক্কাদির সহিত সুমিরি দেশেরও নাম উল্লেখ আছে। ঐ দেশ দুইটী নিকটবর্ত্তী ছিল। [অক্কদ্ দ্র°]

[J. R. A. S. (Old Series), Vol. XX, p. 447.]

অক্কাদেবী—কল্যাণের পশ্চিম চালুক্যবংশীয়া সুপ্রসিদ্ধা রাণী। ইনি কিসুকাড়ের শাসনকর্ত্তা দ্বিতীয় জয়সিংহের জ্যেষ্ঠা ভগিনী এবং কাদম্ব মহামণ্ডলেশ্বর তোয়িমদেবের মাতা। জয়সিংহের শৈশবকালে ইনি চালুক্যগণের রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। তৎকালীন তাম্রলিপিতে দেখা যায় যে, ইঁহাকে "গুণদ-বেড়ঙ্গী" অর্থাৎ সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা, "একবাক্যী" বা সত্যবাদিনী প্রভৃতি উপাধি দ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে। ভারতের নারীরাও যে একদিন অস্ত্রধারণ করিয়া শক্রহস্ত হইতে স্বদেশ রক্ষা করিতে কুণ্ঠিতা হইতেন না, ইনি তাহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইঁহাকে যুদ্ধে শত্রুবিনাশনে "ভৈরবীতুল্যা" বলিয়া প্রাচীন তাম্রলিপিতে বর্ণনা করা হইয়াছে। ১০২১ খৃষ্টাব্দে ইনি দ্বিতীয় জয়সিংহের অধীনে কিসুকাড়ের ৭০টী গ্রাম শাসন করিতেন। অতঃপর ইনি মহারাজ সোমেশ্বরের অধীনেও রাজকার্য্য-পরিচালনায় নিযুক্তা ছিলেন। ১০৪৭ খৃষ্টাব্দে ইনি বেলগাঁও জেলার গোকাগের দুর্গ অবরোধ করেন এবং সম্ভবতঃ বিদ্রোহী প্রজাদিগকে যথোচিত শিক্ষা দিয়াছিলেন। ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কিসুকাড়ের ৭০টী, তোরাগারের ৬টী ও মাসাবাড়ীর ১৪০টী গ্রাম শাসন করিতেন। বিজাপুর জেলার অরসিবিড়ি ও ধারবাড় জেলার সূড়ি গ্রামের তাম্রলিপিতে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ ধারবাড় জেলার হোত্তুর গ্রামের একখানি শাসনে দেখা যায়, ইঁহার পুত্র কাদম্ব মহামণ্ডলেশ্বর তোয়িমদেব বনবাসীর দ্বাদশ সহস্র ও পানুঙ্গলের পঞ্চশত গ্রাম শাসন করিতেন। তোয়িমদেবের শাসন হইতে সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, ইঁহার স্বামী সম্ভবতঃ হাঙ্গলের কাদম্ববংশীয় ছিলেন।

[Indian Antiquary, Vol. XVIII, p. 270ff; Bom. Gaz. Vol. I, pt. ii.—Fleet's The Dynasties of the Kanarese Districts, pp. 437, 440.]

অক্কা-নাগম্মা—লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা বাসবের (১১০০-১১৬৮) ভগিনী ও কলচুরিবংশীয় কল্যাণের রাজা বিজ্জলের পত্নী। ইঁহার অসাধারণ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বিজ্জল ইঁহাকে বিবাহ করেন। তাহাতে রাজদরবারে বাসবের প্রভাব বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল।

[Bom. Gaz. Vol. XXIV, p. 119.]

অক্কিবট—বেলগাঁও জেলার একটী গ্রাম। এখানে একটী প্রাচীন দুর্গ আছে। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে পরশুরাম ভাউ ইহা অবরোধ করেন।

অক্কীজি—সম্রাট্ ৩য় আমেন্-হোতেপের রাজত্বকালে ইনি মিশরের কৎনা নামক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

অক্‌চা—আফগান-তুর্কীস্থানের অন্তর্গত অক্‌চা জেলার প্রধান সহর। অক্ষা° ৩৬°৫৫′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৬°১০′ পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০৮৮ ফুট উচ্চে অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিক্‌ প্রাচীরবেষ্টিত এবং সর্ব্বদাই এখানে একদল আফগানসৈন্য অবস্থান করে। গ্রীষ্মকালে এখানকার জলবায়ু বড়ই খারাপ। আফগান-তুর্কীস্থানের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বোখারার স্বার্থবাহগণই ব্যবসায় উপলক্ষে অধিক সংখ্যায় এখানে সমবেত হয়। প্রায় ১২০০ উজ্‌বেক্‌পরিবার এবং কয়েকঘর হিন্দু ব্যবসায়ী এই সহরে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে বসবাস করিয়া থাকে।

অক্টার্লোনি, স্যর্ ডেভিড—(Sir David Ochterlony) প্রসিদ্ধ ইংরেজ সেনাপতি। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বোষ্টন বিভাগের ম্যাসাচুসেট্‌ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৭৭ সালে ভারতে সৈনিকরূপে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। লর্ড লেকের অধীনে কোয়েল, আলীগড় ও দিল্লীর যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম সাহসের পরিচয় দিয়া ১৮০৩ সালে দিল্লীর রেসিডেন্ট নিযুক্ত হ'ন।



অক্টার্লোনি, স্যর্ ডেভিড

১৮০৪ সালে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হ'ন। এই সময়ে হোলকার দিল্লী আক্রমণ করিলে মুষ্টিমেয় সৈন্যসহ ইনি তাঁহার গতিরোধ করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকে পরাস্ত করেন। ১৮১৪-১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহাকে চারিটী অভিযানের একটীর সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়, পরে প্রধান অভিযানের নেতৃত্বভার ইঁহারই উপর প্রদত্ত হয়। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইনি গোর্খা-সেনাপতি অমরসিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহার অভিযান-সাফল্যের জন্য ইঁহাকে 'ব্যারণ' (Baron) এই সম্মানার্হ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ইনি নেপালযুদ্ধে জয়লাভ করিলে শিগৌলীর সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধিপত্রের সর্ত্তানুসারে আজ পর্য্যন্ত ইংরেজ ও নেপালের মধ্যে সখ্যতাসূত্র অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ইনি 'জি, সি, বি' উপাধিতে ভূষিত হ'ন। ইঁহার পূর্ব্বে কোন ভারতীয় সেনানায়ক এই উপাধি পা'ন নাই। ১৮১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে পিণ্ডারী যুদ্ধে ইনি রাজপুত-সেনাদলের অধিনায়কস্বরূপে সর্দ্দার আমীর খাঁর সহিত পৃথক্‌ভাবে সন্ধি করেন। তাঁহারই কর্ম্মকুশলতায় আমীর খাঁ পিণ্ডারীদের সহিত যোগদান করিতে পারে নাই। ফলে যুদ্ধ না করিয়াই বিজয়মাল্য অক্টার্লোনি পাইয়াছিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজপুতানার রেসিডেন্ট নিযুক্ত হ'ন; পরে দিল্লী-রেসিডেন্সির ভারও তাঁহার উপর প্রদত্ত হয়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ভরতপুরের শিশু নরপতি বলবন্ত সিংহের বিরুদ্ধে যখন দুর্জ্জনশাল বিদ্রোহ উপস্থিত করেন, তখন ইনি আপনার সম্পূর্ণ দায়িত্বে ভরতপুর-রাজের সাহায্য করিয়াছিলেন। ভারতের তদনীন্তন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্ট তাঁহার এই কার্য্য অনুমোদন না করায় ইনি বাধ্য হইয়া কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন ও দিল্লীতে বাস করিতে থাকেন। ইহার কিছুদিন পরে ১৫ই জুলাই মীরাটে ইঁহার মৃত্যু হয়। কৃত কার্য্যের উপযুক্ত পুরস্কারস্বরূপ স্বদেশবাসী ও এদেশীয় গুণগ্রাহী ব্যক্তিরা কলিকাতার গড়ের মাঠে একটী 'মনুমেণ্ট' ইঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য নির্ম্মাণ করেন। ইহা 'অক্টার্লোনি কলম' বলিয়া পরিচিত।

অক্টোপাস্‌—(অষ্টপদ) একপ্রকার সামুদ্রিক প্রাণী। প্রাণীতত্ত্বে ইহারা Cephalopoda শ্রেণীভুক্ত। এই প্রাণীর আটটি বৃহৎ ও বলশালী বাহু আছে, তজ্জন্য এই নাম হইয়াছে। শরীরের মধ্যভাগ গোলাকৃতি, তাহার ব্যাস ১ হইতে ১।০ ফুট। বাহুগুলি ৩ হইতে ৩।০ ফুট লম্বা হইয়া থাকে। বাহুগুলি বিস্তৃত করিলে ৬।৭ ফুট ব্যাসের একটী বৃত্তের ন্যায় হয়। প্রত্যেক বাহুতে কতকগুলি করিয়া শোষণী (Sucker) আছে, তাহার সাহায্যে ইহারা কোন বস্তু বা আশ্রয় দৃঢ়ভাবে ধরিতে পারে। এই প্রাণী ইউরোপের দক্ষিণ উপকূলেই (ভূমধ্যসাগর ও তৎসন্নিহিত স্থানে) বেশী দেখা যায়। কদাচিৎ ইংলণ্ডের দক্ষিণকূলেও দৃষ্ট হয়। ভূমধ্যসাগরের অক্টোপাস্‌ অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার; তাহাদের প্রত্যেক বাহুতে ২ পংক্তি করিয়া শোষণী আছে। ইংলণ্ডের উপকূলবর্ত্তী অক্টোপাসের শোষণী ১ পংক্তি করিয়া। মৎস্য, কর্কট প্রভৃতি ইহাদের খাদ্য। সুযোগ পাইলে মনুষ্যাদি বৃহৎ প্রাণীও

আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহারা সেরূপ দ্রুত সন্তরণ করিতে পারে না। বিশ্রামার্থ ইহারা জলের মধ্যে কোন পাহাড়ের গায়ে অথবা কোন প্রস্তরখণ্ডে বাহু বেষ্টন করিয়া অবস্থান করে। নটিলাস্ (Nautillus) প্রভৃতি প্রাণী ইহাদের সমপর্য্যায়ভুক্ত।

অক্টোবর—ইংরেজী বৎসরের ১০ম মাস। প্রাচীন রোমের জুলিয়ান পঞ্জিকায় মার্চ্চ্ হইতে বর্ষগণনা হইত এবং মার্চ্চ্ হইতে অক্টোবর ৮ম মাস বলিয়া এই মাসের নামকরণ হইয়াছিল (Octo = অষ্ট)। রোমের কয়েকজন সম্রাট্ 'অক্টোবর' নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া নিজেদের নামে এই মাসের নামকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। বঙ্গীয় আশ্বিনের মধ্যভাগ হইতে কার্ত্তিকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই মাসের স্থিতিকাল। এই সময়ে গাছের পাতা হরিদ্রাবর্ণ হইতে থাকে বলিয়া শ্লাভ্‌রা এই মাসকে 'হরিদ্রাবর্ণ মাস' (yellow month) বলিয়া থাকে।

অক্‌ডালা—[একডালা দ্র°]।

অক্‌তঘ্‌লুক্—কাসঘরের এক শ্বেতকায় পাহাড়িয়া জাতি।

অক্‌দাঘ—এশিয়া মাইনরের একটী পর্ব্বত।

অক্‌দিয়া, অকাদিয়া—কাঠিয়াবাড়ের বাব্‌ড় থানার অধীন একটী ক্ষুদ্র করদ রাজ্য। কেরি নদীর উত্তর তীরে বাব্‌ড় হইতে ২০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে এবং ভাদলি হইতে ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসিগণ বাব্‌ড় রাজপুতবংশীয়।
[Bom. Gaz. Vol. VIII, p. 356]

অক্‌পোসো—আফ্রিকার টোগোল্যাণ্ড্‌নিবাসী এক পাহাড়িয়া জাতি।

অক্‌বর—(বাঙ্গলায় চলিত নাম আকবর) ভারতের ৩য় মুগল-সম্রাট্। তিনি তিমুরবংশীয় ছিলেন, তাঁহার পূর্ণ নাম আবুল-ফতহ্ জালালুদ্দীন্ মুহম্মদ অক্‌বর। অক্‌বর বাবরের পৌত্র ও হুমায়ুনের পুত্র। বাবরের কনিষ্ঠ পুত্র হিন্দালের কার্য্যে নিযুক্ত একজন পারস্যবাসী পণ্ডিতের কন্যা হামিদা বানু তাঁহার মাতা। তিনি সিন্ধুপ্রদেশের অন্তর্বর্ত্তী উমরকোটে ১৫৪২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর রবিবার (রজব ৫, ৯৪৯ হিজরি) জন্মগ্রহণ করেন।* ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তিনি পঞ্জাবের অন্তর্বর্ত্তী কলানূরে সিংহাসনে অধিরূঢ় হ'ন। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর আগ্রায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

পিতা হুমায়ুন যখন নির্ব্বাসিত তখন অক্‌বরের জন্ম। যে যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ইতিহাসের একটী শ্রেষ্ঠ ও স্মরণীয় যুগ। আর এই শ্রেষ্ঠ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ হইতেছেন বাদশাহ্ অক্‌বর। এই সময়ে ইউরোপে যে চিন্তাধারার ধর্ম্মপ্রেরণা আসিয়াছিল, ভারতেও সেই একই ভাবের বিকাশ দেখা গিয়াছিল। ভারতে তখন কবীরপন্থী, রওশানী ও শেখ মুবারক নাগোরী-ব্যাখ্যাত সুফীধর্ম্মের স্রোত চলিয়াছিল। এই ধর্ম্মমতগুলির সহিত অক্‌বরের ঘনিষ্ঠভাবে যোগ ছিল।

তিনি রাজকার্য্য সুনিপুণভাবে পরিচালনা করিতেন। এই অসাধারণ দক্ষতায় তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁহার দীর্ঘজীবনে অনন্যসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি ও যথেষ্ট কর্ম্মশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। বিদ্বদ্বংশে জন্মিয়া সর্ব্বদা বিদ্বন্মণ্ডলীর সঙ্গে থাকিয়া, বিশেষতঃ নিত্য সহচরী পত্নী সলিমা সুলতানা ও বিদুষী পিতৃষ্বসা গুলবদন বেগমের সান্নিধ্যে থাকিয়া তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা না হওয়া বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। তবে তাঁহার বিদ্যাবত্তার নিদর্শনের অভাব পরিদৃষ্ট হয় না। অদৃষ্টবিপর্য্যয়ে পিতার সঙ্গে শৈশবে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হওয়ায় তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃত সুযোগ ঘটে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে একেবারে নিরক্ষর ছিলেন একথা স্বীকার করা যায় না। কাহারও কাহারও ধারণা, তিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত মাত্র নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে শিখিয়াছিলেন। কিন্তু India Office Libraryতে তাঁহার স্বাক্ষরিত ও মোহরযুক্ত একখানি কোরানের পুথি সংরক্ষিত আছে।* এই পুথির নজিরে বলা যাইতে পারে, পূর্ব্বকথিত অনুমানটী ভিত্তিহীন।

তাঁহার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। তিনি বাল্যকালে আগ্রহের সহিত হাফিজ্ ও জালালুদ্দীন রূমীর কবিতা শুনিয়া অতি অল্পকালের মধ্যে তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া-

* অক্‌বর-নামায় আবুল-ফজল সম্রাট্ অক্‌বরের জন্মতারিখ ১লা রজব ৯৪৯ হিজরি লিখিয়াছেন; কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থে তাঁহার প্রকৃত জন্মতারিখ ১৪ই শাবন লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

* "The Koran—Kufic Fragments. No. 5 contains seal and signature of Akbar and others on the last page. Presented to the library of the East India House by Major Rawlinson, C. B., the Hon'ble Company's Political Agent in Turkish Arabia, H. M.'s Consul at Baghdad, March 1845, p. 2, 1st and 2nd column; Akbar's signature"—[A. S. B. No. 7650]. A Catalogue of the Arabic MSS in the library of the India Office by Otto Leth., Ph. D., London, 1877.

ছিলেন। তাঁহার জ্ঞানপিপাসা, বিশেষতঃ ধর্ম্মজিজ্ঞাসা প্রগাঢ় ছিল। অন্ধ ব্যক্তিকেও শ্রবণের সাহায্যে অসামান্য জ্ঞানলাভ করিতে দেখা যায়। অক্‌বরও ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ শুনিয়া শুনিয়া নিজেকে অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য-শাসনকুশলতার পরিচয় তাঁহার অধিকৃত রাজ্যের পরিমাণ দেখিয়া উপলব্ধি হয়। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি তাঁহার পিতার সহিত কাবুল হইতে হিন্দুস্থানে গমন করিয়াছিলেন। সিকন্দর শাহ্ শূরের সহিত যে সর্‌হিন্দের যুদ্ধে (২২এ জুন, ১৫৫৫ খৃঃ) হুমায়ুন আগ্রা ও দিল্লী পুনঃপ্রাপ্ত হ'ন, সেই যুদ্ধে তিনি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। যখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, তখন তিনি বৈরাম খাঁর সহিত পঞ্জাবের সিকন্দরের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। তখন তিনি মাত্র পঞ্জাবের ক্ষুদ্রতম অংশের অধিকারী। ঐ সময়ের রাষ্ট্রবিপ্লবে তিনি বিপর্য্যস্ত, আগ্রা হিমূ কর্ত্তৃক গৃহীত এবং দিল্লী তাঁহার সেনানায়ক কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত। সুলেমান বদখ্‌শী কর্ত্তৃক কাবুল আক্রান্ত। তখন মাত্র চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে তিনি এই বিপদের সম্মুখীন হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হইয়াছিলেন। যখন তিনি এই ধরাধাম ছাড়িয়া চলিয়া যা'ন, তখন তিনি তাঁহার উত্তরাধি-কারী পুত্র সেলিমকে সমগ্র উত্তরভারত, কাবুল, কাশ্মীর, বিহার, বঙ্গ, উড়িষ্যা এবং দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ স্থানের অধীশ্বর করিয়া যা'ন।

তিনি যেমন একজন প্রধান বীর ও যোদ্ধা বলিয়া পরিচিত ছিলেন, শাসকরূপেও তেমনই শ্রেষ্ঠ যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্যবিস্তার, শাসনকার্য্যের সৌকর্য্যবিধান, গুণি-গণের আদর ও ব্যক্তিত্ব আলোচনা করিলে উপলব্ধি হয় যে, তিনি মুগল সম্রাট্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

সাম্রাজ্যবিস্তারকল্পে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু যুদ্ধবিগ্রহে তিনি লিপ্ত ছিলেন, কোথাও অমানুষিক অত্যাচার তিনি করেন নাই। যদিও একজন দুর্দ্ধর্ষ বীর ও সেনানায়ক ছিলেন, তথাপি তিনি অকারণ রক্তপাত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁহার শত্রুপক্ষ যখনই বশ্যতা স্বীকার করিত তখনই তিনি সমস্ত দোষ ভুলিয়া তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইতেন।

রাজ্য-গঠনকার্য্যে জগতে যাঁহারা অগ্রণী, অক্‌বর তাঁহাদের সমশ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে হইলে প্রজাদিগের মনোরঞ্জন একান্ত প্রয়োজন—তাহাদিগের শুভেচ্ছা ও প্রীতি ব্যতীত রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হইতে পারে না এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সমষ্টি ব্যতিরেকে এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠিত হওয়া অসম্ভব। এই কারণ দেশের মঙ্গলসাধনে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি জাতীয়তার উদ্বোধনে সচেষ্ট হ'ন। জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে রাজনৈতিক দাবী-দাওয়া সকলেরই সমভাবে ন্যায্য প্রাপ্য, এ কথা তিনি প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন। তিনি ন্যায়পরতা অনুসরণ করিয়া হিন্দুমুসলমানের পার্থক্য দূর করিতে যত্নবান্ হ'ন। বিহারীমল, গোপালদাস, মানসিংহ, বীরবল, টোডরমল্ল, রায়সিংহ প্রভৃতি অনেক সুযোগ্য হিন্দু তাঁহার সভাসদ্ ও প্রধান প্রধান সেনাপতি ছিলেন। [তত্তদ্ শব্দ দ্র°] হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যাহাতে কুটুম্বিতা ও আন্তরিক প্রণয় জন্মে, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। হিন্দুদিগের উপর ধার্য্য 'জিজিয়া' ও 'তীর্থযাত্রী-কর' উঠাইয়া দিয়া তিনি হিন্দুদিগের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। ইহার জন্য রাজকোষে অর্থকৃচ্ছ্রতা দেখা গিয়াছিল। তথাপি তিনি এই গর্হিত কার্য্যের প্রশ্রয় দেন নাই। সতীদাহপ্রথা নিবারণ ও বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিবার তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তবে দুঃখের বিষয়, অনেক সদ্‌গুণের আধার হইলেও অক্‌বর মদ্যপ ছিলেন। এই দোষ তাঁহার সভাসদ্‌বৃন্দেও সংক্রামিত হইয়াছিল।

অক্‌বরের জন্ম ও বাল্যজীবন

অক্‌বর যখন মাতৃগর্ভে, শের খাঁ আসিয়া তখন দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন। [শের খাঁ, হুমায়ুন দ্র°] পিতা হুমায়ুন রাজ্যভ্রষ্ট ও বিতাড়িত হইয়া কয়েকজন মাত্র বিশ্বস্ত অনুচর ও পত্নী হামিদা বানুকে সঙ্গে লইয়া পলাইয়া গেলেন এবং বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অবশেষে সিন্ধু-প্রদেশের অন্তঃপাতী উমরকোটে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানে ১৫৪২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর রবিবার (৫ই রজ্জব, ৯৪৯ হিজরি) অক্‌বরের জন্ম হয়। শত্রুর তীক্ষ্ণদৃষ্টি এখানেও হুমায়ুনের অনুসরণ করিল। তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। বাধ্য হইয়া তিনি পারস্যাভিমুখে পলায়ন করিলেন। পথিমধ্যে কান্দাহারের নিকট তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মির্জা আস্‌করী আসিয়া বালক অক্‌বরকে লইয়া গেলেন এবং কাবুলে তাঁহার মধ্যমভ্রাতা কামরানের নিকট প্রেরণ করিলেন। কামরান্ হুমায়ুনের দুর্দ্দশার সুযোগ বুঝিয়া কাবুল অধিকার করিয়া বসিলেন। ইহার পর, পারস্যরাজ তহ্‌মাস্পের সহায়তায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হুমায়ুন কাবুল অবরোধ করেন। হুমায়ুন গোলার সাহায্যে প্রাচীর ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিলে কামরান্ বালক অক্‌বরকে নগরপ্রাচীরে বসাইয়া রাখেন। কিন্তু তাহাতেও হুমায়ুন ভীত না হইয়া গোলাবর্ষণ করিলে কামরান্ কাবুল রক্ষায় অসমর্থ

হইয়া বদক্‌শানে পলাইয়া যা'ন এবং হুমায়ুন কাবুল অধিকার করিয়া পুত্রের সহিত মিলিত হ'ন।

পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় অক্‌বরের বিদ্যাশিক্ষার আরম্ভ। কিন্তু বাল্যকালে তিনি উষ্ট্র, অশ্ব, কুকুর ও পারাবত লইয়া ক্রীড়ানিরত থাকায় বিদ্যাশিক্ষায় অধিক অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

১৫৫১ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন বাহ্লিক অভিযানে গমন করেন। অক্‌বর মাতার সহিত কাবুলে বাস করিতে থাকেন। কাবুলে অবস্থানকালে অক্‌বর পিতার নিকট হইতে একখানি গ্রাম প্রাপ্ত হ'ন। বাহ্লিক অভিযানে হুমায়ুন বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ায় সুযোগ বুঝিয়া কামরান্ পুনরায় কাবুল অধিকার করিয়া বসিলেন—সঙ্গে সঙ্গে অক্‌বরও তাঁহার হস্তে আসিয়া পড়িল। কিন্তু পুনরায় তিনি হুমায়ুনের নিকট পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন।

হুমায়ুনের ভ্রাতা হিন্দাল গজ্‌নী-প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কামরানের সহিত যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে হুমায়ুন তাঁহার কন্যা রুকাইয়া বেগমের সহিত অক্‌বরের বিবাহ দেন। অতঃপর যোগ্য রাজকর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে তিনি অক্‌বরকে গজ্‌নীর শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করেন। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে কামরান্ সুলতান আদম নামক জনৈক গক্‌খর সর্দ্দারকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া হুমায়ুনের হস্তে সমর্পিত হ'ন। হুমায়ুন তাঁহার চক্ষু অন্ধ করিয়া মক্কায় প্রেরণ করেন। সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। [কামরান্ দ্র°]

১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে সর্‌হিন্দের যুদ্ধজয়ের পর হুমায়ুন প্রকাশ্যভাবে অক্‌বরকে যুবরাজ বলিয়া ঘোষণা করেন। পরে দিল্লীর সিংহাসন পুনরধিকার করিয়া বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বে অক্‌বরকে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন।

সিংহাসন-লাভ

অক্‌বরকে বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বে পঞ্জাবে প্রেরণ করিয়া হুমায়ুন দিল্লীতে শাসনকার্য্য সংস্কারের জন্য ব্যস্ত হইলেন। ভারতে তাঁহার শাসনভিত্তি সুদৃঢ় করিবার প্রয়াসে তিনি প্রধান প্রধান নগরগুলি অধিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং অধিকৃত প্রদেশে দুর্গাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক সৈন্যসমাবেশ করিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ শেরশাহ্-নির্ম্মিত পাঠাগারের সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়া তিনি জ্ঞান হারাইলেন। চতুর্থ দিবসে তাঁহার মৃত্যু হইল (২৮এ জানুয়ারী, ১৫৫৬ খৃঃ)*। তাঁহার বিশ্বাসী কর্ম্মচারিবৃন্দ তিন দিন পর্য্যন্ত এই সংবাদ গোপন রাখিয়া অক্‌বরের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।

অক্‌বর পঞ্জাবের কলানূরে সেকন্দর শূরের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেখানে সম্রাট্ হুমায়ুনের মৃত্যুসংবাদ আসিলে সকলে অক্‌বরকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। দিল্লীতেও ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে অক্‌বর সিংহাসনে আরোহণ করেন (হিজরি ৯৬৩, ২রা রবী২†)।

এই সময় সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা শোচনীয় ছিল। শূরবংশীয় কয়েকজন হিন্দুস্থানের বাদশাহীপদের দাবীদার ছিলেন। হিন্দু সেনাপতি ও মন্ত্রী হিমূ অতিশয় ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া শূর পরিবারস্থ একজনকে বাদশাহ্ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কাবুলে তাঁহার ভ্রাতা নামমাত্র তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশে আফ্‌গান সুলতানেরা স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইয়া দিল। রাজপুতানার রাজগণ তাঁহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া মুগল-শক্তিকে উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মালব এবং গুজ্‌রাট্ স্বাধীন হইল। ভারতবর্ষের অরণ্যময় মধ্যপ্রদেশ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িল। দক্ষিণাপথের উত্তরভাগে বাহ্‌মনী সাম্রাজ্যের ধ্বংসে পাঁচটী ক্ষুদ্র স্বাধীন সুলতানবংশের সৃষ্টি হইল। তাহার দক্ষিণে বিজয়নগরের স্বাধীন হিন্দুরাজগণ অপ্রতিহতভাবে রাজদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। দক্ষিণাপথের পশ্চিম উপকূলে পর্ত্তুগীজগণ গোয়া এবং অপর কয়েকটী নগর অধিকার করিয়া সমগ্র আরবসাগরের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল। উত্তরে কাশ্মীর, সিন্ধুপ্রদেশ এবং বেলুচিস্তান দিল্লীর সাম্রাজ্য হইতে সম্যক্ স্বতন্ত্র হইয়াছিল। এরূপ রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় অক্‌বর দিল্লীশ্বর হইয়া বসিলেন। দিল্লী এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কতকগুলি প্রদেশে অচিরে বাদশাহের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। অবশিষ্ট হিন্দুস্থান অল্পায়াসেই আয়ত্তের মধ্যে আনা যাইতে পারে, অভিভাবক বৈরাম খাঁ তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যাহাতে ঐ সকল জনপদ অনতিবিলম্বে মুগলের অধিকৃত হয়, তিনি তাহার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

অভিষেকের পর কিছুকাল অক্‌বর বৈরাম খাঁর সহিত অবস্থান করিলেন। সিকন্দর শূরের অনুসন্ধান তাঁহার প্রধান

* মতান্তরে ২১এ জানুয়ারী (The Tezkereh Al Vakiat—translated by Major C. Stewart)।

† মতান্তরে ৩রা রবী২ (Price's Muhammedan History, Vol. III, p. 950)।

উদ্দেশ্য। বর্ষার আরম্ভে তাঁহারা কলানুর ছাড়িয়া জালন্ধরে আগমন করেন।

সিকন্দর শূর মেবাত জেলার অন্তর্গত রেবারীবাসী বৈশ্য-জাতীয় হিমূকে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী এবং সেনাপতিপদ প্রদান করেন। কার্য্যকুশলতায় এবং সেনাপতিত্বে হিমূর প্রতিভা অনন্যসাধারণ ছিল। ইনি বাইশটী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। হুমায়ুন যখন হিন্দুস্থান আক্রমণ করেন, তখন সিকন্দর শূর হিমূকে দিল্লীর রক্ষার ভার দিয়া নিজে চুনারে চলিয়া গেলেন।

বৈরাম খাঁ স্বীয় ভ্রাতা তার্দিবেগ খাঁকে পাঁচহাজারী পদে নিযুক্ত করিয়া হিমূর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু তার্দিবেগ খাঁ নিজের আলস্য এবং অযোগ্যতার ফলে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সর্‌হিন্দে পলাইয়া অক্‌বর এবং বৈরাম খাঁর সম্মুখে উপস্থিত হ'ন। এই অবকাশে দিল্লী এবং আগ্রা হিমূর কবলিত হয়। বৈরাম খাঁ তার্দিবেগ খাঁর ব্যবহারে মনে মনে বিরক্ত হইয়াছিলেন। প্রকাশ্যে সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেও তাঁহারই ইঙ্গিতে জনৈক পার্শ্বচর তার্দিবেগ খাঁকে নিহত করে। [তার্দিবেগ খাঁ দ্র°]

হিমূ অতঃপর সিকন্দর শূরের প্রতিনিধিস্বরূপে শাসন-কার্য্য না চালাইয়া স্বয়ং স্বাধীন রাজা বলিয়া পরিচিত হইতে চেষ্টা পাইলেন। তিনি যুদ্ধে জয়লব্ধ ধনরত্নাদি আফ্‌গান সৈন্যগণকে বণ্টন করিয়া দিয়া তাহাদিগকে আপনার আয়ত্তের মধ্যে আনিলেন। এখন হইতে হিমূ স্বয়ং অক্‌বরের প্রতিদ্বন্দ্বী।

পাণিপথের যুদ্ধ

হিমূর অধীনে সেনাবল অধিক থাকিলেও অক্‌বরের অভিভাবক বৈরাম খাঁ বিচলিত হইলেন না। তিনি অল্প-সংখ্যক সৈন্য লইয়া থানেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইলেন। সুপ্রসিদ্ধ পাণিপথ-ক্ষেত্রে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে উভয়পক্ষ মিলিত হইল। হিমূর অধীনে প্রায় পনের শত রণহস্তী ছিল। এই হস্তী দ্বারাই তিনি মুগলদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি বিমুখ হইলেন। হঠাৎ একটী তীর আসিয়া হিমূর চক্ষে বিদ্ধ হওয়ায় তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। হস্তী পলাইয়া নিকটস্থ জঙ্গলে আশ্রয় লইল। সেনাপতির অভাবে নায়কবিহীন হইয়া আফ্‌গান-সৈন্য অচিরাৎ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। বিজয়ী মুগলেরা হিমূকে অজ্ঞান অবস্থায় বন্দী করিয়া লইয়া যায় এবং বৈরাম খাঁর আদেশে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও অক্‌বর তাঁহার শিরশ্ছেদ করেন। [হিমূ ও পাণিপথ দ্র°]

পাণিপথ-যুদ্ধে বিজয়ী অক্‌বর বৈরাম খাঁর সহিত সসৈন্যে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে প্রবেশ করিলে, অল্পকাল মধ্যে আগ্রা তাঁহার হস্তগত হইল। এই সময়ে সিকন্দর শূর মানকোট দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে কিয়ৎকাল অবরোধের পর এই দুর্গ বৈরাম খাঁর অধিকারে আসিল এবং সিকন্দর শূর আত্মসমর্পণ করিলেন। তিনি বিজয়ী-শত্রুর নিকট সদ্ব্যবহার লাভ করিয়াছিলেন। [সিকন্দর শূর দ্র°]

মানকোট অবরোধের সময় সম্রাট্-পরিবার কাবুল হইতে মানকোটে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইল। তথা হইতে দিল্লীর পথে জালন্ধরে হুমায়ুনের সুশিক্ষিতা ভাগিনেয়ী সলিমা বেগমকে বৈরাম খাঁ বিবাহ করিলেন। বৈরামের মৃত্যুর পর সলিমা তাঁহার মাতুলপুত্র অক্‌বরের অঙ্কশায়িনী হ'ন। [সলিমা বেগম দ্র°] ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে অক্‌বর তাঁহার সভাসদ্-গণসহ আগ্রায় আগমন করিলেন। আগ্রা তখন একটী নগণ্য শহর ছিল।

বৈরাম খাঁর পতন

অক্‌বর এই সময় অষ্টাদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন, তিনি অভিভাবকের অধীনে থাকিয়া রাজ্যশাসন করা পছন্দ করিলেন না। এজন্য রাজকার্য্যে বৈরামের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটিতে লাগিল। এই সময়ে বৈরাম শিয়াধর্ম্মী সেখ গদাইকে সদর-ই-সুদুরের পদে নিযুক্ত করিলেন। ভারতের অধিকাংশ মুসলমান সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত। এজন্য একজন শিয়াকে ধর্ম্মবিষয়ে শ্রেষ্ঠ পদ প্রদান করায় তিনি সকলের বিদ্বেষ-ভাজন হইয়া পড়িলেন। রাজকোষের প্রচুর অর্থ বৈরাম নিজের কার্য্যে অপব্যয় করিতে লাগিলেন, অথচ স্বয়ং সম্রাট্ নির্দ্দিষ্ট টাকা ব্যতীত হাতখরচের জন্য এক কপর্দ্দকও অধিক খরচ করিতে পান না। এজন্য অক্‌বর তাঁহার প্রতি বিশেষ প্রীত ছিলেন না; অধিকন্তু বৈরাম খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছেন জানিতে পারিয়া তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার মাতা হামিদা বানূ বেগম, প্রধানা ধাত্রী তুর্কদেশীয়া মাহুম অনগ ও তাঁহার পুত্র অধম খাঁ এবং দিল্লীর শাসনকর্ত্তা শাহাবুদ্দীন্ বৈরামের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্রের প্রধান পোষক হইলেন। গোপনে ষড়্‌যন্ত্র চলিতে লাগিল। বৈরাম খাঁ তখন আগ্রায়, দিল্লীতে ছিল ষড়্‌যন্ত্রের কেন্দ্র।

১৫৬০ খৃষ্টাব্দে ষড়্‌যন্ত্রকারিগণ তাঁহাদের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। অক্‌বর আগ্রা হইতে শিকারে বাহির হইয়াছেন। তাঁহাকে তাঁহার মাতার অসুস্থতা সংবাদ দিয়া দিল্লীতে আনয়ন করা হইল। শাহাবুদ্দীন্ দিল্লীর দুর্গ সুদৃঢ় করিলেন।

লাহোরে এবং কাবুলে অক্‌বরের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার ব্যবস্থা হইল। দিল্লীতে অক্‌বর আসিবার পর প্রচার করিয়া দেওয়া হইল যে, সম্রাটের উপর বৈরামের কোন প্রভাব নাই।

বৈরামের পরামর্শদাতৃগণের মধ্যে কেহ কেহ বৈরামকে যুদ্ধ করিতে বলিলেন বটে, কিন্তু অনেকেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন করিলেন দেখিয়া বৈরাম আর ভরসা পাইলেন না। অক্‌বর বৈরাম খাঁকে পত্র দ্বারা জানাইলেন, "আমি এতদিন পর্য্যন্ত আপনার বিশ্বাসপরায়ণতা এবং সাধুতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিয়া আপনার উপর রাজ্যশাসনের সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিয়া নিজে আমোদআহ্লাদে রত ছিলাম। কিন্তু এখন আমি স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, এজন্য আমার ইচ্ছা যে আপনি রাজকার্য্যে অবসর লইয়া মক্কাতীর্থে গমন করুন। ব্যয়নির্ব্বাহার্থ হিন্দুস্থানে আপনাকে একটী উপযুক্ত জায়গীর দেওয়া হইবে এবং তাহার আয় আপনার নিকট নিয়ম মত পাঠাইব।"

এই চিঠি পাইয়া বৈরাম খাঁ মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। বৈরামের কার্য্যচ্যুত ভৃত্য পীর মুহম্মদকে বৈরামের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য সম্রাট্ অক্‌বর সৈন্যসহ পাঠাইয়া দেন। বৈরাম ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া পূর্ব্বসংকল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। শেষে তিনি পরাজিত ও বন্দী হইয়া সম্রাটের নিকট নীত হ'ন। অক্‌বর ক্ষমা করিলে তিনি পুনরায় মক্কা যাত্রার উদ্দেশ্যে গুজরাটের পাটন নামক স্থানে পঁহুছিলে মুবারক খাঁ লোহানী নামক তাঁহার এক পূর্ব্বশত্রু তাঁহাকে বিনাশ করে। [বৈরাম খাঁ দ্র°] তাঁহার চারি বৎসর বয়স্ক পুত্র আবদুর রহমনকে অক্‌বর নিজের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া লালনপালন করেন। উত্তরকালে ইনি 'খান্-খানান্' উপাধি প্রাপ্ত হইয়া অক্‌বরের সভাসদ্দিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিয়াছিলেন। [আবদুর রহমন দ্র°]

মালব, জৌনপুর ও চুনার জয়

বৈরাম খাঁর মৃত্যুর সময়েও অক্‌বর সমগ্র হিন্দুস্থানের কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন নাই। মালবে সুজাৎ খাঁ নামক শূরবংশীয় একজন পাঠান একটী স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বাজ বাহাদুর তথাকার সুলতান হইলেন। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে অধম খাঁ এবং পীর মুহম্মদের অধীনে একদল সৈন্য তথায় প্রেরিত হয়। বাজ বাহাদুর সারঙ্‌পুরের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। বাজ বাহাদুরের প্রিয়তমা হিন্দুমহিষী রূপমতী পরাজয়-সংবাদ শুনিবামাত্র বিষভক্ষণে আত্মহত্যা করেন। [বাজ বাহাদুর ও রূপমতী দ্র°]

যুদ্ধজয়ের পর পীর মুহম্মদ এবং অধম খাঁ দেশবাসীর উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছিলেন। অধম খাঁ জয়লব্ধ কয়েকটী হস্তী সম্রাটের নিকটে পাঠাইয়া দিয়া অবশিষ্ট ধনরত্ন আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া সম্রাট্ দ্রুতগতিতে মালবদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শেষে সম্রাটের আগমনে ভীত হইয়া অধম খাঁ বন্দীকৃত দুইটী সুন্দরী রমণীকে নিহত করিলেন এবং তাঁহার মাতা অক্‌বরের ধাত্রী মাহুম অনগ আসিয়া পুত্রের হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলে সম্রাট্ পুনরায় তাঁহাকে সুনজরে দেখিতে লাগিলেন। অক্‌বরের উপর এই ধাত্রীর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। [অধম খাঁ দ্র°]

অক্‌বর আগ্রাতে ফিরিয়া আসিবার পর সংবাদ পাইলেন জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা খাঁ জমান্ বিদ্রোহী হইয়াছেন। সম্রাট্ তৎক্ষণাৎ জৌনপুরে সসৈন্যে সমুপস্থিত হইলেন। তখন খাঁ জমান্ ভীত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। এই সময়ে চুনার দুর্গও সম্রাটের হস্তে আসিয়া পড়িল।

সম্রাটের অনুগ্রহে পীর মুহম্মদ মালবের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। পীর মুহম্মদ অধম খাঁর ন্যায়ই অত্যাচারী ছিলেন। নিজের সংকল্পসিদ্ধির জন্য তিনি নর্ম্মদাতীরস্থ বহু গ্রাম জ্বালাইয়া দেন। নর্ম্মদা উত্তরণকালে অশ্ব হইতে নদীতে পড়িয়া গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। [পীর মুহম্মদ দ্র°] তাঁহার মৃত্যুর পর মালবদেশ অরাজক হইয়া পড়ে। বাজ বাহাদুর সুযোগ বুঝিয়া স্বীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হ'ন।

অক্‌বর খৃাজা মুইনুদ্দীন্ নামক একজন সাধুর সংবাদ পাইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য অজমের যাত্রা করেন। পথিমধ্যে অম্বরের রাণা বিহারীমল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় অধীনতা স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত অক্‌বরের বিবাহের প্রস্তাব আনিলেন। অক্‌বর অত্যন্ত আনন্দের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মত হ'ন। অতি অল্পকাল অজমেরে থাকিয়া তিনি অম্বরে চলিয়া আসেন। অম্বরে অক্‌বরের সহিত বিহারীমলের জ্যেষ্ঠা কন্যার অত্যন্ত ধুমধামে বিবাহ হয়। বিবাহশেষে অক্‌বর বিহারীমলের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা মানসিংহকে লইয়া আগ্রায় ফিরিলেন। অল্পকাল মধ্যেই মানসিংহ তাঁহার অধীনে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া সাম্রাজ্য বিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

হুমায়ুনের একজন মাত্র হিন্দু পত্নী ছিলেন, হুমায়ুনের উপর তাঁহার কোন প্রভাব ছিল না। কিন্তু জয়পুর-রাজকন্যার এবং অপরাপর হিন্দু রমণীর সহিত বিবাহে অক্‌বরের অনেকটা আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন ঘটে। ক্রমে হিন্দুধর্ম্মের

উপর তাঁহার আস্থা বাড়িয়া যায় ও এই সূত্র অবলম্বন করিয়া তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতশূন্য এক নবধর্ম্ম প্রতিষ্ঠায় যত্নবান্ হ'ন। [ইলাহী দ্র°]

বাজ বাহাদুরের ঔদ্ধত্য দমন করিবার জন্য দিল্লী-সরকার হইতে আব্‌দুল্লাহ্ খাঁ উজ্‌বেক্ মালবের শাসনকর্তা হইয়া প্রেরিত হইলেন। বাজ বাহাদুর পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া বিভিন্ন রাজাদের আশ্রয়ে বাস করিয়া অবশেষে অক্‌বরের অধীনতা স্বীকার করিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে দুই হাজারী মন্‌সব্‌দারের পদে উন্নীত করিয়াছিলেন।

অক্‌বর এই সময়ে যুদ্ধের বন্দীদিগকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিবার প্রথা রহিত করিয়া দিলেন।

অক্‌বরের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র

১৫৬১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অক্‌বর শাম্‌সুদ্দীন্ মুহম্মদ আৎগা খাঁকে মন্ত্রিপদ প্রদান করেন; ইহাতে মাহুম অনগ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হ'ন। একদিন রাজপ্রাসাদে যখন শাম্‌সুদ্দীন্ রাজ্যের অপরাপর প্রধান ব্যক্তির সহিত রাজকার্য্য আলোচনায় ব্যাপৃত, তখন অধম খাঁ কতকগুলি অনুচরের সহিত তথায় প্রবেশ করিয়া শাম্‌সুদ্দীন্‌কে হত্যা করেন। অতঃপর তাঁহারা সম্রাট্‌কে অপসারিত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসর হ'ন। সংবাদ পাইয়া সম্রাট্ তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ ত্যাগ করেন। তিনি বাহিরে আসিয়া অধম খাঁকে মুষ্টির আঘাতে ধরাশায়ী করিলেন এবং তাঁহাকে ছাদ হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিতে স্বীয় অনুচরদিগকে আদেশ করেন। ইহার ফলে অধম খাঁর মৃত্যু হইল। [অধম খাঁ দ্র°] অধম খাঁর মৃত্যুতে ষড়্‌যন্ত্রকারিগণ ভীত হইলেন। তাঁহারা দুরভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্যকর্ম্মে মনোযোগী হইলেন।

মাহুম অনগের অযোগ্য শাসনের ফলে এই সময়ে রাজ্যের রাজস্ব ঠিকমত আদায় হইত না। রাজকর্ম্মচারীরা ইচ্ছামত সরকারী টাকা আত্মসাৎ করিতেন, অপব্যয়ও হইত। অক্‌বর (২০ বর্ষ বয়সে) ইহার প্রতিবিধানের জন্য শূরবংশীয় ইৎমাদ্ খাঁর হস্তে রাজস্বের ভার অর্পণ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যে সরকারী আয়ব্যয়ে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল।

অক্‌বর শাসনকার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিলেও সঙ্গীত এবং বাদ্যে অতিশয় আকৃষ্ট ছিলেন। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজা রামচাঁদকে গোয়ালিয়রের বিখ্যাত গায়ক তান্‌সেনকে প্রেরণ করিতে আদেশ করিলেন। অক্‌বরের সভায় আসিয়া তান্‌সেন মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। [তান্‌সেন দ্র°]

এই সময়ে অক্‌বরের কতকগুলি মানসিক বৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটে। অযোগ্য কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা রাজকার্য্য পরিচালন অসম্ভব বুঝিতে পারিয়া তিনি এই বিশাল সাম্রাজ্যের দায়িত্বভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার কর্ম্মচারীরা তাঁহার কার্য্যে সহযোগিতা করিবেন মাত্র, এই মনোভাব লইয়া তিনি রাজকার্য্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপনে ব্রতী হ'ন।

এই বৎসরেই সম্রাট্ মথুরায় অবস্থানকালে জানিতে পারিলেন, রাজকর্ম্মচারীরা হিন্দুতীর্থযাত্রীদের নিকট হইতে কর আদায় করিতেছে। সম্রাট্ সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র ঘোষণা করিলেন যে, সৃষ্টিকর্ত্তার উপাসনাকারীর নিকট হইতে কর আদায় করা ভগবানের ইচ্ছাবিরুদ্ধ। তিনি রাজস্বের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও হিন্দুতীর্থযাত্রীর নিকট কর আদায় রহিত করিয়া দেন। অতঃপর ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে অক্‌বর হিন্দুদের নিকট 'জিজিয়া কর' (মাথা-গন্‌তি-কর) আদায় বন্ধ করিয়া দিলেন। ২১।২২ বৎসর বয়সে অক্‌বর যে স্বাধীন চিত্তের পরিচয় দিয়াছিলেন ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। মুসলমানগণ অবশ্য সম্রাটের এই কার্য্য সমর্থন করেন নাই।

গোণ্ডবানা অধিকার

১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ কড়া ও গোণ্ডবানা প্রদেশ অধিকার মানসে আসফ্ খাঁকে প্রেরণ করেন। এই সময়ে নাবালক রাজার পক্ষ হইয়া রাণী দুর্গাবতী রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। রাণী অসীম সাহসে মুগলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। জব্বলপুর জেলাস্থিত গঢ়া এবং মণ্ডলার মধ্যবর্ত্তী স্থানে উভয়পক্ষে ঘোরতর সংঘর্ষ হয়। রাণী দুর্গাবতী পরাজয় আসন্ন দেখিয়া নিজ বক্ষে অসিবিদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। [দুর্গাবতী দ্র°] এই ঘটনার দুইমাস পরে আসফ্ খাঁ নরসিংহপুর অধিকার করেন। রাজা বীরনারায়ণও প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অন্তঃপুরের মহিলাগণ ভীষণ জহরব্রত অনুষ্ঠান করিয়া আপন আপন দেহ ভস্মসাৎ করেন। কেবলমাত্র রাণী দুর্গাবতীর ভগিনী ও পুরগড়ের অনূঢ়া রাজকুমারী বন্দিনী অবস্থায় মুগল-রাজান্তঃপুরে নীত হ'ন।

উক্ত বর্ষে মালবের শাসনকর্তা আবদুল্লাহ্ খাঁ উজ্‌বেক্ বিদ্রোহী হ'ন। সঙ্গে সঙ্গে জৌনপুরের শাসনকর্তা উজ্‌বেক্ আলী কুলি খাঁ জমান্ সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সম্রাট্ অক্‌বর সৈন্যসহ যমুনা পার হইয়া বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হ'ন। আবদুল্লাহ্ খাঁ পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করেন এবং পর বৎসর মুনিম্ খাঁর চেষ্টায় খাঁ জমানের সহিত সম্রাটের সন্ধি হয়। অতঃপর মুনিম্ খাঁ জৌনপুরের শাসনকর্তা হইয়াছিলেন। [মুনিম্ খাঁ দ্র°]

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে অক্‌বর রাজপ্রাসাদের সংস্কার ও সৌষ্ঠব

সম্পাদনে মনোযোগী হ’ন। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে আগ্রার ৭ মাইল দক্ষিণে যে রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই রাজ-প্রাসাদটীর সংস্কার করিয়া সম্রাট্ ‘আমনাবাদ’ (শান্তিনিকেতন) নাম রাখেন।

১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে খাঁ জ়মান্ পুনরায় সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করেন। সম্রাট্ অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া বিদ্রোহী সৈন্যের সম্মুখীন হ’ন। খাঁ জ়মান্ যুদ্ধে পরাজিত এবং তাঁহার ভ্রাতা ধৃত অবস্থায় মুগলশিবিরে আনীত ও ছিন্নশির হইয়াছিলেন।

উক্ত বিদ্রোহ দমন করিয়া অক্‌বর প্রয়াগ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরে তথা হইতে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হ’ন। কাশীবাসী জনগণ দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ নগরদ্বার রুদ্ধ করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট্ স্বীয় সেনাদলকে কাশী লুণ্ঠন করিবার আদেশ দেন।

চিতোর ও রণথম্বর দুর্গজয়

১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে অক্‌বর চিতোর জয়ের সংকল্প করেন। চিতোরের রাণা পলাতক বাজ বাহাদুর এবং মারবারের একজন ক্ষুদ্র রাজাকে আশ্রয় দিয়া সম্রাটের অসন্তোষভাজন হ’ন। মেবারের রাণার পুত্র শক্তসিংহ তখন অক্‌বরের শিবিরে বাস করিতেছিলেন; তিনি সম্রাটের মুখে মেবার অভিযানের বার্ত্তা শুনিয়া পিতার নিকট পলাইয়া আসেন ও মুগল-সম্রাটের অভিসন্ধির কথা পিতৃসমীপে ব্যক্ত করেন। শক্তসিংহ বিনানুমতিতে পলাইয়া আসিয়াছেন এবং মুগলের গূঢ় অভিসন্ধির কথা ব্যক্ত করিয়াছেন এই অপরাধে সম্রাট্ মেবারের রাণার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন।

চিতোর ও রণথম্বর দুর্গ হস্তগত করিয়া রাজপুতপ্রভাব খর্ব্ব করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহার মেবার আক্রমণ-কালে শিশোদীয় কুলকলঙ্ক উদয়সিংহ চিতোরের রাণা ছিলেন। অক্‌বর মেবাররাজ্য আক্রমণ করিলে রাণা গিরবো নদীর অরণ্যানীবহুল উপত্যকাদেশে পলাইয়া যা’ন। এইস্থানে একটী বৃহৎ হ্রদ খনন করিয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বে প্রাসাদ ও প্রমোদ উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় নামে এই নগরটীর উদয়পুর নাম রাখিলেন। [উদয়পুর দ্র°]

এদিকে অক্‌বর চিতোর অবরোধ করিলেন। স্থানে স্থানে তোপ স্থাপিত হইল। মুগলসৈন্য একটী গুপ্ত পথে গোপনে অগ্রসর হইতে লাগিল। চিতোর-সেনাপতি রাঠোর জয়মল্ল এই যুদ্ধে সম্রাটের নিক্ষিপ্ত গুলিতে নিহত হ’ন। [জয়মল্ল দ্র°] তাঁহার পত্নী ষোড়শ বৎসর বয়স্ক পুত্র এবং বালিকা বধূকে যুদ্ধসাজে সজ্জিত করিয়া পতিহন্তার সম্মুখীন হ’ন। ঘোরতর যুদ্ধের পর রাজপুতেরা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল এবং রাজপুত-ললনাগণ জহরব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ-বিসর্জ্জন দিলেন। কথিত আছে, চিতোরযুদ্ধে প্রায় ৩০,০০০ রাজপুত নিহত হয়। [চিতোর দ্র°]

চিতোর অধিকারকালে অকর্ম্মণ্য উদয়সিংহ গোগুণ্ডায় বাস করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র রাণা প্রতাপসিংহ আমরণ যুদ্ধ করিয়া অক্‌বরের অধিকৃত মেবার প্রদেশের অনেক স্থান উদ্ধার করিয়াছিলেন। [প্রতাপসিংহ দ্র°]

চিতোর অধিকারের পর অক্‌বর রণথম্বর দুর্গ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সুদৃঢ় দুর্গ চৌহানজাতীয় হারাবংশীয়-দিগের অধিকারে ছিল। মানসিংহের কৌশলে হারারাজ সুর্জ্জন সম্রাটের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিয়া ঝাঁসি বিভাগের শাসন-কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। [রণথম্বর দ্র°] রণথম্বর অধিকারে ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজাদিগের মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। রেবার রাজা রামচাঁদ বিনাযুদ্ধে সম্রাটের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। [রেবা দ্র°]

গুজরাট্ ও সুরাট্ জয়

অতঃপর সম্রাট্ গুজরাট্‌বিজয়ে অগ্রসর হ’ন। ফতেপুর সিক্‌রী হইতে বহির্গত হইয়া অক্‌বর ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে আহ্‌মদাবাদে আসিয়া উপস্থিত হ’ন। অক্‌বরের আগমনে গুজরাটের শেষ স্বাধীন সুলতান মুজফ্‌ফর শাহ ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন ও ধান্যক্ষেত্রে যাইয়া আত্মগোপন করেন। কিন্তু অবিলম্বে ধৃত হইয়া সম্রাট্‌সমীপে আনীত হ’ন। সম্রাট্ তাঁহার সামান্য মাসহারার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। [মুজফ্‌ফর শাহ্ দ্র°] এখান হইতে সমুদ্র-সন্দর্শনের অছিলায় অক্‌বর কাম্বে আসিয়া উপস্থিত হ’ন। পর্ত্তুগীজ বণিক্‌গণ সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সম্মান নিবেদন করেন। অক্‌বর খান্-ই-আজ়মের হস্তে এই নবাধিকৃত প্রদেশের শাসনভার ন্যস্ত করিয়া বরোদায় ফিরিয়া আসিলেন। এখানে তাঁহার নিকট সংবাদ আসিল, ইব্রাহিম হোসেন মির্জা নামক তাঁহার এক আত্মীয় রোস্তম খাঁকে হত্যা করিয়া সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রয়াস পাইতেছে। সম্রাট্ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া দ্রুত-গতিতে মাহী নদী উত্তীর্ণ হইলেন। পরে উভয়পক্ষে যুদ্ধ হইল এবং সম্রাটের আক্রমণে মির্জা ভীত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেল। [ইব্রাহিম হোসেন মির্জা দ্র°]

অতঃপর অক্‌বর সুরাট্ জয় করিবার উদ্দেশ্যে রাজা টোডর-মল্লকে সুরাটের দুর্গাদির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রেরণ

করেন। টোডরমল্লের ভরসা পাইয়া তিনি ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে সুরাট্‌ অবরোধ করিলেন। পর্ত্তুগীজগণ সম্রাটের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। সম্রাট্‌ তাহাদের সহিত সন্ধি করিয়া মক্কাযাত্রীরা যাহাতে তাহাদের তীর্থগমনের কোন অসুবিধায় না পড়ে তাহার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন। অতঃপর অক্‌বর নগরকোট অবরোধ করেন। এই প্রসিদ্ধ দুর্গ হিমালয়ের নিম্ন অধিত্যকায় অবস্থিত। নগরকোটরাজ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া করদ হইয়াছিলেন।

এই সময়ে সংবাদ আসিল ইখ্‌তিয়ারুল্‌-মুল্‌কের সহযোগে মির্জা মুহম্মদ হোসেন গুজ্‌রাটে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত করিতেছে। সেই বহ্নি নির্ব্বাপিত করা গুজ্‌রাটের শাসনকর্ত্তার সাধ্যায়ত্ত নহে। তিনি অশক্ত জানিয়া বাদশাহ্‌ সৈন্য-সামন্ত সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং গুজ্‌রাট্‌ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার আগমনে বিদ্রোহিগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। যুদ্ধে বিদ্রোহী মুহম্মদ হোসেন আহত এবং ইখ্‌তিয়ারুল্‌-মুল্‌ক্‌ নিহত হওয়াতে গুজ্‌রাটে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হইল।

বিদ্রোহ দমনের পর অক্‌বর গুজ্‌রাটের রাজস্বের সুব্যবস্থা করিবার জন্য টোডরমল্লকে প্রেরণ করেন। রাজা টোডরমল্ল ছয় মাসের মধ্যে গুজ্‌রাট্‌ জরীপ করিয়া ৫০ লক্ষ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন।

বিহার ও বাঙ্গলা বিজয়

অক্‌বরের সমকালে বাঙ্গলার মস্‌নদে সুলেমান্‌ শাহ্‌ কররাণী অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিহারের রোটাস্‌গড় পর্য্যন্ত ইঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। অক্‌বর রোটাস্‌গড় অধিকার করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইলেন, তখন সুলেমান রোটাস্‌দুর্গ ত্যাগ করিয়া বাঙ্গলায় নিজের ক্ষমতা সুদৃঢ় রাখিতে চেষ্টিত হইলেন। তিনি মূল্যবান্‌ উপঢৌকন পাঠাইয়া এবং অক্‌বরের প্রভুত্ব মানিয়া আপনার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখেন। সুলেমানের জীবৎকালে বঙ্গবিজয়ের কথা সম্রাট্‌ আদৌ ভাবিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর, সুলতান বয়াজিদ্‌ গৌড়ের মস্‌নদে আরোহণ করেন। পাঠান সর্দ্দারগণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া সুলেমান শাহ্‌ কররাণীর পুত্র দাউদ খাঁকে বাঙ্গলার সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। দাউদ খাঁ সুলতান হইয়া নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে সম্রাট্‌ মুনিম্‌ খাঁকে দাউদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। পাটনার নিকট দাউদের মন্ত্রী লোদী খাঁর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বৃদ্ধ মুনিম্‌ খাঁ সন্ধি করিতে বাধ্য হ'ন। এই সন্ধির সর্ত্ত অক্‌বরের মনোমত না হওয়ায় তিনি রাজা টোডরমল্লকে পুনরায় বাঙ্গলায় পাঠান। মুনিম্‌ খাঁ ইতিমধ্যে স্বীয় অযোগ্যতা অপবাদ স্খালনার্থ পাটনা অবরোধ করিলেন। কিন্তু পাটনা সুরক্ষিত থাকায় তাঁহার উদ্যম ব্যর্থ হইল। অগত্যা তিনি সম্রাট্‌কে স্বয়ং নেতৃত্ব করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সম্রাট্‌ অক্‌বর ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে পাটনার নিকট আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন।

দাউদ খাঁর অধীনে ২০,০০০ পদাতিক এবং অনেক গোলন্দাজ সৈন্য ছিল, কিন্তু অক্‌বরের আগমনে ভীত হইয়া তিনি পাটনা ছাড়িয়া বাঙ্গলায় পলাইয়া আসিলেন। [দাউদ খাঁ দ্রঃ]

পাটনা অধিকারের পরে বৃদ্ধ মুনিম্‌ খাঁ বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। রাজা টোডরমল্ল এবং অপরাপর কয়েকজন সুযোগ্য কর্ম্মচারী তাঁহার অধীনে প্রেরিত হইলেন। মুনিম্‌ খাঁ মুঙ্গের ও ভাগলপুর অধিকার করিয়া তেলিয়াগড়ির সংকীর্ণ পার্ব্বত্যপথে আফ্‌গানদিগকে আক্রমণ করিলে, তাহারা মুগ্‌লসৈন্যের অতর্কিত আক্রমণে ভীত হইয়া তেলিয়াগড়ি ছাড়িয়া পলায়ন করিল। সুলেমান শাহ্‌ গৌড় উত্তরোত্তর অস্বাস্থ্যকর হইতেছে দেখিয়া তাঁড়ায় রাজধানী স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই রাজধানী মুগ্‌ল-সৈন্য সত্বর অধিকার করিয়া লইল। দাউদ সাতগাঁর পথে উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন।

মুনিম্‌ খাঁ টোড়রমল্লের পরামর্শে পাঠানদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া উড়িষ্যায় আসিলেন। বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত তুকারোই গ্রামের নিকট পাঠান ও মুগ্‌লের একটী ভীষণ সংঘর্ষ হয়। সেই যুদ্ধে অবশেষে মুগ্‌লেরা জয়লাভ করে।

যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দাউদ খাঁ মুনিম্‌ খাঁর সহিত সন্ধি করিলেন। দাউদ খাঁর মনে শঠতা আছে উপলব্ধি করিয়া রাজা টোডরমল্ল এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন নাই।

মুনিম্‌ খাঁর নিয়োগের কিছু পরে সম্রাট্‌ অক্‌বর মুজফ্‌ফর খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে হাজীপুরের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। তেলিয়াগড়ির পার্ব্বত্যপথ রক্ষা করা ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু বৃদ্ধ মুনিম্‌ খাঁ মুজফ্‌ফর খাঁর কার্য্যাবলী সুনজরে দেখিতেন না। উভয়ের মধ্যে অসদ্ভাবহেতু বাঙ্গলায় শাসন-শৃঙ্খলার ব্যাঘাত ঘটিতে থাকে। মুনিম্‌ খাঁ গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট নামক স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই অস্বাস্থ্যকর স্থানে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। সুযোগ বুঝিয়া দাউদ খাঁ সদলবলে আসিয়া বাঙ্গলা অধিকার করিয়া বসিলেন।

অক্‌বর এই সংবাদ পাইয়া মির্জা সুলেমান ও তৎসহ রাজা টোডরমল্লকে বঙ্গবিজয়ে প্রেরণ করেন। তাঁহারা

পুনরায় তেলিয়াগড়ি অধিকার করিয়া রাজমহলে শিবির স্থাপন করিলেন। এই সময়ে বিহারস্থিত কতক সৈন্যের নায়ক হইয়া মুজফ্‌ফর খাঁ সম্রাটের আদেশে খাঁ জাহানের সহিত সম্মিলিত হইলেন। মিলিত সৈন্যদল অদূরে অবস্থিত দাউদ খাঁর সৈন্যের সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। এই যুদ্ধে দাউদের সর্ব্বাপেক্ষা সুযোগ্য সেনাপতি কালাপাহাড় আহত হইলেন এবং আফগানগণ পরাজিত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। [কালাপাহাড় দ্র°] দাউদ খাঁ বন্দী হইয়া খাঁ জাহানের নিকট নীত হইলেন। খাঁ জাহান্ তাঁহার শিরশ্ছেদ করিয়া ছিন্নশির আবদুল্লাহ্ খাঁর সঙ্গে সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন।

সম্রাট্ অক্‌বর এই সংবাদ পাইয়া পুনরায় ফতেপুর-সিক্‌রীতে ফিরিয়া আসিলেন। বাঙ্গলা দেশ শত্রুমুক্ত হইয়া মুগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

রাণা প্রতাপ ও রাজপুত-যুদ্ধ

বাঙ্গলা বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সম্রাট্ অক্‌বর মেবার রাজ্যজয়ে মনোনিবেশ করিলেন। অবশিষ্ট মুগলশক্তি রাজপুতানা অভিমুখে প্রধাবিত হইল। মুগলশক্তির প্রতিদ্বন্দী মহাবল প্রতাপকে বশে আনাই বাদশাহ্ অক্‌বরের মুখ্য উদ্দেশ্য। অমিতবিক্রমশালী রাণা প্রতাপ ১৫ বৎসরকাল দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া রাজপুতবিক্রম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। অক্‌বর বহুবার যুদ্ধ করিয়াও তাঁহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হ'ন নাই। [প্রতাপ সিংহ ও চিতোর দ্র°]

রাজা মানসিংহ এক সময়ে প্রতাপের আতিথ্য স্বীকার করিয়া উদয়সাগরতীরে ছাউনী করিয়াছিলেন। প্রতাপ পত্রদ্বারা তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু রাজার সহিত দেখা করিতে আসিলেন না। অপমানিত মানসিংহ সম্রাট্‌কে বলিয়া এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর হইলেন। সম্রাটের আদেশে প্রতাপের বিরুদ্ধে সমরায়োজন চলিতে লাগিল।

যুবরাজ সেলিমের অধিনায়কত্বে মহব্বৎ খাঁর সহিত রাজা মানসিংহ প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। হল্‌দীঘাটের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রতাপ অশ্বপৃষ্ঠে আহত অবস্থায় রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করেন। [হল্‌দীঘাট দ্র°] অতঃপর প্রতাপ চাবন্দ দুর্গে রাজপুত সৈন্য একত্র করিয়া মুগলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকেন। তাহার পর বহু বর্ষ যুদ্ধ করিয়া তিনি অজমের এবং মণ্ডলগড় অধিকার করিতে সমর্থ হ'ন। ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। রাজপুত যুদ্ধের শেষ সময়ে কাবুলের গোলযোগে অক্‌বরকে ১৩ বৎসরকাল পঞ্জাবে অবস্থান করিতে হয়। একারণ তিনি রাজপুতযুদ্ধে তাদৃশ মনোযোগ দিতে পারেন নাই।

বঙ্গে বিদ্রোহ

১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা খাঁ জাহানের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর অক্‌বর ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে মুজফ্‌ফর খাঁকে বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। তাঁহার সহিত কয়েকজন সুযোগ্য কর্ম্মচারী শাসনকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য প্রেরিত হ'ন। এই সময় খ্বাজা শাহ্-মন্‌সুর সাম্রাজ্যের রাজস্বসচিব ছিলেন। তাঁহার কঠিন শাসনপ্রণালী কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া বাঙ্গলাদেশে পুনরায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। বাঙ্গলা ও বিহারের মুসলমানগণ ধর্ম্মবিষয়ে অতিশয় গোঁড়া ছিলেন। তাঁহারা অক্‌বরের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উদারতা মোটেই পছন্দ করিতেন না। তাহা ছাড়া অক্‌বর ক্রমে ক্রমে মুসলমানধর্ম্মের উপর অনাস্থা প্রদর্শন করিতেছেন মনে করিয়া বিহার ও বাঙ্গলার মুসলমানগণ ক্রোধপরবশ হইয়া অক্‌বরকে দিল্লীর সিংহাসনচ্যুত করিবার দুরভিসন্ধিতে লিপ্ত হ'ন। তাঁহারা সম্রাটের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও কাবুলের শাসনকর্ত্তা মির্জা হাকিম মুহম্মদকে হিন্দুস্থানের সিংহাসনে বসাইবার সংকল্প করিতে লাগিলেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে জৌনপুরের কাজী মুল্লা মুহম্মদ বজদী অক্‌বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহঘোষণা শাস্ত্রসম্মত বলিয়া ফতোয়া জারী করিলেন। এদিকে বজীর জামী বাঙ্গলায় প্রকাশ্যে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহপতাকা উড্ডীন করিলেন। মুজফ্‌ফর খাঁ উচ্চাভিলাষী ও দাম্ভিক প্রকৃতির লোক ছিলেন, তিনিও সম্ভবতঃ বিদ্রোহিগণের সহযোগিতা করিতে ভুলেন নাই।

বিদ্রোহের সূচনা জানিয়া অক্‌বর অবিলম্বে রাজা টোডরমল্লকে বাঙ্গলায় প্রেরণ করিলেন। বিহারের জায়গীরদার মাসুম খাঁ অক্‌বরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন এবং বিদ্রোহিগণের নেতা হইয়া হাকিম মুহম্মদের সহিত পত্রাদি বিনিময় করিতে লাগিলেন। দূরে থাকিয়া অলস ও কর্ম্ম-বুদ্ধিহীন হাকিম মুহম্মদ এই ষড়্‌যন্ত্রপরিচালনে উদ্যোগী হইলেন বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হ'ন নাই।

কাবুল অভিযান

১৫৮১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী অক্‌বর ৫০,০০০ অশ্বারোহী ও ৫০০ হস্তী সঙ্গে লইয়া পঞ্জাব যাত্রা করেন। তাঁহার নিজ ধর্ম্মমত স্থাপন, সিংহাসন সংরক্ষণ ও মির্জা হাকিমকে দমন এই তিন কার্য্য কাবুল অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি মির্জা হাকিমের ষড়্‌যন্ত্রের সূচনা পূর্ব্ব হইতে অবগত ছিলেন। মির্জার পরিচালিত ১৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্য লাহোরের

দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা রাজা মানসিংহ তাঁহার পক্ষে সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি পলায়ন করিতে বাধ্য হ'ন। [মির্জা হাকিম মুহম্মদ দ্র°]

এই যুদ্ধযাত্রায় সম্রাটের সঙ্গে শাহ্‌জাদা সেলিম এবং মুরাদ ছিলেন। ফাদার মনসেরাটে নামক পর্ত্তুগীজ ধর্ম্মযাজক মুরাদের শিক্ষকস্বরূপ সঙ্গে গিয়াছিলেন।

এই সময়ে মির্জা হাকিম কর্ত্তৃক রাজস্বসচিব শাহ্‌ মন্‌সুরের নামে লিখিত যে পত্রগুলি সম্রাটের হস্তে পড়ে, তাহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া তিনি মন্‌সুরের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। এরূপ কর্ম্মকুশল কর্ম্মচারীর মৃত্যুতে সম্রাট্‌ পরে যথেষ্ট অনুশোচনা করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর অক্‌বর অম্বালা হইতে সর্‌হিন্দ্‌ এবং তৎপরে পায়ল নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হ'ন। এখানে আসিয়া তিনি সংবাদ পাইলেন তাঁহার ভ্রাতা পঞ্জাব ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অক্‌বর বিদ্রোহী ভ্রাতাকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য কাবুলে যাওয়াই স্থির করিলেন এবং শতদ্রু ও বিপাশা নদী পার হইয়া পার্ব্বত্যপথে অগ্রসর হইতে থাকেন। কিছুকাল কান্দাহারে অবস্থান করিয়া তিনি কাবুল ও সিন্ধু নদের সংযোগস্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। অতঃপর পেশাবরে আসিয়া তিনি তাঁহার পুত্র সেলিমকে খাইবারের পার্ব্বত্যপথ দিয়া জালালাবাদে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। সম্রাট্‌কুমার মুরাদ ৩রা আগষ্ট কাবুল সহরে প্রবেশ করিলেন। ইহার পূর্ব্বেই মুহম্মদ হাকিম কাবুল ত্যাগ করিয়া পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় লইয়াছিলেন। অক্‌বর কাবুলে আসিয়া তথাকার অধিবাসিগণকে স্বীয় আশ্বাসবাক্য প্রচারপূর্ব্বক কাবুলের শাসনভার তাঁহার ভগিনীর (খ্বাজা হুসেনের স্ত্রীর) হস্তে সমর্পণ করেন। ইনি এই ভার নিজে না গ্রহণ করিয়া তাঁহার ভ্রাতা মুহম্মদ হাকিমকে ছাড়িয়া দেন। উক্ত বর্ষের ডিসেম্বর মাসে মানসিংহকে সিন্ধুনদপ্রবাহিত ভূভাগের শাসনভার অর্পণ করিয়া অক্‌বর রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গুজরাটে মুজফ্‌ফর শাহের পুনর্বিদ্রোহ

মুজফ্‌ফর শাহ্‌ এতদিন অক্‌বরের নজরবন্দী ছিলেন। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কাঠিয়াবাড়স্থিত জুনাগড়ে পলাইয়া আসেন এবং এখানে সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আহ্‌মদাবাদ অধিকার করিয়া তিনি আপনাকে স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং সেই সঙ্গে ভরোচ অধিকার করিয়া লইলেন। সংবাদ পাইয়া অক্‌বর ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে আলাহাবাদে আগমন করেন এবং বৈরাম খাঁর পুত্র আবদুর রহমনকে গুজরাটের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া দেন। মুজফ্‌ফর শাহ্‌ আহ্‌মদাবাদের নিকটবর্ত্তী সর্‌খেজে এবং রাজপিপলার সন্নিকটে পরাজিত হইয়া কচ্ছে পলায়ন করেন। এখানকার স্থানীয় রাজগণ তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলে মুগল-সেনাপতি নিজামুদ্দীন্‌ প্রতিশোধ লইবার জন্য কচ্ছের অন্তর্গত তিনশত গ্রাম ধ্বংস করিয়া ফেলেন। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুজফ্‌ফর শাহ্‌ কাঠিয়াবাড় এবং কচ্ছদ্বীপের ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে থাকিয়া গুজরাটের শান্তিভঙ্গ করিতে থাকেন; কিন্তু অবশেষে ধৃত হইলে আত্মহত্যা দ্বারা স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন দেন। সম্রাট্‌ গুজরাটের বিপ্লবশান্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া আবদুর রহমনকে খান্‌-খানান্‌ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে কাবুলে মুহম্মদ হাকিমের মৃত্যু হয়। ভ্রাতার মৃত্যুতে ঐস্থান সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অধীনে আসিয়া পড়িল। অক্‌বর মানসিংহকে এই দেশের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু নিজে নিশ্চিন্ত না থাকিয়া অনতিবিলম্বে কাবুল যাত্রা করিলেন। সম্রাট্‌ রাবলপিণ্ডিতে আসিয়া উপনীত হইয়া দেখিলেন, রাজা মানসিংহ মির্জা হাকিমের পরিবারবর্গ লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছেন।

মুহম্মদ হাকিমের মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতে উজ্‌বেক্‌-দলপতি আবদুল্লাহ্‌ খাঁ বদকৃশানে তাঁহার ক্ষমতা বিস্তার করিতেছিলেন। উজ্‌বেক্‌গণ কর্ত্তৃক হিন্দুস্থান আক্রান্ত হইতে পারে এই আশঙ্কায় অক্‌বর কিছুকাল লাহোরে অবস্থান করেন।

কাশ্মীর এবং সিন্ধু অধিকার

কাশ্মীরে ঐ সময়ে য়ুসুফ খাঁ সুলতান ছিলেন। অক্‌বরের ইচ্ছা সুলতান স্বয়ং আসিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার ও সামন্তরূপে কাশ্মীর শাসন করিবেন। কিন্তু সুলতান প্রথমবার তাঁহার তৃতীয় পুত্র এবং দ্বিতীয়বার প্রথম পুত্রকে সম্রাটের সভায় প্রেরণ করায় অক্‌বর তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া কাশ্মীর জয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তজ্জন্য সেনাবাহিনী সংগৃহীত হইল। অক্‌বর রাবলপিণ্ডি হইতে আটকের পথে অগ্রসর হইলেন। এইস্থান হইতে কাশ্মীর অভিযান এবং ঐ সঙ্গে আফগানদিগের মধ্যে য়ুসুফ্‌জই ও মন্দরজাতিদের দমন করা সুবিধাজনক। এই উদ্দেশ্যে তিনি জইন্‌ খাঁ কোকলতাসের অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। জইন্‌ খাঁ পুনরায় সম্রাটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। সম্রাট্‌ রাজা বীরবল এবং হাকিম আবুল ফতেকে সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। কিন্তু অকৃতকার্য্য

হইয়া ফিরিবার পথে রাজা বীরবল নিজ নির্বুদ্ধিতায় প্রাণ হারাইলেন। রাজা বীরবলের মত অক্‌বরের পার্শ্বচর আর কেহই ছিলেন না। তাঁহার মৃত্যুতে সম্রাটের অন্তরে বিশেষ-রূপে আঘাত লাগিয়াছিল। [বীরবল দ্র°] বীরবলের পরাজয়ের পর রাজা টোডরমল্ল এই দুর্দ্দান্ত আফগান জাতির বিরুদ্ধে প্রেরিত হ'ন। তিনি এই কার্য্যে অনেকটা সফলতা লাভ করিয়াছিলেন।

যে সময়ে সম্রাট্‌ য়ূসুফজ়ই ও মন্দর জাতির বিরুদ্ধে অভিযান করিতেছিলেন, সেই সময়েই তিনি কাশ্মীরে কাসিম খাঁ এবং রাজা ভগবান্‌দাসের অধীনে সৈন্য প্রেরণ করেন। কাসিম খাঁ অক্‌বরের অধীনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। কাশ্মীরের সুলতান য়ূসুফ খাঁ প্রথমতঃ সন্ধি করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু সম্রাটের সেনাপতিদ্বয় নিজ নিজ নির্বুদ্ধিতায় বিপদে পড়িলেন। বারামূলার পার্ব্বত্য পথে রুদ্ধ সম্রাট্‌-বাহিনীকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইল। সেনাপতি-দ্বয় সুলতানের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়া সম্রাটের শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ভাগ্যচক্রের বিবর্ত্তনে সুলতান ও সুলতানপুত্রকে সম্রাটের অধীনে সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হয় এবং মানসিংহের অধীনে তাঁহারা কয়েক বৎসর কার্য্য করেন। কাশ্মীর সম্রাটের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে অক্‌বর ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে শীলসরে আসিয়া কিছুকাল বাস করেন। অতঃপর দুইমাস কাবুলে যাপন করিয়া তথাকার শাসনভার কাসিম খাঁর হস্তে সমর্পণ করিয়া নবেম্বর মাসে দিল্লী প্রত্যাগত হ'ন।

সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং কান্দাহার জয়

ইহার পর সম্রাট্‌ সিন্ধু ও বেলুচিস্তান জয় করিবার সংকল্প করিলেন। দেশের শাসনকর্ত্তা মির্জা জানী সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার না করায় আবদুর রহমন খান্‌-খানান্‌ তাঁহাকে দমন করিতে প্রেরিত হ'ন। ঠট্ট ও সিংরানের দুইটী যুদ্ধে মির্জা পরাজিত হ'ন ও দুর্গদ্বয় মুগলের অধিকারে আসে। মির্জা জানী সম্রাট্‌প্রচলিত 'দীন ইলাহী' ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সম্রাটের অধীনে তিনহাজারী মনসবদার পদ প্রাপ্ত হ'ন। নবাধিকৃত ঠট্ট প্রদেশ মূলতানের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে অক্‌বরের সেনাপতি মীর মুহম্মদ মাসুম কান্দাহার জয় করেন। কান্দাহার পরে কাবুলরাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছিল।

১৫৯২ খৃষ্টাব্দে লাহোরে অবস্থানকালে সম্রাট্‌ শুনিতে পাইলেন, মানসিংহ উড়িষ্যা জয় করিয়াছেন। উড়িষ্যা পরে বাঙ্গলার সহিত যুক্ত হয়।

গুজ়রাটের শাসনকর্ত্তা আজ়ম খাঁ আজ়ীজ় কোকা অক্‌বরের এই নূতন ধর্ম্মমতের জন্য তাঁহার উপর বিরক্ত ছিলেন। সম্রাট্‌ তাঁহাকে দরবারে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলে, তিনি নানা অছিলায় তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া মক্কায় তীর্থযাত্রা করিলেন। সেখানে তাঁহার সমস্ত অর্থ অপহৃত হইলে তিনি আবার গুজ়রাটে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হ'ন এবং ইলাহী ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়া সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হ'ন। সম্রাট্‌ তাঁহার কন্যার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দেন। আজ়ম খাঁর আর এক কন্যার সহিত তিনি পরে খস্রুর বিবাহ দিয়াছিলেন। [আজ়ম খাঁ দ্র°]

দাক্ষিণাত্য বিজয়

অক্‌বরের রাজ্যজয়ের স্পৃহা উত্তরোত্তর বলবতী হয়। তিনি দক্ষিণাপথের মুসলমান রাজ্যগুলি আত্মসাৎ করিয়া অবশেষে অক্‌সু নদীর পরপারস্থিত ভূভাগ (ট্রান্‌সোক্সিয়ানা) অধিকার করিতে সঙ্কল্প করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি খান্দেশ, আহ্‌মদনগর, বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা এই চারিটী রাজ্যে দূত পাঠাইলেন। বিনা যুদ্ধে যদি সুলতানগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিত, তাহা হইলে গোলযোগ চুকিয়া যাইত। খান্দেশের সুলতান আলী খাঁ ব্যতীত অপর কোন সুলতান সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। বুর্হান্‌পুর তখন খান্দেশের রাজধানী এবং এখানকার আসিরগড়দুর্গ দক্ষিণাপথে প্রবেশের প্রধান দ্বার ছিল। [খান্দেশ ও আসিরগড় দ্র°]

১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে অক্‌বর দাক্ষিণাত্যের যে চারিটী সুলতানের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে ফিরিয়া আসিলেন। আহ্‌মদনগরের সুলতান বুর্হানুল্‌মুল্‌ক্‌ যে উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন তাহা সম্রাটের মনঃপূত না হওয়ায়, তিনি এই রাজ্য জয় করাই স্থির করিলেন। তিনি খান্‌-খানান্‌কে একটী প্রকাণ্ড বাহিনী দিয়া আহ্‌মদনগরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। [আহ্‌মদনগর দ্র°]

সম্রাট্‌পুত্র মুরাদ খান্‌-খানানের সহিত সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব লইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের উভয়ের মধ্যে মতভেদ হওয়াতে মুগলবাহিনীর শক্তি অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব হইয়া পড়ে। যাহাহউক, তাঁহারা আহ্‌মদনগর অবরোধ করিলেন। রাজধানী রক্ষার ভার সুলতানের ভগিনী চাঁদবিবি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহস ও কার্য্যকুশলতায় মুগল-সেনানায়ক বাধ্য হইয়া আহ্‌মদনগরের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সময়ে (১৫৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দে) হিন্দুস্থানে একটী ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষে প্রায় তিন বৎসর ধরিয়া হিন্দুস্থানের লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছিল।

১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় আহ্‌মদনগরের সহিত খান্‌-খানানের নেতৃত্বে মুগলবাহিনীর যুদ্ধ বাধে। বীররমণী চাঁদসুলতানা (চাঁদবিবি নামে প্রসিদ্ধ) অসীম সাহসে মুগলসৈন্যের সম্মুখীন হ'ন। মুগলগণ তাঁহার ভীম আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু চাঁদবিবি ষড়্‌যন্ত্রকারীর হস্তে হঠাৎ নিহত হইলেন। [চাঁদবিবি দ্র°] এদিকে আহ্‌মদনগরের সৈন্যগণ পূর্ব্বসন্ধিপত্রে প্রদত্ত বেরার অধিকারে অগ্রসর হইল। সুপার নিকটে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। ফলে আহ্‌মদনগরের সৈন্যগণ পরাজিত ও রাজ্যভ্রষ্ট হইল। কিন্তু মুগলসৈন্য যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তাহাতে তাহাদের রণক্ষেত্র ছাড়িয়া অগ্রসর হইতে সামর্থ্য রহিল না। খান্দেশের সুলতান আলী খাঁ মুগল পক্ষে যুদ্ধ করিয়া নিহত হ'ন।

এই সময়ে আব্‌দুল্লাহ্‌ খাঁ উজ্‌বেকের মৃত্যু ঘটে। অক্‌বর উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া লাহোর পরিত্যাগ করেন এবং আগ্রায় ফিরিয়া আসেন। অতঃপর তিনি স্বয়ং দক্ষিণাপথ জয় করিবার মানসে নর্ম্মদা নদীর অভিমুখে যাত্রা করেন। যাইবার পূর্ব্বে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিমের উপর রাজধানী এবং অজমের প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করিয়া যা'ন। সেলিমকে তিনি মেবারের রাণার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে আদেশ দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আদেশ সেলিম কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয় নাই।

১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্‌কুমার মুরাদের মৃত্যু হয়। এই বৎসরে সম্রাট্‌ নর্ম্মদা নদী উত্তীর্ণ হইয়া খান্দেশের রাজধানী বুর্হান্‌পুর আক্রমণ করেন। খান্‌-খানান্‌ এবং সম্রাট্‌পুত্র দানিয়াল আহ্‌মদনগর অধিকারার্থ প্রেরিত হইলেন। অন্তর্বিপ্লবে আহ্‌মদনগর রক্ষা করিবার কোন সুব্যবস্থা হইল না। ষড়্‌যন্ত্রকারীর হস্তে পূর্ব্বেই চাঁদবিবি নিহত হইয়াছিলেন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে তোপের মুখে মুগলসৈন্য আহ্‌মদনগর অধিকার করিয়া দুর্গস্থিত সহস্রাধিক সৈন্যের প্রাণবিনাশ করিল। সুলতান এবং সুলতান-পরিবার গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী অবস্থায় প্রেরিত হইলেন; কিন্তু আহ্‌মদনগরের অধিকাংশস্থান স্থানীয় সুলতানবংশীয় মুর্ত্তাজা খাঁর শাসনে রহিয়া গেল। [আহ্‌মদ-নগর দ্র°]

খান্দেশে আলী খাঁর পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী সুলতান মীরান বাহাদুর সম্রাটের শাসনাধীন থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। আসিরগড়দুর্গ অজেয় এই বিশ্বাসে তিনি তথায় যাইয়া আশ্রয় লইলেন। অক্‌বর দুর্গটী শত্রুর হস্তে রাখিয়া যাওয়া নিরাপদ মনে করিলেন না। তিনি কৌশলে উহা অধিকার করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

বলপ্রয়োগদ্বারা আসিরগড় অধিকার করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া অক্‌বর অবশেষে মীরান বাহাদুরকে নানাপ্রকার আশ্বাস দিয়া নিজ শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন এবং বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দী করেন। পরে উৎকোচদানে দুর্গ-রক্ষককে বশীভূত করিয়া আসিরগড়দুর্গ হস্তগত করিয়াছিলেন। [আসিরগড় দ্র°]

সম্রাট্‌ দাক্ষিণাত্যের নবাধিকৃত রাজ্যগুলি আহ্‌মদনগর, বেরার এবং খান্দেশ তিনটী সুবায় বিভক্ত করিয়া এবং গুজরাট্‌ ও মালব প্রদেশ দুইটী লইয়া দক্ষিণাপথ বিভাগের সৃষ্টি করেন। এই বৃহৎ ভূখণ্ডটী শাসনের জন্য সম্রাট্‌ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র দানিয়ালকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। যুবরাজ সেলিমের ক্ষমতাকে সংহত করাই যে সম্রাট্‌ অক্‌বরের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তাহা তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে এইরূপ দায়িত্বজনক পদে নিয়োগ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। [দানিয়াল দ্র°]

সেলিমের বিদ্রোহ

সেলিমের দুর্বিনীত ব্যবহারে সম্রাট্‌ প্রতিনিয়তই সশঙ্কিত ছিলেন। উদ্ধত যুবক সর্ব্বদাই রাজকার্য্যের ছিদ্রান্বেষণে ব্যাপৃত থাকিতেন। আবুল-ফজ্‌লের কোন কার্য্যই তিনি সুনজরে দেখিতেন না। বরং তাঁহার মর্য্যাদার হিংসা করিতেন। কারণ তাঁহার মনে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, তাঁহার পিতার রাজ্যশাসনসংক্রান্ত উদারতার স্থলে আবুল-ফজ্‌লের মন্ত্রণা জাজ্বল্যমান। অক্‌বর পুত্রের এই ঈর্ষ্যা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পুত্রকে শান্ত করিবার মানসে আবুল-ফজ্‌লকে দাক্ষিণাত্য অভিযানে সঙ্গে লইয়া যা'ন এবং সেলিমই যে তাঁহার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী এরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেন।

এদিকে মেবারে আবার যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ হওয়ায় সম্রাট্‌ সেলিমকে ঐ স্থানে যাইতে আদেশ দেন। কিন্তু সম্রাটের তক্তে উপবেশন করিবার দুরাশা সেলিমকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। এই সময়ে বাঙ্গালায় বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠায় মানসিংহ বিদ্রোহ দমন করিতে সসৈন্যে চলিয়া গেলেন। সুযোগ বুঝিয়া সেলিম মেবার-অভিযানে অগ্রসর না হইয়া সসৈন্যে রাজধানীর অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আগ্রায় রাজকীয় বিশ্বস্ত অধ্যক্ষ সম্রাট্‌কুমারকে দুর্গদ্বার খুলিয়া দিলেন না। সেলিম বাহুবলে দুর্গ জয় করিলেন। আলাহাবাদের দুর্গ ও বেরার দখল করিয়া তিনি নিজেকে সম্রাট্‌ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। [জাহাঙ্গীর দ্র°]

১৬০৩ খৃষ্টাব্দে অক্‌বর ও সেলিমের পুনরায় মিলন ঘটে এবং সম্রাটের অনুরোধে সেলিম মেবারের রাণার বিরুদ্ধে

যুদ্ধযাত্রা করিতে বাধ্য হ'ন। এই বিশালবাহিনী সেলিমের অবিমৃষ্যকারিতায় বিপথে চালিত হওয়ায় রাজপুতসেনার হস্তে বিধ্বস্ত হয় এবং বাদশাহের আদেশে সেলিম রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হ'ন।

অক্‌বরের শেষজীবন

অক্‌বরের শেষজীবন বড়ই দুর্ব্বহ হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার প্রথমজাত যমজপুত্রদ্বয় শৈশবেই মারা যায়। ৩য় পুত্র সেলিম দুর্ব্বিনীত বলিয়া সম্রাটের চক্ষুশূল ছিলেন। ৪র্থ পুত্র মুরাদের শোচনীয় পরিণামের কথা (১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে) পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। ৫ম পুত্র দানিয়াল অতিরিক্ত পানদোষ-নিবন্ধন অকালে প্রাণ হারান (১৬০৫ খৃষ্টাব্দে)। দানিয়ালের মৃত্যুতে সম্রাট্ অতিশয় মুহ্যমান্ হইয়া পড়েন এবং এই ভীষণ শোকের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী দেহত্যাগ করেন। আগ্রার নিকটবর্ত্তী ফতেপুর সিক্‌রীতে সম্রাটের সমাধি হয়। এই সমাধিমন্দির এখনও বিদ্যমান আছে। [ফতেপুর সিক্‌রী দ্র°] মৃত্যুর পূর্ব্বে সেলিমকেই তিনি উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করিয়া যা'ন।

দরবারের ওমরাহ্‌গণ এই সংবাদে বিস্মিত হ'ন। তাঁহারা জানিতেন সম্রাট্ কখনই এরূপ মদ্যপ অকর্ম্মণ্য পুত্রকে রাজসিংহাসনের অধিকারী মনোনীত করিবেন না। সেলিমের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার খস্রু সর্ব্ববিধ গুণের আধার এবং তাঁহাকেই সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী মনোনীত করাই অধিক সম্ভব। এদিকে কুমার খস্রু রাজা মানসিংহের ভাগিনেয় ও সেনাপতি আজিজের জামাতা। তাঁহারা খস্রুকে সিংহাসন দান করিতে সচেষ্টিত। কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহাদের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়।

অক্‌বরের বিবাহ

অক্‌বরের সর্ব্বসমেত আটটী পত্নী ছিল। (১) সুলতানা রুকিয়া বেগম প্রথম ও পাটরাণী। ইনি মির্জা হিন্দালের কন্যা। ইঁহার সন্তানসন্ততি হয় নাই; তিনি শাহ্‌জাহানকে প্রতি-পালন করিয়াছিলেন। (২) সুলতানা সলিমা বেগম। পূর্ব্বে ইনি বৈরাম খাঁর পত্নী ছিলেন। বৈরামের মৃত্যুর পর অক্‌বর ইঁহাকে বিবাহ করেন। ইঁহার বেশ কবিত্ব-শক্তি ছিল। (৩) রাজা বিহারীমলের কন্যা ও রাজা ভগবান্‌দাসের ভগিনী। (৪) আব্দুলবাসীর পত্নী। (৫) যোধাবাই। ইনি যোধপুরের রাজদুহিতা। জাহাঙ্গীর এই রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (৬) বিবি দৌলত শাদ। (৭) আবদুল্লাহ্ খাঁ নামক মুগলের কন্যা। (৮) মীরান মুবারক শাহের কন্যা।

বিবাহ সম্বন্ধে সম্রাট্ অক্‌বর একবার এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন—'আমার এমন মন পূর্ব্বে হইলে, হয় ত আমি বিবাহ করিতাম না। কাহাকে আমি বিবাহ করিব? যাঁহারা আমার বয়োজ্যেষ্ঠা, সে সকল নারীকে আমি মাতৃ-সমান দেখিয়া থাকি। বয়সে যাঁহারা ছোট, সে সকল বালিকা আমার কন্যার মত। আর সমান বয়সের স্ত্রীলোকদিগকে আমি বন্ধু বলিয়া জানি।' বহুবিবাহ কি? এবং মানুষের বহুবিবাহ করা কর্ত্তব্য কি না, এ কথা লইয়াও এক সময়ে বিচার উঠে। কাজীরা এ বিষয়ের ঠিক মীমাংসা করিতে পারেন নাই। তবে নিকার চেয়ে বিবাহ ভাল তাহাই স্থির হইয়াছিল। সম্রাট্ বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন। অল্পবয়সে বিবাহ দিলে সে দম্পতীর সন্তান-সন্ততি দুর্ব্বল ও চিররুগ্ন হয় তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।



অক্‌বর

অক্‌বরের পুত্রকন্যা

ইতিহাসে অক্‌বরের পাঁচটী পুত্র ও তিনটী কন্যার নামোল্লেখ আছে। হসন এবং হুসেন সর্ব্বাগ্রজ যমজ সন্তান, জন্মিয়া কেবল একমাসকালমাত্র ইহারা জীবিত ছিল। তৃতীয় পুত্র সেলিম। ইনিই জাহাঙ্গীর নামে প্রসিদ্ধ। চতুর্থ, সুলতান মুরাদ। পঞ্চম, সুলতান দানিয়াল। কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা শাহ্‌জাদা খানুম্। দ্বিতীয়া কন্যা শুক্রুন্নিসা বেগম। কনিষ্ঠা আরাম বানু বেগম।

অক্‌বর-চরিত্রের কয়েকটী গুণ

জীবহিংসায় অক্‌বর অতিশয় বিরত ছিলেন। তিনি প্রায় নিরামিষ ভোজন করিয়া থাকিতেন এবং গোমাংস অখাদ্য বলিয়া জানিতেন। একবার তিনি মনের আক্ষেপে বলিয়াছিলেন—'কি করিব, আমার শরীর তত বড় নয়। বড় হইলে স্বচ্ছন্দে এই মাংসপিণ্ডদেহ পাতিয়া দিতাম, জগতের জীব সুখে ভোজন করিত। প্রাণীহিংসা আর চক্ষে দেখিতে পারি না।'

জীবন অনিত্য; দিন চলিয়া গেলে আর চাহিলে মিলে না। অক্‌বর তাই তিলার্দ্ধকাল মিছা কাজে কাটাইতেন না। ঈশ্বরারাধনা, সত্যের আদর, সদনুষ্ঠানের উৎসাহ, ইহাই তাঁহার দৈনিক কার্য্য ছিল। ইতর-ভদ্র সকলেই আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিত। তিনি ইন্দ্রত্ব পাইয়া কখনও অভিমানী হ'ন নাই।

বিদ্যানুরাগও তাঁহার কম ছিল না। পুস্তকাগারে পুস্তকগুলিকে তিনি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া রাখাইয়াছিলেন। গদ্য এক ঠাঁই, পদ্য এক ঠাঁই, আরবী, পার্সী, হিন্দী, গ্রীক্, কাশ্মীরী প্রভৃতি সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ রাখা হইয়াছিল। পাঠকেরা পড়িতেন; সম্রাট্ শুনিতেন। পড়া সাঙ্গ হইলে সম্রাট্ পাঠককে স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা পারিতোষিক দিতেন। হিন্দুদের পুস্তকের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না। কৃষ্ণ জ্যোতিষী, গঙ্গাধর, মহেশ, মহানন্দ প্রভৃতির গ্রন্থ এবং মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি সংস্কৃতগ্রন্থ তিনি পারস্য ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

অক্‌বরের সময়ে চিত্রবিদ্যার বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। সম্রাট্ স্বয়ং চিত্র অঙ্কন করিতে ভালবাসিতেন। তিনি চিত্রকরদের উৎসাহ দিবার জন্য সপ্তাহে এক দিন করিয়া ছবি দেখিবার দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। সম্রাট্ ভাল ভাল ছবিগুলি বাছিয়া তাঁহার চিত্রকরদিগকে পারিতোষিক দিতেন, কাহারও বেতন বৃদ্ধির জন্য অনুমতি করিতেন। ক্রমে প্রায় একশত চিত্রকর ইউরোপীয় চিত্রকরদের অপেক্ষা ভাল চিত্র আঁকিতে শিখিয়াছিল। আবূল-ফজ্‌ল লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের মধ্যে হিন্দুই অধিক। হিন্দুদের চিত্রনৈপুণ্যের সঙ্গে জগতের তুলনা মিলে না। কেশী, লাল, মুকুন্দ, ক্ষেমঙ্কর, মধু, যোগেন, মহেশ, রাম, হরিবংশ, তারা, হিন্দুদের মধ্যে এই সকল লোকই সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

সম্রাটের অনুমতিক্রমে বহু পারস্য-পুস্তকে চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন কালীয়দমন, নলদময়ন্তী, মহাভারত ও রামায়ণের অঙ্গ সুন্দর চিত্রপটে সুসজ্জিত করা হয়। বস্ত্রশিল্প, সোণারূপার কাজ, মিনার কাজ, জরির কাজ, প্রস্তর ও কাষ্ঠের খোদাই কাজ প্রভৃতি অন্যান্য শিল্প-কার্য্যেও তিনি সমধিক উৎসাহ দিতেন।

সম্রাট্ সকল বিষয়ে বিলক্ষণ শিল্পী ছিলেন। তিনি একখানি গাড়ী নির্ম্মাণ করেন, তাহার গঠনকৌশল অতি চমৎকার। গাড়ীতে একখানি যাঁতা ছিল; গাড়ী চালাইলে সেই যাঁতা আপনি ঘুরিত এবং তাহাতে গোধূমাদি চূর্ণ হইত। একখানি ঐন্দ্রজালিক দর্পণও অক্‌বরের কল্পনা-প্রসূত। দূরে গিয়া কিংবা কাছে বসিয়া সেই আর্‌সীর পানে চাহিলে নানা অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখা যাইত। জল তুলিবার চাকাকল অক্‌বরের আর একটী উদ্ভাবনা। সেই চাকা ঘুরাইলে দূর হইতে কিংবা গভীর কূপ হইতে জল উঠিত। আবার এক দিকে জলের চাকা ঘুরিতেছে, অন্য দিকে সেই সঙ্গে আর একখানি যাঁতা ঘুরিত, তাহাতে গোধূমাদি চূর্ণ করিবার বিশেষ সুবিধা হইত। বন্দুক ও কামান পরিষ্কার করিবার জন্য সম্রাট্ আর একপ্রকার চাকা নির্ম্মাণ করেন। তদ্দ্বারা এককালে ১২টী বন্দুক পরিষ্কৃত হইত।

লুপ্তপ্রায় সঙ্গীতশাস্ত্রকে তিনি পুনরুদ্ধার করেন। হিন্দু, ইরাণী, তুরাণী, কাশ্মীরী প্রভৃতি সকল জাতীয় সঙ্গীতবিশারদ্ স্ত্রী-পুরুষ তাঁহার সভায় বিদ্যমান ছিলেন। মিঞা তানসেনের নাম জানেন না, এমন লোক ভারতে বিরল। সেই সঙ্গীত-নিকুঞ্জের পিকবর অক্‌বরের সভার গন্ধর্ব্ববিশেষ ছিলেন। মালবের বাজ বাহাদুর তখনকার অদ্বিতীয় গায়ক। তদ্ভিন্ন আরও বিস্তর গায়ক ও গায়িকা অক্‌বরের সভায় গান করিতেন। উস্তাদ্ য়ুসুফ, সুলতান হাশিম্, উস্তাদ্ মুহম্মদ্ আমিন এবং উস্তাদ্ মুহম্মদ্ হুসেন তানপুরা বাজাইতেন। গোয়ালিয়রের বীর-মণ্ডল খাঁ স্বরমণ্ডল বাজাইতেন; শিহার খাঁ এবং পুর্ব্বিন খাঁ বীন্ ও শেখ দাওয়ান ধারী করণা বাজাইতেন। উস্তাদ্ দোস্ত নাই বাজাইতেন; ঘিচক বাজাইতেন মীর সৈয়দ আলী ও বহরম কুলী। টাস বেগ কুবজ বাজাইতেন; কোয়াসিম রুবাব বাজাইতেন এবং উস্তদ্ শাহ্-মুহম্মদ সুর্ণা বাজাইতেন।

সম্রাট্ কবিত্বেরও যথেষ্ট সমাদর করিতেন। রাজদরবারে বহু কবি তাঁহার অনুগ্রহলাভে সমর্থ হ'ন। আবূল-ফজ্‌লের ভ্রাতা বিখ্যাত কবি ফৈজ়ী তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রবাদ, ফৈজ়ী ব্রাহ্মণবেশে কাশীধামে পণ্ডিতগৃহে থাকিয়া সংস্কৃতশিক্ষা করিয়া অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন। [ফৈজ়ী দ্র°]

বিকানীরের রাজকুমার পৃথ্বীরাজ অনেক সময় অক্‌বরের দরবারে থাকিতেন। তাঁহার ন্যায় একাধারে বীর ও সুকবি

রাজপুতানায় আর জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যখন স্বনামধন্য প্রতাপসিংহ বাদশাহের অগণিত সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, পাহাড়ে ও জঙ্গলে বর্ণনাতীত ক্লেশ পাইয়াও তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করেন নাই, তখন অসমসাহসী যুবক পৃথ্বীরাজ রাজদরবারেই প্রতাপের শতমুখে প্রশংসা করিতে বিন্দুমাত্র ভীত হ'ন নাই। ইহাতে মহানুভব অক্‌বর তাঁহার উপর মোটেই ক্রুদ্ধ হইতেন না। একদা দারিদ্র্যের তাড়নায় প্রপীড়িত হইয়া যখন প্রতাপ অক্‌বরের নিকট বশ্যতাস্বীকার করিয়া পত্র লিখেন, বাদশাহ্ সেই পত্র পৃথ্বীরাজকে দেখান। রাজপুতবীর সদর্পে বলিলেন, এই পত্র কখনই প্রতাপের স্বহস্তলিখিত নহে এবং তৎক্ষণাৎ বাদশাহের অনুমতি লইয়া অতি সুন্দর পদ্যে কয়েক ছত্র লিখিয়া প্রতাপের নিকট পাঠাইলেন। বলা বাহুল্য, ৫০ হাজার সৈন্যে যাহা করিতে পারিত না পৃথ্বীরাজের কবিতায় তাহা করিয়াছিল। প্রতাপ আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। পৃথ্বীরাজের এই কবিতা এখনও রাজপুতানায় সহস্র প্রকারে গীত হইতেছে। [পৃথ্বীরাজ দ্র°]

প্রত্যেক মাসের ৯ই তারিখে অক্‌বর বেগম-মহলে 'নওরোজা' নামে এক অভিনব উৎসবের সৃষ্টি করেন। এইদিন প্রধান প্রধান বণিক্‌গণের স্ত্রী-কন্যা-পুত্রবধূগণ নানা সুন্দর সুন্দর দ্রব্য লইয়া বেগম-মহলে দোকান পাতিতেন। বাদশাহের বেগমগণ ও আমীর ওমরাহের স্ত্রীকন্যা-আত্মীয়গণ এই সকল দোকানে মনোমত দ্রব্য ক্রয় করিতেন। আগ্রায় হিন্দুমুসলমান প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্তগণের মহিলারা সকলেই নওরোজা দিবসে বেগম-মহলে সমবেত হইতেন। ঐতিহাসিক আবুল-ফজল লিখিয়াছেন "বাদশাহ্ ছদ্মবেশে এই সকল রমণীকুলের মধ্যে গিয়া তাঁহারা সাম্রাজ্য সম্বন্ধে কে কি বলেন তাহা অবগত হইতেন।" কিন্তু কবি পৃথ্বীরাজের বর্ণনা হইতে জানা যায়, এই নওরোজা দিবসে সম্রাট্ কর্ত্তৃক প্রলুব্ধ হইয়া অনেক রাজপুতললনা তাঁহাদের সতীত্ব রক্ষায় সমর্থ হ'ন নাই। অক্‌বরের ন্যায় পূর্ণচন্দ্রের এ কলঙ্ক বিলুপ্ত হইবার নহে।

অক্‌বরের ধর্ম্মমত

হিন্দু, মুসলমান, পার্সী, খৃষ্টান—বহু লেখকই অক্‌বরের ধর্ম্মমত লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। অক্‌বরনামা, বদায়ুনী ও দবিস্তা এবং ডাঃ জ্যারিক্, বারটোলি, ভান্স্ কেনিডি, উইল্‌সন্, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্, রিহাট্‌সেক, ব্লকম্যান্, কাউন্ট মোয়ের, জেনারেল ম্যাকলীগন্ ও অন্যান্য কয়েকজন পণ্ডিতের গ্রন্থ হইতে আমরা তাঁহার ধর্ম্মমতের কতক পরিচয় পাই। ইংলণ্ডের রাজকবি টেনিসন Akbar's Dream নামক কবিতায় অক্‌বরের ধর্ম্মমতের একটী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

প্রথম জীবনে অক্‌বরের ধর্ম্মবিশ্বাস বা ধর্ম্মানুভূতি প্রবল ছিল না। জীবের পরাগতি বা নশ্বরতা-সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ ধারণা ছিল না বা স্বতন্ত্র কোন ধর্ম্মভাব লইয়া নূতন কোন ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তিত করিবার মত শক্তির উন্মেষ তাঁহাতে দৃষ্ট হইত না। কিরূপে সেই ধর্ম্মভাব তাঁহার মধ্যে জাগরিত হইয়াছিল তাহা অন্বেষণ করিতে হইলে প্রথমেই দেখা উচিত যে, কিরূপ বেষ্টনীর মধ্যে তিনি লালিতপালিত হইয়াছিলেন—কিরূপ সংসর্গে ও সাহায্যে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের মূলসূত্রগুলির বিকাশ সম্ভবপর হইয়াছিল; প্রকৃতি তাঁহাকে সহজ জ্ঞানের দ্বারা কতটা ধর্ম্মানুভূতি প্রদান করিয়াছিলেন এবং কতটাই বা তিনি তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা ও সজ্জনসঙ্গলব্ধজ্ঞানের সাহায্যে অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

শৈশবকাল হইতে তিনি সুন্নী মুসলমান সংসারে লালিতপালিত হইয়াছিলেন। সুন্নীদের গোঁড়ামি তাঁহার অস্থিমজ্জাগত ছিল, কিন্তু সুফীগণের ধর্ম্মমতের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার গোঁড়ামির অনেকটা হ্রাস হইয়াছিল। এই সুফীধর্ম্মমত কতকটা আমাদের বৈষ্ণবমতের অনুরূপ। তাঁহার চরিত্রে যে ধর্ম্মানুভূতি সহজে উদ্রেক করিতে পারে নাই, জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা ও সাধুসঙ্গ তাঁহার হৃদয়ে সেই উদার ধর্ম্মভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল। বাল্যে, কৈশোরে ও যৌবনে অক্‌বর কঠোরতা অভ্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহার শিকার-স্পৃহা ও যুদ্ধলিপ্সা তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল। যৌবনে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া যুদ্ধের পর যুদ্ধজয়ে যখন তিনি ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি হইলেন, তখন মনে মনে বুঝিতে পারিলেন যে, এরূপ অকারণ জীবহত্যা ও নরহত্যা মহাপাপ। রাজদরবারে ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনসঙ্গে থাকিয়া এবং রাজপুতকুলললনাগণের পাণিগ্রহণান্তে তাঁহাদের সংশ্রবে আসিয়া ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর ধর্ম্মভাব তাঁহার চিত্তে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। ঘনিষ্টভাবে হিন্দুসহবাসে দিন যাপন ও ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর চরিত্রগৌরব পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচন তাঁহাকে সরল হিন্দুচরিত্রের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছিল। ইহার ফলে তাঁহার চরিত্র অনেকটা হিন্দুর আদর্শে গড়িয়া উঠিয়াছিল। অক্‌বর হিন্দু যোগী ও সন্ন্যাসীদের সহিত ঘনিষ্টভাবে কাল কাটাইয়া তাঁহাদের ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা বদায়ুনীর গ্রন্থ হইতে স্পষ্টই জানা যায়।

আবুল-ফজল বলেন, অক্‌বরের বয়স যখন বিশ বৎসর, তখন একদিন রাত্রিকালে আগ্রার প্রাসাদ হইতে তিনি অযোধ্যার

বহ্‌রাইচ্ নামক স্থানে শালার মাস্থদের অনুগামী তীর্থযাত্রী দলের সহিত মিশিবার জন্য গমন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ দলের একজন তাঁহাকে চিনিতে পারায় তাঁহার আত্মগোপন ব্যর্থ হয় এবং তিনি পলাইয়া আসেন। অতঃপর একদিন রাত্রিযোগে তিনি আগ্রার প্রাসাদ হইতে শিকারোদ্দেশে বহির্গত হ'ন। ফতেপুর-সিক্‌রীর নিকটস্থ মন্দখর নামক স্থানে তিনি কয়েকজন ভক্ত সাধকের সঙ্গীতে মুগ্ধ হ'ন। উহারা অজমেরের প্রসিদ্ধ সাধু মুইনুদ্দীন্ চিস্তির ধর্ম্মবিষয়ক ভজন গাইতেছিল। ঐ গান তাঁহার হৃদয়ে নূতন জগতের সন্ধান আনিয়া দেয়। তখন হইতে তিনি চিস্তির ভক্ত হইয়া পড়েন এবং সাধুর জন্মতিথি উৎসবে অজমেরে আসিয়া তিনি সাধুসন্ন্যাসীদের প্রাণমাতান সঙ্গীত শুনিয়া ধন্য হইতেন। এই মজলিসে যে কেবল মুসলমানেরই গতিবিধি ছিল তাহা নয়, হিন্দুরাও তাহাতে যোগদান করিতেন।

অক্‌বর হিন্দু ও মুসলমানকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এমন কি হিন্দুধর্ম্ম ও ইস্‌লামধর্ম্ম উভয়ের মূল উদ্দেশ্য যে এক তাহা প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক বদায়ুনী তাঁহার মুন্তখবু-ৎ-তবারিখ্ নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "এই বৎসর (৯৮৩ হিজরি বা ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ) দক্ষিণদেশ হইতে শেখ ভাবন নামে একজন শিক্ষিত ব্রাহ্মণ আগমন করেন এবং মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'ন। সেই সময় সম্রাট্ (অক্‌বর) আমাকে 'অথর্বন্' অনুবাদ করিতে আদেশ করেন। এই গ্রন্থের কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ ইস্‌লামধর্ম্মের সহিত এক। অনুবাদকালে এমন অনেক কঠিন অংশ দেখিলাম, যে শেখ ভাবন অবধি তাহার ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইল না। আমি এই বিষয় সম্রাট্‌কে জানাইলাম। তিনি শেখ ফৈজী ও হাজী ইব্রাহিমকে অনুবাদ করিতে অনুমতি করিলেন। হাজী ইব্রাহিম ইচ্ছাসত্ত্বেও কিছু লিখেন নাই। অথর্বণের উপদেশগুলির মধ্যে একটীতে লেখা আছে যে, এই পুস্তকের কোন অংশ পাঠ না করিলে কেহই রক্ষা পাইবে না। এই অংশে পুনঃ পুনঃ 'লা' লিখিত আছে এবং তাহা আমাদের (কোরাণোক্ত) 'অল্লা ইল্লাহ্' ইত্যাদির মত। শেখ ঐ সকল অংশ লইয়া ব্রাহ্মণদিগকে তর্কে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং তাহারা ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।"*

উদ্ধৃত বিবরণ হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে, অক্‌বর বাদশাহের সময়ে অথর্ববেদ-কল্পিত 'অল্লা ইল্লাহ্' ইত্যাদি নাম শুনিয়া অনেক হিন্দু উহা কোরাণের অংশ মনে করিত। আবার অনেকে ঐ নামে মুগ্ধ হইয়া কোরাণকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইত। বাস্তবিক অথর্ববেদ-সংহিতায় ঐ সকল শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল দুইটী মন্ত্রে উহাদের আভাসমাত্র দৃষ্ট হয়,—

"আদলাবুকমেককম্।
অলাবুকং নিখাতকম্।" (অথর্বস° ২০।১৩২।১-২)

সত্যবটে এক্ষণে 'অল্ল' নামে একখানি উপনিষৎ প্রচলিত আছে, কেহ কেহ উহাকে আথর্বণসূক্ত বলিয়া থাকেন। [প্রত্নকম্র-নন্দিনী ৫ম ভাগ, ১ম সংখ্যা ও শব্দকল্পদ্রুমে 'অল্ল' শব্দ দ্র°] এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে 'অল্লা ইল্লে' প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। তবে যদি এইখানি সেই সময়কার অথর্ববেদের অংশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তখনকার হিন্দুদের ভ্রম বলিতে হইবে। কারণ এই অল্লোপনিষদে যে সকল কোরাণের কথা পাওয়া যায়, তাহা বেদ, নিরুক্ত, পাণিনি প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে এমন কি অথর্বপ্রাতিশাখ্যেও দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ এই গ্রন্থে সঙ্কেতে বাদ্‌শাহের (অক্‌বর) নাম পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্বীকার করা যায় যে, এইখানি অক্‌বর বাদ্‌শাহের কোন সভাপণ্ডিত কর্ত্তৃক রচিত এবং 'আথর্বণ সূক্ত বা অল্লোপনিষৎ' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ['অথর্ববেদ' শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্র°]

১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে (হিজরি ৯৮৩) সম্রাট্ উপাসনা বা নমাজ্ করিবার জন্য 'ইবাদ্‌খানা' নির্ম্মাণ করেন। এখানে অনেক সময় বহু ফকিরের সমাগম হইত। সম্রাট্ তাঁহাদের সহিত ভগবচ্ছক্তি ও তাহার বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। সাধুগণের নিকট হইতে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা অবগত হইয়া তাঁহার হৃদয়ে ধীরে ধীরে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। ফতেপুর-প্রাসাদের নির্জ্জন কক্ষে প্রস্তরবেদীর উপর বসিয়া প্রত্যহ প্রত্যুষে তাঁহাকে ভগবানের আরাধনা করিতে দেখা যাইত। তাঁহার ভগবদ্ভক্তি ও ধর্ম্মকর্ম্মে আসক্তি দেখিয়া মনে হয়, তাঁহার অন্তরের নিভৃত প্রদেশ ধর্ম্মের নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

তাঁহার সময়ে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুযোগ্য শাসনকর্ত্তা সুলেমান কররাণী শাসনকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া রাত্রির শেষ কয়েক ঘণ্টা নমাজ্ করিয়া কাটাইতেন। সম্রাট্ এই বিখ্যাত ধার্ম্মিক সুলতান সুলেমানের আদর্শে জীবন গঠন করিতে প্রয়াস পা'ন। [সুলেমান কররাণী দ্র°]

* মুন্তখবু-ৎ-তবারিখ্, ২য় খণ্ড, ২১২ পৃঃ।

'ইবাদ্‌খানা'র নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইবার তিন বৎসর পূর্ব্বে (৯৮০ হিজরি) তাঁহার মৃত্যু হয়।

অক্‌বরের জ্ঞানোন্মেষের আর একজন সহায়ক মির্জা সুলেমান। যৌবনে মির্জা প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন এবং সর্ব্বসমেত ৭২টী যুদ্ধে যোগদান করিয়া স্বীয় কর্ম্মজীবনের পরিচয় দেন। বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া তিনি ঔদ্ধত্য ও হিংসা বিসর্জ্জন দিলেন। সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্ত ফকির বদায়ুনীর সহিত ধর্ম্মালোচনা করিয়া তিনি চিত্তে শান্তি আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আত্মীয় মির্জার এবংবিধ মানসিক উন্নতিতে আকৃষ্ট হইয়া সম্রাট্ তাঁহার পন্থানুবর্ত্তন করিতে প্রয়াস পান এবং অভ্যাস দ্বারা যে কতটা শক্তি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কৃত কর্ম্মাবলী হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়।

১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে (৯৮৪ হিজরি) অক্‌বরের ধর্ম্মপ্রাণতা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তিনি মক্কাতীর্থে যাত্রা করিতে কৃতসঙ্কল্প হ'ন; কিন্তু রাজকর্ম্মচারীদের অনুরোধে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। তিনি তীর্থযাত্রীর বেশে নগ্নপদ ও অনাবৃত মস্তকে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হ'ন। অতঃপর মুসলমান তীর্থ-যাত্রীর মক্কাযাত্রার সৌকর্য্যার্থে তিনি "মীর হাজী" অর্থাৎ তীর্থপরিদর্শক নিযুক্ত করেন। মীর হাজীকে তীর্থ-যাত্রীদিগের কতক ব্যয়ও বহন করিতে হইত। এইরূপে ক্রমশঃ ধর্ম্মেচ্ছা অক্‌বরের হৃদয়ে বলবতী হইতে থাকে।

১৫৭৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিনি ঝিলাম্ নদীতীরে শিকারে বহির্গত হ'ন। দশদিন ধরিয়া শিকারকার্য্য চলিল। হঠাৎ অক্‌বর শিকার বন্ধ করিয়া দিলেন। জীবহিংসা মহা-পাপ এই ধারণা তাঁহার মনে জাগিলে ধৃত পশু ও পাখীগুলি ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার হঠাৎ এই চিত্ত পরিবর্ত্তন ইতিহাসে 'জজ্‌রা কোতরী' নামে অভিহিত।

ইবাদ্‌খানায় গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত অক্‌বর অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত হিন্দু, জৈন, খৃষ্টান ও মুসলমান জাতিদের নিকট হইতে বিভিন্ন ধর্ম্মের মূলতত্ত্বের কথা শুনিতেন। অক্‌বর কখনও কোনও ধর্ম্মাবলম্বীর মতের উপর হস্তক্ষেপ করিতেন না। এই পরধর্ম্মসহিষ্ণুতাগুণে তিনি একজন প্রজারঞ্জক নরপতি হইতে পারিয়াছিলেন। অক্‌বর ইবাদ্‌খানায় সর্ব্ব-ধর্ম্ম সম্মেলনের জন্য এক সভা আহ্বান করিয়া স্বয়ং ঐ সভায় সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সভায় সুফী, হিন্দু দার্শনিক, আলঙ্কারিক, আইনজ্ঞ, শাস্ত্রবিদ্, সুন্নী ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখা-মতাবলম্বী ভক্ত, ব্রাহ্মণ, আরবের য়েমেনের অধিবাসী, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইহুদী, এমন কি নাস্তিকবাদিগণ আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সম্রাট্ সকলের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আলোচনা করিয়াছিলেন, (৩রা অক্টোবর, ১৫৭৮ খৃঃ; ৯৮৬হিজরি)। আবুল-ফজ্‌লের মতে ফাদার রুডলফ্ আকোয়া বিভাও ইহাতে যোগদান করেন, কিন্তু ঐতিহাসিকেরা এ কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। কারণ তাঁহাদের মতে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের পূর্ব্বে ফাদার আকোয়া বিভা ফতেপুরে আসেন নাই।

যাহা হউক, এই ধর্ম্মনিরপেক্ষতা অক্‌বর জীবনের শেষ পর্য্যন্ত রাখিতে পারেন নাই। প্রথমেই তিনি মুসলমান ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করেন। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এক হুকুম জারি করেন যে, মুসলমান-ধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্রাটের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। মুসলমান মৌলবী ও মৌলানাগণ ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিলে সম্রাট্ তাঁহাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হ'ন এবং উলেমার নিকট হইতে ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারে 'মজত হিদের' অপেক্ষা তাঁহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ—এই মর্ম্মে ফতোয়া লইয়া নিজ মত অখণ্ডনীয় রাখেন। মুসলমান সাম্প্রদায়িক-গণের মধ্যে এই ব্যাপারের মনোমালিন্য বিদূরিত হইতে না হইতে সম্রাট্ স্বয়ং ইস্‌লামধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্রভাবে নূতন 'ইলাহী' মত প্রচার করেন। ইহার কিছু পূর্ব্বে ফাদার আকোয়া বিভা সম্রাট্‌কে খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে প্রয়াস পা'ন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সম্রাট্‌প্রবর্ত্তিত এই ধর্ম্মে সর্ব্ব-ধর্ম্মের সারসমন্বয় করা হইয়াছে। ঈশ্বরের একত্ব ইহার প্রধান অবলম্বন। তাঁহার নূতন ধর্ম্মে তাঁহাকে গুরু ও ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিবার কথা ছিল। একেশ্বরবাদিত্বে 'গুরুবাদের' প্রচলন দেখিয়া হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় বিরক্ত হইয়া পড়িলেন। কাজেকাজেই এই ধর্ম্মমত হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রসার লাভ করিতে পারিল না। [ইলাহী দ্র°]

অক্‌বরের শাসন-প্রণালী

বাহুবলে ও কৌশলে ভারতে সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া সম্রাট্ অক্‌বর শাসন-শৃঙ্খলা সংস্থাপনে যত্নবান্ হ'ন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যকে নিম্নলিখিত ১৫টী সুবায় বিভক্ত করেন, যথা—বাঙ্গলা, বিহার, আলাহাবাদ, অযোধ্যা, আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, কাবুল, মূলতান, অজমের, মালব, গুজ্‌রাট, খান্দেশ, বেরার ও আহ্‌মদনগর। প্রত্যেক সুবার শাসনকার্য্য একই পদ্ধতিতে পরিচালিত হইত। প্রত্যেক সুবায় এক এক জন সুবাদার প্রতিষ্ঠিত হ'ন। শাসন ও

সামরিক কার্য্যে তাঁহাদের প্রভাব অপ্রতিহত ছিল। সুবাদারের অধীনে একজন দেওয়ান নিযুক্ত হইতেন। রাজস্ব-আদায়ের সম্পূর্ণ ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত থাকিত। বিচারকার্য্যের ভার মীর আদল ও কাজী নামধেয় কর্ম্মচারীরা নিষ্পন্ন করিতেন। অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা বিচারককে বিচারকার্য্যে সহায়তা করিতেন মাত্র। শান্তিরক্ষার জন্য কোতোয়াল নিযুক্ত ছিল। পল্লীর শান্তিরক্ষার ভার গ্রামবাসীদের উপরেই ন্যস্ত ছিল।

সমরবিভাগে দশহাজারী মনসবদার হইতে এক হাজারী মনসবদার পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিল। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর সামরিক অধিকারে সম্রাটের আত্মীয়স্বজন ও বংশধরেরাই নিযুক্ত হইতেন। পূর্ব্বে সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারীদের বেতনের পরিবর্ত্তে জায়গীর দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। সম্রাট্ অক্‌বর এই প্রথা রহিত করিয়া দেন এবং যোগ্য ব্যক্তির যোগ্য বেতন নির্দ্ধারণ করেন। সাম্রাজ্য চালাইতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সম্রাট্ সদুপায়ে রাজকোষ পরিবৃদ্ধির জন্য রাজস্ব বিভাগের আমূল পরিবর্ত্তন করেন। তাঁহার অমাত্যশ্রেষ্ঠ রাজা টোডরমল্লের সুপরামর্শের প্রত্যাশী হইয়া বাদশাহ্ তাঁহাকে যথাকর্ত্তব্য পন্থা উদ্ভাবন করিতে অনুরোধ করেন, তদনুসারে রাজা টোডরমল্ল সমগ্র উত্তরভারত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জরীপ করান এবং জমির উর্ব্বরতা অনুসারে জমির শ্রেণী বিভাগ করিয়া উৎপন্ন দ্রব্যের একতৃতীয়াংশ রাজকর ধার্য্য করেন। রাজস্ব সাধারণতঃ মুদ্রায় আদায় হইত। কিন্তু প্রজারা ইচ্ছা করিলে শস্যের বিনিময়ে খাজনা পরিশোধ করিতে পারিত। প্রথমে বৎসর বৎসর রাজস্ব নির্দ্ধারিত হইত; তৎপরে অক্‌বর দশ বৎসরের জন্য রাজস্ব নির্দ্ধারিত করেন। রাজস্ব আদায়ের এই প্রথা অক্‌বর শাহ্ প্রচলন করিয়া প্রজা সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রথা শের শাহের অনুষ্ঠিত প্রথার সংস্কার মাত্র। এই বিধান ইংরেজ আমলেও অনুসৃত হইয়াছে।

গুণিগণের আদর

গুণগ্রাহী অক্‌বরের রাজসভায় গুণের আদর যথেষ্ট ছিল। ফৈজী ও আবুল-ফজল ভ্রাতৃদ্বয় বিদ্যাবত্তায় ও রাজনৈতিক কর্ম্মকুশলতায় অদ্বিতীয় ছিলেন। বিখ্যাত কবি ফৈজীর কথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। আবুল-ফজল অক্‌বরের বিশ্বস্ত বন্ধু ও পরামর্শদাতা ছিলেন। তাঁহার রচিত অক্‌বরনামা ও আইন্-ই-অক্‌বরী নামক দুইখানি গ্রন্থে তিনি অক্‌বরের রাজত্বের বিস্তৃত বিবরণ দিয়া গিয়াছেন। [ফৈজী ও আবুল-ফজল দ্র°]

অম্বর-রাজ মানসিংহ অক্‌বরের বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন। দুরূহ সমরাভিযানগুলির কর্ত্তৃত্বভার অধিকাংশ স্থলে তাঁহার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। তিনি বহুবার বহু প্রদেশের সুবাদারের কার্য্য দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অক্‌বর তাঁহাকে 'মির্জা' উপাধিতে ভূষিত করেন। [মানসিংহ দ্র°]

রাজা টোডরমল্ল তাঁহার রাজস্ব-বিভাগের সংস্কারক। ইনি নিজে কর্ম্মকুশলতা দেখাইয়া সেনাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বাদশাহ্ গুণীর আদর জানিতেন এবং যোগ্যব্যক্তিনির্ব্বাচনে তাঁহার যে অদ্ভুত শক্তি ছিল তাহার যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। [টোডরমল্ল দ্র°]

হাস্য-রসিক রাজা বীরবল ও কলাবিদ্ সঙ্গীতনায়ক তান্‌সেন অক্‌বরের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। সমস্তদিনের পরিশ্রমের পর ইঁহারাই সম্রাট্ ও তাঁহার সভাসদ্‌গণের চিত্তবিনোদন করিতেন। ইঁহাদের রসালাপে ও সঙ্গীতচর্চ্চায় সভায় আনন্দের লহর ছুটিত।

অক্‌বরের ব্যক্তিত্ব

অক্‌বরের চরিত্র-বিশিষ্ট সম্বন্ধে কিছু কিছু পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। দয়া, ক্ষমা ও সমদর্শিতা সকলই তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। একদিকে তিনি যেমন সরল, অমায়িক ও দয়ালু ছিলেন, অন্যদিকে তেমনই কঠোরপ্রকৃতি ও গম্ভীরবাদী ছিলেন। স্বপক্ষীয়গণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি যেমন আকর্ষণ করিতেন, সেইরূপ শত্রুগণের তিনি আতঙ্ক ছিলেন। জ্ঞানলাভে তাঁহার অদম্য পিপাসা ছিল। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলী লইয়া তিনি শাস্ত্র, ইতিহাস, দর্শন, কবিতা প্রভৃতি বিষয়ে চর্চ্চা করিতেন এবং শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ফতেপুর সিক্রীতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া গিয়া তিনি যে সকল প্রাসাদ ও হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার স্থাপত্য শিল্প-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। সেকেন্দ্রায় তাঁহার নিজের সমাধির উপরেও ঐসকল শিল্পের প্রকৃষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান। আগ্রায় তাঁহার হিন্দু-মহিষীদের পূজার মন্দিরগুলিতে হিন্দু স্থাপত্যশিল্পের যথেষ্ট নিদর্শন আছে।

পরিশ্রম করিতে অক্‌বর কোনদিনই কাতর ছিলেন না। তিনি স্বয়ং শাসনসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য পরিদর্শন করিতেন। তাঁহার মত বন্ধুবৎসল লোক বড়ই বিরল। শত্রুদের উপর সদয় ব্যবহার করিয়া উদারতা প্রদর্শন তাঁহার অনন্যসাধারণ গুণ ছিল। শত্রু আসিয়া তাঁহার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিলে তিনি তাঁহার সহস্র দোষ নিজগুণে ক্ষমা করিতেন।

শিলালিপিতে অক্‌বর

বিক্রম-সংবৎ—১৬৫০। শত্রুঞ্জয় আদীশ্বরের মন্দিরের শিলালিপি। ইহাতে একজন তপাগচ্ছের প্রশংসা ও সম্রাট্

অক্‌বর (অকব্বর) শাহের বর্ণনা আছে। শিলালিপিটী হেমবিজয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। [Indian Antiquary, Vol. II, p. 50.]

নিম্নলিখিত তিনটী শিলালিপিও অক্‌বরের সময়ে উৎকীর্ণ হইয়াছিল :—

(ক) বিক্রম-সংবৎ—১৬৪৬। সম্রাট্ অক্‌বর ও তাঁহার মন্ত্রী টোডরমল্লের সময়ে বারাণসীতে উৎকীর্ণ শিলালিপি। [Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1875, p. 83.]

(খ) বিক্রম-সংবৎ—১৬৫১। অনহলবাড়ের অন্তর্গত বাড়ীপুর নামক স্থানে পার্শ্বনাথ-মন্দিরে উৎকীর্ণ শিলালিপি। ইহাতে বৃহৎ খরতরগচ্ছের পট্টাবলী আছে। [Indian Antiquary, Vol. I, p. 323.]

(গ) বিক্রম-সংবৎ—১৬৫২। শত্রুঞ্জয়ের জৈন শিলালিপি। [Indian Antiquary, Vol. II, p. 59.]

[অক্‌বরের জীবনের আরও বিশেষ বিবরণের জন্য বৈরাম খাঁ, টোডরমল্ল, মানসিংহ, আবুল-ফজ্‌ল, ফৈজী, তান্‌সেন ও বীরবল দ্র°]

[অক্‌বর সম্বন্ধে গ্রন্থপঞ্জী—আবুল-ফজ্‌ল-লিখিত "অল্লামী অক্‌বরনামা"; Akbarnámá, Bib. Ind. ed iii ; Ain-i-Akbari—Blochmann, Jarrett's translation ; আবদুল কাদির বদায়ুনী-লিখিত—"মুন্তখব্-উ-তবারিখ্"; Badáyuni—Lowe's translation ; Dabistán-al-mazáhib—Shea and Troyer's translation ; সেখ নূর-অল্-হগ্-লিখিত—"জুব্‌দৎ অল্-তবারিখ্ দবিস্তা অল্ মজাহিব্"; Abúl-Fazl's Letters, book i ; Kháfi Khán, Bib. Ind. ed. i ; Elliot's History of India, V. 6 ; সম্‌স্-অল্-উলম মৌলভী মুহম্মদ হুসেন-লিখিত—"দরবারী অক্‌বরী" (Lahore, 1898) ; Count von Noer (Leipzig)—Kaiser Akbar, French and revised English translations ; Graf von Noer—The Emperor Akbar, translation by Mr. Beveridge, Calcutta, 1890 ; Elphinstone's History of India ; Pierre Du Jarric of Toulouse—L'Historie des choses plus me'morables, etc. Bordeaux, 1608-1614 ; Father Goldie, Missions to the Great Mogul (Dublin, 1897) ; Missione al Gran Mogol dal Daniello Bartoli, Piacenza, 1819 ; General Maclagan—'Jesuit Missions to the Emperor Akbar and the Observations thereon' in J. A. S. B. for 1896 and 1904 ; Jerome Xavier, Hist Christi, etc. Latine reddita a ludovico de Dien, Leyden, 1639 ; S. Lee—Controversial Tracts on Christianity and Muhammedanism, Cambridge, 1824 ; H. Beveridge—Notes on General Maclagan's Papers (J. A. S. B. 1896) ; Article by General Vans Kennedy in Transact. Bom. Lit. Soc., and by H. Wilson in Calcutta Quarterly Oriental Magazine ; art. 'The Parsis at the Court of Akbar' by Jivánji Jamshedji Modi in Bom. Branch of R. A. S. for 1902, and App. 1903, p. 537, also published separately, Bombay, 1903 ; Malleson's Akbar (Rulers of India Series) ; Tennyson's Akbar's Dream.]

অক্‌বর₂—মুগল-সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের চতুর্থ পুত্র। শাহ্‌জাদা অক্‌বর ১০৬৭ হিজরির ১২ই জিলহিজ্জ (১২ই সেপ্টেম্বর, ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দ)* তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। সম্রাট্ যখন মেবারের রাণা রাজসিংহকে আক্রমণ করেন, তখন শাহ্‌জাদা অক্‌বর সম্রাট্‌বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহার অধীনে তহ্‌বর খাঁ সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে দাক্ষিণাত্য হইতে শাহ্‌জাদা মুয়জ্জম ও বঙ্গদেশ হইতে শাহ্‌জাদা আজম সসৈন্যে আসিয়া সম্রাটের সহিত যোগদান করিলেন। সম্রাট্ তৎকালে মাত্র এক সহস্র সৈন্য লইয়া অজমেরে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে উক্ত তিন ভ্রাতা রাজপুতানা আক্রমণে প্রবৃত্ত হ'ন। রাজপ্রশস্তিতে লিখিত আছে—

> শতে সপ্তদশোহতীতে বর্ষে ষট্‌ত্রিংশদাহ্বয়ে।
> পৌষস্য কৃষ্ণৈকাদশ্যাং মেবারে দিল্লিকাপতিঃ ॥
> আয়াতস্তস্য পুত্রস্য আদৌ অকবরাভিধঃ।
> তথা তহবরখানঃ প্রাপ্তঃ সেনাসমাবৃতঃ ॥
>
> [রাজপ্রশস্তি ২২ । ১০-১১]

ইহা হইতে বুঝা যায়, ১৭৩৬ সংবতে পৌষমাসের কৃষ্ণ একাদশীতিথিতে দিল্লীশ্বরের পুত্র অক্‌বর তহ্‌বর খাঁর সহিত মেবার আক্রমণ করেন।

দহ্‌বারীঘাটা (দেবারিঘাটা) নামক গিরিসঙ্কটে উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হয়। শাহ্‌জাদা অক্‌বর সসৈন্যে এই গিরিসঙ্কটে কয়েকদিন আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য হ'ন। পরিশেষে রাঠোর দুর্গাদাসের পরামর্শে অক্‌বর সসৈন্যে রাজপুতপক্ষ অবলম্বন করিয়া আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন। তাহার পর তিনি প্রায় সত্তর হাজার সৈন্য লইয়া পিতার বিরুদ্ধে অগ্রসর হ'ন। কিন্তু অক্‌বরের অধীনস্থ অনেক সেনাপতি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সম্রাটের পক্ষে আশ্রয় লইতে চলিল। সেনাপতি তহ্‌বর খাঁ সম্রাটের পক্ষে যোগ দিতে আসিয়া শাহ্‌জাদা মুয়জ্জমের অনুচরগণ দ্বারা নিহত হইলেন। অতঃপর সম্রাটের একখানি চাতুরীপূর্ণ পত্র রাজপুতগণের হাতে পড়ায় তাঁহারা অক্‌বরকে সম্রাটের ষড়্‌যন্ত্রের সহায়ক সন্দেহ করিয়া তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। ক্রমে শাহ্‌জাদার সৈন্যবল হ্রাস হইতে লাগিল। কেবল রাঠোর দুর্গাদাস ও তাঁহার কয়েকজন অনুচর শাহ্‌জাদার পক্ষাবলম্বন করিয়া রহিলেন। নিরুপায় অক্‌বর মাত্র ৫০০ অনুচরসহ দাক্ষিণাত্যে পলাইয়া গেলেন এবং শিবাজীর পুত্র

* মতান্তরে ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৬৫৭ O. S. (১১ই জিলহিজ্জ, ১০৬৭)।

শম্ভাজীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু এখানেও তিনি শান্তিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ না হইয়া একদা নৌকাযোগে পারস্যে পলায়ন করেন। পথিমধ্যে মস্কটের ইমাম তাঁহাকে বন্দী করেন এবং ঔরঙ্গজেবের হস্তে সমর্পণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হ'ন, কিন্তু পারস্যের শাহের আদেশে ইমাম তাঁহাকে পারস্যে পাঠাইয়া দেন। শাহ্ সুলেমান ও তাঁহার পুত্র শাহ্ হুসেন তাঁহাকে সাদরে পারস্যে আশ্রয় দেন। খুরাসানের গর্মশির নামক স্থানে সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের ৪৮ বৎসর রাজত্বকালে শাহ্জাদা অক্‌বর মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। শাহ্জাদা অক্‌বর ধার্ম্মিক মুসলমান ছিলেন। এজন্য ঔরঙ্গজেব এক সময়ে অক্‌বরকেই তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন।

[Elliot's History of India, Vol. VII, pp. 196, 299, 301, 304, 308, 309, 312, 313, 361, 384; রাজপ্রশস্তি ২২শ অধ্যায়; Mediæval India by S. Lane-poole; Aurangjib & his times—J. N. Sarkar.]

অক্‌বর৩—মুগল-সম্রাট্‌বংশের চতুর্দ্দশ সম্রাট্। সম্রাট্ শাহ্ আলমের পুত্র আবূল-নস্‌র্-মুইনুদ্দীন্ মুহম্মদ, দ্বিতীয় অক্‌বর নামে প্রসিদ্ধ। ইনি ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল, বুধবার (New Style) বা ১১৭৩ হিজরির ৭ই রমজান জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২২১ হিজরির ৭ই রমজান বা ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে নবেম্বর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি ৩২ বৎসরকাল দিল্লীসিংহাসনে বসিয়া ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর দেহত্যাগ করেন। ইঁহার পরে ইঁহার পুত্র বাহাদুর শাহ্ সম্রাট্ হইয়াছিলেন; ইনিই শেষ মুগল সম্রাট্।

অক্‌বর৪—লাহোর হইতে মূলতানে যাইবার পথে অবস্থিত একটী গ্রাম। লাহোর হইতে ৮০ মাইল দূরে এবং গুগেরা হইতে ৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এই গ্রামের অনতিদূরে একটী প্রাচীন নগরের ধ্বংশাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কএকটী ধ্বস্ত-স্তূপের একটী স্তূপ প্রায় সহস্র বর্গফুট পরিমিতস্থান জুড়িয়া আছে। তাহার মধ্যে ২০০ বর্গফুট জুড়িয়া একটী প্রাসাদের চিহ্ন প্রাচীন কীর্ত্তির সাক্ষ্য দিতেছে। এই প্রাসাদের উত্তর অংশ প্রায় ৭৫ ফুট উচ্চ। অপর একটী নাতিউচ্চ ধ্বংসস্তূপ দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮০০ ফুট এবং প্রস্থে ৪০০ ফুট হইবে। প্রত্নতত্ত্ববিভাগ হইতে স্যর্ আলেক্‌সান্দার কানিংহাম্ এইস্থান জরীপ করিতে আসেন এবং কয়েকখানি বৃহদাকার ইষ্টক লইয়া যা'ন (২০″ × ১০″ × ৩½″)। তাঁহার মতে ঐ ধ্বংসাবশেষ কোনও অতি প্রাচীন নগরের। বহুকাল যাবৎ ঐ স্থান জনহীন ছিল। অবশেষে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে গোলাবসিং প্রবিন্দিয়া এইস্থানে অক্‌বরগ্রাম স্থাপন করেন। ঐ স্থানের পুরাতন নাম কি ছিল তাহা এখন জানিবার উপায় নাই।

[Cunningham's Ancient Geography of India p. 212.]

অক্‌বর আলী—পঞ্জাবের অন্তর্গত পটৌদী নামক সামন্ত-রাজ্যের একজন রাজকুমার। ইঁহার পিতা তালাবফৈজ্ খাঁ ঝাঝরবংশীয় আফগান ছিলেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড লেক তাঁহার রণচাতুর্য্যে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পটৌদী রাজ্য সমর্পণ করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-যুদ্ধের সময় অক্‌বর আলী ইংরেজদিগের সহায়তা করিতে ভুলেন নাই।

অক্‌বর আলী তশ্‌বিহি—খুলাসৎ-উল্-অষার গ্রন্থে ইঁহাকে রজকপুত্র বলা হইয়াছে। ইনি ভারতে আসিয়া ফকির হইয়া যা'ন। কিন্তু ইনি নাস্তিক ছিলেন বলিয়া কঠোর সন্ন্যাসধর্ম্ম পালনেও আত্মার উন্নতিসাধন করিতে পারেন নাই। ইনি আট হাজার শ্লোকের একটী দীবান ও 'জর্‌রা বা খুর্‌শেদ' নামক একটী মস্‌নবী লিখিয়া যা'ন। ইনি ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে (৯৯৩ হিজরি) জীবিত ছিলেন।

অক্‌বর আলী, সৈয়দ—"জেবল মুল্লুক সাম্‌রোকের পুথি" নামক মুসলমানী আখ্যানগ্রন্থ রচয়িতা। পুস্তকের ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গলা। পুস্তকখানি সৈয়দ অক্‌বর আলীর রচনা। কিন্তু পুথির অধিকাংশ স্থলেই প্রকাশক হামিদুল্লার ভণিতা দেখা যায়। এই পুথিখানি প্রথমতঃ আরবী অক্ষরে চট্টগ্রামী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে অনুমান হয় লেখক চট্টগ্রামবাসী।

অক্‌বর কুলী খান্—গক্‌খরবংশীয় একজন মুগল সেনাপতি। সম্রাট্ শাহ্জাহান জগৎসিংহের বিরুদ্ধে তিনটী সৈন্য-বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত সেনাবাহিনীত্রয়ের অধিনায়করূপে অক্‌বর কুলী খান্ নিযুক্ত ছিলেন (১৬৫৩)। [শাহ্জাহান দ্র°]

[J. A. S. B., 1875, p. 195.]

অক্‌বর খাঁ১—কাবুলের শাহ্ দোস্ত্ মুহম্মদের পুত্র। ইনি ওরাকজুইবংশীয়। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের ভারত-শাসনাধিকারকালে কাবুলের অধিপতি দোস্ত্ মুহম্মদ ইংরেজের বিপক্ষ হইয়া রুসের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিবার অবসর খুঁজিতেছিলেন। রাজপ্রতিনিধি অক্‌ল্যাণ্ড ইহাতে ভারতের রাজনৈতিক আকাশ অচিরে মেঘাচ্ছন্ন হইবে বুঝিয়া ২১ হাজার ইংরেজসৈন্য আফগানি-স্থানে প্রেরণ করিলেন। [অক্‌ল্যাণ্ড দ্র°] ইংরেজসৈন্য দোস্ত্ মুহম্মদকে বিতাড়িত করিয়া ভূতপূর্ব্ব সুলতান শাহ্সুজাকে সিংহা-সনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন; কিন্তু পুনরায় যুদ্ধসজ্জা করায় ইংরেজহস্তে বন্দী হইয়া কলিকাতায় প্রেরিত হ'ন। অতঃপর ইংরেজসৈন্য ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে দোস্ত্ মুহম্মদের পুত্র অক্‌বর খাঁর

নেতৃত্বে কাবুলবাসীরা পুনরায় বিদ্রোহী হয় এবং ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ২রা নবেম্বর তারিখে ইংরেজদূত বার্ণেস (Barnes) সাহেবকে হত্যা করে। ২৩শে ডিসেম্বর প্রধান দূত ম্যাক্‌নাটন্ (Macnaghten) অক্‌বরের সহিত সন্ধি করিতে গিয়া তাঁহার হস্তে নিহত হইলেন। জেনেরল্ এল্‌ফিন্‌স্‌টোন্ সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা ও জামিন্ দিয়া ৬ই জানুয়ারী তারিখে সসৈন্যে ভারত অভিমুখে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু পথিমধ্যে কয়েকটী আফগান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অধিকাংশ সৈন্য বিনষ্ট হইল, কেবলমাত্র ৩০০ লোক লইয়া এল্‌ফিন্‌স্‌টোন্ জগদলক নামক স্থানে পৌছিলেন এবং অক্‌বর খাঁর হস্তে বন্দী হইলেন। কেবলমাত্র ডাক্তার ব্রাইডন কোনমতে ১৩ই জানুয়ারী তারিখে জালালাবাদে প্রাণ লইয়া পৌছিয়া সেনাপতি শুর্ রবার্ট সেলকে এই নিদারুণ সংবাদ জানাইলেন। ১২ই জানুয়ারী তারিখে অক্‌বর খাঁ সেনাপতি নটের হস্তে কান্দাহারে পরাজিত হইলেন। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের পর লর্ড এলেন্‌বরা গবর্ণর-জেনেরল্ হইয়া আসিলেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী কাবুল হইতে প্রথমে প্রত্যাগত সেনাপতি সেলের সৈন্যদল জালালাবাদে অক্‌বর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। সেনাপতি নটের সৈন্যদল কান্দাহারে আটক হইয়াছিল এবং ৫ই মার্চ্চ কাবুলীরা গজ্‌নী পুনরুদ্ধার করিয়া লইল। ইংরেজ সৈন্যগণের উদ্ধারের আশায় এলেন্‌বরা সেনাপতি পলকের অধীনে একদল ইংরেজ ও শিখসৈন্য প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি পলক্ আসিয়া পৌছিলে অক্‌বর জালালাবাদের অবরোধ উঠাইয়া কাবুলের দিকে প্রস্থান করিলেন। শাহ্‌সুজা নিহত হওয়ায় অক্‌বরই প্রকৃতপক্ষে কাবুলের অধিপতি হইলেন। তিনি পলকের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, ইংরেজসৈন্য জালালাবাদ পরিত্যাগ করিয়া গেলে কাবুলের ইংরেজসৈন্যগণকে মুক্তি দেওয়া হইবে। এদিকে সেনাপতি নট্‌কে সাহায্য করিবার জন্য যে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল তাহারাও শত্রুহস্তে পরাজিত হইল। এলেন্‌বরা শঙ্কিত হইয়া পলক্ ও নট্‌কে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু সেনাপতিদ্বয় স্বজাতীয়ের উদ্ধারসাধন না করিয়া ফিরিতে ইচ্ছা করিলেন না। সেনাপতি নট্ গজ্‌নীর দুর্গ ভূমিসাৎ করিয়া কাবুলের দিকে অগ্রসর হইলেন। এদিকে সেনাপতি পলক্ পথিমধ্যে অক্‌বরকে পরাস্ত করিয়া কাবুলে পৌছিলেন। তাহার পর দুইদলে মিলিত হইয়া বন্দীদিগের উদ্ধারসাধন করিলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে অক্‌বর খাঁর মৃত্যু হয়।

অক্‌বর খাঁ$_2$,—মামন্দ (মোহ্‌মন্দ) আফগানদলের নেতা। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মামন্দজাতির সর্দ্দার সয়াদৎ খাঁ ভারত-সীমান্ত আক্রমণ করিয়া ইংরেজদিগকে উত্যক্ত করায় আমীরের আদেশে বন্দী হ'ন। এই সময় হইতে মামন্দজাতির অধ্যুষিত পার্ব্বত্য প্রদেশে ঘোর অরাজকতার সূচনা হয়। অবশেষে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে পেশাবরের উত্তরপশ্চিমস্থ মামন্দজাতির সর্দ্দারপদে অক্‌বর খাঁকে খাঁ-পদে মনোনীত করেন। এই ব্যক্তি অমিতাচার নিবন্ধন ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগ করিয়া কাবুলে প্রবাসী হইতে বাধ্য হয়।

অক্‌বরনগর$_1$,—১৭২২ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গলাকে ১৩ চাক্‌লায় বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে একটী চাক্‌লার নাম অক্‌বরনগর। ঐ তেরটী চাক্‌লার দুইটী উড়িষ্যার মধ্যে। তাহাদের নাম—বন্দর বালেশ্বর ও হিজ্‌লী। পাঁচটী পদ্মার দক্ষিণপশ্চিমে। যথা—সপ্তগ্রাম, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, যশোর ও ভূষণা। ছয়টী পদ্মার উত্তরপূর্ব্ব পারে। যথা—অক্‌বরনগর, ঘোড়াঘাট, কড়াইবাড়ী, জাহাঙ্গীরনগর, শ্রীহট্ট এবং চট্টগ্রাম। এই তেরটী চাক্‌লা ১৬৬০ পরগণায় বিভক্ত। ঐ সমস্ত পরগণা হইতে ১,৪২,৮৮,১৬৬৲ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। চাক্‌লা অক্‌বরনগর সুন্দরবনের নিকটবর্ত্তী।

অক্‌বরনগর$_2$,—দিনাজপুর জেলার একটী গ্রাম। উহা চিরামতী নদীর কূলে অবস্থিত। ঐ পল্লীর পরপারে ধানখাইল নামক গ্রাম।

অক্‌বরনগর$_3$,—বর্ত্তমান রাজমহলের একটী প্রাচীন নাম। [রাজমহল দ্র]

অক্‌বরনামা,—মুগল-সম্রাট্ অক্‌বরের প্রিয় সচিব আবূল-ফজ্‌ল রচিত একখানি বিরাট ঐতিহাসিক গ্রন্থ। গ্রন্থকার তাঁহার মহানুভব প্রভুর জীবনচরিত ও শাসন-পদ্ধতি এই বৃহৎ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকে প্রায় তিন শত অধ্যায় আছে। আবূল-ফজ্‌ল শাহ্‌জাদা সেলিমের চক্রান্তে নিহত হওয়ায় এই বিরাট্ গ্রন্থ শেষ করিতে পারেন নাই। অক্‌বরের শাসনকালের ইতিহাসসমূহের মধ্যে অক্‌বরনামাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রন্থ ; কারণ অক্‌বরের আদেশে এই পুস্তক রচিত হইয়াছিল এবং স্থানে স্থানে সম্রাট্ স্বয়ং ইহার সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। আবূল-ফজ্‌ল অক্‌বরের স্তাবক ছিলেন। তিনি বহুস্থানে সত্যের অপলাপ ঘটাইয়া স্বীয় প্রভুর মহিমাকীর্ত্তনে বিরত হ'ন নাই। তবে ইহা যে অকবরের শাসনকালের একটী পরিস্ফুট চিত্র তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই গ্রন্থে আবূল-ফজ্‌লের ভ্রম প্রমাদেরও অভাব নাই। তিনি অক্‌বরের জন্মতারিখ ১লা রজব ৯৪৯ হিজরি বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ পুরাবিদ্‌মতে উহা ১৪ই

শাবান হওয়া উচিত ছিল। এতদ্ভিন্ন হুমায়ুনের মৃত্যু ও অক্‌বরের পূর্ব্বপুরুষগণের বৃত্তান্ত, আসিরগড়-বিজয় প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থে অনেক ভ্রমপ্রমাদ দৃষ্ট হয়।

গ্রন্থের উপক্রমণিকায় অক্‌বরের জন্মবৃত্তান্ত উপলক্ষ করিয়া গ্রন্থসূচনা করা হইয়াছে। প্রথম একাদশ অধ্যায় অক্‌বরের জন্মবৃত্তান্ত ও জন্মকুণ্ডলীর বিচার লইয়াই লিখিত। দ্বাদশ অধ্যায়ে গ্রন্থকার স্বীয় জন্মবৃত্তান্ত এবং উপযুক্ত সময়ে জন্মগ্রহণ করায় ও অক্‌বরের অনুগ্রহভাজন হওয়ায় ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিতেছেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রথম মানব আদম হইতে অক্‌বরের পূর্ব্বপুরুষগণের বংশতালিকা। পরে ঐ অধ্যায়ের শেষ অংশে গ্রন্থকার হিন্দুমতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের স্থিতিকাল বর্ণনা করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ হইতে ষোড়শ অধ্যায়ে আদম হইতে উমরশেখ মির্জা পর্য্যন্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। সপ্তদশ অধ্যায়ে বাবর বাদশাহের ও হুমায়ুনের শাসনকালের মোটামুটি ইতিহাস আছে। সম্রাট্ হুমায়ুনকে আবুল-ফজল 'জাহানবাণী জন্নৎ আশ্যানী' এবং সম্রাট্ অক্‌বরকে 'শাহিন্‌শাহ্' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অক্‌বরের রাজত্বকালের ষট্‌চত্বারিংশ বৎসর পর্য্যন্ত রচনার পর আবুল-ফজল নিহত হ'ন। ইহার পর ইনায়েতুল্লা নামক একব্যক্তি গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশ লিখেন। নিজামুদ্দীন এবং বদায়ুনীর রচনা হইতে ইহার সময়পঞ্জী (chronology) ও ঐতিহাসিক তথ্য বিশুদ্ধ। তাহার উপর ইহাতে অক্‌বরের শাসনকালের ক্ষুদ্রতম ঘটনা পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ থাকায় গ্রন্থখানি বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অক্‌বরের রাজত্বকালের যে সমস্ত রাজকীয় দলিলপত্রাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অক্‌বর-নামায় তৎসমুদায়ের কতক আভাস পাওয়া যায়। এই কারণ অক্‌বরনামার মূল্য অন্যান্য গ্রন্থাপেক্ষা অনেক অধিক।

আবুল-ফজলের অক্‌বরনামা ও তবকাৎ-ই-অক্‌বরী পুস্তকের সাহায্যে শেখ ইল্লাহাদ ফৈজী সর্‌হিন্দী অপর একখানি অক্‌বরনামা প্রণয়ন করেন।

অক্‌বরনামার অনেকগুলি পুথি পাওয়া গিয়াছে। জারেট্ (Jarret), চামার (Lieutenant Chalmers) এবং হেনরী বেভারিজ ফার্সী মূল পুথি দেখিয়া এই বিরাট্ গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে বেভারিজের অনুবাদ সম্পূর্ণ।

[Akbarnāmā by H. Beveridge I. C. S.; Akbar the Great Mogul by V. A. Smith; Tabakāt-i-Nāsirī (Raverty), pp. 869n, 880n, 883n, 888n, 889n, 894n.]

অক্‌বরপুর$_{১}$,—অযোধ্যা প্রদেশের কানপুর জেলার একটী তহশীল। অক্ষা° ২৬°১৫′ হইতে ২৬°৩৩′ পূঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৫১′ হইতে ৮০°১১′ উঃ। ভূপরিমাণ ৩৭০ বর্গমাইল। এই তহশীলে ২৮৯টী গ্রাম আছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের গণনায় এই স্থানের লোকসংখ্যা ১৪৬৮২৯ ছিল। রিন্দ, নোন্ ও সেন্‌গর নদী এই তহশীলের ভিতর দিয়া গিয়াছে। নিম্ন গঙ্গা-খালের এটাবা শাখা হইতে এই স্থানের জল সরবরাহ করা হয়।

অক্‌বরপুর$_{২}$,—অযোধ্যা প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার একটী তহশীল। ইহার উত্তরে ফৈজাবাদ ও তান্দ তহশীল, পূর্ব্বে তান্দ, দক্ষিণে সুলতানপুর জেলা ও পশ্চিমে বিকাপুর তহশীল অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৫৪১ বর্গমাইল। অক্ষা° ২৬°১৫′ হইতে ২৬°৩৫′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২°১৩′ হইতে ৮২°৫৪′ পূঃ। স্থানীয় অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু। এই তহশীলে সর্ব্বসমেত ৮৮৯টী গ্রাম ও ৩টী নগর আছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে এই-স্থানের লোকসংখ্যা ৩৬৪২৮৩ ছিল। পূর্ব্বে ইহা ভর জাতির অধিকারে ছিল। পরে মুগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। অক্‌বরপুর নগর ইহার সদর।

অক্‌বরপুর$_{৩}$,—উক্ত তহশীলের প্রধান নগর। ইহা তোনস্ নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°২৫′৩৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২°৩৪′ ২৫″ পূঃ। সম্রাট্ অক্‌বর এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩১ সালের গণনায় এখানকার লোকসংখ্যা ৭৬৭৫ ছিল। অধিবাসী-গণের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। এখানে একটী পুরাতন দুর্গ বর্ত্তমান। সম্রাট্ অক্‌বরের রাজত্বকালে মহসীন খাঁ নামক জনৈক মুসলমান ঐ দুর্গমধ্যে একটী মস্‌জিদ্ ও তোনস্ নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী পরগণার নাম অক্‌বরপুর শিপ্তৌলি রাখেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মরাঠা সৈন্যনায়ক রাঘোবা দাদা দিল্লী হইতে অক্‌বরপুরে আসিয়া শিবির সংস্থাপন করেন। এখানে নানা শস্য, চামড়া ও কার্পাস বস্ত্রের বিস্তৃত কারবার আছে।

অক্‌বরপুর$_{৪}$,—মজফ্‌ফরপুর জেলার একটী গ্রাম। ইহার অপর নাম কাট্‌রা। অক্ষা° ২৬°১২′৪৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫°৩৪′২৫″ পূঃ। এস্থানের অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু। রাজা চাঁদ এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এখনও উহার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

অক্‌বরপুর$_{৫}$,—চব্বিশপরগণার অন্তর্গত একটী পরগণার নাম।

অক্‌বরপুর$_{৬}$,—মালদহের একটী পরগণা। তাহার স্থূল ক্ষেত্রফল ১৪·০৭ বর্গমাইল। ঐ পরগণায় পঁচিশ ঘর জমিদার আছেন। উহার একদিকে গঙ্গা অন্যদিকে কালিন্দী নদী। তদ্ভিন্ন, কঙ্কর, গোবরাগরৈয়া, ধর্ম্মদোলা, বঙ্কা ও কাপ নামে কালিন্দীর কয়েকটী শাখা এই পরগণার ভিতর আছে। বর্ষা-

কালে ঐ সকল নদী প্লাবিত হইয়া উঠে। ইহার প্রধান নগর হায়াতপুর। সুলতানগঞ্জ, হরিশ্চন্দ্রপুর, ভেগাল্, ভলুকরাই, কেদারগঞ্জ, দেবীপুর এবং কমলপুর গ্রামে প্রতি সপ্তাহে হাট বসে।

অক্‌বরপুর ঘাট—নিমার জেলার অন্তর্গত নর্ম্মদা নদীতীরস্থ একটী পারঘাট। [নিমার জেলা দ্র°]

অক্‌বরবন্দর—রঙ্গপুর জেলার তিস্তানদীর কূলে অবস্থিত গ্রাম। এখানে তামাকু ও পাটের বিলক্ষণ ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে।

অক্‌বর মুল্লা, সৈয়দ—কাবুলী বিদ্রোহীদিগের নেতা। ইনি অকাখেল আফ্রিদীবংশসম্ভূত ছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে যখন আফগান-সীমান্তে পার্ব্বত্য আফগানজাতিরা ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে থাকে, তখন আফ্রিদী ও টিরার ওরাক্‌জ়ইগণ ঐ বহ্নির আলোক দৃষ্টে উল্লসিত হইয়া অক্‌বর মুল্লার নেতৃত্বে জেহাদ্ ঘোষণা করে। উক্ত অব্দের ১৫ই, ২৩এ ও ২৪এ আগষ্ট ওরাক্‌জ়ইগণ আফ্রিদীদিগের সহযোগে সামানা ও খাইবার অধিকার করে। সিনাবারী ও হঙ্গুতে ইংরেজপাঠানে যুদ্ধ হয়। সেপ্টেম্বর মাসের ১২ই তারিখ পর্য্যন্ত সামানা ও তদন্তর্গত লকহার্ট এবং কাভাগ্‌নারী দুর্গ পাঠানদিগের অধিকারে থাকে; কিন্তু ১৪ই সেপ্টেম্বর সাহায্যকারী নূতন সেনাদল আসিয়া পড়ায় তাহারা খাঙ্কি উপত্যকা অভিমুখে সরিয়া পড়ে।

অক্‌বর মুহম্মদ$_{১}$—'তমিম গোলাল—চৈতন্য সিলাল' নামক পুথির রচয়িতা। তমিম গোলাল ও চৈতন্য সিলালের প্রেম ও পরিণয়কাহিনী ইহাতে বর্ণিত আছে। ভাষা বাঙ্গলা। সিলালের বারমাস-বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী।

অক্‌বর মুহম্মদ$_{২}$—কুলবর্গার মুহম্মদ গেসু দরাজের পুত্র। ইনি পারস্যভাষায় 'আকাএদ্ অক্‌বরী' নামক একখানি ধর্ম্ম-পুস্তক রচনা করেন। ইহাতে ইস্‌লামধর্ম্মের মূল উপদেশগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

অক্‌বর শাহ্$_{১}$—দেবগড়ের একজন মুসলমান নৃপতি। নাগপুরে ইঁহার রাজধানী ছিল। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে চাঁদসুলতানের মৃত্যু হইলে ওয়ালী শাহ্ নামক এক দাসী-পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। চাঁদ সুলতানের বিধবা পত্নী স্বীয় বালকপুত্রের জন্য রঘুজী ভোন্‌স্লের সাহায্য প্রার্থনা করেন। যুদ্ধে ওয়ালী শাহ্ হত হইলে বুর্হান্ শাহ্ ও অক্‌বর শাহ্ রাজত্ব লাভ করেন। শেষে উভয় ভ্রাতার বিবাদ উপস্থিত হইলে এক বৃহৎ আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ঘটে। বুর্হান শাহ্ রঘুজী ভোন্‌স্লের সাহায্যে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে জয়ী হ'ন। অক্‌বর শাহ্ পলাইয়া হায়দ্রাবাদে গিয়া বিষপানে আত্মহত্যা করেন। [রঘুজী ভোন্‌স্লে ও নাগপুর শব্দ দ্র°]

অক্‌বর শাহ্$_{২}$—কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদরচয়িতা একজন মুসলমান।

অক্‌বর শাহ্$_{৩}$—প্রসিদ্ধ হীরক। ইহার উপর আরবী লিপি খোদিত আছে। বরোদার গায়কবাড় ৩৫০০০ পাউণ্ড মূল্যে ইহা ক্রয় করেন।

অক্‌বর শাহ্ সৈয়দ—স্বাৎ উপত্যকাবাসী একজন মুসলমান সর্দ্দার ও ধর্ম্মগুরু। পিণ্ডারী সর্দ্দার আমীর খাঁর সহকর্ম্মী সৈয়দ আহ্‌মদ খাঁ ৪০ জন অনুচর লইয়া পেশাবর সীমান্তে য়ুসুফজ়ই পাঠানদিগের মধ্যে আসিয়া নিরাপদে বাস করিতে থাকেন। [আহ্‌মদ খাঁ দ্র°]

শিখসর্দ্দার শেরসিংহ কর্ত্তৃক ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে আহ্‌মদ খাঁ নিহত হইলে তাঁহার অনুচরবর্গ সিত্তানায় উৎমনজ়ই পাঠান-দিগের মধ্যে আসিয়া বাস করে। এখানে হিন্দুস্থানী অনুচরবর্গের গুরুস্বরূপে অক্‌বর শাহ্ দস্যু, পলাতক ও রাজনৈতিক অপরাধী-দিগকে আশ্রয় দিয়া একটী উপনিবেশ গঠন করেন। এই দুর্ব্বৃত্তেরা দস্যুবৃত্তি ও লুণ্ঠন দ্বারা নিকটস্থ অধিবাসীদিগকে সশঙ্কিত করিয়া তুলিত। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবে ইংরেজ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সানুচর অক্‌বরের ভয়ে সদা শঙ্কিত থাকিতেন।

অক্‌বরশাহী—বীরভূম জেলার অন্তর্গত শাঙ্‌রুল বা সুরুলের প্রাচীন নাম। [সুরুল দ্র°]।

অক্‌বর হুসেন—'মুখমাস কিতাই হিন্দ্' নামক উর্দ্দূ গল্প-গ্রন্থের রচয়িতা।

অক্‌বরাবাদ$_{১}$—মালদহের অন্তর্গত একটী পরগণার নাম। ১৪·৩৮ বর্গমাইল বিস্তার। এই পরগণায় তিনঘর জমিদার আছেন। এখানকার ভূমি উর্ব্বরা, উত্তম শস্যাদি জন্মে; জলবায়ুও স্বাস্থ্যকর।

অক্‌বরাবাদ$_{২}$—বর্ত্তমান আগ্রা সহরের প্রাচীন নাম অক্‌বরা-বাদ। প্রথমে যমুনার পরপারে সহর ছিল, অবশেষে সম্রাট্ অক্‌বর যমুনার পশ্চিম-কূলে এই নূতন নগর নির্ম্মাণ করাইয়া-ছিলেন। প্রাচীন আগ্রার নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। [আগ্রা দ্র°]

অক্‌বরাবাদী মহল—সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের বেগমগণের অন্যতম। ইঁহার অপর নাম আজ্জুন্নিসা বেগম। ইনি ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে (১০৬০ হিজরি) দেড়লক্ষ টাকা ব্যয়ে দিল্লীর ফৈজবাজারে একটী লাল পাথরের মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন। আলমগীরের রাজত্ব-কালে ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী (৪ঠা জিলহিজ্জ,

১০৮৭ হিজরি) ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। আগ্রা সহরের অক্‌বরাবাদী মস্‌জিদ্ ইঁহারই ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়।

অক্‌মোলিন্‌স্ক—রুষাধিকৃত সাইবেরিয়া-ভূভাগের তুর্কিস্থান প্রদেশের কিরঘিজ গণতন্ত্রের অন্তর্গত একটী বিভাগ ও তাহার প্রধান নগর।

অক্রা,—আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম উপকূলবাসী এক জাতি। সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রায় প্রত্যেক নগরেই ইহাদের বাস আছে। ইহারা নানারূপ শিল্পকার্য্য ও নৌ-চালনা করিয়া জীবিকার্জ্জন করে। চতুরতার জন্য ইহারা প্রসিদ্ধ, এই কারণ অভ্যন্তর দেশভাগের অধিবাসী আদিম জাতিরা ইহাদের দ্বারা দোভাষীর কার্য্য করায় এবং গ্রাম্য বা পারিবারিক কলহের মীমাংসার জন্য ইহাদের মধ্যস্থ মানে।

অক্রা$_2$—উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তের অন্তর্গত বন্নু জেলার একটী প্রাচীন স্থান। অক্ষা° ৩৩° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০°৭৪′ পূঃ। বন্নুসহর ইহার নিকটেই অবস্থিত। কথিত আছে, জাল-ই-জারের পুত্র রুস্তম ও কাবুলশাহের কন্যা এখানে থাকিয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। রুস্তমের ভগিনী বান্নু উত্তরাধিকারসূত্রে এই গ্রাম প্রাপ্ত হ'ন। তাঁহার নামানুসারে পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ বান্নু নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। বান্নু হইতে বন্নু নাম ইতিহাসসঙ্গত নয়, কারণ বহু পূর্ব্ববর্ত্তী পাণিনির অষ্টধ্যায়ীগ্রন্থে (৪.২.১০৩) এই স্থান বর্ণু নামে উক্ত হইয়াছে। এই স্থানে গ্রীস ও পশ্চিম-এসিয়ার কতকগুলি খোদাই করা মূল্যবান্ প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে।

[Furtwängler's Antike Gemmen, Vol. II, pp. 27, 59 & Vol. III, pp. 22, 23 and 25.]

অক্‌রাণি,—বোম্বাই প্রদেশান্তর্গত পশ্চিম খান্দেশের একটি পরগণা। ইহার উত্তরে নর্ম্মদা, পূর্ব্বে বাররাণী রাজ্য ও তুরণমাল, দক্ষিণে সুলতানপুর ও কুকরমুণ্ডা তালুক এবং পশ্চিমে কাঠী নামক মেহবা রাজ্য। এই পরগণায় ১৭২টী গ্রাম আছে তন্মধ্যে ১৭টী জনশূন্য। পর্ব্বতের অধিত্যকাভূমি লইয়া এই তহশীল গঠিত। মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের চূড়া ১৬০০ হইতে ২৫০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চে উঠিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি পার্ব্বত্য স্রোতস্বতী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। অধিকাংশ গ্রামই আম্র ও মহুয়া গাছে পূর্ণ, কিন্তু ফল বেশী হয় না। এখানকার অধিবাসিগণ সাধুপ্রকৃতি, পরিশ্রমী ও উন্নতিশীল। ইহারা বারলী ও পাবরা জাতীয়। এই পাহাড়ী জায়গার উপর ইহাদের অত্যধিক মায়া; এইস্থান ছাড়িয়া ইহারা অন্য কোথাও যাইতে চায় না। অনেকেই কৃষিকর্ম্ম করিয়া জীবনধারণ করে। এখানে প্রচুর ঘাস পাওয়া যায় বলিয়া অনেকেই গরু বা মহিষ রাখিয়া থাকে।

ধাড়গাঁর দক্ষিণের স্থানগুলি মুসলমান অধিকারে খান্দেশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুসলমানদের ক্ষমতা হ্রাস হইয়া আসিলে ১৭০০ খৃষ্টাব্দে ধুশবইয়ের রাণা চাবজী ইহা অধিকার করেন। পরবর্ত্তী রাণা গুমান সিংহ অক্‌রাণি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। তৎপরে চারিজন রাজা রাজত্ব করিবার পর শেষ রাজা বংশহীন হ'ন। রাজ্যে মহা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। অবশেষে রাণা ভাউসিংহ রাজা হইয়া রোশমল দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট রাণার বংশধরকে ১৮০০০ টাকা বার্ষিক ভাতা দিয়া ২ খানি গ্রাম ব্যতীত সমস্ত অংশ অধিকার করিয়া ল'ন।

অক্‌রাণি$_2$—উক্ত পরগণার একটী সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় দুর্গ।

অক্রান্তা—বৃহতী বৃক্ষ (The egg plant, Solanum Indicum)। বিরুতি ও ব্যাকুড় নামে সাধারণে পরিচিত। হিন্দী—বরহণ্টা, ভটকটায়ী; মরাঠী ও কর্ণাটী—ডোরলী, পাণ্ডরী, বনভণ্টি; উড়িয়া—অক্রান্তি; তেলেগু—ব্রাকুরু-চেটু। বৃহতী ক্ষুদ্রাকার, উচ্চে দুই তিন হাত হয়। দেখিতে বেগুণ গাছের মত। শাখায় ও পত্রে কাঁটা আছে। ফল বার্ত্তাকুর মত, কিন্তু ক্ষুদ্র। পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ হয়। ইহা জ্বরঘ্ন ও পিত্তনাশক। বৈদ্যেরা পাঁচনের সঙ্গে ব্যবহার করেন। সামান্য ঘুস্‌ঘুসে জ্বরে বিশেষতঃ পেটে বড় বড় কৃমি থাকিলে সিউলিপাতার রস এক ঝিনুক (ইংরেজি ৩ ড্রাম), বৃহতীপত্রের রস অর্দ্ধঝিনুক এবং বিড়ঙ্গচূর্ণ ১০ রতি সেবন করিলে বিলক্ষণ ফল দর্শে। দুষ্টরক্তে অনেকে বৃহতী ফল পাক করিয়া অন্নের সঙ্গে ভোজন করেন; কিন্তু স্পষ্ট কোন উপকার হইতে দেখা যায় না।

অক্‌রাবেতিন্—আরবদেশের অধিকারভুক্ত একটী নগর। মরুসাগরের (Dead Sea) দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। প্রাচীন কালে উহা অক্‌রাব্বিম্ (Acrabbim) নামে খ্যাত ছিল।

অক্রিয়—চন্দ্রবংশীয় গম্ভীরের পুত্র। (ভাগবত ৯.১৭.১০)

অক্রিয়াবাদী—দীঘ-নিকায় (২য় অঃ), মজ্‌ঝিমনিকায় ও সুত্ত-নিপাত হইতে জানিতে পারা যায়, গৌতমবুদ্ধের সময় ছয় শ্রেণীর অজ্ঞেয়বাদী বা বস্তুতন্ত্রবাদী বিদ্যমান ছিল। ইঁহারা না ছিলেন হিন্দু, না ছিলেন বৌদ্ধ। এই ছয় শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণীর সহিত জৈনদিগের সম্বন্ধ সূচিত হইয়া থাকে। অপর পাঁচটী শ্রেণীর উপদেষ্টাদিগের মধ্যে পাঁচজনের নাম

বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের একজনের নাম বেলট্‌ঠ্‌পুত্র সঞ্জয়। দীঘ-নিকায় ১ম খণ্ডে (২৩-২৮) সঞ্জয়-মতাবলম্বীদের অনুরূপ সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে।

অপর চারিটী শ্রেণীর মতবাদীকে অদৃষ্টবাদী ও বস্তুতন্ত্রবাদী বলা হয়। ইঁহাদের মতে 'খাও দাও স্ফূর্ত্তি কর—ভাবনা চিন্তার কোন কারণ নাই, কেন না কালই আমরা মরিতে পারি।' এই মত ভারতবর্ষে কখনও চলে নাই। ব্যাবহারিক জগতে ভারতবর্ষের লোকেরা কখনও এ সকল মত চালাইতে চেষ্টা করে নাই। কেবল 'বার্হস্পত্যদর্শনে' এইরূপ মতের উল্লেখ আছে। পণ্ডিতেরা বলেন, বৃহস্পতি নামে কোন ব্যক্তির এরূপ মত ছিল না। ইহা কোন উর্ব্বর-মস্তিষ্ক পণ্ডিতের কল্পনাপ্রসূত হইয়া থাকিবে। এই শেষোক্ত চারি শ্রেণীর মতবাদীরাই অক্রিয়াবাদী নামে পরিচিত।

ইঁহাদের মতে ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই; অন্যান্য কার্য্যের যেমন কারণ আছে, ইচ্ছারও তেমনই কারণ আছে। মানবের দায়িত্বজ্ঞান বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব যে আছে তাহা ইঁহারা স্বীকার করেন না। ভাল বা মন্দ কার্য্য করিলে মানব উৎকর্ষ বা অপকর্ষ লাভ করে না। জন্মান্তরে বা দেহান্তর আশ্রয়ে ইঁহারা বিশ্বাসী, ইঁহারা সন্ন্যাসী। ইঁহাদের মতে মানব প্রকৃতির নিয়মবশে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। কর্ম্মফলে ইঁহাদের আস্থা নাই। সুকৃতির ফলে মানব যে উচ্চবর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, একথা ইঁহারা স্বীকার করেন না। সন্ন্যাসধর্ম্ম আত্মার গতিবৃদ্ধির সহায়ক। ইহা মুক্তির পথে উন্নীত করিবার অনিবার্য্য উপাদান। এইরূপ মতবাদীদের প্রকৃত মত কি তাহা জানিবার উপায় নাই। বৌদ্ধগণের অঙ্কিত বিকৃত চিত্র হইতে আমরা কতক ধারণা করিতে পারি মাত্র।

ইঁহাদের মধ্যে পুরাণ কাশ্যপের মতে ধর্ম্মকর্ম্ম করিলে কোনরূপ উৎকর্ষ লাভ অথবা মানবকে হত্যা করিলে কোনরূপ অপরাধ বা ক্ষতি হয় না।

এই মতাবলম্বী সন্ন্যাসী অজিত কেশকম্বলী বলেন, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে চারিটী মূল পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নাই। দেহের ধ্বংসের সহিত মূর্খ ও জ্ঞানীর কিছুমাত্র অস্তিত্ব থাকে না। ইনি লোমবহুল ছিলেন বলিয়া লোকে কেশকম্বলী বলিত।

পকুধ কচ্চায়নের মত স্বতন্ত্র। তিনি বলেন, যখন একখানি তীক্ষ্ণ তরবারি মস্তককে দ্বিখণ্ডিত করে, তখন আত্মা ও যন্ত্রণার অনুভূতি ঠিক সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে—যেরূপ তরবারি ও মস্তিষ্কের মূল উপাদানগুলি কার্য্য করে।

এই মতাবলম্বীদের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন মঙ্খলি গোসাল। ইনি কার্য্য-কারণবাদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ইঁহার মতে মানবের স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি নাই। মূর্খ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি ৮৪ লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিবার পর সমস্ত যন্ত্রণার অনুভূতি হইতে পরিত্রাণ পায়। এই মতাবলম্বীদিগকে 'আজীবিক' বলা হয়। অশোকের সময় হইতে খৃষ্টীয় ১৩শ শতক পর্য্যন্ত দক্ষিণ-ভারতের লেখমালায় আজীবিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অশোকের সময় ইহাদের স্বাধীন সত্তা ছিল। অনেকের মতে দিগম্বর সম্প্রদায়ের জৈনদিগকেই আজীবিক বলা হইত। [আজীবিক দ্রঃ]

এই মত-প্রতিষ্ঠাতার সম্বন্ধে নানা বিরুদ্ধ মত প্রচলিত আছে। কারণ ইনি জৈন ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের লোকের নিকট কিছুমাত্র আদৃত ছিলেন না, ফলে উভয় সম্প্রদায়ের লেখকেরাই ইঁহার নামে কুৎসা রটনা করিতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই।

জৈন দিগম্বর-সম্প্রদায়ের সহিত ইঁহাদের মতের অনেকটা মিল আছে। কিন্তু উক্ত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট। ঐ মতভেদগুলি সামাজিক মঙ্গলের পরিপন্থী। মঙ্খলি গোসাল ভ্রাতৃমণ্ডলী বা সঙ্ঘ স্থাপনের বিরোধী ছিলেন, নির্জ্জনবাস ও সম্পূর্ণ নগ্নভাবে থাকিবার পক্ষপাতী ছিলেন না, দূষিত পদার্থ ভক্ষণ করিয়া আত্ম-নিগ্রহ করিতেও চাহিতেন না।

[Article 'Ajivikas' by Hœrnle in E. R. E.; Hœrnle—Uvāsaga dasao, app. pp. 1-29; Rockhill—Life of Buddha, pp. 249ff; Sir Charles Elliot's Hinduism and Buddhism, Vol. I, p. 99.]

অক্রীড়—কুরুথামের পুত্র। অক্রীড়ের চারি সন্তান পাণ্ড্য, কেরল, কোল ও চোল দক্ষিণ ভারতবর্ষে পাণ্ড্য, কোল, চোল ও কেরল প্রদেশের রাজা হইয়াছিলেন। (হরিবংশ)

অক্রুৎ—(নামান্তর—হিজলি বাদাম; লাটিন নাম **Aleurites Moluccana**) মলয়দ্বীপ, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে উৎপন্ন একজাতীয় বৃক্ষ। ইহা ৪০ হইতে ৬০ ফুট্‌ উচ্চ হয়, বেড় প্রায় ৫।৬ ফুট্‌ পর্য্যন্ত। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়। পত্রগুলি চিরসবুজ। ফলের শাঁস খাদ্যদ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা হইতে একপ্রকার তৈলও নিষ্কাসিত হইয়া থাকে।

অক্রূর,—শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য। যদুবংশীয় ধর্ম্মাত্মা রাজা শ্বফল্কের ঔরসে ও কাশীরাজদুহিতা গান্দিনীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। অক্রূর যমুনাহ্রদে নিমগ্ন হইয়া নাগলোক দর্শন করেন এবং তথায় বাসুদেবকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হ'ন।

এক সময়ে রাজা কংস তাঁহার শত্রু কৃষ্ণ ও বলরামকে

বিনাশ করিবার জন্য ছলে ধনুর্যজ্ঞের আয়োজন করেন এবং তাঁহাদিগকে মথুরায় আনিবার জন্য স্বীয় ভগিনীর দেবর অক্রূরকে দূতরূপে নন্দের আলয়ে প্রেরণ করেন। অক্রূর নন্দালয়ে উপনীত হইয়া নন্দের অনুমতিক্রমে কৃষ্ণবলরামকে সঙ্গে লইয়া মথুরায় প্রত্যাবৃত্ত হ'ন।

কংসের সভায় যাইবার সময় তিনি দুই ভাইকে বিশেষতঃ কৃষ্ণকে বলেন, দেখ, তোমার পিতা কংসের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া অবিরত রোদন করিয়া অন্ধ হইয়াছেন, আর তোমরাও কংসকে বধ করিবার জন্যই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছ, অতএব কাল-বিলম্ব না করিয়া কংসকে নিধন করিয়া তাহার উপযুক্ত প্রতিফল দাও। পরে কংস কৃষ্ণহস্তে নিহত হ'ন। [কংস দ্র°]

অক্রূর অত্যন্ত কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। কংসবধের পর শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের ব্যবহার অবগত হইবার জন্য তাঁহাকে হস্তিনায় প্রেরণ করেন। তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অক্রূর 'ধৃতরাষ্ট্রের প্রবল বিদ্বেষভাব' পোষণের কথা শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করেন।

কৃষ্ণ-পত্নী সত্যভামার পিতা রাজা সত্রাজিতের* স্যমন্তক নামে এক মণি ছিল। এক সময়ে অক্রূর এই সত্যভামার পাণিপ্রার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণের সহিত তাঁহার বিবাহ হওয়ায় তিনি বিফলমনোরথ হ'ন। তাহাতে অক্রূরের মনে কৃষ্ণ-বিদ্বেষ জাগিয়া উঠে। তিনি ক্রোধবশে শতধন্বাকে সত্রাজিতের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করাতে শতধন্বা নিশাযোগে গোপনে রাজাকে নিহত করেন। শতধন্বা রাজা সত্রাজিতের ঐ স্যমন্তক মণি অপহরণ করিয়া অক্রূরকে অর্পণ করিয়াছিলেন। সত্যভামা তাঁহার পিতৃহত্যার বিবরণ শ্রীকৃষ্ণকে জানাইলে তিনি ঐ মণির উদ্ধারকল্পে শতধন্বার সহিত যুদ্ধ করেন এবং মিথিলার উপবনে গোপনে তাঁহাকে বধ করেন। [শতধন্বা ও সত্রাজিৎ দ্র°] শতধন্বার মৃত্যু-সংবাদে ভীত হইয়া অক্রূর মণিটী লইয়া কাশীধামে পলায়ন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তিনি নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। যাগযজ্ঞে হইবে ব্রতী থাকিলে কেহ আর তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত না জানিয়া তিনি দীর্ঘকালের জন্য যাগযজ্ঞে লিপ্ত রহিলেন।

অক্রূর যতদিন দ্বারকাতে ছিলেন, ততদিন স্যমন্তক মণির প্রভাবে তথায় কোনরূপ উপদ্রব ঘটে নাই। তাঁহার দ্বারকা-ত্যাগের সহিত তথায় দুর্ভিক্ষ, মহামারী, সর্পভয় প্রভৃতি নানারূপ উপসর্গ ঘটিতে থাকে। এই অনর্থপাতের কারণ নির্দ্দেশার্থ দ্বারকায় এক মহতী সভা আহূত হয়। সেই সভায় স্থির হয় যে, পুণ্যাত্মা অক্রূরের মথুরা ত্যাগের পর হইতে এই সমস্ত আধি-ব্যাধির সূচনা হইয়াছে; সুতরাং অবিলম্বে তাহাকে পুনরায় এখানে আনয়ন করা কর্ত্তব্য। ফলেও তাহাই হইল। তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের সমস্ত উৎপাত প্রশমিত হইল, সমস্ত অমঙ্গল বিদূরিত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, স্যমন্তকমণি নিশ্চয়ই অক্রূরের নিকট আছে। এদিকে শতধন্বার হত্যাসংবাদে সমগ্র যাদবমণ্ডলী, এমন কি বলভদ্রও হত্যাব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ লিপ্ত আছেন বলিয়া সন্দেহ করিলেন। এই সংশয় ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে কলঙ্ক আরোপিত হইল বটে, কিন্তু তিনি তাহাতে বিচলিত হইলেন না। বরং তিনি কৌশলে অক্রূরের নিকট হইতে ঐ মণি হস্তগত করিতে চেষ্টিত হইলেন।

স্যমন্তকমণির প্রভাবে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া অক্রূর দানধ্যানাদি দ্বারা "দানপতি" হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরমভক্ত খুল্লতাত অক্রূরকে একদিন আহারে নিমন্ত্রণ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় যদুবংশও নিমন্ত্রিত হইল। উপস্থিত যাদবগণের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে বলিলেন, 'আজ আমার গৃহ পবিত্র। দানপতির নিকট আজ আমি একটী যাচ্ঞা করিব। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে শতধন্বা স্যমন্তকমণি হরণ করিয়া আপনার হস্তে অর্পণ করিয়া যা'ন, এখন ঐ মণি আপনার নিকট আছে। উহা একবার আমাদিগকে দেখান।'

শ্রীকৃষ্ণের এবংবিধ বাক্যে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অক্রূর স্বীয় বস্ত্রমধ্যে সুবর্ণ-কৌটায় লুক্কায়িত স্যমন্তকমণি সর্ব্বসমক্ষে বাহির করিলেন। মণির প্রভায় দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। 'শতধন্বাকে বধ করিয়া কৃষ্ণই যে মণি আত্মসাৎ করিয়াছেন' এই ভ্রান্ত ধারণা তখন যাদবগণের মন হইতে দূর হইল। মণি দেখিয়া বলভদ্র উহা চাহিয়া বসিলেন, সত্যভামাও তাঁহার পিতৃধন বলিয়া দাবী করিলেন। তখন বিবাদ ভঞ্জন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, 'এই মণিতে সত্যভামার দাবী সকলের অপেক্ষা অধিক, ইহা অস্বীকার করা যায় না; কেননা ইহা তাঁহার পিতৃধন। আবার আমি শতধন্বাকে হত্যা করিয়াছি, অতএব বলভদ্র ও আমার ইহাতে তুল্য অধিকার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা কেহই ইহার অধিকারী হইতে পারি না। কারণ জিতেন্দ্রিয়, ধার্ম্মিক ও সুখসম্ভোগবিহীন না হইলে

* ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (৯৬.৫৪) ইঁহার নাম ভঙ্গকার।

যিনি ইহাকে ধারণ করিবেন, ইহা তাঁহার মঙ্গলের কারণ না হইয়া ধ্বংসেরই কারণ হইবে। অতএব আমাদের মধ্যে কাহারও নিকট ইহা থাকা উচিত নয়, কেননা আমরা ঐ সমস্ত গুণগ্রামে ভূষিত নই। বাস্তবিক খুল্লতাত অক্রূরই ইহা রক্ষা করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।' এই বলিয়া সকলের পরামর্শ লইয়া ঐ সূর্য্যতুল্য প্রভাবশালী মণি তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করিলেন। তিনিও সানন্দে উহা গলদেশে ধারণ করিলেন। [স্যমন্তক দ্র°]

অক্রূরের স্ত্রী উগ্রসেনীর গর্ভে প্রসেন ও উপদেব নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

মহাভারত, হরিবংশ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে অক্রূরের এইরূপ পরিচয় আছে।

গর্গসংহিতা হইতে জানিতে পারা যায়, রাজা প্রদ্যুম্ন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলে অক্রূর তাঁহার সহগামী হইয়াছিলেন। তিনি শিশুপালের সেনাপতি দ্যুমানের সহিত যুদ্ধ করেন।

পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড মতে অনমিত্রের অন্যতম পুত্র চিত্র বা জয়ন্ত হইতে জয়ন্তীর গর্ভে অক্রূর জন্মগ্রহণ করেন।

অক্রূর২—লিঙ্গপুরাণ-মতে গর্গমুনির এক পুত্রের নাম ছিল অক্রূর। রাজা জনমেজয় তাঁহাকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হ'ন। পরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া তিনি সেই পাপ হইতে মুক্ত হ'ন।

অক্রূর৩—শ্যামানন্দের শিষ্য। গোপীবল্লভপুরে ইঁহার শ্রীপাট। 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থের ২০শ বিলাসে ইঁহার নামোল্লেখ আছে—

"উদ্ধব অক্রূর, মধুসূদন, গোবিন্দ।"

অক্রূরযজ্ঞ—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শতধন্বা নিহত হইলে তদীয় পিতৃব্য অক্রূর তাঁহার ভয়ে পলাইয়া গিয়া ষষ্ঠিবর্ষকালব্যাপী এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। [অক্রূর দ্র°] বহু অন্ন ও বহু দক্ষিণান্বিত সর্ব্ব কামপ্রদ সেই যজ্ঞ অক্রূরযজ্ঞ নামে বিখ্যাত হইল (ব্রহ্মাণ্ডপু°, ৯৬.৮২)।

অক্রূর পরমানন্দ—মুর্শিদাবাদের সূত্রধর জাতির এক শাখা।

অক্রূরেশ্বর—নর্ম্মদাতীরস্থ একটী প্রাচীন স্থান। ৩৮৫ কলচুরি বা চেদী সংবতের কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতিথিতে (সম্ভবতঃ ৬৩৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর) উৎকীর্ণ তাম্রশাসনে দেখা যায়, গুর্জ্জররাজ ২য় দদ্দ (৬২৯-৬৪১ খৃঃ) অক্রূরেশ্বর বিষয়ের অন্তর্গত শ্রীশপদ্রক গ্রাম ব্রাহ্মণগণকে দান করিতেছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক বূলার সাহেব ভরোচ জেলার অংক্লেশ্বর নামক স্থানই প্রাচীন অক্রূরেশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু কানিংহাম সাহেব লিখিয়াছেন, ৪৬৩ খৃষ্টাব্দে গুর্জ্জর-নৃপতি শ্রীদত্তকুশলী জম্বুসরের নিকটবর্ত্তী অক্রূরেশ্বর বিষয়ে বহু ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে নর্ম্মদার দক্ষিণ তীরবর্ত্তী ভরোচের অপরপারস্থিত অধুনাতন 'অক্লেসর' গ্রামই সেই প্রাচীন অক্রূরেশ্বর।

[Bom. Gaz. Vol. I, pt ii, p. 314 ; Cunningham's Ancient Geography of India, p. 322]

অক্রোধ—গৃহস্থাশ্রমীর দশটী ধর্ম্মের অন্তর্গত ধর্ম্ম। দশটী ধর্ম্ম এই—"ধৃতিক্ষমাদমোঽস্তেয়ঃ শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্।"—জটাধর।

অক্রোধন—বিষ্ণুপুরাণ-মতে কুরুবংশীয়-অযুতায়ুসের পুত্র। মহাভারত (আদি, ৯৫ অঃ) মতে যযাতি-বংশীয় অযুতায়ীর (মতান্তরে অযুতনায়ী) স্ত্রী পৃথুশ্রবার কন্যা কামার গর্ভে অক্রোধনের জন্ম হয়। কলিঙ্গ-রাজকন্যা করম্ভা হইতে অক্রোধনের দেবাতিথি নামে এক পুত্র জন্মে। দেবাতিথির পুত্র অরিহ।

অক্রোধনেশ্বর—কাশীর উত্তরাংশে অবস্থিত জ্যেষ্ঠেশ্বর তীর্থের প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ। (স্কন্দপুরাণ, কাশীখ°)

অক্রোপোলিতা, জর্জ্জ (Akropolita)—১২১৭ হইতে ১২৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৈজন্তাইন রাজ্যের ইতিবৃত্তলেখক এবং তদ্দেশীয় একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক। কনস্তান্তিনোপল (ইস্তাম্বুল) নগরে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাঁহার পিতা তাঁহাকে নিকিয়ার সম্রাট্ জন ডুকাস্ বাটাজেসের (John Ducas Vatatzes) হস্তে সমর্পণ করেন। সম্রাট্ এবং তাঁহার বংশধর ২য় থিওদোরাস্ ও ৮ম মাইকেল পেলিওলোগাস্ তাঁহাকে নানাকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া রাজকার্য্য পরিচালনের উপযোগী করিয়া তুলেন। ১২৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি চান্সেলার পদে উন্নীত হ'ন। ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে এপিরাসের স্বেচ্ছাচারী রাজা মাইকেল এঞ্জেলাসের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী হ'ন। শত্রুকারাগারে দুই বর্ষ অবস্থানের পর পেলিওলোগাসের চেষ্টায় তিনি মুক্তিলাভ করেন।

পূর্ব্বে গ্রীক্ ও লাটিন চার্চের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম বিষয়ে অনেক মতবিরোধ ছিল। তিনি স্বীয় অসীম অধ্যবসায় ও প্রখর বুদ্ধিবলে উভয় শাখার সম্মেলন করিয়া একটী রাজনীতিক কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ১২৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্রাটের আদেশে রোম নগরে যাইয়া মহামান্য পোপ ১০ম গ্রেগরীর সহিত দেখা করেন এবং পরবৎসর লায়ন্সের ধর্ম্মসঙ্ঘে যোগদান করিয়া রোমের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

১২৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি ট্রেবিজন্দ রাজদরবারে ২য় জনের সভায় কিছুকাল রাজদূতরূপে অবস্থান করেন ; কিন্তু অচিরকাল

মধ্যে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়ায় স্বদেশে ফিরিয়া আসেন এবং অল্পদিন পরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার রচিত 'Annales' নামক ইতিবৃত্তে ১২০৪ খৃষ্টাব্দে লাটিনগণ কর্ত্তৃক কনস্তান্তিনোপল আক্রমণ হইতে ১২৬১ খৃষ্টাব্দে মাইকেল পেলিওলোগাস্ কর্ত্তৃক উহার উদ্ধারসাধন পর্য্যন্ত ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত আছে। এপিরাসের কারাগৃহে বন্দী থাকার সময়ে তিনি 'Processio Spiritus Sancti' নামে যে গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, তাহা ধার্ম্মিক সুধীসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছিল।

অক্রোপোলিস্ (Acropolis)—গ্রীসরাজ্যের প্রধান নগরী আথেন্স প্রাচীন ইতিহাসে অক্রোপোলিস্ নামে প্রখ্যাত ছিল। অক্রোপোলিস্ শব্দে গ্রীক্‌ভাষায় প্রধানতঃ প্রাকার-পরিবেষ্টিত নগরী বুঝাইত এবং একসময়ে আথেন্স, আর্গস, থিবস্, করিন্থ, রোম, জেরুজালেম প্রভৃতি এশিয়া-মাইনরের কয়েকটী দুর্গ পরিশোভিত প্রাচীর-পরিবেষ্টিত নগরী অক্রোপোলিস্ শব্দে উল্লিখিত হইত। [আথেন্স দ্র°]

অক্লিকা—[বৈদ্যক] নীলবৃক্ষ, Indigofera tinctoria. [নীল-বৃক্ষ দ্র°]

অক্লিন্নবর্ত্ম—[বৈদ্যক] চক্ষুরোগবিশেষ। এই রোগে পুনঃ পুনঃ চক্ষু ধৌত করিলেও পুনরায় জুড়িয়া যায়।

অক্লীকা—[বৈদ্যক] নীলগাছ। [অক্লিকা দ্র°]

অক্‌লুজ—বোম্বাই প্রদেশান্তর্গত শোলাপুর জেলার মালশিরা নামক স্থান হইতে ৬ মাইল উত্তরপূর্ব্বে নীরা নদীর তীরে অবস্থিত একটী বাণিজ্যকেন্দ্র। লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। পূর্ব্বে এই স্থান কাপড়ের ব্যবসার জন্য সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। একটী প্রাচীন দুর্গ এখনও বর্ত্তমান। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব প্লেগের ভয়ে বিজাপুর হইতে এখানে চলিয়া আসেন। শম্ভাজীকে ধৃত করিবার জন্য সম্রাট্ এখান হইতে মুকারাব খাঁর অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। রত্নগিরির সঙ্গমেশ্বর নামক স্থানে শম্ভাজী বন্দী হ'ন। এই সংবাদ অক্‌লুজে সম্রাটের শিবিরে পৌঁছিলে উৎসবের ধূম পড়িয়া যায়। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন মূর এই স্থান দুর্গ-প্রাসাদাদিশোভিত এবং খুব সমৃদ্ধিশালী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে বাজীরাওকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে পুনা যাইবার কালে জেনেরল ওয়েলেশ্‌লী ১৩ই হইতে ১৫ই এপ্রিল এখানে অবস্থান করেন।

অক্লেশ—একজন ঋষি। ইঁহার অপর নাম অসিত। ইনি সর্ব্বধার পর্ব্বতে ভ্রাতুষ্পুত্র নলদের সহিত বাস করিতেন। শাক্যসিংহের জন্মিবার পর ইঁহারা উভয়ে তাঁহাকে দেখিতে যা'ন। ইনি শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া বলেন, 'এই বালক ২৯ বৎসর বয়সে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিবে এবং ৬ বৎসরকাল কঠোর তপশ্চর্য্যার পর অমৃতের সন্ধান পাইবে।' ইহার কিছুকাল পরে স্বীয় মৃত্যুকাল উপস্থিত জানিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র নলদকে অনুরোধ করেন, শাক্য যে সময় সত্যের সন্ধান পাইবেন, তিনি কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ যেন তাঁহার মতাবলম্বী হ'ন। এই নলদ পরে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়া 'মহাকাত্যায়ন' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

[Rockhill—The life of the Buddha, p. 18.]

অক্‌ল্যাণ্ড, —নিউজিল্যাণ্ডের সর্ব্বপ্রধান সহর ও সুপ্রসিদ্ধ বন্দর। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বরের সনন্দ অনুসারে নিউজিল্যাণ্ড বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটী স্বতন্ত্র উপনিবেশরূপে গণ্য হয়। এই ঘটনার দুই বৎসর পূর্ব্বেই তথাকার শাসনকর্ত্তা হবসন্ সাহেব অক্‌ল্যাণ্ড নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই সঙ্গে তথায় নিউজিল্যাণ্ড রাষ্ট্রের রাজধানী স্থাপিত হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে রাজধানী ছিল। পরে ওয়েলিংটন নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। রাজধানীর গৌরব হইতে বঞ্চিত হইলেও অক্‌ল্যাণ্ড তাহার বাণিজ্য-প্রাধান্য হারায় নাই, বরং দিন দিন উন্নত হইতেছে। ১৯৩১ সালের গণনা অনুসারে অক্‌ল্যাণ্ড সহরে ১০৫৬০০ লোক ও শহরতলীতে ২১৭০০০ লোক বাস করে।

অক্‌ল্যাণ্ডে একটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তথায় বাণিজ্য, পূর্ত্তবিদ্যা, স্থাপত্য-শিল্প ও বনরক্ষা-সম্বন্ধে শিক্ষাদান করা হয়। অক্‌ল্যাণ্ড নগরের উদ্যান অতি সুন্দর। এতভিন্ন এখানে একটী বৃহৎ পশুশালা আছে, তথায় পশুবিদ্যাসম্বন্ধে গবেষণা করিবার অনেক সুবিধা দেওয়া হয়। এখানকার চিত্রশালাটী দেখিবার জিনিষ। স্থানীয় গ্রন্থাগারে অনেক প্রাচীন পুথি সংগৃহীত আছে। মাখন ও বরফে রক্ষিত মাংস অক্‌ল্যাণ্ড দ্বীপ হইতে বহুল পরিমাণে রপ্তানী হয়।

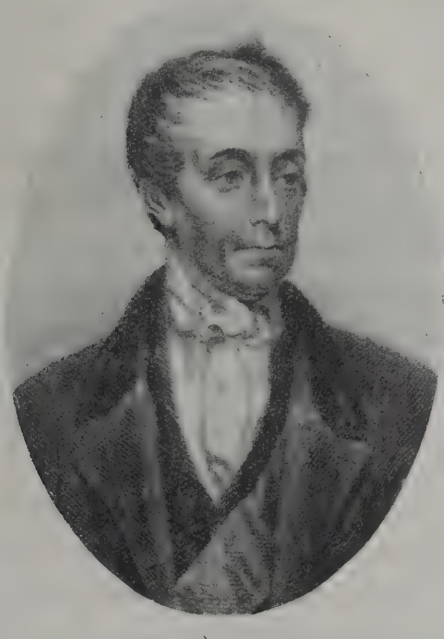
অক্‌ল্যাণ্ড$_2$—ইংলণ্ডের ডার্হাম উপবিভাগের নগর। এখানে কয়েকটী বাজার আছে।

অক্‌ল্যাণ্ড উপসাগর—ব্রহ্মদেশের মেরগুই জেলার সমুদ্রতীরস্থ উপসাগর। অক্ষা° ১২°১০' উঃ ; দ্রাঘি° ৯৮°৩০' পূঃ। মেরগুই দ্বীপপুঞ্জ এই উপসাগরে অবস্থিত।

অক্‌ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ—দক্ষিণ প্রশান্তমহাসাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জ। আয়তন ৩৫০ বর্গমাইল। বৃহত্তম দ্বীপটীর আয়তন

২৭ × ১৫ মাইল। ইহাতে দুইটী বন্দর আছে। নিউজিল্যাণ্ডের অধিকারভুক্ত হইলেও, এস্থানে কোন লোক বসবাস করে না। সহসা সমুদ্রে কোন জাহাজ মগ্ন হইলে নাবিকগণ যাহাতে এখানে আসিয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারে, তজ্জন্য নিউজিল্যাণ্ডের রাজসরকার বৃহত্তম দ্বীপটীতে কিছু আহারীয় দ্রব্য ও পরিধেয় বস্ত্র রাখিয়া দেন।

অক্‌ল্যাণ্ড, জর্জ্জ এডেন, আর্ল—(Earl of Auckland), (১৭৮৪-১৮৪৯ খৃঃ)। প্রথম ব্যারণ অক্‌ল্যাণ্ডের দ্বিতীয় পুত্র। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টার হ'ন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে তিনি দ্বিতীয় ব্যারণ অক্‌ল্যাণ্ড হইয়া হাউস-অফ্-লর্ডস্-এ আসন গ্রহণ করেন। ১৮৩০ খৃঃ অব্দে বোর্ড-অফ্-ট্রেডের (Board of Trade) প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হ'ন ও টাঁকশালের কর্ত্তৃত্ব পান। ১৮৩৪ সালে কয়েক মাসের জন্য তিনি এড্‌মিরালটীর প্রথম লর্ড পদ পাইয়াছিলেন। ১৮৩৬ সালের ২০এ মার্চ্চ তিনি ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনেরল হইয়া ভারতে



অক্‌ল্যাণ্ড, জর্জ্জ এডেন, আর্ল

পদার্পণ করেন। ভারতে আসিয়া প্রথমেই তিনি শিক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারকল্পে তাঁহার শক্তি নিয়োজিত করেন। ১৮৩৮ সালে আফগানিস্থানে গোলযোগের সূত্রপাত হয়। ইহাতে যে ভারতবর্ষেই কেবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা নহে, বিলাতেও তাহার ক্ষীণ তরঙ্গ দেখা দিয়াছিল। আফগানিস্থানের সহিত যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ১৮৩৮ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। অনিবার্য্য কারণে যুদ্ধ বাধিয়া উঠে এবং আফগানরাজ দোস্ত্ মুহম্মদ পদচ্যুত হ'ন। ইহার অল্পকাল পরেই আফগানদের কাছে ইংরেজেরা পরাজিত হইল। এই পরাজয়ে ক্ষুণ্ণ হইয়া গবর্ণমেণ্ট ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে ভারতবর্ষ হইতে অপসারিত করিয়া তাঁহার স্থানে লর্ড এলেন্‌বরাকে গবর্ণর-জেনেরল নিযুক্ত করিলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে বিলাতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি কিছুকাল রাজকীয় বিভাগে কার্য্য করেন, পরে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে স্থায়িভাবে "প্রথম লর্ড অব্ এডমিরালটী" পদ প্রাপ্ত হ'ন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তাঁহার মৃত্যু হয়।

অক্কথিতক্ষীর—[বৈদ্যক] কাঁচা দুধ (বৈদ্যক নিঘণ্টু)।

অক্কন্‌দেব—ফার্‌দৌসীরচিত 'শাহ্‌নামা' কাব্যে বর্ণিত এক দানব। ইহার শরীর পীতবর্ণ ও চিতাবাঘের ন্যায় রেখাযুক্ত, আকৃতি হরিণের ন্যায়। বীরবর রুস্তম কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া এই দানব বায়ুরূপ পরিগ্রহ করিয়া অদৃশ্য হইত।

'অক্কন্' শব্দ পহ্লবীভাষায় 'কুয়ান্' বা 'কন্' বলিয়া লিখিত হইয়াছে; এবং ইহাই যে উক্ত দানবের প্রকৃত নাম, তাহা ফার্‌দৌসী নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন।

চীনদেশের বায়ুদেবতা 'ফে লীয়েন্' (Fei Lien) ও শাহ্‌নামার 'অক্কন্‌দেব' অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। কারণ, ফে লীয়েন্‌ও মৃগরূপী চিত্রব্যাঘ্রের ন্যায় পীতবর্ণ। অধিকন্তু, ফে লীয়েনের সর্পের ন্যায় লাঙ্গুল ছিল, অক্কন্‌দেবকেও ফার্‌দৌসী কর্ত্তৃক সর্পের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, চীনভাষায় 'কুয়ান্' নামযুক্ত বহু দেবতা আছে, যথা:—কুয়ান্‌তি বা কুয়ান্ য়ু (যুদ্ধের দেবতা), কুয়ান্ য়িন্ (দয়াগুণের অধিষ্ঠাত্রী) ইত্যাদি।

আমাদের বায়ুদেবতারও একটী পর্য্যায় মৃগবাহন। [বায়ু দ্র]

[J. A. S. B., Vol. XXIV, 1928, pp. 181]

অক্‌বেল—মধ্য এশিয়ার তিয়ান্-শান্ পর্ব্বতমালার একটী গিরিসঙ্কট। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২ হাজার ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত।

অক্‌বৈতাল—ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী।

অক্‌শালী—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সহ্যাদ্রিখণ্ডবাসী স্বর্ণকার জাতি। ইহারা অক্‌শালী সোণার বলিয়া পরিচিত। মহিসুর রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমস্থ শিকারপুর হইতে ইহারা

সহ্যাদ্রির শির্‌সী, হলিয়াল ও মুণ্ডগোড় নামক স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছে। ইহারা মহিসুরের অকশালীদিগকে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া জানে।

ইহারা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—অক্‌শালী সোণার ও কাঞ্চাগর (কংশকার)। উভয়শ্রেণী একত্রে ভোজন করে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদান করে না। স্বগোত্রে বা নিকট কুটুম্বের মধ্যেও বিবাহাদি চলে না। সমুদ্রোপকূল-বাসী সোণারদিগের অপেক্ষা ইহারা আপনাদিগকে সমাজিক ব্যাপারে উন্নত বলিয়া জানে। ইহারা কণ্ণড় ও মিশ্র-মরাঠী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে।

ইহারা নিরামিষাশী, মদ্যপান করে না, অথবা কোনরূপ নিন্দিত ভোজ্য স্পর্শ করে না। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই হবিগ্ ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় বেশভূষা করে। ছেলেরা বাপের অধীনে অথবা অন্য কোন আত্মীয়ের কারখানায় কাজ করে এবং সকলেই কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকে। অবস্থা বেশ স্বচ্ছল, কেহ কেহ ভূসম্পত্তি কিনিয়া অবস্থা অনেক উন্নত করিয়াছে।

বেদনূরের কালম্মা ও ধারবারের রট্টলী রুদ্র ইহাদের প্রধান উপাস্য। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দেবদেবীর পূজাপর্ব্বে ইহারা বেশ ভক্তির সহিত যোগ দেয় ও উপাসনা করে। বারাণসী, তিরুপতি প্রভৃতি পবিত্র তীর্থে যাইয়া দেবপূজা দিয়া থাকে। ইহারা উপবীতধারী এবং ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ষোড়শ সংস্কার পালন করিয়া থাকে। জাতকের ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠীপূজা ও একাদশে নামকরণ হয়। ৭ম বর্ষে পুত্রের উপনয়ন হইয়া থাকে। ইহাদের বিবাহ, গর্ভাধান, জাত ও মরণাশৌচ হবিগ্ ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় সম্পন্ন হয়। অশৌচমাত্র দশ দিন।

অক্-শেহর (**অক্ষ-সহর**)—এসিয়ামাইনরের কোনিয়া বিষয়ের অন্তর্গত একটী নগর। সুলতানদাঘের উত্তরে উর্ব্বর অধিত্যকার প্রান্তভাগে অবস্থিত। প্রাচীন গ্রীস ও রোমকেরা ইহাকে ফিলোমেলিয়ন্ বলিত। সিসিরো এই নগরের অধিবাসীবর্গের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বৈজন্তাইন্-সম্রাট্ ও রুমের সুলতানের মধ্যে এই সীমান্তপ্রদেশে ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল। পরে উহা সেলজুক্‌দিগের অধিকারে আসে। আঙ্গোরাযুদ্ধে পরাজিত হইয়া বয়াজিদ্ যেলদেরিম এখানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং এখানেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এখানে নূর-উদ্দীন্ খোজার সমাধি বিদ্যমান। তুর্কগণ ঐ সমাধিমন্দিরে সম্মান প্রদর্শনার্থ এখানে আসিয়া থাকে। এখানে আনাতোলিয়া রেলপথের একটী ষ্টেশন আছে। কার্পেট প্রস্তুতের জন্য এইস্থান প্রসিদ্ধ।

অক্ষ, —[তু°—লা° axis ; প্রা° জর্মন asha ; আ° জর্মন Achse ; গ্রী° Axon ; লিথু° assis] পাশক, দ্যূতাঙ্গ, পাষ্টি, পাশা। ২ পাশকক্রীড়া, দ্যূত, দেবন। [অক্ষক্রীড়া দ্র°] ৩ পাশা খেলিবার ঘুটি ; প্রাচীনকালে বিভীদক বা বহেড়া ফল হইতে ইহা নির্ম্মিত হইত। [অক্ষক্রীড়া দ্র°] ৪ [বাণিজ্যে] এক কর্ষ পরিমাণ ; এক ভরি পরিমাণ ; ১৬ মাষা মতান্তরে ২৪ মাষা ; দুই তোলা (সুশ্রুত)। ৫ পরিমাণবিশেষ, ১০৪ অঙ্গুলি। ৬ তুলাদণ্ড (Beam of a balance)। ৭ [শিল্পে] রথচক্র, রথ, শকট, অভ্যন্তরস্থ ঈষ, axle। ৮ মন্দিরের নিম্নাংশ। ৯ [ব্যবহারশা°] আইন, রাজনীতি ; law, Jurisprudence। ১০ ক্রয়বিক্রয়াদিলক্ষণ ব্যবহার (Lawsuit)। [জ্যোতিষে] ১১ বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বের দূরত্ব (Latitude) ১২ গ্রহগণের পরিভ্রমণের পথ ; রাশিচক্রের অবয়ব। ১৩ সর্প। ১৪ কুস্তি। ১৫ আত্মা। ১৬ জ্ঞান। ১৭ জ্ঞাতার্থ (মেদিনী)। ১৮ জন্মান্ধ। ১৯ আধার (বৈজয়ন্তী)। ২০ রন্ধ্র, ছিদ্র (ভাগবত ১০.২.২৭)। ২১ কর্ণনেত্রের মধ্যস্থ শঙ্খের অধোভাগ (মিতাক্ষরা)। ২২ ইন্দ্রিয়। ২৩ চক্ষু। ২৪ (ইন্দ্রিয় সংখ্যানুসারে) পাঁচ (৫) এই সংখ্যা।

অক্ষ, —[বৈদ্যক] তুঁতে, তুথ। রসাঞ্জন। ধূনা। ২ বিভীতক বৃক্ষ ; বহেড়া গাছ। [বিভীতক দ্র°] ৩ রুদ্রাক্ষ-বীজ ; রুদ্রাক্ষগাছ। ৪ পদ্মবীজ। ৫ নিম্ববৃক্ষ (অজয়)। ৬ সৌবর্চ্চল ; সোচল লুন ; সোরা।

অক্ষ, —কাশ্মীরের রাজা। ইনি রাজা দ্বিতীয় নরের পুত্র ; গোপাদিত্যের পিতা। কলির ২৫৮১ বৎসর গত হইলে (৫৯৮ শকাব্দের পূর্ব্বে) রাজা হইয়া ৬০ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। ইনি 'অক্ষবাল' নামে একটী মনোহর শিবমন্দির নির্ম্মাণ করেন। (রাজতরঙ্গিণী) ২ রাবণের পুত্র। সীতার অন্বেষণে হনুমান্ লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া অশোকবনে তাঁহার সাক্ষাৎ পান এবং তাঁহার নিকট হইতে অভিজ্ঞান লইয়া ফিরিবার সময় অশোকবন নষ্ট করেন। এই সংবাদ শুনিয়া রাবণ বিরূপাক্ষ প্রভৃতি পাঁচজন সেনাপতিকে হনুমানের বিরুদ্ধে পাঠান। তাঁহারা সকলেই হনুমানের নিকট পরাজিত ও নিহত হ'ন। তখন রাবণ আপনার পুত্র অক্ষকে হনুমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আদেশ করেন। রাবণ-তনয় অক্ষ যুদ্ধে হনুমানের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন (রামা°, সুন্দর, ৪৬-৪৭ সর্গ)। ৩ এক দেবসেনানী। মহাভারত মতে দেবাসুরসংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ,

সমুদ্র, সমুদয় পর্ব্বত যে সকল সেনানায়ককে পাঠান, অক্ষ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। ৪ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। ইনি সত্যভামার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৯৬.১৩৮)। ৫ গরুড়। ৬ শিব (মহাভা° ১৩.১৭.১২২)। ৭ দ্যুতকার দেবতা (ঋক্ ১০.৩৪)।

অক্ষ৪—[স্থপতি-বিজ্ঞানে] 'অধিষ্ঠান' (The base of a column), (মানসার, ১৪.১৭, টীকা)। "অক্ষঃ পাদস্তম্ভয়োরুপরিনিবিষ্ট তুলাধারপট্টঃ" (মিতাক্ষরা)। ২ পাদপীঠের ক্ষেত্রাকার অংশ ; কণ্ঠ (রামরাজ), (মানসার, ৬০.২৯-৩০ ; ৬৮.২৮)। ৩ চক্ষু (মানসার, ৬০.২৯-৩০)। ৪ দোলা বা রথের যে অংশ গবাক্ষ আকৃতির, জানালার মত (মানসার, ৫০.১৬৫-১৬৬ ; ৪১.৫১)। [অক্ষভার দ্র°]

অক্ষক১—দৈত্যপতি বিপ্রচিত্তির অন্যতম ভ্রাতা ও সঙ্গী (ব্রহ্মাণ্ডপু°, ৬৮.৫)।

অক্ষক২—[বৈদ্যক] তিনিশবৃক্ষ, Dalbergia Oujeinensis.

অক্ষক্রীড়া—দ্যুতক্রীড়া, পাশাখেলা। বৈদিক যুগে ঘোড়দৌড় ও পাশাখেলা এই দুইটী বিশেষ ব্যসনের মধ্যে গণ্য ছিল। বৈদিক সাহিত্যে ইহার বহুল প্রয়োগ থাকিলেও ইহার ক্রীড়া-প্রণালী তৎকালে কিরূপ ছিল তাহা সহজে বোধগম্য হয় না।

"ন স স্বো দক্ষো বরুণ ধ্রুতিঃ সা সুরা মন্যুর্বিভীদকো অচিত্তিঃ।" (ঋক্ ৭.৮৬.৬)

"প্রাবেপা মা বৃহতো মাদয়ংতি প্রবাতেজা ইরিণে বর্বৃতানাঃ। সোমস্যেব মৌজবতস্য ভক্ষো বিভীদকো জাগৃবির্মহ্যমচ্ছান্।" (ঋক্ ১০.৩৪.১)

এই ঋক্ মন্ত্র দুইটী হইতে বুঝা যায়, 'বিভীদক' বা 'বহেড়া' ফল হইতে অক্ষ বা পাশা নির্ম্মিত হইত। সায়ণ বলিয়াছেন, "বিভীদকো বিভীতকবিকারোঽক্ষো"। "ন্যুপ্তাশ্চ বভ্রবো বাচমক্রত" (ঋক্ ১০.৩৪.৫) এই ঋকের টীকায় সায়ণ বলিয়াছেন, "বভ্রবো বভ্রুবর্ণা অক্ষা ন্যুপ্তাঃ কিতবৈরবক্ষিপ্তাঃ সংতো বাচমক্রত। শব্দং কুর্বংতি।" ইহা হইতে বুঝা যায়, বৈদিক যুগে পাশার রং ছিল বভ্রুবর্ণ বা পিঙ্গলবর্ণ (বহেড়ার রং তাহাই) এবং তাহা কিতব বা দ্যুতক্রীড়ক কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া শব্দ করে। সময়ে সময়ে এই বিভীদকনির্ম্মিত অক্ষের অনুকরণে সুবর্ণের অক্ষ নির্ম্মিত হইত। (তৈত্তি° স° ১.৮.৬.১২ (সায়ণ, টীকা) ; শত°ব্রা° ৫.৪.৪.৬)। "চতুরশ্চিদ্দদমানাদ্বিভীয়াদা নিধাতোঃ" (১.৪১.৯), এই ঋকের ভাষ্যে সায়ণ বলিয়াছেন "অক্ষদ্যূতং কুর্বতোরুভয়োর্মধ্যে যঃ পুমান্ চতুরশ্চতুঃসংখ্যাকানকপর্দকান্দদমানাদ্দদতো হস্তে ধারয়তঃ পুরুষাৎ আ নিধাতোঃ কপর্দকনিপাতপর্যংতং বিভীয়াৎ অস্য জয়ো ভবিষ্যতি।" এবং বাজসনেয়ী সংহিতায় (১০.২৮) মহীধরের ভাষ্য হইতে বুঝা যায় যে পরবর্ত্তী যুগে কপর্দ্দক বা কড়ি লইয়া পাশাখেলা হইত। এখনও পল্লীগ্রামে কড়ি লইয়া দশপঁচিশ খেলা হয়। ইহার ছক ঠিক পাশাখেলার ছকেরই অনুরূপ এবং আধুনিক পাশাখেলার মত চার রংয়ের ঘুটি লইয়া খেলা হইয়া থাকে। কেবল প্রভেদ এই যে, ইহাতে পাশার বদলে কড়ি দিয়া দান ফেলা হয় ও চাল চালিবার প্রথাও কিছু স্বতন্ত্র।

বৈদিকযুগে কতগুলি অক্ষ লইয়া খেলা হইত, সে সম্বন্ধে অধিক বিবরণ পাওয়া যায় না। "ত্রিপংচাশঃ ক্রীড়তি ব্রাত এষাং" (ঋক্ ১০.৩৪.৮), এই ঋক্ হইতে অনেকে মনে করেন তিপ্পান্নটী অক্ষ লইয়া ক্রীড়া হইত। কিন্তু এই ঋকের প্রকৃত অর্থ কি—তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তাহার পর আর একস্থলে আছে, "যো বঃ সেনানীর্মহতো গণস্য" (ঋক্ ১০.৩৪.১২)। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, অক্ষের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল। কিন্তু "চতুরশ্চিদ্দদমানাৎ" (ঋক্ ১.৪১.৯) হইতে ও সায়ণের ব্যাখ্যা হইতে মনে হয়, অক্ষের সংখ্যা ছিল চার। আমাদের মনে হয় "ত্রিপংচাশঃ" ও "সেনানীর্মহতো গণস্য" ইহার অর্থ অক্ষ বুঝাইতেছে না—চালিবার ঘুটি বুঝাইতেছে। তিপ্পান্নটী অক্ষ কোন লোক হাতের মুষ্টির মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে না।

পরবর্ত্তী যুগে তৈত্তিরীয় সংহিতা (৪.৩.৩.১-২), বাজসনেয়ী সংহিতা (৩০.১৮), শতপথব্রাহ্মণ (৫.৪.৪.৬) প্রভৃতিতে কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর, আস্কন্দ, অভিভূ, কলি প্রভৃতি শব্দ অক্ষক্রীড়া সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ কিন্তু সহজে বোধগম্য হয় না। তবে মনে হয়, আধুনিক পাশাখেলার দানের 'ছ-তিন নয়', 'কচে বার', 'শে পঞ্জা' প্রভৃতি যে নাম আছে, সে যুগেও সেইরূপ নাম ছিল ; ঐ শব্দগুলি সেইরূপ দান পড়ার নাম মাত্র। পাশাখেলার ছকের কোন আভাস আমরা বৈদিক সাহিত্যে পাই না। তবে ভূমিতে যে স্থানে অক্ষ নিক্ষেপ করা হইত, সেখানে একটু গর্ত্ত করিয়া দেওয়া হইত, তাহার নাম ছিল অধিদেবন (অথর্ববেদ ৫.৩১.৬ ; ৬.৭০.১ ; মৈত্রায়ণী সংহিতা ১.৬.১১ ; ৪.৪.৬), দেবন (ঋক্ ১০.৪৩.৫), ইরিণ (ঋক্ ১০.৩৪.১) ইত্যাদি। যে কৌটায় অক্ষ রাখা হইত তাহাকে বলা হইত অক্ষাবপন (শত°ব্রা° ৫.৩.১.১১) ; এবং যে ক্রীড়ার পরিদর্শক তাহার নাম ছিল অক্ষাবাপ বা অক্ষাধ্যক্ষ। দান বা নিক্ষেপকে গ্রহ (অথর্ববেদ ৪.৩৮.১) বা গ্রাভ (ঋক্ ৮.৮১.১ ; ৯.১০৬.৩) বলিত। খেলার পণের নাম ছিল 'বিজ্'। ঋগ্বেদ হইতে আমরা জানিতে পারি

যে, দ্যূতাসক্ত ব্যক্তি (কিতব) সর্ব্বস্ব এমন কি স্ত্রী পর্য্যন্ত পণ দিয়া পথের ভিখারী হইত।

মহাভারত হইতে অক্ষক্রীড়াসম্বন্ধে আমরা অনেক কথা জানিতে পারি। দুর্য্যোধন রাজসূয়যজ্ঞসভায় যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হ'ন এবং শকুনির পরামর্শে যুধিষ্ঠিরকে অক্ষক্রীড়ায় নিমন্ত্রণ করেন। শকুনি আত্মশ্লাঘা করিয়া দ্যূতক্রীড়ায় নিজের দক্ষতা জানাইতেছেন—

"গ্লহান্ধনূংষি মে বিদ্ধি শরানক্ষাংশ্চ ভারত।
অক্ষাণাং হৃদয়ং মে জ্যাং রথং বিদ্ধি মমাস্ফুরম্॥"

পণ আমার ধনু, অক্ষ আমার শর, অক্ষ-হৃদয় আমার জ্যা ও আমার স্ফূর্ত্তিই আমার রথ। (মহাভা°, সভা°, ৫৬.৩-৪)

গ্লহ (পণ), দুরোদর (অক্ষক্রীড়া), অক্ষদেবী (অক্ষ-ক্রীড়ায় অত্যন্ত নিপুণ) প্রভৃতি শব্দ মহাভারতে আমরা পাইয়া থাকি। অক্ষক্রীড়ার জন্য বিপুল আয়োজন এবং অক্ষক্রীড়ার জন্য সভা-নির্ম্মাণের বর্ণনা অতি বিশদভাবে মহাভারতে বর্ণিত আছে।

যুধিষ্ঠির নিজে দ্যূতক্রীড়াকে অত্যন্ত অমঙ্গলকারী জানিয়াও অত্যন্ত আসক্তিহেতু কপট 'অক্ষদেবী' শকুনির সহিত দ্যূতক্রীড়ায় ধনরত্ন, রাজৈশ্বর্য্য, ভ্রাতৃগণ, এমন কি প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পাঞ্চালীকে পর্য্যন্ত হারাইয়াছিলেন। মহাভারতে আমরা কপট-দ্যূতক্রীড়ক অর্থে 'কিতব' শব্দের ব্যবহার দেখি। বৈদিক যুগে দ্যূতক্রীড়ক মাত্রকেই কিতব বলিত। কালক্রমে পেশাদার দ্যূতক্রীড়কগণ ছলনার আশ্রয় লওয়ায় কিতব অর্থে তাহাদিগকেই বুঝাইত।

আমরা দেখিতেছি, মহাভারতের সময়ে ও প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যে দ্যূতক্রীড়ার সমধিক আদর ছিল। বিরাটরাজ স্বীয় পুত্র উত্তরের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দ্যূতক্রীড়ায় আমোদ করিতে চাহিলে দ্যূতক্রীড়ায় হৃতসর্ব্বস্ব কঙ্ক তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। তাহাতে বিরাট বলিলেন "দ্যূতক্রীড়া আমার অত্যন্ত প্রিয়, সুতরাং তোমার কোন যুক্তিই শুনিব না" (মহাভা°, বিরাট°, ৬৮ অঃ)। অপর স্থলে পুণ্যশ্লোক নলরাজাও দ্যূতক্রীড়াসক্ত হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছিলেন, সে বৃত্তান্তও বর্ণিত আছে (মহাভা°, বন°, ৫৩-৭৯ অঃ)। সুতরাং দ্যূতক্রীড়া সে যুগে বিলাসের সামগ্রী ছিল। ইহার বিসময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়াও যুধিষ্ঠির ও নলের ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও তাহার মোহের প্রভাব হইতে মুক্ত হ'ন নাই। প্রাচীনকালে ভারতে হস্তিদন্ত, কাষ্ঠ, অস্থি, মৃত্তিকা ও সময়ে সময়ে সুবর্ণের অক্ষ নির্ম্মিত হইত এবং কিতবগণ অপরকে বঞ্চনা করিবার জন্য ধাতুগর্ভ অক্ষাদি নির্ম্মাণ করিত। এই অক্ষনির্ম্মাণকৌশল চতুঃষষ্টি কলার অন্তর্গত একটী কলা। মহাভারতে শকুনি ও পুষ্কর এই 'অক্ষহৃদয়' জ্ঞাত হইয়া যুধিষ্ঠির ও নলকে পরাজিত করিয়াছিল। ঋগ্বেদে আমরা 'অক্ষাবপন' শব্দ পাইয়াছি, তাহার অর্থ অক্ষাধার ; তাহাতে রাখিয়া অক্ষগুলিকে ভূতলে নিক্ষেপ করা হইত এবং দ্যূতফলকে গুটিকাদি চালনা করিয়া ক্রীড়া করা হইত।

কামসূত্রকার বাৎস্যায়ন তাঁহার গ্রন্থের প্রথম অধিকরণের তৃতীয় অধ্যায়ে "বিদ্যাসমুদ্দেশ-প্রকরণে" অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখে বলিয়াছেন "অভ্যাসপ্রয়োজ্যাশ্চ চাতুঃষষ্টিকান্ যোগান্ কন্যা রহস্যেকাকিন্যভ্যসেৎ" (কামসূত্র ১.৩.১৪)। টীকাকার যশোধর এই চাতুঃষষ্টিক বা চতুঃষষ্টি কলার বর্ণনায় দ্যূতাশ্রয়া বিংশতি কলার বর্ণনায় 'অক্ষবিধানম্' বলিয়া একটী কলার উল্লেখ করিয়াছেন। এই অক্ষবিধান অর্থে সম্ভবতঃ অক্ষনির্ম্মাণ বুঝাইতেছে। পুনরায় বাৎস্যায়ন উপায়িকী চতুঃষষ্টি কলার মধ্যে 'দ্যূতবিশেষঃ' ও 'আকর্ষ-ক্রীড়া' কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যশোধর এই শব্দদ্বয়ের টীকায় বলিয়াছেন "দ্যূতবিশেষা ইতি। নির্জীব-দ্যূতবিধানমেতদ্, যত্র যে প্রাপ্ত্যাদিভিঃ পঞ্চদশভিরঙ্গৈর্মুষ্টিক্ষুল্লকাদয়ো দ্যূতবিশেষাঃ প্রতীতার্থাঃ। আকর্ষক্রীড়েতি। পাশকক্রীড়া, দ্যূতবিশেষত্বেঽপি পুনর্বচনমত্রাদরার্থম্, সশৃঙ্গারত্বাদ্ দুর্বিজ্ঞেয়ত্বাদ্ বা অক্ষহৃদয়াপরিজ্ঞানে হি নলযুধিষ্ঠিরয়োরপি পরাজয়াৎ।" অর্থাৎ 'দ্যূতবিশেষ অর্থে নির্জীব দ্যূতক্রীড়া (সজীব দ্যূতক্রীড়া হইতেছে 'মেষকুক্কুটলাবকযুদ্ধ' ; দ্যূত অর্থে জুয়া) ; প্রাপ্তি প্রভৃতি পঞ্চদশ অঙ্গে মুষ্টি, ক্ষুল্লক প্রভৃতি ক্রীড়াকে দ্যূতক্রীড়া বলা হইয়াছে। আকর্ষ-ক্রীড়া অর্থাৎ পাশাখেলা দ্যূতবিশেষ হইলেও অত্যন্ত সমাদরের সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ক্রীড়া মনোহারী ও দুর্বিজ্ঞেয় ; অক্ষহৃদয় বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান না থাকায় নল ও যুধিষ্ঠির পরাজিত হইয়াছিলেন।' ইহা হইতে আমরা দেখিতেছি যে, প্রাচীনকালে নানাপ্রকার অক্ষক্রীড়া প্রচলিত ছিল এবং বিলাসি-সমাজে তাহার সমধিক আদর ছিল। বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে আমোদের জন্য যে দ্যূতক্রীড়া হইত তাহাকে 'সুহৃদ্দ্যূত' বলা হইত।

কামসূত্রের প্রথম অধিকরণের চতুর্থ অধ্যায়ে "নাগরক-বৃত্তপ্রকরণে" বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন যে, নাগরকের গৃহকুট্টিমে আকর্ষফলক ও দ্যূতফলক দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়া রাখা হইবে, যাহাতে আবশ্যক হইলে ভূমিতে প্রসারিত করা যায় (কামসূত্র ১.৪.১২)।

বাৎস্যায়ন হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, নাগরকগণ

উদ্যান-বিহার করিতে গিয়া মধ্যাহ্নে তথায় দ্যূতক্রীড়ায় আমোদ উপভোগ করিতেন (১.৪.৪০)। বাৎস্যায়ন রাত্রিকালীন ক্রীড়ার বর্ণনায় 'যক্ষরাত্রি ও কৌমুদীজাগর' নামে দুইটী ক্রীড়ার বর্ণনা করিয়াছেন। টীকাকার বলিয়াছেন, এই যক্ষরাত্রিতে প্রায়শঃ সমস্তরাত্রি ধরিয়া লোকে দ্যূতক্রীড়া করিত এবং কোজাগর পূর্ণিমায় দোলা-ক্রীড়া ও দ্যূতক্রীড়াদি করিয়া রাত্রি জাগরণ করিত।

পরবর্ত্তী যুগের কাব্যাদিতে আমরা দ্যূতক্রীড়ার যথেষ্ট উদাহরণ পাই এবং বাৎস্যায়নের কামসূত্র ও তৎকালীন কাব্যসমূহ হইতে বেশ বুঝিতে পারি যে, গণিকালয়সমূহ প্রাচীন ভারতে বিলাসিগণের দ্যূতক্রীড়ার বিশেষ স্থান বলিয়া বিবেচিত হইত।

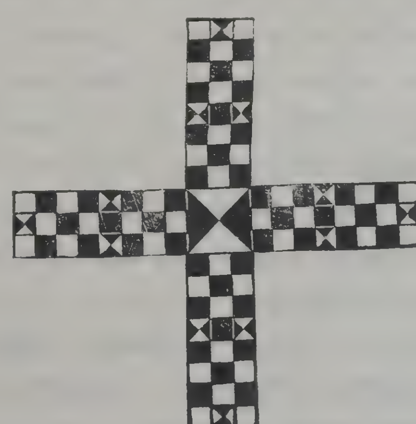
ব্রহ্মপুরাণে কথিত আছে, পুরাকালে মহাদেব দ্যূতক্রীড়ার প্রথম সৃষ্টি করেন। খেলার সৃষ্টি হইল, এখন একবার খেলিয়া দেখিতে হইবে। কার্ত্তিকমাস, শুক্ল প্রতিপদ্। পশুপতি পাশা লইয়া পার্ব্বতীর সঙ্গেই খেলিতে বসিলেন। ভোলানাথ হারিলেন, ভবানীর জয় হইল। সেই সময় হইতে অন্নপূর্ণার দিন সুখে যাইতে লাগিল, কিন্তু ভাঙ্গড় ভোলার আর দুঃখ ঘুচিল না। তদবধি এই বিধি হইয়াছে, দ্যূতপ্রতিপদের প্রাতঃকালে অক্ষক্রীড়া করিলে যাঁহার জয় হইবে, সেই ভাগ্যবান্ পুরুষের সম্বৎসরকাল সুখে কাটিবে; আর যিনি হারিবেন, একবৎসর তাঁহাকে দুঃখের ভার বহিতে হইবে।

মনুসংহিতার নবমাধ্যায়ে লিখিত আছে—রাজা আপনার রাজ্য হইতে দ্যূত ও সমাহ্বয় ক্রীড়া নিবারণ করিবেন। এই দুই ক্রীড়া নৃপতিগণের রাজ্যনাশের কারণ। কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত নির্জীব বলদ্বারা ক্রীড়ার নাম দ্যূত, এবং কুক্কুটাদি প্রাণীর দ্বারা লড়াই করাইলে তাহাকে সমাহ্বয় কহে। যাহারা নিজে এ সকল ক্রীড়া করে কিংবা অন্যের দ্বারা করায়, রাজা তাহাদের এবং ব্রাহ্মণবেশধারী শূদ্রের প্রাণবধ করিবেন। (২২১।২৪) এখনকার জুয়াখেলার মত পূর্ব্বকার লোক বাজি রাখিয়া পাশা খেলিতেন, তজ্জন্য এত কঠিন দণ্ডবিধি হইয়াছিল। ইদানীন্তন লোকে পাশা খেলিতে বসিলে তাঁহাদের আহার নিদ্রা মনে থাকে না। তাই সচরাচর লোকে বলিয়া থাকেন—'পাশা কর্ম্মনাশা।' কবিকঙ্কণের সময়েও পাশাখেলার মহাধূম ছিল।

"আজি কালি বলে নিত্য, নৃপতি সহিত প্রীত,
পায় ধনপতি সদাগর।
রাত্রিদিবা খেলে পাশা, ভক্ষণ সময়ে বাসা,
খাওয়া মাত্র, পাশরিল ঘর॥" (চণ্ডী)

মুসলমান শাসনকালে এই অক্ষক্রীড়ার অত্যন্ত সমাদর ছিল। আইন্-ই-অক্‌বরী গ্রন্থে এই ক্রীড়া 'চৌপড়' নামে উল্লিখিত আছে। তাহাতে গ্রন্থকার ইহাকে অতিপ্রাচীন হিন্দুস্থানী ক্রীড়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে অক্ষ-ক্রীড়ার যেরূপ বর্ণনা আছে, আধুনিক পাশাখেলা হইতে উহার বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। ইহাতে ৪টী করিয়া চারি প্রকার বিভিন্ন রংয়ের ১৬টী ঘুটি ব্যবহৃত হয়। চারিজন লোকে এই খেলা খেলিয়া থাকে, দুইজন এক এক পক্ষে। তিনটী অক্ষ বা পাশা লইয়া খেলা হয়। এই পাশার চারিটী পল এবং এক একটী পলে যথাক্রমে এক, দুই, পাঁচ ও ছয়টী বিন্দু অঙ্কিত থাকে। পাশার পরস্পর বিপরীত দিকের বিন্দুর যোগফল হয় ৭ অর্থাৎ যেদিকে একটী বিন্দু থাকে তাহার অপর দিকে ছয়টী বিন্দু অঙ্কিত দেখা যায়; এবং যাহার একদিকে দুইটী বিন্দু, তাহার বিপরীত দিকে ৫টী বিন্দু অঙ্কিত আছে। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বকালে এই পাশাগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকৃতি হইত। অক্ষ তিনটী চালিয়া উপরস্থ পল তিনটীতে অঙ্কিত বিন্দুগুলির যোগফলকে এক একটী 'দান পড়া' বলে।

ছয় ইঞ্চ পরিসরযুক্ত ও ২॥০ ফুট লম্বা বস্ত্রখণ্ডের ঠিক মধ্যভাগে আর একখানি ঐরূপ পরিমাণের বস্ত্র বা কার্ডবোর্ড আঁটিয়া লইলে অক্ষক্রীড়ার উপযোগী ছক প্রস্তুত হয়। মূলতঃ ইহা সমবাহুযুক্ত ক্রশের (+) আকারেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশে ব্যবহৃত ছকের একটী চিত্র এখানে দেওয়া হইল। এই ছকের চারিবাহুর প্রতি



অক্ষক্রীড়ার একটী ছক

বাহুতে তিনটী করিয়া পংক্তি কাটা আছে। প্রতি পংক্তিতে ৮টি করিয়া ঘর থাকে এবং প্রত্যেক ঘর বিভিন্ন বর্ণের বস্ত্রখণ্ড বা রং দিয়া স্বতন্ত্র চিহ্নিত করিয়া লওয়া হয়। বাহু চারিটী

যেস্থলে সংযুক্ত হইয়াছে, সেইস্থলে যে বৃহত্তর চতুষ্কোণ হয়, তাহা স্বতন্ত্র বর্ণদ্বারা অঙ্কিত থাকে। প্রত্যেক ক্রীড়ক (খেলোয়াড়) তাহার সন্নিহিত বাহুর মধ্যপংক্তির ষষ্ঠ ও সপ্তম স্থানে দুইটী ঘুটি বসাইবে এবং দক্ষিণপার্শ্বস্থ বাহুর বামপংক্তির শেষ সপ্তম ও অষ্টম স্থানে অপর দুইটী ঘুটি বসাইয়া খেলা আরম্ভ করিবে। আজকাল সাধারণতঃ 'ছয়-তিন নয়' (৬+২+১=৯), 'বার-পঞ্চা সতের' (৬+৬+৫=১৭), 'দশ-ছয় ষোল' (৫+৫+৬=১৬) এই তিনটী দানে 'হাত খুলিয়া' খেলা আরম্ভ হয়। অক্ষ ফেলিয়া 'হাত খুলিলে' দক্ষিণদিকে ঘুটি চালিতে হইবে। একস্থান হইতে অপর স্থানে ঘুটি সরাইয়া বসাইলে তাহাকে 'চাল দেওয়া' বলে। এইরূপে যখন সকল ঘুটিগুলি সমস্ত ছকটী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া নিজ বাহুর মধ্যপংক্তির ষষ্ঠ ও সপ্তম স্থানে আসিয়া পৌছে তখন তাহাকে 'পাকা ঘুটি' বলা হয়। নিজ বাহুর মধ্যপংক্তিতে ঘুটি তুলিবার সময় উহাকে কাত্ বা চিৎ করিয়া ঘরে তুলিতে হইবে। পরে সমগ্র ঘুটি ছকের মধ্যস্থিত বৃহত্তর চতুষ্কোণ মধ্যে উঠিয়া গেলে খেলার শেষ জানিতে হইবে।

শেষ ঘুটি নিজের ঘরে ঢুকিবার সময় যে কয়টী ঘর অবশিষ্ট আছে, তাহার অতিরিক্ত দান পড়িলে ঘুটি কাঁচাইয়া পুনরায় খেলা সুরু করিতে হয়। এইরূপে কোন পক্ষের সমস্ত ঘুটিগুলি অগ্রে কেন্দ্রস্থ হইলে সেই পক্ষের জয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে। একপক্ষ প্রতিপক্ষের ঘুটির স্থান অধিকার করিলে সেই ঘুটিকে খাইতে বা স্থানচ্যুত করিতে পারিবে। ইহাকে 'কাটা' বা 'খাওয়া' বলে। কিন্তু ঘুটি জোড় বাঁধিলে অর্থাৎ দুইটী এক রংয়ের ঘুটি একত্র হইলে তাহাকে খাইতে পারিবে না। যুগ্মদান পড়িলে সেই যুগ্মঘুটি অর্দ্ধ বা পূর্ণঘর যাইতে পারিবে অর্থাৎ যদি বার দান পড়ে তাহা হইলে যুগ্মঘুটি বারঘর বা ছয়ঘর ক্রীড়কের সুবিধা অনুসারে যাইতে পারে। অনেক সময় পাকা ঘুটি (এমন কি কেন্দ্রস্থ ঘুটি পর্য্যন্ত) কাঁচাইয়া পুনরায় খেলা আরম্ভ করিতে হয়। এইরূপ ঘুটি কাঁচান খেলার অবস্থার উপর সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করে।

আজকাল আমাদের দেশে দুইজনেও অক্ষক্রীড়া হইয়া থাকে। ইহাকে 'রংখেলা' বলে। খেলিবার নিয়ম 'চৌপড়' বা চারিজন একত্র খেলা হইতে কিছু স্বতন্ত্র। প্রত্যেকে (৪+৪=) ৮টী করিয়া ১৬টী ঘুটি লইয়াই খেলা হয়। ৪টী ঘুটিকে 'রং' এবং অপর চারিটী ঘুটিকে 'বদরং' বলা হয়। ঘুটি সাজাইবার নিয়ম এইরূপ—রংয়ের ৪টী ঘুটি ক্রীড়কের দক্ষিণপার্শ্বস্থ বাহুর বামপংক্তির ৭ম ও ৮ম স্থানে ২টী করিয়া একত্র রাখিতে হইবে এবং বদরংয়ের ৪টী ঘুটি ক্রীড়কের সন্নিকটস্থ বাহুর মধ্যপংক্তির ৬ষ্ঠ ও ৭ম স্থানে ২টী করিয়া একত্র বসাইতে হইবে। দানে '১' থাকিলে তবে হাত খুলিবে (যেমন ৫+২+১, ৬+১+১ ইত্যাদি)। প্রথমে রংয়ের ঘুটি চালিতে হইবে। বদরংয়ের ঘুটি ঘর হইতে একবার বাহির না হইলে রংয়ের ঘুটি পাকিতে পারিবে না। প্রথমে যে দানে খেলা আরম্ভ হইবে, সেই দানেই রংয়ের শেষ ঘুটি ঘরে তুলিতে হইবে। তৎপরে বদরংগুলি উঠিবে। রং ও বদরংয়ের মধ্যে যে ঘুটি অগ্রে কাটা পড়িবে, তাহাই অগ্রে বসিবে। ক্রীড়কের সন্নিকটস্থ মধ্যপংক্তির ১ম স্থানে অর্থাৎ ঘুটিগুলি কেন্দ্রস্থ হইবার পূর্ব্বঘরে দানে '১' থাকিলে তবে ঐ কাটাঘুটি পুনরায় বসিতে পারিবে। বসিবার স্থানে রং ও বদরংয়ের ঘুটি একত্রে বসিতে পারিবে না। এইরূপে বা অন্য কোন কারণে বসিবার স্থান না পাইলে 'ক্রুজ্' হইয়া খেলায় হার হইয়া থাকে। এজন্য কাটাঘুটি বসিবার স্থানে যাহাতে কোন ঘুটি না থাকে, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। এই সকল নিয়মের জন্য চৌপড় অপেক্ষা রংখেলা কিছু শক্ত।

ভারতসম্রাট্ অক্বর এক প্রকার নূতন ধরণের অক্ষক্রীড়া আবিষ্কার করেন, তাহার নাম 'চন্দেল-মন্দেল'। ইহাতে ছকটী বৃত্তাকার হইত, ষোলটী বাহু থাকিত এবং ষোলজন ক্রীড়ক লইয়া খেলা চলিত। তিনটীর পরিবর্ত্তে ইহাতে চারিটী পাশার প্রয়োজন হইত। চৌপড় বা সাধারণ পাশা-খেলার ন্যায় ইহার চাল দেওয়া হইত। ইহাতে প্রত্যেক ক্রীড়ক স্বতন্ত্র পক্ষ বলিয়া নিজ নিজ চাল চালিতে পারিত। যে অগ্রে ঘুটি পাকাইয়া খেলা শেষ করিত তাহাকে অপর পনের জনে বাজীর পণের টাকা দিত। যে দ্বিতীয় হইয়া জয়লাভ করিত তাহাকে অপর চৌদ্দজনে অর্থ দিত। এইরূপ ভাবে খেলা চলিত এবং যে সর্ব্বশেষ হইত, সে সকলকে নিজ অঙ্গীকৃত পণের টাকা দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইত।

বর্ত্তমানে ইউরোপীয় প্রথানুসারে হাড়ের অক্ষ দ্বারা একরূপ জুয়াখেলার প্রচলন হইয়াছে। তাসের চিহ্ন অঙ্কিত করা বড় বড় ছকের উপর সমচতুষ্কোণ হাড়ের অক্ষ লইয়া এই জুয়াখেলা হইয়া থাকে।

ইউরোপীয় অক্ষক্রীড়ার ইতিহাস

যতদূর জানা যায়, প্রস্তরখণ্ড লইয়া "জোড়-বিজোড় খেলা" হইতে অক্ষক্রীড়া (Dice) খেলার প্রচলন হইয়াছিল। সফোক্লিস্ লিখিয়াছেন, ট্রয় নগরী অবরোধকালে পালামিডিস্ নামক একজন গ্রীক্ তাহার স্বদেশবাসিদিগকে এই ক্রীড়া শিক্ষা দিয়াছিল। হিরোদোতস্ (ক্লিও) বলেন, রাজা অতিস্

(Atys)এর শাসনকালে ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় লিডিয়ান্‌গণ এই ক্রীড়া আবিষ্কার করিয়াছিল।

তিনটী বা দুইটী অক্ষ বা ডাইস (Ku Boi) লইয়া অক্ষক্রীড়া বিলাসী অভিজাতগণের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিল। সাধারণতঃ পান-ভোজনের মজলিসে ইহার অধিক অনুষ্ঠান হইত। একটী ঠোঙ্গার মত পাত্রে অক্ষগুলি রাখিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া নিক্ষেপ করিতে হইত। গ্রীসের পাশা বা অক্ষগুলি অনেকটা আধুনিক যুগের লুডো খেলার পাশার মত ছয়পল সম-ঘন-চতুষ্কোণ ছিল। ইহার প্রত্যেক দিকে এক দুই তিন করিয়া যথাক্রমে আধুনিক পাশার মত চক্ষু অঙ্কিত থাকিত। যদি কোন দানে তিনটী অক্ষেই ছয় পড়িত, তাহা হইলে তাহা সর্ব্বগরিষ্ঠ দান বলিয়া বিবেচিত হইত। গ্রীক্‌গণ সেই দানকে বলিত অফ্রোদিতি। তিনটীতেই এক পড়িলে তাহা সর্ব্বনিকৃষ্ট দান বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহার নাম ছিল 'কুক্কুর'। গ্রীস ও রোমে বিভিন্নভাবে দান গণনা করা হইত। রোমকগণ পাশাকে 'তেসেরী' (tesseræ) বা চতুস্তল বলিতেন। তাঁহারা অত্যন্ত দ্যুতাসক্ত ছিলেন। রোমসম্রাট্‌দিগের সময়ে কেবলমাত্র শনিবারে রোমকগণ দ্যূতক্রীড়া করিতে পারিতেন। সম্রাট্, সেনাপতি সকলেই এই দ্যূতক্রীড়ায় উন্মত্ত হইতেন। মার্ক এণ্টনি মিশরে কেবল দ্যূতক্রীড়ায় সময় নষ্ট করিতেন। সম্রাট্ অগস্‌টাস্, নীরো ও ক্লডিয়াস্ অত্যন্ত দ্যূতাসক্ত ছিলেন। সম্রাট্ ক্লডিয়াস্ দ্যূতক্রীড়া সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। দ্যূতক্রীড়াকালে সম্রাট্ ক্লডিয়াস্ প্রতিদ্বন্দ্বীকে বঞ্চনা করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। ডমিটিয়ান্‌ও দ্যূতাসক্ত ছিলেন, এবং কমোডাস দ্যূতক্রীড়ার জন্য রাজপ্রাসাদে কয়েকটি বিশেষ কক্ষ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, সম্রাট্ সমস্ত রজনী দ্যূতক্রীড়ায় অতিবাহিত করিতেন।

সম্রাট্‌গণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অভিজাত (বিলাসী)-সমাজে এই দ্যূতক্রীড়ার বহুল প্রচলন হইয়াছিল। ঐতিহাসিক হোরেস্ লিখিয়াছেন, সে যুগের যুবকগণ পুরুষোচিত ব্যায়ামাদিতে মনোযোগী না হইয়া দ্যূতক্রীড়ায় কালাতিপাত করিত। আইনের কঠোরতা সত্ত্বেও অনেকে দ্যূতক্রীড়ায় হারিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইত। রোমে দ্যূতক্রীড়ার বিরুদ্ধে বহু কঠোর আইন রচিত হইয়াছিল। যে ব্যক্তির গৃহে দ্যূতক্রীড়া হইত সে অপর কর্ত্তৃক নিজ বিত্তে বঞ্চিত হইলেও ধর্ম্মাধিকরণের আশ্রয় পাইত না। তৎকালে রোম নগরে অনেক পেশাদার জুয়াড়ী বাস করিত। তাহারা তাহাদের পাশার ভিতর ধাতু পুরিয়া ভারী করিত। সাধারণ গণিকালয়সমূহ দ্যূত-ক্রীড়ার এক একটী আড্ডা ছিল।

ঐতিহাসিক টাসিটাসের বিবরণ হইতে জানা যায়, রোম-সাম্রাজ্যের বাহিরে জর্মনগণও এত দ্যূতাসক্ত ছিল যে তাহারা সর্ব্বস্ব হারিয়া অবশেষে নিজেদের স্বাধীনতা পণ করিত। বহু শতাব্দ পরে ইউরোপের মধ্যযুগে নাইট্ (Knight) বা যোদ্ধপুরুষ বা অভিজাতগণের মধ্যে এই ক্রীড়া সমধিক সমাদৃত হইয়াছিল। সেই যুগে দ্যূতক্রীড়ার অনেক প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। ফ্রান্সের অভিজাতসম্প্রদায় স্ত্রীপুরুষে এতদূর দ্যূতক্রীড়াসক্ত ছিল যে, আইনের কঠোর শাসনসত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে এই ক্রীড়ার দারুণ স্পৃহার কোনরূপ বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয় নাই।

অক্ষের দানক্ষেপণের সৌকর্য্যার্থে দ্যূতের আধার বহু আকারে ও বিভিন্ন উপাদানে নির্ম্মিত হইত। অনেকে ধূর্ত্ততাপূর্ব্বক দ্যূতাধারে ধাতুশলাকা এরূপভাবে সন্নিবিষ্ট করিত যে উহাদ্বারা অক্ষগুলি ব্যাহত হইয়া রীতিমত সঞ্চালিত হইতে পারিত এবং জুয়াড়ীর অভীষ্টমত দানপাত হইত। পুরাকালে ইংলণ্ডে একরূপ অক্ষ ব্যবহৃত হইত, তাহার উপর কোন চিহ্ন থাকিত না, সেইগুলি একটী সমতল ১ হইতে ৬ চিহ্নিত ছককাটা ফলকে নিক্ষিপ্ত হইত।

উত্তর-আমেরিকাবাসিগণের মধ্যেও অক্ষক্রীড়ার প্রচলন ছিল। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকান্ সৈন্যগণ যখন ফ্রান্সে অবস্থান করিতেছিল, তখন তাহাদিগের মধ্যে ক্র্যাপ্ নামে একরূপ অক্ষক্রীড়ার প্রচলন দেখা গিয়াছিল। আমেরিকার নিগ্রোগণ বিশেষরূপে দ্যূতাসক্ত।

ইউরোপে হস্তিদন্ত, হাড়, কাষ্ঠ বা ধাতুনির্ম্মিত অক্ষ বা dice লইয়া দ্যূতক্রীড়া হইয়া থাকে। ছোট ছোট সম-ঘন-চতুষ্কোণের ছয় দিকে যথাক্রমে এক হইতে ছয়টী বিন্দু অঙ্কিত থাকে এবং সেই অক্ষের দুইটী বিপরীত দিকের বিন্দুসংখ্যা যোগ করিলে ৭ হইয়া থাকে; যথা, যেদিকে ছয়বিন্দু থাকে ঠিক তাহার বিপরীতদিকে একবিন্দু থাকে বা যেদিকে ৪ বিন্দু থাকে ঠিক তাহার বিপরীতদিকে ৩ বিন্দু থাকে। অধুনা পাশ্চাত্ত্যদেশে জুয়াখেলা ব্যতীত সাধারণতঃ অক্ষের ব্যবহার হয় না। তবে ব্যাক্‌গামন (backgammon) বা লুডো প্রভৃতি খেলায় ঐরূপ অক্ষের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন খেলায় বিভিন্নসংখ্যক অক্ষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একটী হইতে পাঁচটী পর্য্যন্ত অক্ষ লইয়া ক্রীড়া দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রেটবৃটেন ও আমেরিকায় সাধারণতঃ দুই বা তিনটী

অক্ষ লইয়া ক্রীড়া হইয়া থাকে। অক্ষগুলি টেবিল বা অন্য কোন সমতল মসৃণ ফলকের উপর হস্ত বা অক্ষাধার হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে গ্রীস, রোম ও প্রাচ্যভূখণ্ডে সাধারণতঃ অক্ষাধারের ব্যবহার হইত। কাষ্ঠ, চর্ম্ম, স্ফটিক, ধাতু, কাগজ প্রভৃতি নানা উপাদানে অক্ষাধার নির্ম্মিত হইত।

অতি প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি অক্ষের আকৃতির বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মিশরের সমাধিসমূহে কিংবা গ্রীস ও প্রাচ্য ভূখণ্ডের প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের খননাদির ফলে যে সকল অক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয় অক্ষের আকার সর্ব্বত্রই এক। রোমের সমাধিসমূহের মধ্য হইতে যে সমস্ত দীর্ঘাকৃতি অক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা টালি (tali) বা Knucklebone নামক ক্রীড়ায় ব্যবহৃত এক প্রকার অক্ষ। ফ্রান্সে পরবর্ত্তী যুগে শিশুদিগকে গণিত শিক্ষা দিবার জন্য অষ্ট পলবিশিষ্ট এক প্রকার অক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। টীটোটাম্ বা ভ্রাম্যমাণ অক্ষ আধুনিক অনেক ক্রীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একটী অক্ষের ভিতর দিয়া একটী ধাতুশলাকা দুই পাশে কিঞ্চিৎ বহির্গত হইয়া থাকে। সেই শলাকার একদিক্ ধরিয়া পাক দিলে অক্ষটী অন্যদিকের শলাকার অগ্রভাগের উপর ঘুরিতে থাকে। প্রাচীনকালে চীন ও জাপানে এইরূপ অক্ষ লইয়া ক্রীড়া হইত। সাধারণতঃ তিনটী অক্ষ লইয়াই তিনবার দান ফেলা হয়। যদি প্রথম নিক্ষেপে কোন অক্ষে ছয় বা পাঁচ পড়ে তাহা হইলে সেই অক্ষটী বা অক্ষগুলিকে সরাইয়া রাখিয়া অবশিষ্ট অক্ষ লইয়া দান ফেলিতে হয়। মূল উদ্দেশ্য তিন ছয় (=১৮) বা তাহার কাছাকাছি কোন দান ফেলিলে বাজী জিত হয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা কম দান পড়িলে হার হয়। আমেরিকার নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের ভিতরে ক্র্যাপ্ বা ক্র্যাপ্-শুটিং (Crap or Crap-shooting) বলিয়া একপ্রকার খেলার প্রচলন আছে, ইহা ফ্রান্সে প্রচলিত হ্যাজার্ড (Hazard) ক্রীড়া হইতে উদ্ভূত। ইহাতে দুইটী অক্ষ ব্যবহৃত হয়। আর এক প্রকার অক্ষক্রীড়া আছে, তাহাতে অক্ষের পাঁচদিকে যথাক্রমে তাসের ন্যায় টেক্কা, সাহেব, বিবি, গোলাম ও দশ অঙ্কিত থাকে, ষষ্ঠদিকে কিছুই থাকে না; এইরূপ পাঁচটি অক্ষ লইয়া দান ফেলা হইয়া থাকে। এই ক্রীড়ার নাম poker dice। ধূর্ত্তগণ অনেক সময় ধাতুগর্ভ অক্ষ ব্যবহার করিয়া অপরকে বঞ্চনা করিয়া থাকে। মহাভারতের শকুনি ঐরূপ ধাতুগর্ভ অক্ষ লইয়া যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়াছিল। আধুনিক-যুগে ক্রীড়ার সুবিধার জন্য অক্ষের ধারগুলি একটু বৃত্তাকার করিয়া দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে বহুবার ক্রীড়া করায় স্বতঃই অক্ষের ধার ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

[পাশা, বিভীতক, দ্যূত, চৌপড়, চন্দেলমন্দেল ও আকর্ষ শব্দ দ্র°]

[ঋগ্বেদ, ১.৪১.৯, ৭.৮৬.৬, ৮.৮১.১, ৯.১০৬.৩, ১০.৩৪.১-১২ ; অথর্ববেদ, ৫.৩১.৬, ৬.৭০.১ ; শতপথব্রাহ্মণ, ৫.৩.১.১১, ৫.৪.৪.৬ ; তৈত্তিরীয়-সংহিতা ১.৮.৬.১২, ৪.৩.৩.১-২ ; বাজসনেয়ী-সংহিতা ১০.২৮, ৩০.১৮ ; মৈত্রায়ণী-সংহিতা, ১.৬.১১, ৪.৪.৬ ; মনুসংহিতা ৯ম অধ্যায় ; ব্রহ্মপুরাণ ; মহাভারত, সভা, বন ও বিরাটপর্ব্ব ; কামসূত্র, প্রথম অধিকরণ, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় ; আইন্-ই-অক্‌বরী ; art 'Dice'—Encyclopaedia Britannica, 11th to 14th editions ; Vedic Index by Macdonnell & Keith.]

অক্ষক্ষেত্র—[জ্যোতিষে] ১২ অঙ্গুল শঙ্কু কোটি, পলভা ভুজ, পলকর্ণ কর্ণ ইহা একটী সমকোণী ত্রিভুজ। এইরূপ লম্বজ্যা অর্থাৎ অক্ষাংশের কোটিজ্যা কোটি, অক্ষজ্যা ভুজ, ত্রিজ্যা কর্ণ এই ত্রিভুজদ্বয় জ্যামিতি ষষ্ঠাধ্যায় চতুর্থ প্রতিজ্ঞানুসারে সজাতীয় ত্রিভুজ। এইরূপে পরস্পর সজাতীয় ও সমানুপাতীয় আটটী ত্রিভুজ অক্ষক্ষেত্র নামে কথিত হয়। অক্ষাংশের সহিত এই ৮টী ক্ষেত্রের সম্বন্ধ আছে বলিয়া ইহাদের নাম অক্ষক্ষেত্র। এই ৮টী যথা :— ১ লম্বজ্যা কোটি, অক্ষজ্যা ভুজ, ত্রিজ্যা কর্ণ। ২ পলভা ভুজ, ১২ অঙ্গুল শঙ্কু কোটি, পলকর্ণ কর্ণ। ৩ উন্মণ্ডলে ক্রান্তিজ্যা কোটি, অহোরাত্রবৃত্তে কুজ্যা ভুজ, ক্ষিতিজবৃত্তে অগ্রা কর্ণ। ৪ সমশঙ্কু কোটি, অগ্রা ভুজ, অহোরাত্রবৃত্তে তদ্ধৃতি কর্ণ। ৫ কুজ্যোন তদ্ধৃতি কোটি, ক্রান্তিজ্যা ভুজ, সমশঙ্কু কর্ণ। ৬ অগ্রার আদিখণ্ড কোটি, উন্মণ্ডলশঙ্কু ভুজ, ক্রান্তিজ্যা কর্ণ। ৭ উন্মণ্ডলশঙ্কু কোটি, অগ্রাগ্রখণ্ড ভুজ, কুজ্যা কর্ণ। ৮ শঙ্কু কোটি, শঙ্কুতল ভুজ, ছেদ বা ইষ্টহৃতি কর্ণ। এই ৮টী অক্ষক্ষেত্রের যে কোন দুইটী ভুজ থাকিলে তাহা হইতে অনুপাত করিয়া তৃতীয় ভুজ জানা যাইতে পারে। এইরূপে ৬৩ প্রকারে প্রতি ভুজ আনয়নের উপায় ভাস্করাচার্য্য সিদ্ধান্ত-শিরোমণি ত্রিপ্রশ্নাধিকারে বলিয়াছেন।

অক্ষগ্রামী—বাঙ্গলাদেশের বাৎস্যগোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের একটী গাঁই।

অক্ষচন্দ্র—বঙ্গদেশের চন্দ্রবংশীয় একজন রাজা। তিব্বতীয় তারনাথের মতে, ইনি হরিচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ইঁহার পুত্রের নাম জয়চন্দ্র।

[Indian Antiquary, Vol. IV, 1875, p. 363.]

অক্ষচরণ—[অক্ষপাদ দ্র°]

অক্ষজ—বিষ্ণু (হেম°)।

অক্ষণতল—(=তণ্ডুলকণা) দক্ষিণ-ভারতের ওড্ডের গোত্র-বিশেষের নাম।

অক্ষত,—যব। ২ আতপ তণ্ডুল। ৩ খই। [খই দ্র°] ৪ শিব

অক্ষত২, অক্ষিত—[বৈদ্যক] অথর্ববেদের একস্থলে (৭.৭৬.৪) যায়ান্য-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া ক্ষতের প্রতিষেধক অক্ষিত ও সুক্ষত কিংবা কৌশিকসূত্রের মতে অক্ষত ও সুক্ষত বা সায়ণের মতে অক্ষিতা ও সুক্ষিতার কথা জানিতে পারা যায়। ব্লুমফিল্ড সাহেব বলেন, এই দুই শব্দে কাটিয়া না গিয়া ও কাটিয়া গিয়া ক্ষত হওয়া বুঝিতে হইবে। (Journal of the American Oriental Society, 13, CXII etc.) পূর্ব্বে তিনি অর্ব্বুদ ও বিস্ফোটক ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। হুইট্‌নী সাহেব এই দুই শব্দে যায়ান্যের দুই শ্রেণীকে বুঝায় বলিয়াছেন। (Translation of the Atharva-Veda, p. 442)

অক্ষতশ্রম—স্কন্দপুরাণ মাহেশ্বরখণ্ড-মতে এক ঋষি। ইনি মহাদেবের বিবাহে উপস্থিত ছিলেন।

অক্ষতা—[বৈদ্যক] কর্কটশৃঙ্গী, কাঁকড়াশৃঙ্গী। [কাঁকড়াশৃঙ্গী দ্র°]

অক্ষথয্য—দক্ষিণ-ভারতের গোল্লাদের এক গোত্রের নাম। ইহারা হরিদ্রাদিদ্বারা রঞ্জিত অন্ন গ্রহণ করে না।

[E. Thurston—Castes and Tribes of Southern India, Vol. I, p. 21.]

অক্ষধর—বিষ্ণুর চক্র। ২ চক্রের কীলক। ৩ চক্রধারকমাত্র। ৪ [বৈদ্যক] শাখোট বৃক্ষ Trophis Aspera। [সেওড়া দ্র°]

অক্ষধূর্ত্ত—[বৈদ্যক] শাখোট বৃক্ষ। [সেওড়া দ্র°]

অক্ষপটল,, অক্ষিপটল—ছানি, চক্ষুরোগবিশেষ। চক্ষুর স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় পুত্তলিকার উপর (lenticular crystaline lens) কিংবা তাহার আবরকের উপর (capsular capsule) কিংবা এই দুইটীরই উপরে (capsule lenticular) একখানি আবরণ পড়ে, তাহাতে দৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ হইয়া যায়। এই আবরণ সিরস্ (serous) রসে পূর্ণ।

ছানি নানা প্রকার। তন্মধ্যে কঠিন ও কোমল ছানি সচরাচর দেখা যায়। কঠিন ছানি (suffusio dura) দেখিতে কটা। ইহা বৃদ্ধলোকের হইয়া থাকে। কোমল ছানি (suflusio mollis) কিঞ্চিৎ নীলের আভাযুক্ত এবং ইহার আকারও অপেক্ষাকৃত বড়। গর্ভ হইতেই কোন কোন শিশুর চক্ষে ছানি পড়িয়া থাকে। মস্তকে ও চক্ষুতে আঘাত লাগিয়া অনেকের ছানিরোগ জন্মিয়াছে। কোন কোন বালকের চক্ষে শাদা দুধের মত ছানি পড়ে। শয়ন করিলে, মস্তক ঘুরাইলে ফিরাইলে, ঐ ছানি এদিক্ ওদিক্ চলিয়া বেড়ায়।

ছানির কারণ এক প্রকার নয়। দৈহিক দুর্ব্বলতা; প্রস্রাবের পীড়া; চক্ষু ও মস্তকে আঘাত; বালকদের তড়কারোগ; কৌলিক দেহস্বভাব অর্থাৎ পিতার ছানিরোগ থাকিলে পুত্রদেরও প্রায় ছানিরোগ হইয়া থাকে। তীব্র আলোকের প্রতি চাহিলে অনেক স্থলে ছানি জন্মে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাজে সর্ব্বদা দৃষ্টি চালনা করিলেও ছানিরোগ হয়। ভেককে চিনি, লবণ ও সুরা কিছুদিন খাইতে দিলে তাহার দুটী চক্ষেই ছানি পড়ে। ছানির এই কয়েক প্রকার চিকিৎসা চলিত আছে—

এলোপ্যাথী—ছানির প্রকৃত চিকিৎসা আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। এলোপ্যাথী ডাক্তারেরা প্রথমে সুপথ্যের ব্যবস্থা করেন—দুগ্ধ, ডিম্ব, মাংস, কড্‌লিভার তৈল ও মণ্ট ইত্যাদি। সেবনের ঔষধ—সিরাপ্ অব্ ফেরি আওডিড্ ১০ বিন্দু মাত্রায় অর্দ্ধছটাক জলের সঙ্গে প্রত্যহ দুইবার সেবন করিবে। কিংবা আওডিড্ অব্ পটাস দুই রতি, ব্রোমাইড্ অব্ পটাস দুই রতি, কলম্বোর ফাণ্ট অর্দ্ধ ছটাক, একত্র মিশ্রিত করিয়া এইরূপ এক এক মাত্রা প্রত্যহ দুইবার সেবন করিতে হইবে। চক্ষের ভিতর প্রয়োগ করিবার জন্য, কেহ অর্দ্ধ ছটাক গোলাব-জলের সঙ্গে ৫ কি ১০ বিন্দু টিঞ্চার আওডিন্ মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ১০ বিন্দু ঐ ঔষধ চক্ষের ভিতর প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দেন। কেহ কেহ অর্দ্ধছটাক পরিষ্কার জলের সঙ্গে অর্দ্ধরতি এট্রোপিয়া মিশ্রিত করিয়া তাহার দুই এক বিন্দু প্রত্যহ কিংবা চারি পাঁচ দিন অন্তর চক্ষের ভিতর দিতে বলেন। ইহার দ্বারা কনীনিকা অর্থাৎ চক্ষের তারা প্রসারিত হয়; সেজন্য ছানিযুক্ত চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। এট্রোপিয়া বিষ বেলেডোনার বীর্য্যে প্রস্তুত। অতএব ইহা সেবন করা নিষিদ্ধ।

অস্ত্রপ্রয়োগ—যতক্ষণ দুইটী চক্ষের মধ্যে এক চক্ষে দৃষ্টি থাকিবে, সে পর্য্যন্ত ছানিতে অস্ত্র প্রয়োগ করিবে না। কারণ এক চক্ষের ছানি তুলাইতে গিয়া দুইটী চক্ষুই নষ্ট হইতে পারে। ছানিতে অস্ত্র করাইলে তাহার ফল নিশ্চিত নহে।

অস্ত্রপ্রয়োগ দুই প্রকার। এক, ছানির নিম্নে পাতলা চর্ম্মে ছিদ্র করিয়া ছানির রস ভিতরে ডুবাইয়া দেওয়া। অন্যটী—ছানির আবরণ অস্ত্রদ্বারা উঠাইয়া আনা। প্রথম উপায়টীতে বিপদ্ অনেক। ছানির রস ভিতরে ডুবাইয়া দিলে হয়ত ভয়ঙ্কর প্রদাহ উপস্থিত হইতে পারে। তজ্জন্য এখনকার কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক সে প্রকার চিকিৎসা করেন না। আমাদের দেশের মালেরা এই উপায়টীই জানে, তাহারা ছানির রস চক্ষের ভিতর ডুবাইতে পারে,—উঠাইয়া আনিতে পারে না। অথচ সকল মালই কৃত্রিম একটী পর্দ্দা আনিয়া রোগীকে ভুলায়। তাহারা অস্ত্রপ্রয়োগের পর

গৃহস্থকে সেইটী দেখাইয়া বলে যে,—ছানি উত্তম তুলিয়া আনা হইয়াছে। ছানির রস খড়ির মত পরিপক্ক হইলে তবে অস্ত্রপ্রয়োগ করিবে। একবার অস্ত্রাঘাত করিলে যদি কোন ফলোদয় না হয়, তবে আরোগ্যের আশা নিশ্চিত ফুরাইল। কাহারও কাহারও ছানি বিনা চিকিৎসায় আপনি কমিয়া যায়, কিছুদিন পরে আবার বৃদ্ধি হইতে থাকে।

হোমিওপ্যাথী—প্রদাহের পর অর্থাৎ চক্ষু উঠিয়া তাহার পর ছানি পড়িলে বেলেডোনা ১২ ডাইলিউসন, ১ বিন্দু মাত্রায় জলের সঙ্গে প্রত্যহ দুইবার সেবন করিবে। সাল্‌ফর ৩০ ডাঃ, ফস্‌ফরাস্ ৩০ ডাঃ, ক্যানাবিস্ ১২ ডাঃ, ক্যাল্‌কেরিয়া ১২ ডাঃ, কোনায়ম ১২ ডাঃ, য়ুফ্রেসিয়া ৬ ডাঃ, সিলিসিয়া ১২ ডাঃ, প্রভৃতি ঔষধ সেবনে উপকার দর্শে।

বৈদ্যক—চক্ষের ভিতর লাগাইবার জন্য চন্দ্রোদয়া বর্ত্তিকা। হরিতকী, বচ, কুড়, পিপুল, মরিচ, বহেড়ার মজ্জা, শঙ্খনাভি, মনছাল, এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধে পিষিয়া বাতি প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ প্রস্তরের উপর ইহা ছাগদুগ্ধে ঘষিয়া লাগাইতে হয়। চন্দ্রপ্রভাবর্ত্তি, চন্দনাদ্যাবর্ত্তি, নয়ন-সুখাবর্ত্তিতেও কখন কখন উপকার হয়।

অক্ষপটল$_2$, **অক্ষপটলাধিকৃত, অক্ষপটলিক**—প্রাচীনকালে হিন্দুরাজসভাস্থ উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। বিচারবিভাগের সমস্ত কাগজপত্র এই ব্যক্তির তত্ত্বাধীন থাকিত। গুপ্তরাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ ও তৎপরবর্ত্তী বহু শিলালিপি ও তাম্রশাসনে, এমন কি কহ্লণের রাজতরঙ্গিণীতেও (৫.৩৯৭) এই শব্দের উল্লেখ আছে।

অক্ষপাদ,—ঋষি গৌতমের নামান্তর। গৌতমের 'অক্ষপাদ' নাম সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা চলিয়া আসিতেছে। আখ্যায়িকাটী এই—বেদব্যাস গৌতম-প্রণীত ন্যায়-সূত্রের নিন্দা করেন। তাহা শুনিয়া গৌতম প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি বেদব্যাসের মুখদর্শন করিবেন না। বেদব্যাস গৌতমকে অনেক করিয়া সান্ত্বনা দেন, কিন্তু গৌতমের প্রতিজ্ঞা অন্যথা হইবার নয়। কাজেই গৌতমের চরণে দৃষ্টিশক্তি প্রকাশিত হইল, তদ্দ্বারা তিনি বেদব্যাসের মুখ দেখিতেন।

অক্ষপাদ ও গৌতম যে অভিন্ন তাহা 'গৌতমীয় পিতৃমেধসূত্রের' অনন্তযজ্বার টীকা হইতে বুঝিতে পারা যায়। (Burnell's Catalogue, pp. 57 ; Hall pp. 20.) অক্ষপাদ দর্শনের কোন কোন স্থানে বেদবাদ অপেক্ষা যুক্তিবাদ বলবান্। পরাশর-উপপুরাণে ইহারই সমর্থনকল্পে লিখিত হইয়াছে :—

"অক্ষপাদপ্রণীতে চ কাণাদে সাংখ্যযোগয়োঃ।
ত্যাজ্যঃ শ্রুতিবিরুদ্ধাংশঃ শ্রুত্যেকশরণৈর্নৃভিঃ।
জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধাংশো ন কশ্চন।
শ্রুত্যা বেদার্থবিজ্ঞানে শ্রুতিপারং গতৌ হি তৌ।"

চীনবাসীদের মহাটীকা নামক গ্রন্থে (১।২২) অক্ষপাদের উল্লেখ আছে। তাহাতে পাওয়া যায়, ভারতবর্ষে 'শক-মক' নামে এক ব্রাহ্মণ প্রথমে ন্যায়শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। 'শক-মক' নামটী ভুল হইয়া থাকিবে, ইহা 'মক-শক' হইবে। কেননা—'মক' শব্দের অর্থ চক্ষু ও 'শক' শব্দের অর্থ পাদ। সুতরাং অর্থের দিক্ দিয়া অক্ষপাদই দাঁড়াইতেছে। জাপানী বিবরণ হইতে জানা যায় যে, অক্ষপাদই বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রের আদি রচয়িতা এবং বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে তিনি ন্যায়শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পর বুদ্ধ স্বয়ং, তাঁহার পর রুজু, মিরক (মৈত্রেয়), সূচক (অসঙ্গ), সেইশ (বসুবন্ধু) এবং অবশেষে মহাদিঙ্‌নাগ ও তাঁহার শিষ্য শঙ্করস্বামী। চৈনিকগণ বলেন, ইনি 'নবযুক্তি' ও 'চতুর্দ্দশ হেত্বাভাস' এই দুইটি মাত্র রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুদিগের মতে পঞ্চ অধ্যায়ে বিভক্ত ৫২৮ সংখ্যক সমগ্র ন্যায়সূত্রাবলী গৌতমের রচিত। কিন্তু সমগ্র সূত্রসমষ্টির মধ্যে নবযুক্তি বা চতুর্দ্দশ হেত্বাভাসের অনুরূপ কিছুই পাওয়া যায় না। দিঙ্‌নাগ ইহা অক্ষপাদের রচিত বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নবযুক্তির বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে ইহা ত্র্যবয়বী ন্যায়বাক্যের পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

ন্যায়সূত্রের যে সংস্করণ আমরা এখন দেখিতে পাই, তাহা পরবর্ত্তী যুগে রচিত। অক্ষপাদ যে ইহার রচয়িতা নহেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বুদ্ধ হইতে বসুবন্ধু পর্য্যন্ত সমস্ত বৌদ্ধ নৈয়ায়িকই তাঁহাদিগের "প্রমার" জ্ঞানের নিমিত্ত অক্ষপাদের নিকট ঋণী। অক্ষপাদের শিষ্যগণ যোগী বা যৌগ নামে খ্যাত। জাপানী বৌদ্ধদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, মিরক বা মৈত্রেয় অক্ষপাদের ন্যায়-পদ্ধতির মধ্যে যোগপদ্ধতি অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন।

আধুনিক ন্যায়দর্শন প্রকৃতপক্ষে ন্যায়বৈশেষিকদর্শন। অধুনাতন নৈয়ায়িকগণের রচনা নৈয়ায়িক আবরণে বৈশেষিক-দর্শন। আধুনিক নৈয়ায়িকগণের 'দুঃখবাদ' তাঁহাদের উপর বৈশেষিকদর্শনের প্রভাববশতঃ হইয়াছে। শ্রীহর্ষ ভ্রমক্রমে গৌতমকে দুঃখবাদী বলিয়াছেন। বিজয়নগরের

মাধবাচার্য্য তাঁহার রচিত 'সংক্ষেপ শঙ্করবিজয়' (১৬.৬৮-৬৯) গ্রন্থে শঙ্করের সহিত নৈয়ায়িকের বিচার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

"তত্রাপি নৈয়ায়িক আত্তগর্বঃ কণাদপক্ষাচ্চরণাক্ষপক্ষে।
মুক্তের্বিশেষং বদ সর্ব্ববিচ্চেন্ নোচেৎ প্রতিজ্ঞাং ত্যজ সর্ব্ববিত্ত্বে॥
অত্যন্তনাশে গুণসঙ্গতের্যা স্থিতির্নভোবৎ কণভক্ষপক্ষে।
মুক্তিস্তদীয়ে চরণাক্ষপক্ষে সানন্দ সংবিৎ সহিতা বিমুক্তিঃ॥"

অর্থাৎ নৈয়ায়িক সাহঙ্কারে (শঙ্করকে) বলিলেন 'যদি তুমি সর্ব্বজ্ঞ হও তাহা হইলে বল কণাদ ও অক্ষপাদের মুক্তিবাদে কি পার্থক্য! যদি তাহা না পার তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞতার অহঙ্কার পরিত্যাগ কর।' শঙ্কর বলিলেন—'যে অবস্থায় সমস্ত গুণাবলীর সহিত সর্ব্ববিধ- সম্পর্ক নাশ হইয়া আত্মা শূন্যবৎ অবস্থান করে, তাহাই কণাদের মতে মুক্তি ; কিন্তু অক্ষপাদের মতে মোক্ষের অবস্থায় সুখানুভূতির লোপ হয় না।'

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে অক্ষপাদ মোটেই দুঃখবাদী ছিলেন না।

[ন্যায়শাস্ত্র, গৌতম, দর্শন, কণাদ দ্র°]

নিম্নে অক্ষপাদদর্শনমতালম্বীদিগের ও তাঁহাদের গ্রন্থের ধারাবাহিক কালক্রমানুসারী তালিকা প্রদত্ত হইল।

১। অক্ষপাদ (গৌতম)	ন্যায়সূত্র
বাৎস্যায়ন (৩০০ খৃঃ পূঃ ?)	ন্যায়সূত্রভাষ্য
উদ্দ্যোতকর (৬৩৫ খৃঃ অঃ)	ন্যায়সূত্রভাষ্যবার্তিক
বাচস্পতি মিশ্র (৮৪২)	ন্যায়বার্তিকতাৎপর্য্যটীকা
উদয়ন (৯৮৪)	ন্যায়বার্তিক (টীকা-ন্যায়বার্তিকতাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি)
বর্দ্ধমান (১২২৫)	পরিশুদ্ধিটীকা (ন্যায়-নিবন্ধপ্রকাশ)
পদ্মনাভ	ন্যায়নিবন্ধপ্রকাশটীকা (বর্দ্ধমানেন্দু)
শঙ্করমিশ্র (১৪২৫)	ন্যায়নিবন্ধপ্রকাশ (ন্যায়তাৎপর্য্যমণ্ডল)
মিত্রমিশ্র (১৫৮০)	ন্যায়সূত্রভাষ্যটীকা (ন্যায়দীপ)
বিশ্বনাথ (১৬৩৪)	ন্যায়সূত্রভাষ্যটীকা
জয়ন্ত (৮৮০)	গৌতমসূত্রবৃত্তি (ন্যায়মঞ্জরী)
জয়রাম	ন্যায়সিদ্ধান্তমালা
রাধামোহন	ন্যায়সূত্রবিবরণ
মহাদেব ভট্ট (১৫৩০)	ন্যায়সূত্রবৃত্তি (মিতভাষিণী)
মুকুন্দদাস	ন্যায়সূত্রবৃত্তি
চন্দ্রনারায়ণ	ঐ
বিশ্বনাথ (১৬৩৪)	ঐ
নাগেশ (১৭১৪)	ন্যায়সূত্রবৃত্তি
২। বাচস্পতি মিশ্র (৮৪২)	ন্যায়সূচীনিবন্ধ, ন্যায়সূত্রোদ্ধার
৩। জয়ন্ত (৮৮০)	ন্যায়কলিকা
৪। ভাসর্বজ্ঞ (৯২৫)	ন্যায়সার
জয়সিংহ	ন্যায়সারটীকা (ন্যায়তাৎপর্য্যদীপিকা)
বাসুদেব কাশ্মীরিক	ন্যায়সারটীকা (পদপঞ্জিকা)
৫। উদয়ন (৯৮৪)	ন্যায়কুসুমাঞ্জলি
বর্দ্ধমান (১২২৫)	ন্যায়কুসুমাঞ্জলিটীকা (প্রকাশ)
রুচিদত্ত (১২১৫)	ন্যায়কুসুমাঞ্জলিটীকা (মকরন্দ)
বরদরাজ (১৪০০)	ন্যায়কুসুমাঞ্জলিটীকা
বামধ্বজ	ঐ
গুণানন্দ	ঐ (বিবেক)
গোপীনাথ মৌনী	ঐ (বিকাশ)
জয়রাম	ঐ (বিবরণ)
চন্দ্রনারায়ণ	ঐ
উদয়ন (৯৮৪)	আত্মতত্ত্ববিবেক
বর্দ্ধমান (১২২৫)	আত্মতত্ত্ববিবেকটীকা
মথুরানাথ (১৫৮০)	ঐ
হরিদাস মিশ্র (১৫৯০)	ঐ
৬। শ্রীকণ্ঠ (১০০০)	ন্যায়ালঙ্কার
৭। বরদাচার্য্য (১০৫০)	তার্কিকরক্ষা
নৃসিংহ ঠক্কুর	তার্কিকরক্ষাটীকা (প্রকাশিকা)
বিনায়ক ভট্ট	ঐ (ন্যায়কৌমুদী)
জ্ঞানপূর্ণ	ঐ
মল্লিনাথ (১৩৫০)	ঐ (নিষ্কণ্টক)
৮। বাসুদেব কাশ্মীরিক	ন্যায়ভূষণ
৯। অভয়তিলক (১৩৫০)	ন্যায়বৃত্তি
১০। গঙ্গেশোপাধ্যায় (১১৭৫)	তত্ত্বচিন্তামণি
বাসুদেব সার্ব্বভৌম (১৪৭৫)	তত্ত্বচিন্তামণিটীকা
উদয়দেব মিশ্র (১২৭৫)	তত্ত্বচিন্তামণিটীকা (তত্ত্বালোক)
হরিদাস মিশ্র (১৫৯০)	তত্ত্বালোকটীকা
হনুমান্	তত্ত্বচিন্তামণিটীকা (হনুমদীয়া)
পক্ষেশ্বর	তত্ত্বচিন্তামণিটীকা
বর্দ্ধমান (১২২৫)	তত্ত্বচিন্তামণিটীকা
তর্কচূড়ামণি	তত্ত্বচিন্তামণিটীকা (প্রকাশ)
রঘুনাথ (১৩০০)	তত্ত্বচিন্তামণিটীকা (তত্ত্বদীধিতি)
জগদীশ (১৫৯০)	তত্ত্বদীধিতিটিপ্পনী (জাগদীশী)
শঙ্করমিশ্র (১৬২৫)	তত্ত্বদীধিতিটিপ্পনী জাগদীশীটীকা

মথুরানাথ (১৫৮০)	তত্ত্বদীধিতিটীকা (মথুরানাথী)
মথুরানাথ	তত্ত্বদীধিতিটীকা (তত্ত্বালোকরহস্য)
ভবানন্দ (১৬০০)	তত্ত্বদীধিতিটীকা (ভবানন্দী)
শঙ্করমিশ্র	তত্ত্বদীধিতিটীকা (ময়ূখ)
গদাধর (১৬৫০)	তত্ত্বদীধিতিটীকা (গদাধরী)
রঘুনাথ শাস্ত্রী (১৮৬০)	গদাধরীটীকা (ন্যায়রত্ন)
১১। কেশব মিশ্র (১২৫০)	তর্কভাষা
... ...	তর্কভাষাটীকা (ন্যায়প্রদীপ)
চিন্নভট্ট (১৩৫০)	তর্কভাষাটীকা (চিন্নভট্টি)
ব্যঙ্কটাচার্য্য	চিন্নভট্টিটীকা
রামলিঙ্গ (১৪৬০)	তর্কভাষাটীকা
গোবর্দ্ধন (১৫৭০)	তর্কভাষাটীকা (তর্কভাষা-প্রকাশ)
মুরারি (১৬১০)	তর্কভাষাটীকা
শুভবিজয় (১৬১০)	তর্কভাষাটীকা (তর্কভাষাবিবরণ)
বিশ্বনাথ (১৬৩৪)	তর্কভাষাটীকা (ন্যায়বিলাস)
গৌরীকান্ত (১৬৫০)	তর্কভাষাটীকা (ভাবার্থ-দীপিকা)
মাধবদেব (১৬৫৫)	তর্কভাষাটীকা
সিদ্ধচন্দ্র (১৭৪০)	তর্কভাষাটীকা
মাধবভট্ট (১৭৭০)	তর্কভাষাটীকা
গণেশদীক্ষিত (১৭৮০)	তর্কভাষাটীকা (তত্ত্ব-প্রবোধিনী)
বাগীশ	তর্কভাষাটীকা (প্রসাদিনী)
কৌণ্ডিন্যদীক্ষিত	তর্কভাষাটীকা (প্রকাশিকা)
বলভদ্র	তর্কভাষাটীকা (প্রকাশিকা)
গুড়ু ভট্ট	তর্কভাষাটীকা
গোপীনাথ মৌনী	তর্কভাষাটীকা (উজ্জ্বলা)
ভাস্কর	তর্কভাষাটীকা (দর্পণ)
গোপীনাথ ঠক্কুর	তর্কভাষাটীকা (ভাব-প্রকাশিকা)
চৈতন্যভট্ট	তর্কভাষাটীকা (প্রকাশ)
নাগেশ (১৭১৪)	তর্কভাষাটীকা (যোগাবলি)
দিনকর	তর্কভাষাটীকা (কৌমুদী)
গঙ্গাধরভট্ট	তর্কভাষাটীকা
নারায়ণ	তর্কভাষাটীকা
১২। রঘুনাথ ভট্ট (১৩০০)	পদার্থখণ্ডন (পদার্থতত্ত্ব-নিরূপণ)
১৩। জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য (১৩০০)	ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী
যাদব	ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীটীকা (ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীসার)
শ্রীকণ্ঠ (১৫৩৫)	ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীটীকা (তর্কপ্রকাশ)
লৌগাক্ষিভাস্কর (১৬২৫)	ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীটীকা
বাসুদেব	ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীটীকা (ন্যায়রত্নাবলী)
কৃষ্ণবাগীশ	ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীটীকা
ত্রিলোচনদেব	ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীটীকা
শশধর	ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীটীকা (ন্যায়সিদ্ধান্তদীপ)
শেষানন্ত	ন্যায়সিদ্ধান্তদীপটীকা (প্রভা)
১৪। জীবরাজ (১৪৫০)	তর্ককারিকা, তর্কমঞ্জরী
১৫। বাসুদেব সার্ব্বভৌম (১৪৭৫)	সার্ব্বভৌমনিরুক্তি
১৬। গণেশদাস (১৫৭০)	ষোড়শপদার্থী
১৭। ভগীরথমেধ (১৫৭০)	দ্রব্যপ্রকাশিকা
১৮। মিত্রমিশ্র (১৫৮০)	পদার্থচন্দ্রিকা
১৯। জগদীশ (১৫৯০)	তর্কামৃত
২০। লৌগাক্ষিভাস্কর (১৬২৫)	পদার্থমালা
২১। মাধবদেব (১৬৫৫)	ন্যায়সার
২২। শশধর	ন্যায়সিদ্ধান্তদীপ
২৩। শ্রীনিবাস	ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী
২৪। অনন্ত	পদমঞ্জরী
২৫। চূড়ামণি	ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী
শ্রীকৃষ্ণ (১৭৮০)	ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীটীকা (ভাবদীপিকা)

অক্ষপাদ$_2$,—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (২৩.২১৬) লিখিত আছে—ভগবান্ রুদ্র প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন, ‘বারাহকল্পের সপ্তবিংশতি দ্বাপরে যখন তপোধন জাতুকর্ণ্য ব্যাস হইবেন, তখন আমিও দ্বিজবর সোমশর্ম্মা নামে বিখ্যাত হইব। তখন অক্ষপাদ, কণাদ, উলূক ও বৎস নামে চারিজন তপোধন পুত্র উৎপন্ন হইবে। এই পুত্রগণ যোগাত্মা, মহাত্মা, বিমল ও বিশুদ্ধবুদ্ধি হইয়া মাহেশ্বরযোগ অবলম্বনে রুদ্রলোকে প্রয়াণ করিবে।’ লিঙ্গপুরাণ (২৪.১২০-১২৪)-মতে, বারাহকল্পের সপ্তবিংশ দ্বাপরে প্রভাসতীর্থে সোমশর্ম্মা নামে যোগাচার্য্য শিবাবতার আবির্ভূত হ’ন। অক্ষপাদ তাঁহার চারিজন শিষ্যের অন্যতম।

অক্ষপাদ$_3$,—ন্যায়দর্শনের অনুবর্ত্তী দার্শনিক।

অক্ষপাদেশ্বর,—কাশীধামের প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ (স্কন্দপু°, কাশীখণ্ড)।

অক্ষপীড়া—[বৈদ্যক] যবতিক্তা লতা। [যবতিক্তা দ্র°]

অক্ষভাগ—অক্ষাংশ। [অক্ষাংশ দ্র°]

অক্ষভার—[স্থপতিবিজ্ঞানে] রথের নিম্নাংশ (মানসার ৪২.৫২-৫৩)।

অক্ষমা—এক রাজকুমার। ইনি সিংহলরাজ বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মার স্বয়ংবরসভায় আগত রাজকুমারদের মধ্যে অন্যতম।

অক্ষমালা,—বশিষ্ঠের পত্নী। ইনি প্রথমে শূদ্রকন্যা ছিলেন; কিন্তু মহর্ষির সংসর্গে তিনি বিলক্ষণ গুণবতী হইয়া উঠেন। মনুসংহিতায় একটী উদাহরণ আছে—

"যাদৃগ্‌গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রীসংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্‌গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা।
অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তাঽধমযোনিজা।
শারঙ্গীমন্দপালেন জগামাভ্যর্হণীয়তাম্।" (৯.২২,২৩)

যেমন নদীর জল সুস্বাদু হইলেও সমুদ্রে পড়িয়া তাহা লবণাক্ত হয়, তদ্রূপ স্ত্রীলোক যেমন পুরুষকে বিবাহ করেন, তাঁহার গুণও তাদৃশ হইয়া থাকে। অক্ষমালা শূদ্রকন্যা, কিন্তু বশিষ্ঠকে বিবাহ করিয়া তিনি পূজনীয়া হইয়াছিলেন, এবং শারঙ্গী মন্দপাল ঋষিকে বিবাহ করিয়া সম্মান লাভ করেন।

বশিষ্ঠের আরও অনেক স্ত্রী ছিলেন। তন্মধ্যে অরুন্ধতী ও উর্জ্জা প্রধান। উর্জ্জা সপ্তর্ষিগণের মাতা। শক্তি প্রভৃতি অন্যান্য সন্তান অপর স্ত্রীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। (ভাগবত ৪.১.৩২-৩৩; বিষ্ণুপু° ১.১০.১৩)।

অক্ষমালা,—জপের জন্য ব্যবহৃত মালা। রুদ্রাক্ষ ও কমলাক্ষ-ভেদে দুই প্রকার। ব্রহ্মা, সরস্বতী, শিব প্রভৃতি দেবদেবীর হস্তে এই মালা দেখিতে পাওয়া যায়।

কাচ, স্ফটিক, স্বর্ণ প্রভৃতির গুটিকা বা মালা অতি প্রাচীনকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কতবার ভগবানের নাম করা হইল বা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হইল, তাহা স্মরণ রাখিবার জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠানেও এগুলি ব্যবহৃত হইত। জগতের অধিকাংশ স্থানে কোন না কোনরূপ এই শ্রেণীর মালা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অক্ষমালা কতদিন হইতে ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছে, তাহার যথার্থ সংবাদ ইতিহাস দিতে পারে না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায়, স্মরণাতীত কাল্ হইতে ভারতে অক্ষমালার—রুদ্রাক্ষ বা কমলাক্ষমালার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে।

এসিয়া মহাদেশেই বোধ হয় ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য এই শ্রেণীর মালার ব্যবহার প্রথম হইয়াছিল; তবে এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারা যায় না যে, একদেশে ইহার প্রথম প্রচলন হইয়া দেশান্তরে ইহার বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। কারণ, স্মরণ রাখিবার এরূপ সহজ উপায় তো আর কিছু নাই; সকল দেশেই ইহা উদ্ভাবিত হইতে পারে। দক্ষিণ আমেরিকায় পেরুবাসীরা স্মরণ রাখিবার জন্য বিন্দু বা গ্রন্থির মালা ব্যবহার করে। এদিকে ইহারা এতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছে যে, সরকারি কাগজ-পত্রের হিসাব পর্য্যন্ত ইহার সাহায্যে রাখিয়া থাকে। এই লিখন-পদ্ধতিকে গ্রন্থি-লেখ (Knot-writing) বলা যায়। বিভিন্ন রকমের গ্রন্থি বিভিন্ন ভাবের দ্যোতক। বিভিন্ন সূত্রেরও বিভিন্ন অর্থ আছে। কথিত আছে, যুয়াং-চিং-চের (Yung-ching-che) সময় চীনদেশে ছোট ছোট রজ্জুতে বিভিন্ন রকমের গ্রন্থির সাহায্যে লিখন-কার্য্য চলিত। গ্রন্থিগুলির আকৃতি ও দূরত্ব অনুসারে বিভিন্ন প্রকার অর্থ বুঝাইত। চীনদেশের পদ্ধতি দক্ষিণ আমেরিকার পেরুবাসীদের মতই। জাপানের বৌদ্ধদিগের সিন্‌গোন্ শ্রেণীর লোকেরা একরূপ গ্রন্থি ব্যবহার করিত। তাহাতে দুইটী গ্রন্থির একত্র সমাবেশ থাকিত এবং তাহা মূলগ্রন্থি হইতে নিম্নদেশে ঝুলিত। প্রাচীন চীনা ভাষায় 'মানুষ' বুঝাইতে এইরূপ গ্রন্থি ব্যবহৃত হইত; কারণ বুদ্ধদেবের নানাগুণের প্রকাশ ইহার দ্বারাই তাহারা করিত।

ব্যাবহারিক বিষয়েও স্মরণ রাখিবার জন্য অনেক দেশে গ্রন্থির প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। গায়নার ইণ্ডিয়ান্‌-দিগের ভিতর যখন 'পাইবারী' (Paiwari) ভোজের অনুষ্ঠান চলিত, তখন নিমন্ত্রণকারী গ্রন্থিযুক্ত মালা রচনা করিয়া প্রত্যেক দলের কর্ত্তাকে একটী মালা দিতেন এবং তিনিও প্রত্যহ এক একটী গ্রন্থি খুলিয়া কবে যে ভোজের আয়োজন হইবে তাহা স্মরণ করিয়া রাখিতেন। এরূপ গ্রন্থিবিশিষ্ট মালা ভোজের দিনের স্মারকচিহ্ন। মধ্যপূর্ব্ব আফ্রিকার ওয়াগোগো জাতি স্ত্রীলোকদের গর্ভ এইরূপ গ্রন্থিদ্বারা মনে করিয়া রাখে। ভারতবর্ষেও স্মরণার্থ রুমালের, কোচার বা জামা বা পায়জামার খুঁটে গ্রন্থি বাঁধিবার নিয়ম প্রচলিত আছে। এখনও মিশরে প্রাচীন-পন্থী গ্রীসদেশীয় গির্জ্জায় স্মরণার্থ মালার ব্যবহার দেখা যায়। ['মালা' শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্র°]

সাধারণতঃ হিন্দুরা অক্ষ—রুদ্রাক্ষ বা কমলাক্ষ বা তুলসীর মালা ব্যবহার করিয়া থাকেন। সংস্কৃতে এরূপ মালাকে জপমালা, অক্ষমালা বা স্মরণী নামে অভিহিত করা হয়। ইষ্টদেবের উদ্দেশে কতবার জপ করা হইল, তাহা স্মরণ রাখিবার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থার প্রথম প্রচলন হয়। হিন্দুরা যে এইরূপ প্রাত্যহিক জপের প্রচলন করিয়াছিলেন কেবল কতবার জপ করা হইল তাহা স্মরণ রাখিবার জন্য তাহা নয়, কারণ

তাঁহারা করণীয় সংখ্যা অপেক্ষা বহুবার ধরিয়া এরূপভাবে জপ করিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে চিন্তাশক্তির প্রসারতা বৃদ্ধি করিবার জন্য সাধু-সন্ন্যাসীরা এইরূপ জপ করিয়া থাকেন।

হিন্দুদিগের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর জন্য বিভিন্ন রকমের অক্ষমালা ব্যবহৃত হইবার প্রথা প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ শৈবেরা রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করেন, শাক্তেরা কমলাক্ষ ও বৈষ্ণবেরা তুলসীর মালা ব্যবহার করেন। আবার হিন্দুউপাসকদিগের ভিতর বিভিন্ন উপাস্য দেবতা হইলেও হিন্দুরা ধর্ম্মবিষয়ে এরূপ উদারতা দেখান যে, বিভিন্নরূপ অক্ষ বা তুলসীর মালা ইহারা ধারণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। অক্ষের সংখ্যাও ধর্ম্মমতের পার্থক্যহেতু দেখিতে পাওয়া যায়। রুদ্রাক্ষ ও কমলাক্ষের ব্যবহারের পৃথক্ পৃথক্ উদ্দেশ্য আছে। শৈবেরা ৩২টী বা ৬৪টী অক্ষ, বৈষ্ণবেরা ১০৮টী অক্ষ ব্যবহার করেন। প্রত্যেক মালার শেষে একটী পৃথক্ অক্ষ থাকে; গণনার ভিতর এটীকে ধরা হয় না। ইহাকে 'সাক্ষী' অক্ষ বলা হয়। এটী যেন দ্রষ্টা—মালা ঠিক মত চলিতেছে কিনা দেখিতেছেন। অনেক সাধু সন্ন্যাসীর মালায় আবার শত সহস্র অক্ষও দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শৈবেরা রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করিয়া থাকেন। একমুখী রুদ্রাক্ষের মালার গুণ অসীম। একমুখী রুদ্রাক্ষ যাঁহারা হস্তে বা গলদেশে ধারণ করেন, তাঁহাদের উপর ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি পড়ে ও তাঁহারা দেবতার নিকট হইতে নানারূপ অনুগ্রহলাভে সমর্থ হ'ন। এরূপ রুদ্রাক্ষ ধারণ-কারী যদি কোন মতে হস্ত হইতে রুদ্রাক্ষটী খুলিয়া না ফেলেন, তাহা হইলে প্রায়শঃ তাঁহার রুদ্রাক্ষটী চুরি যায়; সুতরাং যে ভাগ্যবান্ পুরুষ এইরূপ রুদ্রাক্ষ কোনগতিকে সংগ্রহ করিতে পারেন, তিনি উহা স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত রক্ষা করিয়া থাকেন। অনেকের বিশ্বাস, এরূপ রুদ্রাক্ষ গৃহে থাকিলে গৃহের মঙ্গল হয়। আসল একমুখী রুদ্রাক্ষ কেবলমাত্র সিদ্ধযোগীদের নিকট হইতে পাওয়া যায়। ইহা পাইতে হইলে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে হয়। অর্থের বিনিময়েই যে সকল সময় ইহা পাওয়া যায় তাহা নহে, কারণ সিদ্ধ সন্ন্যাসীরা কামিনী-কাঞ্চনবিরাগী, ইঁহাদের সেবা যত্ন করিয়া অনেকে এরূপ রুদ্রাক্ষ পাইয়া থাকেন, আবার কেহ কেহ ইঁহাদের অহৈতুক প্রীতিবশেও পাইয়া থাকেন। কুমারব্রতাবলম্বী যোগীরা একাদশমুখী রুদ্রাক্ষ এবং বিবাহিত যোগীরা দুইমুখী রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করেন। বলিশ্রেষ্ঠ হনুমান্জীর সেবকেরা সাধারণতঃ পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করেন।

অমসৃণ রুদ্রাক্ষবীজ ব্যবহার হইতে মনে হয় শৈবদের কঠোর তপশ্চর্য্যার ইহা প্রতীক মাত্র। শৈব কিংবদন্তী হইতে জানিতে পারা যায় রুদ্রাক্ষের উৎপত্তি রুদ্র বা মহাদেবের আঁখিজল হইতে হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে একসময়ে দেবাদিদের মহাদেব ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া পড়িলে তাঁহার চক্ষু দিয়া জল নির্গত হইয়া রুদ্রাক্ষের সৃষ্টি হয়। কাহারও কাহারও মতে আবার জানিতে পারা যায়, দুঃখে বা আনন্দের আতিশয্যে মহাদেবের চক্ষু হইতে জল নির্গত হইয়া রুদ্রাক্ষের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার আঁখিজল দানা বাঁধিয়া রুদ্রাক্ষের রূপ ধারণ করিয়াছে। পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ দেবতার পঞ্চ বিভিন্নভাবের দ্যোতক।

বাঙ্গলাদেশের অনেক সন্ন্যাসী রুদ্রাক্ষের মালাকে ভাগ করিয়া অঙ্গে অলঙ্কারের ন্যায় ধারণ করে। ২৭টী অক্ষের মালা তাঁহারা কনুইএ, কব্জিতে ৫টী করিয়া ও কর্ণে ৩টী করিয়া অক্ষের দুল ধারণ করে।

কাহারও মতে হিন্দুরা যখন বাসনা চরিতার্থ করিতে চান তখন রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

অক্ষমালা ও যাদুমন্ত্র

অনেক সময় অক্ষমালা ও যাদুমন্ত্রের পার্থক্য বড় একটা দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে অক্ষমালাও অনেক সময় যাদুমন্ত্রের মত কাজ করিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। দক্ষিণ-মির্জ্জাপুরে একটী আখড়ায় একটী পবিত্র বাদ্যযন্ত্র আছে ইহাকে 'নাগদমন' বলা হয়, কারণ সর্পদিগকে দমন করিবার ইহার মত শক্তি আর কোন কিছুরই নাই। সাপের হাড়ের মালা প্রস্তুত করিয়াই এই বাদ্যযন্ত্রের সহিত সংযুক্ত করা থাকে। একটী মালা সংযুক্ত থাকিলে তেমন ফল লাভ হয় না, এইরূপ দুইটী মালা বাদ্যযন্ত্রের সহিত সংযুক্ত থাকিলে তবে সাফল্য লাভ করা যায়। সাধারণলোকেরা এই বাদ্যযন্ত্রকে অনেক সময় পূজা করিয়া থাকে এবং ইহার সহিত যে সকল হাড়ের টুক্‌রা থাকে, সেগুলির একখণ্ড বা কয়েকখণ্ড মণিবন্ধে বাঁধিয়া রাখিলে অনেক রোগী রোগমুক্ত হইয়া যায়; এরূপ বিশ্বাস অনেকের আছে। সাপুড়েরা ভারতের সর্ব্বত্র যে তুবড়ী বাজাইয়া সাপ খেলাইয়া থাকে, উহার গাত্রে এই হাড়ের মালা বা অক্ষমালা জড়াইয়া রাখে। ইহার গুণে সাপেরা সাপুড়িয়াদিগের বশে থাকিয়া নির্বীর্য্য হইয়া পড়ে। মুসলমান ফকিরেরা সাপের মেরুদণ্ড হইতে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া মালা প্রস্তুত করিয়া অঙ্গে ধারণ করেন, আবার কখনও কখনও উষ্ণীষে লাগাইয়া থাকেন। এইরূপ এক টুক্‌রা হাড় লইয়া বাতগ্রস্ত ব্যক্তিকে ধারণ করাইলে

বাত আরাম হইয়া যায়। মার্কণ্ডেয়পুরাণ, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, রুদ্রযামল, বিশ্বকর্ম্মশিল্প, বৃহৎসংহিতা, মন্ত্রমহার্ণব, শিল্পরত্ন, অংশুমৎভেদাগম, সুপ্রভেদাগম, শ্রীতত্ত্বনিধি, শিবতত্ত্বরত্নাকর, রূপমণ্ডন, কুমারতন্ত্র, পূর্ব্বকারণাগম প্রভৃতি গ্রন্থানুসারে যে দেবদেবীর যে অঙ্গে অক্ষমালা ভূষিত, নিম্নে তাহা লিখিত হইল—

চতুর্ভুজা বা অষ্টভুজা দুর্গাদেবীর একটী বামহস্তে; চতুর্ভুজা মহাকালীর একহস্তে; অষ্টাদশভুজা ভদ্রকালীর একটী বামহস্তে; দ্বিভুজা মঙ্গলা, গৌরী, উমা, পার্ব্বতী, রম্ভা, ও তোড়লার একহস্তে; চতুর্ভুজা ত্রিপুরাবাসিনী, দ্বিভুজা রতি, চতুর্ভুজা কৃষ্ণা, ভদ্রা ও বালা, দ্বিভুজা সরস্বতী, ব্রাহ্মী ও মাহেশ্বরীর এক বামহস্তে; অষ্টভুজ চন্দ্রশেখর, চতুর্ভুজ আলিঙ্গন-চন্দ্রশেখর, চতুর্ভুজ পাশুপতশিব, চতুর্ভুজ উমা-মহেশ্বর, চতুর্ভুজ কামান্তক মহাদেব, ষোড়শভুজ গজান্তক মহাদেব, ব্রহ্মশিরশ্ছেদক চতুর্ভুজ ভৈরব এবং দ্বাত্রিংশভুজ অঘোর শিবমূর্ত্তির বামদিকে একহস্তে; যোগদক্ষিণ, জ্ঞানদক্ষিণ ও ব্যাখ্যানদক্ষিণ চতুর্ভুজ শিবমূর্ত্তির দক্ষিণহস্তে; কঙ্কাল, অর্দ্ধনারীশ্বর, হরিহর ও কল্যাণসুন্দর শিবের বাম-হস্তে; চতুর্ভুজ ঈশান, দশভুজ মহেশ ও ষড়্ভুজ অঘোর মূর্ত্তির একটী দক্ষিণহস্তে; চতুর্ভুজ চণ্ডেশ্বর শিবের এক দক্ষিণ-ভুজে; চতুর্ভুজ ব্রহ্মার কোথাও দক্ষিণ কোথাও বা বামদিকের একটী ভুজে; ষোড়শভুজ অজ, একপাদ ও অহির্বুধ্নের বামদিকের একটী ভুজে; বিরূপাক্ষ ও রেবতের দক্ষিণ-দিকের একহস্তে; চতুর্ভুজ সুব্রহ্মণ্য মূর্ত্তির কোনটীর বামভুজে কোনটীর বা দক্ষিণভুজে; তারকারি, ব্রহ্মশাস্তা, বল্লীকল্যাণ-সুন্দর মূর্ত্তির বামভুজে; চতুর্ভুজা সাবিত্রীর এক দক্ষিণভুজে; ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দিক্‌পাল চতুর্ভুজ হইলে একটী বামহস্তে; চতুর্ভুজ অষ্টবসুর মধ্যে ১ম ধরের পশ্চাৎ দক্ষিণভুজে, ২য় ধ্রুবের সম্মুখ দক্ষিণহস্তে, ৫ম অনিলের পশ্চাৎ দক্ষিণভুজে ও ৬ষ্ঠ অনলের সম্মুখ দক্ষিণভুজে। দ্বিভুজ নাগদেবতা (অষ্টনাগ) প্রত্যেকের দক্ষিণহস্তে এবং সকল প্রকার গণপতি মূর্ত্তির একহস্তে অক্ষমালা দেখা যায়। [Elements of Hindu Iconography, Vol. I, part i মূর্ত্তির রূপ দ্রষ্টব্য]

[E. B. Tylor—Researches into the Early History of Mankind, 1865, pp. 154-158; A. Y. Gognet—Origins des lois, des arts, et des Sciences, Paris, 1758, iii, 332; J. A. M. de Moyria de Maillac, Hist. ge'nde la Chine, Paris 1777-85, i, 4; Journal of Asiatic Society of Japan, ix, 1881, p. 177; E. F. in Thuru, Among the Indians of Guiana, London, 1883, p. 319f; H. Cole. Jai xxxii, 1902, p. 323; R. C. Temple—P. N. Q. ii, 1884-1885, p. 571 & iii, 608; Monier-Willams—Modern India and the Indians, p. 108-110; W. Crooke-Things Indian, London, 1906, p. 408-9; G. Rao—Elements of Hindu Iconography.]

অক্ষমালা—তীর্থবিশেষ (তাপীখণ্ড)।

অক্ষমালাপ্রতিষ্ঠা—একখানি গ্রন্থের নাম।

অক্ষমালী—শিবের নাম (মহাভা°, শান্তি°; ব্রহ্মাণ্ডপু° ৩০.২০৬)।

অক্ষয়—পর্ব্বতবিশেষ (হরিব°—২.৯৮.১৫)। ২ বার্হস্পত্য ষষ্টি সংবৎসরের ২০শ বর্ষ।

অক্ষয়কুমার ঘোষ—একজন প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গ-কবিতা-রচয়িতা। বাসস্থান ছিল বর্দ্ধমান জেলায়; জাতিতে ছিলেন গোপ। ইনি উৎকলবাসী কায়স্থ-কবি সুন্দরদাসের 'কবির'দলের বাদ্যকর ছিলেন। ইনি ইঁহার গুরু সুন্দর-দাসের মত সুন্দর বাঙ্গলা লিখিতে পারিতেন। সংস্কৃত-সাহিত্যেও ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইঁহার পুত্র নটবর ঘোষ ২৪পরগণার মধ্যে একজন বিশিষ্ট 'কবিওয়ালা' বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত—বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত নবদ্বীপের দুই ক্রোশ উত্তর চুপীগ্রামে পীতাম্বর দত্তের ঔরসে ও দয়াময়ীর গর্ভে সন ১২২৭ সালের ১লা শ্রাবণ শনিবার বঙ্গজ কায়স্থকুলে অক্ষয়কুমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রপিতামহ রাজবল্লভ দত্ত পূর্ব্বদেশ হইতে চুপীগ্রামে আসিয়া বসতিস্থাপন করিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার 'হাতেখড়ি' হইয়াছিল, কিন্তু গ্রামে কোন গুরু মহাশয় না থাকায় বিদ্যারম্ভ হয় নাই। ৭ম বর্ষ হইতে ১০ম বর্ষ পর্য্যন্ত গ্রাম্য পাঠশালায় বাঙ্গলা লেখাপড়া ও বাড়ীতে সামান্য ফার্শী শিখিয়া অক্ষয়কুমার কলিকাতার খিদিরপুরে পিতার নিকট আসেন। কলিকাতায় আসিয়া বালক অক্ষয়কুমার ইংরেজী শিখিবার জন্য ব্যগ্র হ'ন। তাঁহার পিতৃব্যপুত্র হরমোহন দত্ত ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। অক্ষয়কুমার প্রথমে তাঁহার নিকট ইংরেজী শিক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে সময়াভাবে তিনি জয়কৃষ্ণ সরকার বা 'জয় মাষ্টারের' নিকট অক্ষয়কুমারের ইংরেজী শিখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার অধ্যাপনায় পরিতৃপ্ত না হইয়া তাঁহাকে কোন ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। এই সময়ে খিদিরপুরে খৃষ্টান মিশনারীদের একটী অবৈতনিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। অক্ষয়কুমার স্বেচ্ছায় সেই স্কুলে ভর্ত্তি হ'ন। ১৬ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতৃব্যের আজ্ঞানু-সারে কলিকাতায় গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েন্টাল

সেমিনারীতে পঞ্চম শ্রেণীতে তাঁহাকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। এই সময়ে কলিকাতায় আসিয়া অক্ষয়কুমার তাঁহার পিসতুতো-ভাই রামধন বসুর বাসায় থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অসামান্য পরিশ্রমের ফলে মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হ'ন। পর বৎসর কাশীধামে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটিলে, তাঁহারই উপর সংসারপ্রতিপালনের ভার পড়িল। এদিকে বিদ্যালয়েও এক বৎসরের মাহিনা অনাদায় পড়িয়া রহিয়াছে; সুতরাং নানা প্রতিবন্ধকতাহেতু অক্ষয়কুমার স্কুল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু স্বাবলম্বী অক্ষয়কুমার জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে বহু পুস্তক



অক্ষয়কুমার দত্ত

কর্জ্জ লইয়া পাঠ করিয়া আপনার জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে লাগিলেন। ১৯ বৎসর বয়সে তিনি কিছুকালের জন্য জনৈক সংস্কৃত অধ্যাপকের নিকট সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করিয়াছিলেন।

এই সময় কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত অক্ষয়কুমারের পরিচয় হয়। তাঁহারই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া অক্ষয়-কুমার প্রথমে পদ্য পরে গদ্য লিখিতে আরম্ভ করেন। 'প্রভাকরেই' তাঁহার সর্ব্বপ্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অক্ষয়কুমারকে অত্যধিক স্নেহ করিতেন, আবার রচনার গাম্ভীর্য্য, চিন্তাশীলতা ও পারিপাট্য দেখিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধাও করিতেন। তিনিই অক্ষয়কুমারকে মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। ১২৪৭ সালে (১৭৬২ শকে) 'তত্ত্ববোধিনী' পাঠশালা স্থাপিত হয়— অক্ষয়কুমার মাত্র ৮৲ টাকা বেতনে এই পাঠশালায় ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হ'ন। এই সময়ে তাঁহার প্রথম পুস্তক (ভূগোল) রচিত হয়। পরে তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইয়া চৌদ্দ টাকা ধার্য্য হয়।

১২৫০ সালে এই পাঠশালা কলিকাতা হইতে বাঁশ-বেড়িয়ায় স্থানান্তরিত হইলে, অক্ষয়কুমার শিক্ষকতাকার্য্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হ'ন। ঈশ্বরচন্দ্র অক্ষয়কুমারকে টাকীর চৌধুরীবাবুদেরও সহিত পরিচয় করিয়া দেন। এই সময় হইতে তাঁহাদের বরাহনগরের বাটীতে 'নীতি-তরঙ্গিণী' নামক সভায় মাসে মাসে তিনি তাঁহার জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করিতেন।

ইহার পর অক্ষয়কুমার 'তত্ত্ববোধিনী' সভার সহকারী-সম্পাদক নিযুক্ত হ'ন। দুই বৎসর পরে ১২৫২ সালে তিনি উক্ত পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। দশ বৎসরকাল ধরিয়া তিনি এই পত্রিকার সম্পাদনকার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনা করিয়া-ছিলেন। বিবিধ বিষয়ের সরল প্রবন্ধমালায় তিনি পত্রিকার গৌরব বৰ্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় পদার্থবিদ্যা, দর্শন, প্রাণিবিদ্যা, ধর্ম্মনীতি, ও মনস্তত্ত্ববিষয়ক জটিল সমস্যাগুলি তিনি ভাষান্তরিত করিয়া বঙ্গবাসীর জ্ঞান-ভাণ্ডার বৰ্দ্ধিত করিবার সুযোগ করিয়া দেন। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধেও তিনি বহু প্রবন্ধ লিখিয়া যা'ন। এই সময়ে তাঁহার বেতন ছিল মাত্র ষাট টাকা।

তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা এত অধিক ছিল যে, তিনি ছাত্রদের সহিত একত্রে মেডিকেল কলেজে ১ম বর্ষে রসায়ন ও ২য় বর্ষে উদ্ভিদ্-বিদ্যা বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। তাহার পর তিনি জর্মনভাষা ও ভূতত্ত্ববিদ্যার অনুশীলন করেন।

১২৬২ সালে কলিকাতায় নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত হইলে মহানুভব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় অক্ষয়কুমার ১৫০৲ টাকা বেতনে তাহার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হ'ন। কাজেই তাঁহাকে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদন-কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হয়। অবশ্য তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাংসারিক অস্বচ্ছলতার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাঁহাকে এ কার্য্য করিতে হইয়াছিল; কিন্তু 'তত্ত্ববোধিনীর' প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতে তিনি কোন দিনই বিরত ছিলেন না। সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি নিয়মিতভাবেই বাহির হইতে লাগিল। মাদকসেবনের অপকারিতা সম্বন্ধে তিনি বহু জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই বৎসর আষাঢ় মাসে একদিন অক্ষয়কুমার ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় বসিয়া মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়েন। ইহাই তাঁহার উৎকট শিরোরোগের সূত্রপাত। এই সময় তিনি অধিকক্ষণ ধরিয়া কোন

গভীর বিষয়ে চিন্তা করিতে পারিতেন না। এরূপ অবস্থাতেও তিনি 'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়' দুইভাগ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ৩১ বৎসরকাল তাঁহাকে এই ভীষণ রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

শেষ বয়সে তিনি হুগলীর 'মোহন উদ্যান' নামক বাগানবাটীতে নির্জ্জনে বাস করিতে থাকেন। এই বাটী তিনি তাঁহার ইচ্ছামত সুসজ্জিত করিয়াছিলেন ও উদ্যানে নানাবিধ তরুলতাগুল্ম বসাইয়াছিলেন। এইখানেই অক্ষয়কুমার ১২৯৩ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার রাত্রি ৩টা ১৫ মিনিটের সময় ৬৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

আজীবন দুঃখ ও অভাব-অভিযোগের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি অপরের দুঃখ বুঝিতেন এবং নানাভাবে বিপন্নের দুঃখ ও অভাব মোচনে তৎপর ছিলেন। তিনি নিরামিষাশী ছিলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মমত পোষণ করিতেন।

নিম্নে আমরা তাঁহার পুস্তকাবলীর একটী ধারাবাহিক তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

'ভূগোল' (১২৪৭) ; 'বিদ্যাদর্শন' মাসিক-পত্রিকা (১২৪৯), মাত্র ৬ মাসকাল প্রকাশিত হইয়াছিল ; 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা-সহ-সম্পাদক (১২৫০) ; ঐ সম্পাদক (১২৫২-১২৬২) ; 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার', ১ম ভাগ, (১২৫৮, মাঘ) ; 'চারুপাঠ', ১ম ভাগ, (১২৫৮, শ্রাবণ) ; 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার', ২য় ভাগ, (১২৫৯) ; 'চারুপাঠ', ২য় ভাগ, (১২৬১) ; 'পদার্থবিদ্যা' (১২৬৩) ; 'চারুপাঠ' ৩য় ভাগ, (১২৭০) ; 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়', ১ম ভাগ, (১২৭৭) ; 'ধর্ম্মনীতি' (১২৮৩, মাঘ) ; 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়', ২য় ভাগ, (১২৮৯, চৈত্র)।

অক্ষয়কুমার বড়াল—বঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ কবি। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার চোরবাগানপল্লীস্থ শ্রীনাথ রায়ের গলিতে সুবর্ণবণিকবংশে অক্ষয়কুমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালীচরণ বড়াল। ইঁহাদের আদি নিবাস ফরাসডাঙ্গা, চন্দননগর। ইঁহারা তিনপুরুষ ধরিয়া কলিকাতায় বাস করেন। কলিকাতা ইম্‌প্রুভমেন্ট-ট্রাষ্ট-কর্ত্তৃক অক্ষয়কুমারের পৈতৃক ভিটা গৃহীত হইয়াছে।

বাল্যে অক্ষয়কুমার হেয়ার-স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু তাঁহার বিদ্যালয়ের শিক্ষা অধিকদূর অগ্রসর হইতে পায় নাই। জ্ঞান-পিপাসা তাঁহার এতদূর বলবতী ছিল যে, সারাজীবন তিনি অধ্যয়ন-রত ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি কোন নূতন পুস্তকের সন্ধান পাইলেই তাহা সংগ্রহ করিয়া পাঠ না করিয়া ছাড়িতেন না। পাঠদ্দশায় তিনি কবিগুরু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর বাটীতে যাতায়াত করিতেন। বিহারীলালের প্রদর্শিত পথে যখন রবীন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ সেন, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সে যুগের নবীন কবিরা আসিয়া পথিক হইয়াছিলেন, অক্ষয়কুমারও তাঁহাদের দলে যোগ দিয়া নব্যবঙ্গের কাব্যালোকে নব-প্রভাতের কাকলিধ্বনি করিয়াছিলেন।



অক্ষয়কুমার বড়াল

বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া তিনি কলিকাতার 'দিল্লী এণ্ড লণ্ডন ব্যাঙ্কে' হিসাব-বিভাগে কর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত হ'ন। বহুদিন এস্থলে কার্য্য করিবার পর ব্যাঙ্কের কর্ম্মাধ্যক্ষের সহিত মনোমালিন্য ঘটায় তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। পরে তিনি 'North British Life Insurance Company'র অফিসে প্রধান কর্ম্মচারীর পদ পাইয়া তথায় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছিলেন।

সন ১২৮৯ সালে সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত "বঙ্গদর্শনে" অক্ষয়কুমারের 'রজনীর মৃত্যু' নামক সুদীর্ঘ প্রথম কবিতা এবং ১২৯০ সালের চৈত্র মাসে তাঁহার প্রথম খণ্ডকাব্য 'প্রদীপ' প্রকাশিত হয়। 'প্রদীপ' পাঠ করিয়া বাঙ্গলার শিক্ষিত-সমাজ ইঁহার কবিত্বের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ১২৯২ সালের আশ্বিন মাসে 'কনকাঞ্জলি' নামক দ্বিতীয় কাব্য ও ১২৯৪ সালে তাঁহার তৃতীয় কাব্য-গ্রন্থ 'ভুল' প্রকাশিত হয়। ১৩১৩ সালে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইলে তিনি ব্যথিতচিত্তে

লোকান্তরিত পত্নীর উদ্দেশে 'এষা' নামে একখানি অতি উপাদেয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৩১৭ সালে অক্ষয়কুমারের শেষ কাব্য-গ্রন্থ 'শঙ্খ' প্রকাশিত হয়। ১৩১১ সালের বৈশাখ মাসে তিনি শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত "সাহিত্য"পত্রিকায় ওমার খৈয়মের অনুকরণে ২৭টী কবিতা-স্তবকে 'পান্থ' নামক কবিতা প্রকাশ করেন। ১৩১৮ সালে উহার আরও ২৪টী স্তবক প্রকাশিত হয়। বঙ্গ-সাহিত্যে এই অনুবাদের যে একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, তাহা কাব্যরসিকমাত্রেই স্বীকার করেন। চণ্ডীদাসের জীবনের ঘটনাবলী লইয়া তিনি একখানি নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাহার চারি অঙ্কের অধিক তিনি লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার সর্ব্বশেষ-রচিত কবিতা 'স্বজাতি-সম্ভাষণ' সুবর্ণ-বণিক্ সম্মিলনীর ১৩২৫ সালের অধিবেশনে চুঁচুড়ায় পঠিত ও "সুবর্ণ-বণিক সমাচারে" প্রকাশিত হয়।

অক্ষয়কুমারের কবিতা যে বাঙ্গালী পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার কারণ তিনি বাঙ্গালীর চিত্তের সুখদুঃখের কাহিনী ভাবের অনুভূতি দিয়া অনাড়ম্বর সরলভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত চিত্র বাঙ্গালীর প্রাণে একটা স্থায়ী দাগ রাখিয়া যায়। 'কনকাঞ্জলি' ভিন্ন তাঁহার অন্যান্য কাব্যের একাধিক সংস্করণ হইতে পাঠক-সমাজে তাঁহার কাব্যের আদরের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে 'কনকাঞ্জলি' সম্বন্ধে একটা কথা বলা আবশ্যক। সুকবি মানকুমারী-রচিত 'কনকাঞ্জলি' নামে আর একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ থাকায় অক্ষয়কুমার প্রথম সংস্করণের সমস্ত পুস্তক শেষ হইয়া গেলেও ২য় সংস্করণ প্রকাশ করেন নাই। 'কনকাঞ্জলি'খানি কবির বড় আদরের কাব্য ছিল। অক্ষয়-কুমারের প্রত্যেক কাব্যেই কবির একখানি করিয়া ফটো আছে। এ ফটোর বৈশিষ্ট্য হইতেছে, যে বয়সে কাব্যখানি প্রকাশিত হইয়াছে, সেই বয়সেরই চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বেশভূষা বা চালচলনে অক্ষয়কুমারের সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের পরিচয় সম্যক্ পাওয়া না গেলেও তাঁহার প্রকাশিত কাব্যের কাগজ, মলাট ও মুদ্রণের দিক্ দিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের পরিচয় বেশ পাওয়া যায়। অক্ষয়কুমারের শব্দানুভূতি এত সূক্ষ্ম ছিল যে, যতক্ষণ না প্রকৃত শব্দটী বসাইতে পারিতেন, ততক্ষণ তিনি ঐ শব্দের অন্বেষণে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ভাবিতেন। শব্দসমষ্টিগত সৌন্দর্য্যসৃষ্টি দ্বারা তিনি সাহিত্যে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ১৩২৬ সালের শ্রাবণ মাসে অক্ষয়কুমার অবিনশ্বর যশঃ রাখিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

অক্ষয়কুমারের রচনায় কবিগুরু বিহারীলালের প্রভাব যথেষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে; এমন কি, অক্ষয়কুমারের পরিণত বয়সের কবিতায় ও শব্দে, ছন্দে ও ঝঙ্কারে 'সারদা-মঙ্গলের' প্রতিধ্বনি নানাস্থানে পরিস্ফুট হইয়াছে। গীতি-কবিতায় যখন সকলে নিত্য নূতন রাগরাগিণীর বিচিত্র সুর বাজাইতে-ছিলেন, তখন অক্ষয়কুমার তাঁহার সেই গুরুমন্ত্রের মতন পরিচিত সুরের সাধনা লইয়াই তন্ময় ছিলেন। অতীতের সেই সুরে গ্রথিত অক্ষয়কুমারের রচনায় এমন এক মধুর রস ও সরল শ্রী আছে যাহা অন্যত্র সুদুর্ল্লভ। শব্দকুশলী কবি ভাবকে প্রকাশ করিবার জন্য উপযুক্ত চলিত ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের সাহায্য লইয়াছেন, কখনও সৃষ্টিছাড়া নূতন শব্দের প্রচলন করেন নাই, বা বৈচিত্র্য আনয়ন করিবার জন্য গম্ভীরভাবকে কখনও চপলছন্দের সাহায্যে প্রকাশ করেন নাই।

অক্ষয়কুমারের কাব্যসমূহের মধ্যে 'এষাই' সর্ব্বপ্রধান। বহু সমালোচকের মতে ইহা টেনিসনের বন্ধু-বিয়োগে রচিত 'In Memoriam' অপেক্ষাও কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ। তুলনায় সমালোচনা না করিয়াও একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায়, 'এষা' বাঙ্গালীর গার্হস্থ্যজীবনের একখানি সুন্দর আলেখ্য। প্রকৃতি-বর্ণনা এবং প্রণয় ও শোকবিষয়ক কবিতা রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

অক্ষয়কুমারের হৃদয় সহানুভূতিতে পূর্ণ ছিল। শতকার্য্য ফেলিয়াও তিনি অপরের কোন উপকার করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করিতেন। তাঁহার বন্ধুপ্রীতি ছিল অসাধারণ। কবি-বন্ধুদের রচনা অল্প পরিবর্ত্তন কিংবা কবিতার কয়েক চরণ একস্থান হইতে অন্য স্থানে বসাইয়া কবিত্বের সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া দিতে তাঁহার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—বঙ্গের একজন সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। ১২৬৮ সালের ১লা মাঘ শুক্রবার অপরাহ্ণে নদীয়া জেলার সিমলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মথুরানাথ মৈত্রেয়, মাতার নাম সৌদামিনী দেবী। ইঁহারা বারেন্দ্রশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ।* ইঁহার মাতামহ রাজসাহীর বৈদ্যনাথ বাগ্‌চী মহাশয় সংস্কৃত ও পার্শীভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ গোপীকৃষ্ণ চট্টগ্রামে ওকালতী করিতেন। ইঁহার পুত্র উমাকান্ত কোন বিষয়কর্ম্ম করিতেন না। তিনি তিনটী বিবাহ করেন। মথুরানাথ তাঁহার প্রথম

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকাণ্ডে অক্ষয়কুমারের রচিত নিজের পারিবারিক ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে।

পক্ষের সন্তান। ইঁহারা রাজসাহীর অন্তর্গত গুড়নই গ্রামের প্রসিদ্ধ মৈত্রেয়বংশ। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ কামদেব মৈত্রেয় ফরিদপুর জেলার নিকটবর্ত্তী মেঘনা গ্রামের জমিদারবংশে বিবাহ করিয়া পৈত্রিক ভিটা ছাড়িয়া আসেন। ফরিদপুর জেলায় রুক্মিণী গ্রামে কামদেবের বংশধরগণ বাস করিতে আরম্ভ করেন। নীলকরদিগের দৌরাত্ম্যে রুক্মিণী গ্রাম হইতে তাঁহার পিতামহী পুত্র-কন্যা লইয়া তাঁহার পিত্রালয় কুমারখালি গ্রামে পলাইয়া আসেন। কুমারখালির হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ) ও অক্ষয়কুমারের পিতা মথুরানাথ বাল্য-বন্ধু ছিলেন ও একযোগে কুমারখালির বহু উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন।



অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

এই সময়ে মথুরানাথ কুমারখালি ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। হরিনাথ ও মথুরানাথের বন্ধুবান্ধবদের তখন আদর্শ সাহিত্যগুরু ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। হরিনাথই তাঁহাদের গুরুদেবের নাম স্মরণে বালকের নাম রাখিয়াছিলেন 'অক্ষয়কুমার' এবং উত্তরকালে তিনিই অক্ষয়কুমারের সাহিত্যগুরু ছিলেন। কাঙ্গালের সাহিত্যিক ছাত্রদের ভিতর তিনজন যশস্বী হইয়াছিলেন। 'ফিকির', 'ফকির', ও 'মুসাফির'। এই 'ফিকির'ই হইতেছেন অক্ষয়কুমার। 'ফকির' ছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব। দুইজনেই এখন স্বর্গগত। জীবিত আছেন 'মুসাফির' জলধর সেন। এই তিনজনেই হরিনাথের বঙ্গবিদ্যালয়ে একসঙ্গে বিদ্যারম্ভ করেন এবং তিনজনেই তাঁহারই নিকট বিদ্যা ও রচনাশিক্ষায় উপদেশ পাইয়াছিলেন।

মথুরানাথ ওকালতী পরীক্ষা দিবার জন্য রাজসাহী গমন করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে বৎসর পরীক্ষা গৃহীত হয় নাই। পরে তিনি সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া রাজসাহীবাসী হ'ন। বালক অক্ষয়কুমার দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কখন কুমারখালিতে, কখনও বা রাজসাহীতে থাকিতেন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বোয়ালিয়া গবর্ণমেণ্ট-স্কুলে অক্ষয়কুমারের ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষার সূত্রপাত হয়। তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের নিকট, পণ্ডিত শিবচন্দ্রের পিতা চন্দ্রকুমার তর্কবাগীশের নিকট, রামকুমার বিদ্যারত্নের (স্বামী রামানন্দ ভারতী) নিকট এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া রাজসাহী বিভাগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হ'ন এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে পনর টাকা বৃত্তি পা'ন। পরে ঐ কলেজ হইতে এফ-এ পরীক্ষায় রাজসাহী বিভাগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া কুড়ি টাকা বৃত্তি পা'ন। এই সময় পাবনা জেলার অন্তর্গত তাঁতিবন্দনিবাসী প্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় অন্নদাগোবিন্দ চৌধুরীর তৃতীয়া কন্যা হৃদ্‌কমল দেবীর সহিত অক্ষয়কুমারের বিবাহ হয়। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ কলেজেই রসায়ন ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষা দিবার জন্য পাঠ সমাপ্ত করেন; কিন্তু এই সময় অধ্যয়নশ্রমে অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহার পিতা তাঁহাকে এম-এ পরীক্ষা হইতে নিরস্ত করেন ও ওকালতী পরীক্ষা দিবার জন্য পাঠার্থ রাজসাহীতে লইয়া যা'ন। রাজসাহী হইতে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ওকালতী আরম্ভ করেন।

সাহিত্য-সাধনা-সম্বন্ধে অক্ষয়কুমারের নিজ লিখিত বিবরণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

'শৈশবে যে পাঠানুরাগ ও বঙ্গসাহিত্যানুরাগ লাভ করিয়াছিলাম, তাহা ক্রমে বাল্যকাল হইতেই বিকশিত হইয়াছে। প্রথমে আমি কবিতা লিখি; বক্তিয়ার খিল্‌জির বঙ্গ-বিজয়ের প্রচলিত বিবরণ যে সর্ব্বথা কাল্পনিক, এই ধারণায় বঙ্গ-বিজয় নামে আমি প্রথম কাব্য লিখি। ঐ গ্রন্থ বর্ত্তমান নাই। গৃহদাহে অপ্রকাশিত বাল্য-রচনা পুড়িয়া গিয়াছে। বাল্যকালের অনেকগুলি রচনা রাজসাহীর 'হিন্দুরঞ্জিকা' ও কুমারখালির 'গ্রামবার্ত্তায়' প্রকাশিত হইয়াছিল। লর্ড

লিটন প্রেস এ্যাক্ট পাশ করায় বৃদ্ধ হরিনাথকে অবসর দিয়া, আমি, জলধর ও প্রসন্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক হরিনাথের জনৈক ছাত্র 'গ্রামবার্ত্তার' সম্পাদনভার গ্রহণ করি। এই কালের মধ্যে স্বদেশের নানা ঐতিহাসিক বিবরণ ঐতিহাসিক চিত্র নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিবার কল্পনা করি। বঙ্গাব্দ ১২৯০ সালে সমরসিংহ নামক গ্রন্থ প্রকাশ করি। এই গ্রন্থ বিদ্যালয়ের বালকগণের মধ্যে অতি অল্প সময়েই বিক্রীত হইয়া যায়। ইহার লভ্য জাতীয় ধনভাণ্ডারে উৎসর্গীকৃত হয়। এফ-এ পড়িবার সময় মেকলের ক্লাইব এবং হেষ্টিংসের গ্রন্থ আমাদের পাঠ্য ছিল। ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন উপলক্ষে রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক ডাউডিং সাহেবের সহিত প্রত্যহ আমার বচসা হইত। মেকলের বর্ণনা যে প্রকৃত নহে, তাহা সাহেবকে বুঝাইবার জন্য আমি নানা প্রমাণের অনুসন্ধান করিতাম। এই অনুসন্ধানকার্য্য দীর্ঘকাল পরিচালিত হয়। তদুপলক্ষে বাঙ্গলার ইতিহাসের আমি বহু বিবরণ সংগ্রহ করি, তদবলম্বনে বাঙ্গলার ইতিহাস লিখিবার জন্য বন্ধুগন আমাকে উপদেশ দান করেন। ইতিহাস লিখিবার সময় আসে নাই বলিয়া, রাণী ভবানীর জীবন-চরিত উপলক্ষ করিয়া, ঐ সময়ের ঐতিহাসিক বিবরণ প্রকাশ করিবার সংকল্প করি। কতকগুলি বিশেষ ঘটনায় 'রাণী ভবাণী' প্রকাশে বিলম্ব ঘটায়, 'সিরাজ-উদ্দৌলার' ঐতিহাসিক চিত্র কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'সাধনা' নামক মাসিক-পত্রিকায় প্রেরিত হয়। কিয়দংশ প্রকাশিত হইবার পর 'সাধনা' বন্ধ হইয়া যায়। 'সিরাজ-উদ্দৌলার' অবশিষ্টাংশ 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে 'সাহিত্যে' সীতারামের ঐতিহাসিক চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে 'সাহিত্যে' রাণী ভবানীর প্রথমাংশ ও 'ভারতী'তে 'মীরকাশিম' সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। 'মীরকাশিমে'র কিয়দংশ 'মীরজাফর' নামে 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করিলে, তাঁহার সহায়তায় এবং তাঁহার প্রস্তাবে, 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামক ত্রৈমাসিক পত্রের সম্পাদনভার গ্রহন করি। ঐ পত্র এক বৎসরের অধিক চলে নাই।

বড়লাট লর্ড কার্জ্জন যখন গৌড় দেখিতে যা'ন, তখন হিন্দুদের সময়ে গৌড় কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরীর অনুরোধে লর্ড কার্জ্জনের পাঠের জন্য আমি Gaur under the Hindus নামক এক ইংরেজী প্রবন্ধ রচনা করি। এ গ্রন্থ কেবল বিতরণার্থ মুদ্রিত হয়।'

পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আহুত হইয়া অক্ষয়কুমার "Pal Kings of Bengal" নামে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটী মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

অক্ষয়কুমার এসিয়াটিক সোসাইটির মেম্বর ছিলেন এবং এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে লক্ষ্মণসেনের তাম্রলিপি ও বহু গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতে স্বদেশ-সেবার জন্য তিনি আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন ও নানা সভাসমিতির সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি রাজসাহী ছাত্রসভা, কলিকাতা ষ্টুডেন্ট্স্ এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এবং রাজসাহী এসোসিয়েশনের উদ্যোগী সভ্য ছিলেন। সাত বৎসরকাল রাজসাহী এসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন। রাজসাহীর মিউনিসিপ্যালিটী, লোকালবোর্ড ও ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সভ্যরূপে বহুকাল কার্য্য করিয়াছেন। তিনি নির্ব্বাচক হইবার জন্য কখনই প্রার্থী হইয়া দাঁড়ান নাই। প্রতিবারেই তিনি সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছেন। কয়েকবার সরকার কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপক সভার সদস্যও মনোনীত হইয়াছেন।

সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল। রসায়ন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রেও তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। রেশম-শিল্প সম্বন্ধে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ডায়মণ্ড-জুবিলীর সময় বক্তৃতায় বত্রিশ হাজার টাকা উঠিলে, ঐ টাকায় রাজসাহীতে একটী রেশম-শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অক্ষয়কুমার পাঁচ বৎসরকাল এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে যে শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হয়, তাহাতে অক্ষয়কুমার বহু লোকের সমক্ষে রেশমশিল্প-সম্বন্ধীয় নানা কার্য্যকলাপ প্রদর্শন করিয়া অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের প্রশংসা অর্জ্জন করেন। এ সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্টেও ইঁহার কার্য্যাবলীর প্রশংসা বাহির হইয়াছে।

রাজসাহীতে ইনি শকুন্তলা, বেণীসংহার প্রভৃতি সংস্কৃত নাটক অভিনয়ের সূত্রপাত করেন। ইঁহার উদ্যোগে রাজসাহীতে যে সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হয়, তাহা দেখিয়া তদানীন্তন ছোটলাট উড্‌বর্ন্ সাহেব পরম প্রীতিলাভ করেন। মদনগোপাল গোস্বামী, পণ্ডিতবর যাদবেশ্বর তর্করত্ন, বর্দ্ধমান-রাজ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হরিনাথ বেদান্তবাগীশ প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী এই অভিনয় দেখিয়া সংস্কৃত শ্লোক-রচিত অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন।

অক্ষয়কুমার ক্রিকেট খেলায় সুপটু ও চিত্রাঙ্কনে সিদ্ধহস্ত

ছিলেন। সরকার বাহাদুর ইঁহাকে সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত করিয়া প্রকৃত গুণীর আদর করিয়াছেন। ইনি অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন, মাতাকে প্রণাম না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। ১৩৩৬ সালের ২৭এ মাঘ অক্ষয়কুমার ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—বঙ্গের একজন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সমালোচক। ১২৫৩ সালের (১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের) ২৭এ অগ্রহায়ণ হুগলী জেলার চুঁচুড়া কদমতলার পৈতৃক বাটীতে অক্ষয়চন্দ্রের জন্ম। তাঁহার পিতার নাম রায় গঙ্গাচরণ সরকার বাহাদুর।



অক্ষয়চন্দ্র সরকার

[গঙ্গাচরণ সরকার দ্র°] তৎকালে তিনি নদীয়ার কালেক্টরীর সেরেস্তাদার ছিলেন। এই আমলাগিরি ও শিক্ষকতা কার্য্য ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২৬এ মে হইতে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। এই তিন বৎসরের মধ্যেই তিনি আইনের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন নদীয়া জেলার হাঁসখালির মুন্সেফ হ'ন। তখন কাছারী ছিল উলা-বীরনগরে।

দশবৎসর বয়স পর্য্যন্ত অক্ষয়চন্দ্র পিতার সহিত উলায় থাকিয়া লেখাপড়া করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা তখন সেখানে সপরিবারে থাকিতেন। দশবৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি 'তিন বারকার' "বার্ষিক প্রভাকর" পড়িয়া মুখস্থ করিয়াছিলেন। উলায় তখন তিনটী স্কুল থাকিলেও তিনি কোন স্কুলে পড়েন নাই, বাড়ীতেই পড়িয়াছিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে অক্ষয়চন্দ্র উলা ত্যাগ করেন। এই সময়ে তিনি নন্দকুমার রায়কৃত অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নাটকের বাঙ্গলা পদ্যানুবাদ পাঠ করিয়া সম্যক্ অর্থগ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন।

উলা হইতে চুঁচুড়ায় আসিয়া ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন অক্ষয়চন্দ্র হুগলী কলিজিয়েট্ স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে সেকেণ্ড নম্বর রীডারের ক্লাশে ভর্ত্তি হ'ন। দ্বিতীয় শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই দুই মাস পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার বিশেষ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া তিনি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ২০৲ টাকা বৃত্তি পা'ন। এই সময়ে ১৭ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার সহধর্ম্মিণী সৌদামিনী অসাধারণ বুদ্ধিমতী ছিলেন বলিয়া অক্ষয়চন্দ্র-সম্পাদিত প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'সাধারণী' পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পর হইতে বঙ্কিমচন্দ্র আদর করিয়া তাঁহাকে "অসাধারণী" বলিয়া ডাকিতেন। ১২৯৭ সালে তিনি অকালে মারা যা'ন। অক্ষয়চন্দ্র হুগলী কলেজ হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এফ-এ, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বি-এ, এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বি-এল পাস করিয়াছিলেন।

ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অক্ষয়চন্দ্র বহরমপুরে ওকালতী করিতে প্রবৃত্ত হ'ন। সেই সময় তাঁহার পিতা বহরমপুরে সদর মুন্সেফ ছিলেন। মাত্র পাঁচ বৎসর তিনি ওকালতী করিয়াছিলেন। ওকালতীতে তিনি বিশেষ কৃতকার্য্য হইলেও ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর বায়ুরোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁহাকে ওকালতী ছাড়িয়া দিয়া চুঁচুড়ায় আসিয়া জননীর সেবার জন্য বাস করিতে হয়। অক্ষয়চন্দ্র তাঁহার জনক-জননীর একমাত্র সন্তান এবং জনক-জননী ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন বয়স্থ আত্মীয় বা আত্মীয়া ছিলেন না।

তখন বহরমপুর বিদ্বজ্জনমণ্ডলীদ্বারা পূর্ণ ছিল। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডক্টর রামদাস সেনের বাটী বহরমপুর। তাঁহার লাইব্রেরীতে বিস্তর বাঙ্গলা ও সংস্কৃত পুস্তক ছিল। ভারতবর্ষসম্বন্ধীয় ইংরেজী পুস্তকও বিস্তর ছিল। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব-প্রণেতা পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বহরমপুর কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। বাঙ্গলার ইতিহাস-লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সময়ে বহরমপুরে ওকালতী করিতেন। প্রসিদ্ধ ব্যাকরণকার লোহারাম শিরোরত্ন মহাশয় বহরমপুর নর্ম্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ

ছিলেন। তখন গঙ্গাচরণ সরকার মুন্সেফ, দীনবন্ধু মিত্র পোষ্টাল ইন্‌স্পেক্টর এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বহরমপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এই সকল সাহিত্যিক জ্যোতিষ্কের একত্র সমাবেশে বহরমপুর তখন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, বাঙ্গলা চর্চ্চার মাহেন্দ্রযোগ ঘটিয়াছিল।

বহরমপুরে এই বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর সমাবেশের অপূর্ব্ব পরিণতি বঙ্গে বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব। ১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' মাসিকপত্র প্রকাশিত হইল। প্রথম সংখ্যা বঙ্গদর্শনে অক্ষয়চন্দ্রের 'উদ্দীপনা' নামক প্রবন্ধ বাহির হইল। এই বহরমপুরেই অক্ষয়চন্দ্রের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম পরিচয়; সেই পরিচয় ক্রমে বয়ঃপার্থক্য অতিক্রম করিয়া অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল।

১২৮০ সালের ১১ই কার্ত্তিক চুঁচুড়া হইতে অক্ষয়চন্দ্র সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাধারণী' প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। 'বঙ্গদর্শনের' সহিত 'সাধারণী'ও কাঁটালপাড়ার বঙ্গদর্শন-যন্ত্রালয় হইতে মুদ্রিত হইত। অক্ষয়চন্দ্র 'সাধারণী' সম্পাদন করিতেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত একযোগে বঙ্গদর্শনে লিখিতেন। তিনিই প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে বঙ্গদর্শনে 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' করিতেন। এই বঙ্গদর্শনেই অক্ষয়চন্দ্রের 'গ্রাবু', 'দশমহাবিদ্যা' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"বঙ্গদর্শনের অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ তাঁহারই প্রণীত। * * * তাঁহার প্রণীত সেই সকল প্রবন্ধগুলির সবিশেষ আলোচনা করিলে, অনেকেই স্বীকার করিবেন যে, অক্ষয়বাবুর ন্যায় প্রতিভাশালী গদ্য-লেখক অল্পই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।" এতদ্‌ভিন্ন বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'কমলাকান্তের দপ্তরের' ৬ষ্ঠ সংখ্যায় অক্ষয়-চন্দ্র-লিখিত 'চন্দ্রালোকে' এবং চতুর্দ্দশ সংখ্যায় 'মশক' প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সাদরে 'চন্দ্রালোকে' প্রবন্ধটীকে কমলাকান্তের দপ্তরভুক্ত করিয়াছেন। ১২৮১ সালে শ্রাবণ মাসে অক্ষয়চন্দ্র চুঁচুড়ার কদমতলায় নিজের বসত বাড়ীর সংলগ্ন স্বতন্ত্র বাটীতে 'সাধারণী যন্ত্রালয়' স্থাপন করিয়া 'সাধারণী' প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সরল ভাষায় রাজনীতি আলোচনা করিবার জন্য এবং জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ প্রকাশ করিবার জন্য 'সাধারণী' পরিচালিত হইত। ইহাতে বিশুদ্ধ সাহিত্যের আলোচনাও থাকিত প্রচুর, আর 'সাধারণীর' বৈশিষ্ট্য ছিল নির্ভীক, নিরপেক্ষ অথচ সরল সমালোচনা। অক্ষয়চন্দ্র বঙ্গের অদ্বিতীয় সমালোচক ছিলেন। ১৩ বৎসর যোগ্যতার সহিত 'সাধারণী' প্রচারিত হইয়া বাঙ্গালীকে রাজনীতির অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়াছিল। 'সাধারণী'র মতামত রাজসকাশে আদৃত হইত। 'বঙ্গবাসী'-পত্রিকার সত্বাধিকারী যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের হাতেখড়ি এই সাধারণীতে। [যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু দ্রঃ] ১২৯৩ সালে নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এবং ভবানীপুরের এল-এম-এস কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ মহাশয় সম্পাদিত 'নববিভাকর' পত্রিকা সাধারণীর সহিত মিলিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র এই 'নববিভাকর-সাধারণী' সম্পাদন ও প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন।

১৮৭২ সালের গুড্‌ ফ্রাইডের ছুটীর সময় চুঁচুড়ায় শ্যামবাবুর ঘাটের প্রসিদ্ধ মল্লিকবাড়ীতে অক্ষয়চন্দ্রের উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় হয়। মফস্বলে বাঙ্গলা নাটকের ইহাই প্রথম অভিনয়। অভিনয়ের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম,—দৃশ্যপট, বেশভূষা, ষ্টেজ, চুল প্রভৃতি অক্ষয়চন্দ্রের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইয়াছিল; তিনি এবং বঙ্কিমচন্দ্র উভয়ে মিলিয়া নাটকের অনেক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্রই অভিনেতৃবর্গকে অভিনয় শিক্ষা দিয়াছিলেন। সমাগত সুধীবৃন্দ এই অভিনয় দর্শনান্তে মুগ্ধ হইয়া মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

১২৯১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ম্যালেরিয়ায় জর্জ্জরিত হইয়া অক্ষয়চন্দ্র 'সাধারণী-যন্ত্রালয়' কলিকাতায় উঠাইয়া আনিলেন। এই সালের শ্রাবণ মাস হইতে তিনি 'নবজীবন' মাসিক-পত্রিকা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নির্জীব হিন্দুসমাজে সজীবতা আনয়ন করিবার জন্য, বাঙ্গালীর প্রাণে ধর্ম্মের সত্য আলোক বিকিরণ করিবার জন্য, বাঙ্গালীকে নবজীবন প্রদান করিবার জন্য তিনি 'নবজীবন' পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে প্রকারে 'নবজীবনের' জন্ম হয় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

এই সময়ে বঙ্কিমবাবু কলিকাতায় থাকিতেন। তাঁহার প্রতাপ চাটুর্জ্যে লেনের বাড়ীতে প্রতি রবিবারে সাহিত্য-বৈঠক বসিত। অন্যান্য সাহিত্যিকের সহিত অক্ষয়বাবুও ইহাতে যোগ দিতেন। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় এই সময় কলিকাতায় আসিয়া হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছিলেন। একদিন আল্‌বার্ট হলের এক সভায় তিনি হিন্দুধর্ম্মকে বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর স্থাপন করিবার প্রস্তাব করিয়া এক বক্তৃতা দেন। অক্ষয়চন্দ্র 'সাধারণী'তে তাহার প্রতিবাদ করিয়া লিখিলেন, 'ধর্ম্মই সকলের আশ্রয়। সেই ধর্ম্মই আবার

বিজ্ঞানে আশ্রয় লইবে কেন? ইহা লইয়া আলোচনা চলিতে লাগিল। ফলে 'নবজীবন' প্রকাশিত হইল, ইহাতে অক্ষয়চন্দ্র হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

'নবজীবন' পাঁচ বৎসর ধরিয়া যোগ্যতার সহিত চলিয়াছিল। 'সাধারণী' ও 'নবজীবন' অক্ষয়চন্দ্রের কীর্ত্তিস্তম্ভ। এই 'নবজীবন' ও 'সাধারণী'তে বাঙ্গলার অনেক সাহিত্যিকের হাতেখড়ি হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রসিদ্ধ নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং প্রসিদ্ধ সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, অক্ষয়চন্দ্র তাঁহাদের সাহিত্যগুরু; সাহিত্যিক-জীবনের প্রারম্ভে তাঁহার সময়োচিত অমূল্য উপদেশ, পরামর্শ, উৎসাহ এবং সর্ব্বোপরি রচনার যথোপযুক্ত সংশোধন ও পরিবর্ত্তনই তাঁহাদের ভবিষ্য সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ। চট্টগ্রামে ষষ্ঠ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে অক্ষয়চন্দ্রকে সভাপতিরূপে বরণ করিতে গিয়া কূটরাজনীতিজ্ঞ প্রবীণ বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বিঘোষিত করিয়াছিলেন,—"আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র শুধু আমার সাহিত্যগুরু নহেন,—তাঁহার সাধারণী পড়িয়াই রাজনীতির ক-খ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ-পড়া পর্য্যন্ত শিখিয়াছি।" আর বঙ্গবাসীর যোগেন্দ্রচন্দ্র অক্ষয়চন্দ্রের হাতেগড়া পূরামাত্রায় সাহিত্য-শিষ্য, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া "ভারত-রাজরাজেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ করিলে লর্ড লিটনের অধিনায়কতায় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে যে প্রথম দরবার হইয়াছিল, সেই দরবারে 'সাধারণী'-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণীতে এবং নবজীবনে নিয়মিতভাবে লিখিতেন। নবজীবনে প্রকাশিত 'ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা', 'অনুশীলন' প্রভৃতি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী-জাত। কিন্তু অক্ষয়চন্দ্রের সহিত তাঁহার আচার ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধে মতের অনৈক্য হওয়ায় তিনি 'প্রচার' প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। সাহিত্যক্ষেত্রে বিরোধী মত পোষণ করিলেও তাঁহাদের আন্তরিক মিল যথেষ্ট ছিল।

১২৯৭ সালে অকালে অক্ষয়চন্দ্রের পত্নীবিয়োগ হইলে, পাঁচমাসের কনিষ্ঠ পুত্র এবং অন্য ছয়টী সন্তানকে লইয়া তিনি অতিশয় বিব্রত হইয়া পড়েন। ফলে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে নববিভাকর-সাধারণী ও নবজীবন প্রকাশ বন্ধ করিয়া চুঁচুড়ায় গিয়া বাস করিতে হয়।

বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবায় অক্ষয়চন্দ্রের একনিষ্ঠা অনন্যসাধারণ। তিনি তাঁহার পিতার নিকটে সাহিত্য-সাধনার দীক্ষা পাইয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে পিতা গুরু—পুত্র শিষ্য; কিন্তু শিষ্যের খ্যাতি গুরুর খ্যাতিকে পরাভূত করিয়াছিল।

অক্ষয়চন্দ্রের অধিক রচনা পুস্তকাকারে সংগৃহীত হয় নাই। তাঁহার রচনায় দেশাত্মবোধের যে শিক্ষা বাঙ্গালী পাইবে, অতি অল্প লেখকের রচনায় তাহা পাওয়া যায়। তিনি যখন যাহা-কিছু লিখিয়াছেন, তাহাই দেশাত্মবোধে ও স্বাদেশিকতায় ওতপ্রোত। তিনি বঙ্কিম-মণ্ডলের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি। তিনি যখন দেশাত্মবোধের প্রচারক হইয়া সারা বাঙ্গলায় বীজমন্ত্র প্রদান করিতেছিলেন, তৎপূর্ব্বেই অক্ষয়চন্দ্রের মনে সেই ভাবের উদয় হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হইবার অনেকদিন পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনেই অক্ষয়চন্দ্র 'দশমহাবিদ্যা' শীর্ষক প্রসিদ্ধ প্রবন্ধে ভারতমাতার দশ দশা বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"আমার বোধ হয় যে, এই ভারতবর্ষের দশ দশাই দশমহাবিদ্যা। এক্ষণে সপ্তমী দশা চলিতেছে, সেই দশার প্রতিমূর্ত্তিই ধূমাবতীমূর্ত্তি।" কিন্তু তাহার পর "মাতা আবার বগলামূর্ত্তিতে দেখা দিবেন। ভারতমাতা আবার রত্নসিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হইবেন, ভারতমাতা আবার সুভূষণে ভূষিতা হইবেন। এমন দিন হইবে। * * * ইহার পরেই ভারতের মাতঙ্গী মূর্ত্তি। ভারতমাতা আপনার চিরপরিচিত দয়ার বশবর্ত্তিনী হইয়া সেই করকবলিত শত্রুকে বিমুক্ত করিয়াছেন; আত্মরক্ষার্থ খড়্গ-চর্ম্ম ধারণ করিয়াছেন; শাসনাস্ত্র পাশাঙ্কুশ পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়াছেন; রত্নপদ্মাসনে রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া বিরাজ করিতেছেন।" ইহাই কিন্তু শেষ নহে। "ইহার পর মা 'মহালক্ষ্মী'-রূপে ভবে দেখা দিবেন,— * * * ভারতমাতার যুগযুগান্তরের মলরাশি শ্বেত হস্তিগণ অমৃতবারি সেচনে বিধৌত করিয়া দিতেছে। ভারতমাতা অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন; পদ্মাসনে পদ্মাসনা পদ্মহস্তে জগতে অভয় দান করিতেছেন। আহা কি শুভ দিন! শরীর রোমাঞ্চ হয়। সকলে একবার আনন্দধ্বনি কর। ভারতমাতার অভিষেক হইতেছে। মাতা যোগিনীমূর্ত্তি, রাজ্ঞীমূর্ত্তি, এমন যে ভুবনে অতুলা ভুবনেশ্বরীমূর্ত্তি;—মাতা তাহা গ্রহণ করেন নাই; মা এখন মহালক্ষ্মীভাবে শোভা পাইতেছেন; সকলে জয়ধ্বনি কর।" এই জয়ধ্বনিই—'বন্দে মাতরম্'। ইহার সহিত 'আনন্দমঠের' মাতৃমূর্ত্তি তুলনীয়।

বাঙ্গলাকে তিনি যেমন ভাল করিয়া জানিতেন, তেমন ভাল করিয়া জানা অনেক বাঙ্গালী সাহিত্যিকের ক্ষমতার

অতীত। যাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসা বলে, সেই প্রাণ দিয়া ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়—অক্ষয়চন্দ্রের বাঙ্গলার প্রতি ও বাঙ্গালীর প্রতি ভালবাসায়। আর কোন কারণে না হইলেও কেবল সেই কারণেই অক্ষয়চন্দ্র বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা-ভাজন। তিনি যে ভাবে দেশকে ভালবাসিতেন, তাহারই কথায় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলিয়াছেন,—'দশের কুকুর ধরি—বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।' কিসে বাঙ্গালী ভাল থাকিবে, কিসে বাঙ্গালী বড় হইবে—কিসে বাঙ্গালী তাহার নষ্ট স্বাস্থ্য ও সম্পদ্ ফিরিয়া পাইবে—তাহাই ছিল অক্ষয়চন্দ্রের চিন্তার বিষয়। বাঙ্গালী তাঁহার চিন্তার কেন্দ্র ছিল। অক্ষয়চন্দ্রের দেশপ্রেমের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। সে ভালবাসা তাঁহার ধাতুতে ছিল—তাঁহার হৃদয়ের উৎস হইতে উৎসারিত হইয়া রচনার মধ্য দিয়া অবাধে প্রবাহিত হইত। তাহা গঙ্গার প্রবাহের মত পবিত্র, তাহার পাবনী শক্তিও অসাধারণ।

আজকাল আমরা সাহিত্যে—রচনায় যে প্রকৃত শিল্পীর নৈপুণ্যের অভাব অনুভব করি, অক্ষয়চন্দ্রের রচনায় সে অভাব নাই। তিনি অতি ক্ষুদ্র রচনাও সরস ও সুন্দর করিতেন। তাই তাঁহার রচনা চিরসুন্দর এবং তাহা বাঙ্গলা রচনার অন্যতম আদর্শ হইয়া থাকিবে। চুঁচুড়ায় পঞ্চম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে এবং পরবৎসর চট্টগ্রামের বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের মূল সভাপতিরূপে তিনি যে দুইটী মহামূল্য অভিভাষণ বঙ্গসাহিত্যে দান করিয়া গিয়াছেন, সে দুইটী—দেশাত্মবোধে এবং স্বাদেশিকতায় ভরপূর—অপূর্ব্ব সাহিত্য-সুষমা।

চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'পৃথিবীর সুখদুঃখ' পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"এক অক্ষয়চন্দ্র বাঙ্গালীর ঘরের কথা ও মনের কথা ভক্তের ন্যায় ভালবাসেন, এবং পাঁতি পাঁতি করিয়া দেখেনও বটে।... অক্ষয়চন্দ্রের হৃদয় যে অতলস্পর্শ।"

১৩২৪ সালের (১৯১৭ খৃঃ) ১৬ই আশ্বিন, ৭১ বৎসর বয়সে, কদমতলা, চুঁচুড়ার বাড়ীতেই অক্ষয়চন্দ্রের মৃত্যু হয়। তাঁহার সমস্ত জীবন মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। প্রথম বাইশ বৎসর পঠদ্দশা, দ্বিতীয় একুশ বৎসর (অর্থাৎ ১২৭৫ হইতে ১২৯৬) সাহিত্যময় জীবন এবং তৃতীয় আটাশ বৎসর সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখিয়াছেন যে তাহা,—"যমে মানুষে টানাটানির পালা,—কখন যম জিতিতেছে, কখন আমি জিতিতেছি।" ১২৯৫ সালে গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয় যোগ্য-ধামে গমন করিলেন,—বিসূচিকা রোগে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। অক্ষয়চন্দ্রের মাথায় সহসা আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি গঙ্গাচরণের একমাত্র সন্তান। পিতৃবিয়োগই তাঁহার প্রথম ও প্রধান শোক। তাঁহার একটানা খরস্রোত সাহিত্য-সেবায় বাধা পড়িল,—একনিষ্ঠ সাধকের সাধনায় বিঘ্ন ঘটিল। অতঃপর ক্রমাগত উপর্য্যুপরি মৃত্যুশোকে অত বড় তেজস্বী, মনস্বী, দৃঢ়চেতা পুরুষকে একটু যেন বিচলিত করিয়া তুলিল। ১২৯৭ সালে সাতটী ছোট ছোট সন্তানকে রাখিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী পরলোক-গমন করিলেন; ১২৯৯ সালে তাঁহার জননী, ১৩০৭ সালে তাঁহার ২৬ বৎসর বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরচন্দ্র এবং পর পর কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জামাতার মৃত্যু হয়। এমনি করিয়া বর্ষের পর বর্ষ গিয়াছে, আর অক্ষয়চন্দ্রের বুকের এক একখানি পাঁজরা খসিয়া গিয়াছে। তাই এই আটাশ বৎসরের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় অনন্যকর্ম্মা হইয়া একমনে একধ্যানে বাণীর সেবা করিবার সুযোগ ও সুবিধা তাঁহার হয় নাই। কিন্তু তবুও তিনি সাহিত্যচর্য্যা ও সাহিত্যসেবা করিতে বিরত হ'ন নাই। এই সময়ের মধ্যেই তাঁহার 'পিতাপুত্র', 'সনাতনী' ও 'কবি হেমচন্দ্র' প্রকাশিত হইয়াছিল; এই সময়ে তিনি 'বঙ্গবাসী' ও 'পূর্ণিমা'র নিয়মিত লেখক ছিলেন, এবং অন্যান্য মাসিক পত্রিকা মধ্যে মধ্যে তাঁহার সরস, সরল, সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য হইত; এই সময়ে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন-উপলক্ষে তিনটী উপাদেয় ও জ্ঞানগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন; এতদ্ভিন্ন তাঁহার বাটীতে স্থাপিত 'হিন্দুসমিতির' তরুণ সভ্যগণকে লইয়া সর্ব্বদা সাহিত্যালোচনা করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। তাঁহার শেষ রচনা মৃত্যুর ১৫।২০ দিন পূর্ব্বে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

রাজনীতি ক্ষেত্রে অক্ষয়চন্দ্র ছিলেন গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতায় রাষ্ট্রশাসন-প্রণালীর আমূল সংস্কার-পন্থী। তিনি 'সাধারণীর' সূচনা-পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"সাধারণী ইংরেজ-কৃত উপকার চিরকাল স্মরণ-পটে অঙ্কিত করিয়া রাখিবে, ও কেবল কৃতজ্ঞতা-স্বীকার জন্য নহে, নিজ স্বার্থাভিলাষে, স্বদেশের স্বার্থাভিলাষে, রাজ্য-বিপ্লবে অত্যন্ত ভীত ও বিপ্লবকারিগণকে চিরকালই নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিবে। * * * এই পত্রিকা বর্ত্তমান রাজত্বের স্থায়িত্ব আকাঙ্ক্ষা করে—স্থায়িত্বের আকাঙ্ক্ষা করে বটে, কিন্তু রাজ্যপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তনও ইহার বাঞ্ছনীয়। দুঃখের বিষয় এই যে, ইংরেজে অদ্যাপি রাজা শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা শাসন করিতেই ব্যস্ত, আইন করিতেই ব্যস্ত, ধনসংগ্রহ করিতে যেমন ব্যস্ত, ধনব্যয় করিতেও তেমনই ব্যস্ত, কিন্তু রাজার যে প্রধান কার্য্য প্রজারঞ্জন তাহাতে তাঁহাদিগের বিশেষ মনোযোগ নাই।" অক্ষয়চন্দ্র এই সহযোগ

ও সংস্কার-নীতিপরায়ণ ছিলেন বলিয়া প্রায় পঁচিশ বৎসর হুগলীর কোর্টে প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন; জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট চেয়ারম্যান থাকা সত্ত্বেও বহুদিন হুগলী-চুঁচুড়া ম্যুনিসিপ্যালিটির কমিশনারের কার্য্য করিয়াছিলেন; সুবিচারক ও সুযোগ্য কমিশনার বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব শ্যামাচরণ সরকারের সভাপতিত্বে এবং দেশমান্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ দেশভক্তগণের উদ্যোগে যে 'ভারত-সভা' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু ইহার প্রথম সম্পাদক এবং তাঁহার সতীর্থ অক্ষয়চন্দ্র প্রথম সহকারী-সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষের জনমত গঠিত করিবার পক্ষে সুরেন্দ্রনাথের ভারত-ভ্রমণ ও ওজোময়ী বক্তৃতা, সিবিল সার্বিশ পরীক্ষার নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন-প্রসঙ্গে আন্দোলন করিবার উদ্দেশ্যে জনপ্রিয় ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের বিলাত গমন এবং এই যুগ্ম সম্পাদকগণের অক্লান্ত কর্ম্মকুশলতাই চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভারত-সভাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তারপর বহুবৎসর যাবৎ 'জমিদারী-পঞ্চায়ৎ' সভার সম্পাদক-রূপে অক্ষয়চন্দ্র যে কিরূপ পরিশ্রম ও যোগ্যতার সহিত কার্য্য পরিচালনা করিয়া দেশের ও দশের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছিলেন, তাহা আজি এই আত্মবিস্মৃত জাতি ভুলিয়া গেলেও বাঙ্গলার জাতীয় ইতিহাস কখনও বিস্মৃত হইবে না। কিন্তু যখনই গবর্ণমেণ্ট হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়া আইন পাস করিতে গিয়াছেন, তখনই অক্ষয়চন্দ্র গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা ত্যাগ করিয়া নানা প্রকারে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই জন্য বিধবা-বিবাহ এবং সহবাস-সম্মতি-আইন প্রবর্ত্তিত হইবার সময় তিনি এই উভয় আইনের বিপক্ষে ভীষণভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন—তুমুল আন্দোলন করিয়াছিলেন। জনমত অগ্রাহ্য করিয়া লর্ড কর্জনের সময়ে বঙ্গভঙ্গ হইলে যেমন দেশবাসী 'স্বদেশী ব্রত' গ্রহণ করিয়াছিল, সেইরূপ সহবাস-সম্মতি-আইন পাস হইয়া গেলেও ভারতবাসী প্রথমবার 'স্বদেশী ব্রত' লইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই প্রথম স্বদেশী ব্রত ভারতবাসী অধিককাল পালন করে নাই,—কেবল বঙ্গমাতার দুইজন কৃতী সন্তান সেই ব্রত একনিষ্ঠভাবে আজীবন পালন করিয়াছিলেন—একজন তাৎকালিক উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি আকুমার দেশভক্ত অক্ষয়চন্দ্র। ১৮৯১ হইতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর কাল অক্ষয়চন্দ্র পারত পক্ষে কোন কিছু বিদেশী দ্রব্য ক্রয় বা ব্যবহার করেন নাই; দেশী ছাতা পাওয়া যায় না, তাই তিনি এই দীর্ঘকাল ছাতা ব্যবহার করেন নাই। তাহার এই স্বাদেশিকতা এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, ব্রত-গ্রহণের প্রথম সাত বৎসর তাঁহার পরিবারমধ্যে ডাক্তারী ঔষধ পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয় নাই। এইরূপ অসাধারণ মনের জোর ছিল তাঁহার চরিত্রের একটী প্রধান বৈশিষ্ট্য। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রবর্ত্তিত 'রাখী-বন্ধন' দিবসে অক্ষয়চন্দ্রের অধিনায়কতায় ও উৎসাহে চুঁচুড়ার গ্রাম্যদেবতা ৺ষণ্ডেশ্বরের যোড়শোপচারে পূজা হইয়াছিল, স্বচরিত সঙ্গীত নগরের পথে পথে গীত হইয়াছিল, বৃদ্ধ অক্ষয়চন্দ্র স্বহস্তে মন্দির-চত্বরে সহস্রাধিক দরিদ্রনারায়ণকে চিড়া, মিঠাই প্রভৃতি বিতরণ করিয়া জনসেবায় সারাদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

অক্ষয়চন্দ্র মামলা-মকদ্দমা করা অতিশয় ঘৃণা করিতেন; বলিতেন,—"ইংরেজের কোর্ট ধর্ম্মাধিকরণ নয়—মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, জুয়াচুরি ও ঠকামির হাট-বাজার। ওখানকার মাটি মাড়াইলে ভদ্রসন্তানের ধর্ম্মহানি হয়, শ্রীভ্রষ্ট হয়—ইহকাল, পরকাল দুই খোয়া যায়।" তাঁহার একটী ছোট পত্তনী মহল ছিল, কিন্তু কখনও বাকি খাজনার নালিশ পর্য্যন্ত করেন নাই। আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, পরিচিত, অপরিচিত—বহু বিপদ্‌গ্রস্ত লোককে তিনি অনেক সময় ঋণ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে মাত্র একজন ভিন্ন অপর কেহই তাঁহার ঋণ পরিশোধ করেন নাই; এইরূপ ভাবে প্রায় দশ হাজার টাকা তাঁহাকে জলে দিতে হইয়াছিল; কিন্তু তবুও তিনি কাহারও নামে কখনও নালিশ করেন নাই। ঋণদানের দলিলগুলি এখনও তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া তাঁহার মহানুভবতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইহা বাঙ্গালীর অতিশয় কলঙ্কের কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু এই দলিলগুলি মূকভাষায় অক্ষয়চন্দ্রের গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

অক্ষয়চন্দ্র দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ, সন্মৌলিক—উপাধি দেব; 'সরকার' মুসলমান-রাজ-দত্ত উপাধি। তিনি ছিলেন অতিশয় নিষ্ঠাবান্, ক্রিয়াকর্ম্মে আস্থাবান্, পূর্ণমাত্রায় পুরাতন-প্রিয়, সদাচার-সম্পন্ন হিন্দু; তাঁহাদের বাড়ীতে মহা ধূমধামের সহিত দুর্গোৎসব হইত, প্রতিমা গড়িয়া কোজাগর লক্ষ্মীপূজা হইত; তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ আজিও বর্ত্তমান। তিনি এতদূর গোঁড়া হিন্দু ছিলেন যে, মস্তকে শিখা পর্য্যন্ত ধারণ করিতেন, আপনাকে ক্ষত্রিয় মনে করিতেন। তিনি তান্ত্রিক মন্ত্র বা গুরুদত্ত দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন;—সর্ব্বদা হরিনাম জপ করিতেন—প্রায়ই মনে

মনে, ক্বচিৎ কথন-বা গুন্ গুন্ রবে। তিনি সদাচারশীল নিষ্ঠাবান্ গোঁড়া হিন্দু ছিলেন বটে, কিন্তু অন্য কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ত ছিলই না, পরন্তু সকল সম্প্রদায়কেই তিনি অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তিনি ছিলেন সকল সম্প্রদায়েরই "আমাদের অক্ষয়বাবু।" এইরূপ ভাবে সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধা ও স্নেহের পাত্র হইবার একমাত্র কারণ তাঁহার নিষ্কলঙ্ক দেবোপম চরিত্র।

দেশে ক্রমেই নিষ্ঠাবান্ সংস্কৃতজ্ঞ পুরোহিতের অভাব ঘটিতেছে, কাজেই হিন্দুর নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠু ভাবে ও শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সম্পন্ন হইতেছে না লক্ষ্য করিয়া এবং দেশমধ্যে যাহাতে ধর্ম্মচর্চ্চা এবং শাস্ত্রানুশীলন বহুবিস্তৃতি লাভ করে এই উদ্দেশ্যে অক্ষয়চন্দ্র স্বীয় বাড়ীর সংলগ্ন স্বতন্ত্র দুইটী বাড়ীতে একটী চতুষ্পাঠী স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকালমৃত্যুর পর এই চতুষ্পাঠীর নামকরণ করিয়াছিলেন 'অমর-চতুষ্পাঠী'। প্রায় পঁচিশ বৎসর ধরিয়া অমর-চতুষ্পাঠী বহুতর ছাত্রকে শিক্ষাদান করিয়া বাঙ্গলার যথেষ্ট কল্যাণসাধন করিয়াছে। ব্রাহ্মণের পুনরভ্যুদয়ের জন্য, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থানের জন্য অক্ষয়চন্দ্র চিরদিন নানাভাবে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এই সাধু উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই তিনি 'নবজীবন' প্রচারে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"ব্রাহ্মণ এখনও হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয়। ব্রাহ্মণের পুনরুত্থান সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক; ব্রাহ্মণ উঠিলে সকলের উদ্ধার সহজ হইবে।"

চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া উহার প্রতিপালন করা ভিন্ন শিক্ষাবিস্তারকল্পে অক্ষয়চন্দ্রের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ইংরেজী উচ্চবিদ্যালয় পরিচালনা। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধ বিদ্যালয় 'হিন্দু-স্কুল' উঠিয়া গেলে অক্ষয়চন্দ্র ইহার যাবতীয় আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম ক্রয় করেন এবং 'সাধারণী-স্কুল' স্থাপিত করিয়া প্রায় দশ বৎসর যাবৎ এই স্কুল পরিচালনা করেন। সাধারণ তত্ত্বাবধান করা ভিন্ন তিনি প্রত্যহ নিয়মিত-ভাবে তিন চারি ঘণ্টা বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন। সাধারণী-কার্য্যালয় কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইলে এই স্কুল উঠিয়া যায়।

তাঁহার অতুল্য গ্রন্থ 'সনাতনী' তিনি তাঁহার পুত্রদ্বয় অজরচন্দ্র ও অচ্যুতচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন। এই উৎসর্গপত্র পাঠ করিলে তাঁহার ধর্ম্মমত স্পষ্টাক্ষরে বুঝিতে পারা যায়। তিনি লিখিয়াছেন,—"পিতৃদেবের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া তোমাদের দুইজনকে 'সনাতনী' উৎসর্গ করিলাম। কেবল যে পূর্ব্বপ্রথায় আমার অনুরাগবশে, এমন নহে, প্রত্যুত ইহাতে আমার যৎকিঞ্চিৎ ভবিষ্যতের আশাও আছে। সনাতনীর ৬০।৬১ পৃষ্ঠায় তাহার আভাস দিয়াছি। * * * আমরা আপনারা যমানুষ্ঠানের চেষ্টা করিব। * * * যদি মরণকালে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, আমি নিয়ত যমানুষ্ঠানের চেষ্টা করিয়াছি, অনেক সময় কৃত-কার্য্য হইয়াছি, আর পাঁচটী যুবা পুরুষকে সেইরূপ অনুষ্ঠানে রত রাখিয়া চলিলাম—তবে কি সুখের মৃত্যুই না হইবে।"

নিম্নে অক্ষয়চন্দ্র-সম্পাদিত ও প্রণীত পত্রিকা এবং পুস্তকাবলির একটী তালিকা দেওয়া হইল :—

'সাধারণী', সাপ্তাহিক পত্র (১১ই কার্ত্তিক, ১২৮০)। 'নবজীবন', মাসিক পত্র (শ্রাবণ, ১২৯১)। 'নববিভাকর-সাধারণী', সাপ্তাহিক পত্র, (বৈশাখ, ১২৯৩)। 'শিক্ষানবিশের পদ্য', পুস্তকের অধিকাংশই বায়রনের রসানুবাদ (১২৮১)। 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' (১) বিদ্যাপতি (২) চণ্ডীদাস (৩) গোবিন্দদাস (৪) রামেশ্বরের সত্যনারায়ণ (৫) মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল; সারদাচরণ মিত্র ও শোভাবাজারের বরদাকান্ত মিত্রের সহযোগিতায় প্রথমে খণ্ডশঃ এবং পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১২৮১)। 'সমাজ সমালোচন', বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'উদ্দীপনা' ও 'গ্রাবু' প্রবন্ধদ্বয়ের সঙ্কলন (১২৮১)। 'গোচারণের মাঠ', যুক্তাক্ষরবর্জ্জিত পয়ার ছন্দে রচিত পল্লীচিত্র; বহুবৎসর যাবৎ পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল; ১২৮৫ সালে সমগ্র গ্রন্থ প্রথমে খণ্ডশঃ সাধারণীতে প্রকাশিত হয় (১২৮৭)। 'সংক্ষিপ্ত রামায়ণ', দেবর্ষি নারদ বাল্মীকিকে সংক্ষেপে যে রামায়ণ বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহারই মূল এবং গদ্যানুবাদ (১২৮৯)। 'আলোচনা', বিদ্যালয়-পাঠ্য প্রবন্ধাবলি; কয়েক বৎসর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল (১২৮৯)। 'হাতে হাতে ফল' (হসন-হাসন), প্রহসন; গ্রন্থে অক্ষয়চন্দ্রের নাম ছিল না,—'শ্রীবঙ্গবিলাস সমজ্দার প্রণীত' লিখিত ছিল; এই ছদ্মনামে তিনি বহুতর রসরচনা 'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত করেন। হসন-হাসন অর্থ,—যাহাতে হাসি পায় ও যদ্দ্বারা হাসান যায় (১২৮৯)। 'প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ' প্রথম খণ্ড (চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, রামেশ্বরের সত্য-নারায়ণের কথা, বিদ্যাপতি), দ্বিতীয় সংস্করণ (১২৯১)। 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' দ্বিতীয় খণ্ড (কবিকঙ্কণ চণ্ডী), দ্বিতীয় সংস্করণ (১২৯১)। 'পিতা-পুত্র', গঙ্গাচরণ সরকার ও অক্ষয়-চন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনী; 'বঙ্গবাসী'-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত (১৩১১)। 'সনাতনী',সনাতন ধর্ম্ম, দর্শন ও সমাজ-সম্বন্ধীয় নিবন্ধমালা (১৩১৭)।

'কবি হেমচন্দ্র', কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং বিশদ কাব্য-সমালোচন (১৩১৮)। 'মোতি-কুমারী', **Haggard**-এর **'Pearl Maiden'**-নামক উপন্যাসের ভাবানুবাদ এবং কয়েকটী ছোট গল্প ও সমাজ-চিত্রের রস-সমষ্টি (১৩২৪)। 'মহাপূজা', সাধারণী ও নবজীবন হইতে সঙ্কলিত দুর্গাপূজাবিষয়ক প্রবন্ধাবলি (১৩২৮)। 'রূপক ও রহস্য', রূপক ও রহস্যশ্রেণীর যাবতীয় রচনার সঙ্কলন; হৃষীকেশ সিরিজের অন্তর্ভুক্ত (১৩৩০)। 'সাহিত্য-সাধনা', কিশোরগণের উপযোগী সাহিত্যবিষয়ক রচনারাশি; অক্ষয়চন্দ্রের সমগ্র জীবনব্যাপী সাহিত্য-সাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় (১৩৩০)। 'সাহিত্য-পাঠ', দ্বিতীয় সংস্করণ; ছোট বালক-বালিকাদের পাঠ্য-পুস্তক (১৩৩১)।

অক্ষয়তৃতীয়া—বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া। কথিত আছে, এই দিনে সত্যযুগের উৎপত্তি হইয়াছিল। "বৈশাখ-শুক্লপক্ষীয়াক্ষয়তৃতীয়ায়াং রবিবারে সত্যযুগোৎপত্তিঃ।" এই দিন তীর্থস্নান দানাদি করিলে অক্ষয় ফললাভ হয়।

অক্ষয়তৃতীয়া-ব্রত বৈশাখের শুক্লপক্ষে চতুর্থীযুক্তা তৃতীয়ায় পূর্ব্বাহ্ণে অনুষ্ঠিত হয়। ভবিষ্যপুরাণে (২১ অঃ) এই ব্রতকথা আছে।

পাটনায় ইহার নাম "অখরতীজ; গয়ায় ইহাকে "অখরতিজিয়া" বলে; শাহাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ইহার নাম "অখর-তীত"; ভাগলপুরের দক্ষিণে ইহা "অছৈ তিরতিয়া" নামে পরিচিত। (G. A. Grierson—Bihar Peasant Life, p. 399)।

অক্ষয়নীবী—দেবোদ্দেশে স্থায়ী দান বা বৃত্তি (a permanent endowment)। প্রাচীন ভারতের বহু শিলালিপি ও তাম্রশাসনে এই শব্দ দৃষ্ট হয়।

অক্ষয়পুরুহূত—শিব।

অক্ষয়প্রভা—তীর্থবিশেষ। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৭৭.২৮)।

অক্ষয়মঙ্গল—মারবারের পলানপুর, পলি ও ভিনমাল নিবাসী ব্রাহ্মণগণের একটী শাখা।

অক্ষয়মতি লোকেশ্বর—মহাযান-মতাবলম্বী বৌদ্ধদিগের উপাস্য সুবর্ণপ্রভ বোধিসত্ত্ব। দেখিতে অবলোকিত লোকেশ্বর বোধিসত্ত্বেরই অনুরূপ; কেবল পার্থক্য এই যে, ইনি দক্ষিণহস্তে অসির পরিবর্ত্তে এক ছড়া মালা এবং বক্ষের নিকট বামহস্তে বারিপূর্ণ ঘটের উপর সংস্থিত পদ্ম ধারণ করিয়া আছেন। [অবলোকিত লোকেশ্বর দ্র°] চীনের কুয়ান্-যিন্ (Kuan-yin) আখ্যাত অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের স্ত্রীমূর্ত্তির বামভাগে পক্ষীমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। কখনও বা ঐ পক্ষীর চঞ্চুপুটে একছড়া মুক্তামালা থাকে। 'সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক'মতে, ঐ মালা বোধিসত্ত্ব অক্ষয়মতি বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরকে দিয়াছিলেন।



অক্ষয়মতি লোকেশ্বর

চীনদেশে প্রকাশিত বৌদ্ধগ্রন্থের মধ্যে একটীর নাম Wou-tsun-hwui-pou-sah-king বা অক্ষয়মতি বোধিসত্ত্ব-সূত্র। রাজগৃহস্থ গৃধ্রকূট পর্ব্বতে ১২৫০ শত ভিক্ষুকের সমক্ষে এই সূত্র প্রচারিত হইবার কথা আছে।

[B. Bhattacharya—The Indian Buddhist Iconography, p. 183; A. Getty—'Gods of Northern Buddhism, p. 80-81; Indian Antiquary, Vol. IV, 1875, p. 95; J. Burgess—Buddhist Art in India, p. 184.]

অক্ষয়রাজজী—শ্বেতাম্বর জৈনসম্প্রদায়ের লুম্পকগচ্ছের গুজরাতী ধনরাজ পক্ষশাখার ১৫শ যতি।

অক্ষয়ললিতা—ভাদ্রমাসের শুক্লাসপ্তমীতে অনুষ্ঠেয় একটী ব্রত। এই দিন স্ত্রীলোকেরা শিবদুর্গার পূজা করেন। [ললিতা সপ্তমী দ্র°]

অক্ষয়বট—প্রয়াগ, ভুবনেশ্বর, গয়া, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি তীর্থস্থানে এক একটী বটবৃক্ষ রোপিত আছে। প্রবাদ এই, ঐ সকল বটগাছের মৃত্যু নাই; কতকাল হইতে চলিল তবু ঝড়ে একটী শাখা ভাঙ্গে না, বা রৌদ্রে একটী পাতা শুকায় না। জনসাধারণের বিশ্বাস, ভক্তিপূর্ব্বক ঐ সকল বৃক্ষে জলসেক করিলে অক্ষয়ফল লাভ হয়। প্রয়াগের অক্ষয়বট এখন কেল্লার ভিতর পড়িয়াছে; গাছটী নিতান্ত ক্ষুদ্র। জগন্নাথপুরীতে অক্ষয়বটের বিবরণ পাওয়া যায়—

"সুধন্য অক্ষয়বট, সুধন্য সিন্ধুর তট,
ধন্য নীলাচল তপোবন।" (মানসিংহ)

প্রয়াগের অক্ষয়বট অতি প্রাচীন বৃক্ষ। রামায়ণে

(অযোধ্যা°, ৫৫.৬) ও রঘুবংশে (১৩.৫৩) ইহা 'শ্যামবট' নামে অভিহিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ঐ গাছ খোলা স্থানে ছিল; ক্রমে চতুর্দ্দিক্ মৃত্তিকায় ভরাট হইয়াছে, সুতরাং বৃক্ষটীও নিম্নে পড়িয়াছে। আলাহাবাদ দুর্গের ভিতর এলেন্‌বরা বারিকের (Ellenborough Barracks) ঠিক পূর্ব্বে পুরাতন মন্দির, মন্দিরের পাশে অক্ষয়বট। তাহাতে রৌদ্র লাগে না, সেখানে বাতাস খেলিতে পায় না, তাই গাছটীর বৃদ্ধি নাই। চীন-পরিব্রাজক যুয়ন্-চোয়াঙ্ ঐ পুরাতন মন্দিরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহার দক্ষিণে অশোক এবং সমুদ্রগুপ্তের প্রস্তরস্তম্ভ। পূর্ব্বে অক্ষয়বট বেণীঘাটের অনেক দূরে ছিল। ক্রমে বর্ষার বন্যায় গঙ্গা-যমুনা ইহার নিকটে আসিয়া পড়ে। আব্দুল কাদির বলেন, অক্‌বর বাদশাহের সময় হিন্দুরা এই বৃক্ষের মূল হইতে গঙ্গায় ঝাপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। এখন আবার কেল্লার নিম্নে অনেক দূর পর্য্যন্ত বালি পড়িয়া গিয়াছে, বেণীঘাট আর অক্ষয়বটের নিকটে নাই। তীর্থযাত্রীরা প্রয়াগে গেলে এই পুণ্যতরু দেখিতে যা'ন। কিন্তু দর্শনের পক্ষে তাঁহাদের অসুবিধা অনেক। মনে করিলেই কেল্লার ভিতরে কেহ প্রবেশ করিতে পা'ন না। পাণ্ডারা অনেক সুযোগ করিয়া যাত্রীদিগকে লইয়া যা'ন। অক্ষয়বটের চতুর্দ্দিক্ পাকা করিয়া গাঁথা, উপরে ছাদ; গর্ত্তের মধ্যে বৃক্ষ, সিঁড়ি দিয়া নিম্নে নামিতে হয়। ভিতরে অন্ধকার, স্পষ্ট দৃষ্টি চলে না। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কানিংহাম সাহেব এই সোপান সাহায্যেই নিম্নে অবতরণ করিয়াছিলেন।

গয়াক্ষেত্রের মধ্যেও একটী অক্ষয়বট আছে। পাণ্ডবেরা বনবাসে গিয়া লোমশমুনির উপদেশানুসারে সেই বৃক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন (মহাভা°, বন°, ৮৭, ৯৫ অঃ)। গয়া-মাহাত্ম্যে* লিখিত আছে, 'অক্ষয়বটে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মকল্পিত ব্রাহ্মণগণকে হব্যকব্য দ্বারা পূজা করিয়া তাঁহাদের সন্তোষবিধান করিতে হয়; এই সকল ব্রাহ্মণ তুষ্ট হইলেই পিতৃগণসহ দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।' মহাভারতের অপর এক স্থানে (দ্রোণ°, ৬৬ অঃ) লিখিত আছে, রাজর্ষি গয়ের যজ্ঞকালে একটী বটবৃক্ষ চিরজীবী হয়, তাহাই অক্ষয়বট।

অক্ষয়শাস্ত্রী—"ভাগবত চম্পূটীকা"কার।

অক্ষয়-সরোবর—নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলীবর্ণিত মানব-শরীরে সপ্ত সরোবরের মধ্যে অন্যতম। মস্তকে অক্ষয়-সরোবর অবস্থিত। নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলীতে দেখা যায়:—

"নাভিস্থানে নাভি-সরোবর জড়পদ্ম তায়॥
মস্তকে অক্ষয়-সরোবর সহস্রদল ইথে।
তার নীচে কণ্ঠ-সরোবর জানিবে নিশ্চিতে॥
চতুর্দ্দল পদ্ম ইথে জানিবে নিশ্চয়।
হৃদয় ভিতরে ক্ষীর-সরোবর হয়॥
অষ্টদল পদ্ম ইথে জানিবে নিশ্চয়॥
উদর ভিতরে মানস-সরোবর কয়।
শতদল পদ্ম ইথে জানিবে নিশ্চয়॥
পৃথু নাভির নাম পৃথু-সরোবর।
ষড়্‌দল পদ্ম ইথে জানিবে নির্দ্ধার॥
ঘোর-সরোবর হয় নির্জ্জন স্থানেতে।
দুইদল পদ্ম ইথে জানিবে নিশ্চিতে॥
ছয় পদ্ম এক জড় সপ্ত এই কয়।" পৃঃ ১৩

পরমাত্মা এই অক্ষয়সরোবরে বাস করেন। প্রত্যেকেরই মাথার উপর পুরুষ ও নারী প্রকৃতির অনুভাবে পরমাত্মা থাকেন।
[M. Bose's Sahajia Cult.]

অক্ষয়া, —বার-তিথি-ঘটিত যোগবিশেষ। ইহাতে অক্ষয় পুণ্য আছে বলিয়া এই নাম। সোমবারে অমাবস্যা, রবিবারে সপ্তমী, মঙ্গলবারে চতুর্থী এবং বৃহস্পতিবারে অষ্টমী তিথি হইলে তাহার নাম অক্ষয়া।

অক্ষয়া, —চৌষট্টিযোগিনীগণের অন্যতমা। (অগ্নিপু°, ৩১ অঃ) ২ ব্রহ্মধানার গর্ভজাত চারিজন ব্রহ্মরাক্ষসীর অন্যতমা। (ব্রহ্মাণ্ডপু°, ৬৯.১৩৪)

অক্ষয়াশ্ব—সূর্য্যবংশীয় সংহতাশ্ব রাজার পুত্র। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৮৮.৬৩)

অক্ষয়িণী—কাশ্মীরের এক দেবীপ্রতিমা। মহারাজ নরেন্দ্রাদিত্য ভুবনেশ্বর নামে একটী দেব ও অক্ষয়িণী নামে একটী দেবী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। (রাজতরঙ্গিণী ১.৩৪৯)

অক্ষয্য—শ্রাদ্ধের শেষ দেয় ঘৃতমধুযুক্ত জল।

অক্ষয্যোদক—পিণ্ডদানের পর মধুতিল মিশ্রিত জল দিয়া শ্রাদ্ধ।

অক্ষর, —ক্ষরণহীন; চ্যুতিশূন্য; অবিনশ্বর; নিত্য। ২ ধ্রুব; স্থির। ৩ কূটস্থ চৈতন্য; পরমব্রহ্ম। বহু উপনিষদে ও গীতার বহু স্থানে অক্ষর পরমব্রহ্মের পর্য্যায়রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। মায়াবাদিগণ পর-ব্রহ্ম অর্থেই অক্ষর শব্দ প্রয়োগ করেন। ৪ [বেদান্তিমতে] পরব্রহ্ম; মোক্ষ। ৫ [মাধ্বমতে] লক্ষ্মী; পরব্রহ্ম। ৬ [বল্লভীয়মতে] ভগবদংশভূত ভগবদ্রূপ ধামবিশেষ। ৭ আকাশ (ether)। ৮ ধর্ম্ম। ৯ তপস্যা।

* বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত বায়ুপুরাণ, ১০৫.৪৫।

১০ যজ্ঞ। ১১ বেদ। ১২ [সাংখ্যমতে] প্রকৃতি। ১৩ নিত্যতা। ১৪ কালপরিমাণভেদ ; কাষ্ঠার পঞ্চম অংশ। ১৫ শিব ; বিষ্ণু।

অক্ষর₂—শব্দাংশ (Syllable) ; আমরা বৈদিকযুগ হইতে অক্ষর শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশকে অক্ষর বলে। আমরা ইংরেজী ভাষায় syllable বলিতে যাহা বুঝি, অক্ষর বলিতে পূর্ব্বে তাহাই বুঝাইত। পরবর্ত্তীযুগে অক্ষর শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হইয়াছে 'বর্ণ' (alphabet)।

ঋগ্বেদে আমরা প্রথম অক্ষর শব্দ পাই—"গায়ত্রেণ প্রতিমিমীতে অর্কমর্কেন সাম ত্রৈষ্টুভেন বাকং। বাকেন বাকং দ্বিপদা চতুষ্পদাক্ষরেণ মিমতে সপ্ত বাণীঃ"। (ঋক্ ১.১৬৪.২৪)

"সপ্ত বাণী" চতুষ্পদাক্ষরেণ অর্থাৎ চারিটী অক্ষরের দ্বারা পরিমিত হইয়া থাকে। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, অক্ষর শব্দের অর্থ শব্দাংশ। তাহার পর পুনরায় দশম মণ্ডলে বিবস্বান্ আদিত্য বলিতেছেন—"অক্ষরেণ প্রতি মিম এতামৃতস্য নাভাবধি সং পুনামি"। (ঋক্ ১০. ১৩. ৩)

শুক্লযজুর্ব্বেদে অশ্বমেধ প্রকরণে প্রশ্নমন্ত্র ও প্রত্যুত্তরমন্ত্রে দেখিতে পাই—

প্রঃ। কত্যস্য বিষ্টাঃ কত্যক্ষরাণি।

প্রত্যুঃ। ষড়স্য বিষ্টাঃ শতমক্ষরাণি।

অর্থাৎ প্রশ্ন হইতেছে 'উহার অন্নই (বিষ্ট) বা কত, অক্ষরই বা কত ?' তাহার উত্তর হইতেছে 'ছয়টী উহার অন্ন এবং শতসংখ্যক উহার অক্ষর।'

বাজসনেয়ী সংহিতায় ছন্দের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে অক্ষরের অর্থবোধ হইতে আর দ্বিধা থাকে না—

"অক্ষরপঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ" (১৫.৪)

অর্থাৎ ছন্দঃ বুঝাইতে অক্ষরপংক্তি বা সমষ্টি বুঝায়। এইরূপ তৈত্তিরীয়সংহিতায় (কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের) ১ম কাণ্ড ৬ষ্ঠ প্রপাঠকে আমরা অক্ষর শব্দ পাই ; তাহা হইতে ইহার অর্থ আরও বিশদ হইয়া যায় :—

"আশ্রাবয়েতি চতুরক্ষরমস্তু শ্রৌষড়িতি চতুরক্ষরং যজেতি দ্ব্যক্ষরং যে যজামহ ইতি পঞ্চাক্ষরং" অর্থাৎ 'আশ্রাবয়' ও 'শ্রৌষড়্' এই শব্দ দুইটীর প্রত্যেকটীই চারি অক্ষরসম্পন্ন, 'যজ' এই শব্দটী দুই অক্ষরসম্পন্ন এবং "যে যজামহ" এই শব্দটী পঞ্চাক্ষরসমন্বিত।

অথর্ব্ববেদে দুইস্থলে অক্ষর এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যথা—"অক্ষরেণ প্রতিমিমীতে অর্কং"।

প্রাতিশাখ্যসমূহে আমরা অক্ষর শব্দের ভূরি ভূরি প্রয়োগ দেখিতে পাই।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণে অনেক স্থলে 'অক্ষর' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। একস্থলে গায়ত্রীকে ত্রিছন্দোময়ী এবং প্রতি ছন্দে ৮টী করিয়া অক্ষর আছে, ইহা লিখিত আছে (১ম পঞ্জিকা, ২য় খণ্ড)। অন্যস্থলে—"অনুষ্টুভো স্বর্গকামঃ কুর্ব্বীত দ্বয়োর্বা অনুষ্টুভোশ্চতুঃষষ্টিরক্ষরাণি"। (১ম পঞ্জিকা, ১ম অধ্যায়, ৫ম খণ্ড) ইহাতে অনুষ্টুভ ছন্দঃ চতুঃষষ্টি অক্ষরসমন্বিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

উপনিষদ্-সমূহেও অক্ষর শব্দের ভূরি ভূরি প্রয়োগ আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে 'ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথঃ' এই প্রথম শ্লোকেই 'ওম্'কে এক অক্ষর বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে "হৃ ইত্যেকমক্ষরং দ ইত্যেকমক্ষরং য় ইত্যেকমক্ষরং" এইভাবে "হৃদয়" শব্দের তিন অক্ষরের বর্ণনা করা হইয়াছে। "প্রাণোঽপানো ব্যান ইত্যষ্টাবক্ষরাণি" এই সকল হইতে আমরা বুঝিতেছি যে, উপনিষদের সময় অক্ষর শব্দের অর্থ শব্দাংশ।

সুতরাং দেখিতেছি, পূর্ব্বকালে স্বররহিত ব্যঞ্জনবর্ণ অক্ষর বলিয়া বিবেচিত হইত না, কিন্তু রামতাপনী উপনিষদে 'ওম্' এই শব্দের বিশ্লেষণে "অকারঃ প্রথমাক্ষরঃ উকারো দ্বিতীয়াক্ষরঃ মকারস্তৃতীয়াক্ষরঃ" দেখিলেই মনে হয় যে, এইস্থলে স্বররহিত মকারকে তৃতীয়াক্ষর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু আর একটু পড়িলেই এই সমস্যার সমাধান হইবে—"অর্দ্ধমাত্রশ্চতুর্থাক্ষরঃ বিন্দুঃ পঞ্চমাক্ষরঃ নাদঃ ষষ্ঠাক্ষরঃ" এইস্থলে অক্ষর শব্দের অর্থ শব্দাংশ। ওম্ শব্দের কালবিভাগ করিয়া তাহাকে ছয়ভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন "অক্ষরাণামকারোঽস্মি"—আমি অক্ষর সমূহের মধ্যে অকার।

আমরা সর্ব্বপ্রথম অক্ষর শব্দের "বর্ণ" এই অর্থ পাই পাণিনির গণপাঠে—"লিখ অক্ষরবিন্যাসে" ; অক্ষরবিন্যাস অর্থ হইতে এস্থলে আর অক্ষর শব্দকে বাক্যাংশ বলা চলে না। তাহার পর হইতে ক্রমে ক্রমে অক্ষর শব্দ বর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল।

আধুনিক ভারতীয় প্রায় সকল ভাষাতেই অক্ষর বর্ণ ও শব্দাংশ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কীর্ত্তনের সময় গায়কগণ নিজ মন হইতে কবিতাকারে যে সমস্ত ব্যাখ্যা বা অতিরিক্ত টিপ্পনী ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাকে আখর (অক্ষর) বলা হয়। অক্ষর শব্দের ধাতুগত অর্থ অবিনাশী। অক্ষর শব্দ বাক্যের ক্ষুদ্রতম অংশ বলিয়া ইহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

তন্ত্রাদিতে অক্ষরশব্দ 'লিপি' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

তাহাতে পাঁচ প্রকার অক্ষরের উল্লেখ আছে,—১ মুদ্রা-লিপি, ২ শিল্পলিপি, ৩ লেখনীসম্ভবা-লিপি, ৪ গুণ্ডিকা, ৫ ঘুণাক্ষর। মুদ্রালিপি, অর্থাৎ অঙ্গুরীয় টাকা প্রভৃতিতে ছাপ। শিল্পলিপি—অর্থাৎ চিত্রকার্য্য ইত্যাদি। লেখনীসম্ভবা-লিপি,—কলমদ্বারা যাহা লিখিত হয়। গুণ্ডিকা, তণ্ডুলাদির গুঁড়াদ্বারা যাহা লিখিত হয় অর্থাৎ আলিপনা ইত্যাদি। 'ঘুণাক্ষর' বলিয়া যে লিপির উল্লেখ আছে, তাহার অর্থ কাষ্ঠাদিতে ঘুণ লাগিলে আপনা আপনি যে অক্ষরের মত রেখা কাটা হইয়া থাকে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ (২৬ অঃ) হইতে জানিতে পারি, ভগবান্ প্রজাপতির চিন্তাধারা হইতেই অক্ষরসমূহের সৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ পুরাণের অপরস্থানে (১০৪ অঃ) লিখিত আছে, সত্যবতী-সুত ব্যাসদেবের কঠোর তপস্যার ফলে বেদরূপী অক্ষরসমূহ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। [বর্ণ ও বর্ণলিপি শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দ্র°]

অক্ষর,—[বৈদ্যক] অপামার্গবৃক্ষ ; আপাঙ্ গাছ (Achyranthes Aspera)। [আপাঙ্ দ্র°]

অক্ষরচ্ছন্দঃ—বর্ণবৃত্ত। যে ছন্দ অক্ষর সংখ্যা দ্বারা রচিত হয়। যথা—অনুষ্টুভ্ অষ্টাক্ষরে ; পয়ার চতুর্দ্দশ অক্ষরে।

অক্ষরচ্যুতক—শ্লোকবিষয়ক ক্রীড়াবিশেষ। এই ক্রীড়ায় শ্লোক-গত পদের একটী অক্ষর ছাড়িয়া দিলে, ঐ শ্লোকের অন্য অর্থ হয়।

"কুর্ব্বন্ দিবাকরশ্লেষং দধচ্চরণডম্বরম্।
দেব যৌষ্মাকসেনয়োঃ করেণুঃ প্রসরত্যসৌ ॥"

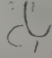
'করেণু' শব্দের 'ক' ছাড়িলে শ্লোকের ভিন্নার্থ হয়।

অক্ষরন্যাস—তন্ত্রশাস্ত্রোক্তি একপ্রকার ক্রিয়া। ইহাতে অং, হং, কং ইত্যাদি উচ্চারণের সহিত এক-একটী অঙ্গ স্পর্শ করিতে হয়।

অক্ষরপংক্তি—বৈদিক ছন্দোবিশেষ। বেদে বৃহতী, পংক্তি প্রভৃতি ছন্দের উল্লেখ আছে। ইহার চারিটী চরণের বর্ণসমূহের যোগফল ২০ হইয়া থাকে।

অক্ষরপল্লি—সংখ্যাবোধক শব্দাংশ বা অক্ষর ; যথা, শত বুঝাইতে শ ; সহস্র বুঝাইতে স ইত্যাদি। প্রাচীন লিপিসমূহে এইরূপ সংখ্যাবোধক অক্ষর ছিল। জৈন গ্রন্থে এই অক্ষরপল্লির উদাহরণ আছে। মল্লিনাথ এই শব্দাংশকে স্পষ্টতঃ শব্দই বলিয়াছেন। বুহ্লার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণ মনে করেন যে, এইরূপ সংখ্যাবোধক অক্ষর বা অক্ষরপল্লি ভারতের নিজস্ব নহে। সেরূপ মনে করিবার কোন বিশেষ কারণ খুঁজিয়া পাই না। প্রথমতঃ নানাঘাটলিপিতে আমরা অক্ষরপল্লির প্রথম নিদর্শন পাই। এই লিপি অন্ধ্র-রাজত্বকালের পূর্ব্বভাগে উৎকীর্ণ। এই শিলালিপিতে এই সকল অক্ষরগুলি যেরূপভাবে উৎকীর্ণ আছে তাহাতে সহজেই প্রতীত হয় যে তাহার ব্যবহার বহু পূর্ব্বকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এই নিমিত্তই বোধ হয় পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের একটু গোল লাগিয়াছে। তাঁহাদের মতে ভারতীয় বর্ণমালা বৈদিকযুগের বহু পরে আবিষ্কৃত হইয়াছে ; কিন্তু এই সকল অক্ষরপল্লি দেখিলে ভারতের নিজস্ব বলিয়াই মনে হয়।

পণ্ডিত বুহ্লারের মতে ভারতীয় সংখ্যাবোধক বর্ণমালায় একক, দশক, শতক, সহস্র প্রভৃতি বুঝাইবার যে সমস্ত চিহ্ন আছে তাহার সকলগুলিই এক একটী শব্দাংশ এবং ঐ ভাবেই উচ্চারিত হইত, তাহারা কেবলমাত্র সংখ্যাবোধক চিহ্ন নহে।

অশোকের অনুশাসনে রূপনাথ ও সাসারাম-লিপির তুলনা করিলে এ সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া যায়। রূপনাথ-লিপিতে ২০০ দুইশত বুঝাইবার জন্য সু () ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু সাসারাম লিপিতে উ () ব্যবহৃত হইয়াছে। যে যে দেশে যে সংখ্যাবোধক শব্দ যেরূপ ভাবে উচ্চারিত হইত, সেই দেশের লিপিতেও ঠিক সেইভাবেই তাহা উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই সমস্ত কারণ হইতে বুহ্লার প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণ মনে করেন যে, অক্ষরপল্লি কেবল চিহ্ন নহে, তাহা শব্দাংশ।

আমাদের মনে হয়, ঐগুলি শব্দদ্যোতক চিহ্ন। তাহার কারণ এই যে, অনেকগুলি সংখ্যা বুঝাইবার এরূপ কয়েকটী চিহ্ন রহিয়াছে যে তাহার উচ্চারণ বা প্রয়োগ ভাষায় সম্ভব নহে। যথা ১০ দশ ইহা প্রাচীন লিপিতে (OC) এইরূপ একটী চিহ্ন দ্বারা বুঝাইতেছে। এখন এই অক্ষর হইতে দশবোধক কোন শব্দের কল্পনা আমাদের মনে আসে না। এক বুঝায় '—' এই চিহ্নে। ইহা হইতে "এক" এই শব্দের কোন আভাস পাওয়া যায় না। [বর্ণলিপি শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্র°]

অক্ষরমুষ্টিকাকথন—অক্ষরসূচক মুষ্টিকা দ্বারা অর্থাৎ অঙ্গুলির ও করপত্রের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান দ্বারা, বর্ণপ্রকাশপূর্ব্বক কথা বলা (Finger speech)। ইহা শৈবতন্ত্রোক্ত চতুঃষষ্টি কলার অন্তর্গত একটী কলা (ভাগবত ১০.৪৫.৩৫ শ্রীধরটীকা)।

অক্ষরলিপি—বর্ণলিপি। [বর্ণলিপি দ্র°]

অক্ষরবাদিনী—দুর্গা (সহস্রনাম)।

অক্ষরশতক—শত অক্ষরের পুস্তিকা। এখানি আর্য্য নাগার্জ্জুন-বিরচিত। তিব্বতী ভাষার অনুবাদে প্রথমে মঞ্জুশ্রীবজ্রকে বন্দনা করা হইয়াছে।

অক্ষরশতক-নামবৃত্তি—ইহা অক্ষরশতকের ভাষ্য। তিব্বতীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছিল অতুল্যশহর কাশ্মীরে। অনুবাদক কুমার-প্রজ্ঞা। এই অনুবাদ পরে পণ্ডিত অনন্ত দ্বারা সংশোধিত হইয়াছিল। তিব্বতীয় ব্যাখ্যাতার নাম গ্রাগস্-ব্যোর্সেসরাব (Grags-hbyor-s'es-rab)।

অক্ষরা, অক্ষরানন্তা—মহেশ্বরীর দেহ হইতে উৎপন্না মহানিশা। দানবসৈন্যদলনে ইনি মহেশ্বরীর সঙ্গে ছিলেন। (স্কন্দপু°, কাশীখণ্ড)

অক্ষরাজ—কলি। [কলি দ্র°]

অক্ষরেখা—নিরক্ষরেখার সমান্তরাল কোনও রেখা কল্পনা করিলে ঐ রেখাকে অক্ষরেখা বলে। অক্ষরেখা ও নিরক্ষরেখার অন্তর সর্ব্বত্র তুল্য। এজন্য এক অক্ষরেখায় অবস্থিত সকল দেশেরই অক্ষাংশ সমান হয়। এগুলি গোলকে নিরক্ষবৃত্তের উত্তরে ও দক্ষিণে মণ্ডলাকারে চিত্রিত থাকে (Lines of Latitude)।

অক্ষবিচলন, অক্ষস্পন্দন—বৃত্তাভাসে পৃথিবী অপবর্ত্তুলাকারে পরিভ্রমণ করিতে করিতে, চন্দ্র ও সূর্য্যের, তথা বৃহৎকায় গ্রহনিচয়ের আকর্ষণ জন্য স্বীয় মেরুদণ্ডের কেন্দ্রাতিগ গতি হইতে কিছু কিছু পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকে। এই সাময়িক বা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল পরিভ্রংশন জন্য বৃত্তাভাসসংলগ্ন ভূমেরু নিরক্ষবৃত্তের উপর পুনঃ পুনঃ কোণ উৎপাদন করে।

যখন আকর্ষণকারী গ্রহ নিরক্ষবৃত্তের সম-ক্ষেত্রে থাকিয়া পৃথিবীকে আকর্ষণ করে, তখন ভ-মেরুর (celestial pole) অভিমুখে এই পরিভ্রংশতা বিশেষ উপলব্ধি হয় না, কিন্তু যখন উহা সমক্ষেত্র হইতে দূরে, অথবা উচ্চে অবস্থিত থাকে, তখনই এই পরিবর্ত্তনের আধিক্য অনুভূত হইয়া থাকে। এই পরিভ্রংশন-গতির পরিণতিফল দুই প্রকারে অবধারিত হয়। একটী, কল্পিত মেরুদণ্ডের নিয়ত ভ্রাম্যমাণ গতির (progressive and nearly uniform motion) দ্বারা এবং অপরটী, প্রকৃত মেরুর চতুর্দ্দিকে চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর বিষুবরেখা হইতে দূরত্ব নিবন্ধন আকর্ষণের হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত আবর্ত্তনের ফলাফল লক্ষ্য করিয়া নির্ণীত হয়। অবস্থা বিশেষে সৃষ্ট কোণগুলির ব্যতিক্রম, ব্যবধান বা পরিণতির পরিমাণ ইংরেজী-জ্যোতিষ্কের গণিতাধ্যায়ে (Celestial mechanics) Nutation নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

জ্যোতিঃশাস্ত্রে ভূমেরুর এই অক্ষবিচ্যুতির সঙ্গে ভ-গোলের ধ্রুবযষ্টিরও পরিভ্রংশতা পরিকল্পিত হয়। চন্দ্রকক্ষার অবলম্বন (inclination) এবং রাহু ও কেতু কেন্দ্রে (moon's node) উহার পরিভ্রমণপ্রাচুর্য্যই স্থানবিশেষে ইহার গতির আধিক্য বা অল্পতা আনয়ন করিয়া থাকে। মোট এই আবর্ত্তনকাল (period of the revolution of the node) ১৮·৬ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই দীর্ঘ যুগের একসময়ে বিষুবরেখা হইতে নির্দ্দিষ্ট জ্যোতিষ্কের দূরত্ব উত্তরে বা দক্ষিণে ২৮° হয়, কিন্তু উহার বিপরীত অভিমুখে মাত্র ১৮° হইয়া থাকে। এই কারণ এই দীর্ঘযুগে অক্ষস্পন্দন নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল ও অবশ্যম্ভাবী। পাশ্চাত্ত্য নাবিকপঞ্জীতে (Nautical Almanac) মেরুদেশের অক্ষদণ্ডের এই নিয়ত পরিবর্ত্তন তালিকা উদ্ধৃত আছে।

অক্ষবৃত্ত—ভূচক্রের উপরে কল্পিত বৃত্তাকার রেখা (Parallels of Latitude)। নিরক্ষরেখার সমান্তরাল এবং নিরক্ষরেখা হইতে ক্রমান্বয়ে দশ দশ অংশ (degree) অন্তর কতিপয় বৃত্ত।

অক্ষশালা—যেস্থলে সুবর্ণাদি মূল্যবান্ ধাতুর শিল্পকার্য্য হইয়া থাকে তাহাকে অক্ষশালা বলে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে লিখিত আছে,—অক্ষশালায় চারিটী গৃহ ও একটী প্রবেশদ্বার থাকিবে। চতুঃশালার নিকটে রাজপথে একজন সুশিক্ষিত, কৌশলী ও সদ্বংশজাত সুবর্ণকারের গৃহ বা দোকান থাকিবে। এই সুবর্ণকার সুবর্ণ-রজতমণি-মুক্তাদি ক্রয়বিক্রয়কালে ক্রেতাদিগকে সাহায্য করিবে। সুবর্ণাধ্যক্ষ এই অক্ষশালার তত্ত্বাবধান করিবেন। কর্ম্মচারী ব্যতীত কেহ অক্ষশালার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। অনধিকার প্রবেশ করিলে শিরশ্ছেদ করা হইবে। কোন শিল্পী যদি নিজের স্বর্ণ বা রৌপ্য লইয়া অক্ষশালায় প্রবেশ করে, তাহা হইলে সে তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে। সাধারণে তাহাদিগের যাহা কিছু কথাবার্ত্তা ও কার্য্য সৌবর্ণিক বা সুবর্ণকারের সহিত বলিবে ও করিবে, অক্ষশালার সহিত তাহাদিগের কোন সম্পর্ক থাকিবে না। শিল্পী, কারিগর ও কর্ম্মচারিগণকে বস্ত্রাদি ও গুহ্য-স্থানাদি পরীক্ষা করিয়া অক্ষশালা হইতে বাহিরে আসিতে দেওয়া হইবে। যন্ত্রাদি ও অসমাপ্তকার্য্য অক্ষশালার মধ্যেই রাখিয়া আসিতে হইবে। সমাপ্তকার্য্য প্রভাত ও সন্ধ্যায় পরীক্ষিত হইয়া শিল্পী ও অক্ষশালাধ্যক্ষের মুদ্রাঙ্কিত হইয়া সিন্ধুকে রক্ষিত হইবে। [সুবর্ণ, সুবর্ণাধ্যক্ষ, সৌবর্ণিক দ্র°]

[কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র—২।১২শ অধ্যায়, ৩১ প্রকরণ]

অক্ষশালী—প্রাচীন ভারতের হিন্দুরাজগণের সময়ের খোদাই-কর। যাঁহারা তাম্র বা শিলালিপিতে অক্ষর খোদাই করিতেন, তাঁহারা অক্ষশালী বা আর্কশালী নামে অভিহিত হইতেন। অক্ষশালার অধ্যক্ষকেও অক্ষশালী বলা হইত। [অক্ষশালা দ্র°]

অক্ষসূত্র—অক্ষমালা বা জপমালা। সাধনমালা নামক বৌদ্ধতন্ত্রে নিম্নলিখিত দেবদেবীর একটী দক্ষিণভুজে

অক্ষসূত্র দৃষ্ট হয়। যথা—চতুর্ভুজ হয়গ্রীব লোকেশ্বর; ষড়্ভুজ হালাহল লোকেশ্বর; চতুর্ভুজ পোতপাদ লোকেশ্বর; ষড়্ভুজ বরদায়ক লোকেশ্বর; চতুর্ভুজ জটামুকুট লোকেশ্বর; ষড়্ভুজ সুখাবতী লোকেশ্বর; ষড়্ভুজ প্রেতসন্তর্পিত লোকেশ্বর; ষড়্ভুজ সুগতিসন্দর্শন লোকেশ্বর; চতুর্ভুজ মণিপদ্ম লোকেশ্বর; চতুর্ভুজ পুপল লোকেশ্বর; ষড়্ভুজ উৎনৌতি লোকেশ্বর; অষ্টভুজ মহাবজ্রসত্ত্ব লোকেশ্বর; ষড়্ভুজ সান্তাসি লোকেশ্বর; ষড়্ভুজ বজ্রোষ্ণীষ লোকেশ্বর; চতুর্ভুজ সর্ব্বশোকতমোনির্ঘাত লোকেশ্বর; অষ্টভুজ মহাসহস্রসূর্য্য লোকেশ্বর; ষড়্ভুজ মহাভয়করী লোকেশ্বর; মহামঞ্জুভূত লোকেশ্বর; মহাবজ্রপাণি লোকেশ্বর; বিশ্বভূত লোকেশ্বর; দ্বাদশভুজ লোকেশ্বর; খসর্পণ লোকেশ্বরের সহচরী চতুর্ভুজা ভৃকুটী; অষ্টভুজ পদ্মনর্ত্তেশ্বর লোকনাথ; ষড়্ভুজ হরিহরিহরিবাহনোদ্ভব লোকেশ্বর; শুক্ল কুরুকুল্লাদেবী; চতুর্ব্বিংশতিভুজা বিদ্যুজ্জ্বালা করালী; ষড়্ভুজা সিততারা; চতুর্ভুজা ধনদতারা; ষড়্ভুজা মায়াজালক্রম কুরুকুল্লা এবং নালান্দায় আবিষ্কৃত একটী দ্বিভুজ নাগার্জ্জুন। কোন কোন হিন্দু দেবদেবীরও হস্তে অক্ষসূত্র শোভিত আছে। অক্ষমালা ও জপমালা শব্দে তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। [অক্ষমালা ও জপমালা শব্দ দ্র°]

অক্ষসেন—প্রাচীন ভারতের একজন রাজা। মৈত্র্যুপনিষদে ইঁহার উল্লেখ আছে।

অক্ষস্তুষ—[বৈদ্যক] বিভীতক, বহেড়া। [বিভীতক দ্র°]

অক্ষাংশ—ভারতীয় জ্যোতিষমতে, কোনও অভীষ্ট দেশ হইতে বিষুববৃত্তের অন্তরের নাম অক্ষাংশ। ঐ দেশ হইতে বিষুবদ্‌বৃত্ত যত নত হয় উত্তরদিকের ধ্রুব তত উন্নত হয়, এজন্য ধ্রুবের উন্নতাংশ ও অক্ষাংশ তুল্য। যে দিবসে দিন ও রাত্রিমান সমান, সেই দিবসে মধ্যাহ্ন সময়ে ১২ অঙ্গুল শঙ্কুর যত অঙ্গুল ছায়া হয়, তাহার নাম দেশের পলভা। পলভার বর্গের সহিত দ্বাদশের বর্গ যোগ করিয়া তাহার মূল লইলে পলকর্ণ পাওয়া যায়। পলভাকে ৯০ অংশের জ্যা অর্থাৎ ত্রিজ্যা দ্বারা গুণ করিয়া পলকর্ণ দ্বারা ভাগ করিলে অক্ষাংশের জ্যা পাওয়া যায়। তাহার চাপই অক্ষাংশ। অক্ষাংশের জ্যা সাধারণতঃ অক্ষজ্যা নামেও অভিহিত হয়। [অগ্রা, কদম্ব, চর, দিনমান প্রভৃতি শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্র°]

পাশ্চাত্য জ্যোতিষ মতে, ভূমণ্ডলের উপরিস্থ কোন স্থান বা বিন্দু এবং নিরক্ষবৃত্তের মধ্যস্থ কোণিক দূরত্বকে (angular distance) ঐ স্থান বা বিন্দুর অক্ষাংশ বা latitude বলা হয়। উক্ত বিন্দুর লম্বরেখা এবং পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের সমতল এতদুভয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী কোণই ঐ বিন্দুর অক্ষাংশের পরিমাপ। পৃথিবীর উভয় মেরুর মধ্যবর্ত্তী সামিবৃত্তাকার কোন দ্রাঘিমাংশকে ১৮০ অংশে এরূপভাবে ভাগ করা হয় যে, ভূকেন্দ্র হইতে ঐ সকল ভাগ বিন্দু পর্য্যন্ত যে সকল রেখা কল্পনা করা হইবে, তাহাদের যে কোন দুইটী সন্নিহিত রেখা পরস্পর সমপরিমাণ কোণ উৎপন্ন করিবে। বিষুববৃত্তের সহিত সমান্তরাল ১৮০টী বৃত্ত উক্ত ভাগ বিন্দুসমূহ ছেদ করিয়া কল্পিত হয়। বিষুবরেখার অক্ষাংশ শূন্য ধরিয়া উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরুর দিকে এই কল্পিত বৃত্তগুলিকে ১°, ২° (ডিগ্রী) প্রভৃতি ক্রমে অভিহিত করা হয়। ভূপৃষ্ঠস্থ কোন স্থানের ভৌগোলিক অক্ষাংশ এই সকল সমান্তরাল বৃত্তের সাহায্যে নির্ণীত হইয়া থাকে।

পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, পৃথিবীর মেরুদ্বয় পরিবর্ত্তনশীল, মেরুকেন্দ্রদ্বয় প্রায় ৫০ ফিট্ ব্যাসবিশিষ্ট এক বৃত্তপথে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। সুতরাং গণনায় পৃথিবীস্থ প্রত্যেক স্থানের অক্ষাংশও কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তনশীল।

অক্ষাগ্রকীলক—চাকা বদ্ধ রাখিবার কীলক, খীল, গোঁজ।

অক্ষানহ—চক্র বদ্ধ রাখিবার কাষ্ঠ।

অক্ষান্তর—উত্তর-দক্ষিণে অবস্থিত দেশদ্বয়ের অক্ষাংশ পরিমাণদ্বয়ের অন্তর অক্ষান্তর। যদি ৩৬০ অংশে পৃথিবীর পরিধি যোজনপরিমাণ পাওয়া যায়, তবে অক্ষান্তরে কি? এই অনুপাতে দেশদ্বয়ের যোজনাদি অন্তর জানা যায়। এইরূপে দেশদ্বয়ের অন্তর ও পৃথিবীর পরিধি জানিলে দেশদ্বয়ের অক্ষান্তর জানা যায়।

অক্ষারলবণ, অক্ষারালবণ—সৈন্ধব, সামুদ্রিক লবণ, ও ক্ষারলবণভিন্ন। ২ হবিষ্য দ্রব্য, যথা—দুগ্ধ, ঘৃত, আতপতণ্ডুল ইত্যাদি।

অক্ষাবপন—পাশা খেলিবার আধার।

অক্ষাবলী—অক্ষমালা, জপমালা। [অক্ষমালা ও জপমালা দ্র°]

অক্ষাবাপ—তৈত্তিরীয় সংহিতায় রত্নী নামে কতকগুলি রাজকর্ম্মচারীর উল্লেখ আছে, অক্ষাবাপ তাহার একটী। এই কর্ম্মচারীর কার্য্য ছিল রাজার অক্ষক্রীড়া বা পাশাখেলার পরিদর্শন করা ও তাহার যথাবিধি ব্যবস্থা করা। ২ কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের কোন কোন টীকাকারের মতে, দ্যূতরোধক রাজকর্ম্মচারী। ইনি ব্যসনাসক্ত ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া তাহার দণ্ডস্বরূপ জরিমানা আদায় করিয়া রাজকোষে জমা দিতেন।

অক্ষাশ্ব—সূর্য্যবংশীয় রাজা সংহতাশ্বের পুত্র। ইঁহার

অপর ভ্রাতার নাম কৃতাশ্ব ও ভগিনীর নাম হৈমবতী। (শিবপু°, ধর্ম্ম°, ৬১.৭৩)

অক্ষি,—অশ-ক্সি। অশূতে বিষয়ানিতি। সমাসে অক্ষি শব্দ অজন্ত হইয়া 'অক্ষ' এই প্রকার হয়। যথা—অব্যয়ীভাব। * । প্রতিপরসমনুভ্যোঽক্ষ্ণঃ। প্রতি, পর, সম্, অনু এই কয় অব্যয়ের পরে অক্ষি শব্দ অজন্ত হয়। প্রতি+অক্ষি প্রত্যক্ষম্। পরোক্ষ, সমক্ষ, অন্বক্ষ। বহুব্রীহি সমাসে। * । বহুব্রীহৌ সক্থ্যক্ষ্ণোঃ স্বাঙ্গাৎষচ্। পা ৫.৪.১১৩। বহুব্রীহি সমাসে স্বাঙ্গ বুঝাইলে সক্থি ও অক্ষি শব্দের উত্তর ষচ্ প্রত্যয় হয়। যথা—বিশালে অক্ষিণী যস্য বিশালাক্ষঃ। কমলাক্ষঃ। স্বাঙ্গ শব্দের অর্থ এই—

স্বাঙ্গং স্যাদদ্রবং মূর্ত্তং প্রাণিস্থমবিকারজং।

দৃষ্টং তত্রাতৎস্থমপি তদ্বত্তাদৃশি চ স্থিতং।

যাহা অদ্রব; মূর্ত্তিমান্; কোন প্রাণীর শরীরস্থ; যাহা বিকৃত দ্রব্য হইতে জন্মে নাই; যাহা পূর্ব্বে প্রাণীর দেহে ছিল; যাহা প্রাণীর মত দেখিতে, তাহার নাম স্বাঙ্গ।

কেশ, চক্ষু ইত্যাদি অদ্রব মূর্ত্ত পদার্থ প্রাণীর দেহে থাকে, অতএব স্বাঙ্গ। পথে কেশ পতিত আছে; এ অবস্থায় আর প্রাণীর দেহে নাই, কিন্তু পূর্ব্বে ছিল। অতএব পথে পতিত কেশ স্বাঙ্গ। প্রতিমা প্রাণীর মত দেখিতে, অথচ প্রাণী নয়; প্রতিমার অঙ্গগুলিও স্বাঙ্গ। "সুকেশী সুকেশা রথ্যা অপ্রাণিস্থস্যাপি প্রাণিনি দৃষ্টত্বাৎ। সুস্তনী সুস্তনা প্রতিমা প্রাণিবৎ প্রাণিসদৃশে স্থিতত্বাৎ।" স্বাঙ্গ না বুঝাইলে বহুব্রীহি সমাসে অক্ষিশব্দ অজন্ত হইবে না যথা—স্থূলাক্ষিরিক্ষুঃ।

তৎপুরুষ সমাসে। * । অক্ষ্ণোঽদর্শনাৎ। পা ৫.৪.৭৬। অক্ষি শব্দে চক্ষু না বুঝাইলে তাহার উত্তর অচ্ হইবে। গবাক্ষঃ। কবরাক্ষম্ অশ্বাদীনাং মুখপ্রচ্ছাদনার্থং বহুচ্ছিদ্রং কবরাক্ষং তেনাপি হি দৃশ্যতে। গবামক্ষীব গবাক্ষঃ। অশ্বাদির মুখে বহু ছিদ্রযুক্ত যে আচ্ছাদন (জাল্‌তি) দেওয়া যায়, তাহাকে কবরাক্ষ কহে, এবং তক্তাতে গরুর চক্ষুর মত ছিদ্র কাটিয়া যাহা ঘরের প্রাচীরে দেওয়া যায়, তাহাকে গবাক্ষ কহে। [ইহার বিবরণ গবাক্ষ শব্দে দ্র°]. 'গবাং কিরণানাং অক্ষীব', কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। *। উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিরিতি সমাসঃ। (কাত্য) পুষ্করমক্ষীব পুষ্করাক্ষম্। গবাং জলানামক্ষীব গবাক্ষম্ পদ্ম। ১মা—অক্ষি, অক্ষিণী অক্ষীণি। ৩য়া—অক্ষ্ণা। ৪র্থী—অক্ষ্ণে। ৭মী—অক্ষ্ণি, অক্ষণি। অস্থি, দধি, সক্থি শব্দ এইরূপ।

লোচন, চক্ষুঃ, নেত্র, দর্শনেন্দ্রিয়। ইহার দ্বারা আমরা দেখিতে পাই। অক্ষির গঠন গোলাকার, মোটামুটীভাবে—ইহার সম্মুখভাগ স্বচ্ছ এবং পশ্চাদ্ভাগে একটী পাতলা কোষময় পরদা থাকে। ইহার পিছনে রঞ্জকবস্তু (pigment) থাকে। এই পিছনের পরদাটীর কোষগুলি সূক্ষ্ম নাড়ী দ্বারা মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত। আলোকের সহিত বহির্ভাগের প্রতিকৃতি ঐ পরদার উপর পতিত হইলে ঐ কোষগুলি উত্তেজিত হয় এবং ঐ উত্তেজনা নাড়ী দিয়া মস্তিষ্কে পৌঁছায়। তখন আমরা বাহিরের পদার্থ দেখিতে পাই। যদি কোনরূপে চক্ষু মস্তিষ্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা সুস্থ অবস্থায় থাকিলেও দৃষ্টিশক্তির লোপ পায়। কারণ, আমরা মস্তিষ্কদ্বারাই প্রকৃতপক্ষে দেখিতে পাই। অক্ষির পিছনের পরদাটীতে কেবলমাত্র বাহিরের ছায়া পতিত হয়।

আদ্যপ্রাণী (protozoa) নামে এক শ্রেণীর অতি ক্ষুদ্র জাতীয় এককোষিক (unicellular)—যাহার দেহ একটীমাত্র কোষে গঠিত—প্রাণিগণের মধ্যে অনেকগুলি চক্ষুর আভাস পাওয়া যায়। ইহারা প্রকৃতপক্ষে দেখিতে পায় না, তবে আলোকের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া আলোকের দিকে ধাবিত হয়। ইহাদের দেহের সম্মুখভাগে একটী রঞ্জকবস্তুর সমষ্টি থাকে। তাহার উপর আলোকের রশ্মি পড়িলেই প্রাণীটী বুঝিতে পারে কোন্ দিক্ হইতে আলোক আসিতেছে। ইহাদের মধ্যে মহাপ্রতোদী (dinoflagellata) নামক একশ্রেণীর কতকগুলি আদ্যপ্রাণীর চক্ষুতে একটী অক্ষিকাচ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ অক্ষিকে 'আদ্যাক্ষি' বা 'অক্ষিকা' (ocellus) বলা হয়।

আরও উচ্চ প্রাণীর দেহে ঐরূপ অক্ষি দেখা যায়। ইহাদের অক্ষিতে একটী অক্ষিকাচ (lens) দেখা যায়। এই সকল প্রাণীদিগকে সুষিরান্ত্রী (cœlenkerata) বলা হয়।

গ্রন্থিল কীটদিগের (annelida) অধিকাংশ প্রাণীর চক্ষুতে অক্ষিকাচ থাকে। তাহার পিছনে একটু তফাতে কোষময় পরদা থাকে এবং তৎপশ্চাতে রঞ্জনবস্তু থাকে। পর্ব্ব-পদী (arthropoda)—চিংড়ী, কাঁকড়া, পতঙ্গ, মাকড়সা, বৃশ্চিক বা কাঁকড়াবিছা, শতপাদিকা অর্থাৎ বিছা, কেন্নুই, ইত্যাদি প্রাণিগণের চক্ষু অসংখ্য স্তম্ভাকার চক্ষুর সমষ্টিমাত্র। এইরূপ চক্ষুকে যৌগিক অক্ষি (compound eye) বলা যায়। এক একটী চক্ষুকে 'স্তম্ভাক্ষি' (ommatidium) বলা হয়। এই স্তম্ভাক্ষিগুলি অংশুর মত সজ্জিত থাকিয়া যৌগিক চক্ষুকে গঠিত করে। স্তম্ভাক্ষিগুলির গঠন অতি জটিল।

অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর প্রাণিগণের (যেমন, কোমলাঙ্গ—শামুক, গুগ্‌লি, ঝিনুক ইত্যাদি) অক্ষির গঠন অনেকটা গ্রন্থিল কীটদের

মতই। উচ্চশ্রেণীর অর্থাৎ মেরুদণ্ডী প্রাণিগণের (যাহাদের পিঠে মেরুদণ্ড অর্থাৎ শিরদাঁড়া থাকে—হাঙ্গর, মৎস্য, ভেক, সরীসৃপ, পক্ষী, পশু) অক্ষি একটী গোলকের মত। ইহাকে অক্ষিগোলক বলা হয়। ইহা মস্তকের দুই পার্শ্বে দুইটী গহ্বরে অবস্থিত। [অক্ষিগোলক ও চক্ষুঃ দ্র°] ২ বংশ প্রভৃতির পর্ব্বের অঙ্কুরোদ্গমস্থান, চোখ, একো। ৩ (বৃত্তি-বিষয়ে) ইন্দ্রিয়মাত্র, চক্ষুঃকর্ণাদি।

অক্ষি$_2$—বোম্বাই প্রদেশের অধীন আলীবাগ মহকুমার অন্তর্গত একটী গ্রাম। ইহা আলীবাগ শহরের তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষি, নাগাঁও, চেউল প্রভৃতি স্থানের উদ্যানগুলি নানা ফলমূল ও তালীবৃক্ষশোভিত হইয়া আলীবাগের দক্ষিণ-প্রান্তে প্রায় ৭ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এই সকল উদ্যান হইতে নানাবিধ ফলফুল ও শাকসবজি বোম্বাই নগরে বিক্রয়ার্থ চালান হইয়া থাকে। আলীবাগ-চেউল রাস্তা হইতে অক্ষিগ্রামের গৃহগুলি ঘননিবিষ্ট তালবৃক্ষপুঞ্জ ও আম্রকুঞ্জের অন্তরালে প্রায় অদৃশ্য। ব্রাহ্মণ, চওকল্সি, ভাণ্ডারী, কুন্‌বি, কোলি প্রভৃতি জাতি এখানকার অধিবাসী। অক্ষিতে ২টী মন্দির আছে। একটী কাল্‌কাবোর্বদেবীর, অপরটী সোমেশ্বর মহাদেবের। এই ২টী মন্দিরের সন্নিধানে দু'খানি খোদিত শিলাফলক দৃষ্ট হয়। উভয় ফলকের উপরেই চন্দ্রসূর্য্যের মূর্ত্তি ও তন্নিম্নে দেবনাগরী লিপি উৎকীর্ণ আছে।

অক্ষি$_3$—কর্দ্দমপ্রজাপতির ঔরসে ও কাম্যার গর্ভে জাত পুত্র। (শিবপু°, ধর্ম্ম°, ৫২.৬)

অক্ষিক$_1$—বানরগণের একজন দলপতি। রামচন্দ্র যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তখন যজ্ঞের অশ্ব রক্ষা করিবার জন্য শত্রুঘ্ন দিগ্বিজয়ে প্রেরিত হ'ন। অক্ষিকও তাঁহার সহগামী হইয়াছিল। (পদ্মপু°, পাতালখণ্ড)

অক্ষিক$_2$, অক্ষীক—[বৈদ্যক] রঞ্জনবৃক্ষ, আতইচ গাছ। [আতইচ দ্র°]

অক্ষিকাচ—অক্ষিগোলকের একটী স্বচ্ছ অংশ (the lens of the eye)। ইহার সম্মুখভাগে তারকামণ্ডল (iris) এবং এক প্রকার স্বচ্ছ তরল পদার্থ (acqueous humour) ও পশ্চাদ্ভাগে সান্দ্র তরল পদার্থ (vitreous humour) থাকে। ইহা স্থূলমধ্যাকৃতি, সম্মুখদিক্ অপেক্ষা পশ্চাদ্দিকে অধিকতর ন্যুব্জ। পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার তরল পদার্থ এবং অক্ষিকাচ—ইহাদের মধ্য দিয়া গমনকালে আলোকরশ্মি পরাবর্ত্তিত হয়। তদ্দ্বারা বহিঃস্থ বস্তুর প্রতিকৃতি ঠিক ছায়াপটলের (retina) উপরে পতিত হয়। [অক্ষি ও অক্ষিগোলক দ্র°]

অক্ষিকূটক—চক্ষুর তারা, অক্ষিগোলক। [অক্ষিগোলক দ্র°]

অক্ষিগোলক—মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মস্তকের দুই পার্শ্বে দুইটী অক্ষিগোলক থাকে। অক্ষিগোলক দুইটী মস্তকের দুইটী গহ্বরে অবস্থিত। এই গহ্বরকে অক্ষিগহ্বর (orbit) বলা হয়।

অক্ষিগোলক ৬টী পেশীদ্বারা অক্ষিকোটরের সহিত সংলগ্ন। এই পেশীগুলির সঙ্কোচনের জন্য অক্ষিগোলকটী চারিদিকে সঞ্চালিত করিতে পারা যায়। অক্ষিগোলকের সম্মুখভাগ চর্ম্মদ্বারা মস্তকের চর্ম্মের সহিত যুক্ত। এই স্বচ্ছ চর্ম্মকেই যোজনত্বক্ (conjunctiva) বলা হয়। অক্ষিগোলকটী কয়েকটী পাতলা পরদা দ্বারা গঠিত। ভিতরে এক প্রকার দ্রব পদার্থ থাকে। অক্ষিগোলকটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। পশ্চাতে একটী বড় গোলক, তাহার সম্মুখের কিয়দংশ সমভাবে কর্ত্তিত। এই কর্ত্তিত অংশে আর একটী ছোট গোলকের কিয়দংশ সংলগ্ন থাকে। অক্ষির পশ্চাদ্গোলকের শ্বেতবর্ণ পরদা থাকে, ইহাকে শ্বেতপটল (sclerotic) বলা হয়। সম্মুখের গোলকের তলের অংশ স্বচ্ছ এবং ইহা বৃত্তাকারে শ্বেতপটলের সহিত সংযুক্ত। ইহাকে স্বচ্ছপটল (cornea) বলা হয়। শ্বেতপটলের ভিতরের দিকে আর একটী পরদা থাকে, তাহাকে কৃষ্ণপটল (choroid coat) বলে। এই পটলে বহু রঞ্জনবস্তু থাকায় ইহার এইরূপ বর্ণ। এই পটলে বহুসংখ্যক রক্তবহা নালী বর্ত্তমান। সম্মুখের ও পশ্চাতের গোলকের সন্ধিস্থলে ভিতরে একটী চক্রাকার পট্টক থাকে। ইহার মধ্যস্থলে একটী ছিদ্র আছে। এই পট্টকটীকে তারকমণ্ডল (iris) বলা হয়। ইহার মধ্যস্থ ছিদ্রটীকে চক্ষুর তারা বা কনীনিকা (pupil) বলা হয়। অক্ষিমণ্ডলে পেশী থাকায় চক্ষুতারকা সঙ্কোচনশীল। পশ্চাৎস্থিত কৃষ্ণপটলের ভিতরে আর একটী পরদা থাকে, তাহাকে আলোচক বা ছায়াপটল (retina) বলা হয়। এই পটলের বহির্ভাগে রঞ্জনবস্তুর একটী স্তর থাকে। ভিতরের ভাগের গঠন অতি জটিল। তবে প্রধান উপাদানগুলি দণ্ডকোষ (rod-cell) এবং শঙ্কুকোষ (cone-cell)। এই কোষগুলি একস্তরে সজ্জিত থাকে। ইহাদের ভিতরে এক প্রকার পিঙ্গলবর্ণ পদার্থ থাকে, তাহাকে দৃষ্টিধূমল (rhodopsin) বলা হয়। ঐ কোষগুলি হইতে সূক্ষ্ম নাড়ীতন্তু বহির্গত হইয়া একত্র গুচ্ছিত হয়। ঐ গুচ্ছ দ্বারা দৃষ্টিনাড়ী (optic nerve) গঠিত। তারকামণ্ডলের পশ্চাতে একটী স্বচ্ছ অক্ষিকাচ (lens) থাকে। মনুষ্য এবং অন্যান্য পশুগণের অক্ষিকাচের আকৃতি মসুরের ডাইলের মত (convex)। মৎস্যদিগের অক্ষিকাচ গোলাকার। অন্যান্য মেরুদণ্ডিগণের

অক্ষিকাচের গঠন নানারূপ। মনুষ্য এবং পশুগণের অক্ষিকাচ একটী ঝিল্লীদ্বারা বেষ্টিত। ইহাকে কাচাবরণ (capsule of the lens) বলে। শ্বেতমণ্ডল এবং স্বচ্ছমণ্ডলের সংযোগস্থলে তারকামণ্ডলের পরিধির পশ্চাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশী বর্ত্তমান থাকে। ঐ পেশীগুলি পাতলা ঝিল্লীদ্বারা আবৃত। ঝিল্লীবেষ্টিত পেশীগুলিকে সন্ধিবলয় পেশী (celiary muscle) বলা হয়। ঐ ঝিল্লী বৃত্তাকারে কাচাবরণের চারিধারে সংলগ্ন। পশ্চাতের গোলকের ভিতরে সান্দ্র (vitreous) তরল পদার্থ থাকে। তারকামণ্ডল এবং স্বচ্ছপটলের মধ্যে যে অবকাশ থাকে, তাহাতে এক প্রকার তরল পদার্থ (acqueous humour) আছে।

বহির্দ্দেশ হইতে আলোকরশ্মি স্বচ্ছপটল, তরলরস, অক্ষিকাচ এবং সান্দ্র তরল পদার্থের ভিতর দিয়া গমন করিবার সময় অনুমুখ (convergent) হইয়া ছায়াপটলের উপর পতিত হয়। এইরূপে বহির্দ্দেশের প্রতিকৃতি ছায়াপটলের উপর অঙ্কিত হয়। তৎক্ষণাৎ ঐ ছায়াপটলের কোষগুলি আলোকের তেজের তারতম্য অনুসারে বিভিন্নভাবে উত্তেজিত হয় এবং ঐ উত্তেজনার প্রবাহ নাড়ীতন্তুদ্বারা বাহিত হইয়া মস্তিষ্কে নীত হয়। তখন আমাদের বাহ্যবস্তুর দৃষ্টিজ্ঞান জন্মে।

আমাদের নিকটদৃষ্টি এবং দূরদৃষ্টির প্রভেদ অনুসারে অক্ষিকাচের গঠন কিছু পরিবর্ত্তিত হয়। সাধারণতঃ অক্ষিকাচের আবরণ সন্ধিবলয়পেশী কর্ত্তৃক টানা থাকে বলিয়া অক্ষিকাচটী অপেক্ষাকৃত চেপ্টা হইয়া থাকে। নিকটদৃষ্টির সময় ঐ পেশীগুলি সঙ্কুচিত হওয়ায় অক্ষিকাচের আবরণ কিছু আল্‌গা হইয়া পড়ে। ঐ সঙ্গে অক্ষিকাচটী অধিকতর ন্যুজ হয় এবং নিকটবর্ত্তী স্থানের আলোকরশ্মি ঠিক ছায়াপটলের উপর পতিত হয়। মৎস্য প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর মেরুদণ্ডিগণের অক্ষিকাচ পশ্চাদ্দিকে স্থানচ্যুত হইয়া ঐ কার্য্য সাধন করে। অক্ষিগোলকের পশ্চাদ্দিক্ হইতে একটী পেশীরজ্জু অক্ষিকাচের সহিত সংলগ্ন থাকে। ঐ পেশীর সঙ্কোচনেই অক্ষিকাচ পশ্চাদ্দিকে নীত হয়। [চক্ষুঃ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্র°]

অক্ষিচ্ছাদন—অক্ষিবর্ত্ম, চক্ষুর পাতা (রত্না°)। [অক্ষি ও চক্ষুঃ দ্র°]

অক্ষিণী—স্থাবর সম্পত্তির আট প্রকার সর্ত্ত বা সুবিধার মধ্যে একটী।

অক্ষিতাবসু—অক্ষীন ধনযুক্ত দেবরাজ ইন্দ্র।

অক্ষিতোতি—ইন্দ্রের নামভেদ। (ঋক্ ১.৫.৯, ৪.১৭.১৬; ৬.২৪.১)

অক্ষিনাশন—চক্ষুর্নাশ, অন্ধত্বরোগ, জন্মান্ধরোগ। [চক্ষুরোগ দ্র°] শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ইহা মহাপাতকজ রোগ, জীব ইহজীবনে যে মহাপাতকের অনুষ্ঠান করে, তাহার ফলে মরণের পর নরক হয়। নরকভোগের পরে ঐ মহাপাতক রোগরূপে পরিণত হইয়া মানবকে কষ্ট দিয়া থাকে।

"পূর্ব্বজন্মকৃতং পাপং নরকস্য পরিক্ষয়ে।
বাধতে ব্যাধিরূপেণ তস্য কৃচ্ছ্রাদিভিঃ শমঃ॥
কুষ্ঠঞ্চ রাজযক্ষ্মাচ প্রমেহো গ্রহণী তথা।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরী কাশা অতীসারভগন্দরৌ॥
দুষ্টব্রণং গণ্ডমালা পক্ষাঘাতোঽক্ষিনাশনং।
ইত্যেবমাদয়ো রোগা মহাপাপোদ্ভবাঃ স্মৃতাঃ॥"

(রঘুনন্দন—মলমাসতত্ত্ব)

যাহাদের এই সকল রোগ হয়, শাস্ত্রানুসারে তাহারা মহাপাতকী, সুতরাং পতিত। এই পাপনাশের জন্য প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান অবশ্যকর্ত্তব্য। যাহারা বিধিবিধানে প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান না করে, তাহারা অব্যবহার্য্য। তপ্তকৃচ্ছ্রাদি আচরণে ইহার প্রশমন হয়। ইহাতে অসমর্থ হইলে পঞ্চদশকার্ষাপণ-দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যকর্ত্তব্য। বিধিবিধানে প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া যদি এরূপ রোগী মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর পরও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহার দেহ দহন বহনাদি করিতে হইবে। যদি তাহার প্রায়শ্চিত্ত না করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে যে সকল ব্যক্তি দহন বহনাদি করিবে, শাস্ত্রানুসারে তাহাদের যতিচান্দ্রায়ণ করিতে হয়। উক্ত পতিত মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধাদি কিছুই হইবে না, ইহাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা। এই মহাপাতকজ চিহ্ন সাত জন্ম পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে।

"মহাপাতকজং চিহ্নং সপ্তজন্মসু জায়তে।
উপপাপোদ্ভবং পঞ্চ ত্রীণি পাপসমুদ্ভবং॥" (মলমাসতত্ত্ব)

অক্ষিপক্ষ্ম, অক্ষিলোম—চক্ষুর আবরণের প্রান্তস্থ লোম (Eyelash)। [চক্ষুঃ দ্র°]

অক্ষিপঞ্চক—চক্ষুরাদি পাঁচটী ইন্দ্রিয়—শ্রোত্র, ত্বক্, রসনা, নেত্র ও নাসা। (রাজনি°)

অক্ষিপটল—[অক্ষপটল দ্র°]

অক্ষিপাক—চক্ষুদাহ, চোখ জ্বালা। [চক্ষুরোগ দ্র°]

অক্ষিপাকাত্যয়—চক্ষুর কৃষ্ণমণ্ডলগত রোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—সমস্ত দোষ কুপিত হওয়ায় সকল কৃষ্ণমণ্ডল যদি শ্বেতবর্ণ হইয়া যায়, তবে তাহাকে অক্ষিপাকাত্যয় কহে। এই রোগ ত্রিদোষজাত, সুতরাং অসাধ্য ও অচিকিৎস্য।

"শ্বেতঃ সমাক্রামতি সর্ব্বতো হি
দোষেণ যস্যাসিতমণ্ডলে তু।

তমক্ষিপাকাত্যয়মক্ষিকোপং
সর্ব্বাত্মকং বর্জ্জয়িতব্যমাহুঃ ॥" (মাধবনি°)

অক্ষিপীলু—[বৈদ্যক] মহানিম্ব, চলিত—ঘোড়ানিম বা বননিম। (বৈদ্যকনি°)

অক্ষিপূজা—সম্রাট্ অশোকের অনুষ্ঠিত অবদানবর্ণিত এক পূজা। রাজা বিন্দুসারের শত পুত্র ছিল। অশোক আপন সহোদর-ভ্রাতা ভিন্ন অপর সকল ভ্রাতাকে হত্যা করাইয়াছিলেন। এই কার্য্যের পর তিনি চারি বৎসর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত না হইয়াও রাজকার্য্য চালাইয়াছিলেন। ইহার পর অর্থাৎ বুদ্ধ-নির্ব্বাণের ২১৮ বৎসর পরে অশোকের রাজ্যাভিষেক হয়।

ঐশ্বরিক 'ইদ্ধি' প্রভাবে রাজা অশোক একদিন একটী সুবর্ণহার পাঠাইয়া নাগরাজদিগের ভিতর মহাকালকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন। ইনি চারিজন বুদ্ধকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। রাজা নাগরাজকে শ্বেত ছত্রতলে মূল্যবান্ রাজকীয় কৌচে বসাইয়া নানাবিধ পুষ্পসম্ভারে পূজা করিতে থাকেন। এই সকল পুষ্প জলজ ও স্থলজ। এগুলির সহিত সুবর্ণপুষ্পও স্থান পাইয়াছিল। তৎপরে তাঁহার চতুর্দ্দিকে ১৬ হাজার নর্ত্তকী রাখিয়া তিনি তাঁহাকে অনুরোধ করেন, 'যিনি শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ, যাঁহার জ্ঞান অসীম এবং যিনি সুন্দর ধর্ম্মচক্র ঘুরাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাকে আপনি আমার অক্ষির সম্মুখে একবার আনিয়া দিন'। এই কথা শুনিয়া নাগরাজ বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি আনয়ন করিলেন। তাঁহার সর্ব্বদেহ হইতে তেজঃপ্রভাব স্ফুরিত হইতেছিল ও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বুদ্ধের ৮০ প্রকার গৌণ লক্ষণ পরিস্ফুট হইল এবং ৩২ প্রকার মহাপুরুষের লক্ষণও দেখা যাইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল যেন জলের উপর লাল ও নীলপদ্ম ভাসিতেছে। আকাশের তারাসমূহ হইতে তেজঃপ্রভাব যেন বিচ্ছুরিত হইতেছে। এই মূর্ত্তির সুন্দর মস্তকে নীল ও পীতবর্ণের উজ্জ্বল আভা দেদীপ্যমান এবং ইঁহার চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত তেজঃপুঞ্জ বিচ্ছুরিত হইতেছে। মনে হইতেছে যেন উচ্চ পর্ব্বতের মস্তকে গোধূলি, রামধনু ও বিদ্যুৎ খেলিয়া বেড়াইতেছে। এই মূর্ত্তি দেখিয়া ব্রহ্মা ও দেব-জগতের বহু দেবতা, মানব, নাগ ও যক্ষেরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। রাজা অশোকও এই মূর্ত্তি দেখিয়া এক সপ্তাহ ধরিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। এই পূজার নাম হইল অক্ষিপূজা। রাজ্যাভিষেকের চতুর্থ বৎসরে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাসী হইলেন।

[J. A. S. B., 1915, p. 65]

অক্ষিব, অক্ষীব—[বৈদ্যক] সামুদ্রলবণ, পাঙা লুণ। ২ মরিচ। (ভাবপ্র°, পূর্ব্বখণ্ড) ৩ শোভাঞ্জন বৃক্ষ, শজিনাগাছ। [শজিনা দ্র°] ৪ বশির, বক।

অক্ষিভূ—[দর্শন°] প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

অক্ষিভেষজ—[বৈদ্যক] চক্ষুর রোগনিবারক ঔষধ। ২ লোধ্রবৃক্ষ, লোধ গাছ (Symplocos crataegaites)। এই বৃক্ষ অধিক বড় হয় না। সচরাচর প্রায় ১২।১৩ হাত উচ্চ হইতে দেখা যায়। ইহার পুষ্প শুভ্রবর্ণ। [লোধ দ্র°]

অক্ষিরোগ—চক্ষুরোগ, নেত্ররোগ। [চক্ষুরোগ দ্র°]

অক্ষিলোম—চক্ষুর আবরণের প্রান্তস্থ লোম (Eyelash)। [চক্ষুঃ দ্র°]

অক্ষী—চন্দ্র ও সূর্য্য। (ঋক্ ১.৭২.১০)

অক্ষীক—[অক্ষিক দ্র°]

অক্ষীকরণ—দূরবীক্ষণ যন্ত্রস্থ কাচখণ্ডের অধিশ্রয়ণ স্থানে (focus) অক্ষি বা দৃষ্টি সমসূত্রে স্থাপন। ইহা দ্বারা দূরস্থ দৃষ্টবস্তু সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়া থাকে। পদার্থ-বিজ্ঞানে জ্যোতিষ্ক-নির্ণায়ক দূরবীক্ষণ (astronomical telescope) অথবা ভূপৃষ্ঠমাপক যন্ত্র (Geodetic instruments) অক্ষি-গোলকের সহিত সমসূত্রে রক্ষাকরণকে Line of Collimation বলে। ইহা দ্বারা কাচপৃষ্ঠে প্রলম্বিত দৃষ্ট-বস্তুর চিত্র সুস্পষ্টরূপে ও পরিমাপকের রেখায় নির্ণয় করিতে পারা যায়। অক্ষীকরণ ঠিক হইয়াছে কি না, তাহা নিরূপণার্থ যে যন্ত্র, তাহা Collimator নামে আখ্যাত।

অক্ষীণ—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। (মহাভা°)

অক্ষু—বেদোক্ত এক প্রকার জাল। (ঋক্ ১.১৮০.৫; অথর্ববে° ৯.৩.৮, ৮.৮.১৮)

অক্ষুণ্ণবেধ—তীর অথবা বর্শার প্রক্ষেপণের প্রকারভেদ।—"পদ-বন্ধে দূরবেধে শব্দবেধে মর্ম্মবেধেঽক্ষুণ্ণবেধে দৃঢ়প্রহারিতায়াম্ পঞ্চস্থানেষু কৃতাবী সংবৃত্তঃ।" (দিব্যাবদান)

অক্ষুণ্ণশক্তি—গঙ্গা। (স্কন্দপু°, কাশীখণ্ড, সহস্রনাম)

অক্ষুধা—ক্ষুধারাহিত্য, ভোজনে অনিচ্ছা। বৈদ্যকশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, অক্ষুধায় ভোজন করিতে নাই। 'অজীর্ণে ভোজনং বিষং'। ভুক্তান্ন জীর্ণ না হইলে ক্ষুধার উদ্রেক হয় না। এই অক্ষুধাবস্থায় যাহা ভোজন করা যায়, তাহা বিষের ন্যায় অপকারী হয়। অতএব অক্ষুধাবস্থায় ভোজন করা কদাপি বিধেয় নহে। ২ রোগবিশেষ, অক্ষুধা একপ্রকার রোগ। এই অক্ষুধারোগ হইলে লঘুপাক দ্রব্য ভোজন এবং যাহাতে পাকস্থলীর ক্রিয়া সুন্দররূপে হয়, এরূপ অর্থাৎ পরিপাকজনক সেবন বিধেয়। অক্ষুধারোগে কিছুদিন সাবধান হইয়া থাকিলেই উহা সারিয়া যায়। অগ্নিমান্দ্য হইতেই এই রোগের উৎপত্তি হয়। [অগ্নিমান্দ্য দ্র°]

অক্ষেত্রজ—অক্ষেত্রজাত পুত্র। অপুত্র মৃতব্যক্তির, ক্লীবের অথবা ব্যাধিগ্রস্তের পত্নীতে ধর্ম্মতঃ নিযুক্ত দেবরাদি সপিণ্ড দ্বারা যে সন্তানোৎপাদন হয়, তাহাকে ক্ষেত্রজ পুত্র কহে। বিবাহিতা পত্নীকে ক্ষেত্র বলা যায়, এই পত্নীতে ধর্ম্মসঙ্গত নিয়মে যে পুত্র জন্মে, তাহাই ক্ষেত্রজ পুত্র। এইরূপ ক্ষেত্রজ পুত্র ভিন্ন, অর্থাৎ পরস্ত্রীতে যে সন্তান উৎপাদন করা যায়, তাহাই অক্ষেত্রজ পুত্র। এই পুত্র পিতার ধনাধিকারী বা শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে অধিকারী হয় না।

অক্ষেত্রজ্ঞ—[দর্শন°] যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ নহেন, যাঁহার ক্ষেত্রবিষয়ক জ্ঞান নাই। সাংখ্যমতে প্রকৃতির নাম ক্ষেত্র এবং পুরুষকে ক্ষেত্রজ্ঞ কহে।

"যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥ (গীতা, ১৩.২৭)

প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মিলনে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। এই সংসার, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি প্রকৃতির ধর্ম্ম, পুরুষের নহে, এইরূপ বিবেকসাক্ষাৎকার যে পুরুষের হইয়াছে, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। ইহা ভিন্ন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানশূন্য ব্যক্তিকে অক্ষেত্রজ্ঞ কহে।

অক্ষেয়—[বৈদ্যক] রক্তার্ক, অর্কমন্দার। (বৈদ্যকনি°)

অক্ষোট, অক্ষোটক—[বৈদ্যক] পীলুবৃক্ষ, অখরোট (Juglans regia, Walnut)। [অখরোট দ্র°]

অক্ষোট তৈল—[বৈদ্যক] অক্ষোটফলোত্থ তৈল, অখরোট ফলের তৈল। গুণ—তীক্ষ্ণ, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, কটু এবং বাত, কফ, কৃমি, কুষ্ঠ, প্রমেহ ও শিরোরোগনাশক।

অক্ষোট মল্ল—কাশ্মীরের রাজভেদ। (রাজতর° ৭.১৫১৪)

অক্ষোড, অক্ষোডক—[বৈদ্যক] পার্ব্বতীয় পীলুবৃক্ষ।

অক্ষোভ্যা—মহেশ্বরীর অষ্টশক্তির অন্যতমা। (অগ্নিপু°, ২২৬ অঃ)

অক্ষোভ—হস্তিবন্ধন স্তম্ভ। (পালকাপ্য)

অক্ষোভ্য—বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বজ্রযান মতাবলম্বীরা যে পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের পূজা করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে দ্বিতীয় ধ্যানীবুদ্ধের নাম অক্ষোভ্য। [ধ্যানীবুদ্ধ দ্র°]

"জিনো বৈরোচনো খ্যাতো রত্নসম্ভব এব চ।
অমিতাভামোঘসিদ্ধিরক্ষোভ্যশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
বর্ণা অমীষাং সিতঃ পীতো রক্তো হরিতমেচকৌ।
বোধ্যগ্রী-বরদো-ধ্যানম্ মুদ্রা অভয়ভূস্পৃশৌ॥"

সাধনমালার এই শ্লোক হইতে বুঝা যায়, অক্ষোভ্যের বর্ণ মেচক বা নীল। ইঁহার মুদ্রা ভূস্পর্শ, বাহন যুগ্ম হস্তী এবং চূড়ায় বজ্রচিহ্ন বর্ত্তমান। অক্ষোভ্যের স্কন্ধ 'বিজ্ঞান' (বিশেষজ্ঞান) এবং তাঁহার বীজমন্ত্র হুঁ; তিনি শিশির ঋতুকে প্রতিনিধান করেন; তাঁহার রস কটু এবং তাঁহার বর্গ 'চ'। প্রমাণ যথা—"নীলহুঙ্কারনিষ্পন্নদ্বিভুজ একমুখো ভূস্পর্শমুদ্রাধরো বজ্রপর্য্যঙ্কী···কৃষ্ণবজ্রচিহ্নঃ সুবিশুদ্ধধর্ম্মধাতুবিজ্ঞানস্কন্ধস্বভাবঃ··· শিশিরমধ্যাহ্নকটুশ্রুতিআকাশশব্দচবর্গঃ। আঃ বজ্রধৃক্ হুং অস্য জাপমন্ত্রঃ।" (অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ) স্তূপসমূহে যে যে স্থলে অক্ষোভ্যের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, সর্ব্বত্রই ইনি পূর্ব্বমুখ এবং বামহস্ত ক্রোড়ে স্থাপিত এবং দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ ভূমি স্পর্শ করিয়া আছেন।



অক্ষোভ্য

বজ্রযানমতের দেবদেবী সকলের বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ মতের অধিকাংশ দেবদেবীই অক্ষোভ্য হইতে উদ্ভূত।

অক্ষোভ্যের শক্তির নাম 'লোচনা' এবং বোধিসত্ত্বের নাম বজ্রপাণি।

সাধনমালায় বাদিরাট্সাধনে মুকুটস্থিত অক্ষোভ্যমূর্ত্তির এইরূপ পরিকল্পনা করা হইয়াছে :—

"দ্বিভুজৈকমুখং পীতং ললিতাক্ষেপমুদ্রয়া সিংহাসনস্থং ব্যাখ্যানমুদ্রাসলীলকরদ্বয়ং রত্নমুকুটিনং।" অর্থাৎ দ্বিভুজ একমুখ পীতবর্ণ ললিতাক্ষেপ মুদ্রায় সিংহাসনে উপবিষ্ট এবং ব্যাখ্যানমুদ্রায় করদ্বয় সলীল। ইহা কিন্তু পূর্ব্ববর্ণিত অক্ষোভ্যমূর্ত্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

ত্রিশূল ও কঙ্কালধারী মহাকাল শিবের পূজা নেপালী হিন্দু ও বৌদ্ধগণের মধ্যে অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। নেওয়ারী বৌদ্ধগণ ইঁহাকে অক্ষোভ্যবুদ্ধের পুত্র বজ্রপাণি বলিয়া থাকে। ইঁহার মুকুটে অক্ষোভ্যের মূর্ত্তি আছে।

সাধনমালাতন্ত্রে মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্বের যে ধ্যান আছে, তাহাতে উক্ত বোধিসত্ত্বের মুকুটে অক্ষোভ্যমূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। যে দেব বা দেবী যে ধ্যানী বুদ্ধ হইতে উৎপন্ন, তাঁহার মুকুটে সেই ধ্যানী বুদ্ধের ক্ষুদ্র মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিত।

মঞ্জুঘোষ, সিদ্ধৈকবীর, বজ্রানঙ্গ ও নামসংগীতি, এই চারি প্রকার মঞ্জুশ্রীর মুকুটে ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্যের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত সাত প্রকার পুংদেবতা অক্ষোভ্য হইতে উদ্ভূত, যথা—চণ্ডরোষণ বা অচল, হেরুক, বুদ্ধকপাল, বজ্রডাক, হয়গ্রীব, যমারি, জম্ভল। ইঁহাদের প্রত্যেকের আবার প্রকারভেদ আছে। [তত্তৎ শব্দ দ্র°]

বৌদ্ধতন্ত্রশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, শূন্যতাস্বরূপ পরমকারণ আদিবুদ্ধ পঞ্চজ্ঞানাত্মিকা হইয়া পঞ্চধ্যানী বোধিসত্ত্বকে সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে তাঁহার অদর্শনজ্ঞান হইতে বায়ু, শ্রবণেন্দ্রিয় ও শব্দের মূলীভূত 'অক্ষোভ্য' আবির্ভূত হইলেন।

উৎকলের বৈষ্ণবকবি অচ্যুত-দাসের বিষ্ণুগর্ভ-গ্রন্থে নিরাকার শূন্যতাস্বরূপ নির্গুণ আদিপুরুষ বিষ্ণু হইতে পঞ্চবিষ্ণুর উৎপত্তির বর্ণনার সহিত উক্ত বর্ণনার মিল আছে। খৃষ্টীয় দশম শতকেও কাশ্মীরী পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্র মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়াছেন। আমাদের দশাবতারের নবম অবতার যে বুদ্ধ, তাহা সকলেই জানেন।

[Indian Buddhist Iconography—B. Bhattacharya ; সাধনমালা, Gaikwar series পৃঃ ১০৪, সাধন No. 49 ; Buddhist Art in India—A. Grunwedel ; The Archæological Survey Report of Mayurabhanja, Vol. I—N. Vasu.]

অক্ষোভ্য-কবচ—তন্ত্রোক্ত কবচবিশেষ।

অক্ষোভ্যতীর্থ—কলিঙ্গদেশবাসী বৈষ্ণবদিগের মাধ্ব-শাখার একজন গুরু। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগুরু আনন্দতীর্থের শিষ্য নরহরিতীর্থ তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে চক্রতীর্থ নামক স্থানে একটী মঠ স্থাপন করিয়া 'স্থানাধিপত্য' লাভ করেন। ইঁহার শিষ্য মাধবতীর্থ ; এই মাধবতীর্থের শিষ্য অক্ষোভ্যতীর্থ—১৭ বৎসরকাল 'স্থানাধিপত্য' লাভ করিয়াছিলেন। অক্ষোভ্যতীর্থ বিজয়নগররাজ ১ম বুক্কের মন্ত্রী মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্যের (১৩৫৩-১৩৭১ খৃঃ) সমসাময়িক।

[Epigraphia Indica, Vol. VI, p. 261-263.]

অক্ষোভ্য দীক্ষিত—মাধ্ব মতানুসারী একজন ব্রাহ্মণ। ইনি সাবনূর নামক স্থানে বাস করিতেন। ইনি ন্যায়শাস্ত্র অভ্যাস করিয়া মাধ্বমতবিষয়ক পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। ১৪০০ শকাব্দে ইনি সাবনূরে দেহরক্ষা করেন। (জ. রা. কবিচরিত্র)

অক্ষোভ্যরাজ—ললিতবিস্তর-বর্ণিত এক ব্যক্তির নাম।

অক্ষোভ্যা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। (অগ্নিপু°, ৩১ অঃ ; হেমাদ্রি°, ২.৯৩.২)

অক্ষোভ্যঃ—বহুসংখ্যক, বৌদ্ধদিগের মতে ১০০ বিবর।

অক্ষোহার—[বৈদ্যক] মধুখর্জ্জুরী। (বৈদ্যকনি°)

অক্ষৌহিণী—অক্ষ+উহিণী। সংখ্যাবিশেষযুক্ত সেনা। মহাভারতোক্ত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে কৌরবপক্ষে একাদশ অক্ষৌহিণী এবং পাণ্ডবপক্ষে সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্যসমাবেশ হইয়াছিল। রামায়ণেও অক্ষৌহিণী শব্দের উল্লেখ আছে। (রামা°, ১.২০.৩) মহাভারতের আদি পর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অক্ষৌহিণীর পরিমাণ এইরূপ আছে—

"একো রথো গজশ্চৈকো নরাঃ পঞ্চ পদাতয়ঃ।
ত্রয়শ্চ তুরগাস্তজ্ঞৈঃ পত্তিরিত্যভিধীয়তে ॥ ১৯
পত্তিং তু ত্রিগুণামেতামাহুঃ সেনামুখং বুধাঃ।
ত্রীণি সেনামুখান্যেকো গুল্ম ইত্যভিধীয়তে ॥ ২০
ত্রয়ো গুল্মা গণো নাম বাহিনী তু গণাস্ত্রয়ঃ।
স্মৃতাস্তিস্রস্তু বাহিন্যঃ পৃতনেতি বিচক্ষণৈঃ ॥ ২১
চমূস্তু পৃতনাস্তিস্রস্তিস্রশ্চম্বস্ত্বনীকিনী।
অনীকিনীং দশগুণাং প্রাহুরক্ষৌহিণীং বুধাঃ ॥" ২২

অর্থাৎ একটী রথ, একটী গজ, তিনটী অশ্ব ও পাঁচজন পদাতি লইয়া একটী পত্তি হয়। তিন পত্তিতে এক সেনামুখ, তিন সেনামুখে এক গুল্ম, তিন গুল্মে এক গণ, তিন গণে এক বাহিনী, তিন বাহিনীতে এক পৃতনা, তিন পৃতনায় এক চমূ, তিন চমূতে এক অনীকিনী এবং দশ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিণী হয়। সুতরাং এক অক্ষৌহিণীতে ৩×৩×৩×৩×৩×৩×৩×১০= ২১৮৭০ হস্তী ; ২১৮৭০ রথ ; ২১৮৭০×৩=৬৫৬১০ অশ্ব ও ২১৮৭০×৫=১০৯৩৫০ পদাতি থাকে। অতএব সর্ব্বশুদ্ধ ২১৮৭০০ চতুরঙ্গসেনা=এক অক্ষৌহিণী।

মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বের ১৫৫ অধ্যায়ে দুর্য্যোধনের সৈন্যবিভাগ-বর্ণনায় প্রতি রথের উপর ৪ জন এবং হস্তীর উপর ৭ জন আরোহীর কথা আছে, যথা—

"ধুর্য্যয়োর্হয়য়োরেকস্তথান্যৌ পার্ষ্ণিসারথী।
তৌ চাপি রথিনাং শ্রেষ্ঠৌ রথী চ হয়বিত্তথা ॥ ১৪
যথা রথাস্তথা নাগা বদ্ধকক্ষাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
বভূবুঃ সপ্তপুরুষা রত্নবন্ত ইবাদ্রয়ঃ ॥ ১৬
দ্বাবঙ্কুশধরৌ তত্র দ্বাবুত্তমধনুর্দ্ধরৌ।
দ্বৌ বরাসিধরৌ রাজন্নেকঃ শক্তিপিনাকধৃক্ ॥" ১৭

অর্থাৎ ধুরি সন্নিহিত অশ্বদ্বয়ের একজন এবং দুইজন পার্ষ্ণিসারথি তাহারা পশ্চাতের দুইটী অশ্বচালনা করিত ও রথচক্র রক্ষা করিত এবং আবশ্যক হইলে যুদ্ধ করিত। রথী নিজেও

সারথ্যে নিপুণ হইতেন। রথের ন্যায় হস্তী সকলও অলঙ্কৃত ও বর্ম্মাবৃত হইত এবং তাহার উপর সাতটী রত্নময় গিরিচূড়ার ন্যায় সাতজন পুরুষ থাকিত, যথা—দুইজন অঙ্কুশধারী, দুইজন উত্তম ধনুর্দ্ধর, দুইজন অসিধারী এবং একজন শক্তি ও পিনাকধারী রাজা। সুতরাং অক্ষৌহিণীতে সর্ব্বসমেত ২১৮৭০×৪+২১৮৭০×৭+৬৫৬১০+১০৯৩৫০ = ৪,১৫,৫৩০ জন অস্ত্রধারী থাকিত, এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক পরিচারক ও অনুচর থাকিত।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণের অনুচর শুক ও সারণ কর্ত্তৃক রামের বানরসৈন্যের বর্ণনাপ্রসঙ্গে যে 'অক্ষৌহিণী' শব্দের উল্লেখ আছে, উহা কেবল উচ্চসংখ্যাজ্ঞাপক, চতুরঙ্গসেনার সংখ্যা নহে। কৃত্তিবাসের অক্ষৌহিণীর হিসাব এইরূপ—শত কোটিতে এক বৃন্দ; শত কোটি বৃন্দে এক মহাবৃন্দ; শত কোটি মহাবৃন্দে এক অর্ব্বুদ; শত কোটি অর্ব্বুদে এক মহার্ব্বুদ; শত কোটি মহার্ব্বুদে এক খর্ব্ব; শত কোটি খর্ব্বে এক মহাখর্ব্ব; শত কোটি মহাখর্ব্বে এক শঙ্খ; শত কোটি শঙ্খে এক মহাশঙ্খ; শত কোটি মহাশঙ্খে এক পদ্ম; শত কোটি পদ্মে এক মহাপদ্মদল; শত কোটি মহাপদ্মদলেতে এক সাগর; শত কোটি সাগরে এক মহাসাগর এবং শত কোটি মহাসাগরে এক অক্ষৌহিণী।

'চণ্ডিকাবিজয়ে'ও (১৪৮) অক্ষৌহিণী শব্দ এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বৌদ্ধগণনায় ১এর পরে ৪২টী শূন্য বসাইলে এক অক্ষৌহিণী হয়।

[মহাভারতম্—১.২.১৯–২২; ৫.১৫৫.১৪,১৬–১৭; অমরকোষ, ২.৮.২.৪৯; হেম° ৭৪৯; নলোপাখ্যান ১.৩; রামা° ১.২২.৩; কৃত্তিবাসী রামায়ণ; চণ্ডিকাবিজয়]

অক্ষ্য—[বৈদ্যক] সৌবর্চ্চল লবণ, সোচল লুণ।

অক্ষ্যপনিষৎ—উপনিষৎবিশেষ।

অক্সফোর্ড,—ইংলণ্ডের অক্সফোর্ডশায়ার নামক উপবিভাগের (County) প্রধান নগর। লোকসংখ্যা (১৯২১ সালে) ৫৭০৫২। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় জগদ্‌বিখ্যাত। লণ্ডনের উত্তর-পশ্চিম-দিকে ৫১ মাইল (রেলপথে ৬৩½ মাইল) দূরে টেম্‌স্ নদীর তীরে এই নগর অবস্থিত। রোমকগণ যখন ইংলণ্ড অধিকার করিয়াছিল, তখন টেম্‌স্ ও চেরওয়াল নদীদ্বয়ের মোহানার উপর একটী ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। তাহাই অধুনা বিরাট নগরীতে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে যে স্থলে ঐ নগরের প্রধান গীর্জ্জা অবস্থিত আছে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সেণ্ট ফ্রাইড্‌স্ ওয়াইড্ সেইখানে একটী সন্ন্যাসিনীদিগের আশ্রম (Nunnery) করিয়া দিয়াছিলেন। রাজা আল্‌ফ্রেডের মুদ্রায় অক্‌স্‌নাফোর্ডা বা অর্স্‌নাফোর্ডা এই লিপি হইতে বুঝা যায়, এইস্থানে সেই সময়ে একটী রাজকীয় মুদ্রাগার ছিল। ইংলিশ ক্রনিক্‌ল্ (English Chronicle) হইতে বুঝা যায়, ৯১২ খৃষ্টাব্দে এই নগর মার্শিয়া ও ওয়েসেক্স এই উভয় রাজ্যের সীমান্ত মধ্যে অবস্থিত ছিল এবং ১০১৩ খৃষ্টাব্দে ঐ নগরের অধিবাসিগণের উল্লেখও ক্রনিকেলে দেখা যায়। প্রায় ১১৩০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম হেনরী এই নগরে বীমণ্ট-প্রাসাদ (Beamont Palace) নামে এক সৌধ নির্ম্মাণ করেন। ১১৪২ খৃষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী মাটিল্‌ডা ইংলণ্ডেশ্বর ষ্টিফেন কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া এই প্রাসাদ হইতে তুষারাবৃত নদীবক্ষ বাহিয়া আবিংডন নামক স্থানে পলায়ন করিয়াছিলেন। এই নগর ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম হেনরীর নিকট হইতে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রাপ্ত হয়। সেই সময় এই স্থানে একটী বণিক্‌সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছিল।

প্রাচীন কালে ইংলণ্ডের শিক্ষার্থিগণ উচ্চশিক্ষালাভার্থ পারীনগরীর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যাইত। সেই সময়ে ইংলণ্ডে কোন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। তবে পুরাতন ফ্রাইড্‌ওয়াইড্ ও অস্‌নী গীর্জ্জার পরিত্যক্ত অট্টালিকাসমূহে কয়েকটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া ধীরে ধীরে একটী বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হইয়া উঠিতেছিল। ১১৩৩ খৃষ্টাব্দে রবার্ট পুলেন নামক বিখ্যাত ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্ পারী হইতে আসিয়া এই স্থানে বাইবেলসম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বেকারিয়াস্ নামক লোম্বার্ডিবাসী এক ব্যক্তি এই স্থানে বক্তৃতা করেন। ইনি ব্যবহারিক আইন সম্বন্ধে (Civil Law) বক্তৃতা করিয়া ইংলণ্ডেশ্বর ষ্টিফেনের বিরাগভাজন হন। ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় হেনরী ক্যাণ্টারবেরির প্রধান ধর্ম্মযাজক টমাস্ বেকেটের সহিত বিবাদ করিয়া ইংলণ্ডের দেবত্র সম্পত্তির অধিকারী সমস্ত প্রবাসী ধর্ম্মযাজকগণকে দেশে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে সমুদ্র পার হইতে নিষেধ করিয়া আজ্ঞা প্রচার করিলেন। তাহার ফলে ১১৬৭ বা ১১৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে পারী হইতে ইংরেজ ছাত্রগণ অক্সফোর্ডে ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। ইংলণ্ড ও পারীর মধ্যে শিক্ষাসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে পারী হইতে প্রত্যাগত শিক্ষার্থিগণ অক্সফোর্ডে একটী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দরিদ্র ছাত্রদিগের ব্যয়ভারনির্ব্বাহের জন্য এক সাহায্যভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছিল এবং ঐ সময় শিক্ষার্থীদিগের বাসোপযোগী গৃহ ও শিক্ষার নিমিত্ত বৃহৎ অলিন্দও নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডের

প্রতিনিধিগণ রাজসমীপে এক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে অক্সফোর্ডকে পারীর পরেই উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল। সেই সময়ে ইহার ছাত্রসংখ্যা ছিল তিন সহস্র। মহামারী বা অন্যরূপ বিপৎকালে ছাত্র-সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া যাইত। কালে কয়েকটী কলেজ স্থাপিত হইলে এই ছাত্রসংখ্যাহ্রাসের ভয় কমিয়া গিয়াছিল। ১২৪৯ খৃষ্টাব্দে ডার্হামের (Durham) ডিউক উইলিয়ম ইউনিভার্সিটি-কলেজ স্থাপন করেন। ১২৬৩ খৃষ্টাব্দে জন ডি বেলিয়ল নামক স্কটলণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বেলিয়ল কলেজ স্থাপন করেন। ১২৬৪ খৃষ্টাব্দে মার্টন কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল। তৎপরে বহু কলেজ স্থাপিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া হইল—

(১) হার্টফোর্ড কলেজ (১২৮৩-১৩০০); (২) এক্সিটর কলেজ (১৩১৪); (৩) অরিয়েল কলেজ (১৩২৬); (৪) কুইন্স্ কলেজ (১৩৪০-১); (৫) নিউ কলেজ (১৩৭৯); (৬) লিঙ্কলন্ কলেজ (১৪২৭); (৭) অল্ সোল্স্ কলেজ (১৪৩৭); (৮) ম্যাগ্‌ডালেন্ কলেজ (১৪৫৮); (৯) ব্রেস্‌নোজ্ কলেজ (১৫০৯); (১০) কর্পাস্ ক্রিষ্টি কলেজ (১৫১৬); (১১) সেন্ট জন্স্ কলেজ (১৫৫৫); (১২) ট্রিনিটি কলেজ (১৫৫৫); (১৩) জিসাস্ কলেজ (১৫৭১); (১৪) ওয়াড্‌হাম কলেজ (১৬১২); (১৫) পেম্‌ব্রোক কলেজ (১৬২৪); (১৬) উর্স্টার কলেজ (১৭১৪); (১৭) কেব্‌ল্ কলেজ (১৮৭০)।

ব্রডষ্ট্রীট্ এবং হাইষ্ট্রীটের মধ্যে বিখ্যাত কলেজগুলি অবস্থিত। এক্সিটর, ব্রেস্‌নোজ্ ও অল্ সোল্স্ কলেজের সীমার মধ্যে যেখানে পুরাতন বিদ্যালয়গুলির হর্ম্ম্যাদি বর্ত্তমান, সেইখানেই বিখ্যাত বড্‌লিয়ন পাঠাগার অবস্থিত।

অক্সফোর্ডের একাডেমিক হল্‌গুলি অতি পুরাতন। প্রথম প্রথম এই সকল শিক্ষায়তনে ছাত্রগণ স্বনির্ব্বাচিত একজন অধ্যক্ষের অধীনে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। পরে কলেজগুলির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে হলগুলিও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

চান্সেলার, অধ্যাপকগণ ও ছাত্রগণ লইয়া অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয় গঠিত। তাহার ভিতর এক একটী কলেজ এক একটী স্বতন্ত্র বিধিবদ্ধ সমিতি (Corporation)। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃ-পক্ষগণ কর্ত্তৃক গঠিত আইন দ্বারাই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয়।

চান্সেলারই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী। ইনি উপাধি-বিতরণ-সভার (Convocation) সভ্যগণ কর্ত্তৃক যাবজ্জীবনের জন্য নির্ব্বাচিত হন। ইনি স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কার্য্যই পরিচালনা করেন না। চান্সেলার কর্ত্তৃক কলেজের অধ্যক্ষ-গণের মধ্য হইতে একজন ভাইস্-চান্সেলার মনোনীত হন। তিনি আবার কলেজের অধ্যক্ষগণের মধ্য হইতে চারিজন প্রো-ভাইস্-চান্সেলার নিযুক্ত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিবাসী (Resident Member) গুরুতর অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিগণের বিচার করিবার নিমিত্ত একজন হাইষ্টুয়ার্ড নিযুক্ত হন। প্রতিবৎসর পর্য্যায়ক্রমে দুই দুইটী কলেজ হইতে দুইটী করিয়া প্রক্টর এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রধান কার্য্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিঃস্থ সভ্যগণের নৈতিক আচরণ ও নিয়মানুবর্ত্তিতার (discipline) উপর দৃষ্টি রাখা। একজন রেজিষ্ট্রার বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্য লিপিবদ্ধ করেন। বোর্ড-অব্-ফ্যাকাল্টি-সমূহের সেক্রেটারিগণ সেই সকল বোর্ডের কার্য্য লিপিবদ্ধ করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট সভায় দুইজন সভ্য পাঠাইতে পারেন।

অক্সফোর্ড-প্রগতি—(Oxford Movement) ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডে চারিত্রিক ও নৈতিক সংস্কারের জন্য যে আন্দোলন হইয়াছিল, তাহাকেই অক্সফোর্ড-প্রগতি বলা হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গির্জ্জায় ১৮৩৩ সালের জুলাই মাসে জন কেব্‌ল্ "জাতীয় স্বধর্ম্মচ্যুতি" (National Apostasy) সম্বন্ধে প্রথম এক বক্তৃতা করেন। তৎপরে ১৪ই জুলাই ফ্রাউড্ (R. H. Froude) সাফোক কাউণ্টির হ্যাড্‌লে (Hadleigh) শহরে এক বক্তৃতা দেন; পরে নিউম্যান, কেব্‌ল্ ও ফ্রাউড্ পুস্তিকাকারে এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মত ব্যক্ত করেন।

চারিদিক্ হইতে ইংলণ্ডের 'চার্চ্চে'র উপর বিপদ্ আসিবার সম্ভাবনা দেখিয়া এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। চারিটী কারণের মধ্যে প্রথম কারণ হইতেছে রাজনৈতিক। অবশ্য এদিক্ হইতে অধিক ভয়ের সম্ভাবনা ছিল না। ইংলণ্ডের চার্চ্চের পদ-গৌরব অটুট রাখা উত্তরোত্তর দুরূহ হইয়া উঠিতেছিল। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে 'ষ্টেট এণ্ড কর্পোরেশন এক্ট' এবং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রোম্যান ক্যাথলিকদিগের উপর শাস্তিপ্রদ আইন রদ বা রহিত হয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে 'রিফর্ম-বিল' এক্টে পরিণত হয়। উদারনীতিক 'হুইগ্'রা এই আইন প্রচলন করেন। ইংলণ্ডের 'চার্চ্চ' চিরদিনই রক্ষণশীল 'টোরি'দলের দ্বারা পরিচালিত হইত। 'হুইগ্'দের প্রাধান্য দেখিয়া লোকের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে 'চার্চ্চের' এইবার দুরবস্থা আসিয়া পড়িল। আয়র্লণ্ডের চার্চ্চের পাদরীর (বিশপের) সংখ্যা ২০ হইতে ১০০ হইল। যখন এই কথা

'হাউস অফ্ লর্ডস্'এ আলোচিত হইতে যাইতেছিল, তখন কেব্‌ল্ তাঁহার প্রসিদ্ধ বক্তৃতা দিয়া বলেন—'আয়র্লণ্ডে যাহা আজ সংঘটিত হইতেছে, শীঘ্রই ইংলণ্ডের চার্চ্চের পক্ষেও তাহাই ঘটিবে।' বিশপ ও পাদরীদিগের চার্চ্চের সংস্কার সম্বন্ধে আপত্তি করিতে দেখিয়া বড় বড় শহরের লোকেরা তাঁহাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে প্রাদুর্ভূত ইরেষ্টান্ ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তার মতাবলম্বীরা যাজকসম্প্রদায়কে সাধারণ শাসন ব্যবস্থার ও আইনকানুনের অধীনে আনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। অবশ্য ইরেষ্টান্ এ মতের সমর্থন করেন নাই। এ মত দার্শনিক হব্‌সের মত। তাঁহার মতে বাইবেল বা চার্চ্চ ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় শেষ কর্ত্তৃপক্ষ নয়—ষ্টেটই অন্যান্য বিভাগে যেমন সর্ব্বময় কর্ত্তা, এ বিভাগেও তাহাই। এই নিয়মবশে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ছয়জন বিশপ ও আয়র্লণ্ডের একজন বিশপ ধর্ম্মনিয়মানুগত কোনরূপ শাস্তি না পাইয়াও ষ্টেটের সংস্রব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন 'ননজুরার' মতাবলম্বীরা। 'ননজুরার' ছিলেন ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের জনৈক পাদরী। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের পর যখন রাজা উইলিয়ম ও মেরীর প্রতি অনুরক্তি দেখাইবার জন্য পাদরীরা Oath of Allegiance গ্রহণ করেন অর্থাৎ রাষ্ট্র বা শাসনশক্তির প্রতি অনুরক্তি দেখাইবার বাধ্যতামূলক আইনের শৃঙ্খলে বদ্ধ হন, তখন পাদরী ননজুরার ঐরূপ স্বীকৃতি সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া বলেন যে, তিনি ইতঃপূর্ব্বে রাজ্যচ্যুত ২য় জেমসের সহিত যে স্বীকৃতি করিয়াছিলেন, তাহার পর আর অন্য স্বীকৃতি লইতে পারেন না। এই ননজুরার-মতাবলম্বীদের ভিতর পণ্ডিত ও জ্ঞানী চার্লস লেস্‌লীর গ্রন্থাবলী ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডের প্রেস হইতে পুনর্মুদ্রিত হয়। কেব্‌ল্ প্রথম হইতে চার্চ্চের উপর ষ্টেটের হস্তক্ষেপ করা যে অবৈধ ও ষ্টেটের অন্যায় অত্যাচার যে চার্চ্চ সহ্য করিতে বাধ্য নহে, তাহাই প্রচার করিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহার মত-পোষক লেস্‌লীর গ্রন্থাবলী প্রচারিত হইয়া তাঁহার মতকে দৃঢ়তর করিতে লাগিল। ক্রমে তাহা রাজবিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মসঙ্ঘ হইতে বিচ্ছিন্ন 'প্রোটেষ্টাণ্ট ডিসেণ্টার' দলের নৈতিক সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল সত্য, কিন্তু উদারনীতিক 'হুইগ্' মন্ত্রীদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই।

উদারমতের প্রচলনের সহিত এই প্রগতি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় এই মত প্রথম প্রচারিত হয় বলিয়া অনেকের ধারণা, কিন্তু ইংলণ্ডে ইহার বহু পূর্ব্বে এ মতের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। জর্মন বিশ্ববিদ্যালয়েও ইহার পূর্ব্বে এই মতের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে পাদরী এইচ. জে. রোজ কেম্ব্রিজে ধর্ম্মোপদেশ দিবার সময় জর্মনীর উদার মতের কথা তুলিয়াছিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে এই মতবাদীরা প্রচার করেন যে, শিক্ষা, সভ্যতা এবং বিচারবুদ্ধির সাহায্যে মানব দুঃখ, যন্ত্রণা ও সর্ব্ববিধ অশুভ হইতে রক্ষা পাইতে পারে। এই মতানুসারে ধর্ম্ম কুসংস্কারের আবর্জ্জনা মাত্র। বিরুদ্ধবাদী অক্সফোর্ড-প্রগতির মতাবলম্বীরা উদারমত (Liberalism) অর্থে বুঝিতেন—আধুনিক চিন্তার সাহায্যে ঈশ্বরাদিষ্ট ধর্ম্মের (Revealed Religion) মূলকে শিথিল করিয়া দেওয়া এবং পরিণামে ধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাকে একেবারে দূর করিয়া ফেলা। (Church, Occasional Papers, ii, 386 ; H. S. Holland, Personal Studies, London, pp. 76-82 and J. H. Newman in the Apologia pro Vila Sua)

সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্ট হইয়াছিল যে মূল ভিত্তির উপর ইংলণ্ডের 'চার্চ্চ' সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, সেই মূল তথ্যগুলি ইংলণ্ডের জনসাধারণের জানা না থাকায়। গুইলস্‌বরোর রেক্টর টমাস সাইকস্ কিছুদিন পূর্ব্বে এই কারণগুলির জন্য সমূহ বিপদের আশঙ্কা করিয়া স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, 'পবিত্র ক্যাথলিক চার্চ্চের মূলনীতিগুলি বন্ধ করিয়া দিবার বিষময় ফলে প্রকৃতির যে প্রতিশোধ আসিবে, তাহা যদি হঠাৎ আসে, তাহা হইলে ইংলণ্ডের যে কি অবস্থা হইবে, তাহা ভাবিয়া শরীর শিহরিয়া উঠে।' অক্সফোর্ড-প্রগতির একটী উদ্দেশ্য, যাহাতে মূল চার্চ্চের নীতিগুলি সাধারণে জানিতে পারে। অজ্ঞতাপ্রসূত Romanistদের মত যাহাতে প্রচলিত হইতে না পারে সে চেষ্টা। (Church, Oxford movement, p. 241) এই প্রগতি ১৮২৯ সালের Emancipation Actএর প্রচলন হইতে উদ্ভব হইয়াছে।

অক্সফোর্ড প্রগতির এইগুলি প্রত্যক্ষ কারণ। পরোক্ষ কারণ হইতেছে ফরাসী বিপ্লবের শোচনীয় অবস্থা। বিপ্লববাদীরা, পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলায় যে ভীষণ অত্যাচারের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহার ফলে মানব পুরাতন প্রতিষ্ঠানকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিতে চাহিল। অপর কারণ হইতেছে স্যর্ ওয়াল্‌টার স্কট্ প্রবর্ত্তিত সাহিত্যে কল্পনার অবাধ প্রসার (Romantic movement in Literature) এবং অক্সফোর্ডের চিন্তাশীল শুদ্ধবুদ্ধি মতাবলম্বীদের উদার মতের প্রচলন (Latitudinarian teachings

of the Oxford Noetus)। ইঁহারা জ্ঞানমার্গের পথিক ছিলেন। প্রজ্ঞা সাহায্যে ইঁহারা চার্চ্চের মূল আদর্শ সাধারণকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। অক্সফোর্ডের বিশপ চার্লস লয়েডের বক্তৃতাও এবিষয়ে অনেক সাহায্য করিয়াছে।

নিম্নে সংক্ষেপে অক্সফোর্ড-প্রগতির ইতিহাস প্রদত্ত হইল। এই প্রগতির গোড়ার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নিউম্যানের প্রভাব ইহার উপরে বেশী ছিল। তাঁহার রচিত পুস্তক ও পুস্তিকা ছাড়া তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশগুলি (Sermon) শুনিয়া লোকে তাঁহার মতের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হইত। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি অক্সফোর্ডে সেন্ট মেরি গির্জ্জার একজন সামান্য ধর্ম্মযাজক (Vicar) ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা সম্বন্ধে তদানীন্তন প্রসিদ্ধ প্রেসবিটেরিয়ান্ জন্ ক্যাম্বেল সার্প বলিয়াছেন, 'তাঁহার মতাবলম্বী না হইলেও—তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার পর অমার্জ্জিত অভব্যতা, স্বার্থপরতা ও সংসারানুরক্তি অনেকটা হ্রাস পাইয়া যায়, বিশ্বাস বর্দ্ধিত হয়।'

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে কেব্‌ল্, নিউম্যান ও পুসের সম্পাদকতায় Library of Fathers ও ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ঐ তিনজনের সম্পাদকতায় Library Anglo-Catholic Theology প্রচারিত হইয়া এই প্রগতির উদ্দেশ্য অনেকটা সফল করিতে পারিয়াছিল। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে এই প্রগতির নিজস্ব একখানি ত্রৈমাসিক পত্র The British Critic প্রকাশিত হইতে লাগিল। নিউম্যান ইহার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি একাই সম্পাদকরূপে পত্রিকাখানি চালাইতে লাগিলেন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে জে. বি. মোজলে প্রমুখ যুবক-সম্প্রদায় আসিয়া নিউম্যানের হস্ত হইতে British Critic পত্রের ভার গ্রহণ করেন। তাহার পর নানারূপ গোলযোগে এই প্রগতির উদ্যম কতকটা হ্রাস হইয়া পড়ে। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে এই প্রগতির কমিটি দুই বৎসরের জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচারকের বেদী হইতে পুসের ধর্ম্মোপদেশ দিবার ক্ষমতা প্রত্যাহার করিয়াছিলেন, কারণ তিনি ইংলণ্ডের চার্চ্চের বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী 'ইউক্যারিষ্ট' দলের মত প্রচার করিয়াছিলেন। ইউক্যারিষ্ট (Eucharist) দল খৃষ্টীয় সমাজে যীশুখৃষ্টের শেষ নৈশ-ভোজন স্মরণার্থ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অপরাধ যে কোথায় হইয়াছিল, পুসে তাহা জানিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই। অপর কয়েকজন বিশপের উক্তি সম্বন্ধেও অযথা আক্রমণ হইয়াছিল। তাঁহাদেরও বক্তৃতা দেওয়া রহিত হইয়া গেল। পুসে ও নিউম্যানের মুখ বন্ধ হইলে যাঁহারা রোমান ক্যাথলিক মত প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাঁহারাই প্রাধান্য লাভ করিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ডব্লিউ. জি. ওয়ার্ড তাঁহার "Ideal of a Christian Church" পুস্তক প্রকাশ করেন। এ পুস্তকে ইংলণ্ডের চার্চ্চের নির্দ্দয়ভাবে সমালোচনা করা হইয়াছিল। আদর্শ চার্চ্চের গঠন কিভাবে হওয়া উচিত, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছিল।

অক্সফোর্ডের কর্ম্মকর্ত্তারা ওয়ার্ডের এই পুস্তকের যথোচিত নিন্দা করিলেন, তাঁহার ডিগ্রী কাড়িয়া লইলেন (১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৫ খৃঃ)। ফলে অক্সফোর্ড-প্রগতির পতন হইল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর তারিখে নিউম্যান খৃষ্টের শেষ নৈশভোজ-সম্প্রদায়ে যোগদান করেন।

এই প্রগতির দ্বিতীয় অবস্থায় লীডস্ শহরের আবর্জ্জনা-পূর্ণ বস্তিতে সেন্টজেভিয়ারের চার্চ্চ প্রতিষ্ঠিত হইল। পুসে আপনার নাম গোপন রাখিয়া বেনামে এই চার্চ্চ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এতদিন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি-গণের পরিচালনায় এই প্রগতি চালিত হইতেছিল। এখন হইতে সাধারণ মানবের সহানুভূতি উদ্রেক করিবার জন্য বড় বড় সহরে কার্য্যক্ষেত্র স্থির হইল। পূর্ব্ব ও মধ্য লণ্ডনে পূর্ণোদ্যমে কার্য্য চলিতে লাগিল। শহরের সাধারণ লোকদের ধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা দেখিয়া ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে আর. এইচ্. ফ্রাউড্ "A Project for reviving Religion in great Towns" নামে পুস্তক প্রচার করিয়া দেখাইলেন, বড় বড় শহরে সহজে সাধারণ লোকের ধর্ম্মানুভূতি জাগ্রত করিতে হইলে ও তাহাদের ধর্ম্মপিপাসা দূর করিতে হইলে, চাই অবিবাহিত ধর্ম্মযাজক-পরিচালিত কলেজের প্রতিষ্ঠা। সঙ্গে সঙ্গে দুঃস্থ ডিষ্ট্রীক্টগুলিতে খৃষ্টীয় সুসমাচার যাহাতে সহজে প্রচারিত হয় ও অর্চ্চনাপদ্ধতির যাহাতে উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহার সম্যক্ চেষ্টা হইতে লাগিল। শেষোক্ত দুই প্রকার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে ভয়ানক আলোচনা চলিতে লাগিল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে এক্‌সিটরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উত্তেজিত জনতার দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অত্যাচার চলিয়াছিল।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে দীক্ষিত খৃষ্টানের আধ্যাত্মিক নবজন্ম (Baptismal regeneration) লইয়া প্রিভি কাউন্সিলে এক মোকদ্দমা উঠে। এক্‌সিটরের বিশপ জি. সি. গোর্‌হামকে রাজকীয় বৃত্তিভুক্ করিতে অসম্মত হইলে, গোর্‌হাম ইংলণ্ডের চার্চ্চের বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্রিভি কাউন্সিল বিচারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যদিও গোর্‌হাম চার্চ্চ

প্রচলিত প্রার্থনা-পুস্তকের (Prayer Book) উপদেশ মানিয়া চলেন নাই, তথাপি তাঁহার মত ইংলণ্ডের চার্চ্চের বিরোধী নহে। এই রায়-প্রকাশে ইংলণ্ডের যাজকমণ্ডলী ও সাধারণ লোকের মনে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। অনেক যাজক ও সাধারণ লোক ইংলণ্ড ছাড়িয়া রোমে চলিয়া যান। তৎপরে খৃষ্টানধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি (Ritualism) লইয়াও অনেক মোকদ্দমা হয়। পরে প্রধান মন্ত্রী ডিস্রায়েলি সাহেব ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে Public Worship Regulation Act দ্বারা ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠানপদ্ধতি রহিত করিয়া দেন। এই আইন প্রচলিত হইলে পাঁচজন খৃষ্টান্ পুরোহিতকে সাজা পাইতে হইল। ইহাতে জনসাধারণ ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠে। ক্রমশঃ এই আইন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সেণ্ট আলবিয়ন্ চার্চ্চের বিশপ হোলবর্ণ ও ভিকার এ. এইচ. ম্যাকোনোচি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত হন এবং ম্যাকোনোচির বৃত্তি বন্ধ হইয়া যায়। চারি বৎসর পরে উত্ত্যক্ত ম্যাকোনোচি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া সকল অত্যাচারের হস্ত হইতে চিরদিনের জন্য নিষ্কৃতি পান। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ডাইক্ সাহেবের অদৃষ্টেও ঠিক ম্যাকোনোচির দশা ঘটিয়াছিল। ডার্হামের বিশপ সি. বারিংএর কোপানলে পড়িয়া তাঁহার অসীম দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে লিঙ্কনের বিশপের মোকদ্দমায় ক্যাণ্টারবেরির আর্চ্ বিশপ ই. ডব্লিউ. বেন্সনের রায় ইংলণ্ডে শান্তি আনয়ন করিতে পারিয়াছিল। অক্সফোর্ড-প্রগতি যে উদ্দেশ্যে এতকাল চেষ্টা করিতেছিল, সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল হইল। চার্চ্চের উপর ষ্টেটের প্রভাব খর্ব্ব হইল।

এই প্রগতির ফলে ইংলণ্ডে চার্চ্চের ধর্ম্মযাজকদিগের জীবন উন্নত হইয়াছিল। চরিত্র ও ধর্ম্মে চার্চ্চের পাদরিরা উন্নত আদর্শ অনুসারে চলিতে লাগিলেন। ধর্ম্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা বাহির হইতে লাগিল। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে আর্ত্তের সেবার জন্য রমণীরা ভগিনীসঙ্ঘ (Sisterhood) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের কার্য্যের পরিসর দ্রুত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এক্ষণে ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত আশ্রম, দাতব্য-চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, প্রায়শ্চিত্তশালা এবং আরোগ্যনিলয় সেবাধর্ম্মের পরাকাষ্ঠার নিদর্শনস্বরূপ হইয়া ইংলণ্ডের চার্চ্চের অশেষ কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। পূর্ব্বে এরূপ প্রতিষ্ঠানের কল্পনাও কেহ করেন নাই। পুরুষদের প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ রমণী-প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠানগুলির মত উন্নতির দিকে ততদূর অগ্রসর না হইলেও এগুলি বড় কম কার্য্য করিতেছে না। সেণ্ট জন সোসাইটী, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে রিচার্ড মেউ বেনসন্ (Richard Mew Benson) কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার শাখা পৃথিবীর মধ্যে চারিটী মহাদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং Community of the Resurrection and Society of the Sacred Missionএর কার্য্যকলাপ অনেকেই জানেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড-প্রগতির ফলে এই সকল সদনুষ্ঠান সুন্দরভাবে চলিয়া মানুষকে ধর্ম্মের পথে লইয়া যাইবার সহায়তা করিতেছে—সেবা-শুশ্রূষার দ্বারা মানবকে আপন করিয়া লইতেছে—ভ্রাতৃ-ভাব জগতে প্রতিষ্ঠা করিতেছে। অক্সফোর্ড ও উইন্‌চেষ্টারের বিশপ স্যামুয়েল উইলবারফোর্স্ আপনার পবিত্র চরিত্রের আদর্শে বিশপ-দিগের চরিত্র-গঠন করিতে প্রগতির প্রারম্ভ হইতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। ইংলণ্ডের বিশপেরাও তাঁহার উন্নত আদর্শ ও চরিত্র-মাধুর্য্যে তাঁহার অনুকরণ করিয়া চার্চ্চের নৈতিক-জীবন সংস্কার করিতে পারিয়াছেন। এই প্রগতি যাজকদিগের অন্তঃকরণে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে ও তাঁহাদের অনুভূতিবিকাশের সহায়ক হইয়াছে।

প্রগতির প্রথম যুগে প্রচারকগণ পুস্তিকা (tracts) লিখিয়া ধর্ম্মযাজকদিগের শত বৎসরের অলসতা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সকলের রচয়িতৃগণ গম্ভীরপ্রকৃতি, চিন্তাশীল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, চরিত্রবান্, সংসারে অনাসক্ত, পদোন্নতিতে বিতৃষ্ণ, কৃত্রিম আড়ম্বর ও প্রতারণার বিরুদ্ধে সর্ব্বদা জাগ্রত। ইঁহারা মানবের শুদ্ধ বুদ্ধির উদ্রেক করিতেই ব্যস্ত ছিলেন। ভাবের প্রাবল্যে মানব যাহাতে না ভাসিয়া যায়, সে দিকে ইঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ইঁহারা শুদ্ধা ভক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান্ ছিলেন। যীশুখৃষ্টকে ইঁহারা ব্যক্তিগতভাবে আপনার জন ও বন্ধু হিসাবে দেখিবার উপদেশ দিতেন। এ ভাবে যীশুখৃষ্টকে ইংলণ্ডের চার্চ্চ কোন দিন দেখে নাই। যীশুখৃষ্ট সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, তিনি কোন দূরবর্ত্তী স্থানে থাকিয়া মানবের ত্রুটি বিচ্যুতির হিসাব নিকাশ রাখেন, প্রাণীকে দণ্ড দেন ও ধার্ম্মিককে পুরস্কৃত করেন। তাঁহার সহিত সম্বন্ধ ছিল—কতক ভয়ের, প্রেমের নয়। ভক্তির নয়—ঠিক বলা যায় না। কিন্তু একথা বলিলে অন্যায় হইবে না যে, সে ভক্তির মূলে ভয় আছে, প্রেম নাই।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত যখন 'বিবর্ত্তনবাদ' প্রচলিত হইল, তখন অক্সফোর্ড-প্রগতি ধর্ম্মযাজকদিগের কার্য্যকলাপও বিবর্ত্তনবাদের ভিতর দিয়া দেখিতে লাগিল, উন্নতির নূতন আলোকে সংস্কারকার্য্যও চলিয়াছিল।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, প্রথম হইতে অক্সফোর্ড-প্রগতি

সংবদ্ধভাবে কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, ব্যক্তিগত মতের উপর কার্য্য করে নাই। তাই প্রগতি একদিকে ধর্ম্মের অতীন্দ্রিয়বাদের দিক্‌টা বা 'মিষ্টিসিজ্‌ম্' পরিহার করিয়া আনুষ্ঠানিক দিক্‌টার উন্নতি করিতে অগ্রসর হয়। ব্যক্তিত্ববাদের (Individualism) দিক্‌টাও পরিহার করিয়া পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতার পরিবর্ত্তে সংবদ্ধভাবে সকলের সহিত সহযোগিতার কার্য্য করিতে উদ্যোগী হয়। ফলে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে Christian Social Unionএর সৃষ্টি হয়। পরস্পরের সাহায্য ও স্বার্থরক্ষণের জন্য 'গণ' (Guild) এবং ধর্ম্মসঙ্ঘ স্থাপন করিয়া প্রগতি সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে শিক্ষা দিয়াছিল। প্রগতির পূর্ব্বে ইংরেজ ঠিক এ ভাবে ধর্ম্মের আলোচনা করে নাই। ধর্ম্মেরও যে একটা সামাজিক দিক্ আছে, তাহার উপলব্ধি ততটা করিতে পারে নাই। ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া মানবের উন্নতির চেষ্টার মূলেও এই প্রগতির কার্য্য বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রগতির সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হইতেছে,—চার্চ্চ ষ্টেটের অধীন নয়, ষ্টেটের অন্যান্য অনুষ্ঠানের মত এটাও একটা অনুষ্ঠান নয় বা ষ্টেটের ডিপার্টমেণ্টও নয়—সেইটী বুঝাইয়া দেওয়া। চার্চ্চ একটা মানবীয় অনুষ্ঠান নয়—ইহা যীশুখৃষ্টের অঙ্গবিশেষ—মানবের ইচ্ছার উপর এ অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা নয়, যীশুখৃষ্টের ইচ্ছার উপর ইহার ভিত্তি।

অক্সাস্—মধ্য এসিয়ার মহানদী। ভারতীয় আর্য্যগণ ইহাকে বক্ষু নামে, আরবগণ জিহুণ নামে ও পারসিকগণ আমুদরিয়া নামে অভিহিত করিতেন। পূর্ব্বতন ভৌগোলিকগণ মনে করিতেন যে, তুর্কী অক্-সু অর্থাৎ শ্বেতনীর হইতে ইহার নাম অক্সাস্ হইয়াছে। কিন্তু অধুনা ইয়ুল, কার্জ্জন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাখ্‌স্ শব্দ হইতে অক্সাস্ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

অক্সাস্ নদী দৈর্ঘ্যে ২৪০০ কিলোমিটার। পামীরের ভিক্টোরিয়া হ্রদ হইতে আফগান তুর্কীস্থানের অন্তর্গত খামিয়াব পর্য্যন্ত প্রায় ৬৮০ মাইল ধরিয়া এই নদী আফগানিস্থান ও রুশিয়ার মধ্যে সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে পামীর সীমানির্দ্দেশ করিবার জন্য যে কমিশন নিযুক্ত করা হয়, তাঁহাদের যত্নে অক্সাসের উৎপত্তিস্থল আবিষ্কৃত হইয়াছে। নিকোলাস্ নামক যে পর্ব্বতশ্রেণী বড় ও ছোট পামীরকে বিভক্ত করিতেছে, তথায় বহু তুষারস্তূপ পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। ঐ তুষারস্তূপ হইতে অক্সাসের দুইটী শাখানদী—অক্সু ও পামীর নদীর উৎপত্তি হইয়াছে ও আব্-ই-পঞ্জা নামক তৃতীয় শাখানদীরও অধিকাংশ জল আসিতেছে। পামীরের নিকটবর্ত্তী তাঘদুমবাশ্ নামক তুষারস্তূপ হইতেও আব্-ই-পঞ্জা নদী জল পাইতেছে। যেস্থানে অক্সাস্ নদী অক্-বৈতাল নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে, সেইস্থান হইতে পঞ্জার সহিত সঙ্গম পর্য্যন্ত ইহার নাম হইয়াছে—মুর্ঘ্-আব্ বা বার্ত্তং।

কিলিফ্ নামক স্থানে হিসার পর্ব্বতের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় অক্সাস্ নদীর প্রস্থ মাত্র ৭০০ হাত হইয়াছে, কিন্তু উপত্যকা ভূমিতে ইহার প্রস্থ গড়ে ১৬০০ হাত হইবে। সাধারণতঃ ইহার জল প্রায় চৌদ্দ হাত গভীর। অক্সাস্ নদীর জল পাইয়া খিবারভূমি অসম্ভব রকম উর্ব্বরা হইয়াছে। কিলিফের উর্দ্ধে নদীর বাম-তীর জলাভূমি ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এই সকল জঙ্গলে হরিণ, ফেজাণ্ট্ এবং ব্যাঘ্র দৃষ্ট হয়।

এই নদী আফগান তুর্কীস্থানের ভূভাগকে উর্ব্বর করিয়াছে। নদীর দক্ষিণতীরবর্ত্তী জলাভূমি এবং তুর্কীস্থানের উর্ব্বর শস্যশালী ভূখণ্ডের মধ্যে, বিশেষতঃ খামিয়াব ও খ্বাজা সলর নামক স্থানের নিকটে অনেকটা স্থান বালুকাপূর্ণ। নদী হইতে অনেকগুলি খাল কাটিয়া এই অনুর্ব্বর ভূভাগ চাষের উপযোগী করিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং এই চেষ্টা কার্য্যকরী হইয়াছে। নদীতীরবর্ত্তী উর্ব্বর ভূভাগ যব, গম প্রভৃতি শস্য এবং নানা ফুলে শোভিত। এই সকল স্থানে শীত-গ্রীষ্ম প্রখরভাবে অনুভূত হয়। কিলিফের খেয়াঘাট, সমরকন্দ ও অক্‌চার মধ্যে একটী দ্বারবিশেষ। এখানকার খেয়ানৌকা ঘোড়া দিয়া চালিত হয়। একগাছি রজ্জু ঘোড়ার সঙ্গে এবং যাত্রী ও মালপত্র বোঝাই বৃহৎ খেয়ানৌকার সহিত সংযুক্ত থাকে। ঘোড়া সাঁতরাইয়া নৌকা পার করে। গ্রীষ্মকালে একটী রুশীয় বাষ্পীয়পোত খিবা হইতে বোখারা প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রায় ৭৫০ মাইল আরোহী লইয়া যাতায়াত করে।

অতি প্রাচীন ইতিহাস হইতে জানা যায়, অক্সাসের উভয় তীরই পারস্যসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পারস্য গল্প ও উপন্যাসে ইহা ইরাণ ও তুরাণের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তবে নদীর উভয় তীরের অধিবাসিগণ ইরাণীয় ছিল বলিয়াই মনে হয়। খৃষ্টপূর্ব্ব ৭ম শতকে এই নদীর উপত্যকাভাগে বল্‌খ্ নামক স্থানে জরথুস্ত্র তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তৎপরে এখানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার হয়। য়ুয়ন্ চোয়াঙ্ ৬৩০-৬৪৪ খৃষ্টাব্দে এ অঞ্চলে ভ্রমণবৃত্তান্তে তের্মেজ, খুলম্, বল্‌খ্, বামিয়ন্ প্রভৃতি স্থানে বহু বৌদ্ধস্তূপ, চৈত্য ও মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। [পামীর, বল্‌খ্, বদক্‌সান প্রভৃতি শব্দ দ্র°]

অক্সিজেন—[অম্লজান দ্র°]

অক্সিন্‌ডেন্, স্যর্ জর্জ্জ—১৬১৯ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ

করেন। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে সুরাটে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফ্যাক্টরীর প্রধান পদে ইনি নিযুক্ত হন। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারিখে সুরাটেই দেহত্যাগ করেন। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে ইনি ব্যারনেট্ হইয়া স্যর্ উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহার সময়েই বোম্বাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তগত হয়। যদিও ইনি বোম্বাইয়েরও শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি অধিকাংশ সময় সুরাটেই থাকিতে ভালবাসিতেন। ইনি পরিকল্পনা করিয়া বোম্বাইয়ের সুদৃশ্য ইংলিশ চার্চ্চ স্থাপন করেন।

অক্সিয়াই (Oxii)—ইরাণ রাজ্যের অধিবাসী পর্ব্বতীয়জাতি। দস্যুবৃত্তিই ইহাদের ব্যবসায় ছিল। গ্রীক্‌বীর আলেক্‌সান্দার যখন দিগ্বিজয়ে ভারতে আসেন, তখন ইহারা গ্রীক্‌সৈন্যগণকে পথিমধ্যে বিপর্য্যস্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। সম্ভবতঃ অক্সাস্ (Oxus) নদীর উপত্যকাবাসী বলিয়া গ্রীক্‌গণ ইহাদিগকে অক্সিয়াই বা অক্সী শব্দে উল্লিখিত করিয়াছেন। ইহারা পরবর্ত্তীকালে পারস্থে 'হুঝা' (Huzha) নামে আখ্যাত হইয়াছিল।

অক্‌সির (ইক্‌সির) মির্জা—ইস্পাহানবাসী একজন শোকগাথা বিষয়ক পুস্তক রচয়িতা। ইনি নবাব নিজাম-উল্-মুল্‌ক্ আসফজাহ্ এবং সফদরজঙ্গের অধীনে চাকরী করিয়াছিলেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে (১১৬৯ হিজরি) বঙ্গদেশে ইঁহার মৃত্যু হয়।

অক্‌সু (Ak-su)—পূর্ব্ব-তুর্কীস্থানের সুপ্রাচীন শহর। অক্ষা° ৪১°৯′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°১৩′ পূঃ। তিয়ানশান্ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন অক্‌সু নদীর বাম-তীরে এই শহর অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহাকে অর্পাদিল বা অর্দাবিল বলা হইত। চীন-পরিব্রাজক য়ুয়ন্-চোয়াঙ্-এর বর্ণনায় এই স্থান পই-শুই-চেঙ্গ্ (Pai-Shui-Ch'eng) বা শ্বেত-নীর শহর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শহরটীর চতুর্দ্দিক্ প্রাচীরবেষ্টিত। একদল চীনসৈন্য সর্ব্বদা তথায় অবস্থান করে। উৎপন্ন দ্রব্য—তামাক, অশ্বা-রোহীর পরিচ্ছদ, মাটীর পাত্র প্রভৃতি। ইহা একপ্রকার শকট-ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল। স্থানীয় অধিবাসীরা গো-মেষাদিও পালন করিয়া থাকে।

অখগাঁও—বেহারবাসী কৃষিজীবী জাতি। ইহারা কাণ্ডু জাতির মগহিয়া শাখার অন্তর্ভুক্ত একটী থাক।

অখট্ট—পিয়ালবৃক্ষ; পিয়ালগাছ; পিয়াসাল (Buchanania latifolia)। [পিয়াল দ্র°] ইহার বীজকে পিয়ালবীজ ও চারদানা কহে।

অখড়জাত—[আরবী] ইহার প্রকৃত উচ্চারণ ইখ্‌ড়াজাত; কিন্তু বাঙ্গালায় অখড়জাত, আখড়্‌জাত—এইরূপ উচ্চারিত হয়। খিরাজ অর্থাৎ রাজস্ব হইতে উৎপন্ন। ইহার অর্থ—রাজস্বের যে অংশ কর্ম্মচারিদিগের বেতনের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট থাকে; জমিদারী সরঞ্জামি খরচ।

অখণ্ড১—এক যক্ষপুত্র। দেবযক্ষ নামে অলকাপুরীতে দেবাদি-দেব মহাদেবের ভক্ত এক বিখ্যাত যক্ষ ছিলেন। শিবপূজার জন্য পুষ্প আনয়ন করিতে তিনি তাঁহার অষ্ট পুত্রকে মানস-সরোবরে পাঠান। তাঁহার সেই পুত্রদিগের নাম—গণ্ড, দণ্ড, দেবকূট, মহাগিরি, প্রচণ্ড, খণ্ড, অখণ্ড ও পৃথু। মানস-সরোবরে গমন করিয়া তাঁহারা সুগন্ধ পুষ্পের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া পুষ্পগুলি আঘ্রাণ করিয়া চয়ন করেন ও অলকাপুরীতে আসিয়া সকলে পিতাকে আহৃত পুষ্প প্রদান করেন। সেই আঘ্রাত ও উচ্ছিষ্ট পুষ্প দেবতাকে দিবার পাপে তাঁহারা তিন জন্মের জন্য অসুরযোনি প্রাপ্ত হন। (গর্গসংহিতা)

অখণ্ড২—একজন গ্রন্থকার। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—'অখণ্ডাদর্শ'।

অখণ্ড৩—গাজীপুরের ১২ মাইল দক্ষিণে দিলদারনগর।

অখণ্ডদ্বাদশী—চান্দ্র অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী। এই দ্বাদশী অতি পুণ্য তিথি। এই তিথিতে পাপ বা পুণ্য যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা খণ্ডিত হয় না। এই জন্য ইহার নাম অখণ্ডদ্বাদশী। এই তিথিতে কদাচ পাপানুষ্ঠান করিবে না এবং প্রযত্নসহকারে পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান বিধেয়।

অখণ্ডদ্বাদশী ব্রত—অখণ্ডদ্বাদশীতে অনুষ্ঠেয় ব্রতবিশেষ। গরুড় পুরাণে (১১৮ অঃ) এই ব্রতকথা লিখিত হইয়াছে।

অখণ্ডন—কাল।

অখণ্ডমণ্ডল—পরিপূর্ণমণ্ডল। "অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।" (গুরু প্রণামমন্ত্র) তিথিবিশেষে চন্দ্রমণ্ডলের খণ্ডাখণ্ড হইয়া থাকে। পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র ষোল কলায় পূর্ণ হইয়া অখণ্ডমণ্ডল হন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শারদী পূর্ণিমা তিথিতে অখণ্ডমণ্ডল চন্দ্রদেবকে অবলোকন করিয়া ললনাদিগের মনোহর কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

"দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণং।
বনঞ্চ তৎ কোমলগোভিরঞ্জিতং জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরং॥"
(ভাগবত ১০.২৯.৩)

অখণ্ডাদর্শ—একখানি স্মৃতিনিবন্ধ। সম্ভবতঃ অখণ্ড-কর্ত্তৃক ইহা রচিত হয়। বেঙ্কটনাথের 'স্মৃতিরত্নাকরে' ইহার উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থ ধর্ম্মসংক্রান্ত কাণ্ড ও ব্যবহার অধ্যায়ে বিভক্ত।

অখণ্ডানন্দ—একজন গ্রন্থকার। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—অদ্বৈত-রত্নকোষ (বেদান্ত), রত্নকোষটীকা (বেদান্ত), মন্ত্রধারপ্রকরণ, মহাবিষ্ণুপূজাপদ্ধতি ও মুক্তিসোপান।

অখণ্ডানন্দ মুনি—আচার্য্য অখণ্ডানুভূতির শিষ্য। ইঁহার

প্রধান গ্রন্থ—'তত্ত্বদীপনপঞ্চপাদিকাবিবরণ' (বেদান্ত) ও 'মহাবিষ্ণুপূজাপদ্ধতি'। 'তত্ত্বদীপনপঞ্চপাদিকাবিবরণ' 'পঞ্চপাদিকা-বিবরণের' উপর একখানি প্রামাণিক নিবন্ধ। অপ্পয়-দীক্ষিতের 'সিদ্ধান্তলেশে' 'তত্ত্বদীপনের' মত উদ্ধৃত হইয়াছে। (সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ—সিদ্ধান্তমঞ্জরী সিরিজ্, ১৪৯ পৃঃ দ্র°)। তত্ত্বদীপনে 'প্রমেয়-সংগ্রহের' উল্লেখ থাকায় অখণ্ডানন্দ বিদ্যারণ্যের পরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়; কিন্তু পঞ্চপাদিকাবিবরণের টীকা 'ভাবপ্রবেশিকায়' তত্ত্বদীপনের উল্লেখ থাকায় অখণ্ডানন্দকে পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে হয়। অখণ্ডানন্দ ভাব-প্রবেশিকাকার নৃসিংহাশ্রমের পূর্ব্ববর্ত্তী। নৃসিংহ ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন; সুতরাং অখণ্ডানন্দ সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতকে বিদ্যমান ছিলেন। বেনারস সংস্কৃত সিরিজে তত্ত্বদীপন প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহার অপর গ্রন্থ—তর্কভাষাপ্রকাশ ব্যাখ্যা ও বিবরণতত্ত্বদীপন (সুরেশ্বরকৃত 'ব্রহ্মসূত্রভাষ্যবার্ত্তিকের' টীকা)।

অখণ্ডানুভূতি—অখণ্ডানন্দের গুরু।

অখণ্ডিত—অক্ষত, অবিচ্ছিন্ন। "অখণ্ডিতং প্রেম লভস্ব পত্যুঃ।" (কুমারস° ৭.২৮)

অখণ্ডিতর্ত্তু—ফলযুক্ত বৃক্ষাদি।

অখতিজ, অখতীজ—বৈশাখ মাসের শুক্লাতৃতীয়া। কৃষকেরা রবিখন্দের সময় বণিক্‌দের নিকট যে ঋণ লয়, তাহা এই দিনে পরিশোধ করে। এই শুভদিনে তাহারা কৃষিকার্য্যের অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে দেয়, কিঞ্চিৎ ভূমিকর্ষণ করিয়া রাখে এবং ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করায়। এ দিন বীজবপন নিষিদ্ধ। বোম্বাই প্রদেশে এই দিনকে অখতৃজ বলা হয়।

অখতিয়ারপুর—দ্বারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত সমস্তীপুর মহকুমার একটী গ্রাম। এই স্থানে নারায়ণী-পাঠশালা নামে একটী সংস্কৃত চতুষ্পাঠী আছে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা একজন সন্ন্যাসী; তিনি ভিক্ষাদ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া ইহার যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন।

অখনবারী—বেহার প্রদেশস্থ হলবাই জাতির তিনমুলিয়া ও ছ'মুলিয়া মধেসিয়া এবং ভোজপুরীয়াদিগের এক শাখা।

অখনা—[অক্কণ্ণা দ্র°]

অখবার—[আরবী] খবর শব্দের বহুবচন; সংবাদ। ২ সংবাদ-পত্র। [সংবাদপত্র দ্র°] ৩ মুসলমানদের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের রাজারা আপন আপন রাজকার্য্যের যে সকল বিবরণ অন্যান্য রাজাদের নিকট লিখিয়া পাঠাইতেন।

অখবারনবীস—[আরবী] সংবাদলেখক; সংবাদদাতা। ইঁহারা মুসলমান সম্রাটদের সময় সংবাদ লিখিয়া পাঠাইবার কর্ম্মচারী ছিলেন। স্ব স্ব নির্দ্দিষ্টস্থানের সংবাদ বাদশাহের নিকট লিখিয়া পাঠাইতেন। বাঙ্গালার শোভাসিংহ বিদ্রোহী হইলে মুর্শিদাবাদের নবাব দিল্লীর বাদশাহকে সংবাদ দেন নাই। কিন্তু তত্রত্য অখবারনবীস গোপনে দিল্লীতে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন।

অখম লোহান—ব্রাহ্মণাবাদের শাসনকর্ত্তা। ইনি লাখ, সম্ম এবং সিহত প্রদেশেরও অধিপতি ছিলেন। সিন্ধুদেশের রাজা চচের সহিত ইঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল। চচ-নামা অথবা তারিখ-ই-হিন্দ-ব-সিন্দ নামক পুস্তকে এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

অখয়সিংহ—জশলমীরের মহরাবালবংশীয় এক প্রসিদ্ধ পুরুষ। ইনি ১৭২২ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

অখরতিজিয়া, অখরতীজ, অখরতীত—[অক্ষয়তৃতীয়া দ্র°]

অখরবাড়—যুক্তপ্রদেশের গোরখপুর জেলাবাসী কূর্ম্মী জাতির একটী শাখা। [কূর্ম্মী দ্র°]

অখরোট, আখরোট—[বৈদ্যক] (চলিত আক্‌রোট) স্বনাম-প্রসিদ্ধ ফলবৃক্ষবিশেষ (**Aleusites triloba** বা **Juglans regia**)। সংস্কৃত—অক্ষোট, অক্ষোড়, পীলুবৃক্ষ, কর্ণরাল; প্রাকৃত—অক্রোড়, কোঙ্কণ—অখোড়; হিন্দী—অখরোট, খরোট-নাসপাতী। ইংরাজী—**Walnut** বা **Candle-nut**।

ইহার ফল বাদামজাতীয় ও তৈলকর। বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—মধুর, বলকর, স্নিগ্ধকারক, উষ্ণবীর্য্য, বাতপিত্তঘ্ন, রক্ত-দোষহর, শীতল ও কফকারক।

কাশ্মীর হইতে হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে, পশ্চিম-তিব্বতের জঙ্গলে, আফগান রাজ্যে, মণিপুর আর আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে এই বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়। গ্রীস, আর্ম্মেনিয়া প্রভৃতি দেশেও ইহার চাষ আছে। আগাছা পরিষ্কার করিয়া উত্তম জমিতে চারা পুতিলে গাছ জন্মে। মধ্যে মধ্যে ঐ জমির আগাছা পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুই এই বৃক্ষের বিশেষ উপযোগী।

অখরোটগাছ বৃহদাকার হয়। ইহার পাতাগুলিও খুব চওড়া। অখরোটপত্র সঙ্কোচক গুণযুক্ত; ক্ষতস্থানে ইহার ক্বাথ লাগাইলে ক্ষতের উপশম হয়। ইহার তৈল গেঁটেবাতের বেদনানাশক বলিয়া অনেকের ধারণা।

জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ইহার ফলগুলি পুষ্ট হইয়া উঠে। ইহার উপরের খোলা মোটা ও শক্ত। কাশ্মীর ও উত্তর হিমালয়ের অধিবাসিগণের ইহা একটী প্রধান খাদ্য। পাতা ও কচি কচি ডালগুলি গবাদি পশুদিগের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

আইন্-ই-অক্‌বরী পাঠে জানা যায় যে, কাশ্মীরের অখরোটই

সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তৎকালে তাতারদেশ হইতে যে সকল অখরোট ভারতে আসিত, তাহা এদেশীয় অখরোট হইতে নিকৃষ্ট ছিল। ইহার ফলের খোসা ও গাছের ছাল রং করিতে লাগে। পশ্চিমাঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা এই ছালের কস দিয়া ঠোঁট রাঙ্গা করে এবং দন্ত পরিষ্কার করে।

অখরোটের শাঁস বা বীজ হইতে তৈল পাওয়া যায়। ফ্রান্সে প্রচুর পরিমাণে অখরোট হইতে তৈল উৎপন্ন হয়। সাবধানে খোসা তুলিয়া নিষ্কাশনযন্ত্রের চাপে যে স্বচ্ছ তৈল পাওয়া যায়, তাহা রন্ধনাদি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। পরে উহার খৈল জলে ভিজাইয়া পুনরায় যে তৈল বাহির হয়, তাহা গাত্রমর্দ্দনের উপযোগী। এই তৈল চিত্রাঙ্কনে এবং সাবান তৈয়ারী করিতেও ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট খৈল গবাদির খাদ্যার্থ ব্যবহৃত হয়।

ইহার কাষ্ঠ মধ্যম প্রকার শক্ত, সুন্দর এবং বেশ পালিস হয়। এই কারণে ইহাতে আসবাবপত্র নির্ম্মাণ করা হইয়া থাকে। দার্জ্জিলিঙের নিকটস্থ রঙ্গবুলে শুধু কাঠের জন্যই অখরোট চাষ করা হয়। ইহার সংস্পর্শে লোহায় মরিচা ধরে না, তজ্জন্য বন্দুকের বাঁটও ইহা হইতে তৈয়ারী করা হয়।

আবূল-ফজ্‌ল লিখিয়াছেন, কাশ্মীরের জিলবুল গ্রামে একটী কুণ্ড আছে। তথাকার অধিবাসীরা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে কি না জানিবার জন্য ঐ কুণ্ডে অখরোট ফল নিক্ষেপ করিত। ফল ভাসিয়া উঠিলে মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে বলিয়া বুঝিত—অন্যথায় মনোরথ বিফল মনে করিত।

অখলকোপ—বোম্বাই প্রদেশের সাতারা জেলার অন্তর্গত এক নগর। কৃষ্ণানদীর দক্ষিণকূলে অষ্টা হইতে ৪ মাইল উত্তরপূর্ব্বে এবং তাসগাঁও হইতে ১১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার দত্তাত্রেয় ও মহসোবার মন্দির সমধিক প্রসিদ্ধ। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে অখলকোপের দেশপাণ্ড্যবংশীয় কৃষ্ণরাও ত্র্যম্বক বাপট কর্তৃক ইহার জীর্ণসংস্কার হয়। এখানে আশ্বিনের কৃষ্ণাদ্বাদশী, মার্গশীর্ষের পূর্ণিমা ও মাঘের কৃষ্ণাপঞ্চমীতে মেলা বসে। স্থানীয় ধনী বণিক্‌গণ মেলার খরচ চালান এবং ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রনারায়ণের সেবায় বহু অর্থব্যয় করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণামাহাত্ম্যে মহসোবা মন্দিরের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। উহা গণপতির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই পীঠের বহির্দ্দেশে প্রস্তরগাত্রে গণপতির অনুচরবর্গের প্রতিমূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। মধ্যভাগে একটী প্রস্তরবেদী। উহা মহসোবার আসন বলিয়া পূজিত। মন্দির প্রবেশের তিনটী দ্বার সার্দ্ধদ্বিশত বৎসর পূর্ব্বে স্থানীয় কোন সর্দ্দার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

অখা,—সাগরের খাড়ী। কোন স্বাভাবিক বিস্তীর্ণ জলভাগের তিন দিকে ভূমি ও এক দিক্ খোলা থাকিলে তাহাকে অখা কহে (Gulf)।

অখা,—ব্রহ্মদেশের সুদূর পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত শানরাজ্যের কেঙ্গটুঙ্গ অধিত্যকাবাসী পাহাড়ী জাতি। শানেরা ইহাদিগকে 'কও' বলিয়া অভিহিত করে। কেঙ্গটুঙ্গ অধিত্যকার প্রায় সর্ব্বত্রই অখাদিগের বাস এবং ইহাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে।

ভাষাগত পার্থক্য ধরিয়া বিচার করিলে ইহাদিগকে কখনই মঙ্গোলীয়-আনাম বা চৈনিক সংস্রবসম্ভূত বলিয়া মনে হয় না। বরং তিব্বতী-ব্রহ্ম সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়াই ধারণা জন্মে। আচার ব্যবহারে ইহারা কতকটা মেকং পান্না ও লোট জাতির অনুরূপ।

চীনদিগের সান্নিধ্যে বহুকাল বসবাসের ফলে চীন-ভাষা শিখিয়া এবং চীনদিগের সহিত আদানপ্রদান করিয়া ইহারা অনেকটা চীনভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা চীনদিগের ন্যায় মাথায় অল্প ঝুঁটি রাখিলেও জাতি হিসাবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

কেঙ্গটুঙ্গের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে আরও যে সকল জাতি বাস করে, তাহাদের সহিত ইহাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য নিতান্তই কম। ইহারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকার ও কৃষ্ণবর্ণ—কতকটা শান বা চীনদিগের মত, কিন্তু প্রকৃত মঙ্গোলীয় জাতির সহিত ইহাদের কোন সৌসাদৃশ্য নাই। পুরুষদের বেশভূষা চীন ও শানদিগের হইতে কতকটা পৃথক্; কিন্তু রমণীরা বেশভূষার পছন্দ সম্বন্ধে পরাধীন নহে। তাহারা আপনাদের দলস্থ নারীদিগের বেশভূষা হইতে কিছু কাটিয়া ছাঁটিয়া নিজেদের পছন্দমত বেশভূষা গড়িয়া লয়। মাথায় যে বাঁশের চেচাড়ি দ্বারা প্রস্তুত টুপী পরে, তাহার শিল্পচাতুর্য্য বড়ই মনোরম।

ইহারা প্রধানতঃ তুলা ও পোস্তদানার চাষ করে। ভূপৃষ্ঠ হইতে অনেক উচ্চে বাঁশের মাচা করিয়া ঘর বাঁধে। ঘরগুলি ছোট এবং আশে পাশে আবর্জ্জনাও যথেষ্ট। কুকুরের মাংস ইহাদের একটী প্রধান খাদ্য।

ইহারা ভূত, প্রেত ও পিতৃপুরুষের উপাসনা করে। বিশেষ বিশেষ উৎসবে ইহারা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-ভোজের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। মৃতব্যক্তিকে ইহারা ভূ-প্রোথিত করে এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনে মহিষ বলি দেয়। ইহাদের বিবাহপ্রথায় কোন বিশেষত্ব নাই। আদিম অসভ্যজাতি-সমূহের ন্যায় বিবাহবন্ধন সিদ্ধ হয়। অখা ভিন্ন অন্যজাতির রমণীকে গ্রহণ করিতে ইহাদের কোন বাধা নাই।

কেঙ্গটুঙ্গ পর্ব্বতের একদেশে অকো নামে আর একটী জাতি বাস করে। ইহাদের ভাষা, পরিচ্ছদাদি ও দৈহিক গঠন অখাদিগের হইতে পৃথক্ হইলেও জাতি হিসাবে ইহাদিগকে অখার অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই মনে হয়।

অখাড়া—[হিন্দী] যে স্থানে সর্ব্বদা ৫।৭ জন বা ততোধিক লোকে একত্র থাকে; মঠ। বাঙ্গালা আখড়া শব্দ অখাড়ার অপভ্রংশ। [আখড়া দ্র°]

অখাত—দেবখাত, অকৃত্রিম জলাশয়, হ্রদ, নদী, নির্ঝর ইত্যাদি।

অখাদ্য—ন খাদ ণ্যৎ, নঞ্-তৎ। অভক্ষ্য; শাস্ত্রনিষিদ্ধ ভোজন-দ্রব্য। পলাণ্ডু, রশুন প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য স্বভাবতঃ অখাদ্য বলিয়া ধরা হইয়াছে। কোন কোন দ্রব্য সময় বিশেষে খাইলে দোষ হয় না, আবার সময় বিশেষে খাইলে দোষ হয়। কোন কোন দ্রব্য স্থানবিশেষে অভক্ষ্য হয়, কোন কোন দ্রব্য অন্য কোন বিশেষ দ্রব্যের সঙ্গে মিশ্রিত করিলে অখাদ্য হয়, কোন কোন দ্রব্য পাত্রবিশেষে রাখিলে অখাদ্য হয়, কোন কোন দ্রব্য অসদ্ব্যক্তি হইতে গ্রহণ করিয়া খাইতে নাই, কোন কোন দ্রব্য জাতিবিশেষে স্পর্শ করিলে অখাদ্য হয়।

অভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন করা আয়ুঃক্ষয়ের প্রধান কারণ। মনুসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের ভূমিকায় আছে,—ঋষিরা ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা সকলেই ত আপন আপন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তবে তাঁহারা বেদবিহিত চারি শত বৎসর পরমায়ু ভোগ করিতে পারেন না কেন? কি নিমিত্ত তাঁহাদের অকালমৃত্যু ঘটিতেছে? এই কথা শুনিয়া ভৃগু বলিলেন,—ব্রাহ্মণেরা ভাল করিয়া বেদ পড়েন না, তাঁহারা আচারভ্রষ্ট হইয়াছেন, দিন দিন অতিশয় অলস হইতেছেন, বিশেষতঃ তাঁহাদের খাদ্য-দোষ ঘটিয়াছে, এইগুলিই অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ। তাহার পর মনুপুত্র ভৃগু অভক্ষ্য দ্রব্যগুলির নাম করেন।

(এ স্থলে কতকটা প্রাচীন ঐতিহাসিক-তত্ত্ব নিশ্চয় করা যাইতেছে। মনুসংহিতায় লেখা রহিয়াছে যে, 'চতুষ্পাৎ সকলো ধর্ম্মঃ সত্যঞ্চৈব কৃতে যুগে'। সত্যযুগে চারিপোয়া ধর্ম্ম এবং সত্য ছিল। কিন্তু সত্যযুগেই ঋষিরা ভৃগুর কাছে ব্রাহ্মণদিগের অকালমৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ভৃগু তাহার উত্তরে আচার-ভ্রষ্টতা ও খাদ্যদোষাদির উল্লেখ করেন। অতএব সত্যযুগেও যে লোকে যথেচ্ছাচারী ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ভোজনাদির অত্যাচার না করিলে লোকে সেকালে দীর্ঘজীবী হইত; ভোজনাদির অত্যাচার না করিলে লোকে এখনও দীর্ঘজীবী হইতে পারে।)

ভৃগু কহিলেন,—গাজর, রশুন, পলাণ্ডু, ছত্রাক (ইহাকে ছাতু, ছাতা এবং কোঁড়কও কহে) এবং বিষ্ঠাদিতে যে সকল শাকাদি জন্মে, তাহা ভোজন করিতে নাই। (শাস্ত্রকারেরা এই সকল দ্রব্য ব্রাহ্মণাদির পক্ষে নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু শূদ্র প্রভৃতির পক্ষে নিষেধ করেন নাই।)

বৃক্ষের যে রক্তবর্ণ নির্য্যাস নির্গত হইয়া কঠিন হইয়া গিয়াছে; বৃক্ষ ছেদন না করিলে যে নির্য্যাস বাহির হয় না; এবং প্রসবের পর দশ দিন গত না হইলে যে গোদুগ্ধ কঠিন হইয়া যায়, তাহা এবং চালতা অভক্ষ্য।

যে সকল পশুর দুগ্ধ পান করিবার ব্যবস্থা আছে, প্রসবের পর দশ দিন গত না হইলে তাহাদের দুগ্ধ খাইতে নাই। উটের দুগ্ধ; অশ্ব প্রভৃতি যে সকল পশুর খুর যোড়া, তাহাদের দুগ্ধ; মেষের দুগ্ধ; ঋতুমতী গাভীর দুগ্ধ; এবং বাছুর নাই এমন গোরুর দুগ্ধপান নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের দুগ্ধ এবং হরিণ প্রভৃতি বন্য পশুর দুগ্ধও পান করা অকর্ত্তব্য। কিন্তু মহিষের দুগ্ধ খাইতে নিষেধ নাই।

যে সকল দ্রব্য স্বভাবতঃ মিষ্ট, তাহা বিকৃত হইয়া বিস্বাদ বা অম্ল হইয়া গেলে ভোজন করা অনুচিত। কিন্তু দধি ও নবনীত অখাদ্য নহে। যে সকল উত্তম ফুল, ফল ও মূল জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়, তাহা খাইবার বিধি আছে।

মাংসাশী পক্ষী; গ্রাম্য পক্ষী; গ্রাম্য কুক্কুট; গ্রাম্য শূকর; এক খুরবিশিষ্ট পশু; টিট্টিভ পাখী; চড়ুই; গুড়্‌গুড়ে; হংস; চক্রবাক; ডাক; শালিক; টিয়া; যে সকল পক্ষী ঠোঁট দিয়া কীটাদি মারিয়া খায়; যে সকল পক্ষী নখ দিয়া মাটি আঁচড়াইয়া খাদ্য অন্বেষণ করে; লিপ্তপদ পক্ষী; পানকৌড়ি প্রভৃতি পক্ষী যাহারা জলে ডুব দিয়া মৎস্য ধরে এবং বক, কাক, খঞ্জন প্রভৃতির মাংস অখাদ্য। শুষ্ক মাংস এবং কসাইয়ের দোকানের মাংস কদাচ ভক্ষণ করিবে না। আরণ্য কুক্কুট ও আরণ্য বরাহ অভক্ষ্য নহে।

বোয়াল, রুই, রাজীব, কাত্‌লা এবং আঁইসযুক্ত মাছ দৈব, পৈত্র্যকার্য্যে এবং পীড়াদিতে ভোজন করা যায়। পুস্তকান্তরে কাঁকড়া, গুগ্‌লি, শামুক, শাঁখ, কড়ি প্রভৃতি খাইতে নিষেধ আছে। সর্প প্রভৃতি যে সকল প্রাণী একাকী চরিয়া বেড়ায়; যে সকল মৃগাদিকে কেহ চিনে না; বিশেষরূপে নিষেধ না থাকায় যাহাদের মাংস খাইতে পারা যায় এরূপ অনুমান হয়; সজারু, গোসাপ, গণ্ডার, কচ্ছপ এবং খরগোস ভিন্ন অন্য পঞ্চনখ জন্তুর মাংস; এবং একপাটী দন্তবিশিষ্ট পশুর মাংস ভোজন করিবে না। কেবল যজ্ঞে উটের মাংস খাইতে ব্যবস্থা আছে।

মহাভারতোক্ত রাজা রন্তিদেবের উপাখ্যান এবং ভবভূতি-প্রণীত উত্তর-রামচরিতের ৪র্থ অঙ্কে সৌধাতকি ও ভাণ্ডায়নের কথোপকথন পাঠে জানা যায়, প্রাচীন আর্য্যগণ গোমাংস ভক্ষণ করিতেন। গোভিল সূত্রেও "তৈষ্যা উর্দ্ধং অষ্টম্যাং গৌঃ"—ইহা দ্বারা গোমাংস দিয়া শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে। উত্তরকালে হিন্দুধর্ম্মে গোমাংস ভক্ষণ একান্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে।

শাস্ত্রকারেরা যে সকল দ্রব্য খাইতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহার অনেকগুলি অহিতকর বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আর কতকগুলি দ্রব্য কেন নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহার গূঢ় কারণ বুঝিয়া উঠা দুষ্কর।

আমাদের শাস্ত্রে যে সকল পশু খাইতে নিষেধ করা হইয়াছে, বাইবেল এবং কোরাণে প্রায় সেইরূপ নিষেধ দেখা যায়। বাইবেে (লেবিটিকাস্ ৯-১১) লিখিত আছে যে, যে সকল রোমন্থক পশুর খুর দ্বিখণ্ডিত তাহাদের মাংস খাইতে পারা যায়। উট রোমন্থন করে, কিন্তু ইহার দ্বিখণ্ডিত খুর নাই, তজ্জন্য উটের মাংস অভক্ষ্য। এই কারণে বাইবেলে শশকও অখাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

শূকরের খুর দ্বিখণ্ডিত, কিন্তু ইহা জাবর কাটে না। তজ্জন্য শূকরমাংস অখাদ্য। জলজন্তুর মধ্যে যাহাদের ডানা এবং আঁইস আছে, তাহাদের মাংস খাইতে পারা যায়, কিন্তু কুম্ভীরাদির মাংস অভক্ষ্য।

ঈগল, চিল, শকুনি, কাক, পেঁচা, কোকিল, বাজবউরী, শিকরা, সোয়ান, রাজহংসাদি, বাদুড়, বক, উষ্ট্রক এবং যে সকল পক্ষী বুকে হাঁটে, তাহাদের মাংস খাইতে নাই।

কোরাণেও লিখিত হইয়াছে যে, পীড়াতে কিংবা আঘাত লাগিয়া কোন জন্তু মরিয়া গেলে তাহার মাংস খাইতে নাই। রক্ত এবং শূকরও অখাদ্য। যে সকল পক্ষী ঠোঁট দিয়া কীটাদি আছড়াইয়া মারে, যাহারা নখ দিয়া মাটি আঁচড়াইয়া খাদ্যদ্রব্য অনুসন্ধান করে, তাহাদের মাংস ভক্ষণ করাও অনুচিত। মুসলমানগণের নিকট কাঁকড়া এবং কচ্ছপও অখাদ্য বলিয়া গণ্য।

হিন্দুশাস্ত্রে জননমরণাশৌচে মৎস্যাদি ভক্ষণ নিষিদ্ধ এবং অশৌচগ্রস্ত নরনারীর স্পৃষ্ট অন্নাদিও অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ অখাদ্য বা অভক্ষ্য ভক্ষণে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও হিন্দুশাস্ত্রকারেরা করিয়াছেন। [প্রায়শ্চিত্ত দ্র°]

বাইবেলে লিখিত আছে, (লেবিটিকাস্ ১২) ঈশ্বর মোজেস্‌কে এইরূপ উপদেশ দিলেন যে, পুত্র প্রসব করিলে সূতিকা ঘরে স্ত্রীলোকেরা সাতদিন অশুচি থাকে। কিন্তু কন্যা সন্তান হইলে অশুচির কাল এক পক্ষ।

এই অশুচিকালের মধ্যে স্ত্রীলোকদের অনেক প্রকার রোগ জন্মে। তাহার মধ্যে এক একটী রোগ অতিশয় সংক্রামক। অতএব তাদৃশ অশুচি অবস্থায় প্রসূতি কোন খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করিলে তাহা ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে।

পেঁয়াজ এবং রশুন মানুষের সুপথ্য কি না, সে বিষয়ে অনেক মতানৈক্য আছে। এলোপ্যাথী চিকিৎসার পুস্তকে এই দুই কন্দ আগ্নেয় ও উত্তেজক বলিয়া লিখিত আছে। হাকিমেরাও ইহাদিগকে আগ্নেয় ও ধাতুপোষক কহেন। বৈদ্যক গ্রন্থে পেঁয়াজের গুণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—ইহা ঝাল, ধাতুপোষক, পাকে মধুর, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, বলকর, পিত্তকর নহে, কফনাশক, তৃপ্তিজনক এবং গুরুপাক। রশুন ক্ষারযুক্ত, মধুর, কণ্ঠস্বরবর্দ্ধক, ধাতুপোষক, বলকর ও বিরেচক। অস্থি প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া গেলে ইহার প্রলেপ দ্বারা ভগ্ন অস্থি যোড়া লাগে। ইহাতে রক্তপিত্তরোগ বৃদ্ধি হয়।

যাঁহারা নিত্য পেঁয়াজ ও রশুন ব্যবহার করেন, তাঁহাদের মুখে ইহাদের দোষ বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু যাঁহারা ক্বচিৎ ইহা ভোজন করেন, তাঁহারা ইহাদের কতকগুলি দোষ দিয়া থাকেন। পেঁয়াজ রশুন দিয়া ব্যঞ্জন পাক করিলে তরকারি সুস্বাদু হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু অতিশয় গুরুপাক হইয়া উঠে এবং রক্ত গরম হয়। সে কারণ আমাদের উষ্ণপ্রধান দেশে, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে ইহা অধিক ভক্ষণ করা উচিত নহে।

মাস, তিথি এবং বার বিশেষেও শাস্ত্রকারেরা নানা প্রকার দ্রব্য খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। যথা,—কার্ত্তিকমাসে ষষ্ঠী, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা এবং পূর্ণিমাতে ও রবিবারে মৎস্যমাংস ভোজন করা অবিধেয়। হরিশয়নে শ্বেতশিম, মাষকলাই, কলম্বী প্রভৃতি দ্রব্য খাইতে নাই। তদ্ভিন্ন, নবমীতে লাউ, ত্রয়োদশীতে বেগুণ এইরূপ তিথিবিশেষে অনেক নিষিদ্ধ দ্রব্য আছে। এ সকলের উদ্দেশ্য স্বাস্থ্যরক্ষা। [সেই সেই বার ও তিথি দ্র°]

তাহার পর মনুসংহিতায় নানাবিধ অভক্ষ্য অন্নের বিষয় লিখিত হইয়াছে। উন্মত্ত, ক্রোধপরবশ এবং ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিতে নাই। অন্নে কেশ ও কীট পড়িয়া থাকিলে, কিংবা ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্ন মাড়াইলে তাহা ভোজন করিবে না। যাহারা ভ্রূণহত্যা করে, সে সকল লোক অন্ন পানে চাহিলে তাহা অভক্ষ্য হয়। কাকাদি পক্ষী কোন অন্নে

মুখ দিলে কিংবা রজস্বলা স্ত্রী অথবা কুকুরে স্পর্শ করিলে তাহা ভোজন করা অনুচিত।

মঠের অন্ন, বেশ্যার অন্ন এবং গরুতে কোন অন্ন আঘ্রাণ লইলে তাহা ভোজন করিতে নাই। চৌর্য্য, বৃত্তি-উপজীবী, সুদখোর, কৃপণ, কয়েদী, মহাপাতকী, ক্লীব, ব্যভিচারিণী, ছলকারী, চিকিৎসক, ব্যাধ, পুরোহিত, শত্রু, অবীরা স্ত্রী এবং সূতিকা ঘরের স্ত্রীর অন্ন অভক্ষ্য। পরের উচ্ছিষ্ট এবং বাসি ভাত খাইতে মনু নিষেধ করিয়াছেন। খাদ্য দ্রব্যের উপর কেহ হাঁচিলে তাহাও ভোজন করিতে নাই।

পত্নী ব্যভিচারিণী হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়াও যে সহ্য করিয়া থাকে; যে ব্যক্তি স্ত্রীর পরামর্শ শুনিয়া কাজ করে; কর্ম্মকার, নিষাদ, নট, গায়ন, স্বর্ণকার, লৌহবিক্রেতা, ডোম, ধোবা এবং যাহারা বস্ত্রে রঙ্ করে ও শীকার করিবার জন্য কুকুর পুষিয়া রাখে, তাহাদের অন্ন খাইতে নাই।

দুগ্ধের সঙ্গে লবণ কিংবা মৎস্যমাংস খাইবে না। সুশ্রুতে লিখিত আছে যে, মৎস্যের সঙ্গে কিংবা মৎস্য ভোজনের পর দুগ্ধ পান করিলে কুষ্ঠরোগ জন্মে। কাঁসার পাত্রে নারিকেল জল বা অন্নাদি ঢালিয়া খাইবে না। তাম্রপাত্রেও মধুর রস ঢালিয়া খাইতে নাই।

জৈনগণ প্রাণিমাত্র বধে বিরত। ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার তাঁহাদের মধ্যে অত্যধিক। যাহা ভক্ষণ করিলে দৃষ্ট বা অদৃষ্ট জীবের প্রাণহানি হওয়া সম্ভব, সেরূপ দ্রব্য জৈন-দিগের অভক্ষ্য। তদ্ভিন্ন জৈন সাধুগণের পক্ষে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলিও অভক্ষ্য মধ্যে গণ্য—মদ্য, অহিফেনাদি, বার্ত্তাকু, মূল ও কন্দজাতীয় দ্রব্য (মূলা, আদা প্রভৃতি)।

বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণের পক্ষে প্রাণিজ খাদ্য—দধি, দুগ্ধ, এবং শর্করা প্রভৃতি নিষিদ্ধ ছিল; তবে অবস্থাবিশেষে এ সকল ভক্ষণ করা যাইত। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি হইলেও বৌদ্ধগণ বহুবিধ প্রাণী ভক্ষণ করিয়া থাকেন। গো, শূকর প্রভৃতি প্রাণীও ইঁহাদের খাদ্য।

অখামণ্ডল—বোম্বাইয়ের অন্তর্গত এক জেলা। ইহা অখা নামেও পরিচিত। বর্ত্তমানে ইহা গাইকবাড় রাজ্যের শাসনাধীন।

অখাস্ মালিক—সুলতান জালালুদ্দীনের মাতুল-পুত্র। ইঁহাকে উক্সাশ্ মালিকও বলা হইত। ইঁহার পিতার নাম খান্ মালিক।

[Tabaqāt-i-Nāsirī (Raverty), p. 291n]

অখিরাজ—একজন নৃপতি। ইঁহার পূর্ব্বতন সামবংশীয় নবম রাজা যোধার পর ইনি সিংহাসনারোহণ করেন। ইনি যাদবগণকে ধ্বংস করিয়া শত্রুঞ্জয় (বা গির্গার) দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে একটী দোহা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে আছে—

অখে তংবোলরে উঠীয়ে চাতরংগো গঢ় লে সাও
দুয়াণ খেদে ভাভিয়ে জাদব কাঢ়া জোই ॥ ১ ॥

অখিরাজের অধস্তন সপ্তম নৃপতি দেবা সম্বৎ ১৩৭২ অব্দে শত্রুঞ্জয় পরিত্যাগপূর্ব্বক খেড়াগঢ় দুর্গ অধিকার করেন। [দেবা দ্র°]

[Indian Antiquary, Vol. III, 1874, pp. 70-1]

অখিলিকা—[বৈদ্যক] ক্ষুদ্র কারবেল্লী, চলিত উচ্ছে (Momordica charantia)। হিন্দী—করেলী ছোটী। [কারবেল্লী দ্র°]

অখিলাণ্ডী নাচ্ছিয়ার—রামনাদের সেতুপতি-বংশধর বিজয়-রঘুনাথের পৌত্রী। পোলিগার সর্দ্দার মুত্তু বিজয়-রঘুনাথের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইনি শিবগঙ্গে নামক স্থানের নায়কগণের মধ্যে প্রথমা ও প্রধানা ছিলেন।

অখুন্দ্ দরবেজা (Akhund Darweza)—আফগানিস্থানের জনৈক প্রসিদ্ধ কবি ও দরবেশ। ইনি অক্‌বরের রাজত্ব-কালে কবিতা লিখিয়া যশস্বী হন। ইনি পুস্তু ভাষায় কবিতা রচনা করিতেন।

অখুয়াপদা—উড়িষ্যার কটক জেলার ভদ্রক মহকুমার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র নগর। এই নগর উড়িষ্যা ট্রঙ্ক রোডের উপর বৈতরণী নদীতীরে অবস্থিত। উত্তর ভারত হইতে শ্রীক্ষেত্রে যাইবার ইহাই একমাত্র পথ ছিল। তজ্জন্য ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে একজন প্রসিদ্ধ ধনী বাঙ্গালীর দ্বারা বিপুল অর্থব্যয়ে রাজঘাট, বালেশ্বর, অখুয়াপদা প্রভৃতি স্থানে সরাই নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখানে পুলিশ ও ডাকঘর আছে। বৈতরণী নদীর স্রোতোগতি রোধ করিবার জন্য এখানে যে বাঁধ দেওয়া আছে, তাহা দেখিবার জিনিস।

অখুব—রাজতরঙ্গিণী (৪.৬৭৭)-বর্ণিত একটী গ্রামের নাম।

অখেততেন—মিশরের তেল্-এল্-অমর্ণের ভূখননে আবিষ্কৃত এক অতি প্রাচীন শহর। ইহা প্রায় ১৩৭৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে রাজা অখেন-অতেন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। প্রাচীন মিশরীয় গৃহস্থাপত্য-কলার নিদর্শন এখানে প্রচুর পাওয়া যায়। নগরের নির্ম্মাণপদ্ধতি অতি সরল। দুইটী অনাচ্ছাদিত প্রশস্ত রাজপথ উত্তরপশ্চিমে বিস্তৃত। বাড়ীগুলি কাঁচা ইটের তৈয়ারী। কোথাও বা নিম্নস্থ প্রধান স্তম্ভগুলি চুণাপাথরের। প্রত্যেক বাড়ীতে একটী করিয়া প্রধান গৃহ, তাহার দেয়াল-গুলি অন্যান্য ঘরের দেয়াল হইতে অধিক উঁচু। বড় ঘরের ছাদ কাঠ ও মাটীর দ্বারা তৈয়ারী এবং তিন বা চারিটী

কাষ্ঠস্তম্ভের উপরে স্থাপিত। বড় ঘরের হল এবং ছাদ কাঠের সিঁড়ি দ্বারা সংযুক্ত। [অখেন-অতেন দ্র°]

অখেদিত্ব—জৈন অর্হতের বাক্‌গুণভেদ। (হেম° ৭১)

অখেন-অতেন—(Akhen-aten) মিশরের একজন সম্রাট্। ইঁহার পিতা ও পূর্ব্বতন মিশরাধিপতি তৃতীয় অমেনোফিস্ বা অমেনহেতেপের পর ইনি রাজা হন। ইনি অমেনহেতেপের একমাত্র পুত্র এবং অমেনহেতেপের রাজত্বকালের বিংশ বৎসরে রাণী তিঈ'র গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিঈ তাঁহার স্বামীর প্রধান বা প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন। [অমেন-হেতেপ (৩য়) দ্র°]

অখেন-অতেন প্রায় ১৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। থীবসে রাণী তিঈ'র সমাধিক্ষেত্রে যে দেহ আবিষ্কৃত হইয়াছে, অনেকের মতে উহাই অখেন-অতেনের দেহ। ইহা সত্য হইলে মৃত্যু-কালে অখেন-অতেনের বয়স মাত্র ২৬।২৭ বৎসর হইয়াছিল। সুতরাং সিংহাসনারোহণ সময়ে (অনুমান ১৩৮০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ) তাঁহার বয়স ৮ বৎসরের অধিক ছিল না। ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে ইনি ইঁহার ভগিনী নেফ্রে-তিতিকে বিবাহ করেন। ইঁহার গর্ভে ৭টী কন্যা জন্মে।


অখেন-অতেন

দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ সেমেন্‌খ্-কারার সহিত ও তৃতীয়ার বিবাহ তুতান্‌খামনের সহিত হইয়াছিল।

রাজা হইয়া তিনি রাজ্যের সামাজিক, রাজনীতিক ও ধর্ম্মসংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। রাজা হইবার পর তাঁহার নাম হয় চতুর্থ অমেনোফিস্ বা অমেনহেতেপ। তিনি স্বার্থপর ও বলশালীর বিপক্ষে অল্প বয়স হইতেই যুদ্ধাদি করিয়াছিলেন। তিনি 'একেশ্বরবাদী' ছিলেন ও 'অতেন' অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলের উপাসনা করিতেন। সেইভাবে তাঁহার নামকরণও হইয়াছিল। 'অখেন-অতেন' অর্থে 'অতেনের শক্তি' অর্থাৎ 'তিনি অতেনকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন'। এই সৌরপূজা ৩য় অমেনহেতেপের সময় হইতেই মিশরের রাজসংসারে প্রচলিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ মিত্তানিবংশের সহিত সংশ্রব থাকার ফলে তিনি সূর্য্যোপাসক হইয়া উঠিয়াছিলেন। অখেন-অতেন অন্যান্য দেবতার পূজা রাজ্য মধ্যে রহিত করিয়া সূর্য্যকেই একমাত্র উপাস্য বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি থীবস্ হইতে রাজধানী অখেততেন নামে নূতন স্থানে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। [অখেততেন দ্র°] স্বীয় রাজধানী, নিউবিয়ার অন্তর্গত সেসেরি এবং পালেষ্টাইনে তিনি সূর্য্যোপাসনা-মন্দির স্থাপন করেন। সূর্য্যের উদ্দেশে তিনি কতকগুলি স্তব রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার নবপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম স্থায়ী হয় নাই। অখেন-অতেনের মৃত্যুর সহিত ইহারও অপ্রচলন হয়।

যতদিন অখেন-অতেন জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি জ্ঞান, বিবেচনা, যুক্তি ও সারল্যের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রজাদের মধ্যে এগুলির উন্মেষের জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। মিশরীয়দের মতে তিনি দর্শনেরও উপদেষ্টা ছিলেন। মিশরীয়গণ বলিয়া থাকে, এই অখেন-অতেনই মিশরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা। মৃত্যুকালে কোন পুত্র-সন্তান না থাকায় তাঁহার জামাতা সেমেন্‌খ্-কারা সিংহাসনারোহণ করেন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তেল্-এল্-অমর্ন হইতে আবিষ্কৃত প্রস্তরফলকে লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়, আসীরিয়ার রাজা অসুর-উবল্লিতের (Ashur-Uballit) সহিত অখেন-অতেনের পত্র বিনিময় হইয়াছিল। এই অসুর-উবল্লিত খৃষ্টজন্মের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

পারির মিউজিয়ামে অখেন-অতেনের একটী মূর্ত্তি ও বৃটিশ মিউজিয়ামে তাঁহার দুইটী চিত্র রক্ষিত আছে।

[Encyclopædia Britannica, 13th Ed., Vol. I, p. 83 ; H. R. Hall—The Ancient History of the Near East, pp. 20, 297-308 ; N. de G. Davies—The Rock Tombs of Tell el Amarna, Archæological Survey, Egypt Exploration Society, 6 Vol. (London, 1903 etc.) ; T. E. Peet and C. L. Woolley—The City of Akhenaten, Vol. I, (London, 1923).]

অখেরাজ—রাজপুতানার অন্তর্বর্ত্তী সিরোহীর একজন রাজা। সংবৎ ১৫৮০ বা ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে ইনি সিংহাসনারোহণ করেন। অনেকে ইঁহাকে অনহিলবাড়পত্তনের কুমারপাল বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। ১৫৮৯ সংবতে ইনি একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

[Indian Antiquary, Vol. II, 1873]

অখেরাজোত—কচ্ছবহ রাজপুতগণের নারুক শ্রেণীর অন্তর্গত এক শাখা।

অখেরি—মহিস্থুরের শিমোগা জেলার একটী গ্রাম। [ইক্কেরি দ্র°]

অখৈবাস (A-kha-i-vasha)—মিশরের আকিয়ান যোদ্ধা। ইহারা দীর্ঘকায় ও ইহাদের চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ। জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, ইহারা আল্‌পাইন্ ও উত্তরদেশবাসীর বংশধর।

[Egyptian Mythology & Legends—D. A. Macle]

অখো—গুজরাতের একজন প্রসিদ্ধ কবি। সাধক ও ভগবদ্ভক্ত বলিয়া সাধারণে তিনি পরিচিত। তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে আহ্‌মদাবাদ জেলার জেতলপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে সোণী (স্বর্ণকার) ছিলেন ; এই জন্য সোণীরা তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করে।

বাল্যকালে জেতলপুর ত্যাগ করিয়া তিনি আহ্‌মদাবাদে আসেন, কিন্তু শহরে বাস তাঁহার ভাল লাগিল না। ক্রমে সংসারবাস বিরক্তিকর বোধ হওয়ায় তিনি সংসার ছাড়িয়া নির্জ্জন প্রদেশে বাস করাই শ্রেয়ঃ মনে করেন। অবশেষে তীর্থযাত্রার উদ্দেশে বহির্গত হইয়া তিনি পথিমধ্যে সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্গ পাইলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া নানা তীর্থপর্য্যটন করিতে লাগিলেন। সাধুসঙ্গে শাস্ত্রালোচনায় তাঁহার জ্ঞানের উদ্দীপনা হয়।

ঐ সময়ে হিন্দুর পবিত্র তীর্থ কাশীধামে অনেক ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ সাধুপুরুষ বাস করিতেন। তাঁহারা প্রায়শঃ এক স্থানে সমবেত হইয়া বেদান্তশাস্ত্রকথিত ব্রহ্মতত্ত্বের মীমাংসায় কালাতিপাত করিতেন। ঐ সকল তর্কযুক্তি শুনিবার জন্য অখো নিত্যই তথায় যাইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার হৃদয় ধর্ম্মজিজ্ঞাসায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার মানসে মণিকর্ণিকায় সাধু ব্রহ্মানন্দ স্বামীর মঠে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী অখোর অচলা ভক্তি, দৃঢ় সংযম ও শ্রবণ-ব্যাকুলতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষার পর তাঁহার জ্ঞানের অভিনব বিকাশ সূচিত হইল ; তিনি ধীরে ধীরে ভগবদ্ভক্তিতে বিভোর হইয়া পড়িলেন।

তাঁহার রচিত পদাবলী সুন্দর কবিত্বরসমাধুরীতে সুললিত, শান্তরসোদ্দীপক এবং হরিভক্তিরসে সদাই পূর্ণ। তাঁহার কবিত্বভাতি তাঁহাকে জনসমাজে যেরূপ সুপরিচিত করিয়াছে, তত্ত্বজ্ঞানদর্শী দার্শনিক হিসাবেও বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট তিনি সেইরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ইঁহার মতবাদ বল্লভীয় সম্প্রদায়ের মত ত' নয়ই, বরং অনেকটা ভাগবত সম্প্রদায়ের মত।

বেদান্তশাস্ত্র সম্পর্কে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে ধর্ম্মমতপ্রবর্ত্তক দাদু, কবীর, রামসোণার, সেনা নহাবী ও গোবিন্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত হিন্দী ও গুজরাতীভাষায় লিখিত আরও কয়েকখানি গ্রন্থ পাওয়া যায় ; তন্মধ্যে সন্তপ্রিয়া ও ব্রহ্মলীলা হিন্দীভাষায় লিখিত। পঞ্চীকরণ, চিত্তবিচার-সংবাদ, গুরুশিষ্য-সংবাদ, অনুভববিন্দু, অখোগীতা, কৈবল্যগীতা, ছপ্পা, ছুটক্‌পদো বা প্রক্ষিপ্ত-পদাবলী এবং সোরঠা বা দোঁহা বা পরজুয়া নামক গ্রন্থনিচয় গুজরাতী ভাষায় তৎকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। পরমপদ-প্রাপ্তি ও পঞ্চদশীতাৎপর্য্য—এই দুইখানি গ্রন্থও অখোর রচিত বলিয়া প্রকাশ। উক্ত গ্রন্থসমূহ আলোচনা করিলে মনে হয়—ভক্তপ্রবর অখো ১৬১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে জীবিত ছিলেন।

অখৌর—শ্রীবাস্তব কায়স্থগণের শাখাবিশেষের নাম। ২ বিহারের ডোম জাতির মগহিয়া শাখার গোষ্ঠীবিশেষকেও ঐ নামে অভিহিত করা হয়।

অখ্‌তার১—বিখ্যাত লেখক ও কবি কাজী মুহম্মদ সাদিক্‌ খাঁ কাব্যগ্রন্থে এই নামে সুপরিচিত।

অখ্‌তার২—অযোধ্যার শেষ নবাব বয়াজিদ্‌ আলী শাহ্‌ কাব্য-জগতে অখ্‌তার নামে প্রসিদ্ধ।

অখ্‌তাল—ওমিয়াদ্‌ খলিফাবংশের রাজত্বকালে আরব দেশে যে সকল কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম (৬৪০-৭১০ খৃঃ)। ইনি তঘলিব্‌ সম্প্রদায়-ভুক্ত এবং খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সুতরাং ইঁহার কবিতায় মুসলমানধর্ম্মবিরোধী ভাব দৃষ্ট হয়। ইঁহার সমসাময়িক দুইজন প্রসিদ্ধ আরবীয় কবির নাম ফরাজ্‌দাক্‌ ও জরীর্‌।

অখ্‌নাবত—কচ্ছবহ রাজপুতগণের বলপোতশ্রেণিভুক্ত এক শাখা।

অখ্‌নুর১—কাশ্মীর রাজ্যের জম্মু জেলার একটী তহশীল। আয়তন ৩১৭ বর্গমাইল। ১৯৩১ সালের গণনায় লোকসংখ্যা ৮০৪৩১ ; তন্মধ্যে পুরুষ ৪২৮৫১ এবং স্ত্রীলোক ৩৭৫৮০। অধিবাসিগণের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। এই তহশীলে ১টী মাত্র নগর এবং ২১৮টী গ্রাম আছে।

অখ্‌নুর২—কাশ্মীর রাজ্যের জম্মু জেলান্তর্গত অখ্‌নুর তহশীলের একটী নগর। অক্ষা° ৩২°৫′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৪৭′ পূঃ। ইহা হিমালয় পর্ব্বতমালার দক্ষিণপাদদেশে চেনাব নদীতীরে অবস্থিত। এই নদীতে নৌকায় যাতায়াত করা যাইতে পারে। নগরের নানাস্থানে বহু ধ্বংসাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়। নগরটীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনযোগ্য। এইস্থানে একটী সুবৃহৎ প্রাচীন প্রাসাদ ও অখ্‌নুর দুর্গ অবস্থিত।

অখ্‌ফাশ ঔসৎ—প্রকৃত নাম আবুল হাসান সৈয়দ। ইঁহার চক্ষুদ্বয় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র থাকায় ইনি 'অখ্‌ফাশ্‌' নামে উক্ত হইতেন। ইনি একজন সুলেখক ছিলেন ও ৮৩০ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি বল্‌খ্‌ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৭৬ হিজরিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এই নামে তিনজন লেখক ছিলেন। পরবর্ত্তী অখ্‌ফাশ্‌ আস্‌গর ৮৪৫ খৃষ্টাব্দে মারা যান।

অখ্‌মতোবা, আন্না—রুষের এক আধুনিক মহিলা কবি। ইঁহার কবিতার মূল উৎস স্বদেশের দুর্দ্দশাবর্ণন। ভাবের আতিশয্য ও ভাষার সংযম এই লেখিকার একটী বিশেষত্ব। ইঁহার অনেক কবিতা প্রেমবিষয়ক। ইঁহার সমসাময়িক ব্লোক্ (A. Blok) প্রভৃতি কবিরা Symbolist নামে অভিহিত। তাঁহারা রূপকের মধ্য দিয়াই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন।* কিন্তু অখ্‌মতোবা, গুমিস্‌লেভ্‌ (Nicholas Gumislev) প্রভৃতি অন্য পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন। ইঁহাদের পথ হইতেছে—বাস্তববাদ (Realism) ও স্বাভাবিকতা। ইঁহার রচিত কয়েকখানি গ্রন্থ—Beads (১৯১৪), The White Flock (১৯১৭), ও Anno Domini (১৯২২)।

অখ্‌মিম্‌ (বা এখ্‌মিম্‌)—নীলনদের দক্ষিণতীরে অবস্থিত মিশরের এক প্রাচীন শহর। এখানে অনেকগুলি প্রাচীন গির্জ্জা ও কয়েকটী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। প্রাচীনকালে এই নগরে মরুযাত্রীদের দেবতা মিন্‌দেবের পূজা হইত। গ্রীক্ কবি নোনাস্‌ খৃষ্টীয় ৪র্থ শতকের শেষভাগে এই নগরে জন্মগ্রহণ করেন।

অখ্‌বারী—শিয়াসম্প্রদায়ের মুসলমানগণের এক বিশিষ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায়। ইঁহারা সকল বিষয়ে আলীর কিংবদন্তীসমূহ মানিয়া চলেন।

অগ্‌ওয়ন—ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন জেলায় রেঙ্গুন নদীর উত্তরপূর্ব্বমুখে অবস্থিত একটী নগরী। সমুদ্রের নিকটে ইহার ভূমি বালুকাময়, জঙ্গল ও উচ্চ তৃণপূর্ণ। উত্তরদিকের ভূভাগ অপেক্ষাকৃত উচ্চ। এই স্থানে অনেক জলাভূমি আছে, তাহাতে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়। অগ্‌ওয়নের অধিবাসীরা কৃষিকর্ম্ম, মৎস্যশীকার ও লবণ প্রস্তুত করিয়া থাকে।

অগ—সর্প। ২ সূর্য্য (আর্য্যভট্টের মতে সূর্য্যের গতি নাই)। ৩ পর্ব্বত। ৪ বৃক্ষ। ৫ (সপ্ত কুলাচলের সংখ্যানুসারে) সাত (৭) এই সংখ্যা। ৬ ঘট বা কুম্ভ (Water jar)।

অগই১—অযোধ্যার প্রতাপগড় জেলার একটী নগর। ইহা প্রতাপগড় হইতে ২৭ মাইল ও রায়বেরেলী হইতে ২৮ মাইল দূরে অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা রাজাপুর এবং রামপুর তালুকের মধ্যস্থ নগর ছিল। ইহার অধিকাংশ অধিবাসীই হিন্দু।

* এই ভাবপ্রকাশচেষ্টা অনেকস্থলে বাস্তবকে ছাড়াইয়া এক চরম আদর্শবাদে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

অগই২—ফলবৃক্ষবিশেষ। A species of fruit tree (Dillenia Ocabrella).

অগচি—নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের একটী শাখা।

অগচ্ছ—বৃক্ষ ; বৃক্ষের গতিশক্তি নাই এইজন্য এই নাম।

অগজ—তুম্বুরু। ২ [বৈদ্যক] আর্দ্র ধান্য, চলিত কাঁচা ধনে। (মদ° নি°) ৩ বন্দা, চলিত মান্দড়া বা পরগাছা, বৃক্ষাদির উপর পরগাছা জন্মে। ৪ শিলাজতু। (রত্নমালা)

অগণিতচার—একখানি জ্যোতিষগ্রন্থ। (G. Oppert's List of Sanskrit Manuscripts, Vol. II, Madras, 1885)

অগণ্যগণাধিপ—শিব। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৩০.২৫২)

অগডে—[অগদে দ্র°]

অগতকুরীন্‌—বিখ্যাত জাপ রঞ্জন-শিল্পী। ইঁহার পিতার নাম অগতো সুকেস। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কুরীন্ চিত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। পরে তিনি কানো ও তোষার পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সেই মতে চীনামাটীর বাসন প্রস্তুত ও তাহার রঙ্‌পালিশ কার্য্যে সম্যক্ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

অগতিক্রিয়—মৃত্যুর পর যাহার বিধিবিধানে দাহাদি কার্য্য হয় না, তাহাকে অগতিক্রিয় কহে। চলিত কথায় বলা হইয়া থাকে যে, তাহার গতি হয় নাই, অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে তাহার দাহাদি কার্য্য হয় নাই।

অগত্তি—মলাবার উপকূলের লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটী দ্বীপ। [লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ দ্র°]

অগথঙ্গেলাস্‌, অকথঙ্কেলস্‌ (Agathangelus)—আর্ম্মেনিয়ার অধিবাসী এক ঐতিহাসিক। ইনি খৃষ্টীয় ৪র্থ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহার লিখিত ইতিহাস গ্রীক্, লাটিন প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

অগথর্কাইদীস্‌ (Agatharchides)—গ্রীসের একজন ইতিহাস ও ভূগোলবেত্তা পণ্ডিত ; টলেমী ফিলোমেতরের সময়ে (খৃঃ পূঃ ১৮১-১৪৬ অব্দে) বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহার লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে একখানির নাম "এশিয়া, ইউরোপ ও লোহিত সাগর"। এখানি থুসিদিদীসের অনুকরণে লিখিত।

অগথর্কাস্‌—খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতকের একজন এথেনীয় চিত্রকর। কথিত আছে, ইনিই সর্ব্বপ্রথম বিয়োগান্ত নাটকের দৃশ্যপট অঙ্কন করেন। প্রকৃত পক্ষে, ইঁহার পূর্ব্বে বস্ত্রোপরি অঙ্কিত দৃশ্যপটের প্রচলন ছিল না, মাত্র কাষ্ঠফলকের চিত্রই প্রচলিত ছিল।

অগথিয়স্‌ (Agathias)—জনৈক গ্রীক্ কবি ও ঐতিহাসিক

(৫৩৬-৫৮২ খৃষ্টাব্দ)। ইনি ইস্তাম্বুলে (কন্‌ষ্টান্টিনোপলে) ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ব্যবহারজীবীর বৃত্তি গ্রহণ করেন। কতকগুলি প্রেমবিষয়ক কবিতারচনা এবং বহু প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া এক পুস্তিকা সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ইনি পাঁচখণ্ড পুস্তকে সমসাময়িক ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থে ৫৫২ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বৈজন্তীয় সাম্রাজ্যের সহিত গথ, ভান্দাল, ফ্রাঙ্ক ও পারসিকগণের যুদ্ধবিগ্রহ বর্ণিত হইয়াছে।

অগথির্সি (Agathyrsi)—থ্রেসীয় হইতে উদ্ভূত এক প্রাচীন জাতি। ইহারা ট্রান্‌সিল্‌ভেনিয়ার মারস্ প্রান্তরে বাস করিত। বৈজন্তীয় রাজ্যনিবাসী ষ্টিফেনাস্ "ত্রওসি" নামে যে থ্রেসীয় জাতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, "অগথির্সি" বোধ হয় ঐ নামেরই শক সংস্করণ। হিরোদোতসের বর্ণনানুসারে এই জাতি বিলাসী ও ভূষণ-প্রিয় ছিল এবং আপনাপন গাত্র উল্কি দ্বারা চিত্রিত করিত। স্ত্রীগণ বহুভর্ত্তৃকা ছিল। ইহারা দেশীয় শাস্ত্রসকল স্বর করিয়া পাঠ করিত।

অগথো (Agatho)—একজন পোপ। ইনি ৬৭৮ হইতে ৬৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রোমের পোপ বা ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। পোপেরা ইস্তাম্বুলে (কন্‌ষ্টান্টিনোপলে) সম্রাট্‌কে যে কর প্রদান করিতেন, ইনি তাহা রহিত করিয়া দেন।

অগথোক্লিয়া—একজন রাজা। উত্তরপশ্চিম ভারতে কাবুল অঞ্চলে কয়েকটী মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এগুলিতে একদিকে গ্রীক্ অক্ষরে 'অগথোক্লিয়া থিয়োট্রপস্' ও অপর দিকে খরোষ্ঠী অক্ষরে 'মহরজস ত্রতরস ধ্রমিকস স্ত্রতস' লিখিত আছে এবং মুদ্রায় শিরস্ত্রাণপরিহিতা রমণীর মুখ অঙ্কিত আছে। অন্য কয়েকটী মুদ্রায় একটী পুরুষ ও নারীর মুখ একসঙ্গে অঙ্কিত আছে। এগুলিতে গ্রীক্ অক্ষরে ষ্ট্রাটো ও অগথোক্লিয়া উভয়েরই নাম রহিয়াছে। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, অগথোক্লিয়া ষ্ট্রাটোর মাতা এবং তিনি পুত্রের নাবালক অবস্থায় রাজ্য পরিচালনা করিতেন। আবার অনেকে মনে করেন, অগথোক্লিয়া ষ্ট্রাটোর পত্নী। ইঁহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধই থাকুক না কেন, ইহা স্থির যে, ষ্ট্রাটো ও অগথোক্লিয়া এক সঙ্গে রাজ্য শাসন করিতেন এবং সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকে ইঁহারা ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে কোন ভূভাগের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

[Catalogue of Coins in the Punjab Museum, Lahore—R. B. Whitehead ; Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, including the Cabinet of the A. S. B. Vol. I—V. Smith ; Points in the History of the Greek and Indo-Scythian Kings in Bactria, Cabul and India—C. Lassen ; The Early History of India—V. Smith ; Rapson's Coins, 16.]

অগথোক্লেস্ (Agathokles)—একজন নৃপতি। ভূমধ্যসাগরের অন্তর্গত সিসিলি দ্বীপের যার্ম্মীনগরে এক দরিদ্র কুম্ভকার-গৃহে ইঁহার জন্ম হয়। অটুট স্বাস্থ্য ও রূপের জন্য ইনি দামাস্ নামক এক ধনীর সুনজরে পড়িয়া যান। পরে দামাসের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবাকে বিবাহ করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন। কালে নিজ বাহুবলে ইনি সিরাকিউজের রাজা হন এবং সিসিলি দ্বীপের অধিকাংশ নিজ অধিকারভুক্ত করেন। কার্থেজীয় সেনাপতি হাসিল্কারের সহিত সংঘর্ষে ইনি একবার পরাজিত হন এবং হাসিল্কার ইঁহার রাজধানী অবরোধ করেন। তাহার পর কিছুদিন আফ্রিকাদেশে ইনি কার্থেজিয়গণের সহিত যুদ্ধ করেন, কিন্তু দেশে বিদ্রোহাদি উপস্থিত হওয়ায় সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ইনি ইটালীর দক্ষিণ অংশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইঁহার শেষজীবন অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছিল। ইঁহার পৌত্র সিংহাসনের আশায় ইঁহার পুত্রকে হত্যা করে এবং উক্ত পৌত্রের ষড়্‌যন্ত্রে বন্ধুকর্ত্তৃক বিষপ্রয়োগে ইনি নিহত হন।

অগথোক্লেস্ ডিকাইয়স্ (Agathokles Dikaios)—একজন রাজা। মৌর্য্যবংশের পতনের পর ব্যাকট্রিয়া ও উত্তরপশ্চিম ভারতে গ্রীক্‌গণ প্রবল হইয়া উঠে। ইউসিডিমস বা তাঁহার পুত্র দিমেত্রিয়সের শাসনকালে (১৯০ খৃঃ পূঃ) গ্রীক্-অধিকৃত ভূভাগে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টি হয়। এই সকল রাজ্যের একটীতে অগথোক্লেস্ নামে একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার উপাধি ছিল ডিকাইয়স্ (Dikaios)। তাঁহার রাজ্য কাবুল উপত্যকা হইতে কান্দাহার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া বোধ হয়। তিনি সম্ভবতঃ পান্তালিয়ন নামক গ্রীক্ নৃপতির উত্তরাধিকারী ছিলেন। ইঁহার বহু মুদ্রা এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কতকগুলি মুদ্রার একদিকে আলেক্‌সান্দারের প্রতিমূর্ত্তি ; কতকগুলিতে জীউসের মূর্ত্তি ; কতকগুলি নিকেলের মুদ্রায় ডায়োনিসসের মূর্ত্তি আছে। কতকগুলি মুদ্রায় ব্রাহ্মী অক্ষরে 'অগথুক্লয়স' এই কথা লেখা আছে। কতকগুলিতে একদিকে বৌদ্ধস্তূপ ও অন্যদিকে  এইরূপ বৌদ্ধচিহ্ন আছে এবং খরোষ্ঠী অক্ষরে 'হিতজসসে' এই কথা লেখা আছে। কতকগুলিতে আবার স্তূপ এবং অপরদিকে রেলিংএর ভিতর বৃক্ষ অঙ্কিত আছে এবং খরোষ্ঠী অক্ষরে একদিকে 'অকথুক্রেয়স' অন্যদিকে 'হিতজসসে' লেখা আছে। ইহা ব্যতীত অনেক মুদ্রায় বিভিন্ন গ্রীক্ দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে।

অগথোক্লেসের মুদ্রায় আমরা সর্ব্বপ্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মচিহ্ন দেখিতে পাই। এই সমস্ত মুদ্রা হইতে অনুমান হয় যে, এই নৃপতি বহুকাল উক্ত ভূভাগ শাসন করিয়াছিলেন এবং শেষজীবনে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

[Catalogue of Coins in the Punjab Museum, Lahore, Vol. I—R. B. Whitehead; Catalogue of Coins in the Indian Museum including the Cabinet of the A. S. B., Vol. I—V. Smith; Points in the History of the Greek and Indo-Scythian Kings in Bactria, Cabul and India—Christian Lassen; Hellenism in Ancient India—Dr. Gauranga Nath Banerjee; The Early History of India—V. Smith.]

অগথোডিমন্$_1$, (Agathodæmon)—গ্রীসের এক পৌরাণিক দেবতা। ইনি শস্যক্ষেত্র ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের অধিদেবতা এবং রাজ্য ও প্রজাগণের রক্ষক। গ্রীক্‌গণ ইঁহার সম্মানার্থ প্রতিবার ভোজনান্তে এক পাত্র মদ্য পান করিতেন। ইনি সর্পমূর্ত্তিতে পূজিত হইয়া থাকেন। কোথাও বা ইনি নবযৌবনসম্পন্ন দিব্য নরদেহধারী, ইঁহার একহস্তে সম্পদ্ ও প্রাচুর্য্যের নিদর্শন শৃঙ্গ (Cornucopia) এবং পাত্র, অপর হস্তে পোস্তফুল ও শস্যের শীষ।

অগথোডিমন্$_2$—আলেক্‌সান্দ্রিয়া নগরবাসী জনৈক মানচিত্রকর। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ২য় শতকে ইনি জীবিত ছিলেন। টলেমীর ভূগোলের ২৭ খানি মানচিত্র ইঁহার অঙ্কিত বলিয়া শুনা যায়।

অগথোন্—গ্রীসের এক বিয়োগান্ত নাটক-লেখক (আনুমানিক ৪৪৮-৪০০ খৃঃ পূঃ)। প্লেটো ও ইউরিপিডিসের (Euripides) বন্ধু। আরিষ্টোফানিস্ (Aristophanes) তাঁহার গ্রন্থে অগথোনের উল্লেখ করিয়াছেন। প্লেটো তাঁহার Symposiumএ লিখিয়াছেন যে, অগথোন্ একখানি বিয়োগান্ত নাটক লিখিয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন, তদুপলক্ষে এক ভোজসভা বসিয়াছিল। সম্ভবতঃ মাসিদনরাজ অর্কেলসের (Archelaus) সভায় অগথোনের মৃত্যু হয়। ইনি গ্রীসের নাটকে কিছু নূতনত্ব আনয়ন করিয়াছিলেন। আরিষ্টটল্ তাঁহার Poetica গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, অগথোনের লিখিত 'আন্থস্' বা 'পুষ্পগুচ্ছ' নামক নাটক মৌলিকত্বের পরিচায়ক; কারণ উহার আখ্যানবস্তু অপর সকল নাটকের ন্যায় পুরাণ হইতে গৃহীত নহে।

অগদ$_1$,—ভেষজ, ঔষধ। ২ বিষঘ্ন ঔষধ (Antidote)। (ত্রি) ৩ রোগহীন।

অগদ$_2$—[বৈদ্যক] দদ্রুঘ্নবৃক্ষ, দাদমর্দ্দনগাছ। (রাজনি°)

অগদ$_3$—নদবিশেষ। কালিকাপুরাণে (৭৭.২০) লিখিত আছে, কামরূপস্থ এই নদ সিতপ্রভা, নবতোয়া প্রভৃতি নদীর পতি। উহা পূর্ব্বপীঠে অবস্থিত, পবিত্র এবং ব্রহ্মপাদ হইতে উৎপন্ন। এই দেব ও গন্ধর্ব্বসেবিত নদ হিমালয় হইতে নির্গত হইয়াছে। উহাতে স্নান করিলে এবং উহার জল পান করিলে মনুষ্য ব্রহ্মগৃহে গমন করে। যে মনুষ্য সমস্ত কার্ত্তিকমাস অবিচ্ছেদে এই মহানদে স্নান করে, সে ইহলোকে নীরোগ হইয়া সকল প্রকার সুখভোগ করিয়া পরকালে দেবগৃহে গমন করে এবং অবশেষে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়।

অগদঃ—ঐন্দ্রজালিক গুণসম্পন্ন বিষঘ্ন মণিবিশেষ। (দিব্যাবদান)

অগদঙ্কার—রোগবিরামকারী বৈদ্য।

অগদতন্ত্র—বিষচিকিৎসাবিষয়ক তন্ত্র। শল্যাদি অষ্টবিধ তন্ত্রের বৈদ্যকাঙ্গবিশেষ। এই অগদতন্ত্রে সর্প, কীট, লূতা, বৃশ্চিক ও মূষিকাদির দংশন, তজ্জন্য বিষক্রিয়া এবং তাহার প্রতিকারাদির বিষয় বিশেষরূপে লিখিত আছে। ইহাকে বিবিধ বিষচিকিৎসাগ্রন্থ বলা যাইতে পারে। সুশ্রুতে এই অগদতন্ত্রের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। (সুশ্রুত, সূত্রস্থা° ১ অঃ)

অগদনস্য—সর্পাদি দংশনে নস্যবিশেষ। সর্পাদিদষ্টব্যক্তির এই নস্য ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়। (সুশ্রুত, কল্পস্থা°)

অগদাঞ্জন—বিষমূর্চ্ছিতাদিতে অঞ্জনবিশেষ। (সুশ্রুত, কল্পস্থা°)

অগদীর—আফ্রিকা মহাদেশের মরক্কো রাজ্যের পশ্চিম সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত একটী নগর ও বন্দর। আটলাণ্টিক মহাসাগরতীরে অবস্থিত থাকায় এখানে পণ্যদ্রব্যের আমদানিরপ্তানি যথেষ্ট আছে। ভূতপূর্ব্ব সুলতান মুলাই হাফিদ ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হইয়া ফেজ ও সেফ্‌রু নগরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী মূরগণ ১৯১০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে। সুলতানের স্বার্থরক্ষায় ফরাসীসৈন্য ফেজ অধিকারে অগ্রসর হয়। ফরাসিদিগের এই অস্বাভাবিক অধিনায়কত্বে স্পেন ও জর্মনী বিরক্ত হইয়া উঠেন। স্পেনীয়গণ ফরাসী-সেনাপতি জেনারেল লিউটের এই অন্যায়াচরণের প্রতিবাদকল্পে এল্ ক্‌সার (El Qsar) ও লারকে (El 'Araish) অধিকার করেন এবং জর্মন অধিবাসিবর্গের স্বার্থ বজায় রাখিতে জর্মন-রণতরী 'প্যান্থার' অগদীরে আসিয়া সমুপস্থিত হয়। তখন যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া ফরাসী ও ইংরেজ ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নবেম্বর জর্মনীর সহিত সন্ধি করিয়া জর্মনীকে মরক্কোর পরিবর্ত্তে কঙ্গো প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপনের অধিকার দেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বিদ্রোহী দলপতি হামেদ এল হিবা মরক্কেশ অধিকার করেন; কিন্তু ফরাসীসৈন্য সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে তদ্দেশ হইতে তাড়াইয়া দেয়। উক্ত বর্ষের অক্টোবর মাসে জেনারেল লিউটে অগদীর

অধিকার করিলেও উহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে কিছুকাল যুদ্ধবিগ্রহ চলিতে থাকে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে অগদীর ও ফেজ ফরাসীর কবলে আসে।

অগদে—'অক্কদ্' শব্দের 'সেমিতিক' নামান্তর। [অক্কদ্ দ্র°]

অগন্ধিক—[বৈদ্যক] সৌবর্চ্চল লবণ, সোছল লুণ। (ভাবপ্র°)

অগপীতস্—এই নামে দুইজন পোপ বা রোমের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। ১ম অগপীতস্ ৫৩৫ হইতে ৫৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এবং ২য় অগপীতস্ ৯৪৬ হইতে ৯৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পোপ ছিলেন।

অগম, —বৃক্ষ। ২ পর্ব্বত। ৩ দুর্গম, দুরারোহ। ৪ দুর্ব্বোধ অর্থাৎ যেখানে কিছুরই নির্ণয় হয় না।

অগম, (Ogam)—আয়র্লণ্ড, স্কট্লণ্ড ও দক্ষিণ-ওয়েল্স্ ভূভাগে প্রচলিত একটী প্রাচীনতম ভাষা। যখন ইংলণ্ড ও স্কট্লণ্ড একমাত্র কেল্টজাতির বাসভূমি ছিল এবং ড্রুয়িড্ পুরোহিতদিগের কর্তৃত্বাধীনে বৃটনবাসী পরিচালিত হইত, তখন ইংলণ্ড, স্কট্লণ্ড ও আয়র্লণ্ডে এই ভাষা ও লিপির প্রচলন ছিল। বর্ত্তমানে অগম বর্ণমালায় লিখিত প্রায় তিনশতাধিক শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভাষাবিদ্গণ ইহাকে Goidelic ভাষার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন এবং অনুমান করেন যে, রোমক অভিযানের বহু পূর্ব্বে এই অগম (কেল্টিক) ভাষা ইংলণ্ডে প্রচলিত ছিল। এখনও অনেক স্তম্ভপৃষ্ঠে এই ভাষালিপির নিদর্শন পাওয়া যায়। ব্যাভেরিয়া দেশীয় বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক জে. সি. জিউস (J. C. Zeuss) স্থির করিয়াছেন যে, এই কেল্টিক ভাষা ভারত হইতে ইউরোপে আনীত হইয়াছে এবং ইহাতে সংস্কৃতভাষার সংশ্রব লক্ষিত হয়।

অগমতনু—(আধুনিক একবাতানা—Ecbatana ; প্রাচীন পারস্তভাষায় হঙ্মতান ; বেহিস্তূনে অগমতনু বা হমদান) শকনৃপতি ইস্তুভেগুর রাজধানী। বাবিলনের শেষ স্বাধীন নৃপতি নবোনিদসের রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে (খৃঃ পূঃ ৫৪৯ অব্দে) অন্শনের শাসনকর্ত্তা কুরুস্ ইস্তুভেগুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন ও এই নগর অধিকার করেন। শকজাতির নামান্তর 'মন্দা'র সহিত 'মদা' (মেদিয় দেশের) নামের সাদৃশ্যহেতু গ্রীকগণ ভ্রমক্রমে অগমতনুকে মেদিয় রাজ্যের রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, মেদিয়রাজ্যে অবস্থিত আধুনিক তখ্ত্-ই-সুলেমান্ নগরীর স্থানে প্রাচীনকালে অপর এক অগমতনু নগর ছিল। কিন্তু এই অনুমান ভুল, তখ্ত্-ই-সুলেমানের প্রাচীন নাম গজাখা।

অগমুদৈয়ন্ (**অগমুদয়**)—কৃষিজীবী এক তামিল জাতি। চিঙ্গলিপত্তন, উত্তর আর্কট, শালেম, কোয়ম্বাতোর ও ত্রিচিনাপল্লীতে, বিশেষতঃ তঞ্জোর ও তিনেবেলিতে ইহাদের বাস। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইহাদের সংখ্যা যেরূপ ছিল, বর্ত্তমানে তদপেক্ষা অনেক কম। সামাজিক সংস্কার ও ক্রমবিবর্ত্তনে উহারা বেল্লালদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। উহাদের সংখ্যাহ্রাসের ইহাই একমাত্র কারণ। তঞ্জোরে ইহাদের সংখ্যা বেশী। এখানে মরবন্ ও কল্লন্ জাতি ইহাদের সহিত সংযুক্ত হওয়ায় সম্ভবতঃ এইরূপ সংখ্যাধিক্য হইয়াছে। আচারব্যবহারে ইহারা বেল্লালদের অনুগামী। উত্তর আর্কটে যে সমস্ত অগমুদৈয়ন্ বাস করে, উহারাও বেল্লালদের আচারাদি মানিয়া চলে। মাদুরার অগমুদৈয়নগণ অন্যান্য স্থান অপেক্ষা সভ্য। সম্ভবতঃ মাদুরার অগমুদৈয়নেরা উত্তর আর্কটের অগমুদৈয়ন্ জাতির বংশধর।

তঞ্জোরে অগমুদৈয়ন্দিগকে অহমুদৈয়ন্ও বলা হয়। স্থানীয় তামিল গ্রন্থাদিতে অহমুদৈয়নের অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তামিল 'আহম্' অর্থে গৃহ বা ভূমি, 'উদৈয়ন্' অর্থে অধিকারী। সুতরাং অহমুদৈয়ন্ অর্থে গৃহবাসী বা ভূস্বামী। অনেকস্থলে ইহাদের অহম্বদীয়ন্ও বলিতে দেখা যায়। অহম্বদীয়ন্ অর্থেও ভূস্বামী বা গৃহবাসী, তবে ইহাদের চরিত্রগত পার্থক্যও যথেষ্ট আছে। তামিল ব্রাহ্মণগণ কোন লোকের পত্নীর নিকট তাহার স্বামীর কথা বলিতে হইলে 'অহমুদৈয়ন্' বলিয়া থাকেন। ভদ্রতার জন্য ও নারীর সম্মানের জন্য উহা ব্যবহৃত হয়। সম্ভবতঃ এস্থানে আহম অর্থে 'পতি' বা 'স্বামী' করা হইয়াছে।

অগমুদৈয়ন্, মরবন্ ও কল্লন্দের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ লইয়া একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। অহল্যার পিতা অহল্যার বিবাহ স্থির করিয়া প্রচার করেন—যে কেহ সহস্রবর্ষ জলমধ্যে থাকিতে পারিবে, তাহার সহিত অহল্যার বিবাহ হইবে। ইহা শুনিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ৫০০ বর্ষ জলমধ্যে থাকিয়া যখন আর পারিলেন না, তখন গৌতম সহস্রবর্ষ জলমগ্ন থাকিলেন। সুতরাং গৌতমের সহিত অহল্যার বিবাহ হইল। কিন্তু ইন্দ্র অহল্যার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কুক্কুটের আকার ধারণপূর্ব্বক মধ্যরাত্রে গৌতমের গৃহে আগমন করিলেন। এই সময়ে প্রভাত আগমনের সূচনা দেখিয়া গৌতম শয্যাত্যাগ করিয়া নদীতে স্নান করিতে গেলেন। ইন্দ্র সুযোগ বুঝিয়া নিজ বেশ গোপন করিয়া অহল্যার নিকট স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। ইন্দ্রের ঔরসে ও অহল্যার গর্ভে তিনটী সন্তান জন্মগ্রহণ

করে; তন্মধ্যে দুইটী সন্তান মরবন্ ও কল্লন্দের পূর্ব্বপুরুষ। [মরবন্, কল্লন্ দ্র°] তৃতীয় পুত্র অগমুদৈয়ন্গণের পূর্ব্বপুরুষ।

মরবন্, কল্লন্ ও অগমুদৈয়ন্গণের মধ্যে অগমুদৈয়ন্গণই প্রধান। অগমুদৈয়ন্ জাতি ব্রাহ্মণগণের সহিত সম্পর্ক রাখায় তাহারা এই প্রাধান্য লাভ করিতে পারিয়াছে। ইহারা পূজার জন্য পুরোহিত রাখে এবং জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহে বিহিত অনুষ্ঠান পালন করে। মাদুরার রামনাদ নামক স্থানে মরবন্গণ মৃত ব্যক্তির দাহ করিবার সময় অগ্নিপাত্র বহন করিয়া থাকে এবং শব ধৌত করিবার জন্য জলপাত্র লইয়া যায়। তঞ্জোর জেলায় অগমুদৈয়ন্দিগকে তের্কিত্তিয়রও বলা হয়। তবে প্রধানতঃ ইহাদের শের্ব্বৈক্কারন্ উপাধিই দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই বেল্লাল ও পিল্লই নামে অভিহিত হয়।

অইবলি নাত্তান, কোত্তইপত্তু, মলয়নাড়ু, নাত্তুমঙ্গলম্, রাজবোজ, রাজকুলম্, রাজবাসল, কল্লন্, মরবন্, তুলুবন্ ও শের্ব্বৈক্কারনে অগমুদৈয়ন্গণ প্রধানতঃ বাস করিয়া থাকে। 'রাজবাসল' অর্থ রাজগণের ভৃত্য। 'কোত্তইপত্তু' অর্থ যাহারা দুর্গে বাস করে। অগমুদৈয়ন্গণের বিশ্বাস, তিনেবেলির তথাকথিত কোত্তইবেল্লালগণই পরে কোত্তইপত্তু হইয়াছে। একটী অগমুদৈয়ন্ পরগণার নাম 'শানি' দেখিতে পাওয়া যায়। তামিলভাষায় শানি অর্থে গোময়।

উন্নত অগমুদৈয়ন্গণ তাহাদের উদ্বাহক্রিয়া পৌরাণিকমতে সম্পন্ন করিয়া থাকে। একজন জ্যোতিষীকে পাত্র ও পাত্রীর যোগ্যতা বিচার করিবার জন্য নিযুক্ত করা হয়। জ্যোতিষী নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিচারকার্য্য সমাধা করেন—

(১) বার (জন্মদিবস); (২) গণ (জাতি); (৩) স্ত্রীদীর্ঘ (স্ত্রীলোকের আয়ু); (৪) যোনি (স্ত্রীযোনি); (৫) রাশি; (৬) রাশ্যধিপতি; (৭) বশ্য (পাত্র ও পাত্রীর উভয়ের চিহ্ন); (৮) রজ্জু (বিবাহের জন্য নির্দ্দিষ্ট); (৯) ঋক্ষ বা নক্ষত্র (অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকই, পূরম্, হস্থম্, থিরুচোনম্ ও উথিরত্তাধি); (১০) পক্ষী; (১১) জাতি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্যান্য জাতি)। ইহাদের বিবাহে পাত্র পাত্রী অপেক্ষা উচ্চজাতীয় হইয়া থাকে এবং তাহার রাশিচক্র পাত্রীর রাশিচক্র অপেক্ষা ভাল হওয়া চাই।

অগমেদিস্ (Agamedes)—গ্রীক্ পৌরাণিক দেবতা, অর্গিনাসের পুত্র। ইনি ও ইঁহার ভ্রাতা ট্রোফোনিয়স্ স্থপতি ছিলেন। ইঁহারা রাজা হিরীউসের (Hyrieus) জন্য এক কোষাগার নির্ম্মাণকালে সুকৌশলে তাহাতে এক গুপ্তদ্বার রাখিয়াছিলেন। ঐ দ্বার দিয়া তাঁহারা ধনরত্ন অপহরণ করিতে লাগিলেন। হিরীউস্ একদিন জানিতে পারিয়া ফাঁদ পাতিয়া রাখেন। অগমেদিস্ ফাঁদে পড়িয়া গেলেন। ট্রোফোনিয়স্ উপায়ান্তর না দেখিয়া ভ্রাতার মস্তক ছেদন করিয়া পলায়ন করিলে হিরীউস্ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করেন। এই অবস্থায় লেবাদিয়ার উদ্যানে ট্রোফোনিয়স্ সহসা ভূগর্ভে নিমজ্জিত হন। তদবধি এই স্থানে ট্রোফোনিয়সের দৈববাণী শ্রুত হইত।

অগম্যা—অমৈথুনার্হা নারী, যে নারীর সহিত যৌনসম্বন্ধ করা উচিত নহে। পৃথিবীর সমস্ত সমাজে, সমস্ত ধর্ম্মে কয়েকটী রমণী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যাহাদিগের সহিত যৌনসম্বন্ধ করিলে পাপ হয়, পাপের ফলে দণ্ডার্হ হইতে হয়। মোটামুটি সকল সমাজেই পরস্ত্রীগমন দোষাবহ এবং তাহার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা আছে। ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ অগম্যাগমনে যেরূপ প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেরূপ বোধ হয় আর কোন প্রাচীন সভ্যদেশেই নাই।

বেদে আমরা অগম্যা শব্দ পাই না। উপনিষদ্গুলির মধ্যে কেবল তেজোবিন্দু উপনিষদে 'অগম্যগম্যকর্ত্তৃ' শব্দ আছে। (তেজো° ৪) ধর্ম্মসূত্রগুলির মধ্যে আমরা অগম্যাসম্বন্ধে আলোচনা দেখিতে পাই। আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে লিখিত আছে, "গুরুতল্পগামী সবৃষণং শিশ্নং পরিবাস্যাঞ্জলাবাধায় দক্ষিণাং দিশমনাবৃত্তিং ব্রজেৎ" (১.২৫.১)। ভাষ্যকার 'গুরু' শব্দের পিতা অর্থ করিয়াছেন, আচার্য্যাদি নহে; এবং 'তল্প' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—ভার্য্যা এবং 'গুরুতল্প' অর্থে বলিয়াছেন, 'সাক্ষাজ্জননী ন তৎসপত্নী'। সুতরাং উপরি-উক্ত সূত্রের অর্থ—মাতৃগামী ব্যক্তি সকোষ স্বীয় লিঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া অঞ্জলিতে গ্রহণপূর্ব্বক বরাবর দক্ষিণ-মুখ হইয়া অগ্রসর হইবে; যতক্ষণ পর্য্যন্ত না দেহত্যাগ হয়, ততক্ষণ এইরূপ করিবে। গুরুতল্পগামীর অন্যরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে আছে—"জ্বলিতাং বা সূর্মিং পরিষ্বজ্য সমাপ্নুয়াৎ"। সূর্মি শব্দের অর্থ লৌহ বা তাম্রময়ী প্রতিমা। এই শূন্যগর্ভ প্রতিমার অভ্যন্তরে দাহ্য পদার্থ নিক্ষেপ করিয়া অগ্নিসংযোগ করিবে। তৎপরে উহা অঙ্গারবৎ তপ্ত হইলে উহাকে আলিঙ্গন করিয়া দেহ বিসর্জ্জন দিবে। গৌতমধর্ম্মসূত্র, বৌধায়নধর্ম্মসূত্র (২.১.১২) এবং শঙ্খলিখিতধর্ম্মসূত্র প্রভৃতি কয়েকটী ধর্ম্মসূত্রে অপর এক প্রকার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে—"তপ্তে লোহশয়নে গুরুতল্পগঃ শয়ীত" (গৌ° ধর্ম্ম° ২৩.৯)। অর্থাৎ উত্তপ্ত লৌহের শয্যায় গুরুতল্পগামী শয়ন করিয়া দেহত্যাগ করিবে।

গৌতমধর্ম্মসূত্রে গুরুতল্পগামী ব্যতীত অপর অগম্যাগামী

সম্বন্ধে এইরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে—"সখীসযোনি-সগোত্রাশিষ্যভার্য্যাসু স্নুষায়াং গবি চ তল্পসমঃ।" (২৩.১২) অর্থাৎ বন্ধুপত্নী, ভগিনী, সগোত্রা, শিষ্যভার্য্যা, কন্যা ও গো গমন করিলে গুরুতল্পগামীর ন্যায়ই প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। এই ধর্ম্মসূত্র হইতে আমরা আরও কয়েকটী অগম্যার নাম পাইতেছি। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির উপর বিশ্বরূপ যে টীকা লিখিয়াছেন, তাহাতে শঙ্খলিখিতের এই একটী বচন উদ্ধৃত আছে—"এবং মাতুলানী-পিতৃস্বসৃ-স্নুষা-ভগিনী-দুহিতৃগমনেষ্বা-চার্য্যদুহিতরি চ"। এই বচন হইতে আমরা আরও কয়েকটী অগম্যার উল্লেখ পাইতেছি।

আপস্তম্বের ধর্ম্মসূত্রে লিখিত আছে—"পূর্ব্ববত্যামসংস্কৃতায়াং বর্ণান্তরে চ মৈথুনে দোষঃ।" (২.১৩.৩) অর্থাৎ পূর্ব্ববতী (অপরের পরিণীতা), অসংস্কৃতা (অনূঢ়া) এবং অপর বর্ণের রমণীতে মৈথুন দোষাবহ। কিন্তু "অবুদ্ধিপূর্ব্বমসংস্কৃতো যুবা পরদারমনুপ্রবিশন্ কুমারীং বা বাচা বাধ্যঃ" (আপ°ধর্ম্ম° ২.২৬.১৮) অর্থাৎ যদি কোন যুবা অভিসন্ধি না করিয়া পরদার বা কুমারীতে অভিগমন করে, তাহাকে বাক্য দ্বারা বাধ্য করিবে অর্থাৎ ভবিষ্যতে এইরূপ করিলে দণ্ড হইবে বলিয়া শাসাইয়া দিবে। আর "বুদ্ধিপূর্ব্বং তু দুষ্টভাবো দণ্ড্যঃ" (২.২৬.১৯) অর্থাৎ যদি অভিসন্ধি করিয়া কুমতলবে অভিগমন করে, তাহা হইলে দণ্ডনীয় হইবে। "সন্নি-পাতে বৃত্তে শিশ্নচ্ছেদনং সবৃষণস্য। কুমার্য্যাং তু স্বান্যাদায় নাশ্যঃ।" যদি পুনঃপুনঃ পরদারগমন করে, তাহা হইলে সকোষশিশ্ন ছেদন করিয়া দিবে। যদি কুমারীগমন করে, তাহা হইলে সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবে।

যদি উচ্চবর্ণের পুরুষ শূদ্রাভিগমন করে, তাহা হইলে তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করা হইবে এবং যদি শূদ্র উচ্চবর্ণের রমণীতে অভিগমন করে, তাহা হইলে তাহাকে বধ করা হইবে। "নাশ্য আর্য্যঃ শূদ্রায়াম্। বধ্যঃ শূদ্র আর্য্যায়াম্॥" (আপ°ধর্ম্ম° ২.২৭.৮-৯) ভাষ্যকার এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

"সজাতাবুত্তমো দণ্ডঃ আনুলোম্যে তু মধ্যমঃ।
প্রাতিলোম্যে বধঃ পুংসাং স্ত্রীণাং নাসাদিকৃন্তনম্॥"

যদি স্ত্রীপুরুষ এক বর্ণের হয়, তাহা হইলে উত্তম বা অল্প দণ্ড হইবে। যদি পুরুষ উচ্চবর্ণের এবং স্ত্রী নীচবর্ণের হয়, তাহা হইলে মধ্যম বা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দণ্ড হইবে এবং যদি পুরুষ নীচবর্ণের ও স্ত্রী উচ্চবর্ণের হয় তাহা হইলে, পুরুষের বধ দণ্ড হইবে এবং স্ত্রীর নাসাদি কর্ত্তন করা হইবে।

গুরুতল্পগামীর দণ্ডের ব্যবস্থা সম্পর্কে আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রের ভাষ্যকার মাতৃগামী ব্যতীত অপর অগম্যাগামীর এইরূপ দণ্ড-ব্যবস্থা করিয়াছেন—

"পিতুদারান্ সমারুহ্য মাতৃবর্জং নরাধমঃ।
ভগিনীং মাতুরাপ্তাং বা স্বসারং বান্যমাতৃজাম্॥
এতা গত্বা স্ত্রিয়ো মোহাৎ তপ্তকৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ॥"

অর্থাৎ মাতা ভিন্ন পিতার অন্যান্য স্ত্রী, সহোদরা বা বিমাতার গর্ভজাতা ভগিনী, ইহাদের সহিত মোহবশে অভিগমন করিলে তপ্তকৃচ্ছ প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিবে।

সংহিতাসমূহে গুরুতল্প শব্দ বিমাতা অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অত্রিসংহিতায় গুরুতল্পগমন মহাপাতক নামে অভিহিত। বিষ্ণুসংহিতায় আছে—

"মাতৃগমনং দুহিতৃগমনং স্নুষাগমনমিত্যতিপাতকানি॥
অতিপাতকিনস্ত্বেতে প্রবিশেয়ুর্হুতাশনম্।
নহ্যন্যা নিষ্কৃতিস্তেষাং বিদ্যতে হি কথঞ্চন॥" (বিষ্ণুস° ৩৪.১-২)

অর্থাৎ মাতৃগমন, কন্যাগমন এবং পুত্রবধূগমন এই তিনটী অতিপাতক। এই সকল অতিপাতকী ব্যক্তি অগ্নি-প্রবেশ করিবে, এতদ্ভিন্ন তাহাদিগের আর কোনরূপেই নিষ্কৃতি নাই। বিষ্ণুসংহিতায় গুরুপত্নীগমন অর্থাৎ বিমাতৃগমন মহাপাতক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহার প্রায়শ্চিত্ত অশ্ব-মেধ যজ্ঞ বা পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থপর্য্যটন।

সংহিতাকার আরও বলিয়াছেন—"পিতৃব্যমাতামহমাতুল-শ্বশুর নৃপপত্ন্যভিগমনং গুরুদারগমনসমম্। পিতৃস্বসৃমাতৃস্বসৃস্বসৃ-গমনঞ্চ। শ্রোত্রিয়র্ত্বিগুপাধ্যায়মিত্রপত্ন্যভিগমনঞ্চ। স্বসুঃ সখ্যাঃ সগোত্রায়া উত্তমবর্ণায়াঃ কুমার্য্যা অন্ত্যজায়া রজস্বলায়াঃ শরণা-গতায়াঃ প্রব্রজিতায়া নিক্ষিপ্তায়াশ্চ।

অনুপাতকিনস্ত্বেতে মহাপাতকিনো যথা।
অশ্বমেধেন শুধ্যন্তি তীর্থানুসরণেন বা॥"

অর্থাৎ পিতৃব্য, মাতামহ, মাতুল, শ্বশুর এবং নৃপপত্নী অভিগমন গুরুদারগমনের সমান। পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা ও ভগিনীগমন; শ্রোত্রিয়, ঋত্বিক্, উপাধ্যায় ও মিত্রপত্নীগমন; ভগিনীর সখী, সগোত্রা, উত্তমবর্ণা, কুমারী, অন্ত্যজা, রজস্বলা, শরণাগতা, প্রব্রজ্যাবলম্বিনী, গচ্ছিতা—এই সকলের সহিত অভি-গমন, গুরুপত্নীগমনতুল্য। এই সকল অনুপাতকীরা অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান বা তীর্থপর্য্যটন দ্বারা পবিত্র হইবে।

উশনঃসংহিতার মতে পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা, মাতুলানী, ভাগি-নেয়ী, পিতৃস্বস্রেয়ী (পিস্তুত ভগিনী), মাতৃস্বস্রেয়ী (মাসতুত ভগিনী), মাতুলকন্যা গমন করিলে চান্দ্রায়ণ এবং ভার্য্যার সখী ও শ্যালীতে অভিগমন করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিবে। (উশনঃস° ৯.২-৪) সংবর্ত্তসংহিতায় নীচ জাতির

মধ্যে চাণ্ডালী, পুক্কসী, নটী, শৈলূষী, রজকী, বেণুজীবিনী ও চর্ম্মোপজীবিনী গমন করিলে বিশেষ করিয়া প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা আছে। (সংবর্ত্তস°, ১৪৯-১৫১)

পরাশরসংহিতায় লিখিত আছে—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য সর্ব্বত্র হীয়ং প্রোক্তা তু নিষ্কৃতিঃ।
অগম্যাগমনে চৈব শুদ্ধৌ চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ॥"

(পরা°স°, ১০.১)

অর্থাৎ সর্ব্ববিধ অগম্যাগমন পাপ হইতে চারিবর্ণের নিষ্কৃতির বিধান ইহাই উক্ত হইল। অগম্যাগমন পাপে শুদ্ধ হইবার জন্য চান্দ্রায়ণই বিহিত। পরাশর কয়েকটী অগম্যাগমনের বিশেষ প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিয়া পশু ও বেশ্যাগমনের প্রায়শ্চিত্তবিধান করিয়াছেন। (পরা°স°, ১০.১৫) অগম্যাগমনে পুরুষের কি কি রোগ বা অঙ্গহানি হইয়া থাকে, তাহার বিবরণ এবং সেই সঙ্গে পাপের প্রায়শ্চিত্তবিধিও শাতাতপসংহিতায় উল্লিখিত আছে। (শাতা°স°, পঞ্চমাধ্যায়)

বাৎস্যায়নের কামসূত্রে অগম্যাগমন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"অগম্যাস্ত্বেবৈতাঃ কুষ্ঠিন্যুন্মত্তা পতিতা ভিন্নরহস্যাপ্রকাশ-প্রার্থিনী গতপ্রায়যৌবনাতিশ্বেতাতিকৃষ্ণা দুর্গন্ধা সম্বন্ধিনী সখী প্রব্রজিতা সম্বন্ধিসখিশ্রোত্রিয়রাজদারাশ্চ।" (কামসূত্র, ১.৫.৩২) অর্থাৎ এইগুলি অগম্যা—কুষ্ঠরোগযুক্তা, উন্মত্তা, পতিতা, গোপ্যপ্রকাশকারিণী, যাহার যৌবন গতপ্রায়, অত্যন্ত শ্বেতবর্ণা, অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণা, (গুহ্যে ও বক্ত্রে) দুর্গন্ধবিশিষ্টা, বৈবাহিক-সম্বন্ধে সম্বন্ধিনী, ভার্য্যার সখী, সন্ন্যাসিনী, বিদ্যাসম্বন্ধে বা রাজ-সম্বন্ধে যাহাদের সহিত সম্বন্ধ তাহাদিগের স্ত্রী, মিত্রস্ত্রী, শ্রোত্রিয়-ব্রাহ্মণ-স্ত্রী ও রাজপত্নী।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে অগম্যা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"যা যা গম্যা নৃণামেব নিবোধ কথয়ামি তে।
স্বস্ত্রী গম্যা চ সর্ব্বেষামিতি বেদনিরূপিতা॥
অগম্যা চ তদন্যা যা ইতি বেদবিদো বিদুঃ।
সামান্যং কথিতং সর্ব্বং বিশেষং শৃণু সুন্দরি!
অগম্যাশ্চৈব যা যাশ্চ নিবোধ কথয়ামি তাঃ।
শূদ্রাণাং বিপ্রপত্নী চ বিপ্রাণাং শূদ্রকামিনী॥
অত্যগম্যা চ নিন্দ্যা চ লোকে বেদে পতিব্রতে।
শূদ্রশ্চ ব্রাহ্মণীং গচ্ছেদ্ব্রহ্মহত্যাশতং লভেৎ॥
তৎসমং ব্রাহ্মণী চাপি কুম্ভীপাকং ব্রজেদ্ধ্রুবং।
যদি শূদ্রাং ব্রজেদ্বিপ্রো বৃষলীপতিরেব সঃ॥
স ভ্রষ্টো বিপ্রজাতেশ্চ চাণ্ডালাৎ সোঽধমঃ স্মৃতঃ
বিষ্ঠাসমশ্চ তৎপিণ্ডো মূত্রং তস্য চ তর্পণং॥
তৎপিতৄণাং সুরাণাঞ্চ পূজনে তৎসমং সতি।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং সন্ধ্যার্চ্চাতপসার্জ্জিতং॥
দ্বিজস্য বৃষলীভোগান্নশ্যত্যেব ন সংশয়ঃ।
ব্রাহ্মণশ্চ সুরাপীতো বিড়্ভোজী বৃষলীপতিঃ॥
হরিবাসরভোজী চ কুম্ভীপাকং ব্রজেদ্ধ্রুবং।
গুরুপত্নীং রাজপত্নীং সপত্নীমাতরং প্রসূং॥
সুতাং পুত্রবধূং শ্বশ্রূং সগর্ভাং ভগিনীং সতি।
সোদরভ্রাতৃজায়াঞ্চ ভগিনীভ্রাতৃকন্যকাং॥
শিষ্যাঞ্চ শিষ্যপত্নীঞ্চ ভাগিনেয়স্য কামিনীং।
ভ্রাতৃপুত্রপ্রিয়াঞ্চৈবাত্যগম্যামাহ পদ্মজঃ॥
এতাস্বেকামনেকাং বা যো ব্রজেন্মানবাধমঃ।
স মাতৃগামী বেদেষু ব্রহ্মহত্যাশতং লভেৎ॥
অকর্ম্মার্হোঽপি সোঽস্পৃশ্যো লোকে বেদেঽতিনিন্দিতঃ।
স যাতি কুম্ভীপাকঞ্চ মহাপাপী সুদুষ্করং॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু°, প্রকৃতিখণ্ড, ২৭ অঃ)

পদ্মপুরাণেও (স্বর্গ°, ৪৬ অঃ) অগম্যাগমন ও তাহার প্রায়শ্চিত্তবিধি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ধর্ম্মসূত্র, সংহিতা ও পুরাণাদি হইতে এই কয়েকটী অগম্যা পাওয়া যাইতেছে—(১) মাতা; (২) বিমাতা; (৩) কন্যা; (৪) পুত্রবধূ; (৫) ভগিনী; (৬) বৈমাত্রেয় ভগিনী; (৭) গুরুপত্নী; (৮) পিতৃব্যপত্নী; (৯) পিতৃ-ষ্বসা; (১০) মাতৃষ্বসা; (১১) নৃপপত্নী; (১২) মাতুলানী; (১৩) মাতামহী; (১৪) শ্বশ্রূ; (১৫) ভ্রাতৃজায়া; (১৬) ভ্রাতুষ্পুত্রী; (১৭) ভাগিনেয়ী; (১৮) স্বগোত্রা বা জ্ঞাতি-কন্যা; (১৯) শিষ্যা; (২০) শিষ্যপত্নী; (২১) পিতৃ-ষ্বস্রেয়ী; (২২) মাতৃষ্বস্রেয়ী; (২৩) মাতুলকন্যা; (২৪) ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ; (২৫) ভাগিনেয়বধূ; (২৬) শ্রোত্রিয়পত্নী; (২৭) ঋত্বিক্পত্নী; (২৮) উপাধ্যায়পত্নী; (২৯) ভার্য্যাসখী; (৩০) শ্যালী; (৩১) ভগিনীসখী। এতদ্ব্যতীত (৩২) উত্তমবর্ণা স্ত্রী; (৩৩) প্রব্রজিতা; (৩৪) রজস্বলা; (৩৫) নিক্ষিপ্তা বা গচ্ছিতা—ইহারাও বিশেষ অগম্যা।

(৩৬) অন্ত্যজা রমণীগণও অগম্যা, বিশেষতঃ চাণ্ডালী, পুক্কসী, নটী, শৈলূষী, রজকী, বেণুজীবিনী ও চর্ম্মোপজীবিনী। এই শেষোক্ত রমণীগণ অস্পৃশ্যা বলিয়াই অগম্যা।

কামসূত্রোক্ত গোণিকাপুত্রের মতে, মিত্রস্ত্রী অন্যের গম্যা নায়কের নয়। সম্বন্ধে দারা অর্থাৎ যাহার সহিত বিদ্যাসম্বন্ধ বা যোনিসম্বন্ধ থাকে, তাহার ভার্য্যা যদি স্বৈরিণীও হয়, তথাপি সে অগম্যা। শ্রোত্রিয় ক্রিয়াবান্, রাজা চাতুর্ব্বর্ণ্যের গুরু,—তাঁহাদিগের ভার্য্যা দুশ্চরিত্রা হইলেও অগম্যা।

বাৎস্যায়নের মতে, সাধ্বী পরস্ত্রী মাত্রেই অগম্যা। ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রা নিতান্তই অগম্যা। শাস্ত্রবিধি মতে যাহার সহিত বিবাহ হইতে পারে না, এবংবিধ কুমারী নিতান্তই অগম্যা।

প্রথমে মাতা, কন্যা, ভগিনী প্রভৃতি অগম্যাগামীর প্রায়শ্চিত্তবিধি অতি কঠোর ছিল। ক্রমশঃ এই কঠোর-বিধি অন্যান্য অগম্যাগমনেও প্রযুক্ত হয়; পরে আবার এই কঠোর নিয়ম শ্লথ হইয়া পড়ে; তখন শুদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অগম্যাগামীর পরিশুদ্ধির ব্যবস্থা হইল। রাজদণ্ড-ব্যতীত সামাজিক দণ্ডের প্রকোপ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস হইয়া পড়িল। এ যুগে এই সমস্ত মহাপাপীর সামাজিক শাস্তির ব্যবস্থা অতি অল্পক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়।

দাক্ষিণাত্যে মাতুলকন্যা বা পিতৃষ্বস্কন্যা অগম্যা নহে। বৌধায়নধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে—

"পঞ্চধা বিপ্রতিপত্তির্দক্ষিণতস্তথোত্তরতঃ।
যানি দক্ষিণতস্তানি ব্যাখ্যাস্যামঃ …
মাতুলপিতৃষ্বস্দুহিতৃগমনমিতি। (১.১.২.১-৩)

বৌধায়নধর্ম্মসূত্রের ব্যাখ্যাকার গোবিন্দস্বামী কুমারিল ভট্টের একটী শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়া উহার সমর্থনে বলিয়াছেন—"স্বমাতুলসুতাং প্রাপ্য দাক্ষিণাত্যস্তু তুষ্যতি।" বাৎস্যায়নের কামসূত্রে লিখিত আছে—"তথাযুক্তশ্চ মাতুলকুলানুবর্ত্তী দক্ষিণাপথে বাল এব মাত্রা চ বিযুক্তঃ পরিভূতকল্পো ধনোৎকর্ষাদলভ্যাং মাতুলদুহিতরমন্যস্মৈ বা পূর্ব্বদত্তাং সাধয়েৎ"॥ অর্থাৎ দক্ষিণাপথে মাতাপিতৃহীন বালক মাতুলকুলে বাস করিয়া, ঘৃণিতপ্রায় হইয়াও সেই উপায়ে (অর্থাৎ বাল্যকাল হইতে কন্যাকে অনুরক্তা করিয়া) ধনের প্রাচুর্য্য হেতু অলভ্যা মাতুলকন্যাকে অপরের বাগ্‌দত্তা হইলেও আয়ত্ত করিয়া থাকে। (কামসূত্র ৩.৩.৩)

দাক্ষিণাত্যের করাড় ব্রাহ্মণগণ মাতুলকন্যাকে বিবাহ করিয়া থাকেন।

রাষ্ট্রকূটনৃপতি দ্বিতীয় কৃষ্ণ হৈহয় নৃপতি কোক্কলের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহাদের পুত্র রাজা দ্বিতীয় জয়তুঙ্গ। ইনি তাঁহার মাতুল রণবিগ্রহের (কোক্কলের পুত্র) কন্যা লক্ষ্মীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে রাজা তৃতীয় ইন্দ্রের জন্ম হয়। ইনি অম্মনদেবের (কোক্কলের পৌত্র ও অর্জ্জুনের পুত্র) কন্যা বিজাম্বাকে বিবাহ করেন।

ভগবান্ গৌতমবুদ্ধ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই শাক্যগণের মধ্যে ভ্রাতার সহিত ভগিনীর বিবাহ সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। মগধের পরাক্রান্ত রাজা অজাতশত্রু আপন মাতুল প্রসেনজিতের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পরে উত্তরভারতে এই প্রথার লোপ হয়।

ভারতের খন্দ, গোণ্ড প্রভৃতি অর্দ্ধসভ্য আদিম জাতিগণের মধ্যে জ্ঞাতি বা সগোত্রের সহিত বিবাহ হয় না। এমন কি, পূর্ব্বে এইরূপ কোন অবৈধ সংসর্গ ঘটিলে উভয়পক্ষের মৃত্যু পর্য্যন্ত দণ্ড হইত। ভীল জাতির মধ্যে এইরূপ ধর্ম্মহানিকর সংসর্গ হইলে নির্ব্বাসনদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। মলয় দ্বীপ-পুঞ্জে ধর্ম্মব্যতিকর সংসর্গকারীকে যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করা হইত। বেদ্দজাতির মধ্যে ঐরূপ অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড হইত।

পৃথিবীর অধিকাংশ আদিমজাতির মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে সভ্যজাতি অপেক্ষা কঠোরতর নিয়ম বর্ত্তমান আছে। ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে বিবাহ তো দূরের কথা, অনেকস্থলে জ্ঞাতি বা নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী জাতির সহিতই বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। কোন কোন স্থলে নিজের গোষ্ঠী, এমন কি স্বগ্রামের কোন কন্যাকে বিবাহ করাও ধর্ম্মবিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মীয়ের বংশের কাহারও সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে (যে সকল জাতি মাতৃ-কুলানুবর্ত্তী, তাহাদের মধ্যে) মাতার কুলের কাহারও সহিত বিবাহ ধর্ম্মতঃ নিষিদ্ধ ছিল। সেই সমস্ত জাতির মধ্যে আবার পত্নীর পূর্ব্বস্বামীর ঔরসজাত কন্যাকে বা ভ্রাতার কন্যাকে বিবাহ করার রীতি ছিল, অথবা ভ্রাতা বৈমাত্রেয় ভগিনীকে বিবাহ করিতে পারিত। কিন্তু সাধারণতঃ এ সমস্ত বিবাহ নিন্দনীয় ছিল। যে ক্ষেত্রে রক্তের সম্বন্ধ বর্ত্তমান, সে ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের মধ্যে যৌনসম্বন্ধ অত্যন্ত ধর্ম্মবিগর্হিত বলিয়া অনেকস্থলে বিবেচিত হইত এবং এই সকল সম্বন্ধ সমস্ত জাতির বিরুদ্ধে অপরাধ (public offence) বলিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বধদণ্ড হইত। আমেরিকার আদিম জাতিগণের মধ্যে এইরূপ ধর্ম্মবিগর্হিত সম্বন্ধ দেশের অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ভূমিকম্প প্রভৃতি সর্ব্বনাশের কারণ বলিয়া গণ্য হইত এবং দেবতার পূজা ও বলি উপহার দিয়া এই পাপের প্রায়-শ্চিত্ত করার বিধি ছিল।

আবার অনেক ক্ষেত্রে নিতান্ত আত্মীয়দিগের মধ্যেও বিবাহ-প্রথা প্রচলন ছিল। সেই সকল বিবাহের সংখ্যা অতি অল্প ও দুই চারিটী জাতির মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। ব্রহ্মদেশের নৃপতিগণের মধ্যে মাতার পূর্ব্বস্বামীর ঔরসজাত কন্যাকে বিবাহ করার পদ্ধতি ছিল। শ্যামরাজ্যে এই প্রথা কিছুকাল পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন মিশরদেশে মাতা ব্যতীত অগম্যা বলিয়া কোন আত্মীয়া ছিল না। সাধারণের মধ্যে প্রচলিত না থাকিলেও

ফারাওবংশের শেষ নৃপতিগণ ও টলেমিগণের মধ্যে ভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল। সুন্দরীশিরোমণি ক্লিওপেট্রা আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

গ্রীসদেশে অতি প্রাচীনকালে নিকট আত্মীয়ের সহিত বিবাহের কথা কোন কোন ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। দত্তককন্যাকে পালকপিতা বিবাহ করিতে পারিতেন না, কিন্তু তাঁহার পুত্রের সহিত বিবাহ দিতে পারিতেন।

রোমদেশে এ সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম ছিল। প্রাচীন রোমে একই গোষ্ঠীর ছয়পুরুষের মধ্যে বিবাহ হইত না,—একই বংশে ছয়পুরুষের মধ্যে জাত জ্ঞাতিভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় পিউনিক্ যুদ্ধের পর পিতৃব্যকন্যাকে বিবাহ করার রীতি প্রচলিত হয়। সম্রাট্ ক্লডিয়াস্ আপন ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়া পিতৃব্যের সহিত ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহপ্রথা প্রচলন করেন। কিন্তু পরে এই প্রথা আইন করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। খৃষ্টধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের পর পূর্ব্ব-ধর্ম্মকেন্দ্রের (Eastern Church) নিয়মানুসারে প্রপিতামহের বংশজাত বা প্রমাতামহের বংশজাত কাহারও মধ্যে বিবাহপ্রথা নিষিদ্ধ হয়; পশ্চিম-ধর্ম্মকেন্দ্রের (Western Church) নিয়মানুসারে ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন সাতপুরুষের মধ্যে বিবাহপ্রথা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট্ এই প্রথা সরল করিয়া চারিপুরুষ পর্য্যন্ত বিবাহ রহিত করিবার আদেশ দেন।

কোরানে লিখিত আছে, পিতার বা পিতামহের বিবাহিত নারীকে বিবাহ করিবে না। কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদ হইলে বিবাহ করিতে বাধা নাই। মাতা, ভগিনী, কন্যা, পিতৃব্য-পত্নী, পিতৃষ্বসা, মাতৃষ্বসা, মাতুলানী, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী, ধাত্রীমাতা, ধাত্রীকন্যা, শ্বশ্রূ, পত্নীর পূর্ব্বস্বামীর ঔরসজাত কন্যা, ঔরসজাত পুত্রের বধূ এবং জীবিতপত্নীর ভগিনীকে বিবাহ করিবে না। স্বাধীন পরদারাতে অভিগমন করিবে না, কিন্তু পরদারা যদি যুদ্ধে বা অন্যরূপে আহৃত হইয়া দাসীবৃত্তি করে, তাহা হইলে তাহাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ নয়।

চীনদেশে স্বগোত্র বা এক উপাধিধারী ব্যক্তির কন্যাকে বিবাহ করিলে সে বিবাহ অসিদ্ধ হয় এবং ৬০ কশাঘাতের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। পিতৃকুলজাত কোন রমণীকে বিবাহ করিলে কঠোরতর দণ্ড হইয়া থাকে। কোন রমণী যদি পিতার পিতৃব্য, পিতার পিতৃব্যপুত্র, পিতার ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত সংসর্গ বা তাহাকে বিবাহ করে, তাহা হইলে উভয়ের মৃত্যুদণ্ড হয়। যে ব্যক্তি মাতৃষ্বসা বা ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করে, তাহাকে শ্বাসরোধ করিয়া বধ করা হয়। যদি কোন ব্যক্তি বৈমাত্রেয় ভগিনীকে বিবাহ করে, তাহা হইলে লঘুতর দণ্ড এবং যদি পিতৃষ্বসা বা মাতৃষ্বসার কন্যাকে বিবাহ করে, তাহা হইলে লঘুতম দণ্ড হইয়া থাকে। এক্ষণে ভ্রাতা ও ভগিনী পরস্পরের পুত্রকন্যার মধ্যে বিবাহ দিতে পারেন, কিন্তু দুই ভ্রাতা তাহাদের পুত্রকন্যার মধ্যে বিবাহ দিতে পারেন না। মৃত ভ্রাতার বিধবা পত্নীকে বিবাহ করিলে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করা হয়। কিন্তু মৃত পত্নীর ভগিনীকে বিবাহ সম্মানার্হ বলিয়া বিবেচিত।

পারস্যদেশে প্রাচীনকালে মাতা ভিন্ন কোন অগম্যা নারী ছিল বলিয়া বোধ হয় না। অধুনা মাতা ও ভগিনী অগম্যা, অন্য আত্মীয়ার সহিত বিবাহ হইতে পারে। পারসিক-গণ সচরাচর স্বগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ করাই সমীচীন বলিয়া মনে করে।

লেবিটিকাস্ (Leviticus) বা প্রাচীন হিব্রুদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে ভগবান্ হজরত মুশাকে (Moses) বলিয়াছেন, আত্মীয়া, বিশেষতঃ মাতা, বিমাতা, ভগিনী (এক পিতা বা এক মাতার সন্তান), পৌত্রী, দৌহিত্রী, পিতৃষ্বসা, মাতৃষ্বসা, পিতৃব্যপত্নী, পুত্রবধূ, ভ্রাতৃবধূ, পত্নীর পূর্ব্বস্বামীর ঔরসজাত কন্যা, পত্নীর পৌত্রী বা দৌহিত্রী, পত্নী বর্ত্তমানে শ্যালী, রজস্বলা স্ত্রী, প্রতিবেশীর স্ত্রী, পুরুষ ও পশু অভিগমন করিবে না। কন্যার নামোল্লেখ না থাকিলেও তাহাও এই তালিকার অন্তর্ভূক্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। (লেবিটিকাস্ ১৮; পৃঃ ৬-২৩)

প্রাচীন রোমে দত্তক কন্যা বা পৌত্রীকে দত্তক অবস্থার পরও বিবাহ করা নিষিদ্ধ ছিল। এই দত্তক অবস্থায় দত্তক ভ্রাতা বা দত্তক ভগিনীকে কেহ বিবাহ করিত না। লাটিন দেশসমূহে দত্তকগৃহীতার সন্তান ও দত্তক-সন্তানের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। ফ্রান্সে এবং বেলজিয়মে দুই দত্তক সন্তানের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে (Church law) দত্তকবিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ নাই।

জস্‌টিনিয়নের বিধি অনুসারে ধর্ম্মপিতা ও ধর্ম্মকন্যার মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। পাদ্রী এবং তাঁহার দ্বারা দীক্ষিতা রমণী বা তাহার মাতার সহিত বিবাহ অশাস্ত্রীয় বলিয়া বিবেচিত। ধর্ম্মপিতা ও ধর্ম্মকন্যার ভগিনীর মধ্যেও বিবাহ নিষিদ্ধ। দীক্ষার পর ধর্ম্মপিতা বা ধর্ম্মমাতার উভয়ে অথবা একজনে অপর ধর্ম্মপিতা বা মাতার কন্যাকে বিবাহ করিবে না।

ইহুদীদিগের মধ্যে পিতব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও পিতৃব্যপত্নীর সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ। ইংলণ্ডের আইন অনুসারে ইংলণ্ডের ইহুদীগণ ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করিতে পারে না।

রুষদেশের দক্ষিন শ্লাভ্‌জাতির মধ্যে পিতৃবংশজাত রমণীর সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ। পার্ব্বত্য আলবেনিয়াতেও এই নিয়ম প্রচলিত।

জর্মনীতে ভ্রাতুষ্পুত্রী ও পিতৃব্যপত্নীকে বিবাহ করা যায়। নিউইয়র্ক, পেরু, উরুগুয়া, ফ্রান্স, ইতালী, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড, সুইডেন এবং মেক্সিকো দেশে এইরূপ বিবাহ নিষিদ্ধ হইলেও ধর্ম্মযাজকের অনুমতিক্রমে বিবাহ হইতে পারে।

ইংলণ্ডে কোন ব্যক্তির স্ববংশের উর্দ্ধতন ও অধস্তন পর্য্যায়ের মধ্যে এবং সপিণ্ডদিগের তিন পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ অর্থাৎ পিতামহী, পিতৃস্বসা, প্রপিতামহী, প্রপিতৃস্বসা ইত্যাদি; পুত্রী, পৌত্রী, প্রপৌত্রী ইত্যাদি এবং ভ্রাতৃকন্যা, পিতৃব্যকন্যা, পিতার পিতৃব্যকন্যা ও মাতুলকন্যা, মাতৃস্বসা, মাতার মাতৃস্বসা, এই সকল আত্মীয়ার সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিভিন্ন দেশে তত্তদ্দেশের সমাজ ও ধর্ম্মনীতি অনুসারে বিবাহ ও যৌনমিলনের নিয়মাবলী প্রচলিত হইয়াছিল। এক দেশে যে মিলন অত্যন্ত ধর্ম্ম ও নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়, অন্যদেশে আবার তাহাই অত্যন্ত সম্মানার্হ বলিয়া আদৃত। তবে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মাতার সহিত মিলন হীন, ধর্ম্ম ও নীতি-বিরুদ্ধ এবং মহাপাপ বলিয়া গণ্য। অসভ্যজাতির মধ্যে কোথাও কোথাও পিতার সহিত পুত্রীর বিবাহের কথা শুনা যায়। প্রাচীন মিশর ও পারস্যদেশে ভগিনীর সহিত ভ্রাতার বিবাহের যথেষ্ট নিদর্শন বর্ত্তমান। ভারতে প্রাচীন-কালে নিয়োগপ্রথা বর্ত্তমান থাকায়, ভর্ত্তা বর্ত্তমানে বা তাহার অবর্ত্তমানে শ্বশুর প্রভৃতি গৃহস্বামীর অনুমতি অনুসারে অপত্যহীনা নারীর সহিত সপিণ্ড কোন পুরুষ পুত্রার্থ সঙ্গত হইতে পারিত। সাধারণতঃ দেবর বা ভর্ত্তার কনিষ্ঠ ভ্রাতাই নিয়োজিত হইতেন। একবার পুত্র উৎপাদিত হইলে পুনরায় আর সেই স্ত্রীতে অভিগমন নিষিদ্ধ ছিল। মনু বলিয়াছেন—

"দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যঙ্‌ নিযুক্তয়া।
প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে॥
বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘৃতাক্তো বাগ্‌যতো নিশি।
একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন॥"

(মনুস°, ৯.৫৯-৬০)

মনু অবশ্য পরবর্তী শ্লোকে দ্বিজাতির পক্ষে নিয়োগ নিষিদ্ধ বলিতেছেন, কিন্তু ধর্ম্মসূত্রসমূহ ও অন্যান্য সংহিতাতে সেইরূপ কোন নিষেধ নাই।

[দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা মতে কোন্ কোন্ কন্যাকে বিবাহ করা যায় না, তাহা বিবাহ শব্দে দ্র°।]

হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে এক বর্ণের স্ত্রীপুরুষের সহিত অপর বর্ণের স্ত্রীপুরুষের মিলন সাধারণভাবে নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অনুলোম বিবাহ বা মিলন তবু সমাজে চলিত, প্রতিলোম বিবাহ বা মিলন নিতান্ত ঘৃণ্য এবং দণ্ডার্হ বলিয়া বিবেচিত হইত। [গম্য; বিবাহ; অনুলোম; প্রতিলোম; প্রায়শ্চিত্ত শব্দ দ্র°]

[আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রম্ (১.২৫.১-২; ২.১৩.৩; ২.২৭.১৮-২০,২৪; ২.২৭.৮-১২); গৌতমধর্ম্মসূত্রম্ ২৩.৯ ১১; বৌধায়নধর্ম্মসূত্রম্ ২.১.১২-১৪; Dharmasutra of Sankha and Likhita, pp. 385-386—P. V. Kane; তেজোবিন্দু উপনিষৎ, ৪; Baudhayana Dharmashastra, Ed. by Hultzch, p. 2; Baudhayana Dharmashastra, Mysore Edition, p. 8; Secred Book of the East, Vol. XIV, p. 146; বিষ্ণুসংহিতা ৩৪,৩৫,৩৬,৫৩ অধ্যায়; যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ৩.২৩১-২৩৩; উশনঃ-সংহিতা (৮.২৩-২৬; ৯.১-৬); সংবর্ত্তসংহিতা ১৪৯-১৬৮; পরাশরসংহিতা ১০.৫-১৬; গৌতমসংহিতা, ২৪ অধ্যায়; মনুসংহিতা, ৯.৫৯-৬০; কামসূত্রম্ ৩.৩.৩-৪; History of Human Marriage, Westermerk; Totemism and Exogamy—Frazer; Encyclopædia of Religion and Ethics—Crime and Punishment.]

অগয়া—উত্তরপশ্চিম প্রদেশে অভিহিত ধান্যের এক প্রকার রোগ। এই রোগ হইলে সমস্ত ধানগাছ শুকাইয়া পোড়াইয়া ফেলা হয়। বহার নামক ঘাসেও এই রোগ হইয়া থাকে।

অগর্‌-অগর্‌—সমুদ্রশৈবালজাত আঠার ন্যায় চট্‌চটে পদার্থ-বিশেষ।

অগর্‌-কি-বাতি—(অপর নাম উদ্‌-বাতি) দেবোদ্দেশে বা মাঙ্গল্যকার্য্যে ব্যবহৃত সুগন্ধি দাহ্যপদার্থবিশেষ। ইহা বেঞ্জোয়েন, চন্দনকাষ্ঠ, তালীশপত্র, চিনি, অগুরুকাষ্ঠচূর্ণ প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত এক প্রকার বর্ত্তিকা। বিজাপুরে ইহা এক সময়ে বহুল প্রস্তুত হইত।

অগর,, অগরিয়া,, অগরী,—দ্রাবিড় বা মুণ্ডাজাতির এক শাখা।* ইহারা শোণ নদের দক্ষিণে মির্জ্জাপুরের পর্ব্বতীয় প্রদেশে বাস করে। ইহাদের নিকট হইতেই শুনা যায় যে, ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইহারা রেবা হইতে মির্জ্জাপুরে আগমন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বাঙ্গালা ও উত্তরভারতের কয়েকটী স্থানে দেখা যায়। বাঙ্গালার কয়েকটী মহল, যুক্তপ্রদেশ এবং সম্বলপুরের অগরিয়াগণ দেখিতে খুব সুশ্রী। ইহারা লৌহ গালাই করিয়া এবং খনিতে মজুরের কাজ করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে। কর্ণেল ডাল্টন

* সহ্যাদ্রিখণ্ডে (২.৪.১৪) লিখিত আছে—"ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়াপুত্র অগরো নাম উচ্যতে।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভে অগরজাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

ও মিঃ রিজলি ছোটনাগপুরের এক সম্প্রদায়কে অগরিয়া নামে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা মির্জ্জাপুরের অনার্য্য অগরিয়া হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। তাঁহারা করোয়া জাতির এক শাখাকেও অগরিয়া নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

অগরিয়াগণ আকৃতিতে অনেকটা দ্রাবিড়জাতির করোয়া, পরহিয়া প্রভৃতি শাখার ন্যায় হইলেও ইহাদের হাবভাবে যেন একটা দুর্ব্বলতা ও অবসাদের চিহ্ন দেখা যায়। ইহারা সাতটী শ্রেণীতে বিভক্ত; তন্মধ্যে বাজুয়েব শাখাই নেতৃস্থানীয়। ইহাদের একটী পঞ্চায়েৎ সভা আছে। তাহাতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষই যোগদান করিয়া নিজেদের জাতীয় ও ব্যভিচারসম্বন্ধীয় দোষ বিচার করে। মৃত্যু ও বিবাহ-সময়েও পঞ্চায়েৎ বসিয়া থাকে। মণ্ডলের পদ বংশানুক্রমিক। যদি মণ্ডলের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকে, তাহা হইলে যতদিন না সে সাবালক হয়, ততদিন ঐ বংশের অন্য কোন ব্যক্তি কার্য্য চালাইয়া থাকে।

ইহারা নিজেদের কুরি বা কুলের মধ্যে বিবাহ না করিলেও খুল্লতাত-ভগিনীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে। বর যদি সহিস বা চামারের কাজ করে, তাহা হইলে তাহার বিবাহ হওয়া কঠিন। বিবাহে কন্যাকে দশটাকা মূল্য দিয়া ক্রয় করা হয়। একজন অগরিয়া যতগুলি স্ত্রী কিনিতে ও ভরণপোষণ করিতে পারিবে, সে ততগুলিকে বিবাহ করিতে পারে। বহু-বিবাহসম্বন্ধে ইহাদের কোনরূপ আপত্তি নাই। জ্যেষ্ঠা স্ত্রীই সংসারের গৃহিণী হয় ও পূজার্চ্চনায় স্বামীর সহিত যোগদান করিয়া থাকে। প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য স্বতন্ত্র ঘর নির্দ্দিষ্ট আছে। এক স্ত্রীর বহুপতিত্ব বা পুরুষের পক্ষে অন্যজাতীয় স্ত্রীলোকের সহিত অবৈধ সম্বন্ধ নিষিদ্ধ। যদি কোন কুমারী স্বজাতীয় লোকের সহিত প্রণয় করে, তাহা হইলে তাহার পিতা দশ টাকা জরিমানা দিয়া ও জ্ঞাতিদের ভোজ দিয়া কন্যাকে তাহার প্রণয়ীর সহিত বিবাহ দিয়া থাকে; তবে তাহাকে কুল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয়। মেয়েদের বিবাহের বয়স পাঁচ হইতে দশ বৎসর। অল্প বয়সে বিবাহ না দিতে পারিলে কন্যার পিতামাতা সমাজে নিন্দিত হইয়া থাকে। উভয়পক্ষের পিতামাতা মত দিলেই বিবাহ হয়—পাত্র বা পাত্রীর মতামতের কোন অপেক্ষা করিতে হয় না। সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেলে বরের পিতা দশটী টাকা ও একযোড়া ধুতি কন্যার পিতার নিকট পাঠাইয়া দেয়। সাধারণতঃ মাঘ মাসই বিবাহের প্রশস্ত সময়। বিবাহের দিন কন্যার পিতা বরযাত্রীদের কোনরূপ ভোজ দেয় না। তাহার পরদিন সকালে বর তাহার বন্ধুদের সহিত কন্যার বাড়ী আসিয়া কন্যাকে গুপ্তস্থান হইতে বাহির করিয়া আনিয়া উঠানে আনে। এই প্রথা দেখিয়া মনে হয় যে, ইহাদের মধ্যেও একসময় জোর করিয়া বিবাহ করিবার পদ্ধতি ছিল। আমাদের মধ্যে যেমন বটগাছের শাখা পুঁতিয়া বহু মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পন্ন করা হয়, ইহাদেরও তেমনই শালবৃক্ষের শাখা পুঁতিয়া বিবাহ করিবার রীতি আছে। এই শাখাকে পাঁচবার প্রদক্ষিণ করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের বিধান নাই—তবে পত্নী অসচ্চরিত্রা হইলে তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিবার প্রথা আছে। গৃহকর্ত্তার অনুমতি লইয়া ইহারা বিধবা-বিবাহ করিতে পারে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হইলে তাহার পত্নীকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করিতে পারে। বিধবার বিবাহ হইলে তাহার আর প্রথম স্বামীর সন্তান বা সম্পত্তিতে কোন অধিকার থাকে না।

ইহাদের মধ্যে অপুত্রক ব্যক্তি দত্তক গ্রহণ করিতে পারে; অবিবাহিত ব্যক্তি বা বিধবা দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না। মেয়েদের দত্তককন্যা লওয়া যায় না। যে ছেলেকে পোষ্য-পুত্ররূপে লওয়া হয়, সে তাহার প্রকৃত পিতার উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হয় না। ইহাদের বহু আচার-ব্যবহার হিন্দুদের অনুকরণে গঠিত।

মৃত ব্যক্তিকে সাধারণতঃ জঙ্গলে দগ্ধ করা হয়। দক্ষিণ-দিকে পা করিয়া শবরক্ষার পর মৃতের কোন নিকট আত্মীয় শবকে পাঁচবার প্রদক্ষিণ করে ও তৎপরে মৃতের মুখে অগ্নি প্রদান করা হয়। যে বাড়ীতে কোন লোক মরে, সে বাড়ীতে সেদিন রন্ধন করা হয় না।

ফাগুয়া উৎসবের দিন ইহারা একটী কুক্কুটকে ভোজন করাইয়া দেবতার নিকট উৎসর্গ করে। এজন্য কোন পুরোহিত নিযুক্ত করে না। হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলেও ইহাদের কোন হিন্দু দেবদেবীর পূজা করিতে দেখা যায় না। অগ্রহায়ণ মাসে ইহারা পাঁচটী কুক্কুট ও একটী ছাগ বলি দিয়া গ্রাম্যদেবতা দিহের পূজা করে। পৌষ মাসে লৌহের অধিষ্ঠাত্রী লোহাসুরদেবীর পূজা হয়। এই দেবীর কোন মূর্ত্তি বা মন্দির নাই। ইহাদের উৎসবের মধ্যে ফাগুয়া ও হোলিই প্রধান। উভয় উৎসবেই ইহারা পিতৃপুরুষের তর্পণ করে ও মদ্যপান করিয়া থাকে। ইহাদের ভূতের ভয় খুব বেশী। মেয়েরা গায়ে নানারূপ চিহ্ন করিয়া রাখে; তাহাদের ধারণা যে, তাহাতে স্বর্গলাভ ঘটিবে। হস্তী, পুথি, শঙ্খ প্রভৃতির চিহ্নই সবিশেষ প্রচলিত। গবাদি সকল প্রকার মাংসই ইহারা ভক্ষণ করে।

মধ্য গঙ্গা-যমুনার অন্তর্বেদীবাসী অগরিয়াদের সহিত মির্জ্জা-পুরের অগরিয়াদের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহারা নিজেদের চৌহান রাজপুত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। ইহারা বলে যে,

প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে ইহারা মুরাদাবাদ জেলার মণ্ডল নামক স্থান হইতে বুলন্দ্‌শহরে আগমন করিয়াছিল। ইহারা লবণপ্রস্তুতকার্য্যে নিযুক্ত থাকে। বিবাহাদিতে রাজপুতগণের ন্যায় ইহাদের রীতি হইলেও বরকর্ত্তাকে কন্যার মূল্যস্বরূপ কিছু দিতে হয়। ব্যভিচারদোষে স্ত্রী পরিত্যক্ত হইলে সে আবার বিবাহ করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখন কৃষিকর্ম্ম করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

অগরী নামে ডোম জাতির এক পাহাড়ী শাখা দেখা যায়। ইহারাও লৌহের কার্য্য ও খনিতে মজুরের কার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে।

পঞ্জাবেও অগরী নামে একটী জাতি আছে। ইহারা সামাজিক পদে জাঠদিগের নিম্নে হইলেও লোহারগণের উপরে। ইহারা সকলেই হিন্দু।

গোলাঠাকুর বা অগরী নামে পরিচিত আর একটী শঙ্কর জাতিও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে দেখা যায়।

অগর₂—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির রেবাকাম্থার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহার বিস্তার ১৭ বর্গমাইল। অগরের রাজা বরোদার গাইকবাড়কে বাৎসরিক কর দিয়া থাকেন। অগর হইতে বজিরিয়া যাইবার পথে একটী প্রাচীন দুর্গ আছে।

অগর₃—মধ্যভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যান্তর্গত শাজাপুর জেলার একটী নগর। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠে হইতে ১৫৯৮ ফুট উচ্চে উপত্যকায় অবস্থিত। অক্ষা° ২৩°৪৩′৩০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°৪′৪৫″ পূঃ। উজ্জয়িনী হইতে ইহার দূরত্ব ৪১ মাইল। ১৯৩১ সালের গণনায় লোকসংখ্যা ৭৩১৫ ছিল। এখানে একটী প্রস্তরনির্ম্মিত দুর্গ আছে। কাহারও কাহারও মতে, এই নগরের নাম হইতেই 'অগরবাল' নামের উৎপত্তি। [অগরবাল দ্র°] স্থানীয় প্রবাদ, খৃষ্টীয় দশম শতকে অগ্রভীল বা অগরভীল নামক এক ব্যক্তি এই নগর স্থাপন করেন। তাঁহারই নামানুসারে এই নগরের নাম অগর হইয়াছে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে বাপুজী সিন্ধিয়া এই নগর ধ্বংস করেন, কিন্তু ইহার কয়েক বৎসর পরে দৌলৎরাও সিন্ধিয়া এই নগর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

অগর আতর—এক প্রকার গন্ধদ্রব্য অথবা আতর। শ্রীহট্টের অন্তর্গত পাথুরিয়া নামক স্থানের পার্ব্বত্য অধিবাসিগণ পিতাকরা (Aquilaria agallocha) নামক বৃক্ষের নির্য্যাস চোয়াইয়া এই আতর তৈয়ার করে। আরব, তুর্কী প্রভৃতি স্থানে ইহা রপ্তানি হইয়া থাকে।

অগরওয়ালা—[অগরবাল দ্র°]

অগরখেড়—বিজাপুরের অন্তর্গত একটী বৃহৎ গ্রাম। এই গ্রাম ভীমা নদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা প্রায় চারি হাজার। গ্রামের দক্ষিণদিকে শঙ্করলিঙ্গদেবের একটী প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান আছে। সম্ভবতঃ ১৮০০ খৃষ্টাব্দে এই শ্বেতমর্ম্মরময় লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু মন্দিরটী সুপ্রাচীন। পূর্ব্বে এই দেবালয়ে যে বিগ্রহ ছিল, তাহা স্থানান্তরিত হওয়ায়, লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই গ্রামে হেমাদপন্থীদিগের একটী মন্দির আছে। ১১৭২ খৃষ্টাব্দে খোদিত একখানি শিলালিপিও এই মন্দিরগাত্রে সংলগ্ন আছে।

অগরমুন্দে—বেরারের গোন্দজাতির এক ক্ষুদ্র শাখা।

অগরবানি—ভাগলপুর জেলার সুপুল মহকুমার একটী ক্ষুদ্র জাতি। এই জাতীয় লোক অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। ইহারা বলে যে, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ নেপাল হইতে তথায় আগমন করিয়াছিল। ইহারা কাঠ চিরিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে এবং খয়েরগাছের নির্য্যাস সংগ্রহ করিয়া খয়ের প্রস্তুত করে।

অগরবাল—পশ্চিমভারতের বণিক্ (বৈশ্য) সম্প্রদায়ের একটী শাখা। ইহারা ধনী ও ব্যবসায়ী। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, অগরুকাষ্ঠ বিক্রয় করিত বলিয়া ইহাদের নাম অগরবাল হইয়াছে। অন্য একটী কিংবদন্তী হইতে জানা যায়, পুরাকালে একশ্রেণীর বৈশ্যগণ কাশ্মীরস্থ বহুতর অগ্নিহোত্রী পরিবারে অগর বা অগরুকাষ্ঠ প্রদান করিত। মহাবীর আলেক্‌সান্দার ভারতবর্ষ আক্রমণকালে এই সকল অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের যজ্ঞকুণ্ড ধ্বংস করিয়া দেন। তখন বাধ্য হইয়া যজ্ঞকাষ্ঠ-সংগ্রহকারী বৈশ্যগণকে জীবিকানির্ব্বাহার্থ নানা স্থানে যাইতে হইল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই অগ্রবন বা আগ্রার সান্নিধ্যে বাস করিয়াছিল বলিয়া অগরবাল নামে পরিচিত হয়। আবার অনেকের বিশ্বাস, পঞ্জাবের অগ্রোহ নামক প্রাচীন নগরের নাম হইতেই অগরবাল নামের উৎপত্তি। রাজা অগ্রসেন এই স্থানে লক্ষ বৈশ্যপরিবারের বাসোপযোগী স্থান দেন। ইহারাই পরে অগরবাল নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। সাহাবুদ্দীন্ ঘোরী ১১৯৫ খৃষ্টাব্দে অগ্রোহনগর লুণ্ঠন করিলে, অগরবালগণ হিন্দুস্থানের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়ে। এই মতই অনেকটা সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, কারণ যুক্তপ্রদেশের অগরবালমাত্রেই অগ্রোহের সর্পরাজ গুগা পীরের পূজা করিয়া থাকে। আবার অনেকে অনুমান করেন, উজ্জয়িনী হইতে প্রায় ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত 'অগর' নগরের নাম হইতে 'অগরবাল' নামকরণ হইয়াছে। রাজা অগ্রসেন সম্বন্ধেও অনেক প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়।

অগরবালদের মধ্যে ১৭৷৷০টী গোত্র দৃষ্ট হয়। এইরূপ কিংবদন্তী আছে, রাজা অগ্রসেন ১৭টী যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়া পরবর্ত্তী

যজ্ঞে পশুবধকালে বাধা পাইয়াছিলেন বলিয়াই ১৭৷৷০টী গোত্রের মধ্যে অর্দ্ধ গোত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। 'দশ' ও 'বিশ' বলিয়া ইহাদের মধ্যে দুইটী বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। 'বিশ'রা আপনাদিগকে যথার্থ অগরবাল বলিয়া মনে করে এবং 'দশ'দিগের সঙ্গে আহার-বিহার বা বিবাহাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান করে না।

বিহারের অগরবালেরা বলে, তাহাদের মাতৃকুল নাগ-বংশোদ্ভূত। এইজন্য হিন্দুই হউক বা জৈনই হউক, কোন অগরবাল সর্পহত্যা করে না। দিল্লী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী বৈষ্ণব অগরবালরা বাটীর বহির্দ্বারের উভয়পার্শ্বে সর্পমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া রাখে এবং ফল ও ফুল দ্বারা ইহার পূজা করে। জৈন অগরবালরা কোন প্রকার সর্পপূজা করে না। কেহ কেহ বলেন, অগরবালদের সহিত নাগবংশের সম্বন্ধের অর্থ এই যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে নাগবংশ আর্য্যদের সহিত যুদ্ধ করিয়াও নিজদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। আর্য্যগণ নাগকুলের কন্যাদিগকে বিবাহ করিবার জন্য উৎসুক হইতেন। এইরূপ বিবাহজাত পুত্রেরা মাতৃনামে পরিচিত হইত। পরে পিতৃনামে পরিচিত হইবার প্রথা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত হয়। আর্য্যগণ নাগকন্যাদের বিবাহ করিবার সময় বহুল পরিমাণে নাগবংশের আচারব্যবহার গ্রহণ করেন।

অগরবালেরা আস্তিক মুনিকে বিশেষ ভক্তির সহিত পূজা করিয়া থাকে। শ্রাবণ মাসের শুক্লা চতুর্থীতে এই পূজা সম্পন্ন হয়। ইহারা শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে স্বগোত্র বা পিতৃমাতৃকুলে বিবাহ করে না। জন্মের ৪০ দিন পরে ইহাদের মধ্যে প্রসূতি শুচিসম্পন্না হয়। বিবাহ সম্বন্ধে ইহাদের কোন বিশেষ নিয়ম নাই। যাহারা ধনী, তাহারা অতি শিশুকালেই কন্যার বিবাহ দিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, তাহারা কন্যা প্রাপ্তবয়স্কা হওয়া পর্য্যন্তও অবিবাহিতা রাখে। ইহাদের মধ্যে কন্যার পণ নাই। বিবাহপ্রথা উচ্চ হিন্দুগণের অনুরূপ। তবে ইহাদের বিবাহ স্থির হইয়া গেলে ভাবী পুত্রবধূর সহিত শাশুড়ীর প্রথম সাক্ষাৎ কোন মন্দিরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। বহুবিবাহ ইহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ, কিন্তু প্রথম পত্নী বন্ধ্যা হইলে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবার বিধি আছে। নতুবা অন্য কোন কারণে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিলে ইহারা সমাজচ্যুত হয়।

অধিকাংশ অগরবালই বৈষ্ণব, তবে ইহাদের মধ্যে জৈন বা সরাওগীর সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই দিগম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে শৈব ও শাক্ত খুব কম আছে—কিন্তু তাহাদের মধ্যে বলিদানপ্রথা প্রচলিত নাই বা তাহারা মদ্যমাংস ব্যবহার করে না। অগরবালদের মধ্যে বর ও কন্যা বিভিন্ন ধর্ম্মের হইলেও বিবাহে কোন বাধা নাই। ইহারা লক্ষ্মী-দেবীরও পূজা করে। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণই সাধারণতঃ ইহাদের পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। বৃক্ষের মধ্যে ইহারা অশ্বত্থ, কদম্ব ও বাবুল বৃক্ষকে ভক্তি করিয়া থাকে। পছৈনিয়া অগরবালদের সকলেই এবং পুরবীয়া অগরবালদের অধিকাংশ লোকই উপবীত ধারণ করে এবং ক্রমশঃ উভয় সমাজের মধ্যে আদান-প্রদানও চলিতেছে। বিহারে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের নিম্নে ইহাদের স্থান। ইহারা সকলেই নিরামিষভোজী। ব্রাহ্মণগণ ইহাদের হাতে জল ও মিষ্টান্ন গ্রহণ করিতে আপত্তি করেন না। প্রাণিহত্যা ভয়ে জৈন অগরবালেরা সন্ধ্যার পরে আর কিছু আহার করে না। এই জাতির পুরোহিতগণ তাহাদের যজমানের সহিত এক হুঁকায় তামাক সেবন করে।

অগরবালগণের মধ্যে অনেকে বলিয়া থাকে যে, তাহারা আর্য্যবৈশ্যগণের বংশধর। বৈশ্যরাজ ধনপাল তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ। শুনা যায়, সম্রাট্ অক্‌বরের মন্ত্রী মধুশাহ্ জাতিতে অগরবাল ছিলেন। অক্‌বর শাহের সময়ের মুদ্রার উপরে তাঁহার নাম আজিও অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মধ্যে অধিকাংশ ব্যবসায়কার্য্য অগরবালেরাই করিয়া থাকে। ইহারাই ব্যাঙ্কার, মহাজন ও জমীদার। ব্যবসা করিয়াই ইহারা জমিদারী করিয়াছে। ইহাদের মেয়েরা অতি সুন্দর মিষ্টান্ন তৈয়ারী করিতে পারে।

অগরা—[অগরী$_2$ দ্র°]

অগরাব—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কোলাবা জেলার একটী গ্রাম। এই গ্রামের একটী প্রাচীন মস্‌জিদগাত্রে একখানি খোদিত লিপি আছে। তদ্ভিন্ন বহু পুরাতন বৃহৎ স্নানাগারের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান।

অগরিয়া$_2$—ছোটনাগপুরের অসুরদিগের এক শাখা। পোষা বানরের নাচ দেখাইয়া ইহারা ভিক্ষা করে ও দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়।

অগরিয়া$_3$—রাঠোর রাজপুতদিগের মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী বংশ-ধরগণ। প্রবাদ, আগ্রা হইতে ইহাদের এই নাম হইয়াছে। কচ্ছ প্রদেশের ভুবর, মথোড়া, খোখরা এবং মাণ্ডরীতে ইহাদিগকে দেখা যায়। ইহারা কৃষিজীবী।

অগরী$_2$—[বৈদ্যক] বিষহীন বৃক্ষ। ২ দেবতাড় বৃক্ষ (Andropogan Serratus) [দেবতাড় দ্র°]; মূষিকবিষহারী।

অগরু—[বৈদ্যক] স্বনামখ্যাত সুগন্ধিকাঠবিশেষ; অগরু

চন্দন (Aquilaria Agallocha)। হিন্দী—অগর; তেলেগু—হরুগুহু চেট্টু; মরাঠী—শিশবাচে ঝাড়; কৃষ্ণাগুরু; গুজরাতী—অগরঃ; ইংরেজী—Aloe or Eagle-wood। পর্য্যায়—জোঙ্গক, সুগন্ধিকাষ্ঠ, প্রবর, লৌহ, রাজার্হ, অনার্য্যজ, যোঙ্গজ, অনার্য্যক, বংশিক, ক্রিমিজ, ক্রিমিজগ্ধ, ধূমাই।

অগরু বা অগুরু চন্দন দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, শিলায় ঘসিলে সুন্দর পীতবর্ণ হয়। অগরু কাষ্ঠ এক প্রকার নয়। ইহা সাধারণতঃ পাঁচপ্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়—কৃষ্ণাগরু, কাষ্ঠাগরু, দাহাগরু, মঙ্গল্যাগরু ও স্বাদু-অগরু। ইহাদের মধ্যে দাহাগরু গুর্জ্জরে জন্মে। মঙ্গল্যাগরু শ্রীহট্টে হয় ও ইহার অন্য নাম 'কেদারে'। [কেদারে দ্র°] কৃষ্ণাগরুর পরীক্ষা—ইহা জলে দিবামাত্র লৌহসম ডুবিয়া যায়।

শ্রীহট্ট, দাক্ষিণাত্য, আসাম প্রভৃতি স্থানে নানাপ্রকার বৃক্ষ আছে। ঐ সকল বৃক্ষের কাষ্ঠ সুগন্ধি এবং দেখিতে অগরুর মত। বাজারে প্রকৃত অগরু নির্ব্বাচন করা কঠিন। ইহার বৃক্ষ বৃহদাকার। উচ্চতায় প্রায় ৬০ হইতে ১০০ হাত পর্য্যন্ত এবং ইহার গুঁড়ির বেড় প্রায় ৭।৮ হাত হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট অগরু সিলেটের (শ্রীহট্টের) পাহাড়ে জন্মে। ইহাকে স্থানীয় অধিবাসীরা 'ঘরকি' বলে। ভোটদেশের হিমালয়ে ও আসাম প্রদেশের পাহাড়ে অগুরু নামক দীর্ঘতরু জন্মে। এই তরুর কাষ্ঠ প্রায়ই আপীত (এই হেতু 'অগুরু চন্দন'ও বলে), লঘু এবং গন্ধহীন; কিন্তু কালক্রমে এই তরুর কাণ্ডে কৃষ্ণবর্ণ সুগন্ধ নির্য্যাস জন্মে, তাহাতে কাষ্ঠাগরু ভারী হয় (এই হেতু সংস্কৃত নাম 'কালীয়ক', 'কালানুসার্য্য')। [কালীয়ক ও কালানুসার্য্য দ্র°]

পুরাতন বৃক্ষ হইতে গুগ্‌গুলের মত এক প্রকার নির্য্যাস নির্গত হয়। গাছের বয়স ২০ বৎসর হইলে তাহা নির্য্যাস বাহির করিবার উপযোগী হয়। সতেজ গাছে তদ্রূপ আঠা পাওয়া যায় না। পূর্ণবয়স্ক অগরুবৃক্ষ হইতে প্রায় চারি সের পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট নির্য্যাস পাওয়া যায় এবং উহার প্রতি সের প্রায় তিন শত টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়। গুগ্‌গুল দগ্ধ করিলে যে প্রকার সদ্‌গন্ধ বাহির হয়, অগরুর নির্য্যাসেও ঠিক সেইরূপ সৌরভ আছে। ধূপদানে পোড়াইলে অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইয়া উঠে। পূর্ব্বকালে আরব, পারস্য ও গ্রীস প্রভৃতি দেশে এখানকার অগরু কাষ্ঠ ও অগরু নির্য্যাস বড় আদরের ছিল। ভারতবর্ষে দেবার্চ্চনার সময় চন্দনের সঙ্গে অগরু কাষ্ঠ ও অগরু-রস অনেকেই ব্যবহার করেন। তদ্ভিন্ন, পূর্ব্বকালের লোকেরা আতর গোলাপ ল্যাভেণ্ডার চিনিতেন না। তখন জননীরা বালকবালিকার ললাট অগরুর অলকাবলী দিয়া সাজাইতেন। বাসরসজ্জায় অভিসারিকা কামিনীরা অগরু দিয়া মুখের শোভাবর্দ্ধন করিতেন।

পূর্ব্বকালে অগরু কাষ্ঠ চোয়াইয়া 'চুয়া' করা হইত। আইন্-ই-অক্‌বরীতে ইহার উল্লেখ আছে। আজকাল অগরু চোয়াইয়া 'অগরু আতর' হইতেছে। এতদ্ভিন্ন ইহা হইতে অগরুধূপ ও অন্যান্য নানাপ্রকার জিনিষও হইয়া থাকে। প্রাচীন ভারতের নায়িকারা নায়কের মনোরঞ্জনার্থ কেশের সহিত অগরুধূপ বাঁধিতেন। বিহ্লনকৃত বিক্রমাঙ্কদেবচরিতের "কুর্য্যাদনার্দ্রেষু কিমঙ্গনানাং কেশেষু কৃষ্ণাগরুধূপবাসঃ" এই শ্লোকার্দ্ধ হইতে আমরা তাহার আভাস পাইতেছি। আসামে অগরুর ছাল 'আগ্রা ছাল' [আগ্রা ছাল দ্র°] নামে বহুকাল ভূর্জপত্রের স্থানে কাগজ স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কোচীন-চীন দেশেও অগরুর ত্বক্ হইতে এক প্রকার স্থূল কাগজ প্রস্তুত হয়।

অগরু কাষ্ঠ হইতে চন্দন তৈলের মত সুগন্ধি তৈল বাহির করা যায়। মেহরোগ ও উদরাধ্মানে ঐ তৈল মহোপকারী। কাষ্ঠের ফাণ্ট জ্বররোগে প্রয়োগ করিলে পিপাসা ও হিক্কা নিবারণ হয়। মাথাঘোরা ও পক্ষাঘাত পীড়ায় ঐ ফাণ্ট সেবন করিলে কিয়ৎপরিমাণে উপকার দর্শে। বৈদ্যকগ্রন্থে অগরুর এই কয়েকটী গুণ লিখিত হইয়াছে—তিক্ত, উষ্ণ, কটু; লেপনে রূক্ষ। এতদ্দ্বারা কফ, বায়ু, বাস্তি, মুখরোগ, ব্রণ এবং কর্ণ ও চক্ষের পীড়া প্রশমিত হয়। অগরুনির্য্যাসের গুণ কাষ্ঠের তুল্য। ঐ নির্য্যাস হইতে এক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হয়। তদ্দ্বারা দুষ্টব্রণ, গ্রন্থিবাত, দুষ্টরক্ত প্রভৃতি রোগ উপশমিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারীরা বলেন, সৎপথ্যাশী হইয়া ঐ ঔষধ এক বৎসর সেবন করিলে শরীরে কোন প্রকার ক্ষত জন্মে না। [উহার বিবরণ গুগ্‌গুল শব্দে দ্র°]

কেহ কেহ মনে করেন, অগরুর সংস্কৃত নাম 'লোহ' এবং 'লঘু' হইতে ইংরেজী Aloe নামের উৎপত্তি। মার্কোপোলো, গার্সিয়া ডি ওর্টা, বারথেমা, বারবোসা, লিন্‌স্কোটেন হার্ব্বার্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য মনীষীরা এই অগরু বৃক্ষের (Eagle or colambac-wood) উল্লেখ করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত কয়েক জাতীয় বৃক্ষের কাষ্ঠে অগরুর মত গন্ধ আছে। আকুইলেরিয়া ওভেটা (Aquilaria ovata); এক্‌স্‌কিকেরিয়া আগেলোকা (Axcœcaria agallocha); আলোক্‌সিলোন আগেলোকা (Alœxylon agalloca)।

অগরু, (অবরু)—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির ভিজাগাপত্তন ও গঞ্জাম জেলার এক তেলেগু জাতি। ইহারা প্রধানতঃ কৃষিজীবী ও নানাপ্রকার তরিতরকারী এবং পান উৎপন্ন

উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহাদের ভাষায় অগরু অর্থে পান। ইহারা স্ত্রীপুরুষে কৃষিকার্য্য করে। ইহাদের ভাষায় বহুতর উড়িয়া শব্দ পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের বিবাহের সময় উড়িয়া ব্রাহ্মণগণই পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। ইহারা মৃত ব্যক্তিকে দাহ করে।

অগর্ভ—গর্ভশূন্য। পূজাদির অর্ঘ্য দানপ্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, সগর্ভা দূর্ব্বা দ্বারা অর্ঘ্য দিবে না। অর্ঘ্যে অগর্ভা দূর্ব্বাই প্রশস্ত। সুতরাং দূর্ব্বার গর্ভমধ্যে যে অঙ্কুর থাকে, তাহা ফেলিয়া দিয়া সেই দূর্ব্বা দ্বারা অর্ঘ্য দিতে হইবে।

অগলপ্পুলৈ—তামিল দেশের একটী নদী। ইহারই তীরে প্রাচীনকালে তণ্ডীনগর অবস্থিত ছিল।

অগলসোই—ভারত-সীমান্তবাসী এক প্রাচীন জাতি। গ্রীক্‌বীর আলেক্‌সান্দার ভারত অভিযানে আসিলে ইহারা ৪০ হাজার পদাতি ও ৩ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। যুদ্ধে ইহাদের বহু লোক নিহত হয় এবং অসংখ্য লোক গ্রীক্‌সেনার হস্তে বন্দী হইয়া ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইয়াছিল।

অগলেগ—ভারতমহাসাগরের এক ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ। অক্ষা° ১০°৩০′ দঃ এবং দ্রাঘি° ৫৭°৩০′ পূঃ।

অগবান্‌পুর-মুগলপুর—উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মুরাদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র নগর।

অগবোন—[অগ্‌ওয়ন দ্র°]

অগশালা—[অক্ষশালা দ্র°]

অগষ্ট্ (August)—(আগষ্ট্) ইংরেজী অষ্টম মাস, পূর্ব্বতন জুলিয়ান্ রোমান্ বর্ষের ৬ষ্ঠ মাস। পূর্ব্বে সেক্সটিলিস্ (Sextilis) নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী কুইন্টিলিস্ মাস জুলিয়াস্ সীজারের নামানুসারে 'জুলাই' নামে প্রচলিত হয়। সেইরূপ সম্রাট্ অগষ্টাস্ এই মাসেই সর্ব্বোচ্চ সম্মান, যুদ্ধে জয়লাভ, সমস্ত রোমকসৈন্যের আনুগত্য স্বীকার, অন্তর্বিদ্রোহ দমন ও মিশর লাভ করেন। বলিতে কি এই মাসে তাঁহার সকল দিকে সৌভাগ্যোন্নতি হইয়াছিল বলিয়া তিনি নিজ নামানুসারে 'অগষ্ট্' নাম ঘোষিত করেন। পূর্ব্বে এই মাস ৩০ দিনে গণিত হইত। কিন্তু জুলাই মাসের ৩১ দিন নির্দ্দিষ্ট থাকায়, তিনি ৩১ দিনে অগষ্ট্ মাস নির্দ্ধারণ ও ইহার প্রাধান্য ঘোষণা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা শ্রাবণমাসের মধ্যভাগ হইতে ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত এই মাসের স্থিতিকাল।

অগষ্টাস্১—রোমের সম্রাট্‌গণের উপাধি। এই উপাধি সর্ব্বপ্রথমে গেয়াস্ জুলিয়াস্ সীজার অক্টেবিয়ানাস্‌কে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইনি পূর্ব্বে গেয়াস্ অক্টেবিয়াস্ নামে পরিচিত ছিলেন। ২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে রোমের সেনেটের ব্যবস্থা অনুসারে ও জনসাধারণের সম্মতিক্রমে অক্টেবিয়ানাস্ এই উপাধি গ্রহণ করেন। অগষ্টাস্ শব্দের মূল অর্থে পূতাত্মা পূজার্হ ব্যক্তিকে বুঝাইত। এই উপাধির সহিত কোন বিশেষ উচ্চ পদের সংস্রব ছিল না। অক্টেবিয়াসের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই ইহা প্রদত্ত হইয়াছিল। তথাপি তাঁহার পরবর্ত্তী প্রত্যেক সম্রাট্ই এই উপাধি ধারণ করিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। পরবর্ত্তী যুগের যে সকল রোমক সম্রাটের সহিত অক্টেবিয়াসের কোনরূপ রক্তের সম্বন্ধ ছিল না, তাঁহারাও অবলীলাক্রমে এই উচ্চ উপাধি গ্রহণ করিতেন। কিন্তু এই উপাধি গ্রহণের পূর্ব্বে সম্রাট্ একবার সেনেটের অনুমতি লইতেন। সুতরাং যথেচ্ছাচারতন্ত্রের যুগে সম্রাটেরা স্বীকার করিতেন যে, সেনেট্ই এই উপাধি দিবার অধিকারী।

ডোমিসিয়ানের সময় হইতে রীতি হয় যে, সম্রাটের উপাধি Imperator Cæsaras prænomina শব্দের দ্বারা আরম্ভ করিয়া Augustus শব্দের দ্বারা শেষ করিতে হইবে। ডাওক্লিসিয়ানের সময় যখন যুগপৎ চারিজন সম্রাট্ রাজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে উপাধিরও ভাগ বাটোয়ারা হইয়া গেল। মুখ্য সম্রাট্ দুইজন অগষ্টাস্ উপাধি লইলেন, আর গৌণ সম্রাট্‌দ্বয় সীজার উপাধি ধারণ করিলেন। রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পরও এই উপাধিটী বর্ত্তমান ছিল। মধ্যযুগে Holy Roman Empire নামক জর্ম্মন্ রাজ্যের সম্রাটেরা Semper Augustus উপাধি ব্যবহার করিতেন।

[History of Rome—Mommsen ; Mythology—Preller ; Dictionary of Greek and Roman Antiquities—Wm. Smith & Wm. Waste]

অগষ্টাস্২—একজন রোমক সম্রাট্। ইনি খৃষ্টপূর্ব্ব ৬৩ অব্দে ২৩এ সেপ্টেম্বর রোম নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা অক্টেবিয়াস্ সম্ভ্রান্তবংশের ব্যক্তি ছিলেন বটে, কিন্তু রাষ্ট্রে তাঁহার বেশী কিছু প্রভাব ছিল না। তাঁহার মাতা আটিয়া ছিলেন জুলিয়াস্ সীজারের ভগিনী জুলিয়ার কন্যা। জুলিয়াস সীজারের সহিত এইরূপ নিকট সম্বন্ধ ছিল বলিয়াই অগষ্টাস সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সম্রাট্ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার নাম ছিল গেয়াস্ অক্টেবিয়াস্। গেয়াসের বয়স যখন পাঁচ বৎসর মাত্র তখন তাঁহার পিতৃ-

বিয়োগ হয় ও মাতা পুনরায় বিবাহ করেন। তিনি তখন সেই মাতার ভর্ত্তার অধীনে বাস করিতে থাকেন।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৫ অব্দে অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে অগষ্টাস্ সেনেট-মহাসভার নিকট হইতে অভিজাতপদবী লাভ করেন ও সীজারের একজন অশ্বাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হন। এই বৎসরেই যখন তিনি ইলিরিয়ার অন্তর্গত আপোলেনিয়া নগরে লেখাপড়া করিতেছিলেন, তখন খবর পাইলেন যে, সীজার নিহত হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়াই তিনি ইতালীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেখানে আসিয়া জানিতে পারিলেন যে, সীজার তাঁহাকে স্বীয় জুলিয়ান্ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া গিয়াছেন। এই উত্তরাধিকার গ্রহণ করার ফলে তাঁহার নাম হইল গেয়াস্ জুলিয়াস্ সীজার অক্টেবিয়ানাস্।

সেই সময়ে রোমের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিতেছিলেন মার্ক আণ্টনি, ব্রুটাস্, কাসিয়াস্, সিসিরো ও লিপিডাস্। জুলিয়াস্ সীজারের হত্যার পর ইঁহাদের প্রায় প্রত্যেকেই রোমের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। অল্পবয়স্ক অগষ্টাস্ যে আবার তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে অবতীর্ণ হইতে পারেন, একথা কেহই ভাবেন নাই। রোমের বহু সৈন্য কিন্তু অগষ্টাস্‌কেই নিজেদের প্রভু বলিয়া মানিয়া লইল। ৪৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে সেনেট-মহাসভা যখন আণ্টনিয়াস্‌কে দমন কবিবার জন্য সৈন্য পাঠাইলেন, তখন অগষ্টাস্ তাহার নায়করূপে আণ্টনিয়াস্‌কে মুটিনার যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। অগষ্টাসের জয়যাত্রার এই স্ত্রপাত হইল।

অতঃপর সৈন্যদলের সাহায্যে অগষ্টাস্ এক বৎসরের জন্য রোমের কন্সাল বা প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইলেন। এই পদ লাভ করিয়া তিনি আণ্টনিয়াস্ ও লিপিডাসের সহিত সন্ধি করিয়া তাঁহাদিগকে স্বপক্ষে আনিলেন। রাষ্ট্রের নানারূপ বিশৃঙ্খলতা দূর করিবেন আশ্বাস দিয়া তিনজনে মিলিয়া পাঁচ বৎসরের জন্য রাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসিলেন। সাধারণতন্ত্রের অধীন পশ্চিমস্থ প্রদেশগুলি তাঁহারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলেন, আর পূর্ব্বদেশের শাসনভার ব্রুটাস্ ও কাসিয়াস্‌কে দিলেন। এই তিন শাসনকর্ত্তা তিনশত জন সেনেটের সভ্য ও দুই হাজার অভিজাত-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করাইয়া নিজেদের ক্ষমতাপ্রসারের উপায় করিয়া লইলেন। অদ্বিতীয় বক্তা সিসিরো আণ্টনিয়াসের প্ররোচনায় নিহত হইলেন। এই সব ব্যাপার দেখিয়া সাধারণতন্ত্রবাদী অন্যান্য ব্যক্তিরা পলায়ন করিলেন। সাধারণতন্ত্রদলের নেতা ব্রুটাস্, কাসিয়াস্ ও সেক্সটাস্ পম্পিয়াস্ তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিলেন। শাসনকর্ত্তৃত্রয় কিন্তু সাধারণতন্ত্রবাদীদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। অগষ্টাস্ ও আণ্টনিয়াস্ ৪২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ইহাদিগকে দমন করিতে উদ্‌যোগী হইলেন। ফিলিপ্পির সুপ্রসিদ্ধ যুদ্ধে ব্রুটাস্ ও কাসিয়াস্ পরাজিত ও নিহত হন। ফিলিপ্পির যুদ্ধক্ষেত্রে সাধারণতন্ত্রের সূর্য্য অস্তমিত হইল!

এই যুদ্ধের পর বিজয়ী বীরদ্বয়ের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া উঠিল। কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁহারা বিবাদ মিটাইয়া ফেলিলেন। আণ্টনিয়াস্ অগষ্টাসের ভগিনী অক্টেবিয়াকে বিবাহ করিয়া রোমের অধীন প্রাচ্য দেশসমূহের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। পশ্চিমভাগের উপর অগষ্টাস্ কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। লিপিডাস্‌কে কেবলমাত্র আফ্রিকা প্রদেশ দেওয়া হইল। এদিকে কিন্তু সেক্সটাস্ পম্পিয়াস্ সমুদ্রের উপর এরূপ ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন যে, রোমে শস্যের আমদানি তিনি বন্ধ করিয়া দিলেন। অগষ্টাস্ তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া তাঁহাকে ভূমধ্যসাগর হইতে এশিয়ায় বিতাড়িত করিলেন। তথায় কিছুদিন পরে পম্পিয়াস্ মৃত্যুমুখে পতিত হন। এইরূপে অগষ্টাসের আর এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী অপসারিত হইল। এখন বাকী রহিলেন লিপিডাস্ ও আণ্টনিয়াস্। লিপিডাস্ দুর্ব্বল-প্রকৃতির লোক ছিলেন বলিয়া কেহ তাঁহাকে গ্রাহের মধ্যে আনিত না। সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব পাইবার জন্য এখন অগষ্টাস্ ও আণ্টনিয়াসের মধ্যে বিবাদ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

ইহার পর পাঁচবৎসরকাল অগষ্টাস্ নিজের শাসনাধীন পশ্চিম দেশগুলিতে শান্তি ও শৃঙ্খলাস্থাপনে ব্যয় করিলেন। তিনি দস্যুদমন করিয়া, সীমান্ত প্রদেশগুলি পাহাড়িয়া জাতির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়া এবং রোমে অনেক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া রোমকদিগের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আকর্ষণ করিলেন। এদিকে আণ্টনিয়াস্ মিশরের রাণী সুন্দরীকুল-শিরোমণি ক্লিওপেট্রার সহিত প্রেমলীলা করিয়া ঐ সময় অপব্যয় করিতে লাগিলেন। ক্লিওপেট্রার কুহকে পড়িয়া তিনি অগষ্টাসের ভগিনী অক্টেবিয়ার সহিত বিবাহবন্ধন ছেদন করিলেন। তিনি ও ক্লিওপেট্রা প্রাচ্যদেশে এক স্বাধীন সাম্রাজ্য স্থাপন করিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছিলেন। এই সকল কথা শুনিয়া একদিকে রোমকগণ যেমন তাঁহার প্রতি বিরক্ত ও বীতশ্রদ্ধ হইল, অন্যদিকে অগষ্টাস্ তেমনি নিজের একাধিপত্য স্থাপনের সুযোগ পাইলেন। তিনি ক্লিওপেট্রার

বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এই যুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—আণ্টনিয়াসের রাজনৈতিক প্রভাব খর্ব্ব করা, কিন্তু ভগিনীর অপমানের প্রতিশোধ লওয়াও অগষ্টাসের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩১ অব্দে অক্টিয়ামের জগৎপ্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে অগষ্টাস্ আণ্টনিয়াসের রণতরীসমূহ নষ্ট ও সৈন্যদলকে পরাজিত করিলেন। ইহার পরবৎসর (৩০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) তিনি আলেক্‌সান্দ্রিয়া নগর অধিকার করিয়া লইলেন; হতভাগ্য আণ্টনিয়াস্ ও রাণী ক্লিওপেট্রা আত্মহত্যা করিয়া পরাজয়ের ভীষণ অপমান হইতে মুক্তি-লাভ করিলেন। ২৯ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের গ্রীষ্মকালে অগষ্টাস্ ইতালীতে ফিরিয়া আসিলেন। রোমকগণ তাঁহাকে বিপুল সম্মান দেখাইয়া অভ্যর্থনা করিল—এ সম্মান কেবলমাত্র বিজয়ী বীরের প্রতি নহে, পরন্তু রোমের শক্তির বিরুদ্ধে যাহারা দাঁড়াইতে স্পর্দ্ধা করিয়াছিল, তাহাদের বিধ্বংসকারীর প্রতি—সাধারণতন্ত্রের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তার প্রতি। অগষ্টাস্ এখন রোমে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিন লক্ষ সৈন্য তাঁহার অধীনে; মিশরের তিনি বিজেতা; দেবতার ন্যায় তিনি প্রাচ্য প্রজাবৃন্দের পূজিত।

জুলিয়াস্ সীজার যেমন প্রকাশ্যেই সাধারণতন্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন, অগষ্টাস্ সেরূপ হঠকারিতা করিলেন না। তিনি সমস্ত ক্ষমতা ভোগ করিবেন, অথচ সাধারণ-তন্ত্রের অনুরূপ শাসনপ্রথা নামে বজায় রাখিবেন স্থির করিলেন। ২৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে তিনি ও বিশ্বস্ত সেনাপতি আগ্রিপা কন্‌সালরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। কন্‌সাল ইচ্ছা করিলে সেনেট হইতে অযোগ্য ব্যক্তিকে অপসারণ করিতে পারিতেন। এই ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া তিনি সেনেটের প্রায় দুইশত সভ্যকে বিদূরিত করিলেন এবং নিজের নাম উহার সভ্যগণের তালিকার প্রথমে স্থাপন করিয়া Princeps Senatus বা 'সেনেটের প্রধান সভ্য' উপাধি গ্রহণ করিলেন। ২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে, তিনি যে সকল অতিরিক্ত ক্ষমতার ব্যবহার করিতেছিলেন, তাহা পরিহার করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, তিনি সাধারণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ দিনই সাধারণতন্ত্রের অবসান হইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইল। রোমে প্রতিবৎসর কয়েকজন করিয়া বিভিন্ন উপাধিধারী শাসনকর্ত্তা বিভিন্ন প্রকারের কাজ করিবার জন্য নির্ব্বাচিত হইতেন। কদাচিৎ একই ব্যক্তি দুই তিনটী পদ প্রাপ্ত হইতেন। অগষ্টাস্ ঐ সকল পদ নিজে গ্রহণ করিয়া রাজ্যের একচ্ছত্র প্রভু হইয়া বসিলেন। রোমের অধীন প্রদেশসমূহ নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী পরিবার দ্বারাই অনেকদিন ধরিয়া শাসিত হইয়া আসিতেছিল। সাধারণতঃ এক ব্যক্তি একটী প্রদেশেরই শাসনভার পাইত। এখন অগষ্টাস্ দুইটী ব্যতীত সকল প্রদেশেরই শাসনকর্ত্তা হইলেন। ইহার পূর্ব্বেই ৩৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে অগষ্টাস্ Tribunicia potestas পদ পাইয়াছিলেন। ঐ পদস্থ ব্যক্তির দেহকে অত্যন্ত পবিত্র ও অধর্ষণীয় বলিয়া মনে করা হইত এবং তিনি ইচ্ছা করিলে আইনের সকল প্রস্তাব নাকচ করিয়া দিতে পারিতেন। অগষ্টাস্ রাজা, মহারাজ বা সম্রাট্ পদবী কখনও গ্রহণ করেন নাই। তিনি 'Imperator' শব্দ নামের সহিত ব্যবহার করিতেন বটে, কিন্তু উহা তাঁহার নামেরই একাংশ ছিল। ২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে সেনেট তাঁহাকে অগষ্টাস্ উপাধি প্রদান করেন। অগষ্টাস্ রোমে সাধারণতন্ত্র নামেমাত্র বজায় রাখিলেও কার্য্যতঃ একাধিপত্য স্থাপন করেন। এজন্য তাঁহাকে রোমের প্রথম সম্রাট্‌রূপে পরিগণিত করা হয়। তিনি প্রতিবৎসর নিজে কন্‌সাল পদ গ্রহণ করিতেন। প্রথমে প্রতি পাঁচবৎসর, পরে দশ বৎসর পর পর দূর প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃরূপে নিজেকে নির্ব্বাচিত করাইয়া লইতেন এবং সমস্ত সৈন্য, রণতরী প্রভৃতির কর্ত্তৃত্বও নিজের হাতে রাখিতেন।

২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে ১৯ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত কতিপয় বৎসর তিনি প্রদেশগুলিতে সুশাসন স্থাপন করিতে ব্যস্ত ছিলেন। এই কয়বৎসর মধ্যে তিনি উত্তর স্পেনে বিদ্রোহী জাতি-দিগকে দমন ও প্রাচ্য প্রদেশসমূহে রোমক-শাসন সুদৃঢ় করেন।

খৃষ্টপূর্ব্ব ২০ অব্দে ভারতীয় কোন নৃপতি অগষ্টাসের সভায় এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কুষাণরাজ প্রথম কাদ্‌ফিস্ তাঁহার কয়েকটী মুদ্রায় অগষ্টাসের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ মহাপরাক্রান্ত রোমক সম্রাটের প্রতিনিধি বলিয়া পরিচিত হওয়া কুষাণ নৃপতিগণ গৌরবজনক মনে করিতেন। গ্রীক্ নাবিকগণ ভারতের উপকূলে বাণিজ্য করিতে আসিয়া মুজিরেসে (?) অগষ্টাসের প্রতিমাসমন্বিত এক মন্দির দর্শন করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ১৪ অব্দে ২৯এ অগষ্ট্ তারিখে এই পরাক্রান্ত রোমক-সম্রাট্ ৭৬ বৎসর বয়সে নোলা নামক স্থানে দেহত্যাগ করেন। পুত্র অভাবে ইনি ইঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রী লিবিয়ার পূর্ব্বপতির ঔরসজাত পুত্র টাইবিরিয়স্‌কে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন।

অগষ্টিন্, সেণ্ট্—একজন খৃষ্টান্ সাধু (৩৫৪-৪৩০ খৃষ্টাব্দ)। খৃষ্টীয় জগতে যে চারিজন মহাপুরুষকে লাটিন চার্চ্চের পিতা নামে

অভিহিত করা হয়, অগষ্টিন্ তাঁহাদের অন্যতম। ইঁহার ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তি খৃষ্টীয় ধর্ম্মজগতে অতি অল্পই জন্মিয়াছে। মার্টিন লুথার যখন ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তখন ইঁহারই মত উদ্ধার করিয়া নিজমত সমর্থন করিয়াছিলেন। আবার ক্যাথলিকগণও প্রোটেষ্টাণ্টবাদকে খণ্ডন করেন—ইঁহারই গ্রন্থের সাহায্যে।

ইনি ৩৫৪ খৃষ্টাব্দে ১৩ই নবেম্বর টাগষ্টি নগরে পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী পিতার ঔরসে ও খৃষ্টান্ মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কিশোরকালেই অগষ্টিন্ একটী বালিকার প্রণয়ে পড়েন ও তাঁহার ঔরসে একটী পুত্র হয়। চরিত্রে একটু উচ্ছৃঙ্খলতা থাকিলেও ইনি অধ্যয়নে অতি নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন।

উনবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালেই অগষ্টিন্ লাটিন এবং গ্রীক্ ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন। ইনি যথাক্রমে টাগষ্টি, কার্থেজ এবং রোম নগরীতে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। প্রথমে ইনি জরথুষ্ট্রীয় ও খৃষ্টীয়তত্ত্ববাদের (Christian-gnostices) সম্মিলনে উৎপন্ন মানিকীবাদ (Manichæism) নামক এক মিশ্র মতের দ্বারা আকৃষ্ট হন; কিন্তু এই মতে ইঁহার বেশীদিন আস্থা ছিল না। পরে মিলান নগরের অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তথায় বক্তৃরূপে গমন করেন। সেখানে ইনি নিউ একাডেমীর প্রভাবে পড়িয়া সন্দেহবাদী হইয়া উঠেন। তখন পারমার্থিক সত্যলাভের জন্য ইঁহার মন ক্রমশঃ ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। ইনি জ্ঞানালোচনায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করিলেন। তৎপরে নিওপ্লেটোনিকবাদ অধ্যয়ন করিয়া ইনি নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে তীক্ষ্ণ করিয়া লন। ভগবান্ যে এক, অবিকারী এবং সমস্ত কার্য্যের কারণস্বরূপ, এই সত্য ইঁহার চিত্তে প্রতিভাত হয়। এই সময় মিলানের বিশপ মহাত্মা আম্ব্রোসের ত্যাগ-স্বীকার ও সাধুতা দর্শন করিয়া এবং তাঁহার উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা শুনিয়া ইনি এক নূতন জগতের সন্ধান পাইলেন।

জীবনে সংযম ও পবিত্রতার প্রয়োজন—এই সত্য এ সময়ে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেও, নিজের নিকট নিজে পরাজয় স্বীকার করিয়া আবার অন্য একটী রমণীর প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। এমন সময় পন্টিসিয়ান নামক জনৈক খৃষ্টান্ বন্ধু ইঁহার নিকটে দুইটী যুবকের সংসারত্যাগের কাহিনী এমনভাবে বর্ণনা করিলেন যে, ইনি পুনরায় বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার Confession বা 'স্বীকারোক্তি' নামক উপাদেয় আত্মজীবনীতে এই বিষয়ে একটী সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। ইনি ঘর হইতে বাহিরে গিয়া গাছের তলায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন; তখন মনে হইল কে যেন আদেশ করিতেছে "যাও পড়, যাও পড়।' এই প্রত্যাদেশ শুনিয়া ইনি উঠিয়া গিয়া 'রোমকগণের নিকট পত্র' (Epistle to the Romans) নামক বাইবেলের অংশ হইতে পড়িলেন যে, 'ত্যাগের দ্বারা ভগবান্‌কে পাওয়া যাইতে পারে, ভোগের দ্বারা নহে'। ইহার পর তিনি খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন (৩৮৬ খৃষ্টাব্দে)। পরে তিনি হিপো নগরীর বিশপপদে অধিষ্ঠিত হন।

অগষ্টিনের সমগ্র জীবনই সংগ্রামে পরিপূর্ণ। প্রথমাংশে নিজের বাসনার সহিত সংগ্রাম, আর শেষাংশে বিরুদ্ধ মতবাদের সহিত সংগ্রাম। ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া একে একে মানিকীবাদ, ডোনাটিষ্টগণের মত ও পেলাগিয়াসের মত খণ্ডন করেন। এই সমস্ত মতবাদ খণ্ডন করিয়া অগষ্টিন্ খৃষ্টীয়বাদের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। ইঁহার বিচার-পদ্ধতিতে যৌক্তিকতা ও সারবত্তা থাকিলেও সময় সময় ইনি ভগবানের কৃপা ও মানবের পাপের উপর অযথা জোর দিয়াছেন। এ বিষয়ে লুথারের ন্যায় ইনিও সকল সময়ে চিত্ত স্থির রাখিয়া বিচার করিতে পারেন নাই। এই সমস্ত বিচারপূর্ণ গ্রন্থ ছাড়াও 'ভগবানের পুরী' ও 'ত্রয়ী' নামে ইঁহার লাটিন ভাষায় লিখিত আরও দুইখানি গ্রন্থ আছে। বক্তা হিসাবে অগষ্টিনের কার্য্য খৃষ্টীয় চার্চ্চের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইয়াছিল। অদ্যাপি তাঁহার চারি শত বক্তৃতা বর্ত্তমান আছে।

ইঁহার শেষজীবন অতি দুঃখে কাটিয়াছিল। যখন ইনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন ভাণ্ডাল নামক অসভ্য জাতি রোমনগরী আক্রমণ করে। সেণ্ট্ অগষ্টিন্ রোমবাসীর জন্য প্রার্থনা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারেন নাই। ইঁহার চরিত্রে বিদ্যা ও ভক্তি মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য বিস্তার করিয়াছিল। ইনি ৪৩০ খৃষ্টাব্দে ২৮এ অগষ্ট্ তারিখে ৭৫ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন।

অগষ্টুমা—জাপানের একটী আগ্নেয়গিরি। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫২৩০ ফুট উচ্চ। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে এই পর্ব্বতে অগ্ন্যুদ্গম হইয়াছিল।

অগস—মহিস্থুর প্রদেশের এবং দক্ষিণ কানাড়া জেলার একটী জাতি। দক্ষিণ কানাড়া জেলায় তিন শ্রেণীর রজক দেখা যায়—(১) কোঙ্কণী খৃষ্টান, (২) কানাড়ী ভাষাভাষী রজক (ইহারা মহিস্থুরের অগসদের সম্পর্কিত মনে হয়), ও (৩) তুলু ভাষাভাষী রজক। অগসি বা পাগড়ী হইতে ইহাদের 'অগস' নাম হইয়াছে।

মহিস্থুরের অগসগণ প্রধানতঃ বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে এবং বেতন বাবদ শস্যাদি পায়। ইহারা

'উব্বে' অর্থাৎ বস্ত্রাদি সিদ্ধ করিয়া হাঁড়িকে পূজা করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বিষ্ণু ও শক্তির উপাসনাও করে।

দক্ষিণ কানাড়ার তুলু 'মড়িবাল' অর্থাৎ রজকগণও বস্ত্রাদি ধৌত করে। ইহাদের প্রধান উপাস্য ভূতের নাম 'জুমদি'। এই ভূতপূজায় ছাগ ও কুক্কুট বলি দেয়।

মহারাষ্ট্রীয় রজকগণের মধ্যে অনেকে 'দন্দু অগস' নামে পরিচিত। অগসদের মধ্যে মামাত ও পিস্তুত ভগিনীর সহিত বিবাহ প্রচলিত। পঞ্চায়েতের অনুমতিক্রমে স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বিবাহও হইয়া থাকে। ইহারা শিব, কেদারলিঙ্গ, ভবানী ও মারুতির ভক্ত। পূর্ব্বপুরুষের তর্পণার্থ ইহারা মহালয়ার দিন এক অনুষ্ঠান করে। একজন মুখ্য পঞ্চায়েৎ ও ১০ জন সভাসদ্ লইয়া ইহাদের পঞ্চায়েৎ-সভা গঠিত। সামাজিক দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রাপ্ত জরিমানার একতৃতীয়াংশ এই পঞ্চায়েৎ-সভা পাইয়া থাকে।

অগসলেরু—ধারবার জেলার অধিবাসী এক স্বর্ণকার জাতি। ইহারা 'সোনার' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ইহারা পাঞ্চালদের অন্তর্ভুক্ত। ধারবারে ইহাদের সংখ্যা অনুমান আড়াই হাজার হইবে। ইহারা কানাড়ী ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে।

ইহাদের মধ্যে কয়েকটী শ্রেণী আছে। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি আদানপ্রদান নিষিদ্ধ। ইহারা কাল্লব ও বাণশঙ্করী নামক দেবতার পূজা করে। তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে ইহারা নবল-গুন্দের শিরসিঙ্গি এবং উত্তর কানাড়ার গোকর্ণ নামক স্থানে গমন করিয়া থাকে। কোলাপুরে তোরগল নামক স্থানে ইহাদের এক ধর্ম্মগুরু অবস্থান করেন। তিনি ইহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। 'কালম্মা' নামে ইহাদের এক পারিবারিক উপাস্য দেবী আছেন। ইনি উষ্ট্রারূঢ়া, অষ্টভুজা ও বিবিধ আয়ুধধারিণী।

ইহারা সুশ্রী, বলবান্ ও মিতাহারী এবং মদ্যমাংস গ্রহণ করে না। স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার এবং মূর্ত্তিনির্ম্মাণই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা।

অধুনা অগসলেরুগণ ব্রাহ্মণোচিত ষোড়শ সংস্কার, ধর্ম্মগ্রন্থ-প্রণয়ন প্রভৃতি বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছে। দেবপূজা ও বিবাহাদি ক্রিয়া স্বশ্রেণীর লোকদ্বারাই সম্পাদিত হয়। ইহাদের মধ্যে অল্প বয়সে বিবাহ ও একাধিক স্ত্রী-গ্রহণ চলিত আছে, কিন্তু বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ। সামাজিক বিবাদবিসং-বাদের নিষ্পত্তি পতদস্বামী নামক গুরুর সাহায্যে হইয়া থাকে।

অগসবারা (Ogasawara)—জাপান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বোনিন্ দ্বীপপুঞ্জের সন্নিহিত একটী দ্বীপ। [বোনিন্ দ্র°]

অগস্তি,—[বৈদ্যক] বকফুল। ইহার হিন্দী নাম অগস্তিয়া, হতিয়া, বৃহৎ বৌলসরী ; মরাঠী—অগস্তা, হদগা ; গুজরাতী—অগথিয়ো ; কর্ণাটী—অগসেয় মরণু ; তেলেগু—অনীসে, অবিসি, লল্লয়বিসেচেট্টু ; তামিল—অর্গতি। ইহার লাটিন নাম Sesbavia grandiflora, Aschynomene grandiflora. পর্য্যায়—অগস্ত্য, বকপুষ্প, মুনিপুষ্প, বঙ্গসেন, মুনিদ্রুম, বকদ্রু, অগস্তিদ্রু, কুম্ভক, কুম্ভযোনি, পূতিশাক, বক্রপুষ্প, শীঘ্রফলক ও দীর্ঘফলক।

অগস্তি বা বকফুল বঙ্গদেশের সকলের নিকটেই পরিচিত। ইহার বৃক্ষ অতি শীঘ্র বর্দ্ধিত ও পুষ্পিত হয় এবং প্রায় ২০ হস্ত পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। এই বৃক্ষের শাখা ঘনসন্নিবিষ্ট নহে এবং ইহার পাতা দেখিতে কতকটা তেঁতুলের পাতার ন্যায় ; একটী দীর্ঘ বৃন্তের দুই পার্শ্বে ৮ বা ততোধিক যুগ্ম পত্র থাকে। অগস্তি বা বকফুল শ্বেত, পীত, নীল ও লোহিত ভেদে চারি প্রকার।

এই ফুলগুলি টিয়াপাখীর ঠোঁটের ন্যায় বাঁকা বলিয়া ইহার নাম বক্রপুষ্প বা বকফুল। এই পুষ্প পৃথক্‌দল এবং ইহার পাঁচটী দল পরস্পর সমান নহে। চাঁপাফুলের সহিত তুলনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, চাঁপাফুল সমদল কিন্তু বকফুল বিষমদল। বকফুলের শিম হয়। যে সকল বৃক্ষে শিম হয়, তাহার ফুল প্রায়ই বকফুলের মত বিষমদল। বকফুল ও উহার শিম লোকে খাইয়া থাকে।

অগস্তিবৃক্ষের পত্র, পুষ্প ও শিম ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৃহন্নিঘণ্টু রত্নাকরে লিখিত আছে—

"অগস্তিকুসুমং শীতং চাতুর্থকনিবারণম্।
নক্তান্ধ্যনাশনং তিক্তং কষায়ং কটুপাকি চ॥
পীনসশ্লেষ্মপিত্তঘ্নং বাতঘ্নমিতি কীর্ত্তিতম্।
পর্ণন্তু মুনিবৃক্ষস্য কটু তিক্তং গুরু স্মৃতম্॥
মধুরং কিঞ্চিদুষ্ণঞ্চ স্বচ্ছং ক্রিমিকফাপহম্।
কণ্ডূং বিষং রক্তপিত্তং নাশয়েদিতি কীর্ত্তিতম্॥
মুনিশিম্বী সরা প্রোক্তা বুদ্ধিদা রুচিরা লঘুঃ।
পাককালে তু মধুরা তিক্তা চৈব স্মৃতিপ্রদা॥
ত্রিদোষশূলকফহৃৎ পাণ্ডুরোগবিষাপনুৎ।
শোফগুল্মহরা প্রোক্তা সা পক্বা রূক্ষপিত্তলা॥"

অর্থাৎ অগস্তি ফুলে চাতুর্থক জ্বর নিবারিত হয় ; রাতকাণা ভাল হয়। ইহা তিক্ত, কষায় ও কটুপাক। শোথ, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও বাতরক্ত নাশ করে। বৃক্ষপত্র কটু, তিক্ত, গুরু, মধুর, কিঞ্চিৎ উষ্ণ, স্বচ্ছ, ক্রিমি ও কফনাশক। ইহা কণ্ডূ, বিষ ও রক্ত-পিত্ত নাশ করে। শিম রেচক, মেধাবৃদ্ধিকারক, রুচিকারক ও

লঘুপাক। পাক হইলে মধুর, তিক্ত ও স্মৃতিপ্রদ; ত্রিদোষ, শূল, কফ, পাণ্ডুরোগের বিষনাশক। পক্ক হইলে শোষ ও গুল্মরোগ নাশ করে।

চরকে অগস্তির নামোল্লেখ নাই। সুশ্রুতে লিখিত আছে—"অগস্ত্যং নাতিশীতোষ্ণং নক্তান্ধানাং প্রশস্যতে।" (সুশ্রুত, ৪৬; পুষ্পবর্গ)

বাগ্‌ভট (৬ উঃ ১৩ অঃ) বলিয়াছেন—"ভৃষ্টং ঘৃতং কুম্ভযোনেঃ পত্রৈঃ পানে চ পূজিতম্"। অর্থাৎ অগস্তিপত্র শিলায় পেষণপূর্ব্বক গব্যঘৃতসহ পাক করিয়া তাহা রাত-কাণাদিগকে পান করিতে দিবে। বাটা পাতার চারগুণ ঘৃত দিয়া পাক করিয়া নীরস হইলে নামাইবে, ভাজা বা পোড়া কাপড়ে ছাঁকিয়া সেই ঘৃত রোগীকে পান করিতে দিবে। মাত্রা সিকি হইতে আধ তোলা।

অগস্তিপত্র অল্প মরিচের সহিত গোমূত্রে পেষণ করিয়া অপস্মার রোগীকে নস্যরূপে ব্যবহার করিতে দিলে অত্যন্ত উপকার হয়। শিশুর অপস্মার হইলে সেই রসে তূলা ভিজাইয়া শিশুর নাসারন্ধ্রের নিকট রাখিতে হয়।

চাতুর্থক অর্থাৎ ২ দিন অন্তর জ্বর হইলে এবং প্লীহাযকৃৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইলে অগস্তিপত্রের রসে নস্য লওয়া বিধেয়। জ্বর আসিবার দিন নস্য লইলে উপকার দর্শে।

অগস্তিপুষ্পের চূর্ণ মহিষদুগ্ধে মিশাইয়া ঐ দুগ্ধের দধি হইতে মাখন তুলিয়া প্রয়োগ করিলে বাতরক্তজন্য গা ফাটা ভাল হয়।

Pharmacographia Indicaর মতে অগস্তিপুষ্প ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে ভারতে আনীত হইয়াছিল।

অগস্তির মূল কফনিঃসারক। পত্র ও পুষ্পের রস নস্যরূপে লইলে পীনস ও শিরঃপীড়া প্রভৃতির উপশম হয়। মূলের রস মধুসহ পান করিলে তরুণ কফরোগে উপকার দর্শে। অগস্তির মূল ধুতুরার মূলের সহিত পেষণ করিয়া স্ফীত অঙ্গে প্রলেপ দিলে যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়। [বকফুল, মুনিদ্রুম, কুম্ভযোনি দ্র°]

[সুশ্রুতসংহিতা; বাগ্‌ভট; হারীত; চক্রদত্ত; ভাবপ্রকাশ; বৃহন্নিঘণ্টুরত্নাকর; বৈদ্যকনিঘণ্টু; রাজনিঘণ্টু; বিরজাচরণ গুপ্ত প্রণীত বনৌষধিদর্পণ, ১ম খণ্ড, ৫-৮ পৃঃ; বনস্পতিগুণাদর্শ; Pharmacographia Indica; Materia Medica of India—R. N. Rhory, part ii, pp. 229-30]

অগস্তি২—কনৌজিয়া ব্রাহ্মণগণের এক গোত্র। ২ নেপালী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও এই গোত্র প্রচলিত।

অগস্তি৩—অগস্ত্যমুনি। এই নামের উল্লেখ অথর্ববেদে (৪.২৯.৩) আছে। [অগস্ত্য দ্র°] কূর্ম্মপুরাণমতে ইনি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্র জয়ধ্বজরাজের যজ্ঞ সম্পাদন করেন। ২ দক্ষিণদিক্। ৩ অগস্ত্য নক্ষত্র। [অগস্ত্য২ দ্র°] ৪ অগস্তি বা অগস্ত্যের গোত্রাপত্যগণ (পা° ৪.১.১০৫; ২.৪.৬৪)।

অগস্তিকুসুম—বকবৃক্ষ। চলিত বকফুল। (ত্রিকা°)

অগস্তিদ্রু, অগস্তিদ্রুম—[বৈদ্যক] বকবৃক্ষ। [অগস্তি, দ্র°]

অগস্তিমোদক—অর্শ-রোগে হিতকর মোদক ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—হরীতকী তিনপল, ত্রিকটু তিনপল, দারুচিনি দুই তোলা এবং পুরাতন গুড় ৮ পল, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া মোদকপাকের প্রণালী অনুসারে এই মোদক প্রস্তুত করিতে হইবে। রোগীর বলাবল অনুসারে উপযুক্ত পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিলে অর্শ, গ্রহণী, শোথ, কাশ ও উদাবর্ত্তরোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

অগস্তী—অগস্ত্যবংশীয়া। (পা° ৬.৪.১৪৯)

অগস্তীশ্বর—কাশীর স্বনামখ্যাত শিবলিঙ্গ। (স্কন্দ ও লিঙ্গপু°)

অগস্ত্য—'যাবদহং নাগচ্ছামি তাবৎ ন বর্দ্ধিতব্যমিতি অগং বিন্ধ্যং ত্যক্তবান্ অন্যেভ্যোঽপীতি ত্যজ-উঃ অপস্করাদিত্বাৎ সুট্।' অপর নাম অগস্তি। ছাব্বিশটী ঋক্‌সূক্তের (১.১৬৫-১৯১) রচয়িতা প্রসিদ্ধ ঋষি। ঋগ্বেদে কোথাও তাঁহার উল্লেখ, কোথাও বা তাঁহার সম্বন্ধীয় ঘটনার ইঙ্গিত আছে। তাঁহার বৈদিক নাম 'মান' ও 'মান্য'। পুরাণে তাঁহাকে দক্ষিণভারতের স্মরণীয় ঋষি বলা হইয়াছে। পুরাণে অগস্ত্যের মিত্র ও বরুণের তেজ হইতে জন্ম বলিয়া ইঁহার নাম 'মৈত্রাবরুণি' এবং কুম্ভ হইতে উদ্ভূত বলিয়া নামান্তর 'কুম্ভসম্ভব' বা 'কলসযোনি'।

ঋগ্বেদে কথিত আছে যে, যজ্ঞস্থলে উর্ব্বশীকে দেখিয়া মিত্র ও বরুণের রেতঃস্খলন হয়। সেই শুক্র যজ্ঞিয় কুম্ভে পড়িয়া-ছিল। তাহাতেই বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যের উৎপত্তি। "সত্রেহ জাতাবিষিতা নমোভিঃ কুম্ভে রেতঃ সিষিচতুঃ সমানং। ততোহ মান উদিয়ায় মধ্যাত্ততো জাতমৃষিমাহুর্বশিষ্ঠম্।" (ঋক্, ৭.৩৩.১৩)

এস্থলে অগস্ত্যের নাম 'মান' লিখিত হইয়াছে। সায়ণাচার্য্য ঋগ্বেদের উক্ত মণ্ডলের ও সূক্তের একাদশ ঋকের ব্যাখ্যাস্থলে বৃহৎসংহিতা হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই মহর্ষি কি কারণে প্রথমে 'মান' নামে প্রসিদ্ধ হন, তাহার কারণ ঐ শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট আছে।

"তয়োরাদিত্যয়োঃ সত্রে দৃষ্ট্বাপ্সরসমুর্ব্বশীম্।
রেতশ্চস্কন্দ তৎকুম্ভে ন্যপতদ্বাসতীবরে।
তেনৈব তু মুহূর্ত্তেন বীর্য্যবন্তৌ তপস্বিনৌ।
অগস্ত্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ তত্রর্ষী সম্বভূবতুঃ।
বহুধা পতিতং রেতঃ কলসে চ জলে স্থলে।
স্থলে বশিষ্ঠস্তু মুনিঃ সম্বভূবর্ষিসত্তমঃ।
কুম্ভে ত্বগস্ত্যঃ সম্ভূতো জলে মৎস্যো মহাদ্যুতিঃ।

উদিয়ায় ততোঽগস্ত্যঃ শম্যামাত্রো মহাতপাঃ।
মানেন সম্মিতো যস্মাত্তস্মান্মান্য ইহোচ্যতে।
যদ্বা কুম্ভাদৃষির্জাতঃ কুম্ভেনাপি হি মীয়তে।
কুম্ভ ইত্যভিধানঞ্চ পরিমাণস্য লক্ষ্যতে।”

অর্থাৎ মিত্র ও বরুণ দেবতা আদিত্যযজ্ঞে উর্ব্বশীকে দেখিলে বাসতীবর নামক যজ্ঞিয় কুম্ভে তাঁহাদের রেতঃস্খলন হয়। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাতে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ নামে দুই বীর্য্যশালী তপস্বী উৎপন্ন হইলেন; সেই রেতঃ কলসে ও জলে স্থলে বহুধা হইয়া পতিত হইয়াছিল। স্থলে ঋষিসত্তম বশিষ্ঠ জন্ম লইলেন; কুম্ভে অগস্ত্য ও জলে দ্যুতিমান্ মৎস্য। মহাতপা অগস্ত্যের আকার লাঙ্গলের জোয়ালের ন্যায় হইয়াছিল। এই আকার পরিমিত, সে জন্য তিনি মান্য নামে পরিচিত হন। অথবা অগস্ত্য কুম্ভে জন্মিয়াছিলেন, অতএব কুম্ভ দ্বারা তাঁহার পরিমাণ হইতেছে (তজ্জন্য তিনি মান নামে প্রথিত)।

অগস্ত্য মিত্রাবরুণের পুত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও মিত্রসহচর বরুণের তেজে জাত বলিয়া ইঁহার অপর নাম বারুণি। (মহাভারত)

অগস্ত্য ও লোপামুদ্রার সম্ভোগসম্বন্ধে কথোপকথনচ্ছলে ঋগ্বেদের ১.১৭৯ সূক্তে চারিটী ঋক্ আছে। অগস্ত্যশিষ্য তাহা শুনিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য আরও দুইটী ঋক্ পাঠ করেন। সে দুটীও ইহার অন্তর্গত। ইহাতে দেখা যায়, কঠোরব্রত ঋষি শেষে প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

খেল নামে এক রাজা ছিলেন। অগস্ত্য ছিলেন তাঁহার পুরোহিত। খেলের স্ত্রী বিশ্পলা। একবার যুদ্ধকালে শত্রুদের অস্ত্রে বিশ্পলার একটী পা কাটিয়া ছিন্ন হইয়া যায়। অগস্ত্য অশ্বিযুগলের স্তুতি করায় রাত্রিতে আসিয়া তাঁহারা বিশ্পলাকে লৌহের পা করিয়া দিলেন। (ঋক্ ১.১১৭.১১; ১.১১৬.১৫ এবং ইহার সায়ণভাষ্য)। ঋগ্বেদে (১.১৯১) অগস্ত্য-রচিত একটী যাদুমন্ত্রের সূক্ত আছে। অথর্ব্ববেদেও যাদুবিদ্যার (magic) সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ দেখা যায় (অথর্ব্ব° ২.৩২.৩; ৪.৩৭.১)। এতদ্ভিন্ন অথর্ব্ববেদে (১৮.৩.১৫) ঋষিদের একটী দীর্ঘ নামের তালিকামধ্যে অগস্ত্যের নাম পাওয়া যায়। মৈত্রায়ণী সংহিতায় এক প্রকার চিহ্নযুক্ত গাভী (‘বিষ্ট-কর্ণ্যঃ’—৪.২.৯) সম্পর্কে অগস্ত্যের নাম পাওয়া যায়।

অগস্ত্য ইন্দ্রকে মরুৎদিগকে স্বতন্ত্র হবিঃ দিবার প্রস্তাব করেন। তাহাতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু অগস্ত্য মরুদ্গণ ও ইন্দ্রের মধ্যে মনোমালিন্য ঘুচাইয়া দিয়া মিলন সম্পাদন করেন। এই ব্যাপার লইয়া ঋগ্বেদে তিনটী সূক্ত আছে (১.১৬৫, ১৭০, ১৭১)। তৈত্তিরীয় সংহিতা (৭.৫.৫.২), পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ (২১.১৪.৫), ঐতরেয়ব্রাহ্মণ (৫.১৬) ও কৌষীতকিব্রাহ্মণে (২৬.৯) এই ব্যাপারের উল্লেখ আছে।

কুমারতন্ত্রে সুব্রহ্মণ্যের পরিবার-দেবতার মধ্যে অগস্ত্যের নাম পাওয়া যায়।

স্কন্দপুরাণীয় কাশীখণ্ডে মিত্রাবরুণ তনয় অগস্ত্যের কাশীধামে তপশ্চর্য্যা, দেবগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতের দর্পচূর্ণ, লোপামুদ্রাপ্রসঙ্গ ও কার্ত্তিকেয়ের সহিত কথোপকথন প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ডে অগস্ত্যের উৎপত্তি, বিন্ধ্যের বৃদ্ধি নিবারণের জন্য দক্ষিণাপথে গমন, দেবতাদিগের উপকারার্থ সমুদ্রশোষণ, রামচন্দ্রের সভায় গমন করিয়া বিবিধ উপাখ্যান কথন, রামচন্দ্রের অগস্ত্যাশ্রমে গমন ও অগস্ত্য কর্ত্তৃক দিব্যাভরণ দান, অগস্ত্যের তপস্যা ও আশ্রম মাহাত্ম্য এবং অগস্ত্যার্ঘ্য-দানবিধি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, পুলস্ত্যের ঔরসে ও প্রীতির গর্ভে দত্তোলির জন্ম হয় এবং ঐ দত্তোলিই পূর্ব্বজন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অগস্ত্য নামে খ্যাত ছিলেন। পুনশ্চ ভাগবতে বর্ণিত আছে, পুলস্ত্যের ঔরসে হবির্ভূর গর্ভে অগস্ত্যের জন্ম এবং পূর্ব্বজন্মে তাঁহার নাম ছিল দর্হাগ্নি।

অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে বিবাহ করেন। এই লোপামুদ্রার গর্ভে তাঁহার দৃঢ়স্যুপ্রমুখ বহু পুত্র হয়। অগস্ত্যের বিবাহসম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। একদিন বনমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে তিনি এক গহ্বরের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। উহার মধ্যে কয়েকজন পুরুষকে অধোমুখে অবস্থান করিতে দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘আপনারা কিজন্য এইরূপ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন?’ উত্তরে তাঁহারা বলেন, ‘বৎস! আমরা তোমার পিতৃপুরুষ; তুমি অপুত্রক বলিয়া আমাদের এইরূপ দুর্গতি হইতেছে; অতএব শীঘ্র পুত্রোৎপাদন করিয়া আমাদিগকে এই দুর্বিষহ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত কর।’ তখন তিনি বিবাহের সঙ্কল্প করিয়া অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু মনোমত কন্যা কোথাও না পাইয়া স্বীয় ক্ষমতাপ্রভাবে সমস্ত প্রাণীর উৎকৃষ্ট অঙ্গ গ্রহণ করিয়া এক অসামান্যসুন্দরী কন্যার উৎপাদন করেন। অতঃপর তিনি এই কন্যাকে বিদর্ভরাজকে প্রদান করেন। বিদর্ভরাজ সানন্দে ব্রাহ্মণদিগকে এই কন্যার নামকরণ করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা সেই কন্যাকে সর্ব্বসুলক্ষণা দেখিয়া লোপামুদ্রা নাম রাখিলেন। লোপামুদ্রা যৌবনপ্রাপ্তা হইলে অগস্ত্য বিদর্ভরাজের নিকট হইতে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিলেন। বিবাহশেষে কিছুকাল তপশ্চর্য্যায়

কাটাইবার পর একদিন তিনি পত্নীকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিতে গেলে লোপামুদ্রা তাহাতে অস্বীকৃতা হইয়া বলিলেন, তাঁহাকে পিতৃগৃহের অনুরূপ অলঙ্কারাদি ও শয্যা প্রদান না করিলে তিনি তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইবেন না। অগস্ত্য তখন লোপামুদ্রার অভীপ্সিত দ্রব্যসমূহ সংগ্রহার্থ নৃপতি শ্রুতর্ব্বা, ব্রধ্নশ্ব ও পুরুকুৎসপুত্র মহারাজ ত্রসদস্যুর দ্বারস্থ হইলেন। কিন্তু তিনি ইঁহাদের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ সমান দেখিয়া সাহায্য গ্রহণ করিলেন না। তখন নৃপতিগণ তাঁহাকে দানবরাজ ইল্বলের নিকট লইয়া যান। ইল্বল অতিশয় ধনবান্ হইলেও ব্রাহ্মণগণের শত্রু ছিলেন। নৃপতিবৃন্দসহ অগস্ত্য তাঁহার নিকট গমন করিলে ইল্বল তাঁহাদিগকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। ইল্বলের বাতাপি নামে এক মায়াবী ছাগরূপী ভ্রাতা ছিল। যে কোন ব্রাহ্মণ ইল্বলের অতিথি হইলে তিনি বাতাপিকে ছেদন করিয়া তাহার মাংস ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিতে দিতেন। ব্রাহ্মণের আহারাদি শেষ হইলেই ইল্বল বাতাপিকে স্মরণ করিতেন। বাতাপি সতেজে ব্রাহ্মণের উদর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিত এবং তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ মৃত্যুমুখে পতিত হইত। ইল্বল অগস্ত্যকে বাতাপির মাংস ভক্ষণ করিতে দিলেন। কিন্তু অগস্ত্য দানবরাজের অভিপ্রায় উপলব্ধি করিয়া বাতাপির সমস্ত মাংস ভক্ষণ করিয়া তাহাকে একেবারে জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং নিজ শক্তিগুণে বাতাপির বাহির হইবার পথ রোধ করিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া ইল্বল মহর্ষি ও অপর নৃপতিদিগকে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। মহর্ষি তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে ইল্বল তাঁহাকে ও তাঁহার সহযাত্রী নৃপতিগণকে বহু ধনরত্ন প্রদান করিলেন। অগস্ত্য সেই অর্থে আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যসমূহ সংগ্রহ করিয়া লোপামুদ্রার হস্তে দিলেন। তখন লোপামুদ্রা তাঁহার গর্ভে বীর্য্যশালী পুত্রোৎপাদন করিতে অনুরোধ করিলেন। সাতবৎসর গর্ভধারণের পর তাঁহার দৃঢ়স্যু নামে পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। এই দৃঢ়স্যু হইতে অগস্ত্যের পূর্ব্বপুরুষগণ মুক্তিলাভ করেন। অগস্ত্য কিছুকাল সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া যোগবলে দেহত্যাগ করেন ও শেষে নক্ষত্রলোক প্রাপ্ত হন। তদবধি দক্ষিণদিকে তিনি নক্ষত্ররূপে উদিত হইয়া থাকেন। তাঁহার উদয়ে সর্ব্বত্র জল নির্ম্মল হয়। [অগস্ত্য$_2$ দ্র°]

লোপামুদ্রার গর্ভে দৃঢ়স্যু নামে যে সন্তান জন্মিয়াছিল, সেই তেজস্বী পুত্র বাল্যাবস্থা হইতে ইন্ধন আহরণ করিতেন বলিয়া অতঃপর তাঁহার নাম ইধ্মবাহ হয়।* “ইধ্মানাং ভারমাজহ্রে ইধ্মবাহস্ততোঽভবৎ।” (মহাভা°, বন°, ৯৯.২৩-২৭)

রাম দণ্ডকারণ্যে অগস্ত্যের আশ্রমে উপনীত হইলে মহর্ষি তাঁহাকে বৈষ্ণবধনু, ব্রহ্মদত্ত শর, অক্ষয় তূণীর ও খড়্গ প্রদান করিয়াছিলেন।

মহাভারতে আছে—বৃত্রকে পরাজিত করিবার পর ইন্দ্র যখন ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া প্রাণভয়ে লুক্কায়িত ছিলেন, তখন সমস্ত দেবগণ মিলিত হইয়া নহুষকে আকাশের দেবতা করেন। আকাশ-দেবতা হইয়া নহুষ ইন্দ্রপত্নী শচীকে বিবাহ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শচী ইহাতে সম্মত না হইয়া বলিলেন—যদি নহুষ সপ্তঋষি দ্বারা চালিত রথে আরোহণ করিয়া ঘুরিয়া আসিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিবেন। নহুষ সপ্তঋষি চালিত রথে ভ্রমণ করিতে করিতে অগস্ত্যকে ধাক্কা দিলেন। ইহাতে অগস্ত্য ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিলেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠির তাঁহাকে উদ্ধার না করিবেন, ততদিন তিনি সর্প হইয়া থাকিবেন।

মহাভারতের আর একটী কাহিনীতে আছে—দেবতাদিগের বিরুদ্ধে বৃত্র যখন যুদ্ধে রত, তখন তাঁহার দলে কালকেয় বা কালেয় নামে একদল অসুর ছিল। বৃত্রের মৃত্যুর পর যাহাতে দেবতাগণ অসুরদিগকে হত্যা না করিতে পারেন, তাহার সঙ্কল্প করিয়া তাহারা সমুদ্রগর্ভে লুক্কায়িত থাকে। ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য লোকজন হত্যা করিয়া তাহারা পৃথিবী ধ্বংস করিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছিল। দেবতাগণ বিব্রত হইয়া অবশেষে বিষ্ণুর নিকট গমন করেন। বিষ্ণু তাঁহাদিগকে মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট গমন করিবার উপদেশ দিলেন। পরে অগস্ত্যের নিকট তাঁহারা আগমন করিয়া কালকেয়দের অত্যাচারের কথা বিবৃত করিলে তিনি সমুদ্রের সমস্ত জল পান করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে সমুদ্র শুষ্ক হইয়া গেল এবং দেবতাগণ অনায়াসে তাহাদের হত্যা করিতে সমর্থ হইলেন। ইহার পর যতদিন পর্য্যন্ত ভগীরথ কর্ত্তৃক

---

* এই স্থানে মহাগোল। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে সুতীক্ষ্ণমুনি, রামচন্দ্রকে অগস্ত্যাশ্রমের পথ দেখাইয়া বলিতেছেন—তুমি ঐ দিক্ দিয়া যাইবে, ঠিক ঐ দিকে। দক্ষিণদিকে আর চারি যোজন পথ। চারি যোজন পথ গেলেই অগস্ত্যভ্রাতার বহুবিস্তৃত সুন্দর আশ্রম দেখিতে পাইবে। “দক্ষিণেন মহাঞ্ছ্রীমানগস্ত্য ভ্রাতুরাশ্রমঃ।” (রামা°, ৩.১১.৩৭)

অগস্ত্যের ভাই কে, বাল্মীকি তাহা বলিয়া দিলেন না। কিন্তু স্বামিকৃত টীকায় লিখিত হইয়াছে, তাঁহার নাম ইধ্মবাহ। (যথা—তত্রাগস্ত্যভ্রাত্রাশ্রমে ইধ্মবাহেতি অস্য নাম। অগস্ত্যঃ প্রাগ্‌দুহিতরমুপযেমে ধৃতব্রতা মস্যাং দৃঢ়ব্রতোজাত ইধ্মবাহাত্মজমুনিরিতি ভাগবতঃতু দেবরাচ্চসুতোৎপত্তিরিতি ন্যায়েনেত্যেকে)।

পৃথিবীতে গঙ্গা আনীত না হইয়াছিল, ততদিন সমুদ্র শুষ্কই ছিল।

অগস্ত্য কর্তৃক বিন্ধ্যপর্ব্বতের দর্পচূর্ণকাহিনী সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য। প্রত্যহ উদয়াস্ত সূর্য্য-চন্দ্র সুমেরু পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিতেন। ইহা দেখিয়া বিন্ধ্য ঈর্ষাপরবশ হইয়া সুমেরু পর্ব্বতের মত নিজেকে বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। দেবতারা ভীত হইয়া অগস্ত্যের নিকট আগমন করিলে অগস্ত্য তাঁহাদের শঙ্কিত হইবার কারণ জানিয়া বিন্ধ্য-সমীপে গমন করিলেন।* অগস্ত্য ছিলেন বিন্ধ্যের দীক্ষাগুরু। বিন্ধ্য নত হইয়া অগস্ত্যকে প্রণাম করিল। তখন অগস্ত্য বলিলেন—'আমি দক্ষিণে যাইতেছি, যতদিন না ফিরিয়া আসি, ততদিন মাথা তুলিও না।' বিন্ধ্যও তাহাতে স্বীকৃত হইল। কিন্তু অগস্ত্য সেই যে দক্ষিণদিকে গমন করিলেন, আর ফিরিলেন না; বিন্ধ্যেরও পুনরায় মাথা তোলা হইল না।

রামায়ণে অগস্ত্যের চিরকালের জন্য দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার উল্লেখ নাই—উহাতে স্পষ্টই আছে, তিনি অযোধ্যায় আসিয়া রামকে রাবণ ও হনুমানের কথা বলিয়াছিলেন।

অগস্ত্যমুনির আশ্রমও এক স্থানে ছিল না। সুতীক্ষ্ণমুনি রামকে যে প্রকার পথ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে দণ্ডকারণ্যে তাঁহার আশ্রম। দণ্ডকারণ্য গোদাবরীর উত্তরকূলে আধুনিক বেরারের পূর্ব্ব-উত্তর সীমা। রামায়ণের অপরস্থানে (৭.৮৯.২০) আছে, শূদ্রতপস্বী শম্বুককে বধ করিয়া রাম অগস্ত্যাশ্রমে গিয়াছিলেন। শম্বুকের আশ্রম বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণে শৈবলগিরির উত্তরপার্শ্বে ছিল। মহাভারতের মতে, অগস্ত্যাশ্রম গয়ার নিকটে অবস্থিত। (বন°, ৯৭-৯৯ অঃ)

রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে অগস্ত্য সম্বন্ধে কয়েকটী আখ্যান আমরা দেখিতে পাইতেছি। কৌটিল্যশাস্ত্রে মহাভারতের বহু গল্প গৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে অগস্ত্যের বহু কাহিনীও পাওয়া যায়। কিন্তু কৌটিল্য সাধারণে প্রচলিত কাহিনীগুলির মূলসূত্র জানিতেন কিনা, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। মনুসংহিতাতেও বহু ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক অসম্ভব কথার উল্লেখের মধ্যে অগস্ত্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে মনুস্মৃতিতে যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই পশুপক্ষী হত্যা বা শিকার সম্বন্ধীয় ঘটনা। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় (৫.২২) যে, অগস্ত্য একজন নিপুণ শিকারী ও তীরন্দাজ ছিলেন; বিশেষতঃ পশুপক্ষী ও হরিণ শিকারে তাঁহার অব্যর্থ লক্ষ্য ছিল।

এতদ্ভিন্ন স্কন্দপুরাণ ও অগ্নিপুরাণে অগস্ত্য কর্তৃক অগস্ত্যেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার কথা লিখিত আছে। গয়ামাহাত্ম্যে নৈমিষারণ্যের অগস্ত্যকুণ্ড এবং গয়ার অগস্ত্যপদের (১০৯.১৯ এবং ১১১.৫৩) উল্লেখ আছে।

দাক্ষিণাত্যের বংশপরম্পরায় প্রচলিত যে, বহু যুগ পূর্ব্বে অগস্ত্য জীবিত ছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে মূল ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা। রামায়ণ-মহাভারতের যুগের পূর্ব্বে তিনি জীবিত ছিলেন। অনেক ঐতিহাসিক কিন্তু তাঁহাকে প্রায় খৃষ্টজন্মের কাছাকাছি লইয়া আসেন।* অগস্ত্য যে দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা, তাহাও অনেকে বিশ্বাস করেন না। মহিসুরে প্রাপ্ত একটী উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানিতে পারা যায়, মুক্কন্ন কদম্ব প্রথমে উত্তরভারত হইতে বহু ব্রাহ্মণ দাক্ষিণাত্যে লইয়া আসিয়াছিলেন।† ইহার পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে কোনও ব্রাহ্মণ ছিলেন না। মুক্কন্ন কদম্ব সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। ঐতিহাসিক ইলিয়ট বলেন যে, ইহার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা দাক্ষিণাত্যে থাকিলেও, তাঁহাদের সংখ্যা খুব অল্পই ছিল। মুক্কন্ন কদম্ব তাঁহাদের সন্ধান পান নাই। বৌদ্ধ ও জৈনই তখন তথায় অধিক ছিল। মহিসুর হইতে প্রাপ্ত মহারাজ অশোকের উৎকীর্ণ লিপি হইতেও বৌদ্ধ প্রভাবের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু পুরাণ ও ঐতিহাসিক ঘটনা দ্বারা স্থির করা যাইতে পারে যে, অগস্ত্যই প্রথমে দাক্ষিণাত্যে গিয়া তথাকার রাজন্য-বর্গের শক্তির উপর স্বীয় ক্ষমতা বিস্তার করিয়া ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রভাবের ফলে দাক্ষিণাত্যে সর্ব্বপ্রথম মন্দির-পূজার প্রবর্ত্তন হয়। ইহাও মনে হয়, অগস্ত্য নামে বহু ব্যক্তি দাক্ষিণাত্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান সংগঠন করিয়া নিজ শিষ্যবর্গের দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতের বহু নৃপতির পুরোহিতরূপেও অগস্ত্য প্রসিদ্ধিলাভ করেন। সিন্নামনুর অনুশাসনে লিখিত আছে—"হতাখিলারাতি-মহীপতীনাং হিমাচলারোপিত-শাসনানাং পুরহুতোঽদ্ভুতবাণীপতীনাং ইয়াদ্ভুবানাং ভগবান্ অগস্ত্যঃ।" সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, অগস্ত্য বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যের নৃপতিগণের গুরু বলিয়া পরিগণিত ছিলেন, পরে নৃপতি-গণের ধর্ম্মোপদেশক হইয়াছিলেন। রাজা সুন্দরপাণ্ড্যের একটী তাম্রপত্রে পাওয়া যায়—"অগস্ত্য-শিষ্য"; সুতরাং

* স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

* ঐতিহাসিক আয়েঙ্গার বলেন যে, যদি অগস্ত্য বলিয়া সত্যই কোন ঋষি ছিলেন, তবে তাঁহার সময় খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে নিশ্চয়ই হইবে। (Tamil Studies, p. 118)

† Rice—Mysore and Croog from Inscriptions. pp. 27 and 204.

অগস্ত্য নামে সুন্দরপাণ্ড্যের গুরু ছিলেন। অগস্ত্যের এই পৌরোহিত্য-কার্য্য সম্বন্ধে অনেক কাহিনী লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে একটী আখ্যায়িকা হইতে পাওয়া যায়—বজ্রাঙ্গদ নামে একজন পাণ্ড্য রাজা একবার দ্রাবিড় দেশের অন্তর্গত সহ্যপর্ব্বতস্থিত সোন নামক পাহাড়ে প্রতিষ্ঠিত তীর্থক্ষেত্রে অশ্বারোহণে গিয়া তাহা অপবিত্র করেন। ইহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য তিনি অগস্ত্য-কর্ত্তৃক শিবলিঙ্গ সোমেশ্বরের পূজা দিবার জন্য আদিষ্ট হন। তিনি তাঁহার স্থানীয় সমস্ত ধনসম্পত্তি সোমেশ্বরের পূজায় নিঃশেষ করিয়া অগস্ত্য ও তাঁহার স্ত্রী লোপামুদ্রার স্নেহ-ভাজন হন।*

অবশ্য এই প্রকার কাহিনীর উপর সম্পূর্ণভাবে আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না। তবে এগুলি হইতে, কি উপায়ে অগস্ত্য নামে প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মপ্রচারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন এবং কিরূপ শ্রদ্ধা ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। দ্রাবিড়দেশে অসংখ্য শৈবতীর্থ প্রতিষ্ঠার মূলে যে অগস্ত্য ছিলেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অগস্ত্যই সর্ব্বপ্রথম দাক্ষিণাত্যে শিবপূজার ও বৈদ্যক-শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করেন।

অগস্ত্যের বংশ 'অগস্ত্যগোত্র' বলিয়া পরিচিত। এখনও অগস্ত্যগোত্রীয়দের সন্ধান পাওয়া যায়। অগস্ত্যের বহু পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।† মৎস্যপুরাণে (২০২.১.১৪) তাঁহাদের কতক গুলির নাম পাওয়া যায়, যথা—আগস্তি, করস্তি, কৌশল্য, শকট, সুমেধ, ময়োভু, গান্ধারকায়ন, ইধ্মবাহ ও দৃঢ়াস্য। ইঁহাদের মধ্যে ইধ্মবাহকে ক্রতু এবং দৃঢ়াস্যকে পুলহ পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

দাক্ষিণাত্যে অগস্ত্যের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত তীর্থগুলির মধ্যে কুমারিকা অন্তরীপের নিকটবর্ত্তী ত্রিচিনপল্লীর 'পোধিয়' পর্ব্বতের 'পদিগই' তীর্থই প্রসিদ্ধ। এই পর্ব্বতের আর একটী নাম অগস্ত্যপর্ব্বত। [অগস্ত্যমলয় দ্র°] প্রবাদ এই যে, এখনও পদিগই-তীর্থে অগস্ত্য জীবিত আছেন এবং চিরকালই থাকিবেন। যদি এই তীর্থভূমি ইঁহার উপস্থিতির অভাবে অপবিত্র হয়, তাহা হইলে ইনি দক্ষিণ-আকাশের নূতন নক্ষত্র-রূপে বিরাজ করিবেন। এই নক্ষত্রের নাম হইবে অগস্ত্য।

অপর একটী প্রসিদ্ধ অগস্ত্য-তীর্থ হইতেছে, পূর্ব্ব আর্কট প্রদেশের নারায়ণবনম্-এর অগস্ত্যেশ্বর স্বামীর মন্দির। উহা পুটুর রেল-ষ্টেশনের অতি নিকটে অবস্থিত। এই মন্দিরের নির্ম্মাণ-কৌশল অতি সুন্দর। উহার মধ্যে অগস্ত্যের বহু প্রস্তর-মূর্ত্তি আছে। বেদারণ্যম্-এ অগস্ত্যের একটী ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত মূর্ত্তি দেখা যায়। এই মূর্ত্তিটী খৃষ্টীয় অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ শতকে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৃহদীশ্বর মন্দিরে অগস্ত্যের একটী প্রস্তর-মূর্ত্তি পাওয়া যায়—তাহা কবে যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, এখনও জানা যায় নাই। চিদম্বরম্-এ এক সুবৃহৎ শিবমন্দির আছে। তথায় সম্প্রতি একটী অগস্ত্যমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মূর্ত্তিটী দ্বাদশ শতাব্দীর।

এই সকল প্রবাদ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অগস্ত্য দাক্ষিণাত্যে উত্তরভারতের সভ্যতা ও কৃষ্টির আলোক বহন করিয়া লইয়া যান। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠাতৃ-রূপে, উপদেষ্টা ও প্রচারকরূপে, গুরু-পুরোহিতরূপে ইনি দাক্ষিণাত্যে যে নূতন আলোক দিয়াছিলেন, তাহার জন্য ইনি দাক্ষিণাত্যবাসীদের নিকট চিরকাল পূজিত হইবার যোগ্য, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ইঁহার পূজাপদ্ধতি স্কন্দ ও অগ্নিপুরাণেও লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শুধু ভারতে বলিয়া নহে, ভারতের বাহিরেও অগস্ত্যের পূজা দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের বাহিরে অর্থাৎ কাম্বোডিয়া, শ্যাম প্রভৃতি দেশে এবং যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে, যেখানে যেখানে শৈবক্ষেত্র পরিলক্ষিত হয়, সেই সকল স্থানেই অগস্ত্যপূজার আদর্শ দেখা যায়। বোধ হয়, এই সমস্ত দেশে শৈবধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যোক্তা অগস্ত্যই। অগস্ত্যের নানা মূর্ত্তিও সেই সকল স্থানে পরিলক্ষিত হয়।* ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অনুষঙ্গপাদে ৪৮ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অগস্ত্য ভারতমহা-সাগরস্থিত বরাহদ্বীপ (সম্ভবতঃ বোর্ণিওদ্বীপ), কুশদ্বীপ, শঙ্খদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মপ্রচারকল্পে গমন করিয়াছিলেন। কাম্বোডিয়ায় আবিষ্কৃত একটী শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে যে, অগস্ত্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ আর্য্যদেশ হইতে আসিয়া কাম্বোজের এক রাজকুমারী যশোমতীকে বিবাহ করেন।

অগস্ত্য ও বৃহত্তর ভারত (Agastya and Greater India)-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দীক্ষিত, এম. এ মহোদয় "Some Aspects of the Vayu Purana"† নামক প্রবন্ধে যাহা লিখিয়া-ছেন, তাহার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল—আখ্যানমূলে জানিতে পারা যায়,

* স্কন্দপুরাণ, মাহেশ্বরখণ্ড, অরুণাচল-মাহাত্ম্য।

† কাহারও কাহারও মতে, অগস্ত্যের পুত্র দৃঢ়াস্য ও দৃঢ়স্যু। এই দুইজন ছাড়া ইধ্মবাহের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ।

* লীডেন মিউজিয়ামে এই সমস্ত স্থানের কতকগুলি অগস্ত্যমূর্ত্তি রক্ষিত আছে।

† Bulletins of the Department of Indian History and Archæology, No. I.

অগস্ত্য বারাণসীবাসী হইয়া দক্ষিণাপথে ভ্রমণ করিয়াছিলেন; দাক্ষিণাত্যের বনবিভাগ ও দাক্ষিণাত্য মনুষ্যবাসের উপযোগী করিয়াছিলেন। সংগম সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারাই জানেন যে, ইনি দাক্ষিণাত্যে 'পধিয়' পর্ব্বতে বাস করিতেন। দক্ষিণাপথে আর্য্যসভ্যতা বিস্তার করিয়া ইনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই, সমুদ্র পার হইয়া ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতের সাধনা ও সভ্যতার উজ্জ্বল বর্ত্তিকা হস্তে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এমন কি, সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও বালী দ্বীপও এই আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।* যাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিলালেখ ও প্রস্তরমূর্ত্তিগুলি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বহু প্রাচীনকাল হইতে অগস্ত্যের পূজা সমধিক প্রচলিত ছিল।

তামিল ভাষার প্রবর্ত্তকদিগের মধ্যে অগস্ত্যেরই নাম সর্ব্বাগ্রে করিতে হয়। তামিল পণ্ডিতগণ অগস্ত্যকেই এই ভাষার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বিবেচনা করেন। অগস্ত্যের ব্যাকরণ তামিল ভাষায় "অগথিয়ম্" নামে পরিচিত। মূর্ত্তিগঠন-সম্বন্ধেও তিনি এক শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। সম্ভবতঃ তাঁহার ১২টী শিষ্য বা ছাত্র ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইতেছেন তোল্‌কাপ্পিয়নার।

অগস্ত্যের প্রাচীন কাহিনীর সহিত ত্রাণধূমাগ্নি বা প্রাচীন তামিল বৈয়াকরণিক তোল্‌কাপ্পিয়নারের (Tolkappiyanar) উপন্যাস জড়িত। তামিল আখ্যায়িকা হইতে জানিতে পারা যায়, ত্রাণধূমাগ্নি জমদগ্নির পুত্র এবং অগস্ত্য পুলস্ত্যের ভগিনী লোপামুদ্রাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।†

ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর নিদর্শন যবদ্বীপের চণ্ডীরাজ্যে (Tjandi Redjo) পাওয়া যায়। এখানে অগস্ত্যের মূর্ত্তির দুইপার্শ্বে সন্ন্যাসীর বেশে দুইজন দণ্ডায়মান আছেন। কাহারও কাহারও মতে, একজন ত্রাণবিন্দু ও অপরজন মারীচি।‡ বোধ হয়, ত্রাণধূমাগ্নি ও ত্রাণবিন্দু অভিন্ন ব্যক্তি।§

তামিল আখ্যায়িকা হইতে আরও জানিতে পারা যায়, ত্রাণবিন্দুর কন্যা দ্রবিড়ার সহিত দ্রবিড়দেশের রাজা পুলস্ত্যের বিবাহ হয়। অগস্ত্য পুলস্ত্যের এক ভগিনীকে বিবাহ করেন এবং পুলস্ত্য ত্রাণবিন্দুর জামাতা। সম্ভবতঃ ত্রাণবিন্দু জামাতার প্রাসাদে গিয়াছিলেন এবং অগস্ত্যকে দ্রবিড়দেশে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে এবং তামিল ভাষার একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচিত দেখিয়াছিলেন। বোধ হয়, ইহার পর রাজা ত্রাণবিন্দু পুত্র বিশালকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করিয়া বৃদ্ধ অগস্ত্যের পদতলে বসিয়া তামিলভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে, অগস্ত্যের বাস তিব্বতদেশে ছিল। নেপালের একটী আখ্যায়িকায় আছে, বুদ্ধদেব একবার উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে অগস্ত্য নামে জন্ম পরিগ্রহ করেন, উহাই অগস্ত্যজাতক বলিয়া পরিচিত। [অগস্ত্যজাতক দ্র°] নেপালীশাস্ত্রে অগস্ত্যকে পূজা করিবার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন কিংবদন্তী, পুরাণ, ইতিহাস ও তামিল সাহিত্য প্রভৃতি হইতে অগস্ত্যের বিজয়-যাত্রার কাহিনী জানিতে পারিতেছি। মূর্ত্তিতত্ত্ব ও উৎকীর্ণ লিপির সাহায্যেও এ কথা সমর্থিত হইয়াছে।*

অগস্ত্য নিম্নলিখিত গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে—

অগস্ত্যসংহিতা (গণ্ডনক্ষত্রশান্তি, অগস্ত্যচন্দ্র, জয়ন্তীনির্ণয়, ব্রহ্মসংহিতা, মুদ্রালক্ষণ, পবিত্রারোপণবিধি প্রভৃতি ৩৬টী অধ্যায়ে সম্পূর্ণ); অগস্ত্যাষ্টকম্ (অগস্ত্য-রচিত শিবস্তুতির ৮টী শ্লোক); সকলাধিকার (জ্যোতিষ ও শিল্পশাস্ত্র সম্বন্ধে); অগস্ত্যসূত্রম্ (৪টী অধ্যায়ে সমাপ্ত; এই বিশ্ব-সৃষ্টির একমাত্র কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, শক্তির পূজা করিলে মোক্ষলাভ হয়); অগস্ত্যস্মৃতি (স্মৃতিগ্রন্থ—প্রত্যহ প্রাতে শয্যাত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রিতে শয্যাগ্রহণ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের যাহা কিছু নিত্যনৈমিত্তিক করণীয়, সমস্তই ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে)।

শাস্ত্রাদি হইতে আমরা অগস্ত্যের এই কয়টী নাম পাইতেছি, যথা—মৈত্রাবরুণি, বারুণি, অগস্তি, পীতাব্ধি, দম্ভোলি, দর্হাগ্নি, বাতাপিদ্বিট্, বাতাপিসূদন, আগ্নেয়, ঔর্ব্বশেয়, অগ্নিমারুত, ঘটোদ্ভব, মান, মান্য, মান্দার্য্য, কুম্ভজ, কুম্ভযোনি, কলসীসুত।

২ অগস্ত্যের গোত্রাপত্যগণ। ৩ শিব।

অগস্ত্য, —মিথুনরাশির শেষসীমায় এবং ৮০ অংশ দক্ষিণ-বিক্ষেপে অবস্থিত এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। "অশীতিভাগৈর্যাম্যায়ামগস্ত্যো মিথুনান্তগঃ"—(সূর্য্যসি°)। সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে,

* Dr. B. R. Chatterji's, Indian Cultural Influence in Cambodia, p. 50.

† Eluttutikāram Sirappuppāyiram, Siva Siddhānta publication, 1923, pp. 14-15.

‡ Q. J. M. S., Vol. XVII, p. 181 & fig (9).

§ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও ত্রাণবিন্দুর উপাখ্যান একাধিকবার দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রাণবিন্দুর কন্যা দ্রবিড়া বা ইড়িবিলার সহিত পুলস্ত্যের বিবাহের কথা ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে।

* O. C. Ganguly—'The Cult of Agastya and the Origin of Indian Colonial Art' (Q. J. M. S., Vol. XVII, p. 3, January, 1927).

এই নক্ষত্র ১৩ অংশ কালাংশে উদিত বা অস্তমিত হয়। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে—

"সঙ্খ্যাবিধানাৎ প্রতিদেশমস্ত
বিজ্ঞায় সন্দর্শনমাদিশেজ্‌জ্ঞঃ।
তচ্চোজ্জয়ন্যামগতস্য কন্যাং
ভাগৈঃ স্বরাখ্যৈঃ স্ফুটভাস্করস্থ॥"

অর্থাৎ, পণ্ডিতগণ গণিতের নিয়মানুসারে অগস্ত্যোদয় গণনা করিয়া সকল দেশে আদেশ করিবেন। যখন সূর্য্যের স্পষ্ট (Longitude) কন্যারাশির ৭ অংশ কম অর্থাৎ ৪।২৩ চারি রাশি তেইশ অংশ হইবে, তখন উজ্জয়িনী নগরীতে অগস্ত্যমুনির উদয় হইবে। ইহা সাধারণতঃ ভাদ্রমাসের ২২ হইতে ২৪ দিবসেই হয়।* অগস্ত্যোদয়ে জলরাশি নির্ম্মল হয়, তাহা সংস্কৃতশাস্ত্রে বহুশঃ উক্ত হইয়াছে। অগস্ত্য নক্ষত্র উদিত হইলে সৌর ভাদ্রের শেষ তিন দিন ধরিয়া তাঁহাকে অর্ঘ্যদান করিবার বিধি আছে।† [অগস্ত্যোদয় দ্র°]

এ সম্বন্ধে বৃহৎসংহিতা হইতে নিম্নে মর্ম্মোদ্ধৃত হইল—

অরুণের কিরণপটলে রাত্রির অন্ধকার ঈষৎ দূর হইলে দৈবজ্ঞ সাহায্যে দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া নরপতি দক্ষিণদিকে যথাকালসম্ভূত অর্থাৎ শরৎকালীন সুগন্ধি পুষ্প, ফল, সাগরজাত রত্ন, সুবর্ণ, বস্ত্র, ধেনু, বৃষ, পরমান্নযুক্ত ভক্ষ্য, দধি, অক্ষত, সুগন্ধি ধূপ এবং চন্দনাদি দ্বারা বিরচিত অর্ঘ্য পৃথিবীর উপর প্রদান করিবেন। নরপতি যদি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া এইরূপ অর্ঘ্য ধারণ করেন, তবে নীরোগ হইয়া সমস্ত শত্রুপক্ষ-বিজয়ী হন। আর যদি ঐরূপ অর্ঘ্য যথাক্রমে সাতবর্ষ প্রদান করেন, তবে সমুদ্ররসনা পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিবেন। ব্রাহ্মণগণ যথালব্ধ বস্তুদ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিলে বেদচতুষ্টয়ে অধিকারী হন এবং সুন্দরী রমণী ও পুত্রলাভ করেন। বৈশ্যগণও যদি যথালব্ধ বস্তুদ্বারা অগস্ত্যার্ঘ্য প্রদান করেন, তবে প্রভূত ধনের অধিকারী হন। শূদ্রগণ অর্ঘ্যদান করিলে রোগক্ষয় ও ধর্ম্মফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অগস্ত্য নক্ষত্র যদি পরুষ অর্থাৎ রুক্ষ দৃষ্ট হন, তবে রোগ হয়। কপিলবর্ণ হইলে অনাবৃষ্টি, ধূম্রবর্ণে গোসকলের অশুভ, স্ফুরণশীল অর্থাৎ কম্পবান্ হইলে ভয়, মঞ্জিষ্ঠার ন্যায় বর্ণযুক্ত হইলে ক্ষুধা ও যুদ্ধ এবং সূক্ষ্ম হইলে নগররোধ হইয়া থাকে। অগস্ত্য নক্ষত্র যদি শাতকুম্ভ অর্থাৎ রৌপ্যের ন্যায় বা স্ফটিকতুল্য শুভ্রবর্ণ হইয়া কিরণদ্বারা পৃথিবীকে তর্পিত করেন, তবে পৃথিবী প্রচুর অন্নশালিনী এবং ভয় ও রোগশূন্য জনগণদ্বারা পরিপূর্ণা হয়। অগস্ত্য যদি উল্কা বা কেতুদ্বারা আহত হন, তবে ক্ষুধাভয় ও মরক হয়। যখন সূর্য্য হস্তানক্ষত্রে গমন করেন, তখন অগস্ত্যনক্ষত্র সকল দেশেই দৃষ্ট হন, আর রোহিণীতে গমন করিলে সকল দেশেই অস্তমিত হন।* (বৃহৎসংহিতা ১২.১৫-২২)

অগস্ত্য নক্ষত্র অর্ণবযানমণ্ডলের সর্ব্বোজ্জ্বল তারকা। ইহা অর্ণবযানের কর্ণে অবস্থিত। ইহার নামান্তর মান, মান্য ও মান্দার্য্য। ঔজ্জ্বল্যে লুব্ধকের পরেই ইহার স্থান। ইহা স্থিরভাবে আলো দেয় না, কম্পিত দীপশিখাবৎ প্রতীয়মান হয়। ইহার ক্রমসূক্ষ্ম প্রান্তদ্বয়বিশিষ্ট লম্বাকৃতি ফলকের ন্যায় বলিয়া বোধ হয়। এই সাদৃশ্য হেতু বকফুলের অপর নাম অগস্ত্যপুষ্প। ১২০০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে সম্ভবতঃ অগস্ত্য দক্ষিণ ধ্রুবতারকা ছিল। পৃথিবীর মানদণ্ড বা অক্ষের প্রান্ত অর্থাৎ (দক্ষিণ) মেরুর প্রদর্শক বলিয়া এই নক্ষত্রের নাম মান ও মান্য হইয়াছিল। মান্দার্য্য নামের উৎপত্তি মন্দর শব্দ হইতে। মন্দর মেরুপর্ব্বতের (অর্থাৎ পৃথিবীর অক্ষের) একটী শৃঙ্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ইউরোপীয় জ্যোতিষে এই নক্ষত্র ক্যানোপাস্ (Canopus) নামে পরিচিত এবং ইহা আর্গো মণ্ডলের (Argo) সর্ব্বোজ্জ্বল তারকা। ইহা ঔজ্জ্বল্যে ১ম শ্রেণীর তারকা-সমূহের অন্তর্গত। আর্গো গ্রীক্ শব্দ, ইহার অর্থ হইতেছে অর্ণবযান।

অগস্ত্য৩—দাক্ষিণাত্যের একজন বৈয়াকরণ। প্রবাদ, প্রায় দুই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে ইনি শূদ্রজাতিতে জন্মগ্রহণ করেন।† দাক্ষিণাত্যের লোকে ইঁহাকে পুরাণপ্রসিদ্ধ ঋষি অগস্ত্যের অবতার বলিয়া থাকেন। ইঁহার রচিত ব্যাকরণ অগস্ত্য-ব্যাকরণ নামে প্রসিদ্ধ। ইনি ন্যায়, বৈদ্যক, রসায়নশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। (কবিচরিত্র)

---

* ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণ মতে, সূর্য্যের স্পষ্ট যখন কন্যারাশির ৩ অংশ কম (অর্থাৎ সূর্য্যের স্পষ্ট যখন ৪।২৭ অংশ) তখন অগস্ত্যোদয় হইয়া থাকে। এই অনুসারে সৌরভাদ্রের প্রায় ২৮ তারিখে অগস্ত্যোদয় হয়। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের সময়ে সৌরভাদ্রমাসের প্রায় ১৭ই তারিখে অগস্ত্যের উদয় হইত। [অগস্ত্যোদয় দ্র°]

জীমূতবাহনের কালবিবেক নামক গ্রন্থে উজ্জয়িনী ও রাঢ়াদি প্রদেশে এই নক্ষত্রের উদয়ের উল্লেখ দেখা যায়। ভাদ্রমাসের শেষ চারিদিন থাকিতে উজ্জয়িনীতে ও শেষ সাতদিন থাকিতে রাঢ়াদিতে অগস্ত্য নক্ষত্রের আবির্ভাব হয়। "তথাহি রাঢ়াদিষু সপ্তাদিনাবশিষ্টে ভাদ্রে তস্যোদয়ঃ। উজ্জয়িন্যাং চ দিনচতুষ্টয়াবশিষ্টে।" (কালবিবেক)

† দাক্ষিণাত্যের অধিবাসিগণ ভাদ্রমাসের শেষ চারিদিন ধরিয়া অগস্ত্যার্ঘ্য প্রদান করেন।

* সূর্য্য ১১ই আশ্বিনে হস্তানক্ষত্রে ও ১১ই জ্যৈষ্ঠ রোহিণী নক্ষত্রে গমন করেন। সুতরাং প্রায় ৪ মাস অগস্ত্য দৃষ্টিগোচর হন না। পরাশরও এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

† এবিষয়ে মতের পার্থক্য রহিয়াছে, এজন্য অগস্ত্য৩ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

অগস্ত্য₄—এক দ্রাবিড় শিল্পশাস্ত্রকার। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—শিল্প-সংগ্রহ (অন্ধ্রটীকা সহিত) ; ইহাতে ময়মত, বিশ্বকর্মীয়, চিত্রসব, সারস্বত, বিশ্বসার, চিত্রজ্ঞান, কপিঞ্জলসংহিতা, চন্দ্রজ্ঞান, মানসার, ব্রহ্মশিল্প, ব্রহ্মযামল, নারদীয়, দীপ্তিসার, কৌমুদিক, আগস্ত্যীয়, প্রভৃতি হইতে বিভিন্ন অধ্যায় সংগৃহীত হইয়াছে। প্রথম হইতে ষষ্ঠ অধ্যায়—(১) উত্তমদশমানসংগ্রহবিশেষ, (২) উত্তমদশতাল, (৩) মধ্যমদশতাল, (৪) সোমাস্কন্দলক্ষণ, (৫) চন্দ্রশেখরলক্ষণ, (৬) বৃষবাহনলক্ষণ ; এগুলি আগস্ত্যীয় হইতে গৃহীত।

অগস্ত্য₅—বালভারতচম্পূ, মণিপরীক্ষা বা রত্নপরীক্ষা, লক্ষ্মীস্তোত্র, ললিতাসহস্রনাম, শিবসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

অগস্ত্য₆, অগস্ত্যকবি, অগস্ত্যপণ্ডিত—দাক্ষিণাত্যের বরঙ্গল-বাসী এক কবি। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র ইঁহার প্রতিপালক। ইনি ৬০ খানির অধিক গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তন্মধ্যে মাত্র তিনখানি গ্রন্থ এখন পাওয়া যায়—(১) প্রতাপরুদ্রীয়ম্ ; (২) বালভারতম্ ; (৩) কৃষ্ণচরিতম্ (গদ্যগ্রন্থ)। প্রতাপরুদ্রীয়ের একটী শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায় যে, বালভারত-রচয়িতা অগস্ত্যপণ্ডিত ও বিদ্যানাথ অভিন্ন ব্যক্তি।

অগস্ত্য₇—দাক্ষিণাত্যের কৌন্দৈয়ম্কোত্তৈ মরবন্ জাতির একটী শাখা।

অগস্ত্য₈—[বৈদ্যক] বঙ্গসেনবৃক্ষ, বকফুলগাছ। [অগস্তি, দ্র°]

অগস্ত্যকূট—[অগস্ত্যমলয় দ্র°]

অগস্ত্যগিরি—ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের একটী পর্ব্বত। [অগস্ত্য-মলয় দ্র°]

অগস্ত্যগীতা—শান্তিপর্ব্বে লিখিত অগস্ত্যোক্ত বিদ্যা। বরাহ-পুরাণের পশুপালনোপাখ্যানে ইহার উল্লেখ আছে।

অগস্ত্যচার—অগস্ত্য নক্ষত্রের শুভাশুভফলস্বরূপ দক্ষিণদিকে গতি ; অগস্ত্য নক্ষত্রের উদয়। [অগস্ত্য₂ ও অগস্ত্যোদয় দ্র°]

অগস্ত্যজাতক—এক বৌদ্ধজাতক। বোধিসত্ত্ব একবার এক ধনী ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া দানাদি কর্ম্ম দ্বারা লোকবিদিত হইয়াছিলেন। তিনি তাহার পর অগস্ত্য নাম গ্রহণপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাঁহার ধর্ম্ম-প্রাণতার কথা শুনিয়া অনেকে তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। ইহাতে ধর্ম্মচিন্তার ব্যাঘাত হওয়ায় তিনি কারা-দ্বীপে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র এই সময়ে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। অগস্ত্য যে বনে বাস করিতেছিলেন, ইন্দ্রের মায়ায় সেই স্থান হইতে ক্রমে সমস্ত ভোজ্য ফলমূলাদি অন্তর্হিত হইল। তখন অগস্ত্য বৃক্ষের পত্র ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া ইন্দ্র বৃক্ষপত্র, এমন কি তৃণ পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অগস্ত্য তখন ভূতলে পতিত কাঁচা পত্র খাইতে লাগিলেন। অনন্তর ইন্দ্র এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি জন্য এই তপস্যা করিতেছ ?" তপস্বী তখন বলিলেন, "আমি এই জন্মান্তরচক্র হইতে মুক্ত হইতে চাই"। ইন্দ্র যখন দেখিলেন যে, এই তপস্বী তাঁহার ইন্দ্রত্ব আকাঙ্ক্ষা করেন না, তখন তিনি তাঁহাকে মনোমত বর চাহিতে বলিলেন। অতঃপর অগস্ত্য ইন্দ্রকে অনেক ধর্ম্মকথা বলিয়াছিলেন।*

[Art 'On the Buddhist Jātakas' (J. R. A. S)—H. Wenzel, Ph. D. ; Sanskrit Buddhist Literature of Nepal—Rajendralal Mitra, C. I. E.]

অগস্ত্যমলয়—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের নেয্যাতিনকর তালুকের মধ্যস্থিত পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার একটী শৃঙ্গ। ইহা সমুদ্র হইতে ৬২০০ ফুট উচ্চ। অক্ষা° ৮°৫'৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৩৩'৫০" পূঃ মধ্যে অবস্থিত। তাম্রপর্ণী ও নেয্যার নদী এই স্থান হইতে বহির্গত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই পর্ব্বত জ্যোতিষগণনার কেন্দ্রস্থল ছিল। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, দাক্ষিণাত্যে আর্য্যসভ্যতার পথপ্রদর্শক ঋষি অগস্ত্য এই পর্ব্বত-শৃঙ্গে যোগনিরত আছেন। [অগস্ত্যাশ্রম দ্র°]

অগস্ত্যমার্গ—অগস্ত্যের পথ, দক্ষিণদিক্।

অগস্ত্যমুনি₁—ঋষি অগস্ত্য। [অগস্ত্য, দ্র°]

অগস্ত্যমুনি₂—একটী গ্রাম। গড়বালের রুদ্রপ্রয়াগ হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে এই গ্রাম অবস্থিত। সাধারণের ধারণা, এখানে অগস্ত্যের আশ্রম ছিল। [অগস্ত্যাশ্রম দ্র°]

অগস্ত্যযাত্রা—অগস্ত্যমুনির প্রস্থান ; বিন্ধ্যলঙ্ঘনপূর্ব্বক অগস্ত্যের দাক্ষিণাত্যে যাত্রা। অগস্ত্য ভাদ্রমাসের প্রথম দিন বিন্ধ্য লঙ্ঘন করিয়া দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করেন, আর ফিরেন নাই। এই হেতু ঐ দিনে যাত্রা নিষিদ্ধ। লৌকিক আচারে ইহা হইতে মাসের প্রথম দিন যাত্রায় নিষিদ্ধ। ২ অগস্ত্যযাত্রা করা, চিরকালের জন্য প্রস্থান করা, জন্মের মত যাওয়া।

অগস্ত্যরস—উদররোগাধিকারোক্ত রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—রস, গন্ধক, জয়পালবীজ, লৌহ, শিলাজতু, তাম্র ও হরিদ্রা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইবে। পরে ত্রিকটু, ভৃঙ্গরাজ, আর্দ্রক, নিম্ব, নিশুণ্ডী ও স্বর্ণুলী ইহাদের কাথে একবার মর্দ্দন করিয়া এই রসৌষধ প্রস্তুত করিবে। পরিমাণ রোগীর বলাবল দেখিয়া নিরূপণ করা আবশ্যক। অনুপান—গুড়, হরীতকী বা কাম্পিল্য চূর্ণ। এই ঔষধ উদররোগের পক্ষে বিশেষ হিতকর। (রসেন্দ্রসারস°)

* নেপালে আবিষ্কৃত বোধিসত্ত্ব অবদানে লিখিত আছে—ইন্দ্রকর্ত্তৃক ভোজ্য অপহৃত হইলে চারিদিন অনাহারে থাকিবার পর অগস্ত্যের প্রাণবিয়োগ ঘটে।

অগস্ত্যবট—তীর্থবিশেষ। মহাভারতের আদিপর্ব্বে এই তীর্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (মহাভা° ১.২১৬.২)

অগস্ত্যবার—বারাণসী জেলার হবেলী পরগণার একটী ক্ষুদ্র রাজপুত সম্প্রদায়। ইঁহারা অগস্ত্যঋষির বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন।

অগস্ত্যবাল—কাঠিয়াবাড়ের নিমারি ও বেদারণ্য এবং আহ্মদাবাদ ও ঢোলকার অধিবাসী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়বিশেষ। অগস্ত্যঋষি হইতে ইঁহাদের উৎপত্তি বলিয়া প্রকাশ।

অগস্ত্যবাস্তুশাস্ত্র—একখানি শিল্পশাস্ত্র। এখানি অগস্ত্যের নামে উৎসর্গীকৃত। ইহাতে বাস্তপত্তিবিভাগ, বাস্তপরোক্ষবিধি, মাসনক্ষত্রপ্রক্রিয়াবিধান, রাজগৃহবিধান, দুর্গনিবেশ, দুর্গাদিকরণ, স্কন্ধাবারবিন্যাস, রাজবেশ্মনিধান, প্রাকারবিধান, গোপুরবিধান, বেশ্মবাসাধিকার, প্রসূতিকাগারবিধান, নিশান্তপ্রবেশ, দিব্যস্থানবিধান ও যন্ত্রবিধান নামক কয়টী অধ্যায় আছে।

অগস্ত্যশিখা—বৃহস্পতি কর্ত্তৃক নির্দ্দেশিত শ্রাদ্ধে ব্যবহৃত দ্রব্যগুলির মধ্যে একটী। ইহা অতিশয় তীব্র ও কষায়গুণসম্পন্ন। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৭৮.৯)

অগস্ত্য-সার—অযোধ্যা নগরীর একটী কুণ্ড। সরযূর দক্ষিণে অবস্থিত। কথিত আছে, এই স্থানে স্নান, দান, যাগ, যজ্ঞ ও তিন রাত্রি বাস করিলে অগ্নিষ্টোম যাগের ফললাভ হয় এবং যিনি তিন রাত্রি তথায় ফলমূলাহারী হইয়া অতিবাহিত করেন, তিনি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হন। (অযোধ্যা-মাহাত্ম্য)

অগস্ত্যসংহিতা—অগস্ত্যমুনিরচিত শাস্ত্রবিশেষ। ইহার অপর নাম 'সিদ্ধগীতা'। এই সংহিতায় আত্মাকেই সার ও শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলা হইয়াছে। পণ্ডিতসমাজে এই সংহিতা দেহতত্ত্ব নামে পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহাতে তপঃসিদ্ধা উলূপীর বিবিধ হিতোপদেশপূর্ণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানসমন্বিত, পরম বিশুদ্ধ ও যুক্তিগর্ভ উপাখ্যান আছে, এইজন্য ইহার নাম 'সিদ্ধগীতা'। ভগবতী দেবী পার্ব্বতী লোকানুগ্রহপরতার বশবর্ত্তিনী হইয়া মহর্ষি অগস্ত্যকে যোগবিয়োগ-সমন্বিত বহুবিধ তত্ত্বোপদেশ প্রদান করেন। এইজন্য ইহার নাম 'অগস্ত্যসংহিতা'।

অগস্ত্যহরীতকী—কাসরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—দশমূল, আলকুশীবীজ, শঙ্খপুষ্পী, শঠী, বেড়েলা, গজপিপ্পলী, অপামার্গ, পিপুলমূল, চিতামূল, বামুনহাটী ও কুড় এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দুই দুই পল, পোট্টলীবদ্ধ যব ৮ সের এবং হরীতকী একশতটী, এই সকল দ্রব্য একত্র দুই মণ জলে সিদ্ধ করিতে হইবে। অর্দ্ধমণ অবশিষ্ট থাকিতে এবং যবগুলি উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে সেই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইবে। সিদ্ধ হরীতকীগুলির গাত্রে ছিদ্র করিয়া তাহা এক সের গব্যঘৃত ও এক সের তিলতৈলে ভাজিয়া লইতে হইবে। তৎপরে সেই ক্বাথে সাড়ে বারো সের পুরাতন গুড় গুলিয়া ঐ ভাজা হরীতকীগুলি তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া মৃদু অগ্নির জ্বালে পাক করিবে। উহা ক্রমে ঘনীভূত হইলে তাহাতে অর্দ্ধসের পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। পরে উহা শীতল হইলে তাহার সহিত এক সের খাঁটী মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ অর্দ্ধতোলা হইতে দুই তোলা মাত্রায় অবলেহন করিতে হয়; এবং সেই সঙ্গে আধখানি হইতে দুইটী পর্য্যন্ত হরীতকী সেবন বিধেয়। এই হরীতকী সেবনে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, হিক্কা, বিষমজ্বর, গ্রহণী, অর্শ, অরুচি, হৃদ্রোগ ও পীনস প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। কাসরোগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারক ও বলবর্ণাদির বৃদ্ধিকর। (চক্রদ° কা°স°)

অগস্ত্যার্ঘ্য—অগস্ত্যঋষির উদ্দেশে অর্ঘ্যদান।

"অপ্রাপ্তে ভাস্করে কন্যাং শেষভূতৈস্ত্রিভির্দিনৈঃ।
অর্ঘ্যং দদ্যুরগস্ত্যায় গৌড়দেশনিবাসিনঃ॥
যস্ত ভাদ্রপদস্যান্তে উদিতে কলসোদ্ভবে।
অর্ঘ্যং দদ্যাদগস্ত্যায় সর্ব্বান্ কামান্ লভেত সঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

সূর্য্য কন্যারাশিতে গমন না করিতে—ভাদ্রমাসের শেষ তিন দিনে গৌড়দেশনিবাসিগণ অগস্ত্যকে অর্ঘ্য প্রদান করিবেন। যিনি অগস্ত্যোদয়ে অগস্ত্যকে অর্ঘ্য প্রদান করেন, তিনি সকল অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকেন।

রঘুনন্দন কৃত্যতত্ত্বে এই অর্ঘ্যদানের বিধান এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মাসস্থলে সৌরমাসই বুঝিতে হইবে। কারণ ইহা সিংহস্থ রবিতে অর্থাৎ ভাদ্রমাসে কর্ত্তব্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। "সিংহস্থরবিকর্ত্তব্যত্বেন সৌরমাসাদরঃ কন্যার্কসংক্রান্তিপূর্ব্বদিনত্রয়ান্যতমে অগস্ত্যার্ঘ্যদানং কর্ত্তব্যং"। (কৃত্যতত্ত্ব) কন্যার্কসংক্রান্তির অর্থাৎ ভাদ্রমাসের শেষ তিনদিনের মধ্যে যে কোন দিনে এই অর্ঘ্য দিতে হইবে। যে দিন অর্ঘ্যদান করিতে হইবে, সেইদিন প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া সংকল্প করিবে। "ওঁ অদ্যেত্যাদি সর্ব্বাভিলষিতসিদ্ধিকামঃ অগস্ত্যপূজনমহং করিষ্যে" এইরূপ সংকল্প করিয়া সামান্য পূজাপদ্ধতির নিয়মানুসারে পূজাদি করিয়া, "এতৎ পাদ্যং ওঁ অগস্ত্যায় নমঃ" এইরূপে পাদ্য প্রদান করিয়া, সিতপুষ্প অক্ষত ও জল শঙ্খে লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। যথা—

"ওঁ কাশপুষ্পপ্রতীকাশ অগ্নিমারুতসম্ভব।
মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্র কুম্ভযোনে নমোঽস্তু তে॥"

এই মন্ত্রে অর্ঘ্যদান করিয়া আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূনা, দীপ ও নৈবেদ্যাদি প্রদান করিবে। তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রার্থনা করিতে হয়।

"বাতাপির্ভক্ষিতো যেন আতাপিশ্চ মহাসুরঃ।
সমুদ্রঃ শোষিতো যেন স মেঽগস্ত্যঃ প্রসীদতু॥"

তৎপরে দক্ষিণান্তাদি করিবে। (কৃত্যতত্ত্ব) অগস্ত্যোদয়ে এই অগস্ত্যার্ঘ্যদান সকলেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। যিনি বিধিবিধানে এই অর্ঘ্য প্রদান করেন, তাঁহার সকল অভিলাষ সিদ্ধ এবং সকল বিপদ বিনষ্ট হয়। অগস্ত্যের পূজা ও অর্ঘ্য দক্ষিণাভিমুখে দিতে হয়। কারণ অগস্ত্য নক্ষত্রের দক্ষিণদিকে উদয় হয়। এই দিনে অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রাকেও অর্ঘ্যদান কর্ত্তব্য। লোপামুদ্রাকে নিম্নোক্ত মন্ত্রে অর্ঘ্য দিতে হয়।

"লোপামুদ্রে মহাভাগে রাজপুত্রি পতিব্রতে।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং মিত্রাবরুণিবল্লভে॥"

রঘুনন্দন কৃত্যতত্ত্বে প্রয়োগবিধিস্থলে লোপামুদ্রার অর্ঘ্যদান ধরেন নাই, কিন্তু মলমাসতত্ত্বে অগস্ত্যার্ঘ্যদানের প্রসঙ্গে লোপামুদ্রার অর্ঘ্যদানের বিষয় বলিয়াছেন। সুতরাং অগস্ত্যার্ঘ্য দানের পর লোপামুদ্রাকেও অর্ঘ্যদান বিধেয়।

অগস্ত্যার্ঘ্যব্রত—ব্রতবিশেষ। গরুড়পুরাণে (১১৬-১৩৭ অ°) এই ব্রতকথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

অগস্ত্যাশ্রম—অগস্ত্য মুনির আশ্রম। এই আশ্রমের স্থাননির্দ্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। [অগস্ত্য, দ্র°] রামায়ণের মতে, বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণে দণ্ডকারণ্যে এই আশ্রম। মহাভারতের মতে, অগস্ত্যাশ্রম গয়ার নিকটে ছিল। (বন° ৯৭-৯৯ অ°) বৃহন্নীলতন্ত্রের মতে এখানে দেবী মহাবিদ্যার পীঠস্থান। এই কয়টী স্থানও অগস্ত্যাশ্রম বলিয়া পরিচিত—

(১) দাক্ষিণাত্যে নাসিক হইতে ২৪ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান নাম অগস্তিপুরী। এই স্থানে ঋষি অগস্ত্যের আশ্রম ছিল। (২) নাসিকের পূর্ব্বে অবস্থিত অকোল্‌হ জনপদ অগস্ত্যের আশ্রম। (রামা°. ৩.১১) (৩) বোম্বাই প্রদেশে কোল্‌হাপুরে অগস্ত্যের আশ্রম। (৪) যুক্তপ্রদেশের সরৈয়াঘাট—ইহা ইটা হইতে ৪০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে এবং সঙ্কিশ হইতে প্রায় ১ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। (৫) তাম্রপর্ণী নদীর উৎপত্তি স্থান তিনেবেলির অগস্ত্যকূট বা অগস্ত্যমলয় পর্ব্বত। এখানকার অধিবাসীদের বিশ্বাস, আজও অগস্ত্য এইস্থানে বাস করিতেছেন। (Caldwell's Dravidian Gr. Intro. 118 ; ভাসকৃত অবিমারক, ৪র্থ অঙ্ক)। (৬) গড়বালের রুদ্রপ্রয়াগ হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে 'অগস্ত্যমুনি' নামক গ্রাম। সাধারণের ধারণা, এই স্থানে অগস্ত্যের আশ্রম ছিল। (৭) বৈদূর্য্য পর্ব্বত বা সাতপুরা পর্ব্বতশ্রেণীর উপরিস্থ আশ্রম (মহাভা°, বন° ৮৮ অ°)।

অগস্ত্যেশ, অগস্ত্যেশ্বর—শিব। উজ্জয়িনী নগরে শূলেশ্বর তীর্থের পূর্ব্বদিকে যে কুণ্ড আছে, সেই স্থানে বসিয়া অগস্ত্যঋষি মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ভক্তবৎসল মহাদেব সেইস্থানে আবির্ভূত হন। এই শিবই অগস্ত্যেশ বা অগস্ত্যেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। (সৌরপু°)

অগস্ত্যেশ্বরাষ্টকম্—কোপ্পরাজ সুব্বয়লিখিত গুণ্টুরে অনুষ্ঠিত অগস্ত্যের একটী স্তুতিপাঠ।

অগস্ত্যোদয়—দক্ষিণদিকে অগস্ত্য নক্ষত্রের (Canopus) উদয়। অগস্ত্যের উদয়ে জল নির্ম্মল হয়। "প্রসসাদোদয়াদম্ভঃ কুম্ভযোনের্মহৌজসঃ।" (রঘু°) রঘুনন্দনের মতে, সৌর ভাদ্র মাসের সপ্তদশ দিবসে সূর্য্য সিংহরাশিতে গমন করিলে অগস্ত্যের উদয় হয়।* ভাদ্রমাসের তিন দিন থাকিতে ব্রাহ্মণেরা অগস্ত্য নক্ষত্রকে ও তাঁহার পত্নী লোপামুদ্রাকে অর্ঘ্য দেন।† [অগস্ত্যার্ঘ্য দ্র°]

অগস্ত্যোপাখ্যানম্—একখানি আখ্যানগ্রন্থ। ইহাতে ভাদ্রপদ মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থ দিবসে বিনায়কের পূজার উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু বিবরণ আছে। অগস্ত্য ও বিনায়কের মধ্যে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেগুলি ইহাতে থাকায় ইহার নাম 'অগস্ত্যোপাখ্যান' হইয়াছে।

অগস্‌বার্গ—জর্মন সাম্রাজ্যভুক্ত বাভেরিয়া রাজ্যের একটী নগর এবং জর্মনীর একটী ধর্ম্মাধিকার কেন্দ্র (Episcopal See)। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫০০ ফিট্ উচ্চ অধিত্যকাভূমে হ্বারটাক্ ও লেক্ নদীর সঙ্গমস্থলের কিছু উর্দ্ধে মিউনিক্ শহর হইতে ৩৯ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। ইহা স্বাবিয়া জেলার সদর এবং রেলপথদ্বারা মিউনিক্, রেগেনবর্গ, ইঙ্গলষ্টাড্ ও উলম্ শহরের সহিত সংযুক্ত থাকায় এখানকার বাণিজ্যপ্রসার বহুল হইয়াছে। মূল নগরের উপকণ্ঠে জেকব প্রভৃতি কএকটী সুন্দর নগর অপূর্ব্ব সৌধমালায় সুশোভিত এবং বাণিজ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ।

এখানকার গোল্ডন-হল নামক টাউন-হল, ফাগার-হাউস, রাজা ৫ম চার্লসের প্রাসাদ ও অপরাপর কএকটী অট্টালিকা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং জর্মনীর স্থাপত্য-শিল্পের গৌরবস্থল। এখানে ১৭টী রোমান্ ক্যাথলিক গির্জ্জা এবং খৃষ্টীয় ১০ম শতকে রোমক স্থাপত্যের আদর্শে গঠিত একটী বৃহদায়তন গীর্জ্জা ও তাহার দীর্ঘ চূড়া এখনও এই স্থানের প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। সেণ্ট্ উলরিক্ ও সেণ্ট্

* এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। [অগস্ত্য২ দ্র°]

† দাক্ষিণাত্যবাসীরা ভাদ্রমাসের শেষ চারিদিন ধরিয়া অগস্ত্যকে অর্ঘ্য প্রদান করেন।

আক্‌রার গীর্জ্জা দুইটী ১৪৭৪ হইতে ১৫০০ খৃষ্টাব্দে মধ্য-গথিক যুগের শিল্পাদর্শে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এখানকার প্রোটেষ্টাণ্ট্‌ খৃষ্টানদিগের সেণ্ট্‌ আনের গীর্জ্জা, শিল্পশালা, প্রাচীন সেণ্ট্‌ ক্যাথারিন্‌বিহারে রক্ষিত চিত্রশালা, যাদুঘর, মান-মন্দির, বোটানিকাল গার্ডেন, এক্সচেঞ্জ, ব্যায়ামাগার, মূকবধির-বিদ্যালয়, অনাথাশ্রম এবং খৃষ্টীয় ১৬শ শতকে নির্ম্মিত কএকটী সুদৃশ্য ফোয়ারা উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমানযুগের স্থাপত্যশিল্পের আদর্শে নির্ম্মিত এখানকার আদালতগৃহ, রঙ্গালয় ও মিউনিসিপাল লাইব্রেরী নগরের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত। ফাগারী (Fuggerei) নামক অনাথাশ্রম ১০৬ খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অট্টালিকায় স্বতন্ত্র নগরাকারে এই নগরোপকণ্ঠে ধর্ম্মাচার্য্য ফাগারগণ (Brothers Fugger) কর্ত্তৃক ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা একটী সুদীর্ঘ মুসাফিরখানা। এখানে স্থানীয় রোমান্‌ ক্যাথলিকগণ নাম মাত্র ভাড়া দিয়া থাকিতে পায়।

অগস্‌বার্গ দক্ষিণ জর্মনীর একটী প্রশস্ত বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে কার্পাসবস্ত্রের বিস্তৃত কারখানা আছে। এতদ্ভিন্ন ইঞ্জিন প্রস্তুত ও ঢালাই-এর কারখানা, কাগজ ও ঘড়ির কারখানা, নানাবিধ যন্ত্র, চামড়া ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কারখানা আছে। এখানকার জগদ্বিখ্যাত Allgemeine Zeitung বা অগস্‌বার্গ-গেজেট নামক সংবাদপত্র মুদ্রণার্থ মুদ্রাযন্ত্র সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে প্রথিত। পূর্ব্বকথিত নদীসঙ্গমের অপর পারস্থিত লেক্‌লুজেন নগরের সহিত এই নগর সেতুদ্বারা সংলগ্ন।

প্রসিদ্ধ রোমকসম্রাট্‌ অগষ্টাসের নামানুসারে এই নগরের নামকরণ হইয়াছিল। সম্রাট্‌ অগষ্টাস্‌ রিটিয়া প্রদেশ জয়মানসে স্বীয় সেনাপতি ড্রুসাস্‌কে প্রেরণ করেন। ড্রুসাস্‌ রিটিয়া জয় করিয়া এখানে একটী রোমক উপনিবেশ স্থাপন করেন (১৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে)। খৃষ্টীয় ১৫শ শতকে হূনগণ এই স্থান লুণ্ঠনপূর্ব্বক বিধ্বস্ত করিয়া যায়। পরে ইহা ফ্রাঙ্কজাতীয় (Frankish) রাজাদিগের অধিকারে আসে। বাভেরিয়ার অধিপতি ৩য় টাসিলোর সহিত যুদ্ধকালে সম্রাট্‌ শার্লেমেন (Charlemagne) এই নগর সমূলে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে যখন সাম্রাজ্যবাদ ঘুচিয়া যায় এবং জর্মন-সাম্রাজ্য বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে, তখন এই নগর স্বাবিয়ার (Swabia) ডিউকদিগের অধিকারে আসে। এই সময় হইতে এই স্থান ব্যবসা ও বাণিজ্যসম্পদে পূর্ণ হইয়া উঠে এবং উত্তর-ইউরোপখণ্ডে ও দক্ষিণে ইতালী পর্য্যন্ত এখানকার উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইতে থাকে। নূরেম্বার্গের পর ইহাই তৎকালে জর্মনীর দ্বিতীয় বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। এখানকার রাজপরিবারভুক্ত বণিক্‌মণ্ডলী ফাগার ভ্রাতৃগণ (Fuggers) এবং ওয়েলসার পরিবারের প্রচেষ্টায় ও বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় অচিরে অগস্‌বার্গ সমগ্র ইউরোপের একটী প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিগণিত হইয়াছিল। কিন্তু খৃষ্টীয় ১৫শ ও ১৬শ শতকের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি আবিষ্কারের ফলে তাঁহাদের এই বাণিজ্যস্রোত ভিন্নপথে চালিত হয় এবং ক্রমে তাঁহাদের অবাধ বাণিজ্যে ভাটা পড়িতে থাকে।

১২৭৬ খৃষ্টাব্দে এই নগরী একটী স্বাধীন জনপদের রাজধানীরূপে গণ্য হয় এবং শাসনসংক্রান্ত অনেক বিধির পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও উহা ১৮০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জর্মন সাম্রাজ্যের রাজধানী থাকে। অতঃপর উহা বাভেরিয়া রাজ্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়। খৃষ্টীয় ১৬শ হইতে ১৯শ শতকের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ে এখানে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কয়টী বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

খৃষ্টীয় ১৬৩২ অব্দে গষ্টাভাস্‌ এডল্‌ফাস্‌ এই নগর অবরোধ ও জয় করেন। ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে ইহা পুনরায় রাজসৈন্যের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে বাভেরিয়ার নির্ব্বাচিত রাজকুমার নগর অবরোধপূর্ব্বক গোলাবর্ষণ করিতে থাকেন এবং নগরবাসিগণ আত্মরক্ষার জন্য বিব্রত হইয়া রাজকুমারকে ৪ লক্ষ ডলার মুদ্রা দিয়া মুক্তিলাভ করেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে পুনরায় এখানে যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের ফলে নগরের ভীষণ ক্ষতি হইয়াছিল।

খৃষ্টধর্ম্মের প্রসার, পরিবৃদ্ধি ও সংস্কার বিষয়ে আলোচনার জন্য এখানে ধর্ম্মাচার্য্যগণের কয়েকটী ধর্ম্মমহাসঙ্ঘ অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে রাজা ৫ম চার্লসের সম্মুখে যে সংস্কৃত স্বীকৃতিপত্র (Confession of Faith) স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, তাহা সমগ্র ইউরোপখণ্ডে 'অগস্‌বার্গের স্বীকৃতিপত্র' (Confession of Augsburg") নামে প্রথিত।*

* ইউরোপের সংস্কারযুগে এই বিবৃতিপত্রই প্রোটেষ্টাণ্ট্‌ খৃষ্টানদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনা। রাজা ৫ম চার্লস্‌ ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই ধর্ম্মসঙ্ঘ আহ্বান করেন এবং তাঁহার সমক্ষে উপনীত থাকিয়া লুথার, জাষ্টাস্‌ জোনাস্‌, মেলাঙ্কথোন ও জোহান্‌ বুগেন্‌ হেগেন এই বিবৃতিপত্রের খসড়া প্রস্তুত করেন। ইহা লুথারের অনুমোদিত মতের স্বরূপ। কোন কোন রাজা ও নগরবাসী এই মত স্বীকারপূর্ব্বক স্বাক্ষর করিলেও অনেকে ইহার বিরুদ্ধ মত পোষণ করিতেছিলেন। সেই কারণ মেলাঙ্কথোন পুনরায় ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে "Confession and Apology" প্রকাশ করিয়া সাধারণের সন্দেহ নিরসন করেন।

ইহার প্রায় সার্দ্ধাধিক শতাব্দ পরে সমগ্র ইউরোপব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ প্রশান্তির জন্য এখানে নেতৃবৃন্দের একটী মহাসম্মিলন বসিয়াছিল। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুলাই ঐ বৈঠকের কার্য্য সম্পন্ন হয়। উহা 'লীগ অব্ অগস্‌বার্গ' (League of Augsburg) নামে খ্যাত। এই সম্মিলনে স্বয়ং জর্মন-সম্রাট্, ব্রাডেন্‌বর্গের শাসনকর্ত্তা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসকবৃন্দ ফরাসী-নীতির বিরুদ্ধে সমবেত হইয়াছিলেন। স্পেন, সুইডেন, ইংলণ্ড এবং আরও অনেকগুলি সামন্তরাজ্য এই সম্মিলনে যোগদান করেন।

বিগত মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) জর্মনীর বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে অগস্‌বার্গের শ্রীবৃদ্ধির হ্রাস ঘটিয়াছে। [জর্মনী দ্র°]

অগহাট—কনৌজের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন সংকিশ নগরীর ধ্বংসাবশেষের ¼ মাইল উত্তরপশ্চিমে অগহাট নামে এক বিশাল ধ্বংসস্তূপ আছে। এই ধ্বংসস্তূপের ব্যাস অর্দ্ধ মাইলেরও অধিক এবং ইহার উচ্চতা প্রায় ৪০ ফুট। ঐ স্থানের প্রাচীন নাম অগহাট। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে (১০৮০ হিজরিতে) ধ্বংসাবশেষের উত্তরপূর্ব্ব কোণে স্থানীয় পাঠান জমিদারগণের পূর্ব্বপুরুষেরা একটী সরাই নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই জন্য এই স্থানকে এখন 'অগহাট সরাই' বলা হয়। মানচিত্রে এই স্থান 'অঘাট' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে দিল্লী ও জৌনপুরের মুসলমান নৃপতিগণের অনেকগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ ধ্বংসস্তূপটী দেখিয়া মনে হয়, সংকিশ ও অগহাট একই সময় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল।

অগা—পশ্চিম-ভারতের অব্রাসা এবং কানরের অধিবাসী এক ক্ষুদ্র মুসলমান সম্প্রদায়।

অগাইট্—ভূস্তরে প্রাপ্ত খনিজ প্রস্তরবিশেষ। চূণ, মাগ্নেসিয়ম্, আলুমিনিয়ম্ ও লৌহ-যোগে উৎপন্ন। গ্রানাইট্ ও আগ্নেয় শিলাস্তরে বিভিন্ন বর্ণের এই জাতীয় প্রস্তর পাওয়া যায়। ইহাকে হর্ণব্লেণ্ড (Horn-blend) বলে। [গ্রানাইট্ দ্র°]

অগা খান্—আগা খাঁ নামে পরিচিত। [আগা খাঁ দ্র°]

অগাধ—গাধ প্রতিষ্ঠায়াং ঘঞ্, নঞ্, বহুব্রী°। (ত্রি) অতি গভীর, অতলস্পর্শ। ২ গম্ভীর (রঘু° ৬.২১)। ৩ দুর্ব্বোধ, দুর্জ্ঞেয়। ৪ নিম্ন সীমারহিত, বিপুল, প্রচুর। ৫ ছিদ্র। ৬ স্বধাকারের বিষয়ীভূত পিঠরাদি পঞ্চাগ্নির অন্যতম। বাণযুদ্ধপ্রসঙ্গে ইঁহার উল্লেখ আছে। (হরিবংশ)

অগাধপল—আনদ্ধ যন্ত্র।

অগাধিরাজ—নগাধিরাজ হিমালয়।

অগামেদিস্ (Agamedes)—প্রাচীন গ্রীসের একজন প্রসিদ্ধ বীর। ইনি প্রাচ্য গ্রীক্‌রাজ্যের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। [অগমেদিস্ দ্র°]

অগামেম্‌নন্—প্রসিদ্ধ গ্রীক্ নৃপতি ও বীর। ইনি অত্রেয়ুসের (Atreus) পুত্র ও মেনেলসের ভ্রাতা। অত্রেয়ুস্ মাইকেনির রাজা ছিলেন। ঈগিস্‌থাস্ নামক এক নৃপতি অত্রেয়ুস্‌কে নিহত করিয়া তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিলে অগামেম্‌নন্ ও মেনেলস্ স্পার্টার রাজা টিন্দারিয়ুসের শরণাগত হন। এই টিন্দারিয়ুসের এক কন্যা ক্লাইটিম্‌নেষ্ট্রাকে অগামেম্‌নন্ ও অপর কন্যা হেলেন্‌কে মেনেলস্ বিবাহ করেন। শ্বশুরের সহায়তায় পিতৃহন্তা ঈগিস্‌থাস্‌কে বিতাড়িত করিয়া অগামেম্‌নন্ পিতৃরাজ্য পুনরধিকার করেন ও ক্রমে রাজ্যবিস্তার করিয়া গ্রীসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলপরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। ইহার কিছুকাল পরে ট্রয়ের রাজপুত্র পারিস্ ইঁহার ভ্রাতৃবধূ হেলেন্‌কে হরণ করিয়া লইয়া যান। তখন অগামেম্‌নন্ অপর নৃপতিগণের সহায়তায় এক বিশাল নৌবাহিনী লইয়া ট্রয় অভিমুখে অভিযান করেন। কিন্তু অর্তীমীস দেবীর অভিশাপে ইঁহার সৈন্যদলে মহামারী দেখা দেয় এবং অনুকূল বায়ুর অভাবে নৌবাহিনীও অগ্রসর হইতে অসমর্থ হয়। তখন দৈবজ্ঞের উপদেশানুসারে অগামেম্‌নন্ স্বীয় কন্যা ইফিজিনিয়াকে দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। অতঃপর ট্রয়নগর অবরুদ্ধ হয় এবং দশ বৎসর অবরোধের পর ট্রয়ের ধ্বংস সাধিত হয়। মধ্যে অগামেম্‌ননের সহিত অকীলিসের একবার বিবাদ হইয়াছিল। [অকীলিস্ দ্র°] তৎপরে তাঁহারা গ্রীসে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অগামেম্‌নন্ ট্রয়ের রাজকন্যা কাসান্দ্রাকে বন্দী করিয়া গ্রীসে লইয়া আসিয়াছিলেন। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া অগামেম্‌নন্ দেখিলেন, তাঁহার পত্নী অপরের সহিত ব্যভিচারিণী হইয়াছেন। অগামেম্‌নন্ ও কাসান্দ্রা উভয়েই পরে এই ব্যভিচারিণী পত্নীকর্তৃক নিহত হন। অগামেম্‌ননের পুত্র ওরেস্তেস্ পরে ইফিজিনিয়ার হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে গ্রীসে অনেক নাটক লিখিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে এস্কাইলাস্ প্রণীত 'ওরেস্তিয়া'ই সমধিক প্রসিদ্ধ। অগামেম্‌ননের রাজোচিত শৌর্য্য ও গাম্ভীর্য্য ছিল। কিন্তু মধ্যে মধ্যে কিছু ঔদ্ধত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার বংশ পূর্ব্বাপর অভিশপ্ত ছিল বলিয়া কিংবদন্তী আছে।

অগারধূম—গৃহধূম, ঝুল। ঘরে ধূম লাগিলে ঝুল পড়িয়া থাকে। (বাভট, উঃ, ৩৮ অ°)

অগারধূমাদ্যতৈল—[বৈদ্যক] তৈলবিশেষ। এই তৈল লাগাইলে উপদংশ হইতে পূযাদি নিঃসৃত হইয়া উহা শুষ্ক ও স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত হয়। ভাগ পরিমাণ—তৈল ৪ সের, কল্কার্থ গৃহের ঝুল ১ পল ১ কর্ষ ৫ মাষা ৩ রতি, হরিদ্রা ২ পল ২ কর্ষ ১০ মাষা ৬ রতি, মম্বীজ ৪ পল। [ভৈষজ্যরত্না°]

অগাবহ—একজন রাজা। যত্নবংশীয় নরপতি বসুদেবের ঔরসে এবং ত্রিগর্ত্তরাজের কন্যা বৃকদেবীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি একজন বলবান্ রাজা ছিলেন। কংসারির সহিত যখন জরাসন্ধের যুদ্ধ হয়, সেই সময় ইনি জরাসন্ধের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। (হরিবংশ ৩৬ অ° ; পদ্মপু°, সৃষ্টিখণ্ড)

অগালহাস—আফ্রিকার সর্ব্বদক্ষিণে অবস্থিত একটী অন্তরীপ। অক্ষা° ৩৪°৫১′ দঃ এবং দ্রাঘি° ২০° পূঃ। প্রবল ঝটিকার জন্য এখানে প্রায়ই জাহাজ গমনাগমনের অসুবিধা ঘটে। এখানে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে একটী আলোকস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়।

অগাশিব—বোম্বাই প্রদেশান্তর্গত সাতারা জেলার একটী পর্ব্বত। ইহা সমতলভূমি হইতে ১২০০ ফুট উচ্চ। পর্ব্বতের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে অনেকগুলি বৌদ্ধগুহা দেখিতে পাওয়া যায়।

অগাসি—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত থানা জেলার বেসিন মহকুমার একটী নগর এবং বন্দর। অক্ষা° ১৯°২৭′৪৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৪৯′৩০″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার জনসংখ্যা প্রায় সাত হাজার। এই বন্দর হইতে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ৫ লক্ষ টাকার দ্রব্য রপ্তানি এবং প্রায় দেড় লক্ষ টাকার দ্রব্য এখানে আমদানি হইয়া থাকে। ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহা দক্ষিণ-ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। তৎকালে এই স্থানে জাহাজ প্রস্তুত হইত। ১৫৩০ এবং ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে ইহা দুইবার পর্ত্তুগীজগণ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বিধ্বস্ত হইয়াছিল। এই স্থানে ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত ভবানী-শঙ্করের একটী বৃহৎ মন্দির বর্ত্তমান আছে। প্রবাদ, এই মন্দির-সংলগ্ন ঘাটে স্নান করিলে চর্ম্মরোগ নিবারিত হয়। পর্ত্তুগীজদিগের নির্ম্মিত অর্নল দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

অগাসিজ, জীন লুই রুডল্ফ্ (Jean Louis Rodolphe Agassiz) একজন বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ব ও ভূতত্ত্ববিৎ (১৮০৭-১৮৭৩)। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে সুইজর্লণ্ডের নিউসাটেল হ্রদের পূর্ব্বসীমান্তে অবস্থিত মেটিয়ার (Matiar) গির্জ্জায় ইঁহার জন্ম হয়। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইনি আর্লেঞ্জেন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Doctor of Philosophy ও ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মিউনিক্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Doctor of Medicine উপাধি লাভ করেন। অতঃপর নিউসাটেল হ্রদের মৎস্যচরিত্র আলোচনা করিতে করিতে তিনি ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে মধ্য ইউরোপের মৎস্যতত্ত্ব-বিষয়ক (History of the Fresh-water Fishes of Central Europe) মৌলিক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই অনুসন্ধিৎসার বশবর্ত্তী হইয়া এবং নিউসাটেল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক থাকা কালীন তিনি ১৮৩৩ হইতে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৫ খণ্ডে বিভক্ত 'Recherches sur les poissons fossiles' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রন্থের বিষয় সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে ইউরোপের নানা দেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাদুঘর পরিদর্শন করিতে হইয়াছিল। পারি নগরে অবস্থানকালে তাঁহার সহিত কুভিয়ারের (Cuvier) সাক্ষাৎকার হয়।

জীবাস্থিসংগ্রহে ও তাহাদের চিত্রাদি অঙ্কনকার্য্যে তাঁহার অর্থকষ্ট উপস্থিত হইতে দেখিয়া আর্ল এলেস্‌মিয়ার (Lord Francis Egerton, Earl of Ellesmere) ডিস্কেল অঙ্কিত চিত্রগুলি ক্রয় করিয়া লণ্ডনের জিওগ্রাফিকাল্ সোসাইটীকে দান করেন। উক্ত সভা অগাসিজ ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে হোলাষ্টন পদক (Wollaston Medal) প্রদান করেন। ১৮৪০ হইতে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার Etudes critiques sur les mollusques fossiles এবং Monographie des poissons fossiles du Vieux Gres Rouge, ou Systeme Devonien (Old Red Sandstone) des Iles Britanniques et de Russie নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই সময় হইতে তাঁহার অনুসন্ধিৎসা ভিন্ন পথে ধাবিত হইল। তিনি কয়েকবার আল্পস্ পর্ব্বতমালা ভূতত্ত্ববিদের দৃষ্টিতে পরিদর্শন করেন এবং অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিবার জন্য আর নামক (Aar Glacier) তুষারনদের তীরে একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া হিমানী-স্রোতের গতি নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার মতে, আল্পসের সর্ব্বোচ্চশিখর হইতে যে স্রোত নামিয়াছিল, তাহা এককালে সুইজর্লণ্ডকে আর একটী গ্রীনলণ্ডে পরিণত করিতে পারিত। এই হিমানীস্রোতের গতি পর্য্যালোচনা করিয়া ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি Etudes sur les Glacier নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। অতঃপর তিনি পণ্ডিতপ্রবর উইলিয়ম বাক্‌লাণ্ডের (William Buckland) সহযোগে ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড, ওয়েল্‌স্ ও আয়র্লণ্ড দেশের পর্ব্বতসমূহ যে হিমানীযুগের তীব্র স্রোতে সমানীত প্রস্তরনিচয়ের সমষ্টিগত ফলে উদ্ভব হইয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন।

১৮৪২ হইতে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশেষ পরিশ্রমে জীবতত্ত্ব-বিষয়ক নির্ঘণ্ট (Nomenclator Zoologicus) প্রকাশ করিয়া জগদ্বাসীর ধন্যবাদের পাত্র হন। প্রুসিয়ার রাজা তাঁহার এই অনুসন্ধিৎসায় প্রীত হইয়া শেষোক্ত বর্ষের শরৎকালে তাঁহাকে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে পাঠান। যুক্তরাজ্যের প্রাণিতত্ত্ব ও ভূতত্ত্ববিষয়ে তথ্যসংগ্রহই এই যাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রুসিয়ারাজ এই যাত্রার সমুদয় ব্যয় বহন করিয়াছিলেন।

আমেরিকায় উপনীত হইলে তিনি পণ্ডিত লাওয়েল্

(J. A. Lowell) কর্ত্তৃক তৎপ্রতিষ্ঠিত লাওয়েল্ ইন্‌ষ্টিটিউটে জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রিত হন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে এই দেশের কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবতত্ত্ব ও ভূতত্ত্ববিষয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার পারদর্শিতা থাকায় তিনি ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে চার্লস্‌টাউনের শবব্যবচ্ছেদাগারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন; কিন্তু প্রবল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা তাঁহাকে এই কার্য্য পরিত্যাগ করাইতে বাধ্য করে।

ইহার পর ১৮৪৮ হইতে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার সংগৃহীত বৈজ্ঞানিক প্রাণিতত্ত্ব ও ভূতত্ত্বের একখানি বিশদ বিবরণী (Bibliographia Zoologiæ et Geologiæ)—হিউ. ই. ষ্ট্রিক্‌লণ্ডের তত্ত্বাবধানে রে সোসাইটী (Ray Society) কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৮৫৭ হইতে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি সুপিরিয়র হ্রদ অভিযানে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ঐ সকল উপাদান লইয়া ৪ খণ্ডে Contributions to the Natural History of the United States নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি শিক্ষিত শিষ্য লইয়া তিনি ব্রেজিল যাত্রা করেন। এই যাত্রার ফল ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ব্রেজিল-ভ্রমণ (A Journey in Brazil) নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সামুদ্রিক জীবজন্তু সম্বন্ধে আলোচনার সাহায্যকল্পে ও বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য আমেরিকার বিখ্যাত ধনী জন্ আণ্ডারসন্ অগাসিজের হস্তে বাজার্ডস্ বে নামক সামুদ্রোপকূলের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত পেনিকিজ্‌ দ্বীপ ও ৫০ হাজার ডলার মুদ্রা দান করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিদ্যালয় স্থাপনের সৌভাগ্য তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। উক্ত বর্ষের ১৪ই ডিসেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। অবর্‌ন্ পর্ব্বতের শিরোদেশে তাঁহার শবদেহ সমাহিত হয়; কিন্তু তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ আর নদীর গর্ভে হিমানীবাহিত শিলাখণ্ডে নির্ম্মিত হইয়া Hotel des Neuchatelois নামক ভোজনাগারের সন্নিকটে স্থাপিত হইয়াছে।

তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত আলেক্‌সান্দার অগাসিজ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জীবতত্ত্বে যশস্বী হইয়াছিলেন। তদীয় দ্বিতীয় পত্নী এলিজাবেথ কাবট্ কেরি (Elizabeth Cabot Cary) বিদুষী ছিলেন।

অগাসিজ, আলেক্‌সান্দার এমানুয়েল (Alexander Emanuel Agassiz)—আমেরিকাবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক (১৮৩৫-১৯১০)। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর সুইজর্লণ্ডের অন্তর্গত নিউসাটেল নগরে তাঁহার জন্ম। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পিতার (J. L. R. Agassiz) সহিত যুক্তরাজ্যে গমন করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে হার্বার্ড কলেজে শিক্ষা সমাপন করিয়া ইনি স্থাপত্যবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভের জন্য লরেন্স সায়েন্টিফিক স্কুলে যোগদান করেন এবং এখান হইতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে সমুদ্রোপকূল পরিদর্শনে (United States Coastal Survey) নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি সামুদ্রিক মৎস্যতত্ত্বে (Marine Ichthyology) বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তৎপ্রকাশিত Seaside Studies in Natural History ও ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে Marine Animals of Massachusetts Bay নামক গ্রন্থদ্বয় তাঁহার মৎস্যতত্ত্ববিষয়ক অভিজ্ঞতার ফল।

তিনি সমুদ্রতীরের পরিদর্শনসংক্রান্ত কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও কালুমেট ও হেক্‌লার তাম্রখনির তত্ত্বাবধান করিতেন। ১৮৬৬ হইতে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি সুপিরিয়র হ্রদের তত্ত্বাবধান কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। উক্ত কার্য্যের অংশ ক্রয় করিয়া তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং তাহা হইতে ৫ লক্ষ ডলার প্রাণিতত্ত্বের আলোচনার জন্য হার্বার্ড যাদুঘরে দান করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিতিকাকা হ্রদ জরীপকালে তিনি চিলি ও পেরু প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া স্বীয় বিদ্যাপীঠ যাদুঘরের জন্য পেরুতে প্রাপ্ত প্রত্নতত্ত্বের অসংখ্য নিদর্শন সংগ্রহ করিয়া আনেন। পরে স্যর্ হ্বাইভিল্ টমসনের (Sir Wyville Thomson) সাহায্যে ঐ সকল সংগৃহীত বস্তুর ইতিবৃত্তমূলক Review of the Echini নামক পুস্তক দুই খণ্ডে প্রণয়ন করেন। ১৮৭৭-১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ব্লেক জাহাজে চড়িয়া তিনি যে ত্রিবর্ষব্যাপী উপকূল পরিদর্শন করেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ তিনি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে পুস্তকাকারে দুই খণ্ডে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অগাসী—(হিন্দী ও ঠগ্) পাগ্‌ড়ী। ঠগেরা চিলের ডাককেও অগাসী বলে। তাহাদের এইরূপ বিশ্বাস যে, রাত্রিকালে চিলের ডাক অত্যন্ত অমঙ্গলকর।

অগিয়ারি—পারসিকদিগের অগ্নিপূজার মন্দির। পারসিকগণ অগ্নির পূজা করিয়া থাকেন। প্রত্যেক পারসিকের গৃহে অগ্নি রক্ষিত হইয়া থাকে। ইহার নাম আতস্ দাদ্‌খান। এই পারিবারিক অগ্নি ভিন্ন সর্ব্বসাধারণের পূজার্থ মন্দিরে যে অগ্নি রক্ষিত হয়, তাহাকে অগিয়ারি বলে। ইহার অপর নাম দরেম চের। অগিয়ারি শব্দ সংস্কৃত 'অগ্নি' ও 'আরি' শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২ বেহারের দোসাদগণের একটী 'পঙ্গত' অথবা শাখা।

অগির—অগ্নি। ২ সূর্য্য। ৩ রাক্ষস। (জটাধর)

অগিরৌকস্—মরুৎগণের নামান্তর। (ঋক্ ১.১৩৫.৯)

অগিসল (Agesilaos = অগেসিলস)—একজন যবনদেশীয় স্থপতি। মহাসেন সঙ্ঘারামে কনিষ্ক-বিহার নির্ম্মাণকালে শকরাজ কনিষ্ক গ্রীক্স্থাপত্যশিল্প পর্য্যবেক্ষণার্থ গ্রীক্দেশীয় স্থপতি অগিসলকে পরিদর্শক (Superintending Engineer) রূপে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন।

[V. A. Smith—History of the Fine Arts in India & Ceylon, p. 358]

অগীত্তি মুহম্মদ খাঁ—কর্ণাটকের নবাব সাদৎ বা সয়াদৎউল্লা খাঁর নামান্তর। [কর্ণাটক ও সয়াদৎউল্লা খাঁ দ্র°]

অগু—রাহুগ্রহ। [রাহু দ্র°]

অগুড়গন্ধ—[অগূঢ়গন্ধ দ্র°]

অগুণ-পানোর—রাজপুতানার অন্তর্গত একটী ভীল জনপদের নাম। ইহা মেবার প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম পর্ব্বতমালার মধ্যস্থিত চম্পণ নামক ভীল প্রদেশের অন্তর্গত।

যৎকালে উদয়পুরের রাণাকুলের আদিপুরুষ বাপ্পারাও, নগেন্দ্রনগরের বনমধ্যে শোলাঙ্কিরাজনন্দিনী ও ছয়শত রাজপুত বালিকার সহিত ক্রীড়া-বিবাহ করিয়া তৎপ্রকাশ ভয়ে নিকটস্থ ত্রিকূট পর্ব্বতের ভীষণ গুহায় লুক্কায়িত হন, সেই সময় এই অগুণ-পানোর-নিবাসী দেব নামে একজন ভীলকুমার তাঁহার সঙ্গী ছিলেন।

এই অগুণ-পানোরে আরও একটী ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সংঘটিত হয়। যে সময়ে মহারাণা প্রতাপসিংহ কমলমীর দুর্গ হইতে চাবন্দ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই সময় আমীর-শাহ্ নামে এক রাজপুত্র চাবন্দ ও অগুণ-পানোরের মধ্যস্থলে থাকিয়া ভীলগণের সহিত মহারাণার সমস্ত সম্বন্ধ (আহারাদি সংগ্রহ ; রাজপুতগণের জীবনরক্ষা প্রভৃতি) বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। (রাজস্থান)

অগুণ্টে—দাক্ষিণাত্যের কর্নূল জেলার একটী গ্রাম। এই স্থান হইতে আবিষ্কৃত তাম্রলিপি হইতে জানা যায় যে, মহারাজ প্রথম বিক্রমাদিত্য জনৈক ব্রাহ্মণকে অগুণ্টে ও তেবুংলোর নামে দুইটী গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

অগুম্বি—মান্দ্রাজ প্রদেশের দক্ষিণ কানাড়া জেলার উদিপি তালুকের মধ্যস্থিত একটী গিরিপথ। ইহা অক্ষা° ১৩°২৯′ হইতে ১৩°২৯′৩০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৬′২০″ হইতে ৭৫°৮′ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহা মহিসুর রাজ্যকে কানাড়া জেলার সহিত সংযুক্ত করিতেছে। তলদেশ হইতে শিখরের শীর্ষদেশ প্রায় ৫ মাইল, কিন্তু গিরিপথ এমন সুন্দরভাবে গঠিত যে, প্রত্যেক ১৮ ফুটের মধ্যে এক ফুটের অধিক উচ্চতা কোথাও পরিলক্ষিত হয় না।

অগুর্ণি—বোম্বাই প্রদেশের সাতারা জেলার কর্‌ছাড় তালুকের অন্তর্গত একটী নদী।

অগুরু—[বৈদ্যক] অগুরুচন্দন ; কালাগুরু। [অগরু দ্র°] অগুরু কাষ্ঠের এই কয়েকটী পর্য্যায়—(১) বংশিক, (২) রাজার্হ, (৩) লোহ, (৪) কৃমিজ, (৫) জোঙ্গক, (৬) শৃঙ্গজ, (৭) কৃষ্ণ, (৮) লোহাখ্য, (৯) লঘু, (১০) পীতক, (১১) বর্ণপ্রসাদন, (১২) অনার্য্যক, (১৩) অসার, (১৪) কৃমিদগ্ধ, (১৫) কাষ্ঠক। অগুরুর লক্ষণ—যে অগুরু স্নিগ্ধ, গুরু ও কাকতুণ্ড-তুল্য তাহা উত্তম ; যাহা অসার, পাণ্ডুবর্ণ, রূক্ষ ও লঘু সে অগুরু অপকৃষ্ট ; তিত্তিরি পক্ষবৎ ও শাল্মলী কাষ্ঠতুল্য অগুরু অতি নিকৃষ্ট, এজন্য অব্যবহার্য্য। ২ শিশুগাছ। [অগুরুশিংশপা দ্র°] ৩ গুরুবর্ণ ব্যতীত অন্য বর্ণ অর্থাৎ লঘুবর্ণ। যে বর্ণ অনুস্বার, বিসর্গ কিংবা দীর্ঘ স্বরযুক্ত নহে ; অথবা সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বে নয়।

"প্রথমমগুরুষট্কং বিদ্যতে যত্র কান্তে !
তদনু চ দশমঞ্চেদক্ষরং দ্বাদশান্তং।
ধরণিধরতুরঙ্গৈর্যত্র কান্তে বিরামঃ
সুকবিজনমনোজ্ঞা মালিনী সা প্রসিদ্ধা ॥" (শ্রুতবোধ)

অগুরুশিংশপা—[বৈদ্যক] শিংশপা বৃক্ষ ; শিশু গাছ। (Dalbergia Sisoo & Latifolia) হিন্দী—শীসব। শিশু-গাছ হিমালয়ের উপত্যকায় আপনি জন্মে। এখন শিশুকাষ্ঠের আদর বাড়িয়াছে। বাঙ্গালায়, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, এবং পঞ্জাবের যে দিকে চাহিবে, সেই দিকেই শিশুগাছ। প্রশস্ত রাজপথের দুইধারে শিশুগাছ সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বৃক্ষগুলি বড় হইলে প্রায় ১২০ হাত উচ্চ হয়। সুতরাং রাস্তার দুইধারে রোপিত থাকায় গ্রীষ্মকালে পথিকেরা রৌদ্রে কষ্ট পায় না। গ্রীষ্মকালে এই বৃক্ষ পুষ্পিত হয়। ইহার বীজ ও গোঁড় হইতে বৃক্ষ হয়। বীজের গাছই উৎকৃষ্টতর।

শিশুকাষ্ঠ কটাবর্ণ ও দীর্ঘকালস্থায়ী। নেপালী শালকাঠ, এদেশের সকল কাষ্ঠ অপেক্ষা কঠিন ও স্থায়ী, সন্দেহ নাই। শিশু ততটা নয়, কিন্তু অন্যান্য গুণে শাল অপেক্ষা শিশু শ্রেষ্ঠ। ইহার কাঠে নৌকা, গাড়ী, কৃষিকার্য্যের অস্ত্র, কেদারা, টেবিল, আলমারী, খাট, সিন্দুক, বাক্স প্রভৃতি অনেক প্রকার দ্রব্য ও গৃহসজ্জার আসবাব প্রস্তুত হয়। কাবুল যুদ্ধের সময় সেখানে নানা প্রকার ভাল ভাল দেশী ও বিলাতী কাঠের গাড়ী লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। আফগানিস্থানের বন্ধুর ভূমিতে সকল প্রকার গাড়ী চূর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু শিশুকাঠের শকটের একখানি চাকাও ভাঙ্গে নাই। তাই, দিন দিন এই গাছের

এত আদর বাড়িতেছে। এদেশের পতিত ভূমিতে শিশুবৃক্ষ রোপণ করিয়া দিলে ভূস্বামীর ও প্রজার আয় বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। ইহা সরস ও নীরস এই উভয়বিধ মৃত্তিকায় সমান তেজী হয়। অগুরুশিংশপা বৃক্ষ দুই প্রকার। এক জাতির নাম শিশু (Dalbergia Sisoo); উহার বিবরণ উপরে লেখা হইয়াছে। অপর জাতির নাম শিশম্ (Dalbergia Latifolia)। প্রথমটীর পাতা লম্বা ও সরু। দ্বিতীয় জাতির পাতা কিঞ্চিৎ গোল ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। কাঠের বর্ণ—উপরিভাগ হল্‌দে, ভিতরে কাল্‌চে লাল, লম্বালম্বি কাল রেখাযুক্ত। এই বৃক্ষ ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ দক্ষিণাঞ্চলে ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে উৎপন্ন হয়। ইংলণ্ডে শিশুকাঠের বিলক্ষণ আদর। দাক্ষিণাত্যের উৎকৃষ্ট শিশুকাঠ সেখানে ৬৲ টাকা করিয়া মণ বিক্রীত হয়।

অগুরুসার—(বৈদ্যক) কৃষ্ণাগুরু বৃক্ষ। [কৃষ্ণাগুরু দ্র°]

অগুরুসারা—[বৈদ্যক] শিংশপা বৃক্ষ।

অগূঢ়—[বৈদ্যক] শ্বেত এরণ্ড, শ্বেত ভেরেণ্ডা (the castor-oil plant, Ricinus communis) হিন্দী—এরণ্ড। [এরণ্ড দ্র°]

অগূঢ়গন্ধ—[বৈদ্যক] হিঙ্গু, পলাণ্ডু, মৃগনাভি ও রশুন। ইহাদের গন্ধ লুক্কায়িত থাকে না, তজ্জন্য এই নাম। [তত্তৎ শব্দ দ্র°]

অগূঢ়গন্ধবটিকা—[বৈদ্যক] হিঙ্গুবটিকা। [হিঙ্গুবটিকা দ্র°]

অগূঢ়গন্ধসার [বৈদ্যক] হিঙ্গুসার। [হিঙ্গুসার দ্র°]

অগৃহী—বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি বা সন্ন্যাসী।

অগেলদাস (হগেলৈদাস)—একজন প্রসিদ্ধ গ্রীক্ ভাস্কর, খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ হইতে ৫ম শতকে জীবিত ছিলেন। শুনা যায়, ইনি জীয়ুসের এবং ৫২০, ৫১৬ ও ৫০৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের অলিম্পিয়ার বিজেতৃগণের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার একটীও এখন বর্ত্তমান নাই।

অগেসিলস, ২য় (Agesilaus II)—স্পার্টার রাজা ২য় অর্কিদমাসের পুত্র। ইঁহার জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ২য় অগিসের পর ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। পারসিক আক্রমণ হইতে এসিয়াখণ্ডস্থিত গ্রীসের অধীন নগরসমূহ রক্ষা করিবার জন্য অগেসিলস ৩৯৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ৮,০০০ সৈন্যসহ এসিয়ায় প্রেরিত হন। পথে থীব্‌সের সৈন্যদল তাঁহাকে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাতে ইনি থীব্‌সের উপর চিরদিনের জন্য বিদ্বিষ্ট হইয়াছিলেন। অগেসিলস এফীসাসে উপস্থিত হইলে লিডিয়া ও কারিয়ার সামন্তরাজ তিসাফার্‌নেস (Tissaphernes) তাঁহার সহিত সন্ধি করেন। এ সন্ধি অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। অগেসিলস ফ্রিজিয়া আক্রমণ করিয়া অনেক ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। তৎপরে তিনি একদল অশ্বারোহী সৈন্য গঠন করিয়া ৩৯৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের বসন্তকালে লিডিয়া অধিকার করেন। তিসাফার্‌নেস তাঁহার অকৃতকার্য্যতার জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁহার স্থানে তিথ্‌রস্তেস্ (Tithraustes) নব শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। তিথ্‌রস্তেস্‌কে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিয়া অগেসিলস উত্তরমুখে অভিযান করিয়া পুনরায় ফ্রিজিয়া ধ্বংস করিলেন। তদনন্তর পুনর্ব্বার দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া ইনি স্বয়ং অর্তক্ষত্রকে আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন, এমন সময়ে ইঁহাকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল; কারণ এই সময়ে স্পার্টার সহিত এথেন্স, থীব্‌স, করিন্থ, আর্গস প্রভৃতি সমবেতশক্তির যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। অগেসিলস থ্রেস ও মাকিদোনিয়ার মধ্য দিয়া থেসেলীতে উপস্থিত হইলেন। এখানে থেসেলীর সৈন্যদলকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া করোনীয়াতে সমবেত শক্তিসঙ্ঘকে পরাভূত করেন। তৎপরে তিনি পেলোপোনেসে উপনীত হন।

ইহার পর করিন্থের সহিত যুদ্ধে অগেসিলস জয়ী হন, কিন্তু এ যুদ্ধে তাঁহার পক্ষে বিস্তর ক্ষতিও হইয়াছিল। ৩৭১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে পুনর্ব্বার থীব্‌স ও স্পার্টার মধ্যে যুদ্ধ ঘটে, ইহাতে স্পার্টারই পরাজয় হয়। স্পার্টার লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার মানসে অগেসিলস বদ্ধপরিকর হন। ৩৬১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে তিনি টাকসের পক্ষাবলম্বী হইয়া পারস্যের বিপক্ষে অভিযান করেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি টাকসের প্রতিদ্বন্দ্বী নেক্তনবীসের পক্ষ অবলম্বন করেন। স্পার্টায় প্রত্যাগমনকালে পথে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৪ বৎসর হইয়াছিল।

অগৈয়াম্বো (Agaiambo)—বৃটিশ নিউগিনি দ্বীপের নিম্নভূমিনিবাসী এক ক্ষুদ্রকায় জাতি। ইহারা হ্রদ বা জলাভূমির ধারে খুঁটীর উপর ঘর বাঁধিয়া বাস করে ও কাঠের ডোঙ্গায় চড়িয়া গমনাগমন করে। সাগুদানা, মাছ ও শালুকের মূল ইহাদের প্রধান খাদ্য। অধুনা ইহাদের বংশ লুপ্তপ্রায়। পপুয়ান্‌দের সহিত ইহাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে।

অগোচর—[দর্শন°] ব্রহ্ম। ২ ইন্দ্রিয় জ্ঞানাতীত বস্তুমাত্র। ৩ ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভাব; পরোক্ষতা; অজ্ঞাতভাব।

অগোয়াদা—পশ্চিমভারতের গোয়ারাজ্যের সমুদ্রোপকূলস্থ একটী খাড়ি ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অন্তরীপাকার উঁচু জমি। অক্ষা° ১৫°২৯′ ২৬·৩″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৪৫′৫৫·১″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা স্থলবিশেষে প্রায় ২৬০ ফুট, অন্যত্র সমতল। মর্মাগাঁও হইতে ইহা প্রায় ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। অগোয়াদা-বে নামক উপসাগরের উত্তরে অগোয়াদা গণ্ডশৈলের অন্তরীপভাগ। ইহার উপর যে দুর্গ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার মধ্যে একটী আলোকস্তম্ভ বিরাজিত। সেনাবারিক,

সেনাপতির বাসভবন, শুল্কসংগ্রাহকের গৃহ ও পাইলটদিগের আবাসবাটী সমুদ্রতীরে অবস্থিত। মূল দুর্গটী পরিখাবেষ্টিত। পর্ব্বতাংশ দুরারোহ হওয়ায় পর্ব্বতপৃষ্ঠ প্রাচীরাদি দ্বারা সুরক্ষিত নহে। উহার পার্শ্বস্থিত ক্ষুদ্র দুর্গটী এক্ষণে সামরিক কয়েদী-দিগের জেলখানায় পরিণত হইয়াছে। বন্দী সেনাদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য এখানে একদল সৈন্য ও একজন নায়ক থাকে। গোয়া হইতে মর্ম্মাগাঁও পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত থাকায় এখানকার বাণিজ্যের অনেক উন্নতি ঘটিয়াছে। এখানে নারিকেল গাছ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিয়া থাকে—জঙ্গলও প্রচুর।

অগোস্তিনি, লিওনার্দো (Agostini, Leonardo)—খৃষ্টীয় ১৭শ শতকের এক ইতালীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্। পোপ ৩য় আলেক্‌-সান্দারের সময়ে ইনি রোমরাজ্যের পুরাতত্ত্বের অধ্যক্ষ ছিলেন।

অগোর, অগৌর—অগুরুচন্দন, অগুরুপঙ্ক [অগরু ও অগুরু দ্র°]

অগোস্তিনো দা সীনা (Agostino Da Siena)—এক ইতালীয় স্থপতি ও ভাস্কর। ইনি ও ইঁহার সহকর্ম্মী অগ্‌নোলো (Agnolo) দা সীনা ১৩১৭ খৃষ্টাব্দে সীনা নগরে স্থাপত্যকার্য্যে নিয়োজিত হন ও পোর্টো রোমানা, সেণ্ট্ ফ্রান্সিসের ভজনালয় ও অপরাপর ভবন নির্ম্মাণ করেন। অরেজ্জোর গীর্জ্জায় গীদো তার্লাতির যে স্মৃতিসৌধ ইঁহারা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা ১৪শ শতাব্দীর স্থাপত্যশিল্পের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ফরাসীদের দ্বারা উক্ত সৌধটি বিনষ্ট হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে অগোস্তিনো ও অগ্‌নোলো দুই ভ্রাতা।

অগোস্তিনো, পাওলো (Agostino, Paolo)—প্রসিদ্ধ ইটালীয় সঙ্গীতজ্ঞ। ইনি ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে ভালেরানো নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সেণ্ট্‌পীতর গীর্জ্জার ভজন-সঙ্গীতের পরিচালক ছিলেন। ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

অগৌকা—অষ্ট পদবিশিষ্ট শরভ। ২ পক্ষী। ৩ সিংহ।

অগৌতি—ত্রিনিদাদ ও গায়েনার মূষিকজাতীয় এক শ্রেণীর প্রাণীর তদ্দেশীয় নাম। ইহারা খরগোসের মত বড় হয়। ইহাদের শরীর কটা ও শক্ত লোমে আচ্ছাদিত, লেজ অতি ক্ষুদ্র। ইহারা নিশাচর, দিনের বেলা গর্ত্তে ও গাছের কোটরে লুকাইয়া থাকে, রাত্রিতে বাহির হইয়া ইক্ষু ও কদলীক্ষেত্রের সর্ব্বনাশ করে। বৃক্ষপত্র, ফল, মূল প্রভৃতি ইহাদের খাদ্য। ইহারা জলে সাঁতার দিতে পারে।

অগৌন্দ—উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইক্ষুর পত্রযুক্ত অগ্রভাগকে (যাহা বীজরূপে পু‌ঁতিয়া দেওয়া হয়) অগৌন্দ বলে।

অগৌর—অযোধ্যা প্রদেশের জমিদারগণকে প্রজাবর্গ কর্ত্তৃক প্রদত্ত জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে দেয় অগ্রিম ভূমিকর। অগ্রিম দেয় হইতে এই শব্দের উৎপত্তি।

অগৌরা—[হিন্দী] ইক্ষুদণ্ডের গ্রন্থিবিশেষের নাম। এই অংশ ইক্ষুদণ্ডের অগ্রভাগে পত্রগুলির কিছু নিম্নে থাকে।

অগ্‌গকুলিক—রাজসভাসদ্‌বিশেষ। প্রাচীনকালে হিন্দু ও বৌদ্ধযুগে কুলশ্রেষ্ঠগণের দ্বারা একটী বিচারসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইত। দণ্ডবিধি সম্বন্ধীয় বিচার যথাযথ হইতেছে কিনা, তাহা লক্ষ্য করাই ইহার কার্য্য। 'কুল' শব্দে ধর্ম্মাধিকরণও বুঝায়। এইরূপ বিচারালয়ে যাঁহারা অধিবেশন করিতেন, তাঁহারা 'কুলিক' বলিয়া খ্যাত হইতেন। কুলিকগণের প্রধান বা নেতাকে অগ্রকুলিক বা অগ্‌গকুলিক বলা হইত। পালিধর্ম্ম-শাস্ত্রাংশপ্রণেতা রাট্‌ঠপাল কুলপুত্তও অগ্গকুলিকের পুত্র ছিলেন। [কুলিক দ্র°]

অগ্‌গঞ্ঞ সুত্ত—বৌদ্ধ দীঘ-নিকায়ের অন্তর্গত ৩৪টী সূত্রের অন্যতম। (দীঘ-নিকায়, ৩য় খণ্ড, ৮০-৯৮ পৃঃ) ব্রাহ্মণদিগের দাবী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া প্রথমেই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে, সুন্দর চরিত্র উচ্চবর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। জগৎ, মনুষ্য ও সমাজের বিবর্ত্তনবাদ সম্বন্ধে ইহাতে অনেক কথাই আছে ; কিন্তু আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের উন্নতির দিনে পাশ্চাত্য বিবর্ত্তনবাদের সহিত ইহার তুলনা করিলে ইহাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। ইহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণের মূলতত্ত্বও বর্ণিত আছে। বর্ণ অপেক্ষা ধর্ম্মের ও চারিত্র্যের শ্রেষ্ঠত্বও ইহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহাতে লিখিত আছে যে, ভগবান্ তথাগত পূব্বারামে (পূর্ব্বারামে) মিগারমাতা প্রাসাদে ছিলেন এবং তিনি যে শাক্যবংশ হইতে সংসার ত্যাগ করিবেন, ইহা কোশলরাজ পশেনদি (প্রসেনজিৎ) জানিতেন। যদিও পশেনদি বুদ্ধদেবের সমবয়স্ক ছিলেন, তথাপি তিনি তাঁহাকে জগতের একজন বিশিষ্ট শিক্ষক বলিয়া সম্মান করিতেন।

অগ্‌গবোধি—সিংহলের জনৈক রাজা (হ° স° ৫৬৩-৫৯৮)। তাঁহার রাজত্বকালে বহু সিংহলী কবি সুরস ও সুললিত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

অগ্‌গল (অর্গলদেব)—দাক্ষিণাত্যের একজন গ্রন্থকার। ইনি ১১৮৯ খৃষ্টাব্দে 'চন্দ্রপ্রভ' পুরাণ লিখিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন 'লীলাবতী' নামক অন্য একখানি গ্রন্থ ইঁহার রচিত বলিয়া উল্লিখিত হয়।

অগ্‌গাড়্‌বচেতিয়—সুগমের অন্তর্গত সন্যাশয় হইতে ৩৫০ মাইল উত্তরে খালসির সন্নিকটে অবস্থিত চৈত্যবিশেষ। এই স্থানে বুদ্ধদেব তাঁহার ষোড়শবর্ষকাল যাপন করিয়াছিলেন এবং এইখানেই 'অড়াবক' যক্ষ বাস করিতেন।

[Fa Hian's Travels, J. R. A. S., 1891, pp. 338-339.]

অগ্‌গেচল—বিহার প্রদেশের বাভন জাতির একটী শাখা। [বাভন দ্র°]

অগ্‌গিবচ্ছগোত্ত সুত্ত—বৌদ্ধ মজ্‌ঝিম-নিকায়ের অন্তর্গত সূত্রবিশেষ। মজ্‌ঝিম-নিকায় সূত্রপিটকের দ্বিতীয় পুস্তক। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত; প্রত্যেক বিভাগে ৫০টী করিয়া সূত্র আছে। এই সূত্র হইতে জানিতে পারা যায়, অগ্‌গিবচ্ছগোত্ত (অগ্নিবৎসগোত্র) নামে বুদ্ধদেবের জনৈক শিষ্য অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

অগ্‌গি বেশায়ন—জৈনদিগের ষড়্‌ দিশাচরার একতম।

অগ্নবি—পাটলিপুত্রবাসী ভিক্ষু শীর্ষকের অন্যতম শিষ্য।

অগ্নায়ী—অথর্ব্ববেদবর্ণিত দেবতাবিশেষ।

অগ্নি—অঙ্গ-নি। *। অঙ্গের্নলোপশ্চ। উণ্‌ ৪। ৫০। অঙ্গতি ঊর্দ্ধং গচ্ছতীতি। অনল, বহ্নি, পাবক, হুতাশন। চলিত আগুন। [অগ্নি, শব্দে অগ্নির অন্যান্য পর্য্যায় দ্র°]

ইংরেজীভাষায় অগ্নি **Fire** নামে প্রসিদ্ধ। এ্যাংলো-সাক্স°—**Fyr**; জর্মনভাষায়—**Feuer**; ওলন্দাজ ভাষায়—**Vuur**; সংস্কৃতের অনুকরণে পূর্ব্বতন টিউটনিকে 'পূ' শব্দে অগ্নি সংজ্ঞা বুঝাইত; সংস্কৃত—পাবক; লাটিন—**Ignis**; গ্রীক্‌—**Pyr**; লিথু°—**Ugnis**; স্লাভ—**Ognj**; গথ°—**Auhn's**; ফ্রা°—**Ignis**; স্পেন ও ইতালী—**Ignes**।

অতি প্রাচীনকালে অগ্নি মৌলিক পদার্থ বলিয়া গণিত হইত এবং সর্ব্বদেহের আশ্রয় ও সর্ব্বতেজের মৌলিক রূপস্বরূপ বিবেচিত হইত। যখন কার্য্য ও কারণ, প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন বলিয়া মানবের জ্ঞান হয় নাই; ইহার দাহিকাশক্তি, সূর্য্যের সহিত একতা, আলোকের সহিত সংস্রব এবং ইহার ভীষণ অথচ মঙ্গলপ্রদ পরাক্রম দৃষ্টে সকলেই ইহাকে ঈশ্বর ভাবিয়া পরম ভক্তির সহিত পূজা করিত। তাই আর্য্যদিগের সর্ব্ব-প্রাচীন ও পূজ্যতম ঋগ্বেদ গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে ঋষিগণ শত্রুভয়ে ও অন্নাভাবে ব্যাকুল হইয়া ইন্দ্র, বরুণ ও অগ্নির স্তব করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যখন মানুষের ঈশ্বর জ্ঞান জন্মিল, পদার্থবিদ্যা আলোচিত হইতে লাগিল এবং বিজ্ঞানের কৌশলে নব নব উপায় উদ্ভাবিত হইল, তখন মনুষ্য ইহার মূলতত্ত্ব জানিতে অগ্রসর হইলেন।

বর্ত্তমান সৌরজগতের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, অতি আদিমকালে সমগ্র জগৎ নীহারিকায় সমাচ্ছন্ন ছিল। আর্য্য-ধর্ম্মশাস্ত্রে জগতের আদি 'তমোময়ত্ব' কল্পিত হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মশাস্ত্রে জগতের আদি অবস্থা Chaos বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। পরে যখন ঐ নীহারিকাকণাসমূহ পরস্পর সংহত হইতে আরম্ভ করে, তখন কতকাংশ গোলাকার পিণ্ডরূপে পরিণত হয়। পিণ্ডগুলি সংঘর্ষিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী নীহারিকামণ্ডলে সতেজে দীপ্ত হইয়া উঠে। এই আলোকময় অবস্থাই তেজঃপদার্থরূপে পরিকল্পিত। তেজের সংস্পর্শে কত নীহারিকা দ্রবীভূত হইয়া জলরূপে পরিণত হয় এবং স্থানভ্রষ্ট হইয়া মরুৎ ও ব্যোমের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।

তেজঃসংস্পৃষ্ট নীহারিকামণ্ডল কালে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে প্রতিভাত হয় এবং স্ব স্ব স্থানে আবদ্ধ থাকে। পরে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তাহারা এক একটী কক্ষনিবদ্ধ হইয়া আপনাপন পথে ঘুরিতে থাকে। [নীহারিকা, জ্যোতিষ্ক, পৃথিবী ও মাধ্যাকর্ষণ দ্র°]

উক্ত তেজঃপদার্থ সেই অনন্তকালে যেখানে যত অধিক সংহত হইয়াছিল, সেইখানে সেইরূপ স্বল্প ও বৃহদাকৃতির জ্যোতিষ্ক সংগঠন করিতে সমর্থ হয়। সেই কারণে সূর্য্য, বৃহস্পতি, শনি, নেপচুন, উরেনাস প্রভৃতি গ্রহের এইরূপ গঠন-তারতম্য ঘটিয়াছে। [তত্তৎ শব্দ দ্র°]

ব্যোমে অবস্থিত এই তেজঃপদার্থ জীবসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জীবের প্রাণদ হইয়াছিল। তাপ না থাকিলে অনন্ত হিমশীতের অন্ধকারে জীবনরক্ষা কষ্টকর ও অসম্ভব হইত। কিন্তু এই উপযুক্ত তেজঃপদার্থই যে অগ্নি, তাহা মনুষ্য, মনুষ্যসৃষ্টির কতকাল পরে যে জানিতে পারিয়াছিল, তাহা অবধারণ করা সুকঠিন। [সৃষ্টিতত্ত্ব দ্র°]

ইতিহাস বলিয়া দেয় যে, প্রথম যুগের সৃষ্ট মনুষ্য নৈসর্গিক তাপ অনুভব করিতে সমর্থ হইলেও অগ্নির বাস্তব সত্তা ও তাহার দ্বারা মানব-সমাজের কিরূপ উপকার সাধিত হইতে পারে, তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই। পরে যখন মনুষ্য ক্রমশঃ জ্ঞানের মার্গে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে এবং তাহার মস্তিষ্কের প্রাথমিক জড়তা বিদূরিত হইয়া তাহাকে তাহার অভাব অভিযোগের বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে চেষ্টিত করে, তখনই তাহার মন একটীর পর একটী অত্যাবশ্যক অভাবের অন্তরায় হইতে আপনাকে নির্ম্মুক্ত করিতে আকৃষ্ট হয়। এইরূপে ধীরে ধীরে জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানবজীবনের একটী ক্রমবিকাশের ইতিহাস গঠিত হইল। বন্য জন্তুর ন্যায় আদি মানব প্রথমে ফলমূলাহারী ছিল। পরে তাহারা প্রয়োজনানু-রোধে পশুহিংসার জন্য প্রস্তরাস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে শিখে। এই পশুমাংস পাথরে কাটিতে কষ্টবোধ হওয়ায় তাহারা নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই লৌহাস্ত্রের আবিষ্কার হয়। সেইরূপ অসভ্য অবস্থায় কাঁচা পশুমাংস ভক্ষণে অভ্যস্ত থাকিয়া মনুষ্য যখন সুসিদ্ধ মাংস

ভক্ষণের উপযোগিতা অনুভব করিতে আরম্ভ করে, তখনই তাহার মনে জলে সিদ্ধ বা অগ্নিদগ্ধ করিয়া লইবার ইচ্ছা বলবতী হয়। তখন এই অগ্নি কোথায় ও কিরূপে পাওয়া যায়, তাহারই পন্থা আবিষ্কারের জন্য মানব সচেষ্ট হয়। বন্য অবস্থায় তাহারা দাবদাহ দেখিয়াছিল। বন জ্বলিয়া যাইতেছে ; কিন্তু কেন ও কি কারণে জ্বলিতেছে তাহা জানিবার চেষ্টা তখন তাহার হয় নাই। অভাবে পড়িয়া অগ্নিপ্রজ্বালনে তাহাদের বাসনা হইল। তাহারা এটা সেটা করিয়া দুইটী কাষ্ঠ ঘষিয়া অগ্নি জ্বালিল। দাবদাহের অগ্নি ও কাষ্ঠঘর্ষণোৎপাদিত অগ্নি যে একই পদার্থ, তখনও তাহারা তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই। পরে যখন দেখিল যে, বজ্রপাতে বন জ্বলিতেছে এবং এই অগ্নি ও দাবাগ্নি এক, তখন তাহারা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিল যে, বিদ্যুৎ ও অগ্নি একই তেজঃপদার্থ। অতঃপর বহুকাল পরে তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল, সূর্য্যকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত তেজ ও বিদ্যুৎ একই পদার্থ। তখন তাহারা অগ্নিকে প্রত্যক্ষ দেবতা সূর্য্য বা মিত্রের নামান্তর বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল।

ভূতত্ত্ব আলোচনায় জানা যায় যে, ভূপৃষ্ঠে ছয়বার হিমপ্রলয় ও উহার মধ্যে পাঁচবার হিমখণ্ডপ্রলয় হইয়াছিল। ভূতত্ত্বে ইহা Glacial epoch ও Inter-glacial epoch নামে খ্যাত। এই দীর্ঘকালকে বৈজ্ঞানিকগণ তুষার-যুগ (The Ice age) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই যুগে ২য় হিম-খণ্ডপ্রলয়ে (The second Inter-glacial period) পৃথিবীপৃষ্ঠ যখন উদ্ভিদ্‌রাজী ও বন্য জীবজন্তুতে সমাকীর্ণ ছিল, তখন ভূস্তর অপেক্ষাকৃত তাপযুক্ত ছিল, সন্দেহ নাই। ঐ সময় হইতে পৃথিবীতে দাবাগ্নি সংঘটন সম্ভবপর। মনুষ্য সৃষ্ট হইবার বহু পরে যখন জ্ঞানের ক্রমবিকাশে সমুন্নত হইয়াছিল, তখন তাহারা দাবাগ্নি দেখিয়া অগ্নির অস্তিত্ব উপলব্ধি করে।

অরণি-সংঘর্ষণই যে, তৎকালে অগ্নিপ্রজ্বালনের প্রকৃষ্ট উপায় অবধারিত হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। কারণ জগতের আদিগ্রন্থ ঋগ্বেদসংহিতায় অগ্নিযজ্ঞে অরণি-সংঘর্ষণ দ্বারা অগ্নিস্থাপনের কথা বিবৃত হইয়াছে। প্রাচীন হিব্রু, বাবিলোনীয় ও জরথ্স্ত্রিয়গণ উক্ত প্রথার অনুবর্ত্তী ছিলেন। ঐ সময়ের মিশরীয় ও সুমেরীয়দিগের মধ্যে অগ্নি উৎপাদনের জন্য অরণিঘর্ষণ আচরিত হইত। আদিম অবস্থায় মানবেরা যে অরণিঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিত, তাহা যেমন শিক্ষিত আর্য্যজাতির মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল, অনার্য্যগণও সেই প্রথা অবলম্বন করিয়া তেমনই অগ্ন্যুৎপাদনে অভ্যস্ত হইয়াছিল। [অরণি ও চক্‌মকি দ্র°]

ইহা হইতে মনে হয়, আদিতে মানব কবে বা কোন্ যুগে অগ্নি আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার কাল নির্দ্দেশ করার চেষ্টা বৃথা। তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে, মানব যেদিন অগ্নির অস্তিত্ব বুঝিয়াছিল, সেইদিন হইতে সে অগ্নিকে রক্ষা করিতে যত্নবান্ হইয়াছিল। প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক দৃশ্যে ও নানা অবস্থায় অগ্নি দেখিয়া এবং তাহার তাপ ও দাহিকাশক্তি অনুভব করিয়া মানব অগ্নির সহিত পরিচিত হয়। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে অন্ধকার রজনী আলোকিত দেখিয়া এবং ধাতব পদার্থের গলিত অবশেষ দেখিয়া, অথবা বনমধ্যে উল্কাপাতে বা সামান্য কোন কারণে শুষ্ক কাষ্ঠ ঘর্ষণে অকস্মাৎ সমস্ত বনানী দাবদাহে আলোকিত অবলোকন করিয়া মানব অগ্নির সত্তা উপলব্ধি করে।

বর্ত্তমান যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, দক্ষিণ ও উত্তর আফ্রিকার অরণ্যপ্রদেশবাসী অনেকেই অগ্নির অস্তিত্ব জানিত না। ১৮৩৮-১৮৪২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের সেনানায়ক লেঃ চার্লস্ উইলকিস্ ফাকাফো বা বোডিচ দ্বীপ আবিষ্কারে যাইয়া তদ্দেশবাসীকে অগ্নিবর্জ্জিত দেখিতে পান। এমন কি, তাহারা চক্‌মকির আগুন দেখিয়া চম্‌কাইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা সূর্য্যের তাপ ও আলোকমাত্র জানিত, কিন্তু রন্ধন করিয়া ভোজ্য বস্তু আহার করিতে জানিত না। আলভারো ডি সাভেডারা (Alvaro de Saavadara) নামক স্পেন দেশীয় জনৈক পরিব্রাজক লিখিয়াছেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থিত লস্ জার্ডিন্ (Los Jardines) দ্বীপের লোকেরা পূর্ব্বে কখনও অগ্নি দেখে নাই। সমুদ্রের কূলে জাহাজ ভিড়িলে দ্বীপবাসীরা আসিয়া জাহাজীদের কাছে প্রথম আগুন দেখিল। বিদ্যুৎ ও সূর্য্যের মত কি সব তেজঃপুঞ্জ দপ্ দপ্ করিতেছে, উপর দিয়া ধূম উড়িতেছে। চক্ষের উপর এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিয়া সকলে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। একবার মাগেলান্ তাহাদের কুটীরে আগুন লাগাইয়া দেন। কুটীর ধূ ধূ করিয়া পুড়িতে লাগিল। দ্বীপবাসীরা স্থির করিল যে, নূতন রকম কোন একটা ভয়ঙ্কর বন্য পশু আসিয়া তাহাদের ঘর দ্বার খাইয়া ফেলিতেছে।

অগ্নি-সম্পর্কিত নৈসর্গিক ব্যাপারসমূহ অবলোকন করিয়া মানবের মন ভয়ে ও ভক্তিতে আত্মহারা হইয়াছিল। এই জন্যই অতঃপর তাহারা দেবতাজ্ঞানে অগ্নিকে পূজা করিতে আরম্ভ করে। [অগ্নি$_2$ দ্র°] কিন্তু স্বভাবজাত অগ্নি দেখিয়া বিস্মিত হইলেও মানব অগ্নির উপকারিতা ক্রমে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ফলে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতি বিভিন্ন উপায়ে অগ্নি সংগ্রহের জ্ঞান লাভ করিয়াছিল।

প্রস্তরযুগে মানব যেমন অগ্নিপ্রস্তরের সাহায্যে অস্ত্র-শস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছিল, ঐ সময়ে অগ্নিপ্রস্তর সংঘর্ষণ হেতু অগ্ন্যুৎপাদনের প্রথাও যে আবিষ্কার না হইয়াছিল, এমন মনে হয় না। আলাস্কা ও আলুসিয়াবাসীরা দুই খণ্ড কোয়ার্টজ্ (Quartz) পাথরে গন্ধক মাখাইয়া পরস্পর ঠোকাঠুকি করিত, ইহাতে গন্ধকে আগুন ধরিয়া যাইত। এস্কিমোরা কোয়ার্টজ্ ও লৌহ পাইরাইট্ ঘর্ষণে আগুন তুলে। পারস্তের শাহ্‌নামায় লিখিত আছে, হুসেন নামক বীর ড্রাগণ নামক ভয়াবহ সর্পকে ধ্বংস করিতে একখণ্ড প্রস্তর ছুড়িয়া মারে। ঐ প্রস্তরখণ্ড সর্পের শিরে পতিত না হইয়া নিকটস্থ পর্ব্বতগাত্রে নিপতিত হয় এবং পর্ব্বতগাত্রের কাল পাথর দীপ্তিময় হইয়া উঠে। ইহা হইতে তৎকালে তদ্দেশবাসীর নিকটে অগ্নির অস্তিত্ব-রহস্য প্রকট হইয়াছিল। লৌহযুগে যখন মানব লৌহ ও ইস্পাত ব্যবহার করিতে শিখিল, তখন সে যে অগ্নিপ্রস্তরে ইস্পাতের আঘাত দ্বারা অগ্নি উৎপাদনের প্রথা অবগত ছিল না, এরূপ মনে হয় না। [অগ্নিপ্রস্তর দ্র°]

অগ্নি-জ্বালন-প্রথার উৎকর্ষসাধনের সহিত অগ্ন্যুৎপাদনের স্বতন্ত্র উপায় নির্দ্ধারণের চেষ্টা হইতে থাকে। সকলেই জানেন যে, নতোদর পরকলা (Concave lens) সাহায্যে সূর্য্যরশ্মি সংহত করা যায়। এরিষ্টোফানিস্ দাহিকাশক্তিপ্রভব এক প্রকার দ্বিন্যুব্জক কাচের উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রীসের উপাখ্যানে আছে, সাইরাকিউজ নগরী পারস্যসৈন্য কর্ত্তৃক জলপথে আক্রান্ত হইলে তথাকার প্রসিদ্ধ দার্শনিক আর্কিমিডিস্ রাজসভাকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া নগর ও নগরবাসীদের রক্ষার নিমিত্ত কাচনির্ম্মিত এক দর্পণ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ঐ দর্পণোপরি পতিত সূর্য্যরশ্মি সমুদ্রোপরিস্থিত বিপক্ষ-নৌবাহিনীর উপর তির্য্যক্‌ভাবে প্রতিফলিত হওয়ায় পারসিকবাহিনী অগ্নিদগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়। ইহাতে অনুমান করা যায় যে, আর্কিমিডিস্ সম্ভবতঃ বৃহদাকার দ্বিন্যুব্জক পরকলা প্রস্তুত করাইয়া দর্পণযোগে সূর্য্যরশ্মি উহাতে প্রতিফলিত করিয়া উহার দীপকত্ব পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। উহা যে আধুনিক বিবর্দ্ধনশক্তিসম্পন্ন পরকলার (Magnifying glass) অনুরূপ ছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। দক্ষিণ আমেরিকার পেরুদেশস্থ সুপ্রাচীন সূর্য্যমন্দিরের কুমারীরা তথাকার বৃহদাকার বলয়স্থ কুব্জপৃষ্ঠ পাত্রে অগ্নি প্রজ্বলিত করিত। চীনবাসীরা অগ্নিপ্রজ্বালনার্থ দাহিকাশক্তির উদ্বোধক কাচ ব্যবহার করিত।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ন্যুব্জপৃষ্ঠ কোন উজ্জ্বলপাত্রে সূর্য্যরশ্মি নিপাতিত করিয়া তাহার নাভিস্থানে (focus) তুলা বা পালকের ন্যায় শুষ্ক লঘুপদার্থ ধরিলে উহা অগ্নি-সংযুক্ত হয়। এই সূর্য্যরশ্মিজাত তেজোপদার্থ ও অরণিসংঘর্ষণে উৎপন্ন পার্থিব অগ্নি যে একই পদার্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দেখা যায়, মনুষ্যজাতির শিক্ষা অগ্নির সহিত তাহার পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ভূত। মনুষ্য যে কালে যে পরিমাণে অগ্নির ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়াছিল, তাহার জ্ঞান তৎকালে ততদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। ক্রমে মানবের মনে আলোক সংগ্রহের চিরাচরিত প্রথার শ্রম লাঘবের জন্য এক প্রচেষ্টা জাগিয়া উঠে। ফলে মনুষ্যজীবনে একটা ভীষণতর পরিণতি আসিয়া পড়িয়া বর্ত্তমান যুগের আলোক-সম্পাতের পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে।

আদিমকালে মানব প্রস্তরঘর্ষণে, অরণিসংঘর্ষে বা চক্‌মকির দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিয়া, শুষ্ক কাষ্ঠে বা শোল প্রভৃতি লঘু পদার্থে উহা রক্ষা করিত এবং তাহা হইতে দিনে বা রাত্রিতে অগ্নি লইয়া গৃহকার্য্য সমাধা করিত। প্রত্যেকের পক্ষে নিজ গৃহে অগ্নি জাগাইয়া রাখা অসম্ভব হইত বলিয়' গ্রামের মধ্যে কোন সাধারণ গৃহে অগ্নিরক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং রাশি রাশি কাষ্ঠ তাহাতে যোগাইতে হইত। মিশরীয়দিগের প্রত্যেক মন্দিরে ও ভারতীয় আর্য্য [অগ্নিহোত্র শব্দে ভারতীয় অগ্নিরক্ষা দ্র°] এবং পারসিক, গ্রীক্ ও লাটিন জাতির মধ্যে প্রত্যেক নগরে বা গ্রামে আগুন থাকিত। নাচেজ, অজতেক, মায়া ও পেরুবাসীর মধ্যে পিরামিডের উপরে জাতীয় অগ্নি জ্বালিয়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। পারসিকদিগের ধর্ম্মমন্দিরে, বৈজন্তীয় ও ক্যাথলিকদিগের গির্জ্জায় যে চিরন্তন অগ্নি সংস্থানের নিদর্শন পাওয়া যায়, উহা প্রাক্তন সংস্থিতাগ্নি (Prytaneum) ভিন্ন আর কিছুই নহে। রোমের পবিত্র কেন্দ্র রেজিয়া (Regia), যাহাকে ভেষ্টার (Vesta) বাসভূমি বলিয়া সাধারণে ভক্তির চক্ষে দেখে, সেখানে একটী ঝরণা হইতে জল ও অগ্নি পাওয়া যাইত। তথাকার সরকারী ও বেসরকারী সকল কার্য্যই এখানে বসিয়া সম্পন্ন হইত। এই অগ্নিকুণ্ডের (Prytaneum) সন্নিকটে দেবমন্দির থাকায় বহুলোক এখানে সমাগত হইত। অগ্ন্যুত্তাপের সুবিধার্থ এখানে বিচারসভা বসিত, বক্তৃতাদি হইত এবং অবকাশমত লোকে বসিয়া গল্পগুজব করিত।

রোমের ভেষ্টার মন্দিরস্থ অগ্নি যদি কোন কারণে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না। অগ্নি পুনঃ প্রজ্বালিত না হওয়া পর্য্যন্ত রোমকদিগকে সকল প্রকার

কার্য্য বন্ধ করিয়া দিতে হইত; এমন কি বিচারসভা (ধর্ম্মাধিকরণ) ও রাজসরকারের যাবতীয় কার্য্য বন্ধ থাকিত। তাহাদের বিশ্বাস, ইহা দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের বন্ধন বিচ্যুত হইয়াছে। অনন্তর যতক্ষণ পর্য্যন্ত অরণিঘর্ষণে বা সূর্য্যরশ্মি হইতে অগ্নিস্থাপন না হইত, ততক্ষণ কেহ নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না।

রোমক বা গ্রীক্‌গণ স্ব স্ব দেশসীমার অতিক্রমের পূর্ব্বে উক্ত কুণ্ড হইতে অগ্নি লইয়া অন্য ভাণ্ডে স্থাপনান্তর স্থানান্তরে যাইত এবং তথায় স্বতন্ত্র বেদীতে উহাকে জাগাইয়া রাখিত। জন্মভূমি হইতে ভিন্নস্থানে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে হইলে গ্রীক্‌গণ হেষ্টিয়ার বেদী হইতে জাগ্রত অগ্নি লইয়া নূতন বাসভুমে স্থাপন করিত। যখন থিসিউস্ আটিকাবাসী (Attica) দ্বাদশটী জাতিকে লইয়া স্থানান্তরে গমন করেন, তখন তাহারা আথীনী পোলিয়াসের মন্দির হইতে অগ্নি লইয়া গিয়াছিল। গ্রীক্‌রাজগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইলে ডেল্‌ফির কুণ্ড হইতে সাধারণে অগ্নি লইত। ডেলোস্ দ্বীপেও এরূপ একটী কেন্দ্রাগ্নি ছিল। গ্রীক্‌দিগের বিশ্বাস, প্রমিথিউস্ সূর্য্যরথ হইতে অগ্নি ধরায় আনিয়াছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার দামারাদিগের মধ্যে এইরূপ চিরন্তন অগ্নিরক্ষার ব্যবস্থা আছে। কুমারীগণ ঐ অগ্নি রক্ষা করিতে বাধ্য। যদি কেহ পিতৃপুরুষের বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায়, তাহাকে আদি কুণ্ড হইতে অগ্নি লইয়া অন্যত্র গমন করিতে হয়। আমেরিকার অসিনৈ, মৈচা প্রভৃতি আদিম জাতির মধ্যে এইরূপ বংশানুক্রমে অগ্নিরক্ষার প্রথা আছে। ঐ অগ্নি কোন কারণে নির্ব্বাপিত হইলে উহার পুনঃ-স্থাপন করা বিধেয়।

প্রাচ্যজগতের এট্রুস্কান্, পেরুবীয়, মেক্সিকান্ ও অজতেক জাতির মধ্যে এই চিরস্থায়ী অগ্নিসংস্কারের একটী উৎসব আচরিত হয়। প্রতি ৫২ বৎসর অন্তর তাহারা কুণ্ডাগ্নি শোধন করিয়া লয়। এই উপলক্ষে পূজা, নাচগান ও ভোজের অনুষ্ঠান হয়।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অগ্ন্যাধানের অভিনব প্রচেষ্টা হইতে থাকে। বিবর্দ্ধনশক্তি-সম্পন্ন পরকলা দিয়া সূর্য্যরশ্মি সংহত করিয়া অগ্নিস্থানে দিয়াশলাই আবিষ্কৃত হয়। উহার অগ্রভাগে সোরা, গন্ধকাদি দ্রব্য লিপ্ত থাকায় উহা বিস্ফোরণশীল হইয়াছে। উহার একটী কাঠি বারুদসংযুক্ত বাক্সের গায়ে ঘর্ষণ করিলে উহা জ্বলিয়া উঠে। ফস্ফরাস ও গন্ধকসংযুক্ত কাঠি কঠিন স্থানে ঘষিলে আলোক-সহকারে প্রজ্বলিত হয়। অতঃপর বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতে অগ্নিকার্পাস আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা দ্বারা কোন দ্রব্য অধিক ক্ষয় হয় না; কিন্তু উহাতে বিস্ফোরণ ও অগ্ন্যুৎপাদন হইয়া থাকে। [অগ্নিকার্পাস ও দিয়াশলাই দ্র°]

দাহ্যবস্তুর শক্তি ও বিভিন্ন দ্রব্যের সংমিশ্রণ হেতু সমষ্টিগত গুণের তারতম্যানুসারে অগ্নির দাহিকাশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং ভোজ্যরূপে অগ্নি দাহ্যবস্তু যতই দহন করিতে থাকে, ততই উহার তেজের বিকাশ হয়। আবার দাহ্যবস্তুর ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নির তেজ ও দীপ্তির বিলয় ঘটিতে থাকে। কাষ্ঠে অগ্নিসংযোগ করিলে উহা ধীরে ধীরে জ্বলিতে থাকে। এমন একটা সময় আসে যখন কাষ্ঠস্তূপ পূর্ণমাত্রায় জ্বলিয়া উঠে। ঐ সময় অগ্নির দীপ্তি, দাহিকাশক্তি ও তাপ চরম সীমায় উঠে। দাহ্যবস্তু পূর্ণ ভোগের পর তাপ কমিতে থাকে, দাহিকাশক্তি হ্রাস পায় এবং পূর্ব্ব দীপ্তি বা ঔজ্জ্বল্য ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে থাকে। পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞানে এই তাপের পরিমাণ বা মাত্রা হইতে অগ্নির দাহিকাশক্তি নিরূপিত হয়। বাহ্যতঃ এই শক্তি অগ্নিশিখা দ্বারা অবধারিত হয়। [অগ্নিশিখা দ্র°]

অগ্নির অধিকাংশই বায়ুতে পূর্ণ। উহার নির্ম্মল অংশ অর্থাৎ অম্লজান (Oxygen) অপর ভৌতিক পদার্থের সহিত মিলিত হইলে তাপ ও আলোকের উৎপত্তি হয়, ঐ তাপ ও আলোক জ্বলন নামে অভিহিত। [জ্বলন দ্র°] অম্লজানের সহিত অপর পদার্থের আকস্মিক মিলন ঘটিলে, যে অগ্নিতে বায়বীয় অম্লজান থাকে, তাহা ক্ষীণতেজ হইয়া পড়ে।

ষ্টৈইক্ ও অন্যান্য দার্শনিকগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, একদিন অগ্নি জগৎ ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। স্কন্দনাভ জাতির প্রাচীন কাব্যে লিখিত আছে, লোকির অগ্নি জগৎ গ্রাস করিয়া আপনার আগুনে আপনি ভস্মীভূত হইবে।

অগ্নি$_2$—ভারতীয় আর্য্যজাতির এক প্রধান দেবতা। আদিম অবস্থায় মানব সর্ব্বপ্রথম যখন তেজোময় অগ্নির প্রচণ্ড দাহিকাশক্তি, আলোকের সহিত সংশ্রব, আকাশের সূর্য্য ও বিদ্যুতের সহিত একতা এবং সর্ব্বোপরি দৈনন্দিন জীবিকানির্ব্বাহের পথে প্রবল উপযোগিতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইল, তখনই ভয় ও ভক্তিতে অভিভূত হইয়া মানবজাতির অশেষ মঙ্গলপ্রদ দ্যুতিমান্ অগ্নিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে আরম্ভ করিল। প্রাচীন-কালে পৃথিবীর বহুস্থানে অগ্নিপূজার প্রচলন ছিল। আর্য্যগণ সর্ব্বতেজের মূলীভূত অগ্নিকে তাঁহাদের উপাস্য প্রধান দেবতা-ত্রয়ের মধ্যেই স্থান দান করিয়াছেন।

আর্য্যগণের ভারতে আসিবার সময় হইতেই এদেশে অগ্নি-পূজার প্রচলন হইয়াছে। বৈদিকভারতে অগ্নির উপাসনার বহুল

প্রচলন ছিল। চারিখানি বেদসংহিতায়, বেদের সকল ব্রাহ্মণে ও সকল প্রধান উপনিষদে অগ্নির মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঋকসংহিতার আদি মন্ত্রে আছে—

"ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং
হোতারং রত্নধাতমম্"।"

অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত, দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক্, হোতা ও প্রভূত রত্নধারী।

সামবেদসংহিতার আদি মন্ত্রেও পাই—

"অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে।
নিহোতা সৎসি বর্হিষি।"

হে অগ্নি, হবি ভক্ষণ করিবার জন্য, (দেবগণকে) হব্যদান করিবার জন্য আমাদের স্তত হইয়া আমাদের যজ্ঞে আগমন কর, হোতার আহ্বানকারী হইয়া কুশে উপবিষ্ট হও।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুইখানি বেদে প্রথমেই অগ্নির স্তুতিমন্ত্র হইতে বৈদিক আর্য্যঋষিগণের নিকট অগ্নি অগ্রগণ্য দেবতা বলিয়া সূচিত হইতেছে। যাস্ক তাঁহার বেদের নিরুক্তে (৭.৫) লিখিয়াছেন—

"তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তা অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো বায়ুর্বেন্দ্রো বান্তরিক্ষস্থানঃ সূর্য্যো দ্যুস্থানস্তাসাং মহাভাগ্যাদৈকৈকস্যা অপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্ত্যপি বা কর্ম্মপৃথকৃত্বাদ্যথা হোতাধ্বর্য্যুর্ব্রহ্মোদ্গাতেত্যপ্যেকস্য সতোঽপি বা পৃথগেব স্যুঃ পৃথগ্ঘি স্তুতয়ো ভবন্তি।"

'নৈরুক্তদিগের মতে দেবতা তিনজন, পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু এবং আকাশে সূর্য্য। তাঁহাদের মহাভাগ্য হেতু এক এক জনের অনেকগুলি নাম অথবা পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মের জন্য হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা ও উদ্গাতা। অথবা তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ দেবই ছিলেন, কেননা তাঁহাদিগকে পৃথক্রূপে স্তুতি করা হইয়াছে।'

যাস্কের উক্তি হইতে মনে হয় যে, তিনজন অগ্রগণ্য দেবতার মধ্যে অগ্নি একজন ছিলেন। চারি বেদসংহিতার মধ্যে অগ্নি সম্বন্ধে যত সূক্ত আছে, অপর কোন দেবতার সেরূপ নাই। এক ঋগ্বেদেরই প্রায় একচতুর্থাংশ মন্ত্র অগ্নির উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে। অগ্নি না হইলে যজ্ঞ হয় না, এজন্য ঋগ্বেদে অনেকস্থলে অগ্নিকে পুরোহিত বলা হইয়াছে। হোতা, পোতা, অধ্বর্য্যু প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির ঋত্বিক্ বা পুরোহিত যজ্ঞের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতেন। হোতা মন্ত্রদ্বারা দেবগণকে আহ্বান করিতেন। অগ্নি না জ্বালিলে যজ্ঞ হয় না। অগ্নিই দেবগণের যজ্ঞে আগমনের কারণ। তাই অগ্নিকে হোতা পুরোহিত বলা হইয়াছে।

শুক্লযজুর্ব্বেদীয় আরণ্যক ব্রাহ্মণের অষ্টম অধ্যায়ে অগ্নিস্তুতি উপলক্ষে অধিভূত অগ্নি দুইপ্রকার লিখিত আছে, যথা, অধিদেব অগ্নি এবং অধ্যাত্ম অগ্নি। অধ্যাত্ম অগ্নিকে জীবদেহের নিধন, সম্বরণ ও জ্যোতিষ্ট্ব এই প্রকার ত্রয়ের কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

যজুর্ব্বেদে লিখিত আছে—"ভ্রমদসি জলদসি + + + + আর্দ্রে সন্দিপ্তমসি + প্রভুরসি জ্যোতিরসি নিধনমসি সংবর্গোঽসি প্রতিষ্ঠোঽসি।" অর্থাৎ—'হে অগ্নি! তুমি প্রাণরূপে দেহের পরিচালক, আবার তুমিই বহিরিন্ধনে প্রজ্বলনরূপে প্রকাশমান। তুমি মেঘোদয়ে বিদ্যুৎরূপে প্রদীপ্ত হও, তুমিই স্থাবরজঙ্গমে থাকিয়া তাহাদের প্রভু হও ও সামর্থ্য প্রদান কর। তুমিই তাহাদের জ্যোতির কারণ, আবার তুমিই তাহাদের আহারের হেতু এবং তুমিই তাহাদের স্থিতি-কারণ।' এস্থানে আমাদের বেদপুরুষেরা কায়াগ্নি বা অধ্যাত্ম অগ্নির সমতায় জীবদেহের স্থিতি, তাহার অভাবে জীবের নিধন—ইহাই উপদেশ দিতেছেন।

অমরকোষে দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয়, অগ্নির এই ত্রিধা মাত্র ভেদ লক্ষিত হয়। নৈয়ায়িকেরা তার্ণ ও অতার্ণ ভেদে অগ্নি দ্বিবিধ বলিয়া থাকেন। [তত্তৎ শব্দ দ্র°]

আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রেও (৫.১৬.৪) চারি প্রকার অগ্নির উল্লেখ আছে—(১) ভৌম; (২) জলমধ্যস্থ; (৩) অন্তরীক্ষ বা সূর্য্যমধ্যস্থ এবং (৪) দ্যুলোকস্থ অগ্নি। ঋগ্বেদের বহুস্থানেও ইহা উক্ত হইয়াছে।

বেদের বিভিন্ন স্থানে অগ্নিদেব সম্বন্ধে নানারূপ আখ্যায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়।

শতপথ-ব্রাহ্মণে অগ্নি সম্বন্ধে একটী গল্প আছে—

বিদেঘ-মাথব মুখমধ্যে অগ্নি ধারণ করেন। গোতম-রাহুগণ নামে এক ঋষি তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। তিনি মাথবকে সম্ভাষণ করিলেন, কিন্তু কি জানি অগ্নি মুখরন্ধ্র হইতে বিনির্গত হন, এই আশঙ্কায় মাথব প্রত্যুত্তর করিলেন না। পুরোহিত অগ্নিদেবকে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্তব করিলেন,—

"বীতিহোত্রং ত্বা কবে দ্যুমন্তং সমিধীমহি।
অগ্নে বৃহন্তমধ্বরে॥" (ঋগ্বেদ ৫.২৬.৩)

মাথব তথাপি উত্তর দিলেন না। পুরোহিত পুনরায় বলিলেন,—"তদগ্নে শুচয়স্তব শুক্রা ভ্রাজন্ত ঈরতে। তব জ্যোতিংষ্যর্চয়ঃ॥" (বিদেঘা ইতি) ঋক্ ৮.৪৪.১৭।

পুরোহিত ইহাতে প্রত্যুত্তর না পাইয়া পুনরায় স্তব করিলেন,—"তং ত্বা ঘৃতস্নবীমহে॥" (ঋক্ ৫.২৬.২) অর্থাৎ হে ঘৃত-প্রেরক অগ্নি! আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করি।

এই অবধি আবৃত্তি করিয়াছেন, এমন সময় অগ্নি 'ঘৃত' এই শব্দ শ্রবণমাত্র মুখ হইতে বাহির হইয়া দীপ্তিমান্ হইয়া উঠিলেন। মাথব তাঁহাকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। সে সময়ে বিদেঘ-মাথব সরস্বতী-তটে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। অগ্নি তখন দহন করিতে করিতে পূর্ব্বাভিমুখে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। গোতম-রাহূগণ ও বিদেঘ-মাথব উভয়ে ঐ দাহ্যমান অগ্নির অনুসারী হইলেন। বৈশ্বানর সমুদয় নদী অতিক্রম করিয়া দাহন করিলেন; কেবল উত্তর-গিরি-বিনির্গত সদানীরা নাম্নী নদীর পরপারমাত্র দগ্ধ করিলেন না। বৈশ্বানর ঐ নদী অতিক্রম করিয়া দাহন করেন নাই বলিয়া পূর্ব্বকালীন ব্রাহ্মণেরা উহাকে উত্তরণ করিয়া যাইতেন না। এখন অনেকানেক ব্রাহ্মণ উহার পূর্ব্বপারে অবস্থান করেন। অগ্নি উহার স্বাদ গ্রহণ করেন নাই বলিয়া উহা বাসাযোগ্য ও জল-সিক্ত ছিল। এক্ষণে ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞানুষ্ঠান করাতে উহা বাসযোগ্য হইয়াছে। অগ্নি ঐ নদী অতিক্রম করিয়া দগ্ধ করেন নাই, এই নিমিত্ত উহা গ্রীষ্মাবশেষেও শীতল থাকে। বোধ হয় যেন ক্রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। 'বিদেঘ-মাথব বলিলেন, 'আমি কোন্ স্থানে অবস্থান করিব?' অগ্নি কহিলেন, 'এই নদীর পূর্ব্বপ্রদেশ তোমার আবাস-ভূমি হইবে।' অদ্যাপি ঐ নদী কোশল ও বিদেহবাসীদিগের মধ্যবর্ত্তিনী। তাহারা মাথব-সন্তান।"* (শতপথব্রা°, ১.৪.১.১০-১৭)

অগ্নিদেবের উৎপত্তির কথা বেদ ও পুরাণাদিতে নানারূপে উক্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদে সাধারণতঃ দ্যৌ অগ্নির পিতা ও মাতা বলিয়া উক্ত আছে। "দ্যৌষ্পিতা জনিতা" (ঋক্ ৪.১.১০); দ্যৌই অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছেন (ঋক্ ১০.৪৫.৮; ৪.১৫.৬; ৬.৪৯.২)। এতদ্ব্যতীত বেদে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে অগ্নির উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। ইনি দ্যাব-পৃথিবীর পুত্র (ঋক্ ৩.২.২; ৩.৩.১১; ৩.২৫.১; ১০.১.২; ১০.২.৩)। অগ্নি, সূর্য্য ও উষা ইন্দ্রাবিষ্ণু হইতে জন্ম লইয়াছেন (ঋক্ ৭.১১.৪)। ইন্দ্র মেঘদ্বয়ের মধ্যে অগ্নিকে উৎপাদন করেন। (ঋক্ ২.১২.৩) ইলার পুত্র অগ্নি অরণিতে উৎপন্ন হইয়াছেন। (ঋক্ ৩.২৯.৩) দেবগণ আর্য্যের জন্য জ্যোতিঃরূপে অগ্নিকে উৎপাদন করেন। (ঋক্ ১.৫৯.২; ৬.৭.১; ৮.৯১.১৩)। এক স্থলে অগ্নিকে বরুণের ভ্রাতা এবং বরুণকে অদিতির পুত্র বলা হইয়াছে, সুতরাং ইহা হইতে আমরা অগ্নিকে অদিতির পুত্র বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি (ঋক্ ৪.১.২)। অরণি-সংঘর্ষণে প্রতিদিন অগ্নির উৎপত্তি হইয়া থাকে, একথাও বেদের স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় (ঋক্ ৩.২১.২; ২.২৩.২; ৩.২৩.৩; ৭.১.১; ৬.৪৮.৫; ১.৯৫.২; ১০.৭.৯)। শুষ্ক কাষ্ঠ হইতে জলন্ত হইয়া অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইয়া-ছেন (ঋক্ ১.৬৮.২)। হব্যবাহক অগ্নি দুইটী কাষ্ঠ হইতে জাত এবং মাতরিশ্বা এই অগ্নিকে মিত্রের ন্যায় ভৃগুবংশীয়-দিগের নিকট আনিলেন।* (ঋক্ ১০.৬০.১)

ঋগ্বেদেরই অপর এক স্থলে পরমপুরুষের মুখ হইতে ইঁহার জন্ম উল্লিখিত হইয়াছে। (ঋক্ ১০.৬০.১)

তৈত্তিরীয়সংহিতায় উক্ত আছে, প্রজাপতি অগ্নির সৃষ্টি করিয়া দেবতাদিগকে বিশ্রামভূমিস্বরূপ দান করেন।

অদ্ভুত-ব্রাহ্মণে, অগ্নি অঙ্গিরসের পুত্র বলিয়া কথিত আছে—

"তেঽগ্নিং প্রজিঘ্যরঙ্গিরসাং বা একোঽগ্নিঃ।
পরেহ্যাদিত্যেভ্যঃ শ্বঃসুত্যাং স্বর্গস্থ লোকস্থ প্রব্রহীতি।"

বেদসংহিতায় অগ্নির সহিত অঙ্গিরা ঋষির সবিশেষ ঘনিষ্ঠতা দৃষ্ট হয়। এমন কি, কোন কোন স্থলে অগ্নিদেব একেবারে অঙ্গিরা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। (ঋক্ ১.৩২.১-২) ফলতঃ অগ্নিদেবের সহিত অঙ্গিরা ঋষির বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, তিনি কখন কখন অগ্নিদেবের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করিয়া দেব-কার্য্য সমাধা করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি ও তৎকালীন ঋষিগণ জনসমাজে অগ্নির উপাসনা প্রচলিত করেন, এইরূপ বহুল কথা বেদ, নিরুক্ত ও মহাভারতে বারংবার উল্লিখিত হইয়াছে। (ঋক্ ১.১.৬; ১.৭১; ২-৩; নিরুক্ত ১১.১৭-১৯ এবং মহাভা°, বন° ১১৬ অ° দ্র°)

বিষ্ণুপুরাণে ইনি ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া কথিত। কিন্তু পুরাণান্তরে, ধর্ম্মের ঔরসে বসু নাম্নী পত্নীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম লিখিত আছে। কোথাও ইনি কশ্যপ ও অদিতির পুত্র বলিয়া উল্লিখিত। ভাগবত, ব্রহ্ম, বায়ু ও পদ্মপুরাণের মতে ইনি একজন দিক্পাল, পিতৃলোকের ও পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণের

* অগ্নির এই উপাখ্যান পাঠে একটী ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়—

আর্য্যেরা যে স্থান দিয়াই ভারতবর্ষে প্রবেশ করুন না কেন, অতি পূর্ব্বে ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে সরস্বতী-তীরে ধর্ম্ম প্রচার করেন এবং ঐ সরস্বতী-তীর হইতে ক্রমশঃ পূর্ব্ব প্রদেশ অধিকারপূর্ব্বক সদানীরা-তটে থাকিয়া স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাই ঐ উপাখ্যানের রূপক প্রমাণ। যে সময়ে শতপথের এই অংশটী রচিত হয়, হিন্দুরা সে সময় সদানীরা নদী অতিক্রম করিয়া বিদেহ অর্থাৎ মিথিলা দেশ অধিকার করিয়াছিলেন।

* Bothlink ও Roth তাঁহাদের জগদ্বিখ্যাত অভিধানে 'মাতরিশ্বা'র অর্থ করিয়াছেন—একজন দেব যিনি বিবস্বানের দূতরূপে আকাশ হইতে অগ্নি আনিয়া ভৃগুবংশীয়দিগকে দেন। বেদের এই উক্তির সহিত গ্রীক্‌দিগের প্রমিথিয়ুসের কাহিনী হুবহু মিলিয়া যাইতেছে।

অধিপতি। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে, যমই কেবল পিতৃলোকের অধিপতি। মৎস্যপুরাণ মতে, তামস মন্বন্তরে অগ্নি, কবি, পৃথু, অকপি, কপি, জন্য ও ধাম নামক মহর্ষিগণ সপ্তর্ষি নামে অভিহিত হইতেন।

"মন্বন্তরং চতুর্থন্তু তামসং নাম বিশ্রুতম্।
কবিঃ পৃথুস্তথৈবাগ্নিরকপিঃ কপিরেব চ॥
তথৈব জন্যধামানৌ মুনয়ঃ সপ্ত তামসে।" (মৎস্যপু ৯ অ°)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে (৪র্থ অ°) অগ্নির উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের মানস হইতে তপ্ত-কাঞ্চন-সদৃশ কামদেব জন্মগ্রহণ করেন। এই কামদেবের বামপার্শ্ব হইতে সকলের মোহকারিণী অনুপমরূপলাবণ্যবতী রতিদেবী উৎপন্না হইলেন। সেই কামদেব মারণ, স্তম্ভন, জৃম্ভণ, শোষণ ও উন্মাদন এই পঞ্চবাণ ধারণ করিয়া পরীক্ষার নিমিত্ত সকলের উপর নিক্ষেপ করিলে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সকলেই এককালে কামাধীন হইয়া উঠিলেন। অধিক কি, মহাযোগী ব্রহ্মারও সতৃষ্ণনয়নে রতিদেবীকে অবলোকনমাত্র রেতঃপাত হইল। তখন ব্রহ্মা অতিশয় লজ্জিত হইয়া নিজ পরিধেয়বস্ত্রদ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই রেতঃ সহসা আবরণবস্ত্র দগ্ধ করিয়া জাজ্বল্যমান শিখাসমূহে পরিবেষ্টিত অতি প্রকাণ্ড দেবপ্রধান জ্বলন্ত অগ্নিরূপে পরিণত হইয়া উঠিল। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সেই অগ্নিকে ভাস্বররূপে বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ অবলীলা-ক্রমে মুখবিন্দু উদ্গার করিয়া নিশ্বাসবায়ুর সহিত জলের সৃষ্টি করিলেন। তাহার কিঞ্চিন্মাত্র অংশ সেই প্রচণ্ড বহ্নিকে শান্ত করিল। এই কারণেই অদ্যাপি জলস্পর্শে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া থাকে। তাহার পর সেই অগ্নিদেবের বামভাগ হইতে স্বাহা নামে এক কন্যা আবির্ভূতা হইলেন। মনীষিগণ তাঁহাকে অগ্নিদেবের পত্নী বলিয়া থাকেন।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মতে, প্রজাসৃষ্টিকামী পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হইলে তদীয় জ্যোতির্মণ্ডল অগ্নিরূপে ভূলোক-দ্যুলোক সমাচ্ছন্ন করিয়া প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ক্রমে সহস্র বৎস-রান্তে সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ একীভূত হইয়া সূর্য্যমণ্ডলাকারে পরিণত হইল। অগ্নিই সোম, কাল এবং রুদ্র। [ব্রহ্মাণ্ডপু° ২১ অ°]

স্বাহা অগ্নির স্ত্রী। প্রাচীন রোমকেরা ইঁহাকে ভেষ্টা নামে পূজা করিতেন, কিন্তু মন্দিরে ইঁহার কোন প্রতিমূর্ত্তি (Vesta) রাখিতেন না ; কেন না—

"No image Vesta's semblance can express,
Fire is too subtle to admit of dress" (Ovid)

কোন প্রতিমূর্ত্তিই ভেষ্টার রূপ প্রকাশ করিতে পারে না। অগ্নি অতি তেজঃপুঞ্জ, ইঁহাকে আবার কে বেশভূষায় পরি-শোভিত করিতে পারে ?

অগ্নির পত্নী স্বাহার গর্ভে পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিনটী পুত্র জন্মে, তাঁহারা বিপুল প্রভাবশালী। পাবক—বৈদ্যুতাগ্নি, পবমান—নির্মথ্যাগ্নি (যাহা ঘর্ষণে উৎপন্ন হয়) ; শুচি—সৌরাগ্নি। পাবকের পুত্র হব্যবাহন, ইনি দেবতা-দিগের অগ্নি। পবমানের পুত্র সহরক্ষস্, ইনি অসুরদিগের অগ্নি।

অগ্নির আর একটী স্ত্রীর নাম বসোধারা। তাঁহার গর্ভে দ্রবণিক প্রভৃতি অনেকগুলি পুত্র জন্মে। তাহারা পরস্পর ৪৫ জন। প্রথমোক্ত অগ্নি, পাবক, পবমান ও শুচি আর এই ৪৫টী একত্র করিলে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৯টী অগ্নি হয়। বায়ু-পুরাণে এই ৪৯টী অগ্নির নাম ও বাসস্থান বর্ণিত আছে। ভাগবত মতে, ৪৯টী অগ্নির প্রভেদ নহে, নাম মাত্র। ভিন্ন ভিন্ন হোমাদিতে অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহৃত হয়। [অগ্নিবংশ দ্র°]

বেদ ও বিভিন্ন পুরাণাদি হইতে আমরা অগ্নির এই কয়টী নাম পাইতেছি—

১ বৈশ্বানর। ২ বহ্নি। ৩ বীতিহোত্র। ৪ ধনঞ্জয়। ৫ কৃপীট-যোনি। ৬ জ্বলন। ৭ জাতবেদস্। ৮ তনূনপাৎ। ৯ তনূনপা। ১০ বর্হিঃশুষ্মন্। ১১ বর্হিস্। ১২ শুষ্মন্। ১৩ কৃষ্ণবর্ত্মন্। ১৪ শোচিষ্কেশ। ১৫ উষর্ব্বুধ। ১৬ আশ্রয়াশ। ১৭ বৃহদ্ভানু। ১৮ কৃশানু। ১৯ পাবক। ২০ অনল। ২১ রোহিতাশ্ব। ২২ বায়ুসখা। ২৩ বায়ুসখ। ২৪ শিখাবৎ। ২৫ শিখিন্। ২৬ আশুশুক্ষণি। ২৭ হিরণ্যরেতস্। ২৮ হুতভুক্। ২৯ হব্যভুক্। ৩০ দহন। ৩১ হব্যবাহন। ৩২ সপ্তার্চ্চিস্। ৩৩ দমুনস্। ৩৪ দমূনস্। ৩৫ শুক্র। ৩৬ চিত্রভানু। ৩৭ বিভাবসু। ৩৮ শুচি। ৩৯ অপ্‌পিত্ত। ৪০ বৃষাকপি। ৪১ জুহূবাল। ৪২ কপিল। ৪৩ পিঙ্গল। ৪৪ অরণি। ৪৫ অগির। ৪৬ পাচন। ৪৭ বিশ্বপ্সস্। ৪৮ ছাগবাহন। ৪৯ কৃষ্ণার্চ্চিস্। ৫০ জহূবার। ৫১ উদর্চ্চিস্। ৫২ ভাস্কর। ৫৩ বসু। ৫৪ শুষ্ম। ৫৫ হিমা-রাতি। ৫৬ তমোনুৎ। ৫৭ সুশিখ। ৫৮ সপ্তজিহ্ব। ৫৯ অপপারিক। ৬০ সর্ব্বদেবমুখ। ৬১ হুতাশন। ৬২ আশয়াশ। ৬৩ মাতরিশ্বা। ৬৪ যুবা। ৬৫ যবিষ্ঠ। ৬৬ অগ্নি।

কর্ম্মবিশেষে অগ্নির পৃথক্ পৃথক্ নাম নির্দ্দিষ্ট আছে। নবগৃহে প্রবেশাদি কর্ম্মে ১ পাবক। গর্ভাধানে ২ মারুত। পুংসবনে ৩ চন্দ্রমস্। শুঙ্গাকর্ম্মে ৪ শোভন। সীমন্তে ৫ মঙ্গল। জাতকর্ম্মে ৬ প্রগল্ভ। নামকরণে ৭ পার্থিব। অন্নপ্রাশনে ৮ শুচি। চূড়াকরণে ৯ সত্য। ব্রতে ১০ সমুদ্ভব। গোদান সংস্কারে ১১ সূর্য্য। সমাবর্ত্তনে ১২ অগ্নি। সাগ্নিকের বেদের সমাপনক্রিয়ায় ১৩ বৈশ্বানর। বিবাহে ১৪ যোজক।

বিবাহের পর চতুর্থী হোমে ১৫ শিখী। ধৃতিহোমাদিতে ১৬ অগ্নি। প্রায়শ্চিত্তাত্মক মহাব্যাহৃতিহোমে ১৭ বিধু। বৃষোৎসর্গ গৃহপ্রতিষ্ঠাদি কর্ম্মে ১৮ সাহস। লক্ষহোমে ১৯ বহ্নি। কোটিহোমে ২০ হুতাশন। পূর্ণাহুতিতে ২১ মৃড়। শান্তিকর্ম্মে ২২ বরদ। পৌষ্টিকে ২৩ বলদ। অভিচারে ২৪ ক্রোধ। বশীকরণে ২৫ শমন। বরদানে ২৬ অতিদূষক। কোষ্ঠে ২৭ জঠর। অমৃতভক্ষণে ২৮ ক্রব্যাদ।

অগ্নির আর একটী নাম নাচিকেত। রাজা বাজশ্রবসের পুত্র নচিকেতা হইতে এই নামের উৎপত্তি। অথর্ব্ববেদীয় কঠোপনিষদে নচিকেতার কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বৈদিক যুগ হইতেই অগ্নির নানা প্রকার মূর্ত্তির কল্পনা করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়া আমরা অগ্নির অবয়ব পরিকল্পনা সম্বন্ধে মোটামুটি এইরূপ জানিতে পারি—

অগ্নির সপ্তরশ্মিবিশিষ্ট তিনটী মস্তক আছে (ঋক্ ১.১৪৬.১ ; ২.৫.৩)। (কোথাও আবার পাদবিহীন ও মস্তক-বর্জ্জিত কল্পনা করা হইয়াছে (ঋক্ ৪.১.১১)। ইনি চতুর্নেত্র, কোথাও বা সহস্রনেত্র (ঋক্ ১.৩১.১৩ ; ১.৭৯.১২)। সহস্র-শৃঙ্গবিশিষ্ট (ঋক্ ৬.১.৮)। ইঁহার তিনটী জিহ্বা (ঋক্ ৩.২০.২)। বাজসনেয় সংহিতার মতে, (১৭.৮৯) অগ্নি সপ্তজিহ্ব। ইঁহার দংষ্ট্রা অতিশয় তীক্ষ্ণ (ঋক্ ৮.৪৯.৩), জ্বালা-যুক্ত (ঋক্ ১.৫৮.৫) এবং সুবর্ণের ন্যায় অত্যুজ্জ্বল (ঋক্ ৫.২.৩ ; ৫.৭.৪)। (কোথাও আবার ইঁহার দন্ত লৌহের ন্যায় দৃঢ় বলা হইয়াছে ; ঋক্ ১০.৮৭.২)। ইনি সুবর্ণশ্মশ্রুবিশিষ্ট, উজ্জ্বলদন্ত, মহান্ এবং অপ্রতিহতবলসম্পন্ন (ঋক্ ৫.৭.৭)। ইঁহার কেশরাশি দীপ্ত এবং পিঙ্গলবর্ণ (ঋক্ ১.৪৫.৬ ; ৩.২.১৩)।

উপনিষদে অগ্নির সপ্ত প্রকার জিহ্বা লিখিত হইয়াছে, যথা—

“কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ॥”
(মুণ্ডকোপনিষৎ ১.২.৪)

অর্থ—(১) কালী, (২) করালী, (৩) মনোজবা, (৪) সুলোহিতা, (৫) সুধূম্রবর্ণা, (৬) স্ফুলিঙ্গিনী, (৭) বিশ্বরুচী এই সপ্ত প্রকার অগ্নির জিহ্বা আহুতি গ্রহণের নিমিত্ত লেলায়মান হয়।

কথিত আছে, যে ব্যক্তি, ঐ সকল অগ্নিজিহ্বা প্রকাশিত হইলে, উপযুক্তকালে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সূর্য্যরশ্মি দ্বারা ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন।

“এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন্।
তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো যত্র দেবানাং পতিরেকোধিবাসঃ॥”৫॥
এখানে সূর্য্যরশ্মির সহিত অগ্নির সম্বন্ধ নির্ণীত হইল।

পৌরাণিক যুগের কোন্ বিশেষ সময়ে অগ্নির মূর্ত্তিপূজা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা নির্দ্দেশ করা সহজসাধ্য নহে। তবে মূর্ত্তিপূজাও যে বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা প্রাচীন ভাস্করশিল্প হইতে বুঝা যায়।*

সনাতনধর্ম্মী হিন্দুগণ পুরাণ ও তন্ত্রের মধ্য দিয়া এবং অগ্ন্যুপাসকগণ তাঁহাদের অভীষ্ট দেবতার বিশেষত্ব রক্ষা করিতে গিয়া অগ্নিদেবতার বিশেষ বিশেষ রূপ কল্পনা করিয়াছেন এবং সেই কল্পনাসম্ভূত বর্ণনা অনুসরণ করিয়া ভাস্করশিল্পে অগ্নির যে বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তি প্রচারিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে বিষ্ণু ও ইন্দ্রপূজার সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি, সূর্য্য, ব্রহ্মা ও শিবের পূজা বিহিত। বৈদিক ত্রিমূর্ত্তি অগ্নি, ইন্দ্র (বায়ু) ও সূর্য্য পরে ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণু (সূর্য্য) মূর্ত্তিতে পরিকল্পিত হন। কলিকাতাস্থ ভারতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত ভাস্করক্ষোদিত ত্রিমূর্ত্তি দৃষ্টে অনুমান হয়, অগ্নি ও ব্রহ্মার মূর্ত্তি একরূপ। ব্রহ্মা যেরূপ কাষায়বস্ত্র পরিহিত ও কমণ্ডলুধর, অগ্নিও সেইরূপ লালবর্ণ ও কমণ্ডলুধারী।

মৎস্য ও অগ্নিপুরাণে বর্ণিত অগ্নিদেবতা দুই বা চারি হস্ত-বিশিষ্ট, ছাগবাহন,† অক্ষমালা, কমণ্ডলু ও শক্তিধর ; দীর্ঘ-শ্মশ্রুল ও সপ্তশিখাসমন্বিতশীর্ষ। হেমাদ্রিখণ্ডের মতে, অগ্নির দক্ষিণহস্তে জ্বালা ও ত্রিশূল এবং বামহস্তে অক্ষমালা। পত্নী স্বাহা রত্নপাত্র লইয়া তাঁহার বাম উৎসঙ্গে উপবিষ্ট। মৎস্যপুরাণ-মতে, অগ্নি ও ব্রহ্মা উভয়েই রক্তবর্ণ ও কমণ্ডলুধারী।

“বামোৎসঙ্গগতা স্বাহা শক্রস্যেব শচী ভবেৎ।
রত্নপাত্রকরা দেবী বহ্নের্দক্ষিণহস্তয়োঃ
জ্বালাত্রিশূলে কর্ত্তব্যে ত্বক্ষমাল্যং চ বামকে।” (হেমাদ্রি)

মথুরা ও কলিকাতার যাদুঘরে অগ্নির দুইটী প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। মথুরার অগ্নিমূর্ত্তিটীর চারিদিকে অগ্নিশিখার চক্র, পার্শ্বে দুই অনুচর, দক্ষিণের অনুচরের মস্তকে ছাগমুণ্ড।

* মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া অগ্নির পূজা ঠিক কোন্ সময় হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। সম্ভবতঃ শাকদ্বীপী (মগ) ব্রাহ্মণগণ শাকদ্বীপে (Scythia) অবস্থানকালে মিশর, বাবিলন, আসিরীয় ও গ্রীস প্রভৃতি পাশ্চাত্য রাজ্যে প্রচলিত দেবতাগণের প্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকিবেন। মিশরে ৫ম রাজবংশের শাসনকালে ‘রা’ নামে সূর্য্যদেবতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। আবুশের নগরের ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত সূর্য্যমন্দির আজিও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। তথায় ২য় রাজবংশের অধিকারকালে মানবমূর্ত্তির অনুকরণে দেবমূর্ত্তি গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

† ঋগ্বেদের একস্থানে ইঁহার বাহন দুইটী সিংহ বলা হইয়াছে (ঋক্ ৮.১৭.২)।

কলিকাতার যাদুঘরে যে অগ্নিমূর্ত্তি আছে, তাহা খর্ব্বাকৃতি এবং শ্মশ্রুযুক্ত। ইঁহার চতুর্দ্দিকে অগ্নিশিখা, হস্তে অক্ষমালা ও কমণ্ডলু এবং ইনি অজারূঢ়। সারদাতিলকে ষড়্ভুজ ও অষ্টভুজ অগ্নির পরিচয় আছে।



অগ্নি (লক্ষ্ণৌ যাদুঘরে রক্ষিত)

পৌরাণিক চিত্রে কোথাও কোথাও অগ্নি পিঙ্গলবর্ণ, দ্বিমুখবিশিষ্ট, ত্রিপাদ ও সপ্তহস্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ত্রিবাঙ্কুরের কণ্ডিয়ূরস্থ শিবমন্দিরে যে মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, উহার দুইটী মুখই ছাগমুখ। এক মুখে জীবের নাশ ও অপরমুখে মঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন। চিদম্বরমের শিবমন্দিরে স্থাপিত অগ্নিমূর্ত্তির দুইটী মুখই মনুষ্যাকৃতি এবং তাহার বাহনরূপে পশ্চাদ্ভাগে বৃষমূর্ত্তি অঙ্কিত। উৎকলের কোণারক, অযোধ্যা ও পুরাণগাঁয় যে সকল সূর্য্যমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের দ্বাররক্ষিরূপে পিঙ্গল (অগ্নি)* ও দণ্ডনায়ক (যম) স্থান পাইয়াছেন।

বিশ্বকর্ম্মশিল্পে অগ্নির যে রূপ বর্ণিত আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল—

"ধ্বজহস্তো মহাবীর্য্যস্তাম্রাক্ষো ধূমসন্নিভঃ।
জ্বালামালাকুলং দীপ্ত-চক্রাকারাংশুমণ্ডলম্॥
মেষারূঢ়ং চ কুণ্ডস্থং যোগপট্টেন বেষ্টিতম্॥
দক্ষিণঞ্চ স্থিতং স্বাহা রত্নকুণ্ডলমণ্ডিতম্।
সর্ব্বযাগহিতং পুণ্যং পিঙ্গভূষণভূষিতম্॥"

ধ্বজহস্ত, মহাবীর্য্য, তাম্রাক্ষ, ধূমসন্নিভ, অগ্নিময়, দীপ্তচক্রবৎ দ্যুতিবিশিষ্ট, মেষারূঢ়, কুণ্ডস্থ এবং যোগপট্টবেষ্টিত, রত্নকুণ্ডলবিভূষিতকর্ণ। ইঁহার দক্ষিণপার্শ্বে স্বাহা উপবিষ্টা। ইনি যজ্ঞে মঙ্গলদাতা, পুণ্যপ্রদ এবং পিঙ্গলবর্ণ উজ্জ্বল আভরণে সমাবৃত। ইহারই অনুরূপ ভাস্কর্য্যচিত্র নীলগিরির ডোমগণ্ডরা ও অযোধ্যায় পাওয়া গিয়াছে।



ডোমগণ্ডরার ভগ্নহস্ত অগ্নিমূর্ত্তি

আদিত্যপুরাণে অগ্নির ধ্যান এইরূপ উল্লিখিত আছে—

"পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ।
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ॥"

অর্থাৎ অগ্নির ভ্রূ, শ্মশ্রু, কেশ এবং অক্ষি পিঙ্গলবর্ণ, অঙ্গ এবং জঠর তাঁহার পীন, স্বয়ং তিনি অরুণবর্ণ। ছাগ তাঁহার বাহন, তিনি অক্ষসূত্রধারী, সপ্তার্চ্চি এবং শক্তিধারী।

সাধারণতঃ উক্তরূপ ধ্যান করিয়াই অগ্নির পূজা করা হয়। কিন্তু অসাধারণ কর্ম্মে—কর্ম্মাঙ্গ হোমব্যাপারে রুদ্রকল্পোক্ত এইরূপ ধ্যানই দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

"রুদ্রতেজঃসমুদ্ভূতং দ্বিমূর্দ্ধানং দ্বিনাসিকং।
যণ্নেত্রন্তু চতুঃশ্রোত্রং ত্রিপাদং সপ্তহস্তকং॥
যাম্যভাগে চতুর্হস্তং সব্যভাগে ত্রিহস্তকং।
স্রুবং স্রুচঞ্চ শক্তিঞ্চ অক্ষমালাঞ্চ দক্ষিণে॥
তোমরং ব্যজনঞ্চৈব ঘৃতপাত্রন্তু বামকে।
বিভ্রতং সপ্তভির্হস্তৈর্দ্বিমুখং সপ্তজিহ্বকং॥

* "লিখিতে যঃ প্রজানাঞ্চ সুকৃতং যশ্চ দুষ্কৃতম্।
অগ্রের্দক্ষিণপার্শ্বে চ পিঙ্গলত্বাৎ তু পিঙ্গলঃ॥" (ভবিষ্যপু° ১২৪ অঃ)

দক্ষিণঞ্চ চতুর্জ্জিহ্বং ত্রিজিহ্বমুত্তরং মুখং।
দ্বাদশকোটিমূর্ত্ত্যাখ্যং দ্বিপঞ্চাশৎ কলাযুতং ॥
স্বাহাস্বধাবষট্‌কারৈরঙ্কিতং মেষবাহনং।
রক্তমাল্যাম্বরধরং রক্তং পদ্মাসনস্থিতং।
রৌদ্রন্ত বহ্নি নামানং বহ্নিমাবাহয়াম্যহং ॥”

অর্থাৎ অগ্নি রুদ্রতেজ হইতে উৎপন্ন, দুই মস্তক, দুই নাসিকা, ছয় নেত্র, চারি কর্ণ, তিন পা, সপ্ত হস্ত, দক্ষিণে চারি হাত ও বামে তিন হাত। দক্ষিণদিকের চারি হাতে স্রুব, স্রুক্, শক্তি ও অক্ষমালা, বামদিকের তিন হাতে তোমর, ব্যজন ও ঘৃতপাত্র। দুই মুখ ও সপ্ত জিহ্বা; তন্মধ্যে দক্ষিণে চারি জিহ্বা এবং উত্তরে তিন জিহ্বা। ইঁহার দ্বাদশকোটি মূর্ত্তি এবং দ্বিপঞ্চাৎ কলা। স্বাহা, স্বধা এবং বষট্‌কারে ইনি চিহ্নিত। ইনি মেষবাহন; রক্তমাল্য এবং রক্তবস্ত্রধারী। স্বয়ং রক্তবর্ণ ও পদ্মাসনে অবস্থিত।

রুদ্র শিবের নামান্তর। বৈদিক যুগে রুদ্রদেবের পূজার বহুল প্রচলন ছিল। আবার সেই বৈদিক যুগের রুদ্রদেব অগ্নিমূর্ত্তিতেও উপাসিত হইতেন। এই রুদ্র বা শিবরূপে অগ্নি সুব্রহ্মণ্য বা স্কন্দের জনক এবং দিক্‌পালরূপে বৈদিক ও পৌরাণিকযুগে পূজিত। তৎকর্ত্তৃক রক্ষিত দিক্ 'অগ্নিকোণ' নামে প্রসিদ্ধ। [কার্ত্তিকেয় ও স্কন্দ দ্র°]

বৈদিকযুগের রুদ্র বা অগ্নি পৌরাণিকযুগে 'অশান্ত' (উগ্র) ও 'শান্তাত্মা' আখ্যা প্রাপ্ত হন। অশান্তমূর্ত্তিতে তিনি রুদ্রভাবে প্রকট হইয়া অশনিসম্পাতে অগ্নিদহনে জগদ্বাসী জীবজন্তুকে প্রপীড়িত করেন। তাঁহার এই উগ্রমূর্ত্তির পরিহার জন্য মনুষ্যগণ তাঁহার স্তবস্তুতি ও আরাধনা করিয়া তাঁহাকে প্রীত করেন।

অপরদিকে রুদ্ররূপী অগ্নি আকাশে সূর্য্যরূপে, নভোমণ্ডলে বিদ্যুৎরূপে এবং প্রত্যক্ষ অগ্নিস্বরূপ পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত। সূর্য্যাগ্নির উত্তাপ পৃথিবীপৃষ্ঠে বায়ু কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হয়। এই নিমিত্তও সূর্য্য বা অগ্নি মরুদ্‌গণের জন্মদাতা এবং ধরাবাসীর জীবনদাতা। স্বাহাকে পত্নীরূপে লইয়া তিনি গৃহী। স্বাহা নামে প্রদত্ত যজ্ঞের হব্যাহুতি তিনি দেব-সকাশে লইয়া যান এবং মানবের প্রার্থনাপূরণ ও মঙ্গলবিধান করেন বলিয়া তিনি শান্তাত্মা।

অগ্নি ও সূর্য্যকে অভেদরূপে এবং জগতের প্রত্যক্ষ দেবতা জানিয়া বিশ্ববাসী অগ্নির উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। দেশবিশেষে মানব অগ্ন্যুপাসক অথবা সূর্য্যোপাসক বা সৌর আখ্যা লাভ করিয়াছে।* ফলতঃ পরবর্ত্তীকালে অগ্ন্যুপাসক বা সৌর একই আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

* ভবিষ্যপুরাণে ব্রাহ্মপর্ব্বে শাকদ্বীপী প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, সৌরগণ অগ্নিকে সূর্য্যের অনুরূপ পূজা করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী কোন কোন সম্প্রদায় নিত্য নিয়ত গৃহে অগ্নি জাগাইয়া "অগ্নিহোত্রী" নামে পরিচিত আছেন। অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারীকেই অগ্নিহোত্রী বলা হয়। বৈদিকযুগে অগ্নিহোত্র ও অগ্নিষ্টোম যাগের প্রচলন ছিল। [অগ্নিহোত্র, অগ্নিহোত্রী ও অগ্নিষ্টোম দ্র°] অপরে ক্রিয়াকর্ম্মে অগ্নি জ্বালিয়া হোমকর্ম্মাদি সমাপন করেন। ভারতবাসী পার্শীগণ (যাহারা জরথুস্ত্রের শিষ্য এবং একসময় সুদূর পারস্যের অধিবাসী ছিলেন) এখনও অগ্নি-স্থাপনা করিয়া থাকেন। ইঁহারাই বর্ত্তমানে অগ্ন্যুপাসক বলিয়া পরিচিত।

প্রথমেই বলা হইয়াছে অগ্নি আর্য্যজাতির এক অগ্রগণ্য দেবতা ছিলেন। তাই আর্য্যজাতির বিভিন্ন শাখা—ইরাণীয়, গ্রীক্, রোমক প্রভৃতি জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নামে অগ্নি পূজিত ছিলেন। বৈদিক অগ্নি নাম হইতে লাটিনদিগের Ignis ও স্লাভদিগের Ogni হওয়া কিছু বিচিত্র নহে।

জন্দভাষায় অগ্নির অপর একটী নাম বিশ্‌পৈতি (Vispaiti)। প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যে কাষ্ঠঘর্ষণে উৎপন্ন বিশ্‌পতি অগ্নির উল্লেখ আছে। বেদে বিশ্‌পত্নী মানবকুলের রক্ষাকর্ত্রীরূপে পূজিত [বিশ্‌পত্নী দ্র°]। বিশ্‌পতি যজ্ঞাগ্নিরূপে গৃহে অধিষ্ঠান ও গৃহস্বামীর মঙ্গলবিধান করেন। এই নিমিত্ত ইনি গৃহকর্ত্তৃরূপেও সমাদৃত। লিথুয়নীয় ভাষায় 'বিশ্‌পতিস্' এবং মোলডাবিয়া ও হ্বলাচিয়া ভাষায় 'হোস্‌পোদর' (Hospodar) শব্দে ইহার উল্লেখ আছে।

বেদে অনেক স্থানে অগ্নিকে 'যুবা' ও 'যবিষ্ঠ' বলা হইয়াছে—

"অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে কবির্গৃহপতির্যুবা।"
(ঋক্ ১.১২.৬)

"আ গ্না অগ্ন ইহাবসে হোত্রাং যবিষ্ঠ ভারতীং"
(ঋক্ ১.২২.১০)

গ্রীক্‌দিগের বিশ্বকর্ম্মার নাম Hephaistos, লাটিনভাষায় Vulcan। পাশ্চাত্ত্য পুরাবিদ্‌গণ মনে করেন, Hephaistos নাম বৈদিক 'যবিষ্ঠ' নামের রূপান্তর মাত্র। দুইটী কাষ্ঠ ঘর্ষণ বা মন্থন করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেজন্য অগ্নির একটী নাম 'প্রমন্থ'। গ্রীক্ পৌরাণিক গ্রন্থে যে দেবতা মনুষ্যের হিতের জন্য স্বর্গ হইতে অগ্নি চুরি করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই দেবের নাম প্রমিথিউস্ (Prometheus), এই শব্দ প্রমন্থের রূপান্তর। অগ্নির একটী নাম 'ভরণ্যু' ও 'ভরন্ত' (শুক্লযজুঃ ১২.৩১)। গ্রীক্‌দিগের অগ্নিদাতা বা সদাচারনিয়ন্তা Phoroneus ও ভরন্ত অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। রোমক-

দিগের Vulcanকেও কেহ কেহ উল্কার রূপান্তর মনে করেন।*

অতি প্রাচীনকাল হইতে ইরাণীয় বা পারসিকগণ অগ্নির পূজা করিয়া আসিতেছেন। আজও পারসিক-রমণীগণ সর্ব্বপ্রথমে অগ্নিপূজা না করিয়া অপর কাহারও পূজা করেন না। পারসিকদিগের মধ্যে 'অর্দিবেহেস্ত যশন্' নামক প্রধান উৎসব প্রচলিত আছে। অগ্নিদেবতা অর্দিবেহেস্ত-অংশস্পন্দের সম্মানার্থ এই উৎসব হইয়া থাকে। এই উৎসবদিবসে সকলে অগ্নিমন্দিরে দলবদ্ধ হইয়া জগদীশ্বরের উপাসনা করেন। এ ছাড়া পারসিকদিগের অগ্নিদেবতা 'অর্দিবেহেস্তে'র সম্মানার্থ আজও 'রাপ্তিবার' নামে একটী উৎসব হইয়া থাকে। [অতেশকেদ দ্র°]

পারসিকদিগের অবস্তাশাস্ত্রে অগ্নি 'শউর্ব' নামে অভিহিত, বেদেও প্রথমে 'সর্ব্ব' অগ্নিদেবের সংজ্ঞা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। শতপথব্রাহ্মণের একস্থানে (৬.১.৩.১০-১১) লিখিত আছে—"সোঽব্রবীজ্জ্যায়ানহমসতোঽস্মি ধেহ্যেব নামেতি। তমব্রবীৎ সর্ব্বোঽসীতি।" অর্থাৎ কুমার (অগ্নি) কহিলেন, আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠতর, আমাকে একটী নাম দাও। প্রজাপতি কহিলেন, তুমি সর্ব্ব।

পুনরায় অবস্তার অন্তর্গত গাথ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জরথুস্ত্র স্পিতম অগ্নিযাজকদিগকে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন এবং আপন অঙ্গ্র নামক সম্প্রদায়কে ঋত্বিক্দিগের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। পারসিক 'অঙ্গ্র' ও বৈদিক প্রজাপতি 'অঙ্গিরা' এই দুইজন এক হওয়া অসম্ভব নহে। [অঙ্গিরা দ্র°] বেদসংহিতায় অগ্নিদেবের সহিত অঙ্গিরার বিশেষ ঘনিষ্ঠতার কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়—ইরাণীয়গণের পূর্ব্বপুরুষ পারসিকগণ ও ভারতীয় আর্য্যগণ যখন একত্র সম্মিলিত ছিলেন, তৎকালে বংশানুক্রমে তাঁহাদের মধ্যে অগ্নির উপাসনা প্রচলিত ছিল, সন্দেহ নাই। [পারসিক দ্র°]

প্রাচীন হিব্রুগণও অগ্নির পূজা করিতেন। আমরা খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল হইতে জানিতে পারি যে, অগ্নি প্রত্যক্ষ দেবতা। জগদীশ্বর হোরেবপর্ব্বতে ধর্ম্মাত্মা মোজেসের সমক্ষে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। (Exod. III, 2) এবং সিনাই পর্ব্বতে ঐ রূপেই আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত করান (Exod. XIX, 18)। তিনি দিবসে মেঘস্তম্ভরূপে এবং রাত্রিতে আলোকস্তম্ভরূপে থাকিয়া ইস্রাইলদিগকে পথনির্দ্দেশ করিয়া লইয়া যান। দানিয়াল প্রাচীন যুগের বর্ণনায় বলিয়াছেন, "একটী অগ্নিস্রোত আসিয়া তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইয়াছিল। প্রাচীনদিগের বিশ্বাস ছিল, তাঁহারা জিহোবাকে যজ্ঞবেদীতে যে বলি অর্পণ করিতেন, স্বর্গে থাকিয়া তিনি তাহা গ্রহণ করেন এবং তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত অগ্নি স্বর্গ হইতে আসিয়া উহা তাঁহার নিকট লইয়া যান।

মোজেস, মানোয়া, সলোমন, এলিজা প্রভৃতি যজ্ঞকালে দেবোদ্দেশে যে পশু বলি দিয়াছিলেন, সেই বলিভাগ গ্রহণ করিতে স্বর্গ হইতে অগ্নি ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ঐ অগ্নিকে য়িহুদীগণ মন্দিরের বেদীতে স্থাপন করেন। ধর্ম্মাচার্য্যগণ উহা রক্ষা করিতেন। য়িহুদীদিগের এই চিরাচরিত প্রথার অনুসরণ করিয়া রোমকগণ ভেষ্টার (Vesta) মন্দিরে অগ্নিরক্ষা করিতে শিখিয়াছিলেন। ঐ মন্দিরের কুমারীদের হস্তে অগ্নিরক্ষার ভার ছিল।

হিব্রুজাতির পুরোহিতগণ পবিত্র অগ্নি রক্ষা করিতেন। তাঁহারা সেই অগ্নি হইতে অগ্নি লইয়া স্বতন্ত্র যজ্ঞবেদী জ্বালিতেন। এক সময়ে নাদাব ও অবিহু অন্য অগ্নি* লইয়া যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করায় পরমপিতার কোপে পতিত হন এবং অগ্নিদাহনে তাঁহাদের ভবলীলা সাঙ্গ হয়। (Leviticus, X.I)

য়িহুদীগণের ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে যে, আহাজের সময়ে এই পবিত্র বহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। আবার অনেকে মনে করেন যে, কাল্দীয়গণের আক্রমণে অগ্নিমন্দির বিধ্বস্ত হইলে ঐ অগ্নি নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বাইবেলে (2 Mac., 1.18 10) লিখিত আছে, কাল্দীয়সেনার বিধ্বংসকারী অভিযানে ভীত হইয়া জনৈক পুরোহিত ঐ পবিত্রাগ্নির কতকাংশ গোপনে রক্ষা করিয়াছিলেন। পরে রাজ্যময় শান্তি স্থাপিত হইলে পুনরায় দ্বিতীয় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ঐ অগ্নি স্থাপন করা হইয়াছিল; কিন্তু উক্তমতে অনেকে আস্থাবান্ নহেন।

* "In this name Yavistha, which is never given to any other Vedic god, we may recognise the Hellenic Hephaistos"—"Thus with the exception of Agni all the names of the fire and the fire-god were carried away by western Aryans; and we have Prometheus answering to Pramantha, Phoroneus to Bharanyu and the Latin Vulcanus to the Sanskrit Ulka" (Cox's Mythology of the Aryan Nation, Vol. II, Chap. IV, Section i.)

* বাইবেল গ্রন্থে ইহা Strange fire নামে বিবৃত। ইহার প্রকৃত অর্থ পবিত্রাগ্নি ভিন্ন অন্য অগ্নি। জোনাথানের টার্গামেরা বলেন, পুরোহিতগণ যে অগ্নিতে আপনাদের যজ্ঞলব্ধ দ্রব্য রন্ধন করিয়াছিলেন সেই অবিশুদ্ধাগ্নি। আবার রাব্বিনেরা বলেন, যে, যজ্ঞকালে অগ্নিস্থাপন করিয়া তাহাতে গন্ধদ্রব্য দান অবিধেয় এবং সেইজন্য অবিশুদ্ধ এইরূপ অগ্নি।

প্রাচীন প্রথার অনুসরণে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী গ্রীকৃগণ তাঁহাদের ধর্ম্মমন্দিরে পবিত্র অগ্নি রক্ষাকরণে যত্নবান্ ছিলেন। জেরুসালেমবাসী গ্রীক্ ও আর্মেনীয় খৃষ্টান্ সাধুগণ প্রতি বৎসর ঈষ্টর পর্ব্বের শনিবারে পবিত্রাগ্নি স্থাপনের জন্য একটী অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতেন। ঐ দিন "দানদিবস" (Day of Charity) নামে অভিহিত এবং যেখানে যীশু-খৃষ্টের পবিত্র দেহ কবরস্থ হইয়াছিল, তৎসংলগ্ন গীর্জ্জায় এই অগ্নি-প্রজ্বালন-ব্যাপার সম্পন্ন হইত।

ঐ দিন প্রাতঃকাল হইতে বহু খৃষ্টান নানা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া পবিত্র সমাধিমন্দিরের (Holy Sepulchre) সন্নিহিত প্রদেশে সমবেত হইত। অপরাহ্ন বেলা ২ ঘটিকার পর, অগ্ন্যাধান উৎসবের উদ্যোগ ও আয়োজন চলিতে থাকে। দর্শক-বৃন্দ এতক্ষণ নানা গোলমালে মত্ত থাকিলেও এইবার শান্ত-ভাব ধারণ করে। বিশপ ও পাদ্রীগণ সদলবলে সাজসজ্জা করিয়া দীপ ও ধূপ জ্বালাইয়া উৎসবযাত্রায় যোগ দেন। তাঁহারা পরিক্রমা সমাধা করিয়া আপনাপন নির্দ্দিষ্ট তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলে পর, রাজসৈন্যেরা গ্রীক্ ও আর্মেনীয় চার্চ্চের দুইজন বৃদ্ধ পুরোহিতকে সমাধিমন্দিরের একটী গৃহে লইয়া আবদ্ধ করে। তাঁহারাও গৃহমধ্যে গিয়া কক্ষটী বন্ধ করিয়া দেন। ভিতরে ২০ মিনিট কাল গোপন প্রক্রিয়ার পর অগ্নি প্রজ্বালিত হয়। তাহার পর ধর্ম্মযাজকদ্বয় সেই অগ্নি তুলিয়া গবাক্ষপথে সকলকে প্রত্যক্ষ করান। তখন ধর্ম্মযাজক ও পুরোহিতেরা অগ্রে যাইয়া ঐ অগ্নিতে মশাল ধরাইয়া লন। অনন্তর উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী আপনাপন বর্ত্তিকা জ্বালাইয়া লইতে অগ্রসর হন। এই সময়ে যাত্রীর ভিড়ের মধ্যে ভীষণ হুড়াহুড়ি লাগিয়া যায়। ইহার পর একজন সংবাদ-বাহীকে বেথেলহেম নগরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। অগ্নির উপাসক এই শ্রেণীর খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিশ্বাস, যে কেহ ঐ অগ্নিতে বর্ত্তিকা জ্বালিয়া লইতে সমর্থ হয়, তাহার পক্ষে স্বর্গদ্বার মুক্ত থাকে। এইজন্য যে ভীষণ ঠেলা-ঠেলি হয়, তাহাতে প্রতি বৎসর সমাধিমন্দির-প্রাঙ্গণে বহু লোকের জীবননাশ হইয়া থাকে।

গ্রীস রাজ্যে প্রাচীনকাল হইতে এই অগ্নিস্থাপন প্রথা চলিয়া আসিতেছে; খৃষ্টধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে উহা নষ্ট হয় নাই। ইউরোপের ধর্ম্মযোদ্ধগণ (Crusaders) এই অগ্নিস্থাপন দেখিয়া গিয়াছেন। তুর্কদিগের আক্রমণেও ইহা বিলয়প্রাপ্ত হয় নাই।

রোমকদিগের ধর্ম্মেও এইরূপ অগ্নিরক্ষার বিধান আছে। ইহাও ঈষ্টার পর্ব্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বৎসর ১লা মার্চ্চ ভেষ্টার মন্দিরে এই অগ্নির পুনঃস্থাপন করা হয়। [ঈষ্টার দ্র°]

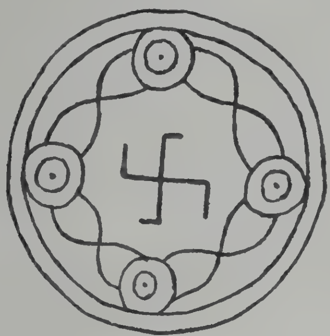
প্রাচীনতম জাতিগণের মধ্যে অগ্নিপূজার বাহুল্য ছিল। কাল্দীয়রাজ নিমরুদ অগ্নির সাধক ছিলেন। অগ্নিপূজার নিন্দা করায় আব্রাহাম উর (Ur) রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন। সমগ্র সিরীয়া প্রদেশে অগ্নির প্রতীকরূপে সূর্য্যই পূজিত হইতেন। অহুরমজদের উপাসনা প্রাচীন মিড্স্ ও পারস্তের অধিবাসীরা করিতেন। ইরাণ ও স্কীদীয়ায় মিথ্রের উপাসনার প্রচলন ছিল। কাপাডোসিয়ার শাকদ্বীপী মগগণ অনাহিতা ও আমনদেবের মন্দিরে চিরন্তন অগ্নি সংরক্ষণে যত্নবান্ থাকিতেন। উত্তর-মদ্রবাসী বা সৌরমতাবলম্বিগণ অগ্নি-পূজক ছিলেন। কালে ইঁহারা স্থানান্তরে গমন করিয়া স্লাভোনীয় জাতিতে পরিণত হন এবং সূর্য্যোপাসক হইয়া পড়েন। লিথুয়ানিয়ায় কিউ ও নবগরোদ নগরে এখনও ইহা-দের পূজাকেন্দ্র দৃষ্টিগোচর হয়। চীনের বৌদ্ধেরা, ফো-পূজকগণ এবং লাও-চি সম্প্রদায় অগ্নিরক্ষা করিয়া আসিতেছেন। আমেরিকার পেরুবাসীরা, রেড ইণ্ডিয়ানগণ এবং অজতেক-জাতি পবিত্র অগ্নি রক্ষা করেন।* [অগ্নি শব্দে অগ্নিরক্ষা সম্বন্ধে অপরাপর বিবরণ দ্র°]

ইংলণ্ডের প্রাচীন কেল্টজাতির মধ্যে অগ্নিরক্ষার ব্যবস্থা ছিল। অবিবাহিতা পুরোহিতকুমারীগণ তৎকালে অগ্নি সঞ্জীবিত রাখিতেন। তাঁহারা প্রতিবৎসর মকরসংক্রান্তিতে বিশুদ্ধাগ্নি পুনঃ-সংস্থাপিত করিতেন। ডেল্ফি, আর্গস্, নক্সোস, রোডস্, তেনোদাস ও এফিসাস্ নগরে পবিত্র অগ্নি রক্ষিত ছিল। তদ্দেশবাসীর বিশ্বাস, 'এই অগ্নি রাজ্যের ও সাধারণ গৃহস্থের মঙ্গল করে; যদি অকস্মাৎ কোনক্রমে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, তাহা হইলে তদ্দেশে মহান্ অনিষ্ট ঘটিবেই।' পারস্তের অগ্নি-উপাসকদিগের মধ্যে রাজার মৃত্যুতে পবিত্রাগ্নি নির্ব্বাণের বিধান আছে, কিন্তু কুণ্ড বিশুদ্ধ করিয়া পুনরায় অগ্নিস্থাপন করিতে হয়। ইহাদের গুইবারশাখা বৎসরে একবার অগ্নি-সংস্কার করিয়া থাকে।

অগ্নির প্রতীক স্বস্তিকযন্ত্রের ব্যবহার সুপ্রাচীনকাল হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত আছে। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, স্বস্তিক সূর্য্যের প্রতিরূপক। বোধ হয়, আলোক ও তাপের উৎস সূর্য্য এবং আলো ও তাপস্বরূপ অগ্নি—উভয়ের জন্য এই স্বস্তিকের প্রচলন হইয়াছিল। দুইখণ্ড বক্র কাষ্ঠ উপর্য্যুপরি রাখিয়া তাহাদের মধ্যস্থলে ছিদ্র করিয়া একটী শলাকা দ্বারা সন্নিবদ্ধ করা হইত। অশ্বত্থ ও শমী কাষ্ঠই এতদর্থে প্রশস্ত বলিয়া বেদে কথিত। ঐ কাষ্ঠদ্বয় সজোরে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল।

* মেক্সিকোবাসীরা ৫২ সম্বৎসরে একবার অগ্নিসংস্কার করিয়া থাকে।

ইহা হইতেই সম্ভবতঃ (অগ্নির) স্বস্তিকের উদ্ভব। প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমকগণও এই উপায়ে অগ্ন্যুৎপাদন করিতেন।



স্বস্তিক

এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার নানাস্থান হইতে প্রাচীনকালে নির্ম্মিত নানা আকারের স্বস্তিক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় অগ্নিপূজা এক সময়ে ভূমণ্ডলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।*

যে যন্ত্রটীর চিত্র উপরে দেওয়া হইয়াছে, ইহা ষ্টক্‌হল্‌মের ঐতিহাসিক যাদুঘরে (Historical Museum, Stockholm) রক্ষিত আছে। ইহা নব লৌহযুগের (later Iron Age) বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। যন্ত্রটীতে মধ্যস্থলে অগ্নিপ্রতীক স্বস্তিক এবং চতুর্দ্দিকে চন্দ্রসূর্য্যের প্রতিরূপক চক্রচিহ্ন।

অগ্নি, (শারীর অগ্নি)—মানবশরীর প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় অবিশ্রান্তভাবে আপনি আপনাকে দগ্ধ করিতেছে। শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় ইহা নীরস হইলে ইহার বিনাশ অথবা নির্ব্বাণ মুহূর্ত্তমধ্যে নিষ্পন্ন হইয়া যাইত, কিন্তু কাষ্ঠস্থিত আর্দ্রতার ন্যায় ইহা শ্লেষ্মার সাহায্যে আর্দ্র বা আপ্যবহুল বলিয়া ইহার নির্ব্বাণ সময়সাপেক্ষ। 'শৃ' ধাতু হইতে 'শরীর' শব্দের উৎপত্তি ; শৃ অর্থে ক্ষয় হওয়া। 'শরীর' অর্থে যাহা প্রতিনিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে—"শীর্য্যতে ইতি শরীরম্।" শরীরে ত্রিবিধ অগ্নি প্রতিষ্ঠিত। উপযুক্ত ইন্ধন না পাইলে এই অগ্নিত্রয় শরীরকেই দগ্ধ করে। সুতরাং শরীর রক্ষার্থ যেমন শ্লেষ্মার প্রয়োজন, অন্নপানরূপ ইন্ধনেরও আবশ্যক।

"বিসর্গাদানবিক্ষেপৈঃ সোমসূর্য্যানিলা যথা।
ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফপিত্তানিলাস্তথা॥" (সুশ্রুতস°)

প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদ্ ফস্‌টার সাহেবের মত নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"The animal body dies daily in the sense that at every moment some part of its substance is suffering decay, is undergoing combustion. Combustible in the ordinary sense of the word an animal body is not, by reason of the large excess of water which enters into its composition ; but an animal body, thoroughly dried, will, in the presence of oxygen burn like fuel and like fuel give out energy as heat."

অর্থাৎ, জীবের শরীরাবয়ব প্রতিনিয়তই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে—বলিলে এই বুঝা যায় যে, প্রতিমুহূর্ত্তে ইহার সমষ্টিগত জান্তব অংশাদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে, দগ্ধ হইতেছে। তবে প্রকৃত প্রস্তাবে এই ক্রিয়াকে 'দগ্ধীকরণ' বলা যায় না, অর্থাৎ জীবদেহকে সাধারণ 'দাহ্য' বলিয়া অভিহিত করিলে ভুল করা হয়, কেন না এই ক্রিয়ার দ্বারা প্রভূত পরিমাণে জল উৎপন্ন হয় ; তবে সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক বা জলশূন্য জীবদেহ অম্লজানের অভ্যন্তরে ঠিক ইন্ধন বা কাষ্ঠাদির ন্যায়ই পোড়ে এবং উহা হইতে ঠিক ইন্ধনের ন্যায়ই তাপ-রূপ শক্তি উৎপন্ন হয়।

তৈলপূর্ণ দীপশিখা বা ইন্ধনপূর্ণ অগ্নিকুণ্ড যে নিরন্তর প্রদীপ্ত থাকে, সেইরূপ জীবদেহ স্বয়ং দহ্যমান হইয়াও যে শীঘ্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, তাহার একমাত্র কারণ, বৈদিক ভাষায় বলিলে বলিতে হয়, মানব আহিতাগ্নি হইয়া আহার্য্য বস্তুর হোম-দ্বারা শরীরস্থ অগ্নিদেবকে সমিৎ প্রদান করে এবং জলের ন্যায় সোমগুণবহুল শ্লেষ্মা বর্ত্তমান থাকিয়া অগ্নিদেবকে প্রশমিত করিয়া রাখে।

"আহিতাগ্নেঃ সদা পথ্যান্যন্তরাগ্নৌ জুহোতি যঃ।
ষট্‌ত্রিংশচ্চ সহস্রাণি রাত্রীণাং হিতভোজনঃ।
জীবত্যনাতুরো জন্তুর্জ্জিতাত্মা সম্মতঃ সতাম।" (চরকস°)

মরুৎসখ সর্ব্বভুক অগ্নির বিষম ক্ষুধা হইতে জীবদেহকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভুক্তান্নজাত—ইন্ধন স্বরূপ যে রস সর্ব্বশরীরে নিয়ত সঞ্চারিত হইতেছে, তাহার মধ্যে দুইটী বিভাগ দৃষ্ট হয়। চরকে লিখিত আছে, শরীরধাতু দ্বিবিধ—মলভূত ও প্রসাদভূত। যাহা শরীরের ক্ষয়ের বা ধ্বংসের বাধাজনক, তাহার নাম মলভূত এবং যাহা বাধাজনক নয়, তাহার নাম প্রসাদভূত। শরীরচ্ছিদ্র-মধ্যস্থ ক্লেদসমূহ মলভূত। প্রসাদভূত ধাতুরূপে পরিণত হয় এবং যে অংশ ধাতুরূপে পরিণত হয় না, তাহার নাম আম। ইহাই শরীরচ্ছিদ্র মধ্যে ক্লেদের সহিত বর্ত্তমান থাকে। আর্য্য-ঋষিগণের মতে এই অব্যবহার্য্য আমাংশ শ্লেষ্মরূপে পরমাণু সংযোগে মধ্যস্থলে অবস্থানপূর্ব্বক দ্ব্যণুকাদি অগণিত অবয়বের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া ধাত্বগ্নির দাহক্ষয় হইতে জীবদেহকে নিয়ত রক্ষা করিতেছে।

* 'Symbolism of the East & West' by H. Murray Aynsley, pp. 35,36,46-52.

বাগ্‌ভটে লিখিত আছে, শ্লেষ্মা যেমন সোমপদার্থ, সেইরূপ পিত্তও অগ্নিস্বরূপ বা অগ্নিবৎ পদার্থ। এই অগ্নিই আহার্য্য বস্তুকে চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য ও পেয়—এই চারিটী আকারে আমাশয়ে আনয়ন করে এবং আমাশয়-ধৃত ভুক্তান্নকে পাচকাগ্নির সাহায্যে রসরূপে পরিণত করে। এতদ্ভিন্ন রসকে ধাতুরূপে এবং ধাতুকে মলরূপে পরিণত করিবার মূলেও এই পিত্ত। পিত্তের এই ক্রিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ভাষায় মেটাবোলিসম্ (metabolism) নামে কথিত হয়।

কিন্তু সাধারণতঃ পিত্ত অর্থে যকৃৎনিঃসৃত পীতবর্ণ তরল পদার্থই বুঝায়। তবে আয়ুর্ব্বেদমতে সোমগুণ ও সোমবহুল শ্লেষ্মা, অগ্নি ও অগ্নিবহুল পিত্ত, গতি উৎপাদক বিদ্যুদগ্নি এবং বহির্গমনশীল বায়ু অভিন্ন বস্তু নয়, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। চরকে লিখিত আছে, যেমন অধঃস্থিত অগ্নি স্থালীস্থ জল ও তণ্ডুলকে অন্নরূপে পাক করে, সেইরূপ পাচকাগ্নি আমাশয়স্থ অন্নকে রস ও মলরূপে পরিণত করে। ভোজনমাত্র অন্নের প্রথম পরিপাক মধুর রস হইতে ফেনীভূত কফের উদ্ভব হয়, পরে পচ্যমান অন্ন অম্লভাবে দগ্ধ হইয়া আমাশয় হইতে ক্ষরিত হইলে তাহা হইতে পিত্ত উদ্গত হয়। অতঃপর অগ্নির দ্বারা শুষ্ক হইয়া পক্বাশয়ে উপস্থিত হইলে উহা পরিপিণ্ডিত ও বিষ্ঠাকারে পরিণত হয়; তখন ইহার কটু রস হইতে বায়ুর উৎপত্তি ঘটে।

সুশ্রুত বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার ধাতুগত ব্যুৎপত্তির দ্বারা ইহাদের তাৎপর্য্য বুঝাইয়াছেন। তাঁহার মতে গতি অর্থবোধক বা ধাতু হইতে বায়ু, সন্তাপ অর্থবোধক তপ্ ধাতু হইতে পিত্ত এবং আলিঙ্গনার্থবোধক শ্লিষ্ ধাতু হইতে শ্লেষ্মা শব্দের উৎপত্তি। সুশ্রুতে লিখিত আছে, পিত্তকেও যখন অগ্নির ন্যায় দহন ও পচনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে দেখা যায় এবং অগ্নিস্বভাব দ্রব্যের দ্বারা যখন পিত্ত বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়, তখন পিত্তকে অগ্নি বলিলে কোন দোষ হয় না। পিত্ত ও অগ্নি এক না হউক, পিত্ত অগ্নিবৎ কোন নির্ব্বিশেষ পদার্থ; শরীরে অগ্নি বলিয়া অন্য কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই।—"নখলু পিত্তব্যতিরেকাদন্যোঽগ্নিরিতি।"

আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের বিশ্বাস যে, সৌর তেজ পৃথিব্যাদি ভূতসমূহে অদৃশ্যভাবে সঞ্চিত থাকে, তাহাই ভূতাগ্নিরূপে মুক্তিলাভ করিয়া জঠরোষ্মা উৎপাদন করে; ভূতাগ্নি, উদরাগ্নি যেমন সৌরতেজ, সেইরূপ ধাত্বগ্নিও সৌরতেজ; ইহা শরীর ও শারীর ধাতুর অভ্যন্তরে অবস্থান করে এবং বায়ু কর্ত্তৃক ইহা উন্মুক্ত ও ক্রিয়াশীল হয়।

সত্ত্বগুণ লঘু ও প্রকাশক—"সত্ত্বং লঘু প্রকাশকং।" সত্ত্বগুণ লঘু, সেইজন্য লঘু পদার্থ ঊর্দ্ধগামী। অগ্নিও ঊর্দ্ধগামী, কারণ অগ্নি সত্ত্বরজোবহুল। "সত্ত্বরজোবহুলোঽগ্নিঃ।" অগ্নি হইতেই জলের উৎপত্তি।—"অগ্নেরাপঃ।" বায়ু আকাশ হইতে উৎপন্ন এবং বায়ু হইতে অগ্নি।—"আকাশাৎ বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ।"

পিত্ত লঘু, দ্রবাত্মক তৈজস পদার্থ। মধুকোষে লিখিত আছে.—"দ্রবতেজঃসমুদয়াত্মকস্যাপি পিত্তস্য তেজোভাগোঽগ্নিরিতি। তেন পিত্তমপ্যগ্নিবন্মন্যতে।"

পিত্ত উষ্মাত্মক দ্রবপদার্থ, এবং এই মিলিত দ্রব ও তেজের তেজোভাগ অগ্নি। সেইজন্য পিত্তকে অগ্নি বলা হয়। তেজ পঞ্চভূতের মধ্যে মূল পদার্থ। তেজ ঘনীভূত হইলে তাপ হয়। যে সকল পদার্থে তেজ অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান, তাহারা তৈজস পদার্থ। তৈজস পদার্থ ক্ষিতি বা অপ্ সংযুক্ত। ক্ষিতি বা অপের ন্যায় গুরু পদার্থের আবরণ ব্যতীত তেজ কখনও পৃথিবীতে থাকিতে পারে না। অগ্নি সত্ত্ব ও রজোবহুল।

প্রকৃতপক্ষে স্থূল অগ্নি পিত্ত হইতে ভিন্ন। অগ্নি ও পিত্ত ভিন্ন ভিন্ন গুণযুক্ত। পিত্ত দ্রব, স্নিগ্ধ ও অধোগামী; অগ্নি ইহার বিপরীত—অদ্রব, রুক্ষ ও ঊর্দ্ধগামী। কিন্তু এ কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, অগ্নির অধিষ্ঠান পিত্ত, এবং তজ্জন্য তেজোময় পিত্তকে অগ্নি বলা হয়। তেজোময় পিত্তের উষ্মাই ভুক্তদ্রব্যের পাচক। কুক্ষিস্থ সেই অগ্নি ধমনীসমূহের মুখ দিয়া সমস্ত শরীরে সঞ্চরণ করে।

এই কারণে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে লিখিত আছে, যে কোন রোগই হউক অগ্রে রোগীর অগ্নি পরীক্ষা করা উচিত। কারণ, একমাত্র অগ্নিই যখন পাকের কর্ত্তা, তখন অগ্নি সতেজ না থাকিলে কে ঔষধ পাক করিবে এবং রোগীর জীবন রক্ষাই বা কি প্রকারে হইবে? সুতরাং সকল প্রকার রোগেই অগ্নি সতেজ আছে কি না অর্থাৎ রোগীর পরিপাক কেমন হয়, ক্ষুধা কেমন, ইত্যাদি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যদি অগ্নির বৈষম্য প্রভৃতি লক্ষিত হয়, তাহা হইলে অগ্রে অগ্নিবৈষম্য দূর করিয়া পরে অন্যান্য রোগপ্রতিকারক ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়।

মাধবকরের নিদানে উক্ত হইয়াছে—জঠরাগ্নি চারি প্রকার, যথা—মন্দ, তীক্ষ্ণ, বিষম ও সম। কফ, পিত্ত ও বায়ুর আধিক্যে এবং উহাদের সমতায় জঠরাগ্নি উল্লিখিত চারি নামে অভিহিত হয়। বিষম অগ্নি বাতজ রোগ, তীক্ষ্ণ অগ্নি পিত্তজ রোগ এবং মন্দাগ্নি কফজাত রোগ সৃষ্টি করে। সম অগ্নিই মনুষ্যদেহের উপকারী। এই অগ্নি সমপরিমিত আহার্য্য বস্তু

সম্যক্ পরিপাক করিয়া দেয়। মন্দ, বিষম ও তীক্ষ্ণ অগ্নি কখন কতক পরিপাক করে, কখন করে না। সুতরাং চারি প্রকার জঠরাগ্নির মধ্যে সম অগ্নিই শ্রেষ্ঠ।

টীকাকার বিজয়রক্ষিত বলিয়াছেন, এই অগ্নি অতি তীক্ষ্ণ বলিয়া ইহার একটা নাম ভস্মক। ভস্মক অগ্নি উপযুক্ত আহার না পাইলে দেহের শোণিতাদি ধাতু সকল পাক করিয়া শীঘ্রই দেহ নষ্ট করে।

ইহার লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—নাভির বামপার্শ্বে কিষৎ পরিমাণ স্থানে সোমমণ্ডল আছে। এই সোমমণ্ডলের মাঝে সৌরমণ্ডল; অগ্নি তাহারই মধ্যে অবস্থিত। কাচাবরণে আবৃত প্রদীপের ন্যায় জরায়ুমাত্রে আবৃত বা প্রচ্ছন্ন হইয়া অগ্নি ঐ স্থানে অবস্থান করে।

এই অগ্নির ক্রিয়া সম্বন্ধে রসপ্রদীপে লিখিত আছে—সূর্য্য আকাশে থাকিয়া প্রখর করনিকরে জলাশয় সকল যেমন শুষ্ক করিয়া ফেলেন, নাভি-আশ্রিত অগ্নিও তেমনি স্বীয় তীক্ষ্ণ তাপে মনুষ্যদিগের বিবিধ ভুক্ত বস্তু সত্বর পরিপাক করে।

এই অগ্নি স্থূলকায় প্রাণীদিগের জঠরে যব-পরিমাণে এবং কৃমি, কীট ও পতঙ্গ প্রভৃতির জঠরে উহা অপেক্ষা অতি অল্প পরিমাণে থাকে।

নিদানে পিত্তের স্থানভেদে পাচক, রঞ্জক, সাধক, লোচক ও ভ্রাজক এই পঞ্চবিধ নাম নিরুক্ত হইয়াছে। অগ্ন্যাশয়, যকৃৎ, প্লীহা, হৃদয়, লোচনদ্বয়, ত্বক্ এবং সর্ব্বশরীরেই পিত্ত অবস্থিত। ইহার মধ্যে পাচক নামক পিত্তই ভুক্ত বস্তুর পরিপাচক। [জঠরাগ্নি দ্র°]

অগ্নি৪—পুলস্ত্যভার্য্যা প্রীতির গর্ভজাত একজন প্রাচীন ঋষি। সন্বতীর গর্ভে পর্জ্জন্য নামে অগ্নির আরও এক পুত্র জন্মে। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ২৯ অঃ)

অগ্নি৫—ছোটনাগপুরের অন্তর্গত মানভূম জেলার ভর জাতির একটী শাখা। ইহাদিগকে অনার্য্য বলিয়াই মনে হয়। হিন্দুদিগের সংস্পর্শে ইহারা অগ্নি উপাধি গ্রহণ করিয়াছে।

অগ্নিক১—১ ইন্দ্রগোপ নামে রক্তবর্ণ কীট; আষাঢ়ে পোকা। ২ চিত্রক বৃক্ষ। ৩ ভল্লাতক বৃক্ষ। [বৈদ্যক]

অগ্নিক২—মহাদেবের গণ। শতকোটী অনুচরের সহিত ইনি শিবের বিবাহে গমন করিয়াছিলেন। (স্কন্দপু°)

অগ্নিকণ—(পুঃ) অগ্নিচ্যুত ক্ষুদ্র অংশ, স্ফুলিঙ্গ।

অগ্নিকর্ণী—বৃক্ষবিশেষ। (বৈদ্যকনি°)

অগ্নিকর্ম্মন্—গ্রন্থি প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য দগ্ধশলাকাদি দ্বারা দাহকার্য্য। চরকে লিখিত আছে যে, ব্রণাদি হইতে রক্তের অতিস্রাবে, বিদ্ধস্থলে, ছেদনার্থ স্থানে, অধিমাংসে, কফ-গ্রন্থিতে, গণ্ডমালারোগে, বাতস্তম্ভস্থানে, বেদনাস্থানে, গম্ভীর-ব্রণে, স্থিরব্রণে, এবং স্পর্শজ্ঞানরহিত স্থানে অগ্নিকর্ম্ম প্রশস্ত।

মোম, তৈল, মজ্জা, মধু, বসা, ঘৃত এবং শলাকাদি বিবিধ প্রকার লৌহদ্রব্য অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তদ্দারা দাহ করিবে, এইরূপ দাহ করার নাম অগ্নিকর্ম্ম। বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বলব্যক্তি, গর্ভিণী স্ত্রী, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, ও জ্বররোগী, ভীরু ও বিষণ্ণ ব্যক্তি—ইহাদের পক্ষে অগ্নিকর্ম্ম বিধেয় নহে। এই সকল ব্যক্তিতে অগ্নিকর্ম্ম করিলে উপকার না হইয়া বরং বিপরীত ফল হয়। বিশেষতঃ স্নায়ুব্রণে, মর্ম্মব্রণে, সবিষ বা সশল্যব্রণে এবং নেত্রকোপব্রণে অগ্নিকর্ম্ম বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। পূর্ব্বোক্ত স্থানে অগ্নিকর্ম্ম সাধারণতঃ নিষিদ্ধ হইলেও সুবিচক্ষণ বৈদ্য যদি তদ্ভিন্ন আর কোন উপায় না দেখেন, তাহা হইলে অগত্যা অগ্নিকর্ম্ম করিতে পারেন। কিন্তু স্নায়ুব্রণ প্রভৃতিতে কখনই অগ্নিকর্ম্ম করিবেন না। অগ্নিকর্ম্মে বিশেষ পারদর্শী না হইলে বৈদ্যের কদাচ অগ্নিকর্ম্ম করিতে নাই। রোগ, দোষ, বল, কাল ও মাত্রা বিবেচনা করিয়া অগ্নিকর্ম্মবিদ্ বৈদ্য শস্ত্রসাধ্য ও অগ্নিসাধ্য রোগে বিবেচনা করিলে ক্ষার প্রয়োগও করিতে পারেন। (চরক চিকিৎসা° ২৫ অ°) সুশ্রুতে লিখিত আছে—শরৎ ও গ্রীষ্ম ঋতুতে কদাচ অগ্নিকর্ম্ম করিবে না। সুশ্রুত সূত্রস্থানে ১২ অধ্যায় এবং বাভট চিকিৎসিত স্থান ১৫ অধ্যায়ে এই অগ্নিকর্ম্মের বিষয় বিশেষ রূপে লিখিত আছে।

২ অগ্নিকার্য্য, শবদাহাদি ক্রিয়া, শাস্ত্রমত শবদেহে অগ্নিপ্রদান করা। [অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দ্র°]

অগ্নিকলা—অগ্নির দশ প্রকার অবয়ব। অগ্নির এই সকল অবয়ব যকারাদি দশ বর্ণের দেবতা।

"ধূম্রার্চ্চিরুষ্মাজ্বলিনীজ্বালিনীবিস্ফুলিঙ্গিনী।
সুশ্রীঃ সুরূপা কপিলা হব্যকব্যবহাঅপি।
যাদীনাং দশবর্ণানাং কলা ধর্ম্মপ্রদা অমূঃ।" (সারদাতিলক)

অগ্নিকশ্যপীয়—অগ্নিকশ্যপৌ অধিকৃত্য কৃত ইতি (শিশুক্রন্দ-যমসভদ্বন্দ্বেন্দ্রজননাদিভ্যশ্ছঃ। পা ৪.৩.৮৮) ইতি ছঃ। অগ্নি ও কশ্যপ এই দুই জনকে অধিকার করিয়া যাহা কৃত হয়। ২ অগ্নিকশ্যপের বংশজাত মুনিভেদ।

অগ্নিকা—বিক্রান্ত নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা। কার্ত্তিকেয় ইহার গর্ভে পরাক্রমশালী এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। (শিবপু°)

অগ্নিকাণ্ড—গৃহাদি দাহ, প্রচুর অগ্নি গৃহাদি ভস্মীভূত করিলে তাহাকে অগ্নিকাণ্ড কহে।

অগ্নিকারিকা—অগ্নিস্থাপন এবং অগ্নিকার্য্যে যজুর্ব্বেদ ও অন্যান্য বেদোক্ত ঋক্। ২ অগ্নিকার্য্য, হোম ও আধানাদি। ৩ ক্ষুধা-বৃদ্ধিকর ঔষধ।

অগ্নিকার্পাস—অগ্নিপ্রভব কার্পাস। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত দাহ্যগুণবিশিষ্ট কার্পাস। ইংরাজীতে ইহাকে Gun-cotton বলে। সাধারণ তাপে তুলাকে তীক্ষ্ণবীর্য্যসম্পন্ন নাইট্রিক ও সালফিউরিক এসিডে ডুবাইয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়, এই কারণ ইহাকে নাইট্রেট্ অব্ সেলুলোজ্ (Nitrate of Cellulose)ও বলে। ইহা স্বল্পমাত্র চাপে অগ্নিস্পৃষ্ট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ শব্দ-সহকারে জ্বলিয়া উঠে।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে পেলৌজ (T. J. Pelouze) রাসায়নিক পরীক্ষায় অবগত হন যে, তুলা অথবা কাগজ ঘনীভূত নাইট্রিক এসিডে ডুবাইয়া রাখিলে উহার আবয়বিক কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না বটে, কিন্তু হইলেও উহা ভারবিশিষ্ট হয় এবং উহাকে শীতল জলে ধৌত করিয়া শুকাইয়া লইলে উহা সশব্দে জ্বলিয়া উঠার শক্তি পায়। যবক্ষার-যুক্ত শ্বেতসার যে দাহিকা শক্তি প্রাপ্ত হয়, একথা ইতিপূর্ব্বে ব্রাকোনো (Henri Braconnot) প্রকাশ করিয়া যান। তিনি উহাকে Xyloidin সংজ্ঞা দেন। পেলৌজ ও ব্রাকোনের সিদ্ধান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে শোনবিন (C. F. Schonbein) নিজ মৌলিক গবেষণা দ্বারা অগ্নিকার্পাসের প্রস্তুতপ্রণালী ও উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইহাঁর পর বুটগার, অটো এবং নপ্ (R. R. Bottger, Otto and Knop) স্ব স্ব প্রণালীতে কার্পাসের যবক্ষারীকরণ প্রথার (use of sulphuric along with nitric acid in the nitration process) উদ্ভাবনা করেন। অতঃপর ক্রাম (W. Crum), হাডো (Hadow) প্রভৃতি রাসায়নিকগণ অগ্নিকার্পাস সংগঠন-কার্য্যে রাসায়নিক দ্রব্যনিয়োগ সম্পর্কে পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে প্রকৃত অগ্নি-কার্পাস প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন।

অগ্নিকার্পাস আবিষ্কারের পর, শোনবিন প্রস্তাব করেন যে, বারুদের পরিবর্ত্তে কামানে অগ্নিকার্পাস দিয়া গোলা ছুড়িবার ব্যবস্থা করা হউক। তাঁহার এই মত কার্য্যোপযোগী হইবে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য জেনারেল ভন লেঙ্ক (General Von Lenk) আল্‌গা, অথবা যন্ত্রপিষ্ট কার্পাস লইয়া পরীক্ষা করিতে থাকেন, কিন্তু ইহা তৎকালে অগ্নিস্পৃষ্ট হইলেও তাদৃশ তৎপরতার সহিত অগ্নি উৎপাদনে সমর্থ হয় নাই। অতঃপর যন্ত্রযোগে যথেষ্ট পরিমাণে পিষ্ট করিয়া দেখা গেল যে, কামানের চোঙ্গার মধ্যে উহার দাহিকাশক্তি ও স্ফোটনধর্ম্ম ক্ষিপ্রতর হইয়াছে। গোলক বিক্ষেপণের উপযোগী করিবার জন্য উহাকে ethylacetate, নাইট্রিক বা অন্য এষ্টার (nitric and other esters), এসিটোন (acetone) এবং অন্য কতকগুলি তদ্ধর্ম্মাবলম্বী দ্রব্যরসে সিক্ত করিয়া লইতে হয়। [কর্ডাইট দ্র°]

বর্ত্তমানে যে প্রথায় অগ্নিকার্পাস প্রস্তুত হয়, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল :—

১৫° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপে গন্ধক ও যবক্ষার দ্রাবক-মিশ্রণ মধ্যে তুলাকে দুই হইতে চারি ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া রাখা হয়। ঐ সময়ের মধ্যে কার্পাস প্রায় ৯০°/॰ নাইট্রিক এসিড্ শোষণ করিয়া লয়। উহার রাসায়নিক সংজ্ঞা $C_6\ H_7\ O_2\ (NO_3)_3$ অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহা কতকটা নিম্নশক্তিসম্পন্ন যব-ক্ষারযুক্ত পদার্থ, কতকটা অম্লজনযুক্ত পদার্থ (oxidation products) কতকটা তুলা এবং কতকটা গন্ধকদ্রাবক মিশ্রিত তুলা (traces of unchanged cellulose and cellulose sul-phates)। ইহার পর ঐ পাত্রের তলদেশে ছিদ্র করিয়া তুলার রস বাহির করিয়া দেওয়া হয় এবং উপর হইতে জলধারা ঢালিয়া তুলাকে যবক্ষারনির্ম্মুক্ত করিতে হয়। এই ধৌতি প্রথার উপর অগ্নিকার্পাসের বিশুদ্ধতা ও শক্তি নির্ভর করে। জলধারার সঙ্গে সেলু-লোজ সালফেট (cellulose sulphate) নির্ম্মুক্ত হইলে অগ্নিকার্পাস ভাল হয়। আবেল (Sir. F. Abel) বলেন, দ্রাবক মিশ্রণ ঝরিয়া তুলা শুকাইয়া আসিলে উহা কুটিয়া চূর্ণ করা আবশ্যক। ইহাতে কার্পাস দ্রাবক-বিনির্ম্মুক্ত হয়। তৎপরে ইহাকে উপযুক্ত রীতিতে ধৌত করিলে উহাতে আর দ্রাবক চিহ্ন থাকে না। ঐ কার্পাস পরে ছাঁকিয়া লইয়া অথবা চাপে পিষ্ট করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। উহাই গোলক-ক্ষেপণকরূপে প্রচলিত।

সর্ব্বতোভাবে পরিশুষ্ক অগ্নিকার্পাস কঠিন প্রস্তরতলে রাখিয়া হাতুড়ি দ্বারা আঘাত করিলে সশব্দে ফাটিয়া উঠে। শুষ্ক ও উষ্ণ কার্পাস ঘর্ষণমাত্র অতি শীঘ্র ও সহজে জ্বলিয়া উঠে। শতকরা ২ অংশ রস (জলীয়াংশ) থাকিলে উহা সশব্দে প্রজ্বলিত হয়, কিন্তু ১৫% জল থাকিলে আদৌ কার্য্যকর হয় না। বাজারে চলিত অগ্নিকার্পাসে শতকরা ১০ হইতে ১৫ অংশের কম যবক্ষারসিক্ত পদার্থ থাকে, এই জন্য উহার অগ্নিস্পর্শশক্তি ২০° হইতে ২৫° কম হয়। বিশেষ সাবধানতার সহিত প্রস্তুত অগ্নিকার্পাস এলকোহল ও ইথরে ধৌত করিলে উহার মধ্য হইতে ভিন্ন পদার্থ নির্গত হইয়া যায়। উহাকে দহনক্ষম করিবার জন্য ১৮০° হইতে ১৮৫° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে পরিশুষ্ক করিয়া রাখা উচিত।

প্রকৃত গান্-কটন (Gun-cotton) ও কলোডিয়ন কটনে (Collodian cotton) প্রভেদ এই যে, প্রথমোক্ত কার্পাস ইথর বা এলকোহলে অথবা উভয়ের সংমিশ্রণে দ্রব

হয় না; পরন্তু কলোডিয়ন কার্পাস যবক্ষারদ্রাবকযুক্ত কার্পাস-কোষ (nitrated cellulose) মাত্র এবং ইহাতে যবক্ষারের পরিমাণও কম থাকে। ইহা ইথর বা এলকোহলে দ্রব হয়; এই নিমিত্ত ইহাকে দ্রবণীয় কার্পাস (soluble cotton) বলা হয়। যবক্ষারের মাত্রা কম থাকাই উহার প্রধানতম কারণ।

অগ্নিকার্পাসের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা $C_6 H_7 O_2 (NO_3)_3$ ধরিলে উহাতে প্রকৃত পক্ষে শতকরা ১৪ অংশের কিছু উপর যবক্ষার থাকা উচিত; কিন্তু সাধারণ অগ্নিকার্পাস পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, উহাতে ১২.৫% হইতে ১৩% অধিক যবক্ষার থাকে না। অগ্নিকার্পাসের অবধারিত সংজ্ঞা হইতে বুঝা যায় যে, উহার আভ্যন্তরিক বিস্ফোরণক্রিয়ার (internal combustion) সহযোগার্থ উহাতে যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন বিদ্যমান আছে। কিন্তু দগ্ধ হইবার পর কোনরূপ অঙ্গারের অস্তিত্ব থাকে না। অগ্নিকার্পাস বায়ুশূন্য পাত্রে দগ্ধ করিয়া যে বায়বীয় মিশ্রণ (gaseous mixture) পাওয়া যায়, তাহাতে বাষ্প (steam), কার্ব্বন মনক্সাইড, কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন, নাইট্রিক এসিড ও মিথেন (methane) থাকে। আবার বায়ুহীন পাত্রে অগ্নিকার্পাস রাখিয়া উহা যে পর্য্যন্ত না অগ্নিদগ্ধ হয়, সেই পর্য্যন্ত উহাকে উত্তপ্ত করিলে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডও (NO_2) পাওয়া যায়। দেখা গিয়াছে, ১০০° ডিগ্রী বাষ্পের উত্তাপে অগ্নি-কার্পাসকে কয়েক সপ্তাহ রাখিয়া দিলে উহা হইতে বসাম্ল (fatty acids), মূল পদার্থ (bases) ও অঙ্কুর দ্রাক্ষাজাত শর্করার ন্যায় পদার্থ নিঃসৃত হয়। অধিক চাপে উহার দহনক্ষমতা পরিবর্দ্ধিত হয় এবং উহা হইতে কার্ব্বনমনক্সাইড বাষ্প ও নাইট্রোজেন বাহির হয়, কিন্তু তখনও নাইট্রিক অক্সাইড বিচ্যুত হয় না। [বিস্ফোরক দ্র°]

অগ্নিকার্য্য—অগ্নেরগ্নৌ বা কার্য্যম্। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রভৃতি দিয়া অগ্নিপ্রজ্বালন। পর্য্যায়—অগ্নীন্ধন, অগ্নীধ্রা, অগ্নিকারিকা (হেম°)। ২ সায়ংপ্রাতঃ অগ্নিতে সমিধ্ হোমের অনুষ্ঠান।

"উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং শিক্ষয়েচ্ছৌচমাদিতঃ।
আচারমগ্নিকার্য্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ ॥" (মনু ২.৬৯)

৩ হোমকর্ম্ম। "বলিপ্রদানে পূজায়ামগ্নিকার্য্যে মহোৎসবে।" ৪ শবদেহ দাহ। (মার্ক° চণ্ডী)

অগ্নিকাষ্ঠ—অগ্নেঃ উদ্দীপনং কাষ্ঠম্। অগুরুকাষ্ঠ। ২ শমীকাষ্ঠ।

অগ্নিকুক্কুট—জ্বলৎ তৃণগুচ্ছ, জ্বলন্ত নুড়া।

অগ্নিকুণ্ড—যজ্ঞাদিতে যে স্থানে কুণ্ড কাটিয়া অগ্নি স্থাপন করা হয়। এই কুণ্ডে দেবোদ্দেশে হোমাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইয়া থাকে। ২ অগ্নিরক্ষার জন্য গহ্বরাকৃতি স্থানবিশেষ; অগ্নিহোত্রী বা অগ্ন্যুপাসকগণ গৃহের যে স্থানে অগ্নিরক্ষা করিয়া থাকেন। ৩ জহরব্রতচারিণী রাজপুতরমণীগণ যে খাতে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া সতীধর্ম্মরক্ষার্থ জীবন বিসর্জ্জন করিতেন। রাজপুতনায় এরূপ অগ্নিকুণ্ডের বহু নিদর্শন আজিও বর্ত্তমান আছে। [জহরব্রত দ্র°] ৪ ঢাকা জিলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমায় অবস্থিত রামপাল গ্রামে 'বল্লালবাড়ী' নামক ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদের অভ্যন্তরস্থ একটী বৃহৎ গর্ত্ত। প্রবাদ, বিক্রমপুরের শেষ হিন্দু রাজা মুসলমান সৈন্যের আগমনে এই খাত খনন করাইয়াছিলেন এবং ধর্ম্মরক্ষার্থ সপরিবারে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্নিসংযোগে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ৫ শীতপ্রধান দেশে গৃহ গরম রাখার জন্য অগ্নিরাখার স্থান (fire-place)।

অগ্নিকুমার$_1$—বন্য ক্ষুপবিশেষ। [Toddalia Aculeata] উড়িষ্যায় ইহাকে তুণ্ডপোড়া বলে। [তুণ্ডপোড়া দ্র°] নারঙ্গাদিবর্গের কণ্টকময় ত্রিপর্ণ পাতা, কটুগন্ধী। ফুল ছোট, আপীত, একলিঙ্গ। ইহার ফল আধ ইঞ্চি, আকারে প্রায় গোল। বিশেষভাবে উড়িষ্যায় ইহা পাওয়া যায়।

অগ্নিকুমার$_2$—কার্ত্তিকেয়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে—এক সময়ে ইন্দ্রকর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া অগ্নি শঙ্করশঙ্করীর কামক্রীড়ায় বাধা উৎপাদন করিয়াছিলেন। উমা তাহাতে অগ্নিকে অভিশাপ দিলেন, 'তুমি আমার এই মহাপ্রভ রৌদ্র শুক্র গ্রহণ করিয়া গর্ভধারণ কর।' অগ্নি দীর্ঘকাল গর্ভযন্ত্রণায় কাতর হইয়া গঙ্গাকে উক্ত গর্ভ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। গঙ্গা তদনুসারে অগ্নি হইতে ঐ গর্ভ গ্রহণ করিয়া হিমালয়ের বিচিত্রপাদপ-পুষ্পিত কুক্ষিতে উহা মোচন করেন। এইরূপে রুদ্রাগ্নি-গঙ্গাতনয় কুমার জন্মগ্রহণ করেন। [কার্ত্তিকেয় শব্দ দ্র°]

অগ্নিকুমারমোদক—বৈদ্যোক্ত গ্রহণী রোগের একটী ঔষধ। ঝোরমূল, বালা, মুথা, গুড়ত্বক, তেজপত্র, নাগেশ্বর, জীরা, কৃষ্ণজীরা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কট্‌ফল, কুড়, শটী, ত্রিকুট, বেলশুঁঠ, ধনে, জায়ফল, লবঙ্গ, কর্পূর, কান্তলৌহ, শৈলজ, বংশলোচন, এলাইচ, জটামাংসী, রাস্না, তগরপাদুকা, বরাক্রান্তা, বেড়েলা, অভ্র, মুরামাংসী ও বঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ। এই সকল চূর্ণের সমান মেথীচূর্ণ। সমুদায় চূর্ণের অর্দ্ধেক শোধিত সিদ্ধিপত্রচূর্ণ। সকল চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি। পাক করিয়া মধু মিলিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। শীতলজল অথবা ছাগদুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে অতি কঠিন গ্রহণী, শ্বাস, আমবাত, অগ্নিমান্দ্য, জীর্ণজ্বর ও প্লীহা প্রভৃতি নানারোগ নিবারিত হয়।

অগ্নিকুমাররস—জ্বর, গ্রহণী ও অগ্নিমান্দ্যের ঔষধ। পারা,

গন্ধক, বিষ, ত্রিকটু, সোহাগার খই, লৌহভস্ম, বনযমানী, আফিম, প্রত্যেক তুল্যাংশ। সমসমষ্টির সমান ওজনের জারিত অভ্র। চিতার রসে এক প্রহরকাল মর্দ্দন করিয়া মরিচের মত বটী করিবে। অনুপান অবস্থাভেদে কর্পূরের জল, জীরা, জামের ছালের রস, শীতল জল।

মতান্তরে অগ্নিকুমাররস—অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগাধিকারোক্ত রসৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ, গন্ধক ও সোহাগার খই, প্রত্যেক দ্রব্যের এক এক ভাগ, মিঠা বিষ, কড়িভস্ম ও শঙ্খভস্ম, প্রত্যেক দ্রব্যের তিন তিন ভাগে, এবং মরিচ ৮ ভাগে, এই সকল দ্রব্য পাকা জামিরের রসে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনে অজীর্ণ, বিসূচিকা, গ্রহণী ও বায়ু রোগ নষ্ট হয়।

বৃহৎ অগ্নিকুমাররস—প্রস্তুত প্রণালী—পারদ একভাগ, গন্ধক দুইভাগ, সোহাগার খই দুইভাগ এবং ত্রিফলা, যবক্ষার, ত্রিকটু ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক দ্রব্যের একভাগ, এই সকল দ্রব্য আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ এক আনা হইতে দুই আনা মাত্রায় আদার রসের সহিত সেব্য। ইহা সেবনে অগ্নিমান্দ্য, আমদোষ, গ্রহণী, অর্শঃ ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

অন্যপ্রকার—গ্রহণীরোগাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারা, গন্ধক, ত্রিকটু, পঞ্চলবণ সমভাগে এবং সমুদায়ের সমান ভাগ একত্র খল করিয়া চিতা, ভাঙ্গ ও ভৃঙ্গরাজ ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া এক প্রহরকাল বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া পরে আদার রসে ভাবনা দিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণে মধুর সহিত সেব্য। যে গ্রহণীরোগে আম থাকে, সেইস্থলে ইহা প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। এই ঔষধ অগ্নির বিশেষ দীপ্তিকারক। (রসেন্দ্রসারস° গ্রহণীরোগাধি°) এতদ্ভিন্ন রসেন্দ্রচিন্তামণি ও ভাবপ্রকাশে অজীর্ণ, গ্রহণী, সন্নিপাত প্রভৃতি অধিকারে আরও কতিপয় অগ্নিকুমাররসের প্রস্তুতপ্রণালী লিখিত আছে।

অগ্নিকুমারলৌহ—প্লীহারোগাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—তুতে, হিঙ্গু, সোহাগা, সৈন্ধবলবণ, ধনে, জীরা, যমানী, মরিচ, শুঁঠ, লবঙ্গ, এলাচ, বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে এক তোলা, চূর্ণ-লৌহভস্ম, সকলের সমান এবং পারা ও গন্ধকে কজ্জলী করিয়া উহা ৮ তোলা পরিমাণে এই সকল দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিবে। ইহার মাত্রা রোগীর বলাবল অনুসারে এক মাষা পর্য্যন্ত। অনুপান ঘৃত ও মধু। এই ঔষধ সেবনে যকৃৎ, প্লীহা, উদরী ও হলীমক প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক। (রসেন্দ্রসারস° প্লীহারোগাধি°)

অগ্নিকুল—রাজপুতনাবাসী রাজপুত জাতির একটী শাখা। ইঁহাদের মধ্যে সূর্য্যবংশী শাখা, শিশোদীয় রাঠোর ও কচ্ছবাহ শ্রেণীর রাজপুতগণ প্রসিদ্ধ। ইঁহারা যথাক্রমে উদয়পুর, যোধপুর ও জয়পুরের রাণা থাকিয়া ইতিহাসে যশ ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রবংশী শাখায় যাদব ও ভট্টিকুলের প্রধান করৌলী ও জয়শালমেরের সর্দ্দারগণ এবং কচ্ছভোজ ও নবনগরের অধিপতিগণ ঝাড়েজাকুল-সমুদ্ভূত। যাদবকুলের অন্যতম থাকে তোমরকুলশিরোমণি উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্য জন্মগ্রহণ করেন।

অগ্নিসদৃশ তেজঃসম্পন্ন জাতি বলিয়া এই রাজপুতশাখা অগ্নিকুল নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, ক্ষাত্রকুলসমুদ্ভূত মহর্ষি বিশ্বামিত্র আবু (অর্ব্বুদ) পর্ব্বতে এক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে অধিষ্ঠিত হইবার জন্য তিনি দেবগণের আরাধনা করেন। যজ্ঞকালে তিনি দর্ভময় চারিটী মূর্ত্তি গড়িয়া অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিয়াছিলেন। পরে সঞ্জীবনী মন্ত্রপ্রভাবে তাঁহাদের প্রাণদান করেন। ঐ মন্ত্রসঞ্জীবিত মূর্ত্তিচতুষ্টয় হইতে যথাক্রমে পরমার বা প্রমার, চালুক্য বা শোলাঙ্কি, পরিহার ও চৌহান রাজপুতকুলের উদ্ভব হয়। অগ্নি হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া ইহারা অগ্নিকুল নামে খ্যাত। পরমার শাখায় ৩৫টী, পরিহার শাখায় ১২টী, চৌহান শাখায় ২৪টী এবং শোলাঙ্কি শাখায় ১৬টী থাক দৃষ্ট হয়। প্রবাদ, পরমারবংশের মোরী থাকে মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। চৌহানকুলে দিল্লীর শেষ হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজের জন্ম। অন্হিলবাড়-পত্তনের শোলাঙ্কি বা চালুক্যরাজগণ ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অগ্নিকুলের তক্ষক থাকে মহারাজ শালিবাহন জন্মগ্রহণ করেন।

ভারতে রাজপুত জাতির অভ্যুদয় ও প্রতিষ্ঠা দেখিয়া অনুমান হয়, অমিততেজা ক্ষাত্রবীর্য্যসম্পন্ন এই জাতি পর্য্যায়ক্রমে রাজপুতনায় আসিয়া বাস করিয়াছিল।

সকল অগ্নিকুলের মূল বাহির করা কঠিন। এই কুলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মেবারের রাণাগণ সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, কিন্তু এই বংশের সুপ্রাচীন শিলালেখ আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ 'নাগরব্রাহ্মণ'রূপে পরিচিত ছিলেন। [নাগর ব্রাহ্মণ ও মেবার দ্র°] আজকাল অগ্নিকুলের উৎপত্তির বিবরণ পৌরাণিক গল্প বলিয়া অনেকে উড়াইয়া দিতে চান। কিন্তু দক্ষিণভারতে যখন অগ্নিকুলের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, তখন একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। দক্ষিণভারতের অগ্নিকুল সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।—

১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই এই (রাজপুতনার) অগ্নিকুলের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে প্রাচীন তামিলগ্রন্থে এক অগ্নিকুলের কথা এবং দক্ষিণভারতে যজ্ঞীয় অগ্নিকুণ্ড হইতে উৎপন্ন এক প্রাচীন রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। দ্রাবিড়ের অন্তর্গত পরম্বুনাড়ু নামক স্থানে এক বিদ্যোৎসাহী রাজবংশে পারি নামে শেষ রাজা ছিলেন। তাঁহার সভায় কপিলর নামে এক বিখ্যাত ও পরমসম্মানিত কবি ছিলেন। চের, চোল ও পাণ্ড্যবংশের তিনজন রাজা ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া উক্ত পারি রাজার রাজ্য অধিকার করিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। তখন পারি রাজার কন্যাগণের সম্প্রদানভার কপিলরের উপর পড়িল। তিনি কন্যাগণকে বিচ্চিক্কন ও অড়য়মের পুলিকড়িমাল ইরুঙ্গোবেল নামক দুই রাজার সকাশে লইয়া গেলেন। পুলিকড়িমালকে কবি বলিতেছেন,—"আপনি ঋষির যজ্ঞাগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ভূত ; তাম্রনিভ উচ্চ প্রাকারমালায় শোভিত দ্বারসমুদ্র আপনার করতলগত ; আপনি দানে অকুণ্ঠিত উনপঞ্চাশৎ পূর্ব্বপুরুষের অধস্তন ; আপনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকপাল।"

তামিল সাহিত্যে সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী সময়ের যে বিবরণাদি পাঠ করা যায়, তাহা হইতে মনে হয়, এই কপিলর কবি খৃষ্টীয় ২য় হইতে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে জীবিত ছিলেন। সুতরাং অগ্নিকুলের বিবরণ তদপেক্ষা প্রাচীন।

ইহা হইতে মনে করিবার কোন কারণ নাই যে, পরমার অগ্নিকুল এবং তামিল অগ্নিকুলের মধ্যে বংশগত কোন সম্বন্ধ আছে। শুধু ইহাই জানা যাইতেছে যে, দেশ ও কালের সুদূর ব্যবধানেও দুইটী রাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটী অনুরূপ আখ্যান প্রচলিত।

অগ্নিকেতু,—অগ্নেঃ কেতুরিব। উর্দ্ধগামী অগ্নির শিখা, উর্দ্ধগামী ধূম।

অগ্নিকেতু₂—রাক্ষসসেনাপতি। লঙ্কাসমরে ইনি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহারই হস্তে নিহত হ'ন। (রামায়ণ)

অগ্নিকৌতুক—অগ্ন্যা কৌতুকং ৩-তৎ। আগুন লইয়া খেলা, বাজিপোড়ান প্রভৃতি। [অগ্নিক্রীড়া দ্র°]

অগ্নিকোণ—পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণ। ঐ কোণের অধিপতি অগ্নি।

অগ্নিক্রিয়া—অগ্নিদাহ মাত্র। ২ বিধিপূর্ব্বক অগ্নিতে মৃতদেহ দগ্ধ করা। [অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দ্র°]

অগ্নিক্রীড়া—আগুনখেলা, ফুলখেলা। বাজী পোড়ানো, নানা বর্ণের আগুন প্রজ্বলিত করা।

ফুলখেলা—চৈত্রমাসে গাজনের সময় সন্ন্যাসীরা শেষ দিন রাত্রিতে নানা স্থান হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া প্রজ্বলিত করে। পরে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর তাহারা ছুটাছুটি করে এবং ঐ অঙ্গার চারিদিকে ছড়াইতে থাকে। এই অগ্নিক্রীড়ার নাম ফুল খেলা। গাজনের সময় বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই এই উৎসব হইয়া থাকে ; কিন্তু সকল স্থানে ইহার জাঁক সমান নয়। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক চড়কপূজা রহিত হওয়ায় অনেক গ্রামে আর এখন ফুল খেলার ঘটা নাই।

বাজী—অন্নপ্রাশন, যজ্ঞোপবীত, বিবাহ, দোল, রাসযাত্রা প্রভৃতি উৎসবে বহুকাল হইতে বাঙ্গালায় বাজী পোড়ানোর প্রথা চলিয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে বিবাহ, কালীপূজা, দোল এবং রাসযাত্রাতে ইহার ধূমধাম কিছু বেশী রকম।

অতি প্রাচীনকাল হইতে চীনদেশে অগ্নিক্রীড়া প্রচলিত আছে। ম্যানিলিয়াসের গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, রোমসম্রাট্ অগষ্টাসের সময় রোমে অগ্নিক্রীড়া হইত। সম্রাট্ কারনিয়স্ এবং ডায়োক্লিশিয়ান অগ্নিক্রীড়া দেখিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে ক্লডিয়ান্ নামক জনৈক রোমক গ্রন্থকার সার্কাসে প্রদর্শিত চরকী, তুবড়ী প্রভৃতির ন্যায় নানাবিধ অগ্নিক্রীড়ার এক অতি মনোরম বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপ হইতে যে সমস্ত বীর পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্র জেরুসালেম মুসলমান-বিজেতৃগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন-কালে প্রাচ্যের অগ্নিচূর্ণ ইউরোপে লইয়া যান। ফলে ইউরোপেও ইহার ব্যবহার প্রচলিত হয়। তাহার পরে সকল বড় বড় শোভাযাত্রায় বা ক্রীড়া-প্রদর্শনীতে অগ্নিক্রীড়া হইতে লাগিল। ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম হেন্‌রী যখন রাজকুমারী এলি-জাবেথকে বিবাহ করেন, তখন নদীবক্ষে অভিনব অগ্নিক্রীড়া হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র রাজা অষ্টম হেন্‌রী যখন আন্ বলিন্‌কে দ্বিতীয়া পত্নীরূপে গ্রহণ করেন, তখন অগ্ন্যুদ্গারী ড্রাগণ নির্ম্মিত হইয়া উৎসবের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল। রাণী এলিজাবেথের সময়েও অগ্নিক্রীড়া অতি সমাদরের বস্তু ছিল। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের নৃপতি পারীর বিরাট্ অগ্নিক্রীড়ায় নিজহস্তে অগ্নি-সংযোগ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ পঞ্চম চার্লস ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে অগ্নিক্রীড়া সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করেন। কালে অন্যান্য দেশেও ঐরূপ আইন প্রণীত হয়। ইহার পরে বর্ম্ম, অসি, ভল্ল প্রভৃতিতে এইরূপ ভাবে অগ্নিচূর্ণ সন্নিবেশিত হইল যে, ক্রীড়া-প্রদর্শনকালে অস্ত্র ও বর্ম্ম আঘাত প্রাপ্ত হইলেই অগ্নিচ্ছটা বাহির করিত ; ইহাকে অগ্নিযুদ্ধ বলা হইত। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌সের কন্যার সহিত পালাষ্টিনের রাজকুমারের বিবাহকালে খুব ঘটা করিয়া অগ্নিক্রীড়া হয়।

প্রাচ্যভূখণ্ড অগ্নিক্রীড়া বা আতসবাজীর জন্য চিরপ্রসিদ্ধ।

ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনকালে এই বিশিষ্ট শিল্প সম্যক্ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 'ভারতেশ্বরী' উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে লর্ড লিটনের নেতৃত্বে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী দিল্লীতে ইংরাজরাজের যে প্রথম দরবার হইয়াছিল, সেই উৎসব উপলক্ষে এক রাত্রিতে লক্ষ টাকার বাজী পুড়িয়াছিল। আতসবাজী তৈয়ার করিবার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে সুনিপুণ শিল্পী নিযুক্ত হইয়াছিল। [আতস বাজী দ্র°]

অগ্নিক্ষ—চন্দ্রবংশীয় পৃথুনামক ভূপতির বংশে কামপতি নামে জনৈক রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পুত্রার্থে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তাঁহার যজ্ঞে উপস্থিত পদ্মাক্ষাদি ঋষিগণ মধ্যে অগ্নিক্ষ ঋষিরও নামোল্লেখ আছে। (স্কন্দপু°, সহ্যাদ্রি°)

অগ্নিগড়—প্রজ্বলিত অগ্নিরচিত গড়। কাহাকেও সর্পে দংশন করিলে কিম্বা ভূত প্রেত দৈত্যদানায় দৃষ্টি দিলে ওঝারা আসিয়া অগ্নিগড় করেন। অগ্নিগড় করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তাঁহারা রোগীকে ঝাড়াইতে থাকেন। অগ্নিগড় করা ওঝাদের একটা উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা। তন্ত্র মন্ত্র ঝাড়া ফুকা অনেকেই জানেন, কিন্তু রোগীকে বেষ্টন করিয়া অগ্নিগড় করার এ বিদ্যা সকলের ক্ষমতায় কুলায় না।

ওঝা কাছা ও মস্তকের শিখা খুলিয়া রোগীর চতুর্দ্দিকে কুলকাঠের ও তালপত্রের অগ্নি প্রজ্বলিত করেন, তৎপরে করতালি দিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন—

"দৈত্য ঝাড়ম্ দানা ঝাড়ম্, ঝাড়ম্ বাও বা।
ব্রহ্মার উদরে বেটা ভস্ম হয়ে যা।
ছাড়্লম সরিষা বাণ ছোটে বার আগে।
ব্রহ্মার আজ্ঞায় বাণ শীগ্‌গির্ লাগ্‌গে।"

এই বলিয়া একমুষ্টি শ্বেত সর্ষপ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। যে যুগে ডাকিনী যোগিনী মানুষের বুকে বসিয়া হৃদয়ের শোণিত শুষিয়া খাইত, ধূলা পড়া, সরিষাবাণ এবং অগ্নিগড় সেই সকল যুগের অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র ছিল। কালে ডাকিনী যোগিনীর বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, সর্ষপবাণেরও তীক্ষ্ণ ধার ক্রমে ক্ষয় হইয়া আসিতেছে।

অগ্নিগর্ভ—অগ্নিজারক বৃক্ষ। ২ সূর্য্যকান্তমণি, আতসী পাথর। সূর্য্যকিরণে আতসী পাথর ধরিয়া তাহার নিম্নে একখানি টীকা, অঙ্গার কিম্বা সোলা রাখিলে, কিঞ্চিৎ কাল পরেই তাহা জ্বলিয়া উঠে। ৩ অগ্নিমন্থনকাষ্ঠরূপ অরণি।

অগ্নিগর্ভা—মহাজ্যোতিষ্মতীলতা। ২ শমীলতা। পূর্ব্বকালে এই লতার কাষ্ঠ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইত। [শমী ও শাঁই দ্র°]

অগ্নির শমীগর্ভে যাইবার বিবরণ মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে এইরূপ আছে,—দেবতারা ব্রহ্মবর-দৃপ্ত তারকাসুরের উপদ্রবে অতিষ্ঠ; ভয়ে ব্রহ্মার নিকট গিয়া পরিত্রাণের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, 'রুদ্রাণীর শাপে দেবতারা অনপত্য, কিন্তু শাপদানের সময় অগ্নি তথায় ছিলেন না; অতএব অগ্নিকে খুঁজিয়া বাহির কর। রুদ্রের তেজ অগ্নিতে পড়িয়া তাহা হইতে গঙ্গাগর্ভে এক পাবকপ্রতিম পুত্র উৎপন্ন হইবে। সেই পুত্র হইতেই তারকাসুরের বধ অবশ্যম্ভাবী।' দেবতারা ব্রহ্মার উপদেশে অগ্নিকে খুঁজিতে থাকেন, কোথাও পান না। অগ্নি রসাতলে যান, একটা মণ্ডূকমুখে সে খবর ব্যক্ত হওয়ায় অগ্নি তাহাকে শাপ দিয়া অশ্বত্থবৃক্ষ আশ্রয় করেন। একটা হস্তী সে খবর প্রচার করিয়া দেয়। অগ্নি তাহাকেও শাপ দিয়া অবশেষে শমীগর্ভে প্রবেশ করেন। শুকমুখে এই সংবাদ পাইয়া দেবতারা তথায় উপস্থিত হন এবং অগ্নিশপ্ত শুককে বর দানে আপ্যায়িত করিয়া শমীগর্ভে অগ্নির সাক্ষাৎ লাভ করেন। সেই হইতে অগ্নি শমীগর্ভে দৃষ্ট হন। ৩ পৃথিবী। (শ্রুতি)

অগ্নিগৃহ১—অগ্নিকার্য্যার্থং গৃহম্। হোমের নিমিত্ত গৃহ। ২ শ্রৌত স্মার্ত্ত অগ্নিকার্য্যের আধারগৃহ। [অগ্নিমন্দির দ্র°]

অগ্নিগৃহ২—অগ্নিশালা। যে গৃহে পারসীকগণ অগ্নিস্থাপনা করিয়া পূজা করেন। জরথুস্ত্রমতাবলম্বিগণ এই গৃহ পরম পবিত্র বলিয়া গণ্য করিতেন। ৫২১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে কাম্বিশেসের মৃত্যুর পর পারস্যের সিংহাসন লইয়া একটী ঘোরতর রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়। তখন কাইরসের পুত্র গৌমতা (Gaumata) বলপূর্ব্বক পারস্যরাজ্য দখল করেন। অহুরমজ্‌দের সহায়তায় ১ম দরায়ুস্ বিদ্রোহীদিগের যথোপযুক্ত দণ্ডবিধান করিয়া বিদ্রোহাগ্নি প্রশমনে বদ্ধপরিকর হন। তাঁহার চেষ্টায় রাজ্যময় শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তিনি অগ্নিগৃহগুলি পুনরুদ্ধার করিয়া সংস্কার করিয়াছিলেন। [দরায়ুস্ দ্র°]

অগ্নিগ্রন্থ—অগ্নিপ্রতিপাদকঃ গ্রন্থঃ। শাক-তৎ। অগ্নিহোমাদি প্রতিপাদক শাস্ত্র। "অগ্নিগ্রন্থপর্য্যন্তমধীতে" (সি° কৌ°)

অগ্নিঘৃত—অগ্ন্যুদ্দীপনং ঘৃতং। [বৈদ্যক] ক্ষুধাবৃদ্ধিকর ঘৃত। পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, চই, গজপিপুল, বনযমানী, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, ক্ষারদ্বয়, হবুষা, প্রত্যেক ৮ তোলা। দধি, কাঞ্জি ও শুক্ত ঘৃতের সমান ভাগ। আর্দ্রকরস ও ঘৃত প্রত্যেক দুই সের। একত্র পাক করিবে। এই ঘৃত মন্দাগ্নি রোগে উপকার করে।

অন্যপ্রকারে অগ্নিমান্দ্যরোগাধিকারোক্ত ঘৃতৌষধ। প্রস্তুত প্রণালী—৫০০ ভেলা ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার ১৬ সের অবশেষ রাখিবে। সেই কাথ ১৬ সের দধির মণ্ডে, কাঁজি, শুক্ত, আদার রস ও সজিনামূলের রস প্রত্যেকে ৪ সের এবং

কল্কার্থ ত্রিকটু, পিপুলমূল, চিতামূল, গজপিপ্পলী, হিঙ্গু, চই, বনযমানী, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচীক্ষার ও হবুষা ইহাদের প্রত্যেকের চারিতোলা পরিমাণে লইয়া তাহার সহিত ৪ সের গব্যঘৃত পাকের নিয়মানুসারে পাক করিবে। মাত্রা রোগীর বলাবল অনুসারে নিরূপণ করা বিধেয়। উপযুক্ত মাত্রায় এই ঘৃত সেবনে অগ্নিমান্দ্য, অর্শ, গ্রহণী, মূঢ়বাত, গুল্ম, পাণ্ডু, শোথ, কাস প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। এই ঘৃত অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ইহা অতিশয় অগ্নিবর্দ্ধক। (ভৈষজ্যরত্না° অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগা°) এই অগ্নিঘৃত বৃহৎ অগ্নিঘৃত নামে অভিহিত।

অগ্নিচয়ন—অগ্নি-চি, ভাবে ল্যুট্। অগ্ন্যাধান। করণে ল্যুট্। ২ অগ্ন্যাধান মন্ত্র।

অগ্নিচিৎ—(ত্রি) অগ্নিং চিতবান্ ভূতার্থে অগ্নি-চি-ক্বিপ্। অগ্নিহোত্রী; মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যিনি বহ্নি স্থাপন করেন। অগ্নি-চি-ক্বিপ্ ভাবে। ২ অগ্ন্যাধান।

অগ্নিচিতি—হোমার্থ অগ্নিস্থাপনের অঙ্গীভূত মন্ত্র। (যজুর্ব্বেদ)

অগ্নিচিত্যা—চি-ভাবে ক্যপ্। অগ্নিচয়ন, অগ্ন্যাধান। "উপবিশেদগ্নিপুচ্ছস্য সাগ্নিচিত্যায়াং" (গৃহস্থ°)

অগ্নিচিত্বৎ—অগ্নিচিৎ-মতুপ্, মস্য বঃ। তান্ত, ন পদত্ব, অগ্নিচয়নযুক্ত যজ্ঞ। "অধ্বরেস্বগ্নিচিত্বৎসু" (ভট্টি)

অগ্নিচূড়—তাম্রচূড় পক্ষী, চলিত কুক্‌ড়া, তামিল কোম্‌ড়া, হিন্দী—মুর্গা। বন্য ও গ্রাম্য ভেদে ইহা দ্বিবিধ। গ্রাম্যগুণ—বৃংহণ, বৃষ্য, বলকর, গুরু, শুক্র ও কফবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য ও কষায় রস। আরণ্যগুণ—স্নিগ্ধ, বৃংহণ, শ্লেষ্মল, গুরু, বাত, পিত্ত, ক্ষয়, বমি ও বিষমজ্বরনাশক। (ভাবপ্র°)

অগ্নিচূর্ণ—বারুদ; যে চূর্ণ হইতে সহজেই অগ্নি উৎপন্ন হয়। এই অগ্নিচূর্ণের ব্যবহার যে কত প্রাচীন, সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। যদি মহাভারতের বনপর্ব্ব বা রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে উল্লিখিত নালীক অস্ত্র বা বৈশম্পায়নের ধনুর্ব্বেদ বা শার্ঙ্গধরের ধনুর্ব্বেদে উল্লিখিত নালীকাস্ত্র বা নলিকাস্ত্র বন্দুকজাতীয় কোন অস্ত্রক্ষেপক যন্ত্র হয়, তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, অগ্নিচূর্ণ বা বারুদের ব্যবহার নিতান্ত আধুনিক নহে। মহাভারতের বনপর্ব্ব ও রামায়ণের উত্তরকাণ্ড পরবর্ত্তী রচনা হইলেও তাহা যে সময়ে রচিত হইয়াছিল, তখন য়ূরোপে বারুদের (Gunpowder) ব্যবহার কেহই জানিত না। যাহা হউক ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ভারতে মুসলমান অভিযানের পূর্ব্বেও নলিকাস্ত্রের ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল না। ভারত ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথমে মোগলবীর বাবরই পাণিপথ (১ম) যুদ্ধক্ষেত্রে কামান ব্যবহার করেন। এরূপ ভাবে কামান ব্যবহার ভারতীয় ঐতিহাসিকযুগে ইতিপূর্ব্বে অন্য কোন যুদ্ধেই হয় নাই বলিয়া বোধ হয়। [নলিকাস্ত্র দ্র°] য়ূরোপের সহিত অটোমানশক্তির ধর্ম্মযুদ্ধের সময় জেরুসেলাম হইতে প্রত্যাগত বীরগণ অগ্নিচূর্ণ বা বারুদের ব্যবহার শিখিয়াছিলেন। সেই সময় ইসলামের জয়ধ্বজাধারী বীরগণ এই রাসায়নিক চূর্ণের সবিশেষ ব্যবহার জানিতেন।

এককালে আরবদেশে রসায়নশাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। আরবীয় রসায়নশাস্ত্রকার বা কিমিয়াবিদ্‌গণ ভারতের রসায়নশাস্ত্রে যথেষ্ট ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সুতরাং আরবে তথা তুরস্কে অগ্নিচূর্ণের ব্যবহারপ্রণালী যে ভারত হইতেই গিয়াছিল, ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক উক্তি নহে।

শুক্রনীতিতে অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত করিবার কয়েকটী প্রণালী লিখিত আছে,—

১। "সুবর্চ্চিলবণাৎ পঞ্চপলানি গন্ধকাৎ পলম্।
অন্তর্ধূমবিপকার্কস্নুহ্যাদ্যঙ্গারতঃ পলম্॥
শুদ্ধাৎ সংগৃহ্য সঞ্চূর্ণ্য সম্মীল্য প্রপুটেদ্রসৈঃ।
স্নুহ্যর্কাণাং রসোনস্য শোষয়েদাতপেন চ॥
পিষ্ট্বা শর্করবচ্চৈতদগ্নিচূর্ণং ভবেৎ খলু॥"

অর্থাৎ সুবর্চিলবণ বা সোরা ৫ পল, গন্ধক ১ পল এবং সিজবৃক্ষ (স্নুহী) বা আকন্দের কাষ্ঠ বা অন্য কোন হাল্‌কা কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগপূর্ব্বক ধূম বাহির হইয়া না যায়, এরূপভাবে প্রস্তুত অঙ্গার ১ পল। এই সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে সংশোধিত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিতে হইবে। তাহার পর সেই চূর্ণ একত্র করিয়া পিষিয়া মিশাইয়া ফেলিতে হইবে। অতঃপর ইহাতে সিজবৃক্ষের রস বা রসুনের রস দিয়া পেষণ করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হইবে। ইহা পুনরায় উত্তমরূপে পিষ্ট হইলে বালুকার ন্যায় দানা দানা চূর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই অগ্নিচূর্ণ।

২। "সুবর্চ্চিলবণাৎ ভাগানষড়্ বা চত্বার এব বা।
নালাস্ত্রার্থাগ্নিচূর্ণে তু গন্ধাঙ্গারৌ তু পূর্ব্ববৎ॥"

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত চূর্ণের মধ্যে সোরার ভাগ কম করিয়া ৪ ভাগ বা বেশী করিয়া ৬ ভাগ দিয়া নালাস্ত্রের অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

৩। "অঙ্গারস্যৈব গন্ধস্য সুবর্চ্চিলবণস্য চ।
শিলায়া হরিতালস্য তথা সীসমলস্য চ॥
হিঙ্গুলস্য তথা কান্তরজসঃ কর্পূরস্য চ।
জতোর্নীল্যাশ্চ সরল-নির্য্যাসস্য তথৈব চ॥
সমন্যূনাধিকৈরংশৈরগ্নিচূর্ণান্যনেকশঃ।
কল্পয়ন্তি চ তদ্বিদ্যাশ্চন্দ্রিকাভাদিমন্তি চ॥"

অর্থাৎ অঙ্গার, গন্ধক, সোরা, মনছাল, হরিতাল, সীসার মল, হিঙ্গুল, উত্তম লোহার মল, কর্পূর, গালা, নীলী, ধূনা এই সকল দ্রব্য সমভাগে বা ন্যূনাধিক ভাগে মিশ্রিত করিলে নানাবিধ অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা উক্ত দ্রব্য সকলের ভাগবিশেষ অবলম্বন করিয়া নানাপ্রকার আভাযুক্ত নানাবর্ণের অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

উক্ত প্রমাণ হইতে মনে হইতেছে যে, নানাবিধ রংমশাল ও আতসবাজীও প্রাচীন ভারতে প্রস্তুত হইত। [বারুদ শব্দে অন্যান্য বিবরণ ও বর্ত্তমান কালের অগ্নিচূর্ণের বিষয় দ্র°]

অগ্নিজ—অগ্নি-জন্-ড। ৪তৎ। অগ্নিজারবৃক্ষ। ৫তৎ। ২ স্বর্ণ। ৩ কার্ত্তিকেয়। [কার্ত্তিকেয় দ্র°] ৪ অগ্নিজাত মাত্র। ৫ ভল্লাতক। ৬ মাংস ধাতু।

অগ্নিজ (Igneous)—অগ্নিজাত প্রস্তর (rock)। আগ্নেয় পর্ব্বতের অগ্ন্যুদ্গিরণে নিঃসৃত দ্রব পদার্থসমূহ অনন্তকাল ভূপৃষ্ঠে নিপতিত থাকিয়া প্রস্তরাকারে পরিণত হয়; এমন কি, ঐ বিস্তীর্ণ স্তূপরাশি কালসহকারে পর্ব্বতে রূপান্তরিত হইয়া উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান থাকে। এইরূপ অগ্নিজাত প্রস্তর-স্তর বা পর্ব্বত বহুদেশে বিদ্যমান আছে। ভারতের বিন্ধ্য-পর্ব্বতকে ভূতত্ত্ববিদ্গণ আগ্নেয় পর্ব্বতের গলিত ধাতুর রূপান্তর বলিয়া স্থির করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যে অগ্নিজ অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

অগ্নিজননী—অগ্নিমান্দ্য রোগনাশক ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—এক পল মূর্চ্ছিত পারদ, মরিচ, হিঙ্গু ও জীরক এবং প্রত্যেকে এককর্ষ পরিমাণ বচ ও শুণ্ঠী এই সকব দ্রব্য একদিন ভৃঙ্গরাজরসের সহিত মর্দ্দন করিয়া ইহা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ একমাষা পরিমাণ মধুর সহিত লেহন করিয়া পরে এককর্ষ পরিমাণ গুড়ের সহিত দাড়িমরস ও নাগররস অনুপান করিবে। (প্রয়োগা°)

অগ্নিজন্মন্—অগ্নেরনলাৎ জন্ম অস্য। কার্ত্তিকেয়। ২ স্বর্ণ।

অগ্নিজন্য খটী—অগ্ন্যুদ্গিরণ জন্য ব্যবহৃত প্রকৃতিজাত খড়ি (Chalk) নামক খনিজ পদার্থ বিশেষ। এলুমিনা, সোডা, পটাশ, সিলিকেট প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা সংগঠিত। [খড়ি দ্র°]

অগ্নিজাত—অগ্নিজার বৃক্ষ (রাজনি°)। (ত্রি) ২ অগ্নি হইতে উৎপন্ন।

অগ্নিজাতসুব্রহ্মণ্য—শ্রীতত্ত্বনিধি নামক গ্রন্থে বর্ণিত সুব্রহ্মণ্য বা কার্ত্তিকেয়ের মূর্ত্তিবিশেষ। সুব্রহ্মণ্য মূর্ত্তি দাক্ষি-ণাত্যের পল্লীতে পল্লীতে পূজিত হইয়া থাকে। কিন্তু উত্তরভারতে উঁহার পূজা প্রচলিত নাই বলিলেই হয়। অগ্নিজাত-সুব্রহ্মণ্যের দুই মুখ ও আট হাত। তাঁহার বর্ণ শ্বেত, কিন্তু কর্ণ কৃষ্ণবর্ণ। তাঁহার এক হস্ত স্বস্তিকভাবে থাকে এবং অন্য হস্তগুলি দ্বারা স্রুব, অক্ষমালা, খড়্গ, বজ্র, কুক্কুট, খেটক ও ঘৃতপাত্র ধৃত থাকে। অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছে, এইভাবে তাঁহার মূর্ত্তি গঠিত।

অগ্নিজার—অগ্নিজার বৃক্ষ। অগ্নিনির্য্যাস বৃক্ষ। অগ্নিজাল। এই দ্রব্য ঔষধে লাগে; ইহার গুণ কটু ও উষ্ণ; সেবন করিলে কফ, বায়ু, উদরবেদনা এবং শীত নষ্ট হয়; কিন্তু ইহাতে পিত্তবৃদ্ধি করে। ইহা সাগরজাত ঔষধ; পশ্চিম সমুদ্রে প্রসিদ্ধ। এই ঔষধ চারি প্রকার বর্ণবিশিষ্ট; তন্মধ্যে লোহিত বর্ণ ই শ্রেষ্ঠ। [অগ্নিনির্য্যাস দ্র°]

অগ্নিজাল—অগ্নিজার বৃক্ষ। [অগ্নিজার দ্র°]

অগ্নিজিহ্ব—অগ্নিঃ জিহ্বা ইব যস্য। অগ্নিমুখ দেবতা। দেবোদ্দেশে অগ্নিতে ঘৃতাদি প্রক্ষিপ্ত হয়। দেবতারা অগ্নি-রূপ জিহ্বা দ্বারা সেই হোমঘৃত পান করেন। তজ্জন্য দেবতাকে 'অগ্নিজিহ্ব' বলা যায়। ২ বরাহমূর্ত্তিধারী বিষ্ণু। ৩ শুভাকাঙ্ক্ষী এক ক্ষেত্রপাল। (কালিকাপু°)

অগ্নিজিহ্বা (অগ্নিজিহ্বিকা)—লাঙ্গলীবৃক্ষ। বিষলাঙ্গলা। অগ্নির সপ্তবিধ জিহ্বা। যথা—করালী, ধূমিনী, শ্বেতা, লোহিতা, নীললোহিতা, সুবর্ণা, পদ্মরাগা। [অগ্নি দ্র°] ২ জ্যোতিষোক্ত যোগবিশেষ।

"সপ্তষষ্ঠ্যাদিতিথয়ঃ সোমবারাদিভির্যুতাঃ।
অগ্নিজিহ্বাঃ সপ্তযোগাঃ মঙ্গলেষ্বতিগর্হিতাঃ॥" (যোগশাস্ত্র)

অগ্নিজ্বাল—নরকবিশেষ, যাহারা আশ্রমভ্রষ্ট, তাহারা এই নরকে পতিত হয়। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ১০০.৮৩)

অগ্নিজ্বালা—ধাতকীবৃক্ষ। ['ধাইফুল' দ্র°] ২ গজপিপ্পলী। ৩ জলপিপ্পলী, কাঁচড়া। ৪ অগ্নিশিখা। **Grislea tomentosa**।

অগ্নিঝম্প—প্রজ্বলিত হুতাশন মধ্যে ঝম্প প্রদান। চৈত্রমাসে শিবের গাজনপর্ব্বে শিবভক্ত সন্ন্যাসীদিগের নগ্নপদে অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া বা চলিয়া যাইবার বিধান আছে। অগ্নিদগ্ধ বা ক্ষতগ্রস্ত হইলে সে ভণ্ড বলিয়া প্রমাণিত হয়। এই পরীক্ষায় ভক্ত সন্ন্যাসীর প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ভক্ত প্রহ্লাদ অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন। রাজপুত-রমণীগণ সতীত্বের মর্য্যাদা রক্ষার্থ অগ্নিতে ঝাঁপ দিতেন।

অগ্নিতত্ত্ব—দেবীশক্তির অন্তর্ভূত অষ্টতত্ত্বের অন্যতম। অষ্টতত্ত্ব যথা—পৃথ্বীময়ী, জলরূপিণী, আগ্নেয়াকারা, বায়বাকারা, আকাশ-রূপিণী, চন্দ্ররূপিণী, সূর্য্যরূপা, ও আত্মরূপা। [সিদ্ধান্তসারাবলী]

অগ্নিতপ্—অগ্নি-তপ-ক্বিপ্। অগ্নিহোত্রী।

অগ্নিতপস্—অগ্নি-তপ্-অসুন। অগ্নিপরিবেষ্টনেন তপ্যতে। চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া এবং সূর্য্যের দিকে মুখ রাখিয়া যিনি তপস্যা করেন। কুমারসম্ভবে বর্ণিত আছে—ভগবতী শিবকে পতি পাইবার জন্য এইরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন।

অগ্নিতীর্থ,—তীর্থভেদ। গঙ্গাযমুনাসঙ্গমের সন্নিকটে যমুনার দক্ষিণ ভাগে এই তীর্থ অবস্থিত। অগ্নিতীর্থে পিণ্ড প্রদত্ত হইলে মৃত ব্যক্তি পরম গতি লাভ করে। (কূর্ম্মপু° ৩৮.৪)

২ থানেশ্বর হইতে ৭ ক্রোশ পশ্চিমে পৃথূদক নগরের পার্শ্বে অমরহ্রদ ও অগ্নিতীর্থ বিদ্যমান। উহা বর্ত্তমানে অমৃত-কুণ্ড ও অগ্নিকুণ্ড নামে পরিচিত।

অগ্নিতুণ্ডীরস—অগ্নিমান্দ্যরোগের ঔষধবিশেষ। পারা, বিষ, গন্ধক, বনযমানী, ত্রিফলা, সাচিক্ষার, সোরা, চিতামূল, সৈন্ধবলবণ, জীরা, সচললবণ, বিড়ঙ্গ, করকচ লবণ, সোহাগার খই। প্রত্যেক সমানাংশ। সর্ব্বসমভাগ বিষমুষ্টি। সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া গোঁড়া নেবুর রসে মর্দ্দন করিবে। মরিচ প্রমাণ এক একটী বড়ি জলের সঙ্গে সেব্য। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়। [রসেন্দ্রসারস°]

অগ্নিতেজস্—অগ্নিরিব তেজো যস্য। অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, অতি তেজস্বী। ২ একাদশ মন্বন্তরের পুলহপুত্র সপ্তর্ষিভেদ। বিষ্ণু-পুরাণ মতে ধর্ম্মসাবর্ণি মন্বন্তরে এবং হরিবংশ মতে রুদ্রমেরু সাবর্ণির সময়ে ইনি সপ্তর্ষির অন্যতম। ৩ বারাণসীরাজ দুর্জ্জয়ের অন্যতম সেনাপতি। মহর্ষি গৌরমুখের মণিসম্ভূত সৈন্যহস্তে বিনষ্ট হন। (বরাহপু°) ৪ অগ্নির তেজ।

অগ্নিত্রয়—গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি। এইরূপ কথিত আছে, চন্দ্রবংশীয় পুরূরবা রাজা উর্ব্বশীর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন প্রণয় লাভ করিবার জন্য অগ্নিকে তিন ভাগ করিয়া যাগ করেন। তৎকাল হইতে অগ্নিত্রয়ের সৃষ্টি হয়। "একোঽগ্নিরাদাবভবৎ, ঐলেন ত্বত্র মন্বন্তরে ত্রেতা প্রবর্ত্তিতা।" (বিষ্ণুপুরাণ ৪.৬.৪৫) ২ বহ্নিত্রয়রূপ পিত্রাদি। (বিষ্ণুসংহিতা)

অগ্নিত্রেতা—তিনপ্রকার অগ্নি। গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি ও আহবনীয় এই তিন অগ্নির নাম অগ্নিত্রেতা। মনুতে লিখিত আছে যে, পিতা গার্হপত্য অগ্নি, মাতা দক্ষিণাগ্নি এবং আচার্য্য আহবনীয়াগ্নি। এই তিন অগ্নিই পৃথিবীমধ্যে শ্রেষ্ঠ। বেদদাতা আচার্য্য ব্রহ্মের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি, জন্মদাতা পিতা প্রজাপতি ব্রহ্মার মূর্ত্তি, গর্ভধারিণী মাতা পৃথিবীর সাক্ষাৎ মূর্ত্তি। এই তিন অগ্নির প্রতি অর্থাৎ এই তিন জনের উপর অনাদর প্রকাশ না করিয়া যে গৃহী ইহাদের প্রতি সর্ব্বদা অবহিত থাকেন, তিনি ত্রিলোক জয় করিতে সমর্থ হন। এই তিনজনকে আদর করিলে ধর্ম্মকে আদর এবং অনাদরে ধর্ম্মকর্ম্ম সকল বিফল হয়। ইহাদের সেবাদির অবিরোধে পরলোককামনায় মনোবাক্-কর্ম্মদ্বারা যে কিছু ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, সে সমুদয় ইঁহাদিগকে নিবেদন করিবে। ইহাই সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। তদ্ভিন্ন অগ্নিহোত্রাদি অপর যে কিছু ধর্ম্ম আছে, সে সকলই উপধর্ম্ম। (মনু ২ অ°)

অগ্নিদ—অগ্নিং দদাতি যঃ, অগ্নি-দা-ক। অগ্নিদানকারী। ২ ছয় প্রকার আততায়ীর অন্যতম; যে শত্রুতা করিয়া ঘরে আগুন দেয়।

"অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ।" (স্মৃতি)

মনু বলিয়াছেন, অগ্নিদ রাজার বধ্য। (৯.২৭৮) এই শ্রেণীর আততায়ী আক্রমণ করিলে, কোন বিচার বিবেচনা না করিয়াই তাহাকে বধ করিবে।

"আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্।" (নীতিশাস্ত্র)

অগ্নিদগ্ধ,—অগ্নিনা দগ্ধঃ দহ-ক্ত। ৩-তৎ। অগ্নিদ্বারা দগ্ধকরা বস্তু, আগুনে পোড়া। সকল প্রকার চিকিৎসা-শাস্ত্রেই আগুনে পুড়িয়া অথবা গরম বা ফুটন্ত জলে দেহ পুড়িয়া গেলে তাহাকে অগ্নিদগ্ধ বা দগ্ধাঘাত বলা হয়। অগ্নিদগ্ধকে দুই প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে। অগ্নিশিখা অথবা উত্তপ্ত কঠিন পদার্থ দ্বারা দগ্ধ হইলে তাহাকে সাধারণ অগ্নিদগ্ধ (burn) বলা যায়। আর উত্তপ্ত তরলপদার্থ বা বাষ্পদ্বারা দগ্ধ হইলে তাহাকে তারলদগ্ধ (scald) বলা হইয়া থাকে। দগ্ধগুলি তিন প্রকারের হইতে পারে। ১ম শ্রেণীর দগ্ধ—ইহাতে চর্ম্ম রক্তবর্ণ ধারণ করে এবং সামান্য স্ফীত হইতে পারে। ২য় শ্রেণীর দগ্ধ—ইহাতে উপত্বক্ (epidermis) অধস্ত্বক্ (dermis) হইতে ভিন্ন হয় এবং তাহাদের ব্যবধানে রস সঞ্চিত হয়, ইহাকে "ফোস্কাপড়া" বলে। ৩য় শ্রেণীর দগ্ধে অধস্ত্বক্, এমন কি নিম্নস্থ ঝিল্লী ও মাংসপেশী সকল দগ্ধ হইয়া যায়। ফলে ঐগুলি গলিত মাংসে (slough) পরিণত হয়।

লক্ষণ—১ম শ্রেণীর দগ্ধে কোন বিশেষ শারীরিক লক্ষণ দেখা যায় না। ২য় শ্রেণীর দগ্ধে ফোস্কাগুলি গলিয়া যায় এবং অধস্ত্বকের উপরিভাগ দেখা দেয়, কিন্তু শীঘ্রই উপত্বক্ বর্দ্ধিত হইয়া উহাকে ঢাকিয়া ফেলে। ৩য় শ্রেণীর দগ্ধে দগ্ধ অংশ চারিপাশের অদগ্ধ অংশ হইতে ক্রমশঃ ভিন্ন হয় এবং ঐ দগ্ধ অংশ গলিত মাংসে পরিণত হইয়া দেহ হইতে ছাড়িয়া যায়। দগ্ধের প্রধান লক্ষণ শারীরিক অবসন্নতা বা বিক্ষোভ (shock)। রোগী একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে, দেহের উষ্ণতা অত্যন্ত কম হইয়া যাওয়ায় হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া যায়। অল্পস্থান

দগ্ধ হইলে রোগী ধীরে ধীরে সুস্থ হয়। অতিরিক্ত দগ্ধ হইলে রোগী ২।১ দিনের মধ্যেই মারা যাইতে পারে। যত কম দগ্ধ হয়, তত যন্ত্রণা বেশী হয়। তাহার কারণ এই যে, কম দগ্ধে সংজ্ঞা-নাড়ীর (sensory nerves) সূক্ষ্ম শাখাগুলি উদ্দীপ্ত (irritated) হয়। গভীর দগ্ধে ঐ নাড়ীগুলি দগ্ধ হইয়া একেবারে নষ্ট হইয়া যাওয়ায় দগ্ধ স্থানের কোন রকম সংজ্ঞা থাকে না। অতিরিক্ত দগ্ধে কখনও কখনও পরে জ্বর দেখা দিতে পারে।

ভাবী ফল—যদি গাত্রের ⅓ অংশ দগ্ধ হয়, তাহা হইলে রোগীর পক্ষে বাঁচিয়া থাকা সুকঠিন। ছোট ছেলে হইলে তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মোট কথা, গাত্রের যত বেশী ভাগ দগ্ধ হইবে, ভাবী ফল তত খারাপ বুঝিতে হইবে।

এলোপাথী চিকিৎসা—অতিরিক্ত বিক্ষোভ হইলে অনেকেই মর্ফিন ইঞ্জেকশন্ দিয়া থাকেন। ১ম শ্রেণীর দগ্ধে বিশেষ কিছু করিতে হয় না, সঙ্গে সঙ্গে ঐ অঙ্গটী মেথিলেটেড স্পিরিটে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিলে, অথবা কাপড়ের টুকরা ঐ স্পিরিটে ভিজাইয়া তদ্দ্বারা ঐ স্থান আবৃত করিয়া রাখিলে যন্ত্রণার উপশম হয় এবং আর কিছু উপসর্গ হয় না। ২য় শ্রেণীর দগ্ধেও এই ব্যবস্থা করিলে আর ফোস্কা পড়ে না। ৩য় শ্রেণীর দগ্ধে দগ্ধস্থান বোরিক তুলা অথবা বোরিক অয়েন্টমেণ্ট (মলম) প্রলেপ দিয়া তুলা দিয়া আবৃত করিয়া রাখা হয়। এখনও কেহ কেহ ক্যারন্ অয়েল (Caron oil) দগ্ধস্থানে লাগাইয়া থাকেন। Picric acid জলে দ্রব করিয়া অথবা antiflavin জলে দ্রব করিয়া তাহাও দগ্ধস্থানে তুলাতে ভিজাইয়া লাগান হয়।

হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা—অর্টিকা ইরেন্স, ক্যান্থেরাইডিস্, ক্রিয়োসোট্ জলের সঙ্গে ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করা হয়। স্থূল কথা এই, ক্ষতস্থানে যাহাতে বায়ু না লাগে অগ্রেই এমন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

সেবন করিবার জন্য জ্বরসত্ত্বে ও প্রদাহাবস্থায় একোনাইট্ দিবে। দগ্ধস্থানে পচা ক্ষত হইয়া পড়িলে আর্সেনিক্ ও কার্বো ভেজিটেবেলিস্ সেবনে উপকার দর্শে।

বৈদ্যক—দগ্ধস্থানে মধু মাখাইয়া তাহার উপরিভাগে যবের চূর্ণ ছড়াইয়া দিলে জ্বালা নিবারণ হয়। চারি সের জলে এক পোয়া জীরা সিদ্ধ করিয়া এক সের থাকিতে নামাইবে। সেই ক্বাথ ছাঁকিয়া এক সের ঘৃতের সঙ্গে পাক করিবে। নির্জল হইলে দগ্ধস্থানে ঐ ঘৃতের প্রলেপ দিলে বিলক্ষণ উপকার হয়। [কিঙ্কুনকতৈল ও পাটলী তৈল দেখ।] হকিমরা ডিম্বের শ্বেতলালা দগ্ধস্থানে মাখাইতে ব্যবস্থা দেন।

মুষ্টিযোগ—ঘৃতকুমারীর রস, নারিকেল তৈল, চূণের জল মিশাইয়া অথবা রেড়ির তৈল প্রভৃতি।

ঘরকরণা করিতে হইলে অগ্নি লইয়াই অষ্টপ্রহর কাজ। তাই মধ্যে মধ্যে গৃহস্থের বাটীতে অতিশয় শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়া থাকে। অপোগণ্ড শিশুদের বস্ত্রে আগুন লাগিয়া তাহাদের শরীর পুড়িয়া যায়। এ প্রকার দুর্ঘটনার সময় বিশেষ সতর্কতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব চাই। শিশুদের কাপড়ে আগুন লাগিলে অনেক জনকজননী ব্যস্ত হইয়া তাহা খুলিতে যান, ইত্যবসরে ছেলের শরীর পুড়িয়া যায়। বিপদ্‌কালে উপস্থিত বুদ্ধি নিতান্ত আবশ্যক। কাপড়ে আগুন লাগিলে ক্ষণকালের মধ্যে ইহা ভাবিয়া লইতে হইবে যে, বস্ত্র শীঘ্র খোলা যাইবে কি না। যদি বুঝেন যে, খুলিতে বিলম্ব হইবে, তাহা হইলে বালকের সর্ব্বাঙ্গ শতরঞ্চ কিম্বা অন্য কোন মোটা কাপড় দিয়া জড়াইয়া ফেলিবেন। বাতাস বন্ধ হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। নিকটে মোটা কাপড় না থাকিলে বালকটীকে মাটীর উপর গড়াগড়ি দেওয়াইবেন, ইহাতেও শীঘ্র অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যায়।

অগ্নিদগ্ধ$_2$—সংস্কৃত বা অসংস্কৃত অনলে দগ্ধ জীব। হিন্দুশাস্ত্রে ইহারা 'অগ্নিদগ্ধাঃ' এই প্রথমার বহুবচনান্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রাদ্ধ করিতে বসিয়া ইহাদিগকেও বিকির বা অন্ন দান করিতে হয়। এই অন্ন পিণ্ডাকারে দেওয়ার প্রথাই বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে; তাই ইহা অগ্নিদগ্ধার পিণ্ড নামে অভিহিত। সামবেদী ও যজুর্ব্বেদীরা এই পিণ্ড নৈঋতকোণে দিয়া থাকেন। তবে বৃদ্ধি বা নান্দীশ্রাদ্ধে দৈব ও পিতৃপক্ষের মধ্যস্থলেই অগ্নিদগ্ধার পিণ্ডদান বিহিত। ঋগ্‌বেদীর পক্ষে শ্রাদ্ধকারীর সম্মুখভাগেই এই পিণ্ডদানের নিয়ম।

অগ্নিদগ্ধার পিণ্ডদানকালে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, যথা—

"অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিং॥
যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্যসিদ্ধির্নতথান্নমস্তি।
তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়াস্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ॥"

ঋগ্‌বেদীরা এই মন্ত্র পাঠের পূর্ব্বে "যে অগ্নিদগ্ধা যে নাগ্নিদগ্ধা" ইত্যাদি আরও একটী বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন।

অগ্নিদগ্ধ$_3$—বিপ্রদিগের প্রধান পিতৃগণবিশেষ। (মনু ৩.১৯৯)

অগ্নিদগ্ধ$_4$—চিতার উপর মৃতদেহ রাখিয়া অগ্নিসংযোগে সৎকার (বৈদিক পরিভাষা)। দুই প্রকারে মৃতদেহের সৎকার করা হইয়া থাকে,—এক অগ্নিদগ্ধ করিয়া, অপর ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া (অনগ্নিদগ্ধা) অথবা নদীগর্ভে ভাসাইয়া দিয়া। অথর্ব্ব-বেদে আরও দুই প্রকারে মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা উল্লিখিত

হইয়াছে। মৃতদেহকে ফেলিয়া দেওয়া (পরোপ্ত) ও মৃতদেহকে অনাবৃত স্থানে ত্যাগ করা (উদ্ধতাঃ) [সংকার দ্র°]

অগ্নিদগ্ধপ্রস্তর (Volcanic rocks)—অগ্নিদ্বারা উৎপন্ন প্রস্তর। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ সমস্ত প্রস্তর দুইভাগে বিভাগ করিয়াছেন, যথা—অগ্নিদগ্ধ বা আগ্নেয় প্রস্তর ও বারুণ প্রস্তর। অগ্নিদগ্ধ প্রস্তর—আগুনে গলাইয়া লইলে পর প্রস্তরাকারে পরিণত হয়। এই জন্য ইহার নাম আগ্নেয় প্রস্তর।

অগ্নিদগ্ধব্রণ—অগ্নিতে পুড়িয়া যে ক্ষত জন্মে। [অগ্নিদগ্ধ, দ্র°]

সাধারণ ব্যবস্থা—জ্বালা নিবারণের জন্য দগ্ধস্থানে কদাচ কাঁজি, 'শীতল জল পড়া,' পুঁইশাকের রস ইত্যাদি প্রয়োগ করিবে না। তাহাতে আরও উৎকট উপসর্গ ঘটে। দগ্ধস্থান সর্ব্বতোভাবে আবৃত রাখাই জীবনরক্ষার প্রধান উপায়। প্রথমে দগ্ধস্থানের উপর একখানি লিণ্ট, ফেলানেল কিম্বা অন্য কোন কোমল বস্ত্র বিছাইয়া দিবে। ঐ বস্ত্র সাত আট দিন একাদিক্রমে তদবস্থায় রাখিবে, একবারও খুলিবে না। বস্ত্রের উপরে মধ্যে মধ্যে নিম্নলিখিত তৈল প্রয়োগ করিবে,—কার্ব্বলিক এসিড্ অর্দ্ধছটাক, বাদাম তৈল কিম্বা নারিকেল তৈল দেড়পোয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। অথবা—চুণের পরিষ্কার জল অর্দ্ধছটাক, বাদাম কিম্বা নারিকেলতৈল দেড়পোয়া, একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। ভিতরের বস্ত্র উক্ত তৈলদ্বারা আর্দ্র করিয়া উহার উপর কোমল তুলা বিছাইয়া দিবে।

অগ্নিদত্ত—এই নামধেয় জনৈক ব্রাহ্মণ গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য প্রতিবাসীর ইষ্টক অপহরণ করায় রাক্ষস-যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রতিবাসী এক বণিকের পুণ্যফলে শাপমুক্ত হন। (বরাহপু°)

অগ্নিদমনী, (অগ্নিদমনক)—ক্ষুপবিশেষ। (Premna integrifolia) চলিত গণিয়ারী। পর্য্যায়—ক্ষুদ্র কণ্টারিকা, বহ্নি-দমনী, বহুকণ্টকা, বল্লিকণ্টারিকা, গুচ্ছফলা, ক্ষুদ্রফলা, ক্ষুদ্রদুঃস্পর্শা, মর্ত্ত্যেন্দ্রমাতা, দমনী। এই বৃক্ষ কটু, উষ্ণ ও রূক্ষ। ইহা সেবনে বাত, কফ, গুল্ম এবং প্লীহা নষ্ট হয়। ক্ষুধাবৃদ্ধি ও আহারে রুচি হইতে থাকে। ক্ষুদ্র ফলগুচ্ছযুক্ত কাঁটা গাছ। [গণিয়ারী দ্র°]

অগ্নিদাতৃ—অন্ত্যেষ্টির সময় যিনি বিধানানুসারে মুখাগ্নি করেন। পুত্র, জ্ঞাতি ইত্যাদি। শাস্ত্রানুসারে যিনি প্রেতপিণ্ড দিবার অধিকারী, তিনিই অগ্নিদাতা। "যশ্চাগ্নিদাতা প্রেতস্য পিণ্ডং দদ্যাৎ স এব হি" (স্মৃতি)। মুখ্য অধিকারীর অভাবে বা অনুপস্থিতিতে জ্ঞাতি বা আত্মীয় অন্তরঙ্গ যে কেহ অগ্নিদাতা হইতে পারেন।

যিনি অগ্নিদাতা, তিনিই প্রেতপিণ্ড দান করিবেন, এইরূপ শাস্ত্র-নির্দেশ আছে বলিয়া কোন কোন বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজে এইরূপ নিয়ম দেখা যায় যে, মুখ্য অধিকারীর অনুপস্থিতিতে যিনি অগ্নিদাতা, তিনিও পিণ্ডদান করেন এবং যিনি অধিকারী, তাঁহাকে দিয়াও পিণ্ডদান করান হয়। অবশ্য এইরূপ নিয়ম সকলের মধ্যে নাই। ২ যে কোন অগ্নিদানকারী।

অগ্নিদায়ক—অগ্নিদ, শত্রুবিশেষ, যিনি শত্রুতা করিয়া গৃহদাহ করেন, তাদৃশ শত্রু ; আততায়ী শত্রু।

অগ্নিদিব্য—দিব্য বা শপথভেদ। বহু প্রাচীনকালে আরবদেশে যখন মুসলমানধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হয় নাই, তখন তদ্দেশবাসীর মধ্যে অগ্নিদিব্য প্রচলিত ছিল। আর্য্যদিগের মধ্যেও অগ্নিদিব্যের প্রথা ছিল (ঋক্ ১.১৫৮.৪ ও পঞ্চবিংশব্রা° ১৪.৬.৬)। বর্ত্তমানকালেও 'আগুন ছুঁয়ে দিব্য করিতেছি' বলিয়া অনেকে প্রতিশ্রুতি করিয়া থাকে। প্রাচীন ইরাণী বা পারসিকদিগের অবেস্তাগ্রন্থে ৩৩ প্রকার দিব্য 'দিলেসার' উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে অগ্নিদিব্য অন্যতম।

অগ্নিদিশ্—অগ্নির অধিষ্ঠিত দিক্ ; অগ্নিকোণ।

অগ্নিদীপন—১ অগ্নিবর্দ্ধক। ২ বরুণবৃক্ষ। ৩ ঔষধ বিশেষ।

অগ্নিদীপনী—অগ্নের্জঠরানলস্য দীপনী। অগ্নিদীপন, অগ্নিবৃদ্ধিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, যাহাতে উদরাগ্নি বর্দ্ধিত হয়। বৈদ্যকশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, মিথ্যা আহার ও বিহার দ্বারা দোষ সকল আমাশয় আশ্রয় করিয়া উদরাগ্নির মন্দতা জন্মায়। এই অবস্থায় যে ঔষধ সেবনে পুনরায় অগ্নির বলবৃদ্ধি হয়, তাহাকে অগ্নিদীপনী কহে। কোষ্ঠাগ্নির বৃদ্ধিকর ঔষধমাত্রেই অগ্নিদীপনী।

"হরিতকী তথা শুণ্ঠী ভক্ষ্যমাণা গুড়েণ বা।
সৈন্ধবেন যুতা বা স্যাৎ সাতত্যেনাগ্নিদীপনী ॥" (ভাবপ্র°)

হরীতকী ও শুণ্ঠী, গুড় বা সৈন্ধবের সহিত বা এই দুইয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়। সাধারণতঃ পাতিলেবুর জারক, কড়িভস্ম, যোয়ান প্রভৃতি বিশেষ অগ্নিবর্দ্ধক। বৈদ্যকশাস্ত্রে অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যরোগাধিকারে অগ্নিবর্দ্ধক ভেষজের বিবরণ লিখিত আছে।

অগ্নিদীপ্ত—অগ্নিনা দীপ্তঃ। অগ্নিদ্বারা প্রদীপ্ত। মনুতে লিখিত আছে যে, পরস্পর যুদ্ধকালে কূটাস্ত্র ও অগ্নিদীপ্তাস্ত্র দ্বারা প্রহার করা বিধেয় নহে। এইরূপে যুদ্ধ করিলে পাতক হয়। (মনু° ৭.৯০)

অগ্নিদীপ্তা—মহাজ্যোতিষ্মতীলতা। চলিত লতাফট্‌কী।

অগ্নিদুর্গা—আগমে বর্ণিত দুর্গার নয়টী প্রসিদ্ধ মূর্ত্তির অন্যতম। ইনিও অষ্টভুজা। ইনি ছয় হস্তে যথাক্রমে চক্র, খড়্গ, খেটক, বাণ, পাশ এবং অঙ্কুশ ধারণ করিয়া থাকেন। অপর দুই হস্তের একখানি বরদা ও অপরখানি তর্জ্জনীভাবে ধারণ করেন।

ইনি ত্রিনয়না ও বিদ্যুদ্বরণা। ইঁহার মুকুটে চন্দ্রলেখা সংবদ্ধ থাকে। ইনি সিংহারূঢ়া হইয়া ভীষণ মূর্ত্তিতে বিরাজ করেন। ইঁহার দুই পার্শ্বে তরবারি ও বর্ম্মধারিণী দুইটী দেবকন্যা দণ্ডায়মানা।

[T. A. Gopinath Rav—Elements of Hindu Iconography Vol. I, pt. ii, pp. 342, 393.]

অগ্নিদূত—অগ্নির্দূত ইব যত্র যস্ত বা। অগ্নিস্থাপনের পর আহুত-দৈবত যজ্ঞাদি। "যমং হ যজ্ঞো গচ্ছত্যগ্নিদূতো অরংকৃতঃ" (ঋক্ ১০.১৪.১৩)। ২ যজ্ঞাহূত অগ্নিদেব।

অগ্নিদেব—অগ্নির উপাসক, অগ্নিপূজক। ২ অগ্নিরূপ দেবতা।

অগ্নিদেবা—অগ্নিদৈবত কৃত্তিকানক্ষত্র। [কৃত্তিকা দ্র°]

অগ্নিদৈবত—অগ্নিদেবতাবিষয়ক (বৃহদারণ্যক ৩.৯.২৪)। [অগ্নি দ্র°]

অগ্নিদ্বার—অগ্নিকোণে বা পূর্ব্ব-দক্ষিণদিকে অবস্থিত দ্বার বা দরজা।

অগ্নিধ্—অগ্নি-ধা-ক্বিপ্। অগ্ন্যাধানকর্ত্তা। "অধ্বর্য্যং বা মধু-পাণিং সুহস্তমগ্নিধং" (ঋক্ ১০.৩৪.১৩)।

অগ্নিধমন—কটুনিম্ব, কটু নিম, চলিত ঘোড়ানিম।

অগ্নিধান—অগ্নির্ধীয়তে বিধিনা অস্মিন্ ধা-আধারে ল্যুট্। অগ্নিহোত্রগৃহ। "পদং কৃণুতে অগ্নিধানে" (ঋক্ ১০.১৬৫.৩)

অগ্নিধৌত—বেহারবাসী বাভনজাতির একটী থাক।

অগ্নিধ্র, অগ্নীধ্র, আগ্নিধ্র—স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র ও প্রিয়ব্রতের পুত্র। ইনি বিশ্বকর্ম্মার কন্যা বর্হিষ্মতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগবত, বিষ্ণু ও শিবপুরাণে সেই কন্যার নাম কন্যা। বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার শ্রীধরস্বামী কর্দ্দমের 'কন্যা' নাম্নী কন্যা বলিয়াছেন। হরিবংশ ও মার্কণ্ডেয়পুরাণমতে ইঁহার নাম কাম্যা। রাজা প্রিয়ব্রত সপ্তদ্বীপা পৃথিবী তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলে জম্বুদ্বীপ অগ্নিধ্রের অংশে পড়ে। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৩৪.১১) ইনি জম্বুদ্বীপের অধিপতি হইয়া মন্দরপর্ব্বতে গিয়া পুত্রকামনায় ব্রহ্মার প্রীত্যর্থে তপস্যায় মনোনিবেশ করেন। ব্রহ্মা প্রীত হইয়া পূর্ব্বচিত্তী নাম্নী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। অগ্নিধ্র গন্ধর্ব্ববিধানে এই অপ্সরাকে আপনার পত্নীত্বে বরণ করেন। অপ্সরার গর্ভে ইঁহার নাভি প্রভৃতি নয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ইনি স্বীয় রাজ্য জম্বুদ্বীপ নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক পুত্রকে এক একটী ভাগের নরপতি করিয়া দেন। পুত্রগণের নামানুসারে নয়টি ভাগের বা বর্ষের নামকরণ হয়। অতঃপর তিনি গণ্ডকীনদীর তীরবর্ত্তী শালগ্রাম তীর্থে গমন করিয়া যোগাবলম্বনে মায়িক দেহ ত্যাগ করেন। (ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ) ২ কশ্যপের পুত্র। ভৌত্য মনুর সময়ে সপ্তর্ষির অন্যতম ছিলেন। (হরিবংশ) ৩ কর্দ্দম প্রজাপতির দৌহিত্র। ঐ প্রজাপতির কন্যার গর্ভে ইঁহার জন্ম। (বিষ্ণুপু°) ৪ স্বায়ম্ভুব মনুর অষ্ট পুত্রের অন্যতম। (ব্রহ্মপুরাণ)

অগ্নিধ্রুক্—দ্বাদশমন্বন্তরে রুদ্রসাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষির অন্যতম ঋষি। (ভাগবত)

অগ্নিনক্ষত্র—কৃত্তিকা নক্ষত্র।

অগ্নিনগর—বাণাসুরের রাজধানী। ঐতিহাসিকযুগে প্রাচীন আসামের (কামরূপের) অন্তর্গত শোণিতপুরের রাজধানী ছিল।

অগ্নিনয়ন—যথাবিধি অগ্নিসংস্কাররূপ বিধিদ্বারা অগ্নিপ্রণয়ন। ২ রক্তনেত্র। ৩ অগ্নির নেত্র, অগ্নির চক্ষু।

অগ্নিনির্য্যাস—অগ্নিজার বৃক্ষ। [অগ্নিজার দ্র°]

অগ্নিনির্ব্বাপণ—আগুন নিবাইয়া দেওয়া, আগুন নিবান। [অগ্নিস্তম্ভ দ্র°]

অগ্নিনুন্ন—অগ্নির দ্বারা আক্রান্ত বা বজ্রাহত। "তেষাং বা অগ্নি-নুন্নানামিন্দ্র ইতি।" (সাম°উ° ৯.৮.২)

অগ্নিনেত্র—দেবতা। দেবতারা অগ্নির সাহায্যেই হুত হবি পাইয়া থাকেন; এইজন্য অগ্নিনেত্র শব্দে দেবতা মাত্রকেই বুঝায়। ২ অগ্নির চক্ষুঃ।

অগ্নিপক্ব—অগ্নি দ্বারা কৃতপাক। অগ্নিসিদ্ধ বস্তুমাত্র। "অগ্নি-পক্বমথামং বা" (ভট্টি ৭.১২.১৮)

অগ্নিপত্রী—অগ্নিবতী, চলিত আগিয়া গাছ।

অগ্নিপদ—অগ্ন্যাধানের স্থান। ২ অগ্নিবোধক শব্দ।

অগ্নিপরিক্রিয়া—অগ্নিপরিচর্য্যা। হোমাদি, অগ্নিসেবা। মনু বলিয়াছেন, বৈধ বিবাহই স্ত্রীলোকের উপনয়ন নামক বৈদিক সংস্কার, পতিসেবাই গুরুকুলে বাস এবং গৃহকর্ম্মই তাহাদের অগ্নিপরিক্রিয়া বা সায়ংপ্রাতঃকালের সমিধ্ হোম। "পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া।" (মনু ২.৬৭)

অগ্নিপরিচরণ—অগ্নিপ্রদক্ষিণ।

অগ্নিপরিচ্ছদ—অগ্নিপূজায় ব্যবহৃত স্রুক্স্রুবাদি দ্রব্য। "অগ্নি-হোত্রং সমাদায় গৃহ্যঞ্চাগ্নিপরিচ্ছদং।" (মনু ৬.৪)

অগ্নিপরিধান—অগ্নিকে ঘিরিয়া রাখিবার বস্ত্রবিশেষ।

অগ্নিপরিশুদ্ধি—অগ্নি দ্বারা শোধন। অগ্নিপরীক্ষা। বিচারক সমক্ষে এই পরীক্ষা গ্রহণ বিহিত। তাঁহার সমীপে অঙ্গুলি পরিমিত ১৬ অঙ্গুলি অন্তর ৭টী মণ্ডল করিতে হইবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি মুখ ও বাহু প্রসারণ করিলে তাহার করদ্বয়ে ৭টী অশ্বত্থপত্র দিতে হইবে। দুই হস্তের সহিত সেই সকল পত্র সূত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া দিতে হয়। তৎপরে তাহাতে পঞ্চাশৎ পল পরিমিত সমতল অগ্নিবর্ণ জলন্ত লৌহপিণ্ড স্থাপন করিবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা লইয়া সেই সকল মণ্ডলে নাতিশীঘ্র ও নাতিবিলম্বিতভাবে পদক্ষেপ

করিয়া গমন করিবে। তৎপশ্চাৎ ৭টী মণ্ডল পার হইয়া ঐ লৌহপিণ্ড ফেলিয়া দিবে। উক্ত ব্যক্তির যদি দুই হস্তের মধ্যে কোন স্থান দগ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাকে দোষী এবং দগ্ধ না হইলে তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া নিরূপণ করিবেন। (বিষ্ণুস° ১১ অ°)

অগ্নিপরীক্ষা,—(স্ত্রী) অগ্নিতে পরীক্ষা দ্বারা শুদ্ধাশুদ্ধিনির্ণয়। বিষ্ণুসংহিতায় তুলা, জল, বিষ প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষার বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, অসমর্থ ও লৌহকারের অগ্নিপরীক্ষা হইবে না। শরৎ ও গ্রীষ্মকালে অগ্নিপরীক্ষা নিষিদ্ধ। অগ্নিপরীক্ষাকালে বিচারক অগ্নিকে 'হে অগ্নি! যাহা মানবের অজ্ঞাত, তাহা তুমিই অবগত আছ। ব্যবহারস্থলে আরোপিত কলঙ্ক হইতে এই মানব শুদ্ধি প্রার্থনা করিতেছে, অতএব ইহাকে এই সংশয় হইতে পরিত্রাণ করা ধর্ম্মতঃ তোমার উচিত।'

"ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি সাক্ষিবৎ।
ত্বমেবাগ্নে বিজানীষে ন বিদুর্যানি মানবাঃ॥
ব্যবহারাভিশস্তোঽয়ং মানুষঃ শুদ্ধিমিচ্ছতি।
তদেনং সংশয়াদস্মাদ্ধর্ম্মতস্ত্রাতুমর্হসি॥"
(বিষ্ণুস° ১১.১১-১২)

এই বলিয়া অভিযুক্তকে অগ্নিপরীক্ষা করিবেন।

২ কঠোর পরীক্ষামাত্র। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এবং ইউরোপেও তস্করদের দোষাদোষ অগ্নিদ্বারা পরীক্ষিত হইত। রাজসভায় চোরকে ধরিয়া আনা হইলে সে ব্যক্তি যথার্থ অপরাধী কি না, রাজারা অগ্নিতে তাহার পরীক্ষা করিতেন। ইংরেজেরা এ দেশে আসিবার পূর্ব্বে হিন্দু নৃপতিগণ এইরূপ বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। সেদিন পর্য্যন্তও দাক্ষিণাত্যে এই রীতি প্রচলিত ছিল, সম্প্রতি বন্ধ হইয়াছে।

অগ্নিপরীক্ষা₂—অগ্নিতে স্ত্রীলোকের দোষাদোষের পরীক্ষা। স্ত্রীলোক সতী কি ব্যভিচারিণী, পূর্ব্বে সে পরীক্ষাও অগ্নিতে হইত। এখনও কোন কোন ইতর জাতির মধ্যে [বেদে ও বাজিকর দ্র°] এ প্রথা প্রচলিত আছে। সীতা জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ভিতর বসিয়া রামের কাছে নিজ পতি-পরায়ণতার পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এখন অগ্নির মধ্যে বসিয়া পরীক্ষা দেওয়ার দিন ফুরাইয়াছে। আজকাল কেবল ইতর জাতির মধ্যে অগ্নিপরীক্ষা আছে, কিন্তু সে অন্য প্রকার। স্ত্রীলোকের প্রতি সন্দেহ হইলে, বাটীর কর্ত্তা লাঙ্গলের লৌহফলক অগ্নির তাপে রক্তবর্ণ করিয়া জিহ্বাদ্বারা চাটিতে বলেন। সাধ্বী স্ত্রী হইলে তাহার মুখ পুড়িয়া যায় না। কিন্তু অসতী স্ত্রীলোক চাটিতে গেলেই তাহার মুখ পুড়িয়া যায়। গৃহস্বামী আর তাহাকে গ্রহণ করেন না, সুতরাং সেই অভাগিনী নারীকে যাবজ্জীবন কলঙ্কের পসরা মাথায় করিয়া কাল কাটাইতে হয়।

অগ্নিপরীক্ষা₃—অগ্নিতে স্বর্ণাদি ধাতুর পরীক্ষা। বিশুদ্ধ সোনা হাপরের আগুনে রাখিলে বিবর্ণ হয় না, কিন্তু ভেল সোনা বিবর্ণ হইয়া যায়। ইহাই স্বর্ণরৌপ্যাদির অগ্নিতে পরীক্ষা।

অগ্নিপর্ব্বত—(পুং) আগ্নেয়গিরি। সাধারণতঃ পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া ভূমধ্যস্থ অগ্নি, কর্দ্দম, ভস্ম ও উত্তপ্ত ধাতুস্রাব যাহা ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, তাহাকে আগ্নেয় পর্ব্বতের স্রাব বলে; কিন্তু বস্তুতঃ পর্ব্বতপৃষ্ঠে না হইয়া যদি সমতল ভূপঞ্জর ভেদ করিয়া ঐ সকল পদার্থ নির্গত হয়, তাহাকেও অগ্নিপর্ব্বত বলা যায়। রামায়ণে (৫.৩৫.৪৩) অগ্নিপর্ব্বত হইতে বহ্নিনির্গমের কথা আছে—

"ত্বদ্দর্শনপরো দেবি রাঘবঃ পরিতপ্যতে।
মহতা জ্বলতা দেবি বহ্নিনেবাগ্নিপর্ব্বতঃ॥"

ব্রহ্মযামলে লিখিত আছে—

"ভূমেরন্তর্গতৈর্দেবি! তেজোঽম্বুশ্বসনৈঃ কিল।
বিকুর্ব্বদ্ভিঃ প্রজায়ন্তে বহবো ধাতবঃ শিবে॥
তৈরেব চাল্যতে ভূমিরূর্দ্ধমুৎক্ষিপ্যতে ক্বচিৎ।
উৎপদ্যন্তে মহাসারা ভূধরাঃ ক্বাপি সুব্রতে॥"

অর্থাৎ হে দেবি! ভূগর্ভস্থ পার্থিব তেজ, জল ও বায়ু বিকৃত হইলে বিবিধ ধাতু উৎপন্ন হয়। তাহারাই পৃথিবীকে কখন পরিচালিত, কখন বা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করে এবং কোন কোন স্থান হইতে মহাসার পর্ব্বত সকল উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে। উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে অগ্নিপর্ব্বত সম্বন্ধে ভারতবাসীর অভিজ্ঞতা জানিতে পারি।

পর্ব্বতমাত্রই যে অগ্ন্যুদ্গিরণে অথবা ধাতবনিঃসরণে সমর্থ, এরূপ কোন প্রমাণ দেখা যায় না। সিসিলী দ্বীপের এট্না ও লিপারী দ্বীপের ষ্ট্রম্বলী পর্ব্বত গ্রীক্-দিগের অগ্নিদেবতা হিফিষ্টাসের (Hephaestus) প্রিয়ভূমি। রোমক পুরাণে হিফিষ্টাস্ Vulcan নামে পূজিত। Vulcan এর নামানুসারে অগ্নিপর্ব্বতের লাটিন নাম Vulcano। ভূপঞ্জর অথবা পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া যে গর্ত্তপথে ধাতবস্রাব নির্গত হয়, নিরন্তর অথবা সাময়িক উদ্গমনের ফলে ঐ গর্ত্ত ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় এবং গর্ত্তের চতুষ্পার্শ্বে ধাতবস্রাব জমিয়া কতকটা ফুদেলের আকার ধারণ করে। এই গর্ত্ত বা মুখকে ইংরেজীতে Crater বলে। পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ অগ্নির উদ্গমন-ক্রম (igneous activity) যে সকল দৃশ্য পর্য্যায়ে সম্ভাবিত হয়, তাহাকে Vulcanicity বলে এবং যাহাতে ঐ বিষয়ক ক্রম লিপিবদ্ধ আছে, তাহাকে Vulcanology বলা হয়।

পৃথিবীতে বর্ত্তমানকালে এট্‌না, ষ্ট্রম্বলী, বিসুবিয়াস্, ক্রাকোটোয়া প্রভৃতি যে সকল ক্রিয়াশীল অগ্নিপর্ব্বত আছে, তাহাদের চরিত্র আলোচনা করিলে জানা যায় যে, পর্ব্বতগুলি কখন সক্রিয়, কখন নিষ্ক্রিয়, কখন বিবর্দ্ধিতবেগ এবং কখন বা সংযতবেগ। যদি অগ্নিপর্ব্বত দীর্ঘকাল শান্ত থাকে, তবে উহার পুনরুদ্গিরণবেগ ভীষণতরই হয়। প্রায় দুই শতাব্দ নিশ্চল থাকিয়া ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ক্রাকোটোয়া পর্ব্বত ভীষণতর বেগে অগ্ন্যুদ্গিরণ করিয়াছিল। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে জাপান দ্বীপের বন্দেশান পর্ব্বতে ভীষণবেগে প্রভূত ধাতবস্রাব উদ্গত হয়।

অগ্নিপর্ব্বত হইতে অগ্ন্যুদ্গম হইবার প্রধানতম পূর্ব্বলক্ষণ ভূমিকম্প। এই ভূকম্পের পর ভূস্তরমধ্যে ঘন ঘন কম্প (tremor) অনুভূত হইতে থাকে। যে পর্ব্বতপৃষ্ঠ বা ভূস্তর ভেদ করিয়া অগ্নিজ স্রাব বিনির্গত হইবে, সেই স্থানেই কম্পন কিছুকাল কেন্দ্রীভূত থাকে। প্রথম ভূকম্পে ভূগর্ভজাত স্তরে অথবা কম্পনের আলোড়নে নিষ্পিষ্ট পর্ব্বতের ফাটলে পুনঃপুনঃ গলিত ধাতুর বেগ লাগিয়া ক্রমশঃ ঐ ফাটল বাড়িয়া এক স্থানে একটী গর্ত্ত করে,—যে পথে উহা সহজে ভূপৃষ্ঠে নির্গত হইতে পারে।

৭৯ খৃষ্টাব্দে বিসুবিয়াস্ পর্ব্বতের উদ্গিরণে প্রসিদ্ধ হার্কুলেনিয়ম ও পম্পিয়াই নগর ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া যায়।* কিন্তু ঐ সময়ের ষোলবর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাম্পানিয়ার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী দেশে ভূকম্প অনুভূত হইয়াছিল। ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে পোজুওলীর নিকটবর্ত্তী মন্টি নুওবো (Monte Nuovo) পর্ব্বতে অগ্ন্যুদ্গিরণের সূচনায় যুগব্যাপী ভূকম্প সংঘটিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে যখন যে দেশে অগ্ন্যুদ্গিরণের সূচনা হইয়াছে, তখন সেইখানেই সর্ব্বাগ্রে ভূকম্প দেখা দিয়াছে।

ভূকম্পনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অভ্যন্তরে বজ্রগম্ভীর গড়গড় শব্দ সমুত্থিত হয়। কখন বা অশ্বারোহী সেনাদলের আক্রমণকালীন অশ্বখুরোত্থিত শব্দের ন্যায় শুনা যায়। নিকটবর্ত্তী প্রস্রবণাদি ও কূপসমূহ জলশূন্য হইয়া যায়। কোথাও বা ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া উষ্ণ জল উঠিতে থাকে; কখন বা জলে কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড্ পাওয়া যায়।

দীর্ঘকাল ধরিয়া যে অগ্নিপর্ব্বত নিষ্ক্রিয় থাকে, তাহাকে নিদ্রিত বলা যায়; কিন্তু সে মরিয়া শক্তিহীন হইয়াছে এবং আর কখনও অগ্ন্যুদ্গিরণ করিবে না, এরূপ ধারণা ভুল। ফ্রান্সে এইরূপ নিদ্রিত কতকগুলি অগ্নিপর্ব্বত আছে। ইহাদের অগ্ন্যুদ্গমনের কথা কোন ইতিবৃত্তে উল্লিখিত নাই। যদি এরূপ নিদ্রিত কোন অগ্নিপর্ব্বত পুনরায় অগ্ন্যুদ্গিরণ করে, তখন উহার গহ্বর স্ফীত হইয়া উঠে এবং তাহার মধ্যগত ছিদ্রপথ দিয়া ধূম বহির্গত হইতে থাকে। অনেক সময় এই গহ্বর বিস্তৃত ও জলপূর্ণ থাকে। উহাকে ইংরেজীতে (Crater-lake) বলে। অগ্ন্যুদ্গিরণের পূর্ব্বে ঐ জল এমন উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে, জলে কিছু ফেলিলে সিদ্ধ হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে এতাদৃশ ধূম নির্গত হয় যে, আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

অগ্নিপর্ব্বতের উদ্গিরণের প্রারম্ভে ধূমনির্গম একটী প্রকৃষ্ট লক্ষণ। প্রায় প্রত্যেক পর্ব্বত হইতে বিগলিত ধাতবস্রাব নির্গত হইবার পূর্ব্বে ধূম বা উষ্ণ বাষ্প বহির্গত হইতে থাকে। কখন অল্প অল্প, কখন বা প্রভূত পরিমাণে প্রগাঢ় ধূম নির্গত হয়। ইহার পর ভস্ম ও ধাতবস্রাব নির্গত হইয়া ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া আসে। ইহার পরও মধ্যে মধ্যে ধূমোদ্গার হইতে দেখা যায়।

অগ্নিপর্ব্বত হইতে উদ্গিরিত ধূমরাশি সাধারণ ধূম নহে। উহা অধিক পরিমাণে বাষ্পমিশ্রিত। কখন ঐ বাষ্পে ক্লোরাইড্ বা গন্ধক থাকে। ধূমোদ্গারের সময় সাধারণতঃ ভস্ম উঠে, গহ্বর মধ্যে গলিত ধাতুর বুদ্‌বুদ্ বিস্ফোরণের শব্দ শ্রুত হয়। ঐ শব্দ ধারাবাহিক ও কামানগর্জ্জনবৎ। অধ্যাপক এস, ওয়াইজ (S. Wise) ইকোয়েডরের অন্তর্গত সান্‌গে পর্ব্বতের বুদ্‌বুদ্‌বিস্ফোরণ প্রতি ঘণ্টায় ২৬৭বার নির্ণয় করিয়াছেন।

ধূমোদ্গমকালে সাধারণতঃ বাষ্পমধ্যে ছাই থাকে; কিন্তু যখন ছাই থাকে না, তখন মনে হয়, সাদা মেঘ গোল হইয়া জড়াইয়া উঠিতেছে। এই উদ্গীর্ণ বাষ্প কখন বা সবেগে আকাশমার্গে উত্থিত হয়, এবং একটী স্তম্ভাকারে উঠিয়া মেঘরাশি ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে ধাবমান হয়। উত্থিত বাষ্পের পরে যখন গলিত ধাতবস্রাব বাহির হইতে আরম্ভ হয়, তখন কামানের গোলার অগ্রবর্ত্তী ধূমের ন্যায় এই ধূমেও নানাবর্ণের বিকাশ হইয়া থাকে। কখন ছাই ও বালি মিশাইয়া একরকম রং পায়, কখন বা গলিত ধাতুর রংয়ে হরিদ্রা বা ধূসরবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে। বায়ুর গতি প্রবল না থাকিলে ধূমোত্থিত বালি ও ভস্মরাশি নিম্নদেশ হইতে বেগে উত্থিত বাষ্পের আঘাতে পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত হইয়া একটী ঘূর্ণমান গোলক সৃষ্টি করে এবং উহার কেন্দ্রস্থান নত হইয়া ঘূর্ণীবায়ুসৃষ্ট গোলকের মত দেখায়। আবার উপরে উত্থিত ধূমশিখা কখন ছত্রাকারে, কখন বা ফুলের তোড়ার অথবা বেঙের ছাতার মত ছড়াইয়া মেঘমালায় পর্য্যবসিত হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বিসুবিয়াস্

* উক্ত নগরদ্বয় বর্ত্তমানকালে বাহির করা হইয়াছে। উহার শিল্পসৌন্দর্য্য ও গঠনপারিপাট্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। নগর দুইটী যে প্রাচীন কীর্ত্তিতে মণ্ডিত ছিল, তাহা সংগৃহীত নিদর্শন দৃষ্টে বুঝা যায়। [ইতালী, হার্কুলেনিয়ম দ্র°]

পর্ব্বতের অগ্ন্যুদ্‌গিরণের পূর্ব্বে বাষ্প ও বালুরাশি আকাশমার্গে ৬ হইতে ৮ মাইল উর্দ্ধে উঠিয়াছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে অগষ্ট্ ক্রাকোটোয়া পর্ব্বতের অগ্ন্যুদ্‌গিরণপ্রারম্ভে যে ধূমস্তম্ভ দেখা দিয়াছিল, তাহা দৈর্ঘ্যে ২০ মাইল। কাহারও কাহারও মতে ভীষণ বেগে উত্থিত এই ধূমস্তম্ভে যে সকল সূক্ষ্মতম বালুকণা ছিল, তাহা আরও উর্দ্ধে উঠিয়াছিল।

কারণবিশেষে উদ্গত উষ্ণ বাষ্প ও ভস্মাদি মিশ্রিত হইয়া উষ্ণ কর্দ্দমস্রোত সৃষ্টি করে। ইতালীবাসীরা ইহাকে Lava d'acqua এবং Lava di fango এবং দক্ষিণ-আমেরিকার লোকেরা ইহাকে Moya বলে। কখন কখন এই কর্দ্দমস্রোত ধাতবস্রোতের সহিত মিলিত হইয়া পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া আসে এবং নিকটস্থিত গ্রাম বা নগর ধ্বংস করিয়া ফেলে। এই ধাতব কর্দ্দমস্তরকে tuff বা tufa বলে। ৭৯ খৃষ্টাব্দে বিসুবিয়াস্ পর্ব্বতের অগ্ন্যুদ্গারে এই জাতীয় স্তরে (tufaceous crust) হার্কুলেনিয়ম নগরী প্লাবিত হইয়াছিল এবং এই জন্যই উক্ত নগরীর উৎখননক্রিয়া কঠিন হইয়াছে। পম্পিয়াই নগরী দূরে অবস্থিত থাকায় ঐ সময়ে কেবল সামান্য কর্দ্দমস্রোত ও ভস্মরাশিতে সমাচ্ছাদিত হইয়াছিল মাত্র। ঐ সকল রাশীকৃত ভস্ম ও কর্দ্দম সরাইয়া ফেলা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে।

কোন কোন অগ্নিপর্ব্বতের উদ্গীর্ণ বাষ্পরাশি বায়ুর চাপে সংহত হইয়া উষ্ণ জলধারা বর্ষণ করে। কোথাও বা ঐ উষ্ণজলে ভস্ম মিশ্রিত হইয়া কর্দ্দমধারা প্রবাহিত করে। আইস্‌লণ্ডদ্বীপে নদী ও হ্রদজলে বা গলিত তুষারে ঐ ভস্ম মিলিত হওয়ায় কর্দ্দমপ্রবাহ নির্গত হয়। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে মণ্টপেলী (Mont Pele in Martinique) পর্ব্বতের উদ্‌গিরণ আরম্ভ হয়। ৫ই মে তারিখে ভীষণ বিস্ফোরণের সহিত ভস্ম ও বাষ্প নির্গত হইয়া উত্তপ্ত কর্দ্দমস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। উহা পাহাড়ের গা বাহিয়া দ্রুতবেগে পর্ব্বতখণ্ড সঞ্চালিত করিয়া Reviere Blanche নামক স্থানে অবতরণ করিয়াছিল। যদি এইরূপ গলিত ধাতবস্রোত চলনপথে বাধা পায়, তাহা হইলে তদ্দেশ অনতিকাল মধ্যেই গলিত ধাতবস্রোতে প্লাবিত হইয়া যায়।

অনেক সময় আগ্নেয়পর্ব্বত হইতে খণ্ডপ্রস্তর উদ্গীর্ণ হয়। ডাঃ জনষ্টন-লাভিস্ (Dr. H. J. Johnston-Lavis) বিসুবিয়াস্ পর্ব্বতের এই প্রস্তরোদ্গারকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। অগ্নি পর্ব্বতের গহ্বরগাত্র ভাঙ্গিয়া যে সকল প্রস্তরখণ্ড উঠে, তাহা—'accessory ejecta'; ভিতর হইতে যাহা কিছু উঠে, তাহা—'accidental ejecta' এবং ধাতব স্রাব ও ভস্মাদির সহিত যাহা পাওয়া যায়, তাহা—'essential ejecta'। সোম্মা পর্ব্বত হইতে উদ্গীর্ণ কতক প্রস্তর—Cretaceous বা Apennine limestone। এট্না পর্ব্বত হইতে Sandstoneএর সঙ্গে দানাদার কোয়ার্টজ পাথর বাহির হইতে দেখা গিয়াছে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বিসুবিয়াস্ পর্ব্বত হইতে পোড়া কয়লা, ভস্ম ও বালি বহির্গত হইতে থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা বড় পোড়া কয়লাকে cinder বা scoriae, ছোটগুলিতে lapilli, যেগুলি গোল বা বৃত্তাভাসাকার, তাহা bombs বা volcanic tears এবং চূর্ণীকৃত লাভা (ধাতবস্রাব) volcanic sand নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এই ভস্মোদ্গারের চাপে ওট্টাজানো ও সান্ গুইসেপী নগর সমাচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল *। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে সুমবাবার অন্তর্গত তোম্বোরো পর্ব্বতে ভীষণ উদ্গার হয়। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্ট ইণ্ডীজ দ্বীপপুঞ্জে যে অগ্ন্যুদ্গমন ঘটে, তাহাতে Sulphur di-oxide ও অন্যান্য বাষ্প ও উজ্জ্বল বালুকণা উঠিয়াছিল। উক্ত বর্ষে ১৭ই মে, সুফ্রিয়েরি পর্ব্বতে যে উদ্‌গিরণ হয়, তাহা পর্ব্বতশিখর হইতে ২০০০ মাইল পূর্ব্বে নিপতিত হইয়াছিল।

অগ্নিপর্ব্বতের আভ্যন্তরিক আলোড়নে যে ধাতবস্রাব নির্গত হয়, তাহাকে লাভা (Lava) বলে। ছাই, বালু, ভস্ম ও ধূলি ছাড়া উহাতে অনেক খনিজ পদার্থ গলিত অবস্থায় থাকে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে এট্না পর্ব্বতের উদ্‌গিরণে যে 'লাভা' বাহির হইয়াছিল, তাহার উত্তাপ ১০৬০° সেন্টি°। বিসুবিয়াসের গলিত লাভায় ১০৯০° সেন্টি° তাপ ছিল; কিন্তু ঠাণ্ডা হইয়া সর পড়িলেও যতক্ষণ উহা কোমল ছিল ততক্ষণ উহাতে ১০৩০° সেন্টি° তাপ পাওয়া গিয়াছিল।† ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে বিসুবিয়াসের লাভা স্রাবে টোরে ডেল্ গ্রীকো

* ১৮১২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বারবাডস্ দ্বীপের সুফ্রিয়েরি (Soufriere in St. Vincent) পর্ব্বতে যে ভস্মোদ্গার হয়, উহা কেন্দ্রস্থান হইতে প্রায় ১০০ মাইল দূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ৪৭২ খৃষ্টাব্দে বিসুবিয়াসের ঐরূপ ভস্মোদ্গার ঘটে। উহা বায়ুসন্তাড়িত হইয়া কনস্তান্তিনোপল পর্য্যন্ত গিয়াছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ৩রা জুলাই কোটোপাক্সী পর্ব্বতের উদ্গারে যে ধূমস্তম্ভ বাহির হয়, তাহা গহ্বরমুখ হইতে ২০ হাজার ফুট উচ্চ এবং তাহাতে অনুমান ২০ লক্ষ টন বালু ছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ক্রাকোটোয়া পর্ব্বতে বালিরাশির সঙ্গে magnetite, pyroxenes, felspar, কাচ প্রভৃতি বাহির হয়। উহা উচ্চতায় ৩০ মাইল উঠিয়াছিল এবং প্রায় ১০০০ মাইল ব্যবধানে উত্থিত বালুকণা বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

† ১৬৩১ ও ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বিসুবিয়াস্ পর্ব্বতে যে লাভাস্রাব হয়, তাহা ১৯০৬

নামক জনপদ ধ্বংস হইয়া যায়। ঐ নগরে যে সকল পিত্তলনির্ম্মিত পাত্র ছিল, তাহা লাভার ১০০০° তাপে গলিয়া গিয়াছিল এবং জানালার কাচও দগ্ধ হইয়া বিকৃত হইয়াছিল।

১৭৭১ ও ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে বিসুবিয়াস্ পর্ব্বতের নির্গত লাভা-স্রোত ঘণ্টায় ৫০ মাইল বেগে ধাবিত হয়। হাউই দ্বীপের মৌনালোয়া পর্ব্বতের লাভানিঃসরণ-বেগ ঘণ্টায় ৪০ মাইল হিসাবে প্রধাবিত হইয়াছিল।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ক্রাকোটোয়া, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্রম্বলী, ১৯০২ খৃষ্টাব্দে মণ্টপেলী, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে এট্না ও ১৯০৬ সালে বিসুবিয়াস্ ও পরে হাউইয়ের অন্তর্গত কিলাউয়ি পর্ব্বতের* লাভায় সিলিকা, এলুমিনা, বোরিক্ অক্সাইড্, মাঙ্গানাস্ অক্সাইড্, মাগ্নেসিয়া, লাইম্, সোডা, পটাশ, টিটানিয়ম্ ডাই অক্সাইড্, ফস্ফরাস পেণ্টক্সাইড্ প্রভৃতি খনিজ পদার্থ পাওয়া গিয়াছিল। লিপারী দ্বীপের ভলকানো পর্ব্বতের উদ্গারে Rhyolitic এবং ধাতবস্রাবে Basaltic সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্রম্বলীর সেণ্ট ভিন্সেণ্ট ও মার্টিনিক পর্ব্বত হইতে যে স্রাব নির্গত হয়, তাহা প্রশান্তমহাসাগর-কূলজাত প্রস্তরের সিক্থ (Magma) মাত্র।†

ভূপৃষ্ঠে যেমন অগ্নিপর্ব্বত আছে, সমুদ্রগর্ভেও ঐরূপ অগ্নিপর্ব্বতের অবস্থান নির্ণীত হয়। এই সকল অগ্নিপর্ব্বত সমুদ্রতলে থাকিয়া যখন জাগিয়া উঠে, তখন সেই স্থানের সমুদ্রতল ভীষণ ভাবে আলোড়িত হয় ও অগ্নিস্পর্শে চারিদিকের জল ফুটিতে থাকে। গহ্বরমুখ হইতে উৎসারিত ভস্মের সঙ্গে মৃত মৎস্যরাজি ভাসিতে দেখা যায়। জলে ফোয়ারার ন্যায় জলস্তম্ভ দেখা দেয়। ভারতমহাসাগরের খৃষ্টিয়ান দ্বীপের নিকট ১৪,০০০ ফুট জলগর্ভে অগ্নিপর্ব্বত আছে। প্রশান্তমহাসাগরের স্থানে স্থানে জলগর্ভে অগ্নিপর্ব্বতের অস্তিত্ব দেখা যায়। আমাদের পুরাণাদিতে এই সকল পর্ব্বত বড়বাগ্নি নামে কথিত। [বড়বাগ্নি দ্র°]

খৃষ্টাব্দেরই অনুরূপ। ১৮৬৬, ১৮৬৭, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সান্তোরিন পর্ব্বত হইতে augite-andesite মিশ্রিত প্রস্তরপিণ্ড বাহির হইয়াছিল।

* মৌনালোয়া হইতে কিলাউয়ি ২০ মাইল।

† উপরে বর্ণিত খনিজ পদার্থ ভিন্ন লাভার সঙ্গে আরও অনেক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য নির্গত হয়। তাহাদের নাম নির্দ্দেশ অসম্ভব। ভলকানো পর্ব্বতে গর্ত্তমুখে পর্য্যাপ্ত বোরিক্ এসিড (H_3BO_3) পাওয়া যায়। ঐ বোরিক্ এসিড বাণিজ্যপণ্যরূপে বিক্রীত হয়। পোজুওলীর নিকটস্থ সোল্ফাতারা পর্ব্বতে গন্ধকের ভাগই অধিক। ইহার গন্ধকমিশ্রিত বাষ্প স্থানীয় পর্ব্বতে লাগিয়া alum, kaolin, gypsum, alunogen ও mendozite (Soda-alum) সৃষ্টি করিয়াছে।

ভূতত্ত্ব আলোচনা করিলে জানা যায়, ভূমধ্যসাগরের জলগর্ভসমুদ্ভূত অগ্নিরাশি হইতে এট্না ও বিসুবিয়াসের উৎপত্তি হইয়াছে। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে সিসিলী ও আফ্রিকার মধ্যবর্ত্তী ভূমধ্যসাগরগর্ভে অগ্ন্যুদ্গিরণ (submarine eruption) হয়। উহার ভস্মরাশি ক্রমশঃ জমিয়া ৮০০ ফুট উচ্চ হয়। ইংরেজেরা উহাকে Graham's Island, ফরাসীরা Ilejulie এবং ইতালীয়গণ Isola Ferdinandea বলিয়া থাকেন।

আইস্লণ্ড, মোদেনা, তামান, ক্রিমিয়া, কাস্পীয়সাগরের বকুদ্বীপ, যবদ্বীপ, ত্রিনিদাদ, টার্বাকো (কলম্বিয়া), সিসিলী, প্রভৃতি স্থানে কেবল মাত্র কর্দ্দমোদ্গারী অগ্নিপর্ব্বতের সংস্থান দেখা যায়। ইহা হইতে চিক্কণমাটী, পাথর, ন্যাপ্থা ও পেট্রোলিয়াম উঠে। ঐ সঙ্গে হাইড্রো-কার্ব্বন (Hydrocarbon,) কার্ব্বন ডই-অক্সাইড্ (Carbon di-oxide) ও যবক্ষার (Nitrogen) গ্যাস পাওয়া যায়। ইহারা কতকটা উষ্ণপ্রস্রবণের (Geyser) তুল্য। [উষ্ণপ্রস্রবণ দ্র°]

পৃথিবীর যে সকল দেশে ভূকম্প (Seismic activity) প্রবল, সেই সকল স্থানে অগ্নিপর্ব্বতের সংস্থান অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ভূগর্ভনিহিত গলিত ধাতুর বহির্গমন প্রচেষ্টা ভূস্তরকে সংঘাত করিয়া তদ্দেশস্থ স্তরকে বিদারণ করিতে চেষ্টা পায়। উহাতে অন্তর্নিহিত পর্ব্বতস্তর বিদীর্ণ বা দ্বিখণ্ডিত, কখন বা স্তর অধোগত হইয়া উদ্গত উষ্ণজল, বালু বা লাভা বহিরভিমুখী করিয়া দেয়। প্রশান্তমহাসাগর-কূলে অবস্থিত ভূস্তর এইরূপ বিদীর্ণ হইয়া অনেক অগ্নিপর্ব্বত সৃষ্টি করিয়াছে। [ভূকম্প দ্র°]

অগ্নিপুচ্ছ—(পুং) আহিতাগ্নিস্থানের পশ্চাদ্ভাগ।

অগ্নিপুরাণ—(পুং) অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত অষ্টম পুরাণ। অগ্নি বশিষ্ঠের নিকট ঈশানকল্প বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছিলেন, সেই বিবরণ লইয়া অগ্নিপুরাণ। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১০,৪০০। ইহার মধ্যে বিষ্ণু অবতার; জগৎ সৃষ্টি; বিষ্ণুপূজা; অগ্নিপূজা; মুদ্রাদির বিবরণ; দীক্ষা অভিষেক; মণ্ডপলক্ষণ; কুশমার্জ্জন; পবিত্রারোপণ; দেবালয় প্রতিষ্ঠা; শালগ্রামপূজা; নানা প্রকার মূর্ত্তির লক্ষণ; বিনায়ক পূজা; দীক্ষার বিধি; দেবপ্রতিষ্ঠা; ব্রহ্মাণ্ড নিরূপণ; গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থের বৃত্তান্ত; ষট্‌কর্ম্ম; মন্ত্র, যন্ত্র ও ওষধির বিবরণ; কুব্জিকার পূজা; ষোঢ়ান্যাস; হোম; মন্বন্তর; ব্রহ্মচর্য্য; শ্রাদ্ধ; গ্রহযজ্ঞ; বৈদিক ও স্মার্ত্তকর্ম্ম; প্রায়শ্চিত্ত; তিথিব্রত; বার, নক্ষত্র ও মাসিকব্রত; দীপদান; নবব্যূহার্চ্চন; নরকের বিবরণ; দানধর্ম্ম; নাড়ীচক্র; সন্ধ্যাপদ্ধতি; গায়ত্রীর অর্থ; লিঙ্গস্তোত্র; রাজ্যাভিষেকমন্ত্র; রাজধর্ম্ম; স্বপ্ন; শকুন;

যুদ্ধদীক্ষা; নীতিশাস্ত্র; রত্ননিরূপণ; ধনুর্ব্বিদ্যা; ব্যবহার-বিধি; দেবাসুরের যুদ্ধ; আয়ুর্ব্বেদ; হস্তিচিকিৎসা ও শান্তি; গোচিকিৎসা; নানাবিধ পূজা ও শান্তি; ছন্দ ও সাহিত্যবিদ্যা; একার্ণাদি বিচার; স্বর্গবর্গ; প্রলয়; যোগ-শাস্ত্র ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয় এই পুরাণে গ্রথিত হইয়াছে। অগ্নিপুরাণের শ্লোকসংখ্যা গণনা করিলে দশ হাজারের অধিক হয় না। কিন্তু পুস্তকবিশেষে লিখিত আছে যে, ইহার শ্লোকসংখ্যা সাড়ে চৌদ্দ হাজার। [পুরাণ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্র°]

অগ্নিপূত—(ত্রি) অগ্নিনা পূতঃ; ৩-তৎ। অগ্নিদ্বারা পবিত্র। "সোঽগ্নিপূতোভাতি"। (কৈবল্যোপনি°)

অগ্নিপ্রণয়ন—(ক্লী) যথাবিধি অগ্নির সংস্কার। গৃহ্যসূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে—আহবনীয়ে অবস্থিত অগ্নিকে দক্ষিণ হইতে উত্তর বেদীতে লইয়া যাওয়াই অগ্নিপ্রণয়ন। "দক্ষিণত আহবনীয়েঽবস্থিতস্যাগ্নেঃ সৌমিকায়ামুত্তরবেদ্যাং নয়নং যদস্তি তদেতদগ্নিপ্রণয়নং।" (গৃহ্যসূত্র)

অগ্নিপ্রতিষ্ঠা—(স্ত্রী) অগ্নিস্থাপন। ২ বৈবাহিক অগ্নিস্থাপন।

অগ্নিপ্রবেশ—(পুং) অগ্নির প্রবেশ। ২ অগ্নিমধ্যে প্রবেশ; আগুনের মধ্যে যাওয়া। ৩ সহমরণ, মৃতপতির সহিত একত্র চিতানলে প্রবেশ। [সহমরণ দ্র°]

অগ্নিপ্রস্কন্দন—(ক্লী) অগ্নেঃ প্রস্কন্দনম্; ৬ তৎ। শ্রৌত স্মার্ত্ত হোমকার্য্য পরিত্যাগ; অগ্নিসাধ্য কর্ম্মত্যাগ। "শ্রৌতস্মার্ত্তাদ্যগ্নি-সাধ্যকর্ম্মত্যাগঃ।" (নীলকণ্ঠ) [মহাভা° ১.৮৪.২৬ শ্লোক দ্র°]

অগ্নিপ্রস্তর—(পুং) অগ্ন্যুৎপাদক প্রস্তরখণ্ড: চকমকি পাথর। টিউটনিক, স্কান্দিনেভিয় ও ওলন্দাজ ভাষায় ইহা Flint, এবং গ্রীক্ ভাষায় Plinthos নামে অভিহিত। ইহা কোয়ার্টজ্ জাতীয় স্ফটিক (Crystalline Quartz) প্রস্তর; বর্ণ কৃষ্ণধূসর, কাচধর্ম্মী ও তদ্বৎ মসৃণ। ভাঙ্গিলে চূর্ণ হয়, কোণাকার দানাগুলি (Angular grains) খালি চোখে দেখা যায় না।

ইহার কঠিন পৃষ্ঠে ছুরিদ্বারা দাগ কাটিলে ধূসরবর্ণের রেখা পড়ে মাত্র, কিন্তু কঠিন ইস্পাতখণ্ড দিয়া আঘাত করিলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হয়। দিয়াশলাই আবিষ্কারের পূর্ব্বে এই চকমকি পাথর সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বস্থানে অগ্নি প্রজ্বালনের একমাত্র উপায় ছিল। জাহাজে, নৌকায়, এমন কি প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে অগ্নি জ্বালিবার জন্য চকমকি, ইস্পাত ও সোলা রাখা হইত। চকমকি পাথরে ইস্পাত দিয়া আঘাত করিলে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হয়, তাহা শুষ্ক সোলার মুখে পড়িবামাত্র সোলা অগ্নিসংশ্লিষ্ট হয় এবং ফুৎকারযোগে উহাকে বিশেষরূপে উদ্দীপ্ত করিয়া দীপশলাকা ধরাইয়া আগুন জ্বালা হইয়া থাকে। এইরূপ অগ্নি বিশুদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত। দ্বিন্যুব্জককাচের (Double convex lens) মধ্য দিয়া সূর্য্যরশ্মি পরিচালিত করিলে অগ্ন্যাধান হয়; উহাও বিশুদ্ধাগ্নি বলিয়া পরিগণিত।

ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৬, প্রকৃত কোয়ার্টজ্ হইতে কিছু কম। ইহার মূল উপাদান সিলিকা। [কাচ শব্দে সিলিকার বিস্তৃত বিবরণ দ্র°] ভূপঞ্জরের খটিকাস্তরে অগ্নিপ্রস্তর শিরা-প্রশিরার আকারে জমাট বাঁধিয়া থাকে। সেই জন্য কখন কখন ক্যালসাইট্ বা ডলোমাইট্ সংযোগ দৃষ্ট হয়। কখন কখন খড়ি পাথরের স্তরে সামুদ্রিক জীবদেহাবশেষ-সংস্থান মধ্যে প্রভূত পরিমাণে চক্‌মকি পাথর পাওয়া যায়। [খড়ি দ্র°]

খাঁটি চক্‌মকি ভিন্ন অপেক্ষাকৃত স্বল্প শক্তিসম্পন্ন আরও কএক প্রকার পাথর পাওয়া যায়, যে গুলি পূর্ব্বকালে চক্‌-মকির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত। এই সকল পাথর বিভিন্ন যুগে মানবের বিশেষ উপকারে লাগিয়াছিল। চের্‌ট (Chert) নামক চক্‌মকির পাথর চূণা পাথরের স্তরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মনুষ্যেরা চক্‌মকি পাথর কাটিয়া যেমন নিজেদের ব্যবহারোপযোগী যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছিল, সেইরূপ বর্ত্তমান সভ্য জগদ্বাসীরা অগ্নিপ্রস্তরের টুক্‌রা করিয়া আপনাদের পথঘাট প্রস্তুতকার্য্যে ও গৃহাদির গঠনকার্য্যে ফেরো-কংক্রিট রূপে (Ferro-concrete) লোহার উপর জমাইয়া বিশেষভাবে ব্যবহার করিতেছে।

প্রাথমিক প্রস্তরযুগে (Palæolithic) ও পরবর্ত্তী প্রস্তর-যুগে (Neolithic) মানবেরা চক্‌মকি দিয়া ব্যবহারোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল। উহার বহুতর নিদর্শন মিসর, আসিরীয়া, ভারত, ইংলণ্ড, সুইডেন, নরওয়ে ও ডেন-মার্ক প্রভৃতি দেশে মৃত্তিকাগর্ভে পাওয়া গিয়াছে। আদিম জাতিরা ইহাদ্বারা কুঠার, তীর ও বর্ষার অগ্রভাগ, ছুরি প্রভৃতি প্রস্তুত করিত।

পূর্ব্বকালে অস্ত্রাদি ব্যতীত চক্‌মকিতে ইস্পাতের আঘাত দিয়া সর্ব্বত্রই আলো জ্বালিবার ব্যবস্থা ছিল এবং পরবর্ত্তি-কালে আগ্নেয়াস্ত্র প্রচলনের পরও বন্দুকে অগ্নিসংযোগের জন্য চক্‌মকি ব্যবহৃত হইত। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের সাফোক্‌সায়ারের অন্তর্গত ব্রাণ্ডন নগরে বন্দুকে ব্যবহারোপযোগী চক্‌মকি প্রস্তুত করার কারবার চলিয়াছিল। পূর্ব্বে কাচ-নির্ম্মাণে চক্‌মকি-চূর্ণ ব্যবহৃত হইত এবং এখনও দামী চীনা-মাটীর বাসন প্রস্তুত করিতে চক্‌মকি-চূর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বঙ্গদেশে চক্‌মকির ভূরি প্রচলন ছিল। তখন বিলাতী দিয়াশলাই প্রস্তত হয় নাই; প্রস্তত হইলেও অনেক দিন এদেশে আসে নাই। আগুন করিতে হইলে বাঙ্গালীরা চক্‌মকি ঠুকিতেন। একটী কাঠের বাক্সে, সরাতে, মাল্‌সাতে কিংবা বাঁশের চোঙ্গা অথবা খুঙ্গীতে একখানি ঘোড়া-খুরে পাথর, একমুখ দগ্ধ তিন চারি খানি সোলা, একখানি পাইন দেওয়া ইস্পাত এবং অঙ্গার বা নারিকেলের অথবা খড়ের নুটী থাকিত। বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী এবং মধ্যমার মধ্যে প্রস্তর, তাহার নিম্নে সোলাখানি ধরিতে হয়। সোলার দগ্ধমুখ ঠিক প্রস্তরের কাছে থাকে। তাহার পর দক্ষিণ হস্তে ইস্পাত লইয়া প্রস্তরে আঘাত করিলে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ উঠিয়া সোলাতে পতিত হয়। স্ফুলিঙ্গ পড়িলেই তাড়াতাড়ি ফুৎকার দিতে দিতে তাহাতে অঙ্গার কিংবা নুটী দেওয়া চাই। প্রস্তরাভাবে ইষ্টকের ঝামাতেও আগুন উঠে। ইহাতে কাঠসোলা অপেক্ষা ফুলসোলারই অধিক আদর। বর্ষাকালে শীতল বাতাস পাইলে সোলা নরম হইয়া উঠে। তখন আগুন তুলিবার সময় হাই দিয়া সোলাকে ঈষদুষ্ণ করা চাই। কোন কোন স্থলে সোলার অভাবে লোকে বাঁশের চোঙ্গার ভিতর তুলা পূরিয়া তাহাতে আগুন তুলে। চক্‌মকির ইস্পাত কিঞ্চিৎ বক্র, অল্প প্রশস্ত ও পাতলা। তাহার এক পার্শ্বে পাইন দেওয়া। পাইন না দিলে শীঘ্র আগুন উঠে না। [চক্‌মকি দ্র°]

হোমিওপ্যাথী ডাক্তারেরা বিশুদ্ধ চক্‌মকির পাথর (Silica, Flint) ঔষধার্থ প্রয়োগ করেন। পুরাতন অস্থি-রোগে (Rickets ; caries and exfoliation of bone ; Tabes Dorsalis); শ্লৈষ্মিক গ্রন্থির পীড়ায়; যক্ষ্মা, স্ফোটক এবং অন্যান্য পূযসঞ্চিত রোগে; পচা দন্তপীড়া ও আঙ্গুলহাড়ায় ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। হোমিওপ্যাথী ডাক্তারেরা কহেন যে, আঙ্গুলহাড়ার এমন চমৎকার ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। স্ফোটকাদি পাকাইতে হইলে সিলিকা সেবনে শীঘ্র পরিপক্ক হয়, আবার যে স্থলে অধিক পূয বৃদ্ধি হইতেছে, সে স্থলে ইহাতে অচিরাৎ পূয কমিয়া আসে। তদ্ভিন্ন পূযজনিত জীর্ণজ্বরে, কর্ণমূল ফুলিয়া রস জমিলে এবং উপদংশ ও গণ্ডমালা রোগে এই প্রস্তর মহৌষধ মধ্যে গণ্য।

অগ্নিফলা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] মহাজ্যোতিষ্মতী লতা, চলিত—বড় লতাফট্‌কী।

অগ্নিবাহু—(ক্লী) ধূম।

অগ্নিব্রহ্মা—(পুং) মহারাজ প্রিয়দর্শী অশোকের জামাতা। রাজপুত্রী থেরী সংঘমিত্তা (সংঘমিত্রা) ইঁহার পত্নী। অশোকের রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে অশোকের সহোদর তিষ্য বা বিগতা-শোকের সহিত একসঙ্গে ইনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

অগ্নিব্রাহ্মণ—(পুং) মৃতদেহ সংকারের সময় যে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরূপে কার্য্য করেন, তাঁহাকে এই নামে অভিহিত করা হয়।

অগ্নিভ—(ক্লী) অগ্নি-ভা-ক, অগ্নিরিব ভাতি। অগ্নিবর্ণ বস্তু। ২ স্বর্ণ। ভং নক্ষত্রং অগ্নের্ভং ; ৬-তৎ। ৩ কৃত্তিকানক্ষত্র।

অগ্নিভা—[বৈদ্যক] মহাজ্যোতিষ্মতী লতা; চলিত—বড় লতাফট্‌কী।

অগ্নিভাস—(পুং) রৈবত মন্বন্তরের একজন দেবতা। (বায়ুপু°)

অগ্নিভুক্—অপর নাম উপনন্দ। যাঁহারা নিকুঞ্জে গো-পালনে রত এবং বংশী ও ময়ূরপুচ্ছধারী, তাঁহারা এই নামে অভিহিত হন। (গার্গসংহিতা)

অগ্নিভূ,—(পুং) অগ্নি-ভূ-ক্বিপ্, অগ্নেরনলাৎ ভবতীতি। অগ্নি-পুত্র, কার্ত্তিকেয়। মহাদেব স্বীয় বীর্য্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে অগ্নি তাহার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া উহা গঙ্গায় ফেলিয়া দেন। গঙ্গা হইতে ছয়জন কৃত্তিকা ঐ বীর্য্য গ্রহণ করেন। এই ছয় জনেরই ছয়টী পুত্র হয়, এবং উঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়া একীভূত হইয়া কার্ত্তিকেয় নাম ধারণ করেন। ইঁহার ছয়টী মস্তক, দ্বাদশটী হস্ত এবং দ্বাদশটী চক্ষু। কার্ত্তিকেয়ের এই উৎপত্তিবিবরণ হইতে অগ্নিভূ, গঙ্গাপুত্র, কার্ত্তিকেয়, ষণ্মুখ, ষণ্মাতুর, ষড়ানন প্রভৃতি নাম হইয়াছে। (অগ্নিপু°)

রামায়ণের বালকাণ্ড-মতে, গঙ্গার গর্ভে অগ্নির ঔরসে কার্ত্তিকেয় জন্ম লইয়াছেন। মহাভারতের বনপর্ব্বে ইঁহার জন্মবৃত্তান্ত অন্য প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। [ষড়ানন, কার্ত্তিকেয়, কৃত্তিকা দ্র°]

অগ্নিভূ₂—(ত্রি) অগ্নি হইতে উৎপন্ন, অগ্নিসম্ভব। (ক্লী) ২ স্বর্ণ, সুবর্ণ। ৩ জল। (রাজনি°)

অগ্নিভূকাশ্যপ—(পুং) বংশব্রাহ্মণে লিখিত আছে, ইনি ইন্দ্র-ভূকাশ্যপের শিষ্য।

অগ্নিভূতি,—(পুং) জৈনধর্ম্মপ্রচারক মহাবীরের একজন শিষ্য। ইনি মগধের গৌতমবংশীয় ব্রাহ্মণ বসুভূতির পুত্র। মহাবীর মগধে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে জৈনধর্ম্মে আস্থাবান্ করিতে চেষ্টা করিলে অগ্নিভূতি তাহা প্রথমে অস্বীকার করেন; কিন্তু পরে পরাজিত হইয়া মহাবীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া জৈনধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

অগ্নিভূতি,—(স্ত্রী) অগ্নির বিভূতি, অগ্নির বীর্য্য। ২ (ক্লী) অগ্নিসম্ভব, অগ্নিজাত।

অগ্নিভ্রাজস্—(ত্রি) অগ্নিতুল্য দীপ্তিযুক্ত। (পুং) বিদ্যুৎ। "অগ্নিভ্রাজসো বিদ্যুতো গভস্ত্যোঃ" (ঋক্ ৫.৫৪.১১)।

অগ্নিমঠর, অগ্নিমাঠর—(পুং) ঋগ্বেদোক্ত ঋষি। ইনি মহর্ষি বাষ্কলির নিকট বেদাধ্যয়ন করেন। (বিষ্ণুপু°)

মহর্ষি বাষ্কলি-সঙ্কলিত চারিখানি বেদসংহিতা আছে, তন্মধ্যে দ্বিতীয় শাখাখানি ইনি গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ডপু°)

অগ্নিমণি—(পুং) অগ্নেরুৎপাদকো মণিঃ প্রস্তরঃ; শাক-তৎ। সূর্য্যকান্তমণি, আতসী, চকমকি পাথর।

অগ্নিমৎ—(পুং) যথাবিধি আহিতাগ্নিক বা সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। "দারাস্বগ্নিং বিনিঃক্ষিপ্য প্রবসেদগ্নিমান্ দ্বিজঃ।" (স্মৃতি)

অগ্নিমথ্—(পুং) অগ্নিং মথ্নাতি; অগ্নি-মন্থ্-কিপ্ ন লোপঃ। যাজ্ঞিক, সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। যাঁহারা অরণিদ্বয় ঘর্ষণদ্বারা অগ্ন্যুৎপাদন করিয়া যজ্ঞ করেন। ২ অগ্নিমন্থনসাধন মন্ত্র। ৩ অরণিকাষ্ঠ।

পূর্ব্বকালে সাগ্নিক ব্রাহ্মণেরা কোথাও যাইতে হইলে সঙ্গে অরণিকাষ্ঠ লইয়া যাইতেন। অগ্নির প্রয়োজন হইলে সেই দুইখানি কাষ্ঠ একত্র বলপূর্ব্বক ঘর্ষণ করিতেন, তাহাতে অগ্ন্যুৎপাদন হইত। তাঁহারা অরণি ফেলিয়া কুত্রাপি যাইতেন না।

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে, তৎকালে অগ্ন্যুৎপাদনের অন্য কোন সহজ উপায় ছিল না। এখনও বনের অসভ্য জাতিরা কাষ্ঠঘর্ষণ দ্বারা অগ্ন্যুৎপাদন করে। প্রথমে তাহারা দুইখণ্ড কঠিন কাষ্ঠ একত্র ঘর্ষণ করিতে থাকে। তাহাতে তাপ জন্মিলে তন্মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র ছিন্নবস্ত্র দিয়া পুনরায় ঘর্ষণ করে। কিঞ্চিৎ পরেই সেই ছিন্ন বস্ত্রখানি জ্বলিয়া উঠে।

বৎসর বৎসর দাবানলে বন দগ্ধ হয়, তাহার উৎপত্তিও এইরূপে। বৃক্ষের শুষ্ক শাখা অন্য শাখার উপর পড়িয়া গ্রীষ্মকালের ঝড়ে নড়িতে থাকে। সেই ঘর্ষণে আগুন জন্মে। একবার আগুন উঠিলে প্রথমে বৃক্ষের শাখা, তাহার পর বৃক্ষ, ক্রমে সমস্ত বন হু হু শব্দে পুড়িতে থাকে। শুনিতে পাওয়া যায়, পর্ব্বতে গণিয়ারী প্রভৃতি কতকগুলি বৃক্ষে শীঘ্রই অগ্নির উৎপত্তি হয়। ঋষিরা শমীবৃক্ষের সঙ্গে জাত অশ্বত্থ কাষ্ঠের অরণি প্রস্তুত করিতেন। ছাঁচুনী দ্বারা আমরা যে প্রকারে দধি মন্থন করি, ঋষিরা সেই প্রণালীতে অরণিমন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন করিতেন।

পূর্ব্বকালাপেক্ষা এখন অগ্নিমন্থন অর্থাৎ অগ্ন্যুৎপাদন করিবার অনেক সহজ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। চক্‌মকির কথা সকলেই জ্ঞাত আছেন। বেত্রঘর্ষণ করিয়াও সহজে অগ্ন্যুৎপাদন করা যায়। চীন ও সিঙ্গাপুর অঞ্চলের বেত (যাহাতে কেদারা ও মোড়া প্রস্তুত হয়) দুই ভাগে চিরিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে সেই বেতের চেরাদিক্ একত্র ঘর্ষণ করিলে শীঘ্র অগ্নি উৎপন্ন হয়। বিলাতী দিয়াশলাইতে সর্ব্বাপেক্ষা সহজে ও দ্রুত অগ্নি উঠে। [ইহার উপাদান ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী দিয়াশলাই শব্দে দ্র°]

অগ্নিমথা—(স্ত্রী) সমুদ্রমন্থনে উৎপন্না জ্যেষ্ঠাদেবীর যে মূর্ত্তি আছে, তাহার বামভাগে একটী নারীমূর্ত্তি দেখা যায়। অংশুমদ্ভেদাগমে ইঁহার নাম অগ্নিমথা বলা হইয়াছে। ইনি কৃষ্ণবর্ণা, নবযৌবন-সম্পন্না, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা, করণ্ডমুকুটধারিণী ও রক্তবস্ত্র-পরিহিতা। ইঁহার বামপদ প্রলম্বিত, দক্ষিণহস্তে নীলোৎপল।

[T. Gopinath Rao—Elements of Hindu Iconography, Vol. I, p. 394.]

অগ্নিমন্থ,—(পুং) অগ্নিমন্থনসাধন মন্ত্র। ২ অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠ।

অগ্নিমন্থ২—[বৈদ্যক] গণিয়ারীবৃক্ষ। গণিয়ারী বৃক্ষের কাষ্ঠদ্বয় ঘর্ষণে শীঘ্র অগ্নি উৎপন্ন হয়। [গণিয়ারী দ্র°]

অগ্নিমন্থন,—(ক্লী) যজুর্ব্বেদোক্ত বিধিবিশেষ। অগ্নিসমারোপের পর যজমানকে যজ্ঞভূমির উত্তরস্থ বেদীতে অগ্নিমন্থন করিয়া অগ্নিস্থাপন করিতে হয় (যজুঃ, সৌম°, ৬ প্র°)। ২ অগ্নিমন্থন-সাধন মন্ত্র। ৩ অগ্নির মন্থন। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, সোমরাজ আগত হইলে অগ্নিমন্থন করিতে হয়। তাহা এইরূপ, যেমন কোন পূজ্যব্যক্তি উপস্থিত হইলে বৃষ অথবা বেহৎ অর্থাৎ গর্ভশালিনী গাভী হত্যা করা হয়, সেইরূপ অগ্নির যে মন্থন হয়, তাহাতেই সোমের উদ্দেশে অগ্নির হত্যা করা হয়; কারণ অগ্নিই দেবগণের পশু। বৃষ যজ্ঞীয় দ্রব্যাদি বহন করে, অগ্নিও দেবগণের নিকটে হব্য বহিয়া লইয়া যায়। এজন্য অগ্নিতে পশুর সাদৃশ্য। "সোমে রাজন্যাগতে তস্মৈবাদো মনুষ্যরাজ আগতে হন্যস্মিন্ বার্হত্যুক্ষাণং বা বেহতং বা ক্ষদন্ত এব মেবাস্মা এতৎ ক্ষদস্তে যদগ্নিং মন্থন্ত্যগ্নির্হি দেবানাং পশুঃ" (ঐত° ব্রা° ১.১৫)

অগ্নিমন্থন২—(ক্লী) [বৈদ্যক] গণিয়ারী বৃক্ষ। [গণিয়ারী দ্র°]

অগ্নিমন্দির—অগ্নির সম্মান ও সম্পূজনার্থ অগ্নিপূজকদিগের স্থাপিত মন্দির বা দেবগৃহ। এই গৃহমধ্যে চিরন্তনী পবিত্রাগ্নি সংরক্ষিত এবং পূজিত হইয়া থাকে। স্কীদীয়া ও ইরাণে প্রাচীন জরথুস্ত্রীয়গণের নির্ম্মিত কএকটী অগ্নিমন্দির ছিল। হূণদিগের উপদ্রবে তাহা বিধ্বস্ত ও পরে পুনঃসংস্কৃত হইয়াছিল। রোমের

Vesta দেবীর মন্দির এবং গ্রীসের আথেন্স নগরাস্থ মিনার্ভা দেবীর মন্দির-সংলগ্ন Pryteneum নামক বাটিকা অগ্নি-স্থাপনার্থ উৎসৃষ্ট। এখন এখানে একটী বাতি জ্বালাইয়া রাখা হয়। [অগ্নি,১-২ দ্র°]

অগ্নিমান—অগ্নির তাপ মাপিবার যন্ত্র-বিশেষ। ইংরেজীতে ইহাকে Fire-meter বলে। মেসনব্রোক এই যন্ত্রের উদ্ভাবয়িতা। ইহাতে একটী ধাতুশলাকা অগ্নির উত্তাপে তপ্ত করিতে হয়। উত্তাপ বৃদ্ধির সহিত ঐ ধাতুযষ্টিও আয়তনে বর্দ্ধিত হয়। উক্ত শলাকার অপর মুখে একটী শঙ্কুকীলক সংযোজিত থাকে। উহার পৃষ্ঠে ডিগ্রী ও অংশমান দেওয়া একটী চক্র সন্নিবেশিত হয়। ধাতুশলাকার পরিবর্দ্ধনানুসারে শঙ্কুকীলক সরিতে থাকিলে নির্দিষ্ট রেখা হইতে তাপমান নির্দ্ধারিত হয়। রূপা, সোণা, প্লাটিনাম্ অথবা মিশ্রধাতু হইলে তাপের তারতম্য হয়। এইজন্য ধাতু হিসাবে ব্যবধান নির্দ্দেশ করিয়া তাপমান নির্ণয় করা আবশ্যক। [তাপমান দ্র°]

অগ্নিমান্দ্য—(ক্লী) [বৈদ্যক] অজীর্ণরোগ (Dyspepsia); ক্ষুধামান্দ্য। পরিপাকশক্তির হ্রাস। অগ্নিমান্দ্য রোগ সহজ নয়, ইহাতে অনেক প্রকার উপসর্গ ঘটে। প্রথমে আহারে অরুচি, কোষ্ঠবদ্ধতা, কোথাও পুনঃপুনঃ অল্প অল্প মল নির্গত হয়, উদরাধ্মান, শরীর দুর্ব্বল, মধ্যে মধ্যে উদ্গার উঠে, 'গা বমি বমি' করে, কাহারও অম্ল ও পিত্তমিশ্রিত বমন হয়, অন্তঃকরণে স্ফূর্ত্তি থাকে না, চিত্ত মলিন ও বিরস, বক্ষঃস্থলে জ্বালা, আহারের পর উদরে ভারবোধ। এই সকল লক্ষণের পর ক্রমে নিদ্রাভাব, দুঃস্বপ্ন, কাল্পনিক দুশ্চিন্তা, হৃৎস্পন্দ প্রভৃতি উপসর্গ আসিয়া পড়ে। এই প্রকারে শরীর ক্লিষ্ট ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে যথার্থ যে সকল উপসর্গ ঘটে নাই, রোগী মনে মনে তেমন রোগেরও সৃষ্টি করিয়া লয়। অন্য কোন ব্যক্তির ব্যাধির গল্প শুনিলে অজীর্ণরোগী মনে মনে বিশ্বাস করে যে, তাহারও সেই ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে।

কারণতত্ত্ব—প্রত্যহ গুরুপাক দ্রব্য ভোজন; শারীরিক পরিশ্রমের অভাব; অতিশয় মানসিক চিন্তা; তামাক, আফিম, গাঁজা, মদ্য প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন; দুশ্চিন্তা ও মনস্তাপ; এইগুলি অগ্নিমান্দ্য রোগের প্রধান কারণ। তদ্ভিন্ন যকৃৎরোগ, জ্বর, হৃদ্রোগ প্রভৃতি অন্য কোন পীড়া থাকিলেও অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা—প্রথমে পীড়ার মূল কারণ দূরীভূত করা আবশ্যক। যাঁহারা সর্ব্বদা একস্থানে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকেন, কিছুমাত্র দৈহিক পরিশ্রম করেন না, তাঁহাদের কিঞ্চিৎ ব্যায়াম করা উচিত। ভদ্রলোকের পক্ষে, প্রত্যহ মুগুর ভাঁজা, প্রাতঃকালে ও বৈকালে নির্ম্মল বায়ুতে ভ্রমণ,—এই দুই নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে সুফল পাওয়া যায়। যাঁহারা অমিতভোজী, সে সকল ব্যক্তি আহারের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। প্রতিদিন যথাকালে সৎপথ্য খাইবেন, ক্ষুধাবোধ না হইলে আহার করিবেন না। মনস্তাপের জন্য অগ্নিমান্দ্য ঘটিলে, চিত্ত প্রফুল্ল রাখিতে যত্নবান্ হইবেন।

হোমিওপ্যাথী—উদরে ভারবোধ ও বেদনা, উদ্গার, বুক-জ্বালা, বা উদরাধ্মান থাকিলে নক্সভমিকা প্রত্যহ তিনবার সেবন করিবে। অর্শরোগের কোন পূর্ব্বলক্ষণ জানিতে পারিলে, প্রাতে নক্সভমিকা ও সন্ধ্যাতে সাল্‌ফার সেবন করা কর্ত্তব্য।

পুনঃপুনঃ বিরেচন হইলে কিংবা গুরুতর ভোজনের পর অজীর্ণ ঘটিলে, পাল্‌সেটিলা সেবনে উপকার দর্শে।

কোষ্ঠবদ্ধতা, মস্তকে বেদনা, খিট্‌খিটে স্বভাব হইলে ব্রাই-ওনিয়া মহৌষধ।

আহারে অরুচি ও খাদ্যদ্রব্য মুখে বিস্বাদ লাগিলে পুরাতন অগ্নিমান্দ্য রোগে এন্টি-মনিয়ম্ ক্রুডম্, সাল্‌ফার, হিপার সাল্‌ফিউরিস্ ব্যবস্থা করিবে। তদ্ভিন্ন শরীর দুর্ব্বল হইলে চায়না, ফস্‌ফরিক্ অম্ল, ফস্‌ফরাস্ ও ফেরম্ সেবন করা উচিত। অজীর্ণের জন্য হিক্কা উঠিলে নক্সভমিকা, জেলসিমিনম্ বা আর্সেনিক খাইবে।

এলোপ্যাথী—অগ্নিমান্দ্যরোগে পেপ্‌সিন্ মহৌষধ। ভোজ-নের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ৩ রতি পেপ্‌সিন্ পোর্সাই সেবন করিবে। ভোজনের পর সিকি গ্রেণ ইপিকাক চূর্ণ, কুই-নাইন্ ১ গ্রেণ এবং জেন্‌সিয়ানের সার ২ গ্রেণ একত্র একটী বটী করিয়া সেবন করিলেও বিশেষ উপকার দর্শে। উদরাময় থাকিলে ট্রিস্ নাইট্রেট্ অব্ বিসমথ্ ৫ গ্রেণ, শুঁঠচূর্ণ ২ গ্রেণ, পেপ্‌সিন্ ২ গ্রেণ একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী পুরিয়া করিবে। এই ঔষধ প্রত্যেহ দুইবার সেবন করিলে উদরা-ময়ের শান্তি হইতে পারে।

ভোজনের পূর্ব্বে গরম জল দিয়া ৫ হইতে ১০ গ্রেন সোডি বাই-কার্ব্বনেট জলসহ খাইবে। টিংচার নক্সভমিকা ঐরূপে খাইলেও চলে। আহারান্তে এসিড হাইড্রোক্লোরিক্ ডিল্ (১০ ফোঁটা) জলসহ সেব্য।

বৈদ্যক—অগ্নিমুখচূর্ণ, অগ্নিকুমাররস, অগ্নিমুখরস, অগ্নি-মুখলবণ, অগ্নিমুখলৌহ, অজীর্ণবলকালানল, শঙ্খবটী প্রভৃতি ঔষধ প্রযোজ্য। [ঐ সকল ঔষধের উপকরণ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী তত্তৎ শব্দে দ্র°]

হকিমী—ইউনানী মতে, জোয়ারীশ্ ই-সঙ্গদানে মুর্গ

অগ্নিমান্দ্যরোগের মহৌষধ। ইহা মুর্গীর পেপ্‌সিন্ অর্থাৎ মুর্গীর পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে প্রস্তুত। এই ঔষধ প্রতিদিন প্রাতঃকালে এক তোলা মাত্রায় সেবন করিতে হয়। হকিমেরা অগ্নিমান্দ্যে আরক সতারও ব্যবস্থা করেন। সচরাচর নিম্নলিখিত ঔষধও ব্যবহৃত হইয়া থাকে—শুঁঠ অর্দ্ধ পোয়া, গোলমরিচ ৩ তোলা, পিপুল ১ তোলা, ছোট এলাচ ১ তোলা, নিশাদল অর্দ্ধ তোলা, দুগ্ধমর্দ্দিত আমলাসা গন্ধক অর্দ্ধ তোলা; চারি প্রকার লবণ, যথা—সৈন্ধব, খাড়ী, বিট্ এবং করকচ সর্ব্বসমেত অর্দ্ধ পোয়া। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পিষিয়া কাগজী বা পাতি নেবুর রসে ভিজাইয়া ছোট কুলের আটির মত বড়ি প্রস্তুত করিবে। রৌদ্রে শুষ্ক হইলে ইহার এক একটী মুখে রাখিয়া চুষিতে হয়। ইহার অম্লাস্বাদ জন্য এটী অগ্নিমান্দ্য রোগীর বেশ রুচিকর হইয়া থাকে।

অগ্নিমান্দ্যরোগী সর্ব্বদা এই কয়েকটী হইতে বিরত থাকিবে। দিবানিদ্রা; আহারের পর পরিশ্রম, পরিশ্রমের পরই আহার; রাত্রি জাগরণ; মাদক দ্রব্য সেবন। মন্দ দ্রব্য ভোজন এককালে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

শ্বেতসারঘটিত খাদ্য—আলু, মূলা, কলা প্রভৃতি বেশী খাইবে না। যাহাদের যকৃৎবিকৃতির জন্য অগ্নিমান্দ্য দেখা দিয়াছে, তাহাদের যকৃতেরই চিকিৎসা কর্ত্তব্য। অন্যান্য রোগের সহিত যে অগ্নিমান্দ্য দেখা যায়, তাহার স্বতন্ত্র চিকিৎসা করিতে হয় না, মূল রোগের চিকিৎসা দ্বারাই উপশম হয়। ভোজনকালে জল পান না করিয়া পরে করিবে।

অগ্নিমারুতি—(পুং) অগ্নিশ্চ মরুচ্চ তয়োরপত্যং পুমান্। (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪.১.৯৬। ইঞ্ প্রত্যয়ঃ। বাহু প্রভৃতি শব্দের উত্তর অপত্যার্থে ইঞ্ প্রত্যয় হয়। যথা—বাহোরপত্যং বাহু-ইঞ্। বাহবিঃ [বাহ্বাদি দ্র°]। *। দেবতা দ্বন্দ্বে চ। পা ৬.৩.২৬। *। ইদ্‌বৃদ্ধৌ। পা ৬.৩.২৮। দেবতাবাচি দ্বন্দ্বে পূর্ব্বপদে আনঙ্ (আ) আদেশ হয়, কিন্তু অগ্নিশব্দের উত্তর ইকার হইয়া থাকে। এই সূত্রানুসারে 'আগ্নীমারুতি' এই প্রকার রূপ সিদ্ধি হইবে। এস্থলে 'অগ্নিমারুতি' এটী বেদের গৃহীত রূপ, পৃষোদরাদির নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদ হ্রস্ব এবং ইকারের লোপ হইয়াছে।) অগস্ত্যের নামান্তর। বিন্ধ্যপর্ব্বত নিজ কলেবর বৃদ্ধি করিয়া অগ্নি ও মরুতের গতিরোধ করিতে উদ্যত হইলে মহামুনি অগস্ত্যকর্ত্তৃক তাহা নিবারিত হয়, এই নিমিত্ত তাঁহার অপর নাম অগ্নিমারুতি। [অগস্ত্য দ্র°]

অগ্নিমিত্র,—শুঙ্গবংশীয় দ্বিতীয় নৃপতি। চন্দ্রগুপ্ত-প্রতিষ্ঠিত মৌর্য্যবংশের শেষ নৃপতি বৃহদ্রথকে বিনাশ করিয়া তদীয় সেনাপতি পুষ্যমিত্র বা পুষ্পমিত্র মগধের অধীশ্বর হন। এই পুষ্পমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্র বিদিশার 'কুমার' বা শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। পুষ্যমিত্রের প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম শুঙ্গবংশ। বিদিশা-শাসনকালে প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব ১৭০ অব্দে অগ্নিমিত্রের সহিত বিদর্ভরাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। কালিদাসের "মালবিকাগ্নিমিত্রে" এই বিদর্ভরাজের নাম যজ্ঞসেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই সময় বিদর্ভদেশ অন্ধ্র সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্ভবতঃ এই যজ্ঞসেন কোন অন্ধ্র নৃপতি বা তাঁহাদিগের অধীন কোন সামন্ত নৃপতি হইবেন।

পুষ্যমিত্রের মৃত্যুর পর অগ্নিমিত্র আট বৎসর মগধের সম্রাট্-রূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পুষ্যমিত্র একটী অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং স্বীয় পৌত্র—অগ্নিমিত্রের পুত্র বসুমিত্রকে অশ্বের রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সিন্ধুনদতীরে গ্রীকগণ সেই যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিলে বসুমিত্র তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া সেই অশ্ব উদ্ধার করেন। উত্তর-পঞ্চাল অঞ্চলে অগ্নিমিত্র ও তাঁহার বংশধরগণের অনেক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ অহিচ্ছত্র প্রদেশ এক সময়ে শুঙ্গবংশীয় নৃপতিগণের অধীন ছিল। অগ্নিমিত্রের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সুজ্যেষ্ঠ মগধের রাজা হন। (ভাগবত ১২.১)

মহাকবি কালিদাস অগ্নিমিত্রের সহিত বিদর্ভ-রাজকন্যা মালবিকার প্রণয়-উপলক্ষ করিয়া একটী মনোরম নাটক রচনা করিয়াছিলেন। এই নাটকের উপাখ্যানভাগ এইরূপ—

চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের প্রতিষ্ঠিত মৌর্য্যবংশ অনন্ত কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাঁহাদের রাজ্য শুঙ্গবংশের অধিকারে। মৌর্য্যবংশের সেনাপতি পুষ্পমিত্র শেষ রাজা বৃহদ্রথকে এ জগৎ হইতে চিরদিনের জন্য অপসারিত করিয়া স্বীয় পুত্র অগ্নিমিত্রের মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন। নিজে কিন্তু সৈন্যচালনাতেই আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

বিদর্ভরাজের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মাধবসেনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র যজ্ঞসেন রাজ্য অধিকার করেন। মাধবসেন ভগিনী মালবিকাকে অগ্নিমিত্রের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য বিদিশায় আসিতেছিলেন। কিন্তু রাজ্যসীমান্তে বন্দী হইয়া তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। অনন্তর অমাত্য সুমতি ও তাঁহার ভগিনী কৌশিকী যখন মালবিকাকে লইয়া আসিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সুমতি নিহত হন। অগ্নিমিত্রের অন্যতম সেনাপতি বীরসেন দস্যুহস্ত হইতে মালবিকাকে উদ্ধার করিয়া বিদিশামহিষী ধারিণীর নিকট পাঠাইয়া দেন। কৌশিকীও পরিব্রাজিকা বেশ গ্রহণ করিয়া

বিদিশায় উপস্থিত হইলেন। মালবিকা রাজমহিষীর পরিচারিকা-রূপে শুদ্ধান্তঃপুরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অগ্নিমিত্র একটী আলেখ্যে মহিষীর সহিত মালবিকার প্রতি-মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। মহিষী তাহা বুঝিতে পারিয়া মালবিকা যাহাতে রাজার নয়নগোচর না হইতে পারেন, তজ্জন্য সচেষ্ট রহিলেন। কিন্তু রাজার বিদূষক গৌতম কৌশল করিয়া দুই নাট্যাচার্য্যের বিবাদ সূচনাপূর্ব্বক তাঁহাদিগের একজনের শিষ্যা মালবিকাকে নৃত্যকলাবিদ্যার পরীক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে নৃপতির লোচনবর্ত্তিনী করেন। ফলে রাজা মালবিকাতে অধিকতর আসক্ত হন। এই সময় রাজোদ্যানস্থিত পট্টমহিষীর প্রিয় অশোকতরুর পুষ্পোদ্গমের বিলম্ব ঘটিতেছিল। মহিষীর পায়ে ব্যথা হওয়ায় তিনি পাদপ্রহারে অশোকের দোহদদানে অশক্ত হইয়া মালবিকাকে আদেশ করেন যে, যদি পাঁচ রাত্রির মধ্যে অশোকের পুষ্পো-দ্গম হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে তিনি পুরস্কৃতা করিবেন। মালবিকা যে সময়ে অশোকবৃক্ষে পাদপ্রহার করিতেছিলেন, সেই সময় রাজা তথায় পুনরায় উপস্থিত হন। তখন সখীর সহিত আলাপপ্রসঙ্গে মালবিকা রাজার প্রতি নিজের অনুরাগ ব্যক্ত করিতেছিলেন। রাজা অন্তরাল হইতে শুনিতে পাইয়া মালবিকার সম্মুখে উপনীত হন এবং প্রণয় নিবেদন করেন। এই সময় রাণী ইরাবতী সেই স্থানে উপস্থিত হন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া রাজার প্রণয়নিবেদন মহিষী ধারিণীর নিকট জ্ঞাপন করেন। মহিষীর আদেশে মালবিকা ও তাঁহার সখী বন্দী হইলেন। পরে বিদূষক কৌশলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া একস্থানে লুকাইয়া রাখেন এবং রাজার সহিত পুনরায় মিলন ঘটাইয়া দেন। এই সময় পাঁচ রাত্রির মধ্যেই অশোকবৃক্ষ মুকুলিত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে রাজা অগ্নিমিত্র যজ্ঞসেনকে মাধবসেনের মুক্তির জন্য অনুরোধ করিলে যজ্ঞসেন বলিয়া পাঠাইলেন, অগ্নিমিত্র যদি যজ্ঞসেনের শ্যালক মৌর্য্য অমাত্যকে মুক্ত করেন, তাহা হইলে তিনি মাধবসেনকে মুক্ত করিতে পারেন। ইহাতে অগ্নিমিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে যজ্ঞসেন অগ্নিমিত্রের সেনাপতি বীরসেনকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। মাধবসেনও মুক্তিলাভ করিলেন। বিদর্ভ হইতে প্রেরিত শিল্পিগণের নিকট রাজা ও মহিষী মালবিকার প্রকৃত পরিচয় পাইলেন। এই সময় সেনাপতি পুষ্পমিত্র অশ্বমেধযজ্ঞে পুত্র অগ্নিমিত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন এবং জানাইলেন যে কুমার বসুমিত্র যবন-দিগকে পরাজিত করিয়া যজ্ঞীয় অশ্ব উদ্ধার করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। মহিষী এই সংবাদে সন্তুষ্ট হন এবং নিজের প্রতিশ্রুতি স্মরণপূর্ব্বক মালবিকাকে রাজকন্যা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে রাজার হস্তে সমর্পণ করেন।

অগ্নিমিত্রের আদেশে বিদর্ভদেশ দুইভাগে বিভক্ত হইল। বরদা নদীর উত্তরে যজ্ঞসেন ও দক্ষিণ বিভাগে মাধবসেন দুই পৃথক্ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

অগ্নিমিত্র₂—(পুং) মহর্ষি বাস্কলের শিষ্য। ইনি গুরুর নিকট ঋগ্বেদসংহিতার কিয়দংশ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। (ভাগবত)

অগ্নিমুখ,—(পুং) অগ্নির্মুখমিব যস্য। দেবতা। দেবতারা অগ্নিরূপ মুখদ্বারা হব্য পান করেন। ২ ব্রাহ্মণ। ৩ নিম্নতল নামক পাতালবাসী জনৈক যবন। (কূর্ম্মপুং) ৪ মহাদেবের অন্যতম অনুচর। ইনি এক কোটী অনুচরসহ শিবের বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। (স্কন্দপুং, মহেশ্বরখণ্ড)

অগ্নিমুখ₂—[বৈদ্যক] ক্ষুধাবৃদ্ধির জন্য ঔষধবিশেষ। হিঙ্গু ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, জোয়ান ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, চিতা ৭ ভাগ, কুড় ৮ভাগ। এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া দধির সহিত সেবন করিলে অজীর্ণ ও বায়ুপিত্ত নষ্ট হয়। (পুং) ২ ভেলা, ভল্লাতক। ৩ চিতা।

অগ্নিমুখচূর্ণ—[বৈদ্যক] এক প্রকার ঔষধ। ইহার উপকরণ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী এই—সোরা, সাচিক্ষার, চিতামূল, পাঠামূল, করঞ্জমূল, পঞ্চলবণ, ছোট এলাচ, তেজপত্র, বামুনহাটী, বিড়ঙ্গ, হিঙ্গু, কুড়, শঠী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ী, মুতা, বচ, ইন্দ্রযব, আমলা, জীরা, আমরুল, গজপিপ্পলী, কৃষ্ণজীরা, অম্লবেতস, তিন্তিড়ী, যবানী, দেবদারু, হরীতকী, আতইচ, অনন্তমূল, হবুষা, সোঁদালফলের শাঁস, তিলনালের ক্ষার, পলাশক্ষার ও গোমূত্রসিক্ত মণ্ডূর। এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। তাহার পর তিন দিবস ট্যাবানেবুর রসে, তিন দিবস কাঁজিতে, তিন দিবস আদার রসে ভাবনা দিয়া শুকাইবে। মাত্রা ২ তোলা। ঘৃত ও অন্নের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ইহাতে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় ও অজীর্ণ রোগ দূর হয়।

অগ্নিমুখতাম্র—[বৈদ্যক] অম্লপিত্তরোগাধিকারোক্ত রসৌষধ বিশেষ। রসরত্নাকরে এই ঔষধের প্রস্তুতপ্রণালী লিখিত আছে; কিন্তু সাধারণতঃ এই ঔষধের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না।

অগ্নিমুখমণ্ডূর—[বৈদ্যক] শোথরোগের এক ঔষধ। শোধিত মণ্ডূর ৯৬ তোলা, ইহার আটগুণ গোমূত্রের সহিত পাক করিবে। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, দেবদারু, মুতা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ৮ তোলা প্রক্ষেপ

দিয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ তোলা। ঘৃত এবং মধুর সঙ্গে মাড়িয়া তক্রের সহিত সেবন করিবে। ইহা শোথ-রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অগ্নিমুখরস—[বৈদ্যক] অগ্নিমান্দ্যরোগের এক ঔষধ। মরিচ, মুতা, বচ, কুড়—প্রত্যেক একতোলা ও বিষ একতোলা। আদার রসে মাড়িয়া মুগপ্রমাণ এক একটী বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যরোগে সেব্য।

অগ্নিমুখলবণ—[বৈদ্যক] অগ্নিমান্দ্যরোগের এক প্রকার ঔষধ। চিতামূল, ত্রিফলা, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, কুড়। প্রত্যেক সমান অংশ। সর্ব্বসমষ্টির সমান সৈন্ধব লবণ। একত্র সিজের আটায় ভাবনা দিয়া সিজের ডালের ভিতর পূরিবে। তাহার উপর পঙ্কের লেপ দিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া চূর্ণ করিবে। চূর্ণের মাত্রা ৫ রতি। ইহাতে অগ্নিবৃদ্ধি ও যকৃৎ, প্লীহা, গুল্ম, অর্শ, পার্শ্বশূল প্রভৃতি নষ্ট হয়।

অগ্নিমুখলৌহ—[বৈদ্যক] এক প্রকার ঔষধ। প্রথমে ১৯২ তোলা ঘৃত উষ্ণ করিয়া লইবে। তাহার পর, বিচূটীর মূলের রসে শোধিত লৌহভস্ম ৯৬ তোলা সেই ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে তেউড়ী, চিতা, নিসিন্দা, সিজ, মুণ্ডুরী, ভুই-আমলা—প্রত্যেক ৪৮ তোলা। জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথ এবং ১৯২ তোলা চিনি ঐ ঘৃতে দিবে। ঘনীভূত হইলে বিড়ঙ্গ ও ত্রিকটুচূর্ণ প্রত্যেক ২৪ তোলা, ত্রিফলাচূর্ণ ৪০ তোলা এবং শিলাজতু ৮ তোলা দিবে। শীতল হইলে ১৯২ তোলা মধু মিশাইতে হইবে। মাত্রা ৪ মাষা। ইহা অগ্নিমান্দ্য, শোথ, প্লীহা ও অর্শের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অগ্নিমুখী$_1$—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] ভল্লাতকবৃক্ষ; ভেলাগাছ। [ভল্লাতক দ্র°] ২ লাঙ্গলিকা বৃক্ষ।

অগ্নিমুখী$_2$—(স্ত্রী) গায়ত্রী। গোভিল বলিয়াছেন, গায়ত্রী অগ্নিমুখী; সুতরাং জলে থাকিয়া উহা জপ করিতে নাই, জল হইতে উঠিয়া জপ করিতে হয়।

"গায়ত্র্যগ্নিমুখী যস্মাৎ তস্মাদুত্থায় তাং জপেৎ।" (গোভিল) ২ পাকশালা। ৩ অগ্নিপ্রমুখ দেবতা।

অগ্নিমেদল—দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত বিনুকোণ্ডা তালুকে অবস্থিত একটী প্রাচীন স্থান। এই স্থানে কতকগুলি উষ্ণপ্রস্রবণ ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। এখানে মলরাজবংশীয়-দিগের একটী প্রাচীন দুর্গ ভগ্নাবস্থায় বর্ত্তমান আছে। প্রাচীন-তায় ও স্থাপত্য নিদর্শনের দিক্ হইতে দুর্গটী প্রসিদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য।

অগ্নিযন্ত্র$_1$—কামান, বন্দুক প্রভৃতি; যে যন্ত্রে অগ্নিবর্ষণ হয়। [অগ্ন্যস্ত্র দ্র°]

অগ্নিযন্ত্র$_2$—অগ্নিনির্ব্বাপক যন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্র প্রধানতঃ দুই প্রকার:—(১) যানবাহিত বারিবর্ষক বৃহৎ যন্ত্র; (২) অদাহ্য গ্যাসসৃষ্টিকারী ক্ষুদ্র যন্ত্র। আজকাল পৃথিবীর প্রায় সকল বড় শহরেই এই দুই প্রকারের যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

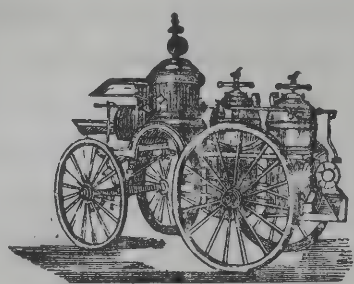
প্রথম প্রকারের যন্ত্রের চলিত নাম দমকল। দমকলের উদ্ভাবন অতি প্রাচীনকালেই হইয়াছিল। ১৫০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে আলেক্সান্দ্রিয়ানিবাসী হীরো দুইটী চুঙ্গি এবং একটী দণ্ডের সাহায্যে চালিত দমকলের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। প্লিনীও লিখিয়াছেন, পুরাকালে প্রাচীন রোমে দমকলের ব্যবহার ছিল। বৃহৎ পিচকারীর সাহায্যে জলধারা বর্ষণ করিয়া অগ্নিনির্ব্বাপণের প্রথাও জানা যায়। ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে অগস্-বার্গের অগ্নিকাণ্ড এবং ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরের প্রসিদ্ধ অগ্নিকাণ্ডে বড় বড় পিচকারী হইতে জল বর্ষণ করা হইয়াছিল। ইহা হইতেই ক্রমে দমকলের উদ্ভাবন হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১৪শ শতকে যানবাহিত যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হয়। একখানি গাড়ীর উপরে স্থাপিত বৃহৎ জলাধারে নল লাগান থাকিত এবং পাম্প দিয়া তাহা হইতে জলবর্ষণ করিয়া আগুন নিবান হইত। প্রকৃতপক্ষে আমরা বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই দমকলের সম্যক্ ব্যবহার দেখিতে পাই। দমকলের পূর্ব্বকথিত গাড়ীগুলি অশ্ববাহিত ছিল, পরে মোটর-চালিত হইয়াছে। দমকল চালাইতে বাষ্প, পেট্রল এবং তাড়িতশক্তিও নিয়োজিত হয়।

চামড়া, ক্যাম্বিস বা রবার নির্ম্মিত নল দমকলে ব্যবহৃত হয়। নলগুলি সাধারণতঃ ১॥ বা ২ ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট ও খুব লম্বা হয়। ইহার সাহায্যে প্রায় ২০০ ফুট উচ্চে জল বর্ষণ করা যায়। প্রত্যেক নলের প্রান্তে এরূপ স্ক্রু বসান থাকে, যাহাতে ২।৩ বা তদধিক নল একসঙ্গে জুড়িয়া ইচ্ছামত লম্বা করা যায়। তারের দড়ি ও ধাতুনির্ম্মিত একপ্রকার মই-এর সাহায্যে উচ্চ গৃহের দেওয়ালের যে কোন স্থানে অনায়াসে নল লাগান যায়। ভূতল হইতেই যন্ত্র সাহায্যে নলের মুখ ইচ্ছামত ঘোরান ফিরান যায়।

বড় বড় শহরে যেখানে রাস্তার পার্শ্বে জলের কল থাকে, তথায় কলের সঙ্গে নলের নিম্ন প্রান্ত সংলগ্ন করিয়া পাম্প করিয়া জল ঊর্দ্ধে বর্ষণ করা হয়। যেখানে এরূপ সুবিধা নাই, সেখানে কূপ বা জলাশয় হইতে নলে জল লওয়া হয়। অনেক সময় দমকলের গাড়ীতেই জলাধার বাহিত হইয়া থাকে।

বড় বড় শহরে দমকলের একটী বা একাধিক ঘাটি থাকে। নগরের প্রায় প্রতি রাস্তায় কতকগুলি করিয়া অগ্নিকাণ্ডসূচক

এলার্ম বা সাঙ্কেতিক শব্দজনক যন্ত্র থাকে। টেলিফোন দমকলের ঘাটির সহিত সংযুক্ত। নিকটে কোথায়ও অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইলে, যে কোনও লোক উক্ত এলার্মের কাচনির্ম্মিত আবরণ ভাঙ্গিয়া টান দিলেই ঘাটিতে ঐ সঙ্কেত সূচিত হয়। তৎক্ষণাৎ ঘাটি হইতে দমকল সাহায্যার্থ প্রেরিত হয়। কোন কোন এলার্ম চাবি বন্ধ থাকে এবং চাবিটী নিকটস্থ কোন প্রহরীর জিম্বায় থাকে। দরকার হইলে ঐ চাবি লইয়া এলার্মের বাক্স খুলিয়া সংবাদ দিতে হয়। বিনা কারণে দমকল ডাকিলে শাস্তি পাইতে হয়। দমকলের ঘাটিতে দমকলবাহী গাড়ী এবং লোকজন সর্ব্বদা এরূপভাবে প্রস্তুত থাকে, যাহাতে কোন স্থান হইতে অগ্নিকাণ্ডের খবর আসিবামাত্রই অবিলম্বে সাহায্যার্থ সেখানে উপস্থিত হইতে পারে। যন্ত্রাদি ও লোকজন সহ এই গাড়ীকে ফায়ার বিগ্রেড্ (Fire Brigade) বলে। প্রত্যেক ফায়ার-ব্রিগেডে ১০।১৫ জন সুশিক্ষিত ও সুনিপুণ লোক এবং একজন পদস্থ নায়ক থাকেন।



অগ্নিনির্ব্বাপণে গমনকালে দমকলের গাড়ী হইতে অবিশ্রান্ত উচ্চ ঘণ্টাধ্বনি করা হয়। তাহা শুনিয়া রাস্তার অপর যানবাহনাদি একপার্শ্বে সরিয়া ফায়ার-ব্রিগেডের দ্রুতবেগে গমন নিমিত্ত পথ ছাড়িয়া দেয়। [দমকল দ্র°]

দ্বিতীয় প্রকার অগ্নিযন্ত্র সামান্য অগ্নি নির্ব্বাপণের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা একজন লোকে একাই ব্যবহার করিতে পারে। ইহার আকৃতি সাধারণতঃ মোচার ন্যায়। শহরের আফিসে, হোটেলে, পাঠাগারে, গীর্জ্জায়, রেলষ্টেশনে এবং অন্যান্য ভবনের দেওয়ালে প্রায়ই এই যন্ত্র লাগাইয়া রাখা হয়। ইহার মধ্যে দ্রবীভূত সোডা (Bicarbonate of Soda) এবং গন্ধকদ্রাবক (Sulphuric Acid) পৃথক্‌ভাবে রক্ষিত থাকে। গন্ধকদ্রাবক সাধারণতঃ একটী বদ্ধ কাচপাত্রে থাকে। যন্ত্রটীর নিম্নভাগে একটী হাতল অথবা বাল্‌ব্ থাকে। তাহাতে জোরে আঘাত করিলেই গন্ধকদ্রাবকের কাচপাত্র ভাঙ্গিয়া যায় এবং দ্রবীভূত সোডা ও দ্রাবক একত্র মিশ্রিত হইয়া কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস (CO_2) উৎপন্ন হয়। এই বাষ্প অদাহ্য ও অত্যন্ত ভারী, সুতরাং অগ্নিনির্ব্বাপক। যন্ত্রটীর উপরিভাগস্থিত একটী মুখ দিয়া ভিতরে উৎপন্ন বাষ্প সজোরে নির্গত হইয়া অগ্নিনির্ব্বাপণে সাহায্য করে। কোন কোন যন্ত্র এরূপভাবে নির্ম্মিত যে, দেওয়াল হইতে খুলিয়া লইয়া উল্টাইয়া ধরিলেই সোডা ও দ্রাবক একত্র মিশ্রিত হইয়া গ্যাস উৎপাদন করে। ছোট যন্ত্রে গ্যাস অধিক পরিমাণে ধরে না। তজ্জন্য অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার যন্ত্রে দুইটী জালা থাকে। একটীর বাষ্প ফুরাইতেই অপরটীকে কার্য্যোপযোগী করিয়া লওয়া হয়।

অগ্নিযুত (স্)—(পুং) ঋগ্বেদের জনৈক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

অগ্নিযোজন—(ক্লী) যজ্ঞীয় অগ্নি প্রজ্বালন।

অগ্নিরক্ষণ—(ক্লী) অগ্নি-রক্ষ-ল্যুট্। রাক্ষসাদি হইতে আগুন রক্ষা করিবার মন্ত্র। সেকালে রাক্ষসেরা আসিয়া ঋষিদের যজ্ঞকুণ্ড নিবাইয়া দিত। তজ্জন্য তাঁহারা মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক এই অত্যাচার নিবারণ করিতেন। ২ অগ্নিহোত্র। ৩ অগ্নিহোত্রগৃহ। ৪ অগ্ন্যাধান।

অগ্নিরজস্—(পুং) ইন্দ্রগোপ নামে রক্তবর্ণ কীট। (ক্লী) ২ স্বর্ণ। ৩ অগ্নিবীর্য্য।

অগ্নিরজ্জু—(পুং) ইন্দ্রগোপ কীট, চলিত আষাড়ে পোকা।

অগ্নিরস—(পুং) [বৈদ্যক] ক্ষয়রোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—শোধিত পারদ এক ভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, একত্র খলে পেষণ করিয়া কজ্জলী করিবে। এই কজ্জলীর সমপরিমাণ লৌহ একত্র ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন ও পিণ্ডাকার করিয়া দুই প্রহর কাল রৌদ্রে রাখিবে। পরে উহা তাম্রপাত্রে করিয়া এরণ্ডপত্রদ্বারা আচ্ছাদন এবং ঐ উষ্ণাবস্থাতেই ধান্যরাশির মধ্যে স্থাপন করিবে। এইরূপে ৮ দিনের পর ধান্যরাশি হইতে উহা তুলিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। পরে বস্ত্রে উত্তমরূপে ছাকিয়া উহার সহিত ত্রিকটু, ত্রিফলা, এলাচ, জায়ফল ও লবঙ্গ একত্র এই ৯ দ্রব্যের ৯ ভাগ মিশ্রিত ও চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা রোগীর বলাবল অনুসারে একতোলা হইতে। অনুপান মধু। এই ঔষধ সেবনে ক্ষয়রোগ আশু প্রশমিত হয় (ভাবপ্র°, কাসরোগাধি°)। অগ্নিরস আরও এক প্রকারের আছে। উহা সজ্বর রাজযক্ষ্মারোগে হিতকর।

অগ্নিরহস্য—(ত্রি) অগ্নির পূজাপদ্ধতিবোধক শাস্ত্র।

অগ্নিরাশি—(পুং) জলন্ত অগ্নিস্তূপ।

অগ্নিরুহা—(স্ত্রী) অগ্নি-রুহ-ক। মাংসাদনী বৃক্ষ, অগ্নিবর্ণবৎ নূতন অঙ্কুর। ঐ বৃক্ষের অঙ্কুর অগ্নির ন্যায় রক্তবর্ণ হয় বলিয়া উহার নাম অগ্নিরুহা। [মাংসাদনী দ্র°]

অগ্নিরূপ—(ত্রি) অগ্নিতুল্য বর্ণবিশিষ্ট। ২ অগ্নিসদৃশ মান্য। ৩ অগ্নির বর্ণ, ধ্যেয় রূপ বা মূর্ত্তি।

অগ্নিরেতস্—(ক্লী) সুবর্ণ। ২ অগ্নির শুক্র। মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে উক্ত আছে—স্খলিত রুদ্রতেজ অগ্নিতে সংক্রামিত হয়। অগ্নি দেবগণের প্রার্থনায় উহা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করেন।

গঙ্গা উহা ধারণে অক্ষম হইয়া গিরিবর সুমেরুর উপর ফেলিয়া দেন। মেরুপৃষ্ঠে পতিত হওয়ায় ঐ শুক্রতেজে মেরুস্থ সমস্ত বস্তু সুবর্ণীকৃত হয়। [ইহার বিস্তৃত বিবরণ কাঞ্চন ও কার্ত্তিকেয় শব্দে দ্র°]

অগ্নিরোহিণী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] মাংসরোহিণী। মাংসাদনী বৃক্ষ। (বাভট, উ° ৩১ অ°) ২ ক্ষুদ্ররোগবিশেষ। লক্ষণ—

"কক্ষাভাগেষু বিস্ফোটা জায়ন্তে মাংসদারুণাঃ।
অন্তর্দ্দাহজ্বরকরা দীপ্তপাবকসন্নিভাঃ॥
সপ্তাহাদ্বা দশাহাদ্বা পক্ষাদ্বা ঘ্নন্তি মানবং।
তামগ্নিরোহিণীং বিদ্যাদসাধ্যাং সান্নিপাতিকীং॥"
(ভাবপ্র°, ক্ষুদ্ররোগাধি°)

যে রোগে ত্রিদোষ কুপিত হইয়া কক্ষপ্রদেশে মাংসবিদারক প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় স্ফোটক উৎপন্ন হয় এবং অন্তর্দ্দাহ ও জ্বর হয়, তাহার নাম অগ্নিরোহিণী। এই রোগ অসাধ্য। এই রোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই যথাবিধানে চিকিৎসা করা আবশ্যক। উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে জ্বরের আধিক্য থাকিলে সপ্তাহ, এবং পিত্তাধিক্যে দশাহ এবং কফাধিক্যে এক পক্ষের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয়। যথানিয়মে এই রোগ চিকিৎসিত হইলে সাধ্য হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—এই রোগ উৎপন্ন হইবা মাত্র পৈত্তিক বিসর্পের ন্যায় চিকিৎসা এবং লঙ্ঘন, রক্তমোক্ষণ, রক্ষক্রিয়া, ও বমনাদি দ্বারা শোধন করিবে। অতিবর্দ্ধিত অগ্নিরোহিণী-রোগীকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়। (ভাবপ্র°, ক্ষুদ্ররোগাধি°)

বাভটের উত্তরতন্ত্রে এই রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসাদির বিষয় বিশেষরূপে লিখিত আছে।

অগ্নিলোক—সুমেরুপর্ব্বতশৃঙ্গের নিম্নস্থ জনপদবিশেষ। কাশীখণ্ডে বর্ণিত আছে যে, এই অগ্নিলোকের স্থান অন্তরীক্ষে। তজ্জন্য অনুমান হয়, এটা কাল্পনিক পুরী। কিম্বা হয়ত সুমেরু পর্ব্বতের নিম্নে কোন উপত্যকায় পূর্ব্বে অগ্নি-পূজকদের বাসস্থান ছিল। সেই জনপদকে সকলে অগ্নিলোক বলিত। চীনপরিব্রাজক যুয়ন্ চুয়ং অ-কি-নি নামে কাশ্মীরের উত্তরে একটী জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা অগ্নিলোক বলিয়া মনে হয়

অগ্নিবংশ—অগ্নিদেবতার সন্ততিপরম্পরা। পুরাণে অগ্নির সংখ্যানির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি, তাহাদের শক্তি ও রূপ কল্পিত হইয়াছে। ইহার সহিত বেদোক্ত অগ্নির শক্তি, ক্রিয়া ও রূপের সামঞ্জস্য আছে। ইহা হইতে মনে হয়, বৈদিক ও পৌরাণিক ঋষিগণ অগ্নির বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াও অবগত ছিলেন। তাঁহারা তাপমান দ্বারা তাপ নির্দ্দেশ করিতে জানিতেন। তৎকালের লোকেরা যে অগ্নির সাহায্যে অনেক কার্য্য সমাধান করিতে সমর্থ হইতেন, তাহারই আভাস নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপ অগ্নির উৎপত্তি হয়। অগ্নি হইতে স্বাহার জন্ম। পাবক, পবমান ও শুচি স্বাহার পুত্র। পাবক হইতে সহরক্ষ, পবমান হইতে কব্যবাহন ও শুচি হইতে হব্যবাহনের জন্ম। ইঁহাদের মধ্যে হব্যবাহন দেবগণের, কব্যবাহন পিতৃগণের এবং সহরক্ষ অসুরগণের অগ্নি বলিয়া প্রখ্যাত। ইঁহাদের ৪৯ জন পুত্রপৌত্র; তাঁহারা শক্তি অনুসারে বিভিন্ন নামে প্রথিত হইয়াছেন।

ব্রহ্মার প্রথম পুত্র লৌকিকাগ্নি বৈদ্যুত। তাঁহার পুত্র বিশ্ববিশ্রুত ব্রহ্মৌদনাগ্নি; ইনি ভরত নামে আখ্যাত ছিলেন। বৈশ্বানর ইঁহার মুখ এবং ইনি যজ্ঞীয় ভোজ্য দ্রব্যের জলরস পান করিয়া থাকেন। পুষ্করসাগর মন্থনে অথর্ব্বা ঋষির উৎপত্তি। এই অথর্ব্বা লৌকিকাগ্নি বলিয়া প্রখ্যাত। অথর্ব্বার পুত্র দধ্যঙ্গ ও অঙ্গিরা। ইঁহারাও লৌকিকাগ্নির মধ্যে পরিগণিত। পবমান নামক অগ্নি মন্থনযোগ্য, ইনি গার্হপত্যাগ্নি নামে পরিচিত। গার্হপত্য অগ্নির দুই পুত্র—শংস্য ও শুক্র। শংস্য আহবনীয়, এই জন্য ইনি হব্যবাহন নামে এবং শুক্র প্রণীতাগ্নি নামে পরিচিত। শংস্যের পুত্র সভ্য ও আবসথ্য। দ্বিজগণ হব্যবানের আহবনীয়ত্ব অবগত হইয়া তাঁহার নিকট কাবেরী কৃষ্ণা, গোদাবরী, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা, কৌশিকী, শতদ্রু, সরযূ, সীতা, সরস্বতী, হ্লাদিনী ও পাবনী নদী প্রার্থনা করেন। এই হেতু হব্যবাহন আপনাকে স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত করিয়া ঐ সকল নদীতে সঙ্গত হন। তাহাতে ধিষ্ণী উৎপন্ন হয়। এই বিবরণ হইতে নদীস্রোতে বৈদ্যুতিক-শক্তিরূপে অগ্নির অবস্থান সূচনা করিতেছে। এই শক্তি-দ্বারাই আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কত কলকারখানা চালিত করিতেছেন।

ধিষ্ণী হইতে উৎপন্ন নদীপুত্রগণের মধ্যে বিহরণীয় ও উপস্থেয় নামে যে সকল অগ্নি আছেন, তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে ঋতু নামক অগ্নি। ইনি প্রবাহন ও অগ্নীধ্র নামে খ্যাত। যজ্ঞদিনে সবনানুক্রমে যে অগ্নি স্থাপিত হয়, তিনি সম্রাট্ অগ্নি নামে অভিহিত। ইঁহার পরবর্ত্তী পর্ষদস্য নামক অগ্নি। ইনি ব্রহ্মস্থানে ব্রহ্মজ্যোতিসম্পন্ন বসু, শামিত্রে হব্যসূর্য্যাদির অসংসৃষ্ট অগ্নি, ব্রহ্মস্থানে সমুদ্রাগ্নি এবং ঔদুম্বরীস্থলে ঋতুধাম নামে বিখ্যাত। তদ্ভিন্ন উপস্থেয়াংশসম্ভূত অজৈক-

পাদাগ্নি শালামুখীয়ক ও অহির্বুধ্নাগ্নি গৃহপতি নামে উক্ত হন।

জলের উদ্ভাবয়িতা পাবকাগ্নি। জলের আবাহনের উদ্দেশ্যে ইঁহাকে আবাহন করা হয়। পাবকের পুত্র হৃচ্ছয়, ইনি মনুষ্য-জঠরে বাস করেন বলিয়া জঠরাগ্নি নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহার পুত্র মন্যুমান্, মন্যুমান্ স্বতঃ উদ্দীপ্ত হইয়া হবিঃ ভোজন করেন। মন্যুমানের পুত্র সম্বর্ত্তক। ইনি বড়বামুখ বা বড়বাগ্নি, সমুদ্রে অবস্থান করিয়া জলশোষণ করেন। সমুদ্রব্যাপী সম্বর্ত্তকের পুত্র সহরক্ষ। ইঁহার পুত্র গৃহীমানবের গৃহদগ্ধকারী ক্ষাম। ক্ষামের পুত্র ক্রব্যাদ; ইনি শবদেহ ভক্ষণ করেন। নাম ও কর্ম্মানুসারে পাবকপুত্রগণ ভিন্ন ভিন্ন নামে কীর্ত্তিত।

দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অসুরবর্গ কর্ত্তৃক নমিত হইয়া যে অগ্নি অরণ্যমধ্যে 'অরণি' রূপে সংস্থিত হইয়াছেন, তিনি তৃণ ও ওষধিতে আয়ুদরূপে বিরাজিত আছেন বলিয়া আয়ু নামে কথিত। আয়ুর পুত্র মহিমান্, পাকযজ্ঞে ইনি সবন নামে বিখ্যাত। সবনের পুত্র অদ্ভুত, তাঁহার পুত্র বিবিচি—ভীম-কর্ম্মাদিগের দ্বারা আহূত হন এবং তাহাদের প্রায়শ্চিত্তের হবি ভোজন করেন। বিবিচির পুত্র অর্ক, অর্কের পুত্র অনীকবান্, বাস্‌জবান্, রক্ষোহা, পিতৃকৃৎ, সুরভি ও রুক্মবান্।

উপরি বর্ণিত অগ্নিগুলি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন শক্তিতে উদ্ভূত হইয়া থাকেন। ইঁহারা যজ্ঞকার্য্যে সন্তুষ্ট। আদি সৃষ্টিকালে এই সকল অগ্নি দেবতুল্য যামগণের সহিত স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অন্তর্হিত হইয়াছেন। স্বারোচিষ হইতে সাবর্ণি পর্য্যন্ত সপ্ত মন্বন্তরেই এবং ভবিষ্যৎকালে এই অগ্নি বিরাজিত থাকিবেন। (ব্রহ্মাণ্ডপুং ২৯.১-৪৯)

অগ্নিবক্ত্র—[বৈদ্যক] ভল্লাতক বৃক্ষ, ভেলা গাছ। ২ চিত্রক-ক্ষুপ, চিতে গাছ।

অগ্নিবৎ—(ত্রি) অগ্নিতুল্য। বেদে মন্তু ব। ২ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ।

অগ্নিবতী—আগিয়া এই নামে খ্যাত লোকপ্রসিদ্ধ ওষধি।

অগ্নিবধূ—(স্ত্রী) স্বাহা, দক্ষকন্যা। [স্বাহা দ্রং]

অগ্নিবর্চ্চস্১—(ত্রি) অগ্নিতুল্য দীপ্তিমান্। ২ অগ্নিতেজ।

অগ্নিবর্চ্চস্২—মহর্ষি রোমহর্ষণের জনৈক শিষ্য। রোমহর্ষণ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের নিকট পুরাণসংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন

অগ্নিবর্ণ১—অগ্নির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। ২ অগ্নির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত, উত্তপ্ত। ৩ অগ্নির রূপ।

অগ্নিবর্ণ২—(পুং) সূর্য্যবংশীয় নরপতি সুদর্শনের পুত্র। অমিত-বিক্রমশালী মহারাজ সুদর্শন নিজ ভুজবলে বহুদেশ জয় করিয়া এবং স্বরাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করেন। ইনি নিষ্কণ্টক রাজ্যভার পাইয়া রাজকার্য্যে অমনোযোগী হন। প্রধান মন্ত্রীর হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সর্ব্বদাই অন্তঃপুরে নারীগণবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। দেশের কোন প্রধান রাজকর্ম্মচারী বা প্রজারা তাঁহার দর্শন প্রার্থনা করিলে তিনি অন্তঃপুরের গবাক্ষ হইতে চরণ দেখাইতেন। রাজদর্শনাকাঙ্ক্ষীরা উহা দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। পিতার প্রভাবে রাজ্যে অশান্তি বা গোলযোগের সম্ভাবনা না থাকায় তিনি যদৃচ্ছাক্রমে ইন্দ্রিয়লালসা চরিতার্থ করিয়া এতদূর অমিতাচারী হইয়াছিলেন যে শীঘ্রই রাজযক্ষ্মারোগা-ক্রান্ত হইয়া অকালে মারা যান। (রঘুবংশ, ১৯ সর্গ)

শিবপুরাণমতে বশিষ্ঠের পুত্র পুষ্য, পুষ্যের পুত্র ধ্রুবসন্ধি, ধ্রুবসন্ধির পুত্র সুদর্শন। অগ্নিবর্ণ সুদর্শনের পুত্র ছিলেন। (শিবপুং) কল্কিপুরাণমতে ধ্রুবের পুত্র স্যন্দন, স্যন্দনের পুত্র অগ্নিবর্ণ। (কল্কিপুং)

অগ্নিবর্দ্ধন—অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ; যমানী প্রভৃতি, যাহা সেবনে জঠরাগ্নির বৃদ্ধি হয়।

অগ্নিবল—(ক্লী) অগ্নের্বলং। অগ্নির বল, অগ্নির তেজঃ। ২ জঠরাগ্নির বল। বৈদ্যকশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, অগ্নির বল থাকিলে শরীর সুস্থ থাকে, কোন ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে না। অগ্নির বল ক্ষীণ হইলে নানাপ্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অসুস্থ হইয়া পড়িতে হয়, তখন অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগাধিকারোক্ত ঔষধাদি সেবন করিয়া অগ্নির বল বৃদ্ধি করা আবশ্যক। কারণ শরীরকে সুস্থ রাখিতে হইলে জঠরাগ্নির প্রতি দৃষ্টি করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। [অগ্নি-মান্দ্য দ্রং]

অগ্নিবলবৃদ্ধি—জঠরাগ্নির বৃদ্ধি।

অগ্নিবল্লভ—সালবৃক্ষ, সর্জ-যোনি সালভেদ। ২ অগ্নিপ্রিয়। [শাল দ্রং] ৩ রাল।

অগ্নিবল্লী—(স্ত্রী) লতাবিশেষ। রসেন্দ্রসারসংগ্রহে জ্বরচিকিৎসা-স্থলে স্বচ্ছন্দনায়ক রসৌষধে এই লতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

অগ্নিবাণ—(পুং) অগ্নিরেব বাণঃ। অগ্নিরূপ বাণ, যে বাণে আগুন বর্ষণ হয়। আগ্নেয়াস্ত্র, বন্দুক প্রভৃতি। প্রবাদ আছে যে, যাদুকরেরা মন্ত্রবলে যাহার উদ্দেশে অগ্নিবাণ প্রয়োগ করে, তাহার সর্ব্বশরীর আপনা-আপনি পুড়িয়া যায়। মন্ত্র দ্বারা এই বাণ না কাটাইলে তাহার শরীর ততক্ষণ পুড়িতে থাকে।

অগ্নিবায়ূ—অগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ। অগ্নি এবং বায়ুদেবতা।

অগ্নিবারক—যাহা অগ্নির উত্তাপ রোধ করে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত ইষ্টক বা ইস্পাতের পাত, যাহা অগ্নির প্রচণ্ড তাপ সহ্য করিতে সমর্থ হয়। কলকারখানার প্রসারের সঙ্গে

এঞ্জিন, হাফর (furnace) প্রভৃতির প্রচণ্ড অগ্নিদাহন হইতে অব্যাহতিলাভার্থ বৈজ্ঞানিকগণ একপ্রকার তাপ-সহ ইষ্টক (fire-bricks) নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই বস্তুর উপাদান সংগ্রহের জন্য তাঁহারা নানাপ্রকার মৃত্তিকার গুণাবলী পরীক্ষা করেন। অবশেষে এলুমিনা ও সিলিকা বিশেষভাবে তাপ-সহ জানিয়া উহাদের সহিত লৌহের মরিচা (oxide of iron), ম্যাগনেসিয়া, সোডা ও পটাশ মিশ্রণ করিয়া যে তাপ-সহ মৃত্তিকা (fire-clay) প্রস্তুত করেন, তাহা বিশেষ উপযোগী হয়। উহা ১,৬০০° সেন্টিগ্রেড তাপ সহিতে সমর্থ।

উক্ত রাসায়নিক সংমিশ্রণে সাধারণতঃ গ্যানিষ্টার (ganister) বালু বা তজ্জাতীয় তাপবিকিরণকারী পদার্থ দিয়া ইষ্টক প্রস্তুত করা হয়। এই ইষ্টক দিয়া হাফর, ধূম-নিঃসারক নল (flues) অথবা অগ্নি বাহির হইবার মুখের (fire mouth) চারিদিক্ গাঁথিয়া দেওয়া হয়। উহা অগ্নির তাপকে এত অধিক পরিমাণে প্রতিরোধ করে যে, তৎসন্নিকটে অবস্থিত ব্যক্তি অগ্নির সেই উৎকট তাপেও বিশেষ ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয় না।

তাপের অনুরূপ বিভিন্ন অগ্নিবারক ইষ্টক ব্যবহার করাই বিধি। যে চুল্লী বা হাফরে অধিক তাপ, তথায় এলুমিনাযুক্ত ইষ্টকই ব্যবহার করা প্রশস্ত, অর্থাৎ এস্থলে সিলিকা অধিক পরিমাণে ব্যবহার না করিয়া এলুমিনা, চূণ, ম্যাগ্নেসিয়া বা আয়রণ অক্সাইড ব্যবহার করা ভাল। অন্যত্র লাইম, ম্যাগ্নেসিয়া ও তাহার কোন কোন কার্ব্বনেট দেওয়া চলে। স্থলবিশেষে বক্সাইট নামক কর্দ্দম, লৌহের মরিচা বা প্লামব্যাগো ব্যবহার করিতে হয়। পূর্ব্বে মূল্যবান্ দলিল, খত বা টাকা, মোহর অথবা কাগজের নোট লোহার সিন্ধুকে রাখিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল ; কিন্তু অগ্নিদাহে উহার অভ্যন্তরস্থ সমুদয় কাগজ ইত্যাদি নষ্ট হইবার সমূহ সম্ভাবনা থাকিত। এই ক্ষতি রোধ করিবার জন্য অধুনা অগ্নিরোধক সিন্ধুক (Fire-proof safes) নির্ম্মিত হইতেছে। উহার অভ্যন্তরভাগ অগ্নিবারক কর্দ্দম দ্বারা প্রথমে আবৃত হইত। এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিবারকতার প্রকারভেদ জানিতে পারা গিয়াছে। অগ্নি-রোধক সিন্ধুক ও আলমারী এখন স্বতন্ত্র উপাদানে অভিনব প্রণালীতে নির্ম্মিত হইতেছে

অভ্র একটী অগ্নিরোধক পদার্থ। ইহাতে অগ্নির তাপ বারিত হয়, এই জন্য রেলওয়ে এঞ্জিন এবং অন্যান্য এঞ্জিনের ...লারে অভ্র দিয়া তাপ নিবারণের ব্যবস্থা হইয়াছে। অভ্র দ্র°]

অগ্নিবাসস্—(ক্লী) অগ্নিরিব শুদ্ধং বাসো বস্ত্রম্। বস-অসুন্। অগ্নিতুল্য শুদ্ধ বস্ত্র। (পুং) ২ অগ্নিরিব শুদ্ধং বাসো যস্য। অগ্নিতুল্য শুদ্ধ বস্ত্রপরিধায়ী।

অগ্নিবাহ—(পুং) অগ্নিং বাহয়তি। অগ্নি-বহ-ণিচ্-অণ্। ছাগ। ২ ধূম। অগ্নিবাহকমাত্র।

অগ্নিবাহ, অগ্নিবাহন—ছাগ। অগ্নির রথ চারিটী ছাগলে টানিয়া থাকে। পৌরাণিক ধ্যান যথা—"চতুর্ভিশ্ছাগলৈর্যুক্তে বায়ুচিহ্নে রথে স্থিতং।"

অগ্নিবাহু, —রাজা প্রিয়ব্রতের পুত্র। ইঁহার মাতার নাম কাম্যা। ইনি জম্বুদ্বীপের স্বীয় নামীয় বর্ষের নরপতি ছিলেন। ইনি রাজ্যভোগলালসা পরিত্যাগ করিয়া যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন (বিষ্ণুপু°)। কূর্ম্মপুরাণমতে ইনি যোগপরায়ণ ও জাতিস্মর ছিলেন। রাজ্যভোগে ইনি অনুরক্ত ছিলেন না।

চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ইন্দ্রসাবর্ণির সময়ে ইনি সপ্তর্ষির অন্যতম ঋষি ছিলেন। (ভাগবত)

ইনি স্বায়ম্ভুব মনুর অষ্ট পুত্রের অন্যতম পুত্র। (ব্রহ্মপু°)

অগ্নিবাহু, —(পুং) উৎকলবিজেতা জনৈক দুর্বৃত্ত রাজপুত। কেবল উৎকল দেশেই এই অগ্নিবাহুর নাম শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি উৎকলবাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া জগন্নাথ-দেবের মূর্ত্তি চুরি করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ইঁহাকে রক্তবাহু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অগ্নিবিকার—(পুং) [বৈদ্যক] অগ্নের্বিকারঃ। অগ্নির বিকার। এতন্নামক রোগবিশেষ। ইহা চারি প্রকার। মন্দাগ্নি, তীক্ষ্ণাগ্নি, বিষমাগ্নি ও সমাগ্নি। মাধবনিদানে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—কফের আধিক্যে মন্দাগ্নি, পিত্তাধিক্যে তীক্ষ্ণাগ্নি, বায়ুর আধিক্যে বিষমাগ্নি এবং এই তিনটী দোষ সাম্যাবস্থায় থাকিলে সমাগ্নি হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে মন্দাগ্নিবিশিষ্ট ব্যক্তির অতি অল্পমাত্র আহারও সম্যক্ পরিপাক হয় না, এবং বমি, শরীরে অবসন্নতা ও প্রসেক এবং উদরের গুরুত্ব হয়। পরিমিত বা অপরিমিত আহার করিলেও যদ্যপি সহজে জীর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহাকে তীক্ষ্ণাগ্নি কহে। কেহ কেহ এই তীক্ষ্ণাগ্নির বিশেষ প্রশংসা করেন। কিন্তু ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, মধুর ও স্নিগ্ধাদি ভক্ষ্যদ্রব্য তীক্ষ্ণাগ্নি দ্বারা সম্যক্রূপে পরিপাক হয়, এইজন্য ইহা শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু ইহা কিরূপে রোগমধ্যে গণ্য হইয়া থাকে ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, সমাগ্নি-সম্পন্ন ব্যক্তি ক্ষুধা ধারণ করিলে সহসা কোন রোগ জন্মে না। কিন্তু তীক্ষ্ণাগ্নিসম্পন্ন ব্যক্তি ক্ষণমাত্রও ক্ষুধা-বেগ ধারণ করিলেই পৈত্তিক রোগে আক্রান্ত হয়। কারণ, তীক্ষ্ণাগ্নি পৈত্তিক, বিষমাগ্নি বাতজ এবং মন্দাগ্নি শ্লেষ্মজ রোগের

উৎপাদক। বিষমাগ্নি দ্বারা উপযুক্ত মাত্রায় ভক্ষিত দ্রব্য কখন সম্যক্‌রূপে পরিপাক হয়, কখনও পরিপাক হয় না এবং উদারাধ্মান, উদাবর্ত্ত, শূল, উদরের গুরুত্ব, কুন্থন, অতিসার ও কুক্ষিদেশে গুড়গুড় শব্দ হইয়া থাকে। যথোচিত আহারাদি সম্যক্‌রূপে পরিপাক হইলে তাহাকে সমাগ্নি কহে। চারি প্রকার অগ্নির মধ্যে সমাগ্নিই শ্রেষ্ঠ। (মাধবনি°) এইরূপ অগ্নিবিকার হইলে অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগোক্ত ঔষধ নিয়মানুসারে সেবনে অচিরে উহা প্রশমিত হয়। [অগ্নিমান্দ্য শব্দ দ্র°]

অগ্নিবিদ্—(পুং) অগ্নি-বিন্দ্ বা বিদ্-ক্বিপ্। অগ্নিহোত্রী, সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। ২ অগ্নিরহস্যশাস্ত্রবেত্তা।

অগ্নিবিন্দু—(পুং) অগ্নের্বিন্দুরিব। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, অগ্নি-কণা।

অগ্নিবিবর্দ্ধন—(ক্লী) অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ, যমানী প্রভৃতি।

অগ্নিবিসর্প—(ক্লী) [বৈদ্যক] বিসর্পরোগবিশেষ। (Pain from a boil) বৈদ্যকে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—স্ব স্ব প্রকোপকারণে বায়ু ও পিত্ত অতিশয় প্রকুপিত এবং পরস্পর লব্ধবল হইয়া শরীরে শীঘ্রই অগ্নিবিসর্প রোগ উৎপাদন করে। এই রোগ হইলে রোগী এই বিসর্পের তাপে আপনার সর্ব্বশরীরকে প্রদীপ্যমান অঙ্গারাগ্নি দ্বারা আকীর্ণ বলিয়া জ্ঞান করে এবং বমি, অতিসার, মূর্চ্ছা, দাহ, মোহ, জ্বর, তমক, অরুচি, অস্থিভেদ, সন্ধিভেদ, তৃষ্ণা, অপরিপাক এবং অঙ্গভেদাদি উপদ্রবে অভিভূত হয়। এই বিসর্প শরীরের যে স্থানে অনুসর্পণ করে, সে স্থান শান্ত অর্থাৎ নির্ব্বাপিতাগ্নি, অঙ্গারবৎ কৃষ্ণবর্ণ বা অতিরিক্তবর্ণ হয় এবং অগ্নিদাহোৎপন্ন স্ফোটকবৎ স্ফোটকসমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। শীঘ্রগামিত্ব হেতু এই বিসর্প আশু মর্ম্মস্থান অনুসরণ করে। ইহা দ্বারা মর্ম্ম উপতপ্ত হইলে বায়ু অতি বলবান্ হইয়া অঙ্গসকলকে ভঙ্গবৎ পীড়ায় অতিমাত্র পীড়িত ও সংজ্ঞা নাশ করিয়া থাকে এবং হিক্কাশ্বাস ও নিদ্রালোপ হয়। এই রোগী কোন স্থানে গিয়া সুখ পায় না, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে। অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া যদ্যপি নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে হয়ত অতিকষ্টে প্রবুদ্ধ হয়, নচেৎ এই নিদ্রায়ই প্রাণত্যাগ করে। এই অগ্নিবিসর্প অচিকিৎস্য ব্যাধি।

এই ব্যাধি অচিকিৎস্য হইলেও যদি এই রোগে জ্বরাদি উপদ্রব না থাকে এবং বক্ষোমর্ম্ম অনুপহত হয়, শিরা, স্নায়ু, ও মাংস যদি পচিয়া খসিয়া না পড়ে বা তজ্জন্য শিরা ও স্নায়ু দেখা না যায়, এবং বিধিবিধানে যদি শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি ও যথাবিহিত চিকিৎসা করা হয়, তাহা হইলে এই ব্যাধির প্রশমন হইতেও পারে। কিন্তু যদি পূর্ব্বোক্ত উপদ্রব থাকে, তাহা হইলে এই ব্যাধি আশু রোগীর প্রাণ বিনষ্ট করিয়া থাকে। (চরক, চিকিৎসা°, বীসর্পচি°) [বিসর্প শব্দ দ্র°]

অগ্নিবীজ—(ক্লী) সুবর্ণ। অগ্নির রেতঃ বা শুক্র হইতে উৎপন্ন বলিয়া উপচারতঃ এই নাম। স্বর্ণদানমন্ত্রে উল্লেখ আছে—"রুদ্রতেজঃসমুদ্ভূতং হেমবীজং বিভাবসোঃ।" [অগ্নিরেতস্ দ্র°] ২ তন্ত্রোক্ত রকার বর্ণ। "রমিতি বহ্নিবীজেন ইত্যাদি" (ভূতশুদ্ধি)। [বৈদ্যক] ৩ অগ্নিমন্থ।

অগ্নিবীর্য্য—(ক্লী) অগ্নির রেতঃ, শুক্র। ২ অগ্নির পরাক্রম। ৩ স্বর্ণ। (ত্রি) ৪ অগ্নিতুল্য পরাক্রমশালী।

অগ্নিবৃদ্ধি—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] জঠরাগ্নির বৃদ্ধি, ক্ষুধাবৃদ্ধি।

অগ্নিবৃষ্টি—(ত্রি) অগ্নির বর্ষণ; বারিধারার ন্যায় অবিরত অগ্ন্যুৎপাত। [অগ্ন্যুৎপাত দ্র°] ২ গোলাগুলি প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্রের বর্ষণ। ৩ অগ্নিবৎ উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ।

অগ্নিবেতাল—(পুং) শুভাকাঙ্ক্ষী ক্ষেত্রপালদিগের মধ্যে একতম। (কালিকাপু°)

অগ্নিবেশ,—(পুং) একজন ঋষি। বরাহকল্পের চতুর্ব্বিংশতি দ্বাপরে কলিকালে নৈমিষারণ্যে মহাদেব শূলী নামে মহাযোগিরূপে অবতীর্ণ হন। অগ্নিবেশ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন (লিঙ্গপু°)। মহাভারতমতে অগ্নিসম্ভূত অগ্নিবেশ ভরদ্বাজের নিকট আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা করেন। ভরদ্বাজ-পুত্র দ্রোণ ইঁহার নিকট ঐ বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

অগ্নিবেশ$_{২}$—(পুং) একজন ঋষি। আত্রেয় মুনির নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত 'আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতা' নামক পুস্তকখানি মহর্ষি আত্রেয় এবং অন্যান্য দেবর্ষি ও দেবতাদিগের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। (ভাবপ্রকাশ)। ইনি পাঞ্চালরাজ্যে বাস করিতেন।

অগ্নিবেশ$_{৩}$—(পুং) অঞ্জননিদান, নিদানস্থান প্রভৃতি চিকিৎসাসম্বন্ধীয় পুস্তক এবং রামচন্দ্রচরিত্রসার, রামায়ণরহস্য ও রামায়ণসার প্রভৃতি সাহিত্য-পুস্তক প্রণেতা। বাগ্‌ভট ইঁহাকে চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অগ্নিবেশ্ম,—(পুং) একজন মুনি। ইঁহার নামে একটী গোত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। [গোত্র দ্র°]

অগ্নিবেশ্ম$_{২}$—(পুং) বিয়াল্লিশটী গোত্রের অন্তর্গত গোত্রবিশেষ। ২ বাঙ্গালার পাশ্চাত্য বৈদিকসমাজে প্রচলিত একটী গোত্র। ৩ বাঙ্গালার কায়স্থসমাজে প্রচলিত একটী গোত্র।

অগ্নিবেশ্য,—(পুং) ধনুর্বিদ্যাবিশারদ অগ্নির পুত্রভেদ। দ্রোণাচার্য্য ইঁহার নিকট ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিয়া অগ্ন্যস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। (মহাভা° আদি°)। [অগ্নিবেশ্ম, দ্র°]

অগ্নিবেশ্য২—(পুং) একজন ব্রহ্মর্ষি। ২ সূর্য্যবংশীয় নরিষ্যন্ত রাজার কুলোৎপন্ন দেবদত্ত রাজার পুত্র। ইনি জাতুকর্ণ নামেও পরিচিত। তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ইনি ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। (কূর্ম্মপু° ও ভাগবত) ইঁহার সন্ততিবর্গ অগ্নিবেশ্যায়ন বলিয়া কথিত। ৩ অগস্ত্য ঋষির একজন শিষ্য। ইনি দ্রোণাচার্য্যের নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া পুরস্কারস্বরূপ 'ব্রহ্মশির' নামক অস্ত্র প্রাপ্ত হন। পাণ্ডবগণসহ ইনি কিছুকাল দ্বৈতবনে বাস করিয়াছিলেন। ৪ ভারত-যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধকারী একজন রাজা। ৫ একজন ঋষি, ইঁহার শাপে কন্যাপহারী কাশীরাজকুমার কুশধ্বজ গৃধ্রযোনি প্রাপ্ত হন। (স্কন্দপুরাণ—মাহেশ্বরখণ্ড)। ৬ যোগবাশিষ্ঠোক্ত জনৈক ঋষি, ইনি পুত্র কারুণ্যকে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের মিলনে যে মুক্তি পাওয়া যায়, সে বিষয়ে সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছিলেন।

অগ্নিবৈশ্য—(পুং) অগ্নিবেশের গোত্রাপত্য।

অগ্নিবৈশ্যায়ন—(পুং) অগ্নিবৈশ্যের গোত্রাপত্য।

অগ্নিব্রত—(ক্লী) অগ্নিপূজার্থক ব্রতবিশেষ। (পদ্মপুরাণ)

অগ্নিশর্ম্মন্—(পুং) অতি ক্রুদ্ধ। কেহ অতিশয় কোপান্বিত হইলে বলা যায়,—তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। ২ একজন ঋষি।

অগ্নিশর্ম্মা—(পুং) সিংহলরাজের জনৈক প্রচণ্ড রাক্ষস পুরোহিত।

অগ্নিশর্ম্মায়ন—(পুং) কশ্যপবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎস্যপু°)

অগ্নিশহর—মধ্য এসিয়ার একটী প্রাচীন নগর। চীন-পরিব্রাজক য়ুয়ন্-চুয়ঙ্গ্ ইহাকে 'কাও-চাঙ্গ' প্রদেশের প্রাচীন রাজধানী 'অ-কি-নি' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। চীনপরিব্রাজক যখন ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন এখানকার পূর্ব্বশ্রী বিনষ্ট হইয়াছিল। ৬৪০ খৃষ্টাব্দের প্রাক্কালে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে চীনসম্রাট্ তাই-সুঙ্গ এখানকার শাসনকর্ত্তা কু-বেন-তইকে দণ্ড দিতে আসিয়া নগরটী বিধ্বস্ত করিয়া যান। হূন বা তাঙ্গ রাজবংশের অধিকারকালে লিখিত গ্রন্থাবলীতে এই নগর 'য়েঙ্কি' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। তুর্কীগণ অগ্নিকে 'য়েঞ্জি' শব্দে ব্যক্ত করিতেন। ফা-হু, তাও-হ্সুয়ান, ফাঙ্গ-চিহ্, ফা-হ্সিয়েন এবং মধ্য এসিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক বৌদ্ধ যতিগণের অনুবাদগ্রন্থে এই নগর 'বু-কি' বা 'বুই' নামে অভিহিত হইয়াছে। উচ্চারণ হিসাবে চীনভাষার 'বু' শব্দ 'অ' অথবা 'ও' হয়; সুতরাং পালিভাষাভাষী বৌদ্ধ যাজকগণের অগ্নির রূপান্তর 'অ-কি-নি' হইতে বু-কিতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া অনায়াসে অনুমান করা যায়। 'য়েঙ্কি' ও 'অ-কি-নি' শব্দ যে অগ্নির নামান্তর তাহাতে সন্দেহ নাই। এক সময়ে মধ্য এসিয়ার শাকদ্বীপে অগ্নিপূজার বহুল প্রচার ছিল। সম্ভবতঃ অগ্নিপূজক জরথুস্ত্রীয় মতাবলম্বীরা আপনাদের ইষ্টদেবতার সম্মানার্থ অগ্নিপূজার কেন্দ্রস্বরূপ অগ্নিশহর স্থাপন করিয়া থাকিবেন।

অগ্নিশাল—(ক্লী) অগ্নীনাং শালা। বিকল্পে ক্লীবত্বং। অগ্নিগৃহ, যে গৃহে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান হয়। এই স্থান অতি পবিত্র।

অগ্নিশালা—(স্ত্রী) অগ্ন্যাধানের স্থান। অথর্ব্ববেদের মতে যজ্ঞস্থলের যে অংশে অগ্নিস্থাপনা করা হয়, তাহা—সাধারণতঃ মধ্যস্থল।

অগ্নিশিখ১—[বৈদ্যক] (পুং) কুঙ্কুমবৃক্ষ। ২ কুসুম্ভবৃক্ষ। ৩ অগ্নিতুল্য শিখাবিশিষ্ট জাঙ্গলীবৃক্ষ। (ত্রি) ৪ অগ্নিতুল্য জটাশালী। ৫ অগ্নিতুল্য অগ্রভাগ। (ক্লী) ৬ সুবর্ণ। ৭ কুসুম্ভপুষ্প। ৮ পূতিকরঞ্জ, চলিত নাটা। ৯ শূরণ, চলিত ওলগাছ।

অগ্নিশিখ২—(পুং) অন্তরিক্ষমুনির কুলে জাত একজন ঋষি। ইঁহার পিতা নীল ও পিতামহ পৃষদ নৃপতি। [সহ্যাদ্রি দ্র°]

অগ্নিশিখা১—(স্ত্রী) অগ্নির জ্বালা। আগুনের শীষ। ২ [বৈদ্যক] লাঙ্গলীবৃক্ষ, বিষলাঙ্গলা। পর্য্যায়, বিশল্যা, ফলিনী, শক্রপুষ্পী। ৩ অনন্তা। [বিশল্যা দ্র°]

অগ্নিশিখা২—(স্ত্রী) দাহ্য বস্তুতে অগ্নিসংযোগ করিলে তাপবিকিরণ সহকারে যে তেজ ঊর্দ্ধমুখে উত্থিত হয়। গুণসমন্বয়ে দাহ্য বস্তু যতই জটিল হয়, অগ্নিশিখার ততই বৈজ্ঞানিক প্রকারভেদ ঘটে।

সাধারণতঃ অগ্নি প্রজ্বলিত করিলে আমরা যে শিখা উঠিতে দেখি, উহা অঙ্গারোদজন (Hydrocarbon)। দাহ্য বস্তুর গুণানুসারে শিখার পরিবর্ত্তন আমরা লক্ষ্য করি বটে, কিন্তু ঐ সঙ্গে দাহ্যবস্তু হইতে যে সকল অবশ্যম্ভাবী অম্লজনমিশ্র (oxidation) পদার্থ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতে উহার সমস্যাসমাধান দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। প্রধানতঃ অগ্নিতে উদজন ও অম্লজন এবং কারবন মনোক্সাইড ও অম্লজনমিশ্রিত শিখা দেখা যায়। রসায়নে উহা $2H_2+0_2=2H_20$ এবং $2C0+0_2=2C0_2$ সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। প্রত্যেক শিখায় যে জলীয় বাষ্প আছে, উর্দ্ধে উত্থিত ধূম হইতে তাহা প্রমাণিত হয়; কিন্তু উহার মধ্যে অন্যান্য দ্রব্যাণুর যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাহার জটিলতা নিরাকরণ সম্পূর্ণ অসম্ভব।

অগ্নিশিখা দুইপ্রকার—দীপ্ত (Luminous) ও দীপ্তিহীন (Non-luminous)। শেষোক্ত বিষয়ে ইথিলিন ও ক্লোরিন গ্যাসের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ দুইটী গ্যাস মিশ্রিত করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলে শিখা ধীরে ধীরে উঠিতে থাকে, তাহা অনতিকাল পরে লক্‌লক্ ভাবে জিহ্বাবিস্তার করিতে সমর্থ হয়।

তখন উহার গতি প্রতি সেকেণ্ডে দুই হাজার মিটর পর্য্যন্ত বাড়িয়া উঠিতে পারে।

কোন গ্যাসমিশ্রণে অগ্নিসংযোগ করিলে শিখা ধীরে ধীরে পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয়। শিখার ঐ পরিণত অবস্থাকে প্রজ্বলন-উত্তাপ (Temperature of ignition) বলে। ভাণ্ড হোফ্, ভিক্টর মেয়র প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, উদজন ও অম্লজন একত্র জ্বালাইলে প্রজ্বলন-উত্তাপ হইতে কম উত্তাপে জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু যদি ঐ মিশ্র গ্যাস পাত্রবিশেষে রক্ষিত হয়, তাহা হইলে উত্তাপের তারতম্য ঘটে। কাচপাত্রে মিশ্রণের গুণসমষ্টির ক্রিয়া ৪৪৮ডিগ্রীতে অনুভূত হয়, কিন্তু রৌপ্যপাত্রে পরিবর্ত্তন করিলে অপেক্ষাকৃত স্বল্পতাপে ১৮২ ডিগ্রীতে ক্রিয়া আরম্ভ হইতেছে, বুঝা যায়।

শিখার তাপনির্ণয়ের জন্য বৈজ্ঞানিকেরা বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। চাটেলিয়রের প্রবর্ত্তিত থারমো-ইলেকট্রিক কুপ্‌ল (Thermo-Electric Couples)* ও পাইরো-মিটার (Pyrometer) যন্ত্রের তাপ হ্রাস করাইয়া কএকজন বৈজ্ঞানিক যথোচিত সাবধানতা সহকারে যে তাপ-শক্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অনেকটা ভ্রমশূন্য বলিয়া মনে হয়।†

অগ্নিশিখা কোণাকার। সূর্য্যমণ্ডলে যে তেজোরাশি আছে তাহাও কোণমুখে উদ্গত হইয়া থাকে। সামান্য বর্ত্তিকা জ্বালিলে বর্ত্তিশিখাও কোণাকার হইয়া উঠে। হোমাগ্নি বা শবাগ্নির শিখাও কোণাকার। প্রত্যেক শিখার কেন্দ্রমধ্যস্থ আলোক ঘনসন্নিবিষ্ট হওয়ায় নিবিড় জ্যোতিঃবিশিষ্ট হয় এবং সেই কেন্দ্রের বহির্ভাগস্থ শিখা অপেক্ষাকৃত লঘু ও তরল ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। শিখার আলোক বা জ্যোতির মূলীভূত কারণ বিভিন্ন দাহ্যবস্তুতে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সংমিশ্রণ। দাহ্যবস্তু কঠিন, তরল অথবা বাষ্পাকার হইতে পারে। দাহ্যবস্তু যে অবস্থার হয়, শিখার আলোকেরও সেই-রূপ পর্য্যায়ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। E. Wiedemann Smithells, Sir H. Davy, Frankland প্রভৃতি পণ্ডিতগণ গবেষণার দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, নিম্নে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

ডেভীর মতে কঠিন পদার্থে আলোক অধিকতর উজ্জ্বল হয়। ফ্রাঙ্কলাণ্ড বলেন, গ্যাস যদি চাপদ্বারা সংহত করা যায়, তাহা হইলে সেই ঘনীভূত বাষ্পে জাত আলোকও উজ্জ্বলতর হয়। তিনি বলেন, অম্লজনে ফস্ফরাস এবং নাইট্রিক অক্সাইড বা কার্ব্বন্ ডাইসালফাইড দিলে আলোক উজ্জ্বল হয়। চাপে হাইড্রোজেন ও কার্ব্বন মনোক্সাইড ভাল জ্বলে। কাহারও কাহারও মতে, বৈদ্যুতিক সংঘাতদ্বারা গ্যাসের দীপ্তি বর্দ্ধিত হয়। নভোবক্ষে উচ্চশক্তির বৈদ্যুতিক সংঘাতে অম্লজন ও যবক্ষারজন মিলিত হইয়া দীর্ঘ-চঞ্চল জ্যোতি বাহির করে; উহা নিবিয়া গেলে নাইট্রোজেন পারক্সাইড পাওয়া যায়; উহা সাধারণ শিখার একটী প্রধান উপাদান।

স্মিথেল বলেন, বাষ্পের রাসায়নিক সংগঠন অগ্নিসংস্পর্শে পুড়িয়া উঠিলে তখন উহাতে নূতন শ্রেণীর অণুসংস্থান সৃষ্ট হয়। বায়ুস্থিত অম্লজন বাষ্পের তাড়নে উহা পুনঃ পুনঃ সঞ্চালিত হইয়া অণুগুলিকে গতিশীল করিয়া তোলে এবং অণুগুলি পরস্পরের গতিদ্বারা সন্তাড়িত হইয়া যে অবস্থার সৃষ্টি করে, তাহাই তাপ। কিন্তু এ তত্ত্ব অনেক বৈজ্ঞানিক স্বীকার করেন নাই। ফ্রাঙ্কলাণ্ড অণুপুঞ্জে ভার স্বীকার করিলেও অগ্নিশিখার দীপ্তির আধিক্য সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করেন নাই। এ বিষয়টী এখনও বৈজ্ঞানিক জগতে অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে।

অগ্নিশিখার ঔজ্জ্বল্য ও আকৃতিগত বিভিন্নতা দেখা যায়। বিশুদ্ধ কার্ব্বন মনোক্সাইড বাষ্প বায়ুর সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে যদি বর্ত্তিকামুখে অগ্নিসংযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে কোণাকার গাঢ়তর আলোক পাওয়া যায়। বর্ত্তিকামুখ গোলছিদ্রবিশিষ্ট হইলে এবং মধ্যস্থিত বাষ্প ধীরে ধীরে মুক্ত হইলে আলোকশিখা কোণাকার ও শূন্যগর্ভ হয়। আর যদি কার্ব্বন মনোক্সাইড অন্য পদার্থে মিশ্রিত হইয়া অম্লজন সহযোগে পুড়ে, তাহা হইলে শিখার চতুষ্পার্শ্ব ক্ষীণ হরি-তাভ আলোকে মণ্ডিত হয়। অধ্যাপক এচ্. বি. ডিক্সনের মতে, অম্লজন ও যবক্ষারজন সমবায়েও এইরূপ আলোক হয়। আবার যদি কার্ব্বন মনোক্সাইড এমন অত্যুৎকট তাপে তাপিত করা যায় যে, কতক পরিমাণে কার্ব্বন ও কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে, তখন যদি উপরি-উক্ত উত্তপ্ত বাষ্পের অগ্নিতে অদগ্ধ কার্ব্বন মনোক্সাইড জ্বালান যায়, তাহা হইলে কার্ব্বন-বিমুক্ত ঐ বাষ্পের আলোকশিখা যে স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

বাস্তবিক পক্ষে সকল শিখাই উদজন ও অঙ্গারের সংমিশ্রণ। এইরূপ হাইড্রোকার্ব্বন শ্রেণীর শিখারও আকৃতি-গত অনেক পার্থক্য আছে। সায়ানোজেন বাষ্প বিস্ময়জনক শিখা উৎপাদন করে। উহার শিখা শঙ্খাকার ও লালবর্ণ,

* এই যন্ত্রের একটী তার প্লাটিনাম ধাতুনির্ম্মিত এবং অপরটীতে ৯০%ভাগ প্লাটিনাম ও ১০% ভাগ রোড়িয়ম থাকে।

† পুরাণে অগ্নিবংশ বলিয়া যে বিভিন্নসংজ্ঞক অগ্নির নামকরণ ও তাহাদের কার্য্যশক্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে বর্ত্তমান বিজ্ঞানে নির্ণীত তাপশক্তির যথেষ্ট সামঞ্জস্য রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। [অগ্নিবংশ দ্র°]

এবং উহার চারি ধার উজ্জ্বল নীল। এইরূপ হইবার কারণ এই যে, প্রথমে সায়ানোজেনস্থিত কার্ব্বন অম্লজন যোগে কার্ব্বন মনোক্সাইড সৃষ্টি করে এবং কার্ব্বন মনোক্সাইডে পুনরায় অম্লজন যুক্ত হওয়ায় উহা কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, যদি সায়ানোজেনের শিখা অম্লজন বাষ্পের মধ্যে দহন করা হয়, তাহা হইলে সেই শিখাতে কোনরূপ জড় অঙ্গার পাওয়া যায় না; পক্ষান্তরে অম্লজনের একটী উৎস যদি সায়ানোজেনে দহন করা যায়, তাহা হইলে শিখামুখে জড় অঙ্গার স্বতন্ত্রভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। ইথিলিন বাষ্পের শিখা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, উহাতে নিম্নলিখিত পদার্থ বিদ্যমান আছে:—

কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড	=	৩·৬
জল	=	৯·৫
কার্ব্বন মনোক্সাইড	=	১৫·৬
হাইড্রোকার্ব্বন	=	১·৩
উদজন	=	৯·৪
যবক্ষারজন	=	৬০·৬

উপরি-উক্ত দাহ্যবস্তুনিচয়ের সমাবেশ হইত বুঝা যায় যে, অনেকটা উদজন অম্লজনযুক্ত হয় নাই এবং প্রকৃতপক্ষে প্রায় সমস্ত কার্ব্বনই কার্ব্বন মনোক্সাইড বা কার্ব্বন ডাই-অক্সাইডে রূপান্তরিত হইয়াছে। যে যে পদার্থের সমন্বয়ে ঐ বাষ্প গঠিত, উহার উত্তপ্ত অবস্থায় তাহা সহজে নির্ণয় করিতে পারা যায়; কিন্তু উহা শীতল হইয়া আসিলে উহার উপাদানসমূহ নির্ণয় করা যায় না। অধ্যাপক বোন (W.A. Bone) কএকজন সহযোগীর সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন হাইড্রোকার্ব্বন লইয়া অম্লজনযোগে পরীক্ষায় ব্যাপৃত হন। তিনি প্রথমে ২৫০° সেন্টি° তাপে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। পরে ঐ তাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা হয়। ইথেন ($CH_3 \cdot CH_3$) এবং ইথিলিন ($CH_2 : CH_2$) তাপভেদে বিভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি করিয়া যথাক্রমে এসেট্-অ্যাল-ডি-হাইড ও ফরম্যাল-ডি-হাইডে পরিণত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, হাইড্রোকার্ব্বন ও অম্লজান পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ।

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ বহু গবেষণা ও পরীক্ষার দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, মূলতঃ হাইড্রোকার্ব্বনের দহন জন্যই অগ্নিশিখার উৎপত্তি; কিন্তু কি কারণে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উহার দীপ্তির বিভিন্নতা ঘটে, তাহার মুখ্য কারণ এখনও পরীক্ষাধীন। ক্ষুদ্র বর্ত্তিকালোক হইতে বিস্তৃত অগ্নিকুণ্ডের শিখা কোণাকার হওয়ার কারণ সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন যে, দাহ্য বস্তু অগ্নিস্পৃষ্ট হইলে জ্বলিয়া উঠে এবং সেই প্রদীপ্ত অগ্নির নিম্নদেশে দাহ্যবস্তু হইতে বিন্দু বিন্দু ভাবে উদ্গত অদগ্ধ বাষ্প ইন্ধন যোগাইয়া ঐ অগ্নিকে উর্দ্ধদিকে উত্তোলিত করে। এইরূপে ক্রমান্বয়ে উত্থিত উর্দ্ধমুখ অগ্নি কোণাকার শিখায় পর্য্যবসিত হয়। নিম্নস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখাবিন্দুতে কার্ব্বনের ভাগ অধিক পরিমাণে থাকে বলিয়া উহার জ্যোতি অধিকতর রক্তবর্ণ দেখায়। নিম্নস্থ শিখাসমূহের নিরন্তর তাপে উপরের শিখা উর্দ্ধে উত্তোলিত হইয়া কার্ব্বন-বিযুক্ত হইয়া পড়ে, এইজন্য উপরের শিখাগ্র নীলাভ দেখা যায়।

অগ্নিশিরস্—(পুং) কাম্যকবনের উত্তরদিকে অবস্থিত একটী তীর্থ। এই তীর্থে সৃঞ্জয়পুত্র রাজা সঞ্জয় শম্যাক্ষেপ যজ্ঞ করেন। ভরত রাজাও এইস্থানে ১৪৮টী যজ্ঞ করিয়াছিলেন। (মহাভা° বনপর্ব্ব, ৯০ অঃ)

অগ্নিশিলা—(স্ত্রী) প্রভাসের অন্তর্গত একটী তীর্থ। ইহাকে জাতবেদশিলাও কহে। যে ব্যক্তি সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় এই অগ্নিশিলায় প্রবেশ করে, সে স্বর্গগামী হয় এবং শান্ত নামক অগ্নিরূপে পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করে। এই শিলায় যাহা প্রদান করা যায়, তাহা অক্ষয় হয়। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৭৭.৪৩-৪৪)

অগ্নিশুশ্রূষা—(স্ত্রী) সায়ংপ্রাতঃ অগ্নিতে সমিধ্ হোমাদি। মনু বলিয়াছেন, বৈধ হোমাদি দ্বারা অগ্নিশুশ্রূষা করিয়া দেহাবচ্ছিন্ন জীবকে ব্রহ্মলাভের যোগ্য করিয়া লইবে। (মনু ২.২৪৮)

অগ্নিশেখর—(পুং) [বৈদ্যক] কুঙ্কুম বৃক্ষ। ২ কুসুমবৃক্ষ। ৩ জাঙ্গলীবৃক্ষ। (ত্রি) ৪ অগ্নিতুল্য অগ্রবিশিষ্ট।

অগ্নিষ্টুৎ—(পুং) অগ্নি-স্তু-ক্বিপ্। অগ্নিঃ স্তূয়তে যত্র। *। অগ্নেঃ স্তুৎস্তোমসোমাঃ। পা ৮.৩.৮২। অগ্নিশব্দের পর স্তুৎ, স্তোম এবং সোম শব্দের সএর ষত্ব হয়। একাহসাধ্য যজ্ঞবিশেষ। ২ চাক্ষুষ মনুর ঔরসে ও নড়লার গর্ভে অগ্নিষ্টুৎএর জন্ম। (কূর্ম্মপু°)

অগ্নিষ্টুভ্—(পুং) যজ্ঞবিশেষ। ২ নকুলার গর্ভজাত প্রজাপতি বৈরাজের পুত্র।

অগ্নিষ্টোম—(পুং) অগ্নীনাং স্তোমঃ, অগ্নেঃ স্তুৎস্তোমসোমা ইতি ষঃ। যজ্ঞবিশেষ "স্বর্গকামো যজেত" (শ্রুতি)। স্বর্গকামনায় যজ্ঞানুষ্ঠিত হয়। যজ্ঞ প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—সোমযজ্ঞ ও হবির্যজ্ঞ। যে যজ্ঞে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত এবং পুরোডাশ প্রভৃতি পিষ্টক আহুতি দিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয়, তাহাকে হবির্যজ্ঞ বলে এবং সোমরস আহুতি দিয়া যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম সোমযজ্ঞ। এই অগ্নিষ্টোম সোমযাগের অন্তর্ভুক্ত। এই অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে সোমরস আহুতি দিয়া পরে সোম পান করা হয়। এই যজ্ঞ বসন্তকালে করিতে হয়, কারণ বসন্তে প্রচুর সোম পাওয়া যায়। "বসন্তে অগ্নিষ্টোমঃ" (কাত্যা°)।

এই যজ্ঞের প্রধান দেবতা অগ্নি, ইহাতে অগ্নিরই স্তব করা হয় বলিয়া এই যজ্ঞের নাম অগ্নিষ্টোম হইয়াছে। এই যজ্ঞে অগ্নি প্রধান দেবতা হইলেও ইন্দ্র ও বায়ু প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশেও স্তব করা হয়। সোমযাগের অন্তর্ভুক্ত অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্‌থ প্রভৃতি যজ্ঞ ব্রাহ্মণেরই কর্ত্তব্য। পূর্ব্বকালে যদি কোন ব্রাহ্মণের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিন পুরুষের মধ্যে কেহই অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি দুর্ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এই দোষ পরিহারের জন্য তাঁহার আশ্বিন পশ্বনুষ্ঠান এবং সোমপান না করার জন্য ঐন্দ্রাগ্র পশ্বনুষ্ঠান করা আবশ্যক হইত। ইহা একরূপ প্রায়শ্চিত্তবিশেষ। তিন পুরুষের মধ্যে যে কেহ ইহার অনুষ্ঠান করিলে উক্ত প্রকার অনুষ্ঠান করিতে হইত না।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণ-ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন—জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের সাতটী সংস্থা, তন্মধ্যে অগ্নিষ্টোম, উক্‌থ্য ষোড়শী ও অতিরাত্র এই চারিটী সংস্থা পর পর বর্ণিত হইয়াছে। এই চারিটীর মধ্যে অগ্নিষ্টোম প্রকৃতি অর্থাৎ সকল অনুষ্ঠানই অগ্নিষ্টোমে উপদিষ্ট হইয়াছে। অগ্নিষ্টোমের আরম্ভে প্রথম ঋত্বিক্‌বরণ করিতে হয়, তৎপরে ইষ্টিবিধান করা হইয়াছে। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, 'একাদশ কপালে সংস্কৃত ও দীক্ষণীয় পুরোডাশ অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দেশে নির্ব্বপণ করিয়া এতদ্দ্বারা সকল দেবতার উদ্দেশেই নিরবশেষে নির্ব্বপণ (পুরোডাশ প্রদান) করা হইবে। দর্শপূর্ণ মাস যাগদ্বারা দীক্ষণীয়েষ্টি সম্পাদন করিবে। তৎপরে সপ্তদশ সামিধেনী পাঠ হইবে। দীক্ষণীয় ইষ্টি ও আনুষঙ্গিক সংস্কারাদি বিধানের পর যে যজমান ইতঃপূর্ব্বে সোমযাগ করে নাই, তাহার জন্য "ত্বমগ্নে স প্রথা অসি" (ঋক্ ৫.১৩.৫) ও "সোম সস্তে ময়োভুবঃ (৩.৯১.৯) ইত্যাদি মন্ত্র আজ্যভাগদ্বয়ের পুরোঽনুবাক্যা রূপে পাঠ করিতে হইবে। যে যজমান পূর্ব্বে যাগ করিয়াছে, তাহার জন্য "অগ্নিঃ প্রত্নেন মন্মনা" (ঋক্ ৮.৪৪.১২) এবং "সোম গীর্ভিষ্ট্বা বয়ম্" (৯.৯১.১১) ইত্যাদি দুই মন্ত্র পাঠ করিবে। আজ্যভাগদানকর্ম্মাঙ্গে "অগ্নির্মুখং প্রথমো দেবতানাম্" এবং "অগ্নিশ্চ বিষ্ণো তপ উত্তমং মহঃ" ইত্যাদি (আশ্ব° শ্রৌত° ৪.২) দুই মন্ত্র অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দেশে হবিঃ প্রদানের জন্য অনুবাক্যা ও বাক্যারূপে পাঠ করিতে হইবে। তৎপরে বিবিধ কাম্য ও সংযাজ্যা ও সত্যোক্তি পাঠ করিয়া প্রায়ণীয়েষ্টি করিতে হইবে। তৎপরে প্রয়াজাহুতি, দেবতাপ্রশংসা, প্রায়ণীয়েষ্টির যাজ্যানুবাক্যা ও তাহার প্রশংসা, সংযাজ্যাবিধান, প্রযাজ ও অনুযাজবিধান, পরে উদয়নীয় ইষ্টি শেষ করিয়া যথাক্রমে সোমপ্রবহণ, অগ্নিমন্থন, আতিথ্যেষ্টি, প্রবর্গ্য কর্ম্ম, উপসদিষ্টি, সোমাপ্যায়ন ও ব্রতোপায়ন নিহ্নব যথামন্ত্র সম্পন্ন করিয়া সোমক্রয়, অগ্নিপ্রণয়ন, হবির্ধানপ্রবর্ত্তন, অগ্নীষোমপ্রণয়ন, যূপসংস্কার, অধ্রিগুপ্রৈষ, পুরোডাশ ও বপাহোম, পশ্বঙ্গহোম, পশুযাগ, বপাস্তোকহোম, প্রাতরনুবাক, অপোনপ্ত্রীয় সূক্তপাঠ, উপাংশুগ্রহ ও অন্তর্যামগ্রহ, বহিস্পবমানস্তোত্র, সবনকর্ম্ম, দ্বিদেবত্যগ্রহহোম, ঋতুগ্রহহোম, তূষ্ণীংশংস, আজ্যশস্ত্র, প্রউগশস্ত্র, তদন্তর্গত বষট্‌কার, প্রৈষকর্ম্ম, নিবিৎস্থাপনা, আহাব, প্রতিগর, মরুত্বতীয়শস্ত্র, নিষ্কেবল্য শস্ত্র, বৈশ্বদেবশস্ত্র ও শেষে আগ্নিমারুতশস্ত্র সম্পন্ন করিতে হয়। ঐতরেয়ব্রাহ্মণের ১ম পঞ্চিকা হইতে ৩য় পঞ্চিকার ১৪শ অধ্যায় পর্য্যন্ত অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

এই যজ্ঞ করিতে হইলে প্রথমে পুণ্যলক্ষণযুক্ত ভূমি অন্বেষণ করিয়া তাহাতে যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণ করা আবশ্যক; কিন্তু শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে, যে কোনস্থলেই এই যজ্ঞ করা যাইতে পারে, যজ্ঞের জন্য পুণ্যভূমি স্থির করিবার আবশ্যক নাই।

"তদ্ধহোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো বার্ষ্ণ্যায় দেবযজনং জীবয়িতুমৈম তৎ সাত্যযজ্ঞোঽব্রবীৎ সর্ব্বা বা ইয়ং পৃথিবী দেবযজনং যত্র বা অস্যৈ ক্বচ যজুষৈব পরিগৃহ্য যাজয়েতি॥" (শত°ব্রা°) অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলিয়াছিলেন, 'আমরা এক সময়ে যজ্ঞোপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করিতেছিলাম। পথিমধ্যে সাত্যযজ্ঞের সহিত দেখা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, সকল স্থানেই যজ্ঞ হয়, তোমার যেখানে ইচ্ছা সেই স্থানেই যজ্ঞানুষ্ঠান কর।'

যজ্ঞস্থান নিরূপণ করিয়া একটী যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। এই মণ্ডপ চতুরস্র, প্রত্যেক দিকে ১২ অরত্নিপ্রমাণ করিয়া হইবে। এই মণ্ডপের চারিদিক তৃণাচ্ছাদিত করা আবশ্যক।

অধীতবেদ ও আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণই এই যজ্ঞের অধিকারী। অন্য ব্রাহ্মণ এই যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে পারিবেন না। এই যাগের প্রধান দ্রব্য সোমরস। দেবতা—ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি। ঋত্বিক্ ইহাতে ষোল জন আবশ্যক। হোতা অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা ও উদ্‌গাতা এই চারিজনের চারি চারিটী দল এই যজ্ঞে ব্রতী হইবেন। উঁহাদের এক এক দলে চারি চারি জন থাকিবেন। যথা—হোতৃদলে হোতা, প্রশাস্তা, অচ্ছাবাক, ও গ্রাবস্তোতা; অধ্বর্য্যু দলে অধ্বর্য্যু, প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা ও উন্নেতা,; ব্রহ্মদলে ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণাচ্ছংশী, অগ্নীধ্র ও পোতা এবং উদ্‌গাতার দলে উদ্‌গাতা, প্রস্তোতা, প্রতিহর্ত্তা ও সুব্রহ্মণ্য এই ষোলজন ঋত্বিক্ অগ্নিষ্টোমে ব্রতী হইবেন। আপস্তম্বে লিখিত আছে যে, ইহাতে সদস্যেরও প্রয়োজন, সুতরাং সদস্যকে লইয়া ১৭ জন ঋত্বিক্ আবশ্যক। এই ১৭ জন ঋত্বিকের মধ্যে চারিজন

প্রধান,—হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা। বাকী সকলে ইঁহাদিগের সাহায্য এবং সদস্য দোষগুণ পরিদর্শন করিবেন। হোতৃদলের প্রশাস্তা, অচ্ছাবাক ও গ্রাবস্তোতা হোতার সাহায্য করিবেন। অধ্বর্য্যুদলের মধ্যে প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা ও উন্নেতা, অধ্বর্য্যুর সাহায্য করিবেন। ব্রহ্মদলের ব্রাহ্মণাচ্ছংশী, অগ্নীতৃ ও পোতা ইঁহারা ব্রহ্মার সাহায্য এবং উদ্গাতৃদলের প্রস্তোতা, প্রতিহর্ত্তা ও সুব্রহ্মণ্য ইঁহারা উদ্গাতার সাহায্য করিবেন। অগ্নিমুখে দেবতার স্তব ও আহ্বান করা হোতার, দেবগণের সন্তোষজনক সামগান করা উদ্গাতার এবং কর্ম্মবিশেষে অনুমতি দেওয়া এবং সকলের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও জপ করা ব্রহ্মার কার্য্য। সাধারণতঃ এই যজ্ঞ পঞ্চাহসাধ্য। ইহা ভিন্ন এই যজ্ঞ বহুদিন ব্যাপিয়াও হইতে পারে। দুই হইতে বার দিন ব্যাপিয়া এই যজ্ঞ হইলে তাহাকে অহীন এবং পক্ষ বা বহুকাল ব্যাপিয়া হইলে তাহাকে সত্র কহে।

প্রথম দিনে দীক্ষা, দ্বিতীয়ে প্রায়ণীয় যাগ, ও সোমলতাক্রয়; উক্ত দুই দিন ও চতুর্থ দিন প্রাতে এবং সায়ংকালে প্রবর্গ্য নামক যাগানুষ্ঠান। এই দিনেই অগ্নিষোমীয় পশু যূপে বন্ধন করা হয়।

যে ব্রাহ্মণের গৃহে পিতা, পিতামহ বা প্রপিতামহ মধ্যে কেহই সোমরস পান করেন নাই, তাঁহার দোষক্ষালনের জন্য ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দেশ্যে পশু আলম্ভন কর্ত্তব্য। এইরূপে তিনটী পশুকেই যুগপৎ যেখানে আলম্ভন করার প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে তিনটীই একই যূপে বন্ধন করিতে হয়। অতঃপর প্রয়োগ আরম্ভ কর্ত্তব্য। এই ব্যাপারে গ্রহপাত্র, চমস এবং স্থালী পাত্ররূপে ব্যবহার্য্য। গ্রহপাত্রগুলি উলূখলের আকারে বিতস্তিমাত্র হইবে। উর্দ্ধপাত্র ও চমস পাত্রের পরিমাণও ঐরূপ। তবে ঐ পাত্রগুলি বক্রাকৃতি ও চতুষ্কোণযুত করিবে। ধারণার্থ উহাতে দণ্ড রাখিবে। স্থালীগুলি মৃত্তিকাময় হইবে। পূর্ব্বোক্ত দিন হইতে সোমলতার রস নিষ্কাসন করিয়া হোম করিতে থাকিবে। ঐ দিন সূর্য্যোদয়ের পরই আগ্নেয় পশুযাগ কর্ত্তব্য।

এইরূপে প্রাতঃসবন সমাপ্তি। অতঃপর মধ্যন্দিন সবন ও দক্ষিণা দান। এই যজ্ঞের দক্ষিণা একশত দ্বাদশ ধেনু। অতঃপর তৃতীয় সবন। এইরূপে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও তৃতীয় সবনরূপ প্রধান যাগ এই অগ্নিষ্টোম। ইহার অন্যান্য অঙ্গযাগও আছে।

মৈত্রী উপনিষদে অগ্নিষ্টোম করিয়া যমরাজ্য জয়ের উল্লেখ আছে।

পাঁচদিনে যে স্থলে এই যজ্ঞ শেষ হয়, সেই স্থলে প্রথম দিনে যজ্ঞদীক্ষা এবং তদঙ্গানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রথমে যজমান ঋত্বিক্ সকলকে বরণ করিবেন। তদনন্তর ঋত্বিক্‌গণ যজমানের হস্ত ধারণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞমণ্ডপে লইয়া গিয়া দীক্ষিত করিবেন। দীক্ষাগ্রহণকালে যজমান অগ্রে ক্ষৌরকার্য্য, স্নান, নববস্ত্র পরিধান ও মাঙ্গল্যদ্রব্য ধারণ করিলে ঋত্বিক্‌গণ দর্ভপিঞ্জলী অর্থাৎ কুশগুচ্ছ লইয়া যজমানের সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জন করিবেন। অনন্তর বেদমন্ত্র পাঠ করিতে করিতে যজ্ঞমণ্ডপের পূর্ব্বদ্বার দিয়া যজমানকে তন্মধ্যে লইয়া যাইবেন; তথায় প্রবেশ করিলে তাঁহাকে যজ্ঞদীক্ষিত করা হয়। এই যজ্ঞদীক্ষা একটী ক্ষুদ্র হোম মাত্র। ইহার নাম দীক্ষণীয় ইষ্টি। এই ইষ্টিতে একাদশটী পুরোডাশ হোম করা হয়। এইরূপে যজমান যজ্ঞদীক্ষিত হইলে প্রথমে অধ্বর্য্যু দেবতা ও মনুষ্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিবেন—"অদীক্ষিষ্টায়ং ব্রাহ্মণঃ"। (তৈত্তি° ৬.১.৪.৩) অনন্তর দীক্ষিত যজমান নিজে প্রায়ণীয়েষ্টি নামক একটী ক্ষুদ্র যাগ করিবেন। এই যাগে চরু পাক করিয়া তদ্দ্বারা অদিতি এবং ঘৃতের দ্বারা অগ্নি, সোম ও সূর্য্যের হোম করিতে হয়। এই ইষ্টি সমাপ্ত হইলেই প্রকৃতপ্রস্তাবে যজ্ঞের আরম্ভ হইল। পরে দ্বিতীয় দিনে প্রায়ণীয় যাগ ও সোমলতা ক্রয় করিতে হয়। এই সোমলতা ক্রয় এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। প্রতিপ্রস্থাতা নামক ঋত্বিক্ উপরব প্রদেশে একখানি বৃষচর্ম্ম বিছাইয়া তাহার উপর কুশ ছড়াইয়া দিবেন। এইস্থলে সোমবিক্রেতা সোমভার স্থাপন করিবে এবং সোমের অংশু সকল পরীক্ষা এবং পরিষ্কার করিতে থাকিবে। পরে যজমান ১৭ জন ঋত্বিকের সহিত আগমন করিয়া তাহা ক্রয় করিবেন। এই সোম মূল্য দিয়া ক্রয় করিলে হইবে না, একটী অরুণবর্ণ, পিঙ্গলচক্ষু, এক বৎসরের গাভী দিয়া ক্রয় করিতে হইবে। [সোম দ্র°] যজমান যথাবিধানে সোম ক্রয় করিয়া যাগগৃহের পূর্ব্বদ্বার দিয়া আনিয়া আহবনীয় নামক অগ্নিকুণ্ডের দক্ষিণ দিকস্থ মৃগচর্ম্মাবৃত কাষ্ঠপীঠের উপর উহা রাখিয়া দিবেন। এই সময় আতিথ্যেষ্টি নামক একটী ক্ষুদ্র যাগ করা হয়। এই যজ্ঞের তাৎপর্য্য এই যে, রাজা সোম যেন গৃহে অতিথি হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার যথোচিত অতিথিসৎকার করা উচিত—এই ভাবেই এই ইষ্টি সম্পন্ন করা হয়।

পরে সোমের বিঘ্নকারী অসুরদিগের পরাভবকামনায় উপসদ নামক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে প্রাতঃ ও সায়ংকালে সোম ও বিষ্ণুদেবতার উদ্দেশে ঘৃতাহুতির দ্বারা হোম করা হয়। এই উপসদ নামক যজ্ঞকার্য্যে আর একটী পৃথক্ বেদী নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। এই বেদীর নাম সৌমিক বেদী। এই বেদী নির্ম্মিত হইলে অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা দুইখানি হবির্ধান শকট উৎকর গর্ত্তে ধুইয়া লইয়া পশ্চিম দ্বার দিয়া মহাবেদীর নিকট আনয়ন করিবেন। পরে হবির্ধান ও সদোমণ্ডপ নামক বেদীও নির্ম্মাণ করিতে হয়।

এই মণ্ডপ দশ অরত্নি প্রমাণ, পূর্ব্বায়ত, নয় অরত্নি দীর্ঘ, চতুরস্র, স্তম্ভসুশোভিত এবং বিশেষ পরিষ্কৃত করা আবশ্যক।

উল্লিখিত সদোমণ্ডপে বা অগ্নিহোত্রশালায় যে সকল বেদী নির্ম্মাণ করা হয়, যাজ্ঞিকগণ এই সকলের নাম ধিষ্ণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। হোতার জন্য ১, মৈত্রাবরুণের ১, প্রশাস্তার ১, ব্রাহ্মণাচ্ছংশীর ১, পোতার ১, নেষ্টার ১, অচ্ছাবাকের ১—এই ৭টী ধিষ্ণ্য সদোমণ্ডপমধ্যে নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

মহাবেদী নির্ম্মিত হইলে বৈসর্জ্জননামক হোম করিতে হইবে। এই হোম সমাধা হইলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের পশু-যাগ আরম্ভ হয়। এই যাগটী সোমযাগের পূর্ব্বাঙ্গ। এই সময়েই প্রাগ্বংশশালায় উত্তরবেদীস্থিত সোমলতা সকল আনীত হইয়া হবির্ধান মণ্ডপে স্থাপিত হয়। পরে অগ্নিষ্টোমীয় পশুকে পবিত্র জলে স্নান, যূপের সম্মুখে পশ্চিমাভি-মুখে স্থাপন, কুশপিঞ্জলীযুক্ত প্লক্ষশাখার দ্বারা মন্ত্রপূত করা হইয়া থাকে। এইরূপ মন্ত্রপূত করার নাম উপাকরণ। সুলক্ষণাক্রান্ত পশুই যজ্ঞে গ্রহণীয়। রুগ্ন, শিশু প্রভৃতি পশু যজ্ঞে ব্যবহৃত হইবে না।

উক্ত পশু যখন মধ্যস্থানে নীত হয়, তখন ঋত্বিকেরা উচ্চৈঃস্বরে বেদমন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন। সংজ্ঞপন অর্থাৎ বধকার্য্য শেষ হইলে পরে পশুর নিম্নলিখিত অংশ সকল কর্ত্তন করিয়া শামিত্র নামক অগ্নিকুণ্ডে পাক করা হয়। অতঃপর বেদমন্ত্র গান করিতে করিতে হৃদয়, জিহ্বা, বক্ষ, যকৃৎ, বৃক্কদ্বয়, বামহস্ত, পার্শ্বদ্বয়, দক্ষিণশ্রোণী, পায়ুনাল, ও বসা প্রভৃতি দ্বারা হোম করিতে হয়। এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া পশুদ্বারা হোম করার নাম অগ্নিষ্টোমীয় পশুযাগ। এই হোমের পর উপবসত নামক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা বিধেয়।

তাহার পরবর্ত্তী দিবসের নাম সুত্যাদিবস। এই দিনে অধ্বর্য্যু প্রভৃতি কৃতস্নান হইয়া প্রথমে হবির্ধান-শকট হইতে সোম আহরণ করিয়া উপসবস্থলে স্থাপন করিবেন। অধ্বর্য্যু এই দিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া হোতাকে প্রেষ-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিবেন। হোতা প্রাতরনুবাক্ পাঠ করিয়া অশ্বিনীকুমারের স্তব করিতে থাকেন। তখন আগ্নীধ্র পুরো-ডাশ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। উন্নেতা সোম-পাত্র সকল সজ্জিত করিতে থাকেন।

অনন্তর হবির্ধান শকটের অক্ষপ্রদেশে দুইখানি ঔর্ণবস্ত্র সোমরস শোধনের জন্য স্থাপন করা হয়, তাহার একখানি প্রাদেশপ্রমাণ এবং দ্বিতীয়খানি অরত্নিপরিমাণ।

পরে হবির্ধান শকটের নিম্নে মৃণ্ময় দ্রোণ সকল স্থাপন করা হয়; এবং উত্তর হবির্ধান শকটের উপরে অন্য দুইটী বৃহৎ কলস রক্ষিত হয়, তাহার একটীর নাম উপভৃত এবং অপরটীর নাম আহবনীয়। পুনরায় উত্তর শকটের নিম্নে ১০ খানি কাষ্ঠময় চমস, এবং ৫টী মৃণ্ময় ঘট স্থাপন করিতে হয়। এই সকল কার্য্য উন্নেতা করিয়া থাকেন।

পরে অধ্বর্য্যুর অনুজ্ঞাক্রমে যজমানপত্নী এবং চমসাধ্বর্য্যু ঘটদ্বারা জল আহরণ করিবেন। পুরুষগণ যে জল আনয়ন করেন, তাহার নাম একধন এবং স্ত্রীদিগের আহৃত জল পান্নেজন নামে অভিহিত। পরে যজমান, প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা এবং অধ্বর্য্যু এই কয়জন ঋত্বিক্ সোমাভিষবফলকের নিকটে উপবিষ্ট হইয়া উপলখণ্ড দ্বারা সোম পেষণ করিবেন। অধ্বর্য্যু পাঁচ মুষ্টি সোম প্রস্তরফলকে স্থাপন করিবেন। প্রতিপ্রস্থাতা ৬টী সোমের অংশু গ্রহণ করিয়া স্বীয় অঙ্গুলীসন্ধিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। পরে সকলে একত্র হইলে তাহা নিষ্কাসন করা হয়। এই সোমরস নিষ্কাসন করার নাম সোমাভিষব।

সোমাভিষব সমাপ্ত হইলে ঋত্বিক্গণ মহাভিষব অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে সোমপেষণ আরম্ভ করেন। এই সোম উত্তমরূপে পিষ্ট হইলে অধ্বর্য্যু তাহাতে তখন জলসেক করিতে থাকেন। এই পিষ্ট সিক্ত সোম পরে আহবনীয় কলসে স্থাপন করিয়া আলোড়ন করা আবশ্যক। পরে তাহা বস্ত্রদ্বারা নিষ্পীড়ন করিয়া লওয়া হয়। সেই রস ক্রমে চমস ও কলসে পূর্ণ করা হয়। এই সময় নানাপ্রকার বেদমন্ত্র পঠিত হইতে থাকে। এই সোম দ্বারা তখন অগ্নিতে হোম করা হয়। অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র, বসু, মিত্র, বরুণ, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে হোম হইয়া থাকে।

এইরূপে সোমদ্বারা আহুতি শেষ হইলে ঋত্বিক্, যজমান প্রভৃতি যজ্ঞাবশিষ্ট সোম পান করিয়া কৃতকৃতার্থ হইবেন। ঋত্বিক্ ও যজমানের সোমপান-বিধান একরূপ নহে।

উক্তরূপে সোমপান শেষ হইলে এই যজ্ঞ এক প্রকার সম্পন্ন হয়। তখন যজমান পূর্ব্বোল্লিখিত সদোমণ্ডপে গিয়া ঋত্বিক্গণকে দক্ষিণা দিবেন।

অগ্নিষ্টোমসাম—(ক্লী) অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের শেষে বিহিত সামগান-বিশেষ।

অগ্নিষ্ঠ—(পুং) অগ্নৌ স্থাতুমর্হতীতি অগ্নি-স্থা-ক ষত্ব। যাহা অগ্নির উপর থাকিতে পারে, ভর্জ্জনপাত্র। ২ লোহার খোলা। ৩ খই ভাজিবার কড়া ইত্যাদি।

অগ্নিষ্বাত্ত—[অগ্নিস্বাত্ত দ্রঃ]

অগ্নিসংস্কার—(পুং) বিধিপূর্ব্বক অগ্নিদ্বারা সংস্কার; শবদাহ। মনুর বিধি এই যে, যাহার দুই বৎসর বয়স পূর্ণ হয় নাই, তাহার অগ্নিসংস্কার করিবে না। (মনু ৫.১৬৯)

অগ্নিসখ—(পুং) (উদ্দীপনহেতু) অগ্নির বন্ধু ; বায়ু। ২ ধূম। ৩ ধূম্রবর্ণ পারাবত।

অগ্নিসঙ্কাশ—(ত্রি) অগ্নিতুল্যবর্ণ, অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী। ২ অগ্নির ন্যায় তেজ বা পরাক্রমশালী। "মকারশ্চাগ্নিসঙ্কাশঃ" (ব্রহ্মবিন্দু উপ° ৯)

অগ্নিসৎকার—(পুং) অগ্নি দ্বারা শবদাহ।

অগ্নিসন্দীপন—(ক্লী) [বৈদ্যক] যে ঔষধ সেবন দ্বারা জঠরানল বৃদ্ধি হয় ; ক্ষুধাবৃদ্ধিকর ঔষধ। ২ অগ্নি সন্দীপিত করা।

অগ্নিসন্দীপনরস—[বৈদ্যক] ক্ষুধামান্দ্যরোগের ঔষধ। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, পঞ্চলবণ, সোরা, সাচিক্ষার, সোহাগা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যবানী, বচ, মৌরী, হিং, জায়ফল, কুড়, জয়িত্রী, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাচ, তেঁতুলছাল ভস্ম, আপাঙ্গ ভস্ম, বিষ, পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ, লবঙ্গ, হরীতকী—প্রত্যেক এক এক ভাগ ; অম্লবেতস ২ দুই ভাগ, শঙ্খভস্ম ৪ চারি ভাগ। একত্র করিয়া পঞ্চকোল, চিতামূল এবং আপাঙ্গের কাথে ও অম্ললোনীর রসে ৩ তিন বার, এবং নেবুর রসে ২১ একুশবার ভাবনা দিয়া কুলের মত বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান, অবস্থাভেদে মৌরীর জল, আমরুল রস, কর্পূরের জল। ইহাতে অজীর্ণ ও ক্ষুধামান্দ্যরোগ নষ্ট হয়।

অগ্নিসমাবেশ—(পুং) অগ্নিস্থাপনরূপ যজুর্ব্বেদোক্ত প্রক্রিয়া-বিশেষ। দেবযজনার্থ যজ্ঞভূমিতে সমাগত হইয়া ঋত্বিক্কর্ত্তৃক অরণিসংঘর্ষণদ্বারা অগ্নিসমারোপণ।

অগ্নিসম্ভব—(পুং) অরণ্যকুসুম্ভ। (ক্লী) ২ স্বর্ণ। (ত্রি) ৩ অগ্নি হইতে উৎপন্ন বস্তুমাত্র। (পুং) ৪ উর্জ্জা নামক অপ্সরা হইতে জাত দেবগণ।

অগ্নিসহায়—(পুং) বায়ু। ২ ধূম। ৩ বনকপোত।

অগ্নিসাক্ষিক—(ত্রি) যে কার্য্য অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া সম্পন্ন করা হয়।

অগ্নিসাৎ—(ত্রি) অগ্নীভূত, যাহা সমস্তই অগ্নি হইয়া গিয়াছে বা যাইতেছে।

অগ্নিসাদ—(পুং) [বৈদ্যক] জঠরাগ্নির অবসাদ, অগ্নিমান্দ্য। (সুশ্রুত)

অগ্নিসার—(ক্লী) রসাঞ্জন।

অগ্নিসিংহ—(পুং) সপ্তম কৃষ্ণ বাসুদেবের পিতা। (জৈনত°)

অগ্নিসুন্দররস—(পুং) অজীর্ণাধিকারে রসৌষধিবিশেষ।

অগ্নিস্তম্ভ—(পুং) অগ্নির দাহিকাশক্তি-নিবারক মন্ত্রবিশেষ। ২ অগ্নিতাপনাশের প্রক্রিয়াবিশেষ। বেলের আটা এবং জোঁক একত্র বাটিয়া হস্তে লেপন করিলে অল্প আগুনে হাত দগ্ধ হয় না। বচ, মরিচ, কুড়, মুণ্ডীর এবং নাগরমুথা চর্ব্বণ করিয়া মুখে আগুন রাখিলে মুখ দগ্ধ হয় না। প্রথমে কর্পূর কিম্বা আকরকরা চিবাইয়া কসে রাখিবে। তাহার পর হাল্কা কাঠের অঙ্গার মুখে রাখিলে জিহ্বাদি পুড়িয়া যায় না।

পারা অর্দ্ধ ছটাক, কর্পূর এক কাঁচ্চা, আর্মেনিক বোল এক ছটাক এই তিনটী দ্রব্য উত্তমরূপে একত্র পেষণ করিবে। পরে সেই দ্রব্য হস্তে মাখাইয়া গলিত সীসার মুচিতে অঙ্গুলি ডুবাইলে হাত পুড়িয়া যায় না। একগাছি সূতা আগে লবণের সঙ্গে উত্তমরূপে মাজিয়া শুষ্ক করিতে হয়। শুকাইলে তাহার একদিকে কোন একটী হাল্কা দ্রব্য বাঁধিয়া অগ্নি দিলে সূত্রটী পুড়িয়া যায়, কিন্তু সূত্রের ভস্মে সেই হাল্কা দ্রব্য ঝুলিতে থাকে।

কোন কোন যোগী হস্তের উপর অশ্বত্থপত্র বিছাইয়া হোম করেন। জ্বলন্ত অঙ্গার হু হু করিয়া পুড়িতে থাকে, ঘৃতের আহুতি দিলে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু হাত পুড়িয়া যায় না। এই প্রক্রিয়ার গূঢ় কৌশল কি তাহা ঠিক প্রকাশ নাই। অগ্নিস্তম্ভের যে কয়েকটী কৌশল প্রকাশিত আছে, তাহাতে প্রখর অগ্নির তেজ সহ্য হয় না।

আফিম, ফট্‌কিরি, সম্বর লবণ, কতিরাগঁদ, কুক্কুটের ডিম্বের খোসা ও পারদ, সির্কার সঙ্গে একত্র পিষিয়া হস্তে মাখাইবে। তাহার উপর অশ্বত্থপত্র বিছাইয়া হোম করিলে আর আগুনের তাপ লাগে না। কেহ কেহ বলেন, সোনাবেঙ্গের মস্তিষ্ক হস্তে মাখাইয়া হোম করিলে হাত পুড়িয়া যায় না।

৩ অগ্নির দাহিকাশক্তি-নিবারক যন্ত্রবিশেষ। [অগ্নিযন্ত্র দ্র°]

অগ্নিস্তম্ভন—(ক্লী) [অগ্নিস্তম্ভ দ্র°]

অগ্নিস্থাপনা—(স্ত্রী) বিধিপূর্ব্বক অগ্নি রক্ষা করা।

অগ্নিস্বাত্ত, অগ্নিষ্বাত্ত—(পুং) অগ্নিতঃ আত্তং, গ্রহণং যেষাং বহুব্রী° অগ্নি-সু-আ-দা-ক্ত। অগ্নিকর্ত্তৃক সম্যক্ আত্ত ; যাঁহারা শ্রৌত ও স্মার্ত্ত অগ্নিকর্ত্তৃক ভক্ষিত ; শ্রাদ্ধীয় বিপ্রকররূপ অনল হইতে যাঁহাদের সম্যক্ গ্রহণ। মরীচিপুত্র পিতৃগণবিশেষ। পিতৃগণের মধ্যে সাকার ও নিরাকার ভেদে সাতটী শ্রেণী আছে, তন্মধ্যে অগ্নিষ্বাত্ত প্রথম। মরীচির ঔরসে ইঁহাদের জন্ম। ইঁহারা ব্রহ্মার পৌত্র। চন্দ্রলোকে ইঁহারা বাস করেন। তর্পণকালে সর্ব্বাগ্রে এই অগ্নিস্বাত্ত পিতৃগণের সন্তোষবিধান করিয়া পরে পিতৃ-পিতামহের তর্পণ করিতে হয়। ২ ব্রহ্মার পুত্রগণ। ইঁহাদের অগ্নি উদ্ভব করিবার শক্তি নাই। কারণ শ্রুতিতে লিখিত আছে, যে সকল গৃহী যজ্ঞ না করিয়া পিতৃগণকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পূজা গ্রহণ করিয়া ইঁহারা অনগ্নি হইয়াছেন।

মাধবাচার্য্যের মতে, মনুষ্যজন্মে যাঁহারা অগ্নিষ্টোমাদি করেন

নাই, কেবল স্মার্ত্ত কর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহারাই মৃত্যুর পরে অগ্নিস্বাত্তপিতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অগ্নিস্বামী—(পুং) মানবকল্পসূত্রের টীকাকার ও লাট্যায়ন-শ্রৌতসূত্রের ভাষ্যকার।

অগ্নিহুৎ—(পুং) অগ্নি-হু-ক্বিপ্। অগ্নিহোত্রী।

অগ্নিহোত্র,—(ক্লী) অগ্নি-হু-ত্র, অগ্নয়ে হূয়তে অত্র। ৪ তৎ। যজ্ঞবিশেষ। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণের একটী আখ্যায়িকায় অগ্নিহোত্র শব্দের নিরুক্তি এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়—এক সময় অগ্নি ভীত হইয়া পলায়নে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভাবনা হইয়াছিল—প্রজাপতি পুনঃ পুনঃ আহুতি দ্বারা আমাকে লাভ করেন; কিন্তু আমাকে তো ভাগ প্রদান করেন না। যে সকল আহুতি আমাকে প্রদত্ত হয়, তাহা দেবতারাই গ্রহণ করেন। সুতরাং ভাগরহিত হইয়া আমি সেবা করিতে পারিব না।

এইরূপ বিচার আলোচনা করিয়া অগ্নি পূর্ব্বের ন্যায় আর পলাইলেন না; তিনি একেবারে প্রজাপতির দেহেই প্রবেশ করিলেন। প্রজাপতি অগ্নিকে জন্মিবার জন্য বার বার বলিতে লাগিলেন। অগ্নি প্রজাপতির উদরে থাকিয়াই উত্তর করিলেন,—'আমি ভাগরহিত হইয়া ক্ষুধায় কষ্ট পাই। এ অবস্থায় সেবা করিতে আমি অক্ষম। আমার একটা ভাগ নাই। আমি কি ভাগ অবলম্বন করিয়া জন্ম লইব?'

অগ্নির কথায় প্রজাপতি বলিলেন—'এই অগ্নিহোত্রগত হবি তোমাকেই দেওয়া হইবে।' এই বলিয়া প্রজাপতি অগ্নির ভাগ নির্দ্দেশ করিয়া দেন। তখন অগ্নি সেই অগ্নিহোত্র-হবিঃস্বরূপ ভাগ উপলক্ষ্য করিয়া উৎপন্ন হন।

এইজন্যই "অগ্নিতে হোত্র বা হোম করা হয় এই কর্ম্মে" এই বহুব্রীহিগত ব্যুৎপত্তি অনুসারে এই কর্ম্মের নাম অগ্নিহোত্র।

এই অগ্নিহোত্রযজ্ঞ যদিও কেবল যজুর্ব্বেদেই বিহিত হইয়াছে, তথাচ ইহা সকল বেদীরই কর্ত্তব্য। ছন্দোগপরিশিষ্টে ইহা স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—

"যন্নাম্নাতং স্বশাখায়াং পারক্যমবিরোধিচ।
বিদ্বদ্‌ভিস্তদনুষ্ঠেয়ং অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মবৎ॥"
(ছন্দোগপরি° কাত্যায়ন)

অগ্নিহোত্র দ্বিবিধ;—কাম্য এবং নিত্য। কাম্য—এক মাসে উদ্‌যাপনীয়। নিত্য যাবজ্জীবন অনুষ্ঠেয়। যাবজ্জীবন এই যাগ করিতে হইলে প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে হোম করা আবশ্যক। অগ্নিহোত্র যজ্ঞের স্থূল স্থূল প্রকরণ এই,—অন্ধ, বধির এবং পঙ্গুর পক্ষে এই যাগ নিষিদ্ধ। বিবাহের পর ব্রাহ্মণেরা বসন্তকালে, ক্ষত্রিয়জাতি গ্রীষ্মকালে এবং বৈশ্যজাতি শরৎকালে বিহিত মন্ত্রদ্বারা অগ্নিস্থাপন করিবেন। তাহার পর হোম। হোমের উপকরণ দুগ্ধ, দধি, যবাগূ, ঘৃত, অন্ন, তণ্ডুল, সোমরস, মাংস, তৈল, মাষকলায়। কলিযুগে সোমরস পাওয়া যায় না, সোমলতা কি, তাহাও কেহ জানেন না। সেজন্য এযুগে সুলভ দুগ্ধ, তণ্ডুল ও যবাগূ প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারাই যজ্ঞানুষ্ঠান হইয়া থাকে। প্রথমদিন যে দ্রব্য লইয়া যজ্ঞের সঙ্কল্প করিয়া বসিবে, জীবনাবধি সেই দ্রব্য দ্বারাই হোম করা বিহিত। অমাবস্যার রাত্রিতে যজমান নিজে যবাগূ দিয়া হোম করিবেন। অন্য দিনে, ঋত্বিক্ স্বয়ং করুন কিম্বা যজমানদ্বারা করুন, তাহাতে প্রত্যবায় নাই। অগ্নিহোত্রহোম আরম্ভদিন হইতে যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য। যে দিনে অগ্নিস্থাপন করা হয়, সেইদিন সায়ংকালে প্রথম হোম আরম্ভ কর্ত্তব্য। এইরূপে শত হোম সমাপ্ত হইলে প্রাতে সূর্য্যদেবতার এবং সন্ধ্যাকালে অগ্নিদেবতার হোম করিবে। অগ্ন্যাধানের পর প্রথম পূর্ণিমাতে দর্শপৌর্ণমাসযাগ আরম্ভ করা আবশ্যক। তাহার মধ্যে পৌর্ণমাসীতে তিনটী এবং অমাবস্যাতে তিনটী দর্শপৌর্ণমাসের এই ছয় যজ্ঞ। এ গুলির অনুষ্ঠানও যাবজ্জীবন করিতে হয়। মনুর মতে, যাবজ্জীবন-সাধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দারগ্রহণান্তে যথাক্রমে বসন্ত, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে অগ্নিত্রয় যথাবিধি স্থাপন করিয়া তাহাতে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, যবাগূ ইত্যাদি দশবিধ দ্রব্যে হোম করিবেন। জীবনান্তে যাগকর্ত্তার দেহ এই অগ্নিতে দগ্ধ করিতে হইবে।

শতপথব্রাহ্মণে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের এইরূপ ফল কথিত হইয়াছে—অগ্নিহোত্র যাজ্ঞিকেরা লোকান্তরে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাতে ভোজন করেন, দর্শপূর্ণমাসযাজীরা পক্ষান্তে, চাতুর্মাস্য-যাজীরা চারি মাসান্তর; পশুবন্ধযাজীরা ছয় মাস অন্তর; সোম-যাজীরা সম্বৎসরে; এবং অগ্নিচিৎরা শতবর্ষান্তর আপন ইচ্ছামত ভোজন করেন। এই সকল যাজ্ঞিক এক প্রকার অমরত্ব লাভ করিয়া থাকেন। চার্ব্বাকমতাবলম্বী বৃহস্পতি এই অগ্নিহোত্র ব্যাপারটাকে বুদ্ধি-পৌরুষহীনদিগের একটা জীবিকা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

"অগ্নিহোত্রং এয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডো ভস্মধারণং।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ॥" (চার্ব্বাকমত)

২ যজ্ঞের অগ্নিরক্ষণ, অগ্ন্যাধান। ৩ শ্রৌত ও স্মার্ত্ত অগ্নি। ৪ অগ্নিসংরক্ষণ স্থান, অগ্নিকুণ্ড। ৫ হোমদ্রব্য। ৬ ঘৃত। ৭ (ত্রি) অগ্নিসম্বন্ধীয়।

অগ্নিহোত্র$_2$—যজ্ঞদেবভেদ। সবিতৃদেবের ঔরসে ও পৃশ্নির গর্ভে ইঁহার জন্ম (ভাগবত)।

অগ্নিহোত্র$_{৩}$—বেহারের বাভনজাতির একটী থাক।

অগ্নিহোত্রভট্ট$_{১}$—জয়দেবের তত্ত্বচিন্তামণ্যালোক নামক গ্রন্থের টীকাকার।

অগ্নিহোত্রভট্ট$_{২}$—শ্রৌতক্রিয়ানুষ্ঠান নামক গ্রন্থের রচয়িতা।

অগ্নিহোত্রসূরি—তত্ত্ববিবেচনী নামে অদ্বৈতরত্নকোষের টীকাকার।

অগ্নিহোত্রহবনী—(স্ত্রী) ৬-তৎ। অগ্নিহোত্রের হব্য গ্রহণের ঋগ্মন্ত্র বিশেষ।

অগ্নিহোত্রহুৎ—(পুং) অগ্নিহোত্র-হু-ক্বিপ্ ভূতে। ৬-তৎ। কৃতাগ্নিহোত্র।

অগ্নিহোত্রহোম—(পুং) অগ্নিহোত্রীর অবশ্যকরণীয় হোম। [অগ্নিহোত্র দ্র°]

অগ্নিহোত্রিন্—(পুং) অগ্নিহোত্র-ইন্। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অতিশয় ব্যয়সাপেক্ষ এবং অগ্নিহোত্রিগণকে অত্যন্ত কঠোর নিয়ম ও আচার প্রতিপালন করিতে হয়। ইত্যাদি কারণে অগ্নিহোত্রীর সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। পঞ্চগৌড়ীয় ব্রাহ্মণের মধ্যে অগ্নিহোত্রী নাই বলিলেই চলে; পঞ্চ দ্রাবিড় অথবা দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আজও অগ্নিহোত্রী দৃষ্ট হয়। অগ্নিহোত্রিগণকে যে সকল আচার পালন করিতে হয়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত রীতি সকল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (১) তাঁহারা গৃহ হইতে দীর্ঘকাল স্থানান্তরে থাকিতে পারেন না এবং ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবার রীতি নাই; (২) গৃহজাত দ্রব্য ভিন্ন অন্য বস্তু বিক্রয় করিবার রীতি নাই; (৩) অতিরিক্ত মাত্রায় সাংসারিক হওয়া দোষ; (৪) সর্ব্বদা সত্য কথা বলা; (৫) স্নানান্তে প্রত্যহ প্রাতে এবং সন্ধ্যায় দৈনন্দিন পূজা করা; (৬) প্রতিপক্ষে মৃত পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান; (৭) রাত্রিতে আহার না করা; (৮) মধু, মাংস প্রভৃতি ভোজন না করা; (৯) শয্যায় শয়ন না করিয়া ভূমিতে শয়ন; (১০) অধিকাংশ রাত্রি জাগরণ করিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করা; (১১) নিজের স্ত্রী ভিন্ন পরস্ত্রীর সম্বন্ধে কোনরূপ অসৎ চিন্তা না করা এবং (১২) কোনরূপ কুকার্য্যদ্বারা নিজের চরিত্র মলিন না করা।

সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর অগ্নিহোত্রী দেখিতে পাওয়া যায়,—(১) পুরুষানুক্রমিক অগ্নিহোত্রী; (২) যাঁহারা উপনয়নের সময় হইতে সাগ্নিক হইয়াছেন; এবং (৩) যাঁহারা অধিক বয়সে সাগ্নিক হইয়াছেন। উপনয়নের সময় হইতেই অগ্নিরক্ষা করা কর্ত্তব্য; কিন্তু যাঁহারা অধিক বয়সে সাগ্নিক হন, তাঁহাদিগকে প্রাজাপত্যব্রত অনুষ্ঠানপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া অগ্নিহোত্রী হইতে হয়; অথবা উপনয়নের সময় হইতে যত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণকে ততগুলি গাভী দান করিতে হয়।

অগ্নিহোত্রিগণের গৃহের একটী স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে একটী কুণ্ডের মধ্যে হোমাগ্নি রক্ষিত হয়; ইহার নাম হবনীয় কুণ্ড। পরিবারবর্গের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে, তাহাকে দাহ করিবার জন্য আর একটী স্বতন্ত্র কুণ্ড হইতে অগ্নি লওয়া হয়। এই কুণ্ডের নাম দগ্ধকুণ্ড। তদ্ভিন্ন রন্ধনাদি গৃহকার্য্যের জন্য একটী তৃতীয় কুণ্ডে অগ্নি রক্ষিত হয়। ইহার নাম গার্হপত্য।

প্রতি অমাবস্যায় অগ্নিহোত্রিগণ পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন বর্ষার চারিমাস তাঁহারা প্রতি সংক্রান্তিতে শ্রাদ্ধ এবং প্রত্যহ হোম করেন।

পার্ব্বত্যপ্রদেশের অগ্নিহোত্রিগণের আচারব্যবহার কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। ইঁহারা অধিকাংশই সামবেদী। ইঁহারা বিবাহের দিন হইতে অগ্নির উপাসক হন। বিবাহ-সময়ে যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নি প্রজ্বালিত হয়, তাহাই তাম্রপাত্রে গৃহে আনীত হইয়া কুণ্ডে রক্ষিত হইয়া থাকে। ক্রমাগত ইন্ধন-প্রয়োগে এই অগ্নি জ্বালিয়া রাখা হয় এবং অগ্নিহোত্রীর মৃত্যু হইলে এই অগ্নিদ্বারা তাঁহার দাহ হইয়া থাকে।

অগ্নিহোত্রীরা দিবসে তিনবার স্নান করেন এবং একবার মাত্র আহার করেন। ইঁহারা মাংস, মসুর প্রভৃতি নিষিদ্ধ বস্তু ভোজন করেন না; কখনও জুতা ব্যবহার করেন না; প্রতিদিন ঘৃত ও চাউলদ্বারা হোম করিয়া থাকেন এবং হোমের সময় সামবেদীয় মন্ত্র সকল আবৃত্তি করেন। ইঁহারা সাধারণতঃ অপরাহ্ণে ভোজন করেন এবং ভোজন করিবার পূর্ব্বে প্রতিদিন একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করান। সাধারণতঃ জ্যেষ্ঠপুত্রই পিতার মৃত্যুতে অগ্নিহোত্রী হইয়া থাকেন, কিন্তু অন্যান্য সন্তানেরাও ইচ্ছা করিলে সাগ্নিক হইতে পারেন। যদি কোনক্রমে যজ্ঞিয় অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, তাহা হইলে অন্য কোন অগ্নিহোত্রীর কুণ্ড হইতে অগ্নি আনীত হইয়া থাকে, অথবা অরণিদ্বারা শমীকাষ্ঠ হইতে অগ্নি উৎপাদন করা হইয়া থাকে। এক্ষণে প্রকৃত অগ্নিহোত্রী আর নাই। উত্তরপশ্চিমাঞ্চল এবং মিথিলাদি স্থান হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায়ে অগ্নিহোত্রের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। ইহাঁরা যজ্ঞাগ্নি রক্ষা করেন না; কিন্তু যে অগ্নিতে মৃতব্যক্তির অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হয়, তাঁহারা দশ দিন পর্য্যন্ত সেই চিতানল রক্ষা করেন। দশম দিবসে শ্মশানে গিয়া বিধিপূর্ব্বক চিতায় কুশ ও পিণ্ড দিয়া তাহার পর অগ্নি নিবাইয়া দেন। বোম্বাইয়ের পারসীরা অগ্নির পূজা করেন। অনে-

কের বিশ্বাস এই যে, তাঁহারা পুরাতন আর্য্যবংশের শাখা প্রশাখা। [পারসিক শব্দ দ্র°]

অগ্নীধ্—(পুং) অগ্নি-ইন্ধ-ক্বিপ্ ভাবে। ৬-তৎ। অগ্নির উদ্দীপন। কর্ত্তরি ক্বিপ্। ২ অগ্ন্যাধানকর্ত্তা।

অগ্নীধ্র—(পুং) অগ্নিম্ আদধাতি, অগ্নি-ধৃ-ক, দীর্ঘঃ। ঋত্বিগ্ বিশেষ। যজ্ঞিয় অগ্নিরক্ষাই ইঁহার কার্য্য। ২ প্রিয়ব্রত রাজার পুত্র। ইনি আপনার অংশে জম্বুদ্বীপ পাইয়া তথাকার রাজা হইয়াছিলেন (বিষ্ণুপু° ২.১.১২)। ভাগবতে ইঁহার নাম আগ্নীধ্র লিখিত হইয়াছে। ৩ স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র রাজবিশেষ। সম্প্রদানে ক, ৪ অগ্নিকৃত্য হোমাদি।

অগ্নীধ্রা—(স্ত্রী) অগ্নিকার্য্য। ঘৃতাহুতির পর অগ্নিজ্বালন।

অগ্নীন্দ্র—(পুং) অগ্নিশ্চ ইন্দ্রশ্চ দ্বন্দ্ব। দ্বিবচনান্ত। অগ্নি ও ইন্দ্র নামে দেবতাদ্বয়। ইঁহারা এক হবিঃ পান করেন।

অগ্নীন্ধন—(ক্লী) অগ্নিপ্রজ্বালন-মন্ত্রবিশেষ। ভাবে ল্যুট্। ২ ঘৃতাহুতি প্রভৃতি দ্বারা অগ্নিপ্রজ্বালন। ৩ অগ্নির দীপ্তিবিধান। ৪ সায়ংপ্রাতঃ সমিধ্-হোম। (মনু ২.১০৮)

অগ্নীয়—(ত্রি) অগ্নি-ছ। অগ্নির নিকটস্থ স্থান। ২ অগ্নিসম্বন্ধীয়।

অগ্নীলা—(স্ত্রী) স্ত্রীদেবতাভেদ। (ঋক্ ৩.২৯.৯)

অগ্নীবরুণ—(পুং) অগ্নিশ্চ বরুণশ্চ, দ্বন্দ্ব। দ্বিবচনান্ত। ঈদগ্নেঃ সোমবরুণয়োঃ। পা ৬.৩.২৭। একত্র এক হবিঃপায়ী দেবদ্বয়—অগ্নি ও বরুণ।

অগ্নীষোম—(পুং) অগ্নিশ্চ সোমশ্চ, দ্বন্দ্ব। দ্বিবচনান্ত। এক হবির্ভোক্তা দেবদ্বয়—অগ্নি ও সোম। [অগ্নীবরুণ দ্র°]

অগ্নীষোমপ্রণয়নী—(স্ত্রী) অগ্নীষোমৌ প্রণীয়েতে সংস্ক্রিয়েতে অনয়া অত্র বা নী-করণে আধারে বা ল্যুট্, ঙীপ্। অগ্নি ও সোমসংস্কারক মন্ত্র। ২ ঐ দেবদ্বয়ের সংস্কারক পাত্র। ভাবে ল্যুট্, ৬-তৎ। ৩ অগ্নি ও সোমের সংস্কার।

অগ্নিষোমীয়—(ত্রি) অগ্নি ও সোমদেবতাক পশু প্রভৃতি। ২ কপালরূপ পাত্রাদিতে সংস্কৃত হবির্বিশেষ।

অগ্নীষ্টক—অগ্নি-ইষ্টক ; (Fire-brick) একপ্রকার ইষ্টক। কারখানার যেখানে সর্ব্বদা আগুন জ্বলে, ইহা সেই স্থানের বিশেষ উপযোগী। অন্যান্য ইটের মত ইহা দিবারাত্র আগুনে পুড়িয়া শীঘ্র নষ্ট হয় না। এই জন্যই ইহার এত আদর ও মূল্য। অন্য ইটের মত সকল প্রকার মাটীতেই ইহা প্রস্তুত হয় না। যে মৃত্তিকায় শতকরা সিলিকা ৪০ ভাগ, আলুমিনা ৩৭ ভাগ, ম্যাগনেসিয়া ২ ভাগ ও পটাশ ৯ ভাগ, জল ১২ ভাগ আছে, তাহাতেই ইহা প্রস্তুত হয়। এই সকল দ্রব্য কয়লার খাদের নিকটেই পাওয়া যায়। কলিকাতার বরন্ এণ্ড কোম্পানির রাণীগঞ্জের নিকটস্থ কারখানায় এই ইট প্রস্তুত হইত।

অগ্নেয়ী—(স্ত্রী) কোপনস্বভাব ঋষি অগ্নিশর্ম্মার পত্নী। অঙ্গ, সুমনস, ক্রতু, স্বাতি, অঙ্গিরা ও শিব নামে ইঁহার ছয় পুত্র।

অগ্নেস্, সেণ্ট—(St. Agnes) ক্যাথলিক খৃষ্টীয়গণের একজন কুমারী সেণ্ট। প্রতিবৎসর ২০এ ও ২১এ জানুয়ারী তারিখে ইঁহার উদ্দেশে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। খৃষ্টীয় কুমারীগণ ঐ উপলক্ষে ইঁহার পূজা করেন ও ইঁহার নিকট অভিলষিত পতি প্রার্থনা করিয়া থাকেন। ইঁহার চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ প্রচার করিয়া ইঁহাকে পুড়াইয়া মারিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, কিন্তু দৈবকৃপায় কোনক্রমে কাঠ জ্বালিতে না পারায় ঘাতক তরবারি দ্বারা ইঁহার শিরশ্ছেদ করে। ৩০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

অগ্নেসি, মেরিয়া গীতানা—(Agnesi, Maria Gaetana) ইটালীর প্রসিদ্ধা বিদুষী মহিলা (১৭১৮-১৭৯৯ খৃঃ অঃ)। অতি অল্প বয়সেই ইনি ইউরোপের প্রায় সকল ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি দুরূহ দার্শনিকতত্ত্ব ও উচ্চগণিতের কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন। সেগুলি ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে। মেরিয়ার পিতা বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপকপদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে মেরিয়া সেই পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শেষজীবনে মেরিয়া ধর্ম্মচর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করেন।

অগ্ন্যগার—(ক্লী) অগ্নেঃ অগারং ৬-তৎ। অগ্নিহোত্রগৃহ, অগ্নিশালা। (রঘু ৫.২৫)

অগ্ন্যস্ত্র—(ক্লী) অগ্ন্যুৎপাদকমস্ত্রম্, শাক-তৎ। আগ্নেয় অস্ত্র। কামান, বন্দুক, পূর্ব্বকালের অগ্নিবাণ।

অগ্ন্যস্ত্র কি, এখন সে কথার কিছুই ঠিক বলা যায় না। বায়ব্যাস্ত্র, বরুণাস্ত্র, সর্পবাণ, গরুড়বাণ এই রূপ অনেক অস্ত্রের বৃত্তান্ত মহাভারত ও রামায়ণে লেখা আছে। কেহ কেহ বলেন, এ সকলিই মিথ্যা—কবিদের কল্পনা বৈ আর কিছুই নয়। কিন্তু আগাগোড়া সকলই কল্পনা হইতে পারে না। সেকালে আর্য্যেরা বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনেক জটিল বিষয় বুঝিয়াছিলেন। তাই বোধ হয়, এখনকার বারুদ ও বিস্ফোরকের মত দাহ্যপদার্থ দ্বারা তাঁহারা কোন ভয়ঙ্কর অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। সেদিন পর্য্যন্ত হিন্দু, গ্রীক্ এবং মুসলমানেরা যুদ্ধক্ষেত্রে সর্প, বৃশ্চিক এবং আগুন ব্যবহার করিতেন, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহম্মদ সুবক্তগীনের ইতিবৃত্ত 'কিতাব-ই-য়ামীনী' নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বকালে শত্রুদের মধ্যে সর্প ও বৃশ্চিক ফেলিয়া দিয়া যুদ্ধ করা হইত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে দুর্য্যোধন আপন পক্ষের শিবির রক্ষা করিবার জন্য সেনাদের হাতে সর্প, বৃশ্চিক, বালি ও তৈল দিয়া

রাখিয়াছিলেন। তারিখ্-ই-আল্‌ফী পুস্তকেও লিখিত আছে যে, মহম্মদের মৃত্যুর সাত বৎসর পরে, ওমারের রাজত্বকালে, নাসিবিন্ নগর আক্রমণের সময় শত্রুদের মধ্যে কাল কাল বিছা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পূর্ব্ববাঙ্গালার চোরেরা যাত্রীদের নৌকায় সাপ ও আগুন ফেলিয়া দিত। যাত্রীরা শশব্যস্ত হইলে তাহাদের সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইত। তাই বোধ হইতেছে, সর্প, অগ্নি প্রভৃতি ভয়ানক দ্রব্য দূর হইতে শত্রুর মধ্যে ছুড়িয়া ফেলিবার কোন রকম কৌশল আর্য্যেরা জ্ঞাত ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, অগ্ন্যস্ত্র কামান কিম্বা বন্দুক হইবে। রাজপুতানার লোকে বন্দুককে অগ্নিবাণ কহে। বিলাতে রিভল্‌বারের সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে রাজপুতানার লোকেরা রিভল্‌বার গড়িতে জানিত, তাহারও প্রমাণ আছে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার মেলায় রাজপুতানা হইতে একটী চারিনলা বন্দুক আসে। সেই রিভল্‌বার বন্দুকটী চারিশত বৎসরেরও অধিক পুরাতন। তাই কোন কোন লোকের বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষে বন্দুক, কামান ও গোলা-গুলি বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এ অনুমান কত দূর সঙ্গত, ঠিক বলা যায় না। কিন্তু প্রাচীন আর্য্যেরা তীরের ফলায় অগ্নি ও এখনকার ডাইনেমাইটের মত কোন ভয়ানক দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

"ন কুটৈরায়ুধৈর্হন্যাৎ যুধ্যমানো রণে রিপূন্।
ন কর্ণিভির্নাপি দিগ্ধৈর্নাগ্নিজ্বলিততেজনৈঃ॥" (মনু ৭.৯০)

রাজা কখন কুটাস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিবেন না, কর্ণ্যস্ত্র দিয়াও যুদ্ধ করিবেন না, কিম্বা যে বাণের ফলা বিষাক্ত বা যাহাতে অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে, তেমন অস্ত্র দিয়া শত্রুকে আঘাত করিবেন না।

মনুর এই বচন দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে, অগ্ন্যস্ত্র কেবল কবিদের কল্পনা নহে। কল্পনা হইলে মনু তাহার জন্য কখন একটা নিষেধবিধি করিতেন না। অগ্ন্যস্ত্র সকলের প্রতি নিক্ষেপ করিতে নাই। রাক্ষস প্রভৃতি যাহারা প্রবল শত্রু, আর্য্যেরা তাহাদিগকেই অগ্নিবাণ মারিতেন। তবে যুদ্ধের সময় ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কোন কোন বীর মানুষকেও অগ্নিবাণ মারিয়াছেন, মহাভারতে তাহার প্রমাণ আছে।

প্রথমে মানুষ অগ্নিদ্বারা আপনাকে রক্ষা করিতে ও শত্রুকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করিত। কেহ গ্রাম কিংবা দুর্গ আক্রমণ করিলে আততায়ীদের মাথায় পাথর ও আগুন ফেলিয়া দেওয়া হইত। ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে তৈমুরলঙ্গ দিল্লী আক্রমণ করেন। তিনি ভারতবর্ষীয় গজযূথকে ভয় দেখাইবার জন্য উটের পৃষ্ঠে তৃণরাশি জ্বালিয়া শত্রুদের দিকে তাড়াইয়া দিলেন। সেই আগুন দেখিয়া সমস্ত হাতী ছুটিয়া পলাইল।

আর্য্যেরা প্রথমে তীরের ফলায় ধূনা, তৈল, ঘৃত, পাট, তুলা প্রভৃতি দ্রব্য জড়াইয়া রাখিতেন। শত্রুকে বাণ মারিবার সময় তাহা জ্বালিয়া নিক্ষেপ করিতেন। ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের উন্নতি হইতে লাগিল, তাঁহারা আরও উৎকট উৎকট অস্ত্রের আবিষ্কার করিলেন। আরাকান, ব্রহ্মদেশ, চীন, সিন্ধুনদের নিকটবর্ত্তী স্থান এবং পারস্যদেশে মাটীর ভিতর দাহ্য পদার্থ (Naptha and other bituminous substances) মিলে। আর্য্যেরা ঐ ন্যাপ্‌থা প্রভৃতি দ্রব্যের সঙ্গে ধূনা, গন্ধক, সোরা ও অন্যান্য দাহ্য পদার্থ মিশাইয়া কোন প্রকার অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। তাহার তেজ এখনকার বারুদ বিস্ফোরক অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, ইহাই অনুমান হইতেছে। মূর্খের হাতে পড়িলে এই অস্ত্রদ্বারা এক দিনে ত্রিজগৎ উল্টিয়া যাইতে পারে, তাই বিজ্ঞলোকেরা যে সে ব্যক্তিকে অগ্ন্যস্ত্রের গূঢ় সন্ধান বলিয়া দিতেন না। নিতান্ত প্রিয় শিষ্য হইলে গুরুরা তাঁহাদিগকে দুই একটী বাণ দিতেন। আর্য্যেরা এত সাবধান ছিলেন, তথাপি প্রাচীন গ্রীকরা ভারতবর্ষ হইতে কি প্রকারে অগ্ন্যস্ত্রের কৌশল শিখিয়া লইয়াছিলেন। গ্রীসে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ক্যালেনে-কস্ নামক জনৈক ব্যক্তি ঐ অস্ত্র আবিষ্কার করেন। বোধ করি, তিনি ভারতবর্ষের 'কল্যাণাক্ষ" নামে কোন ব্যক্তি হইবেন। ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে রুম (Constantinople) নগর অবরুদ্ধ হইলে, নগরবাসীরা কেবল এই অব্যর্থ অগ্ন্যস্ত্রের প্রভাবে শত্রুদের হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছিলেন। ইতিবৃত্ত-লেখক গিবন্ সাহেব ঐ মহাস্ত্রকে গ্রীসদেশের অগ্নি (Greek Fire) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ব্বে মুসলমানেরা অগ্ন্যস্ত্রের বিষয় জ্ঞাত ছিলেন না, তাঁহারা রোমকদিগের নিকট উহার নির্ম্মাণকৌশল শিখিয়া লন। যৎকালে জেরুসালেম লইয়া খৃষ্টান ও মুসলমানের মধ্যে তুমুল সমর (Crusades) হয়, তখন অগ্নিবাণে বিস্তর লোক হত হইয়াছিল। স্যার দে জৈন্‌ভিল (Sir de Joinville) নামক জনৈক ফরাসী স্বচক্ষে ঐ যুদ্ধ দেখিয়া অগ্নিবাণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"La manière du feu grégois estoit tele que il venoit bien devant aussi gros comme un tonnel de verjus, et la queue du feu qui partoit de li, estoit bien aussi grant comme un grant glaive. Il faisoit tele noise au venir, que il sembloit que ce feust la foudre du ciel ; il sembloit un dragon

qui volast par l'air. Tant getoit grant clarté que l'on véoit parmi l'ost comme se il feust jour, pour la grant foison du feu qui getoit la grant clarté." স্যর ওয়াল্টার স্কট (Sir Walter Scott) তাঁহার উপন্যাসে (Waverly Novels) ইহার সংক্ষেপে এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন,—'It came flying through the air, like a winged dragon, about the thickness of a hogshead, with the report of thunder and the speed of lightning, and the darkness of night was dispelled by this horrrible illumination.'—অর্থাৎ ঐ অগ্ন্যস্ত্র পক্ষবান্ অজগরের ন্যায় আকাশে উড়িয়া আসিতে লাগিল। তাহা মদের পিপার মত স্থূল, বিদ্যুতের মত বেগবান্ এবং তাহার শব্দ বজ্রতুল্য। ঐ ভয়ানক জ্যোতিঃপুঞ্জ অস্ত্রে রাত্রির অন্ধকার পর্য্যন্ত দূর হইয়া গেল।

দ্রোণাচার্য্য হত হইলে অশ্বত্থামা নারায়ণাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই দিব্যবাণের প্রভাব ঠিক ঐ প্রকার।

"প্রাদুশ্চক্রে ততো দ্রৌণিরস্ত্রং নারায়ণং তদা।
অভিসন্ধায় পাণ্ডূনাং পঞ্চালানাঞ্চ বাহিনীম্॥
প্রাদুরাসংস্ততো বাণা দীপ্তাগ্রাঃ খে সহস্রশঃ।
পাণ্ডবান্ ক্ষপয়িষ্যন্তো দীপ্তাস্যাঃ পন্নগা ইব॥" (মহাভা°)

অর্থাৎ, তাহার পর দ্রোণপুত্র পাণ্ডবদের এবং পঞ্চালদের সৈন্য লক্ষ্য করিয়া নারায়ণাস্ত্রের সৃষ্টি করিলেন। সেই বাণ পাণ্ডবদিগকে ক্ষয় করিবার জন্য জ্বলন্তমুখ বৃহৎ সর্পের ন্যায় আকাশে সহস্র সহস্র তেজঃপুঞ্জ বাণের সৃষ্টি করিল।

অশ্বত্থামার অগ্ন্যস্ত্র এবং জৈন্‌ভিল-বর্ণিত গ্রীকাগ্নিতে অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তাই মনে হয় যে, সে কালে কোন প্রকার ভয়ানক অগ্নিবাণ প্রচলিত ছিল।

কৃষ্ণযজুর্বেদ বা তৈত্তিরীয় সংহিতায় 'কর্ণকাবতী সূর্ম্মী'র উল্লেখ আছে,—"হিমা ইত্যাহ শতায়ুঃ পুরুষঃ শতেন্দ্রিয় আয়ুষ্যেবেন্দ্রিয়ে প্রতিতিষ্ঠত্যেষা বৈ সূর্ম্মী কর্ণকাবত্যেতয়া হ স্ম বৈ দেবা অসুরাণাং শততর্হাংস্তৃংহন্তি যদেতয়া সমিধমাদধাতি বজ্রমেবৈতচ্ছতঘ্নীং যজমানো ভ্রাতৃব্যায় প্রহরতি স্তৃত্যা অছম্বট্‌কারং সং ত্বমগ্নে সূর্য্যস্য বর্চসাগথা ইত্যাহৈতত্ত্বমসীদমহম্।" (তৈত্তি°স° ১.৫.৭.৬)

সায়ণাচার্য্য উক্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"জ্বলন্তী লৌহময়ী স্থূণা সূর্ম্মী। সা চ কর্ণকাবতী ছিদ্রবতী। অতএব জ্বলন্তীত্যর্থঃ। একেন প্রহারেণ শতসংখ্যকান্ মারয়ন্তঃ শূরাঃ শততর্হাঃ। অসুরাণাং মধ্যে তাদৃশান্ (সূর্ম্মীযোদ্ধৃন্) এতয়া ঋচা দেবা হিংসন্তি। অনয়া সমিদাধানেন শতঘ্নীমেনাং ঋচং বজ্রং কৃত্বা বৈরিণং হন্তুং প্রহরন্তি।"

অর্থাৎ, সেই জ্বলন্তী লৌহময়ী স্থূণা,—যাহার অভ্যন্তরে ছিদ্র,—তন্মধ্যে প্রজ্বলিত হুতাশন; অসুরগণের মধ্যে যাহারা সূর্ম্মীর দ্বারা যুদ্ধ করে—এক আঘাতে শত শত্রু বিনাশ করে, দেবতারা তাহাদিগকে এই (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শতঘ্নীবজ্র বা সূর্ম্মীর ন্যায়) ঋকের সাহায্যে বধ করেন। যে যজমান অর্থাৎ যজ্ঞকর্ত্তা এই ঋকের দ্বারা সমিদাধান (অগ্নিতে আহুতিদান করেন, তিনিও এই শতঘ্নী সূর্ম্মী বা বজ্র উদ্ধৃত করিয়া শত্রুর প্রতি ঋক্ বা মন্ত্ররূপ প্রহরণ প্রহার করিতে সমর্থ হন।

মহাভারতে কয়েকটী অস্ত্রের নাম পাইতেছি—
"ক্ষুরাঃ ক্ষুরপ্রনালিকাবৎসদন্তাস্থিসন্ধয়ঃ।" (মহা°, দ্রোণ° ৩০.১৭)
'নালিকা নলিকয়া ক্ষেপ্যাঃ।' (নীলকণ্ঠ)।

ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, নালিক, বৎসদন্ত, অস্থিসন্ধি ইত্যাদি। নলিকা দ্বারা যাহা ছুড়িতে হয়, তাহাই নালিক। অন্যান্য ফলকাস্ত্রের সাহচর্য্য হেতু নালিকও একটী ফলকাস্ত্র, ইহাই অনুমান হয়।

নালাস্ত্রের ধারণ, পরিচালন ও প্রয়োগপদ্ধতি সম্বন্ধে শুক্রনীতিতে লিখিত আছে :—

"নালাস্ত্রং শোধয়েদাদৌ দদ্যাত্তত্রাগ্নিচূর্ণকম্।
নিবেশয়েত্তু দণ্ডেন নালমূলে যথাদৃঢ়ম্॥
ততঃ সুগোলকং দদ্যাৎ ততঃ কর্ণেঽগ্নিচূর্ণকম্।
মন্ত্রচূর্ণাগ্নিদানেন গোলং লক্ষ্যে নিপাতয়েৎ॥
লক্ষ্যভেদো যথা বাণো ধনুর্জ্যাবিনিযোজিতঃ।
ভবেত্তথা তু সন্ধায়—" ইত্যাদি।

প্রথমে নালাস্ত্রের সংশোধন করিবে। পরে তাহাতে অগ্নিচূর্ণ অর্থাৎ বারুদ প্রদান করিবে। অনন্তর দণ্ড সাহায্যে সেই বারুদ দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিবে। পরে তাহাতে গোলা প্রদান করিবে। অতঃপর কর্ণপ্রদেশে অগ্নিচূর্ণ স্থাপন করিয়া তাহাতে যন্ত্রপ্রস্তরাগ্নি সংযোগপূর্ব্বক তন্মধ্যস্থ গুলিকাকে লক্ষ্যস্থানে নিক্ষেপ করিবে। [অগ্নিচূর্ণ দ্র°]

শুক্রাচার্য্য আরও বলিয়াছেন, ক্ষুদ্র নালিক বা লঘুনালিক পদাতি ও অশ্বারোহী সৈন্যেরা ব্যবহার করিবে। বৃহন্নালিক সম্বন্ধে তাঁহার বর্ণনা এই—

"যথা যথা তু ত্বক্‌সারং যথা স্থূলবিলান্তরম্।
যথা দীর্ঘবৃহদ্‌গোলং দূরভেদী তথা তথা॥
মূলকীলভ্রমল্লক্ষ্যসমসন্ধানভাজি যৎ।
বৃহন্নালিকসংজ্ঞং তৎ কাষ্ঠবুধ্নবিবর্জ্জিতম্॥
প্রবাহ্যং শকটাদ্যৈস্তু সুযুক্তং বিজয়প্রদম্।"

নালিকাস্ত্রের ত্বক্ যত কঠিন হইবে, উহার আয়তন যত বড় হইবে, গর্ত্ত যত স্থূল হইবে এবং গোলা যত বড় হইবে,—উহা তত দূরভেদী হইবে। উহার মূলদেশে কীলক;

উহাতে কাষ্ঠবুধ্ন অর্থাৎ কাষ্ঠনির্ম্মিত ধরিবার মুট নাই। শকটাদির দ্বারা উহা বাহিত হয়। এই বৃহন্নালিক অস্ত্র উপযুক্তরূপে প্রযুক্ত হইলে যুদ্ধে জয়প্রদ হয়।

গোলা ও গুলিকাপ্রস্তুত সম্বন্ধে শুক্রনীতির উপদেশ যথা—

"গোলোলোহময়ী গর্ভঘুটিকঃ কেবলোঽপি বা।
সীসস্য লঘুনালার্থে হ্যন্যধাতুভবোঽপি বা॥
লৌহসারময়ং বাপি নালাস্ত্রং ত্বন্যধাতুজম্।"

অর্থাৎ বৃহন্নালিকের গোলা সগর্ভ বা অগর্ভ (নিরেট) ও লৌহময় হইবে। সগর্ভগোলার অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র গুলিকা পূর্ণ করা যাইতে পারে। লঘুনালিকের জন্য সীসক বা অন্যধাতুর গুলিকা প্রস্তুত করিবে। নালাস্ত্রগুলি লৌহসার দ্বারা কিংবা অন্য কোন ধাতুতে নির্ম্মিত হইবে।

শুক্রনীতির উদ্ধৃত বচনসমূহ পাঠ করিলে বৃহন্নালিক কামানের ন্যায় কোন অস্ত্র বলিয়াই মনে হয়। এ স্থলে বলা আবশ্যক, মহাভারতের অনেক স্থানে উশনা বা শুক্রপ্রণীত নীতি-শাস্ত্রের উল্লেখ আছে। মহাভারত আদিপর্ব্বে পাই—

"অয়ঃকণপ-চক্রাশ্ম-ভূষণ্ড্যুদ্যতবাহবঃ।
কৃষ্ণপার্থৌ জিঘাংসন্তঃ ক্রোধসম্মূর্চ্ছিতৌজসঃ।"
(মহাভা° আদি° ২২৫.২৫)।

নীলকণ্ঠটীকায় অয়ঃকণপ নালিকের পর্য্যায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যথা—"অয়ঃকণান্ লৌহগুলিকা পিবতীতি তৎ তথাবিধং লৌহময়ং যন্ত্রং যেন আগ্নেয়ৌষধবলেন গর্ভসম্ভৃতা লৌহগুলিকাঃ ক্ষিপ্যন্তে।" আবার বনপর্ব্বে মাতলি-আগমন প্রস্তাবে বর্ণিত চক্রযুক্ত তুলাগুড়া অস্ত্রটী বৃহন্নালিকেরই নামান্তর মনে হয়। নীলকণ্ঠভট্ট 'তুলাগুড়ার' ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "তুলাগুড়াঃ ভাণ্ডগোলকাঃ। ভাণ্ডানি আগ্নেয়দ্রব্যবলেন গোল-নিক্ষেপপাত্রাণি তুলান্ বন্দুখ ইত্যাদি ম্লেচ্ছভাষাপ্রসিদ্ধানি।" মূল শ্লোকটী এই—

"তথৈবাশনয়শ্চৈব চক্রযুক্তাস্তুলাগুড়াঃ।
বায়ুস্ফোটাঃ সনির্ঘাতা মহামেঘস্বনাস্তথা॥" (মহাভা°)

'বায়ুস্ফোট' সম্বন্ধে নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—"বেগবশাৎ বায়ুং জনয়ন্ত্যঃ। সনির্ঘাতাঃ অশনিধ্বনিযুক্তাঃ মহামেঘস্বনাশ্চ।" রামায়ণেও বহুস্থানে নালিকাস্ত্রের প্রয়োগ দেখা যায়।

বাইবেলের প্রাচীনাংশ হইতে জানা যায় যে, ধীমান্ ব্যক্তিগণ তীর ও প্রস্তরাদি দূরে নিক্ষেপ করিবার জন্য একপ্রকার ক্ষেপণযন্ত্র নির্ম্মাণ করিতেন। ইউরোপে প্রাচীন ও মধ্যযুগ পর্য্যন্ত এই ক্ষেপণযন্ত্রের উন্নতিসাধন হইয়াছিল। এমন কি, বারুদ আবিষ্কারের পরও এই যন্ত্রের ব্যবহার সহসা এককালে উঠিয়া যায় নাই।

এখন অগ্ন্যস্ত্র বলিতে আমরা বন্দুক, রিভলবার, কামান প্রভৃতি বুঝিয়া থাকি; এগুলি বারুদ ও বিস্ফোরকের আবিষ্কার-ফল বলা যাইতে পারে। প্রাচীনকালে বারুদ বা বিস্ফোরকের সাহায্য ব্যতীত অগ্ন্যস্ত্র যুদ্ধাদিতে ব্যবহৃত হইত। ক্রুসেডে (খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে জেরুসালেম লইয়া যে ধর্ম্মযুদ্ধ হয়, ১০৯৭-১২৯১ খৃষ্টাব্দ) যে অগ্ন্যস্ত্রের ব্যবহার হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। খৃষ্টান ও মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এই সকল অগ্ন্যস্ত্রের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে বারুদ বা বিস্ফোরকের ব্যবহার কোনক্রমেই প্রমাণিত হয় না।

অগ্ন্যস্ত্রের প্রচলিত অর্থে আমরা যাহা বুঝি, অর্থাৎ বন্দুক, কামান প্রভৃতির উদ্ভাবন বারুদ আবিষ্কারের পরেই সম্ভবপর হইয়াছে। বারুদ কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে কেহ কেহ বলেন, রজার্ বেকনই বারুদের আবিষ্কারক। বেকন খৃঃ ১১শ শতকের লোক। তাঁহার গ্রন্থে বারুদের নির্ম্মাণ-প্রণালী লিখিত আছে। বেকন কিন্তু যুদ্ধাস্ত্রের উপকরণরূপে বারুদ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। আবার অধিকাংশ লোকের মতেই জর্ম্মনীর সোয়ার্জ্জ নামক এক ব্যক্তি ১৩৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম বারুদ প্রস্তুত করেন। কিন্তু ইংলণ্ডে ১৩৪৪ খৃষ্টাব্দে বারুদ ও কামানের ব্যবহার হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। ফ্লোরেন্সে ১৩২৬ খৃষ্টাব্দে ও ফ্রান্সে ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে বন্দুক ব্যবহারের প্রমাণও পাওয়া যায়। সুতরাং বারুদের আবিষ্কার ১৩৫৪ খৃষ্টাব্দের বহুপূর্ব্বেই হইয়াছিল। ['বারুদ' দ্র°]।

বন্দুক ও কামান আবিষ্কার কোন্ সময়ে কে করিয়াছিল, তাহাও নির্ণীত হয় নাই। কেহ বলেন চীনে, কেহ বলেন আরবে এই সকল অস্ত্রের উদ্ভব। তবে ইহাদের অস্তিত্বের প্রাচীনতম প্রমাণ আমরা পাই ইউরোপে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকে।

চতুর্দ্দশ শতকে ফ্লেমিংগণ (ফ্লাণ্ডার্সের অধিবাসিগণ) এক-প্রকার বন্দুক (বা হাতকামান) নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এগুলিতে জ্বলন্ত কাষ্ঠের সাহায্যে অগ্নিসংযোগ করা হইত। ১৩৭৫ খৃষ্টাব্দে হাণ্টারকোম্ব মেনর অবরোধে ইংলণ্ডে এই প্রকার বন্দুক ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৪৭১ খৃষ্টাব্দে ৪র্থ এড্ওয়ার্ড যখন ফ্রান্স হইতে সসৈন্য ইংলণ্ডে আসিয়া অবতরণ করেন, তখন তাঁহার দলে অনেক বন্দুকধারী বার্গাণ্ডীয় সৈন্য ছিল। এই সকল বন্দুকের কলকব্জার কোন বিশেষত্ব ছিল না। একখণ্ড সরল কাষ্ঠদণ্ডের সহিত একটী লৌহনলিকা সংলগ্ন থাকিত। সংযোগস্থলে নলীতে একটী ছিদ্র থাকিত। নলীর মধ্যে বারুদ ও গুলি ভরিয়া একটী জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড অথবা পলিতা দিয়া উক্ত ছিদ্রে অগ্নি প্রদান করিয়া গুলি ছোড়া হইত।

৪র্থ এড্‌ওয়ার্ডের রাজত্বের শেষভাগে অথবা ৭ম হেন্‌রির রাজত্বের প্রথমভাগে বন্দুকে কক্ বা ঘোড়া যোজনা করা হইল। এই ককের সঙ্গে দীপকাটি বদ্ধ থাকিত বলিয়া এই প্রকার বন্দুকের নাম হইল ম্যাচ্‌লক (match-lock)। চীন, তাতার ও তুর্কীদের মধ্যে এখনও এইপ্রকার বন্দুকের ব্যবহার আছে।

এই সময় পর্য্যন্ত বন্দুকগুলি কোন কাষ্ঠাধারের উপর রাখিয়া ছোড়া হইত। তৎপরে শুধু হাতে ছোড়ার সুবিধার জন্য বন্দুকের কাষ্ঠনির্ম্মিত পশ্চাদ্ভাগটী আরও প্রশস্ত এবং বক্র করিয়া তৈয়ারী করা হইতে লাগিল। খৃষ্টীয় ১৫শ শতকে জর্ম্মনগণ ও ষোড়শ শতকে স্পেনীয়গণ বন্দুকের বিলক্ষণ উন্নতি করেন।

১৫১৫ অথবা ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মনীর অন্তর্গত নুরেম্‌বার্গে একপ্রকার চাকা-ওয়ালা বন্দুক আবিষ্কৃত হয়। বন্দুকের ঘোড়ার জায়গায় একখানা চাকা থাকিত। ঐ চাকা একটী স্প্রিংয়ের সহিত এরূপভাবে জোড়া থাকিত যে, স্প্রিংয়ের চাবি ঘুরাইয়া ছাড়িয়া দিলে চাকাও সজোরে ঘূর্ণিত হইত। ঐ ঘর্ষণে বিস্ফোরকবিশেষের সাহায্যে নলের ছিদ্রপ্রান্তে অগ্নি উৎপাদিত হইয়া গুলি নির্গত হইত। কিন্তু এই প্রণালী কিছু ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া সাধারণভাবে সৈন্যদলে গৃহীত হয় নাই।

ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ হইতে চক্‌মকি দিয়া বন্দুকের ঘোড়া তৈয়ারী হইতে লাগিল। অষ্টাদশ শতক পর্য্যন্ত অধিকাংশ স্থলেই এই চক্‌মকি-বসান ঘোড়া বন্দুকে ব্যবহৃত হইত। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে আলেক্‌সান্দার ফর্‌সিথ্ নামক এক স্কট্‌লণ্ডীয় ধর্ম্মযাজক ক্লোরেট অব পটাশ, গন্ধক ও কয়লার সংমিশ্রণে বিস্ফোরক আবিষ্কার করিয়া তৎসাহায্যে ক্যাপ তৈয়ারী করেন। তামার পাতে ক্যাপ নির্ম্মিত হইত। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইউরোপীয় প্রায় সকল সৈন্যদলেই এই ক্যাপ প্রচলিত হইয়াছিল।

পরবর্ত্তী কালে (rifle) রাইফেল বন্দুকের প্রচলনই অধিক হইল। রাইফেলের নলের ভিতরের অংশ প্যাঁচকাটা। ইহার গুলি ঐ প্যাঁচ বা খাঁজের পথে ঘুরিয়া নির্গত হয়। ইহাতে সুবিধা এই, গুলির গঠনে বা ভারে কিছু বৈষম্য থাকিলেও আবর্ত্তনের জন্য সমগতিতে ও দ্রুততর বেগে বাহির হয়। ইহাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা অনেক কম।

রাইফেলের আবিষ্কার প্রায় ১৫২০ খৃষ্টাব্দে হইলেও ইহার দ্রুত প্রচলন হয় নাই। ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্রের সময়ে রাইফেল-ধারী সৈন্য ছিল। নেপোলিয়ন পরে রাইফেল রহিত করিয়া সাধারণ বন্দুকই ব্যবহার করিতে আদেশ দেন। আল্‌জিরিয়ার যুদ্ধে ফরাসীরা পুনরায় রাইফেল ব্যবহার করিয়াছিল। আমেরিকার যুদ্ধে ইংরেজগণ রাইফেল হইতে প্রভূত সাহায্য পাইয়াছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রসিদ্ধ রাইফেল ব্রিগেড্ নামক সৈন্যদলের সৃষ্টি হয়।

আধুনিককালে বন্দুকে কার্ত্তুজ ব্যবহার হয়। ইহাতে স্বতন্ত্র ক্যাপের প্রয়োজন হয় না। কার্ত্তুজের প্রচলনও খৃষ্টীয় ষোড়শ শতক হইতে; কিন্তু তখনকার কার্ত্তুজ অতি অনুন্নত ছিল। প্রকৃতপক্ষে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে প্যারিস নগরে আধুনিক কার্ত্তুজ প্রথম নির্ম্মিত হয়। আধুনিক কার্ত্তুজে প্রসারণশীল কার্ত্তুজ-কেস থাকে। উহা প্রসারিত হইয়া বন্দুকের ব্যারেল বা নলকে পশ্চাদ্দেশে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দেয়, সুতরাং বারুদের গ্যাস্ নষ্ট হইতে পারে না ও গুলির বেগ বৃদ্ধি হয়।

বন্দুকের আর একটী উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইতেছে ব্রীচ্-লোডিং (breech-loading)। বন্দুকে নলীর মুখ দিয়া গুলি না ভরিয়া নলীর পশ্চাদ্ভাগ দিয়া গুলি ভরা হয়। রাইফেল, ব্রীচ্-লোডিং ও কার্ত্তুজ—এই তিনটীই আধুনিক অগ্ন্যস্ত্রের বৈশিষ্ট্য।

দোনলা বন্দুকে ২টী নল থাকে। একবারে দুইটী গুলি ভর্ত্তি করিয়া পুনর্ব্বার গুলি না ভরিয়া একসঙ্গে বা পর পর দুইটী গুলি ছোড়া যায়।

ম্যাগাজিন্ রাইফেলে (magazine rifle) একসঙ্গে অনেক-গুলি কার্ত্তুজ রাখা চলে। এ সকল সৈন্যবিভাগেই ব্যবহৃত হয়। ইহাকে রিপীটিং রাইফেলও (repeating rifle) বলা হয়। ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

ক্ষুদ্র অগ্ন্যস্ত্রের মধ্যে পিস্তল ও রিভল্‌বার সকল দেশেই আজকাল বহুল প্রচলিত। এইগুলি প্রধানতঃ আত্মরক্ষার্থ অল্পদূরে গুলি চালাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এগুলি অনায়াসে পকেটে বহন করা চলে। ইটালীদেশের পিস্তোয়া নামক স্থানে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে পিস্তল উদ্ভাবিত হয়। পিস্তলে প্রথমে চক্‌মকি ঘোড়া এবং পরে ক্যাপ ব্যবহার করা হইত। কার্ত্তুজ আবিষ্কার হইবার পর হইতে সর্ব্বত্র কার্ত্তুজই চলিত হইয়াছে।

ডুয়েল্ বা দ্বন্দ্বযুদ্ধের কল্যাণে পিস্তলের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। পিস্তলেরই উন্নত সংস্করণ রিভল্‌বার। রিভল্‌বারে একসঙ্গে ৪।৫ বা তদধিক কার্ত্তুজ ভরিবার জন্য পশ্চাদ্দেশে পৃথক্ পৃথক্ ঘর থাকে। একবার ঘোড়া টিপিলে একটী করিয়া গুলি নির্গত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্ত্তী গুলিভরা খোপটী ঘুরিয়া আসিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী খালি খোপের ঠিক পাশে হাজির হয়। খোপগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাজির হয় বলিয়া ইহার নাম রিভল্‌বার বা ঘূরণশীল অগ্ন্যস্ত্র। রাইফেল ও ব্রীচ্-লোডিং বন্দুক আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল এবং রিভল্‌বারের নলের ভিতরের গাত্র ঘোরান ও প্যাঁচকাটা করা হইয়াছে এবং গুলিও পিছন দিক্ দিয়া ভরা হইতেছে।

নবাবিষ্কৃত অটোমেটিক পিস্তল (automatic pistol) এই শ্রেণীর অস্ত্রসমূহের মধ্যে সর্ব্বাংশে সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহারও রিভল্‌বারের ন্যায় ঘূরণশীল ম্যাগাজিন বা গুলির খোপ আছে। একটী গুলি ছোড়া হইলে তাহার প্রতি-বিক্ষেপশক্তি দ্বারা শূন্য কার্ত্তুজ-কেসের নির্গমন, পরবর্ত্তী কার্ত্তুজের যথাস্থানে অবস্থাপন প্রভৃতি কার্য্য দ্রুতগতিতে স্বতঃই সম্পন্ন হয়।

অধুনা সম্মুখযুদ্ধের অস্ত্রস্বরূপ সৈন্যদলে বন্দুকের সঙ্গে ইহার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। [পিস্তল দ্র°]

জর্ম্মনরা ব্রীচ্‌লোডার ও রিভল্‌বারের বিষয় ১৫শ শতকেও অবগত ছিল। প্যারিসের আগ্নেয়াস্ত্র কারখানায় (Museè d'Artillirie) ১৬শ শতকে নির্ম্মিত কয়েকটী ব্রীচ্‌লোডার বন্দুক আছে। টাওয়ার অস্ত্রাগারে ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত একটী ম্যাচলক রিভল্‌বার আছে। সিগ্‌ম্যারিনজেন যাদুঘরে ষোড়শ শতকে জর্ম্মনীতে নির্ম্মিত একটী বন্দুক আছে, উহা রিভল্‌বারের ন্যায় ৭ নলা।

গত শতাব্দী ও বর্ত্তমান শতাব্দীতে বন্দুকের আরও বহুবিধ উন্নতি হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে, বিশেষতঃ লণ্ডনেই, সর্ব্বোৎকৃষ্ট বন্দুক নির্ম্মিত হয়। [বন্দুক দ্র°]

কামান—ব্রাকেনবারী তাঁহার 'ইউরোপের প্রাচীন কামান' (Ancient Cannon of Europe) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, পুরাতন 'গ্রীক ফায়ার' প্রভৃতি অগ্ন্যস্ত্র হইতেই কামানের উৎপত্তি। ১৪শ শতাব্দী হইতে কামান ব্যবহারের কথা জানা যায়।

কামানের বিবর্ত্তনের ৩টী যুগ ধরা যাইতে পারে। প্রথম, ১৩১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এই যুগে পেটা লোহার কামানে প্রধানতঃ প্রস্তরনির্ম্মিত গোলা ব্যবহৃত হইত। ১৫২০ হইতে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২য় যুগ। এ যুগে কামানের খুব বেশী উন্নতি হয় নাই; তবে পেটা লোহার পরিবর্ত্তে ঢালা লোহার কামান প্রচলিত হইয়াছিল। তাহার পর হইতে ৩য় যুগ চলিতেছে। এই যুগের কামান-গুলি রাইফেলবোর, অর্থাৎ নলীর ভিতরদিকে ঘোরান প্যাঁচ-কাটা, এবং গোলার আকৃতি মোচার ন্যায়। তদ্ভিন্ন কামানের কলকব্জা, উপাদান, গোলার নির্ম্মাণপ্রণালী, রঞ্জুৎ প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ে কামানের অচিন্ত্যপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছে।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের প্রথমভাগে ইউরোপে যে কামান তৈয়ারী হইত, তাহা ক্ষুদ্রাকার এবং কতকটা ধুতুরাফুলের ন্যায় আকারবিশিষ্ট। ঐ শতকের শেষভাগে ২০০ হইতে ৪৫০ পাউণ্ডের গোলা নিক্ষেপকারী বৃহৎ কামান নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সময়ে নির্ম্মিত একটী কামান ঘেণ্ট শহরে আছে। ইহার ওজন প্রায় ১৩ টন বা প্রায় ৩৭০ মণ। পিপা যেরূপ তক্তা জুড়িয়া তৈয়ারী হয়, ইহা সেইপ্রকার কতকগুলি পুরু এবং লম্বা লোহার পাত জুড়িয়া প্রস্তুত। ইহার দৈর্ঘ্য ১৯৭ ইঞ্চি এবং মুখের ব্যাস ২২ ইঞ্চি। ৭০০ পাউণ্ড ওজনের পাথরের গোলা এই কামান হইতে ছোড়া হইত। ১৪২৩ খৃষ্টাব্দে নর্মাণ্ডীর যুদ্ধে ইংরেজেরা ১৯ ও ২০ ইঞ্চি ব্যাসের দুইটী কামান ব্যবহার করিয়াছিল। ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে কনষ্টাণ্টিনোপলে প্রস্তুত একটী কামান উল্‌-উইচ শহরে রক্ষিত আছে। ইহার মুখের ব্যাস ২৫ ইঞ্চি, ওজন প্রায় ১৯ টন। ইহা ৬৭২ পাউণ্ডের পাথরের গোলা নিক্ষেপ করিতে পারিত।

ভারতবর্ষেও পূর্ব্বে কামান প্রস্তুত হইত, তাহার নিদর্শন বিদ্যমান আছে। চন্দ্রদ্বীপের রাজবাড়ীতে একটী বৃহৎ পিত্তলের কামান রক্ষিত আছে। ঐ কামানের উপর বঙ্গাক্ষরে রাজা কন্দর্পনারায়ণের নাম ও ৩১৮ অঙ্ক খোদিত। কন্দর্পনারায়ণ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিতেন। [চন্দ্রদ্বীপ দ্র°]

ইংলণ্ডে ১৫২১ খৃষ্টাব্দ হইতে ব্রোঞ্জধাতু-নির্ম্মিত কামান তৈয়ারী আরম্ভ হয় এবং ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে লোহার কামান প্রস্তুত হইতে থাকে। ষোড়শ শতক হইতে কামানের আয়তন অপেক্ষাকৃত হ্রাস করা হইয়াছিল। কারণ, পূর্ব্বোক্ত ভারী কামান স্থানান্তরিত করা সহজ ব্যাপার ছিল না।

প্রথম প্রথম গোলার বেগ খুব বেশী ছিল না, কারণ তখন ভাল বারুদ তৈয়ারী হইত না। গোলা সাধারণতঃ পাথরের হইত; কখনও বা তাহার উপর সীসা ঝালাইয়া দেওয়া হইত। ১৮শ শতক হইতে ১৯শ শতকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত যদিও ধাতুবিজ্ঞান, বারুদ এবং তৎসঙ্গে কামানের উপাদানগত যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, তথাপি কামানের গঠনকৌশল বা কলকব্জা অনেকাংশে পূর্ব্বের ন্যায়ই ছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে কামানের নির্ম্মাণপ্রণালী অনেক উন্নততর হয়। ইহার মূল-কারণ রাইফেল ও ব্রীচ্‌লোডিং অস্ত্রের উদ্ভাবন।

পূর্ব্বে কামান মাটিতে শায়িত রাখা হইত এবং উহার পশ্চাতে ও উভয়পার্শ্বে কাঠের ঠেকনা দিয়া গোলা ছোড়া হইত। পরে কাঠের চাকাযুক্ত গাড়ীতে কামান বসাইয়া ছোড়া হইতে থাকে। এই সকল গাড়ী ঘোড়ায় টানিত, কচিৎ বলদ দিয়াও টানা হইত।

১৪শ শতকের শেষাংশে ব্রীচ্‌লোডিং কামান ব্যবহৃত হইতে থাকে! কিন্তু তখনকার ব্রীচ্‌লোডিং নিতান্ত সেকেলে ধরণের; বিশেষতঃ কামানের সম্মুখভাগ ও পশ্চাদ্ভাগ প্রথমে বিযুক্ত করিয়া গোলা ভরিয়া আবার যুড়িয়া দেওয়া হইত বলিয়া অনেক-স্থলে বারুদের বেগে যোড় খুলিয়া দুর্ঘটনা ঘটিত। আবার

অধিকাংশ সময়েই যোড়া সম্পূর্ণ ও সুষ্ঠু না হওয়ায় অনেকটা গ্যাস অপব্যয় হইত।

ব্রীচ্‌লোডিং প্রণালী উন্নততর করিবার চেষ্টা অনেক হইয়াছে। মেজর কাবালি ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে নূতন ব্রীচ্‌লোডিং প্রণালীর প্রবর্ত্তন করেন। তাহার পর ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ আর্মষ্ট্রং প্রণালী ও তৎপরে ডি বেঞ্জ নামক ফ্রান্সে উদ্ভাবিত প্রণালী গৃহীত হয়। তদবধি সকল দেশেই ব্রীচ্‌লোডিং কামানের আদর হইয়াছে।

আধুনিক কামান—বর্ত্তমানকালের যুদ্ধে ব্যবহৃত কামানে ২টী বিষয় প্রধানতঃ দ্রষ্টব্য—কামানের পাল্লা ও ওজন। সহজে স্থানান্তরিত হইতে পারে ও বহু ক্রোশ দূরে গোলা নিক্ষেপ করা যাইতে পারে, ইহাই হইতেছে এখনকার কামাননির্ম্মাণের প্রধান লক্ষ্য। কামানের শক্তির হ্রাস না করিয়া ওজন হাল্কা করিবার উদ্দেশ্যে নিকেল ক্রোম মোলিব্‌ডিনাম্, ক্রোম ভ্যানাডিয়াম্ প্রভৃতি প্রবল শক্তিসহ ইস্পাত দিয়া এখন কামান নির্ম্মিত হয়। অতিশয় ভারী (Super-heavy) কামানগুলি রেলওয়ে মাউন্টিংয়ের উপর ও তদপেক্ষা হাল্কা (Light, medium ও heavy) কামানগুলি গাড়ীতে অথবা চলন্ত মঞ্চের উপর বসাইয়া যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। কামানের মুখ দক্ষিণে বামে এবং ঊর্দ্ধে ও নিম্নে সরাইবার কলকব্জা গাড়ীর সঙ্গেই থাকে। সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে আধুনিক কামান-গুলিকে ভাগ করা হয়—(১) বি. এল—ব্রীচ্‌লোডিং (Breech-loading) এবং (২) কিউ. এফ বা দ্রুতগোলানিক্ষেপকারী (Quick-firing) কামান। বি. এল কামানের এখন এত উন্নতি হইয়াছে যে, ইহা কিউ. এফ-এর ন্যায়ই দ্রুত গোলানিক্ষেপ করিতে পারে। বস্তুতঃ এই দুই শ্রেণীর পার্থক্য হইতেছে কামান হইতে গ্যাস-নিঃসরণ বন্ধ করার শক্তিতে।

ইদানীং কামানের পাল্লা অতিশয় বাড়িয়াছে। ১৯১৮ সালে জর্ম্মনেরা ৪৫ মাইল দূর হইতে পারিসের উপর গোলাবর্ষণ করিয়াছিল। ইহা অপেক্ষা লম্বা পাল্লার কামানও মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপের অনেক দেশে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এমন কি, জর্ম্মনেরা ৭৫ মাইল পাল্লার কামানও ব্যবহার করিয়াছিল। এই সকল কামান হইতে ঈষৎ ঊর্দ্ধমুখে অতীব প্রবলবেগে গোলা নিক্ষিপ্ত হয়। বহু ঊর্দ্ধে (প্রায় ২৫ মাইল) উঠিলে বাতাসের প্রতিরোধ অল্প হয়, সুতরাং গোলা অনেক দূরে গিয়া পড়ে। কিন্তু এই সকল কামানের আয়ু অতি অল্প! ৬০।৭০ বার গোলা নিক্ষেপ করিবার পর এগুলি প্রায়ই অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। কারণ, গোলানিক্ষেপকালে এরূপ ভীষণ প্রতিবিক্ষেপ হয় যে, কামানের সমস্ত কলকব্জা তাহাতে নড়িয়া যায় এবং ক্রমে কমজোর হইয়া পড়ে।

প্রতিবিক্ষেপ হ্রাসের জন্য কামানে বাফার (buffer) থাকে। পূর্ণ ১টী ইস্পাতের পিপার সঙ্গে একটী পিষ্টন ও রড্ সংলগ্ন করিয়া বাফার প্রস্তুত হয়। বাফার প্রতিবিক্ষেপ-শক্তিতে বাধা দেয় এবং রিকুপারেটর (recuperator) নামক কলের দ্বারা কামান যথাস্থানে পুনঃস্থাপিত হয়।

কামানের আকার নানাপ্রকারের। কামানের মুখের ব্যাসের দ্বারা কামানের আকার স্থির করা হয়। যুদ্ধের হাল্কা কামানের মুখ প্রায়ই ৫ ইঞ্চির মধ্যে। মাঝারি এবং ভারী কামানের মুখ সাধারণতঃ ৫ হইতে ৮ ইঞ্চি, কখনও বা তাহারও অধিক। ১৬॥ ইঞ্চি ও তদধিক মাপের অতিশয় ভারী কামানও ইউরোপের মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

মাঝারি ভারী এবং অতিশয় ভারী হাউইট্‌জার কামান প্রধানতঃ কেল্লা, সুরক্ষিত স্থান ও পরিখা ধ্বংসের জন্য ব্যবহৃত হয়। হাউইট্‌জার (Howitzer) কামান খর্ব্বাকৃতি, ইহা ১০০০ পাউণ্ড বা তদধিক ওজনের গোলা ১০।১৫ হাজার গজ দূরে অনায়াসে নিক্ষেপ করিতে পারে। মহাযুদ্ধে অষ্ট্রিয়ানেরা ১৬॥০ ইঞ্চির একটী হাউইট্‌জার দিয়া ১ টন ভারী শেল গোলা ১৪,১০০ গজ দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল। হাউইট্‌জার কামান ঊর্দ্ধমুখে (প্রায় ৪৫° কোণে) গোলা নিক্ষেপ করে। গোলা ক্ষেপণী-বৃত্তপথে পরিভ্রমণ করিয়া অনেকটা দূরে গিয়া কিছু খাড়াভাবে পতিত হয়। যে কামান অপেক্ষাকৃত সরল পথে গোলা নিক্ষেপ করে, তাহাতে প্রাথমিক গতিবেগ খুব বেশী হওয়া আবশ্যক। পরিখা-বিধ্বংসের জন্য সেরূপ কামান তত উপযোগী নহে, কারণ তাহার গোলা মাত্র পরিখার উপরের অংশের ক্ষতি করিতে পারে, ভিতরের অংশের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না।

কামানের গোলা দুই প্রকার; শেল (shell) ও শ্রাপ্‌নেল (shrapnel)। শেল একটী মাত্র আস্ত গোলা। ইহার মধ্যে শক্তিমান্ বিস্ফোরক থাকে। ইহার ধ্বংস করিবার শক্তি স্থানিক অর্থাৎ ইহা যে জায়গায় পড়ে, মাত্র সেই জায়গারই ক্ষতি করিতে পারে। তবে ইহার স্থানিক ধ্বংসশক্তি খুব বেশী। দুর্গাদিধ্বংসে এইরূপ গোলারই প্রয়োজন। শ্রাপ্‌নেল প্রকৃত পক্ষে অনেকগুলি গোলার সমষ্টি। ইহার মধ্যে অনেকগুলি (প্রায় ২৫০ হইতে ৩০০) ছোট ছোট গোলা ভরা থাকে। গোলার আবরণ বিদীর্ণ হইলে ঐ গোলাগুলি অনেক জায়গা জুড়িয়া বিক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং সৈন্যধ্বংসে এই গোলার উপযোগিতা অধিকতর।

গোলাবিদারণের জন্য কয়েকপ্রকার ফিউজ ব্যবহৃত হয়। টাইম ফিউজ নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তরে বিদীর্ণ হয়। কামান ছুড়িবার আগেই ঠিক করিয়া দেওয়া হয়, গোলা নিক্ষিপ্ত হইবার কয় সেকেণ্ড পরে ফাটিবে। সুতরাং গোলা মধ্যপথে ফাটিতে পারে, লক্ষ্যে আঘাত করা মাত্রই ফাটিতে পারে অথবা আরও বিলম্বে ফাটিতে পারে। পারকাশন ফিউজ সংঘাতপ্রাপ্তিমাত্র বিদীর্ণ হয়। কোন কোন গোলায় টাইম ও পারকাশন ফিউজ একত্র ব্যবহৃত হয়। শেল গোলায় পারকাশন এবং শ্রাপ্‌নেল গোলায় টাইম ফিউজই বেশী ব্যবহার করা হয়।

আজকাল যুদ্ধজাহাজের কামানও মাপে এবং পাল্লায় পূর্ব্বাপেক্ষা ভারী হইতেছে। নৌবলে ইংলণ্ডই জগতে অগ্রণী। ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যুদ্ধজাহাজে ১২ ইঞ্চি মাপের ভারী কামান এবং তাহার সহিত ৪ ইঞ্চি মাপের ছোট কামান বসান হইত। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ১৩॥ ইঞ্চি, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ১৫ ইঞ্চি এবং সর্ব্বশেষে ১৬ ইঞ্চি মাপের ভারী কামান, ৬ ইঞ্চি মাপের ছোট কামানের সহিত যুদ্ধজাহাজে ব্যবহৃত হইতেছে। অবশ্য, দেশ-ভেদে মাপের কিছু ন্যূনাধিক্য ঘটে।

মেসিন গান বা কলের কামান অতিদ্রুত গোলানিক্ষেপার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহার দ্বারা বহুক্ষণ ধরিয়া অবিশ্রান্ত ধারার ন্যায় গোলাবর্ষণ করা যায়।

হাতে করিয়া লইয়া যাইবার সুবিধার জন্য এগুলি ওজনে হাল্কা করিয়া তৈয়ারী হয়। সাধারণতঃ এগুলি ৩০ হইতে ৫৫ পাউণ্ড ভারী হইয়া থাকে। নলের ব্যাস সাধারণতঃ ·২৫ হইতে ·৩১ ইঞ্চি। ভারী কলের কামানের নলের ব্যাস ·৫ হইতে ·৯ ইঞ্চিও হয়। একটী ভারী ও মজবুত তেপায়ার উপরে বসাইয়া এই কামান ছোড়া হয়। প্রতি মিনিটে ৪০০।৫০০টী গোলা ইহা হইতে ছোড়া যাইতে পারে। এত দ্রুত গোলাবর্ষনে কামানের নল স্বভাবতঃই ভীষণ উত্তপ্ত হইয়া উঠে, তাহাতে নলের মধ্যভাগের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। সেইজন্য শৈত্যসম্পাদন আবশ্যক। জলদ্বারা, তাপবিকিরণ দ্বারা এবং তাপবিকিরণ ও বায়ুর সাহায্যে শৈত্যসম্পাদন করা হয়। [কামান দ্র°]

অগ্ন্যাগার—(ক্লী) [অগ্নের্নিমিত্তং আগারম্, ৬-তৎ] যজ্ঞিয় অগ্ন্যাধার কুণ্ড। ২ অগ্নিহোত্রগৃহ।

অগ্ন্যাত্মক—(ত্রি) [অগ্নিস্বরূপ আত্মা যস্য, বহুব্রী] অগ্নিতুল্য স্বভাবযুক্ত। "সোমাত্মিকা স্ত্রী অগ্ন্যাত্মকঃ পুরুষঃ।" (শঙ্কর)

অগ্ন্যাধান—(ক্লী) [অগ্নি-ডুধাঞ্‌-ল্যুট্। ৬-তৎ] বেদমন্ত্রদ্বারা অগ্নিসংস্থাপন। বহুব্রী। অগ্নিহোত্রযাগ। অগ্নিস্থাপন। তৈত্তিরীয় সংহিতোক্ত একটী বিধি। অগ্নিহোত্রযজ্ঞে এই বিশেষ বিধির উল্লেখ আছে। শমীবৃক্ষের তক্তায় পিপ্পল্যাদির দণ্ড অরণি করিয়া ঘর্ষণপূর্ব্বক অগ্নি উৎপাদন করিতে হয়। পরে সেই অগ্নি তিন বা পাঁচ স্থানে রক্ষিত হয়। অগ্ন্যাধানানন্তর যজমান ও তাঁহার পত্নী, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, হোতা, উদ্গাতা ও অগ্নীধ্র এই পঞ্চ ঋত্বিক্ সঙ্গে লইয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হন এবং তাঁহাদিগকে যজ্ঞকার্য্যে নিয়োজিত করেন। অধ্বর্য্যু সর্ব্বকর্ম্মমুখ্য ; উদ্গাতা অগ্নি-স্থাপন প্রসঙ্গে সামগান করেন, হোতা স্তুতি এবং ব্রহ্মা ও অগ্নীধ্র নিজ নিজ কার্য্যে ব্রতী থাকেন।

অগ্ন্যাধানকালে গার্হপত্যাগ্নি, দক্ষিণাগ্নি ও আহবনীয়াগ্নি তিন গৃহের অগ্নিকোণে স্থাপন করিতে হয়। যদি প্রমাদবশতঃ অগ্নিহোত্রাগ্নি নষ্ট হইয়া যায়, তবে পুনরাধানের বিকল্পবিধান আছে। (তৈত্তি°স° ১.৫.১-৪)।

অগ্ন্যাধেয়—(পুং) [অগ্নিঃ আধীয়তে যেন। আ-ধা-যৎ] সাগ্নিক, অগ্নিহোত্রী। কাত্যায়নসংহিতা ও কল্পগ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ উল্লিখিত আছে।

অগ্ন্যালয়—(পুং) [অগ্নেরালয়ঃ। ৬-তৎ] বেদমন্ত্র দ্বারা বহ্নি-স্থাপনযোগ্য গৃহ। ২ যজ্ঞানলের কুণ্ড। ৩ স্থণ্ডিল।

অগ্ন্যাশয়—(পুং) [বৈদ্যক] পাকস্থলীর পশ্চাদ্বর্ত্তী পিণ্ডাকার গ্রন্থিবিশেষ (Pancreas)। এই গ্রন্থি হইতে একপ্রকার রস নিঃসৃত হইয়া পাকাশয়স্থ খাদ্যসামগ্রীর পরিপাকক্রিয়ার সাহায্য করে। [পকাশয় দ্র°]

অগ্ন্যাহিত—(পুং) [অগ্নি-আ-ধা-ক্ত কর্ম্মণি, আহিতঃ স্থাপিতঃ অগ্নিঃ হোমাগ্নিঃ যেন। পরনিপাতঃ] সাগ্নিক দ্বিজ।

অগ্ন্যুৎপাত—(পুং) [অগ্নি-উৎ-পত্‌-ঘঞ্‌। অগ্নিনা কৃত উৎ-পাতঃ। ব্যোম্নি অগ্নিবিকারঃ] ধূমকেতু, আকাশস্থ অগ্নির উল্কাপাতাদি উপদ্রব। এই উৎপাত পঞ্চবিধ। যথা—ধিষ্ণ্যা, উল্কা, অশনি, বিদ্যুৎ এবং তারা। এই পঞ্চবিধ অগ্ন্যুৎপাত জগতের পক্ষে অতি অশুভসূচনা করে।

প্রথমে উল্কার কথাই বলা যাইতেছে। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে, স্বর্গে সুখভোগের পর ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তিরা মর্ত্ত্যে পতনকালে যে যে রূপে পতিত হন, তাহারই নাম উল্কা। উল্কাপতনের পঞ্চদশদিন মধ্যে ফল দেখা যায়। উল্কা পূর্ণফল প্রদান করে। ইহা পতিত হইতে হইতে বর্দ্ধিত হয়। ইহার পুচ্ছভাগ হ্রস্ব হইতে থাকে। উল্কা দৈর্ঘ্যে এক একটা পুরুষের প্রমাণ, ইহা অনেক প্রকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। উল্কার আকার কখন প্রেত, প্রহরণ, গর্দ্দভ, করিশাবক, কুম্ভীর, বানর, দংষ্ট্রী, লাঙ্গুল ও মৃগের ন্যায় ; কখন বা গোধা, সর্প ও ধূমের ন্যায় ; কখন ইহা দ্বিশিরস্ক হইয়া দেখা দেয়। এই সকল আকারের উল্কা পাপময়ী : উহাতে অশুভ ফলই সূচনা

করে। উল্কা কখন কখন ধ্বজ, মৎস্য, হস্তী, গিরি, কমল, ইন্দু, তুরগ, তপ্তরজত, হংস, শ্রীবৎস, বজ্র, শঙ্খ ও স্বস্তিক আকারে প্রকাশ পায়। এই আকারের উল্কা মঙ্গল ও সুভিক্ষজনক।

নানারূপ উল্কা আকাশে নিয়ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া তথা হইতে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। ইহাতে রাজা ও রাজ্যনাশ ঘটায়। পতনের পূর্ব্বে উল্কা যদি চন্দ্র বা সূর্য্যকে স্পর্শ করিয়া তথা হইতে পতিত হয়; আর ঐ সময় যদি ভূকম্পন হইতে থাকে, তাহা হইলে পররাষ্ট্রের আক্রমণ, রাজবধ, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি ও অন্যান্য ভয় হয়। সূর্য্যচন্দ্রের দক্ষিণে উল্কা থাকিলে বনবাসীদিগের মৃত্যু সূচনা করে।

দিবাকর-নিঃসৃতা উল্কা যদি যাত্রাকারীর সম্মুখে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে শুভফল পাওয়া যায়।

শুক্ল, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণের উল্কা যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের নাশক। উল্কার সর্ব্বাঙ্গে না থাকিয়া যদি মাত্র মস্তক, বক্ষ, পার্শ্ব ও পুচ্ছে ও ঐ ঐ বর্ণ থাকে, তাহা হইলেও যথাক্রমে চারিবর্ণের নাশক হইবে।

উল্কা উত্তরাদি দিকে প্রদক্ষিণক্রমে পড়িলে, যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের নাশক এবং সরল, স্নিগ্ধ, অখণ্ড ও নিম্নভাবে পড়িলে উহাদের বৃদ্ধির কারণ হইবে।

শ্যাম, অরুণ, নীল, রক্ত, অগ্নি, কৃষ্ণ ও ভস্মাকার উল্কা; রুক্ষা, সন্ধ্যাজাতা, দিন-জাতা, বক্রা ও দলিতা উল্কার পতন শত্রুকর্ত্তৃক দেশ আক্রমণের সূচক।

উদয়ে বা অস্তকালে চন্দ্রসূর্য্যকে আহত করিয়া উল্কাপতনে বনবাসীদিগের নাশ এবং ধনিষ্ঠা ও মূলানক্ষত্র উল্কাহত হইলে যুবতীগণের পীড়া হয়। এইরূপে বিশেষ বিশেষ নক্ষত্র ও গণ উল্কাহত হইয়া উল্কাপতনে বিপ্র ও ক্ষত্রিয়গণের, নৃপগণের, চৌরগণের এবং কলাবিদ্গণের পীড়া হইয়া থাকে।

উল্কা দেবপ্রতিমায় পড়িলে রাজা ও রাজ্যের ভয় এবং ইন্দ্রধ্বজে পড়িলে রাজগণের ও গৃহে পড়িলে গৃহস্বামীদিগের পীড়া হইয়া থাকে।

দিগধিপতি গ্রহ উল্কাহত হইলে সেই সেই দিকের অধিবাসী-দিগের, কৃষকদিগের এবং চৈত্যতরুতে উল্কাপতনে সাধুগণের পীড়া হয়।

উল্কা পুরদ্বারে পড়িলে পুরক্ষয়, ইন্দ্রকীলে জনক্ষয়, ব্রহ্মায়তনে ব্রাহ্মণনাশ এবং গোষ্ঠে পড়িলে বহুগোধনসম্পন্ন ব্যক্তিগণের বিনাশ সূচনা করে।

উল্কাপাতকালে ক্ষেড়, স্ফোটিত, বাদিত, গীত বা উচ্চ রোদন-ধ্বনি হইলে রাজা ও রাজ্যের ভয় হয়। যে উল্কা প্রথম অবস্থায় দণ্ডাকৃতি হইয়া আকাশে অনেকক্ষণ থাকে, যাহা আকাশস্থ হইয়া সূত্রধৃতার ন্যায় ঝুলিতে থাকে এবং যাহা ইন্দ্রধ্বজের আকারে দেখা দেয়, এই শ্রেণীর উল্কাগুলিও রাজভয়ের কারণ।

উল্কা বিপরীতগামিনী হইলে বণিক্গণের, বক্রগামিনী হইলে রাজপত্নীগণের, অধোমুখী হইলে নৃপগণের এবং ঊর্দ্ধমুখী হইলে ব্রাহ্মণগণের বিনাশসাধন করে।

ময়ূরপুচ্ছধারিণী উল্কা লোক ক্ষয় করে এবং সর্পবৎ সর্পিণী উল্কা স্ত্রীজাতির অনিষ্ট ঘটাইয়া থাকে।

উল্কা মণ্ডলরূপে বা ছত্ররূপে দৃষ্ট হইলে যথাক্রমে নগর ও পুরোহিত নাশ করে।

উল্কা কৃষ্ণসর্প বা শূকরাকারে দৃষ্ট হইলে, কিংবা বিস্ফুলিঙ্গ-মালায় মণ্ডিত দেখাইলে অথবা খণ্ডাকারে বা সশব্দে গমন করিলে বিশ্ববাসীর পাপ জন্মাইয়া থাকে।

উল্কা আকাশে লীন হইয়া গেলে মেঘ নাশ করে।

উল্কা যদি বায়ুর প্রতিকূল দিকে কুটিলভাবে গিয়া ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে সকলের শুভজনক হয়।

উল্কা যে দিক্ হইতে আসিয়া নগর ও নাগরিক বল অভিভূত করে, রাজার ভয় সেইদিক্ হইতেই জানিবে।

যে দিক্ দীপ্ত করিয়া উল্কাপাত হয়, রাজা সেইদিক্ দিয়া শত্রুবল আক্রমণ করিলে, অচিরাৎ জয়লাভ করিতে পারেন।

অতঃপর অন্যতম অগ্ন্যুৎপাত ধিষ্ণ্যার কথা বলা যাইতেছে। ধিষ্ণ্যা আকারে কৃশা, অল্পপুচ্ছা ও জ্বলিত অঙ্গারবৎ পরিলক্ষিতা হয়। ধিষ্ণ্যার পরিমাণ দ্বিহস্ত। ইহা দশ ধনু ও তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক স্থানেও দেখা যায়। এই ধিষ্ণ্যা-উৎপাতের ফল ত্রিপক্ষমধ্যেই ফলে। ইহা অর্দ্ধফল দেয়।

তৃতীয় উৎপাত—অশনি। ইহারও ফল ত্রিপক্ষমধ্যে। আকারে ইহা চক্রের ন্যায়। ইহা মহাশব্দে ধরাতল বিদীর্ণ করিতে করিতে মনুষ্য, গজ, অশ্ব, মৃগ, প্রস্তর, গৃহ, বৃক্ষ ও পশু প্রভৃতির উপর পড়ে। ইহা পূর্ণ ফলপ্রদ।

চতুর্থ—বিদ্যুৎ। ইহার ফল ছয় দিনে। ইহা সহসা তটতট-স্বনে প্রাণিপুঞ্জের ত্রাস জন্মাইয়া কুটিল, বিশাল ও প্রোজ্জ্বল আকারে জীব ও ইন্ধনরাশিতে পতিত হয়। ইহাও পূর্ণ-ফলপ্রদ।

পঞ্চম—তারা। তারার ফলও ছয় দিনে। ইহা তাম্রপদ্ম-তন্তুরূপে অথবা শুক্লাকারেও দেখা দেয়। দৈর্ঘ্যে ইহা একহস্ত পরিমাণ। ইহার গতি আকাশে যেন ঝুলিয়া ঝুলিয়া তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ বা অধোভাবে হয়। ইহা একচতুর্থাংশ ফল প্রদান করে।

অগ্ন্যুৎপাত$_2$—(পুং) আগ্নেয়গিরি বা অগ্নিপর্ব্বত হইতে অগ্নি, ধূম ও অন্যান্য ধাতব পদার্থের নিঃসরন। [অগ্নিপর্ব্বত দ্র°] ২ গৃহদাহাদি অগ্নিজন্য উৎপাত।

অগ্ন্যুৎসব—[বহ্ন্যুৎসব দ্র°]

অগ্ন্যুদ্গম, অগ্ন্যুদ্গার, অগ্ন্যুদ্গিরণ—(ত্রি) আগ্নেয়-গিরির মুখগহ্বর হইতে অগ্ন্যাদির উদ্গমন বা উৎক্ষেপণ। [অগ্নিপর্ব্বত দ্র°]

অগ্ন্যুদ্ধার—(পুং) [অরণিসংঘর্ষণেন অগ্নেরুদ্ধারঃ উৎপাদনম্। ৬-তৎ] অরণিমন্থন দ্বারা অগ্ন্যুত্থাপন, অগ্ন্যুৎপাদন। [অরণি দ্র°]

অগ্ন্যুপস্থান—(ক্লী) [অগ্নি-উপ-স্থা-ভাবে লুট্। ৬-তৎ] অগ্নির উপাসনা। [অগ্নিরুপস্থীয়তে অনেন। করণে লুট্] ২ অগ্নির উপাসনা-মন্ত্র।

অগ্ন্যুপাসী—শিশোদীয় রাজপুতবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাপ্পার সন্ততিগণ সূর্য্যবংশী অগ্ন্যুপাসী (অগ্নির উপাসক) বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অগম্মণ্ড—আইস্‌লণ্ডের একজন খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক। ইনি উক্ত দ্বীপের স্কালহোল্ট নগরের বিশপ ছিলেন। ১৫১২ খৃষ্টাব্দে সুকবি জন আরাসন হোলারের বিশপপদে নিযুক্ত হইলে অগ্‌মণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত হইতে বাধ্য করেন। কিন্তু অত্যল্পকাল পরে আরাসন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অনুমতি পান। এই সময়ে লুথারপ্রবর্ত্তিত সংশোধিত খৃষ্টমত আইস্‌লণ্ডে প্রচারের নিমিত্ত দিনেমাররাজ ৩য় খৃষ্টিয়ান বিশেষ চেষ্টা করেন। দ্বীপবাসী বহুলোক লুথারের মত গ্রহণ করে; কিন্তু রোমান ক্যাথলিক মতাবলম্বী অগ্‌মণ্ড ও আরাসন রাজ-দ্রোহিতা করেন। তাঁহারা উভয়ে স্ব স্ব দলবল লইয়া দ্বীপবাসী লুথার-মতাবলম্বিগণকে আক্রমণ করেন। রাজসৈন্যের হস্তে আরাসন ধৃত ও নিহত হন। [আরাসন দ্র°।]

অগ্‌মোর—ইংলণ্ডের ওয়েলস্ বিভাগস্থ একটী নদী ও তত্তীরস্থ নগর।

অগ্র,—(ক্লী) [অন্‌গ্‌-রক্, ন-লোপঃ] প্রথম, আদি। [কাল-সম্বন্ধে] "মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনাৎ"। ২ উপরিভাগ, ঊর্দ্ধ। ৩ শেষভাগ, প্রান্ত। ৪ সূক্ষ্মশেষাংশ, ডগা (Tip, Point)। ৫ উৎকর্ষ। "অগ্রাদগ্রং রোহতি" (তাণ্ড্যব্রা°)। ৬ আধিক্য। ৭ পুরোভাগ, সম্মুখ। ৮ পূর্ব্বভাগ, পূর্ব্বাবয়বাংশ। "অথাগ্রহস্তে মুকুলীকৃতাঙ্গুলৌ" (কুমারস°)। ৯ শিখর, শৃঙ্গ। "কৈলাসাগ্রসমাসীনং" (তন্ত্র)। ১০ সমীপ, নিকট। ১১ প্রথমাংশ। ১২ কোন জাতিমধ্যে শ্রেষ্ঠমাত্র। ১৩ সমূহ। ১৪ আলম্বন, বিষয় (মনু ১.১)। ১৫ প্রথমভাগ। "প্রতাপোঽগ্রে ততঃ শব্দঃ পরাগস্তদনন্তরম্" (রঘু ৪.৩০)। ১৬ জ্যোতিষোক্ত অক্ষরূপ পলপরিমাণ। ১৭ ভিক্ষার পরিমাণভেদ। "অগ্রং ভিক্ষাচতুষ্টয়ং" (স্মৃতি)। ১৮ ত্রিভুজশীর্ষ। (ত্রি) ১৯ প্রথম। ২০ উত্তম, শ্রেষ্ঠ। ২১ প্রধান। "মমাগ্রমহিষী ভব" (রামায়ণ ৩.৪৭.২৮)। ২২ অধিক। ২৩ উপরিস্থ। "অগ্রং পুরস্তাদুপরি পরিমাণে পলস্য চ। আলম্বনে সমূহে চ প্রান্তে চ স্যান্নপুংসকম্। অধিকে চ প্রধানে চ প্রথমে চাভিধেয়বৎ। (মেদিনী)

অগ্র,—যশোহরের অন্তর্গত সুন্দরবনের একটী পল্লীর নাম। এইখানে বিস্তর পুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। পূর্ব্বে সুন্দরবনের অনেকস্থানে ধনিলোকের বাস ছিল। তাঁহারা নানাপ্রকার ব্যবসায়বাণিজ্য করিতেন। কিন্তু মগ ও পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গীদের অত্যাচারে ক্রমে ঐ সকল জনপদ লোকশূন্য হইয়া গিয়াছে।

অগ্রকর—(পুং) [করস্য অগ্র; ৬-তৎ। অগ্রঃ করঃ কর্ম্মধা (মল্লিনাথ)] হস্তের অগ্রাংশ; অঙ্গুলি। ২ প্রথম কিরণ।

অগ্রকায়—(পুং) [অগ্রঃ কায়ঃ, কর্ম্মধা] শরীরের পুরোভাগ।

অগ্রকোণ—বোম্বাইপ্রদেশে কোঙ্কণ অঞ্চলের একটী বন্দর; গোকর্ণের এক ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। ষোড়শ শতকে এইস্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ শাসনকালে চিতকুল এবং অঙ্কোলের মধ্যবর্ত্তী এই বন্দর হইতে ৩০০ বস্তা ধান রাজস্ব-স্বরূপ আদায় হইত। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে ডি'বারোস চিতকুলের দক্ষিণে অঙ্কোল, মির্জান ও এগোরপন শহরের উল্লেখ করিয়াছেন। ডি'বারোস অগ্রকোণকেই ভ্রমক্রমে 'এগোরপন' বলিয়াছেন। টলেমীর গ্রন্থে উল্লিখিত অর্মগরকে (Armagara) অনেকে অগ্রকোণ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু টলেমী অর্মগরকে নিত্রের উত্তরে সমুদ্রকূলে অবস্থিত বলিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, হোনাবরই এই অর্মগর। গোয়ায় অবস্থিত মর্মগোয়াও অর্মগর হওয়া সম্ভব। অগ্রকোণ পরে লবণ-ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল।

অগ্রগ—(ত্রি) [অগ্র-গম-ড] পুরোগামী, অগ্রগামী। ২ (পুং) অধিপতি, নায়ক।

অগ্রগণ্য—(ত্রি) [অগ্র-গণ-যৎ। ৭-তৎ] প্রথমে গণনীয়, অগ্রে উল্লেখযোগ্য। ২ শ্রেষ্ঠ।

অগ্রগামিন্—(ত্রি) [অগ্র-গম-ণিনি। ৭-তৎ] পুরোগামী। ২ নায়ক।

অগ্রচর্ব্বণকদন্ত—মুখের সম্মুখভাগে অবস্থিত চর্ব্বণদন্ত (Pre-molar tooth) [চর্ব্বণদন্ত দ্র°]

অগ্রজ—(পুং) [অগ্র-জন-ড] পূর্ব্বজ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। কোন ব্যক্তির অধিক পত্নী থাকিলে, যে সন্তান প্রথম স্ত্রীর গর্ভে জন্মিবে সেই জ্যেষ্ঠ হইবে, এমন ব্যবস্থা নহে। যে অগ্রে জন্মিবে, সেই অগ্রজ বা জ্যেষ্ঠ।

"সদৃশস্ত্রীষু জাতানাং পুত্রাণামবিশেষতঃ।

ন মাতৃতো জ্যৈষ্ঠ্যমস্তি জন্মতো জ্যৈষ্ঠ্যমুচ্যতে॥"(মনু ৯.১২৫) ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ, পাণ্ডুনৃপতি তাঁহার অনুজ। কিন্তু তদনুসারে দুর্য্যোধন জ্যেষ্ঠ হন নাই। যুধিষ্ঠির অগ্রে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তিনিই জ্যেষ্ঠ এবং রাজ্যের অধিকারী।

"জন্মতস্তু প্রমাণেন জ্যেষ্ঠো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।"

(মহা°, আদি,° ১১৫.২৫)

২ ব্রাহ্মণ। (ত্রি) ৩ অগ্রে জাত, পূর্ব্বজাত।

অগ্রজঙ্ঘা—(স্ত্রী) [অগ্রা জঙ্ঘা, কর্ম্মধা] জঙ্ঘার অগ্রভাগ।

অগ্রজন্মন্—(পুং) [অগ্রে জন্ম যস্য, বহুব্রী] জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ২ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা। ৩ বিপ্র, ব্রাহ্মণ। (মনু ২.২০ ; ৩.১৩)

বিপ্রের অগ্রজন্মসম্বন্ধে তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে এইরূপ বিবরণ দেখা যায়,—প্রজাপতির যজ্ঞকামনার ফলে তাঁহার মুখ হইতে ত্রিরাবৃত্তিসাধ্য অগ্নিষ্টোম, তৎপরে গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, তদনন্তর অগ্নি-দেবতা ও তৎপশ্চাৎ ব্রাহ্মণসৃষ্টি হয়। ব্রহ্মার প্রধান অঙ্গ মুখ হইতে সৃষ্টি বা জন্ম বলিয়া ব্রাহ্মণের নাম অগ্রজন্মা। কাহারও কাহারও মতে, ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বর্ণের আদি সৃষ্টি বলিয়া অগ্রজন্মা। [ব্রাহ্মণ দ্র°]

অগ্রজা—(স্ত্রী) জ্যেষ্ঠা ভগিনী।

অগ্রজাত—(পুং) [অগ্র-জন-ক্ত, ৭-তৎ] জ্যেষ্ঠভ্রাতা। ২ ব্রাহ্মণ। (ত্রি) ৩ পূর্ব্বজাতমাত্র।

অগ্রজাতক—(পুং) [অগ্রে জাতং জন্ম যস্য বহুব্রী, সমাসান্ত কঃ] ব্রাহ্মণ।

অগ্রজাতা—(স্ত্রী) জ্যেষ্ঠা ভগিনী। জ্যেষ্ঠা ভগিনী ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-দিনে ভাইকে অন্ন দিবার সময় "ভ্রাতস্তবাগ্রজাতাহং ভুঙ্ক্ষ্ব ভক্তমিদং শুভং" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া থাকেন।

অগ্রজাতি—(পুং) [অগ্র-জন-ক্তি, কর্ম্মধা] প্রধান জাতি, ব্রাহ্মণ।

অগ্রজিহ্বা—(স্ত্রী) অগ্রা জিহ্বা, কর্ম্মধা। জিহ্বার অগ্রভাগ।

অগ্রজ্ঞান—[দর্শন] অগ্রজাত জ্ঞান (anticipation)। কোন ব্যক্তি বা বস্তুসম্বন্ধে কোন চিন্তা বা তদ্বিষয়ক ভাবনা যাহা সর্ব্বাগ্রে অনুধাবন করা হয়।

অগ্রণী—(স্ত্রী) [অগ্র-নী-ক্বিপ্। ণত্ব] প্রভু। ২ বহ্নি।

"অগ্রং যচ্ছন্তি ভূতানাং যেন ভূতানি নিত্যদা।

কর্ম্মস্বিহ বিচিত্রেষু সোঽগ্রণীর্বহ্নিরুচ্যতে॥"

(মহাভা° ৩.২২০.২২)

(ত্রি) ৩ অগ্রিম, শ্রেষ্ঠ, প্রধান।

অগ্রতস্—(অব্য) [অগ্র-তস্ পঞ্চম্যর্থে] অগ্রে, প্রথমে। ২ পূর্ব্ব-ভাগ অবধি। ৩ সম্মুখে।

অগ্রতঃসর—(ত্রি) [অগ্রতস্ সৃ-ট] অগ্রগামী।

অগ্রতীর্থ—(পুং) গণ নামক বীর্য্যবান্ দানবের বংশের একজন পরাক্রমশালী ও যশস্বী নরপতি। (মহাভা°)

অগ্রতোলা—ত্রিপুরার রাজধানী। উমামাণিক্য এই নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান নাম আগরতলা। [আগরতলা দ্র°]

অগ্রদানিন্—(পুং) [অগ্র-দান-ইন্] দানগ্রহণে পতিত ব্রাহ্মণ। ইঁহাদিগকে অগ্রদানী ব্রাহ্মণ বলা হয়। পুরাণে উল্লিখিত আছে—কোন লোভী ব্রাহ্মণ প্রথমে শূদ্রদিগের দান গ্রহণ করেন এবং প্রেতকার্য্যের তিলাদি দানও লইতে থাকেন ; এইজন্য তাঁহার অগ্রদানী নাম প্রচলিত হয়।

"লোভী বিপ্রশ্চ শূদ্রাণামগ্রে দানং গৃহীতবান্।

গ্রহণাৎ তিলদানানামগ্রদানী বভূব সঃ॥" (ব্রহ্মবৈ°পু°)

বঙ্গদেশে এই অগ্রদানী ব্রাহ্মণেরাই এখনও প্রেতোদ্দেশে প্রদত্ত দানদ্রব্য প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশে ইঁহারা একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী হইয়া আছেন। ইঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। সকল গ্রামেও এই সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ নাই। বঙ্গের বিশুদ্ধ সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণেরা ইঁহাদের সঙ্গে আহার ব্যবহার লোকলৌকতা কিছুই করেন না।

কাহারও কাহারও মতে, রাজা বল্লালসেনের মাতৃশ্রাদ্ধে গো, হিরণ্য, হস্ত্যশ্ব, নৌকা, পাল্‌কী ও রথাদি মহাদানের গ্রহণই ইঁহাদের সদাচার ও সমাজচ্যুতির কারণ। ইঁহারা যাজন ও অধ্যাপনায় বঞ্চিত। ইঁহাদিগের কন্যাগ্রহণে আদিবংশজের উৎপত্তি হইয়াছে।

অগ্রদানীয়—(পুং) [অগ্র-দান-ছ] অগ্রদানী ব্রাহ্মণ।

অগ্রদাসজী—খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে পশ্চিম-ভারতে আবির্ভূত জনৈক সাধুপুরুষ। ইনি সর্ব্বদাই হরিসেবায় অনুরক্ত থাকিতেন। একদিন মহারাজ মানসিংহ ইঁহার দর্শনলাভ করিবার উদ্দেশ্যে ও ইঁহার বাক্যালাপ শ্রবণে নিজকে কৃতার্থ করিবার জন্য ইঁহার আশ্রমে গমন করেন। ইনি তৎকালে আশ্রমের আবর্জ্জনা ঝাঁট দিয়া ফেলিতেছিলেন। রাজা মানসিংহকে বহু অনুচরবর্গসহ আসিতে দেখিয়া তিনি বিষয়ীর সংসর্গ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য দূরস্থিত বৃক্ষতলে গিয়া উপবেশন করিলেন। তখন মানসিংহ সমস্ত অনুচরবর্গ রাখিয়া নিজে সাধুর নিকট গমন করেন। সাধুও সামান্য দুই চারিটী কথায় তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে বিদায় দেন। ভারতবর্ষের সাধুগণ যে রাজৈশ্বর্য্যের সমক্ষেও নিজেদের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেন, তাহারই উদাহরণস্বরূপ ভক্তমালগ্রন্থে ইঁহার চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

অগ্রদ্বীপ—নদীয়া জেলার ভাগীরথী নদীর উপর এক দ্বীপ। অক্ষা° ২৩°৩৭′ হইতে ২৫°৩৩′৪৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°১৭′১৫″ হইতে ৮৮°১৯′১৫″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। গঙ্গার গর্ভে চড়া পড়িয়া প্রথম যে দ্বীপ উৎপন্ন হয়, তাহাই এখনকার অগ্রদ্বীপ। অগ্রদ্বীপের প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে আর একটী চড়া পড়ে। সেই চড়া এখন নবদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ।

অগ্রদ্বীপ কাঁটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ভাগীরথীতীরস্থ একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম ও বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে একটী প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। পূর্ব্বতন অগ্রদ্বীপ বর্ত্তমান অগ্রদ্বীপের প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে ছিল, গঙ্গার গতি-পরিবর্ত্তনের সহিত গ্রামও ক্রমে সরিয়া আসিয়াছে। মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতেই অগ্রদ্বীপ সুপ্রাচীন তীর্থ বলিয়া গণ্য। দিগ্বিজয়-প্রকাশে লিখিত আছে, বারাণসীতে গঙ্গাস্নান করিলে যেরূপ ফল হয়, বারুণীর দিন অগ্রদ্বীপে গঙ্গাস্নান করিলে সেইরূপ ফল হয়। এখানকার ফলমাহাত্ম্যের জন্য রাজা বিক্রমাদিত্য এখানে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন। আজও বারুণী উপলক্ষে এখানে ১৫ দিনব্যাপী বড় মেলা হয়, তাহাতে প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

অধুনা গোপীনাথ-বিগ্রহের ও ঘোষঠাকুরের জন্যই এই স্থান প্রসিদ্ধ। অগ্রদ্বীপের এই ঘোষঠাকুরের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে অনেকে গোল করিয়া থাকেন। এ জন্য এখানে প্রকৃত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলে সোমঘোষের অধস্তন ১৪শ পুরুষ যজাননিবাসী দাতা দিগম্বরের প্রপৌত্র হইতেছেন, বল্লভঘোষ। উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় আছে—

"গোপালতনয় এক ডাক সরসে পাই।
বল্লভে বাইসা খ্যাতি দক্ষিণে কুলাই ॥"

কেহ কেহ মনে করেন বাইশ জন ওমরাহের মধ্যে বল্লভ-ঘোষও একজন ছিলেন। হিন্দু রাজকর্ম্মচারিগণের উপর মুসলমান রাজপুরুষগণের বিদ্বেষদৃষ্টি পতিত হইলে বল্লভ দক্ষিণে পলাইয়া আসিয়া কুলাই নামক স্থানে বাস করিতে থাকেন, তদবধি কুলাই ঘোষবংশের একটী প্রধান সমাজ বলিয়া গণ্য হয়। [কুলাই দ্র°] বল্লভের ৯টী পুত্র—বাসুদেব, গোবিন্দ, মাধব, জগন্নাথ, দামোদর, মুকুন্দ, দনুজারি, কংসারি ও মীনকেতন। প্রথম ছয়জন সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তন্মধ্যে বাসু-দেব, গোবিন্দ, মাধব ও মুকুন্দ এই চারিজন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-দেবের পার্ষদ ও পদকর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ বাসুঘোষের পদ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের অপার্থিব ও অপূর্ব্ব জিনিষ।* তাঁহার অনুজ গোবিন্দঘোষই অগ্রদ্বীপের ঘোষঠাকুর। [গোবিন্দ ও বাসুদেবঘোষ দ্র°]

কাশীপুর বিষ্ণুতলায় সিংহ-বংশে গোবিন্দঘোষের বিবাহ হয়। পত্নীর মৃত্যুর পর সন্তানাদি না থাকায় তাঁহার সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তিনি অগ্রদ্বীপের নিকট গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করেন। এক দিবস মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-দেব ভক্তমণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া ভাগীরথীসলিলে অবগাহন করিতেছেন, এমন সময়ে গোবিন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি নবীন সন্ন্যাসীর তেজোময় অপূর্ব্ব মুখশ্রী দেখিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হইলেন, মহাপ্রভুর চরণে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "প্রভো! আমি সংসার চাই না, ধন মান ঐশ্বর্য্য চাই না, আত্মীয় স্বজন চাই না, কেবল তোমার ঐ চরণকমল সেবা করিতে চাই।"

এই কথা শুনিয়া গৌরাঙ্গদেব গোবিন্দকে সংসারের নানা প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে সংসারে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু গোবিন্দ কিছুতেই বিচলিত হইবার লোক নহেন। তিনি বলিলেন, "ধন মান ঐশ্বর্য্য সমস্ত দূর হউক, উহারা আমাকে আর জ্বালাইতে পারিবে না। এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া শ্রীচরণে স্থান দিন।" এই বলিয়া তিনি চৈতন্যের পা জড়াইয়া ধরিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যও গোবিন্দকে প্রকৃত ভক্ত জানিতে পারিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন, "যদি নিষ্কাম ব্রত পালন করিতে পার, তাহা হইলে আমার সহিত থাকিতে পাইবে।" গোবিন্দ ইহা শুনিয়া মহানন্দে চৈতন্যের পদরেণু গ্রহণ করিলেন এবং নিষ্কাম ব্রত পালনে সম্মত হইলেন। পরে কিছুদিন তিনি মহাপ্রভুর সহিত মহানন্দে কাটাইলেন।

একদিন মহাপ্রভু আহারান্তে মুখশুদ্ধি না পাইয়া ভক্তগণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ আর মুখশুদ্ধি হইল না।" শিষ্যগণ নীরব রহিলেন। গোবিন্দ অমনি কৃতাঞ্জলিপুটে প্রভুর সম্মুখে যাইয়া কহিলেন, "প্রভো! আমার নিকট একটী হরী-তকী আছে; যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আপনার সেবার জন্য অর্পণ করি।" এই কথায় শ্রীচৈতন্য হাসিয়া উঠিলেন। তিনি কহিলেন, "গোবিন্দ! তোমার ভক্তির সামগ্রী আমি আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিলাম। কিন্তু আজ হইতে তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ কর।" গোবিন্দের মস্তকে যেন অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দেব! দাস এমন কি অপরাধ করিয়াছে, যাহার জন্য এ কঠোর আদেশ করিলেন?" চৈতন্যদেব কহিলেন, "গোবিন্দ! তুমি যথার্থ ভক্ত ও হরিপূজার অধিকারী। কিন্তু নিষ্কাম ব্রত

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস কায়স্থকাণ্ড, ৪র্থাংশ, ২য় অধ্যায়ে বিস্তৃত পরিচয় দ্রষ্টব্য।

পালনে উপযুক্ত নও, এখনও তোমার বিষয়-বাসনা দূর হয় নাই, এখনও তোমার সঞ্চয়-স্পৃহা আছে। তাই বলিতেছি, গৃহে ফিরিয়া যাও, হরির আরাধনা করিও, তাহাতেই মুক্তি হইবে।”

“আমি কিছু চাই না, সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়াছি, আর সংসারে ফিরিব না”—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সজল নয়নে গোবিন্দ এই কএকটী কথা বলিলেন।

চৈতন্যদেব ভক্তশ্রেষ্ঠ গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “গোবিন্দ! তুমি যথার্থই সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছ, কিন্তু এখনও তোমার সম্মুখে বিষম কণ্টক রহিয়াছে। আজ একটী হরীতকী সঞ্চয় করিয়াছ, কাল আবার আর একটী সঞ্চয়ের ইচ্ছা হইবে, পরশ্ব আর একটী। এইরূপ কামনাই নিষ্কাম ব্রত-পালনের ঘোর অন্তরায় জানিবে। সেই জন্য বলিতেছি, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও। যেদিন তোমার জীবনে কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটিবে, সেই দিন আবার আমার দর্শন পাইবে। যদি কোন অলৌকিক দ্রব্য পাও, যত্নসহকারে রাখিয়া দিও। তোমার আশা পূর্ণ হইবে।” মহাপ্রভু এই প্রকারে গোবিন্দকে পরিত্যাগ করিলেন। গোবিন্দ অগ্রদ্বীপে আসিয়া “আবার কবে প্রভুর দর্শন পাইব”—এই আশায় নির্ভর করিয়া রহিলেন।

এইরূপে বহুদিন গত হইল। শুভ মধুমাস আসিল। এক দিন ভক্তপ্রবর গোবিন্দ জাহ্নবীসলিলে আবক্ষ নিমগ্ন হইয়া ধ্যানে নিরত রহিয়াছেন, এমন সময়ে কি একটা জিনিস আসিয়া তিনবার তাঁহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল। তিনি চাহিয়া দেখেন, শবদাহের একখণ্ড ক্ষুদ্র কাষ্ঠ। তিনি সেই কাঠখানি তীরে তুলিয়া রাখিলেন। কিন্তু তুলিবার সময় বুঝিলেন যে, ঐ কাঠখানি স্বাভাবিক গুরুত্ব অপেক্ষা শতগুণ ভারী। একি হইল! বিস্ময়ে গোবিন্দের মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। তিনি কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু মনের সেই অপার্থিব ভাব কিছুতেই দূর হইল না—এই চিন্তায় সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলেন, শঙ্খচক্রগদাধর যেন তাঁহাকে বলিতেছেন, “গোবিন্দ! ভুল না, ভুল না, সেই কাঠখানি তুলিয়া আনিয়া গৃহে রাখ। মহাপ্রভু আসিতেছেন, আসিলে তাঁহাকে দিও।”

গোবিন্দের নিদ্রা ভাঙ্গিল, দেখিলেন চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার। তিনি সেই নিবিড় অন্ধকারে যেন কোন কুহকের বলে আকৃষ্ট হইয়া গঙ্গাতীরে আসিলেন। এখানে আসিয়া দেখিলেন, সেই কাঠখানি যথাস্থানে পড়িয়া আছে। গোবিন্দ অতি যত্নে কাঠখানি স্কন্ধে লইয়া ধীরে ধীরে কুটীরে আনিয়া রাখিলেন। সে রাত্রি আর তাঁহার চক্ষে নিদ্রা আসিল না।

ক্রমে প্রভাত হইল। গোবিন্দ অরুণের আলোকে দেখিতে পাইলেন, সেখানি শবদাহের কাষ্ঠ নয়—এক খানি সমুজ্জ্বল কৃষ্ণ-প্রস্তর। গোবিন্দ চমকিয়া উঠিলেন। চৈতন্যদেবের কথাগুলি তাঁহার স্মরণ হইল।

বেলা দ্বিপ্রহরসময়ে গোবিন্দ গ্রাম-মধ্যে ভিক্ষা করিতে বহির্গত হইলেন। ভিক্ষান্তে কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, কুটীর-দ্বারে চৈতন্যদেব। ভক্তপ্রধান গোবিন্দ চৈতন্যদেবকে দেখিয়া পুলকে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। গোবিন্দের ভক্তিদর্শনে চৈতন্যেরও প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার কিছু হইয়াছে?” গোবিন্দ সকল কথাই ব্যক্ত করিলেন। তখন চৈতন্যদেব বলিলেন, “গোবিন্দ! তোমার আর কোন চিন্তা নাই। ভগবান্ তোমার মঙ্গলের জন্য ঐ শিলা পাঠাইয়াছেন। কল্য এক ভাস্কর আসিয়া ঐ শিলা হইতে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ নির্ম্মাণ করিবে। সেই বিগ্রহ আমি প্রতিষ্ঠা করিব। তুমি তাঁহার সেবাইত হইবে।”



অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ ও বামপার্শ্বে রাধিকামূর্ত্তি

পরদিন যথাকালে এক অজ্ঞাতকুলশীল অপরিচিত ভাস্কর আসিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সকলের অসাক্ষাতে চলিয়া গেল। সকলেই দেখিলেন—নবদূর্ব্বাদলশ্যাম বঙ্কিম কৃষ্ণবিগ্রহ প্রস্তুত

হইয়াছে। চৈতন্যদেব তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং গোবিন্দ ঘোষ তাঁহার পূজক নিযুক্ত হইলেন। ঐ কৃষ্ণবিগ্রহের নামই গোপীনাথ। গোবিন্দ ঘোষই পরে 'ঘোষঠাকুর' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

গোপীনাথ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পর ঘোষ-ঠাকুর বহুদিন জীবিত ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি বহুসংখ্যক শিষ্য ও বিস্তর দেবোত্তর সম্পত্তি পাইয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েক দণ্ড পূর্ব্বে তিনি শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, "আমি চলিলাম, আজ আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। তোমরা যথারীতি প্রভুর সেবা করিও। মহাপ্রভুর আজ্ঞা—আমার প্রাণ বাহির হইলে যথাসময়ে গোপীনাথদেব যেন আমার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করেন। আমার দেহ দাহ করিও না, গ্রামের এক পার্শ্বে সমাধি দিও।" এই বলিয়া ভক্তপ্রবর গোবিন্দ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। প্রবাদ এইরূপ, সেই দিন গোপীনাথের চক্ষেও বিন্দু বিন্দু জল দেখা দিয়াছিল। চৈত্রমাসে কৃষ্ণা একাদশীতে গোপীনাথ শ্রাদ্ধীয় বাস ও কুশাঙ্গুরী পরিয়া সেবকের পুত্ররূপে শ্রাদ্ধ করিলেন। এখনও প্রতি বৎসর ঐ দিনে গোপীনাথকর্ত্তৃক ঘোষ-ঠাকুরের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

গোপীনাথ দর্শন করিবার জন্য বহু দূরদেশ হইতে ভক্ত বৈষ্ণবগণ এখানে আগমন করিতেন। তাহাতে যথেষ্ট আয় হইত। ঘোষ-ঠাকুরের ভ্রাতৃবংশধরগণ আসিয়া সেবা চালাইতেন। ক্রমে তাঁহাদের প্রভাব রাঢ় ছাড়িয়া পূর্ব্ববঙ্গে পঁহুছিল। পূর্ব্ববঙ্গের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাদের কাহারও কাহারও শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, তাঁহারাও শিষ্যসম্পত্তি রক্ষার জন্য অনেকে পূর্ব্ববঙ্গ আশ্রয় করিলেন। এই সঙ্গে তাঁহাদের হৃদয়ে গোপীনাথ-বিগ্রহ লইয়া যাইবার আশা বলবতী হইল। কিন্তু তাঁহাদের যে সকল সরিক রাঢ়ে ছিলেন, তাঁহারা গোপীনাথকে ছাড়িতে সম্মত হইলেন না। পূর্ব্ববঙ্গগামী ঘোষবংশীয়গণ একদিন গোপনে গোপীনাথকে লইয়া চলিলেন, জ্ঞাতিগণ সংবাদ পাইয়া পথ আটকাইলেন, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে বেশী লোকজন থাকায় জ্ঞাতিগণ ফিরিয়া আসিলেন এবং তৎকালের পাটুলীর উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থরাজের নিকট বিগ্রহ উদ্ধার করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পাটুলীর রাজারা তৎক্ষণাৎ একদল সৈন্য পাঠাইয়া কুষ্টিয়ার নিকট হইতে গোপীনাথকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন এবং পাটুলীর রাজবাটীতেই কিছুকাল রাখিয়া দিলেন। এইরূপে গোপীনাথ ঘোষবংশের হাতছাড়া হইলেন। পাটুলীর রাজা অগ্রদ্বীপ ও নিকটবর্ত্তী জমিদারী গোপীনাথের সেবার জন্য অর্পণ করেন এবং চৈত্র-একাদশীর দিন অগ্রদ্বীপে গোপীনাথকে পাঠাইয়া পূর্ব্ববৎ শ্রাদ্ধাদি উৎসব নির্ব্বাহ করিতেন। একবার মেলায় বহু লোকের জনতায় কতকগুলি লোক মারা যায়। এ সংবাদ পাইয়া মুর্শিদাবাদের নবাব স্থানীয় জমিদারকে কারণ দর্শাইতে হুকুম দেন। মুর্শিদাবাদ সরকারে পাটুলীর পক্ষে যিনি উকীল ছিলেন, তিনি নিজ প্রভুর সমূহ বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া ভয়ে কিছুই বলিলেন না। মোকদ্দমার ডাক হইলে নদীয়া-রাজের উকীল উঠিয়া বলিলেন, 'হুজুর! সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড় হয়। এত ভিড়ের মধ্যে দুই চারি জন মরিবে, তাহা কিছু অসম্ভব নহে। তবে আমার প্রভু নবদ্বীপরাজ ভবিষ্যতে বিশেষ সাবধান হইবেন।' উপযুক্ত উত্তর শুনিয়া নবাব সন্তুষ্ট হইলেন। নবদ্বীপের উকীলের কৌশলে সেই দিন হইতে গোপীনাথসহ অগ্রদ্বীপ-জমিদারী নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারভুক্ত হইল। যেখানে গোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুরের সমাধি ছিল, তাহারই পার্শ্বে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গোপীনাথের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন।

ভূকৈলাসের মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষালের পিতা মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্র ১১৭১ সালে ত্রিস্থলী করিয়া ফিরিবার সময় অগ্রদ্বীপে নামিয়াছিলেন। সহযাত্রী কবি বিজয়রাম তাঁহার তীর্থমঙ্গলে লিখিয়াছেন—

> "অগ্রদ্বীপে আসি নৌকা হৈল উপস্থিত ॥ ১০১২
> সেই স্থানে গোপীনাথ ঠাকুরের ঘর।
> অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ বাটী দেখিতে সুন্দর ॥ ১০১৩
> রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ী আছেন গোপীনাথ।
> দর্শন না পায়্যা যাত্রী মাথে মারে ঘাত ॥" ১০১৪

কলিকাতার শোভাবাজার-রাজবাটীতে প্রবাদ আছে যে, মহারাজ নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধে অথবা তাঁহার গোবিন্দজী প্রতিষ্ঠাকালে রাঢ়বঙ্গে যত বিষ্ণুবিগ্রহ ছিলেন, রাজা নবকৃষ্ণ সে সকলকেই নিজ প্রাসাদে আনাইয়াছিলেন। কার্য্যান্তে সকল দেবই ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু গোপীনাথের মোহনমূর্ত্তি দেখিয়া তিনি আর তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন না। এই বিগ্রহ লইয়া নবদ্বীপাধিপতির সহিত মহারাজ নবকৃষ্ণের বিবাদ উপস্থিত হয়। কিন্তু অগ্রদ্বীপে প্রবাদ আছে যে, মহারাজ নবকৃষ্ণ গোপনে গোপীনাথ বিগ্রহ কলিকাতায় লইয়া যান। সমসাময়িক ইংরেজ লেখক ওয়ার্ড সাহেব কিন্তু লিখিয়াছেন—

"গোপীনাথের অধিকারী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজা নবকৃষ্ণের নিকট তিন লক্ষ টাকা ধারিতেন। সেই জন্য রাজা নবকৃষ্ণ অগ্রদ্বীপের গোপীনাথকে লইয়া যান। অবশেষে কৃষ্ণনগরপতি মোকদ্দমা করিয়া সেই মূর্ত্তি উদ্ধার করেন।"*

* Ward's History of the Hindoos, Vol. 1. p. 205-206.

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে গোপীনাথের সেবার জন্য প্রত্যহ ৫০৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল, তৎপরে ২৫৲ টাকা হয়, ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিয়া এখন দৈনিক ৷৷০ আনা ব্যবস্থা হইয়াছে।

তীর্থমঙ্গলে গোপীনাথের যে "অপূর্ব্ব-নির্ম্মাণ বাটী"র উল্লেখ আছে, ভীষণ ভূমিকম্পে তাহার অধিকাংশই ভগ্ন হইয়াছে। সংস্কারাভাবে মূল-মন্দিরের উভয় পার্শ্বে নাটমন্দির ও ভোগগৃহ ধ্বংসপ্রায়। মূল-মন্দির সামান্য সংস্কারের ফলে এখনও দাঁড়াইয়া আছে বটে, কিন্তু উপযুক্ত সংস্কার না হইলে শীঘ্রই ধ্বংসমুখে পতিত হইবে।

অগ্রদ্বীপ গ্রামে বাগানের মধ্যে মেলা হয়। গ্রামের মধ্যে ও মেলাস্থানের নিকট বর্দ্ধমানরাজদত্ত মহাপ্রভুর সেবা আছে। তাহারই নিকট রাধাকান্তজী আছেন, নাটোররাজদত্ত বৃত্তিতে তাঁহার সেবা চলে। এখানে সকল জাতির বাস আছে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক।

অগ্রধান্য—(ক্লী) ধান্যবিশেষ, জবার, বজরা।

অগ্রনখ—(পুং) [অগ্রো নখঃ, কর্ম্মধা] নখাগ্র।

অগ্রনাসিকা—(স্ত্রী) নাসিকার অগ্রভাগ।

অগ্রন্থিক—(পুং) [নাস্তি গ্রন্থির্যস্য। বহুব্রী] জৈনসম্প্রদায়-বিশেষ। [নির্গ্রন্থ, জৈন দ্র°] ২ আত্মতত্ত্বজ্ঞ। সংসারপাশ হইতে যিনি মুক্ত হইয়াছেন। (ত্রি) ৩ গ্রন্থিশূন্য।

অগ্রপর্ণী—আলকুশী। [আলকুশী দ্র°]

অগ্রপূজা—(স্ত্রী) প্রাথমিক পূজা।

অগ্রভাগ—(পুং) [অগ্র-ভজ-ঘঞ্] শ্রাদ্ধে ও পূজাদিতে প্রথম দেয় ভাগ। ২ অবয়বের শেষভাগ, যথা শিখাগ্রভাগ।

অগ্রভুজ্—(ত্রি) [অগ্র-ভুজ-ক্বিপ্] দেবতা-পিতৃপুরুষাদিকে না দিয়া যে অগ্রে ভোজন করে। ঔদরিক। পেটুক।

অগ্রভূ—(পুং) [অগ্র-ভূ-ক্বিপ্, ৭ তৎ] জ্যেষ্ঠভ্রাতা। ২ ব্রাহ্মণ। (স্ত্রী) ৩ জ্যেষ্ঠভগিনী। (ত্রি) ৪ পূর্ব্বজাত।

অগ্রমহিষী—(স্ত্রী) কর্ম্ম-ধা। প্রধানা রাজমহিষী, পাটরাণী।

অগ্রমাংস—(ক্লী) কর্ম্ম-ধা। হৃদয়ের মধ্যস্থিত পদ্মাকার মাংস। ফুস্ফুস্, ফুক্কা।

অগ্রমাংস, (-মাস)—[বৈদ্যক] এক প্রকার রোগ। অগ্রমাস রোগশব্দে উদরের উর্দ্ধভাগস্থ মাংসবৃদ্ধিকে বুঝায়। প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি রোগের সঙ্গে বুকের নিম্নাস্থি বৃদ্ধি হইলে তাহাকে অগ্রমাস বা 'কড়া' কহে।

লক্ষণ—দক্ষিণ কক্ষ ও উদরের উর্দ্ধভাগ চাপিলে বেদনা ও ভার বোধ হয়। রোগী পার্শ্ব ফিরিতে কষ্ট বোধ করে। কখন কখন কাশ, কখন কখন দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনা; নাড়ী মৃদু ও অনিয়মিত হইয়া থাকে। জ্বর অতিশয় প্রবল হয়। সামান্য যকৃৎ অপেক্ষা ইহা সাঙ্ঘাতিক।

কারণ—শীতল স্থান হইতে উষ্ণ স্থানে গমন; গরম মশলাদি দিয়া প্রস্তুত খাদ্য অপরিমিত ভোজন; মদ্যপান, ক্রোধ কিম্বা অপর কোনরূপ মানসিক প্রভাব এবং দক্ষিণ কক্ষে আঘাত ইত্যাদি বশতঃ এই রোগ জন্মিতে পারে।

হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা—জ্বর ও কম্পজ্বর ছাড়িলে ফস্ফরাস্, মার্কুরিয়াস্, নাইট্রিক এসিড্, এগারিকাস্ মার্কেরিয়াস্, আর্সেনিক ও চায়না। কম্পজ্বর সত্বে কালি-ব্রোমাইডাম ব্যবহার করিবে। প্রতিরাত্রে ২০ মিনিট গরমজলে স্বেদ দিবে।

এলোপ্যাথী—কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে বিরেচক ঔষধ দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য পরে নাইট্রিক্ মিউরেটিক্ এসিড্ ডাইলিউট্, লাইকর ট্র্যাক্সিকম্, ভাইনাম্ ইপিকাক্, ইন্‌ফিউযন্ কলম্বো, একত্র করিয়া বয়স অনুসারে উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহার্য্য।

এ রোগে মার্কারী (পারদ) ঘটিত ঔষধ কখন কখন বিশেষ উপকার করিয়া থাকে।

কবিরাজী—যকৃতাদি লৌহ ও লোকনাথরস চূর্ণের জলের সহিত পান করিতে দিবে।

সাদাচটী নামক ঔষধও অগ্রমাস রোগের উৎকৃষ্ট মুষ্টিযোগ। এজন্য সাদাচটীর প্রস্তুতকরণপ্রণালী লিখিত হইল—

পরিষ্কার সোরা ... ৮ তোলা।

পরিষ্কৃত ফট্‌কিরি ... ২ তোলা।

উভয়কে উত্তমরূপে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিবে। তৎপরে উনানের উপর কড়া চাপাইয়া ঐ মিশ্রিত দ্রব্য ১০ তোলা তাহাতে নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ উহা জলের ন্যায় তরল হইবে; তৎপরে খন্তি আড় করিয়া কড়া হইতে সেই জলবৎ তরল পদার্থকে তুলিতে হইবে। খন্তি ঝাড়িলে বা ছুরী দ্বারা চাঁচিলে শুক্লবর্ণ অতি সূক্ষ্ম চটী বাহির হইবে। খন্তি গরম হইলে দ্বিতীয় খন্তি কিম্বা সেই খন্তি জলে ডুবাইয়া ও পুঁছিয়া পুনর্ব্বার কড়াতে দিবে। খন্তিতে যেন জল না থাকে, তাহা হইলে ভয়ঙ্কর ঘটনা হইবার আশঙ্কা। যখন কড়ায় অগ্নিকণা দৃষ্ট হইবে, সেই সময় কড়া নামান বা অল্প জাল দেওয়া আবশ্যক।

সাদাচটী ৩ হইতে ৬ রতি পরিমাণে দিবসে দুইবার জলের সঙ্গে সেবন বিধি। ইহা দ্বারা প্লীহা, যকৃৎ, অগ্রমাস, উগ্রকড়া, গুল্ম প্রভৃতি আরোগ্য এবং অগ্নিবৃদ্ধি ও কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। [যকৃৎ দ্র°]

অগ্রমুখ—(ক্লী) [অগ্রং মুখম্, কর্ম্মধা] মুখাগ্র।

অগ্রম্মেস্—(পুং) খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতকের গ্রীক ঐতিহাসিকগণ

উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে, অগ্রস্মেস্ নামে এক নৃপতি ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তবাসী প্রসিয়াই ও গঙ্গারিদে নামক দুইটী জাতিকে শাসন করিতেন। প্রসিয়াই প্রাচ্যশব্দের রূপান্তর বলিয়া মনে হয়। উক্ত লেখকগণ প্রসিয়াইগণের রাজধানী পালিম্বোথ্ৰ (পাটলীপুত্র) বলিয়াছেন। গঙ্গারিদে জাতি—বোধ হয় গঙ্গাতীরবর্ত্তী রাঢ়ের নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসীদিগকে বুঝাইতেছে।

অগ্রয়ণ—(ক্লী) [অগ্রময়নাৎ ; ণত্বম্, অলোপশ্চ শকন্ধাদি] অগ্রহায়ণ মাস। ২ এই মাসে সাগ্নিকব্রাহ্মণ-কর্ত্তব্য নবশস্য-যজ্ঞবিশেষ। ৩ নিরগ্নিব্রাহ্মণ-কর্ত্তব্য নবান্ন-শ্রাদ্ধ।

অগ্রযান(-ণ)—(ক্লী) [অগ্র-যা-ল্যুট্। অগ্রে যানং যস্য] পূরোগামী সৈন্য। (ত্রি) ২ পুরোগামী মাত্র। (পুং) ৩ জনৈক ঋষি। ইনি যাস্কের পূর্ব্বে বেদব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

অগ্রযায়িন্—(ত্রি) পুরোগামী। ২ শ্রেষ্ঠ।

অগ্রযায়ী—ভারতযুদ্ধে খ্যাত এক কৌরববীর। ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে ও গান্ধারীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি অত্যন্ত বলশালী ও সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ছিলেন। ইনি ভীমহস্তে নিহত হন।

অগ্রযাবন্—(পুং) অগ্রগামী। (ঋক্ ১০.৭০.২)

অগ্রযোধিন্—(পুং) [অগ্র-যুধ্-ণিনি, ৭-তৎ] অগ্রযোদ্ধা। যিনি সৈন্যের সম্মুখে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। (রামা° ৪.২১.১২)

অগ্রলোড্য—(পুং) [বৈদ্যক] চেঁচকো, চিঞ্চোড়মূল।

অগ্রলোহিতা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] চিল্লীশাক। [চিল্লীশাক দ্র°]

অগ্রবন—(ক্লী) [বনস্য বৃন্দাবনস্যাগ্রম্] আগ্রার পূর্ব্বতন নাম। আগ্রা, ব্রজ-মণ্ডলের একটী বন। পরিক্রমার তীর্থ-যাত্রীদের ইহাই প্রথম গন্তব্যস্থান বলিয়া এই স্থানের নাম অগ্রবন। শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য রূপ ও সনাতন গোস্বামী যখন বৃন্দাবন আবিষ্কার করিবার জন্য আসেন, তখন বৈষ্ণবদিগের মতে এই স্থানে প্রকাণ্ড অরণ্য ছিল। বহ্‌লোল ও সিকন্দর লোদী দিল্লী হইতে আগ্রায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান শহরের অপরদিকে যমুনার তীরে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইব্রাহিম লোদী ও বাবর এইখানেই রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হয় এবং তিনি চরবাগে সমাহিত হন। অক্‌বরের সভাসদেরা এই স্থানকে রামবাগ বলিয়া অভিহিত করিতেন। পরে বাবরের কবর কাবুলে স্থানান্তরিত করা হয়। আগ্রার দুর্গ অক্‌বরকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। কথিত আছে, এই অগ্রবন হইতে 'অগরবাল' নামের উৎপত্তি। [আগ্রা দ্র°]

অগ্রবরখেরা—মধ্যভারতের এক ক্ষুদ্র রাজ্য। অক্ষা° ২৩°৫৭′ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭°৩২′ পূঃ।

অগ্রবীজ—(পুং) [অগ্রং শাখাগ্রং বীজরূপমুৎপাদকং যস্য] কলম হইতে যে বৃক্ষ জন্মে। যাহার শাখা পুঁতিলে গাছ হয়। যথা, কুরণ্ট, গোলাপ, মল্লিকা ইত্যাদি বৃক্ষ।

অগ্রবীর—(পুং) শ্রেষ্ঠ বীর। "কর্ম্মসু চাগ্রবীরঃ" (রামা°)

অগ্রশ্রেণী—(স্ত্রী) অগ্রগামী সৈন্যশ্রেণী বা বাহিনী ; যুদ্ধের সময় যে বিশিষ্ট বাহিনী অগ্রে গমন করিয়া বিপক্ষদলকে আক্রমণ করে।

অগ্রসংখ্যা—(স্ত্রী) প্রথম সংখ্যা, প্রথম স্থান। (রঘু° ১৮.৩০)

অগ্রসন্ধানী—(স্ত্রী) [অগ্র-সম্-ধা-ল্যুট্। স্ত্রী ঙীপ্। যমপঞ্জিকা। প্রাণিগণের প্রাক্তনের শুভাশুভ অগ্রে লিখিত থাকে, তজ্জন্য যমপঞ্জিকার নাম অগ্রসন্ধানী। কেহ কেহ ইহাকে যমপট্টিকা নামেও অভিহিত করেন। (ত্রি) ২ অগ্রসন্ধানকারী।

অগ্রসন্ধ্যা—(স্ত্রী) [সন্ধ্যায়াঃ অগ্রং অথবা অগ্রা সন্ধ্যা, কর্ম্মধা°] সন্ধ্যার পূর্ব্বকাল। ২ প্রাতঃসন্ধ্যা। "রঞ্জয়ত্যগ্রসন্ধ্যা" (শকুন্তলা)

অগ্রসমাজ—মহাবস্তু-অবদান গ্রন্থে শারীপুত্রকথা প্রসঙ্গে অগ্রসমাজ পাহাড়ের উল্লেখ আছে। ঐ উপাখ্যানে লিখিত আছে যে, অলন্দনিবাসী উপতিষ্য বা শারীপুত্র ও তাঁহার মিত্র কোলিত (মৌদ্‌গল্যায়ন) অগ্রসমাজশৈলবাসী পঞ্চশত যতির সমাজভুক্ত হইয়া যতিধর্ম্ম শিক্ষা করেন। পরে ইঁহারা সকলে বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। [শারীপুত্র দ্র°]

অগ্রসর—(ত্রি) [অগ্র-সৃ-ট। অগ্রং অগ্রেণ অগ্রে বা সরতীতি] [অগ্রতঃসর দ্র°]। অগ্রগামী।

অগ্রসারা—(স্ত্রী) [অগ্রং শীর্ষ-ভাগমাত্রং সারোঽস্যাঃ] ফলশূন্য শিখা, মঞ্জরী। যাহার আগাই সারমাত্র। আগ্‌ড়া।

অগ্রসূচনা—(স্ত্রী) পূর্ব্বাভাস।

অগ্রহ—(পুং) পরিগ্রহাভাব। বহুব্রী। ২ সর্ব্বপরিগ্রহশূন্য সন্ন্যাসী প্রভৃতি। ৩ বানপ্রস্থ। (ত্রি) ৪ জ্ঞানশূন্য।

অগ্রহণীয়—(ত্রি) গ্রহণের অযোগ্য।

অগ্রহর—(ত্রি) [অগ্র-হৃ-অচ্, কর্ম্মণি] অগ্রদেয় বস্তু। [কর্ত্তরি অচ্] ২ অগ্রভাগহারী। [অংশহর দ্র°]

অগ্রহরি—বিহার এবং উত্তর-ভারতের একটী ব্যবসায়ী জাতি। ইহারা কৃষিকার্য্যও করিয়া থাকে। সম্ভবতঃ অগরবালদিগের সহিত ইহাদিগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ইহারা অতি শৈশবে কন্যার বিবাহ দেয়। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ এবং বিবাহ-ভঙ্গ প্রচলিত নাই, কিন্তু বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। অগরবালগণ বহুবিবাহ করে না। ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণের মধ্যে বহুবিবাহ নিন্দনীয় নহে, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর বণিক্‌গণ বহুবিবাহকে অতিশয় ঘৃণা করে। তাই অগরবালগণ অগ্রহরি-

দিগকে ঘৃণা করিয়া থাকে। খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে ইহারা নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর আচার পালন করে এবং মদ্যপান ইহাদের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। অগরবালগণের ন্যায় ইহাদিগের স্ত্রীলোকগণের মধ্যে অবরোধপ্রথা নাই। স্ত্রীগণ ক্রয়বিক্রয়াদি কার্য্যে পুরুষগণকে সাহায্য করে। ইহারা উপবীতধারী বৈশ্য হইলেও, সমাজে অগরবালগণের নিম্নে ইহাদিগের স্থান।

ইহাদের মধ্যে বহু গোত্র দেখিতে পাওয়া যায়। স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার বিধবা পত্নী ইচ্ছা করিলে দেবরকে বিবাহ করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে কতক লোক বৈষ্ণবমতাবলম্বী, কতক নানকপন্থী। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে ইহাদের বিবাহাদি হইতে বাধা নাই। সাধারণতঃ ইহারা মুদীখানার দোকান করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইহাদের মেয়েরাও দোকান করে, এজন্য ইহারা অগরবাল অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ইহারা অগুরু, চন্দন প্রভৃতি সুগন্ধি কাঠেরও ব্যবসা করে। ইহাদের মধ্যে যাহারা ধনী, তাহারা তেজারতী ও মহাজনী কাজ করিয়া থাকে। সকল বণিক্-সমাজই ইহাদের হাতে খাদ্য গ্রহণ করে।

অগ্রহস্ত—(পুং) [অগ্রশ্চাসৌ হস্তশ্চেতি কর্ম্মধা°। গুণগুণিনোরভেদাৎ] হস্তাগ্রভাগ (কুমারস° ৫.৩৬)। ২ অঙ্গুলি। "প্রভ্রষ্টং মে অগ্রহস্তাৎ পুষ্পভাজনং" (শকুন্তলা ৪ অঃ)। ৩ প্রধান বা দক্ষিণ হস্ত। ৪ গজশুণ্ডাগ্র।

অগ্রহায়ণ—(পুং) [হায়নস্য বৎসরস্য প্রথমো মাসঃ ণত্বং] মার্গশীর্ষ মাস। পূর্ব্বে অগ্রহায়ণ মাসে বৎসর আরম্ভ হইত এবং কার্ত্তিক মাসে বৎসর শেষ হইত, তজ্জন্য মার্গশীর্ষ মাসের নাম অগ্রহায়ণ হইয়াছে। অমরাদি প্রাচীন কোষে এ কথা স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট আছে।

[অগ্র-হা-ল্যুট্ হায়ন। *। হশ্চব্রীহিকালয়োঃ। পা ৩.১.১৪৮। জহাতি উদকমিতি হায়নো ব্রীহিঃ। জহাতি ভাবানিতি হায়নো বর্ষম্। ব্রীহি এবং কাল অর্থ বুঝাইলে হা ধাতুর উত্তর (ওহাক্ত্যাগে ওহাঙ্ গতৌ) ল্যুট্ প্রত্যয় হয়। (স্ত্রী) অগ্রহায়ণী, টিত্বাৎ]

পূর্ব্বে অগ্রহায়ণ মাস হইতে কেন বৎসর গণনা করা হইত, তাহার কারণ আছে। বোধ করি, সে কারণ অমূলক নহে। সাধারণ লোক চন্দ্রসূর্য্যের গতি দেখিয়া বৎসর গণনা করিতে পারিত না। চন্দ্রসূর্য্যের গতি দেখিয়া বৎসর গণনা করা একটু কঠিন কাজ। তজ্জন্য তাহারা স্বভাবের সামান্য লক্ষণ দেখিয়া মোটামুটি বৎসর নির্ণয় করিত। 'অগ্রহায়ণ'—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্রীহি যে সময়ে হয় (অগ্রঃ শ্রেষ্ঠঃ হায়নঃ ব্রীহিঃ অস্মিন্ কালে)। সামান্য লোক ব্রীহির উৎপত্তি দেখিয়া বৎসর গণিত, ইহাই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। এখনকার মত তখনও দরিদ্র লোকে বণিক্‌দের কাছে ধানের বাড়ী খাইত। কোন্ সময়ে মহাজনেরা ঋণ দিতেছেন এবং কোন সময়ে সেই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, মাস সন তারিখ বলিলে অজ্ঞলোকেরা তাহার কিছু অর্থ বুঝিতে পারিত না। তজ্জন্য স্বভাবের এক একটী স্পষ্ট লক্ষণ দেখাইয়া বণিকেরা তাহাদিগকে সময় বুঝাইয়া দিতেন। পাণিনির কয়েকটী সূত্রে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা,—দেয়মৃণে। ৪.৩.৪৭। যে সময়ে কিংবা যে সময় হইতে দেয় ঋণ। এই সূত্রের অনুবৃত্তি করিয়া পরে কয়েকটী সূত্র লিখিত হইয়াছে। এখানে তাহার দুইটী উদ্ধৃত করা গেল।—কলাপ্যশ্বথযববুসাদ্‌বুন্ (৪.৩.৪৮) এবং,—গ্রীষ্মাবরসমাদ্‌বুঞ্ (৪.৩.৪৯)।

'যস্মিন্ কালে ময়ূরাঃ কলাপিনো ভবন্তি স উপচারাৎ কলাপী, তত্র দেয়মৃণং কলাপকম্। যস্মিন্ কালেঽশ্বত্থাঃ ফলন্তি তত্র দেয়মৃণমশ্বত্থকম্। যস্মিন্ যববুসমুৎপদ্যতে তত্র দেয়ং যববুসকম্। গ্রীষ্মে দেয়মৃণং গ্রৈষ্মকম্।' (ভট্টোজি)

যে সময়ে ময়ূরেরা উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে দেয় ঋণের নাম কলাপক। অশ্বত্থ গাছে যখন ফল ধরে, তখনকার দেয় ঋণের নাম অশ্বত্থক। যখন যবের শীর্ষ বাহির হইতে থাকে, তখনকার দেয় ঋণের নাম যববুসক। গ্রীষ্মকালে দেয় ঋণের নাম গ্রৈষ্মক বর্ষার প্রথমে দেয় ঋণের নাম আবরসমক।

কালবাচী কলাপীশব্দের ব্যাখ্যায় মতান্তর আছে। আনন্দগিরি দুই প্রকার ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। (১) যখন ময়ূর উৎপন্ন হয়—বর্ষাকাল। (২) যখন ময়ূরে পুচ্ছ মেলিতে আরম্ভ করে—বর্ষাকাল।

স্বভাবের এক একটী সহজ লক্ষণের সঙ্গে দেয় ঋণের এমন সম্পর্ক থাকিবার প্রয়োজন কি? খাতকেরা কোন্ সময়ে ঋণ লইতেছে এবং কত দিন পরে সেই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, মাস ও সন তারিখ ধরিয়া তাহাদের সময় নিশ্চিত করিবার ক্ষমতা থাকিলে, এ প্রকার মোটা হিসাব কখনই প্রচলিত হইত না।

এই মাস হেমন্তঋতুর অন্তর্গত। ইহার অপর নাম—মার্গশীর্ষ, সহসমার্গ, আগ্রহায়ণিক, অগ্রয়ণ। বিষ্ণুপুরাণে ইহার নাম সহস্ লিখিত আছে। এই মাসে জন্মিলে জাতক তীর্থপ্রবাসী, পরোপকারী, সচ্চরিত্র ও স্ত্রৈণ হয়। এই মাসে নবান্ন উৎসব অনুষ্ঠেয়। [নবান্ন দ্র°]

অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠেয় ব্রত—বেলপুকুর ও সংযুতি বা সেঁযুতি। বেলপুকুর ব্রত কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত করিতে হয়। চারি বৎসরে

এই ব্রতের উদ্‌যাপন হয়। পুণ্যপুকুরের মত এই ব্রত তত বেশী অনুষ্ঠিত না হইলেও অনেকেই ইহা গ্রহণ করিয়া থাকে। এই ব্রত অনেকটা পুণ্যপুকুরের মত, তবে উহার মধ্যে পার্থক্য এই যে, কড়ির পরিবর্ত্তে এই ব্রতে ভাঁটা ব্যবহার করা হয় এবং বেলগাছের শাখা পুষ্করিণীর চারি কোণে পুঁতিতে হয়। এই ব্রতে সতীত্ব ও যোগ্য স্বামীর প্রার্থনা করা হয়; কোন কোন স্থলে সপত্নীকে অভিসম্পাত করিতেও দেখা যায়।

সপত্নীবিদ্বেষের পরিচয় সেঁযুতি ব্রতেও দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার অনেক জায়গায় বেলপুকুর ব্রতের পরিবর্ত্তে এই ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। এই ব্রত সন্ধ্যার সময় করিতে হয়, ইহা ব্রতের নামকরণ হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। অনেক স্থলে পুষ্করিণীর পরিবর্ত্তে দেবতা এবং বীরের প্রতিমূর্ত্তি, মহাদেব বা ভগবতীর মন্দির, সূর্য্য ও চন্দ্র, যমুনা ও গঙ্গা কিংবা গৃহস্থালীর বাসনাদি মাটির উপর আঁকিয়া চাউলের পিণ্ড পুষ্প ও দুর্ব্বার দ্বারা পূজা করা হইয়া থাকে।

বেলপুকুর ব্রতে সচরাচর নিম্নলিখিত ছড়া বলা হয়—

"রামের মত পতি পাই,
সীতার মত সতী হই।
বর যেন সুখী হয়,
সতীন যেন মরে যায়।
সতীনের হোক নাক কান কাটা,
আমার হোক সোনার পানের বাটা।
সতীন হ'বে স্বামীর দো,
আমি হ'ব স্বামীর শো।
সতীনের পথে প'ড়বে কাঁটা,
আমার হ'বে সোনার বেটা।
সতীন হ'বে আমার দাসী,
আমি ক'রব হাসি খুসী।
স্বামীর হ'ব সোহাগিনী,
আঁস্তাকুড় ঝাঁটাবে সতিনী।"

সেঁযুতিব্রতে নিম্নলিখিত ছড়া বলা হয়ঃ—

"সাঁজের পূজা সেঁযুতি,
বার ঘরে তের বাতি,
লক্ষ্মীর ঘরে ঘটী।
ঘটী থুয়ে মাগি বর,
আমার বাপ-ভাই ধনদৌলতে লক্ষ্মীশ্বর।
হুট্ বিড়ালী হুট্ যা,
ভাতারপুত থুয়ে সতীন খা।
গুয়া গাছ বেগুন গাছ গুটি ধরে মাজা,
ভাই হয়েছেন দিল্লীশ্বর, বাপ হয়েছেন রাজা।
আকাশে যতগুলি নক্ষত্র ততগুলি ভাই,
শিবদুর্গা পূজা ক'রে দৌড়ে ঘরে যাই।
রাজাদের বেটি দোলায় আসেন দোলায় যান,
চন্দন কাঠে রেঁধে খান।
বাপ রাজা, ভাই পাত্র,
স্বামীর মাথায় রাজছত্র।
হাতা হাতা হাতা,
খা সতীনের মাতা।
বেড়ি বেড়ি বেড়ি,
সতীন বেটি চেড়ী।
খোড়া খোড়া খোড়া,
সতীনকে লয়ে যায় তিন মিন্‌সে গোরা।
বাঁশ বাঁশ বাঁশ,
সতীনের হয় যেন যক্ষ্মাকাশ।"

বাঙ্গালার বাহিরে বেলপুকুরের অনুষ্ঠান বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। শাহাবাদে 'অঘান-পিণ্ডি' পূজায় মাটির ভাঁটা ব্যবহার হইতে দেখা যায়। বাড়ীর সদর দরজায় এগুলি রাখা হয় এবং বালিকারা গান গাইতে গাইতে ফুল ও ফল দিয়া পূজা করিয়া থাকে।

অগ্রহায়ণষষ্ঠীপূজা—অগ্রহায়ণ মাসে বালকবালিকাদের রক্ষয়িত্রী ষষ্ঠীদেবীর যে পূজা হইয়া থাকে।

অগ্রহায়ণেষ্টি—(স্ত্রী) [অগ্রহায়ণে বিহিতা ইষ্টিঃ] নবশস্যের যাগবিশেষ।

অগ্রহার$_1$—(পুং) [অগ্রং হ্রিয়তে ইতি অগ্র-হৃ-ঘঞ্ কর্ম্মণি] ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য হইতে তুলিয়া ব্রাহ্মণোদ্দেশে স্থাপ্য ধান্যাদির অগ্রভাগ। ২ গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত ব্রহ্মচারীকে দেয় ক্ষেত্রাদি। ৩ ব্রহ্মত্রভূমি। "অগ্রহারাংশ্চ দাস্যামি" (মহাভা° ৩.৬৮.৪)। [অগ্রং হরতীতি অণ্] (ত্রি) ৪ অগ্রহারক।

অগ্রহার$_2$—যে গ্রাম বেদবিদ্যায় পারদর্শী ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত। ইহার অপর নাম 'মঙ্গল'। [ব্রহ্মশাসন দ্র°]

অগ্রহার-বল্লালুর—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কোইম্বাতোর জেলার একটী নগর। অক্ষা° ১০°৫৮'৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৩'৩৪" পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার অধিবাসিগণ প্রধানতঃ কৃষিজীবী। কোইম্বাতোর হইতে ৫ মাইল দূরে, নোয়িল নদীর তীরে অবস্থিত।

অগ্রহার-বাচহল্লী—মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। খৃষ্টীয় ১৩শ শতকে হোয়শলবংশীয় জনৈক রাজা এখানে একটী

মন্দির নির্ম্মাণ করান এবং মন্দিরের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বাচহল্লী গ্রাম দান করেন। পরে এই গ্রামখানি অগ্রহার-বাচহল্লী নামে পরিচিত হয়। এই মন্দিরগাত্রে চালুক্যযুগের দ্রাবিড়শিল্পের পরিণতি দৃষ্ট হয়। মন্দিরস্থ স্তম্ভগুলির মাথায় হাতী, গরুড়, মাহুত এবং হস্তিপৃষ্ঠে ৪ জন আরোহী ক্ষোদিত আছে।

অগ্রহারেকল—(পুং) দাক্ষিণাত্যের ভত্রাজুজাতির একটী শাখা। অগ্রহারম্ অর্থে ব্রাহ্মণপল্লী, যে সকল ভত্রাজু ব্রাহ্মণ-পল্লীতে বাস করে, তাহাদিগকে অগ্রহারেকল বলে।

অগ্রা—(স্ত্রী) [জ্যোতিষ] ক্ষিতিজের (Horizon) যে বিন্দুতে স্ূর্য্যোদয় দৃষ্ট হয়, সেই বিন্দু হইতে পূর্ব্ববিন্দুর জ্যারূপ অন্তরের নাম অগ্রা। অথবা যে বিন্দুতে সূর্য্যাস্ত দৃষ্ট হয়, সেই বিন্দু হইতে পশ্চিমবিন্দুর জ্যারূপ অন্তরের নাম অগ্রা। উদয়কালীন বা অস্তকালীন অগ্রা দেখিয়া সে সময়ের সায়নসূর্য্য কত, তাহা স্থির হয়; ইহা হইতে অয়নাংশ বিয়োগ করিলে নিরয়ন সূর্য্যের পরিমাণ জানা যায়।

অগ্রাক্ষি—(ক্লী) [অগ্রঞ্চ তদক্ষি চ ইতি, গুণগুণিনোরভেদাৎ কর্ম্মধা°। সাঙ্গপরত্বাৎ নাচ্‌সমা°] অক্ষির অগ্রভাগ। ২ অপাঙ্গ। "অগ্রাক্ষ্ণা বীক্ষমাণস্তু" (রামায়ণ ২.২৩.৫)

অগ্রাণীক—(ক্লী) [অগ্রঞ্চ তদনীকঞ্চ, কর্ম্মধা°; নিপাতনে ণত্বম্] অগ্রগামী সৈন্য।

অগ্রায়ণীয়—(ক্লী) [অগ্রং শ্রেষ্ঠম্ অয়নং জ্ঞানং তত্র সাধু ছ] জৈনধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত চতুর্দ্দশ পূর্ব্ববাদের দ্বিতীয়।

অগ্রাবলেহিত—(ক্লী) [অগ্রং অবলেহিতং আস্বাদিতং যস্য] শ্রাদ্ধ বা পূজার অগ্রভাগ গ্রহণপূর্ব্বক উচ্ছিষ্ট করা দানাদির অযোগ্য অন্নাদি। দুইবার পাক করা, পুড়িয়া যাওয়া বা অগ্রাবলেহিত অর্থাৎ অগ্রভাগ তুলিয়া স্বাদ লওয়া অন্নাদি শ্রাদ্ধকার্য্যে বর্জ্জনীয়।

"দ্বিঃস্বিন্নং পরিদগ্ধঞ্চ তথৈবাগ্রাবলেহিতং।" (ব্রহ্মপু°)

অগ্রাসন—(ক্লী) [অগ্রম্ আসনম্, কর্ম্মধা°] শ্রাদ্ধান্নভোজনার্থ অর্ঘ্যদানাদির অগ্রে কল্পিত ব্রাহ্মণের উপবেশনার্থ প্রথম আসন।

অগ্রাহ্য—(ত্রি) [ন-গ্রহ-ণ্যৎ। নঞ্-তৎ। ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩.১.১২৪] অগ্রহণীয়। গ্রহণের অযোগ্য। ২ অবজ্ঞেয়, তুচ্ছ। ৩ শিবনির্ম্মাল্য প্রভৃতি। তিথিতত্ত্বোদ্ধৃত পুরাণবচনে দেখা যায়, শিবনির্ম্মাল্য পত্র, পুষ্প, ফল, জল অগ্রাহ্য। "অগ্রাহ্যং শিব-নির্ম্মাল্যং" ইত্যাদি (তিথিতত্ত্ব)। ৪ প্রতিগ্রহের অযোগ্য তিলাশ্বাদি। মনুর মতে কুলটা, ষণ্ড, পতিত ও শত্রুদিগের দ্রব্যও অগ্রাহ্য। ৫ শৌচাদিকর্ম্মে অনুপাদেয় মৃত্তিকা। স্মৃতিশাস্ত্রের মতে জলমধ্য, দেবগৃহ, বল্মীক, মূষিকস্থল ও শৌচাবশেষ, এই পঞ্চবিধ মৃত্তিকা অগ্রাহ্য।

"অন্তর্জলে দেবগৃহে বল্মীকে মূষিকস্থলে।
কৃতশৌচাবশিষ্টে চ অগ্রাহ্যা পঞ্চমৃত্তিকাঃ॥" (স্মৃতি)

৬ অবিচারণীয়। (বাচস্পত্য)

অগ্রাহ্যবীর্য্য—(ত্রি) [অগ্রাহ্যম্ ঈষদ্‌গ্রাহ্যং বীর্য্যং যস্য] ঈষদ্-গ্রাহ্যবীর্য্য, যাহার অল্প বল, যাহার অল্প তেজ। "অগ্রাহ্য-বীর্য্যঃ পূর্ব্বাহ্নে মধ্যাহ্নে স্পর্শতঃ সুখঃ" (রামা°)। (ক্লী) ২ অল্পতেজ।

অগ্রি—(পুং) অগ্রে জাত অগ্নি। (শত°ব্রা° ২.২.৪.২)

অগ্রিওনিয়া (Agrionia)—প্রাচীন গ্রীকদিগের একটী উৎসব। অর্কোমেনাস প্রভৃতি স্থানে দিওনিসাস্ অগ্রিওনিনাসের স্মৃতি-পূজাস্বরূপ এই উৎসব রাত্রিকালে অনুষ্ঠিত হইত। অর্কোমেনাস-নগরের রমণীগণ ও দিওনিসাস্ দেবমন্দিরের পুরোহিতগণ উৎসবের রাত্রিতে দেবতার অন্বেষণে বাহির হইয়া বৃথা ঘুরিয়া বেড়াইতেন। প্রবাদ, অর্কোমেনাসরাজ মিনিয়াসের কন্যাগণ দিওনিসাসের পূজায় অবহেলা করিয়া উন্মাদরোগগ্রস্ত হন এবং দেবতার অভিশাপে নিজেদের একটী সন্ততি বধ করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করেন। এই পাপের দণ্ডবিধানের জন্য পুরোহিতেরা প্রথমে মিনিয়ানবংশের একটী স্ত্রীলোককে বলি দিয়া দেবতার এই অপবাদ খণ্ডন করিতেন। কালক্রমে এই স্ত্রীবলি ব্যাপার রূপান্তরিত হইয়া অন্যরূপ উৎসবে পরিণত হইয়াছিল।

অগ্রিগেণ্টাম্—ভূমধ্যসাগরস্থিত সিসিলী দ্বীপের দক্ষিণ উপকূলে সমুদ্রতীর হইতে ২॥ মাইল দূরে অবস্থিত একটী প্রাচীন নগর। ইহা বর্ত্তমানে গীরগেন্টি নামে পরিচিত। আনুমানিক ৫৮২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে গেলা হইতে সিকানীয় ঔপনিবেশিক দল এখানে আসিয়া বাস করে। তাহাদের আধিপত্যকালে এখানে একটী ক্ষুদ্র নগরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সিসিলী গ্রীকদিগের অধিকারে আসিলে ইহা শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে।

এখানে কতকগুলি প্রাচীন অট্টালিকা দৃষ্ট হয়। ঐ গুলি এই নগরের সৌভাগ্যোদয়-সূচনায় নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজা ফলারিস্ ৫৭০ হইতে ৫৫৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় যথেচ্ছাচারী রাজা তৎকালে খুব কমই ছিলেন। ইহার পর কিছুকাল এখানকার শাসন-তন্ত্রের কোন ইতিহাসই পাওয়া যায় না। খৃঃ পূঃ ৪৮৮ হইতে ৪৭৩ পর্য্যন্ত রাজা থেরন এখানকার অধীশ্বর ছিলেন; তিনিও অত্যাচারী রাজা বলিয়া প্রখ্যাত। তাঁহার পুত্র থ্রাসিডিউস ৪৭২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে হিএরোর হস্তে পরাজিত হইয়া রাজ্য-চ্যুত হন এবং রাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪১৫-৪১৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে সাইরাকিউজ-বাসীদিগের সহিত আথেন্সবাসী

গ্রীকগণের বিরোধ উপস্থিত হইলে এখানকার লোকেরা কোন পক্ষ অবলম্বন করে নাই।

৪০৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত এখানকার শিল্পবাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হয়। এই সময় কার্থেজীয় সৈন্য নগর অধিকার ও লুণ্ঠন করিয়া ইহাকে বিধ্বস্ত করিয়া দেয়; তদবধি নগরবাসিগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আপনাদের পূর্ব্বশ্রী ও শক্তি ফিরাইয়া আনিতে পারে নাই। ৩৩৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে রাজা টিমোলিওন্ লুকানিয়ার অন্তর্গত ভেলিয়ার কতকগুলি অধিবাসীকে এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিবার অনুমতি দেন। তখনও এখানকার অধিবাসীদিগের মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার মত শক্তি হয় নাই। ২৮৯-২৭৯ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে দুর্দ্ধর্ষ রাজা ফিন্টিয়াসের রাজত্বকালে এখানকার অধিবাসীরা শক্তিসঞ্চয় করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ১ম পিউনিক যুদ্ধে (২৬১ খৃঃ পূঃ) রোমকগণ এবং ২৫৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে কার্থেজীয়গণ এই নগর লুণ্ঠন করে। অবশেষে ২১০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ২য় পিউনিক যুদ্ধে ইহা রোমকদিগের অধিকারে আসে। রোমকযুগে এখানকার বাণিজ্য অপ্রতিহত ছিল। উৎপন্ন দ্রব্য কার্পাসবস্ত্রাদি ও গন্ধকের বিস্তৃত কারবার চলিয়াছিল। রপ্তানীর পূর্ব্বে গন্ধকের বাতির গায় ছাপ দেওয়া হইত। স্থানীয় যাদুঘরে রক্ষিত ঐরূপ একটী ছাঁচ হইতে বুঝা যায়, গন্ধকের খনিগুলি রাজসম্পত্তি ছিল এবং ঠিকাদারদিগের হস্তে খনি হইতে গন্ধক উঠাইবার ভার দেওয়া হইত।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরিবেষ্টিত হওয়ায় নগরের সংস্থান বড়ই মনোহর এবং গণ্ডশৈলোপরি স্থাপিত হওয়ায় ইহা বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আপনাকে সুরক্ষিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। উক্ত শৈলমালার পশ্চিমাংশে ৯৮৫ ফুট উচ্চ অধিত্যকার উর্দ্ধাংশ আথেনা রক বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ ইহাকে অক্রাগাসের অক্রোপোলিস বা প্রাকার-পরিবেষ্টিত নগরী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এখানে জিউস্ অতাবিরিয়াস ও আথেনার মন্দির বিদ্যমান। গির্গেন্টি নগরাংশের সান্তা মেরিয়া ডি গ্রেসী নামক গীর্জা ও তৎসন্নিকটস্থ ধর্ম্মমন্দিরটী বহু প্রাচীন; দুঃখের বিষয়, এই দুইটী অট্টালিকার পূর্ব্ব নিদর্শন আর কিছুই নাই।

নগরের দক্ষিণাংশে ডোরীয় (Dorian) স্থাপত্যশিল্পে রচিত কয়েকটী মন্দির আছে। সেগুলি প্রাচীন নগরের প্রাচীনতম কীর্ত্তি—শ্রেণীবদ্ধাকারে পর্ব্বতশৃঙ্গে বিন্যস্ত। জিউস্, এস্ক্লিপিয়াস্, হিরাক্লিস্, হিরা ও কনকর্ডের মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, কিন্তু ধ্বংসাবস্থায় নিপতিত। গির্গেন্টির ধর্ম্মযাজক ২য় গ্রেগরী ৫৯৭ খৃষ্টাব্দে শেষোক্ত মন্দিরটীকে গীর্জ্জায় পরিণত করেন, কিন্তু এখনও উহার গাত্রে তৎকালের শ্রেষ্ঠতম ডোরীয় শিল্পের নিদর্শন রহিয়াছে। রোমকযুগে হিরাক্লিসের মন্দিরটী সংস্কৃত হইয়াছিল। জিউসের মন্দিরে স্থাপিত ২৫ ফুট উচ্চ অতলান্তিসের মূর্ত্তি আজিও বর্ত্তমান্। উপরের বর্ণিত মন্দিরগুলির কতকাংশ পরবর্ত্তী সময়ে ভূকম্পে ধ্বসিয়া পড়ে এবং সেই ভগ্ন প্রস্তররাশির দ্বারা এম্পেডোকল নামক বন্দর ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত হয়।

নগরের চতুঃপার্শ্বে যে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীর ছিল, তাহা স্থানে স্থানে বিলুপ্ত হইয়া গেলেও উহা ৫০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়। এই প্রাচীরসীমার মধ্যে আরও অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়।

নগরের দক্ষিণভাগে বলোটিজ্জো নগরের নিকট খনন সময়ে বৈজন্তীয় অধিকারকালের একটী গ্রাম ও তাহার নিদর্শনস্বরূপ অট্টালিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ ঘরগুলি পর্ব্বতগাত্র কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল।

অগ্রিপা, অ্যাগ্রিপা (Agrippa)—একজন পাশ্চাত্ত্য নাস্তিকতাবাদী দার্শনিক। ইঁহাকে সিসিরোর সমকালিক অন্যতম দার্শনিক ইনিসিদিমাসের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বলিয়া পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতমণ্ডলী স্থির করিয়াছেন। সেক্স্টাস এম্পিরিকাস বলেন যে, তিনি ঘোর সংশয়বাদী ছিলেন। জগৎসংসারের কার্য্যকারণ সম্বন্ধে তাঁহার আদৌ বিশ্বাস ছিল না। প্রত্যক্ষ ও অনুভূতি প্রমাণই যে দ্রব্যের জ্ঞানোপলব্ধির একমাত্র কারণ, একথা তিনি স্বীকার করিতেন না।

অগ্রিপা, ১ম হেরদ—জুডিয়ার রাজা। (খৃঃ পূঃ ১০ অব্দ হইতে ৪৪ খৃঃ অব্দ) ইনি অরিষ্টাবুলাসের পুত্র এবং মহাত্মা হেরদের পৌত্র। ১০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার প্রকৃত নাম মার্কাস্ জুলিয়াস্ অগ্রিপা। রোমনগরে ইঁহার পিতার মৃত্যু হইলে মহাত্মা হেরদ ইঁহাকে সম্রাট্ টাইবেরিয়াসের নিকট পাঠাইয়া দেন। সম্রাট্ পিতৃহীন বালকের প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাকে স্বীয় পুত্র ড্রুসাশের বাল্যসহচর নিযুক্ত করেন। যুবরাজের অনুচররূপে সম্রাটের অনুগ্রহভাজন থাকিয়া অগ্রিপা ক্রমশঃ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠেন এবং ঋণগ্রস্ত হইয়া রোম পরিত্যাগ করেন। পরে স্বীয় খুল্লতাত টেট্রার্ক্ হেরদের দয়ায় তিনি ঋণমুক্ত হইয়া টাইবেরিয়ার বাজারের পরিদর্শক নিযুক্ত হন। কিন্তু খুল্লতাতের অনুগ্রহ হইতে অচিরে বঞ্চিত হইয়া তিনি জুডিয়া ছাড়িয়া অন্তিওকে চলিয়া যান, এবং পরে পুনরায় রোমনগরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সম্রাট্ টাইবেরিয়াসের অনুগ্রহ লাভ করেন। অতঃপর তিনি ভাবী সম্রাট্ গায়াস্ কালিগুলার (Gaius Caligula) সহিত ষড়্যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া

বৃদ্ধ টাইবেরিয়াসের উচ্ছেদসাধনের চেষ্টা করেন, কিন্তু সম্রাট্ তাহা অবগত হইয়া গায়াস্‌কে কারারুদ্ধ করেন।

৩৭ খৃষ্টাব্দে কালিগুলা সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া অগ্রিপাকে যথেষ্ট কৃপা করেন। এই উপলক্ষে অগ্রিপা বহু অর্থ ও ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। মহাত্মা হেরদের পুত্র ফিলিপ ও লাইসেনিয়াসের অধিকৃত প্রদেশগুলির শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া অগ্রিপা একজন শীর্ষস্থানীয় সামন্তরাজ হইয়া জুডিয়ায় গমন করেন। ৩৯ খৃষ্টাব্দে পুনরায় রোমে আসিয়া তিনি হেরদ্ এণ্টিপাসের নির্ব্বাসন ঘটাইয়া তাঁহার অধিকৃত রাজ্য স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন। ৪১ খৃষ্টাব্দে কালিগুলার মৃত্যু ঘটিলে, তিনি ক্লডিয়াসের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইতে সমর্থ হন। এই কৃতকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ সম্রাট্ তাঁহার ভ্রাতাকে লেবেননের অন্তর্গত ক্যালসি প্রদেশ দান করেন। এইরূপে অগ্রিপা সমগ্র পূর্ব্বাঞ্চলের অধিপতি হইয়া নির্ব্বিরোধে জুডারাজ্য শাসন করিতে থাকেন। য়িহুদীগণ জুডাধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক জ্ঞানে তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী অগ্রিপা ক্রমে খৃষ্টধর্ম্মবিদ্বেষী হইয়া উঠেন। তিনি ৪৪ খৃষ্টাব্দে “পাসোভার” (Passover) ভোজের অব্যবহিত পরে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক জনের (John, the Evangelist) ভ্রাতা জেমসকে কারারুদ্ধ করিয়া বধ করেন। পরে তিনি পিটরকেও বন্দী করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ক্লডিয়াসের সম্মানার্থ সিজারিয়ায় আসিয়া একটী উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। সিডোন ও টায়ারবাসী ক্ষুব্ধ খৃষ্টানগণ সমবেত হন এবং শান্তিকামনায় অগ্রিপার গুণকীর্ত্তন করিয়া আত্মব্যথা নিবেদন করেন; কিন্তু সিংহাসনে উপবিষ্ট অগ্রিপা নিতান্ত দুঃখিতের ন্যায় ভাব দেখাইয়া তাঁহাদিগকে বলেন যে, তিনি কিছুই করেন নাই, ভগবানের দূত আসিয়া কীটরূপে তাঁহার হৃৎপিণ্ড দংশন করিয়াছে। ইহার কিছুদিন পরে অগ্রিপার মৃত্যু হয়। খৃষ্টানেরা বলে যে, কপটীর হৃদয় কীটে ভক্ষণ করিয়া মৃত্যু ঘটাইয়াছে। ঐতিহাসিকেরা ঐ অবিশ্বাস্য গল্পাংশ পরিবর্জ্জন করিয়া নির্দ্দেশ করেন যে, অগ্রিপার এই শক্তিসঞ্চয় রোমকদিগের অসহ্য হওয়ায় কোন রোমবাসী গোপনে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল।

অগ্রিপা, —রোমকসম্রাট্ ক্লডিয়াসের অধীন একজন সামন্ত নরপতি। ইনি স্বীয় পিতার ন্যায় ২য় হেরদ নামে বিখ্যাত হন। প্রথমে ইনি পিতার ন্যায় মার্কাস জুলিয়াস অগ্রিপা নামে পরিচিত ছিলেন। ২৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ৫৩ খৃষ্টাব্দে ইঁহার খুল্লতাতের মৃত্যু হইলে ইনি কালসিস্ জনপদ ও পবিত্র মন্দির পরিদর্শনভার প্রাপ্ত হন। ভেস্‌পিয়ান্ য়িহুদীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলে, রাজা ২য় হেরদ্ স্বয়ং য়িহুদীধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ২,০০০ সৈন্য পাঠাইয়া রোমক-সৈন্যের সহায়তা করিয়াছিলেন। সম্রাট্ ট্রাজানের রাজত্বের ৩য় বৎসরে ১০০ খৃষ্টাব্দে রোমনগরে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি মহাত্মা হেরদ্ হইতে অধস্তন ৭ম পুরুষ এবং বংশের শেষ রাজা। মহাত্মা সেণ্ট পল সিজেরিয়া নগরে ইঁহার ও ইঁহার ভগিনী বেরেনিসের সমক্ষে খৃষ্টধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

অগ্রিপা, মার্কাস্ ভিপ্‌স্যানিয়াস—একজন রোমান্ রাজনৈতিক ও যোদ্ধা। ইনি সম্রাট্ অগষ্টাসের মন্ত্রী ও জামাতা ছিলেন। পঠদ্দশায় ইনি অগষ্টাসের সহিত আপলোনিয়ায় থাকিতেন এবং সহপাঠিরূপে উভয়ের সৌহার্দ্দ্যও যথেষ্ট ছিল। ৪৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে জুলিয়াস সিজারের হত্যাসংবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে অগ্রিপা স্বীয় সহপাঠী অক্টেবিয়ানকে (ভাবী সম্রাট্ অগষ্টাস্) সঙ্গে লইয়া রোমে আসিয়া উপনীত হন। এখানে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় নিজের ও সম্রাটের সম্মান রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৪০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মার্ক এণ্টনির ভ্রাতা লুসিয়াসের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া ইনি পেরুসিয়া অধিকার করেন। ইহার দুই বর্ষ পরে গল রাজ্যবাসী একুইটেনিয়ান জাতির বিদ্রোহ দমন করিয়া ইনি জর্ম্মন জাতির আক্রমণ হইতে দেশবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য রাইন নদী পার হইয়া জর্ম্মনদিগকে বিতাড়িত করেন। রোমকগণ এই বিজয়-গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া ইঁহাকে সম্মানিত করিতে অগ্রসর হইলে ইনি উৎসবে যোগদান করিতে বিরত হন এবং ‘কন্‌সাল’পদ মাত্র স্বীকার করিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন (৩৭ খৃঃ পূঃ)। এই সময় সেক্স্‌টাস পম্পিয়াসের সহিত রোমকদিগের যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠে, কারণ পম্পিয়াস তৎকালে ইতালীর উপকূলভাগে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতেছিলেন। অগ্রিপা রোমের রণতরীসমূহ নিরাপদ বন্দরে রক্ষার জন্য সমুদ্রের উপকূল অংশ কাটাইয়া আভার্নাস হ্রদে ও লুক্রিনাস মুখে বাহির সমুদ্রে দুইটী বন্দর নির্ম্মাণ করেন। এখানে নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষরূপে সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইয়া ইনি স্বীয় অধীন বাহিনীকে রীতিমত নৌযুদ্ধ শিক্ষা দেন। অতঃপর তাহারা পারদর্শী হইয়া উঠিলে ইনি দলবলসহ অগ্রসর হইয়া ৩৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে মাইলার ও নৌলোকাসের যুদ্ধে পম্পিয়াসকে পরাভূত করেন। উক্ত যুদ্ধের পূর্ব্বে অগ্রিপা সিসিরোর বন্ধু পম্পোনিয়াস এটিকাসের কন্যা পম্পোনিয়ার পাণিগ্রহণ করিয়া রোমকদের মধ্যে বিশেষ সম্মানার্হ হইয়াছিলেন। ৩৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ইনি রোমের “ইডাইল” (aedile)

পদ পাইয়া রোমনগরীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। যে রোমনগরী পূর্ব্বে ইষ্টকনির্ম্মিত হর্ম্ম্যমালায় গঠিত হইয়াছিল, অগ্রিপার প্রযত্নে কএক বর্ষ মধ্যে তাহা মর্ম্মরপ্রস্তরমণ্ডিত সৌধমালায় সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছিল।

এই সময়ে এণ্টনি রোমকদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধের আয়োজন করেন। অগ্রিপা স্বীয় নৌবাহিনী লইয়া এক্টিয়াম্ রণক্ষেত্রে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করেন। এণ্টনি যুদ্ধে পরাজিত হইলে সমগ্র রোম ও রোমসাম্রাজ্য সম্রাট্ অক্টেবিয়ানের (অগষ্টাস) করতলগত হয়। অগ্রিপার এই অদ্ভুত রণকৌশল ও যুদ্ধজয়ে প্রীত হইয়া অক্টেবিয়ান তৎপ্রতি স্বীয় প্রগাঢ় অনুরাগের চিহ্নস্বরূপ স্বীয় ভাগিনেয়ী মার্শেলাকে তাঁহার করে সমর্পণ করেন (২৮ খৃঃ পূঃ)। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, তৎকালে ইঁহার প্রথমা পত্নী পম্পোনিয়া হয় গত হইয়াছিলেন, অথবা তাঁহাদের বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল।

২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে অগ্রিপা তৃতীয়বার কন্সাল নিযুক্ত হন এবং তাঁহারই উদ্যোগে ও পরামর্শে রোমক সেনেট অক্টে-বিয়ান্‌কে অগষ্টাস্ নামে রোমকসম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন।

এক্টিয়ামের রণবিজয়ের কীর্ত্তি ঘোষণার জন্য অগ্রিপা লা-রোটোণ্ডায় যে পান্থিয়াম (Pantheum) নির্ম্মাণ করেন, তাহা আজিও বিদ্যমান আছে এবং উক্ত অট্টালিকার প্রবেশপথে যে শিলাফলক উৎকীর্ণ আছে, তাহা হইতে জানা যায়, উহা অগ্রিপার তৃতীয়বার কন্সালপদে নিয়োগের সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সম্রাট্ অগষ্টাসের সহিত বন্ধুত্ব এবং রোমরাজ্যমধ্যে অগ্রিপার প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার শ্বশুর মার্শেলাস হিংসাপরবশ হইয়া উভয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটাইতে চেষ্টা করেন। সম্রাটের ২য়া পত্নী লিভিয়া মার্শেলাসের পরামর্শে স্বীয় স্বামীকে অগ্রিপার প্রবল প্রতাপ হইতে মুক্ত রাখিতে ও পাছে তাঁহার কোন বিপদ্ সমুপস্থিত হয়, এই ভয়ে উক্ত ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ফলে অগ্রিপা সিরীয়া প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া তদ্দেশে স্বীয় প্রতিনিধি প্রেরণ করেন এবং নিজে রাজকার্য্য হইতে অপসৃত হইয়া নির্ব্বাসিতের ন্যায় লেস্‌বসে বসবাস করিতে থাকেন।

অতঃপর মার্শেলাসের মৃত্যু ঘটিলে অগষ্টাস পুনরায় অগ্রি-পাকে রোমে ডাকিয়া আনেন ; কারণ অগ্রিপার উদারতা ও মহদন্তঃকরণের কথা সম্রাট্ কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিলেন না। অগ্রিপাকে আরও অন্তরঙ্গ আত্মীয় করিবার অভিপ্রায়ে এবং মিসেনাসের পরামর্শক্রমে সম্রাট্ তাঁহাকে জামাতা করিতে ইচ্ছা করেন। সম্রাটের অনুরোধে অগ্রিপা মার্শেলাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং তাহার পর ২১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে সম্রাট্-তনয়া জুলিয়াকে বিবাহ করেন। জুলিয়া তাঁহার ভূতপূর্ব্ব শ্বশুর মার্শেলাসের পত্নী।

১৯ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে অগ্রিপা স্পেনদেশীয় কান্টাব্রীয়ান জাতির বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হন। ১৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহাকে ২য় বার সিরীয়ার শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিয়া পাঠান হয়। এখানে তাঁহার সুশাসনে সেই স্থানের হিব্রুগণ প্রীত হইয়া অধীনতা স্বীকার করেন। ১৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে পান্নোনিয়ার বিদ্রোহ দমন তাঁহার শেষ রাজকার্য্য। এই যুদ্ধে তাঁহাকে বলক্ষয় করিতে হয় নাই, পরন্তু কূট রাজনীতির কৌশলে তিনি পান্নোনিয়াবাসীকে পরাভূত করিয়াছিলেন। ৫১ বৎসর বয়সে কাম্পানিয়ায় তাঁহার মৃত্যু হয় (খৃঃ পূঃ ৬৩-১২)। সম্রাট্ অগষ্টাস তাঁহার সমাধিকার্য্য বিশেষ সমারোহে সমাধা করিয়াছিলেন।

অগ্রিপা একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেক গ্রন্থ ও স্বীয় জীবনবৃত্তান্ত ছিল। শেষোক্ত গ্রন্থখানি এখন আর পাওয়া যায় না। স্থাপত্যশিল্পে ও স্থপতিবিদ্যায় তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। স্বয়ং জুলিয়াস সীজার রোমক সাম্রাজ্যের একখানি পূর্ণ মানচিত্র সঙ্কলন করিতে চেষ্টিত ছিলেন ; অগ্রিপা নিজের তত্ত্বাবধানে সেই কার্য্য সম্পাদন করিতে মনোযোগী হন এবং নিজে যতদূর সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন, সেইগুলির সাহায্যে একখণ্ড মর্ম্মরে মানচিত্র উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। ঐ প্রস্তরাঙ্কিত সাম্রাজ্যচিত্র তদীয় ভগিনী পোল্লা-স্থাপিত স্তম্ভবাটিকায় (Colonnade) গ্রথিত রহিয়াছে। তাঁহার তিন পত্নীর মধ্যে পম্পোনিয়া ও জুলিয়ার গর্ভে যে কয়টী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তন্মধ্যে পম্পোনিয়া-তনয়া ভিপ্‌সানিয়া সম্রাট্ টাইবেরিয়াসের মহিষী হইয়াছিলেন। জুলিয়ার কন্যা অগ্রিপিনা জার্মানিকস্‌কে বিবাহ করেন। [অগ্রিপিনা দ্র°]

অগ্রিপা ভন্ নেটেস্হায়েম, হেনরী কর্নেলিয়াস্—(১৪৮৬-১৫৩৫ খৃঃ অঃ) বিখ্যাত জর্ম্মন্ গ্রন্থকার। তিনি একযোগে চিকিৎসাবিদ্, ঐন্দ্রজালিক ও সেনানায়ক ছিলেন। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে ১৪ই সেপ্টেম্বর কলোন্ নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই হাবস্‌বর্গের রাজপরিবারে কার্য্য করিয়া যশোভাজন হইয়া গিয়াছেন।

তাঁহার বাল্যজীবনের কোনরূপ বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এই মাত্র জানা যায় যে, তিনি কলোনের

বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিয়া ৮টী বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং কিছুকাল ফ্রান্সদেশে থাকিয়া পরে জর্ম্মনীতে প্রত্যাগত হন। বাল্যকালেই তিনি জর্ম্মনরাজ ১ম ম্যাক্সিমিলিয়ানের (Maximilian) অধীনে সেনাবিভাগে নিযুক্ত হন এবং ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে কাটালোনিয়ার যুদ্ধে সৈন্যভার গ্রহণ করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। রাজার অধীনে সেনাপতি থাকিয়া ও তাঁহার প্রধান কর্ম্মকারক হইয়াও তাঁহার এ মর্য্যাদা ভাল লাগিল না। তিনি উক্ত কার্য্য ছাড়িয়া পরাবিদ্যা ও তদন্তর্গত ইন্দ্রজাল (Magic) বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতে অগ্রসর হন।

১৫০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ডোলের (Dole) বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া জন রুক্‌লিনের "De Verbo Mirifico" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ধর্ম্মযাজক জন ক্যাটিলিনেট তাঁহার মত ধর্ম্মবিদ্বেষী বলিয়া ঘোষণা করিলে তিনি ডোল পরিত্যাগপূর্ব্বক নেদারলণ্ড যাত্রা করেন। এখানে আসিয়া পুনরায় তিনি রাজা ম্যাক্সিমিলিয়ানের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। পর বৎসর ১৫১০ খৃষ্টাব্দে তিনি কোন রাজনৈতিক বিষয়ের মীমাংসায় রাজাদেশে ইংলণ্ডযাত্রা করেন। এখানে তিনি সেণ্টপল গীর্জ্জার ধর্ম্মাধ্যক্ষ (Dean of St. Paul) কলেটের অতিথি হন এবং গীর্জ্জায় বসিয়া ক্যাটিলিনেটের মতনিরাসক এক প্রতিবাদপত্র প্রচার করেন।

রাজকার্য্য সমাধানান্তে তিনি কলোন নগরে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং অবিলম্বে ১৫১১ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্সিমিলিয়ানের সহিত ইতালী গমন করেন। ঐ সময়ে পোপ ২য় জুলিয়ানের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসঙ্ঘের প্রতিবাদকল্পে পিসা নগরে উচ্চতম ধর্ম্মযাজকদিগের দ্বিতীয় সভা আহূত হয়। ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া অগ্রিপাও এই সভায় আহূত হইয়াছিলেন। ইতালীতে তিনি ৭ বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কিছুকাল ৪র্থ উইলিয়াম ও অবশিষ্টাংশ সাভয়-পতি ৩য় চার্লসের অধীনে ধর্ম্মপ্রচার ও আয়ুর্বিজ্ঞানচর্চ্চায় অতিবাহিত করেন।

১৫১৫ খৃষ্টাব্দে পাডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাদানার্থ তিনি তথায় গমন করেন, কিন্তু ফরাসীরাজ ১ম ফ্রান্সিস্ তদ্দেশ আক্রমণ ও জয় করায় তাঁহার বক্তৃতাদানে বিঘ্ন উপস্থিত হয় এবং তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মেট্‌জ্ নগরের প্রধান বক্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এখানে ধর্ম্মবিষয়ের তদন্তকারী নিকোলাস সাভিনের সহিত তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক ব্যাপারে মতদ্বৈধ উপস্থিত হওয়ায় ১৫২০ খৃষ্টাব্দে তিনি ঐ পদ ত্যাগ করিয়া কলোনে ফিরিয়া আইসেন। দুই বর্ষ পরে তিনি জেনেভা ও ফ্রাইবর্গ শহরে গমন করিয়া চিকিৎসকরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার যশ ও প্রতিভার ফলে ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজা ১ম ফ্রান্সিসের মাতা সাভয়ের রাণী লুইর গৃহচিকিৎসকরূপে লিয়ঁস্ নগরে গমন করেন; কিন্তু এ কার্য্য তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডরাজ ৮ম হেন্‌রী তাঁহার পত্নী আরাগণ-কুমারী ক্যাথারিণকে (Queen Catherine of Aragon) পরিত্যাগ করিতে সংকল্প করেন; কিন্তু বিবাহিতা পত্নীকে বিনাকারণে ত্যাগ ন্যায়সঙ্গত কি না, তাহার মীমাংসার্থ অগ্রিপা আহূত হয়েন। এই অসঙ্গত কার্য্য তাঁহার স্বাধীনবৃত্তির অনুমোদিত না হওয়ায় তিনি সাভয়ের ডচেস্ মার্গারেটের অনুরোধে সম্রাট্ ৫ম চার্লসের অধীনে প্রধান ঐতিহাসিক ও দপ্তরখানার অধ্যক্ষ (Archivist) পদ বরণ করিয়া লন। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে মার্গারেটের মৃত্যুতে তাঁহার পদমর্য্যাদার হ্রাস হইতে থাকে, কারণ তাঁহার শত্রুপক্ষ ও ভিন্নমতাবলম্বিগণ এই সময়ে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সুযোগ পাইয়াছিল। তাঁহারা সকলে তাঁহাকে ধর্ম্মদ্বেষী বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ঋণজালে জড়িত হওয়ায় তিনি ব্রুসেল্‌স আদালতে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং মুক্তির পর কিছুকাল কলোন ও বন নগরে বাস করেন। এই সময় রাজমাতার প্রতি অশিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করায় তিনি রাজা ১ম ফ্রান্সিস্ কর্ত্তৃক ধৃত ও বন্দী হন এবং বিচারকের অনুগ্রহে অচিরে মুক্ত হইয়া কিছুদিন মুক্ত বাতাসে স্বভাবের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

তাঁহার রচিত De Occulta Philosophia; De Incertitudine et Vanitate Scientiarum et Artium atque Excellentia Verbi Dei Declamatio; De Nobilitate et Praecellentia Feminei Sexus; De Matrimonii Sacramento ও কএকখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত গ্রন্থদ্বয় তাঁহার খৃষ্টধর্ম্মের মতপোষক। তিনি খৃষ্টধর্ম্মের পূর্ব্বতন সরলতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেই প্রাচীনতম সারল্য যেন পুনরায় খৃষ্টজগতে আসে, এ আকাঙ্ক্ষা তিনি চিরদিন পোষণ করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মসংস্কারকদিগের বৃথা মতপ্রচারে তাঁহার কোন আস্থা ছিল না। অবসরমত তিনি বক্তৃতায় বা পুস্তকে তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিতে ছাড়েন নাই।

De Occulta Philosophia গ্রন্থখানি তাঁহার ভৌতিক আলোচনার ভিত্তিস্বরূপ। ইহাতে তিনি স্পষ্টভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, এই বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে মানব

প্রাকৃতিক যাবতীয় বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবে এবং সেই পথের অনুবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে শিখিবে। তিনি তিনটী জগৎ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

তিনি জ্ঞানী ও সৎসাহসী ছিলেন। কর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণায় যখন তাঁহার মানসিক গতি যে পথে চালিত হইত, কর্ত্তব্য-জ্ঞানে তিনি সেই পথে চলিয়া যাইতেন; কোন বাধা তিনি মানিতেন না। দুঃখের বিষয়, কষ্টসহিষ্ণুতায় তিনি আদৌ অভ্যস্ত ছিলেন না। এইজন্য অনেক সময়ে তাঁহাকে কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। জীবনে তিনি তিনটী বিবাহ করিয়াছিলেন।

অগ্রিপিনা (জ্যেষ্ঠ)—মার্কাস ভিপ্‌সানিয়াস্ অগ্রিপার কন্যা ও সম্রাট্ অগষ্টাস-তনয়া জুলিয়ার গর্ভজাত। বিখ্যাত বীর জার্মানিকাসের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ১৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অগষ্টাসের মৃত্যু হইলে, রাইন্ নদীতীরস্থ রোমকসৈন্য বিদ্রোহী হইয়া উঠে। এই উদ্ধত সেনাদলকে দমন করিতে জার্মানিকাস প্রেরিত হন। বীরপত্নী অগ্রিপিনা তাঁহার সহিত রণক্ষেত্রে গমন করেন। পরে জার্মানিকাস পূর্ব্বদেশের অধিনায়করূপে গমন করিলে ইনিও তাঁহার সহিত তথায় গমন করেন। ১৯ খৃষ্টাব্দে সিরীয়ার শাসনকর্ত্তা কালপার্ণিয়াস পাইসোর গুপ্তচর জার্মানিকাসকে অন্তিওক্ নগরে হত্যা করেন। এই হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য সম্রাট্‌দৌহিত্রী রোম-রাজদরবারে উপনীত হইয়া স্বীয় স্বামীর হত্যার কথা সম্রাট্-সমক্ষে নিবেদন করিয়া প্রতিবিধান প্রার্থনা করেন। [জার্মানিকাস দ্র°]

সম্রাট্ টাইবেরিয়াস ও তাঁহার প্রিয় বয়স্য সেজনাস্ এই ক্রোধোন্মত্তা রমণীর আচরণে ভীত হইয়া উঠিলেন এবং পাছে তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া স্বীয় পুত্রগণের জন্য রোম-সিংহাসন চাহিয়া বসেন, এই ভয়ে তাঁহারা তাঁহাকে কাম্পানিয়া উপকূলের অদূরবর্ত্তী পাণ্ডতারিয়া দ্বীপে নির্ব্বাসিত করেন। এখানে মনের খেদে অগ্রিপিনা অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন। (১৮ই অক্টোবর, ৩৩ খৃষ্টাব্দ)।

অগ্রিপিনার পুত্রগণের মধ্যে নীরো ও ড্রুসাস্ পূর্ব্বে সেজনাসের কৌশলে নিহত হইয়াছিল। অপর দুইটীর মধ্যে কন্যা অগ্রিপিনা ও গায়াস সিজার (Gaius Caesar) খ্যাতি-লাভ করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত রাজকুমারই টাইবেরিয়াসের মৃত্যুর পর কালিগুলা (Caligula) নামে রোমসাম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

অগ্রিপিনা (কনিষ্ঠ)—ইনি জার্মানিকাস্ ও (জ্যেষ্ঠ) অগ্রি-পিনার কন্যা (১৬-৫৯ খৃঃ অঃ), সম্রাট্ কালিগুলার ভগিনী ও রোমের প্রখ্যাত সম্রাট্ নীরোর মাতা। রাইন নদীর তীরে ওপিডাম উবিওরাম নামক প্রবাসে ইঁহার জন্ম হয়। এই ঘটনার স্মৃতিরক্ষার্থ এইস্থান পরে কলোনিয়া অগ্রিপিনী (Colonia Agrippinae) নামে অভিহিত হয়। বর্ত্তমানে ঐ স্থান মহাসমৃদ্ধিশালী কলোন (Cologne) নগরে পরিণত হইয়াছে।

অগ্রিপিনার জীবন কুহেলিকায় পূর্ণ, প্রতারণা ও কুমন্ত্রণা উহার প্রধান অঙ্গ। তাঁহার প্রথম স্বামী গ্নিয়াস্ ডোমিটিয়াস্ আহেনোবার্বাসের ঔরসজাত পুত্র সম্রাট্ নীরো। তাঁহার দ্বিতীয় স্বামী পাসিনাস্ ক্রিস্‌পাস্‌কে বিষপ্রয়োগে হত্যা করার অপরাধে তিনি অপরাধিনী। এই অসৎ কার্য্য তিনি দুরভিসন্ধিবশে সম্পাদন করিয়াছিলেন। নীরোকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। প্যালাস নামক জনৈক শক্তিশালী ব্যক্তির দ্বারা তিনি সম্রাট্ ক্লডিয়াস্‌কে জানান যে, সম্রাট্ যদি বৃটানিকাসের পরিবর্ত্তে নীরোকে সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন, তাহা হইলে মেসালিনার মৃত্যুর পর তিনি সম্রাট্‌কে বিবাহ করিতে পারেন। উভয়ের গুপ্ত প্রণয় গাঢ়তর হইবার পূর্ব্বেই অগ্রিপিনা বিষপ্রয়োগে ক্লডিয়াস্‌কে বধ করেন। নীরোর জন্য সিংহাসন নিষ্কণ্টক হইল বটে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে নীরোর অভিভাবিকা-স্বরূপ তিনি রাজকার্য্য পরিচালনের ভার গ্রহণ করিলেন। নীরো স্বয়ং রাজপদ গ্রহণ করিতে প্রয়াসী হইলে রাণী অগ্রিপিনা কোন প্রকারে তাঁহাকে বশে আনিতে না পারিয়া অবশেষে ন্যায়তঃ উত্তরাধিকারী বৃটানিকাস্‌কে সিংহাসনে বসাইবার উদ্‌যোগ করিলেন। ইহাতে বিরক্ত হইয়া নীরো বৃটানিকাস্‌কে বধ করেন এবং স্বীয় মাতাকে ইহজগৎ হইতে অপসারিত করিতে চেষ্টা করেন। তিনি প্রথমে মাতাকে বাইয়ীতে (Baiae) আমন্ত্রণ করিয়া জলমগ্ন করিতে প্রয়াসী হন। ইহাতে ব্যর্থমনোরথ হইলে তিনি তাঁহাকে তাঁহার নিজ আবাসে গুপ্তঘাতকের দ্বারা নিহত করেন। [নীরো দ্র°]

অগ্রিপিনা বিদুষী ছিলেন। তাঁহার রচিত তৎসময়ের এক-খানি জীবনবৃত্তান্তের উল্লেখ টাসিটাসের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

অগ্রিম,—(পুং) [অগ্রে ভবঃ অগ্র-ডিমচ্।] জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ২ উত্তম। ৩ শ্রেষ্ঠ। ৪ অগ্র।

অগ্রিম$_2$—অগ্রে দেয়। কোন দ্রব্য খরিদের জন্য অগ্রে যে টাকা দিতে হয় তাহা উক্ত দ্রব্যের দেয় অগ্রিম মূল্য। কৃষক-দিগের নিকট হইতে নীল খরিদের জন্য নীলকরগণ অগ্রিম টাকা দিয়া দলিল লেখাপড়া করিয়া রাখিতেন। এই অগ্রিম দেওয়াকে চলিত কথায় 'দাদন দেওয়া' বলে।

২ পিতা জীবদ্দশায় কোন প্রিয় পুত্রকে তাহার উপভোগের

জন্য যদি স্বতন্ত্রভাবে কিছু টাকা বা সম্পত্তি দিয়া যান, ইংরেজী আইনে উহা অগ্রিম দান (Advancement) বলিয়া গণ্য। পিতার চরমপত্রে (উইলে) ঐ সম্পত্তির কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত থাকা আবশ্যক।

কিরূপ স্থলে অগ্রিম সম্পত্তির উপস্বত্ব আমলে আসিতে পারে, নিম্নে তাহার ধারা উদ্ধৃত হইল :—

(১) যে স্থলে কোন চরমপত্র নাই, সে স্থলে সম্পত্তি ভাগীদারদের পিতার হওয়া চাই।

(২) অগ্রিম দান পিতার জীবদ্দশায় প্রদত্ত হওয়া চাই।

(৩) কোন পুত্র আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী (heir-at-law) অথবা সাধারণ উত্তরাধিকারী (customary heir) হইয়াও যদি পিতার বর্ত্তমানে কোন ভূসম্পত্তি উপভোগার্থ পায়, তাহা যৌথ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে না।

(৪) দাতার বিধবা অগ্রিমদত্ত সম্পত্তির উপস্বত্ব ভোগ করিতে পারে না।

প্রকৃত অগ্রিম দান কি, তাহা লইয়া আইনজ্ঞগণের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, পুত্রের বিবাহ-কালে অথবা জীবনযাত্রায় প্রতিষ্ঠালাভের জন্য পুত্র পিতার নিকট হইতে যে দান পায়, তাহাই অগ্রিম; আবার কেহ কেহ বলেন যে, পুত্রের অনুরোধে পিতা প্রিয় পুত্রকে সুখী করিবার জন্য যে প্রভূত অর্থ দেন, তাহাই প্রকৃত অগ্রিম। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, কোন পুত্রের সম্মানরক্ষার জন্য পিতা যদি ঐ পুত্রের ঋণ পরিশোধার্থ টাকা দেন, তাহাও অগ্রিম বলিয়া গণ্য হইতে পারে; কিন্তু পুত্রের সুখসম্পাদনের নিমিত্ত অর্থদান বা তাহার আঢ্যতার সহায়ক উপহারাদি কখনই অগ্রিম বলিয়া গণ্য হইবে না।

অগ্রিমা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] লবলী বৃক্ষ। চলিত লোণা গাছ।

অগ্রিয়,—(পুং) [অগ্রে ভবঃ ইতি অগ্র-ঘ] জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ২ শ্রেষ্ঠ। ৩ উত্তম। (ত্রি) ৪ অগ্রে জাতমাত্র। "সন্ধ্যা অগ্রিয়া ভবতি"। (তাণ্ড্যব্রা°)

অগ্রিয়,—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির আহ্মদাবাদ জেলার একটী নিম্ন-জাতি। [অগ্রী, দ্র°]

অগ্রী,—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ধারবাড় জেলার করজগি তালুকের একটী নগর। হবেরির উত্তরপূর্ব্বে চারি মাইল দূরে অবস্থিত। এইস্থানে যথনাচার্য্য সম্প্রদায়ের একটী সুপ্রাচীন মন্দির আছে।

অগ্রী, (অগ্রীয়া, আগ্‌রী)—বোম্বাই অঞ্চলের এক জাতি। অগর বা আগর নামক পাত্রে লবণ প্রস্তুত করে বলিয়া ইহারা অগ্রী বা আগ্‌রী নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা জাতিতে কোলী। লবণ প্রস্তুত করা ইহাদের জাতীয় ব্যবসায়। কেহ কেহ চাষ আবাদও করে।

ইহারা প্রধানতঃ তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত :—সুদাগ্রী, দশাগ্রী ও উরপাগ্রী। ইহারা পরস্পর পানভোজন করে না এবং পুত্র কন্যার বিবাহও দেয় না। সুদাগ্রীদিগের মধ্যে আবার তিনটী থাক :—(১) মিঠাগ্রীরা কেবল লবণ প্রস্তুত করে; (২) যশা-গ্রীরা তাড়ীর ব্যবসায় করিয়া থাকে এবং (৩) ঢোলাগ্রীরা ঢোল বাজায়। ইহাদের মধ্যে পরস্পর আদানপ্রদান ও পানভোজন চলে। ইহারা মরাঠী বলিয়া গণ্য হইলেও, প্রভু এবং পাঁচকলসীদিগের ন্যায় আপনাদিগকে বিদেশ হইতে আগত বলিয়া স্বীকার করে। বৈর, মহত্রে, মুকুল, নাবরায়, নাএক, পোবার, যাদব, কিম-মালী, মন্দারে, শেলার, শেল্‌কা, চন্দেরী, চাভন, ঘরাট, গুলবী, বাজে প্রভৃতি কতকগুলি পদবী ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ইহারা স্ব স্ব গ্রাম্যদেবতার পূজা করে। পূজার সময় স্বজাতির একজন পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। দেবতার উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি দানই ইহাদের পূজার প্রধান অঙ্গ। আনারস, হরীতকী, আম্র, যজ্ঞডুম্বুর বা বন-আম্র পত্র ইহারা শ্রেণী-বিশেষে ধারণ করিয়া থাকে।

সুদাগ্রীরা একজাতি-ভুক্ত হইলেও কোন কোন জেলায় ইহাদের মধ্যে রাজপুত-সংস্রবের পরিচয় পাওয়া যায়। পনবেল অগ্রীরা অপেক্ষাকৃত রাজপুত আচারানুষ্ঠানের পক্ষপাতী। ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই রাজপুতজাতিগত নাম পাওয়া যায়। সালশেট-দ্বীপবাসী অগ্রীরা রাজপুত-পদবীর ততদূর পক্ষপাতী না হইলেও পুত্রকন্যার বিবাহ ভিন্ন সমাজের পদবীযুক্ত অগ্রীর সহিত দেয় না।

ইহারা খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ ও কর্ম্মপটু। সকলেই চলিত মরাঠী ভাষায় কথা কয়। ঘরে কৌপীন বা লুঙ্গী পরিলেও ইহারা বাহিরে জনসমাজে কুন্‌বী জাতির ধরণে বস্ত্র পরিধান করে ও মাথায় পাগ্‌ড়ী দেয়। স্ত্রীলোকেরা জামা পরে। সন্ধ্যার পর স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া মদ্য পান করে, সকলেই মাছ মাংস খায়। মদ্যপানে প্রবল আসক্তি থাকায় ইহাদের পরিশ্রমলব্ধ অর্থ ইহারা নষ্ট করিয়া ফেলে; কিন্তু তাই বলিয়া ইহারা ঋণগ্রস্ত নহে। ইহারা মরাঠা, কুন্‌বী বা কোলীর কন্যা গ্রহণ করে না। পুরাণোক্ত হিন্দু দেবদেবীতে ইহাদের প্রগাঢ় ভক্তি। চেড়া ও গ্রাম্যদেবতার পূজায় ইহাদের উৎসাহ যথেষ্ট।

দশী বা উত্তরীয় ধারণ করে বলিয়া "দশাগ্রী" এই নামে প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ 'দশ' শব্দে কুড়ির অর্দ্ধেক জ্ঞাপক অর্থে ইহাদিগকে মূল জাতির অর্দ্ধেক বা মিশ্রজাতি বলিয়া অনুমান

করেন। ইহাদের সহিত সুদাগ্রীদের আহারবিহার নাই; এবং আকৃতিগত বৈষম্য দৃষ্টে মনে হয় যে, ইহারা একটী মিশ্র জাতি। ইহাদের বর্ণ উজ্জ্বল, চক্ষু গোলাকার ও দীপ্ত, মুখমণ্ডল গোলাকৃতি ও কোমল।

উরপ-অগ্রী বা বরপ-অগ্রীরা বসাই ও সালশেট দ্বীপে বাস করে। ইহারা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, পরে ১৮২০ হইতে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সকলেই পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করে। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের পর ইহারা আপনাদিগকে ইউরোপ শব্দের অপভ্রংশে উরপ (উরপীয় অর্থে) বলিতে আরম্ভ করে। কেহ কেহ বলেন, উহা উর্দ্দূ 'উর্ফ' শব্দজাত। মতান্তরে, তাহারা পুনঃসংস্কারের সময় অগ্নিস্পর্শ দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছিল বলিয়া, ইহারা মরাঠী 'বরপ্নে' শব্দ হইতে বরপ বা ওরপ নাম পাইয়াছে। ইহারা নব-মরাঠী নামেও খ্যাত।

সুদ বা দশ অগ্রীদের সহিত ইহাদের আদানপ্রদান নাই। ইহাদের পুরোহিত ও মণ্ডল স্বতন্ত্র; কিন্তু আচার-ব্যবহার অন্যান্য অগ্রীদিগের মত। ইহারা যে এককালে খৃষ্টান ছিল, তাহা ইহাদের গোমাজ, সোজ, ফার্নান, ফ্রতাদ, সিনেজ প্রভৃতি পর্ত্তুগীজ পদবী হইতে বুঝা যায়। ইহারা বর্ত্তমানে সকল হিন্দু দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে।

বাবা রামচন্দ্র জোষী নামক একজন পলশাই ব্রাহ্মণ ইহাদিগকে হিন্দুধর্ম্মে পুনর্দীক্ষিত করেন। তৎপরে ভাই মুকুন্দ জোষী পলশাই পৌরোহিত্যভার গ্রহণ করেন। তিনি সমাজচ্যুত হইয়া পরে প্রায়শ্চিত্তান্তে স্বসমাজে চলিত হন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ১২ই নবেম্বর বিঠল হরিনায়ক বৈদ্য নামক অপর একজন পলশাই ব্রাহ্মণ অবশিষ্ট সকল অগ্রিকে হিন্দুধর্ম্মে সংস্কৃত করিয়া লন।

অগ্রীয়—(পুং) [অগ্রে ভবঃ অগ্র-ছ] জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। (ত্রি) ২ শ্রেষ্ঠ। ৩ উত্তম।

অগ্রু, অগ্রূ—(স্ত্রী) [অগি-ক্রু, নলোপ উঙ্] অঙ্গুলি। ২ নদী। (ত্রি) ৩ অগ্রগামী। (ঋক্ ৫.৪৪.৭)

অগ্রূ২—ঋগ্বেদোল্লিখিত কোন স্ত্রীলোক। ইন্দ্র ইঁহার অন্ধ পুত্র পুরাবৃত্তকে বল্মীক হইতে উদ্ধার করিয়া যজ্ঞভাগী করেন। (ঋক্ ৪.১৯.৯; ৪.৩০.১৬)

অগ্রেগ—(ত্রি) [অগ্র-গম--ড, অলুক্-স°] অগ্রগামী।

অগ্রেগা—(ত্রি) [অগ্রে-গম-বিট্, অলুক্-স°] বিট্ প্রত্যয়ের অন্তে আকার হয়। অগ্রগামী।

অগ্রেগূ—(ত্রি)—[অগ্র-গম্ ক্বি উঙ্। গমঃ ক্বৌ। পা ৬.৪.৪০। উঙ্ চ গমাদীনামিতি বক্তব্যম। (বার্ত্তিক)। উণাদি ডূ প্রত্যয়েও এই শব্দ সিদ্ধ হয়] অগ্রগামী সেবক।

অগ্রেদিধিষু, অগ্রেদিধিষূ—(পুং) [দিধিং ধৈর্য্যং স্যতি ত্যজতীতি। দিধি-সো-কু, নিপাতনে সিদ্ধ; অগ্রে গণনীয়া দিধিষুঃ দ্বিরূঢ়া স্ত্রী যস্য বা বহুব্রী°] দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রীর পতি। (স্ত্রী) ২ অবিবাহিতা জ্যেষ্ঠা ভগিনী থাকিতে অগ্রে বিবাহিতা কনিষ্ঠা ভগিনী।

"জ্যেষ্ঠায়াং বিদ্যমানায়ং কন্যায়ামুহ্যতেঽনুজা।
সা চাগ্রেদিধিষূর্জ্ঞেয়া পূর্ব্বা চ দিধিষূঃ স্মৃতা॥" (মনু)

অগ্রেদিধিষূপতি—(পুং) ৬-তৎ। দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রীর স্বামী। হিন্দুশাস্ত্রে দিধিষূপতি অতিশয় ঘৃণার পাত্র। তাহারা দৈবাদি ক্রিয়া হইতে বর্জ্জনীয়।

"উপপতেঃ সুতো যশ্চ যশ্চৈব দিধিষূপতিঃ।
পরপূর্ব্বাপতির্জাতা বর্জ্যাঃ সর্ব্বে প্রযত্নতঃ॥"
(পরাশর স°)

অগ্রেপা—(ত্রি) [অগ্রে পাতীতি পা-ক্বিপ্] অগ্রপালক। যিনি অগ্রে থাকিয়া রক্ষা করেন। (ঋক্ ৪.৩৪.১০)

অগ্রেপূ—(ত্রি) [অগ্রে-পূ-ক্বিপ্] অগ্রে পবিত্রকারক। (শুক্ল যজুঃ ১।১২)

অগ্রেবণ—(ক্লী) [বনস্য অগ্রং, রাজদন্তাদি অলুক্-স°] বনের অগ্রভাগ। [রাজদন্তাদি দ্র°]

অগ্রেসর—(ত্রি) [অগ্রে-সৃ-ট, অলুক্-স°] অগ্রগামী।

অগ্রেসরিক—(ত্রি) [অগ্রে-সর-ঠন্] অগ্রগামী, সেবক।

অগ্রোপহরণীয়—(ত্রি) [অগ্র-উপ-হৃ-সম্প্রদানে অনীয়র্] প্রথম দানীয় দ্রব্য।

অগ্রোর—(অগ্রোরে) পঞ্জাবের হজারা জেলার অন্তর্গত একটী সীমান্ত উপত্যকা। এই উপত্যকার নিম্নদেশ দিয়া কুনহর নদী প্রবাহিত। ইহার নিম্নপ্রদেশ অতিশয় উর্ব্বর। এইস্থানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়, কাজেই শস্যের অজন্মা প্রায়ই ঘটে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম ও পল্লী এবং বহুতর পাইন বৃক্ষাচ্ছাদিত পর্ব্বতমালায় সুশোভিত হওয়ায় এই উপত্যকা অতি মনোরম। ইহা অক্ষা° ৩৪°২৯′ হইতে ৩৪°৩৫′১৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৫৮′ হইতে ৭৩° ৯′ ৩০″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই স্বাতি এবং গুজর জাতীয়। ইহারা প্রায়ই মুসলমান। স্থানীয় মোটা সূতার বস্ত্রই এই স্থানের প্রধান ব্যবসায়ের সামগ্রী। ক্রয়বিক্রয় প্রধানতঃ এই প্রদেশের মধ্যেই সংসাধিত হয়, তবে কিছু কিছু শস্যাদি বিদেশে রপ্তানিও হইয়া থাকে। ইহার শাসনভার স্থানীয় খাঁ উপাধিধারী ব্যক্তির প্রতি অর্পিত আছে। তিনিই স্বাধীনভাবে ইহার রাজকার্য্য ও শাসনপ্রণালী পরিচালন করেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইহার শান্তিরক্ষার্থ এইস্থানে পুলিস

রাখিয়াছেন এবং অন্যান্য সীমান্তবাসিগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এখানে একদল সৈন্য রাখিয়া থাকেন। ইহার বিস্তৃতি প্রায় ৪১,০০০ একর; কিন্তু ইহার প্রায় অর্দ্ধেকাংশে এখনও চাষ আবাদ হয় না।

অগ্রোহা—পঞ্জাবের হিসার জেলার অন্তর্গত ফতেহাবাদ তহশীলের একটী সুপ্রাচীন নগর। ইহা হিসার হইতে ১৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। অনেকের বিশ্বাস, পূর্ব্বে এই নগরই অগরবাল বণিক্‌দিগের আদি বাসভূমি ছিল। ইহা যে পুরাকালে একটী সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, তাহার যথেষ্ট নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। বর্ত্তমান পল্লীর অর্দ্ধ মাইল দূরে একটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, এবং ইহার চতুর্দ্দিকে অর্দ্ধপ্রোথিত অবস্থায় বহুতর প্রাচীন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ ও নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা অগ্রোহার পূর্ব্বগৌরব লুপ্ত হইয়াছে। আজকাল ইহার লোকসংখ্যা এক সহস্রের কিছু অধিক হইবে মাত্র। ১১৯৫ খৃষ্টাব্দে সাহাব-উদ্দিন-ঘোরী কর্ত্তৃক এই নগর আক্রান্ত হইয়া ধ্বংসমুখে পতিত হয়, এবং সেই সময়ে ইহার অধিবাসী অগরবালগণ ভারতের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। [অগরবাল দ্র°]

অগ্র্য—(ত্রি) [অগ্রে ভবঃ অগ্র-যৎ] জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ২ শ্রেষ্ঠ। ৩ উত্তম, প্রধান। ইব অর্থাৎ প্রতিকৃতি বা তত্তুল্যার্থেও অগ্র শব্দের উত্তর যৎ প্রত্যয় হয়।

অগ্র্যা—(স্ত্রী) জ্যেষ্ঠ ভগিনী। ২ শ্রেষ্ঠা উত্তমা। ৩ [বৈদ্যক] ত্রিফলা।

অঘ—(ক্লী) অঘ-ভাবে অচ্। পাপ। ২ দুঃখ। ৩ ব্যসন। "অঘস্তু ব্যসনে প্রোক্তমঘং পাতকদুঃখয়োঃ" (বিশ্বপ্রকাশ)। কর্ত্তরি অচ্ (ত্রি)। ৪ পাপকারক। (পুং) ৫ পূতনা ও বকাসুরের ভ্রাতা অসুর বিশেষ।

অঘকৃৎ—(ত্রি) [অঘ-কৃ-ক্বিপ্] পাপাচারী, পাপকারী। (অথর্ব্ব ১০.১.৫) ২ সতত পাপশীল।

অঘন,—(ত্রি) নঞ্-তৎ। পাতলা, ঘন নহে। ২ দধি, দৈ। (বৈদ্যকশব্দসি°)

অঘন,—(শিল্প) মানসারবাস্তু নামক শিল্পশাস্ত্রে—স্তম্ভের ভেদ। ফাঁপা বন্ধ, স্তম্ভ, উপপীঠ বা জানালার স্তম্ভ বর্ণনায় 'অঘন' অংশের পরিচয় আছে। (মানসার ৩৩.২৯০—২৯২; ৫৭২—৫৯৪)

অঘনমান—নির্ম্মিত অট্টালিকা প্রভৃতির গর্ভগৃহের পরিমাণ। (মানসার ৩৩.৩৩১-৩৩৫)

অঘনাশন—(ত্রি) [অঘ-নশ-ণিচ্ ল্যুট্] পাপনাশক জপদানাদি। ২ শ্রীকৃষ্ণ। অঘ নামে কংসানুচর একটা অসুর ছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করেন। এই জন্য অঘনাশন শব্দে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়। এই অঘাসুর বধের বিস্তৃত বিবরণ [অঘাসুর দ্র°]

অঘনাশনী—(অঘনাশিনী) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উত্তর কানাড়া জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। ইহা গঙ্গাবালী নদীর ৬ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রে নিপতিত হইয়াছে। শিরশীর ১৫ মাইল পশ্চিমে মঞ্জুগঞ্জের সন্নিকটস্থ একটী কুণ্ড হইতে বাকুড়-হোলে ও শিরশীর নিকট হইতে দোনীহল্লা নামক স্রোতস্বিনীদ্বয় শিরশী হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে মুত্তহল্লী নামক স্থানে মিলিত হইয়া তাদ্রী বা অঘনাশনী নামে সহ্যাদ্রি পর্ব্বতের পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া বিল্‌গী নগরের ৮ মাইল উত্তরে পর্ব্বত হইতে নিম্নতলে নিপতিত হইয়াছে। ইহা লুসিংটন প্রপাত নামে পরিচিত। গেরসাপ্পার ন্যায় এই প্রপাতের পার্শ্ববর্ত্তী সৌন্দর্য্যও নিতান্ত মন্দ নহে।

উপরিউক্ত স্রোতস্বিনীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলের দক্ষিণ ও বামকূলে তাদ্রী ও অঘনাশী নগর থাকায় এই নদী ঐ নগরদ্বয়ের নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। মীর্জানের নিকটে নদীমুখে একটী বিস্তীর্ণ গাঙ্গ বা বাঁওড় হইয়া ঐ বাঁওড়ের উত্তর দিয়া জলরাশি দুইটী নাতি-উর্দ্ধ শৈলের মধ্য দিয়া সমুদ্রে মিশিয়াছে; জোয়ারের সময়ে মোহানার খাতে ১৭ ফিট গভীর জল থাকে।

অঘনাশী—দক্ষিণ ভারতের উত্তর কানাড়া জেলার একটী তীর্থ। তাদ্রী নদীর মুখে গোকর্ণ হইতে ৩ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে কানেশ্বর মহাদেব ও গণপতির মন্দির আছে।

প্রবাদ, হরকোপানলে মদন ভস্মীভূত হইলে তাঁহার অভিশপ্ত জীবনে গোকর্ণে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হন। এই কারণে তিনি শিবের আরাধনা করিতে অঘনাশী তীর্থে একটী শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া পূজা করেন। দেবাদিদেব মদনের আরাধনায় প্রীত হইয়া গঙ্গাকে অঘনাশিনীতে আনয়ন করেন। মদন ঐ পবিত্র সলিলে স্নান করিয়া শাপমুক্ত হন এবং গোকর্ণে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। এই তীর্থে স্নান করিলে সকল প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া লোকে অক্ষয় স্বর্গ লাভ করে।

অঘমর্ষণ—(ক্লী) [অঘং পাপং মৃষ্যতে উৎপন্নত্বেঽপি নাশনেন, কর্ম্মাক্ষমত্বাৎ সহতেঽনেন অঘ-মৃষ-ল্যুট্] পাপনাশন। ২ অশ্বমেধ যজ্ঞের অঙ্গ অবভৃত স্নানমন্ত্র। ৩ বৈদিক সন্ধ্যার অন্তর্গত মন্ত্রপূত আঘ্রাত জল প্রক্ষেপরূপ ক্রিয়াবিশেষ। ৪ উৎপন্ন নিখিল পাপনাশের জন্য জপ্য মন্ত্র বিশেষ।

ব্রাহ্মণেরা প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নে এই তিন বেলাই বৈদিক সন্ধ্যা করিবার সময় পাপনাশার্থ অঘমর্ষণমন্ত্র জপ করেন। এই সময় যে কয়টী মন্ত্র বা সূক্ত পাঠ করিতে হয়, তাহাই

অঘমর্ষণমন্ত্র নামে অভিহিত। সেই মন্ত্র বা সূক্ত তিনটীর প্রারম্ভ এইরূপ :—

"দ্রুপদাদিব" ইত্যাদি (অথর্ব্ব ৬.১১৫.৩) "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ" ইত্যাদি (ঋক্ ১০.১৯০.১) এবং "আপোহিষ্ঠা" ইত্যাদি (ঋক্ ১১.৯.১)।

বৌধায়ন বলিয়াছেন, জলমধ্যে থাকিয়া 'ঋতঞ্চ' ইত্যাদি অঘমর্ষণ মন্ত্র তিনবার পাঠ করিলে, সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

"ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাত্যর্ঘমর্ষণং ত্রিরন্তর্জলে জপন্ সর্ব্বস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে" ইতি (বৌধায়নস°)।

শঙ্খ বলিয়াছেন, জলমগ্ন হইয়া প্রাণসংযমপূর্ব্বক তিনবার অঘমর্ষণ সূক্ত জপ করিয়া স্নান করিবে, অঘমর্ষণ অপেক্ষা পাপঘ্ন আর নাই।

"জলনিমগ্নঃ ত্রিরাবৃত্যাঘমর্ষণসূক্তেন স্নায়াৎ নাস্ত্যঘমর্ষণাৎ পরমন্তর্জলে।" (শঙ্খস°)

হারীত বলিয়াছেন,—পাতক, উপপাতক ও মহাপাতক ইহার মধ্যে যে কোন পাতক উপস্থিত হউক, অঘমর্ষণমন্ত্রই জপ করিবে।

"পাতকোপাতকমহাপাতকানাং সন্নিপাতেঽঘমর্ষণমেব জপেৎ।" (হারীতস°)

বৃহন্মনুর মতে, অগম্যাগমনজনিত পাপে লিপ্ত হইয়াও জলমধ্যে থাকিয়া অঘমর্ষণ জপে পাপমুক্ত ও পূত হইতে পারিবে। পাপের গুরুত্ব বুঝিয়া সংযতভাবে একমাস পর্য্যন্ত জলাবগাহনপূর্ব্বক তিনবার অঘমর্ষণ সূক্ত জপ করিতে হইবে।

বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, মনে মনে পাপ করিলেও অঘমর্ষণ জপ করিবে।

"মনসা পাপং কৃত্বা অঘমর্ষণং জপেৎ।" (বশিষ্ঠ)

লিখিতের মতে, ব্রহ্মহত্যাকারীও ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া জলমধ্যে তিনবার অঘমর্ষণ জপে শুদ্ধ হইবে।

এইরূপে ধর্ম্মশাস্ত্রকার প্রায় সকল ঋষিই একবাক্যে অঘমর্ষণ মন্ত্রের অশেষ পাপহর শক্তি কীর্ত্তন করিয়াছেন।

তান্ত্রিক সন্ধ্যায় অঘমর্ষণের প্রকার এই—ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া বামহস্তে জল লইবে, পরে দক্ষিণহস্তে জল ঢাকিয়া 'হং যং রং লং বং' এই মন্ত্রে তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া করতল-গলিত জলবিন্দুগুলি সাতবার মস্তকে ছিটাইয়া দিবে। যাহার যাহা মূলমন্ত্র, সেই মন্ত্র পড়িয়াই তত্ত্বমুদ্রায় ছিটাইতে হইবে। বামহস্তে যে জল অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দক্ষিণহস্তে লইয়া একটা তেজোরূপ ধ্যান ও ইড়ানাড়ীপথে আকর্ষণ করিয়া দেহ মধ্যে যে কিছু পাপ আছে, তাহা প্রক্ষালনান্তে ঐ জলটুকুকে কৃষ্ণবর্ণ চিন্তা করিবে, পরে পিঙ্গলা নাড়ী-পথে বিরেচন করিয়া পূর্ব্বকল্পিত বজ্রশিলায় 'ফট্' এই মন্ত্রে ঐ জল পাপপুরুষরূপে নিক্ষেপ করিবে। ইহাই তান্ত্রিক অঘমর্ষণ। ইহার প্রমাণাদি তন্ত্রসারে উল্লিখিত আছে।

২ (পুং) ত্রয়োদশ কুশিকদের মধ্যে ষষ্ঠ ঋষি। যথা—

"বিশ্বামিত্রশ্চ গাধেয়ো দেবরাজস্তথা বলঃ।

তথা বিদ্বান্ মধুচ্ছন্দা ঋষয়শ্চাঘমর্ষণঃ।" [কুশিক দ্র°]

৩ মুনিবিশেষ। 'বিশ্বামিত্রের অন্যতমা পত্নী শালাবতীর গর্ভে হিরণ্যাক্ষের জন্ম হয়। অঘমর্ষণ এই হিরণ্যাক্ষের পুত্র। (হরিব°)

অঘমার—(ত্রি) [অঘ-মৃ-ণিচ্-অণ্, উপ-তৎ] পাপনাশক, দেবাদি। "যমো মৃত্যুরঘমারো নির্ঋথঃ" (অথর্ব্ব ৬.৯৩.১২)

অঘরিকা—একপ্রকার ক্রীড়া।

অঘরিয়া—লোহার জাতির ছয়টী বিভাগের মধ্যে একটী। ইহারা লোহা গলাইয়া তাহা হইতে নানাপ্রকার দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। [অগরিয়া দ্র°]

অঘরুদ্—(ত্রি) [অঘ-রুদ-ক্বিপ্ অপাদানে] পাপাপনোদনের হেতু। ২ পাপনাশন মন্ত্র। (অথর্ব্ব ৮.১.১৯) [কর্ত্তরি ক্বিপ্] ৩ যে ব্যক্তি কেবল রোদন করিয়াই বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইতে চায়, বিপদে প্রতিকারের কোনই চেষ্টা করে না।

অঘর্ম্ম—(পুং) [নঞ্ তৎ] শীত, শীতকাল। (ত্রি) ২ শীতযুক্ত, সন্তাপশূন্য।

অঘল—(ত্রি) [অঘং পাপং লাতীতি, অঘ-লা-ক] পাপনাশক। "ঋত্যোর্যে অঘলা দূতাঃ" (অথর্ব্ব ৮.৮.৪০)

অঘবৎ—(ত্রি) [অঘ-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ] পাপী।

অঘবিষ—(পুং) [বিষং অঘমেব যস্য] সর্প।

অঘশংস—(পুং) [অঘং শংসতি, অঘ-শংস-অণ্, উপ-তৎ। অঘ-শংস-অচ্, ৬-তৎ] অনিষ্টসূচক, রাক্ষস। (ঋক্ ৭.১০৪.৪) ২ চোর। (ঋক্ ১.৪২.৪) ৩ পাপকর্ম্ম। "অপাঘশংসং নুদতামরাতিং" (তৈত্তি°ব্রা° ৩.১.৪,৪) [ভাবে অচ্] ৪ ব্যসন-সূচন।

অঘশংসহন্—(পুং) চোর বা পাপকর্ম্মের নাশক। (ঋক্ ৯.২৪.১৭)

অঘশংসিন্—(ত্রি) [অঘ-শংস-ণিনি। ৬-তৎ] ব্যসনসূচক।

অঘহার—(পুং) পাপহর, ব্যসনহারী। (সাম° ১১.৯.৩.৬)

অঘহারিণী—(স্ত্রী) [অঘং পাপং দুঃখং বা হরতি যা, সা। অঘ-হৃ-ণিনি] পাপনাশিনী, দুঃখহারিণী। কাশীখণ্ডে সহস্রনামকীর্ত্তন প্রসঙ্গে গঙ্গার অঘহারিণী নামের উল্লেখ আছে।

অঘা—সামবেদোক্ত পাপ দেবতা। মহর্ষি অপ্রতিরথ ইঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন। (সাম°)

অঘাদ—বোম্বাই প্রদেশে রেবাকাণ্ঠার অন্তর্গত এক ক্ষুদ্র রাজ্য। অক্ষা° ২৩°৫৫'৪০" উ°; দ্রাঘি° ৭২°১৫'৩০" পূঃ। আয়তন ২ বর্গমাইল।

অঘায়ু—(ত্রি) অঘ-ক্যচ্-উ] পাপাচরণে অভিলাষী। ২ পরানিষ্টচিকীর্ষু। (ঋক্ ১.১২০.৭)

অঘায়ুস্—(ত্রি) [অঘং পাপসাধনমায়ুরস্য] সকল অবস্থায় পাপকারী। "অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামঃ" (গীতা)

অঘবান্‌পুর-মোগলপুর—যুক্তপ্রদেশের রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত মুরাদাবাদ জেলার একটী নগর। ইহার জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচহাজার, তন্মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের অনুপাত প্রায় সমান।

অঘারিন্—(ত্রি) [অঘমৃচ্ছতীতি অঘ-ঋ-ণিনি] ব্যসনযুক্ত। (স্ত্রী) অঘারিণী। (অথর্ব্ব ১১.১১.১৪)

অঘাশ্ব—পেটু নামক রাজর্ষি। (ঋক্ ১.১১৬.৬) "অঘাশ্বায় অহন্তব্যাশ্বায় পেটুনাম্নে রাজর্ষয়ে।" (সায়ণ)

অঘাসুর—(পুং) [কর্ম্মধা°] অঘ নামে অসুরবিশেষ। এই দানব পূতনা ও বকাসুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য কংস অঘাসুরকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। পূর্ব্বে কৃষ্ণ পূতনা এবং বকাসুরকে বিনাশ করেন, অঘাসুরের মনে এজন্য যথেষ্ট আক্রোশও ছিল। বৃন্দাবনের গোষ্ঠে গোপবালকেরা গরু চরাইতেছে, অঘাসুর সেইখানে আসিয়া বৃহৎ অজগরের আকারে মুখ মেলিয়া থাকিল। তাহার হাঁ-করা মুখখানা একটা মহাগিরিগুহার ন্যায় হইয়া দাঁড়াইল। গোবৎস ও গোপালগণসহ কৃষ্ণ নির্ভয়ে তাহার মুখের ভিতর প্রবেশ করিলেন। দানবের শ্বাসরোধ হওয়ায় ব্রহ্মতালু ফাটিয়া গেল। (ভাগবত ১০.১২ অ°)

অঘাহ—(পুং) [অঘস্য অহঃ, অচ্-সমাস] অশৌচ দিন। ২ অসুর বিশেষ। এই সর্পাকৃতি অসুর সমুদ্রতটে বাস করিত এবং ফুৎকার দ্বারা রসনা বিস্তার করিয়া আপনার আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করিত। কৃষ্ণ ইহাকে বিনাশ করেন। (গর্গসংহিতা)

অঘোর—(ত্রি) অভীষণ, সৌম্য। "শিবাতনুরঘোরা" (যজুঃ ১৬.৩) [নাস্তি ঘোরো যস্মাৎ, বহুব্রী°] ২ অতি ভয়ানক। ৩ রুদ্রমূর্ত্তিবিশেষ। পুরাণমতে ঈশান, অঘোর, বামদেব ও সদ্যোজাত এই চারি শিবমূর্ত্তি যথাক্রমে পূজনীয়।

শিবরাত্রির প্রথম প্রহরে এই অঘোর শিবের পূজা করিতে হয়। পূজাকালে দুগ্ধ দ্বারা ইঁহাকে স্নান করাইবে। [শিবরাত্রি দ্র°]

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে, পঞ্চদশ নেত্রশোভী ষড়্-জ্যোতিঃপূর্ণ বৃষবাহন হস্তিচর্ম্মাচ্ছাদিত পঞ্চমুখ মহাদেবের পঞ্চমুখের নাম সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ ও ঈশান। অঘোরমুখ দক্ষিণে অবস্থিত, নীলবর্ণ ও ভয়জনক দন্তবিশিষ্ট। (কালিকাপু° ৫১.১১৩-১১০)

লিঙ্গপুরাণে অঘোরোৎপত্তি প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, এক-ত্রিংশত্তম কল্পগত হইলে ব্রহ্মা স্রষ্টুকাম হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে কৃষ্ণবর্ণ মহাতেজা এক কুমার প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার উষ্ণীষ, যজ্ঞোপবীত, মৌলি ও স্রক্ কৃষ্ণবর্ণ। তাঁহার গাত্রবর্ণ পিঙ্গলাভ কৃষ্ণ। ব্রহ্মা দেবদেবের এই অদ্ভুত মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া তাঁহার ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন। অঘোরও ব্রহ্মাকে নিরীক্ষণ করিয়া ব্রহ্মরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা ধ্যানে কুমারের কৃষ্ণ, কৃষ্ণশিখ, কৃষ্ণাস্য ও কৃষ্ণবস্ত্রধৃক্ এই চারিটী মূর্ত্তি অবলোকন করিলেন। (লিঙ্গপু° ১৪.২-১০)

লিঙ্গপুরাণের অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—

"ভাদ্রমাস্যসিতে পক্ষে হ্যঘোরাখ্যা চতুর্দ্দশী।
তস্যামারাধিতঃ শম্ভুর্নয়েচ্ছিবপুরং ধ্রুবম্॥"

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীই অঘোরা চতুর্দ্দশী। ঐ দিন শিবের আরাধনা করিলে লোকে শিবপুরে গমন করে। কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী হইতে পরবর্ত্তী শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত পূজার বিধান আছে। মতান্তরে ফাল্গুনী শিবচতুর্দ্দশীকে অঘোরচতুর্দ্দশী বলা হয়।

শিবের অঘোরমূর্ত্তি অষ্ট হস্তবিশিষ্ট। দক্ষিণাদিক্রমে শূল, ডমরু, পাশ, কপাল, দণ্ড, ধনু, বাণ ও খড়্গ আছে। কণ্ঠ নীল ও কৃষ্ণ বর্ণ। এই মূর্ত্তি কখনও উলঙ্গ, কখন বা হস্তী কিংবা সিংহচর্ম্মপরিধায়িন্। শির জটাযুক্ত ও সর্প বন্ধনে বিজড়িত।

কারণাগমে অঘোরাখ্য মূর্ত্তি (অঘোরমূর্ত্তি) ত্রিনয়ন, অষ্টহস্ত, ঘোরদর্শন, রক্তাম্বরধারী, রক্তবর্ণ পুষ্পমালাধর ও নৃ-কপালমালী অথবা খড়্গমালাবিভূষণ। তাঁহার দুই হস্তে ত্রিশূল, অন্য হস্তে বেতাল, খড়্গ, ডমরু, কপাল এবং ঘণ্টা আছে।

দশভুজ অঘোরমূর্ত্তির হস্তে যথাক্রমে পরশু, ডমরু, খড়্গ, খেটক, বাণ, ধনু, শূল, কপাল, বরদ ও অভয় আছে। এইরূপ মূর্ত্তি তিরুক্কড়ুক্কুনড়ম্ ও পট্টীশ্বরমে পাওয়া গিয়াছে।

বিজয়াগম, নিশ্বাসাগম, অনলাগম, বীরাগম ও ত্রিপুরাসার-সমুচ্চয়ে অঘোরমূর্ত্তির প্রকার বিবৃত আছে। [অঘোরমূর্ত্তি দ্র°]

অঘোরঘণ্ট—বামাচারী শাক্ত-সম্প্রদায়। ইহারা কাপালিক নামেও পরিচিত। ৭।৮ শত বর্ষ পূর্ব্বে ইহারা কালী, চামুণ্ডা, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি শক্তিমূর্ত্তির সম্মুখে নরবলি দিয়া শক্তিসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার প্রয়াস পাইত। দক্ষিণ-ভারতের কাঞ্জুলীয় ও করারী সম্প্রদায় এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

শঙ্করবিজয়গ্রন্থে কাপালিকগণ উদ্দিষ্ট-গণপতি বা হৈড়িম সম্প্রদায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহাদের অপকীর্ত্তির কথা নানা গ্রন্থে বর্ণিত আছে। 'মালতীমাধবে' অঘোরঘণ্টের উল্লেখ আছে।

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়—একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক। ইনি ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার ব্রাহ্মণগাঁ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম পণ্ডিত রামচরণ চট্টোপাধ্যায়। ইনি ঢাকা ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করেন। পরে গিলক্রাইষ্ট স্কলারশিপ্ লইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ বৎসর বিদ্যাশিক্ষা করিয়া Doctor of Science বা বিজ্ঞানাচার্য্য উপাধি লাভ করেন। তৎকালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ তিনি Boxter Physical Science Scholarship এবং Hope Prize একসঙ্গে পাইয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত কোন দেশী বা বিদেশী ছাত্র এই দুইটী পুরস্কার একসঙ্গে পান নাই। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ডাক্তার অঘোরনাথ রসায়নশাস্ত্রের বিশেষরূপ চর্চ্চা করিবার জন্য জর্ম্মনীতে গমন করেন এবং বন্ (Bohn) বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসর বিশেষ কৃতিত্বের সহিত অধ্যয়ন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় হায়দ্রাবাদে নিজামরাজ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি নিজাম কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। সে সময় তাঁহার মত কৃতবিদ্য লোক নিজাম কলেজে না থাকিলে কলেজের এতদূর উন্নতি সম্ভবপর হইত না। রসায়ন-সম্বন্ধে তাঁহার অনেক মৌলিক গবেষণা ইংলণ্ড ও জর্ম্মনীর রাসায়নিকদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। তাঁহার চরিত্র অতি মধুর ছিল। হায়দ্রাবাদে সকলেই তাঁহাকে বিশেষভাবে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত। এই প্রবাসী বাঙ্গালীর গবেষণায় রাসায়নিক জগৎ অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাইয়াছে। ১৯১৫ সালের ২৯শে জানুয়ারী ইনি পরলোক গমন করেন। ইঁহার পুত্রকন্যারা সকলেই বিদ্বান্ ও বিদুষী। তাঁহার স্বনামধন্যা কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু একজন সুকবি, বক্তা ও প্রকৃত স্বদেশহিতৈষিণী। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত হারীত চট্টোপাধ্যায়ও ইংরেজী সাহিত্যের একজন প্রসিদ্ধ কবি। শেষ জীবনে অঘোরনাথ Alchemy বা কিমিয়া-বিদ্যা সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছিলেন এবং কয়েকটী মেকি ধাতুকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করিতে পারিয়াছিলেন।

অঘোরনাথ রায়—ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক এক সাধু। ১৭৬৩ শকের ১৮ই অগ্রহায়ণ শান্তিপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য-পরিবারে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতা যোগধর্ম্মপরায়ণ সাত্ত্বিক হিন্দু ছিলেন। বাল্যকালে কিছুদিন পাঠশালায় ও টোলে পাঠাভ্যাস করিয়া ইনি তদীয় চতুর্থ ভ্রাতা ভুবনমোহন রায়ের সাহায্যে অষ্টাদশবর্ষ বয়সে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। ইঁহারই সহাধ্যায়ী যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম এ মহাশয় বলিয়াছেন—'বিদ্যালয়ে আমাদের বন্ধু যখন পড়িতেন, তখন হইতেই তিনি বিনম্র, সরল ও প্রেমিকহৃদয় ছিলেন। বয়স্যগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহা মিটাইয়া দিতেন, কাহারও পীড়া হইলে সেবাশুশ্রূষা করিতেন।' এই সময়েই ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মানুরূপ আচরণ করিতেন। কিছুকাল পরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার অভিলাষ পোষণ করিয়া তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন ও ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন।

তৎকালে ব্রাহ্মসঙ্গতসভাই যুবক ব্রাহ্মগণকে লইয়া বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি গড়িয়া তুলিতেছিল, সেই সভার ইনি একজন অন্যতম সভ্য ছিলেন। জোড়াসাঁকো ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে কেশবচন্দ্র যখন কয়েকটী যুবক কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন, তখন অঘোরনাথ সেই কয়টী যুবকদের মধ্যে একজন ছিলেন।

১৭৮৬ শকে অঘোরনাথ ঢাকা ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন। কিন্তু কিছুপরে এ কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া ইনি নানা স্থানে ভ্রমণপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। ইহাতেই ইনি ইঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইনি বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম, মধ্যভারত, অযোধ্যা, রাজপুতানা প্রভৃতি দেশের প্রায় প্রত্যেক নগর বা উপনগরে গমন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন। চিরঞ্জীব শর্ম্মা ইঁহার একখানি জীবনী লিখিয়াছেন।

অঘোরনৃসিংহরস—(পুং) [বৈদ্যক] সান্নিপাতিকজ্বরে প্রযোজ্য রসৌষধভেদ।

অঘোরপন্থী, অঘোরী—(পুং) শৈবসম্প্রদায়ের এক নিম্নশ্রেণীর যোগী। কাশীর রামগড়ে ইহাদের প্রধান আড্ডা।

কাশীরাজ বলবন্তসিংহের সমসাময়িক কিন্নারাম এই মতের প্রবর্ত্তক। বাল্যকালেই তিনি নির্জ্জনস্থানে জন্মমৃত্যুর সমস্যা সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিতেন। তিনি অল্প বয়সে গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া জগন্নাথক্ষেত্রে গমন করেন ও তথায় বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু কিছুকাল পরে কালুরাম নামে এক সন্ন্যাসী তাঁহাকে স্বীয় বিভূতিবলে শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সেই সময় হইতেই তিনি অঘোরী হন এবং গুরুর আদেশানুসারে অগ্নিকে সর্ব্বদা প্রজ্বলিত রাখেন। তিনি পরে দিল্লীতে মুসলমান বাদশাহ্‌কে নিজের অসামান্য প্রভাব দেখাইয়া মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার বহু শিষ্য হইয়াছিল। অতিবৃদ্ধকালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অঘোরপন্থীদের শিক্ষাপ্রণালী একটু নূতন ধরণের। কিন্না-

রামের সমাধিপ্রস্তরের উপর দীক্ষাকালে একপাত্র ভাঙ্গ ও একপাত্র মদ্য স্থাপন করা হয়। যাহারা জাতিধর্ম্ম বজায় রাখিয়া অঘোরী হইতে চাহে, তাহারা শুধু ভাঙ্গ্ গ্রহণ করে, এবং যাহারা জাতিকূল ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে অঘোরী হইতে ইচ্ছা করে, তাহারা মদ্যপাত্রই গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহার পর কিন্নারাম যে অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে নানাবিধ ফল উৎসর্গ করা হয় ও একটী করিয়া ছাগ বলি দেওয়া হয়। অঘোরপন্থিগণের বিশ্বাস, কার্য্য শেষ হইয়া গেলে ঐ ছাগ আবার জীবন ফিরিয়া পায়। ছাগবলি হইয়া গেলে সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তির মূত্রদ্বারা দীক্ষার্থীর মস্তকের চুল ভিজাইয়া মুণ্ডন করা হয়। 'বীজক' নামক কিন্নারামের গ্রন্থের বিষয়গুলি পরে শিষ্য অনুধ্যান করে। যাহারা লেখাপড়া জানে না তাহারা অন্যের দ্বারা ঐ গ্রন্থ পড়াইয়া শোনে। উপস্থিত সকল শিষ্যকে মদ্যমাংস দিয়া দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করা হয়। উহারা মদ খাইয়া ও গাঁজা টানিয়া জীবন অতিবাহিত করে। 'কিন্নারামজীকী জয়' বলিয়া ইহারা ভিক্ষা করিয়া থাকে। যাহারা ইহাদের ভিক্ষা দেয় না তাহাদিগকে ইহারা গালাগালি করে। শুনা যায় ১২ বৎসর এইভাবে জীবন যাপন করিবার পর ইহারা মদ খাওয়া ছাড়িয়া দেয় এবং নানাপ্রকার জঘন্য খাদ্যে উদর পূরণ করিয়া থাকে।

শৈবধর্ম্মে পরমহংসপন্থীদের মতে বিশ্বের সমস্তই ব্রহ্মময়। অঘোরপন্থীরা এই বিশ্বাস কার্য্যে প্রমাণ করিবার জন্য মলমূত্রাদি নির্ব্বিচারে গ্রহণ করে। কোথাও শবদাহ হইলে ইহারা মন্ত্রের সহিত সেই শবের অঙ্গ হইতে মাংস তুলিয়া ভোজন করে। এইরূপ একটী সংবাদ পাওয়া যায়—১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবের চোটেক নামক স্থানে একজন অঘোরপন্থী সদ্যঃপ্রোথিত একটী শিশুর মৃতদেহ তুলিয়া ভক্ষণ করিতেছিল—এই অবস্থায় ধৃত হয়। লাসেন্ ও রিজলী সাহেবের মতে অঘোরপন্থীরা কাপালিক সম্প্রদায়ের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-সূত্রে সংবদ্ধ। যে কাপালিক ভবভূতির মালতীমাধবনাটকে মালতীকে চামুণ্ডার নিকট বলি দিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহার নাম অঘোরঘণ্ট। আচার-ব্যবহারে এই অঘোরঘণ্ট অঘোরপন্থী, কাপালিকগণের আচারের সহিত এই অঘোরাচারীর অনেক বিষয়ে সামঞ্জস্য আছে। প্রত্যেক হিন্দুই ইহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। ইহাদের সংখ্যাও ক্রমে হ্রাস পাইতেছে।

অঘোরমূর্ত্তি—(স্ত্রী) শিবের উগ্রমূর্ত্তিবিশেষ। ইঁহার উপাসনা করিলে রাজারা শত্রুর বিনাশ সাধন করিতে পারেন বলিয়া কথিত আছে। লিঙ্গপুরাণে ইঁহার উপাসনা-পদ্ধতি যেরূপভাবে বর্ণিত আছে, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল—

যে পুরোহিত মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনি এই পূজার্থে যেখানে কোন শব বা সপ্তমাতৃকার মূর্ত্তি আছে, সেখানে গমনপূর্ব্বক চারিদিকে পাঁচটী ও মধ্যস্থলে একটী কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবেন। অমাবস্যার দিন পূজা আরম্ভ করিয়া শুক্লা অষ্টমী পর্য্যন্ত পূজা করিতে হয়। এই সময়ে মন্ত্রসিদ্ধ পুরোহিত চারিজন শিষ্যসহ পাঁচটী কুণ্ডে অঘোরমূর্ত্তিকে ধ্যান করিয়া হোম প্রদান করিবেন। তাহার পর যে রাজা শত্রুতা সাধন করিতেছেন, তাঁহার দারুময় মূর্ত্তির মস্তক নিম্নদিকে রাখিয়া কুণ্ডে স্থাপন করিয়া শ্মশান হইতে অগ্নি আনিয়া দগ্ধ করিবেন। ইহা ভিন্ন আরও কিছু অনুষ্ঠানের বিধি আছে।

অঘোরমূর্ত্তির ধ্যান সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারা যায়, তাহাতে আমরা দেখি যে, অঘোরের আটটী হস্ত,—এই আট হস্তে শূল, ডমরু, পাশ, কপাল, দণ্ড, ধনু, বাণ ও খড়্গ ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার কণ্ঠ নীল এবং গায়ের চর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণ। তিনি উলঙ্গ অথবা হস্তী বা সিংহচর্ম্ম পরিধান করিয়া থাকিবেন। তাঁহার অলঙ্কার সর্পাদির দ্বারা নির্ম্মিত ও মনুষ্যের শবের ভস্মদ্বারা তাঁহার অঙ্গ লিপ্ত হইবে। তাঁহার আকার ভীষণ ও উভয় পার্শ্বে শুঁড়যুক্ত। একটী সর্পদ্বারা তাঁহার কেশ আবদ্ধ এবং ভূতপ্রেতযোনি তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকিবে।

'শিবতত্ত্বরত্নাকরে' ইঁহার আর এক প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই বর্ণনামতে তাঁহার একটীমাত্র বদন ও বত্রিশখানি হাত। তাঁহার মস্তকে জটামুকুট এবং উহাতে চন্দ্রলেখা বর্ত্তমান থাকিবে। তিনি ত্রিনয়ন হইবেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্তসমূহে অভয়, খড়্গ, শূল, চক্র, ডমরু, অস্থি, বাণ, গদা, পদ্ম, কপাল, জ্ঞানমুদ্রা, কুণ্ড, অঙ্কুশ, অক্ষমালা, খট্টাঙ্গ এবং পরশু থাকিবে এবং বাম হস্তসমূহে বরদ, কবচ, টঙ্ক, পাশ, মুদ্গর, সর্প, অগ্নি, ছাগ, ঘণ্টা, ধনু, কটিবিলম্বিত হস্ত, রত্ন, জলপদ্ম, কলসী, মুষল ও পুস্তক থাকিবে। তিনি কালের কর্ত্তিত মস্তকের উপর দণ্ডায়মান থাকিবেন। এই মূর্ত্তির উপাসনা করিলে সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

দশভুজ অঘোরমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—ইনি ত্রিনয়ন ও ভীষণ মূর্ত্তি। ইঁহার বর্ণ নীল ও বস্ত্রাদি রক্তবর্ণ। সর্পালঙ্কারে ইনি বিভূষিত। দাক্ষিণাত্যের তিরুক্কাড়ুক্কুণড়মে অঘোর শিবের দুইটী মূর্ত্তি আছে। উভয় মূর্ত্তিই প্রায় এক প্রকারের। ইঁহাদের গলায় চরণ পর্য্যন্ত বিলম্বিত মুণ্ডমালা দেখা যায়। প্রভামণ্ডল দ্বারা মূর্ত্তিদ্বয় বেষ্টিত।
[অঘোর দ্র°]

অঘোররূপরূপ—(পুং) শিবের নামান্তর।

"অঘোররূপরূপায় ঘোরঘোরতরায় চ।
নমঃ শিবায় শান্তায় নমঃ শান্ততরায় চ॥"
(ব্রহ্মাণ্ডপু° ৩১.২০৭)

অঘোরশিব—(পুং) দাক্ষিণাত্যের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি দক্ষিণভারতের শৈব ও গাণপত্য ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠার জন্য কএকখানি আগম ও দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। [অঘোর শিবাচার্য্য দ্র°]

অঘোর শিবাচার্য্য—দাক্ষিণাত্যনিবাসী আগমান্ত বা শুদ্ধ-শৈবসম্প্রদায়ের একজন গ্রন্থকার। ইনি ১০৮০ শকাব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহার রচিত একখানি গ্রন্থের নাম ক্রিয়াক্রমদ্যোতিনী। শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠাবিধি, বিঘ্নেশ্বরপ্রতিষ্ঠা-বিধি প্রভৃতিও ইঁহার রচিত।

অঘোরা—(স্ত্রী) ভাদ্রমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী। শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, এই চতুর্দ্দশীতে শিবের আরাধনা করিলে শিবলোক লাভ হয়।

"ভাদ্রমাস্যসিতে পক্ষে অঘোরাখ্যা চতুর্দ্দশী।
তস্যামারাধিতঃ স্থাণুর্নয়েচ্ছিবপুরং ধ্রুবং।" (ভবিষ্যপু°)

অঘোরাস্ত্রমূর্ত্তি—শিবের উগ্রমূর্ত্তিবিশেষ। কারণাগামে বর্ণিত আছে যে, ইঁহার উপাসনা করিলে জয়লাভ, ধনলাভ ও ব্রহ্ম-হত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ইঁহার মূর্ত্তি ভীষণ, মুখমণ্ডলের উভয়দিকে শুণ্ড, ইনি কৃষ্ণবর্ণ, ত্রিনয়ন, অষ্ট হস্তবিশিষ্ট ও রক্তবস্ত্রধারী। রক্তবর্ণ পুষ্পমাল্য, মুণ্ডমালা, খড়্গমালা এবং উৎপলশোভিত অলঙ্কার দ্বারা ইনি বিভূষিত। ইঁহার কেশ অত্যুজ্জ্বল এবং কপালে ভস্মদ্বারা চন্দ্রলেখা অঙ্কিত। দুই হাতে সংহারোদ্যত ত্রিশূল ও অন্য হস্তগুলিতে বেতাল, খড়্গ, ডমরু, কলাপ ও ঘণ্টা। [অঘোরমূর্ত্তি দ্র°]

অঘোরী—[অঘোরপন্থী দ্র°]

অঘোরেশ্বর—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সিমোগা জেলার ইখেরী গ্রামে (অক্ষা° ১৪°৭'২০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৩'৪৫" পূঃ) অবস্থিত একটী শিবমন্দির। প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দিরটী বর্ত্তমানে ধ্বংসমুখে পতিত। মন্দির মধ্যে পূজানিরত তিনজন রাজার মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে।

অঘোষ—(পুং) [নাস্তি ঘোষোঽত্র] বর্ণোচ্চারণার্থ প্রযত্ন। ইহা দুই প্রকার, আভ্যন্তর ও বাহ্য। আভ্যন্তর প্রযত্ন আবার পাঁচ প্রকার যথা—স্পৃষ্ট, ঈষৎস্পৃষ্ট, বিবৃত, ঈষদ্‌বিবৃত এবং সংবৃত।

বাহ্যপ্রযত্ন একাদশ প্রকার। যথা—বিবার, সংবার, শ্বাস, নাদ, ঘোষ, অঘোষ, অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত।

"খয়াং যমাঃ খয়ঃ + ⌣ক ⌣পৌ বিসর্গঃ শর এব চ।
এতে শ্বাসানুপ্রদানা অঘোষাশ্চ বিবৃণ্বতে। * * *

তত্র বর্গাণাং প্রথমদ্বিতীয়াঃ খয়স্তথা তেষামেব যমাঃ জিহ্বা-মূলীয়োপধ্মানীয়ৌ বিসর্গঃ শষসাশ্চেত্যেতেষাং বিবারঃ শ্বাসোঽ-ঘোষশ্চ। (সিদ্ধান্তকৌমুদী, ৮.২.১ সূত্রে ভট্টোজি°।)

বর্গের প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ণগুলি খয়্ (কখ, চছ, টঠ, তথ, পফ)। জিহ্বামূলীয়, উপধ্মানীয়, বিসর্গ এবং শষস এইগুলি যম। এই সমস্ত বর্ণ বিবার, শ্বাস এবং অঘোষ। জিহ্বামূলীয় ও উপাধ্মানীয় এগুলি অর্দ্ধবিসর্গ। এই সকলের প্রকৃত উচ্চারণ কাহারও মুখে না শুনিলে ঠিক বোধগম্য হয় না। (ত্রি) ২ শব্দশূন্য। ৩ আভীর শূন্য দেশাদি। [অল্পার্থে নঞ্] ৪ অল্পধ্বনি যুক্ত। ৫ কলাপোক্ত সংজ্ঞাবিশেষ।

অঘোষবৎ—(ত্রি) পাণিন্যুক্ত প্রযত্নযুক্ত বর্ণসমূহ।

অঘ্‌লবি—পূর্ব্ব-আফ্রিকার উপকূল প্রদেশের একটী রাজ-বংশ। খৃষ্টীয় ৮ম শতকের শেষকালে খলিফার অধীনস্থ আফ্রিকাখণ্ডে অরাজকতার লক্ষণ দেখিয়া খলিফা হারুণ-অল্ রসিদ স্বীয় সেনাপতি ইব্রাহিম বিন্-অল্-অঘ্‌লবের হস্তে শাসনভার সমর্পণ করিয়া পূর্ব্ব আফ্রিকায় প্রেরণ করেন। অঘ্‌লব-প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহা অঘ্‌লবি বংশ নামে খ্যাত হয়। তাঁহারা কএক পুরুষ খলিফার অধীনস্থ সামন্তরূপে মুসলমান-বিজিত পূর্ব্ব আফ্রিকা শাসন করিয়াছিলেন।

অঘ্নৎ—(ত্রি) অহিংসক। (ঋক্ ৮.২৫.১২)

অঘ্ন্য—(পুং) [ন হন্+যক্, নিপাতনে] প্রজাপতি।

অঘ্ন্যা—(স্ত্রী) স্ত্রীগবী। (অথর্ব্ব ৮.৭.২৫)

অঘ্রেয়—(ত্রি) [ন ঘ্রাতুং অর্হঃ] ঘ্রাণের অযোগ্য, দুর্গন্ধ দ্রব্যমাত্র। (ক্লী) ২ মদিরা।

অঙ্ক—(পুং, ক্লী) [অঙ্কয়তীতি অঙ্ক-করণে কর্ত্তরি বা অচ্ (গ্রী°—agkas, ogkos ; লা°—uncus)] চিহ্ন। "রতিবলয়পদাঙ্কে চাপমাসজ্য কণ্ঠে।" (কুমারস°) ২ ক্রোড়, কোল। "তমঙ্কমা-রোপ্য শরীরযোগজৈঃ।" (রঘু°) ৩ পরম্পরাসম্বন্ধচিহ্ন। (বাচ-স্পত্য) ৪ অপরাধ। ৫ একত্বাদি সংখ্যাবোধক রেখাসন্নিবেশ।

"অঙ্কযুতিঃ কিল সঙ্কলিতাখ্যা।" (লীলাবতী)

৬ যুদ্ধভূষণ। ৭ চিত্রযুদ্ধ। (বিশ্ব°) ৮ পর্ব্বত। ৯ সমীপ। ১০ দেহ। ১১ স্থান। ১২ [জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত] নব সংখ্যা। ১৩ কটিপ্রদেশ। ১৪ কুচভূষার প্রকার। (শব্দকল্পদ্রুম) ১৫ কলঙ্ক। "নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।" (কুমার° ১ স°) ১৬ যণ্ডাদি পশুগাত্রে কৃত চিহ্ন। ১৭ দূষণচিহ্ন, লাঞ্ছন। (মনু ৮.২৮১) ১৮ [অঙ্কশাস্ত্রোক্ত] মান (cœfficient)। ১৯ অঙ্কুশাকৃতিবিশিষ্ট যন্ত্র, হুক্। ২০ বক্রভাব। ২১ বক্ররেখা। ২২ হস্তের বক্রাংশ। ২৩ দৃশ্য-কাব্যের অঙ্গবিশেষ বা নাটকের অংশ।

নাটকীয় অঙ্কগুলি কি ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে অলঙ্কারশাস্ত্রকারেরা একটা নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন। প্রাচীনকালের সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যগুলির অঙ্ক রচনা সেই নিয়মেই চলিত। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি প্রাচীন কবিকুলশিরোমণির দৃশ্যকাব্য-রচনায় আমরা আলঙ্কারিক নিয়মের নিখুঁত চিত্রই প্রায় দেখিতে পাই। আলঙ্কারিকেরা অঙ্ক-বিন্যাসের যেরূপ সূত্র রচিয়াছেন, কালিদাস প্রভৃতির পরবর্ত্তী সংস্কৃত-দৃশ্যকাব্য-রচয়িতারাও সেই সূত্র ধরিয়াই অঙ্ক বিন্যাস করিয়াছেন।

শুধু সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যগুলিতেই যে আলঙ্কারিক নিয়ম যথাযথ পালিত হইত, অন্যত্র হইত না, একথা বলা যায় না। কারণ ভাষান্তরে লিখিত প্রাচীন নাটকাদিতেও অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের অনুসরণ দেখা যায়।

প্রাচীন সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের অঙ্ক-রচনায় কিরূপ বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হইত, তাহাই আলোচিত হইতেছে।

নাট্যশাস্ত্রকার ভরত ঋষি অঙ্ক শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, 'অঙ্ক' একটা রূঢ়ি শব্দ। রসে এবং ভাবে মূল অভিনেয় বিষয়গুলিকে উপচিত করিয়া দেয়, এবং নানা ঘটনায় যুক্ত থাকে বলিয়া অঙ্ক বলা হয়।

সাহিত্যদর্পণকার অঙ্কলক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—অঙ্কে নায়কের চরিত্র-চিত্রণ এমন ভাবে করিতে হইবে যেন দর্শকমণ্ডলীর চোখের সামনে তাহা প্রত্যক্ষের ন্যায় ভাসিয়া উঠে। সমস্ত অঙ্কটা রসে ভাবে ভরপূর থাকিবে। অভিনেতৃগণের বাক্যার্থ সুস্পষ্ট হওয়া চাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চূর্ণক বা গদ্য থাকা ইহাতে আবশ্যক। অনন্তর বিষয়ের এক এক অংশ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেও প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়ের সহিত কিঞ্চিৎ যোগ থাকা চাই। নানা ঘটনা যোজনায় বা বহু বাগাড়ম্বরে জটিল হইবে না। যে যে ঘটনা বিন্যাস করা হইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য থাকা চাই। অঙ্কে পদ্য রচনা এমন থাকিবে, যাহা অতি প্রচুর বলিয়া বোধ হইবে না। সন্ধ্যা বন্দনা বা ভগবদুপাসনা প্রভৃতি অবশ্যকর্ত্তব্যগুলি অবিকল বজায় রাখিয়া অঙ্ক রচনা করিতে হইবে। যে কথাটা নিষ্পন্ন হইতে বহুদিন লাগিয়া যায়, এমন কথার সন্নিবেশ অঙ্কে ঘটাইবে না। নায়ককে নিকটবর্ত্তী রাখিতে হইবে, তিন বা চারিজন পাত্রের সমাগম বর্ণনীয় হইবে। দূরাহ্বান, বধ, যুদ্ধ, রাজ্য ও দেশাদির বিপ্লব, আহার, অভিশাপদান, মরণ, রতিক্রিয়া, দন্তচ্ছেদ, নখচ্ছেদ বা অন্য যে কিছু লজ্জাকর ব্যাপার—শয়ন, চুম্বনাদি এ সমস্তই অঙ্কে বর্জ্জনীয়। ইহা ভিন্ন নগরাদির অবরোধ, স্নান, অনুলেপন প্রভৃতি অঙ্কে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখাইবে না। অঙ্ক অতি বিস্তৃত করিয়া ফেলিতে নাই। রাজপত্নী, পরিজন, অমাত্যবর্গ ও বণিক্‌দিগের বৈচিত্র্যপূর্ণ রসভাবময় চরিত্রগুলি প্রত্যক্ষের ন্যায় চিত্রিত থাকিবে। অঙ্ক শেষ হইয়া গেলে, সকল পাত্রই নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইবে।

"প্রত্যক্ষনেতৃচরিতো রসভাবসমুজ্জ্বলঃ।
ভবেদগূঢ়শব্দার্থঃ ক্ষুদ্রচূর্ণকসংযুতঃ॥
বিচ্ছিন্নাবান্তরৈকার্থঃ কিঞ্চিৎসংলগ্নবিন্দুকঃ।
যুক্তো ন বহুভিঃ কার্য্যৈর্বীজসংহৃতিমান্ ন চ॥" ইত্যাদি
(সাহিত্যদ° ৬.৭)

আমাদের দেশের ন্যায় অন্যান্য দেশের নাটকগুলিও বিভিন্ন অঙ্কে বিভক্ত করিয়া লিখিত হয়। ইংরেজীভাষায় ইহাকে Act বলে। [অভিনয় শব্দ দ্র°]

অঙ্ক২—(পুং) অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত দশবিধ রূপকের অন্যতম। সাহিত্য-দর্পণকার বলেন, ইহাকে কেহ কেহ নাটকাদির অন্তর্গত অঙ্ক পরিচ্ছেদের নিমিত্ত উৎসৃষ্টিকাঙ্ক নামেও অভিহিত করিয়াছেন। ইহাতে একটী মাত্র অঙ্ক থাকিবে। প্রাকৃত বা নাতিবিজ্ঞ ব্যক্তিরাই ইহার নায়ক হইবে। একমাত্র করুণ-রসই ইহাতে স্থায়ী রাখিতে হইবে। বহু নারীর পরিদেবনযুত কোন প্রখ্যাত ইতিবৃত্ত লইয়া ইহা রচিত হইবে। কবি নিজের বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতানুসারে ইহার বিস্তৃতি ঘটাইবেন। ভাণে যেমন যেমন আছে, ইহাতেও সেইরূপ সন্ধি, বৃত্তি, অঙ্গ, জয় পরাজয় বর্ণিত হইবে। বাগ্‌যুদ্ধই বর্ণনীয়, প্রকৃত যুদ্ধ ইহাতে দেখাইবেন না। নির্ব্বেদ বাক্য যথেষ্টই ইহাতে থাকিবে।

"উৎসৃষ্টিকাঙ্ক একাঙ্কো নেতারঃ প্রাকৃতা নরাঃ
রসোঽত্র করুণঃ স্থায়ী বহুস্ত্রীপরিদেবিতং।" ইত্যাদি
(সাহিত্যদ° ৬.২৪৯)

অঙ্ক৩—(পুং, ক্লী) এক হইতে নব সংখ্যা। যথা ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সকল সভ্য জাতিই মূল রূঢ় সংখ্যাগুলি এক হইতে নয় পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। শূন্য একটী স্বতন্ত্র অঙ্ক, কিন্তু সংখ্যা নহে। এক একটী শূন্যের আশ্রয়ে সকলেই এক দুই প্রভৃতি অঙ্কের দশগুণ করিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। এই প্রথা সর্ব্বত্র কেন প্রচলিত হইল, তাহার ঠিক কারণ বুঝিতে পারা যায় না। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, মানুষ অসভ্যাবস্থায় গণিতে জানিত না, তজ্জন্য তাহারা হাতের অঙ্গুলিতে দ্রব্যাদির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিত। দুই হাতে দশটী অঙ্গুলি, তাহার একটী দিয়া গণনা করিলে অবশিষ্ট নয়টী থাকে। এই নয়টী অঙ্গুলি পূর্ব্বকালের লোকের সংখ্যা রাখিবার উপায় ছিল, তাই রূঢ় অঙ্কের সংখ্যা কেবল

নয়টী হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, এই কারণে নয় রূপ অঙ্কের নাম 'ডিজিট' অর্থাৎ অঙ্গুলি।

আমেরিকার অসভ্য জাতিরা পাঁচের অধিক গণিতে পারে না। অধিক সংখ্যা বুঝাইতে হইলে তাহারা গাছের পাতা দেখাইয়া দেয়। অশিক্ষিত কাফ্রিদেরও বুদ্ধিশুদ্ধি এই প্রকার। তাহারাও অধিক সংখ্যা বুঝাইবার জন্য মরুভূমির একমুষ্টি বালি তুলিয়া দেখায়। আমাদের দেশের অজ্ঞলোকেরা দড়িতে গ্রন্থি দিয়া, প্রাচীরে চূণের ফোঁটা লাগাইয়া এবং বাঁশের কঞ্চিতে আঁক কাটিয়া সংখ্যা ঠিক করিয়া রাখে। সাঁওতালেরা দুগ্ধঘৃতাদি বিক্রয় করিতে আসিবার সময় সঙ্গে একগাছি দড়ি ও একটী চোঙ্গা আনে। এক এক চোঙ্গা ঘৃতাদি মাপিয়া দিয়া তাহারা দড়িতে এক একটী গাঁইট বাঁধে। ঐ দড়িই তাহাদের হিসাবের খাতাপত্র। বাঙ্গালার ইতর লোকেরা গৃহস্থের বাটীতে দ্রব্যসামগ্রী যোগান দেয়। তাহারা লিখিতে পড়িতে জানে না, সন তারিখ বুঝে না। প্রতিদিন পাঁচিলের গায় একটী করিয়া চূণের টোপা দেয়, সে সকল অজ্ঞ লোকের তাহাই জমাখরচের হিসাব। এদেশের সামান্য লোকেরা দোকান হইতে কোন দ্রব্য ধারে কিনিতে গেলে একগাছি আঁকবাড়ী লইয়া যায়। একটী কঞ্চির মধ্যস্থলে চিরিয়া তাহার আধখানি দোকানী আপনার নিকট রাখে, অন্য আধখানি খাতকের নিকট থাকে। ধারে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার সময় দু-খানি কঞ্চি কাটিয়া দেয়।

এখন দেখা যাউক, প্রথম গণিত-শাস্ত্রের উৎপত্তি কোন দেশে হইয়াছিল এবং রূঢ় অঙ্কগুলির সংখ্যা নয় পর্য্যন্ত হইল কেন? 'আবু জাফর মুহম্মদ বিন্ মূষা আল্‌খারিমি' গণিত পুস্তক, ভারতবর্ষের গণিত শাস্ত্রের অনুবাদ। আরবেরা স্পষ্টই স্বীকার করেন যে, ব্রাহ্মণেরা উহার মূল পুস্তকের লেখক। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে ঐ অনুবাদ বোগদাদ নগরে প্রথম প্রকাশিত হয়। কিছুদিন পরে উহা লাটিন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। (Max Muller's 'Chips from a German Workshop') বিখ্যাত জর্ম্মন্ পণ্ডিত হম্‌বোল্‌ট্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে উদ্ভাবিত অঙ্কপ্রণালী আরবীয়-গণকর্ত্তৃক প্রতীচ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। য়ুইপিক্ অনুমান করেন যে, দুইটী প্রশস্ত উপায় দ্বারা গণিতশাস্ত্র ভারতবর্ষ হইতে আরব প্রভৃতি দেশে আসিয়া থাকিবে। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে বাণিজ্যের জন্য মিশরের বণিকেরা ভারতবর্ষ হইতে অঙ্কবিদ্যা আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগরীতে আনিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন, প্লাটিনাস্, নিউমারিনো প্রভৃতি পণ্ডিতগণ উজ্জয়িনীর বণিক্‌দের কাছে অঙ্কশাস্ত্র শিখিয়াছিলেন। পরিশেষে মিশরবাসীদের নিকট য়িহুদী ও রোমকেরা গণিতবিদ্যা শিক্ষা করেন। রেনোর (Reinaud) মতে ভারতবর্ষ হইতে ঐ বিদ্যা ৭২০ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে প্রচলিত হয়। এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষেই প্রথমে অঙ্কশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল।

পূর্ব্বকালের ব্রাহ্মণেরা অঙ্কবিদ্যার গুরু। আরবী, মিশরী, য়িহুদী এবং রোমকেরা সেই গুরুর শিষ্য। আমাদের বিশ্বাস, এদেশে প্রথম প্রথম ১, ২, ৩ ইত্যাদি সাঙ্কেতিক চিহ্নদ্বারা অঙ্কপাত করা হইত না। তখন বর্ণমালার ক, খ প্রভৃতি কোন বিশেষ বিশেষ বর্ণদ্বারা সংখ্যা লিখিত হইত। এই অনুমান সত্য কি না তাহা নিশ্চয় করিতে পারিলে, রূঢ় অঙ্ক নয়টী হইল কেন, তাহাও নিশ্চয় করা যাইবে।

য়িহুদী এবং রোমকেরা ব্রাহ্মণদের শিষ্য, তাঁহারা আর্য্য-জাতির কাছে গণিতশাস্ত্র শিখিয়াছিলেন। শিষ্যের কাজ দেখিলে, গুরু তাঁহাকে কি প্রকার পাঠ দিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন য়িহুদীরা বর্ণমালার প্রথম নয়টী বর্ণ (অর্থাৎ আলেফ্, বেত্, গিমেল্, দালেথ, হে, ভাউ, জৈন্, চেত এবং টেত্) দ্বারা এক হইতে নয় সংখ্যা পর্য্যন্ত লিখিতেন। তাঁহার পরবর্ত্তী আর নয়টী বর্ণদ্বারা তাঁহারা দশ হইতে নব্বই পর্য্যন্ত লিখিতেন। বর্ণমালার শেষ চারিটী বর্ণদ্বারা যথাক্রমে একশত হইতে চারিশত পর্য্যন্ত লিখিত হইত। গ্রীক্‌রাও য়িহুদীদের মত আল্‌ফা, বেটা প্রভৃতি বর্ণ-মালার বর্ণদ্বারা ১, ২ ইত্যাদি অঙ্ক লিখিতেন। গ্রীক্‌ভাষার দশ, ব (D) অর্থাৎ ডেকা বা দেশের আদ্যক্ষর দিয়া লিখিত হইত। রোমকেরা এক লিখিতে হইলে (I) এক দাঁড়ির মত একটী আঁক কাটিতেন। দুই লিখিতে হইলে (II) দুই দাঁড়ি ইত্যাদি। দশ লিখিতে হইলে তাঁহারা (X) ঢেরার মত একটী চিহ্ন করিতেন। ঐরূপ দুইটী ঢেরা দ্বারা কুড়ি এবং তিনটী ঢেরা দ্বারা ত্রিশ ইত্যাদি অঙ্ক লিখিত হইত। (C) এইরূপ চিহ্ন দ্বারা (১০০) লিখিত হইত। (M) চিহ্ন সহস্রসংখ্যার বোধক।

উপরে লিখিত প্রমাণ দ্বারা বুঝিতে পারা গেল, প্রাচীন য়িহুদী, গ্রীক্ এবং রোমকেরা ১, ২, ৩ ইত্যাদি সাঙ্কেতিক চিহ্নদ্বারা অঙ্কপাত করিতেন না এবং তাঁহাদের সংখ্যা লিখিবার অক্ষর কেবল নয়টীমাত্র নহে। তাঁহারা বড় বড় রাশি লিখিবার সময় বর্ণমালার অনেকগুলি বর্ণের প্রয়োগ করিতেন।

ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা ঐ সকল জাতির অঙ্কবিদ্যার গুরু, তবে সে কালের ব্রাহ্মণেরা কি করিতেন? ব্রাহ্মণেরাও বর্ণমালার অঙ্কবিশেষ দ্বারা ১, ২ ইত্যাদি অঙ্কগুলি লিখিতেন। কারণ, পঞ্জাবের উত্তরে টাকরী ভাষায় অদ্যাপি এক, দুই,

তিন ইত্যাদি সংখ্যাবোধক শব্দের আদ্যক্ষর দ্বারা (এ, দ্বি, ত্রি ইত্যাদি) ১, ২, ৩ প্রভৃতি অঙ্কগুলি লিখিত হয়। (Cunningham)। ঐ স্থানের লোকেরা আজও প্রাচীন পদ্ধতি ত্যাগ করে নাই; এক্ষণে তাহারা যে প্রথানুসারে অঙ্কপাত করিতেছে, তাহা আর্য্যজাতির পুরাতন প্রথা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। [বর্ণমালা দ্র°]

সংস্কৃতভাষায় সংখ্যাগুলির নাম বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আর্য্যেরা গণিতবিদ্যা ভালরূপ শিখিলে দশমিক অঙ্কপাত পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছিল। রূঢ়সংখ্যা নয় পর্য্যন্ত লইয়া তাহার পর কেবল এক একটী শূন্যের আশ্রয়ে উত্তরোত্তর দশগুণ করিয়া সংখ্যাবৃদ্ধি করা, বিজ্ঞজনোচিত বুদ্ধির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কারণ অঙ্কপাতের মধ্যে সঙ্কলন, ব্যবকলন ও গুণের নিয়ম রহিয়াছে। পঞ্চদশ বলিলে দশ এবং পঞ্চ (১০+৫) বুঝাইতেছে। সুতরাং ইহাতে সঙ্কলন দ্বারা এই রাশি লিখিত হইল। একোনবিংশতি বলিলে, (২০—১) বিংশতির এক কম বুঝাইতেছে। সুতরং ইহাতে ব্যবকলন রহিয়াছে। ত্রিংশৎ বলিলে (১০×৩) তিন গুণ দশ বুঝাইতেছে, অতএব এখানে গুণের নিয়ম রহিয়াছে। ঋগ্বেদ জগতের সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ। সেই ঋগ্বেদে লিখিত আছে,—

"ত্বমেতাঞ্জনরাজ্ঞো দ্বির্দশাবন্ধুনা সুশ্রবসোপজগ্মুষঃ।
ষষ্টিং সহস্রা নবতিং নব শ্রুতো নি চক্রেণ রথ্যা
দুষ্পদাবৃণক্।" (ঋক্ ১.৫৩.৯)

হে ইন্দ্র? আপনি লোকবিশ্রুত সহায়রহিত হইয়া সুশ্রবা রাজকর্ত্তৃক আক্রান্ত বিংশতিসংখ্যক (দ্বির্দশ) জনপদাধিপতি এবং তাঁহাদের ষাট হাজার নিরানব্বইসংখ্যক (৬০০০০+৯০ +৯) অনুচরগণকে শত্রুনাশক অস্ত্রদ্বারা বিনষ্ট করিয়াছিলেন।

এখানে দ্বির্দশ (২×১০) এই গুণক্রিয়া রহিয়াছে, এবং ষষ্টিসহস্র+নবতি+নব ইহাতে সঙ্কলনের নিয়ম গৃহীত হইয়াছে। কাজেই স্বীকার করিতে হইল যে, দশমিক পদ্ধতির সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে আর্য্যেরা তেরিজ, জমাখরচ এবং পূরণ বুঝিতেন।

য়িহুদী, রোমক, গ্রীক্ এবং আর্য্যেরা বর্ণমালার বর্ণদ্বারা এক, দুই প্রভৃতি অঙ্ক লিখিতেন, তাহা প্রতিপন্ন করা হইল। কিন্তু এ নিয়মে অসুবিধা অনেক। একটী বড় রাশি লিখিতে হইলে এক সঙ্গে অনেকগুলি বর্ণযোজনা করিতে হয়। বোধ করি, তাই আর্য্যেরা ভাবিলেন যে, যেমন কতকগুলি বর্ণের পরস্পর যোজনা দ্বারা সকল প্রকার শব্দ লিখিতে পারা যায়, তদ্রূপ এমন কোন উপায় উদ্ভাবিত করা আবশ্যক, যদ্দারা সকল রাশিও লেখা যাইতে পারে। এই চিন্তা করিয়া তাঁহারা অ, ই প্রভৃতি নয়টী হ্রস্বস্বর দেখিয়া ১, ২ প্রভৃতি নয়টী রূঢ় অঙ্কের কল্পনা করেন; এবং অনুস্বার দৃষ্টে তাঁহারা (০) শূন্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। বর্ত্তমান ১, ২ ইত্যাদি অঙ্কের সাঙ্কেতিক চিহ্ন অ ই প্রভৃতি স্বরের কিংবা এক দুই ইত্যাদি শব্দের আদ্যক্ষরের অপভ্রংশ, সন্দেহ নাই।

সমগ্র ইউরোপে ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রোমান পদ্ধতি অনুসারে গণিতবিদ্যার প্রচলন ছিল। এখনও এই পদ্ধতির নিদর্শন ঘড়ির ফলকের (dial) উপর, দৈনিক তারিখের সংখ্যায় ও পুস্তকের পরিচ্ছেদে দেখিতে পাওয়া যায়। ১২০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে গ্রীক্ বা রোমকেরা ১, ২, ৩ প্রভৃতি সংখ্যার কল্পনাও করিতে পারে নাই। আরবেরা ভারতবর্ষ হইতে ইহা শিক্ষা করিয়া পাশ্চাত্ত্য-জগতে প্রচার করে। নয়টী সংখ্যা ও (০) শূন্যের প্রচলন হইতে ক্রমশঃ দশমিক প্রথা উদ্ভাবিত হয়। এই দশমিক প্রথার কল্পনা যে মানবের দশটী অঙ্গুলি হইতে উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন বাবিলন ও মিশরের লেখমালা (inscriptions) হইতে জানিতে পারা যায়। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক হইতে দ্রুতগতিতে অঙ্কশাস্ত্র বা পাটীগণিতের উন্নতি হইতে লাগিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে বহুরাশিকের (Double Rule of Three) ও সপ্তদশ শতকে মার্চ্চিষ্টনের লর্ড নেপিয়ার কর্ত্তৃক (১৬০৪ খৃষ্টাব্দে) সংবর্গমানের (logarithm) সৃষ্টি হইয়া অঙ্কশাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি হয়। পরে ভগ্নাংশ যখন বাহির হইল, তখন পাটীগণিতের উন্নতি চরম সীমায় উঠিল।*

অবশ্য ইহার পূর্ব্বে গণিতশাস্ত্রের উন্নতি আরবদিগের দ্বারা হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৩২০ সালে রোডসের ইউডিমক, যিনি প্রসিদ্ধ দার্শনিক আরিষ্টটলের ছাত্র ও প্রসিদ্ধ উদ্ভিদবিদ্যাবিদ্ দার্শনিক পণ্ডিত থিওফ্রেসটোর (খৃঃ পূঃ ৩৭২-২৮৮) বন্ধু ছিলেন পাটীগণিতের একখানি ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। থিওফ্রেসটোও অপর একখানি পাটীগণিতের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ দুইখানির কোনখানিই এখন পাওয়া যায় না। যদি কোনদিন এই দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে পাটীগণিতের ইতিহাসে নূতন আলোকপাত হইতে পারে। চৈনিক অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ চং শাং (Chang Tsa'ng) ১৫২ সালে মারা যান। ইনি তাঁহার নবম অধ্যায়ে গণিতশাস্ত্র (Arithmetic in nine section) চীনা ভাষায় লিখিয়া ভগ্নাংশ ও ত্রৈরাশিক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া পাটীগণিতের জ্ঞান-ভাণ্ডার বর্দ্ধিত করেন।

* J. Bertrand's Traited Arithmetique.

হেলেনদেশের গণিতশাস্ত্রজ্ঞ নিকোমেকাস্ খৃষ্টীয় প্রথম শতকের শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি গ্রীক্‌ভাষায় যে পুস্তক লিখিয়াছেন তাহার অর্থ হইতেছে Introduction to Arithmetic। ইহাতেই তিনি প্রথম দেখাইয়াছেন ১+(৩+৫)+(৭+৯+১১)+(১৩+১৫+১৭+১৯) +.........=১^{৩}+২^{৩}+৩^{৩}+৪^{৩}.........দুইটী অযুগ্ম সংখ্যা, তৎপরে ঐ রূপ আর তিনটী অযুগ্ম সংখ্যা ও পরে ঐ রূপ ৪টী অযুগ্ম সংখ্যা যোগ করিলে প্রত্যেক সংখ্যায় অর্থাৎ ১, ২, ৩, ৪ এর প্রত্যেকের ঘনফল যোগ করিলে একই হইবে।

তাহা হইলেই বুঝা গেল, সংখ্যা ও অঙ্কবিদ্যা ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়া আরবদিগের দ্বারা পাশ্চাত্ত্যজগতে নীত এবং ক্রমশঃ এই বিদ্যার উন্নতি হইয়া এক্ষণে উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছে। [গণিত শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্র°]

অঙ্ক$_৩$—(ক্লী) ["সংঘাঙ্কলক্ষণেষ্বঞ্যঞিঞামণ্।" পা ৪.৩.১২৭] মুদ্রাঙ্কিত বর্ষসংখ্যা। ২ এক রাজার মৃত্যুর পর নূতন রাজার মুদ্রায় যে চিহ্ন-পার্থক্য দেখা যায়। ৩ রাজমুদ্রার লিখন, যেমন কুশনরাজগণের মুদ্রায় 'নানা' এই অঙ্ক লিখিত আছে। (কাশিকা, ৩০৪ পৃঃ)। ৪ রাজাঙ্ক [রাজাঙ্ক দ্র°] ৫ হস্তাঙ্ক, সহি।

"প্রাড়্‌বিবাকাদি-হস্তাঙ্কং মুদ্রিতং রাজমুদ্রয়া।"
(বীরমিত্রোদয়)

৬ কালনির্দ্দেশক সংখ্যা। রাজা ২য় নরসিংহদেবের কেন্দুয়া-পটনা তাম্রফলকে বর্ণিত আছে যে, তাঁহার পিতা ১ম ভানুদেব ১৮ অঙ্ক অর্থাৎ ১৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

অঙ্ক$_৪$—(পুং) দাক্ষিণাত্যের সুগন্ধবর্ত্তী অথবা সৌন্দত্তির একজন রাজা। ইনি ১০৪৮ খৃষ্টাব্দে তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। পশ্চিম চালুক্য নরপতি ১ম সোমেশ্বর ১১শ শতকের মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার অধীন যে সকল রাজার নাম পাওয়া যায়, মহারাজ অঙ্ক তাঁহাদের অন্যতম। ইনি রট্টবংশ-সম্ভূত। ইঁহার পিতার নাম ১ম কন্নকৈর। কন্নকৈরের মৃত্যু হইলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র এড়গ ১০৪০ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসন লাভ করেন এবং তৎপরে ১০৪৮ খৃষ্টাব্দে রাজা অঙ্ক সুগন্ধবর্ত্তীর রাজা হন। সৌন্দত্তির অঙ্কলেশ্বর মন্দিরগাত্রে যে উৎকীর্ণ শিলালিপি আছে, তাহাতে রাজা অঙ্ক মহাসামন্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন।

অঙ্ক$_৫$—(ক্লী) তৈত্তিরীয়-সংহিতা ও ব্রাহ্মণে রথের দুই ও নয় অঙ্কের উল্লেখ আছে। কোন কোন ভাষ্যকার অঙ্ক অর্থে রথের পার্শ্বদেশ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অঙ্ককরণ—(ক্লী) অঙ্কন, চিত্রীকরণ। ২ রেখাকরণ, আঁক কাটা।

অঙ্কতন্ত্র—(ক্লী) [অঙ্কপ্রতিপাদকং তন্ত্রম্] এক হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত সংখ্যাবোধক রেখাবিশেষ-প্রতিপাদক শাস্ত্র; ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপ অঙ্ক; বীজগণিত ও পাটীগণিত প্রভৃতি।

অঙ্কতি—(পুং) [অন্‌চ-গতৌ অতি। কুত্বং] বাত, বায়ু। ২ ব্রহ্মা। ৩ অগ্নি। ৪ অগ্নিহোত্রী। (ত্রি) ৫ গতিশীল।

অঙ্কতী—(স্ত্রী) [স্ত্রিয়াং অঙ্কতি+ঙীপ্] গমনশীলা।

অঙ্কধারণ—(ক্লী) [অঙ্ক-ধৃ-ণিচ্‌-ল্যুট্ ভাবে, ৬-তৎ] চিহ্ন-ধারণ। ২ তপ্তমুদ্রাদি বৈষ্ণবচিহ্নধারণ। [ণিচ্ ভাবে যুচ্ স্ত্রীয়াং]—অঙ্কধারণা। (আশ্বলায়ন শ্রৌত° ১.১)

অঙ্কন$_১$—(ক্লী) [অঙ্ক-ল্যুট্ ভাবে] চিহ্নকরণ। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে রঘুনন্দন লিখিয়াছেন, বৃষোৎসর্গে বৃষাঙ্গে ত্রিশূলাদি চিহ্ন করার নাম অঙ্কন। [করণে ল্যুট্] ২ যদ্দ্বারা চিহ্ন করা যায়।

অঙ্কন$_২$—আলেখন। রেখা, বিন্দু প্রভৃতি চিহ্ন দ্বারা প্রতিমূর্ত্তি রচন। অঙ্কন ব্যাপার মানবীয় সভ্যতার বিস্তারের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অতি প্রাচীনকাল হইতে মানুষ যে অঙ্কনের দ্বারা ভাব প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে, সে অঙ্কন নানা ভাবে নানা ধারায় মানবীয় সভ্যতা ও শীলতার বাহন হইয়া আসিয়াছে।

মানবের সুদূর প্রাগৈতিহাসিক অরিগ্‌নেসিয়ান (Aurignacian) যুগে আমরা অঙ্কনের প্রস্ফুট প্রকাশ দেখিতে পাই। Dordogne গুহাতে হাতীর দাঁত ও হাড়ের উপর চমৎকার অঙ্কন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। সেকালের বন্য বৃষভ ও হরিণের মূর্ত্তির উৎকর্ষ এ যুগেরও বিস্ময়ের বিষয়। ম্যাগ্‌ডালেনিয়ান (Magdalenian) যুগে প্রাগৈতিহাসিক চিত্রবিদ্যার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ লক্ষিত হয়। সে যুগের মানুষ প্রচুর অলঙ্কার ব্যবহার করিত। সেই কালের অঙ্কনচেষ্টায় পশুর মুখোস-পরা মানুষের চেহারা এবং মানুষের মুখযুক্ত হরিণের ছবি পাওয়া গিয়াছে। এই সব অঙ্কন-চেষ্টা গুহামধ্যস্থ অতি দুরধিগম্য প্রদেশে নিহিত আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, সে সব জায়গায় যাইতে শিল্পীকে সাঁতার কাটিয়া বা হামাগুড়ি দিয়া যাইতে হইয়াছে। ধর্ম্মবিধি ও যাদুবিদ্যার বিচিত্র সংস্কার এই সকল আদিম অঙ্কন-চেষ্টার ধারার প্রবর্ত্তক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

পিয়েট (Piette) Mas d'Azail গুহায় পাথরের উপর অঙ্কিত অনেক নক্সা আবিষ্কার করিয়াছেন। কোন কোন অক্ষরবিদের মতে ইহাই আদিম অক্ষরাঙ্কনের চেষ্টা; কিন্তু বস্তুতঃ সফলভাবে এ সমস্ত নক্সার কোন ব্যাখ্যা আজ পর্য্যন্ত কেহ দিতে পারেন নাই। কাহারও মতে, পিতৃপিতামহের স্মৃতিপূজা এবং উন্নততর ধর্ম্মবিধিকল্পনা হইতে এ সমস্ত জন্মলাভ করিয়াছে। এ সমস্ত চেষ্টার প্রাচীনতা কত, জানিতে হইলে ব্যারন দী গিয়ারের (Baron de Geer) শরণাপন্ন

হইতে হয়। ম্যাগ্‌ড্যালেনিয়ান যুগ খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪,০০০ বৎসর প্রাচীন—এ রকমের উক্তি তাঁহার নিকট হইতে পাওয়া যায়। ৫০,০০০ বৎসরের প্রাচীন অঙ্কনচেষ্টা হইতে এই যুগ পর্য্যন্ত চিত্রের ধারা অব্যাহতভাবে নিশ্চয়ই চলিয়া আসিয়াছে।

কাজেই মানুষের আন্তর ইতিহাসের গূঢ় বার্ত্তার সুনিপুণ বাহনরূপে অঙ্কনকলা মানুষের ভাবরাজ্যের ধারাকে নানাযুগে নানাভাবে ব্যক্ত করিয়াছে। সভ্যতর যুগে যখন মানুষ সৃষ্টিতত্ত্ব বিচার করিয়াছে, তখন সমগ্র ভুবনকেই বিধাতার লিপি বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ মানুষের যে প্রধান বিভাগ করিয়াছেন, তাহাতে ক্রো-ম্যাগ্‌নন (Cro-Magnon) মানুষকেই আধুনিক মানবের আদিপুরুষ বলা হইয়াছে। এই আদিপুরুষ ক্রমেই নূতন সৃষ্টির উৎসাহে তন্ময় হইয়া যায়। সে একদিকে নানা আয়ুধ কল্পনা ও নির্ম্মাণ করিয়া আত্মবিস্তৃতির পথ উদ্ঘাটিত করিয়াছিল, অন্যদিকে অধ্যাত্মস্পন্দনে আলোড়িত চিত্তকে সে ধর্ম্মের বিধিতে নূতন পথে লইয়া যায়। ধর্ম্মসংস্কারের সে পথই আজ জগন্ময় বিস্তৃত হইয়া সভ্যতার মায়াজগৎ সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে।

অঙ্কনসৃষ্টির মূলেই সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। মানুষের আদিম আন্তর প্রেরণা মানুষকে নূতন সৃষ্টির মায়ালোকের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। মানুষের ক্ষুদ্র শরীর-পরিধির ভিতর আছে এক অসীমের সংস্পর্শ, সে স্পর্শ তাহাকে অমরলোকের অধিকারী করিয়াছে। সে কিছুতেই কোন ক্ষুদ্র সীমাকে চিরস্থায়ী বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়; অন্তরে উপলব্ধ অসীমের এই বিস্তৃত আহ্বানকে সে নানাভাবে ও নানাদিকে সার্থক করিয়া তুলিতে চাহে। যাহা কিছু খণ্ড ও ক্ষুদ্র, তাহাকে সে অখণ্ড ও মহান্ করিয়া তোলে। হৃদয়াগ্নির আহুতিতে সে এমনিভাবে এক নূতন রসজগৎ সৃষ্টি করিয়া রসাস্বাদে চরিতার্থ হয়।

এই রসানুভূতিকে ভারতীয় আলঙ্কারিকগণ "ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এ রসজগতের স্রষ্টা মানুষ নিজে—মানুষের ভিতর যে অনাদ্যন্ত বিরাটত্ব আছে, তাহা মানুষকে স্রষ্টার মহিমায় অভিষিক্ত করিয়াছে। সৃষ্টির মুহূর্ত্তে মানুষ অসীমতার প্রেরণায় আন্দোলিত হয়, এজন্য রসসৃষ্টিকে বিশ্লেষণ করা চলে না, অনুভব করা যায় মাত্র। ইউরোপীয় দার্শনিকগণ বলেন, স্রষ্টা ও সৃষ্টের (subject ও object) মিলন হয় রূপসৃষ্টিক্ষেত্রে—অসীম ও সীমার বোঝাপড়া হয়—অঘটনঘটনপটীয়সী সৃষ্টিক্রিয়ায়।

বস্তুতঃ, শুধু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বর্ণ বা রেখার সমষ্টিতে রসস্থানীয় অঙ্কন হয় না। রসসৃষ্টি অনির্ব্বচনীয় শক্তি হইতে উৎসারিত হয়। আলঙ্কারিকগণের মধ্যে এ প্রসঙ্গে বিশ্বনাথের বিশ্লেষণই অতি মনোজ্ঞ—অনেক বিষয়ে ইহা আধুনিকতম প্রতীচ্য ভাবুকদের সহিত সাম্য রক্ষা করিয়া চলে। বিশ্বনাথের উক্তিটী এই,—

"সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ড-স্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ।
লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণঃ........." (সাহিত্যদ°)

সৌন্দর্য্যসৃষ্টির ভিতর লোকোত্তর সম্পর্কটীই কলাসৃষ্টিকে অখণ্ড ও স্বপ্রকাশ করিয়া তোলে। সমগ্র মানবজাতির প্রকাশানন্দের প্রতি পল্লবে দ্যোতিত হয়—এই বিরাট্ স্পর্শ, যাহা হইতে গঙ্গোত্তরীধারার মত মানুষের কারু-অঙ্কনের সমগ্র কাহিনীর ইতিহাস সহজেই পাওয়া যায়।

চৌষট্টি কলার ভিতর অঙ্কনকলার প্রাধান্য ভারতীয় শাস্ত্রকারেরা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে আছে, সমস্ত কলার শ্রেষ্ঠতম হইতেছে চিত্রকলা—তাহাতে ধর্ম্ম ও মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। রসসৃষ্টির বৈচিত্র্যের সমস্ত বাহনের অন্যতম হইতেছে অঙ্কন-কলা। এ অঙ্কনকলার দুইটী দিক্ আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে, ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন দুই উপায়ে—নামে ও রূপে। একটী হইল রূপকাত্মক (symbolical), অন্যটী হইল প্রকাশাত্মক (expressional)। একটী হইল ভাষা ও সাহিত্যগত সৃষ্টি (linguistic), অন্যটী হইল রূপগত।

এই দুইটী সৃষ্টির মূলেই অঙ্কনকলার সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। বস্তুতঃ মানবীয় শীলতা ও সভ্যতার ইহা একটী অনিবার্য্য পাথেয়। সঙ্কেতাত্মক ভাষা-সৃষ্টি শুধু ধ্বন্যাত্মক শব্দ মাত্রে পর্য্যবসিত হয় না—তাহাকে লীলায়িত রেখাঙ্কনে রচিত আক্ষরিক রূপে সুবিন্যস্ত করিয়াই মানবীয় সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছে; কখনও বা নানা মূর্ত্তি রচনা করিয়া ভাবপ্রকাশের বিচিত্র পথ নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।* রূপগত সৃষ্টির মূলেও যেমনি অঙ্কনব্যাপার অপরিহার্য্য, তেমনি মানবের সমগ্র জ্ঞান, বিজ্ঞান ও কল্পনার ক্ষেত্রেও তাহা অবিচ্ছেদ্য হইয়া পড়িয়াছে। এমন সভ্যতা নাই, মানবীয় কল্পনাজগতের এমন দূরদিগন্ত নাই, যাহা অঙ্কনকলার মায়াজালের সহায়তায় আত্মপ্রকাশ করে নাই।

বস্তুতঃ, এ মায়াজালের আকর্ষণ কখন এমনি গভীর ও ব্যাপক হইয়াছে যে, তাহাতে অধ্যাত্ম-জগতের অতীন্দ্রিয় কল্পনা এবং অরূপের নিঃশব্দ সাধনা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য কোন কোন ধর্ম্মবিধান মূর্ত্তি-অঙ্কন নিষিদ্ধ করিয়াছেন, কিং বা

* মিশরের Hieroglyphics.

বিশেষ প্রথায় আঁকাকে একান্তভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া অনুশাসন প্রচার করিয়াছেন। আবার অন্য ধর্ম্মবিধান স্বতঃই অসীমের দ্যোতককে প্রকাশ অসম্ভব বলিয়া উচ্চতম স্তরের সাধনায় মূর্ত্তি-রচনার নিষিদ্ধতা ঘোষণা করিয়াছেন। জগতের তিনটী বিরাট্ ধর্ম্মের ইতিহাস—ইস্‌লাম, খৃষ্টীয় ও বৌদ্ধ—অঙ্কন ও মূর্ত্তিকলাকে এ ভাবে সঙ্কুচিত করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই।

ইউরোপে Nicean Council of Prelates ৭৮৭ খৃষ্টাব্দে অনুশাসন প্রচার করেন যে, মূর্ত্তি কি রকম রচিত হইবে, ধর্ম্ম-যাজকেরাই সে সম্বন্ধে বিধান প্রবর্ত্তিত করিবেন; এ সম্বন্ধে শিল্পীদের কোন স্বাধীনতা থাকিবে না। সেকালে কন্‌ষ্টাণ্টি-নোপল হইতে অসংখ্য চিত্রকর ইতালী, পশ্চিম ইউরোপ এবং স্লাভীয় দেশে যাইত এবং তাহারাই পাদ্‌রীদের নির্দ্দেশ অনুসারে মূর্ত্তি রচনা করিত। রুষিয়া ও বুলগেরিয়ার অধিবাসী-দের ভিতর এ শ্রেণীর মূর্ত্তির প্রচলন ছিল। ইউরোপের ইতিহাসে অঙ্কনবিদ্যা এরূপে প্রতিহত হইয়া যায়। Orcagna প্রভৃতি শিল্পীরা পরবর্ত্তীযুগে আবার অতি কৌশলে নূতন রসসঞ্চার করিয়া স্বাধীন অঙ্কনক্রিয়ার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন।

ভারহুত, সাঁচী ও অমরাবতীর রূপাবলির ভিতর বুদ্ধ-মূর্ত্তিকে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ভগবান্ তথাগতকে যথাযথ-ভাবে উপস্থাপন সম্ভব বিবেচিত হয় নাই বলিয়া প্রাথমিক বৌদ্ধ শীলতায় অঙ্কনবিদ্যাদির সাহায্যে বুদ্ধমূর্ত্তি রচনা উৎসাহিত হয় নাই।

ইস্‌লামীয় সভ্যতায়ও অঙ্কনবিদ্যার দ্বার রুদ্ধ করা হইয়াছিল। ফলে অঙ্কিত হইয়াছিল অবাস্তব রেখার জাল—যাহাকে arabesque বলা হয়। বহুকাল পরে পারস্থে ও মোগল বাদ্‌শাহ্‌দের আমলে ভারতীয় আবহাওয়ার সংস্পর্শে আবার ইস্‌লামীয় অঙ্কনবিদ্যায় মূর্ত্তিরচনার অধ্যায় আরম্ভ হয়। অঙ্কনকলার অসীম ক্ষমতার ইতিহাস এ সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে অনুমিত হইবে। অন্ধ সংস্কার ও নিষ্ঠুর বিধানের দ্বারা অঙ্কনবিদ্যাকে জগতে লুপ্ত করা সম্ভব হয় নাই। বারবার উহা জগতের ইতিহাসে অসীম ক্ষমতার আধাররূপে আত্মপরিচয় দান করিয়াছে।

আধুনিক গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে—সুকুমার শিল্পকলার ভিতর অঙ্কনের প্রভুত্ব একসময় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। বিরাট্ স্থাপত্য ও পরিপূর্ণ ভাস্কর্য্য-চেষ্টাও অঙ্কনের প্রাধান্য হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। ১৯০১-১৯০২ সালে ইভান্স, থিওডোর (Dr. A. J. Evans, Theodore Fife) প্রভৃতি পণ্ডিত ক্রীট্‌দ্বীপে প্রাচীন কুসসের (Knossos) প্রাসাদ খননকালে অনেকগুলি রঙীন আবরণের (painted plaster) টুক্‌রা দেখিতে পান। সেলিনাস্ (Selinus), ঈজিনা (Aegina) প্রভৃতি স্থানের ডোরিক মন্দিরগুলিতেও এরূপ রঙের প্রলেপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। হলিকার্ণেসাস্ (Halicarnassus), এফিসাস্ (Ephesus) এবং আথেন্স (Athens) প্রভৃতি জায়গার আইওনীয় (Ionic) মন্দিরেও বর্ণপ্রয়োগের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। হিট্টর্ফ (Hittorf), পেন্‌রোজ (Penrose) প্রভৃতি বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়া যথেষ্ট উপকৃত করিয়াছেন। গ্রীসের বিখ্যাত পার্থিননের (Parthenon) মন্দিরকে বর্ণের সাহায্যে অলঙ্কৃত করা হইয়াছিল। পেন্‌রোজের মতে* পার্থিননের নানা অংশ বর্ণাঙ্কনে কতটা ভূষিত ছিল, তাহা ইদানীং অনুমান মাত্র করা যাইতে পারে; কিন্তু বর্ণাঙ্কনের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কারণ পশ্চিমদিকের স্তম্ভগুলিতে পীতবর্ণের প্রলেপ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

প্রাচীন মিশরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যও যে এরূপ বর্ণের সাহায্যে সুশোভিত করা হইত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পশ্চিমের সভ্যতায় বর্ণাঙ্কনের কারুতা বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া কোন আলোচক† বলিয়াছেন—"No people ever excelled the Egyptians in their lavish use of colour in decoration."

পাশ্চাত্যদেশের অঙ্কনবিদ্যা-প্রসঙ্গেও এ আলোচনা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। সুসাতে (Susa) দিঁয়ে লা ফয় (M. Dien la foy) ১৮৮৪-১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এনামেলের অনেক ভগ্ন ইটের টুক্‌রা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সে সব যুক্ত করিয়া লায়ন ফ্রিজ্ (Lion Frieze) ও আর্চার্স ফ্রিজ্ (Archers Frieze) নামক প্রাচীন নক্সার পুনরুদ্ধার করা হয়। তিরীয়ুস্ (Tiryus), মাইকেণী (Mycenae) এবং থেরাতে (Thera) শ্লিমান্ (Schliemann), ডর্‌পফেল্ড্ (Dorpfeld) প্রভৃতি মনীষীরা যে সমস্ত প্রাসাদ আবিষ্কারের প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়—শুধু প্রকাশ্য অভ্যর্থনাগৃহে (megarons) মাত্র নয়, ভিতরকার প্রকোষ্ঠগুলির দেওয়াল, ছাদ ও মেঝেতেও রঙীন নক্সা করা হইয়াছিল।

কাজেই দেখা যাইতেছে, ইউরোপ, আফ্রিকা ও এসিয়ার প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে অঙ্কনবিদ্যার প্রভুত্বকে মূর্ত্তি ও সৌধকলা শিরোধার্য্য করিয়াছে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চিত্রকলার শ্রেষ্ঠত্বের যে উক্তি পাওয়া যায়, তাহাও এইভাবে সমর্থিত হইতেছে।

* Principles of Athenian Architecture.

† J. Ward.

অঙ্কনবিদ্যার অবলম্বন সম্বন্ধে আলোচনা এস্থলে বিশেষ প্রয়োজন। আঁকিতে হইলে নানা উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। এক একটী উপায়ই জগতের ইতিহাসে বিরাট্ ব্যাপার ঘটাইয়া তুলিয়াছে। চিত্রে কএকটী উপাদান আছে—রেখা, বর্ণ, ছায়া ও বিষয়। শুধু রেখাদ্বারা অঙ্কন বা শুধু বর্ণের সাহায্যে রূপসৃষ্টি কিংবা শুধু আলো ও ছায়া প্রতিফলনেও চিত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা চলে। এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার রূপসৃষ্টির ইতিহাসে এই রকমের নানা রচনার বৈচিত্র্য দেখিয়া মানবের অঙ্কনচেষ্টার অসীম ঐশ্বর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

বলা হইয়াছে, শুধু কয়েকটী রসহীন রেখার সংযোগে বা বর্ণের সংযোগেই সুষ্ঠু অঙ্কন হয় না ; অন্ততঃ তাহাকে কলাস্থানীয় বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না। বৈদিক যজ্ঞ-বেদীর উপর অনেক নক্সা রচনা করিতে হইত, সে রচনা মুখ্যতঃ কোন বিশিষ্ট ক্রিয়ার সহিত যুক্ত থাকিলেও রেখাকার তাহাতে নিজের কৃতিত্ব দেখাইতে বিরত হন নাই। সমগ্র ভারতীয় ধর্ম্মের ইতিহাসে এরূপভাবে নানা রেখাঙ্কনের একটী ধারা প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে ; অপেক্ষাকৃত আধুনিক তান্ত্রিকযুগেও যে সমস্ত 'যন্ত্রাদি' কল্পিত হইয়াছে, তাহাতেও রেখাব্যঞ্জনের অন্তরালে রসমূর্চ্ছনার অবকাশ ঘটিয়াছে। ধর্ম্মবিধির ব্যবস্থায় মানুষের দেহেও রূপকাত্মক নানা রেখা-বিন্যাস অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছিল। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য প্রভৃতি অসংখ্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ ললাটে, বক্ষে ও বাহুতে নানা চিহ্ন, রূপক প্রভৃতি ধারণ করিয়াছে। এ সব রচনায় অঙ্কনকারদের কৃতিত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

যে কারণে প্রাগৈতিহাসিক যুগে জীবন্ত পশু প্রভৃতির রেখাচিত্রাঙ্কন সম্ভবপর হইয়াছিল, সে কারণ ইদানীন্তন যুগেও অন্তর্হিত হয় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার বুশ্ম্যানদের রেখাঙ্কনে এক আশ্চর্য্য কৃতিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। যুদ্ধের বা শিকারের একটী রেখাঙ্কিত রচনায় যাদুকরের চারিদিকে নৃত্যপরায়ণ নরনারীর চেহারা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ শ্রেণীর রচনার গূঢ় অর্থ আছে। সেকালে অনেক সময় শত্রুহননের জন্য শত্রুর চেহারা আঁকিয়া তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করা হইত। ইন্দ্রজালের (Shamanism) প্রভাব অল্পবিস্তর সকল সভ্যতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষেও মারণ ও বশীকরণ প্রভৃতি কার্য্যে কোন কোন স্থলে অঙ্কনের প্রয়োজন উপলব্ধি হইয়াছে। এই সকল কার্য্যে অসংখ্য সাঙ্কেতিক পদার্থ অঙ্কনে এ দেশের সমগ্র শীলতাগত উৎসাহ ব্যয়িত হইয়াছে। আসন, আধার, মুদ্রা, আয়ুধ প্রভৃতি রচনার পশ্চাতে চিরকালই ছিল একটা বিরাট্ ধর্ম্মগত প্রেরণা, যাহা সমগ্র জাতিকে এক সময় পরিচালিত করে। প্রাচীন উড়িষ্যার পটে রেখাঙ্কনের অসীম কারুতা এবং সঙ্কেতাত্মক সৃষ্টির পর্য্যায় সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে।

এ প্রসঙ্গে কোরিয়ার সমাধি-অঙ্কনও উল্লেখ করিতে হয়। ৪০০ খৃষ্টাব্দে রচিত চতুর্দ্দেব-সমাধির (The tomb of the four gods) উপরকার অঙ্কন-কলা আশ্চর্য্যভাবে প্রাগৈতিহাসিক সৃষ্টিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এই সকল কবরাঙ্কনে দ্রুতগামী হরিণ ও শিকারের দৃশ্যাদির চিত্র অনুপম সফলতায় মণ্ডিত হইয়াছে। যুগ্ম-স্তম্ভ সমাধির (The tomb of the Twin Pillars) উপর অঙ্কিত পরিচ্ছদাবৃত নারীগণের মূর্ত্তির রেখাবিন্যাস দর্শককে মুগ্ধ করিয়া দেয়। ৫৫০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত গুকেন্‌রির (Gukenri) সমাধির পূর্ব্বদিকের দেয়ালে অঙ্কিত ড্রাগনের মূর্ত্তি অঙ্কনকলার গৌরবের বস্তু।

ইদানীন্তন কালেও মন্ত্রতন্ত্রাত্মক রহস্যসম্পুটকে রেখাঙ্কনের সাহায্যে মানুষের দৃষ্টিগোচর করা হইয়াছে। এ রকমের দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষেও প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে অতি সুনিপুণ ও অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। আধুনিক নেপালে দুইরকমের ধাতুমণ্ডল (relic shrine) দেখিতে পাওয়া যায়—বজ্রধাতুমণ্ডল ও ধর্ম্মধাতুমণ্ডল। ধাতুমণ্ডলের উপরে নানা মূর্ত্তি অঙ্কিত করা হয়। বজ্রধাতুমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা দেবতা বৈরোচন প্রথম দিব্যবুদ্ধ ; ধর্ম্মধাতুমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্ব। ধর্ম্মধাতুমণ্ডলের উপর প্রায় ২২২টী দেবতার স্বতন্ত্র রেখাঙ্কন আছে। বজ্রধাতুমণ্ডলে প্রায় পঞ্চাশ ষাটটী নক্সা অঙ্কিত হইয়া থাকে—তাহাদের প্রত্যেকটীই স্বতন্ত্র আকারের। এ সমস্ত মণ্ডলের চক্রাকৃতি বেদী অতি প্রাচুর্য্যের সহিত অঙ্কন করা হয়। নেপালের স্বয়ম্ভুমন্দিরে বজ্রের নীচে যে ধাতুমণ্ডলটী রক্ষিত আছে, তাহা ধর্ম্ম-ধাতুমণ্ডল। অঙ্কিত বারটী জন্তু দ্বারা বারটী মাসের নাম সূচনা করা হইয়াছে। ইহার উপরকার অংশটী তাম্রফলকে ঢাকা দেওয়া আছে, এ ফলকটীর উপর ২২২টী দেবদেবীর নক্সা আছে।

এ প্রসঙ্গে তিব্বতীয় রূপকাঙ্কনের ঐশ্বর্য্যের কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জগতের কোথাও এ রকমের রূপকাত্মক সৃষ্টির প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন—"Tibetan Buddhism has carried symbolism to a wonderful perfection and its art is unique in its blending of microscopic details and bold decorative schemes."* রাজচ্ছত্রে রাজকীয় পদবী ; মৎস্যে

* Saunders.

আনন্দ ও ভাগ্য ; শঙ্খে সদ্ব্যবহার ; পদ্মে মুক্তি ; পতাকাতে জয় ; চক্রে ধর্ম্ম প্রভৃতি সূচিত হয়। অতি নিপুণভাবে এই সকল অঙ্কিত হইয়া প্রাচ্যদেশের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে।



রেখাঙ্কন (তিব্বতীয়)

রূপকাঙ্কন অঙ্কনবিদ্যার একটী অঙ্গ মাত্র। রূপকের অন্তরালে থাকে আর একটী বার্ত্তা ; এ সমস্ত অঙ্কন-কথা সে বার্ত্তাকে স্মৃতির সাযুজ্যে (association of ideas) মুখর করিয়া তোলে। কিন্তু রূপক ছাড়িয়া যথার্থ রূপের ক্ষেত্রকে অঙ্কনবিদ্যার সাম্রাজ্য বলিলেও চলে। সে ক্ষেত্রের ইতিহাস অতি বিচিত্র ঐশ্বর্য্যপূর্ণ।

এ স্থলে রেখাঙ্কনবিদ্যার আর একটী অধ্যায়ের আলোচনা করা আবশ্যক। সেটী হইতেছে অক্ষর-কলার বিশ্বব্যাপী প্রসার। মানুষ ভাবপ্রকাশের জন্য ভাষাকে রূপকস্থানীয় করিয়া তোলে এবং এই ভাষার বিস্তৃতির জন্য রেখাসঙ্কেত সৃষ্টি করে। মিশরের হিরোগ্লিফিক বস্তুচিত্রের ভিতর দিয়া ভাবের বাহন হইয়াছে। এইজন্য এ সব চিত্রাঙ্কনে বিশেষ দক্ষতা প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

জগতের সর্ব্বত্র নানারকমের লিপিচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। সে সব চেষ্টার মূলে এ প্রসঙ্গে শুধু অঙ্কনবিধিই লক্ষ্য করিবার বিষয়। এক সময় সর্ব্বত্রই হস্তলিখিত পুথির প্রচলন ছিল। প্রতীচ্য ও প্রাচ্য অঙ্কনে এক সময় এই সকল পুথির কারু অক্ষরাঙ্কনচেষ্টা জয়জয়কারের ব্যাপার হইত। ইউরোপে তিনখানি পুস্তক বিখ্যাত—(১) হোমারের ইলিয়ড—তৃতীয় শতকের পুথি, সম্প্রতি মিলানের আম্ব্রেসিয়ান্ লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। (২) ভার্জিলের গ্রন্থ, ভাটিকান্ পুস্তকাগারে রক্ষিত। (৩) তৃতীয় পুথিখানি হইতেছে, The Greek Menology, (৯৭৬-১০২৫ খৃষ্টাব্দ)।

এই সমস্ত পুথি অধিকাংশ স্থলেই চিত্রাঙ্কিত। মিশর দেশের Papyrus পুথি পারির লুভারে (Louver) রক্ষিত আছে। অতি উজ্জ্বল বর্ণে ও স্বর্ণরেখায় এ শ্রেণীর পুথি রচিত হইয়াছে। পশ্চিমে লালা (Lala) নামক নারীশিল্পীকে ক্ষুদ্র চিত্রাঙ্কনের অগ্রণী বলা হয়। গোচর্ম্ম হইতে তৈয়ারী ভেলাম ও হাতীর দাঁতে এই নারী স্বীয় প্রতিভা দেখাইয়াছেন। ইনি অগষ্টাস্ সীজারের সমসাময়িক। ইউরোপীয় অক্ষর রোমের সৃষ্টি ; রোম গ্রীস হইতে তাহা গ্রহণ করে; গ্রীকেরা ফিনিসীয়দের নিকট এবং ফিনিসীয়েরা মিশরীয়দের নিকট হইতে তাহা লাভ করে। ওয়েলীর (Waily) রচিত গ্রন্থ হইতে ইউরোপীয় অক্ষরকলার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ভাটিকানে রক্ষিত ভার্জিলের দুইখানি পুথি হস্তরচনার চমৎকার দৃষ্টান্ত। এই দুইখানি পুথির একখানির (৩২২৫ নং) সম্বন্ধে কোন পণ্ডিত* বলিয়াছেন—"Some of the best and most interesting specimens of ancient painting which have come down to us." এতদ্ব্যতীত ' Dioscorides" নামক ষষ্ঠ শতকের পুথিতে অঙ্কনকলার নানা নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈজন্তীয় (Byzantine) যুগেই লিপিকলা উচ্চতর সোপানে আরোহন করে। ইস্তাম্বুল শহর অগ্নিসংযোগে ধ্বংস হইলে রোমসম্রাট্ জাষ্টিনিয়ান্ যে নূতন নগর পত্তন করেন, তাহা বিলাস-প্রাচুর্য্যে সেকালে অপরাজেয় হইয়া উঠে। এই নব্য বৈজন্তীয়ম্ (Byzantium) শহর নানা প্রকার শিল্পের জন্য বিখ্যাত হইয়া পড়ে। বৈজন্তীয় রেশমের নক্সায় শুধু রেখাঙ্কন মাত্র নহে, পশু-পক্ষী অঙ্কনের চেষ্টাও লক্ষিত হইত। এ নগরে লিপিকলারও বিপুল উৎকর্ষ সাধিত হয়। কোন লেখকের মতে—"The progress has been from mere Cheirography to Calligraphy ; now it was from Calligraphy to Chrysography and Arguriography."† স্বর্ণ ও রৌপ্যের জল দিয়া রচনা অঙ্কন-কলার আর একটা অধ্যায় সূচিত করে। বৈজন্তীয় হস্তলিখিত পুথি ইউরোপীয় লিপিবিদ্যার (Calligraphy) উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মনে করা যাইতে পারে। পরবর্ত্তীকালে অন্যত্রও লিপিবিদ্যার যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়।

* Sir. M. D. Wyatt.

† J. W. Bradley.

স্বর্ণযুগের (Golden Age of Illumination) একখানি হস্তলিখিত পুথি দেখিলেই তাহা প্রমাণিত হইবে। এখানির নাম রাস্কিন্ (Ruskin)—(১৭৩৪১ নং অতিরিক্ত পুথি)। ইহা দেখিলে ইউরোপের অক্ষরাঙ্কন ও পুথির চিত্রাঙ্কন বিষয়ে অনেকটা পরিষ্কার ধারণা হইবে।



বৈজন্তীয় পুথির [Burney Mss.] অঙ্কিত চিত্র—খৃঃ নবম শতাব্দী।

প্রাচ্যদেশে লিপিবিদ্যা আরও গভীরতর চেষ্টার সহিত যুক্ত হইয়াছে। অক্ষরাঙ্কনে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে চীনদেশে অনেক সাধনা করিতে হইত। সুঙ্ আমলের চু-চাঙ্-ওয়ান্-রচিত 'মিহ্-চে-পীন' নামক গ্রন্থে লিপিবিদ্যা ও প্রসিদ্ধ লিপিকারদের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। চীনদেশে প্রাচীন চিত্র ও লিপির অনুকরণ ব্যাপার শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। এজন্য তথায় বহু পুথি ও চিত্রের নকল প্রস্তুত হইয়াছে। সূক্ষ্ম রেখাঙ্কনের বিশিষ্ট মর্য্যাদা স্বীকৃত হওয়াতে শিল্পিগণ রেখাঙ্কনের ক্ষেত্রে অতি দুর্ল্লভ ক্ষমতার অধিকারী হইত। এমন কি, চিত্রকলাও লিপিকলার একটী অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।* মোটের উপর চীনদেশে এ দুটীকে একই শিল্পের যুগ্মরূপ বলিয়া মনে করা হয় এবং শিল্পীদের বলা হয় 'হলিন' (Haulin) বা তুলিকাকাননের রসিক। বস্তুতঃ রেখাঙ্কনের কারুতা হইতে শিল্পীর কৌলীন্য স্থিরীকৃত হয়। পুরাতন চিত্র নকল করিয়া নূতন শিল্পীরা পাকা জালিয়াতের মত হইয়া পড়ে।* চীনদেশে আসল ও নকলের পার্থক্য ধরা কঠিন। একই বিষয় লইয়া বহুশত বৎসর পর্য্যন্ত ছবি আঁকা চলে। শিল্পী পেই-কুয়ান্ (Pei-kuan) "দশটী ঘোড়া" নামে একখানি ছবি আঁকেন, তাহার প্রায় ছয়শত বৎসর পরে শিল্পী চেও-মেঙ-ফু সে বিষয় লইয়া আর একখানি ছবি অঙ্কন করেন। এই সকল ছবিতে লিপিকারদের অঙ্কনকৃতিত্বই বিচারের মুখ্য ব্যাপার হইয়া পড়ে। রেখাপাতের নিপুণতা সঞ্চারিত হয়—তুলিকা ব্যবহারের বৈচিত্র্যের উপর। এ বৈচিত্র্যকে পি-ফা (Pi-fa) বলা হয়। বড় কুঠারের বা ছোট কুঠারের টান্, বারিবিন্দুর টান্—এসব হইল রেখাঙ্কনের নামপর্য্যায়। ষোড়শ শতকের শেষে চি-চঙ্ (Chi Chang) অঙ্কনবিদ্যা সম্বন্ধে যে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এ সব বিষয় আলোচিত হইয়াছে। পাহাড়ের চিত্রের সীমান্ত-রেখা (tsún-fa) হইতেছে—ওস্তাদের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি, সে রেখার নৈপুণ্য দেখিয়া ভালমন্দের বিচার করিতে হয়। চৈনিক শিল্পী Tson-I-Kueiর মতে ইউরোপীয় চিত্রকলা একান্ত তুচ্ছ ও নগণ্য ব্যাপার। বস্তুতঃ রেখাঙ্কনের দক্ষতা বিষয়ে প্রাচ্যখণ্ড অতুলনীয় সম্পদের অধিকারী। শিল্পী Lich-I একবর্গ ইঞ্চির পরিসরের মধ্যে এমন এক চিত্র আঁকেন—যাহাতে পাঁচটী পর্ব্বত ও চারিটী সমুদ্র এবং প্রত্যেক দেশের রেখাঙ্কিত চেহারা থাকে। ভারতবর্ষেও শিল্পীদের এ শ্রেণীর কীর্ত্তির বিষয় সকলের জানা আছে। ক্ষুদ্রচিত্রাঙ্কন (miniature) বিষয়ে ভারতের শিল্পীর যশও বিশ্বব্যাপী। চৈনিক শিল্পী ওয়াঙ্ হিসিয়ার (Waung Hsia) অঙ্কনপ্রণালী অত্যন্ত অদ্ভুত ছিল। মাতাল হইলেও তাহার চিত্রাঙ্কনে দক্ষতা ছিল অসাধারণ। সে মাঝে মাঝে কালিতে হাত ডুবাইয়া রেশমের কাপড়ের উপর হাত ঝাড়িয়া দিত। মুহূর্ত্তের ভিতর বিস্ময়জনকভাবে পাহাড়, হ্রদ ও বৃক্ষাদির চেহারা তাহাতে ভাসিয়া উঠিত। কখনও প্রচুর কালি চিত্রের উপর ফেলিয়া তাহার উপর পদাঘাত করিতে বা ঘষিতে আরম্ভ করিত—ক্রমশঃ হয়ত একটা সূর্য্যাস্ত বা ঝটিকাযুক্ত বৃষ্টিপাতের চেহারা ফুটিয়া উঠিত এবং প্রাথমিক কালি নিক্ষেপের চিহ্নই পাওয়া

* "Painting for the Chinese is a branch of handwriting" [Chinese Art—Burlington Magazine, Monograph]

* "At the beginning of the Manchu Dynasty there lived in Chuan Chu Lane at Soochao a family called Chin. Father, sons, young and old were all experts in picture-forging……The fashion grew apace and forgers became more numerous every day." [Waley—Chinese Painting.]

যাইত না। অঙ্কনকলার বৈচিত্র্যের ইতিহাসে এ সমস্ত রোমাঞ্চকর কাহিনী অতি বিস্ময়ের ব্যাপার সন্দেহ নাই।

জাপানেও রেখাঙ্কনের নিপুণতা ও বৈচিত্র্যের উপর চিত্রকরদের কৌলীন্য নির্ভর করে। জাপানের চিত্রকরেরা অসংখ্য রেখার প্রয়োগদ্বারা ভাবাবেগকে বিকশিত করিয়া থাকে। শুধু ভূচিত্রেই (landscape) প্রায় যোল রকমের তুলিকা ব্যবহারের ধারা আছে। বস্তুতঃ হাতের পেশীর অতি সূক্ষ্ম কম্পনের সহিত নিপুণ শিল্পীর প্রাণকম্প জড়িত হইয়া থাকে।* কোজ, তাকুমা, কাশুগা প্রভৃতি চিত্র-চক্রে এ শ্রেণীর কৃতিত্বই সকলের দ্রষ্টব্য। তুলিকাঙ্কনের সীমাহীন বৈচিত্র্য প্রাচ্যকলাকে ইউরোপের চক্ষে মহিমা দান করিয়াছে। জাপানে লতাপাতা আঁকিবার প্রায় ছত্রিশ রকমের তুলিকা প্রয়োগের কায়দা আছে। সে সব আয়ত্ত করা জীবনব্যাপী সাধনার ফল। জাপানীরা মনে করে, দিব্যানুভূতির ফলে এ সমস্ত রেখাবৈচিত্র্যের সুষ্ঠু প্রয়োগ সম্ভব হয়। জাপানের আধ্যাত্মিক চিত্রকরেরা অতি সূক্ষ্ম ভাবাবর্ত্তকে তুলিকাকম্পনের সহায়তায় মূর্ত্ত করিয়া থাকে। জাপানের উদ্যান-রচনায় পাথর, উৎস ও বৃক্ষাদির সংযোগে এক অপূর্ব্ব রূপাঙ্কনের ব্যবস্থা আছে, যাহাতে সত্ত্ব, রজঃ, তম ইত্যাদি গুণ প্রকাশ করা হইয়া থাকে। যোশীমারার উদ্যান এই শ্রেণীর রচনার জন্য বিখ্যাত। জাপানীরা পাথরের ভিতর দিয়াও মর্ম্মবাণী প্রকাশ করে—ইহা ভারতীয় শীলতা-সংস্পর্শেরই ফল। কোন লেখক বলেন—"The Japanese ascribe more humanity to their stones than they do to their flower or tree even to their animals."†

জাপানী লিপিকলা রেখাঙ্কনের দক্ষতার উপর নির্ভর করে, সে জন্য তাহা অতি চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী। বস্তুতঃ চীন ও জাপানে রক্ষিত হস্তলিখিত পুথির অতুলনীয় কারুতা জগতের ইতিহাসে বিখ্যাত। এ দুইটী দেশই তুলিকার সাহায্যে রেখাঙ্কনের অপূর্ব্বত্ব এবং লিপিকলা ও চিত্রকলার আত্মীয়তার জন্য সর্ব্বত্র শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছে।

প্রাচ্য লিপিবিদ্যার কৃতিত্ব ইউরোপের সকল চেষ্টাকে মলিন করিয়া দিয়াছে। পারস্য দেশের পুথিগুলিও জগতে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। পারস্য চিত্রের অবলম্বনই হইতেছে অনেক সময় পুস্তকের পাতা। পারস্য অক্ষরের লীলায়িত গতিহিল্লোল অতি মনোজ্ঞভাবে অসংখ্য হস্তলিখিত গ্রন্থে অঙ্কিত হইয়া থাকে।

* শ্রীযামিনীকান্ত সেন প্রণীত 'আন্তর্জাতিক রূপতন্ত্র', ৭৩ পৃঃ।

† B. Taylor—Japanese Gardens.

ভারতীয় হস্তলিখিত পুথিতেও বর্ণ ও রেখাঙ্কনের অতি নিপুণ দৃষ্টান্ত আছে। প্রাচীন হস্তলিখিত বহু পুথি ভারতের নানা জায়গায় সুরক্ষিত আছে। নেপালে কাটামাণ্ডু শহরের বীর লাইব্রেরী এ সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান সঞ্চয়। প্রায় ষাট হাজার হস্তলিখিত পুথি এখানে সংগৃহীত আছে। এখানকার রঞ্জনাক্ষরে লিখিত অনেক পুথি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। কাল রঙের কাগজের উপর সোনার জলে লিখিত পুথি, হস্তাক্ষরের কারুতা ও সৌকুমার্য্যে এক অনির্ব্বচনীয় বস্তু। এসব যেন এক একটা অলৌকিক স্বপ্নসম্পদ্! নেপালের অনেক পুথিতে অঙ্কিত চিত্রাদিও অতি সূক্ষ্ম রেখাপ্রয়োগের দৃষ্টান্তস্থল। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকাগারে সংরক্ষিত অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা পুথির অঙ্কন-কারুতা সর্ব্বজনবিদিত—ইহা একাদশ ও দ্বাদশ শতকের অঙ্কনবিদ্যার দৃষ্টান্ত। ইহা ছাড়াও এমন অনেক পুথি এখানে সংগৃহীত আছে, যেগুলি প্রাচীন লিপিকলার অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

ভারতীয় মোগল বাদশাহ্গণের আমলেও হস্তলিখিত গ্রন্থের ঐশ্বর্য্য* অক্ষুণ্ণ ছিল। বার্লিন গ্রন্থাগারে রক্ষিত জাহাঙ্গীরের এল্‌বাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। জয়পুর পুস্তকাগারে রক্ষিত 'রম্‌জানামা'র চিত্র অতি চমৎকার। এ চিত্রে ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান-রীতির মিলন হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভারতের নানা স্থানে অতি নিপুণভাবে লিখিত তালপাতার পুথির উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। উড়িষ্যার তালপাতার পুথিতে অঙ্কনবিদ্যার একটা চরম সফলতা লক্ষ্য করিতে হয়। রেখাঙ্কনের দ্বারা অতি সূক্ষ্ম ও পেলব ভাবে এ সমস্ত পুথিতে অসংখ্য চিত্র দেওয়া থাকে—সেগুলি কঠোর সাধনার ফল। অঙ্কনবিদ্যার এ অধ্যায় জগতের ইতিহাসে এক অভাবনীয় ব্যাপার।

অঙ্কনকলার যৌথ, যুগ্ম ও নিঃসঙ্গ প্রথা আছে। কিন্তু সমগ্র ক্ষেত্রেই কলাবিদ্যার যাহা মুখ্য স্বধর্ম্ম, তাহা স্বীকার করিয়াই অগ্রসর হইতে হইয়াছে। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথের উল্লিখিত 'অখণ্ডত্ব'সাধন কলাসৃষ্টিমাত্রেরই অবিচ্ছেদ্য ব্যাপার। সমগ্র রচনা মিলিয়া এক অবিভাজ্য শ্রীকে উদ্ভাসিত না করিতে পারিলে কলাচেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়। রসযুক্ত বাক্য যেমন কাব্যস্থানীয় হয়, তেমনি রসানুসিক্ত না হইলে অঙ্কিত সৃষ্টি কলাস্থানীয় হইতে পারে না। এই রসবিন্যাসের ক্ষমতা ঐশ ব্যাপার। শুক্রনীতিসারে বিদ্যা ও কলার বিভেদ-প্রসঙ্গে শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন—

* Indian Book Painting—E. Kuhnel and Hermann Goelz.

"যদ্ যৎ স্যাদ্ বাচিকং সম্যক্ কর্ম্ম বিদ্যাভিসংজ্ঞকম্।
শক্তো মূকোঽপি যৎ কর্ত্তুং কলাসংজ্ঞন্তু তৎ স্মৃতং॥"
(শুক্রনীতি ৪.৩.২৫)

শিল্পশাস্ত্র, কাব্য ও অলঙ্কার সম্বন্ধেও শুক্রাচার্য্যের উক্তি উল্লেখ করিতে হয়। তাহা হইলে সমগ্র রসরচনাক্ষেত্রে শুক্র-নীতির আদর্শ প্রকাশ পাইবে।

"প্রাসাদপ্রতিমারামগৃহবাপ্যাদিসৎকৃতিঃ।
কথিতা যত্র তচ্ছিল্পশাস্ত্রমুক্তং মহর্ষিভিঃ॥ ৪.৫৮
সরসালঙ্কতাদুষ্টশব্দার্থং কাব্যমেব তৎ।
বিলক্ষণচমৎকারবীজং পদ্যাদিভেদতঃ॥ ৪.৬০
সমন্যূনাধিকত্বেন স্বারূপ্যাদি প্রভেদতঃ
অন্যান্যগুণভূষা তু বর্ণ্যতেঽলঙ্কৃতিশ্চ সা॥" ৪.৫৯

রম্যকলার সার্ব্বজনিক প্রকাশধর্ম্মকে 'বাচিকে'র বিপরীত বলিয়া উল্লেখ করিয়া শুক্রাচার্য্য ইতরজনের নিকট কলাবিদ্যার তটস্থ লক্ষণ দেদীপ্যমান করিয়াছেন। কাব্য ও অলঙ্কার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি রসপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া রূপকলার স্বরূপধর্ম্মের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে বিশ্লেষণমূলক গবেষণা অঙ্কনকলাকে ষড়ঙ্গক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছে। সৌন্দর্য্যতত্ত্বের দিক্ হইতে আলোচনা না করিয়া প্রাকাশিক দিক্ হইতে বিচার করিয়া প্রতিচিত্রের উপপাদ্য ব্যাপারগুলিকে আলোচনা করিতেও ভারতীয় রূপালোচকগণ দ্বিধা বোধ করেন নাই। সমস্ত বিধির মূলেই সৌন্দর্য্যবিধিকে স্বীকার করিতে হইবে। অঙ্কন-কলায় রসাঙ্কন সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিতে না পারিলে ব্যর্থ হইয়া থাকে। শিল্পীদের এজন্য ভিতর ও বাহির (subjective ও objective)—উভয়দিক্ হইতেই অঙ্কনবিদ্যা সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

অন্তরের দিক্ হইতে সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথের উক্তি উল্লেখ করা হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে উজ্জ্বলনীলমণির অপেক্ষাকৃত আধুনিক সৌন্দর্য্যব্যাখ্যাও অতি হৃদয়গ্রাহী।

"অঙ্গান্যভূষিতান্যেব কেনচিৎ ভূষণাদিনা।
যেন ভূষিতবদ্ ভান্তি তদ্রূপমিতি কথ্যতে॥
অঙ্গপ্রত্যঙ্গকানাং যঃ সন্নিবেশো যথোচিতম্।
সুশ্লিষ্টঃ সন্নিবদ্ধঃ স্যাৎ তৎ সৌন্দর্য্যমুদাহৃতম্॥"

উজ্জ্বলনীলমণির মতে, অঙ্কিত বিষয়ের সুসম্বদ্ধ সামঞ্জস্য-বিধানই সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। এ সামঞ্জস্যবিধান অঙ্কনব্যাপারে কিরূপে সম্পন্ন করিতে হয়, সে সম্বন্ধে নানা সভ্যতা ও শীলতা নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া বিষয়টীকে সুস্পষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছে। অঙ্কনব্যাপারের ক্ষেত্রে শিল্পীরা এই সমস্ত ভাবুকের নির্দ্দেশ অনুসারে চিত্তকে সুগঠিত এবং কলাকে বিধিবদ্ধ করিয়া থাকেন।

মিশরীয়, বৈজন্তীয়, গ্রীক্, ভারতীয় ও চৈনিক শীলতার দান এ সম্পর্কে অতি বিচিত্র ও কোন কোন বিষয়ে বিপরীত-ধর্ম্মী। কোন কোন সভ্যতার চিন্তা অতি সামান্য স্তরেই নিহিত—জটিল সভ্যতাগুলি অতি কঠিন বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

মিশরের মেম্ফিস্ বিধি (Memphis Formula) এবং বৈজন্তীয় বিধি (Byzantine Canons) দুইটী অঙ্কনাধ্যায়ের সূত্রপাত করিয়াছে। গ্রীসের আথস্ পর্ব্বতের উপর পুরোহিত শিল্পীরা এখনও অনেকটা বৈজন্তীয় প্রথায় চিত্রাঙ্কন করিয়া থাকেন। সে সব অতি অদ্ভুত এবং কোন কোন ইউরোপীয় শিল্পীর মতে কদর্য্য সৃষ্টি। নাইসীয় (Nicean) সভার সিদ্ধান্তে পাদ্রীরাই চিত্রাঙ্কনের পদ্ধতি স্থির করার অধিকারী হন। বুলগেরীয় ও রুষীয় খৃষ্টানগণ বৈজন্তীয় মূর্ত্তির পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। বৈজন্তীয় পাদ্রীরা ৯৮৮ খৃষ্টাব্দে ভ্লাডিমার দি গ্রেটকে নিজেদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ফলে এ শ্রেণীর অঙ্কন ব্যাপক হইয়া পড়ে। কোন ইউরোপীয় আলোচক বলেন—"These productions from their weird appearance may be classed artificial spectres of sacred personages than objects of art.........The Russian and Bulgarian sacred pictures of Christ, the Madonna and the saints gradually assumed a dirty brown colcur in the flesh tints, the figures becoming more sorrowful in expression having elongated heads and lifeless hands and feet, all painted very flatly in accordance with reciper and Byzantine tradition."*

গ্রীক্ সভ্যতা পলিক্লিটিসের বিধিকে (Canon of Polycletes) শিরোধার্য্য করিয়া সৌন্দর্য্যরচনায় উৎসাহিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে ও চীনদেশে এ সম্পর্কে যে সমস্ত বিচার ও বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেগুলি নানাকারণে অতুলনীয়। চীন-দেশ ভারতবর্ষের নিকট নানাভাবে ঋণী। চীন শুধু ভারতের ধর্ম্মমন্ত্র গ্রহণ করেন নাই—ভারতের বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব-গণের রূপাবলীও চীন ভৃগুপদচিহ্নের মত বক্ষে ধারণ করিয়াছে।

* Ward —Ancient and Modern Painting.

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই যশোধরকর্তৃক উদ্ধৃত একটী শ্লোকে আলোচনা করিতে হয়।

"রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনং।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকং।"

ভারতীয় চিত্রাঙ্কনের অবিচ্ছেদ্য এই সমস্ত লক্ষণ বিশেষ-রূপে অনুধাবনযোগ্য। পশ্চিমের চিত্রসৃষ্টির আলোচনায় এ শ্রেণীর প্রসঙ্গ অতি তুচ্ছ। রূপভেদ বলিতে কি বুঝিতে হইবে—এ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে ব্যাখ্যা কেহ কেহ দিয়াছেন, অধিকাংশ স্থলেই তাহা ভ্রান্ত, কারণ সে সব আলোচনা ভারতীয় সৌন্দর্য্যতত্ত্বের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারে নাই। চিত্রের সঙ্গতিতে থাকিবে—বৈচিত্র্যের ঐক্যসাধন। পৌনঃপুনিক নক্সাকে অলঙ্কার বলা চলে—চিত্র বলা চলে না। রেখা ও বর্ণাঙ্কিত চিত্রপদার্থের অংশগুলির বিন্যাস রূপান্বিত হওয়া চাই—এ রূপসম্পদ্ বাহ্য অলঙ্কার-যোগের ব্যাপার নয়, আন্তর সংহতি-সৃষ্টির দ্যোতক বস্তু। অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে নিহিত রূপবিস্তারে অবশ্যম্ভাবী বৈচিত্র্য থাকিবেই—এই বৈচিত্র্যকেই 'ভেদ' বলা হইয়াছে। যাহাকে ensemble বা সঙ্গতি বলা হয়, তাহা ভেদ-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত—ভেদজ্ঞান সম্ভব না হইলে চিত্রাঙ্কন মনকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। একঘেয়ে একটানা জিনিযে রূপান্বয় (synthesis of form) সম্ভব হয় না। এ প্রসঙ্গে তত্ত্বকারগণ বর্ণের ও রেখার ভিতরও প্রকৃতি-অনুযায়ী স্ত্রী-পুরুষভেদ করিতে ইতস্ততঃ করেন না। শিল্পীর প্রতিভায় এক একটী বর্ণপ্রলেপ বা রেখালীলা অন্তটীর সহিত অনির্ব্বচনীয় যোগযুক্ত হয়।

প্রমাণ বলিতে দৈর্ঘ্য, বিস্তার এবং সূক্ষ্মতা ও স্থূলতা প্রভৃতির ভিতর একটা সমতারক্ষা বুঝায়, ইহা চিত্রাঙ্কনে অনিবার্য্য। সমগ্র চিত্রচেষ্টার পরিধির ভিতর এই সুসঙ্গতি রক্ষা একটা মুখ্য ব্যাপার। এ প্রমাণ জ্যামিতিক বা গণিতশাস্ত্রের পরিমাপের উপর নির্ভর করে না—চিত্রগত রেখা ও বর্ণব্যবস্থার অনিবার্য্য নৈসর্গিক আকর্ষণ তাহা সুসম্পন্ন করিয়া তোলে। বর্ণ, রেখা ও বর্ণনার যে আন্তর সংহতি সৃষ্টি করিতে হয়, তাহা নৈসর্গিক উপলব্ধির (Instinctive sense) উপর নির্ভর করে।

'ভাব' হইতেছে মানসিক অবস্থা, যাহা হইতে রসসঞ্চার হয়। ভাবযুক্ত হইলে তাহা দর্শকের মনে নানারকমের রস উৎপন্ন করে। ভাবহীন অঙ্কন অঙ্কনই নয়। এদিক্ হইতে বিচার করিতে গেলে দেখা যাইবে, ভারতীয় অঙ্কনমাত্রই বিশিষ্ট ভাবের দ্যোতক—মানসী লীলার বিকাশ। শুধু শূন্যতাময় অবয়বরচনা ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল না। 'লাবণ্যযোজনম্' চিত্রের চতুর্থ অঙ্গ—এ কথাটীরও যথেষ্ট ব্যাখ্যা হইয়াছে। জগতে যে সমস্ত দ্রব্যাদি দেখা যায়, তাহা যে সব সময় লাবণ্যযুক্ত, তাহা নয়—যদিও সে সব হয়ত জীবন্ত। অঙ্কনকার যখন কিছু আঁকিতেছেন, তখন তিনি শুধু নিরুপাধি বাস্তবকে আঁকিবেন না—তাহা হইলে সে সব ডাক্তারী বা উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রের পুস্তকের ছবির মত প্রাণহীন ব্যাপার হইয়া পড়িবে। একদিকে থাকিবে—রূপভেদ ; এই বিভেদের ভিতরকার বৈচিত্র্য দর্শকের চিত্তকে আঘাত করিতে পারে না, যদি সমগ্র ব্যাপার লাবণ্যযুক্ত সঙ্গতি দ্বারা সংহত না হয়। সমগ্র রচনা হইতে একটা দ্যুতিগত সৌন্দর্য্য তখনই প্রকটিত হয়, যখন শিল্পী অঙ্কিত পদার্থের যথার্থ সৌন্দর্য্যগত প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারেন।

অঙ্কিত চিত্রের পঞ্চম অঙ্গ হইতেছে সাদৃশ্য। যাহা অঙ্কিত হইবে, তাহা শিল্পশাস্ত্রে উল্লিখিত লক্ষণ ও অবস্থার অনুরূপ হওয়া চাই। এ সাদৃশ্যসৃষ্টি হুবহুত্ব-সাধন নয়, ইহা রূপবিধির সহিত তুল্যতা সাধন। ইহার অভাবে ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসের উচ্ছৃঙ্খল গণ্ডীর উপর নিহিত হইলে চিত্রাঙ্কন রসিকদের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিবে না।

চিত্রের ষষ্ঠ অঙ্গ হইতেছে—'বর্ণিকাভঙ্গ', অর্থাৎ বর্ণ-সংযোগের সুব্যবস্থা। বর্ণসংহতি ও সঙ্গতি চিত্রের একটী প্রধান ব্যাপার। পরস্পরবিরোধী বর্ণলেপে চিত্রে অসঙ্গতি-দোষ ঘটে।

অঙ্কনব্যাপার শুধু উচ্ছৃঙ্খল স্বৈরাচারমাত্র নয়—তাহা অন্তরঙ্গ সুসঙ্গতির বাহন না হইলে ব্যর্থ হয়। ভারতীয় রসশাস্ত্র অনিবার্য্য অন্তরঙ্গ ব্যাপারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া অঙ্কনকারের একান্ত কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্যযোজন, সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গ—প্রত্যেকটী বিষয়ে অঙ্কনকারকে সচেতন থাকিতে হইবে—এসব হইবে রূপকারদের জপমন্ত্র। শৈশব হইতে গুরুগৃহে এ সমস্ত বিষয়ে হাতেখড়ি হওয়া চাই, তবেই অঙ্কনপ্রয়াসে সফলতা সম্ভব হইবে। বলা প্রয়োজন, সকল দেশের সকল চিত্র ষড়ঙ্গক নয়। এক একটী অঙ্গের প্রাবল্যে বা ভূয়িষ্ঠপ্রয়োগে অন্যান্য অঙ্গ তুচ্ছীকৃত হয়। কাজেই ভারতের আদর্শ অনুসারে সে সব উচ্চশ্রেণীর চিত্র হইতে পারে না।

একদিকে গুণবর্ণনা যেমন হইয়াছে, তেমন অন্যদিকে অঙ্কিত আলেখ্যের দোষের কথাও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—

"দৌর্ব্বল্যং স্থূলরেখাত্বমবিভক্তত্বমেব চ।
বর্ণানাং সঙ্করশ্চাত্র চিত্রদোষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

অঙ্কনকারের সাধনা সামান্য হইলে রেখাঙ্কনে ও বর্ণপ্রলেপে ভীরুতা আসিবে, সহজ আত্মপ্রত্যয়ের ভিতর দিয়া অকুণ্ঠিতভাবে সে অগ্রসর হইতে পারিবে না। শুধু চীন ও জাপানে নহে—

ভারতবর্ষেও রেখাপ্রয়োগের সূক্ষ্মতা ও কারুতা একটী বিশেষ প্রার্থয়িতব্য ব্যাপার ছিল। এখনও নানা প্রদেশের অঙ্কন-কলাকে 'কলম' বলা হয়, যথা, কাংড়া কলম, জয়পুর কলম ইত্যাদি। এই রেখাঙ্কনসাধনা পুরুষানুক্রমিক চেষ্টায় সুসম্পন্ন হয়। রেখা মুখ্য ব্যাপার নয়,—উপায় মাত্র; কাজেই রেখার স্থূলত্ব ও সৌকুমার্য্যের অভাব অঙ্কনকারের অক্ষমতাই সূচনা করে। অঙ্কিত পদার্থের যথোচিত অঙ্গসন্নিবেশ না হইলে সমগ্রের সঙ্গতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না। বর্ণপ্রয়োগের সুষ্ঠুতাও একান্ত সাধনার বস্তু। শাস্ত্রকারগণ বহু চিন্তা ও গবেষণায় বর্ণের যথাযোগ্য সন্নিবেশের প্রণালী উল্লেখ করিয়াছেন—সে সমস্ত আয়ত্ত করিতে হয়। পশ্চিমদেশেও ইদানীং বর্ণসঞ্চার সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা হইয়াছে। কোন কোন রঙ্ প্রয়োগ করিলে মনে হয়—তাহা যেন আগাইয়া আসে, আবার কোন্ কোন রঙ্ মনে হয়—যেন পিছাইয়া যাইতেছে। এসবের হিসাব জানা দরকার। যে সমস্ত রঙ্‌কে যোজকবর্ণ (complementary colours) বলে, সেগুলি সম্বন্ধেও পরিচয় একান্ত প্রয়োজন হয়। কোন্ রঙের পার্শ্বে কোন্ রঙ্ দিতে হয়, এ যুগে তাহার একটা বৈজ্ঞানিক বোঝাপড়াও হইয়াছে। এজন্য কোন কোন শিল্পী স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক বর্ণবিন্যাস ত্যাগ করিয়া অন্তরঙ্গ সঙ্গতিপূর্ণ বর্ণবিন্যাস করিতে উৎসাহিত হইয়াছেন। এ বিষয়ে বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী গোগ্যাঁর (Gauguin) নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। গোগ্যাঁর স্বাধীন বর্ণাঙ্কন এ যুগে অনুকরণাত্মক অঙ্কনের প্রিয়ভূমি ইউরোপে এক বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে।

এদেশে বর্ণবিচার অতি গভীর আলোচনার বস্তু হইয়াছে। রূপশাস্ত্রে দেবতা, মানুষ প্রভৃতিতে কি রকম বর্ণপ্রয়োগ সমীচীন হইবে, তাহা উল্লেখ করিয়া শাস্ত্রকারেরা ক্ষান্ত হন নাই। ভারতীয় রসতাত্ত্বিকগণ 'রস'মাত্রকেই নানা বর্ণের মূর্ত্ত বিকাশ মনে করিয়াছেন, এবং প্রত্যেক বর্ণেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করিয়া নিরস্ত হইয়াছেন।

কাজেই বর্ণসঞ্চারের ত্রুটি হইতে যাহাতে অঙ্কনকারগণ আত্মরক্ষা করিতে পারেন, সে সম্বন্ধে এই শ্রেণীর উপদেশ সকল শিল্পীরই বন্দনীয় হইয়াছে। অঙ্কিতব্য বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবে।

চীনদেশেও এ শ্রেণীর বহু গবেষণা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, চৈনিক অঙ্কনকলায় হস্তলিখিত পুঁথির মর্য্যাদা যথেষ্ট। এক একটা চৈনিক অক্ষর চতুর শিল্পীর হাতে এক একটী চিত্রের মত হইয়া পড়ে। কারণ, তাহাতে শিল্পীরা রেখাবিলাসের একটা ক্ষেত্র পাইয়া থাকে। উই-সুছু-রচিত গ্রন্থে ৫৬ রকমের বিভিন্ন লিপি-অঙ্কনপ্রণালীর উল্লেখ আছে। শুধু এক একটী বিষয় অঙ্কন সম্বন্ধে এক একখানি গ্রন্থ আছে, যেমন—বাঁশগাছ আঁকিবার আলোচ্য গ্রন্থ হইতেছে—'চুহ্-পূ-রেয়াংলুহ্'। কথিত আছে, অঙ্কনকার চ্যাঙ্-উ, উইটানের কবর খুঁড়িয়া হস্তলিপি-কলা-সম্বন্ধে সুগুপ্ত পুথিখানি চুরি করিয়া লইয়া আসেন এবং পরে প্রাচীন যুগের শ্রেষ্ঠতম লিপিশিল্পী বলিয়া পরিচিত হন।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষে অঙ্কনবিষয়ে চি-চ্যাঙ্গ যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে অঙ্কনবিস্তার বিশ্লেষণমূলক বহু গবেষণা আছে। বিখ্যাত শিল্পী কু-কাই-চির মতে অঙ্কনকলার সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন বিষয় হইতেছে—মানুষের মূর্ত্তি, তাহার পরই ভূচিত্রের স্থান; দেবমূর্ত্তি ও ঘোটকমূর্ত্তি তদপেক্ষা সহজ। সর্ব্বাপেক্ষা সহজ হইতেছে—গৃহাঙ্কন।



চৈনিক ভূচিত্রাঙ্কন

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষভাগে হিসিয়ে-হো (Hsieh-Ho) চিত্রাঙ্কনের ষড়ঙ্গ-নামক গ্রন্থ রচনা করেন। নানা কারণে এ আলোচনা অতি উপাদেয় হইয়াছে। হিসিয়ের মতে অঙ্কনের প্রথম অঙ্গ—আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্য বা প্রাণপ্রতিষ্ঠা। শুক্রনীতিসারেও এ প্রসঙ্গে অতি চমৎকার আলোচনা আছে। দ্বিতীয় অঙ্গ—তূলিকাপ্রয়োগ; তৃতীয়—সাদৃশ্য, অর্থাৎ যে রকমের বস্তু হইবে,

তদনুযায়ী আকার দান করা ; চতুর্থ—যে জাতীয় জিনিষ, তদনুযায়ী বর্ণপ্রয়োগ ; পঞ্চম—হইতেছে প্রমাণ, অর্থাৎ যথাযথ পরিমাপযুক্ত ব্যবস্থা ; ষষ্ঠ—অনুকরণ ও হস্তান্তর করিয়া অঙ্কিত সৌন্দর্য্যকে (নক্সা) বিস্তার করা। কোক্কাপত্রে* সেই-ইচি-টাকি চীনাঙ্কনের এই ষড়্‌বিধি আলোচনা করিয়াছেন। ভারতীয় ষড়ঙ্গের সহিত কোন কোন বিষয়ে চৈনিক বিধির সাদৃশ্য আছে—না থাকিলেই আশ্চর্য্যের বিষয় হইত। বস্তুতঃ এই দুইটী উৎস হইতেই প্রাচ্য শীলতার সৌন্দর্য্যপ্রসঙ্গ একটা স্থিরতর পীঠ লাভ করিয়াছে।

চৈনিক বিধির ভিতর ভারতীয় ষড়ঙ্গের একটা মুখ্য ব্যাপার নাই—সেটা হইতেছে 'ভাব'। ভারতীয় শীলতার দুর্লভ দৃষ্টি প্রাচ্যাঞ্চলে কোন জাতিই লাভ করিতে পারে নাই, কাজেই রস ও ভাবকল্পনাক্ষেত্রে ভারতেতর সর্ব্বত্রই একটা পঙ্গুতা ও সঙ্কীর্ণতা উপলব্ধি হয়। পরবর্ত্তীকালে চীনদেশে 'ওয়াঙ্গ ওয়েই'র (Wang Wei) প্রভাবে ভাবাভিব্যক্তির নূতন প্রয়াস আরম্ভ হয়।† দশম শতকে ভূচিত্র আলোচনা-প্রসঙ্গে কেহ কেহ অনুরূপ ষড়বিধির আলোচনা করিয়াছেন। সেগুলি হইতেছে—প্রাণবত্তা, সামঞ্জস্য, চিন্তা, আবেষ্টন, তূলিকা ও মসী। প্রাণবত্তার সাহায্যে তূলিকা-স্পন্দনের তালে তালে চিত্তস্পন্দন হয় এবং অভ্রান্তভাবে আকার সৃষ্টি হয় ; সামঞ্জস্য জ্ঞানে রূপায়তন সম্পন্ন হয় ; চিন্তাদ্বারা বিষয়ের অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য্য অংশ এবং অনাবশ্যক অংশ নির্ণীত হইলে শিল্পী মুখ্য ব্যাপারে মনোযোগ নিবদ্ধ করে। আবেষ্টন ও আবহাওয়ার (atmosphere) সাহায্যে ওস্তাদ শিল্পী অন্তরঙ্গ সত্য ও রহস্যকে প্রস্ফুট করিতে পারে। তূলিকার দক্ষতা চিত্রাঙ্কনের সমস্ত বিধিব্যবস্থাকে শিরোধার্য্য করে ও লীলাঙ্কনের স্বাধীনতা সম্ভব করিয়া তোলে। মসীজ্ঞানে পারদর্শী শিল্পী গভীর ও অগভীর বর্ণসঞ্চারদ্বারা বিষয়ের গুরুত্ব ও লঘুত্ব প্রকটিত এবং একটা স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা সৃষ্টি করে।

ভারতীয় অঙ্কনবিদ্যার বৈশিষ্ট্য আলোচনায় রসগ্রন্থাদির বিশেষ আলোচনা করা প্রয়োজন। সফল অঙ্কন কি এবং কৃতী অঙ্কনকার কে ?

"তরঙ্গাগ্নিশিখাধূমং বৈজয়ন্ত্যম্বরাদিকম্।
বায়ুগত্যা লিখেৎ বস্তু বিজ্ঞেয়ঃ স তু চিত্রবিৎ॥
সুপ্তঞ্চ চেতনাযুক্তং মৃতং চৈতন্যবর্জ্জিতং।
নিম্নোন্নতবিভাগঞ্চ যঃ করোতি স চিত্রবিৎ॥"

জগৎ গতিশীল ; ভারতের শক্তিবাদ সর্ব্বত্রই গতিবেগ কল্পনা করিয়া ধন্য হইয়াছে। এই গতিবেগমূলক জগদ্‌-ব্যাপারকে চিত্রে বিন্যাস করিতে না পারিলে সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। এ মুখ্য ব্যাপারটীকে প্রস্ফুট করিতেই বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে মার্কণ্ডেয় অতি সূক্ষ্ম উক্তি করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, কলাবিদ্যার অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায় এই গূঢ় তত্ত্বটী সকলের চোখে পড়ে নাই। মার্কণ্ডেয় বজ্রের প্রশ্নোত্তরে বলেন,* "নৃত্যকলা না জানিলে চিত্রকলা উপলব্ধি করা অতি দুরূহ......



রেখাঙ্কন—যশোদাগোপাল (বাঙ্গালাদেশ)

সঙ্গীতকলা না জানিলে নৃত্যকলা দুর্বোধ্য—কারণ সঙ্গীতকলা-বর্জ্জিত নৃত্য সম্ভব নয়।" বস্তুতঃ নৃত্যকলাতে এই গতি-বেগের শ্রী ও সামঞ্জস্য মুখ্য ব্যাপার ; কাজেই চিত্রকলাতে এই গতিবেগকে উপস্থাপিত ও সত্যোপেত করিতে না পারিলে সমস্ত ব্যাপারই ব্যর্থ হয়। এজন্যই স্থানান্তরে 'সশ্বাস চিত্র'কে শুভলক্ষণযুক্ত বলা হইয়াছে।† এ শ্রেণীর সংজ্ঞা জগতের কোথাও কোন রসবিধি উপস্থাপিত করে নাই।

এ রকমের অন্তরাত্মবিধি থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় রসকারগণ স্থূলবিধি আলোচনায়ও পরাঙ্মুখ হন নাই। বৃহৎসংহিতা

* Kokka—338.

† "To embody in a picture the emotion caused by reading a poem—such was the ambition of the Sung Landscapists who claimed Wang Wei as their ancestor."—Waley.

* দ্বিতীয় অধ্যায় ১-৯.

† "সশ্বাস ইব যচ্চিত্রং তচ্চিত্রং শুভলক্ষণম্।"

শুক্রনীতিসার, চিত্রলক্ষণ ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে হস্ত, পদ, মুখ ইত্যাদির বিশদভাবে পরিমাপ দেওয়া হইয়াছে। অঙ্কিত চিত্রের চারিটী রীতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকার উল্লেখ করিয়াছেন—সত্য, বৈণিক, নাগর ও মিশ্র। সত্যচিত্রে স্বাভাবিক প্রতিকৃতি, বৈণিকে কল্পনাত্মক, নাগররীতিতে বিষয়বৈচিত্র্য ও মিশ্ররীতিতে এ সমস্তের মিশ্র বৈচিত্র্য প্রকাশ করা হয়। মানুষের চিত্রাঙ্কনে পাঁচটী শ্রেণী আছে—হংস, ভদ্র, মালব্য, রুচক ও শশক; এ সমস্তের পরিমাপও দেওয়া হইয়াছে। নয় রকমের অঙ্গভঙ্গি কল্পনা করা অতি সুনিপুণ ও সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তির ফল। 'ঋজ্বাগতম্' অর্থাৎ সম্মুখের দৃশ্য, 'অনৃজু' বা পশ্চাতের দৃশ্য, 'সাচীকৃতশরীরং' অর্থাৎ বঙ্কিমদৃশ্য, আধুনিক চিত্রকারদের প্রিয় ব্যবস্থাগুলিকে মনে করাইয়া দেয়। এতদ্‌ভিন্ন 'অর্দ্ধবিলোচন' 'পার্শ্বগত' 'পরাবৃত্ত' 'পৃষ্ঠাগত' 'পরিবৃত্ত' ও 'সমানত' প্রভৃতি অঙ্গভঙ্গী-রচনাগুলিও অঙ্কনকলার চরম কৌলীন্য সূচিত করে। এতগুলি অঙ্গভঙ্গী শুধু সেই জাতিরই অধিগম্য হইয়াছে, যে জাতি বলিতে পারিয়াছে—নৃত্যকলা না জানিলে চিত্রকলা উপলব্ধি হয় না। নৃত্যকলায় অবয়বের সীমাহীন অঙ্গভঙ্গী দ্যোতিত হয় নানা উপায়ে—তূলিকা, বর্ণ ও বর্ত্তনাদির সহায়তায়। এই সমস্ত অপরূপ রূপভঙ্গী চিত্রার্পিত হইয়া ভারতীয় অঙ্কনবিদ্যাকে অতি মহার্ঘ করিয়া তুলিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অঙ্কনকলার নানা উপায় আছে। বর্ণ, রেখা, আলো, ছায়া ও বর্ণনা প্রভৃতির সাহায্যে অঙ্কনকার্য্য সুসম্পন্ন করা হয়। গুহাদি অঙ্কনে (Fresco) ব্যবহৃত বিশিষ্ট-শ্রেণীর বর্ণ, তৈলবর্ণ (oil colour), গালাযুক্ত বর্ণ (encaustic), ডিম্ব গঁদ প্রভৃতি মিশ্রিত বর্ণ (tempera), জলীয় বর্ণ (water colour), স্বর্ণ ও রৌপ্যবর্ণ প্রভৃতি বর্ণের বহুমুখী বৈচিত্র্য শুধু আধুনিক কালে নয়—প্রাচীন অঙ্কনেও ব্যবহৃত হইত। বর্ণ-বৈচিত্র্যের বিপুলতার ন্যায় রেখাবিন্যাসের বৈচিত্র্যের কথাও ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। চীন, জাপান ও ভারতের অঙ্কনকলা তাই বৈচিত্র্যে ও ঐশ্বর্য্যে জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছে।

বলা প্রয়োজন, অঙ্কন-কারুতার প্রতিষ্ঠা এ সব ছাড়াও সম্ভব হয়। রঙীন পাথর বা অন্য কোন কঠিন উপাদানের পারিপার্শ্বিক প্রয়োগে অতি বিচিত্র অঙ্কন সম্ভব হয়। ইউরোপের প্রাচীন মোসেয়িক (mosaic) এবং ভারতেরও অসংখ্য প্রস্তর ও ধাত্বঙ্কন-শিল্পে এ বিধির প্রয়োগ হইয়াছে। রঙীন সূতা, রেশম প্রভৃতি দ্বারা সুরঞ্জিত গালিচা ও নক্সাপূর্ণ বস্ত্র প্রভৃতিতে অতি সুন্দরভাবে অঙ্কনশিল্পের চর্চা সম্ভব হয়। রঙীন কাচের সহযোগে বিচিত্র নক্সাযুক্ত জানালা তৈয়ারী হয়। এ সকল ভিন্ন ভারতীয় 'শিল্পরত্নে' ধূলিচিত্রের উল্লেখও আছে—আধুনিককালে এ দেশে তাহা আলপিনা নামে পরিচিত। আলিপনাতে নক্সার সীমাহীন বৈচিত্র্য সঞ্চার করা যায়। বস্ত্রবয়নশিল্পে অঙ্কনকৃতিত্বের নানা পরিচয় প্রদান করা যায়। ভারতের মিনাশিল্প (enamel) ধাতুপাত্রে চিত্রাঙ্কন করিয়া সকলকে মুগ্ধ করে। এরূপে ঘটে, পটে, উদ্যানে, প্রকোষ্ঠে, প্রাসাদে



মিনার অঙ্কন (ভারতবর্ষ)

মন্দিরে নানা উপায়ে ভাবের অসংখ্য তরঙ্গভঙ্গ অঙ্কিত হইয়াছে। বস্তুতঃ অঙ্কনকলার বহুমুখী উপায় স্বীকৃত হইয়া মানুষের ভৌগোলিক আনন্দনিকেতন প্রস্তুত হইয়াছে।

অনেকেরই ধারণা আধুনিক ইউরোপীয় অঙ্কনবিধিতে আলো ও ছায়াসঞ্চারের যে ব্যবস্থা আছে, যাহা রেম্‌ব্রাঁদ (Rembrand) প্রমুখ শিল্পীর হাতে অনবদ্য লীলাভঙ্গীতে বিকশিত হইয়াছে—তাহা হয়ত ভারতবর্ষে জানা ছিল না। অঙ্কনবিদ্যার এই মহান্ আলম্বন সম্বন্ধে এ সংস্কার দূর হওয়া দরকার। অজণ্টার আলো ও ছায়ার ব্যঞ্জনা আছে; জাপানের প্রসিদ্ধ হরউজি (Horyuji) মন্দিরের স্বর্ণপ্রকোষ্ঠেও (Golden Hall) এ প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়।

বস্তুতঃ এ দেশের শিল্পরসিকগণ আলো ও ছায়া দ্বারা গভীরতা বা সামীপ্যসঞ্চার ব্যাপারকে 'বর্ত্তনা' নামে অভিহিত করিতেন। ভারতবর্ষের সমন্বয়-শীলতা সকল প্রথা ও উপাদানের আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য সাধন করে। এ দেশের অঙ্কনকৃতিত্বে রেখা, বর্ণ প্রভৃতির সার্থকতা কোথায়, তাহা একটী শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে—

"রেখাং প্রশংসন্ত্যাচার্য্যা বর্ত্তনাঞ্চ বিচক্ষণাঃ।
স্ত্রিয়ো ভূষণমিচ্ছন্তি বর্ণাঢ্যমিতরে জনাঃ॥"

(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, ৪১ অ°)

আচার্য্যগণ রেখাপ্রয়োগের সুষ্ঠুতা ও মহার্হতা প্রশংসা করেন, বিচক্ষণ লোকেরা আলো ও ছায়ার প্রয়োগে পুলকিত হন। নারীরা অলঙ্করণে তৃপ্ত হয় এবং সাধারণে বর্ণের উজ্জ্বলতায় মুগ্ধ হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে, 'বর্ত্তনা'-বিষয়ে ভারতীয় রচনাবিদ্ চিরকালই সজাগ থাকিতেন। পর-প্রেক্ষিত (perspective) ব্যবস্থাও ভারতীয় অঙ্কনের প্রধান অঙ্গ ছিল। ঋজ্বাগত, অনৃজু প্রভৃতি অবস্থা আঁকিবার সময় 'ক্ষয়' ও 'বৃদ্ধি'র সঞ্চার করিতে হইত। বর্ত্তনাসঞ্চারের ত্রিবিধ প্রথা বর্ণিত হইয়াছে—পত্রজ, ঐরিক ও বিন্দুজ প্রথা। পত্রজ প্রথায় রেখার বিপরীত প্রয়োগ (cross line) করিতে হয়, যেমন গাছের পাতায় আছে। অতি সূক্ষ্ম রেখা-প্রয়োগকে ঐরিক বলা হয়; বিন্দুজ প্রথায় রেখাপ্রবাহ থাকে না—অসংলগ্নভাবে বিন্দুর মত অঙ্কনের প্রয়োজন হয়। এ সমস্ত উপায়ে বর্ত্তনাবিধান বা আলো ও ছায়া দ্বারা গভীরতা ও দূরত্ব সূচিত করিতে হয়।

ইতরজনেরা বর্ণাঢ্যের প্রশংসা করে বলিয়া বর্ণসঞ্চারক্রিয়া লঘুভাবে আলোচিত হয় নাই। পশ্চিমের অঙ্কনকলায় বর্ণের স্থান কি এবং কোথায়, তাহা পরে আলোচিত হইবে। ভারতের বর্ণবিধি অতি অপূর্ব্ব ব্যাপার। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকার পাঁচটী মুখ্য বর্ণের উল্লেখ করিয়াছেন—শ্বেত, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ, হরিৎ। দুই তিনটী মুখ্যবর্ণের সংমিশ্রণে যে অগণিত মিশ্রবর্ণ রচিত হইতে পারে—তাহা বলিতেও তিনি ইতস্ততঃ করেন নাই এবং এই বর্ণগুলির গাঢ়তা ও লঘুতা ইত্যাদি ভেদে যে অসংখ্য বর্ণের সৃষ্টি হয়, তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ বর্ণের বৈচিত্র্য-বিধান সম্বন্ধে অতি গভীর সাধনা এদেশে হইয়াছে—তাহা শুধু ইতর জনের চিত্তবিচারের অপেক্ষা করে নাই।

রসবৈচিত্র্যের দিক্ হইতেও ভারতবর্ষে যে বর্ণবিচার ও বর্ণরূপকত্ব সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা জগতের পক্ষে অভিনব ব্যাপার। প্রত্যেক রসই একটী বর্ণে দ্যোতিত হয় এবং সে বর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পিত হইয়া থাকে। শৃঙ্গার, হাস্য, রৌদ্র, বীর, করুণ, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুতরসের দ্যোতক বর্ণ ও দেবতার একটী পর্য্যায় দেওয়া গেল—

রস	বর্ণ	দেবতা
শৃঙ্গার	কৃষ্ণ	বিষ্ণু
হাস্য	শ্বেত	রাম
রৌদ্র	রক্ত	রুদ্র
বীর	রক্ত	শক্র
করুণ	ধূসর	বরুণ
ভয়ানক	কৃষ্ণ	যম
বীভৎস	নীল	মহাকাল
অদ্ভুত	পীত	ব্রহ্মা

উপরি-উক্ত শ্রেণিবিন্যাস ঠিক প্রামাণ্য নয়—তবে প্রত্যেক দেবতাই বিশিষ্ট বর্ণে অঙ্কিত হইয়া থাকেন এবং সেইজন্য বর্ণগুলি একটী নূতন মহিমা লাভ করে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বাসুকি, দৈত্য, দানব, রাক্ষস প্রভৃতি দিব্যমূর্ত্তি অঙ্কনে কি বর্ণ ব্যবহৃত হইবে এবং নানা জাতির অঙ্কনেও কি বর্ণ ব্যবহৃত হইবে, তাহারও নির্দ্দেশ আছে। পুলিন্দ ও দক্ষিণাপথের লোককে মলিন বর্ণে; শক, যবন, পহ্লব ও উত্তরাপথের লোকদের শ্বেতবর্ণে; মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গবাসীদেরও মলিন বর্ণে আঁকিবার কথা আছে। সম্রাট্ ও ধনবান্ ব্যক্তিদের পদ্মের রঙ্ দিয়া এবং রুগ্ন, কুকর্ম্মী, শাপগ্রস্ত বা প্রায়শ্চিত্তপরায়ণকে কৃষ্ণবর্ণে আঁকিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। 'শিল্পরত্ন' ও 'অভিলষিতার্থচিন্তামণি'তে বর্ণ তৈয়ারীর ব্যবস্থা এবং প্রণালীর বর্ণনা আছে।



রেখাঙ্কন—লিনোকাট্ (ইউরোপ)

কাজেই দেখা যাইতেছে—ভারতবর্ষে অঙ্কনকৃতিত্বে সমগ্র উপায়েরই সমন্বয় করা হইয়াছে। কোন কোন দেশ রেখা-ঙ্কনের জন্য প্রসিদ্ধ, যেমন চীন দেশ; কোন দেশ বর্ণাঢ্যের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছে, যেমন মিশর দেশ; কোনও দেশ বর্ত্তনায় বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে, যেমন প্রাচীন গ্রীস।

কিন্তু সকল অঙ্গের একটী বিশিষ্ট সুসঙ্গতি স্থাপিত হইয়াছে ভারতীয় অঙ্কনকলায়। অজণ্টা গুহার চিত্রাবলী এবং মোগল আমলের চিত্রাবলী এ বিষয়ের দৃষ্টান্তস্থল।

ইদানীং ইউরোপে অঙ্কনকৃতিত্ব নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে—রেখা ও বর্ণাদির নিঃসঙ্গ সাহায্যে স্বাধীনভাবে



ছায়াপন্থী অঙ্কন—Impressionist (ইউরোপ)

অঙ্কনচর্চ্চা সুরু হইয়াছে। শুধু রেখা দ্বারা অঙ্কনের এক বিশ্বব্যাপী আগ্রহ দেখা দিয়াছে। সাদাকালো রঙে (Black and white) নূতন অঙ্কনমাহাত্ম্য ফুটিয়া উঠিতেছে; etching বা রুক্ষরৈখিক অঙ্কন এক শ্রেণীর নূতন প্রতিকৃতি ও দৃশ্যরচনা সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে—যাহার পেলবত্ব চিত্তাকর্ষণ করে। লিনোকাট্ (Linocut) প্রভৃতিও রেখাঙ্কনের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। বিশুদ্ধ রেখাবর্ত্তের নিঃসঙ্গ কারুতার এই স্বাধীন প্রতিফলন আধুনিক অঙ্কনজগতে একটা বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে।

কিন্তু এ রকমের রেখারচনাও এদেশে ছিল না যে, তাহা নয়, বরং কোন কোন বিষয়ে এ শ্রেণীর প্রাচীন রচনাকে পরাভূত করিবার ক্ষমতা আধুনিক যন্ত্রজগতের পক্ষে অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে বাঙ্গালাদেশের পটের বলিষ্ঠ সারল্য এবং অখণ্ড লীলা-ভঙ্গী অপরাজেয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। রেখাচিত্রের এরূপ প্রাণবান্ সৌন্দর্য্য দুর্লভ। তিব্বতীয় রচনাতেও এরূপ নিঃসঙ্গ রেখালীলা আছে—তাহাতে কোন রকম কৃত্রিম আবহাওয়া বা বঞ্চনার উপসর্গ নাই; এক সতেজ সরলতায় তাহা লোভনীয় ভাবে মণ্ডিত। এই ঋজুতা ও দার্ঢ্য অনুকরণ করিবার জন্যই পশ্চিমের বিখ্যাত আধুনিক শিল্পী মাতিস্ (Matisse) ও গোগ্যাঁ নিগ্রো-রচনা ও তাহিতী দ্বীপের আবহাওয়া অধ্যয়ন করেন।

ইউরোপের আর এক শ্রেণীর অঙ্কনবিদ্ রেখাকে বর্জ্জন করিয়া শুধু বর্ণবিন্যাসের উপাসনায় বিভোর হইয়াছেন। ইউরোপের বিশ্লেষক ও ব্যতিরেকী (analytic) সাধনা বিরোধ ও বর্জ্জনের উৎসাহে একান্ত অধীর হইয়া পড়ে। ম্যাক্‌ডোনাল্ড রাইট (Macdonald Wright) শুধু রেখামাত্র নয়, বিষয়কেও নির্ব্বাসিত করিয়া বর্ণ-হিল্লোলের বিচিত্র পট আঁকিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। ইনি আমেরিকার অধিবাসী। এই শিল্পী বৃত্তাকারে বর্ণস্তরের প্রলেপ দান করিয়া এক অনির্ব্বচনীয় চিত্র আঁকিয়াছেন। এ শ্রেণীর ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশের সাধনা একান্ত বুদ্ধিবৃত্তির (intellectual) ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। রূপ-কলার ভিতর নৈসর্গিক প্রেরণার প্রসার না থাকিলে তাহাতে রসশ্রী দেদীপ্যমান হয় না। বুদ্ধির সাহায্যে বর্জ্জন ও গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ হিসাব করিয়া আঁকা একটা বৈয়াকরণিক প্রবৃত্তি মাত্র। এ সমস্ত কারণে ইউরোপে সচকিত ও একান্ত জাগ্রৎ বুদ্ধিগম্য বর্ণাঙ্কন নিরঙ্কুশ হয় নাই। এ দেশেও বর্ণ-স্তরের সাহায্যে অর্থাৎ বিশিষ্টভাবে বর্ণপ্রলেপের দ্বারা অঙ্কনও দুর্লভ নয়। অজণ্টার যে চিত্রটী দেওয়া গেল, তাহাতে রেখার ইন্দ্রজাল নাই বলিলেই চলে,—আছে শুধু বর্ণস্তরের



ছায়াপন্থী অঙ্কন (ভারতবর্ষ, অজণ্টা)

সাহচর্য্যে চিত্র-শ্রী প্রকাশ। এ চিত্রের অসামান্য কারুতায় মুগ্ধ হইতে হয়। দেখা যাইতেছে, অতি আধুনিককালেও বর্ত্তমান-অঙ্কনবিদ্যার নানা আন্দোলন যে সমস্ত বিচিত্র ফল প্রসব করিয়াছে—বহু শতাব্দী পূর্ব্বে বিশিষ্ট আন্দোলন ছাড়াও শিল্প-

শাস্ত্রকারগণের ইঙ্গিতে শিল্পীরা সে শ্রেণীর রচনা সুসম্পন্ন করিয়া আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছেন।

পশ্চিমে শুধু আলো ও ছায়ার প্রয়োগেও এ যুগে চিত্রাঙ্কনের একটা পদ্ধতি সৃষ্ট হইয়াছে। আলো ও ছায়াকে মুখ্য করিয়াই এ শ্রেণীর অঙ্কনে বর্ণসঞ্চার করা হইয়াছিল। কারণ এই রূপচক্রের সেবকগণ মনে করিতেন যে, চিত্রের ভিতর আলো ও ছায়ার সমাবেশই প্রধান ব্যাপার। আলোর প্রভাবে প্রতি মুহূর্ত্তেই বর্ণের পরিবর্ত্তন হয়—একই দৃশ্য প্রভাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় ভিন্ন আকার ধারণ করে। তাহাদের মতে গাছপালা নয়—আলোটাই দৃশ্যের ভিতরকার সত্য বস্তু; তাহাকে অঙ্কনের দ্বারা উদ্ঘাটিত করিতে না পারিলে—চিত্রচেষ্টাই বিফল হয়। এ শ্রেণীর অঙ্কনকারদিগকে ছায়াপন্থী (Impressionists) বলা হইয়াছে। মোনে (Monet) ও মানে (Manet) এ শ্রেণীর চিত্রাঙ্কনে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। সুরা (Seura) ও সিনিয়াক (Signiac)* এ শ্রেণীর বিখ্যাত চিত্রকর।

একান্তভাবে বিশ্লেষণমূলক কোন অঙ্কনচেষ্টাই রসশ্রেণীতে স্থায়ী স্থান অধিকার করিতে পারে না। স্বপ্রতিষ্ঠ আলো ও বহিঃপ্রতিষ্ঠ আলোতে বিভেদ আছে। বহিঃপ্রতিষ্ঠ আলোর স্বাধীন সংহতি নাই—তাহা পরকীয় আশ্রয়ে পুষ্ট হয়। এই পরকীয় আশ্রয়কে তুচ্ছ করিলে জিনিষটা অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। ভারতীয় দেবমূর্ত্তিতে স্বপ্রতিষ্ঠ ও আনুকেন্দ্রিক আলোকমণ্ডল আছে—প্রভাতোরণ আছে। এ আলোকমণ্ডল অঙ্কনের বিষয়ীভূত হইয়াছে—কিন্তু অনাশ্রিত ও উপাধিযুক্ত আলো-অঙ্কনের কৃত্রিম চেষ্টা একান্ত অলীক বলিয়া এ দেশে তাহা প্রচলিত হওয়া সম্ভব হয় নাই। পশ্চিমেও বস্তুতঃ এ শ্রেণীর চিত্র একটা বৈজ্ঞানিক খেয়ালে পর্য্যবসিত হয়। ভারতবর্ষের মোগল আমলের নৈশচিত্রে 'আলো' অঙ্কনের অতি নিপুণ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অপরপক্ষে চীনদেশে আলো ও ছায়ার এই বৈপরীত্যই দুঃসহ। চিত্রে সেখানে ছায়ার প্রতিফলন নাই, সেখানকার দৃশ্যে আছে অবিরোধী আলো বা neutral light। অঙ্কিত সমগ্র পটই ছায়াবর্জ্জিত আলোতে পূর্ণ। কথিত আছে, কোন চৈনিক সম্রাট্ ইউরোপীয় চিত্রে কৃষ্ণবর্ণ ছায়ারোপ দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং এ শ্রেণীর অঙ্কনের তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করেন। চৈনিক শিল্পীরা ইউরোপীয় চিত্রকলাকে চিত্রাঙ্কন বলিয়াই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন।

আলো ও ছায়াকে আলঙ্কারিক দিক্ হইতে অঙ্কন করিয়াছে রেম্‌ব্রাঁদ (Rembrandt)। রেম্‌ব্রাঁদের প্রেয়সী সাস্‌কিয়া (Saskia) সুন্দরী নারী ছিলেন না, কিন্তু শিল্পী তাঁহার প্রিয়তমার চিত্রাঙ্কনে এমনিভাবে আলো ও ছায়া নিয়োগ করিয়াছিলেন, যাহাতে অসুন্দর অংশটুকু ঢাকা পড়ে। বস্তুতঃ শিল্পীর কৃতিত্বে অঘটন ঘটন সম্ভব হয়। কোন চৈনিক শিল্পী নিজের পৃষ্ঠপোষকের চিত্রাঙ্কনে উৎসাহ প্রকাশ করিলে তিনি বলেন "আমি দেখিতে অতি কদাকার—তুমি আমার চিত্র আঁকিও না"। শিল্পী উত্তর করেন,—"প্রভু তোমার সব অংশই দেখিতে ভাল—শুধু চোখই দেখিতে খারাপ; তোমার চোখের উপর আমি এমনি একটা আবরণ দিব, যাহাতে সূর্য্যের উপর পাত্‌লা মেঘের আবরণ পড়িলে যেমন তাহার শোভা বৃদ্ধি করে—তেমনি তোমার চোখের শোভা আরও বৃদ্ধি পাইবে।" শিল্পীর হাতের আলো ও ছায়াদি রঙের তাসের মত—তাহা সম্পদ্ ও শ্রী বাড়ায়।



নারীমূর্ত্তি—ফ্রেস্‌কো (শ্রীগৃহ, লঙ্কাদ্বীপ)

চিত্রাঙ্কনের বিষয় লইয়াই ইদানীং পশ্চিমে বিশেষ আলোচনা আরম্ভ হওয়ায় অঙ্কনকলার এক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। আধুনিক রসতাত্ত্বিকগণের মতে চিত্রার্পিত বিষয় বা বর্ণনা রম্যকলার মুখ্য ব্যাপার নয়—উপলক্ষ্য মাত্র। তাহার ভিতরকার প্রণিধানযোগ্য ব্যাপার হইতেছে রসবিচ্ছুরণ। তাহাদের মতে রম্যকলা যতটা বিষয়গত বস্তু হইতে নিজকে মুক্ত করিতে পারিবে, ততই তাহা আনন্দদায়ক হইবে। সঙ্গীতে যেমন যে বিষয় লইয়া সুরের খেলা চলে, সে বিষয়টী মুখ্য

* Pointillist বা Divisionistদের শিল্পচক্রপ্রবর্ত্তক।

ব্যাপার নয়—গৌণ মাত্র, এবং সুরের খেলাটাই মুখ্য, তেমনি অঙ্কনকলার ভিতরকার চিত্রার্পিত ছন্দটাই মহার্হ ব্যাপার, তদতিরিক্ত যাহা কিছু তাহা রস-বাহন মাত্র—রসপদার্থ নয়। ইংলণ্ডের পেটার (Watter Pater) প্রমুখ রসতাত্ত্বিকগণ এজন্য সঙ্গীতকলাকে সকল কলাবিদ্যার অনুকরণীয় (anders-streben) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।* সকল কলাকেই মিশ্র অবস্থা হইতে উন্মুক্ত করিয়া খাঁটি করিবার চেষ্টা হইতেছে। ইহার ফলে অঙ্কনবিদ্যার ক্ষেত্রে বিষয়বৈচিত্র্যকে অন্তর্হিত করা হইতেছে। শুধু রেখাঙ্কনের কারুতা বা বর্ণাঙ্কনের মাধুর্য্যকে উপস্থিত করাই প্রশংসার বিষয় হইয়াছে। Kandinsky প্রমুখ শিল্পিগণের চিত্রে কোন পরিচিত বস্তু বা বিষয়ের অনুকৃতি নাই। কেবল তুলিকার টানের লালিত্য ও বর্ণসঙ্গতির কারুতা লইয়া অঙ্কনের একটা কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি হইয়াছে। বলিতে গেলে এ সমস্ত সৃষ্টি ইউরোপীয় বুদ্ধিবাদের প্রসূন বলিতে হয়—কারণ সহজ মানব-হৃদয়ে কোনরূপ নিষ্ঠুর ও জাগ্রৎ ভেদবুদ্ধির শাসন সম্ভ হয় না।

রূপকাত্মক (symbolical) সৃষ্টি হইতেছে ঠিক ইহার বিপরীত। রূপকের সাহায্যে যখন কিছু প্রকাশ করিতে হয়, তখন রূপক জিনিষটা (symbol) মুখ্য হয় না—রূপক যে জগৎকে সূচিত করে (suggest) তাহাই মুখ্য হইয়া পড়ে। প্রত্যক্ষ জিনিষের ভিতর দিয়া অপ্রত্যক্ষকে সূচিত করা হইতেছে রূপকাত্মক অঙ্কনের ধর্ম্ম। প্রাচীন অঙ্কনবিদ্যা এরূপে অতি গভীরতম আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে রূপার্পিত করিয়াছে। ইউরোপীয় অঙ্কনচেষ্টায় 'ঘুঘু', 'মেষশাবক', 'সাপ' প্রভৃতির ভিতর দিয়া সরলতা, নিরীহতা ও খলতা প্রভৃতি ভাবের প্রতিফলন হইয়াছে। চৈনিক ড্রাগনও আধ্যাত্মিক অনুভূতির দ্যোতক। জাপানী উদ্যানে উৎস ও প্রস্তরসমূহ সুবিন্যস্ত করিয়া এমনি একটা রচনাঙ্কন করা হয়, যাহাতে আধ্যাত্মিক নানা বার্ত্তা সূচিত করে। ভারতেও ষট্‌চক্রাদি অঙ্কনের দ্বারা নূতন জগতের সূচনা করা হইয়াছে—শুধু চক্রগুলিই সেখানে মুখ্য ব্যাপার হয় নাই। অনেক সময় গভীর আধ্যাত্মিক জগৎকে স্থূলতার ভিতর দিয়া উপস্থাপিত করা দুরূহ হয় বলিয়া বিষয়গত রূপকের প্রাচুর্য্য সকল উচ্চশ্রেণীর কলার ভিতর অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

তবুও অঙ্কনকলায় রূপ ও রূপকের যুগ্মসম্পর্ক প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে অক্ষত আছে। ইউরোপের নব্যাঙ্কনে (Post-Expressionist) Kandinskyর প্রবর্ত্তিত ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া আবার বর্ণনাসম্পর্ক লাভ করিয়াছে।



খৃষ্টমূর্ত্তি অঙ্কন—র‍্যাফেল (ইউরোপ)

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকলার চরমসৃষ্টি দেবরচনা ও মহাপুরুষ রচনায় অতি সহজে লক্ষিত হয়। ইউরোপে যীশুখৃষ্টের রূপাঙ্কনে যুগের পর যুগ অব্যাহত চেষ্টা চলিয়াছে। আদিম গুহানিহিত (Catacomb) খৃষ্টের ছবিতে আছে বিষণ্ণ ও মলিনভাব। সেকালে খৃষ্টীয় বিধি সৌন্দর্য্যকে অধ্যাত্মজগতের পরিপন্থী মনে করিত। "Flesh is death, Spirit is life" ইহাই ছিল তাহাদের জপমন্ত্র। কাজেই তাহারা বৈজন্তীয় আমল পর্য্যন্ত রুগ্ন, মলিন ও বিষণ্ণ খৃষ্টরূপ অঙ্কন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে।*

* "Art then is thus always striving to be independent of mere intelligence, to become a matter of pure perception, to get rid of its responsibilities to its subject or material, the ideal examples of poetry and painting being those in which the constituent elements of the composition are so wedded together that the material or subject no longer strikes the intellect only; but form and matter in their union or identity present one single effect to the imaginative reason, that complex faculty for which thought and feeling is twin born with its sensible analogue or symbol."—W. Pater.

* "In the Church of San Vitale in Ravenna of the sixth century, the spirit of the antique had almost passed;

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, নাইসীয় কাউন্সিলে পাদ্‌রীগণ এমন একটা অনুজ্ঞা জারি করেন, যাহাতে শিল্পীরা খৃষ্টমূর্ত্তিতে কোনরূপ লালিত্যবিধান না করেন। ইহাতে শিল্পীরা বহুপরিমাণে স্বাধীন পথ অবলম্বন করিতে সাহসী হন নাই।

পশ্চিমে খৃষ্ট, পূর্ব্বাঞ্চলে বুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণ অবতার বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন। দেবমূর্ত্তি একান্তভাবে স্বর্গীয় ব্যাপার—তাহাতে মানবিকতা নাই বলিয়া মানবচিত্তের সহিত স্থূল সামাজিকতা সম্ভব হয় না। কিন্তু অবতারগণ একাধারে দেবতা ও মানুষ; সীমা ও অসীমের যুগ্মমিলন হয় অবতার-কল্পনায়। এইজন্য সকল দেশের ও কালের অঙ্কনবিদ্যায় অবতার অঙ্কনে একটা সমানভূমি পাওয়া যায়। একথা বলাই বাহুল্য, সমস্ত দেশের বা সভ্যতার চরম দানই কল্পিত হইয়াছে এশ্রেণীর অঙ্কনে। কাজেই অঙ্কনকলার গৌরীশঙ্করশৃঙ্গ লক্ষ্য করিতে হয়—সকল দেশে এ শ্রেণীর অভিমানব কল্পনায়। ইউরোপের রেনাঁসাস্ (Renaissance) যুগের অঙ্কনবিদ্‌রা পশ্চিমে চরমসৃষ্টি সফল করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া বিশ্বময় একটা খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছে। যদিও ফ্রা এঞ্জেলিকো (Fra Angelico) প্রভৃতি শিল্পীর কৃতিত্ব কাহারও মতে প্রচুর, তবুও র‍্যাফেল, লিয়নার্দ-দা-ভিন্সি ও মাইকেল এঞ্জেলোর নাম এ প্রসঙ্গে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। র‍্যাফেলের অঙ্কিত খৃষ্টচিত্র ইউরোপীয় শীলতার অন্তরাত্মপ্রকৃতি সূচিত করে। র‍্যাফেল-রচিত খৃষ্টের মূর্ত্তির দৃষ্টি বাহিরের দিকে—অন্তরের দিকে নয়। কোনও সাধনায় পরমতত্ত্ব বাহিরের ব্যাপার—কোন সাধনায় তাহা অন্তরের বস্তু। এজন্য ভারতীয় বুদ্ধ আত্মনিবিষ্ট ও অন্তর্মুখীন—খৃষ্টচিত্র বহির্মুখীন। র‍্যাফেল-অঙ্কিত খৃষ্টমূর্ত্তিতে মুখের পারিপাট্য আছে—কিন্তু ভাবের ব্যঞ্জনা অতি যৎসামান্য। শুধু আকাশের দিকে নিবদ্ধ চোখ—অথচ মুখশ্রীতে বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আভ্যন্তরীণ মননের কোন সুষ্ঠু প্রতিফলন নাই। গ্রীকেরা মুখ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে কোন বিশিষ্ট ভাবের বাহনরূপে কল্পনা করিতে পারে নাই। শুধু মাংসপেশীবহুল সুগঠিত জড়পিণ্ড হিসাবেই সে সব রচিত হইত। এজন্য মুদ্রা, অঙ্গভঙ্গী, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদির ভিতর দিয়া কোন উচ্চতর লোকের ব্যঞ্জনা ইউরোপীয় অঙ্কনকার সম্ভব করিতে পারে নাই। ভারতীয় ব্যঞ্জনা অন্যশ্রেণীর। ললিতবিস্তরাদি গ্রন্থে মহাপুরুষের বত্রিশটী লক্ষণের উল্লেখ আছে এবং অনুব্যঞ্জনার লক্ষণ প্রায় অশীতিসংখ্যক। কাজেই দেহসীমার প্রতি অংশকেই অপরূপ-জগতের প্রকাশকরূপে লক্ষ্য করা ইউরোপের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ফলে র‍্যাফেল বা ইউরোপীয় অন্যান্য চিত্রকারদের অঙ্কিত খৃষ্টমূর্ত্তি একটা মাংসপেশীপূর্ণ দেহপিণ্ডমাত্র—তাহার ভিতর কোন সূক্ষ্মতর জগতের প্রতিভাস নাই। র‍্যাফেলের অঙ্কিত খৃষ্টচিত্র একটা পরিচ্ছদশোভিত অভিনেতার চেহারামাত্র, সত্যকার কোন সহজ অতীন্দ্রিয়লোকের বার্ত্তাবাহক দিব্যপুরুষ নহে। অতি আধুনিক যুগেও নূতন নূতন খৃষ্টমূর্ত্তি নূতন পোষাকে ও ভঙ্গীতে রচিত হইয়াছে, কিন্তু এ সমস্ত মূর্ত্তিতে রসসমাবেশ অতি সামান্য। স্যর্ এড্‌ওয়ার্ড বার্ণেস্ জোন্‌স্ খৃষ্টচিত্র অঙ্কনের ব্যর্থতা স্মরণ করিয়া একবার বলিয়াছেন—জীবনে যতবার তিনি খৃষ্টচিত্র আঁকিতে গিয়াছেন, ততবারই তিনি ব্যর্থ হইয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা ইউরোপেরই স্বীকৃতি—আধুনিক অঙ্কনকার খৃষ্টকে মুটের চেহারায় আঁকিয়াও তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। এইরূপে খৃষ্টকে শ্রমিক আন্দোলনের অন্তর্ভূত করিয়া ইউরোপ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে।



বুদ্ধমূর্ত্তি অঙ্কন (ভারতবর্ষ, অজন্টা)

অপরদিকে, প্রাচ্যাঞ্চলে বুদ্ধ কখনও মুটের বেশ ধারণ

in the basilica of San Lorenzo fuori-le-mura the bearded Christ is no longer sublime and dignified but wan and emaciated; while in the Church of SS. Nazarus and Celsus at Ravenna, there is a mosaic of the fifth century in which even the sheep are beginning to look with gloomy and dissatisfied eyes."—A. M. Ludovici.

করেন নাই কিংবা অন্য কোন নাটকীয় ঘটনার পরিচ্ছদে তাঁহাকে ভূষিত করিয়া কেহ আত্মপ্রসাদ লাভ করে নাই। ভারতের, চীনের ও জাপানের বুদ্ধ-চিত্রাঙ্কন প্রাচ্য শীলতার চরম দান। গভীরতম মনস্তাত্ত্বিক জগতের অসংখ্য ছন্দ দ্যোতিত হইয়াছে—এই সমস্ত চিত্রে। সমগ্র প্রাচ্যজগতের সভ্যতার প্রতিভূ হইয়াছে বুদ্ধমূর্ত্তি।

অজণ্টার বুদ্ধমূর্ত্তি এ সম্পর্কে জগতের ইতিহাসে একটী সমুচ্চ দান। অসীম কারুণ্যে ভরপুর এ মূর্ত্তির তুলনা নাই—এ অঙ্কন সৌন্দর্য্যকলার অভ্রভেদী ফলক। ভারতীয় সভ্যতা বহুশতাব্দীর সাধনায় অন্তরে যে অলৌকিক সম্পদ্ আহরণ করিয়াছে—কয়েকটী রেখার পুলকিত প্রয়োগে এবং বর্ণের বিচিত্র প্রলেপে সে অসীম সৌন্দর্য্যকেই উদ্ঘাটিত করিয়াছে। অন্তরজগতের সীমাহীন কারুতা দেহসীমার সমগ্র বাধা ভেদ করিয়া অমলিনভাবে দেদীপ্যমান হইয়াছে। ভারতীয় রেখাঙ্কনে প্রস্ফুট হইয়াছে মনস্তাত্ত্বিক-জগতের একটা বাহ্যরূপ; যাহা সুগুপ্ত ছিল, তাহাকে দেহাবরণের বাহিরে দ্যোতিত করা হইয়াছে—রেখাভঙ্গীর মায়াজালে। প্রতি রেখাই এ ক্ষেত্রে অধ্যাত্মবাণীর বাহক—প্রতি বর্ণই আন্তরজগতের উত্তুঙ্গ কিরীটের প্রতিফলক। প্রাচ্যসাধনার সাফল্য এ শ্রেণীর একটা মূর্ত্তির অঙ্কনেই স্বপ্রকাশ হইয়া পড়ে।

অপরপক্ষে, শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি অঙ্কনে প্রতিফলিত হইয়াছে, ভাব-জগতের অন্য সীমান্ত। শ্রীকৃষ্ণের রাজবেশে রাজপুতকলা উদ্ঘাটিত করিয়াছে, ভারতীয় রাজবিধির রঞ্জনধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের বহুমুখী কারুতা উদ্ঘাটিত করিয়া ভারতীয় শীলতা দেখাইয়াছে—শুধু অরূপের রূপাঙ্কনে ভারতীয় কারুতা নিবদ্ধ নয়—কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক জগতের বহুমুখী রসসঞ্চারে ভারতের সফলতা নিবদ্ধ নয়; রূপজগতের ভোগরাজ্যের সকল দিক্ ও সীমান্ত ভারতীয় অঙ্কনকারের পরিচিত। যে দেশে চৌষট্টিকলার সাধনা হইয়াছে, সে দেশ শুধু শুষ্ক অধ্যাত্মতত্ত্ব ও সন্ন্যাস লইয়া আত্মহারা হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের নারীনির্ম্মিত গরুড়বাহন এ শ্রেণীর একটী অপরূপ সৃষ্টি। উদ্দাম রসমত্ত গোপিনী-রচিত বিচিত্র বাহনে আরূঢ় হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাইতেছেন—ইহা ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয় জগতের একটী সুরম্য সেতু। লৌকিক দিক্ হইতে ইহার রসমূর্চ্ছনায় আছে ভোগ-বিলাসের পারিপাট্য। অলৌকিক দিক্ হইতে আছে একটী তূরীয় লীলার অপরূপ পার্থিব প্রকাশ। জগৎনাট্যের নায়ক রূপরসাতীত রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া কিরূপে রূপজগতে লীলা-ভিনয় করিয়াছেন, তাহাই দ্যোতিত হইয়াছে এই দ্বৈততত্ত্বমূলক চিত্রাঙ্কনে। বস্তুতঃ ভারতীয় রূপতত্ত্ব একদেশদর্শী কোন সৃষ্টিতে নিবদ্ধ হয় নাই।

অরূপতত্ত্বে দীক্ষিত, অধ্যাত্মবলে বলীয়ান্ ভারত অতি সন্তর্পণে এরূপে রূপ ও অরূপের, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মিলন সম্ভব করিয়াছে। প্রাথমিক ইতিহাসে শিল্পীরা অতি সঙ্কোচের সহিত জটিল অধ্যাত্মজগৎব্যঞ্জনায় অগ্রসর হইয়াছে। বস্তুতঃ



রাধাকৃষ্ণের রাজবেশ (ভারতবর্ষ, নেপাল)

অঙ্কনাদি বিষ্ণার আদিম বিবরণ অলৌকিক ব্যাপারের সহিত এজন্যই জড়িত। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে আছে, ঋষি নারায়ণ অপ্সরাদের সলজ্জ করিতে আম্ররসের সাহায্যে উর্ব্বশীর মূর্ত্তি অঙ্কন করেন। ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তা'তে আছে—রাজা উদয়ন ও রাজকুমারী বাসবদত্তার মূর্ত্তি অঙ্কন করিয়া উভয়ের উদ্বাহকার্য্য নিষ্পন্ন করা হয়। একটী অষ্টাদশ শতকের তিব্বতীয় পুঁথিতে* আছে, কোন রাজা জলের প্রতিবিম্বের সাহায্যে বুদ্ধমূর্ত্তি রচনা করিয়াছিলেন। এ শ্রেণীর অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তিব্বতে Pu-ton Rimpo-Che এর Cho Chungএ আছে, ভারতবর্ষীয়দের তিব্বতীয়গণ যাদুকর মনে করিত।

এ প্রসঙ্গে চিত্রলেখার প্রাচীন গল্পেরও উল্লেখ করিতে হয়।

* "D'pag bsan ljon bzair"—শরৎচন্দ্র দাস সম্পাদিত।

রাজকুমারী উষা একটী সুন্দর যুবককে স্বপ্নে দেখিয়া অঙ্কন-বিদ্যায় সুদক্ষ সখী চিত্রলেখাকে সে বিষয় উল্লেখ করেন। চিত্রলেখা রাজকুমারীকে সান্ত্বনা দিতে একে একে সমগ্র দেবতা-মণ্ডলী ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের চিত্র অঙ্কন করে। কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের মূর্ত্তি অঙ্কিত হইলেই রাজকুমারী তাঁহাকে স্বপ্নদৃষ্ট যুবক বলিয়া প্রকাশ করেন। পরিশেষে উভয়ের উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। সপ্তদশ শতকের ঐতিহাসিক তারনাথের মতে দেবতারাই প্রথম চিত্রাঙ্কনপ্রথার সূত্রপাত করেন। তাহার পর যক্ষ ও নাগেরা অঙ্কনবিদ্যাকে সমৃদ্ধ করে। এ সমস্ত দেবরীতি, যক্ষরীতি ও নাগরীতি নামে উল্লিখিত হইয়াছে। তারনাথের মতে যক্ষরীতি রাজা অশোকের সমসাময়িক (খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতক) এবং নাগরীতি নাগার্জ্জুনের সময়ে প্রচলিত ছিল।



নারী-গরুড়ারূঢ় শ্রীকৃষ্ণ (ভারতবর্ষ, নেপাল)

পরবর্ত্তী যুগের অঙ্কনরীতির বিষয়েও তারনাথ আলোচনা করিয়াছেন। তিনটী প্রধান চক্র ভারতে প্রাধান্য লাভ করে—মধ্যদেশের চক্র, পশ্চিমের চক্র ও পূর্ব্বাঞ্চলের চক্র। মধ্য-দেশের রীতি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে দৃষ্ট হয়। মগধের বিম্বিসার নামক চিত্রকর এ রীতির প্রবর্ত্তক। এ শিল্পী বুদ্ধপক্ষ নৃপতির রাজত্বের সময় ষষ্ঠ শতকে জন্মগ্রহণ করে। তারনাথের মতে এই রীতির অনুকারক বহু শিল্পী ছিল এবং এই রীতি দেব-রীতিকে অনুসরণ করিত। পশ্চিমের শিল্পচক্রের কেন্দ্র ছিল রাজপুতানা এবং শৃঙ্গধরই এই রীতির প্রধান শিল্পী ছিলেন। উদয়পুরের নৃপতি শিলাদিত্যের যুগে এই শিল্পী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এ প্রথায় যক্ষরীতি অনুসৃত হইত। ধর্ম্মপাল ও দেবপালের রাজত্বের সময় পূর্ব্বাঞ্চলের রীতি প্রবর্ত্তিত হয়। ইহা নাগরীতির দ্যোতক। এ প্রসঙ্গে ধীমান্ ও বিটপালের নাম প্রধানতম শিল্পিরূপে খ্যাত হইয়াছে।

বাঙ্গালাদেশ হইতে নেপাল ও তিব্বতে অঙ্কনকলার ধারা প্রসারিত হয়। নেপালী শিল্পীরা এই রীতিকে সুদূর পূর্ব্বাঞ্চলে বিস্তৃত করে। চৈনিক সম্রাট্ কাবলা খাঁর আমলে আনিকো নামক একজন নেপালী শিল্পীকে রম্যকলাবিভাগের প্রধান পদ দেওয়া হয়। ক্রমশঃ জাপানেও এই কলাসংস্পর্শ ঘটে।

এরূপে প্রাচ্যকলাক্ষেত্রে ভারতীয় অঙ্কনপ্রথা ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়। পূর্ব্ব এশিয়া শুধু যে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহা নহে, নিজেদের অসংখ্য মন্দিরে ভারতের বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তিও গ্রহণ করিয়াছে। এই মূর্ত্তির পদাঙ্কে প্রসারিত হইয়াছে ভারতীয় অঙ্কনরীতি—যে রীতি হইতে বুদ্ধমূর্ত্তিকে বিযুক্ত করা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ ভারতীয় অঙ্কনশিল্পের এই বিজয়যাত্রা কিছুতেই এবং কোথাও নিরস্ত হয় নাই।

ক্রমশঃ ভারতের সমন্বয়প্রথা চীনদেশ এবং জাপানেও গৃহীত হইয়াছে। শুধু রেখাঙ্কন মাত্র নয়, শুধু বর্ণাঙ্কনও নয়—বর্ত্তনা, অলঙ্করণ ও বর্ণাঢ্যতা, সকলদিকেই সুদূর প্রাচ্যে অঙ্কনকলা সমৃদ্ধ হইয়া রসগ্রাহীদের তৃপ্তিবিধান করিয়াছে।

অঙ্কপল্লী (আনকপল্লী)—উড়িষ্যার পুরীজেলায় অবস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম ; সুপ্রাচীন কলিঙ্গনগরের দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়

অঙ্কপাত—(পুং) [অঙ্ক-পত-ঘঞ্, ৬-তৎ] অঙ্ক রাখা।

এক হইতে নয় পর্য্যন্ত নয়টী মূল অঙ্কের এবং শূন্যের আনুকূল্যে গুণ ও যোগ দ্বারা যে রাশি লিখিত হয়, তাহাকে অঙ্কপাত কহে। অঙ্কবিন্যাস, রাশিলিখন।

অঙ্কের দক্ষিণ পার্শ্বে যতগুলি শূন্য দিবে, মূল অঙ্কের তত দশগুণ সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। যথা, ১ একটী একক অঙ্ক, ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে একটী (০) শূন্য রাখিলে দশ হইবে। অর্থাৎ একের দশগুণ সংখ্যা বৃদ্ধি হইল। দুই অঙ্কের পার্শ্বে একটী (০) শূন্য দিলে দুই অঙ্কের দশগুণ সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। যথা ২০ বিংশতি হইল। অর্থাৎ (২) অঙ্কের দশগুণ। এইরূপ, ৩০ ত্রিংশৎ, ৪০ চত্বারিংশৎ, ৫০ পঞ্চাশৎ, ৬০ ষষ্টি, ৭০ সপ্ততি, ৮০ অশীতি, ৯০ নবতি, ১০০ শত ইত্যাদি। এইরূপ লিখিত অঙ্ককে রাশি কহে।

"একং দশং শতঞ্চৈব সহস্রময়ুতং তথা।
লক্ষঞ্চ নিযুতঞ্চৈব কোটিরর্ব্বুদমেব চ ॥
বৃন্দঃ খর্ব্বো নিখর্ব্বশ্চ শঙ্খপদ্মৌ চ সাগরঃ।
অন্ত্যং মধ্যং পরার্দ্ধঞ্চ দশবৃদ্ধ্যা যথোত্তরম্ ॥" (জ্যোতিষ)

একটী রাশিতে যত অঙ্ক যোগ করিবে, পূর্ব্ব রাশির উপর তত সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। যথা, ১০+১=১১, এখানে দশ রাশিতে (১) এক অঙ্ক যোগ করা হইল,

অতএব দশের উপর এক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া একাদশ হইল। এইরূপ ১০+২=দ্বাদশ। ১০+৯=১৯ একোনবিংশতি; অর্থাৎ বিংশতির এক সংখ্যা কম। ২০+২ =দ্বাবিংশতি। ৩০+৯=উনচত্বারিংশৎ।

এক	অঙ্কে	১ একক।
দুই	,,	১০ দশ।
তিন	,,	১০০ শত।
চারি	,,	১০০০ সহস্র।
পাঁচ	,,	১০০০০ অযুত।
ছয়	,,	১০০০০০ লক্ষ।
সাত	,,	১০০০০০০ নিযুত।
আট	,,	১০০০০০০০ কোটি।
নয়	,,	১০০০০০০০০ অর্ব্বুদ।
দশ	,,	১০০০০০০০০০ বৃন্দ।
একাদশ	,,	১০০০০০০০০০০ খর্ব্ব।
দ্বাদশ	,,	১০০০০০০০০০০০ নিখর্ব্ব।
ত্রয়োদশ	,,	১০০০০০০০০০০০০ শঙ্খ।
চতুর্দ্দশ	,,	১০০০০০০০০০০০০০ পদ্ম।
পঞ্চদশ	,,	১০০০০০০০০০০০০০০ জলধি।
ষোড়শ	,,	১০০০০০০০০০০০০০০০ অন্ত্য।
সপ্তদশ	,,	১০০০০০০০০০০০০০০০০ মধ্য।
অষ্টাদশ	,,	১০০০০০০০০০০০০০০০০০ পরার্দ্ধ।

রাশি বৃহত্তম হইলে প্রথমে দক্ষিণ দিকের তিনটী অঙ্কের পর একটী চিহ্ন দিয়া তৎপরে দুই দুইটীর পর এক একটী চিহ্ন দিলে গণনা করিবার সুবিধা হয়। ৩,২৭,৫১,৭২,৯৪,৩৭,৮১,২৪,৭৮০। সমস্ত রাশি বামভাগ হইতে গণনা করিয়া আসিবে। যথা—

পরার্দ্ধ	মধ্য	অন্ত্য	জলধি	পদ্ম	শঙ্খ	নিখর্ব্ব	খর্ব্ব	বৃন্দ	অর্ব্বুদ	কোটি	নিযুত	লক্ষ	অযুত	সহস্র	শত	আশী
৩,	২	৭,	৫	১,	৭	২,	৯	৪,	৩	৭,	৮	১,	২	৪,	৭	৮০

তিন পরার্দ্ধ, দুই মধ্য, সাত অন্ত্য, পাঁচ জলধি, এক পদ্ম, সাত শঙ্খ, দুই নিখর্ব্ব, নয় খর্ব্ব, চারি বৃন্দ, তিন অর্ব্বুদ, সাত কোটি, আট নিযুত, এক লক্ষ, দুই অযুত, চারি সহস্র সাত শত আশী।

গণনা দ্বারা রাশির সংখ্যা নিশ্চিত করিতে হইলে দক্ষিণ ভাগ হইতে গণিয়া যাইবে। দক্ষিণ ভাগের প্রথম অঙ্ক এককের স্থানে, দ্বিতীয় অঙ্ক দশকের স্থানে, তৃতীয় অঙ্ক শতকের স্থানে ইত্যাদি।

১, ২, ৩, ইত্যাদিকে পূর্ণ অঙ্ক কহে। ভগ্নাঙ্ক বা ভগ্নাংশ লিখিবার অন্য সঙ্কেত আছে। ৪ চারি একটী পূর্ণ অঙ্ক। চারিকে দুই সমান অংশে বিভক্ত করিলে এক এক অংশে দুই হয়। কিন্তু ১ অঙ্ককে দুই সমান অংশে বিভাগ করা যায় না। সে জন্য ঐ সমান বিভাগ দেখাইবার সঙ্কেত আছে। যথা, $\frac{১}{২}$ ইহার দ্বারা এই বুঝিতে হইবে যে, কোন একটী সমস্ত পদার্থকে দুই সমান অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং সেই দুই অংশের এক অংশ গ্রহণ করা হইয়াছে। এইরূপ $\frac{৩}{৪}$ লিখিত থাকিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, কোন সমস্ত পদার্থকে সমান চারি অংশে বিভাগ করিয়া তাহার তিন অংশ গ্রহণ করা হইয়াছে। এ প্রকার অঙ্কপাতকে ভগ্নাংশ কহে। [ভগ্নাংশ দ্র°]

আর এক প্রকার ভগ্ন অঙ্ক আছে, তাহার নাম দশমিক ভগ্নাংশ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কোন অঙ্কের দক্ষিণ ভাগে এক একটী শূন্য দিলে প্রত্যেক শূন্যের দশগুণ সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। দশমিক ভগ্নাংশ ঠিক তাহার বিপরীত। কোন অঙ্কের বাম ভাগে এক একটী শূন্য দিলে প্রত্যেক শূন্যে দশগুণ সংখ্যা কমিয়া আসে। যথা—১, এক একটী সংখ্যা, ·০১ ইহাতে এক সংখ্যার দশগুণ কম বুঝায়। ·০০১ ইহাতে এক সংখ্যার ১০০ গুণ কম বুঝায়। এরূপ ঘটিবার গূঢ় তাৎপর্য্য এই—

দেখা যাইতেছে—১ এক সংখ্যাকে একস্থান বামে সরাইলে ১০ হয়। দুই স্থান বামে সরাইলে ১০০ একশত হয়। এখানে প্রত্যেক বারে দশগুণ সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। পুনর্ব্বার একস্থান দক্ষিণে সরাইলে ·১০ দশ হইয়া পড়ে। দুই স্থান দক্ষিণে সরাইলে ·০০১ হইয়া পড়ে। অর্থাৎ প্রত্যেক বারে দশগুণ কমিতেছে। অতএব এতদ্দ্বারা এই নিশ্চিত হইল, কোন অঙ্ককে যত স্থান দক্ষিণ দিকে সরাইবে তত দশগুণ সংখ্যা কমিয়া আসিবে। অঙ্কের বামে শূন্য দিলে তাহাকে দক্ষিণ দিকে স্থানান্তরিত করা বুঝায়। কিন্তু অঙ্কের বামে একটী শূন্য স্থানে একটী বিন্দু প্রয়োগ করা হয়, যথা—·২ এইরূপ লিখিলে ২ দুয়ের বামে একটী শূন্য আছে, তাহাই বুঝাইবে। অর্থাৎ দুই অঙ্কের দশগুণ কম। [দশমিক ও ভগ্নাংশ দ্র°]

এই প্রকার অঙ্কপাতকে পাটীগণিতের অঙ্ক বা রাশি কহে। বীজগণিতের অঙ্ক বর্ণমালার বর্ণদ্বারা লিখিত হয়। তাহার সংখ্যা অনির্দ্দিষ্ট। যথা—ক, খ, গ ইত্যাদি বর্ণকে ১ ২ প্রভৃতি অঙ্কের তুল্য কল্পনা করা হয়। ক, খ বর্ণ কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা নহে। ২ ক বলিলে ক স্থানে যে কোন অঙ্ক বসাইতে পারা যায়। [সঙ্কলন, ব্যবকলন দ্র°]

অঙ্কপাদ—(ক্লী) ছাগ ও হরিণাদির অবয়ববিশেষ। (বাভট, সূত্র° ৩৯)

অঙ্কপাদব্রত—(ক্লী) ব্রতবিশেষ।

অঙ্কপালি(-লী)—(স্ত্রী) [অঙ্ক-পা-অল-ঙীপ্, ৬-তৎ] ক্রোড়প্রান্ত। [অঙ্কেন পালয়তীতি, পালি-ঙীপ্, ৬-তৎ] ২ উপমাতা, ধাত্রী। ৩ আলিঙ্গন। ৪ বেদিকাখ্য গন্ধদ্রব্য-বিশেষ, ইহার নামান্তর কোটি।

অঙ্কপালিকা—(স্ত্রী) আলিঙ্গন।

অঙ্কপাশ—(পুং) অঙ্কের সংস্থাপনবিশেষ ; অঙ্কবন্ধন। লীলাবতী-কথিত একাদি অঙ্কের স্থান বিনিময়ে সংখ্যা ভেদ-বোধক। ২ ঐক্যসংখ্যাসঙ্কলনের উপযোগী প্রক্রিয়াভেদ। ইহার উদাহরণ স্থলে বলা যায়, যেমন ১ ও ২, এই দুই সংখ্যা পর পর বসাইলে হয় ১২, আর যদি স্থান বিনিময় করা হয়, তাহা হইলে ২১ হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ ভেদ ভিন্ন অঙ্ক ও অঙ্কভেদের নাম সংখ্যৈক্যমিতি ও ঐক্যাঙ্কমিতি। অঙ্কপাশ শব্দে এইরূপ বিশেষ অর্থই বুঝায়।

"গর্ব্বিতগণকবহূনাং স্যাৎ পাতোঽবশ্যমঙ্কপাশেঽস্মিন্"

(লীলাবতী)

অঙ্কপূরণ—(ক্লী) অঙ্কের গুণ করা। ইংরেজীতে গুণের চিহ্ন ×. এইরূপ। ৫×৩ এই প্রকার দুই অঙ্কের মধ্যে উক্ত চিহ্ন থাকিলে গুণ করা বুঝাইবে। [গুণ দ্র°]

অঙ্কবন্ধ—(পুং) ক্রোড়বন্ধ।

অঙ্কমিরি—আসামের সুন্দরী নদীর উপত্যকাবাসী এক পাহাড়িয়া জাতি। ইহারা আপনাদিগকে তালে নামে অভিহিত করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ উল্কি দিয়া মুখ চিত্র বিচিত্র করে বলিয়া আসামীরা ইহাদের নাম রাখিয়াছেন 'অঙ্কমিরি'। ইহাদের পুরুষগণ একপ্রকার অলঙ্কার পরিধান করে, তাহা বেতের তৈয়ারী ও চামরের ন্যায় পিছন দিকে ঝুলিয়া থাকে।

স্ত্রীলোকেরা স্বহস্তনির্ম্মিত সুতীর জামা পরিধান করে। দিহং অঞ্চলের অবোর জাতির সহিত ইহাদের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। অপরাপর পাহাড়ী জাতির ন্যায় ইহারা শত্রুকে গুপ্ত আক্রমণ করে না।

অঙ্কমুখ—(ক্লী) অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত নিখিল অঙ্কসূচক অঙ্কবিশেষ। ইহা অঙ্কনিরুদ্ধ বস্তুসমূহের বীজার্থজ্ঞাপক।

সাহিত্য-দর্পণকার বলিয়াছেন, যে একটী অঙ্কে নিখিল অঙ্ক-বর্ণনীয় সমস্ত বিষয়ের সূচনা থাকে এবং যাহা কেবল অঙ্ক-নিবন্ধনীয় সমস্ত বস্তুর বীজার্থ মাত্রের সূচনা করিয়া দেয়, তাহাই অঙ্কমুখ নামে অভিহিত।

"যত্র স্যাদঙ্ক একস্মিন্নঙ্কানাং সূচনাখিলা।
তদঙ্কমুখমিত্যাহুর্বীজার্থখ্যাপকঞ্চ তৎ॥"

(সাহিত্যদ° ৬.৪২)

অঙ্কলক্ষ্মী—(স্ত্রী) অঙ্কগত সম্পদ, হাতের লক্ষ্মী। ২ স্ত্রী।

অঙ্কলেখ্য—(পুং) [বৈদ্যক] চিঙ্কোড় বৃক্ষ। চলিত চেঁচ্‌কো মূল।

অঙ্কলেশ্বর,—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ভরোচ জেলার দক্ষিণস্থ একটী তালুক। হাঁসোট বা হংসস্রোত উপবিভাগ ইহার অন্তর্গত। অক্ষা° ২১°২৫′ হইতে ২১°৪৩′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৩৫′ হইতে ৭৩°৮′ পূঃ। ভূপরিমাণ ২৯৪ বর্গমাইল। দুইটী নগর ও ১০৪টী গ্রাম লইয়া এই তালুক গঠিত। ইহার উত্তরাংশ ক্রমশঃ সমতল হইয়া নর্ম্মদার অববাহিকায় আসিয়া মিলিয়াছে। ইহার পূর্ব্বদিক্ দিয়া বম্বে-বরোদা-সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলপথ বিস্তৃত থাকায় এখানকার পণ্যদ্রব্য রপ্তানির বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

নর্ম্মদা নদীর উত্তরস্থ ভূমি বিশেষ উর্ব্বরা। এখানে গম ও জোয়ারের বিস্তৃত চাষ আছে।

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর। অক্ষা° ২১°৩৮′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৫৯′ পূঃ। এখানে বম্বে-বরোদা-সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলপথের একটী ষ্টেশন আছে। ১৯২১ সালের গণনায় ইহার লোকসংখ্যা ১১২৬২। নগরটী ভরোচ হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে এবং নর্ম্মদার বামকূল হইতে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। হাঁসোট নগরে যাইবার একটী প্রশস্ত রাস্তা এবং রাজপিপ্‌লা রাজ্যের অন্তর্গত নান্দোড় নগর হইতে পণ্যদ্রব্য আমদানি ও রপ্তানির সুবিধার্থ একটী রেলপথ আছে।

ইহা কার্পাস বাণিজ্যের একটী প্রসিদ্ধ কেন্দ্র এবং কার্পাস-বস্ত্র নির্ম্মাণের জন্য এখানে কএকটী কলকারখানাও হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সাবান প্রস্তুতের বিস্তৃত কারবার আছে।

পশ্চিম-চালুক্যরাজবংশের অধীন মহাসামন্ত অঙ্ক স্বনামে এই নগর ও সৌন্দত্তিবিভাগে অঙ্কলেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই শিবমূর্ত্তি অঙ্কুশেশ্বর বা অঙ্কুলেশ্বর নামেও প্রখ্যাত। উক্ত মন্দিরগাত্রস্থ শিলাফলক পাঠে জানা যায় যে, পশ্চিম চালুক্য-রাজ প্রথম সোমেশ্বরদেবের রাজ্যাধিকারকালে, অনুমান ১০৪৮ খৃষ্টাব্দে রাজা অঙ্ক বিদ্যমান ছিলেন। [অঙ্ক$_{8}$ দ্র°] ইঁহার বংশধর কন্ন ও ২য় কার্ত্তবীর্য্য মহামণ্ডলেশ্বর অভিধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৭০১ শকের অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীমন্ত রাজশ্রী বালাজী নায়ক জলপথে এখানে আসিয়া উপস্থিত হন।

অঙ্কলেশ্বর$_{২}$—দাক্ষিণাত্যের সৌন্দত্তির অন্তর্গত একটী মন্দির। [অঙ্ক$_{8}$ ও অঙ্কলেশ্বর, দ্র°]

অঙ্কলোড্য—(পুং) [বৈদ্যক] চিঙ্কোটক ক্ষুপ, চলিত চেঁচ্‌কো।

অঙ্কলোপ—(পুং) [৬-তৎ]। অঙ্কের বিয়োগসাধন। বাকি কাটা।

অঙ্কশাস্ত্র—(ক্লী) অঙ্কবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র। [গণিত দ্র°]

অঙ্কস্—(ক্লী) [অন্চ্-অসুন্; কুত্ব] চিহ্ন। ২ শরীর।

অঙ্কস—(ত্রি) [অঙ্কস্-অচ্ অস্ত্যর্থে] চিহ্নযুক্ত।

অঙ্কস্থ—(ত্রি) নিকটস্থ। ২ ক্রোড়স্থিত।

অঙ্কাই, অঙ্কাই-টঙ্কাই—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর নাসিক জেলার থেওলা তালুকের অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ। ইহা অঙ্কাই-টঙ্কাই নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। অঙ্কাই ও টঙ্কাই নামক দুইটী গণ্ডশৈলের শিখরদেশে ঐ দুর্গ স্থাপিত। অক্ষা° ২০°১১′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°২৭′ পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ এবং পার্শ্ববর্ত্তী সমতল ক্ষেত্র হইতে এই স্থান যথাক্রমে ৩,১৮২ ও ৯০০ ফুট উচ্চ। দুর্গের পরিধি প্রায় ১ মাইল ব্যাপী ও চতুর্দ্দিক্ উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত। ইহাকে দুর্ভেদ্য করিবার জন্য চতুঃসীমায় ৭ থাক কামানশ্রেণী ও বুরুজাদি স্থাপিত আছে। টঙ্কাই শৈলাংশে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া ভাণ্ডারে জমা করা হইত। এই দুর্গ হইতে কিছু দূরে অঙ্কাই-টঙ্কাই গিরিবর্ত্ম অবস্থিত।

১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাটের সেনাপতি খান্-ই-খানান অল্কা-পল্কা সহ এই দুর্গ অধিকার করেন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে থেবেনো (Thevenot) এই দুর্গের সমৃদ্ধ অবস্থার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শেষ মরাঠা যুদ্ধে ইংরেজ সেনানী কর্ণেল মাক্ডাউয়েল সসৈন্য অঙ্কাই দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হন এবং ৫ই এপ্রিল তারিখে দুর্গটী ইংরেজের হস্তগত হয়।

পর্ব্বতের উপর ৩টী দেবমন্দির আছে। টঙ্কাই শৈলের দক্ষিণগাত্রে ৭টী জৈনগুহা বিদ্যমান। উহার স্থাপত্যশিল্প অতি সুন্দর, কিন্তু দুঃখের বিষয় জলবায়ুর প্রকোপে উহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

অঙ্কাগত—(ত্রি) সন্নিহিত, নিকটে আগত।

অঙ্কাঙ্ক—(ক্লী) [অঙ্কে মধ্যে অঙ্কাঃ শতপত্রাদিচিহ্নানি যস্য] জল। "আপো বৈ অঙ্কাঙ্কাঃ চন্দঃ।" (শুক্লযজুঃ ১৫.৫)

অঙ্কান্তপাত্র—(পুং) নাটকীয় কোনও একটী অঙ্কের সর্ব্বশেষে প্রবিষ্ট পাত্র। এই পাত্র পরবর্ত্তী অঙ্কের প্রারম্ভ সূচনা করিয়া দেয়। "অঙ্কান্তপাত্রৈর্ব্বাঙ্কাস্যং ছিন্নাঙ্কস্যার্থসূচনাৎ।" (সাহিত্য-দ°, ৬.৪৩)

অঙ্কালম্ম—সুপ্রাচীন নাগমন্দির। মান্দ্রাজের কৃষ্ণা জেলার পলনাড় তালুকের অন্তর্গত কারেম্পূড়ী গ্রামে অঙ্কালম্মের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের চতুঃপার্শ্বস্থ প্রস্তর-প্রাচীরের অভ্যন্তরগাত্রে কতকগুলি নাগমূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। ইহাদের কোন কোন মূর্ত্তি ত্রিমস্তক; একটীতে যুগ্মনাগ বর্ত্তমান। কোথায়ও বা ত্রিশূল ছত্রধারী সৈনিকমূর্ত্তি। পূর্ব্বদিক্স্থ একখণ্ড প্রস্তরে হংসারূঢ়া, চতুর্হস্তা দেবীমূর্ত্তি। অপর একখণ্ড প্রস্তরে এক নাগকন্যার মূর্ত্তি। একস্থানে দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ ভৈরবমূর্ত্তি। প্রাচীরে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায়, মহামণ্ডলেশ্বর কুলোত্তুঙ্গ চোড়গঙ্গ রাজুর মন্ত্রী মন্দিরের দীপদানার্থ ১০৭৬ শকাব্দে একটী বৃত্তিদান করিয়াছিলেন।

অঙ্কাবতার—(পুং) নাটকীয় পাত্রসূচিত অঙ্কের অঙ্গবিশেষ। অঙ্কাবসানে অভিনেতৃগণ যে পরবর্ত্তী অঙ্কের সূচনা করিয়া দেয়, সেই অঙ্কের অঙ্গসংলগ্নরূপে যে অঙ্কাবতারণা করা হয়, তাহাই অঙ্কাবতার নামে কথিত। শকুন্তলার ষষ্ঠাঙ্কে ইহার উদাহরণ দেখা যায়। ইহার লক্ষণ যথা—

"অঙ্কান্তে সূচিতো পাত্রৈস্তদঙ্কস্যাবিভাগতঃ।
যত্রাঙ্কোঽবতরত্যেষোঽঙ্কাবতার ইতি স্মৃতঃ॥"
(সাহিত্যদ°, ৬.৪১)

অঙ্কিত—(ত্রি) [অঙ্ক-ক্ত] চিহ্নিত, কৃতচিহ্ন। "স্বাহাস্বধা-বষট্কারৈরঙ্কিতং মেষবাহনং" (অগ্নিধ্যান)। ২ নিন্দিত। ৩ চিত্রিত, লিখিত। ৪ লাঞ্ছিত। ৫ লিপ্ত। [অঙ্ক-ইতচ্] ৬ অঙ্কযুক্ত।

অঙ্কিদেব—রট্টবংশীয় একজন মহাসামন্ত। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কোল্হাপুর রাজ্যের খানাপুর হইতে আবিষ্কৃত ক্ষোদিত লিপিতে লিখিত আছে—১১২৯ খৃষ্টাব্দে ইনি চালুক্যরাজ ৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের অধীনে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু রট্টবংশের বংশতালিকায় ইঁহার নাম পাওয়া যায় না।

অঙ্কিন্—(ত্রি) [অঙ্কে ক্রোড়ে বিদ্যতে বাদ্যকালে, অঙ্ক-ইনি] মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্র। যে সকল বাদ্যযন্ত্র কোলে রাখিয়া বাজাইতে হয়। [অঙ্ক-ইনি অস্ত্যর্থে] ২ ক্রোড়বিশিষ্ট। (অথর্ব্ব° ১৯.৬৬.১)

অঙ্কিনী—(স্ত্রী) [অঙ্ক-ইনি স্ত্রিয়াং ঙীপ্, অঙ্কানাং চিহ্নানাং সমূহঃ। *। খলাদিভ্যঃ ইনির্বক্তব্যঃ (কাত্যায়ন)] অঙ্কসমূহ। [অঙ্ক-ইনি অস্ত্যর্থে ঙীপ্] ২ অঙ্কবিশিষ্টা বা চিহ্নযুক্তা স্ত্রী।

অঙ্কুয়া—ছোটনাগপুরের অন্তর্গত সিংভূম জেলার এক পর্ব্বত-শ্রেণী। বেঙ্গলনাগপুর রেললাইনের মনোহরপুর ষ্টেশনের দক্ষিণপূর্ব্বে প্রায় ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। পতরবাসা ও গুণন্দ্রিয়া নামক ক্ষুদ্র পল্লীঘরের নিকট যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী অঙ্কুয়া পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, সেই নদীগুলির বালুকা হইতে সুবর্ণরেণু প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা দেখিয়া ভূতত্ত্ববিদ্ মাক্লারেন (Maclaren) সাহেব অনুমান করেন যে, এই পর্ব্বতের সন্নিকটে সুবর্ণের খনি থাকা সম্ভব।

অঙ্কুর,—(পুং, ক্লী) [অঙ্ক-উরচ্] বীজোদ্ভব, অভিনবোদ্ভিদ্। চলিত কথায় 'কল' অর্থাৎ বীজ হইতে ভ্রূণের যে আদ্য-

মূল (Radicle) বীজচ্ছদ (বা বীজের খোসা) ভেদ করিয়া বাহির হয়। তৎপরে ভ্রূণের আদ্যকাণ্ড নির্গত হইয়া উভয়ে মিলিয়া একটী চারাগাছে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াকে অঙ্কুরোৎপত্তি বা অঙ্কুরোদ্গম বলা হয়। [অঙ্কুরোদ্গম দ্র°]

২ মাংসাঙ্কুর (Granulation) অর্থাৎ নূতন মাংসের উপর যে ছোট ছোট দানার মত অংশ দৃষ্ট হয়। যদি কোন বিষাক্ত ক্ষত অধিত্বক্ বা উপত্বকের (Epidermis) ভিতর দিয়া অধস্ত্বক (Dermis) পর্য্যন্ত ভেদ করে, তাহা হইলে ক্ষতের আরোগ্যপ্রক্রিয়ায় অধস্ত্বকের ক্ষতাংশের উপর মাংসাঙ্কুর দেখা দেয়। যে ক্ষত ২।১ দিনের মধ্যে সারিয়া উঠে এবং যাহাতে ক্ষতস্থানের দুই পার্শ্ব ২।১ দিনের মধ্যে জুড়িয়া যায়, সে স্থলে ঐরূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হইবার আবশ্যকতা থাকে না বলিয়া উহা আর জন্মে না।

৩ জল। ৪ রক্ত। ৫ লোম। ৬ মুকুল। "চূতাঙ্কুরাস্বাদ-কষায়কণ্ঠঃ" (কুমারস°)। ৭ প্ররোহ, বৃক্ষাদির নূতন পত্র। ৮ অর্ব্বুদ, আব। (সুশ্রুত) ৯ বালক, ছোট শিশু। ১০ তীক্ষ্ণাগ্রভাগ, অঙ্কুরের ন্যায় কোনও দ্রব্যের সূক্ষ্মপ্রান্ত। ১১ প্রথমাবস্থা, সূচনা।

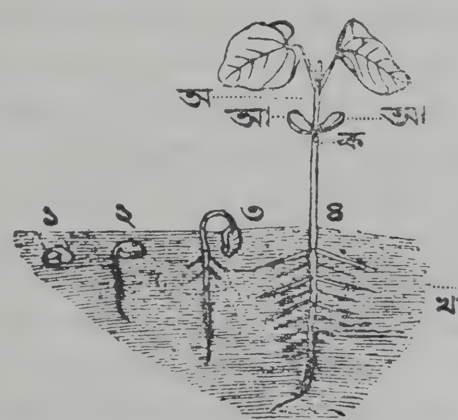
অঙ্কুর২—বঙ্গদেশীয় দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থগণের উপাধিবিশেষ।

অঙ্কুরক—(পুং) [অন্চ-ঘুরচ্-ক] পশুপক্ষীর বাসস্থান, বাসা।

অঙ্কুরিত—(ত্রি) [অঙ্কুরঃ সঞ্জাতঃ অস্য ; অঙ্কুর-ইতচ্। তদস্য সঞ্জাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫.২.৩৬] জাতাঙ্কুর ; অঙ্কুর জন্মিয়াছে যাহার।

অঙ্কুরিয়া—বঙ্গদেশের ডোমজাতির শাখাবিশেষ। ইহারা বাঁশের ঝুড়ি চুবড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে।

অঙ্কুরোদ্গম—অঙ্কুরোৎপত্তি, বীজ হইতে অঙ্কুর বা 'কল' বাহির হওয়াকে অঙ্কুরোদ্গম বলে। আমরা প্রথমে বীজের অংশগুলি পরীক্ষা করিব। বীজের ভিতর ভ্রূণ উদ্ভিদ্ থাকে। তাহা বীজচ্ছদ (খোসা) দ্বারা আবৃত। বীজচ্ছদ সাধারণতঃ দুইটী—বহির্বীজচ্ছদ (Testa) এবং অন্তর্বীজচ্ছদ (Tegmen)। সাধারণতঃ বহির্বীজচ্ছদ পুরু এবং দৃঢ় হয়। অন্তর্বীজচ্ছদ অপেক্ষাকৃত পাতলা হয়। কোন কোন বীজে একটী মাত্র বীজচ্ছদ থাকে। কখনও কখনও বীজচ্ছদের উপর আর একটী স্তর বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে উপচ্ছদ (Aril) বলে। লিচুর যে অংশ আমরা খাই এবং জায়ফলের বীজের উপরে যে পাতলা চর্ম্মের মত অংশ থাকে, তাহাই উপচ্ছদ। এরণ্ডবীজের পাদদেশে যে উচ্চ এবং বন্ধুর অংশ থাকে, তাহাও এক প্রকার উপচ্ছদ। ইহাকে পাদচ্ছদ (Caruncle) বলা যাইতে পারে। বীজচ্ছদের গায়ে একটী কর্কশ অংশ দেখা যায়, ইহাকে বীজক্ষত (Hylum) বলে। বীজচ্ছদের গাত্রে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে, ইহাকে গাত্রচ্ছিদ্র বা অণুচ্ছিদ্র (Mycropyle) বলা যাইতে পারে। বীজচ্ছদ ছিঁড়িয়া ফেলিলে ভিতরে যে অংশ দেখা যায়, তাহাই ভ্রূণ। ছোলা, মটর, বরবটী, কুমড়া প্রভৃতির বীজে আমরা ২টী স্থূল অথবা পাতলা অংশ দেখিতে পাই। এই দুই অংশকে বীজদল বা বীজপত্র (Cotyledon) বলা হয়। বীজপত্র দুইটীর মধ্যে ভ্রূণের আদ্যমূল বা ভ্রূণমূল (Radicle) এবং তাহার বিপরীতদিকে আদ্যকাণ্ড বা ভ্রূণকাণ্ড (Plumule) থাকে। ভ্রূণকাণ্ড অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রদ্বারা আবৃত। ধান, গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি বীজে ১টী মাত্র বীজপত্র থাকে। এইজন্য আমরা ফলধর বা গুপ্তবীজ (Angiosperm) উদ্ভিদ্‌গণকে দ্বিবীজপত্র (Dicotyledon) এবং একবীজপত্র (Monocotyledon) এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া থাকি। ভ্রূণের যে স্থলে বীজপত্র সংলগ্ন থাকে, তাহার উপরের অংশকে অধিপত্র বা অধিখণ্ড (Epicotyl) এবং নীচের অংশকে অধঃপত্র



অ অধিপত্র। আ, আ বীজপত্র। ক অধঃপত্র। ১, ২, ৩ ও ৪নং চিত্রে অঙ্কুরোদ্গমের বিভিন্ন অবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। ১ ও ২নং চিত্রে ভ্রূণকাণ্ড বীজপত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ৩নং চিত্রে ভ্রূণকাণ্ড ঈষদ্‌দৃষ্ট হইতেছে। ৪নং চিত্রে উহা আরও বর্দ্ধিত এবং সুপরিস্ফুট।

বা অধঃখণ্ড (Hypocotyl) বলে। ভ্রূণের খাদ্যসামগ্রী সঞ্চিত থাকিবার জন্য কএক রকম ব্যবস্থা আছে। প্রথমতঃ বীজপত্র ২টীর ভিতরেই খাদ্যসামগ্রী সঞ্চিত থাকে, যেমন ছোলা, বরবটী, মটর প্রভৃতি। ধান, গম, ভুট্টার বীজদলের গায়ে ১টী স্থূল অংশ দেখা যায়। ইহাকে অন্তঃপোষক (Endosperm) কহে। নারিকেলের যে অংশ আমরা খাই, তাহা অন্তঃপোষক। কোন কোন বীজে আবার ভ্রূণকে বেষ্টন করিয়া যে পোষণাংশ থাকে, তাহাকে পরিপোষক (Perisperm) কহে।

এরণ্ডবীজেও এইরূপ দৃষ্ট হয়। বড় এলাচের বীজে অন্তঃপোষক ও পরিপোষক উভয়ই বর্ত্তমান।

কতকগুলি বীজে কঠিন আবরণ থাকায় সহজে কীটদষ্ট হয় না। বীজ পক্ক হইলেই তাহা হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইতে পারে। উইলো প্রভৃতি কএকপ্রকার গাছের বীজ ৩ ঘণ্টার মধ্যেই অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। অধিকাংশ বীজ ৪।৫ দিনের মধ্যে সচরাচর অঙ্কুরিত হয়। দেখা গিয়াছে, বহুদিনের পুরাতন বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইতে পারে। এক বৎসরাধিক পুরাতন ধানে ভাল চারা হয় না। গম ৭ বৎসরের এবং সোঁদাল প্রভৃতির বীজ ৬০ বৎসরের পুরাতন হইলেও অঙ্কুরিত হইতে পারে। ১৪০ বৎসরের পুরাতন রাই এবং তিনশত বৎসরের পুরাতন জনার বীজের চারা হইতে দেখা গিয়াছে।

সাধারণতঃ ফল পক্ক হইলেই বীজগুলি গাছ হইতে খসিয়া পড়ে। তবে শাঁসাল ফল পক্ক হইলে গাছ হইতে পড়িয়া যায় এবং তাহার ভিতর হইতেই বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে। কতকগুলি গাছে পক্ক ফল ও বীজ গাছে সংলগ্ন থাকিয়াও অঙ্কুরিত হয়, যেমন কাঁঠাল, নারিকেল প্রভৃতি।

ভড় (Rhizophora mucronata Lamarck এবং Rhizophora conjugata Linn.), গড়ান (Ceriopes roxburghiana Arn.) প্রভৃতি গাছের বীজ গাছেই অঙ্কুরিত হয় এবং ইহার ভ্রূণমূল ১ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। তৎপরে বীজটী গাছ হইতে খসিয়া পড়ে এবং ঐ দীর্ঘ ভ্রূণমূল মৃত্তিকায় সংলগ্ন হয়।

যে সকল বীজ গাছ হইতে খসিয়া পড়িয়া অঙ্কুরিত হয়, তাহাদের অঙ্কুরোদ্গম দুই প্রকারে হইয়া থাকে। যে সকল বীজে প্রচুর পোষণবস্তু থাকে, তাহাদের ভ্রূণের অধঃখণ্ড বর্দ্ধিত হয় না; ভ্রূণ ঐ খাদ্যসামগ্রী হইতে পুষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে চারাগাছে পরিণত হয়। তৎপরে ঐ চারাগাছ হইতে সবুজ পত্র নির্গত হইতে দেখা যায়। বীজটী আবরণে বেষ্টিত হইয়া মাটির উপরই পড়িয়া থাকে। এই প্রকার অঙ্কুরোদ্গমকে অধোমৃত্তিক বা মৃচ্ছায়ী (Hypogeal) অঙ্কুরোদ্গম বলা হয়। যে সকল বীজে (যেমন লাউ, কুমড়া, শশা ইত্যাদি) খাদ্যসামগ্রী তত প্রচুর পরিমাণে থাকে না, তাহাদের ভ্রূণকাণ্ডের অধঃখণ্ড শীঘ্রই বর্দ্ধিত হয় এবং বীজপত্রদ্বয় মৃত্তিকা হইতে উর্দ্ধে উত্থিত ও বর্দ্ধিত হইয়া সবুজবর্ণ ধারণ করে; ইহা তখন সাধারণ পত্রের ন্যায় কার্য্য করে। এই প্রকার অঙ্কুরোদ্গমকে অধিমৃত্তিক বা উর্দ্ধগামী (Epigeal) উদ্গম বলা হয়।

অঙ্কুরোদ্গমের জন্য আর্দ্রতা, উত্তাপ ও বায়ু আবশ্যক। শুষ্ক বীজে অঙ্কুরোদ্গম হয় না, কিন্তু আর্দ্রতা পাইলেই বীজ হইতে কল বাহির হয়। বীজের অঙ্কুরোদ্গমে কিয়ৎপরিমাণে উত্তাপের আবশ্যক। অতিরিক্ত উত্তাপ অথবা শৈত্য থাকিলে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় না। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, এক এক-প্রকার বীজের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের উষ্ণতার দরকার হয়। সচরাচর বীজ ৭৮ হইতে ৯৩ ডিগ্রী ফারেনহিট উত্তাপে অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। অত্যন্ত শৈত্য বা অত্যন্ত উত্তাপে বীজের ভিতরকার ভ্রূণটী মরিয়া যাইতে পারে। বায়ুতে যে অম্লজনবায়ু থাকে, তাহাও অঙ্কুরোদ্গমে দরকারী। তবে কোন কোন বীজের অঙ্কুরোদ্গমে ভ্রূণের দেহ হইতেই অম্লজন নির্গত হয় এবং তাহাই অঙ্কুরোদ্গমে ব্যবহৃত হয়। যেমন অম্লজন বায়ু গৃহীত হয়, তেমনি অঙ্গারাম্ল বায়ু এবং জলীয় বাষ্প বীজ হইতে নির্গত হয়। একেবারে জলের ভিতর বীজ রাখিলে তাহা হইতে অঙ্কুর নির্গত হয় না।

অঙ্কুরোদ্গমে বীজ হইতে উত্তাপ নির্গত হয়। উষ্ণতামান (Thermometer) যন্ত্রের সাহায্যে ইহা সহজেই নির্ণীত হয়। অঙ্কুরোদ্গমে ভ্রূণের কাণ্ড ও মূল বর্দ্ধিত হয়। এই বৃদ্ধির জন্য বীজের ভিতর যে খাদ্য সঞ্চিত থাকে, তাহা ভ্রূণ গ্রহণ করে। ঐ খাদ্য শ্বেতসার, আমিষবস্তুর (Protein) কণা অথবা তৈলবিন্দুরূপে বর্ত্তমান থাকে। ঐ পদার্থগুলি এই অবস্থায় জলে দ্রব হয় না, অথচ দ্রবপদার্থ না হইলে ভ্রূণ তাহা খাদ্যরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। কিণ্ব (Ferment) নামক এক জাতীয় পদার্থের সাহায্যে ঐ পদার্থগুলি এভাবে পরিবর্ত্তিত হয় যে, তাহারা এক্ষণে সহজেই জলে দ্রব হইতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় ঐ অদ্রবণীয় পদার্থ-গুলি বিশ্লিষ্ট হয়; এবং ঐ সঙ্গে কিয়ৎপরিমাণ উত্তাপ বাহির হইয়া যায়। ইহাই আমরা বাহিরে দেখিতে পাই। বীজের অন্তর্গত ভ্রূণের বর্দ্ধিষ্ণু অংশের শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য অম্লজন বায়ু গৃহীত হয়।

যাহাতে একস্থানের গাছ চারিপার্শ্বে দূরে জন্মিতে পারে, সেইজন্য ফল এবং বীজ গাছ হইতে দূরে নীত হওয়া দরকার। তাহা হইলে ক্রমশঃ বহুস্থান জুড়িয়া এবং বহুদূর পর্য্যন্ত ঐ জাতীয় গাছ ব্যাপ্ত হইতে পারে। বীজগুলিকে গাছ হইতে দূরে লইয়া যাইবার জন্য প্রকৃতির যেরূপ ব্যবস্থা আছে, তাহাকে বীজের বিস্তার বলা যাইতে পারে। সাধারণতঃ বায়ু, জল, প্রাণী দ্বারা এবং হঠাৎ ফল ফাটিয়া বীজের বিস্তার ঘটিয়া থাকে। এই বিস্তার-প্রক্রিয়ার বিভিন্নতা অনুসারে বীজের গঠনের বিভিন্নতা দেখা যায়।

(১) যে সকল বীজ বায়ুকর্ত্তৃক দূরে নীত হয়, তাহারা প্রায় ক্ষুদ্র ও লঘু হইয়া থাকে এবং সহজেই বায়ুতে

উড়িয়া যায়। কতকগুলি বীজ অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর হওয়ায় তাহারা অল্প পরিমাণে বারে বারে ফল হইতে নির্গত হয় এবং বাতাসের জোরে অন্যস্থলে নীত হয়।

বায়ুকর্ত্তৃক নীত কএকপ্রকার বীজ চেপ্টা হইয়া থাকে। আবার কতকগুলি বীজের গায়ে পক্ষবৎ পাৎলা ত্বক (মেহগ্নি, সজিনা, শণ, সরল ইত্যাদি) অথবা রোমগুচ্ছ (কার্পাস, আকন্দ, ছাতিম, শিমূল প্রভৃতিতে) বর্ত্তমান থাকে। বায়ুতে নীত বীজগুলির অনেকাংশ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকায় এই প্রকার বীজ বহু পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

(২) জলজ গাছের বীজগুলি অনেকক্ষেত্রে এইরূপ যে, তাহারা জলে ভাসে না; কেবল জলের স্রোতে কিছু দূরে নীত হইতে পারে। কিন্তু কতকগুলি গাছের বীজের বাহিরে আবরণ থাকে; সেগুলি এইরূপভাবে গঠিত যে তাহা জলে ভাসিতে পারে এবং স্রোতে গাছ হইতে বহুদূরে নীত হয়। নারিকেল, তাল, সুপারী প্রভৃতি এইভাবে বিস্তৃত হয়।

(৩) যে সকল বীজ এবং ফল প্রাণিসাহায্যে ছড়াইয়া পড়ে, তাহারা প্রায়ই প্রাণিকর্ত্তৃক ভক্ষিত হয় অথবা ঐ বীজ বা ফলের গাত্রে কাঁটা, দৃঢ় লোম প্রভৃতি প্রবর্দ্ধন থাকায় ঐ গুলি সহজেই প্রাণীর গাত্রে সংলগ্ন হয়। সরস ফল প্রাণিকর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়। প্রাণী অন্যত্র উপনীত হইয়া মলত্যাগ করিলে বীজগুলি পরে মলের সহিত নির্গত হয় এবং তখন উহা হইতে গাছ জন্মে। বট, পেয়ারা প্রভৃতির বীজ এইভাবে স্থানান্তরিত হয়। যে সকল বীজ প্রাণীর গাত্রে সংলগ্ন হয়, সেগুলিও অন্যস্থলে নীত হয়।

(৪) কতকগুলি ফল পক্ক হইলে এরূপ জোরের সহিত ফাটিয়া যায় যে বীজগুলি কিছু দূরে গিয়া পড়ে। এইরূপে ক্রমশঃ ঐ গাছ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। দোপাটী ফুলের বীজ ইহার একটী উদাহরণ।

এই সকল প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া ব্যতীত মনুষ্যের সাহায্যে ও নানা কৃত্রিম উপায়ে একদেশ হইতে অন্য দেশে ফল ও বীজ নীত হইতে পারে। আমদানি ও রপ্তানির জন্য একদেশের ফল অন্য দেশে নীত হয় এবং তথায় পুনরায় বৃক্ষরূপে জন্মিয়া থাকে। এইরূপ বহু উদাহরণ দেখা যায়, যেমন আনারস, পেঁপে, লিচু, আপেল, পেয়ারা ইত্যাদি। বিদেশ হইতে যে সকল জিনিষ আমদানি হয়, উহা বস্তা বা বাক্সবন্দী হইয়া আসে; ঐ সকল দ্রব্য নানাজাতীয় শুষ্ক গাছের ডালপালা দ্বারা বেষ্টিত থাকে। সুতরাং ঐ সঙ্গে উহাদের বীজও আসিয়া পড়িতে পারে।

অঙ্কুশ,—(পুং ক্লী) [অঙ্ক-উশচ্] হস্তী চালাইবার বক্রাগ্র লৌহাস্ত্রবিশেষ; ডাঙ্গশ। ২ প্রতিবন্ধ। "নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ" (সিদ্ধান্তকৌ°)। ৩ দণ্ড। ৪ যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। ভারতের বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্ত্তিতে এইরূপ অস্ত্রচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

অঙ্কুশ$_2$—পঞ্চরাত্র মতানুযায়ী বৈষ্ণবদিগের দেবতাবিশেষ। দেবতার হস্তে যে অঙ্কুশ থাকে তাহাই এস্থলে মূর্ত্তিরূপে কল্পিত হয়। ঈশ্বরসংহিতায় (৭ অ°, পৃঃ ১০৬) নিম্নলিখিত ধ্যানটী পাওয়া যায়। যথা—

"কৃশাঙ্গং দীর্ঘবাহুঞ্চ পিঙ্গলাক্ষং তু চাঙ্কুশম্।
বিকরালমুখং রৌদ্রং ভিন্নাঞ্জনগিরিপ্রভম্॥"

অর্থাৎ অঙ্কুশদেবতার দেহ কৃশ, বাহু দীর্ঘ, চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, মুখ ভীষণাকৃতি, মূর্ত্তি রৌদ্র এবং কৃষ্ণবর্ণ পাহাড়ের ন্যায়।

অঙ্কুশক্রিমি—প্রাণিদেহের অন্ত্রমধ্যস্থ একপ্রকার ক্রিমি (Hookworm)। অঙ্কুশক্রিমি সাধারণতঃ দুই প্রকার—Ankylostoma duodenale ও Necator americanus; উভয়ই পরাঙ্গপুষ্ট। Ankylostoma duodenale প্রাচীন মহাদ্বীপে এবং Necator americanus নূতন মহাদ্বীপে দৃষ্ট হয়। কএক বৎসর পূর্ব্বে সিংহল দ্বীপে অপর এক জাতীয় অঙ্কুশক্রিমি মানুষের অন্ত্র হইতে পাওয়া গিয়াছিল। ইহাকে Ankylostomaceylonicum বলা হয়। ইহা সাধারণতঃ খট্টাশের অন্ত্রে দেখা যায়।

অঙ্কুশক্রিমির স্ত্রী ও পুরুষ ভিন্ন। পুরুষ ও স্ত্রী ক্রিমিগুলি যথাক্রমে ⅓ ও ½ ইঞ্চ অপেক্ষা কিছু লম্বা। পুংক্রিমির পশ্চাদ্ভাগে ছাতার মত বিস্তৃত ঝিল্লী দেখা যায়। কিন্তু স্ত্রীক্রিমির পশ্চাদ্ভাগ সূক্ষ্মাগ্র। Ankylostoma duodenaleএর স্ত্রীক্রিমির জননেন্দ্রিয়ের ছিদ্র দেহের নিম্নার্দ্ধভাগের সম্মুখভাগে অবস্থিত, কিন্তু স্ত্রী Necator americanusএর জননেন্দ্রিয়ের ছিদ্র উর্দ্ধার্দ্ধভাগের মধ্যে অবস্থিত। Ankyl. duodenaleএর মুখ বৃহৎ এবং ডিম্বাকার। মুখগহ্বরের ভিতরে সম্মুখ দিকে চারিটী অঙ্কুশের ন্যায় দন্ত এবং পশ্চাদ্দিকে দুইটী ছোট গুলির ন্যায় দন্ত দৃষ্ট হয়। সম্মুখের দন্ত চারিটীর নীচের দিকে দুইটী ধারাল ছুরির ফলার মত দাঁত আছে। N. americanusএর মুখ গোল ও ক্ষুদ্র এবং মুখগহ্বরের ভিতর চারিটী দৃঢ় পট্টক থাকে। পশ্চাদ্দিকেও ঐরূপ দুইখানি পট্টক দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন পশ্চাদ্ভাগের মধ্যরেখায় একটী বৃহৎ ক্রমসূক্ষ্ম দন্ত পরিদৃষ্ট হয়। এই দন্ত Ankyl. duodenaleএর থাকে না। এই জাতীয় পুরুষের পশ্চাদ্ভাগে যে বিস্তৃত চর্ম্ম থাকে, তাহা তিন ভাগে বিভক্ত; কিন্তু N. americanusএর উহা দুই ভাগে বিভক্ত।

অঙ্কুশক্রিমির জীবনী—অঙ্কুশক্রিমি মানুষের অন্ত্রের গাত্রে দন্তদ্বারা সংলগ্ন থাকে। ক্রিমির ডিমগুলি মলের সঙ্গে বহির্গত হইয়া ২।১ দিনের মধ্যেই ছোট ছোট শিশুক্রিমি

ফুটিয়া বাহির হয়। এই শিশুক্রিমি দেখিতে অতি ক্ষুদ্র দণ্ডের ন্যায়। ইহারা শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় এবং তিন দিনের পর একবার খোলস ছাড়ে। পাঁচ দিন পরে ইহারা আর একবার খোলস ছাড়ে এবং তৎকালে একটী কোষের ভিতর থাকিয়া যায়। এই সময় ইহারা খাদ্যাদি গ্রহণ করে না এবং ঘাসের পাতার উপর আস্তে আস্তে চলিয়া বেড়ায়। ইহারা আর্দ্রতা ও ছায়ার বর্ত্তমানে কয়েকমাস পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র শিশুগুলি চর্ম্মভেদ করিয়া অথবা তরিতরকারির সহিত মুখের ভিতর দিয়া মানুষের দেহে প্রবিষ্ট হয়। চর্ম্মভেদ করিয়া মানুষের দেহে প্রবেশ করিবার পর ইহারা লসিকানালী (lymphatic) অথবা শিরার ভিতর দিয়া হৃদয়ের দক্ষিণ ভাগে উপস্থিত হয়। তথা হইতে ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিয়া ফুস্‌ফুসে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থলী আছে, তাহার ভিতর যাইয়া পড়ে ; তৎপরে ঐ স্থান হইতে শ্বাসনালী (bronchii) দিয়া ক্রমশঃ বায়ুনালীতে (trachea) উপস্থিত হয়। পরে বায়ুনালী হইতে বাহির হইয়া অন্নবহা নালীর (œsophagus) ভিতর দিয়া প্রথমে পাকস্থলী ও তৎপরে অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে সংলগ্ন হয়।

অঙ্কুশক্রিমি-রোগ (Ankylostomiasis)—অঙ্কুশক্রিমিজাত রোগবিশেষ। এই রোগ উষ্ণমণ্ডল এবং তাহার দুইপার্শ্বস্থ দেশ-সমূহে দৃষ্ট হয়। কিন্তু উষ্ণমণ্ডলের বাহিরেও খনি এবং সুড়ঙ্গমধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব আছে। ইহা ভারতবর্ষ, মিশর, চীন, শ্যাম প্রভৃতি দেশে এবং ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জে দৃষ্ট হয়। আমেরিকায় ব্রেজিল, মধ্যআমেরিকায় মেক্সিকো এবং যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ ভাগে এই রোগের প্রাদুর্ভাব আছে।

কারণ—অঙ্কুশক্রিমি অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে সংলগ্ন থাকিয়া এই রোগের উৎপাদন করে। চর্ম্মের যে স্থান দিয়া অঙ্কুশক্রিমির শাবকগুলি মনুষ্যদেহে প্রবিষ্ট হয়, ঐ স্থানে প্রদাহ দেখা যায়। ঐ প্রদাহ পক্ষকাল বর্ত্তমান থাকে। যে সময়ে শাবকগুলি ফুস্‌ফুসে উপস্থিত হয়, তখন অতিরিক্ত কাসির উপদ্রব ঘটে। অঙ্কুশক্রিমি কি প্রকারে রোগোৎপাদন করে, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ মনে করেন, এই ক্রিমি দ্বারা অন্ত্রের গাত্রে যে ক্ষত উৎপাদিত হয়, তাহার ভিতর দিয়া bacteria বা জীবাণু দেহ-মধ্যে প্রবেশ করে। কাহারও কাহারও মতে, এই ক্রিমিগুলির দেহ হইতে একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ নির্গত হইয়া রক্ত-কণিকাগুলিকে ধ্বংস করিয়া দেয়। আবার কাহারও মতে, এই ক্রিমিগুলি রোগীর রক্ত পান করিয়া রক্তহীনতা উৎপাদন করে।

লক্ষণ—লক্ষণ হিসাবে আমরা রোগীদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারি। (১) যে সকল রোগীর কোন রকম লক্ষণই থাকে না। মল পরীক্ষা করিয়া মলের সহিত ইহাদের ডিম দেখিয়া রোগ নির্ণয় করা হয়। (২) ইহাদের দেহে সামান্য রক্তাল্পতা হয়। পাকস্থলীর উপর টিপিলে ব্যথা অনুভব করে ; এবং প্রায়ই অম্লোদ্গার দেখা যায়। বুক ধড়ফড় করে এবং অল্প পরিশ্রমে নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট অনুভূত হয়। মাথাব্যথা এবং মাথাঘোরা থাকিতে পারে। (৩) অত্যন্ত রক্তাল্পতা, অল্প পরিশ্রমেই বুক ধড়ফড় করা এবং হাঁপানী দেখা যায়, পাকস্থলী স্ফীত হয় এবং পেট বড় হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পায়ে শোথ দেখা দেয় ও কাণে ঝিঁঝিঁ ধরিয়া থাকে। রোগীর ক্ষুধা নষ্ট হইয়া যায় এবং মাটি, খড়ি প্রভৃতি খাইবার ইচ্ছা জন্মে। দেহের উত্তাপ বরাবরই সমান ভাবে থাকে, জ্বর হয় না।

রোগনির্ণয়—যদিও ঐ সকল লক্ষণ দ্বারা এই রোগ নির্ণয় করা যাইতে পারে, কিন্তু অণুবীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্যে মল পরীক্ষা করিয়া অঙ্কুশক্রিমি ও তাহার ডিম দেখিয়া রোগের নির্ণয় হয়। ডিমগুলি অণ্ডাকার, খোলা পাতলা, খোলের ভিতরে একটী স্বচ্ছ স্তর থাকে, মধ্যভাগ কণাময় এবং কএকখণ্ডে বিভক্ত। রক্ত পরীক্ষায় জানা যায় যে, লাল কণিকার সংখ্যা ও রক্তের রঞ্জক বস্তর পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়াছে। এই রোগে ইয়োজিনোফিল নামক শ্বেতকণিকার সংখ্যা বাড়িয়া যায়।

ভাবী ফল—পূর্ণবয়স্কদের অপেক্ষা বালকদের পক্ষে এই রোগ অধিকতর মারাত্মক। কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যগণ অপেক্ষা শ্বেতবর্ণ মনুষ্যেরা ইহাদ্বারা অধিক আক্রান্ত হয়।

রোগনিবারণ ও চিকিৎসা—রোগ নিবারণ করিতে হইলে সন্দেহজনক রোগীর মল পরীক্ষা করিতে হইবে। মলে অঙ্কুশক্রিমির ডিম থাকিলে ঐ মল এমন ভাবে নষ্ট করিতে হইবে, যাহাতে উহা হইতে রোগ ছড়াইয়া না পড়ে। এই রোগের প্রধান ঔষধ থাইমল (thymol), চিনো-পোডিয়াম্ তৈল (chenopodium oil) এবং বীটা ন্যাপথল। থাইমল ১৫ হইতে ৩০ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। ক্ষুদ্র শিশু অথবা অতি বৃদ্ধের থাইমল দ্বারা চিকিৎসায় বাধা আছে। কার্ব্বন্ টেট্রাক্লোরাইড্ নামক ঔষধেও খুব উপকার দেখা গিয়াছে। ইহার মাত্রা ১০ হইতে ৪৫ ফোঁটা, দুগ্ধের সহিত খাওয়ানই প্রশস্ত। থাইমল দিয়া চিকিৎসার সময় রোগী তৈল, ঘৃত অথবা কোনরূপ স্নেহঘটিত খাদ্য বা ঔষধ খাইবে না, কারণ থাইমল ঐ সকল পদার্থে দ্রব হয় এবং শরীরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বিষক্রিয়া সম্পাদন

করে। যে দিন থাইমল খাওয়ান হইবে, সে দিন রোগী সামান্য খাদ্য খাইয়া থাকিবে। ব্রেজিলে ৫ গ্রেন্ বীটা-ন্যাপথল এবং ১ গ্রেন্ ফিনল্ফ্থালিন্ মিশাইয়া খাওয়ান হয়। এই সকল ঔষধ দ্বারা ক্রিমিগুলি অন্ত্র হইতে নির্গত হইয়া গেলে রোগীকে লৌহঘটিত অথবা আর্সেনিকঘটিত বলকারক ঔষধ সেবন করান আবশ্যক হয়।

অঙ্কুশ খাঁ—বোম্বাই প্রদেশস্থ সাঙ্গলি রাজ্যের অন্তর্গত শিরহট্টি দুর্গের নির্ম্মাতা। ইঁহার নিবাস লক্ষ্মেশ্বর নামক স্থানে ছিল। কেহ কেহ বলেন, শিরহট্টি দুর্গ অঙ্কুশ খাঁর নির্ম্মিত নহে,—খঙ্গবন্দ দেশাই নামক এক ব্যক্তি উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

অঙ্কুশগ্রহ—(পুং) [অঙ্কুশ-গ্রহ-অচ্] নিষাদী ; মাহুত ; অঙ্কুশধারী। "অন্বেতুকামোঽবমতাঙ্কুশগ্রহঃ"। (মাঘ)

অঙ্কুশদুর্দ্ধর—(পুং) [অঙ্কুশেন দুঃখেন ধ্রিয়তে দুর-ধৃ-খল্] ক্ষিপ্ত হস্তী ; দুর্দ্দান্ত হস্তী।

অঙ্কুশধারিন্—(পুং) [অঙ্কুশং ধারয়তি, অঙ্কুশ-ধারি-ণিনি] অঙ্কুশধারী, হস্তিচালক। ২ অঙ্কুশধারী ঋকারাধিষ্ঠিত দেবতা। তন্ত্রমতে প্রত্যেক অক্ষরের একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পরিকল্পিত হয়। শ্রীতত্ত্বনিধিতে (পৃঃ ৪০) ইঁহার ধ্যান নিম্নপ্রকার। যথা—

"হেমবর্ণো নরাকৃতির্দক্ষিণহস্তে তর্জ্জনীমুদ্রান্বিতঃ
কটিবিন্যস্তবামহস্তঃ স্বচিহ্নাঙ্কিতমস্তকঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ।"

অর্থাৎ অঙ্কুশধারী দেবতার গায়ের রঙ্ সোণার মত, আকৃতি মানুষের মত, দক্ষিণহস্তে তর্জ্জনীমুদ্রা এবং বামহস্ত কটিতে বিন্যস্ত। তাঁহার মস্তকে একটী ছোট অঙ্কুশের মূর্ত্তি এবং তিনি সকল প্রকার আভরণে ভূষিত।

অঙ্কুশমুদ্রা—(স্ত্রী) অঙ্কুশাকার মুদ্রা। মধ্যমা অঙ্গুলিকে সরল করিয়া উহার মধ্য পর্ব্বের মূল হইতে তর্জ্জনীকে কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করিলে যে আকৃতি হয়, তাহাকে অঙ্কুশমুদ্রা কহে।

"ঋজ্বীঞ্চ মধ্যমাং কৃত্বা তন্মধ্যপর্ব্বমূলতঃ।
তর্জ্জনীং কিঞ্চিদাকুঞ্চেৎ সা মুদ্রাঙ্কুশসংজ্ঞিতা॥" (তন্ত্র)

এই মুদ্রাটী পূজাদির সময় তীর্থ আবাহন (জলশুদ্ধি) করিতে আবশ্যক হয়। তীর্থ আবাহনের মন্ত্র এই—

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"

অঙ্কুশরায়—একাম্রনাথ-রচিত 'জাম্ববতী-পরিণয়' ও 'সত্যা-পরিণয়' কাব্যে ইম্মড়ি-অঙ্কুশরায় নামক এক রাজার উল্লেখ আছে। ইনি রাণাবংশীয় এবং ইঁহার বংশপরিচয় উক্ত গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

তিম্ম = মল্লমা
|
শিঙ্গ = গঙ্গমা
|
জগদেকরায় = গির্য্যম্বা
|
অঙ্কুশ = লিঙ্গমা + বিট্ঠলাম্বা
|
ইম্মড়ি-অঙ্কুশ

অঙ্কুশশক্তি—(স্ত্রী) ইনি অঙ্কুশদেবতার শক্তিরূপে পরিকল্পিত হইয়াছেন। ইঁহার অপর নাম পরমেশ্বরী। কালীবিলাসতন্ত্রে (২৯ পটল, পত্র ৬৯) ইঁহার নিম্নলিখিত ধ্যান পাওয়া যায়—

"প্রতপ্তকাঞ্চনাভাসাং চতুর্ব্বাহুসমন্বিতাম্।
দিব্যাম্বরপরীধানাং দিব্যাভরণভূষিতাম্॥
দ্বিভুজাং পদ্মমুচ্চার্য্য বরাভয়বিধারিণীম্।
সিন্দূরতিলকোদ্দীপ্তামঞ্জনাঞ্চিতলোচনাম্॥
কটাক্ষবিশিখোপেতভ্রূলতাপরিশোভিতাম্।
মায়ারূপাঙ্কুশং বামে বিভ্রতীং পরমেশ্বরীম্॥"

অঙ্কুশশক্তি বা পরমেশ্বরীর বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়, ইঁহার চারি হাত ; দুইহাতে পদ্ম ও অপর দুইহাতে বর ও অভয় ; ললাটে সিন্দূর ও তিলক, নেত্রে অঞ্জনশোভা। ইঁহার ভ্রূযুগল শায়কতুল্য ও মনোহর কটাক্ষশোভিত এবং বামে মায়ারূপী অঙ্কুশ অবস্থিত।

অঙ্কুশা—(স্ত্রী) জৈনদিগের দেবীবিশেষ। প্রতিপক্ষের উপর জয়লাভের জন্য এই দেবীর উপাসনা জৈনদিগের মধ্যে ছিল। আচারদিনকরে (প. ১৭৭) অঙ্কুশার নিম্নলিখিত ধ্যান পাওয়া যায়—

"পদ্মাসনোজ্জ্বলতনুশ্চতুরাঢ্যবাহুঃ,
পাশাসিলক্ষিতসুদক্ষিণহস্তযুগ্মা।
বামে চ হস্তযুগলেঽঙ্কুশখেটকাভ্যাং
রম্যাঙ্কুশা দলয়তু প্রতিপক্ষবৃন্দম্॥"

অঙ্কুশা পদ্মাসনে সমাসীনা ; তিনি চতুর্ভুজা, তাঁহার দক্ষিণহস্তদ্বয়ে পাশ ও অসি এবং বামহস্তযুগলে অঙ্কুশ ও খেটক থাকে এবং তাঁহার মূর্ত্তি অতি রমণীয়।

নির্ব্বাণকলিকায় (প. ৩৬) যে ধ্যান পাওয়া যায়, তাহা উপরিলিখিত ধ্যান হইতে একটু বিভিন্ন। এই মূর্ত্তির বামহস্তে খেটকের বদলে চর্ম্মফলক থাকে।

অঙ্কুশী—(স্ত্রী) [অঙ্কুশোঽস্ত্যস্যাঃ অচ্ গৌরাদি°] চিত্তরূপ হস্তীকে দমন করিবার উপায় আছে যাহার, অর্থাৎ যে স্ত্রীলোকের চঞ্চল চিত্তকে সংযত করিবার মত বিবেক আছে। ২ বৌদ্ধদিগের দেবতাবিশেষ। ইঁহার অপর নাম বজ্রাঙ্কুশী এবং ইনি বজ্রতারা মণ্ডলের আটটী পার্শ্বদেবতার মধ্যে একটী। 'ওঁ তারে তুত্তারে তারে স্বাহা' মন্ত্রের "ত্তা"

অঙ্কর হইতে ইঁহার উৎপত্তি। সাধনমালায় (প. ১৯৮) ইঁহার নিম্নলিখিত ধ্যান পাওয়া যায়—

"পূর্ব্বদ্বারেহঙ্কুশীং শুক্লাং বীজত্তাকারসংভবাম্।
দক্ষিণে অঙ্কুশধরাং বামতো দুষ্টতর্জ্জনীম্॥"

অর্থাৎ অঙ্কুশী দেবীকে পূর্ব্বদ্বারে কল্পনা করিবে। তাঁহার অঙ্গের বর্ণ শুক্ল, এবং তিনি "ত্তা"কার বীজ হইতে উৎপন্ন হন। তাঁহার দক্ষিণহস্তে অঙ্কুশ থাকে, এবং তিনি বামহস্তের তর্জ্জনীর দ্বারা দুষ্টদিগের শাসন করিয়া থাকেন।

অঙ্কূর—(পুং) [অঙ্ক-উরচ্; খর্জ্জূরাদিত্বাৎ দীর্ঘোঽপি] বীজোৎপন্ন বৃক্ষাদির কোরক। [অঙ্কুর দ্র°]

অঙ্কূষ—(পুং) [অঙ্ক-উষচ্, খর্জ্জূরাদিত্বাৎ দীর্ঘো বা] ডাঙ্গশ। [অঙ্কুশ দ্র°]

অঙ্কেবালিয়া—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় রাজ্যের অন্তর্গত ঝালাবার প্রান্তস্থ একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। গ্রামসংখ্যা ৩টী। এখানকার সর্দ্দারগণ লিমডীর ঝালাবংশীয় রাজপুত। লিমডীর সর্দ্দার ভোজরাজজীর (১৬৯৪ খৃঃ) দ্বিতীয় পুত্র সাঙ্গোজী এই বংশের আদিপুরুষ।

অঙ্কো—প্রাচীন জাপানের একজন সম্রাট্। ইনি ৪৫৪ হইতে ৪৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সম্রাট্ পদে অভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বে ইঁহার নাম ছিল অনাহো। ইঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাট্ ইঙ্গ্যা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কারুকে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। কিন্তু অভিষেকের পূর্ব্বে জানা গেল যে, নিজের সহোদরা ভগিনীর সহিত তাঁহার অবৈধ সম্বন্ধ আছে। জাপানে খৃষ্টীয় সপ্তম শতক পর্য্যন্ত বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে এবং খুল্লতাতের সহিত ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ প্রচলিত ছিল; কিন্তু সহোদরার প্রতি ঈদৃশ আচরণ দেখিয়া জাপানবাসিগণ কারুকে রাজা বলিয়া মানিতে চাহিল না। মন্ত্রিগণ মৃত সম্রাটের মনোনয়ন অগ্রাহ্য করিয়া রাজপুত্র অনাহোকে সম্রাট্পদে নির্ব্বাচিত করিলেন।

অনাহো সম্রাট্ হইয়া বেশীদিন সুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। তিনি দুষ্ট মন্ত্রীর প্ররোচনায় নিজের খুল্ল-পিতামহকে হত্যা করিয়া খুল্ল-পিতামহীকে উপপত্নীরূপে গ্রহণ করেন। এইরূপ ব্যবহারে ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার খুল্ল-পিতামহের বালকপুত্র তাঁহাকে হত্যা করেন।

অঙ্কোট—(পুং) [অঙ্ক-ওট] [বৈদ্যক] দীর্ঘকণ্টকযুক্ত রক্তবর্ণ-ফলবৃক্ষবিশেষ; আকোটগাছ। বাঙ্গালায় ইহাকে বাঘআকড়া বা বাঘ আঁচড়া, আঁকোড় ও ধল আঁকোড় বলে। ইহার হিন্দী নাম অকোলা, ঢেরা; উড়িয়া—ধলাঙ্কু; মহারাষ্ট্রীয়—অঙ্কোল; গুজরাটী—ওঁকলা; কর্ণাটী—অঙ্কুলে; তেলেগু—উড়ুগচেট্টু, অঙ্কোলম্চেট্টু; কনাড়ী—উরু, অঙ্কোল; সিংহলী—ঈপট্ট। সংস্কৃত পর্য্যায়—অঙ্কোঠ, অঙ্কোল, অঙ্কোলা, অঙ্কোলিকা, পীতসার, সুগন্ধিপুষ্প, দৃঢ়কণ্টক, লম্বপর্ণ, গন্ধপুষ্প, তাম্রফল। বৈজ্ঞানিক নাম—Alangium Lamarkii, Alangium Hexapetalum, Alangium Decapetalum.

অঙ্কোট একপ্রকার ক্ষুদ্রকায় আরণ্যবৃক্ষ। ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশে ইহা দৃষ্ট হয়; বঙ্গদেশে হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার এঁটেল জমিতে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। শুষ্ক ও উচ্চ জমিতে ইহা ভাল জন্মে। পাতাগুলি লম্বা চওড়ায় কতকটা আমের পাতার মত। পাতার উপর অর্ব্বুদাকৃতি স্ফীতি হইয়া থাকে। অঙ্কোট বৃক্ষে বিল্ব বৃক্ষের ন্যায় কণ্টক এবং তীক্ষ্ণাগ্র প্রশাখা আছে। রঙ্ উপরিভাগে পীত, মধ্যভাগে বাদামী। কাঠ শক্ত, পালিসে সুন্দর ও মসৃণ হয়। চৈত্র মাসে অঙ্কোট বৃক্ষে ফুল হইয়া থাকে, তখন গাছে একটীও পাতা থাকে না, দেখিলে মনে হয় যেন শুষ্ককাষ্ঠে ফুল ফুটিয়াছে। অঙ্কোট পুষ্প সুগন্ধিযুক্ত ও ইহার গন্ধ উপকারী; পুষ্পের রঙ্ শাদা। অঙ্কোটফল কালো—ভাঁটার মত, ইহাতে একটী মাত্র বীজ থাকে। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ফল পাকিলে জামের মত দেখায়। পল্লীগ্রামে বালকেরা পাকা আঁকোড় ফল খাইয়া থাকে। পাকা ফল ঈষৎ মিষ্ট এবং একটু আঁস্টে গন্ধযুক্ত। আঁকোড় গাছের ডালে সুন্দর ছড়ি হয়। অঙ্কোটমূল ও ত্বক্ অত্যন্ত তিক্ত।

আঁকোড় গাছের মূল ও ছাল আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে ব্যবহৃত হয়। চরকে লিখিত আছে, "শ্লেষ্মলং গুরুবিষ্টম্ভিবাঙ্কোট-ফলমগ্নিজিৎ"। সুশ্রুত বলিয়াছেন, বিষাক্ত দন্তকাষ্ঠ বা দাঁতন দ্বারা জিহ্বা, দাঁতের মাড়ী ও ওষ্ঠ স্ফীত হইলে অঙ্কোট মূলের ছাল চূর্ণ করিয়া স্ফীতস্থানে মধুর সহিত ঘষিতে বা প্রলেপ দেওয়া বিধেয়। বিষাক্ত অঞ্জন ব্যবহারে দৃষ্টির স্বল্পতা হইলে অঙ্কোট পুষ্পের অঞ্জন দিতে হয়। ভাবপ্রকাশে ইহার মূলের ছালকে বিরেচক, ক্রিমিঘ্ন এবং শূল, দাহ ও বিষঘ্ন বলা হইয়াছে; ইহার ফল স্নিগ্ধ, বলকারক ও ক্ষয়রোগে উপকারী।

বাগ্ভটের মতে, অঙ্কোল মূল বা ছাল ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া পান বা লেপন করিলে সর্ব্বপ্রকার মূষিকবিষ নষ্ট হইয়া থাকে। (বাগ্ভট, উ° ৩৮ অ°)

এক তোলা অঙ্কোটমূল চাল ধোয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে অতিসার ও গ্রহণী রোগ প্রশমিত হয়। অঙ্কোটমূলের ক্বাথ জাল দিয়া ঘন করিয়া ফেনাইয়া গব্য ঘৃতের সহিত রোগীকে সেবন করাইলে এবং সেবনের পূর্ব্বে তাহাকে তিল তৈল মাখাইয়া স্বেদ দিলে গরদোষ বা গরল প্রভৃতি উপবিষ নাশ হয়। (চক্রদত্ত)

পাগলা কুকুরে কামড়াইলে অঙ্কোটমূলের ত্বক্ গোদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিতে দেওয়া হয়। (ভাবপ্রকাশ)

ধন্বন্তরিনির্ঘণ্টু মতে অঙ্কোটের গুণ—স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণোষ্ণ, কটু, বাতনাশক এবং কুক্কুর, ইন্দুর ও নানা প্রকার জলজন্তুর বিষনাশকারী এবং কণ্ঠশূলশোধক। রাজনির্ঘণ্টু মতে ইহার গুণ—কটু, স্নিগ্ধ, লূতাদি বিষদোষহর, কফ ও বায়ুনাশক এবং রেচক। ভাবপ্রকাশের মতে—কটু, তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, তুবর, লঘু, রেচন, ক্রিমি, শূল, আম, শোথ ও গ্রহবিষনাশক এবং বিসর্প, কফ, পিত্ত, মূষিক ও সর্পবিষাপহ। অঙ্কোটফল শীতল, স্বাদু, শ্লেষ্মঘ্ন, বৃংহণ, গুরু, বলকর, বিরেচন এবং বাত, পিত্ত, দাহ, ক্ষয় ও আমজিৎ।

মুদেন শেরিফের মতে, অঙ্কোট মূলের ত্বক্ জ্বরঘ্ন, বমনজনক, চর্ম্মরোগহর, কুষ্ঠ ও উপদংশরোগে হিতকর। বমনার্থ মাত্রা ৪৫ হইতে ৫০ গ্রেণ; ৬ হইতে ১০ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহারে ঘর্ম্মনিঃসরণ হইয়া জ্বরের উপশম হয়।

অঙ্কোটবটক—(পুং) [বৈদ্যক] রক্তাতিসারে দেয় বটক বা বটিকা।

অঙ্কোঠ—(পুং) [অঙ্ক-ওঠ] [বৈদ্যক] অঙ্কোট বৃক্ষ, আঁকোড় গাছ। [অঙ্কোট দ্র°]

অঙ্কোরথোম—শ্যাম-উপদ্বীপের দক্ষিণস্থ কম্বোজ (কম্বোডিয়া) দেশের প্রাচীন রাজধানীর নাম। কথিত আছে, খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতকে ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে এক রাজকুমার বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া এই কম্বোজ দেশের চৌকন (অঙ্কোরের উত্তরে) নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। সেই ভারতবাসিগণই এই দেশে বৈদিক ধর্ম্মের আচারাদি আনয়ন করিলে এখানকার নাগপূজকগণ তাহা সমাদরে গ্রহণ করেন। প্রথমে এই দেশের আদিম অধিবাসিগণের সহিত ভারতবাসীরা নির্ব্বিবাদে বাস করিতেছিলেন। কিছুকাল পরে উভয়জাতির মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হওয়ায় ভারতবাসিগণ আদিম অধিবাসিগণকে পরাজিত করিয়া স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করেন। তাহার পর ১২৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে চীন-সম্রাট্ কম্বোজদেশ জয় করিয়া উহা করদ রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় প্রথম শতকে দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বোপকূলবাসিগণ কম্বোজ দেশে আসিয়া তথায় বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃপ্রচার এবং ভারতীয় লিপির প্রচলন করেন। সংস্কৃত ও খ্মের শিলালিপিসমূহ হইতে জানিতে পারা যায়, খৃষ্টীয় ৪৩৫ অব্দ হইতে ৬৪০ অব্দ পর্য্যন্ত এক রাজবংশ এই দেশ শাসন করিতেন। সেই বংশের সাতজন নৃপতির মধ্যে ভববর্ম্মা একজন দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন। এই বংশের শেষ নৃপতি জয়বর্ম্মার মৃত্যুর পর হইতে নবম শতকের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত কম্বোজ দেশের ইতিহাসের বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ গৃহবিবাদের নিমিত্ত এই সময়কার ইতিহাস এইরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন। পুনরায় ৮০২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় জয়বর্ম্মা নামক অপর একজন নৃপতি একটী নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজবংশে ১৮ জন নৃপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন। জয়বর্ম্মা কম্বোজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া তোন্‌লিসাপ হ্রদের ১৪ মাইল উত্তরে মেকং উপত্যকায় অঙ্কোরথোম নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার রাজত্বের দশম বৎসরে এই রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি রাজধানীর মধ্যস্থলে রাজপ্রাসাদ, চূড়াকৃতি ফিমেয়নক মন্দিরগুলি, বেয়োঁর বিশাল মন্দির ও বহু হর্ম্ম্যরাজি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। যে কম্বোজীয় ভাস্করশিল্পধারা পরবর্ত্তী চারিশত বর্ষব্যাপী বিরাট্ ভাস্কর্য্যের ভিতর দিয়া বিকশিত হইয়াছিল, তাহার প্রথম সূত্রপাত হয় তাঁহারই সময়ে। অবশ্য তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ষষ্ঠ শতকের শেষ ভাগে ও সপ্তম শতকের প্রারম্ভে কম্বোজ-ভাস্কর্য্যের কয়েকটী নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি নিতান্তই নগণ্য। ফরাসী ঐতিহাসিক অয়মোনিয়র্ (Aymonier) মনে করেন যে, দ্বিতীয় জয়বর্ম্মা যবদ্বীপ হইতে আসিয়া থাকিবেন; কারণ, তাঁহার সময়কার ভাস্করশিল্পের সহিত যবদ্বীপের বরবদরের বিখ্যাত মন্দিরের অনেক শিল্পসাদৃশ্য আছে।

এই বংশের তৃতীয় নৃপতি ইন্দ্রবর্ম্মা বকু এবং বকংএর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং কম্বোজীয় স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ-নিদর্শন অঙ্কোরথোমের বেয়োঁ মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত করাইয়া তাহাতে দেবপ্রতিষ্ঠা করেন। রাজধানী অঙ্কোরথোমের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হইতে বহুদিন লাগিয়াছিল এবং ৯০০ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ নৃপতি যশোবর্ম্মার রাজত্বকালে হরিহরালয় হইতে রাজধানী এই নূতন নগরীতে স্থানান্তরিত হয়। জয়বর্ম্মার মৃত্যুর পর বহুকাল সেই স্থান হইতেই রাজ্যশাসন চলিতেছিল। যশোবর্ম্মা রাজপ্রাসাদের প্রাচীর মধ্যে লোলীমন্দির ও চূড়াকৃতি ফিমেয়নকমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার অসাধারণ দৈহিক শক্তি ছিল, কিন্তু উনবিংশ বা বিংশ বৎসর রাজত্বকালে তিনি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হওয়ায় পুত্রদিগের হস্তে রাজ্যভার দিয়া রাজ্যের উত্তর সীমান্তস্থিত অরণ্যে গিয়া বাস করেন। এই নৃপতির দ্বিতীয় পুত্র ঈশানবর্ম্মা ৯২৬ খৃষ্টাব্দে অঙ্কোরথোম পরিত্যাগ করিয়া চোক্-গর্গ্যের নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। ইনি ও ইঁহার পুত্র এইস্থান হইতেই রাজ্যশাসন করেন। ৯৪২ খৃষ্টাব্দে এই বংশের নবম নৃপতি রাজেন্দ্রবর্ম্মা পুনরায়

অঙ্কোরথোমে ফিরিয়া আসেন। এই নৃপতির রাজত্বকালে এই দেশে প্রথম বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। তাঁহার নির্ম্মিত তাপ্রোম ও বানতিয়ৈ কেদীর মন্দিরদ্বয় যথাক্রমে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ মন্দির। তাঁহার উত্তরাধিকারীর রাজত্বকালে অনেকগুলি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অঙ্কোরথোমের রাজপ্রাসাদের দক্ষিণদিকস্থ চূড়াকৃতি বাপুয়োঁ মন্দিরটী প্রধান। এই বংশের একাদশ নৃপতি সূর্য্যবর্ম্মা তাঁহার ৪৮ বর্ষ রাজত্বকালে বহু মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

দ্বাদশ নৃপতি উদয়াদিত্যবর্ম্মার সময়ও বহু মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী তিনজন নৃপতির রাজত্বকালে পুরসতের রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতি এই মন্দিরের সূচনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে এই বিরাট্ কীর্ত্তি পরিসমাপ্ত হয়। এই বংশের শেষ দুইজন নৃপতির রাজত্বকালে পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যগুলির সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায় সেই সময়ে কোন মন্দিরাদি নির্ম্মিত হয় নাই।

এই দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের ফলে কম্বোডিয়া বা কম্বোজ রাজ্যের পতন হয়। চম্পার (বা কোচিন চীনের) অধিবাসিগণ, পেগু ও শ্যামদেশবাসিগণ অনবরত কম্বোজ দেশ আক্রমণ করিয়া এই দেশ ধ্বংস করিতে থাকে। ১৩৭৫ খৃষ্টাব্দে



ব্রহ্মমন্দির—অঙ্কোরথোম

বাট্‌ফু মন্দির (১০৯০-১১০০ খৃষ্টাব্দ) ব্যতীত কোন নূতন মন্দির নির্ম্মাণের বিষয় জানা যায় না। এই সময় পুরাতন মন্দিরগুলির সংস্করণ ও পরিবর্দ্ধন এবং কম্বোজরাজ্যে অনেক বিপৎপাত হইয়াছিল। তাহার পর দ্বিতীয় সূর্য্যবর্ম্মা সাম্রাজ্যের পূর্ব্বাবস্থা ফিরাইয়া আনিয়া বহু হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি কেবল রণনিপুণ ছিলেন না, বিদ্যায় ও কবিত্বে তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। তিনি বিরাট্ অঙ্কোরবট-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া কীর্ত্তি সাতমাস অবরোধের পর রাজধানী অঙ্কোরথোম অধিকৃত হইয়াছিল। ইহার পর ক্রমান্বয়ে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়া অবশেষে মেকং নদীর তীরে ফ্নোম্‌পেন্‌ নামক স্থানে ধ্বংসাবশিষ্ট কম্বোজরাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হয়। [কম্বোজ দ্র°]

রাজা দ্বিতীয় জয়বর্ম্মা অঙ্কোরথোমে রাজধানী নির্ম্মাণের সূচনা করিয়া যান। তাঁহার সময় পুরীপ্রাকার ও সিংহদ্বারের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয় এবং পরবর্ত্তী চতুর্থ নৃপতির শাসনকালে তাহা

সম্পূর্ণ হইয়াছিল। সেই সকল পুরীপ্রাকার ও সিংহদ্বার বা গোপুরগুলির ধ্বংসাবশেষ আজিও প্রাচীন কীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রাজধানী পূর্ব্বপশ্চিমে ১০,০০০ ফুট দীর্ঘ এবং উত্তরদক্ষিণে ৯,৬০০ ফুট প্রস্থ; সুতরাং পুরীপ্রাকারটী দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে সর্ব্বসমেত সাড়েসাত মাইল। ইহা উচ্চে ২২ ফুট এবং ইহার বাহিরে নগরের চারিদিক্ ৩০০ ফুট প্রস্থ পরিখাদ্বারা বেষ্টিত। উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে এক একটী করিয়া এবং পূর্ব্বদিকে দুইটী পুরীপ্রবেশের দ্বার আছে। এই দ্বারগুলির মধ্যে বিজয়তোরণই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই তোরণটীর অভ্যন্তরের নক্সা কতকটা ক্রুশের মত—মধ্যস্থলে প্রশস্ত প্রবেশপথ এবং দুই পার্শ্বের পরিসরস্থান ক্রুশের বাহুর ন্যায়। এই তোরণের তিনটী শিখর আছে: শিখরগুলির উপরিভাগে চারিদিকে চারিটী বিরাট্ ব্রহ্মার মুখ।

এখানকার ব্রহ্মমন্দিরগুলির একটু বিশেষত্ব এই যে প্রত্যেক মন্দিরের চূড়ায় ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ শোভা পাইতেছে। এক একটী বৃহৎ ব্রহ্মমন্দির অঙ্কোরবটের সমকক্ষ হইতে পারে। অতি ক্ষুদ্রটীরও আয়তন ও গঠনপ্রণালী নিতান্ত সামান্য নয়। পূর্ব্বপৃষ্ঠে একটী ক্ষুদ্র ব্রহ্মমন্দিরের চিত্র দেওয়া গেল। মন্দিরের অভ্যন্তর যে প্রণালীতে এবং যেরূপ কৌশলে নির্ম্মিত, তাহা চিত্র করিয়া দেখান যায় না। স্থূল কথা, শিল্পিগণ প্রাণ ভরিয়া নিজ নিজ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

তোরণের প্রবেশপথের দুই পার্শ্বে হস্তীর মুখ এবং তাহার উপরে বহু প্রকার মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। পূর্ব্বদিকের অপর দ্বারটী দিয়া বেয়োঁ মন্দিরে যাওয়া যায়। নগরের ঠিক মধ্যস্থলে রাজপ্রাসাদ ২,০০০ ফুট দীর্ঘ ও ৮০০ ফুট প্রস্থ। ইহা দুইটী প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং প্রাচীরদ্বয়ের মধ্যে একটী পরিখা বর্ত্তমান। ফিমেয়নক চূড়াকৃতি মন্দির ও কয়েকটী প্রস্তরনির্ম্মিত হর্ম্ম্যাধিষ্ঠান ব্যতীত রাজপ্রাসাদের কোন চিহ্নই এখন বর্ত্তমান নাই।

এই সমস্ত মন্দির, প্রাচীর, প্রাকার ও নগরাবশেষ দেখিয়া বুঝা যায় যে, প্রাচীন কম্বোজ-দেশবাসিগণ ভারতীয় ধর্ম্মপ্রভাবের নিদর্শন প্রকৃষ্টভাবেই রাখিয়া গিয়াছেন।

অঙ্কোরবট—কম্বোজের প্রাচীন রাজধানী অঙ্কোরথোমের নিকটবর্ত্তী একটী বিখ্যাত মন্দির। শ্যামবাসীরা ইহাকে 'নখনবট' বলে, এই শব্দের অর্থ 'নগরের মন্দির'। এই মন্দিরটী অঙ্কোরথোম ও তোন্‌লিসাপ হ্রদের মধ্যপথে অবস্থিত। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ২৩শে মার্চ্চ তারিখে ফ্রান্স ও শ্যামদেশের মধ্যে সন্ধি হওয়ায় যে সকল স্থান ফরাসী অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এই মন্দিরটী অন্যতম। এই মন্দিরটীর নির্ম্মাণকার্য্য খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে রাজা প্রথম ধরণীধরবর্ম্মার রাজত্বকালে আরম্ভ হয় এবং পরবর্ত্তী নৃপতি দ্বিতীয় সূর্য্যবর্ম্মার রাজত্বকালে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হয়।

এই মন্দিরটী দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় সমান। মন্দিরের চতুঃপার্শ্বস্থ প্রাচীরটী দৈর্ঘ্যে ১,১০০ গজ, প্রস্থে ১,০৮০ গজ এবং চারিদিক্ ২১৬ গজ বিস্তৃত পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই পরিখার পশ্চিম দিক্ হইতে দুই সারি স্তম্ভের উপর নির্ম্মিত একটী মনোরম পথ বরাবর পরিখা পার হইয়া প্রাচীরের ভিতর দিয়া মন্দির পর্য্যন্ত গিয়াছে। প্রাচীরের প্রবেশ-দ্বার বা গোপুরটী দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত মন্দিরসমূহের গোপুরের অনুরূপ, কিন্তু ইহা সেগুলি অপেক্ষা অনেক প্রশস্ত এবং বহু চূড়া ও দুইপার্শ্বে স্তম্ভসমন্বিত অলিন্দশোভিত। গোপুর হইতে মন্দির পর্য্যন্ত পথটী ৩৭০ গজ দীর্ঘ ও মন্দিরের ঠিক সম্মুখে এই পথের দুই ধারে স্তম্ভশ্রেণীর উপর অবস্থিত দুইটী ছোট ছোট সুন্দর মন্দির আছে। প্রধান মন্দিরের চারিদিকে পর পর তিনটী বেষ্টনী আছে। এই বেষ্টনীগুলি একটী হইতে অপরটী ১৫ হইতে ২০ ফুট উচ্চ তলে অবস্থিত। ইহাতে মন্দিরটীর আকৃতি কতকটা পিরামিডের মত বলিয়া মনে হয়। বাহিরের বেষ্টনীটী ৭০০ ফুট দীর্ঘ ও ৫৯৬ ফুট প্রস্থ। এই বেষ্টনীর প্রতিদিকে তিনটী করিয়া প্রবেশপথ আছে এবং সেইগুলির উপর চূড়াকৃতি গোপুর এবং প্রত্যেকটীর দুইপার্শ্বে স্তম্ভশোভিত খোলা টানা বারান্দা আছে। এই বারান্দার ভিত্তিগাত্রে উৎকীর্ণ চিত্রগুলি মন্দিরটীর শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। মন্দিরের চূড়া ভূমি-তল হইতে ১৮০ ফুট উচ্চ।

পূর্ব্বোল্লিখিত টানা বারান্দা বা অলিন্দের ভাস্করনৈপুণ্য ও তাহার শিল্পচাতুর্য্য অতুলনীয়। অলিন্দের একপার্শ্বে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড নির্ম্মিত ভিত্তি। এই প্রস্তরগুলি কোন প্রকার বজ্রলেপ দ্বারা সংবদ্ধ নহে এবং এইগুলি এইরূপ ভাবে মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে যেন একখণ্ড প্রস্তর বলিয়া ভ্রম হয়। এই ভিত্তির সম্মুখে দুই সারি ব্রহ্মকাণ্ড বা চতুষ্কোণ স্তম্ভ; তাহাদের বোধিকাগুলি প্রাচীন ভারতের স্তম্ভ-বোধিকার ন্যায়, তবে অধিকতর কারুকার্য্যশোভিত। এই স্তম্ভগুলির কোন অধিষ্ঠান নাই, কিন্তু স্তম্ভের প্রতিদিকে একটী করিয়া উপাসকের মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। স্তম্ভের উপর উত্তর (architrave) এবং তাহার উপর যে কণ্ঠ (frieze) আছে, সেগুলির মন্দিরাভ্যন্তর ভাগ সুন্দর উৎকীর্ণ চিত্রদ্বারা অলঙ্কৃত। তাহার উপর প্রাচীন কালোচিত কার্ণিশ, তদুপরি ভারতীয়শিখরা-কৃতি খিলান। একটীর উপর আর একটী বহিঃপ্রসৃত প্রস্তর সাজাইয়া খিলান নির্ম্মিত। খিলানে কোনরূপ কারুকার্য্য নাই।

এই অলিন্দের পর অন্য একটী অলিন্দ, তাহার স্তম্ভগুলি ক্ষুদ্রতর; সেগুলির অধিষ্ঠান ও বোধিকা দুইই আছে। এই স্তম্ভগুলির উপরে আড়াআড়ি ভাবে ভিতরের বৃহত্তর স্তম্ভগুলির সহিত সম্বদ্ধ প্রস্তরের কড়ি বা বন্ধনী আছে। সেই বন্ধনীগুলি বৃহত্তর স্তম্ভগুলির সহিত এরূপভাবে সম্বদ্ধ যে হঠাৎ দেখিলে এক খণ্ড প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া ভ্রম হয়। এইরূপ পরপর দুইটী অলিন্দ থাকায় সূর্য্যের প্রখর তেজ ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না, অথচ আলোবাতাস যথেষ্টই পাওয়া যায়। অলিন্দের বহির্দ্দিকস্থ ছাদের কার্ণিশ সপ্তশীর্ষনাগশ্রেণীর দ্বারা গঠিত।

অলিন্দের অভ্যন্তরস্থ ভিত্তি গাত্রে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী হইতে যুদ্ধের দৃশ্য অতি সুন্দর ভাবে উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

নৈঋ্ত কোণ দিয়া মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিলে ডান ধারে অপূর্ব্ব দৃশ্য নয়নগোচর হয়। এখানে ভীষ্মের শরশয্যার দৃশ্য। মধ্যস্থলে কুরুপিতামহ ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত; তাঁহার দুইপার্শ্বে মুকুট ও কিরীটশোভিত কুরু ও পাণ্ডব-পক্ষীয় বীরগণ দণ্ডায়মান। গজে ও রথে তেজঃপুঞ্জ মহা-রথিগণ অবস্থান করিতেছেন। পিতামহ ভীষ্মের অনতিদূরে গজের উপর রাজা দুর্য্যোধন ম্লানবদনে বসিয়া আছেন।



রাবণের সমর-শয্যা

শত শত বর্ষ গত হইয়াছে, তথাপি ঐ সকল মূর্ত্তির কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই; এই প্রস্তরখোদিত মূর্ত্তিসকল দূর হইতে দেখিলে জীবন্ত বলিয়া বোধ হয়।

মন্দিরের মধ্যে পশ্চিমোত্তরভাগে রামায়ণের দৃশ্য। রাক্ষসবানরে ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে। বিকট মূর্ত্তিধারী রাক্ষসবীরগণ রথে চড়িয়া বাণ বর্ষণ করিতেছে; মধ্যস্থলে রাম হনূমানের উপর বসিয়া রাবণের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতেছেন, তাঁহার দুই পার্শ্বে লক্ষ্মণ ও বিভীষণ দণ্ডায়মান। সিংহ-যোজিত রথে রাবণ রামের শরপীড়নে জর্জ্জরিত হইয়া অবস্থান করিতেছে। রাবণের মুকুটশোভিত দশ মুণ্ড ও বিংশতিবাহু। স্কন্ধের উপর প্রথম সারিতে ৪টী, তাহার উপরে পুনরায় ৪টী ও তদুপরি পুনরায় ২টী মুণ্ড এবং বাহুগুলি বিভিন্ন প্রহরণে সুসজ্জিত।



বালীবধ

অপর একস্থানে বালীবধের দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে শরাঘাতে বালী শায়িত, তাহার মস্তকের দিকে রাম-লক্ষ্মণ, বামপার্শ্বে সুগ্রীবাদি পঞ্চকপি এবং পাদদেশের নিকট সহচরীপরিবৃতা তারা ও সহচরসহ অঙ্গদ অবস্থান করিতেছে।

উত্তর-পশ্চিমভাগে দেবাসুরের সমর-দৃশ্য। বিবিধ মূর্ত্তি-ধারী মুকুটশোভিত দেবগণ অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া বাণ বর্ষণ করিতেছেন। বিকটমূর্ত্তিধারী অসুরগণও প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে। এখানকার মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্রদেবের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি অতি সুন্দর। দেবগণ স্ব স্ব বাহনে আরূঢ়।

উত্তরপূর্ব্বমঞ্চে দেবাসুরে যুদ্ধ। চতুরানন, পঞ্চানন, ষড়ানন, গরুড়োপরি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু অসুর দলন করিতেছেন। বহুমুখ ও বহুহস্তবিশিষ্ট দেবগণ অশ্বে, গজে ও সিংহে বা বরাহে আরোহণ করিয়া তীরধনুক হস্তে যুদ্ধে ব্যাপৃত। যুদ্ধস্থলের অদূরে জটাজূটবিলম্বিত ত্রিশূলধারী মহাদেবের মূর্ত্তি; সিদ্ধর্ষি যোগিগণ পুষ্পকরে তাঁহার অর্চ্চনা করিতেছেন।

উত্তরভাগের কিছু পূর্ব্বে আর একটী মঞ্চ। এখানকার শিল্পনৈপুণ্য ও স্থাপত্যকার্য্যাদি এখনও শেষ হয় নাই, সকলই যেন অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। এখানেও পৌরাণিক দৃশ্য। বিষ্ণু গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া একজন গজারোহী অসুরকে বিনাশ করিতেছেন। আরও অনেক দেবাসুর মূর্ত্তি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে।

পূর্ব্বদক্ষিণভাগে সমুদ্রমন্থন দৃশ্য। কি শিল্পকার্য্যে, কি চিত্রকার্য্যে, কি স্থাপত্যবিদ্যায় সর্ব্ববিষয়ে এই মঞ্চটী পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সমুদ্রমন্থনের এমন জীবন্ত দৃশ্য বোধ হয় আর কোথায়ও নাই। মধ্যস্থলে কূর্ম্মের উপর মন্দরাচল স্থাপিত, তদুপরি বিষ্ণু; মন্দর বাসুকীদ্বারা বেষ্টিত, নাগরাজের মুখের দিকে প্রায় ১০০ শত বিকটাকার দৈত্যমূর্ত্তি এবং পুচ্ছভাগে ১০০ দেবমূর্ত্তি। দৈত্যগণকে দেখিতে খর্ব্ব, বলিষ্ঠ, শিরস্ত্রাণ ও কবচাবৃত, সকলেরই কর্ণে কুণ্ডল ও লম্বা দাড়ী আছে। দেবগণের মাথায় মুকুট, কণ্ঠে হার, হস্তে বলয়, দুই থাক অঙ্গদ ও যজ্ঞসূত্র শোভিত। এই দুই শত মূর্ত্তি ঠিক একভাবে দণ্ডায়মান।

যেখানে সমুদ্রমন্থন হইতেছে, তাহার উপরিভাগের দৃশ্য অতি চমৎকার। যেন শত শত স্বর্গবিদ্যাধরী ও অপ্সরা আকাশপথে নৃত্য করিতেছে। তাহার অধোভাগে সাগরের দৃশ্য। নানাপ্রকার সামুদ্রিক জীবজন্তু ও মৎস্যাদি এই কল্পিত সমুদ্রে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। স্বচ্ছ সলিলে কেমন ধীরে ধীরে স্রোত বহিতেছে।

তাহার পর দক্ষিণপূর্ব্বভাগের আর একটী মঞ্চ। এখানে যমালয়ের দৃশ্য। পাপের নিগ্রহ, পুণ্যের পুরস্কার; স্বর্গ ও নরকের সুখ ও দুঃখের দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে নরকযন্ত্রণার ৩৬টী মূর্ত্তি ক্ষোদিত হইয়াছে। প্রত্যেক মূর্ত্তির নিম্নে ক্ষোদিত-লিপিতে যে প্রকার পাপ করিলে যেরূপ নরকভোগ হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

উক্ত মঞ্চ ছাড়াইয়া পশ্চিমে কিছুদূর গমন করিলে আর একটী সুদৃশ্য মঞ্চ নয়নগোচর হয়। এখানে কম্বোজের রাজা ও রাজপরিবারগণের মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। এখানকার কারুকার্য্যে পারিপাট্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়; এমন জাঁকজমক দৃশ্য কম্বোজের আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ! কোথাও পীনোন্নতপয়োধরা সুচারুহাসিনী রাজ-মহিলাগণ বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া মহাপায়ায় বসিয়া সমারোহ মধ্য দিয়া যাইতেছেন, উপরে চিত্রবিচিত্র চন্দ্রাতপ দোদুল্যমান; আবার তাহারই পশ্চাতে দিব্যরূপ-ধারিণী মনোমোহিনী রাজকন্যাগণ নরচালিত রথে আরোহণ করিয়া আছেন, যেন কোথায় যাইতেছেন। তাঁহাদের সঙ্গে সখীবৃন্দ পুষ্পচয়ন করিয়া উপহার দিতেছে, দাসদাসীগণ নিকটবর্ত্তী ফলশালী বৃক্ষ হইতে ফল লইয়া ছোট ছোট বালকবালিকাকে বিতরণ করিতেছে। রাজকন্যাগণের পার্শ্বে সহচরীগণ কেহ চামর ব্যজন করিতেছে, কেহ মাথায় ছাতি ধরিয়াছে, কেহ সুস্বাদু ফল লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। তাহারই অদূরে নির্জ্জন উপবন-দৃশ্য! গিরিমালা মধ্যে তরুরাজি,—তরুতলে মৃগশিশু খেলা করিতেছে; তরুশাখায় নানাবিধ পক্ষী বসিয়া আছে।

মঞ্চের উপরিভাগে সশস্ত্র কবচাবৃত রাজপুরুষ, নর্ত্তক এবং ধানুকীগণ দণ্ডায়মান। ইহাদের বেশভূষাও রাজসভার উপযোগী। সম্মুখে রাজসভা। কুণ্ডলধারী জটাজূটবিলম্বিত ব্রাহ্মণগণ গম্ভীরভাবে সমাসীন, রাজা ও রাজকুমারগণ পদোচিত বেশভূষা করিয়া যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট, অস্ত্রধারী যোদ্ধগণ রাজসভা উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া আছেন। প্রাচীন হিন্দুরাজসভা যেরূপ ভাবে হইত, এই দৃশ্য দেখিলে তাহার কতকটা ধারণা হইতে পারে। পরমবিষ্ণুলোক জয়বর্ম্মা অঙ্কোরবটের উক্ত মহাকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

বহিঃস্থ অলিন্দ পার হইয়া পশ্চিম দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে একটী সমচতুষ্কোণ শতাধিক স্তম্ভশোভিত নাটমন্দির পাওয়া যায়। এই নাটমন্দিরের অভ্যন্তরে চারি কোণে ছোট ছোট চারিটী প্রাঙ্গণ। নাটমন্দিরের উভয় পার্শ্বে কিছুদূরে চত্বর মধ্যে দুইটী বিচ্ছিন্ন মন্দির। নাটমন্দির হইতে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া মধ্যস্থ চত্বরে উঠিতে হয়। এই চত্বরের কেন্দ্র স্থলে মূল মন্দিরটী স্থাপিত। এই মন্দিরটী দৈর্ঘ্যে ২১৩ ফুট এবং প্রস্থে ২০০ ফুট। মন্দিরটী পাঁচটী শিখর শোভিত, চারি কোণে চারিটী এবং মধ্যস্থলে একটী। ইহার বর্ণনা পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। নাটমন্দিরের ন্যায় এই মন্দিরটীতেও চারিটী প্রাঙ্গণ আছে। কেন্দ্রস্থ মন্দিরের চারিদিকে চারিটী ছোট ছোট কক্ষ আছে। এই কক্ষগুলির মধ্য দিয়া কেন্দ্রস্থ বৃহৎ কক্ষে প্রবেশ করা যায়।

সমগ্র মন্দিরটী অতি উচ্চ অঙ্গের উৎকীর্ণ চিত্র ও কারুকার্য্যে শোভিত এবং পূর্ব্বে যে প্রাঙ্গণগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে সেগুলি জলপূর্ণ। সেই জন্য ইহাদিগকে প্রাঙ্গণ না বলিয়া জলাশয় বলাই ঠিক। স্থানীয় ভাষায় ইহাদিগকে "স্র" বলে। মন্দিরের স্তম্ভগুলির সহিত রোমীয় ডোরিকস্তম্ভের অনেক সাদৃশ্য আছে। কাহারও কাহারও মতে, মন্দিরটী পূর্ব্বে সর্প-দেবতার মন্দির ছিল, পরে ইহা বৌদ্ধ মন্দিরে পরিণত হইয়াছে।

[কম্বোজ, অঙ্কোরথোম দ্র°]

অঙ্কোল, অঙ্কোলক—(পুং) [অঙ্ক-ওল ; অঙ্কোলক—অঙ্কোল স্বার্থে ক] [বৈদ্যক] অঙ্কোটবৃক্ষ ; চলিত কাঁকরোল, ওকড়া। (রসেন্দ্রসা°)

অঙ্কোলতৈল—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] অঙ্কোল ফলবীজের তৈল। আঁকোড়বীজের তৈল। ইহার গুণ—বাতঘ্ন, অভ্যঙ্গ ও চর্ম্মরোগহর এবং কফনাশক।

অঙ্কোলফলসঙ্কাশ—(পুং) [বৈদ্যক] ফলবিশেষ। চলিত পেস্তা।

অঙ্কোলসার—(পুং) [৬-তৎ] [বৈদ্যক] অঙ্কোল বৃক্ষের সার। ২ বিষবিশেষ।

অঙ্কোলা—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত উত্তর কানাড়া জেলার একটী মহকুমা। অক্ষা° ১৪°৩৪′ হইতে ১৪°৫৩′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°১৫′ হইতে ৭৪°৪০′ পূঃ। আয়তন ৩৭৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার।

২ অঙ্কোলা মহকুমার প্রধান নগর এবং বন্দর। অক্ষা° ১৪°৩৯′৩০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°২০′৫৫″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এইস্থানে একটী অতি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ এবং অনেকগুলি পুরাতন মন্দির আছে, তন্মধ্যে ভূমিদেবতার মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ।

প্রবাদ সোন্দবংশীয় জনৈক রাজা এই দুর্গ নির্ম্মাণ করান। খৃষ্টীয় ১৬শ শতকের শেষভাগে বিজাপুররাজ-প্রতিনিধি শেরিফ-উল্-মুল্ক্ ইহা অধিকার করিয়া লন এবং পরে পরিখাদি সংযোগে উহার সুদৃঢ়ত্ব সম্পাদন করেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে হায়দর আলী কানাড়া আক্রমণ করেন, ঐ সময় এখানকার সেণ্টমেরী গির্জ্জা উল্লেখযোগ্য অট্টালিকারূপে পরিগণিত ছিল। টিপুসুলতান নগর আক্রমণ করিয়া এই গির্জ্জা অগ্নিসংযোগে নষ্ট করিয়া ফেলেন এবং এখানকার সমগ্র খৃষ্টান অধিবাসীকে শ্রীরঙ্গপত্তনে লইয়া গিয়া বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

অঙ্কোলার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। বোম্বাইপ্রদেশের বিভিন্ন অংশের সামন্তরাজগণ ঘটনাচক্রে এখানকার ইতিহাসে সংশ্লিষ্ট রহিয়া গিয়াছেন। তৎপরে পর্ত্তুগীজগণের ভারতাগমন হইতে এখানকার কতক ইতিহাস তাহাদের রক্ষিত গীর্জ্জাসংক্রান্ত বিবরণীতে পাওয়া যায়।

১৫১০ খৃষ্টাব্দে হোনাবর-সর্দ্দার মলহররাও পর্ত্তুগীজদিগকে গোয়া হইতে বিতাড়িত করিতে প্রয়াস পান। এই সুযোগে তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বদলবলে অঙ্কোলায় আসিয়া তাঁহার গতিরোধ করেন। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দের বিবরণী হইতে জানা যায়, পর্ত্তুগীজগণ এখানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং অঙ্কোলা নদীবক্ষে বাহিত পণ্যের শুল্ক আদায় করিতেছেন। ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগররাজ সদাশিবরাও ও পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তা ডম জোয়াও দে কাষ্ট্রোর (Dom Joao De Castro) মধ্যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। তাহাতে লিখিত আছে যে, পর্ত্তুগীজগণ ইতিপূর্ব্বে সাবন্তবাড়ীর অন্তর্গত বাণ্ডায় যে সকল বস্ত্রাদি বিক্রয়ার্থ লইয়া গিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা হোনাবর ও অঙ্কোলার কুটীতে লইতে পারিবেন এবং বিজয়নগরের সমস্ত প্রজা এই নবগঠিত বন্দরে যাইয়া তাহাদের পণ্যের পরিবর্ত্তে পর্ত্তুগীজদিগের আনীত তাম্র, পারদ, সিন্দূর, প্রবাল, টীন ও হরমুজে প্রস্তুত রেশমীবস্ত্র প্রভৃতি লইতে পারিবেন। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে সীজার ফ্রেডারিক নামক জনৈক ভিনিসীয় বণিক্ বাণিজ্য ব্যপদেশে এখানে আসিয়া কিছুকাল বাস করেন। তিনি অঙ্কোলাকে সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দর বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তৎপরে প্রায় শতাব্দকাল এখানে পর্ত্তুগীজ প্রাধান্য বলবৎ থাকে। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী পর্ত্তুগীজদিগের ঔদ্ধত্য দমন করিতে সসৈন্যে আগমন করেন এবং নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র ধ্বংস করিয়া দেন। ঐ সময়ে এখানে গঙ্গাবলী নদীমুখে একটী সুদৃঢ় দুর্গ সংস্থাপিত ছিল। বিজাপুরের মুসলমান সেনাগণ পর্ত্তুগীজদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দুর্গটী বিধ্বস্ত করে এবং এখান হইতে ৫০টী পিত্তলনির্ম্মিত কামান লইয়া যায়।

১৭২০ খৃষ্টাব্দে ইহা সোন্দপ্রদেশের শাসনাধীন সামুদ্রিক-বন্দররূপে পরিগণিত ছিল। উক্ত বর্ষে মোগল-সম্রাট্ যে ১৬টী জেলা "স্বরাজ" শাসনার্থ মরাঠাদিগকে দান করেন, তন্মধ্যে অঙ্কোলা কানাড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে রত্নগিরির অন্তর্গত শালসি হইতে অঙ্কোলা পর্য্যন্ত ভূভাগ কোল্হাপুর রাজ্যের কোঙ্কন প্রদেশভুক্ত হয়। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে হায়দর আলীর সেনাপতি হয়বৎজঙ্গ অঙ্কোলা দুর্গ অধিকার করেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজসেনা অঙ্কোলা ও সদাশিব-গড় বিজয়ার্থ প্রেরিত হয়। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে টিপুসুলতান এই দুর্গ পুনরধিকার করিয়া সেনাসন্নিবেশ করেন। হায়দর-বংশের অধঃপতনে ইহা পুনরায় ইংরেজের করতলগত হয়। ঐ সময়ে দুর্গের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে বুকানন সাহেব দুর্গের ধ্বস্ত অবস্থা ও নগর-সমৃদ্ধির শ্রীহীনতার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ব সমৃদ্ধির তিরোধানে নগরে সৌন্দর্য্যের হ্রাস ঘটিয়াছে এবং লোকসংখ্যাও কমিয়াছে। পূর্ব্বে এখানকার জঙ্গল হইতে খদির আহরণ করিয়া খদির প্রস্তুতের কারবার ছিল। এখন কেবল কার্পাসবস্ত্রের সামান্য কারবার আছে।

অঙ্কোলিকা—(স্ত্রী) [অঙ্ক-উল-ক-অপ্। বল-অচ্ নিপাতনাৎ সম্প্রসারণে উলঃ] আলিঙ্গন।

অঙ্কোল্ল—(পুং) [বৈদ্যক] দেবদারু।

অঙ্কোল্লক—(পুং) [বৈদ্যক] অঙ্কোটবৃক্ষ।

অঙ্কোল্লসার—(পুং) [বৈদ্যক] মালবদেশপ্রসিদ্ধ স্থাবরবিষবি°।

অঙ্কোল্লিকা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] অঙ্কোটবৃক্ষ, আঁকোড় গাছ।

অঙ্ক্য—(পুং) [অঙ্কে সংস্থাপ্য বাদ্যতেঽসৌ ইতি অঙ্ক যৎ। অথবা অঙ্কে সাধুঃ ইতি য] ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক বাদনীয় মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র। এইরূপ বাদ্যযন্ত্রের আয়াম সার্দ্ধ তাল ত্রয়, মুখ চতুর্দ্দশ অঙ্গুল এবং আকৃতি হরীতকীর ন্যায়।

"সার্দ্ধতালত্রয়ায়ামশ্চতুর্দ্দশাঙ্গুলাননঃ।
হরীতক্যাকৃতির্যঃ স্যাদঙ্ক্যোঽঙ্কে স হি বাদ্যতে॥" (ভরত°)

অঙ্গ,—(ক্লী) [অঙ্গ-অচ্] শরীর। ২ মন, চিত্ত। ৩ অংশ। ৪ অপ্রধান-বিষয়। (সাহিত্যদ° ৬.১০) ৫ অপ্রধান পাত্র-সমূহ। ৬ উপায়, সাধন। ৭ প্রধান-উপযোগী উপকরণ। (মনু° ১১.১১) ৮ বিভাগ। ৯ দৃশ্যকাব্যের মুখসন্ধি প্রভৃতি পঞ্চসন্ধির উপক্ষেপাদি চতুঃষষ্টি বিভাগ। (সাহিত্যদ° ৬.৬৮-১৩৫) ১০ অপাঙ্গ। ১১ হর্ষ, আনন্দ। ১২ (অব্যয়) পুনঃ, পুনরায়। ১৩ (অব্যয়) সম্বোধন। ১৪ প্রধান প্রধান জৈন গ্রন্থসমূহ। ১৫ [বৈদ্যক] বোল, চলিত সুগন্ধি বোল (রাজনি°)। ১৬ [ব্যবহার] পাঁচপ্রকার রাজনীতি বিভাগের অন্যতম।

(পুং) [অঙ্গশব্দ ব্যাকরণমতে জনপদবাচী বহুবচনান্ত। বেদেও বহুবচনান্ত অঙ্গশব্দের উল্লেখ দেখা যায়। (অথর্ব্ব° ৫.২২.১৪)] ১৭ দেশবিশেষ, অঙ্গদেশ। [অঙ্গ৬ দ্র°] ১৮ অঙ্গদেশবাসিগণ। ১৯ অঙ্গদেশের রাজগণ।

(ত্রি) ২০ অঙ্গ আছে যাহার, দেহী। ২১ সমীপ, অন্তিক।

অঙ্গ২—(ক্লী) করচরণাদি অবয়ব। সুশ্রুত নামক চিকিৎসা-শাস্ত্রে অঙ্গ ও উপাঙ্গের বিষয় এইরূপ কথিত আছে—মস্তক প্রধান অঙ্গ। তাহার উপাঙ্গ কুন্তল ও তাহার অন্তর্গত জটা, ললাট, ভ্রূযুগল, নেত্রদ্বয়, চক্ষুর দুটী তারা, কৃষ্ণবর্ণ অক্ষিগোলক, দৃষ্টিদ্বয়, শ্বেতভাগ, বর্ত্মদ্বয়, চক্ষের পাতা, অপাঙ্গ, শঙ্খদ্বয়, কর্ণ, কর্ণকুহর, কর্ণের পালি, কপোল, নাসিকা, ওষ্ঠ, সৃক্কণি, মুখ, তালু, হনু, দন্ত, মাড়ী (দন্তবেষ্ট), জিহ্বা, চিবুক ও গলদেশ। দ্বিতীয়াঙ্গ—গ্রীবা। তৃতীয়াঙ্গ—বাহুযুগল। বাহুর উপাঙ্গ—বাহুর উপরে স্কন্ধ, নিম্নে প্রগণ্ড, তাহার নিম্নে কফোণি, তন্নিম্নে প্রকোষ্ঠ, মণিবন্ধ, হস্ততল, হস্তের দশ অঙ্গুলি ও নখ। চতুর্থাঙ্গ—বক্ষঃস্থল। বক্ষের উপাঙ্গ—স্তনদ্বয়, ইহা স্ত্রীপুরুষভেদে বিভিন্ন। হৃদয় পদ্মফুলের ন্যায় অধোমুখ হইয়া আছে; ইহা জাগ্রৎ অবস্থায় বিকসিত ও নিদ্রিতাবস্থায় মুদ্রিত থাকে। কক্ষদ্বয়, কক্ষের সন্ধিদ্বয় ও বঙ্ক্ষণদ্বয় (কুঁচ্‌কী)। পঞ্চমাঙ্গ—উদর। ষষ্ঠাঙ্গ—পার্শ্বদ্বয়। সপ্তমাঙ্গ—পৃষ্ঠবংশ ও সমস্ত পৃষ্ঠ। বাম ভাগে হৃদয়ের নিম্নে প্লীহা এবং পশ্চাদ্ভাগে ফুস্‌ফুস্। হৃদয়ের নিম্নে দক্ষিণভাগে যকৃৎ। ইহাই পিত্তের স্থান, রক্তে ইহার জন্ম। হৃদয়ের নিম্নে দক্ষিণ ভাগে ক্লোম আছে। ইহাই জলবাহিশিরার মূল এবং তৃষ্ণানিবারক। ঐ ক্লোম বাত ও রক্ত হইতে জন্মে। বায়ুযুক্ত রক্ত হইতে কালীয়ক উৎপন্ন হয়। মেদ ও শোণিতের সার হইতে বৃক্কক্‌যুগলের উৎপত্তি। কথিত আছে, বৃক্কক্‌দ্বয় জঠরস্থ মেদের পুষ্টিকর। পুরুষের অন্ত্র সাড়েতিন ব্যাম এবং স্ত্রীলোকের অন্ত্র তিন ব্যাম। তাহার পর উণ্ডুক, কটি, ত্রিক, বস্তি, উরুযুগলের সন্ধিদ্বয়। তৎপরে কস্তরাদির মূল। উহা শুক্র, মূত্র এবং স্ত্রীলোকদের গর্ভধারণের সাধক। তাহার পর শঙ্খনাভির আকার স্ত্রীলোকের যোনি। উহার তিনটী আবর্ত্ত আছে। গর্ভশয্যা তৃতীয়াবর্ত্তে স্থিত। কফ, রক্ত, মাংস এবং মেদ হইতে কোষদ্বয়ের উৎপত্তি। উহা পুরুষের বীর্য্যবাহী শিরার আধার। গুহ্যের পরিমাণ চারি অঙ্গুলি। উহা শঙ্খাবর্ত্ত তুল্য তিনটী বলিবিশিষ্ট। প্রথমে প্রবাহিণী নাড়ী; তাঁহার পরিমাণ দেড় অঙ্গুলি মাত্র। তাহার পর উৎসর্জ্জনী, উহারও পরিমাণ দেড় অঙ্গুলি। তৎপরে সঞ্চরণী, তাহার পরিমাণ এক অঙ্গুলি মাত্র। মল নির্গত হইবার জন্য এই পথের সৃষ্টি হইয়াছে। তৎপরে নিতম্ব। নিতম্বের নিম্নে অষ্টমাঙ্গ—সক্থিনী। সকথিনীর উপাঙ্গ—জানু, পঞ্জিকা, জঙ্ঘা, গুল্‌ফ, পদদ্বয়, পদের অঙ্গুলি এবং নখ।

অঙ্গের বিশেষ বিশেষ বিবরণ তত্তৎ নামে দ্রষ্টব্য। তদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত শব্দেও অনেক কথা লিখিত হইয়াছে।

অস্থি (bone); অলিজিহ্বা (আল্‌জিব্, uvula); জিহ্বা (tongue); ফুস্‌ফুস্ (lungs); হৃৎপিণ্ড (heart); মূত্রাশয় (bladder); বৃক্কক্ (kidneys); অন্ত্র (intestines); পাকাশয় (stomach); শ্বাসনালী (larynx and trachea); অন্ননালী (œsophagus); গলগ্রন্থি (tonsils); মস্তিষ্ক (brain); পেশী (tendons); প্লীহা (spleen); যকৃৎ (liver); রসপ্রণালী (thoracic duct); মূত্রপ্রণালী (urethra); কশেরুমজ্জা (spinal marrow); জননেন্দ্রিয়; জরায়ু।

অঙ্গ৩—(ক্লী) [জ্যোতিষ] লগ্ন। কালপুরুষের দেহের দ্বাদশ রাশিরূপ দ্বাদশ বিভাগ। যথা—(১) মস্তক—মেষ;

(২) মুখ—বৃষ ; (৩) বক্ষঃ—মিথুন ; (৪) হৃদয়—কর্কট ; (৫) উদর—সিংহ ; (৬) কটি—কন্যা ; (৭) বস্তি—তুলা ; (৮) পুংস্ত্ব—বৃশ্চিক ; (৯) উরু—ধনুঃ ; (১০) জানু—মকর ; (১১) জঙ্ঘ—কুম্ভ ; (১২) পাদদ্বয়—মীন।

২ অঙ্গ শব্দে জ্যোতিষের নানাবিধ অঙ্গ বুঝায়। উহার মধ্যে তিনটী প্রধান অঙ্গের বিষয় বরাহসংহিতায় উক্ত হইয়াছে। নরপতিজয়চর্য্যা নামক জ্যোতিষ গ্রন্থে ষড়্‌বিধ জ্যোতিষাঙ্গ উল্লিখিত হইয়া উহাদের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গর্গসংহিতার মতে জ্যোতিষাঙ্গ চতুর্ব্বিংশতি, উপাঙ্গ চত্বারিংশৎ। এই অঙ্গ ও উপাঙ্গ লইয়া মোট সংখ্যা চতুঃষষ্টি।

"যথৈব বেদস্যাঙ্গানি ষড়ুক্তানি মনীষিভিঃ।

চতুঃষষ্টিস্তথাঙ্গানি জ্যোতিষসংবিদুর্ব্বুধাঃ॥" (গর্গসংহিতা)

অঙ্গ$_{৪}$—বেদের ষড়ঙ্গ। যথা—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ।

এই সকল শাস্ত্র বেদার্থ জ্ঞানের উপযোগী বলিয়া ইহাদিগকে বেদের অঙ্গ বলা হয়। ইহাদের মধ্যে ছন্দ বেদের পাদদ্বয়, কল্প হস্তদ্বয়, জ্যোতিষ চক্ষু, নিরুক্ত শ্রোত্র, শিক্ষা ঘ্রাণ এবং ব্যাকরণ মুখ বলিয়া বর্ণিত। [বেদাঙ্গ দ্র°]

অঙ্গ$_{৫}$—(পুং) একজন প্রাচীন রাজা। মনুপুত্র উত্তানপাদের বংশে ধ্রুব হইতে অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ। ইনি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নামানুসারে অঙ্গরাজ্য স্থাপিত হয়। (বিষ্ণুপু° ও ভাগবত)

২ পুরুবংশীয় একজন রাজা। (হরিবংশ)

৩ প্রজাপতিভেদ। ইনি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। মৃত্যুকন্যা সুনীথাকে ইনি বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে বেণের উৎপত্তি হয়। (মৎস্যপু° ১০.৩ ; পদ্মপু°, ভূমি° ১৬ অ° ; ব্রহ্মাণ্ডপু° ৬২.১০৭-১০৮)

পদ্মপুরাণ মতে, ইনি অত্রিবংশীয় এবং বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশাদিতে ইনি সূর্য্যবংশীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ইনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পুত্র বেণের দৌরাত্ম্যে ইনি প্রব্রজ্যা লইতে বাধ্য হন।

৪ সুশর্ম্মগণোক্ত ঋষিভেদ। মেরুসাবর্ণি যিনি রোহিত প্রজাপতি ও পরে ভবিষ্য মনু বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহার বহু পুত্র ছিল। এই পুত্রগণ শিক্ষার তারতম্যানুসারে তিনটী গণে বিভক্ত হয়। ১ম—মরীচিগর্ভ, ২য়—সুশর্ম্ম এবং ৩য় পার। অঙ্গ এই সুশর্ম্মগণোক্ত দ্বাদশ ঋষির অন্যতম ছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ১০০.৫৯-৬১)

৫ দানব বিরেচনাত্মজ বলিরাজার ক্ষেত্রজ পুত্র। মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে এবং মহর্ষি দীর্ঘতমার সংযোগে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামে বলির পাঁচটী পুত্র উৎপন্ন হয়। [দীর্ঘতমা শব্দে ইঁহাদের জন্মবৃত্তান্ত দ্র°] ভ্রাতৃগণের মধ্যে অঙ্গই জ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং তাঁহার দধিবাহন বা অনপান নামে এক পুত্র জন্মে। (মৎস্যপু° ৪৮.৭৭-৭৮ ; ব্রহ্মাণ্ডপু° ৯৯.৬৪-১০১)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অপরস্থলে (৯৯.২৫-২৯) লিখিত আছে, রাজা বলি বৈবস্বত মন্বন্তরে প্রাদুর্ভূত হন। ইনি অসুরযোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াও স্বীয় তপস্যা-প্রভাবে চন্দ্রবংশীয় মহাবাহু উথদ্রথের পুত্র হেমের ক্ষীণপ্রায় বংশে মনুষ্যযোনিতে জন্ম লন। সেই মহাযোগী বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ বলি জগতে চাতুর্ব্বর্ণ্য সংস্থাপনার্থ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামে পাঁচ ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করেন এবং তাঁহাদের নামানুসারেই পাঁচটী রাজ্য স্থাপিত হয়।

বিষ্ণুপুরাণ মতেও ইনি চন্দ্রবংশীয় যযাতিপুত্র অনুর অধস্তন ১০ম পুরুষ রাজা হেমের পৌত্র এবং বলির পুত্র। (বিষ্ণুপু° ৪.১৮)

৬ রাজভেদ। ইনি বলিসুত অঙ্গের অধস্তন ১৬শ পুরুষ রাজা জনমেজয়ের পুত্র। ইঁহার পরে মহাবীর কর্ণ অঙ্গদেশাধিপতি হইয়াছিলেন। (মৎস্যপু° ৪৮.১০২)

অঙ্গ$_{৬}$—প্রাচ্যভারতের একটী প্রাচীনতম দেশ। অথর্ব্ববেদে উল্লেখ আছে যে, এই দেশে অঙ্গ নামে এক জাতি বাস করিত।* এই জাতিরই নামানুসারে এই দেশের নাম অঙ্গ হইয়াছে। মগধ জাতিও অঙ্গ জাতির সমসাময়িক। অথর্ব্ববেদের সময় এই দুই জাতিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন জাতিরূপে পরিচিত ছিল।

গোপথব্রাহ্মণে (২.৯) 'অঙ্গমগধাঃ' এইরূপ জনপদবাচক সংযুক্ত শব্দ পাওয়া যায়। স্মৃতিনিবন্ধে আছে—

"অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।

তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥"

অর্থাৎ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র এবং মগধে তীর্থযাত্রা উপলক্ষ ভিন্ন গমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করা চাই।

তীর্থযাত্রা ভিন্ন অঙ্গদেশে আসিলে কেন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত, তাহার কারণ ঠিক বলা যায় না। বিশেষতঃ শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে যে, 'অঙ্গদেশে গমন করিলে কোন দোষ নাই।' রামায়ণে রাজা দশরথের মিত্র রোমপাদ অঙ্গদেশের রাজা ছিলেন এবং তাঁহার জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গমুনি সেই রাজবাটীতে বাস করিতেন। অঙ্গদেশ চিরকাল অপবিত্র থাকিলে ঋষিরা কখনই এদেশে বাস করিতেন না।

* "গন্ধারিভ্যো মূজবদ্ভ্যোঙ্গেভ্যো মগধেভ্যঃ
প্রৈষ্যন্ জনমিব শেবধিং তক্মানং পরিদদ্মসি॥" (অথর্ব্বস° ৫.২২.১৪)

রামায়ণে বালকাণ্ডের ২৩ সর্গে দেখা যায় যে, কামদেবতা মদন একদা হরকোপানলে পতিত হইয়া তাঁহার আশ্রম হইতে পলায়নকালে মহাদেবের নেত্রনির্গত অগ্নিতে ভস্মীভূত হন। যে স্থানে মদন ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, সেই স্থান 'অঙ্গ' নামে প্রসিদ্ধ হয়। তদবধি কামদেবতা 'অনঙ্গ' এবং মহাদেবের আশ্রম 'কামাশ্রম' নামে বিখ্যাত হইল। রঘুবংশে (১১.১৩ স°) এই কামাশ্রম 'মদন-তপোবন' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। রামায়ণ হইতে আরও জানিতে পারা যায় যে, সরযূ ও গঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলে এই আশ্রম অবস্থিত ছিল। স্থানীয় প্রবাদ যে, বর্ত্তমান গঙ্গাতীরস্থ বক্সারের অপর পারে বালিয়া-প্রদেশের করণতেড়ীর আট মাইল উত্তরে 'কারণ' নামক স্থানেই রামায়ণকথিত মহাদেবের আশ্রম ছিল। এই স্থানে কামেশ্বরনাথ বা কৌলেশ্বরনাথ নামে মহাদেবের একটী মন্দির আছে। রামায়ণ-কথিত গঙ্গা ও সরযূর মিলনস্থান বর্ত্তমান শাহাবাদ জেলার বক্সার নামক স্থানে। সুতরাং মগধদেশের কতকাংশ ও স্থানীয় গঙ্গার তীরবর্ত্তী প্রদেশ অঙ্গরাজ্যের মধ্যেই অবস্থিত ছিল।

মহাভারত ও পুরাণে কিন্তু অঙ্গের উৎপত্তি ভিন্নরূপ দেখা যায়। মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে ও মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে বলি রাজার অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামে পাঁচটী ক্ষেত্রজ পুত্র জন্মে। এই পাঁচজনের নামে বলি যথাক্রমে পাঁচটী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপে অঙ্গদেশ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার বংশধরগণ ঐ দেশে বাস করিতে থাকেন। বিষ্ণু (৪.১৮) ও ব্রহ্মাণ্ড (৯৯.১২-২৮) পুরাণ মতে, এই বলি যযাতিপুত্র অনুর অধস্তন ১০ম পুরুষ রাজা হেমের পুত্র। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণের অপরস্থলে ও ভাগবতে লিখিত আছে যে, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মনুপুত্র উত্তানপাদের বংশে ধ্রুব হইতে অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষে অঙ্গ নামে রাজা ছিলেন; ইঁহারই নামানুসারে অঙ্গরাজ্য স্থাপিত হয়। পূর্ব্বোক্ত বলিপুত্র অঙ্গের অধস্তন ৮ম পুরুষে চম্প অঙ্গাধীশ্বর হন। ইনি স্বীয় নামানুসারে রাজধানীর নাম চম্পা রাখেন। বর্ত্তমান ভাগলপুর শহরের পশ্চিমভাগে অবস্থিত চম্পানগরই পৌরাণিক চম্পা বলিয়া অনেকের অনুমান। চীনপরিব্রাজক যুয়ন্-চোয়াঙ্ চম্পায় আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বিবরণীতে লিখিয়া গিয়াছেন যে, 'এই কল্পের প্রারম্ভে যখন মানুষ প্রভৃতির প্রথম সৃষ্টি হয়, সেই সময়ে এক অপ্সরা কোন অপরাধে স্বর্গচ্যুতা হইয়া মর্ত্ত্যে আসিয়া বাস করেন। পরে কোন দেবের ঔরসে ঐ অপ্সরার গর্ভে ৪টী পুত্র জন্মে। ঐ পুত্রগণ জম্বুদ্বীপকে চারি অংশ করিয়া এক এক জন এক এক অংশে রাজ্য স্থাপন করেন। উঁহাদেরই একজন চম্পানগরের স্থাপয়িতা।' [চম্পা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্র°]

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে দেখা যায় যে, অঙ্গরাজ্য বৈদ্যনাথ হইতে ভুবনেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।* কিন্তু এই বিষয়ে অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; কারণ বৈদ্যনাথ পর্য্যন্ত অঙ্গরাজ্যের উত্তর সীমা নির্দ্দিষ্ট হইলে চম্পা উহার বাহিরে আসিয়া পড়ে। কিন্তু চম্পাই অঙ্গের রাজধানী ছিল, এ কথা হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন।

অনেকে ভুবনেশকে ভুবনেশ্বর বলিয়া থাকেন। কিন্তু শক্তিসঙ্গমতন্ত্রেই আছে যে, ভুবনেশ গৌড় রাজ্যের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত। কিন্তু ভুবনেশ্বর গৌড় বা অঙ্গ উভয়েরই দক্ষিণে অবস্থিত নহে। উড়িষ্যা পর্য্যন্ত যে অঙ্গরাজ্য বিস্তৃত ছিল, তাহার প্রমাণ অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক নন্দলাল দে মহাশয়ের মতে, মুর্শিদাবাদ শহরের তিন মাইল দূরে কিরীটকোণা নামক স্থানে ভুবনেশী বা কিরীটেশ্বরী নামে একটী মন্দির আছে। সতীর শরীরের ৫২টী অংশের মধ্যে মুকুট বা কিরীট এই স্থানে পতিত হইয়াছিল। এই জন্য তথায় প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের নাম ভুবনেশী বা কিরীটেশ্বরী হইয়াছে। শক্তিসঙ্গমতন্ত্র বোধ হয় এই কিরীটেশ্বরীর নামই উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্থান অঙ্গরাজ্যের দক্ষিণ সীমা হওয়া সম্ভব।

বৃহৎসংহিতার কূর্ম্মবিভাগে এই স্থান ভারতবর্ষের অগ্নিকোণে লিখিত হইয়াছে। অনেকের মতে, বর্ত্তমান ভাগলপুর, মুঙ্গের ও সাঁওতাল পরগণা লইয়া পূর্ব্বে অঙ্গরাজ্য ছিল। বিভিন্ন সময়ে উহার আয়তন বিভিন্নরূপে পর্য্যবসিত হয়। স্যার জর্জ্জ বার্ড-উড্ বলেন যে, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও মানভূম এই তিনটী জেলা অঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উহার উত্তর সীমায় সর্ব্বদাই গঙ্গা প্রবাহিত। গঙ্গার অপর পারে এই রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে নাই। আবার সুবিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা টডের মতে, অঙ্গদেশ তিব্বতদেশের পার্শ্বে স্থাপিত, বঙ্গদেশের পার্শ্বে নহে।

বিনয়পিটকে আছে, অঙ্গরাজ্যে সর্ব্বসমেত ৮০,০০০ গ্রাম ছিল, তন্মধ্যে চম্পা একটী। জাতকের মতে চম্পা মিথিলা হইতে ৬০ যোজন দূরে অবস্থিত। জাতকে উহাকে কালচম্পাও বলা হইয়াছে।† সংযুত্তনিকায় গ্রন্থে অঙ্গের 'আপন' নামে

* "বৈদ্যনাথং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
তাবদঙ্গাভিধো দেশো যাত্রায়াং ন হি দুষ্যতে॥" (শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, ১২ অ°)

† জাতক (Fausboll, ৬ষ্ঠ খণ্ড ২৫৬ পৃঃ) গ্রন্থে আছে, হিমালয় হইতে বহু সন্ন্যাসী কালচম্পায় রন্ধনদ্রব্য ভক্ষণ করিতে আসিয়াছিলেন।

একটী নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারত, পুরাণ বা হরিবংশের মতে চম্পার প্রাচীন নাম মালিনী।*

মহাগোবিন্দসুত্তন্তে দেখা যায় যে, মহাগোবিন্দ চম্পানগরী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সুত্তন্ত গ্রন্থে আরও দেখা যে, তৎকালে ভারতে সাতটী প্রধান রাজ্য এবং প্রত্যেকটীরই একটী করিয়া রাজধানী ছিল। তন্মধ্যে অঙ্গ একটী রাজ্য ও চম্পা উহার রাজধানী।

বুদ্ধের জন্মের পূর্ব্বে অঙ্গ একটী শক্তিশালী প্রদেশ ছিল। জাতকে উল্লেখ আছে, মগধরাজ্য এককালে অঙ্গরাজ্যের অধীনে শাসিত হইত। এই জাতকেই দেখা যায়, অঙ্গ ও মগধের মধ্যে প্রবাহিত একটী নদীতে এক নাগরাজ বাস করিতেন। তিনি মগধরাজের পক্ষাবলম্বী এবং যাহাতে অঙ্গরাজ পরাস্ত ও নিহত হইয়া অঙ্গরাজ্য মগধের অধীন হয়, তজ্জন্য সচেষ্ট ছিলেন। জাতকে আরও দেখা যায়, ব্রহ্মবর্দ্ধন বা বারাণসীর রাজা মনোজ অঙ্গ ও মগধ জয় করিয়াছিলেন।

সুমঙ্গলবিলাসিনীতে আমরা দেখিতে পাই, রাণী গগ্‌গরা কর্ত্তৃক চম্পায় একটী পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠিত হইলে উহার নাম দেওয়া হয় "গগ্‌গরপোখ্‌খরণী"। দীঘনিকায়সুত্তন্তে উল্লিখিত আছে যে, বুদ্ধদেব বহু ভিক্ষু সমভিব্যাহারে অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত চম্পায় আসিয়া এই গগ্‌গর-পুষ্করিণীর তীরে বাস করিয়াছিলেন। বিনয়পিটকেও চম্পায় বুদ্ধের অবস্থান সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। এই রাজ্যেরই অশ্বপুর নামক নগরে থাকিয়া তিনি ভিক্ষুদের মহাশ্বপুরসুত্তন্ত উপদেশ দিয়াছিলেন। (মজ্‌ঝিম-নিকায়) নিদানকথায় দেখা যায়, বুদ্ধদেব যখন রাজগৃহ হইতে কপিলবাস্তুতে গমন করিয়াছিলেন, তখন অঙ্গরাজ্যের বহু গৃহস্থপুত্র, তাঁহার সহগমন করিয়াছিল। প্রসেনজিৎ কোশলের পিতা রাজা মহাকোশল গার্হস্থ্যজীবন ত্যাগ করিয়া অঙ্গ, মগধ ও কুরুরাজ্যের মধ্যস্থিত স্থানে বাস করিতেন। ইনি অগ্নিদত্ত নামেই বিশেষ পরিচিত ছিলেন। অঙ্গ ও মগধের অধিবাসিগণ ও শিষ্যবর্গ তাঁহাকে শ্রদ্ধোপচার প্রদান করিত।

বিমানবথু গ্রন্থে দেখা যায়, অঙ্গরাজ্যে বহু বণিক্ বাস করিতেন। সুতরাং অঙ্গের অধিবাসিগণ যে অন্যান্য দেশে ব্যবসায় করিতে যাইতেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উক্ত গ্রন্থেই লিখিত আছে, এই বণিক্‌গণ একবার মরুভূমির মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে পথ হারাইয়াছিলেন। ভগবান্ স্বয়ং উদ্ধার করিলে তাঁহারা রক্ষা পাইয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থাদি হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে, বুদ্ধদেবের সময়ে চম্পানগরী ভারতের সুবৃহৎ নগরগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল। একবার আনন্দ বুদ্ধদেবকে চম্পা বা রাজগৃহের মত সুবৃহৎ নগরে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন।

রামায়ণের বালকাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অঙ্গদেশ রোমপাদ নামক একজন রাজার অধীন ছিল। রোমপাদের আর একটী নাম ছিল দশরথ। কোশলাধিপতি দশরথের তিনি বন্ধু ছিলেন এবং ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গের দ্বারা এক যজ্ঞ সমাধান করাইয়া মহাদুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে নিজরাজ্য রক্ষা করেন। রামায়ণে অঙ্গবাসীদিগকে বিদেহ, কাশী, কোশল ও পুণ্ড্রের অধিবাসিগণের সহিত একসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। বিভিন্ন পুরাণাদি হইতে জানা যায় যে, রোমপাদ অঙ্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলিপুত্র অঙ্গের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ।

মহাভারতের সময়ে অঙ্গ সম্ভবতঃ হস্তিনাপুরের কুরুগণের অধীন একটী রাজ্য ছিল। কারণ অর্জ্জুন যখন কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করেন, তখন সেই কৃত্রিম যুদ্ধক্ষেত্রেই দুর্য্যোধন কর্ণকে অঙ্গাধিপতি করিয়া অর্জ্জুনের সমপদস্থ করিয়া দেন। (মহাভারত, আদিপর্ব্ব) অঙ্গ যদি কৌরবগণের অধীন না হইত, তাহা হইলে ইচ্ছামাত্র কর্ণকে দুর্য্যোধন সেই দেশের রাজা করিয়া দিতে পারিতেন না।

রাজসূয় যজ্ঞের প্রাক্কালে ভীমসেন পূর্ব্বদিকে দিগ্বিজয়ে অগ্রসর হইয়া গিরিব্রজে জরাসন্ধের পুত্রের নিকট কর আদায় করেন এবং তৎপরে মহাবীর কর্ণকে পরাজিত করিয়া অধীনতাপাশে আবদ্ধ করেন। সুতরাং অঙ্গদেশ গিরিব্রজ অর্থাৎ বর্ত্তমান রাজগৃহের পূর্ব্বপার্শ্বে অবস্থিত ছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। এই রাজসূয়যজ্ঞে অঙ্গদেশের রাজা উপস্থিত ছিলেন, এ কথা মহাভারতের সভাপর্ব্বেই উক্ত আছে।

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতক অঙ্গরাজ্যের উজ্জ্বলতম সময়। এই সময় ভারতে ধর্ম্মভাবধারার স্মরণীয় বিরাট্ আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল। মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ এই সময় জন্মগ্রহণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের ধর্ম্মের আদর্শ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। অঙ্গ তখন ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম ছিল। এই সময় ভারতীয় নৈতিক জীবনের ক্রম-অবনতি ঘটিয়াছিল। যাঁহারা ধনী, তাঁহারা বিলাসে মত্ত হইয়াছিলেন এবং যাঁহারা নৃপতি বা নায়ক, তাঁহারা পরস্পরে বিবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে লিপ্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিপত্তি এই সময় কমিয়া আসে।

---

* "চম্পস্য তু পুরী চম্পা যা মালিন্যভবৎ পুরা"—মহাভারত ১২.৫.৬-৭; মৎস্যপু°, ৪৮.৯৭; ব্রহ্মাণ্ডপু°, ৯৯.১০৫-৬; হরিবংশ, ৩২.৪৯।

কিন্তু উক্ত দুইজন যুগপ্রবর্ত্তক পুনরায় ভারতে অনেকটা শান্তি ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহাতে সমস্ত ভারতে এক নূতন ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হয়। জৈনসূত্রপাঠে অবগত হওয়া যায়, খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতকের শেষভাগে ও ষষ্ঠশতকের প্রথমাংশে অঙ্গদেশ দধিবাহন নামক রাজার অধীনে ছিল। দধিবাহনের কন্যা চন্দনা বা চন্দ্রবালা মহিলাগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম জৈনধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তিনি অতি সত্বর ৩৬ হাজার ভিক্ষুণীর পরিচালিকা হইয়াছিলেন। কৌশাম্বীরাজ শতানীক চম্পা আক্রমণ করিলে চন্দনা দস্যুহস্তে পতিত হন, কিন্তু তিনি তাঁহার ধর্ম্ম-ব্রত ভঙ্গ করেন নাই। মগধ সে সময় একটী ক্ষুদ্র রাজ্যমাত্র ছিল। অঙ্গ ও মগধে তখন প্রাধান্য লইয়া ভীষণ দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। অঙ্গই প্রায়শঃ যুদ্ধে জয়লাভ করিত; কারণ বিধুরপণ্ডিতজাতকে রাজগৃহকে অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নগর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

শ্রীহর্ষ প্রিয়দর্শিকা নাটকের চতুর্থাঙ্কে দৃঢ়বর্ম্ম নামক একজন অঙ্গদেশের রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বুদ্ধের সমসাময়িক কৌশাম্বীরাজ উদয়নের দ্বারা স্বরাজ্যে পুনঃ স্থাপিত হইয়াছিলেন। অঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্ত মগধের ভট্টিয়কে পরাজিত করেন। এই ভট্টিয়ের নাম পুরাণে ক্ষত্রৌজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু যখন ভট্টিয়ের পুত্র বিম্বিসার বা শ্রেণিক বা শ্রেণীয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি অঙ্গ আক্রমণ করিয়া ব্রহ্মদত্তকে নিহত করেন ও চম্পানগরীকে নিজের করায়ত্ত করিয়া লন। তাঁহার সময় চম্পায় শোণদণ্ড নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বুদ্ধদেবের সহিত জাতিতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। বিম্বিসার তাঁহাকে তাঁহার রাজ্যের বহু ভূভাগ দান করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিম্বিসার চম্পানগরীতে পিতার প্রতিনিধিস্বরূপে বাস করিতেন। তাহার পর তিনি মগধে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দুল্‌ভসূত্রে বর্ণিত এই ঘটনা শোণদণ্ডসুত্ত দ্বারা সমর্থিত হয়। ব্রহ্মদত্তই অঙ্গদেশের শেষ স্বাধীন নরপতি। স্পেন্সহার্ডি বলেন যে, ইহার পর আর কোন দিনই অঙ্গ স্বাধীনতালাভ করিতে সমর্থ হয় নাই—চিরদিনই মগধের অধীনে ছিল। বুদ্ধদেব যখন বালক, তখন অঙ্গদেশ বিজিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অতি প্রাচীনকাল হইতে ক্ষত্রৌজার সময় পর্য্যন্ত অঙ্গ স্বীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু মৎস্যাদি পুরাণে অঙ্গদেশের প্রতিষ্ঠাতা অঙ্গের সময় হইতে মাত্র কর্ণের পৌত্র পৃথুসেনের সময় পর্য্যন্ত অঙ্গরাজ্য স্বাধীন ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

অঙ্গদেশ মগধের অধীনতা স্বীকার করিলেও, একেবারে তাহার অস্তিত্ব লোপ হয় নাই। মগধ হইতে একজন শাসনকর্ত্তা চম্পানগরীতে প্রেরিত হইয়া অঙ্গদেশ শাসন করিতেন। বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুও তাঁহার পিতার ন্যায় প্রথমে অঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের স্থবিরাবলীতে লিখিত আছে, অজাতশত্রু প্রজাদিগকে এরূপভাবে পীড়ন করিতেন যে, তাহারা বাধ্য হইয়া বিম্বিসারের নিকট অভিযোগ করিয়াছিল। জৈনগ্রন্থকারগণের মতে অজাতশত্রু তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর চম্পানগরীতে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র উদায়িন্ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া পাটলিপুত্রে পুনরায় রাজধানী আনয়ন করেন। বৌদ্ধগ্রন্থকারেরা কিন্তু অজাতশত্রু যে চম্পাতে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, একথা স্বীকার করেন না। সম্ভবতঃ অজাতশত্রু সময়ে সময়ে চম্পাতে বাস করিতেন। দেখা যায়, তিনি যখন তাঁহার ভ্রাতা হল এবং বিহলকে নির্য্যাতন করিবার জন্য তাঁহার মাতামহ চেতকের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম করেন, তখন চম্পা হইতেই অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল।

তীর্থঙ্কর মহাবীর কৈবল্য লাভ করিবার পর বিদেহ, মগধ ও অঙ্গরাজ্যে তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হয়। তিনি তিনটী বর্ষা চম্পাতে ও দুইটী বর্ষা ভদ্রিকাতে যাপন করেন। বুদ্ধদেবও অঙ্গদেশের এই দুইটী প্রসিদ্ধ স্থানে গমন করিয়া বহুলোককে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব শ্রাবস্তী হইতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর কন্যা সুভদ্রার অনুরোধে অঙ্গদেশে গমন করিয়াছিলেন। সুভদ্রার অঙ্গদেশে বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার শ্বশুরকুলের সকলেই জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন। বুদ্ধদেব তাঁহাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করান। পরে শিষ্য অনুরুদ্ধের উপর অঙ্গদেশে ধর্ম্মপ্রচারের ভার অর্পণ করিয়া তিনি মগধে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

মগধের ইতিহাসের সহিত অঙ্গের পরবর্ত্তী ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নন্দলাল দে মহাশয় অনুমান করেন, সুবর্ণগিরির শাসনকর্ত্তা দ্বারা অশোক অঙ্গদেশ শাসন করাইতেন। হাতিগুম্ফা শিলালিপির বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে সুবৃহৎ মগধ সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া একমাত্র অঙ্গ ও মগধ প্রদেশে পরিণত হইয়াছিল।

অশোকের মৃত্যুর পরবর্ত্তী তিন বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তৃতভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে নাগার্জ্জুন বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে মহাযানমত প্রচার করেন। অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধে এই নূতন ধর্ম্মমত সহস্র সহস্র লোক স্বীকার করিয়া লইল। অদ্যাপি ভাগলপুর জেলায় বৌদ্ধতান্ত্রিক মতের বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং একসময়ে

যে বৌদ্ধতান্ত্রিক মত অধিকাংশ অঙ্গদেশবাসী কর্তৃক গৃহীত-হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে শকগণ অন্ধ্রভৃত্যবংশীয়দিগের পতনোন্মুখ অবস্থা দেখিয়া সম্ভবতঃ অঙ্গদেশ আক্রমণ করেন এবং তথায় তাঁহাদিগের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ভাগলপুর জেলার সুলতানগঞ্জের স্তূপের নীচে 'মহাক্ষত্রপস্বামী রুদ্রসেনের' নামাঙ্কিত একটী রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। উক্ত মুদ্রা চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য বা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রার সহিত একত্র রক্ষিত ছিল। সমুদ্রগুপ্ত শকদিগের হস্ত হইতে অঙ্গদেশ উদ্ধার করিতে পারেন নাই। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষভাগে তাঁহার পুত্র চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য শকাধিপ দ্বিতীয় রুদ্রসেনকে পরাজিত করিয়া সুরাষ্ট্র ও মালবদেশ মগধসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন ও অঙ্গদেশ হইতে শকদিগকে বিতাড়িত করিয়া তথায় গুপ্তগণের অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ইহার সম্যক্ প্রমাণ পাওয়া যায়। অঙ্গদেশে খৃষ্টীয় অষ্টম শতক পর্য্যন্ত গুপ্তাধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান ৪০৫ হইতে ৪১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মগধসাম্রাজ্য ভ্রমণকালে অঙ্গদেশে গমন করেন। তিনি বলেন, ঐ দেশ গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। তথায় তিনি কয়েকটী স্মারক স্তূপ ও কয়েকজন বৌদ্ধভিক্ষু দেখিতে পান। তিনি অঙ্গদেশকে "চম্পার সুমহৎ রাজ্য" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সময়ে অঙ্গদেশকে অঙ্গ ও চম্পা এই দুইটী নামেই অভিহিত করা হইত। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বরাহমিহির ও দণ্ডী উভয়েই ইহাকে অঙ্গ ও চম্পা নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। সপ্তম শতকে য়ুয়ন্-চোয়াঙ্ ইহাকে "চেন্‌পো" রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িক বাণভট্টও অঙ্গাধিপকে 'চম্পাধিপ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সম্ভবতঃ কর্ণসুবর্ণের রাজগণ কিছুদিন অঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষভাগে উত্তর ভারতে কোন প্রবলপরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন না। এই জন্য চালুক্য-বংশীয় প্রথম পুলকেশীর পুত্র প্রথম কীর্ত্তিবর্ম্মার পক্ষে সেই সময় অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি উত্তর ভারতের রাজ্যসমূহ জয় করা বিশেষ কঠিন হয় নাই। কিন্তু দক্ষিণাপথের বাদামী নগর হইতে এই অঙ্গদেশকে শাসন করা তত সহজব্যাপার ছিল না। এই কারণে চালুক্যগণও বেশী দিন অঙ্গদেশ ভোগ করিতে পারেন নাই বলিয়াই মনে হয়।

গুপ্তবংশীয়গণের ক্ষমতা হ্রাস হওয়ায় হর্ষবর্দ্ধন সহজেই উত্তর ভারতে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে অঙ্গ সহ মগধ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে যখন য়ুয়ন্-চোয়াঙ্ অঙ্গদেশে আগমন করেন, তখন তিনি ইহাকে গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্ত্তী চারিশত ক্রোশব্যাপী রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। এখানে তিনি বহু সঙ্ঘারাম দেখিতে পান, তন্মধ্যে অধিকাংশই ধ্বংসাবস্থায় পরিণত হইয়াছিল। হীনযান সম্প্রদায়ের দুই শত বৌদ্ধ ভিক্ষুকে তিনি এখানে দেখিতে পান। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, অঙ্গদেশে প্রথমে মহাযান ও পরে হীনযান মত প্রচারিত হইয়াছিল। য়ুয়ন্-চোয়াঙ্ এখানে কুড়িটী দেবমন্দিরও দেখিয়াছিলেন। তিনি এখানকার কোন রাজার নাম বা ইহাকে স্বতন্ত্র একটী রাজ্য বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ হর্ষবর্দ্ধনই তৎকালে উক্ত রাজ্য শাসন করিতেন।

হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য তদীয় বংশধরগণের হস্তচ্যুত হয়। সপ্তম শতকের মধ্যভাগে গুপ্তবংশীয় আদিত্য-সেন "সকলোত্তরপথেশ্বর" হইয়া অঙ্গকে নিজ মগধ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। আদিত্যসেনের পর তাঁহার বংশধর দেবগুপ্ত, বিষ্ণুগুপ্ত ও জীবিতগুপ্ত যথাক্রমে অঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন। অতঃপর মগধের গুপ্তবংশীয়গণের কোন সংবাদ আর পাওয়া যায় না।

অষ্টম শতকের শেষভাগে পালবংশীয় গোপালের জয়যাত্রার পূর্ব্বে নেপালের লিচ্ছবিবংশীয় দ্বিতীয় জয়দেব অঙ্গ ও বঙ্গ জয় করেন, ইহা তাঁহার শিলালিপিপাঠে জানা যায়। পালবংশীয়-গণের রাজত্বকালের অধিকাংশ সময়ই অঙ্গদেশ তাঁহাদের অধীন ছিল। এখানে রাজবংশীয় কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সাধারণতঃ পাল-সম্রাট্‌গণের প্রতিনিধিস্বরূপে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রথমভাগে রামপাল কনৌজের গোবিন্দচন্দ্রের স্ত্রী কুমারদেবীর মাতামহ মহনকে এখানকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। "চম্পকশ্রেষ্ঠী-কথা" নামক জৈনগ্রন্থে আমরা সামন্তপাল নামক একজন চম্পার নৃপতির নাম দেখিতে পাই। সামন্তপাল বলিয়া পালরাজগণের মধ্যে কেহ ছিলেন না। তিনি পালসম্রাট্‌গণের কোন নিকট আত্মীয় হওয়াই সম্ভব। তিনি অঙ্গদেশে পালসম্রাট্‌গণের প্রতিনিধি হইতে পারেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিম্বিসারের সময় হইতে পালরাজগণের সময় পর্য্যন্ত প্রায় দুই সহস্র বৎসরকাল অঙ্গদেশ ভারত সাম্রাজ্যের একটী প্রধান দেশ বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিয়াছিল।

রাষ্ট্রকূট-বংশীয় দক্ষিণাপথের সম্রাট্‌গণ অঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষভাগে ও নবম শতকের প্রথমে প্রভূতবর্ষ ও জগত্তুঙ্গ উপাধিধারী তৃতীয় গোবিন্দ অঙ্গ,

বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধ আক্রমণ করেন। তাঁহার পুত্র নৃপতুঙ্গ প্রথম অমোঘবর্ষ পালরাজ ধর্ম্মপাল ও দেবপালের সময়ে এই সকল রাজ্য পুনরায় আক্রমণ করেন। কিন্তু এই আক্রমণের কোন স্থায়ী ফল হয় নাই। ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূটবংশীয়া রণ্ণাদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; এই রণ্ণাদেবী পরবল-(সম্ভবতঃ তৃতীয় গোবিন্দের) কন্যা। এইরূপে রাষ্ট্রকূটগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া পালরাজগণ অঙ্গ, বঙ্গ, মগধাদি দেশ শাসন করিতেন। নারায়ণপালের দুর্ব্বল বংশধরগণের রাজত্বকালে অমোঘবর্ষের পুত্র দ্বিতীয় কৃষ্ণ অঙ্গ প্রভৃতি দেশগুলি আক্রমণ করিয়াছিলেন। খাজুরাহো লিপি হইতে জানা যায় যে, জেজাভুক্তির রাজা ধঙ্গদেব খৃষ্টীয় দশম শতকের শেষভাগে অঙ্গদেশ জয় করিয়া তথাকার রাণীকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তখন অঙ্গদেশে কোন স্বাধীন রাজা না থাকায় এই লিপিকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা যায় না।

খৃষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগে চালুক্যবংশীয় ত্রিভুবন-মল্ল তাঁহার পিতা আহবমল্লের রাজত্বকালে (১০৪০—১০৬৯) অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও অন্যান্য দেশ জয় করিয়াছিলেন। ইনি পরে বিক্রমাদিত্য বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন।

সেনরাজগণের মধ্যে বিজয়সেন ও তাঁহার পুত্র বল্লালসেন অঙ্গদেশকে মগধের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। 'অনর্ঘরাঘব'-প্রণেতা মুরারি পণ্ডিত সেই সময়ে জীবিত ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, চম্পা নগরী গৌড়ের রাজধানী ছিল। আমরা কিন্তু অন্য কোন গ্রন্থে এই কথা দেখিতে পাই না। তবে অঙ্গ-দেশ যে সেনরাজগণের সময়ে উহার পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে অঙ্গ প্রভৃতি উত্তর ভারতের দেশগুলিতে দক্ষিণাপথবাসিগণ আসিয়া লুঠ-পাট করিয়া যাইতেন। বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে বিরোধেও বোধ হয় এই সব দেশের শক্তি হ্রাস হইয়াছিল। পরিশেষে দ্বাদশ শতকের শেষভাগে অঙ্গদেশ মুসলমানগণের অধিকারভুক্ত হয়। তখন হইতে ইহার আর তেমন প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায় না। মুসলমান রাজত্বকালে বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তদবধি বিহারের ইতিহাসই অঙ্গদেশের ইতিহাস হইয়াছে। [বিহার দ্র°]

অঙ্গ৭—(পুং) দেবমূর্ত্তির গণ। কোন দেবমূর্ত্তির অনুচর বা উপাসকরূপে মূল মূর্ত্তির সহিত যে মূর্ত্তি থাকে, তাহাদিগকে অঙ্গমূর্ত্তি বলা হয়।

অঙ্গ৮—(পুং) যে সকল ভক্তের মূর্ত্তিপূজা আগমে বিধান আছে, তাঁহাদের শ্রেণীবিশেষ। ভক্ত দুই প্রকার—প্রধান ও অঙ্গ। অঙ্গভক্তের মূর্ত্তি তাঁহার উপাস্য দেবতার মন্দিরে স্থাপন করিতে হয়। দক্ষিণাপথের প্রধান প্রধান সকল মন্দিরেই অঙ্গভক্তের মূর্ত্তি আছে।

অঙ্গ৯—(ক্লী) পাণিনিগৃহীত সংজ্ঞাবিশেষ। * । যস্মাৎ প্রত্যয়-বিধিস্তদাদি প্রত্যয়েঽঙ্গম্। (পা ১.৪.১৩) যস্মাৎ প্রত্যয়ো বিধীয়তে ধাতোর্বা প্রাতিপদিকাদ্বা তদাদি শব্দরূপং প্রত্যয়ে পরতোঽঙ্গসংজ্ঞং ভবতি। যে ধাতু কিংবা প্রাতিপদিকের উত্তর যে প্রত্যয় বিধান করা যায়, সেই প্রত্যয় যাহার পরে থাকে, ঐ প্রকৃতি পূর্ব্বক সমুদায়কে অঙ্গ কহে। যেমন রাম শব্দ একটী প্রকৃতি, ইহার পর যেন 'সু' প্রত্যয় বিধান করা যাইবে। এখানে প্রত্যয় পরে থাকিলে ব্যপদেশিভাবে রাম শব্দের অঙ্গ-সংজ্ঞা হইল। অঙ্গসংজ্ঞা করিবার ফল এই,—। * । এঙ্হ্রস্বাৎ-সম্বুদ্ধেঃ। (পা ৬.১.৬৯) এঙন্ত বা হ্রস্বান্ত অঙ্গের পর সম্বোধনের যে হল্, তাহার লোপ হয়। রাম এটী হ্রস্বান্ত শব্দ। ইহার সম্বুদ্ধির হল্ বর্ণ 'সু' থাকিলে সকারের লোপ হইবে। যথা—রাম,—সু সম্বোধনে, হে রাম!

অঙ্গক—(ক্লী) [অঙ্গ-স্বার্থে ক] অঙ্গ, দেহ। (মাঘ ৪.৩৬) [স্বল্পার্থে ক] ২ লঘু অঙ্গ, পাতলা দেহ, ক্ষুদ্র দেহ। "পরিমৃদিত-মৃণালীদুর্ব্বলান্যঙ্গকানি"। (ভবভূতি)

অঙ্গকর—বিকানীর রাজ্যে প্রচলিত করবিশেষ। ইহা কতকাংশে সম্পত্তির উপর আদায় হয় বলা যাইতে পারে। কারণ, ইহা যেমন প্রত্যেক অধিবাসীকে দিতে হয়, সেইরূপ তাহাদিগের অধিকৃত দ্বিপদ ও চতুষ্পদ পশুর জন্য স্বতন্ত্র কর নির্দ্দিষ্ট আছে।

অঙ্গকর্ত্তন—(ক্লী) অঙ্গচ্ছেদন।

অঙ্গকর্ম্মন্—(ক্লী) [অঙ্গস্য কর্ম্ম, ৬-তৎ] অঙ্গসেবা। হস্তপদাদিমর্দ্দন; শরীর টিপিয়া দেওয়া। দেহে তৈল ও সুগন্ধাদিলেপন। ২ প্রধান যজ্ঞকর্ম্মের অঙ্গীভূত কর্ম্ম।

অঙ্গকিলোন্—এসিয়াখণ্ডের বেরিং প্রণালীর সন্নিহিত উত্তরমেরু-প্রদেশবাসী এক আদিম জাতি। ইহাদের অপর নাম অঙ্গ-কলি। পার্শ্ববর্ত্তী চুক্চী ও এস্কিমো প্রভৃতি জাতির সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে ইহাদের সংখ্যা অনেক কম হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে কুশমেন, কোরিয়াক ও চুকলুকমুইত এস্কিমোগণের সহিত বিবাহাদি সংস্রবে মেলামেশা করিয়া ইহারা আপনাদের স্বাতন্ত্র্য হারাইতে বসিয়াছে। জাতিতত্ত্ব হিসাবে ইহাদিগকে মধ্য এসিয়াবাসী মোগলদিগের বংশধর বলিয়া গণ্য করা যায়। আমেরিকার "ইণ্ডিয়ান" নামধেয় জাতির সহিত ইহাদের গঠনসাদৃশ্য আছে।

অঙ্গক্রিয়া—(স্ত্রী) যজ্ঞে প্রধান কর্ম্মের উপযোগী ক্রিয়াবিশেষ।

অঙ্গগৌরব—(ক্লী) [বৈদ্যক] দেহের গুরুত্ব, গা-ভার। (বাভট)

অঙ্গগ্রহ—(পুং) [অঙ্গস্য গ্রহঃ রোগহেতোর্বেদনা ; ৬-তৎ] [বৈদ্যক] শরীরের বেদনা। গ্রন্থির চর্ব্বণবৎ বেদনা।

অঙ্গগ্রহ স্বয়ং একটী মূল পীড়া নয়, ইহা অন্য ব্যাধির উপসর্গ মাত্র। নানা প্রকার কারণে অঙ্গগ্রহ ঘটে। যৌবনকাল পর্য্যন্ত যাঁহারা নিত্য ব্যায়াম করেন, প্রৌঢ়াবস্থায় সেই অভ্যাস পরিত্যাগ করিলে অঙ্গবেদনা উপস্থিত হয়। গ্রন্থিবাত, কটিশূল (Lumbago), পুরাতন উপদংশ প্রভৃতি সঞ্চিত পীড়া থাকিলে মধ্যে মধ্যে অঙ্গবেদনা করে। রাত্রিকালের বায়ু কিংবা পূর্ব্বদিগের বাতাস লাগিলে গ্রন্থির চর্ব্বণবৎ বেদনা আরও বৃদ্ধি পায়। রুগ্ন শরীরে সামান্য একটু অনিয়ম হইলেই হস্তপদের গাঁইটে ব্যথা করিতে থাকে। ম্যালেরিয়া জ্বরে অঙ্গগ্রহ একটী প্রধান লক্ষণ। জ্বর আসিবার পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গ সিড়্ সিড়্ করিয়া শীত বোধ হয়, সেই সময়ে পায়ের ডিমে এবং কটিতে চর্ব্বণবৎ বেদনা করে। স্নায়ুশূল রোগে (Neuralgia) কোন স্থান স্ফীত হয় না, কিন্তু হস্তপদাদিতে সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা হইতে থাকে।

চিকিৎসা—চল্লিশ বৎসরের অধিক বয়ঃক্রমে যদি সঞ্চিত বাতরোগ জন্মে এবং তজ্জন্য অঙ্গবেদনা করে, তবে তাহা আরোগ্য হওয়া কঠিন। এ অবস্থায় অল্প অল্প আফিম সেবন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে রোগের প্রতীকার হয় না, বরং অতিরিক্ত একটা নূতন উপসর্গ ঘটে,—সকলেই ক্রমে আফিমখোর হইয়া পড়েন। কিন্তু এ দোষ থাকিলেও সঞ্চিত বাতরোগে অহিফেন সেবন করিলে দেহ অনেকটা স্বচ্ছন্দে থাকে।

এলোপ্যাথিক চিকিৎসা—যে রোগের জন্য অঙ্গগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিয়া ঐ রোগের চিকিৎসা করা আবশ্যক। প্রাচীন উপদংশ, প্রমেহ প্রভৃতি রোগে স্নায়ু প্রভৃতি তন্তুময় কলার প্রাচীন প্রদাহ জন্মিয়া সন্ধিবেষ্টনকলার বেদনা উপস্থিত হয়। ঐ রোগের চিকিৎসা করিলেই এই লক্ষণের উপশম হইয়া থাকে। আর এক প্রকার অঙ্গবেদনা দেখা যায়, তাহা তন্তুময় কলার প্রাচীন প্রদাহ (Fibrosites, chronic rheumatism) হইতে উৎপন্ন হয়। এক্ষণে প্রমাণিত হইয়াছে যে, দাঁতের গোড়ার পূঁয অন্ত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রীতিমত পরিপাকক্রিয়ার অভাবে নানাবিধ বিষাক্ত পদার্থের উৎপাদন করে, ঐ বিষ রক্তের সহিত মিলিত হইয়া শরীরে সঞ্চারিত হইলে এই রোগের উৎপত্তি হয়। আরও জানা গিয়াছে, ষ্ট্রেপ্টোকোকাস্ বা মালাজীবাণু শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াও এই রোগ উৎপাদন করে। কটিশূল (Lumbago) ও গৃধ্রসী (Sciatica) এই জাতীয় রোগ। এইরূপ তন্তুময় কলার প্রাচীন প্রদাহে দুগ্ধ প্রভৃতি নানাজাতীয় আন্তবস্ত (Protein) শরীরে সূচী দ্বারা নিক্ষেপ (inject) করিলে এই রোগের উপশম হয়। তৎসঙ্গে কোনরূপ আইয়োডিন বা পারাঘটিত মালিশ ব্যবহার করা উচিত। প্রাচীনলোকের এইরূপ রোগে গন্ধক এবং গোইএকাম্ (Guaiacum) ঘটিত ঔষধ সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। স্থূলকায় ব্যক্তির দেহের ভারজনিত জানু এবং গুল্‌ফসন্ধির তন্তুময় বেষ্টনের প্রাচীন প্রদাহ দেখা যায়। এ সকল রোগেরও চিকিৎসা ঐরূপ। তবে তাঁহাদিগকে খাদ্যের পরিমাণ কমাইয়া এবং যথাসম্ভব ব্যায়াম করাইয়া দেহের ভার কমান নিতান্ত আবশ্যক। এইরূপ বাতগ্রস্ত ব্যক্তির সকালে ও বিকালে ভ্রমণ করা উচিত। একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় উপবাস করিলে ভাল হয়। তাঁহারা কম করিয়া খাইবেন এবং যে সকল খাদ্য সহজে পরিপাক হয় না, তাহা ভক্ষণ করিবেন না। রাত্রে ভাত খাইবেন না ; দধি এবং অতিরিক্ত ফলমূলও তাঁহাদের খাওয়া উচিত নয়।

যুবা ও বৃদ্ধ ব্যক্তির কটি ও হস্তপদের গ্রন্থিতে সঞ্চিত বেদনা থাকিলে ক্যাজুপুট তৈল মর্দ্দন করিলে অনেকটা উপকার দর্শে। সেবনের জন্য দুই বিন্দু একোনাইটের অরিষ্ট জলের সঙ্গে প্রত্যহ দুইবার ব্যবস্থা করা যায়। উর্দ্ধপতিত গন্ধক দুগ্ধের সঙ্গে খাইলে পীড়ার কতকটা শান্তি হয়। চর্ম্মের নিম্নে মর্ফিয়ার পিচ্‌কারী দিলে ফল দর্শে। এই চিকিৎসা বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা করানো চাই।

হোমিওপ্যাথী—শরীরের এক দিকের স্নায়ুতে মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত চর্ব্বণবৎ বেদনা হইলে আর্সেনিক (Arsenic)। দুর্ব্বল ব্যক্তির স্নায়ুশূল জন্মিলে ফস্‌ফরাস (Phosphorus)। রাত্রিজাগরণ, শীতল বায়ুসেবন, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি কারণে মস্তকাদি বেদনা করিলে একোনাইট্ (Aconite)। ম্যালেরিয়া জনিত অঙ্গগ্রহে চায়না (China) সেব্য।

বৈদ্যক—মাখিবার জন্য কুব্জপ্রসারণীতৈল। সেবনের জন্য গুগ্‌গুল। [গুগ্‌গুল দ্র°] [শিরঃশূল, বাত, উপদংশ, স্নায়ুশূল, কটিশূল, গ্রন্থিবাত প্রভৃতি শব্দে অঙ্গগ্রহ রোগের বিশেষ বিবরণ দ্র°]

অঙ্গগ্লানি—(স্ত্রী) দেহজাড্য, শরীরের জড়তা। (বাভট)

অঙ্গঘাত—(পুং) অঙ্গাঘাত, গাত্রে আঘাত লাগা।

অঙ্গচয়—(পুং) গুহ্যদেশ ও বৃষণের মধ্যস্থল। (বৈদ্যকনি°)

অঙ্গচেষ্টা—(স্ত্রী) অঙ্গচালন, অঙ্গের চালনা। (বাভট)

অঙ্গজ,—(পুং) [অঙ্গাৎ জায়তে, অঙ্গ-জন-ড] পুত্র, আত্মজ। [পঞ্চম্যামজাতৌ। পা ৩.২.৯৮। জাতিবাচক শব্দ ব্যতীত পঞ্চম্যন্ত উপপদের পর জন্ ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় হয়। সুতরাং হস্তিজ, অশ্বজ এ প্রকার রূপসিদ্ধি হইবে না, কারণ হস্তী ও অশ্ব জন্তুর মধ্যে জাতিবিশেষ।]

২ রোগ। ৩ কেশ, চুল। ৪ মদ। ৫ কাম, কন্দর্প। ৬ [বৈদ্যক] মাংসধাতু। (বিশ্বপ্রকাশ°)

(ক্লী) ৭ লোম। ৮ রক্ত, শোণিত। ৯ মল। (ত্রি) ১০ যাহা অঙ্গ হইতে জন্মে, দেহজাতমাত্র। ১১ যাহা দেহে লিপ্ত থাকে, অঙ্গসংলগ্ন। ১২ শারীরিক।

অঙ্গজ২—(পুং) ইনি হিন্দুদিগের দেবতা এবং কামদেব হইতে অভিন্ন। প্রপঞ্চসারে (প. ১২৯) অঙ্গজ দেবতার নিম্নলিখিত ধ্যানের উল্লেখ পাওয়া যায়—

"অরুণতরবসনমাল্যানুলেপনমিক্ষুশরাসনধরম্।
ন্যস্তশরবীজদেহো ধ্যায়েদাত্মানং অঙ্গজং রুচিরম্॥"

অঙ্গজ রক্তবর্ণ বসন, মাল্য ও অনুলেপন ধারণ করেন এবং তিনি দুইহস্তে ইক্ষুদণ্ডের শরাসনে শর যোজনা করেন। রমণীয় কান্তি অঙ্গজদেবতাকে এইভাবে ধ্যান করিতে হয়।

অঙ্গজ৩—(পুং) সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার পুত্র। (ভাগবত : মৎস্যপু°)

অঙ্গজনুস্—(ত্রি) অঙ্গজাত; অঙ্গ হইতে যাহার জন্ম। (পুং) ২ পুত্র।

অঙ্গজা—(স্ত্রী) কন্যা। স্মৃতিশাস্ত্রে দুহিতাকেও অঙ্গজা বলা হইয়াছে।

"অঙ্গাদঙ্গং সম্ভবতি পুত্রবদ্দুহিতা নৃণাং।" (স্মৃতি)

(স্ত্রী) ২ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার দশমী কন্যা। ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে দক্ষ প্রভৃতি নয়জন পুত্রের পর ইনি উদ্ভূত হন। (মৎস্যপু° ৩.১২)

অঙ্গজাত—অঙ্গ হইতে জাত। ২ অঙ্গে জাত। ৩ যাগাদি প্রধান কর্ম্মের অঙ্গীভূত কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন।

অঙ্গজ্বর—(পুং) [অঙ্গম্ অধিকৃত্য জ্বরঃ, সুপ্‌সুবেতি সমাসঃ] রাজযক্ষ্মা, যক্ষ্মা, ক্ষয়কাসরোগ। [ইহার নিদান ও ঔষধ কাসরোগ শব্দে দ্র°]

অঙ্গড়ি—মহিসুরের কদুর জেলাস্থ মুদ্‌গেরে তালুকের অন্তর্গত একখানি গ্রাম; মুদ্‌গেরে শহর হইতে ৭ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে অঙ্গড়ির লোকসংখ্যা ৫৩৫ ছিল। হোয়শল রাজবংশের আদিস্থান শশিপুর বা শশিকপুর (শোশেবূর) এইখানেই; যে শার্দ্দূলব্যাপার হইতে উক্ত রাজবংশের উৎপত্তি ও নামকরণ হইয়াছে, তাহা এখানেই সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গ্রামে কতিপয় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার জৈন বস্তিতে কতকগুলি সুন্দর ভাস্কর্য্যশিল্পের নিদর্শন ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। স্থানীয় বসন্তম্মা দেবীই সমধিক প্রসিদ্ধা। বসন্তম্মা বোধ হয় হোয়শলগণের বাসন্তিকা দেবী হইবেন। [হোয়শল দ্র°]

অঙ্গড়িপুরম্—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার একটী নগর। ইহা অক্ষা° ১০°৫৯′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°১৫′ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। জনসংখ্যা প্রায় ৮ হাজার। ইহা কালিকটের ৪৫ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত এবং কালিকট হইতে অঙ্গড়িপুরম্ পর্য্যন্ত একটী রাস্তা আছে। এই স্থানে যে দুর্গ ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অভগ্ন অবস্থায় দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা এক্ষণে ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে। নগরস্থ একটী মন্দিরের জন্য এবং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মোপলাগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়া এই স্থান ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

অঙ্গণ—(ক্লী) [অগি-ল্যুট্। ইদিতো নুম্। অঙ্গ্যতে গম্যতে ইতি অঙ্গণং। পৃষোদরাদিত্বাৎ ণত্বমপি] চত্বর, উঠান। "বিমানং...তিষ্ঠতি তেঽঙ্গণে।" (চণ্ডী) বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে অঙ্গণ শব্দের অপভ্রংশে 'উঠান' ও 'আগনে' এইরূপ শব্দ প্রচলিত আছে। [অঙ্গ-ল্যুট্ করণে] ২ যান। যে বহন করে।

অঙ্গতাপ—(পুং) দেহের উষ্ণতা, গায়ের তাপ।

অঙ্গতি১—(পুং) [অগি-গতৌ অঙ্গতীতি কর্ত্তরি অতি] অগ্নিহোত্রী। [অঙ্গ্যতে গম্যতে কর্ম্মণি অতি] ২ ব্রহ্মা। ৩ অগ্নি। ৪ বিষ্ণু। [অঙ্গতি যাতি অনেন করণে অতি] ৫ বাহন, যান। [কাহার কাহারও মতে স্ত্রীত্বে ঙীপ্—অঙ্গতী]

অঙ্গতি২—জাতকবর্ণিত বিদেহদেশের একজন রাজা। ইঁহার বিবরণ ৫৪৪ সংখ্যক জাতকে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

অঙ্গত্রাণ—(ক্লী) অঙ্গের ত্রাণ, দেহরক্ষণ। ২ অঙ্গ বা দেহরক্ষক, বর্ম্ম, চলিত সাঁজোয়া।

অঙ্গদ১—(ক্লী) [অঙ্গং দায়তি শোধয়তি; অঙ্গ-দৈপ্ শোধনে ক] কেয়ূর, তাড়, বাজু। বহু দেবদেবীর অঙ্গে এইরূপ অলঙ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। অঙ্গদ অর্থাৎ তাড় এই অলঙ্কারের চলন এখন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। বীরভূম, মানভূম, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় আজি পর্য্যন্ত বালকেরা ইহা পরিয়া থাকে। তাড় প্রায় রৌপ্যনির্ম্মিত। ইহাতে কিছুই কারিগরি বা শোভাসৌন্দর্য্য নাই। এক অঙ্গুলি বা দেড় অঙ্গুলি বিস্তৃত পাতলা রৌপ্যপাতের দুই ধারে দুইটী সরু খাঁজ কাটা। তাহাই বালার মত গোল করিয়া বাহুর উপর পরিতে হয়। তিন তোলা হইতে ছয় তোলা রৌপ্যে এক জোড়া তাড় প্রস্তুত হইতে পারে। [তাড় দ্র°] [অঙ্গং দদাতীতি দা-ক] (ত্রি) ২ অঙ্গদানকর্ত্তা।

অঙ্গদ২—(পুং) কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি বানররাজ বালীর পুত্র। বালিপত্নী সুষেণনন্দিনী তারা ইঁহার জননী। অঙ্গদ অল্প বয়সেই পিতৃহীন। অঙ্গদের পিতৃব্য সুগ্রীবের সহিত ইঁহার পিতা বালীর বহুকাল হইতেই শত্রুতা ছিল। এই শত্রুতার ফলে সুগ্রীব বিতাড়িত

হইয়া কয়েকজন সহচরসহ ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ঘটনাক্রমে নির্ব্বাসিত রামচন্দ্রের সহিত সুগ্রীবের বন্ধুতার ফলে অঙ্গদের পিতা বালী রামশরে নিহত হন। বালীর মৃত্যু-কালীন অনুরোধে রাম অঙ্গদকে কিষ্কিন্ধ্যার যুবরাজ এবং রাজ্য-প্রাপ্ত সুগ্রীবকে অঙ্গদের অভিভাবক নিযুক্ত করেন।

সুগ্রীব বহুলক্ষ বানরসৈন্য সংগ্রহ করিয়া যখন রাবণহৃতা সীতার সন্ধানে নানাদিকে সৈন্য প্রেরণ করেন, তখন এই অঙ্গদের উপরই একদল বানর সৈন্যের ভার অর্পিত হইয়াছিল। অঙ্গদ দক্ষিণদিকে প্রেরিত হন। এই বানর-সৈন্য-দলেই অঙ্গদের সাহায্যার্থ হনুমান্, জাম্ববান্ প্রভৃতি বুদ্ধিমান্ বীর বানরবৃন্দ দক্ষিণে সীতান্বেষণে গিয়াছিলেন।

সম্পাতির মুখে সীতার সন্ধান মিলিলে, শত যোজন সাগর লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় গিয়া কে সীতাকে দেখিয়া আসিবে, সাগর লঙ্ঘনে কাহার শক্তি কিরূপ, এই প্রকার আলোচনা যখন চলিতেছিল, তখন অঙ্গদ নিজের শক্তিমত্তা সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, তিনি সাগর লঙ্ঘন করিতে পারেন, কিন্তু ফিরিয়া আসিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ।

যাহা হউক, অঙ্গদ এই দলের নেতা ও যুবরাজ বলিয়াই এইরূপ অসমসাহসের কার্য্য করিতে নিবারিত হন। এই ব্যাপারে অঙ্গদের অসাধারণ শক্তিমত্তা ও ক্ষমতার পরিচয়ই পাওয়া যায়।

রামচন্দ্রের আদেশে বানরবীরগণ যখন লঙ্কাদুর্গ অবরোধ করেন, তখন অঙ্গদ এক বিরাট্ বানর-বাহিনী লইয়া লঙ্কার দক্ষিণদ্বার অবরোধ করিয়াছিলেন। লঙ্কাযুদ্ধে ইনি অশেষ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। বজ্রদংষ্ট্র প্রভৃতি বহু রাবণ-সেনানী অঙ্গদের হস্তে নিহত হইয়াছিল।

অঙ্গদ কেবল বীরই ছিলেন না,—বুদ্ধি ও বাক্‌পটুতায়ও তিনি একজন গণ্যমান্য ছিলেন। লঙ্কা অবরোধ করিয়া রামচন্দ্র অঙ্গদকেই একদিন দূতরূপে রাবণের নিকট প্রেরণ করেন। অঙ্গদ লঙ্কার দুর্গপ্রাচীর টপকাইয়া একাকী রাবণ-সভায় দূতরূপে গমন করেন এবং বিচক্ষণ-তার সহিত নিজ পক্ষের বক্তব্য রাবণকে বলিয়া সে স্থান হইতে ফিরিয়া আসেন। অঙ্গদের বীরত্বব্যঞ্জক স্পষ্ট কথায় উত্তেজিত হইয়া ক্রুদ্ধ রাবণ অঙ্গদকে বাঁধিয়া মারিয়া ফেলিবার আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু রাক্ষসবীরগণের সমস্ত বিক্রম ব্যর্থ হয়। অঙ্গদ স্বীয় প্রতাপে রাবণের একটা প্রাসাদশৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিয়া এ যাত্রা নিজ শিবিরে ফিরিয়া আসেন। এইরূপে অঙ্গদ লঙ্কা-যুদ্ধে এক প্রধান ভূমিকা লইয়াছিলেন।

লঙ্কাযুদ্ধের পর অযোধ্যায় রামের রাজ্যাভিষেককালে অঙ্গদ এক জোড়া বৈদূর্য্যমণি-মণ্ডিত কেয়ূর উপহার পাইয়াছিলেন।

রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে ইনি শত্রুঘ্নের অনুগামী হন এবং শত্রুঘ্ন ইঁহাকে একবার সুরথরাজার নিকট দূতরূপে প্রেরণ করেন।

লৌকিক প্রবাদ এইরূপ, এই অঙ্গদ দ্বাপরযুগে ব্যাধরূপে জন্মিয়া কৃষ্ণহন্তা হইয়াছিলেন।

অঙ্গদ$_{৩}$—(পুং) সূর্য্যবংশীয় একজন রাজা। রামচন্দ্রের ভ্রাতা লক্ষ্মণের ঔরসে ও উর্ম্মিলার গর্ভে ইঁহার জন্ম। রামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ পশ্চিমদিকে গমন করিয়া কারুপদ বা কারাপথ দেশ জয় করিয়া ইঁহাকে সেই প্রদেশের শাসনভার প্রদান করেন। (রামায়ণ)

ইনি হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিপতি ছিলেন বলিয়া ঐ রাজ্যের নাম অঙ্গদীয়া হইয়াছে। (ব্রহ্মাণ্ডপুং ৮৮.১৮৮)

অঙ্গদ$_{৪}$—(পুং) জনৈক বিদ্যাধর। বিদ্যাধর-রাজ সুবেশের পুত্র রুরু, রুরুর পুত্র বাহু। ইনি বাহুর পুত্র। (কালিকাপুং)

অঙ্গদ$_{৫}$—(পুং) শিনিবংশীয় বীর। বৃহদুক্‌থের কন্যা বৃহতীর সহিত সুনয়ের বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফলে যে কয়টী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। (ব্রহ্মাণ্ডপুং ৯৬.২৪৬)

অঙ্গদ$_{৬}$—(পুং) শ্রীকৃষ্ণের এক পুত্র। কৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী শৈব্যার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। (হরিবংশ)

অঙ্গদ$_{৭}$—(পুং) একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। মগধদেশে ব্রাহ্মণ দেবদাসের ঔরসে ও তাঁহার পত্নী উত্তমার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। (পদ্মপুং, উত্তরখণ্ড)

অঙ্গদ$_{৮}$—(পুং) ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতম। ভীমসেনের হস্তে ইনি নিহত হন। (মহাভাং)

অঙ্গদ$_{৯}$—(পুং) শিখ সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় গুরু (১৫০৪—১৫৫২ খৃষ্টাব্দ)। বাবা নানক ইঁহার চরিত্রে অপূর্ব্ব গুরুভক্তি ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা দর্শন করিয়া ইঁহাকেই গুরুপদে মনোনীত করিয়া যান। একদা নানক তাঁহার গাভীগুলির জন্য তিন বোঝা ঘাস কাটিয়া মাঠের মধ্যে জমা করিয়া ঐগুলি কেহ তাঁহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেয় কি না দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার পুত্রগণ মাঠে উপস্থিত হইলে নানক তাঁহাদিগকে ঐ বোঝা বহন করিয়া লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। তাঁহার পুত্রগণ এরূপ হীন কার্য্য করিতে কোনমতেই স্বীকৃত হইল না। সেই সময় ভাই লেহনাকে আসিতে দেখিয়া তাহারা বলিল, 'এই একজন মোটবাহক আসিতেছে, ইহার মাথায় এগুলি চাপাইয়া দিন।' ভাই লেহনা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সন্তান। তাঁহার পরিধানে তখন শুভ্র বস্ত্র ছিল। তাহা সত্ত্বেও

তিনি নানকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'গুরুর জন্য আমি মোটবাহকই হইব।' এই বলিয়া তিনি তিনটী মোটই একসঙ্গে মাথায় তুলিয়া লইলেন। নানক তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'হাঁ, তোমার স্কন্ধই দেখিতেছি অনেক ভার গ্রহণ করিবার যোগ্য।'

ভাই লেহনা যখন তাঁহার শুভ্র বস্ত্র কর্দ্দমাক্ত করিয়া গুরুগৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন নানকের পত্নী নানকের নিকট দুঃখ করিয়া বলিলেন, 'এমন করিয়া কি ভদ্রসন্তানকে দিয়া এইরূপ কার্য্য করাইতে হয়। দেখ দেখি, ইহার কাপড় কিরূপ কাদামাখা হইয়া গিয়াছে।' গুরু বলিলেন—'উহা কর্দ্দম নয়, উহা সিন্দূর; উহা দ্বারা ভগবান উহাকে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন। ভারবহনের জন্য ভগবান্ কেবল উহার স্কন্ধই প্রশস্ত করিয়াছেন।'

অঙ্গদেরই পূর্ব্বনাম ভাই লেহনা। তিনি স্বয়ং আদি-গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন যে, গুরুর আদেশে কোন কর্ম্ম—তাহা যতই নিকৃষ্ট ও জঘন্য হউক না কেন, তাহাতে তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না। এইরূপ আদেশানুবর্ত্তিতা তাঁহার চরিত্রের মধ্যে ছিল বলিয়া তিনি শিখদিগকে কর্ম্মপরায়ণ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ করিতে পারিয়াছিলেন। গুরু নানক ভাই লেহনাকে তাঁহার নিজের অঙ্গ হইতেও প্রিয়তর ভাবিতেন বলিয়া তাঁহার নাম রাখেন 'অঙ্গদ'।

অঙ্গদ সকল শিখদিগকে সমান চক্ষে দেখিতেন এবং সকল সময়েই সকল জাতির সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করিতেন। মন নামক একজন শিখ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ভক্তিপ্রদর্শন করিত এবং তিনি যাহা করিতে বলিতেন, তাহাই করিত। কিন্তু জনসেবার জন্য সে কিছুই করিত না। কেহ কোন কাজ করিতে বলিলে সে বলিত, 'আমি গুরুর দাস, আমি তাঁহারই সেবা করিব—অন্যের আমি দাস নহি, সুতরাং অন্যের কাজ করিব না।' গুরু অঙ্গদ ইহা শুনিয়াছিলেন এবং যখন মন আদেশের প্রতীক্ষায় তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন তিনি বলিলেন, 'আমি আদেশ করিতেছি, তুমি বনে যাইয়া কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা পুড়িয়া মর।' এবার আর মন গুরু-আদেশ পালন করিল না। এইরূপ আরও নানা উদাহরণ আছে। এইভাবে অঙ্গদ তাঁহার শিষ্যগণকে আত্মত্যাগ ও জনসেবায় উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিতেন।

অঙ্গদ গুরুপদ প্রাপ্ত হইয়া নানকের সমস্ত উক্তিগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পরে আদিগ্রন্থের কিয়দংশ রচনা করিয়া উহার কলেবর বর্দ্ধিত করেন। ইহাতে তাঁহার রচিত দুই চরণে মিলযুক্ত বহু যুগ্মক কবিতা আছে। তিনিই সর্ব্বপ্রথম টাক্‌রি অক্ষর হইতে গুরুমুখী অক্ষর আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহাতে সহজেই অনুমিত হয় যে, তিনি কেবলমাত্র তাঁহার শিষ্যদিগের ধর্ম্মজীবন লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন না—পঞ্জাব যাহাতে ভাষায় স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া নিজের প্রাণের ভাব সহজে প্রকাশ করিতে পারে, তৎপ্রতিও তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। বাঙ্গালায় যেমন শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার অনুচরগণ বঙ্গভাষায় এক নবপ্রাণ সঞ্চার করিয়াছিলেন, তেমনই অঙ্গদ গুরুমুখী ভাষা ও সাহিত্য নিজ চেষ্টায় গড়িয়া তুলেন।

অঙ্গদ ছিলেন ক্ষত্রি জাতীয়। গুরুপদে আসীন হইয়াও তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সামান্যভাবে জীবন যাপন করিতেন। ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তিনি অমরদাসকে গুরুপদে নির্ব্বাচিত করিয়া যান।

অঙ্গদ,₁₀—'পন্থাবলী' রচয়িতা এক কবি।

অঙ্গদ,₁₁—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত রেবাকাঠার একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। অক্ষা° ২৩° ৫৫′ ৪০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ১৩′ ৩০″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার আয়তন সাড়ে তিন মাইল। এই রাজ্যের একাধিক অধিপতি। তাঁহারা বরদার গাইকবাড়কে বাৎসরিক কর প্রদান করিয়া থাকেন।

অঙ্গদনির্য্যূহ—(পুং) [নির-যা-ভু-বহ-ক নির্য্যূহঃ শেখরঃ। অঙ্গদস্য কেয়ূরস্য নির্য্যূহঃ শেখর ইব। ৬-তৎ] কেয়ূরের শীর্ষস্থ চূড়াকার অগ্রভাগ। তাড়ের চাঁদ।

অঙ্গদ-ভক্ত—একজন বৈষ্ণব ভক্ত। পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশে রায়-সেন-গড় নামে একটী প্রদেশ ছিল। অঙ্গদ-ভক্ত সেই প্রদেশের রাজার সেনাপতি ও পিতৃব্য। তিনি অতিশয় স্ত্রৈণ ও মূর্খ ছিলেন। তাঁহার আদৌ ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞান ছিল না। পরের অনিষ্ট ভিন্ন ভাল করিতে জানিতেন না। তাঁহার এক স্ত্রী ছিলেন, তিনি অতিশয় সচ্চরিত্রা, সুশীলা ও একজন পরম বৈষ্ণবী। একদিন গুরুঠাকুর অঙ্গদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। গুরুকে দেখিয়া অঙ্গদপত্নী অত্যন্ত ভক্তিসহকারে তাঁহাকে নিজ ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন এবং পরম যত্নে গুরুসেবা করিলেন। কিন্তু অঙ্গদ সে সময় বাটীতে ছিলেন না। বাটীতে আসিয়া স্ত্রী পরপুরুষকে ঘরে লইয়াছে শুনিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। পত্নীকে ভ্রষ্টা মনে করিয়া, অঙ্গদ গুরুকে ও পত্নীকে অত্যন্ত দুর্ব্বাক্য বলিলেন। তাহাতে সুশীলা অঙ্গদপত্নী মর্ম্মপীড়িতা হইয়া অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। স্ত্রৈণ অঙ্গদ স্ত্রীকে 'অনাহারী' শুনিয়া তাঁহাকে খাওয়াইবার জন্য সাধাসাধি করিতে লাগিলেন। তাহাতেও মানিনীর মান ভাঙ্গিল না। খেদ করিয়া অঙ্গদপত্নী বলিলেন, 'যদ্যপি তুমি

কৃষ্ণদীক্ষা গ্রহণ কর, তবে আমি আহার করিব।' অঙ্গদ পত্নীর বাক্য এড়াইতে পারিলেন না। কৃষ্ণ-দীক্ষা আশ্রয় করিলেন।

"আশ্রয় মাত্রেতে তার চক্ষু খুলি গেল।
অজ্ঞানতিমির নাশি জ্ঞান প্রকাশিল॥"

তৎপরে অঙ্গদ একজন কৃষ্ণভক্ত ও ধার্ম্মিক হইয়া উঠিলেন। পরে রাজার কঠিন আদেশে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে একটী যুদ্ধে যাইতে হইল। কৃষ্ণকৃপায় একদিনের মধ্যে জয়লাভ করিলেন ও সেই দেশ লুটিয়া বহুদ্রব্য ঘরে আনিলেন। সেই সকল দ্রব্যমধ্যে একটী অত্যুৎকৃষ্ট হীরা ছিল। অপর সকল দ্রব্য রাজাকে উপঢৌকন দিলেন, কিন্তু সেটী গোপন করিয়া রাখিলেন। রাজা লোকের মুখে হীরার কথা শুনিয়া তাহা চাহিয়া পাঠাইলেন। অঙ্গদ ইতিপূর্ব্বে ঐ দ্রব্যটী পুরুষোত্তমে যাইয়া জগন্নাথের গলায় পরাইয়া আসিবেন, ইহাই স্থির করিয়াছিলেন। এক্ষণে রাজাজ্ঞা শুনিয়া তাঁহার মনে বড় কষ্ট হইল! তিনি হীরাটী লইয়া পুরুষোত্তমে যাইতে মনস্থ করিলেন এবং অল্প লোক সঙ্গে লইয়া গুপ্তভাবে বাটী হইতে বাহির হইলেন। রাজা কোন সূত্রে এই সংবাদ পাইয়া অঙ্গদকে শীঘ্র হাজির করিবার জন্য একদল সৈন্য পাঠাইলেন। সৈন্যগণ পথিমধ্যে অঙ্গদকে ধরিল। তখন অঙ্গদ স্নান করিবার ভান করিয়া নিকটস্থ সরোবরে গমন করিলেন এবং জলে নামিয়া শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশে ভক্তিভাবে সেই হীরাটী ফেলিয়া দিলেন। তটস্থ সৈন্যগণ তদ্দৃষ্টে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং সকলে মিলিয়া রাজাকে সংবাদ দিতে চলিল।

এদিকে অঙ্গদ পুরুষোত্তমে উপনীত হইলেন এবং তথায় ইষ্টদেবের কপালে ঐ হীরারত্ন দেখিতে পাইয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। পাণ্ডারাও আশ্চর্য্য হইলেন এবং স্বপ্নে সেই দৈবকাণ্ড অবগত হইয়া সকলে অঙ্গদকে যত্নপূর্ব্বক আহ্বান করিলেন। সেই অবধি অঙ্গদ একজন প্রধান কৃষ্ণভক্ত বলিয়া বিখ্যাত হইলেন।

জগন্নাথদেবের কপালে সেই হীরা অদ্যাবধি রহিয়াছে।

"সেই হীরা অদ্যাবধি কপালে শোভয়।
পর্ব্বে পর্ব্বে পরেন সতত না পরয়॥" (ভক্তমাল)

অঙ্গদরণ—(ক্লী) [বৈদ্যক] পিত্তজনিত পীড়া।

অঙ্গদসিংহ—পাথার প্রদেশের পরমারজাতীয় হূন-নরপতি। অষ্টম শতকে যে সময় চিতোর প্রথম অবরুদ্ধ হয়, তৎকালে ইনি সসৈন্যে মহারাণার পক্ষে থাকিয়া বিপক্ষ সহ যুদ্ধ করেন। বিজোল্লীর বিখ্যাত মন্দির ইঁহার নির্ম্মিত। (রাজস্থান)

অঙ্গদা—(স্ত্রী) [অঙ্গদ-আপ্] নারী। ২ দক্ষিণ-দিক্‌স্থ ঐরাবতরাজ বামন নামক হস্তীর ভার্য্যা। (ব্রহ্মাণ্ড-পু°, ৬৯ অ°)

অঙ্গদাহ—(পুং) গাত্রদাহ, গা জ্বালা।

অঙ্গদীয়বিষয়—২২ হর্ষ সংবতে (৬২৮ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ সম্রাট্ হর্ষের বাংসখেরা তাম্রফলকে 'অঙ্গদীয়বিষয়' নামে একটী স্থানের উল্লেখ আছে।

অঙ্গদীয়া—হিমালয়ের পার্শ্ববর্ত্তী কারাপথদেশে রামচন্দ্রানুজ লক্ষ্মণের পুত্র অঙ্গদ স্বীয়নামে অঙ্গদীয়া নামে পুরী নির্ম্মাণ করেন। (ব্রহ্মাণ্ডপু°, ৮৮.১৮৮) রামায়ণে (উত্তর°, ১০২ সর্গ) ইহার নামান্তর অশ্বনগর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

অঙ্গদূষণ—(ক্লী) অঙ্গহানিদোষ, অসম্পূর্ণতা দোষ। ২ পূর্ত্ত-কার্য্যের অঙ্গহানি বা অসম্পূর্ণতা দোষ হেতু শাস্তি। "মানসার" নামক বাস্তুশাস্ত্রের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের নাম 'অঙ্গদূষণ অধ্যায়'। এই পরিচ্ছেদের প্রথমেই—নির্ম্মাণকার্য্যে যদি অঙ্গহানি বা অসম্পূর্ণতা দোষ দেখা যায়, তাহার জন্য প্রধান শিল্পী, রাজা ও রাজ্য কি ভাবে শাস্তি পাইবে, তাহার বিবরণ বর্ণিত আছে।

প্রসার, উচ্চতা, উপান, দ্বারপিণ্ডী (Lintel), স্তম্ভ, প্রস্তার (Entablature), কলস (Finial), স্থান (Adytum), অবতরণিকা, ছাদ, তোরণ (Gate house), পটমণ্ডপ, প্রাচীর প্রভৃতিতে কোন দোষ থাকিবে না। (মানসার, ৬.৩-১০)

দোষযুক্ত গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য বিভিন্নপ্রকার শাস্তির বিধান আছে; যথা—বেদিকা যদি দোষযুক্ত হয়, তাহা হইলে শিল্পীর চক্ষু উৎপাটন করা হইবে। গম্বুজ যদি বড় বা ছোট হয়, তাহা হইলে প্রজারা দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়। স্তম্ভ যদি বড় বা ছোট হয়, তাহা হইলে শিল্পীর বংশের ধ্বংস অনিবার্য্য। (মানসার, ৬ষ্ঠ অধ্যায়) গৃহাদির বিভিন্ন অঙ্গ যদি ন্যূনাধিক হয়, অর্থাৎ যেখানে যেমনটী যে পরিমাণ হওয়া উচিত, তাহার বিপরীত হয়, তাহা হইলে রাজা এবং রাজ্যপরিচালক-দিগের দোষপ্রাপ্তির কথাই মানসারে বলা হইয়াছে। এইজন্য এ দোষের প্রতিবিধানকল্পে শিল্পীর চক্ষু উৎপাটনই বিধেয়।

"তস্মাৎ তু দোষসম্প্রাপ্তে-শিল্পিদৃষ্টিং নিবারয়েৎ।" (৬.১১)

অঙ্গদেম্বা—দার্জ্জিলিঙের লিম্বুজাতির পাম্বার শাখার এক গোষ্ঠী।

অঙ্গদেবী—হিন্দুদিগের দেবতাবিশেষ। শ্রীতত্ত্বনিধিতে (প. ১০) অঙ্গদেব্যাদি ছয় অঙ্গদেবীর বর্ণনা আছে। তাঁহাদের সকলের বিবরণ একই প্রকারের। যথা—

"নবলাবণ্যপূর্ণাঙ্গসাবধানধৃতায়ুধাঃ।
পরিতো বিন্দুপীঠং চ ভ্রাম্যন্তো দীপ্তমূর্ত্তয়ঃ॥"

তাঁহারা সকলেই নবলাবণ্যবতী, পূর্ণাবয়বা এবং সাবধানে

আপন আপন আয়ুধ ধরিয়া দীপ্তমূর্ত্তিতে বিন্দুপীঠের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে থাকেন। ইঁহাদের বর্ণ রক্ত।

অঙ্গদ্বীপ—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবর্ণিত দক্ষিণমহাসাগরস্থ নানা রত্নসমন্বিত ষড়্দ্বীপের অন্যতম। এই দ্বীপ বিবিধ প্রাণিপরিপূর্ণ, বহু ম্লেচ্ছ-জনসমাকীর্ণ, বহু বিস্তীর্ণ এবং হেমবিক্রমাদি বহুবিধ রত্নের আকর। এই দ্বীপ বহু নদী ও শৈলবন দ্বারা বিচিত্র এবং লবণজলধিসন্নিভ। এখানে বহু নির্ঝর ও কন্দরসমন্বিত চক্র-গিরি নামক একটী পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বতের গুহাপ্রদেশ নানাবিধ জন্তুর আশ্রয় এবং নাগদেশের মধ্যে ঐ মহাগিরি দ্বারাই বহু প্রদেশ পরিব্যাপ্ত। উহার কটিদেশে নাগনিলয় ও নদনদীপতি সাগর বিরাজিত রহিয়াছে। (ব্রহ্মাণ্ডপু°, ৪৮ অ°) এই পুরাণের অপরস্থলে ইহাকে একটী উপদ্বীপ বলা হইয়াছে। এখানে ম্লেচ্ছজাতির বাস; তাহারা হিন্দুদেবদেবীর উপাসনা করিয়া থাকে।

এই অঙ্গদ্বীপ প্রশান্তমহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত এবং অধুনা আনাম ও কম্বোজ (কম্বোডিয়া) নামে প্রসিদ্ধ। [আনাম, চম্পা ও কম্বোজ দ্র°]

অঙ্গধুক্—(পুং) যমদুহিতা নির্ম্মাষ্টির পুত্র। (মার্কণ্ডেয়পু°)

অঙ্গন$_1$—(ক্লী) [অগি-ল্যুট্। ইদিতো নুম্] চত্বরভূমি. অজির, প্রাঙ্গণ, উঠান। বাস্তুশাস্ত্রে এসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ উক্ত হইয়াছে। [প্রাঙ্গণ দ্র°] ২ যান। ৩ গমন।

অঙ্গন$_2$—[অঙ্কন দ্র°]

অঙ্গনদেব—চেদিরাজ অর্জ্জুনের পুত্র। ইঁহার কন্যা বিজাম্বার সহিত তৃতীয় ইন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল। ইন্দ্রের পিতা জগত্তুঙ্গ ও পিতামহ দ্বিতীয় কৃষ্ণ।

অঙ্গনলাল—প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি। ইনি 'রসাল' নামে সমধিক পরিচিত। হরিদ্বারের সন্নিকট বিল্বগ্রাম (বেলগাঁও) জেলায় ইঁহার বাস ছিল। ইনি ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

অঙ্গনা—(স্ত্রী) [কল্যাণম্ অঙ্গমস্তি অস্যাঃ অঙ্গ-ন। কল্যাণার্থে] সুন্দরাঙ্গী স্ত্রী, সুশ্রী কামিনী। ২ পত্নী। ৩ সার্ব্বভৌম নামক উত্তরদিগ্‌হস্তীর স্ত্রী। কিন্তু হারাবলীর মতে বামন নামক দক্ষিণদিক্ হস্তীর স্ত্রী। ৪ বৃষ-কর্কট-কন্যা-বৃশ্চিক-মকর-মীন এই ছয় রাশি। (জ্যোতিস্তত্ত্ব) ৫ কন্যারাশি। ৬ [বৈদ্যক] প্রিয়ঙ্গু। (ভাবপ্র°)

অঙ্গনাথ—(পুং) অঙ্গাধিপ কর্ণ। ২ অঙ্গদেশের রাজা।

অঙ্গনাপ্রিয়—(পুং) [প্রীণাতীতি প্রী-ক প্রিয়ঃ। অঙ্গনায়াঃ প্রিয়ঃ। ৬-তৎ] [বৈদ্যক] অশোকবৃক্ষ। অশোকফুলের গুচ্ছ দিয়া অঙ্গনারা কেশরচনা করিতেন, তজ্জন্য ইহা স্ত্রীলোকের প্রিয় বৃক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। অথবা, সাংসারিক ও মানসিক শোক না ঘটে এই কামনায় স্ত্রীলোকেরা অশোকপুষ্প দিয়া অশোকষষ্ঠীর ব্রত করেন, সে কারণেও উহা অঙ্গনাদের প্রিয় বৃক্ষ হইতে পারে। (ত্রি) ২ স্ত্রীলোকের প্রিয় মাত্র। ৩ (পুং) দ্রুমোৎপল, চলিত ওলট-কম্বল। [অঙ্গনা প্রিয়া যস্য, বহুব্রী°] ৪ স্ত্রী-অনুরক্ত। ৫ বামন নামক দক্ষিণদিগ্‌গজ।

অঙ্গনাপ্রিয়া—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] প্রিয়ঙ্গু নামক গন্ধদ্রব্য। (ভাবপ্র°)

অঙ্গন্যাস—(পুং) [অঙ্গেষু অঙ্গশুদ্ধিহেতোরঙ্গেষু হৃদয়াদিষু মন্ত্রভেদস্য ন্যাসঃ] তন্ত্রোক্ত বিশেষ বিশেষ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক হস্তদ্বারা হৃদয়াদি ছয় অঙ্গ স্পর্শ করা। ছয় অঙ্গ যথা—হৃদয়, শির, শিখা, কবচ, নেত্রত্রয় ও করতলপৃষ্ঠ। ন্যাসকালে এই সকল শব্দ চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত করিয়া লইবে।

অঙ্গপাকতা—(স্ত্রী) পিত্তজন্য রোগ; পাকা ফোড়ার ন্যায় গাত্রবেদনা।

অঙ্গপালক—(ত্রি) [অঙ্গং পালয়তি যঃ সঃ] অঙ্গপালনকারক, অঙ্গরক্ষক।

অঙ্গপালি—(পুং) [অঙ্গং পাল্যতে সম্বধ্যতে অত্র। অঙ্গ-পাল-ই] আলিঙ্গন।

অঙ্গপালিকা—(স্ত্রী) [অঙ্গং পালয়তীতি আপ্। অঙ্গ-পালি-ণ্ বুল্, ৬-তৎ] দেহপালনকর্ত্রী, ধাইমা, ধাত্রী।

অঙ্গপীড়া—(স্ত্রী) বায়ুজন্য রোগ; চলিত গা ব্যথা।

অঙ্গপুর—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সাতারা জেলার একটী নগর। অঙ্গপুরের দেশমুখ আনন্দরাও ভীমরাও এখানে ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে একটী গণপতি-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। উহার প্রাচীরগাত্র প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং উপরের গম্বুজ ইষ্টক-নির্ম্মিত।

অঙ্গপূজিত—(পুং) অশ্বতর। (মদনপাল)

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—(ক্লী) মুখনেত্রাদি সর্ব্ব অবয়ব। "অঙ্গপ্রত্যঙ্গজঃ পুত্রঃ।" (রামা° ২.৭৪.১৪)

অঙ্গপ্রসারণ—(ক্লী) দেহবিস্তার, চলিত হাত-পা ছড়ানো।

অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত—(ক্লী) [৬-তৎ] অশৌচে পঞ্চশূনাজন্য পাপক্ষয়ার্থ ক্রিয়া। ২ স্মৃত্যুক্ত দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত।

অঙ্গবলী—(স্ত্রী) ত্রিবলি, জঠরাবয়ববিশেষ।

অঙ্গবাহু—(পুং) যদুবংশীয় একজন নৃপতি। ইনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। (মহাভা°)

অঙ্গবু—দার্জ্জিলিঙের লিম্বুজাতির থেকিম্ শাখার গোষ্ঠীবিশেষ।

অঙ্গবেল্লাল—এক প্রাচীন নৃপতি। মহিসুরের অন্তর্গত হাসান জেলায় চেনবাইপট্টমের পাঁচ মাইল দূরে শ্রবণ-বেলগোলা নামে একটী নগর আছে। এই স্থান জৈনদেবতা গোমতেশ্বরের মূর্ত্তির জন্য প্রসিদ্ধ। স্থলপুরাণে দেখা যায় যে, অমলকীর্ত্তি ৪৯ বর্ষ ব্যাপী ৫০০০ মন্দির নির্ম্মাণে ব্যাপৃত ছিলেন। অমলকীর্ত্তির পর অঙ্গরাজ ৫৬ বৎসর ধরিয়া উহার

নির্ম্মাণকার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন। তিনি প্রভাচন্দ্র সিদ্ধান্তাচার্য্যের উপর এই কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ভার প্রদান করেন।

অঙ্গবোহাঙ্—দার্জ্জিলিঙের লিম্বুজাতির আঠারইশাখার গোষ্ঠী-বিশেষ।

অঙ্গভঙ্গ—(পুং) [বৈদ্যক] শরীর ভঙ্গ, চলিত গা ভাঙ্গা। ২ গুহ্যদেশ ও বৃষণের মধ্যস্থল। ৩ রোগ। ৪ বায়ুরোগ।

অঙ্গভূ—(পুং) [অঙ্গাদ্‌ভবতীতি ভূ-ক্বিপ্] পুত্র। ২ কাম। (ত্রি) ৩ দেহ ও মনোজাত মাত্র। [অঙ্গানাং অঙ্গমন্ত্রাণাং ভূঃ স্থানং] ৪ কৃতাঙ্গন্যাস। "ব্রহ্মাঙ্গভূর্ব্রহ্মণি যোজিতাত্মা।" (কুমারস°)

অঙ্গভেদ—(পুং) [বৈদ্যক] বায়ুরোগ, বায়ুজন্য গাত্রভঙ্গ।

অঙ্গমন্ত্র—(পুং) [হৃদয়াদিষু ষট্‌সু স্থানেষু ন্যাসস্য মন্ত্রঃ ; ৭-তৎ] অঙ্গন্যাসের তন্ত্রোক্ত মন্ত্রবিশেষ। [অঙ্গন্যাস দ্র°]

অঙ্গমর্দ্দ—(পুং) [অঙ্গং মৃদ্‌নাতীতি। অঙ্গ-মৃদ্-অচ্ ; ৬-তৎ] অঙ্গমর্দ্দনকারক ভৃত্য ; যে ভৃত্য হস্তপদাদি অঙ্গ টিপিয়া দেয় ; সংবাহক। (ত্রি) ২ অঙ্গমর্দ্দনকারক। [ভাবে ল্যুট্] (পুং) ৩ অঙ্গমর্দ্দন, অঙ্গসেবা। ৪ [বৈদ্যক] গাত্রবেদনা।

অঙ্গমর্দ্দক—(পুং) [অঙ্গং মৃদ্নাতীতি, অঙ্গ-মৃদ-ণ্বুল্] যে ভৃত্য অঙ্গ টিপিয়া দেয়। (ত্রি) ২ অঙ্গমর্দ্দনকারক।

অঙ্গমর্দ্দন—(ক্লী) গাত্রপোটন ; চলিত গা কুটনো। [অঙ্গ-সংমর্দ্দন দ্র°]

অঙ্গমর্দ্দিন্—(পুং) [অঙ্গ-মৃদ-ণিনি] অঙ্গমর্দ্দক ভৃত্য। (ত্রি) ২ অঙ্গমর্দ্দনকারক মাত্র। [স্ত্রিয়াং ঙীপ্—অঙ্গমর্দ্দিনী]

অঙ্গমর্ষ—(পুং) বাতাদিহেতু অঙ্গবেদনা। [অঙ্গগ্রহ দ্র°]

অঙ্গমলজ—(পুং) জনপদবিশেষ। (মহাভা°, ভীষ্ম°, ভূমি°)

অঙ্গমলয় (অঙ্গমাল)—দক্ষিণ ভারতের কোচীনরাজ্যের অন্তর্গত একটী জনস্থান। প্রবাদ, এখানে চেরমন পেরুমলের রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক সেণ্ট টমাস এখানে ৫২ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ আগমন করেন। ইহা বর্ত্তমানে কোদঙ্গলূর বা ক্রাঙ্গানুর নামে পরিচিত। [কোদঙ্গনূর দ্র°]

অঙ্গমেজয়ত্ব—(ক্লী) অঙ্গকম্পন, চলিত গা কাঁপা।

অঙ্গমোটন—(ক্লী) আলস্যজনিত হস্তপদাদির প্রসারণ করিবার ও মট্‌কাইবার ইচ্ছা। চলিত কথায় "হাড় মট্ মট্ বা গা গস্ গস্।"

অঙ্গযজ্ঞ—(পুং) [অঙ্গীভূতঃ প্রধানযজ্ঞোপকরণীভূতঃ যজ্ঞঃ, কর্ম্মধা°] কর্ম্মমাত্রের অঙ্গ গ্রহযাগাদি। ২ দর্শাদি অঙ্গ সমিধ্‌যাগাদি। এই সকল যাগ সমিধ্, তনূনপাত, ইড়, বর্হিঃ ও স্বাহাকার ভেদে পঞ্চবিধ। মীমাংসা মতে, এই সকল যাগের একবার অনুষ্ঠানেই আগ্নেয়াদি প্রধান যাগের উপকারিতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অঙ্গযাগাদি ব্যাপারেও এই সকল অর্থই বুঝায়। "অঙ্গান্যযাক্ষীদভিতঃ প্রধানম্" (ভট্টি)

অঙ্গযষ্টি—(স্ত্রী) যষ্টির ন্যায় কৃশ দেহ।

অঙ্গযাগ—(পুং) বৈদিক যজ্ঞ প্রকরণে বর্ণিত পশুপুরোডাশ যাগবিধি। অধ্বর্য্যু খণ্ড খণ্ড পশ্বাঙ্গ লইয়া হবন করেন বলিয়া ইহা অঙ্গযাগ অথবা পশুপুরোডাশ যাগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৬.৩.১০) এই পশুপুরোডাশ যাগের বিস্তৃতভাবে উল্লেখ আছে।

"সোঽব্রবীদ্বরং বৃণৈ পশোরুদ্ধারমুদ্ধরা ইতি স এতমুদ্ধার-মুদহরতদোঃ পূর্ব্বার্দ্ধস্য গুদং মধ্যতঃ শ্রোণিং জঘনার্দ্ধস্য ততো দেবা অভবন্ পরাসুরায়ত্র্যোগাণাং সমবস্যতি ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ ভবত্যাত্মনা পরাস্য ভ্রাতৃব্যো ভবত্যক্ষ্ণয়াবস্যতি তস্মা-দক্ষ্ণয়া পশবোঙ্গানি প্রহরন্তি প্রতিষ্ঠিত্যৈ।" (তৈত্তিরীয়স° ৬.৩.১০)

হবন দগ্ধ এই মাংস অধ্বর্য্যু, হোতা, ব্রহ্মা, মৈত্রাবরুণ, অগ্নীধ্র ও সর্ব্বশেষে যজমান ভক্ষণ করিয়া থাকেন। যজ্ঞে তৃতীয় সবনে 'পাশুকানুষ্ঠানের' পর 'অঙ্গযাগ' ও তদনন্তর তৃতীয় পুরোডাশযাগের বিধান আছে। [যজ্ঞ, অগ্নিষ্টোম, পুরোডাশ প্রভৃতি শব্দ দ্র°]

অঙ্গযোনি—হিন্দুদিগের দেবতাবিশেষ। ইনি অঙ্গজ বা কামদেব হইতে অভিন্ন। প্রপঞ্চসারে (প. ১২৮) ইঁহার নিম্নলিখিত ধ্যান পাওয়া যায়—

"অরুণমরুণবাসো মাল্যদামাঙ্গরাগং
স্বকরকলিতপাশং সাঙ্কুশাস্ত্রেষু চাপম্।
মণিময়মুকুটাদ্যৈর্দীপ্তিমাকল্পজাতৈ-
ররুণনলিনসংস্থং চিন্তয়েদঙ্গযোনিম্॥"

অঙ্গযোনির দেহের বর্ণ লাল, তাঁহার পরিচ্ছদও লাল-বর্ণের এবং তিনি রক্তবর্ণের পদ্মের উপর বসিয়া থাকেন। তাঁহার হস্তে পাশ, অঙ্কুশাস্ত্র, বাণ ও ধনু থাকে এবং ইহা হইতে অনুমান হয় তিনি চতুর্হস্ত। [অঙ্গজ ও কামদেব দ্র°]

অঙ্গরক্ত—(পুং) [অঙ্গেন রক্তঃ, ৩-তৎ। অথবা, অঙ্গে রক্তঃ রন্‌জ-ক্ত, ৭তৎ] [বৈদ্যক] কম্পিল্যদেশজাত রক্তবর্ণ চূর্ণবিশিষ্ট বৃক্ষবিশেষ। চলিত গুণ্ডারোচনী। পর্য্যায়—পিকাক্ষ, রোচনী, লঘুপত্রক, কম্পিল্য, কর্কশ, চন্দ্র ও রক্তাঙ্গ। ২ কম্পিল্লক, চলিত কমলাগুড়ি। (ত্রি) ৩ রক্তাঙ্গ মাত্র।

অঙ্গরক্ষক—(পুং) শরীররক্ষী, দেহরক্ষাকারী।

অঙ্গরক্ষণী—(স্ত্রী) [অঙ্গং রক্ষতি যা, অঙ্গ-রক্ষ-ণিনি, অথবা অঙ্গং রক্ষ্যতেঽনয়া, রক্ষ-করণে ল্যুট্, ৬-তৎ। স্ত্রীত্বে ঙীপ্]

অঙ্গরক্ষাকর লৌহজালময় বর্ম্মবিশেষ; অঙ্গত্রাণ; চলিত সাঁজোয়া; আংরাখা। পর্য্যায়—জালিকা, জালপ্রায়া, আয়সী। (হেম°) (ত্রি) ২ অঙ্গরক্ষার উপযোগী যে কোন বস্তু। [ভাবে ল্যুট্] (ক্লী) ৩ দেহত্রাণ।

অঙ্গরচনা—(স্ত্রী) নৃত্য ও অভিনয়ের নেপথ্যবিধি চারি প্রকার, তন্মধ্যে অঙ্গরচনা এক প্রকার। মাল্য, আভরণ, বস্ত্রাদি এবং শ্বেত, পীত, নীল, লোহিতাদি বর্ণ দ্বারা যথাযোগ্য স্থানে যথাযোগ্যভাবে যে বিন্যাস করা যায়, তাহার নাম অঙ্গরচনা।

অঙ্গরবরি—বিহারের সিংভূম জেলাস্থিত সরন্দ পাহাড়ের একটী শিখর। উচ্চতা ২১৩৭ ফুট। অক্ষা° ২০°৩০′ উঃ; দ্রাঘি° ৮৫°৩৭′৩০″ পূঃ। চাঁইবাসা হইতে ৩ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত।

অঙ্গরাও—(পুং) যদুবংশীয় জশলমীর রাজবংশ জাত রাজবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ হইতে ১৪ পুরুষ অধস্তন এবং জশলমীর নগর প্রতিষ্ঠাতা জয়শাল হইতে ৯ পুরুষ ঊর্দ্ধতন। ইহার পিতার নাম বলন্দ। ইনি পিতার কনিষ্ঠ সন্তান। (রাজস্থান)

অঙ্গরাগ—(পুং) [অঙ্গস্য রাগঃ, ৬-তৎ, ভাবে ঘঞ্] অঙ্গের বিলেপন, গাত্ররঞ্জন। [রজ্যতেঽনেনেতি অঙ্গ-রঞ্জ-করণে ঘঞ্] ২ গাত্রে লেপন করিবার চন্দনকুঙ্কুমাদি গন্ধদ্রব্য। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে সকল বিলাসের সামগ্রী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে অঙ্গরাগজাতীয় দ্রব্যই প্রধান। নানাবিধ সাবান, আতর, এসেন্স, হেয়ার লোশন এবং স্নানকালে ব্যবহার্য্য সুগন্ধ দ্রব্যাদি এই অঙ্গরাগজাতীয় অধুনাবিষ্কৃত সামগ্রী। প্রাচীন ভারতের ঐশ্বর্য্যের অভাব ছিল না, বিলাসীরও অভাব ছিল না, সুতরাং বিলাসের সামগ্রীরই বা অভাব থাকিবে কেন? কামশাস্ত্র বিলাসীর বিলাসের সহচর। এই কামশাস্ত্রসমূহে অঙ্গরাগের নানাবিধ-প্রকরণ ও প্রণালী প্রাচীন মনীষিগণ বিলাসীর সুবিধার জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত ও প্রাকৃত কাব্যসমূহে এই অঙ্গরাগের যে কত বর্ণনা রহিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এখন ভারতবাসী দেহের যত্ন ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এমন দিন ছিল যখন বিলাসী ও বিলাসিনীগণ নানাবিধ অঙ্গরাগে অঙ্গবিভূষিত ও সুরভিত করিয়া প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর মনোরঞ্জন করিতেন। কামসূত্রকার বাৎস্যায়ন কুচুমার মুনিকে ঔপনিষদিক প্রকরণের বিশেষজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই কুচুমারমুনি-প্রণীত কুচুমারতন্ত্রে অঙ্গরাগের যথেষ্ট প্রয়োগ লিপিবদ্ধ আছে এবং কামসূত্র, রতিরহস্য, অনঙ্গরঙ্গ, পঞ্চসায়ক, নাগরসর্ব্বস্ব প্রভৃতি কামশাস্ত্রে এই অঙ্গরাগের ভূরি ভূরি প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে। ঈশ্বরকৃত "গন্ধযুক্তি" এবং শার্ঙ্গধরকৃত "গন্ধদীপিকা" গ্রন্থে এই অঙ্গরাগাদির বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। কামসূত্রকার বাৎস্যায়ন মুনি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থের প্রথম অধিকরণের চতুর্থ অধ্যায়ে নাগরকবৃত্তের মধ্যে বিলাসী নাগরকের প্রাত্যহিক অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে এই কয়েকটী কার্য্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"স প্রাতরুত্থায় কৃতনিয়তকৃত্যঃ, গৃহীতদন্তধাবনঃ, মাত্রয়ানুলেপনং ধূপং স্রজমিতি গৃহীত্বা, দত্ত্বা সিক্থকমলক্তকঞ্চ, দৃষ্ট্বাদর্শে মুখম্, গৃহীতমুখবাসতাম্বূলঃ, কার্য্যাণ্যনুতিষ্ঠেৎ॥"

"নিত্যং স্নানং, দ্বিতীয়কমুৎসাদনং, তৃতীয়কঃ ফেণকঃ, চতুর্থকমায়ুষ্যম্, পঞ্চমকং দশমকং বা প্রত্যায়ুষ্যমিত্যহীনম্॥"

"সাতত্যাচ্চ সংবৃতকক্ষাস্বেদাপনোদঃ॥"

(কামসূত্র ১.৪.১৬-১৮)

অর্থাৎ নায়ক প্রভাতে শয্যাত্যাগপূর্ব্বক নিত্যকৃত্য সমাপন করিয়া দন্তধাবন করিবে, তাহার পর কিছু অনুলেপন অর্থাৎ গন্ধদ্রব্যাদি লেপন করিবে, তাহার পর ধূপ দ্বারা কেশ ও অঙ্গ সুবাসিত করিবে, তৎপরে মাল্যাদি ধারণ করিবে। অনন্তর সিক্থ (মোম) ও অলক্তক দিয়া বদনের প্রসাধন করিবে অর্থাৎ মুখে মোম দিয়া মুখ চিক্কন করিবে এবং গণ্ডে অলক্তক দিয়া তাহা রক্তাভ করিবে। তাহার পর আর্সিতে মুখ দেখিয়া মুখে মুখবাসগুটিকা গ্রহণ করিয়া তাম্বূল ভক্ষণ করিবে।

অনন্তর বাৎস্যায়ন বলিতেছেন, নাগরকের স্নান নিত্যকর্ত্তব্য। একদিন অন্তর উৎসাদন অর্থাৎ তৈলাদি দ্বারা গাত্রের মল পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য; তৃতীয় দিনে জঙ্ঘাযুগলে এবং কনুই প্রভৃতি স্থানে ফেণক অর্থাৎ স্নেহময় পদার্থ (ক্রীম) লাগাইবে; চতুর্থ দিনে শ্মশ্রু প্রভৃতিতে এবং পঞ্চম বা দশম দিনে গুহ্যস্থানে ক্ষৌরকার্য্য করিবে। সর্ব্বদা কক্ষ বা বগল প্রভৃতি যে সকল স্থান সংবৃত থাকে, সেই সকল স্থানের স্বেদাপনোদন করিবে।

এই নাগরকবৃত্ত হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, প্রাচীনকালের বিলাসিগণ আধুনিক কালের বিলাসিগণ অপেক্ষা কোন অংশে কম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিলেন না এবং জীবনের যাবতীয় সুখ-স্বচ্ছন্দতা তাঁহারা রক্ষা করিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেন।

বৃহৎসংহিতায়ও গন্ধযুক্তি প্রকরণে অনেক প্রকার অঙ্গরাগের বিষয় বলা হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, কামশাস্ত্রসমূহে এই সকল গন্ধদ্রব্যের এত উল্লেখ কেন? ইহার সহিত কামশাস্ত্রের কি সম্বন্ধ? তাহার উত্তরে, যৌন-আকর্ষণের মূলে গন্ধের শক্তি যে কত প্রবল, তাহা আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব। পুরুষ ও নারী-

ভেদে জীবদেহের গন্ধ বিভিন্ন। আবার ব্যক্তিভেদে এই গন্ধের উগ্রতা বা অল্পতা দেখিতে পাওয়া যায় এবং সময় বিশেষে উভয়ের দেহজাত গন্ধের ইতর বিশেষ ঘটিয়া থাকে। ইতর প্রাণিগণ এই গন্ধের দ্বারা স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। সুগন্ধ যে কাম-বর্দ্ধক এবং দুর্গন্ধ যে কামবৃত্তি-নাশক, তাহা অধুনা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রসাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। প্রাচীনকালের কামশাস্ত্রকারগণ সে বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন।

সকল প্রকার অঙ্গরাগকে দুইটী বিশেষ ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ এক প্রকার অঙ্গরাগের ব্যবহারে দেহজাত দুর্গন্ধ নাশ হয় এবং এক অতি মৃদু সুগন্ধে দেহ সুরভিত হইয়া উঠে ; এই সৌরভ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে মন প্রফুল্ল হয়। দ্বিতীয়তঃ অন্য এক প্রকার অঙ্গরাগ আছে, যাহা দেহজাত দুর্গন্ধনাশ করিয়া অতি মনোমদ-অঙ্গসৌরভ সৃষ্টি করে এবং এই গন্ধ কামোদ্দীপক। এই দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গরাগের মধ্যে আবার দুই প্রকার ভেদ আছে। একপ্রকার—যে ব্যবহার করে তাহাকেই কামোত্তেজিত করে, অন্য প্রকার—তাহার সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে উদ্দীপিত করিয়া থাকে। পুরুষ অপেক্ষা রমণীগণই বেশীর ভাগ আত্মতৃপ্তি বা আত্ম-উত্তেজনার জন্য সুগন্ধি অঙ্গরাগ ব্যবহার করিয়া থাকেন। অবশ্য তাঁহারা যে ইহা ঠিক জ্ঞাতসারেই করিয়া থাকেন, তাহা বলা যায় না ; ইহা কিয়ৎ-পরিমাণে তাঁহাদের প্রকৃতিগত চিরন্তন অভ্যাস।

এই সকল কারণে অঙ্গরাগের চারি প্রকার বিভাগ সম্ভবপর হইয়াছে, যথা—(১) যে অঙ্গরাগ পুরুষ জাতির দেহদুর্গন্ধ নাশ করে, (২) যাহা নারীজাতির দেহদুর্গন্ধ নাশ করে, (৩) যাহা পুরুষ জাতির দেহসৌগন্ধ্যের সৌকর্য্যবিধান করিয়া স্ত্রীজাতিকে বিমোহিত করে এবং (৪) যাহা স্ত্রীজাতির দেহসৌগন্ধ্য বর্দ্ধিত করিয়া পুরুষ জাতিকে তৎপ্রতি আকৃষ্ট করে।

এতদ্ভিন্ন অঙ্গরাগের গুণ ও ক্রিয়া হিসাবে নিম্নলিখিত কএক প্রকার বিভাগের উল্লেখ আছে—(১) ঘর্ম্মজ দুর্গন্ধ-নাশক, (২) ঘর্ম্মাম্বুনিরোধক, (৩) দেহসৌরভকারী, (৪) স্নানীয় সুগন্ধিদ্রব্য, (৫) দেহের কান্তিবর্দ্ধক, (৬) অঙ্গমল-নাশক, (৭) মুখবাস ও পূগবাস এবং (৮) সুগন্ধি কেশতৈল ও কেশবাস।

(১) ঘর্ম্মজ দুর্গন্ধনাশক প্রলেপ বা চূর্ণ। এ সম্বন্ধে কোক্কোক কবি-প্রণীত রতিরহস্য, কল্যাণমল্ল-প্রণীত অনঙ্গরঙ্গ, পদ্মশ্রীবিরচিত নাগরসর্ব্বস্ব এবং জ্যোতীশ্বরাচার্য্যবিরচিত পঞ্চসায়ক হইতে কএকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে।

রতিরহস্যে লিখিত আছে—

(ক) "ককুভকুসুমজম্বুদললোধ্রৈরুদ্বর্ত্তনং চ সমভাগৈঃ।

হরতি নিদাঘে বিহিতং ঘর্ম্মাদিজদেহদৌর্গন্ধ্যম্ ॥" (১৫.৮৫

অর্জ্জুনগাছের ফুল, জামপাতা এবং লোধগাছের ছাল সমভাগে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ঘর্ম্মজাত দেহদুর্গন্ধ নাশ হয়।

(খ) "রোধ্রোশীরশিরীষকপদ্মচূর্ণেন মিলিতদেহস্য।

গ্রীষ্মেঽপি ত্বগ্রোধাঃ স্বেদপ্রভবা ন জায়ন্তে ॥" (১৫.৮৬)

লোধ্রকাঠ, খস্‌খস্, শিরীষবৃক্ষের ত্বক্, পদ্মকাষ্ঠ—এই সমস্ত চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণে দেহ লিপ্ত করিলে স্বেদজ দুর্গন্ধ নাশ হয়।

(গ) "মলয়জ-কাশ্মীরজ-লঘু-লোধ্র-তগর-বালকৈশ্চ সমভাগৈঃ।

সকৃদপি কৃতমুদ্বর্ত্তনমতনুং তনুগন্ধমপনয়তি ॥" (১৫.৮৭)

চন্দন, কুঙ্কুম (জাফরান্), কৃষ্ণাগুরু, লোধকাঠ, তগর ও বালা সমভাগে পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে দেহজাত দুর্গন্ধ নাশ হয়।

(ঘ) "বিল্বশিবাসমভাগৈর্লেপাদ্ভুজমূলগন্ধমপনয়তি।

পরিণত-তিন্তিড়িকান্বিত-পূতিকরঞ্জোত্থবীজং বা ॥"

(১৫.৮৮)

বেলপাতা ও হরীতকী (অথবা আমলকী) সমভাগে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কক্ষদেশের দুর্গন্ধ নাশ হয়। অথবা পাকা তেঁতুল এবং নাটাকরঞ্জার বীজ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও কক্ষদেশের দুর্গন্ধ নাশ হয়।

অনঙ্গরঙ্গে লিখিত অছে—

(ঙ) "চন্দনোশীর-পথ্যাদি-লোধ্রাম্রত্বক্‌সমুদ্ভবঃ।

লেপঃ স্বেদজদৌর্গন্ধ্যং হরত্যাশু বিলাসিনাম্ ॥" (৭.৪৩)

চন্দন, খস্‌খস্, হরীতকী, লোধকাঠ এবং আম গাছের ছাল একত্র পিষিয়া প্রলেপ দিলে ঘর্ম্মজাত দুর্গন্ধ নাশ হয়।

(চ) "পথ্যানিম্বদলং লোধ্রং দাড়িমী-সপ্তপর্ণয়োঃ।

বল্কলশ্চ প্রলেপোঽয়মঙ্গদুর্গন্ধিনাশনঃ ॥" (৭.৪৪)

হরীতকী, নিমপাতা, লোধকাঠ, ডালিম এবং ছাতিমগাছের ছাল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অঙ্গদুর্গন্ধ নাশ হয়।

(ছ) "নাগপুষ্পাগুরূশীরঃ কোলমজ্জাম্বুচন্দনৈঃ।

লিপ্তাঙ্গো বিনিহন্ত্যাশু দুর্গন্ধং ঘর্ম্মবারিজং ॥" (৭.৪৬)

নাগকেশর, অগুরু, উশীর, কুলের শাঁস, বালা ও চন্দন পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ঘর্ম্মজাত দুর্গন্ধ দূর হয়।

পঞ্চসায়কে লিখিত আছে—

(জ) "সধাতকী-লোধ্রমরিষ্টপত্রং সচন্দনং দাড়িমবল্কলঞ্চ।

এষোঽঙ্গনানাং কথিতঃ কবীন্দ্রৈঃ শরীরদৌর্গন্ধ্যহরঃ প্রলেপঃ ॥" (পঞ্চসায়ক ৩.২)

ধাইফুল, লোধকাঠ, নিমপাতা, চন্দন এবং ডালিম গাছের ছাল এই সমস্ত দিয়া প্রলেপ দিলে রমণীদিগের শরীরের দুর্গন্ধ নাশ হয়।

(ঝ) "হরীতকী-চন্দনমুস্তনাগেরুশীরলোধ্রোৎপলরাত্রিমূলৈঃ।
স্ত্রীপুংসয়োর্ঘর্ম্মজগাত্রগন্ধং বিনাশয়ত্যাশু বিলেপনেন॥"
(পঞ্চসায়ক ৩.৩)

হরীতকী, চন্দন, মুতা, নাগকেশর, খস্‌খস্‌, লোধকাঠ, পদ্মকাঠ, হরিদ্রা—এ সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া লেপন করিলে স্ত্রী ও পুরুষের ঘর্ম্মজাত গন্ধ নাশ হয়!

আরব-দেশীয় কামশাস্ত্রে কক্ষগন্ধ দূর করিবার এইরূপ ব্যবস্থা আছে—রসাঞ্জন ও মাস্‌তিক (mastic) নামক বৃক্ষনির্য্যাস উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মাটীর পাত্রে জল দিয়া মাড়িলে যখন লোহিতবর্ণ হইবে, তখন সেই প্রলেপ কক্ষে লাগাইলে কক্ষগন্ধ দূর হইবে।

উল্লিখিত (জ) ব্যবস্থায় বিশেষভাবে স্ত্রীলোকের গাত্রগন্ধ দূরীকরণের কথা এবং (ঙ) ব্যবস্থায় পুরুষদিগের গাত্রগন্ধ নাশ করিবার কথা আলোচিত হইয়াছে এবং (ঝ) ব্যবস্থায় স্ত্রীপুরুষ উভয়ের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, এই সকল অঙ্গরাগ স্ত্রীপুরুষ-ভেদে অঙ্গদুর্গন্ধ নাশ করিবার জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইত।

(২) ঘর্ম্মাম্বুনিরোধক অঙ্গরাগ।

অনঙ্গরঙ্গে লিখিত আছে—

(ক) "খগপীলুতরোঃ পুষ্পং তথা জম্বুফলং সমম্।
এতদ্দেহে নিদাঘেষু লিপ্তং ঘর্ম্মাম্বুনাশনম্॥" (৭.৪৭)

খগপীলুবৃক্ষের পুষ্প এবং জাম সমভাগে পেষণ করিয়া গ্রীষ্মকালে দেহে লেপন করিলে ঘাম হয় না।

(খ) "পিচুমন্দদলাম্ভোজ-লোধ্র-দাড়িমবল্কলৈঃ।
নিদাঘকালে লিপ্তাঙ্গো ঘর্ম্মবারিচয়ং জয়েৎ॥" (৭.৪৮)

নিমপাতা, পদ্মকাঠ, লোধকাঠ ও ডালিমের ছাল এই সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে ঘর্ম্মনাশ করে।

(গ) "শিরীষ-কেসরোশীর-লোধ্রৈরঙ্গবিলেপনাৎ।
তদ্ভক্ষণাচ্চ ঘর্ম্মাম্বুনিদাঘে নৈব বিন্দতি॥" (৭.৪৯)

শিরীষত্বক্‌, নাগকেশর, খস্‌খস্‌ ও লোধকাঠ পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে বা ভক্ষণ করিলে গ্রীষ্মকালে ঘর্ম্ম হয় না।

পঞ্চসায়কে লিখিত আছে—

(ঘ) "সদাড়িমত্বগ্‌মধুলোধ্রপদ্মৈঃ পিষ্টৈঃ সমানৈঃ পিচুমন্দপত্রৈঃ।
বিলিপ্য গাত্রং তরুণী নিদাঘে দুর্গন্ধিঘর্ম্মাপচয়ং নিহন্তি॥"
(পঞ্চসায়ক ৩.৬)

ডালিমছাল, মধু, লোধকাঠ, পদ্মকাঠ ও নিমপাতা সমান ভাগে পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে গ্রীষ্মে তরুণীর ঘর্ম্মাপচয় হয় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিভিন্ন গন্ধের বিভিন্ন গুণ আছে এবং কয়েকটী গন্ধ পুরুষের কামোদ্দীপনা করে, আবার কয়েকটী নারীর কামোদ্দীপনা করিয়া থাকে। ল্যাভেণ্ডার পুষ্পের গন্ধ সাধারণতঃ রমণীর কামোদ্দীপক এবং বিশেষ ভাবে রমণীর দেহদুর্গন্ধ নাশ করাই ইহার বৈশিষ্ট্য। অনেকেই জানেন, কস্তূরীমৃগ আপন দেহগন্ধে আপনিই উন্মাদ হইয়া যায়। কস্তূরীর তীব্রগন্ধ পুরুষ জাতির পক্ষে অত্যন্ত কামোদ্দীপক। ইহা যাবতীয় দুর্গন্ধ দূর করিয়া নিজের সৌরভ বিস্তার করে এবং দেহজাত সুগন্ধও ইহাতে অধিকতর বৰ্দ্ধিত হয়।

(৩) অঙ্গসৌরভার্থ অঙ্গরাগ।

(ক) "হরীতকী-তোয়দ-তুল্যভাগৈর্বনেচরস্থাপি চতুর্থভাগঃ।
তদর্দ্ধভাগঃ কথিতো নখস্থ স্যাদেষ গন্ধো মদনপ্রকাশঃ॥"
(পঞ্চসায়ক ৩.১১)

হরীতকী ও নাগরমুতা সমভাগ, বনেচর সিকিভাগ এবং তাহার অৰ্দ্ধেক নখী—এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া যে প্রলেপ বা চূর্ণ প্রস্তুত করা হয়, তাহা কামোদ্দীপক।

(খ) "চন্দনৈলাশটীপত্রশিগ্রুপথ্যাম্বুতোয়দৈঃ।
সমানৈর্লেপ উক্তোঽয়ং সুগন্ধিঃ কামিবল্লভঃ॥"
(অনঙ্গরঙ্গ ৭.৫৪)

চন্দন, এলাচ, কর্চূরপত্র, শ্বেত সজিনামূল, হরীতকী, বালা এবং নাগর মুতা সমান ভাগে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কামিবল্লভ সুগন্ধি হয়।

(গ) "কর্পূরং কুঙ্কুমং লোধ্রং স্থৌণেয়ং জলমম্বুদঃ।
উশীরং চ সমৈরেভির্লেপঃ স্যাৎ সুরভিঃ পরঃ॥"
(অনঙ্গরঙ্গ ৭.৫৫)

কর্পূর, কুঙ্কুম, লোধকাঠ, স্থৌণেয়, বালা, মুতা ও খস্‌খস্‌ এই সকল দ্রব্য সমভাগে পেষণ করিলে উত্তম সুগন্ধি প্রলেপ প্রস্তুত হয়।

(ঘ) "উশীর-কৃষ্ণাগুরু-চন্দনানি
পত্রাম্বুতুল্যানি ঘনানি পিষ্ট্বা।
এতানি গাত্রেষু বিলাসিনীনাং
শ্রীখণ্ডতুল্যং কথয়ন্তি গন্ধম্॥" (পঞ্চসায়ক ৩.১৪)

খস্‌খস্‌, কৃষ্ণাগুরু, চন্দন, তেজপাত, বালা ও নাগরমুতা পেষণ করিয়া বিলাসিনীগণ গাত্রে লেপন করিলে শ্রীখণ্ডতুল্য গন্ধ হয়।

(ঙ) "কস্তূরীনাগকুসুমং শৈলেয়ং চন্দনং ঘনঃ।
শ্রীবাসঃ কনকশ্চন্দ্রো জাতী স্থৌণেয়পূতিকৌ॥
সুশ্লক্ষ্ণপিষ্টৈরেভিস্ত নাগবল্লীদলোদ্ভবৈঃ।
রসৈর্লেপঃ সুগন্ধোঽয়মুক্তো যোগ্যো মহীভুজাম্॥"
(অনঙ্গরঙ্গ ৭.৫৭-৫৮)

কস্তূরী, নাগকেশর ফুল, শিলাজতু, চন্দন, নাগরমুতা, শ্রীবাসধূপ, কনকচাঁপা, কর্পূর, জাতীপুষ্প, স্থৌণেয়, নাটা-করঞ্জা এই সমস্ত দ্রব্য খুব মিহি করিয়া বাটিয়া তাহার সহিত পানের রস মিশাইয়া প্রলেপ দিলে রাজকীয় সুগন্ধি প্রস্তুত হয়।

(চ) "স্যাত্তোয়দস্য ভাগৈকং পথ্যাভাগচতুষ্টয়ম্।
ব্যাধিস্থৌণেয়চন্দ্রাণাং প্রত্যেকং ভাগযুগ্মকম্॥
শিলাত্মজস্য পঞ্চস্যুর্নবভাগা নখস্য তু।
এভিরুক্তসুগন্ধোঽয়ং কস্তূরীদলসংজ্ঞকঃ॥"

(অনঙ্গরঙ্গ ৭.৫৯-৬০)

এক ভাগ নাগরমুতা, চারিভাগ হরীতকী, কুড়, স্থৌণেয় এবং কর্পূর প্রত্যেক দুই ভাগ, শিলাজতু পঞ্চভাগ এবং নয় ভাগ নখী একত্র পেষণ করিলে যে গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহার নাম কস্তূরীদল।

(ছ) "পথ্যা ভাগচতুষ্টয়ং জলমুচো ভাগৈকমাত্রং সদা
শ্রীখণ্ডাগুরুজাতিকা মৃগমদাস্তোক্তাশ্চ ভাগাস্ত্রয়ঃ।
মাংসী-পদ্মতুষারবালকসমৈঃ সম্যক্তয়া পেষিতঃ
সর্ব্বৈরেভিরিহোত্তমঃ প্রকথিতঃ সৌরভ্যগর্ভাভিধঃ॥"

(পঞ্চসায়ক ৩.১৭)

হরীতকী ৪ ভাগ; নাগরমুতা ১ ভাগ; চন্দন, অগুরু, জায়ফল, কস্তূরী, প্রত্যেক ৩ ভাগ; জটামাংসী, পদ্মকাষ্ঠ, কর্পূর ও বালা সমান একভাগ করিয়া পেষণ করিলে এক উত্তম সুরভি হয়; ইহার নাম সৌরভগর্ভ।

অনঙ্গরঙ্গে আর এক প্রকার সৌরভগর্ভ বর্ণিত হইয়াছে—

(জ) "নখপথ্যাভয়াম্ভোদমাংসীমিসিকরঞ্জকাঃ।
সমাঃ স্বর্ণাম্ভসোরুক্তং প্রত্যেকং ভাগযুগ্মকম্॥
কর্পূরাগুরুকস্তূরীজাতীস্থৌণেয়কস্য তু।
ভাগত্রিকং স্যাৎ প্রত্যেকং সর্ব্বৈরেভিরিহোচ্যতে॥
লেপঃ সৌরভ্যগর্ভাখ্যঃ সর্ব্বলোকমনোরমঃ।
ভূভুজামেব যোগ্যোঽয়মন্যেষাং দুর্লভঃ স্মৃতঃ॥"

(অনঙ্গরঙ্গ ৭.৬১-৬৩)

নখী, হরীতকী, কুঙ্কুম, নাগরমুতা, জটামাংসী, মৌরী, নাটা-করঞ্জা, নাগকেশর ও বালা প্রত্যেকটী ২ ভাগ; কর্পূর, অগুরু, কস্তূরী, জায়ফল, স্থৌণেয় (গণ্ঠিবন) প্রত্যেক ৩ ভাগ লইয়া পেষণ করিলে যে প্রলেপ প্রস্তুত হয়, তাহার নাম সৌরভগর্ভ; ইহা সর্ব্বলোকমনোরম এবং নৃপতিগণের যোগ্য; অন্যের পক্ষে ইহা দুর্লভ।

(৪) স্নানীয় সুগন্ধি। স্নানীয় সুগন্ধি অনেকটা আজকাল-কার বাথলোশন অথবা বাথক্রিষ্টালের ন্যায় সদ্গন্ধযুক্ত।

(ক) "এলাম্বুদনখস্বর্ণমাংসী-কর্চূরপত্রকৈঃ।
স্নাত্বা সুগন্ধিং পরমং মূর্দ্ধজানাং প্রবিদন্তি॥"

(অনঙ্গরঙ্গ ৭.৫২)

এলাচ, নাগরমুতা, নখী, নাগকেশর, জটামাংসী, কর্চূরপত্র, এই সমস্ত পিষিয়া জলে দিয়া স্নান করিলে দেহ সদ্গন্ধযুক্ত হয়।

(খ) "ধাত্রীস্বর্ণঘনোশীরপথ্যামাংসীবিলেপনৈঃ।
স্নাত্বা মাসার্দ্ধমাধত্তে কেশসৌরভ্যমুত্তমম্॥"

(অনঙ্গরঙ্গ ৭.৫৩)

ধাইফুল, নাগকেশর, নাগরমুতা, খস্‌খস্, হরীতকী, জটা-মাংসী এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ জলে মিশাইয়া স্নান করিলে মাসার্দ্ধ-কাল কেশের সুগন্ধ বর্ত্তমান থাকে।

(গ) "পথ্যারসালামলকীফলানাং সজম্বুজীমূতদলোৎপলানাম্।
মাংসীযুতানাং পরিলেপনেন স্নায়ান্নরঃ সৌরভকান্তিবৃদ্ধ্যৈ॥"

(পঞ্চসায়ক ৩.১০)

হরীতকী, আমছাল, আমলকী, জামপাতা, মুতা, পদ্মদল ও জটামাংসী পেষণ করিয়া লেপনপূর্ব্বক স্নান করিলে দেহের সুগন্ধ হয় ও কান্তি বর্দ্ধিত হয়।

(ঘ) "ত্বগ্‌গুরুমুস্তকতগরং চৌরশঠীগ্রন্থিপর্ণকনখং চ।
কস্তূরীসংযুক্তং স্নানীয়ং তৎ প্রশস্যতে সদ্ভিঃ॥"

(নাগরসর্ব্বস্ব ৪.১২)

দারুচিনি, অগুরু, মুতা, তগর, চৌর, শটী, গ্রন্থিপর্ণ, নখী ও কস্তূরীমিশ্রিত স্নানীয় অত্যন্ত সুগন্ধি।

(৫) দেহের কান্তিবর্দ্ধক ও (৬) অঙ্গমলনাশক অঙ্গরাগ। রতিরহস্যে ইহাকেই কেবল অঙ্গরাগ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

(ক) "তিলসর্ষপরজনীদ্বয়কুষ্ঠ কৃতোদ্বর্ত্তনানি ভজমানাঃ।
কান্তিং হসন্তি স্নেহো বিভ্রতি সৌরভ্যমধিকঞ্চ॥"

(রতিরহস্য ১৫.৯৪)

তিল, সরিষা, দুই প্রকার হরিদ্রা, কুঠ, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া অঙ্গে প্রলেপ দিলে দেহের কান্তি বৃদ্ধি হয় এবং দেহ সুগন্ধ হয়।

(খ) "নিম্বারগ্বধদাড়িমশিরীষকল্কৈঃ সলোধ্রকৈঃ স্ত্রীণাম্।
রজনীযুতমুস্তৈঃ স্যাদঙ্গনানাং সুন্দরো রাগঃ॥"

(রতিরহস্য ১৫.৯৫)

নিম, সোঁদাল, ডালিমছাল, শিরীষছাল, লোধকাঠ, হরিদ্রা, মুতা ইত্যাদি দ্বারা স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহারোপযোগী অতি সুন্দর অঙ্গরাগ প্রস্তুত হয়।

(গ) "কৃষ্ণতিলক-কৃষ্ণজীরক-সিদ্ধার্থ-জীরকৈঃ সমং পয়সা।
লেপোঽতি বদনসুভগোঽপ্যঙ্গকলঙ্কং চ নাশয়তি॥"

(রতিরহস্য ১৫.৯৬)

কৃষ্ণতিল, কালজিরা, সাদাসরিষা ও জীরা সমভাগে লইয়া দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বদনের কান্তি বৰ্দ্ধিত ও দেহজাত চৰ্ম্মদোষ দূর হয়।

(ঘ) "অপনয়তি বদরমজ্জাগুড়মধুনবনীতসংযুতাপ্যঙ্গম্।
লেপেন বরুণকল্কলমজ্জাক্ষীরেণ পিষ্টং বা ॥"

(রতিরহস্য ১৫.৯৭)

কুলের শাঁস, গুড়, মধু, ননী একত্র করিয়া লেপন করিলে বা বরুণশাকের শাঁস দুগ্ধদ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অঙ্গমল নাশ হয়।

(ঙ) "লোধ্রবচাধান্যাকৈর্যৌবনপিটকাপহোলেপঃ।
গোরোচনান্বিতেন চ লেপো মরিচেন তাদৃক্ষঃ॥"

(রতিরহস্য ১৫.৯৮)

লোধ, বচ ও ধনিয়া বাটিয়া লেপ দিলে বা গোরোচনার প্রলেপ দিলে বা গোলমরিচ বাটিয়া লেপন করিলে ব্রণ দূর হয়।

(চ) "বিতুষযবচূর্ণযষ্টিমধুসিতসিদ্ধার্থলোধ্রলেপেন।
স্ত্রীণাং ভবন্তি নিয়তং বরকাঞ্চনতুল্যানি বদনানি॥"

(রতিরহস্য ১৫.৯৯)

তুষশূন্য যবচূর্ণ, যষ্টিমধু, শ্বেতসরিষা ও লোধকাষ্ঠচূর্ণ একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে স্ত্রীলোকদিগের বদন কাঞ্চনতুল্য হয়।

(ছ) "পরিণতবটদলকাঞ্চনপর্ণীমধুকপ্রিয়ঙ্গুপদ্মানাম্।
সহদেবী-হরিচন্দন-লাক্ষাবাহ্লীকলোধ্রাণাম্॥
সমভাগৈর্জলপিষ্টৈর্বিলাসিনীনাং করোতি নিয়তময়ম্।
অধরিতশারদশশধরদীধিতিমুখপঙ্কজং লেপঃ॥"

(রতিরহস্য ১৫.১০০-১)

পাকা বটপাতা, কাঞ্চনপর্ণী (হিন্দি কচনার), যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, বেড়েলা, হরিচন্দন, লাক্ষা, কুঙ্কুম ও লোধ এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিলাসিনীদের বদন শারদচন্দ্রকেও লজ্জা দেয়।

অনঙ্গরঙ্গে পাওয়া যায়—

(জ) "কণ্টকৈঃ শাল্মলীয়ৈশ্চ ক্ষীরপিষ্টৈর্বিলেপয়েৎ।
মুখং তস্যাপি পিটকানাশং গচ্ছন্ত্যসংশয়ম্॥"

(অনঙ্গরঙ্গ ৬.৮৯)

শিমুলগাছের কাঁটা দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে মুখব্রণ নিঃসংশয়ে দূর হয়।

(ঝ) "লোধ্রসৈন্ধব-সিদ্ধার্থ-বচানাং পরিলেপনাৎ।
গণ্ডস্থাঃ পিটকা যান্তি দেহিনাং সংক্ষয়ং ক্রমাৎ॥"

(অনঙ্গরঙ্গ ৬.৯০)

লোধকাষ্ঠ, সৈন্ধবলবণ, শ্বেতসরিষা ও বচ পেষণ করিয়া লেপন করিলে গণ্ডস্থ ব্রণ ক্রমে লোপ পাইয়া থাকে।

(ঞ) "গৈরিকং শোণযষ্টি চ মেঘনাদং নিশাদ্বয়ম্।
পিষ্ট্বা রম্ভাম্ভসা লেপাৎ সপ্তাহং নীলিকাং জয়েৎ॥"

(অনঙ্গরঙ্গ ৬.৯২)

গিরিমাটি, শোণাপাঠার মূল, যষ্টিমধু, তণ্ডুলীয় শাক এবং দুই প্রকার হরিদ্রা পেষণ করিয়া কলার মূলের রস দিয়া বাটিয়া লেপন করিলে মুখের নীল দাগ দূর হয়।

(৭) মুখদুর্গন্ধনাশক অঙ্গরাগ। রতিরহস্যে লিখিত আছে—

(ক) "আস্বাদিতা চ সকৃদপি মুখগন্ধং সকলমপনয়তি।
ত্বগ্‌বীজপূরকফলজা পবনমবাচ্যং চ নাশয়তি॥"

(খ) "কুষ্ঠৈলবালুকৈলাযষ্টিমধুমুস্তধান্যকৃতকবলঃ।
হরতি মুখগন্ধমখিলং ক্ষিপতি রসোনাদিকং গন্ধম্॥"

(গ) "জাতিফল-জাতিপত্রীফণিজ্জবাহ্লীককুষ্ঠসঞ্চরিতা।
অপহরতি পূতিগন্ধং মুখবিবরপরিস্থিতা গুটিকা॥"

(ঘ) "বিঘটয়তি পূতিগন্ধং মুখগন্ধং খাদ্যমানমনুদিবসম্।
কটুতিক্তকষায়রসং তৈলযুতং দন্তধাবনং পুংসাম্॥"

(রতিরহস্য ১৫.৮৯-৯২)

অর্থাৎ (ক) টাবালেবুর খোসা চিবাইলে সকল মুখগন্ধ দূর হয় এবং অপান বায়ুও নাশ হয়। (খ) কুড়, এলাবালুক, এলাচ, যষ্টিমধু, মুতা, ধনিয়া এই সমস্ত দ্রব্য চিবাইলে মুখের সকল গন্ধ দূর হয়; রসুন প্রভৃতি দ্রব্যের উগ্র গন্ধও ইহা দ্বারা দূর হইয়া থাকে। (গ) জায়ফল, জৈত্রী, গন্ধ তুলসী, হিঙ্গ ও কুড় এই সমস্ত বাটিয়া বটিকা করিয়া মুখে রাখিলে মুখের দুর্গন্ধ বিদূরিত হইয়া থাকে। (ঘ) প্রত্যহ কটু, তিক্ত ও কষায়রসযুক্ত দ্রব্য ভক্ষণ ও তৈল দ্বারা দন্তধাবন করিলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়।

অনঙ্গরঙ্গে লিখিত আছে—

(ঙ) "ত্বক্‌পত্রৈলানখ-স্বর্ণজাতিভিঃ কারয়েদ্বটীম্।
তাম্বূলযুক্তা সা ভুক্তা বক্ত্রং সুরভিতাং নয়েৎ॥
কেসরং কোলমজ্জা চ স্থৌণেয়ং জাতিশস্যকম্।
বটিকা মধুনৈতেষাং কৃতা বক্ত্রং সুবাসয়েৎ॥
মুরা-কিঞ্জল্ককুষ্ঠানাং চূর্ণং লীঢ়ং হি সন্ধ্যয়োঃ।
কর্পূরগন্ধিবদনং কুর্যান্মাসার্দ্ধতো ধ্রুবম্॥
কম্বোজীবীজ-কুষ্ঠোত্থং চূর্ণং মধুঘৃতান্বিতম্।
যো লেঢ়ি মাসং তদ্বক্ত্রং মাসং কুসুমবদ্ভবেৎ॥
আম্রপত্ররসে ক্ষারং মার্গবৃক্ষভবং ক্ষিপেৎ।
সংশোধ্য ভানুকিরণৈর্ভক্ষেত্তাম্বূলমধ্যগম্॥

প্রাতঃ প্রতিদিনং যস্ত সুগন্ধিস্তাত্তদাননম্।
সর্ব্বেষু মুখবাসস্থ যোগেষ্বয়মনুত্তমঃ॥"
(অনঙ্গরঙ্গ ৭.৮৪-৯১)

দারুচিনি, এলাচি, নখী, নাগকেশর ও জায়ফল বাটিয়া বটিকা তৈয়ারী করিয়া পানের সহিত খাইলে মুখে সুগন্ধ হয়।

নাগকেশর, কুলের শাঁস, গ্রন্থিপর্ণ ও জায়ফল মধুর সহিত বটিকা করিয়া মুখে রাখিলে মুখ সুগন্ধিযুক্ত হয়।

তালীশপত্র, নাগকেশরপুষ্প ও কুড় চূর্ণ করিয়া সন্ধ্যা-কালে লেহন করিলে মাসার্দ্ধের মধ্যে মুখে কর্পূর গন্ধ হইয়া থাকে।

পাপড়ি খয়ের ও কুড় চূর্ণ করিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত এক মাস লেহন করিলে মুখে কুসুমগন্ধ হয়।

আমপাতার রসে মার্গবৃক্ষের ক্ষার দিয়া রৌদ্রে ভাবনা দিয়া পানের মধ্যে করিয়া প্রতিদিন প্রভাতে ভক্ষণ করিলে অতি উত্তম মুখবাস হইয়া থাকে।

(চ) "রসাল-জম্বূফলগর্ভসারঃ সকর্কটোমাক্ষিকসংযুতশ্চ।
স্থিতো মুখান্তে পুরুষস্থ রাত্রৌ করোতি সৌরভ্যসুখং মুখস্থ॥"
(পঞ্চসায়ক ৩.৮)

আম ও জামের শাঁস এবং কাঁকড়াশৃঙ্গী, মধুর সহিত মাড়িয়া রাত্রে মুখে রাখিলে মুখ সুগন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে।

(ছ) "জাতীফলকস্তূরীকর্পূরং চূতকরিসংস্থিতম্।
ধূপিতমগুরুশিহ্লকমধুগুড়সিতৈশ্চ মুখবাসঃ॥
ক্রমবর্ধিতত্বগেলামাংসীশঠ্যগুরুকুঙ্কুমং চাপি।
ঘনচন্দন-জাতীফল-লবঙ্গ-কঙ্কোল-কর্পূরম্॥
অষ্টাংশবংশরোচন-সুকলিতমতিস্বল্পশর্করাসহিতম্।
পিষ্টা সহকাররসৈর্মুখবাসো ভূমিপালানাম্॥"
(নাগরসর্ব্বস্ব ৪.৭-৯)

"কুষ্ঠ-তগর-জাতীফল-কর্পূর-লবঙ্গৈকেলাভিঃ।
বরতনু বাসয় শীঘ্রং পূগফলং ভূমিপালানাম্॥"
(নাগরসর্ব্বস্ব ৪.১১)

জায়ফল, কস্তূরী, কর্পূর, আমফল বা পাতার রসের সহিত পেষণ করিয়া অগুরু, শিলাজতু, মধু, গুড় ও চিনির সহিত ধূমপান করিলে মুখে সুগন্ধ হয়। দারুচিনি ১ ভাগ, এলাচ ২ ভাগ, জটামাংসী ৩ ভাগ, শঠী ৪ ভাগ, অগুরু ৫ ভাগ, কুঙ্কুম ৬ ভাগ, মুতা ৭ ভাগ, চন্দন ৮ ভাগ, জায়ফল ৯ ভাগ, লবঙ্গ ১০ ভাগ, কড়বী বা কঙ্কোলী ১১ ভাগ, কর্পূর ১২ ভাগ—ইহাদের সহিত মুকুলিত অতিশ্বেত বংশরোচন অতি অল্প চিনির সহিত মিশাইয়া আমরসের সহিত পেষণ করিলে নৃপতিদিগের মুখবাস হইয়া থাকে। কুড়, তগর, জায়ফল, কর্পূর, লবঙ্গ ও এলাচ দিয়া সুপারি সুগন্ধিত করিলে তাহা রাজভোগ্য হয়।

এইরূপ বিবিধ অঙ্গরাগের বিবরণ কামশাস্ত্রসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। কেশবাস ও কেশরঞ্জনবিধি কেশরঞ্জন শব্দে আলোচিত হইয়াছে। [কেশরঞ্জন দ্র°] এই কেশরঞ্জন মধ্যে চুলের কলপ, সুগন্ধিতৈল এবং নানাপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবস্থা আছে। এতদ্ব্যতীত উদ্বর্তন, ধূপবর্ত্তি, দীপবর্ত্তি প্রভৃতি বহুপ্রকার সুগন্ধির ব্যবস্থাও পাওয়া যায়। [গন্ধদ্রব্য দ্র°]

সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রাচীন ভারতে অঙ্গরাগের অতি সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই গন্ধ-সমূহের একটা নৈসর্গিক যৌন আকর্ষণ-শক্তি আছে। প্রাচীন আরবে এই সুগন্ধিদ্রব্য রমণী বা পুরুষ বশীকরণের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। আবূ জাফেরি মুহম্মদ-বিন্-জেরির তাঁহার গ্রন্থে হজরতের প্রতিদ্বন্দ্বী, পরে শিষ্য মোশেলামা এবং শেজার উপাখ্যানে গন্ধদ্রব্যের এই অদ্ভুত ক্ষমতার বর্ণনা করিয়াছেন। অনঙ্গরঙ্গ, পঞ্চসায়ক, রতিরহস্য প্রভৃতি কামশাস্ত্রে এই অঙ্গরাগাদির বিষয় বশী-করণাধ্যায়ে সন্নিবেশিত আছে।

ইদানীন্তন যুগে ভারতীয় নরনারীর মধ্যে অঙ্গরাগের এই বহুল ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বকালের সে চন্দন-কুঙ্কুমাদির পরিবর্ত্তে এতদ্দেশীয় বিলাসীমহল পাশ্চাত্ত্য প্রথার অনুকরণে ক্রীম, পমেটম, পাউডার প্রভৃতির পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছে। অধুনা পাশ্চাত্ত্য সমাজে 'অঙ্গরাগ' সভ্যতার একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ; অন্নবস্ত্রের ন্যায়ই নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত। শরীরসৌন্দর্য্য ও বহির্ভূষণই প্রতীচ্যের নরনারীর প্রধান লক্ষ্য। তাই বিবিধ প্রসাধন-সামগ্রীর ব্যবহারও তাহাদের মধ্যে অত্যধিক।

এই সকল আধুনিক অঙ্গরাগদ্রব্য রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয়। এই গুলিকে প্রথমতঃ দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যাইতে পারে—ধাবনদ্রব্য (সাবান প্রভৃতি) এবং অনুলেপনদ্রব্য (পাউডার, ক্রীম ইত্যাদি)। অনুলেপনকে আবার গাত্রানুলেপন ও কেশানুলেপন এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। গাত্রানুলেপনদ্রব্য ক্রীম ও পাউডার এই দুই আকারে ব্যবহৃত হয়। ক্রীম সাধারণতঃ উদ্ভিজ্জ বা জান্তব তৈলপদার্থ, মোম, গোলাপনির্য্যাস, নিরোলী, ভার্ব্বেনা প্রভৃতি দ্রব্যসাহায্যে প্রস্তুত হয়। পাউডার তৈয়ারী করিতে শ্বেতসার, জিঙ্ক্-অক্সাইড্, বিস্‌মাথ অক্সাইড্, ফ্রেঞ্চ্ চক এবং গন্ধদ্রব্যাদির প্রয়োজন হইয়া থাকে। গাত্রানুলেপন

সামগ্রী শ্বেতবর্ণের, কখনও তাহা ফিকে গোলাপী বা বেগুনে রঙের আভাযুক্ত হয়। সজ্জাকারিণীর দেহবর্ণের বৈশিষ্ট্যানুসারে ব্যবহার্য্য অনুলেপনের বর্ণের তারতম্য বিহিত আছে। কেশের জন্য বহুবিধ হেয়ার-লোশন্, ক্রীম ও পমেটম লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, কেশের বিভিন্নতা (বর্ণ, কার্কশ্য, কোমলতা, প্রাচুর্য্য বা অল্পতা) অনুসারে, সর্ব্বোপরি স্বীয় রুচি অনুসারে, লোকে ইহার কোন কোনটী ব্যবহার করে। [কেশরঞ্জন দ্র°]

পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে অতি প্রাচীনকালে যে অঙ্গপ্রসাধনের নিমিত্ত কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল ইতিহাসে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীন কেল্ট ও গ্রীক্গণ বেশভূষার পারিপাট্য সাধন করিয়া উৎসবাদিতে যোগদান করিতেন, ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাইবেল গ্রন্থে উপবাসশীর্ণের বিশুষ্ক কেশে তৈল মাখিয়া শ্রীসম্পাদনের ব্যবস্থা আছে। (Matt., 6.27) অন্ধের চক্ষুতে তিনি কর্দ্দমের কজ্জলী পরাইয়া দিয়াছিলেন। (জন ৯.৬) তৎকালে রাজার অভিষেকে, উত্তরাধিকারীর পিতৃসম্পত্তির অধিকারলাভের পূর্ব্বে এবং ধর্ম্মাচার্য্যপদে দীক্ষা গ্রহণের সময়ে পূত তৈল মাখাইবার ব্যবস্থা ছিল। উহা যে শীতপ্রধান-দেশে অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পাদনের একটী প্রধান অঙ্গ ছিল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহারা যে কজ্জল পরিয়া অঙ্গরাগ বাড়াইতেন তাহা জনের উক্তি হইতে সমর্থিত হয়। বাইবেলে পূর্ব্বোক্ত পবিত্র গন্ধতৈল প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ আছে। (Exod., 30.22-25) ইহাতে মনে হয় তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদীয় প্রথায় গন্ধদ্রব্য মিশ্রণে তৈল প্রস্তুত করিয়া অঙ্গপ্রসাধনও করিতে অভ্যস্ত ছিলেন।

মুসলমান প্রাধান্যে ধনী মুসলমানগণ যেমন তৈলের পরিবর্ত্তে স্নানান্তে আতর মাখিতেন, মধ্যযুগে ইউরোপেও সেইরূপ গন্ধতৈল মাখিবার ব্যবস্থা ছিল। Drydenএর কবিতায় "And fragrant oils the stiffened limbs anoint" হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, তৎকালে পরিশুষ্কত্বকে তৈলমর্দ্দন দ্বারা শ্রীসম্পাদন করা হইত। Spenserএর উক্তিতে "precious balm" মাখিবার কথা আছে। পোপের লেখা হইতে বুঝা যায় যে, তৎকালের স্ত্রীলোকেরা বেশপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য 'অঙ্গপ্রসাধন' ব্যবহার করিতেন।

"First, robed in white, the nymph intent adores,
With head uncovered, the cosmetic powers." (Pope)

ইহা ভিন্ন তৎকালের রমণীরা কেশসৌন্দর্য্য বাড়াইবার জন্য চুলের উপর পাউডার দিয়া তারার ন্যায় ছাপ দিতেন। মহাকবি মিল্টন লিখিয়াছেন—

"A circling zone thou seest Powdered with stars."—Milton.

ইহা হইতে জানা যায় যে, তৎকালের রমণীরা কবরী বাঁধিয়া তাহাতে পুষ্পচিত্র দিয়া কবরীসৌন্দর্য্যসম্পাদনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ১৯শ শতক হইতে ইউরোপে বৈজ্ঞানিক যুগের প্রতিষ্ঠা। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গরাগ সম্পাদনের প্রসার ও প্রচেষ্টা হয়। চাউল ও গমের শ্বেতসারচূর্ণ গন্ধসংযোগে পাউডার (powder) প্রস্তুত করার সঙ্গে সঙ্গে ভায়োলেট পাউডার (Violet powder) ও চন্দন পাউডার (Sandal powder) প্রস্তুত হয়। উহা শ্রীসম্পাদনে বিশেষ উপযোগী এবং গন্ধরাগে রমণীর মনহরণ করিতে সমর্থ হয়। কস্মেটিক ষ্টিক্ বা তৈল (Cosmetic stick or ointment), কেশপ্রসাধনে একটী বিলাসের সামগ্রী হইয়া উঠে। অধুনা নানা দ্রব্য হইতে গন্ধতৈল প্রস্তুত হইতেছে এবং গন্ধসার (Essences of scents) প্রস্তুতের ইয়ত্তা নাই। পুষ্প, মূল ও বীজ হইতে নানা জাতীয় গন্ধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। শীতে ওষ্ঠ ও গণ্ডদেশ ফাটিয়া যাইবার ভয়ে নানা জাতীয় ক্রীম (Cold cream) ও স্নো (Snow) প্রস্তুত হইতেছে। [গন্ধদ্রব্য দ্র°]

অঙ্গরাজ্—(পুং) [অঙ্গেষু রাজতে রাজ্ ক্বিপ্ ; ৭-তৎ] অঙ্গদেশ-পতি কর্ণ। [কর্ণ দ্র°] ২ অঙ্গদেশীয় নৃপতি মাত্র। [অঙ্গ৬ দ্র°]

অঙ্গরাজ—(পুং) [অঙ্গানাং জনপদানাং রাজা ; অচ্-সমা°। ৬-তৎ] অঙ্গদেশের অধিপতি মাত্র। ২ কুন্তীনন্দন কর্ণ। "অঙ্গরাজ সেনাপতে দ্রোণোপহাসিন্ কর্ণ।" (বেণীসংহার) [কর্ণ দ্র°]

অঙ্গরিয়া১—ছোটনাগপুরের লোহারজাতির এক শাখা।

অঙ্গরিয়া২—সাঁওতালদিগের গোষ্ঠীবিশেষ।

অঙ্গরিয়া৩—হোসজাতির গোষ্ঠীবিশেষ।

অঙ্গরুহ—(ক্লী) [অঙ্গে রোহতি রুহ-ক্বিপ্ ; ৭-তৎ] দেহজাত লোমকেশাদি। "বিহঙ্গরাজাঙ্গরুহৈরিবায়তৈঃ" (মাঘ)

অঙ্গরেথ (Angareth)—ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী দক্ষিণ ওয়েল্সের এক রাজকন্যা ; নর্ম্মানরাজ রীস্ আপ্ টিউডরের কন্যা নেস্তার গর্ভজাত। উইলিয়ম ডি-বারীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহারাই আয়র্লণ্ডের বারী-বংশের পূর্ব্বপুরুষ।

অঙ্গলাঘব—(ক্লী) দেহলঘুত্ব ; চলিত গা হাল্কি। (বাভট)

অঙ্গলিপি—(স্ত্রী) অঙ্গদেশীয় লিপি। (ললিতবিস্তর)

অঙ্গলেপ—(পুং) [অঙ্গং লিপ্যতে অনেন, লিপ্ করণে ঘঞ্ ; ৬-তৎ] অঙ্গরাগদ্রব্য। [ভাবে ঘঞ্, ৭-তৎ] ২ দেহে চন্দনাদি অনুলেপন। [অঙ্গরাগ দ্র°]

অঙ্গলোক—(পুং) দেশবিশেষ। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উক্ত হইয়াছে, বিন্দুসরোবর হইতে সাতটী নদী প্রসৃত হইয়া ম্লেচ্ছ দেশসমূহ প্লাবিত করিয়াছে। এই সপ্ত নদীই সিরীন্ধ্র, কুন্তল, চীন, বর্ব্বর, যবন, দ্রুহ, রুষান, কুলিন্দ ও প্রসিদ্ধ অঙ্গলোকে উপস্থিত হইয়াছে। (ব্রহ্মাণ্ডপু°, ৪৭ অ°) মৎস্যপুরাণে (১২১.৪৪), এই স্থান 'অঙ্গলোক্য' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে, ইহা অঙ্গদেশের নামান্তর।

অঙ্গলোড্য, অঙ্কলোড্য—(পুং) [বৈদ্যক] আর্দ্রক, আদা। ২ চিঞ্চোটক তৃণ; চোঁচড়া ঘাস। [চিঞ্চোটক তৃণ দ্র°]

অঙ্গলৌকিক—অঙ্গলৌকিক জাতিদের দেশ। সম্ভবতঃ ইহারা আলেক্সান্দারের সময়ের ঐতিহাসিক-বর্ণিত অগলাসিয়ান (Agalassians) জাতি। ইহারা শিবিদিগের প্রতিবেশী। বিপাশা ও অসিক্লীর (চন্দ্রভাগার) সঙ্গমস্থলের নিম্নভাগে এই দেশ অবস্থিত ছিল।

অঙ্গব—(ক্লী) [অঙ্গে স্বশরীরমধ্যে বাতি অন্তর্ভবতি, অতিশোষণাৎ সঙ্কুচিতাঙ্গমিব ভবতি। অঙ্গ-বা-ড; ৭-তৎ] শুষ্কফল। যে ফল অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া সঙ্কুচিত হইয়াছে। চোপ্‌সাফল। যথা—শুষ্ক বেদানা।

অঙ্গবস্ত্রোত্থা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] শ্বেতযমানী, সাদা যোয়ান।

অঙ্গবার১—রজবারদিগের একটী শাখা।

অঙ্গবার২—বিহারপ্রদেশের তুরি বা দক্ষিণা ডোমদিগের শাখা। ইহারা গৃহদেবতার পূজা স্ব স্ব গৃহের উঠানের মধ্যেই সারিয়া লয়।

অঙ্গবিকল—(ত্রি) [অঙ্গেন বিকলঃ; ৩-তৎ] অঙ্গবিকলতাযুক্ত, অবসন্নদেহ। ২ শরীরবিষয়ে বিকৃত, পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

অঙ্গবিকার—(পুং) [অঙ্গস্য বিকারঃ; ৬-তৎ] অঙ্গের বিকার, দেহের অন্যথা ভাব, অঙ্গবিশেষের হানি বা বিকৃতভাব।

অঙ্গবিকৃতি—(স্ত্রী) [অঙ্গস্য বিকৃতিঃ। বি-কৃ-ক্তিন্; ৬-তৎ] অঙ্গের বিকার। [অঙ্গস্য বিকৃতির্যস্মাৎ; বহুব্রী] (পুং) ২ মৃগীরোগ, অপস্মাররোগ, অঙ্গচালনাদি (Apoplexy)। [অপস্মার দ্র°]

অঙ্গবিক্ষেপ—(পুং) [অঙ্গস্য বিক্ষেপঃ; ৬-তৎ] অঙ্গচালন, অঙ্গহার। [অঙ্গস্য বিক্ষেপশ্চালনং যস্মিন্; বহুব্রী] ২ অঙ্গুলি প্রভৃতির বিন্যাসভেদে অঙ্গচালনসহযোগে নৃত্য। [নৃত্য দ্র°]

অঙ্গবিদ্যা—(স্ত্রী) [বিদন্ত্যনয়া বিদ্যা, বিদ্-ক্যপ্। অঙ্গমাশ্রিত্য বিদ্যা; সুপ্‌সুপেতি সমাস] শরীরবিজ্ঞান, দেহতত্ত্ব। [অঙ্গরূপা বিদ্যা; কর্ম্মধা°]। ২ ব্যাকরণাদি বিদ্যা। ৩ হস্তরেখাদির লক্ষণজ্ঞান। (মনু ৬.৫০) ৪ জ্যোতিষাঙ্গ শাস্ত্র। প্রশ্নকালে হস্তপদমুখাদি অঙ্গের অবস্থা দেখিয়া যে বিদ্যার দ্বারা শুভাশুভ নিশ্চিত করা যায়। [হনুমান্‌চরিত্র দ্র°]

বৃহৎসংহিতায় অঙ্গবিদ্যা সম্বন্ধে লিখিত আছে—যে সকল দৈবজ্ঞ প্রশ্নকর্ত্তার শুভাশুভ বলিতে যাইবেন, তাঁহাদিগকে অগ্রে শাস্ত্রোক্ত স্থান, দিক্ ও সম্মুখস্থ পদার্থগুলি দেখিয়া লইয়া পরে প্রশ্নকর্ত্তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, নিজের অঙ্গ ও অন্যান্য উপস্থিত ব্যক্তির অঙ্গের অবস্থা এবং কিরূপ সময়ে প্রশ্ন বলিতে বসিলেন, তাহার বৈধতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

কোথায় কিরূপ স্থানে বসিয়া কোন সময়ে প্রশ্ন করা উচিত বা অনুচিত তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ বৃহৎসংহিতায় উল্লিখিত আছে।

ফলকথা সুন্দর ফল, ফুল, জল ও সৎশস্যশোভিত স্থান এবং দেব, ঋষি ও সিদ্ধ সাধুজনের আবাস; পূর্ব্ব, উত্তর ও ঈশান কোণ এবং পূর্ব্বাহ্ণ কালই প্রশ্ন করার পক্ষে শুভ বা প্রশস্ত।

যিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, তাঁহার সম্মুখে কে কি বস্তু রাখিয়া গেল, তাঁহার পাণিতলে বা বস্ত্রের উপর কি কি চিহ্ন আছে, প্রশ্নকর্ত্তা তাঁহার কোন্ অঙ্গ স্পর্শ করিতেছেন, এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া বক্তা বক্তব্য বিষয়ের জ্ঞান অর্জ্জন করিবেন।

মনুষ্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পুরুষ, স্ত্রী ও ক্লীব ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে পুরুষ নামে অভিহিত অঙ্গ—উরু, ওষ্ঠ, স্তন, মুষ্ক, পদ, দন্ত, হস্ত, ভুজ, গণ্ড, কেশ, গাল, নখ, অঙ্গুষ্ঠ, শঙ্খ, স্কন্ধ, শ্রবণ, পায়ু ও সন্ধিস্থল।

স্ত্রীসংজ্ঞিত অঙ্গ—ভ্রূ, নাসা, স্ফিক্, বলি, কটি ও সুরেখাঙ্কিত অঙ্গুলিদল।

ক্লীবনামের অঙ্গ—জিহ্বা, গ্রীবা, পিণ্ডিক, পার্ষ্ণি, জঙ্ঘা, নাভি, কর্ণপালী, কৃকাটী, বদন, পৃষ্ঠ, জত্রু, জানু, অস্থিপার্শ্ব, হৃদয়, তালু, চক্ষু, মেহন, বক্ষ, ত্রিক, মস্তক ও ললাট।

এই সকল ক্লীব অঙ্গ প্রশ্নকর্ত্তা স্পর্শ করিলে তাহার শুভ বা সিদ্ধি কখনই হয় না। তবে ইহাদের মধ্যে বদনাদি কএকটা অঙ্গ আছে, উহারা রূক্ষ, ক্ষত, ভগ্ন বা কৃশ না হইলে উহাদের স্পর্শে বিলম্বে সিদ্ধি লাভ হয়। পদাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শনে বা চালনে অক্ষিরোগ, অঙ্গুলিতে আঘাত লাগিলে দুহিতার শোক, মস্তকে আঘাত লাগিলে রাজভয় এবং বক্ষঃস্পর্শে বিচ্ছেদ ঘটে।

প্রশ্নকর্ত্তার অঙ্গ হইতে তৎকালে কেহ বস্ত্র টানিয়া লইলে অনর্থ, কিন্তু সেই বস্ত্র লইয়া পিছু হাটিলে প্রিয়প্রাপ্তি বুঝিতে হয়। পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভূমিলেখন করিলে ক্ষেত্রজাত চিন্তা এবং হস্তদ্বারা পদদ্বয় কণ্ডূয়নে ভূমির বশ্যতা বুঝিতে হয়।

প্রশ্নকালে যদি তাল বা ভূর্জ্জপত্র অথবা কেশ, তুষ, অস্থি বা ভস্মগত দ্রব্য দর্শন হয়, তাহা হইলে প্রশ্নকর্ত্তার বস্ত্র-চিন্তা বুঝিতে হয়। রজ্জুজালক দর্শনে ব্যাধি এবং বল্কল দর্শনে বন্ধন বুঝিতে হয়।

প্রশ্নকালে যদি পিপ্পলী, মরিচ, শুণ্ঠী, বারিদ, লোধ্র, কুষ্ঠ, বসন, অম্বু, জীরক, গন্ধ, মাংসী, শতপুষ্পা, বা তগরপুষ্পের নাম উচ্চারিত বা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে স্ত্রীদোষ, পুরুষদোষ, অধ্ব, সুত, অর্থ, ধান্য, দ্বিপদ, চতুষ্পদ ও ক্ষিতিবিনাশ, এমন কি পীড়িতের নাশ ও সর্ব্বনাশের চিন্তাই সূচিত করে।

প্রশ্নকর্ত্তার হাতে যদি বট, মধূক, তিন্দুক, জম্বু, প্লক্ষ, আম্র, বদরী বা জাতিফল থাকে, তাহা হইলে যথাক্রমে ধন, কনক, পুরুষ, লৌহ, অংশুক, রৌপ্য ও উদুম্বর প্রাপ্তির চিন্তা বুঝিতে হয়। ধান্যপরিপূর্ণ পাত্র ও পূর্ণকুম্ভ দর্শনে কুটুম্ব-বৃদ্ধি বুঝিতে হইবে আর যদি গজ, গো ও কুক্কুরবিষ্ঠা দৃষ্ট হয়, তবে ইহা প্রশ্নকর্ত্তার ধন, যুবতী ও সুহৃদ্‌বর্গের বিনাশ করে।

তৎকালে যদি পশু, হস্তী, মহিষ, পঙ্কজ, রজত বা ব্যাঘ্র দেখা যায়, তবে যথাক্রমে মেষ, ধন, ক্ষৌমবস্ত্র, চন্দন, কৌষেয় বস্ত্র ও আভরণসমূহ লাভ করিবার চিন্তা বুঝিতে হইবে।

কাপালিক দর্শনে নরগণের মিত্র, দূত ও অর্থঘটিত চিন্তা এবং উত্তম পরিব্রাজক দর্শনে গণিকা, রাজা, প্রসূতা নারী, ও অর্থসম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসা জানিবে।

শাক্য, উপাধ্যায়, আর্হত, নির্গ্রন্থ, নিমিত্ত, নিগম ও কৈবর্ত্ত দর্শনে জানিতে হইবে, প্রশ্নকর্ত্তা যথাক্রমে চোর, সেনাপতি, বণিক্‌, দাসী, যোদ্ধা, আপণস্থ দ্রব্যসামগ্রী ও বধ্য বিষয়ের চিন্তা করিতেছেন; ঐ সময় যদি কোন তাপস বা শৌণ্ডিক দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, প্রশ্নকর্ত্তার অন্তরে কোন প্রবাসী ব্যক্তির ও পশুপালনের বিষয় উদিত হইয়াছে এবং উঞ্ছবৃত্তিতে বিপন্নতা বুঝিতে হইবে।

প্রশ্নকারী যদি প্রশ্নকালে 'আমি জানিতে ইচ্ছা করি', 'বলুন', 'দর্শন করুন' বা 'আপনি সম্যক্‌ আদেশ করুন,' এই সকল ভাষা উচ্চারণ করে, তবে বুঝিতে হইবে, প্রশ্নকর্ত্তার চিন্তা—সংযোগ, কুটুম্বলাভ ও ঐশ্বর্য্যবিষয়ক।

বক্তাকে যদি সর্ব্বসমক্ষে বলা হয় যে, 'আপনি প্রত্য-বেক্ষণ করিয়া আমার মানসবিষয় বলুন', 'নির্দ্দেশ করুন', 'আপনি শীঘ্র দেখুন',—তাহা হইলে যথাক্রমে প্রশ্নকর্ত্তার জয় ও পথবিষয়ক চিন্তা এবং বন্ধু ও চৌর সম্বন্ধীয় চিন্তা বুঝা যায়।

প্রশ্নকালে প্রশ্নকর্ত্তা তাহার কোন্‌ কোন্‌ অঙ্গ হাত দিয়া স্পর্শ করিলে কি কি বিষয়ের চিন্তা বুঝা যাইবে, তৎসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—অন্তঃস্থ অঙ্গস্পর্শে স্বজন, বহিঃস্থ অঙ্গে বাহিরের লোক, পাদাঙ্গুষ্ঠ বা পাদাঙ্গুলি স্পর্শে দাসদাসীজন, জঙ্ঘা স্পর্শে প্রেষণীয় ব্যক্তি, নাভিস্পর্শে ভগিনী, হৃদয়স্পর্শে স্বীয় ভার্য্যা এবং হস্তস্থ অঙ্গুষ্ঠ বা অন্য অঙ্গুলি স্পর্শে পুত্রকন্যা বিষয়ক চিন্তা বুঝিবে। জঠর স্পর্শনে প্রশ্নকারীর মাতা, মস্তক স্পর্শে গুরু এবং বাম ও দক্ষিণ বাহু স্পর্শে ভ্রাতা ও তৎপত্নী চোর বলিয়া সূচিত হয়।

প্রশ্নকারী যদি অন্তঃস্থ অঙ্গ ছাড়িয়া বাহ্য অঙ্গ স্পর্শ করে, বা শ্লেষ্মা, মূত্র ও বিষ্ঠা ত্যাগ করিতে করিতে করতলস্থ বস্তু অধোভাগে ফেলিয়া দেয়, অত্যন্ত অবনামিত অঙ্গ মোটন করিতে থাকে অথবা লোকের হাতে শূন্য ভাণ্ড দেখা যায় বা চোর দর্শন হয় এবং ঐ কালে যদি হৃত, পতিত, ক্ষত, অস্মৃত, নষ্ট, ভগ্ন, গত, উন্মূষিত ও মৃত প্রভৃতি অনিষ্ট রব উত্থিত হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে, হৃত বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তি আর ঘটিবে না।

উল্লিখিত লক্ষণগুলি যদি তুষ, অস্থি ও বিষ প্রভৃতি বস্তু দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে রোদন ও ক্ষুতধ্বনিযুক্ত হয়, তাহা হইলে পীড়িত ব্যক্তিদিগের মৃত্যু নিশ্চিতই বুঝিতে পারা যায়।

প্রশ্নকালে প্রশ্নকর্ত্তার বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ ও লক্ষণ লক্ষ্য করিয়া তিনি কি কি দিয়া আহার করিয়াছেন, তাহাও বলা যাইতে পারে।

গর্ভিণীর গর্ভবিষয়ক প্রশ্নে পুরুষ, স্ত্রী ও ক্লীব অঙ্গ বা ব্যক্তি যাহাই কেন দৃষ্ট, অনুমিত, পুরঃস্থিত কিংবা স্পৃষ্ট হইবে, সেই গর্ভে তাহারই জন্ম নিশ্চিত। তবে যদি প্রশ্নকালে পান, অন্ন, পুষ্প বা ফল দর্শন করা যায়, তাহা হইলে শুভ ফল সূচিত হয়। অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভ্রূ, উদর বা অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া যদি প্রশ্ন করা হয়, তবে প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্ন গর্ভসম্বন্ধীয় বলিয়া বুঝিতে হইবে।

প্রশ্নকালে যদি মধু, ঘৃত, সুবর্ণ, রত্ন, প্রবাল অথবা সম্মুখস্থ মাতা, ধাত্রী বা পুত্র দেখা যায়, তাহা হইলে প্রশ্নকর্ত্তার চিন্তা গর্ভবিষয়ক জানিতে হইবে।

প্রশ্নকারীর জঠর করগত অর্থাৎ স্পৃষ্ট হইলে জানিবে—গর্ভিণীর গর্ভ ঠিকই আছে। এই বিষয়ের প্রশ্নকালে দুর্নিমিত্ত দেখা গেলে গর্ভনাশের সূচনা করে। যদি পৃষ্ঠমর্দ্দন, জঠর আকর্ষণ, বা হস্তে হস্ত আকর্ষণ করিয়া প্রশ্ন করা হয়, তাহা হইলে গর্ভ বিনাশ বুঝা যায়।

গর্ভ হইবে কি না, এরূপ প্রশ্নকালে প্রশ্নকর্ত্তা যদি নাসার দক্ষিণ দ্বার স্পর্শ করে, তবে একমাস পরে গর্ভধারণ হইয়া থাকে। বামনাসা ও বামকর্ণ স্পর্শে দুইবৎসর পরে, দক্ষিণকর্ণ

স্পর্শে দুইমাস পরে এবং স্তনদ্বয় স্পর্শে চারিমাস পরে গর্ভসঞ্চার জানিবে।

গর্ভধারিণী বেণীমূল স্পর্শ করিলে তিনটী পুত্র ও দুইটী কন্যা, কর্ণ স্পর্শে পাঁচটী পুত্র এবং হস্ত স্পর্শে তিনটী পুত্রের জননী হইবে। প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্নকালে পদের অঙ্গুষ্ঠ বা পার্ষ্ণিযুগ্ম স্পর্শ করিলে একটী কন্যা জন্মিবে। এইরূপে কনিষ্ঠাঙ্গুলি স্পর্শে পাঁচটী কন্যা, অনামিকা স্পর্শে চারিটী, মধ্যমা স্পর্শে তিনটী ও তর্জ্জনী স্পর্শে দুইটী কন্যার জন্ম বুঝিতে পারা যায়। সব্য-উরু স্পর্শে দুইটী কন্যা ও বাম উরু স্পর্শে দুইটী পুত্র এবং ললাটের মধ্যস্থল স্পর্শে চারিটী ও ললাটের শেষ প্রান্ত স্পর্শে তিনটী কন্যার জন্ম হইবে জানিতে পারা যায়।

এইরূপে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্পর্শ দ্বারা শুভাশুভ নির্ণয়ের নামই অঙ্গবিদ্যা।

অঙ্গবিধি—(পুং) [অঙ্গস্য প্রধানোপকারিণঃ বিধিঃ ; মধ্যপদ-লোপী কর্ম্মধা°] অনুষ্ঠেয় প্রধান অঙ্গীভূত অপ্রধান বিধি। ইহার দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায়, যেমন 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' এটা হইল প্রধান বিধি, আর 'দধ্না জুহোতি' এটা হইল অঙ্গবিধি।

অঙ্গবিভ্রংশ—(পুং) [বৈদ্যক] কায়শিথিলতারূপ বায়ুজ রোগ।

অঙ্গবৈকৃত—(ক্লী) [অঙ্গস্য বৈকৃতম্ ; ৬-তৎ] শরীরের বিকার। [অঙ্গচেষ্টয়া বৈকৃতং মনসো বিকৃতভাবো জ্ঞাপ্যতে যস্মিন্ তৎ ; বহুব্রী] ২ আকার, হৃদয়ের ভাবপরিচায়ক মুখ-ভঙ্গী, ইঙ্গিত।

অঙ্গবৈগুণ্য—(ক্লী) [অঙ্গস্য বৈগুণ্যম্ ; ৬-তৎ] অঙ্গহীনতা, অঙ্গহানি। প্রধান কার্য্যের অঙ্গীভূত যে সকল দ্রব্যাদি তাহার অন্যথাকরন। পূজা ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের অঙ্গহানি হইলে উহাকে অঙ্গবৈগুণ্য বলিয়া উল্লেখ করা হয়। অঙ্গবৈগুণ্য একটী দোষের মধ্যে গণ্য। এই দোষ প্রশমনের নিমিত্ত বিষ্ণুস্মরণ কর্ত্তব্য। ইহাই স্মৃতিশাস্ত্রের বিধি। এই জন্যই কর্ম্মান্তে "যৎ কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় বিষ্ণুস্মরণ-মহং করিষ্যে" এই সঙ্কল্প করিয়া তিনবার "ওঁ বিষ্ণুঃ" অথবা "শ্রীবিষ্ণুঃ" উচ্চারণ করিতে হয়।

অঙ্গবৈরোচন—(পুং) একজন রাজা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে সকল প্রসিদ্ধ নরপতির নাম দেখিতে পাওয়া যায়, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। ইঁহার পুরোহিত ছিলেন আত্রেয়বংশীয় উদমায়।

অঙ্গশুদ্ধি—(স্ত্রী) [শুধ্যতেঽনয়া শুধ-করণে ক্তিন্] জলাদি দ্বারা দেহের সংস্কারসাধন। [অঙ্গস্য শুদ্ধিঃ শুধ-ক্তিন্] ২ শরীরশোধন, দেহের পবিত্রতাসাধন।

অঙ্গশূল—(ক্লী) [বৈদ্যক] গাত্রতোদ ; গা শূলন।

অঙ্গশোথ—(পুং) [বৈদ্যক] কায়শোফ ; গা ফোলা।

অঙ্গশোষ—(পুং) [বৈদ্যক] বায়ুজ রোগ। (বাভট)

অঙ্গশোষণ—(ক্লী) অঙ্গশুষ্কতা। গাত্রের ত্বক্ শুষ্ক হওন।

অঙ্গস্—(ক্লী) [অঙ্গ-অসুন্। কুত্বঞ্চ] পক্ষী। (উজ্জ্বলদত্ত)

অঙ্গসংমর্দ্দন (Massage)—(ক্লী) কোন রোগের উপশম অথবা দেহের পুষ্টিবৃদ্ধির জন্য হস্ত কিংবা কোন যন্ত্রদ্বারা গাত্র ঘর্ষণ, মৃদু আঘাত, চাপ প্রদান বা পীড়ন এবং মর্দ্দনকে অঙ্গ-সংমর্দ্দন বলা হয়। এই প্রক্রিয়া অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল দেশেই প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষ, চীন, আরব, মিশর, গ্রীস্, রোম প্রভৃতি নানাদেশে প্রাচীনকালে ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অঙ্গসংমর্দ্দনের চারি প্রকার প্রণালী আছে, যথা—গাত্রঘর্ষণ, মৃদু আঘাত, চাপ ও মর্দ্দন। এই চতুর্ব্বিধ অঙ্গমর্দ্দনই মৃদুভাবে, মধ্যমপ্রকারে এবং বলসহকারে সাধিত হইতে পারে। এই সকল প্রক্রিয়ার কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে। মৃদু-ভাবে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সবলে সংমর্দ্দন করিতে হইবে এবং ধীরে ধীরে পুনর্ব্বার মৃদুভাবে শেষ করিতে হইবে। অঙ্গসংমর্দ্দনে দুই হাতের তলদেশ ব্যবহার করাই ভাল। রোগীকে এমনভাবে বসাইতে হইবে যাহাতে তাহার কোনরূপ ক্লেশ না হয়। কতক্ষণ ধরিয়া অঙ্গমর্দ্দন করিতে হইবে, তাহা রোগীর শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করে।

সাধারণতঃ হস্ত ও পদের উপর ঘর্ষণ এবং মর্দ্দন করিতে হয়, তবে বক্ষ এবং উদরদেশেও সংমর্দ্দনের এইরূপ ব্যবস্থা আছে। উদর ও বক্ষে সংমর্দ্দন মৃদু হওয়া আবশ্যক এবং হস্ত ও পদে ঘর্ষণ অনুলম্ব অর্থাৎ লম্বালম্বি হওয়া দরকার। সাধারণতঃ অঙ্গুলির দিক্ হইতে উপর দিকে সং-মর্দ্দন করা উচিত। পৃষ্ঠদেশে সংমর্দ্দন করিতে হইলে রোগীকে একপার্শ্বে শোয়ান দরকার। পৃষ্ঠের সংমর্দ্দন কিছু বলসহ-কারে হওয়াই আবশ্যক।

শিথিল মাংসের উপর মৃদুভাবে আঘাত করিলে উপকার হয়। এই আঘাত হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির দিক্ দিয়া করিতে হয়।

অঙ্গসংমর্দ্দনের ফল—অঙ্গসংমর্দ্দনের দ্বারা চর্ম্ম, চর্ম্মের নিম্নস্থ তান্তব ঝিল্লী, পেশী, রক্তনালী, লসিকানালী এবং স্নায়ু (Nerve) সকলের পুষ্টিবৃদ্ধি হইয়া থাকে ; কারণ ইহা দ্বারা ঐ সকল কলায় রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অঙ্গসংমর্দ্দনের পর শরীরের স্বাচ্ছন্দ্য ও মনের প্রফুল্লতা প্রকাশ পায়।

নিম্নলিখিত রোগে অঙ্গসংমর্দ্দন বিশেষ উপকারী—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, লেখকের অঙ্গুলিগ্রহ বা আঙ্গুলে খিল ধরা এবং

ঐ প্রকারের অন্যান্য রোগ, তাণ্ডব রোগ, গ্রীবাস্তম্ভ, স্নায়ুশূল এবং নানাবিধ পক্ষাঘাত রোগ, সন্ধিবেষ্টনীর প্রাচীন প্রদাহ ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন কোষ্ঠবদ্ধতা, রক্তাল্পতা, বায়ুরোগ, উন্মাদ, মেদোরোগ, চর্ম্মরোগ প্রভৃতিতেও ইহাদ্বারা উপকার পাওয়া যায়। জ্বর, গর্ভ, ক্ষত, পূঁযসঞ্চয়, তরুণ গ্রন্থিবেদনা প্রভৃতি যে সকল ক্ষেত্রে রক্তসঞ্চালনবৃদ্ধি হানিকর, তথায় অঙ্গসংমর্দ্দন করা উচিত নহে।

অঙ্গসংস্কার—(পুং) [অঙ্গং সংক্রিয়তেঽনেন ইতি সম্-কৃ-করণে ঘঞ্, সুট্] অঙ্গসংশোধনার্থ স্নান। ২ তৈল, গোধূমচূর্ণাদি দ্বারা অঙ্গমর্দ্দন। [ভাবে ঘঞ্ ; ৬-তৎ] ৩ দেহসংস্কার, বিলেপনাদি। [কর্ত্তরি অণ্ ; ৬-তৎ] ৪ দেহসংস্কারক ব্যক্তিমাত্র।

অঙ্গসংস্ক্রিয়া—(স্ত্রী) [অঙ্গস্য সংস্ক্রিয়া ; ৬-তৎ। সম্-কৃ-শ] দেহসংস্কার।

অঙ্গসংস্থান (Morphology)—(ক্লী) জীবদেহের আকৃতিগত পরিণতি অর্থাৎ পুষ্টি-গঠনাদি যে ভাবে সাধিত হয়। যে বিজ্ঞানে অঙ্গসংস্থান বর্ণিত আছে, তাহা শারীরবিদ্যা নামে কথিত। [শারীরবিদ্যা দ্র°]

অঙ্গসংহতি—(স্ত্রী) [অঙ্গানাং সংহতিঃ ; ৬-তৎ] অঙ্গের দৃঢ়তা ; দেহের বাঁধন। ২ অঙ্গসংঘাত। (কিরাত ১৩.৫০)

অঙ্গসঙ্কেত—(পুং) নানাবিধ অঙ্গসঞ্চালন দ্বারা সঙ্কেতপূর্ব্বক স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করণ। নায়ক নায়িকার পরস্পরের প্রতি অনুরাগ জন্মিলে ও সে সম্বন্ধে পরস্পরকে সাক্ষাৎভাবে জানাইবার অসুবিধা হইলে নানা প্রকার সঙ্কেতের ব্যবহার বহুপূর্ব্বকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। [সঙ্কেত দ্র°] প্রাচীন ভারতের কামশাস্ত্রে নানাবিধ সঙ্কেতের উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে অঙ্গসঙ্কেত অন্যতম। নায়িকা কোন কথা না বলিয়া নানাবিধ অঙ্গ সঞ্চালন দ্বারা নায়কের উদ্দেশে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। পদ্মশ্রী-বিরচিত নাগরসর্ব্বস্ব নামক কামশাস্ত্রে এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

কামসূত্রকার "ভাবং চ কুর্বতীমিঙ্গিতাকারৈঃ সূচয়েৎ" এবং "যুবতয়ো হি সংসৃষ্টমভীক্ষ্ণদর্শনং চ পুরুষং প্রথমং কাময়ন্তে কাময়মানা অপি তু নাভিযুঞ্জত ইতি প্রণয়োবাদ ইতি বালায়ামুপক্রমাঃ" এই সূত্রদ্বয়ে ইঙ্গিতাকারের কারণ দেখাইয়াছেন। তাহার পর তৃতীয় অধিকরণান্তর্গত তৃতীয় অধ্যায়ে (অনুরাগ প্রদর্শনের অন্তর্গত) "ইঙ্গিতাকারসূচন" প্রকরণে অঙ্গসঙ্কেত সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন।

নাগরসর্ব্বস্ব নামক কামশাস্ত্রে লিখিত আছে—

"ক্ষেমপ্রশ্নে কর্ণলতা, কথিতা কথনেঽপি সা।
কচদংশস্তু কামার্ত্তাবুরঃ স্নেহে, শিরোঽর্চনে॥" (৬.১)

ক্ষেমপ্রশ্ন অর্থাৎ কুশলপ্রশ্ন করিতে গেলে বা কুশল জ্ঞাপন করিতে গেলে কর্ণলতা, কামার্ত্ত এই কথা জ্ঞাপন করিতে হইলে কেশ, স্নেহ জ্ঞাপন করিতে গেলে বক্ষঃস্থল এবং অর্চ্চনা বুঝাইতে হইলে কেশ স্পর্শ করিবে। এই সমস্ত কার্য্যে হস্ত পতাকাসদৃশ করিয়া তাহার দ্বারা করা উচিত। "প্রসারিতাঃ সমাঃ সর্ব্বা যস্যাঙ্গুল্যো ভবন্তি হি। কুঞ্চিতশ্চ তথাঙ্গুষ্ঠঃ সপতাক ইতি স্মৃতঃ।" (ভরত ৯.১৭-১৮) সুতরাং সকল অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ কুঞ্চিত করিলে পতাকা হয়।

"মধ্যমাঽবসরপ্রশ্নে তর্জনীপৃষ্ঠযোজিতা।
অবসরেঽঞ্জলির্জ্ঞেয় আহ্বানে কুঞ্চিতাঙ্গুলিঃ॥" (৬.২)

অবসর আছে কি না অর্থাৎ সমাগমের সুবিধা হইবে কিনা জানিতে হইলে মধ্যমাঙ্গুলি তর্জ্জনীর পৃষ্ঠে যোগ করিতে হয় এবং অবসর আছে ইহা জানাইতে হইলে অঞ্জলি করিতে হয়। "পতাকাভ্যাং তু হস্তাভ্যাং সংশ্লেষাদঞ্জলিঃ স্মৃতঃ।" (ভরত ৯.১২১) অর্থাৎ দুইহাত পতাকাসদৃশ করিয়া একত্র করিলে অঞ্জলি সূচিত হয়। আহ্বান করিতে হইলে অঙ্গুলি কুঞ্চিত করিবে অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত অন্য অঙ্গুলিসকল কুঞ্চিত করিবে।

"অঙ্গুষ্ঠ-তর্জনীমধ্যাঃ পূর্ব্বদক্ষিণপশ্চিমাঃ।
উত্তরানামিকাচেতি দিশো জ্ঞেয়া অনুক্রমাৎ॥" (৬.৩)

পূর্ব্বদিক্ বুঝাইতে অঙ্গুষ্ঠ, দক্ষিণদিক্ বুঝাইতে তর্জ্জনী, পশ্চিম বুঝাইতে মধ্যমা এবং উত্তর বুঝাইতে অনামিকা অঙ্গুলি ব্যবহার করিবে।

"কনিষ্ঠামূলমারভ্য রেখাপঞ্চদশক্রমাৎ।
অঙ্গুষ্ঠস্যোর্দ্ধরেখান্তাঃ স্মৃতা প্রতিপদাদিষু॥" (৬.৪)

কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া অঙ্গুষ্ঠের ঊর্দ্ধস্থ রেখা পর্য্যন্ত পঞ্চদশটী রেখা আছে। তিথি বুঝাইতে হইলে ঐ রেখাগুলির আশ্রয় লইতে হইবে অর্থাৎ যে তিথি বুঝাইতে হইবে, সেই বিশেষ রেখাটীতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলে তাহাই বুঝাইবে।

"শুক্লে বামকরে জ্ঞেয়া অসিতে দক্ষিণে করে।
যদ্যৎ স্পৃশন্তি কামিন্যস্তত্তার্থং নিপুণঃ স্মরেৎ॥" (৬.৫)

শুক্লপক্ষ বুঝাইতে হইলে বাম হস্তের রেখা ও কৃষ্ণপক্ষ বুঝাইতে হইলে দক্ষিণ হস্তের রেখা স্পর্শ করিতে হয়। কামিনী যে যে রেখা স্পর্শ করিবে সেই সেই তিথি বুঝাইবে অর্থাৎ যেমন শুক্লা পঞ্চমী বুঝাইতে হইলে বামহস্তের অনামিকার মধ্যরেখা স্পর্শ করিতে হইবে।

যেমন অঙ্গসঙ্কেত বর্ণিত হইল সেইরূপ ভাষাসঙ্কেত,

পোটলী বা পুঁটলীসঙ্কেত, বস্ত্রসঙ্কেত, তাম্বুলসঙ্কেত ও পুষ্পমালা-সঙ্কেত কামশাস্ত্রাদিতে বর্ণিত আছে। [তত্তদ্ শব্দ দ্র°]

অঙ্গসঙ্গ—(পুং) অঙ্গের সংস্পর্শ, দেহসম্পর্ক। ২ মৈথুন।

অঙ্গসদন—(ক্লী) শরীরাবসাদ, দেহের অবসন্নতা। (বাভট)

অঙ্গসাদ—(পুং) অবসাদ। [অবসাদ দ্র°]

অঙ্গসুন্দর—(পুং) [বৈদ্যক] দক্রুঘ্ন বৃক্ষ ; চলিত দাদমর্দ্দন।

অঙ্গসুপ্তি—(স্ত্রী) কায়স্পর্শাজ্ঞতা, দেহস্পর্শজ্ঞানহীনতা। ২ শরীরস্বাপ, গাত্রের অসাড়তা।

অঙ্গসেন—(পুং) [বৈদ্যক] অগস্তিদ্রুম, বাকস গাছ। (রত্নাবলী)

অঙ্গসেনা—(স্ত্রী) শ্রীরামচন্দ্রের অনুগত নৃপতি রিপুতাপনের পত্নী। [পদ্মপু°, পাতালখ ও]

অঙ্গসেবক—(পুং) [৬-তৎ] দেহের সেবাকারক ; দেহরক্ষী (Bodygurd)।

অঙ্গসেবা—(স্ত্রী) [৬-তৎ] দেহের সেবা, পরিচর্য্যা।

অঙ্গসৌষ্ঠব—(ত্রি) সুন্দর অঙ্গসংস্থান ; সুগঠিত অঙ্গের সৌন্দর্য্য।

অঙ্গস্পর্শ—(ক্লী) [অঙ্গস্য স্পর্শঃ ; ৬-তৎ। স্পর্শ-উপতাপে ঘঞ্] জন্ম-মৃত্যুর পর অশুচি শরীরের স্পর্শযোগ্যতা।

"জাতে পুত্রে পিতুঃ স্নানং সচেলস্তু বিধীয়তে।
মাতা শুধ্যেদ্দশাহেন স্নানাত্তু স্পর্শনং পিতুঃ।" (সম্বর্ত্তস°)

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর চতুর্থ দিবসে দ্বিজাতিরা মৃতব্যক্তির অস্থিসঞ্চয় করিবেন, তাহার পর হইতে অশুচিব্যক্তির অঙ্গস্পর্শ করা যায়।

"চতুর্থেঽহনি কর্ত্তব্যমস্থিসঞ্চয়নং দ্বিজৈঃ।
ততঃ সঞ্চয়নাদূর্দ্ধমঙ্গস্পর্শো বিধীয়তে।" (বাচস্পতিধৃত দক্ষ)

অঙ্গহর্ষ—(পুং) রোমাঞ্চ। (বাভট)

অঙ্গহানি—(স্ত্রী) [অঙ্গস্য হানিঃ ; হা-ক্তিন্, ৬-তৎ] প্রধান কর্ম্মের উপযোগী গুণাদির অন্যথাকরণ বা অকরণ।

কোন প্রধান বা মুখ্য কর্ম্ম করিতে গিয়া তাহার যে সকল অঙ্গীভূত কর্ম্ম আছে, তাহার অন্যথা করা বা একেবারেই তাহা না করাকে অঙ্গহানি বলা হয়।

পুরাণে নির্দ্দেশ আছে—দৈবে, ভ্রমে বা প্রমাদবশে যদি এইরূপ অঙ্গহানি ঘটে, তবে বিষ্ণুস্মরণেই তাহার পূর্ণতা হয়।

"দৈবাদ্ভ্রমাৎ প্রমাদাচ্চেদঙ্গহানিঃ প্রজায়তে।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ॥"

২ অঙ্গবিকলতা, কাণত্ব, খঞ্জত্বাদি। [অঙ্গহীন দ্র°]

অঙ্গহার—(পুং) [অঙ্গ-হৃ-অধিকরণে ঘঞ ; ৬-তৎ] অঙ্গুলি ও হস্তপদাদির নানা প্রকার ভাবভঙ্গীপূর্ব্বক নৃত্য। [ভাবে ঘঞ্] ২ অঙ্গের হরণ ; অঙ্গবিক্ষেপ।

অঙ্গহারি—(পুং) [অঙ্গ-হৃ-ণিনি] নৃত্য করিবার যোগ্য রঙ্গস্থল।

অঙ্গহারিণী—(স্ত্রী) গঙ্গা। (কাশীখণ্ড, গঙ্গাসহস্রনাম)

অঙ্গহীন—(ত্রি) [অঙ্গেন হীনং ; ৩-তৎ] সাধনীভূত দ্রব্য-কালাদি অঙ্গরহিত কর্ম্ম।

'অঙ্গহীন, ক্রিয়াহীন, বা বিধিহীন যে কিছু কর্ম্ম, ভাস্করের প্রসাদে পূর্ণতা প্রাপ্ত হউক' এইরূপ প্রার্থনাবাক্য স্মৃতি-শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

"অঙ্গহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
তৎসর্ব্বং পূর্ণতামেতু ভাস্করস্য প্রসাদতঃ॥" (স্মৃতি)

পৌরাণিক বচনে উল্লিখিত আছে যে, অঙ্গহীন যজ্ঞ রাষ্ট্র দগ্ধ করে।

"অঙ্গহীনো দহেদ্রাষ্ট্রং মন্ত্রহীনস্তু ঋত্বিজং।
যজমানমদক্ষিণ্যো নাস্তি যজ্ঞসমো রিপুঃ॥"

২ অবয়বহীন। ৩ বিকল। ৪ ছিন্নদেহ। [অঙ্গেন দেহেন হীনঃ রহিতঃ] (পুং) ৫ কামদেব। [অঙ্গং হীনং যস্য, বহুব্রী°] (ত্রি) ৬ অযথোচিত করচরণাদিযুক্ত। হস্তপদ প্রভৃতি যে পরি-মাণের যেরূপ হওয়া উচিত, তাহা যাহার হয় নাই। যথা—খঞ্জ কাণ বামন প্রভৃতি।

এইরূপ অঙ্গহীনতার কারণ সম্বন্ধে সুশ্রুতে দেখা যায়—গর্ভিণীর গর্ভাবস্থায় আহারবিহারাদি ব্যাপারে যেরূপ সাধ হয়, তাহার অপূরণের হেতুই কুব্জ, কুণি, খঞ্জ, জড়, বামন, বিকৃতাক্ষ ও অক্ষিহীন প্রভৃতি অঙ্গহীন সন্তান উৎপন্ন হয়। সুতরাং যথাকালে গর্ভিণীর যে যে দ্রব্যে সাধ হইবে, সেই সেই দ্রব্য তাহাকে দেওয়া উচিত। নারী ইচ্ছানুরূপ সাধের সামগ্রী পাইয়া বীর্য্যবান্ ও দীর্ঘায়ু পুত্র প্রসব করে।

"দ্বিহৃদয়াঞ্চ নারীং দৌহৃদিনীমাচক্ষতে। দৌহৃদবিমাননাৎ কুব্জং কুণিং খঞ্জং জড়ং বামনং বিকৃতাক্ষমনক্ষং বা নারী সুতং জনয়তি। তস্মাৎ সা যদ্যদিচ্ছেত্তত্তস্যৈ দাপয়েৎ। লব্ধদৌহৃদা হি বীর্য্যবন্তং চিরায়ুষঞ্চ পুত্রং জনয়তি।" (সুশ্রুত)

অঙ্গাঙ্গিত্ব—(ক্লী) অঙ্গাঙ্গিভাব, গৌণমুখ্যভাব। [অঙ্গা-ঙ্গিভাব দ্র°]

অঙ্গাঙ্গিভাব—(পুং) [অঙ্গস্য অঙ্গিনশ্চ ভাবঃ ; ৬-তৎ] [দর্শন°] দেহদেহিভাব। ২ গৌণমুখ্যভাব ; উপকার্য্য ও উপকারকভাব।

"অঙ্গাঙ্গিভাবমজ্ঞাত্বা কথং সামর্থ্যমন্বয়ঃ।" (মীমাংসা)

অঙ্গাধিপ—(পুং) অঙ্গরাজ কর্ণ। কর্ণ কিরূপে অঙ্গরাজ্যের অধিপতি হইলেন, সে বিবরণ মহাভারতে বর্ণিত আছে। [কর্ণ দ্র°]

২ অঙ্গদেশের অধিপতি মাত্র, তবে প্রধানতঃ কর্ণকেই অঙ্গাধিপ বলা হয়।

৩ লগ্নাধিপতি। জ্যোতিষশাস্ত্রে মেষ বৃষাদিরাশির উদয়-কালকে লগ্ন বলা হয়। এই লগ্নের অধিপতি অঙ্গাধিপ নামে অভিহিত হন। অঙ্গাধিপ বা লগ্নপতি বলবান্ থাকিলে জাতকের সর্ব্ববিধ সুখ-সমৃদ্ধি লাভ হয়।

"অঙ্গাধিপে বলিনি সর্ব্ববিভূতিসম্পৎ।" (জ্যোতিষ)

কোন্ গ্রহ কোন্ লগ্নের বা অঙ্গের অধিপতি, সে বিবরণ জ্যোতিষশাস্ত্রে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। [লগ্নাধিপতি দ্র°]

অঙ্গাধীশ—(পুং) [অঙ্গস্য দেশভেদস্য অধীশঃ; ৬-তৎ] [অঙ্গাধিপ দ্র°]

অঙ্গাধীশ্বর—(পুং) [অঙ্গস্য অঙ্গদেশস্য অধীশ্বরঃ; ৬-তৎ] [অঙ্গাধিপ দ্র°]

অঙ্গাপূরকর (হরি)—একজন মরাঠী কবি। ইনি বশিষ্ঠ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। ইঁহার পিতার নাম অঙ্গাপুরগাঁবী গোপালরাও ও মাতার নাম যমুনা বাঈ। ইনি ১৭১৪ শকে (ইং ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার গুরুর নাম হরিনারায়ণ। গুরুর প্রসাদে ইনি "কেদারবিজয়" নামে একখানি কাব্য ৩৫ অধ্যায়ে সঙ্কলন করেন। গ্রন্থারম্ভে কবি গুরুর মহিমা বিশেষ যোগ্যতার সহিত কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ইনি রামযোশী, মোরোপন্ত প্রভৃতির সমকালীন ছিলেন। (মহারাষ্ট্র-কবিচরিত্র)

অঙ্গাভরণ—(ক্লী) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত তালভেদ।

অঙ্গামীনাগা—আসামের দক্ষিণে নাগাপর্ব্বতের নাগাজাতির সম্প্রদায়বিশেষ। মণিপুররাজ্যের উত্তরে, ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকার দক্ষিণে ও ধানসিরি নদীর পূর্ব্বে অঙ্গামীনাগাদের বাস। ইহার পূর্ব্বদিকে বর্ম্মাদেশ। সম্ভবতঃ মহাভারতোক্ত নাগবংশই এখনকার এই নাগাজাতি। অর্জ্জুন উলূপীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সুভগে! তুমি কে? কাহার কন্যা? আর এ কোন্ দেশে আমাকে আনিলে?" উলূপী বলিলেন—"ঐরাবতকুলে জাতঃ কৌরব্যো নাম পন্নগঃ। তস্যাস্মি দুহিতা রাজন্নুলূপী নাম পন্নগী।" (মহাভা°, আদিপর্ব্ব, ২১৪ অ°) অর্থাৎ আমার পিতার নাম নাগরাজ কৌরব্য। ঐরাবতবংশে তাঁহার জন্ম। আমি সেই নাগরাজের কন্যা, আমার নাম উলূপী।

এখনকার নাগারা ঐরাবতী নদীর নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে বাস করে। পূর্ব্বে ইহারাই ঐরাবতের বংশধর বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিত, সন্দেহ নাই। অঙ্গামীনাগারা বলে—'পৃথিবী আগে বড় সুখের স্থান ছিল। তখন এত লোক ছিল না, পরস্পর এত বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিত না। একটী দেবতা, একজন মানুষ, তাহার পত্নী, আর একটী বাঘ, এই চারিজন একত্র বাস করিত। কালক্রমে সেই দম্পতীর দুইটী সন্তান জন্মে। উভয় ভ্রাতার মধ্যে সৌহার্দ্দ্যের অভাব ছিল না। মানুষ চিরকাল বাঁচে না; দিন ফুরাইল, স্ত্রীলোকটী মরিয়া গেল। মৃতদেহ দেখিয়া বাঘের আহ্লাদ আর ধরে না, সে হৃদয়ের উপর গিয়া শোণিত খাইতে বসিল! জগতে হিংসা ছিল না, আজি হইতে হিংসা আসিল। আজি হইতে সুখের সংসার ভাঙ্গিয়া গেল। পরে দুই ভাইয়েও বিবাদ করিয়া একজন চম্মূবনের দিকে চলিয়া গেলেন, আর একজন চেমু জঙ্গলের দিকে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সন্তানেরা এখনও গৌরবর্ণ আছে, কিন্তু কনিষ্ঠের পুত্রেরা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে।' আর একটী গল্প। গল্প একটু অদ্ভুত কথা দিয়া সাজানো না থাকিলে ভাল লাগে না। তাই সে গল্পটীও চিত্র করা। নাগারা বলে, 'একবার একটা ভেলা জলে ভাসিতে ভাসিতে পর্ব্বতের নিম্নে নদীতটে আসিয়া লাগিল। ভেলায় কেবল একটী শাদা কুকুর আর এক জন রূপবতী বালিকা,—অন্য আরোহী কেহ ছিল না। এখনকার গৌরবর্ণ নাগারা তাহাদেরই সন্তানসন্ততি।' স্থূল কথা, নাগাদের পূর্ব্ব ইতিহাস কিছুই নাই, তাই এত গল্পের ঘটা। [নাগা দ্র°]

অধিক দিনের কথা নয়, প্রায় তিন শত বৎসর হইল, জয়ন্তীপুরের মহারাজের সহোদর তাহার ভাইঝীকে লইয়া দিমাপুরে পলাইয়া যায়। তখন দিমাপুর কাছাড়ের রাজধানী। রাজা সেই দুষ্টকে আশ্রয় দিয়া রাখিলেন। দুই দিন যায়, পাঁচ দিন যায়, এইরূপে কষ্টের এক এক দিন এক এক বৎসর হইয়া আসিতেছে আর যাইতেছে। পাপীর মনে সুখ নাই; তখনি ভয়, তখনি ভরসা; তখনি আবার সহস্র বিছার জ্বালায় পুড়িতেছে। দুষ্ট মনে যে শঙ্কা করিয়াছিল, শেষে তাহাই ঘটিল। জয়ন্তীরাজের সেনাগণ তাহাকে ধরিতে আসিল। তখন সে পুনর্ব্বার ভাইঝীকে লইয়া নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের উপর গিয়া লুকাইল। কাছাড়ের লোকেরা বলে, অঙ্গামীনাগারা তাহাদেরই সন্তানসন্ততি।

নাগাজাতির মধ্যে যে সাতটী শাখা আছে, তন্মধ্যে অঙ্গামী একটী প্রধান শাখা। নাগাগণ কোথা হইতে আসিয়া মণিপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিয়াছিল, তাহা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। স্যর্ জর্জ্জ গ্রিয়ারসন্ বলেন যে, ইহারা তিব্বতী-ব্রহ্মজাতীয় এবং ইয়াং-সি-কিয়াং ও হো-আং-হো নদীর মধ্যবর্ত্তী উত্তরপশ্চিম চীনপ্রদেশ হইতে এদেশে আসিয়াছিল। ভাষা হিসাবে অঙ্গামীনাগাগণ তিব্বতী-চীন পরিবারের আসাম-ব্রহ্ম শাখার অন্তর্গত।

অঙ্গামীনাগাদিগকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য এই দুই প্রধান বিভাগে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ বিভক্ত করিয়া থাকেন। প্রাচ্যবিভাগে চক্‌রিমা কেজামা ও মেমি শাখার এবং পাশ্চাত্ত্য বিভাগে বিশ্বেমা, কোহিমা, খোনোমা ও চাকরোমা শাখার লোককে বুঝায়।

অঙ্গামীনাগাগণের চেহারা সুন্দর। তাহারা পৌনেছয় হইতে ছয় ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। তাহাদের দেহেও বেশ জোর আছে। উচ্চ পাহাড়ে অনবরত কএকদিন ধরিয়া বিচরণ করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা তাহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিশ সের বোঝা পিঠে করিয়া আটক্রোশ দুর্গম পার্ব্বত্য পথ তাহারা অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিরই নাক বোঁচা এবং ঠোঁট পুরু। ইহাদের দাড়ী গোঁপ হইতে প্রায়ই দেখা যায় না। মাথায় বড় বড় চুল; কেবল সম্মুখে ছোট, তাহাই সীঁথা করিয়া আঁচড়ানো। অনেকে আবার সীঁথা কাটে না, চুলের হালি ভ্রূর উপর ঝুলাইয়া রাখে। বড় চুলে চূড়া বাঁধা। চূড়াতে বেড় দিয়া থোলো থোলো ফুটন্ত কাপাস জড়ানো। পূজা পার্ব্বণ আসিলে তাহার উপর পাখীর পালক লাগাইয়া দেয়। পুচ্ছের শাদা পাখা, শাদার উপর কাল রঙের আঁজি দেওয়া। তাহাই অঙ্গামীদের অধিক প্রিয়। মনে ধরিলে তাহারা একটী পালক আট আনা দিয়া ক্রয় করে। কিন্তু পোষাকের রুচি সকলের সমান নয়। কেহ কেহ কেবল বাউরী কাটিয়া ফুর ফুরে চুল উড়াইয়া দেয়, মাথায় কোন রকম বেশভূষা পরে না। কেহ বা ভালুকের লোমে মালা করিয়া মাথায় জড়াইয়া রাখে।



যুদ্ধসাজে সজ্জিত একজন অঙ্গামী-সর্দ্দার

কাণের ভূষণও অনেক। তাহাদের মধ্যে কর্ণফুলটীই সকলে অধিক ভালবাসে। এই ফুলে বেশ একটু কারিগরি আছে। প্রথমে লাল পশমের ছোট থোবা; থোবার চারি পাশে ছোট চামচের মত ছাগলোমের ঝালর। মধ্যস্থলে সবুজ পোকার পালক, পরকলার মত লাগানো পালকের ধারে ধারে শাদা বীজ মুক্তার মত সাজানো থাকে। ফুলের বোঁটা কানের পশ্চাতে বনশূকরের দাঁতে আঁটিয়া দেওয়া। দাঁতের গোড়ায় নানা বর্ণের বেত দিয়া কাজ করা। অনেকে কাঁসার মাকড়ি, কাপাসের গোছা এবং পাখীর পালকও কানে পরিয়া থাকে। কণ্ঠভূষণের মধ্যে হাড়ের মালা; অকীক, কাচ, শাঁখ এবং কড়ির মালাই অধিক চলিত। বাহুতে হাতীর দাঁতের পদক কিংবা বেতের তাড়। হাঁটুর নিম্নে বিচিত্র বেতের মল।



একজন সুন্দরী অঙ্গামী নারী

ইহাদের নারীরা সুন্দরী না হইলেও সুশ্রী এবং তাহাদের কণ্ঠস্বর মধুর ও ব্যবহার ভদ্র। পার্ব্বতবাসী হইলেও ইহারা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। প্রতিদিন স্নান ও দিনের মধ্যে বহুবার দেহ ধৌত করে।

নাগাদের মধ্যে কোন কোন জাতি কাপড় পরে না, ভূষণ চিনে না। স্বভাবের কাজের উপর আজও কেহ হস্তক্ষেপ করিতে শিখে নাই—বিধাতা যেমন গড়িয়াছেন, এখনও তাহারা সেইরূপ বিবস্ত্র আছে। কিন্তু অঙ্গামীরা কাপড় পরিতে জানে। ইহাদের প্রধান পরিচ্ছদ কতকটা ধড়ার মত। বহরে এক হাত ও লম্বে আড়াই হাত, ছোট কাপড় ধড়া করিয়া পরে। ধড়ার আঁচলের সহিত তিন বা চারি পঙ্‌ক্তি কড়ি সেলাই করিয়া ব্যবহার করা ইহাদের মধ্যে প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে কোন ব্যক্তিই তিন পঙ্‌ক্তি কড়ি ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু বিশেষ প্রভাব বা যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন না করিয়া চতুর্থ পঙ্‌ক্তি কড়ি ধারণ করা নিয়ম নহে। চক্‌রিমা ও কেজামা অঙ্গামীদের চতুর্থ পঙ্‌ক্তি কড়ি অনেক স্থলেই কৃতকার্য্যতা জ্ঞাপন করে। যদি কেহ নিম্নলিখিত তিনপ্রকার প্রণয়ের মধ্যে কোন কএকটীতে সফল হইতে পারে, তবে চতুর্থ পঙ্‌ক্তি কড়ি ধারণ করিবার উপযুক্ত বিবেচিত হয়। (১) স্বামীর সহিত বাস করিতেছে এইরূপ নারীর সহিত প্রণয়; (২) একনামের দুই তরুণীর সহিত একসঙ্গে প্রণয়; (৩) মা ও মেয়ের সহিত একযোগে প্রণয়। যে কেহ উক্ত কোন প্রকার প্রণয়ে কৃতকার্য্য হয় তাহাকে ‘জাসেজ্বা’ উপাধি দেওয়া হয়। সভ্য সমাজে যে প্রকারের প্রণয় ঘৃণ্য, ইহাদের মধ্যে তাহাই গৌরবের। অঙ্গামীজাতির মেয়েরা কখনও কড়ি পরে না। কুমারীদের মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেওয়া হয়, আর বিবাহিতা নারীরা দীর্ঘকেশ ধারণ করে। রমণীরা পায়ে কোন অলঙ্কার পরে না, তবে হাতে ও গলায় কাঁসার গহনা পরিয়া থাকে। হাতে আংটি ব্যবহার করার প্রথা ইহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই।

নৃত্য গীত ও যুদ্ধের সজ্জা অন্য প্রকার। গাঢ় নীলবর্ণ চাদরের দুই আঁচলে ঝালরদার হাসিয়া, তাহার দুই ধারে লাল ও হরিদ্রা পা'ড়—সেই চাদর পিঠের উপর দিয়া বুকে বাঁধা থাকে—ইহাই অঙ্গামীদের যুদ্ধের ও নাচের সাজ। স্ত্রীলোকদেরও কাপড় দুই খানি। গায়ের উপর প্রথমে একটী ছোট জামা কাঁকাল পর্য্যন্ত ঝুলিয়া থাকে। তাহার পর একখানি চাদর কাঁধের উপরে বেড় দিয়া কোমরে লাগানো। শীত পড়িলে তাহারা ইহার উপর আর একখানি চাদর গায়ে দেয়।

বর্শা ইহাদের প্রধান অস্ত্র। সামাজিক অবস্থা, বয়স ও সামরিক শক্তি অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকারের বর্শা ব্যবহার করিয়া থাকে। পদস্থ ব্যক্তিরা বর্শাকে নানারূপে বিভূষিত করিয়া থাকে। ৫ ফুট হইতে ৭ ফুট উচ্চ ঢাল ইহাদের ব্যবহার করিতে দেখা যায়। গণ্ডার, হস্তী বা মহিষের চর্ম্ম দ্বারা ঢাল তৈয়ার করা হয়। বর্শার সঙ্গে 'দাও' নামক অস্ত্রও ইহারা ব্যবহার করে।



যুদ্ধসাজে সজ্জিত অঙ্গামী

অঙ্গামীনাগারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান্। একজন নৃতত্ত্ববিদ্ বলিয়াছেন, ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ইউরোপীয়দের মতন। তবে নূতনের প্রতি ইহাদের বিরাগ দেখা যায়। ইহারা সরল প্রকৃতির ও সাহসী। প্রয়োজন হইলে অঙ্গামীরা মিথ্যাকথা বলে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ ইহাদের কথার উপর আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে। অন্যান্য প্রাচ্যজাতির ন্যায় ইহারাও অতিথিপরায়ণ। পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি, বিশেষতঃ দুর্ব্বল ও অসমর্থ ব্যক্তিদের উপর ইহারা সদয় ব্যবহার করে। অঙ্গামীনাগাদের রসিকতা উপভোগ করিবার জিনিষ। কিন্তু তাহাদের নৃত্যগীতের মধ্যে একটা করুণ বিষাদের ছবি ফুটিয়া উঠে। মৃত্যুর বিভীষিকা যেন উহাদের জীবনকে তমসাচ্ছন্ন করিয়াছে। মৃত্যুতেই মানবের সত্তার শেষ হইয়া যায়, ইহাই তাহাদের ধারণা। তাই তাহাদের সঙ্গীতের মধ্যে এইরূপ ভাব দেখা যায় যে, চন্দ্র অস্ত যায়, আবার উদিত হয়; কিন্তু প্রিয়তমা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে আর কখনও তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না।

অঙ্গামীজাতির গ্রামগুলি সাধারণতঃ পাহাড়ের উপর অবস্থিত এবং সুগঠিত। চারিদিকে দেওয়াল দিয়া ঘেরা, পরিখাবেষ্টিত গ্রামগুলি বেশ সুরক্ষিত। যুদ্ধের সময় গ্রামের ভিতরে যাইবার রাস্তাগুলির মাঝে মাঝে গর্ত্ত করিয়া ইহারা সুতীক্ষ্ণ বংশদণ্ড এমনভাবে লুকাইয়া রাখে যে, শত্রু বা শত্রুর চর সেই পথে অগ্রসর হইতে গেলেই গর্ত্তে পড়িয়া আহত হয়। ইহারা ছোট ছোট রাস্তা ও সেতু নির্ম্মাণ করিতে সুনিপুণ। গ্রাম হইতে চাষ করিবার মাঠে যাইবার রাস্তার ধারে ধারে পান্থশালা থাকে। তথায় বসিয়া পরিশ্রান্ত কৃষকগণ পানাহার করিতে পারে।

ইহাদের বাড়ী প্রায়ই পূর্ব্বমুখী করিয়া নির্ম্মাণ করা হয়। বাড়ীর সম্মুখে একটু খালি জায়গা ও বেড়া দিয়া ঘেরা সব্জীর বাগান থাকে। প্রত্যেক গ্রামেই একটী নির্দ্দিষ্ট উচ্চস্থানে কতকগুলি বসিবার জায়গা আছে। সেইস্থান হইতে পূর্ব্বে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করা হইত। গ্রামের নিকটে একটী সমাধিক্ষেত্র থাকে। সমাধিগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাধির নিকটে তাহাদের দারুময় মূর্ত্তি স্থাপন করা হয়। ঐ মূর্ত্তির গাত্রে মৃতব্যক্তির বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি রাখিয়া দেওয়া হয়। শবদেহ পুঁতিবার সময় মদ, মুর্গী প্রভৃতি পুঁতিয়া দেওয়ার বিধি আছে। এক এক গোত্রের বাসস্থানের নিকট 'কিপুচে' নামক একখণ্ড প্রস্তর থাকে। ঐ প্রস্তরখণ্ড সকলের পূজা পায়।



'কিপুচে' ব্যতীত আরও অনেক প্রস্তরখণ্ড গ্রামের মধ্যে স্থাপিত রহিয়াছে দেখা যায়। কোন কোন প্রস্তরখণ্ড এত বড় যে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারা যায় না, সেগুলিকে কিরূপে গ্রামের মধ্যে আনা হইয়াছে। পাথরগুলির মধ্যে কোনটী—উৎসব বা ভোজের স্মারকরূপে, আবার কোনটী কোন ব্যক্তিবিশেষের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ স্থাপন করা হয়।

সাধারণতঃ নাগাজাতির মধ্যে অবিবাহিত যুবকযুবতীদের জন্য স্বতন্ত্র একপ্রকার গৃহ থাকে, তাহাকে 'মোরুং' বলে। অঙ্গামীনাগাদের মধ্যে কিন্তু 'মোরুং' অধিক নাই। অনেক ক্ষেত্রেই অবিবাহিত যুবকযুবতীরা পিতামাতা বা জ্যেষ্ঠভ্রাতার গৃহে বাস করে। যে দুই চারিটী 'মোরুং' আছে, সেগুলি যুবকদের আড্ডাঘর।

প্রায়ই গ্রামের বাহিরের কোন নির্ঝর হইতে জল সরবরাহ হইয়া থাকে। গ্রামের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বড় অভাব। স্বতন্ত্র পায়খানার ব্যবস্থা না থাকায় ও গ্রাম হইতে জঙ্গল দূরে থাকায় পথের দুই পাশে নরনারী মলমূত্র ত্যাগ করে। শূকর, কুকুর প্রভৃতি জন্তুর মলের দ্বারাও রাস্তাগুলি এরূপ অপরিষ্কৃত ও জঘন্য হইয়া পড়ে যে, গ্রীষ্মকালে

বাহিরের লোকের পক্ষে ঐ সব পথ দিয়া চলা দুষ্কর হয়। মাঝে মাঝে আগুন লাগিয়া গ্রামগুলি পুড়িয়া যায়, তাহাতে গ্রামবাসীর সাময়িক কষ্ট হয় বটে, কিন্তু আগুন লাগার জন্যও পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনা দূর হয়।

অঙ্গামীদের বাড়ী সাধারণতঃ খড় বা ঘাস দ্বারা ছাওয়া হয়। তবে বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়ী কাষ্ঠনির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহাদের বাড়ীর তিনটী বিভাগ আছে। প্রথম ভাগে একটী বড় ঘর, তাহাতে শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখা হয় ও লোকজন আসিলে বসিতে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ভাগে রাঁধিবার জায়গা ও শুইবার ঘর। তৃতীয় ভাগে মদ বা তাড়ী রাখিবার জালা থাকে। গরু, শূকর, কুকুর, মুর্গী প্রভৃতি বাড়ীর মধ্যে রাখা হয় বলিয়া এখানকার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা দুষ্কর হইয়া উঠে।

অঙ্গামীদের পরিবার ছোট খাট। তিনটীর বেশী ছেলে মেয়ে কম লোকেরই থাকে। কোন লোকের পাঁচটী ছেলে-মেয়ে হইলে উহা অসাধারণ ঘটনা বলিয়া পরিগণিত হয়। পরিবারে স্বামী, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধ পিতা বা মাতা এবং কখনও কখনও একটী অবিবাহিত ভ্রাতা থাকে। বিবাহ হইলে ছেলে সাধারণতঃ স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করে। যদি অর্থের খুব অনটন হয়, তবে এক বাড়ীর মধ্যেই বেড়া দিয়া বিবাহিত পুত্র স্বতন্ত্রভাবে বাস করে, তবে তাহাকে বাটীর পশ্চাদ্‌ভাগে থাকিতে হয়, কেননা পিতা কখনও পুত্রের পশ্চাতে বাস করেন না।

অঙ্গামীরা গৃহের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে দেয় না। যদি দৈবাৎ কখনও অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, তবে সকলে উহা অমঙ্গল-সূচক মনে করে। ভারতীয় আর্য্যগণের ও প্রাচীন পারসিক-গণের অগ্নিরক্ষার প্রথা অসভ্য অঙ্গামীজাতির মধ্যে কিরূপে প্রচলিত হইল, তাহা অনুসন্ধেয়।

অঙ্গামীরা নিজেদের কাপড় নিজেরা বুনিয়া থাকে। পূর্ব্বে ইহারা তুলার চাষ করিয়া নিজেরাই সূতা প্রস্তুত করিত, কিন্তু এখন ব্রহ্মদেশ হইতে সূক্ষ্ম সূতা আমদানি হয়। মেয়েরাই সাধারণতঃ কাপড় বুনিয়া থাকে। কাপড় বোনা ছাড়া অঙ্গামীরা কৃষি ও কর্ম্মকারের কার্য্য এবং বাঁশ ও বেতের দ্বারা নানাপ্রকার ঝুড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করে। কড়ি, হস্তিদন্ত, শিং ও হাড়ের দ্বারা অনেক প্রকার জিনিষ পত্রও ইহারা তৈয়ারী করিতে পারে।

ইংরেজ অধিকারের পূর্ব্বে অঙ্গামীদের ক্রয়বিক্রয় বিনিময়ের উপরই অনেক সময়ে নির্ভর করিত। কড়ি ও লোহার মুদ্রাও অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। আট অঙ্গুলি লম্বা একটী কড়ির বিনিময়ে একটী গরু পাওয়া যাইত। প্রায় আট ইঞ্চি লম্বা চাবির আকারে প্রস্তুত পাত্‌লা লোহার একপ্রকার মুদ্রাকে 'চবিলি' বলা হইত। এক চবিলি একজন শ্রমিকের এক দিনের বেতন ছিল। এখন বৃটিশ ভারতের মুদ্রাই উহাদের মধ্যে প্রচলিত।

অঙ্গামীরা ভাত খায়, তবে ভাত অপেক্ষা মাংস ইহাদের অধিকতর প্রিয়। এমন পশুপক্ষী কমই আছে যাহার মাংস ইহারা খায় না। চিল ও বাজপাখীর মাংসকে অঙ্গামীরা অত্যন্ত উপাদেয় মনে করে। হাতীর মাংস খাইতে ইহারা খুব ভাল-বাসে, এমন কি হাতীর চামড়া পর্য্যন্ত ইহারা খাইয়া ফেলে। অঙ্গামীনারীদিগকে বাঘের ও পাঁঠার মাংস খাইতে দেওয়া হয় না। কাছাড় ও সিলেট হইতে শুঁট্‌কি মাছ আমদানি করিয়া অঙ্গামীরা খাইয়া থাকে। ইহারা অষ্টপ্রহরের মধ্যে তিনবার মাত্র আহার করে।

অঙ্গামীজাতির কুমারীরা নিজেদের পছন্দ মত বিবাহ করিতে পারে। তাহাদের পিতামাতা ভাল বর খুঁজিয়া দিলেও যদি পাত্রী ঐ বরকে পছন্দ না করে, তাহা হইলে বিবাহ হয় না। ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত নাই, তবে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা বিশেষ কঠিন নহে। দুইজনের মনের মিল না হইলেই বিবাহবিচ্ছেদ হইতে পারে। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য বিবাহ এবং সকলপ্রকার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করে। কিন্তু যদি উভয়ের সম্মতিক্রমে বা স্বামীর ব্যভিচারের জন্য বিবাহবিচ্ছেদ হয়, তাহা হইলে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির একতৃতীয়াংশ পাইয়া থাকে। বিধবা যখন খুশী তখন বিবাহ করিতে পারে, তবে স্বামীর বংশের কাহাকেও বিবাহ করিতে পারে না।

বিবাহের পূর্ব্বে অঙ্গামী-কুমারীরা বিবাহযোগ্য ব্যক্তির সহিত প্রণয় করিতে পারে, তবে স্বগোত্রীয় ব্যক্তির সহিত প্রণয় করা গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হয়। ১৮৯১ সালের আদমসুমারির বিবরণীতে গেট সাহেব লিখিয়াছেন, 'ড্রেং ল্‌হোটাস্ শাখার মধ্যে একটী প্রথা আছে যে, কোন ব্যক্তি দূর প্রবাসে যাইবার সময় তাহার কোন নিকট আত্মীয়কে নিজের স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবার অনুমতি দিয়া যায়।' এই প্রথা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, অঙ্গামীরা নারীকে সমগ্র শাখার সম্পত্তি বলিয়া বিবেচনা করে; কিন্তু তাহা হইলে স্বগোত্র-বিবাহ বা স্বগোত্রা-গমন নিষিদ্ধ হইত না।

অঙ্গামীদের মধ্যে দত্তকগ্রহণপ্রথা প্রচলিত আছে, তবে কুলের বা গোত্রের মধ্যেই দত্তক নির্ব্বাচন করা নিয়ম। অন্য

কুলের ব্যক্তিকে দত্তক লইলে বিবাদ বিসংবাদ হয়। মৃত-ব্যক্তির একতৃতীয়াংশ সম্পত্তি তাহার স্ত্রী পায়। অন্যান্য সম্পত্তি অধিকারীর নির্দ্দেশ মত বিভাগ হইয়া থাকে। পুত্র বিবাহ করিলে পিতার সম্পত্তির এক অংশ পায়। পিতার মৃত্যুর পর তাহার নিজস্ব অংশ কনিষ্ঠ পুত্র পাইয়া থাকে। কন্যাকে স্থাবর সম্পত্তি দেওয়া নিয়ম নহে।

অঙ্গামীদের রাজা নাই। তাহারা সকলেই স্ব স্ব প্রধান। তবে তাহাদের প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে একজন করিয়া নামে মাত্র সর্দ্দার আছে, এই পর্য্যন্ত। সেই সর্দ্দারকে 'পিউমা' বলে। যিনি সদ্বক্তা, যুদ্ধে দুই একবার বীরত্ব দেখাইয়াছেন, এবং যাঁহার ভূমি ও গরু বাছুর অনেক আছে, তিনি সর্দ্দারের উপযুক্ত। বিরোধ ঘটিলে তিনিই উভয় পক্ষের মধ্যস্থ হন। কিন্তু বিবাদ মিটাইবার সময় যদি দুই দিকের মন রাখিতে পারেন, তবেই তাঁহার কথা লোকে মানে। অন্যথা, তাহারা আপনারাই গায়ের জোরে বিবাদ নিষ্পত্তি করে। সুখের বিষয়, এই অঙ্গামীদের এক এক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে অন্য শ্রেণীর নাগারা কোন পক্ষ অবলম্বন করে না। যুদ্ধের সময় তাহারা প্রায় নিরপেক্ষ থাকে। এই গুণ না থাকিলে নাগাজাতি এতদিন নির্ম্মূল হইয়া যাইত।

নাগারা ইংরেজদের সঙ্গে অনেকবার যুদ্ধ করিয়াছে। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন জেন্‌কিন্স, পেম্বার্টন্ এবং গর্ডন, নাগাদের সঙ্গে আসাম ও মণিপুরে যাহাতে ব্যবসা চলে, তাহার পথ খোলসা করিতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে কামান, বন্দুক এবং অনেক লোকজন ছিল। কিন্তু অঙ্গামীরা স্বাধীনতার বরপুত্র; অপরিচিত লোক না বলিয়া কহিয়া চতুরঙ্গ সেনাবলে তাহাদের অধিকার দিয়া যাইবে, এ অপরাধ কখনই সহ্য হইতে পারে না। রাগে আগুন ছুটিল। কত নাগা ইংরেজদের ধরিয়া মারিল, কত নাগা ইংরেজদের মারিতে গিয়া গুলিবৃষ্টিতে উড়িয়া গেল। তাহার পর আঠার-শ-পঞ্চাশ সাল। পঞ্চাশ সাল আসিল না কাল আসিল। সমগুতিঙ্গে ইংরেজদের একটী আড্ডা ছিল। নাগারা পুনঃপুনঃ সেই খানে আসিয়া উৎপাত করিত, শেষে তথাকার জমাদার ভোগচাঁদকে মারিয়া ফেলে। এই অপরাধের উচিত দণ্ড দিতে ইংরেজেরা আবার ছুটিয়া আসিলেন। যুদ্ধ হইল, নাগারা হঠিয়া গেল। এখন অঙ্গামীদের দৌরাত্ম্য অনেকটা কমিয়াছে। [নাগা দ্র°]

যদিও অঙ্গামীরা বিভিন্ন দেবতাকে কোন কোন সময়ে এক বলিয়াই মনে করে, তথাপি তাহাদের মধ্যে একেশ্বরবাদ প্রচলিত আছে বলা যায় না। অতিপ্রাকৃত শক্তিসমূহের দ্বারা জীবন নিয়ন্ত্রিত হইতেছে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। নদী, জঙ্গল, পাহাড় প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে বলিয়া উহারা মনে করে। মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত না থাকিলেও বিভিন্ন প্রকারের পাথর ইহারা পূজা করিয়া থাকে। লাজেমী শাখার অন্তর্গত সেমা গ্রামে দুইখানি শিলা আছে, ইহাদের মধ্যে একখানি স্ত্রী ও অন্যখানি পুরুষ। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, এই প্রস্তরদ্বয়ের সঙ্গমের ফলে সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ বিশ্বাস প্রায় প্রত্যেক গ্রামবাসীরই আছে। যে সকল পশুকে সহজে মারা যায় না, তাহাদিগকে ইহারা দেবতা মনে করিয়া পূজা করে।

ইহাদের দেবতাদের মধ্যে 'কেপেনোপ্‌ফু' প্রধান। ইনি জন্মের দেবতা। কেপেনোপ্‌ফু হইতেই অন্যান্য দেবতা ও বড় বড় বিড়ালের জন্ম হইয়াছে বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস। মানুষ-জাতিও ইঁহা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। ইনি পুরুষ কি স্ত্রী দেবতা তাহা লইয়া মতভেদ আছে। ইঁহার বাসস্থান আকাশে, যাহারা সদ্‌ভাবে জীবন যাপন করে, তাহারা মৃত্যুর পর আকাশে যাইয়া কেপেনোপ্‌ফুর সহিত বাস করে। আমাদের মধ্যে যেমন যমকে মৃত্যুর দেবতা বলা হয়, অঙ্গামীদের মধ্যে তেমনি 'রুটজে'কে আকস্মিক মৃত্যুর দেবতারূপে গণ্য করা হয়। টসুখো ও ড্‌জ্রাবু হইতেছেন স্বামী ও স্ত্রী—বামন আকারবিশিষ্ট। ইঁহারা বন্য পশুদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। 'টেমি' ভূতযোনিবিশেষ। জলে ডুবিয়া, শত্রুর দ্বারা আহত হইয়া বা আত্মহত্যা করিয়া যাহারা মরে, তাহাদের মৃতদেহ হইতে 'টেমি' বাহির হয়। 'টেমি' লোককে মারিয়া ফেলিতে পারে না বটে, কিন্তু ভয় দেখাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন আরও অসংখ্য দেব-দেবী আছে। প্রত্যেক গ্রামেই বিশেষ বিশেষ দেব-দেবী আছে, কিন্তু সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি বা প্রকৃতির বিশেষ কোন অভিব্যক্তিকে ইহারা পূজা করে না।

পূজার্চ্চনা পরিচালিত করিবার জন্য প্রত্যেক গ্রামে কএক-জন পুরোহিত শ্রেণীর ব্যক্তি থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে 'কেমোভো'। গ্রামের আদিম প্রতিষ্ঠাতার বংশধরই 'কেমোভো' হয়। এই ব্যক্তির নির্দ্দেশ মত উৎসব ও পূজার দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কুল, গোত্র ও বংশের ইতিহাস জানিয়া রাখাও ইহার কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। কেমোভোকে যুদ্ধে হত্যা করাও পাপ বলিয়া গণ্য হয়। প্রাচ্য অঙ্গামীদের মধ্যে দুইজন কেমোভো থাকে।

অঙ্গামীদের মধ্যে প্রচলিত অনুষ্ঠানকে মোটামুটী তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—কেন্না, পেন্না ও নান্নু। কোন ব্যক্তির পক্ষে যে সকল কার্য্য নিষিদ্ধ, তাহাকে কেন্না

বলে। ছোট বড় অনেক কাজই ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে নিষিদ্ধ এবং তাহার প্রত্যেকটীই কেন্না। যখন কোন পরিবার 'কেন্না' প্রতিপালন করে, তখন তাহার বাড়ীর সম্মুখে কতকগুলি কাঁচা পাতা রাখিয়া দেওয়া হয়। সেই সময়ে ঐ পরিবারের কেহ বাহিরের কোন লোকের সহিত বাক্যালাপ বা ইঙ্গিতে কথা কহে না। যখন গোত্রের বা গ্রামের সকলে মিলিয়া প্রায়শ্চিত্ত করে, তখন তাহাকে 'পেন্না' বলে। পেন্না প্রতিপালন কালে কেহ চাষ করিতে বা বাহিরের কোন কাজ করিতে যাইতে পারে না। বৎসরের মধ্যে কএকদিন এইরূপ পেন্না করা হয়। পূজার্চ্চনাকে 'নান্নু' বলা হয়। একটী পাতায় কতকগুলি চাল ও কএক ফোঁটা মদ ছড়াইয়া উৎসর্গ করিয়া পূজা করা যাইতে পারে, আবার বিরাট্ ভোজের আয়োজন করিয়া নাচগান সহযোগে পূজা হইতে পারে। বড় বড় উৎসবের দিনে বিশেষ জমকাল পোষাক ধারণ করা নিয়ম।

অঙ্গামীরা শিকার পাইবার জন্য বা শস্যলাভের জন্য কখনও কখনও প্রার্থনা করিয়া থাকে। কিন্তু অনেকস্থলে প্রার্থনা মন্ত্রের মতন মুখস্থ করিয়া বলা হয়।

অঙ্গার$_1$—(পুং ক্লী) [অঙ্গ-আরন্] অগ্নিসংক্রান্ত বা অগ্নিশূন্য অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড। চলিত আঙ্গার, আঙার, কয়লা। পর্য্যায়—অলাত, উল্মুক।

[ইংরেজী—Coal ; জর্ম্মন্—Kohle ; প্রা° জর্ম্মন্—Col, Colo ; লিথু°—Anglis ; রুষ°—*ū*golj]

ব্রহ্মা স্বীয় গাত্রমল লইয়া অগ্নিশিখায় নিক্ষেপ করেন, তাহাতে ভৃগুঋষির উৎপত্তি হয়। ঐ অগ্নি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে দগ্ধ অঙ্গারখণ্ড হইতে অঙ্গিরাঋষির উৎপত্তি হয়। (নিরুক্ত)

"সেঽঙ্গারা আসংস্তেঽঙ্গিরসোঽভবন্॥" (ঐতরেয় ৩.৩৪)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (৬৫.৬১) লিখিত আছে, ব্রহ্মার দেহদ্যুতি হইতে রুদ্র ও আদিত্যগণের উৎপত্তি এবং অঙ্গার হইতে দিব্যমানুষ জ্যোতিঃসমূহ উৎপন্ন হয়।

নীতিশাস্ত্রকারেরা মানুষের মন্দ স্বভাবের দুরপনেয়তা দেখাইবার জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপে অঙ্গারের উল্লেখ করিয়াছেন।

"অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।" (চাণক্যনীতি)

অঙ্গার দ্বারা চিহ্ন বা দাগ রাখিবার প্রথা এখনও আছে, পূর্ব্বেও ছিল। ইহার প্রমান কুমারসম্ভবে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"যমোঽপি বিলিখন্ ভূমিং দণ্ডেনাস্তমিতত্বিষা।
কুরুতেঽস্মিন্নমোঘেঽপি নির্ব্বাণালতলাঘবং।"

(কুমারস° ২.২৩)

২ (সাদৃশ্যে) অধম, কলঙ্ককর। (পুং) ৩ মঙ্গলগ্রহ। ৪ [বৈদ্যক] কুরুণ্টকবৃক্ষ, পীতঝাঁটী। ৫ হিতাবলীবৃক্ষ। (ক্লী) ৬ রক্তবর্ণ। ৭ অঙ্গারপূর্ণ পাত্র। (হেমাদ্রি°) (ত্রি) ৮ রক্তবর্ণবিশিষ্ট।

অঙ্গার$_2$—(পুং, ক্লী) অঙ্গারজাত বস্তু ; ভস্ম। হোমের ভস্ম বিভূতি প্রভৃতি পবিত্র পদার্থ। অগ্নির উপাসনায় অগ্নিহোত্রযাগে অগ্নিকুণ্ডের অন্তর্গত ভস্ম। পদ্মপুরাণ ১০৬ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, অগ্নিহোত্রযাগে অগ্নিকুণ্ডে সংরক্ষিত ভস্ম মৃত্যুঞ্জয়মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া অরুন্ধতী এক মৃত ব্রাহ্মণকে জীবন দান করেন। পুনশ্চ ১০৭ অধ্যায়ে বীরভদ্র কর্ত্তৃক এক রাক্ষসের জীবনদানের কথা আছে। বস্তুতঃ এইরূপ অভিমন্ত্রিত ভস্ম ধারণ করিলে দেহে অদ্ভুত শক্তি অঙ্গীভূত হইয়া থাকে। জ্বরাদি রোগ নিরাকরণে ইহা শক্তিসম্পন্ন। মহারাষ্ট্রদেশে বিশেষতঃ কোঙ্কণ প্রদেশে ইহার অধিক প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ন্যাসিদত্ত বিভূতি যে বিশেষ গুণপ্রদ তাহা অনেকস্থলেই দেখা যায়। এইজন্য অনেকে বিভূতি রক্ষা করিয়া থাকেন এবং তদ্দ্বারা তিলক ধারণ করেন। আমাদের দেশে বৈরাগী, গোঁসাই, মুস্কিল-আসান প্রভৃতি ফকিরেরা ভিক্ষার্থে আসিয়া গৃহস্থ বালকবালিকার কপালে অঙ্গারের তিলক দিয়া থাকেন। সাধারণের বিশ্বাস, এই অঙ্গার-তিলক বিঘ্ননাশন, জ্বরাপহারক ও শুভফলপ্রদ। [ভস্ম দ্র°]

অঙ্গার$_3$—(পুং) যযাতিবংশীয় সেতুর পুত্র। ইঁহার অপর নাম মরুৎপতি। ইনি যৌবনাশ্ব রাজার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাঁহার হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। ইঁহার পুত্র গান্ধারের নামানুসারে গান্ধাররাজ্য স্থাপিত হয়। (হরিবংশ)

২ মহাভারতোক্ত রাজবিশেষ। ইনি মান্ধাতার সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হন। ৩ জাতিবিশেষ।

অঙ্গার$_4$—একপ্রকার রাসায়নিক অধাতব মৌলিক পদার্থ। সাঙ্কেতিকচিহ্ন 'ক' (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী) ; ইংরেজী নাম Carbon (সাঙ্কেতিক চিহ্ন C)। আণবিক ভার (Atomic weight) ১২ ; মিলনসংখ্যা (Valency) ৪।

স্বাভাবিক অবস্থায় অঙ্গার হীরক, কৃষ্ণসীসক (Graphite), পাথুরিয়া কয়লা ইত্যাদি অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। ইহা অন্যান্য পদার্থের সংযোগে বহু যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে। প্রাণী এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থের প্রধান উপাদান অঙ্গার। মর্ম্মর, চূর্ণপ্রস্তর, খটিকা প্রভৃতি বহুবিধ খনিজ পদার্থেরও একটী উপাদান অঙ্গার।

অঙ্গারের অণুর গঠন এইরূপ। ইহার মধ্যস্থ নাভিখণ্ডে (Nucleus) ১২টী ধনাণু (Proton) এবং তাহার অর্দ্ধেক

ঋণাণু (Electron) থাকে। ইহার বাহিরে বলয়াকারে বর্ত্তমান ঋণাণুর সংখ্যা ৬।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অঙ্গার স্বাভাবিক অবস্থায় তিনরূপে বর্ত্তমান থাকে, যথা—

১। হীরক। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩.৫। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বিরল এবং স্বাভাবিক অবস্থায় অষ্টফলকাকার স্ফটিকরূপে (Octohedral crystal) বর্ত্তমান থাকে। ইহাতে প্রায়ই বিশুদ্ধ অঙ্গার থাকে, তবে অম্লজন বায়ু কর্ত্তৃক দগ্ধ হইলে অতি অল্প পরিমাণে ভস্ম অবশিষ্ট থাকে। তাহাতে সিকতাক (Silica), এলুমিনিয়াম্ এবং কখনও কখনও লৌহভস্ম বর্ত্তমান থাকে। হীরক সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন পদার্থ এবং ইহা কাচ কাটিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। হীরকের অত্যধিক আলোবক্রণশক্তি (high refracting power) থাকায় ইহা এত উজ্জ্বল দেখায়। মোয়া সাঁ নামক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হীরকের আণুবীক্ষণিক স্ফটিক (Crystal) প্রস্তুত করিয়াছিলেন। [হীরক দ্র°]

২। কৃষ্ণসীসক—আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.২। ইহার স্ফটিক ষড়্ভুজ ফলকাকারে (Six-sided plate) বর্ত্তমান থাকে। ইহার বর্ণ কৃষ্ণাভ ধূসর এবং স্পর্শে ইহা নরম এবং মসৃণ। ইহাতে কাগজে লেখা যায়। ইহা পেন্সিল প্রস্তুত করিবার জন্য এবং লৌহনির্ম্মিত কলকব্জা তৈলাক্ত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৩। কয়লা—(ক) কাষ্ঠ এবং প্রাণিদিগের অস্থি বায়ুর মধ্যে দগ্ধ করিয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়। কাঠকয়লা বন্দুকের বারুদ প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকায় ইহা বাষ্প শোষণ করিতে পারে। এজন্য ইহা দুর্গন্ধনাশকরূপে ব্যবহৃত হয়। জান্তব কয়লায় চূণ (Lime) এবং দীপক (Phosphorus)-ঘটিত পদার্থ বর্ত্তমান থাকে। যদি ঐ কয়লা লবণদ্রাবকে (Hydrochloric Acid) ভিজান যায়, তাহা হইলে শেষোক্ত পদার্থগুলি ঐ দ্রাবকের সহিত মিলিত হয়; ঐ কয়লা এক্ষণে জলে ধৌত করিলে বিশুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। চিনি প্রস্তুতের জন্য গুড় জান্তব কয়লার ভিতর দিয়া পরিস্রুত করিয়া লওয়া হয়।

(খ) পাথুরিয়া কয়লাও ইহার এক উদাহরণ। বহুযুগ পূর্ব্বের অতি বৃহৎ কাষ্ঠরাশি ধীরে ধীরে পাথুরিয়া কয়লায় পরিণত হইয়াছে।

(গ) বোদমাটি (Peat)—ইহাতে কিছু কয়লা বর্ত্তমান থাকে। জলাভূমিতে তৃণ, শৈবাল প্রভৃতি পদার্থ ক্রমশঃ পচিয়া কয়লায় পরিণত হয়। টিণ্ডার (Tinder) নামে একপ্রকার আশুদাহ্য পদার্থও সাধারণ কয়লার একটী ভেদমাত্র। ইহা স্ফুলিঙ্গ হইতে অগ্নি জ্বালাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

(ঘ) ভুসাকালি ও ঝুল অতিসূক্ষ্ম চূর্ণরূপে সাধারণ কয়লা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

অঙ্গারের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ—অঙ্গার অত্যধিক তাপে বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। ইহা সাধারণতঃ কোন তরলপদার্থে দ্রব হয় না। কিন্তু অত্যুত্তপ্ত গলিত লোহায় অঙ্গার কিছু দ্রবভাবে বর্ত্তমান থাকে। ঐ উত্তপ্ত লৌহ শীতল অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কতকটা অঙ্গার কৃষ্ণসীসকের স্ফটিকরূপে পরিণত হয়। বাকী ঐ লৌহের সঙ্গে মিলিত থাকে। অঙ্গার উত্তপ্ত হইয়া রক্তবর্ণ ধারণ করিলে ইহা বায়ু হইতে অম্লজন বাষ্প গ্রহণ করে। এইরূপে বহু ধাতব পদার্থের ভস্ম হইতে বায়ু গ্রহণ করিয়া ঐ সকল পদার্থকে ধাতুর অবস্থায় পরিণত করিতে পারে। প্রচুর পরিমাণে বায়ু বর্ত্তমান থাকিলে অঙ্গার ২ ভাগ অম্লজনের সহিত মিলিত হইয়া অঙ্গারাম্লজন বা দ্ব্যঙ্গারাম্ল (Carbon dioxide) উৎপাদন করে। [অঙ্গারাম্লজন দ্র°] কিন্তু বায়ুর পরিমাণ অল্প থাকিলে সমপরিমাণে অম্লজনের সহিত মিশ্রিত হইয়া একাঙ্গারাম্ল (Carbon monoxide) উৎপাদন করে। এই বায়ু অঙ্গারাম্ল হইতেও অতি বিষাক্ত। আবদ্ধ গৃহমধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাখিলে এই বায়ু উৎপন্ন হয় এবং গৃহমধ্যস্থ মনুষ্য তাহা হইতে নিদ্রিতাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে, এরূপ দুর্ঘটনার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

অঙ্গার অপর মৌলিক পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া বহুসংখ্যক যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। যথা—উপাম্ল-অঙ্গার (Carbon Suboxide), কুলহরিণ-অঙ্গারীয় (Carbonyl Chloride) প্রভৃতি। [তত্তৎ শব্দ দ্র°]

ঔষধার্থে ব্যবহার—

এলোপ্যাথী মতে—বিশোধিত অঙ্গার ১০ হইতে ৩০ রতি মাত্রায় বায়ু ও অম্লরোগে ব্যবহার্য্য। রক্তামাশয়জনিত অন্ত্রপচনে ইহা পিচ্কারী সাহায্যে মলদ্বারে প্রযুক্ত হয়। আফিম্, কাঠবিষ, কুচিলা প্রভৃতি দ্বারা বিষাক্ত হইলে কয়লা সেবন করাইয়া গরম জল পান করান হইয়া থাকে।

হোমিওপ্যাথী মতে—নিম্নলিখিত পীড়ায় অঙ্গার ব্যবহৃত হয়, যথা—পুরাতন অতিসার, জ্বর ও বিসূচিকায় নাড়ীর ক্ষীণতা, পুরাতন চাপা কাশি, বুকজ্বালা, উদরাধ্মান প্রভৃতি।

অঙ্গারক,—(পুং) [অঙ্গার স্বার্থে কন্] মঙ্গলগ্রহ। জ্যোতিষ ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে অনেক বিষয় লিখিত আছে। [মঙ্গল দ্র°]

অঙ্গারক দেবতারূপে পূজিত হইয়া মঙ্গল, ভৌম, ভূমিসুত ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন এবং ইঁহার পূজা যদিও হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মে প্রচলিত আছে, কিন্তু ইঁহার মূর্ত্তি সর্ব্বত্র একই ভাবে কল্পিত হয় নাই। জৈনদিগের নির্ব্বাণকলিকা গ্রন্থে (প. ৩৮) তাঁহার নিম্নলিখিত ধ্যান পাওয়া যায়—

"তথাঽঙ্গারকং রক্তবর্ণং দ্বিভুজং দক্ষিণেঽক্ষসূত্রং বামে কুণ্ডিকাং চেতি।"

অর্থাৎ তাঁহার বর্ণ লাল, এবং তিনি দ্বিভুজ, তাঁহার দক্ষিণহস্তে অক্ষসূত্র ও বামে কমণ্ডলু থাকে।

কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যে তিন প্রকারের ধ্যান পাওয়া যায়। একটীতে, তাঁহার বামহস্ত জানুতে অবস্থিত এবং দক্ষিণ-হস্ত অভয়মুদ্রা প্রদর্শন করে। দ্বিতীয় ধ্যানে দেখা যায়, তাঁহার দক্ষিণহস্তে পাত্র থাকে।

অঙ্গারক সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর বিবরণ শ্রীতত্ত্বনিধিতে (প. ১২৩) পাওয়া যায়; কিন্তু এ বিবরণ হইতে দেখা যায়, তাঁহার মূর্ত্তির সহিত উপরিলিখিত মূর্ত্তির বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই। এটী তৃতীয় প্রকারের। তাঁহাকে আবাহন করিবার মন্ত্রটী এইরূপ—

"ভগবন্ অঙ্গারক অগ্ন্যাকৃতে ভরদ্বাজগোত্র অবন্তীদেশেশ্বর অষ্টম্যাং শ্রবণনক্ষত্রোৎপন্ন জ্বালাপুঞ্জোপমাঙ্গদ্যুতে চতুর্ভুজ শক্তিশূলগদাখট্টাঙ্গধারিন্ রক্তাম্বরমাল্যানুলেপনপ্রবালাভরণভূষিত-সর্ব্বাঙ্গদ্যুতে আলোকদীপ্তে নমস্তে, সন্নদ্ধরক্তধ্বজোপশোভিতেন রক্তমেষাষ্টরথবাহনেন মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্ আগচ্ছ।"

শ্রীতত্ত্বনিধিতে লিখিত উপরি উক্ত আবাহনমন্ত্র হইতে অঙ্গারকের তৃতীয় মূর্ত্তি বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ভগবান্ অঙ্গারক অগ্ন্যাকৃতি, ভরদ্বাজগোত্রসম্ভূত, অবন্তী-দেশের ঈশ্বর এবং অষ্টমীতিথিতে শ্রবণানক্ষত্রে জাত। ইনি চতুর্হস্তে শক্তি, শূল, গদা এবং খট্টাঙ্গ ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহার বসন, মাল্য, অনুলেপন ইত্যাদি সকলই রক্তবর্ণ; এবং তাঁহার আভরণগুলি রক্তবর্ণ প্রবাল দ্বারা নির্ম্মিত। রক্তবর্ণ ধ্বজাদ্বারা শোভিত রথে তিনি আসীন এবং তাঁহার রথ আটটী রক্তবর্ণ মেষ বহন করিয়া থাকে। তিনি এই রথে উপবিষ্ট হইয়া মেরু প্রদক্ষিণ করিয়া পূজাস্থানে উপস্থিত হয়েন।

অঙ্গারক২—(পুং) দক্ষযজ্ঞোৎপন্ন বীরভদ্রের নামান্তর। পদ্ম-পুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে অঙ্গারকের বিবরণ এইরূপ পাওয়া যায়—দক্ষযজ্ঞে কুপিত কৈলাসপতির ললাটতট হইতে স্বেদ-বিন্দুর পতনে ভীষণ বীরভদ্রের উৎপত্তি হয়। বীরভদ্র যজ্ঞ ধ্বংস করিয়া যখন জগদ্বিনাশে উদ্যত, তখন শিব তাঁহাকে লোকসংহার কার্য্য হইতে বিরত করিয়া বলেন, 'তুমি যথেষ্ট করিয়াছ, যজ্ঞ ধ্বংস করিয়া জগতের শান্তি দিয়াছ; সুতরাং তোমার এই কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ তোমাকে গ্রহগণের শ্রেষ্ঠতা প্রদান করা হইল। তুমি অঙ্গারক নামে বিখ্যাত হইবে। মহৎ লোকে তোমার পূজা করিবে। চতুর্থী দিনে মানবেরা তোমার পূজা করিয়া রূপ, আরোগ্য এবং ঐশ্বর্য্যলাভের অধিকারী হইবে।'

২ একাদশ রুদ্রের অন্যতম। রুদ্রগণ সুরভির গর্ভে ও কশ্যপের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মাণ্ডপু°, ৬৬.৬৯) কিন্তু পদ্ম ও মৎস্যপুরাণ এবং হরিবংশ মতে, ইনি ব্রহ্মার ঔরসে ও সুরভির গর্ভে জন্ম লন। ৩ ভূমিরূপী মহাদেবের পত্নী বিকেশীর পুত্র। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ২৭.৫১) ৪ সূর্য্যের নামান্তর। (মহাভারত) ৫ সৌবীররাজভেদ।

অঙ্গারক৩—(পুং ক্লী) [বৈদ্যক] কুরুণ্টক বৃক্ষ, ঝাঁটী গাছ। ২ ভৃঙ্গরাজ বৃক্ষ; চলিত ভীমরাজ। ৩ [অল্পার্থে কন্] অঙ্গারের ক্ষুদ্রাংশ, বিস্ফুলিঙ্গ।

অঙ্গারকচতুর্থী—(স্ত্রী) ব্রতবিশেষ। [অঙ্গারকব্রত দ্র°]

অঙ্গারকতৈল—(ক্লী) [বৈদ্যক] জ্বরাধিকারে প্রযোজ্য তৈলৌষধ-ভেদ। ইহা দ্বিবিধ। প্রস্তুতপ্রণালী—মূর্চ্ছিত তিল তৈল ৪ সের, কাঞ্জিক ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশশার মূল, বৃহতী, সৈন্ধবলবণ, কুড়, রাস্না, জটামাংসী, শতমূলী—এই সকল দ্রব্য মিলিত ⁄১ সের। কল্কপাকার্থ জল ১৬ সের। পাক সিদ্ধ হইলে তৈল ছাঁকিয়া লইয়া উহাতে কর্পূর, শিলারস ও নখী প্রত্যেক ২ তোলা করিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই তৈল শীতল অথবা স্থলবিশেষে উষ্ণ করিয়া অভ্যঙ্গ করিলে জ্বর উপশমিত ও শরীর শীতল হয়।

বৃহৎ অঙ্গারক তৈল প্রস্তুত প্রকরণে কল্কার্থ শুষ্ক মূলা, পুনর্ণবা, দেবদারু, রাস্না, শুণ্ঠী এবং উপরিবর্ণিত অঙ্গারক তৈলের কল্কসমূহ সমুদায়ে ১ সের লইবে। মূর্চ্ছিত তিল তৈল ৪ সের এবং পাকার্থ জল ১৬ সের। ইহা মর্দ্দন করিলে জ্বর, শোথ ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়।

অঙ্গারকদিন—(পুং) মঙ্গলগ্রহের সম্মানার্থ ১৪ই চৈত্রে অনুষ্ঠেয় উৎসববিশেষ।

অঙ্গারকমণি—(পুং) [অঙ্গারকস্য প্রিয়ঃ মণিঃ; শাক-তৎ] প্রবাল। প্রবাল রক্তবর্ণ, তজ্জন্য মঙ্গলগ্রহের প্রিয়। মঙ্গলের প্রীতিসাধনের নিমিত্ত তাঁহাকে প্রবাল উৎসর্গ করিবার ব্যবস্থা আছে। যথা—

"মাণিক্যং বিগুণে সূর্য্যে বৈদূর্য্যং শশলাঞ্ছনে।
প্রবালং ভূমিপুত্রে চ পদ্মরাগং শশাঙ্কজে॥"

অঙ্গারকর্কটী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] রোটিকা, রুটী। বৈদ্যক-নির্ঘণ্টু মতে ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—শুষ্ক গোধূমচূর্ণে জল মিশাইয়া গাঢ়ভাবে মর্দ্দন করিবে। পরে বটিকাকারে প্রস্তুত করিয়া ধূমশূন্য অনলে ধীরে ধীরে সেঁকিয়া লইবে। ইহা বৃংহণ, শুক্রবৃদ্ধিকর, লঘু, দীপন, কফকর, বল্য এবং পীনস, শ্বাস ও কাসনাশক।

অঙ্গারক-বাষ্প—[একাঙ্গারাম্ল (Carbon Monoxide) দ্র°]

অঙ্গারকব্রত—(ক্লী) ব্রতবিশেষ। প্রহ্লাদনন্দন বিরোচনের প্রশ্নে ভার্গব অঙ্গারকব্রতের বিবরণ ও মাহাত্ম্য বলেন।

মঙ্গলবারে চতুর্থীতিথি হইলে সেইদিন এই ব্রত করিতে হয়। ব্রতের পূর্ব্বদিনে স্নানান্তে গোময় দ্বারা প্রাঙ্গণ লেপিয়া রাখা কর্ত্তব্য। পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা উহা অর্চ্চনা করিয়া তদুপরি কুঙ্কুম, অভাবে রক্তচন্দন দ্বারা একটী অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিতে হয়। এই ব্রতে চারিটী উত্তম ভোজ্য চারিকোণে রাখিয়া বিবিধ ফল ও গন্ধমাল্য প্রভৃতি নিবেদন করা হইয়া থাকে। সুবর্ণশৃঙ্গা, রৌপ্যখুরা, সবস্ত্রা কপিলা গাভীর অর্চ্চনা করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করিতে হইবে। প্রচুর ধান্যদানও এই ব্রতে কর্ত্তব্য। একটী অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ, চতুর্ব্বাহু পুরুষপ্রতিমা সুবর্ণ দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া গুড় ও ঘৃতযুক্ত তাম্রপাত্রে রাখিয়া দিতে হয়। পূজান্তে বেদজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকে উহা দান করা বিধেয়। এই ব্রতের অর্ঘ্যদানমন্ত্র এইরূপ—

"ভূমিপুত্র মহাভাগ দেহোদ্ভব পিনাকিনঃ।
রূপার্থী ত্বাং প্রপন্নোঽহং গৃহাণার্ঘ্যং নমোঽস্তু তে॥" ইত্যাদি

এই ব্রতসংক্রান্ত অন্যান্য বিবরণ মৎস্যপুরাণ ৭২ অধ্যায়ে, পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডের ২য় অধ্যায়ে, সাম্বপুরাণ ১৭শ অধ্যায়ে এবং গণেশপুরাণ ৫৯-৬৪ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

এই ব্রতের ফলশ্রুতি এইরূপ—ভক্তির সহিত অঙ্গারকব্রতের আটবার অথবা চারিবার অনুষ্ঠান করিলে মানব প্রতি জন্মে রূপ ও সৌভাগ্য লাভ করে, এমন কি জন্মে জন্মে শিব বা বিষ্ণুভক্ত হইয়া সপ্তদ্বীপের অধিপতি হইতে পারে। অনুষ্ঠাতার সপ্তসহস্রকল্প রুদ্রলোকে বাস হয়।

অঙ্গারকা—(স্ত্রী) দক্ষিণসমুদ্রবাসী একজন রাক্ষসী। ছায়া-যোগে এই রাক্ষসী জীবগণকে আকর্ষণ করিয়া ভক্ষণ করিত। (রামা°, ৪.৪১.২৬)

অঙ্গারকারিন্—(ত্রি) [অঙ্গারং করোতীতি কৃ-ণিনি] যাহারা বিক্রয়ার্থ কাষ্ঠের অঙ্গার প্রস্তুত করে। মাড়ুই। [স্ত্রী—অঙ্গারকারিণী]

বাঙ্গালার বনাঞ্চলের লোকেরা জঙ্গলের বড় বড় বৃক্ষ কাটা হইলে তাহাদের মূল তুলিয়া দগ্ধ করে। পরে সেই অঙ্গার বিক্রয়ার্থ বিশ পঁচিশ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত পাঠাইয়া দেয়। কর্ম্মকার এবং স্বর্ণকারেরা হাপর জ্বালিবার জন্য ঐ অঙ্গার ক্রয় করে। যেখানে কাষ্ঠের এ প্রকার সুবিধা নাই, সে স্থলে ইতর লোকেরা বাঁশের গোড়া তুলিয়া অঙ্গার প্রস্তুত করে। টীকা এবং গুলের জন্যও যথেষ্ট অঙ্গার বিক্রীত হয়। সালপত্র, পলাশপত্র এবং পচাপাতা মাত্রেই উত্তম টীকা ও গুল প্রস্তুত হইয়া থাকে। তদভাবে কাষ্ঠের অঙ্গার ব্যবহৃত হয়। অড়হর, ধঞ্চী এবং বেগুন কাঠের অঙ্গারে বারুদ প্রস্তুত হয়। তামাকু খাইবার জন্য টীকাই অধিক চলিত। কাপড় ইস্ত্রি করিবার জন্য রজকেরা গুল ব্যবহার করে।

অঙ্গারকুষ্ঠক—(পুং) [অঙ্গার-কুষ্ঠ-কন্] [বৈদ্যক] হিতাবলী নামক ঔষধবিশেষ।

অঙ্গার-গন্ধকমিশ্র (Carbon Bisulphide)—সাঙ্কেতিক চিহ্ন CS_2। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে লাম্পেডিয়াস্ (W. A. Lampadius) অঙ্গার ও মাক্ষিক (Pyrites) মিশ্রিত করিয়া তাপসহযোগে এই রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত করেন।

সাধারণতঃ গন্ধকের বাষ্প তপ্ত-রক্তবর্ণ কয়লার উপর দিয়া চালিত করিয়া প্রথমতঃ একটী প্রকোষ্ঠে লওয়া হয়; তথায় কতকগুলি আধারে উদ্ভিজ্জ তৈল রক্ষিত হয়। পরে ঐ বাষ্প চুণ দ্বারা পূর্ণ অপর একটী প্রকোষ্ঠের মধ্যে চালিত করা হয়। এইরূপে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। অবশেষে ইহাতে চুণের জল অতি সূক্ষ্ম ধারায় পাতিত করিয়া ইহা পরিস্রুত করা হয়।

অঙ্গার-গন্ধকমিশ্র দেখিতে চক্‌চকে, পরিষ্কার ও বর্ণহীন তরল পদার্থ। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.২৬৬১ (১৮°/৪°) এবং বিষমোত্তাপ ২৭৭·৭০ সেন্টি° ও বিষম-চাপ ৭৮·১। ইহা অতি সহজে উবিয়া যায় এবং ইহার বাষ্প অতিশয় ভারী ও দাহ্য। দহনকালে নীলবর্ণ শিখা দেখা যায়। ইহা জলে দ্রবণীয় নহে, কিন্তু সুরাসার, ইথার, বেন্‌জিন ও বহুবিধ তৈলে ইহা গলিয়া থাকে।

অঙ্গারগর্ভ-স্তর—(Carboniferous system) ডেভোনিয়ান বা লাল বালুপাথর স্তরের উপর যে স্তরীভূত প্রস্তর ও আগ্নেয়-গিরি-সঞ্জাত পর্ব্বতস্তর আছে এবং পার্ম্মীয় বা ট্রিয়াসিক যুগের স্তরের নিম্নে যে স্তর পাওয়া যায়, ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ ঐ স্তরদ্বয়ের অঙ্গারগর্ভ অর্থাৎ অঙ্গারজ স্তর নামকরণ করিয়াছেন।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক কনীবিয়ার (W. D. Conybeare) কয়লা-স্তরের (Coal bearing strata) নিম্নে কঙ্কর চুণের অবস্থান দেখিয়া ইহাকে Carbonaceous bed বলিয়া অবধারণ করেন। পরবর্ত্তী গবেষণার ফলে জানা যায় যে, ঐ কয়লা-

স্তরের (Coal-seams) নিম্নে বহুদূর পর্য্যন্ত যে প্রস্তরীভূত পার্ব্বত্যস্তর আছে, তাহাতে সামুদ্রিক চূণাপাথর (Marine limestone), আঁইশ, বেলে পাথর, তৈলাক্ত পাথর, লবণ, অঙ্গারপূর্ণ মৃত্তিকা প্রভৃতি বিদ্যমান আছে। সুতরাং এই সুবৃহৎ প্রস্তরীভূত স্তরটীকে অঙ্গারগর্ভ-স্তর (Carboniferous system) বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

পৃথিবীর অনেকস্থলেই লাল বালুপাথরের স্তর এবং অঙ্গার-গর্ভ-স্তরের সীমা স্বতন্ত্রভাবে নির্দ্দেশ করা যায় না। কোথাও বা ইহা ধীরে ধীরে পার্ম্মীয় স্তরে আসিয়া লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল কারণ প্রত্যক্ষ করিয়া অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই এইরূপ তিন প্রকার স্তরকে একই পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ভূতত্ত্ববিদ্ রেণেভিয়ার (E. Renevier) উক্ত তিনটী স্তরকে একযোগে "Carbonique system" সংজ্ঞা প্রদান করেন।

ইংলণ্ড হইতে এইরূপ একটী অঙ্গারগর্ভ-স্তরধারা উত্তর ও মধ্য ফ্রান্স হইয়া জর্ম্মনী, বোহেমিয়া, আল্পস্, ইতালী ও স্পেনের মধ্যে প্রসৃত হইয়াছে। রুষ সাম্রাজ্যের স্পিটস্‌বার্গেন পর্য্যন্ত এই অঙ্গারগর্ভ-স্তর প্রায় ৩০ হাজার বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া আছে। উত্তর ও দক্ষিণ আফ্রিকায়, ভারতে ও অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে এবং চীন সাম্রাজ্যের সহস্র সহস্র বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া এই অঙ্গারগর্ভ-স্তর রহিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় ২ লক্ষ বর্গমাইল স্থান অঙ্গারগর্ভ-স্তরে ব্যাপিয়া আছে। [ভূতত্ত্ব, ভূস্তর, ভূপঞ্জর ও পৃথিবী শব্দ দ্র°]

অঙ্গার-জলমিশ্র (Carbonohydrous)—অঙ্গার ও জলজন-সংযোগে যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অঙ্গার-জলমিশ্র বলা যাইতে পারে।

অঙ্গারধানিক—(পুং) [অঙ্গার-ধা-ল্যুট্, স্বার্থে কন্] অঙ্গার রাখিবার আধার, আংটা।

অঙ্গারধানী—(স্ত্রী) [অঙ্গারাণি ধীয়ন্তে অস্যাম্। ধা অধি-করণে ল্যুট্, স্ত্রীত্বাৎ ঙীপ্] অঙ্গার রাখিবার আধার, আংটা।

অঙ্গারধূপ—(পুং) [বৈদ্যক] অঙ্গার দ্বারা হিঙ্গু প্রভৃতি যোগে প্রসিদ্ধ ধূপ।

অঙ্গারপরিপাচিত—(ক্লী) [জ্বলদঙ্গারেণ পাচিতঃ। অঙ্গার-পরি-পচ্-স্বার্থে-ণিচ্-ক্ত] [বৈদ্যক] জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ মাংসাদি (কাবাব)। (ত্রি) ২ অঙ্গারপক্ব।

অঙ্গারপর্ণ—(পুং) [অঙ্গারবদ্ভাস্বরং দুস্পর্শঞ্চ পর্ণং বাহনং রথো যস্য সোঽঙ্গারপর্ণঃ] (নীলকণ্ঠ) জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় দীপ্তিমান্ ও দুস্পর্শ হইয়াছে পর্ণ অর্থাৎ বাহন যাহার, তিনি অঙ্গারপর্ণ।

ইঁহার অপর নাম চিত্ররথ। তিনি যে বনে বাস করি-তেন, তাহারও নাম অঙ্গারপর্ণ। ঐ বন গঙ্গা ও রাকী-নদীর কূলে অবস্থিত। চিত্ররথের প্রধানা মহিষীর নাম কুম্ভীনসী। গন্ধর্ব্বরাজ সন্ধ্যাকালে রমণীগণকে লইয়া গঙ্গা ও রাকীনদীতে জলক্রীড়া করিতেন। একদিন সায়ংকালে পাণ্ডবগণ কুন্তির সঙ্গে সেই পথে যাইতেছিলেন, তদ্দর্শনে চিত্ররথ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন সেই ভৎর্সনাবাক্য সহিতে না পারিয়া আগ্নেয় অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। কিন্তু কুম্ভীনসী আসিয়া পাণ্ডবদের শরণা-পন্ন হইল, সেজন্য অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বের প্রাণ নষ্ট করিলেন না। এই দিন হইতে চিত্ররথের সঙ্গে পাণ্ডবদের মিত্রতা হয়। গন্ধর্ব্বরাজ অর্জ্জুনকে দিব্য ঘোটক এবং চাক্ষুসী বিদ্যা প্রদান করিলেন। (মহাভা°, আদিপর্ব্ব, ১৭০ অ°)

২ (ক্লী) [অঙ্গারমিব রক্তবর্ণং পর্ণং যস্য] চিত্ররথ নামক গন্ধর্ব্বের বন।

অঙ্গারপর্ণী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] ভার্গী, চলিত বামনহাটী।

অঙ্গারপাত্রী—(স্ত্রী) [অঙ্গারস্য পাত্রী ; ৬-তৎ] অঙ্গার রাখিবার আধার ; আংটা।

অঙ্গারপুষ্প—(পুং) [অঙ্গারমিব রক্তবর্ণং পুষ্পং যস্য ; বহুব্রী] জীবপুত্রবৃক্ষ ; ইঙ্গুদীবৃক্ষ ; চলিত জিয়াপুতা গাছ (Balanites Roxburghii ; B. Indica ; B. Egyptica)। ইংরেজীতে ইহাকে Ingua বলে।

অঙ্গারপূরিকা—(স্ত্রী) রোটক, চলিত রুটী।

অঙ্গারমঞ্জরী—(স্ত্রী) [অঙ্গারা রক্তবর্ণা মঞ্জরী যস্যাঃ ; বহুব্রী] রক্তকরঞ্জবিশেষ। (বাচস্পত্য) ২ মহাকরঞ্জ, চলিত ডহর-করঞ্জ। (রাজনি°)

অঙ্গারমঞ্জী—(স্ত্রী) [অঙ্গারা রক্তবর্ণা মঞ্জী মঞ্জরী যস্যাঃ। বহুব্রী] করঞ্জবিশেষ ; করম্‌চা গাছ। (শব্দরত্না°) রাজনিঘণ্টু মতে অঙ্গারমঞ্জরী ও অঙ্গারমঞ্জী শব্দের অর্থ মহাকরঞ্জ, চলিত ডহর-করঞ্জ। (A species of Bonduc or Bonducella)

অঙ্গারমণি—(পুং) প্রবাল। [অঙ্গারকমণি দ্র°]

অঙ্গারমিশ্র (Carburet)—অঙ্গার নিকৃষ্ট ধাতু (base) বা কোন প্রকার দ্রাবকের সহিত মিশ্রিত না হইয়া যদি অপর কোন বস্তুর সঙ্গে একত্র হয়, তাহাকে অঙ্গারমিশ্র বলা যাইতে পারে। এক্ষণে কার্ব্বরেট্‌কে ইংরেজীতে কার্ব্বাইড্ (Carbide) বলা হয়। [কার্ব্বাইড্ দ্র°]

অঙ্গারমিশ্র-জলজন (Carburetted Hydrogen)—[জল-জন দ্র°]

অঙ্গারবর্ণী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] ভার্গী, চলিত বামনহাটী।

অঙ্গারবর্ম্মা—একজন রাজা। ইঁহার পিতার নাম বীরবর্ম্মা। কোরাগর জাতীয় হাবাসি অঙ্গারবর্ম্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বীরবর্ম্মার মৃত্যুর পর হাবাসি নিজ শক্তিবলে স্বীয় পুত্র শিব্ধ বৈরুকে বীরবর্ম্মার সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন।

অঙ্গারবল্লরী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] করঞ্জবিশেষ, চলিত নাটাকরঞ্জা (Ovieda verticallata)।

অঙ্গারবল্লিকা—(স্ত্রী) [অঙ্গারা রক্তবর্ণা বল্লী, কর্ম্মধা°; স্বার্থে কন্] [অঙ্গারবল্লী দ্র°]

অঙ্গারবল্লী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] গুঞ্জা; কুঁচ। ২ কটুকরঞ্জ; কাঠকরঞ্জা। ৩ করঞ্জবল্লী। ৪ রক্তগুঞ্জা। (ভাবপ্রকাশ) ৫ ভার্গী। (বাভট) ৬ মহাকরঞ্জ, চলিত ডহরকরঞ্জ।

অঙ্গারবাহিকা—(স্ত্রী) নদীবিশেষ। উৎকৃষ্ট পিতৃতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত। এই তীর্থে স্নান ও দান করিলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। (মৎস্যপু° ২২.৩৫)

অঙ্গারবাহিনী—(স্ত্রী) ভদ্রাশ্ববর্ষের এক পুণ্যতোয়া নদী। (ব্রহ্মাণ্ডপু°, ৪৩ অ°)

অঙ্গারবৃক্ষ—(পুং) [বৈদ্যক] ইঙ্গুদীবৃক্ষ। (ভাবপ্র°, পূ°)

অঙ্গারবেণু—(পুং) [অঙ্গারবর্ণঃ বেণুঃ] [বৈদ্যক] রক্তবর্ণ বাঁশ।

অঙ্গারশকটী—(স্ত্রী) [অঙ্গারস্য শকট, শকটী অল্পার্থে ঙীপ্; ৬-তৎ] অঙ্গার রাখিবার ক্ষুদ্র আধার; আংটা ধুনাচী। ২ চুল্লী; চুলো।

অঙ্গারসেতু—(পুং) জনৈক রাজা। ইনি গান্ধারের জনক।

অঙ্গারা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] হিতাবলী। ২ ইঙ্গুদীবৃক্ষ, চলিত জিয়াপুতা।

অঙ্গারাম্ল (Carbonic acid)—জলের সহিত সামান্য অঙ্গারাম্লজন মিশ্রিত হইলে অঙ্গারাম্ল উৎপন্ন হয়। [অঙ্গারাম্লজন দ্র°] ইহা দ্বিভাস্মিক (Dibasic), অর্থাৎ ইহা হইতে দুই রকমের লবণ (Salt) উৎপন্ন হয়—একটী অম্লাত্মক, অপরটী সামান্য (Normal)।

(১) অম্লাত্মক কার্ব্বনেট, বা বাই-কার্ব্বনেট, যথা—$NaHCO_3$, $Ca(HCO_3)$ ইত্যাদি।

(২) সামান্য বা নর্ম্মাল কার্ব্বনেট, যথা—Na_2CO_3, $CaCO_3$ ইত্যাদি।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, অঙ্গারাম্ল হইতে উৎপন্ন লবণগুলি কার্ব্বনেট নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ক্ষারধাতুর (Alkali metals) সামান্য কার্ব্বনেট্গুলি দ্রব অবস্থায় জল-বিচ্ছেদিত (Hydrolysed) হইয়া ক্ষারের মত ব্যবহার করে; যথা—$Na_2CO_3 + H_2O = NaOH + NaHCO_3$। সর্জ্জিকাক্ষারের (Sodium Carbonate) ডেসিনর্ম্মাল সলিউশন ২৫° তাপমানে শতকরা ৩·১৭ জলবিচ্ছেদিত হয়।

অঙ্গারাম্লের অম্লশক্তি অত্যন্ত কম। ইহার অম্লশক্তি সিরকাম্লেরও (acetic acid) এক পঞ্চমাংশ বলিয়া অনুমিত হয়। সিরকাম্ল-কার্ব্বনেট হইতে অঙ্গারাম্লজন পাওয়া যায়।

অঙ্গারাম্লজন (Carbon dioxide)—সাধারণ অবস্থায় ইহা একটী বায়বীয় পদার্থ। অঙ্গার এবং অম্লজন (Oxygen) এই দুই মৌলিক পদার্থের সম্মিলনে অঙ্গারাম্লজনের উৎপত্তি। ইহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন CO_2। অঙ্গারাম্লজন বাতাসেও যথেষ্ট পরিমাণে যবক্ষারজন (Nitrogen) প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে। বায়ুমণ্ডলের ১০,০০০ ঘনফলের (volume) প্রায় তিন অংশ (অর্থাৎ ৩ ঘনফল) অঙ্গারাম্লজন। পাথুরিয়া কয়লা এবং অন্যান্য অঙ্গারঘটিত জ্বালানী বস্তু পোড়ান হয় বলিয়া অপরিমিত অঙ্গারাম্লজন বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কারণেও ইহা বাতাসে বিস্তারলাভ করে।

অঙ্গারাম্লজন বর্ণহীন; কিন্তু গন্ধ সামান্য উগ্র এবং স্বাদ অম্ল, তাই ইহা হইতে অঙ্গারাম্লও প্রস্তুত হয়। [অঙ্গারাম্ল দ্র°] ইহার ঘনত্ব ২২ এবং আণবিক ওজন ৪৪। ইহা বাতাস অপেক্ষা প্রায় দেড়গুণ ভারী। ইহার ঘনত্ব এত অধিক বলিয়া প্রশ্বাসের সহিত টানিয়া লইলে শ্বাস রোধ হইয়া আসে এবং কোন স্থানে ইহা অধিক পরিমাণে থাকিলে তথায় শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু ঘটে। ইহা অতি সামান্যরূপে জলে গোলা যায়; এবং জলে গুলিবার পরিমাণ চাপ বাড়াইলে বৃদ্ধি পায়, আর উত্তাপ অধিক হইলে কমিয়া যায়। যে সোডার জল পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা আর কিছুই নয়—অঙ্গারাম্লজন-গোলা জলবিশেষ; অধিক চাপে খুব বেশী পরিমাণে অঙ্গারাম্লজন জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখা হয়। সেই জন্যই সোডার বোতলের মুখ খুলিয়া দিলে চাপমুক্ত হয় বলিয়া ইহা বুদ্বুদের আকারে জোরের সঙ্গে বাহির হইয়া আসিতে থাকে। ইহার স্বাদ অম্ল বলিয়াই সোডার জল হজমের পক্ষেও সাহায্য করে। চূণের জলের সহিত মিলিয়া ইহা ক্যাল্সিয়ম কার্ব্বনেট (Calcium Carbonate) উৎপন্ন করে; সেই জন্যই চূণের জলের সহিত অঙ্গারাম্লজন মিশাইয়া বেশ করিয়া গাড়িয়া দিলে উক্ত কার্ব্বনেটের অধঃক্ষেপ (Precipitation) হেতু জলটা ঘোলাটে হয়। নিঃশ্বাসের সহিত যে অঙ্গারাম্লজন নির্গত হয়, তাহার পরীক্ষাও চূণের জলের সাহায্যে করিতে পারা যায়। নিঃশ্বাস ফেলিবার

কালে যদি তাহা চূণের জলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করা যায়, তবে জলটা ঐরূপ ঘোলাটে হইতে দেখা যায়। চূণের জলের পাত্র যদি অনাবৃত অবস্থায় রাখিয়া দেওয়া যায়, তবে জলের উপরে একটা পাত্‌লা সাদা সর পড়ে। ইহার কারণ আর কিছুই নয়—বায়ুমণ্ডলের অঙ্গারাম্লজন চূণের জলের সংস্পর্শে আসিয়া ঐরূপ কার্ব্বনেটের সৃষ্টি করে।

বায়ুমণ্ডলস্থিত অঙ্গারাম্লজন প্রতিনিয়তই প্রকৃতির কার্য্যের যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে। উদ্ভিদের সবুজ পত্রগুলিতে পত্রহরিৎ (Chlorophyll) নামক একপ্রকার পদার্থ বিদ্যমান আছে। এই সবুজ পাতাগুলি সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে অঙ্গারাম্লজনের বিঘটন (Decomposition) সাধন করিয়া অঙ্গারকে দেহ গঠনের নিমিত্ত গ্রহণ করে, আর অম্লজনকে আবার বায়ুমণ্ডলে মুক্ত করিয়া দেয়। মনুষ্যাদি অন্যান্য সচল প্রাণী আবার প্রশ্বাসের সহিত অম্লজন টানিয়া লইয়া নিশ্বাসের সঙ্গে মুক্ত করিয়া দেয় অঙ্গারাম্লজন। এইরূপে উদ্ভিদ্ ও সচল প্রাণীর মধ্যে নিয়তই অঙ্গারাম্লজনের একটা আদানপ্রদান চলিতেছে।

যবদ্বীপের বিষ-উপত্যকা (Poison valley) ও ইতালীর অন্তর্গত নেপ্‌ল্‌সের গ্রোটো-ডেল্-কেন (grotto del cane) প্রভৃতি স্থানে ভূমি হইতে যথেষ্ট পরিমাণে অঙ্গারাম্লজন উত্থিত হইতে দেখা যায়। বটেভিয়া নগর হইতে ৮১ ক্রোশ অন্তরে 'বোহন্ উপাস্' নামে এক ভয়ানক বিষবৃক্ষ আছে, তাহার নির্য্যাস অঙ্গারাম্লজনে পূর্ণ। সেল্‌টার্‌স্ (Selters), বীচি (Vichy), সারাটোগাস্থ উষ্ণ-প্রস্রবণ প্রভৃতি উৎস এবং অন্যান্য বহু খনিজ জলের সহিত ইহা মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন সময়ে ঝরণার জলে ইহা অধিক পরিমাণে মিশ্রিত থাকে বলিয়া এবং চাপ বৃদ্ধিহেতু অঙ্গারাম্লজন উত্থিত হইয়া বুদ্‌বুদের সৃষ্টি করে। মদ্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য যখন চিনি গাঁজানো হয়, তখনও উহাতে অঙ্গারাম্লজন উৎপন্ন হইয়া থাকে। কি ভাবে যে গাঁজান প্রথায় অঙ্গারাম্লজন উৎপন্ন হয়, তাহার সমীকরণ (equation) এইরূপ—$C_6H_{12}O_6$ (চিনি) = গাঁজিয়া যাইবার পরে $2C_2H_5OH$ (অ্যালকোহল্ বা সুরাসার) $+ 2CO_2$ (অঙ্গারাম্লজন)।

রুটী ইত্যাদি প্রস্তুতকালে খাসি বা কিণ্ব (yeast) প্রয়োগের জন্য যে গাঁজনের উৎপত্তি হয়, তাহার ফলেও অঙ্গারাম্লজন উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর সেই জন্যই ময়দার আঠাল ভাবটা কাটিয়া গিয়া রুটী বেশ নরম হয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বহু প্রকার গাঁজনের নিমিত্ত এবং জৈব (Organic) পদার্থ পচিবার ফলে অঙ্গারাম্লজনের উদ্ভব হইয়া থাকে।

চূণের সহিত মিলিত অবস্থায় ক্যাল্‌সাইট চূণাপাথর, খড়িমাটি, মার্ব্বল ইত্যাদি এবং ম্যাগ্‌নেসাইট ($MgCO_3$), ডোলোমাইট ($MgCO_3$, $CaCO_3$) প্রভৃতি বহু ধাতব যৌগিক পদার্থের সহিত নানাভাবে অঙ্গারাম্লজন চারি দিকে মিশ্রিত রহিয়াছে।

ইহার প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে বহু দিন পর্য্যন্ত নানা অদ্ভুত ধারণা ছিল এবং অনেককাল পর্য্যন্ত ইহার যথার্থ সত্তা লইয়া নানা দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে ভান্ হেল্‌মণ্ট্ (Van Helmant) সর্ব্বপ্রথম অঙ্গারাম্লজন প্রস্তুত করেন। কিন্তু তখনও তিনি ইহার প্রকৃত নাম দিতে পারেন নাই। তিনি ইহার নাম দিয়াছিলেন 'গ্যাস সিল্‌ভেস্টার' (Gas sylvestre); অর্থাৎ বন্য গ্যাস—যাহা পোষ মানে না। তাঁহার এইরূপ নামকরণ করার একটু ইতিহাস আছে। একটা কাচের বোতলে খানিকটা চূণাপাথর ও অম্ল রাখিয়া তিনি বোতলটা ছিপি বন্ধ করিয়া রাখেন; ফলে অঙ্গারাম্লজনের অতিরিক্ত চাপে বোতলটা ফাটিয়া যায়। তাই তিনি ইহার ঐরূপ নামকরণ করেন। অতঃপর ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে নানারূপ পরীক্ষা করিয়া জোসেফ্ ব্ল্যাক্ ইহার নাম দেন 'স্থির বায়ু' (Fixed air)। তৎপরে বার্জ্জমানও (Bergman) ইহাকে বহুতররূপে পরীক্ষা করিয়া দেখেন। কিন্তু ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে লাভেসিয়ার চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করিয়া দেন যে, ইহা অঙ্গার ও অম্লজনের যোগাযোগে উৎপন্ন; এবং সাধারণতঃ ইহা বায়বীয়।

অঙ্গারাম্লজন নানা প্রকারে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সাধারণভাবে কার্ব্বনেটের উপরে অম্লের ক্রিয়ার ফলে অঙ্গারাম্লজন উৎপন্ন হয়। অমিশ্র নির্ম্মল অঙ্গারাম্লজনের প্রয়োজন হইলে অবশ্য উক্ত উপায়ে প্রস্তুত করিলে চলিবে না। বিশুদ্ধ অম্লাত্মক-সর্জ্জিকাক্ষারে (Sodium bicarbonate) তাপ দিলে নির্ম্মল অঙ্গারাম্লজনের উদ্গম হয়। যথা—$2NaHCO_3$ (অম্লাত্মক সর্জ্জিকাক্ষার) $= Na_2CO_3$ (সর্জ্জিকাক্ষার) $+ CO_2$ (অঙ্গারাম্লজন) $+ H_2O$ (জল)।

অপেক্ষাকৃত তরল গন্ধকাম্ল ও পরিষ্কৃত সর্জ্জিকাক্ষারের যোগাযোগেও বিশুদ্ধ অঙ্গারাম্লজন পাওয়া যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন একভাগ সর্জ্জিকাক্ষার ও তিন ভাগ পটাসিয়ম ডাইক্রোমেট মিলাইয়া লইয়া তাপ দিলে যে অঙ্গারাম্লজন পাওয়া যায়, তাহাতেও অন্য কোনরূপ বস্তু মিশ্রিত থাকে না।

এতদ্ভিন্ন ক্ষারধাতু (Alkali metals) এবং বেরিয়াম কার্ব্বনেট (Barium carbonate) ব্যতীত যে কোন কার্ব্বনেট হইতে তাপযোগে ইহা প্রস্তুত করা সম্ভব; ইহা কুল-

খড়ি, চূণাপাথর প্রভৃতি হইতে বাষ্পাকারে নির্গত হইয়া আসে, যদি তাহাতে আরক্ত-তাপ (red-heat) প্রয়োগ করা হয়। অধুনা বাতাসের সাহায্যে এক নবতর উপায়ে অঙ্গারাম্লজন প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমরা জানি যে, বাতাসে অন্যান্য বায়বীয় পদার্থের সহিত অম্লজন ও যবক্ষারজন—এই দুইটী গ্যাসও অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। যদি বাতাসকে কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে আরক্ত-তপ্ত (red-hot) পাথর কয়লা বা কাঠ কয়লার উপর দিয়া প্রবাহিত করিয়া লইয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে অঙ্গারাম্লজন পাওয়া যায়। যথা—C (অঙ্গার) $+ O_2$ (অম্লজন) $= CO_2$ (অঙ্গারাম্লজন)। অবশ্য এইরূপে প্রস্তুত অঙ্গারাম্লজনের সহিত যবক্ষারজন মিশ্রিত রহিয়া যাইবে। কিন্তু যদি এই মিশ্রিত গ্যাস গাঢ় দ্রব যবক্ষারের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ যবক্ষারের সহিত যুক্ত হইয়া অঙ্গারাম্লজন অম্লাত্মক-যবক্ষার উৎপাদন করে এবং পরে পুনরায় তাপ প্রয়োগে উহা হইতে যবক্ষারজনমুক্ত অঙ্গারাম্লজন লাভ করা যায়।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বাতাস অপেক্ষা অঙ্গারাম্লজন প্রায় দেড় গুণ ভারী। ইহা প্রজ্বলনের মোটেই সহায়তা করে না। এই দুইটী গুণের সুযোগ লইয়া অগ্নিনির্ব্বাপক-রূপে অঙ্গারাম্লজনের ব্যবহার বর্ত্তমান যুগে বহুল প্রসার লাভ করিয়াছে। খুব শক্ত ধাতুনির্ম্মিত পাত্রে খানিকটা সর্জ্জিকাক্ষারদ্রাবণ (Solution of sodium carbonate) রাখিয়া দেওয়া হয়, আর ঐ পাত্রটীর মধ্যে গন্ধকাম্লপূর্ণ একটী কাচের নল থাকে। পাত্রটীর মুখ বন্ধ করিয়া এমনভাবে একটী ধাতু-নির্ম্মিত যষ্টির ব্যবস্থা করিয়া রাখা হয় যে, বাহির হইতে ঐ যষ্টি চালিত করিয়া অনায়াসে ঐ কাচের নল ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়। কাচের নলটী ভাঙ্গিয়া ফেলিবামাত্র তরল এবং বায়বীয় পদার্থ এক সঙ্গে সঙ্কীর্ণ নির্গমপথে তীব্রবেগে বাহির হইতে থাকে। এই মিশ্রণের (Mixture) সহিত অঙ্গারাম্লজন যথেষ্ট পরিমাণে আছে বলিয়া অগ্নি-নির্ব্বাপণের পক্ষে সুবিধা হয়। (Na_2CO_3 (সর্জ্জিকাক্ষার) $+ H_2SO_4$ (গন্ধকাম্ল) $= Na_2SO_4 + CO_2$ (অঙ্গারাম্লজন) $+ H_2O$ (জল)।

এই প্রবল প্রবাহ তখন আগুনের দিকে নিক্ষেপ করা হয়। বাজারে ফায়ার কিং (Fire king) নামে যে সকল অগ্নিনির্ব্বাপণযন্ত্র বিক্রয় হয়, তাহাদের প্রস্তুতপ্রণালীতে সামান্য পার্থক্য থাকিলেও আসলে একই তথ্য অবলম্বনে সেগুলি প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

বায়বীয় (gaseous) অঙ্গারাম্লজনকে তরল এবং কঠিন আকারে পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায়। ০° সেন্টি° উত্তাপে সাধারণ বায়ুচাপের প্রায় ৪০ গুণ চাপ প্রয়োগ করিলে ইহা তরল আকার ধারণ করে। আজকাল এইরূপ তরল অঙ্গারাম্লজন যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং তাহা ইস্পাতের চোঙ্গার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখা হয়। এই চোঙ্গার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলে চাপমুক্ত হইয়া সেই তরল পদার্থ দ্রুতবেগে বায়ুতে মিশ্রিত হইতে থাকে। এই প্রকার দ্রুত উপসরণকালে (Evaporation) এত অধিক তাপ শোষিত হয় যে, তরল অঙ্গারাম্লজনের কতকাংশ অতিরিক্ত তাপ-ক্ষয় হেতু আরও ঠাণ্ডা হইয়া কঠিন আকারে পরিণত হয়। কঠিন অঙ্গারাম্লজন তুষারবৎ শুভ্র; এবং সেই জন্য ব্যবসায়িগণের মধ্যে 'কার্ব্বনিক এ্যাসিড্ স্নো' বেশী পরিচিত।

যখন বায়ুচাপ ৫·৩০ গুণ, তখন তরল অঙ্গারাম্লজনের স্ফুটন-সীমা হইল—৫৬° সেন্টি° এবং কঠিন অঙ্গারাম্লজনের উর্দ্ধপাতন (Sublimation)-সীমা সাধারণ বায়ুচাপে ৭৮·৫২° সেন্টি° হইয়া থাকে। কঠিন অঙ্গারাম্লজনে ইথা মিশ্রিত হইলে উত্তাপ ঐ সীমায় আসিয়া পৌঁছে। অঙ্গারাম্লজনের বিষমোত্তাপ (Critical temperature) ৩১° সেন্টি° এবং ৭২·৮৫ বায়ুচাপ হইল বিষম-চাপ (Critical pressure)। প্রত্যেক বায়বীয় পদার্থেরই উত্তাপের একটা সীমা আছে, যাহার নীচে উত্তাপ না কমাইয়া সহস্রগুণ চাপ প্রয়োগ করিলেও উহা তরলাকারে পরিণত হইবে না; এই উত্তাপকেই বিষমোত্তাপ বলা হয়। বিষমোত্তাপের ঠিক নীচে চাপ কমাইয়া বায়বীয় পদার্থকে তরল করিতে হইলে যতটা চাপের প্রয়োজন হয়, তাহাকে বিষম-চাপ বলা হইয়াছে।

অত্যন্ত বেশী উত্তাপে আবার অঙ্গারাম্লজন বিচ্ছিন্ন (Dissociate) হইয়া একাঙ্গারাম্ল (Carbon Monoxide) ও অম্লজনে বিভক্ত হইয়া পড়ে ($2CO_2 = 2CO + O_2$)। প্রতি একশত অণু পরিমাণ অঙ্গারাম্লজনের সাধারণ বায়ুচাপে এবং বিভিন্ন উত্তাপে কতগুলি অণু বিচ্ছিন্ন হয়, তাহার একটী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

চরমোত্তাপ (Temperature absolute)	১০,০০০°	১,৫০০°	২,০০০°	২,৫০০°	৩,০০০°	৩,৫০০°
শতকরা বিচ্ছিন্ন অণু	০·০০০০২৫	০·০৪৮৩	২·০৫	১৭·৬	৫৪·৮	৮৩·২

বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের (Electric spark) দ্বারাও অঙ্গারাম্লজন বিচ্ছিন্ন করা যায়।

নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বিশুদ্ধ অঙ্গার (হীরক বা কৃষ্ণসীসক)

বিশুদ্ধ অম্লজনের সহিত পোড়াইয়া পরে ওজন করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ১২ ভাগ অঙ্গার ৩২ ভাগ অম্লজনের সহিত মিলিত হইয়া ৪৪ ভাগ অঙ্গারাম্লজন প্রস্তুত হইয়াছে। বায়বীয় অঙ্গারাম্লজনের কোন নির্দ্দিষ্ট ঘনফল (volume) পরীক্ষা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে যে অম্লজন রহিয়াছে, তাহার ঘনফল অঙ্গারাম্লজনেরই সমান।

অঙ্গারাম্লজন উদ্ভিদের বীজ বা অঙ্কুরের পক্ষে অনিষ্টকর। প্রাণীর পক্ষে ইহার শ্বাস বিষক্রিয়া করে। অঙ্গারাম্লজনপূর্ণ স্থানে অবস্থান করিলে মনুষ্যের এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়—মাথা ধরা, মনের চাঞ্চল্য, শক্তিহ্রাস, বক্ষঃস্থলের সঙ্কোচন, হৃদ্‌পিণ্ডের গতিবৃদ্ধি ও কাঁপুনী। ক্রমে স্মরণশক্তি ও বোধশক্তির হ্রাস, কাণে ভোঁ ভোঁ শব্দ, নিদ্রাপ্রবৃত্তি, নাড়ীর ক্ষীণতা, খেঁচুনী, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

ক্ষয়রোগে কেহ কেহ ইহার নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে ব্যবস্থা দেন। নেত্ররোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অঙ্গারাম্লজন উদরস্থ হইলে অম্ল ও অজীর্ণের উপকার করে। এতদ্ভিন্ন কর্কট, নালী ঘা, অতিসার, নাসা, বমন প্রভৃতি রোগেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

অঙ্গারাবক্ষয়ণ—(ক্লী) অগ্নিনির্ব্বাণার্থ পাত্রবিশেষ। কোন কোন টীকাকার ইহাকে প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ডের উত্তোলক চিমটা বা সন্দংশ বলিয়া মনে করেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই শব্দটীর প্রয়োগ আছে। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ কি, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

অঙ্গারাবক্ষেপণ—(ক্লী) [অঙ্গার-অব-ক্ষিপ করণে ল্যুট্, অঙ্গারং অবক্ষিপ্যতে অনেনেতি] যদ্দ্বারা অঙ্গার ছুড়িয়া ফেলা যায়। অঙ্গার নিক্ষেপ করিবার পাত্র। [অঙ্গারস্য অবক্ষেপণম্; ৬-তৎ। ভাবে ল্যুট্] ২ অঙ্গারক্ষেপণ।

অঙ্গারি—(স্ত্রী) [অঙ্গার-মত্বর্থে ঠন্ পৃষোদরাদিত্বাৎ কলোপঃ] অঙ্গার রাখিবার আধার বা পাত্র ; আংটা।

অঙ্গারিকা—(স্ত্রী) [অঙ্গার-ঠন্, স্ত্রীত্বাৎ টাপ্] আগুন রাখিবার আংটা। ২ কুষ্মাণ্ডপিশাচগণের ষোড়শ কুলের এক কুল। (ব্রহ্মাণ্ডপু°, ৬৯ অ°) [বৈদ্যক] ৩ ইক্ষুকাণ্ড ; আকগাছ। ৪ কিংশুক ; কোরক ; পলাশকলি।

অঙ্গারিণী—(স্ত্রী) [অঙ্গার-মত্বর্থে ইন, স্ত্রীত্বাৎ ঙীপ্] আগুন রাখিবার আংটা। ২ সূর্য্যের গমনপথ। (ত্রি) ৩ অঙ্গারযুক্তমাত্র।

অঙ্গারিত—(ক্লী) [অঙ্গারমিব 'আচরতীতি অঙ্গার-ক্বিপ্, কর্ত্তরি ক্ত] [বৈদ্যক] পলাশকলিকা, পলাশফুলের কুঁড়ি। (ত্রি) ২ দগ্ধপ্রায় কাষ্ঠমাত্র।

অঙ্গারিতা—(স্ত্রী) লতামাত্র। ২ চুল্লী। ৩ নদীবিশেষ।

অঙ্গারিয়া—বেলুচিস্থানের দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত লাস্‌বেলা রাজ্যের অধিবাসী এক মুসলমান জাতি। ইহারা নুমারিয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ইহাদের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। নুমারিয়াগণ এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসী বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

অঙ্গারীয়—(ত্রি) [প্রকৃতিরূপার্থে, অঙ্গারেভ্য এতানি অঙ্গার-ছ] দগ্ধকাষ্ঠমাত্র। ২ অঙ্গার সম্বন্ধীয়।

অঙ্গারেশ—(পুং) নর্ম্মদানদীর তীরস্থিত তীর্থবিশেষ। এখানে স্নান করিলে মানব রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। (মৎস্যপু° ১৯১.৫৮)

অঙ্গার্শপীর—দিনাজপুরের শত্রুঞ্জয় পাহাড়ে অবস্থিত হনুমান্‌-মন্দিরের কিছু নিম্নে এক বৃক্ষতলে একটী দরগা আছে। ইহা মুসলমান সাধু অঙ্গার্শের দরগা বলিয়া পরিচিত। কথিত আছে, ইনি স্বীয় অলৌকিক ক্ষমতায় নানা পার্থিব জিনিষ বশীভূত করিয়াছিলেন।

অঙ্গালম্মে, অঙ্গালি—তামিল দেবীবিশেষ। ইঁহার পদতল স্বর্ণময়। এই দেবী কালিকামূর্ত্তির অনুরূপ।

অঙ্গিকা—(স্ত্রী) [অঙ্গমাবৃণোতি, অঙ্গ-ইনি, কন্ স্বার্থে, স্ত্রীত্বাৎ টাপ্] কঞ্চুক, আংরাখা, কাঁচুলী।

অঙ্গিন্১—(ত্রি) [অঙ্গ-ইন্ অস্ত্যর্থে] শরীরী, অঙ্গবিশিষ্ট। ২ প্রধান। "এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা।" (সাহিত্যদ°, ৬ অ°)

অঙ্গিন্২—বিশ্বামিত্র মুনিকুলে জাত ধর্ম্মরাজ নামক জনৈক নৃপতির পুত্র। (স্কন্দপু°, সহ্যাদ্রি ৩২.২৬)

অঙ্গিয়কুল—অঙ্গিয়বংশ। সাতবাহন বা অন্ধ্রবংশের স্থাপয়িতা সিমুক সাতবাহনের পুত্র শ্রীশাতকর্ণি ক্ষমতাশালী অঙ্গিয়বংশের রাজকন্যা নাগনিকাকে বিবাহ করেন। এই বংশের নৃপতিগণকে 'মহারঠি' বলা হইত। নাগনিকার পিতার নাম ছিল মহারঠি ত্রনকয়িরো কললায়। নানাঘাটের গুহায় ইঁহার নামাঙ্কিত একটী প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। প্রথমে ইঁহারা স্বাধীন ছিলেন, পরে সাতবাহন রাজাদিগের অধীন সামন্তরূপে গণ্য হন।

অঙ্গিয়ার, জেরাল্ড (Gerald Aungier)—একজন ইংরেজ শাসনকর্তা। অঙ্গিয়ার ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারিখে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে বোম্বাই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা বা গবর্ণর নিযুক্ত হন। ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়, কিন্তু সেইদিন পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সাধারণতঃ সুরাটেই থাকিতেন, তবে ১৬৭৩ হইতে ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অধিকাংশ সময় বোম্বাই নগরে যাপন করেন।

তাঁহারই অক্লান্ত চেষ্টার ফলে বোম্বাই একটী পর্ণকুটীরময় গ্রাম হইতে শহরে পরিণত হয়। তিনিই বোম্বাই দুর্গের ভিত্তি পত্তন করেন। তাঁহার পত্র হইতে জানা যায় যে, তিনি বোম্বাইয়ে বিভিন্ন দেশবাসী শ্রমিক ও বণিক্‌দিগকে বাস করিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করিতেন। তিনি এরূপ প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন যে, যে সকল বিদেশীয় ব্যক্তি বোম্বাইয়ে আসিয়া বসবাস করিতে চাহে, তাহাদিগকে তিনি আসিবার খরচা দিবেন এবং এক-বৎসরের জন্য তাহাদের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিবেন। এইরূপ প্রচেষ্টা না করিলে বোম্বাইয়ে হয়ত সেই সময়ে এত অধিক সংখ্যক ব্যক্তির বসতি হইত না।

বোম্বাইয়ে বিভিন্ন প্রদেশবাসী, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী যে সকল লোক বসতি স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদিগকে সুশাসনে রাখিয়া একতাসূত্রে বদ্ধ করাই ছিল অঙ্গিয়ারের জীবনের ব্রত।

এই গুরুতর সমস্যা সমাধানে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা পত্রাকারে লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল পত্র তাঁহার পরবর্ত্তী কালের শাসনকর্ত্তাদের অনেক উপকারে লাগিয়াছিল। অঙ্গিয়ারই সর্ব্বপ্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষকে বলেন যে, সুরাট হইতে বোম্বাইয়ে শাসনকেন্দ্র স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য। তিনি ১৬৭১ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে ঐ বিষয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সভাপতিকে এক পত্র লিখেন, কিন্তু ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।

অঙ্গিয়ার যখন সুরাটের ইংরেজ কুঠীর প্রধান পদে অধিষ্ঠিত, তখন মহারাজ শিবাজী দ্বিতীয়বার ঐ নগরী আক্রমণ করেন। অঙ্গিয়ার শিবাজীকে 'সয়তান' 'বিশ্বাসঘাতক শত্রু' 'দাক্ষিণাত্যের ভীষণ বিদ্রোহী' প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি শিবাজীর আক্রমণ হইতে সুরাটের ইংরেজকুঠী রক্ষা করিয়াছিলেন।

অঙ্গিয়ারের নিকট ভারতীয় শাসনপদ্ধতি দুইটী মহান্ অবদান পাইয়াছে। তিনি জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণকে ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাণীর ঘোষণা-পত্র হইতে উদার ধর্ম্মনীতির প্রবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া সাধারণের ধারণা, কিন্তু উহার প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে অঙ্গিয়ার কর্ত্তৃক ইহা ঘোষিত ও অবলম্বিত হইয়াছিল। নিমা পারক নামক বণিকের সহিত ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে মার্চ্চ তারিখে তিনি যে সন্ধি করেন, তাহার ষষ্ঠ ধারায় অঙ্গিয়ার প্রতিশ্রুতি দেন যে, ব্রাহ্মণ ও বণিক্‌গণ নিজ নিজ গৃহে ইচ্ছামত নিজেদের কুলধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম পালন করিতে পারিবে; তাহাদের বাসপল্লীতে কোন ইংরেজ, পর্ত্তুগীজ, খৃষ্টান বা মুসলমান বাস করিতে পাইবে না; কেহ পশুহত্যা করিতে পারিবে না। হিন্দুদিগকে কেহ অপমানিত বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিবে না। যদি কেহ তাহাদিগকে তাহাদের পল্লীর মধ্যে কোনরূপ উৎপীড়ন করে, তবে গবর্ণর বা তাঁহার প্রতিনিধির নিকট অভিযোগ করিলে উৎপীড়নকারীকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে। হিন্দুদের কাহাকেও কোনক্রমে খৃষ্টান হইতে বা তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে বাধ্য করা হইবে না।

তাঁহার দ্বিতীয় অবদান এই যে, তিনি পলাশীর যুদ্ধের আশীবৎসর পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিয়াছিলেন, ভারতে বাণিজ্য চালাইতে হইলে কেবল বণিক্‌ভাবে থাকিলে চলিবে না—একহাতে তরবারি এবং অন্য হাতে শান্তিচিহ্ন লইয়া ইংরেজদিগকে ভারতে বাণিজ্য করিতে হইবে—"In one hand the sword and another the olive branch।" বলা বাহুল্য এই নীতি অনুসরণ করিয়াই ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

অঙ্গির—(পুং) [অঙ্গিরস্ ও অঙ্গিরা দ্র°]। ২ তিত্তিরপক্ষী।

অঙ্গিরঃসংহিতা—(স্ত্রী) [অঙ্গিরঃস্মৃতি দ্র°]

অঙ্গিরঃস্মৃতি—একখানি প্রাচীন স্মৃতি। ইহা অঙ্গিরঃসংহিতা নামেও প্রসিদ্ধ। উনবিংশ স্মৃতির অন্যতম। যাজ্ঞবল্ক্য, পৈঠীনসী, বিজ্ঞানেশ্বর, মাধবাচার্য্য, হলায়ুধ, হেমাদ্রি প্রভৃতি এই স্মৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। কুলমণিশুক্ল ইহার টীকা রচনা করেন। বিজ্ঞানেশ্বরকৃত মিতাক্ষরায় এবং প্রায়শ্চিত্তময়ূখে মধ্যমাঙ্গিরসের উল্লেখ আছে। বৃহদঙ্গিরস নামক স্মৃতিগ্রন্থেরও সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রচলিত অঙ্গিরঃ-সংহিতায় চাতুর্ব্বর্ণের প্রায়শ্চিত্তবিধি বর্ণিত হইয়াছে। এই স্মৃতিখানি এক অধ্যায়ে সম্পূর্ণ এবং ইহাতে আপস্তম্বের মত গৃহীত হইয়াছে।

অঙ্গিরস্—(পুং) [অগি গতৌ অস্-ইরুট্; উণ্ ৪.২৩৫। অঙ্গতেরসিঃ ইরুড়াগমশ্চ] একজন ঋষি। [গ্রীক্ Aggolos, Aggaros; জাপানী—Akeira] ইনি অঙ্গির, অঙ্গিরা প্রভৃতি নামেও উক্ত হইয়াছেন। ঋগ্বেদের অনেক স্থলে ইঁহার স্তব বর্ণিত আছে। কোন স্থলে অগ্নির পরিবর্ত্তে ইঁহার নাম এবং ইঁহার পরিবর্ত্তে অগ্নির নাম গৃহীত হইয়াছে। কোথায়ও ইঁহাকে অগ্নির পুত্র (ঋক্ ১০.৬২-৫), আবার কোথায়ও বা অগ্নিকে ইঁহার পুত্ররূপে (ঋক্ ৫.৮.৪) বর্ণনা করা হইয়াছে। অগ্নি হইতেছেন অঙ্গিরাগণের আদি ঋষি, প্রথম ও সর্ব্বোত্তম (ঋক্ ১.৩১.১-২)। আবার অঙ্গিরা কর্ত্তৃক অগ্নির আবিষ্কারের

কথাও ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায় (ঋক্ ৫.১১.৬)। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, অগ্নি ও অঙ্গিরার মধ্যে অতিনিকট সম্পর্ক ছিল। এইজন্য ঋগ্বেদের ঋষিগণ ইঁহাকে অগ্নির সহিত অভেদরূপে পরিকল্পনা করিয়াছেন। শতপথ-ব্রাহ্মণের (১.৪.১.২৫) ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য ইহা সমর্থন করিয়াছেন। অবশ্য দুই এক স্থানে ইনি আদিত্যপুত্র বলিয়াও পরিচিত হইয়াছেন। (ঋক্ ৪.৩.১৫) গমনশীল রশ্মিরূপেও ইঁহাকে কল্পনা করিতে দেখা যায়। (ঋক্ ৬.৪৯.১১)

পণি অসুর কর্ত্তৃক গাভী অপহৃতা হইলে অঙ্গিরা ইন্দ্রের সহযোগিতায় ঐ গাভী উদ্ধার করেন। ঋগ্বেদের বহুমন্ত্রে এজন্য অঙ্গিরার গুণগান করা হইয়াছে। (ঋক্ ১.৬২.২-৩ ; ১.৭১.২) ইনি আবার পিতৃলোকগণেরও অন্যতম (ঋক্ ১০.১৪.৩-৫)। অথর্ব্ববেদে ইঁহাকে দ্বিরাত্র যাগের ঋষি (অথর্ব্বস° ৭.১.৪) ও মধ্যস্থান দেবতার অন্যতম ("বিশ্বদেবা অঙ্গিরসো বা"—অথর্ব্বস° ১০.৬২.৫) বলা হইয়াছে। সুতরাং অঙ্গিরা যে তেজঃপুঞ্জ ও মহাশক্তিশালী ছিলেন, তাহা তদুদ্দেশে রচিত বৈদিক মন্ত্রাদি হইতেই জানিতে পারা যায়।

বেদের নানাস্থানে বৃহস্পতি, গৌতম, অথর্ব্বন্ প্রভৃতি অঙ্গির-বংশোদ্ভব অঙ্গিরসগণের নাম পাওয়া যায়। ভাষ্যকার সায়ন লিখিয়াছেন, "অঙ্গিরসানাং ঋষীণাং সর্ব্বেষাং জনকত্বাৎ।" কিন্তু নিরুক্তকার যাস্কের মতে "অঙ্গিরা অঙ্গারাঃ" অর্থাৎ অঙ্গিরা অঙ্গার মাত্র। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে অঙ্গিরা বংশের সমস্ত উপাখ্যান কি কেবল উপমা মাত্র? ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে আদিত্যাদি দেবোৎপত্তি প্রসঙ্গে লিখিত আছে—প্রজাপতির রেতঃপিণ্ড দগ্ধ হইয়া অঙ্গার হইয়াছিল। সেই অঙ্গাররাশি হইতেই অঙ্গিরা নামক ঋষিগণের উৎপত্তি হয়। (ঐতরেয়ব্রা° ৩.৩৪) অগ্নি প্রথমে অঙ্গিরা ছিলেন, পরে দেব হয়েন ও অঙ্গিরাগণ তাঁহার সন্ততি এই আখ্যানের নিগূঢ় অর্থ কি? অঙ্গিরার সকল কথাই যে উপমা এরূপ বোধ হয় না। সুতরাং অঙ্গিরা নামে প্রকৃত একটী প্রাচীন ঋষিবংশ তৎকালে ছিল এবং সেই ঋষিগণের দ্বারাই ভারতে অগ্নিপূজা অনেকটা প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

পরম ঋষি অঙ্গিরা যে একজন অসাধারণ জ্ঞানী ও সুপণ্ডিত ছিলেন, তাহা অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষৎ হইতে জানিতে পারা যায়। ইনি ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী ছিলেন এবং মহামতি শৌনককে ঐ বিদ্যা প্রদান করেন। ইঁহার মতে, পরা ও অপরা বিদ্যা বোধগম্য হইলে সকল বিষয়েই সম্যক্ জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। (মুণ্ডকোপনিষৎ ১.১.১-৫)

বেদের অনেকস্থলে বসুগণ, রুদ্রগণ প্রভৃতি গণের ন্যায় অঙ্গিরাগণেরও কথা লিখিত আছে। তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণের একস্থলে আছে, সমৃদ্ধিলাভের নিমিত্ত ত্রয়স্ত্রিংশরাত্র যাগের মধ্যে এক-বিংশতিরাত্র যাগের ভাগ আদিত্যগণ এবং অবশিষ্ট দ্বাদশাহ যাগের ভাগ অঙ্গিরাগণ পাইয়া থাকেন। (তাণ্ড্যব্রা° ২৪.২.২) অপর একস্থানে আছে, সাদ্যঃক্র নামক পঞ্চাহ যাগ দ্বারা আদিত্য ও অঙ্গিরস উভয়েই 'আমি অগ্রে স্বর্গে যাইব' বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন। আদিত্য অযাস্য ঋষিকে উদ্গাতা পদে বরণ করিয়া এই যজ্ঞ সমাপনান্তে স্বর্গে গমন করেন; কিন্তু অঙ্গিরস যথাবিধি এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে না পারায় স্বর্গভ্রষ্ট হন। (তাণ্ড্যব্রা° ১৬.১২.১)

বিভিন্ন পুরাণাদি হইতে জানা যায়, অঙ্গিরা জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার মানসপুত্রগণের অন্যতম। ব্রহ্মার এই মানস সন্তানগণ লোকসৃষ্টির বিস্তারক। ইঁহাদিগের দ্বারা প্রজাসমূহ বিস্তারলাভ করিয়াছিল বলিয়া ইঁহারা প্রজাপতি শব্দে অভিহিত। এই মহর্ষিগণই লোকবিশ্রুত পিতৃগণ ও সপ্তর্ষির উদ্ভাবয়িতা। [ভৃগু, মরীচি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি ও বশিষ্ঠ দ্র°]

শিবপুরাণ (৯.৬৫-৭৫) ও পদ্মপুরাণ (সৃষ্টিখণ্ড, ৩ অ°) মতে ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু অত্রি, দক্ষ, মরীচি ও বশিষ্ঠ এই নয় জন ব্রহ্মার মানস পুত্র হইতে যে বংশধারা প্রবর্ত্তিত হয়, তাঁহারা পুরাণে "নব ব্রাহ্মণ" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই বংশের সকলেই ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ ও ব্রহ্মবাদী ছিলেন।

মহাভারতে বর্ণিত আছে, পূর্ব্বে ভগবান্ রুদ্র বারুণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে ব্রহ্মা হুতাশনে আহুতি প্রদানে ব্রতী ছিলেন। উপ-স্থিত দেবকন্যাগণকে দেখিয়া ব্রহ্মার রেতঃস্খলন হয় এবং তিনি সেই রেতঃ অগ্নিতে আহুতি দেন। সেই অগ্নিশিখা হইতে ভৃগু, সধূম অঙ্গার হইতে অঙ্গিরা এবং নির্ধূম অঙ্গার হইতে কবি উৎপন্ন হন। যজ্ঞীয় অগ্নি হইতে উৎপন্ন ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবি কাহার সন্তান বলিয়া পরিচিত হইবেন, ইহা লইয়া ব্রহ্মা, অগ্নি ও রুদ্রের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। দেবগণের মধ্যস্থতায় ব্রহ্মা কবিকে, রুদ্র ভৃগুকে ও অগ্নি অঙ্গিরাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ইঁহারা তিনজনেই 'আগ্নেয়' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

শিবপুরাণ (৫৬.৪০-৪২) ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও (৬৫.১৬-২১ ; ৪০-৪২) অঙ্গিরার উৎপত্তিকথা এইভাবেই সমর্থিত হইয়াছে। মহাভারতের একস্থানে আছে, অঙ্গিরা অতি তেজস্বী ছিলেন। একবার ইনি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। তপোবলে

তাঁহার শরীরের প্রভায় জগৎ ঢাকিয়া গেল। সেই সময়ে অগ্নিও তপস্যা করিতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন,—'তপস্যায় থাকায় আমার তেজ নষ্ট হইয়াছে। বোধ করি, ব্রহ্মা সে কারণ অন্য অগ্নির সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন।' তাহার পর হুতাশন দেখিতে পাইলেন, অঙ্গিরা অগ্নিসদৃশ হইয়া জগতে তাপ দিতেছেন। তখন অঙ্গিরা অগ্নিকে দেখিয়া বলিলেন—'আপনি শীঘ্র অগ্নি হইয়া নিজের অধিকার গ্রহণ করুন।' তাহাতে অগ্নি বলিলেন, 'তুমিই প্রথম অগ্নি হও এবং আমি প্রাজাপত্য নামে দ্বিতীয় অগ্নি হই।' অঙ্গিরা বলিলেন, 'আপনিই অগ্নি হউন এবং আমি আপনার প্রথম পুত্র হইব।' জাতবেদা অগ্নি অঙ্গিরার এই প্রার্থনা রক্ষা করিলেন। তদনন্তর অঙ্গিরার বৃহস্পতি নামে এক পুত্র জন্মে। (বনপর্ব্ব, ২১৬ অ°)

ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও লিঙ্গপুরাণ মতে অঙ্গিরা ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত হন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, অঙ্গিরা ব্রহ্মার দ্বাদশ মানসপুত্রের অন্যতম এবং তাঁহার মস্তক হইতে জাত। (ব্রহ্মাণ্ডপু°, ৯.১০১)। কূর্ম্মপুরাণেও (৭.৩২-৩৫) ইনি ব্রহ্মার মস্তক হইতে জাত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণের মতে ইনি ব্রহ্মার দ্বিতীয় পুত্র এবং মহাভারতে ইনি ব্রহ্মার তৃতীয় পুত্র বলিয়া কথিত।

বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও হরিবংশের অপর স্থলে লিখিত আছে, চাক্ষুষ মনুপুত্র উরুর ঔরসে ও আগ্নেয়ীর গর্ভে অঙ্গিরার জন্ম।

আবার শিবপুরাণ (১৮.৯৮) হইতে জানা যায়, বরাহকল্পে ইনি বেদবিভাজক, পুরাণ ও জ্ঞানপ্রদর্শক ব্যাস ছিলেন। বরাহকল্পের নবম দ্বাপরে মহাদেব ঋষভ নামে জগতে অবতীর্ণ হন। তখন তাঁহার চারি পুত্র জন্মে—পরাশর, ভার্গব, গর্গ ও অঙ্গিরা। একসময় শ্রীকৃষ্ণ ব্যাঘ্রপদ ঋষির আশ্রমে অঙ্গিরা মুনির নিকট পাশুপতযোগ লাভ করিয়া কঠোর তপস্যায় রত হন।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, ইনি দক্ষরাজের চব্বিশটী কন্যার মধ্যে স্মৃতিকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে সিনীবালী, রাকা, কুহূ ও অনুমতি নামে চারি কন্যা জন্মে। অঙ্গিরা 'অঙ্গিরঃ-সংহিতা' নামে একখানি ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করেন। ইহাতে প্রায়শ্চিত্ত ও দ্রব্যশুদ্ধির বিষয় বর্ণিত আছে। ইনি একসময়ে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট অথর্ব্ববেদ পাঠ করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করেন ও যজ্ঞভাগের অধিকারী হন। দেবরাজের অপর একটী বরে অথর্ব্ববেদ জগতে অথর্ব্বাঙ্গিরস নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

ভাগবত মতে, ইঁহার পত্নীর নাম শ্রদ্ধা ও মতি এবং মহাভারত মতে, শুভা। ইনি কশ্যপের স্বধা ও সতী নামে দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু ভাগবতে স্বধা ও সতীকে দক্ষ প্রজাপতির ৬০ কন্যার অন্যতমা বলা হইয়াছে এবং স্বধা হইতে পিতৃগণ ও সতী হইতে অঙ্গিরা নামে বেদের উৎপত্তি হয়।

আবার ব্রহ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—অঙ্গিরা অগ্নির কন্যা আত্রেয়ীকে বিবাহ করেন। আত্রেয়ীর গর্ভে আঙ্গিরস জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অত্যন্ত কঠোরভাষী ছিলেন। আত্রেয়ী আপনার শ্বশুর অগ্নির অনুরোধে স্বামীকে জলপ্লাবিত করিয়া শান্ত করেন। এইরূপ করিবার জন্য তাঁহাকে যে জলময় দেহ ধারণ করিতে হয়, তাহার নাম পরুষ্ণী নদী। এই নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।

সাম্বপুরাণ (১০.১৪) মতে, মরীচিকন্যা সুরূপাকে অঙ্গিরা বিবাহ করেন।

মৎস্যপুরাণে (১৯৬. ১-৫) লিখিত আছে, অঙ্গিরার ঔরসে ও মরীচিকন্যা সুরূপার গর্ভে আত্মায়ুঃ, দমন, দক্ষ, সদঃ, প্রাণ, হবিষ্মান্, গবিষ্ঠ, ঋত ও সত্য নামে সোমপায়ী দেবতা এবং বৃহস্পতি, গৌতম, সম্বর্ত্ত, উতথ্য, বামদেব, অজস্য ও ঋষিজ নামে গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। মার্কণ্ডেয় মুনিও যে অঙ্গিরার পুত্র, তাহাও মৎস্যপুরাণের অপরস্থলে (১৬৭.৪৩) উল্লিখিত হইয়াছে।

মহাভারত মতে, শুভার গর্ভে অঙ্গিরার এই কয়টী সন্তান হয়—১ বৃহৎকীর্ত্তি, ২ বৃহজ্জ্যোতি, ৩ বৃহদ্‌ব্রহ্মা, ৪ বৃহন্মনা, ৫ বৃহন্মন্ত্র, ৬ বৃহদ্ভাস ও ৭ বৃহস্পতি। অঙ্গিরার প্রথমা কন্যা দেবী ভানুমতী, ২ রাকা, ৩ সিনীবালী, ৪ অর্চ্চিষ্মতী, ৫ হবিষ্মতী, ৬ মহিষ্মতী ও ৭ কুহূ।

হরিবংশে অঙ্গিরার এই কয়টী পুত্রের নাম পাওয়া যায়—সত্য, চারুধিষ্ণ্য, উতথ্য, ধৃতিমান্, বৃহস্পতি, মার্কণ্ডেয় ও শুচি। হরিবংশের অন্য একস্থলে লিখিত আছে, নড্‌লার গর্ভজাত অঙ্গিরার উরু প্রভৃতি দশ পুত্রই ষষ্ঠ মনুর পুত্র। মৎস্যপুরাণ মতে, ব্রহ্মার দৌহিত্রী বীরিণীর গর্ভে চাক্ষুষ মনুর জন্ম। ঐ চাক্ষুষ মনু বৈরাজের কন্যা নড্‌লার গর্ভে উরু প্রভৃতি দশ পুত্র উৎপাদন করেন।

মার্কণ্ডেয়পুরাণ মতে, অঙ্গিরার ভূতি নামে এক কোপন-স্বভাব পুত্র এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মতে, উঁহার পত্নী স্মৃতি ভরতাগ্নি ও কীর্ত্তিমন্ত নামে দুই পুত্র প্রসব করেন।

বেদে ইঁহার কন্যার নাম ঋক্ বা বৈদিক স্তুতি।

ভাগবতে লিখিত আছে, কর্দ্দমমুনিকন্যা শ্রদ্ধার গর্ভে অঙ্গিরার চারি কন্যা জন্মে, ১ সিনীবালী, ২ কুহূ, ৩ রাকা, ৪ অনুমতি। (৪.১.৩৩-৩৯) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ (২৮.১৪-১৫) মতে অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতি হইতে উক্ত চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

ভাগবত হইতে আরও জানা যায়, অঙ্গিরা ঋষি ক্ষত্রিয়পতি রথীতরের স্ত্রীর গর্ভে কতিপয় সন্তান উৎপাদন করেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া পরিশেষে অঙ্গিরস নামে বিখ্যাত হন।

ঋগ্বেদে সুধন্বা নামে ইঁহার এক পুত্রের নাম পাওয়া যায়। সুধন্বার তিনপুত্র ঋভু, বিভু ও বাজ নিজ নিজ কর্ম্মফলে দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা সূর্য্যালোকবাসী ছিলেন। অঙ্গিরার এক পুত্র হিরণ্যস্তূপ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। অঙ্গিরার অপর পুত্রদিগের মধ্যে সব্য, বিন্দু, প্রভুবসু, বরুণ, বীতহব্য বা ভরদ্বাজ, বিরূপ, কৃষ্ণ, কুৎস, ঘোর, উতথ্য প্রভৃতি ঋগ্বেদের অনেক ঋকের রচয়িতা। অঙ্গিরার কন্যা এবং অসঙ্গের ভার্য্যা শশ্বতী ৮.১.৩৪ ঋকের বক্তা এবং ঋষি। অঙ্গিরা-গোত্রীয়গণের মধ্যে প্রিয়মেধ, ব্যশ্বের পুত্র বৈয়শ্ব বা বিশ্বমনা, বৃহৎমতি, নৃমেধ, অমহীয়ু প্রভৃতি ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন।

অঙ্গিরার বংশধরগণ অঙ্গিরস নামে খ্যাত এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে একটী আখ্যায়িকা আছে—একদা অঙ্গিরসগণ স্বর্গপ্রাপ্তিকামনায় যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তাঁহারা স্বর্গের পথ স্থির করিতে পারিলেন না। উঁহাদের মধ্যে কল্যাণ নামধেয় একজন অঙ্গিরস একদা 'স্বর্গের পথ কোথায়' চিন্তা করিতে করিতে গমনকালে ঊর্ণায়ুঃ নামক গন্ধর্ব্বের সাক্ষাৎলাভ করেন। ঐ ঊর্ণায়ুঃ হইতে তিনি স্বর্গপথপ্রদর্শক একটী সাম প্রাপ্ত হন। কিন্তু কল্যাণ অন্যান্য অঙ্গিরসদিগের নিকট ফিরিয়া আসিয়া গন্ধর্ব্বের কথা গোপন করিয়া বলিলেন, 'আমি নিজ হইতেই এই সাম লাভ করিয়াছি।' অতঃপর এই সাম স্তুতিদ্বারা কল্যাণ ব্যতীত অপর অঙ্গিরসগণের সকলেই স্বর্গলোকে গমন করেন। কিন্তু কল্যাণ মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগহেতু কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া পৃথিবীতেই অবস্থান করিলেন। (তাণ্ড্যব্রা° ১২.১১.১০)

অবস্তার অন্তর্গত গাথ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাওয়া যায়, জরথুস্ত্রস্পিতম অগ্নি-যাজকদিগকে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন এবং আপন অঙ্গ্র নামক সম্প্রদায়কে ঋত্বিগ্‌দিগের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। পারসীক 'অঙ্গ্র' ও বৈদিক প্রজাপতি অঙ্গিরা এ দুই জনই এক, এইরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। বেদসংহিতায় অগ্নিদেবের সহিত অঙ্গিরার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে এবং স্থানবিশেষে অগ্নিদেবকে অঙ্গিরা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। (ঋক্ ১.৩১.১-২) অগ্নির সহিত অঙ্গিরার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, তিনি সময়বিশেষে অনেকস্থলে অগ্নির প্রতিনিধিস্বরূপ দেবকার্য্য সমাধা করিতেন, এইরূপ বহুতর প্রসঙ্গ বেদ ও নিরুক্ত প্রভৃতির অনেকস্থলে আছে। এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে 'অঙ্গ্র' ও 'অঙ্গিরা' যে এক, ইহাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না। পারসীক ও হিন্দুরা যখন সম্মিলিত ছিলেন, তখন তাঁহাদেরই বংশ-পরম্পরাক্রমে এইরূপে অগ্নির উপাসনা প্রচলিত হইয়াছে, এই অনুমান অসঙ্গত নহে। [পারস্য দ্র°]



অকেইরা (অঙ্গিরা)

জাপানের দেবতা অকেইরা (Akeira) সম্ভবতঃ অঙ্গিরা হইতে অভিন্ন। উপরে অকেইরার একটী চিত্র দেওয়া হইল।

জ্যোতিষশাস্ত্রের অনেকস্থলে অঙ্গিরা বৃহস্পতিগ্রহের পরিবর্ত্তে অভিহিত হইয়াছেন। ইনি সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্তর্গত একটী নক্ষত্ররূপে উত্তর-পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া থাকেন। [অঙ্গিরা৩ দ্র°]

অঙ্গিরস১—(পুং) অঙ্গিরার বংশধরগণ। কোন কোন স্থলে ইঁহারা অগ্নিপুত্র বলিয়া অভিহিত। অঙ্গিরা ঋষির ন্যায় ইঁহারাও যজ্ঞভাগ পাইয়া থাকেন। শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে, অঙ্গিরস ও আদিত্যগণ প্রজাপতির বংশসম্ভূত। পৌরাণিক মতে অঙ্গিরসের মধ্যে কেহ কেহ ক্ষত্রিয় এবং কেহ কেহ ব্রাহ্মণ।

অথর্ব্ববেদের মন্ত্রগুলির নাম অঙ্গিরস। তজ্জন্য অঙ্গিরা-বংশীয়গণ অথর্ব্ববেদের যজ্ঞসকল রক্ষা করিতে নিযুক্ত হন। এই কারণে কিংবা অথর্ব্ববংশধরদিগের সঙ্গে ইঁহাদের মিত্রতা প্রযুক্তই হউক, ইঁহারা অথর্ব্বাঙ্গিরস নামে বিখ্যাত। [অথর্ব্বাঙ্গিরস দ্র°]

অঙ্গিরস২—(পুং) বিশ্বামিত্রকুলে জাত সোমবংশীয় জনৈক রাজা। ইনি হয়ের পুত্র ও বাহুকের পিতা। (স্কন্দপু°, সহ্যাদ্রি° ৩২.১০)

অঙ্গিরস৩—(পুং) গোত্রবিশেষ।

অঙ্গিরসাময়ন—(স্ত্রী) যজ্ঞভেদ। (কাত্যায়ন-শ্রৌত° ২৪.৪.১০)

অঙ্গিরস্তম—(ত্রি) অঙ্গিরাগণের শ্রেষ্ঠ। (ঋক্ ১.৭৫.২)

অঙ্গিরস্বৎ—(ত্রি) [অঙ্গিরা (অগ্নিঃ) সহায়ত্বেন বিদ্যতে অস্য মতুপ্ মস্য ব। ন পদত্বং সান্তত্বাৎ] বায়ু।

অঙ্গিরা$_1$—(পুং) [অঙ্গিরস্ দ্র°]। ২ অগ্নি। ৩ অঙ্গিরার গোত্রাপত্যগণ। ৪ অথর্ব্ববেদের মন্ত্রসকল। ৫ অথর্ব্ব-মন্ত্রবিৎ ঋত্বিক্।

অঙ্গিরা$_2$—(পুং) ইনি হিন্দুদিগের সংবৎসরের দেবতা। ষষ্টি সংখ্যক সংবৎসরের ষষ্ঠ সংবৎসরের নাম অঙ্গিরা। অপরাপর সংবৎসরগুলির ন্যায় ইঁহারও মূর্ত্তি কল্পনা হইয়াছিল। হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে (প. ২০৫) অঙ্গিরার ধ্যান পাওয়া যায়। যথা—

"অঙ্গিরাখ্যস্ততঃ ষষ্ঠো বর্ণশুভ্রোঽতিলোমশঃ।
তাম্রবর্ণো মহাতেজা দ্বাদশাঙ্গঃ সচন্দনঃ॥
পবিত্রদর্ভপাণিস্ত জটামণ্ডিতমস্তকঃ।
জ্ঞানখড়্গং তু দক্ষাগ্রে দ্বিতীয়ে সমিধং করে॥
বামাদিকে শরাবং তু ব্রহ্মদণ্ডং দ্বিতীয়কে।
দধৎ সুপূজিতো ভূত্যৈ শ্রেয়সে চ সুখায় চ॥"

অর্থাৎ অঙ্গিরা স্বভাবতঃ শুভ্রবর্ণ, অতিলোমশ, অত্যন্ত তেজঃশালী বলিয়া তাঁহাকে তাম্রাভ দেখা যায়। বৎসরের দ্বাদশ মাস তাঁহার অঙ্গ। দেহ চন্দনচর্চ্চিত। হস্তে তাঁহার পবিত্র দর্ভ। মস্তকে জটাজূট। দক্ষিণের এক হাতে জ্ঞান-খড়্গ, অন্য হাতে সমিধ্। বামদিকের এক হস্তে শরাব এবং অন্য হস্তে ব্রহ্মদণ্ড। ইনি যথাবিধি পূজিত হইয়া সুখৈশ্বর্য্য ও শ্রেয়ো দান করেন।

অঙ্গিরা$_3$—(পুং) সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্যতম নক্ষত্রবিশেষ। বৃহৎসংহি-তায় সপ্তর্ষিচারে লিখিত আছে, সপ্তর্ষিগণ ধ্রুবনক্ষত্ররূপ নায়কের উপদেশে উত্তরদিগাকাশে ইতস্ততঃ নৃত্য করিয়া বেড়ান। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে ইঁহারা মঘা নক্ষত্রে অবস্থিত ছিলেন। এক একটী নক্ষত্রে ইঁহারা শতবর্ষ বিচরণ করেন। পূর্ব্বভাগে ভগবান্ মরীচি, মরীচির পশ্চিমদিকে বশিষ্ঠ, তৎপরে অঙ্গিরা, তদনন্তর অত্রি, তন্নিকটবর্ত্তী পুলস্ত্য, পুলহ, ও ভগবান্ ক্রতু যথাক্রমে পূর্ব্বাদি দিকে অবস্থিত। উল্কা, অশনি ও ধূমাদি দ্বারা হত, বিবর্ণ, জ্যোতিহীন ও হ্রস্ব হইলে, তাঁহারা নিজ নিজ বর্গ নাশ করিয়া থাকেন এবং বিপুল ও স্নিগ্ধ হইলে স্ব স্ব বর্গ বৃদ্ধি করেন। অঙ্গিরা উপহত হইলে জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এবং ব্রাহ্মণসকল বিনষ্ট হয়।

জ্যোতিষ গ্রন্থের স্থলবিশেষে বৃহস্পতিকে অঙ্গিরা বলা হইয়াছে।

অঙ্গিরা$_4$—(পুং) অঙ্গিরঃসংহিতা নামক স্মৃতিগ্রন্থের প্রণেতা। [অঙ্গিরঃস্মৃতি দ্র°] ইনি মন্বাদি ঊনবিংশ সংহিতাকারের অন্যতম।

অঙ্গিরা$_5$—(পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। ইঁহার গোত্র তিন শাখাতে বিভক্ত। যথা—কেবলাঙ্গিরস, গৌতমাঙ্গিরস ও ভরদ্বাজাঙ্গিরস।

অঙ্গিরা$_6$—(পুং) গোত্রভেদ।

অঙ্গিরাগণ—(পুং) মহর্ষি অঙ্গিরার পত্নী আত্রেয়ীর গর্ভে ইঁহারা জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা আদিত্যদিগের যাজন কার্য্য করিয়া গৌতমী নদীর দক্ষিণতীরস্থ ভূমি দক্ষিণাস্বরূপ প্রাপ্ত হন। এইস্থানে কপিলাতীর্থ বিদ্যমান। (ব্রহ্মপু°)

অঙ্গিরাবৃত—(পুং) পরাক্রমশালী দানবভেদ। (ব্রহ্মাণ্ডপু°, ৬৮.৫)

অঙ্গীকরণ—(ক্লী) [অঙ্গ-চ্বি-কৃ-অন্-ল্যুট্] স্বীকৃত হওন।

অঙ্গীকার—(পুং) [অঙ্গ-চ্বি-কৃ-ঘঞ্। অভূততদ্ভাবে চ্বি বিহিত হইলে অবর্ণান্ত অঙ্গের পর ঈকার আদেশ হয়] স্বীকার, গ্রহণ। পর্য্যায়—সম্বিৎ, আগূ, প্রতিজ্ঞান, নিয়ম, আশ্রব, সংশ্রব, অভ্যুপগম, সমাধি ও প্রতিশ্রব।

অঙ্গীকার্য্য—(ত্রি) [অঙ্গী-কৃ-ণ্যৎ] স্বীকার্য্য, গ্রহণীয়।

অঙ্গীকৃত—(ত্রি) স্বীকৃত। "অঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি।" (চৌরপঞ্চা°) পর্য্যায়—উরীকৃত, উররীকৃত, আশ্রুত, প্রতিজ্ঞাত, সংগীর্ণ, বিদিত, সংশ্রুত, সমাহিত, উপশ্রুত, উপগত, প্রতিশ্রুত, অভ্যুপগত। (অমর)

অঙ্গীভূত—(ত্রি) যাহা অঙ্গস্বরূপ হইয়াছে, অবয়বীভূত।

অঙ্গু—(পুং) [অগি-উন্। ইদিতো নুম্] হস্ত, হাত।

অঙ্গুটী—(পুং) [দেশজ] অঙ্গুরী, আংটী। [অঙ্গুরী দ্র°]

অঙ্গুণ—(পুং) বার্ত্তাকু, বেগুন।

অঙ্গুত্তরনিকায়—বৌদ্ধ ত্রিপিটক মধ্যে সুত্তপিটকের অন্তর্গত ৪র্থ নিকায়। [ত্রিপিটক ও নিকায় দ্র°]

অঙ্গুত্তরনিকায়ে সর্ব্বসমেত ৯৫৫৭টী সুত্ত বা সূত্র আছে। অবশ্য অনেকস্থলে একই কথা বার বার উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা—প্রথম অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ বিভাগে লেখা আছে—"ইঁহারাই আমার প্রধান ভ্রাতা। ভ্রাতাদিগের মধ্যে 'অঞ্ঞ্ঞ্ঞা কোদঞ্ঞ্ঞ'ই সর্ব্বপ্রধান।" এইরূপ আশীজন শিষ্যের নাম করিয়া ৮০ বার একই সূত্র লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক এই সব সূত্র বাদ দিলে ইহার সূত্রসংখ্যা ২৩০০ হয়।

সূত্রগুলি সব সমান নাই। এক পঙ্ক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া কোন কোন সূত্র তিন চারি পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া লিখিত আছে। তবে অধিকাংশ সূত্রই অত্যন্ত ক্ষুদ্র। 'অঙ্গুত্তরনিকায়' শব্দের অর্থ 'ক্রমবর্দ্ধনশীল সংখ্যানুযায়ী বাক্যাবলী,' অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্মের বা ধর্ম্মাচারের যে যে বিষয়গুলির প্রকারভেদে শ্রেণীবিভাগ করা চলে, সেই বিষয়গুলি ইহাতে ক্রমানুসারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের মনস্তত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব ও আত্মসংযমের বিশদ উপায়গুলির অধিকাংশই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

অঙ্গুত্তরনিকায় এগার অধ্যায়ে বিভক্ত এবং এই অধ্যায়-গুলি এরূপভাবে শ্রেণিবদ্ধ যে, যে সকল বস্তুর একটী মাত্র করিয়া প্রকার আছে, সেই গুলির বিষয় প্রথম অধ্যায়ে, যে গুলির দুইটী করিয়া প্রকার আছে, সেইগুলি দ্বিতীয় অধ্যায়ে; এইরূপভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুই প্রকার বুদ্ধের কথা এবং একাদশ অধ্যায়ে নির্ব্বাণলাভের একাদশটী আবশ্যকীয় গুণাবলী, সাধুভাবে জীবনযাপনের একাদশটী বৃত্তি ইত্যাদি আলোচিত হইয়াছে। এই নিকায়ের এইরূপ বিভাগ বাইবেলের দশটী অনুজ্ঞা (Ten commandments), সপ্তমহাপাতক (Seven deadly Sins), ঊনচত্বারিংশ নিয়মাবলী (Thirty-nine Articles) ইত্যাদির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ইহার প্রথম দুইটী অধ্যায় কথোপকথনচ্ছলে লিখিত হইয়াছে।

সূত্রমাত্রই যেরূপ 'স্বল্পাক্ষর' হইয়া থাকে, এই সূত্রগুলিও সেইরূপ। ধর্ম্মাচার্য্যগণ শিষ্যদিগকে এই সূত্রগুলির অর্থ বিশদ-ভাবে বুঝাইয়া দিতেন এবং সেই ব্যাখ্যাগুলি গুরুপরম্পরায় লোকমুখেই প্রচারিত হইত। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে বুদ্ধঘোষ ঐ সকল ব্যাখ্যা সঙ্কলন করিয়া 'মনোরথপূরণী' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। [বুদ্ধঘোষ দ্র°]

অঙ্গুত্তর নিকায়ের মধ্যে অনেক সূত্র ও শ্লোক আছে—যাহা অপরাপর ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় এবং অনেক স্থলে তাহা অপর পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, এই নিকায়টী যত প্রাচীন বলিয়া পরিচিত, প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে।

অঙ্গুরি, অঙ্গুরী—(স্ত্রী) [অঙ্গ-উলি। *। বালমূললঘ্বলমঙ্গুলীনাং বা লো রত্বমাপদ্যতে। উণ্ ১.২৯। বাল মূল লঘু অলম্ ও অঙ্গুলি এই সকল শব্দের লকার স্থানে বিকল্পে রেফ হয়] অঙ্গুলি, আঙ্গুল। ২ অঙ্গুলির ভূষণ, চলিত আঙ্‌টী। পর্য্যায়—অঙ্গুরীয়, অঙ্গুরীয়ক, অঙ্গুলীয়, অঙ্গুলীয়ক, ঊর্ম্মিকা, মুদ্রিকা, খাদি।

অঙ্গুরীয় সাধারণতঃ স্বর্ণ, রৌপ্য পিত্তল ও কাঁসায় নির্ম্মিত। ধনীলোকেরা সোণা বা রূপার আঙ্‌টীর উপর হীরা প্রভৃতি বহুমূল্য পাথর বসাইয়া তাহা পরিধান করেন। প্লাটিনাম নির্ম্মিত অঙ্গুরীও অধুনা ব্যবহৃত হইতেছে। অনামিকা অঙ্গুলিতেই সকলে এই অলঙ্কার পরেন; কিন্তু যাঁহারা ঐশ্বর্য্যশালী, তাঁহাদের দুই হাতেরই কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলিতে যোড়া যোড়া আঙ্‌টী। ইতর লোকেরা ঝুটা পাথর ও কাচ বসানো আঙ্‌টী হাতের ও পায়ের অঙ্গুলিতে পরিয়া থাকে।

বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অষ্ট ধাতুর আঙ্‌টী ব্যবহার করেন। পূর্ব্বকালের মুনিঋষিরা কুশের অঙ্গুরী পরিতেন। তাই এখনও কোন হিন্দুর ঘরে দৈবক্রিয়ার সময় কুশের অঙ্গুরী পরিতে হয়। নহিলে জল শুদ্ধ হয় না। অঙ্গুরী ধারণের স্মৃত্যুক্ত ব্যবস্থা আছে। যথা—

"তর্জ্জনী রৌপ্যসংযুক্তা হেমযুক্তা অনামিকা।"

অর্থাৎ—তর্জ্জনী অঙ্গুলিতে রূপার এবং অনামিকায় সোণার আঙ্‌টী ধারণ করিবে।

বাতশিরা রোগে অনেকে অষ্টধাতুর আঙ্‌টী পরিয়া থাকেন। অনেকে মনে করেন, পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলে লোহার কিংবা অপর কোন ধাতুর আঙ্‌টী ধারণ করিলে জলদোষের পীড়া হয় না। তাই, বোধ হয় এ দেশের রমণীগণ গর্ভবতী হইলে অনেকে পায়ের বুড়া আঙ্গুলে রূপার 'আঙট্' পরিয়া থাকেন। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা বলেন যে, 'আঙট্' পরা থাকিলে কোন অশুদ্ধ বস্তু ডিঙ্গাইয়া গেলে কিংবা স্পর্শ করিলে, গর্ভিণীকে কোন দোষ স্পর্শে না। একশিরা রোগে অনেকে বনরুইয়ের আঁইসের আঙ্‌টী পরিয়া থাকেন।

বিশুদ্ধ পারদনির্ম্মিত অঙ্গুরীও রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপকারী। [পারদ দ্র°]

এক্ষণে কলিকাতার অনেক স্থলে বৈদ্যুতিক (Electro-galvanic) অঙ্গুরী বিক্রয় হইতেছে। শুনা যায়, সুস্থ শরীরে এই অঙ্গুরী ব্যবহার করিলে ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক পীড়া স্পর্শ করিতে পারে না।

আমাদের কোন বন্ধু পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, যদি প্রকৃত বৈদ্যুতিক অঙ্গুরী বা কবচ প্রস্তুত করিয়া বহুদিনের পুরাতন রোগীকে ধারণ করিতে ব্যবস্থা দেওয়া যায়, তাহা হইলে চিকিৎসা-বহির্ভূত রোগ হইলেও অনেক স্থলে আরোগ্য হইয়া থাকে। এক্ষণে বিলাতে এই প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে।

অঙ্গুরী মানবের অঙ্গভূষণরূপে বহুকালাবধি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ভারতে যে অতি প্রাচীনকাল হইতে অঙ্গুরীর বহুল প্রচলন ছিল, তাহা আমরা বেদ পুরাণ রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি। ঋগ্বেদে অঙ্গুরী বুঝাইতে 'খাদি' শব্দ বহুস্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। (ঋক্ ১.১৬৬.৯; ৫.৫৪.১১; ৭.৫৬.১৩; ৫.৫৩.৪; ১.১৬৮.৩) "স্থাবো ন স্তুভিশ্চিতয়ন্ত খাদিন" (ঋক্ ২.৩৪.২) এইস্থলে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য "খাদি" শব্দের অপর অর্থ ধরিয়াছেন 'কটক'। কটক শব্দের অর্থ হইতেছে অঙ্গুরী বা বলয়। মরুদ্‌গণ "হিরণ্য-খাদয়ঃ" এই কথা শাঙ্খায়নশ্রৌতসূত্রেও (৩.৫.১৩; ৮.২৩.৬) পাওয়া যায়। সায়ণ 'খাদি' শব্দের 'হস্তত্রাণকটক' প্রভৃতি অর্থও ব্যবহার করিয়াছেন। বোথ্‌লিঙ্ক ও রথ এবং মনিয়ার উইলিয়মস্‌ও উহার অঙ্গুরী ও বলয় অর্থ ধরিয়াছেন।

রামায়ণে এখনকার শিলআঙ্‌টীর মত নামাঙ্কিত অঙ্গুরীর

প্রমাণ পাওয়া যায়। রামচন্দ্র নিজ নামাঙ্কিত অঙ্গুরী হনুমানের হস্তে দিয়াছিলেন। হনুমান্ সীতার নিকট গিয়া সেই অঙ্গুরী দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—

"বানরোঽহং মহাভাগে দূতো রামস্থ ধীমতঃ।
রামনামাঙ্কিতং চেদং পশ্ব দেব্যঙ্গুলীয়কং॥"
(রামায়ণ, ৫.৩২)

হে মহাভাগে! আমি ধীমান্ রামের দূত। এই দেখুন রামনামাঙ্কিত সুন্দর আঙ্‌টী।

মুদ্রিকা অর্থাৎ মোহর অঙ্গুরীর কথা মহাভারতেও পাওয়া যায়। হস্তিনাপুরে দ্রোণাচার্য্য কূপের ভিতর আপনার আঙ্‌টী ফেলিয়া দিয়া ইষিকাদ্বারা তাহা উপরে তুলিয়াছিলেন।

"বীটাঞ্চ মুদ্রিকাঞ্চৈব হ্যহমেতদপি দ্বয়ং।
উদ্ধরেয়মিষীকাভিঃ * * *।" (মহাভা° ১.১৩১.২৪)।

কালিদাসও এই আঙ্‌টীর জন্য শকুন্তলাকে লইয়া হুলুস্থূল বাধাইয়াছিলেন। রাজা দুষ্মন্ত নিজ নামাঙ্কিত অঙ্গুরী অভিজ্ঞানের নিমিত্ত শকুন্তলাকে প্রদান করেন। শকুন্তলা ঐ আঙ্‌টী লইয়া পতিগৃহে যাইবার কালে ভ্রমক্রমে নদীতে ফেলিয়া আসেন। রাজসভায় দুষ্মন্ত যৎকালে শকুন্তলার নিকট নিদর্শন চাহেন, শকুন্তলা আঙ্‌টী দেখাইতে পারিলেন না। দুষ্মন্ত পরস্ত্রী মনে করিয়া শকুন্তলাকে ত্যাগ করিলেন। পুনরায় একজন জেলে নদী হইতে মাছ ধরিবার কালে সেই আঙ্‌টী প্রাপ্ত হয়। সেই অঙ্গুরীতে দুষ্মন্তের নাম লেখা থাকায় ধীবর যেমনি বিক্রয় করিতে আসিবে, অমনি রাজপুরুষেরা তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। আঙ্‌টী পুনরায় রাজার কাছে গেল। আঙ্‌টী দেখিয়া রাজার গতস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তখন জানিতে পারিলেন যে, শকুন্তলা তাঁহারই প্রিয়তমা পত্নী।

সংস্কৃত শাস্ত্রের বহুস্থানে অঙ্গুরীয় অর্থে অঙ্গুলী, অঙ্গুলীয়ক, ঊর্মিকা প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

ভারতের ন্যায় অন্যান্য দেশসমূহেও পূর্ব্বকাল হইতেই অঙ্গুরীর ব্যবহার আছে। কবচ, মুদ্রা (মোহর) ও অলঙ্কার এই তিন ভাবে পূর্ব্বকালে অঙ্গুরীর ব্যবহার হইত। বর্ত্তমানকালে লোকে ইহা প্রধানতঃ অলঙ্কারস্বরূপই পরিধান করে। পূর্ব্বে স্পার্টার মাজিষ্ট্রেট্গণ রাষ্ট্রীয় দলিলাদি অঙ্গুরীয় দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করিতেন। গ্রীক্ ইতিবৃত্তপাঠে জানিতে পারা যায় যে, ইহারও পূর্ব্বে অঙ্গুরীয়ক রাজকীয় অলঙ্কাররূপে পরিগণিত হইত। এই উপলক্ষে মিনসের এবং সামসের রাজা পলিক্রাটসের অঙ্গুরীয়ক সম্বন্ধে উপকথা উল্লেখযোগ্য। রোমে সামরিক গৌরব অর্জ্জন করিলে সৈন্যগণ অঙ্গুরীয়ক ধারণ করিবার অধিকার লাভ করিত। জাস্ আন্নুলি অরেই নামক আইনে (Jus Anuli Aurei) ইহার ব্যবহার সীমাবদ্ধ করিয়াছিল। কথিত আছে যে, যখন কানীর যুদ্ধক্ষেত্রে হানিবল অধিকাংশ রোমকসৈন্য নিহত করেন, তখন সেই মৃত রোমকসৈন্যদিগের অঙ্গুলি হইতে বহুসংখ্যক অঙ্গুরীয়ক খুলিয়া লইয়া হানিবলের দূত কার্থেজ নগরের রাষ্ট্রীয় সভায় বস্ত্রাঞ্চল হইতে যুদ্ধজয়ের নিদর্শনস্বরূপ তাহা ঢালিয়া ফেলিয়া সভ্যদিগকে বিস্মিত এবং যুদ্ধে উৎসাহিত করেন।

রোমকসম্রাট্দিগের অঙ্গুরীয়ক রাষ্ট্রীয় কার্য্যে মুদ্রাস্বরূপ ব্যবহৃত হইত। অঙ্গুরীয়ক বর্ত্তমানকালে বহু জাতির মধ্যে বিবাহে কিংবা বাগ্দানে প্রদত্ত হইয়া থাকে। রোমকদের মধ্যে পূর্ব্বে বাগ্দানে লৌহাঙ্গুরী ব্যবহৃত হইত। খৃষ্টীয় ২য় শতক হইতে তৎপরিবর্ত্তে স্বর্ণাঙ্গুরীর প্রচলন হয়।

ইংরেজগণ মাঝে মাঝে অভিষেকের অঙ্গুরীয়ককে 'ইংলণ্ডের বিবাহের অঙ্গুরীয়ক' বলিয়া থাকেন। ভেনিসের ডোজ্ (Doge) প্রতি বৎসর একটী করিয়া অঙ্গুরীয়ক সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতেন। আদ্রিয়াতিকের সহিত ভেনিসের বিবাহ উৎসবের ইহাই নিদর্শন। এই উৎসব প্রতি বৎসর Ascension দিবসে অনুষ্ঠিত হইত।

ইংলণ্ডে একটী কুসংস্কার আছে, রাজাঙ্গুরীয়ক যত শক্ত ভাবে সংশ্লিষ্ট হয়, ততই রাজা জনপ্রিয় হইবেন এবং তাঁহার রাজ্যকাল দীর্ঘকালস্থায়ী হইবে।

আমাদের দেশের ন্যায় অন্যান্য দেশেও অঙ্গুরীয়ক অনেক সময়ে অভিজ্ঞানরূপে ব্যবহৃত হইত। আলেক্সান্দার তাঁহার মৃত্যুশয্যায় স্বীয় অঙ্গুরীয়ক পারদিক্কাসকে প্রদান করেন। এই দানের দ্বারা তিনি পারদিক্কাসকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন আংগ্লো-সাক্সন্ রাজা ওফ্ফা অঙ্গুরীয়ক প্রেরণ করিয়া তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন।

অঙ্গুরীয়ক কখনও প্রতিশ্রুতির নিদর্শনস্বরূপ কখনও বা আদেশজ্ঞাপকরূপে ব্যবহৃত হইত। স্কট্লণ্ডের রাণী মেরিষ্টুয়ার্ট অঙ্গুরীয়ক প্রেরণ করিয়া দুইটী নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড রহিত করিয়া দেন। এস্থেরের পুস্তকে (Book of Esther) লিখিত আছে, আহাসেউরুস্ হামানকে একটী অঙ্গুরী প্রদান করেন, যাহার বলে বলীয়ান্ হইয়া তিনি বহুসংখ্যক ইহুদীকে হত্যা করিয়াছিলেন।

প্রাচীনকালের যে সকল অঙ্গুরী পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে মিশরে আবিষ্কৃত অঙ্গুরীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ১৮শ ও ২০শ রাজবংশের সময় মিশরে অতি সুন্দর অঙ্গুরী ব্যবহৃত হইত।

ঐ সকল অঙ্গুরী বিশুদ্ধ সুবর্ণনির্ম্মিত, ভারী ও অল্পকারুকার্য্য-খচিত। অনেকস্থলে আবার ইহার উপর মালিকের নাম ক্ষোদিত থাকিত। রৌপ্য, ব্রোঞ্জ, কাচ, শ্বেতমৃত্তিকা নির্ম্মিত অঙ্গুরীরও প্রচলন ছিল। প্রাচীন বাবিলন ও অসুরীয়দেশে অঙ্গুরী ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়।

ক্রীট্, মাইসেনি, ফিনিসিয়া প্রভৃতি দেশেও বিভিন্ন প্রকার অঙ্গুরী ব্যবহৃত হইত।

গ্রীসে পূর্ব্বকালে যে সকল স্বর্ণাঙ্গুরী প্রস্তুত হইত, সেগুলির মণিবেষ্টনী চেপ্টা ও তাহাতে কোন প্রকার মূর্ত্তি ক্ষোদাই করা হইত। আবার ফিনিসীয় ধরণে প্রস্তুত সচল মণিবেষ্টযুক্ত অঙ্গুরীর ব্যবহারও তৎকালে ছিল।

রোমে সাধারণতন্ত্রের শাসনকালে সাধারণলোকে লৌহনির্ম্মিত অঙ্গুরী ব্যবহার করিত। স্বর্ণাঙ্গুরী শুধু রাজদূত, কন্সাল, সেনেটের সভ্য এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরাই ব্যবহার করিতে পারিতেন। এই সকল প্রাচীন অঙ্গুরী অনেক সময়ে দেবমন্দিরের দেবতার উদ্দেশ্যে দান করা হইত। অঙ্গুরী সম্বন্ধে নানা আইন রোমে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। প্লিনি লিখিয়াছেন, সম্রাট্ টাইবেরিয়াস এক নিয়ম করেন, তদনুসারে যে সমস্ত লোক রাজবংশে বা স্বাধীন বংশ হইতে জন্মগ্রহণ করে নাই, তাহারা সুবর্ণাঙ্গুরী ব্যবহার করিবার উপযুক্ত কিনা, তাহা তাহাদের সম্পত্তির মূল্য দেখিয়া নির্দ্ধারিত হইত। এই সকল আইন পরে তুলিয়া দেওয়া হয়।

খৃষ্টীয় ৩য় ও ৪র্থ শতকে রোমে ব্যবহৃত কএকটী অঙ্গুরী পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে খৃষ্ট ও খৃষ্টধর্ম্মের আনুষঙ্গিক চিহ্ন অঙ্কিত আছে।

ইউরোপের মধ্যযুগে অঙ্গুরীয়ক এবং ক্রুশ একটী তুমুল আন্দোলনের বিষয় হইয়া পড়ে। ফিউডাল বা সামন্ত যুগে ইউরোপে রাজা ভূমির মালিক বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। রাজার নিকট হইতে যেমন তাহার অধীনস্থ সামন্তগণ (Duke, Marquis, Earl, Baron) ভূমি পাইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতেন, সেইরূপ চুক্তিতে ধর্ম্মযাজকদিগকেও রাজা ভূমি দান করিতেন। মধ্যযুগে ইউরোপে ধর্ম্মবিশ্বাস অতিশয় প্রবল ছিল। সেইজন্য সাধারণ লোকে ধর্ম্মযাজকদিগকে প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করিত। রাজা সাধারণ লোকের নিকট ভূমির পরিবর্ত্তে নানারূপ দাবী দাওয়া করিতে পারিতেন। সে দাবীদাওয়াগুলি প্রত্যেক দেশের আইনানুসারে বিধিবদ্ধ ছিল। সাধারণ ভূম্যধকারীদিগের নিকট হইতে তিনি যুদ্ধের সময় ব্যক্তিগত সাহায্যের দাবী করিতে পারিতেন। কিন্তু ধর্ম্মযাজকদিগের নিকট তিনি এইরূপ দাবী করিতে পারিতেন না। সেইজন্য সম্রাট্গণ ভূম্যধিকারী-ধর্ম্মযাজক-দিগকে অঙ্গুরীয়ক এবং ক্রুশ দিয়া তাঁহাদিগকে একদিকে ভূমি-সত্ব দান ও অপরদিকে তাঁহাদিগকে পৌরোহিত্য পদে প্রতিষ্ঠিত করিতেন। সম্রাটের নিকট হইতে তাঁহারা অঙ্গুরীয়ক এবং ক্রুশ লাভ করিতেন বলিয়া এই অনুষ্ঠানটী তাঁহাদের বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ বিবেচিত হইত। এই অনুষ্ঠান লইয়া কএক শতাব্দী ধরিয়া পোপ এবং সম্রাটের মধ্যে অতিশয় বিরোধের সৃষ্টি হয়। ১০৭৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ চতুর্থ হেন্‌রী ও পোপ সপ্তম গ্রেগরীর মধ্যে ধর্ম্মযাজকদিগের অভিষেক লইয়া যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার ফলে সাময়িক ভাবে সম্রাট্‌কে কানোসায় যেরূপ লাঞ্ছিত হইতে হয়, তাহা ইতিহাসবিশ্রুত ঘটনা। কিন্তু সম্রাটের এই পরাভবের পর তিনি কিংবা তাঁহার পরবর্ত্তী সম্রাট্গণ ধর্ম্মযাজকদিগকে অভিষেক করিবার ক্ষমতা ত্যাগ করেন নাই। ১১২২ খৃষ্টাব্দে এই অভিষেক-সংঘর্ষের অবসান হয়। ওরম্স্ শহরে পোপের সহিত সম্রাটের আপোষ নিষ্পত্তির ফলে ধর্ম্মযাজকগণ তাঁহাদের ভূসম্পত্তির জন্য সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু ইহার পর হইতে সম্রাট্ অঙ্গুরীয়ক এবং ক্রুশের দ্বারা তাঁহাদিগকে অভিষেক করিবার ক্ষমতা হারাইলেন।

ইংলণ্ডে ধর্ম্মযাজকদিগের অভিষেক লইয়া অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্যই রাজা এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মসঙ্ঘের সহিত বিবাদ বাধে। ইংলণ্ডের প্রধান ধর্ম্মযাজক আন্‌শ্লেম এবং রাজা হেন্‌রীর সহিত যে বিবাদ হয়, তাহার নিষ্পত্তি হইতে বিলম্ব হয় নাই। এখানেও রাজাকে অঙ্গুরীয়ক এবং ক্রুশের দ্বারা ধর্ম্ম-যাজকদিগকে অভিষেক করিবার ক্ষমতা পরিত্যাগ করিতে হয়।

ইউরোপে ১৫শ ও ১৬শ শতকে পোপেরা কার্ডিনালদের অভিষেক সময়ে অঙ্গুরী দান করিতেন। এগুলির বেষ্টনীতে সচরাচর পোপের নাম ও চিহ্ন অঙ্কিত থাকিত। উক্ত অঙ্গুরীগুলি অঙ্গুষ্ঠে পরিবার জন্য নির্ম্মিত হইত।

যুগল-অঙ্গুরীর নিদর্শনও খৃষ্টীয় ১৬শ ও ১৭শ শতকে পাওয়া যায়। বাগ্‌দানে এই অঙ্গুরীর বহুল ব্যবহার ছিল।

নামাঙ্কিত অঙ্গুরীর কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীস্ ও রোমে মন্ত্রাঙ্কিত অঙ্গুরীর চলন ছিল। অর্থাৎ অঙ্গুরীতে কোন বিশিষ্ট শব্দ কিংবা অক্ষরাবলী ক্ষোদিত থাকিত এবং লোকে বিশ্বাস করিত, ঐ অঙ্গুরী ধারণ করিলে সৌভাগ্যলাভ হইবে। কবিতার ছত্র বা বচনসম্বলিত অঙ্গুরী ষোড়শ শতাব্দী হইতে লোকে ব্যবহার করিতেছে। এই যুগে স্মৃতিচিহ্নস্বরূপেও অঙ্গুরী ব্যবহৃত হইত—অঙ্গুরীতে মৃত ব্যক্তির নাম, মৃত্যু তারিখ প্রভৃতি লিখিত থাকিত।

দশকাঙ্গুরী (decade ring) নামক একপ্রকারের অঙ্গুরী পূর্ব্বে, বিশেষতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়গণ ব্যবহার করিতেন। মালায় যেরূপ জপসংখ্যা রাখা হয়, সেইরূপ প্রার্থনার সময়ে সংখ্যা ঠিক করিবার জন্য এই অঙ্গুরীতে ১০টী গ্রন্থি থাকিত।

বাণিজ্যার্থ মালের ছাড়পত্রের নিদর্শনরূপে ব্যবসায়ীরা পূর্ব্বকালে অনেক সময় অঙ্গুরী ব্যবহার করিতেন। এতদর্থে স্থলবিশেষে অঙ্গুরীর ছাপ, কখনও বা গোটা অঙ্গুরীটাই প্রেরণ করা হইত।

বিষাঙ্গুরী বা জহরাঙ্গুরীর কথা সর্ব্বদেশেই পাওয়া যায়। আমাদের দেশের অনেক উপাখ্যানে অঙ্গুরীর বিষাক্ত প্রস্তর লেহন করিয়া আত্মহত্যার বিষয় শুনা যায়। পাশ্চাত্ত্য হানিবল ও ডিমস্থেনিসের বিবরণও ঠিক এই প্রকার।

অঙ্গুরীয়,—(ক্লী) [অঙ্গুরৌ ভবম্, অঙ্গুরি-ছঃ বা লম্বাভাবঃ] অঙ্গুলির ভূষণ, অঙ্গুরী, চলিত আঙ্‌টী। [অঙ্গুরী দ্র°]

অঙ্গুরীয়$_{২}$, অঙ্গুলীয়—সংহিতাকার হিরণ্যনাভের জনৈক শিষ্য। হিরণ্যনাভ চতুর্ব্বিংশতি সংহিতা রচনা করিয়া চব্বিশজন শিষ্যকে প্রদান করেন। অঙ্গুরীয় তন্মধ্যে একজন। (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

অঙ্গুরীয়ক—(পুং ক্লী) [অঙ্গুরীয়-কন্ স্বার্থে] অঙ্গুলির ভূষণ, অঙ্গুরী, আংটী। [অঙ্গুরী দ্র°] ২ শনি। শনিগ্রহ দেখিতে অতি সুন্দর। অঙ্গুরীয়কের ন্যায় তিনটী সুদৃশ্য বেড় তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে।

অঙ্গুল,—(পুং) [অঙ্গ-উল] হস্তপদের শাখা, অঙ্গুলি। [অঙ্গুলি, দ্র°] ২ বাৎস্যায়ন মুনি। ৩ দ্বাদশাংশ। (জ্যোতিষ) (ক্লী) ৪ অষ্টযবের পরিমাণ। "যবোদরৈরঙ্গুলমষ্টসংখ্যৈঃ।" (ভাস্করাচার্য্য) [অঙ্গুলি$_{২}$ দ্র°] ৫ অঙ্গুষ্ঠ।

অঙ্গুল$_{২}$—উড়িষ্যার একটী জেলা। পূর্ব্বে ইহা সামন্ত রাজ্য ছিল, ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ-ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। অক্ষা° ২০°১৩′ ও ২১°১০′ উঃ; দ্রাঘি° ৮৩°৫০′ ও ৮৫°৪৩′ পূঃ। ভূপরিমাণ ১৬৮১ বর্গমাইল। ১৯৩১ সালের গণনায় ইহার জনসংখ্যা ২২২৭৩৬। উত্তরে মধ্যপ্রদেশের রায়রাখোল ও বামড়া রাজ্য; পূর্ব্বে তালচের, ঢেঙ্কানল ও হিন্দোল রাজ্য; দক্ষিণে নরসিংহ-পুর, দশপল্লা রাজ্য ও মহানদী এবং পশ্চিমে অঠমল্লিক রাজ্য। এই জেলার দক্ষিণভাগ পাহাড়-বেষ্টিত। অঙ্গুলের অধিকাংশ স্থান জঙ্গলে পূর্ণ, তবে কএকস্থানে চাউল, তুলা, ইক্ষু প্রভৃতির চাষ হয়। অনাবৃষ্টির জন্য বা বন্যার প্রভাবে বহুল শস্যাদি নষ্ট হয়। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে কাপড়, কয়লা, লৌহ ও পিত্তল-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি প্রসিদ্ধ।

অঙ্গুল জেলায় মোট ১৬০৮টী গ্রাম আছে। অধিবাসীর অধিকাংশই হিন্দু। মধ্যে মধ্যে বৌদ্ধদিগেরও বাস আছে। প্রধান আদিম জাতি খন্দ ও কয়াড়। অন্যান্য আদিম জাতির মধ্যে পান ও খৈরা জাতি অন্যতম। স্থানীয় কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দুই অধিক পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়।

বর্ত্তমানে অঙ্গুল হইতে প্রাচীন প্রস্তরযুগের (Palæolithic) কএকটী অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পূর্ব্বে এই স্থান খন্দ নামক বন্যজাতির আবাসভূমি ছিল। পরবর্ত্তীকালে ইহা উড়িষ্যার গড়জাত প্রদেশের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হয়। মহারাষ্ট্রনায়ক রঘুজী ভোন্‌স্লে যখন উড়িষ্যায় আগমন করেন, তৎকালে অঙ্গুল খুর্দ্দার রাজার অধীন ছিল। রঘুজী ঐ রাজার নিকট হইতে এই রাজ্য ছিনাইয়া লইয়া একটী স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত করেন। তৎপরে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ করিবার ষড়যন্ত্রের অপরাধে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর অসন্তোষের কারণ হওয়ায় পূর্ব্বতন রাজবংশীয়দের হস্তচ্যুত হইয়া অঙ্গুল রাজ্য বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। রাজবংশীয়গণের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সরকার কর্ত্তৃক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল। এই সময় (১৮৫০ খৃষ্টাব্দে) উড়িষ্যা—পুরী, কটক, বালেশ্বর ও অঙ্গুল এই চারিটী জেলায় বিভক্ত হয়। ইহার পর ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে কটকের কমিশনারের অধীনে একজন তহশীলদার কর্ত্তৃক এই স্থান শাসিত হইতে থাকে। মধ্যে অঙ্গুল বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্ত্তমানে পুনরায় উড়িষ্যা প্রদেশের মধ্যে গিয়াছে।

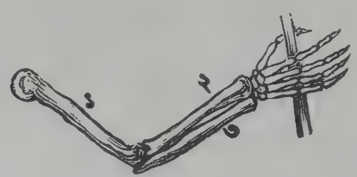
১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোন ব্যবসায়-বাণিজ্য অঙ্গুল রাজ্যে হইত না। ইহার পর হইতে ব্যবসায় বাণিজ্যের সুব্যবস্থা করা হয়। অঙ্গুলের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের পর প্রায় এক মাইলের মধ্যে ব্রাহ্মণী নদী প্রবাহিতা। এতদ্ভিন্ন কটক হইতে সম্বলপুর পর্য্যন্ত একটী পথ অঙ্গুলের মধ্য দিয়া গিয়াছে। ইহাতে যাতায়াতের পক্ষে, বিশেষতঃ ব্যবসায়ের আদান-প্রদানের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

২ উড়িষ্যা প্রদেশের অঙ্গুল জেলার প্রধান গ্রাম। এখানে অঙ্গুল রাজ্যের পূর্ব্বতন নৃপতিগণের বাসস্থান ছিল। অক্ষা° ২০°৪৮′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪°৫৯′ পূঃ।

অঙ্গুলি,—(স্ত্রী) [অঙ্গ-উলি। অঙ্গেরুলি। উণ্ ৪.২। অঙ্গুলি শব্দের পুংলিঙ্গে প্রয়োগও দেখা যায়, "সংবৃতাধরোষ্টমঙ্গুলিনা"। (শকুন্তলা)] অঙ্গুল, আঙ্গুল। হাঙ্গর এবং মৎস্যশ্রেণীর উর্দ্ধে যাবতীয় মেরুদণ্ডী প্রাণীর সম্মুখ এবং পশ্চাতের শাখাদ্বয়ের অগ্রভাগে পাঁচটী করিয়া যে প্রশাখা দেখা যায়, সেইগুলিকে অঙ্গুলি বলে। কিন্তু অনেক মেরুদণ্ডী প্রাণীর এক বা ততোধিক অঙ্গুলি লোপ পাওয়ায় অঙ্গুলি সংখ্যা কম হইয়া

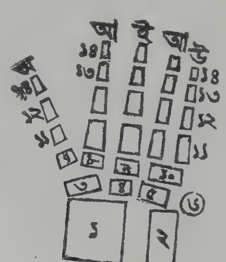
যায়। কিন্তু মানুষের হস্তে ও পদে ৫টী করিয়া অঙ্গুলি বর্ত্তমান থাকে।

মনুষ্যের অঙ্গুলিগুলি অস্থি, মাংস, পেশী, স্নায়ু, শিরা ও নাড়ীতে গঠিত। এক এক পায়ের ও হাতের অঙ্গুলিতে চৌদ্দখানি হাড় আছে। হাতের অঙ্গুলিতে যথা—কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা এবং তর্জ্জনী, ইহাদের প্রত্যেকে তিনখানি অস্থি। বুড়ো আঙ্গুলে দুই খানি। অঙ্গুলির এক এক খানি অস্থিকে আমরা পর্ব্ব বলি। ইহার চলিত নাম 'পাব্'। অঙ্গুলির হাড়গুলি পরস্পর পেশীসূত্রে গাঁথা আছে। অস্থির



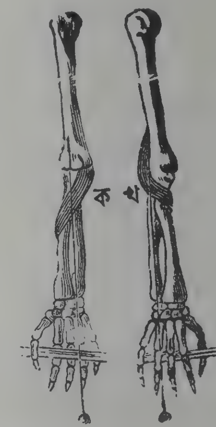
১, কাঁধ হইতে কনুই পর্য্যন্ত উপর বাহুর অস্থি (humerus)। ২, কনুই হইতে কব্জা পর্য্যন্ত নিম্ন বাহুর বুড়ো আঙ্গুলের দিকের হাড় (radius); ৩, ঐ কোড়ে আঙ্গুলের দিকের হাড় (ulna)। এই দুই অস্থির অগ্রভাগে ঊর্দ্ধমণিবন্ধ অর্থাৎ উপর কব্জার হাড় (carpal bones) তাহার পর নিম্ন মণিবন্ধ অর্থাৎ নীচের কব্জার হাড় (metacarpal bones)। তৎপরে অঙ্গুলির পর্ব্বের অস্থি (phalanges)।

যোড়ের ভিতর বাতাস প্রবেশ করিলে সেখানকার হাড় সরিয়া যায়। পেশীই শরীরের বল, মাংসপেশী দিয়া আমাদের আঙ্গুল ও কব্জা আঁটা আছে, তাই আমরা হাতে এত বল পাই। আঙ্গুলে এমন কতকগুলি মাংসপেশী আছে, যদ্দ্বারা উহা ফিরাইতে ঘুরাইতে পারা যায়।



১, নিম্ন বাহুর বুড়ো আঙ্গুলের দিকের অস্থির শেষভাগ। ২, ঐ কোড়ে আঙ্গুলের দিকের অস্থির শেষভাগ। ৩, নৌনিভাস্থি অর্থাৎ নৌকার মত কুব্জ অস্থি (scaphoid)। ৪, অর্দ্ধচন্দ্রাকার অস্থি (semilunar)। ৫, উপলকাস্থি (cuneiform) অর্থাৎ দেখিতে প্রায় তীরের ফলার মত। ৬, বর্ত্তুলাস্থি (pisiform) অর্থাৎ ছোলা বা মটরের মত দেখিতে গোল ও ক্ষুদ্র। ৭, চতুর্ভুজাস্থি (trapezium)। ৮, কূটকাস্থি (trapezoid)। ৯, মধ্যকূটাস্থি (magnum)। ১০, ফণধরাস্থি (unciform)। ১১, ১১, শলাকাস্থি নীচের কব্জার অস্থিশ্রেণী (metacarpal bones)। ১২, ১২, আঙ্গুলের পর্ব্বের প্রথম শ্রেণীর অস্থি। ১৩, ঐ দ্বিতীয় শ্রেণী। ১৪, ঐ তৃতীয় শ্রেণী। অ, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ। আ, তর্জ্জনী। ই, মধ্যমা। আ, অনামিকা। উ, কনিষ্ঠা।





কনুয়ের কাছে স্থিতিস্থাপক মাংশপেশী আছে, যথা, ক এবং খ। ঐ পেশীর দ্বারা হাত চিত ও উবুড় করা যায়। গো মেষ প্রভৃতি অন্যান্য জন্তুর পায়ের এই স্থানের গড়ন ঠিক মানুষের কনুয়ের মতন, কিন্তু তাহাদের পা স্বভাবতঃ উবুড় হইয়া আছে, ইচ্ছা করিলে চিত করিতে পারে না।

আমরা ইচ্ছা করিলে আঙ্গুল ফাঁক করিতে পারি, জড় করিতে পারি, এবং সমস্ত অঙ্গুলি গুটাইয়া হাত মুটা করিতে পারি। এ সকল কাজও মাংসপেশীর দ্বারা সাধিত হয়।

হাতের উপরে তিনটী স্থিতিস্থাপক মাংসপেশী আছে। তাহার একটী বাহু হইতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দিকে আসিয়াছে (radial flexor)। দ্বিতীয়টী কনিষ্ঠ অঙ্গুলির দিকে আসিয়াছে (ulnar flexor)। তৃতীয়টী তলহাতের দিকে আসিয়াছে। এই সকল মাংসপেশী দ্বারা আমরা হাতের কনুই ও কব্জা ছড়াইতে ও গুটাইতে পারি। উপরের বড় বড় মাংসপেশীর শাখা প্রশাখা অঙ্গুলিতে আসিয়াছে, তদ্দ্বারা অঙ্গুলিও ছড়াইতে ও গুটাইতে পারা যায়। [অঙ্গুলির পেশী, শিরা ও নাড়ী প্রভৃতির চিত্র হস্ত শব্দে দ্র°]। ক চিহ্নিত ছবিখানিতে অঙ্গুলির পেশীসূত্র আবরণে ঢাকা রহিয়াছে (sheath of flexor tendons)।

অঙ্গুলিতে অনেকগুলি নাড়ী আছে। হাতের প্রধান রক্তবহা নাড়ী (Brachial) বাহুর মধ্যস্থল দিয়া আসিয়া কনুইয়ের নিম্নে দুইটী বড় বড় শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। তাহার একটী শাখা (Radial artery) হাতের উপর দিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দিকে চলিয়া গিয়াছে। পীড়ার সময় মণিবন্ধে এই নাড়ী আমরা পরীক্ষা করি। আর একটী শাখা (Ulnar artery) হাতের নীচে দিয়া কনিষ্ঠা অঙ্গুলির দিকে আসিয়াছে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ও কনিষ্ঠা আঙ্গুলের গোড়া দিয়া এই দুইটী অর্দ্ধচন্দ্রাকারে (Palmar arch) গোল হইয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে বুড়া আঙ্গুলের দিকের নাড়ীটী মাংসভেদী, হাতের তলে পেশীর অনেক নীচে ডুবিয়া আছে। কনিষ্ঠা আঙ্গুলের দিকের নাড়ী হাতের তলে ভাসা ভাসা

হইয়া আছে, মাংসের অধিক ভিতর দিয়া যায় নাই। এই দুইটী ধমনীর গোল বেড় হইতে সরু সরু শাখা নাড়ী বাহির হইয়া অঙ্গুলির দিকে চলিয়া আসিয়াছে। হাতের উপর পৃষ্ঠেও এই দুইটী বড় ধমনীর শাখা অঙ্গুলির দিকে চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক আঙ্গুলের দুই পার্শ্বে নাড়ী আছে, তাই অস্ত্র প্রয়োগের সময় দুই পার্শ্ব বাঁচাইয়া স্ফোটকাদি কাটিতে হয়।

অঙ্গুলির শিরাও (Veins) অনেক। হাতের প্রধান শিরা দুইটী। একটী বাহুর উপর দিয়া ভাসা ভাসা হইয়া আসিয়াছে। আর একটী শিরা বাহুর নীচে দিয়া আসিয়াছে; এইটী অত্যন্ত গভীর। এই দুই প্রধান শিরার শাখা প্রশাখা অঙ্গুলিতে জড়িত হইয়া আছে। [অঙ্গুলি দ্বারা কি প্রকারে স্পর্শজ্ঞান জন্মে, তাহা স্নায়ু শব্দে দ্র°]

অঙ্গুলের অগ্রভাগে নখ। নখ অস্থি হইতে গজায় না, ইহার উৎপত্তি চর্ম্মে। নখের মূলে সচ্ছিদ্র মোমের ন্যায় এক প্রকার মাংস আছে, সেই মাংস হইতে ইহা বাড়িতে থাকে। নখ শিঙের ন্যায় পদার্থ; ইহার প্রধান উপাদান অঙ্গার ও গন্ধক। [নখ দ্র°]

অঙ্গুলির পীড়ার মধ্যে চিপ্প বা আঙ্গুলহাড়াই সচরাচর হইয়া থাকে। [আঙ্গুলহাড়া দ্র°]

সাংসারিক কাজকর্ম্ম করিতে অঙ্গুলিই প্রধান ইন্দ্রিয়। তাই সচরাচর আঙ্গুল কাটিয়া যায়; দ্বারে, যাঁতায়, ঢেঁকীতে ও কলে আঙ্গুল ছেঁচিয়া ও কুটিয়া যায়। কাটা আঙ্গুল দিয়া অত্যন্ত রক্ত পড়িলে তৎক্ষণাৎ ভিজা কাপড় দিয়া অঙ্গুলিটী আঁটিয়া বাঁধিবে এবং হাত উঁচু করিয়া থাকিবে। ক্ষতস্থানে আপনি ফাইব্রিন জমিয়া রক্ত বন্ধ করিয়া দেয়। অতএব প্রথমে কাটাস্থানে জল ঢালিবে না; জল ঢালিলে রক্ত জমিতে পায় না। কাল-কাসুন্দে ও আমটেওর পাতা রক্ত বন্ধ করিবার উৎকৃষ্ট ঔষধ। কাল-কাসুন্দে কিংবা আমটেওর পাতা হুকার জলে বাটিয়া কাটাস্থানে লাগাইলে তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হইয়া যায়। ফট্‌কিরি, লৌহের আরক, বরফ প্রভৃতি দ্রব্য কাটাস্থানে দিয়া আঁটিয়া বাঁধিলে রক্ত বন্ধ হয়। দূর্ব্বা ঘাস চিবাইয়া দিলেও এই ফল দর্শে। আঙ্গুলের মোটা নাড়ী কাটিয়া গেলে কখন কখন এই সকল উপায়ে রক্ত বন্ধ করা যায় না। তদ্রূপ স্থলে একটী লোহার দ্রব্য আগুনে অল্প পোড়াইয়া কাটাস্থানে ছেঁকা দিবে। তাহাতে অবিলম্বে রক্ত বন্ধ হইয়া যায়।

কোন প্রকারে আঙ্গুল ছেঁচিয়া গেলে সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করানো উচিত। কারণ ভিতরের অস্থি চূর্ণ হইলে অঙ্গুলির কিয়দংশ কাটিয়া ফেলিতে হয়। না কাটিলে ক্রমশঃ ঐ স্থান পচিতে থাকে এবং অবশেষে প্রাণ সংশয় হইতে পারে। অঙ্গুলির অগ্রভাগ স্নায়ুমণ্ডলে জড়িত, তজ্জন্য আঘাত লাগিলে কখন কখনও ধনুষ্টঙ্কার রোগ উপস্থিত হয়। অঙ্গুলিতে অধিক আঘাত না লাগিলে তেমন ভয়ের বিষয় নহে। শীতল জলে কাপড় ভিজাইয়া আঙ্গুল বাঁধিয়া রাখিবে। কিংবা ৩০ রতি সীস্ সর্করা (প্লম্বাই এসিড্), এক ড্রাম আফিমের অরিষ্ট এবং অর্দ্ধসের শীতল জল একত্র মিশ্রিত করিয়া ঐ ঔষধ ক্ষত স্থানে প্রয়োগ করিবে। গেঁদা ফুলের পাতার রস কিংবা হোমিওপ্যাথী মতের ক্যালেণ্ডিউলা জলের সঙ্গে আহত স্থানে প্রয়োগ করিলে অনেক সময়ে উপকার দর্শে। [অন্যান্য বিবরণ হস্ত ও পদ শব্দে দ্র°]

জপাদির সংখ্যা রাখিবার জন্য বৈদিক ও তান্ত্রিক মতে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গুলিতে কর বিন্যাস করিবার ব্যবস্থা আছে। বৈদিক মন্ত্র জপ করিবার সময় দক্ষিণ হস্তের অনামিকার মধ্য পর্ব্বে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া প্রথমে জপ আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠার মূল হইতে সকল অঙ্গুলির উপরের পর্ব্ব দিয়া তর্জ্জনীর মূল পর্য্যন্ত জপ করিয়া যাইবে। এতদ্দ্বারা দশবার জপ করা হয়। সনৎকুমারসংহিতায় ইহার প্রমাণ এই—

"অনামা-মধ্যমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এব চ।
তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তং দশপর্ব্বসু সংজপেৎ।"

একশত আটবার জপ করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে দশ দশবার করিয়া প্রথমে একশত জপ সমাধা করিবে। তাহার পর অনামিকার মূল হইতে সকল অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া তর্জ্জনীর মধ্যপর্ব্ব পর্য্যন্ত আট সংখ্যা জপ করিবে। ইহাতে একশত আটবার জপ করা হয়।

তান্ত্রিক জপের নিয়ম—অনামিকার মধ্যপর্ব্বে সংখ্যা আরম্ভ করিবে। পরে তাহার মূল, কনিষ্ঠার মূল হইতে সমস্ত পর্ব্ব, অনামিকার অগ্রভাগ এবং মধ্যমার উপরের পর্ব্ব হইতে নিম্নে আসিয়া তর্জ্জনীর মূলে জপ সমাপ্ত করিবে। ইহাতে দশবার জপ করা হয়। তর্জ্জনীর অগ্র বা মধ্য পর্ব্বে কদাচ সংখ্যা রাখিবে না, তাহাতে পাপ জন্মে। প্রমাণ যথা—

"অনামিকাত্রয়ং পর্ব্ব কনিষ্ঠাপি ত্রিপর্ব্বিকা।
মধ্যমায়াশ্চ ত্রিতয়ং তর্জ্জনীমূলপর্ব্বণি।
তর্জ্জন্যগ্রে তথা মধ্যে যো জপেৎ স তু পাপকৃৎ।"

একশত আটবার জপ করিতে হইলে, প্রথমে পূর্ব্বোক্ত

নিয়মানুসারে একশতবার জপ সমাপ্ত করিবে। তাহার পর অনামিকার মূল হইতে কনিষ্ঠার সমস্ত পর্ব্ব এবং অনামিকার ও মধ্যমার অগ্রভাগ দিয়া মধ্যমার মূলে সংখ্যা শেষ করিবে। ইহাতে আটবার জপ করা হয়। প্রমাণ যথা—

"অনামামূলমারভ্য প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ চ।
মধ্যমামূলপর্য্যন্তং জপেদষ্টসু পর্ব্বসু।"

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে কথায় কথায় সকল কাজের ব্যবস্থা আছে। শাস্ত্রকারেরা উপদেশ দিয়াছেন,—ইটের গুঁড়া, ঢিল ও পাথর দিয়া এবং অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ ভিন্ন অন্য অঙ্গুলি দ্বারা দাঁত মাজিবে না।

"ইষ্টকালোষ্ট্রপাষাণৈরিতরাঙ্গুলিভিস্তথা।
ত্যক্ত্বা হ্যনামিকাঙ্গুষ্ঠৌ বর্জ্জয়েদ্দন্তধাবনম্।" (স্মৃতি)

আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা লজ্জাভরে অধোমুখী হইলে প্রায়ই অঙ্গুলি দিয়া মাটী খুঁটিতে থাকেন। বাঙ্গালী স্ত্রীচরিত্রের ইহা একটী বিশেষত্ব। কোন রোগীর নিকট হইতে দূত আসিয়া যদ্যপি চিকিৎসকের সম্মুখে কথা কহিতে কহিতে অঙ্গুলি দ্বারা মাটী খুঁটিতে থাকে, তবে সে রোগীর পীড়া প্রায়ই উৎকট হইয়া উঠে।

অঙ্গুলি২—(স্ত্রী) পরিমাণবিশেষ। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যে ব্যবহার্য্য মান—অঙ্গুল।

বরাহমিহিরের মতে—

"জালান্তরগে ভানৌ যদণুতরং দর্শনং রজো যাতি।
তদ্বিন্দ্যাৎ পরমাণুং প্রথমং তদ্ধি প্রমাণানাম্॥
পরমাণুরজো বালাগ্রলিক্ষাযূকাযবোঽঙ্গুলঞ্চেতি।
অষ্টগুণানি যথোত্তরমঙ্গুলমেকং ভবতি মাত্রা॥"

(বৃহৎসংহিতা ৫৮.১-২)

অর্থাৎ গবাক্ষচ্ছিদ্র-পতিত সূর্য্যকিরণে যে সূক্ষ্মতর রজঃ দর্শনপথে পতিত হয়, তাহার নাম পরমাণু; উহাই প্রমাণ-সকলের প্রথম। পরমাণু, রজঃ, বালাগ্র, লিক্ষা, যূকা, যব ও অঙ্গুল এই কয়টী যথাক্রমে অষ্টগুণ বৃদ্ধিযুক্ত; কিন্তু এক অঙ্গুলই মাত্রা বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং—

৮ পরমাণু	=	১ রজঃ
৮ রজঃ	=	১ বালাগ্র
৮ বালাগ্র	=	১ লিক্ষা (উৎকুণের ডিম্ব)
৮ লিক্ষা	=	১ যূকা (উৎকুণ)
৮ যূকা	=	১ যব
৮ যব	=	১ অঙ্গুলি।

বাপুদেবকৃত সিদ্ধান্তশিরোমণিতেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে। যথা—

"বেশমানতঃ পতিতেষু ভাস্করকরৈর্ষালোকয়তে যদ্রজঃ।
স প্রোক্তঃ পরমাণুরষ্টগুণিতৈস্তৈরেব রেণুর্ভবেৎ॥
তৈর্বালাগ্রমথাষ্টাভিঃ কচমুখৈর্লিক্ষা চ যূকাষ্টাভিঃ।
স্যাত্তি্রভিশ্চ তদষ্টকেন চ যবোঽষ্টাভিশ্চ তৈরঙ্গুলম্॥"

এতদ্ভিন্ন মৎস্যপুরাণ (৫.১৭.১৯), সুপ্রভেদাগম এবং বাস্তু-বিদ্যাতেও (১.৩.৫) এই মান সমর্থিত হইয়াছে।

তিন প্রকারের অঙ্গুলি দেখা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অঙ্গুলির পরিমাণ ৮ যব। মাঝারি অঙ্গুলের পরিমাণ ৭ যব এবং ছোট অঙ্গুলের পরিমাণ ৬ যব। (মানসার)

অঙ্গুলি হইতে বিভিন্ন হস্তের পরিমাণ ও অন্যান্য মাপ পাওয়া যায়—

১২ অঙ্গুলি	=	১ বিতস্তি
২ বিতস্তি বা ২৪ অঙ্গুলি	=	১ কিষ্কু-হস্ত
২৫ অঙ্গুলি	=	১ প্রাজাপত্য-হস্ত
২৬ „	=	১ ধনুর মুষ্টিহস্ত
৪ হাত	=	১ ধনুঃ বা দণ্ড
৮ দণ্ড	=	১ রজ্জু

যানবাহন ও বিছানার চাদর প্রভৃতি ২৪ অঙ্গুলিতে হস্ত ধরিয়া পরিমিত হয়। রাজপ্রাসাদ বা বৃহৎবাটী অথবা বিমানের (দেবমন্দির) পরিমাণ ২৫ অঙ্গুলিতে, জমি বা বাস্তুর পরিমাপে ২৬ অঙ্গুলিতে এবং গ্রামের পরিমাণ আবশ্যক হইলে ২৭ অঙ্গুলিতে হস্ত ধরিতে হয়। সাধারণতঃ ২৪ অঙ্গুলিতে হস্ত ধরিয়া এই সকল নির্ম্মাণকার্য্যের পরিমাণ করা হয়।

মানসার মতে, অঙ্গুলির মানদণ্ড তিন প্রকার—

"মাত্রাঙ্গুলগতং প্রোক্তমঙ্গুলং ত্রিবিধং ভবেৎ।"

(১) ৮ যব হইতেছে অঙ্গুলির সাধারণ মানদণ্ড।

"যবমানাষ্টমাত্রং স্যান্মানাঙ্গুলমিতি স্মৃতম্।"

(২) মাত্রাঙ্গুল শিল্পীর দক্ষিণহস্তের মধ্যমাঙ্গুলির মধ্যাংশ।

"কর্ত্তুর্দক্ষিণহস্তস্য মধ্যমাঙ্গুলমধ্যমে।
* * * মাত্রাঙ্গুলমুদাহৃতম্।"

(৩) দেহলব্ধাঙ্গুল।

"ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতাংশং স্যাদ্দেহলব্ধাঙ্গুলেন বা।"

দেহলব্ধাঙ্গুল পরিমাণ সাধারণতঃ মূর্তিনির্ম্মাণ কার্য্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দেহলব্ধাঙ্গুলকে আবার 'বেরাঙ্গুল' ও 'লিঙ্গাঙ্গুল' বলা হয়।

"অংশকং মানমেবোক্তমঙ্গুলৈর্মানমুচ্যতে।
লিঙ্গতুঙ্গসংগ্রহং চতুর্ব্বিংশচ্ছতাংশকম্।
লিঙ্গাঙ্গুলমিতি প্রোক্তং বেরাং তালবশাদপি॥

কৃত্বা বেরাঙ্গুলং প্রোক্তং মানাঙ্গুলমিহোচ্যতে।
যবৈরষ্টভির্মাত্রং স্যাদ্দেবানামঙ্গুলং ভবেৎ ॥”

প্রতিমা নির্ম্মাণকালে পরিমাণবিশেষকে ‘অঙ্গুল’ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, একথা কার্ণ সাহেবও সমর্থন করিয়াছেন।

“যস্মাৎ কাষ্ঠাৎ পাষাণাদিকাদ্ বা প্রতিমা ক্রিয়তে তদ্ দৈর্ঘ্যং পীঠপ্রমাণবিবর্জ্জিতং দেবদশভাগবিভক্তং কৃত্বা তত্রৈকং ভাগং নবধা কারয়েৎ সোঽঙ্গুলসংজ্ঞকো ভবতি, যস্মাদ-ষ্টাধিকমঙ্গুলশতং প্রতিমাপ্রমাণং বক্ষ্যতি।” (J. R. A. S ; Vol. VI, p. 323, N. S.)

এখানে অঙ্গুলের অনন্যসাপেক্ষ (Absolute) মূল্য নাই, আপেক্ষিক (Relative) মূল্য আছে। ইহার পরিমাণ উচ্চতার ১/১০৮ কিংবা দেবমূর্ত্তির ১/১০৮ অংশ মাত্র। এস্থলে অঙ্গুলের ইহাই মান।

নারায়ণ ভারতী ও যশোবন্ত ভারতীকৃত ‘রাজবল্লভমণ্ডন’ পুস্তকের ভূমিকায় লিখিত আছে—

১ অঙ্গুল	=	মাত্রা	১১ অঙ্গুল	=	গোকর্ণ
২ „	=	কলা	১২ „	=	বিতস্তি
৩ „	=	পর্ব্ব	১৪ „	=	অনাহপদ
৪ „	=	মুষ্টি	২১ „	=	রত্নি
৫ „	=	তল	২৪ „	=	অরত্নি
৬ „	=	করপাদ	৮৪ „	=	পুরুষ (মানবের উচ্চতা)
৭ „	=	দৃষ্টি			
৮ „	=	তূণী	৯৬ „	=	ধনুঃ
৯ „	=	প্রদেশ	১০৬ „	=	দণ্ড
১০ „	=	সয়তাল			

অঙ্গুলগুলির শিল্পবিজ্ঞানসম্মত এইরূপ নাম পাওয়া যায়—

এক অঙ্গুল—বিন্দু, মোক্ষ। দুই অঙ্গুল—কলা (অন্যত্র এক অঙ্গুলের নাম বুঝাইতে ইহা ব্যবহৃত হয়), কোলক, পদ্ম, অক্ষি, অশ্বিনী। তিন অঙ্গুল—রুদ্রাক্ষি, অগ্নি, গুন, শূল (এবং) বিষ্ণা। চার অঙ্গুল—যুগ (এবং) ভাগ, বেদ এবং তুরীয়। পাঁচ অঙ্গুল—রুদ্রানন, ইন্দ্রিয়, ভূত এবং বাণ। ছয় অঙ্গুল—কর্ম্ম, অঙ্গ, অয়ন এবং রাস। সাত অঙ্গুল—পাতাল, মুনি, ধাতু এবং অবধি। আট অঙ্গুল—বসু, লোক (ঈশ ?) এবং মূর্ত্তি। নয় অঙ্গুল—দ্বার, সূত্র, গ্রহ এবং শক্তি। দশ অঙ্গুল—দিশ, নাড়ী, আয়ুধ এবং প্রাদুর্ভাব। বিশ অঙ্গুল—ত্রিযু (এবং) ভিক্ষু। ত্রিশ অঙ্গুল—গতি। চল্লিশ অঙ্গুল—ত্রিজগৎ (?)। পঞ্চাশ অঙ্গুল—শক্করী। ষাট অঙ্গুল—অতিশক্করী। সত্তর অঙ্গুল—যষ্টি। আশী অঙ্গুল—অত্যষ্টি। নব্বই অঙ্গুলি—ধৃতি ; এবং একশত অঙ্গুলি—অতিধৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের ৮ম অধ্যায়ে অঙ্গুলিমানের চমকপ্রদ উৎপত্তির বিবরণ পাওয়া যায়। মানুষ প্রথমে গুহা, পর্ব্বত, নদী প্রভৃতি স্থানে বাস করিত। আপনাদিগকে শীতোষ্ণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহারা গৃহাদি বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তৎপরে তাহারা খেট (শহর), পুর (গৃহ) গ্রাম, নগর প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ, দুই বাসস্থানের ব্যবধানের (সন্নিবেশ) পরিমাপের জন্য মানুষ যথাজ্ঞানে বা সহজ জ্ঞানে আপন আপন অঙ্গুলির ব্যবহার করিত। তখন হইতে অঙ্গুলই মাপের মানরূপে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। প্রদেশ বা প্রাদেশ, হস্ত, কিষ্কু, ধনু ইত্যাদি সংজ্ঞাও এই সময় হইতে প্রচলিত হয়।

“দশত্বঙ্গুলিপর্ব্বাণি প্রদেশঃ সংজ্ঞিতস্তু তৈঃ ॥
অঙ্গুষ্ঠস্য প্রদেশিন্যা ব্যাসঃ প্রাদেশ উচ্যতে।
তালঃ স্মৃতো মধ্যমায়া গোকর্ণশ্চাপ্যনাময়া ॥
কনিষ্ঠায়াং বিতস্তিস্তু দ্বাদশাঙ্গুল উচ্যতে।
রত্নিরঙ্গুলপর্ব্বাণি সংখ্যায়া ত্বেকবিংশতিঃ ॥
চতুর্ব্বিংশতিভিশ্চৈব হস্তঃ স্যাদঙ্গুলানি তু।
কিষ্কুঃ স্মৃতো দ্বিরত্নিস্তু দ্বি-চত্বারিংশদঙ্গুলম্ ॥
চতুর্হস্তং ধনুর্দণ্ডো নালিকাযুগমেব চ।
ধনুঃ সহস্রে দ্বে তত্র গব্যূতিস্তৈর্বিভাব্যতে ॥
অষ্টৌ ধনুঃসহস্রাণি যোজনং তৈর্নিরুচ্যতে।
এতেন যোজনেনৈব সন্নিবেশস্ততঃ কৃতঃ ॥”

(ব্রহ্মাণ্ডপু° ৮.১০২-১০৭)

দশটী অঙ্গুলিপর্ব্বে অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ হইতে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত যে ব্যাস পরিমাণ তাহার নাম প্রাদেশ ; অঙ্গুষ্ঠ হইতে মধ্যমা পর্য্যন্ত তাল ; অনামিকা পর্য্যন্ত পরিমাণ গোকর্ণ এবং কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত পরিমাণকে বিতস্তি বলা হয়। এক বিতস্তির পরিমাণ দ্বাদশ অঙ্গুলি। একবিংশতি অঙ্গুলিপর্ব্বে ১ রত্নি (বা অরত্নি) ; চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলিপর্ব্বে ১ হস্ত এবং ২ রত্নি বা দ্বিচত্বারিংশৎ অঙ্গুলিতে ১ কিষ্কু হয়। ৪ হাতে ১ ধনু, দণ্ড, নালিকা ও যুগ হয়। দুই সহস্র ধনুতে ১ গব্যূতি এবং ৮ সহস্র ধনুতে ১ যোজন হয়। শিবপুরাণ মতে, বিংশতি রত্নিতে ১ ধনু, বিংশতি অঙ্গুলিতে ১ হস্ত বা কিষ্কু এবং দ্বিচত্বারিংশৎ অঙ্গুলিতে ১ দ্বিরত্নি হয়। এই দ্বিরত্নি চতুর্হস্ত, চতুর্দ্দণ্ড, নালিকা ও যুগনামে অভিহিত।

সুপ্রভেদাগম হইতে আরও কএকটী মাপ পাওয়া যায়।

“কিষ্কুশ্চ প্রাজাপত্যশ্চ ধনুর্মুষ্টির্ধনুর্গ্রহঃ।
অঙ্গুলস্তু চতুর্ব্বিংশাৎ কিষ্কুরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥

পঞ্চবিংশতিভিশ্চৈব প্রাজাপত্যমুদাহৃতম্।
স্যাদ্ বিংশতির্ধনুর্মুষ্টিঃ সপ্তবিংশাদ্ ধনুর্গ্রহঃ॥"

কোন কোন মানানুসারে অরত্নি ও হস্তের মধ্যে পার্থক্য এই—অরত্নি=২১ অঙ্গুল, হস্ত=২৪ অঙ্গুল; কিন্তু বৌধায়নের শুল্বসূত্রানুসারে অরত্নি=২ প্রাদেশ=২×১২=২৪ অঙ্গুল। শতপথব্রাহ্মণেও বিস্তারে ২৪ অঙ্গুলিকে মানস্বরূপ ধরা হইয়াছে, কিন্তু 'অরত্নি' বলিয়া উল্লেখ নাই।

কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে পরমাণুকে সূক্ষ্ম অণু বলিয়াছেন ও অন্যান্য হিন্দু সারণীর সহিত ইহাকে প্রথম মানরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অণু হইতে চারিটী মধ্য শ্রেণী দিয়া অঙ্গুলে উপনীত হওয়া যায়। এই চারিটী শ্রেণীর প্রত্যেকেই ৮টী করিয়া দ্রব্যের সংযোগে উৎপন্ন। কৌটিল্যের মতে ১ অঙ্গুল=৮ যবমধ্য বা ৮টী যবের পাশাপাশি অবস্থান। ইহার সংজ্ঞা আবার অন্যরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। মাঝারি আকারের মানুষের মধ্যমার মধ্যম পাবের বিস্তারই হইতেছে এক অঙ্গুল। ইহা হইতে আরও জানিতে পারা যায়, ১ বিতস্তি =১২ অঙ্গুল; ২ বিতস্তি=১ অরত্নি=২৪ অঙ্গুল। এখানে ২৪ অঙ্গুলির অরত্নি বুঝাইতে অন্যান্য মানদণ্ডে যাহাকে সাধারণতঃ হস্ত বা কর বলে, তাহাই বুঝাইতেছে। 'প্রাজাপত্য' হস্ত 'অরত্নি' হস্তের নামান্তর মাত্র। ৮ হস্ত বা অরত্নিতে ১ দণ্ড বা ধনু=৯৬ অঙ্গুলি।

অঙ্গুল বা অঙ্গুলবিস্তার গণিতশাস্ত্রের কাল্পনিক (Theoretical) একক (unit); সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে ইহাই ব্যবহারিক একক এবং অন্যান্য মাপের ভিত্তি ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ হস্ত তাহার স্থল অধিকার করিয়া লইয়াছে। এখন হস্তই ব্যবহারিক পরিমাপের একক এবং এই মাপ সরকারী দপ্তরখানায় পর্য্যন্ত গৃহীত হইয়াছে।

কোলব্রুক সাহেব তাঁহার "Essays" নামক পুস্তকে হস্তকে ১৮ ইঞ্চ ধরিয়াছেন, অর্থাৎ অঙ্গুল=$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চ। এই মানদণ্ডই এখন সর্ব্বত্র চলিতেছে।

[হস্ত, কিষ্কু, অরত্নি, রত্নি, বিতস্তি, প্রাদেশ প্রভৃতি শব্দে অন্যান্য বিবরণ দ্র°]

অঙ্গুলি$_৩$—(স্ত্রী) গজশুণ্ডাগ্র। ২ [বৈদ্যক] গজকর্ণিকা, হাতিশুঁড়ার গাছ।

অঙ্গুলিকণ্টক—(পুং) নখ।

অঙ্গুলিগ—(ত্রি) [অঙ্গুলি-গম্-ড; অঙ্গুলিভিঃ গচ্ছতীতি] যে জন্তু অঙ্গুলির উপর ভর দিয়া চলে।

অঙ্গুলিগ্রহ (Writer's cramp)—অঙ্গুলি বা মণিবন্ধের স্থানিক আক্ষেপ বা স্থানিক স্তব্ধতা। আপেক্ষিক অঙ্গুলিগ্রহের লক্ষণ—লিখন বা কোন বস্তু ধারণের চেষ্টা করিলে হস্ত কম্পন; সচরাচর তৎসহ একপ্রকার বেদনা। স্তব্ধ অঙ্গুলিগ্রহে কোন দ্রব্য ধারণে অসামর্থ্য দেখা যায়; মণিবন্ধ এবং বৃদ্ধ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলদেশ অসাড় বোধ হয়। কখন কখন স্কন্ধ হইতে কনুই অবধি যন্ত্রণা অনুভূত হয়। এই রোগ সাধারণতঃ লেখক, টেলিগ্রাফ ক্লার্ক, পিয়ানোবাদক, ইষ্টকনির্ম্মাতা, পেরেকনির্ম্মাতা প্রভৃতির মধ্যে দেখা যায়। অতিরিক্ত হস্ত বা অঙ্গুলির চালনাই ইহার কারণ। চিকিৎসা—হস্তের সম্পূর্ণ বিশ্রাম, রোগাক্রান্ত অঙ্গের মৃদু মার্জ্জন, কোন বলকর ঔষধ সেবন, বিশুদ্ধ বায়ুতে ভ্রমণ, ব্যায়াম ইত্যাদি। কঠিন অবস্থায় অস্ত্র করিয়া কোন বিশেষ স্নায়ু ছাড়াইয়া দিবার প্রয়োজন হইতে পারে।

অঙ্গুলিচালন—(ত্রি) [৬-তৎ] অঙ্গুলির চালনা; অঙ্গুলিপ্রবেশন। যোনিদেশে অঙ্গুলিচালনা করিলে কামার্ত্তা রমণীগণের রসোদ্রেক হইয়া থাকে। [অঙ্গুলিপ্রবেশ দ্র°]

অঙ্গুলিতোরণ—(ক্লী) [অঙ্গুলেঃ তোরণমিব কৃতম্] ললাটের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দনতিলক।

অঙ্গুলিত্র—(ক্লী) [অঙ্গুলিং ত্রায়তে ত্রৈ-ক; ৬-তৎ] ধনুর্যোধীর জ্যাকর্ষণজনিত কষ্টনিবারণার্থ অঙ্গুলিবদ্ধ চর্ম্মাবরণ। (রামা° ২.৮৭.২৩) চলিত ভাষায় ইহার নাম চামাটী বা দস্তানা।

সীবন বা সেলাই কার্য্য করিতে গিয়া দর্জ্জিরা আঙ্গুলের মাথায় চামড়ার বা পিতলের এক প্রকার টুপির মত আচ্ছাদন দিয়া বস্ত্রাদি সেলাই করে, উহা না দিলে অঙ্গুলির মাথা বার বার সূচিবিদ্ধ হয়। এইরূপ চর্ম্ম বা পিতলের আবরণকে অঙ্গুলিত্র বলা যায়।

শৈত্যনিবারণার্থ বস্ত্রাদি দ্বারা অঙ্গুলির বা করের এক প্রকার আবরণ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করা হয়, ইহাকেও অঙ্গুলিত্র বলা যাইতে পারে। [দস্তানা দ্র°]

অঙ্গুলিত্রাণ—(ক্লী) [অঙ্গুলি-ত্রৈ-ক। নিষ্ঠাতকার স্থানে ন] অঙ্গুলিবদ্ধ চর্ম্মাবরণ। (রামা° ১.২২.৯; ২.২৩.৩৫) [অঙ্গুলিত্র দ্র°]

অঙ্গুলিত্রাণক—(ক্লী) যন্ত্রবিশেষ। আঙ্‌টা। (বাভট, সূ°, ২৫ অ°)

অঙ্গুলি-নলক (Phalanges)—পরস্পরের পার্শ্বে অবস্থিত অঙ্গুলির অস্থিসমূহ।

অঙ্গুলিপঞ্চক—(ক্লী) পঞ্চ করাঙ্গুলি। যথা—অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা।

অঙ্গুলিপর্ব্ব—(ক্লী) অঙ্গুলির গ্রন্থি; পাব। [অঙ্গুলি$_২$ দ্র°]

অঙ্গুলিপ্রবেশ, অঙ্গুলীরত—অঙ্গুলিদ্বারা যোনিক্ষোভণ। ভারতীয় কামশাস্ত্রকারগণ সম্প্রযোগের প্রধানতঃ তিনটী বিভাগ

করিয়াছেন—(১) রতারম্ভ ও বাহ্যসম্ভোগ; (২) সংবেশন ও সুরত; (৩) রতাবসানিক। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় পক্ষের যুগপৎ তৃপ্তিলাভ হইলে সম্প্রযোগের সার্থকতা হয়। আলাপ ও ইঙ্গিত হইতে অনুরাগের সূচনা বা কামভাবের উৎপত্তিকে রতারম্ভ বলা হয়। এই আলাপ হইতে ক্রমশঃ বাহ্যসম্ভোগের সূচনা। চুম্বন বা আলিঙ্গন হইতেই এই বাহ্যসম্ভোগের আরম্ভ। চুম্বন বা আলিঙ্গন হইতে যন্ত্রযোগকাল পর্য্যন্ত বাহ্যসম্ভোগ। পুরুষের তৃপ্তি হয় শুক্রবিসৃষ্টিতে। রমণীর শুক্র নাই, যন্ত্রযোগের আরম্ভ হইতেই তাহার সুখোদয় হয় এবং এক প্রকার তরল শ্লেষ্মবৎ পদার্থের নির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে রমণীর তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। অনেক পাশ্চাত্ত্য দেহতত্ত্ববিদ্ সন্দেহ করেন যে, সকল রমণীরই এই প্রকার শ্লেষ্মা নির্গমন হয় কি না? ভারতীয় কামশাস্ত্রকারগণ বলেন যে, সকল রমণীরই এই ধাতুক্ষয় ঘটিয়া থাকে, তবে কাহারও কাহারও অতি বিলম্বে ঘটে। পুরুষ ও নারীর শুক্রবিসৃষ্টি ও ধাতুক্ষয় যাহাতে যুগপৎ ঘটে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। সেইজন্য বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন—

"সুরতান্তে সুখং পুংসাং স্ত্রীণাং তু সততং সুখম্।
ধাতুক্ষয়নিমিত্তা চ বিরামেচ্ছোপজায়তে॥"
"তস্মাৎ পুরুষবদেব যোষিতোঽপি রসব্যক্তির্দ্রষ্টব্যা॥"

(কামসূত্র ২.১.৪১-৪২)

অতৃপ্ত সম্ভোগে স্ত্রী কি পুরুষ উভয়েরই অমঙ্গল হইতে পারে। স্নায়বিক রোগাদি হইতে কখনও কখনও উন্মত্ততা ও মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। হিষ্টিরিয়া বা মূর্চ্ছারোগ সাধারণতঃ অতৃপ্ত সম্ভোগেরই কুফল। পুরুষের এই রোগ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়, কিন্তু রমণীর মধ্যে ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। [জন্মনিরোধ দ্রʼ] রমণীগণের মধ্যে কাহারও তৃপ্তি শীঘ্র হয় এবং কাহারও অতিবিলম্বে ঘটিয়া থাকে। সেইজন্যই বাৎস্যায়ন লিখিয়াছেন—

"জাতেরভেদাদ্দম্পত্যোঃ সদৃশং সুখমিষ্যতে।
তস্মাৎ তথোপচর্য্যা স্ত্রী যথাগ্রে প্রাপ্নুয়াদ্রতিম্॥"

(কামসূত্র ২.১.৬৩)

"মৃদুত্বাদপ্যমৃদুত্বান্নিসর্গাচ্চৈব যোষিতঃ।
প্রাপ্নবন্ত্যাশু তাঃ প্রীতিমিত্যাচার্য্যা ব্যবস্থিতাঃ॥"

(কামসূত্র ২.১.৭০)

টীকাকার যশোধর লিখিয়াছেন, "নিসর্গাৎ স্বভাবতো যা স্ত্রিয়ো মৃদ্বঙ্গ্যঃ, অমৃদ্বঙ্গ্যোঽপি যাশ্চ স্তনাদিভির্বাহ্যৈরান্তরৈশ্চাঙ্গুলিকর্ম্মাদিভিরুপমৃদ্যন্তে তাঃ শীঘ্রতরং প্রীতিং প্রাপ্নুবন্তি।" অর্থাৎ যে সকল স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ কোমলাঙ্গী, তাহারা সত্বরই প্রীতিলাভ করে। যদি স্বভাবতঃ কোমলাঙ্গী না হয়, তাহা হইলে তাহারা চুম্বনাদি ও আন্তরোপায় অঙ্গুলিকর্ম্মাদি দ্বারা উপমৃদিত হইলে অতি সত্বরই প্রীতিলাভ করিয়া থাকে।

সুতরাং বাহ্যসম্ভোগের উদ্দেশ্য—স্ত্রীপুরুষের যুগপৎ প্রীতিলাভ কিংবা পুরুষের পূর্ব্বে স্ত্রীর তৃপ্তিলাভ। রমণীর তৃপ্তিলাভের পূর্ব্বে পুরুষের শুক্রবিসৃষ্টি হইলে রমণী অতৃপ্তাই থাকিয়া যায়। এইজন্য কামশাস্ত্রকারগণ অতৃপ্ত রমণীগণের তৃপ্তির জন্য সম্প্রযোগের পরও অঙ্গুলীরতের ব্যবস্থা দিয়াছেন। "তৃপ্তিমেতি যদি নৈবম প্যসাবাচরেদ্‌গদিতমঙ্গুলীরতম্।" (রতিরহস্য ১০.৫০)

বাহ্যসম্ভোগ বলিলে আলিঙ্গন, চুম্বন, মর্দ্দন, নখাঘাত, দশনাঘাত ও অঙ্গুলীরত বুঝায়। ইহার মধ্যে কেবল অঙ্গুলীরত যন্ত্রযোগের পূর্ব্বে বা পরে কর্ত্তব্য, অপরগুলি যন্ত্রযোগের পূর্ব্বে বা যন্ত্রযোগকালেও করা হইয়া থাকে।

বাহ্যরতকে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য কামশাস্ত্রকারগণ স্থানিক উত্তেজন (Local stimulation) বলিয়া থাকেন এবং ভারতীয় কামশাস্ত্রকারগণ ইহার 'চন্দ্রকলাচালন' এই নাম দিয়াছেন। সকল কামশাস্ত্রে তিথি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন চন্দ্রকলাস্থানে বিভিন্ন প্রকার চালনার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যোনি একটী প্রধান চন্দ্রকলাস্থান, তাহার চালনা করিতে হয়—অঙ্গুলিদ্বারা, "কুর্ব্বন্তি স্মরমন্দিরে করিকরক্রীড়া" (রতিরহস্য ২.৩)। রতিরহস্যকার কোক্কোক একাদশী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমায় অঙ্গুলীরত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অনঙ্গরঙ্গকার কল্যাণমল্ল অষ্টমীতে চিত্রিণীর, সপ্তমীতে শঙ্খিনীর এবং দশমীতে হস্তিনীর অঙ্গুলীরত করিলে শীঘ্রই রসাবেশ হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রতিরত্নপ্রদীপিকায় পঞ্চমী, সপ্তমী, নবমী, দশমী, একাদশী, চতুর্দ্দশী এবং অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় অঙ্গুলীরতের ব্যবস্থা আছে।

কোক্কোক সুরত-পরাঙ্‌মুখীকে সুরতাভিমুখী করিবার জন্য এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন—

"যদি বিমতিমুপেয়াদ্ গণ্ডপালীং বিচুম্ব্য
স্মরগৃহমপি লিঙ্গাগ্রেণ সম্পীড্য দত্ত্বা।
মুখমভিমুখমস্যা অঙ্গমালিঙ্গ্য দোর্ভ্যাং
মদনসদনহস্তক্ষোভলীলাং বিদধ্যাৎ॥" (রতিরহস্য ১০.৪)

অর্থাৎ গণ্ডস্থল চুম্বন করিয়া লিঙ্গাগ্রের দ্বারা স্মরমন্দির পীড়ন করিয়া, মুখে মুখ মিলাইয়া হস্ত দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া মদনালয়ে অঙ্গুলিপ্রবেশ করাইয়া ক্ষোভণ করিবে।

অঙ্গুলীরতের দুইটী স্থান আছে, প্রথম মদনচ্ছত্রক্ষোভণ ও দ্বিতীয় সম্বাধক্ষোভণ। মদনচ্ছত্র একটী স্নায়ুকেন্দ্র এবং ইহা অত্যন্ত অনুভূতিসম্পন্ন। অঙ্গুলিদ্বারা তাহার ক্ষোভণ করিলে রমণীরা অত্যন্ত পুলক অনুভব করে।

কোক্কোক লিখিয়াছেন—

"নিবসতি ভগমধ্যে নাড়িকা লিঙ্গতুল্যা
মদনগমনদোলা দ্ব্যঙ্গুলক্ষোভিতা সা।
সৃজতি মদজলৌঘং সা চ কামাতপত্রং
দ্বয়মিহ যুবতীনামিন্দ্রিয়ং নির্দ্দিশন্তি॥
মদনসদনরন্ধ্রাদূর্দ্ধতো নাসিকাভং
সকল-মদশিরাঢ্যং মন্মথচ্ছত্রমাহুঃ।
বসতি মদনরন্ধ্রস্যান্তরে নাতিদূরাৎ
স্মরজলপরিপূর্ণা পূর্ণচন্দ্রেতি নাড়ী॥
নিবসতি বহুনাড়ীচক্রমন্যৎ প্রধানা
ত্রিতয়মিদমিহোক্তং হস্তশাখাবিমর্দ্দে
করিকরফণিভোগার্দ্ধেন্দুকামাঙ্কুশাদ্যৈ-
রলমিহ করশাখাযোগভেদাভিধানৈঃ॥
শিথিলয়তি কঠোরাং তর্জ্জনীমধ্যমাভ্যা-
মসকৃদুদিতনাড়ীং ক্ষোভয়িত্বা যথেষ্টম্।
ইতি নখরদচুম্বা শ্লেষগুহ্যোপচারৈ-
র্বিলসতি মদরাজ্যে যন্ত্রযোগং বিদধ্যাৎ॥"

(রতিরহস্য ১০.৬-৯)

অর্থাৎ যোনিমধ্যে লিঙ্গাকার একটী গ্রন্থি আছে, তাহা কামের বাহন-স্বরূপ। দুই অঙ্গুলিদ্বারা ক্ষোভিত হইলে তাহা যে মদন-জলপ্রবাহ সৃষ্টি করে, তাহার নাম মদনদোলা। রতিরন্ধ্রের উপরে নাসিকাকার সমস্ত মদশিরার কেন্দ্রস্বরূপ যে অংশ আছে, তাহার নাম মদনচ্ছত্র এবং মদনরন্ধ্রের অনতিদূরে অবস্থিত স্মরজল-পরিপূর্ণ যে গ্রন্থি আছে, তাহাকে পূর্ণচন্দ্রা বলে। ইহা ব্যতীত আরও বহু নাড়ী ও গ্রন্থি আছে; কিন্তু অঙ্গুলিদ্বারা ক্ষোভণের জন্য এই তিনটীই উল্লেখযোগ্য। অঙ্গুলীরতের করিকর, ফণিভোগ, অর্দ্ধেন্দু, কামাঙ্কুশ প্রভৃতি অনেকগুলি প্রকার আছে। কঠোরবেগা নারীগণের ঐ সকল নাড়ী বা গ্রন্থিতে তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়দ্বারা অবিরত ও যথেষ্ট ক্ষোভণ করিয়া উহাদিগকে নখাঘাত, দন্তাঘাত, চুম্বন, আলিঙ্গন ও অঙ্গুলীরত দ্বারা অত্যন্ত উত্তেজিত করিয়া যন্ত্র-যোগ করা কর্ত্তব্য। বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন—

"তস্যাঃ প্রাগ্‌যন্ত্রযোগাৎ করেণ সংবাধং
গজ ইব ক্ষোভয়েদামৃদুভাবাৎ ততো যন্ত্রযোজনম্।"

(কামসূত্র ২.৮.১০)

নাগরসর্ব্বস্বে লিখিত আছে,—

"সংপ্রাপ্য বালাং করশাখয়ৈব লিঙ্গেন চাত্মীয়সমাং সমেত্য।
লিঙ্গাঙ্গুলিভ্যাং তু তথাভিরূঢ়াং প্রচোদনীয়ং মদনাতপত্রম্॥"

(নাগরসর্ব্বস্ব ১২.৩)

নাগরসর্ব্বস্বের ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদে ছয় প্রকারের অঙ্গুলি-প্রবেশের উল্লেখ আছে—

"প্রবেশ্যতে তর্জ্জনিকা বরাঙ্গে
প্রবেশনং তৎকরণং বদন্তি।
সা মধ্যমা পৃষ্ঠগতা যদা স্যাৎ
বিদ্ভির্বিদগ্ধাঃ কনকাভিধানম্॥
তয়োর্দ্বয়োঃ পৃষ্ঠবিপর্যয়েণ
বদন্তি ধীরা বিকনং তদেব।
ততে তু তে দ্বে কথিতা পতাকা
ত্রিস্রঃ সহানামিকয়া ত্রিশূলঃ॥
শ্লিষ্টা যদা তাঃ শনিভোগমাহুঃ॥"

যোনিতে তর্জ্জনী প্রবেশ করাইলে 'প্রবেশন' বলে। তর্জ্জনী মধ্যমাঙ্গুলির পৃষ্ঠগতা হইলে 'কনক' এবং তর্জ্জনীর পৃষ্ঠভাগে মধ্যমাঙ্গুলি রাখিলে 'বিকন' কহে। মধ্যমা ও তর্জ্জনী পাশাপাশি ছড়াইয়া রাখিলে 'পতাকা' বলে। সেইরূপ তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিন অঙ্গুলি বিস্তৃত করিয়া প্রবেশ করাইলে, 'ত্রিশূল' বলে এবং ঐ তিন অঙ্গুলি একত্র করিয়া প্রবেশ করাইলে 'শনিভোগ' কহে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত রতিরহস্যান্তর্গত করিকর, ফণিভোগ, অর্দ্ধেন্দু ও কামাঙ্কুশ, এইগুলি অঙ্গুলিপ্রবেশেরই প্রকারভেদ। করিকর বা করিহস্তের লক্ষণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"তর্জ্জন্যনামিকা যুক্তে মধ্যমা পৃষ্ঠতো যদি।
করিহস্ত ইতি প্রোক্তঃ কামশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥"

অর্থাৎ তর্জ্জনী ও অনামিকা যুক্ত করিয়া যদি মধ্যমার পৃষ্ঠগত করা হয়, তবে কামশাস্ত্রবিদ্‌গণ তাহাকে করিহস্ত বলিয়া থাকেন। কামসূত্রের টীকাকার যশোধর বাৎস্যায়নের "গজ ইব ক্ষোভয়েৎ" শব্দের ব্যাখ্যায় নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন—

"অনামিকা প্রদেশিন্যৌ শ্লিষ্টাগ্রে জ্যেষ্ঠয়া সহ।
গজহস্তাগ্রসাদৃশ্যাৎ তৎসংজ্ঞং কৃত্রিমং স্মৃতম্॥"

অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলি অঙ্গুষ্ঠের সহিত শ্লিষ্টাগ্র (অর্থাৎ অগ্রভাগ মিলিত) হইয়া হস্তিশুণ্ডের অগ্রভাগের ন্যায় হইলে গজহস্ত হয়।

বিভিন্ন দেশের রমণীগণ রতিকালে কিরূপে তৃপ্ত হইয়া থাকে, কামশাস্ত্রকারগণ তাহার বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কোন্ কোন্ দেশীয় রমণী অঙ্গুলীরতে তুষ্টা হইয়া থাকে, তাহারও উল্লেখ আছে।

বাৎস্যায়ন ও কোক্কোকের মতে, স্ত্রীরাজ্য ও কোশল-দেশের নারী এবং নাগরসর্ব্বস্বের মতে স্ত্রীরাজ্য, কোশলদেশ,

কর্ণাটদেশ ও মহারাষ্ট্রদেশের রমণীগণ অঙ্গুলীরত ও অপদ্রব্য দ্বারা তুষ্টা হইয়া থাকে।

চণ্ডবেগা রমণীগণ সুরতকালে তৃপ্ত না হইলে, তাহাদিগকে অঙ্গুলিপ্রবেশ দ্বারা তৃপ্ত করা উচিত। এই সম্বন্ধে স্মরদীপিকায় লিখিত আছে—

"অঙ্গুলীনাং প্রবেশৈস্তু তথা কৃত্রিমলিঙ্গকৈঃ।
মৃদুহ্রস্বধ্বজঃ কামী রমেৎ স্ত্রীতোষহেতবে॥"

স্ত্রীদিগের তুষ্টির জন্য মৃদুবেগ ও হ্রস্বধ্বজ কামী অঙ্গুলিপ্রবেশ দ্বারা বা কৃত্রিম লিঙ্গদ্বারা রমণ করিবে।

সম্বাধের উপর ও শীর্ষদেশে ধীরে ধীরে অঙ্গুলিক্ষোভণ করিলে ইন্দ্রিয়টী কিঞ্চিৎ দৃঢ়কায় হইয়া উচ্ছ্রিত হয় এবং ইহার আবরণী অপসারিত হওয়ায় মদনচ্ছত্রটী প্রকট হইয়া পড়ে। সেই স্থানে অঙ্গুলিক্ষোভণ করিলে রমণী তৃপ্তিলাভ করে। যে সকল রমণী সহজে মৃদুত্ব প্রাপ্ত হয় না, তাহাদিগের কিঞ্চিৎ অধিকক্ষণ ক্ষোভণ করা আবশ্যক। বিশেষতঃ অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া অঙ্গুষ্ঠটী মদনদোলায় বা মদনচ্ছত্রে ন্যস্ত করিয়া ক্ষোভণ করিলে সহজেই কামের উদ্রেক হইয়া থাকে। অঙ্গুলি-ক্ষোভণ অতি সাবধানতার সহিত করা উচিত। যে সকল রমণী সহজেই মৃদুস্বভাবা, তাহাদের উপর অঙ্গুলীরতপ্রয়োগ উচিত নহে।

অঙ্গুলীরতের উপকারিতা ও অনুপকারিতা সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত মতামত এবং অপদ্রব্যাদি ও কৃত্রিম লিঙ্গের দ্বারা রতিক্রিয়ার ফলাফল যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে। [মৈথুন, রমণ, রতিক্রিয়া দ্র°]

অঙ্গুলিফলা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] শ্বেতনিষ্পাব। (রাজনি°)

অঙ্গুলির্মালিয়সুত্ত—বৌদ্ধ মহাযান-মতবাদী এক বৈপুল্যসূত্র। এই সূত্রের একস্থলে সকল চেতন পদার্থকে ভগবান্ তথাগতের গর্ভস্থ বলা হইয়াছে। অপরস্থলে বুদ্ধকে নিগুর্ণ, শূন্য বা আকাশের ন্যায় বর্ণনা করা হইয়াছে।

অঙ্গুলিমান—(ক্লী) অঙ্গুলি দ্বারা যোজন পর্য্যন্ত মান। আট যবে এক অঙ্গুলি, চব্বিশ অঙ্গুলিতে এক হাত, চারি হাতে এক দণ্ড, দুই শত দণ্ডে এক ক্রোশ এবং চারি ক্রোশে এক যোজন।

অঙ্গুলিমালসুত্ত—মজ্ঝিমনিকায়ের অন্তর্গত একটী সূত্র। ইহাতে পরস্বলুণ্ঠনকারী দস্যু অঙ্গুলিমালকে বুদ্ধদেব সদ্ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহার যথাযথ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। থের-গাথায় যে কয়টী গাথা আছে, ঠিক সেই গাথা-গুলিও এই সূত্রে অঙ্গুলিমালকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে।

অঙ্গুলিমুদ্রা—(স্ত্রী) [অঙ্গুলি-মুদ-রা-ক ; ৬-তৎ] নামাঙ্কিত আঙ্টী ; অঙ্কিত অঙ্গুলিভূষণ। "উপহিতস্মৃতিরঙ্গুলিমুদ্রয়া।" (শকু°)

অঙ্গুলিমুদ্রিকা—(স্ত্রী) [অঙ্গুলিমুদ্রা-স্বার্থে ক, স্ত্রীত্বে আপ্] [অঙ্গুলিমুদ্রা দ্র°]

অঙ্গুলিমূল—(ক্লী) অঙ্গুলির প্রারম্ভ স্থান। মনুর মতে, করতলে ব্রাহ্ম, কায়, দৈব ও পিত্র্য, এই চারিটী তীর্থ। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ অঙ্গুলিমূলে কায়তীর্থ। "কায়মঙ্গুলিমূলেঽগ্রে দৈবং পিত্র্যং তয়োরধঃ।" (মনু ২.৫৯)

অঙ্গুলিমোটন—(ক্লী) [অঙ্গুল্যোঃ মোটনং মর্দ্দনং যত্র ; বহুব্রী] অঙ্গুলিদ্বয়মর্দ্দনজাত শব্দ। তুড়ি ; আঙ্গুল মট্‌কান।

অঙ্গুলিবেষ্টক—(পুং) [বৈদ্যক] অঙ্গুলির একপ্রকার রোগ। গাম্ভারিবৃক্ষের ৭টী কোমল পত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া বান্ধিয়া রাখিলে এই রোগের নাশ হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

অঙ্গুলিষঙ্গা—(স্ত্রী) [অঙ্গুলৌ সঙ্গঃ যস্যাঃ ; বহুব্রী ষত্ব] অঙ্গুলিতে লেপন করিবার যবের মণ্ড। যাউ।

অঙ্গুলিসংজ্ঞা—(স্ত্রী) [অঙ্গুল্যা সংজ্ঞা সঙ্কেতজ্ঞাপনম্] অঙ্গু-লির দ্বারা ইঙ্গিত ; সঙ্কেত। "মুখার্পিতৈকাঙ্গুলিসংজ্ঞয়ৈব" (কুমারস° ৩য় সর্গ)

অঙ্গুলিসঞ্চালন (Athetosis)—এই রোগে সাধারণতঃ হাতের ও পায়ের অঙ্গুলি ধীরে ধীরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও চালিত হইতে থাকে। যে সকল পেশী স্তম্ভিত (অর্থাৎ সঙ্কোচনে অসমর্থ) সেই সকল পেশী এই রোগে আক্রান্ত হয়। এই রোগ বালকদিগেরই সচরাচর হইয়া থাকে। মস্তিষ্কের কোন প্রকার গঠনগত বিকার উপস্থিত হইলে এই রোগের উৎপত্তি হয়। সাধারণতঃ ইহা পক্ষাঘাতের পর দেখা যায়। এই রোগ অসাধ্য।

অঙ্গুলিসন্দেশ—(পুং) [অঙ্গুলি-সম্-দিশ্-ঘঞ্ ভাবে] অঙ্গুলি-ধ্বনি দ্বারা ভাবপ্রকাশ। অঙ্গুলির শব্দে সংজ্ঞাদান। তুড়ি দিয়া সংবাদজ্ঞাপন।

অঙ্গুলিসম্ভূত—(পুং) [অঙ্গুল্যাং সম্ভূতঃ ; অঙ্গুলি-সম্-ভূ-ক্ত, ৭-তৎ] নখ। (ত্রি) ২ অঙ্গুলিতে জাতমাত্র।

অঙ্গুলিস্ফোটন—(ক্লী) [অঙ্গুল্যোঃ স্ফোটনং যত্র ; বহুব্রী] অঙ্গুলিদ্বয়ের মর্দ্দনজাত শব্দ ; তুড়ি। [৬-তৎ] ২ অঙ্গুলির স্ফোটন মাত্র। অঙ্গুলি মট্‌কান। অঙ্গুলি ফোটান। আবশ্যক না হইলেও হাতের স্বস্তির নিমিত্ত অনেকে আঙ্গুল মট্‌কাইয়া থাকেন। কুন্দুলে স্ত্রীলোকেরা কাহাকেও অভিসম্পাত করিবার সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গুল মট্‌কাইতে থাকে।

অঙ্গুলী—(স্ত্রী) [অঙ্গুলি-স্ত্রিয়াং বা ঙীপ্] দেহাবয়ববিশেষ ; অঙ্গুল। পর্য্যায়—করশাখা, অঙ্গুলি, অঙ্গুলী, অঙ্গুরি, অঙ্গুরী, অঙ্গুল। ইহা পঞ্চপ্রকার, যথা—অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা। "চ্যুতমপি লব্ধপদং যদঙ্গুলীষু"। (শকুন্তলা)

অঙ্গুলীক—(পুং, ক্লী) [অঙ্গুল্যাং কায়তে নিধীয়তেঽসৌ ; অঙ্গুলি-কৈ-ঘঞর্থে কর্ম্মণি ক] অঙ্গুলীভূষণ, আঙ্‌টী, চুট্‌কী প্রভৃতি।

অঙ্গুলীপঞ্চক—(ক্লী) [অঙ্গুলিপঞ্চক দ্র°]

অঙ্গুলীয়—(ক্লী) [অঙ্গুলী-ছ] অঙ্গুরীয় ; আঙ্‌টী। (পুং) ২ হিরণ্যনাভের শিষ্যভেদ। [অঙ্গুরীয়২ দ্র°]

অঙ্গুলীয়ক—(পুং, ক্লী) [অঙ্গুলীয়-স্বার্থে ক] অঙ্গুলিভূষণ। পর্য্যায়—ঊর্ম্মিকা, অঙ্গুরীয়ক, অঙ্গুরীয়, অঙ্গুলীয়, করারোট, অঙ্গুলীক। "অঙ্গুলীয়করত্নানি সমস্তাস্বঙ্গুলীষু চ।" । (মার্ক° চণ্ডী)

অঙ্গুলীসম্ভূত—(ত্রি) [অঙ্গুলিসম্ভূত দ্র°]

অঙ্গুল্যাকার—(ত্রি) অঙ্গুলির ন্যায় আকারবিশিষ্ট।

অঙ্গুল্যাদি—(পুং) পাণিন্যুক্ত শব্দগণসমূহ। ইবার্থে ঐ সকল শব্দের উত্তর ঠক্ প্রত্যয় হয়। অঙ্গুলি-ঠক্, আঙ্গুলিক ইত্যাদি। [অঙ্গুল্যাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৫.৩.১০৮] নিম্নলিখিত শব্দগুলি অঙ্গুল্যাদি গণমধ্যে পঠিত,—অঙ্গুলী, ভরুজ, বভ্রু, বল্গু, মণ্ডর, মণ্ডল, শষ্কুলী, কপি, উদশ্বিৎ, গোণী, উরস্, শিখা, কুলিশ। পুস্তকান্তরে—হরি, মুনি, রুহ, খল এই কএকটী শব্দও গৃহীত হইয়াছে।

অঙ্গুষ্ঠ—(পুং) [অঙ্গে পাণৌ তিষ্ঠতীতি অঙ্গ-স্থা-ক। ষত্ব। ৭-তৎ] বৃদ্ধাঙ্গুলি ; বুড়া আঙ্গুল। "অঙ্গুষ্ঠোদরমধ্যে তু যবো যস্য বিরাজতে।" (সামুদ্রিক) [হস্ত দ্র°] চলিত কথায় 'সে অঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া গেল বা সে বুড়া আঙ্গুল দেখাইয়া গেল।'—অর্থাৎ সে ফাঁকি দিয়া গেল। ২ অঙ্গুষ্ঠের বৃহৎপর্ব্ব। (কাত্যায়ন ৭.৫) [অঙ্গুষ্ঠমাত্র দ্র°]

অঙ্গুষ্ঠমাত্র—(ত্রি) [অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণার্থে মাত্রচ্] অঙ্গুষ্ঠের বৃহৎ পর্ব্বপরিমিত ; বুড়া অঙ্গুলের বড় গাঁইটের সমান। কাত্যায়ন বলিয়াছেন, যেখানে যেখানে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণের উল্লেখ আছে, সেই সেই খানেই অঙ্গুষ্ঠের বৃহৎপর্ব্বগ্রন্থি পর্য্যন্ত মান বুঝিতে হইবে।

"অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলমানন্তু যত্র যত্রোপদিশ্যতে।
তত্র তত্র বৃহৎপর্ব্বগ্রন্থিভির্মিনুয়াৎ সদা।" (কাত্যায়ন)

অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষ—(পুং) পরমাত্মা। "অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ বলাদ্‌যমঃ।" (মহা° ৩.২৯৬.১৭) ২ পরমাত্ম-স্বরূপ ভগবান্। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৩০.২৭৬)

অঙ্গুষ্ঠমূল—(ক্লী) বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলদেশ। অঙ্গুষ্ঠ মূলের তলে ব্রাহ্মতীর্থ। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ এই ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারাই সর্ব্বদা আচমন করিবেন। (মনু ২.৫৮-৫৯)

অঙ্গুষ্ঠ্য—(পুং) অঙ্গুষ্ঠের নখ। (কাত্যায়নশ্রৌ° ৭.২.৮)

অঙ্গূষ—(পুং) [অগি গতৌ-উষন্] নকুল। ২ বাণ।

অঙ্গেষ্ঠা—(স্ত্রী) অঙ্গে স্থিত। "বলাসং সর্ব্বং নাশয়াঙ্গেষ্ঠা যশ্চ পর্ব্বসু" (অথর্ব্ব° ৬.১১১.১)

অঙ্গোরা—(এন্‌গুরী, প্রাচীন অন্‌কিরা—**Ancyra**) তুর্ক-সুলতানের অধিকৃত এসিয়া-মাইনরস্থ একটী জনপদ (বিলায়েত)। ইহা প্রাচীন গালেসিয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এখানকার অঙ্গোরা ও কির-শহরে পশমের প্রভূত কারবার আছে। এতদ্ভিন্ন এখানে রূপা, তামা ও লবণের খনি রহিয়াছে।

২ উক্ত জনপদের প্রধান নগর। একটী গণ্ডশৈলের ৫০০ ফুট উচ্চ অধিত্যকায় সাকারিয়া নদীর এন্‌গুরি-সু শাখার বামকূলে কন্‌স্তান্তিনোপল হইতে ২২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। ১৯২৪ সালের গণনায় এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার হইয়াছে।

এই পর্ব্বতপৃষ্ঠে এখনও গ্রীক্ ও রোমক যুগের এবং বৈজন্তীয় স্থাপত্যের বহু কীর্ত্তি বিদ্যমান ; তন্মধ্যে 'রোম' ও 'অগষ্টাস্' নামক রোমক সম্রাট্‌দ্বয়ের কীর্ত্তিজ্ঞাপক মর্ম্মর-প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দিরটী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের বিশেষ আদরের জিনিষ। খৃষ্টান প্রাধান্যে ইহা গীর্জ্জায় পরিণত হয় এবং খৃষ্টীয় ১৬শ শতকে ইহার দক্ষিণদিকে একটী সুন্দর মস্‌জিদ সংযোজিত করিয়া দিয়া উহাকে মুসলমানদিগের সম্পত্তিরূপে ঘোষিত করা হয়। কিন্তু উহার একটী দেওয়ালের একদিকে লাটিন ও অপরদিকে গ্রীক্ অক্ষরে ক্ষোদিত শিলালিপি আছে। উহা সম্রাট্ অগষ্টাসের মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে (১৩-১৪ খৃঃ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

পারস্য হইতে গ্রীসে আসিবার পথে অবস্থিত থাকায় এই নগর বহু প্রাচীনকাল হইতে সমৃদ্ধিশালী ছিল। প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ পর্য্যবেক্ষণে যতদূর অবগত হওয়া যায়, তাহাতে অনুমিত হয় যে, ফ্রিজীয়গণ এক সময়ে এই স্থান শাসন করিতেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ২৩২ অব্দে এখানে (গালেসিয়ায়) তেক্তোসাগী (**Tectosages**) নামে গলজাতির একটী শাখা স্থায়িভাবে বাস করিত। বর্ব্বর জাতির আক্রমণে দেশবাসী নিপীড়িত ও প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ বিধ্বস্ত হইলে অঙ্গোরা একটী গণ্ডগ্রামে পরিণত হয়। ১৮৯ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে মান্‌লিয়াস ভালসো এইস্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। ৬৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে পম্পী অঙ্গোরা ও তেক্তো-সাগীদিগের অধ্যুষিত দেশভাগ লইয়া একটী স্বতন্ত্র জনপদ গঠন করেন এবং একজন দেশীয় সর্দ্দারের উপর উহার শাসনভার অর্পিত হয়। ২৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে এই নগর রোমসাম্রাজ্যের খাস রাজধানীরূপে পরিগণিত হয়। ১৯ খৃষ্টাব্দে ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন যে, এখানে মাত্র একটী দুর্গ ছিল। রোমক অথবা গ্রীক্ অধিকারকালে সুশাসনের জন্য এখানে কোন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কিন্তু শিলালিপি, প্রাচীন মুদ্রা ও স্থাপত্যশিল্প হইতে প্রমাণিত হয় যে, স্থানীয় কেল্টিক বা হেলেনিক জাতির উপর যে রোমক সংস্পর্শ না ঘটিয়াছে

এমন নহে। ১৫০ খৃষ্টাব্দে এখানে হেলেনিকদিগের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ১৯২ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা পল এখানে গীর্জ্জার প্রতিষ্ঠা করেন। কনস্তান্তিনোপল রোমক-সাম্রাজ্যের রাজধানী হইবার পর এই স্থানের নষ্ট সৌন্দর্য্য পুনরায় ফিরিয়া আসিতে আরম্ভ করে।

বৈজন্তীয় অধিকারে ইহার সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিলে ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র আরব ও পারস্যবাসিগণ এই স্থান অধিকার করে। তৎপরে কিছুকাল উহা সেলজুক্ জাতীয় তুর্ক ও রোমীয় যোদ্ধ-বর্গের (Latin Crusaders) শাসনাধীন থাকে। ১৩৬০ খৃষ্টাব্দে ইহা তুরুষ্কের সুলতানের অধিকৃত হয়। ১৪০২ খৃষ্টাব্দে এখানে সুলতান বয়াজিদের সহিত দুর্দ্ধর্ষ তাতার-সেনাপতি তৈমূরশাহের যুদ্ধ হয়। পরাজয়ের সঙ্গে এখানকার অধিকার তুর্কের হস্তচ্যুত হয়, কিন্তু ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে তুর্ক-সুলতান ১ম মহম্মদ ইহা পুনরধিকার করেন এবং সেই সময় হইতে ইহা সুলতানের অধিকারে থাকে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম পাশা তাঁহার মিশরীয় সৈন্য লইয়া এই স্থান অধিকার করিয়া লন। অতঃপর অঙ্গোরা হইতে কনস্তান্তিনোপল রেলপথ দ্বারা সংযোজিত হয়।

বিগত মহাযুদ্ধের পর যখন তুর্ক-সাম্রাজ্যকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া শক্তিহীন করিবার পরামর্শ চলিতে লাগিল এবং এসিয়া মাইনরে গ্রীক্‌সৈন্য কর্ত্তৃক তুর্কীরা নিপীড়িত হইল, অথচ সুলতান তাহাতে হস্তক্ষেপ করিলেন না, তখন মুস্তাফা কামাল পাশা ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এক জাতীয় দল সংগঠন করেন এবং নানা বাধাবিঘ্ন ও যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়া ১৯২০ খৃষ্টাব্দে অঙ্গোরায় রাজধানী স্থাপন করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর জাতীয় মহাসভার (Great National Assembly) ঘোষণায় অঙ্গোরাই তুর্ক-সাম্রাজ্যের রাজধানী বলিয়া ঘোষিত হয়। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে কামাল পাশার প্রযত্নে এই নগর রাজকার্য্য-পরিচালনোপযোগী সৌধমালায় বিভূষিত হয় এবং রাজকর্ম্মচারী ও বৈদেশিকগণ রাজাদেশে অঙ্গোরায় আসিতে বাধ্য হন। [তুরুষ্ক দ্র°]

অঙ্গোলা (Angola)—বিষুবরেখার দক্ষিণে আফ্রিকার পশ্চিমোপকূলস্থিত একটী পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ। ইহার অপর নাম পর্ত্তুগীজ পশ্চিম-আফ্রিকা (Portuguese West Africa)। কবিন্দা ব্যতিরেকে এই প্রদেশের প্রায় অধিকাংশ স্থানই কঙ্গোনদীর দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার পশ্চিমে অতলান্তিক মহাসাগর। উত্তরে কঙ্গোনদী (অক্ষা° ৬° দঃ ও দ্রাঘি° ১২° পূঃ) হইতে কুনিন নদীর মোহানা (অক্ষা° ১৭° ১৮′ দঃ ও দ্রাঘি° ১১° ৫০′ পূঃ) পর্য্যন্ত এই ভূভাগ বিস্তৃত। প্রকৃত প্রস্তাবে কঙ্গোনদী উত্তরে ৮০ মাইল বিস্তৃত থাকিয়া ইহাকে স্বাধীন কঙ্গো (Congo Free State) হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইহার পূর্ব্বসীমায় কঙ্গো-রাজ্য ও রোডেসিয়া এবং দক্ষিণসীমায় নদীর পরপারে জর্ম্মন্-অধিকৃত দক্ষিণ-পশ্চিম-আফ্রিকা (ইহা বিগত মহাযুদ্ধের পর ইংরেজদিগের অধিকারে আসিয়াছে)। অঙ্গোলা উপনিবেশের ভূপরিমাণ ৪৮০,০০০ বর্গমাইল এবং ১৯২০ সালের গণনায় ইহার লোকসংখ্যা প্রায় চল্লিশ লক্ষ হইয়াছে। ত্রিশহাজার শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই পর্ত্তুগীজ।

বাণ্টু ভাষায় এই দেশের নাম ঙ্গোলা (Ngola)। পর্ত্তুগীজগণ উচ্চারণসৌকর্য্যার্থে উহাকে অঙ্গোলা (Angola) করিয়া লইয়াছেন। এই প্রদেশ ৫টী জেলায় বিভক্ত; তন্মধ্যে ৪টী সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী এবং ৫ম লাণ্ডাপ্রদেশ অভ্যন্তর-ভাগে অবস্থিত। এক সময়ে লাণ্ডায় বাণ্টুরাজ্যের রাজধানী ছিল, পরে উহা স্বাধীন কঙ্গো ও পর্ত্তুগীজদিগের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চুক্তি অনুসারে ঐ রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসে। সমুদ্রোপ-কূলস্থিত জেলাগুলির মধ্যে সর্ব্বোত্তরে কঙ্গো জেলা—কঙ্গো ও লোজে নদীর মধ্যে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে লোয়াণ্ডা, তন্নিম্নে বেঙ্গুয়েলা ও মোস্‌সামেদিস্ অবস্থিত। সর্ব্বদক্ষিণে মোস্‌সামেদিসের অভ্যন্তর ভাগের নাম হুইল্লা।

উপকূলভাগ প্রায় সমতল। মধ্যে মধ্যে লাল বেলে পাথরের পাহাড় আছে। দেশের মধ্যস্থল ক্রমে উচ্চ হইয়া ৪০০০ হইতে ৬০০০ ফুট উচ্চ এক সুদীর্ঘ অধিত্যকায় পর্য্যবসিত হইয়া মধ্য আফ্রিকার মূল অধিত্যকায় মিশিয়া গিয়াছে। কেবল পূর্ব্বাংশে কঙ্গো ও জাম্বেজী নদীর অববাহিকায় ক্রম-নিম্নস্তরে অবতরণ করিয়া সমতল ক্ষেত্রে একটী বালুকাময় অনুর্ব্বর মরুভূমি উৎপন্ন করিয়াছে। এই প্রদেশের মধ্য দিয়া কান্‌জা, কুনিন, কোয়ান্‌গো, কাসাই, লোজে প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী প্রবাহিত। সমুদ্রোপকূলে গ্রেট ফিস্ বে, লিট্‌ল্ ফিস্ বে, পোর্ট আলেক্‌সান্দার ও লোবিটো বে নামক খাড়ী বা উপসাগর আছে। ইহার মধ্যে লোবিটো উপসাগরের গভীরতা বেশী বলিয়া এই পথে পণ্যবাহী বড় বড় জাহাজ দেশের অভ্যন্তরে যাইয়া মাল খালাস করিতে পারে। উপরি-উক্ত অধিত্যকা-সংশ্লিষ্ট পর্ব্বতমালার মধ্যে বেঙ্গুয়েলা জেলার লোভিটি (৭৭৮০ ফুট) ও এলোঙ্গা (৭৫৫০ ফুট) শিখর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। কোয়ান্‌জা নদীর দক্ষিণে কাকুলো-কাবাজা নামক ৩৩০০ ফুট উচ্চ একটী আগ্নেয়গিরি আছে।

পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতমালায় নানা জাতীয় প্রস্তর পাওয়া যায়। তাম্র, গন্ধক প্রভৃতি ধাতব পদার্থেরও অভাব

নাই। সাও সাল্‌বদর দো কঙ্গো, লোয়াণ্ডা ও কাকোণ্ডা নগর উচ্চ অধিত্যকাভূমে স্থাপিত হওয়ায় বেশ মনোরম ও স্বাস্থ্যপ্রদ। বৈশাখমাসে এখানে ভীষণ বারিপাত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কাল বৈশাখীর ন্যায় ঝড়ও উঠিয়া থাকে।

এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই বাণ্টু নিগ্রো শাখাভুক্ত। ইহাদের মধ্যে বা-কঙ্গো, অবুণ্ডা, বাঙ্গালা এবং মুশী-কঙ্গো প্রধান। দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে বুশ্‌মেন জাতির কএকটী শাখার বাস। বুয়র জাতির সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। ইহারা ভূত-প্রেতের পূজা করে এবং অপদেবতার প্রকোপনিবারণার্থ গলায় শান্তিকবচস্বরূপ 'শান্ত' বাঁধে। শান্ত দেখিতে অনেকটা খৃষ্টানদিগের ক্রুশ-চিহ্নের মত।

সাও পৌলো ডি লোয়াণ্ডা এখানকার রাজধানী। এতদ্ভিন্ন কবিন্দা, বেঙ্গুয়েলা, মোস্‌সামেদিস্‌, লোবিটো, নোকি, আম্‌ব্রিজ, নোভো রেডণ্ডো, এগিটো, পোর্ট আলেক্‌সান্দার, হুম্পাতা, অম্বাকা, মালাঞ্জে, সাও সাল্‌বদর, বেম্বে, এঙ্কোজে, কঙ্গোম্বা ও কাকোণ্ডা প্রভৃতি নগর বাণিজ্যপ্রধান। এখানে ইক্ষু, তূলা, কফি, তামাক প্রভৃতির চাষ হয়। নারিকেল, নারিকেল তৈল, রবার, মোম, হস্তিদন্ত, গঁদ, তূলা প্রভৃতি দ্রব্য এখান হইতে বহুল পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে। খনিজ পদার্থের মধ্যে স্বর্ণ, তাম্র, লৌহ, পেট্রোলিয়ম ও খনিজ লবণের রপ্তানীও যথেষ্ট। চিনির কল হইতে রম (Rum) নামক মদ্য প্রস্তুত হয়। এই প্রদেশের অরণ্যগুলি নানা হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতকের শেষভাগে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের সহিত পর্ত্তুগীজদিগের প্রথম পরিচয় ঘটে। ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে ডিওগো কাম্‌ কঙ্গো নদী আবিষ্কার করিয়া এখানকার অধিবাসিবর্গের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। এই সদ্ভাবের ফলে তিনি নদীর মোহানায় একটী প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপনে সাহসী হন। ঐ স্তম্ভ 'Rio de Padrao' নামে পরিচিত। দেশবাসীদের মুখে ডিওগো জানিতে পারেন যে মানি-কঙ্গো এখানকার রাজা এবং বোন্‌জা-কঙ্গোয় তাঁহার রাজধানী। পর্ত্তুগালরাজ ঐ কথা শুনিয়া গোন্‌জালো ডি সুসাকে ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে দূতরূপে অঙ্গোলায় পাঠান। ঐ সঙ্গে একজন খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকও আসেন। তাঁহার উপদেশে রাজা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে অনেকেই এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে বোন্‌জা-কঙ্গোয় একটী উপাসনাগার (Cathedral) স্থাপিত হয়। এই স্থানই পরে 'সাও সাল্‌বদর' নামে অভিহিত হয়। অতঃপর ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে পলো দিয়াজ ডি নোভিসের অধীনে জেস্যুইট্‌ খৃষ্টান সম্প্রদায় এখানে আগমন করেন। ক্রমে খৃষ্টধর্ম্মের প্রসার ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পর্ত্তুগালরাজ অঙ্গোলার দক্ষিণস্থ জেলাগুলিতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেন। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে লোয়াণ্ডায় একজন বিশপ স্থাপিত হন। ক্রমে দলে দলে পর্ত্তুগীজগণ এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিলেন এবং ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে এঙ্কোজে নগরে পর্ত্তুগীজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৭৮৪ হইতে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আম্‌ব্রিজের দক্ষিণস্থ মুসোলোবাসী দেশীয়গণের সহিত যুদ্ধ করিয়া পর্ত্তুগীজগণ আত্মপ্রতিষ্ঠায় যত্নবান্‌ হন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা লোজে নদীতীরস্থ কুইন্‌কোলো নগরে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং বেম্বের খনিতে কাজ করিবার অধিকার পান।

এই সময় হইতে প্রায় অর্দ্ধ শতকেরও কিঞ্চিদধিককাল এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নাই। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে আম্‌ব্রিজ অধিকৃত হইলেও ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজ-গণ এস্থানের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখেন নাই। ঐ বর্ষে ইউরোপের বিভিন্ন শক্তি ভাগ্যান্বেষণার্থ দক্ষিণ আফ্রিকায় উপনীত হন। ঐ সময়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা রক্ষার্থে পর্ত্তুগালরাজ এখানে দুর্গনির্ম্মাণের ব্যবস্থা করেন এবং সাও সাল্‌বদরে দেশীয় রাজা ডম্‌ পেদ্রো পর্ত্তুগালরাজের অধীনে সামন্তরাজ-রূপে দেশশাসন করিতে থাকেন।

পর্ত্তুগীজদিগের প্রাধান্যে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া বৃটিশরাজ আম্‌ব্রিজের উত্তরদিকস্থ প্রদেশ পর্ত্তুগালের অধীন বলিয়া স্বীকার করিলেন না। অবশেষে ১৮৮৪-৮৬ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে কঙ্গোনদীর উভয় তীরস্থ ভূভাগ পর্ত্তুগীজ অধিকারভুক্ত বলিয়া সাব্যস্ত হয়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে সাও সাল্‌বদরে রাজকার্য্যপরিদর্শনার্থ স্থায়িভাবে একজন পর্ত্তুগীজ রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ ও ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ইতালী সন্ধিসূত্রে পর্ত্তুগীজ অধিকার স্বীকার করিয়া লন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জর্ম্মন্‌ সীমান্তস্থ কুনিন নদীতীরবাসী কুনাহামা জাতির বিদ্রোহ দমনে পর্ত্তুগীজদিগের বিশেষ বলক্ষয় হয়। ১৯০৫ ও ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে আদিম অধিবাসীদিগের সহিত পর্ত্তুগীজদিগের পুনরায় যুদ্ধ বাঁধে।

এই বিপ্লব ক্রমে শান্তভাব ধারণ করিলে প্রবল বাণিজ্য-প্রতিযোগিতার সূত্রপাত হয়। ১৯১৭-১৯২০ খৃষ্টাব্দে এখানে হীরকখনি ও স্বর্ণখনি হইতে প্রভূত মাল উত্তোলিত হওয়ায় ইহার প্রতি জর্ম্মনীর লোভ হয় এবং ক্রমে তাঁহারা অধিকাংশ বাণিজ্যই হস্তগত করেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ-পার্লিয়ামেণ্ট অঙ্গোলাবাসীদের

স্বায়ত্তশাসন প্রদান করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর সেনর নর্টন অঙ্গোলার হাই-কমিশনররূপে এখানে আসিয়া দেশের উন্নতিসাধনে ব্রতী হন। তাঁহার একান্ত চেষ্টার ফলে বন্দরগুলির যথেষ্ট উন্নতি ও সংস্কার হইয়াছিল। ১৯১৪ হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অনেকগুলি রেলপথ বিস্তৃত হয়।

জর্ম্মনীর অধিকৃত দক্ষিণ-পশ্চিম-আফ্রিকা প্রদেশ অঙ্গোলার দক্ষিণে থাকায় জর্ম্মনী এখানকার বাণিজ্য ব্যাপারে এমন কি শাসনকার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হন। ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এখানে জর্ম্মন্-প্রাধান্য স্বীকার করিয়া এক সন্ধি করেন; কিন্তু ঐ সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবার পূর্ব্বেই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের অগষ্ট্ মাসে ইউরোপ-খণ্ডে মহাসমর বাঁধিয়া উঠে এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মনী দক্ষিন-আফ্রিকার প্রতিপত্তি হারাইতে বাধ্য হন।

অঙ্গোষিণ্—(ত্রি) শব্দায়মান, ঝঙ্কারকারী। ২ সোমপানে ঈষন্মত্ত। (সামবেদ, পূ° ৬.৪.৬ এবং উ° ৬.১১.১)

অঙ্গ্য—(ত্রি) অঙ্গে ভব, বা অঙ্গস্থ। (ঋক্ ১.১৯১.৭)

অঙ্গ্রিয়া—কোঙ্কণবাসী এক মরাঠা-বংশ। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা তুকাজী অঙ্গ্রিয়া শিবাজীর অধীনে বিশেষ দক্ষতার সহিত নৌবিভাগে কার্য্য করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করেন। শিবাজীর মৃত্যুর ৯ বৎসর পরে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপুত্র কাহ্নোজীও নৌবিভাগে প্রবেশ করিয়া সিদোজী গুজরের অধীনে সহকারী-পোতাধ্যক্ষ পদ প্রাপ্ত হন।

কাহ্নোজী নৌবিভাগে সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। সহকারী-পোতাধ্যক্ষ থাকা কালে তিনি বলদর্পী সিদ্দিগণকে পরাজিত করেন। তাঁহার রণপাণ্ডিত্য ও বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া সিদোজী গুজরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরই তাঁহাকে রাজারাম মরাঠা-পোতবাহিনীর অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। শাহু মুগল কবল হইতে মুক্ত হইয়া মরাঠা রাজ্যে নিজ প্রাধান্য স্থাপনে উদ্যোগী হইলে কাহ্নোজী তারাবাঈয়ের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে বিরক্ত হইয়া শাহু তাঁহার বিরুদ্ধে সেনাদল প্রেরণ করিলেন। কাহ্নোজী সেনাপতিকে যুদ্ধে বন্দী করিয়া লোহাগড়, রাজমাচী প্রভৃতি দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। অনতিবিলম্বে কাহ্নোজীকে সাতারা আক্রমণে অগ্রসর দেখিয়া দুর্ব্বলহৃদয় শাহু বালাজী বিশ্বনাথের পরামর্শে কাহ্নোজীর সহিত সন্ধি করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন। সন্ধির ফলে কাহ্নোজী শাহুর পক্ষ অবলম্বন করিলেন এবং উহার সর্ত্তানুসারে তিনি দশটী প্রধান দুর্গ, ১৬টী প্রাচীরবেষ্টিত স্থান ও তদন্তর্গত কএকটী গ্রাম পাইলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি মরাঠা-পোতবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত থাকিলেন। এই সন্ধির দ্বারা তিনি যে সকল গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে সিদ্দিদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়াছিল।

শম্ভাজী ও শাহুর দুর্ব্বলতার কারণ মহারাষ্ট্রশক্তি দিন দিন হীনবল হইয়া পড়িতেছিল এবং মরাঠা-সর্দ্দারগণ আপনাপন প্রভুত্বরক্ষার্থ বদ্ধপরিকর হইতেছিলেন। অরাজকতার এই সুযোগ কাহ্নোজীও হারাইলেন না। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই হইতে বিজয়দুর্গ পর্য্যন্ত সমগ্র উপকূল ও দেশান্তর্ভাগ তাঁহার করতলগত দেখিয়া কাহ্নোজী আপনাকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং বিজয়দুর্গে তাঁহার রাজপাট প্রতিষ্ঠিত হইল। এই রাজশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে তিনি যে শক্তি ও রণকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা অসমসাহসিক ও অদম্য অধ্যবসায়ী মহারাজ শিবাজীর বীরত্ব অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল না।

কাহ্নোজীর নৌবাহিনী কর্ত্তৃক বৈদেশিক বণিক্‌দিগের পণ্য পুনঃপুনঃ লুণ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের ইংরেজ-গবর্ণমেণ্ট বিজয়দুর্গ আক্রমণার্থ সেনাদল প্রেরণ করেন। নৌযুদ্ধে মরাঠাবাহিনী ইংরেজের 'সাক্‌সেস' (Success) নামক জাহাজ অধিকার করিয়া লইল। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজেরা পুনরায় খান্দেরী আক্রমণ করেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত ও ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে গোয়ার পর্ত্তুগীজগণ ইংরেজের সহিত মিলিত হইয়া অঙ্গ্রিয়াকে দমন করিতে অগ্রসর হন। এই যুদ্ধে মরাঠা পক্ষের ১৬ খানি জাহাজ বিনষ্ট হইলেও কাহ্নোজীর হস্তে মিলিত সেনাদল পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার পর পুনরায় ১৭২২ খৃষ্টাব্দে মিলিত ইংরেজ ও পর্ত্তুগীজসৈন্য কোলাবা আক্রমণ করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইঁহারা পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা জল ও স্থলপথে বিজয়দুর্গ আক্রমণ করিলেও ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন না থাকায় তাঁহারা পরাভূত হইয়া পলায়ন করেন।

পুনঃপুনঃ রণজয়ে ও বিপক্ষপক্ষবিমর্দ্দনে উৎফুল্ল হইয়া কাহ্নোজী ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের মূল্যবান্ পণ্যবাহী ডার্বি- (Derby) নামক জাহাজ কাড়িয়া লন। ঐ সময়ের কিছুকাল মধ্যে তিনি ওলন্দাজ ও ফরাসীদিগের কএকখানি জাহাজ হস্তগত করিয়াছিলেন। দুর্দ্ধর্ষ মরাঠা দস্যুদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নৌবাহিনী রক্ষার্থ তৎকালে বার্ষিক প্রায় ৫০ হাজার পাউণ্ড ব্যয় করিতে হইত।

১৭২৮ খৃষ্টাব্দে কাহ্নোজীর মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শাকোজী কোলাবার শাসনকর্ত্তা হন; কিন্তু অনতিকালমধ্যে

তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শম্ভাজী সুবর্ণদুর্গে থাকিয়া রাজ্যভার গ্রহণপূর্ব্বক মানাজী ও যেশাজী নামক কাহ্নোজীর অবৈধ পুত্রদ্বয়কে নৌবহরের ও কোলাবার কর্ত্তৃত্ব দান করেন। মানাজী ও যেশাজীর মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হওয়ায় উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। মানাজী পর্ত্তুগীজদিগের সহায়তায় কোলাবা অধিকার করিয়া যেশাজীকে বন্দী করেন ও তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করিয়া ফেলেন। মানাজীর এবংবিধ আচরণে উত্যক্ত হইয়া শম্ভাজী মানাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। সম্মুখে সমূহ বিপদ দেখিয়া মানাজী পেশবার শরণাপন্ন হন। তিনি কাট্‌লা (কাঠিগড় ?) ও রাজমাচী-দুর্গ পেশবার হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহার সাহায্যে শম্ভাজীকে বিদূরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু উভয় পক্ষের এই বিরোধ কিছুকাল ধরিয়া চলিয়াছিল।

১৭৩০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজেরা ফোন্দ সাবন্তের সহযোগে ও ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে সিদ্দিদিগের সাহায্যে অঙ্গ্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু দুইটী যুদ্ধেই তাঁহারা বিশেষ ফলবান্ হইতে পারেন নাই। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ-সেনাপতি বাগ্‌ওয়েল (Commodore Bagwel) শম্ভাজীর নৌবাহিনীর পশ্চাদনুসরণ করিয়া রাজাপুর নদীর ভিতর তাড়াইয়া লইয়া যান। এই যুদ্ধে মরাঠা-বাহিনীর বিশেষ ক্ষতি না হইলেও নৌসেনাপতি গুলির আঘাতে নিহত হন।

এই সময়ে সমুদ্রোপকূলে মানাজীর দৌরাত্ম্য বাড়িয়া উঠে। করঞ্জ ও এলিফাণ্টা দ্বীপ তিনি অধিকার করিয়া লইয়াছেন দেখিয়া শম্ভাজী তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া চেউল, আলীবাগ, সাগরগড় ও থল অধিকার করিয়া লন; কিন্তু কোলাবা সংরক্ষণে প্রেরিত বালাজী বাজীরাও মানাজীর পক্ষে থাকায় তিনি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই।

ইংরেজেরা এই সুযোগে শম্ভাজীকে আক্রমণ করিয়া সুবর্ণদুর্গ পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া যান, কিন্তু তিনি পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে শম্ভাজী ভরতগড়, ভগবন্তগড় ও শালসী বিভাগে বাদী নামক স্থানের কতকাংশ অধিকার করিয়া লন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে শম্ভাজীর মৃত্যু হইলে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তুলাজী উত্তরাধিকারী হন। তিনি কখনও পেশবার সপক্ষে কখন বিপক্ষে থাকিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাণিজ্যপোত লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইতেন। এই সময়ে সাবন্তেরা, কোল্‌হাপুরের সর্দ্দারেরা এবং সঙ্গমেশ্বরের মালবানেরা জলদস্যুরূপে বৈদেশিকের জাহাজ লুণ্ঠন করিয়া উপকূলভাগ বিপদসঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছিলেন।

কিছুকাল বিভিন্ন দস্যুসম্প্রদায় কর্ত্তৃক এইরূপ ভাবে মলবার উপকূল উপদ্রুত থাকার পর, ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ মরাঠা ও সিদ্দিসৈন্যের সহযোগে তুলাজীর প্রভাব খর্ব্ব করিতে বদ্ধপরিকর হন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সুবর্ণদুর্গ, বাঙ্কট, বিজয়দুর্গ প্রভৃতি ইংরেজ-সেনাপতি ওয়াটসন ও ক্লাইব এবং মরাঠা-সেনাপতি রামজী পন্তের কবলিত হয়। তুলাজী অঙ্গ্রিয়াকে রায়গড়দুর্গে বন্দী করা হয়। এই অবস্থাতেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার দুই পুত্র ১২।১৪ বৎসর কারাযন্ত্রণা ভোগের পর মুক্তি পাইয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অনুকম্পায় বোম্বাই শহরে আশ্রয় পাইয়াছিলেন।

এই অঙ্গ্রিয়া-বংশের অন্য একটী শাখা প্রায় শতাধিক বর্ষ রাজসম্মান লাভ করিয়া কোলাবায় বসবাস করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কখনও বৈদেশিক বণিক্-দিগকে উপকূলভাগে উৎপীড়িত করেন নাই। মরাঠা সরকারের অনুগ্রহভাজন থাকিয়া মানাজী ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র রঘুজী ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি কোলাবা ও আলীবাগে রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করিয়াও মধ্যে মধ্যে লুণ্ঠন দ্বারা পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম বজায় রাখিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। রঘুজীর মৃত্যুর পর তৎপুত্র মানাজী (২য়) রাজা হন; কিন্তু পেশবা ও দৌলৎরাও সিন্দের মনোনীত না হওয়ায় ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া উক্ত বংশের বাবুরাও নামক জনৈক ব্যক্তিকে গদীতে বসান হয়। ইহার পর প্রথম মানাজীর পৌত্র রাজা হন; কিন্তু এই সময়ের মধ্যে বলবান্ মরাঠা ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বণ্টন-বিভ্রাটে বিজয়দুর্গরাজ্য ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে এবং যাঁহারা রাজতক্তে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বাধীন রাজা বলিয়া গণ্য হইতেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে শেষ বংশধরের মৃত্যু হইলে কোলাবা রাজ্য ইংরেজ শাসনভুক্ত হয়।

নিম্নে অঙ্গ্রিয়াবংশের প্রধান ব্যক্তিগণের একটী তালিকা লিপিবদ্ধ হইল—

কাহ্নোজী	...	১৬৮৯-১৭২৮	খৃষ্টাব্দ
শাকোজী	...	১৭২৮	,,
শম্ভাজী	...	১৭২৮-১৭৪৮	,,
তুলাজী	...	১৭৪৮-১৭৫৬	,,
মানাজী (১ম)	...	১৭২৮-১৭৫৯	,,
রঘুজী	...	১৭৫৯-১৭৯৩	,,
মানাজী (২য়)	...	১৭৯৩-১৭৯৯	,,
বাবুরাও	...	১৭৯৯-১৮১৩	,,
মানাজী (৩য়)	...	১৮১৩-১৮১৭	,,
রঘুজী (২য়)	...	১৮১৭-১৮৩৮	,,
কাহ্নোজী (শিশু অবস্থায় মৃত)		১৮৩৯-৪০	,,

অঙ্গি্বারী—জর্ম্মন্ সাম্রাজ্যবাসী একটী জাতি (Angrivarii)। ওয়েসার নদীর নিম্নতম অববাহিকা প্রদেশে ইহাদের বাস।

অঙ্গ্রামৈন্যুষ—(অবস্তামতে) জীবের অমঙ্গলকারী বা নাশকারী এক দেবতা। অহুর-মজ্দের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। যখন জগৎ মহাপ্রলয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, তখন অহুর-মজ্দের হস্তে এই হিংসাশক্তির বিলয় ঘটিবে। জুর্বান্ সাম্প্রদায়িকগণ ইঁহাকে পরিদৃশ্যমান চিরন্তনী শক্তি 'জুর্বান্ অকরাণা' বলিয়া অভিহিত করেন।

অঙ্ঘস্—(ক্লী) [অগি-গতৌ অসুন্] পাপ। "যুষ্মচ্ছাশনলঙ্ঘনাঙ্ঘসি ময়া মগ্নেন নাম স্থিতং।" (বেণীসংহার)

অঙ্ঘারি—(পুং) [অঙ্ঘ-ঋ-ইণ্। পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। ৬-তৎ] দীপ্তিশীল। "কবিরসিরঙ্ঘারিরসি" (শুক্লযজু° ৫.৩২) ২ সোমরস। (শুক্লযজু° ৪.২৭) ৩ যজ্ঞবেদীবিশেষ।

অঙ্ঘি—(পুং) [অঘি-গতৌ ইন্] পাদ। ২ বৃক্ষমূল।

অঙ্ঘ্রালজী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] এক প্রকার রোগ। [অন্ধ্রালজী দ্র°]

অঙ্ঘ্রি১, অংঘ্রি—(পুং) [অঘি গতৌ ক্রিন্ করণে] পাদ। ২ বৃক্ষমূল। ৩ ছন্দের চতুর্থ ভাগ। "প্রথমাঙ্ঘ্রি সমো যত্র" (বৃত্তরত্নাকর)

অঙ্ঘ্রি২—(পুং) শিল্পশাস্ত্র-সম্মত ক্ষুদ্র স্তম্ভ; চরণ। সাধারণতঃ বড় স্তম্ভের উপরিস্থিত ছোট স্তম্ভ। গৃহের উচ্চতলের উপরিস্থিত ছোট স্তম্ভ। (মানসার)

অঙ্ঘ্রিকবারি—দীপদণ্ড বন্ধ। "অগ্রে চ ফলকান্তং চ তাটিকাদ্যৈর্বিভূষিতম্। অথবাঙ্ঘ্রিকবারিং স্যাদূর্দ্ধে চ কুড্যালান্বিতম্॥ (মানসার)

অঙ্ঘ্রিগ্রন্থিক—(ক্লী) [বৈদ্যক] পিপ্পলীমূল।

অঙ্ঘ্রিজ—(ত্রি) পাদজাতমাত্র। [স্ত্রিয়াং টাপ্] ২ বিষ্ণুপদোদ্ভবা গঙ্গা।

অঙ্ঘ্রিজিহ্বিক—(পুং) [বৈদ্যক] দমনকবৃক্ষ।

অঙ্ঘ্রি(-নামন্)নামক—(পুং) [বৈদ্যক] দমনকবৃক্ষ। ২ বৃক্ষমূল। (রাজনি°)

অঙ্ঘ্রিপ—(পুং) [অঙ্ঘ্রিণা পিবতীতি অঙ্ঘ্রি-পা-ক; ৩-তৎ] পাদপ, বৃক্ষ। ২ লতা।

অঙ্ঘ্রি(পর্ণিকা)পর্ণী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] পৃশ্নিপর্ণী, চলিত চাকুলে বৃক্ষ। [চাকুলে দ্র°]

অঙ্ঘ্রিবলা, অঙ্ঘ্রিবল্লিকা, অঙ্ঘ্রিবল্লী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] পৃশ্নিপর্ণী, চলিত চাকুলে।

অঙ্ঘ্রিষ—(পুং) তন্নামক তালুরোগ। [অঞ্রষ দ্র°]

অঙ্ঘ্রিসন্ধি—(পুং) পাদগুল্ফ।

অঙ্ঘ্রিস্কন্ধ—(পুং) গুলফ, পায়ের গোড়ালি।

অঙ্ঘ্র্য—(পুং) পাদগুল্ফ।

অচ্১—অবিস্পষ্টকথা, গতি। ভ্বা-উ। সেট্। ক্ত্বায়াম্ বেট্। লট্ অচতি অচতে। লুঙ্ আচীৎ আচিষ্ট। আশিষি অচ্যাৎ অচিষীষ্ট। ক্ত অক্ত। ক্ত্বা অচিত্বা অক্ত্বা।

অচ্২—(অঞ্চু, অচু, অচি) গতি, অব্যক্তশব্দ, পূজা। ভ্বা-প। সকর্ম্মক সেট্। লট্ অঞ্চতি। লিট্ আনঞ্চ। লৃট্ অঞ্চিষ্যতি। আশিষি, অঞ্চ্যাৎ। অঞ্চু গতৌ অচ্যাৎ। লুঙ্ আঞ্চীৎ। কর্ম্মণি, অচ্যতে। সন্ অঞ্চিচিষতি। ণিচ্ অঞ্চয়তি। ক্ত অঞ্চিত। ক্ত্বা অঞ্চিত্বা। অচ্ চু-প°। অঞ্চয়তি।

এই ধাতু কিবন্ত করিয়া প্র, পরা, অপ প্রভৃতি উপসর্গ যোগে প্রাচ্, প্রাচী, প্রভৃতি বিভিন্নার্থক বহু শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। [তত্তৎ শব্দ দ্র°]

অচ্৩—যাবতীয় স্বরবর্ণ। বৈয়াকরণেরা সমস্ত স্বরবর্ণের অচ্ সংজ্ঞা করিয়াছেন। তাহার কারণ এই—অ ই উণ্। ঋ ৯ ক্। এ ও ঙ্। ঐ ঔ চ্ এই চারিটী প্রত্যাহারের মধ্যে সমস্ত স্বরবর্ণ গৃহীত হইয়াছে। এই চারিটী প্রত্যাহারের মধ্যগত ণ্ ক্ এবং ঙ্ ইৎ হয়। আদি বর্ণ অ এবং অন্ত্যবর্ণ চ্ এই বর্ণদ্বয়ে অচ্ সংজ্ঞা হইয়াছে; কিন্তু কার্য্যকালে ইহার চকার ইৎ যায়। এই সংজ্ঞা দ্বারা আকার সমেত চ্কারের মধ্যগত সমস্ত স্বরবর্ণকে বুঝাইতেছে। তজ্জন্য অচ্সন্ধি বলিলে স্বরসন্ধি বুঝায়।

পাণিনি-গৃহীত কৃদন্ত প্রভৃতিতে অচ্ প্রত্যয়ও আছে। অচ্ প্রত্যয়ের চ্ ইৎ হয়, অ থাকে।

অ ই উ ঋ ৯ এ ও ঐ ঔ এই কএকটী বর্ণ অচ্। বাকী ক খ প্রভৃতি সমস্ত বর্ণ হল্। সংস্কৃত ভাষায় অচ্বর্ণ এবং হল্বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ গৃহীত হইয়াছে। অন্য ভাষায় সেরূপ হয় নাই—সমস্ত বর্ণই এক সঙ্গে লিখিত আছে। এখন সন্দেহ এই, মানুষ আগে কোন্ বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছিল—অচ্ না হল্বর্ণের? প্রথম শুনিতেই এই প্রশ্ন কিছু কঠিন বোধ হয়; কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে এই পুরাতন কথার অনেকটা মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায়। প্রথম প্রথম মানুষ লিখিতে জানিত না, কথা কহিতে পারিত; তাহাও আবার দীর্ঘচ্ছন্দে নয়। দুইটী বর্ণ এক যোড়া দিতে পারিলে তাহাই যথেষ্ট হইত। দুইটী অক্ষরে এক একটী কথা, তাহারও আবার শেষ বর্ণটী হলন্ত। অসভ্য আন্দামানবাসীরা ইহার প্রমাণ। তাহারা কোন রকমে কতক কতক মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারে, কিন্তু অধিক কথা কহিতে পারে না।

মানুষ আগে কথা কহিতে শিখিয়াছিল; কিন্তু দূরের

লোকের সঙ্গে কথোপকথন চলে না—পত্র লেখা চাই। পত্র লিখিতে হইলেই অক্ষরাদি আবশ্যক। যখন অক্ষরের সৃষ্টি হয় নাই, তখন লোকে কি প্রকারে পত্র লিখিত? ফিনিশিয়ার লোকেরা, কাহাকে মনের কথা বলিয়া পাঠাইতে হইলে গাছের পাতায় কি বাকলে এক এক খানি চিত্র আঁকিয়া পাঠাইতেন। গরু বুঝাইতে হইলে একটী গরুর মূর্ত্তি চিত্র করিয়া পাঠাইতেন। দর্শনশক্তি বুঝাইতে হইলে একটী চক্ষু আঁকিয়া দিতেন। প্রাচীন ফিনিশিয়াবাসীদের পত্র লিখিবার এইরূপ সঙ্কেত ছিল। ক্রমে আরও সংক্ষেপে পত্র লিখিবার জন্য সমস্ত গরু না আঁকিয়া কেবল তাহার মাথা বা শিং লিখিয়া পাঠাইতেন। তাহার পর আরও সুবিধা খুঁজিতে খুঁজিতে অক্ষরের সৃষ্টি হইল। অনেকে অনুমান করেন, বর্ত্তমান এক একটী অক্ষরের নাম এক একটী বস্তুর নাম হইতে হইয়াছে। হিব্রু ভাষায় প্রথম অক্ষরের নাম আলেফ্। আলেফ্ শব্দে ষাঁড়কে বুঝায়। আর একটী অক্ষরের নাম গিমেল্, তাহাতে উটকে বুঝায়। আর একটী অক্ষরের নাম মেম্। মেম্ শব্দে জল। ফিনিশিয়াবাসী ও ইহুদীরা  ঢেউয়ের মত চিত্র আঁকিয়া জল বুঝাইতেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া যাঁহারা অনুমান করেন যে, এক একটী বস্তুর নাম হইতে বর্ণমালার অক্ষরগুলির নাম দেওয়া হইয়াছে, বোধ করি তাঁহাদের কথা মিথ্যা নয়।

রঞ্জেস্ এবং টেলর্ সাহেবের মত এই যে, ফিনিশিয়ার লোকেরাই প্রথমে লিখিবার কৌশল বাহির করেন। তাঁহাদের দেখিয়া পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরা লিখিতে শিখিয়াছেন। কিন্তু ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না, কারণ সে কালে সকল প্রাচীনজাতিই ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। আরব এবং মিশরবাসীরা ব্রাহ্মণদের কাছে গণিতশাস্ত্র শিখিয়াছিলেন, লিখিবার কৌশলও এই হিন্দুদের দেশ হইতে বিদেশে গিয়া পড়িয়াছিল, আরবেরা তাহা স্বীকার করিতেন।

তবে ভারতবর্ষেও প্রথম প্রথম ছবি দিয়া পত্র লিখিবার প্রথা চলিত ছিল কি না?—ছিল বৈ কি। না থাকিলে ফিনিশিয়াবাসীরা এ বিদ্যা শিখিলেন কোথা? এদেশ হইতে এখন দিন দিন উঠিয়া যাইতেছে, তাই, নতুবা পুরাতন রীতি বাহির করিয়া দিবার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালের লোক কি প্রণালীতে পত্র লেখালেখি করিতেন, বররুচির পত্রকৌমুদীতে তাহার অনেক নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করা আছে। পত্রের উপরে অঙ্কুশের মত একটী রেখা টানিবে। অঙ্কুশের ভিতর একটী বিন্দু দিবে। রাজাকে পত্র লিখিতে হইলে পত্রের উর্দ্ধে কুঙ্কুম কস্তূরী দিয়া একটী চন্দ্রমণ্ডল আঁকিবে। পণ্ডিত ও গুরুজন প্রভৃতির পত্রে চন্দনের চিহ্ন দেওয়া আবশ্যক। স্বামীর পত্রে স্ত্রী সিন্দূরের ফোঁটা দিবেন। স্বামী, পত্নীকে পত্র লিখিতে হইলে আল্‌তা দিয়া রঙ্ করিবেন। আবার শত্রুর কাছে পত্র পাঠাইতে হইলে তাহাতে রক্তের চিহ্ন দেওয়া চাই।

এ কিছু দিন পূর্ব্বের সংবাদ। যখন বররুচি জীবিত ছিলেন, তাহার কিছু আগে হইতে এই সকল নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু আরও পূর্ব্বে লোকে কি করিতেন, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না! তবে ঐ সকল চিহ্ন কাটিবার প্রথা দেখিয়া স্পষ্ট অনুমান হইতেছে যে, হিন্দুরা যখন লিখিতে জানিতেন না, সে সময়ে কেবল চিত্র আঁকিয়া দূরের লোককে মনের কথা বলিয়া পাঠাইতেন। হিন্দুদের অভ্যাস এই,—একবার কোন রীতি চলিত হইলে চিরকাল তাহা মানিতে হইবে, না মানিলে প্রত্যবায় হয়। তাই, অজ্ঞতাবশতঃ কোন্ কালে লোকে চিত্র আঁকিয়া পত্র লিখিত, সে দিন পর্য্যন্ত আমরা সেই পুরাতন নিয়ম মানিয়া আসিতেছিলাম,—এখনও বিবাহের পত্রে, কিছু না হউক, তবু সিন্দূরের ফোঁটাটা দেওয়া চাই।

আর এক কথা। নাগা সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্যজাতিরা লিখিতে জানে না, পড়িতে পারে না। দূরের লোককে মনের কথা বলিয়া পাঠাইবার জন্য তাহাদের এক একটা সঙ্কেত আছে। সাঁওতালেরা বিপদে পড়িলে গ্রামে গ্রামে সংবাদ দিবার নিমিত্ত সাল গাছের একটী ডাল পাঠাইয়া দেয়। এই সঙ্কেত পাইলেই সমস্ত লোক ধনুর্ব্বাণ লইয়া ছুটিতে থাকে। শত্রুদিগকে ভয় দেখাইতে হইলে নাগারা একখানি পোড়া কাঠ, লঙ্কা এবং অস্ত্র পাঠাইয়া দেয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শত্রুদের গ্রাম পোড়াকাঠের মত দগ্ধ করা হইবে এবং তাহারা অস্ত্রাঘাতে ঝাল লঙ্কার মত জর জর হইতে থাকিবে। এখন যেমন ভারতবর্ষের অজ্ঞ জাতির মধ্যে সংবাদাদি পাঠাইবার এক একটা সঙ্কেত চলিত আছে, আদিম অবস্থায় আর্য্যেরা যখন অজ্ঞ ছিলেন, সে সময়ে তাঁহাদের মধ্যে সংবাদ পাঠাইবার কোন প্রকার সঙ্কেত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রথম প্রথম অনেক দেশের লোক পশুপালন করিত। কাজেই ছাগ, মেষ ও গোবৎসদিগকে চরাইবার জন্য দিবারাত্র তাহাদিগকে মাঠে, বনে, নদীকূলে এবং পর্ব্বতের উপর বেড়াইতে হইত। সন্ধ্যায় কোন্ তারাটী উদিত

হয়, কোন্ নক্ষত্রটী রাত্রি দুই প্রহরের, ভোর হইলে কোন্ নক্ষত্রটী কোথায় থাকে, পর্ব্বতের উপর হইতে তাহারা আকাশে গ্রহনক্ষত্রাদির এই সকল গতিবিধি বেশ দেখিতে পাইত। তাই সকল দেশেই জ্যোতিষের মন্ত্রগুরু পশুপালক রাখালেরা। কাল্ডিয়া দেশেও প্রথমে গোপালেরা জ্যোতিষের মর্ম্ম বুঝিয়াছিল। তাহা যদি হইল তবে রাশি প্রভৃতির নাম সেই সকল পশুপালকেরাই দিয়াছিল, একথা স্বীকার করিতে হইবে। তখন গরুর রাখালেরা সামান্য লোক ছিল; রাশি প্রভৃতির ভাল দেখিয়া নাম রাখা তাহাদের বুদ্ধিতে ঘটিতে পারে না। তজ্জন্য যে সকল দ্রব্য তাহারা অষ্টপ্রহর দেখিত, হাতে করিয়া বেড়াইত, খাইত,—তাহাই দেখিয়া রাশি প্রভৃতির নাম রাখিল। মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন। বারটী রাশির নাম এই। সত্য কিছু কোন রাশি ভেড়াও নয়, ষাঁড়ও নয়। কোন রাশি সিংহের মত কেশর ফুলাইয়াও নাই। আকাশের স্থানে স্থানে কতকগুলি তারা কাছাকাছি যেন মিলিত হইয়া আছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিলে তাহাদিগকে এক একটা বস্তুর আকারের মত বোধ হয়। কেহ সেই সকল নক্ষত্রপুঞ্জকে ভালুকের সঙ্গে তুলনা করেন,—যিনি যে বস্তু ভাল রকম চেনেন, তিনি তাহার সঙ্গে তুলনা করেন: সেকালের রাখালেরা যে সকল বস্তু ভাল চিনিত, তাহাই দেখিয়া রাশিদের নাম রাখিয়াছিল। কিন্তু জ্যোতিষের মেষ প্রভৃতির ঠিক চিত্র আঁকা থাকে না। ভাল দেখাইবে বলিয়া কেহ যদি রাশিদের নামানুসারে অবিকল ছবি চিত্র করিয়া দেন, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু অবিকল চিত্র দিবার প্রথা নাই। রাশির আকৃতির এক এক প্রকার সঙ্কেত আছে। [রাশি দ্র°]। ইহুদীরা যেমন জল বুঝাইতে হইলে ঢেউ চিত্র করিয়া দেখাইত— এবং জ্যোতিষের কুম্ভরাশির স্থলে তাহারা ঢেউ আঁকিয়া রাখিত, এদেশেও রাশির সঙ্কেত কেবল মেষবৃষাদির সংক্ষিপ্ত আকার বৈ আর কিছুই নয়। পূর্ব্বে তাহাদের যে প্রকার চিত্র ছিল, এখন তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাই আমরা চিনিতে পারি না। এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিলে অনেকটা বিশ্বাস জন্মে যে, লিখিবার কৌশল আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে এদেশের লোকেও চিত্র পাঠাইয়া দূরের লোকের কাছে মনের ভাব প্রকাশ করিতেন। পরে সুবিধার নিমিত্ত এক একটী বস্তুর আগুক্ষর হইতে বর্ণমালার বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে।

অচ্‌বর্ণ এবং হল্‌বর্ণের সৃষ্টি এককালেই হইয়াছিল, তাহাতে অগ্র পশ্চাৎ নাই। কিন্তু প্রথমে এতগুলি বর্ণ ছিল না। মানুষের গলার সুর যত পরিষ্কার হইয়া আসিতে লাগিল, বিশুদ্ধ রাগরাগিণী ও তান লয় সুরে সকলে গান করিতে শিখিল, নানা প্রকার বর্ণেরও তত সৃষ্টি হইতে লাগিল। অচের মধ্যে প্রথমে আকার মাত্র ছিল। কারণ এই উচ্চারণ সহজ ও স্বাভাবিক। সম্পূর্ণরূপে মুখ মেলিয়া শব্দ করিলেই আকার উচ্চারিত হয়। পরে ক্রমশঃ 'হাঁ' ছোট করিয়া আনিলে অকার, ইকার, উকার প্রভৃতি অন্য স্বরবর্ণগুলি বাহির হইতে থাকে। আবার মুখের কোন স্থান স্পর্শ করিলে হল্‌বর্ণ উচ্চারিত হয়। বর্ণের উচ্চারণস্থান এবং প্রযত্ন তাহার প্রমাণ। উচ্চারণস্থান যথা—অ আ আ ৩ ক খ গ ঘ ঙ হ এবং বিসর্গ, ইহাদের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ (অ কু হ বিসর্জ্জনীয়ানাং কণ্ঠঃ)। ই ঈ ঈ ৩ চ ছ জ ঝ ঞ য এবং শ, ইহাদের উচ্চারণস্থান তালু (ইচুযশানাং তালুঃ)। ঋ ৠ ৠ ৩ ট ঠ ড ঢ ণ র ষ ইহাদের উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা (ঋটুরষাণাং মূর্দ্ধা)। ৯ ৡ ৩ ত থ দ ধ ন ল স ইহাদের উচ্চারণস্থান দন্ত (৯তুলসানাং দন্তাঃ)। উ ঊ ঊ ৩ প ফ ব ভ ম এবং উপধ্মানীয় অর্থাৎ ⌒ প ⌒ ফ ইহাদের উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ (উপূপধ্মানীয়ানামোষ্ঠৌ)। ঙ ঞ ণ ন ম ইহাদের উচ্চারণ স্ব স্ব বর্গ ভিন্ন নাসিকা হইতেও হয় (ঞমঙণনানাং নাসিকা চ)। এ ঐ ইহাদের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ ও তালু (এদৈতোঃ কণ্ঠতালু)। ও ঔ ইহাদের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ ও ওষ্ঠ (ওদৌতোঃ কণ্ঠৌষ্ঠম্)। বকারের উচ্চারণস্থান দন্ত এবং ওষ্ঠ (বকারস্য দন্তৌষ্ঠম্)। জিহ্বামূলীয় অর্থাৎ ⌒ ক ⌒ খ ইহাদের উচ্চারণস্থান জিহ্বার মূল (জিহ্বামূলীয়স্য জিহ্বামূলম্) অনুস্বারের উচ্চারণস্থান নাসিকা (নাসিকাঽনুস্বারস্য)।

তাহার পর প্রযত্নাদি নানা প্রকার সুরেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—প্রযত্ন দুই প্রকার। আভ্যন্তর অর্থাৎ মুখের, এবং বাহ্য অর্থাৎ মুখের বাহিরে বা কণ্ঠাদির। আভ্যন্তর প্রযত্ন পাঁচ প্রকার। যথা—স্পৃষ্ট, ঈষৎস্পৃষ্ট, ঈষদ্বিবৃত, বিবৃত এবং সংবৃত। [অ, দ্র°] যে বর্ণ উচ্চারণ করিতে জিহ্বার স্থানকে স্পর্শ করে না, তাহাকে স্পৃষ্ট প্রযত্ন কহে। স্পর্শবর্ণের স্পৃষ্টপ্রযত্ন হইয়া থাকে। ঈষৎস্পৃষ্ট অর্থাৎ কিঞ্চিৎ স্পৃষ্ট, অন্তস্থবর্ণের এই প্রযত্ন হইয়া থাকে। উষ্মবর্ণের ঈষদ্বিবৃত প্রযত্ন হয়। অচ্ অর্থাৎ স্বরবর্ণের বিবৃত প্রযত্ন হয়। যে বর্ণ উচ্চারণ করিতে জিহ্বার

স্থানকে স্পর্শ করে না, তাহাকে বিবৃতপ্রযত্ন কহে। প্রয়োগে অর্থাৎ বলিতে কহিতে গেলে হ্রস্ব অকারের সংবৃতপ্রযত্ন বলা যায়। কিন্তু প্রক্রিয়া দশায় অর্থাৎ কোন বিধির দ্বারা যেখানে অকার করা যায়, তখন ইহার বিবৃতপ্রযত্ন কহে। এরূপ না করিলে অকারের সবর্ণ সংজ্ঞা আর কোন প্রকারে ঘটিতে পারে না। এই সকল ভেদ ধরিয়া গণনা করিলে বাহ্যপ্রযত্ন এগার প্রকার হয়। যথা—১ বিবার, ২ সংবার, ৩ শ্বাস, ৪ নাদ, ৫ ঘোষ, ৬ অঘোষ, ৭ অল্পপ্রাণ, ৮ মহাপ্রাণ, ৯ উদাত্ত, ১০ অনুদাত্ত, ১১ স্বরিত। খর্ প্রত্যাহারের মধ্যে যত বর্ণ আছে (খ ফ ছ ঠ থ চ ট ত ক প শ ষ স), তাহাদিগের বিবার, শ্বাস এবং অঘোষ প্রযত্ন হইয়া থাকে। হশ্ প্রত্যাহারের মধ্যে যত বর্ণ আছে (হ য ব র ল ঞ ম ঙ ণ ন ঝ ভ ঘ ঢ ধ জ ব গ ড দ) তাহাদের সংবার, নাদ এবং ঘোষ প্রযত্ন হয়। বর্ণমালার প্রত্যেক বর্গের প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চম বর্ণ (ক চ ট ত প, গ জ ড দ ব, ঙ ঞ ণ ন ম) এবং যণ্ প্রত্যাহারের ভিতর যত বর্ণ আছে (য র ল ব) ইহাদের অল্পপ্রাণ প্রযত্ন কহে। প্রত্যেক বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ অক্ষর মহাপ্রাণ প্রযত্ন। [অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ প্রযত্নের ফল রস ও অনুপ্রাস শব্দে দ্র°]। ককার হইতে মকার পর্য্যন্ত যাবতীয় বর্ণকে স্পর্শবর্ণ কহে। যণ্ প্রত্যাহারের বর্ণকে অন্তঃস্থ কহে। কারণ বর্ণমালার স্পর্শ ও উষ্মবর্ণের মধ্যে উহাদের স্থান দেওয়া হইয়াছে। শল্ প্রত্যাহারের ভিতর যত বর্ণ আছে (শ ষ স হ) উহাদিগকে উষ্মবর্ণ কহে। অচ্ প্রত্যাহারের বর্ণকে স্বর বলা যায়। ⌣ক ⌣খ, এইরূপ ককার খকারের পূর্ব্ব অর্দ্ধ বিসর্গের চিহ্নকে জিহ্বামূলীয় কহে। ⌣প ⌣ফ এইরূপ পকার ফকারের পূর্ব্ব যে অর্দ্ধ বিসর্গের চিহ্ন, ইহাকে উপধ্মানীয় বলা যায়।

বিশুদ্ধ স্বরে বেদ গান করিতে হইলে এই সকল স্বরভেদ নিতান্ত আবশ্যক। ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে, সঙ্গীতবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে নানা প্রকার উচ্চারণের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ সহজে বুঝিতে পারা যাইবে বলিয়া কোথাও এক একটী অক্ষর বা শব্দের উপর এক এক প্রকার চিহ্ন দেওয়া হয়, কোথাও বা তজ্জন্য এক একটী বর্ণের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

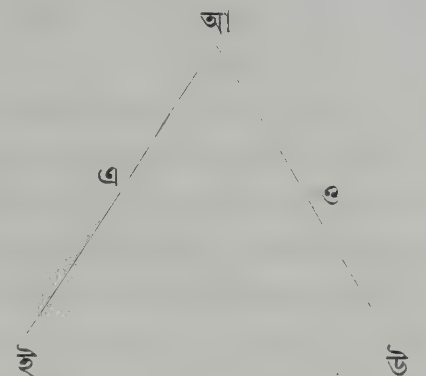
প্রথম প্রথম অচ্ বর্ণের মধ্যে এক মাত্র আকার ছিল, তাহার পর আকার হইতে অন্যান্য স্বরের উৎপত্তি হইয়াছে। কার্য্যকারণ ভাব বিচার করিয়া দেখিলে এ কথা ঠিক বুঝিতে পারা যায়। বৃক্ষাদি মাটী হইতে জন্মে বলিয়া কাঠ পচিলে মাটী হয়। মাটী হইতে না জন্মিলে কাঠ পচিয়া মাটী হইত না। বর্ণমালার বর্ণগুলিরও এই প্রকার নিয়ম দেখা যায়। ন এবং ম এই দুই বর্ণের স্থানে অনুস্বার হয় এবং অনুস্বারের স্থানেও ন ও ম হইয়া থাকে। র এবং স স্থানে বিসর্গ হয় এবং বিসর্গ স্থানেও র ও স হইয়া থাকে। অতএব ন ও মকারের সঙ্গে অনুস্বারের এবং রেফ ও সকারের সঙ্গে বিসর্গের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিতে হইবে। তদ্রূপ আকারের সঙ্গেও ইকার এবং উকারের সম্বন্ধ আছে দেখা যায়। অনেক সংস্কৃত শব্দের অকারান্ত বর্ণ বাঙ্গালায় ও প্রাকৃত ভাষায় আকারান্ত, ইকারান্ত এবং উকারান্ত হয়। যথা, অঙ্ক—আঁক। চর্ম্ম—চাম। গর্দ্দভ—গাধা। এইরূপ অনেকস্থলে অকারস্থানে আকার হয়। সজ্ঞান—সিয়ানা। ভণ—ভিয়াণ। সন্ধি—সিঁধ। পশ্চাৎ—পিছন। এইরূপ অনেকস্থলে অকারস্থানে ইকার হয়। পুষ্করিণী—পুকুর। বৎস—বাছুর। কর্কটিক—কাঁকুড়। পর্কটি—পাকুড়। ধুস্তর—ধুতুরা। দ্বিপ্রহর—দুপুর। ব্রাহ্মণ—বামুন। হরিদ্রা—হলুদ। বক্ষ—বুক। এখানে অকার স্থানে উকার হইয়াছে। ঔষধ—ওসুধ। এখানে ঔকার স্থানে অকার হইয়াছে। বধূ—বৌ। মধু—মৌ। জতু—জৌ। এখানে অকার স্থানে ঔকার হইয়াছে। আর্য্য—অজ্জ। এখানে আকার স্থানে অকার হইয়াছে। এইরূপ শব্দশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট জানা যায়, কেবল কণ্ঠের স্বরবৈষম্য দ্বারা এক আকার হইতে ই উ এ ঐ ও ঔ প্রভৃতি স্বরবর্ণগুলির উৎপত্তি হইয়াছে। যেমন নানা প্রকার সুর বাজাইতে হইলে বাদ্যযন্ত্রে অনেকগুলি তাঁত বা তার খাটাইয়া তাহার নানা স্থান বিবেচনাপূর্ব্বক টিপিতে হয়; তবে নানা রকম সুরের রেস বাহির হইতে থাকে। তদ্রূপ নানা প্রকার সুর ও শব্দ উচ্চারণ করিতে হইলে অনেক প্রকার বর্ণ আবশ্যক। কাজেই সঙ্গীতবিদ্যা ও ভাষার উন্নতির সঙ্গে নঙ্গে নানাবিধ বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। স্বরবর্ণ হইতেই সুর উঠিতে থাকে, হল্‌বর্ণের সুর নাই। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় এতগুলি স্বরবর্ণ রহিয়াছে, তবু আমরা এক্ষণে দুইটী স্বরবর্ণের অভাব অনুভব করিতেছি। একটী অকার উকার এবং ঔকারের মধ্যবর্ত্তী; আর একটী অকার ও ইকারের মধ্যবর্ত্তী। 'রেড়ীর খ'ল'। 'স'ল মাছ'। 'আমের ব'ল'। এখানে খল কিংবা খোল, খৌল এরূপ কোনটী লিখিলে ঠিক উচ্চারণ হয় না। কিন্তু বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, স্বরবর্ণের অভাবে ঐ উচ্চারণ হইতেছে না। সেটী অ উ এবং ঔকারের মধ্যবর্ত্তী কোন

প্রকার একটী নূতন উচ্চারণের স্বরবর্ণ। পুনশ্চ ডা'ল, চা'ল, চা'র, পা'ল ইত্যাদি শব্দ ডাইল, চাইল এপ্রকারে লিখিলে ঠিক উচ্চারণ হয় না; অথচ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, অকার ও ইকারের মধ্যবর্ত্তী কোন প্রকার একটী নূতন স্বরবর্ণ চাই; তাহা হইলে ঐ সকল শব্দ ঠিক লিখিতে পারা যায়। এইরূপ মুখের স্বরবৈষম্য ঘটিলে এক একটী বর্ণের অভাব বুঝিতে পারা যায়। অভাব জানিতে পারিলেই তাহা পূরণ করিবার জন্য নূতন বর্ণের সৃষ্টি করিতে হয়।

ফিনিশিয়া ভাষায় আলেফ্ তালু হইতে উচ্চারিত হয়, তাহা হলবর্ণের মত। কিন্তু গ্রীক্ ভাষার আল্‌ফা বিশুদ্ধ স্বরবর্ণ। স্বরবর্ণের মধ্যে প্রথমে আকারের সৃষ্টিই সকল দেশে হইয়াছিল। সম্পূর্ণরূপে মুখ মেলিয়া ভিতরের তাম্বাদি স্থানের স্পর্শ ভিন্ন যে বর্ণ উচ্চারিত হয়, তাহাই (আ) আকার। জিহ্বা অথবা ওষ্ঠ দ্বারা বায়ুপথ যত সঙ্কুচিত করিবে, তত অন্যান্য স্বরবর্ণ উচ্চারিত হইবে। ওকার উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বার নিম্নস্থান তুলিয়া আলজিব ও জিহ্বার মধ্যবর্ত্তী স্থান ফাঁক করিয়া দিতে হয়। আবার ইকার উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বার অগ্রভাগ উচ্চ করিয়া জিহ্বার ও তালুর মধ্যবর্ত্তী স্থান ফাঁক করিয়া দিতে হয়। স্থূল কথা এই, কণ্ঠ হইতে ওষ্ঠ পর্য্যন্ত সমস্ত বায়ুপথ উত্তম রূপে খুলিয়া দিলে আকার উচ্চারিত হয়। সুতরাং স্পর্শাদি প্রতিবন্ধ ভিন্ন যে বর্ণ উচ্চারণ করা যায়, তাহাই অচ্ বা স্বরবর্ণ। আর কোন শব্দেন্দ্রিয় এদিকে ওদিকে ফিরাইলে ঘুরাইলে এবং ভিতরে অল্প বা অধিক প্রতিবন্ধ ঘটিলে হল্‌বর্ণ উচ্চারিত হয়। তাই আকারের মত বিশুদ্ধ স্বর একটীও নাই। কারণ ইকার উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বা উঠিয়া প্রায় তালুকে স্পর্শ করে। উকার উচ্চারণ করিবার সময় ওষ্ঠ অনেকটা বন্ধ করা চাই। তজ্জন্য আকার আদিস্বর। বাকি অচ্ বর্ণগুলি আকারের রূপান্তর মাত্র। একটী বিন্দুর দুইদিকে দুইটী রেখা টানিলে আকারের রূপান্তর স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। পরবর্ত্তী স্তম্ভে ইহা চিত্রদ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইল।

শব্দশাস্ত্রের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, প্রথমে আকার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ ছিল না। আকার হইতে ইকারাদি আর কএকটী স্বরের উৎপত্তি হইয়াছে।

আরবী ও পারসী ভাষা একথার আর একটী প্রমাণস্থল। আজ পর্য্যন্ত ঐ দুই প্রাচীন ভাষায় হ্রস্ব ইকার, ও হ্রস্ব উকার একমাত্র আলেফ দ্বারা লিখিত হয়, তজ্জন্য বিভিন্ন স্বরবর্ণ নাই। আলেফ্ জের=ই। আলেফ্ পেশ=উ। আলেফের উপর যে সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি দিয়া ই উ লিখিত হয়, তাহাকে জের এবং পেশ কহে। অতএব এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল অধিকাংশ ভাষাতেই প্রথম অচ্‌বর্ণ আকার স্বভাবতঃই গৃহীত হইয়াছিল। তাহার পর অন্যান্য স্বরের উৎপত্তি হইয়াছে।



একদিকে আকার হইতে ক্রমশঃ মুখ সঙ্কুচিত করিয়া আসিলে প্রথমে একার, তাহার পর ইকার উচ্চারিত হয়। ইকারের পর তাম্বাদি স্পর্শ না করিয়া অন্য স্বরবর্ণ আর উচ্চারণ করা যায় না।

অপর দিকে প্রথমে ওকার, তাহার পর উকার উচ্চারিত হয়। উকারের পর অন্য স্বরবর্ণ আর উচ্চারণ করা যায় না।

অ-চং—ব্রহ্ম ও চীনের সীমান্ত প্রদেশের এক ক্ষুদ্র জাতি। ইন্দো-চীনের নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহাদিগকে তাই সম্প্রদায়ের শাখাবিশেষের অন্তর্গত স্থির করিয়াছেন। ইহারা সাধারণতঃ হোসা ও লাসা রাজ্যে বাস করিয়া থাকে। এই উভয় রাজ্যই নাম্-হ্সা উপত্যকায় অবস্থিত এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থানের উচ্চতা প্রায় ৪,৫০০ ফুট। এই দুই রাজ্য অক্ষা° ২৪°২১′ উঃ ও দ্রাঘি° ৯৭°৫৬′ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ব্রহ্ম-সীমান্তের উভয় পার্শ্বেও ইহাদের বাস করিতে দেখা যায়। অ-চংদের সর্দ্দারেরা চীন-রাষ্ট্রতন্ত্রের অধীন; কিন্তু ইহাদের অনেক বিষয়ে স্বাধীনতাও আছে। পূর্ব্বে ইহারা মাঞ্চুবংশের অধীনস্থ তেং-য়ূয়ের তিং-এর অধীনে (T'ing of Tëng-yüeh) ছিল। এই তেং আবার 'ই-সি-দাও' বা য়ুনান প্রদেশের পশ্চিম-বিভাগের শাসনকর্ত্তা য়ুয়াং-চং-ফুর অধীন ছিল।

অ-চংদিগকে সাধারণতঃ লোকেরা যাযাবর বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। যদিও ইহারা খুব বেশী ভ্রমণ

করিয়া থাকে, তথাপি ইহাদিগকে যাযাবর বলা চলে না। কারণ ইহারা আপনাদিগের সীমাবদ্ধ স্থানের বাহিরে বড় একটা যায় না; অবস্থাগতিকে বাধ্য হইয়া যাইতে হইলে অত্যন্ত দুঃখের সহিত আপনাদের অধিকার ত্যাগ করে।

ইহাদের অধিকৃত স্থানে চীনা অধিবাসীরাই শক্তিশালী। চীন-শানেরাও এখানে বাস করিয়া থাকে এবং চারিদিকের পাহাড়ে চিংপ, কএক ঘর লিসু ও পলাং জাতীয় লোকও বাস করে।

নৃতত্ত্বের দিক্ হইতে ইহাদের সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের নামোল্লেখ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে জন-এণ্ডার্সন সাহেবের কথাই বলিতে হয়। ইনি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম এই জাতির কাহিনী বিবৃত করেন; কিন্তু ইহারা কোন্ জাতির কোন্ শাখার অন্তর্গত তাহা তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারেন নাই। মর্গান ওয়েব সাহেবও অতিশয় কুণ্ঠার সহিত ইহাদিগকে তিব্বতী-ব্রহ্মশ্রেণীর মরুস, লাসি প্রভৃতির সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন।

কোন অ-চংকে প্রশ্ন করিলেই সে আপনাকে 'শান' বলিয়া পরিচয় দেয়। এমন কি তাহারা শানেদের মত চীনদেশের পোষাক পরিধান করিতে মোটেই ইতস্ততঃ করে না। যদি কোনরূপ লাভের সম্ভাবনা থাকে বুঝিতে পারে, তাহা হইলে আপনার বাটীর দ্বারে স্বীয় বংশপরিচয় দিবার সময় প্রকৃত শান-সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

য়ুনানীরা ইহাদিগকে অ-চং বা ন্‌গ-চং বলিয়া থাকে। কিন্তু শানেরা ইহাদের তাই-মোঙ্গ-হ্‌সা বা তাই-হ্‌সা বলে; কারণ হোসা ও লাসার সাধারণ নাম হইতেছে মোঙ্গ-হ্‌সা। ব্রহ্মবাসীরা ইহাদিগকে মৈইংগথা বলিয়া থাকে। ইহাও মোঙ্গ-হ্‌সার অপভ্রংশ মাত্র। আবার অনেকস্থলে অ-চং-দিগকে ভালরূপে জেরা করিলে তাহারা শান-সম্প্রদায়ভুক্ত নয় বলিয়া অস্বীকার করিতে দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত ইহারা আপনাদিগকে পাহাড়ী জাতি বলিয়া স্বীকার করে না। ইহাদের অধ্যুষিত হোসা ও লাসা প্রদেশ সর্দ্দার দ্বারা শাসিত হইয়া থাকে। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশের শু-চুয়ান হইতে যে সকল সেনাপতি য়ুনানের সীমান্তপ্রদেশে বিদ্রোহ দমন করিতে আসিয়াছিল, এই সর্দ্দারেরা তাহাদেরই বংশধর। তাহাদের কৃতকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ তাহারা অ-চং প্রদেশ, চীন-শান প্রদেশের কনাই রাজ্য এবং গান্‌তিন পাইয়াছিল।

অ-চং ও শানদিগের ভিতর সাদৃশ্য অত্যন্ত বেশী মনে করিলেও, উভয় জাতির ভিতর পার্থক্যই বেশী পরিলক্ষিত হয়। দেহের উচ্চতা সমান নয়। উচ্চতায় অ-চং স্ত্রী-পুরুষ চীন বা ব্রহ্মদেশের শানদিগের স্ত্রী-পুরুষ অপেক্ষা অনেক ছোট; কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা ইহারা অধিকতর মাংসল ও কৃষ্ণবর্ণ, মুখমণ্ডল খর্ব্ব ও চওড়া, কপোল-ফলক শানদিগের অপেক্ষা উদ্গত বা সমুন্নত। এণ্ডার্সন সাহেব বলিয়াছেন, চওড়ায় ইহাদের চক্ষু বড়, মুখমণ্ডল ভারী এবং ওষ্ঠদ্বয় প্রলম্বিত। ব্যবহারিক মানবমিতি শাস্ত্রজ্ঞের (Practical anthropometrist) নিকট এ সকল পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে এবং এগুলি দেখিয়া মনে হয়, অ-চংদিগের তিব্বতী-ব্রহ্মশ্রেণীর চিংপদিগের সহিত অনেকটা সৌসাদৃশ রহিয়াছে।

অ-চং পুরুষেরা শানদিগের মত পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদে একটু স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। অ-চংদের চাষারা ঢিলা আঙ্‌রাখা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদের কোর্ত্তার বুকের এক পার্শ্ব অপর পার্শ্বের উপর দুই সারি বোতাম দ্বারা আবদ্ধ। বোতামগুলি হয় পিলু না হয় রজন কিংবা রৌপ্যনির্ম্মিত। ইহাদের মস্তকে লম্বা শ্যামলবর্ণের উষ্ণীষ। ইহা মস্তক বেষ্টন করিয়া কিয়দংশ পৃষ্ঠের উপর বিলম্বিত রহিয়াছে। বর্ষা ও গ্রীষ্মকালে এই পাগড়ীর উপর ইহারা খড়ের ছাতা ব্যবহার করিয়া থাকে। এই ছাতায় ইহারা মসৃণ রেশমী কাপড় জড়াইয়া দেয়। পরিহিত পায়জামা ঢিলা, হাঁটুর নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অ-চংরা আপনাদিগকে আঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য জঙ্ঘার অগ্রভাগ লম্বা নীল-কাপড়ের টুকরার দ্বারা আবৃত করিয়া রাখে। এরূপ প্রথা শান, কথৈয়ন ও চীনাদের ভিতরও দেখা যায়। ইহাদের জুতার উপরের অংশ পুরু নীল কাপড়ের, কিনারায় সরু চিকন তোলা রেশমী ফিতা লাগান এবং তলা পুরু চামড়ার।

স্ত্রীলোকেরা শানদিগের মত আঙ্‌রাখা এবং পুরুষদের মত ঢিলা পায়জামা পরে। আঙ্‌রাখার পশ্চাদ্ভাগ হাঁটু পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং সম্মুখদিকে চীনাদের মত দেহের সম্মুখভাগের পোষাককে রক্ষা করিবার জন্য একখানি বহির্ব্বাস; ইহার প্রান্ত কটির নীচে পর্য্যন্ত ঝুলিতে থাকে। বহির্ব্বাসের কোমরবন্ধ ছয় ইঞ্চ চওড়া। ইহাদের স্কন্ধাভরণ একটু নূতন ধরণের। পরিচ্ছদের স্কন্ধাভরণ হইতে গোলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র বিলম্বিত থাকে। এগুলি স্কন্ধের চারিদিকের রৌপ্যনির্ম্মিত বোতামের সহিত সংযুক্ত। ইহারা কদাচ জুতা পরিয়া থাকে। ইহাদের মস্তকা-

বরণেরও একটু বৈশিষ্ট্য আছে। একটা বেতের চারিদিকে কাপড় দিয়া মুড়িয়া একটা আঙ্‌টার মত করা হয়। আঙ্‌টার ব্যাস প্রায় ছয় ইঞ্চ। এই আঙ্‌টাকে মাথার মধ্যস্থলে বসান হয় এবং তির্য্যগ্‌ভাবে বিভক্ত সম্মুখ ও পশ্চাদ্দিকের কেশ একত্র মিলাইয়া আঙ্‌টার মধ্যস্থলে খোঁপা বাঁধা হয়। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা স্নান করিবার পর যেরূপ কেশ ফুলাইয়া চূড়া বাঁধিয়া থাকে, ইহা অনেকটা দেখিতে সেইরূপ। এই খোঁপা ২৫।৩০টা রূপার পিন দ্বারা আবদ্ধ থাকে। এই পিনগুলি সরু এবং মাথা বড়। এগুলি রূপার চওড়া প্লেটে লম্বালম্বিভাবে চুলের সহিত আবদ্ধ। ইহাতে নানা কারুকার্য্য খচিত হইয়া থাকে। ইহার বাহিরে নীলবর্ণের পাত্‌লা পাগড়ী থাকে এবং ঐ পাগড়ীর বিলম্বিত বস্ত্রের ধারে ধারে রূপার আঙ্‌টা ঝুলিতে থাকে। চুল আট্‌কাইবার জন্য উপরোক্ত পিন ছাড়াও চারিটী বড় গোছের পিন সম্মুখদিকে, পশ্চাদভাগে ও আঙ্‌টার দুই পার্শ্বে আবদ্ধ থাকে। এই পিনগুলি সাধারণতঃ সুন্দর এনামেল করা।

অ-চংরা সোণা ও রূপার উপর সুন্দর নক্সা তুলিতে পারে। স্ত্রীলোকেরা মাক্‌ড়ী, আঙ্‌টী, গলার হার এবং বলয় বা চুড়ী ব্যবহার করিয়া থাকে। এগুলির কাজ এত সুন্দর ও নূতন ধরণের যে, দেখিলেই মনে হয় ইহাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান বেশ আছে। ইহাদের ব্যবহৃত রূপার জিনিষ, রূপার জিনিষের উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ও এনামেলের উপর কাজ খুবই সুন্দর। পার্শ্ববর্ত্তী কোন জাতিই এবিষয়ে ইহাদের সমকক্ষ নহে।

অ-চংরা শান্ত প্রকৃতির এবং অত্যন্ত লাজুক। ইহাদের পুরোহিতেরা গোঁড়া বৌদ্ধ। তাহাদের দেখাদেখি সাধারণ লোকেরাও এই ধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান্‌। অ-চংদের শান-বৌদ্ধদিগের মত ধর্ম্মবিষয়ে শৈথিল্য নাই। ইহাদের অধ্যুষিত হোসা উপত্যকার দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে ছোট ছোট পাহাড়ের পাদদেশে কএকটী পাগোডা দেখিতে পাওয়া যায়; এগুলি ব্রহ্মদেশের পাগোডারই অনুরূপ।

অ-চংরা মৃত্তিকার উপর ইটের বাড়ী নির্ম্মাণ করে। এগুলি শান বা ব্রহ্মবাসীদের মত উঁচু নয়। প্রত্যেক গ্রাম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্তিকার প্রাচীর কিংবা ফণিমনসা গাছের বেড়া দিয়া ঘেরা। সর্দ্দারদের বাসস্থান সাধারণ চৈনিক রাজকর্ম্মচারিদের সরকারী বাসভবনের মত এবং প্রাচীর-গাত্রে ড্রাগণের চিত্র অঙ্কিত থাকে।

অ-চংরা শান ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে। কেহ কেহ আবার চীনা ভাষা বেশ জানে। এই কারণে ও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করায় তাহারা মূলতঃ যে তিব্বতী-ব্রহ্মজাতীয় তাহা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। নিজেদের ভিতর ইহারা অ-চং ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে দেখা যায়। গ্রিয়ার্‌সন সাহেবের মতে ইহারা ব্রহ্মবাসীদিগের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

মেজর ডেভিসের মতের ভিত্তির উপর অনুসন্ধান করিয়া স্যর্ জর্জ্জ স্কট্ বলিয়াছেন, অ-চং ভাষায় শতকরা ৩০টী শব্দ ব্রহ্ম-ভাষার সহিত ও ১২টী শব্দ শান-ভাষার সহিত সংশ্লিষ্ট। শেষোক্ত শব্দগুলি পার্শ্ববর্ত্তী শানদিগের নিকট হইতে গৃহীত। শানদিগের সহিত পরিচিত হইবার ও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে এ শব্দগুলি সম্বন্ধে ইহাদের কোনরূপ জ্ঞানই ছিল না। ব্রহ্মবাসীদের ভাষার বিশেষতঃ জি, মরু ও লাসি ভাষার সহিত অ-চং ভাষার সৌসাদৃশ্য খুব বেশী। ইরাবতীর উত্তরদিকের গিরিসঙ্কটবাসী হ্‌পোন্‌দের ভাষার সহিতও ইহার অনেকটা মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

অচক্‌জৈ—ভারতসীমান্তবাসী এক আফগান জাতি। ইহারা পাঠানদিগের একটী শাখা। জ্‌মিদাবার জেলায় ইহাদের বাস। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের পর কএকবার এই জাতির সহিত ইংরেজসৈন্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল।

অ-চক্‌-প—য়ুয়নবংশের সপ্তম সম্রাট্ (১৩২০-২৮ খৃষ্টাব্দ)। ইনি যেশান তৈমূরের পুত্র। জানাদুর সম্রাট্‌রূপে ইনি ঘোষিত হন; কিন্তু এই সময় তদীয় পিতৃমন্ত্রী ইয়েন্-তৈমূর কইদ্দুনের পুত্রগণের জন্য পিকিনে ঘোষণা করেন। ইহাতে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। অ-চক্‌-প পরাজিত হন এবং জানাদু ইয়েন্-তৈমূরের হস্তগত হয়।

অচকিত—(ত্রি) চক্ষুর নিমেষশূন্য, স্থির। ২ অভীত। ৩ অতৃপ্ত।

অচক্র—(ত্রি) চক্রহীন। "না তন্ত্রী বিদ্যতে বীণা নাচক্রো বিদ্যতে রথঃ।" (রামা ২.৩৯.২৯)

অচক্ষুর্বিষয়—(ত্রি) চক্ষুর অবিষয়ীভূত, অপ্রত্যক্ষ। "অচক্ষুর্বিষয়শ্চন্দ্রঃ কাং প্রীতিং জনয়িষ্যতি।" (রামা° ৬.১০১.১০)

অচক্ষুষ্ক—(ত্রি) যাহার চক্ষু নাই, অন্ধ। (বৃহদারণ্যক ৩.৮.৩)

অচক্ষুস্—(ত্রি) [নাস্তি চক্ষুর্যস্য; বহুব্রী] মন্দনেত্র, অল্পদৃষ্টিশক্তিযুক্ত। ২ নেত্রহীন, অন্ধ। [নঞ্‌-তৎ] (ক্লী) ৩ চক্ষু ভিন্ন অন্য কিছু। ৪ (পুং) যজ্ঞভূমিতে স্থাপনীয় অগ্নিবিশেষ। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ২৯.২৭)

অচঙ্গো—ফরাসী-অধিকৃত কঙ্গো রাজ্যের অন্তর্গত একটী বামনাকৃতি মনুষ্যজাতি। ইহারা নিগ্রোবংশসম্ভূত, অবয়বাদির গঠন নিগ্রোদের সহিত একরূপ, কিন্তু ক্ষুদ্রাকার।

অচঞ্চল—(ত্রি) [নঞ্-তৎ] স্থির, স্তব্ধ।

অচট—[দেশজ] অচষা, অকৃষ্ট, পতিত (জমি)।

অচণাচার্য্য—(পুং) গ্রন্থকারবিশেষ। ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম কৃষ্ণরাজসার্ব্বভৌমত্রিশতী ও কৃষ্ণরাজাষ্টোত্তরশতী।

অচণ্ড—(ত্রি) অকোপন, শান্তস্বভাব।

অচণ্ডী—(স্ত্রী) [চড়ি কোপনে, পচাদ্যচ্, ইদিত্বাৎ নুম্, স্ত্রিয়াং ঙীপ্; নঞ্-তৎ] শান্তশীলা গবী, চলিত শান্ত গাই। পর্য্যায়—সুকরা। ২ অকোপনা, সুশীলা স্ত্রী।

অচতুর—(ত্রি) [ন সন্তি চত্বারি যত্র বা যস্য; বহুব্রী। অচ্ সমা°] চতুঃসংখ্যাহীন। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গ যথায় বা যাহার নাই। [চতুরোনিপুণঃ; নঞ্-তৎ] ২ অপটু, অদক্ষ।

অচন—এই শব্দের অর্থ পিতা বা স্বামী। ১৯০১ সালের লোকগণনায় কোচিনের নায়ারদের এক উপাধি 'অচন' দেখা যায়। উইগ্রাম সাহেব তাঁহার **Malabar Law and Custom** গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, অচনশব্দ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপাধিস্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

(১) পালঘাট রাজবংশীয়গণ; (২) কালিকট রাজের মন্ত্রী (নাম মঙ্গাত অচন); (৩) কোচিন রাজমন্ত্রী (নাম পলিয়ৎ অচন); (৪) কালিকটের দ্বিতীয় রাজার মন্ত্রী (নাম চেনলি অচন)।

অচন্ত—নামান্তর অৎসন্ত বা ঔৎসন্ত। মান্দ্রাজ প্রদেশের গোদাবরী জেলাস্থিত নর্শাপুর তালুকের একটী নগরী। অক্ষা° ১৬°৩৬′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১°৫০′৩০″ পূঃ। পূর্ব্বে অচন্ত পিথাপুরমের অন্তর্গত ছিল। এই নগরের অধিবাসী সাধারণতঃ কৃষিজীবী।

অচন্দেবিলন্তন—মাদ্রাজের তিন্নেবেলী জেলান্তবর্ত্তী শ্রীবল্লীপতূর তালুকের অন্তর্গত একটী নগরী। ইহা কায়াকুদিমতী নদীর বামতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ৯°২৯′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৪২′ পূঃ।

অচন্দ্র—(ত্রি) চন্দ্রবিহীন।

অচন্দ্রিক—(ত্রি) কিরণশূন্য।

অচপল—(ত্রি) [ন চপলঃ; নঞ্-তৎ] ধীর, স্থির। [নাস্তি চপলো যস্মাৎ; বহুব্রী] ২ অত্যন্ত চঞ্চল। ব্রজবুলিতে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

অচর—(ত্রি) [ন চর-অচ্; নঞ্-তৎ] স্থির, চলনশূন্য। ২ জ্যোতিষোক্ত বিশেষ বিশেষ লগ্ন। জ্যোতিষের মতে, মেষ কর্কট তুলা মকর এইগুলি চর লগ্ন। এতদ্ব্যতীত অন্য লগ্ন অর্থাৎ বৃষ সিংহ বৃশ্চিক কুম্ভ এইগুলি স্থির বা অচর লগ্ন। ৩ স্থিতিশীল তৃণলতাদি। (মনু ৫.২৯)

অচরণা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] যোনিব্যাপদ্‌বিশেষ। এই রোগের বিবরণ মাধবনিঘণ্টুতে বর্ণিত হইয়াছে।

অচরৎ—(ত্রি) স্থির, স্থায়ী। (ঋক্ ১.১৮৫.২; ৩.৫৬.২)

অচরম—(ত্রি) [ন চরমঃ; নঞ্-তৎ] অন্তিমত্ববিরোধী মধ্যত্বাদি অবস্থাযুক্ত। "বয়স্যচরমে"। (পাণিনি) অচরম বয়স বলিতে কৌমার যৌবনাদি অবস্থা বুঝায়। ২ অনিকৃষ্ট। (ঋক্ ৫.৩৮.৫)

অচরপাকম্‌চেট্টি$_1$—দক্ষিণভারতের চেট্টিসম্প্রদায়ের একটী শাখা। [চেট্টি দ্র°]

অচরপাকম্‌চেট্টি$_2$—দক্ষিণভারতে চেট্টির সদরবিশেষ। বিশেষতঃ ইহা বিরিচেট্টিদের বাসস্থান।

অচরলু—রামানুজাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের মোহান্তদিগকে এই আখ্যায় অভিহিত করা হয়। সংস্কৃত 'আচার্য্য' শব্দের সহিত তেলেগু 'লু' শব্দ-যোগে এই শব্দের উৎপত্তি।

অচরিষ্ণু—(ত্রি) অচলনশীল। ২ চলৎশক্তি রহিত।

অচর্ম্মিন্—(ত্রি) নিষ্ফলকী, ঢালী নহে।

অচল$_1$—(পুং) [ন চলঃ; নঞ্-তৎ] শঙ্কু, কীলক, চলিত গোঁজ। ২ পর্ব্বত। "অচল এষ ভবানিব রাজতে"। (মাঘ) ৩ বৃক্ষ। ৪ শিব। ৫ আত্মা। "অচলোঽয়ং সনাতনঃ।" (গীতা ২.২৪)। ৬ সাত (৭) সংখ্যা। (ক্লী) ৭ ব্রহ্ম। (ত্রি) ৮ চলনশূন্য, নিষ্কম্প, স্থির, দৃঢ়।

"আসসাদ ততো রামং স্থিতং শৈলমিবাচলম্।" (রামায়ণ)

(দেশজ) ৯ বিনিময়ের অযোগ্য, মেকি টাকা ইত্যাদি। ১০ বার্দ্ধক্যাদিহেতু অকর্ম্মণ্য। ১১ অর্থাভাবনিবন্ধন সংসারনির্ব্বাহের উপায়রহিত। ১২ অধিক লোক না থাকায় সাংসারিক কার্য্যে বিশৃঙ্খলতা।

অচল$_2$—(পুং) প্রত্যুষ ঋষির পুত্র। ইনি একজন দেবর্ষি ছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৬১.৮৪)

অচল$_3$—(পুং) বৌদ্ধদিগের একজন ক্রূর দেবতা। ইঁহার অপর নাম চণ্ডমহারোষণ। বজ্রবারাহী ও হেরুকমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে চারিটী দেবতা থাকেন, তাঁহাদের একটীর নাম অচল।

অচলের যে ধ্যান সাধনমালায় (প. ১৬৯) পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ—

"অবনিনিহিতজানুঃ সব্যহস্তৈকখড়্গঃ
তদিতরকরমুষ্টৌ তর্জ্জনীসক্তপাশঃ।
নিবিড়-ঘনশরীরশ্চণ্ডরুক্ চণ্ডচক্ষুঃ
শময়তু ভববিঘ্নং বিঘ্নহন্তাঽচলোঽয়ম্॥"

অর্থাৎ অচলের জানু ধরাতলে নিহিত, তাঁহার দক্ষিণহস্তে খড়্গ এবং বামহস্তে তর্জ্জনীতে সংলগ্ন পাশ ও তাঁহার মূর্ত্তি

সুদৃঢ় এবং সুসংবদ্ধ; তাঁহার তেজ ও দৃষ্টি অতি প্রখর। বিঘ্নহন্তা অচল ভববিঘ্ন নাশ করেন। [চণ্ডমহারোষণ দ্র°]



অচল

অচল$_4$—(পুং) জৈনদিগের ৯ম বলভদ্রের অন্যতম। (হেমচন্দ্র)

অচল$_5$—(পুং) একজন বৌদ্ধস্থবির। অজন্তার একটী বৌদ্ধ শিলালিপিতে যোগী বুদ্ধভদ্রের গুহায় এক মন্দির নির্ম্মাণের বর্ণনা আছে। এই শিলালিপিতে রাজা অশ্মকের মন্ত্রী ভব্বিরাজ ও দেবরাজ এবং স্থবির অচলের উল্লেখ পাওয়া যায়। [অচলস্থবির দ্র°]

অচল$_6$—(পুং) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে যে সমস্ত মহর্ষি উপস্থিত ছিলেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। (মহাভারত)

অচল$_7$—(পুং) বৃহদ্বলবংশজ একজন রাজা। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, ইনি কলিযুগে ৩২ বৎসর রাজত্ব করিবেন। (মৎস্যপু° ২৭১.২৮)

অচল$_8$—(পুং) গান্ধার রাজবংশীয় জনৈক মহাবীর। ইনি শকুনির ভ্রাতা। ইঁহার অপর এক ভ্রাতার নাম বৃষক। মহাভারতে লিখিত আছে, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধকালে উভয় ভ্রাতাই কৌরবপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের হস্তে ইঁহার মৃত্যু হয়। (মহাভা°, উদ্যোগ°, ১৬৭ অ°)

অচল$_9$—মারবারের রাজা গজসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। অল্প বয়সে ইনি প্রাণত্যাগ করেন। আদি নৃপতি শিবজী হইতে ইনি অধস্তন ২১শ পুরুষ। (রাজস্থান—মারবার)

অচল$_{10}$—জিৎ-বংশীয় নরপতিবিশেষ। বুন্দী রাজ্যের ৩ ক্রোশ পূর্ব্বে রামচন্দ্রপুর নামক স্থানে একটী কূপ খননকালে জিৎ-বংশ সম্বন্ধে কতকগুলি শিলালিপি পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একখানিতে লিখিত আছে যে, 'কুহল নামে রাজা স্বীয় প্রিয়তমার প্রীত্যর্থে সূর্য্যের উদ্দেশে একটী মন্দির স্থাপন করেন ও মহারাজ যশোবর্ম্মার পুত্র অচল হইতে উক্ত মন্দির প্রসিদ্ধি লাভ করে।'

অচল$_{11}$—একজন গ্রন্থকার। ইনি বৎসরাজের পুত্র ও গোবিন্দের পৌত্র এবং আনন্দপুরনিবাসী। ইঁহার রচিত গ্রন্থ 'আহ্নিক-দীপক', 'নির্ণয়দীপক', 'মহারুদ্রপদ্ধতি' ও 'শাঙ্খায়নাহ্নিক' বা 'শাঙ্খায়নাহ্নিকদীপিকা'। 'আহ্নিকদীপক' ও নির্ণয়দীপক', ১৫৭৫ সংবতে (১৫১৮-১৯ খৃষ্টাব্দে) লিখিত বলিয়া অনেকের অনুমান।

অচল$_{12}$—বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে একটী।

অচল$_{13}$—(পুং) ধ্রুবতারা। ধ্রুবনক্ষত্র এক স্থানেই উদিত হইয়া থাকে বলিয়া এই নাম।

অচল উপাধ্যায়—এক দার্শনিক গ্রন্থকার। ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'বাক্যবাদ'।

অচলকন্যা—(স্ত্রী) [অচলস্য হিমালয়স্য কন্যা ; ৬-তৎ] পার্ব্বতী। দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করিয়া ইনি হিমালয়ের ঔরসে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

অচলকীলা—(স্ত্রী) [অচলাঃ কীলা ইব যস্যাঃ] পৃথিবী।

অচলকূটক—(পুং) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত কেতুমালবর্ষের অন্তর্গত একটী রাজ্য। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৪৪.৯)



অচলকেতু-লোকেশ্বর

অচলকেতু-লোকেশ্বর—(পুং) বৌদ্ধতন্ত্রোক্ত এক দেবতা। ইঁহার একটী মুখ, দুই বাহু ও ইনি পদ্মের উপর দণ্ডায়মান।

ইঁহার দক্ষিণহস্তে অভয়মুদ্রা ও বামহস্তে পিণ্ডপাত্র এবং দক্ষিণ স্কন্ধের উপর একটী চামর রক্ষিত।

অচলগড়,—নাসিক জেলার চান্দোর শৈল-শ্রেণীর পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত দিন্দোরী শহরের প্রায় ১০ ক্রোশ উত্তরবর্ত্তী একটী দুর্গ। ইহা ভূপৃষ্ঠ হইতে ৪০৬৮ ফুট উচ্চ। যে পাহাড়ের উপরে এই দুর্গ বিদ্যমান, তাহা অনেকদূর পর্য্যন্ত বেশ সুগম। কেবল শীর্ষদেশের কিয়দংশ দুরারোহ। পাহাড়ের গায়ে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত একটী অসম্পূর্ণ প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

অচলগড়₂—আবু পর্ব্বতের আবু ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত একটী গ্রাম। অক্ষা° ২৪°৩৭′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৪৮½′ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে গুরুশিখর। [গুরুশিখর দ্র°] পূর্ব্বে এখানে একটী সুবৃহৎ ও উল্লেখযোগ্য দুর্গ ছিল। দুইটী বৃহৎ তোরণ দিয়া গ্রামে প্রবেশ করা যায়। এই তোরণ দুইটীর মধ্যে একটীর নাম 'চম্পা তোরণ'। গ্রামটী পর্ব্বত শিখরোপরি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৬৮৮ ফুট উচ্চ। অচলগড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড়ই মনোরম। অচলেশ্বরে উপস্থিত হইলেই প্রথমে অচলেশ্বরের জৈনমন্দির পরিদৃষ্ট হয়। মন্দিরে আদিনাথের মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত। মন্দিরটী কারুকার্য্যশোভিত শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত এবং চতুষ্পার্শ্ব প্রাচীর-বেষ্টিত। নানারূপ স্থাপত্যকলার নিদর্শন এই মন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে মন্দিরে কোনরূপ লিপি নাই; তবে ঐতিহাসিক টড্ সাহেব একটী প্রস্তরলিপির উল্লেখ করিয়াছেন। পাহাড়ের নীচে মন্দাকিনী নামে একটী ছোট দীর্ঘিকা। এই দীর্ঘিকার তীরে আদিপাল নামে এক রাজপুতমূর্ত্তি ধনুর্ব্বাণহস্তে দণ্ডায়মান। প্রবাদ, এইস্থানে কএকজন ঋষি যজ্ঞ করিতেন। তিনজন অসুর মিলিয়া এই যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করায় তাঁহারা অগ্নিতে আহুতি দিয়া এই রাজপুতমূর্ত্তি সৃষ্টি করেন। রাজপুতের হস্তে অসুরগণ নিধন প্রাপ্ত হয়। এইস্থানে অনেকগুলি কুণ্ড আছে। স্থানীয় প্রবাদ আছে যে, অচলগড়ের একটী অপরূপ পর্ব্বতগুহাস্থিত কুণ্ডে দেবতাগণ রাত্রিতে স্নান করিতে আসেন। গুহাটীর নাম ভর্তৃহরি গুহা। এই গুহার কারুশিল্প অপূর্ব্ব। দীর্ঘিকাতীরে অবস্থিত অচলেশ্বর শিবের মন্দিরটী খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া অনেকের অনুমান। এই অচলেশ্বরের লিঙ্গ হইতে এই স্থানের অপর নাম অচলেশ্বর হইয়াছে। লিঙ্গটী বেশ বড়। অচলেশ্বর মন্দিরের নিকটে গণপতি, লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাম ও দেবী মন্দিরও বর্ত্তমান।

অচলজ—(ত্রি) [অচলাৎ জায়তে। অচল-জন-ড; ৫-তৎ] পর্ব্বতে জাতমাত্র। [স্ত্রিয়াং আপ্] (স্ত্রী) ২ পর্ব্বতকন্যা, পার্ব্বতী। ৩ পর্ব্বতজাতা লতাদি।

অচলত্বিষ্—(পুং) [অচলা স্থিরা ত্বিট্ কান্তির্যস্য; বহুব্রী] কোকিল। (ত্রি) ২ স্থিরকান্তিযুক্ত। [কর্ম্মধা] ৩ স্থিরকান্তি।

অচলদান—দানভেদ। ইহাতে দশবিধ দ্রব্যের অচল অর্থাৎ পর্ব্বত দান করিতে হয়, যথা—ধান্যাচল, লবণাচল, গুড়াচল, হেমাচল, তিলাচল, কার্পাসাচল, ঘৃতাচল, রত্নাচল, রজতাচল ও শর্করাচল। বিষুবায়নে, ব্যতীপাতে, শুক্লাতৃতীয়ায়, গ্রহণে, অমাবস্যায়, শুভনক্ষত্রে, পূর্ণিমা বা দ্বাদশী তিথিতে, বিবাহে, যজ্ঞে, কার্ত্তিকমাসে জ্যেষ্ঠপুষ্করতীর্থে, দেবায়তনে, গোষ্ঠে বা গৃহাঙ্গনে পূর্ব্ব বা উত্তরদ্বার চতুরস্র মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া বিধিমতে এই দান করিতে হয়। [এই দানের বিস্তৃত বিবরণ পদ্মপু°, সৃষ্টি°, ২১ অ° দ্র°]

অচলদেব—(পুং) গ্রন্থকারবিশেষ। ইঁহার রচিত গ্রন্থ মহা-রুদ্রপদ্ধতি।

অচলদ্বিষ্—(পুং) [অচলেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ দ্বেষ্টি। অচল-দ্বিষ্-ক্বিপ্; ৪-তৎ] ইন্দ্র। ইন্দ্র পর্ব্বতদের পক্ষচ্ছেদন করিয়াছিলেন।

অচলধৃতি—(স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। 'দ্বিগুণিত-বসুলঘুভিরচল-ধৃতিরিহ।' অর্থাৎ এই ছন্দ ষোলবর্ণে (২×৮ দ্বিগুণিত-বসু) গ্রথিত এবং সকল বর্ণগুলিই লঘু। যথা—'কই সই নবজলধর চিকণ বরণ ?'

অচলনারী—(স্ত্রী) [অচলস্য হিমাচলস্য নারী; ৬-তৎ] মেনকা; হিমালয়ের স্ত্রী। "আমি অচলনারী, চলিতে নাহিরে, পারি না যে দেখে আসি।" (রামবসু)

অচলনিবন্ধ—(পুং) ধর্ম্মশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থবিশেষ।

অচলপতি—(পুং) [অচলানাং পতিঃ; ৬-তৎ] গিরিরাজ, হিমালয়।

অচলভ্রাতৃ—(পুং) জৈনগণাধিপবিশেষ। ইনি শেষ জৈনাচার্য্য মহাবীরের একাদশ শিষ্যের অন্তর্গত একজন শিষ্য।

অচলমতি—(পুং) জনৈক রাক্ষস। (ললিতবিস্তর)

অচলমিশ্র—(পুং) সিদ্ধান্তসংগ্রহ-রচয়িতা।

অচলরাজ—(পুং) [অচলানাং রাজা; ৬-তৎ। রাজাহঃ-সখিভ্যষ্টচ্। পা ৫.৪.৯১] হিমালয়। ব্রহ্মা হিমালয়কে শৈল-গণের, সাগরকে নদীগণের এবং চিত্ররথকে গন্ধর্ব্বগণের অধিপতি করিয়া দেন।

"শৈলানাং হিমবন্তঞ্চ নদীনাঞ্চৈব সাগরম্।
গন্ধর্ব্বাণামধিপতিং চক্রে চিত্ররথং বিধিঃ॥" (ব্রহ্মপু°)

অচললিঙ্গ—(পুং) শিবলিঙ্গের প্রকারভেদ। শিবলিঙ্গ দুই প্রকার—চললিঙ্গ ও অচললিঙ্গ। সুপ্রভেদাগমে অচল লিঙ্গের নয়

প্রকার বিভাগ দেখা যায়; যথা—স্বায়ম্ভুব, পূর্ব্ব বা পুরাণ, দৈবত, গাণপত্য, অসুর, সুর, আর্ষ, রাক্ষস, মানব বা মানুষ ও বাণলিঙ্গ। [তত্তৎ শব্দ দ্র°] ইহাদের মধ্যে স্বায়ম্ভুবলিঙ্গ শ্রেষ্ঠ, দৈবত ও গাণপত্য লিঙ্গ উত্তম ও মধ্যম এবং আর্ষলিঙ্গ উত্তমাধম। মানবলিঙ্গ মধ্যমাধম শ্রেণীর। মানসার মতে, অচললিঙ্গ ছয় প্রকার—শৈব, পাশুপত, কালামুখ, বাম, ভৈরব ও অপর একপ্রকারের নামোল্লেখ নাই।

"লিঙ্গমানবিধিং সম্যগ্‌লক্ষণং বক্ষ্যতেঽধুনা।
শৈবং পাশুপতঞ্চৈব কালামুখমুদাহৃতম্॥
বামং চ ভৈরবঞ্চৈব লিঙ্গমানন্ত ষড়্‌বিধম্।" (মানসার)

'মুকুটাগম' নামক গ্রন্থে দৈবিক, আর্ষক, গাণপত্য ও মানৰভেদে চারি প্রকার অচললিঙ্গের বিভাগ করা হইয়াছে। 'কামিকাগম' নামক অতি প্রামাণ্য দৈব আগম গ্রন্থে অচললিঙ্গের স্বায়ম্ভুব, দৈবিক, আর্ষক, গাণপত্য, মানুষ ও বাণ এই ছয় প্রকার বিভাগ দেখা যায়। 'কামিকাগমে' লিখিত আছে যে, স্বায়ম্ভুবলিঙ্গ অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান। যদি অগ্নি, মত্ত হস্তী, জলপ্লাবন ধর্ম্মশত্রু বা ভূতগ্রস্ত লোক দ্বারা এই লিঙ্গ কিয়ৎপরিমাণেও নষ্ট হয়, তবে তাঁহাকে পুনরায় স্থাপন করিবার প্রয়োজন হয় না। যদি স্বায়ম্ভুব কোন প্রকারে স্থানচ্যুত হন, তাহা হইলে স্থানীয় রাজার রাজ্য ও জীবন নষ্ট হইয়া থাকে। ব্যাঘ্রপুরনিবাসী নিগমজ্ঞানদেব তাঁহার 'জীর্ণোদ্ধার-দশক' নামক গ্রন্থের টীকায় ভারতবর্ষের এমন ৬৮টী স্থানের নাম করিয়াছেন, যেখানে স্বায়ম্ভুবলিঙ্গ স্থাপিত আছেন। ঐ স্থানগুলির মধ্যে বারাণসী, প্রয়াগ, নৈমিষ, গয়া, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, পুষ্কর প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ আছে। 'মুকুটাগম' অনুসারে দৈবিকলিঙ্গ অগ্নিশিখা-সদৃশ বা অঞ্জলিবদ্ধহস্তসদৃশ হইবে। এই লিঙ্গের গাত্র বন্ধুর এবং ইহাতে টঙ্ক ও শূলসদৃশ দাগ থাকিতে পারে। গাণপত্যলিঙ্গ গণদিগের দ্বারা স্থাপিত; ইঁহার আকার আতা ফলের মত। আর্ষলিঙ্গ ঋষিগণ স্থাপন করিয়া পূজা করিতেন; ইঁহার আকার নারিকেল ফলের মত। উক্ত তিনটী মূর্ত্তিরই ব্রহ্মসূত্র নাই। অচললিঙ্গের অধিকাংশই মানব-লিঙ্গ। ইঁহারা মানব কর্ত্তৃক স্থাপিত। আগমোক্ত নিয়মানুসারে ইঁহাদের স্থাপন করা হইয়া থাকে। ইঁহাদের আকারও নানাবিধ। এই লিঙ্গের তিনটী অংশ আছে। নিম্নাংশের চতুষ্কোণ ভাগকে ব্রহ্মভাগ বলে, মধ্যের অষ্টকোণ ভাগকে বিষ্ণুভাগ এবং ঊর্দ্ধাংশের গোলাকার ভাগকে রুদ্রভাগ বলে। রুদ্রভাগের উপর ব্রহ্মসূত্রের অনুরূপ কতকগুলি রেখা অঙ্কিত করা হয়।

অচলবর্ম্মা সমরঘজ্বল—সিংহপুরাধিপতি। সিংহপুরে যদুবংশে সেনবর্ম্মা নামে এক রাজা ছিলেন। সেনবর্ম্মার অধস্তন নবম পুরুষের নাম অচলবর্ম্মা সমরঘজ্বল।

অচলবসন্ত—উড়িষ্যার কটক জেলার অশিয়া পাহাড়শ্রেণীর একটী শিখর। অক্ষা° ২০°৩৮′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬°১৬′ পূঃ। এস্থানে চিরবসন্ত বিরাজমান। ইহার পাদদেশে মাঝিপুরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এই স্থানে প্রাচীন হিন্দুরাজগণের আবাস ছিল।

অচলসিংহ,—অযোধ্যার খেরিনগরবাসী চৌহানবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা। ইনি ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে রাজা নরপৎসিংহের মৃত্যুর পর ইনি সিংহাসনারোহণ করেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে রাজপুতানা হইতে অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ খুর্দ্দের সময় ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ যামিনী খান্ খেরির চৌধুরীর পদ প্রাপ্ত হন। তিনি উক্ত পরগণার সমস্ত জমির উপর কর বসাইবার অধিকার পান। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে এই বংশের আজবসিংহ রাজা 'উপাধি' প্রাপ্ত হন এবং ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ঐ উপাধি বংশানুক্রমিক হয়।

অচলসিংহ$_2$—মিবারের মহারাণা বিখ্যাত প্রতাপসিংহের ভ্রাতা শক্তসিংহের ২য় পুত্র। শক্তসিংহের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ভণজী স্বীয় পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতে না গিয়া ভিন্‌শরো (ভিল্-শহর) দুর্গে প্রবিষ্ট হইয়া দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে অন্যান্য রাজপুত্রেরা প্রত্যাগত হইয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় ভণজী উত্তর দিলেন যে, 'এই দুর্গে তোমাদের স্থান হইবে না, অন্যত্র প্রস্থান কর। আমাকে অনেকগুলির আহার দান করিতে হইবে।' এই সময় তাঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা অচল জ্যেষ্ঠের আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, 'আপনার অভিপ্রায়ের বিপরীতাচরণ করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু আমাদিগের স্ত্রী, পুত্র, অস্ত্রসমূহ ও অশ্বগুলি প্রদান করুন।' এই কথায় ভণজী দুর্গদ্বার মুক্ত করিলে অচলসিংহ ও তাঁহার কনিষ্ঠ অপর পঞ্চদশ ভ্রাতা দুর্গে প্রবিষ্ট হইয়া অশ্ব, অস্ত্র ও পরিবারবর্গ লইয়া সকলে ইদর রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পরিবারবর্গের মধ্যে অচলের পত্নী তখন পূর্ণগর্ভা, সুতরাং তাঁহাকে লইয়া অতি সাবধানে পথ চলিতে হইল। পালোড় নামক স্থানে উপনীত হইবামাত্র অচলের বনিতা প্রসববেদনায় কাতর হইলেন, সুতরাং তাঁহারা আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

পালোড়ের শনিগুরু সর্দ্দারের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা

করিলেন, কিন্তু নিষ্ঠুর সর্দ্দার আশ্রয় দিল না। অগত্যা তাঁহারা নিকটস্থ ভগ্ন দেবালয়ে আশ্রয় লইলেন। উক্ত মন্দিরে জাহ্নবী দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সময় প্রবল ঝড় ও মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। ঝটিকার প্রাবল্যে মন্দিরের একখানি বৃহৎ প্রস্তর পতনোন্মুখ হইলে শক্তসিংহের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র বল্ল সেই প্রস্তর নিজ মস্তকে ধারণ করিয়া রহিলেন। যদি তিনি সেই প্রস্তরের ভার নিজ মস্তকে না লইতেন, তাহা হইলে প্রস্তরাঘাতে নিম্নস্থ প্রসব-বেদনা-পীড়িতা অচলপত্নী চূর্ণীকৃত হইতেন। পরে অচলের অপর ভ্রাতৃগণ নিকটস্থ বাব্‌লা (বাবুল) বৃক্ষ ছেদন করিয়া সেই পতনোন্মুখ প্রস্তরে স্তম্ভরূপে স্থাপন করিলে বল্ল নিষ্কৃতি পাইলেন।

ইতিমধ্যে অচলের একটী পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। প্রবাদ, এই সময় সেই মন্দিরস্থিতা ভগবতী জাহ্নবী দেবী আশা-পূর্ণারূপে তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া প্রসূতিকে গমনোপযোগী বল প্রদান করিলেন। পরে সকলের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া নবকুমারের নাম 'আশা' রাখা হইল। যথাকালে সকলে ইদরে উপনীত হইলেন। তত্রত্য শাসনকর্ত্তা তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া বাস করিবার উপযুক্ত ভূমি ও বৃত্তি প্রদান করিলেন।

অচলসিংহ৩—পান্না মহারাজের একজন সর্দ্দার। আলীপুর নগর ইঁহার স্থাপিত। [আলীপুর দ্র°]

অচলসেন—সূর্য্যবংশোদ্ভব অন্তরথের পুত্র। ইনি প্রথমে সৌরাষ্ট্র জয় করেন। ইঁহার পুত্রের নাম কনকসেন। অনুমান ১৮৮ সংবতে ইঁহার মৃত্যু হয়। (রাজস্থান)

অচলসোপান—(ক্লী) স্থায়ী বা অচল অবতরণিকা। "অচলঞ্চ চলঞ্চৈব দ্বিধা সোপানমীরিতম্।" (মানসার) [সোপান দ্র°] মানসারে এইরূপ সোপান সম্বন্ধে আরও আলোচনা আছে।

অচলস্থবির—(পুং) একজন বৌদ্ধ অর্হৎ। অজন্তার ২৬ নং গুহাচৈত্যে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায়, ঐ চৈত্য অচল-স্থবির কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। [অচল৮ দ্র°] চীন-পরিব্রাজক য়ুয়ন্-চোয়াঙের বর্ণনায়ও ইঁহার নাম পাওয়া যায়।

অচলা১—(স্ত্রী) [ন চলঃ; নঞ্-তৎ। স্ত্রিয়াং টাপ্] পৃথিবী।

ভাস্করাচার্য্য তৎকৃত সিদ্ধান্ত-শিরোমণির গোলাধ্যায়ে পৃথিবীকে অচলা বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার মতে রবি, শশী, শুক্র, বুধ প্রভৃতি গ্রহ ও নক্ষত্রকক্ষাবরণে আবৃত হইয়া এই পৃথিবী সর্ব্বদাই মৃত্তিকা, জল, অনিল, আকাশ ও তেজোময় হইয়া আছে। ইহার অন্য আধার নাই। পৃথিবী স্বীয় শক্তিগুণেই নিয়ত শূন্যপথে অবস্থিত। দনুজ, মনুজ, আদিত্য, দৈত্য যাবতীয় প্রাণী ইহারই পৃষ্ঠে ইতস্ততঃ নিয়ত বসবাস করিতেছে। কদম্বকুসুমের গ্রন্থি যেমন কেসরনিকরে প্রতিভাত, ইহার উপরিস্থ গিরি, গ্রাম, আরাম ও চৈত্যসমূহে ইহাও তেমনি নানাদিকে পরিব্যাপ্ত। সূর্য্য ও অগ্নির উষ্ণতা, চন্দ্রের শৈত্য, জলের দ্রবভাব, প্রস্তরের কাঠিন্য এবং বায়ুর চাঞ্চল্য যেমন স্বাভাবিক, পৃথিবীর অচলতাও তেমনি স্বভাবসিদ্ধ।

"ভূমেঃ পিণ্ডঃ শশাঙ্কজ্ঞকবিরবিকুজেজ্যার্কিনক্ষত্রকক্ষা বৃত্তৈর্বৃত্তো বৃতঃ সন্ মৃদনিলসলিলব্যোমতেজোময়োঽয়ম্। নান্যাধারঃ স্বশক্ত্যেব বিয়তি নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্য পৃষ্ঠে নিষ্ঠং বিশ্বঞ্চ শশ্বৎ সদনুজমনুজাদিত্যদৈত্যং সমন্তাৎ॥ সর্ব্বতঃ পর্ব্বতারামগ্রাম-চৈত্যচয়ৈশ্চিতঃ। কদম্বকুসুমগ্রন্থিঃ কেসরপ্রকরৈরিব॥ যথোষ্ণ-তার্কানলয়োশ্চ শীততা বিধৌ দ্রুতিঃ কে কঠিনত্বমশ্মনি। মরুচ্চলো ভূরচলা স্বভাবতো যতো বিচিত্রা বত বস্তুশক্তয়ঃ।" (সিদ্ধান্ত-শিরোমণি—গোলাধ্যায়)

আর্য্যভট্টের মতে পৃথিবী অচলা নহে,—চলা। তবে তিনি এই অর্থে ইহাকে অচলা বলিয়াছেন যে, অচল অর্থাৎ পর্ব্বত সকল ইহাতে আছে (অস্ত্যর্থে অচ্); অথবা নিজ কক্ষা হইতে ইহার বহির্গমনের অভাব বলিয়া ইহাকে অচলা বলা যায়। অন্যথা, পৃথিবীর চলত্বই তাঁহার সিদ্ধান্ত। [ভূগোল দ্র°] অমরকোষেও পৃথিবীকে অচলা বলা হইয়াছে—"ভূভূ মিরচলানন্তা রসা বিশ্বম্ভরা স্থিরা।" [পৃথিবী দ্র°]

২ হিমালয়পত্নী মেনকা। ৩ দেবাসুরযুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্যতমা অনুচরী মাতৃকা। (মহাভারত) ৪ বৌদ্ধদিগের ১০টী পৃথিবীর অন্যতমা। (ত্রি) ৫ চলনহীনা, স্থিরা, অটলা। "সমাধাবচলা বুদ্ধিঃ" (গীতা ২.৫৩)

অচলা২—বঙ্গজ কায়স্থদিগের একটী শ্রেণীবিভাগ। মহারাজ বল্লালসেন বঙ্গজদিগকে কুলীন, মধ্যল্য, মহাপাত্র ও অচলা এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন।

সর্ব্বশুদ্ধ ৭২ ঘর কায়স্থবংশ 'অচলা' বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। যথা—

"হোড়শ্চ স্মরকশ্চৈব ধরণী বাণ এব চ।
আইচঃ পৈশুরশ্চৈব শানশ্চ ভঞ্জবিন্দুকৌ॥
গুহশ্চ বললোপ্তৌ চ শর্ম্মা বর্ম্মা চ ভূমিকঃ।
হুইশ্চ রুদ্রকশ্চৈব বাণাদিত্যৌ চ পীলকঃ॥
খিলশ্চ গুপ্তচাঞ্চীচ বন্ধুশ্চ শাক্তিসংজ্ঞকঃ।
হেশশ্চ সুমনুগণ্ডৌ রাণারাহুতদোহকাঃ॥
দানাগণাপমানাখ্যাঃ খামঃ ক্ষেমশ্চ তোষকঃ।
বৈশ্চাপি ঘরবেদৌচ ভূতার্ণবকব্রহ্মকাঃ॥

ইন্দ্রশ্চ শক্তিসঙ্কোচ ক্ষেমাশৌ বর্দ্ধনস্তথা।
হেমশ্চ বন্ধকশ্চৈব ভঞ্জঃ কীর্ত্তিশ্চ শীলকঃ॥
ধনুর্গুণো যশশ্চৈব মনোরীতিশ্চ দাড়িকঃ।
চাকিশ্চ শ্যামপূঞ্জিশ্চ গণ্ডকো নাদকস্তথা॥
বোইশ্চ হোমকশ্চৈব চাশকশ্চ তথৈব চ।
ঢোলশ্চ দূতকশ্চেতি দ্বিসপ্তত্যচলাঃ স্মৃতাঃ॥"
(ঘটক রামানন্দশর্ম্মকৃত—কুলদীপিকা)

অচলা$_২$—নাসিক জেলার একটী দুর্গ। [অচলগড়, দ্র°]

অচলাচার্য্য—একজন জ্যোতিষগ্রন্থকার। ইঁহার রচিত গ্রন্থ 'জ্যোতির্ব্বেদশৃঙ্গার'।

অচলাধিপ—(পুং) পর্ব্বতরাজ, হিমালয়। [অচলরাজ দ্র°]

অচলাসপ্তমী—ভবিষ্যোত্তরপুরাণান্তর্গত ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়ে বর্ণিত ব্রতবিশেষ।

অচলেশ—শক্তসিংহের অন্যতম পুত্র। ইনি অমরসিংহের সহিত জাহাঙ্গীরের যুদ্ধকালে অন্তলার যুদ্ধক্ষেত্রে জাতীয় উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হইয়া অসীম বীরত্ব প্রকাশ করতঃ মহারাণার জন্য, চিতোরের জন্য, স্বদেশের জন্য স্বীয় জীবন উৎসর্গ করেন।

অচলেশ্বর$_১$—তঞ্জোর জেলাস্থ তিরুবল্লূর শহরের একটী মন্দির। এখানে অচলেশ্বর বিগ্রহের পূজা ও উৎসব হয়। প্রতিবৎসর গ্রীষ্মকালে রথযাত্রা উপলক্ষে এখানে বহু লোকসমাগম হইয়া থাকে। মন্দিরটী সুবৃহৎ এবং চতুর্দ্দিকে সোপানাবলী-শোভিত সরোবরের পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। সরোবরের মধ্যস্থলে এক ক্ষুদ্র কৃত্রিম দ্বীপের উপর অপর একটী মন্দির বিরাজমান। অচলেশ্বর মন্দিরগাত্রে রাজরাজ এবং রাজেন্দ্রচোল ও তদ্বংশীয় পরবর্ত্তী রাজগণের এবং পাণ্ড্যবংশীয় কতিপয় রাজার লিপি উৎকীর্ণ আছে।

অচলেশ্বর$_২$—আবুপর্ব্বতের আবু ষ্টেশনের ৬ মাইল দূরে অচলগড় দুর্গের পাদদেশে অবস্থিত একটী তীর্থক্ষেত্র। এই স্থান অচলেশ্বর শিবলিঙ্গ ও জৈনদিগের আদিনাথ মন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ। [অচলগড়$_২$ দ্র°]

অচলোজী—একজন মরাঠা; লুখজী যাদবের পুত্র। নিজাম শাহ্ ইঁহাকে হত্যা করেন। ইঁহার পুত্র সন্তাজীকে জিজাবাঈ গোপনে প্রতিপালন করেন।

অচাত-লোকেশ্বর—বৌদ্ধতন্ত্রের এক দেবতা। ইঁহার একটী মুখ ও ছয় বাহু এবং ইনি ললিতভঙ্গীতে উপবিষ্ট। ইঁহার তিনটী দক্ষিণহস্তের একটীতে তরবারি, একটীতে শর ও অপর একটী হস্ত বরদভঙ্গীতে রক্ষিত। বামদিকের তিনটী হস্তের মধ্যে দুইটীতে কর্ত্রী ও ধনু এবং একটী হস্ত অভয়ভঙ্গীতে অবস্থিত।



অচাত-লোকেশ্বর

অচান্ত—মান্দ্রাজের কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত নর্শাপুর তালুকের একটী শহর। অক্ষা° ১৬°৩৬′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১°৪৯′ পূঃ।

অচাপল—(ক্লী) [চপলস্য ভাবঃ অণ্; নঞ্-তৎ] স্থির, চপলতাশূন্য। [নাস্তি চাপল্যং যস্য; বহুব্রী] (ত্রি) ২ চাপল্যহীন।

অচাপল্য—(ক্লী) [নঞ্-তৎ] স্থিরতা। [নাস্তি চাপল্যং যস্য; বহুব্রী] (ত্রি) ২ চাপল্যশূন্য।

অচামি—দার্জ্জিলিঙের মন্দরজাতির শাখাবিশেষ।

অচারু—(ত্রি) অসুন্দর, অমনোজ্ঞ, যাহা চারু নহে।

অচি, অছি—(দেশজ) কর্ম্মাধ্যক্ষ। আরবী ওয়াসী শব্দের অপভ্রংশ। যাঁহারা নাবালকের বিষয়ের ভারগ্রহণ করিয়া কার্য্যাদির তত্ত্বাবধান করেন, এখন বাঙ্গালায় তাঁহাদিগকেই প্রায় অচি বা অছি বলা হয়।

অচিকিৎসা—[ন চিকিৎসা; নঞ্-তৎ] চিকিৎসার অভাব। ২ কুচিকিৎসা, মন্দচিকিৎসা।

অচিকিৎস্য—(ত্রি) চিকিৎসা করিবার অযোগ্য। যে রোগের বা রোগীর কোন চিকিৎসা নাই। [স্ত্রী—অচিকিৎস্যা]

অচিকিত্বস্—(ত্রি) দেবতত্ত্বানভিজ্ঞ। (ঋক্ ১.১৬৪.৬)

অচিকুর—(পুং) খালিত্য, টাক্।

অচিক্কণ—(ত্রি) [ন চিক্কণঃ] রুক্ষ, খস্‌খসে, অমসৃণ, অপরিষ্কার।

অচিৎ—(ত্রি) [নাস্তি চিৎ জ্ঞানং যস্য; বহুব্রী] চেতনারহিত, জ্ঞানহীন। ২ যে অগ্নিচয়ন করে না, অর্থাৎ অধার্ম্মিক। [নঞ্-তৎ] (স্ত্রী) ৩ চিদ্‌ভিন্ন, অজ্ঞান। (ঋক্ ৭.৬১.৫)

রামানুজ-সম্প্রদায়ের মতে প্রত্যক্ষ যাবতীয় বস্তুই অচিৎ।

ইহা জড়স্বরূপ; ভোগ্য অন্নাদি, ভোগোপকরণ ভোজন-পাত্রাদি ও ভোগায়তন দেহ—এই তিনভাগে অচিৎ বিভক্ত। চিৎ জীব এবং ঈশ্বর অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ। চিৎ, অচিৎ উভয়েই ঈশ্বরের শরীর। [চিৎ দ্র°]

অচিত্ত,—(ত্রি) জ্ঞান বা বুদ্ধিহীন। ২ অচেতন, জড়। ৩ অনবলোকিত, অপ্রত্যাশিত। ৪ চিত্তের অবিষয়ীভূত, কল্পনাতীত। ৫ সৎকর্ম্মে অনাসক্ত চিত্ত। (ঋক্ ৩.১৮.২) ৬ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের উপসংহার, মৃত্যু, মরণ। (ঋক্ ৪.৩.১) ৭ বৃক্ষাদি দ্বারা নিবিড় (দেশ)। (ঋক্ ৬.৪৯.১১)

অচিত্ত₂—গণ বা সমূহ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলে এই শব্দ বসুগণ, ভাবগণ প্রভৃতি সমাজ বা রাজনীতি-ভিন্নার্থক সাধারণ সমষ্টি-মাত্র বুঝাইবে। সামাজিক বা রাজনৈতিক গণ বা সঙ্ঘকে 'সচিত্ত' বলা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অপরবিধ গণ 'অচিত্ত' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। "সচিত্তসমূহো যথা মল্লগণঃ...অচিত্ত-সমূহো যথা বসুগণঃ কুপ্রবচনে দ্রব্যগণো যথা চরকাদিগণঃ। চরকঃ পরিব্রাজকঃ।" (অভিধান-রাজেন্দ্র নামক জৈন প্রাকৃত অভিধানে উল্লিখিত টীকা)। পাণিনিও (৪.২.৪৭ ও ৪.৩.৯৬) রাজনৈতিক সঙ্ঘ বা গণকে সচিত্ত বলিয়াছেন। [গণ দ্র°]

অচিত্তি—(স্ত্রী) অজ্ঞান, অবিবেকের কারণ। (ঋক্ ৭.৮৬.৬)

অচিত্র—(ত্রি) অনাশ্চর্য্য, বৈশিষ্ট্যহীন। ২ অস্পষ্ট, অনিরূপণীয়। (ঋক্ ৪.৪১.৩)

অচিন্ত—একটী বৌদ্ধবিহার। মধ্যভারতের ইলোরা গিরি-গুহার ৫০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। এই অচিন্তবিহারে যোগাচার্য্যবাদী বৌদ্ধদিগের প্রতিষ্ঠাতা আর্য্যসঙ্ঘ বাস করিতেন। এই স্থানের গিরিগুহাগুলি খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকে নির্ম্মিত হয়। এখানকার ফ্রেস্কো চিত্র অতুলনীয়। একখানি উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায়, ইহার খোদাই কার্য্য অচল নামে জনৈক স্থবির-কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল।

অচিন্তনীয়—(ত্রি) [ন চিন্ত শক্যার্থে অনীয়র্] চিন্তার অযোগ্য, যাহা চিন্তা করিয়া উঠা যায় না। "অচিন্তনীয়স্তু তব প্রভাবঃ।" (রঘু°) (ক্লী) ২ ব্রহ্ম।

অচিন্তিত—(ত্রি) অভাবিত, আকস্মিক।

অচিন্ত্য,—(ত্রি) অনুমাপক হেতুর অভাবে চিন্তার বা তর্কের অবিষয়ীভূত। "অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।" (ব্রহ্মের প্রণামমন্ত্র) (পুং) ২ শিব।

অচিন্ত্য—অজন্তার ১৬ সংখ্যক গুহায় উৎকীর্ণ লিপিতে রাজা রবিসাম্বের মন্ত্রী বলিয়া ইঁহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে। বাকা-টকরাজ হরিসেন যখন রাজত্ব করিতেছিলেন, তৎকালে অচিন্ত্য এই ১৬ সংখ্যক গুহামণ্ডপটী বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মাণ করেন। সুতরাং ইনি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। [অজন্তা দ্র°]

অচিন্ত্যজ—(পুং) [বৈদ্যক] পারদ। (রাজনি°)

অচিন্ত্যশক্তি—(স্ত্রী) গঙ্গার সহস্রনামের মধ্যে একটী। (স্কন্দপু°, কাশীখণ্ড)

অচিন্ত্যশক্তিরস—(পুং) নব জ্বরে প্রযোজ্য রসৌষধবিশেষ। ইহার মাত্রা দুই রতি এবং অনুপান ধান্যপিপ্পলী-কাথ। ইহা বদ্ধমুষায় বালুকাযন্ত্রে সাহায্যে লঘুপুটে পাক করিতে হয়। (বৈদ্যকশব্দ°) ভৈষজ্য-রত্নাবলীর জ্বরাধিকারে ইহার প্রস্তুত-প্রণালী ও অনুপানবিধি এইরূপ—

রস ২ মাষা, গন্ধক ২ মাষা, একত্র কজ্জলী করিয়া ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ, নিসিন্দা, থানকুনী, গিমে, শ্বেত অপরাজিতার মূল, শালিঞ্চ, কাঁটানটে, হুড়হুড়ে—ইহাদের প্রত্যেকের ৪ মাষা করিয়া রস লইয়া উহাতে মিশ্রিত করিতে হয়। পরে স্বর্ণ-মাক্ষিক ১ মাষা, মরিচ ১ মাষা সংযুক্ত করিয়া মুগপ্রমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হয়। প্রথম দিন ৩ বটী, দ্বিতীয় দিনে ২ বটী, তৃতীয় দিনে ১ বটী শীতল জলসহ সেবন করা বিধি। তৎপরে শীতল জল পান করিতে দিতে হয়। তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে জল ও মাংসের যূষ পান করিতে দেওয়া উচিত। শিরঃ-কম্পন বা শিরঃশূল উপস্থিত হইলে মস্তকে নারায়ণতৈলাদি মর্দ্দন করান বিধি।

অচিন্তপূর্ণী—পঞ্জাবের একটী গিরিসঙ্কট।

অচিন্ত্যাত্মন্—(পুং) পরমাত্মা।

অচিবল—কাশ্মীরের একটী বৃহৎ জলোৎস। ইহা অচিগান পল্লীর সন্নিকটে অবস্থিত। পূর্ব্বে এইখানে পেসাদার নর্ত্তকী-দের বাস ছিল।

অ-চিয়াও—হান-বংশীয় সম্রাট্ উ-তির পত্নীগণের মধ্যে অন্যতমা। ইনি খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে জীবিত ছিলেন। উ-তি যখন বালকমাত্র, তখন তিনি ইঁহাকে বিবাহ করেন।

অচির—(ক্লী) [ন চিরম্] অল্পকাল, শীঘ্র। ২ নব, নূতন। (ত্রি) ৩ অল্পকালস্থায়ী বস্তুমাত্র।

অচিরক্রিয়—(ত্রি) কার্য্যসাধনে যাহার দীর্ঘকাল লাগে না; অদীর্ঘসূত্র।

অচিরত্বিষ্—(স্ত্রী) [অচিরা অল্পকালস্থায়িনী ত্বিট্ প্রভা যস্যাঃ] ক্ষণপ্রভা, বিদ্যুৎ। (ত্রি) ২ অল্পকালস্থায়ী কান্তিযুক্ত।

অচিরদ্যুতি—(স্ত্রী) [অচিরা অল্পকালস্থায়িনী দ্যুতিঃ প্রভা যস্যাঃ] বিদ্যুৎ। [কর্ম্মধা] (ত্রি) ২ অল্পকালস্থায়িনী দ্যুতি। [বহুব্রী] ৩ অল্পকালস্থায়ী দ্যুতিযুক্ত।

অচিরপল্লব—(পুং) [বৈদ্যক] সপ্তপর্ণ বৃক্ষ, ছাতিম গাছ।

অচিরপ্রভা—(স্ত্রী) [অচিরা ক্ষণকালস্থায়িনী প্রভা যস্যাঃ ; বহুব্রী] ক্ষণপ্রভা, বিদ্যুৎ। [কর্ম্মধা] ২ অচিরদীপ্তি। [বহুব্রী] (ত্রি) ৩ অল্পকালস্থায়ী প্রভাযুক্ত।

অচিরভাস্—(স্ত্রী) [অচিরা অল্পকালস্থায়িনী ভাঃ যস্যাঃ] বিদ্যুৎ। [কর্ম্মধা] ২ অল্পকালস্থায়িনী প্রভা। [বহুব্রী] (ত্রি) ৩ অল্পকালস্থায়ী দীপ্তিযুক্ত।

অচিররোচিস্—(স্ত্রী) [অচিরং রোচিঃ দীপ্তির্যস্যাঃ ; বহুব্রী] বিদ্যুৎ। [কর্ম্মধা] ২ অল্পকালস্থায়িনী দ্যুতি। (ত্রি) ৩ ক্ষণিক দ্যুতিযুক্ত।

অচিরবর্তী—(স্ত্রী) নদীভেদ। ভগবান্ গোতম বুদ্ধ নেপালের অন্তর্গত কুশীনগরে দেহত্যাগ করেন। এই কুশীনগর অচিরবর্তী ও হিরণ্যবতী নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল। ভিন্সেণ্ট স্মিথ ও নেপালের কুমার খড়্গ সমশের জঙ্গ বাহাদুর ভবসাগর ঘাটের নিকট ছোটরাপ্তি ও গণ্ডকের সঙ্গমস্থলকে কুশীনগর বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের খননের ফলে এই সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। [কুশীনগর দ্র°] স্মিথ ও কুমার খড়্গ সমশেরের মতে ছোট রাপ্তি নদীরই প্রাচীন নাম অচিরবতী।

সংযুক্তনিকায় ও অঙ্গুত্তরনিকায়ের মতে ইহা জম্বুদ্বীপের পাচটী মহানদীর অন্যতমা। অন্য চারিটী মহানদীর নাম—গঙ্গা, যমুনা, সরযূ ও মহী। সালিট্টকজাতক ও কুরুধম্মজাতক হইতে জানিতে পারা যায় যে, ইহা শ্রাবস্তীর নিকটে প্রবাহিত ছিল। ধম্মপদট্ঠ-কথায় লিখিত আছে যে, শ্রাবস্তীর নিকটবর্ত্তী পাণ্ডুপুর নামক একটী গ্রামে এক মৎস্যজীবী বাস করিত। সে শ্রাবস্তীর পথে অচিরবতী নদীর তীরে কচ্ছপের ডিম্ব দেখিতে পাইয়াছিল। ধম্মপদট্ঠ-কথা হইতে আরও জানিতে পারা যায় যে, প্রসেনজিতের পুত্র কিরূপে অচিরবতী নদীতীরে যুদ্ধে শাক্যদিগকে সমূলে উৎখাত করেন। কিন্তু অচিরবতী নদীর জল স্ফীত হইয়া বিজয়ী সৈন্যদিগকে ভাসাইয়া সমুদ্রে লইয়া যায়। দীঘনিকায়ে লিখিত আছে, এক সময় তথাগত কোশলরাজ্যের অন্তর্গত মনসাকট গ্রামে গিয়াছিলেন। তথায় তিনি মনসাকটের উত্তরে প্রবাহিত অচিরবতী নদীর তীরে অম্ববনে বাস করিয়াছিলেন। মিলন্দপঞ্হোয় লিখিত আছে, হিমবন্ত হইতে পাচ শত নদী বাহির হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে দশটী প্রধান নদী। অচিরবর্তী এই দশটীর অন্যতমা।

অচিরস্য—(অব্য) অল্পকালে। অচিরাৎ। শীঘ্র।

অচিরা—(স্ত্রী) জৈনদিগের এক স্ত্রীদেবতা। আচারদিনকরে (প. ১৬১) যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"হস্তিনাপুরসংস্থায়ৈ দয়াময়পরাত্মনে।
প্রিয়ায়ৈ বিশ্বসেনস্য অচিরায়ৈ চিরং নমঃ॥
ওঁ নমঃ শ্রী অচিরায়ৈ শান্তিস্বামিজনন্যৈ।"

এই বিবরণ হইতে বুঝা যায়, তিনি হস্তিনাপুর-নিবাসিনী বিশ্বসেনের স্ত্রী ও শান্তিস্বামীর জননী। ইহা হইতে জৈনদিগের তীর্থঙ্কর শান্তিদেবের জননীর নাম অচিরা, ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে।

অচিরাংশু—(স্ত্রী) [অচিরাঃ ক্ষণস্থায়িনঃ অংশবো যস্যাঃ ; বহুব্রী] বিদ্যুৎ। [কর্ম্মধা] ২ ক্ষণস্থায়ী কিরণ।

অচিরাৎ, অচিরায়, অচিরেণ—(অব্য) অল্পকাল। ২ শীঘ্র।

অচিরাভা—(স্ত্রী) [অচিরা আভা যস্যাঃ ; বহুব্রী] বিদ্যুৎ।

অচিরে—(দেশজ) শীঘ্র।

অচিষ্ণু—(ত্রি) [অচ্ গতৌ-ইষ্ণুচ্] গমনশীল।

অচীন—ভারতমহাসাগরস্থ সুমাত্রা দ্বীপের উত্তরস্থ বিভাগ। ভূ-পরিমাণ ২০৫৪৪ বর্গমাইল। ইহা একটী ওলন্দাজ উপনিবেশ। ওলন্দাজেরা ইহাকে 'অৎজে' নামে অভিহিত করেন।

এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মনোরম। সুমাত্রা দ্বীপের অন্যান্য স্থানের ন্যায় ইহার মধ্য দিয়া একটী উচ্চ পর্ব্বতমালা বিরাজিত। উহার পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকের ক্রমনিম্ন অধিত্যকা সমুদ্রতীরে আসিয়া সমতলক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ঐ অধিত্যকার অববাহিকা ভেদ করিয়া উত্তরদিকে পেদির, গিঘেন ও সমলঙ্গ নদী ; পূর্ব্বে এদি, পের্লাক, লঙ্গসর ; পশ্চিমে ক্রুবা, রিগাস, মেলাবু নদী এবং প্রায় প্রত্যেক নদীর অববাহিকায় খণ্ড খণ্ড দেশীয় রাজ্য। ওলে-লে এবং কোটরাজ বা অচীন এখানকার প্রধান বন্দর। কোটরাজ পূর্ব্বে ক্রাতোন নামে অভিহিত হইত।

কোটরাজ সুমাত্রা দ্বীপের সর্ব্বোত্তর প্রান্তে অচীন নদীর অববাহিকাভূমে সমুদ্রোপকূল হইতে ৩ মাইল ভিতর দিকে অবস্থিত। উপকূলভাগ খুব নিম্ন এবং প্রায় ১২॥ মাইল বিস্তৃত। এজন্য এই নিম্নভূমিতে প্রচুর ধান্যের চাষ হয়। ওলে-লের সহিত কোটরাজ রেল লাইন দ্বারা সংযুক্ত, ইহাতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের বেশ সুবিধা হইয়াছে। নদীগর্ভেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পণ্যবাহী নৌকা দেখিতে পাওয়া যায়। উপকূলভাগে মৎস্য ধরিবার ও পণ্যবহনের জন্য বৃহৎ নৌকা আছে। এখানে সোণার কাজ, ইস্পাতের অস্ত্র, রেশমী-বস্ত্র ও চীনামাটির খেল্না প্রস্তুত হইয়া থাকে। অচীনবাসীদের প্রাচীন দুর্গগৃহে এখন ওলন্দাজদিগের সেনাবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অচীনবাসীরা মলয়-শাখাভুক্ত। ইহারা সুমাত্রার অন্যান্য

স্থানের মলয় জাতির ন্যায় সুশ্রী নহে, বরং অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকার। এখানকার ভদ্রবংশীয়েরা আপনাদিগকে আরব-বংশসম্ভূত বলিয়া স্বীকার করে, কিন্তু ইহাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায় যে, ইহারা এক সময়ে হিন্দু ছিল; পরে আরবজাতির সংমিশ্রণে মুসলমান হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের ভাষা ও সাহিত্য অন্যান্য মলয় জাতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ধর্ম্মতত্ত্ব ও আখ্যায়িকামূলক বংশানুচরিত কীর্ত্তনই ইহাদের সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ। ভাষায় প্রাচীন হিন্দুত্বের পরিচায়ক অনেক সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, অথচ বর্ত্তমানে ইহারা আরবী বর্ণমালায় লেখা পড়া করে। ইহারা সাহসী, যোদ্ধা ও বিশেষ কর্ম্মঠ। কৃষি, বস্ত্রবয়ন ও জাহাজনির্ম্মাণই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা।

মধ্যযুগে ইউরোপীয় ভ্রমণকারী মার্কো পোলো, ফ্রায়ার ওডোরিকো ও নিকোলো কণ্টি প্রভৃতি উত্তর সুমাত্রা পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ এবং ভারতীয় কোন কোন গ্রন্থকার এই স্থান লম্ব্রি রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ নৌসেনাপতি ত্রিস্তান্ দা কান্হার জনৈক পোতাধ্যক্ষ আল্‌ভারো তেলেজ এই জনস্থানকে 'অচীন' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; তখন ইহা পেদির রাজ্যের সুলতানের অধীন ছিল। ঐ সময় হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে অচীন স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে সমর্থ হয় এবং ক্রমে উত্তর সুমাত্রার অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্য ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পড়ে।

সুলতান ইস্কন্দর মুদার শাসনকালে (১৬০৭-১৬৩৬ খৃঃ) অচীন রাজশক্তিসম্পন্ন একটী ক্ষুদ্ররাজ্য বলিয়া সংগঠিত হয়। ঐ সময়ে অরু হইতে পশ্চিম উপকূলের বেঙ্কুলেন নগরী পর্য্যন্ত ১১০০ মাইল পরিমিত সুদীর্ঘ সমুদ্রকূল, নিয়াজ দ্বীপ ও মলয়রাজ্যের অন্তর্গত জোহর, পাহাঙ্গ, কেদা ও পেরাক প্রভৃতি স্থান ইস্কন্দরের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

এখানে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায় শুনিয়া পাশ্চাত্য বণিক্‌সম্প্রদায় অচীনে আসিয়া বাণিজ্য পরিচালনের চেষ্টা পায়। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ বণিক্‌গণ এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের পত্র লইয়া স্যর্ জেমস্ লাঙ্কাষ্টার অচীনে আগমন করেন। তদানীন্তন রাজা আলাউদ্দীন্ শাহ্ তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। অতঃপর ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে ইস্কন্দর মুদার সভায় রাজা ১ম জেমসের পত্র লইয়া পুনরায় একজন ইংরেজ বাণিজ্যদূত এখানে আগমন করেন; কিন্তু ইংরেজেরা তৎকালে কুঠী নির্ম্মাণ করিবার অধিকার পায় নাই। ১৬২১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বণিক্‌দল দেশবাসীর সহিত সদ্ভাবপ্রতিষ্ঠায় যত্নবান্ হইলেও বিশেষ কোন ফল হয় নাই।

অচীনের প্রথম স্বাধীন সুলতানের রাজ্যাধিকারকালে পর্ত্তুগীজগণ এখানে প্রভাব বিস্তারে চেষ্টা পায়, কিন্তু ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে মলাক্কাদ্বীপে পর্ত্তুগীজশক্তি খর্ব্ব হইলে এখানেও পর্ত্তুগীজদিগের প্রতিপত্তির হ্রাস হইয়া যায়। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে ইস্কন্দর মুদা মলাক্কা অধিকারকালে ৫০০ রণতরী ও ২৫০ ছিপ পর্ত্তুগীজদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, ঐরূপ নৌ-বাহিনী তৎকালে ইউরোপের কোন রাজারই ছিল না।

১৬৪১ খৃষ্টাব্দে ইস্কন্দরের বংশধরের মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার বিধবা পত্নীকে রাজতক্তে বসান হয়। ইহাতে সুযোগবাদী স্বার্থান্ধ সর্দ্দারেরা স্ত্রীশাসনের পক্ষপাতী হইয়া পর পর আরও তিনজনকে রাণীর পদে অভিষিক্ত করিয়া আপনাদের শক্তি ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা পান। অবশেষে ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় আরববংশীয়গণ এই নারীশাসনের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবার অভিপ্রায়ে আপনাদের মধ্য হইতে একজনকে সর্দ্দার মনোনীত করিয়া রাজতক্তে বসান। ইহার পরবর্ত্তী কিছুকাল অচীনের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে নাই।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে যবদ্বীপ ওলন্দাজদিগের হস্তে সমর্পিত হইলে নিকটবর্ত্তী দ্বীপবাসী ইংরেজ ঔপনিবেশিকগণ অচীনে প্রাধান্য রক্ষা করিতে চেষ্টিত হন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেণ্ট একটী সন্ধি দ্বারা অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিকে অচীনে স্থায়িভাবে বসবাস করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হলণ্ডের সহিত চুক্তি অনুসারে সুমাত্রার ইংরেজাধিকৃত স্থানগুলি ছাড়িয়া দিয়া এসিয়া মহাদেশের অন্য কএকটী ওলন্দাজ অধিকারের সহিত বিনিময় করিয়া লন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা অচীনের সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। উক্ত বর্ষের এপ্রিল মাসে ওলন্দাজ সেনা অচীন আক্রমণ করে, কিন্তু সেনাপতি কোহ্‌লার নিহত হওয়ায় এই উদ্যম ব্যর্থ হয়। পর বর্ষে জানুয়ারী মাসে নূতন উদ্যমে ওলন্দাজগণ পুনরায় অচীন আক্রমণ ও অধিকার করিলেও অতর্কিত আক্রমণ হইতে তাহারা আপনাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। অবশেষে ১৮৭৮-৮১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জেনারেল ভান দার হেডেন দেশবাসীদিগকে কিয়ৎপরিমাণে দমন করিতে সমর্থ হন। কিন্তু ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তাকু ওমরের অধীনে দেশীয়গণ পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ১৮৯৮

খৃষ্টাব্দে সেনাপতি ভান হুট্‌জ্‌ এই বিদ্রোহিদলকে শাসন করিতে অগ্রসর হন এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রধান প্রধান সর্দ্দারেরা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি নিজেকে সুলতান বলিয়া পরিচিত করিয়াছিল, সে গাজোয় পলাইয়া আত্মরক্ষা করে। তদবধি ১৯০৪ সাল পর্য্যন্ত পূর্ণ উদ্যমে ইহাকে ধরিবার চেষ্টা হয়; কিন্তু ওলন্দাজ সেনাদল কিছুতেই তাহাকে ধরিতে সমর্থ হয় নাই, বরং বিদ্রোহিদল ইহার পরেও বহুদিন যাবৎ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টকে উত্ত্যক্ত করিয়াছিল।

অচেককোল—তুর্কীস্থানের পর্ব্বতময় অধিত্যকায় অবস্থিত একটী হ্রদ।

অচেকতাঘ—তুর্কীস্থানের অন্তর্ভুক্ত একটী গিরিশ্রেণী। অচেককোল হ্রদের উত্তরদিকে অবস্থিত। রুষদেশীয় পর্য্যটকগণ ইহাকে মস্কো রেঞ্জ (Moscow Range) নামে অভিহিত করিয়াছেন।

অচেকদরিয়া—তুর্কীস্থানের অন্তর্গত গোবীমরুর পর্ব্বতীয় অধিত্যকায় প্রবাহিত একটী নদী।

অচেত—(দেশজ) সংস্কৃত 'অচেতাঃ' শব্দের অপভ্রংশ। ইহার অর্থ জ্ঞানশূন্য, বিবেকহীন। হিন্দী ভাষাতেও এই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

অচেতন—(ক্লী) [চিত-ল্যু; নঞ্‌-তৎ] জ্ঞানবিশিষ্ট ভিন্ন; অজ্ঞান। জ্ঞান দুই প্রকার—বিষয়াকার মনোবৃত্তিরূপ এবং তৎফলিত চৈতন্যরূপ। ইহার মধ্যে বৃত্তিরূপ যে জ্ঞান, তাহা চিত্তেরই ধর্ম্ম। কেন না, শ্রুতি বলিয়াছেন—কাম, সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী, বুদ্ধি, ভীতি, প্রভৃতি সমস্তই মন।

"কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা
ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব।" (শ্রুতি)

দ্বিতীয় জ্ঞান, যাহা চৈতন্যরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা আত্মধর্ম্ম। চৈতন্য সর্ব্বদা প্রকাশরূপে অবস্থিত হইলেও বৃত্তি-সহকারেই তিনি তদ্গত অজ্ঞাননিবারণে সমুজ্জ্বল হইয়া থাকেন। এই জন্যই বৈদান্তিকেরা একটী দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিয়াছেন—ঘটজ্ঞানে বুদ্ধিবৃত্তি এবং চিদাভাস উভয়ই যুগপৎ ঘটে পরিব্যাপ্ত হয়। বুদ্ধিতে তদ্গত অজ্ঞাননাশ এবং চিদাভাসে উহার স্ফুরণ হইয়া উঠে।

"বুদ্ধিবৃত্তিচিদাভাসৌ দ্বাবেতৌ ব্যাপ্নুতো ঘটম্।
তত্রাজ্ঞানং ধিয়া নশ্যেদাভাসাত্তু ঘটঃ স্ফুরেৎ॥" (বেদান্ত)

সাংখ্যমতে বিষয়োপরক্ত বৃত্তি চিতি প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাতেই বিষয়াবভাস হইয়া থাকে। সরোবরের তটস্থ-তরুগণ যেমন সরোবরসলিলে প্রতিবিম্বিত হয়, এই দৃশ্যমান সমস্ত বস্তুই তেমনি সেই চিদ্দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতেছে।

"তস্মিংশ্চিদ্দর্পণে স্ফারে সমস্তা বস্তুদৃষ্টয়ঃ।
ইমাস্তাঃ প্রতিবিম্বন্তি সরসীব তটদ্রুমাঃ॥" (সাংখ্য)

সাংখ্য ও বেদান্ত মতসিদ্ধ যে বৃত্তিরূপ জ্ঞান, তৎস্থানীয় আত্মচৈতন্যই নৈয়ায়িকগণের স্বীকৃত। তাদৃশ বৃত্তি ও তৎস্থানীয় জ্ঞানে আত্মমনঃসংযোগাদিই কারণ। আভ্যন্তর সুখাদি বিষয়গ্রহণে মন এবং স্ব স্ব গ্রাহ্য বিষয়গ্রহণে ইন্দ্রিয় সকলই কারণ।

গৌতম ও কপিল উভয়েই উক্ত রূপ স্ব স্ব বিষয়ে ইন্দ্রিয়সমূহেরই গ্রাহকতা উল্লেখ করিয়াছেন।

এইরূপে আভ্যন্তর সুখাদিতে যেমন মন, সেইরূপ বাহ্য শব্দাদিবিষয়ে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণই অসাধারণ কারণ। বিশেষ এই যে, মন এই সমুদয় বিষয়ে সাধারণ কারণ।

এই মতে বুঝা যায়, জ্ঞানকারণ ইন্দ্রিয় যাহাতে নাই, তাহাই অচেতন। ইন্দ্রিয়শূন্য বিষয়েই অচেতন শব্দের ব্যবহার। এই জন্যই চরক বলিয়াছেন, যে দ্রব্য ইন্দ্রিয়যুক্ত, তাহাই চেতন, আর যাহা ইন্দ্রিয়হীন, তাহাই অচেতন।

"সেন্দ্রিয়ং চেতনং দ্রব্যং নিরিন্দ্রিয়মচেতনম্।" (চরক)

সাধারণতঃ বৃক্ষাদিকে অচেতন বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা অচেতন নহে। তাহাদেরও অন্তঃকরণাদি আছে। কারণ স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী দুঃখভোগের জন্যই পাপের ফলে তাহারা স্থাবরত্ব পাইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, মহাপাতকজনিত দারুণ নরকভোগের পর মহাপাতকীরা কর্ম্মক্ষয়ে ইহসংসারে জন্ম লয়।

"মহাপাতকজান্ ঘোরান্ নরকান্ প্রাপ্য দারুণান্।
কর্ম্মক্ষয়াৎ প্রজায়ন্তে মহাপাতকিনস্ত্বিহ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া পরে বলিয়াছেন, "তৃণগুল্মলতাত্বঞ্চ ক্রমশো গুরুতল্পগঃ।" অর্থাৎ গুরুতল্পগামী ক্রমশঃ তৃণ গুল্ম ও লতা হয়।

তৎপরে বলিয়াছেন, "শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।" মানব কায়িক কর্ম্ম দোষেই সাধারণতঃ স্থাবর হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

পাপাবশেষ ভোগের জন্য চেতনেরই তৃণবৃক্ষাদিরূপে জন্ম প্রাপ্তির কথা যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন। সুতরাং দুঃখভোগের জন্যই যখন বৃক্ষাদিরূপত্ব প্রাপ্তি, তখন ইন্দ্রিয় অভাবে কিরূপে তাহারা দুঃখানুভব করিবে?

সুতরাং উক্ত ঋষিবাক্যে বুঝা যায়, বৃক্ষ তৃণ লতা প্রভৃতির ইন্দ্রিয়াদি অবশ্যই আছে এবং আছে বলিয়াই দেখা

যায়, পদ্ম সরোবরান্তরে গমন করে এবং তরুশাখা ছিন্ন হইলেও চেতনযোগেই পুনঃ প্ররূঢ় হয়।

শ্রুতিবাক্যেও দেখা যায়, "অথ জীবো যাং জহাতি সা শুষ্যতি।" এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা উহাদের জীবসম্বন্ধই প্রমাণিত হয়!

পদার্থাদর্শে চারি প্রকার দেহের উল্লেখ আছে। যথা—উদ্ভিজ্জ, উষ্মজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ।

"দেহশ্চতুর্ব্বিধো জ্ঞেয়ো জন্তোরুৎপত্তিভেদতঃ।

উদ্ভিজ্জ উষ্মজোঽণ্ডোথশ্চতুর্থস্তু জরায়ুজঃ।" (পদার্থাদর্শ)

এই বচন দ্বারা স্থাবরেরও দেহসম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনেও চেতন সম্বন্ধেই ভোগায়তন দেহের উৎপত্তি বলা হইয়াছে। তবে স্থাবর সম্বন্ধে বলা হয়, উহাদের সকল ইন্দ্রিয় নাই। কিন্তু ত্বাচ্ প্রত্যক্ষ এবং ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ আছে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কারণ, অনলাদির খরতর কিরণ স্পর্শে উহাদের শুষ্কতা এবং ওষধিবিশেষের ধূমাদি সম্পর্কে ঘ্রাণগ্রহণে উহাদের পুষ্পফলোদ্গম স্পষ্টই দেখা যায়। এই কারণে বৃক্ষাদিকে দ্বীন্দ্রিয় বা দুইটী ইন্দ্রিয়যুক্ত বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে।

"পঞ্চেন্দ্রিয়া মনুষ্যাদ্যাঃ সর্পাদ্যাশ্চতুরিন্দ্রিয়াঃ।

ত্রীন্দ্রিয়াঃ কৃমিকীটাদ্যা দ্বীন্দ্রিয়া বৃক্ষজাতয়ঃ॥" (পদার্থাদর্শ)

এখন কথা এই যে, বৃক্ষাদির কি মনুষ্যাদির ন্যায় বিশিষ্ট চেতনা আছে? না,—সেরূপ বিশিষ্ট চেতনা বৃক্ষাদির নাই; এই জন্যই সাধারণতঃ উহাদিগকে অচেতন বলা হয়।

বৃক্ষাদির মন থাকিলেও হৃদয়রূপ বিশিষ্ট চেতনাস্থানের অভাব আছে। এই জন্যই উহাদের স্পষ্ট অববোধ বা চেতনা নাই। সুশ্রুত হৃদয়কেই বিশিষ্ট চেতনাশ্রয় বলিয়াছেন। "তদ্ধৃদয়ং বিশিষ্টচেতনাশ্রয়ম্।" (সুশ্রুত)

সুতরাং বৃক্ষাদির বিশিষ্ট চেতনাশ্রয় হৃদয়স্থান নাই বলিয়াই উহাদের বিশিষ্ট চেতনাবত্তাও নাই। বিশেষত্ব এই যে, উহাদের সুখদুঃখানুভব হয় মাত্র। ইহারা যে সুখ-দুঃখ-যুত, একথা মনু ও মহাভারতকারও সমর্থন করিয়াছেন।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু বৃক্ষাদির চেতনত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিয়াছেন। বৃক্ষাদির যে ইন্দ্রিয় আছে ও তাহারা অনুভব করিতে পারে, তাহা তিনিও প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

আধুনিক দর্শনে ও বিজ্ঞানে অচেতন শব্দ যে যে অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা 'চেতনা' শব্দে আলোচিত হইয়াছে। [চেতনা, তরু, লতা, জ্ঞান শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্র°]

[চেতনা জ্ঞানং নঞ্; বহুব্রী] (ত্রি) ২ চেতনশূন্য।
"অচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং।" (সাংখ্যকা°)

৩ বিশেষ জ্ঞানশূন্য। "তন্তু দুঃখাভিসন্তপ্তং বিলপন্তমচেতনং।" (রামায়ণ, অযোধ্যা°)

অচেতনা—(স্ত্রী) সংজ্ঞাহীন অবস্থা অর্থাৎ কোনরূপ জ্ঞান না থাকিলে সেই অবস্থাকে তন্দ্রাদোষ, অচৈতন্য বা অচেতনা (Unconsciousness) বলা হয়। অচেতনার গুরুত্ব অনুসারে প্রধানতঃ উহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম, সম্পূর্ণ অচেতনা বা সংজ্ঞালোপ (Coma)। এ অবস্থায় রোগীর কোন রকমে জ্ঞান হয় না; রোগী গভীরভাবে সংজ্ঞা-হীন হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদে ইহাকে সান্নিপাতিক মূর্চ্ছা বলে। দ্বিতীয়, তন্দ্রালুতা (Stupor)—ইহাতে রোগী সম্পূর্ণভাবে জ্ঞানশূন্য হয় না এবং ডাকিয়া অথবা নাড়া দিয়া সাড়া পাওয়া যায়।

মস্তিষ্কের বহির্ভাগে যে ধূসরবর্ণের স্তর থাকে, তাহাতে বহু কোষ দৃষ্ট হয়। আমাদের দেহের ভিতর কোথায় কি হইতেছে এবং দেহের বাহিরে চারিপার্শ্বে কিরূপ অবস্থা আছে, তাহার যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকেই সংজ্ঞা বা চেতনাবস্থা বলা হয়। মস্তিষ্কের ঐ কোষগুলির জন্যই আমরা চেতনাবস্থা প্রাপ্ত হই। যদি কোন প্রকারে ঐ কোষগুলির কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে, তাহা হইলেই আমাদের সংজ্ঞার বা চেতনার অভাব দেখা যায়। কোষের ক্রিয়ার ব্যাঘাত যতই অধিকতর হয়, আমাদের ক্রমশঃ ততই সংজ্ঞার হানি, নিদ্রা-লুতা, গভীর নিদ্রা, তন্দ্রালুতা এবং সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীনতা ঘটিয়া থাকে।

নানাপ্রকার রোগে বিভিন্ন প্রকারের সংজ্ঞাহীনতা দৃষ্ট হয়। তবে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত রোগ বা অবস্থা হইতেছে সংজ্ঞাহীনতার মুখ্যকারণ। মাথায় কোনরূপ গুরুতর আঘাত পাইয়া মস্তিষ্ক কোনরূপে আলোড়িত বা আহত হইলে রোগীর সংজ্ঞালোপ হয়। স্ত্রীলোকের মূর্চ্ছারোগেও সংজ্ঞা থাকে না। অপস্মার বা মৃগীরোগেও (Epilepsy) সংজ্ঞা লোপ হয়। সন্ন্যাসরোগে (Apoplexy) মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র রক্তবাহী নালী ছিঁড়িয়া গিয়া মস্তিষ্কে রক্তস্রাব হওয়ায় রোগী সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। রক্তস্রাবের স্থানানুসারে পক্ষাঘাত (Hæmoplegia) প্রভৃতি অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়; মধুমেহ বা বহুমূত্র (Diabetes mellitus) এবং বৃক্ক বা মূত্রযন্ত্রের প্রদাহে (Nephritis) সংজ্ঞালোপ হইতে পারে; ইহা সাধারণতঃ শেষ অবস্থায় হইয়া থাকে বলিয়া প্রায়ই রোগীর প্রাণবিয়োগ ঘটে। অহিফেন সেবনজনিত বিষক্রিয়ায়

গভীরভাবে সংজ্ঞালোপ হইয়া থাকে। অধিকাংশ রোগে শেষ অবস্থায় অর্থাৎ মৃত্যুর প্রাক্কালে রোগী সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে।

সংজ্ঞাহীনতার কারণ ধরিয়া তাহার চিকিৎসা কর্ত্তব্য। অল্প সংজ্ঞাহীনতায় স্মেলিং সল্ট্ অথবা স্পিরিট আমন্ আরোমাট নাকের কাছে ধরিলে রোগী শীঘ্রই চেতনা লাভ করে। গোলমরিচ পোড়াইয়া তাহার ধোঁয়া নাকের কাছে ধরিলে স্ত্রীলোকের মূর্চ্ছা অনেক সময় ভাঙিয়া যায়। চোখে মুখে বরফ বা জলের ঝাপটা দিয়া বদ্ধ হস্তপদাদি খুলিয়া দিলেও উপকার দর্শে।

অচেতস্—(ত্রি) [চিত-অসুন্; নঞ্-তৎ] চেতনাশূন্য, অচেতন (ঘটাদি)। ২ তত্তদ্ বিষয়জ্ঞান রহিত। [নাস্তি চেতঃ জ্ঞানমস্য; বহুব্রী] (ত্রি) ৩ চিত্তরহিত।

অচেতান—(ত্রি) [চিত-শানচ্, ন 'মুক্' বেদে; নঞ্-তৎ] চেতনাশূন্য। ২ অবিদ্বান্। (ঋক্ ৭.৪.৭)

অচেনকৈল, —ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের একটী নদী (কন্নকদেব)। অচেনকৈল গিরিপথের পাদদেশ হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রায় ৭০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া পাম্বেয়ার নদীতে মিলিত হইয়াছে। অক্ষা° ৯°৫′ হইতে ৯°৩১′৩০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°২৫′১৫″ হইতে ৭৭°১৪′৩০″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

অচেনকৈল$_২$—ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের চেঙ্গানুর তালুকের একটী গিরিপথ। অক্ষা° ৯°৫′৪৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°১৬′ পূঃ। উহা তিন্নেবেল্লী জেলা ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। বৃটিশরাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসীরা এই পথটীকে 'সেনকোতাই' বলে। অরিয়নকাৰু অপেক্ষা অচেনকৈল পথ দুর্গম হওয়ায় ইহাতে বেশী লোকচলাচল হয় না। -

অচেনকৈল$_৩$—ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের চেঙ্গানুর তালুকের একটী গ্রাম। অক্ষা° ৯°৫′৪৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°১৬′ পূঃ।

অচেনকৈল$_৪$—ত্রিবাঙ্কুরের চেঙ্গানুর তালুকের অরণ্যময় পর্ব্বতীয় প্রদেশে অবস্থিত একটী প্রসিদ্ধ মন্দির। এখানে একটী শিবলিঙ্গ রহিয়াছে।

অচেনা—(দেশজ) চেনা নহে, অপরিচিত। ইহা অচিহ্নিত শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। ২ অপরিচিত ব্যক্তি।

অচের—বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত একটী বন্দর। অক্ষা° ১৬°১৩′৩৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°২৯′৫০″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

অচেল—(ত্রি) বস্ত্রহীন, উলঙ্গ।

অচেষ্ট—(ত্রি) [নাস্তি চেষ্টা যস্য; বহুব্রী] চেষ্টারহিত, নিশ্চেষ্ট।

অচেষ্টতা—(স্ত্রী) [অচেষ্ট-তাচ্] চেষ্টাহীনতা, নিশ্চেষ্টতা, চেষ্টারাহিত্য। অচেষ্টতা বুঝিতে হইলে অগ্রে জানিতে হইবে চেষ্টা কি? যত্নসাধ্য ক্রিয়াজনক যে ব্যাপার, তাহাই চেষ্টা। কারণ আত্মজন্য ইচ্ছা, ইচ্ছা হইতে কৃতি, কৃতিজন্য চেষ্টা, চেষ্টা হইতেই ক্রিয়ার উৎপত্তি।

"আত্মজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা ভবেৎ কৃতিঃ।
কৃতিজন্যা ভবেচ্চেষ্টা চেষ্টাজন্যা ভবেৎ ক্রিয়া॥" (ব্যা° কারি°)

দেখা যায়, যে দেহে আত্মার প্রযত্ন আছে, সেই দেহাবচ্ছেদেই চেষ্টা হয়। অন্যত্র উহা হয় না। সুতরাং চেতনাধিষ্ঠিত দেহেরই কর্ম্মবিশেষ চেষ্টা। চেতনা যেখানে নাই, চেষ্টা তথায় থাকে না। এই চেষ্টাকে উদ্যমস্বরূপ বলা হয়।

মন এবং বায়ু ভিন্ন দ্রব্যের স্বতঃক্রিয়া সম্ভাবনা নাই। তবে যদি গুরু দ্রব্যাদির আঘাত বা প্রেরণাদি ঘটে, সেই কালেই উহাদের ক্রিয়া হইয়া থাকে; অন্যথা নহে। হস্তাদির চালন দর্শনেই তাহার কারণীভূত প্রেরণাদির অনুমান করা যায়। ঐরূপ প্রেরণ করার কর্ত্তা একমাত্র আত্মা, অন্য কাহারও কর্তৃত্ব উহাতে উপলব্ধি হয় না। সুতরাং চেতনাধিষ্ঠিত দেহের কর্ম্মবিশেষ যাহাতে নাই, তাহাকেই নিশ্চেষ্ট বলা যায়; এই নিশ্চেষ্টের অবস্থাই অচেষ্টতা।

অচৈকস্, (Achaicus)—বাইবেল গ্রন্থোক্ত একজন ধর্ম্মাত্মা। সম্ভবতঃ ফর্চুনেটাসের অনুচর। মহাত্মা পল ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

অচৈকস্$_২$—গ্রীক্‌দেশীয় একজন দার্শনিক। ইনি অস্পাসিয়াস্ ও অড্রাষ্টাসের পরবর্ত্তী। ইনি হার্মিনাস্ ও সোসিগেনিসের সহযোগে আরিষ্টটল্ প্রভৃতি দার্শনিকদিগের রচিত দার্শনিক-সূত্রের ব্যাখ্যা রচনা করেন।

অচৈতন্য—(ত্রি) [নাস্তি চৈতন্যং চেতনা যস্য; বহুব্রী] চৈতন্যশূন্য, চেতনাহীন, জ্ঞানশূন্য। [নঞ্-তৎ] (ক্লী) ২ চৈতন্য ভিন্ন, অজ্ঞান। চৈতন্যচন্দ্রামৃতে কবি সমস্ত বিশ্বকেই অচৈতন্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। "অচৈতন্যমিদং বিশ্বং দৈবং চৈতন্যমেব যৎ।" (চৈতন্যচন্দ্রামৃত)

অচোদস্—(ত্রি) অনন্য-প্রেরিত। (ঋক্ ৯.৭৯.১)

অচোট—(দেশজ) যাহাতে চোট লাগে নাই, যাহাতে অস্ত্রাঘাত করা হয় নাই। 'অচোট ভূমি'—অর্থাৎ যে ভূমিতে কখন কর্ষণ করা হয় নাই। সচরাচর এই শব্দকে 'আচোট' বলা হয়। যথা—'মিছে আচোট ভুঁয়ে বীজ ছড়ায়ে কাল গোঁয়ালে ফলের আশে।'

অচোল—বোম্বাইয়ের থানা জেলার একটী স্থান। এখানে পর্ত্তুগীজদিগের নির্ম্মিত একটী দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে।

অচোল মণিপুর হইতে দেড় মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই স্থানের এক মাইল উত্তরে কৃষ্ণপ্রস্তর ও অভ্রের পাহাড় বর্ত্তমান। এখানে প্রায় ৩০০ ফুট উচ্চ একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত বাঁধের ভগ্নাবশেষ এবং অনেকগুলি ষড়্‌ফলক প্রস্তর-স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়।

অচোলী—নিগ্রোজাতির একটী শাখা। মধ্য-আফ্রিকার আলবার্ট-নিয়াঞ্জা হ্রদের এক শত মাইল উত্তরে বহর্‌এল্‌-জেবেল নদীতীরে ইহাদের বাস। নীল নদের উৎপত্তি স্থানের অধিত্যকাবাসী শিল্লুক জাতির সহিত ইহাদের অনেকটা মিল আছে। ইহারা মুখমণ্ডলে উল্কি পরিয়া থাকে। শীকারে অচোলীরা বিশেষ পটু। ইহারা ছাগ, ভেড়া, গরু প্রভৃতি গৃহপালিত পশু পুষিতে জানে। পার্শ্ববর্ত্তী দেশীয়গণের সহিত ইহারা প্রায়ই যুদ্ধ বাঁধায়। প্রাচীন ভ্রমণকারীদের গ্রন্থে অচোলীরা 'শূলি' নামে বর্ণিত হইয়াছে।

ইহাদের কথিত ভাষা অলূর, লাঙ্গো ও জা-লুও প্রভৃতি জাতির অনুরূপ। ভূতপূজা ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

অচ্চুবারু—উড়িষ্যাদেশীয় একটী জাতি। উড়িষ্যায় বাস করিলেও ইহারা উড়িয়া নয়। ইহারা দিবাঙ্গ তন্তুবায়-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। অচ্চুপানি হইতেই ইহাদের নামকরণ হইয়াছে। 'অচ্চুপানি' শব্দের অর্থ—তাঁতের ঝাঁপে সুতা চড়ানো।

অচোরী—কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। শ্রীনগর হইতে ৩৮ মাইল উত্তরে। অক্ষা° ৩৪°৩৬′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৫৬′ পূঃ। গোলাবসিংহ এইস্থান অধিকার করেন।

অচ্ছ,—(ত্রি) [ন ছ্যতি দৃষ্টিম্ ছো-ক। এখানে নঞের ন স্থানে অ এবং হ্রস্ব স্বরের পর ছ রহিয়াছে, এজন্য চ্ছ হইয়াছে। ছে চ। পা ৬.১.৭৩। ছকার পরে থাকিলে হ্রস্ব স্বরের পর তুগাগম হয়। অ+ছ=অৎ+ছ (তুক্ অর্থাৎ তকারের আগম হইল) অচ্ছঃ, ত্‌ স্থানে চ] স্বচ্ছ, নির্ম্মল। "স্বচ্ছন্দোচ্ছলদচ্ছকচ্ছকুহরে।" (কাব্যপ্রকাশ) (পুং) ২ স্ফটিক। ৩ ভল্লুক। কাহারও মতে 'অচ্ছভল্লুক' একই নাম। [বৈদ্যক] ৪ গুন্দ্র।

অচ্ছ₂—(অব্য) [ন চ্ছ্যতি দৃষ্টিম্ ছো-ক] অভিমুখ, আভিমুখ্য। (ঋক্ ৯.৯১.২)

অচ্ছটাশব্দ—তুড়ী দেওয়ার বা অঙ্গুল মট্‌কাইবার জন্য শব্দ। (দিব্যাবদান)

অচ্ছত্র—(ত্রি) [নাস্তি ছত্রং রাজশাসনং যত্র] যে স্থলে রাজচ্ছত্র নাই, অরাজক (দেশ)।

অচ্ছদ্মন্—(ত্রি) ছদ্মবেশশূন্য, অনাচ্ছাদিত। ২ ছলশূন্য, অকপট।

অচ্ছন্দস্—(ত্রি) [নাস্তি ছন্দঃ বেদো যস্য] বেদাধ্যয়নশূন্য। অনুপনীত বালক। ২ সর্ব্বপ্রকার বেদাধ্যয়নবর্জ্জিত শূদ্রাদি। [নাস্তি ছন্দঃ পরিমিতমাত্রাক্ষরাদিবাক্যানি যত্র] ৩ ছন্দোহীন গদ্যাত্মক চূর্ণক বা শব্দসমষ্টি। [বহুব্রী] (ত্রি) ৪ অভিপ্রায়শূন্য।

অচ্ছন্দস্ক—(ত্রি) [অচ্ছন্দস্ বা কপ্‌] [অচ্ছন্দস্ দ্র°]

অচ্ছভল্ল, অচ্ছভল্লুক, অচ্ছোভল্ল—(পুং) [অচ্ছম্ আভিমুখ্যেন ভল্লতি হন্তি। অচ্ছ-ভল্ল-অচ্‌] ভল্লুক, ভালুক।

অচ্ছরিয়ভূতধম্মসুত্ত—মজ্‌ঝিম্‌নিকায়ের অন্তর্গত সুত্রবিশেষ। ইহাতে আনন্দ সত্যান্বেষীর আনন্দ ও বিস্ময়ের পরিচয় সুন্দর-ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

অচ্ছর্দ্দিকা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] বান্তি। (রাজনি°)

অচ্ছল—(ত্রি) তুলনা রহিত, সরল। ২ সাধু। (পুং) [বৈদ্যক] ৩ তিলকল্ক।

অচ্ছা,—(স্ত্রী) [অঃ বিষ্ণুচ্ছায়তে অচ্ছাস্যতে অনয়াচ্ছ্যতি ছো-অঙ্‌; ৬-তৎ] বিষ্ণুর আচ্ছাদন নির্ম্মলা। (মুগ্ধবোধ)

অচ্ছা₂—(অব্য) অভিমুখ। (ঋক্ ৯.৯২.২)

অচ্ছা₃—(হিন্দী) উত্তম, ভাল। যথা—'বহুৎ অচ্ছা'। ২ সম্মতিসূচক। বাঙ্গালায় ইহা 'আচ্ছা' বলিয়া প্রযুক্ত হয়। যথা—'তুমি এই কর্ম্ম কর'। উত্তর—'আচ্ছা'।

অচ্ছাকৈরুক সা—তুর্কীস্থানের চিলের নাম (Milvus melanotis)।

অচ্ছায়—(ত্রি) ছায়াবর্জ্জিত, তমোরহিত। (ঋক্ ১০.২৭.১৪)

অচ্ছারাজসিংহ—বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত বেরী তালুকের জায়গীর-দারগণের পূর্ব্বপুরুষ। ইঁহার পিতার নাম দেওয়ান মহম রায়। গোয়ালিয়র রাজ্যে তাঁহার বাস ছিল। দেওয়ান অচ্ছারাজসিংহ অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে জলৌন্ জেলার অন্তর্গত সন্দী নামক স্থানে গিয়া বাস করেন। এখানে রাজা জগৎরাজের কন্যাকে বিবাহ করিয়া বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা আয়ের একটী জায়গীর প্রাপ্ত হন। ইঁহার পৌত্র যুগল-প্রসাদ ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সরকারের নিকট হইতে বেরী লাভ করেন।

অচ্ছাবক—(পুং) একজন মহর্ষি। সায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মা যে যজ্ঞ করেন, তাহাতে ইনি ঋত্বিক্‌দিগের অন্যতম ছিলেন। (পদ্মপু°, সৃষ্টি°)

অচ্ছাবাক—(পুং) [অচ্ছং নির্ম্মলং বক্তীতি, অচ্ছ-বচ্‌-ঘঞ্‌] সোমযাগে হোতার সহকারী ঋত্বিক্। "প্রশাস্তা ব্রাহ্মণাচ্ছংস্য-চ্ছাবাক ইতি শস্ত্রিণো হোত্রকাঃ।" (আশ্বলায়নশ্রৌত° ৫.১০) আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রে ইহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। [সোমযাগ দ্র°]

অচ্ছাবাকপ্রয়োগ—(পুং) একখানি গ্রন্থ। যাজ্ঞিক রঘুনাথ 'অচ্ছাবাকপ্রয়োগ' রচনা করেন। এই গ্রন্থে আপস্তম্ব, আশ্বলায়ন ও শাঙ্খায়ন মতানুসারে অচ্ছাবাকের কার্য্যপ্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

অচ্ছাবাকসামন্—(ক্লী) [অচ্ছাবাকেন গেয়ং সাম] সোম-যাগে হোতার সহকারী ঋত্বিক্ কর্ত্তৃক গেয় সামভেদ। ইহার অপর একটী নাম উদ্বংশীয়। (তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ)

অচ্ছাবাকীয়—(ক্লী) [অচ্ছাবাকস্থ ঋত্বিগ্‌ভেদস্থ কর্ম্ম ভাবো বা] অচ্ছাবাক ঋত্বিকের কর্ম্মাদি। (ঐতরেয়ব্রা° ২.৩৭) [অচ্ছাবাকশব্দোঽস্ত্যত্র অচ্ছাবাক-ছ] ২ অচ্ছাবাক শব্দযুক্ত সূক্তভেদ। (ঋক্ ৫.২৫.১-৩)

অচ্ছাবাক্যা—(স্ত্রী) [অচ্ছাবাকস্যেয়ং অচ্ছাবাক-যৎ] অচ্ছাবাক ঋত্বিক্‌পাঠ্য ঋক্। "এষা হোত্রা যদচ্ছাবাক্যা।" (তাণ্ড্য°ব্রা°) ২ ভাষ্যমতে হোতৃনির্দ্দিষ্ট অচ্ছাবাকের ক্রিয়া।

অচ্ছিদ্যমান—(ত্রি) অবিচ্ছিন্ন। (ঋক্ ২.৩২.৪)

অচ্ছিদ্র—(ত্রি) [নাস্তি ছিদ্রম্ স্খলনং অঙ্গহীনতা রন্ধ্রং বা যত্র ; বহুব্রী] প্রমাদ, ত্রুটি বা দোষশূন্য, অঙ্গহীনতারহিত। "অচ্ছিদ্রেণ বিচেতব্যা দেশাঃ সগিরিকন্দরাঃ।" (রামায়ণ) ২ রন্ধ্রশূন্য। ৩ ভ্রান্তিরহিত। ৪ শ্রাদ্ধযাগাদি ক্রিয়ার পর উচ্চার্য্য বাক্য। "যজ্ঞচ্ছিদ্রং তপশ্ছিদ্রং যচ্ছিদ্রং পূজনে মম অচ্ছিদ্রমস্তু তৎসর্ব্বম্।" অর্থাৎ পূজাদি ক্রিয়ায় যদি কিছু ত্রুটি হইয়া থাকে, সে দোষ যেন দূরীভূত হয়।

অচ্ছিদ্রকাণ্ড—(ক্লী) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের অন্তর্গত এক প্রপাঠকের নাম।

অচ্ছিদ্রতা—(স্ত্রী) সর্ব্বতোভাবে বৈধতা, নির্দ্দোষতা।

অচ্ছিদ্রাবধারণ—(ক্লী) [অচ্ছিদ্র-অব-ধৃ-নিচ্-ল্যুট্। যাগাদি-ক্রিয়াসম্পন্নতয়া 'অচ্ছিদ্রমস্তু' ইত্যবধারণবাক্যম্] যাগাদির অচ্ছিদ্রাবধারণ বাক্য ; দোষরহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের নিশ্চয়। অনুষ্ঠিত কর্ম্মমাত্রেরই অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হয়।

"অচ্ছিদ্রমিতি যদ্বাক্যং বদন্তি ক্ষিতিদেবতাঃ।
প্রণম্য শিরসা গ্রাহ্যমগ্নিষ্টোমফলৈঃ সমম্॥"
(শাতাতপ ও পরাশরস°)

বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—
"ততঃ শান্তিং প্রকুর্ব্বীত অবধারণবাচনং।" (বশিষ্ঠস°)
অচ্ছিদ্রাবধারণের বাক্য এইরূপ—
"অদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ মৎকৃতৈতদ-মুককর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।"

অচ্ছিদ্রোতি—(পুং) [অচ্ছিদ্র+উতি] সর্ব্বতোভাবে রক্ষা-কারী, অবিচ্ছিন্নরক্ষণ (অগ্নি)। (ঋক্ ১.১৪৫.৩)

অচ্ছিদ্রোধ্নী—(স্ত্রী) [অচ্ছিদ্রমূধঃ আপীনমস্যাঃ] যে গাভীর পালানে কোন দোষ নাই। (ঋক্ ১০.১৩৩.৭)

অচ্ছিন্ন—(ত্রি) [ন ছিদ-কর্ম্মণি ক্ত ; নঞ্-তৎ] ছেদন-রহিত, অকর্ত্তিত। গর্গ বলিয়াছেন—পুত্রের জন্ম-সংবাদ শুনিয়া পিতা বেদোক্ত ক্রিয়া সমাধানান্তে সুবর্ণ ও ফল দান-পূর্ব্বক নাড়ী অচ্ছিন্ন থাকিতেই পুত্রদর্শন করিবেন।

"শ্রুত্বা পুত্রস্য বৈ জন্ম কৃত্বা বেদোদিতাঃ ক্রিয়াঃ।
অচ্ছিন্ননালং পশ্যেত্তং দত্ত্বা রুক্মং ফলান্বিতং॥"
(শুদ্ধিতত্ত্বধৃত গর্গসংহিতা)

২ সন্তত, অবিরত, ছেদরহিত। আভ্যুদয়িকাদি কর্ম্মে অচ্ছিন্ন ঘৃতধারায় বসুধারা দিতে হয়।

"বসুধারাং প্রকুর্ব্বীত অচ্ছিন্নঘৃতধারয়া।" (পুরাণ)

অচ্ছিন্নপত্র—(পুং) [ন ছিন্নানি সন্ততানি পত্রাণি যস্য ; বহুব্রী] [বৈদ্যক] শাখোটবৃক্ষ। চলিত শেওড়া গাছ। [শাখোট দ্র°] ২ সতত পত্রযুক্ত বৃক্ষ, অচ্ছিন্নপত্র বৃক্ষমাত্র। (ক্লী) [কর্ম্মধা] ৩ যে পত্র ছিন্ন নহে।

অচ্ছিন্নপর্ণ—(ত্রি) [অচ্ছিন্নপত্র দ্র°]

অচ্ছিন্নসংশয়—(ত্রি) [অচ্ছিন্নঃ সংশয়ো যস্য ; বহুব্রী] ফল, উপায় ও ইতিকর্ত্তব্যতাবিষয়ে নিশ্চয়শূন্য। শঙ্খসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—শ্রদ্ধাহীন, পাপাত্মা, নাস্তিক, অচ্ছিন্নসংশয় ও হেতুনিষ্ঠ বা হেতুবাদী এই পাঁচ শ্রেণীর লোক তীর্থফল পাইবার অনধিকারী।

"অশ্রদ্দধানঃ পাপাত্মা নাস্তিকোঽচ্ছিন্নসংশয়ঃ।
হেতুনিষ্ঠশ্চ পঞ্চৈতে ন তীর্থফলভাগিনঃ॥"
(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃত শঙ্খসংহিতা)

অচ্ছুক—(পুং) [বৈদ্যক] তন্নামক রঞ্জনপুষ্পবৃক্ষ ; চলিত আচ ফুলের গাছ। ২ তিনিশ বৃক্ষ।

অচ্ছুর অনন্য—এক প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি। ইনি ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শান্তরসই ইঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য।

অচ্ছুপ্তা—জৈনদিগের এক স্ত্রীদেবতা। মণ্ডলে ইঁহার স্থান উত্তরদিকে। হেমচন্দ্র তাঁহার 'অভিধানচিন্তামণি'তে (২.৯৩) ইঁহাকে ষোড়শ বিদ্যাদেবীর অন্যতমা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। দিগম্বরসম্প্রদায়ের মতে, ইঁহার অপর নাম অনন্তবতী। আচারদিনকর (প. ৬৩) ও নির্ব্বাণকলিকায় (প. ৩৮) এই দেবীর বিবরণ পাওয়া যায়। শেষোক্ত পুস্তকের বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

"তথা অচ্ছুপ্তাং তড়িদ্বর্ণাং তুরগবাহনাং চতুর্ভুজাং খড়্গবাণযুত-দক্ষিণকরাং খেটকাহিযুতবামকরাং চেতি।"

অচ্ছুপ্তার বর্ণ বিদ্যুতের ন্যায়; তিনি চতুর্ভুজা, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে খড়্গ ও বাণ এবং বামহস্তদ্বয়ে খেটক ও সর্প ধারণ করেন। এই দেবী তুরগবাহনা।

আচারদিনকরের বিবরণ হইতে বুঝা যায়, অচ্ছুপ্তার অপর একটী রূপ দ্বিভুজ এবং এই মূর্ত্তিতে তিনি সব্যহস্তে শরাসন এবং অপরহস্তে খড়্গ ধারণ করিয়া থাকেন।

অচ্ছেত—(ত্রি) [অচ্ছ-ইত] প্রত্যুদ্গত। (শুক্লযজু° ৮.৫৪)

অচ্ছেদিক—(ত্রি) [ছেদং নার্হতীতি অচ্ছেদ-ঠন্] ছেদনের অযোগ্য।

অচ্ছেদ্য—(ত্রি) [ন ছেত্তুমর্হতীতি ছিদ্ অর্হার্থে কর্ম্মণি যৎ; নঞ্-তৎ] ছেদনানর্হ, ছেদনের অযোগ্য। (পুং) ২ আত্মা। "অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়ম্" (গীতা)

অচ্ছোক্তি—(ত্রি) [অচ্ছা উক্তির্যেষাং; বহুব্রী] নির্ম্মল উক্তিযুক্ত (বেদ)। (ঋক্ ১.১৮৪.২)

অচ্ছোটন—(ক্লী) মৃগয়া। (হেম)

অচ্ছোদ—(ক্লী) [অচ্ছং নির্ম্মলং উদকং; কর্ম্মধা] স্বচ্ছ জল। [অচ্ছং উদকং যস্য; বহুব্রী] (ত্রি) ২ হিমালয়ের একটী স্বচ্ছজলপূর্ণ সরোবর। [অচ্ছোদসরোবর দ্র°]

অচ্ছোদসরোবর—(ক্লী) [অচ্ছম্ নির্ম্মলং উদকং জলং যস্য। উদকস্যোদঃ সংজ্ঞায়াম্। পা ৬.৩.৫৭] কাশ্মীরের একটী হ্রদের নাম। বাণভট্টের 'কাদম্বরী' ও বিহ্লনের 'বিক্রমদেবচরিতে' ইহার উল্লেখ আছে। ইহা মার্ত্তণ্ড হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। বৃহন্নারদীয়পুরাণে (১ম অ°) লিখিত আছে, এই হ্রদের তীরে 'সিদ্ধাশ্রম' বিরাজিত। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণমতে (৪৭.৫) কৈলাস পর্ব্বতের পূর্ব্বোত্তরস্থ চন্দ্রপ্রভগিরির পাদদেশে এই সুবৃহৎ স্বর্গীয় সরোবর বিরাজিত এবং এই সরোবর হইতে অচ্ছোদা নাম্নী এক দিব্য নদী প্রবাহিত হইতেছে।

অচ্ছোদা—(স্ত্রী) একটী পৌরাণিক নদী। অচ্ছোদসরোবর হইতে এই নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। [অচ্ছোদসরোবর দ্র°] ইনি 'অগ্নিষ্বাত্তাদি' পিতৃগণের মানসী কন্যা। "এতেষাং (অগ্নিষ্বাত্তানাং) মানসী কন্যা অচ্ছোদা নাম নিম্নগা।" (হরিবংশ)। ইনি কখনও পিতৃগণকে স্বচক্ষে দেখেন নাই। একদা ইনি আয়ুর পুত্র মহাযশা অমাবসুকে অদ্রিকা নাম্নী অপ্সরার সহিত অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করিতে দেখেন এবং পিতা মনে করিয়া তাঁহাকে পিতৃসম্বোধন করেন। এই পাপের ফলে ইনি স্বর্গভ্রষ্ট হন। সৌভাগ্যবশতঃ অৰ্দ্ধপথে ইনি আপন পিতৃগণকে ত্রসরেণু-পরিমাণ তিনখানি রথে অবস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহাদের নিকট আপনার দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করেন। কন্যাকে স্বর্গভ্রষ্ট হইতে দেখিয়া তাঁহারা বলিলেন, 'বৎসে! ঐ স্থানে অবস্থান কর।' তখন অচ্ছোদা কাতরস্বরে পিতৃগণকে স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারা বলিলেন, 'তুমি অপর একজনকে পিতৃসম্বোধন করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছ, তাহার ফলভোগ তোমাকে অবশ্যই করিতে হইবে। ঐ অমাবসুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া অতি নীচ যোনি প্রাপ্ত হইবে। যখন তোমার গর্ভে বেদবিভাগকর্ত্তা ব্যাসদেব, ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ জন্মগ্রহণ করিবেন, সেই সময় তুমি শাপমুক্ত হইয়া পুনরায় স্বর্গধামে আগমন করিবে!' [অমাবসু, সত্যবতী, পরাশর, বেদব্যাস দ্র°]

অচ্ছোদ্য—(অব্য) [অচ্ছ-বদতীতি, অচ্ছ-বদ-ক্যপ্] অভিমুখে কহিয়া।

অচ্যুৎ—(পুং) ইনি বিভিন্দুকীয়গণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সত্রের প্রতিহর্ত্তা ছিলেন। (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ৩.২৩৩)

অচ্যুত—(পুং) [ন চ্যুতঃ ন চ্যবতে ন চ্যবিষ্যতে বা স্বরূপসামর্থ্যাৎ। চ্যু-কর্ত্তরি ক্ত কালসামান্যে। নঞ্-তৎ] যাঁহার কখন ক্ষয় হয় নাই, হইতেছে না, কোন কালেও হইবে না,—অর্থাৎ সনাতন ব্রহ্ম। পরমেশ্বর। "যস্মান্ন চ্যুতপূর্ব্বোঽহমচ্যুতস্তেন কর্ম্মণা।" (গীতা) 'তেন চ্যুত্যভাবরূপপ্রবৃত্তিনিমিত্তেন।' (আনন্দগিরি)

২ পরমেশ্বরের অবতারভেদ, বাসুদেব।

৩ নারায়ণ, বিষ্ণু। "গরুড়মূর্ত্তিরিবাচ্যুতস্থিতিরমণীয়া।" (কাদম্বরী) "অচ্যুতস্য বিষ্ণোঃ স্থিতিঃ" (ব্যাখ্যা)

বিষ্ণুর অসংখ্য এবং বিভিন্ন প্রকারের মূর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে অচ্যুতমূর্ত্তি অন্যতম। বিষ্ণুর চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এইগুলি ভুজবিশেষে অদলবদল হইলে তাহা হইতে সর্ব্বসমেত ২৪টী মূর্ত্তি পাওয়া যায়, এবং প্রত্যেকটীর বিভিন্ন নাম হইয়া থাকে। অচ্যুতের প্রথম হস্তে চক্র, দ্বিতীয় হস্তে শঙ্খ, তৃতীয় হস্তে গদা এবং চতুর্থ হস্তে পদ্ম থাকে বলিয়া ইনিও উক্ত ২৪ মূর্ত্তির ভিতর একটী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।

অনেকস্থানে অচ্যুতের ধ্যান পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে ক্রমদীপিকা (প. ১৬৯), তন্ত্রসার, নারদপঞ্চরাত্র (প. ২২৯ প্রাণতোষিণী (প. ৩০২), বৃহদ্ব্রহ্মসংহিতা (প. ১১৩), শারদাতিলক (প. ৩৩৮), শ্রীতত্ত্বনিধি (প. ৫২), ইত্যাদি পুস্তকই প্রধান। এই সকল পুস্তক হইতে প্রাপ্ত বিবরণ হইতে অচ্যুতের পূর্ব্বোক্ত রূপ ভিন্নও অপরাপর রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্ত্রসারমতে অচ্যুতের ধ্যান এইরূপ—

"উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশ-মণিসিংহাসনাম্বুজে
সমাসীনোঽচ্যুতো ধ্যেয়ো দ্রুতহাটকসন্নিভঃ
সমানোদিতচন্দ্রার্ক-তড়িৎকোটিসমদ্যুতিঃ
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ সৌম্যঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ ॥
পীতবাসাশ্চক্রশঙ্খগদাপদ্মোল্লসদ্ভুজঃ।
অনারতোচ্ছলদ্রত্নধারৌঘকলসং স্পৃশন্ ॥
বামপাদাম্বুজাগ্রেণ মুঞ্চতা পল্লবচ্ছবিম্।
রুক্মিণীসত্যভামেঽস্য মূর্দ্ধ্নি রত্নৌঘধারয়া ॥
সিঞ্চন্ত্যৌ দক্ষবামস্থে স্বদোঃস্থকলশোত্থয়া।
নাগ্নজিতী সুনন্দা চ দিশন্ত্যৌ কলশৌ তয়োঃ ॥
তাভ্যাং চ দক্ষবামস্থে মিত্রবিন্দা সুলক্ষণে।
রত্ননদ্যোঃ সমুদ্ধৃত্য রত্নপূর্ণৌ ঘটৌ তয়োঃ ॥
জাম্ববতী সুশীলা চ দিশন্ত্যৌ দক্ষবামকে।
বহিঃ ষোড়শসাহস্রসংখ্যাতাঃ পরিতঃ প্রিয়াঃ ॥
ধ্যেয়াঃ কনকরত্নৌঘধারাযুক্ কলশোজ্জ্বলাঃ ॥"

(তন্ত্রসার, প. ১০৪)

উপরিউক্ত ধ্যান হইতে বুঝা যায়, দেবতা অচ্যুত সিংহাসনে পদ্মের উপর সমাসীন, তাঁহার অঙ্গের বর্ণ গলিত সুবর্ণের ন্যায় এবং সমগ্র মূর্ত্তি পূর্ণচন্দ্র, সূর্য্য ও কোটি কোটি বিদ্যুতের ন্যায় উদ্ভাসিত। তিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সৌম্যমূর্ত্তি, এবং সকল প্রকার আভরণে ভূষিত। তাঁহার পরিধানে পীতবস্ত্র এবং তাঁহার চারিটী হস্তে যথাক্রমে চক্র, শঙ্খ, গদা ও পদ্ম শোভিত। তাঁহার বাম পদের নীচে অনবরত রত্নধারাস্রাবী রত্নকলশ এবং দুই পার্শ্বে রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি অষ্ট প্রধানা মহিষী দক্ষিণ ও বামে যথাক্রমে বিরাজমানা। তাঁহাদের মধ্যে দুইজনে দক্ষিণে ও বামে থাকিয়া রত্নধারায় তাঁহাকে স্নান করাইতেছেন এবং অপর সকলে রত্ননদী হইতে উদ্ধৃত রত্নপূর্ণ ঘট হস্তে শোভা পাইতেছেন। মণ্ডলের বহির্ভাগে ষোড়শ সহস্র রমণী উজ্জ্বল রত্নকলশহস্তে দণ্ডায়মানা।

এই দেবতা বিষ্ণুর অপরাপর মূর্ত্তির ন্যায় তার্ক্ষ্যবাহন বা গরুড়ের উপর অবস্থিত।

শ্রীসাত্বতসংহিতায় যে ধ্যান পাওয়া যায়, তাহাতে অচ্যুতের দক্ষিণহস্তদ্বয়ে হল ও চক্র, এবং বামহস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও মুষল শোভা পাইতেছে। বরাহপুরাণে উল্লিখিত ধ্যানে অচ্যুতের চারিহস্তে যথাক্রমে শঙ্খ, খড়্গ, চক্র এবং গদা বিদ্যমান। এই পুরাণ-বর্ণনায় অচ্যুতের হস্তস্থিত প্রহরণগুলির একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। যথা—শঙ্খ অবিদ্যাবিজয়ের জন্য, খড়্গ অজ্ঞানচ্ছেদনের জন্য, চক্র কালচক্রনির্দ্দেশের জন্য এবং গদা অধার্ম্মিক রাজাদের হনন করিবার জন্য রহিয়াছে।

ক্রমদীপিকার একটী ধ্যানে দেখা যায়, অচ্যুত গরুড়ের উপর বলরাম ও প্রদ্যুম্নের সহিত উপবিষ্ট এবং নীচে জ্বরের দেবতা, নিজের জ্বরে নিপীড়িত হইয়া তাঁহার স্তবে নিরত। এই ধ্যানটী নারদপঞ্চরাত্রেও পাওয়া যায়।

ক্রমদীপিকায় অচ্যুতের আর একটী নূতন মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। এ মূর্ত্তিতে তিনি দুই হস্তে বেণুবাদন করেন এবং অপর দুই হস্তে পাশ ও যষ্টি ধারণ করেন; তিনি পীতাম্বর এবং তাঁহার মস্তকে শিখিপাখার অলঙ্কার। এই ধ্যানটী নারদপঞ্চরাত্রেও পাওয়া যায়।

নারদপঞ্চরাত্রে অপর একটী ধ্যান আছে। অচ্যুতের এক হস্তে বরদমুদ্রা ও অপর হস্তে অভয়মুদ্রা এবং এই দুই হস্তে তিনি আপনাকে জড়াইয়া থাকেন।

ইনি মাতৃকারূপেও উক্ত হইয়া থাকেন এবং যে অক্ষরে ইনি অধিষ্ঠান করেন, তাহা বর্ণমালার তকার। শ্রীতত্ত্বনিধিতে (প. ২২০) এই তকারাধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিম্নলিখিত ধ্যান পাওয়া যায়। যথা—

"পীতবর্ণশ্চতুর্ভুজঃ শঙ্খপদ্মচক্রগদা-
ধরঃ শ্রীভূসহিতঃ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতঃ ॥"

ইনি পীতবর্ণ, চতুর্ভুজ এবং শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও গদাধারী, এবং সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত হইয়া শ্রীদেবী ও ভূদেবীর সহিত বিরাজমান।

৪ মরুদ্গণ। (ঋক্ ১.৮৫.৪) ৫ দ্বাদশ সর্গযুক্ত কাব্য-বিশেষ। (হেম) (ত্রি) ৬ চলনরহিত, স্থির, অভ্রষ্ট। (ঋক্ ১.৫২.২) ৭ ষড্‌ভাব-বিকাররহিত। ৮ মরণবর্জ্জিত, অমৃত। (ভাগবত ৭.৭.৫৪) [ন চ্যোততি ক্ষরতি চ্যুত-ক; নঞ্-তৎ] (ত্রি) ৯ ক্ষরণশূন্য। (পুং) [বৈদ্যক] ১০ বৃক্ষবিশেষ (Morinda Tinctoria)।

অচ্যুত$_২$—(পুং) একজন যক্ষ-সেনাপতি। দেবাসুরযুদ্ধে দেবা-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য যক্ষগণ যে পঞ্চদশ সেনাপতি প্রেরণ করেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। (বামনপুরাণ)

অচ্যুত$_৩$—আর্য্যাবর্ত্তের একজন নৃপতি। মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের আলাহাবাদের একটী শিলালিপিতে দেখা যায় যে, সমুদ্রগুপ্ত রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্ম্মা, গণপতিনাগ, নাগসেন, অচ্যুত, বলবর্ম্মা ও আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য রাজাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

অচ্যুত$_৪$—মিথিলার রাজা শিবসিংহের মন্ত্রী।

অচ্যুত$_৫$—'ভাগীরথীচম্পূ' ও 'কাব্যমালা' রচয়িতা। ২ 'গুরুবর-প্রার্থনাপঞ্চরত্নস্তোত্র' ও 'বৃহৎস্তোত্ররত্নাকর'-রচয়িতা। ৩

'রত্নমালা'-রচয়িতা। ৪ ধরণিগোনিকের পুত্র। ইঁহার রচিত বৈদ্যকগ্রন্থ—'রসসংগ্রহসিদ্ধান্ত'।

অচ্যুত, (অচ্যুতানন্দ)—শান্তিপুরনিবাসী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্শ্বদ অদ্বৈতাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। যথা "অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ।" (চৈতন্যভাগবত, অন্ত, ৯ম অ°)। অদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য ঈশান নাগর তাঁহার 'শ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, ১৪১৪ শকের বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসে অচ্যুতানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু চৈতন্যভাগবতে অন্যরূপ আছে। সন্ন্যাসগ্রহণের পাঁচ বৎসর পরে মহাপ্রভু জননী ও জন্মভূমি দর্শন করিবার জন্য দেশে আসিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে যখন উপস্থিত হইলেন, সেই সময় অচ্যুত "পঞ্চবর্ষ বয়স মধুর দিগম্বর। খেলাখেলি সর্ব্ব অঙ্গ ধুলায় ধূসর॥" তাহা হইলে অচ্যুতের জন্ম ১৪৩১ শকে অর্থাৎ মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের বৎসর হইয়াছিল ধরিয়া লইতে হইবে। কিন্তু ১৪৩১ শকে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া যখন তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের বাটীতে গমন করিলেন, তখন "দিগম্বর শিশুরূপ অদ্বৈত তনয়। নাম শ্রীঅচ্যুতানন্দ মহাজ্যোতির্ম্ময়॥ ধূলাময় সর্ব্ব অঙ্গ হাসিতে হাসিতে। জানিয়া আইলা প্রভুচরণ দেখিতে॥ আসিয়া পড়িলা গৌরচন্দ্র পদতলে। ধুলার সহিত প্রভু লইলেন কোলে॥" তখন অচ্যুতের বয়স তিন বৎসর ধরিলে অচ্যুতের জন্ম ১৪২৮ শকে হওয়া উচিত। আবার সন্ন্যাসের একবৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গের মহাপ্রকাশ হয়। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে সস্ত্রীক অদ্বৈতাচার্য্যকে নবদ্বীপে লইয়া আসিবার জন্য মহাপ্রভু শ্রীবাসের অনুজ শ্রীরাম বা রামাই পণ্ডিতকে শান্তিপুরে পাঠাইয়া দেন। তাঁহার নিকট মহাপ্রভুর শ্রীবাসের বাড়ীর প্রথম প্রকাশের কথা শুনিয়া অদ্বৈতাচার্য্য আনন্দে ক্রন্দন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া—"অদ্বৈতের তনয় অচ্যুতানন্দ নাম। পরম বালক সেই কান্দে অবিরাম॥" ইহারও পূর্ব্বে একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দসহ শান্তিপুরে গিয়াছিলেন। সেদিনও মহাপ্রভুকে দেখিয়া "অচ্যুত প্রণাম করে অদ্বৈত-তনয়।" তখন যে তাঁহার বয়স কত তাহা জানা যায় না। তবে ৪।৫ বৎসরের কম হইবে না, তাহা নিশ্চয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে বৃন্দাবনদাসের কথার কোন সামঞ্জস্য নাই। অতএব ঈশান নাগরের কথাই প্রকৃত বলিয়া অনুমিত হয়। অর্থাৎ অচ্যুত ১৪১৪ শকে জন্মগ্রহণ করেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। অচ্যুত যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ছিলেন এবং শৈশব হইতেই মহাপ্রভুর অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন, তাহা উপরের উদ্ধৃত পংক্তিগুলি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই সম্বন্ধে আরও দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। একদা এক সন্ন্যাসী অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তিনি অদ্বৈতাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করেন, "কেশব ভারতী মহাপ্রভুর কে?" অদ্বৈত অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন যে, কেশব ভারতী চৈতন্যের গুরু হন। অচ্যুত তখনই সেখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহার কানে ঐ কথা গেল। তিনি তখন "পঞ্চবর্ষ বয়স মধুর দিগম্বর।" "চৈতন্যের গুরু আছে বচন শুনিয়া। ক্রোধাবেশে কহে কিছু হাসিয়া হাসিয়া॥ কি বলিলা বাপ, বল দেখি আর বার। চৈতন্যের গুরু আছে বিচার তোমার॥" ইহা বলিয়া অনেক তত্ত্বকথা বলিলেন। অদ্বৈত অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া "বাপ বাপ বলি ধরি করিলেন কোলে। সিঞ্চিলেন অচ্যুতের অঙ্গ প্রেমজলে॥" তৎপরে বলিলেন, "তুমি সে জনক বাপ, আমি সে তনয়। শিখাইতে পুত্ররূপে হইলে উদয়॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যশাখা গণনায় অচ্যুতের নাম আছে—"অচ্যুতানন্দ আচার্য্য অদ্বৈত-তনয়। নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ আশ্রয়॥"

আবার চরিতামৃতেই অদ্বৈতাচার্য্যের শাখাবর্ণনায় আছে, "অচ্যুতানন্দ বড় শাখা আচার্য্যনন্দন। আজন্ম সেবিলা তেঁহো চৈতন্যচরণ॥" যদুনন্দনদাসকৃত গদাধরপণ্ডিত গোস্বামীর 'শাখা নির্ণয়ামৃত' গ্রন্থে দেখা যায় যে, অচ্যুতানন্দ গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। বৃন্দাবন দাসও চৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন যে, অচ্যুতানন্দ গদাধরপণ্ডিতের শিষ্যের প্রধান ছিলেন। কবিকর্ণপুরের 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় অচ্যুতকে গদাধরের শিষ্য ও মহাপ্রভুর প্রিয় বলা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, অচ্যুতের নাম শ্রীচৈতন্য ও অদ্বৈত শাখার মধ্যে থাকিলেও তিনি গদাধর পণ্ডিতেরই মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বৈষ্ণব গ্রন্থে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বস্তুতঃ শাখা ও শিষ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। গদাধর পণ্ডিত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শিষ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি শ্রীচৈতন্যশাখার অন্তর্ভুক্ত। সেই হিসাবে গদাধরপণ্ডিতের শিষ্য অচ্যুতকে মহাপ্রভুর উপশাখায় গণনা করা উচিত ছিল। কিন্তু তাঁহার যোগ্যতার জন্যই তিনি চৈতন্যের মূল শাখা ও অদ্বৈতের মূলশাখায় গণিত হইয়াছেন। এইরূপ উভয় শাখার মধ্যেও অনেকের নাম বৈষ্ণব গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। যেমন বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি। ইঁহারা শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ উভয় শাখার অন্তর্ভুক্তরূপে পরিচিত।

অদ্বৈতপ্রকাশে আছে যে, মহাপ্রভু যখন বারাণসী হইয়া বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন অচ্যুতও সেখানে গমন

করেন। চৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়, অচ্যুত মহাপ্রভুর নিকট নীলাচলেই অবস্থিতি করিতেন। রথযাত্রার সময় গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে গমন করিতেন এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া রথাগ্রে নৃত্য-কীর্ত্তন করিতেন। অচ্যুতকে সে সময় তাঁহার পিতার সম্প্রদায়েই দেখিতে পাওয়া যায়, "শান্তিপুর আচার্য্যের এক সম্প্রদায়। অচ্যুতানন্দ নাচে তাহাঁ, আর সব গায়॥" শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তীর 'নরোত্তমবিলাস' গ্রন্থে খেতরি মহোৎসবে তাঁহার যোগদানের কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অচ্যুত দারপরিগ্রহ করেন নাই। নরহরি চক্রবর্ত্তীর মতে, তিনি শেষ জীবনে শান্তিপুরের বাটীতে বাস করিয়াছিলেন। তিনি কোন্ শকে দেহরক্ষা করেন, তাহা জানা যায় না।

অচ্যুত, —জৈন ধর্ম্মগ্রন্থবর্ণিত স্বর্গবিশেষের নাম। জৈন দিগম্বর-সম্প্রদায়ের ষোড়শ (কাহারও মতে ১২শ) স্বর্গের অন্যতম।

অচ্যুত উপাধ্যায়—অমরকোষের টীকাকার।

অচ্যুতকল্প—জৈন চামুণ্ডরায়পুরাণে উল্লিখিত একটী স্থান। ইহা পুষ্পোত্তরবিমানে অবস্থিত। ২ জৈনদিগের একটী স্বর্গের নাম। এখানে অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর দেবতাদের বাস।

অচ্যুতকৃষ্ণানন্দ—এক সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—'একাদশী-মাহাত্ম্য' ও 'ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌বিবরণ'।

অচ্যুতকৃষ্ণানন্দতীর্থ — কৃষ্ণালঙ্কারশাস্ত্রসিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ-টীকা-রচয়িতা। ইনি স্বয়ম্প্রকাশানন্দতীর্থ সরস্বতীর শিষ্য।

অচ্যুতক্ষিৎ—(ত্রি) কঠিন বা শক্ত ভূমিযুক্ত। ২ সোমভেদ।

অচ্যুত চক্রবর্ত্তী—একজন স্মার্ত্ত গ্রন্থকার। হরিদাস তর্কাচার্য্যের পুত্র। শ্রীনাথের বংশের সহিত ইঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং ইনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

ইনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি রচনা করিয়াছেন—

(১) শ্রাদ্ধবিবেকটিপ্পনী—আজ পর্য্যন্ত এই পুথি আবিষ্কৃত হয় নাই, তবে তাঁহার দায়ভাগের টীকায় এই পুথির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) দায়ভাগসিদ্ধান্তকুমুদচন্দ্রিকা—ইহা দায়ভাগের একখানি বৃহৎ টীকা। প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীনাথের নিবন্ধের অনেক স্থলের খণ্ডন ইহাতে আছে। ইহা শ্রীনাথের টীকা হইতে কোন অংশে হীন নহে। মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য নামক দায়ভাগের অপর একজন টীকাকারকে ইহার অনেকাংশ উদ্ধৃত করিতে দেখা যায়। শেষোক্ত টীকাকার অপেক্ষা প্রথিতযশা টীকাকার শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারও ইঁহার টীকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। আবার কোন কোন স্থলে রামভদ্র অচ্যুতের মত খণ্ডন করিয়াছেন।

(৩) সন্দর্ভ-স্মৃতিকা—ইহা অনিরুদ্ধ ভট্টের হারলতার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন টীকা।

অচ্যুতচ্যুত—(ত্রি) স্থিরতর হইতে পতিত বা ভ্রষ্ট।

অচ্যুতজ—(পুং) [অচ্যুত-জন-ড] অচ্যুত হইতে জাত, অচ্যুতাত্মজ। [অচ্যুতাত্মজ দ্র°] ২ বিষ্ণু হইতে উদ্ভূত জৈনদিগের দেবগণভেদ। (হেমচন্দ্র)

অচ্যুতজল্কিন্—(পুং) অমরকোষের টীকাকার অচ্যুতোপাধ্যায়।

অচ্যুতদন্ত, অচ্যুতন্ত—(পুং) আচ্যুতদন্তি বা আচ্যুতন্তি নামক যোদ্ধজাতির আদিপুরুষ।

অচ্যুত দাস, —'গোপীভক্তিরস বা কৃষ্ণলীলা' রচয়িতা।

অচ্যুত দাস, (**অচ্যুতানন্দ**)—জনৈক বৈষ্ণব কবি। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে রাজা প্রতাপরুদ্রের শাসনকালে উৎকলে যে ছয় জন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, অচ্যুত দাস তাঁহাদের অন্যতম। উক্ত ছয়জনের অপর পাঁচজন কবির নাম বলরাম দাস, জগন্নাথ দাস, অনন্ত দাস, যশোবন্ত দাস ও চৈতন্য দাস।

অচ্যুত দাসের প্রধান গ্রন্থ শূন্যসংহিতায় বলরামাদি চারি জনের নাম দৃষ্ট হয়। কিন্তু চৈতন্য দাসের কোন উল্লেখ নাই। ইহাতে মনে হয়, চৈতন্য দাস এই পাঁচজনের অল্প পরেই আবির্ভূত হন।

বলরামাদি সকলেই বিষ্ণুকে জগতের আদিকারণ স্বরূপ মহাশূন্য বলিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ মহাযান ধর্ম্মের সহিত এইখানে ইঁহাদের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে। অচ্যুত দাস শূন্যসংহিতায় স্পষ্টভাবেই শূন্যপুরুষকে মায়াময় জগতের একমাত্র কারণ বলিয়াছেন—

"ভলা পচারিলু গুপত সন্ধি।
শূন্যপুরুষ শূন্য পরে বন্দী॥
শূন্যপুরুষ উদাসরে রহে।
শূন্যপুরুষ সবু মায়া ত্যায়ে॥
শূন্যপুরুষ দয়ালু অটই।
শূন্যপুরুষ সর্ব্বঘটে রহি॥
শূন্যপুরুষ করে নট ঘট।
শূন্যপুরুষ জাণে ছন্দকুট॥
শূন্যপুরুষ শূন্যরে মারই।
মারি শূন্য পুণ্য গতি করই॥"

পরে বলিয়াছেন, এই শূন্যপুরুষ জীবাত্মরূপে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া বিরাজ করেন।

রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহার ব্যাখ্যা সাধারণ বৈষ্ণব মতানুযায়ী

নহে, উহা একপ্রকার প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত। শূন্যসংহিতায় লিখিত হইয়াছে—

"জীব আত্মা রাধে বলি পরম মুরারি।" (শূন্যস°, ২য় অ°)

আবার—"পরম আত্মাটী মহাশূন্য বলি ভাব॥
এহিটী অরূপানন্দ নাম তত্ত্ব ঠুল্।
উদ্ভব সংগ্রহ করে রাধা প্রেম ভোল॥"
(শূন্যস°, ২২ অ°)

বৌদ্ধশাস্ত্রে শূন্যতা বা প্রজ্ঞাপারমিতাকে তথাগতসমূহের জননী (আদি মাতা) বলা হইয়াছে; অচ্যুতানন্দও ধর্ম্ম অর্থাৎ শূন্যকে আদি দেবমাতা বলিয়াছেন এবং পরমাত্মন্ শব্দে মহাশূন্যকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"আদ্য দেবমাতা শূন্যে বরদাতা এহাঙ্কু শূন্যটী কহি।"
(শূন্যস°, ১৪ অ°)

নিরাকারসংহিতায় অচ্যুত দাস নির্ব্বাণকেই ধর্ম্মজীবনের শেষ অবস্থা বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মানন্দ যেহু অদিত্য অব্যক্ত দিব্যানন্দ তহু জাণ।
তাঙ্ক গুরুনাম সচ্চিদানন্দটী স্বয়ং অনাদি নির্ব্বাণ॥"

শূন্যসংহিতা ও নিরাকারসংহিতায় কবি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, অচ্যুত দাস প্রথমে সনাতন গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এই সময় তাঁহার মনে ঘোর সংসারবৈরাগ্য উপস্থিত হয়। ক্রমে তিনি নির্গুণের সন্ধান পান, তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়। তিনি দীক্ষাগ্রহণের দশ বৎসর দশ মাস পরে পটনাতীরস্থ ত্রিপুর গ্রামে বটবৃক্ষতলে গুরুর সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তাঁহার নাম মহানন্দ। গুরু মহানন্দ অচ্যুতকে শিখাইলেন যে, 'সচ্চিদানন্দ' 'অনাদি নির্ব্বাণ'ই একমাত্র ধ্যেয়, কাম্য ও শ্রেষ্ঠ বস্তু। অনন্তর প্রাচীর পূর্ব্বতীরে দণ্ডকবনে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা গভীর রাত্রে তিনি ভগবান্ বুদ্ধের দর্শন লাভ করেন। ভগবান্ তথাগত তাঁহাকে 'নিরাধার' ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাকে ঐ ধর্ম্ম প্রচারের আদেশ করেন।

অচ্যুতানন্দ শ্রীচৈতন্যমতাবলম্বী ও সনাতন গোস্বামীর শিষ্য হইয়াও বৈষ্ণবধর্ম্মের আবরণে বুদ্ধেরই উপাসনা করিতেন বলিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ও রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন। শূন্যসংহিতায় ইহার বিবরণ আছে। এই কারণে শূন্যসংহিতায় বলা হইয়াছে—

"কলিযুগে বৌদ্ধরূপে নিজরূপ গোপ্য।"

শূন্যসংহিতায় তৎকালে উৎকলে প্রচলিত এই কএকটী ধর্ম্মমতের নাম পাওয়া যায়, যথা—নাগান্তক, বেদান্তক, যোগান্তক। ইহা ছাড়া গোরক্ষনাথ এবং মল্লিকানাথ প্রবর্ত্তিত যোগধর্ম্ম, বাউলী, সাক্ষিমন্ত্র প্রভৃতির অস্তিত্বও জ্ঞাত হওয়া যায়। অচ্যুত দাস নাগার্জ্জুনের মাধ্যমিক ন্যায়কে নাগান্তক, অসঙ্গাদিপ্রবর্ত্তিত যোগাচারকে যোগান্তক এবং বৌদ্ধ সৌত্রান্তিক ধর্ম্মকে বেদান্তক বলিয়াছেন। (শূন্যস°, ১০ অ°)

অচ্যুতের গ্রন্থ হইতে জানা যায়, তিনি চিত্রোৎপলা নদীতীরস্থ নেম্বালগ্রামে অবস্থান করিয়া ২৫৫ জন বৌদ্ধবৈষ্ণব শিষ্যকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন।

শূন্যসংহিতা ও নিরাকারসংহিতা ছাড়া অনাদিসংহিতা নামে একখানি গ্রন্থও অচ্যুত দাসের লিখিত।*

অচ্যুতদেবরায়—বিজয়নগরের যাদববংশীয় রাজা (১৫২৯-১৫৪২ খৃঃ)। ইঁহার পিতার নাম নরসিংহ। নারসিংহ ও কৃষ্ণদেবরায় ইঁহার দুই ভ্রাতা। কোন কোন শিলালিপিতে অচ্যুতদেবকে কৃষ্ণদেবের পুত্র বলা হইয়াছে। কৃষ্ণদেবরায়ের মৃত্যুর পরে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। অচ্যুতরায় কৃষ্ণদেবরায়ের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন ও লোকপ্রিয় ছিলেন না। ইঁহার দুর্ব্বলতায় ও অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া কর্ম্মচারিগণ বিদ্রোহী হন। অচ্যুতের মৃত্যু হইলে তাঁহার শিশুপুত্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তাহারও মৃত্যু ঘটে।

অচ্যুত ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য অবরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ লাভবান্ হইতে পারেন নাই। মান্দ্রাজের কুর্নুল দুর্গ অচ্যুতরায়ের নির্ম্মিত বলিয়া কথিত হয়। ইনি স্বীয় নামে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেন। ইঁহার জন্ম ও জীবনের প্রধান ঘটনাবলী লইয়া রাজনাথ 'অচ্যুতরায়াভ্যুদয়ম্' নামে দ্বাদশসর্গযুক্ত একখানি সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। [বিজয়নগর দ্র°]

অচ্যুত নায়ক—দেবগিরির যাদববংশীয় রাজা রামচন্দ্রের একজন সামন্ত। শিলালিপিতে ইঁহার 'মহাপ্রধান' উপাধি দেখা যায়। ১২৭৩ ও ১২৯১ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ দুইখানি তাম্রফলক হইতে জানা যায়, রামচন্দ্রদেব ইঁহাকে থানা জেলা সমর্পণ করেন। ১২৭২ খৃষ্টাব্দে ইনি কোঙ্কণপ্রদেশের মহাপ্রধান বা শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

অচ্যুত পণ্ডিত—অভিরাম দাসকৃত 'পাটপর্য্যটন' মতে ইনি অভিরাম গোস্বামীর শিষ্য। শ্রীপাট কোটরা গ্রামে ইঁহার বাস ছিল।

"কোটরাতে বাস অচ্যুত পণ্ডিত আখ্যান।" (পাটপর্য্যটন)

* The Modern Buddhism and its followers in Orissa, by N. Vasu, pp. 38—161.

অচ্যুতপন্থী—মহানুভবপন্থীর গুজরাতস্থ একটী শাখা। ভগবান্ অচ্যুতের নামানুসারেই ইহার নামকরণ হইয়াছে। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণভক্ত পরমবৈষ্ণব। [মহানুভবপন্থী দ্র°]

অচ্যুতপুরম্—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এই স্থানে উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় নৃপতি ইন্দ্রবর্ম্মা রাজসিংহের একটী তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। [ইন্দ্রবর্ম্মা দ্র°]

অচ্যুতপ্পা—কর্ণাটের একজন রাজা। ইনি ১৫৭৩-১৬১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইঁহার পরে রঘুনাথ রাজা হন।

অচ্যুতপ্রগাথ—বৈদিক প্রগাথবিশেষ। [প্রগাথ দ্র°]

অচ্যুতপ্রেক্ষাচার্য্য—আনন্দগিরির গুরু।

অচ্যুতবিবি—আহ্‌মদাবাদ নগরের একটী মস্‌জিদের নাম।

অচ্যুত ভট্ট—'ভাস্বতীকরণটীকা'-কার।

অচ্যুতমূর্ত্তি—(স্ত্রী) বিষ্ণুর মূর্ত্তিভেদ। [অচ্যুত, দ্র°]

অচ্যুত যতি—একজন গ্রন্থকার। ইনি মধুসূদনাশ্রমের শিষ্য। 'সীতারামাষ্টকস্তোত্র' ও 'বৃহৎস্তোত্ররত্নাকর' ইঁহার রচিত।

অচ্যুতরঘুনাথভূপাল—'রামায়ণসারসংগ্রহ'-রচয়িতা।

অচ্যুত শর্ম্মা, —'দায়ভাগটীকা'-কার।

অচ্যুত শর্ম্মা, —'বেদান্তামৃতচিদ্রত্নচষকটীকা'-কার।

অচ্যুত সূরি—মাধবাচার্য্যকৃত 'শঙ্করবিজয়ে'র টীকাকার।

অচ্যুতস্থল—(ক্লী) পঞ্জাবের একটী স্থান। (মহাভা°, কর্ণ°)

অচ্যুতা, —জৈনদিগের একজন দেবী। ইঁহার ধ্যান 'আচারদিনকরে' (প. ১৫১) এইরূপ পাওয়া যায়—

"রসিতমুচ্চতরঙ্গমনায়কং বিশতু কাঞ্চনকান্তিরিহাচ্যুতা।
ধৃতধনুঃফলকাসিশরৈঃ করৈরসিতমুচ্চতরঙ্গমনায়কম্॥"

অর্থাৎ অচ্যুতাদেবীর কান্তি কাঞ্চনের ন্যায়, তিনি চতুর্হস্তা এবং চারিটী হস্তে ধনু, ফলক, অসি এবং বাণ ধারণ করেন।

'আচারদিনকরে'র অপর একস্থলে (প. ১৭৭) অচ্যুতার আর একটী সুন্দর ধ্যান পাওয়া যায়। কিন্তু এই মূর্ত্তি পূর্ব্বলিখিত মূর্ত্তি হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। ধ্যান এইরূপ—

"শ্যামা চতুর্ভুজধরা নরবাহনস্থা
পাশং তথা চ বরদং করয়োর্দধানা।
বামান্যয়োস্তদনু সুন্দরবীজপূরং
তীক্ষ্ণাঙ্কুশং চ পরয়োঃ প্রমুদেঽচ্যুতাস্তু॥"

অর্থাৎ অচ্যুতা শ্যামবর্ণা, চতুর্ভুজা, এবং নরবাহনা। দুইটী দক্ষিণহস্তের একটীতে পাশ ও অপরটীতে বরদমুদ্রা এবং দুই বামহস্তে বীজপূর এবং তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ ধারণ করেন।

আর একস্থলে অচ্যুতার বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি দুইটী দক্ষিণহস্তে বরদমুদ্রা এবং বীণা ধারণ করেন এবং দুই বামহস্তে ধনু ও অভয় প্রদর্শন করেন।

অচ্যুতা, —গঙ্গার সহস্র নামের মধ্যে একটী। (স্কন্দপু°, কাশীখণ্ড)

অচ্যুতাগ্রজ—(পুং) [অচ্যুতস্য কৃষ্ণস্য অগ্রজঃ ; ৬-তৎ] বলরাম। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে জন্মিয়াছিলেন, এই জন্যই তিনি অচ্যুতাগ্রজ নাম পাইলেন। ২ ইন্দ্র। কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে ইন্দ্র অগ্রে জন্মগ্রহণ করেন, পরে ভগবান প্রসূত হন।

অচ্যুতাঙ্গজ—(পুং) [অচ্যুতস্য অঙ্গাৎ জায়তে জন-ড] কৃষ্ণের পুত্র, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি।

অচ্যুতাত্মজ—(পুং) [অচ্যুতস্য আত্মনঃ জায়তে জন-ড] [অচ্যুতাঙ্গজ দ্র°]

অচ্যুতানন্দ, (রাজা)—সুবর্ণরেখার তীরবর্ত্তী রয়নীর অধিপতি। 'ভক্তিরত্নাকরে' ইঁহার নাম অচ্যুত।

"মল্লভূমি মধ্যেতে রয়নী নামে গ্রাম।
গ্রামপাশে নদী সে সুবর্ণরেখা নাম॥
* * *
অচ্যুত নামেতে সে দেশের অধিপতি।
প্রজা পালনেতে প্রীত অতি শুদ্ধরীতি॥
রয়নী গ্রামে প্রসিদ্ধ অচ্যুততনয়।
শ্রীরাধিকানন্দ শ্রীমুরারি নামদ্বয়॥"

(ভক্তিরত্নাকর, ১৫শ তরঙ্গ)

ইঁহার পত্নীর নাম ভবানী এবং দুই পুত্রের নাম রাধিকানন্দ ও মুরারি। রাধিকানন্দ ও মুরারি প্রসিদ্ধ শ্যামানন্দের শিষ্য ; তদানীন্তন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ইঁহারা যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। প্রেমবিলাসে ইনি অচ্যুতানন্দ নামে বর্ণিত হইয়াছেন।

"যবন উদ্ধারি শ্যামানন্দ রয়নীতে গেলা।
তথা গিয়া প্রেমভক্তি বিস্তার করিলা॥
সুবর্ণরেখা নদীতীরে হয় সেই গ্রাম।
তথি আছয়ে রাজা অচ্যুতানন্দ নাম॥
রাধিকা মুরারি নামে তার পুত্রদ্বয়।
শ্যামানন্দ তাহে কৃপা কৈলা অতিশয়॥"

(প্রেমবিলাস, ১৯শ বিলাস)

অচ্যুতানন্দ, —গ্রন্থকারবিশেষ। ইনি আনন্দগিরির শিষ্য। ইঁহার রচিত গ্রন্থ 'একাদশীনির্ণয়ব্যাখ্যা'।

অচ্যুতানুজা—(স্ত্রী) [অচ্যুতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অনুজা] ভগবতী। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের দিন ভগবতী নন্দালয়ে জন্ম লইয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে অচ্যুতানুজা বলা যায়।

"অন্নপূর্ণা অপর্ণা অন্নদা অষ্টভুজা।

অভয়া অপরাজিতা অচ্যুত-অনুজা॥" (ভারতচন্দ্র)

অচ্যুতাবাস—(পুং) [অচ্যুতেন ওষ্যতেঽত্র, আ-বস-অধিকরণে ঘঞ্] অশ্বত্থবৃক্ষ। "অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং।" (গীতা ১০ অ°) ভগবান্ অচ্যুত অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, বৃক্ষমধ্যে আমি অশ্বত্থবৃক্ষ। এই জন্যই অশ্বত্থ অচ্যুতাবাস বলিয়া বিখ্যাত।

অচ্যুতাশ্রম—ইনি পরমানন্দাশ্রম বা চিদানন্দাশ্রমের শিষ্য। ইঁহার শিষ্য কৃষ্ণযাজ্ঞবল্কীর পুত্র গোপাল যাজ্ঞবল্কী। শিবকল্যাণ তাঁহার 'শ্রীঅনুভবামৃতটীকায়' ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—'ভগবদ্গীতা', 'ব্রহ্মকথা', 'রামবোবিয়া', 'রামার্চ্চনচন্দ্রিকা', 'বিশ্বেশ্বরীপদ্ধতি' (বা 'যতিধর্ম্মসংগ্রহ'), 'সন্ন্যাসধর্ম্মসংগ্রহ' ও 'সন্ন্যাসপদ্ধতি'। বিশ্বেশ্বরীপদ্ধতিতে জ্ঞানার্ণবের উল্লেখ আছে। বরোদার 'ওরিয়েন্টাল ইনস্‌টিটিউটে' বিশ্বেশ্বরীপদ্ধতির একটী অনুলিপি রক্ষিত আছে, উহা সংবৎ ১৮৮৭ অব্দে (১৮৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে) লিখিত হয়।

অচ্যুতি—(স্ত্রী) [ন চ্যু-ক্তিন্; নঞ্-তৎ] ক্ষরণাভাব। [নাস্তি চ্যুতির্যস্য; বহুব্রী] (ত্রি) ২ বিচ্যুতিশূন্য।

অচ্যুতেন্দ্র—জৈনদিগের অচ্যুতকল্পনামক স্বর্গের ইন্দ্র। [অচ্যুতকল্প দ্র°]

অচ্যুতোপাধ্যায়—[অচ্যুত উপাধ্যায় দ্র°]

অছ—(দেশজ) থাকা, বাসকরা।

অছি—(দেশজ) [অচি দ্র°]

অছিপছি—(দেশজ) অস্থিরভাব, আকুলি-বিকুলি।

অছিলা—(দেশজ) উপায়, ছুতা। ২ নিমিত্ত, হেতু।

অছ্‌নেরা (অচিনেরা)—আগ্রা জেলার কিরাবলী তালুকের এক শহর। অক্ষা° ২৭°১০′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৪৬′ পূঃ। আগ্রা হইতে ভরতপুরগামী রাজপথের সন্নিকটে এই শহর অবস্থিত। ইহারই নিকটে রাজপুতানা-মালব রেলপথ ও কানপুর-অছ্‌নেরা রেলপথ পরস্পরকে সংযুক্ত করিয়াছে। এখানকার হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে জাঠ, ব্রাহ্মণ, বাণিয়া ও চামার প্রধান। এখানে থানা, ডাকঘর, সরকারী ডাকবাংলা, বিদ্যালয় ও বাজার আছে। অছ্‌নেরায় কএকটী কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চৈত্রমাসে এখানে দেবীমেলা নামে একটী মেলা বসে। কংসলীলা ও ফুলদোল উৎসব উপলক্ষে আরও দুইটী মেলা ঐ সময়েই এখানে হইয়া থাকে।

অছ্‌নেরা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কএকটী প্রবাদ শ্রুত হয়। এক মতে ১২৫০ খৃষ্টাব্দে অছ্‌নিধর নামে একজন জাঠ এই শহর স্থাপন করেন। অপর মতে দিল্লীর তোমর-রাজ অনঙ্গপালের পুত্র অচল রাজা খৃষ্টীয় একাদশ শতকে এই শহর প্রতিষ্ঠিত করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, 'অচ্ছা' (শ্রেষ্ঠ) ও 'নের' (শহর) এই দুই শব্দ হইতে অছ্‌নেরা নাম হইয়াছে। এখানে একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে; কিন্তু ঐ দুর্গের কোন ইতিহাস জানা যায় না।

অজ্—ভ্বাদি°, পর° সক° সেট্। ক্ষেপণ। ২ গতি। লট্ অজতি। ঘঞ্ ও অপ্ ভিন্ন আর্দ্ধ ধাতুকে অজ স্থানে বী আদেশ। লিট্ বিবায়, লুট্ বেতা, লৃট্ বেষ্যতি, আশীঃ বীয়াৎ, লুঙ্ অবৈষীৎ আজীৎ, সন বিবীষতি, যঙ্ বেবীয়তে, কর্ম্মণি বীয়তে, তৃচ্ বেতা অজিতা, ক্ত প্রবীতঃ। ৩ দীপ্তি। ইদিৎ। চু-উ°, অক° সেট্। অঞ্জয়তি অঞ্জয়তে, লুঙ্ আঞ্জিজৎ আঞ্জিজত। লিট্ অঞ্জয়ামাস, অঞ্জয়াম্বভূব, অঞ্জয়াঞ্চকার, অঞ্জয়াঞ্চক্রে।

ভ্বাদি অজ্ ধাতুর প্রয়োগ বেদে উভয় পদেই দৃষ্ট হয়। (ঋক ৯.৯১.১৮; ১.১২৯.৬) এই ধাতু প্র, পরা, অপ প্রভৃতি উপসর্গ যোগে বিভিন্ন অর্থের প্রকাশক। [তৎ তৎ শব্দ দ্র°]

অজ,—(পুং) [ন জায়তে ইতি জন-ড; নঞ্-তৎ] জন্মবর্জ্জিত ঈশ্বর। "ন জাতো ন জনিষ্যতে।" (শ্রুতি) ঈশ্বর নিজেই বলিয়াছেন, আমি জন্মি নাই, জন্মিতেছি না, বা কখন জন্মিব না, তাই আমি অজ।

"ন হি জাতো ন জায়েঽহং ন জনিষ্যে কদাচন।

ক্ষেত্রজ্ঞঃ সর্ব্বভূতানাং তস্মাদহমজঃ স্মৃতঃ।" (মহাভারত)

২ দ্বাদশধা বিভক্ত রাশিচক্রের প্রথম রাশি। "ক্ষেত্রাণি স্যুরজাদয়ঃ।" (জ্যোতিষ) ৩ ব্রহ্মা। ৪ বিষ্ণু। ৫ হর। [অজ৬ দ্র°] সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ প্রভৃতি উপাধি ঈশ্বরেরই নিজ মায়াগত উপাধি। ঐ সকল উপাধি দ্বারা জন্ম, স্থিতি ও সংহাররূপ কার্য্য করিবার নিমিত্ত মায়ার আবির্ভাব হেতু অজস্বরূপ হইতে অনতিরিক্ত বলিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হর অজ নামে অভিহিত। শ্রুতিবাক্যেও জানা যায়, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই প্রকৃতি গুণে অন্বিত একমাত্র পরমপুরুষই এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের জন্য বিরিঞ্চি, হরি ও হর সংজ্ঞা ধারণ করেন। "সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণাস্তৈ-র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে। স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাং * * *।" (শ্রুতি)

[আৎ বিষ্ণোর্জ্জায়তে ইতি] ৬ বিষ্ণু হইতে জাত, কামদেব। ৭ চন্দ্র। শ্রুতিতে আছে, "চন্দ্রমা মনসো জাতঃ।" অর্থাৎ চন্দ্র—ব্রহ্ম বা বিষ্ণুর মন হইতে উৎপন্ন। এই জন্য চন্দ্র অজ নামে অভিহিত। ৮ সূর্য্যের এক নাম।

(মহাভারত) ৯ অগ্নি। ১০ মেষ। দক্ষযজ্ঞভঙ্গকালে ব্রহ্মা মেষরূপ ধরিয়া পলায়ন করেন। এই জন্য মেষের নাম অজ। ১১ [বৈদ্যক] মাক্ষিক ধাতু; স্বর্ণমাক্ষিক। ১২ অজনামক ওষধিবিশেষ, চলিত অজশৃঙ্গী। (চরক, চিং, ১ অং) এই ওষধির লক্ষণ এইরূপ—ইহার রূপ ক্ষুপের ন্যায়, এবং কন্দ অজাস্তনের আকার, ইহাতে ক্ষীর আছে এবং ইহা শঙ্খ, কুন্দ ও ইন্দুর ন্যায় পাণ্ডুর।

"অজাস্তনাভকন্দা তু সক্ষীরা ক্ষুপরূপিণী।
অজা মহৌষধী জ্ঞেয়া শঙ্খকুন্দেন্দুপাণ্ডরা॥"

(ত্রি) ১৩ জন্মরহিত।

অজ$_2$—(পুং) জীব। "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ।" (গীতা) জীব কে? যিনি স্বীয় উপাধিভূত বুদ্ধিনিষ্ঠ কর্ম্ম-দ্বারা আরব্ধ দেহ আশ্রয় করিয়া বুদ্ধিনিষ্ঠ কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি আত্মাভিমান পোষণ করিতেছেন, তাঁহাকেই জীব নামে নির্দ্দেশ করা হয়।

যাস্ক ছয়টা ভাববিকারের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা— "জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্যতি।" এই ছয় ভাববিকার জীবে নাই।

জীব যে জন্মাদি শূন্য, একথা গীতায় স্পষ্টরূপেই উল্লিখিত হইয়াছে। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কথঞ্চিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।" (গীতা, ২ অং)

বেদান্তমতে জীব ব্রহ্মাভিন্ন, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম একই পদার্থ। জীব এক, কেবল বুদ্ধিরূপ উপাধি ভিন্ন ভিন্ন। উপাধি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও উপহিত বা উপাধিবিশিষ্ট যিনি, তাঁহার অর্থাৎ জীবের একত্বই অবধারিত।

সাংখ্যমতবাদীরা বলেন, জীব এক নহে—বহু। যতগুলি বুদ্ধিব্যক্তি, ততগুলিই জীব। এই সকল জীব স্ব স্ব উপাধি-কৃত কর্ম্মাদিতে নিজ নিজ কর্তৃত্বাভিমান পোষণ করিয়া তৎপ্রযুক্ত সুখদুঃখাদিকে আপনার বলিয়া মনে করে এবং আমি ভোক্তা এইরূপ ব্যবহার হয়।

যদি বহু জীব না বলিয়া সর্ব্বত্র একই জীব বলা হয়, তবে একের সুখদুঃখে বা জন্মমরণে অন্যের সুখদুঃখ বা জন্মমরণ ঘটে না কেন? সুতরাং জীবের বহুত্ব স্বীকার অসমীচীন নহে।

বুদ্ধিরূপ উপাধি বা নামভেদ থাকিলেও তাহারা যে পৃথক্, একথা বলা যায় না। দৃষ্টান্তস্থলে আকাশের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আকাশ এক; কিন্তু ঘটে, পটে, মঠে সর্ব্বত্রই আছে। তাই বলিয়া আকাশকে অনেক বলা যায় না। তাহার ঘটাদি উপাধি বা নাম নষ্ট হইলে, সে যে আকাশ, সেই আকাশই। জীবের অবস্থাও এইরূপ। তাঁহার নানা উপাধি সত্ত্বেও তিনি একই।

নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকমতে জ্ঞানাদি বৃত্তিগুলি জীবের ধর্ম্ম। জীব বহু; উহারা নিত্য এবং ব্যাপক। কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি জীবদিগেরই ধর্ম্ম। উহারা ব্যাপক হইলেও উহাদের স্ব স্ব অদৃষ্টারব্ধ দেহে যে সংযোগবিশেষ, তাহাই জন্ম; আর সেই সেই দেহের সহিত বিচ্ছেদই উহাদের মরণ। কিন্তু বাস্তব পক্ষে জন্মমরণ জীবের নাই।

নৈয়ায়িক-বৈশেষিক প্রভৃতি মতবাদীরা এইরূপ যুক্তি দেখাইয়াই জীবাত্মার অজত্ব প্রমাণ করিয়াছেন।

এইরূপে দেখা যায়, সকল দর্শনই একবাক্যে জীবকে অজ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এ বিষয়ে কোন দর্শনই অমত করেন নাই।

মাধ্বাচার্য্যসম্প্রদায়ের মতে জীব অণু এবং ঈশ্বর হইতেই তাহার উত্থান বা উৎপত্তি।

"এতস্মৈব বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি॥" (শ্রুতি)

জীব কিরূপ অণু, তাঁহার অণুত্বের পরিমাণ কতটুকু, সে সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্যে দেখা যায়, শতধা ছিন্ন কেশাগ্র-ভাগকে শত ভাগ করিলে যে পরিমাণ ভাগ কল্পনা করা যায়, সেই ভাগপরিমিতই জীব। অর্থাৎ জীব অণু হইতেও অণু।

"বালাগ্রশতধারস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ * * *"

"অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান্" ইত্যাদি। (শ্রুতি)

জীব অতি অণু হইয়াও গুণ দ্বারাই সমস্ত দেহগত সুখ-দুঃখাদির সন্ধান লইয়া থাকেন। অর্থাৎ অণু হইতেও অণুরূপী নানা জীব নানা দেহের সুখ দুঃখ অনুভব করেন। দৃষ্টান্ত-স্থলে বলা যায়, কস্তূরী প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য যদি গৃহের এক প্রান্তে থাকে, তাহা হইলে সৌরভে যেমন সমস্ত গৃহই আমোদিত করিয়া তুলে, হৃদয়স্থ বিস্ফুলিঙ্গরূপ চৈতন্যও তেমনি সর্ব্ব-দেহের প্রকাশ ঘটায় এবং শব্দাদি বিষয়সমূহকেও অবভাসিত করিয়া দেয়।

সৌগত বা বৌদ্ধাদি মতে জীব সম্বিদনতিরিক্ত বলিয়া সর্ব্বসম্বিদ্-অনুস্যূত এবং জন্মান্তরভাবী কর্ম্মফলাদির ভোগ তাঁহার আছে বলিয়া তিনি নিত্য, নিত্য বলিয়াই জীব অজ।

চার্ব্বাকমতাবলম্বীরা আত্মার অজত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে দেহাকারে পরিণত ভূতচতুষ্টয়ই জীব। [চার্ব্বাকদর্শন দ্রং]

অজ৩—(পুং) শিবের নামান্তর। ইঁহাকে মহারুদ্রও বলা হইয়া থাকে। ইঁহার ধ্যান এইরূপ—

"অজনামা মহারুদ্রো ধত্তে শূলমথাঙ্কুশম্।
কপালং ডমরুং সর্পং মুদ্গরং চ সুদর্শনম্॥
অক্ষসূত্রমধো দক্ষে তথা বামে করাষ্টকে।
তর্জ্জনীমূর্দ্ধতস্তত্র খট্বাঙ্গং তদধঃ করে॥
গদাং চ পট্টিশং ঘণ্টাং শক্তিং পরশুকুণ্ডিকে॥"

অজ নামক মহারুদ্র ষোড়শ ভুজ। তাঁহার আটটী দক্ষিণহস্তে উপর হইতে নীচে যথাক্রমে শূল, অঙ্কুশ, কপাল, ডমরু, সর্প, মুদ্গর, সুদর্শনচক্র এবং অক্ষসূত্র বিরাজিত। বাকী আটটী বামহস্তে যথাক্রমে উপর হইতে নীচে—তর্জ্জনী-মুদ্রা, খট্বাঙ্গ, গদা, পট্টিশ, ঘণ্টা, শক্তি, পরশু ও কুণ্ডিকাস্ত্র শোভিত।

হরিবংশে লিখিত আছে, ব্রহ্মার শরীরার্দ্ধময়ী কাম-স্বরূপিণী যে পত্নী সম্ভূতা হন, তিনি সুরভিনাম্নী গোরূপ ধারণ করিলে ব্রহ্মা তাহাতে উপগত হইয়া নির্ঋতি, সর্প, একপাৎ, অজ, মৃগব্যাধ, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, অহির্ব্রধ্ন, সেনানী ও কপালী নামে একাদশ রুদ্রের জন্ম দেন। ইঁহারা জন্মিবামাত্র রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিলেন বলিয়া রুদ্র নামে খ্যাত হন।

ভাগবতমতে, দক্ষের অন্যতমা কন্যা স্বরূপাকে ভূত বিবাহ করেন। এই পরিণয়ফলে যথাক্রমে রৈবত, অজ, ভব, ভীম, বাম, উগ্র, বৃষাকপি, অজৈকপাদ, অহির্ব্রধ্ন, বহুরূপ ও মহান্ নামে একাদশ রুদ্রের জন্ম হয়। অজ এই একাদশ রুদ্রের অন্যতম। কিন্তু লিঙ্গপুরাণোক্ত একাদশ রুদ্র ইহা হইতে ভিন্ন, যথা—একপাৎ, অজ, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, ভৈরব, হর, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, বহুরূপ ও পিনাকী।

অজ৪—(পুং) স্বারোচিষ মন্বন্তরের দেবতা দ্বাদশ তুষিতের অন্যতম। ইনি ক্রতুপুত্র ও সোমপায়ী ছিলেন। ইঁহার মাতার নাম তুষিতা। (ব্রহ্মাণ্ডপু°, ৬২.১১) আবার ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অপর স্থলে (৬২.১৩) ইনি স্বারোচিষ মন্বন্তরের দেবতা দ্বাদশ পারাবতের অন্যতম বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ২ ক্ষত্রবংশ-বীজ উত্তমমনুর ত্রয়োদশ পুত্রের একতম। (ব্রহ্মাণ্ডপু°, ৬২.৩৫) মার্কণ্ডেয়পুরাণমতে ইনি উত্তম মনুর তিন পুত্রের মধ্যে একটী। ৩ জনৈক রাজা। শ্রীমদ্ভাগবতমতে, প্রিয়ব্রত-মনুবংশীয় রাজা প্রতিহর্ত্তার পত্নী স্তুতির গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ৪ ভৃগুবংশীয় কাব্য হইতে তৎপত্নী দেবীর গর্ভে জাত দ্বাদশ যাজ্ঞিক দেবতার একতম। (ব্রহ্মাণ্ডপু°, ৬৫.৮৬) ৫ পুরাকালের জনৈক নৃপতি। ইনি স্বাধ্যায় প্রভাবে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। (মহাভারত) ৬ সোমবংশীয় বিজয়কুলোদ্ভব জহ্নু রাজার পুত্র। ইঁহার নামান্তর পুরু। ৭ বিদেহবংশীয় উর্দ্ধকেতুনামক জনকের পুত্র এবং পুরুজিৎ জনকের পিতা। ৮ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডব-পক্ষীয় একজন রাজা। (মহাভা°, উদ্যোগ, ১৭১ অ°) ৯ পঞ্চদশ রাত্রিমুহূর্ত্তের একতম। এই মুহূর্ত্তগণ দণ্ড-প্রহরাদি বোধ ও কালের অবস্থাবিশেষের জ্ঞাপকমাত্র। ইঁহারা দেবতা, চন্দ্রের গতি অনুসারেই ইঁহাদের উদয়াস্ত হইয়া থাকে। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৬৬.৪৩) ১০ দনুর এক পুত্র। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৬৮.১১) ১১ এক পিশাচ। ইহার কন্যা ব্রহ্মধনার সহিত কশ্যপতনয় যক্ষের পৈশাচিক বিধানে বিবাহ হইয়াছিল। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৬৯.১২১) ১২ ধন্বন্তরির নামান্তর। সমুদ্রমন্থনে প্রথমে ধন্বন্তরি উদ্ভূত হন। তাঁহাকে সর্ব্বসুসম্পন্নদেহে সমুৎপন্ন হইতে দেখিয়া ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, 'তুমি অজ।' তদবধি তিনি অজ নামে প্রসিদ্ধ। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৯২.৮-১০)

অজ৫—(পুং) বৈদিক যুগের এক জাতি। বৈদিক যুগে ত্রিষ্টু জাতির নৃপতি সুদাস যমুনাকুলে অজ শিগ্রু এবং যক্ষু জাতির সহিত মিলিত রাজা ভেদের সম্মিলিত শক্তিকে পরাজিত করেন।

অজ৬—(পুং) সূর্য্যবংশের এক রাজা। বাল্মীকি-রামায়ণের মতে অম্বরীষের পুত্র নহুষ, নহুষের পুত্র নাভাগ, নাভাগের দুই পুত্র অজ ও সুব্রত। ভাস ও কালিদাসের মতে অজ—রঘুর পুত্র। ইঁহার পুত্র রাজা দশরথ। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় বাল্মীকি-রামায়ণে অজরাজার নামোল্লেখ মাত্র একবার আছে—"অজশ্চ সুব্রতশ্চৈব নাভাগস্য সুতাবুভৌ" (রামা° ২.১১০.৩৪, বঙ্গবাসী), মহা-ভারতে বনপর্ব্বে রামোপাখ্যানে আমরা দশরথের পিতা অজের নাম পাই।

"অজো নামাভবদ্রাজা মহানিক্ষ্বাকুবংশজঃ।
তস্য পুত্রো দশরথঃ শশ্বৎ স্বাধ্যায়বান্ শুচিঃ॥"
(মহাভা°, বন°, ২৭৩.৬)

বিষ্ণুপুরাণে ভগীরথবংশবিস্তারবর্ণনে অজের পিতার নাম রঘু বলিয়া জানিতে পারি। "খট্বাঙ্গতো (দিলীপ) দীর্ঘবাহুঃ পুত্রোঽভবৎ। ততো রঘুঃ, তস্মাদপ্যজঃ, অজাৎ দশরথঃ" (বিষ্ণুপুরাণ, ভগীরথবংশবিস্তার)। পদ্মপুরাণ-(সৃষ্টিখণ্ড) মতে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রঘুর পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র অজ, তৎপুত্র দীর্ঘবাহু, তৎপুত্র প্রজাপাল এবং প্রজাপালের পুত্র দশরথ। অগ্নিপুরাণের মতে, দিলীপের পুত্র অজ, অজের পুত্র কাল, তৎপুত্র অজপাল এবং অজপালের পুত্র রাজা দশরথ। সুতরাং বিভিন্ন পুরাণে এই বংশবর্ণনায় যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু রঘুর পুত্র অজ এবং অজের

পুত্র দশরথ, এ কথা প্রায় অধিকাংশ পুরাণেই বর্ণিত হইয়াছে। ভাসের প্রতিমা নাটকে তৃতীয় অঙ্কে প্রতিমাপরিচয়দানকালে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

"অয়ং খলু তাবৎ প্রিয়াবিয়োগনির্ব্বেদপরিত্যক্তরাজ্যভারো নিত্যাবভৃথস্নানপ্রশান্তরজা অজঃ।" অর্থাৎ যিনি প্রিয়াবিয়োগ-দুঃখে রাজ্যভার পরিত্যাগ করিয়া নিত্য যজ্ঞান্ত স্নানে রজোমুক্ত হইয়া উঠিয়াছেন, ইনি সেই অজ।

রঘুবংশের পঞ্চম সর্গে কালিদাস লিখিয়াছেন—

"ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে কিল তস্য দেবী কুমারকল্পং সুষুবে কুমারম্।
অতঃপিতা ব্রহ্মণ এব নাম্না তমাত্মজন্মানমজং চকার॥"

(রঘু° ৫.৩৬)

অর্থাৎ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে তাঁহার (রঘুর) মহিষী কুমারের (কার্ত্তিকেয়) মত কুমারকে প্রসব করিলেন। এই জন্য পিতা ব্রহ্মার নামানুসারে পুত্রের নাম রাখিলেন—অজ।

তাহার পর পঞ্চম হইতে অষ্টম সর্গ পর্য্যন্ত কালিদাস অজের বিবরণ বর্ণন করিয়াছেন। নিম্নে সংক্ষেপে তাহা লিপিবদ্ধ হইল—

'রঘুর পুত্র অজ দিন দিন পিতার মত দীর্ঘকান্তি ও বীর্য্যশালী হইয়া উঠিলেন। ক্রমে তাঁহার যৌবন প্রাপ্তি হইলে বিদর্ভাদি-পতি ক্রথকৌশিকদিগের রাজা ভোজ তাঁহার ভগিনীর স্বয়ংবর-উপলক্ষে অজকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। পথিমধ্যে নর্ম্মদা-তীরে অজ এক বন্য হস্তিরূপী শাপগ্রস্ত গন্ধর্ব্বকে বধ করিলেন। গন্ধর্ব্ব শাপমুক্ত হইয়া অজকে সম্মোহন মন্ত্র দিয়া গন্ধর্ব্বলোকে চলিয়া গেল। তাহার পর বিদর্ভদেশে উপস্থিত হইলে বিদর্ভরাজ সমাদরে অজকে অভ্যর্থনা করিলেন। স্বয়ংবরসভায় সখী সুনন্দার নিকট পরিচয় পাইয়া ইন্দুমতী অজের কণ্ঠেই বরমাল্য অর্পণ করিলেন। ইন্দুমতীকে লইয়া অজ যখন অযোধ্যায় ফিরিতেছিলেন, তখন অন্যান্য ব্যর্থমনোরথ নৃপতিবৃন্দ তাঁহাকে আক্রমণ করায় অজ তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া অযোধ্যায় ফিরিলেন। তাহার পর রঘু পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। কিছুকাল পরে রঘুর মৃত্যু হইলে অজ রাজা হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ইন্দুমতীর গর্ভে দশরথের জন্ম হইল। একদিন রাজা ও রাণী যখন উদ্যানে ক্রীড়া করিতেছিলেন, তখন আকাশপথ হইতে নারদের বীণাচ্যুত কুসুমমাল্য ইন্দুমতীর বক্ষে পতিত হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। পত্নী-বিয়োগে রাজা নানাপ্রকার বিলাপ করিলেন। কোনমতে আট বৎসর বিরহখিন্ন জীবন যাপন করিয়া গঙ্গা এবং সরযূর সঙ্গমস্থলে রাজা অজ প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করিলেন।' ইন্দুমতীবিরহে অজের বিলাপ কালিদাস অতি সুন্দরভাবেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে অজ-ইন্দুমতীর উপাখ্যান দেখিতে পাই। ইহাও মোটামুটী কালিদাসের উপাখ্যান হইতেই গৃহীত বলিয়া মনে হয়। [সূর্য্যবংশ, দশরথ, রঘু, ইন্দুমতী দ্র°]

অজ৭ (বা **অজয়**)—জনৈক চৌহান রাজপুতরাজ। কথিত আছে, ইনি ১৪৫ খৃষ্টাব্দে অজমের নগর প্রতিষ্ঠা করেন। [অজ-মের দ্র°] প্রথমে ইনি নাগপাহাড় নামক শৈলোপরি নগর নির্ম্মাণের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হন; কারণ, দিবাভাগে নগরের প্রাচীর যতটুকু নির্ম্মিত হইত, রাত্রে তাহা কি ভাবে ভগ্ন হইয়া থাকিত। এই কারণে তিনি কিয়দ্দূরবর্ত্তী তারাগড় পাহাড়ে গড়বিতলি নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, এবং সমীপবর্ত্তী সমতলপ্রদেশে স্বীয় নামানুসারে অজমের নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। শেষ জীবনে রাজা অজ সন্ন্যাসিরূপে অজমের নগরের পশ্চিমস্থ পাহাড়ে গমন করেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। অজের মৃত্যুস্থলে অজয়পাল মন্দির বর্ত্তমান আছে।

ডাঃ বূলার প্রভৃতির মতে, রাজা অজ ১১০০ খৃষ্টাব্দ বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে অজমের নগর স্থাপন করেন। অজের পুত্র অনা ১১৫০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। [অনা দ্র°]

অজ৮—পশ্চিম আফ্রিকাবাসী নিগ্রোজাতির একটী শাখা। ইহারা ইউ ভাষাভাষী। উহা অন্যান্য নিগ্রোজাতির ভাষা হইতে পৃথক্।

অজ৯ (**অজজ্**)—আরবদেশের নেজদ্ উপবিভাগে অবস্থিত একটী পর্ব্বতমালা। জেবেল সম্মার পর্ব্বত হইতে পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার একটী শৃঙ্গ ফারা ৪৬০০ ফুট উচ্চ।

অজ১০—(পুং) তৃণপত্রভোজী চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ; ছাগ বা ছাগল। ইহা বন্য (Capra oegagrus) ও গৃহপালিত (Capra hircus) ভেদে দ্বিবিধ। তবে দেশভেদে ও আকৃতিগত বৈষম্য নিবন্ধন ইহাদের আরও কএকটী শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশের মুনিঋষিরা ছাগজাতিকে কেবল গ্রাম্য বলিতেন।

"ছাগ-মেষ-বৃষাশ্বাদ্যাঃ গ্রাম্যাঃ প্রোক্তা মহর্ষিভিঃ॥"

বৈদিক সাহিত্যে ছাগ অর্থে অজ শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। এমন কি ঋগ্বেদে ছাগ ও মেষ বুঝাইতে 'অজভ্যাঃ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (৯.৩৪) লিখিত আছে, ব্রহ্মার মুখ হইতে অজের উৎপত্তি এবং ইহা গ্রাম্য পশুগণের অন্যতম।

বিভিন্ন দেশের ভাষায় ছাগলের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে—

প্রা° ইংরেজী—Gat ; আ° ইংরেজী—Goat , লাটিন—ago ; (ছাগশিশু অর্থে haedus) গথ°—gaits ; প্রা° জর্ম্মন্—Keiz ; আ° জর্ম্মন্—Geisz ; ফরাসী—Chevre ; গ্রীক্—aiz, aigos ; লিথু°—Ozys ; দিনেমার ও আইস্‌লণ্ড—Geit ; অবস্তা—বুজা : পহ্লবী ও ফার্সী—বুজ্ ; সংস্কৃত ও বাঙ্গালা—অজ, ছাগ, ছাগল ; হিন্দী ও মরাঠী—বকরা, বকরী ।

ভেড়া হইতে ছাগলের আকৃতিগত পার্থক্য যথেষ্টই রহিয়াছে। উপরন্তু আরও কয়টী বিশেষ বৈষম্য নির্দ্দেশ করা সহজসাধ্য। যৌবনকালে পুংছাগলের গায়ে উগ্র দুর্গন্ধ হয় ও তাহাদের নিম্নের থুত্‌নীতে দাড়ী গজায়। এতদ্ব্যতীত তাহাদের সম্মুখের পদদ্বয়ের খুরের মধ্যে গ্রন্থি আছে।

ইহাদের পায়ের চারিটী খুর ও দুইটী শৃঙ্গ ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ লোমে আবৃত। কোন কোন ছাগজাতির গায়ে কোমল এবং রেশমের ন্যায় চিক্কণ পশম হয়, কোন কোন জাতির লোম চুলের ন্যায় মোটা। ইহাদের লাঙ্গুল ছোট এবং কোন কোন জাতির শৃঙ্গ নাই। রোমন্থন করিবার সময় ভুক্তদ্রব্য মুখে উগারিয়া লয়, তখন 'হড়াৎ' করিয়া সামান্য একটী শব্দ হয়। ছাগলের বত্রিশটী দাঁত। তন্মধ্যে নিম্ন পাটীতে ২০টী এবং উপর পাটীতে ১২টী। নিম্ন পাটীর ২০টী দাঁতের মধ্যে দুই কসের ১২টী দাঁত দিয়া খাদ্যদ্রব্য চর্ব্বণ করে এবং সম্মুখের ৮টী দিয়া তৃণাদি ছিঁড়িয়া লয়। উপর পাটীর দুই কসে কেবল খাদ্যদ্রব্য চর্ব্বণ করিবার জন্য ১২টী দাঁত আছে। ভুমিষ্ঠ হইলে পর ছাগশিশুর কেবল ছয়টী কসের দাঁত থাকে। সম্মুখের দাঁতগুলি একুশ দিনের মধ্যেই বাহির হইয়া পড়ে। এক বৎসর কিংবা ১৫ মাসের পর সম্মুখের দুইটী দুধে দাঁত ভাঙ্গিয়া যায় ; তাহার পর নূতন দাঁত বাহির হয়। দুই বৎসর কিংবা ৩০ মাস বয়ঃক্রমে আর একটী সম্মুখের দাঁত পড়িয়া যায়, সাড়ে তিন বৎসরের ভিতর আর একটী দাঁত ভাঙ্গে ; বাকি দুটী সাড়ে চারি বৎসরের মধ্যে পড়িয়া যায়। অতএব পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত দাঁত দেখিয়া ছাগলের বয়ঃক্রম নিশ্চিত হইতে পারে। ডাক পুরুষের মতে ছাগল ১৩ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।

"নরা গজা বিশে শয়।
তার অর্দ্ধেক ঘোড়া রয়॥
বাইশ বলদা তের ছাগলা।
গুণে গেঁথে বরা পাগলা॥"

ছাগলের সম্মুখের পদদ্বয় অপেক্ষাকৃত ছোট ও খুরগুলি দৃঢ় হওয়ায়, পর্ব্বতের সঙ্কীর্ণ পথে ইহাদের দ্বারা পণ্যবাহন-কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয়। লাদক অঞ্চলে এবং হিমাচল বক্ষে এরূপ সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্ম দিয়া দেশান্তরে অর্থাৎ তিব্বতের অপর পারে যাইতে হইলে ছাগলের পৃষ্ঠে দ্রব্য বোঝাই দিয়া যাওয়া ভিন্ন উপায় নাই। ইহারা সহজে পর্ব্বতের ঢালু গাত্র চড়িয়া অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। 'যাক্' (Yak) নামক বন্য গরু যে সকল সঙ্কীর্ণপথে পণ্য লইয়া যাইতে অসমর্থ, বন্য ছাগলের পৃষ্ঠে তৎস্থানবাসীরা মাল বোঝাই দিয়া অতি সহজে সেই পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া দেশান্তরে চলিয়া যায়।

ছাগলের বয়ঃক্রম সাত মাস হইলে সন্তানোৎপাদনের শক্তি জন্মে। অজার বয়স এক বৎসর হইলে গর্ভধারণের কাল উপস্থিত হয়। কিন্তু উভয়ের বয়ঃক্রম আর একটু পরিপক্ব হইলে শাবকগুলি বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে। ছয় মাস গর্ভধারণের পর ছাগলের সন্তান হয় এবং সচরাচর দুইটী, ক্বচিৎ তিন চারিটী বাচ্ছা হইয়া থাকে। ছাগলের দুইটী মাত্র স্তন, তজ্জন্য এক কালে অধিক সন্তান হইলে তাহারা দুগ্ধের অভাবে সবল হইতে পায় না। দুইটীর অধিক সন্তান হইলে অনেক স্থলে তাহার দুই একটী বাচ্ছা মরিয়া যায়।

ছাগদুগ্ধ সুপাচ্য, এই কারণে সুপথ্য হিসাবে চিকিৎসকগণ ইহার বহুল ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা মধুর, শীতল ও ধারক গুণবিশিষ্ট ; এই কারণে কাসরোগীর পক্ষে হিতকর। ইহা অগ্নিবৃদ্ধিকর এবং রক্তপিত্ত ও ক্ষয়নিবারক। ছাগলে কটু ও তিক্ত দ্রব্য খায় এবং অল্প জল পান করে ; এই জন্য ইহার দুগ্ধের এত গুণ। অল্পবয়স্ক শিশুদিগের পক্ষে ছাগদুগ্ধ বিশেষ উপকারী।

প্রসবের দশদিন পরে ছাগলের দুগ্ধ পান করিবার ব্যবস্থা আছে। যথা—

"অজা গাবো মহিষ্যশ্চ ব্রাহ্মণী চ প্রসূতিকা।
শুদ্ধ্যন্তি দিবসৈরেব দশভির্নাত্র সংশয়ঃ॥" (স্মৃতি)

অনেক অজার গলায় স্তনের মত মাংসপিণ্ড গজায়। সেই স্তন নিরর্থক, তাহাতে দুগ্ধ হয় না। তাই নীতি-শাস্ত্রকারেরা একটী উপমা দিয়া নির্গুণ পুরুষের এইরূপ নিন্দা করেন—

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যস্যৈকোঽপি ন বিদ্যতে।
অজাগলস্তনস্যেব তস্য জন্ম নিরর্থকম্॥"

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের মধ্যে যাহার একটীও নাই, সে ব্যক্তির জন্ম ছাগলের গলার স্তনের মত নিরর্থক।

ছাগমাংস একটী বলকর খাদ্য। বহু প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে অজমাংস ভোজন করাইয়া অতিথি আপ্যায়নের

ব্যবস্থা ছিল। উত্তররামচরিতের চতুর্থাঙ্কে গৃহস্থকর্তৃক বাছুর, ষাঁড় অথবা ছাগল মারিয়া মুনিঋষি বা ব্রাহ্মণদের ভোজন করাইবার উল্লেখ আছে। পুরোহিতকে যজমান অজপঞ্চৌদন দান করিলে স্বর্গলাভ করিতেন।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ছাগমাংসের গুণাগুণ লিখিত আছে। ভাবমিশ্র লিখিয়াছেন—

"ছাগমাংসং লঘুস্নিগ্ধং স্বাদুপাকং ত্রিদোষনুৎ।
নাতিশীতমদাহি স্যাৎ স্বাদু পীনসনাশনম্॥
পরং বলকরং রুচ্যং বৃংহণং বীর্য্যবর্দ্ধনম্॥"

অর্থাৎ—ছাগমাংস লঘু, স্নিগ্ধকর, পাকে মধুর এবং বায়ু, পিত্ত, কফ এই ত্রিদোষনাশক। এই মাংস খুব শীতলও নয়, খুব উষ্ণও নয়। অপর মাংসের ন্যায় ইহার দাহিকা-শক্তি নাই। ইহা অতি সুস্বাদু এবং ইহা দ্বারা পীনস রোগ নষ্ট হয়। ইহা অত্যন্ত বলকর, রুচিকর, উত্তেজক ও শুক্রবর্দ্ধক।

অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, সেকালে পাঁঠীরও অত্যন্ত আদর ছিল, তাই আয়ুর্ব্বেদে পাঁঠা অপেক্ষা পাঁঠীর গুণ অধিক লিখিত হইয়াছে। যথা—

"অজায়া অপ্রসূতায়া মাংসং পীনসনাশনম্।
শুষ্ককাসেঽরুচৌ শোষে হিতমগ্নেশ্চ দীপনম্॥"

যাহার ছানা হয় নাই, এরূপ ছাগীর মাংস ভক্ষণ করিলে পীনস রোগ ভাল হয়। শুষ্ক কাস, অরুচি ও শোষ রোগের পক্ষেও ইহা উপকারী এবং অগ্নির উদ্দীপক।

কলিকাতার মিউনিসিপাল বাজারে ও মেছুয়াবাজারে মুসলমানের দোকানে আমরা যে পাঁঠী বিক্রয় হইতে দেখি, উহাকে 'হালোয়ান' বলে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত অপ্রসূতা ছাগী মুসলমানদের নিকট 'হালোয়ান' নামে প্রসিদ্ধ।

কচি পাঁঠার গুণ অত্যন্ত লঘু, হৃদ্‌রোগের পক্ষে উপকারী, জ্বরনাশক, স্বাদু ও অত্যন্ত বলকর। যথা—

"অজাসুতস্য বালস্য মাংসং লঘুতরং স্মৃতম্।
হৃদ্যং জ্বরহরং শ্রেষ্ঠং সুস্বাদু বলদং ভৃশম্॥"

ছাগলের অণ্ডের গুণ মৎস্যডিম্ব অপেক্ষা পুষ্ট ও বলকারী, সুস্বাদু ও পীনস রোগনাশক। ছাগ-অণ্ড খাইতে মধুর, তাই বোধ হয় সকলে ছাগ-অণ্ডকে মধুকোষ বলে। খাসীর গুণও লিখিত আছে। যথা—

"মাংসং নিষ্কাসিতাণ্ডস্য ছাগস্য কফকৃদ্ গুরু।
স্রোতঃ শুদ্ধিকরং বল্যং মাংসদং বাতপিত্তনুৎ॥"

যে ছাগলের অণ্ড নিষ্কাসিত করা হইয়াছে, এমন ছাগের (খাসীর) মাংস, কফবৃদ্ধিকর ও গুরুপাক। ইহা দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ শোধিত হয়। ইহা বল্য, মাংসদ এবং বাত ও পিত্তনাশক।

"উর্দ্ধজত্রুবিকারঘ্নং ছাগমুণ্ডং রুচিপ্রদম্।"

পাঁঠার মুড়ি খাইলে কণ্ঠাস্থির উর্দ্ধগত অঙ্গজাত রোগ নষ্ট এবং রুচি বর্দ্ধিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদের মতে বুড়া, রোগা ও মরা পাঁঠা খাওয়া উচিত নয়, ইহা অত্যন্ত রূক্ষ ও বায়ুবৃদ্ধিকর।

"বৃদ্ধস্য বাতলং রূক্ষং তথা ব্যাধিমৃতস্য চ।" (ভাবপ্রকাশ)

কিরূপ অজমাংসভোজন প্রশস্ত, তৎসম্বন্ধে ডাকের বচনে এইরূপ উক্তি দেখা যায়।

"অজা জালী, বুড়া মেষ।
দইএর আগ, ঘোলের শেষ॥
মাছের মা, শাগের ছা।
ডাক বলে এই দেখে খা॥"

সাধারণতঃ মাংসের পোলাও, ঝোল, কালিয়া, কোর্ম্মা, কাবাব, ভাজা চপ প্রভৃতি রন্ধন করিয়া খাওয়া হইয়া থাকে। মাংসের কাথ (সুরুয়া) দুর্ব্বল রোগীকে বলাধানের জন্য খাইতে দেওয়া হয়। অধুনা চিকিৎসকগণ কাঁচা মাংস নিষ্পেষণ-যন্ত্রে পিষ্ট করিয়া সেই রক্ত-রস (Meat-juice) রোগীকে খাইতে দেন।

ছাগলের চর্ম্মে ঢাক, ঢোলক, তবলা, মশক, তৈলকুপিকা প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। ছাগলের চর্ম্ম কসজলে সিদ্ধ করিয়া **Kid-skin, Gloss-kid** প্রভৃতি বাণিজ্যপণ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহা হইতে জুতা দস্তানা প্রভৃতি তৈয়ার হয়। সদ্য কাটা ছাগচর্ম্ম দগ্ধ করিয়া কোন কোন ইতর শ্রেণীর লোকে খাইয়া থাকে। ছাগলের লোমে চিত্রকরের তূলিকা, কম্বল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ইহাদের চর্ব্বি নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। খাদ্যদ্রব্য হিসাবে ইহার প্রয়োজনীয়তা কম নহে। ঘৃতের পরিবর্ত্তে অথবা ঘৃতের সহিত ভেজাল দিয়া ইহা খাওয়া যায়। ছাগবিষ্ঠা পচাইয়া ক্ষেত্রে সার দেওয়া হয়। রজকেরা 'ছাগলনাদী' জলে গুলিয়া কাপড়ের সহিত ফুটাইয়া লয়। উহাতে কার্পাসসূত্রের অভ্যন্তরস্থ তৈল ও ময়লা অপসারিত হইয়া যায়। ক্ষারজ গুণ অধিক পরিমাণে থাকায় বৈদ্যেরা কখন কখন ছাগলনাদী গরম করিয়া প্রলেপ দিতে বলেন। স্ফোটকাদিতে ছাগলনাদীর প্রলেপ দিলে স্ফোটক কমিয়া যায়। পার্শ্বশূলে ছাগলনাদী, হিং, আদা, আতপ চাউল ও অশ্বগন্ধার ছাল বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে। ছাগলনাদী জলে সিদ্ধ করিয়া সেই উষ্ণ জলে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর অবশাঙ্গ মর্দ্দন করিলে কতক উপকার

পাওয়া যায়। কৃত্রিম স্বর্ণ প্রস্তুত কালে ঘোড়া ও ছাগলের বিষ্ঠা দিয়া পারা ফুটাইয়া লইতে হয়। [স্বর্ণ দ্র°]

যৌবনকাল অতিক্রান্ত হইলে ইহাদের গাত্রে এক প্রকার বোট্‌কা গন্ধ হয় এবং ঐ সময়ে কোন কোন অজের দাড়ি বাহির হইয়া থাকে ; এই কারণে লোকে ইহাদিগকে 'বোকা পাঁঠা' বলে। পূর্ণ যৌবনে মাংস পাকিয়া কিংবা কোষ হইতে এই বোট্‌কা গন্ধ বাহির হয়, এ কথা আজিও নিশ্চিতরূপে অবধারিত হয় নাই। তবে বোট্‌কা গন্ধযুক্ত ছাগ যে কাসরোগীর পক্ষে উপকারী, এ কথা বৈদ্য মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। বৈদ্যকমতে নপুংসক ছাগ বিশেষ উপকারী। নপুংসক ছাগমাংস দিয়া 'ছাগলাদ্য' ও 'বৃহচ্ছাগলাদ্য' নামক বলকর ঘৃতৌষধ কবিরাজগণ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ছাগলের মধ্যে যেরূপ অধিকসংখ্যক নপুংসক পাওয়া যায়, অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে সেরূপ নপুংসক দেখা যায় না। অযোগ্য মিলন ইহার প্রধান কারণ বলিয়া চিকিৎসকগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। নপুংসক ছাগল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় বলিয়া সাধারণ ছাগল অপেক্ষা মূল্যবান্।

ছাগের অণ্ডকোষ কাটিয়া লইয়া তাহাদিগকে 'খাসী' করা হয়। ইহাতে তাহারা শীঘ্র শীঘ্র হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠে। ছাগল বা খাসী বড় হইলে তাহাদের শৃঙ্গে এক প্রকার কীট জন্মে। ঐ কীটের আভ্যন্তরিক উপদ্রবে তাহাদের সাময়িক মূর্চ্ছা অথবা মৃত্যু ঘটে। ছাগলের অন্ত্রে ও পিত্তকোষে এক প্রকার পাথর জন্মে। উহা বিষঘ্ন বলিয়া পূর্ব্বে লোকেরা নানা রোগে ঐ পাথর ঘসিয়া প্রয়োগ করিতেন।

ছাগলেরা প্রায় সকল প্রকার উদ্ভিদ্ খাইয়া থাকে। ইহাদের অখাদ্য কিছুই দেখা যায় না। কাঁটাগাছ খাইতেও ইহাদের কোন কষ্ট নাই। কিন্তু নবীন মঞ্জরী এবং নূতন তৃণেই কিছু অধিক রুচি। ইহারা প্রায় জল খায় না। ইহাদের শরীরেও জল লাগিলে অতিশয় কষ্ট বোধ করে, তাই বৃষ্টির সময় ঘরের বাহিরে যায় না। গায়ে অধিক জল লাগিলে কখন কখন গুটি নামে এক প্রকার রোগ জন্মে। গুটি রোগ জন্মিলে সর্ব্বাঙ্গের লোম ঝরিয়া যায়। গৃহপালিত ছাগল অনেকটা নিরীহ ; কিন্তু বড় বড় 'বোকা পাঁঠা' অতিশয় উপদ্রব করে। স্ত্রীলোক এবং বালকবালিকা দেখিলে তাহাদিগকে 'ঢুস' মারিয়া ফেলিয়া দেয়। হাতে খাদ্যদ্রব্য থাকিলে কাড়িয়া খায়। ভেড়ার সঙ্গে লড়াই লাগিলে ছাগল প্রায় জয়ী হয়। তবে দোষের মধ্যে এই, ঢুস মারিবার সময় ভেড়া মাথা হেঁট করিয়া ছুটিয়া আসে ; কিন্তু ছাগল মাথা তুলিয়া ঢুস মারে, তাই সাবধান হইতে না পারিলে ভেড়ার ঢুস ছাগলের বুকে কিংবা পেটে আসিয়া লাগে। ছাগলেরা খেলিবার সময় পরস্পর মারামারি করে। সম্মুখের দুটী পা তুলিয়া, ঘাড় ও মাথা একটু বক্র করিয়া এরূপ ভাব দেখায়, যেন সেই ঢুসে ব্রহ্মাণ্ড ফাটিয়া দুইখানা হইবে। কিন্তু এতটা আড়ম্বর মাত্র সার, আঘাত করিবার সময় উভয়ে কেবল শৃঙ্গে শৃঙ্গে অল্প ঠেকাঠেকি করে। তাই উদ্ভট কবিতায় আছে—"অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে। দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।"

ছাগলেরা উচ্চস্থানে শুইতে ভালবাসে। তাই প্রায় ভগ্ন প্রাচীরের উপর শুইয়া থাকে। অনেকে এইটী কুলক্ষণ মনে করেন। তাঁহারা বলেন, ছাগল কাহারও লক্ষ্মীশ্রী দেখিতে পারে না। গৃহস্থের বাটী ভাঙ্গিয়া যাউক, তাহার উপর শুইয়া সুখে নিদ্রা যাইতে পাইবে, ইহাই তাহাদের প্রার্থনা।

বহু প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের দেশে দেবতার নিকট ছাগ বলি দিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। কিরূপ ছাগ বলিদানে প্রশস্ত, তৎসম্বন্ধে যুক্তিকল্পতরুতে এইরূপ লিখিত আছে—

"নক্ষত্রাণাং বিভেদেন নরাণান্তু গণত্রয়ং।
তেষাং শুভায় নির্দ্দিষ্টং পশবস্তৎত্রয়ং বলৌ ॥
যে কৃষ্ণাঃ শুচয়শ্ছাগাঃ পশবোঽন্যে তথৈব চ।
দেবজাতিভিরুৎসৃজ্যাস্তে সর্ব্বার্থোপসিদ্ধয়ে ॥
যে পীতা হরিতা বাপি নরজাতেরুদীরিতাঃ।
যে শুক্লাশ্চ মহান্তো বা রক্ষোজাতেঃ শুভপ্রদাঃ ॥
যো মোহাদথবাজ্ঞানাদ্বলিমন্যং প্রযচ্ছতি।
বধ এব ফলং তস্য নান্যৎ কিঞ্চিৎ ফলং ভবেৎ ॥"

(যুক্তিকল্পতরু)

অর্থাৎ নক্ষত্রভেদে নরগণের তিনটী গণ নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ গণত্রয় অনুসারে বলিকার্য্যে নরগণের মঙ্গলার্থ পশুত্রয় বা ত্রিবিধ পশু নিরূপিত হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তি দেবজাতি বা দেবগণভুক্ত, তাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ নিখুঁত ছাগ বা অন্যবিধ ছাগ সর্ব্বার্থসিদ্ধির জন্য দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করিবেন। যাঁহারা নরগণ বা নরজাতি, তাঁহাদের পক্ষে পীত ও হরিতবর্ণ পশু বলিদানে প্রশস্ত। যাঁহারা রাক্ষস বা দেবারিগণের অন্তর্ভুক্ত, তাঁহাদের পক্ষে শুক্লবর্ণ ও বৃহৎ বৃহৎ পশু বলিকার্য্যে শুভপ্রদ। যে যজমান মোহে বা অজ্ঞানবশে এই বিধি না মানিয়া অন্য বলি প্রদান করে, তাহার পক্ষে একটা পশুবধ করাই সার হয়, অন্য কোন শুভফলই হয় না।

সাধারণতঃ যে ছাগলের শিং গজাইয়াছে ও শরীরের কুত্রাপি ক্ষত নাই এবং পূর্ব্বে যাহাকে শৃগালাদি পশুতে

কখনও দংশন করে নাই, তাহাই বলির যোগ্য। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে—

"অজানাং মহিষাণাঞ্চ মেষাণাঞ্চ তথাবিধাৎ।
প্রীণয়েৎ বিধিবদ্দুর্গাং মাংসশোণিততর্পণৈঃ॥
দুর্গায়া দর্শনং পুণ্যং দর্শনাদভিবন্দনং।
বন্দনাৎ স্পর্শনং শ্রেষ্ঠং স্পর্শনাদভিপূজনং॥
পূজনাৎ স্নপনং শ্রেষ্ঠং স্নপনাত্তর্পণং স্মৃতং।
তর্পণান্মাংসদানন্তু মহিষাজনিপাতনং॥"

অর্থাৎ ছাগলের, মহিষের এবং মেষের শোণিতমাংস দিয়া দুর্গাকে বিধিপূর্ব্বক তুষ্ট করিবে। দুর্গাকে দর্শন করিলেই পুণ্য হয়। কিন্তু দর্শন অপেক্ষা বন্দনাদিদ্বারা আরও অধিক পুণ্য জন্মে। আবার বন্দনাদি অপেক্ষা দুর্গাকে স্পর্শ করিলে ফল অধিক। স্পর্শের চেয়ে পূজায় অধিক পুণ্য। আবার পূজার চেয়ে দেবীকে স্নান করাইলে আরও ফললাভ হয়। স্নান করানো অপেক্ষা তর্পণ আরও শ্রেষ্ঠ। আবার যে পূজায় মাংস দানের জন্য মহিষ ও ছাগল বলি দেওয়া হয়, তাহার ফল আরও অধিক।

"অজস্য দশবর্ষাণি রুধিরেণ সুতর্পিতা" অর্থাৎ ছাগরক্ত দিয়া দেবীর তর্পণ করিলে তিনি দশবৎসর প্রীত থাকেন। এই বচনের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক হিন্দু পুণ্যলাভের নিমিত্ত জীবহিংসা করিতে মোটেই কুণ্ঠিত নহেন।

পাঁঠা কাটিবার সময় যদি দুই চোট লাগে কিংবা কাটামুণ্ড দৈবাৎ ডাকিয়া উঠে, তবে সমূহ বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা। দুই চোটে পাঁঠা কাটা হইলে তাহাকে 'বেঁড়ে পড়া' বলে। পাঁঠা বেঁড়ে পড়িলে পূজা অঙ্গহীন হইয়াছে, তজ্জন্য দেবতা বলি গ্রহণ করেন নাই, ইহাই সকলের বিশ্বাস। পাঁঠা বেঁড়ে পড়িলে পাছে গৃহস্থের কোন বিঘ্ন ঘটে, সে কারণ সেই বেঁড়ে পাঁঠার মাংস দিয়া হোম করিতে হয়। হোম করিলে সকল দোষের শান্তি হইয়া থাকে। [বলি দ্র°]

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সাধারণতঃ ছাগল বন্য ও গৃহপালিত ভেদে দ্বিবিধ। বন্য ছাগল একমাত্র প্রাচ্যভূখণ্ডেই দেখা যায়। ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকায় মাত্র দুইচারিটী শ্রেণী এবং অবশিষ্ট দক্ষিণ পশ্চিম ও মধ্য এসিয়া হইতে সুদূর ভারতোত্তরে হিমাচলশিখরে বাস করিতে দেখা যায়।

পারস্যের প্রসিদ্ধ পশং নামক বন্য ছাগ (Capra hircus aegagrus) আকারে বড়। এসিয়া-মাইনর ও পারস্যের পর্ব্বতময় প্রদেশে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থান হইতে ঐ জাতীয় ছাগ সিন্ধুপ্রদেশে আনীত হইয়া আকৃতিগত বৈষম্যনিবন্ধন স্বতন্ত্র সংজ্ঞা (C. h. blythi) প্রাপ্ত হইয়াছে। ইউরোপের সাইক্লেদিস্ ও ক্রীট্ দ্বীপে এই জাতীয় ছাগল (C. h. creticus) ক্ষুদ্রকায় হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু গ্রাম্য ছাগলের সহিত সংমিশ্রণ না হওয়ায় ইহাদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষিত আছে। এই জাতীয় ধাড়ী ছাগলের শিংগুলি বড় ও লম্বা, দেখিতে ছোরার মত ও সুন্দর; ছোট ঘাড়ের উপর লতাইয়া পৃষ্ঠের উপর পর্য্যন্ত বাঁকিয়া অগ্রভাগ ছুঁচাল হইয়া আসিয়াছে। সর্ব্বশরীর ধূসরবর্ণ লোমে আবৃত। পৃষ্ঠদণ্ডের উপর একটী কাল রেখা এবং পুচ্ছ ক্ষুদ্র। উদর ও দাড়ির রোম ঈষৎ কটা। হেব্রাইদিস্, শেট্‌লণ্ড, কানারী, এজোর্স, এসেন্সন ও জুয়ান ফার্ণাণ্ডেজ নামক দ্বীপসমূহে অনেক পালিত ছাগল বন্য ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এজোর্স দ্বীপের ছাগলের শৃঙ্গ ঋজুভাবে ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত। ইহারা Antelope goat নামে প্রসিদ্ধ।

বন্য ছাগের মধ্যে গঠনসাদৃশ্যে আল্পস্ পর্ব্বতমালার আইবেক্স (Capra ibex) ছাগল বিশেষ বিখ্যাত। ইহারা জর্ম্মনী, সুইজার্লণ্ড, টাইরোল ও আল্পস্ পর্ব্বতে বাস করে এবং লম্বায় ৪॥ ফুট ও উর্দ্ধে প্রায় ৪০ ইঞ্চ হয়। শৃঙ্গগুলিও দৈর্ঘ্যে প্রায় ১ গজ। ইহাদের সম্মুখের পদ পশ্চাতের পদদ্বয় অপেক্ষা ছোট হওয়ায় ইহারা সহজে পর্ব্বতের ঢালু গাত্রে আরোহণ করিতে পারে। ভারতের সিন্ধু প্রদেশে ও নীলগিরি পর্ব্বতে (Hemitragus hylocrius) আইবেক্স জাতীয় ছাগ দেখা যায়।



ইহারা 'তহ্‌র্' নামে খ্যাত। এতদ্ভিন্ন উত্তর এসিয়ার সাইবেরিয়া রাজ্যে (C. sibirica), আরব, নিউবিয়া (C. nubiana), আবিসিনিয়া (C. vali), ককেশস পর্ব্বত (C. caucasica, C. pallasi), স্পেনদেশে (C. pyrenaica) ও তিয়ানশানে আইবেক জাতির বাস আছে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর আইবেক ইউরোপের আইবেকদিগের অপেক্ষা দেখিতে সুন্দর।

ভারতের প্লিওসিন (Pliocene) যুগের নিম্ন স্তরে একজাতীয় বন্য ছাগের অস্থি পাওয়া গিয়াছে। আকৃতিগত বৈষম্য থাকিলেও বর্ত্তমান মার্খোর (Markhor C. falconero) জাতীয় ছাগদিগকে উহাদের বংশধর বলা যায়। হিমালয়পর্ব্বত, কাশ্মীরের পীরপঞ্জাল হইতে বাল্‌তিস্থান, আস্তোর, হান্‌জা, আফগানিস্থান এবং সিন্ধুনদের অপর

পারস্থিত পঞ্জাব প্রদেশে মার্খোর ছাগলের বাস আছে। ইহাদের শৃঙ্গদ্বয় কোণাকারে সমুন্নত ও পরস্পরে বিচ্ছিন্ন।

উত্তর আমেরিকার রকী পর্ব্বতে আর এক জাতীয় বন্য ছাগল দেখা যায়। ইহারা রকী পর্ব্বতজাত বা শ্বেতবর্ণ ছাগ (Rocky mountain goat বা white goat) নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা সাধারণতঃ শ্বেতবর্ণের হইয়া থাকে। ইহাদের শৃঙ্গ কোণাকার, ফাঁপা ও পশ্চাদ্দিকে হেলান। গাত্রলোম বড় ও নিম্নপ্রসারী। নীচের থুত্‌নিতে ছোট্ট ছোট দাড়ী আছে। কান মাঝারি ও লেজ ছোট



এবং স্কন্ধদেশ ঈষৎন্যুব্জ। ভূমিতল হইতে স্কন্ধের উচ্চতা প্রায় ৩ ফুট। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে কিয়াক দ্বীপের (Kyak Island) বিপরীতদিক্‌স্থ পর্ব্বতাংশে কজার নদীর মোহানার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে একটী সাদা ছাগলের মাথা পাওয়া যায়। করোটীর গঠন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহাকে তদ্দেশের প্রভাবোৎপন্ন একটী স্বতন্ত্র ছাগজাতি (Oreamnus montanus Kennedyi) বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহাদের আকৃতি হিমালয়জাত 'শরাউ' নামক ছাগাকৃতি হরিণের অনুরূপ। [শরাউ দ্র°]

আমাদের দেশে গৃহপালিত ছাগ সাধারণতঃ তিন প্রকার—

(১) বঙ্গদেশীয় ছোট ছোট ছাগল। ইহাদের গায়ের রোম বড় হয় না এবং নানা রঙের হইয়া থাকে। ইহাদের কান ছোট; দুধও কম দেয়।

(২) আলাহাবাদ হইতে কানপুর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ অন্তর্ব্বেদীর মধ্যস্থলের ছাগেরা মধ্যমাকৃতি হয়। দুগ্ধও বেশী দেয়। ইহারা শুক্‌না ঘাস, পাতা প্রভৃতি খাইয়া থাকে। বর্ষাকালে হরিদ্বর্ণ তৃণভোজন ইহাদের পক্ষে অহিতকর।

(৩) রামছাগল আকারে বড়। কান গলদেশ পর্য্যন্ত লোটান। রঙ্‌ কাল, শাদা ও পাট্‌কিলে হয়। গড়বালীরা ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অনেকে রামছাগল পোষে। ইহারা একটী ছোট গরুর সমান দুধ দেয়। হিমালয়ের পর্ব্বতীয় প্রদেশ ইহাদের জন্মস্থান। ইহাদের মাংস কঠিন ও দুষ্পাচ্য, খাইতেও তত ভাল লাগে না। রামছাগলের দুগ্ধে ঘৃত প্রস্তুত হয় এবং পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে এই ঘৃতে মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন দেশভেদে জন্ম হেতু ছাগলের আকৃতিগত বৈষম্যও যথেষ্ট ঘটিয়াছে। এমন কি হঠাৎ দেখিলে উহাদিগকে স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া ভ্রম হয়। ইউরোপের সর্ব্বত্র যে সকল সাধারণ ছাগল দেখা যায়, উহাদের সহিত এসিয়া মহাদেশজাত ছাগলের অনেক পার্থক্য আছে। ইউরোপীয় ছাগলের কান খাড়া অথবা সোজা হয়; কিন্তু এসিয়ার ছাগলের কান নিম্নদিকে লোটান। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে প্রধানতঃ স্বল্প-লোম ও লোমবহুল দুইশ্রেণীর ছাগলের বাস আছে। ইহাদের লোমের নিম্নে সরু সরু রেশমী রোম থাকায় গাত্রাবরণ ঘন-সন্নিবিষ্ট বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য ইউরোপীয় ছাগলের ন্যায় ইহাদের শৃঙ্গ সরল ও সমান্তরালভাবে পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত প্রলম্বিত এবং শৃঙ্গমূল চেপ্টা ও শৃঙ্গমুখ ছুঁচাল। ইংলণ্ডের ছাগ অপেক্ষা আয়র্লণ্ডের ছাগ কম দুধ দেয়।

ফরাসীদেশের ছাগগুলি প্রায়ই ইংলণ্ডীয় ছাগের মত; তবে লোমের দৈর্ঘ্য, বর্ণবৈষম্য ও শৃঙ্গের গঠনে কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। নরওয়ে রাজ্যে যে ছাগ জন্মে, তাহাদের রোম রূপার মত সাদা ও দীর্ঘ এবং শরীরের গঠন খর্ব্ব। এই জন্য এই শ্রেণীর ছাগল দেখিতে খুব ছোট হয়, মনে হয় যেন রোমাচ্ছাদিত মাংসপিণ্ড। ইহাদের সকলের মুখের গঠন, কপালাস্থি ও শৃঙ্গ স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন। কাহারও কপাল মেড়ার ন্যায় উচ্চ, কাহারও বা সাধারণ ছাগলের ন্যায় সমভাবাপন্ন। মাল্টা দ্বীপের ছাগলের কান লম্বাচওড়া ও চোয়ালের নিম্নপর্য্যন্ত ঝোলা। এই জাতীয় ছাগলের শৃঙ্গ হয় না এবং লোমগুলি হরিদ্রাভ শ্বেত।

সিরিয়া দেশজাত ছাগল অনেক স্থানেই দেখা যায়। মিশরদেশে, ভারত মহাসাগরের উপকূলে এবং মাদাগাস্কার দ্বীপে ইহাদের বাস। ইহাদের লোম খুব বড় ও কান লম্বা হয়। লোম মধ্যে মধ্যে ছাঁটিয়া না দিলে কাঁটায় বাধিয়া অথবা পাথরে আট্‌কাইয়া ছিঁড়িয়া যায়।

অঙ্গোরার ছাগল ও কাশ্মীরজাত ছাগল একই জাতীয় বলিয়া অনেকের ধারণা, কিন্তু উহারা পরস্পরে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পুংছাগের শিং বড় ও ঘাড়ের দিকে বাঁকা। স্ত্রী-ছাগীর শিং ছোট, কিন্তু চূড়াকার। গায়ের লোম খুব বড়, সরু, নরম ও চক্‌চকে হয়। কোন ছাগলের লোম চুলের মত কঠিন, কাহারও বা নরম এবং কোঁকড়ান। প্রতিবৎসর বসন্তের পূর্ব্বে এই লোম ছাঁটিয়া লওয়া হয় এবং প্রতি ছাগে প্রায় ২॥ পাউণ্ড লোম পাওয়া যায়। খাসীর লোমই সব চেয়ে ভাল; তার চেয়ে নিরেশ পাঁঠীর লোম।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কন্‌স্তান্তিনোপল হইতে অঙ্গোরার ছাগল কেপকলনীতে লইয়া পালনের ব্যবস্থা হয়। এ সকল স্থানের ছাগলেরা কম দুধ দেয় এবং স্বীয় সন্তানাদির যত্ন লয় না। কিন্তু খাদ্য হিসাবে ইহাদের মাংস সুমধুর।

কাশ্মীরী বা তিব্বতদেশজাত ছাগল হিমালয়ের অধিবাসী।

তবে ভিন্ন ভিন্ন অংশে পালিত। ইহাদের মুখ সরু ও ছোট, কান বড় ও অল্প ঝোলা, শিং লম্বা ও সোজা, এবং কখন কখন বাঁকা হইয়া একটী আর একটীর উপর গিয়া পড়ে। সমস্ত দেহ বড় বড় লোম দিয়া ঢাকা। উপরের লোম চুলের মত শক্ত, নীচের লোম নরম ও পশমের মত চক্‌চকে। একটী কাশ্মীরী ছাগলের গায়ে প্রায় আধ সের উৎকৃষ্ট পশম পাওয়া যায়। তিব্বতদেশীয় ও মঙ্গোলীয় ছাগলের লোম ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। তিব্বতের অধিবাসীরা লোমের জন্য ছাগল পোষে। লাদক প্রভৃতি স্থানে ছাগলোম বিক্রয়ার্থ সংগৃহীত হয়। উহা পূর্ব্বে কাশ্মীরের রাজদরবার হইতে খরিদ করা হইত এবং কাশ্মীরের ভাল ভাল শাল ঐ ছাগলোমে প্রস্তুত হইত। একসময়ে ঐ পশম লইয়া কাশ্মীর ও পঞ্জাবে প্রায় ১৬ হাজার তাঁত চলিত। [শাল ও পশম দ্র°] শরৎকাল হইতে ছাগলের লোম গজাইতে আরম্ভ করে। বসন্তের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তারপর আস্তে আস্তে গাত্র হইতে লোম ঝরিয়া পড়ে। ঝরিবার পূর্ব্বে লোম কাটিয়া লয় এবং একত্র সংগ্রহ করিয়া বাজারে বিক্রয় করে।

নিউবিয়ার ছাগল আফ্রিকার নিউবিয়া রাজ্যে, উত্তর মিশরে ও আবিসিনিয়ায় বাস করে। অন্যান্য ছাগলের সহিত তুলনায় ইহাদের বিভিন্নতা অনেক। ইহাদের পা খুব



বড়, গায়ের লোম ও শৃঙ্গ দুইটী ছোট। মুখাকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; মুখ, নাসারন্ধ্র ও কপালের হাড় উঁচু এবং কান দুইটীও লোটান।

থিবস্‌দেশীয় ছাগল (Theban goat) সুদান প্রদেশে দেখা যায়। ইহাদের মাথা ও করোটীর হাড় ভেড়ার মত; অন্যান্য আকৃতিগত সাদৃশ্য নিউবিয়া দেশজাত ছাগলের অনুরূপ।

নেপালী ছাগলকে নিউবিয়া-ছাগলের বংশধর বলিয়া মনে হয়। আকৃতিগত সাদৃশ্য অনেক আছে, পার্থক্যের মধ্যে নেপালী ছাগের শৃঙ্গ পেঁচাল (Spiral), লোম বড় এবং রঙ্ কাল, সাদা বা ধূসর ও মিশ্র হয়।

গিনি দেশের ছাগল ক্ষুদ্রাকার তিনশ্রেণীর হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে সাধারণ ছাগল ভিন্ন Capra recuma অতি অল্পই প্রতিপালিত হয়। এতদ্ভিন্ন মরিশস, মাদাগাস্কার ও বোঁর্বো দ্বীপে C. depressa নামক ছাগল পাওয়া যায়। শ্বেত নীলনদ (White Nile) প্রবাহিত নিম্ন-মিশর দেশের ছাগ ইহা হইতে স্বতন্ত্র।

এক্ষণে দেখা যাউক পুরাকালে বিভিন্ন দেশে ছাগল কোন কার্য্যে কি ভাবে ব্যবহৃত হইত। গ্রীক্ আখ্যায়িকা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ছাগ জিয়ুসের স্রষ্ট এবং এমলথিয়া নাম্নী এক অজা জিয়ুস্‌কে স্তন্যদানে পালন করিয়াছিল। তিনিও কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য উক্ত অজার চর্ম্মদ্বারা আপনার উরস্ত্রাণ আচ্ছাদন করিয়াছিলেন।

গ্রীক্-পুরাণে আর্গসে হেরার পূজায় ছাগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময় হেরা বনমধ্যে পলায়ন করেন এবং ছাগই তাঁহার গুপ্ত স্থান প্রকাশ করিয়া দেয়। তজ্জন্য যুবকেরা ছাগের গায়ে বর্শা ছুঁড়িত এবং যাহার বর্শা ঐ ছাগীকে বিদ্ধ করিত, সেই উহা পুরস্কার-স্বরূপে পাইত।

এথেনীর পূজায় ছাগের সংস্পর্শ নিষিদ্ধ। তবে বৎসরের ভিতর একদিন মাত্র অক্রোপোলিশে ছাগী হনন করা হইত। আবার এথেনীদেবীর চর্ম্মফলক মৃত ছাগের চর্ম্মে নির্ম্মিত।

স্পার্টায় শত্রুকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে আর্টিমিসের নিকট ছাগবলি দেওয়া হইত। ইজিয়ানায় ছাগের শৃঙ্গে মশাল বাঁধিয়া দিলে আক্রমণকারীরা পলায়ন করিত বলিয়া লোকের বিশ্বাস। আটিকায় মারাথনের নিকট ৫০০ ছাগ উৎসর্গ করা হইত।

এফ্রোডাইট ছাগের উপর চড়িতেন, সম্ভবতঃ অজাই ছিল তাঁহার পবিত্র বাহন।

রোমে লুপারকেলিয়া উৎসবে ছাগবলি হইত এবং যুবকেরা উৎসর্গীকৃত ছাগচর্ম্মে আবৃত থাকিত। তাহারা ভোজের উৎসবে যোগদান করিবার পর পালেটাইনের পাদপীঠের চারিদিকে চর্ম্মরজ্জু লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত এবং যে সকল রমণীর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইত, তাহাদিগকে ঐ চর্ম্ম-রজ্জু দ্বারা আঘাত করিত কিংবা যাহারা ঐরূপে আহত হইতে চাহিত, তাহাদিগকে আঘাত করিত।

আবার অনেকের বিশ্বাস, সম্ভবতঃ উদ্ভিজ্জজগতের দেবতা-স্বরূপে ডায়োনিসাস্ ছাগমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। ছোট

খাট অনেক দেবতার যেমন পান, সিলিনাস, মাটির, ফৌনস্‌ প্রভৃতির আকৃতি ছাগের মত কিংবা তাহাদের দেহের কোন না কোন অংশ ছাগের দেহের অংশ-বিশেষের অনুরূপ। ইউরোপের সয়তানের মূর্ত্তিতে দেখা যায় যে, তাহার এক পদে ছাগলের খুর আছে। মধ্যযুগের ভূতবিদ্যায় (Demonology) সয়তান ও ডাইন্‌দিগের সহিত ছাগলের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্রামদিবসে প্রায়শঃ সয়তান ছাগমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। উত্তর ইউরোপে বনদেবী (Wood-spirit) উল্‌সাইর শৃঙ্গ, কর্ণ ও পদ ছাগলের মত এবং শস্যদেবী ছাগমূর্ত্তিতেই দেখা দিয়া থাকেন।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকে সারকাসীয় তাতারেরা সেন্ট এলিয়সের দিনে সাধারণতঃ মেষশাবককে বলি দিত, কোন কোন স্থলে ছাগবলিও প্রদত্ত হইত। বলি দিবার মত ছাগ পাওয়া গেলে পূজকেরা ইহার গাত্রচর্ম্ম কর্ণের উপর তুলিয়া ধরিয়া একটী কীলকের উপর রক্ষা করিতেন। তৎপরে মাংস রন্ধন করিয়া পুরুষ ও রমণী একত্রে ভোজনে প্রবৃত্ত হইত। আহারের পর পুরুষেরা ছাগচর্ম্মের নিকট প্রার্থনা করিত এবং রমণীরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইত। সেই সময়ে উহারা ব্রাণ্ডি খাইয়া ভক্তিভরে উৎসবে যোগদান করিত।

আফ্রিকার বিজাগো জাতির ছাগই প্রধান উপাস্য। মানা নদীতে ইষ্টদেবতার মত ইহাদিগকে রাখা হয়। কখন কখন মৃতব্যক্তিদের আত্মা ইহাদের ভিতর রক্ষিত হয়। সান সাল্‌বদরের রাজা তাঁহার আত্মাকে ছাগলের ভিতর রাখিয়াছিলেন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

আবার সুন্দা দ্বীপে ছাগলের নাম পর্য্যন্ত করিতে নাই। বেচুয়ানাদিগের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের নিকট ছাগ নিষিদ্ধ জীব। তাহাদের বিশ্বাস, ছাগের দিকে চাহিলেও তাহারা অপবিত্র হইয়া যাইবে এবং তাহাদের মনে অত্যন্ত অসন্তোষের ভাব জন্মিবে। ছাগল যদি কোন গৃহের ছাদের উপর উঠে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে বর্শা দ্বারা আহত করা হয়। কারণ, যদি ইহাকে মারিয়া না ফেলা হয়, তাহা হইলে বাড়ীর কর্ত্তাকে ছাগ মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিবে। ডাইন্‌দিগের সাহচর্য্যে থাকে বলিয়া ছাগলের উপর ইহারা এত বীতশ্রদ্ধ।

ইহুদীদিগের ভিতর একটী প্রথা আছে যে, মানুষের পাপ বোঝাই করিয়া একটী ছাগকে বনমধ্যে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। মানুষের পাপগ্রাহীরূপে পশ্চিম আফ্রিকার লোকেরা এবং উগাণ্ডাবাসীরা ছাগ উৎসর্গ করে। তিব্বতে ছাগচর্ম্মে আবৃত করিয়া এক মানুষের ঘাড়ে সকল মানুষের পাপের বোঝা চাপাইয়া দিয়া লাথি মারিয়া ও চপেটাঘাত করিয়া অন্যত্র পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

ব্রহ্মদেশে কারেণদের বিশ্বাস যে, চন্দ্র বা সূর্য্যকে ছাগল খাইয়া ফেলে বলিয়া গ্রহণ হয় এবং এই কারণে ইহারা ঐ ছাগকে তাড়াইবার জন্য গ্রহণের সময় গোলমাল করিয়া থাকে।

বোহেমিয়ায় সেপ্টেম্বর মাসে গীর্জ্জা হইতে ছাগলকে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

ট্রান্‌সিল্‌ভেনিয়ায় সম্ভবতঃ প্রজননশক্তি-বৃদ্ধির জন্য বিবাহের সময় ছাগলের নৃত্য হয়। এই শেষোক্ত কারণে বুলগেরিয়ায় কন্যার পিতামাতা কর্ত্তৃক কন্যাকে ছাগল উপঢৌকন দিবার রীতি প্রচলিত আছে। এখানে ও উত্তর পালেটিনেটে ছাগ-মাংস ভোজে প্রধান খাদ্য বলিয়া বিবেচিত।

দক্ষিণ আফ্রিকায় মেটিয়েবেলদিগের ভিতর বরকন্যার সহচরীদের মধ্যে একটী ছাগমাংসের ভোজ হইয়া থাকে।

ভোসজেসে ছোট ভগিনী পূর্ব্বে বিবাহ করিলে বড় ভগিনীকে একটী শ্বেতবর্ণের ছাগল উপহার দেয়।

বড়দিন বা কোন বিশেষ উৎসবে ইউরোপে ছাগলের মিছিল বাহির হয়।

[অন্যান্য বিবরণ 'ছাগ' ও 'ছাগল' শব্দে দ্র°]

অজ,,—(দেশজ) নিরেট, আদৎ, খাঁটি। যেমন, অজ মূর্খ; অজ চাষা; অজ পাড়াগেঁয়ে ইত্যাদি।

অজক—(পুং) চন্দ্রবংশীয় রাজা সুজহ্নুর পুত্র। ইঁহার পুত্রের নাম বলাকাশ্ব। (বিষ্ণুপু°) হরিবংশমতে, ইনি জহ্নুর পুত্র। ২ সোমবংশীয় বলাকের পুত্র। (ভাগবত) ৩ সুনন্দের পুত্র এবং জহ্নুর পৌত্র। ইঁহার পুত্র বলাকাশ্ব। (ব্রহ্মপু°) ৪ ইনি চন্দ্র-বংশীয় রাজা যদুর পঞ্চ পুত্রের অন্যতম। (বিষ্ণুপু°) ৫ চন্দ্রবংশীয় রাজা সুনহের পুত্র। (হরিবংশ) ৬ দানবরাজ বৃষপর্ব্বার ভ্রাতা। ইনি শাল্ব নরপতিরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভারত) ৭ দক্ষ প্রজাপতির কন্যা দনুর গর্ভে মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে যে চল্লিশটী অমিততেজা পরাক্রমশালী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। (পদ্মপু°, সৃষ্টিখণ্ড) ৮ সূতপ্রোক্ত কলিযুগের ভবিষ্য রাজবংশবর্ণনায় ইনি (মগধরাজ) প্রদ্যোতের বংশধর বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, বীতিহোত্র বংশের রাজত্বকালে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে অবজ্ঞা করিয়া মুনিক নামে জনৈক রাজকর্ম্মচারী স্বীয় প্রভু প্রদ্যোতকে নিহত করিয়া তাঁহার পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবে। এই নব নৃপতি ত্রয়োবিংশতি

বৎসর রাজত্ব করিবেন। অনন্তর রাজা পালক চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ, তৎপর নৃপতি বিশাখযূপ পঞ্চবিংশতি বর্ষ, অনন্তর রাজা অজক একত্রিংশ বর্ষ রাজ্যভোগ করিবেন। (ব্রহ্মাণ্ডপু°, ৯৯.৩০৯-৩১৩)

অজকর্ণ—(পুং) [অজস্য কর্ণ ইব পর্ণং যস্য ; বহুব্রী] [বৈদ্যক] ছাগকর্ণবৎ লম্বমান পত্রযুক্ত শালতরুবিশেষ। ২ আসনবৃক্ষ ; (রত্নমালা) ৩ বালসর্জ্জ। (রত্নাবলী) ৪ পীতশাল, চলিত আসনা, পিয়াশাল ; হিন্দী—আসন্। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, কষায়, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ, পাণ্ডু, কর্ণরোগ, প্রমেহ, কুষ্ঠ, ও বিষব্রণনাশক। ৫ সর্জ্জবৃক্ষ। (রাজনি°) ৬ মহাসর্জ্জ-তরু, শালভেদ। (সুশ্রুত, সূত্র°, ৩৮ অ°) ৭ মরিচবৃক্ষ। (বাচস্পতি) [৬-তৎ] ৮ ছাগলের কর্ণ।

অজকর্ণক—(পুং) [অজকর্ণ ইব কায়তি পত্রেণ প্রকাশতে কৈ-ক] [বৈদ্যক] শালবৃক্ষ। [অজকর্ণ দ্র°]

অজকব—(পুং ক্লী) [অজো বিষ্ণুঃ কো ব্রহ্মা তৌ বাতি ত্রিপুরাসুরবধদ্বারা অনেন বা-ক করণে ; ৬-তৎ] শিবধনুঃ ; ত্রিপুরাসুরের বধে শিব এই ধনু দ্বারাই ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুকে তুষ্ট করিয়াছিলেন ; এই জন্য শিবধনুর নাম অজকব। [বৈদ্যক] ২ বাবুইগাছ।

অজকা—(স্ত্রী) [অজস্য বিকারঃ অবয়বঃ গলস্তনঃ পুরীষং বা অজ-কন্] ছাগগলস্থ স্তনাকার মাংসপিণ্ড। ২ ছাগবিষ্ঠা। [বৈদ্যক] ৩ নেত্ররোগবিশেষ। (বাভট, উ, ১০ অ°) ৪ অজকর্ণবৃক্ষ।

অজকাজাত—(ক্লী) [অজকেব জাতঃ ; ৫-তৎ] [বৈদ্যক] নেত্রতারকাগত রোগবিশেষ। ইহার আকার অজাপুরীষের ন্যায়।

"অজাপুরীষপ্রতিমো রুজাবান্
সলোহিতো লোহিতপিচ্ছিলাস্রঃ।
বিদার্য্য কৃষ্ণং প্রচয়োঽভ্যুপৈতি
তং চাজকাজাতমিতি ব্যবস্যেৎ॥" (সুশ্রুত)

এই রোগ জন্মিলে নেত্রদ্বয়ে ব্যথা হয়, দুই চক্ষু লাল হইয়া উঠে এবং পূঁযস্রাব হইতে থাকে। [ইহার অন্যান্য লক্ষণ মাধবনিদানে দ্র°]

চক্ষুর শ্বেতপটল পাৎলা হইয়া অর্ব্বুদাকারে বর্দ্ধিত হইলে অজকাজাত বলা হয়। এই বৃদ্ধি সম্মুখদিকে বা পশ্চাদ্দিক্ হইতে দেখা যায়। চক্ষুর শ্বেতপটলের প্রদাহ, কোনরূপ আঘাত অথবা কোনরূপ অর্ব্বুদ হইতে এই রোগ জন্মে। পুরাতন ধূসরমন্থরোগ (Glaucoma) হইতেও ইহা জন্মিতে পারে। এই রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে অন্ধতা উপস্থিত হইয়া থাকে। ধূসরমন্থজনিত অজকাজাত রোগে চক্ষুর তারকামণ্ডলের (iris) কিয়দংশ ছেদ করিলে রোগ আরোগ্য হইতে পারে। অন্যান্য প্রকারের অজকাজাতে অক্ষিগোলক উৎপাটিত করিতে হয়।

অজকাব—(ক্লী) [অজকৌ অবতীতি-ক] শিবধনুঃ। [অজকং ছাগং বাতি প্রীণাতি বা-ক] (পুং) [বৈদ্যক] ২ বর্ব্বরী বৃক্ষ, চলিত বাবুই। ইহা ভক্ষণে ছাগের অত্যধিক তৃপ্তি হয় বলিয়াই বাবুই গাছের এই নাম। [বাবুই দ্র°]

[অজকা অজাগলস্তন ইব বাতি প্রকাশতে বা-ক] ৩ যজ্ঞীয় মৈত্রাবরুণ পাত্রবিশেষ। ইহা অজাগলস্তনাকার কাষ্ঠাবয়বযুক্ত। (শতপথব্রা° ৪.১.৪.১৯) (পুং) ৪ অজকা-জাত নামক রোগভেদ। [অজকাজাত দ্র°]

অজকাশ্ব—(পুং) জহ্নুর পুত্র। ইঁহার পুত্রের নাম বলাকাশ্ব। এই বংশে বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করেন। (অগ্নিপুরাণ) [অজক দ্র°]

অজকূলা—(স্ত্রী) বৌদ্ধদিগের একটী নগরী।

অজকেতু—(পুং) একজন রাজা। কাঠিয়াবাড়ের কাঠী জাতিরা বলিয়া থাকে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ হইতেছেন, অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় রাজা বৃষকেতু। এই বংশে অজকেতু জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথম সৌরাষ্ট্রদেশে আগমন করিয়া দুর্গাদি ও বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

অজকেশী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] নীলীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

অজক্ষীর—(ক্লী) [অজায়া ক্ষীরং ; ৬-তৎ। পুংবদ্ভাবঃ] [বৈদ্যক] ছাগীস্তন্যদুগ্ধ। "অজক্ষীরেণ পাচয়েৎ।"

অজক্ষীরনাশ—(পুং) [বৈদ্যক] শাখোট বৃক্ষ, চলিত শেওড়া গাছ।

অজগ—(ক্লী) [অজং বিষ্ণুং গচ্ছতি শরত্বেন গম-ড] শিব-ধনুঃ। [অজেন ব্রহ্মণা গীয়তে গম্যতে বা কর্ম্মণি গৈ-ক, বা গম-ড] (পুং) ২ বিষ্ণু। [অজেন গচ্ছতীতি অজ-গম-ড] ৩ অগ্নি।

অজগঁই—অযোধ্যার উনাও জেলার একটী নগরী। ইহা উনাও নগর হইতে ১০ মাইল ও লক্ষ্ণৌ হইতে ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড রেলপথের ষ্টেশনের নামও অজগঁই। পূর্ব্বে ইহার নাম প্রতিষ্ঠাতা ভানসিংহের নামানুসারে 'ভানপাড়া' ছিল। কিন্তু পরে ব্রহ্মার নামানুসারে এই স্থানের নাম অজগঁই করা হয়। কারণ ব্রহ্মার অপর নাম হইতেছে অজ।

অজগন্ধ—(পুং) মহাদেবের নামান্তর। মহাদেবের অনুচরবর্গ যখন গঙ্গাদ্বারে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিতেছিল, তখন যজ্ঞ মৃগরূপ ধারণ করিয়া সবেগে পলায়ন করিতে থাকেন। মহাদেব স্বয়ং তাঁহাকে বাণদ্বারা বিদ্ধ করেন ও তাঁহার দেহ

রুধিরপ্লাবিত হইয়া পড়ে। এই জন্য দেবগণ মহাদেবকে অজগন্ধ ও তাঁহার পত্নীকে অজগন্ধা নামে অভিহিত করেন। (পদ্মপু°, সৃষ্টি°)

অজগন্ধা,—(স্ত্রী) [অজস্য গন্ধ ইব গন্ধোঽস্যাঃ] [বৈদ্যক] বনযমানী বা ক্ষেত্রযমানী; Ocymum gratissimum। (অমর; রত্নাবলী) বনযমানীর গুণ—কটু, তীক্ষ্ণ, রূক্ষ, হৃদ্য, অগ্নিবর্দ্ধক, দৃষ্টিহ্রাসকর, লঘু এবং শুক্র, বাত ও কফঘ্ন। (মদনপা°, ১ ব°) ২ বনতুলসী। ইহার গুণ—লঘু, রূক্ষ, হৃদ্য, এবং বাত ও কফঘ্ন।

অজগন্ধা,—(স্ত্রী) অজগন্ধ অর্থাৎ মহাদেবের পত্নী—পার্ব্বতী।

অজগন্ধিকা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] বর্ব্বরী শাক, চলিত বাবুই শাক। ২ বনযমানী। [অজগন্ধা, দ্র°]

অজগন্ধিনী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] অজশৃঙ্গী বৃক্ষ, মেষশৃঙ্গী, চলিত গাড়ল শিঙে।

অজগর—(পুং) [অজং ছাগং গিরতি গিলতি গৄ-অচ্] সর্পজাতীয় বৃহদাকার প্রাণী। ময়াল, বোড়া প্রভৃতি কএক প্রকার বৃহৎ সর্পকে আমরা অজগর বলিয়া থাকি। প্রাণিতত্ত্বে অজগরবর্গকে Boidæ নাম দেওয়া হইয়াছে। এই বর্গের সর্পের কএকটী বৈশিষ্ট্য আছে; তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে যে, ইহাদের দেহের পশ্চাদ্ভাগে লুপ্তপ্রায় বস্তির অস্থির ন্যায় অস্থি আছে এবং দুই পার্শ্বে নখরের ন্যায় ক্ষুদ্র দুইখানি অস্থি দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, অধুনা লুপ্ত এক প্রকার অতিকায় গোধিকা হইতে ক্রমবিকাশের ফলে অজগরের উৎপত্তি হইয়াছে, ঐ ক্ষুদ্র অস্থিদ্বয় উক্ত গোধার লুপ্ত পশ্চাৎপদের চিহ্ন।

অজগর বা Boidæ বর্গ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—(১) পাইথন (Python) বা ময়াল; (২) বোয়া (Boa) অর্থাৎ বোড়া। এতন্মধ্যে ময়ালের প্রধানতঃ নয়টী এবং বোড়ার প্রায় ৪০টী শ্রেণী আছে। ময়াল এবং বোড়ার শরীরগত কএকটী পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ময়ালের সম্মুখের চোয়ালে কএকটী দাঁত, লেজের নীচে দুই সারি শক্ত আঁইশ এবং অক্ষিকোটরের উপরে দুইখানি হাড় রহিয়াছে; কিন্তু বোড়ার সম্মুখের চোয়ালে দাঁত বা অক্ষিকোটরের উপরে হাড় নাই, লেজের নীচে মাত্র একসারি আঁইশ।

ময়াল সাপের প্রধান প্রধান শ্রেণীর উল্লেখ করা যাইতেছে। বৃহত্তম ময়ালের বৈজ্ঞানিক নাম পাইথন রেটিকিউলেটস্ (Python reticulatus)। এই সর্প মলয় উপদ্বীপ, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোচীনে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা দৈর্ঘ্যে প্রায় ত্রিশ ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ভারতীয় ময়ালের নাম পাইথন মোলিউরস্ (Python molurus); ইহারা ভারতবর্ষ ও সিংহলে দৃষ্ট হয়। দৈর্ঘ্যে ইহারা রেটিকিউলেটসের মত বড় নহে, সাধারণতঃ বিশ ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আফ্রিকার ময়াল আরও কিছু ক্ষুদ্র, উহারা দৈর্ঘ্যে সচরাচর পনর ফুট পর্য্যন্ত হয়। আফ্রিকার উষ্ণমণ্ডলে এবং দক্ষিণাংশে পাইথন সেবি (P. Sebæ) এবং পশ্চিম আফ্রিকায় পাইথন রেজিয়স্ (P. regius) নামক ময়াল দৃষ্ট হয়। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউগিনি দ্বীপের ময়াল (পাইথন স্পাইলোটেস্) এই জাতীয় ক্ষুদ্রতম সর্প। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ সুন্দরবন, তরাই, আসামের গভীর জঙ্গল, মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যের জঙ্গলে ময়াল দেখিতে পাওয়া যায়।

বোড়া সাপের নিম্নলিখিত কএকটী শ্রেণী প্রধান। 'বোয়া ইরিক্স' উত্তর আফ্রিকায়, গ্রীসে ও এসিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে; 'এনিগ্রাস্' শ্রেণী নিউগিনি হইতে ফিজি পর্য্যন্ত দ্বীপসমূহে; 'ক্যাসারিয়া ডুস্সুমিয়েরি' শ্রেণী মরিশসের নিকটবর্ত্তী রাউণ্ড দ্বীপে; 'কোরালাস্' শ্রেণী মাদাগাস্কার দ্বীপে দৃষ্ট হয়। নূতন মহাদ্বীপে বিভিন্ন শ্রেণীর বোড়া দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে মেক্সিকো হইতে ব্রেজিল পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগে প্রসিদ্ধ 'বোয়া কন্‌ষ্ট্রিক্টর' এবং দক্ষিণ আমেরিকায় জলা ও জঙ্গলময় সকল প্রদেশেই 'আনাকোণ্ডা' নামক অতি বৃহৎ সর্পের বাস।

অজগর জাতীয় সর্পসমূহের মধ্যে ময়াল সর্প সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক ও উগ্র প্রকৃতির। বোড়ার প্রকৃতি কতকটা শান্ত। ময়ালের তিন সারি দাঁত, উপরের চোয়ালে ২ সারি, নীচের চোয়ালে এক সারি। সকল অজগরই বিষদন্তহীন। কিন্তু দাঁতগুলি কুলের কাঁটার মত বাঁকান এবং মুখের ভিতর দিকে ফিরান। এ কারণ কোন জন্তু একবার ইহাদের কবলে পড়িলে তাহার নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন।

ময়ালের মেরুদণ্ড প্রায় চারিশতখানি অস্থি দ্বারা গঠিত। ইহাদের শারীরিক বলের কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহারা শৃগাল, শূকর, হরিণ প্রভৃতি জন্তু প্রায়ই উদরস্থ করিয়া থাকে। ব্যাঘ্র মহিষাদি বৃহদাকার জন্তুকেও ইহারা অনেক সময় আক্রমণ ও বধ করিতে পশ্চাদ্‌পদ হয় না। বৃহদাকার ময়াল সাপ পাঁচ মিনিটেই একটী পূর্ণবয়স্ক মনুষ্যকে জড়াইয়া পিণ্ডীভূত করিতে পারে। হরিণ প্রভৃতি বৃহৎকায় জন্তু ১৫।২০ মিনিটেই পিষিয়া পিণ্ডের ন্যায় কোমল করিয়া ফেলে—তখন তাহাদের অস্থি বা পূর্ব্বাকৃতির কোন চিহ্নই থাকে না। ইহাদের পুচ্ছেও অসাধারণ শক্তি। পুচ্ছের অগ্রভাগ দ্বারা বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিয়া স্বীয় প্রকাণ্ড দেহটী দোদুল্যমান রাখে।

অজগরের মাড়ীর গড়ন বড় অদ্ভুত। অপর সকল জন্তুর মাড়ী জোড়া, ইচ্ছা করিলে কেবল দুই কস মেলিয়া মুখ বিস্তীর্ণ করিতে পারে। কিন্তু ইহাদের মাড়ীর হাড় সেরূপ জোড়া নয়; এক একটী হাড় পর পর সাজান, একটীর সঙ্গে অন্যটীর কোন সংস্রব নাই, তাই অনায়াসে সকল দিকেই যায়। ইহারা মনে করিলে উপর ও পাশের দিকেও হাঁ বড় করিতে পারে। এক দিকের চোয়াল না নাড়িয়া অনায়াসে অন্য দিকের চোয়াল নাড়িয়া শীকার ধরিতে সমর্থ হয়।



ইহারা ক্ষুধার্ত্ত হইলে, হ্রদ, নদ নদী ও পাহাড়ের ঝরণার ধারে গাছের উপর লেজ লাগাইয়া ঝুলিতে থাকে। ইহাদের মলদ্বারের নিকট বড়শীর মত যে বাঁকা হাড় আছে, গাছের ডালে সেইখানি লাগাইয়া অনায়াসে ঝুলিতে পারে। কোন জন্তু জল খাইতে আসিলে তাহার উপর লাফাইয়া পড়ে এবং স্বীয় দেহবেষ্টনে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। এরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত ময়াল শিকার ধরিয়া নিজ শরীর দ্বারা বেষ্টিত করিয়া ফেলে যে, ইহার শিকার ধরিবার প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করাই দুঃসাধ্য। একবার যাহাকে ধরিবে, তাহার আর নিস্তার নাই, কোন জন্তুই ইহাদের মুখ ছাড়াইয়া পলাইতে সমর্থ হয় না। তাহার কারণ, ইহাদের দুই পাটী দাঁত মুখের ভিতর দিকে ফিরানো থাকে। গিলিবার সময় পশ্বাদির শরীর অনায়াসে উদরস্থ হয়, কিন্তু বাহিরের দিকে টানিলে ঐ দাঁতের জন্য বদ্ধ হইয়া যায়, আর বাহির হইতে পারে না। অনেকে দেখিয়াছেন, কোন জন্তুকে একবার কামড়াইয়া ধরিলে, সাপ নিজে মনে করিলেও সহজে শীকার ছাড়িয়া দিতে পারে না।

সর্পজাতিমাত্রেই মাংসভোজী; তন্মধ্যে যাহারা ছোট, তাহারা কীট, ইন্দুর, টিক্‌টিকা, সামুক ইত্যাদি জীব ভক্ষণ করে। বৃহৎকায় সাপেরা বিশেষতঃ ময়ালসাপ বড় বড় চতুষ্পদ জন্তু আক্রমণ করে। ইহারা নিজ শরীরের মাংসাপেক্ষা বৃহৎ জন্তুকে গিলিতে পারে। যখন কৃষ্ণসারের ন্যায় কোন বৃহৎ চতুষ্পদ জন্তুকে আক্রমণ করে, তখন ইহারা প্রথমে আপন শরীর তাহার চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলে, লালায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজাইয়া দেয়। চাপ দিয়া ক্রমে সেই জন্তুর হাড় গুঁড়া করিয়া তাহাকে অতি কষ্টে গ্রাস করে। এই সময় কখন কখন কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হয়।

বড় বড় জন্তু গিলিবার সময় বুকে চাপ লাগিয়া পাছে শ্বাস রোধ হয়, তাই জগদীশ্বর ইহাদের শ্বাসযন্ত্র অপূর্ব্ব কৌশলে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহাদের ফুস্‌ফুসে দুইটী কোষ, একটী বড়, একটী ছোট। বড় কোষটীর অগ্রভাগে বায়ু থাকিবার একটী আধার আছে। বড় বড় পশু গিলিবার সময় ঐ বায়ু দ্বারা রক্ত পরিষ্কৃত থাকে।

ইহারা কোন বড় জন্তু গিলিবার পর, খাইতে কিংবা নড়িতে চড়িতে পারে না। জড় পদার্থের ন্যায় এক স্থানে পড়িয়া ঘুমাইতে থাকে। এই অবস্থায় সহজেই ইহাদিগকে মারিতে পারা যায়।

অনেক সময় বৃহদাকার জন্তুকে গিলিতে গিয়া অজগর নিজেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। একবার ব্রহ্মদেশের জঙ্গলে একটী ময়াল বৃহৎ শৃঙ্গযুক্ত এক হরিণকে ভক্ষণ করিতে গিয়া মরিয়া গিয়াছিল। আফ্রিকার জঙ্গলে ঐরূপ এক অজগর এক বৃহৎ শূকর উদরস্থ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। আবার এক ময়াল এক চিতা বাঘের পশ্চাদ্ভাগ হইতে বেষ্টন করিয়া পিষ্ট করিতেছিল। চিতার সম্মুখের একটী পা বাহির হইয়াছিল, তদ্দ্বারা সে নখরাঘাতে সর্পের দেহ বিদীর্ণ করিয়া দেয় এবং পরে সর্পের গলদেশে দংশন করে। ফলে সর্প এবং ব্যাঘ্র উভয়েই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

চিঁড়িয়াখানায় কখন কখনও এক অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। একই খাঁচায় যদি ছোট বড় দুইটী ময়াল থাকে এবং একটী শিকার খাঁচায় ফেলিয়া দেওয়া হয়, তবে দুইটী সাপই ঐ শিকারকে গিলিতে চেষ্টা করে; এবং ক্রমে শিকারসহ ছোট সাপটীও বড় সাপের উদরে প্রবিষ্ট হয়।

জঙ্গলময় প্রদেশের অধিবাসিগণ কখন কখনও ময়ালের কবলে পতিত হয়। আফ্রিকার একজন কাফ্রি শিকারের সময় ময়াল দ্বারা নিহত হইয়াছিল। অল্পদিন পূর্ব্বে ব্রহ্মের জঙ্গলে একটী মনুষ্য এক বৃহৎ ময়ালের উদরস্থ হইয়াছিল। ঐ ময়ালকে পরে বন্দুকের গুলিতে নিহত করা হয়। হায়দ্রাবাদ রাজ্যে পঞ্চদশবর্ষীয় একটী বালক পনর ফুট দীর্ঘ এক ময়াল কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার পোর্ট এলিজাবেথ যাদুঘরের অধ্যক্ষ ফিট্‌জ সাইমন্ সাহেবকে একবার যাদুঘরে রক্ষিত একটী ময়াল অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া পুচ্ছদ্বারা

বেষ্টিত করিয়া ফেলে। এই বিপদে অনন্যোপায় হইয়া সাহেব সজোরে সর্পের গলদেশে দংশন করেন এবং ছুরিকা দ্বারা উহার মস্তক কর্ত্তিত করিয়া মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন।

ময়াল সাধারণতঃ প্রতি ঋতুতে একবার করিয়া খোলস ত্যাগ করে। পশুশালায় অনেক সময় দেখা গিয়াছে, উহারা খণ্ড খণ্ড ভাবে খোলস ছাড়িয়া থাকে। তখন শরীর-সংলগ্ন কোন খণ্ড থাকিলে উহা ছাড়াইয়া দিতে হয়, নচেৎ উহারা অসুস্থ হইয়া পড়ে।

ইহারা অণ্ডজ। ডিম পাড়িলে কোন গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া রাখে এবং দুইমাস ধরিয়া তা দেয়। পারি নগরে একটী বোড়া লইয়া যাওয়া হয়। সেই সাপটী ৬ই মে তারিখে হংস ডিম্বের ন্যায় ১৫টী ডিম পাড়ে। ডিমগুলিকে চূড়ার ন্যায় পর পর সাজাইয়া, বোড়া তাহার চতুর্দ্দিকে কুণ্ডলী করিয়া সেই ডিমগুলির উপর বসিয়া থাকে এবং মাথাটী সকলের মাঝখানে রাখে। এইরূপে দুই মাস কাল অনাহারে বসিয়া থাকার পর ৩রা জুলাই তারিখে ৮টী ডিম ফুটিয়া উঠে।

ময়ালের ডিমে শক্ত খোলস নাই। উহা সাদা, নরম, পাৎলা ও কোঁচকান চামড়ার ন্যায় পদার্থে আবৃত। ইহাদের ডিমের শাদা এবং পীত অংশ পৃথক্‌ভাবে থাকে না। প্রত্যেক ডিমের ওজন ৫ হইতে ৫॥ আউন্স। ময়াল সর্পী কতগুলি ডিম একবারে পাড়িয়া থাকে, তাহার নির্দ্দিষ্ট কোন সংখ্যা নাই। তবে পর্য্যবেক্ষণে দেখা গিয়াছে, সর্পীর দৈর্ঘ্যের পরিমাণ অনুসারে ডিমের সংখ্যারও হ্রাসবৃদ্ধি হয়। ১৭ ফুট দীর্ঘ ময়ালের প্রায় ৬০ বা ততোধিক ডিম হইয়া থাকে। ১৩ ফুট দীর্ঘ সর্পীর প্রায় ৪০টী ডিম হয়। ইহারা যখন ডিমে তা দেয় তখন ইহাদের শরীর হইতে ৯০° ডিগ্রী হইতে ৯৬° ডিগ্রী পর্য্যন্ত তাপ ডিমে লাগে। ডিম্বে উত্তাপ-প্রদানকাল বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপ দেখা গিয়াছে। কলিকাতার আলীপুর চিঁড়িয়াখানায় একবার একটী ময়ালসর্পী এক মাস তা দিয়া ডিম ফুটাইয়াছিল। পূর্ব্বোল্লিখিত একটী কাহিনীতে দুই মাস তাপ প্রয়োগের কথা জানা যাইতেছে। লণ্ডন পশুশালায় এক ময়াল সর্পী চারি মাসেরও অধিককাল ডিমে তা দিয়াছিল।

সচরাচর ময়ালেরা শরৎকালে যৌনসংসর্গ করে। এই সময়ে ইহাদের গাত্র হইতে এক প্রকার ঈষদুগ্র গন্ধ নির্গত হয়। বোধ হয় উহা যৌন আকর্ষণের সহায়ক। ইহারা কত দিন গর্ভধারণ করে ঠিক বলা যায় না। একবার লণ্ডন পশুশালায় জুন মাসে সঙ্গম ও পরবর্ত্তী জানুয়ারী মাসে ডিম্ব ত্যাগ দেখা গিয়াছিল।

ধৃত হইয়া পশুশালায় আনীত হইলে অনেক সময় অজগর কিছুই খায় না। তখন পিচকারী সাহায্যে বা অন্য উপায়ে তাহাকে খাওয়াইতে হয়। কিছুদিন পর সর্প নিজেই খাইতে আরম্ভ করে। কোন কোন স্থলে শেষ পর্য্যন্ত স্বেচ্ছায় কিছুই না খাইয়া ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পশু-শালায় রক্ষিত ময়ালের সম্মুখে শ্বেত, ধূসর, পীত, কৃষ্ণ প্রভৃতি নানা বর্ণের গিনিপিগ বা ঐরূপ কোন জন্তু ছাড়িয়া দিলে ময়াল প্রায় ধূসর জন্তুটীকেই বাছিয়া ধরিয়া থাকে। ইহা বোধ হয় অরণ্যে বাসকালে শিকার ধরিবার একটী সংস্কার।

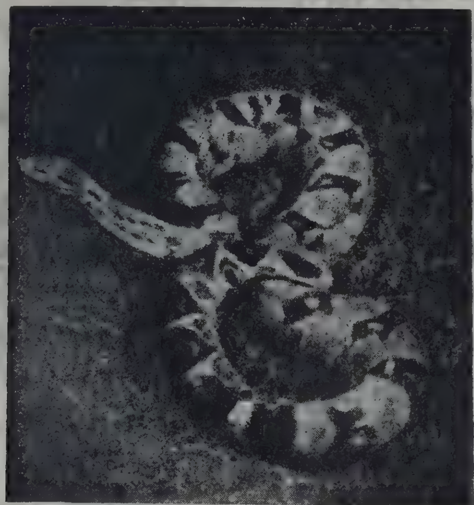
ময়াল আহত হইলেও সহসা প্রাণত্যাগ করে না। এক-বার এক ময়ালের উদর ভেদ করিয়া গলাধঃকৃত হরিণের শিং বাহির হইয়াছিল। ইহাতে সর্প মরে নাই, কিছুদিন মধ্যে ঐ ক্ষত শুকাইয়া গিয়াছিল। মস্তকে কিংবা ফুস্‌ফুসে বন্দুকের গুলি বিদ্ধ হইলেও বৃহৎ ময়াল তাহাতে শীঘ্র মরে না। পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে, অন্য বিষাক্ত সর্পের বিষে ময়ালের মৃত্যু হয় না। পশুশালায় ময়ালকে প্রায় ২৫ বৎসর অবধি বাঁচিতে দেখা গিয়াছে।

আফ্রিকার অসভ্য লোকেরা ময়াল শিকার ও উহার মাংস ভক্ষণ করে। তাহারা সচরাচর নিদ্রিত ময়ালকে জাল দিয়া ধরে। কখন কখনও কাফ্রিরা কএকখানি কম্বল সাহায্যে ময়াল ধরিতে যায়। ময়াল উত্তেজিত হইয়া দংশন করিতে আসিলে তাহার সম্মুখে কম্বলখানি ধরা হয়। ক্রুদ্ধ অজগর আততায়ী বোধে কম্বলে দংশন করিলে উহার বক্র দন্তশ্রেণী কম্বলে আটকাইয়া যায়। এই অবসরে শিকারীরা অপর কম্বল-গুলি দিয়া উহার মস্তক চাপিয়া ধরে এবং গলায় ফাঁস লাগাইয়া উহাকে বন্দী করে। আফ্রিকাবাসীরা অতি বৃহৎ ময়ালকে দেবতাজ্ঞানে পূজাও করিয়া থাকে। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা তদ্দেশীয় অজগরকে দেবতা মনে করিয়া পূজা করে।

আফ্রিকাদেশে ময়ালদ্বারা মানুষের উপকারও সাধিত হয়। তথায় ইক্ষু ও শস্যক্ষেত্রে বহু বড় বড় ইন্দুর, শৃগাল, হরিণ প্রভৃতি প্রবেশ করিয়া সর্ব্বনাশ করে। ময়ালেরা অনেক সময় ক্ষেত্রস্থ ঐ সকল প্রাণী ভক্ষণ করিয়া কৃষকের উপকার করে।

বোড়া জাতীয় অজগরের মধ্যে বোয়া কন্‌ষ্ট্রিক্‌টরের মস্তক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শল্ক দ্বারা আবৃত। চক্ষুর সম্মুখস্থ একখানি শল্ক অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর। ইহাদের গায়ের রঙ্‌ ফিকে বাদামী, তাহার উপর প্রায় ১৫।২০টী গাঢ় রঙের আড়াআড়ি দাগ। ঐগুলি আবার অনেক সময় দুইটী আরও গাঢ় লম্বালম্বি দাগের সাহায্যে পরস্পর যুক্ত। লম্বা দাগগুলির মধ্যে বড় বড় বাদামী আকারের চক্র। গায়ের দুই পাশে কাল রঙের সারি বাঁধা

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র। ঐগুলি লেজের দিকে আরও স্পষ্ট। লেজের রঙ্ আরও উজ্জ্বল—পাট্‌কিলে, কাল ও হলদে।



বোর্ড়া জাতীয় সর্প অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বভাব। ইহারা সচরাচর ছোট ছোট প্রাণী আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করে। আনাকোণ্ডা সর্প কিন্তু আকারে যেরূপ বৃহৎ, তাহার স্বভাব তেমনি ভয়ঙ্কর হিংস্র। আনাকোণ্ডাকে বোড়াশ্রেণীতে ধরা হয় এবং ইহার বৈজ্ঞানিক নামও পূর্ব্বে 'বোয়া মিউরিলা' ছিল, এখন 'ইউনেক্‌টিস্ মিউরিলাস্' হইয়াছে। ইহারা দৈর্ঘ্যে ৩০ ফুটেরও অধিক হয়। আনাকোণ্ডা জলে ও স্থলে উভয় স্থানেই বিচরণ ও শিকার করিয়া থাকে। ব্রেজিল ও গিনি দেশের হ্রদ, নদী ও জলাতে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা অত্যন্ত মাংসাশী, যেখানে থাকে, সেখানকার মৎস্যাদি থাকিতে দেয় না, মানুষ পর্য্যন্ত জল আনিতে গেলে ফিরিয়া আসে না। ইহারা ডাঙ্গায় উঠিয়া নিকটস্থ গোলাঘর হইতে গোমেষাদি ধরিয়া আনে। কখন কখন মানুষকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া থাকে।

অজগর$_২$—(পুং) বিলেশয় মৃগবিশেষ। এই মৃগ অর্শোরোগে হিতকর। (সুশ্রুত, সূ°, ৪৬ অ°)

অজগর$_৩$—(পুং) একজন মুনি। ইনি কাবেরী নদীর নিকট সহ্যাদ্রির পাদদেশে ব্রতাবলম্বন করিয়া বাস করিতেন। প্রহ্লাদ নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া ইঁহার নিকট উপস্থিত হন ও ইঁহার মুখে তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করেন। (ভাগবত)

অজগল্লিকা, অজগল্লী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] বর্ব্বরীবৃক্ষ ; চলিত বাবুই তুলসী। (ভাবপ্রকাশ) ২ ক্ষুদ্ররোগান্তর্গত বালরোগ-বিশেষ। কফ ও বায়ুর প্রকোপে বালকদিগের এই রোগ হয়।

"স্নিগ্ধাঃ সবর্ণা গ্রথিতা নীরুজা মুদ্গসন্নিভাঃ।
পিটিকাঃ কফবাতাভ্যাং বালানামজগল্লিকাঃ॥" (মাধবনি°)

অজগব—(পুং) [অজগো বিষ্ণুঃ ত্রিপুরবধে শরত্বেন অস্ত্যস্য, অজগ-অস্ত্যর্থে ব] শিবধনু। ইহার রূপান্তর—অজকব, অজকাব, অজীকব, অজগাব।

রাজা পৃথু যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন আকাশ হইতে মহাদেবের ধনু, দৈববাণ ও রাজচ্ছত্র পতিত হইয়াছিল।

অজগাঁও—অযোধ্যাপ্রদেশের উনাও জেলার শয় নদীতীরস্থ এক নগর। স্থানীয় অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু এবং উহারা জনবার রাজপুত। প্রায় তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে জনবার রাজগণই এই নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তামাকের জন্য এই স্থান বিখ্যাত।

অজগার (অস্‌গার)—মধ্য আফ্রিকার তুয়ারেস প্রদেশ-বাসী জাতিবিশেষ। এই প্রদেশ তুয়াৎ হইতে তিম্বাক্টু ও ফেজ্জান হইতে জিন্দার পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার অজগার ও অপরাপর জাতির সাহায্যে সাহারা মরুপ্রদেশের অন্তর্ব্বাণিজ্য চলিয়া থাকে।

অজগাব—(পুং) [অজগং বিষ্ণুমবতীতি অব-অণ্, উপ° স°] হরধনু। [অজগব দ্র°]

অজঘন্য$_১$—(ত্রি) [ন জঘন্যঃ ; নঞ্-তৎ] অধম ভিন্ন, অকনিষ্ঠ, অনন্তিম। ২ শ্রেষ্ঠ। "বিষ্ণুরজঘন্যো জঘন্যজঃ।" (মিতাক্ষরা ৪.১৪২) "সর্ব্বেষামজঘন্যস্তু" (মহাভা° ৩.১১৬.৪)

অজঘন্য$_২$—(পুং) দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। ইনি সূর্য্যের মুখ হইতে উৎপন্ন হন। (হরিবংশ)

অজঘোষ—(পুং) [বৈদ্যক] ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত জ্বরের অন্যতম। ইহার লক্ষণ—রোগীর গাত্র হইতে ছাগলের গন্ধ পাওয়া যায় ; স্কন্ধ বা ঘাড়ে বেদনা হয় ; গলরন্ধ্র নিরুদ্ধ হইয়া যায় এবং রোগীর নেত্র তাম্রবর্ণ হইয়া উঠে। (ভাবপ্রকাশ)

অজজীবিক—(ত্রি) [অজঃ জীবিকা জীবনোপায়ঃ ক্রয়-বিক্রয়াদিনা পালনাদিনা চ যস্য] ছাগদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ-কারী। ছাগ ক্রয়, বিক্রয় ও পালন করিয়া যাহারা জীবিকা-সংস্থান করে।

অজটা—(স্ত্রী) [নাস্তি জটা জটাকারং মূলং যস্যাঃ, বহুব্রী] [বৈদ্যক] ভুঁই-আমলা গাছ। ইহার অপর নাম অজড়া। ২ অগ্নিমুখলৌহ। (বৈদ্যকশব্দসি°)

অজড়—(ত্রি) অবুদ্ধিবিকল, বুদ্ধিযুক্ত। "অজড়শ্চেদপোগণ্ডঃ" (মনু ৮.১৪৮) ২ যাহা জড় নহে, অর্থাৎ চলন বা ক্রিয়াশীল।

অজড়া—(স্ত্রী) [অজড়-ণিচ্-অচ্। অজড়য়তি স্পর্শমাত্রেণ অঙ্গমর্দ্দনার্থং সঞ্চালয়তি। উপপদ°স°] [বৈদ্যক] কপিকচ্ছু। আলকুশীগাছ। (ত্রি) ২ জড়ভিন্ন।

অজড়াফল—(ক্লী) [বৈদ্যক] শুকশিম্বীফল, চলিত আলকুশী।

অজণ্টা—[অজন্তা দ্র°]

অজতুঙ্গ—(পুং) একটী তীর্থ। এই শুভতীর্থে সতত পিতৃলোকের তর্পণ করা কর্ত্তব্য। প্রতি পর্ব্বে এই অজতুঙ্গে নিত্য দেবতাদিগের ছায়া পতিত হয়। পাণ্ডবগণ এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিয়া নীরোগ হইয়াছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৭৭.৪৭-৪৮)

অজথ্যা—(স্ত্রী) [অজ-হিতার্থে থ্যন্। অজাবিভ্যাং থ্যন্। পা। ৫.১.৮] যুথি, জুঁইফুল; স্বর্ণযুথিকা। ২ অজসমূহ। (বাচস্পতি)

অজদণ্ডী—(স্ত্রী) [অজ-দণ্ড গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্; অজস্য ব্রহ্মণো দণ্ডোঽস্যাঃ; বহুব্রী] [বৈদ্যক] ব্রহ্মদণ্ডীবৃক্ষ। বামুনহাটী। এই বৃক্ষের কাষ্ঠের দ্বারা ব্রহ্মার যজ্ঞদণ্ড নির্ম্মাণ করা হয় বলিয়া উহার নাম ব্রহ্মদণ্ডী হইয়াছে।

অজদেবতা—(পুং) [অজাধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মধ্যপদলোপি-কর্ম্মধা] ছাগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অগ্নি। "রৌদ্রী ধেনুর্বিনির্দ্দিষ্টা ছাগ আগ্নেয় উচ্যতে।" (শুদ্ধিতত্ত্বোদ্ধৃত বিষ্ণুধর্ম্ম)

অজন১—(ত্রি) [নাস্তি জনো যস্মিন্; বহুব্রী] জনহীন, জনশূন্য। "যোজনেষ্বজনে বনে।" (রামা° ২.৯২.১০) ২ অজ, জন্মহীন। "হ্যকর্ত্তুরজনস্য চ" (ভাগবত ১.৩.৩৫)। (পুং) ৩ নারায়ণ। (ভাগবত ১০.৩.১) ৪ ব্রহ্মা। [নঞ্-তৎ] ৫ জনভিন্ন, অমানুষ।

অজন২—এক দৈত্য। বিপ্রচিত্তির ঔরসে ও হিরণ্যকশিপুর ভগিনী সিংহিকার গর্ভে যে ত্রয়োদশ পুত্র জন্মগ্রহণ করে, এই দৈত্য তাহাদের অন্যতম। ইনি সৈংহিকেয় নামে পরিচিত। (ভাগবত)

অজনক—(পুং) [ন জনকঃ; নঞ্-তৎ] অজন্মদ, জনকভিন্ন।

অজননি—(স্ত্রী) [ন জন-নিন্দায়াং অনি; নঞ্-তৎ] জন্মাভাব। "তস্যাজননিরেবাস্তু" (ভারবি, ১০ স°) [বা ঙীপ্; অব্যয়ী°] (অব্য) ২ জননীর অভাব।

অজনামক—(ক্লী) [বৈদ্যক] মাক্ষিক। (হেম)

অজনাল১—পঞ্জাবের অমৃতসরের অন্তর্গত এক তহশীল। ইহা অমৃতসরের উত্তর-পূর্ব্বসীমায় অবস্থিত ও রাবী নদী পর্য্যন্ত প্রসারিত। অক্ষা° ৩১°৩৭′ হইতে ৩২°৩′১৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৩২′৩০″ হইতে ৭৫°১′ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৪১৫ বর্গমাইল।

অজনাল২—অমৃতসর জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। অজনাল নগর হইতে ১৬ মাইল উত্তরপশ্চিমে এবং অমৃতসর ও শিয়ালকোটের মধ্যস্থ রাস্তার উপর ইহা অবস্থিত। শিখ-শাসনে এই গ্রামের নিকটস্থ নদীর উপর একটী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল; উহা এখনও বর্ত্তমান। নজ্জার জাতীয় বাগ নামক ব্যক্তি অজনালের প্রতিষ্ঠাতা। তখন উহার নাম হইয়াছিল নজরাল। সম্ভবতঃ নজরাল হইতেই অজনাল হইয়াছে।

অজন্ত—(ত্রি) যে সকল শব্দের শেষে স্বরবর্ণ রহিয়াছে; স্বরান্ত (শব্দ)।

অজন্তুজগ্ধ—(ত্রি) অকীটভক্ষিত, যাহা কীটভক্ষিত নহে। (চক্রদত্ত)

অজন্তা—ইহার প্রকৃত নাম অজণ্টা বা আজুণ্ঠা। হায়দ্রাবাদের নিজাম-রাজ্যের ঔরঙ্গাবাদ জেলার ভোকর্দন তালুকের অন্তর্গত একটী গ্রাম। অক্ষা° ২০°৩২′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৪৬′ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। নাসিক জেলার ভন্‌বাদের নিকট পশ্চিম-ঘাট পর্ব্বতমালা হইতে একটী শাখা বরাবর পূর্ব্বাভিমুখী হইয়াছে। এই গিরিশ্রেণী মধ্যে মধ্যে ছিন্ন হইয়া বেরার প্রদেশের ভিতর চলিয়া গিয়াছে। ইহার উত্তর ও দক্ষিণে দুইটী প্রধান বিভাগ আছে। তন্মধ্যে উত্তর ভাগের যে অংশের নাম ইন্ধ্যাদ্রি বা আজুণ্ঠা তাহার মধ্যে অনেকগুলি গুহা আছে। এই গুহাগুলির জন্যই এই স্থানটী প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

অজন্তা গ্রাম গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলার রেলপথের জলগাঁও ষ্টেশন হইতে ৩৮ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানের প্রায় সাড়ে তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে আজুণ্ঠা পর্ব্বত। এই পর্ব্বত হইতেই গ্রামের নাম অজন্তা হইয়াছে। অরণ্যসমাকুল আজুণ্ঠা পর্ব্বতের সরল ভৃগুগাত্রে প্রাচীনকালের ক্ষোদিত কএকটী গুহা আছে। এই ভৃগুপ্রদেশ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ন্যুব্জ এবং প্রায় ২৫০ ফুট উচ্চ। উপত্যকার কিছু উচ্চে বাগ্‌হুরা বা বাগুরা নাম্নী এক খরস্রোতা তটিনী পূর্ব্বদিক্ হইতে প্রবাহিত হইতেছে এবং প্রায় একশত ফুট উচ্চ হইতে উপত্যকামধ্যে সপ্তধারায় পতিত হইয়া এক অতি মনোরম জলপ্রপাত সৃষ্টি করিয়াছে। এই জলপ্রপাতের শব্দ গিরিগুহাগুলির অভ্যন্তর হইতে অবিরত শ্রুতিগোচর হয়। উপত্যকামধ্যে পতিত হইয়া সেই স্রোতস্বিনী ভীমবেগে এই গুহাসঙ্কুল পর্ব্বতসানুর পাদদেশে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে আবর্ত্তিত হইয়া সহসা উত্তরাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে।

এই সমস্ত গুহা একই সময়ে ক্ষোদিত হয় নাই। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দ পর্য্যন্ত নয়শত বৎসর ধরিয়া এই বিরাট্ স্থাপত্য ও চিত্রকলার অসাধারণ প্রয়াস চলিয়াছিল। এই গুহাগুলির নির্ম্মাণকৌশল, কারুকার্য্য ও চিত্রকলা আজও জগতের প্রগাঢ় বিস্ময় ও প্রশংসা উৎপাদন করিতেছে। বহুদিনের পর ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে যখন ইহা বিস্মৃতির আবরণ হইতে পুনরায় লোকচক্ষুর গোচরীভূত



অজন্তাগুহাশ্রেণীর বহির্দৃশ্য।

হয়, তখন গুহাগাত্রে অঙ্কিত চিত্রগুলি অনেকটা সুরক্ষিত অবস্থায় ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ চর্ম্মচটিকা ও দর্শকগণের অত্যাচারে ইহা ধ্বংসমুখে পতিত হইতে থাকে। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ফার্গুসন সাহেব ভারতের গুহামন্দিরসমূহ সম্বন্ধে একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিবার পর সাধারণের দৃষ্টি এই গুহাগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী আবেদন করেন যে, এই চিত্রগুলির যথাযথ অনুলিপি লইবার জন্য একজন সুদক্ষ শিল্পীর আবশ্যক। কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদনানুসারে মেজর রবার্ট জিল নামক একজন সুদক্ষ শিল্পী দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া অনেকগুলি অনুলিপি গ্রহণ করেন। অনুলিপি প্রস্তুত হইবার পর সেগুলি মধ্যে মধ্যে ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়া সিডনহামের 'ক্রষ্টাল্ প্যালেসে' প্রদর্শিত হইতেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রদর্শনীতে আগুন লাগায় ঐগুলির কিছুই রক্ষা পায় নাই। তাহার পর মিঃ ফার্গুসন ও মিঃ বার্জেস্ ভারতসরকারের নিকট আবেদন করেন যে, বাদুড় ও দর্শকদিগের অত্যাচারে এই অতুলনীয় চিত্রগুলি গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যাইতেছে, সুতরাং পুনরায় তাহার অনুলিপি প্রস্তুত করা উচিত। অবশেষে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট বাৎসরিক কিছু কিছু অর্থসাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় বোম্বাইস্থ কলাবিদ্যালয়ের মিঃ জন্ গ্রিফিথ ও তাঁহার কতিপয় ছাত্রকে চিত্রগুলির পুনরায় অনুলিপি লইবার জন্য নিযুক্ত করা হয়। মধ্যে তিন বৎসর গবর্ণমেণ্ট বাৎসরিক সাহায্য বন্ধ করার পর ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলে শীঘ্র শীঘ্র চিত্রগুলি প্রকাশিত করিবার চেষ্টা হয়; কিন্তু নানা কারণে প্রকাশে বিলম্ব ঘটিতে থাকে। এই সময় চিত্রগুলি সাউথ কেন্‌সিংটন যাদুঘরে রক্ষিত ছিল। সেই সময় পুনরায় অগ্নিসংযোগে ৩৩৫ খানি অনুলিপির মধ্যে ১৬৩ খানি সম্পূর্ণ দগ্ধ এবং আরও কতকগুলি অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া যায়। তাহার পর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গ্রিফিথ সাহেবের সম্পাদকতায় ফোলিও আকারে দুইখণ্ডে দগ্ধাবশিষ্ট চিত্রগুলি প্রকাশিত হয়। এখন সেই প্রকাশিত দগ্ধাবশিষ্ট অনুলিপিগুলির মধ্যে অনেকগুলির মূলচিত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এই অনুলিপিগুলি তাহার একমাত্র নিদর্শন। ইহার পরবর্ত্তিকালে মিসেস্

হেরিংহাম, শ্রীনন্দলাল বসু প্রমুখ কএকজন শিল্পী ধ্বংসাবশিষ্ট চিত্রগুলির কএকটী অনুলিপি ও আলোকচিত্র লইয়াছিলেন।

অবশেষে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে নিজাম সরকারের আদেশে একটী পুরাতত্ত্ববিভাগ খোলা হয়। ইহার অত্যল্পকাল পরেই সৈয়দ আহ্মদ নামক জনৈক শিল্পী চিত্রাবলীর যথাযথ প্রতিকৃতি লইবার জন্য নিযুক্ত হন। মিঃ সৈয়দ আহ্মদ লেডী হেরিংহামের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্ গোলাম য়াজদানী নিজাম সরকারের ব্যয়ে "Ajanta, the Colour and Monochrome Reproduction of the Ajanta Frescos based on Photography" নামক পুস্তকের ১ম ও ২য় অংশ প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা এতদিন অজন্তার চিত্রের অবিকল প্রতিলিপি দেখিতে ইচ্ছুক ছিলেন, তাঁহারা বর্ত্তমান সংগ্রহ দেখিয়া নিশ্চয়ই আনন্দ লাভ করিবেন। পূর্ব্বে যাঁহারা অজন্তার চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের ব্যক্তিগত মনোভাবের দ্বারা ইহার প্রতিলিপি ব্যক্ত করিয়াছেন। সেইজন্য লেডী হেরিংহামের মতে সেগুলি প্রতিকৃতি না হইয়া অনুলিপিভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

রঙ্গীন আলোকচিত্র দ্বারা অজন্তার প্রাচীরগাত্র হইতে এই সকল চিত্রগুলির প্রতিকৃতি লওয়া হইয়াছে। ইহাও অতিশয় কষ্টসাধ্য। বহু শতাব্দীর অবহেলার জন্য প্রাচীর গাত্র আর্দ্র ও ধূলিতে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে যাঁহারা ইহার নকল লইয়াছিলেন, তাঁহারা মৌলিক বর্ণকে উজ্জ্বল করিবার জন্য বার্ণিশ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইহাতে ছবির রেখাগুলি এবং চিত্রসন্নিবেশ অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে এই চিত্রগুলির যথার্থ রূপ উদ্ধার করিবার জন্য নিজাম সরকার কর্ত্তৃক দুইজন ইটালীয় শিল্পী নিযুক্ত হন। ইঁহারা ১৬শ ও ১৭শ সংখ্যক গুহা ব্যতীত অপর সকল গুহার গাত্র হইতে চিত্রগুলির যথাযথ রূপ উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তৎপরে ভেসি ও ব্রাউন সাহেব রঙ্গীন আলোকচিত্র দ্বারা ইহাদের প্রতিকৃতি তুলেন।

গুহাপরিচয় ও নির্ম্মাণকাল।

গুহাগুলি সংখ্যায় উনত্রিশটী। নদীবক্ষ হইতে ৩৫ ফুট হইতে আরম্ভ করিয়া ১১০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ এবং প্রায় ⅓ মাইল ব্যাপিয়া ক্রমান্বয়ে এই গুহাশ্রেণী বিস্তৃত রহিয়াছে।

এই সকল গুহা পর্ব্বতের একস্তরে অবস্থিত নহে। নির্দ্দেশের সুবিধার জন্য পশ্চিমপ্রান্ত হইতে গুহাগুলি সংখ্যাক্রমে চিহ্নিত হইয়াছে। ৮ম সংখ্যক গুহাটী সর্ব্বনিম্নস্তরে অবস্থিত; ৯ম সংখ্যক গুহাটী কিন্তু তাহার অনেক উচ্চে। ৩য় সংখ্যক গুহাটী ৮ম সংখ্যক গুহা হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চস্তরে এবং তদূর্দ্ধে ২য় ও ৪র্থ সংখ্যক গুহা দুইটী। এই গুহা দুইটী কিঞ্চিৎ দুরারোহ। ৫ম সংখ্যক গুহাটী আবার ৪র্থ সংখ্যক গুহা অপেক্ষা নিম্নস্তরে এবং ৬ষ্ঠ সংখ্যক গুহার সম্মুখ দিয়া ৭ম সংখ্যক গুহা পর্য্যন্ত একটী সোপানশ্রেণী নামিয়া আসিয়াছে। এদিকে ১১শ সংখ্যক গুহাটী ১২শ ও ১০ম সংখ্যক গুহা অপেক্ষা উচ্চস্তরে এবং ১৪শ সংখ্যক অসম্পূর্ণ গুহাটী ১৩শ সংখ্যক গুহার ঠিক উপরে অবস্থিত। ১৫শ হইতে ১৯শ সংখ্যক গুহাগুলি কতকটা একই স্তরে রহিয়াছে। কিন্তু ২০শ সংখ্যক গুহাটী ১৯শ সংখ্যক গুহা অপেক্ষা উচ্চস্তরে অবস্থিত। ২২শ সংখ্যক গুহাটী ২১শ বা ২৩শ সংখ্যক গুহা অপেক্ষা অনেক উচ্চে এবং ২৫শ সংখ্যক গুহাটী ২৬শ সংখ্যক গুহার বারান্দার দক্ষিণ প্রান্তস্থিত উপাসনা-গৃহ ও শয়নকক্ষের উপরে অবস্থিত। ২৭শ সংখ্যক গুহাটী পূর্ব্বোক্ত গুহার সমস্তরে এবং অপর পার্শ্বে রহিয়াছে। ২৮শ ও ২৯শ সংখ্যক গুহা দুইটীর খনন কার্য্য আরম্ভ হওয়ার পরই পরিত্যক্ত হইয়াছে। উহা বহু উচ্চস্তরে অবস্থিত এবং অধুনা দুরারোহ।



চাম্পেয়জাতকের চিত্রাংশ (১ম গুহা)।

এই গুহাগুলির মধ্যে ২৪টী বিহার এবং পাঁচটী চৈত্যগৃহ। ইহার মধ্যে দুইটী চৈত্য (৯ম ও ১০ম গুহা) এবং দুইটী বিহার (১২শ এবং ১৩শ গুহা) খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ক্ষোদিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই চারিটীর মধ্যে কোনটী যে প্রাচীনতম তাহা নির্ণয় করা কঠিন।



১৯শ গুহার ঘরমুখ।

পূর্ব্ববর্ণিত চারিটী গুহা ক্ষোদিত হওয়ার পর কিছুকাল কোন গুহা ক্ষোদিত হয় নাই। কারণ ইহার পরবর্ত্তীকালে ক্ষোদিত গুহা বলিতে আমরা ১১শ, ১৪শ ও ১৫শ সংখ্যক গুহাগুলিকে নির্দ্দেশ করিতে পারি। এগুলি প্রথমোক্ত গুহাগুলির পরবর্ত্তী তিন শতকের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

অবশিষ্ট গুহাগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম এবং ১৬শ হইতে ২০শ সংখ্যক পর্য্যন্ত গুহাগুলি খৃষ্টীয় পঞ্চম হইতে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে ক্ষোদিত হইয়াছিল। ইহার একদিকে ১ম হইতে ৫ম পর্য্যন্ত ও অপরদিকে ২১শ হইতে ২৯শ পর্য্যন্ত গুহাগুলি সপ্তম শতকের মধ্যেই ক্ষোদিত হইয়া থাকিবে। এই সকল গুহায় মহাযানমতের প্রভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট রহিয়াছে।

প্রথমোক্ত চারিটী গুহার পর ১৬শ ও ১৭শ সংখ্যক গুহা দুইটী ব্যতীত অপর গুহাগুলির যথাযথ নির্ম্মাণকাল নির্দ্দেশ করা কঠিন। উক্ত গুহাদ্বয় কলাগরিষ্ঠ ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসম্পন্ন। এই গুহাদ্বয়ের বিশেষত্ব—ভিত্তিগাত্রে জাতক ও অন্যান্য বিষয়ের মনোরম চিত্র। ভারতের অন্যান্যস্থানে এইরূপ সুন্দর চিত্র অতি অল্পই আছে। ছাদের ও স্তম্ভের নানা বিচিত্র কারুকার্য্য দ্বারা এই বিহার দুইটীর শোভা বহু গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার সহিত আবার ভাস্করের শিল্পচাতুর্য্য মিশ্রিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়, এই গুহা দুইটীর নির্ম্মাণকাল জানিবার একটু সুযোগ রহিয়া গিয়াছে। গুহা দুইটীর ভিতর দুইটী বৃহৎ শিলালিপির ভগ্নাবশেষ হইতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারা যায়।

১৮শ হইতে ২০শ সংখ্যক গুহাত্রয় পূর্ব্বোক্ত গুহা দুইটীর পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় পাদের মধ্যেই নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।

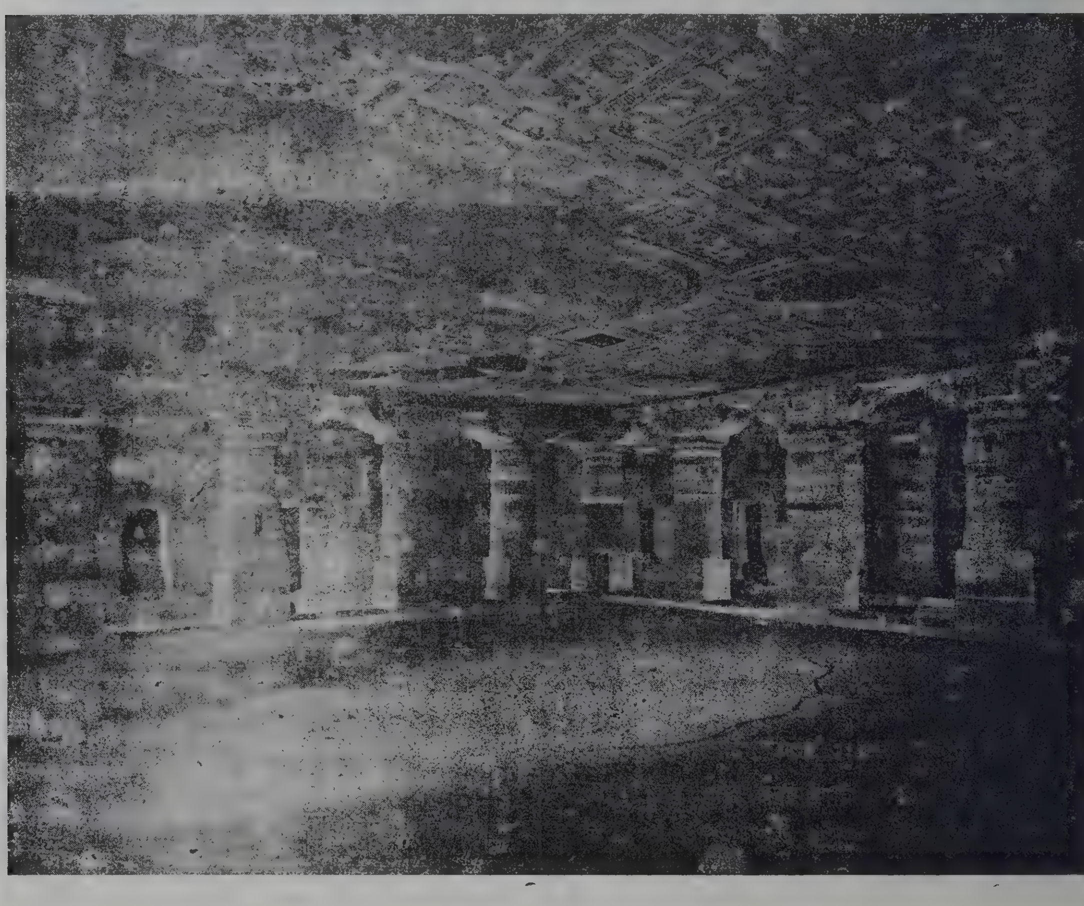
ইহার পর ভাস্করগণ আর এইদিকে অগ্রসর না হইয়া অপর দিকে গুহা ক্ষোদিত করিতে আরম্ভ করে। পূর্ব্বোল্লিখিত গুহাগুলির পর ৮ম, ৭ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যক গুহাগুলি ক্ষোদিত হয়।

এখন অবশিষ্ট থাকিল দক্ষিণপূর্ব্বদিকে পাঁচটী ও দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে ছয়টী গুহা। ইহার মধ্যে দুইটী (৪ ও ২৪শ সংখ্যক) গুহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এই গুহা দুইটী সম্পূর্ণ হইলে সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম ও বৃহৎ হইত বলিয়া মনে হয়।

অজন্তার গুহাশ্রেণীর মধ্যে ১ম ও ২য় সংখ্যক গুহা দুইটী ভাস্কর্য্যশিল্পের নিদর্শনে পরিপূর্ণ। সুন্দর সুন্দর মূর্তিচিত্র এই গুহা দুইটীর সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করিতেছে। ১ম সংখ্যক গুহার ঘরমুখটী কারুকার্য্যের একটী শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। উভয়প্রান্তের গুহাগুলির শিল্পসৌন্দর্য্য দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, সেই যুগে ভাস্কর্য্যশিল্পের কতদূর উন্নতি হইয়াছিল।

অজন্তার অধিকাংশ গুহাই মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত—বারান্দা, উপাশ্রয়গৃহ (Hall) এবং গর্ভগৃহ। ঘরমুখেই বারান্দা, এখান হইতে দ্বারপথে উপাশ্রয়গৃহে প্রবেশ করিতে হয়। আবার উপাশ্রয়গৃহ হইতে গর্ভগৃহে যাইতে হইলে একটী প্রকোষ্ঠ (Antechamber) অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। গুহার চতুষ্পার্শ্বে বিভিন্ন সংখ্যক ও বিভিন্ন আয়তনের কুঠুরী বর্ত্তমান। নিম্নে সংক্ষেপে ২৯টী গুহার বিবরণ দেওয়া হইল।

১ম গুহা।—এই গুহাটী এটী বিহার। ইহার বারান্দা ৬৪ ফুট দীর্ঘ, ৯½ ফুট প্রস্থ এবং ১৩½ ফুট উচ্চ। ইহার দুই প্রান্তে দুইটী কুঠুরী আছে। মধ্যস্থলে যে বৃহৎ দরজা আছে, তাহার পার্শ্ব ও উপরিভাগ নানা কারুকার্য্যে শোভিত। এই দরজা দিয়া উপাশ্রয়গৃহে (হলঘরে) প্রবেশ করা যায়। উপাশ্রয়গৃহটী দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ৬৪ ফুট করিয়া। উহার ছাদ ২০টী স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান এবং দেওয়াল ও স্তম্ভশ্রেণীর মধ্যে একটী ৯½ ফুট বিস্তারবিশিষ্ট অলিন্দ চারিদিক বেষ্টন করিয়া আছে। পশ্চাদ্ভাগে গর্ভগৃহ ও তাহার সম্মুখে আর একটী প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। গর্ভগৃহের আয়তন ২০ ফুট×২০ ফুট এবং তন্মধ্যে একটী বৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। গুহার অভ্যন্তরে ১৪টী ছোট ছোট কুঠুরী আছে—দক্ষিণে বামে ও পশ্চাদ্ভাগে চারিটী করিয়া, সম্মুখস্থ দুই পার্শ্বে দুইটী। বারান্দার স্তম্ভগুলি নানাবিধ কাল্পনিক চিত্রে মণ্ডিত। স্তম্ভগাত্রে সরল ও ঘুরান শির আছে। ঊর্দ্ধ ও পাদদেশে পৌরাণিক কাহিনী ও নানা জীবজন্তু ও ফলফুলের চিত্র অঙ্কিত। একটী স্তম্ভের উপরে একই মস্তকবিশিষ্ট চারিটী হরিণের চিত্র অতি সুকৌশলে অঙ্কিত হইয়াছে। চিত্রটী অতি সুন্দর ও বাস্তব, যেন একান্তই সজীব। এইরূপ এক মস্তকবিশিষ্ট চারি হরিণের চিত্রের অনুরূপ চিত্র ঘটোৎকচ গুহায়ও আছে।



১ম গুহার উপাশ্রয়গৃহ (Hall)।

১নং গুহাগাত্রে কোন লিপি উৎকীর্ণ নাই। সুতরাং ইহার নির্ম্মাণকাল সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না। তবে স্থাপত্য, ভাস্কর্য্যকৌশল ও চিত্রপদ্ধতি আলোচনায় ইহা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের বলিয়া অনুমিত হয়।

২য় গুহা।—১নং গুহার ন্যায় এই গুহাটীও একটী বিহার। পূর্ব্বোক্ত গুহার ন্যায় ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ম গুহা অপেক্ষা এটী কিছু ছোট; ইহার ধরণও ততটা জমকালো নয়। কিন্তু ইহার কল্পনাপ্রাচুর্য্য ও সাজসজ্জার সূক্ষ্ম কারুকার্য্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় গুহার পরিকল্পনা প্রথম গুহার তুল্য। বারান্দাটী কিছু অল্পায়তন—৭ ফুট × ৪৬২ ফুট। ইহার স্তম্ভসমূহের ক্ষোদিত কারুকার্য্যও প্রচুর এবং কিছু নূতন ধরণের। স্তম্ভগুলি গোল, ঊর্দ্ধদিকে ক্রমসূক্ষ্ম; শীর্ষদেশ উপর্য্যুপরিস্থিত তিনটী পদ্ম দ্বারা শোভিত। মধ্যের পদ্মটী পূর্ণবিকশিত এবং ঘণ্টাকৃতি। স্তম্ভগাত্র শিরতোলা; ঐ



দণ্ডায়মানা রমণী (২য় গুহা)।

শিরগুলি স্তম্ভের শীর্ষগামী হইয়া লম্বিত পুষ্পদলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঘরমুখে বিশেষ কোন ক্ষোদাই কার্য্য ছিল না, কিন্তু স্তম্ভশ্রেণীর উপরে প্রস্তরগাত্রে কতকগুলি চতুষ্কোণ ছিদ্র কোন প্রকার কারুকার্য্যের পূর্ব্বাস্তিত্ব সূচনা করিতেছে।

বারান্দার ছাদ ও দেওয়াল সুন্দরভাবে রঞ্জিত। প্রচুর আলো থাকায় এখানে বর্ণ পর্য্যবেক্ষণ করিবার বিশেষ সুবিধা আছে। কএক প্রকারের সবুজ এবং নীল রঙ্ এই চিত্রসমূহে বহুল ব্যবহৃত হইয়াছে। নীলরঙের উজ্জ্বলতা এত দীর্ঘকালের ব্যবধানেও দর্শকের মন হরণ করিতেছে। এখানকার কতকগুলি সুন্দর শিল্প-কৌশল লক্ষ্য করিবার বিষয়। যথা, কৃষ্ণাভ পাটলবর্ণের কতকগুলি মূর্ত্তির নাসিকা ও চিবুকে উজ্জ্বল আলোর প্রতিফলন প্রদর্শন করিতে চিত্রকর একপ্রকার পাৎলা পীতরঙের সাহায্য লইয়াছেন। আবার কতকগুলি মূর্ত্তির অক্ষিপত্রের নিম্নে ছায়া দেখাইবার জন্য নীল রেখা টানিয়া দেওয়ায় তাহার ফল অতি সুন্দর হইয়াছে। কোথায়ও বহির্বিন্যস্তরেখায় ঘন বর্ণের প্রলেপ দ্বারা অঙ্গের সুগোলত্ব দেখান হইয়াছে। কোথায়ও বিন্দুসাহায্যে পরিপ্রেক্ষা সৃষ্টি করা হইয়াছে।

বারান্দার বাম ও দক্ষিণপ্রান্তে দুইটী ক্ষুদ্র গৃহ আছে। এই গৃহদ্বয়ের মুখভাগে সুন্দর কারুকার্য্য বিদ্যমান। সপার্ষদ নাগরাজগণ এবং গণদেব তার মূর্ত্তিগুলি উচ্চাঙ্গের। প্রতি গৃহের পশ্চাতে একটী করিয়া প্রকোষ্ঠ।

গুহার মধ্যস্থিত উপাশ্রয়গৃহটী প্রায় সমচতুষ্কোণ (৪৮'৪" × ৪৭'৭")। সূক্ষ্মকারুকার্য্যখচিত দ্বাদশটী বৃহৎ স্তম্ভের উপর ছাদটী দণ্ডায়মান। ইহার চতুর্দ্দিকে অলিন্দ এবং ভিক্ষুদের বাসার্থ দশটী প্রকোষ্ঠ আছে। এই দশটী প্রকোষ্ঠের মধ্যে দক্ষিণ ও বাম অলিন্দে তিনটী করিয়া এবং সম্মুখ ও পশ্চাতের অলিন্দে দুইটী করিয়া প্রকোষ্ঠ।

গর্ভগৃহটী আয়তনে ১৪ ফুট × ১১ ফুট। মধ্যে ধর্ম্মচক্রে উপবিষ্ট বুদ্ধদেবের বিশালমূর্ত্তি। এই গৃহ ও তাহার সম্মুখস্থ প্রকোষ্ঠের দ্বার তক্ষণকার্য্যে শোভিত। সম্মুখস্থ প্রকোষ্ঠের স্তম্ভও কারুকার্য্যময়। ইহার দুই পার্শ্বে দুইটী পার্শ্বগৃহ আছে। তাহাতে যক্ষমূর্ত্তি বিদ্যমান।

উপাশ্রয়গৃহে এবং গর্ভগৃহে যাইবার প্রকোষ্ঠের স্তম্ভগুলি দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে, রূপ ও বর্ণের সমাবেশে ভারতীয় শিল্পিগণ বৈচিত্র্য কিরূপ পছন্দ করিতেন। শিল্পকৌশলের দিক্ দিয়া ভাস্কর ও চিত্রকর উভয়ের কার্য্যই সুনিপুণ ও প্রশংসার্হ হইয়াছে। যদিও ১নং ও ২নং গুহার কোন কোন চিত্রের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে, তবুও দুই গুহার অধিকাংশ চিত্রেই ভাবে ও শিল্পে অনেকটা বিভিন্ন। ২নং গুহার চিত্রাঙ্কনে শিল্পী সজ্জার দিকেই প্রধানতঃ মন দিয়াছেন। সর্ব্বত্রই অলঙ্করণের প্রাচুর্য্য। ১নং গুহার 'বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি' অথবা 'প্রাসাদদ্বারে ভিক্ষু' প্রভৃতি চিত্রের মহান্ ভাব এই গুহার কোন চিত্রে দৃষ্ট হয় না।

এই গুহায় এগার খানি চিত্রসংবলিত লিপি দৃষ্ট হয়।

তাহাদের অধিকাংশই অতিশয় ভগ্ন, খণ্ডিত ও বিকৃত। ডাঃ জে. বার্জেস্ এতন্মধ্যে কএকখানি লিপি প্রকাশ করিয়াছেন।*

এই লিপিগুলি পরীক্ষা করিয়া এলান্ সাহেব (Mr. J. Allan, Keeper of Coins and Medals in the British Museum) ঐ সকল লিপি ৫০০-৫৫০ খৃষ্টাব্দে লিখিত এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। সকল লিপিই সংস্কৃত বা ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত, মাত্র একখানি কনাড়ী অক্ষরে এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে লিখিত। অপর একখানি লিপি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন।



বুদ্ধসমীপে মাতা ও শিশুর অর্ঘ্যদান (১৯শ গুহা)।

অধ্যাপক লুডারের মতে তিনখানি লিপি (ও তৎসম্বন্ধীয় চিত্র) আর্য্যশূরের 'জাতকমালা' গ্রন্থের ক্ষান্তিবাদীজাতক অবলম্বনে রচিত। ইহাদের দুইখানিকে তিনি ক্ষান্তিবাদী জাতকের কএকটী শ্লোকেরই বিকৃত পাঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অধ্যাপক লুডার অপর একখানি লিপিকে আর্য্যশূরের মৈত্রাবলজাতকের একটী শ্লোকের অশুদ্ধ পাঠ বলিয়াছেন। এই সকল চিত্রসংবলিত লিপি বাম অলিন্দের পার্শ্বগৃহের প্রাচীরে, গর্ভগৃহের সম্মুখস্থ প্রকোষ্ঠের বামদিকে অবস্থিত স্তম্ভের পাদপীঠে ও পশ্চাতের প্রাচীরে এবং গর্ভগৃহের দ্বারপার্শ্বে বিরাজমান।

৩য় গুহা।—এই গুহাটী অপেক্ষাকৃত ছোট এবং অসম্পূর্ণ। ইহা ২য় গুহার কিছু উপরে অবস্থিত। ইহার বারান্দা ২৯ ফুট লম্বা ও ৭ ফুট চওড়া; উহা চারিটী বৃহৎ ও দুইটী ক্ষুদ্র স্তম্ভের উপর রক্ষিত। মনে হয়, উপাশ্রয়গৃহে ঢুকিবার জন্য সবেমাত্র দরজা তৈয়ারী করা হইয়াছিল, কিন্তু খননকার্য্য আরম্ভ করিবার পর কোন কারণে এই গুহার অপরাপর কার্য্য স্থগিত রাখা হয়।

৪র্থ গুহা।—ফার্গুসন ৪র্থ গুহাকে ৩য় গুহা বলিয়াছেন। এই গুহাটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। বারান্দাটী ৮৭ ফুট লম্বা, ১১$\frac{1}{4}$ ফুট চওড়া ও ১৬ ফুট উচ্চ। ইহা আটটী অষ্টকোণ স্তম্ভের উপরে রক্ষিত। স্তম্ভের কুম্ভবন্ধ কিংবা বোধিকায় বিশেষ কোন কারুকার্য্য নাই। বারান্দার দুই পার্শ্বে দুইটী ছোট ছোট ঘর; এই দুইটী ঘরের আয়তন ১০ ফুট × ৮$\frac{1}{2}$ ফুট। উপাশ্রয়গৃহে প্রবেশের প্রধান দ্বারের উপরে কারুমণ্ডিত বাতায়ন; তাহাতে বুদ্ধের মূর্ত্তি ক্ষোদিত। এই গুহা প্রায় ২য় গুহারই অনুরূপ; প্রবেশদ্বারে নারী দ্বাররক্ষিকা। উপাশ্রয়গৃহের আয়তন ৮৭ ফুট সমচতুষ্কোণ। ইহার মধ্যে ২৮টী স্তম্ভ আছে এবং সবগুলিই সুন্দর তক্ষণশিল্পে পরিশোভিত। সম্মুখের স্তম্ভশ্রেণীর বিভক্তস্থান ৯৭ ফুট লম্বা। উহার উভয় পার্শ্বে একটী করিয়া প্রকোষ্ঠ। এই গুহাতে চিত্রশিল্প নাই, কিন্তু ভাস্কর্য্যের বিশেষ নিদর্শন আছে।

৫ম গুহা।—এই গুহাটীও অসম্পূর্ণ। ইহা ৪৫$\frac{1}{2}$ ফুট লম্বা ও প্রায় ৯ ফুট চওড়া। বারান্দার চারিটী স্তম্ভের মধ্যে একটী স্তম্ভের নির্ম্মাণ প্রায় শেষ করা হইয়াছিল। প্রধান প্রবেশ-দ্বারের চারিদিকেই প্রস্তার করা হইয়াছে। উভয় পার্শ্বের প্রস্তারে ছয়টী খোপ আছে—উহাদের মধ্যে দণ্ডায়মান মূর্ত্তি অবস্থিত। দরজার বামদিকের জানালা উচ্চাঙ্গের তক্ষণশিল্পে শোভিত। ইহা ছাড়া অন্য কোন কাজ আরম্ভ করা হয় নাই।

৬ষ্ঠ গুহা।—এই গুহাটী অজন্তা গুহাশ্রেণীর মধ্যে একমাত্র দ্বিতল বিহার। এই স্থানের প্রস্তর অত্যন্ত খারাপ থাকায় গুহাটী আর্দ্রতার প্রভাবে ধ্বংসমুখে পতিত হইতেছে। প্রথম তলের সম্মুখভাগের বারান্দা সমস্তই ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। সম্মুখভাগের দেওয়ালে চারিটী সুবৃহৎ জানালা। উহাদের দ্বারা ভিতরে আলোক প্রবেশের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সম্মুখের ভিত্তিগাত্র প্রায় ৫৩$\frac{1}{2}$ ফুট চওড়া ও প্রায় ৫৪$\frac{1}{2}$ ফুট উচ্চ। দুই পার্শ্বেই একটী করিয়া প্রকোষ্ঠ; প্রত্যেকটীই ১০ × ৮ ফুট।

* Vide Inscriptions from the Cave Temples of Western India, (1881), pp. 80-82.

সম্ভবতঃ এই গুহাটী রন্ধনের জন্য ব্যবহৃত হইত। রন্ধন-স্থানের বহু চিহ্ন এখনও দেখা যায়। উহার স্তম্ভগুলি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রত্যেক শ্রেণীতে চারিটী করিয়া স্তম্ভ। এই স্তম্ভগুলির মধ্যে পাঁচটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ৭টী স্তম্ভ এখনও ভাল অবস্থায় আছে। বাকী চারিটী কোনরূপে দাঁড়াইয়া আছে। ঈষদুত্থিত ক্ষুদ্র স্তম্ভগুলির মধ্য-স্থানে দুই পার্শ্বেই তিনটী করিয়া প্রকোষ্ঠ। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ ৯×৮ ফুট। গর্ভগৃহটী ১৫½ ফুট উচ্চ। উহাতে উপ-দেশনিরত শাক্য-বুদ্ধের নীলবর্ণ মূর্ত্তি আছে। এই গুহাটীতে একাধারে চিত্র ও ভাস্কর্য্যশিল্পের সমাবেশ রহিয়াছে। চিত্রসম্ভার অবশ্য প্রথম বা দ্বিতীয় গুহার মত প্রচুর নয়।

৭ম গুহা।—এই গুহাটী একটু অন্য ধরণের। বারান্দার সম্মুখে দুইটী চাতাল অষ্টকোণ স্তম্ভের উপর রক্ষিত ছিল। সম্মুখের ভিত্তিগাত্রে জানালা রহিয়াছে। বারান্দাটী ৬২ ফুট ১০ ইঞ্চ লম্বা ও ১৩ ফুট ৭ ইঞ্চ চওড়া এবং ১৩½ ফুট উচ্চ। এই গুহার কোন উপাশ্রয়গৃহ নাই। তবে পিছনের দেওয়ালে চারিটী প্রকোষ্ঠ আছে। মধ্যের প্রকোষ্ঠ দিয়া গর্ভগৃহে যাওয়া যায়। বারান্দার দুইপার্শ্বেও দুইটী প্রকোষ্ঠ বর্ত্তমান। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়া আরও ৩টী প্রকোষ্ঠে যাওয়া যায়। এই প্রকোষ্ঠগুলি ৪½ ফুট সমচতুষ্কোণ। গর্ভগৃহে শাক্যবুদ্ধ অবস্থিত। গুহাস্থ ক্ষোদিত মূর্ত্তিশিল্পের সমস্তই বুদ্ধসম্পর্কিত। পিছনের দেওয়ালে সামান্য কিছু চিত্রের আভাস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে কোন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় না।

৮ম গুহা।—এই গুহাটী পাহাড়ের সর্ব্বনিম্নে অবস্থিত। সম্মুখ-ভাগের সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে। প্রধান উপাশ্রয়গৃহের যে অংশ এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহা প্রায় ৩২ ফুট লম্বা, ১০ ফুট চওড়া ও ১৭ ফুট উচ্চ। ইহার দুই পার্শ্বে দুইটী প্রকোষ্ঠ। গর্ভগৃহের দুই পার্শ্বেও দুইটী ঘর। গর্ভগৃহে কোন মূর্ত্তি নাই, কেবলমাত্র একটী শয্যাবেদী দেখিতে পাওয়া যায়।



উপাশ্রয়গৃহের ছাদে চিত্রিত কারুকার্য্য (১ম গুহা)।

৯ম গুহা।—এই গুহাটী হীনযান বৌদ্ধযুগের একটী ক্ষুদ্র চৈত্যগৃহ। প্রায় ৪৫ ফুট লম্বা, ২৩ ফুট চওড়া এবং ২৩ ফুট উচ্চ। ইহার প্রবেশদ্বারটী আড়ম্বরশূন্য। ইহার ভিতরে যে কাঠের কাজ ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঘরমুখে কাঠের ঝিলমিলিটীর চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই, কেবল ভিত্তিগাত্রে গর্ত্তগুলি আছে। গুহাভ্যন্তরে এই প্রকার কাঠের ঝিলি-মিলি ও বাঁকানো বরগার অস্তিত্ব লইয় ইউরোপীয় স্থাপত্য-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের মধ্যে বহুতর বাদানু-বাদের সৃষ্টি হইয়াছে। ফার্গুসন-প্রমুখ স্থাপত্যবিদ্‌গণ বলেন যে, এই কাঠের কাজ-গুলির অস্তিত্বে প্রমাণিত হয়, পূর্ব্বে এদেশে লোকে কাষ্ঠ ব্যতীত অন্য উপাদানে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে জানিতই না। পরে গ্রীক্, পারসীক প্রভৃতি জাতির নিকট ইষ্টক ও প্রস্তরে গৃহ-নির্ম্মাণ শিখিলেও সেই কাঠের ছাঁদ ও কাঠের ব্যবহার তাহারা ভুলিতে পারে নাই। এ সম্বন্ধে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার "Indo Aryans" গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন ও তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সকল নূতন তথ্য জানা গিয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, চাঁদোয়া, ঝালর, পরদা প্রভৃতি টাঙ্গাইবার ব্যবস্থার জন্যই এই সকল কাঠের ঝিলিমিলি ও বরগার ব্যবস্থা করা হইত এবং ফার্গুসন প্রভৃতির সিদ্ধান্ত নিতান্ত অযৌক্তিক।

চৈত্যগাত্রে যে বুদ্ধমূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে, তাহা পরবর্ত্তী মহাযান বৌদ্ধযুগে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান। এই গুহা ও ১০ম সংখ্যক গুহার দেওয়াল এবং স্তম্ভগুলি ১২শ ও ১৩শ সংখ্যক গুহাগুলির ন্যায় মসৃণ। সম্ভবতঃ ইহার উপর একটা রঙের বা অন্য কোন প্রকার পাৎলা প্রলেপ দেওয়া ছিল, কিন্তু দেওয়ালের মসৃণ গাত্র হইতে উহা সহজেই ঝরিয়া পড়ে; সুতরাং অল্পকাল পরেই উহার উপর পুনরায় রঙের প্রলেপ দিবার আবশ্যকতা হইয়াছিল। স্তম্ভগুলি প্রায়ই সরল, তবে স্তম্ভের মূল হইতে বোধিকা পর্য্যন্ত

ক্রমশঃ প্রায় এক ইঞ্চ পরিমাণ ক্ষীণতর হইয়াছে। দেওয়ালে ও স্তম্ভে তিনটী বিভিন্ন সময়ের রঙের প্রলেপের চিহ্ন লক্ষিত হয়। সম্মুখের দেওয়ালের অভ্যন্তরভাগে নিম্নতম স্তরের প্রাথমিক দুই একটী সুস্পষ্ট প্রাচীনতম চিত্রের নিদর্শন বর্ত্তমান। এগুলি সম্ভবতঃ ১ম ও ২য় গুহায় অঙ্কিত চিত্রের পূর্ব্বেকার। চিত্রগুলি অধিকাংশই বুদ্ধঘটিত। বুদ্ধের আদর্শ অতি সুন্দর-ভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। পশ্চাতের দেওয়ালে যে চিত্রের চিহ্ন আছে, তাহা পরবর্ত্তিযুগে অঙ্কিত এবং তাহার উপর যে লিপি অঙ্কিত আছে, তাহার অক্ষরগুলি দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাহা খৃষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকের। এই গুহার মধ্যে অনূ্যন বিশটী লিপির চিহ্ন আছে, কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই খণ্ডিত। সমস্ত লিপিগুলিই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত উৎসর্গলিপি।

১০ম গুহা।—এই গুহাটীও একটী চৈত্যগৃহ। ইহা ৯৫½ ফুট লম্বা, ৪১ ফুট চওড়া ও প্রায় ৩৬ ফুট উচ্চ। এই চৈত্যগৃহের সম্মুখভাগ আড়ম্বররহিত। অন্যান্য প্রাচীন চৈত্যের ন্যায় ইহার প্রবেশদ্বারের উপরিস্থিত বৃহৎ গবাক্ষের উপর কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ঝিলিমিলি ছিল, কিন্তু তাহা নষ্ট হইয়া গেলে পরবর্ত্তী যুগে ইহার নিম্নাংশ বৃহদাকার ইষ্টক দিয়া গাঁথা হইয়াছিল। গবাক্ষের বৃহৎ খিলানের বহির্দ্দেশে কোনপ্রকার কারুকার্য্যের চিহ্ন নাই। খিলানের নিম্নে দক্ষিণদিকে মৌর্য্য অক্ষরে একটী ছোট দানলিপি উৎকীর্ণ আছে—"বাসিঠিপুতস কটহাদিনো ঘরমুখদানং" অর্থাৎ বাসিষ্ঠীপুত্র কটহাদি এই ঘরমুখ দান করিতেছেন। কোন ধনবান ব্যক্তির ব্যয়ে চৈত্যের সম্মুখস্থ বৃহৎ গবাক্ষটী নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান। এই লিপির অক্ষর ও ভাষা প্রভৃতি দেখিয়া এবং খৃষ্টপূর্ব্বযুগের চৈত্যগুহার সহিত সাদৃশ্যে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই গুহাটী খৃষ্টজন্মের অন্ততঃ দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ক্ষোদিত হইয়াছিল।

ঘনসন্নিবিষ্ট স্তম্ভশ্রেণী চৈত্যগৃহের মধ্যভাগের দুই পার্শ্বে বরাবর সমান্তরভাবে গিয়া অবশেষে গুহাপ্রান্তে স্তূপের পশ্চাতে অর্দ্ধবৃত্তাকারে মিশিয়াছে; এবং পার্শ্ববর্ত্তী অংশদ্বয়ও সমান্তর ভাবে যাইয়া প্রান্তভাগে এক হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বসমেত ৩৯টী অষ্টপল স্তম্ভ আছে। স্তম্ভগুলি মূল হইতে শীর্ষ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ঈষৎ সূক্ষ্মতর হইয়া গিয়াছে। স্তম্ভগুলির অধিষ্ঠান বা বোধিকা কিছুই নাই। স্তম্ভগাত্রে যে সমস্ত বুদ্ধমূর্ত্তি আছে, তাহা বহু পরবর্ত্তিযুগে ক্ষোদিত হইয়াছিল। এই গুহার দুই পার্শ্বের দেওয়ালে যে চিত্র অঙ্কিত দেখা যায়, তাহা বহু প্রাচীন, বিশেষতঃ বাম দেওয়ালে উৎকীর্ণ লিপি ইহা সপ্রমাণ করিতেছে। দক্ষিণদিকের দেওয়ালে 'ছদন্ত'-জাতকের গল্প চিত্রিত আছে। [ছদন্তজাতক দ্র°] এই গুহা ও ৯ম গুহার প্রাচীর ও স্তম্ভগাত্রের বিভিন্ন ছাঁদের চিত্রগুলি দেখিয়া সংশয় মাত্র থাকে না যে, বিভিন্নকালে কএক শতকের ব্যবধানে সেগুলি চিত্রিত হইয়াছিল এবং প্রাচীনতম চিত্রগুলি



১ম গুহার ঘরমুখ

মৌর্য্যযুগে ও শেষের গুলি অন্ততঃ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে অঙ্কিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত লিপি ব্যতীত চিত্রগুলির সহিত আরও কতকগুলি লিপি আছে। তাহার অক্ষর দেখিয়া মনে হয়, ঐগুলি খৃষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকের। ঐগুলির ভাষা সংস্কৃত, তাহাতেই বোধ হয় উহা মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধগণের প্রচেষ্টার চিহ্ন।

১১শ গুহা।—এই গুহাটী ১০ম সংখ্যক গুহার পশ্চিমে পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা ১০ম সংখ্যক গুহার প্রায় ৪০০ বর্ষ পরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার বারান্দা চারিটী স্তম্ভের উপর রক্ষিত। প্রত্যেক স্তম্ভই অষ্টকোণ। বারান্দার দুইপার্শ্বে দুইটী প্রকোষ্ঠ। উপাশ্রয়গৃহে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণে তিনটী খোপ দেখা যায়, সেগুলিতে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত। স্তম্ভগুলি কারুকার্য্যশোভিত। উপাশ্রয়গৃহটী ৩৭ ফুট লম্বা, ২৮ ফুট চওড়া ও ১০ ফুট উচ্চ। ইহাতে মাত্র চারিটী স্তম্ভ আছে। এইগুলি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন আদর্শে নির্ম্মিত। গর্ভগৃহটী ১২ ফুট চওড়া ও প্রায় ১৯ ফুট লম্বা। এই গুহার চিত্রসম্ভার প্রায় সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে, কেবল মাত্র বারান্দায় এখনও কিছু কিছু দেখা যায়। সমস্ত গুহার অভ্যন্তরভাগ চিত্রিত ছিল। গুহার প্রান্তস্থিত একটী শয়নকক্ষের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া পরবর্ত্তিকালে তাহাতে একটী বেদীর উপর বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই গর্ভগৃহের একদিকের ভিত্তিগাত্রে অনেক উচ্চে একটী ছোট কক্ষ ক্ষোদিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহার মধ্যে পূজা-সম্বন্ধীয় মূল্যবান্ দ্রব্যাদি লুক্কায়িত থাকিত। এই গুহাটী দেখিলে মনে হয় যে, ইহা খৃষ্টজন্মের পরবর্ত্তিকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

১২শ গুহা।—ইহা একটী বিহার। এই গুহার ভাস্কর্য্য দেখিয়া মনে হয়, ইহা ১০ম সংখ্যক গুহার সমসাময়িক। প্রথমতঃ, গুহাটীর ভিতর কোন স্তম্ভ নাই। দ্বিতীয়তঃ, উপাশ্রয়গৃহের (৩৬½ ফুট সমচতুষ্কোণ) তিন দিকে যে দ্বাদশটী শয়নকক্ষ আছে, সেই গুলির প্রবেশদ্বারের উপর মৌর্য্যযুগের অশ্বক্ষুরাকৃতি খিলান রচিত হইয়াছে এবং প্রতি দ্বারদ্বয়ের মধ্যে ভিত্তিগাত্রে সেই যুগের বেষ্টনী বা রেলিং এবং ক্ষুদ্রাকৃতি দুইটী করিয়া খিলান ক্ষোদিত আছে। ইহাই এই গুহাটীর একমাত্র কারুকার্য্য। তৃতীয়তঃ, প্রতি শয়নকক্ষে দুইটী করিয়া শয্যাবেদী আছে। চতুর্থতঃ, এই গুহার দক্ষিণপ্রান্তস্থ শয়নকক্ষের প্রবেশদ্বারের বাম-পার্শ্বে এই দানলিপিটী ক্ষোদিত আছে—"ঠানকো দেয়ধমং ঘনামদডস বণিজ[স] সউববরকো সউপা[সয়ো]।" অর্থাৎ বণিক্ ঘনামদড কর্ত্তৃক এই উপাশ্রয় ও শয়নকক্ষাদিসংবলিত বিহারগৃহ দান করা হইল। মোট কথা, এই বিহারটীর সহিত ভাজা, নাসিকের ১৪শ সংখ্যক গুহা ও কোণ্ডানের গুহার এতই সাদৃশ্য আছে যে, ইহা যে সেই যুগের নির্ম্মিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

১৩শ গুহা।—এই গুহাটী একটী আড়ম্বরশূন্য বিহার। দেখিলে সহজেই প্রাচীন বলিয়া প্রতীত হয়। ইহার অভ্যন্তরভাগের দেওয়ালগুলি মসৃণ। এই গুহার মধ্যে কোন স্তম্ভ নাই এবং ইহার উপাশ্রয়গৃহের চারিপার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাতটী কক্ষ বর্ত্তমান। কক্ষগুলির ভিতর প্রস্তরনির্ম্মিত শয্যাবেদী রহিয়াছে। এইরূপ শয্যাবেদী বুদ্ধের সমকালীন রাজগৃহস্থ গৃধ্রকূট পর্ব্বতগুহায় পাওয়া গিয়াছে। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া এগুলি মৌর্য্যযুগে বা তাহার অব্যবহিত পরে ক্ষোদিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। উপাশ্রয়গৃহটী দৈর্ঘ্যে ১৬½ ফুট, প্রস্থে ১৩½ ফুট এবং উচ্চতায় ৭ ফুট। পর্ব্বত ধ্বসিয়া যাওয়ায় ইহার প্রবেশদ্বার সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

১৪শ গুহা।—১৩শ গুহার কিছু উপরে এই গুহা অবস্থিত। ইহার বারান্দা ৬৩ ফুট লম্বা, ১১ ফুট চওড়া ও ৯ ফুট উচ্চ। উহা ছয়টী স্তম্ভের উপর রক্ষিত। ইহাতে দুইটী ছোট থামও আছে। গুহাটী একরূপ অসম্পূর্ণ। মাত্র প্রবেশদ্বার নির্ম্মাণ করিয়া ভিতরের উপাশ্রয়গৃহের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছিল। প্রবেশদ্বারটী অতি সুন্দর তক্ষণশিল্পে পরিশোভিত—উহার উপরে জানালাও বর্ত্তমান।

১৫শ গুহা।—১৪শ গুহার কিছু পরেই ১৫শ গুহা অবস্থিত। ইহার বারান্দা ৩৩ ফুট লম্বা ও ৬½ ফুট চওড়া। ইহাতে দুইটী বৃহৎ ও দুইটী ঈষদুচ্চ স্তম্ভ আছে। গুহার সম্মুখভাগ ভূমিসাৎ হইয়াছে। অধুনা বারান্দায় একটী মাত্র স্তম্ভের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। দ্বারের উপর বিশেষ কোন কারুকার্য্য নাই। উপাশ্রয়গৃহটী প্রায় সমচতুষ্কোণ, উহাতে কোন স্তম্ভ নাই। উহার এক একটী দিক্ প্রায় ৩৪ ফুট এবং উচ্চতা প্রায় দশ ফুট। এই গৃহের প্রতি পার্শ্বেই চারিটী করিয়া প্রকোষ্ঠ। এতদ্ব্যতীত বারান্দার দুইপার্শ্বে দুইটী প্রকোষ্ঠ। এই গুহায় মূর্ত্তিশিল্পের সামান্য নিদর্শন আছে—চিত্রশিল্প নাই বলিলেই হয়।

১৬শ গুহা।—ইহা একটী বিহার। ইহার বারান্দা ৬৫ ফুট লম্বা ও ১০½ ফুট চওড়া এবং উহা ৮টী স্তম্ভের উপর রক্ষিত ছিল। এক্ষণে একটী ব্যতীত সমস্ত স্তম্ভই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। উপাশ্রয়গৃহটী ৬৬ ফুট লম্বা, ৬৫ ফুট চওড়া এবং প্রায় ১৫ ফুট উচ্চ। ইহাতে কুড়িটী অষ্টকোণ স্তম্ভ আছে। এই বিহারে ষোলটী শয়নকক্ষ এবং একটী গর্ভগৃহ বর্ত্তমান। এই গর্ভগৃহের মধ্যে একটী বেদীর উপর আধুনিক চেয়ারে বসার ভঙ্গীতে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি

রহিয়াছে। ভিত্তিগাত্রে নিপুণ চিত্রকর কর্ত্তৃক জাতক হইতে বুদ্ধের পূর্ব্বজন্মের কাহিনীসকল চিত্রিত আছে। স্তম্ভ ও ছাদের (Ceiling) কারুকার্য্য নিপুণতম বর্ণসৌষ্ঠবে চিত্রিত রহিয়াছে। এই গুহায় তিনটী চিত্রিত দানলিপি বর্ত্তমান।

বারান্দার বামপ্রান্তস্থিত ভিত্তিগাত্রে একটী বৃহৎ শিলালিপি দৃষ্ট হয়। লিপিটীর ভাষা সংস্কৃত ও ছন্দোবদ্ধ। ২৭ পংক্তিতে এই লিপিটী লিখিত হইয়াছে। অক্ষরগুলি আনুমানিক খৃষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকের। লিপিটী অত্যন্ত জীর্ণ ও অনেকাংশে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহা হস্তিভোজ নামক এক রাজমন্ত্রীর পুত্রের দানলিপি। দাতা বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের বাসার্থ একটী বিহার দান করিতেছেন, তাহাই ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দাতার নামটী মুছিয়া গিয়াছে। তবে একবিংশ পংক্তিতে যে বরাহ-দেবের নামোল্লেখ আছে, তিনি বোধ হয় রাজা হরিষেণের মন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁহার পিতা হস্তিভোজ রাজা দেবসেনের মন্ত্রিত্ব করিতেন।

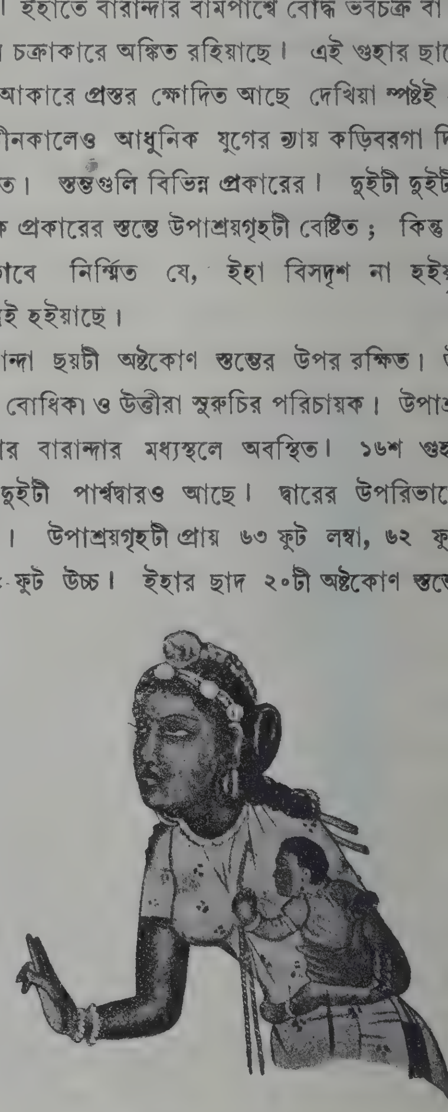
লিপিটীর মর্ম্ম এই—'বিন্ধ্যশক্তি নামে এক মহাপরাক্রান্ত দ্বিজ নরপাল ছিলেন। তিনি 'বাকাটক-বংশকেতু'। তাঁহার পুত্র প্রবরসেন বহু নৃপতিকে পরাজিত করিয়া চক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। প্রবরসেনের পুত্র(?) [রুদ্র]সেন বহু শত্রুসৈন্য জয় করিয়াছিলেন ('জিতসর্ব্বসেন')। তিনি কুন্তলাধিপকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। পুত্রের যখন আট বৎসর বয়স, তখন দ্বিতীয় প্রবরসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎপুত্র দেবসেন। দেবসেনের মন্ত্রীর নাম হস্তিভোজ। দেবসেনের পুত্র হরিষেণ একাধারে হরি, রাম, হর, কাম ও ইন্দ্র সদৃশ এবং সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী ছিলেন। তিনি কুন্তল, অবন্তি, কলিঙ্গ, কোশল, ত্রিকূট, লাট, অন্ধ্র প্রভৃতি দেশ জয় করিয়াছিলেন। হস্তিভোজের পুত্র তাঁহার মন্ত্রী হইয়াছিলেন। নাগাধিপগণদ্বারা অধ্যুষিত জলভারাবনত-মেঘচুম্বী পর্ব্বতশ্রেষ্ঠের শিখরে তিনি গবাক্ষ, নির্য্যূহ, সুবীথি বেদিকা ও দেবকন্যাদিগের প্রতিমাদি দ্বারা অলঙ্কৃত এবং মনোহর স্তম্ভাদি দ্বারা আশ্রিত একটী উচ্চ চৈত্যমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া-ছিলেন। সেই গুহা ভিক্ষুসংঘকে উৎসর্গ করিয়া বরাহদেব সবান্ধবে 'নৃদেবসৌখ্য' অনুভব করিয়া সুগতের প্রশংসা-ভাজন হইয়াছিলেন।' *

* শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জৈসবাল বিহার ও উড়িষ্যা রিসার্চ্চ সোসাইটীর জার্নালে (মার্চ্চ ও জুন, ১৯৩৩) প্রকাশিত 'History of India, C. 150 A. D. to 350 A. D.' শীর্ষক প্রবন্ধে বাকাটক রাজগণের সম্পূর্ণ তালিকা ও তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন।

চম্মক তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, উপরোক্ত দ্বিতীয় প্রবরসেন গুপ্তসম্রাট্ দেবগুপ্তের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। এই বাকাটক সম্রাট্গণের রাজ্যের সীমানার মধ্যে অজন্তা অবস্থিত ছিল। বাকাটকগণ ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ-সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহারা কুশানদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। [বাকাটক দ্র°]

১৭শ গুহা।—১৭শ গুহা অজন্তার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুহাগুলির মধ্যে অন্যতম। ইহা পূর্ব্বোক্ত গুহার মত একই পদ্ধতিতে এবং একই সময়ে নির্ম্মিত। এই গুহার নাম ভবচক্রগুহা (Zodiac Cave)। ইহাতে বারান্দার বামপার্শ্বে বৌদ্ধ ভবচক্র বা জীবনের দশাসকল চক্রাকারে অঙ্কিত রহিয়াছে। এই গুহার ছাদে কড়ি-বরগার আকারে প্রস্তর ক্ষোদিত আছে দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হয় যে, প্রাচীনকালেও আধুনিক যুগের ন্যায় কড়িবরগা দিয়া ছাদ করা হইত। স্তম্ভগুলি বিভিন্ন প্রকারের। দুইটী দুইটী করিয়া এক এক প্রকারের স্তম্ভে উপাশ্রয়গৃহটী বেষ্টিত; কিন্তু স্তম্ভগুলি এইরূপভাবে নির্ম্মিত যে, ইহা বিসদৃশ না হইয়া নয়ন-প্রীতিকরই হইয়াছে।

বারান্দা ছয়টী অষ্টকোণ স্তম্ভের উপর রক্ষিত। উহাদের কুম্ভবন্ধ, বোধিকা ও উত্তীরা সুরুচির পরিচায়ক। উপাশ্রয়গৃহটীর প্রবেশদ্বার বারান্দার মধ্যস্থলে অবস্থিত। ১৬শ গুহার ন্যায় ইহার দুইটী পার্শ্বদ্বারও আছে। দ্বারের উপরিভাগে দুইটী জানালা। উপাশ্রয়গৃহটী প্রায় ৬৩ ফুট লম্বা, ৬২ ফুট চওড়া এবং ১৫ ফুট উচ্চ। ইহার ছাদ ২০টী অষ্টকোণ স্তম্ভের উপর



সন্তান ক্রোড়ে রমণী (১৭শ গুহা)।

অধিষ্ঠিত। গর্ভগৃহটী দৈর্ঘ্যে ২০ ফুট এবং প্রস্থে প্রায় ১৭ ফুট। এইস্থানে বুদ্ধমূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বুদ্ধের পায়ের নিকটেই দুইটী ছোট মূর্ত্তি; তন্মধ্যে একটী ভিক্ষুর মূর্ত্তি ও অপরটী ভাঙ্গিয়া

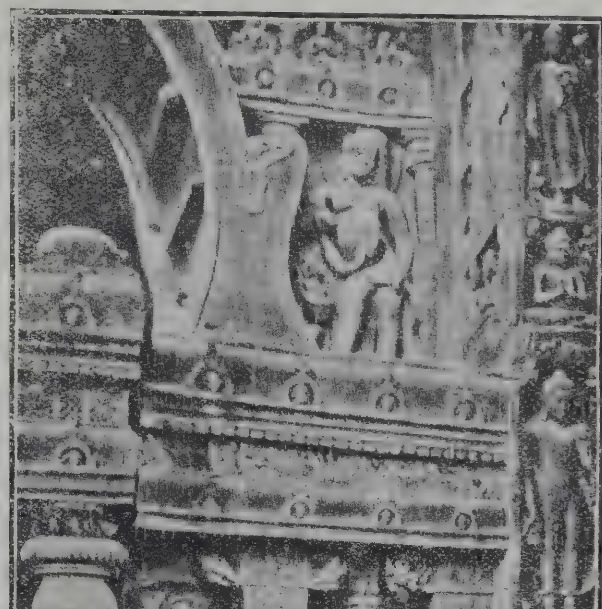
গিয়াছে। অন্যান্য গুহার ন্যায় ইহারও বারান্দার দুইপার্শ্বে দুইটী প্রকোষ্ঠ। গুহাভ্যন্তরে সর্ব্বসমেত ১৬টী প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। বারান্দার দক্ষিণপ্রান্তে একটী গর্ত্ত। তাহাতে সম্ভবতঃ জল রাখা হইত।

এই গুহার বারান্দার বাহিরের দেওয়ালে একটী শিলালিপি আছে। পূর্ব্বোল্লিখিত লিপির ন্যায় এই লিপিটীও অতিশয় জীর্ণ। এই লিপির ২১শ পংক্তিতে বাকাটক নৃপতি হরিষেণের নামোল্লেখ আছে এবং এই লিপিতে উল্লিখিত নৃপতিগণ বাকাটক নৃপতিগণের সামন্তরূপে এই প্রদেশ শাসন করিতেন। লিপিটী সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ও ছন্দোবদ্ধ। ইহাতে মোট ২৯টী পংক্তি আছে; প্রতি পংক্তিতে একটী করিয়া শ্লোক। লিপিটীর মর্ম্ম এই—'* * (অস্পষ্ট) নৃপতির ধৃতরাষ্ট্র নামে একটী পুত্র হয়। তাঁহার পুত্রের নাম হরিসাম্ব এবং তৎপুত্র সৌরিসাম্ব। তাঁহার পুত্রের নাম উপেন্দ্রগুপ্ত। তৎপুত্র কাচ। কাচের পুত্র ভিক্ষুদাস। ভিক্ষুদাসের পুত্র নীলদাস। তৎপুত্র কাচ। তাঁহার পর কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাসের মহিষীর গর্ভে প্রদ্যুম্ন ও সাম্বের ন্যায় দুইটী পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ * * (নাম অস্পষ্ট) রাজা হন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম রবিসাম্ব। তাঁহারা অশ্মক ও অন্যান্য দেশ জয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মন্ত্রীর নাম ছিল অচিন্ত্য। যখন রাজচক্রবর্ত্তী হরিষেণ প্রজাপালন করিতেছিলেন, তখন অচিন্ত্য এই একাশ্মক (monolithic) মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং তাহার মধ্যে মুনিরাজ বুদ্ধের চৈত্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। বহু অর্থব্যয়ে এই বিহারটী নির্ম্মিত হয়। ইহার মধ্যে একটী নয়নাভিরাম, লঘু, প্রসন্ন ও শীতল সলিলবিশিষ্ট জলাশয় খনিত হইয়াছিল। ইহার অপরদিকে পশ্চিমপার্শ্বে একটী গন্ধকুঠীও নির্ম্মিত হয়।'

পূর্ব্বোক্ত ভবচক্র চিত্র ব্যতীত অন্যান্য স্থানে বিশেষতঃ প্রাচীরগাত্রে ও ছাদে চিত্রের অভাব নাই। অসংখ্য চিত্রের তথায় সমাবেশ হইয়াছে। ১ম গুহার মত ইহারও বহু চিত্র রাজা ও রাজপুরীবিষয়ক। তবে বুদ্ধসম্পর্কিত বহু চিত্রও দেখা যায়। চিত্রগুলির অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা ও শিল্পনৈপুণ্যে এই গুহাটী সকল গুহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

১৮শ গুহা।—এই গুহাটী উল্লেখযোগ্য নহে। ইহা একটী চাতাল মাত্র। চাতালটী ১৯'৪" × ৮'১০" ফুট। উহা দুইটী স্তম্ভের উপর রক্ষিত। সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী গুহায় যাইবার সুবিধার জন্য ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। আবার ইহার নিম্নে জলাশয়ের চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বোধ হয়, এইস্থানে জল রক্ষা করা হইত।

১৯শ গুহা।—এই গুহাটী একটী চৈত্য। ইহা দৈর্ঘ্যে ৪৬ ফুট ও প্রস্থে ২৪ ফুট এবং প্রায় ২৪ ফুট উচ্চ। কিন্তু ইহার ভাস্কর্য্য সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। কাষ্ঠের কার্য্যের পরিবর্ত্তে এই গুহায় প্রস্তর খোদাই করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। চিত্রের স্থান মূর্ত্তিশিল্প আসিয়া অধিকার করিয়াছে এবং সর্ব্বত্রই নানাভাবে বুদ্ধের মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। প্রাচীন বৌদ্ধ যুগের সুপরিচিত বেষ্টনী (railing) এই গুহার বহির্ভাগে আর অলঙ্কারস্বরূপ ব্যবহৃত হয় নাই। অশ্বক্ষুরাকৃতি গবাক্ষ



১৯শ গুহার ঘরমুখের দক্ষিণপার্শ্ব—দণ্ডায়মান বুদ্ধ।

ক্ষুদ্রাকৃতি হইয়া প্রস্তরক্ষোদিত মুখের বহিঃস্থ অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি হীনযানের নিরাকার সাংখ্যবাদের স্থলে মহাযানের ঘোরতর পৌত্তলিকতা আসিয়া প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

গুহায় ঢুকিবার মাত্র একটী দরজা। অন্যান্য গুহার ন্যায় ইহার উপর কালের করাল ছায়া পতিত হয় নাই। এখনও গুহাটী সুন্দরভাবে পরিরক্ষিত আছে। সম্মুখের অংশটীও বেশ সুরক্ষিত। চাতাল ও সম্মুখভাগের সমস্ত অংশই

উচ্চাঙ্গের কারুশিল্পে শোভিত। এখানেও বহু বুদ্ধমূর্ত্তি দেখা যায়। স্থানে স্থানে নাগমূর্ত্তিও আছে। চাতালের স্তম্ভগুলিও ক্ষোদিত। সেগুলি ১ম গুহার স্তম্ভেরই অনুরূপ। গুহার সম্মুখভাগের দক্ষিণপার্শ্বে সামান্য চিত্রাংশ রহিয়াছে।

২০শ গুহা।—এই গুহাটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ইহার বারান্দায় মাত্র দুইটী বৃহৎ স্তম্ভ ও দুইটী ঈষদুদ্গত ক্ষুদ্র স্তম্ভ আছে। দুইটী স্তম্ভের মধ্যে একটী স্তম্ভ ভগ্ন। বারান্দার ছাদে কড়ি বরগার সুন্দর অনুকরণ করা হইয়াছে। দুই পার্শ্বে দুইটী ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ। উপাশ্রয়গৃহটী ২৮'২"×২৫'৪" ফুট এবং উচ্চতা ১২½ ফুট। উহার কোন স্তম্ভ নাই। দুই পার্শ্বে দুইটী মাত্র ঘর বা প্রকোষ্ঠ। চারিপার্শ্বের দেওয়ালের উপর সমগ্র গুহাটী রক্ষিত। ইহাতে বহু বুদ্ধমূর্ত্তি রহিয়াছে। গর্ভগৃহের মূর্ত্তিটী স্থানীয় ভীলদের নিকট মৎস্যেন্দ্রনাথরূপে পরিচিত ছিল ও মূর্ত্তিটীর উপর লাল রঙ্ করা হইয়াছিল। ছাদে (Ceiling) বহু চিত্র ছিল, কিন্তু অধুনা সেগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে।

২১শ গুহা।—ইহার বারান্দাটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মাত্র দুই-পার্শ্বে দুইটী স্তম্ভের সামান্য অংশ অবশিষ্ট আছে। উহা দেখিলে সহজেই ধারণা করা যাইতে পারে যে, বারান্দাটী খুব সুন্দরভাবে নির্ম্মিত এবং উহার শিল্পসৌন্দর্য্য উচ্চাঙ্গের ছিল। বারান্দার দুইপার্শ্বে দুইটী ছোট ছোট ঘর। উহার দ্বার ১ম বা ২য় গুহার মতই উন্মুক্ত। উপাশ্রয়গৃহটী ৫১ ফুট সমচতুষ্কোণ। ইহার ছাদ ১২টী স্তম্ভের উপর রক্ষিত। স্তম্ভগুলির কারুকার্য্য শেষ হয় নাই। গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারটীও অসম্পূর্ণ। গৃহমধ্যে বুদ্ধ উপবিষ্ট। তাঁহার পার্শ্বে ব্যজনবাহী ও নিম্নে ইন্দ্র।

গুহার ছাদ প্রায় সমস্তই চিত্রিত ছিল। উহাতে চিত্রের জ্যামিতিক রেখা পরিদৃষ্ট হয়। ভিত্তিগাত্রগুলি সম্ভবতঃ চিত্রিত ছিল না; কারণ সেরূপ কোন প্রমাণ বা চিহ্ন পাওয়া যায় নাই।

২২শ গুহা।—এই গুহা অজন্তাযুগের শেষ সময়ের। গুহাটী ছোট। উহা প্রায় ১৬ ফুট সমচতুষ্কোণ ও ৯ ফুট উচ্চ। চারিটী প্রকোষ্ঠের সব কয়টীই অসমাপ্ত। বারান্দাটী ছোট ও সরু; উহার দুইটী স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। উপাশ্রয়গৃহে ঢুকিবার মাত্র একটী প্রবেশপথ। অন্যান্য গুহার মত এই গুহায় জানালা নাই। গুহায় ঢুকিয়া সম্মুখেই পদ্মাসন বুদ্ধমূর্ত্তি। ইহার ভাস্কর্য্য বা চিত্রকলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। মাত্র ছাদ ও দেওয়ালের কিয়দংশ চিত্রিত।

গুহার বারান্দার বামপ্রান্তস্থ একটী স্তম্ভে একটী দানলিপি ক্ষোদিত আছে। তাহার অক্ষরগুলি ১৬শ সংখ্যক গুহালিপির অনুরূপ। ইহা জয়ন্ত নামক এক উপাসকের দান। এই গুহাতে অঙ্কিত ৮ জন বুদ্ধের মূর্ত্তির নিম্নে তাঁহাদের নাম লিখিত আছে ও একটী দানলিপিও বর্ত্তমান।

২৩শ গুহা।—এই গুহটীও অজন্তার শেষ যুগের। ইহা দৈর্ঘ্যে ৫১ ফুট, প্রস্থে ৫০½ ফুট ও উচ্চতায় প্রায় ১২ ফুট। গুহায় সর্ব্বসমেত ১২টী স্তম্ভ আছে। চারিটী স্তম্ভ এখনও অক্ষত অবস্থায় রহিয়াছে। গুহায় কোন চিত্র নাই, তক্ষণশিল্পেরও বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন নাই। তবে প্রবেশদ্বারের দ্বারপালের মূর্ত্তি দুইটী দেখিবার মত। দুইজন মনুষ্য দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান; উহাদের মাথায় সর্পফণা।

২৪শ গুহা।—এই গুহা ২৩শ গুহার সমসাময়িক। সম্ভবতঃ অজন্তার শিল্পিগণ একটী বৃহৎ গুহা নির্ম্মাণ করিবেন কল্পনা করিয়া কোন কারণে তাহা পরিত্যাগ করেন, এই কারণেই ইহা অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। গুহাটী ৭৫ ফুট লম্বা ও ৭৩¾ ফুট চওড়া; মধ্যে ২০টী স্তম্ভ। ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হইলে বোধ হয় এই গুহাটী অজন্তার শ্রেষ্ঠ গুহাগুলির অন্যতম হইত। বারান্দাটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। উহা ছয়টী স্তম্ভের উপর রক্ষিত ছিল। স্তম্ভগুলির মধ্যে মাত্র একটী অবশিষ্ট রহিয়াছে। বোধিকাগুলি ছাদে লাগিয়া আছে, তাহা দেখিয়া বুঝা যায়, এই গুহাটী সম্পূর্ণ হইলে কিরূপ কারুকার্য্যে শোভিত হইত।

২৫শ গুহা।—এই গুহাটীও ২৩শ বা ২৪শ গুহার সমসাময়িক। অন্যান্য গুহা অপেক্ষা ইহা ছোট ও পাহাড়ের কিছু উপরে অবস্থিত। ইহার বারান্দা মাত্র দুইটী স্তম্ভের উপর রক্ষিত। উপাশ্রয়গৃহটী ২৬ ফুট ৫ ইঞ্চ লম্বা ও ২৫ ফুট ৪ ইঞ্চ চওড়া। ইহার কোন গর্ভগৃহ নাই। গুহায় প্রবেশের জন্য তিনটী দরজা রহিয়াছে। বারান্দার বামদিকে একটী প্রকোষ্ঠ এবং বারান্দার সম্মুখে একটী ঘেরা উঠান দেখিতে পাওয়া যায়। উঠানটীর আয়তন ৩০¾×১৪ ফুট হইবে। উঠানের সম্মুখে একটী প্রবেশদ্বার আছে। তাহা দিয়া পরবর্ত্তী গুহায় যাইতে পারা যায়।

২৬শ গুহা।—এই গুহাটী একটী চৈত্য। ইহা অনেকাংশে ১৯শ গুহার অনুরূপ। ইহার মধ্যে ভাস্কর্য্যের অভাব নাই। বারান্দাটী বর্ত্তমানে ভগ্ন। উহাও যে সুন্দর কারুকার্য্যখচিত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইহার ৪টী স্তম্ভের মধ্যে ৩টী এখনও বর্ত্তমান আছে। বারান্দার সম্মুখের উঠানটী বেশ বড়।

গুহাস্থিত মূর্ত্তি বা চিত্র সমস্তই বুদ্ধঘটিত। তন্মধ্যে বুদ্ধ ও মারের উপাখ্যানমূলক চিত্রই অধিক। ছাদটীর প্রায় সমস্তই চিত্রিত; কিন্তু অনেক স্থানে চিত্র অস্পষ্ট হইয়া যাওয়ায় বুঝা যায় না।

এই গুহায় অনেকগুলি শিলালিপি আছে। দক্ষিণদ্বারের উপরে সংস্কৃত ভাষায় ছন্দোবদ্ধ একটী বৃহৎ শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়। এই লিপি ২৭টী পংক্তিতে বিভক্ত। ইহা অনেকটা সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। অক্ষরগুলি প্রাচীন চালুক্য বা বলভী অক্ষরের অনুরূপ এবং খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে বা সপ্তম শতকের প্রথমে লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বুদ্ধভদ্র নামক এক ভিক্ষুর আদেশে ও অর্থে এই গুহাটী ক্ষোদিত হইয়াছিল। ধর্ম্মদত্ত নামক একজন ভিক্ষু ও ভদ্রবন্ধু নামক বুদ্ধভদ্রের একজন শিষ্য এই গুহার নির্ম্মাণকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। বুদ্ধভদ্র অর্থশালী ব্যক্তি ছিলেন। অশ্মকদিগের রাজা ভব্বিরাজ ও দেবরাজের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। এই লিপি হইতে জানা যায় যে, স্থবির অচল বহু গুহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন—"স্থবিরাচলেন মুনিনা শাসনমদ্ভাবয়কৃতজ্ঞেন কৃতকৃত্যেনাপি সতা শৈলগৃহং কারিতং শাস্তুঃ ॥"

এই গুহার বামদ্বারের পার্শ্বে ক্ষোদিত দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তির পাদপীঠে এই লিপি ক্ষোদিত আছে—"দেয়ধর্ম্মোয়ং শাক্যভিক্ষোর্ভদন্তগুণাকরস্য যদত্রপুণ্যং তদ্ভবতু মাতাপিতরং পূর্ব্বঙ্গমং কৃত্বা সর্ব্বসত্ত্বেভ্য অনুত্তর জ্ঞান আপ্তয়ে।" অর্থাৎ 'শাক্য ভিক্ষু ভদন্ত গুণাকরের ধর্ম্মার্থে দান; এই দানকার্য্যের জন্য যাহা কিছু পুণ্য অর্জ্জিত হইল, তাহা মাতাপিতা আদি করিয়া সমস্ত জীবজগতের পরমজ্ঞানের জন্যই ব্যয়িত হউক।' গৃহদ্বারের অপর দিকস্থ ঐরূপ মূর্ত্তির নিম্নে একটী শিলালিপি আছে। তাহার অনেক অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চৈত্যগৃহের দক্ষিণ দেওয়ালে একটী ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্ত্তির নিম্নস্থ শিলালিপিতে এইরূপ লিখিত আছে—"দেয়ধর্ম্মোয়ং শাক্যভিক্ষুসংঘমিত্রস্য" অর্থাৎ বৌদ্ধভিক্ষু সংঘমিত্রের ধর্ম্মার্থে দান।

২৭শ গুহা।—ইহাও অজন্তার শেষযুগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। গুহার সম্মুখভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অধুনা গুহার সম্মুখে সুবৃহৎ পর্ব্বতের ভগ্নাংশ পতিত রহিয়াছে। গুহাটী ৪৩½ ফুট লম্বা এবং ৩১ ফুট চওড়া। ইহা একরূপ অসমাপ্ত। গুহার বামপার্শ্বে তিনটী প্রকোষ্ঠ—বামদিকে একটী ও পিছনে দুইটী। বামদিকের প্রকোষ্ঠটী ভগ্ন।

২৮শ গুহা।—এই গুহাটী ২১শ ও ২২শ গুহার উপরে অবস্থিত। ইহা একটী চৈত্যের অনুরূপ। ইহার নির্ম্মাণকার্য্য আরব্ধ হইয়াছিল মাত্র। এই গুহায় যাওয়া কষ্টসাধ্য।

২৯শ গুহা।—এই গুহাটী ২৭শ গুহার পিছনে অবস্থিত একটী বারান্দা মাত্র। মোট ৮টী স্তম্ভের উপর বারান্দাটী রক্ষিত। স্তম্ভগুলি কারুকার্য্যহীন। এই গুহাটীতে প্রবেশ করাও কষ্টসাধ্য।

চিত্রপরিচয়।

উপরে যে ২৯টী গুহার পরিচয় দেওয়া হইল, এই সকল গুহাসংযুক্ত চিত্রাবলীর মধ্যে কতক পৌরাণিক আখ্যায়িকা এবং কতক প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত জাতকের চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। তাহার প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ধার করিবার উপযুক্ত চেষ্টা পূর্ব্বে হয় নাই। অল্পদিন হইল পুরাবিদ্গণ এ সম্বন্ধে মনোযোগী হইয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম দুইটী গুহার চিত্রপরিচয় অনেকটা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। অপরগুলি এখনও সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই। এখানে আমরা আবশ্যক বোধে ১ম ও ২য় গুহার চিত্রপরিচয় অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি। এই দুইটীর পরিচয় হইতে সাধারণে বুঝিতে পারিবেন যে, অজন্তার চিত্রকলা কিরূপ বিশাল, কিরূপ মহান্ ও কিরূপ অতুলনীয়।

১ম গুহা।—সম্মুখ অলিন্দের প্রাচীরগাত্রে প্রধানদ্বার ও তাহার বামে অবস্থিত গবাক্ষের মধ্যস্থলে, শিবিজাতকের কপোত ও শ্যেনের উপাখ্যান চিত্রিত আছে। চিত্রখানি তিন দৃশ্যে বিভক্ত। প্রথম দৃশ্যে সিংহাসনাসীন রাজা ও তাঁহার ক্রোড়ে কপোত। দ্বিতীয় দৃশ্যে এক অনাবৃতস্থলে অশ্বত্থবৃক্ষতলে তুলাদণ্ড, তাহার নিকটে রাজা দণ্ডায়মান। চতুর্দ্দিকে পৌরজন ইত্যাদি। তৃতীয় দৃশ্যে দণ্ডমুকুটধারী এক পুরুষ, তাহার দক্ষিণে অষ্টযোগী, নৃত্যরত ময়ূর, কদলীবৃক্ষ (?) ও জীর্ণ দেবায়তন (?)।

এই চিত্রের ডানদিকে বাতায়নের উপরিভাগে প্রাচীরগাত্রে স্নানরতা রমণীর এক চিত্র আছে। রমণী বুদ্ধের পত্নী অথবা রাজকন্যা শীবলী বলিয়া মনে হয়। চিত্রমধ্যস্থ পরিচ্ছদ ও উপাধানগুলি হইতে প্রাচীন ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বিষয়ে অনেক কথা জানা যাইতে পারে।

পূর্ব্ববর্ণিত চিত্রের দক্ষিণপার্শ্বে, দ্বারের উপরিভাগে এক ভিক্ষু (বুদ্ধ) রাজপ্রাসাদের দ্বারে ভিক্ষার্থ দণ্ডায়মান। তাঁহার মুখমণ্ডলের প্রশান্তভাব সুস্পষ্ট, দক্ষিণহস্ত ঈষদুত্তোলিত। প্রাসাদের অভ্যন্তরে এক রাজকন্যা, সখী ও পরিচারিকাবৃন্দ; দ্বারপ্রান্তে দ্বারপাল ভিক্ষুর আগমনসংবাদ জ্ঞাপন করিতেছে। রাজকন্যা এত সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন যে, তাঁহার গাত্র অনাবৃত বলিয়া বোধ হইতেছে। চিত্রে গৃহতল রক্তাভ কৃষ্ণবর্ণ, পশ্চাদংশ সবুজ, ভিক্ষুর অবয়ব ধূসরবর্ণ এবং রাজকন্যা উজ্জ্বল গৌরবর্ণ হওয়ায় ইহার বর্ণসমাবেশ অতি সুন্দর ফুটিয়াছে।

এই চিত্রের সংলগ্ন অপর একখানি চিত্রে রাজপ্রাসাদের দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে। ইহা সম্মুখ অলিন্দের বাম কোণে রহিয়াছে। সাজসজ্জা ও অবস্থান দৃষ্টে মনে হয়, এই চিত্রখানির ও পূর্ব্ববর্ণিত চিত্রের বিষয় ও শিল্পী একই।

সম্মুখ অলিন্দের বামপার্শ্বস্থ প্রাচীরগাত্রে এক নৃত্যসভার চিত্র রহিয়াছে। দ্বারের দক্ষিণে সিংহাসনে রাজারাণী ব্যসনরত। রাজার মস্তকোপরি সাতটী উদ্যত সর্পফণা, রাণীর শিরে একটী। এজন্য ইহা নাগরাজের প্রতিকৃতি বলিয়া মনে হয়। সভার মধ্যস্থলে, রাণীর পদনিম্নে প্রধানা নর্ত্তকী। তাহার এক হস্ত ও এক পদ মনোহরভাবে উত্তোলিত। এই নর্ত্তকীর নীলবর্ণ গাত্রাবরণ, হস্তালঙ্কার ও কেশবিন্যাস প্রভৃতি সুরুচির পরিচায়ক। প্রধানা নর্ত্তকীর দক্ষিণদিকে একজন রমণী করতাল বাজাইতেছে। তাহার পশ্চাতে একজন ভৃত্য মনোযোগসহকারে নৃত্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। নিকটে আরও কএকটী মূর্ত্তি রহিয়াছে।

বাম অলিন্দের প্রথম দ্বারের উর্দ্ধদেশে যে চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহা শঙ্খপাল-জাতকের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত মনে হয়। চিত্রের উপরিভাগে বামপার্শ্বে মগধরাজ শঙ্খপালকে উপদেশ দিতেছেন। শঙ্খপালের আকৃতি ও অবয়বে বিনীত শ্রদ্ধার ভাব পরিস্ফুট। রাজার পাদদেশস্থ রমণীটীর মূর্ত্তি হইতে শিল্পীর অসাধারণ কলাজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। চিত্রস্থ পুষ্পপাত্রবাহী বামনের কৌতুকাবহ অঙ্গভঙ্গী সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চিত্রের দক্ষিণভাগে শঙ্খপালের শ্বেতবর্ণ নাগমূর্ত্তি, ছয়জন শিকারী তাঁহার নাসিকায় রজ্জুবদ্ধ করিয়া প্রবলবেগে আকর্ষণ করিতেছে। নাগমূর্ত্তির নিম্নে কএকটী সুন্দর গতিভঙ্গিসম্পন্ন বলিবর্দ্দসহ এক ব্যক্তি (সম্ভবতঃ অলার) শিকারীদের নিকট কোন আবেদন জানাইতেছে। চিত্রের নিম্নভাগে বামদিকে অপর এক দৃশ্য। এখানে শঙ্খপাল নরদেহে অলারকে এক পদ্মশোভিত জলাশয় দেখাইতেছেন। এই জলাশয় শঙ্খপালের গৃহের প্রতীক।

শঙ্খপালজাতক চিত্রের দক্ষিণে যে চিত্র আছে, তাহা মহাজনকজাতকের উপাখ্যান বলিয়া মনে হয়। এই চিত্রে মহাজনক ও রাজ্ঞী শীবলী, নর্ত্তকীদল, বাদিকাগণ, বামন ও অন্যান্য বহু মূর্ত্তি রহিয়াছে। পটমণ্ডপতলে সিংহাসনে রাজা আসীন। রাজা ও রাণীর শরীর বহুমূল্য রত্নরাজিতে শোভিত। সিংহাসনের দক্ষিণে নর্ত্তকী ও বাদিকার দল। প্রধানা নর্ত্তকী একটী সাদা ঘাঘরা পরিয়া আছে। চিত্রস্থ নর্ত্তকীগণের নৃত্য-ভঙ্গী আধুনিক কালের ন্যায়। পটমণ্ডপের নিম্নে চারিটী দণ্ডদ্বারা ধৃত একটী আচ্ছাদনীতে একটী স্ত্রীলোক মশলা পিসিতেছে। নিকটে অপর দুইটী রমণী বসিয়া আছে।

বাম অলিন্দের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকোষ্ঠ দ্বারের মধ্যে যে চিত্রখানি রহিয়াছে, উহা মহাজনকজাতকে বর্ণিত রাজার উত্তরহিমবতে নারদ ও মিগাজিন ঋষির নিকট গমন অবলম্বনে রচিত বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। চিত্রের নিম্নে বামদিকে একটী দ্বারপথে রাজা সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে গমন করিতেছেন। চিত্রের উপরের অংশে হিমবতে ঋষিস্থানের দৃশ্য অঙ্কিত। রাজা যুক্তকরে অতি শ্রদ্ধাসহকারে ঋষির উপদেশ শ্রবণ করিতেছেন। ঋষির হস্তে একগাছি মালা। ঋষির নিম্নে অঙ্কিত দুইটী মৃগের চিত্র হইতে কেহ কেহ এই চিত্রকে বারাণসীস্থ মৃগদাবে বুদ্ধের ধর্ম্মশিক্ষাদান অবলম্বনে রচিত মনে করেন। চিত্রমধ্যস্থ সমৃণাল পদ্মগুলির রঙ্ অতি সুন্দর।

পূর্ব্ববর্ণিত জাতকোপাখ্যানের পরের অংশ বাম অলিন্দের প্রাচীরগাত্রে তৃতীয় ও চতুর্থ দ্বারের মধ্যবর্ত্তিস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। উপরার্দ্ধের বামভাগে এক বর্ষীয়সী রমণী (সম্ভবতঃ রাজমাতা) প্রাসাদ মধ্যে রাণীকে সান্ত্বনা দিতেছেন। দক্ষিণ-ভাগে অপর এক প্রকোষ্ঠে রাজা রাণীকে উপদেশ দিতেছেন। রাজার ভাবটী মহান্ সঙ্কল্প ও দয়ার সংমিশ্রণে অতি সুন্দর হইয়াছে। উপরার্দ্ধের দক্ষিণভাগে রাজা শ্বেত অশ্বে আরোহণ করিয়া বহির্গত হইতেছেন। তাঁহার ভাব চিন্তাপূর্ণ। অশ্বের গ্রীবা ও কণ্ঠ অতি স্বাভাবিক। চিত্রের সর্ব্ব দক্ষিণে ছত্রতলে রাণী একাকী গমন করিতেছেন। ইহা বোধ হয় মহাজনকের গৃহত্যাগের পর রাজ্ঞী শীবলীর চিত্র। বর্ণবিন্যাস ও চরিত্র সমাবেশে এই চিত্রখানি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

বাম অলিন্দের চতুর্থ প্রকোষ্ঠদ্বারের উপর প্রাচীরগাত্রে নৌকাযাত্রা ও তরীনিমজ্জনের চিত্র। মহাজনকজাতকে মহাজনকের যোড়শবর্ষ বয়সে নৌকাযাত্রার উপাখ্যান আছে উহাই এই চিত্রের বিষয় কিনা সন্দেহ। চিত্রের বামভাগে একখানি নৌকায় কতিপয় অনুচরসহ এক ব্যক্তি, তাহাদের মাথার উপর পটমণ্ডপের ন্যায় আচ্ছাদনী। বামপার্শ্বস্থ অনুচরের পার্শ্বে ছত্রতলে একটী অতি অস্পষ্ট মূর্ত্তি। ইনি বোধ হয় মহাজনক। চিত্রের দক্ষিণার্দ্ধে নিমজ্জমান তরী। নৌকার সম্মুখার্দ্ধ জলের নীচে রহিয়াছে। পিছনে ও পার্শ্বে কএক ব্যক্তি মৎস্য ও জলজন্তু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বিষম ভীত হইয়া পড়িয়াছে।

পশ্চাৎ অলিন্দের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠদ্বারের মধ্যে মহাজনকের অভিষেক ও সন্ন্যাসদৃশ্য চিত্রিত হইয়াছে। সর্ব্বদক্ষিণে মণ্ডপতলে রাজকুমার সিংহাসনে আসীন। সিংহাসনের পৃষ্ঠদেশে স্বর্ণ ও রত্নের কারুকার্য্য দেখা যায়। দুই দিকে দুইটী ছাগ পিছনের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুইটী ভৃত্য শিরতোলা কলসী হইতে রাজপুত্রের মাথায় জল ঢালিতেছে। ভৃত্যদ্বয়ের মস্তক শ্বেতবস্ত্রে আবৃত এবং উহার প্রান্ত তাহাদের পৃষ্ঠোপরি বিলম্বিত। কুমারের মুখ

চিন্তাব্যঞ্জক। তাঁহার বামে তিনটী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া। মধ্যের রমণী ঈষৎ লোহিতবর্ণা, তাহার চিবুক ও নেত্রদ্বয় বেশ উজ্জলভাবে চিত্রিত। এই মণ্ডপের দক্ষিণে আর একটী মণ্ডপ। তন্মধ্যে বামদিকে কটিবস্ত্র ও উপবীত-ধারী এক তাম্রবর্ণ ভৃত্য বারিপাত্র বহন করিতেছে। তাহার সম্মুখে শাদা জামা পরিয়া অপর এক ভৃত্য যষ্টিতে ভর করিয়া দণ্ডায়মান। দক্ষিণে কৃষ্ণ ও ধূসরবর্ণের দুইটী স্ত্রীলোক। কৃষ্ণা রমণী পাত্র বহন করিতেছে। ধূসরবর্ণা স্ত্রীটী অতি সূক্ষ্ম শাড়ী পরিহিতা, উহা সিক্ত হওয়ায় স্ত্রীলোকটীকে নগ্না মনে হইতেছে। সে ন্যুব্জা হইয়া সিঁড়ির উপরিস্থ এক বামনের মস্তক হইতে একটী পাত্র তুলিয়া লইতেছে। বামন পাত্রের ভারে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই মণ্ডপের বামপার্শ্বে চারিজন ভিক্ষার্থী ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছে। দুইটী গুবাক বৃক্ষ, আরও কিছু দূরে বেড়ার অন্তরাল হইতে কএকটী কদলী বৃক্ষাগ্রভাগ দৃষ্ট হয়। এই চিত্রের মণ্ডপগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত দেখান হইয়াছে। স্তম্ভগুলি লাল, শীর্ষাংশে নীলের উপরে বিন্দুচিহ্নদ্বারা আলোকের তারতম্য অতি দক্ষতার সহিত প্রকটিত হইয়াছে। স্তম্ভের নিম্নস্থ কাষ্ঠাসনগুলি ব্যাঘ্র ও হায়নার দারুময় মস্তকের উপরে স্থাপিত। রাজপ্রকোষ্ঠের বামপার্শ্বে একস্থানে তৃণপত্রনির্ম্মিত এক আচ্ছাদনী রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত চিত্রের বামভাগে এক মণ্ডপে রাজকুমার ভিক্ষুবেশে আসীন। তাঁহার হস্তে ভিক্ষাপাত্র, এবং শিরোদেশে একটী ধারণীর উপরে কএকটী গোলাকার ডিম্বাকৃতি মৃত্তিকাপাত্র। পাত্র-গুলির গলা সরু এবং মুখ চেপ্টা। মান্দ্রাজে এই ধরণের জলপাত্র এখনও ব্যবহৃত হয়। এই মণ্ডপের বামদিকেই পূজানিরতা চারিটী স্ত্রীলোক ও দুইটী শিশুর চিত্র। এই চিত্রের শিল্পকৌশল অপর চিত্রগুলি হইতে বিভিন্ন।



মহাজনকের অভিষেকদৃশ্য (১ম গুহা)।

পূর্ব্ববর্ণিত অভিষেকচিত্রের নিম্নে একখানি ছবি অতি অস্পষ্টভাবে আছে। এখানি জাতকে বর্ণিত অমরাদেবীর উপাখ্যান লইয়া অঙ্কিত বলিয়া মনে হয়। চিত্রস্থ কাষ্ঠমণ্ডপের দক্ষিণভাগে এক ব্যক্তির হস্তস্থিত স্থালীতে ৪টী নরমুণ্ড এবং একজন সন্ন্যাসী একটী মালা লইয়া ঐ স্থালীর দিকে সদয় দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন।

পশ্চাৎ দিকের অলিন্দের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠদ্বারের উপরে কিছু দক্ষিণে বোধি-সত্ত্ব পদ্মপাণির মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। এই চিত্রখানি ভারতীয় চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বোধিসত্ত্বের এই মূর্ত্তিটী অতি বৃহৎ, মস্তক হইতে জানুর নিম্নভাগ পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে ৫ ফুট ৯½ ইঞ্চ। অপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গও সদৃশাকার। বোধিসত্ত্বের প্রতি অবয়বে শ্রী ও কমনীয়তা। বর্ণ ও অবস্থানও মনোহর। সর্ব্বাঙ্গ বংশ-গৌরব ও আধ্যাত্মিকতার ভাবমণ্ডিত। অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য নাই, কিন্তু গলদেশে মুক্তার মালার মধ্যে নীলকান্তমণি গ্রথিত থাকায় অতীব শোভাকর হইয়াছে। একটী সূক্ষ্ম মুক্তার মেখলা বামস্কন্ধ হইতে নামিয়া সমগ্র বক্ষ ও দক্ষিণহস্তের কনুইএর উপর বেড়িয়া রহিয়াছে। মস্তকে বিলম্বিত কেশ-রাশির উপরে রত্নখচিত মুকুট শোভা পাইতেছে। কটিদেশ ঈষৎ বক্র এবং বিভিন্নবর্ণে রঞ্জিত একটী রেশমের কটিবাস পরিধান করিয়া আছেন। দক্ষিণহস্তে একটী নীলপদ্ম। মূর্ত্তিতে আলোছায়ার সন্নিবেশও অতি নিপুণ।

বোধিসত্ত্বের বামে কৃষ্ণবর্ণা পূর্ণায়তন নারীমূর্ত্তিও শিল্পীর গৌরব ঘোষণা করিতেছে। ইঁহার মুখমণ্ডল অতি সুন্দর প্রশান্তভাবপূর্ণ। পশ্চাতে এক চামরধারিণী; ইহাকে ভিন্নদেশীয়া বলিয়া বোধ হয়। বোধিসত্ত্বের দক্ষিণপার্শ্বে এক স্থূলকায় কৃষ্ণবর্ণ দণ্ডধারী। চিত্রের পশ্চাদ্ভাগে শৈল-শ্রেণী রক্তাভ রেখাদ্বারা সূচিত হইতেছে। শৈলোপরি বানরগণ ক্রীড়া করিতেছে, ময়ূরময়ূরী নর্ত্তনে মত্ত হইয়াছে।

তাহাদের দক্ষিণে এক ব্যক্তি ও তাহার স্ত্রী বোধিসত্ত্বকে নিরীক্ষণ করিতেছে। চিত্রের উপরে বামকোণে দুইটী গন্ধর্ব্বের শরীরের অর্দ্ধাংশ অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। তন্নিম্নে কিন্নরদ্বয় বীণার ন্যায় কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাইতেছে। নিম্নে (বোধিসত্ত্বের স্কন্ধের কিছু উপরে) দুইটী বামন উপবিষ্ট। পূর্ব্বোক্ত গন্ধর্ব্বদ্বয়ের নিম্নে উৎসবরত এক রাজা ও তাঁহার রাণী বোধিসত্ত্বকে দেখিতেছেন। রাণী কৃষ্ণবর্ণা, কিন্তু তাহার শরীরের ভঙ্গী চমৎকার এবং দেখিলেই নগ্না বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদের বামে পাহাড়ের উপর কতকগুলি বানর ও একটী সিংহ রহিয়াছে। পাহাড়ের উপরে একটী সুপারী ও একটী অশোক বৃক্ষ চমৎকার অঙ্কিত হইয়াছে। এই চিত্রের বিরুদ্ধভাব ও বিরুদ্ধ বর্ণের সমাবেশ শিল্পীর অসাধারণ কলানৈপুণ্যের পরিচায়ক।

গর্ভগৃহে গমন করিতে হইলে যে প্রকোষ্ঠ দিয়া যাইতে হয়, তাহার বামপার্শ্বস্থ প্রাচীরের চিত্রখানি মারের প্রলোভনের উপাখ্যান লইয়া রচিত। ইহা অনেকাংশে অস্পষ্ট। চৌদিকে আক্রমণরত বিকটাকার রাক্ষসরাক্ষসীগণ ও প্রলুব্ধকারিণী মারকন্যাগণ, মধ্যস্থলে বুদ্ধের ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তি।

পূর্ব্বকথিত গর্ভগৃহের সম্মুখস্থ প্রকোষ্ঠের ভিতরের দেওয়ালে, দ্বারের উভয়পার্শ্বে (অবলোকিতেশ্বর?) বুদ্ধের দুই বৃহৎ মূর্ত্তি দ্বারপালরূপে চিত্রিত আছে। মস্তকে ঘন কুঞ্চিত কেশরাশি, তদুপরি রত্নমুকুট। উপরের বামকোণে দুইটী স্ত্রীপুরুষ পাহাড়ের উপর হইতে বুদ্ধকে দেখিতেছে। দক্ষিণকোণেও দুইটী স্ত্রীপুরুষ বসিয়া আছে। তন্নিম্নে পাহাড় হইতে একটী ভীল বুদ্ধকে নিরীক্ষণ করিতেছে, তাহার স্ত্রী একটী সাজি লইয়া নিকটে দাঁড়াইয়া আছে।

গর্ভগৃহের সম্মুখস্থ প্রকোষ্ঠের দক্ষিণপার্শ্বস্থ দেওয়ালে অঙ্কিত চিত্রে বুদ্ধদেবকে বিভিন্ন মূর্ত্তি, পরিচ্ছদ ও মুদ্রায় দেখান হইয়াছে। অনেকের মতে এই চিত্রে দিব্যাবদানবর্ণিত শ্রাবস্তীর বুদ্ধমায়া বর্ণিত হইয়াছে। শ্রাবস্তীতে বুদ্ধদেব ছয়জন নাস্তিকের দর্পচূর্ণ করিয়া পদ্মাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শরীর হইতে বহু বুদ্ধমূর্ত্তির উদ্ভব হইয়াছিল।

পশ্চাতের অলিন্দের প্রাচীরগাত্রে, তৃতীয় প্রকোষ্ঠদ্বারের উপরে অঙ্কিত বুদ্ধমূর্ত্তিকে অনেকে বজ্রপাণি বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি বলিয়া মনে করেন।* ইঁহার মনোহর অবয়ব, সুগঠিত নাসিকা, বৃহৎ চক্ষুদ্বয়, দৃঢ়তাব্যঞ্জক ওষ্ঠ, সুচারু মুখমণ্ডল প্রভৃতি পার্থিব ও স্বর্গীয় গৌরবদ্যোতক। চিত্রে বুদ্ধপত্নীর মুখমণ্ডল ও নেত্রদ্বয়ের ভাব অতি মনোহর, স্বাভাবিক ও জীবন্ত। শিল্পী এখানে তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এই রমণীর কুঞ্চিত ঘন কেশপাশ, মুক্তানীলমণিশোভিত সিঁথি (টায়রা) উল্লেখযোগ্য। চিত্রমধ্যস্থ অন্যান্য স্ত্রীপুরুষগণের মধ্যে সেনাপতির মূর্ত্তিও উল্লেখযোগ্য। চিত্রখানির বর্ণবিন্যাসে সুন্দর নীল ও ফিকে সবুজের উপরে শাদা ফুলগুলি বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

পশ্চাৎ অলিন্দের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকোষ্ঠদ্বারের উপরে ও মধ্যে প্রাচীরগাত্রে চাম্পেয়জাতকের উপাখ্যান চারিখানি দৃশ্যে চিত্রিত হইয়াছে। উপরার্দ্ধে বামভাগে রাজা চাম্পেয় দক্ষিণহস্ত রাজ্ঞীর জানুর উপরে স্থাপন করিয়া বসিয়া আছেন, মুখে ও হাবভাবে অনুশোচনার চিহ্ন। কিঞ্চিৎ বামে স্তম্ভশ্রেণীর অন্তরে এক মাতা ও শিশু। এই রমণী বোধ হয় নাগিনী



বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি (১ম গুহা)।

সুমনা। এই দৃশ্যের দক্ষিণে দ্বিতীয় দৃশ্য। উভয়ের মধ্যে শ্বেত ও লোহিত কতকগুলি চতুষ্কোণ ফলক, বোধ হয় হর্ম্ম্য বা পর্ব্বতশ্রেণী সূচনা করিতেছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজা উগ্রসেন মীনচিহ্নিত সিংহাসনে বসিয়া আছেন। রাজার সম্মুখে কতিপয় ব্যক্তি ভূমিতলে আসীন। ইহাদের পরিচ্ছদ, বসিবার ধরণ, কেশরাশি ও শিরোবন্ধ দেখিবার জিনিষ। একজন ঝুড়ি লইয়া বসিয়া, তাহার সন্মুখে এক শ্বেতসর্প। সিংহাসনের নিম্নে ভিন্নদেশীয় দুইটী লোক, অতি নৈপুণ্যসহকারে চিত্রিত।

* কেহ কেহ ইঁহাকে ইন্দ্রমূর্ত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহাদের একজনকে বারাণসীর অধিবাসী বলিয়া মনে হয়। অপর ব্যক্তির চেহারা ও সাজসজ্জা ঠিক উড়িয়া ব্রাহ্মণের ন্যায়। চিত্রের বামভাগে শিশুসহ এক নারী (সম্ভবতঃ নারীমূর্ত্তিতে নাগকন্যা সুমনা) কাতর প্রার্থনা জানাইতেছে। নিকটে অপর দুই স্ত্রী, তাহাদের মুখে সমবেদনার চিহ্ন। তৃতীয় দৃশ্যের বামভাগে কদলী ও গুবাকবৃক্ষ এবং অশোকের কুঞ্জ। পার্শ্বে বহির্দ্বার। চাম্পেয় ও উগ্রসেন এক লোহিতাভ হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া এই দ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান। চাম্পেয়ের মস্তকে নাগছত্র। ইহার দক্ষিণে রাজসভা। তথায় চাম্পেয় উগ্রসেনকে উপদেশ দিতেছেন। চতুর্দ্দিকে কতকগুলি স্ত্রীলোক ও ভৃত্য। চাম্পেয়ের দক্ষিণপার্শ্বে যে সুন্দরী রমণী দাঁড়াইয়া আছে, তাহার চিত্রটী অতি মনোরম। নাগ-রাজের পশ্চাতে অদ্ভুতদর্শন একটী বামন। বামনের বামপার্শ্বে লোহিতাঙ্গী এক রমণী দক্ষিণহস্তে মুক্তার মালা ও বামহস্তে স্থালী লইয়া দাঁড়াইয়া। ইহারও মস্তকে সর্পফণা, সিঁথিতে অলঙ্কার। রমণীর বামপার্শ্বে লোহিতবর্ণ এক প্রহরী; তাহার শিরস্ত্রাণটী লক্ষ্য করিবার বিষয়। এ ব্যক্তিকে সাজসজ্জায় বিদেশীয় বোধ হয়। এই চিত্রের দক্ষিণভাগে পাঁচটী রমণী; তাহাদের ভঙ্গীও চিত্তাকর্ষক। ইহাদের পশ্চাতে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান। তাহার ললাট ত্রিরেখাঙ্কিত, মস্তক আবৃত। চিত্রমধ্যস্থ বহির্দ্বার, সভামণ্ডপ ও বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত স্তম্ভগুলি শিল্পীর কলানৈপুণ্যের পরিচায়ক। এই চিত্রের নিম্নভাগে একখানি অতি অস্পষ্ট বিলুপ্তপ্রায় চিত্র আছে।

দক্ষিণ অলিন্দের প্রাচীরগাত্রে একখানি অসম্পূর্ণ চিত্র আছে। বামভাগে এক নাগরাজ ও দুইটী তপস্বী। একজন তপস্বী রাজার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিতেছেন। কিছু দক্ষিণে সিংহাসনাসীন এক নৃপতি, দুইজন পরিচারক, চারিটী লোহিতাভ হস্তী ও দুইটী শ্বেত হস্তিশাবক। হস্তিচতুষ্টয়ের মস্তক ও দন্ত বেশ স্বাভাবিক। আরও দক্ষিণে অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিকগণের এক শোভাযাত্রা। ইহারও কিঞ্চিৎ দক্ষিণে একটী প্রাসাদচত্বর।

সম্মুখ অলিন্দের দক্ষিণস্থ প্রাচীরগাত্রে একটী রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরদৃশ্য। এক নৃপতি সিংহাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার দক্ষিণপাদ বক্রভাবে সবুজবর্ণ সিংহাসনের উপর রহিয়াছে। বামপাদ বিলম্বিত। সম্মুখে রাণী বসিয়া আছেন। রাণীর ভাবভঙ্গী সুন্দর। রাজা ও রাণীর মধ্যে রত্নাভরণ-পরিহিতা ঈষৎকৃষ্ণবর্ণা এক রমণী বসিয়া রাজার মুখপানে চাহিয়া আছে। নিকটেই এক গৌরবর্ণ ভৃত্য দণ্ডায়মান। রমণীর পশ্চাতে একটী চামরধারিণী। রাণীর সিংহাসন-নিম্নে দুইটী খর্ব্বাকৃতি স্ত্রীলোক। একজনের বামস্কন্ধে শিরতোলা ঝাঁপি, দক্ষিণহস্তে নীলপদ্ম। রাজার পশ্চাতে শ্যামবর্ণা এক চামরধারিণী। রাজার সিংহাসনের নিম্নে অপর একটী গৌরবর্ণা চামরধারিণী। ইহার সম্মুখে আংটাযুক্ত একটী ভারী পাত্র ও একটী পানপাত্র রহিয়াছে। চিত্রমধ্যস্থ কএকটী রমণীমূর্ত্তি অর্দ্ধনগ্ন বলিয়াই মনে হয়। চিত্রের দক্ষিণভাগে কাঠের জানালায় জালির কাজ দেখা যাইতেছে।

সম্মুখ অলিন্দের প্রাচীরগাত্রে প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বে অঙ্কিত চিত্রখানি কাহারও মতে চালুক্যরাজ পুলকেশীর সভায় পারস্যদৌত্য; আবার কেহ বা বলিতে চাহেন, জাতকের কোন উপাখ্যানের সহিত ইহার সংস্রব কোন দিন আবিষ্কৃত হইতে পারে। চিত্রের দক্ষিণভাগে রাজসভার দ্বারের বাহিরে কতিপয় বৈদেশিক। তাহাদের মাথায় তুর্কীটুপীর ন্যায় টুপী, গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল। সভায় বহু সভাসদ্ দ্বারা পরিবৃত রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট। তিনজন বৈদেশিক রাজার সম্মুখে রহিয়াছে। একজন তুর্কীটুপী পরিয়া আছে। তাহার গায়ে শাদার উপরে নীল ও কাল ডোরা কাটা লম্বা জামা। সে রাজাকে একটী মুক্তাহার উপঢৌকন দিতেছে। সিংহাসনের ধারে শাদা ও কাল রেখা আছে, তাহাতে মনে হয় ইহা দারু ও হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত। সিংহাসনের পশ্চাদ্ভাগ ময়ূরের পাখার ন্যায় এবং রত্নখচিত। সিংহাসনস্থ উপাধানের উপরে রাজা আসীন। উপাধানটী ডোরা কাটা রেশমী কাপড়ে আবৃত। সিংহাসনের নিম্নে চামরহস্তা একটী রমণী বসিয়া আছে। তাহার পরিধানে শাড়ী, উহার প্রান্ত রমণীর দক্ষিণ স্কন্ধ ও পৃষ্ঠ বেষ্টন করিয়া আছে। নিকটে কারুকার্য্যশোভিত একটী পাত্র। ইহার পশ্চাতে অপর এক ব্যক্তি একটী গোলাকার (ধাতুনির্ম্মিত ?) পাত্র-হস্তে বসিয়া আছে। পাত্রটীর গায়ে হস্তীর ছবি তোলা এবং ঢাকনিটী চূড়াকার। এই ব্যক্তির পশ্চাতে অপর তিনটী লোক বসিয়া আছে। তাহাদের পশ্চাতে দ্বারের সন্নিকটে এক ব্যক্তি দণ্ড লইয়া দণ্ডায়মান। চিত্রের বামভাগে সিংহাসনপার্শ্বে একটী রমণী থালা ক্রোড়ে রাখিয়া বসিয়া আছে। নিকটে আর একখানা থালার উপরে কতকগুলি ছোট ছোট বাক্স রহিয়াছে। এই শেষোক্তা রমণীর বক্ষো-বেষ্টনী লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহার বামদিকে আর একজন রমণী উপবিষ্ট রহিয়াছে। রাজসভার স্তম্ভগুলি কৃষ্ণবর্ণ এবং দারুনির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়। স্তম্ভগুলির রঙ্ কতকগুলি কৃষ্ণ রেখা সাহায্যে বেশ নিপুণভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। থামের শীর্ষদেশের নীল রঙ্ কতকগুলি বিন্দুদ্বারা দেখান হইয়াছে। পটমণ্ডপের কারুকার্য্যও চিত্তাকর্ষক।

উপাশ্রয়গৃহের ছাদের চিত্রগুলি দেওয়ালের চিত্রের ন্যায় ধর্ম্মবিষয়ক নহে। এ চিত্রগুলিতে ফল, ফুল, পশুপক্ষী এবং নানা কাল্পনিক বস্তু ও দৃশ্য অঙ্কিত আছে। এই গৃহে প্রবেশ করিতেই ছাদের দক্ষিণপার্শ্বে একখানি পানোৎসবের চিত্র রহিয়াছে। যদিও অনেকে ইহাকে পারস্যরাজ খসরু ও তাঁহার রাজ্ঞীর ছবি বলেন, তথাপি এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে। এই শ্রেণীর চিত্র ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ব-বিদের আলোচনার বস্তু।

এই চিত্রে এক ব্যক্তি পানপাত্র হস্তে মোটা গদীর উপর বসিয়া আছে। ইহার মুখে দাড়ী আছে, চোক মুখ বসিয়া গিয়াছে, দেখিলেই সুরাভিভূত বুঝা যায়। মুখের গঠনে পারস্য-বাসী অপেক্ষা তুরানীয় বলিয়াই বেশী মনে হয়। ইহার মুসলমানী পোষাক লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই ব্যক্তির বামপার্শ্বে এক সুন্দরী দাঁড়াইয়া। সুন্দরীর ডান হাত পুরুষের স্কন্ধে স্থাপিত। তাহার দৃষ্টি পুরুষের মুখপানে নিবদ্ধ। সুন্দরীর গায়ে শাদা লম্বা একটী পোষাক; উহার গলা, হাত ও বাহুর নিকট বুটার কাজ করা। মাথার পিছন দিকে ফিতার অংশ লক্ষ্য করিবার বিষয়। সুন্দরীর বামপার্শ্বে সুরাপাত্র হস্তে একটী রমণী সম্মুখদিকে একটু ঝুকিয়া দাঁড়াইয়া। উল্লিখিত গদীর সম্মুখে শাদা টুপী-পরা দুই ব্যক্তি ফলের রেকাব সহ বসিয়া তাহাদের প্রভুর দিকে চাহিয়া আছে। ইহাদের মুখে দাড়ি, নাক খাঁদা, চোক ছোট এবং মুখের হাড় উঁচু, দেখিতে মঙ্গোলীয় ধরণের। উভয়ের মস্তকে শাদা টুপী। ইহাদের একজনের শাদা ও অপর জনের ফিকে নীল জামা গায়ে। চিত্রের বামে আর একটী সুরাপাত্রবাহিকা দাঁড়াইয়া আছে। ইহার পরিধানে ফিকে নীল পোষাক। সভার পশ্চাতে দেওয়াল অথবা পর্দ্দার উপর লাল ফুল দেখা যাইতেছে। চিত্রখানির চারিধারে ও কোণে আম্র, দাড়িম্ব ও আনারসের স্তবক এবং পল্লবাকৃতিপুচ্ছযুক্ত রাজহংসমিথুন চিত্রকরের কল্পনাচাতুর্য্য প্রকাশ করিতেছে।



পানোৎসবের চিত্র (১ম গুহা)।

পূর্ব্বোক্ত চিত্রের কিছু পশ্চাতে ছাদের গায়ে অঙ্কিত অপর একখানি চিত্রও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার মধ্যস্থলে পরস্পর ক্রীড়ারত দুইটী কাল্পনিক জন্তু। তাহাদের বৃষের ন্যায় মস্তক, পশ্চাদ্দেশ সুন্দর পল্লবাকার। দক্ষিণ ও বামে দুইটী ধারী, তাহাতে সোনার কারুকার্য্যের উপর নীলা ও চুনী বসান। উপরিভাগে কএকটী অতি মনোরম পদ্ম অঙ্কিত, তাহাদের মৃণালে একটী শুকপক্ষী রহিয়াছে। এক কোণে দুইটী শ্বেত পরীশিশু (বা বামন?) এবং নিম্নেও একস্থানে এক শিশু একটী বৃহৎ পদ্ম লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। স্থানে স্থানে ফলগুচ্ছ রহিয়াছে।

ছাদের গায়ে আরও অনেকগুলি চিত্র আছে। ঐ সকল চিত্রের বর্ণনা এ স্থলে সম্ভবপর নহে।

উপাশ্রয়গৃহের পশ্চাদ্দেশে বাম কোণের নিকটবর্ত্তী একটী স্তম্ভের উপরে একটী বৃষযুদ্ধের চিত্র আছে। চিত্র-খানি বহুল প্রশংসিত। বৃষ দুইটী মস্তক অবনত করিয়া এবং পুচ্ছ উর্দ্ধে তুলিয়া যুদ্ধ করিতেছে। চিত্রে ইহাদের ক্রুদ্ধভাব ও অঙ্গভঙ্গী সজীবতা আনয়ন করিয়াছে। ভারতের অন্যান্য স্থানের অঙ্কিত বৃষযুদ্ধের চিত্র অপেক্ষা এইস্থানের চিত্রটী অধিক চিত্তাকর্ষক। [পরপৃষ্ঠায় চিত্র দ্রষ্টব্য।]

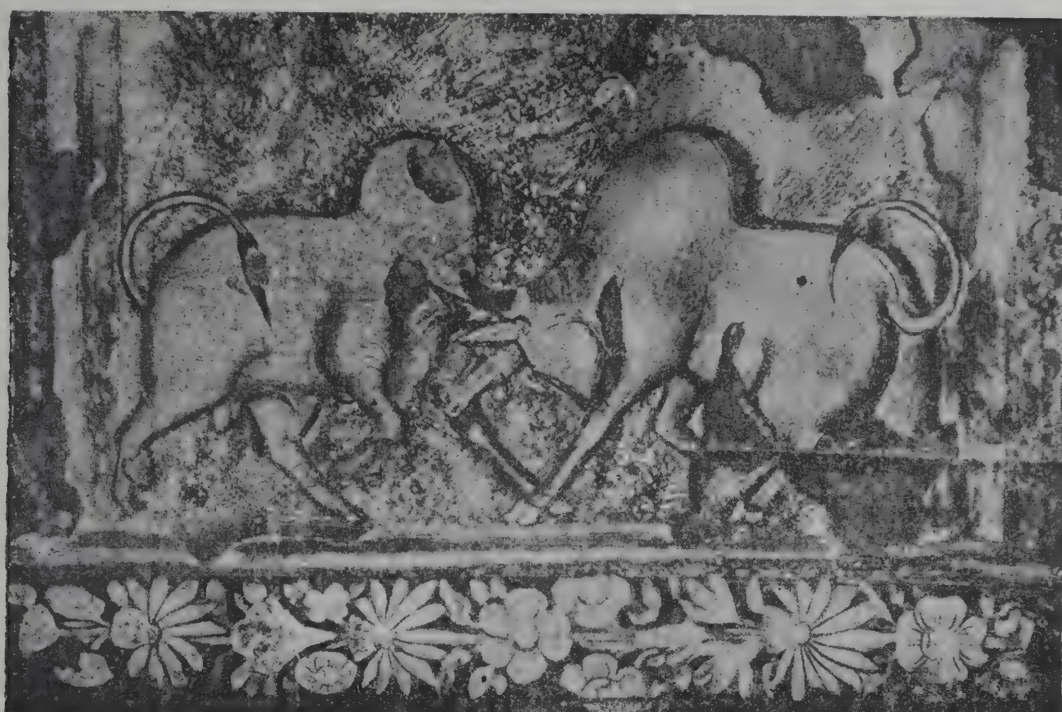
২য় গুহা।—বারান্দার পশ্চাতের প্রাচীরে দ্বারের বামপার্শ্বে সুন্দর রঙ্গীন চিত্র। দুইজন অর্হৎ বুদ্ধের পূজা করিতেছেন। এক যক্ষদম্পতী পুষ্পার্ঘ্য বহন করিতেছে। নিকটে দুইটী কিন্নর বাদ্য বাজাইতেছে। চিত্রস্থ অশোক বৃক্ষ, মেঘমালা এবং যক্ষদম্পতীর বেশভূষা সুন্দর ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিত্রিত। দ্বারের দক্ষিণপার্শ্বস্থ চিত্রে একটী উড্ডীয়মানা অপ্সরার শরীরভঙ্গী আশ্চর্য্য শিল্পকৌশলের পরিচায়ক এবং অজন্তার একটী গৌরবের বিষয়।

উক্ত প্রাচীরে, দ্বারের দক্ষিণে ইন্দ্র এবং চারি যক্ষের চিত্র। মহাযান ধর্ম্মে অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে অনেক পৌরাণিক দেবদেবীর উপাখ্যান গৃহীত হইয়াছিল। এই চিত্রে তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

বারান্দার ভিতরের ছাদের গায়ে কএকখানি চিত্র রহিয়াছে।

এইগুলিতে বিবিধ সাজসজ্জাকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। পুষ্প, পল্লব, ফল, পশুপক্ষী, জ্যামিতিক ক্ষেত্র ও নানা কাল্পনিক মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। শ্বেত ও নীল পদ্মগুলি অতি মনোহর। শুক, রাজহংস, কলহংস, সারস প্রভৃতি পক্ষী, উড্ডীয়মান যক্ষ, বামন, বিদূষক, বৈদেশিক, যাদুকর প্রভৃতির কৌতুকাবহ মূর্ত্তিও এখানে দৃষ্ট হয়। চিত্রে আলোছায়ার সম্পাত এবং পৃষ্ঠদৃশ্য প্রদর্শনে এক নূতন কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে।

দৃশ্যে বিভক্ত। প্রথমে পদ্মশোভিত সরোবর, স্বর্গীয় হংসযুগল, ব্যাধ প্রভৃতি। পরবর্ত্তী দৃশ্যে রাজা সংযম এবং রাণী ক্ষেমা—হংসরাজ ধৃতরাষ্ট্রের মুখে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতেছেন। তৎপরে অন্য এক দৃশ্যে ধর্ম্মচক্রে উপবিষ্ট বোধিসত্ত্ব; সপার্ষদ রাজা ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতেছেন, নিকটে রাণী এবং অপর কএকটী রমণী। শেষ দৃশ্যে পদ্মসরোবর মধ্যে কতকগুলি স্বর্ণহংস, তীরে রাণী ক্ষেমা। রাণীর অঙ্গভঙ্গী, গঠন এবং অনাড়ম্বর পরিচ্ছদের নিগূঢ়



বৃষযুদ্ধ (১ম গুহা)।

বারান্দার দক্ষিণপ্রান্তস্থিত পার্শ্বগৃহের প্রাচীরে তিনখানি চিত্রদ্বারা একটী উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। জাতকের সহিত ইহার সম্বন্ধ নির্ণীত হয় নাই। সমগ্র চিত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অনুমানে এইরূপ করা যাইতে পারে—নির্ব্বাসিতা একটী রমণী বনমধ্যে একটী সন্তান প্রসব করিয়াছেন। নবজাত সন্তানকে দোলায় করিয়া এক পদ্মশোভিত সরোবরে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তৎপরে একস্থানে নাগরাজ ও নাগিনী-গণকে দেখা যাইতেছে। অপর দৃশ্যে এক রাজসভা, বহির্দ্দেশে কএকজন নরনারী হস্তী ও অশ্বপৃষ্ঠে আগমন করিতেছে। চিত্রের প্রথমাংশে করুণদৃশ্য অতিশয় কৌশলের সহিত ফুটান হইয়াছে।

২য় গুহার বিহারের সম্মুখস্থ মঞ্চের বামদিকের প্রাচীরে স্বর্ণহংসোপাখ্যান (মহাহংসজাতক) চিত্রিত আছে। ইহা কএকটী

সৌন্দর্য্য দর্শনীয়। অশোকবৃক্ষ, পদ্ম এবং হংসমালার চিত্র-শিল্পীর সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচায়ক।

বাম অলিন্দের প্রাচীরে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠদ্বারের পার্শ্বে ও উপরে বুদ্ধজন্মের উপাখ্যান চিত্রিত আছে। প্রথম দৃশ্যে রাণী মহামায়ার স্বপ্নদর্শন; তৎপরের দৃশ্যে রাণী স্বামীকে স্বপ্নবৃত্তান্ত কহিতেছেন। ১ম গুহার মহাজনকজাতকের শীবলীর সহিত এখানে রাণীর বিশেষ সাদৃশ্য আছে। পরবর্ত্তী দৃশ্যে এক রাজপুত্র, তাঁহার মস্তকে ছটামুকুট, ভঙ্গী ধর্ম্ম-ব্যাখ্যানের। ইনি বোধ হয় তুষিতস্বর্গবাসী ভবিষ্যবুদ্ধ। পরবর্ত্তী দৃশ্যে রাজা ও রাণী ব্রাহ্মণসকাশে স্বপ্নব্যাখ্যান শ্রবণ করিতেছেন। তৎপরে একটী গৃহে মায়াদেবী, তাঁহার অনুচরী ও ব্রাহ্মণ। রাণীর বাহ্য সাজসজ্জার অল্পতা তাঁহার আন্তর সৌন্দর্য্যের পূর্ণতা দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে। চিত্রকর এখানে

অপূর্ব্ব শিল্পকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। অপর দৃশ্যে লুম্বিনী-কাননে বুদ্ধের জন্মদৃশ্য। পদ্মোপরি নবজাত শিশু (বুদ্ধ) দণ্ডায়মান, কিয়দ্দূরে মায়াদেবী, ইন্দ্রাদি দেবগণ, সন্ন্যাসী প্রভৃতি।

গর্ভগৃহের সম্মুখস্থ মণ্ডপের বামে যে পার্শ্বগৃহ রহিয়াছে, তাহার ভিতরের ছাদে কাল্পনিক পশুপক্ষী, ড্রাগন প্রভৃতির চিত্র আছে। কতকগুলি সমকেন্দ্রিক বৃত্তের মধ্যে মধ্যে রত্নালঙ্কার, পল্লবরাজি এবং হংসশ্রেণীর অভিযান চিত্রিত রহিয়াছে। হংসসমূহের ভঙ্গী নানা ভাবের প্রকাশক। ইহাদের চিত্র অতি স্বাভাবিক ও বাস্তব এবং শিল্পীর সূক্ষ্ম-দৃষ্টির পরিচায়ক।

পশ্চাতের প্রাচীরে একস্থানে অনেকগুলি বুদ্ধমূর্ত্তি। প্রধান মূর্ত্তিটী একটী ফলশাখাসমন্বিত সুন্দর আম্রবৃক্ষতলে দণ্ডায়মান। এই চিত্রের নিম্নভাগে একখানি লিপি উৎকীর্ণ আছে।

গর্ভগৃহের দ্বারের উভয়পার্শ্বে দুইটী বুদ্ধমূর্ত্তি এবং দক্ষিণে ও বামদিকের প্রাচীরে বিভিন্ন ভঙ্গীতে আসীন অনেকগুলি বুদ্ধের মূর্ত্তি আছে।

গর্ভগৃহের ছাদে কএকটী সমকেন্দ্রিক বৃত্তের ব্যবধানে পুষ্পাদির চিত্র রহিয়াছে। ইহাতে বর্ণবিন্যাসনৈপুণ্য প্রকটিত। স্বস্তিকগ্রথিত শঙ্খচতুষ্টয়, যুগলস্তম্ভ প্রভৃতি কএকটী চিত্র গূঢ় রহস্যব্যঞ্জক—মন্দিরের অন্ধকারে এই সকল রহস্যচিহ্নের গাম্ভীর্য্য আরও বাড়িয়াছে। ছাদের কোণে কএকটী দেবদূতের মূর্ত্তি। এইগুলি অতি সুন্দর।

পশ্চাৎ অলিন্দের প্রাচীরে, গর্ভগৃহের সম্মুখস্থ মণ্ডপ ও দক্ষিণ পার্শ্বগৃহের মধ্যস্থলে একটী বুদ্ধমূর্ত্তি। মূর্ত্তিটী অতিশয় ভগ্ন এবং বিকৃত হইলেও এক সময়ে যে ইহা অপূর্ব্ব ভাবমণ্ডিত ছিল, তাহার আভাস পাওয়া যায়। বামদিকে শৈলোপরি উপবিষ্টা নারীমূর্ত্তিও অতি মনোহর।

দক্ষিণ পার্শ্বগৃহের বামপ্রাচীরে কএকটী রমণী ও বালক-বালিকা, গন্ধর্ব্ব ও অর্হতের চিত্র। রমণীদের শিরোভূষণ লক্ষ্য করিবার বিষয়। এক রমণীর মস্তকে যবনীদের ন্যায় ডোরা ও বুটাদার ওড়না, তাহার অগ্রভাগে ফিতার ন্যায় কোন দ্রব্য গ্রথিত। অপর এক রমণীর মস্তকে চূড়াকৃতি শিরস্ত্রাণ। চিত্রের উভয়পার্শ্বস্থ কদলী ও অশোকবৃক্ষ অতি সুন্দর এবং স্বাভাবিক। উক্ত পার্শ্বগৃহের দক্ষিণপ্রাচীরে একজন বোধিসত্ত্ব (পদ্মপাণি) এবং কএকটী স্ত্রীপুরুষ ও বালকবালিকার চিত্র।

বামপার্শ্বগৃহের পশ্চাতের প্রাচীরে হারিতী ও পাঞ্চিকের ভাস্কর্য্যমূর্ত্তি বর্ত্তমান। মূর্ত্তিদ্বয় প্রথানুযায়ী স্ফীতোদর। হারিতীর হস্তে মুদ্রাস্থলী, জানূপরি শিশু। তাঁহাদের নিকটে অনুচর ও চামরবাহিনীগণ। এতৎসংলগ্ন একটী দৃশ্যে হারিতী চারিহস্তে অস্ত্র লইয়া বুদ্ধকে আক্রমণোদ্যত। অপর এক দৃশ্যে হারিতী বুদ্ধের পদতলে বসিয়া তাঁহার পূজা করিতেছেন।

দক্ষিণ বারান্দার প্রাচীরগাত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ-দ্বারের মধ্যবর্ত্তীস্থানে ও উপরে কএকখানি চিত্রে 'বিধুরপণ্ডিত-জাতকের' উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। বামদিকের দৃশ্যে রাজা ধনঞ্জয়, যক্ষ পূর্ণক, রাণী, দ্বারপাল. পরিচারক প্রভৃতি। রাজার সম্মুখে দুইজন মন্ত্রী আসীন। ইহার দক্ষিণে অক্ষক্রীড়ার দৃশ্য। রাজা এবং পূর্ণক অক্ষক্রীড়া করিতেছেন, নিকটে রাণী বসিয়া রহিয়াছেন। ইহার নিম্নে অপর দুইটী দৃশ্য, এই দৃশ্যদ্বয়ের মধ্যস্থলে একটী বারান্দা। বামদিকের দৃশ্যে রাজা ও বিধুরপণ্ডিত অক্ষপণ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছেন, নিকটে পূর্ণক উপবিষ্ট। দক্ষিণস্থ দৃশ্যে বিধুরপণ্ডিত নাগপুরী গমনের পূর্ব্বে প্রাসাদস্থ রমণীগণের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। মন্ত্রীর মুখমণ্ডলে স্বর্গীয় রহস্যের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। পরের দৃশ্যে বিধুরপণ্ডিত হস্তিপৃষ্ঠে নাগপুরী গমন করিতেছেন। সঙ্গে পূর্ণক তাঁহার ঐন্দ্রজালিক অশ্বে আরূঢ়। ইঁহাদের পশ্চাতে অশ্বারোহী, পদাতিক ও বাদকদল। পরবর্ত্তী দৃশ্যে বিধুরপণ্ডিত নাগরাজ বরুণকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতেছেন। একস্থলে প্রকোষ্ঠমধ্যে রাণী বিমলা ও রাজকন্যা ইন্দরতী। অপর একস্থলে এক রাজপুত্র ও রাজপুত্রী আলাপনিরত। পরবর্ত্তী দৃশ্যে নাগসভায় নাগরাজ, তাঁহার সামন্ত ও জ্ঞাতিবৃন্দ প্রভৃতি আসীন। রাজার দুইপার্শ্বে রাণী ও রাজকন্যা। নিম্নস্থ অপর দৃশ্যে ইন্দরতী পুষ্পদোলনে দোদুল্য-মানা। তৎপরেই দেখা যাইতেছে ইন্দরতী ও পূর্ণক ভূতলে দণ্ডায়মান হইয়া আলাপে রত। ইহারই সংলগ্ন একটী দৃশ্যে প্রাসাদাভ্যন্তরে নাগরাজ, রাণী, রাজকন্যা, পূর্ণক প্রভৃতির চিত্র। চিত্রখানি স্থানে স্থানে অতিশয় সৌন্দর্য্যমণ্ডিত এবং খুবই উচ্চাঙ্গের।

দক্ষিণ বারান্দার দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকোষ্ঠদ্বারের মধ্যে ও উপরে দিব্যাবদানবর্ণিত পূর্ণাবদান উপাখ্যান চিত্রিত আছে। এক দৃশ্যে ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ভবিলের পোতাভিযান প্রদর্শিত হইয়াছে। উপরে অন্য একটী দৃশ্যে পূর্ণ শোভাযাত্রাসহকারে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য লইয়া যাইতেছে। একস্থলে একটী চত্বরে কতকগুলি নরনারী। দক্ষিণস্থ এক দৃশ্যে বুদ্ধ সমবেত উপাসক ও উপাসিকাবৃন্দকে উপদেশ দান করিতেছেন। একস্থলে একটী সঙ্গীতভবনের দৃশ্য। তৃতীয় প্রকোষ্ঠদ্বারের ঊর্দ্ধে অপর এক দৃশ্য। ইহাতে পূর্ণনির্ম্মিত চন্দনবিহারে বুদ্ধ ও অর্হৎগণ আগমন করিতেছেন। পূর্ণ জলপূর্ণ ঘট দ্বারা বুদ্ধকে পূজা করিতেছেন। নিকটে কএকটী পুরুষ ও নারী। কিয়দ্দূরে চন্দন-বিহার দেখা যাইতেছে। বুদ্ধ ও শিষ্যগণের নিম্নে বাদকদল

উপাশ্রয়গৃহের এবং সম্মুখ ও পশ্চাতের অলিন্দের ভিতর ছাদে নানা জ্যামিতিক চিত্র এবং পুষ্পপল্লব, রত্নাভরন ও নানা প্রাণীর চিত্র রহিয়াছে। এই সকল চিত্রে একদিকে শিল্পীর কল্পনাকুশলতা, অপর দিকে তৎকালীন বাস্তব জীবনের নিদর্শন পাওয়া যায়। কাল্পনিক পুষ্পযুক্ত হংস, জলদেবী, পশুমুণ্ডযুক্ত মনুষ্য, পদ্মোপরি শঙ্খ, মেঘ মধ্যে সঞ্চরমাণ অর্হৎ প্রভৃতির চিত্র দৃষ্ট হয়।

উপাশ্রয়গৃহের পশ্চাৎ দিকের স্তম্ভসমূহের পাদপীঠে নাগদম্পতি, গণদেবতা ও হাস্যোদ্দীপক কতিপয় মূর্ত্তি চিত্রিত আছে।

অজন্তার চিত্র ও ভাস্কর্য্যের কার্য্যপ্রণালী এবং উহাদের উৎকর্ষ-বিচার

চিত্রকার্য্যের জন্য কর্দ্দম দ্বারা গুহার প্রাচীরগাত্র প্রলিপ্ত করা হইত। এই কর্দ্দমের সহিত সম্ভবতঃ গোময়, তুষ এবং আরও কএকটী অজ্ঞাত পদার্থ মিশ্রিত করিয়া তাহাকে কার্য্যোপযোগী করা হইত। এই প্রলেপ বিশেষ পুরু এবং তাহার উপরিভাগ রঙ্ ধরাইবার জন্য অমসৃণ রাখা হইত। অজন্তার চিত্রাবলীর অধিকাংশই এই শ্রেণীর জমির উপরে চিত্রিত। ঘোর গেরুয়া রঙে চিত্রের প্রান্তরেখা (Outline) অঙ্কিত হইত। তাহার উপর মূল চিত্রের পৃষ্ঠদৃশ্যে (Background) শ্বেতবর্ণের প্রলেপ পড়িত। প্রান্তরেখার সংশোধনের প্রয়োজন হইলে তাহা ঘোর গেরুয়া রঙে অঙ্কন করা হইত। ইহার পরে চিত্রবিষয়ের উপরে পরিকল্পনানুযায়ী নানা-প্রকার বর্ণবিন্যাস দ্বারা চিত্রকর চিত্রের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেন। জমিতে রঙ্ ফলাইবার পর চিত্রের প্রান্তরেখাগুলি পরে বিশেষ সুস্পষ্ট করা হইত। বর্ণব্যঞ্জনা (Colour Composition) এবং বর্ণের তারতম্য সম্বন্ধে শিল্পীদিগের অসামান্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল। প্রথমে চিত্রের জমি প্রস্তুত হইত, পরে জমি আর্দ্র থাকিতেই তাহার উপরে চিত্র অঙ্কিত করা হইত। রঙের সহিত কোনরূপ আঠা ব্যবহৃত হইত কিনা, তাহা এখনও জানা যায় নাই।

কএকটী গুহায় অন্যপ্রকার প্রলেপের ব্যবহার দেখা যায়। এইরূপ জমির উপরেই অজন্তার প্রাচীনতম চিত্র অঙ্কিত হইত। ইহা শঙ্খের মত সাদা, মসৃণ এবং ডিম্বের খোলার মত পাৎলা একপ্রকার প্রলেপ। এ জিনিস যে কি, তাহা অদ্যাবধি জানা যায় নাই এবং এ পর্য্যন্ত ইহাকে কেহই বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন নাই। বর্ত্তমানে ইহার নিদর্শন অতি অল্প গুহাতেই পাওয়া যায়।

অজন্তা সম্বন্ধে সাধারণতঃ একটা প্রকাণ্ড ভুল ধারণা যে, ইহার সমগ্র চিত্রই একই ধাঁজে অঙ্কিত হইয়াছিল। বাস্তবিক অজন্তায় বহুপ্রকার বিভিন্ন চিত্রকলার পদ্ধতি লক্ষিত হয়। কোন কোন গুহার চিত্রে বর্ণের গাঢ়তার তারতম্যে চিত্রের ক্ষেত্র কিংবা দূরত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; কোন কোন স্থানের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র রেখার দ্বারা ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। এইজন্য 'অজন্তার চিত্র-পদ্ধতি' (Ajanta style of painting) কথাগুলি অর্থহীন। অজন্তায় বহু বিভিন্ন চিত্রকলাপদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে একটী পদ্ধতিতে পটের সমরূপ ছাঁদ অবলম্বিত হইয়াছে। ইহাতে চিত্রস্থ বিষয়-গুলিকে সুডৌল করিবার বা তাহার আয়তন দেখাইবার কোন চেষ্টা করা হয় নাই। আর একটী পদ্ধতিতে চিহ্নিত বিষয়গুলি সুডৌল করিবার ও তাহাদের আয়তন জ্ঞাপনের জন্য বর্ণ-ব্যঞ্জনায় আলোছায়াপাত এবং নানাপ্রকার প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইয়াছে। এই সকল চিত্রে আয়তন ও জনতার দৃশ্যের বিভিন্ন স্তর অতি সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। অবশ্য এইরূপ প্রণালী উনবিংশ শতকের ইউরোপীয় পারি-প্রেক্ষিক (Perspective) নহে।

২য় সংখ্যক গুহার ভিতরে একটী পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা অপর কোন গুহার চিত্রাবলীতে দৃষ্ট হয় না। এই পদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্রগুলির প্রান্তরেখা এরূপ অসামান্য দক্ষতার সহিত অঙ্কিত যে, পৃথিবীতে ইহার তুলনা মিলিবে কিনা সন্দেহ। মাঝে মাঝে একটা তুলিকারেখা ক্ষীণ সূত্রের সূক্ষ্মতায় আরব্ধ হইয়া একটী মাত্র টানে ছয় অঙ্গুলি পরিমাণ স্থূলত্ব লাভ করিয়াছে। ইহার দ্বারা একাধারে শিল্পীর লালিত্যবোধ ও অসামান্য শক্তি প্রকাশ পাইতেছে। কোন কোন স্থানে দেখা যায় যে, অনভিজ্ঞ ছাত্রের অপরিপক্ক হস্ত দ্বারা যে দুর্ব্বল রেখাপাত হইয়াছে, গুরু তাহা আপনার উপযুক্ত কলমে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। আবার দেখা যায়, চিত্রের জন্য প্রথম যে জমি প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা ঢাকিয়া দিয়া তাহার উপরেই নূতন মৃৎপ্রলেপ পড়িয়াছে এবং অপর একটী নূতন চিত্র তাহার উপরে অঙ্কিত হইয়াছে। এই প্রকার কার্য্য যেখানে যেখানে করা হইয়াছে, সম্ভবতঃ সে সকল স্থানে চিত্রের বিষয় ভুল হওয়ায় এইরূপ সংশোধনের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই চিত্রগুলির অঙ্গবিন্যাস অতি সুন্দর। একটী সূক্ষ্ম অথচ অপূর্ব্ব ভাবসন্নিবেশের নিপুণ প্রভাব প্রত্যেক মূর্ত্তি ও প্রত্যেক দৃশ্যে লীলায়িত গতিতে চলিয়া গিয়াছে। সমুচ্চ প্রাচীরের উপরিভাগে ছবি আঁকিবার সময় শিল্পী এরূপ দক্ষতার সহিত সাধারণ পারিপ্রেক্ষিকের একটু অদল বদল করিয়াছেন যে, নীচে দাঁড়াইয়া দেখিবার সময় দর্শকের নিকট উপর ও নীচের ছবির আয়তন সম্বন্ধে কোন পার্থক্য বোধ হইতে পারে না। কি করিয়া অজন্তার

চিত্রশিল্পিগণ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দূরাদূরত্ববোধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া রেখা ও বর্ণসম্পাতে তাহা ফুটাইয়া তুলিবার অতুলনীয় দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা একটী বিস্ময়ের ব্যাপার!

অজন্তার চিত্রে ঘোর গেরুয়া, শ্বেত, সবুজ, নীল, পীত ও পিঙ্গল বর্ণের সমধিক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ রঙ্ সম্বন্ধে জ্ঞান চিত্রকরদিগের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইয়াছে। তবে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু প্রমুখ ভারতীয় শিল্পিগণের গবেষণার ফলে মনে হয়, অজন্তায় সহজলভ্য ধাতব প্রস্তরাদি হইতেই এই সকল রঙ্ প্রস্তুত হইত।

চীনদেশের এক প্রাচীন চিত্রকর বলিয়া গিয়াছেন যে, প্রান্তরেখাগুলির প্রকৃতি চিত্রের বিষয়ের সহিত পরিবর্ত্তন করা উচিত। চীন ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগে (Classical period) যতপ্রকার তুলিকাসম্পাতের নমুনা পাওয়া গিয়াছে, দুই একটী ব্যতীত সকল প্রকারই অজন্তার চিত্রকলায় দেখিতে পাওয়া যায়।

চিত্রবিষয়

অনেক পণ্ডিতই এখন বলিয়া থাকেন যে, জাতকোল্লিখিত কাহিনী অজন্তার গুহাগাত্রস্থ চিত্রাবলীর বিষয়। একথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু কেবলমাত্র জাতকের গল্পগুলিকে চিত্রে ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই যে এই মহাশিল্পিগণ তুলিকাধারণ করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। অজন্তায় জীবনের যে সমস্ত দৃশ্য চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে সম্ভোগান্তে নায়িকার আবেশময় দৃশ্য হইতে সাধারণ জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম ঘটনা, এমন কি, অতি সাধারণ হাসি-বিদ্রূপের দৃশ্যও বাদ যায় নাই। অজন্তায় চিত্রশিল্পের যে নমুনা পাওয়া যায়, তাহা লৌকিক। চিত্রকরেরা যেমন জাতকের গল্পগুলি ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তেমনি চিত্রের মধ্য দিয়া জীবনের সমস্ত অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা সজীবভাবে ব্যক্ত করিয়া চিত্রকলাবোধের এবং নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

জাতকের গল্প ও বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত সংস্রব সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, অজন্তার শিল্পকলা প্রধানতঃ লৌকিক (Proletarian)। বৌদ্ধধর্ম্ম জনসাধারণের ধর্ম্ম ছিল এবং ইহাও সর্ব্বত্র দেখা গিয়াছে যে, প্রধানতঃ জনসাধারণের হিতের জন্য, মূল বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। ১৭শ গুহায় যে দৃশ্যটী শিল্পকলার সর্ব্বোচ্চ উৎকর্ষের পরিচায়ক, তাহার পরিকল্পনা হইতে ইহাই অনুমিত হইতে পারে যে, ভেদশূন্য সার্ব্বজনীনতার ভাবই অজন্তার চিত্রশিল্পীদিগের মনে সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত চিত্রে বুদ্ধদেবকে সমাসীন অবস্থায় দেখা যায়। তাঁহার সম্মুখে যে লোকসমাগম দেখান হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুইটী ধনী যুবকের পার্শ্বে ভিক্ষুক, তৎসন্নিকটে শিশুসন্তান ক্রোড়ে মাতা, তাহার নিকটে গণিকা এবং তাহাদের পশ্চাতে সাধারণ জনতার ভিড়। এই দৃশ্যটী হইতে বুদ্ধদেবের শ্রেণীভেদশূন্য মনুষ্যসমাজের উপরে যে করুণা, তাহাই চিত্রকরের তুলিকায় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই প্রেমের চিত্রটী চিত্রজগতে বিস্ময়জনক। একবার দেখিলে তাহার স্মৃতি কখনও মন হইতে অপসৃত হয় না।

অজন্তায় যে নরনারীর চিত্র দেখা যায়, তাহা স্থানীয় নরনারীর চিত্র বলিয়াই অনুমিত হইতে পারে। তখন তাহাদের মূর্ত্তিগুলি সুখস্বাস্থ্যের প্রতীক ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানকালে তত্রত্য নরনারীর উপরে বহুশতাব্দীর দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর যে ছাপ পড়িয়াছে, তাহাতে তথাকার আধুনিক নরনারীর যেরূপ অতিশয় করুণ অথচ হিংস্রভাব দেখা যায়, তাহা চিত্রন্যস্ত নরনারীর মুখে চোখে ফুটাইয়া তোলা হয় নাই। চিত্রন্যস্ত নরনারীর পরণে যে সকল কাপড় দেখা যায়, সেগুলির অধিকাংশই মোটা ধরণের বলিয়া মনে হয়। এই শ্রেণীর মোটা কাপড়ের ব্যবহার এখনও পর্য্যন্ত অজন্তার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধধর্ম্মের চারিটী প্রধান পশু—সিংহ, হস্তী, অশ্ব ও ষণ্ড; হংসাদি নানাবিধ পক্ষী; বানর প্রভৃতি নানাবিধ জীব; পদ্ম, কুমুদ প্রভৃতি পুষ্প এবং আম্র, বিল্ব, লেবু প্রভৃতি ফল চিত্রসমূহের মধ্যে অধিক পরিমাণে দেখিতে পাই। যক্ষদম্পতি, পশু ও পক্ষিমিথুনও যথেষ্ট পরিমাণে এই চিত্রসমূহের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ইহা ব্যতীত বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনী ও সমসাময়িক অন্যান্য ঘটনাও এই চিত্রাবলীর বিষয়ীভূত।

ভাস্কর্য্য

অজন্তার ভাস্কর্য্যও কলাগৌরবে জগতে অতুলনীয়। বিহারস্থ গর্ভগৃহগুলির অর্দ্ধ-অন্ধকারে ক্ষোদিত সৌম্য, গম্ভীর ও বিশাল বুদ্ধমূর্ত্তিগুলিই ইহার বিশেষ পরিচায়ক। শিল্পকলাবিদ্ ভিলেনস্কির মতে বুদ্ধমূর্ত্তিতেই অসাধারণ কলাসৌষ্ঠবসহ ব্যঞ্জনা ও সংস্থিতি সম্মিলিত হইয়া ভাস্কর্য্যের বিশুদ্ধ রূপকে পূর্ণ অভিব্যক্তি দান করিয়াছে। স্তম্ভাদির কারুকার্য্যের কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

আলোকপাতের রহস্য

অজন্তার গুহাগুলি অন্ধকারময়। কিন্তু দরজা ও জানালা-সকল গুহাগুলিতে এইরূপ ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে, সূর্য্যালোকে কোন কোন চিত্র দিবসের বিশেষ বিশেষ সময়ে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়া উঠে। এই গুহাগুলিতে এমন ভাবে

আলোক প্রতিফলিত করিবার পদ্ধতি দৃষ্ট হয় যে, মনে হয় কোন কোন বিশেষ চিত্র কেবলমাত্র একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেখিবার জন্যই অঙ্কিত হইয়াছিল। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে ইহাই বলা চলে যে, অজন্তা-গুহাচিত্রাবলী যদি মশালের আলোকে দেখা যায়, তাহা হইলেই তাহাদের মর্ম্ম সম্যক্ প্রকারে উপলব্ধ হইতে পারে। বিজলী বাতির উজ্জ্বল আলোকে কোনো ফলই পাওয়া যায় না। মশালের আলোকপাতে অজন্তার চিত্রিত নরনারী যেন জীবন্ত ও সচল হইয়া উঠে।

অজন্তাচিত্রাবলী ধ্বংসের কারণ

অজন্তার গুহাগুলি আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে তাহার চিত্রাবলী দ্রুত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। এই ধ্বংসকার্য্যের সহায়ক হইয়াছে—কাল, মানুষের অবহেলা, নানাবিধ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া, অনুসন্ধিৎসু ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের কৌতূহল, দেশীয় পুরাতাত্ত্বিকদিগের উৎসাহ, দেশী ও বিদেশী শিল্পীদিগের অনুলিপি গ্রহণের প্রচেষ্টা ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত গুহাস্থিত বাদুড়ও এই মহাচিত্রগুলি ধ্বংসের অন্যতম কারণ।

অজন্তাযুগ সম্বন্ধে মতভেদ

প্রথমে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই মত ব্যক্ত করিতেন যে, অজন্তাশিল্প খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে আরব্ধ হইয়া খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে সমাপ্ত হয়। এখন দেখা যায় যে, তাঁহারা এই সময়টীকে ক্রমশঃ অগ্রবর্ত্তী করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। এখন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, অজন্তার যুগ খৃষ্টীয় দুইশত হইতে অষ্টশত শতাব্দী পর্য্যন্ত ব্যাপক ছিল। ইহার কারণ সহজেই অনুমিত হয়। গান্ধারের কলাশিল্পের পর যদি অজন্তার যুগ নির্দ্দিষ্ট না হয়, তাহা হইলে ভারতীয় কলাশিল্পে কি করিয়া গ্রীক্ প্রভাব প্রমাণিত হইবে? বলা বাহুল্য, তাঁহাদের এই মত অযৌক্তিক, এবং সেই কারণে বিশ্বাসযোগ্য নহে।

অজন্তা,২—একটী নদী। বোম্বাই প্রদেশে তাপ্তী নদীর পার্শ্বে প্রবাহিত।

অজন্মন্—(পুং) [ন জন্-মনিন্। নাস্তি জন্ম যত্র ; বহুব্রী] জন্মনিবৃত্তি, মোক্ষ। (ত্রি) ২ জন্মরহিত।

অজন্য—(ক্লী) [ন জন্যতে লৌকিকহেতুভির্ন সম্পাদ্যতে ইতি জন-ণিচ্ যৎ] দৈবকৃত শুভাশুভসূচক ভূকম্পাদি উৎপাত। (ত্রি) ২ জন্যভিন্ন, অজননীয়।

অজপ,—(পুং) [ন জপ-অচ্। অস্পষ্টং জপতি, নিন্দার্থে নঞ্] কুপাঠক, যে ভাল পাঠ করিতে পারে না। [অজং পাতি পা-ক] ২ ছাগলপালক, যে ছাগ রক্ষা করে।

অজপ,২—(পুং) একজন পৌরাণিক নরপতি। রাজর্ষি জহ্নু যৌবনাশ্বের কন্যা কাবেরীকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য সুহোত্রের জন্ম হয়। অজপ সুহোত্রের পুত্র। (পদ্মপু°) ২ তৃতীয় মূহূর্ত্তের দেবতা। (ব্রহ্মাণ্ডপু°)

অজপঞ্চৌদন—(পুং,ক্লী) যজমান কর্ত্তৃক পুরোহিতকে ছাগ-দান। অথর্ব্ববেদে অজদানের এইরূপ ফল কথিত আছে। অজদান করিলে, যজমান তৃতীয় আকাশের, তৃতীয় স্বর্গের তৃতীয় পৃষ্ঠে স্থান পান। (অথর্ব্ব° ৯.৫.১০)। এক পতি থাকিতে স্ত্রীলোকেরা যদি অন্য পতি গ্রহণ করেন, তবে অজপঞ্চৌদন দান করিলে তাঁহাদের মধ্যে আর বিচ্ছেদ ঘটে না। (অথর্ব্ব° ১.৫.২৭)।

অজপতি—(পুং) [অজ-পা-ডতি ; ৬-তৎ] ছাগশ্রেষ্ঠ। ২ মেষরাশির অধিপতি, মঙ্গলগ্রহ।

অজপথ—(পুং) [অজস্য পন্থাঃ ; ৬-তৎ। অজেন ব্রহ্মণা বা নির্ম্মিতঃ পন্থাঃ। ৩-তৎ, অপ্ সমা°] ছাগবিচরণযোগ্য পথ। ২ প্রজাপতিসৃষ্ট আকাশস্থ পথাকার আকার সেতু ; ছায়াপথ ; যমনালা।

অজপথ্য—(ত্রি) [অজ-পথ ইবার্থে যৎ] দেবপথ। ২ সঙ্কীর্ণ পথ। ৩ গগনসেতুতুল্য।

অজপদ—(পুং) [অজপাদ দ্র°]।

অজপা,—(স্ত্রী) [যত্নেন বিনা জপ্যা ন জপ-কর্ম্মণি অচ্] শ্বাস ও প্রশ্বাসের আগমন ও বহির্গমনহেতু অক্ষরনিষ্পাদন-রূপ জপ। ইহা 'সোঽহং' ইত্যাকারের হংসঃ। ২ হংসাকার মন্ত্র। এই মন্ত্রের দেবতা অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি। ইঁহার ধ্যান তন্ত্রসারে দ্রষ্টব্য।

প্রত্যেক জীবই প্রতিদিন যে শ্বাস টানিয়া লয়, তাহাতে 'হং', আর যে শ্বাস ফেলে, তাহাতে 'সঃ' এই দুই অক্ষরেরই সৃষ্টিপুষ্টি। ঐ অক্ষরদ্বয়ের উচ্চারণে 'হংসঃ' এই মন্ত্রেরই উচ্চারণ হয়। সুতরাং 'হংসঃ' মন্ত্রের জপ সর্ব্বদাই জীবের হইতেছে। এ জপে অন্য মন্ত্র জপের ন্যায় প্রযত্ন কিছুই নাই। ইহা স্বভাবের নিয়মে আপনা হইতেই হইতেছে। এইজন্য এরূপ জপের নাম হইয়াছে অজপা।

'সোঽহং' শব্দের পরিবৃত্তিই অনেকের মতে হংসঃ। জীব-মাত্রেই দিনেরাত্রে শ্বাসের আগমনির্গমে মোট একুশ হাজার ছয়শত বার 'হংসঃ' মন্ত্র জপ করে। এই অজপা জপ যতক্ষণ, ততক্ষণই জীবের আয়ুঃ। অজপা জপ ফুরাইলেই তাহার আয়ুঃশেষ।

দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায় লিখিত আছে, শ্রীগুরুর কৃপায় জীব যদি এই মন্ত্ররহস্য জানিয়া অজপা জপ করে, তবেই তাহার ভববন্ধন মোচন হয়। প্রাণ হৃদয়ের অগ্রে হংস নামে আত্মা-

কারে অবস্থিত। ষষ্টি শ্বাসে প্রাণ, ষট্ প্রাণে নাড়িকা, ষষ্টি নাড়িকায় অহোরাত্র। জীব প্রত্যহ ২১ হাজার ৬ শত বার হংসমন্ত্রে পরমানন্দময়ীকে জপ করিতেছে। বিনা জপেই জপ, তাই ইহা অজপা। অজপা—ভবপাশছেদনকর্ত্রী।

"শ্রীগুরোঃ কৃপয়া দেবি জ্ঞায়তে জপ্যতে যদা।
উচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসতয়া তদা বন্ধক্ষয়ো ভবেৎ।
তস্মাৎ প্রাণশ্চ হংসাখ্য আত্মাকারেণ সংস্থিতঃ।
নাভেরুচ্ছাসনিঃশ্বাসাৎ হৃদয়াগ্রে ব্যবস্থিতঃ।
ষষ্টিশ্বাসৈর্ভবেৎ প্রাণঃ ষট্প্রাণা নাড়িকা মতা।
ষষ্টিনাড্যা হ্যহোরাত্রং জপসংখ্যাক্রমো মতঃ।
একবিংশতিসাহস্রং ষট্শতাধিকমীশ্বরি।
জপতে প্রত্যহং প্রাণী সান্দ্রানন্দময়ীং পরাং।
উৎপত্তির্জপমারম্ভো মৃত্যুস্তত্র নিবেদনং।
বিনা জপেন দেবেশি জপো ভবতি মন্ত্রিণঃ।
অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তা ভবপাশনিকৃন্তনী॥"

(দক্ষিণামূর্ত্তিসং)

আমরা প্রত্যহ যে নিঃশ্বাস গ্রহণ করি ও প্রশ্বাস ত্যাগ করি, তাহার কিয়দংশ দেবতারা ভোগ করেন। বিশ্বাদর্শে লিখিত আছে—

"অযুতে দ্বে সহস্রৈকং ষট্শতানি দিবানিশোঃ।
ভবন্তি হংসজপ্যানি নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাসনামতঃ।
ষট্শতানি গণেশস্য ষট্সহস্রং প্রজাপতেঃ।
গদাপাণেঃ ষট্সহস্রং ষট্সহস্রং ত্রিলোচনে।
সহস্রং স্যাদাত্মনস্তু সহস্রন্তু গুরুদ্বয়ে।
পরমাত্মনি সহস্রং স্যাদিতি সংখ্যা নিবেদয়েৎ।"

রাত্রি দিনের মধ্যে মানুষের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা ২১,৬০০ বার। ইহার নাম হংসমন্ত্রজপ। এই জপের মধ্যে ৬০০ গণেশের, ৬০০০ প্রজাপতির, বিষ্ণুর ৬০০০, শিবের ৬০০০, নিজের ১০০০, গুরুদ্বয়ের ১০০০, এবং পরমাত্মার ১০০০।

নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে এক একটী দেবতার অধিকার আছে, এ কথার তাৎপর্য্য কি আমরা বুঝিতে পারি না। উপরে শ্বাস প্রশ্বাসের যে প্রকার সংখ্যা লিখিত হইল, আধুনিক মতের সঙ্গে তাহার বিশেষ অনৈক্য নাই। কোএটেনেটের মতে শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে প্রতি মিনিটে তাহার শ্বাসপ্রশ্বাসের সংখ্যা ৪৪, পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমে ২৬। এইরূপ বয়ঃক্রম, শীতগ্রীষ্ম এবং খাদ্যসামগ্রীর প্রভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসের সংখ্যা কম বেশী হইয়া থাকে। সুস্থ যুবা ব্যক্তির শ্বাসপ্রশ্বাসের সংখ্যা গড়ে প্রতি মিনিটে ২০ বার ধরিলে সমস্ত দিবা রাত্রে ২৮,৮০০ বার হয়। আমাদের শাস্ত্রকারেরা ২১,৬০০ সংখ্যা গণনা করিয়াছেন, অতএব এই উভয়ের মধ্যে অধিক প্রভেদ নাই।

'হং' অর্থাৎ নিঃশ্বাস তুলিয়া লইতে অধিক সময় লাগে না। 'সঃ' অর্থাৎ নিঃশ্বাস ফেলিতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে। পুরুষের পক্ষে এই দুই ক্রিয়ার অনুপাত ১০:১২। শিশু এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে ১০:১৪। [প্রাণায়াম ও নিঃশ্বাস দ্র°]

অজপা$_2$—হিন্দুদিগের দেবতাবিশেষ। ইনি তৃতীয় মুহূর্ত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে (প. ১৯৩) ইঁহার যে ধ্যান পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ ;—

"তৃতীয়ো যোঽজপাখ্যস্তু কৃষ্ণঃ শুভ্রো মহাতনুঃ।
দক্ষিণে পঙ্কজং নীলং বামে সর্পং মহাফণম্॥
বিভ্রদ্বিপুলভোগায় পূজনীয়ো মহাধিয়া।"

তৃতীয় মুহূর্ত্তের নাম অজপা। ইনি শ্বেতকৃষ্ণবর্ণ ও বিপুলতনুবিশিষ্ট। ইঁহার দক্ষিণহস্তে নীলোৎপল ও বামহস্তে মহাফণাবিশিষ্ট সর্প। বিপুল ভোগকামনা যাঁহারা করেন, এরূপ মনীষিমাত্রেরই এই দেবতা পূজনীয়।

অজপাদ—(পুং) [অজস্য পাদ ইব পাদো যস্য ; বহুব্রী] অজৈকপাৎ নামক রুদ্রবিশেষ। ২ রুদ্রদেবতাক পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র।

অজপার্শ্ব—(পুং) এক রাজপুত্র। পাণ্ডুবংশীয় রাজা শ্বেতকর্ণ অপুত্রক অবস্থায় পত্নী মালিনীসহ তপোবনে গমন করেন। কিছুদিন তপোবনবাসের পর রাজা মহাপ্রস্থানে উদ্যোগী হন। পতিব্রতা মালিনীও স্বামীর অনুগমন করেন। পথিমধ্যে মালিনীর এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। সদ্যোজাত সন্তানকে পথের পার্শ্বে রাখিয়া মালিনী স্বামীর সহিত গন্তব্য পথে চলিতে থাকেন। ঋষি পৈপ্পলাদ ও কৌশিক রোরুদ্যমান শিশুকে দেখিতে পাইয়া আশ্রমে আনয়নপূর্ব্বক লালনপালন করিতে লাগিলেন। কুমারের পার্শ্বদ্বয় অজের ন্যায় শ্যামবর্ণ ছিল বলিয়া ঋষিরা ইঁহার নাম রাখেন অজপার্শ্ব। এত অল্পবয়স্ক শিশুর প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া ঋষিরা মহর্ষি বেগমের পত্নী বেগমীর হস্তে ইহার পালনভার সমর্পণ করেন। (হরিবংশ)

কিন্তু ব্রহ্মপুরাণমতে, ইনি মহর্ষি রেমক ও তৎপত্নী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন।

অজপাল—(পুং) সূর্য্যবংশীয় অজাত্মজ দীর্ঘবাহুর পুত্র। ইঁহার পুত্রের নাম রাজা দশরথ। দশরথের পুত্র রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন। (মৎস্যপু° ও অগ্নিপু°)

অজপুর—একটী প্রাচীন নগর। স্কন্দগুপ্তের বিহার প্রদেশে আবিষ্কৃত শিলাস্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপিতে এইস্থানের উল্লেখ আছে।

অজপ্রিয়া—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] বদরীবৃক্ষ। চলিত কুলগাছ।

অজবন্ধনহোম—(পুং) হোমবিশেষ। (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৬.১)

অজবন্ধু—(পুং) [অজস্য বন্ধুরিব মূর্খত্বাৎ] ছাগলের মত যাহার বুদ্ধি স্থূল ; মন্দবুদ্ধি ; মূর্খ।

অজবরসেন—পঞ্জাবের মন্দী-রাজবংশের একজন নৃপতি। ইনি ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে মন্দী শহর প্রতিষ্ঠা করেন। [মন্দী দ্র°]

অজবলা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] কৃষ্ণতুলসী, কালতুলসী।

অজবাহন—(পুং) বৈবস্বত মনুবংশীয় নাভাগের পৌত্র এবং ভলন্দনের পুত্র। (লিঙ্গপু°) ২ অগ্নি।

অজভক্ষ—(পুং) [অজৈর্ভক্ষ্যতেঽসৌ, অজ-ভক্ষ-কর্ম্মণি ঘঞ্ ; ৬-তৎ] [বৈদ্যক] বর্ব্বরীবৃক্ষ, চলিত বাবুই। এই গাছের পাতা ছাগলেরা অতি তৃপ্তির সহিত খায়। ২ ক্ষুদ্র দুরালভা। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ ছাগলের প্রিয় খাদ্যমাত্র।

অজমঘ—(পুং) সুহোত্রের এক পুত্র। ইনি বহু বৈদিক ঋকের রচয়িতা। ২ যুধিষ্ঠিরের একটী উপাধি। ৩ চন্দ্রবংশীয় জনৈক রাজা।

অজমতী—অজয়নদের নামান্তর। ইহাই মেগস্থেনিস-বর্ণিত Amystis। কাটোয়ার নিকট ইহা গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। আরিয়ানও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। গালব-তন্ত্রে অজয়নদের নাম আছে। কবি জয়দেব এই অজয়নদের তীরে কেন্দুবিল্ব বা কেন্দুলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। [অজয়$_৪$ দ্র°]

অজমল—(পুং) [বৈদ্যক] গোধূম। চলিত গম।

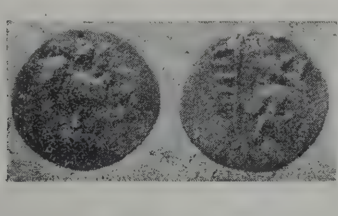
অজমাংস—(ক্লী) ছাগমাংস। [অজ$_{১০}$ ও ছাগমাংস দ্র°]

অজমান—বেদুইন্ আরবজাতির একটী শাখা। ইহারা আরব-মরুর পূর্ব্বাংশে বাস করে এবং মক্কাযাত্রীদিগের ধনরত্ন লুটিয়া লয়।

অজমায়ু—(ত্রি) অজের ন্যায় শব্দকারী। (ঋক্ ৭.১০৩.৬)

অজমার, অজমারক—(পুং) [অজান্ মারয়তি বিক্রয়ার্থং ; অজ-মৃ-ণিচ্-অণ্ ; উপ-তৎ] যে ছাগল কাটিয়া তাহার মাংস বিক্রয় করে ; মাংসবিক্রয়ী ; কসাই। ২ কসাইপ্রধান দেশ। [ভবাদি অর্থে কুর্ব্বা° ণ্য আজমার্য্য]—(ত্রি) ৩ তদ্দেশোৎপন্ন।

অজমিত্র—উত্তরভারতের উদুম্বরদেশের একজন প্রাচীন রাজা।



অজমিত্রের তাম্রমুদ্রা

ঐতিহাসিক কানিংহাম সাহেব পাঠানকোট হইতে অজমিত্রের নামাঙ্কিত একটী তাম্রমুদ্রা পাইয়াছেন। তাঁহার মতে, মুদ্রাটী খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকের। মুদ্রাটীর ওজন ৭১ গ্রেণ। ইহার একপার্শ্বে ব্রাহ্মীলিপিতে 'অজমিতস' কথাটী এবং উন্নতশুণ্ড হস্তিমূর্ত্তি ক্ষোদিত। হস্তী বামদিকে একটী বৃক্ষের প্রতি ধাবমান। মুদ্রার অপরপার্শ্বে বর্শাহস্তে এক মনুষ্যমূর্ত্তি। তাহার দক্ষিণে একটী সর্প অঙ্কিত আছে ; এতদ্ব্যতীত 'রাজ্ঞ অজমিতস' এই কথাটীও ক্ষোদিত রহিয়াছে।

অজমীঢ়$_১$—(পুং) সুহোত্রের পুত্র। ঋগ্বেদে (৪.৪৪.৬) ইনি অজমীল্হ নামে উক্ত হইয়াছেন। [অজমীলহ দ্র°]

বিষ্ণুপুরাণ (৪.১৯) মতে, ইনি পুরুবংশীয় রাজা হস্তীর পুত্র। ইঁহার নীলিনী, ভূমিনী, কেশিনী ও ধূমিনী নামে চারি স্ত্রী ছিল। কেশিনীর গর্ভে কণ্ব জন্মগ্রহণ করেন। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। এই মেধাতিথি হইতে কাণ্বায়ন দ্বিজগণের উৎপত্তি। ভূমিনীর গর্ভে বৃহদনু ও ধূমিনীর গর্ভে যবীনর ও ধূম্রবর্ণ ঋক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। ঋক্ষের পুত্র সম্বরণ। নীলিনীর গর্ভে নীল জন্মগ্রহণ করেন। নীলের পুত্র শান্তি। ঋক্ষ হস্তিনাপুর হইতে কুরুদেশ, নীল উত্তর-পঞ্চাল এবং বৃহদনু দক্ষিণ-পঞ্চাল শাসন করিতেন। অজমীঢ়ের দ্বিমীঢ় নামে এক ভ্রাতা ছিল। তিনি একটী পৃথক্ রাজবংশের স্থাপয়িতা।

মহাভারতের মতে, রাজা সুহোত্রের ঔরসে ঐক্ষ্বাকীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার তিনটী পত্নী ছিল ; তন্মধ্যে ধূমিনীর গর্ভে ঋক্ষ ; কেশিনীর গর্ভে জহ্নু, ব্রজন ও রূপিন নামে তিন পুত্র এবং নীলিনীর গর্ভে দুষ্মন্ত ও পরমেষ্ঠী নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই দুষ্মন্ত হইতে পঞ্চালবংশের সৃষ্টি হয়। আবার মহাভারতের অন্যস্থানে আছে, বিকুণ্ঠনের ঔরসে ও তদীয় পত্নী সুদেবার গর্ভে ইঁহার জন্ম। বিকুণ্ঠন ছিলেন রাজা হস্তীর পুত্র (মহাভা°, আদি°, ৯৪-৯৫ অ°)।

ভাগবত (৯.২৭.৩০) ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ মতে, ইনি বৃহৎক্ষত্রাত্মজ হস্তীর পুত্র। ইঁহার পুত্রের নাম নীল। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও (৯৯.১৬৫-৬৬) ইঁহার উল্লেখ আছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অন্যত্র আছে, ইনি অঙ্গিরসের ৩৩ জন পুত্রের অন্যতম এবং একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ২ অজমীঢ়-বংশীয় রাজগণ।

অজমীঢ়$_২$—(পুং) উত্তর-পঞ্চাল রাজবংশে সোমক অজমীঢ় নামে এক রাজা ছিলেন।

অজমীরীগঞ্জ—আসাম প্রদেশের শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত সুর্ম্মা নদীতীরে অবস্থিত একটী নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। অক্ষা° ২৪°৩৩' উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১°১৩' পূঃ। স্থানীয় অধিবাসীর সংখ্যা বেশী না হইলেও বাণিজ্যপণ্য ক্রয়বিক্রয়ের জন্য এখানে বহু লোকসমাগম হইয়া থাকে। অধিকাংশ

বাণিজ্যদ্রব্য জলপথে দেশীয় নৌকা দ্বারা বাহিত হয়। এখান হইতে চাউল, শুঁট্‌কীমাছ, বাঁশ, পাটী, চেটাই প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী এবং নানাবিধ শস্য, তৈল, লবণ, তামাক, চিনি ও কার্পাসবস্ত্র এখানে আমদানী হইয়া থাকে।

অজমীল্হ—(পুং) একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ইনি সুহোত্রের পুত্রদ্বয়ের অন্যতম এবং ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডলের ৪৩ ও ৪৪ সংখ্যক সূক্ত দুইটীর ঋষি। ৪.৪৪.৬ ঋকে ইঁহার উল্লেখ আছে।

অজমুখ—(পুং) [অজস্য ছাগস্য মুখমেব মুখত্বেন কল্পিতমস্য] দক্ষ প্রজাপতি ; সতীর পিতা ; শিবের শ্বশুর। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে—পুরাকালে শিবদ্বেষী দক্ষ যজ্ঞক্ষেত্রে অজস্র শিবনিন্দা করিতেছিলেন ; তাই শিবের আদেশে বীরভদ্র তাঁহার মুখ ছিঁড়িয়া ফেলেন। পরে শিব প্রসন্ন হইয়া পুনরায় মুখ-যোজনার আদেশ করিলে বীরভদ্র একটা অজমুখ লইয়া দক্ষের মুখে জুড়িয়া দেন। [দক্ষ দ্র°]

অজমের (আজমীর)—রাজপুতানার একটী প্রধান নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। ইংরেজাধিকৃত অজমের-মেরবাড় প্রদেশের সদর। অক্ষা° ২৬°২৭′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৩৭′ পূঃ।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এই নগরের লোকসংখ্যা ছিল ৩৫,১১১ এবং ১৯৩১ সালের গণনায় হইয়াছে ১১৯,৫২৪। ক্রমশঃ ইহার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

তারাগড় শৈলের পাদমূলে এই নগর প্রতিষ্ঠিত। পথঘাট ভাল এবং বাড়ীঘর সুন্দর। নগরের চারিদিক্ প্রাচীরবেষ্টিত ও তন্মধ্যে ৫টী ফটক বা প্রবেশদ্বার রহিয়াছে। এইগুলি এক্ষণে সংস্কারাভাবে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন অজমের-নগরী ইন্দ্রকোট উপত্যকায় বিদ্যমান ছিল। ইন্দ্রকোট হইতে একটী রাস্তা তারাগড় পর্য্যন্ত গিয়াছে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে রাজপুতানা-মালব রেলপথ অজমের দিয়া পরিচালিত হয়।

ইন্দ্রকোটে যে সকল মুসলমান অধিবাসী আছে, তাহারা ইন্দ্রকোটী নামে খ্যাত। তির্পোলিয়া ফটকের সান্নিধ্যে তাহাদের বাস। তারাগড় শৈলের শিখরদেশে তারাগড় নামক দুর্গ ছিল। ঐ স্থান হইতে নগরের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি রাখা যাইত। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। পরে স্বাস্থ্য-নিবাসের উপযোগী করিয়া উহাতে গৃহ-বাটিকাদি নির্ম্মাণ করা হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে মৌ ও নাসিরাবাদের সেনাদল এখানে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। বিখ্যাত মুসলমান সাধু সৈয়দ হুসেনের পবিত্র তীর্থ 'গঞ্জ শহীদান' ইহার মধ্যে সংস্থাপিত।

এই অজমের নগরে বহু প্রাচীন অট্টালিকা বিদ্যমান। এখানে 'আড়াইদিনকা ঝোপড়া' নামক একটী মস্‌জিদ আছে। উহা প্রথমে চৌহানরাজ বিসলদেব কর্ত্তৃক স্থাপিত একটী হিন্দুবিদ্যাগার ছিল। মুহম্মদ ঘোরী অজমের দিয়া যাইবার কালে এই হিন্দুগৌরব কীর্ত্তি দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হন এবং আপনার অধীনস্থ সেনাপতিকে আদেশ দেন, যেন ২॥ দিনের মধ্যে আমি ফিরিয়া আসিয়া এইখানে নমাজ পড়িতে পারি। তদনুসারে উহার ছাদ ও স্তম্ভগুলি ব্যতীত সমুদয় ভাঙ্গিয়া মস্‌জিদাকারে পরিণত করা হয়। ইহার সম্মুখভাগটী বড়ই সুন্দর। লর্ড মেওর শাসনকালে এবং ১৯০১-২ খৃষ্টাব্দে ইহা পুনঃসংস্কৃত হইয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, দিল্লীর কুতবমিনার যে সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহারই সমকালে ইহার গঠনকার্য্য সমাধা হয়।

আনাসাগরের বাঁধের উপর সম্রাট্ শাহ্‌জহান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত পাঁচটী মর্ম্মর-বাটিকা ও 'হামাম' (স্নানাগার) বর্ত্তমান ছিল। এক্ষণে উক্ত পাঁচটী বাটিকার মধ্যে বামদিকের তিনটীতে ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ বাস করেন ও দক্ষিণদিকের দুইটী ১৯০২ সালে পুনর্নির্ম্মিত হয়। এই সংস্কারকালে যতদূর সম্ভব উহার পূর্ব্বাবস্থা রক্ষা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

মুসলমান সাধু মুইনুদ্দীন্ চিস্তির সমাধি বা 'দরগা খ্বাজা সাহেব' স্থাপত্যশিল্পের একটী অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। ১২৩৫ খৃষ্টাব্দে চিস্তি ইহলোক ত্যাগ করিলে তাঁহার মুসলমান ভক্তগণ সমাধিস্থানে একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। দিল্লীর দাসবংশীয় সুলতান শামসুদ্দীন্ আল্‌তামাশ উহার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করেন এবং মুগল বাদশাহ্ হুমায়ুনের রাজত্বকালে উহা পরিসমাপ্ত ও স্বর্ণ-রৌপ্য-খচিত কারুকার্য্যে অলঙ্কৃত হয়। হুমায়ুনপুত্র সম্রাট্ অক্‌বর এই পবিত্র তীর্থের উন্নতিবিধানে যত্নবান্ হইয়া স্বতন্ত্র একটী মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। তদীয় পৌত্র বাদশাহ্ শাহ্‌জহান পুনরায় একটী মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে আরও অনেকগুলি অট্টালিকা ঐ সমাধি-সৌধের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছে। সম্রাট্ অক্‌বর চিতোর লুণ্ঠনকালে একটী পিত্তলনির্ম্মিত দীপদণ্ড ও সুবৃহৎ ঢক্কা আনিয়াছিলেন। তিনি সমাধিমন্দিরের শোভাবর্দ্ধনার্থ ঐ দুইটী এখানে দিয়া যান। এইরূপ অসংখ্য উপহার দরগায় সংরক্ষিত আছে।

প্রতি বৎসর রজব মাসে এখানে ছয় দিনব্যাপী একটী মেলা বসে। ঐ সময়ে ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে বহু মুসলমান এখানে সমবেত হয়। সকলেই সাধুর সমাধিস্থলে শ্রদ্ধা নিবেদনার্থ দ্রব্যোপহার দিয়া থাকেন। এই সময়ে ধনী ও মধ্যবিত্তের মধ্যে অনেকে 'ডেগ' বা ডেগ্‌চি দিবার মানস করেন। মস্‌জিদ প্রাঙ্গণে 'বড়' ও 'ছোট' দুইটী ডেগ্‌চি রক্ষিত আছে।

দাতা দরগায় উপযুক্ত মূল্য জমা দিলে উহাতে খিচুড়ী রাঁধিয়া সাধারণের মধ্যে বিতরিত হয়। সকল বর্ণের লোক ভক্তির সহিত ঐ ভোগ ক্রয় করে এবং ভগবানের প্রসাদ জানিয়া খাইতে দ্বিধাবোধ করে না।

অজমের-দুর্গ সম্রাট্ অক্‌বর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। দুর্গটী চতুষ্কোণ। উহার ভিত্তি সুদৃঢ় এবং প্রতি কোণে একটী করিয়া অষ্টকোণ বুরুজ স্থাপিত। মুগল সম্রাট্‌গণ অজমেরে আসিলেই এই দুর্গে বাস করিতেন এবং এখান হইতেই তাঁহাদের শাসনকার্য্য পরিচালিত হইত। মরাঠাদিগের অধিকারেও এখানে শাসনকেন্দ্র অধিষ্ঠিত ছিল। এক্ষণে দুর্গের মধ্যভাগের অট্টালিকাটীর অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া ইংরেজসরকারের তহশীল-কাছারী স্থাপিত হইয়াছে।

দুর্গপ্রতিষ্ঠার সমকালে অজমের নগর প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছিল। এখনও ঐ প্রাচীরের অংশ বিদ্যমান আছে। দিল্লী, মদার, উস্‌রি, আগ্রা ও তির্পোলিয়া ফটক দিয়া বাহিরে যাতায়াতের পথ রহিয়াছে। ঐ ফটক পাঁচটী এক সময়ে শিল্পনৈপুণ্যে পূর্ণ ছিল।

মুগল-অধিকারে তারাগড় শৈলের নিম্নদেশে প্রাচীন অজমের নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন উহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যক্ত হইলেও মুগল-সম্রাট্‌দিগের ব্যবহৃত 'নূর-চসম' নামক উদ্যানবাটিকা আজিও প্রাচীন সমৃদ্ধির সাক্ষ্য দিতেছে। উপরের তারাগড় দুর্গে জল তুলিবার জন্য রাজা মালদেব রাঠোর একটী জলোত্তোলন-যন্ত্র বসাইয়াছিলেন। আজিও ইহা তৎকালের বিজ্ঞানবত্তার পরিচয় দিতেছে। জাহাঙ্গীর বাদশাহের বিখ্যাত 'দৌলতবাগ' উদ্যানটী দেখিবার জিনিস। স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর ব্যয়ে উহা সংরক্ষিত হইতেছে।

এখানকার বাণিজ্য স্থানীয় শেঠদিগের দ্বারা পরিচালিত। কলিকাতা, বোম্বাই, সমগ্র রাজপুতানা ও ভারতের প্রধান প্রধান নগরে তাঁহাদের গদী আছে। পণ্যদ্রব্যের কারবার ব্যতীত তাঁহারা মহাজনী কারবারও করিয়া থাকেন। এখানে রাজপুতানা-মালব রেলপথের একটী প্রধান কেন্দ্র থাকায় পণ্যদ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানীর বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। নগরের তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত 'ফয়-সাগর' নামক বাঁধ হইতে এখানকার পানীয় জল সরবরাহ হয়।

রাজপুত সামন্ত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের পুত্রগণের পদোচিত শিক্ষা দিবার জন্য এখানে মেও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে উহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হইয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ডাফরিন্ সাহেব কর্ত্তৃক দ্বারোন্মোচন সংঘটিত হইয়াছিল। উহার প্রধান অট্টালিকাটী মর্ম্মরপ্রস্তরে নির্ম্মিত। ভারত-গবর্ণমেণ্ট পুরাতন রেসিডেন্সীর উদ্যানবাটিকা এতদুদ্দেশ্যে দান করিয়াছিলেন। উহার কতকাংশ এক্ষণে 'কলেজ পার্ক' নামে খ্যাত। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় রাজন্যবর্গের ব্যয়ে নির্ম্মিত কএকটী বোর্ডিং হাউস ইহার সহিত সংযোজিত হইয়াছে।

অজমেরে একটী সেণ্ট্রাল জেল, একটী জেনারেল হাঁসপাতাল ও দুইটী ছোট হাঁসপাতাল আছে। অজমের রাজপুতানা-মালব রেলপথের একটী উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র এবং এখানকার রেলষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে রেলকোম্পানীর কারখানা প্রভৃতি আছে। এই কেন্দ্রে বোম্বে-বরোদা ও সেন্‌ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলপথ মিলিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ষ্টেশনের নিকটে বাংলা, হিন্দু হোটেল ও সরাইখানা প্রভৃতি আছে। [অন্যান্য বিবরণ অজমের-মেরবাড় শব্দে দ্র°]

অজমের (আজমীর)-মেরবাড়—রাজপুতানার অন্তর্গত ইংরেজাধিকৃত একটী প্রদেশ। ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ রাজপুতানার এজেণ্ট এখানকার চীফ্ কমিশনাররূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। অজমের ও মেরবাড় নামক দুইটী জেলা লইয়া এই প্রদেশ গঠিত। অক্ষা° ২৫°২৪′ হইতে ২৬°৪২′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৪৫′ হইতে ৭৪°২৪′ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ২৭১১ বর্গমাইল।

ইহার উত্তর ও পশ্চিম সীমায় যোধপুর রাজ্য (মারবাড়) ; পূর্ব্বে জয়পুর রাজ্য এবং দক্ষিণে উদয়পুর রাজ্য (মেবার)।

১৯৩১ সালের আদম-সুমারীর গণনা অনুসারে অজমের-মেরবাড় প্রদেশের মোট লোকসংখ্যা হইয়াছিল ৫৬০,২৯২। তন্মধ্যে অজমের উপবিভাগে ১৯১,১০৭ ; কেক্‌রি উপবিভাগে ১১৩,২৮৭ ; বিয়াবর তহশীলে ৮৭,৬৪৩ এবং তোড়গড় তহশীলে ৪৮,৭৩১ জন। এই প্রদেশে শিক্ষিতের সংখ্যা ৫৯,৪৩৫ ও ইংরেজী শিক্ষিতের সংখ্যা ১২,৯৩১।

সংস্কৃতে মেরু শব্দের অর্থ পর্ব্বত। প্রবাদ, সূর্য্যবংশীয় রাজা অজ এই পর্ব্বতবহুল প্রদেশে দিগ্‌বিজয়ে আসিয়া অজমেরু নামে এক রাজধানী স্থাপন করেন। পরে উহাই অজমের নামে পরিচিত হইয়াছে।

অজমের জেলার মধ্যে মধ্যে মরু-সদৃশ বালুকাময় প্রান্তর রহিয়াছে ; বিশেষতঃ পুষ্কর ও গোবিন্দগড়ের পশ্চিমাংশে বালুকাময় স্থানই বেশী। আবার স্থানে স্থানে শৈলমালাও দৃষ্ট হয়। মেরবাড় উপবিভাগ আরাবল্লী (অর্ব্বুদ) শৈলের শাখা-সমূহে সমাকীর্ণ। আরাবল্লীর যে অংশে তারাগড় দুর্গ অবস্থিত, উহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৮৫৫ ফুট উচ্চ। ইহারই সন্নিকটে নাগ-পাহাড় নামক অধিত্যকাভূমে অজমের নগর অধিষ্ঠিত। অজমের

হইতে নাসিরাবাদ অভিমুখে যে পর্ব্বতমালা বিস্তৃত রহিয়াছে, উহা ভারতের একটী দ্বিধাবিভক্ত অববাহিকাভূমির সৃষ্টি করিয়াছে। এই প্রদেশের দক্ষিণভাগে যে সকল বারিপাত হইয়া থাকে, তাহা চম্বল নদীযোগে এবং ইহার বিপরীতভাগে পতিত জলরাশি লূনি নদীযোগে সাগরে নীত হয়।

ঐ সকল নদীনালার মধ্যে বনাসনদী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহা আরাবল্লী হইতে সমুদ্ভূত হইয়া উদয়পুরের উত্তর-পশ্চিম দিয়া অজমের জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। বর্ষার সময় জলবৃদ্ধি ঘটিলে এই নদীতে নৌকাযোগে যাতায়াত করা যায়। খারীনদী মেরবাড় জেলার বীরজাল গ্রামের সন্নিকটস্থ পর্ব্বতে উদ্ভূত হইয়া পরে নেগ্রিয়ার সন্নিকটে বনাসে পড়িয়াছে। সাগরমতী নদী অজমের নগরের অদূরস্থ আনাসাগর নামক দীর্ঘিকা হইতে বাহির হইয়া সমগ্র অজমের উপত্যকা অতিক্রম পূর্ব্বক পুষ্কর উপত্যকার জলরাশি-বাহিত সরস্বতীতে মিলিত হইয়া কচ্ছ উপসাগরে পড়িবার সময় লূনি নাম ধারণ করিয়াছে। স্থানীয় জলাশয়সমূহের জলেই সাধারণতঃ কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

অজমেরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নিতান্ত মন্দ নহে। চন্দ্রালোকে আলোকিত আনাসাগর ও তাহার বাঁধসংস্থিত বৃক্ষরাজির দৃশ্য বড়ই মনোরম।

এই প্রদেশের পর্ব্বতগুলিতে যথেষ্ট খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। বৃটিশ অধিকারের পূর্ব্বে ও প্রারম্ভে তারাগড় পর্ব্বতে সীসকের খনি ছিল। কিন্তু বিদেশী সীসার সহিত প্রতিযোগিতায় না পারায় খনি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তাম্র ও লৌহও যথেষ্ট পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা খনি হইতে আহরণ করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বলিয়া সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা হয় নাই। আজবেস্‌টস, অভ্র ও গার্ণেট্ নামক এক প্রকার মূল্যবান্ প্রস্তর এই প্রদেশে পাওয়া যায়। নানাপ্রকার প্রস্তর ও বিভিন্নবর্ণের মর্ম্মরও এই প্রদেশে যথেষ্ট সুলভ। পর্ব্বতময় প্রদেশ নানাপ্রকার ভেষজে পূর্ণ। বন্য জন্তুর মধ্যে নেক্‌ড়েবাঘ, চিতাবাঘ, হায়েনা, কৃষ্ণসার মৃগ, নীলগাই ও শম্বর প্রধান। এখানে বরাহও যথেষ্ট পাওয়া যায়। রাজপুতগণ বরাহশীকারে বিশেষ আমোদ অনুভব করিয়া থাকেন।

অজমের নগর ও পুষ্কর তীর্থ ছাড়া এই প্রদেশে প্রাচীন স্থাপত্যের বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। অজমের জেলার দক্ষিণপূর্ব্বাংশে হিন্দুযুগে স্থাপিত কতকগুলি দেবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত কোন্ সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। জয়পুর রাজ্যের সীমান্তে প্রায় ৩০ মাইল ব্যাপী স্থানে ঐরূপ অনেক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। অধিক সম্ভব উহা তোড়া রায়সেন নামক স্থানের রাজবংশীয়দিগের কীর্ত্তিকলাপ। বঘেরা ও সক্রানিতেও ঐরূপ মন্দিরের অনেক নিদর্শন আছে। ভিনাই নগরে একটী প্রাচীন দুর্গ আছে। উহার স্থাপত্যশিল্প প্রশংসনীয়। উহা কোন রণকুশল রাজপুত সামন্তরাজের বাসভবন ছিল।

অজমের, নাসিরাবাদ, বিয়াবর দেওলি ও কেক্‌রি এখানকার প্রধান নগর। এ ছাড়া এখানে প্রায় ৭৪৭ খানি গ্রাম আছে। মেরবাড়ের কৃষিজীবী জনসাধারণ প্রায়ই উপত্যকাভূমে বাস করে। এই জেলার অনুপাতে অজমের জেলাস্থ গ্রামসমূহে অধিক লোকের বাস। অধিবাসীদিগের সাধারণ ভাষা রাজস্থানী ও হিন্দী; কিন্তু শ্রেণীভেদে অজমেরী, মাড়বারী, মেরবাড়ী, মেবারী ও অন্যান্য দেশী ভাষায় কিছু কিছু পার্থক্য আছে। স্থানীয় লোকেরা যে চল্‌তি ভাষায় কথা কহিয়া থাকে, তাহা কিছু কর্কশ ও দুর্ব্বোধ্য।

মেরবাড়ীদিগের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত দেখা যায় এবং প্রত্যেক মাতার সন্ততিবর্গ বিষয়ের অংশ পায়। অজমেরের রাজপুতগণের মধ্যে পিতৃপরিত্যক্ত সম্পত্তি জ্যেষ্ঠপুত্রে সীমাবদ্ধ। গূজর, জাঠ ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। মুসলমানেরা নিকা করিতে পারে এবং আইন মত তালাক্ দিয়া স্বামীত্যাগও করে।

এখানকার বণিক্ সম্প্রদায়—অসবাল, অগ্রবাল, মহেশবাড়ী ও সরাওগী ধনে ও মানে প্রতিষ্ঠিত। ব্যবসা উপলক্ষে এই সম্প্রদায়ের অনেকেই এক্ষণে কলিকাতা মহানগরীতে বাস করিতেছেন। আবশ্যক মত তাঁহারা অজমেরে যাইয়া থাকেন। গূজরেরা কৃষিজীবী বলিয়া গোচারণে দিন কাটায়। মেরবাড়ের অধিবাসিগণ সাধারণতঃ 'মের' নামে অভিহিত। অজমেরের মুসলমানগণের অনেকেই শেখ উপাধিযুক্ত। স্থানীয় জাঠগণ যুদ্ধব্যবসায়ী ও কৃষিকার্য্যে সুদক্ষ।

পুষ্কর বিভাগে অনেক ব্রাহ্মণের বাস আছে। ইঁহারা পুষ্করতীর্থে যাত্রীদিগের পৌরোহিত্য করেন এবং যজনযাজন ও শাস্ত্রাধ্যয়নই ইঁহাদের উপজীবিকা। স্থানীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ নিরামিষাশী। কিন্তু রাজপুতেরা চিরাচরিত প্রথামত মাংসভোজনে বিরত নহেন। মেরবাড়ের জৈন অধিবাসীর মধ্যে অনেকেই যতি বা আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহারা সাধারণতঃ অলস প্রকৃতির, এজন্য স্বীয় ভরণপোষণের জন্য অন্য কোন কার্য্য করেন না। যজমানের শ্রদ্ধাদত্ত উপহারই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন। জৈন ছাড়া বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মাবলম্বীও অনেকে আছেন।

উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ সাধারণতঃ ধুতি, কোর্ত্তা, পাগড়ী ও

দোপাট্টা ধারণ করেন। স্ত্রীলোকেরা কাঁচুলী, আঙ্গরাখা ও উড়ানি ব্যবহার করে এবং শাড়ী, পেচোরা ও ঘাগ্‌রা পরিয়া থাকে। মুসলমানেরা পায়জামা পরিধান করে ও জামার বামদিকে বোতাম লাগায়।

বর্ষাঋতু ব্যতীত এই অধিত্যকাভূমির অধিবাসীদিগকে ভীষণ জলকষ্ট ভোগ করিতে হয়। এই কারণ হিন্দুরাজগণ প্রজাদিগের স্বচ্ছন্দবিধানার্থ পূর্ব্ব হইতে আনাসাগর প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। মেরবাড়ের বলাড়, দিলবারা, জবাজা ও কালিঞ্জর বিভাগেও ঐরূপ অনেক জলাশয় আছে। এই সকল জলাশয়ে বাঁধ দিয়া জল রাখার ব্যবস্থা করায় স্থানীয় অধিবাসিগণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। সামান্য জলাভাব ঘটিলেই এখানে অকাল উপস্থিত হয়। উপর্য্যুপরি যদি দুই তিন বর্ষ বারিপাত না হয়, তাহা হইলে দারুণ দুর্ভিক্ষ এবং ইহার সহিত মহামারীও দেখা যায়।

ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই অজমের-মেরবাড়ের কৃষির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এই প্রদেশের ভূমি অত্যন্ত অনুর্ব্বর। এতদ্ভিন্ন এখানে বারিপাতও অত্যন্ত অল্প ও অনির্দ্দিষ্ট। সুতরাং কৃত্রিম উপায়ে জল সরবরাহের উপর কৃষির ভাগ্য নির্ভর করে। গুজর, জাঠ, মেবাত, রাজপুত ও রাবৎ প্রভৃতি জাতিই সাধারণতঃ কৃষিজীবী। এখানে সাধারণতঃ ভুট্টা, জোয়ার, যব, তুলা, তিল, বাজরা ও গম উৎপন্ন হয়। তোড়গড় তহশীলে কিছু কিছু পোস্ত এবং পুষ্কর উপত্যকায় ইক্ষু জন্মে। শহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে সামান্য শাকসব্জী ও ফলমূল পাওয়া যায়। আশু বা আউশ শস্য বর্ষাকালে বপন করিয়া কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে সংগ্রহ করা হয়। আমন শস্য আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে রোপণ এবং ফাল্গুন-চৈত্রে আহরণ করা হইয়া থাকে। ভূমির অনুর্ব্বরতার জন্য প্রচুর পরিমাণে সার ও জল সরবরাহ করিতে হয়।

গবর্ণমেণ্ট বহু অর্থব্যয়ে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেইজন্য এই প্রদেশের জলকর কিঞ্চিৎ অধিক। কৃষকগণ জমিদারদিগকে অধিকাংশ সময় শস্যেই খাজনা দিয়া থাকে। অর্থে খাজনা দেওয়ার প্রথাও বিরল নহে। কুলী-মজুর, দাস-দাসীর মাহিনাও শস্যে দেওয়া হয়। গত ১৯৩০ সাল অপেক্ষা ১৯৩১ সালে শস্যাদির দাম প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছিল। নিম্নে তাহার একটু নমুনা দেওয়া গেল।

১৯৩০	১৯৩১
গম—টাকায় /৭ সের	গম—টাকায় /২ সের
যব— „ /৯।৵ ছটাক	যব— „ /৫।০ ছটাক
ভুট্টা— „ /৯।৶ „	ভুট্টা— „ /৬।৶ ছটাক

এখানে পুষ্করক্ষেত্রে প্রতি বৎসর একটী মেলা বসে। ঐ সময় নানাস্থান হইতে অশ্ব ও গবাদি বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। রিণ্ডীখাঁ নামক স্থানের গাভীগুলি বেশ দুগ্ধবতী।

এই প্রদেশের আয় সাধারণতঃ ভূমিকর, অহিফেন, ষ্ট্যাম্প এবং আবগারী বিভাগ হইতে সংগৃহীত হয়। এই প্রদেশে একটী জেলাবোর্ড ও স্থানে স্থানে মিউনিসিপালিটি আছে। এইস্থানের পূর্ত্তবিভাগ একজন এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। অজমেরের জমিদারী সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত—খালসা ও ইস্তিমরারি। ইস্তিমরারদারদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ রাজপুত সৈন্যদলে কার্য্য করিয়া জমিদারী প্রাপ্ত হন। মরাঠা সরকার ইঁহাদের স্থায়ী রাজকর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট বহু ইস্তিমরারদারকে সনদ দ্বারা এইরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মানিয়া লন। তবে উত্তরাধিকার-লাভ কালে প্রত্যেক ইস্তিমরারদারকে বিশেষ নজর দিতে হয়। বর্ত্তমানে এই প্রদেশে ৬৬ জন ইস্তিমরারদার আছেন; তন্মধ্যে ১৫ জনকে তাজিমী-ইস্তিমরারদার বলা হয়। এতদ্ব্যতীত ভূঁইয়া নামে আর এক প্রকার জমিদার আছেন। কিষণগড়ের ভূঁইয়ারা 'মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত।

কর্ণেল ডিক্সন সাহেব ১৮৪৯ হইতে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই প্রদেশ জরিপ করেন। কিন্তু ১৮৭২ হইতে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লা-টুস্ (Sir James La Touche) সাহেব এইস্থান পুনরায় জরিপ করিয়া ভূমির তারতম্যানুসারে খাজনার হার স্থির করিয়া দেন। ১৮৮৪ হইতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হোয়াইট্‌ওয়ে (Mr. Whiteway) সাহেব এখানকার হস্তবুদ সংশোধন করিয়া পুনরায় নূতন কর ধার্য্য করিয়া যান। এই প্রদেশের জল ও স্থলবিভাগের রাজস্ব স্বতন্ত্র আদায় হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানীর পৃথক্ আয়কর ধরা হয়।

রাজপুতানা-মালব রেলপথের প্রধান বর্ত্ম অজমেরের ভিতর দিয়া এবং মেরবাড়ের উত্তর দিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৫৯ মাইল চলিয়া গিয়াছে। অজমের-খাণ্ডোয়া শাখাটী অজমের শহরের দক্ষিণ দিয়া ৪১ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছে। এই প্রদেশে ৫০০ মাইলের অধিক পাকা রাস্তা এবং ততোধিক কাঁচা রাস্তা বর্ত্তমান। অধুনা মোটর-লরী ও বাসের প্রচলন হওয়ায় যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

ইংরেজাধিকারে এই প্রদেশের অজমের, দেওলি ও নাসিরাবাদে সেনানিবাস স্থাপিত হইয়াছে (১৯০৪ খৃষ্টাব্দে)। মেরবাড়-পদাতিক সৈন্য অজমের ছাউনীতে থাকে। ১৮২২

খৃষ্টাব্দে মেরবাড়-সেনাদল গঠিত হয়। পরে উহা ৪৪ সংখ্যক মেরবাড়-পদাতিক (**44th Merwāra Infantry**) নামে খ্যাত হইয়াছিল। ইহারা বিশেষ প্রভুভক্ত। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় নাসিরাবাদের সেনাদল বিদ্রোহী হইলে, মেরবাড়-সেনাদলের এক বাহিনী বিয়াবর হইতে নাসিরাবাদ যাইয়া রাজকোষ ও বারুদখানার ভার লয় এবং বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে অজমের রক্ষা করে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মের রেজিমেণ্ট এবং পরে দেওলি রেজিমেণ্ট গঠিত হয়। অজমের, নাসিরাবাদ ও বিয়াবরে জেলখানা আছে। অজমেরের সেণ্ট্রাল জেলে সুন্দর কার্পেট ও কম্বল প্রস্তুত হয়।

কমিশনারই এই প্রদেশের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর। অজমের-গবর্ণমেণ্ট-কলেজের অধ্যক্ষ তাঁহাকে এ সম্বন্ধে সাহায্য করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত কএকজন স্কুল ও কলেজ-পরিদর্শক আছেন। এই প্রদেশে ক্রমশঃ শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে। হিন্দু ও মুসলমান সমভাবে শিক্ষা পাইতেছে। স্ত্রীশিক্ষারও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। অজমেরের মেয়ো-কলেজ প্রভৃতি বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা ও স্কটলণ্ডের মিশনরীসম্প্রদায় কর্ত্তৃক কএকটী বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। অজমেরে শিক্ষকদিগের জন্য ট্রেনিং স্কুলও আছে। ইহা ব্যতীত শিল্পশিক্ষার্থ ২।১টী শিল্পবিদ্যালয়ও এই প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অজমেরের জেনারেল হাঁসপাতাল কর্ণেল ডিক্সনের সৎকার্য্যাবলীর মধ্যে অন্যতম। তিনিই ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে এই হাঁসপাতালের সূচনা করিয়া যান। ইহা ব্যতীত এই প্রদেশে ৭।৮টী হাঁসপাতাল ও ঔষধাগার আছে।

[অজমের, আনাসাগর, তারাগড়, পুষ্কর প্রভৃতি শব্দে অন্যান্য বিবরণ দ্র°]

অজমেরের প্রাচীন ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। যে টুকু পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই কিংবদন্তীমূলক। একটী প্রবাদ আছে যে, চৌহান রাজপুতবংশের অজ নামধারী জনৈক রাজা অনুমান ১৪৫ খৃষ্টাব্দে অজমের নগর ও দুর্গ স্থাপন করেন। প্রথমে নাগপাহাড়ের সুবিস্তৃত অধিত্যকা-ভূমে দুর্গ নির্ম্মাণ করাইবার বাসনাই তাঁহার হৃদয়ে সমুদিত হইয়াছিল, কিন্তু দৈবকারণে উহার প্রাকারাদি ধ্বংস হওয়ায় তিনি ঐ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া তারাগড়-শৈলে গড় বিট্‌লি নামক একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করান। পরে এই পর্ব্বতের পাদমূলে অবস্থিত ইন্দ্রকোট নামক উপত্যকার একাংশে তিনি অজমের নগর সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধবয়সে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া নগর হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে একটী শৈলশিখরে জীবন অতিবাহিত করেন। আজিও অজয়পালের মন্দির তাঁহার সমাধিস্মৃতি বহন করিতেছে।

অপর একটী কিংবদন্তী মতে, চৌহানগণ রোহিলখণ্ডের অহিচ্ছত্রপুর হইতে (সম্ভবতঃ ৭৫০ খৃষ্টাব্দে) রাজপুতানায় আগমন করেন। তাঁহাদের প্রথম রাজধানী ছিল শম্বর। অজমের প্রদেশ তাঁহাদের করায়ত্ত হইলেও তৎকালে অজমের নগর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

কর্ণেল টডের মতে, পুষ্করের চৌহানবংশীয় অজপাল নামক নৃপতি অজমের নগরের প্রতিষ্ঠাতা। কানিংহাম সাহেব লিখিয়াছেন, অজমেরের প্রতিষ্ঠাতা চৌহানরাজ অজয়পাল ৮১৯ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি এই বংশীয় পূর্ব্বতন নৃপতিগণের নাম বা রাজত্বকাল নির্দ্দেশ করেন নাই, তবে চৌহানবংশ কর্ত্তৃক দিল্লী-বিজয়ের আনুমানিক সময় ১১৫১ খৃষ্টাব্দ ধরিয়াছেন। নয়চন্দ্রকৃত 'হাম্বির মহাকাব্যে' অজয়মেরুদুর্গের প্রতিষ্ঠাতা অজয়পালকে চৌহানবংশীয় ৩য় নৃপতি বলা হইয়াছে। ডাঃ জে. মরিসনের মতে, চাহমানবংশীয় ২০শ নৃপতি অজয়রাজ (সল্হণ) অজয়মেরুর প্রতিষ্ঠা করেন।

কিংবদন্তীসমূহের মূলে যে সত্য নিহিত আছে, তাহারই অবলম্বনে ডাঃ বূহ্‌লার প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, রাজা অজ বা অজয় সম্ভবতঃ ১১০০ খৃষ্টাব্দের সমকালে বিদ্যমান ছিলেন এবং ঐ সময়েই অজমের নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।*

অজয়ের পুত্র আনা বা অর্ণোরাজ সুদৃশ্য আনাসাগরের প্রতিষ্ঠাতা। কিছুদিন হইল চিতোর নগর হইতে একটী শিলাফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। উদয়পুরের সুবিখ্যাত পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর ওঝা উহার পাঠোদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, রাজা অর্ণোরাজ ১১৫০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। 'পৃথ্বীরাজবিজয়' গ্রন্থ হইতে জানা যায়, অর্ণোরাজ গুজরাতের জয়সিংহ-সিদ্ধরাজবংশীয়া কাঞ্চনদেবীকে বিবাহ করেন। প্রবাদ, জয়সিংহ-সিদ্ধরাজের উত্তরাধিকারী কুমারপালের সহিত অর্ণোরাজের যুদ্ধ হইয়াছিল (সম্ভবতঃ ১১৪৯—১১৫০ বা ১১৫১ খৃষ্টাব্দে)। আনার পুত্র বিসলদেব বা ৩য় বিগ্রহরাজ অজমেরের চৌহান রাজবংশের প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি তোমরগণকে পরাজিত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন এবং স্বীয় রাজ্যে বিসলসাগর নামক দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইঁহার রাজত্বকালে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি (১১৬৩-৬৪ খৃঃ)

* Indian Antiquary, June, 1897.

পাওয়া গিয়াছে। বিসলদেবের পৌত্র সুবিখ্যাত পৃথ্বীরাজ দিল্লী ও অজমেরের রাজা ছিলেন। *

১১৯২ খৃষ্টাব্দে পৃথ্বীরাজের হস্তে শাহাবুদ্দীন্ মুহম্মদ ঘোরী পরাস্ত হন। কিন্তু ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে ঘোরী পুনরায় নূতন সৈন্য লইয়া দিল্লী আক্রমণ করেন। এই সময়ে রাজপুতজাতি আত্মকলহে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। জয়চাঁদের ষড়্যন্ত্র ও মুসলমান-নেতা কর্ত্তৃক পৃথ্বীরাজহত্যা ইতিহাসবিদিত। [জয়চাঁদ, পৃথ্বীরাজ ও মুহম্মদ ঘোরী দ্র°]

পৃথ্বীরাজকে নিহত করিয়া মুহম্মদ ঘোরী অজমের অধিকার করেন। মুসলমান সেনাদল প্রতিহিংসাবশে পরিচালিত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুদিগকে হত্যা করিয়া নগরে রক্তনদী বহাইয়াছিল। তাহাদের প্রতিশোধ গ্রহণের পিপাসা মিটিলে দেখা গেল—অজমের বীরশূন্য হইয়াছে।

পৃথ্বীরাজের এক পুত্রকে অজমেরের সামন্তরাজপদে নিযুক্ত করিয়া শাহাবুদ্দীন্ চলিয়া যান। পরে ঐ নাবালক রাজার নিকট হইতে তদীয় খুল্লতাত হরিরাজ বলপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করেন। হরিরাজের আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া ঘোরীর প্রতিনিধি কুতবুদ্দীন্ (পরে দাসবংশের ১ম রাজা) অজমের যাত্রা করেন। হরিরাজ মুসলমানের কোপ হইতে রক্ষা পাওয়ার আশা কম দেখিয়া আত্মহত্যা করিয়া অব্যাহতি লাভ করেন। তদবধি অজমের দিল্লীর অধীন হইল।

১২১০ খৃষ্টাব্দে কুতবুদ্দীনের মৃত্যু ঘটিলে মুসলমানশক্তি হীনবল দেখিয়া গুজরাতের সোলাঙ্কিগণ ও দুর্দ্ধর্ষ মেরগণ গভীর নিশীথে তারাগড় আক্রমণ করেন। তাঁহারা দুর্গস্থ ও অজমের নগরস্থ সমস্ত মুসলমানকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তৎকালীন মুসলমান-শাসনকর্ত্তা সৈয়দ্ হুসেন রাজপুতহস্তে নিহত হন। অজমের নগরের মধ্যবর্ত্তী 'গঞ্জ শহীদান' নামক সমাধিচত্বরে শাসনকর্ত্তা হুসেন, তাঁহার সহকর্ম্মী যোদ্ধৃগণ এবং তাঁহার বিখ্যাত অশ্বকে গোর দেওয়া হইয়াছিল।

সম্রাট্ শামসুদ্দীন্ আল্‌তামাশ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া পুনরায় অজমের অধিকার করেন। ইহার পর তৈমূরলঙ্গের অভিযান পর্য্যন্ত অজমেরে পাঠানশাসন অব্যাহত ছিল। এই সময়ে রাণা কুম্ভ রাজপুতানার শ্রেষ্ঠ অধিনায়ক। তিনি পাঠানশিবিরে দৌর্ব্বল্য ও অরাজকতার লক্ষণ দেখিয়া অজমের দখল করিয়া লইলেন। অনতিকাল পরেই গুপ্তঘাতকের হস্তে রাণা নিহত হইলে মালবের মুসলমান শাসনকর্ত্তা সুযোগ বুঝিয়া অজমের অধিকার করেন। ১৪৭০ হইতে ১৫৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা মালবের শাসনাধীন থাকে। [মালব দ্র°]

ইহার পর মারবাড়ের অধীশ্বর মালদেব অজমের দখল করেন ; কিন্তু মুগল-সম্রাট্ অক্‌বর দিল্লীসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াই অজমের দখল করিয়া লন। অক্‌বর অজমের দুর্গ সংস্কার করান। তিনি ইহাকে একটী স্বতন্ত্র সুবায় বিভক্ত করিয়া সমগ্র রাজপুতানাকে 'সুবা অজমেরের' অধীন করিয়াছিলেন।

অজমেরের জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ এবং দুর্গটী দুর্ভেদ্য জানিয়া মুগল-সম্রাট্গণ এখানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। কারণ উহাকে কেন্দ্র করিয়া উত্তরভারত হইতে গুজরাত ও দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত বিদ্রোহী রাজন্যবর্গের উপর লক্ষ্য রাখিতে তাঁহাদের অনেক সুবিধা হইত।

একবার বাদশাহ্ অক্‌বর মানত করেন যে, যদি তাঁহার পুত্র জন্মিয়া জীবিত থাকে, তাহা হইলে আগ্রা হইতে অজমেরে যাইয়া তিনি প্রসিদ্ধ সাধু মুইনুদ্দীন্ চিস্তির সমাধিমন্দিরে পূজা প্রদান করিবেন। † ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ সেলিম জন্মগ্রহণ করেন। ইহার ১০ বৎসর পরে অক্‌বর নিজ প্রতিশ্রুতি মত চিস্তির সরিফে আসিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া যান। ইহার পরও কএকবার তিনি অজমের তীর্থে আসিয়াছিলেন। তিনি আগ্রা হইতে অজমের আসিবার যে পথ নির্দ্দেশ করেন, উহার পার্শ্বে প্রস্তরস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ঐ সকল স্তম্ভরাজি আজিও অভগ্ন অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ও তৎপুত্র শাহ্‌জহান জীবনের অনেক সময় অজমেরে অতিবাহিত করিয়াছেন। এই নগরে ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর ইংলণ্ডেশ্বর রাজা ১ম জেমস্ কর্ত্তৃক প্রেরিত রাজদূত স্যর্ টমাস রোকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

সুরাট বন্দর হইতে স্যর্ টমাস রো যখন সম্রাট্ সন্দর্শনে অজমের অভিমুখে আসিতেছিলেন, তখন চিতোরের সন্নিকটে টমাস কোরিয়াট্ (Thomas Coryat) নামক একজন বিকৃত মস্তিষ্ক ইংরেজপুঙ্গবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ঐ ব্যক্তি জেরুজালেম হইতে অজমের হাঁটিয়া আসিয়াছিল। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত অজমেরে থাকিয়া রো সাহেব ১৬১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সম্রাটের সহিত উজ্জয়িনী

* অজমেরের প্রতিষ্ঠাতা ও তদ্বংশীয়গণ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। এজন্য বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে চাহমান বা চৌহান, অর্ণোরাজ বা আনা, বিসলদেব, পৃথ্বীরাজ প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।

† এই সমাধিমন্দির দরগা খ্বাজা সাহেব নামে প্রসিদ্ধ। কএক শতাব্দী ধরিয়া মুসলমানগণ এই সমাধিক্ষেত্রে তীর্থযাত্রা করিয়া আসিতেছেন। খৃষ্টীয় ১২শ শতকে মুইনুদ্দীন্ ঘোররাজ্য হইতে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। [মুইনুদ্দীন্ চিস্তি দ্র°]

পৌছেন। রো সাহেব তাঁহার বিবরণীতে অজমের বাসের কথা সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

অজমের নগর হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে পর্ব্বতবক্ষে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের সহিত তাঁহার ভ্রাতা দারার যুদ্ধ হয়। দারা পরাজিত হইয়া যে নির্যাতন ভোগ করেন, বার্ণিয়ার সাহেব তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। [দারা দ্র°]

দারার পরাভব হইতে ১৭২০ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ্ ফরুখসিয়রের মৃত্যু পর্য্যন্ত অজমেরের ইতিহাসে আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে মারবাড়ের রাজা যশোবন্তসিংহের পুত্র অজিতসিংহ মুগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন সমাগত দেখিয়া অজমের আক্রমণ করেন। মুগল-শাসনকর্ত্তা তাঁহার হস্তে নিহত এবং অজমের পদানত হয়। মুহম্মদ শাহ্ কিছুদিনের জন্য নগর উদ্ধার করেন বটে, কিন্তু অবশেষে বাধ্য হইয়া ১০ বর্ষ অন্তে তিনি অজিতসিংহের পুত্র অভয়সিংহকে অজমের ও আহ্মদাবাদের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। এখন হইতে অর্থাৎ ১৭৩১ হইতে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অজমেরের শাসনভার মারবাড়ের রাঠোর রাজগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে। ইহার পরে রাজ্যাধিকার লইয়া বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়। মরাঠা-সেনানায়ক জয়াপ্পা সিন্ধিয়াকে হত্যার অপরাধে তৎকালীন রাজা বিজয়সিংহ অজমের দুর্গ ও জেল মরাঠাদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে মাধোজী সিন্ধিয়া জয়পুর আক্রমণ করিলে সমবেত রাঠোর সর্দ্দারগণের হস্তে মরাঠা-সৈন্য পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। ইহাতে অজমের রাঠোরদিগের অধিকারে আসিল বটে, কিন্তু অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ডি বোইনে (De Boiyne) পরিচালিত সিন্ধিয়াসৈন্য মৈরতা নামক স্থানে রাজপুতদিগকে আক্রমণ ও পরাস্ত করে। ইহার পরে তিনি অজমের অধিকার করিয়া লন। ইংরেজাধিকারে আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অজমের গোয়ালিয়রপতির শাসনাধীন ছিল। পিণ্ডারী যুদ্ধের অবসানে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৫এ জুন তারিখের সন্ধিসূত্রে গোয়ালিয়রপতি দৌলতরাও সিন্ধিয়া অজমের ইংরেজদিগকে ছাড়িয়া দেন। [দৌলতরাও সিন্ধিয়া দ্র°]

ইংরেজাধিকারে আসিবার পর এইস্থানের যুদ্ধবিগ্রহাদির অবসান হয়। ১৮১৮ হইতে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহার শাসনভার কএকজন পরিদর্শক কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকে। ইহারা প্রথমে দিল্লীস্থ রেসিডেণ্ট, পরে মালব-রাজপুতানার রেসিডেণ্টের মতামত লইয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে উহা উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ভাবে শাসিত হইতে থাকে। তৎপরে অজমের-মেরবাড় একটী স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে গঠিত হয় এবং ভারত সরকারের বৈদেশিক বিভাগে চীফ্ কমিশনর দ্বারা শাসনের ব্যবস্থা হয়।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে মিঃ ওয়াইল্ডার মহারাষ্ট্র-সুবেদারের হস্ত হইতে এখানকার শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ডিক্সন অজমের ও মেরবাড়ের ভার প্রাপ্ত হন। তিনি স্থানীয় অধিবাসিগণের হিতার্থ খাল কাটাইয়া চাষবাসের সুবিধা করিয়া দেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ হইতেই এখানকার শাসনকার্য্য ঠিক মত চলিতে থাকে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে নাসিরাবাদ হইতে দুইদল বঙ্গীয় পদাতিক-বাহিনী ও একদল কামানবাহী সেনা (Bengal Infantry and Bengal Artillery) বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া দিল্লী অভিমুখে চলিয়া যায়। তৎপরে এই প্রদেশে আর বিশেষ কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এখানে রাজপুতানা-মালব রেলপথ স্থাপিত হয়। তৎপর হইতেই অজমের নগরের শ্রীবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইতেছে।

অজমোদ—(পুং) [বৈদ্যক] দীপ্যক। (বাভট, সূ°, ৩৫ অ°)

অজমোদা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] [প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক ভট্টোজী দীক্ষিতের পুত্র ভানুজী দীক্ষিতের মতে, 'অজং মোদয়তি (ছাগলের প্রিয়) ইতি অজমোদা। অজ্ মুদ্-অণ্ কর্ম্মণি টাপ্ স্ত্রিয়াম্] যমানী। [যমানী দ্র°] ইহার পর্য্যায়—উগ্রগন্ধা, ব্রহ্মদর্ভা, যবানিকা (অমর); যমানী, দীপক, দীপ্য, ভূতিক, যমানিকা (রত্নমালা)। [অজস্য মোদইব মোদো গন্ধো যস্যাঃ] ২ অজগন্ধবতী বনযমানী, বনযোয়ান। বৈদ্যকে ইহার সংস্কৃত নাম—খরাহ্বা, মায়ূরী, দীপ্যক, ব্রহ্মকুশা, কারবী, লোচমস্তকা, বস্তমোদা, মর্কটী, মোদা, গন্ধদলা, হস্তিকারবী, গন্ধপত্রিকা, শিখিমোদা, মোদাঢ্যা, বহ্নিদীপিকা, ব্রহ্মকোশী, বিশালী, হয়গন্ধা, উগ্রগন্ধিকা, মোদিনী, ফলমুখ্যা, বিশল্যা। হিন্দুস্থানী—অজমোদ্। মরাঠী ও কর্ণাটী—অজমোদা। গুজরাতী—অজমোদ্। তেলেগু—বামং ও আজামোদা। আসামী—বনজনী। বাঙ্গালা—বনযমানী। আরবী—হব্‌উলকর্‌ত্ কের্‌ফস্। লাটিন—Apium involucratum. এবং ডাক্তারী নাম Seseli Indicum.

বৈদ্যক মতে গুণ—কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য এবং বিদাহজনক অর্থাৎ ঝালের সঙ্গে একটা জ্বালার অনুভূতি হয়। ইহা কফ ও বায়ুনাশক, হৃদয়ের হিতকর, বলকারক, পুষ্টিজনক ও লঘু এবং কৃমি, অগ্নিমান্দ্য, শূল, অরুচি, বমি, হিক্কা, বস্তিদোষ ও নেত্ররোগে ইহা প্রযোজ্য।

যমানী সাধারণতঃ তিন প্রকার। যথা—যমানী, বনযমানী

ও পারসীক যমানী (ইহার অপর নাম খুরাসানী যমানী)। ইহাদের গুণ প্রায়ই তুল্যরূপ, তবে ইহাদের মধ্যে কএকটী বিশেষত্বও দৃষ্ট হয়। [যমানী শব্দে ইহার বিবরণ দ্র°]

কেহ কেহ অজমোদাকে যোয়ান বা যমানী বলিয়া মনে করেন। মনে করিবার একটা হেতুও আছে। কেননা যমানীর অপর নাম অজমোদিকা। আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যগুণশাস্ত্র রচয়িতা পাছে অজমোদা বলিলে যমানীকে বুঝায়, সেজন্য যমানীর পর্য্যায় শব্দে "যবানিকোগ্রগন্ধা চ ব্রহ্মদর্ভাজ-মোদিকা" ইত্যাদি বলিয়াছেন এবং "অজমোদা খরাহ্বা চ মায়ূরী দীপ্যকস্তথা" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা অজমোদা অর্থাৎ বনযমানীকে পৃথকরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন যমানী ও বনযমানী উভয়ের গুণ ও কার্য্য প্রায়ই তুল্যরূপ, তবে বনযমানী অপেক্ষা যমানীর গুণ অধিক।

অজমোদাকে কেহ কেহ রাঁধুনী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাঁধুনীর গন্ধ যমানীর চেয়ে ভাল। এই যমানীজাতীয় আর এক প্রকার দ্রব্য আছে, তাহার নাম 'অনীস্থঁ'। অনীস্থঁকে কবিরাজগণ ব্যবহার করেন না, হকীমী চিকিৎসায় উহার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। অজমোদা বা বনযমানীর যে সকল গুণ বৈদ্যক শাস্ত্রে লিখিত আছে, সে সকল গুণ অনীস্থঁর মধ্যেও দেখা যায়।

অজমোদাখ্যা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] বনযমানী। ২ ক্ষেত্রযমানী। (রত্নাবলী) ৩ বৃহল্লবঙ্গাদিচূর্ণ। ৪ যমানী। (রাজনি°)

অজমোদাদ্যবটক—(পুং) [বৈদ্যক] আমবাতে হিতকর ঔষধ-বিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—যমান্যাদি চূর্ণ অর্থাৎ বনযমানী, মরিচ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, শুল্‌ফা, সৈন্ধব ও পিপুল-মূল—এই নয় দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ পল, শুণ্ঠী ১০ পল, বৃদ্ধদারক ১০ পল, হরীতকী ৫ পল, সর্ব্বচূর্ণ সমান গুড় দিয়া একত্র মিশাইয়া বটক প্রস্তুত করিবে। গুড়ের সহিত কিঞ্চিৎ জল মিশাইয়া অগ্নিতাপে দ্রবীভূত করিয়া চূর্ণ প্রক্ষেপান্তে বটী প্রস্তুত করিতে হয়। গুড় সহযোগ বিনাও শুদ্ধ চূর্ণগুলি উষ্ণ জলসহ অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে উপকার দর্শে। আমবাত প্রভৃতি নানা রোগ ইহাতে নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

অজমোদিকা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] [অজস্য মোদিকা ; ৬-তৎ] যমানী। ২ বনযমানী। [অজমোদা দ্র°]

অজম্ভ—(পুং) [ন সন্তি জম্ভা দন্তা অস্য ; বহুব্রী] ভেক, ব্যাঙ্। ২ সূর্য্য। (ত্রি) ৩ দন্তশূন্য, যাহার দাঁত নাই। ৪ অজাতদন্ত অবস্থাবিশেষ।

অজয়₁—(পুং) [জি ভাবে অচ্ ; নঞ্-তৎ] জয়াভাব, পরাভব। "লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ"। (গীতা ২ অ°) ২ অপরাজয়, অপরাভব। [নাস্তি জয়ঃ পরাভবো যস্য ; বহুব্রী] (ত্রি) ৩ জয়শূন্য, অপরাজেয়। (অব্য°) ৪ জয়াভাব। [অজেন ছাগেন যাতি যা-ক ; ৩-তৎ] (পুং) ৫ অজ-বাহন অগ্নি। ৬ বিষ্ণু।

অজয়₂—(পুং) মগধের অষ্টম নরপতি। ইনি শিশুনাগবংশীয় দর্ভকের পুত্র। ইঁহার পুত্রের নাম নন্দীবর্দ্ধন। (ভাগবত)

অজয়₃—(পুং) অজয়মেরু বা অজমের নগরের প্রতিষ্ঠাতা জনৈক রাজা। [অজমের-মেরবাড় দ্র°]

অজয়₄—বঙ্গদেশের বীরভূম জেলাস্থিত একটী নদ। [অজয়নদ দ্র°]

অজয়গড়—মধ্যভারতের বুন্দেলখণ্ড এজেন্সীর অন্তর্গত এক সামন্ত রাজ্য। অক্ষা° ২৪°৪৫´ হইতে ২৫° উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৪´ হইতে ৮০°৩২´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তর ও পূর্ব্বে পান্নারাজ্য, দক্ষিণে দামো ও জব্বলপুর জেলা এবং পশ্চিমে চরখরি ও ছত্রপুর রাজ্য। ভূপরিমাণ ৮০২ বর্গমাইল। এই রাজ্যে একটী শহর ও ৩৪৩টী গ্রাম আছে। ১৯৩১ সালের গণনায় অজয়গড়ের লোকসংখ্যা ৮৫৮৯৫ হইয়াছিল।

এই রাজ্য বিন্ধ্যপর্ব্বতমালার মধ্যবর্ত্তী এবং পাহাড় ও উপত্যকায় পরিপূর্ণ। কেন এবং বৈরমা এখানকার প্রধান নদী। এখানে বৎসরে গড়ে ৪৭ ইঞ্চ বৃষ্টিপাত হয়।

অজয়গড়ের রাজবংশীয়েরা বুন্দেলা রাজপুত এবং পান্নারাজ ছত্রশালের বংশধর। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে ছত্রশাল তাঁহার রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ তাঁহার তৃতীয় পুত্র জগৎ-রাজকে প্রদান করেন। জগৎরাজের মৃত্যুর পর তৎপুত্র পাহাড়সিংহ রাজা হন। তিনি স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র গুমান-সিংহকে বান্দা ও তদন্তর্গত অজয়গড় দুর্গ প্রদান করেন। তৎপরে গুমানসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র ভক্তসিংহ বান্দার রাজা হন, কিন্তু আলী মুহম্মদ নামক এক ব্যক্তি তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে বুন্দেলখণ্ড যখন ইংরেজদের অধিকারে আসে, তখন অজয়গড় লছমন দাওবা নামক এক দুর্দ্দান্ত সর্দ্দারের অধীনে ছিল। ইংরেজদের সহিত ঐ সর্দ্দারের এক সন্ধি হয়। সর্দ্দার সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করায় ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল মার্টিণ্ডেল অজয়গড় দুর্গ অধিকার করেন এবং উহা গুমানসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র ভক্তসিংহকে প্রদান করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ভক্তসিংহ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎপরে মাধবসিংহ, মহীপৎসিংহ ও বিজয়সিংহ যথাক্রমে অজয়গড়ের রাজা হন। বিজয়সিংহ ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কোন উত্তরাধিকারী না রাখিয়া মারা যান। তখন এই রাজ্য ইংরেজরাজের হস্তে আসে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় পরলোকগত রাজা বিজয়সিংহের

মাতা ইংরেজদিগকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া বিজয়সিংহের এক ভ্রাতা রণজোরসিংহকে সিংহাসন প্রদান করা হয়।

রণজোরসিংহ ইংরেজসরকার হইতে মহারাজা, সবাই এবং কে. সি. আই. ই উপাধি লাভ করেন। রণজোরসিংহের পুত্র ভূপালসিংহ বর্ত্তমানে সবাই ও মহারাজা উপাধিতে ভূষিত।

অজয়গড় শহরের ১৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে বচ্ছোনগ্রামে একটী প্রাচীন শহরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ, চন্দেল্লনৃপতি পরমর্দ্দিদেবের (১১৬৫-১২০৩ খৃঃ) অমাত্য বাচ্চা রাজা উহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এখানে আবিষ্কৃত ১৩৭৬ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ এক শিলালিপিতে এই শহরকে বচ্ছিউন নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। অজয়গড়ে নাচ্‌না নামক অপর একটী স্থান উল্লেখযোগ্য। এখানকার প্রাচীন শহরের ভগ্নাবশেষ বুন্দেলা-রাজবংশের কীর্ত্তিচিহ্ন। এখানে ২টী ভগ্ন প্রাচীন মন্দির বর্ত্তমান। তন্মধ্যে পার্ব্বতীমন্দিরটী বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহার শিল্পের ধারা খৃষ্টীয় ৪র্থ কিংবা ৫ম শতকের গুপ্তযুগের। ঐ যুগের গুপ্তরাজগণের মুদ্রায় যেরূপ কুঞ্চিত-কেশযুক্ত মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, এই মন্দিরের গাত্রেও সেই প্রকার মূর্ত্তিসমূহ বিদ্যমান। অপর মন্দিরটী চতুর্ম্মুখ মহাদেবের, ইহার শিল্পপ্রণালী খৃষ্টীয় ৮ম শতকের।

এখানকার লৌহশিল্প ক্রমশঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। বন্দুক, পিস্তল ও তরবারী সামান্য পরিমাণে এখনও প্রস্তুত হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে হীরকের খনি আছে।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান শহর। অক্ষা° ২৪°৫৪′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°১৮′ পূঃ। অজয়গড়ের প্রাচীন দুর্গের পাদদেশেই ঐ শহর অবস্থিত। ১৯৩১ সালের গণনায় লোকসংখ্যা ৪২৭৯ হইয়াছে।

বর্ত্তমান রাজধানী নৌশহর বলিয়া পরিচিত এবং যে পাহাড়ের উপর দুর্গটী দণ্ডায়মান তাহার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দুর্গ নূতন শহরের উপর ভ্রূকুটি করিয়া সদর্পে দণ্ডায়মান। ইহা মুগল ও মরাঠীদের সহিত যুদ্ধে বুন্দেলাদিগকে অনেক সাহায্য করিয়াছিল।

যে পাহাড়ের উপর দুর্গটী নির্ম্মিত উহার নাম কেদার পর্ব্বত। উহা ১৭৪৪ ফুট উচ্চ। অজয়গড় দুর্গ খৃষ্টীয় ৯ম শতকে বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল; অথচ এক আবুলফজল ব্যতীত অপর কোন ঐতিহাসিক ইহার উল্লেখ করেন নাই। এখানে উৎকীর্ণ লিপিসমূহে ইহার প্রাচীন নাম জয়পুরদুর্গ। বর্ত্তমান নাম অজয়গড় 'জয়গড়' বা 'জয়দুর্গ' নামের অপভ্রংশ। ইহার প্রতিষ্ঠাতা অজয়পাল হইতেই যে অজয়গড় নাম হইয়াছে, উহা কিংবদন্তী মাত্র। এই দুর্গের নিকটে কএকটী জৈন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই মন্দিরগুলির স্থাপত্য-ধারা দ্বাদশ শতকের এবং খাজুরাহোর মন্দিরসমূহের অনুরূপ। ইহার চতুর্দ্দিকে বহু মূর্ত্তি, স্তম্ভ, পাদ-পীঠ প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ১১৪১ হইতে ১৩১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উৎকীর্ণ কতকগুলি চন্দেল্লযুগের লিপি এই সকল মন্দিরে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

অজয়গড় শহরে ডাকঘর, বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি আছে।

অজয়চাঁদ—কান্যকুব্জরাজ ধর্ম্মবিম্বের পুত্র। আদি রাঠোররাজ নয়নপাল হইতে অধস্তন ৫ পুরুষ।

অজয়দেব—গুজরাতের সোলাঙ্কিবংশীয় নৃপতি কুমারপালের ভ্রাতুষ্পুত্র অজয়পালের নামান্তর। [অজয়পাল, দ্র°]

অজয়নদ—বীরভূম জেলায় প্রবাহিত একটী নদ। বীরভূমের ময়ূরাক্ষী নদী ও এই নদের গতি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে। অজয়নদ খানিকটা দক্ষিণমুখী হইয়া বীরভূম এবং বর্দ্ধমান জেলার সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছে। এই নদ সাঁওতাল পরগণার পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া বীরভূম ও বর্দ্ধমান জেলা দিয়া প্রবাহিত হইয়া কাটোয়ার নিকটে ভাগীরথী নদীর সহিত মিশিয়াছে। এই নদের পশ্চিমাংশ অনেকটা ঋজু এবং ইহার তটভূমিদ্বয় বেশ সুনির্দ্দিষ্ট। কিন্তু প্রস্তর-শয্যা ত্যাগ করিবার পর বহু চরের সৃষ্টি হইয়া অজয়-নদের গতি অতিশয় আকাবাঁকা হইয়া গিয়াছে। এই নদের গর্ভদেশ অতিশয় বালুকাপূর্ণ। গ্রীষ্মকালে ইহাতে জল খুব কমই থাকে। বর্ষার সময় প্রবল জলস্রোত দুকূল ছাপাইয়া নিকটবর্ত্তী কৃষিক্ষেত্রগুলি প্লাবিত করে। বর্দ্ধমান জেলার রক্তবর্ণ মৃত্তিকার উপর দিয়া প্রবাহিত বলিয়া তৎকালে অজয়ের জল অনেকটা লাল হইয়া উঠে। ভাগীরথীর জলও এই সময় রক্তবর্ণ ধারণ করে, এজন্য অজয় প্রভৃতি বর্দ্ধমান জেলায় প্রবাহিত নদীগুলি অনেকাংশে দায়ী।

উইলফোর্ড সাহেব লিখিয়াছেন যে, আরিয়ান Amystis নামে অজয়নদেরই উল্লেখ করিয়াছেন; তাঁহার উল্লিখিত কাটদুপ (Katadupa) কাটোয়ার (সংস্কৃত কাষ্ঠ-দ্বীপ) নামান্তর মাত্র। হণ্টার সাহেবের মতে, অজয় সংস্কৃত অ-জয় শব্দ হইতে উদ্ভূত।

অজয়নদের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ উপনদী হিঙ্গলা। এই নদী সাঁওতাল পরগণা হইতে অজয়নদের আট মাইল উত্তরে বীরভূম জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। তৎপরে দুবরাজপুর থানার এলাকার মধ্য দিয়া অজয়নদের সহিত সমান্তরালে প্রবাহিত

হইয়া চাপলায় এই নদের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। বীরভূম জেলায় ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫ মাইল।

বীরভূমের পশ্চিমে পাণ্ডবেশ্বর এবং দক্ষিণে তেদিয়ার নিকটে অজয়নদের উপরে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-রেলকোম্পানী সাঁকো নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে অজয়নদের পার্শ্ববর্ত্তী গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া লোক চলাচল ছিল। এক্ষণে এই নদের উভয়পার্শ্বস্থ ভীমগড়, শ্যামরূপার গড় প্রভৃতি পুরাতন জীর্ণ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ সেই প্রাচীন কালের সাক্ষ্য দিতেছে।

পূর্ব্বে অজয়ের উপর দিয়া মাল বোঝাই বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিত। সুপুর, ইলামবাজার প্রভৃতি বীরভূমের ছোট ছোট বাণিজ্যকেন্দ্র হইতে বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানের বণিক্‌গণ যেমন বীরভূমের উৎপন্ন চাউল, লাক্ষা, গালা, তসর, রেশম, কার্পাস-বস্ত্র, কাঁসার বাসন ও বিবিধ লৌহনির্ম্মিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিত, তেমনি সুপারি, নারিকেল, বহুবিধ মসলা ও অপর নানা পণ্য বিক্রয় করিয়া যাইত। কাটোয়া এই আমদানী-রপ্তানীর অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-রেলপথের লুপলাইন স্থাপিত হওয়ার পর এই আমদানী-রপ্তানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য অজয়ের খাত মজিয়া ভরাট হইয়া যাওয়ার কারণেই নৌকা চলাচল বন্ধ হইয়াছে। এক সময় অজয় ও ময়ূরাক্ষী দিয়া মগ, পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি বোম্বেটের দল আসিয়া বীরভূম ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে অত্যাচার করিয়া গিয়াছে।

প্রায় তিন চারিশত বৎসর পূর্ব্বে অজয় অমরকবি চণ্ডীদাসের জন্মভূমি নান্নুরের দক্ষিণে প্রবাহিত হইত। সেকালের অজয়-তীরবর্ত্তী বালুই, বালিসারা, বন্দর প্রভৃতি গ্রাম তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। নান্নুর হইতে অজয়ের স্রোত এক্ষণে বহু দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছে।

অজয়ের তীরেই কেন্দুবিল্ব গ্রাম, বর্ত্তমান জয়দেব-কেন্দুলী—যেখানে জয়দেবের অমৃত-মধুর গীতিকাব্য গীতগোবিন্দ রচিত হইয়াছিল। জয়দেবের পুণ্যস্মৃতিই অজয়কে অমর করিয়া রাখিয়াছে। আজিও প্রতি পৌষ-সংক্রান্তি হইতে তিন দিবসব্যাপী উৎসবে প্রায় পঞ্চাশ-হাজার নরনারী কবির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে আসে। এই উপলক্ষ্যে সেখানে একটী বৃহৎ মেলা বসে। মেলায় নানা জিনিষ বিক্রীত হয়। কবি বনমালী দাস 'জয়দেবচরিত্র' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, জয়দেব প্রত্যহ প্রভাতে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। কেন্দুলী হইতে গঙ্গা অনেক দূর, নিত্য যাতায়াতে জয়দেবের কষ্ট হয়, তাই গঙ্গাদেবী বলেন যে, আমি প্রতিদিন অরুণোদয়ে তোমার স্নান-কালে অজয়ে গিয়া উপস্থিত হইব এবং পৌষ সংক্রান্তির উৎসব-দিবসে সর্ব্বসাধারণে আমার দর্শন পাইবে। জনসাধারণের বিশ্বাস, পৌষ সংক্রান্তির ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে আজিও অজয়ের স্রোত উজানে বহিয়া পুণ্য-প্রবাহিণী ভাগীরথীর আগমনবার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করে। অজয়ের কদম্বখণ্ডীর ঘাট প্রসিদ্ধ। বনমালী দাস লিখিয়াছেন—

"অজয়ে তরঙ্গ বহে অতি সুশোভন।
কিনারে পুষ্পের শোভা গন্ধে হরে মন॥"

প্রবাদ, এই ঘাটেই কবি জয়দেব শ্রীরাধামাধবের যুগলবিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মাঝে মাঝে এখানে বসিয়াও তিনি গীতগোবিন্দ রচনা করিতেন।

অজয়পাল,—গুজরাতের সোলাঙ্কি রাজবংশের নবম নৃপতি। ইনি এই বংশের অষ্টম নৃপতি কুমারপালের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইঁহার পিতার নাম মহীপাল। ১১৭২ খৃষ্টাব্দে অজয়পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই নির্ব্বোধ রাজার সময় হইতে গুজরাতের সোলাঙ্কি রাজ্যের অবনতির সূচনা হয়। মেবারের রাণা সামন্তসিংহের সহিত যুদ্ধে ইনি পরাজিত ও আহত হন। সেই সময় আবু পর্ব্বতের পরমারবংশীয় রাজা ধারাবর্ষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রহ্লাদন অত্যন্ত বীরত্ব দেখাইয়া গুজরাত রক্ষা করিয়াছিলেন। অজয়পাল জৈনধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন এবং এই নিমিত্ত বহু অত্যাচার করিয়াছিলেন। সংবৎ ১২৩৩ অর্থাৎ ১১৭৬ খৃষ্টাব্দে ইনি নিজ দ্বারপালের হস্তে নিহত হন।

১২৩১ বিক্রম সংবতের দানপত্রে ও চালুক্যরাজ দ্বিতীয় ভীমদেবের ১২৫৬ বিক্রম সংবতের অণহিলপাটক দানপত্রে এবং ভাববৃহস্পতির খণ্ডিত বেরাবল শিলালিপিতে ইঁহার উল্লেখ আছে। ইঁহারই রাজত্বকালে (বিক্রম সংবৎ ১২৩২ বা ১১৭৫ খৃঃ) অণহিলবাড়ে ধারা-নিবাসী অমর দেবের পুত্র নরপতি কর্ত্তৃক 'নরপতিজয়চর্য্যা' নামক গ্রন্থ প্রণীত হয়।

অজয়পাল$_2$,—এক বরগূজর নৃপতি। ইনি খৃষ্টীয় ১০ম শতকের মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। আলবার রাজ্যের রাজগড় শহরের প্রায় ৯ ক্রোশ পশ্চিমে পারনগর নামক স্থানে নীলকণ্ঠমহাদেবের মন্দির অবস্থিত। ঐ মন্দির অজয়পালের নির্ম্মিত বলিয়া কথিত হয়।

অজয়পাল$_3$,—কুমায়ুন রাজ্যের চাঁদবংশীয় নায়ক। ইনি শ্রীনগরে একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন (১৩৫৮ খৃঃ)।

অজয়পাল$_4$,—অজমেরের প্রতিষ্ঠাতা চৌহানবংশীয় একজন নরপতি। ঐতিহাসিক কানিংহাম সাহেবের মতে, ইনি ৮১৯ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। নয়চন্দ্রকৃত 'হাম্বির মহাকাব্যে' অজয়মেরুর প্রতিষ্ঠাতা অজয়পালকে চৌহানবংশীয় ৩য় নৃপতি বলা হইয়াছে। বূহ্লার প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ ইঁহার রাজত্বকাল খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রথমপাদ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। [অজমের-মেরবাড় দ্র°]

অজয়পাল,—কান্যকুব্জের এক রাজা। নয়নপাল নামক প্রথম রাঠোররাজ ইঁহাকে হত্যা করিয়া ৫২৬ সংবতে কান্যকুব্জের রাজা হন।

অজয়পাল,—এক প্রাচীন সংস্কৃত কোষ ও স্মার্ত্ত গ্রন্থকার। কমলাকরের 'শূদ্রধর্ম্মতত্ত্বে' ইঁহার উল্লেখ আছে।

অজয়পাল,—সঙ্গীতের নিয়মবিশেষ।

অজয়পুর,—অধুনা বুক্রুর বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গ্রাম বুদ্ধগয়ার পূর্ব্বে এবং ফল্গুনদীর ধারে অবস্থিত। ইহার উত্তর দিকে একটী প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। অজয়পুর অনেক কালের পুরাতন। পূর্ব্বে ইহার অনেক সমৃদ্ধি ছিল। এক্ষণে কতকগুলি প্রস্তরখচিত মূর্ত্তি ও স্তম্ভ আছে। অনেকে সেইগুলি বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ন্ চোয়াঙ্ এস্থানে আসিয়াছিলেন। তিনি এখানকার একটী গল্প লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, অজয়পুরের জনৈক রাজকর্ত্তৃক একবার গন্ধহস্তী আক্রান্ত হইয়াছিল। * বোধিসত্ত্বের ন্যায় একজন বুদ্ধ ঐ হস্তীর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রবাদ স্মরণ রাখিবার জন্য বোধ হয় ঐ সকল স্তম্ভ ও স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে বুদ্ধকুণ্ড ও সূর্য্যকুণ্ড নামে প্রাচীরবেষ্টিত দুইটী সুন্দর পুষ্করিণী আছে। বুদ্ধকুণ্ডে স্নান করিবার জন্য প্রতি বৎসর অনেক লোকসমাগম হয়।

অজয়পুর,—রাজপুতানার একটী প্রাচীন নগর। কল্যাণরায়ের এক মন্দিরে ১২৩৬ বিক্রম সংবতে (১১৮০-১ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ একটী লিপিতে অজয়পুরের (বা বিজয়পুরের) উল্লেখ দেখা যায়।

কথিত আছে যে, অজয়া (অজিয়া) দেবী নাম্নী একজন দহীয়া কুমারীকে অজমেরে পৃথ্বীরাজের সহিত বিবাহ দিবার জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছিল। পথিমধ্যে অজয়া অজয়াপুর নামক একটী নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া সেইখানেই বাস করিতে লাগিলেন। পৃথ্বীরাজ অজয়াপুরে শিকার করিতে যাইলে অজয়ার সহিত সাক্ষাৎ হয়; তখন তিনি তাঁহাকে অজমেরে আনয়ন করেন। এই প্রবাদটী সম্ভবতঃ উপরোক্ত লিপিটীর সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। কারণ উহাতে রাজা পৃথ্বীদেবের ও অজয়পুরের নামোল্লেখ আছে।

অজয়মল্ল—মারবারের প্রথম রাজা শিবজীর কনিষ্ঠ পুত্র। ইঁহার অপর দুই ভ্রাতা অপেক্ষা ইনি অধিক সাহসী ও প্রতিভাশালী ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অশ্বত্থামা পৈত্রিক রাজ্য এবং মধ্যম ভ্রাতা শোণাঙ্গ ইদর অধিকার করিলে, ইনি নিজ অদৃষ্ট পরীক্ষার্থ স্বদেশ হইতে বহির্গত হইলেন। সুরাট নগরের শেষ সীমা পর্য্যন্ত গিয়া পশ্চিম উপকূলস্থ ওখমণ্ডলের চাবড়া জাতীয় রাজা বিক্রমসিংহকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিলেন। বিক্রমের প্রাণবধ করিয়া রাজ্য লইয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার বংশধরেরা 'বধাইল' নামে বিখ্যাত। উক্ত প্রদেশে আজিও অনেক বধাইল বাস করে।

* Julien's Hwen Thsang, iii, 1.

অজয়মেরু—অজমেরের প্রাচীন নাম। চৌহান অজয়রাজ ইহা স্থাপন করেন। [অজয়রাজ দ্র°]

অজয়রাজ (সল্হণ)—চৌহানবংশীয় বিংশ নরপতি। ইনি প্রথম পৃথ্বীরাজের পুত্র। ১১৩০ খৃষ্টাব্দে ইনি অজয়মেরু স্থাপন করিয়াছিলেন। [I. A., Vol. XIV, p. 14] [অজমের-মেরবাড় দ্র°]

অজয়বর্ম্মা—মালবের পরমার রাজবংশের ষোড়শ নৃপতি। ইঁহার পিতার নাম যশোবর্ম্মা। ইনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা জয়বর্ম্মাকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া স্বয়ং মালবের রাজা হন। ইঁহার সময় মালবের পরমারবংশ দুইটী শাখায় বিভক্ত হয়। জ্যেষ্ঠশাখা মালবের নৃপতি বলিয়া পরিচিত এবং কনিষ্ঠ শাখা 'মহাকুমার' নামে অভিহিত হয়। রাজা জয়বর্ম্মার দুর্ব্বল হস্ত হইতে যখন অজয়বর্ম্মা রাজদণ্ড কাড়িয়া লইলেন, সেই সুযোগে কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মীবর্ম্মা অসিবলে স্বতন্ত্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। অজয়বর্ম্মার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিন্ধ্যবর্ম্মা মালবের রাজা হন। [পরমার, মালব, জয়বর্ম্মা, লক্ষ্মীবর্ম্মা দ্র°]

অজয়সিংহ,—মেবারের রাণা লক্ষ্মণসিংহের পুত্র। প্রবাদ, রাণা লক্ষ্মণসিংহ যখন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন, তখন তাঁহার পিতৃব্য রাণা ভীমসিংহ রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন এবং এই ভীমসিংহের পত্নী পদ্মিনীর জন্য আলাউদ্দীন্ চিতোর আক্রমণ করেন। প্রথমবারে অকৃতকার্য্য হইয়া আলাউদ্দীন্ দ্বিতীয়বার চিতোর অবরোধ করিলে রাজপুত ও মুসলমানে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। একদিন গভীর রাত্রে রাণা দৈববাণী শুনিলেন, অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিতেছেন, "মৈঁ ভুখা হুঁ"। রাণা সর্দ্দারগণকে তাহা জানাইলেন। কিন্তু তাঁহারা বিশ্বাস না করায় তিনি নিশাকালে সকলকে প্রাসাদে আহ্বান করিলেন। পুনরায় সেইরূপ দৈববাণী হইল। দেবী বলিলেন, এক এক দিন এক এক জন রাজকুমারকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া যুদ্ধে পাঠাইতে হইবে। এইরূপে দ্বাদশটী বলি পাইলে আমি পরিতৃপ্ত হইব। আদেশমত কাজ হইল, জ্যেষ্ঠ অরিসিংহ প্রথম রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। রাণার দ্বিতীয় পুত্র অজয়সিংহ কিন্তু রাণার নিষেধে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে পারিলেন না। তাঁহার কনিষ্ঠগণ রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া যুদ্ধে গিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। এইরূপে

একাদশজন রাজপুত্র বিনষ্ট হইলে রাণা লক্ষ্মণসিংহ অজয়কে অনুচরসহ কৈলবারায় পাঠাইয়া দিয়া নিজে যুদ্ধে গমন করিয়া আত্মাহুতি দিলেন। চিতোর আলাউদ্দীন্ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল।

অজয় কৈলবারায় গিয়াও শান্তিতে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। পাহাড়ী শত্রু মঞ্জুর আক্রমণে উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। পুত্র আজিম ও সুজনসিংহ তখন বালক। তাহারা কিছুই করিতে পারিল না। অগত্যা তিনি জ্যেষ্ঠ অরিসিংহের পুত্র হামীরকে আহ্বান করিলেন। হামীর মঞ্জুর ছিন্নশির আনিয়া পিতৃব্যকে উপহার দিলে তিনি সেই শত্রুরক্তেই হামীরের ললাটে রাজটীকা অঙ্কিত করিয়া দিলেন। হামীরসিংহই চিতোর উদ্ধার করেন এবং সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। অজয়ের ভাগ্যে চিতোরের সিংহাসনলাভ ঘটিয়া উঠে নাই। কথিত আছে, হামীর ১৩০১ খৃষ্টাব্দে (বিক্রম-সংবৎ ১৩৫৭) সিংহাসনে আরোহণ করেন। সম্ভবতঃ তৎপূর্ব্বে অজয়সিংহ পরলোক গমন করিয়াছিলেন।

সমরসিংহের আবু পর্ব্বতের উৎকীর্ণ শিলালিপিতে এবং রাণা কুম্ভের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে (বিক্রম-সংবৎ ১৪৯৬) ইঁহার উল্লেখ আছে।

অজয়সিংহ₂—মারবারের জনৈক রাজপুত্র। ইনি আদি নৃপতি শিবজী হইতে বার পুরুষ অধস্তন। ইঁহার পিতার নাম চণ্ড।

অজয়সিংহ₃—কলচুরির জনৈক রাজা। কলচুরির (চেদি) বিজয়সিংহদেব ও তাঁহার মাতা গোসলদেবী কুম্ভ উপলক্ষে নর্ম্মদাতটস্থিত ত্রিপুরী নামক স্থানে যে দানপত্র প্রদান করেন (চেদি-সংবৎ ৯৩২), উহাতে অজয়সিংহের নামোল্লেখ আছে।

অজয়া—(স্ত্রী) [নাস্তি জয়ো মাদকত্বেন অস্যাঃ] বিজয়া, (চলিত) সিদ্ধি, ভাঙ্গ।

অজয়া₂—(স্ত্রী) বৌদ্ধতন্ত্রোক্ত এক দেবী। ইনি তন্ত্রোক্ত দেবতা বুদ্ধকপালের সহিত অবস্থান করেন। [বুদ্ধকপাল দ্র°]

অজয়া₃—(স্ত্রী) দেবীবিশেষ। বরাহপুরাণ মতে, বৈষ্ণবী, কাশ্যপী ও অজয়া নাম্নী তিন দেবীকে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে মাসে মাসে তিলোদক দান করিলে পিতৃলোক তৃপ্ত হন।

অজয্য—(ত্রি) [ন জি-যৎ শক্যার্থে ; নঞ্-তৎ] দুর্জ্জয় (শত্রু)। "দেবৈরজয্যান্ দিতিজান্"। (ভারবি) ২ পণ।

অজর₁—(ত্রি) [নাস্তি জরাঽস্য] বার্দ্ধক্যশূন্য, জরারহিত। "অজরামরবৎপ্রাজ্ঞঃ" (হিতোপদেশ)। (পুং) ২ দেবতা। ছয়টী ভাববিকারের মধ্যে প্রথম তিনটী দেবতাদের আছে, পরবর্ত্তী তিনটী নাই, এইজন্য তাঁহারা অজর। ৩ আত্মা। (বৃহদারণ্যক ৪.৪.২৫) ৪ অজীর্ণ, নবীন। (মহাভা° ১.১৩১.৭) ৫ বৃন্দারক নামক বৃক্ষবিশেষ। [ন জীর্য্যতি ক্ষীয়তে ন জৃ-অচ্] (ক্লী) ৬ পরব্রহ্ম। ৭ সুবর্ণ। (রাজনি°)

অজর₂—ককেশস্ পর্ব্বতের একটী শাখা। [ককেশস্ দ্র°]

অজর₃ (অযর বা তেল্লী-নোর)—রুষাধিকৃত মধ্য এসিয়ার একটী হ্রদ। সুবৃহৎ গোবী নামক দেশের কিরঘিজ বিভাগে অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহার জলরাশি বলখাশ্ হ্রদে আসিয়া পড়িত। [বলখাশ্ দ্র°]

অজরক—(ক্লী) [বৈদ্যক] অজীর্ণ। (সিদ্ধযোগ, কাস-চি°)

অজরৎ—(ত্রি) [ন জৃ-শতৃ ; নঞ্-তৎ] অজরাগ্রস্ত। (স্ত্রী) ২ অদিতি। (শুক্লযজুঃ ২১.৫)

অজরয়ু—(ত্রি) জরারহিত, নিত্য তরুণ। (ঋক্ ১.১১৬.২০)

অজরস্—(ত্রি) বার্দ্ধক্যহীন।

অজরা₁—(স্ত্রী) [নাস্তি জরা অস্যাঃ] [বৈদ্যক] ঘৃতকুমারী। ঘৃতকুমারী গাছ শুষ্ক হয় না বলিয়া ইহার নাম অজরা। ২ গৃহগোধিকা, টিক্‌টিকী। ৩ জীর্ণফঞ্জীলতা। (শব্দকল্প°) ৪ ব্রাহ্মণজাতি। "সা সত্যা সাজরামরা" (মনু ২.১৪৮)। ৫ আত্মগুপ্তা, চলিত আলকুশী। (ভাবপ্র°, পূ°)

অজরা₂—(স্ত্রী) প্রাণের কন্যা। মেরুকন্যা আয়তি ধাতা হইতে প্রাণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। প্রাণের স্ত্রী ধূম্রবতীর গর্ভে দ্যুতিমান্ ও অজরা নামে দুই সন্তান জন্মে। (মার্ক°পু°)

অজরা₃—দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্ব্বতমালার দক্ষিণাংশে আর্জেন্টিনা প্রদেশের অন্তর্গত একটী হ্রদ। আয়তন ৮ বর্গমাইল।

অজর্য্য—(ক্লী) [ন জৃ-যৎ, সঙ্গমনে কর্ত্তরি নিপাত্যতে। ন জীর্য্যতীত্যজর্য্যম্] মৈত্রী, সৌহার্দ্দ। পর্য্যায়—স্নেহ, মৈত্রী, প্রীতি, সভাজন, সঙ্গত। (হলায়ুধ) ২ অনপায়। "রামাজর্য্যং কুরু দ্রুতং"। (ভট্টি ৬.৫৩) (ত্রি) ৩ অজরার্হ। (রঘু° ১৮.১৬)

অজলম্বন—(ক্লী) [অজ ইব লম্ব্যতে গৃহ্যতে, অজ-লম্ব-ল্যুট্] স্রোতোঽঞ্জন। ২ রসাঞ্জন, সুর্ম্মা।

অজলোমন্—(পুং) [অজস্য লোম ইব লোম যস্য ; বহুব্রী] [বৈদ্যক] অজলোমের ন্যায় মঞ্জরীযুক্ত বৃক্ষ, চলিত শুয়াশিম্বী। পর্য্যায়—শিখী, কেশী, মহাহ্রস্বা, অগ্রপর্ণী।

অজলোমা(-মী)—(স্ত্রী) [অজলোম-ডাপ্ বা ঙীপ্ চ] [বৈদ্যক] শূকশিম্বী, চলিত আলকুশী। ২ মহৌষধিভেদ।

অজবস্—(পুং) [ন জু-অসুন্] বেগশূন্য, দুর্ব্বল। (ঋক্ ২.১৫.৬)

অজবস্তি—(পুং) ঋষিবিশেষ। [এই শব্দ পাণিনির গৃষ্ট্যাদি, শুভ্রাদি ও যস্কাদি গণে পঠিত]

অজবল্লী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] মেষশৃঙ্গী, চলিত মেড়া শিঙ্গে।

অজবাহ—(পুং) [অজং বাহয়তি যত্র, অজ-বহ-ঘঞ্ অধিকরণে] দেশবিশেষ। [কচ্ছাদিগণীয় অজবাহ-ভবাদি অর্থে অণ্] (ত্রি) ২ তদ্দেশীয়, তদ্দেশজাত ইত্যাদি।

অজবীথী—(স্ত্রী) [অজা অজাতা নিত্যকালব্যাপিনী ইতি

বা বীথী নক্ষত্রাণাং শ্রেণী ; কর্ম্মধা। অজেন ব্রহ্মণা নির্ম্মিতা বীথী পদম্ শাকপা°তৎ° ইতি বাচস্পত্যম্] গগনসেতুরূপ ছায়াপথ, যমনালা। আকাশের উত্তর-দক্ষিণ-ব্যাপিনী নক্ষত্রমালা। এই অজবীথী হইতে আরম্ভ করিয়া অগস্ত্যস্থান পর্য্যন্ত পিতৃযান পথ। "পিতৃযানোঽজবীথ্যাশ্চ যদগস্ত্যস্থ চান্তরং।" (যাজ্ঞবল্ক্য° ৩.১৮৪) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মতে, (৫০.১৩০ ; ৬৬.৫১) সূর্য্যের সাম্বৎসরিক গতিপথের মধ্যে উত্তরপথ নাগবীথী ও দক্ষিণপথ অজবীথী নামে প্রসিদ্ধ। মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া লইয়া অজবীথী। [ছায়াপথ দ্র°]

অজবেশ,—হিন্দুস্থানের এক প্রাচীন কবি। ইনি ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বান্দারাজ্যের (রেবা) অধিপতি বীরভানুসিংহের (১৫৪০-১৫৫৪ খৃঃ) সভাকবি ছিলেন। হরিশ্চন্দ্র ভারতেন্দু প্রণীত 'সুন্দরীতিলক' গ্রন্থে ইঁহার উল্লেখ আছে।

অজবেশ₂—এক কবি। ইনি রেবানরেশ মহারাজ বিশ্বনাথসিংহের সভাকবি ছিলেন। ইনি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

অজশৃঙ্গী, (-শৃঙ্গিকা)—(স্ত্রী) [অজস্য মেষস্য শৃঙ্গমিব ফলমস্যাঃ ; বহুব্রী] তিক্তশাকগণীয় স্বনামখ্যাত বৃক্ষ ; মেষশৃঙ্গী। চলিত গাড়লশিঙ্গা, ছাগলবেঁটে, মেড়াশৃঙ্গী। সংস্কৃত পর্য্যায়—বিষাণী, বিষাণিকা, চক্রশ্রেণী, অজগন্ধিনী, মৌর্ব্বী, নেত্রৌষধি, আবর্ত্তিনী, মেষশৃঙ্গী, বর্ত্তিকা, সর্পদংষ্ট্রিকা, চক্ষুষ্যা, তিক্তদুগ্ধা, পুত্রশৃঙ্গী, কর্ণিকা। মরাঠী—মেষসেংগ। কর্ণাটী—উরিয়মর। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত ; ইহাতে কফ, অর্শ, শূল, শোথ, শ্বাস, হৃদ্রোগ, বিষরোগ, কাস, কুষ্ঠ, প্রভৃতি পীড়া নষ্ট হয়। ইহার ফলের গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, কটু, কফ ও বায়ুনাশক, জঠরাগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, হৃদ্য। ইহা লবণ ও অম্লরসযুক্ত। (রাজনি°) ২ কর্কটশৃঙ্গ, ইহা পুত্রজীবাকার তরুবিশেষ। (সুশ্রুত, সূ°, ৩৭ অ°) অনেকে কর্কটশৃঙ্গী ও অজশৃঙ্গী একই বস্তু মনে করেন। কিন্তু ঐ দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্। [মেষশৃঙ্গী ও কর্কটশৃঙ্গী দ্র°]

অজশৃঙ্গী₂—(স্ত্রী) এক প্রকার চারাগাছ। রাক্ষসহন্তা বলিয়া অথর্ব্ববেদে (৪.৪৭) ইহার উল্লেখ আছে।

অজশ্রী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] ফটিকারিকা। (মাধবনি°)

অজস্তুন্দ—(ক্লী) [অজস্য তুন্দমিব তুন্দমস্য। নগর অর্থে সুট্ নিপাতনে] নগরবিশেষ। "অজস্তুন্দং নাম নগরং।" (সিদ্ধান্তকৌ°)

অজস্য—(পুং) একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। ইনি অঙ্গিরার ঔরসে ও মরীচির কন্যা সুরূপার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (মৎস্যপু° ১৯৬.৪)

অজস্র—(ক্লী) [ন জসু মোক্ষণে—র তাচ্ছীল্যাদৌ কর্ত্তরি] সন্তত, নিরবচ্ছিন্ন। "অজস্রদীক্ষাপ্রযতস্য মদ্গুরোঃ"। (রঘু° ৩.৪৪) (ত্রি) ২ চিরস্থির বস্তুমাত্র। ৩ ঘর্ম্ম। (ঋক্ ৩.২৬.৭ ; অথর্ব্ব ৬.৩৬.১) ৪ জ্যোতিঃ। (ঋক্ ১০.১৩৯.১) ৫ ভানু। (শুক্লযজুঃ ৮.১১.২৮) ৬ অগ্নি। (ঋক্ ৮.৪৯.৪) (ক্লী) ৭ মান। (ঋক্ ১.১০০.১৪)

অজস্র₂—(পুং) ভবিষ্য মন্বন্তরের ভবিষ্য মনু মেরুসাবর্ণি বা রোহিত প্রজাপতির এক পুত্র। ইনি সুশর্ম্মগণভুক্ত। (ব্রহ্মাণ্ডপু°, ১০০.৬৪) [সুশর্ম্ম দ্র°]

অজহৎস্বার্থা—(স্ত্রী) [ন ওহাক্ ত্যাগে-শতৃ অজহৎ। ন জহাতি স্বার্থো যাম্] নিজের অর্থ পরিত্যাগ না করিয়া পরার্থের বোধক ; অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত লক্ষণা নামে শব্দের বৃত্তি বা শক্তিবিশেষ। ইহার অপর নাম উপাদানলক্ষণা। মম্মটভট্ট ইহার এই লক্ষণ করিয়াছেন—

"স্বসিদ্ধয়ে পরাপেক্ষঃ পরার্থে স্বসমর্পণম্।
উপাদানং লক্ষণঞ্চেত্যুক্তা শুদ্ধেব সা দ্বিধা॥"

অন্বয়সিদ্ধির নিমিত্ত অন্যকে আশ্রয় করিয়া যে শব্দ পরের অর্থে অর্থ সমর্পণ করে, তাহাই উপাদানলক্ষণা। ইহাকে মুখ্য লক্ষণা কহে। উপাদানলক্ষণা দুই প্রকার, রূঢ়িমূল ও প্রয়োজনমূল। যথা—'শ্বেতো ধাবতি।' শ্বেতবর্ণ দৌড়িতেছে। শ্বেতবর্ণ কখন দৌড়িতে পারে না। সুতরাং এখানে শ্বেতবর্ণের প্রকৃত অর্থ থাকিতেছে না, তাই ক্রিয়ার সঙ্গেও ঠিক অন্বয় হইতেছে না। এখানে শ্বেতবর্ণে লক্ষণা দ্বারা শুভ্র পশ্বাদি বুঝিতে হইবে। 'কুন্তাঃ প্রবিশন্তি।' অস্ত্র সকল প্রবেশ করিতেছে। অষ্টাঙ্গ অস্ত্রশস্ত্রভূষিত পুরুষেরা প্রবেশ করিতেছে, ইহাই এ কথার তাৎপর্য্য।

অজহল্লিঙ্গ—(পুং) [হা (ওহাক্ ত্যাগে) শতৃ, ন জহৎ লিঙ্গং যম্ ; বহুব্রী] যে শব্দ, ভিন্ন লিঙ্গের বিশেষ্যের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইলেও আপনার লিঙ্গ পরিত্যাগ করে না। যথা, "বেদঃ শ্রুতির্বা প্রমাণম্।" বেদ কিংবা শ্রুতিই প্রমাণ। এখানে বেদ পুংলিঙ্গ শব্দ এবং শ্রুতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ; প্রমাণ ক্লীবলিঙ্গ শব্দ, কিন্তু বেদ ও শ্রুতি পদের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াও আপনার লিঙ্গ পরিত্যাগ করে নাই। অর্থাৎ বেদ শব্দের বিশেষণস্বরূপ বলিয়া ইহা পুংলিঙ্গ হয় নাই এবং শ্রুতি শব্দের বিশেষণস্বরূপ বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গও হয় নাই।

অজহা—(স্ত্রী) [ন জহাতি শূকান্, হা-শ ; দ্বিত্বং স্ত্রিয়াং টাপ্ ; নঞ্-তৎ] [বৈদ্যক] আলকুশী, শূকশিম্বী। (ত্রি) ২ অত্যাজ্য।

অজহিবেব—পূর্ব্ব আফ্রিকাবাসী একটী ভ্রমণশীল জাতি। ইহারা হমিতকবংশীয় ; কিন্তু দেখিতে অনেকটা বেজা জাতির মত। ভাষা ও আচারানুষ্ঠান আবিসীনীয়দিগের ন্যায়। ইহারা মম্বাসার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে বাস করে এবং

আপনাদের পালিত গবাদি পশু একস্থান হইতে অন্যস্থানে চরাইয়া লইয়া যায়। ইহারা পূর্ব্বে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে সকলে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইহারা 'হাবাব্' নামেও পরিচিত।

অজা,—(স্ত্রী) [ন জায়তে ইতি জন-ড, স্ত্রিয়াং টাপ্] সাংখ্যমতসিদ্ধ প্রধান বা প্রকৃতির অপর পর্য্যায়। সাম্যাবস্থায় অবস্থিত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ ত্রিগুণ ইঁহার স্বরূপ। সত্ত্বাদি গুণের অনুসরণ করিয়া ইনি শ্বেতলোহিতাদি রূপসম্পন্ন নানা কার্য্যের সৃষ্টিকর্ত্রী; এইজন্যই সাংখ্যমতে ইনি নানাবর্ণশালিনী। "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণবর্ণাং সরূপাঃ বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং"। (শ্রুতি)

২ বেদান্তমতসিদ্ধ তেজ, জল ও অন্নাভিমানিনী দেবতা। ৩ অবিদ্যা, মায়া। [অজা শব্দোক্তা নানা গুণাঃ সন্ত্যস্যাং ইতি অজ-অচ্, জাতিত্বেঽপি অজাদিত্বাৎ টাপ্] ৪ ছাগী। "অজাগলস্তনস্যেব তস্য জন্ম নিরর্থকং।" (হিতোপদেশ)

অজা,—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] ছাগীস্তন্য সদৃশ ক্ষীরযুক্ত কন্দ। ইহার গাছ ছোট ছোট ক্ষুপজাতীয়। কন্দগুলি অতিশুভ্র। ইহা মহৌষধি বলিয়া সুশ্রুত বর্ণনা করিয়াছেন। যথা, "অজাস্তনাভকন্দা তু সক্ষীরাক্ষুপরূপিণী অজা মহৌষধী জ্ঞেয়া শঙ্খকুন্দেন্দুপাণ্ডরা।" বর্ত্তমানে অজা নামে কোন কন্দ দেখিতে পাওয়া যায় না এবং কবিরাজগণ যে সকল ভেষজ ব্যবহার করেন, তাহাদের মধ্যেও ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সকল ভেষজ এখন বিলুপ্তপ্রায়, অজা তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

অজা আশ্রম (**অজাশ্রম**)—মধ্যবঙ্গনিবাসী ময়রা জাতির একটী শাখা।

অজাক্ষী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] কাকোডুম্বরিকা, চলিত কাকডুমুর।

অজাক্ষীর—(ক্লী) [বৈদ্যক] ছাগীদুগ্ধ।

অজাগর—(পুং) [জাগৃ-অচ্ ইতি জাগরঃ, ন জাগরো যস্মাৎ; বহুব্রী] ভৃঙ্গরাজ, ভীমরাজ। ভীমরাজ সেবন করিলে নিদ্রা হয় না। [ন জাগর ইতি অজাগরঃ] (ত্রি) ২ জাগরণহীন।

অজাগলস্তন—(পুং) অজা অর্থাৎ ছাগীর গলে স্থিত স্তনাকার মাংসপিণ্ড। [অজ,০ দ্র°]

অজাঘৃত—(ক্লী) [বৈদ্যক] ছাগীঘৃত। ইহার গুণ—চক্ষুষ্য, দীপন, বলকর, বৃষ্য, পাকে কটু এবং কাস, শ্বাস, ক্ষয়, কফ, অর্শ ও রাজযক্ষ্মানাশক। (বৈদ্যকনি°)

অজাঘ্রাত—(ক্লী) [অজেন ছাগেন আঘ্রাতম্; ৩-তৎ] প্রায়শ্চিত্তবিশেষ। কাশ্যপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, রজস্বলা স্ত্রীলোক যদি চণ্ডাল বা শ্বপাককে স্পর্শ করে, তবে ঋতুর তিন দিন পরে ত্রিরাত্র উপবাস এবং পঞ্চগব্যে শুদ্ধ হইয়া তৎপরে ছাগল দ্বারা আপনার শরীর শোঁকাইবে।

"চাণ্ডালেন শ্বপাকেন সংস্পৃষ্টা চেদ্রজস্বলা।
তান্যহানি ব্যতিক্রম্য প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ॥
ত্রিরাত্রমুপবাসঃ স্যাৎ পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি।
তাং নিশান্তু ব্যতিক্রম্য অজাঘ্রাতন্তু কারয়েৎ॥" (স্মৃতি)

স্পর্শবিষয়ে বৃহস্পতি একটী অতিরিক্ত বিধি করিয়াছেন। যথা—

"তীর্থে বিবাহে যাত্রায়াং সংগ্রামে দেশবিপ্লবে।
নগরগ্রামদাহে চ স্পৃষ্টাস্পৃষ্টির্ন দুষ্যতি।"

অর্থাৎ তীর্থগমনে, বিবাহের সময়, দেবতাদির পূজা করিতে যাইলে, যুদ্ধকালে, দেশে বিপ্লব ঘটিলে, কিংবা নগরগ্রামাদিতে অগ্নি লাগিলে অস্পৃশ্য ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে দোষ হয় না।

অজাচ্ছন্দস্—(পুং) ছন্দোবিশেষ। (তৈত্তিরীয়স° ৪.৩.৭)

অজাজটস্থ—(পুং) যুধিষ্ঠির।

অজাজিক (**-কা**)—(পুং) [বৈদ্যক] পীতজীরক। (রাজনি°)

অজা(-জি)জী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] [অজ ক্ষেপণে-ঘঞ্ ইতি আজঃ। অজেন ছাগেন বীয়তে গন্ধোৎকটত্বাৎ ত্যজ্যতে, অজ-আজ-ইন্; ৬-তৎ] জীরক, কালোজীরা। ২ শ্বেতজীরক। ৩ স্থূলজীরক, বড়জীরে। [জীরক শব্দে ইহাদের গুণ দ্র°] ৪ কাকোডুম্বরিকা, চলিত যজ্ঞডুমুর। (বৈদ্যকশ°) বাচস্পতি মতে পেয়ারা গাছ।

অজাজীব—(পুং) [অজস্য ক্রয়বিক্রয়াদিনা আজীবতি ইতি অজ-আ-জীব-অচ্; ৩-তৎ]। ছাগমেষাদির ব্যবসায়ী।

অজাজ্যাদিচূর্ণ—(পুং) [বৈদ্যক] গ্রহণ্যধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—জীরা ২ পল, যবক্ষার ১ পল, অহিফেন ১ পল, আকন্দমূলচূর্ণ ৪ পল; এই সমুদয় চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবনে সরক্ত বা নীরক্ত অতিসার, জ্বরাতিসার, গ্রহণী ও বিসূচিকা উপশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

অজাত,—(ত্রি) [জন-কর্ত্তরি ড, ন জাতঃ; নঞ্-তৎ]। অনুৎপন্ন। "হস্তি জাতানজাতাংশ্চ।" (মনু ৮.৯৯) দায়ভাগে অজাত পুত্রেরও বৃত্তিকামনার উল্লেখ আছে।

"যে জাতা যেঽপ্যজাতা বা যে চ গর্ভে ব্যবস্থিতাঃ।
বৃত্তিং তেঽপি হি কাঙ্ক্ষন্তি বৃত্তিলোপো বিগর্হিতঃ॥" (দায়ভাগ)

অজাত,—(পুং) ভজমানবংশের প্রতিক্ষেত্রের পৌত্র। ইঁহার পিতার নাম হৃদিক। (ভাগবত)

২ ভোজের পৌত্র ও হৃদিকের পুত্র এবং কৃতবর্ম্মার ভ্রাতা। (পদ্মপু°, সৃষ্টিখণ্ড)

অজাতককুদ্—(পুং) [ন জাতং ককুদমংসকূটম্ অস্য; বহুব্রী; অন্ত্য অকারলোপ] যে বৃষের ঝুঁট জন্মে নাই, অল্পবয়স্ক গবাদির বৎস, বাছুর।

অজাতকোপ—(ত্রি) যাহার কোপ হয় না; অক্রোধ।

অজাতক্র—(ক্লী) [বৈদ্যক] ছাগীতক্র। ইহার গুণ—লঘু, স্নিগ্ধ, দাহ, গুল্ম ও অর্শনাশক, ত্রিদোষঘ্ন, শোথ, গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগহর। (বৈদ্যকনি°)

অজাতক্রোধ—(ত্রি) যাহার ক্রোধ হয় না; অক্রোধ।

অজাতদন্ত—(ত্রি) [ন জাতো দন্তো অস্য অত্র বয়সি বা; বহুব্রী] যে শিশুর দন্ত গজায় নাই। শিশুদের প্রায় ছয় মাসে দন্ত গজায়। অজাতদন্ত শিশু মরণে পিতামাতার একাহ অশৌচ হয়। "অজাতদন্তমরণে পিত্রোরেকাহমিষ্যতে।" (শুদ্ধিতত্ত্বধৃত কূর্ম্মপু°) পশুদের প্রধান দাঁত না উঠিলে অজাতদন্ত বা 'আদাঁতা' বলা হয়। বৈদ্যক মতে, ছয় মাসের পরও যে শিশুর দন্তোদ্গম হয় নাই, তাদৃশ শিশু অজাতদন্ত। ২ অবস্থাবিশেষ।

অজাতপক্ষ—(ত্রি) [ন জাতৌ পক্ষৌ অস্য] পক্ষিশাবক, যে ছানার ডানা বাহির হয় নাই, যে ছানা উড়িতে পারে না।

অজাতব্যঞ্জন—(ত্রি) যাহার ব্যঞ্জন অর্থাৎ পুরুষচিহ্ন (শ্মশ্রু প্রভৃতি) জন্মে নাই, অজাতশ্মশ্রু।

অজাতব্যবহার—(ত্রি) যাহার ব্যবহার হয় নাই, অপ্রাপ্তবয়স্ক, নাবালক।

অজাতশত্রু—(পুং) [ন জাতাঃ অনুৎপন্নাঃ শত্রবঃ শাতয়িতারো যস্য; বহুব্রী] ইন্দ্র। ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া স্বীয় সৈন্য দ্বারা তাহার রাজ্য নিজের আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সেই হইতে তিনি অজাতশত্রু নামে অভিহিত। (ঋক্ ৮.৩.১৫) ২ শিব। [ন জাতঃ শত্রুর্যস্য, অথবা জাতস্য জীবমাত্রস্য ন শত্রুঃ] ৩ জ্যেষ্ঠপাণ্ডব রাজা যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠির কোন দিনই কাহাকেও দ্বেষ করিতেন না; এইজন্য ইনি অজাতশত্রু নামে প্রসিদ্ধ। "ন দ্বেষ্টি যজ্জনমতস্ত্বমজাতশত্রুঃ।" (বেণীসংহার) মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকে অজাতশত্রু বলিয়া বহু স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে।

৪ শমীকরাজের পুত্র। হরিবংশে উল্লিখিত আছে—শ্যামের পুত্র শমীক রাজ্য লাভ করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, অজাতশত্রু নামে তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হয়। এই অজাতশত্রু শত্রুকুলের উচ্ছেদ করিয়াছিলেন।

৫ কাশীর জনৈক রাজা। লোকে ইঁহাকে জনক বলিয়া সম্বোধন করিত। বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রে অজাতশত্রুর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। কৌষীতকী (৪.১) ও বৃহদারণ্যক (২.১১) উপনিষদে এবং শতপথব্রাহ্মণে ইঁহার ধর্ম্মজ্ঞানের বিষয় কথিত হইয়াছে। মহারাজের বেদাদিতে এমন ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল যে, তিনি ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে ধর্ম্মশাস্ত্রে উপদেশ দিতে পারিতেন। একবার মহর্ষি গার্গ্য বালাকি কাশীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া মহারাজকে বলিলেন—'আমি আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিব।' রাজা কহিলেন,—'বেশ, আপনি আমাকে উপদেশ দিন, আমি সহস্র ধেনু পুরস্কার দিব'। কিন্তু বালাকি রাজাকে অধিক উপদেশ দিতে সমর্থ হইলেন না। বরং তিনি নিজে ব্রাহ্মণ হইয়া অজাতশত্রুর কাছে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ পাইবার জন্য অভিলাষ প্রকাশ করিলেন।

অজাতশত্রু (কুণিক)—মগধরাজ বিম্বিসারের পুত্র এবং মগধসাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে অন্যতম।

মগধে বার্হদ্রথবংশীয় রাজাদিগের পতনের পরে যে দ্বিতীয় বংশ মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, পুরাণকারগণ একমত হইয়া শিশুনাগকে তাহার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই বংশেই বিম্বিসার এবং তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু অশ্বঘোষ তদীয় বুদ্ধচরিতে স্পষ্টই লিখিয়া গিয়াছেন যে, শ্রেণিক বিম্বিসার হিরণ্যকুলজাত। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বিম্বিসার শিশুনাগবংশীয় নৃপতি নহেন, শিশুনাগ ইঁহার প্রতিষ্ঠিত বংশের পরবর্ত্তী রাজা।*

এদিকে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ জয়সবাল শৈশুনাগ রাজন্যবর্গের বংশানুক্রম বিশদভাগে আলোচনা করিয়াছেন।† তাঁহার মতে শিশুনাগবংশীয় রাজারা ৩৬৩ বৎসর পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে মগধের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তিনি মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড, ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণের রাজন্য বংশতালিকা বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া নিম্নলিখিত শিশুনাগবংশীয় রাজাদিগের বংশানুক্রমণিকা এবং তাঁহাদের রাজত্বকাল নির্ণয় করিয়াছেন—

শিশুনাগ (কাশীর রাজা)	৪০ বৎসর
কাকবর্ণ	২৬ "
ক্ষেমধর্ম্মিন্	২০ "
ক্ষেমবিৎ	৪০ "
বিম্বিসার	৫১ "
অজাতশত্রু	৩৫ "
দর্শক	৩৫ "
উদয়ী	৩৩ "
নন্দিবর্দ্ধন	৪০ "
মহানন্দ	৪৩ "
	৩৬৩ বৎসর

* Dr. Hemachandra Ray Chaudhury—'Ancient History of India'.

† Journal of the Bihar & Orissa Research Society, January, 1915.

আবার মহাবংশের মতে, বিম্বিসার কর্ত্তৃক মগধে যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বংশের ষষ্ঠ রাজার পরে শিশুনাগ মগধের সিংহাসনে অরোহণ করেন।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও (৯৯.৩১৪) লিখিত আছে যে—

"অষ্টত্রিংশচ্ছতং ভাব্যাঃ প্রাদ্যোতাঃ পঞ্চ তে স্মৃতাঃ।

হত্বা তেষাং যশঃ কৃৎস্নং শিশুনাগো ভবিষ্যতি।"

এই প্রবাদকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে বিম্বিসারের পূর্ব্বে কখনও শিশুনাগ রাজা হইতে পারেন না। কারণ মহাসেন প্রদ্যোত প্রাচীন পালিধর্ম্মশাস্ত্রে বিম্বিসারের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই সকল কারণেই ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন। [শিশুনাগ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্র°]

খৃষ্টপূর্ব্ব ৭ম শতকের পূর্ব্বাংশে বিম্বিসার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বকাল মগধের পক্ষে অতিশয় ঘটনাবহুল এবং স্মরণীয় যুগ। ইনি চতুষ্পার্শ্বস্থ রাজন্যবর্গের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন বলিয়া পুত্র অজাতশত্রু উত্তরকালে তাঁহার পিতার বৈবাহিক সম্বন্ধকে সাম্রাজ্যবিস্তারের উপায়স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

অজাতশত্রু একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি কোশলের স্বাধীনতা অপহরণ করেন এবং বৈশালীর স্বায়ত্তশাসন-গর্ব্বিত পুরবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদেরও স্বাধীনতা খর্ব্ব করেন। সম্ভবতঃ ইনিই গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে পাটলীগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা।

পরস্পরবিরোধী কিংবদন্তী হইতে ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে যে, অজাতশত্রুর রাজত্বের অষ্টম বর্ষে (স্থানান্তরে চতুর্থ বর্ষে) বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ সংঘটিত হয়। ইঁহারই রাজত্ব-কালে বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে দুইটী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক মহাবীর এবং মঙ্খলি গোশাল দেহরক্ষা করেন।

উত্তরকালে মগধসাম্রাজ্যের যে বিপুল বিস্তৃতি ঘটে, তাহার মূলে অজাতশত্রুর কর্ম্মকুশলতা এবং রণদক্ষতা ছিল, তাহা ঐতিহাসিকগণ সকলেই স্বীকার করেন।

অজাতশত্রু সম্বন্ধে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদিগের মধ্যে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত। এগুলির মধ্যে এত অধিক বৈষম্য দেখা যায় যে, কোন একটী বিশেষ আখ্যায়িকায় সম্পূর্ণরূপে আস্থা স্থাপন করা যায় না।

বিম্বিসারের সময় মগধের ক্ষমতা দক্ষিণে এবং পশ্চিমে প্রসারিত হইয়াছিল। তিনি কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভগিনী কোশলদেবীকে (মতান্তরে বৈদেহী) বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহের যৌতুকস্বরূপ কাশীগ্রামের রাজস্ব প্রদত্ত হইয়াছিল। কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে যে, এই কোশলরাজের ভগিনীর গর্ভেই অজাতশত্রুর জন্ম হয়।

জৈন ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে, বিম্বিসার বৈশালীর রাজা চেতকের কন্যা চেল্লনার পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহারই গর্ভে অজাতশত্রুর জন্ম হয়। কিন্তু তিব্বতীয় দুল্বে (বিনয়পিটকে) লিখিত আছে যে, বিদেহের রাজা বিরুধকের মন্ত্রী শকল রাজার অপর মন্ত্রীদিগের ভয়ে বৈশালীতে পলাইয়া আসেন। সঙ্গে তাঁহার গোপাল এবং সিংহ নামে দুইটী পুত্র ছিল। বৈশালীতে শীঘ্রই শকলের প্রতিপত্তি হইল এবং তদীয় গুণমুগ্ধ নাগরিকগণ অবশেষে তাঁহাকে তাঁহাদের নায়কপদে নির্ব্বাচিত করিল। তাঁহার পুত্রদ্বয়ের বৈশালীতেই বিবাহ হয়। সিংহের দুইটী কন্যা জন্মলাভ করে, একজনের নাম বাসবী এবং অপরটীর নাম উপবাসবী। কিছুকাল পরে যখন শকলের মৃত্যু হয়, তখন বৈশালীর পৌরগণ সিংহকে তাঁহাদের নায়কপদে বরণ করে। ইহাতে গোপাল মনঃক্ষোভে রাজগৃহে চলিয়া আসিলেন। অত্যল্পকাল পরে, বিম্বিসার তাঁহাকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী বাসবীর পাণিগ্রহণ করেন। বাসবীর গর্ভে বিম্বিসারের ঔরসে অজাতশত্রুর জন্ম হয়।

অজাতশত্রু নামের কারণ সম্বন্ধে বুদ্ধঘোষ লিখিয়াছেন যে, অজাতশত্রু যখন মাতৃগর্ভে, তখন তাঁহার মাতার বিম্বিসারের রক্তপান করিবার আকাঙ্ক্ষা হয়। রাজা অমাত্যদিগের পরামর্শে একটী জামা তৈয়ারী করাইলেন, যাহার বাহিরের দিক্‌টা কাপড়ের এবং ভিতরের দিক্‌টা কাঁচা পশুমাংসের ছিল। এইরূপ জামা পরিধান করিয়া রাজা রাণীর নিকট গমন করিলে রাণী রাজার পৃষ্ঠদেশ দংশন করিয়া জামার নীচের পশুমাংসকে রাজার দেহের মাংস মনে করিয়া উহার শোণিত পানান্তে দোহদতৃপ্তি লাভ করিলেন, এবং রাজারও শরীর অক্ষত রহিল। এই কারণে সন্তান জন্মিলে তাঁহার নাম অজাতশত্রু রাখা হয়। জৈনধর্ম্মশাস্ত্রে ইনি 'কুণিক' নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই শব্দের অর্থ 'নুলো' বা নিষ্ক্রিয়হস্ত।

অজাতশত্রু প্রাপ্তবয়স্ক হইলে বিম্বিসার তাঁহাকে চম্পার রাজ-প্রতিনিধিপদে নিযুক্ত করেন। জৈন কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায়, বৃদ্ধবয়সে বিম্বিসার অজাতশত্রুকে মগধের রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধশাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, বিম্বিসার বুদ্ধদেবের পরমভক্ত ছিলেন। বুদ্ধের সহিত তদীয় শ্যালক দেবদত্তের বিরোধ উপস্থিত হইলে দেবদত্ত মনে করিলেন, কুমার অজাতশত্রুকে হস্তগত করিতে পারিলে বুদ্ধকে জব্দ করিবার

সুবিধা হইবে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি স্বীয় অলৌকিক ঋদ্ধিপ্রভাবে কুমার অজাতশত্রুকে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন এবং অজাতশত্রুও তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি করিতে লাগিলেন। ক্রমে ইনি দেবদত্তের এত অনুগত হইয়া পড়েন যে, তাঁহার বাসের জন্য গয়াশীর্ষে একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং প্রত্যহ তাঁহার ৫০০ শত অনুচরের আহার্য্য প্রদান করিতে থাকেন। ইহারই সহায়তায় দেবদত্ত একবার বুদ্ধকে বিনাশ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বিম্বিসারকে ইহজগৎ হইতে অপসারিত করিতে পারিলে বুদ্ধ-নির্য্যাতনে কেহ বাধা দিতে পারিবে না মনে করিয়া দেবদত্ত অজাতশত্রুকে সত্বর পিতৃহত্যা করিয়া রাজা হইবার উপদেশ দেন। অজাতশত্রুও পিতৃহত্যায় অগ্রসর হইয়া ধরা পড়িলেন। কিন্তু স্নেহকাতর বিম্বিসার পুত্রের এই অপরাধ বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। রাজা হইয়াই অজাতশত্রু দেবদত্তের পরামর্শানুসারে বৃদ্ধ পিতাকে কারাগারে নিক্ষেপপূর্ব্বক অনাহারে রাখিয়া তিলে তিলে বিনাশ করেন।*

কথিত আছে, যে দিন বিম্বিসার কারাগারে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হন, সেই দিনই অজাতশত্রুর একটী পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। রাজা পুত্রের জন্মসংবাদে আনন্দিত হইয়া স্বীয় পিতাকে কারামুক্ত করিতে যাইয়া দেখিলেন, তৎপূর্ব্বেই পিতার প্রাণবায়ু নির্গত হইয়াছে। তখন গভীর অনুতাপে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি স্নেহময় পিতাকে এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছেন স্মরণ করিয়া বিবেকের তীব্র কষাঘাতে মর্ম্ম-বেদনায় পীড়িত হইয়া জীবনের সুখশান্তি চিরতরে হারাইলেন।

এদিকে বিম্বিসারের মৃত্যুতে প্রসেনজিতের ভগিনী পতি-শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহাতে প্রসেনজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কাশীগ্রামের রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। ফলে মগধ ও কোশলে যুদ্ধ বাধিল।† প্রথম তিনটী যুদ্ধে অজাতশত্রু জয়লাভ করেন। কিন্তু শেষে প্রসেনজিতের কৌশলে মগধসৈন্য পরাজিত হয় এবং অজাতশত্রুও বন্দী হন। প্রসেনজিৎ রাজ-নৈতিককারণে অজাতশত্রুর সহিত তাঁহার কন্যা বজ্রার (স্থানান্তরে ইঁহার নাম চন্দ্রা) বিবাহ দিয়া কাশীগ্রামের রাজস্ব কন্যার স্নানান্তে গন্ধলেপনাদির ব্যয়নির্ব্বাহার্থ যৌতুকস্বরূপ প্রদান করেন। ইহার পর কএক বৎসর নির্ব্বিবাদে কাটিলে পুনরায় উভয় রাজ্যের মধ্যে গোলযোগের সূত্রপাত হয়।

কথিত আছে, প্রসেনজিৎ তাঁহার পুত্র বিরুধকের দ্বারা সিংহাসনচ্যুত হইয়া রাজগৃহে পলাইয়া আসেন। সেখানে অনাহার এবং পথভ্রমণের ক্লান্তিবশতঃ মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহাতে অজাতশত্রুর সহিত কোশলের পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধে কোশলের পতন হইল। সম্ভবতঃ ইহারই ফলে মগধের উত্তর-পশ্চিম সীমা প্রসারিত হয়।

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, মগধের বিরুদ্ধে কোশলরাজ এবং বৃজ্জিগণ একত্র হইয়া যুদ্ধ করেন। একই কালে যে মগধরাজ্য এইরূপ দুইটী প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সাহসী হইবে, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তিব্বতীয় কিংবদন্তী অনুসারে কোশলরাজ বিরুধকের সহিত শাক্যদিগের যুদ্ধ, তাহার ফলে শাক্যদিগের বিনাশ এবং অজাতশত্রুর সহিত বৃজ্জিদিগের শত্রুতায় বৃজ্জিদিগের পরাজয়—এই দুইটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কথিত আছে, বুদ্ধের নির্ব্বাণের এক বৎসর পূর্ব্বে অজাতশত্রু বৈশালী জয় করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব রাজগৃহের নিকটস্থ গৃধ্রকূটে আসিয়া বাস করেন। বৈশালী জয়ের পূর্ব্বে অজাতশত্রু তাঁহার মন্ত্রী বর্ষকারকে বৈশালী জয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তথাগতের নিকটে প্রেরণ করেন। বর্ষকার রাজার মনোভাবের কথা বুদ্ধদেবের নিকট নিবেদন করিলে বুদ্ধদেব বলিলেন, যখন তিনি বৃজ্জিদিগের দেশে বাস করিতেন, তখন তাহাদিগকে সাতটী পরামর্শ দিয়াছিলেন, এই সাতটী পরামর্শ যদি তাহারা মানে, তাহা হইলে তাহাদিগকে কেহই জয় করিতে পারিবে না। শ্রেণীনির্ব্বিশেষে সঙ্ঘবদ্ধ থাকাই বুদ্ধদেবের পরামর্শের মুখ্য উদ্দেশ্য। বুদ্ধের এই বাণী শুনিয়া বর্ষকার কৌশলে তাহাদের মধ্যে ভেদনীতির বীজ বপন করেন এবং ইহার ফলে অজাতশত্রু বিনাযুদ্ধে বৈশালী জয় করিতে সমর্থ হন।

সম্ভবতঃ বৈশালী জয়ের পর অজাতশত্রু পাটলীগ্রামে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং এই সময় হইতেই ইহার সবিশেষ উন্নতি আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বেই লিচ্ছবি ও কোশল আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য পাটলীগ্রামে দুর্গের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে এইস্থান পাটলীপুত্র বা কুসুমপুর নামে খ্যাত হইয়া ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে গণ্য হয়।

ব্রহ্মদেশীয় উপাখ্যান হইতে জানা যায়, অজাতশত্রু গণ্ডক পর্য্যন্ত একটী রাজপথ নির্ম্মাণ করেন। সেই পথের মধ্যে মধ্যে

* এই সংবাদ কতদূর সত্য, তাহা বলা যায় না। মিঃ ভিন্সেণ্ট স্মিথ, এস বি. বেঙ্কটেশ্বর প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের এই প্রবাদের উপর আস্থা নাই। অপর পক্ষে রাজ্ ডেভিড্ সাহেব এই প্রবাদে বিশ্বাস-জ্ঞাপন করিয়াছেন।

† এই যুদ্ধের বিবরণ হরিতশতজাতক (জাতকসংখ্যা ২৩৯), বধকি-শূকরজাতক (২৮৩ সংখ্যক জাতক), তচ্ছশূকরজাতক (জাতকসংখ্যা ৪৪২) এবং কুমারপিণ্ডজাতকে (৪১৫ সংখ্যক জাতক) বর্ণিত আছে।

পথিকদিগের জন্য বিশ্রামাগার স্থাপিত হইয়াছিল।

অজাতশত্রুর রাজত্বকালে ক্রমশঃ মগধের সীমা উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

মঝ্‌ঝিম-নিকায় হইতে জানিতে পারা যায়, প্রদ্যোত মগধ আক্রমণ করিতে পারেন, এই আশঙ্কায় অজাতশত্রু রাজগৃহের দুর্গাদির পুনঃসংস্কার করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধশাস্ত্রে লিখিত আছে, পিতার মৃত্যুর পর স্বীয় দুষ্কর্ম্মের কথা চিন্তা করিয়া অজাতশত্রু নিরন্তর অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। দেবদত্তের স্বরূপ সম্যক্ বুঝিতে পারিয়া তিনি তাঁহার সকল প্রকার সাহায্য বন্ধ করিয়া দিলেন। ভগবান্ তথাগত তৎকালে রাজগৃহের এক আম্রবনে বাস করিতেছিলেন। শান্তিলাভের আশায় অজাতশত্রু অগত্যা তাঁহারই শরণাপন্ন হইলেন। পরম ক্ষমাশীল বুদ্ধও রাজার পূর্ব্বশত্রুতা বিস্মৃত হইয়া সুমধুর উপদেশাবলী দ্বারা তাঁহার তাপিত চিত্তে শান্তিবারি সিঞ্চন করিলেন।* রাজা শ্রদ্ধাবনতচিত্তে বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণান্তে ত্রিরত্নের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করেন।

কথিত আছে, বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পরে অজাতশত্রু ভস্মাবশেষের একাংশের দাবী এবং বুদ্ধসংবৎসরের প্রবর্ত্তন করেন। উত্তরকালে রচিত মালাঙ্করবত্থুতে লিখিত আছে যে, তাঁহারই অনুমত্যনুসারে রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় বৌদ্ধদিগের প্রথম ধর্ম্মসঙ্গতি বসিয়াছিল।

কাহারও কাহারও মতে ৫২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে অজাতশত্রুর মৃত্যু হয়। আবার কাহারও মতে অজাতশত্রু ৫৫২ হইতে ৫১৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

অজাতশত্রুর প্রতিমূর্ত্তি

মথুরার যাদুঘরে 'পারখম-মূর্ত্তি' নামে পরিচিত যে প্রাচীন যুগের এক পুরুষমূর্ত্তি আছে, তাহার পাদপীঠে উৎকীর্ণ শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়া ঐতিহাসিক কাশীপ্রসাদ জয়সবাল ইহাকে মগধরাজ অজাতশত্রুর প্রতিকৃতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই মূর্ত্তিটী প্রত্নতত্ত্ববিশারদ কানিংহাম সাহেব পারখম নামক গ্রাম হইতে আবিষ্কার করেন। ইহাতে মৌর্য্য ও মৌর্য্যপূর্ব্বযুগের বিশিষ্ট পালিশের চিহ্ন এখনও রহিয়াছে। শ্রীযুত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের এক নিবন্ধের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া জয়সবাল স্বয়ং মথুরায় গিয়া মূর্ত্তিটী পরিদর্শন করিয়া তাহার পাদমূলস্থ শিলালিপির পাঠ উদ্ধার করেন। জয়সবালের পাঠানুযায়ী শিলালিপিটী এইরূপ—

[দক্ষিণে]

"নিভাদপ্র-শেনি অজ[া]*শত্রু রাজো [সি] র [ি]

[সম্মুখে]

সংখ্যাক্ষর ৪, ২০ (ব্রাহ্মী 'থ') ১০ (ব্রাহ্মী 'ড') পূর্ণচ্ছেদ ৮ [হি বা হ্রি]

[বামে]

কুণিক-শেবাসি-নাগো মাগধানাং রাজা"

জয়সবাল ইহার অর্থ করিয়াছেন—

'লোকান্তরিত শ্রেণীজ অজাতশত্রু [শত্রুবিহীন] রাজা শ্রীকুণিক শেবাসি-নাগ [ইহা 'শিশু-নাগে'র প্রাচীন প্রাকৃতরূপ] মাগধদিগের রাজা'

'৪ + ২০ + ১০ = ৩৪ [বৎসর]; ৮ [মাস]' (রাজত্বকাল?)

এই লিপিতে অজাতশত্রুর 'অ' বড় করিয়া লেখা। অন্যান্য অক্ষরগুলির প্রাক্-অশোকীয় রূপ।*

কএকটী পুরাণে অজাতশত্রুর রাজত্বকাল ৩৫ বৎসর নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং পারখম মূর্ত্তির পাদমূলে এই ৩৪ বৎসর ৮ মাসের উল্লেখ তাঁহার রাজত্বকালের উল্লেখ হওয়া আদৌ অসম্ভব নহে।

জয়সবালের এই পাঠ ও সিদ্ধান্ত অনেকে মানেন না। অনেকে ইহাকে এখনও যক্ষমূর্ত্তি বলিতে চান। এই মূর্ত্তিগুলিকে যক্ষমূর্ত্তি বলিয়া ধরিয়া লইবার পূর্ব্বে একথা পূর্ণরূপে প্রতিপাদন করা প্রয়োজন হইয়া উঠে যে, যক্ষ উপাসনা কোন সময়ে, বিশেষতঃ বুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্ত্তীকালে প্রচলিত ছিল। বৈদিক অথবা পৌরাণিক সাহিত্যে ইহার নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় না। অপর পক্ষে, পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই যক্ষতত্ত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। বিহার-উড়িষ্যা-রিসার্চ সোসাইটীর জার্নালে ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসের সংখ্যায় প্রকাশিত একটী প্রবন্ধে তিনি যক্ষতত্ত্ব অস্বীকার করিয়া জয়সবালের শিলালিপির পাঠ ও সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া পাটনায় আবিষ্কৃত দুইটী মূর্ত্তিকে মগধরাজ অজ-উদয়িন্ ও নন্দীবর্দ্ধনের মূর্ত্তি এবং 'পারখম মূর্ত্তিকে' স্বাধীনভাবে কুণিক অজাতশত্রুর মূর্ত্তি বলিয়া স্থির করেন। এই প্রসঙ্গে মথুরায় প্রাপ্ত খৃষ্টীয় প্রথম শতকে স্বামিন্ শিবনন্দীর রাজত্বের চতুর্থবর্ষে গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত 'যক্ষ' মণিভদ্রের মূর্ত্তিকেও তিনি যক্ষমূর্ত্তি বলিয়া স্বীকার না করিয়া বোধিসত্ত্ব মণিভদ্রের মূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ

* তথাগতের মুখনিঃসৃত এই উপদেশাবলী শ্রামণ্যফলসূত্রে (সামন্ন ফল সুত্তে) বর্ণিত হইয়াছে।

* সম্প্রতি রাজগৃহ-শিলাগাত্রে বিহার-প্রত্নতত্ত্ববিভাগের বর্ত্তমান পরিচালক গণেশচন্দ্র চন্দ্র প্রাক্-অশোকীয় ব্রাহ্মী অক্ষরে 'কুণিক'লিপি আবিষ্কার করিয়াছেন।

করিয়াছেন। তাহার অন্যান্য কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ—মূর্ত্তিতে যে উৎকীর্ণ লিপি আছে—তাহাতে মণিভদ্র 'ভগবান্' বিশেষণে ভূষিত। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে যক্ষকে কোথাও 'ভগবান্' বিশেষণে বিভূষিত করিবার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। এতদ্ব্যতীত সুপ্রসিদ্ধ শিল্প-সমালোচক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্র-কলার অধ্যাপক অরুণ সেনের মতে, এই মূর্ত্তিগুলি এতদূর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে, ইহাদিগকে কোন মতে কোনও সাধারণ লক্ষণাক্রান্ত যক্ষমূর্ত্তির কোঠায় ফেলা সম্ভবপর নহে। ইহা ছাড়া পরলোকগত রাজাদিগের মূর্ত্তিরচনা করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করিবার রীতিসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ অতি অল্প। মহারাজ খারবেলের হাথীগুম্ফা-শিলালিপি ও ভাসের 'প্রতিমা' নাটক প্রভৃতি তাহার নিঃসংশয় সাক্ষ্য দিতেছে। পারখম-মূর্ত্তির লিপির পাঠ সম্বন্ধে যতই মতদ্বৈধ থাক, এ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হইলে পারখম-মূর্ত্তির রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব্ব ৫১৫ অব্দের অব্যবহিত পরেই হইবে সন্দেহ নাই। এই আবিষ্কার হইতে দুইটী তথ্য অবগত হওয়া যায়—প্রথমতঃ ইউরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণ যাহাকে মৌর্য্যপালিশ বলিতেন, তাহা মৌর্য্যদেরই বিশিষ্ট প্রক্রিয়া নহে। মৌর্য্যদের পূর্ব্বে ও পরেও তাহা পাওয়া যায়। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় সম্ভবতঃ ইহাকেই 'বজ্রলেপ' বলিয়া বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ভারতের ভাস্কর্য্য-শিল্পের অতি পরিণত অবস্থার নিদর্শন মৌর্য্যযুগের কএক শতাব্দী পূর্ব্বেই বুদ্ধের সমসাময়িক-কালে শৈশুনাগ যুগে অতি সুস্পষ্টরূপেই পাওয়া যায়।

অজাতশত্রু,—(পুং) বিষ্ণুযশের গুরু ও পুষ্পসূত্রভাষ্যের রচয়িতা।

অজাতারি—(পুং) [অজাতঃ সর্ব্বজনপ্রিয়ত্বাৎ অনুৎপন্নঃ অরির্যস্য সঃ; বহুব্রী] রাজা যুধিষ্ঠির। (ভূরিপ্রয়োগ)

অজাতি—(স্ত্রী) [ন জন্-ক্তিন্; নঞ্-তৎ] অনুৎপত্তি। [বহুব্রী] (ত্রি) ২ অনুৎপন্ন। ৩ জাতিশূন্য। ৪ ন্যায়োক্ত জাতিহীন। ৫ জন্মরহিত, নিত্য।

অজাতৌল্বলি—(পুং) [তুল্বলস্য অপত্যং পুমান্ ইতি তৌল্বলিঃ। অজোপজীবী চাসৌ তৌল্বলিশ্চেতি মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা] ছাগমাংসোপজীবী তুল্বল মুনির সন্তান। (সুপদ্ম-টীকা)

অজাত্ব—(ক্লী) অজার ভাব বা ধর্ম্ম।

অজাদ—(ত্রি) [অজ-অদ-অচ্] ছাগভুক্। ২ (পুং) ক্ষত্রিয়জাতির জনৈক পূর্ব্বপুরুষ। [বৈদ্যক] ৩ দুরালভা।

অজাদনী—(স্ত্রী) [অজৈঃ ছাগৈঃ অক্লেশেন অদ্যতে অসৌ, অজ-অদ-ল্যুট্ কর্ম্মণি; ৬-তৎ] দুরালভা, চলিত বিচিতি, বিচুটী। এই বৃক্ষ স্পর্শমাত্রই দুঃখদায়ক। ২ ক্ষুদ্র দুরালভা (রাজনি°)

অজাদি—(পুং) [অজ ইতি শব্দ আদৌ যেষাং; বহুব্রী] পাণিন্যুক্ত অজ, এড়ক, কোকিল, চটক, মূষিক, অশ্ব, বাল, বৎস হোড়, পাক, মন্দ প্রভৃতি শব্দসমষ্টি। ইহাদের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ হয়; ঙীপ্ নিষিদ্ধ।

অজান—বিহারস্থ সোনার বা স্বর্ণকারদিগের কনৌজীয়া শাখার একটী থাক।

অজানি—(পুং) [নাস্তি জায়া যস্য; বহুব্রী। জায়ায়া অন্তে নিঙাদেশঃ] জায়াশূন্য, যাহার স্ত্রী নাই। "জায়ামজানয়ে" (অথর্ব্ব ৬.৬০.১)।

অজানি₂—জাজেরা রাজপুতগণের একটী শাখা। কচ্ছের নানাস্থানে ইহাদের বাস আছে।

অজানিক—(ত্রি) [অজেন তদ্‌বিক্রয়পালনাদিনা আনো জীবনমস্তি অস্য ঠন্] অজাজীবী, ছাগব্যবসায়ী। [অজস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা পুরোহিতাদি° যক্—আজানিক্য (ক্লী)]

অজানূর—মান্দ্রাজের দক্ষিণ কানাড়া জেলার এক নগর। ইহা মঙ্গলূর ও কন্নানূরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। অক্ষা° ১২°২০′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৭′১৫″ পূঃ। লোকসংখ্যা প্রায় এক হাজার।

অজানেয়—(পুং) [অজেঽপি বিক্ষেপেঽপি আনেয়ঃ প্রাপণীয়ঃ আরোহী যেন, অজ-বিক্ষেপে অপ্ ন ব্যাদেশঃ। আ-নী-যৎ কর্ম্মণি। ততঃ ৩-বহুব্রী] উত্তম অশ্ব। পর্য্যায়—হয়োত্তম, বাতাশ্বাজাত্য (ত্রিকা°); অজানেয়, কুলীন (অমর)। ২ বহু শস্ত্র প্রহারে ব্যাহত করিলেও যে অশ্ব আরোহীকে গন্তব্য স্থানে পৌছাইয়া দেয়। (ত্রি) ৩ নির্ভয়।

অজান্ত্রী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] নীলবুহ্না, চলিত নীলবোনা, ছাগলবেঁটে। (রত্নাবলী) সংস্কৃত পর্য্যায়—নীলপুষ্পী, অতিলোমশা, নীলিনী, ছগলান্ত্রী, অন্তঃকোটরপুষ্পী, বস্তান্ত্রী। ইহার গুণ—কটু, কাসঘ্ন, বীজদায়ক ও গর্ভজনক। ২ বৃদ্ধদারক। (রাজনি°)

অজাপক—(ক্লী) [বৈদ্যক] চক্রদত্তোক্ত ঘৃতবিশেষ। ছাগবিষ্ঠার রস, ছাগমূত্র, ছাগক্ষীর ও ছাগদধি দ্বারা এই ঘৃত প্রস্তুত করিতে হয়। ইহার গুণ—যক্ষ্মা, কাস ও শ্বাসনাশক।

অজাপঞ্চক—(ক্লী) [বৈদ্যক] যক্ষ্মারোগে ব্যবস্থেয় ঘৃতবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ছাগঘৃত ৪ সের, ছাগবিষ্ঠার রস ৪ সের, ছাগমূত্র ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের, ছাগদধি ৪ সের, একত্র পাক করিয়া ১ সের যবক্ষারচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। পানের মাত্রা ১ তোলা। এই ঘৃত পানে যক্ষ্মা, শ্বাস ও কাস প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

অজাপয়স্—(ক্লী) ছাগীদুগ্ধ। (বাভট, উ°)

অজাপালক—(ত্রি) [অজান্ আপালয়তি আ-পা-ণিচ্-ণ্বুল্, উপপ°] ছাগপালক। ২ অজ বা ছাগদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী।

অজাপ্রিয়া—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] বদরীবৃক্ষ।

অজামাংস—(ক্লী) [বৈদ্যক] ছাগমাংস। ইহার গুণ—লঘু, স্নিগ্ধ, কিঞ্চিৎ শীত, রুচিকর, মধুর, পুষ্টিকর, বলকর ও বাতপিত্তহর। (বৈদ্যকনি°) [ছাগমাংস দ্র°]

অজামি—(ত্রি) বিজাতীয়। "নাজামিং ন পরিবৃণক্তি জামিং" (ঋক্ ১.১২৪.৬) ২ সহানুৎপন্ন, অসহজাত। (ঋক্ ১.১১১.৩) 'অজামিং সহানুৎপন্নং শত্রুং বা' (সায়ণ)। ৩ অবন্ধু, অস্তোত্রকারী। (ঋক্ ৭.৮২.৬)

অজামিতা—(স্ত্রী) সম্বন্ধাভাব। ২ অসৌখ্য। ৩ অসাদৃশ্য। (শতপথব্রা° ১.৩.২.৮ ; ৪.২.২.৯)

অজামিল—(পুং) কান্যকুব্জবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ। নামমাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে ইঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে— ইনি একজন সদাচারী ও সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। সদা সত্য কথা কহিতেন, সকলের প্রিয়াচরণ করিতেন, নিয়মনিষ্ঠা ও শৌচাচারে থাকিয়া গুরু, অগ্নি, অতিথি ও বৃদ্ধসেবায় দিন কাটাইতেন।

একদিন পিতার আদেশে অজামিল বনে যাইয়া ফল, পুষ্প, সমিধ্ ও কুশ লইয়া আশ্রমে ফিরিবার কালে পথে এক কামুককে শূদ্রাণী বেশ্যা লইয়া ভোগমত্ত দেখিলেন। মদ্যপানে বেশ্যার নেত্র ঘুরিতেছে, কটীর বসন খসিয়া পড়িয়াছে, হাসি, গান, কেলি, সমান চলিতেছে ; দেখিয়াই অজামিলের মন মজিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও মন ফিরাইতে পারিলেন না। বেশ্যাসক্ত হইয়া ধর্ম্মকর্ম্ম হারাইলেন। সদ্বংশজাতা সাধ্বী স্ত্রী, পিতামাতা সকলই পরিত্যক্ত হইল। এইরূপে সংসর্গদোষে দূষিত হইয়া অজামিল দ্যূতক্রীড়া ও চৌর্য্য প্রভৃতি অসদ্বৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতে লাগিলেন। শূদ্রাগর্ভে তাঁহার দশটী পুত্র উৎপন্ন হয়। এই পুত্রগণের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠের নাম নারায়ণ। নারায়ণকে তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন। অজামিলের যখন বয়ঃক্রম অষ্টাশীতিবর্ষ, তখন তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত। এমন সময় দেখিলেন, তিনজন পাশহস্ত বক্রমুখ ভয়ানক যমদূত তাঁহাকে লইবার জন্য আসিয়াছে। তাহাদের দেখিয়া অজামিল অত্যন্ত ভীত হইলেন, উচ্চৈঃস্বরে বালক নারায়ণকে বার বার ডাকিতে লাগিলেন। ভয়াকুল অজামিলের মুখ হইতে নারায়ণের নাম উচ্চারিত হওয়ায় বিষ্ণুদূতগণ আসিয়া যমদূতদিগকে নিবারণ করিলেন এবং তাহাদের নিকট হরিগুণানুবাদ কীর্ত্তন করিলেন। ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া অজামিলের নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। অপত্যস্নেহাদি সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া গঙ্গাদ্বারে যাত্রা করিলেন, তথায় যোগসাধনপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইলেন।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে লিখিত আছে—

"পুত্র বুদ্ধে অজামিল বলি নারায়ণে।
বৈকুণ্ঠে চলিল দ্বিজ চাপিয়া বিমানে॥
দ্বিজ হয়ে বেশ্যা সঙ্গে করে রতি রঙ্গ।
সেজন পাইল মুক্তি পেয়ে প্রভু সঙ্গ॥"

অজামুখ—(পুং) কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভে জাত শত পুত্রের অন্যতম। ইনি একজন মহাপরাক্রমশালী মায়াবী দানব ছিলেন। (শিবপু°)

অজামুখী,—(স্ত্রী) হিন্দুদিগের এক স্ত্রীদেবতা। শ্রীতত্ত্ব-নিধিতে (প. ১৩৭) উল্লিখিত ধ্যান হইতে জানা যায়, ইনি একজন মাতৃকাদেবতা এবং স্বরবর্ণ অকারের অধিষ্ঠাত্রী। ধ্যান যথা—

"অজামুখী রক্তবর্ণা হংসগা ধবলাংশুকা।
শরাসনং বরং দক্ষে ধত্তে বামে শরাভয়ৌ॥"

অজামুখী রক্তবর্ণা, শ্বেত পরিচ্ছদ-পরিহিতা, হংসারূঢ়া এবং চতুর্ভুজা ; তাঁহার দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে ধনু ও বরদমুদ্রা এবং বামহস্তদ্বয়ে বাণ ও অভয়মুদ্রা।

অজামুখী,—(স্ত্রী) এক রাক্ষসী। এই রাক্ষসী অশোকবনে জানকীকে ভয় দেখাইয়া রাবণের প্রতি অনুরাগিণী করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। (রামা°, ৫.২৪.৪৩)

অজামূত্র—(ক্লী) [বৈদ্যক] ছাগীমূত্র। গুণ—কটু, উষ্ণ, রুক্ষ, নাড়ীবিষঘ্ন, প্লীহা, উদর, কফ, শ্বাস, গুল্ম ও শোফহর এবং লঘু। (রাজনি° ও বাভট)

অজামেদস্—(ক্লী) [বৈদ্যক] ছাগবসা, ছাগের মেদ। (বাভট)

অজায়মান—(ত্রি) যাহা জন্ম লইতেছে না, জন্মিতেছে না। ২ প্রজাপতি। (শুক্লযজুঃ ৩১.১৯)

অজারা, (Don Jose Nicholas De Azara)—একজন স্পেনদেশীয় কূট রাজনীতিজ্ঞ। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে আরাগনের অন্তঃপাতী বার্বুনাল নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি Procurator-general নির্ব্বাচিত হন এবং ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে রাজদূতরূপে রোমনগরে গমন করেন।

স্পেনদেশ হইতে জেসুইট্ সম্প্রদায়ের বিতাড়নকার্য্যে ইনি অগ্রণী ছিলেন এবং ৬ষ্ঠ পায়াসের নির্ব্বাচনকালে তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী-সৈন্য রোম অধিকার করিলে তিনি ফ্লোরেন্স নগরে পলাইয়া যান এবং এখান হইতে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে পোপ ষষ্ঠ পায়াসের (Pius VI) মৃত্যুপর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্য পরিচালনা করেন।

ইহার পর তিনি রাজদূতরূপে ফ্রান্সের রাজধানী পারি নগরে আগমন করেন। স্পেনীয় দরবারকে তৎকালে বাধ্য হইয়া ফ্রান্সের সহিত সন্ধি করিতে হয়। অজারা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বদেশের ক্ষতিকর সন্ধিসর্ত্তসমূহে স্বীকৃত হইতে বাধ্য হন এবং স্পেনরাজ্য সম্পূর্ণরূপে নেপোলিয়নের করতলগত হয়। এই ফরাসী সহযোগিতা প্রথমে তিনি স্পেনের মঙ্গলদায়ক হইবে ভাবিয়াছিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন যে, স্পেন নেপোলিয়নের পক্ষে নিজের সমস্ত স্বার্থ বলি দিতেছে, তখন তিনি ভগ্নমনোরথ হইয়া পড়েন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে পারি নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অজারা₂ (Don Felix De Azara)—উপরোক্ত নিকোলাস অজারার কনিষ্ঠ ভ্রাতা (১৭৪৬-১৮১১ খৃঃ)। দক্ষিণ আমেরিকায় দেশাধিকার লইয়া স্পেন ও পর্ত্তুগালের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। এই সীমানির্দ্দেশের মীমাংসা করাইবার জন্য স্পেন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কমিশনার নিযুক্ত করিয়া দক্ষিণ আমেরিকায় প্রেরণ করেন। এই কার্য্যে তিনি আমেরিকায় ২০ বৎসর অবস্থান করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে তিনি পারাগুয়ে ও রিও-ডি-লাপ্লাটা প্রদেশে পরিভ্রমণকালে যে সমস্ত বিষয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা 'Voyage dans l' Amerique meridionale depuis 1781 jusqu'en 1801' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। উহাতে তিনি উক্ত উভয় দেশের ইতিহাস, ভূতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ববিষয়ক বহু কথা বিবৃত করিয়াছেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার হস্তলিপি ফরাসী ভাষায় অনুদিত হইয়া পারি নগরে প্রকাশিত হয়।

অজারিয়া—বাইবেলের প্রাচীন বিভাগে (Old Testament) বর্ণিত কএকজন ব্যক্তি। ইঁহারা 'অজারিয়া' নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। নিম্নে ইঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

১ জদোকের পুত্র। ইনি লেভির (Levi) বংশধরদিগের অন্যতম।

২ রাজা সলোমানের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী নাথানের পুত্র।

৩ জেকোলিয়ার গর্ভজাত আমাজিয়ার পুত্র। ইনি জুডার রাজা এবং উজ্জিয়া নামেও পরিচিত ছিলেন।

৪ জুডার প্রপৌত্র ও এথানের পুত্র।

৫ জুডার অধস্তন পুরুষ জেহুর পুত্র।

৬ জুডারাজ আসার রাজত্বকালে পয়গম্বররূপে প্রথিত জনৈক ব্যক্তি।

৭ জুডারাজ জেহোসাফতের দুই পুত্র।

৮ জুডার এক রাজা; জেহোরামের পুত্র। ইনি আহাজিয়া ও জেহোয়াহাজ নামেও পরিচিত ছিলেন।

৯ জেরোহামের পুত্র এবং ১০ ওবেদের পুত্র। ইঁহারা ধর্ম্মযাজক জেহোইয়াদা কর্ত্তৃক বহু শত সৈন্যের নেতৃরূপে (Captains of hundreds) নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

১১ হিল্‌কিয়ার পুত্র। ধর্ম্মগ্রন্থলেখক এজ্‌রা ইঁহার পৌত্র।

১২ মাসিয়ার পুত্র। ইনি রাজা অর্ত্তক্ষত্রের (Artaxerxes) আদেশে জেরুজালেম নগরের প্রাচীর সংস্কারে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

১৩ হোশাইয়ার পুত্র। ইনি পয়গম্বর জেরেমিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

১৪ পয়গম্বর দানিএলের জনৈক ভক্ত। রাজা নেবুকাদ্রেজার (Nebuchadrezzar) ইঁহাকে আবেদনেগো নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি সম্রাট্ স্থাপিত দেবতার স্বর্ণমূর্ত্তি উপাসনায় অস্বীকৃত হওয়ায় দানিএলের সহিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হন।

অজারেণু—(স্ত্রী) অজা অর্থাৎ ছাগীর ক্ষুরোৎক্ষিপ্ত ধূলি। অজারেণুস্পর্শ অলক্ষ্মীজনক। উহাতে ইন্দ্রের লক্ষ্মীও নাশ পায়। "অজারেণুঃ স্পৃশংশ্চৈন শক্রস্যাপি শ্রিয়ং হরেৎ।" (অত্রিস° ৩৮২)

অজাবিক—(ক্লী) [অজাশ্চ অবিকাশ্চ দ্বন্দ্বৈকবদ্‌ভাবঃ, গবাশ্বাদি গণীয়ঃ] ছাগ ও মেষসমূহ।

"অজাবিকে তু সংরুদ্ধে বৃকৈঃ পালে ত্বনায়তি"। (মনু ৮.২৩৫)

অজাবিট্—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] ছাগবিষ্ঠা।

অজাবৃষ—শ্রাবস্তীর শিলালিপিতে (বিক্রম-সংবৎ ১২৭৬) উল্লিখিত একটী বৌদ্ধনগর।

অজাশ্রম—[অজা আশ্রম দ্র°]

অজাশ্ব,—(ক্লী) [দ্বন্দ্বৈকবদ্‌ভাবঃ] ছাগ ও অশ্বসকল। "অজাশ্বং মুখতো মেধ্যং ন গৌর্ন নরজামলাঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্যস° ১.২৬১)

অজাশ্ব₂—(পুং) পূষার নামান্তর। (ঋক্ ১.১৩৮.৪) 'হে অজাশ্ব পূষন্ (অজাশ্বেতি পূষণমাহেতি যাস্কঃ। নি° ৪.২৫)' (সায়ণ)

অজাহুৎ সরদেশমুখ—মহারাষ্ট্র শাসনকালে যে রাজকর্ম্মচারী সরদেশমুখী আদায় করিতেন, তাঁহার উপাধি। শাহুর সময়ে এই পদের সৃষ্টি হইয়াছিল।

অজাহ্বা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] আত্মগুপ্তা, চলিত আলকুশী।

অজি,—(ত্রি) [অজ-ইন্ ব্যভাবঃ। স্ত্রিয়াং বা ঙীপ্] গতিশীল। [পদ্ভ্যামজতি যাতি, পদাজি।] [ভাবে ইন্] ২ গতি। ৩ ক্ষেপণ।

অজি₂—কাথিয়াবার জেলার একটী নদী। সর্‌ধার গ্রামের নিকটে পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রায় ৩০ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া বালম্ভার নিকটে কচ্ছ উপসাগরে পড়িয়াছে। রাজ-

কোটের অতি নিকট দিয়া এই নদী প্রবাহিত। রাজকোটের প্রায় ১০ ক্রোশ নিম্নে ধোন্দী ও নীয়ারী নামক দুই স্রোতস্বিনীর যুক্তপ্রবাহ এই নদীতে আসিয়া মিশিয়াছে। এই নদীর জল অতি সুপেয়। পূর্ব্বে ইহার বালুকা হইতে লোকে স্বর্ণ সংগ্রহ করিত।

অজিক—(পুং) বিপ্রচিত্তির এক পুত্র। বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভে সৈংহিকেয় নামে উৎপন্ন ত্রয়োদশ জন অমিত-পরাক্রমশালী পুত্রের অন্যতম। (শিবপু°)

অজিকা—(স্ত্রী) ক্ষুদ্র ছাগী।

অজিগর্ত্তসৌয়বস্—(পুং) শুনঃশেফের জনক। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের (৭.১৫.১৭) প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকায় শুনঃশেফের পিতার নাম অজিগর্ত্তসৌয়বস্ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। [অজীগর্ত্ত দ্র°]

অজিঘাংসক—(ত্রি) হননেচ্ছাহীন, অহিংস্রক।

অজিঘাংসু—(ত্রি) [ন জিঘাংসুঃ] হননেচ্ছু নহে। [জিঘাংসু দ্র°]

অজিজ্ঞাস্য—(ত্রি) জিজ্ঞাসার অযোগ্য।

অজিত,—(ত্রি) [ন জি-কর্ম্মণি ক্ত ; নঞ্-তৎ] জিতভিন্ন, অপরাজিত, অনির্জ্জিত। "নচ তেঽস্ত্যজিতং কিঞ্চিৎ।" (রামা°) (পুং) ২ শিব। (মহাভা° ১৩.১৭.৮) [বৈদ্যক] ৩ তেজস্কর ঔষধবিশেষ। ৪ ইন্দুরবিশেষ।

অজিত$_২$—(পুং) বিষ্ণুর একটী নাম। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বিষ্ণুর অংশে রুচির ঔরসে আকূতির গর্ভে যজ্ঞ উৎপন্ন হন। স্বারোচিষ মন্বন্তরে এই যজ্ঞই অজিত নাম ধারণ করেন। (বিষ্ণুপু°) ২ চাক্ষুষ মন্বন্তরে ভগবান্ হরি বৈরাজ প্রজাপতির ভার্য্যা দেবসম্ভূতির গর্ভে অজিত নামে জন্ম লইয়াছিলেন। ইনি সলিলমধ্যে কূর্ম্মরূপে থাকিয়া পৃষ্ঠে ঘূর্ণমান মন্দর পর্ব্বত ধারণ করেন এবং সমুদ্রমন্থনে উত্থিত অমৃত দেবতাদিগকে পরিবেশন করিয়া দেন। (ভাগবত)

অজিত$_৩$—(পুং) দেবগণবিশেষ। ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে স্থির করেন যে, একাকী এ কার্য্য করা সুকঠিন। তাঁহাকে এই কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য তিনি জয় নামে দ্বাদশজন দেবতা সৃষ্টি করেন। ইঁহাদিগকে ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে সাহায্য করিতে বলিলে তাঁহারা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া যোগনিরত হন। এই ব্যবহারে ব্রহ্মা কুপিত হইয়া ইঁহাদিগকে অভিসম্পাত দেন যে, তোমরা যখন আমার কথায় অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছ, তখন তোমাদিগকে সপ্ত মন্বন্তরের প্রতি মন্বন্তরে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। ইহার পর হইতেই জয় নামক দেবগণ ক্রমান্বয়ে অজিতগণ, তুষিতগণ, সত্যগণ, হরিগণ, বৈকুণ্ঠগণ, সাধ্যগণ ও আদিত্যগণ নামে জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মাণ্ডপু°, ৬৬.১.১২)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অন্যত্র (৬৭.৩২-৩৩) লিখিত আছে, ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত জয় নামক দেবগণ ১২টী হ্রদে পরিণত হন। অতঃপর ঐ ১২শ জন স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অজিতার গর্ভে রুচির পুত্ররূপে জন্ম লইয়া অজিত নামে প্রখ্যাত হন।

অজিত$_৪$—(পুং) দেবগণভেদ। চাক্ষুষ মন্বন্তরে অজিষ্ঠ, দেব, শাক্যন, বাণপৃষ্ঠ, শাঙ্কর, সত্যধৃষ্ণু, বিষ্ণু, বিজয় ও অজিত—ইঁহারা পৃথক দেবগণ বলিয়া বিদিত হন। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৬২.৬২)

অজিত$_৫$—(পুং) স্বায়ম্ভুব মনুর শুক্রনামধেয় মানস পুত্র। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৩১.৪)

অজিত$_৬$—(পুং) পুলহের এক পুত্র। ভৌত্য মন্বন্তরের সপ্তর্ষির অন্যতম। (বিষ্ণুপু° ও হরিবংশ)

অজিত$_৭$—(পুং) বুদ্ধভেদ। অবলোকিত ও মঞ্জুশ্রীর পরেই বোধিসত্ত্বগণের ভিতর মৈত্রেয়ের স্থান। পালি ভাষায় ইঁহার নাম মেত্তেয্য। ইঁহার অপর একটী নাম অজিত। পালি বৌদ্ধশাস্ত্র মতে অন্যান্য বোধিসত্ত্বের সহিত ইঁহার যথেষ্ট পার্থক্য আছে। অপর সকলে অতিমানব, কিন্তু মৈত্রেয় বুদ্ধদেবের মত মানব। বহু জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সাধনাবলে গৌতমের ন্যায় ইনি বোধিসত্ত্বে উন্নীত হইয়াছেন। গৌতম আপনাকে বহু বুদ্ধের ভিতর একজন বুদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। মহাপরিনির্ব্বাণসূত্র হইতে জানিতে পারা যায়, তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধগণের এবং অনাগত বুদ্ধদেরও নাম করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে পালিভাষায় দীঘনিকায় ও অনাগতবংশ * এবং সংস্কৃতে ললিতবিস্তর, দিব্যাবদান ও মহাভারতে ইঁহার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। 'সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকে' ইঁহার স্থান অতি উচ্চে; কিন্তু তথাপি ইনি মঞ্জুশ্রীর নিম্নে অবস্থিত। অবশেষে ইনি অবলোকিতেশ্বর ও মঞ্জুশ্রী কর্ত্তৃক নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু খৃষ্টীয় শতকের প্রারম্ভে ইঁহার সম্মান বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়। তখন বৌদ্ধ জগতের সর্ব্বত্র ইঁহার মূর্ত্তি রক্ষিত হইতে লাগিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতির ভার ইঁহার উপর ন্যস্ত ছিল।† ইনি এ বিষয়ে অসঙ্গকে বিশেষ প্রত্যাদেশ দিয়াছিলেন।‡ মধ্য এসিয়ার তুরকানে মৈত্রেয়ের এক মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে চীন ভাষায় উৎকীর্ণ একটী শিলালেখ হইতে জানিতে পারা যায়, ইনি একজন কর্ম্মিষ্ঠ ও মানবের হিতাকাঙ্ক্ষী দেবতা

* 'অনাগতবংশ' মৈত্রেয় সম্বন্ধীয় একখানি কাব্যগ্রন্থ। [অনাগতবংশ দ্র°]

† Yuan Chwang by Watters, Vol. I, p 239.

‡ Yuan Chwang and Pari by Watters, in B. E. F. E. O. 1911, p. 439.

ছিলেন এবং মানবের মঙ্গলের জন্যই বহুরূপে বহুভাবে প্রকাশিত হন। চিত্রে ইঁহার বর্ণ হরিদ্রার মত। ইঁহার প্রস্তরমূর্ত্তিগুলি বৃহদাকারের; হয় দণ্ডায়মান অবস্থায়, না হয় ইউরোপীয় ধরণে বসিয়া আছেন। এ দেশের লোকেরা যে ভাবে পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া থাকে বা দেবতাদের যে বীরাসনস্থ দেখা যায়, সেভাবে ইঁহাকে বসিয়া থাকিতে দেখা যায় না। প্রাচীন গান্ধার স্থাপত্যে ইঁহার অনেক মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় এবং উদ্যানে ইঁহার যে বিখ্যাত প্রস্তরমূর্ত্তি আছে, ফা-হিয়ানের মতে উহা বহু প্রাচীন। য়ুয়ন্ চোয়াঙ্-এর মতে, শাক্যমুনি ইঁহাকেই ভবিষ্যৎ বুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করায় ইঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য একটী স্তূপও নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু কোথায় যে এ স্তূপটী আছে, তাহা তাঁহার বিবরণ হইতে জানিবার কোন উপায় নাই। কাহারও মতে বারাণসী ধামে, আবার কাহারও মতে রাজগৃহ কিংবা শ্রাবস্তীতে এই স্তূপ আছে। ইনি যখন বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবেন, তখন তৌমস্বর্গে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

অজিত,৮—(পুং) নেপালে আবিষ্কৃত ব্রতাবদানমালা গ্রন্থে 'সুবর্ণ-বর্ণাবদান' নামক উপাখ্যানে উল্লিখিত জনৈক ভিক্ষু। ইনি একদা এক বিহারে উপস্থিত হইলেন। ইঁহার পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতায় ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া বিহারস্থ ভিক্ষু সুবর্ণবর্ণ তাঁহার নামে মিথ্যা অপবাদ প্রচার করিলেন। অজিত তাহাতে প্রতিবাদ করিলে সুবর্ণবর্ণ বলিলেন, 'তোমার শূলদণ্ড হওয়া উচিত।' অজিত এই ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলে সুবর্ণবর্ণ আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অজিতের সমীপে উপস্থিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখন তিনি তাঁহার অনুচিত বাক্যের শাস্তিস্বরূপ নিজেই শূলদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

অজিত,৯—(পুং) শূরসেনের নায়ক কুলভট্টের ঔরসে ও তদীয় পত্নী দ্রঙ্গিনীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। কামা বা কামবনের (ভরতপুর, রাজপুতানা) স্তূপোপরি উৎকীর্ণ শিলালিপিতে অজিতের উল্লেখ আছে। ইনি অপ্সরাপ্রিয়াকে বিবাহ করিয়াছিলেন।*

অজিত,১০—(পুং) মেবারের একজন প্রাচীন নৃপতি। ৭১৮ বিক্রমসংবতে উৎকীর্ণ উদয়পুরের অপরাজিত-প্রস্তরলেখে ইঁহার উল্লেখ আছে। ইঁহার পিতার নাম বৎস ও পিতামহের নাম অচ্যুত।

অজিত,১১—অজয়নন্দের নামান্তর। [অজয়নন্দ দ্র°]

অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী—ফরিদপুর জেলায় কোটালিপাড় পরগণার অন্তর্গত মঠবাড়ী গ্রামের ব্রাহ্মণপণ্ডিতবংশে ৺শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জন্ম। তিনি পঠদ্দশায় কলিকাতায় ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং পরে সিটীস্কুলের শিক্ষকের পদে কর্ম্ম করেন। তাঁহার পুত্র অজিতকুমার ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৯এ আগষ্ট্ (১২৯৩ সাল, ৪ঠা ভাদ্র) কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে মাত্র ১১ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি ১২ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা এবং ১৬ বৎসর বয়সে বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইতিমধ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার রচনার প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং অধ্যয়নে আর অধিকদূর অগ্রসর না হইয়া, ১৩১০ সাল হইতে নাম-মাত্র বেতনে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করেন। ১৩১৭ সালে তাঁহার বিবাহ হয়। ইহার অল্পকাল পরেই তিনি মান্চেষ্টার-বৃত্তি লইয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। কিন্তু অসুস্থতার জন্য তাঁহাকে অবিলম্বেই দেশে প্রত্যাগমন করিতে হয়। অতঃপর তিনি শান্তিনিকেতনেই কার্য্য করিতে থাকেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' নামক মহর্ষির সুবৃহৎ জীবন-চরিত গ্রন্থখানি প্রধান। তিনি অল্প বয়সেই বঙ্গ-সাহিত্যের সমালোচকরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের রসাস্বাদনের সহায়তাকল্পে রচিত তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথ' ও 'কাব্য-পরিক্রমা' খ্যাতিলাভ করিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন এবং এইজন্যই তাঁহার লিখিত বিশ্বসাহিত্যের সহিত বাঙ্গালা-সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনাগুলি উপভোগ্য হইত। মহর্ষির জীবন-চরিতের ন্যায়, তিনি রাজা রামমোহন রায়ের একখানি বিস্তৃত জীবনী রচনার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু অকাল মৃত্যুর জন্য তাহার প্রকাশকার্য্য ঘটিয়া উঠে নাই। তবে, তাঁহার রচিত ক্ষুদ্র গ্রন্থ 'রাজা রামমোহন রায়' সম্প্রতি (১৯৩৪ খৃঃ) প্রকাশিত হইয়াছে। অজিতকুমারের অন্যান্য গ্রন্থ—'বাতায়ন', 'ভক্তবাণী' (১ম ও ২য় ভাগ) এবং 'খৃষ্ট'। 'প্রবাসী', 'ভারতী' প্রভৃতি মাসিক পত্রেও তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। অজিতকুমার কিঞ্চিদধিক ৩২ বৎসর বয়সে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে (১৩২৫ সালের ১৩ই পৌষ, রবিবার) পরলোকগমন করেন।

অজিতকেশকম্বল—বুদ্ধের সমসাময়িক ছয়জন প্রচারকগণের অন্যতম। বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রে ইঁহাদিগকে পাষণ্ড আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে; কারণ বুদ্ধদেবের মতের সঙ্গে ইঁহাদের কাহারও মতের মিল ছিল না। ইঁহাদের মধ্যে জ্ঞাতপুত্র নির্গ্রন্থ মহাবীর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ভারতবর্ষে এখনও বহু সংখ্যক নরনারীর মধ্যে প্রচলিত আছে। মস্করী গোশাল

* I. A., Vol X., p. 34; Archaeological Survey Reports of India, Vol. XX. Pt. xii.

আজীবক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এ সম্প্রদায়েরও অস্তিত্ব ভারতবর্ষে অনেকদিন পর্য্যন্ত ছিল। বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক ইঁহাদের পরাভবকথা বৌদ্ধশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইলেও ইহা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয়।

কথিত আছে, যখন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ শুনিলেন যে, তথাগত রাজগৃহস্থ জেতবনে বাস করিতেছেন, তখন তিনি রাজগৃহে আগমন করিয়া বুদ্ধদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'যখন পূর্ণ কাশ্যপ, পরিব্রাজক মস্করী গোশাল, বৈরাতিপুত্র সঞ্জয়, অজিতকেশকম্বল প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম্মগুরুগণ 'বুদ্ধ' আখ্যা গ্রহণ করেন নাই, তখন তাঁহার মতন লোক কি করিয়া এই গৌরবের পদ দাবী করিতেছেন?' তখন বুদ্ধদেব কোশলরাজকে 'কুমারদৃষ্টান্তসূত্র' বর্ণনা করিয়া স্বীয় মতে প্রবর্ত্তিত এবং ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। আর একবার প্রসেনজিৎ শ্রাবস্তী এবং জেতবনের মধ্যে একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া সেই স্থানে বুদ্ধদেব এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী অজিতকেশকম্বল প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে তাঁহাদের ক্ষমতার পরিচয় দিতে আহ্বান করিলেন। বুদ্ধদেবের ঐন্দ্রজালিক শক্তির অসাধারণ প্রভাব দেখিয়া অন্যান্য তীর্থিকগণ পরাজয়ের ভয়ে পলাইয়া গেলেন।*

বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র হইতে জানা যায়, মগধরাজ অজাতশত্রুও অজিতকেশকম্বলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মতবাদ অজাতশত্রুর হৃদয়গ্রাহী না হওয়ায় তিনি অবশেষে বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

অজিতকেশকম্বল বলিতেন যে, ভাল ও মন্দের কোন ফল কিংবা পরিণাম নাই; পরলোক বলিয়া কোনও জগৎ নাই; এ জগৎও মিথ্যা, এই জীবনের উপর পিতামাতা কিংবা পূর্ব্ব-জন্মের কোন প্রভাব নাই। এই জীবনে যাহাই কিছু আমরা করি তাহা দ্বারা আমরা মৃত্যুকে কোন প্রকারে প্রতিহত করিতে পারি না। সামন্নফল-সুত্তে ইহাই অজিতকেশ-কম্বলের মত বলিয়া প্রচারিত হইলেও তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থে ইহা পূর্ণ কাশ্যপের মত বলিয়াই আলোচিত হইয়াছে।

তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে অজিতকেশকম্বলের মতবাদ এইরূপ জানা যায়—মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু, সুখ, দুঃখ ও সত্ত্ব (প্রাণশক্তি) এই সপ্তবিধ পুদ্গলদেহ সৃষ্ট নহে, ইহাদিগকে সৃষ্ট করানও হয় নাই। ইহারা অন্য কিছু হইতে উদ্ভূত নহে, ইহাদিগকে উদ্ভূত করান হয় নাই। ইহারা পরস্পর বিরোধী নহে। ইহারা নিত্য এবং একই স্তম্ভবৎ দণ্ডায়মান। পাপপুণ্য বা সুখদুঃখ ইহাদিগকে বিনষ্ট বা চালিত করিতে পারে না। যদি কেহ অপর কাহারও মস্তক ছেদন করে, তাহা হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি ইহজগতে বিচরণশীল বা সত্ত্বাযুক্ত কাহারও কোন পরিবর্ত্তন সাধন করে না; কিন্তু ছেদনের সহায়ভূত তরবারি উক্ত সপ্ত মূল পদার্থের মধ্য দিয়া গমন করিয়া জীবের অনিষ্ট ঘটায়। হনন, মৃত্যু ঘটান, চিন্তা করা বা করান, উপদেশ দান করা বা করান, জানা বা জ্ঞাত হওয়ান—এ সকল কিছুরই অস্তিত্ব নাই। জ্ঞানী ও অজ্ঞান উভয়েরই ১৪০০০ মুখ্য জন্ম, ৬০০০০ বা ৬০০ মহাকল্প, পঞ্চ কর্ম্ম, দ্বিবিধ বা ত্রিবিধ গৌণকর্ম্ম (বা অর্দ্ধকর্ম্ম) বর্ত্তমান। (জগতে) ৬২ পথ, ৬২ মধ্যকল্প, ৭ সংজ্ঞা, ১২০ নরক, ১৩০ অঙ্গ, ৩৬ রেণু, ৪৯০০০ নাগ, ৪৯০০০ গরুড়, ৪৯০০০ পরি-ব্রাজক, ৪৯০০০ অলেখ, ৪৯০০০ নির্গ্রন্থ, ৭ প্রকার সজ্ঞান-জন্ম, ৭ প্রকার অজ্ঞানজন্ম, ৭ অসুরজন্ম, ৭ পিশাচজন্ম, ৭ দেবজন্ম, ৭ মনুষ্যজন্ম, ৭ বা ৭০০ সরোবর, ৭ বা ৭০০ লিপি, ৭ বা ৭০০ স্বপ্ন, ৭ বা ৭০০ প্রমাণ, ৭ বা ৭০০ তুঙ্গস্থান, ৬ সামাজিক উপাধি, ১০ স্তর, ৮ প্রকার মহা-পুরুষ—এই সকল বর্ত্তমান। প্রত্যেকেরই ৮৪০০০ মহাকল্প ব্যাপিয়া বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া শেষে দুঃখ নিবৃত্তি হয়। যেমন সূত্রপোট্টলী শূন্যে নিক্ষিপ্ত হইলে উহা সম্পূর্ণভাবে বিস্তৃত হয়, তদ্রূপ জ্ঞানী ও অজ্ঞান ব্যক্তিরা ৮৪০০০ মহাকল্প পরিভ্রমণ করিয়া দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পায়। সুতরাং 'আমি সৎকার্য্য, ধর্ম্মানুশীলন, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা কর্ম্মের বিপাক সাধন করিয়া কর্ম্মনাশ করিব'—শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদের এই উক্তি ভ্রান্ত। সুখ ও দুঃখের অস্তিত্ব আছে; আরোহী বা অবরোহী জন্ম নাই।

চৈনিক ধর্ম্মশাস্ত্রে অজিতকেশকম্বলের (অ-ই-ডা শি-শা-কিন্-বা-রা) মত সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত আছে,—মানুষ চতুর্ভূতের সমষ্টিমাত্র; মারা গেলে দেহস্থ ক্ষিতি মৃত্তিকায়, অপ্ জলে, তেজ অগ্নিতে ও মরুৎ বায়ুতে মিশিয়া যায়। মানুষের সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মানুষ জ্ঞানী হউক কিংবা নির্বোধই হউক না কেন, তাহার যখন মৃত্যু হয়, তখন তাহার সকলই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ভাল ও মন্দের কোন মূল্য নাই। কারণ সকলই ধ্বংসশীল।

'কেশকম্বল' শব্দটী পরিব্রাজক অজিতের বর্ণনাসূচক বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তাঁহার কেশ কম্বলের মতন ছিল বলিয়াই সম্ভবতঃ তিনি কেশকম্বল নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

ভারতবর্ষে তখনকার দিনে যে ধর্ম্মবিপ্লব দেখা দিয়াছিল, অজিতকেশকম্বলের ধর্ম্মবিপ্লবী মতবাদ তন্মধ্যে একটী। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে যাঁহারা বিশ্বাসী, তাঁহারা মনে করিতেন যে, যাগ-

* Vide 'Life of Buddha' by W. W. Rockhill, p. 79-80.

যজ্ঞ করিলে ইহলোকে এবং পরলোকে অনেক কাম্য বস্তুর লাভ হয়। ইহার মধ্যে যুক্তিতর্ক ছিল না। ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য জাতির লোক দেখিত যে, তাহাদের লাভালাভ অপেক্ষা যাগযজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগের লাভ অনেক বেশী। চার্ব্বাক-মতবাদীরা সেইজন্য নাস্তিকতার প্রচার করেন। এই উভয় দলের পরস্পর-বিরোধী মতের মধ্যে উপনিষৎকারগণ ব্রহ্মতত্ত্ব নির্দ্দেশ করেন। ব্রহ্মবাদিগণের মতে আত্মাই সত্য, অপর কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নাই এবং তাহাদের কোন সত্তাও নাই। নাস্তিকবাদীরা ঈশ্বর ও পরলোক অস্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কোন সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই, অন্ধশক্তির দ্বারা চালিত হইয়া মানুষ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে; তাহার জীবনের উপরে ভালমন্দের কোন প্রভাব নাই, যাহা ঘটিবে তাহা ঘটিবেই।

এই তিনটী মত বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষের ধর্ম্মজগতে এক সময়ে এমন এক অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, যেখানে দার্শনিক মতবাদের কোনরূপ প্রগতির সম্ভাবনা ছিল না।† বুদ্ধ যে ছয়জন ধর্ম্মপ্রচারকের সমীপে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বেদবিরোধী এবং নাস্তিকবাদী। বুদ্ধদেব কার্য্যকারণের সম্পর্ক মানিতেন, কিন্তু ইঁহাদের নাস্তিক-বাদকে জীবনের নৈতিক আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিতেন না।

অজিতচাঁদ—রাজবিশেষ। ইনি কতেহররাজ নরপৎসিংহের পুত্র এবং গড়বাল ও কমায়ুনরাজ জ্ঞানচাঁদের দৌহিত্র। বিষ্টিগণের কৌশলে আলমোড়ার রাজাসন প্রাপ্ত হন। ইঁহার রাজত্বকাল অনুমান ১৭২৬-২৯ খৃঃ। ইনি ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীনাথেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণের জন্য এক খণ্ড ভূমি দান করেন। ইঁহার সময় বিষ্টিরাই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। কথিত আছে, পূরণমল্ল নামক একজন বিষ্টি অজিতচাঁদের অন্তঃপুরে পর্য্যন্ত যাইতেন। সেই দুরাত্মা অন্তঃপুরের একজন সখীকে ভ্রষ্টা করিয়া তাহার গর্ভে এক সন্তান উৎপাদন করেন। দুর্বৃত্ত পূরণমল্ল সেই দাসীপুত্রকে অজিতচাঁদের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে যান। অজিতচাঁদ ভিতরের কাণ্ড জানিতে পারিয়া ঐ পুত্রকে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তাহাতে পূরণমল্লের অত্যন্ত ভয় হইল। অপরাপর বিষ্টিগণের সঙ্গে ষড়্যন্ত্র করিয়া তিনি অজিতচাঁদকে হত্যা করিলেন।

অজিতচাঁদের পর সেই দাসীপুত্র বিষ্টিগণ কর্ত্তৃক রাজ্য প্রাপ্ত হয়। তাহার নাম বাল-কল্যাণচাঁদ।

অজিততৈল—(ক্লী) [বৈদ্যক] নেত্ররোগাধিকারোক্ত তৈল-বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—তিলতৈল অর্দ্ধসের, আমলকীর রস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ যষ্টিমধু ১ পল। এই তৈল ব্যবহারে তিমিরাদি রোগ নষ্ট হইয়া দৃষ্টি পরিষ্কৃত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

অজিতদেবসূরি,—এক জৈন গ্রন্থকার। সংবৎ ১২৭৩ অব্দে ইনি 'যোগবিধি' রচনা করেন। 'বিচাররত্ন-সংগ্রহ' গ্রন্থে ইঁহার উল্লেখ আছে। অজিতদেবসূরি স্বীয় গ্রন্থে তাঁহার পূর্ব্বতন গুরু শ্রীভানুপ্রভ এবং শীলগণ (সংবৎ ১২৫০), মানতুঙ্গ, মলয়সূরি ও ভদ্রগুপ্তের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই চন্দ্রকুলোদ্ভব। মানতুঙ্গ তাঁহার 'সিদ্ধজয়ন্তীচরিত' অজিতদেবসূরিকে উৎসর্গ করেন (সংবৎ ১২৬১ অব্দে)।

অজিতদেবসূরি₂—ইনি একজন পট্টাচার্য্য। মুনিচন্দ্রসূরি ও মানদেবসূরির শিষ্য এবং বিজয়সিংহসূরির গুরু। [বিজয়সিংহ-সূরি দ্র°] ইনি তপাগচ্ছপট্টাবলীর ৪১তম আচার্য্য। জৈন-তত্ত্বাদর্শ মতে, ইনি ৪০তম আচার্য্য এবং অনুমান ১২০৪ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

অজিতদেবাচার্য্য—জনৈক প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। 'গণরত্নমহো-দধিতে' ইঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

অজিতনাথ,—২য় জৈন-তীর্থঙ্কর। [অজিতনাথস্বামী দ্র°]

অজিতনাথ₂—চন্দেল রাজবংশসম্ভূত বুন্দেলখণ্ডের একজন রাজা। ইঁহার পিতার নাম সুমতিনাথ। ১১৯২ সংবতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২২০ সংবতে রাজা হন।

অজিতনাথ ন্যায়রত্ন—নবদ্বীপের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও স্বভাব-কবি। ইনি ১২৪৪ সালে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম নবকুমার ভট্টাচার্য্য। ইঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং সুপ্রসিদ্ধ আগমবাগীশের বংশধর। কএকশত বৎসরের প্রতিষ্ঠিত বহু প্রাচীন ৺রাধাবল্লভজীউর সেবা ইঁহাদের বাড়ীতে এখনও প্রচলিত আছে। এজন্য উক্ত বাটী 'রাধাবল্লভের বাড়ী' বলিয়াই খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

অজিতনাথ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের নিকট ন্যায় ও কাব্য অধ্যয়ন করেন। ইনি প্রায় ৩০ বৎসরকাল নদীয়ার মহারাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র তাঁহাকে 'কবিভূষণ' উপাধি প্রদান করেন। অজিতনাথ নব-দ্বীপের শেষ কবি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যেক কবিতার দুই তিন রকম অর্থ প্রকাশই তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য। কবিতা রচনা করিতে তাঁহার সময় লাগিত না, মুখে মুখে তিনি শ্লোকরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকা', 'নাট্য-পরিশিষ্ট' ও 'কাশীখণ্ড' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া মুদ্রিত করেন। নাট্য-পরিশিষ্টের একপক্ষে সূত্র ও অপর পক্ষে নাটক ইহাই রচনার বৈশিষ্ট্য। অনেক অমুদ্রিত কবিতা

† Vide 'History of Indian Philosophy' by S. N. Das Gupta.

তাঁহার ছাত্রদের এখনও মুখস্থ আছে। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পাণ্ডিত্য ও গুণের পুরস্কারস্বরূপ 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। ১৩২৬ সালের মাঘ মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮২ বৎসর হইয়াছিল।

অজিতনাথপুরাণ—একখানি জৈন পুরাণ। ২য় জৈন-তীর্থঙ্কর অজিতনাথস্বামীর বিবরণ ও মাহাত্ম্য লইয়া অজিতনাথপুরাণ রচিত হইয়াছে। একাধিক জৈনাচার্য্য অজিতনাথপুরাণ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে অরুণ-মণি-রচিত অজিতনাথপুরাণে এইরূপ পাওয়া যায়—১ম পর্ব্বে মঙ্গলাচরণে চতুর্ব্বিংশতি জিনস্তব, গৌতমসুধর্ম্মাদি ও গুণভদ্রাদি পূর্ব্ববর্ত্তী পুরাণকারগণের বন্দনা, সংবেগিনী ও নির্ব্বেদদায়িনী ধর্ম্মকথা, বৰ্দ্ধমান হইতে গুরু-পরম্পরায় পুরাণ-প্রাপ্তিকথা, বিপুলাচলে মহাবীর ও শ্রেণিক-সংবাদ, অজিত-নাথ-পুরাণানুক্রমণিকাকথন। ২য় পর্ব্বে শ্রেণিক-ইন্দ্রভূতি সংবাদে পুরাণোপক্রম। ৩য়—ত্রিলোক-রচনাবিধান। ৪র্থ—কুলকর্ত্তৃগণের জন্ম ও অভিধান। ৫ম—ঋষভের উৎপত্তি, নগাধিপে ঋষভের অভিষেক, বিবিধ উপদেশ, লোকদুঃখনাশ, শ্রমণধর্ম্মাশ্রয় ও কেবলোৎপত্তি। ৬ষ্ঠ—আদিজিনের ঐশ্বর্য্য, নর এবং অমরাধিপগণের উপর অধ্যক্ষতা, সদ্ধর্ম্মামৃত-বর্ষণ, কৈলাসে ঋষভনাথের নির্ব্বাণ ও ভরতের নির্ব্বাণ। ৭ম—রাজগণের কীর্ত্তন, ভূতিবিক্রম নামক রাজেন্দ্রের তপোবন গমন, সুরবিক্রমের বৈরাগ্য, মোক্ষসাধনের কারণ, গুণসেনের মাহাত্ম্য। ৮ম—বিজয়াদি রাজগণের দীক্ষা ও দীক্ষাযন্ত্রের নিরূপণ, বিজয়ের মহাক্ষোভ ও তাঁহার অযোধ্যাগমন। ৯ম—পুরুদেবচরিত। ১০ম—পুরুদেবের মাহাত্ম্য। ১১শ—সিংহ-ধ্বজের মাহাত্ম্য। ১২শ—সুকেতুচরিত, জিতশত্রুরাজের রাজ্যলাভবর্ণন। ১৩শ—তাঁহার বংশাধিকার। ১৪শ—অজিত জিনোৎপত্তিপ্রসঙ্গ। ১৫শ—জিনগর্ভাবতার। ১৬শ—অজিতনাথের জন্মাভিষেক। ১৭শ—তাঁহার চেষ্টা। ১৮শ—বাল্যকালে তাঁহার অপরাজয়কথন, তড়িদ্বেগের তিরস্কার, অজিতনাথের পরাক্রমবর্ণন। ১৯শ—জিতশত্রুর বৈরাগ্য, অজিতনাথের রাজ্যাভিষেক। ২০শ—সগরের জন্ম। ২১শ—অজিতনাথের নিষ্ক্রমণ। ২২শ—সগরের হরণ, প্রেমশ্রীর প্রেম-বন্ধন। ২৩শ—সগরের জিন-বন্দনা। ২৪শ—সগরের বিবাহ। ২৫শ—সগরের মতিবর্দ্ধিনীলাভ। ২৬শ—সগরের শ্রীমালা-লাভকথন। ২৭শ—মহোদয়ের দীক্ষাবর্ণন। ২৮শ—সগরের অভ্যুদয়। ২৯শ—অজিতনাথের কেবলজ্ঞানলাভ। ৩০শ—সগরের স্ত্রীরত্ন-লাভ। ৩১শ—সগরের দিগ্বিজয়। ৩২শ—অযোধ্যাগমন। ৩৩শ—সগরসাম্রাজ্য। ৩৪শ—ভগীরথের জন্ম। ৩৫শ—সমবস্রুতিব্যাখ্যান। ৩৬শ—জিনের বিহার-বর্ণন ও সগরের জিনবন্দনা। ৩৭শ—তত্ত্বোপদেশ। ৩৮শ—সদ্ধর্ম্মোপদেশকথন। ৩৯শ—দেবীগণের ভাবান্তর সম্বন্ধ। ৪০শ—অজিতনাথের নির্ব্বাণবর্ণন। ৪১শ—সগরের নির্ব্বেদ, সগরের নিষ্ক্রমণ। ৪২শ—সগরের কেবলজ্ঞানরূপ সাম্রাজ্যলাভ। ৪৩শ—চৈত্যালয়, সংযত চৈত্য, সিদ্ধপ্রতিমাদর্শন ও সগরের নির্ব্বাণকথন। ৪৪শ—ভগীরথের নির্ব্বাণ, জহ্নুর উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য। ৪৫শ—সম্ভবজিনমাহাত্ম্য। ৪৬শ—অন্য জিনগণের প্রসঙ্গ এবং ৪৭শ পর্ব্বে—গুরুপরম্পরাকথন।*

অজিতনাথস্বামী—দ্বিতীয় জৈন-তীর্থঙ্কর। অযোধ্যানগরে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা জিতশত্রুর ঔরসে রাণী বিজয়া দেবীর গর্ভে অজিতনাথের জন্ম। জৈন-তত্ত্বাদর্শ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, যে সময়ে অজিতনাথ জন্মগ্রহণ করেন, তৎকালে অযোধ্যার নাম বিনীতা এবং উহা কৈলাস পর্ব্বতের নিকট অবস্থিত ছিল। অজিতনাথের জন্মকালে রাণী বিজয়া চৌদ্দটী স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। রাজা জিতশত্রুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুমিত্র যুবরাজ ছিলেন। সুমিত্রের ঔরসে রাণী যশোমতীর গর্ভে সগর জন্মগ্রহণ করেন। উভয় ভ্রাতার যৌবনকালে জিতশত্রু ও সুমিত্র দীক্ষা লইয়া মোক্ষমার্গ আশ্রয় করেন। তখন অজিতনাথ রাজপদে এবং সগর যুবরাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। কিছুকাল রাজত্ব করিবার পর অজিতনাথের রাজ্যস্পৃহা অন্তর্হিত হইল। তিনি স্বয়ং দীক্ষা লইয়া তপস্যায় মনঃসংযোগ করিলেন। অল্পদিন পরেই কেবলজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি দ্বিতীয় তীর্থঙ্কর বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার রাজপদত্যাগের পর সগর রাজচক্রবর্ত্তী হইলেন। রাজা সগর ভরতের ন্যায় বহুকাল রাজত্ব করেন। এই সগরের জহ্নুকুমার-প্রমুখ ষাটহাজার পুত্র হইয়াছিল। তাঁহারা খাদ কাটিয়া কৈলাসশৃঙ্গবাহিনী গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তন করিয়া গঙ্গাকে নিম্নে চালাইয়া আনেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, কৈলাসের উপর ভরত ঋষভাদি তীর্থ-ঙ্করেরা যে সুবর্ণময় মন্দির প্রস্তুত করাইয়াছেন, গঙ্গাস্রোত হইতে সেই সকলের রক্ষা। তদুদ্দেশ্যেই পর্ব্বতের চারিদিক্ খনন করিয়া গঙ্গার গতি ফিরাইয়া দেওয়া হয়। তাঁহাদের ঐ কার্য্যে ক্রুদ্ধ হইয়া নাগদেবতারা ষাটহাজার সগরসন্তানকে মারিয়া ফেলেন। এদিকে গঙ্গার জলে দেশে বড় উপদ্রব ঘটে।

* আলোচ্য অজিতনাথপুরাণখানি অরুণমণি-বিরচিত। ইঁহার পূর্ব্বেও যে ভিন্ন অজিতনাথপুরাণ প্রচলিত ছিল, তাহা জিনসেনের আদিপুরাণ হইতে জানা যায়। বর্ত্তমান পুরাণে জিনসেন, গুণভদ্র, শ্রুতকীর্ত্তি প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী পুরাণকারগণের প্রশংসা আছে, সুতরাং এখানি খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর পর রচিত এরূপ অনুমান করা যায়।

তখন সগররাজের পৌত্র (জহ্নুর পুত্র) ভগীরথ সগরের আজ্ঞায় ভূমি খনন করিয়া গঙ্গাকে সমুদ্রের সহিত মিলাইয়া দিলেন। এই কারণে গঙ্গার নাম জাহ্নবী ও ভাগীরথী হয়। রাজচক্রবর্ত্তী সগর অজিতনাথের নিকট দীক্ষা লইয়া তপঃ-প্রভাবে কেবলজ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হন। অজিতনাথ-স্বামী সমেত-শিখর পর্ব্বতে দেহত্যাগ করিয়া মোক্ষলাভ করেন।

জৈনশাস্ত্রমতে, অজিতনাথ স্বামীর চবণতিথি বৈশাখ শুক্লা-ত্রয়োদশী, বিমানের নাম বিজয়, জন্মতিথি মাঘ শুক্লাষ্টমী, জন্মনক্ষত্র রোহিণী, জন্মরাশি বৃষ, লাঞ্ছন হস্তী, শরীরমান ৪৫০ ধনুঃ, আয়ুঃমান ৭১ লক্ষপূর্ব্ব, শরীরের বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়, পদবী রাজা, বিবাহিত, হাজার সাধুর সহিত দীক্ষা, দীক্ষার স্থান অযোধ্যা, দীক্ষার পর দুইদিন উপবাস, উপবাসের পর পরমান্ন ও ক্ষীর প্রথম পারণ, পারণের স্থান ব্রহ্মদত্তের ঘর, দীক্ষাতিথি মহাবদি নবমী, ছদ্মস্থ কাল ১২ বর্ষ, জ্ঞাননগরী অযোধ্যা, জ্ঞানতপ দুইদিন উপবাস, দীক্ষাবৃক্ষ সালতরু, জ্ঞানতিথি পৌষ কৃষ্ণা-একাদশী, গণধরসংখ্যা ৯৫, সাধুর সংখ্যা ১ লক্ষ, সাধ্বীর সংখ্যা ৩৩০০০০, বৈক্রিয়-লব্ধি ২০৪০০, বাদীর সংখ্যা ১২৪০০, অবধিজ্ঞানীর সংখ্যা ৯৪০০, কেবলীর সংখ্যা ২২০০০, মনঃপর্য্যায়সংখ্যা ১২৫৫০, চতুর্দ্দশ পূর্ব্বীর সংখ্যা ৩৭২০, শ্রাবকসংখ্যা ২৯৮০০০, শ্রাবিকার সংখ্যা ৫৪৫০০০, শাসনযক্ষের নাম মহাযক্ষ, শাসনযক্ষিণীর নাম অজিতবলা, প্রথম গণধর সিংহসেন, প্রথম আর্য্যা ফাল্গু, মোক্ষস্থান সমেতশিখর, মোক্ষতিথি চৈত্র শুক্লাপঞ্চমী, মোক্ষসংলেষণা এক মাস, মোক্ষ আসন কায়োৎসর্গ, অন্তরমান ৩০ লক্ষ কোটী, গণনাম মানবগণ, যোনি-নাম সর্পযোনি, মোক্ষপরিবার ১০০০, ভবসংখ্যা তিন ভব, কুলগোত্র ইক্ষ্বাকুকুল। (জৈনতত্ত্বাদর্শ)

জিনসেনের আদিপুরাণে, সকলকীর্ত্তি ও অরুণমণিরচিত অজিতনাথপুরাণে এবং আচার্য্য হেমচন্দ্ররচিত ত্রিষষ্টিশলাকা-পুরুষচরিতের ২য় পর্ব্বে অজিতনাথস্বামীর বিস্তৃত পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে।*

অজিতপাল—গুজরাতের চালুক্য অজয়পালের নামান্তর। [অজয়পাল দ্র°]

* হেমচন্দ্রের ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষ-চরিত্রের ২য় পর্ব্বে অজিতনাথ ও সগর চক্রবর্ত্তীর চরিত্র সম্বন্ধে ৬টী সর্গে এইরূপে পাইতেছি—১ম সর্গে অজিতনাথ স্বামিভববর্ণন; ২য় সর্গে অজিতনাথস্বামি-তীর্থঙ্কর ও সগর চক্রধরের জন্মবর্ণন; ৩য় সর্গে অজিতস্বামীর দীক্ষা ও কেবলজ্ঞানবর্ণন; ৪র্থ সর্গে সগরের দিগ্বিজয়, চক্রবর্ত্তিত্ব ও অভিষেকবর্ণন; ৫ম সর্গে সগরপুত্র-নিষেধন এবং ৬ষ্ঠ সর্গে অজিত-স্বামী ও সগরের দীক্ষা ও নির্ব্বাণবর্ণন।

অজিতপ্রভগণি—এক জৈনাচার্য্য। ১২৯২ সংবতে বিজাপুরে (গুজরাতে) যে তিনজন জৈনাচার্য্য শিক্ষাদান করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অজিতপ্রভগণি একজন।

অজিতপ্রভসূরি—এক প্রসিদ্ধ জৈন গ্রন্থকার। ইনি 'শান্তি-নাথচরিত' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনি ইঁহার বংশাবলীতে সুধর্ম্ম, জম্বু, বজ্রব, শয্যম্ভব, যশোভদ্র, সম্ভূত, ভদ্রবাহু, স্থূলভদ্র, আর্য্যমহাগিরি ও বজ্রসূরির নাম দিয়াছেন। ইঁহার পরে ইঁহার স্থান বজ্রসূরি অধিকার করেন। [বজ্রসূরি দ্র°] বজ্রসূরির চারি-জন শিষ্য চারিটী সঙ্ঘের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। উঁহাদের মধ্যে চন্দ্রসঙ্ঘ প্রধান। ইঁহাদের গুরুপরম্পরা এইরূপ—চন্দ্রা-বতীর অধিবাসী বিজয়সিংহের শিষ্য অভয়দেবসূরি, অভয়দেব-সূরির শিষ্য চন্দ্রসূরি, চন্দ্রসূরির শিষ্য দেবসূরি, দেবসূরির শিষ্য তিলকপ্রভ, তিলকপ্রভের শিষ্য বীরপ্রভ ও সোমপ্রভ এবং বীরপ্রভের শিষ্য অজিতপ্রভসূরি।

অজিতবলা—(স্ত্রী) জৈনদিগের এক স্ত্রীদেবতা। আচারদিনকরে অজিতবলার নিম্নলিখিত মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে—

"গোগামিনী ধবলরুক্ চ চতুর্ভুজাঢ্যা
বামেতরং বরদপাশবিভাসমানা।
বামং চ পাণিযুগলং সৃণিমাতুলুঙ্গ-
যুক্তং সদাঽজিতবলা দধতী পুনাতু॥"

অজিতবলা গোবাহনা, শ্বেতবর্ণা ও চতুর্ভুজা। দুই দক্ষিণ-হস্তে বরদমুদ্রা ও পাশ এবং বামহস্তদ্বয়ে সৃণি বা অঙ্কুশ ও মাতুলুঙ্গ ফল ধারণ করেন।

ইনি দ্বিতীয় জৈনতীর্থঙ্কর অজিতনাথের শাসনযক্ষিণী।

অজিতমান—মানবংশীয় একজন রাজা। উদয়মানদেবের দুধপানি পাহাড়ে (বাঙ্গালা দেশে) উৎকীর্ণ শিলালিপিতে ইঁহার উল্লেখ আছে। উদয়মান, শ্রীধৌতমান এবং অজিতমান এই তিন ভ্রাতা যথাক্রমে ভ্রমরশাল্মলী, নভূতিষণ্ডক ও ছিঙ্গলা নামক স্থানের রাজা হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে ইঁহারা অযোধ্যায় বাণিজ্য করিতেন। [উদয়মান দ্র°]

অজিতবল্লভা—(স্ত্রী) বিষ্ণুর যিনি প্রিয়া বা ভার্য্যা; লক্ষ্মী।

"অজিতবল্লভা লক্ষ্মী ব্রহ্মার জননী।
তোমার চরণ বন্দি যোড় করি পাণি॥"
(কবিকঙ্কণ—চণ্ডী)

অজিতসিংহ—মারবাড়রাজ রাঠোর যশোবন্তসিংহের পুত্র। সম্রাট্ ঔরংজেব যশোবন্তকে বিশ্বাস করিতেন না। তাই তাঁহাকে দিল্লী হইতে বহুদূরে কাবুল শাসন করিতে পাঠান। দুর্গম-পথে নানারূপ কষ্টভোগ করিয়া পরিশ্রান্ত যশোবন্ত কাবুলে পৌঁছিলেন। কিন্তু সেখানকার জল-হাওয়া তাঁহার সহ্য হইল

না। তিনি ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে স্বর্গারোহণ করিলেন। অজিতসিংহ তখন মাতৃগর্ভে, এইজন্যই অজিতের মাতা স্বামীর চিতায় সহমৃতা হন নাই।

অজিত ভূমিষ্ঠ হইল, একটু সুস্থ হইয়াই রাণী নবজাত শিশুকে লইয়া অনুচরগণসহ দিল্লীর পথে যাত্রা করিলেন। কাবুল পরিত্যাগের সময় শাসনকর্তার ছাড়পত্র লওয়া হয় নাই, সম্রাটের নিকট হইতেও অনুমতি আনা হয় নাই, সুতরাং তাঁহারা আটকের নিকট সিন্ধুতীরে উপস্থিত হইলে সম্রাট্-কর্ম্মচারীরা পথরোধ করিল। রাঠোর বীরগণ বলপূর্ব্বক পথ পরিষ্কৃত করিলেন এবং রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সংবাদ সম্রাটের কর্ণে পৌছিলে তিনি রাঠোর-শিবির অবরোধের আদেশ দিলেন। সেনাপতি দুর্গাদাস ঔরংজেবের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন, সঙ্গে সঙ্গে উপায়ও আবিষ্কৃত হইল। রাঠোরবীর মুকুন্দ খীচী সাপুড়ের ছদ্মবেশে উপর নীচের দুই দুই ঝাঁপিতে দুইটী করিয়া গোখুরা সাপ রাখিয়া মাঝের দুইটী ঝাঁপিতে অজিত ও তাহার ছোট ভাইকে শোয়াইয়া যোড়া বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে দিল্লী হইতে পলায়ন করিলেন। দুইটী রাজপুত-শিশুকে রাজপুত্রের পরিচ্ছদে সাজাইয়া অপর একদল রাঠোর-শিবিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে দুর্গাদাস রাণীকে লইয়া দিল্লী ত্যাগ করিলেন। শিবির অবরোধ-কারীরা যখন এ সংবাদ শুনিল, সহসা বিশ্বাস করিতে পারিল না। সম্রাটের নিকট সংবাদ পাঠানো হইল। সম্রাট্ গোলমালে পড়িয়া শিবিরের সকলকেই বন্দী করিতে আদেশ দিলেন। রাঠোরগণ সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ দিল। শিশু দুইটী সম্রাট্-সকাশে নীত হইয়া রাজপুত্ররূপেই প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

দুর্গাদাস সন্ন্যাসী সাজিলেন, অজিত তাঁহার চেলা সাজিল। অজিতের ভ্রাতার মৃত্যু হইল। পরে তাঁহারা আবু পর্ব্বতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে দুর্গাদাসের জ্যেষ্ঠ সহোদর সোনিং, বিশ্বস্ত মুকুন্দ ও অপর কএকজন অনুচর। তাঁহারা নিভৃত কন্দরে অজিতকে লুকাইয়া সর্ব্বদা সজাগ রহিলেন। এদিকে অরাজক মারবাড়ে অন্তর্বিপ্লব দেখা দিল। সম্রাট্ সুযোগ খুঁজিতে-ছিলেন; তিনি মারবাড় আক্রমণ করিলেন। মন্দিরকে মসজিদে পরিণত করা হইল; হিন্দুকে মুসলমান করিবার জন্য কোন চেষ্টাই বাকী রহিল না। আগুন জ্বলিয়া উঠিল, রাঠোরের সঙ্গে শিশোদীয় আসিয়া যোগ দিল, পুষ্কর ক্ষেত্রের নিকট উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। সম্রাট্-সেনাপতি তাইবরের অধীনে সত্তর হাজার মুগল সৈন্য, তাহাদের সঙ্গে রণোন্মত্ত রাজপুত দলে দলে প্রাণ দিল। অবসর বুঝিয়া ঔরংজেব চিতোরের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। যশোবন্তের রাণী এবং দুর্গাদাস গিয়া রাণা রাজসিংহের আশ্রয় ভিক্ষা করিলে এবার আর রাণা নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না। রাজপুত-কুলতিলক রাজসিংহ স্বয়ং আসিয়া দোবারির গিরিসঙ্কটে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন, সম্রাটের গতি প্রতিহত হইল। পরাজিত সম্রাট্ তাঁহার বিপুল বাহিনী পুত্র অক্‌বর এবং সেনাপতি তাইবরের অধীনে মারবাড়ে পাঠাইলেন, মেবারেশ্বরের পুত্র ভীমসিংহও দুর্গাদাসের সঙ্গে মিলিত হইয়া মারবাড়রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। নাদোলের ভীষণ যুদ্ধে ভীমসিংহের মৃত্যু হইল।

অকবর পিতার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। রাজপুতের শৌর্য্য-বীর্য্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিল, তিনি দুর্গাদাসের সঙ্গে সন্ধি করিলেন। রাজপুতেরা তাঁহাকে দিল্লীর সম্রাট্ বলিয়া মানিয়া লইল। তাইবরও আসিয়া অক্‌বরের দলে যোগ দিলেন। কিন্তু সম্রাটের কূটবুদ্ধি রাজপুত ও মুগলে বিরোধ বাধাইয়া তুলিল, ভেদ ঘটাইয়া দিল। বেগতিক দেখিয়া দুর্গাদাস জ্যেষ্ঠ সোনিং ও মুকুন্দের উপর অজিতের ভার দিয়া এক হাজার বিশ্বস্ত অনুচর ও শাহ্‌জাদা অক্‌বরকে লইয়া দাক্ষিণাত্যের পথে প্রস্থান করিলেন। সম্রাট্ কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ করিলেন না, অবশেষে সোনিংএর বীরত্বে ব্যতিব্যস্ত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইলেন। অজিত সাতহাজারী মন্‌সবদার হইলেন, সোনিং অজমেরের শাসনকর্তৃত্ব পাইলেন। সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়া গেল। পরদিনই সোনিং মহাপ্রস্থান করিলেন। অনেকে বলেন, বিষ-প্রয়োগই সোনিংএর অকাল মৃত্যুর কারণ। সোনিংএর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সম্রাট্ সন্ধি ভাঙ্গিয়া দিলেন, যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এদিকে ঔরংজেবের প্রচার কার্য্যের ফলে অজিতের অস্তিত্বে লোকের সংশয় জাগিতে লাগিল। তখন প্রভুভক্ত রাজপুতগণ আপনাদের প্রভুকে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। হারাবংশী কুমার দুর্জ্জনশাল হাজার-অশ্বারোহী সঙ্গে দর্শনার্থিগণের নেতৃত্ব লইলেন। মুকুন্দের মনের সাধ পূর্ণ হইল, তিনি সকলকে লইয়া আবু-পর্ব্বতে পৌছিলেন এবং তাহাদের সমক্ষে কুমারকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। সমবেত-কণ্ঠের বিপুল জয়ধ্বনি আবু-পর্ব্বতের শিখরে শিখরে প্রতিধ্বনিত হইল। সর্দ্দারগণ বহু উপঢৌকন দিয়া অজিতের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। অতঃপর অজিত দলবলসহ অধীনস্থ সামন্তগণের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহাদের দেওয়া উপঢৌকন গ্রহণ করিতে করিতে পুষ্করে দুর্গাদাসের সঙ্গে সম্মিলিত হইলেন। যুদ্ধ চলিতেছিল। এখন অজিতসিংহ যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। প্রথম যুদ্ধে অজিতের সেনাপতি পরাজিত হইলেও দ্বিতীয় যুদ্ধে অজিত জয়লাভ করেন। ইহার

কিছুদিন পরে (১৭৫০ বিক্রম-সংবতে) মেবারের রাণার ভ্রাতা গজসিংহের কন্যার সহিত অজিতের বিবাহ হয়। ১৭৫৭ বিক্রম-সংবতে অজিতসিংহ পৈতৃক রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন। তবে এ সৌভাগ্য তাঁহার বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। কুমার আজিম যোধপুর অধিকার করিলে অজিত ঝালোরে চলিয়া যান। কিন্তু আজিম অধিক দিন যোধপুর দখলে রাখিতে পারিলেন না। অল্পদিনের মধ্যেই অজিত পুনরায় যোধপুর অধিকার করিয়া লইলেন। এই বর্ষেই পুত্র অভয়সিংহের জন্ম হয়।

ঔরংজেব যোধপুর জয়ের সংবাদ শুনিয়া সসৈন্যে অজমেরের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। এদিকে রাঠোরগণও জীবনপণে অজমের রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অবস্থা বুঝিয়া সম্রাট্ সন্ধি-বন্ধনের প্রস্তাব পাঠাইলেন। পরে অজিতসিংহ সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তিনি অজিতসিংহকে 'তেগ বাহাদুর' উপাধি ও ফরমান্ দিলেন। কিন্তু যোধপুরের উপর তাঁহার লোলুপদৃষ্টি ছিল। সুতরাং এদিকে যখন সদালাপ এবং সৌজন্যের আদান-প্রদান চলিতেছিল, ওদিকে তখন মৈরব খাঁ ও মুহকিম-খাঁ সম্রাটের আদেশে যোধপুরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। যোধপুর অধিকৃত হইল, সম্রাট্ও কালবিলম্ব না করিয়া অজিত-সিংহ ও অম্বরপতি জয়সিংহকে লইয়া দাক্ষিণাত্যে অভিযান করিলেন। অজিত ও জয়সিংহ সমস্ত বুঝিতে পারিয়াও সুযোগের অভাবে নীরব রহিলেন। কিন্তু সুযোগ মিলিতেও বিলম্ব ঘটিল না। সম্রাট্ যে সময়ে সসৈন্যে নর্ম্মদানদী উত্তীর্ণ হইলেন, ইঁহারা সেই অবসরে স্বীয় সৈন্যগণসহ রাজবাড়ার পথ ধরিলেন। স্বদেশে ফিরিয়াই প্রথমে মেবারপতি রাণা অমরসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং অবশেষে মারবাড়ে আসিয়া পৌঁছিলেন। ত্রিশহাজার রাঠোরসৈন্য যোধপুর অবরোধ করিল; মৈরব খাঁ মানে মানে সরিয়া পড়িলেন। অজিত রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর অজিত ও জয়সিংহ অজমের অধিকারপূর্ব্বক অম্বর অধিকারে কৃতসংকল্প হইলেন। যুদ্ধে মুগল-সেনাপতি নিহত হইলে অম্বর জয়-সিংহের হস্তগত হইল। এই সময় রঘুনাথভাণ্ডারী অজিতের মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হন। ইহার পর অজিত নাগর আক্রমণ করিলে নাগরের শাসনকর্ত্তা ইন্দ্রসিংহ অজিতের বশ্যতা স্বীকার করেন। অপমানিত ইন্দ্রসিংহের উত্তেজনায় সম্রাট্ পুনরায় অজিতের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। অম্বর ও মারবাড়ের সম্মিলিত বাহিনী সম্রাটের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে, সম্রাট্ বাধ্য হইয়া অবশেষে উভয় রাজাকে স্ব স্ব রাজ্যের জন্য সনদ প্রদান করিয়া মিষ্টমুখে বিদায় দিলেন। অজিত যোধপুরে ফিরিয়া পুনরায় বিবাহ করিলেন। তৎপরে তিনি কুরুক্ষেত্রে গমন করেন ও এই বৎসরই সম্রাটের আদেশে হিমালয়ের শিবালিক পর্ব্বতের বিদ্রোহী সামন্তদিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে পরাজিত করেন। তৎপরে তিনি জাহ্নবীসলিলে স্নান করিয়া যোধপুরে উপনীত হইলেন।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ঔরংজেব দেহত্যাগ করেন। এ সম্বন্ধে রাজপুতানায় একটী গাথা প্রচলিত আছে। দূত গিয়া অজিতকে সম্রাটের মৃত্যুসংবাদ দিলে অজিত বলিয়াছিলেন—

"আইয়ো খবর অচিন্ত্যারী মিট গীয়ো তনরী দাহ।
কসীদা ইম ভাখীও মর গীও আওরঙ্গ শাহ্॥"

অর্থাৎ অচিন্তিত সংবাদ আসিল, গায়ের জ্বালা মিটিল, দূত বলিতেছে আওরঙ্গ শাহের মৃত্যু হইয়াছে।

অতঃপর দিল্লীর ময়ূর-সিংহাসন লইয়া সম্রাটের দুই পৌত্র আজিমুশ্শান ও মুইজুদ্দীনের মধ্যে যুদ্ধ, যুদ্ধে আজিমের মৃত্যু, মুইজুদ্দীনের বাহাদুর শাহ্ উপাধিসহ সিংহাসনে আরোহণ, সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়ের অভ্যুদয়, মুইজুদ্দীনের পরলোক, ফরুখ্সিয়রের সাম্রাজ্যপ্রাপ্তি, ভারতের রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে পর পর অনেক ঘটনাই ঘটিয়া গেল। সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয় অজিতকে আদেশ করিলেন, জ্যেষ্ঠপুত্র অভয়সিংহকে একদল সৈন্যসহ দিল্লীতে থাকিতে হইবে। অজিত অসম্মত হইলে মুগল-সৈন্য যোধপুর আক্রমণ করিল। অজিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন, এবার আর অভয়সিংহকে দিল্লীতে পাঠাইয়াই অব্যাহতি মিলিল না, ফরুখ্সিয়রের সঙ্গে কন্যারও বিবাহ দিতে হইল। ফলে অভয় হইলেন পাঁচহাজারী মনসবদার, আর অজিতসিংহ হইলেন গুজরাতের শাসনকর্ত্তা। গুজরাত শাসন করিতে গিয়া তাঁহাকে বহু যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। গুজরাতের পথে ঝালোরে বর্ষাকাল কাটাইয়া তিনি পলান্-পুরে ফিরোজখাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন এবং থরাডের রাজার নিকট লক্ষমুদ্রা উপঢৌকন লাভ করিলেন। অতঃপর কাম্বে, কোলি, নবনগর প্রভৃতি রাজ্যের রাজাকে সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করাইলেন। গুজরাত-শাসনের ব্যবস্থা করিয়া দ্বারকাতীর্থে পূজা দিয়া অজিত বিজয়-গৌরবে যোধপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

মুগল-রাষ্ট্রবিপ্লবে অজিতসিংহ সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। দিল্লী গিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলে সম্রাট্ অজিতকে সাতহাজারী মন্সবদারের পদ প্রদান করেন। কিন্তু সম্রাটের কোন অনুগ্রহই তাঁহাকে সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়ের বন্ধুত্ব-বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিল না। এই সময়ে সম্রাট্ সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়ের আচরণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন

গোপনে তিনি তাঁহাদের হত্যার ষড়্‌যন্ত্র করিতেছিলেন, ফলে উল্টা ফল ফলিল। সম্রাটের বিশ্বস্ত সেনাপতি অম্বরপতি জয়সিংহকে কৌশলে দূরে সরাইয়া অজিতের সাহায্যে সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয় দিল্লীর প্রাসাদ অধিকার করিলেন। সম্রাট্ তিরস্কৃত হইলেন এবং তৎপর দিন স্বর্গীয় বাহাদুর শাহের পৌত্র রফিউদ্‌দরাজৎ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। কএকজন আফগান ফরুখ্‌সিয়রকে অন্তঃপুর হইতে টানিয়া আনিয়া তাঁহার দুইটী চক্ষু নষ্ট করিয়া এক অন্ধকার কারাকক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। ইহার দুইমাস পরে এই হতভাগ্য সম্রাট্ সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়ের আদেশে অতি নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইয়াছিলেন। অনেকে অজিতকে এই পাপের অংশভাগী করেন এবং বলেন যে, এই পাপেই পুত্রহস্তে অজিতের মৃত্যু হইয়াছিল।

সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে সঙ্গে অজিতেরও প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হয়। তিনিও দিল্লী সিংহাসনের অন্যতম কর্ণধার হইয়া উঠেন। তাঁহারই পরামর্শে জিজিয়া কর রহিত হয়। ফরুখ্‌-সিয়রের মৃত্যুর পর অজিতসিংহ আপন বিধবা কন্যাকে তাহার যাবতীয় অর্থ ও অলঙ্কারসহ যোধপুরে লইয়া যান। ঐতিহাসিকগণ বলেন, নগদ অর্থ ও অলঙ্কারাদির মূল্যের পরিমাণ প্রায় কোটী টাকার উপর হইবে। কন্যাকে হিন্দুর পোষাক পরাইয়া মুসলমান বাঁদীদের বিদায় দিয়া তিনি সম্রাট্-অন্তঃপুর হইতে গৃহে লইয়া গেলেন। এইভাবে ইস্‌লামের অপমান করিতে ইতিপূর্ব্বে আর কেহ সাহস করেন নাই বলিয়া মুসলমান ঐতিহাসিকগণ আক্ষেপ করিয়াছেন।

সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যু হইল। মুহম্মদ শাহ্ সম্রাট্ হইলেন। অজিত স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। তারাগড়, শম্বর হ্রদ প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া তিনি স্বাধীন নরপতির অনুরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বত্র মুসলমান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বন্ধ করিয়া দিলেন। সম্রাট্ সেনাপতি মুজঃফরকে অজিতের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। অজিত স্বীয় পুত্র অভয়কে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। অভয় শাহ্‌জহানপুর আক্রমণ, নার্নৌল লুণ্ঠন ও পট্টনের উপর কর স্থাপনপূর্ব্বক মুগলসৈন্যকে আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তুলিলেন। এইবার সম্রাট্ জয়সিংহ, হায়দার কুলী ও ইরাদৎ খাঁর অধীনে এক বিপুল বাহিনী প্রেরণ করিলেন। অবস্থা বুঝিয়া অভয় জয়সিংহের পরামর্শে সন্ধির প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। অজমের মুগলহস্তে প্রত্যর্পিত হইল। অভয় দিল্লীর দরবারে সসম্মানে গৃহীত হইলেন। এই সময় ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে অজিতসিংহ পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর কোন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস মিলে না। অনেকে সন্দেহ করেন—যুদ্ধ জয়, দিল্লীর দরবারে সম্মান প্রভৃতি অভয়কে লুব্ধ করিয়াছিল এবং তাঁহারই চক্রান্তে অজিত নিহত হন।

অজিতসিংহের জীবন রাজপুত ইতিহাসের এক গৌরব-জনক অধ্যায়। অজিত নির্ভীক, উদার, উদ্যমশীল এবং শৌর্য্য-সম্পন্ন ছিলেন। সমসাময়িক রাজনীতিতে অনুরূপ নৈপুণ্য থাকিলে তিনি মুগল সাম্রাজ্যের গতি ভিন্নপথে চালিত করিতে পারিতেন। সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে সখ্য, জামাতা ফরুখ্‌-সিয়রের হত্যা প্রভৃতির মূলে কতখানি মুসলমান বিদ্বেষ অথবা অর্থলোলুপতা ছিল, ঐতিহাসিকগণ তাহার বিচার করিবেন। অজিত-চরিত্রের অন্যতম কলঙ্ক—দুর্গাদাসের নির্ব্বাসন। বাল্যে রক্ষক, কৈশোরে শিক্ষক, যৌবনে পরিচালক, প্রভুভক্ত, বিশ্বাসী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, বীর দুর্গাদাস—অজিত তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করেন। ইহার রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা যতই গুরুতর হউক, মনুষ্যত্বের দিক হইতে এ অপরাধ অমার্জ্জনীয়।

অজিতসিংহ$_{২}$—গোয়ালিয়র রাজ্যের অধীন রঘুগড় রাজ্যের এক রাজা। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের সন্ধি-সর্ত্তানুসারে অজিতসিংহ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে রঘুগড়ের শাসনভার প্রাপ্ত হন। ইনি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইঁহার পরে জয়মণ্ডলসিংহ রঘু-গড়ের গদী প্রাপ্ত হন।

অজিতসিংহ$_{৩}$—পঞ্জাবের কাংড়া জেলার অন্তর্গত কুলু নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের এক রাজা। ইনি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে শিখদিগের অত্যাচারে শিমলা হিল্ ষ্টেটের সাঙ্‌রি রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তদবধি কুলুরাজ্য ইঁহার হস্তচ্যুত হয়।

অজিতসিংহ$_{৪}$—কোটার এক রাজা। রাজা দুর্জ্জনশালের পরে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইনি কোটার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎপরে ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ছত্রশাল ইঁহার স্থলাভিষিক্ত হন।

অজিতসিংহ$_{৫}$ (ঠাকুর অজিতসিংহ)—উদয়পুরের অসীন্ধ রাজ্যের রাবৎবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই রাবৎগণ চন্দাবৎ রাজপুতশাখা হইতে উদ্ভূত। অজিতসিংহ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

অজিতসিংহ$_{৬}$—১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে মুগলসম্রাট্ কর্ত্তৃক ইনি পঞ্জাবের বল্লভগড় রাজ্যের রাজা মনোনীত হন। ইঁহার পুত্র বাহাদুর-সিংহ বল্লভগড় শহর নির্ম্মাণ করেন।

অজিতসিংহ$_{৭}$—বুন্দীর এক রাজা। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার পিতা মহারাও উমেদসিংহ সিংহাসন ত্যাগ করিলে ইনি রাজা হন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ইনি শিকারকালে ভ্রম-ক্রমে উদয়পুরের রাণা অরিসিংহের বন্দুকের গুলিতে নিহত হন। প্রবাদ, বহুবর্ষ পূর্ব্বে এক সতী সহমরণের সময় শাপ দিয়া যান যে, রাও (বুন্দীরাজ) ও রাণা (উদয়পুররাজ) একত্র শিকারে গমন

করিলে তাঁহাদের একজন শিকারে নিহত হইবেন। অজিত-সিংহের পর তৎপুত্র বিষণসিংহ বুন্দীর রাজা হন।

অজিতসিংহ৮—মহারাজ শেরসিংহের হত্যাকারী এক শিখ-সর্দ্দার। অজিতসিংহ শিখ সর্দ্দার ধ্যানসিংহকে নিহত করিলে, তৎপুত্র হীরাসিংহ ইঁহাকে বন্দী করিয়া হত্যা করেন (১৮৪৩ খৃঃ)।

অজিতসিংহসূরি—এক জৈন গ্রন্থকার। ইনি রাজা সমর-সিংহকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। সংবৎ ১২৮৩ অব্দে দদা নামক গ্রামে জিনদেবের ঔরসে ও জিনমতীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি সংবৎ ১২৯১ অব্দে দীক্ষা, সংবৎ ১৩১৪ অব্দে সুরি-পদ, সংবৎ ১৩১৬ অব্দে গচ্ছ-পদ ও সংবৎ ১৩৩৯ অব্দে স্বর্গ লাভ করেন। ইঁহার গুরুর নাম সিংহপ্রভ।

অজিতসেন—এক জৈন ধর্ম্মাচার্য্য। ইনি 'অলঙ্কার-চিন্তামণি' ও যক্ষবর্ম্মা-বিরচিত চিন্তামণি গ্রন্থের 'চিন্তামণি-প্রকাশিকা' নাম্নী টীকা রচনা করেন। ইনি অজিতসেনাচার্য্য নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন।

অজিতা১—(স্ত্রী) দেবীবিশেষ। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ইঁহার গর্ভে রুচির পুত্ররূপে অজিতদেবগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। [অজিত৩ দ্র°]

অজিতা২—(স্ত্রী) শক্তিমন্দিরে দেবীর অনুচরী দ্বারপালিকা এবং দেবীর অষ্ট নায়িকার অন্যতমা। প্রথমে জয়া ও বিজয়া, তৎপরে অজিতা ও অপরাজিতা দেবীর রক্ষিকারূপে বিরাজমানা।

"অজিতা বাম পার্শ্বে চ দক্ষিণে চাপরাজিতা।"

(চণ্ডীকবচ)

দাক্ষিণাত্যের একটী গৌরীমন্দিরে অজিতার একহস্তে অভয়মুদ্রা ও অপরহস্তে পদ্ম আছে। "অভয়াম্বুজপাশদৈওরজিতা চাপরাজিতা।" (রূপমণ্ডন) [অষ্টনায়িকা দ্র°]

অজিতা৩—(স্ত্রী) দেবতাবিশেষ। ইঁহার পূজা পঞ্চরাত্র মতানুযায়ী বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। মণ্ডলে ইঁহার স্থান পশ্চিমদিকে। অহির্বুধ্নসংহিতায় প্রদত্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায়, ইনি পীতবর্ণা।

অজিতা৪—(স্ত্রী) জৈনদিগের দেবতাবিশেষ। ইনি যক্ষিণী বলিয়া পরিচিত। জৈনদিগের দেবসঙ্ঘে নানা যক্ষ ও যক্ষিণী আছে এবং নামগুলি দেখিলে মনে হয় যে, জৈনেরা হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবতাদিগকে যক্ষ ও যক্ষিণী নামে অভিহিত করিতেন। অজিতাও একজন যক্ষিণী এবং বোধ হয় ইনি প্রথমতঃ হিন্দুদের দেবতা ছিলেন, পরে জৈন দেবসঙ্ঘে ইঁহার প্রবেশলাভ ঘটে।

নির্ব্বাণ-কলিকায় (প. ২০, ৩৪) ইঁহার দুইটী ধ্যান আছে। তন্মধ্যে প্রথমটী এইরূপ যথা, "অজিতাভিধানাং যক্ষিণীং গৌরবর্ণাং লোহাসনাধিরূঢ়াং চতুর্ভুজাং বরদপাশাধিষ্ঠিত-দক্ষিণ-করাং বীজপুরকাঙ্কুশযুক্ত-বামকরাঞ্চ।"

অর্থাৎ, অজিতা যক্ষিণী গৌরবর্ণা, লৌহাসনে সমাসীনা এবং চতুর্ভুজা। ইঁহার দক্ষিণভুজদ্বয়ে বরদমুদ্রা ও পাশ এবং বামকরদ্বয়ে বীজপুর এবং অঙ্কুশ।

দ্বিতীয় ধ্যানটী হইতে বুঝা যায়, অজিতার স্থান মণ্ডলে র পশ্চিমদ্বারে এবং তাঁহার চারিটী হস্তে যথাক্রমে অভয়মুদ্রা, পাশ, অঙ্কুশ ও মুদ্গর। ইহাই অজিতার দ্বিতীয়রূপ বলিয়া পরিকল্পিত হইয়াছে।

অজিতাগম—শৈবাগমভেদ। পঞ্চমুখ শিবের পশ্চিম বা 'সদ্যোজাত' মুখনির্গত পঞ্চাগমের অন্যতম। এই পশ্চিমমুখী শিবের নাম ব্রহ্মা।

অজিতাত্মন্—(ত্রি) [ন জিতঃ অজিতঃ আত্মা যস্য সঃ; বহুব্রী] যাহার আত্মা বা মন অজিত, অজিতেন্দ্রিয়।

"অতস্তু বিপরীতস্য নৃপতেরজিতাত্মনঃ।" (মনু ৭.৩৪)

অজিতাপীড়—(পুং) কাশ্মীরের কর্কোটকবংশীয় একজন রাজা। ইনি বিখ্যাত সম্রাট্ ললিতাদিত্যের প্রপৌত্র, বজ্রাদিত্যের পৌত্র এবং ত্রিভুবনাপীড়ের পুত্র। ত্রিভুবনাপীড় ছিলেন বজ্রাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কিন্তু তিনি ষড়্‌যন্ত্র ও কূটনীতি ভালবাসিতেন না বলিয়া বজ্রাদিত্যের পর রাজা হইতে পারেন নাই। তাঁহার পরিবর্ত্তে চিপ্পট জয়াপীড় (উপাধি বৃহস্পতি) কাশ্মীরের রাজা হইলেন (৮২৬-৩২ খৃঃ)। জয়াপীড়ের মৃত্যু হইলে উৎপল নামে তাঁহারই এক মাতুল বলপূর্ব্বক অজিতা-পীড়কে কাশ্মীরের সিংহাসনে বসাইলেন। অজিতাপীড় ত্রিভুবনাপীড়ের ঔরসে তদীয় পত্নী জয়াদেবীর গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করেন।

জয়াপীড়ের পাঁচজন মাতুল; তাঁহাদের নাম যথাক্রমে পদ্ম, উৎপল, কল্যাণ, মর্ম্ম এবং ধর্ম্ম। ইঁহাদের অনুগ্রহেই অজিতাপীড় সিংহাসন লাভ করেন। রাজস্বের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ তাঁহারা তাঁহার উপজীবিকাস্বরূপ দান করিতেন এবং ইহাই তাঁহার জীবন ধারণের একমাত্র সম্বল ছিল। তদুপরি রাজাকে সদাসর্ব্বদা ইঁহাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। রাজস্বের অধিকাংশই মাতুলগণ আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতেন এবং তদ্দ্বারা নগর, মন্দির এবং অপরাপর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেন।

ইঁহারা আবার পরস্পর বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন। ইহারই ফলে মর্ম্ম এবং উৎপলের মধ্যে ভীষণ বিরোধ বাধে। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধে এত লোকের মৃত্যু হয় যে, মৃতদেহদ্বারা বিতস্তা নদীর স্রোত বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া কবি শঙ্কুক 'ভুবনাভ্যুদয়' নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। এই যুদ্ধে বিজয়লক্ষ্মী মর্ম্মের পুত্র যশোবর্ম্মার অঙ্কশায়িনী হন। যুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়া মর্ম্ম অজিতাপীড়কে সিংহাসনচ্যুত

করেন এবং দ্বিতীয় সংগ্রামাপীড়ের পুত্র অনঙ্গাপীড়কে কাশ্মীরের রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। ৮৫০ খৃষ্টাব্দে অজিতাপীড়ের রাজত্বের অবসান হয়।

অজিতেন্দ্রিয়—(ত্রি) ইন্দ্রিয়ের বশীভূত, জিতেন্দ্রিয় নহে।

অজিতোদয়—বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতায় বুদ্ধকথিত সুপ্রিয় ও সুভদ্রের উপাখ্যান প্রসঙ্গে উল্লিখিত এক নগরী। রাজা বিজয়ন্ত্র এই নগরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার প্রজাগণ অতিশয় ধার্ম্মিক ছিল। মৃত্যুর পর তাহারা দলে দলে স্বর্গে গমন করিতে লাগিল। রাজা বিজয়ন্ত্রের ধার্ম্মিকতা পরীক্ষার জন্য ইন্দ্র এক ভিক্ষুককে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। ঐ ভিক্ষুক রাজার দেহ হইতে ক্রমাগত মাংসভিক্ষা করিতে লাগিল। রাজা স্বীয় মাংস দান করিতে করিতে অবশেষে কঙ্কালে পরিণত হইলেন।

অজিদরিয়া—মধ্য এসিয়ার রুষাধিকৃত কাস্পীয় সাগরের অন্তর্গত একটী উপসাগর। ইহা কুলিদরিয়া ও কারা-বোঘজ নামেও কথিত হয়।

অজিন—(ক্লী) [বীয়তে ক্ষিপ্যতে রজ আদি অনেন, ইতি অজ-ইনচ্ ন ব্যাদেশঃ] চর্ম্ম। মৃগ, রুরু ও অজ এই পশুত্রয়ের অজিন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণের যথাক্রমে ধারণীয়। "ঐণেয়েনাজিনেন ব্রাহ্মণং রৌরবেণ ক্ষত্রিয়মাজেন বৈশ্যং।"
(আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র ১.১৬)

অজিন ব্রহ্মচারী, যোগী ও তাপসদিগের পরিধেয়। "অথাজিনাষাঢ়ধরঃ।" (-কুমার° ৫.৩০) রাম অজিনপরিবৃত হইয়া বনে বাস করেন। "বল্কলাজিনসংবৃতঃ।" (গো° রামা° ১.১.৩৪) অজিন আসনেও ব্যবহার্য্য। "চেলাজিন-কুশোত্তরং।" (গীতা ৬.১১) মনু বলিয়াছেন, অবকীর্ণ পাপে গর্দ্দভাজিন পরিয়া স্বকৃত পাপ খ্যাপনপূর্ব্বক সপ্ত গৃহে ভিক্ষা করিবে। (মনু ১১.১২৩) অমরকোষ-মতে অজিন—মৃগচর্ম্ম।

অজিন,—(পুং) রাজবিশেষ। ইনি মনুবংশীয় নরপতি হবির্দ্ধানের ঔরসে ও তাঁহার পত্নী আগ্নেয়ী ধীষণার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (হরিবংশ ও বিষ্ণুপু°)

অজিন৩—(পুং) বুদ্ধ। ভাগবতে লিখিত আছে, বিষ্ণু দৈত্যদিগকে ছলনা করিবার জন্য বুদ্ধ নামে কীকটনগরে জিনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীধরস্বামী ভাগবতের টীকায় লিখিয়াছেন, জিন ও অজিন একই ব্যক্তির নাম এবং কীকটনগর গয়ার অন্তর্ভুক্ত।

অজিনপত্রা—(স্ত্রী) [অজিনং চর্ম্ম তদ্রূপে সুশ্লিষ্টে পত্রে পক্ষৌ যস্যাঃ সা ; বহুব্রী] পক্ষিবিশেষ। যাহার পক্ষ চর্ম্মের মত ; চাম্‌চিকা।

অজিনপত্রিকা—(স্ত্রী) চর্ম্মচটী, বাদুড়, চাম্‌চিকা। (হেম) ২ পেচক।

অজিনপত্রী—(স্ত্রী) জতুকা। চাম্‌চিকা। (রাজনি°) বৈদ্যক গ্রন্থে ইহাকে চর্ম্মচটী, বাদুড় ও চাম্‌চিকা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু বাদুড় ও চাম্‌চিকা এক জাতীয় হইলেও উভয়ের প্রভেদ আছে। [বাদুড়, চাম্‌চিকা দ্র°]

অজিনফলা—(স্ত্রী) [অজিনমিব চর্ম্মবিকারত্বাৎ ভস্ত্রা ইব ফলং যস্যাঃ জাতিলক্ষণং ঙীপং বাধিত্বা অজাদি° টাপ্] [বৈদ্যক] ভস্ত্রাকার ফলশালী বৃক্ষ। চলিত টেঁপারী।

অজিনযোনি—(পুং) হরিণ। "হরিণা অমী অজিনযোনয়ঃ"। (অমর)

অজিনবাসিন্—(ত্রি) অজিনাবৃত হইয়া বিচরণকারী। বিশ্বজিৎ প্রভৃতি যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দান করিয়া অজিনবাস ধারণ করিতে হয়। "তৎসর্ব্বং দত্ত্বাজিনবাসী চরতি।" (শতপথব্রা° ৩.৯.১.১২) 'সর্ব্বং ব্রাহ্মণেভ্যো দত্ত্বা অজিনবাসী অজিনমাচ্ছাদ্য সঞ্চরতি।' (সায়ণ)

অজিনসন্ধ—(পুং) চর্ম্মকার।

অজিনূর—ককেশস্ পর্ব্বতের সানুদেশস্থ একটী বিশাল তৃণভূমি। এখানে ভ্রমণশীল জাতিরা গবাদি লইয়া বাস করে।

অজির,—(ক্লী) [অজ-কিরন্, ন ব্যাদেশঃ] চত্বর, প্রাঙ্গণ, চলিত উঠান। (ত্রি) ২ গমনশীল। (ঋক্ ১.১৩৪.৩ ; ১.১৪০.৪) ৩ শীঘ্র গমনশীল। "শ্যেনা অজিরাঃ।" (তাণ্ড্যব্রা°) 'অজিরাঃ ক্ষিপ্রগমনশীলাঃ।' (সায়ণ) (পুং) ৪ বায়ু। ৫ মণ্ডূক, ভেক। [অজন্তি ইন্দ্রিয়াণি গচ্ছন্ত্যত্র] ৬ বিষয়। (ক্লী) ৭ শরীর। ৮ ক্রীড়াস্থান। "ব্যালোলূকশিবাজিরং।" (ভাগবত ১.৬.১৪) 'ব্যালাদীনামজিরং ক্রীড়াস্থানং।' (শ্রীধর)

অজির২—(পুং) একজন ঋষি। ইনি সর্পকুলের পুরোহিত ছিলেন। পঞ্চবিংশ-ব্রাহ্মণে (২৫.১৫) ইঁহার উল্লেখ দেখা যায়।

অজির৩—(পুং) দেবভেদ। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ইনি একজন সোমপায়ী দেবতা ছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ডপু°)

অজিরবতী—(স্ত্রী) [অজির-মতুপ্ মস্য বঃ, অজিরাদিত্বাৎ দীর্ঘাভাবঃ, স্ত্রিয়াং ঙীপ্] একটী নদী। পাণিনি বলিয়াছেন, এই নদীতীরে শ্রাবস্তী নগরী ছিল। (পা ৬.৩.১১৯) সম্ভবতঃ ইহা অচিরবতী নদীর নামান্তর। [অচিরবতী দ্র°]

অজিরশোচিস্—(পুং) [অজিরং ক্ষিপ্রগামি শোচিঃ তেজো যস্য] ক্ষিপ্রগতিশীল তেজঃসম্পন্ন অগ্নি। (ঋক্ ৮.১৯.১৩)

অজিরা১—(স্ত্রী) বেগবতী নদী। (নিরুক্ত) ২ চণ্ডী, দুর্গা।

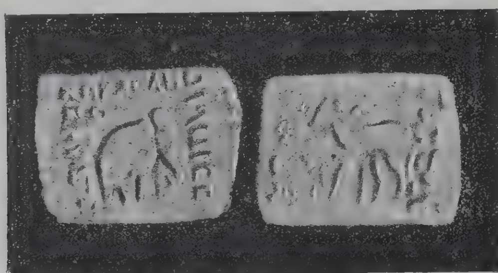
অজিরা২—ইঁহার পুত্র মহর্ষি পবিত্র ঋগ্বেদের (ঋক্ ৯.৮৩) একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

অজিরাদি—[অজির আদৌ যেষাং] পাণিন্যুক্ত অজিরাদিগণ মধ্যে পঠিত শব্দসমূহ। পাণিনি বলিয়াছেন, বহু অচ্ শব্দের পর মতুপ্ প্রত্যয় থাকিলে সংজ্ঞা-বিষয়ে মতুপের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর দীর্ঘ হয়। কিন্তু অজিরাদি শব্দের স্বর দীর্ঘ হয় না। অজিরাদি যথা—অজির, খদির, পুলিন, হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক।

অজিরাধিরাজ—(পুং) ক্ষিপ্রগতিশীল অধিপতি মৃত্যু এবং নিঋর্তি। (অথর্ব্ব ৭.৭১.৩)

অজিরাস্—(ত্রি) গমনশীল। (ঋক্ ১:১৪০:৪)

অজিলিজেস—১ম অজেসের পরবর্ত্তী রাজা। সিস্তান এবং কান্দাহারে যখন পহ্লবরাজ বোনোনেস রাজত্ব করিতেছিলেন,



অজিলিজেসের মুদ্রা

সম্ভবতঃ সেই সময়েই অজিলিজেস ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলস্থ তক্ষশিলায় সিংহাসনারূঢ় ছিলেন। [অজেস (১ম) দ্র°]

অজিশক—যবদ্বীপে প্রচলিত প্রবাদ যে, স্থানীয় ১ম অব্দে (অনুমান ৭৫-৭৮ খৃষ্টাব্দে) পূর্ব্বভারত হইতে বহু লোক যবদ্বীপে গমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইহাদের অধিনায়কের নাম ছিল অজিশক।

অজিষ্ঠ—(পুং) চাক্ষুষ মন্বন্তরীয় পৃথুকগণের অন্যতম। (ব্রহ্মাণ্ড-পু°, ৬২.৬২) [অজিত$_৪$ দ্র°]

অজিস্থু (অদ্‌জিস্থু)—পশ্চিম আফ্রিকার অসান্তি প্রদেশ-বাসী এক জাতি। ইহারা আপনাদের সর্দ্দারের অধীন; কিন্তু কুমাশীর রাজাকে আপনাদের রাজা বলিয়া স্বীকার করে।

অজিহ্ম$_১$—(ত্রি) [হা-মন্ দ্বিত্ব, অকার-লোপ, সন্‌বৎ প্রক্রিয়া, 'অ'-স্থানে ইঃ, জিহ্মঃ। ন জিহ্মঃ; নঞ্-তৎ] অকুটিল, সরল, অবক্র। (মনু ৩.২৪৬) ২ অমন্দ। (পুং) ৩ ভেক।

অজিহ্ম$_২$—(পুং) স্বারোচিষ মন্বন্তরের পারাবতগণোক্ত দেবতা-ভেদ। স্বারোচিষ মন্বন্তরের দেবতা তুষিত এবং বিদ্বান্ পারাবত। ক্রতু হইতে তুষিতার গর্ভে পারাবত ও ছন্দোজগণোক্ত পুত্রগণ জন্ম পরিগ্রহ করেন। প্রচেতা, বিশ্বদেব, সমঞ্জ, বিশ্রুত, অজিহ্ম, অরিমর্দ্দন, অজিহ্মান প্রভৃতি দ্বাদশজন পারাবতগণভুক্ত। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৬২.১২-১৩)

অজিহ্মগ—(পুং) [অজিহ্মং সরলং গচ্ছতি, অজিহ্ম-গম্-ড] বাণ। "রুক্মপুঙ্খা অজিহ্মগাঃ।" (রামা° ৬.৭০.১৬) (ত্রি) ২ সরলগামী। "ব্রজেদ্দিশমজিহ্মগঃ।" (মনু ৬.৩১)

অজিহ্মগামিন্—(ত্রি) সরলগমনশীল, ঋজুগামী। "অজিহ্ম-গামিভিঃ।" (মাঘ ১.৬৩)

অজিহ্মা—(স্ত্রী) [ন জিহ্মা; নঞ্-তৎ] অকুটিলা, অপাপবিদ্ধা, পাপরহিতা। মনু বলিয়াছেন, গৃহাশ্রমে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোচিত অজিহ্ম জীবিকার অনুষ্ঠান করিবেন।

"অজিহ্মামশঠাং শুদ্ধাং জীবেদ্‌ব্রাহ্মণজীবিকাং।" (মনু ৪.১১) 'অজিহ্মাং মৃষাত্মগুণবর্ণনাদি-পাপরহিতাং।' (কুল্লূক)

অজিহ্মান—(পুং) পারাবতগণোক্ত দেবতাভেদ। [অজিহ্ম$_২$ দ্র°]

অজিহ্ব—(পুং) [নাস্তি জিহ্বা যস্য; বহুব্রী] ভেক। চলিত ব্যাঙ্। ভেকের জিহ্বা নাই। কেন নাই?—সে সম্বন্ধে মহাভারতে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—

এক সময় অগ্নি অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। দেবতারা তাঁহার সন্ধান লইতেছিলেন। একটা ভেক রসাতল হইতে উঠিয়া দেবগণকে সংবাদ দিল, অগ্নি রসাতলে আছেন। অগ্নির তাপে অতিষ্ঠ হইয়া আমরা ভূতলে আসিয়াছি। আপনারা যদি অগ্নিকে দেখিতে চান, তাহা হইলে রসাতলে যান।

ভেক এই বলিয়া অগ্নির ভয়ে সত্বর পলায়ন করিল। অগ্নি বুঝিলেন, ভেকের পিশুনতার জন্যই দেবতারা আমার সন্ধান পাইয়াছেন। ইহা স্থির করিয়া অগ্নি ভেককেই অভিশাপ দিলেন; বলিলেন—'ভেকের কোন রসাস্বাদ লইবার ক্ষমতা থাকিবে না।' দেবতারা এই শাপ-সংবাদ শুনিয়া ভেকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া বলিলেন, 'অগ্নিশাপে অজিহ্ব বা জিহ্বাহীন হইয়া রসাস্বাদের ক্ষমতা হারাইলেও বিবিধ শব্দ উচ্চারণে তোমাদের কোনই অসুবিধা হইবে না। তোমরা গর্ত্তে থাকিয়া নিরাহারে অচেতন বা মৃতপ্রায় শুষ্ক হইয়া গেলেও ভূমি তোমাদিগকে রক্ষা করিবে এবং নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতেও তোমরা বিচরণ করিতে পারিবে। (মহাভারত, অনুশাসন°, ৮৫ অ°) (ত্রি) ২ জিহ্বাশূন্য, রসনাহীন।

অজীকব—(পুং-ক্লী) হরধনু। [অজকব দ্র°]

অজীগর্ত্ত$_১$—(পুং) [অজ্যৈ গমনায় গর্ত্তমস্য] সর্প।

অজীগর্ত্ত—(পুং) শুনঃশেফের জনক জনৈক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ইনি ক্ষুৎপীড়িত হইয়া নিজ পুত্র শুনঃশেফকে বিক্রয় করেন। এরূপ করায় মনুর মতে তিনি পাপলিপ্ত হন নাই।

"অজীগর্ত্তঃ সুতং হন্তুমুপাসর্পদ্‌বুভুক্ষিতঃ।
ন চালিপ্যত পাপেন ক্ষুৎপ্রতীকারমাচরন্॥" (মনু ১০.১০৫)

ঐতরেয়ব্রাহ্মণে ইঁহার এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—রাজা হরিশ্চন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন। সে কারণ তিনি বরুণদেবের কাছে

এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, দেবপ্রসাদে যদি তাঁহার সন্তান জন্মে, তবে প্রথম পুত্রটী তিনি বরুণের কাছে বলি দিবেন। হরিশ্চন্দ্রের সন্তান হইল, তাহার নাম রোহিত রাখিলেন। পূর্ব্ব হইতে প্রতিজ্ঞা ছিল, তাই বরুণ সন্তানটী চাহিলেন। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র এখন পুত্রের মায়ায় ঠেকিয়াছেন, তাই তিনি সন্তানকে বলি দিতে পারিলেন না। রোহিত বড় হইয়া বনে গমন করিলেন। কিন্তু বরুণের রাগ ক্ষান্ত হইল না; তিনি হরিশ্চন্দ্রকে জরা-জীর্ণ করিয়া রাখিলেন। দেবতার ক্রোধ থাকা ভাল নয়, এই বুঝিয়া রোহিত এক শত ধেনু দিয়া অজীগর্ত্ত নামে কোন এক ব্রাহ্মণের কাছে তাঁহার পুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করিয়া লন। শুনঃশেফকে যূপকাষ্ঠে বাঁধা হইয়াছে, কেবল খড়্গাঘাত করিলেই হয়, এমন সময় বিশ্বামিত্রের পরামর্শে তিনি বরুণ দেবতার স্তব করিয়া মুক্তি পাইলেন। (ঐতরেয়ব্রা° ৭.১৫.১৭)

ভাগবতে লিখিত আছে, ভৃগুবংশীয় অজীগর্ত্তের তনয় শুনঃশেফকে বিশ্বামিত্র দেবরাত নামক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। [শুনঃশেফ দ্র°]

অজীত—(ত্রি) [ন জ্যা-ক্ত; নঞ্-তৎ] অম্লান, অক্ষীণ।

অজীতপুনর্বণ্য—(ক্লী) অপ্রাপ্ত বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তিকারণ—উক্ত নামীয় বক্ষ্যমাণ আহুতিদ্বয়।

"অজীতপুনর্বণ্যং বা এতদ্‌যদেতে আহুতী।" (ঐতরেয়ব্রা° ৭.২২) 'নষ্টমপ্রাপ্তং বা যদ্‌বস্তু তদেতদজীতং তস্য পুনরপি বনসাধনং প্রাপ্তিকারণং বক্ষ্যমাণমাহুতিদ্বয়মেতন্নামকমিত্যর্থঃ।' (সায়ণ)

অজীতি—(স্ত্রী) অপরাভব। (ঋক্ ৯.৯৭.৩০)

অজীর্ণ,—(ত্রি) [ন জৃ-কর্ত্তরি ক্ত; নঞ্-তৎ] জীর্ণভিন্ন, বার্দ্ধক্যহীন।

অজীর্ণ₂—(ক্লী) [জৃ-ভাবে ক্ত, ন জীর্ণং; নঞ্-তৎ] [বৈদ্যক] ভুক্ত অন্নাদির অপাক। পর্য্যায়—অন্তর্বমি, বায়ুগণ্ড, পলতাশয়। [ন জীর্ণং যস্মিন্; বহুব্রী] ২ রোগবিশেষ। জীর্ণ না হওয়া, অগ্নিমান্দ্য। [অগ্নিমান্দ্য দ্র°]

এক প্রকার পেটের অসুখকে অজীর্ণ বলা হয়। এই রোগের নিদান সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, অত্যধিক জলপান, বিষম আহার অর্থাৎ যে বস্তুর সহিত যে বস্তু খাইতে নাই, যেমন দুগ্ধে লবণ, মাংসে দুগ্ধ ইত্যাদি আহার, ক্ষুধা, বাত, মূত্র ও পুরীষাদির বেগ ধারণ এবং দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ, এই সকল কারণে যথাকালে ভুক্ত দেহোপযোগী স্নিগ্ধ উষ্ণাদি গুণযুক্ত লঘু অন্নও পরিপাক হয় না।

"অত্যম্বুপানাদ্‌বিষমাশনাচ্চ সন্ধারণাৎ স্বপ্নবিপর্য্যয়াচ্চ,
কালেঽপি সাত্ম্যং লঘু চাপি ভুক্ত মন্নং ন পাকং ভজতে
নরস্য।" (নিদান)

আয়ুর্ব্বেদে এই রোগের অনেক প্রকার নির্দ্দেশ আছে। যথা—আমাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ, বিষ্টব্ধাজীর্ণ ও রসশেষাজীর্ণ।

যেখানে ভুক্ত পদার্থের পরিপাক সম্যক্ প্রকারে না হওয়ায় পেট-ভার, মুখ দিয়া জল উঠা, গা বমি বমি প্রভৃতি হইতে থাকে এবং ভুগিতে ভুগিতে মুখ ও চোখের কোল ফুলিয়া উঠে; উদ্গারের সঙ্গে ভুক্তদ্রব্য কিংবা মিষ্ট আস্বাদযুক্ত বা ভুক্তদ্রব্যের স্বাদ ও গন্ধযুক্ত উদ্গার উঠে, তাহারই নাম আমাজীর্ণ। আমাজীর্ণের প্রথম চিকিৎসা রোগীকে বমন করান। কিন্তু বর্ত্তমানকালে লোকের যেরূপ শরীরের অবস্থা, তাহাতে বমন করান যুক্তিযুক্ত নহে। তদ্ভিন্ন বমন-প্রয়োগ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদই নিষেধ করিয়াছেন—বমনের যোগ্য ব্যক্তি ব্যতীত সকলকেই বমন করান উচিত নহে। যাহারা ভীরু (Nervous), বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিণী, অক্ষি বা হৃদ্‌রোগ-গ্রস্ত কিংবা দুর্ব্বল, তাহারা বমনের অযোগ্য। তবে যেখানে আপনা হইতে বমি হইবার মত হয়, সেখানে বমনবেগ রোধ করাও উচিত নহে। আমাজীর্ণের ঔষধ—ধনে ও শুঁঠের কাথ অথবা হরীতকী, শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণচূর্ণ—প্রত্যেকে সমান। এই চূর্ণের দুই আনা পরিমাণ প্রত্যহ সকালে শীতল জলসহ পান করিলে আমাজীর্ণ প্রশমিত হয়। তদ্ভিন্ন রামবাণ, শঙ্খবটী, অগ্নিকুমার, অজীর্ণকণ্টক, অজীর্ণ-বল-কালানল প্রভৃতি ঔষধও এইরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। আমাজীর্ণে পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। পুরাতন চাউলের অন্ন (বেশ সুসিদ্ধ) ঝোল দিয়া অল্প পরিমাণে অর্থাৎ আধ পেটা খাওয়া উচিত। দাল ও শাক এবং অম্লদ্রব্য বর্জ্জন করা, যথাসময়ে খাওয়া, রাত্রিজাগরণ না করা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

যদি কখন আমাজীর্ণে ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাকবশতঃ অথবা মল পরিষ্কার না হওয়ার জন্য পেটে বেদনা বা শূল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই বেদনা বা শূল নিবারণের জন্য এমন কোন ঔষধ কখনই খাওয়া উচিত নয়, যাহাতে মলরোধ হইতে পারে বা পরিপাকশক্তির হ্রাস হয়।

ভুক্তদ্রব্যের পরিপাককালকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথমভাগের পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যাঘাতকে আমাজীর্ণ বলা যাইতে পারে। সাধারণতঃ আমাশয়ের যে রস ভুক্তপদার্থকে পরিপাক করিয়া থাকে, সেই রসের বিকৃতির জন্য আমাজীর্ণ উপস্থিত হয়।

ভুক্তপদার্থ যখন আমাশয় ত্যাগ করিয়া গ্রহণীপ্রদেশে

উপস্থিত হয়, তখন সেই পরিপাককালের দ্বিতীয়ভাগে ভুক্ত-পদার্থকে পরিপাক করিবার জন্য যকৃৎ হইতে যে পিত্ত নিঃসৃত হয়, সেই পিত্ত বিকৃত, অতি নিঃসৃত বা অসময়ে নিঃসৃত হইয়া ভুক্তদ্রব্যকে বিকৃত করিলে বুক-জ্বালা বা গলা জ্বালা প্রভৃতি হইতে থাকে ; ইহাকেই বিদগ্ধাজীর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। বিদগ্ধাজীর্ণে শীতল জল পান করিলে, তখনই গলা জ্বালা প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

বিদগ্ধাজীর্ণে শঙ্খভস্ম /০ আনা ও সৈন্ধবলবণ /০ আনা মিশাইয়া শীতল জলসহ পান করিলে ভাল হয়। তদ্ভিন্ন নারিকেল-লবণ বা বজ্রক্ষার যাহাকে কবিরাজগণ সাদাচটী, শুভ্রক্ষার প্রভৃতি নামে অভিহিত করেন, সে সকলও বিশেষ ফলপ্রদ। এইরূপ ক্ষেত্রে অনেকে সোডা (Bicarbonate of Soda) খাইয়া অম্ল নিবারণ করে। কিন্তু দীর্ঘকাল সোডা খাওয়া অভ্যাস করিলে পাকস্থলীর বিকৃতি ঘটে। যাহাকে লোকে সাধারণ কথায় অম্বলের ব্যারাম বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাহা এই বিদগ্ধাজীর্ণের অন্তর্গত। বিদগ্ধাজীর্ণে শাক, অম্লদ্রব্য, লঙ্কা, সর্ষপ, সর্ষপতৈল ও দাল খাওয়া ভাল নয়। যাহা সহজে পরিপাক হয়, এরূপ লঘুপাচ্য দ্রব্য ভোজন করাই উচিত।

পরিপাককালের শেষ অবস্থায় বায়ুজন্য যে অজীর্ণরোগ জন্মে, যাহাতে পেট ফাঁপে, স্তব্ধ হইয়া থাকে ও কখন কখন পেটে ব্যথাও হয়, তাহাকে বিষ্টব্ধাজীর্ণ বলে। বিষ্টব্ধাজীর্ণে কুপিত বায়ু যখন ভুক্তপদার্থের রসগ্রহণকার্য্য হইতে বিরত হয়, তখন উহা রসশেষাজীর্ণ নামে কথিত হয়। এই রস-শেষাজীর্ণে ভাস্করলবণ ও শঙ্খবটী প্রভৃতি ঔষধ বিশেষফল-দায়ক হয়। কিন্তু এই ভাস্করলবণ ও শঙ্খবটী বিদগ্ধাজীর্ণে প্রয়োগ করিলে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই হইয়া থাকে। সুতরাং অজীর্ণের অবস্থা ও প্রকৃতি না জানিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা বা অনভিজ্ঞ লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া কোন ঔষধ খাওয়া উচিত নহে। যাহা অমৃত, তাহাও অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইলে বিষের কার্য্য করে ; আর উপযুক্ত ক্ষেত্র বুঝিয়া প্রয়োগ করিলে বিষও অমৃত হয়।

অজীর্ণকণ্টকরস—[বৈদ্যক] অজীর্ণরোগে প্রযোজ্য রসৌষধি-বিশেষ। নিম্নে তিন প্রকার প্রস্তুতপ্রণালী দেওয়া হইল।

১ম প্রকার :—

সোহাগার খৈ ও শোধিত হিঙ্গুল প্রত্যেকে সমান, সোহাগার খৈএর বার গুণ মরিচচূর্ণ, শোধিত মিঠাবিষ সোহাগার খৈএর বার ভাগের একভাগ, সৈন্ধবলবণ সোহাগার খৈএর তিনগুণ—এই সকল দ্রব্য লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া দুই রতি প্রমাণ বড়ি করিবে। ব্যবহারক্ষেত্র—অজীর্ণ, অতিসার, গুল্ম, প্লীহা, উদর, শূল, সংগ্রহগ্রহণী, শ্বাস, কাস, ক্ষয় প্রভৃতি রোগ। তদ্ভিন্ন ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বরভাব হইলে অথবা জ্বর হইলে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ইহা বিসূচিকা রোগেরও একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ব্যবহারবিধি—সকালে ও বৈকালে, আবশ্যক হইলে মধ্যাহ্নেও একটী করিয়া বড়ি। অনুপান—যে রোগে প্রয়োগ করা হইবে বা যে অবস্থায় প্রয়োগ করা হইবে, তখন যাহা হিতকর, তাহাই অনুপানরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

২য় প্রকার :—

পারদ ও গন্ধক মিলিত অর্থাৎ কজ্জলী দুই তোলা, শোধিত মিঠাবিষ এক তোলা, মরিচচূর্ণ তিন তোলা—এই সকল দ্রব্য কণ্টিকারীর রসে বা ক্বাথে একুশ বার ভাবনা দিয়া দুই রতি পরিমিত বটিকা করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণরোগে বিশেষ ফলপ্রদ। অনুপান—বিসূচিকায় বা কলেরায় বড় এলাচচূর্ণ ও জীরাভাজার চূর্ণের সহিত মধু দিয়া মাড়িবে ও একটু একটু করিয়া চাটাইবে। তদ্ভিন্ন, রোগের অবস্থা বুঝিয়া অনুপানের ব্যবস্থা করিবে। উনত্রিশখানি প্রাচীন রসগ্রন্থে এই ঔষধটীর উল্লেখ দেখা যায়। গ্রন্থ সকলের নাম এখানে অনাবশ্যকবোধে উল্লিখিত হইল না।

৩য় প্রকার :—

সোহাগার খৈ, পিপুল, অমৃত ও হিঙ্গুল প্রত্যেকে সমান। মরিচচূর্ণ পিপুলচূর্ণের দ্বিগুণ, লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি পরিমিত বটী করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ ও কফরোগ নাশ করে।

অজীর্ণজরণ—(পুং) [বৈদ্যক] কর্চ্চূর।

অজীর্ণ-বল-কালানল—[বৈদ্যক] অজীর্ণরোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারদ ২ পল ; গন্ধক ২ পল ; লৌহ, তাম্র, হরিতাল, বিষ, তুঁতে, বঙ্গ, লবঙ্গ, সোহাগা, দন্তীমূল, তেউড়ী-মূলচূর্ণ—ইহাদের প্রত্যেকে ১ পল ; বনযমানী, যমানী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ—ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা ; এই সমুদয় একত্র করিয়া আদার রসে ২১ বার, পঞ্চ-কোলের ক্বাথে ১০ বার ও গুলঞ্চ রসে ১০ বার ভাবনা দিয়া, চূর্ণ-সমষ্টির অর্দ্ধেক মরিচচূর্ণ তাহার সহিত মিশাইয়া মর্দ্দন করিয়া লইবে। পরে ঐ ঔষধ কাচকূপীর (শিশি বা বোতলের) মধ্যে রাখিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া চণক প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে অগ্নিমান্দ্য, আমবাত, প্লীহা, পাণ্ডু প্রভৃতি নানা রোগ নিবারিত হইয়া থাকে। বহু দিবসের নষ্ট-অগ্নিও ইহার দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। আকণ্ঠ গুরুপাক-দ্রব্য

আহার করিয়া এই ঔষধ সেবন করিলে অৰ্দ্ধপ্রহর মধ্যে সমুদয় ভস্মীভূত হইয়া যায়। (ভৈষজ্যরত্না°, অগ্নিমান্দ্যাধিকার)

অজীর্ণারি—[বৈদ্যক] অজীর্ণরোগে প্রযোজ্য ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—শোধিত পারা ও গন্ধক প্রত্যেকের ১ পল (৮ তোলা) ; হরিতকী ২ পল ; শুঁঠ তিন পল ; পিপুল, মরিচ ও সৈন্ধব প্রত্যেকের ৩ পল ও সিদ্ধি ৪ পল। পাতিনেবুর রসে একত্র মর্দ্দন করিবে। পরে রৌদ্রে (মুচির মধ্যে) সাতবার পুটপাক করিবে। ইহার দ্বারা সদ্যঃসদ্য অগ্নিবৃদ্ধি ও কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। (রসেন্দ্রচিন্তামণি)

অজীর্ণিন্—(ত্রি) অজীর্ণরোগযুক্ত।

অজীর্য্যৎ—(ত্রি) অজরাগ্রস্ত। "অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য।" (কঠোপনিষৎ ১.২৮)

অজীব১—(ত্রি) [নাস্তি জীবো জীবনং বা যস্য] জীবনরহিত (ঘটাদি)। ২ মৃত ; অসত্ত্ব। (ত্রিকাণ্ড°) ৩ জীব অর্থাৎ প্রাণী ভিন্ন অন্য কিছু।

অজীব২—জৈন-দর্শনোক্ত নবতত্ত্বের অন্যতম। জীব সাত্মক, অজীব অনাত্মক। অজীব দ্বিবিধ—অরূপী ও রূপী। অরূপী আবার চতুর্ব্বিধ, যথা—(১) ধৰ্ম্মাস্তিকায় অর্থাৎ গতির আশ্রয় ; (২) অধর্ম্মাস্তিকায় অর্থাৎ স্থিতির আশ্রয় ; (৩) আকাশাস্তিকায় অর্থাৎ শূন্য ; (৪) কাল। এই চারিটীর প্রত্যেকটী স্কন্ধ, দেশ ও প্রদেশ এই তিন ভাগে বিভক্ত। স্কন্ধ অর্থে সমষ্টি, দেশ অর্থে সমষ্টির বিভাজ্য অংশ এবং প্রদেশ অর্থে সমষ্টির অবিভাজ্য অংশ বুঝাইতেছে। রূপী জড়বস্তু, ইহার অপর নাম পুদ্গলাস্তিকায়। ইহা স্কন্ধ, দেশ, প্রদেশ ও পরমাণু এই চারিভাগে বিভক্ত।

অজীবজনি—প্রাণিতত্ত্বে এক প্রকার কল্পিত স্বতোজননপ্রক্রিয়া। ইংরেজীতে ইহাকে Abiogenesis বলা হইয়াছে। বহুদিন পর্য্যন্ত মনুষ্যের বিশ্বাস ছিল, কতকগুলি প্রাণী অজৈব অর্থাৎ জড় পদার্থ হইতে অন্য প্রাণিদেহের সাহায্য ব্যতিরেকেই উৎপন্ন। দার্শনিকপ্রবর আরিষ্টটল এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, পচ্যমান জড়বস্তু হইতে কোন কোনও জীবের উৎপত্তি প্রত্যক্ষ হয় ; যেমন, বৃক্ষোপরি শিশির পড়িয়া পত্রভোজী কীট (plant lice) উৎপাদন করে ; গলিত জিনিষ হইতে কীট ও মশক জন্মে। আলেক্‌সান্দার রস্ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা উক্ত মতে আস্থাবান্ ছিলেন। রস্ বিশ্বাস করিতেন, পনিরে এবং কাষ্ঠে কীট জন্মে, গোময়ে গুবরে-পোকা ও বোল্‌তা উৎপন্ন হয় ; বহুবিধ গলিত পদার্থে প্রজাপতি, শলভ, ফড়িং, শামুক প্রভৃতি প্রাণী জন্মিয়া থাকে। অনেক পণ্ডিতই এই প্রকার মত পোষণ করিতেন। আমাদের শাস্ত্রেও বলা হইয়াছে, "গোময়াৎ বৃশ্চিকো জায়তে।"

ইতালীদেশীয় পণ্ডিত রেডি সর্ব্বপ্রথম উপরি উক্ত মতের বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিয়া উহা খণ্ডন করেন। তিনি ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রমাণ করেন, তারের ঘনসন্নিবিষ্ট আচ্ছাদনীর মধ্যে মাংসখণ্ড মক্ষিকাস্পর্শ হইতে রক্ষা করিলে উহাতে মক্ষিকা উৎপন্ন হয় না ; কারণ মক্ষিকা উহাতে ডিম পাড়িতে পারে না। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতক হইতে ক্রমে লোকের বিশ্বাস জন্মিতে থাকে যে, অজীব হইতে জীবের উৎপত্তি হইতে পারে না—অন্ততঃ অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং অণুবীক্ষণযন্ত্র ব্যতিরেকে দৃশ্যমান প্রাণীর সম্বন্ধে অজীবজনি-মতবাদ মিথ্যা।

অণুবীক্ষণযন্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে অজীবজনি পুনরায় নবভাবে আলোচিত হইতে লাগিল। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে লিউ-বেনহিক্ (A. Von Leeuwenhœk) দেখাইলেন, জড়বস্তু আচ্ছাদনীর অন্তরালে বা ছিপি আঁটা পাত্রে যত সাবধানেই রাখা হউক না কেন, উহাতে পচনক্রিয়া আরম্ভ হইবেই এবং উদ্ভিজ্জাণু দেখা দিবে। আণুবীক্ষণিক জীবজগৎ সম্বন্ধে লোকের যতই জ্ঞান বাড়িতে লাগিল, ততই লোকে অজীব-জনিতে আবার বিশ্বাসবান্ হইতে লাগিল। অনেক পণ্ডিত বিশ্বাস করিলেন যে, অপেক্ষাকৃত উন্নততর জীবসমূহ সম-জাতীয় জীব হইতেই উৎপন্ন হয়, কিন্তু আদিস্তরের জীব অনুকূল অবস্থায় জড় হইতে উদ্ভূত হইতে পারে।

যে সকল বৈজ্ঞানিক অজীবজনি মতকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে পাস্তরই (L. Pasteur) প্রধান। তিনি প্রমাণ করিলেন, আণুবীক্ষণিক জগতেও অজীবজনি সত্য নহে। জড়বস্তুকে নিঃসংক্রামক বা বীজাণুশূন্য (Steri-lised) করিয়া বাহিরের সংস্পর্শবর্জ্জিত ভাবে কোন পাত্রে রাখিতে পারিলে উহাতে পচন বা জীবোৎপত্তি দেখা যায় না। কিন্তু এই নিঃসংক্রমণকার্য্য সহজসাধ্য ছিল না বলিয়া সকলের মন হইতে সন্দেহ নিরাকৃত হইল না। ভূমণ্ডলের ও বায়ুমণ্ডলের কোন স্থান জীবাণুমুক্ত নহে এবং জীবাণু প্রচণ্ড উত্তাপ সহ্য করিতে পারে। এই কারণেই কোন বস্তু জীবাণু-শূন্য করা দুরূহ ব্যাপার।

যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত অজীবজনি যে ভ্রান্ত ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। এ স্থলে বলা আবশ্যক, এ সিদ্ধান্ত এই পর্য্যন্ত জ্ঞাত জীবদেহ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। এত দিন আমরা জীবদেহকে জীবকোষ বা প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ নামক উপাদানে গঠিত বলিয়াই জানি। যদি ভবিষ্যতে কোন দিন অজৈব পদার্থ হইতে জীবকোষ উৎপাদন করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে অজীবজনি

মতটী নূতন করিয়া গঠন করিতে হইবে। অতীতে অজৈব পদার্থ হইতে জীবকোষের উৎপত্তি হইয়াছে কিনা, তাহাও আমরা নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি না।

অজীবৎ—(ত্রি) জীবিকানির্ব্বাহে অসমর্থ।

"অজীবংস্তু যথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ স্বেন কর্ম্মণা।" (মনু ১০.৮১)

অজীবন—(ক্লী) [ন জীবনং ; নঞ্-তৎ] জীবনাভাব, মৃত্যু। "অজীবনার্হেণ ময়া নৃশংসা, কৃতা প্রতিজ্ঞা নিয়মেন তাবৎ।" (রামা° ২.৩৭.৭) [নাস্তি জীবনং যস্য] (ত্রি) ২ প্রাণহীন, মৃত। (অথর্ব্ব° ১৮.২.৩০)

অজীবনি—(স্ত্রী) [ন জীব-অনি। আক্রোশে নঞ্যনিঃ। পা ৩.৩.১১২] আক্রুশ্যমান জীবনাভাব। ২ নিন্দিত জীবন। ৩ আক্রোশাত্মক শাপ। "অজীবনিস্তে শঠ ভূয়াৎ।" (পাণিনি) 'রে শঠ! তুই অল্পায়ু হ'।

অজীবিত—(ক্লী) জীবনাভাব। "ন মাং তপ্স্যত্যজীবিতম্"। (ব্রাহ্মণবিলাপ ২.৩১) (ত্রি) ২ জীবিত নহে, মৃত।

অজীবোৎপত্তি—[অজীবজনি দ্র°]

অজুগুপ্সিত—(ত্রি) [ন গুপ-নিন্দায়াং সন্-ক্ত ; নঞ্-তৎ অনিন্দিত। "আসনেষ্বজুগুপ্সিতান্।" (মনু ৩.২০৯)

অজুদাহন—একটী স্থানের নাম। ইবন্-বতুতা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণকালে এইস্থানে আগমন করিয়াছিলেন। ফরিদ-উদ্দীন্-অল্ বদায়ুনীর কবরস্থান এখানে অবস্থিত।

অজুর—(ত্রি) [অজ-কুরচ্, ন ব্যাদেশঃ] বেগশীল, বলবান্। ২ জরারহিত। ৩ অহিংসিত। "অবক্রক্ষিণং বৃষভং যথাজুরং।" (ঋক্ ৮.১.২)

অজুর্য্য—(ত্রি) [ন জুর্য্যঃ ; নঞ্-তৎ] সন্তাপরহিত। "মহীং দেবীং বিষ্ণুপত্নীমজুর্য্যাং।" (তৈত্তিরীয়ব্রা° ৩.১.২.৭) ২ জরাগ্রস্ত করিতে অশক্য। (ঋক্ ২.৩৯.৫) ৩ হিংসার অযোগ্য, বা জন্মশূন্য (অগ্নির দ্বারাভিমানিনী দেবতা)। (ঋক্ ২.৩.৫) ৪ ক্ষয়রহিত, অমৃত (অন্ন)। (ঋক্ ৩. ৫৩.১৫ ৫ অশীর্ণ, নিত্যনূতন (উষা)। (ঋক্ ৪.৫১.৬)

অজুষ্ট—(ত্রি) অসেব্য। (ঋক্ ২.৪০.২ ; ৫.৭৭.২) ২ অপ্রিয়। (ঋক্ ৭.৭৫.১)

অজুষ্টি—(স্ত্রী) অপ্রীতি। (ঋক্ ১.৬৩.৫)

অজূহাৎ—[দেশজ] কারণ, কারণসমূহ।

অজূহান্নামা—[দেশজ] যাহাতে মোকদ্দমার কারণসমূহ লিখিত থাকে, অজূহাৎনামা।

অজেগ্লিও (Marquis D' Massimo Taparelli Azeglio) —ইতালীবাসী একজন রাজনীতিজ্ঞ ও গ্রন্থকার। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে টিউরিন্ নগরে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা সিজারে ডি অজেগ্লিও পীড্‌মণ্ট সেনাদলের নায়ক ছিলেন। ষোলবর্ষ বয়সে তিনি সেনাবিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। নেপোলিয়নের অধঃপতনের পর পোপ ৭ম পায়াস (Pius VII) রোমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পিতাপুত্রে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণার্থ ভাটিকানে গমন করেন। এখানে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তিনি সেনাবিভাগের কর্ম্ম ছাড়িয়া রোমে থাকিয়া শিল্পকলা-শিক্ষায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। পরে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে মিলান নগরে আসিয়া বিখ্যাত ঔপন্যাসিক আলেসান্দ্রো মান্‌জোনির (Alessandro Manzoni) সহিত পরিচিত হন এবং তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। এই সময় হইতে তিনি চিত্রবিদ্যা ছাড়িয়া সাহিত্যচর্চ্চায় মনঃসংযোগ করিলেন।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইতালীর স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে তিনি ভিসেঞ্জা (Vicenza) রণক্ষেত্রে সেনাপতি ডুরাণ্ডোর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং আহত হইয়া ফ্লোরেন্স নগরে চিকিৎসার্থ আগমন করেন। এই সময় রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভা শতমুখে বিকশিত হয়। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে নোভারার যুদ্ধে সার্দ্দিনিয়ারাজ চার্ল্‌স্ এলবার্ট পরাজিত হইয়া সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং ভিক্টর ২য় ইমান্যুয়েল রাজা হন। রাজাদেশে অজেগ্লিও মন্ত্রিসভা-গঠনে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। তিনি সন্ধিস্থাপনাদি দ্বারা ক্রমে দেশে শান্তিস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিন বৎসর পরে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় ও স্বীয় দলের কএকজনের সহিত মতদ্বৈধতার কারণ তিনি কাউণ্ট কাভুরকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ইহার পরবর্ত্তী ৫ বৎসর তিনি চিত্রবিদ্যায় আত্মনিয়োগ করিলেও কাভুর মধ্যে মধ্যে রাজকার্য্যসম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য তাঁহার নিকট আগমন করিতেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি টিউরিন্ চিত্রশালার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পারি ও লণ্ডননগরে গমন করেন। কিন্তু পীড্‌মণ্ট ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া পুনরায় ইতালীতে ফিরিয়া আসেন এবং কাভুর কর্ত্তৃক কমিশনার নিযুক্ত হইয়া রোমানা রক্ষা করিতে সমর্থ হন। ফরাসীরাজ তৃতীয় নেপোলিয়ন যাহাতে ইতালীর পক্ষ সমর্থন করেন, এই অভিপ্রায়ে তিনি উক্ত বর্ষে "De la Politique et du droit chretien au point de vue de la question italienne" নামক পুস্তিকা ফরাসী ভাষায় প্রকাশ করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মাজেণ্টার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অষ্ট্রীয়গণ মিলান পরিত্যাগ করিলে তিনি কাভুরকর্ত্তৃক তথাকার শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হন এবং এই অরাজকতার দিনে তিনি

বিশেষ দক্ষতার সহিত শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন। এই সময়ে গারিবল্ডীর সিসিলী-অভিযান ও পীড্‌মণ্টকর্তৃক নেপল্‌সের অধিকার রক্ষা অসুবিধাজনক দেখিয়া তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কাভুরের এবং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দুই ভ্রাতার মৃত্যু হওয়ায়, তিনি শোকে অভিভূত হন। ইহার পর হইতে তিনি তাঁহার কেন্নেরোর উদ্যান-বাটিকায় থাকিয়া একমাত্র রাজনৈতিক গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি এবং নিজের জীবনী রচনা করিয়া স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী জ্বররোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অজেতব্য—(ত্রি) অপরাজেয়, যাহাকে পরাজয় করা যায় না।

অজেয়,—(ত্রি) [ন জি-যৎ, নঞ্‌-তৎ] অজেতব্য, জয়ের অযোগ্য। "অজেয়ত্বঞ্চ সংগ্রামে মমাপি হি ভবিষ্যতি।" (স্কন্দপু°, কাশীখণ্ড)

"—কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিত মেঘনাদে—অজেয় জগতে
উর্ম্মিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা।"

(মেঘনাদবধকাব্য)

[বৈদ্যক] (ক্লী) ২ অজেয়নামক ঘৃত। "পিবেদ্‌ঘৃতমজেয়াখ্য-মমৃতাখ্যঞ্চ...।" (সুশ্রুত) (পুং) ৩ অর্জ্জুনবৃক্ষ। (রাজনি°)

অজেয়₂—(পুং) বিষ্ণুর একটী ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের (প. ৭৯) একটী ধ্যান হইতে বুঝা যায়—অজেয় সজল জলদের ন্যায় নীলবর্ণ, পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত অক্ষিবিশিষ্ট, গরুড়াসীন এবং ষড়্‌ভুজ। প্রথম তিনটী হস্তে হল, মুষল ও গদা এবং অপর তিনটীতে ধনু, চক্র ও অসি। ধ্যানটী নিম্নে দেওয়া হইল—

"সজলজলদনীলং পদ্মপত্রায়তাক্ষং
খগপতিমবরূঢ়ং কল্পবৃক্ষোপমানম্।
হলমুষলগদাভিঃ শোভিতং দেবদেবং
বরপুরুষমজেয়ং শার্ঙ্গচক্রাসিপাণিম্॥"

অজেয়₃—(পুং) পঞ্চম রৈবত মন্বন্তরের এক দেবতা। ইনি সুমেধা নামক দেবগণের অন্তর্গত। (ব্রহ্মাণ্ডপু°, ৬২.৫০)

অজেরবতী—অবদানশতকে বর্ণিত একটী নদী। সম্ভবত ইহা অচিরবতী নদীর নামান্তর। [অচিরবতী দ্র°] এই নদীর তীরে শ্রাবস্তীর অন্তর্গত একটী গ্রামে বুদ্ধদেব এক সময়ে অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ স্থানের অধিবাসিবৃন্দ নৌজীবী। তাহারা তাহাদের সামান্য আহার্য্য দ্বারা বুদ্ধদেবকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার উপদেশাবলী সযত্নে শ্রবণ করিয়াছিল।

অজেরবাইজান—পারস্য রাজ্যের উত্তরপশ্চিম প্রান্তস্থিত একটী প্রাচীন জনপদ। প্রাচীন গ্রীক্ গ্রন্থকারগণ ইহাকে Athropatakan ও Atropatene শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। মধ্যযুগের ভৌগোলিকগণ ইহাকে আবার অজেরবাদেগান নামে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

ইহার উত্তরসীমা অরাস্ নদী রুষ রাজ্য হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে; পূর্ব্বে কাস্পীয় সাগর, গিলান ও খামশে (জেন্‌জান); দক্ষিণে খুর্দ্দিস্থান এবং পশ্চিমে এসিয়াস্থ তুরুষ্ক রাজ্য। ভূপরিমাণ ৩২ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ। এখানে পারসীক, তুর্ক, খুর্দ্দ, সিরীয়, আর্মেনীয় প্রভৃতি জাতির বাস আছে। দেশভাগ প্রায়শঃ বন্ধুর হইলেও উর্ব্বর ক্ষেত্ররাজির অভাব নাই। ঠিক মধ্যস্থলে সেহন্দ পর্ব্বত, উহার চূড়া সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২০০০ ফুট উচ্চ। পূর্ব্বাঞ্চলে সাভেলান শৈলশিখর এবং কাস্পীয় সাগর সন্নিকটস্থ তালিশ পর্ব্বত যথাক্রমে ১৫৭৯২ ও ৯০০০ ফুট উচ্চ।

এই প্রদেশের প্রধান নদী অরাস্, কিজিল ও উজাইন বহু শাখা প্রশাখায় বৰ্দ্ধিতকলেবর হইয়া কাস্পীয় সাগরে পতিত হইয়াছে। জঘতু, ততবা, মৰ্দ্দি, আজি প্রভৃতি নদী ভিন্ন ভিন্ন অববাহিকা বাহিয়া উর্ম্মিয়া হ্রদে আসিয়া মিশিয়াছে। এই হ্রদের পশ্চিমাংশ এবং শেল্‌মাস্ ও উর্ম্মিয়া জেলা অজেরবাইজানের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর ভূভাগ।

এখানে বাসগৃহ-নির্ম্মাণোপযোগী বনবৃক্ষের একান্ত অভাব। ফল ও মেওয়ার বাগানও যথেষ্ট আছে। ঐ সকল বাগান হইতে প্রভূত শুষ্ক ফল রুষদেশে রপ্তানী হয়। এতদ্ভিন্ন সীসক, তাম্র, গন্ধক, হরিতাল প্রভৃতি খনিজ পদার্থ এবং মরাঘা ও তাব্রিজের চিত্রাঙ্কিত মর্ম্মরপ্রস্তর বাণিজ্য-পণ্যরূপে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে।

তাব্রিজ, উস্কু, দেহ্‌খারেগান্, মরাঘা, মিয়ান্‌দোয়াব, সৌজবুলাঘ, সালহুজ, উর্ম্মিয়া, সেলমাস, খোই, মাকু, গার্গার, মেরেন্দ, কারাদাঘ্, অর্‌বানেক্, তালিশ, অৰ্দ্দেবিল, মিশ্‌কিন্, খাল্‌খাল, হাশত্রুদ, গার্মরুদ, অফ্‌শার, সাইন্‌কালে, উজান ও সরাব এখানকার প্রধান নগর ও শাসনকেন্দ্র। বিচারকার্য্যের সুবিধার্থ এই প্রদেশ কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগে এক একজন হাকিম বা শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত আছেন। ইহাদের উপর একজন রাজপ্রতিনিধি কর্তৃত্ব করেন। ইনি কাজরবংশীয় এবং প্রায়শঃ পারস্যরাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী। তাঁহাকে আবার রাজদরবার হইতে প্রেরিত একজন মন্ত্রীর পরামর্শ লইয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে হয়।

অজেরবাইজানবাসীর বীরত্ব ও সাহসিকতা চিরপ্রসিদ্ধ।

এই কারণে পারসীক-সেনাদলে আজিও ইহাদের নির্ব্বাচনে সমধিক আগ্রহ দেখা যায়।

অজেলো—চীন সাম্রাজ্যের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশের একটী নগর। ইহা অ-শে-হো বা অল্ চুকু নামেও পরিচিত। এই নগর ফিরিন্ হইতে ১২৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। লোকসংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার।

অজেশ—(পুং) রুদ্রবিশেষ। দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধে ইনি মহাদেবের সঙ্গে থাকিয়া বহু দৈত্য সংহার করেন। (মৎস্যপুং, ১৫৩.১৯)

অজেস (১ম)—একজন শকসম্রাট্। মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের পতনের পর বাহ্লিক (বাল্খ) হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান আফগানিস্থান এবং সমগ্র পঞ্জাব যবন (গ্রীক্)-দিগের অধীনে আসে। পরবর্ত্তী-কালে যবনেরা হীনবল হইয়া পড়ায় শকগণ এই বিস্তৃত ভূভাগ অধিকার করে। যবনদিগের অব্যবহিত পরে যে তিনজন শকজাতীয় ক্ষমতাশালী নরপতি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এবং পঞ্জাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম যথাক্রমে মৌয়েস, অজেস (১ম) ও অজিলিজেস। ইঁহারা যে সকল মুদ্রা প্রচলন করেন, তাহার অধিকাংশই পূর্ব্ববর্ত্তী যবনরাজগণের মুদ্রার অনুকরণে নির্ম্মিত।

সম্ভবতঃ ৮৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের পরে মৌয়েস ভারত আক্রমণ করেন। তক্ষশিলায় প্রাপ্ত পতিকের তাম্রশাসনে উল্লিখিত মহারাজ মোগ সম্ভবতঃ মৌয়েসের নামান্তর মাত্র। মৌয়েসের পর অজেস (১ম) তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। অজেসের সময় শক-সাম্রাজ্য বহুবিস্তৃত হয়। মৌয়েসের সময়েও পঞ্জাবের পূর্ব্বভাগ যবনশাসনাধীন ছিল; কিন্তু অজেসের সময় সমগ্র পঞ্জাব শকদিগের করায়ত্ত হয়। স্যর্ জন মার্শাল সাহেবের মতে অজেস (১ম) বিক্রম-সংবতের প্রবর্ত্তক। তিনি অনুমান করেন যে, ৫৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে অজেস সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল তক্ষশিলায়। অজেসের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজত্বের প্রথম বৎসর হইতে বিক্রম-সংবতের গণনা আরম্ভ হয়। ১৯১৪ সালে রয়াল এসিয়াটিক্ সোসাইটীর জার্নালে স্যর্ জন মার্শাল এবং জে. এফ. ফ্লিটের মধ্যে এ সম্বন্ধে যে বাদানুবাদ হয়, তাহাতে মার্শালের সিদ্ধান্ত অনেক ঐতিহাসিক অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু উক্ত পত্রিকায় ১৯১৫ সালে প্রকাশিত সংখ্যায় মার্শাল সাহেব তাঁহার মতের যৌক্তিকতা সপ্রমাণ করিতে বিশেষ প্রয়াস পান। তিনি তক্ষশিলার প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ খননকালে প্রস্তরাধারে স্থাপিত রৌপ্যপাত্রে অতি সাবধানতার সহিত রক্ষিত একটী দানপত্র আবিষ্কার করেন। বোধিসত্ত্বের উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত পূজাগৃহে বাহ্লিকদেশস্থ ধীতফ্রিয়ের পুত্র ধীরসাকেস এই দানপত্রটীর সহিত বুদ্ধের পূতাস্থি সংরক্ষিত করেন। লিপিপাঠে জানা যায় যে, অয়ের ১৩৬ বৎসরে আষাঢ়মাসের পঞ্চদশ দিবসে ধীরসাকেস এই দানক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই সময় হইতে গণনা করিলে ৫৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ অজেসের রাজত্বকালের প্রথম বৎসরে উপনীত হওয়া যায় এবং এই ৫৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতেই বিক্রম-সংবতের প্রচলন হয়। কিন্তু ফ্লিট্ সাহেব মার্শাল সাহেবের মতের বিরুদ্ধে এই যুক্তির অবতারণা করেন যে, ক্ষত্রপ পতিকের তাম্রশাসনে মৌয়েসের দ্বারা প্রচলিত একটী অব্দের কথা পাওয়া যায়; সুতরাং তাঁহারই পরবর্ত্তী রাজা পুনরায় কি জন্য আর একটী অব্দের প্রচলন করিবেন? স্যর্ জন মার্শাল ইহার উত্তরে বলেন যে, এমন কোন প্রমাণ নাই, যাহার বলে অজেসকে মৌয়েসের বংশধর বলিয়া গ্রহণ করা যায়। এই যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেকের মত এই যে, তক্ষশিলার ১ম অজেস কান্দাহারের স্পালিরিসেসের সহযোগী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। স্পালিরিসেস পহ্লব রাজাধিরাজ বোনোনেসের ভ্রাতা। অজেস কান্দাহার (আরাকোসিয়া) হইতে তক্ষশিলায় গিয়া সেখানে একটী স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই মত যদি গৃহীত হয়, তাহা হইলে অজেসকে পহ্লবজাতীয় বলিয়া মনে করিতে কোন বাধা থাকে না। অজেস যে মৌয়েসের প্রবর্ত্তিত অব্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কোন প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই এবং পহ্লবগণ যে অজেস-প্রবর্ত্তিত সংবৎ তাহাদের দানপত্রাদিতে ব্যবহার করিবে, তাহার বিরুদ্ধে কোন যুক্তিই দেখা যায় না। এইজন্য স্যর্ জন মার্শাল ১ম অজেসকে বিক্রম-সংবতের প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে করেন। এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া রাপ্‌সন সাহেব কেম্ব্রিজের History of Ancient India নামক পুস্তকে তাঁহার মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ১ম অজেস যদি বিক্রম-সংবতের প্রবর্ত্তক হন, তাহা হইলে ভারতের ইতিহাসে তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনার প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

১ম অজেসের কতকগুলি মুদ্রাতে ওমিক্রোণের পার্শ্বে ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ বৃত্তাকার গ্রীক্ অক্ষর ক্ষোদিত দেখা যায়। এই যুগে পার্থিয়ার রাজা ১ম ওরোডেসের (৫৭-৩৮ খৃষ্টপূর্ব্ব) মুদ্রাতেও এইরূপ নক্‌সা পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, অজেসের রাজত্বকালে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের সহিত পার্থিয়ার ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল। অজেসের রাজত্বের শেষভাগের মুদ্রায় তাঁহার সহিত অজিলিজেসের নাম মুদ্রিত

হইয়াছে। সম্ভবতঃ অজেস বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলে তাঁহার বংশধর অজিলিজেস যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন এবং অজেসের মৃত্যুর পর তিনিই সিংহাসনে আরোহণ করেন।

অজেস (২য়)—একজন প্রাচীন নরপতি। স্পালিরিসেসের মুদ্রাতে যে অজেসের নাম ক্ষোদিত দেখা যায়, তিনি সম্ভবতঃ স্পালিরিসেসের পুত্র এবং দ্বিতীয় অজেস। এই অনুমান সত্য হইলে ইনিই সম্রাট্ বোনানেসের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন এবং পহ্লববংশীয় স্পালিরিসেসের মৃত্যু হইলে ইনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের স্বাধীন নরপতিরূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার রাজত্বকাল অনুমান ৩০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে ১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। বোনানেসের বংশধরদিগের নামকরণে পহ্লব এবং শক-প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বোনোনেসের নাম পহ্লবভাষা হইতে উদ্ভূত, অথচ তাঁহারই ভ্রাতা স্পালিরিসেস এবং তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র অজেসের নাম স্কীদীয় বা শকশব্দীয়। ইহা হইতে অনুমিত হয়, ইরাণে এই সময়ে শক এবং পহ্লব-সভ্যতা সংমিশ্রিত হইয়াছিল। আবার এই দুই জাতিই গ্রীক্‌দিগের উচ্চতর সভ্যতার প্রভাবাধীন ছিল। কারণ তাঁহাদের মুদ্রায় সিংহাসনারূঢ় জিউসের মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ইঁহাদের অধীনস্থ প্রদেশসমূহে ইঁহারা যে সকল শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিতেন, তাঁহাদের উপাধি ছিল স্ট্রাটেগোস। এই গ্রীক্ শব্দটীর সংস্কৃত প্রতিশব্দ হইতেছে সেনাপতি। এই পদবীর প্রয়োগ হইতেও শক এবং পহ্লবদিগের উপরে গ্রীক্-প্রভাব অনুমিত হইতে পারে। অস্পবর্ম্মন্ এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সসস্ ২য় অজেসের প্রতিনিধিস্বরূপ পশ্চিমভারত-শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহাদের উপাধি ছিল স্ট্রাটেগোস। দ্বিতীয় অজেসের মৃত্যুর পর গণ্ডোফার্ণেস তক্ষশিলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

অজৈ (Pierre Hyacinthe Azais)—একজন ফরাসী দার্শনিক (১৭৬৬-১৮৪৫ খৃঃ)। প্রথম জীবনে তিনি স্বীয় জন্মভূমি সোরিজ গ্রামের শিক্ষালয়ে শিক্ষকতা করিতেন এবং এই সময়েই তিনি সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। ফরাসী-রাষ্ট্রবিপ্লবে তিনি অনুকূল মত পোষণ করিলেও বিপ্লবিগণের অত্যাচার সমর্থন করিতেন না এবং দেশ হইতে যাহাতে এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ড নিবারিত হয়, তাহার প্রতিবিধান জন্য ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে "Des Compensations dans les destinees humaines" নামক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ফরাসী-সম্রাট্ নেপোলিয়ন ইহা পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি এত প্রীত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সেণ্টকায়ার (St. Cyr) বিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া দেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে আবিগ্‌ননের এবং ১৮১২ হইতে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি নান্সির সাধারণ পাঠাগারের পরিদর্শক নিযুক্ত হন। ইহার পর তিনি পেন্সন লন এবং বক্তৃতাদি দিয়া ও দার্শনিক পুস্তক লিখিয়া জীবন অতিবাহিত করেন।

তিনি ১৮১২ খৃষ্টাব্দে Systeme universel (৮ খণ্ড), ১৮২০ খৃষ্টাব্দে Du Sort de l'homme (৩ খণ্ড) এবং ৮ খণ্ডে প্রকাশিত Cours de philosophie পুনঃসংস্কৃত করিয়া Explication universelle নামে ৩ খণ্ডে (১৮২৬ হইতে ১৮২৮ খৃঃ) প্রকাশ করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি আরও কএকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে পারি নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অজৈকপাৎ—(পুং) মহাদেব। (মহাভা° ১৩.১৭.১০২) ২ রুদ্রভেদ। [অজৈকপাদ দ্র°]

অজৈকপাদ,—(পুং) [অজস্য ছাগস্য একঃ পাদ ইব পাদো যস্য ; উপমা° বহুব্রী, বিকল্পে 'অ'-লোপাভাবঃ] রুদ্রবিশেষ।

অজৈকপাদ একাদশ রুদ্রের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু বিভিন্ন পুরাণাদিতে ইঁহাদের নামে ও জন্মবৃত্তান্তে যথেষ্ট পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

হরিবংশ মতে, মহাদেবের প্রসাদে দক্ষকন্যা সুরভির গর্ভে এবং কশ্যপের ঔরসে অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন, পিনাকী, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী ও রৈবত নামে এই একাদশ রুদ্র উৎপন্ন হন। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (৬৬. ৬৮-৭০) ইঁহাদের নাম এইরূপ পাওয়া যায়—অঙ্গারক, সর্প, নির্ঋতি, সদসস্পতি, অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন, ঊর্দ্ধকেতু, জ্বর, ভুবন, মৃত্যু ও কপাল।

সাম্বপুরাণ (১৭.৮-৯) মতে, অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন, হর, সর্ব্ব, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী, রৈবত ও ভুবন এই একাদশজন রুদ্র নামে অভিহিত। মৎস্যপুরাণ (৫.২৯-৩০) মতে, অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত এই একাদশ গণেশ্বর রুদ্র নামে খ্যাত।

ভাগবত মতে, দক্ষের কন্যা স্বরূপা ভূত হইতে অজ, রৈবত, ভব, ভীম, বাম, উগ্র, বৃষাকপি, অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন, মহান্ ও বহুরূপ নামে একাদশ রুদ্র উৎপাদন করেন।

মহাভারত মতে, মৃগব্যাধ, সর্প, নির্ঋতি, অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, কপালী, স্থাণু ও ভগ নামে এই একাদশ রুদ্র মরীচির সন্তান।

বিষ্ণুপুরাণ মতে, অহির্বুধ্ন, রুদ্র, অজৈকপাদ ও ত্বষ্টা এই চারিজন দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার পুত্র।

আবার লিঙ্গপুরাণ ও হরিবংশ মতে অজ একটী পৃথক

নাম এবং একপাদ অন্য নাম। রুদ্রদিগের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ ধ্যান আছে। সেই ধ্যানগুলির মধ্যে অজের পৃথক্ ধ্যান যথা—"অজনামা মহারুদ্রঃ" ইত্যাদি। একপাদের পৃথক্ ধ্যান—"একপাদাভিধো বিপ্র" ইত্যাদি।

ঋগ্বেদে ছয়বার অজৈকপাদ নাম উল্লিখিত হইয়াছে (২.৩১.৫; ৬.৫০.১৫; ৭.৩৫.১৩; ১০.৬৪.৪; ১০.৬৫.১৩; ১০.৬৬.১১)। পাঁচস্থানে ইঁহাকে অহির্বুধ্নের সহিত, দুইস্থানে পৃথিবীর সহিত, তিনস্থানে সাগরের সহিত, একস্থানে সূর্য্য, অগ্নি, পৃশ্নি, বৃহস্পতি, নদী, আকাশ, মেঘ, সিন্ধু, ঋভু, আপ ও সরস্বতী এই সকল দেবতার সহিত স্তব করা হইয়াছে।

বাজসনেয়সংহিতায় (৫.৩৫) অজৈকপাদ ও অহির্বুধ্নকে গার্হপত্যাগ্নি বলা হইয়াছে; কিন্তু তৈত্তিরীয়সংহিতায় (১.৩.৩) ইঁহাদিগকে যথাক্রমে গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি বলা হইয়াছে। অথর্ব্ববেদে (১৯.১১.৩) উক্ত হইয়াছে, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী সৃষ্ট হইলে অজৈকপাদ তথায় স্থাপিত হইয়াছিলেন।

তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে (৩.১.২.৮) সূর্য্যকে অজৈকপাদ বলা হইয়াছে; আবার তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণের অন্যত্র উক্ত হইয়াছে, অজৈকপাদের পূর্ব্বে প্রোষ্ঠপদ এবং প্রোষ্ঠপদের উত্তরে অহির্বুধ্ন অবস্থিত। (তৈত্তিঃব্রাঃ ১.৫.১.৫; ৩.১.২.৯)

যাস্কের নিরুক্ত মতে (১২.৩০), অজৈকপাদের অর্থ যিনি এক পদে ভ্রমণ করেন, অথবা যিনি একপদে রক্ষণ বা পান করেন। নিঘণ্টুকার (নিঘণ্টু ৫.৬) অজৈকপাদকে দেবতাভেদ বলিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ (২৯.২৩) মতে, অজৈকপাদ অগ্নি পূজনীয় এবং ইঁহাকে শালামুখ করিয়া স্থাপন করিতে হয়।

ঋগ্বেদে অজৈকপাদকে দৌস্পিতর্ নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। গ্রীক ঐতিহাসিক দিওদোরাস লিখিয়াছেন, ধরিত্রী দেবীর কন্যা এল্লার গর্ভে এবং জুপীতরের ঔরসে শকগণের আবির্ভাব হয়। এল্লার অবয়ব কটিদেশ হইতে উপরের অর্দ্ধাংশ নারীর ন্যায়। নিম্নার্দ্ধ নাগাকৃতি। এই দৌস্পিতর্ (অজৈকপাদ) ও জুপীতর অভিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। বৈদিক দেবতাসমূহ শকগণকর্ত্তৃক সূর্য্যের বিভিন্ন মূর্ত্তিতে কল্পিত ও পূজিত হইয়াছেন। অজৈকপাদও সম্ভবতঃ ঐ ভাবে পূজিত হইয়া থাকিবেন।

উড়িষ্যার কোঁইসারিগড়ের একটী মূর্ত্তিকে অনেকে অজৈকপাদের মূর্ত্তি বলিয়া মনে করেন।* এই মূর্ত্তি চতুর্হস্ত। উপরের দক্ষিণহস্তে ডমরু, নিম্নদক্ষিণহস্তে পাত্র, উপরের বামহস্তে অক্ষমালা, নিম্নহস্তখানি ভগ্ন। মূর্ত্তির উভয়পার্শ্বে দুইটী মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। একটীর হস্তে ত্রিশূল, অপরটী উন্নতহস্ত। পাদদেশে দক্ষিণে শকুনিমূর্ত্তি, বামে মর্কটমুখ



ময়ূরভঞ্জে কোঁইসারিগড়ের অজৈকপাদমূর্ত্তি

নন্দিমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি শকযুগের বলিয়া বোধ হয়। ইহার মুকুটে ক্ষুদ্র ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, বৌদ্ধেরা ইহা গ্রহণ করিয়া পূজা করিয়াছিল। কথিত আছে, শৈব, শাক্ত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৌদ্ধসম্প্রদায়গের ঐক্য সাধনের নিমিত্তই বৌদ্ধ মহাযানধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছিল। সুতরাং মহাযানমতের অভ্যুদয়কালে এই মূর্ত্তি নির্ম্মিত হওয়া সম্ভব। নেপালে ত্রিশূল-কপালধারী মহাকালের মূর্ত্তি হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়েরই পূজ্য। এই মহাকালের মুকুটে অক্ষোভ্যবুদ্ধমূর্ত্তি আছে। এই মহাকালমূর্ত্তি পূর্ব্ববর্ণিত অজৈকপাদেরই রূপভেদ বলিয়া বোধ হয়।

অজৈকপাদ$_2$—(পুং) রুদ্রদেবতাক নক্ষত্রবিশেষ। যাজুষজ্যোতিষ (১০ শ্লোক) ও আর্চ জ্যোতিষে (৯ শ্লোক)

* Vide Archæological Survey Reports of Mayurbhanj, Vol. I, by N. Vasu, p. xxxi.

পূর্ব্বপ্রোষ্ঠপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রমণ্ডলের স্থলে অজৈকপাদ ও অহির্বুধ্নের নাম পাওয়া যায়; অন্যত্র ইঁহারা যথাক্রমে পূর্ব্বভাদ্রপদ (পূর্ব্বপ্রোষ্ঠপদ) ও উত্তরভাদ্রপদের দেবতা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। পিতামহসিদ্ধান্ত, বৃদ্ধবশিষ্ঠসিদ্ধান্ত (৮ অ° ৮ শ্লো; ৮ অ° ২০ শ্লো), সোমসিদ্ধান্ত (৪.৬.৩২) ও সূর্য্যসিদ্ধান্ত (৮.১৬) প্রভৃতি জ্যোতিষ গ্রন্থে ইঁহারা নক্ষত্ররূপে উল্লিখিত হইয়াছেন।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অজৈকপাদ অর্থে সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বিদ্যুৎ প্রভৃতি বস্তু কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু উদ্ধৃত প্রমাণসমূহ হইতে অজৈকপাদ ও অহির্বুধ্ন দুইটী নক্ষত্র বলিয়াই মনে হয়।

পূর্ব্বভাদ্রপদের তিনচতুর্থাংশ কুম্ভরাশির অন্তর্গত। পূর্ব্বভাদ্রপদের একচতুর্থাংশ এবং উত্তরভাদ্রপদ লইয়া মীনরাশি। কুম্ভের পূর্ব্বভাগে মকররাশি। হিন্দুজ্যোতিষে মকররাশির চিহ্ন সকলেরই পরিচিত। কিন্তু প্রাচীন বাবীলোনীয়, গ্রীক্ ও আরবীয় জ্যোতিষে এই রাশি পূর্ব্বভাগে ছাগ ও পশ্চাদ্ভাগে মৎস্যের আকৃতিযুক্ত। ছাগের দুইটী পায়ে অবস্থান জন্য বোধ হয় বৃদ্ধবশিষ্ঠসিদ্ধান্তে নক্ষত্রদ্বয়ের অজপাদ নাম দেওয়া হইয়াছে।

অজৈকপাদ,—(পুং) বীরভদ্রের নামান্তর।

অজৈকা—(স্ত্রী) এক প্রমদা। এক সময় বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ যখন গৌতমী নদীর তীরে যজ্ঞকার্য্যে রত ছিলেন, তখন রাক্ষসেরা বিঘ্ন উৎপাদনে প্রবৃত্ত হইলে ব্রহ্মা উহাদের বিনাশের জন্য মায়াবলে অজৈকা নাম্নী এক সুন্দরী রমণীকে সৃষ্টি করিয়া ঋষিদিগের হস্তে অর্পণ করেন। কিন্তু রাক্ষসপতি শম্বর ইহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। (ব্রহ্মপু°)

অজৈকাদশী—ভাদ্রমাসের কৃষ্ণৈকাদশী তিথিতে পালনীয় ব্রত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে এই ব্রত-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজ্যধনহীন হইয়া নানা দুঃখ পাইয়াছিলেন। অবশেষে গৌতম মুনির উপদেশে এই একাদশীর অনুষ্ঠান করিয়া রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হন ও পরে স্বর্গলাভ করেন। এই ব্রতমাহাত্ম্য পঠন বা শ্রবণে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয়। (পদ্মপু°, উত্তর°, ৩৪ অ°)

অজৈড়ক—(ক্লী) [অজাশ্চ এড়কাশ্চ, দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবঃ] ছাগ এবং মেষসমূহ।

অজৈব (Inorganic)—যাহার উৎপত্তি কোন জন্তু (প্রাণী) বা উদ্ভিদ্ হইতে নহে তাহাকে অজৈব বলা হয়। এই শব্দ হইতে মোটামুটি ধারণা হয় যে, যাহা জীবন সম্বন্ধীয় নহে, তাহাই অজৈব। তাহা যদি হয়, তবে বলা যাইতে পারে যে, খনিজ পদার্থগুলি এবং ধাতু ও ধাতব পদার্থসকল অজৈব। কিন্তু আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের দুই একটী অত্যাশ্চর্য্য পরীক্ষার ফলে ঐরূপ ধারণা সম্পর্কেও সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। আচার্য্য বসু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে বিশেষ বিশেষ উত্তেজকের প্রয়োগে ধাতু, উদ্ভিদ্ এবং জন্তু সমভাবে সাড়া দিয়া থাকে; তাহাদের মধ্যে তিনি একই প্রকারের উত্তেজনা, অবসাদ ও ক্লান্তির লক্ষণ প্রকট দেখিতে পান। তাঁহার মতে তথাকথিত অজৈব পদার্থেরও অবসাদ দূরীভূত হইয়া নবোদ্যম লাভের সম্ভাবনা আছে, একথা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই।* এমতাবস্থায় 'অজৈব' সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করা সমীচীন নহে।

এতৎসম্পর্কে আর একটী কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। রসায়ন-শাস্ত্রের একটী অংশকে 'অজৈব রসায়ন' (Inorganic Chemistry) আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু রসায়নের এই অংশে জীবনহীন পদার্থের রাসায়নিক গঠন ও ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। এইরূপ ধারণা পোষণ করাও এখন অমূলক হইয়া দাঁড়াইবে। যদিও ধাতু এবং স্থূলতঃ অন্যান্য জীবনহীন পদার্থ সম্বন্ধে আলোচনা করাই অজৈব রসায়নের মুখ্য উদ্দেশ্য, তথাপি এমন কথা বলা যায় না যে, জীব-সম্বন্ধে আলোচনাই জৈব রসায়নের একমাত্র লক্ষ্য এবং এই হিসাবে জৈব ও অজৈব রসায়নের সীমা নির্দ্দেশ করাও সঙ্গত হইবে না। কারণ তাহাতে দুই অংশের প্রকৃত পার্থক্য-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মিবে না। মোটামুটিভাবে এই বলা যাইতে পারে যে, প্রধানতঃ সংযোজনার সরলতা ও জটিলতার উপর নির্ভর করিয়া রসায়ন-শাস্ত্রকে এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। খনিজ পদার্থ, ধাতু, বায়বীয় পদার্থ এবং তাহাদের রাসায়নিক উপাদান ও ক্রিয়াদির আলোচনা অজৈব রসায়নের অন্তর্ভুক্ত; আর অঙ্গারঘটিত জটিলতর পদার্থগুলি জৈব-রসায়নে স্থান লাভ করে। অবশ্য অঙ্গারাম্ল, অঙ্গারাম্লজন প্রভৃতি পদার্থ অঙ্গারঘটিত হইলেও অজৈব রসায়নের বিষয়ীভূত। রসায়ন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে এই বিষয়ের আলোচনা লিপিবদ্ধ হইবে। [রসায়ন দ্র°]

অজো (Azo)—ইতালীবাসী একজন ব্যবহারশাস্ত্রবিৎ। তিনি খৃষ্টীয় ১১৫০ হইতে ১২৩০ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার পূর্ণনাম অজো সোলদানাস (Azo Soldanus)। বেলোনা নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি জোয়ানেস্ বাসিয়ানাসের ছাত্র ছিলেন এবং স্বদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন।

* Response in the Living and Non-living (1902).

ব্যবহারশাস্ত্র-অধ্যাপনাকালে তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় আইন-তত্ত্ব-সম্বন্ধে যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ছাত্র আলেসান্দ্রো (Alessandro de Santo Aegidio) সংগ্রহ করিয়া যান। হিউগোলিনাস (Hugolinus) ও ওদোফ্রেদাস Odofredus) তাঁহার পরিত্যক্ত অংশ সংযোজিত করিয়া রোমক-আইনের (Roman law) একটী ধারাবাহিক ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। বিখ্যাত ব্যবহারবিৎ Accursius ও Jacobus Balduinus তাঁহার শিষ্য। ১২৩০ খৃষ্টাব্দে ইনি পরলোকগমন করেন।

অজোগন্ধ—শিবের দৈবিক লিঙ্গভেদ। পুষ্করতীর্থ ইঁহার স্থান।

অজোধন—একটী যুদ্ধক্ষেত্র। ইহা অজুধান নামেও পরিচিত। অধুনা ইহার নাম পাকপত্তন। [পাকপত্তন দ্র°] অবস্থান অক্ষা° ৩০°২০'৪০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°২৫'৫০" পূঃ। এখানে শেখ ফরিদ্‌উদ্দীন্ গঞ্জ-শক্করের সমাধি আছে।

১৪০১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী (হিজরি ৮০৩, রজব ৯) মুলতানের শাসনকর্ত্তা খিজির খাঁ সামানের শাসনকর্ত্তা গালিব খাঁর জামাতা তগী খাঁকে অজোধনের যুদ্ধক্ষেত্রে পরাস্ত করেন। আর একবার অজোধনে খিজির খাঁর সহিত ইক্‌বালের যুদ্ধ হয় (১২ই নভেম্বর, ১৪০৫ খৃঃ)। এই যুদ্ধে ইক্‌বাল পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন।

অজোভ (Azov)—রুষসাম্রাজ্যের একটী নগর। ইহা ডন্-কসাক্‌দিগের অধিকারভুক্ত এবং ডন্ নদীর বামকূলে মোহানা হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। নগরটী বাণিজ্য-প্রধান ও এখানে একটী সামরিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত আছে। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে রুষরাজ পিটার দি গ্রেট্ বহুদিন অবরোধের পর এই স্থান দখল করেন। ১৭১১ খৃষ্টাব্দে উহা তুর্ক জাতির অধিকারে আসে। পরে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে পুনরায় উহা রুষসাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ইহার ১০ মাইল উত্তরে তানাই শহর। এখানে জেনোয়াবাসী বণিক্‌গণ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে একটী কুঠী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ সময় হইতে এখানকার বাণিজ্য-প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। রুষাধিকারে আসিবার পর, এখানকার বন্দরে পলি পড়ায় পণ্যবাহী নৌকাদি গমনাগমনের অসুবিধা ঘটে। ঐ সময়ে তগন্‌রোগ নগরে আর একটী বাণিজ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এখানকার বাণিজ্য-প্রসার ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

অজোভ উপসাগর (Sea of Azov)—ইউরোপের দক্ষিণে অবস্থিত সাগরের অংশবিশেষ, কৃষ্ণসাগরের সহিত ইহা য়েনিকেল বা কার্চ-প্রণালী দ্বারা সংযোজিত। প্রাচীন গ্রীকেরা ইহাকে Bosporus Cimmerius ও রোমকেরা Palus Maeotis বলিত। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে তেমারেন্দা বলে।

এই উপসাগর অক্ষা° ৪৫°২০' হইতে ৪৭°১৮' উঃ এবং দ্রাঘি° ৩৫° হইতে ৩৯° পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহা উত্তর-পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রায় ২৩০ মাইল বিস্তৃত। জলভাগের পরিমাণ ১৪৫১৫ বর্গমাইল। ডন্ নদী এই উপসাগরে আসিয়া মিশিয়াছে। নবেম্বর হইতে এপ্রিল মাসের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত ইহার জল জমিয়া যায়। ইহার তীরে তগন্‌রোগ, বের্দ্দিয়ানস্ক, মারিউপোল ও য়েনিকেল নগর প্রতিষ্ঠিত থাকায় ঐ সকল স্থান হইতে রুষ-সাম্রাজ্যের বাণিজ্য পরিচালিত হইয়া থাকে। ইহার পশ্চিমাংশে আরাবৎ নামক বালুকাময় খাদ। উহাতে সমুদ্রজল আবদ্ধ হইয়া সিবাশ নামক হ্রদে পরিণত হইয়াছে।

প্রাগৈতিহাসিকযুগে কাস্পীয় সাগরের সহিত অজোভ উপসাগর একটী নদী দ্বারা সংযুক্ত ছিল। এখনও ঐ খাদ বিদ্যমান, কিন্তু বর্ত্তমানে উহা জলশূন্য।

এই উপসাগরে প্রচুর মৎস্য জন্মে। এই কারণ তুর্কীরা ইহাকে 'বলুক দেনিজ' (মৎস্যসাগর) বলিয়া থাকে।

অজোর্স (Azores)—উত্তর অতলান্তিক মহাসাগরস্থ পর্ত্তুগাল-রাজ্যের অধিকৃত একটী দ্বীপপুঞ্জ। পর্ত্তুগীজভাষায় উহা অশোর্স নামে অভিহিত। অক্ষা° ৩৬°৫৫' হইতে ৩৯°৫৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ২৫° হইতে ৩১°১৬' পঃ মধ্যে অবস্থিত।

এই দ্বীপপুঞ্জ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। দক্ষিণপূর্ব্ব অংশে সেণ্ট মাইকেল, সেণ্ট মেরী ও ফর্ম্মিগস্; মধ্যাংশে ফায়াল, পিকো, সেণ্ট জর্জ্জ, টার্শিরা ও গ্রাসিওসা এবং উত্তরপশ্চিমে ফ্লোর্স ও কোর্ভো দ্বীপ অবস্থিত। পর্ত্তুগালের রোকা অন্তরীপ হইতে সেণ্ট মাইকেল দ্বীপ ৮৩০ মাইল।

দ্বীপগুলির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মন্দ নহে। সকলগুলিই পর্ব্বতমালা সমাকীর্ণ, দেখিলে মনে হয় এক সময়ে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গমে সঞ্চিত ভস্মরাশি স্তূপীকৃত হওয়ায় ইহাদের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল। পিকো দ্বীপের পর্ব্বতশিখর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭৬১২ ফুট উচ্চ। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে ফায়াল দ্বীপে একবার মাত্র অগ্ন্যুদ্গীরণ হইয়াছিল। ১৪৪৪-১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট মাইকেল দ্বীপে অগ্ন্যুদ্গম হয়। ১৫২২ খৃষ্টাব্দে ভিলা-ফ্রাঙ্কা নগরী ভস্মরাশিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে পিকো দ্বীপে ঘন ঘন ভূকম্পসহ অগ্ন্যুদ্গার হইতে থাকে। ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে টার্শিরা দ্বীপের একটী নগরী ধ্বংস হয়। ১৬৩০, ১৬৫২, ১৬৫৬, ১৭৫৫ ও ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট মাইকেল দ্বীপে ঘন ঘন ভূকম্পসহ অগ্নিনির্গত হইতে দেখা যায়। ১৬৩৮, ১৭২০, ১৮১১ ও

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ভূগর্ত হইতে যে গলিত স্রাব নির্গত হয়, তাহাতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে।

এখানকার জলবায়ু মনোরম—নাতিশীতোষ্ণ ; কিন্তু বাতাসের বেগ প্রবল থাকায় উপকূলে বাণিজ্য বিঘ্নসঙ্কুল। এখানে জীবজন্তু খুব কম। তিমিমৎস্যের শীকার এতদ্দেশবাসীর একটী প্রধান ব্যবসায়। মূল্যবান্ বৃক্ষ দ্বীপে নাই বলিলেই চলে। ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে বণিক্‌গণ যে সমস্ত ফল ও পুষ্পের বৃক্ষ আনিয়া এখানে রোপণ করিয়াছে, তাহাতেই দ্বীপের শোভা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দ্বীপবাসীদের অধিকাংশই পর্তুগীজ। তবে তাহাদের মধ্যে মূর ও ফ্লেমিশ রক্ত বিদ্যমান। ইংরেজ, স্কচ্ ও আইরিশ ঔপনিবেশিকের সংখ্যাও কম নহে। এতদ্ভিন্ন এখানে নিগ্রোজাতিরও বাস আছে।

এই সকল দ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। প্রাচীন গ্রীক্ বা রোমকদিগের ভৌগোলিক বিবরণীতে ইহার কোন উল্লেখ নাই। কোর্ভোদ্বীপে কতকগুলি কার্থেজীয় মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তাহা দেখিয়া মনে হয়, কার্থেজবাসী বণিক্‌সম্প্রদায় ভাগ্যান্বেষণে বাহির হইয়া বাণিজ্যপোতে এখানে আসিয়া পণ্য বিক্রয়ের চেষ্টা পাইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১২শ শতকে আরব-দেশীয় ভৌগোলিক ইদ্রিসি ও ১৪শ শতকে ইবন্-অল্-বর্দ্দী কানারীদ্বীপের পার্শ্বে অবস্থিত কতকগুলি দ্বীপের (অজোর্স) বর্ণনা-প্রসঙ্গে ঐ স্থানের পশুপক্ষীর উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। শিক্‌রা পক্ষীকে পর্তুগীজ ভাষায় 'অশোর' বলে। এই পক্ষীর বাহুল্য হেতুই ইহার নাম অশোর্স বা অজোর্স হইয়াছে। আরবদেশীয় লেখকগণ লিখিয়াছেন যে, এইস্থান পূর্ব্বে জনবহুল ছিল ; কিন্তু অন্তর্বিরোধের কারণ ক্রমশঃ লোকসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।

১৩৫১ খৃষ্টাব্দে এই দ্বীপপুঞ্জ ইউরোপীয় বণিক্‌গণের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। তৎকালে প্রকাশিত একখানি মানচিত্রে দক্ষিণাংশের দ্বীপগুলি Cabreras ; মধ্যাংশের দ্বীপগুলি De Ventura sive de Columbis এবং পশ্চিমের দ্বীপ De Brazi নামে লিখিত হয়। পুনরায় ১৩৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত অপর একখানি মানচিত্রে Corvi Marini (Corvo), Li Conigi (Flores) ও San Zorze (St. George) দ্বীপের উল্লেখ পাওয়া যায়। উপরি-উক্ত নামকরণ হইতে মনে হয়, জেনোয়াবাসী বণিকেরাই প্রথমে এই দ্বীপপুঞ্জ দেখিতে পাইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৪৩২ খৃষ্টাব্দ হইতেই ইহার আবিষ্কারের সূত্রপাত হয়। পর্তুগালের বিখ্যাত নাবিক হেনরী তাঁহার ভ্রাতা ডম্ পেড্রোর সমুদ্র-যাত্রার চিত্র হইতে এই দ্বীপপুঞ্জের সংস্থান অবগত হইয়া কেব্রাল (Gonzalo Velho Cabral) নামক এক বণিক্‌কে আবিষ্কারার্থ প্রেরণ করেন। কেব্রাল উক্ত বর্ষে দলবল লইয়া যাত্রা করেন এবং সান্তা মারিয়া বা সেণ্ট মেরী দ্বীপে (Santa Maria or St. Mary) উপস্থিত হন। ১৪৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সেণ্ট মাইকেল দ্বীপ অধিকার করিয়া লন। ইহার পর ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সমস্ত দ্বীপগুলি আবিষ্কৃত হয় এবং ধীরে ধীরে ফ্লেমিশগণ এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে থাকে। ১৪৬৬ খৃষ্টাব্দে রাজা ৫ম আল্‌ফন্সো (Alphonso V) বার্গাণ্ডীর ডিউকের পত্নী ইসাবেলাকে ফায়ালদ্বীপ যৌতুকস্বরূপ প্রদান করেন।

১৫৮০ হইতে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সমগ্র পর্তুগালসহ এই দ্বীপপুঞ্জ স্পেনরাজের শাসনাধীন থাকে। ঐ সময়ে এখানে আমেরিকাগামী নৌবহরের একটী আড্ডা স্থাপিত হয়। এইসূত্রে এখানে ইংরেজের সহিত স্পেনীয়দিগের বিরোধ ঘটে। ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ফ্লোর্সদ্বীপের নিকট ইংরেজের 'Revenge' নামক রণতরীর সহিত স্পেনীয় পোতবাহিনীর সংঘর্ষ ঘটে। মার্কুইশ ডি পোম্বালের শাসনাধিকারে (১৬৯৯-১৭৮২ খৃঃ) এস্থানের অনেক উন্নতি সাধিত হয় ; কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অবিবেচনায় দেশবাসীর মঙ্গলকর প্রস্তাবসমূহ কার্য্যকরী হয় নাই। খৃষ্টীয় ১৯শ শতকের প্রারম্ভে পর্তুগীজগণ এই দ্বীপের অধিকার দাবী করেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রাণী মেরিয়া টার্শিরা দ্বীপের অধিকার পান। তৎপরে ধীরে ধীরে সমগ্র দ্বীপগুলি পর্তুগীজ অধিকারে আসিয়াছে।

অজোষ্য—(ত্রি) অসেব্য, সেবার অযোগ্য। (ঋক্ ১.৩৮.৫)

অজ্জ—উদয়পুরের অন্তর্গত বরী-সাদ্‌রির রাজবংশের আদিপুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা। সাদ্‌রির রাজা মেবারাধিপতির এক প্রধান পার্ষদ ও সেনাপতি। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে ঝালাবংশীয় অজ্জ নামক এক বীরপুরুষ কাঠিয়াবাড় অঞ্চল হইতে মেবারে আগমন করিয়া রাণা ১ম সংগ্রামসিংহের পক্ষে বাবরের বিরুদ্ধে খান্নুয়ার যুদ্ধে যোগদান করেন। সংগ্রামসিংহ যুদ্ধে আহত হওয়ায় যখন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অন্যত্র নীত হইতেছিলেন, তখন অজ্জ তাঁহার স্থলাভিষিক্তরূপে হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া শত্রুগণের আক্রমণ প্রতিহত করিবার চেষ্টা করেন। যুদ্ধে অজ্জের মৃত্যু হয়। এই আত্মত্যাগের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহার পুত্র সাদ্‌রির জায়গীর ও 'রাজা' উপাধি লাভ করেন এবং মেবারের প্রাসাদদ্বার অবধি রাজপতাকা বহন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। তদ্বংশীয় অপরাপর ব্যক্তিও অদ্যাবধি এই সকল অধিকার ভোগ করিতেছেন।

অজ্জ(জ্জু)কা—(স্ত্রী) [অর্জ্জয়তি যা সা অর্জ্জি-উক, পৃ° রকারস্থ জত্বম্] নাট্যোক্ত বেশ্যা। [নাট্যাদন্যত্র প্রয়োগো নাস্তীত্যর্থঃ। (মহেশ্বর)]

অজ্জনন্দি—এক জৈন আচার্য্য। মথুরা হইতে ৬ মইল দূরে অনমলৈ গ্রামে ইঁহার একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

অজ ঝটা—(স্ত্রী) [অজতি দোষং ক্ষিপতি অজ্-ক্ষিপ্, ঝটতি সংহন্যতে অজ-ঝট-অচ্। ততঃ কর্ম্মধা পৃ° ন কুত্বং, ন 'বী'-আদেশঃ] ভুঁই-আমলা। পর্য্যায়—ঝটা, অমলা, তালী, শিবা, ভূম্যামলকী। [ভুঁই-আমলা দ্র°]

অজ ঝল—(ক্লী) [উজ্ঝতি অস্ত্রং বারয়তি উজ্ঝ্-কর্ত্তরি অল্চ, পৃষোদরাদি° 'উ'স্থানে 'অ':] চর্ম্মাদিময় ফলক, চলিত ঢাল। (পুং) ২ কোকিল। ৩ অঙ্গার।

অজ্ঞ—(ত্রি) [ন জানাতি জ্ঞা-ক] জ্ঞানশূন্য। ২ বিশেষ জ্ঞানশূন্য। ৩ মূর্খ। ৪ বেদান্তমতসিদ্ধ অজ্ঞানরূপ পদার্থযুক্ত। 'অহমজ্ঞঃ' অর্থাৎ 'আমি অজ্ঞ' এই যে অনুভব, ইহা বেদান্তমতে অজ্ঞানবিষয়ক। এই অজ্ঞান জ্ঞানাভাব নয়, ইহা একটী ভিন্ন পদার্থ। ৫ অচেতন। ৬ জড়। "বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্থ যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্থ।" (সাংখ্যকারিকা) ৭ অল্পজ্ঞ। ৮ কিঞ্চিজ্জ্ঞ। ['প্র' প্রকৃষ্টরূপে অজ্ঞ, প্রাজ্ঞঃ] ৯ সুষুপ্তি-অবস্থাপন্ন জীব। সুষুপ্তিকালে জীবে বিশেষ জ্ঞান থাকে না বলিয়াই তাহাকে প্রাজ্ঞ বা প্রকৃষ্টরূপে অজ্ঞ বলা হয়। ১০ সর্ব্বজ্ঞ। (ভাগবত ১০.২৫.৫) 'নাস্তি জ্ঞো যস্মাৎ তং সর্ব্বজ্ঞমিত্যর্থঃ।' (শ্রীধর) (পুং) ১১ জীব। (শ্বেতাশ্বতরউ° ১.৯)

সচরাচর যে লিখিতে পড়িতে জানে না, সহজ বিষয় ভিন্ন কঠিন তত্ত্বে যাহার বোধ প্রবিষ্ট হয় না, সমাজের মধ্যে ভালরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে পারে না, কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে যে অক্ষম, তাহাকেই আমরা অজ্ঞ বলি।

অজ্ঞতা—(স্ত্রী) অজ্ঞের ভাব বা ধর্ম্ম।

অজ্ঞাত—(ত্রি) [ন জ্ঞা-কর্ম্মণি ক্ত] অপরিচিত, জ্ঞানের অবিষয়ীভূত; অবিদিত। "অজ্ঞাতকুলশীলস্থ বাসো দেয়ো ন কুত্রচিৎ।" (হিতোপদেশ)

অজ্ঞাতকেত—(ত্রি) অপ্রজ্ঞাতচিহ্ন; যাহার চিহ্ন জানা যায় না। (ঋক্ ৫.৩.১১)

অজ্ঞাতকৌণ্ডিল্য—মহাবস্তুবদানে লিখিত আছে, বুদ্ধদেব বারাণসীতে পঞ্চ যুবককে দীক্ষিত করেন। ইঁহারা পূর্ব্বে তীর্থিকদের মতাবলম্বী ছিলেন। এই পঞ্চজনের একজন হইতেছেন—অজ্ঞাতকৌণ্ডিল্য।

কথিত আছে, অজ্ঞাতকৌণ্ডিল্য পূর্ব্বজন্মে এক কুম্ভকার ছিলেন। ঐ জন্মে তিনি একজন প্রত্যেক-বুদ্ধকে পিত্তরোগ হইতে নিরাময় করেন। প্রত্যেকবুদ্ধ তাঁহাকে বর প্রদান করেন যে, তিনিই প্রথমে সৌগতধর্ম্ম লাভ করিবেন। অপর এক জন্মে তিনি বণিক্ ছিলেন। তাঁহার বাণিজ্যতরী ডুবিয়া গেলে তিনি নিঃস্ব হইয়া দানবীর কোশলরাজের নিকট সাহায্যলাভার্থ গমন করিতেছিলেন। দৈববিড়ম্বনায় তৎকালে কোশলরাজও রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এই অবস্থায় দুইজনের সাক্ষাৎ হইল। কোশলরাজের দুরবস্থা দেখিয়া বণিক্ সাহায্যলাভের আশা ত্যাগ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন রাজা সঙ্কল্প করিলেন যে, বণিক্ সহ তাঁহার শত্রু কাশীরাজের সভায় গিয়া ধরা দিবেন; কারণ কোশলরাজের মস্তকের জন্য কাশীরাজ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহারা কাশীরাজসকাশে উপস্থিত হইলে কাশীরাজ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর এই মহানুভবতা দর্শনে মুগ্ধ হইলেন এবং সকল বৈরিতা বিস্মৃত হইয়া কোশলরাজকে তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন। বণিক্ও প্রচুর ধনরত্ন প্রাপ্ত হইলেন।

অজ্ঞাতচর্য্যা (স্ত্রী) অজ্ঞাত বাস বা বসতি। "হংসাঃ সম্প্রতি পাণ্ডবা ইব বনাদজ্ঞাতচর্য্যাং গতাঃ।" (মৃচ্ছকটিক ৫.৬)

অজ্ঞাতপিতৃক (পুং) নিজের পিতাকে যে জানে না, জারজ।

অজ্ঞাতপূর্ব্ব (ত্রি) পূর্ব্বে যাহা জানা হয় নাই।

অজ্ঞাতযক্ষ্ম—(পুং) শরীরগত অপরিজ্ঞাতনামা রোগ। "অজ্ঞাতযক্ষ্মাদুত রাজযক্ষ্মাৎ।" (ঋক্ ১০.১৬১.১) 'অয়মেতৎসংজ্ঞ ইত্যপ্রজ্ঞাতঃ শরীরগতো রোগঃ অজ্ঞাতযক্ষ্মঃ।' (সায়ণ)

অজ্ঞাতযৌবনা (স্ত্রী) [অজ্ঞাতং যৌবনং যস্থাঃ; বহুব্রী। স্ত্রিয়াং টাপ্] যে নারী নিজের যৌবন বুঝে না; মুগ্ধা নায়িকাবিশেষ। (রসমঞ্জরী)

অজ্ঞাতবাস (ত্রি) [অজ্ঞাতো বাসো বাসস্থানং যস্থ যস্মিন্ বা; বহুব্রী] অবিদিত-বাসস্থান; যাহার বা যে বাসকার্য্যে বাসস্থান জানা যায় নাই। "কথং বিরাটনগরে মম পূর্ব্বপিতামহাঃ। অজ্ঞাতবাসমুষিতা দুর্য্যোধনভয়ার্দ্দিতাঃ॥" (মহাভা° ৪.১.১) [অজ্ঞাতো বাসঃ; কর্ম্মধা] (পুং) ২ অজ্ঞাত বসতি, অজ্ঞাতসারে বাস।

অজ্ঞাতসার (ত্রি) সার বা মর্ম্ম যাহার অবিদিত; পরোক্ষ।

অজ্ঞাতি—(পুং) [ন জ্ঞাতিঃ; নঞ্-তৎ] জ্ঞাতিভিন্ন অন্য ব্যক্তি। মনু বলিয়াছেন, মৃত অজ্ঞাতিরও স্বেচ্ছায় শবানুগমন করিয়া পরে সবস্ত্র স্নান, অগ্নিস্পর্শ ও তৎপরে ঘৃতপ্রাশন করিবে। এইরূপে মৃত অজ্ঞাতির অনুগমন নিমিত্ত অশৌচের শান্তি হইবে। (মনু ৫.১০৩)

অজ্ঞান,—(ত্রি) [নাস্তি জ্ঞানং যস্থ] যাহার বিশিষ্ট জ্ঞান

নাই, তাদৃশ অজ্ঞ। ২ তত্ত্বজ্ঞানহীন। [ন জ্ঞানং ; নঞ্-তৎ] (ক্লী) ৩ জ্ঞানাভাব। ৪ বিরুদ্ধজ্ঞান। শ্রীমদ্ভাগবত মতে, ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে পাঁচ প্রকার অজ্ঞানের কল্পনা করেন। যথা—তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র এবং অন্ধতামিস্র। ৫ বেদান্তমতে জ্ঞানবিরোধ পদার্থান্তর। অবস্তুতে বস্তুত্বের আরোপ। ইহা বেদান্তে 'অবিদ্যা' এবং 'মায়া' নামেও উক্ত হইয়াছে। সর্ব্ববিধ দর্শনের গোড়ায় ইহাকে মানিয়া লওয়া হইয়াছে। দর্শনের উদ্দেশ্য জ্ঞান—সৎ পদার্থের জ্ঞান। যদি সতের সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রকার ধারণা পূর্ব্ব হইতেই না থাকে, তাহা হইলে দর্শনের উদ্দেশ্য কখনই সিদ্ধ হয় না। যদি সৎপদার্থের যথার্থ জ্ঞান আমাদের থাকে, তাহা হইলে চিন্তা বা দার্শনিক অনুধাবনা সাহায্যে উহা লাভ করিবার কোনই অবকাশ থাকে না। সুতরাং সর্ব্ববিধ দার্শনিক চিন্তার মূলে ইহাই আছে যে,—আমাদের ব্রহ্মসম্বন্ধে ধারণা আছে, কিন্তু যথার্থ জ্ঞান নাই। আমাদের ধারণা বা জ্ঞান ভ্রান্তিপূর্ণ। দার্শনিক চিন্তার উদ্দেশ্য হইল—এই ভ্রান্তি নিরাস করিয়া ব্রহ্মকে (সৎবস্তুকে) যথার্থরূপে জানা। সৎ সম্বন্ধে এই ভ্রমপূর্ণ জ্ঞান বা ধারণাকে অজ্ঞান বলা হইয়াছে।

বেদান্ত একমাত্র ব্রহ্মকেই সত্য ও জগৎকে মিথ্যা বলে। জগৎ দৃষ্টিবিভ্রমমাত্র। উহার প্রকৃত সত্তা নাই। কিন্তু জগৎ আছে বলিয়া যে মনে হয়, এই প্রতীতিই অবিদ্যা। সুতরাং বেদান্তে দুইটী প্রধান বিষয় লইয়াই আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে—ব্রহ্ম ও অবিদ্যা।

অবিদ্যা জগতের কারণ নহে। জগৎ নিজেই অবিদ্যা। যাবৎ জগৎ প্রতীত হইতেছে, তাবৎ অজ্ঞান রহিয়াছে। অজ্ঞানের নাশই জগতের নাশ।

সকল বৈদান্তিক কিন্তু উহা স্বীকার করেন না। কেহ কেহ অবিদ্যা ও অধ্যাসকে পৃথক্ মনে করেন এবং অবিদ্যাকে অধ্যাসের কারণ বলিয়া থাকেন।

যেহেতু ব্রহ্মই একমাত্র সৎপদার্থ, সুতরাং অজ্ঞান মিথ্যা বা অলীক। উহার অস্তিত্ব নাই। আবার উহার আত্যন্তিক অভাবও নাই। কারণ জগৎ আমাদের প্রতীত হইতেছে। শশশৃঙ্গের ন্যায় উহা সম্পূর্ণ অভাবাত্মক নহে। অজ্ঞানের 'অস্তিভাব'ও নাই 'নাস্তিভাব'ও নাই। সুতরাং ইহা অনির্ব্বচনীয়। "অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধিভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি।" (বেদান্তসার) [মায়াবাদ ও অবিদ্যা দ্র°]

৬ জীবের সংজ্ঞাহীন অবস্থা অর্থাৎ কোনরূপ জ্ঞান না থাকিলে সেই অবস্থাকে অজ্ঞান, অচৈতন্য বা অচেতনা বলে। [অচেতনা দ্র°]

অজ্ঞানতিমির—(ক্লী) [কর্ম্মধা] অজ্ঞানরূপ অন্ধকার; মোহান্ধকার।

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥" (গুরুগীতা)

অজ্ঞানিন্—(ত্রি) মূর্খ, অনভিজ্ঞ। ২ তত্ত্বজ্ঞানহীন।

অজ্ঞাস্—(ত্রি) অকৃতজ্ঞ। (ঋক্ ১০.৩৯.৬)

অজ্ঞিকা—(স্ত্রী) অজ্ঞা, অনভিজ্ঞা।

অজ্ঞেয়—(ত্রি) [ন জ্ঞেয়ঃ ; নঞ্-তৎ] জানিবার অযোগ্য।

অজ্ঞেয়বাদ—বিশ্বজগতের পরমতত্ত্ব মানবজ্ঞানের অনধিগম্য প্রদেশে গভীর গুহায় নিহিত, এই মতবাদ অজ্ঞেয়বাদ নামে প্রচলিত। ঠিক এই কথাটীর ব্যবহার বা উল্লেখ প্রাচীন বা নবীন সংস্কৃত দার্শনিক সাহিত্যে পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয় না; ইংরেজ বৈজ্ঞানিক টমাস্ হেন্‌রী হাক্সলী উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে Agnosticism নামক যে কথাটীর প্রচলন করেন, অজ্ঞেয়বাদ তাহারই বাঙ্গালা প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। Agnosticism এই ইংরেজী শব্দটীর উৎপত্তি সম্বন্ধে হাক্সলী এইরূপ লিখিয়াছেন—

"আমার বুদ্ধি পরিপক্ক হইলে মনে এই প্রশ্ন উদিত হইল যে, আমি নাস্তিক, আস্তিক, সর্ব্বেশ্বরবাদী, জড়বাদী, আদর্শবাদী, খৃষ্টধর্ম্মী ও স্বাধীনচিন্তক—ইহার মধ্যে কোন্‌টী? এ বিষয়ে যতই ভাবিতে লাগিলাম, সমস্যা ততই দুরূহ বোধ হইতে লাগিল। শেষে সিদ্ধান্ত করিলাম, শেষোক্ত শ্রেণী ব্যতীত অপর কোন শ্রেণীর সহিত আমার কোনই সম্বন্ধ নাই। ইঁহাদের অধিকাংশ লোকই যে বিষয়ে একমত, ঠিক সেই বিষয়েই তাঁহাদের সহিত আমার অনৈক্য। তাঁহাদের নিশ্চিত ধারণা যে, তাঁহারা একটা বিশেষ 'জ্ঞানের' সন্ধান পাইয়াছেন এবং জীবনমরণের সমস্যাকে একভাবে সমাধান করিয়াছেন। কিন্তু আমার নিশ্চিত ধারণা, আমি ঐরূপ কিছুই করিতে পারি নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এ সমস্যার সমাধান হয় না। হিউম এবং কান্ট্‌কে আমার মতের সমর্থকরূপে পাইয়া আমি উক্ত ধারণা দৃঢ়ভাবেই পোষণ করিলাম। এই অবস্থায় আমি সৌভাগ্যক্রমে Metaphysical Society নামক বিখ্যাত সমিতির সভ্যদলভুক্ত হইয়া পড়িলাম। এই সমিতি ছিল সর্ব্বমতের সংমিশ্রণ; সর্ব্ববিধ দার্শনিক ও ধর্ম্মমত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিবার অধিকার সকল সভ্যেরই ছিল। সকল সভ্যই কোন না কোন প্রকার 'বাদী' ছিলেন। কিন্তু আমার কোন বিশিষ্ট মত ছিল না; কাজেই আমার দশা হইল উপাখ্যানের সেই লাঙ্গুলহীন শৃগালের ন্যায়। তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া 'Agnostic' কথাটী আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম, কারণ এইটীই আমার নিকট সকলের চেয়ে

উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইল। খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাসে Gnostic বলিয়া একটী সম্প্রদায় ছিল; ঠিক যে বিষয়টী আমার নিকট অজ্ঞাত, এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা সেই বিষয়েই প্রগাঢ় জ্ঞানের ভাণ দেখাইতেন। এই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধবাদিরূপে 'agnostic' কথাটী আমার মনে আসিল এবং এই বিশেষণের আবরণে আমার নিজের নগ্নতা ঢাকিলাম। কথাটী বেশ ফলদায়ক হইল। 'স্পেক্টেটর' পত্র যখন এই শব্দটী সমর্থন ও ব্যবহার করিল, তখন ইহার উৎপত্তির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার সন্দেহ বিদ্বন্মণ্ডলীর মন হইতে একেবারে দূরীভূত হইল।"*

অক্সফোর্ডের বিখ্যাত New English Dictionaryতে এই কথাটীর উৎপত্তির ইতিহাস একটু অন্যরূপ দেওয়া হইয়াছে—

"১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে, অধুনালুপ্ত Metaphysical Society গঠনের পূর্ব্বে ক্লাপ্‌হাম কমন নামক স্থানে মিঃ জেম্‌স্ নোলেসের ভবনে এক সান্ধ্যবাসরে আমার সমক্ষে হাক্সলী এই শব্দটীর উদ্ভাবন করেন। 'অজ্ঞাত ঈশ্বরে'র উদ্দেশে পূজাবেদী সম্পর্কে সেন্টপলের উক্তি হইতে হাক্সলী এই শব্দটী গ্রহণ করেন।" †

অধ্যাপক হাক্সলীর লেখা হইতে উদ্ধৃত অংশে স্পেক্টেটর পত্রিকার কথা লিখিত আছে; উক্ত পত্রিকা Agnostic ও Agnosticism শব্দ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২৯এ জানুয়ারী (১৩৫ সংখ্যা) তারিখে প্রথম ব্যবহার করেন। ক্রমশঃ উহা ইংলণ্ডের দার্শনিক সাহিত্যে প্রবেশলাভ করে।

Agnosticism বা অজ্ঞেয়বাদ ইউরোপে বহু দার্শনিক প্রচার করিয়াছেন। হিউম, কাণ্ট্, কোঁৎ, হামিল্টন, মান্‌সেল ও স্পেন্সার এই মতের পৃষ্ঠপোষক। অনেকের মতে, ব্রাড্‌লীর মতবাদ অজ্ঞেয়বাদেরই রূপান্তর। যে যে পুস্তকে এই দার্শনিকগণ প্রধানতঃ তাঁহাদের মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল;—

ডেভিড হিউম :—Natural History of Religions ও Dialogues Concerning Natural Religion.

ইমান্যুয়েল কাণ্ট্ :—Critique of Pure Reason.

অগস্ত কোঁৎ :—Cours de la Philosophie Positive.

স্যর্ উইলিয়ম হামিল্টন :—Discussions.

হেন্‌রী লঙ্গেভিল মান্‌সেল—Limits of Religious Thought.

হার্ব্বার্ট স্পেন্সার :—First Principles.

ফ্রান্সিস্ হার্ব্বার্ট্ ব্রাড্‌লী :—Appearance and Reality.

অজ্ঞেয়বাদ কখনও হিউমের প্রত্যয়বাদের কখনও বা কাণ্টের প্রপঞ্চবাদের ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়াছে। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের বিরোধ এবং সামঞ্জস্যের চেষ্টায় ইহার উৎপত্তি হইয়াছে বলা যায়। পরমসত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার না করিয়া কেবল তাঁহাকে জ্ঞানের বহির্ভূত বলিয়া অজ্ঞেয়রূপে নির্দ্দেশ করা এই মতবাদের মর্ম্ম।

প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শনে এই মতবাদের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে নাসদীয় সূক্তে ইহা সূচিত হইয়াছে; শতপথ-ব্রাহ্মণে ইহার ইঙ্গিত আছে। সাংখ্যদর্শনেও এই মতবাদের বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ শূন্যবাদে এই ভাবধারা বর্ত্তমান; এমন কি বেদান্তেও ইহার সমর্থক চিন্তা লক্ষিত হয়।

ভারতীয় মধ্যযুগে বহুবিধ ঈশ্বরোপাসক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়; সুতরাং অজ্ঞেয়বাদের সমর্থক কোন চিন্তাধারার উল্লেখ ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের পূর্ব্বে আর পাওয়া যায় না। হিন্দু কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক হেন্‌রী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও সাহেব ১৮২৭ হইতে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত 'Academic Association' নামক সভায় ধর্ম্ম, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিতেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ সিকদার, মহেশচন্দ্র ঘোষ, রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি স্বনামখ্যাত ব্যক্তি এই সভায় যোগদান করিতেন। অধ্যাপক ডিরোজিও ছাত্রদের মনে ধর্ম্মসম্বন্ধে গোঁড়ামী ত্যাগ ও স্বাধীন চিন্তার বিকাশের চেষ্টা করিতেন। তিনি নিজে অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন ও ঐ মতবাদ প্রচার করিতেন। তিনি তাঁহার পদত্যাগ সম্বন্ধে ডাঃ উইলসনের পত্রের উত্তরে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২৬এ এপ্রিল যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ হইতে তাঁহার ঈশ্বর সম্বন্ধে মতবাদ জানা যায়। ঐ পত্রে এইরূপ লিখিত আছে—

"কোন মনুষ্যের জ্ঞানগোচরে আমি কখনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করি নাই। এ বিষয়ে কোন কথা বলাই যদি অন্যায় হয়, তাহা হইলে আমার অন্যায় হইয়াছে। কিন্তু এই সম্পর্কে দার্শনিকদিগের সন্দেহ আলোচনার প্রেরণা দিয়াছি, ইহা স্বীকার করিতে আমি লজ্জিত বা ভীত নহি। কারণ, উপরোক্ত সন্দেহের সমাধান করিতেও আমি প্রেরণা দিয়াছি। এইরূপ প্রশ্নসম্পর্কে বিচার কি কোনস্থলে নিষিদ্ধ হইয়াছে? যদি তাহাই হয়, তবে আস্তিকতা ও নাস্তিকতা উভয়ই সমান দোষাবহ। এই অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারে আমরা কেবলমাত্র নিজমতই দেখিব, বিরুদ্ধমতের আলোচনামাত্র করিব না—সত্যের উচ্চ আদর্শ কি ইহাতে রক্ষিত হয়?

* Collected Essays, Vol. V. pp. 239-40

† R. H. Hutton in his letter, 13th March, 1881.

সকল প্রকার বিরুদ্ধ মত সম্যক্ না বুঝিয়া দেখিলে এবং তাহাদের অসঙ্গতি না দেখাইয়া দিলে কি প্রকারে কোন মতবাদকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়? একটী বিশেষ অবস্থার মধ্যে কতকগুলি যুবকের শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। বড় বড় সমস্যাকে শুধু একটীমাত্র দিক্ দিয়া দেখিতে দিয়া তাহাদিগকে তর্কপটু, অজ্ঞ ও গোঁড়া করিয়া তুলিলেই কি আমার কর্ত্তব্য সাধিত হইত? তাহাতে যে শুধু আমার মনের সঙ্কীর্ণতাই প্রকাশ পাইত, তাহা নহে, যুবকদের নিজেদের মানসিক শক্তি ও জ্ঞান তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইত। অপর পক্ষে যাহাই বলা হউক না কেন, আমার কার্য্যপ্রণালীর সমর্থনের নিমিত্ত আমি লর্ড বেকনের ন্যায় নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তির মত উদ্ধৃত করিতেছি। উক্ত পণ্ডিতবর বলিয়াছেন—(এই সব বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তি আর নাই)—'যদি কেহ বিষয়বস্তুকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, পরিণামে তাহার মনে সন্দেহ আসিবেই।' প্রথমে স্বীয় অজ্ঞতা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিয়া পরে অনেকটা দেরীতে যদি কেহ চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহার উল্লিখিত অবস্থা আসিবেই। এক সংশয় হইতে অপর একটী সংশয় উৎপন্ন হয়, এইরূপে ফলে সর্ব্ববিষয়ে সন্দেহ আসে। সুতরাং আমার মনে হইল, হিউম্ লিখিত ক্লিয়াস্থাস্ ও ফিলোর কথাবার্ত্তার (যাহাতে আস্তিক্যবাদের বিপক্ষে অতি গভীর ও সূক্ষ্ম মত উপস্থাপিত হইয়াছে) মর্ম্ম কলেজের কতিপয় ছাত্রকে জানান উচিত। কিন্তু ডাঃ রীড্ ও ডুগাল্ড ষ্টুয়ার্ট্ হিউম্‌কে যে তীক্ষ্ণতর উত্তর দিয়াছিলেন—যে উত্তর আজ পর্য্যন্ত কেহ খণ্ডন করিতে পারে নাই—তাহাও আমি ঐ যুবকদিগকে পড়াইয়াছিলাম। ইহাই আমার সকল অপরাধ। আমার এই কার্য্যের ফলে যদি যুবকদের ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া থাকে, তবে দোষ আমার নয়। কোনরূপ বিশ্বাস উৎপাদন আমার সাধ্যায়ত্ত ছিল না। কতকগুলি ছাত্রের নাস্তিকতার জন্য যদি আমাকে অপরাধী করা হয়, তবে অপর ছাত্রদের আস্তিকতার জন্যও আমার প্রশংসা পাওয়া উচিত। আমি আপনাকে সত্যই বলিতেছি, অতি তুচ্ছ বিষয়েও আমি নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতে পারি না; কারণ মনুষ্যের অজ্ঞতা এবং মতের পরিবর্ত্তনশীলতা আমার মনে গভীর ছাপ দিয়াছে। সত্যান্বেষীর মনে গোঁড়ামীর দৃঢ়তা প্রবেশ করিতে পারে না,—আমাদের চতুর্দ্দিকে এতই সংশয় ও অনিশ্চয়তা ঘিরিয়া রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণাসমূহ বহুল আলোচনা করিয়া এবং প্রতিভার যথাসাধ্য পরিচালনা করিয়াও দুঃখ এবং নৈরাশ্যের সহিত আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, বিনয়ই সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান; কারণ সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানই মনুষ্যের নিকটে তাহার অজ্ঞতা সপ্রমাণ করে। অতএব 'ইহা মিথ্যা', 'ইহাই সত্য'—এরূপ উক্তি আমি কখনও করিতে পারি না।"

পত্রের উল্লিখিত অংশ হইতে, বিশেষতঃ শেষাংশ হইতে ঈশ্বর সম্বন্ধে ডিরোজিওর মতবাদ বুঝিতে পারা যায়। অতএব তিনিই সম্ভবতঃ আধুনিক যুগে এদেশে অজ্ঞেয়বাদের জন্মদাতা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ডিরোজিওর সমসাময়িক। তিনিও ডিরোজিওর প্রভাব হইতে মুক্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি বহুবিধ বিষয়ে বহু আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু ধর্ম্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রায় কোন কথা বলেন নাই। ধর্ম্মমতে গোঁড়ামী তাঁহার নিকট অত্যন্ত অপ্রীতিকর ছিল। মানুষের বুদ্ধি পরমতত্ত্বে পৌঁছিতে পারে বলিয়া তিনি মনে করিতেন না। তিনি বলিয়াছেন, "এ দুনিয়ার একজন মালিক আছেন তা বেশ বুঝি, তবে ঐ পথে না চলিয়া এ পথে চলিলে নিশ্চয় তাঁহার প্রিয়পাত্র হইব, স্বর্গরাজ্য অধিকার করিব, এ সকল বুঝিও না, আর লোককে তাহা বুঝাইবার চেষ্টাও করি না। নিজে যেমন বুঝি, সেই পথে চলিতে চেষ্টা করি, পীড়াপীড়ি করিলে বলিব, 'এর বেশী বুঝিতে পারি নাই'।" তিনি ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে বিদ্রূপ করিতেন ও বলিতেন যে, জানা পথেই লোকের এত ভুল হয়, অজানা পথের সন্ধান তাঁহারা কোথা হইতে পাইবেন। তিনি বেকন, মিল ও কোঁতের মতবাদ পছন্দ করিতেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই তারিখে বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট হালিডে সাহেবকে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"ইহা সত্য যে, হিন্দুদর্শনসমূহের অধিকাংশই আধুনিক কালের উন্নত চিন্তাধারার সহিত মিলে না। ছাত্রেরা যখন ভারতীয় দর্শনশ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতে আসে, তখন তাহারা আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিবার পক্ষে যথেষ্ট ইংরেজীর জ্ঞান লইয়াই আসে। সুতরাং তাহারা নিজদেশের দর্শনের সহিত পাশ্চাত্ত্য নবদর্শনের তুলনা করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়া থাকে। কেবলমাত্র ইউরোপীয় দর্শনে জ্ঞানলাভ করা অপেক্ষা এইভাবে শিক্ষিত হইলে যুবকেরা প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের ভ্রমসমূহ আরও সহজে প্রদর্শন করিতে পারিবে।"

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন—"বেদান্ত ও সাংখ্যমত যে ভ্রান্ত তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। ভ্রান্ত হইলেও হিন্দুরা এই মতদ্বয়কে অসীম শ্রদ্ধা করে। সংস্কৃত পাঠ্যে ঐ সকল শিক্ষাদানের সহিত পাশ্চাত্ত্যের উৎকৃষ্ট দর্শনেও তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে; তাহাতে হিন্দুদর্শনের প্রভাব হইতে তাহারা মুক্ত থাকিবে।"

বিদ্যাসাগরচরিত-প্রণেতা শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অখিলদ্দিন নামক এক ফকিরের যে সকল গান বিদ্যাসাগর মহাশয় শুনিতে ভালবাসিতেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর-বিশ্বাসী বলিয়া ধারণা করিয়াছেন, তাহা এই—

১। কোথায় ভু'লে রয়েছ নিরঞ্জন নিশ্রয় কর্ব্বে রে কে,
তুমি কোনখানে খাও কোথায় থাক রে মন অচল
হয়ে, কোথায় ভুলে রয়েছ—।

২ তুমি আপনি নৌকা আপনি নদী, আপনি দাঁড়ী
আপনি মাঝি।
আপনি হও রে চড়নদারজী, আপনি হও রে নায়ের কাছি,
আপনি হওরে হাইল বৈঠা।

৩। তুমি আপনি মাতা আপনি পিতা,
আপনার নামটী রাখলে কোথা, সে নাম হৃদয়ে গাঁথা,
আমার গোঁসাঞিচাঁদ বাউলে বলে সে সব ভুলবো নারে
প্রাণ গেলে।

৪। তুমি আপনি অসার, আপনি হও সার,
আপনি হও রে নদীর দুধার, আপনি নদীর কিনার,
আমি অগাধ জলে ডুব দিতে চাই, সে নাম ভুলবো
নারে প্রাণ গেলে।

৫। আপনি তারা আপনি সারা, আপনি জরা আপনি মরা,
আপনি হও সে নদীর পাড়া আবার আপনি হও সে
শ্মশানকর্ত্তা গো,
আপনি হও সে জলের মীন, ও নিরঞ্জন তোর কোথায়
গো সাকিম।
আমি ভেবে চিন্তে হলেম ক্ষীণ।

এই সকল গানে ঈশ্বরের অনির্ব্বাচ্য অজ্ঞেয়তাই সূচিত হইয়াছে। তিনি নিজেও এক স্থলে বলিয়াছেন "গীতার উপদেশ অনুসারে চলিলেই ভাল হয়।" নিষ্কামকর্ম্মই গীতার উপদেশ আর এই উপদেশই তিনি জীবনে পালন করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরের বিষয়ে আলোচনা নিরর্থক মনে করিয়াই বোধ হয় সে বিষয়ে কথা বলিতেন না।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদর্শনে 'মিল, ডার্ব্বিন্ ও হিন্দুধর্ম্ম' নামে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের মতবাদের আলোচনা-প্রসঙ্গে 'অজ্ঞেয়' কথাটীর ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহা হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের Unknowable এর অনুবাদ। অতঃপর তিনি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার টীকায় ঐ ঐ মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ও 'বিবিধ প্রবন্ধে' এ বিষয়ে পুনঃপুনঃ আলোচনার দ্বারা অজ্ঞেয়বাদ-চিন্তাধারা বাঙ্গালা-সাহিত্যে প্রচলিত হয়।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'সাধনা' নামক মাসিক পত্রে 'জগতের অস্তিত্ব' নামক প্রবন্ধে অজ্ঞেয় বা Unknowable সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে 'ভারতী' মাসিক পত্রের 'এক না দুই' নামক প্রবন্ধে 'অজ্ঞেয়বাদী' কথাটীর ব্যবহার করেন ও ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে 'সাহিত্য' পত্রিক 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' নামক প্রবন্ধে অজ্ঞেয়বাদের আলোচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র বা রামেন্দ্রসুন্দর কেহই অজ্ঞেয় হইলেও তাঁহাদের লেখায় এই মতবাদের আলোচনা দ্বারা ইহা বাঙ্গালা-সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে।

ডিরোজিও-প্রবর্ত্তিত চিন্তাধারা দেশব্যাপী আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল; সমস্ত দেশ এই নব্যভাবে অনুপ্রাণিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল; এমন সময় রামমোহন রায়-প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মসমাজের ভাবধারায় তাহা বাধা প্রাপ্ত হইল। আবার রামকৃষ্ণের সাধনা ও বিবেকানন্দের নব্যবেদান্ত প্রচারের ফলে ডিরোজিওর চিন্তাধারার শক্তি ক্রমশঃ কমিয়া আসিল। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান অধ্যাপকেরা নব্য হেগেলীয় দর্শন প্রচার করিতে লাগিলেন। ফলে স্পেন্সার, কোঁৎ প্রভৃতির অজ্ঞেয়বাদের বিরুদ্ধে যুক্তি সকল বেশী প্রদর্শিত হইতে লাগিল। ঈশ্বরবাদ পুনরায় দেশে প্রবর্ত্তিত হইল।

গত ২৫।৩০ বৎসর যাবৎ এই নব্য হেগেলীয় মতবাদ এদেশে প্রচলিত ছিল; কিন্তু ইউরোপে এই ভাবধারার বিরুদ্ধে বহু দার্শনিক যুক্তি প্রদর্শিত এবং নূতন নূতন চিন্তাধারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কাজেই হেগেলীয় চর্ব্বিত-চর্ব্বণে আর কুলাইতেছে না। দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মনে এক্ষণে পুনরায় dogmatismএর বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। সোজাসুজি জড়বাদ সমর্থন করাও কঠিন, আবার জড়কে উড়াইয়া দিয়া বিশ্বকে চৈতন্যময়রূপে কল্পনা করাও বাড়াবাড়ি বলিয়া শিক্ষিত মনের ধারণা জন্মিয়াছে। কাজেই দৃশ্যমান বিশ্বজগতের বাহিরে তাহার মূলীভূত সত্তা সম্বন্ধে অজ্ঞেয়বাদের পুনঃপ্রচলন হওয়াই সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

অজ্‌দ্ (অল্-অজ্‌দ্)—আরববাসী মুসলমানজাতির একটী শাখা। ইহারা ওমান প্রদেশের অন্তর্গত নিজবা জনপদের অধিবাসী। ১০০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ওমান খিলাফতের শাসন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে এই অজ্‌দ্ জাতি হইতে নির্ব্বাচিত ৫ জন ইমাম দেশের শাসনভার প্রাপ্ত হন। ১১৫৪ হইতে ১৪০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বনি-নেভানবংশীয় মালিকগণ এখানে প্রাধান্য লাভ করেন। ইহাদের অত্যাচারে দেশবাসীরা উত্যক্ত হইয়া ১৪৩৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় অজ্‌দ্জাতীয় ইমামদের উপর কর্ত্তৃত্বভার প্রদান করে।

অজ্ম—(ত্রি) ক্ষেপক, ক্ষেপণকারী। (ঋক্ ১.৩৭.৮) ২ আকাশমার্গ। (ঋক্ ৩.২.১২) (ক্লী) ৩ গমন। (ঋক্ ৫.৮৭.৭)

অজ্মন্,—(স্ত্রী) [অজতি গচ্ছতি স্বর্গং দানেন অনয়া, অজ-মনিন্ করণে; এখানে অজ ধাতুর স্থানে 'বী' আদেশ হয় নাই।] গাভী, গাই। (নিরুক্ত) (পুং) ২ সংগ্রাম। (ঋক্ ১.৬৫.৫)

অজ্মন্, (Ajman)—আরবের এক বেদুইন্ জাতি। ইহারা মরুপ্রান্তরবাসী এবং দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা।

অজ্যেষ্ঠ—(ত্রি) [ন জ্যেষ্ঠঃ; নঞ্-তৎ] জ্যেষ্ঠ ভিন্ন। ২ জ্যেষ্ঠোচিত কার্য্যের অন্যথাকারী, কনিষ্ঠ-বঞ্চক। মনু বলিয়াছেন—যে জ্যেষ্ঠ, লোভের বশে কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে বঞ্চনা করেন, তিনি অজ্যেষ্ঠ। জ্যেষ্ঠোচিত পূজা তিনি পাইতে পারেন না, তাঁহার উদ্ধারভাগ রহিত হইবে, তিনি রাজ-বিচারে দণ্ডনীয় হইবেন।

"যো জ্যেষ্ঠো বিনিকুর্ব্বীত লোভাদ্ ভ্রাতৄন্ যবীয়সঃ।
সোঽজ্যেষ্ঠঃ স্যাদভাগশ্চ নিয়ন্তব্যশ্চ রাজভিঃ॥"
(মনু ৯.২১৩)

অজ্যেষ্ঠবৃত্তি—(পুং) [ন জ্যেষ্ঠস্য বৃত্তিঃ আচরণং; ৬-তৎ। নাস্তি জ্যেষ্ঠবৃত্তির্যস্য; বহুব্রী] জ্যেষ্ঠবৃত্তি বা জ্যেষ্ঠোচিত আচার-রহিত। মনু বলিয়াছেন, একান্নবর্ত্তী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি ধার্ম্মিক হন, তবে তাঁহার আদর্শে অনুজগণও ধার্ম্মিক হইয়া উঠে। ইহাতে কুল বৃদ্ধি পায়, আর অধার্ম্মিক হইলে অনুজগণও তাহার পথানুবর্ত্তী হওয়ায় কুল নাশ পায়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনুজগণের প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করিবেন, করিলে, অনুজগণের নিকট তিনি মাতাপিতার ন্যায়ই অর্চ্চনীয় হইবেন। ইহার অন্যথা অর্থাৎ অজ্যেষ্ঠবৃত্তি করিলে মাতুলাদি বান্ধবগণের ন্যায়ই তিনি অনুজগণের অর্চ্চনার পাত্র হইবেন।

"যো জ্যেষ্ঠো জ্যেষ্ঠবৃত্তিঃ স্যান্মাতেব স পিতেব সঃ।
অজ্যেষ্ঠবৃত্তির্যস্তু স্যাৎ স সম্পূজ্যস্তু বন্ধুবৎ॥" (মনু ৯.১১০)

অজ্র—(ত্রি) অনভিভবনীয়। ২ ঋজুগমন। (ঋক্ ৮.২৭.১৮) ৩ ক্ষিপ্রগতিযুক্ত। (৮.১৫.২) ৪ গতিশীল। (ঋক্ ১০.৪৪.৮) ৫ মেঘ। (ঋক্ ৫.৫৪.৪)

অজ্রা—কোলাপুর জেলার ইচলকরঞ্জি মহকুমার অন্তর্গত একটী শহর এবং অজ্রা উপবিভাগের প্রধান নগর। ইহা ইচলকরঞ্জির ২৪ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে এবং শঙ্কেশ্বরের ১২ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। সহ্যাদ্রির পূর্ব্বগামী একটী শাখার উপরে চিত্রী ও হিরণ্যকেশী নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলের কিছু উত্তরপশ্চিমে আম্রপনসবন দ্বারা বেষ্টিত অজ্রা শহর বিদ্যমান। শহরটী উত্তরদক্ষিণে লম্বা। ক্ষেত্রফল প্রায় ২॥ বর্গমাইল। ইহা দুইটী অংশে বিভক্ত। প্রাচীন শহরটী উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ ও গড়খাই দ্বারা বেষ্টিত। নূতন অংশের নাম নবাবপুর, ইহা পূর্ব্বোক্ত গড়খাইয়ের বাহিরে উত্তরদিকে অবস্থিত। শহরের জলসরবরাহ নদী এবং কূপ হইতে হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে এখানকার আবহাওয়া বেশ শীতল ও উপভোগ্য। অজ্রা হইতে বেঙ্গুরলা, নিপানি, শঙ্কেশ্বর প্রভৃতি স্থানে এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে যাতায়াতের জন্য অনেকগুলি রাস্তা আছে। এখান হইতে পুনা প্রভৃতি স্থানে চাউল রপ্তানী হইয়া থাকে। অপর রপ্তানীদ্রব্যের মধ্যে হরিতকী ও কফি উল্লেখযোগ্য। নারবেকর বানিয়ারাই এখানকার দৈনন্দিন পণ্যদ্রব্যের ব্যবসায় চালাইয়া থাকে।

অজ্রা এক সময়ে কাপ্সীর 'সেনাপতি'দের অধীন ছিল। তাঁহাদের নাম হইতেই ইচলকরঞ্জির শাসনকর্ত্তাদের 'ঘোরপড়ে' উপাধি হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১৮শ শতকের শেষার্দ্ধে অজ্রায় অনেকগুলি সীমান্তযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে পেশবা বালাজী বাজীরাওয়ের সহায়তায় সাতারার রাজা শাহু ইচলকরঞ্জিবংশের প্রতিষ্ঠাতা নারো মহাদেবের পুত্রবধূ অনুবাঈ সাহেবাকে অজ্রা পরগণা এবং শহর প্রদান করেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে অজ্রার ফড়নবীশদিগকে উহা ইজারা দেওয়া হয়। ফড়নবীশদের অধীনে অজ্রার সহিত নেসৃরি, ভূদর-গড় ও কোলাপুরের অনেক যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে চিন্তো রামচন্দ্র ফড়নবীশ অজ্রার রক্ষিসৈন্যদল লইয়া হর্পাবদ এবং বেল্লেবাড়ী আক্রমণ ও ইব্রাহিমপুর দখল করেন। পর বৎসর তাঁহার ভ্রাতা জীবাজী ভূদরগড়ের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। তবে ফড়নবীশদের পরাক্রমহেতু অজ্রা অপরের অধিকৃত হয় নাই।

মহকুমার সদর ষ্টেশন হিসাবে অজ্রায় রাজস্ব অফিস, থানা ও ডাকঘর এবং একটী অস্থায়ী মুন্সেফী আদালতও আছে। এতদ্ব্যতীত এখানে স্কুল, হাঁসপাতাল, পাঠাগার, ধর্ম্মশালা ও কতকগুলি হিন্দুমন্দির রহিয়াছে। রাবলনাথ ও রামলিঙ্গমন্দির এবং শৈলদুর্গের ভগ্নাবশেষটী দেখিবার জিনিষ। রামলিঙ্গের মন্দির শহর হইতে ১॥ মাইল উত্তরে, হিরণ্যকেশীর সুগভীর উপত্যকাস্থিত এক রমণীয় হ্রদ ও জলপ্রপাতের সন্নিকটে অবস্থিত। মন্দিরটী প্রস্তরনির্ম্মিত। অভ্যন্তরে নন্দী ও ষণ্ডের পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তি, পূজারীরূপে জনৈক গোস্বামীর প্রতিমূর্ত্তি সম্মুখে বিরাজমান। শিবরাত্রির সময়ে এখানে বিস্তর লোক-সমাগম হয়। নবাবপুরের উত্তরসীমায় ক্ষুদ্র একটী পাহাড়ের উপরে এক পুরাতন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। প্রবাদ,

এই পাহাড় ও দুর্গ এবং নবাবপুর পূর্ব্বে প্রাচীন শহরেরই অন্তর্গত ছিল। মুসলমানদের সময়ে দস্যু প্রভৃতির উপদ্রবে নগরবাসিগণ ক্রমে উত্তরাংশ ত্যাগ করিয়া অজ্‌রায় আশ্রয় লয় এবং মৃত্তিকাপ্রাচীর ও গড়খাই নির্ম্মাণ করিয়া অজ্‌রা সুরক্ষিত করে। পূর্ব্বে শহরের দুইটী মাত্র দ্বার ছিল। এখন প্রাচীর ভাঙ্গিয়া আরও অনেকগুলি দ্বার নির্ম্মিত হইয়াছে।

অজ্র্য—(পুং) জন, লোক। (ঋক্ ১০.৬৯.৬)

অজ্বর—(ত্রি) রোগহীন, জ্বরবিহীন।

অঞ্জিন্—(ত্রি) গতিশীল। "অগ্নিরজ্ঞী গায়ত্রেণ ছন্দসা * * * উষা অজ্ঞিনী ত্রৈষ্টুভেন।" (আশ্ব° শ্রৌত°, ৬.৫)

অজহর—মিশরের কাইরো নগরস্থ একটী সুবিখ্যাত মস্‌জিদ। এল্‌-অজহর নামেও পরিচিত। ফতিমাবংশীয় খলিফা মোইজের সেনাপতি জৌহর ৯৭০ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে একটী ইস্‌লামীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত আছে। মিশর, মরক্কো, সিরিয়া, আরব, ভারতবর্ষ ও তুরুষ্ক দেশ হইতে সমাগত ছাত্রবৃন্দকে এখানে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। দুঃস্থ ছাত্রবৃন্দকে অশনবসন দিয়া শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে।

অঝর—(দেশজ) অক্ষর, অস্খলিত; যাহা ঝরে না। ২ অবিরল অশ্রুধারাবিশিষ্ট; সতত গলদশ্রুধার।

অঝর-নয়ন, -নে—(দেশজ) সতত গলদশ্রুনেত্রে। "অঝর-নয়নে সবে করেন রোদন।" (চৈতন্যচরিতামৃত)

অঝোর,—[অঝর দ্র°]

অঝোর,—মালদহের একটী পরগণা। ২ দিনাজপুরের অন্তর্গত একটী পরগণা।

অঝোর-নয়ন—[অঝর-নয়ন দ্র°]

অঞ্চ্ (অচি)—[ভ্বা° উভ° সক° অনিট্] গতি, প্রাপ্তি। ২ যাচন, প্রার্থন। [সেট্] ৩ পূজন, সম্মান। [অক°] ৪ অব্যক্ত-শব্দকরণ। [চুরা° পর° সক° সেট্] ৫ বিশিষ্টীকরণ। 'অঞ্চয়তি বুদ্ধিং সুধীঃ, বিশিনষ্টীত্যর্থঃ।' (কবিকল্প°)

অঞ্চ—(পুং) উদ্গম, উর্দ্ধগমন।

অঞ্চক—(ক্লী) [বৈদ্যক] নেত্র। (রাজনি°)

অঞ্চতি—(পুং, ক্লী) [অনচ্-অতি। অঞ্চঃ কো বা। উণ্ ৪.৬১। অঙ্কতিঃ অঞ্চতির্বা] বায়ু, বাতাস। (ত্রি) ২ গতিশীল।

অঞ্চন—(ক্লী) [অঞ্চ-ল্যুট্] অক্রবক্র, আঁকাবাঁকা। "ঘোরৈর্জানু-প্রহারৈশ্চ নয়নাঞ্চনপীড়নৈঃ।" (রামায়ণ)

অঞ্চর—কাশ্মীরের একটী ক্ষুদ্র হ্রদ।

অঞ্চল—(পুং) [অঞ্চ-অলচ্] বস্ত্রের প্রান্ত; চলিত আঁচল। কাপড়ের যে প্রান্তে দসী ও পাড়ের অধিক সৌন্দর্য্য থাকে, তাহাকে আঁচল বা আঁচলা বলা যায়। এ দেশীয় স্ত্রীলোকদের বস্ত্রেরই আঁচল থাকে। পুরুষদের বস্ত্রের প্রান্তভাগ আছে, কিন্তু তাহার নাম আঁচলা নয়। স্ত্রীলোকেরা অঞ্চল লুটাইতে লুটাইতে চলিয়া গেলে বৃদ্ধা গৃহিণীরা তাহা বড় কুলক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করেন। লোকের এইরূপ বিশ্বাস, ভূতপ্রেতাদি কাপড়ের আঁচল ধরিয়া শরীরে প্রবেশ করে।

অঞ্চলের অপভ্রংশে আঁচল ও আঁচলা। প্রতিমা সাজাইবার সময় একখানি প্রশস্ত ডাকের অলঙ্কার ঠাকুরের বুকের উপর দিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, তাহার নাম আঁচলা। নূতন কাপড় পরিবার সময় বাঙ্গালার অনেক স্থানে স্ত্রীলোকেরা আঁচলের একপাশ হরিদ্রা দিয়া ছোপাইয়া লন এবং অঞ্চলের এক গাছি সূতা খুলিয়া তাহার এক এক খণ্ড ছিঁড়িয়া কাঁটা, খোঁচা, চোর ও অগ্নি প্রভৃতিকে সমর্পণ করেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কাঁটা প্রভৃতি সমস্ত শত্রুকে বস্ত্রের অংশ দেওয়া হইল, অতএব আর কেহ অনিষ্ট করিবে না। যখন ভাগ পাইল, তখন কাঁটাতেই ছিঁড়িবে কেন? আগুনেই বা পুড়িবে কেন? কোন কথা মনে করিয়া রাখিবার জন্য স্ত্রীলোকেরা আঁচলের এক কোণে গাঁইট দিয়া রাখেন। বালকদের মাথায় কাপড়ের অঞ্চল লাগিলে অকল্যাণ হয়। তজ্জন্য হঠাৎ কোন শিশুর মস্তকে অঞ্চল লাগিলে একবার তাহা মাটীতে ঠেকাইলে আর কোন দোষ থাকে না। বিবাহের সময় কন্যার অঞ্চলে ও পাত্রের চাদরে একত্র গাঁইট ছড়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ২ প্রান্তভাগ। "দৃগঞ্চলৈঃ পশ্যতি কেবলং মনাক্।" (উদ্ভট)

অঞ্চলগচ্ছ—জৈন চন্দ্রগচ্ছের একটী শাখা। [জৈনশব্দ দ্র°] মুনিচন্দ্রের 'তীর্থমালাস্তবন' গ্রন্থে অঞ্চলগচ্ছ গুরুপরম্পরা উল্লিখিত আছে। আর্য্যরক্ষিতসূরি ১১৩৬ বিক্রম সংবতে (১০৮০ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১১৫৯ বিক্রম সংবতে (১১০৩ খৃঃ) অঞ্চলগচ্ছ প্রতিষ্ঠা করেন। [আর্য্যরক্ষিতসূরি দ্র°]

অঞ্চিত,—(ত্রি) [অনচ্ গতৌ অনিট্ ক্ত, অক্তঃ। পূজায়াং সেট্—অঞ্চিতঃ] পূজিত। ২ আকুঞ্চিত। ৩ গ্রথিত। "অর্দ্ধাঞ্চিতা সত্বরমুত্থিতায়াঃ।" (রঘু° ৭.১০) ৪ মনোহর। "উভাবলঞ্চক্রতুরঞ্চিতাভ্যাম্"। (রঘু° ২.১৮)

অঞ্চিত,—চতুর নামক শিবনৃত্যে হস্তের ভঙ্গিবিশেষ। ইহাতে হস্তের অঙ্গুলিসমূহ পরস্পর পৃথক্ এবং সকল অঙ্গুলিই করতলপানে প্রসারিত থাকে। শিবের বামকরই অঞ্চিত মুদ্রায় থাকে, যথা—

"অঞ্চিতঃ স্যাৎ করো বামঃ সমশ্চতুর এব তু।

দক্ষিণঃ কুট্টিতং পাদশ্চতুরং তৎপ্রকীর্ত্তিতম্ ॥"

(নাট্যবেদবিবৃতি)

অঞ্চিতভ্রূ—(স্ত্রী) [অঞ্চিতে কুটিলে ভ্রুবৌ যস্যাঃ] সুন্দর-ভ্রূযুক্তা নারী।

অঞ্চিত্তই দুর্গ—মান্দ্রাজের সালেম জেলাস্থিত একটী পর্ব্বতীয় দুর্গ। অক্ষা° ১২°২১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৪৫'৪৫" পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে কন্দরাও ও মকদুম আলীর মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মকদুম এই দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। অঞ্চিত্তই গ্রাম শ্রীরঙ্গপত্তনের ৭ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত।

অঞ্জ্—[রুধা° সক° সেট্, পর°] ব্যক্তীকরণ, স্ফুটীকরণ। ২ ম্রক্ষণ। ৩ গতি। ৪ কান্তি। [লট্—অনক্তি,। লৃট্—অঞ্জিষ্যতি, অঙ্ক্ষ্যতি। লুট্—অঞ্জিতা, অঙ্‌ক্তা। লিট্—আনঞ্জ। লুঙ্—আঞ্জীৎ। ক্ত্বা—অঞ্জিত্বা, অঙ্‌ক্ত্বা, অক্ত্বা। ক্ত—অক্ত। চুরা°—অঞ্জয়তি।] এই ধাতু উপসর্গযোগে নানা অর্থের প্রকাশক। [তৎ তৎ শব্দ দ্র°]

অঞ্জ,—(পুং) ব্যঞ্জক, প্রকাশক। (ঋক্ ১.১৯০.২)

অঞ্জ২—(দেশজ) অঞ্জনাঙ্কিত করা, কাজল পরান। "অঞ্জইতে লোচন দুনয়ান ছলছল।" (বলরাম দাস)

অঞ্জক,—(পুং) এক মহাপরাক্রমশালী দানব। ইনি হিরণ্য-কশিপুর ভগিনী সিংহিকার গর্ভে ও দানবপতি বিপ্রচিত্তির ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণুপু° ও ব্রহ্মাণ্ডপু°)

অঞ্জক২—(পুং) যযাতিনন্দন যদুর জনৈক পুত্র। [অঞ্জিক দ্র°]

অঞ্জন,—(ক্লী) [অন্জ্-ভাবে ল্যুট্] মিশ্রীকরণ। ২ লেপন। ৩ গমন। ৪ ব্যক্তীকরণ। ৫ মালিন্য, মল, পাপ। "নিরবদ্যং নিরঞ্জনং।" (শ্রুতি) [অঞ্জনবর্ণোঽস্ত্যস্য অর্শ° অচ্] (পুং) ৬ জ্যেষ্ঠ দিগ্‌গজ। (বাচস্পত্য) ৭ পশ্চিম দিক্-হস্তী। (শব্দকল্পদ্রুম) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ (৬৯.২১৩-১৫)-মতে ইনি ঐরাবতের পুত্র ও যমের বাহন। ৮ অঞ্জননামক পর্ব্বত, নীলাচল। ৯ রাত্রি। ১০ মসী, কালি। (হেম°) ১১ অগ্নি। (বিশ্ব°) [অঞ্জয়তি রবেণ শুভাশুভে সূচয়তি, অন্জ্-ণিচ্-ল্যুট্] জ্যেঠী, চলিত জেঠী, টিক্‌টিকী।

অঞ্জন২—(ক্লী) [অজ্যতেঽনেন অন্জ্-করণে ল্যুট্] যাহা দ্বারা চক্ষু রঞ্জিত করা হয়; কজ্জল, চলিত কাজল।

অঞ্জন বা কাজল পরিয়া চক্ষুর সৌন্দর্য্য-সাধনের প্রথা অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে প্রচলিত আছে। সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে এদেশের নরনারী অঞ্জনের ব্যবহার করিতেন, অঞ্জনাঙ্কিত-নয়নে থাকিতেন, ইহার প্রমাণ বেদ, আরণ্যক, উপনিষৎ, গৃহ্যসূত্র ও স্মৃতি প্রভৃতি সুপ্রাচীন গ্রন্থে যথেষ্টই পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে (১০.১৮.৭), অথর্ব্ববেদে (১২.২.৩১ ও ১৮.৩.৫৭), তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (৬.১০.২), আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে (৪.৬.১২) ও আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে (৬.১৪) এবং এইরূপ আরও অনেক স্থলেই অঞ্জন বা কজ্জল শব্দের উল্লেখ পাই। "ওঁ সমিদ্ধ্যাঞ্জন কৃতবন্ম-তীনাং" ইত্যাদি যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রে এবং "ওঁ অঞ্জতে ব্যঞ্জতে" ইত্যাদি সাম ও ঋগ্বেদীয় মন্ত্রে দেবদেবীর অধিবাসকার্য্যে অদ্যাপি অঞ্জন বা কজ্জল দান করিতে দেখা যায়।

মনুস্মৃতিতে এই অঞ্জনব্যবহার মানবের পূর্ব্বাহ্নকৃত্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আবার সময়বিশেষে ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধও হইয়াছে। "মৈত্র্যং প্রসাধনং স্নানং দন্তধাবনমঞ্জনম্। পূর্ব্বাহ্ণ এব কুর্ব্বীত"। (মনু ৪.১৫২) "অভ্যঙ্গমঞ্জনং চাক্ষ্ণোঃ (বর্জ্জয়েৎ)।" (মনু ২.১৭৮)

বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, মহাকাব্য ও নাটকাদিতেও অঞ্জন শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায় এবং ইহার ব্যবহারের বর্ণনও অনেকস্থলে দেখিতে পাই। বাল্মীকি-কৃত রামায়ণের ২.৯৫.১৯ শ্লোকে "চচার রম্যং নয়নাঞ্জন-প্রভং" ও ৩.৫৫.৫ শ্লোকে "কৃষ্ণাঞ্জনগিরিঃ", কালিদাসকৃত মেঘদূতের ২.৩৪ শ্লোকে "অঞ্জনস্নেহশূন্যং", রঘুবংশের ৭.৮ শ্লোকে "বিলোচনং দক্ষিণমঞ্জনেন", ৯.৪১ শ্লোকে "অলিভিরঞ্জন-বিন্দুমনোহরৈঃ", শূদ্রককৃত মৃচ্ছকটিকের "কুর্ব্বন্নঞ্জনমেচকা ইব দিশঃ", শ্রীহর্ষকৃত নৈষধচরিতের ২ সর্গে "অপি খঞ্জনমঞ্জনাঞ্চিতং", বেদব্যাসকৃত শনিগ্রহের প্রণামমন্ত্রের "নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং", বেদাঙ্গ শিক্ষাগ্রন্থে পাণিনির প্রণামমন্ত্রে "অজ্ঞানান্ধস্য লোকস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া", গুরুপ্রণামের তান্ত্রিক মন্ত্রের "জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া" এবং হিতোপদেশের "প্রমদালোচনন্যস্তং মলীমস-মিবাঞ্জনং" ইত্যাদি অশেষ উক্তি হইতেই প্রাচীন ভারতের তাৎকালিক অঞ্জন ব্যবহারের সন্ধান পাই।

অধুনাতন কালেও এই অঞ্জনের ব্যবহার ভারত হইতে লুপ্ত হয় নাই। বালক-বালিকা এবং বয়স্ক নরনারীর মধ্যে উপকারিতা বা চক্ষুর সৌষ্ঠব-সাধন হিসাবে অঞ্জনের ব্যবহার এখনও চলিয়া আসিতেছে।

এদেশে অঞ্জনের অপভ্রংশে আঁজন বলা হয়। এই অঞ্জন বা আঁজন অনেক প্রকার প্রচলিত আছে।

কালিকাপুরাণে ষড়্‌বিধ অঞ্জন বা কজ্জলের নামনিরুক্তি দেখা যায়। যথা—সৌবীর, জাম্বল, তুত্থ, ময়ূরশ্রীকর, দর্ব্বিকা ও নীলমেঘ।

"সৌবীরং জাম্বলং তুত্থং ময়ূরশ্রীকরং তথা।
দর্ব্বিকা নীলমেঘঞ্চ অঞ্জনানি ভবন্তি ষট্।"

উক্ত পুরাণে কজ্জলের লক্ষণাদি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে;—

সৌবীর—গলিতাক দ্রব্য, জাম্বল—এক প্রকার প্রস্তর, ময়ূরশ্রীকর—রত্নবিশেষ, মেঘনীল—তৈজস।

কোন শিলাখণ্ডে বা তৈজস পাত্রে এই সকল বস্তু ঘর্ষণ করিয়া কজ্জল বা অঞ্জন প্রস্তুত করিতে হয়। তাম্রাদি পাত্রে ঘৃত, তৈল প্রভৃতি স্নেহ পদার্থ লাগাইয়া দীপানলশিখায় তাপ দিয়া-দিয়া, যে কজ্জল বা অঞ্জন প্রস্তুত করা হয়, তাহার নাম দর্ব্বিকাঞ্জন।

পূজাব্যাপারে দেবদেবীকে অঞ্জন দান করিতে হয়। পূর্ব্বে সৌবীরাদি যে কয় প্রকার অঞ্জনের কথা বলা হইয়াছে, ঐ সকল অঞ্জনই দেবদেবীকে অর্পণ করিবে। যদি ঐ কয় প্রকার অঞ্জনের অভাব হয়, উল্লিখিত এক প্রকার অঞ্জনও না মিলে, তাহা হইলে দেবদেবীকে একমাত্র শেষোক্ত দর্ব্বিকাঞ্জনই প্রদান করিবে।

মহামায়া, জগদ্ধাত্রী, কামাখ্যা এবং ত্রিপুরাদেবী উক্ত ষড়্‌বিধ অঞ্জন দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া সর্ব্বদাই পরম পরিতোষ লাভ করেন।

দেবতার উদ্দেশে দেয় অঞ্জন বিধবা দ্বারা প্রস্তুত করাইতে নাই। বিধবা-প্রস্তুত অঞ্জন দেবীপূজায় অগ্রাহ্য।

সাধক কখনও মৃৎপাত্রে করিয়া অঞ্জন প্রস্তুত করিবেন না। মৃৎপাত্রে বিহিত অঞ্জন দ্বারা পূজাফল পাওয়া যায় না।

"প্রবক্ষ্যপন্তু সৌবীরং জাম্বলং প্রস্তরং তথা।
ময়ূরশ্রীকরং রত্নং মেঘনীলন্তু তৈজসম্॥
ঘৃষ্ট্বা নিগাহ্য চৈতানি শিলায়াং তৈজসেঽথবা।
প্রদদ্যাৎ সর্ব্বদেবেভ্যো দেবীভ্যশ্চাপি পুত্রক॥
ঘৃততৈলাদিযোগেন তাম্রাদৌ দীপবহ্নিনা।
যদঞ্জনং জায়তে তু দর্ব্বিকা পরিকীর্ত্তিতা॥
সর্ব্বাভাবে তু তাং দদ্যাদ্‌দেবীভ্যো দর্ব্বিকাঞ্জনম্।
মহামায়া জগদ্ধাত্রী কামাখ্যা ত্রিপুরা তথা।
আপ্নুবন্তি মহাতোষং ষড়্‌ভিরেভিঃ সদাঞ্জনৈঃ॥
বিধবা নাঞ্জনং কুর্য্যাৎ মহামায়ার্থমুত্তমম্।
নাদত্তে ত্বঞ্জনং দেবী বৈষ্ণবী বিধবাকৃতং॥
ন মৃৎপাত্রে যোজয়েত্তু সাধকো নেত্ররঞ্জনং।
ন পূজাফলমাপ্নোতি মৃৎপাত্রবিহিতাঞ্জনৈঃ॥"
(কালিকাপু,° ৬৮ অ°)

বৈদ্যকে তিন প্রকার অঞ্জন দেখা যায়—খনিজ, কাষ্ঠজ ও ভেষজ।

খনিজ অঞ্জন।

খনিজ অঞ্জন চারি প্রকার। যথা সৌবীরাঞ্জন, স্রোতোঽঞ্জন, নীলাঞ্জন ও পুষ্পাঞ্জন। রসশাস্ত্রে ইহাদের পরিচয় সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে—

১। সৌবীরাঞ্জন—

"সৌবীরাখ্যঞ্চাঞ্জনং ধূম্রবর্ণং পিত্তাস্রঘ্নং ছর্দ্দিহিক্কাব্রণঘ্নম্।
নেত্রব্যাধৌ শোধনরোপণে চ শ্রেষ্ঠং প্রোক্তং কর্ণরোগোপশান্তয়ে॥"
(আয়ুর্ব্বেদপ্রকাশ)

অর্থাৎ সৌবীরাঞ্জন ধূম্রবর্ণ। উহা রক্তপিত্ত, বমি, হিক্কা ও ব্রণনাশক, নেত্ররোগে হিতকর, ক্ষতশোধক ও রোপক এবং কর্ণরোগ শান্তির পক্ষে শ্রেষ্ঠ।

২। স্রোতোঽঞ্জন—

"স্নিগ্ধ-স্বাদু-কষায়কং বিষবমীপিত্তাস্রনুল্লেখনম্।
নেত্র্যং হিধ্মরুজাপহং নিগদিতং স্রোতোঽঞ্জনং সর্ব্বদা॥"
(রসকামধেনু)

অর্থাৎ স্রোতোঽঞ্জন স্নিগ্ধ, কষায় রসযুক্ত, বিষ, বমি, রক্তপিত্তনাশক, লেখন, নেত্রের হিতকর এবং হিক্কা ও বেদনানাশক।

৩। নীলাঞ্জন—

"রসায়নং সুবর্ণঘ্নং স্নিগ্ধং তত্তু ত্রিদোষহা।
নীলাঞ্জনং চ কথিতং লৌহমার্দ্দবকারকম্॥" (রসার্ণব)

অর্থাৎ নীলাঞ্জন রসায়ন (জরা ও ব্যাধিনাশক), স্নিগ্ধ ও ত্রিদোষনাশক এবং ইহা স্বর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া সহজেই স্বর্ণভস্ম করা যায়। তদ্ভিন্ন নীলাঞ্জনকে লৌহের সহিত মিলিত করিলে কঠিন লৌহও কোমল হয়।

৪। পুষ্পাঞ্জন—

"সিতং স্নিগ্ধং হিমং চৈব নেত্ররোগবিষাপহম্।
জ্বরঘ্নমতিহিক্কাঘ্নং পুষ্পাঞ্জনমিহোদিতম্॥" (রসশাস্ত্র)

অর্থাৎ পুষ্পাঞ্জন শ্বেতবর্ণ। উহা স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য, নেত্ররোগ ও বিষনাশক এবং জ্বর ও অতি উৎকট হিক্কাও প্রশমিত করিয়া থাকে।

কাষ্ঠজ অঞ্জন।

দারুহরিদ্রার ক্বাথ হইতে প্রস্তুত করা হয়। ইহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"পীতাভং বিষরক্তদোষশমনং সশ্বাসহিক্কাপহম্।
বর্ণ্যং বাতবিনাশনং কৃমিহরং দার্ব্ব্যুদ্ভবং শোভনম্॥"
(আয়ুর্ব্বেদপ্রকাশ)

অর্থাৎ দারুহরিদ্রা হইতে জাত রসাঞ্জন পীতবর্ণ। ইহার গুণ—বিস, রক্তদোষ, শ্বাস ও হিক্কানাশক, বর্ণকারক, বাতঘ্ন ও কৃমিনাশক। উহা জলে গুলিলে অতি সুন্দর রঙ্‌ হয়।

ভেষজ অঞ্জন।

ভেষজসংযোগে রচিত অঞ্জন তিনপ্রকার। (১) নেত্রের

স্বাস্থ্য অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তিকে অব্যাহত রাখার জন্য, (২) নেত্ররোগ নিবারণের জন্য ও (৩) সংজ্ঞাপ্রবোধনের জন্য।

দৃষ্টিশক্তিকে অব্যাহত রাখিতে হইলে প্রতি পঞ্চম বা ষষ্ঠ রাত্রিতে তীক্ষ্ণ অঞ্জন লইয়া জলস্রাব করান উচিত। জলস্রাব করার উদ্দেশ্য—

"চক্ষুস্তেজোময়ং তস্য বিশেষাৎ শ্লেষ্মতো ভয়ম্।"

(চরক, সূত্র° ৫ম অ°)

অর্থাৎ চক্ষু তেজোময় পদার্থ; এজন্য শ্লেষ্মা হইতেই তাহার বিশেষ ভয়। এই শ্লেষ্মভয় নিবারণ করিবার জন্য চক্ষু হইতে জলস্রাব করাইতে হয়। জলস্রাব করাইতে হইলে নিত্য যে অঞ্জন প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইতে তীক্ষ্ণ অঞ্জন প্রয়োগ করা উচিত। কিন্তু তীক্ষ্ণ অঞ্জন প্রয়োগ করিলে জলস্রাবের পর চক্ষু আলোক সহ্য করিতে পারে না; সেজন্য বলা হইয়াছে—

"দিবা তন্ন প্রযোক্তব্যং নেত্রয়োস্তীক্ষ্ণমঞ্জনম্।
বিরেকদুর্ব্বলা দৃষ্টিরাদিত্যং প্রাপ্য সীদতি ॥"

(চরকসংহিতা)

অর্থাৎ তীক্ষ্ণ অঞ্জন দিনে চক্ষুতে প্রয়োগ করিবে না। যেহেতু অতিরিক্ত জলস্রাবে চক্ষু দুর্ব্বল হয় এবং সেই দুর্ব্বল চক্ষু সূর্য্যকিরণে অবসন্ন হইয়া বিশেষ ক্লেশ অনুভব করে। সুতরাং রাত্রিতে তীক্ষ্ণ অঞ্জন প্রয়োগ করিলে চক্ষু হইতে জলস্রাবের পর আলোকের অভাবে সমস্ত রাত্রি বিশ্রামলাভ করিতে সক্ষম হয়। মহর্ষি চরক বলেন—

"যথাহি কনকাদীনাং মলিনাং বিবিধাত্মনাম্।
ধৌতানাং নির্ম্মলা শুদ্ধিস্তৈলচেলকচাদিভিঃ ॥
এবং নেত্রেষু মর্ত্ত্যানামঞ্জনাশ্চোতনাদিভিঃ।
দৃষ্টির্নিরাকুলা ভাতি নির্ম্মলে নভসীন্দুবৎ ॥"

(চরক, সূত্র,° ৫ম অ°)

অর্থাৎ স্বর্ণপ্রভৃতি ধাতুপাত্র সকল মলিন বা কলঙ্কযুক্ত হইলে তাহাকে ধুইয়া মুছিয়া তৈল, বস্ত্রখণ্ড ও কেশ দিয়া উত্তমরূপে মাজিয়া ঘষিয়া দিলে যেমন নির্ম্মল হয়, তেমনি মানুষের চক্ষুতে অঞ্জন ও আশ্চোতন (জলস্রাবের পর চক্ষে গোলাপজল প্রভৃতি) দিলে নেত্রের সকল দোষ কাটিয়া যায়, দৃষ্টিশক্তি নির্ম্মল নিরাকুল হয় এবং নির্ম্মল আকাশে পূর্ণচন্দ্রের মত শোভা পাইতে থাকে।

চক্ষুকে শ্লেষ্মভয় হইতে রক্ষা করিবার জন্য পাঁচদিন বা ছয়দিন অন্তর তীক্ষ্ণ অঞ্জন একবার করিয়া প্রয়োগ করা ব্যতীত প্রত্যহ চক্ষুতে সৌবীরাঞ্জন (সুর্ম্মা) প্রয়োগ করিতে হয়। সেজন্য বলা হইয়াছে—

"সৌবীরমঞ্জনং নিত্যং হিতমক্ষ্ণোঃ প্রযোজয়েৎ।"

(চরকসংহিতা)

নেত্ররোগ নিবারণের জন্য যে অঞ্জন প্রয়োগ করা হয়, তাহার অপর নাম বর্ত্তি। বর্ত্তি কতকগুলি ভেষজসংযোগে প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখিতে হয় এবং আবশ্যক হইলে সেই বর্ত্তি একটু মধুতে ঘষিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিতে হয়। এই বর্ত্তি অনেক প্রকার, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইতেছে। যথা—

চন্দ্রোদয়া-বর্ত্তিঃ।

"হরীতকী বচা কুষ্ঠং পিপ্পলী মরিচানি চ।
বিভীতকস্য মজ্জা চ শঙ্খনাভির্ম্মনঃশিলা ॥
সর্ব্বমেতৎ সমাহৃত্য ছাগক্ষীরেণ পেষয়েৎ।
নাশয়েৎ তিমিরং কণ্ডূং পটলান্যর্ব্বুদানি চ।
অধিকানি চ মাংসানি যশ্চ রাত্রৌ ন পশ্যতি ॥
অপি দ্বিবার্ষিকং পুষ্পং মাসেনৈকেন নশ্যতি।
বর্ত্তিশ্চন্দ্রোদয়া নাম নৃণাং দৃষ্টিপ্রসাদনী ॥"

(রসেন্দ্রসংগ্রহ)

হরীতকী, বচ, কুড়, পিপুল, মরিচ, বহেড়ার বীজের শাঁস, শঙ্খনাভি ও শোধিত মনঃশিলা—প্রত্যেকে সমপরিমাণে লইয়া ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া বর্ত্তি করিবে। উহা মধু দিয়া ঘষিয়া অঞ্জন লইলে চক্ষুর কণ্ডূ, তিমির, পটল, অর্ব্বুদ, অধিমাংস প্রভৃতি নাশ হয় এবং একমাস প্রয়োগ করিলে দুই বৎসরের পুরাতন চোখে ফুলপড়াও সারিয়া যায়। এতদ্ভিন্ন এই চন্দ্রোদয়া-বর্ত্তি মানুষের রাতকাণা-রোগ ভাল করে ও দৃষ্টিশক্তিকে প্রসন্ন করিয়া থাকে।

বৃহচ্চন্দ্রোদয়া-বর্ত্তিঃ।

"রসাঞ্জনমথৈলাচ কুঙ্কুমং সমনঃশিলম্।
শঙ্খনাভি-শিগ্রুবীজং শর্করা চাত্র সপ্তমী ॥
এষা চন্দ্রোদয়া নাম বর্ত্তিশ্চক্ষুঃপ্রসাদনী।
হন্যাৎ পিচ্ছাঞ্চ কণ্ডূঞ্চ তিমিরঞ্চাপকর্ষতি ॥"

(আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহ)

রসাঞ্জন, এলাচ, কুঙ্কুম, মনঃশিলা, শঙ্খনাভি, সজিনাবীজ ও চিনি—এই সাতটী দ্রব্যের প্রত্যেকটী সমপরিমাণ লইয়া জলে পেষণ করিয়া বর্ত্তি করিবে। এই বর্ত্তি ঘষিয়া অঞ্জন দিলে দৃষ্টিশক্তি নির্ম্মল হয় এবং চোখের পিচুটী কাটা ও চোখ কুটকুট করা ভাল হয় এবং তিমিররোগও নিবারিত হইয়া থাকে।

হরীতক্যাদি-বর্ত্তিঃ।

"হরীতকী হরিদ্রা চ পিপ্পল্যো লবণানি চ।
কণ্ডূতিমিরজিদ্বর্ত্তির্ন ক্বচিৎ প্রতিহন্যতে ॥"

(আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহ)

হরীতকী, হরিদ্রা, পিপুল ও পঞ্চলবণ প্রত্যেকে সমপরিমাণ লইয়া জলে মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি করিবে ও রৌদ্রশুষ্ক করিয়া রাখিয়া দিবে। ইহা ব্যবহারে নেত্রকণ্ডূ ও তিমিররোগ নিবারিত হয়। ইহার ফল কখনও ব্যর্থ হইতে দেখা যায় না।

কুমারিকা-বর্ত্তিঃ।

"অশীতিস্তিলপুষ্পাণি ষষ্টিঃ পিপ্পলিতণ্ডুলাঃ।
জাতিপুষ্পাণি পঞ্চাশৎ মরিচানি চ ষোড়শ॥
এষা কুমারিকাবর্ত্তির্গতং চক্ষুর্নিবর্ত্তয়েৎ॥"

(আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহ)

তিলের ফুল ৮০টী, পিপুল হইতে দানা বাহির করিয়া ৬০টী, চামেলীফুল ৫০টী এবং ১৬টী মরিচ, সবগুলি একত্র জল দিয়া পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে এবং রৌদ্রশুষ্ক করিয়া রাখিয়া দিবে। মধু দিয়া ঘষিয়া চোখে অঞ্জন দিলে যাবতীয় উৎকট চক্ষুরোগ নিবারিত হয়। এমন কি চিকিৎসকগণ, যাহা ভাল হইবে না বলিয়া জবাব দিয়াছেন, তাদৃশ চক্ষুরোগও সারে।

ত্র্যূষণাদ্যা-বর্ত্তিঃ।

"ত্র্যূষণং ত্রিফলা বক্ত্রং সৈন্ধবালমনঃশিলা।
ক্লেদোপদেহকণ্ডূঘ্নী বর্ত্তিঃ শস্তা কফাপহা॥"

(আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহ)

ত্রিকটু, ত্রিফলা, তগরপাদুকা, সৈন্ধব, হরিতাল ও মনঃশিলা প্রত্যেকে সমপরিমাণ। প্রথমে হরিতাল ও মনঃশিলাকে খলে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। তারপর অন্য চূর্ণ সকল দিয়া জলে মর্দ্দনান্তর বর্ত্তি করিয়া শুকাইয়া রাখিবে। মধু দিয়া মাড়িয়া চোখে অঞ্জন দিতে হয়। ইহাতে চোখ দিয়া জলপড়া, পিচুটী-কাটা, চোখ উঠা প্রভৃতি যাবতীয় কফজন্য নেত্ররোগ নিবারিত হয়।

দৃষ্টিপ্রদা-বর্ত্তিঃ।

"ত্রিফলা কুক্কুটাণ্ডত্বক্ কাসীসময়সোরজঃ।
নীলোৎপলং বিড়ঙ্গানি ফেনঞ্চ সরিতাং পতেঃ॥
আজেন পয়সা পিষ্ট্বা ভাবয়েৎ তাম্রভাজনে।
সপ্তরাত্রস্থিতং ভূয়ঃ পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ বর্ত্তয়েৎ॥
এষা দৃষ্টিপ্রদা-বর্ত্তিরন্ধস্যাভিন্নচক্ষুষঃ॥" (আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহ)

ত্রিফলা, মুরগীর ডিমের খোলা, হিরাকস, লৌহচূর্ণ, নীল-সুন্দিফুল, বিড়ঙ্গ ও সমুদ্রফেন—এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া প্রত্যেক দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ করিবে। পরে উহা একটী তাম্রপাত্রে রাখিয়া প্রত্যহ ছাগদুগ্ধ দিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া মর্দ্দন করিবে। (তাম্রনির্ম্মিত খল হইলেই ভাল হয়, নতুবা উত্তমরূপে মর্দ্দন করা যায় না। এজন্য ঔষধ ভাল হয় না, চোখে দেওয়া যায় না, দিলে চোখ কর্ কর্ করে।) সাতরাত্রি পর্য্যন্ত ছাগদুগ্ধে ভাবনা দিবে অর্থাৎ রাত্রিতে ছাগদুগ্ধ দিয়া মাড়িয়া রাখিয়া দিবে ও পরে দিনেও মাড়িবে। এইরূপ সাতদিন করার পর পুনরায় ছাগদুগ্ধে মাড়িয়া বর্ত্তি করিবে ও রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিবে। এই বর্ত্তি মধু দিয়া মাড়িয়া চোখে অঞ্জন দিতে হয়। ইহা দ্বারা সকল প্রকার নেত্ররোগ নিবারিত হইয়া থাকে। যে চক্ষে দেখিতে পায় না বা যাহার চক্ষে ছানি পড়িয়াছে, দীর্ঘকাল ব্যবহারে তাহার ছানিও কাটিয়া যায়, আবার সে পূর্ব্বের মত দেখিতে পায়।

চন্দনাদ্যা-বর্ত্তিঃ।

"চন্দন-ত্রিফলা-পূগ-পলাশতরুশোণিতৈঃ।
জলপিষ্টৈরিয়ং বর্ত্তিরশেষতিমিরাপহা॥"

(আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহ)

রক্তচন্দন, ত্রিফলা, সুপারি ও পলাশের আঠা—প্রত্যেকে সমান জলে মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি করিবে। এই বর্ত্তি ব্যবহারে সকল প্রকার তিমিররোগ নিবারিত হয়।

নয়নসুখা-বর্ত্তিঃ।

"একগুণা মাগধিকা দ্বিগুণাচ হরীতকী সলিলপিষ্টা।
বর্ত্তিরিয়ং নয়নসুখার্ম্মতিমিরাপটলকাচাশ্রুহরী॥"

(আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহ)

পিপুল ১ ভাগ ও হরীতকী ২ ভাগ জলে পেষণ করিয়া বর্ত্তি করিবে। এই নয়নসুখা-বর্ত্তি অর্ম্ম, তিমির, পটল, কাচ ও অশ্রু প্রভৃতি নেত্ররোগ সকল নিবারিত করে।

পুষ্পহরী-বর্ত্তিঃ।

"পলাশপুষ্পস্বরসৈর্বহুশঃ পরিভাবিতম্।
করঞ্জবীজং তদ্বর্ত্তির্দৃষ্টেঃ পুষ্পং বিনাশয়েৎ॥"

(আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহ)

করঞ্জবীজকে বহুবার পলাশপুষ্পের রসে ভাবনা দিয়া বর্ত্তি করিবে। এই বর্ত্তি মধু দিয়া মাড়িয়া চোখে অঞ্জন দিলে চোখে ফুলপড়া ভাল হয়।

ব্রণশুক্রহরী-বর্ত্তিঃ।

"চন্দনং গৈরিকং লাক্ষা মালতীকলিকা সমা।
ব্রণশুক্রহরী-বর্ত্তিঃ শোণিতস্য প্রসাদনী॥"

(আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহ)

রক্তচন্দন, গেরিমাটী, লাক্ষা ও মালতীফুলের কুড়ি—প্রত্যেকে সমপরিমাণ লইয়া জলে পেষণ করিয়া বর্ত্তি করিবে। ইহা ব্যবহারে ব্রণশুক্র নামক নেত্ররোগ প্রশমিত হয় ও চক্ষুর মধ্যস্থিত সূক্ষ্ম ধমনীজালে সঞ্চিত রক্ত প্রসন্ন হয়। তাহাতে চক্ষুর রক্তবর্ণতা কাটিয়া গিয়া চক্ষু নির্ম্মল হইয়া থাকে।

দন্ত-বর্ত্তিঃ।

"দন্তৈর্হস্তিবরাহোষ্ট্রগবাশ্বাজখরোদ্ভবৈঃ।
শঙ্খমৌক্তিকাম্ভোধিফেনৈর্ম্মরিচপাদিকৈঃ।
ক্ষতশুক্রমপি ব্যাধিং দন্তবর্ত্তির্বিনাশয়েৎ॥"

(আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহ)

হস্তী, শূকর, উষ্ট্র, গো, অশ্ব, ছাগ ও গর্দ্দভ ইহাদের দন্ত, শঙ্খনাভি, মুক্তা ও সমুদ্রফেন—প্রত্যেকে সমান, সর্ব্বসমষ্টির চতুর্থাংশ মরিচচূর্ণ—এই সকল দ্রব্য জলে মাড়িয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহা দ্বারা ক্ষতশুক্র নামক নেত্ররোগও নিবারিত হয়।

সুখাবতী-বর্ত্তিঃ।

"কতকস্য ফলং শঙ্খং ত্র্যূষণং সৈন্ধবং সিতা।
ফেনো রসাঞ্জনং ক্ষৌদ্রং বিড়ঙ্গানি মনঃশিলা॥
কুক্কুটাণ্ডকপালানি বর্ত্তিরেষা ব্যপোহতি।
তিমিরং পটলং কাচমর্ম্ম শুক্রং তথৈব চ॥
কণ্ডূক্লেদার্ব্বুদং হন্তি মলঞ্চাশু সুখাবতী॥"

(আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহ)

নির্ম্মলীফল, শঙ্খনাভি, ত্রিকটু, সৈন্ধবলবণ, চিনি, সমুদ্রফেন, রসাঞ্জন, মধু, বিড়ঙ্গ, মনঃশিলা ও মুরগীর ডিমের খোলা—প্রত্যেকে সমপরিমাণ লইয়া জলে মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি করিবে।

চন্দ্রপ্রভা-বর্ত্তিঃ।

"অঞ্জনং শ্বেতমরিচং পিপ্পলী মধুযষ্টিকা।
বিভীতকস্য মধ্যন্তু শঙ্খনাভির্ম্মনঃশিলা॥
এতানি সমভাগানি অজাক্ষীরেণ পেষয়েৎ।
ছায়াশুষ্কাং কৃতাং বর্ত্তিং নেত্রেষু চ প্রযোজয়েৎ॥
অর্ব্বুদং পটলং কাচং তিমিরং রক্তরাজিকাম্।
অধিমাংসার্ম্মণী চৈব যশ্চ রাত্রৌ ন পশ্যতি।
বর্ত্তিশ্চন্দ্রপ্রভা নাম জাতান্ধ্যমপি নাশয়েৎ॥"

(আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহ)

রসাঞ্জন, শ্বেতমরিচ, পিপুল, যষ্টিমধু, বহেড়াবীজের শাঁস, শঙ্খনাভি ও মনঃশিলা—প্রত্যেকে সমপরিমাণ লইয়া ছাগদুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। বর্ত্তিগুলি ছায়ায় শুষ্ক করিয়া রাখিবে ও আবশ্যক হইলে মধু দিয়া মাড়িয়া চোখে অঞ্জন দিবে। ইহা দ্বারা অর্ব্বুদ, পটল, কাচ, তিমির, রক্তরাজি, অধিমাংস ও অর্ম্ম* প্রভৃতি নেত্ররোগ সকল প্রশমিত হয় এবং যাহারা রাত্রিতে দেখিতে পায় না, এমন কি বাল্যাবস্থা হইতেই যাহারা ক্ষীণদৃষ্টি, তাহারাও এই বর্ত্তির অঞ্জন লইলে দেখিতে পায়, দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

পঞ্চশতিকা-বর্ত্তিঃ।

"নীলোৎপলপত্রশতং মুদ্গশতং যবশতং নিস্তুষং গ্রাহ্যম্।
মালত্যাঃ কুসুমশতং পিপ্পলীতণ্ডুলশতঞ্চ॥
পঞ্চশতৈর্ব্বর্ত্তিবিহিতাঞ্জনং কুর্য্যাৎ সর্ব্বাত্মকে নয়নে।
তিমিরাশ্রুকাচপটলানাং নাস্ত্যপরঃ সাধনোপায়ঃ॥"

(আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহ)

নীলসুন্দিফুলের পাপড়ি ১০০টা, মুগ ১০০টা, তুষরহিত যব ১০০টা, মালতীফুল ১০০টা ও পিপুলের দানা ১০০টা। এই সকল দ্রব্য একত্র জলে পেষণ করিয়া বর্ত্তি করিবে। ইহা ব্যবহারে তিমির, অশ্রু, কাচ ও পটল প্রভৃতি যাবতীয় নেত্ররোগ প্রশমিত হয়। ইহার তুল্য শ্রেষ্ঠ ঔষধ আর নাই।

ব্যোষাদ্যা-বর্ত্তিঃ।

"ব্যোষোৎপলাভয়াকুষ্ঠতার্ক্ষ্যৈর্বর্ত্তিঃ কৃতা হরেৎ।
অর্ব্বুদং পটলং কাচং তিমিরার্ম্মাশ্রুবিস্রুতিম্॥"

(আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহ)

ত্রিকটু, নীলোৎপল, হরীতকী, কুড়, রসাঞ্জন—প্রত্যেকের সমপরিমাণ লইয়া জলে মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি করিবে। ইহার অঞ্জন দিলে অর্ব্বুদ, পটল, কাচ, তিমির, অর্ম্ম ও জলস্রাব প্রভৃতি নেত্ররোগ নিবারিত হয়।

পিপ্পল্যাদ্যা-বর্ত্তিঃ।

"পিপ্পলীং সতগরোৎপলপত্রং বর্ত্তয়েৎ সমধুকাং সহরিদ্রাম্।
এতয়া সততমঞ্জয়িতব্যং যঃ সুপর্ণসমমিচ্ছতি চক্ষুঃ॥"

(আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহ)

পিপুল, তগরপাদুকা, নীলোৎপলপত্র, যষ্টিমধু ও হরিদ্রা—প্রত্যেকের সমভাগ লইয়া জলে মাড়িয়া বর্ত্তি করিবে। এই বর্ত্তির অঞ্জন প্রত্যহ লইলে গরুড়ের মত দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

তারকাদ্যা-বর্ত্তিঃ।

"তারং তাম্রং রসং নাগং কর্পূরং খর্পরং তথা।
রসাঞ্জনং কাংস্যশঙ্খং হংসপাদ্যা দ্রবৈর্দিনম্।
বর্ত্তিং কৃত্বাঽঞ্জনাৎ হন্তি সমস্তং নেত্রজাময়ম্॥"

(আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহ)

রৌপ্যভস্ম, তাম্রভস্ম, পারদ, সীসাভস্ম, কর্পূর, খর্পরভস্ম, রসাঞ্জন, কাংস্যভস্ম ও শঙ্খনাভির প্রত্যেকে সমভাগ লইয়া গোয়ালে-লতার পাতার রসে মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি করিবে। এই বর্ত্তির অঞ্জন লইলে যাবতীয় নেত্ররোগ নিবারিত হয়।

* চোখের উপর পর্দ্দার মত যে মাংস জন্মে, তাহার নাম অর্ম্ম। চোখের ভিতরে মাংসবৃদ্ধি হইলে অধিমাংস বলে। তিমির, কাচ ও নীলিকা প্রভৃতি নেত্ররোগে চোখের তারকার মধ্যগত মণি বিকৃত হইয়া দৃষ্টিশক্তি লোপ করে।

কোকিলা-বৰ্ত্তিঃ।

"ব্যোষায়শ্চূর্ণসিন্ধূত্থত্রিফলাঞ্জনসংযুতা।
বর্ত্তিকা জলপিষ্টেয়ং কোকিলা তিমিরাপহা॥" (আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহ)

ত্রিকটু, লৌহচূর্ণ, সৈন্ধবলবণ, ত্রিফলা ও রসাঞ্জন—প্রত্যেকে সমপরিমাণ লইয়া জলে মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি করিবে। ইহার দ্বারা তিমির নামক নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

অতঃপর সংজ্ঞাপ্রবোধনের জন্য যে সকল অঞ্জন ব্যবহৃত হয়, সে সকলের উল্লেখ করা হইতেছে।

ভূতোন্মাদে অঞ্জন।

"কৃষ্ণামরিচসিন্ধূত্থমধুগোপিত্তনির্ম্মিতম্।
অঞ্জনং সর্ব্বভূতোত্থমহোন্মাদবিনাশনম্॥"
(ভৈষজ্যরত্নাবলী)

পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ ও গোরোচনা—প্রত্যেকে সমান। এইগুলি মধু দিয়া মাড়িয়া অঞ্জন দিলে সর্ব্বপ্রকার উৎকট ভূতোন্মাদ নিবারিত হয়।

উন্মাদে ত্র্যূষণাদ্যা-বৰ্ত্তিঃ।

"ত্র্যূষণং হিঙ্গুলবণং বচা কটুকরোহিণী।
শিরীষনক্তমালানাং বীজং গৌরাশ্চ সর্ষপাঃ॥
গোমূত্রপিষ্টৈরেভিশ্চ বর্ত্তির্নেত্রাঞ্জনে হিতা।
হন্ত্যুন্মাদমপস্মারং তথা চাতুর্থকং জ্বরম্॥"
(ভৈষজ্যরত্নাবলী)

ত্রিকটু, হিং, সৈন্ধবলবণ, বচ, কট্‌কী, শিরীষবীজ, করঞ্জবীজ ও শ্বেতসর্ষপ—প্রত্যেকে সমান লইয়া গোমূত্রে পেষণ করিয়া বর্ত্তি করিবে। এই বর্ত্তির অঞ্জন লইলে উন্মাদ, অপস্মার ও চাতুর্থক জ্বর (যে জ্বর প্রতি চতুর্থদিনে পালাজ্বরের মত হয়) নিবারিত হয়।

অপস্মারে অঞ্জন।

অপস্মারকে লোকে মৃগীরোগ বলে। নিম্নলিখিত অঞ্জন ব্যবহার করিলে অপস্মার বা মৃগীরোগ নিবারিত হয়। যথা—

"মনোহরী তার্ক্ষ্যজঞ্চৈব শকৃৎ পারাবতস্য চ।
অঞ্জনং হন্ত্যপস্মারং উন্মাদঞ্চ বিশেষতঃ॥" (রসার্ণব)

মনঃশিলা, রসাঞ্জন ও পায়রার বিষ্ঠার অঞ্জন দিলে অপস্মার এবং উন্মাদরোগ প্রশমিত হয়। অথবা—

"যষ্টিহিঙ্গুবচাবক্রশিরীষলশুনামযৈঃ।
সাজামূত্রৈরপস্মারে সোন্মাদে নাবনাঞ্জনে॥" (রসতন্ত্র)

যষ্টিমধু, হিং, বচ, তগরপাদুকা, রসোন ও কুড়—এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া নস্য বা অঞ্জন লইলে উন্মাদ ও অপস্মার বিনষ্ট হয়।

সন্নিপাতরোগে অঞ্জন।

১। মক্ষিকার বিষ্ঠা মধু দিয়া ঘষিয়া অঞ্জন দিলে সন্নিপাতের তন্দ্রা নিবারিত হয়।

২। সাপের খোলস দুইখানি কটরার মধ্যে পুরিয়া দগ্ধ করিয়া যে মসী হয়, তাহা মধু দিয়া মাড়িয়া অঞ্জন দিলে সন্নিপাতের তন্দ্রা বা আচ্ছন্নভাব কাটিয়া যায়।

অঞ্জনভৈরব।

"সূততীক্ষ্ণকণাগন্ধমেকাংশং জয়পালকম্।
সর্ব্বৈস্ত্রিগুণিতং জম্বুবারিণা চ সুপেষিতম্॥
নেত্রাঞ্জনেন হন্ত্যাশু সর্ব্বোপদ্রবমুদ্ধতম্॥"(ভৈষজ্যরত্নাবলী)

পারদ, গন্ধক (কজ্জলী), লৌহভস্ম ও পিপুল—প্রত্যেকে সমান; সর্ব্বসমষ্টির তিনগুণ জয়পাল—এই সকল দ্রব্য জামীরের রসে মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি করিবে। এই বর্ত্তি জলে বা মধু দিয়া ঘষিয়া অঞ্জন দিলে সর্ব্বপ্রকার উপদ্রবযুক্ত সন্নিপাত নিবারিত হয়।

অঞ্জনভৈরব (অন্যপ্রকার)

"শুদ্ধঃ সূতঃ পিপ্পলী টঙ্কগন্ধৌ।
সর্ব্বে তুল্যাঃ সারকঃ স্যাত্তদর্দ্ধঃ॥
সর্ব্বং ভাব্যং নিম্বুকোত্থৈঃ পয়োভিঃ।
ছায়াশুষ্কং কাচভাণ্ডে নিদধ্যাৎ॥
নেত্রয়োরঞ্জনাদেষ নিহন্ত্যঞ্জনভৈরবঃ।
সন্নিপাতান রসান্ সর্ব্বান্ দুঃসাধ্যান্নাত্র সংশয়ঃ॥"
(রসযোগসাগর)

শুদ্ধ পারা, পিপুল, সোহাগার খৈ ও গন্ধক—প্রত্যেকে সর্ব্বসমষ্টির সমান; অর্দ্ধাংশ জয়পাল—এই সমস্ত দ্রব্য লেবুর রসে মাড়িয়া বটী করিবে ও ছায়াশুষ্ক করিয়া কাচের শিশিতে রাখিয়া দিবে। ইহার অঞ্জন দিলে দুঃসাধ্য সন্নিপাত নিবারিত হয় অর্থাৎ সন্নিপাতে মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তির সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে, রোগী আরোগ্যলাভ করে।

অঞ্জনম্।

"বাহ্লীকং রসকং তুত্থং কর্পূরং মৃতশুল্বকম্।
কাসমর্দ্দরসৈর্ম্মর্দ্দ্যং দিনার্দ্ধং বটকীকৃতম্॥
অঞ্জনং জ্বরদাহঘ্নং সর্ব্বদোষনিসূদনম্॥" (রসযোগসাগর)

হিঙ্গু, খর্পরভস্ম, তুঁতেভস্ম, কর্পূর ও তাম্রভস্ম—প্রত্যেকের সমভাগ লইয়া কালকাসুন্দের রসে দুই প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া বটিকা করিবে। এই বটিকা ঘষিয়া অঞ্জন দিলে জ্বরের দাহ ও সর্ব্বপ্রকার দোষ নিবারিত হয়।

অঞ্জন (বিসূচিকায়)।

"রসব্যোষকরঞ্জাত্র মাতুলুঙ্গজটা নিশা।

অঞ্জনং কাঞ্জিকেনৈব বিসূচীং হন্তি দারুণম্ ॥”

(রসযোগসাগর)

পারদ, ত্রিকটু, করঞ্জবীজ, গোঁড়ালেবুর মূল ও হরিদ্রা—এই সকল দ্রব্য কাঁজিতে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে দারুণ বিসূচিকা (কলেরা) নিবারিত হয়।

শিরীষাঞ্জনম্।

“শিরীষবীজ-গোমূত্র-কৃষ্ণামরিচ-সৈন্ধবৈঃ।

অঞ্জনং স্যাৎ প্রবোধায় সরসোনশিলাবচৈঃ ॥”

(ভৈষজ্যরত্নাবলী)

শিরীষবীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, রসুন, মনঃশিলা এবং বচ—প্রত্যেকে সমপরিমাণ লইয়া গোমূত্রে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহার অঞ্জন প্রয়োগ করিলে সংজ্ঞাহীন রোগী প্রবুদ্ধ হয়।

সর্পদষ্টে অঞ্জন।

১। জয়পালের বীজের অন্তর্গত অতি সূক্ষ্ম পত্র মনুষ্য-লালায় ঘষিয়া অঞ্জন দিলে সর্পদষ্ট ব্যক্তির মোহাচ্ছন্ন সংজ্ঞাহীনতা কাটিয়া যায়, সেজন্য বিষও নষ্ট হয়।

২। জয়পালের বীজকে একুশ বার আদার রস দিয়া মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি মনুষ্য-লালায় ঘষিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে, সর্পদষ্ট সংজ্ঞাহীন ব্যক্তি প্রবুদ্ধ হইবে ও সাপের বিষ কাটিয়া যাইবে।

দ্রষ্টব্য।—এই দুইটী এবং যে কোন অঞ্জন, যাহাতে জয়পাল আছে, সে সকল অতি তীব্র, সেজন্য রোগ সারিয়া যাওয়ার পরেও চোখের জ্বালা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে চোখে গোলাপ-জল বা শীতল জলধারা দেওয়া কর্ত্তব্য।

খনিজ অঞ্জন-শোধন।

“ভৃঙ্গরাজরসেনৈব সর্ব্বাণ্যেবাঞ্জনানি চ।

বিশুধ্যন্তীহ সততং সত্যং গুরুবচো যথা ॥”

(আয়ুর্ব্বেদপ্রকাশ)

অর্থাৎ যাবতীয় ধাতুজ অঞ্জন ভৃঙ্গরাজের রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া লইলে বিশুদ্ধ হয়, এ কথা গুরুবাক্যের মত সত্য।

দার্ব্বীকাথজাত-রসাঞ্জনশুদ্ধি।

“তোয়েঽত্যাঞ্চে পরিক্ষিপ্য দ্রবীকুর্য্যাদ্ রসাঞ্জনম্।

বাসসা স্রাবয়িত্বা চ শোধনং ভানুরশ্মিনা ॥” (রসশাস্ত্র)

দারুহরিদ্রার ক্বাথজাত রসাঞ্জন(রসোৎ)কে গরমজলে গুলিয়া ছাঁকিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে বিশুদ্ধ হয়।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ‘হিন্দুরসায়নের ইতিহাস’ গ্রন্থে (প্রথম খণ্ড, ৯৩ পৃ°) সৌবীরাঞ্জন, রসাঞ্জন, স্রোতোঽঞ্জন, পুষ্পাঞ্জন ও নীলাঞ্জন সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উক্ত গ্রন্থের অন্যান্য বহুস্থানে অঞ্জনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় (প্রথম খণ্ড, ৩১, ৫৩, ৫৫, ৫৭, ৫৯, ৭০, ৮১, ৯৩, ৯৪, ১১৯ পৃ°)।

রসরত্নসমুচ্চয়ে লিখিত আছে—

“সৌবীরমঞ্জনং প্রোক্তং রসাঞ্জনমতঃপরম্।

স্রোতোঽঞ্জনং তদন্যচ্চ পুষ্পাঞ্জনকমেব চ ॥

নীলাঞ্জনং চ তেষাং হি স্বরূপমিহ বর্ণ্যতে।

সৌবীরমঞ্জনং ধূম্রং রক্তপিত্তহরং হিমম্ ॥

অঞ্জনানি বিশুধ্যন্তি ভৃঙ্গরাজনিজদ্রবৈঃ।

মনোহ্বাসত্ত্ববৎ সত্ত্বমঞ্জনানাং সমাহরেৎ ॥

বল্মীকশিখরাকারং ভঙ্গে নীলোৎপলদ্যুতিঃ।

ঘৃষ্টং তু গৈরিকচ্ছায়ং স্রোতোজং লক্ষয়েদ্বুধঃ ॥

গোশকৃদ্রসমূত্রেষু ঘৃতক্ষৌদ্রবসাসু চ।

ভাবিতং বহুশস্তচ্চ শীঘ্রং বধ্নাতি সূতকম্ ॥”

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঐ সকল মতবাদের আলোচনাকালে অনেক স্থলেই গন্ধকাঞ্জনকের (**Stibnite** বা **Antimony Sulphide**) উল্লেখ করা হইয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের কিন্তু বেশীর ভাগেরই মত গন্ধকাঞ্জনক (**Stibnite**) ও গন্ধক-সীসই (**Galena** বা **Lead Sulphide**) প্রকৃতপক্ষে দুইপ্রকারের অঞ্জন। কিন্তু তাই বলিয়া আয়ুর্ব্বেদাদি গ্রন্থে বর্ণিত অন্যান্য অঞ্জনকেও অগ্রাহ্য করা যায় না। তবে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে গন্ধকাঞ্জনক এবং গন্ধক-সীসই বেশী প্রচলিত ও অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদুভয়ের মধ্যে গন্ধক-সীসই সচরাচর লোকে ব্যবহার করে। অন্যান্য অঞ্জনগুলি হয় ত বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞগণের দ্বারাই অধিক ব্যবহৃত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্রধানতঃ দুই প্রকারের ধাতব অঞ্জনের সহিতই আমরা বেশী পরিচিত—ষ্টিব্‌নাইট্ বা গন্ধকাঞ্জনক বা এন্টিমনি সাল্‌ফাইড্ ও গন্ধক-সীস বা গেলেনা বা লেড্ সাল্‌ফাইড্। গন্ধকাঞ্জনককে রসাঞ্জন বা স্রোতোঽঞ্জনও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। কিন্তু রসাঞ্জনকে নির্ব্বিবাদে ষ্টিব্‌নাইট্ বলিয়া গ্রহণ করার পক্ষে অন্তরায় রহিয়াছে। [অঞ্জনক দ্র°] স্রোতোঽঞ্জন সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ না থাকিলেও নানা গ্রন্থে আলোচিত বর্ণনা হইতে, বিশেষ করিয়া আচার্য্য রায়ের হিন্দু রসায়নের আলোচনা হইতে (প্রথম খণ্ড, ৫৩, ৫৫, ৭০, ৮১, ৯৩ ও ৯৪ পৃ°) এবং যোগেশচন্দ্র রায়ের মতানুসারে (বাঙ্গালা শব্দকোষ—প্রথম খণ্ড) স্রোতোঽঞ্জনকে ষ্টিব্‌নাইট্ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। অবশ্য রাসায়নিক প্রথায় প্রকৃত পদার্থটী নির্দ্ধারিত হওয়াই সমধিক বাঞ্ছনীয়। খুব সম্ভব নীলাঞ্জনই প্রকৃত ষ্টিব্‌নাইট্। রসেন্দ্রচূড়ামণিতে

নীলাঞ্জনের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা হইতে মনে হয় ষ্টিব্‌নাইট্‌কেই (Antimony Sulphide) গেলেনার (Lead Sulphide) সহিত ভুল করা হইয়াছে ; এইরূপ বিভ্রম হওয়া অসম্ভবও নহে।* [অঞ্জনক দ্র°]

নামকরণ যে যাহাই করুক না কেন, ষ্টিব্‌নাইট্‌ যে একপ্রকার অঞ্জন, তাহা নিশ্চিত মানিয়া লওয়া যায়। ইহা অঞ্জনক ধাতু ও গন্ধকের যোগে উৎপন্ন। ষ্টিব্‌নাইট্‌ স্বভাবজরূপেই যথেষ্ট পাওয়া যায়। ফ্রান্স, ইতালী, চীন প্রভৃতি দেশে ইহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, ভারতবর্ষের পেশোয়ার, ঝেলাম নদীর তটবর্ত্তী স্থান, হাজারিবাগ জেলা, গোদাবরী নদীর তীর, তুঙ্গভদ্রা নদীর সন্নিকটস্থ স্থান, বিশাখপত্তনের নিকট, বেরার (হায়দ্রাবাদ), বঙ্গলোরের উত্তরাংশ, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানেও ষ্টিব্‌নাইট্‌ অল্প-বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

তৎপর গেলেনা বা লেড্‌ সাল্‌ফাইড্‌। ইহা বহুতর খনিজ ধাতব পদার্থের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। [সীসক দ্র°] স্বভাবজরূপে কেবল গেলেনাই যথেষ্ট পাওয়া যায়। আফগানিস্থান, ভারতবর্ষের কাশ্মীর, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি কএকটী প্রদেশে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। বাজারে সুর্ম্মা নামে যে অঞ্জন বিক্রয় হয়, তাহা গেলেনা ব্যতীত আর কিছু নহে এবং ইহা অধিক পরিমাণে আফগানিস্থানে উৎপন্ন হয়।

বাঙ্গালা দেশে আর এক প্রকার অঞ্জন ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, তাহা কাজল নামেই অধিক পরিচিত। কাজলদান বা কাজলনাতা নামে লৌহ বা রৌপ্য-নির্ম্মিত চামচের মত এক রকম জিনিষ পাওয়া যায় ; তাহা তৈলাক্ত বা ঘৃতাক্ত করিয়া প্রদীপের উপর ধরিলে যে কাল, পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাই কাজল। অনেক সময় কলার পাতা বা সিজ মনসাপাতা প্রভৃতির উপর তৈল মাখিয়া এইরূপ কাজল প্রস্তুত করা হয়। ইহা কিন্তু পারদ ও গন্ধক-ঘটিত কজ্জলী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। এই কাজল সাধারণতঃ নবজাত শিশুদের চোখের নিমিত্তই ব্যবহৃত হয়। ইহা বেশ মসৃণ এবং শিশুর চোখের পক্ষে খুব উপকারী। ধাতুঘটিত অঞ্জন শিশুর কোমল চামড়ার পক্ষে ক্ষতিকর হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে। সেই হিসাবে এই তৈলনিসিক্ত অঞ্জন বা কাজল উৎকৃষ্টতর বলিয়া মনে হয়।

শিশুদিগের চক্ষু হইতে জল পড়িলে কিংবা রাত্রিতে চক্ষু যোড়া লাগিয়া থাকিলে চারি প্রকার অঞ্জন প্রস্তুত হইয়া থাকে। মাকড়শার জাল ভস্ম করিয়া কাজলনাতায় উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইবে। পরে তাহাতে অল্প তৈল দিয়া প্রদীপের শিখায় ধরিতে হয়। কিঞ্চিৎ ভুষা পড়িলে অঙ্গুলি দ্বারা মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই অঞ্জন শিশুদের চক্ষে দিলে জলপড়া নিবারণ হইয়া থাকে। রসুনের কোয়া কিংবা দোক্তা তামাক অল্প দগ্ধ করিয়া তাহাতেও ঐ প্রকারে কজ্জল প্রস্তুত করা যায়। পালিতামাদার গাছের ছালে অল্প তৈল মাখাইয়া প্রদীপের শিখায় ধরিলে অল্প ভুষা পড়ে। সেই ভুষা অঙ্গুলিদ্বারা মর্দ্দন করিয়া লইলে উত্তম কজ্জল প্রস্তুত হয়।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সুর্ম্মার কজ্জল সকলে ব্যবহার করেন। বাঙ্গালাদেশে প্রস্থতিরা অঞ্জন দিয়া শিশুদের চক্ষু সাজাইয়া দেন। পূর্ব্বের ন্যায় আজকাল কেহ সাধ করিয়া কজ্জল পরেন না। কিন্তু উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রায় সকলেই অঞ্জন ধারণ করেন। অঞ্জন পরাইবার জন্য আলাহাবাদ, দিল্লী প্রভৃতি বড় বড় শহরে পেশাদার লোকও আছে। নাপিতের ভাঁড়ের মত তাহাদের নিকট এক একটী ঝুলি থাকে। ঝুলির ভিতর সুর্ম্মার কৌটা, দুইটী সীসের সরু শলা, দুইটী সীসের মোটা পাত, কিঞ্চিৎ আতর, একখানি চিরুণী ও একখানি আরসী থাকে। প্রাতঃকাল হইলে ঐ পেসাদারেরা ঝুলি লইয়া ধনবান্‌ লোকের বাড়ী কজ্জল পরাইতে যায়। প্রথমে সীসের সরু শলা দুইটী এক এক বার চক্ষুর ভিতর পর্য্যন্ত বুলাইয়া আনে। সীসাধাতু সহজে শীতল, কাজেই সাবধানে চক্ষুর ভিতর বুলাইলে বেশ স্বস্তিবোধ হয়। তাহার পর চিরুণীদ্বারা মাথার চুলগুলি আঁচড়াইয়া চক্ষে সুর্ম্মা পরাইয়া দেয়। কজ্জল পরান হইলে দুইটী মোটা পাত কিঞ্চিৎকাল চক্ষের উপর ধরিয়া থাকে। শেষে গোঁফে আতর মাখাইয়া আরসীতে মুখ দেখিতে দেয়। এই সকল পেসাদার লোক প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট দুই একটী করিয়া পয়সা পায়। বোধ করি, মুসলমান সম্রাটের রাজত্বকাল হইতে এই ব্যবসার প্রচলন হইয়া থাকিবে।

এতদ্ব্যতীত তন্ত্রশাস্ত্রে বহু প্রকার অঞ্জনের উল্লেখ আছে, এই অঞ্জন লাগাইলে অনেক অদৃশ্য বস্তুও দেখিতে পাওয়া যায়।*

২ সৌবীরাঞ্জন। ৩ রসাঞ্জন।

অঞ্জন৩—(ক্লী) আলঙ্কারিকোক্ত শক্য ও লক্ষ্য অর্থাতিরিক্ত অর্থবোধক ব্যঞ্জনাবৃত্তিরূপ শব্দশক্তিবিশেষ।

কাব্যপ্রকাশে অঞ্জন বা অঞ্জনাবৃত্তির এইরূপ লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে—

"অনেকার্থস্য শব্দস্য বাচকত্বে নিয়ন্ত্রিতে।
সংযোগাদ্যৈরবাচ্যার্থধীকৃদ্ব্যাপৃতিরঞ্জনম্‌ ॥"

* "তীক্ষ্ণং নীলাঞ্জনোপেতো ধাতং হি বহুশো দৃঢ়ম্‌।
মৃদুকৃষ্ণং দ্রুতদ্রাবং বরনাগং তদুচ্যতে ॥"

* তান্ত্রিক অঞ্জন শ্রীনাথকৃত "কামদেবতন্ত্রে" দ্রষ্টব্য।

শ্লোকাদির মধ্যে অনেক অর্থবোধক শব্দ থাকে, সংযোগ বিপ্রযোগাদি দ্বারা তাহাদের বাচকার্থ নির্ণীত হওয়ার পরে যে ব্যাপার দ্বারা অবাচ্য অর্থের বোধ হয়, তাহাকে অঞ্জন বা অঞ্জনাবৃত্তি কহে।

"ভদ্রাত্মনোদুরধিরোহতনোর্বিশাল-
বংশোন্নতেঃ কৃতশিলীমুখসংগ্রহস্য।
যস্যানুপপ্লুতগতেঃ পরবারণস্য
দানাম্বুসেকসুভগঃ সততং করোঽভূৎ ॥"

উত্তমস্বভাব, রিপুদলের অনির্জ্জিত, মহদ্বংশোদ্ভব, বাণধারী, উপদ্রবহীন, শত্রুনিবারক যে রাজার হস্ত সর্ব্বদা দানজলসেক দ্বারা সুন্দর হইয়াছে।

এখানে রাজার প্রকরণ হেতু প্রথমে রাজ-রূপের অর্থ বোধ হইল। আবার ঐ সকল শব্দের শক্তি সহকারে হস্তিরূপ অর্থবোধও হইতেছে। যথা—

ভদ্রাখ্যজাতীয়, বড় বাঁশ গাছের মত উচ্চ, অতএব দুরারোহপৃষ্ঠ, ভ্রমরদল-পরিবেষ্টিত, গভীর গতি যে হস্তিশ্রেষ্ঠের শুণ্ড সর্ব্বদা মদজলসেক দ্বারা শোভিত হইয়াছে।

এই ব্যঞ্জনাবৃত্তি কাব্যের ব্যঙ্গার্থবোধক শক্তি। এই শক্তি দ্বারা তাৎপর্য্যার্থের বোধ হয়। যে সকল শব্দ দ্বারা শ্লোকাদি রচিত হয়, প্রথমে তাহাদের অর্থ দ্বারা এক প্রকার ভাব ঘটাইয়া তাহার পর আবার যদি ভিন্ন অর্থ দ্বারা অন্য ভাব ঘটাইতে পারা যায়, তবে শব্দের এই শক্তিকে অঞ্জনা-বৃত্তি বলে।

"অজকুলে জন্ম লাভ হয়েছে যাহার।
জনক-তনয়া বিয়ে শোভা পায় তার ॥"

অর্থাৎ প্রধান অজবংশে যে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করি-য়াছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ জনকরাজার কন্যা সীতাকে বিবাহ করিতে পারেন।

পুনশ্চ,—অজ অর্থাৎ ছাগলের বংশে যাহার জন্ম হইয়াছে, সেই জনক অর্থ পিতার কন্যা আপনার ভগিনীকে বিবাহ করিতে পারেন।

এই শ্লেষে সহজে ব্যঞ্জনাবৃত্তি বুঝিতে পারা যাইবে।

অঞ্জন৪—(পুং) কাশীরাজ কুশধ্বজের বংশোদ্ভব এক রাজপুত্র। ইঁহার পিতার নাম কুণি। কুণি ছিলেন নরপতি সত্যধ্বজের পুত্র। (বিষ্ণুপুরাণ) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কুণির স্থলে শকুনি নাম দৃষ্ট হয়।

২ কীকটের একজন রাজা। ইঁহার পুত্ররূপে স্বয়ং বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মতান্তরে 'অজিন' পাঠও দেখা যায়। (ভাগবত ১.৩.২৪)

৩ মহাবস্তুবদানে উল্লিখিত বারাণসীর জনৈক রাজা। বুদ্ধদেব পুণ্যবন্ত নামে ইঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৪ শাক্যবংশীয় রাজা দেবদহের পুত্র। ইনি দেবদহনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার সঙ্গে জয়সেনের কন্যা যশোধরার বিবাহ হয়। ইঁহার দুই কন্যা—মায়া ও প্রজাপতি এবং দুই পুত্র—দণ্ডপাণি ও সুপ্রবুদ্ধ (সুপ্পবুদ্ধ)। (মহাবংশ, ২ পরি°) অঞ্জনরাজের রাজত্বকাল অনুমান ৬১১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ। ইনিই প্রথমে অঞ্জনাব্দ প্রচলিত করেন। [অঞ্জন৮ দ্র°]

৫ দৈত্যপতি মহিষাসুরের অষ্টজন সেনাপতির অন্যতম। ইনি বৈষ্ণবমূর্ত্তি-প্রেরিত অষ্টবসুর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অন্যান্য সেনাপতির সহিত মহিষাসুর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যুদ্ধে নিহত হন। (বরাহপু°)

৬ হিরণ্যকশিপুর ভাগিনেয় দনুবংশীয় জনৈক দানব। বিপ্রচিত্তি নামক দানবের ঔরসে সিংহিকার গর্ভে ইঁহার জন্ম। ভাগবত, বিষ্ণু ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ইঁহার অঞ্জক নাম দৃষ্ট হয়। [অঞ্জক দ্র°] পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ও মৎস্যপুরাণ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে হিরণ্যকশিপুর ত্রয়োদশজন ভাগিনেয়ের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে অঞ্জন একজন।

৭ কশ্যপপত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। (ব্রহ্মাণ্ডপু°, ৬৯.৬৯)

অঞ্জন৫—হিমাদ্রির উত্তরখণ্ডস্থিত একটী পর্ব্বত। শীতোদ সরোবরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ইহা বনাকীর্ণ ও মহোরগ-দিগের বাসভূমি। (ব্রহ্মাণ্ডপু°, ৩৬.২৮ ; ৩৯.৫৯) রামায়ণে (৪.৩৭.১৯-২০) লিখিত আছে অঞ্জনপর্ব্বত হইতে ৩ কোটী অঞ্জনবর্ণ বানরগণ সুগ্রীবের আদেশে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়াছিল।

অঞ্জন৬—বৃহৎসংহিতায় বর্ণিত ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিকস্থ একটী দেশ। (বৃহৎসংহিতা, ১৪শ অ°)

অঞ্জন৭—মধ্যদেশবাসী এক জাতি। (বৃহৎসংহিতা)

অঞ্জন৮—অব্দবিশেষ। অঞ্জন নামে দেবদহের একজন রাজা এই অব্দ প্রথমে প্রচলন করেন। [অঞ্জন৪ দ্র°] ব্রহ্মদেশীয়দের ধর্ম্ম-পুস্তকে ইঁহার নাম ইট্‌জেন্। এই অব্দের ৬৮ বৎসরে বুদ্ধদেব জন্ম-গ্রহণ করেন। ব্রহ্মবাসীরা তাহাদের তাজু মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম শনিবার হইতে এই অব্দের প্রথম দিন গণনা করিয়া থাকেন। অজাতশত্রুর রাজত্বকালে এই অব্দ লোপ পাইয়াছিল। বুদ্ধ-দেবের নির্ব্বাণের পর (১৪৮ অঞ্জনাব্দে) এই নামে আর এক নূতন অব্দ প্রচলিত হয়। এই নূতন অঞ্জনাব্দের তৃতীয় বৎসরে অজাতশত্রু বৈশালী আক্রমণ করেন।

অঞ্জনক (Antimony)—ধাতুবিশেষ। ইংরেজীতে ইহা

এন্টিমনি নামে পরিচিত। ইহার রাসায়নিক নাম ষ্টিবিয়ম্ (Stibium), এবং 'Sb' এই সঙ্কেত দ্বারা চিহ্নিত হয়। নামটীর ব্যাখ্যা করিয়া দেখিলে পদার্থটী সম্বন্ধে মোটামুটী ধারণা জন্মিবে—যাহা অঞ্জন করে তাহাই অঞ্জনক। অতি প্রাচীনকালেও অঙ্গরাগ হিসাবে নানা স্থানে নানা ভাবে অঞ্জনের ব্যবহার সম্বন্ধে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভ্রূ-চিত্রণের নিমিত্ত ইহার ব্যবহার যে যুগ যুগান্তর পূর্ব্বেও বহু দেশে প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০০ বৎসর হইতে মিশরে ইহার বহুল প্রচলনের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এক সময়ে ভারতীয় নারীদের মধ্যেও কৃষ্ণ-অঞ্জন বিশেষ আদরের প্রসাধনসামগ্রী ছিল এবং তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, ভ্রূযুগলে অঞ্জনের রেখা না টানিলে নারী-সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ হয় না। আজ পর্য্যন্তও এদেশে অঞ্জনের প্রচলন রহিয়াছে। আমাদের দেশে যে কৃষ্ণ-অঞ্জন চোখে ব্যবহৃত হইত এবং বর্ত্তমানেও হয়, তাহা কাহারও মতে আরব দেশে উদ্ভূত। এই আরব্য পদার্থটীই বোধ হয় গন্ধকযুক্ত অঞ্জনক (Sb_2S_3), যাহা বর্ত্তমানে রাসায়নিকগণের মধ্যে ষ্টিব্‌নাইট্ (Stibnite) নামে পরিচিত। নীলাঞ্জন বা সৌবীরাঞ্জনই খুব সম্ভব যথার্থ ষ্টিব্‌নাইট্।* [অঞ্জন দ্র°]

অঞ্জনককে কেহ কেহ রসাঞ্জনও বলিয়াছেন (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে এক প্রকার রসাঞ্জনের উল্লেখ আছে, তাহার প্রস্তুতপ্রণালী হইতে প্রতীয়মান হয়, তাহা ধাতু বা ধাতব পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কবিরাজ শ্রীরাখালদাস কাব্যতীর্থ মহাশয় তাঁহার 'রসশাস্ত্র' গ্রন্থে বলিয়াছেন, রসাঞ্জন ছাড়া আর সকল অঞ্জনই খনিজ।† আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ও তাঁহার হিন্দু রসায়নের ইতিহাসে ঐরূপ একটী নির্য্যাসের উল্লেখ করিয়াছেন।‡ অতএব অঞ্জনকই রসাঞ্জন কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে বর্ত্তমান যুগেও অঞ্জনক ধাতুঘটিত বহুবিধ ঔষধ ব্যবহৃত হইতেছে। পুরাকালেও ঔষধাদিতে এই ধাতুর ব্যবহার হইত বলিয়া অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন মহাশয় তাঁহার লিখিত 'চরক-সংহিতা'র অনুবাদ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। আবার কাহারও মতে ষ্টিব্‌নাইট্‌ই রসাঞ্জন।*

কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের নানা গ্রন্থ আলোচনা করিয়া দেখিলে এবং বিশেষ করিয়া রাখালদাস কাব্যতীর্থ মহাশয়ের মতানুসারে রসাঞ্জন মোটেই ধাতব পদার্থ কিন তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। অথচ বাজারে রসাঞ্জন নামে যে বস্তু কিনিতে পাওয়া যায়, যাহা কবিরাজগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা দেখিতে কিন্তু খনিজ ধাতুর মতই মনে হয়। সে যাহা হউক—যে পর্য্যন্ত না রাসায়নিক প্রথায় ইহা নির্দ্ধারিত হয়, সেই পর্য্যন্ত অঞ্জনক ও রসাঞ্জনকে একই বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করা উচিত হইবে কিনা বিবেচ্য।

যদিও পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রাচীন গ্রন্থাদিতে অঞ্জনকের (Antimony) নামের উল্লেখ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি ইহার ব্যবহার যে তদ্দেশেও অপ্রচলিত ছিল না, তাহা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। রসায়ন-বিদ্ বার্থেলট্ প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বের একটী ফুলদান পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, উহা সম্পূর্ণ এই ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত। অঞ্জনক ধাতুর এইরূপ ব্যবহার থাকা সত্ত্বেও নামোল্লেখ নাই বলিয়া মনে হয় খুব সম্ভব সেই কালের লোকেরা ইহাকে সীসক (Lead) বলিয়াই মনে করিত। এই ভুল হওয়া অসম্ভবও নহে। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন গ্রন্থাদিতে নীলাঞ্জন হইতে উৎকৃষ্টতর সীসক (বরনাগ) লাভ করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই সীসকের যে প্রস্তুতপ্রণালীর বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা হইতে মনে হয় যে, ইহা অঞ্জনক ব্যতীত আর কিছু নহে। কারণ "নীলাঞ্জন তীক্ষ্ণের (Cast iron) সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনঃপুনঃ উত্তাপ দিলে এক প্রকার উৎকৃষ্টতর সীসকের উৎপত্তি হয়; ইহা সহজ-দ্রবণীয় এবং বর্ণ ঈষৎ কৃষ্ণ।" [অঞ্জন২ দ্র°] এই উৎকৃষ্টতর সীসক সম্বন্ধে আচার্য্য রায় বলেন—ইহা স্পষ্টতঃ অঞ্জনক।† সীসকের সহিত অঞ্জনকের এইরূপ ভুল হওয়া যে অহেতুকী নহে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ষ্টিব্‌নাইট্ (Antimony sulphide) ও গেলেনা (Lead sulphide) উভয়ই কৃষ্ণবর্ণের; উভয়ই অঞ্জনরূপে ব্যবহৃত হয়; এবং ধাতুর প্রকৃতি ও গুণেরও

* "A History of Hindu Chemistry' by P. C. Ray, Vol I, p. 119.

† "ঋতে রসাঞ্জনং সর্ব্বাণি খল্বঞ্জনানি পার্থিবানি (খনিজাতানি) ভবন্তি। রসাঞ্জনং তু দারুহরিদ্রায়া ঘনীভূতঃ কাথঃ। অস্যাপি অঞ্জনবন্নেত্রোপযোগিত্বাৎ অঞ্জনসাধর্ম্ম্যাদঞ্জনপর্য্যায়ে পরিগ্রহঃ।" (রসশাস্ত্রম্, ৫৭ পৃ°)

‡ "Rasanjana (রসাঞ্জন) is the extract of *berberis Asiatica* called *rasot* in the vernacular"—A History of Hindu Chemistry by P. C. Ray, Vol. I, p. 95.

* শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়কৃত বাঙ্গালা শব্দকোষ।

† 'The "superior kind of lead" is evidently antimony' — A History of Hindu Chemistry.

সৌসাদৃশ্য কিছু বর্ত্তমান রহিয়াছে। অথচ দুইটীর মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহাও দৃষ্টি এড়ায় নাই, তাই প্রকৃত পার্থক্য স্থির করিতে পারা যায় নাই বলিয়া একটীকে উৎকৃষ্টতর বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ গোলযোগ যে কেবল ভারতীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণই করিয়াছেন তাহা নহে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণও এইরূপ একটা গোলযোগে পড়িয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটী এতৎসম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকসম্পাত করিতে পারে।

"But to detain you no longer on the subject, give me only leave to strengthen the paradox I have proposed, by the authority of that great and candid chemist *Basilius Valentinus*, who, speaking of antimony, after he hath told us that there are several kinds of it, and especially two; the one more mercurial and of a golden property, witnessed by the shining streaks or beams it abounds with; the other more full of sulphur, but destitute of the golden nature that enriches the former; adds, that there is such a different goodness betwixt the several sorts of antimony, as there is betwixt the several sorts of flesh or fish, which, though agreeing in name and, if you please, in nature, do exceedingly differ in point of goodness, which brings to my mind the great difference which I have found, even visible to the eye, betwixt the several sorts of antimony."—(Boyle's work : l. c., p. 324.)

এই ধাতু বহু প্রকারে বহু প্রয়োজনে বর্ত্তমান কালে ব্যবহৃত হইতেছে। তজ্জন্যই নিম্নে অঞ্জনক ও অঞ্জনক হইতে উৎপন্ন বিভিন্ন পদার্থ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

সর্ব্বপ্রথমে এখন ধাতুটী কি ভাবে পাওয়া যাইতে পারে তদ্বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। পূর্ব্বে যে গন্ধকঘটিত অঞ্জনক বা অঞ্জনের (Antimony sulphide) উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হইতে অতি অনায়াসে বিজারণ (reduction) প্রথায় গন্ধক হইতে ইহা পৃথক্ করিয়া লওয়া যায়। অঞ্জন বা ষ্টিব্‌নাইট্ বা গন্ধকাঞ্জনক চীন, ফ্রান্স ও ইটালীদেশে যথেষ্ট পাওয়া যায়; ভারতবর্ষেরও নানা স্থানে অল্প-বিস্তর রহিয়াছে। খনি হইতে তুলিয়া উত্তাপযোগে সহজ-দ্রবণীয় গন্ধকাঞ্জনক (দ্রবণতাপমান—৫৫০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) অন্যান্য প্রস্তরাদি কঠিন পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া হয়। তৎপরে এই গলিত গন্ধকাঞ্জনক কৃষ্ণসীসক-নির্ম্মিত (Plumbago) মূষা বা মুচিতে (crucible) লইয়া লৌহ ও কিঞ্চিৎ লবণের সহিত উত্তপ্ত করিলে অঞ্জনক পৃথক্ হইয়া বাহির হইয়া আসে [Sb_2S_3 (গন্ধকাঞ্জনক) $+ 3Fe$ (লৌহ) $= 2Sb$ (অঞ্জনক) $+ 3FeS$]। ধাতুমলের (slag) নীচে এইরূপ পৃথক্ করা ধাতুটী জমিতে থাকে। ঐ গন্ধকাঞ্জনক পরাবর্ত্তক চুল্লীতে (reverberatory furnace) লইয়া পুড়াইয়া জারিত করিলে ৩৫০° ডিগ্রী তাপমানে এন্টিমনি ডাই-অক্সাইড্ (Sb_2O_4) চুল্লীতে পড়িয়া থাকে। ৩৫০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের ঊর্দ্ধে উত্তাপ দিলে এন্টিমনি-ট্রাই-অক্সাইড্ (Sb_4O_6) উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে (sublimes)। এই এন্টিমনি অক্সাইড্ পরে কাঠকয়লা এবং সর্জ্জিকাক্ষারের (Sodium carbonate) সহিত মিশাইয়া উত্তপ্ত করা হয়। তাপ দিতে দিতে যখন সমস্তটা গরম হইয়া রক্তাভ হইয়া আসে, তখন বিজারণ আরম্ভ হয় [$Sb_4O_6 + 6C = 4Sb + 6CO$]। তৎপরে এই অপরিষ্কৃত ধাতুতে সর্জ্জিকাক্ষার ও কিঞ্চিৎ সোরা (nitre) মিলাইয়া লইয়া গলাইলে পরিষ্কৃত অঞ্জনক পাওয়া যায়। ইহার পর ঠাণ্ডা করিলে অতি সুন্দর ঝক্‌ঝকে স্ফটিকপাত (crystallise) হইতে থাকে। আর এক উপায়ে অতি পরিষ্কার অঞ্জনক পাওয়া যাইতে পারে। রিক্রিষ্টালাইজ্‌ড্ ক্লোর্-এন্টিমনিক্ এসিড্ জলবিচ্ছেদ করিলে (on hydrolysis) পেণ্টক্সাইড্ পাওয়া যায়; এই পেণ্টক্সাইডে পটাশিয়ম্ সাএনাইড্ মিলাইয়া গলাইলে নির্ম্মল অঞ্জনক বাহির হইয়া আসে।

অঞ্জনকের বর্ণ রৌপ্য-শুভ্র এবং চক্‌চকে। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৬'৮। ইহা অতি সহজে চূর্ণ করা যায়। গলান অঞ্জনক ধাতু ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করিলে বেশ বড় বড় চৌকো দানা পড়িতে আরম্ভ করে; আর ঠাণ্ডা যদি খুব তাড়াতাড়ি করা যায়, তবে রেণুকণার মত (granular) দানা হয়। ৬৩০° ডিগ্রীতে এই ধাতু গলে এবং ১৪৪০° ডিগ্রীতে ফুটিতে আরম্ভ করে। এন্টিমনি ট্রাই-ক্লোরাইড্ গলাইয়া তাহাতে দস্তা (Zinc) দিলে এক প্রকার কাল গুঁড়ার উৎপত্তি হয়। এই গুঁড়া প্লাষ্টারের ঢালাই জিনিষে লোহার রঙ্ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। বাতাসের সংস্পর্শে, জলে, কিংবা তরলতর (dilute) অম্লে অঞ্জনক ধাতুর কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। কিন্তু খুব গাঢ় (concentrated) নাইট্রিক্ এসিড্ (Nitric Acid) দ্বারা ইহা অক্সিডাইজ্‌ড্ হইয়া এন্টিমনিক্ অম্ল উৎপাদন করে এবং উক্ত ক্রিয়ার ফলে যবক্ষার বা নেত্রজনের (Nitrogen) অক্সাইড্ও উৎপন্ন হয়। এন্টিমনিক্ এসিডের বর্ণ সাদা এবং উহা সাধারণতঃ গুঁড়াই হয়। একোয়া রেজিয়াতে (হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড্ + নাইট্রিক্-এসিড) ইহা অতি সহজে গলে এবং ফলে পেণ্টাক্লোরাইড্

সলিউশন পাওয়া যায়। খোলা বাতাসে রাখিয়া উত্তাপ দিলে অঞ্জনক হইতে শ্বেতবর্ণের ধূম উদ্গত হইতে থাকে—এই শ্বেত ধূম এন্টিমনি ট্রাই-অক্সাইড্ (Sb_2O_3) এবং টেট্রক্সাইড্ (Sb_2O_4) হইতে উৎপন্ন।

গলানো ষ্টিবাইনের বা এন্টিমনি ট্রাইহাইড্রাইডের (SbH_3) উপর ওজোনাইজ্ড্ (ozonized) অম্লজনের ক্রিয়ার ফলে হলুদবর্ণের এক নবতর পদার্থের উৎপত্তি হয়। ইহা ইয়েলো অথবা আল্ফা-এন্টিমনি নামে অভিহিত। ইহা নিরবয়ব (amorphous) অর্থাৎ ইহার কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট আকারের স্ফটিক নাই এবং কার্ব্বন্ ডাইসাল্ফাইডে ইহা সামান্য গলে। কিন্তু এই আল্ফা-এন্টিমনির অস্তিত্ব অত্যন্ত অনিশ্চিত। ৯০° ডিগ্রীর উর্দ্ধেই ইহা এক নূতন রকমের কৃষ্ণবর্ণ গুঁড়ায় পরিবর্ত্তিত হয়। এই গুঁড়া বাতাসের সংস্পর্শে আসিলে আপনা-আপনি অক্সিডাইজ্ড্ হইয়া সামান্য তাপেই দানাদার আকারে পরিবর্ত্তিত হয়; এইরূপ দানাদার আকার বিটা-এন্টিমনি নামে পরিচিত।

বহু ধাতুর সহিত সংমিশ্রণে অঞ্জনক মিশ্রধাতুর (alloy) উৎপাদন করে। সীসক ও টিন এই দুই ধাতুর সহিত ইহার মিশ্রণই বেশী হইয়া থাকে। ১৫ ভাগ অঞ্জনক এবং ৮৫ ভাগ সীসক একত্র করিয়া যে মিশ্রধাতু প্রস্তুত হয়, তাহা 'হার্ড লেড্' নামে পরিচিত। ছাপার জন্য যে অক্ষর প্রস্তুত করা হয় তাহাতেও অঞ্জনক রহিয়াছে। তদ্ব্যতীত তাম্র, দস্তা ও বিস্মাথের সহিতও অঞ্জনকের মিশ্রণ করা যাইতে পারে। তাম্র ও টিনের সংযোজনায় অঞ্জনকভূত মিশ্রের উৎপাদনই কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে হয়। তাম্রের সহিত অঞ্জনকের যে $SbCu_2$ ধরণের মিশ্র ধাতু প্রস্তুত হয়, তাহার নীল-লোহিত (purple) বর্ণ যথার্থই মনোমুগ্ধকর।

অঞ্জনক ধাতুর তিন প্রকার অক্সাইড্ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। অক্সাইড্গুলি প্রায়ই অম্লাত্মক ; কিন্তু ট্রাই-অক্সাইডের সামান্য ক্ষারীয় গুণও দেখিতে পাওয়া যায়; এবং সকল অক্সাইড্ই উদজন (Hydrogen) বা অঙ্গার দ্বারা অম্লজন-মুক্ত করিতে পারা যায়। অক্সাইড্গুলির মধ্যে প্রথমতঃ এন্টিমনি ট্রাই-অক্সাইডের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ট্রাই-অক্সাইড্ স্বভাবজরূপেও পাওয়া যায়। সর্জ্জি-কাক্ষারের সলিউশন দ্বারা পরিপাক করিয়া (digesting) এন্টিমনি অক্সিক্লোরাইড্ (SbOCl) হইতে ট্রাই-অক্সাইড্ প্রস্তুত করা যাইতে পারে; তাহা ছাড়া আরক্ত-তপ্ত (red-hot) অঞ্জনকের উপর দিয়া জলীয় বাষ্প চালিত করিলেও ট্রাই-অক্সাইড্ উৎপন্ন হয়। উত্তপ্ত করিলে এন্টিমনি ট্রাই-অক্সাইড্ হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে এবং ঠাণ্ডা করিলে সেই রঙ্ আবার বাফ্-রঙে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। ইহা ৬৫৬° ডিগ্রীতে গলে এবং ১৫৬০° ডিগ্রীতে বাষ্পাকারে পরিণত হইতে থাকে। সাধারণ অম্লত্ব গুণে ইহা ক্ষার বা এল্কেলির সহিত ক্রিয়া করিয়া লবণ উৎপাদন করে, যথা $NaSbO_2, 3H_2O$। এই ধরণের লবণ উৎপাদনের হেতু আমরা মাত্র তখনই নির্দ্ধারণ করিতে পারি, যখন আমরা মেটা-এন্টিমনিয়ম্ এসিডের ($HSbO_2$) অস্তিত্ব কল্পনা করি। এই সর্জ্জিক (Sodium) লবণ জলে অতি সামান্য গলে এবং ঝক্ঝকে অষ্টফলক স্ফটিকাকারে (octohedra crystal) পরিণত হয়। কিন্তু পটাশের সহিত এন্টিমনি ট্রাই-অক্সাইড (Sb_2O_3) মিলাইয়া জ্বাল দিলে যে পটাশিয়ম্ লবণ ($K_2O, 3Sb_2O_3$) পাওয়া যায়, তাহা অতি অনায়াসে জলে গলে। টার্‌টার ইমেটিকের সহিত তরল নাইট্রিক্ এসিড্ বা গন্ধকাম্লের যোগাযোগে যে অধঃক্ষেপ (precipitate) হয়, তাহা ১০০° ডিগ্রীতে শুকাইলে অর্থো-এন্টিমনিয়স্ এসিড্ (H_3SbO_3) নামে এক অম্ল পাওয়া যায়। এই স্থানে টার্‌টার ইমেটিকের প্রস্তুত-প্রণালীর উল্লেখ করা প্রয়োজন; নচেৎ অর্থো-এন্টিমনিয়স্ এসিডের উল্লেখ সম্পূর্ণ অস্থানীয় হইয়া পড়িবে। এন্টিমনি অক্সাইড্, জল এবং টার্‌টার-ক্ষীর বা ক্রীম্ অব্ টার্‌টার (Potassium hydrogen tartrate) একত্র করিয়া ফুটাইলে যে লবণের উৎপত্তি হয়, তাহাই টার্‌টার ইমেটিক্। ইহার রাসায়নিক নাম হইল পটাশিয়ম্ এন্টিমনিল্ টার্‌ট্রেট্ [$2K(SbO)C_4H_4O_6, H_2O$]। এই টার্‌টার ইমেটিক্ ঔষধাদিতে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। রঙ্‌বন্ধনীতেও (mordant) ইহার ব্যবহার প্রচলিত আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এন্টিমনি ট্রাই-অক্সাইডের কিঞ্চিৎ ক্ষারগুণও দেখিতে পাওয়া যায়। তাই ইহা কএকটী অম্লের উপরে অনুরূপ ক্রিয়া করিয়া থাকে। গাঢ় নাইট্রিক্ অম্লের সহিত সাধারণ অবস্থায়ই ইহা হইতে এন্টিমনি নাইট্রেট্ [$Sb(NO_3)_3$] পাওয়া যায়; উত্তাপযোগে গাঢ় গন্ধকাম্লের সহিত ইহা এন্টিমনি সালফেট্ [$Sb_2(SO_4)_3$] উৎপাদন করে; আর তরলতর (dilute) হাইড্রোক্লোরিক্ অম্লে ইহা সহজেই গলিয়া গিয়া এন্টিমনি ট্রাইক্লোরাইডের ($SbCl_3$) সৃষ্টি করে।

অক্সাইড্গুলির মধ্যে দ্বিতীয়তঃ টেট্রক্সাইডের (Sb_2O_4) আলোচনা করা যাইতে পারে। টেট্রক্সাইড্ সহজেই ট্রাই-অক্সাইড্ হইতে প্রস্তুত করা যায়। ট্রাই-অক্সাইডে উন্মুক্ত বাতাসে ৩৯০-৭৭৫° ডিগ্রী উত্তাপ দিলেই টেট্রক্সাইডের

শ্বেতবর্ণ চূর্ণ লাভ করা যায়। পেণ্টক্সাইড্ আবার উত্তাপযোগে টেট্রক্সাইডে পরিণত হয়। ষ্টিব্নাইট্ জারিত করিয়াও টেট্রক্সাইড্ পাইতে পারা যায়, কিন্তু তাহা অপরিষ্কার। যদি অম্লজনযোগ (oxidation) সম্পূর্ণ হইবার অবকাশ না দেওয়া হয়, তবে যে গলিত পদার্থ পাওয়া যায় তাহা এণ্টিমনি কাচ নামে খ্যাত। ইহা টেট্রক্সাইড্ ও অপরিবর্ত্তিত ষ্টিব্-নাইটের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। এই পদার্থটী কাচ ও চিনা-মাটীর জিনিষপত্রে হলুদ্ রঙ্ করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। ক্ষারের সহিত লইয়া গলাইলে এণ্টিমনি টেট্রক্সাইড্ হাইপো-এণ্টিমনিয়েট্ নামে এক প্রকার লবণ উৎপন্ন করে।

পূর্ব্বে যে এণ্টিমনি পেণ্টক্সাইডের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার প্রস্তুতপ্রণালী মোটামুটী তথায় প্রদত্ত হইয়াছে। এই পেণ্টক্সাইডে ৪৪০° ডিগ্রীর উর্দ্ধে উত্তাপ দিলেই উহা বিচ্ছিন্ন হইয়া এণ্টিমনি টেট্রক্সাইডে পরিণত হয়।

এতদ্ব্যতীত পটাশিয়ম্ মেটা-এণ্টিমনিএট্ ($KSbO_3$) ধরণের লবণ এবং পাইরো-এণ্টিমনিক্ এসিড্ ($H_4Sb_2O_7$), মেটা-এণ্টিমনিক্ এসিড্ ($HSbO_3$), অর্থো-এণ্টিমনিক্ এসিড্ (H_3SbO_4) ইত্যাদি বহু প্রকার যৌগিক পদার্থ অঞ্জনক হইতে প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

হ্যালোজেনগুলির* সহিত অঞ্জনক SbX_3 এবং SbX_5 এই ধরণের দুই শ্রেণীর যৌগিক পদার্থের উৎপাদন করে। তন্মধ্যে SbX_3 শ্রেণীর পদার্থ সকল হ্যালোজেনের সহিতই গঠিত হয়; আর SbX_5 শ্রেণীর পদার্থ কেবল ক্লোরিণ এবং ফ্লোরিণের সহিতই ঘটিতে দেখা যায়।

এণ্টিমনি ট্রাইক্লোরাইড্ ($SbCl_3$)—এই পদার্থটী বেসিল ভালেণ্টাইন্ জারিত (roasted) ষ্টিব্নাইটের (Sb_2S_3) সহিত মারকিউরিক্ ক্লোরাইড্ ($HgCl_2$) মিশাইয়া পাতন (distillation) দ্বারা প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে গ্লবার (Glauber) গরম গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক্ এসিডে ষ্টিব্নাইট্ বা গন্ধকাঞ্জনক গলাইয়া এণ্টিমনি ট্রাইক্লোরাইড্ প্রস্তুত করেন ($Sb_2S_3+6HCl=2SbCl_3+3H_2S$)।

উক্ত ক্রিয়া হইতে যে গাঢ় পিঙ্গলবর্ণের দ্রব পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা পাতিত (distillation) করা হয়। পাতনকালে সর্ব্বপ্রথম জল নির্গত হইয়া যায়, তৎপর হাইড্রোক্লোরিক্ অম্ল বিদূরিত হয়; এবং সর্ব্বশেষে বাহির হয় এণ্টিমনি ট্রাইক্লোরাইড্। এই ট্রাই-ক্লোরাইড্ যাইয়া গ্রহণপাত্রে (receiver) সাদা স্ফটিকাকারে জমা হইতে থাকে। এইরূপ ট্রাইক্লোরাইড্কে অঞ্জনক-ননী (butter of antimony) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এণ্টিমনি ট্রাইক্লোরাইড্ জলে বিচ্ছিন্ন হইয়া বেসিক্ ক্লোরাইডে (basic chloride) পরিণত হয়। ইহা হাইড্রোক্লোরিক্ অম্লে গলিয়া যায় এবং তাহা হইতে ক্লোর্-এণ্টিমনিয়স্-এসিড্ ($2SbCl_3$, HCl, $2H_2O$) স্ফটিকাকারে পাওয়া যাইতে পারে। এণ্টিমনি ট্রাইক্লোরাইড্ হইতে আর একটী নূতন ক্লোরাইড্ প্রস্তুত করা যায়। ট্রাই-ক্লোরাইড্ হাইড্রোক্লোরিক্ অম্লে গলাইয়া জলে ঢালিয়া দিলে এক প্রকার সাদা গুঁড়া অধঃপতিত হয়। এই সাদা গুঁড়া হইল এণ্টিমনিয়স্ অক্সিক্লোরাইড্। দুইটী অক্সিক্লোরাইডের অস্তিত্ব এ পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে। যথা—

$SbCl_3+H_2O \leqq SbOCl+2HCl$ [জলের পরিমাণ যখন কম]

$4SbCl_3+5H_2O \leqq Sb_4O_5Cl_2+10HCl$ [জলের পরিমাণ যখন বেশী]

ট্রাইক্লোরাইডের উপর অতিরিক্ত ক্লোরিণের ক্রিয়ার ফলে অথবা ট্রাইক্লোরাইডের সহিত একোয়া রেজিয়ার [একোয়া রেজিয়া=৩ ভাগ হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড্+১ ভাগ নাইট্রিক্ এসিড্ (উভয় এসিড্ই ষ্ট্রং প্রয়োজন)] যোগাযোগে এণ্টিমনি পেণ্টাক্লোরাইডের উৎপত্তি হয়। ১৪০° ডিগ্রী উত্তাপে এই পেণ্টাক্লোরাইড্ সামান্য বিশ্লিষ্ট হইয়া ক্লোরিণ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে ($SbCl_5 \leqq SbCl_3+Cl_2$)। ২২ মিলিমিটার চাপে ৭৯° ডিগ্রী উত্তাপে ইহা উদ্বায়ী হইতে থাকে এবং তখন সংযোজনার (Composition) কোনরূপ ব্যাঘাত হয় না। বরফ-শীতল জলের সহিত ইহা দুই প্রকারে জল-সংযোজিত (hydrated) হইয়া স্ফটিকাকারে নিপতিত হয়। একটী হইল $SbCl_5$, H_2O—ইহা ক্লোরোফর্ম্মে গলিয়া যায়; আর অপরটীর ($SbCl_5$, $4H_2O$) উপরে ক্লোরোফর্ম্ম কোনরূপ ক্রিয়া করিতে পারে না। এণ্টিমনি পেণ্টাক্লোরাইড্ ও পেণ্টক্সাইড্ যথাক্রমে ৩ : ১ ($3SbCl_5 : Sb_2O_5$) ভাগে লইয়া ১৪০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ দেওয়া হয়, তবে পেণ্টাক্লোরাইড্ হইতে Sb_3OCl_{13} এবং $Sb3O_4Cl_7$ এই দুই প্রকারের অক্সিক্লোরাইড্ পাওয়া যায়। হাইড্রোক্লোরিক্ এসিডের সহিত ইহা ক্লোর্-এণ্টিমনিক্ এসিড্ ($2HSbCl_6$, $9H_2O$) নামে এক স্ফটিকাকার কথঞ্চিৎ স্থায়ী অম্লের উৎপাদন করে।

মারকিউরিক্ ক্লোরাইডের সহিত অঞ্জনক পাতিত করিয়া (distilling) এণ্টিমনি ট্রাইক্লোরাইড্ প্রস্তুত

* ক্লোরিণ, ব্রমিণ, আওডিন, ফ্লোরিণ প্রভৃতিকে হ্যালোজেন (Halogen) কহে।

করা যায় ; অথবা হাইড্রোক্লোরিক্ এসিডে এন্টিমনি ট্রাই-অক্সাইড্ গলাইয়া পরে উদ্বায়ন (evaporation) দ্বারাও প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই ক্লোরাইড্ শ্রেণীর মধ্যে পটাশিয়ম্ ফ্লোর্-এন্টিমনাইট্ (K_2SbF_5) কেলিকো প্রিন্টিং-এর জন্য বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হয়। পটাশিয়ম্ ফ্লোরাইড্ (KF) এবং হাইড্রোফ্লোরিক্ এসিডের (HF) সলিউশনে এন্টিমনি ট্রাই-অক্সাইড্ গলাইয়া ইহা তৈয়ারী করা হয়।

এন্‌হাইড্রাস্ হাইড্রোফ্লোরিক্ এসিডের সহিত এন্টিমনি পেন্টাক্লোরাইড্ মিশাইয়া রিফ্লাক্স কন্‌ডেন্সারে (reflux condenser) তিন দিন ধরিয়া ফুটাইলে এন্টিমনি পেন্টা-ফ্লোরাইড্ পাওয়া যায়। ইহা বর্ণহীন, তেলের মত তরল হয় ; এবং জলের সংস্পর্শ ব্যতীত কাচের উপর কোন প্রকার ক্রিয়া করিতে পারে না। এই স্থানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, হাইড্রোফ্লোরিক্ এসিড্ ভীষণ-ভাবে কাচকে আক্রমণ করে।

অঞ্জনক ধাতুর ট্রাই-ব্রোমাইড্ ও ট্রাই-আওডাইড্ মৌলিক পদার্থের যোগাযোগেই উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু জলের সংস্পর্শে আসিলে ঐগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া অক্সিব্রোমাইড্ (SbOBr) ও অক্সিআওডাইড্ (SbOI) উৎপাদন করে।

এন্টিমনির দুই প্রকারের সাল্‌ফাইডের সহিত আমরা পরিচিত—ট্রাই-সাল্‌ফাইড্ (Sb_2S_3) ও পেন্টাসাল্‌ফাইড্ (Sb_2S_5)। ট্রাইসাল্‌ফাইড্ বা গন্ধকাঞ্জনকের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহা খনিজরূপে পাওয়া যায়—অর্থাৎ যে ষ্টিব্‌নাইটের কথা বলা হইয়াছে, তাহাই ট্রাইসাল্‌ফাইড্। ইহা দুই তিন প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। হাইড্রোক্লোরিক্ এসিডে ট্রাইক্লোরাইডের মধ্য দিয়া সাল্‌ফিউরেটেড্ হাই-ড্রোজেনের ক্রিয়ার ফলে যে লাল বর্ণের নিরবয়ব অধঃক্ষেপ (precipitate) পাওয়া যায়, তাহাই ১০০° ডিগ্রীতে শুকাইয়া অঙ্গারাম্লজনে ২০০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ দিলে ধূসর-কৃষ্ণ আকারে আত্মপ্রকাশ করে। লাল বর্ণের গন্ধকাঞ্জনককে অঞ্জনক-সিন্দূর (Antimony vermilion) নাম দেওয়া হইয়াছে এবং বর্ণরাগরূপে ইহার ব্যবহারও প্রচলিত আছে। এতদ্ব্যতীত রবারে গন্ধকযোগ (vulcanise) করিবার নিমিত্ত ও রবারের বর্ণ লাল করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। কৃষ্ণ-বর্ণের ট্রাইসাল্‌ফাইড্‌কে যদি নেত্রজন (Nitrogen) প্রবাহের মধ্যে ৮৫০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ দেওয়া হয় এবং নির্গত বাষ্পকে যদি দ্রুত ঠাণ্ডা করিয়া ফেলা যায়, তবে তৃতীয় রকমের ট্রাইসাল্-ফাইডের উৎপত্তি হইয়া থাকে ; ইহার বর্ণ ঈষদ্ রক্ত (lilac) ও আকৃতি গুটির মত (globular)। যবক্ষার ও গন্ধকের সহিত পাইরোটেক্‌নীতে (Pyrotechny) নীল অগ্ন্যুৎপাদনের নিমিত্ত এবং দিয়াশলাই প্রস্তুত করিবার জন্য এই সাল্‌ফাইড্ যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। বাজারে যে সকল দিয়াশলাই (safety matches) পাওয়া যায়, তাহাতে সাধারণতঃ নিম্নোক্ত রূপ অগ্ন্যুৎপাদক বস্তু ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এন্টিমনি সাল্‌ফাইড্	২৪ ভাগ
পটাশিয়ম্ ক্লোরেট্	৩২ „
পটাশিয়ম্ ডাইক্রোমেট্	১২ „
রেড্ লেড্	৩২ „
	১০০ ভাগ

অন্যান্য ধাতুর সহিত এন্টিমনির থাও (thio-) লবণও দেখিতে পাওয়া যায় ; যথা—$Na_3SbS_4, 9H_2O$ (সোডিয়ম্ থাও-এন্টিমনিএট্), K_3SbS_4, $9H_2O$ (পটাশিয়ম্ থাও-এন্টিমনিএট্), $(NH_4)_3SbS_4$ (আমোনিয়ম্ থাও-এন্টিমনি-এট্), $Ba_3SbS_4, 6H_2O$ (বেরিয়ম্ থাও-এন্টিমনিএট্) ইত্যাদি। এই সমস্ত থাও-লবণ হইতে মনে হয় যেন ইহারা অর্থো-থাও-এন্টিমনিক্ এসিডের (H_3SbS_4 অথবা Sb_2S_5, $3H_2S$) মত কোন একটা অম্ল হইতে উৎপন্ন। অথচ এইরূপ অম্লের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নিরূপিত হয় নাই। দেখিতেও কিন্তু পাওয়া যায়, এই সকল থাও-লবণের অম্লীকরণের ফলে অম্লের উৎপত্তি না হইয়া নিরুদক অম্লই (acidic anhydride) অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং ইহা এন্টিমনি পেন্টাসাল্‌ফাইড্ (Sb_2S_5) অথবা এন্টিমনি টেট্রাসাল্‌ফাইড্ (Sb_2S_4) ও গন্ধকের মিশ্রণ [$2(NH_4)_3\ SbS_4+6\ HCl=6NH_4Cl+Sb_2S_5+3H_2S$]।

উদজনের সহিত অঞ্জনক সংযোজিত হইয়া হাইড্রাইডের সৃষ্টি করে। এন্টিমনি ট্রাইহাইড্রাইড্ বা ষ্টিবাইন্ (SbH_3) উদজনের সহিত মিশ্রিতভাবে পাওয়া যায়, যদি কোন এন্টিমনি লবণ দস্তা এবং তরল গন্ধকাম্লের সহিত মিশাইয়া রাসায়নিক ক্রিয়ার নিমিত্ত রাখিয়া দেওয়া হয়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ষ্টক্ ও ডট্ (Stock & Doht) ইহা বেশ পরিষ্কৃতরূপে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহাতে অন্য কোন পদার্থ মিশ্রিত ছিল না। তাঁহারা মাগ্‌নেসিয়ম্ ও এন্টিমনির মিশ্রধাতুর উপর হাইড্রোক্লোরিক্ অম্লের ক্রিয়া দ্বারা এই ষ্টিবাইন্ বাষ্প প্রস্তুত করেন ($Mg_3Sb_2+6HCl=3\ MgCl_2+2SbH_3$ । এই বাষ্প পরে জলে ধুইয়া কাল্‌সিয়ম্ ক্লোরাইডে শুকাইয়া তরলীকৃত-বাতাসে-ঘেরা নলে রক্ষা করা হয় ; ফলে কঠিন ষ্টিবাইনের উৎপত্তি হয়। ইহা ৮৮° ডিগ্রীতে

বর্ণহীন তরল পদার্থে রূপান্তরিত হইয়া ৯৭° ডিগ্রীতে ফুটিতে আরম্ভ করে। ষ্টিবাইন্ বাষ্পের গন্ধ অত্যন্ত অপ্রীতিকর এবং বিষাক্ত জল, বাতাস ইত্যাদির সংস্পর্শে আসিলে ইহা বিভিন্ন উপাদানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের আবিষ্কৃত কালাজ্বরের মহৌষধ ইউরিয়া-ষ্টিবামিন্-এরও অঞ্জনক একটী বিশিষ্ট উপাদান।

অঞ্জনক২—(পুং) অঞ্জনশব্দযুক্ত বেদাংশ।

অঞ্জনকর্ম্মন্—(ক্লী) অঞ্জন দ্বারা নেত্রপ্রসাধনাদি কর্ম্ম। স্মৃতিশাস্ত্রের মতে অঞ্জনকর্ম্ম পূর্ব্বাহ্ণে কর্ত্তব্য। "মৈত্র্যং প্রসাধনং স্নানং দন্তধাবনমঞ্জনম্। পূর্ব্বাহ্ণ এব কুর্ব্বীত।" (স্মৃতি)

বৈদ্যক শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, যাহা দ্বারা অঞ্জন করা যায়, সেই দ্রব্যের নামই অঞ্জন।

"অঞ্জনং ক্রিয়তে যেন তদ্‌দ্রব্যং চাঞ্জনং স্মৃতম্।" (বৈদ্যকশব্দ°)

উক্ত শাস্ত্রে পাঁচ প্রকার অঞ্জনের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পঞ্চ অঞ্জনের বর্ণ ও গুণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—সৌবীরাঞ্জনের বর্ণ ধূম্রাভ, ইহা রক্তপিত্তহর; রসাঞ্জনের গুণ বিষ, হিক্কা এবং অক্ষিরোগ-নাশক; স্রোতোঽঞ্জন পীতাভ; পুষ্পাঞ্জন শুভ্রবর্ণ এবং নীলাঞ্জন নীলবর্ণ। [বিস্তৃত বিবরণ অঞ্জন শব্দে দ্র°]

অঞ্জনকী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] ভৈষজ্য বৃক্ষবিশেষ।

অঞ্জনকেশিকা, -কেশী—(স্ত্রী) [অঞ্জনমিব কৃষ্ণবর্ণঃ কেশো যস্যাঃ। বহুব্রী] [বৈদ্যক] নখী নামক এক প্রকার গন্ধদ্রব্য। ইহা লাগাইলে চুল অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ হয়। অমরের টীকাকার মহেশ্বর বলেন, এই দ্রব্য দেখিতে বহেড়ার পাতার মত। পর্য্যায়—হনু, হট্টবিলাসিনী, ধমনী, নলী, শুক্তি, শঙ্খ, খুর। ভাবপ্রকাশের পূর্ব্বার্দ্ধের প্রথম ভাগে কর্পূরবর্গে ইহাকে উত্তরদেশপ্রসিদ্ধ নলিকা নামক গন্ধদ্রব্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

অঞ্জনগাঁও১—বেরারের অমরাবতী জেলাস্থিত এক নগর। সানুর নদীতীরে এলিচপুর নগরের ১৬ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২১°১০'৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°২০'৩০" পূঃ। এখানে তূলাজাত কাপড়, ঝোড়া বা টুক্‌রি এবং পাণ প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে। দ্বিতীয় মহারাষ্ট্র যুদ্ধের পর ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর এখানে স্যর্ আর্থার ওয়েলেস্‌লীর সহিত সিন্ধিয়ার প্রধান মন্ত্রী বিঠ্‌ঠল পন্তের সন্ধি হয়। তৎপরে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এলিচপুরের নবাব গোলাম হোসেন খাঁর সহিত অকোটের সৈয়দ সিরাজুদ্দীন্ হোসেনের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সিরাজুদ্দীন্ পরাজিত হন। প্রসিদ্ধ মরাঠী কবি শিবনাথ রঙ্গোপন্ত এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

অঞ্জনগাঁও২—বোম্বাইপ্রদেশের পূর্ব্বখান্দেশ জেলার এদ্লাবাদ হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত একটী গ্রাম। এখানে অমরসিংহের দেউল বর্ত্তমান।

অঞ্জনগাঁও-বাড়ী—বেরারের অমরাবতী জেলাস্থিত এক নগরী। বড়নেরা হইতে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে রামগির বাবা নামে এক সাধুর সমাধি আছে।

অঞ্জনগুড়িকা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] বিসূচিকারোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ত্রিকটু, ডহরকরঞ্জফল, হরিদ্রা ও বনমাতুলুঙ্গমূল জলে বাটিয়া ছায়ায় শুকাইয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন মউলসার, অপাঙ্গবীজের তণ্ডুল, শ্বেত অপরাজিতার মূল ও ত্রিকটু—এই সকল দ্রব্য দ্বারা অঞ্জনগুড়িকা প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে বিসূচিকারোগ প্রশমিত হয়।

অঞ্জনত্রয়, -ত্রিতয়—(ক্লী) [বৈদ্যক] কালাঞ্জন, স্রোতোঽঞ্জন ও রসাঞ্জন। (রাজনি°)

অঞ্জননামিকা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] বর্ত্মগত নেত্ররোগবিশেষ। বর্ত্মমধ্যে এক প্রকার তাম্রবর্ণ পিড়কা জন্মে। উহাতে দাহ ও বেদনা হয় এবং উহা সূক্ষ্ম ও মৃদু। এইরূপ পিড়কাকেই অঞ্জননামিকা বলিয়া জানিবে। (মাধবনি°) [অঞ্জনী৩ দ্র°]

অঞ্জনপর্ব্বা—(পুং) মহাবীর ঘটোৎকচের পুত্র। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে ইনি সাহসী ও একজন বীর বলিয়া পরিচিত। সেই সময়ে দ্রোণাচার্য্যের হস্তে ইঁহার মৃত্যু হয়। (মহাভা°, দ্রোণ°, ১৫৬ অ°)

অঞ্জনবন—বনবিশেষ। এক সময়ে বুদ্ধদেব সাকেত প্রদেশের অঞ্জনবনের মৃগদাবে বাস করিয়াছিলেন। (সংযুত্তনিকায়, ১ম ও ৫ম খণ্ড)

অঞ্জনভৈরব—(পুং) [বৈদ্যক] সান্নিপাতিক জ্বরে রসৌষধবিশেষ। (রসেন্দ্রসার°, সান্নি° জ্বরচি°)

অঞ্জনযুগ্ম—(ক্লী) [বৈদ্যক] স্রোতোঽঞ্জন ও রসাঞ্জন। (বাভট, সূত্র°)

অঞ্জনরস—(পুং) [বৈদ্যক] সান্নিপাতিক জ্বরে নস্যভেদ। (রসেন্দ্রসার°, জ্বরচি°)

অঞ্জনবিধি—(পুং) [বৈদ্যক] নেত্রপ্রসাধনভেদ। অঞ্জন ত্রিবিধ—রস, বটী ও চূর্ণ। ইহারা প্রত্যেকে আবার ত্রিবিধ—লেখন, রোপণ ও স্নেহন। এই সকল অঞ্জন যথাবিধি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে নেত্রবর্ত্মাদি দোষ প্রশমিত হয়। (ভাবপ্র°)

অঞ্জনবেল—বোম্বাই প্রদেশস্থ রত্নাগিরি জেলার একটী বন্দর। অক্ষা° ১৭°৩৩' উঃ ও দ্রাঘি° ৭৩°১৩' পূঃ। এখানে একটী প্রাচীন দুর্গ ও কএকটী দেবালয় বর্ত্তমান। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইহা বৃটীশ সৈন্যহস্তে সমর্পিত হয়।

অঞ্জনশলাকা—(স্ত্রী) [অঞ্জনলেপনার্থং শলাকা, মধ্যপদলোপি-কর্ম্মধা] [বৈদ্যক] চক্ষে অঞ্জন লাগাইবার শলাকা। ইহা প্রায় সীসক ধাতুতে নির্ম্মিত হয়। গুণসূচের মত মোটা ও বড়, কিন্তু দুই মুখই সরু।

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া" (গুরুনতি)

অঞ্জনা১—(স্ত্রী) [অঞ্জন-টাপ্] ঈশানদিকের দিক্‌হস্তিনী। [অঞ্জনাবতী দ্র°]

অঞ্জনা২—(স্ত্রী) হিন্দুদিগের স্ত্রীদেবতাবিশেষ। সংস্কৃত বর্ণমালার অংকার অক্ষরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। শ্রীতত্ত্বনিধিতে (প. ১৫১) এই দেবতার যে ধ্যান পাওয়া যায়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"অঞ্জনাভাঽঞ্জনা দেবী পঞ্চাস্যা জটিলা কৃশা।
মহোদরী মহাব্যাঘ্রবরবাহনমাস্থিতা॥
চতুর্ভুজা শূলপাশবরাভয়করা মতা।"

অঞ্জনা দেবীর গায়ের রঙ্ কাজলের ন্যায়। তাঁহার মুখ পাঁচটী, তাঁহার মাথায় জটা এবং শরীর কৃশ। তাঁহার উদর বৃহৎ এবং তিনি বিরাট্ ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে বসিয়া আছেন। তিনি চতুর্ভুজা এবং চারিটী হস্তে শূল, পাশ, বরদমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা রহিয়াছে।

অঞ্জনা৩—(স্ত্রী) বানরশ্রেষ্ঠ কুঞ্জরের কন্যা ও কেশরী নামক বানররাজের পত্নী এবং হনুমানের মাতা। ইনি পূর্ব্বজন্মে পুঞ্জিকস্থলা নাম্নী অপ্সরা ছিলেন। হনুমান্ কেশরীর ক্ষেত্রজ পুত্র। পবনদেব যোনিসম্বন্ধবিনা অঞ্জনার গর্ভে যে বীর্য্যপাত করেন, তাহা হইতেই বীরশ্রেষ্ঠ হনুমানের জন্ম হয়।

অঞ্জনা একজন বীরনারী ছিলেন। কথিত আছে, হনুমান্ লঙ্কাযুদ্ধের পর যখন মাতার সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, তখন অঞ্জনা হনুমান্‌কে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন—"হনু, তোকে ধিক্! তুই আমার পুত্র হইয়া অতি সামান্য রাবণ, তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিলি? দশনখে রাবণের দশমুণ্ড ছিঁড়িয়া রামকে উপহার দিতে পারিস্ নাই? সীতাসহ অশোকবন তুলিয়া আনিতে অসমর্থ হইলি? সমুদ্রবন্ধন কেন? তুই নিজ শরীর বিস্তার করিয়া সেতুস্বরূপ হইলে কি কার্য্য চলিত না? তোকে ধিক্, তুই আমার কুপুত্র," ইত্যাদি।

অঞ্জনা৪—(স্ত্রী) কাশ্মীরের একজন রাজ্ঞী। তোরমানের পত্নী ও বজ্রেন্দ্রের কন্যা। ইঁহার পুত্রের নাম প্রবরসেন। (রাজতরঙ্গিণী)

অঞ্জনা৫—(স্ত্রী) নদীবিশেষ। (পদ্মপু°, সৃষ্টি°, ১১ অ°) ২ নদীবিশেষ। কৃষ্ণনগর জেলার অন্তর্গত বারুইহুদার দক্ষিণে এবং দোগাছিয়া ও হাঁসখালির উত্তরে এই নদী অবস্থিত। অঞ্জনা নদী যাত্রাপুরের নিকট দ্বিধারা হইয়া পরে উভয়ধারা মামজোয়াল গ্রামের নিকট দিয়া দক্ষিণে গিয়া শেষে হরধামের উত্তর দিয়া চাকদহের নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। রাজা রুদ্রের সময় এই নদী বদ্ধ থাকিত।

অঞ্জনাগিরি—(পুং) [অঞ্জনবর্ণো গিরিঃ পর্ব্বতঃ। সমাসে গিরিশব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী অঞ্জন শব্দের অন্ত্যস্বর দীর্ঘ। বনগির্য্যোঃ সংজ্ঞায়াং কোটরকিংশুলকাদীনাম্। পা ৬.৩.১১৭] নীলপর্ব্বত। [নীলপর্ব্বত ও নীলাচল দ্র°]

অঞ্জনাচল—(পুং) কৈলাস শৈলের দক্ষিণস্থ এক শৈল। ইহা বৃত্রকায় হইতে উৎপন্ন এবং ক্রূর জন্তু ও ওষধি-মণ্ডিত। (ব্রহ্মাণ্ডপু°, ৪৭.১৩)

অঞ্জনাচার্য্য—(পুং) 'কঙ্কালাধ্যায়' নামক চিকিৎসাগ্রন্থের প্রণেতা।

অঞ্জনাদিগণ—(পুং) [বৈদ্যক] অঞ্জন, ফলিনী, মাংসী, পদ্মোৎপল, রসাঞ্জন, মধুক ও নাগাহ্বরূপ বর্গ। ইহার গুণ—বিষ, অন্তর্দাহ ও পিত্তঘ্ন। (বাভ°, সূত্র°, ১৫ অ°) সুশ্রুতের মতে সৌবীরাঞ্জন, রসাঞ্জন, নাগকেশরপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, বীরণমূল, নলিন, মধুক ও পুন্নাগ অঞ্জনাদিগণে গ্রাহ্য। (সুশ্রুত, সূত্র°, ৩৮ অ°)

অঞ্জনাদিসাধন—পঞ্চরাত্র আগমোক্ত সাধনবিশেষ। জয়াখ্য-সংহিতায় 'মূলমন্ত্রসাধন' নামক পটলে ইহার বিধি প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—

"পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন পূজয়েন্মন্ত্রনায়কম্।
রোচনাং শঙ্খশুক্তৌ তু গৃহীত্বা শঙ্খমুদ্রয়া॥
তাবৎ পরিজপেন্মন্ত্রং যাবজ্জ্বালাঃ প্রমুঞ্চতি।
তন্মধ্যে দৃশ্যতে কান্তা কন্যকা কামরূপিণী॥
সিদ্ধাস্মীতি বদেৎ সা তু কুরু কার্য্যং যথেপ্সিতম্।
অনেনৈব বিধানেন অঞ্জনাদীনি সাধয়েৎ॥"

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত (অর্থাৎ শ্রীভগবৎকথিত দেশবৈলক্ষণ ও ভূতোপশমনাদি বিষয়ক) বিধানানুসারে মন্ত্রনায়ককে পূজা করিবে। পরে গোরোচনা, শঙ্খ ও শুক্তি শঙ্খমুদ্রায় গ্রহণ করিয়া যাবৎ অগ্নিজ্বালা প্রকাশিত না হয়, তাবৎ মন্ত্র জপ করিবে। জ্বালামধ্যে কামরূপিণী কুমারী কান্তা প্রকাশিত হইয়া 'আমি সিদ্ধা হইয়াছি' এই বাক্য কহিলে যথেপ্সিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। ইহাই অঞ্জনাদিসাধনের বিধান।

অঞ্জনাদ্রি—(পুং) [অঞ্জনমিব কৃষ্ণবর্ণঃ অদ্রিঃ] নীলপর্ব্বত। 'অঞ্জনাদ্রিনিভাং শ্যামাং'। (কালীধ্যান)

অঞ্জনাধিকা—(স্ত্রী) [অঞ্জনাধিকা কৃষ্ণবর্ণত্বাৎ ; ৫-তৎ] [বৈদ্যক] অঞ্জনিকা কীটবিশেষ, চলিত আজনাই ; ইহা এক প্রকার গিরগিটী। ২ ক্ষুদ্র মূষিকা। (বৈদ্যকশব্দ°) ৩ কৃষ্ণকার্পাস ক্ষুপ। [অঞ্জনিকা দ্র°]

অঞ্জনানিদান—আয়ুর্ব্বেদীয় রোগবিজ্ঞানমূলক গ্রন্থ। ইহা মহর্ষি অগ্নিবেশ কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু এ বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় রহিয়াছে। যেহেতু অঞ্জনানিদানের কতিপয় পাঠ অগ্নিবেশসংহিতার মধ্যে দেখা যাইলেও অঞ্জনানিদানের এমন অনেক পাঠই সুশ্রুতসংহিতার মধ্যে দেখা যায়, যাহা অগ্নিবেশসংহিতার মধ্যে নাই। যেমন—

"দূষয়িত্বা রসং দোষা বিগুণং হৃদয়ং গতাঃ।
হৃদি বাধাং প্রকুর্ব্বন্তি হৃদ্রোগং তং প্রচক্ষতে॥"

এই পাঠ সুশ্রুত ও অঞ্জনানিদানে আছে, চরকে নাই। যদি উভয় গ্রন্থের একই ব্যক্তি গ্রন্থকার হন এবং বিষয় এক হয়, তাহা হইলে একখানি গ্রন্থে যাহা উল্লিখিত হইল অপর খানিতে তাহার উল্লেখ নাই—ইহাই সংশয়ের বিষয়। তদ্ভিন্ন—

"গুদস্য দ্ব্যঙ্গুলে ক্ষেত্রে পার্শ্বতঃ পিড়কার্ত্তিকৃৎ।
ভিন্নো ভগন্দরো জ্ঞেয়ঃ স চ পঞ্চবিধো মতঃ॥"

এই পাঠ কেবল মাধবনিদান ও অঞ্জনানিদানে দেখা যায়। চক্রপাণি, বিজয়রক্ষিত প্রভৃতি বৈদ্যাচার্য্যগণ এবং মাধবও স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন—সর্ব্বপ্রথম নিদান রচনা করেন মাধবকর। সুতরাং অঞ্জনানিদান মাধবনিদানের পরবর্ত্তী গ্রন্থ। ইহা ব্যতীত অঞ্জনানিদান যদি মাধবনিদানের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ হইত, তাহা হইলে বিজয়রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠদত্ত প্রভৃতি নিদানের টীকাকারগণ স্বমত সমর্থনের জন্য কোথাও না কোথাও অঞ্জনানিদানের পাঠ উদ্ধৃত করিতেন। এই সকল কারণে অঞ্জনানিদানের রচয়িতা মহর্ষি অগ্নিবেশ কিনা ইহা সংশয়ের বিষয়।

অঞ্জনাম্ভস্—(ক্লী) [বৈদ্যক] অঞ্জনজল (Liquid collyrium)।

অঞ্জনাবতী—(স্ত্রী) [অঞ্জনং বিদ্যতে অস্যাঃ অধিককৃষ্ণবর্ণত্বাৎ অঞ্জন-মতুপ্ মকারস্য বঃ, মতৌ চ দীর্ঘঃ।] ঈশানকোণের দিক্‌হস্তিনী, সুপ্রতীক নামক হস্তীর ভার্য্যা। ২ দিক্‌হস্তী অঞ্জনের স্ত্রী। (অমরকোষ) ৩ নাগবিশেষ। [বৈদ্যক] ৪ কালাঞ্জনীবৃক্ষ।

অঞ্জনিক—(পুং) [বৈদ্যক] গন্ধরাস্না।

অঞ্জনিকা—(স্ত্রী) [অঞ্জন-ঠন্। পূর্ব্বাকারস্য ইত্বং] টিক্‌টিকী জাতীয় জীবভেদ (Lacerta Unjinensis); জ্যেষ্ঠীবিশেষ; চলিত আঞ্জিনা, আঁজনাই। পর্য্যায়—অঞ্জনাধিকা, হালিনী, হলাহল। (হেম°) [অঞ্জনা স্বার্থে কন্] ২ সুপ্রতীক নামক দিক্-হস্তীর স্ত্রী। ৩ ক্ষুদ্র মূষিকা।

অঞ্জনী$_1$—(স্ত্রী) [অজ্যতে চন্দনকুঙ্কুমাদিভিরসৌ। অঞ্জ কর্ম্মণি ল্যুট্ ঙীপ্] কুঙ্কুমাদি দ্বারা অনুলিপ্তা নারী। ২ লেপ্যনারী, চন্দনাদি লেপযোগ্যা কামিনী। (হারাবলী) [করণে ল্যুট্] [বৈদ্যক] ৩ কটুকা বৃক্ষ। ৪ কালাঞ্জনীবৃক্ষ। যজ্ঞে অঞ্জনীকাষ্ঠ দ্বারা মৈত্রাবরুণস্তম্ভ প্রস্তুত করিতে হয়। "অঞ্জনী দারুকাষ্ঠময়-স্তম্ভো মৈত্রাবরুণঃ।" (যাজ্ঞিক°)

অঞ্জনী$_2$—(স্ত্রী) স্কন্দপুরাণের (মাহেশ্বর°, কুমা°, ৪০.২৫৫) কলি-যুগের ভবিষ্যরাজবংশবর্ণনায় লিখিত আছে, মগধরাজ হেম-সদনের ভার্য্যা হইবেন অঞ্জনী এবং তাঁহার গর্ভে বিষ্ণু-অংশে বুধরাজার জন্ম হইবে।

অঞ্জনী$_3$—চক্ষুর পাতার প্রান্তভাগে পক্ষ্মগুলির মূলদেশে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেদঃস্রাবক বা গণ্ড (ciliary sebacious gland) থাকে, অথবা চক্ষুর পাতার পশ্চাদ্‌গাত্রে যে সকল স্রাবক থাকে, তাহাদের তরুণ প্রদাহকে অঞ্জনী (Hordeolum) বলা হয়। ইহা প্রায়ই পাকিয়া গিয়া ভিতরে পূঁয সঞ্চিত করে। অতিরিক্ত চক্ষুর কার্য্য, চক্ষুর পক্ষ্মের মূলদেশের প্রদাহ, সাধারণ অস্বাস্থ্য এবং কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ হইতে ইহা প্রায়ই জন্মে। রোগের কারণ অনুসন্ধান করিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। বিশ্রাম, স্বল্প ব্যায়াম, উন্মুক্ত বায়ু সেবন, গরম জলে স্নান, নিয়মিত লঘু আহার এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা দরকার। লৌহ, কুচিলা, কড্‌লিভার অয়েল বা শঙ্খবিষঘটিত ঔষধ সেবন বিধেয়। রোগের প্রথম অবস্থায়ই জিঙ্ক্ সালফেট্ লোসন (১ আউন্স জলে ৩০ গ্রেণ) চোখের পাতায় তুলি দিয়া সাবধানে লাগাইতে হইবে। ঐ ঔষধ কোনরকমে যেন চোখে না পড়ে। অথবা হাইড্রার্জ্জ্ অক্সিডিফ্লাভা ২॥ গ্রেণ, ল্যানোলিন ১ ড্রাম, সফ্‌ট্ প্যারা-ফিন্ ১ ড্রাম চোখের পাতায় লাগাইতে হইবে। যদি ইহাতে অঞ্জনী না বসিয়া যায়, তবে উষ্ণ বোরিক্ লোশনে তুলা ভিজাইয়া চোখের পাতায় স্বেদ দিতে হইবে। ভিতরে পূঁয জন্মিলে অস্ত্রোপচার করিয়া পূঁয বাহির করিয়া দেওয়া আবশ্যক। কিছুদিন ধরিয়া চোখের পাতায় উপরোক্ত মলম লাগাইলে পুনরাক্রমণের ভয় থাকে না। ইহার পূঁয হইতে টীকার বীজ প্রস্তুত করিয়া তাহা সূচী দ্বারা দেহে প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে।

অঞ্জনেরী (অঞ্জিনী)—বোম্বাইয়ের নাসিক জেলায় অবস্থিত একটী পাহাড়। অক্ষা° ১৯°৫৭′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৩৫′ পূঃ। এই পাহাড়ের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪২৯৫ ফুট। উপরিভাগ কতকটা সমতল। ইহা ত্রিম্বক হইতে ২ ক্রোশ পূর্ব্বে এবং নাসিক শহর হইতে ৭॥ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। পাহাড়ের উত্তর-পূর্ব্বকোণে পাদদেশে অঞ্জনেরী গ্রাম রহিয়াছে। পাহাড়ের শীর্ষদেশে একটী দুর্গ এবং অঞ্জিনীদেবীর মন্দির আছে।

এখানে পৌছিবার জন্য উত্তর-পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক্ হইতে দুইটী রাস্তা উঠিয়াছে। ধ্বংসাবশেষ দর্শনে জানা যায়, এক সময়ে দুর্গের দরজার ধাপগুলি পাহাড়ের গাত্র হইতে কর্ত্তিত কৃষ্ণ-প্রস্তরের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। উত্তর-পূর্ব্ব দিকে উচ্চভূমির উপরে কএকখানা বাংলা আছে। এখানে একটী সুদৃশ্য জলাশয় রহিয়াছে। উহার তিনটী তীর জম্বুবৃক্ষবেষ্টিত; চতুর্থ তীর এরূপ নিম্ন যে উক্ত বাংলাগুলি হইতে সম্মুখস্থ সমতলভূমি একখানি মানচিত্রের ন্যায় দেখায়। এখানে দুইটী জৈন গুহা-মন্দির আছে। সুগম ও সুদৃশ্য বলিয়া গ্রীষ্মকালে নাসিক জেলার বহুলোক এখানে অবস্থান করিয়া থাকে।

কথিত আছে, শেষ পেশবার পিতা রঘুনাথ নাসিকের দক্ষিণস্থ আনন্দবেলী গ্রামে নির্ব্বাসিত থাকিবার সময় অঞ্জনেরীতে একটী গ্রীষ্মাবাস নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

অঞ্জনেরীর নিম্নে কতকগুলি জৈন, বৈষ্ণব ও শৈব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এইগুলি দেবগিরির যাদবদিগের রাজত্বকালে নির্ম্মিত বলিয়া শুনা যায়। একটী জৈনমন্দিরের ক্ষোদিত সংস্কৃত লিপি হইতে জানা যায়, যাদবরাজ ৩য় সেউণচন্দ্র (সেউণদেব ?) ১০৬৩ শকে মন্দিরে দেবোদ্দেশে কিছু দান করিয়াছিলেন।

অঞ্জলি—(পুং) [অনজ অলিচ্। উণ্ ৪.২] সংযুত করপুট; চলিত আঁজলা। "ক্রিয়তাং মে দয়া ভদ্রে ময়ায়ং রচিতোঽঞ্জলিঃ।" (রামা°, ২.১৩.১৮) "দূর্ব্বাসর্ষপপুষ্পাণাং দত্ত্বার্ঘং পূর্ণমঞ্জলিম্।" (যাজ্ঞবল্ক্য) ২ কুড়ব পরিমাণ। (হেম°) ৩ প্রসৃতিদ্বয়, বত্রিশ তোলা। (পরিভাষাপ্র°) ৪ অঞ্জলি পরিমিত দ্রব্য।

অঞ্জলিক—প্রাচীনভারতে ব্যবহৃত যুদ্ধাস্ত্রভেদ। (রামা°, ৬.৪৫.২৩)

অঞ্জলিকরণ—(ক্লী) [অঞ্জলিবন্ধন দ্র°]

অঞ্জলিকর্ম্মন্—(ক্লী) অঞ্জলিবন্ধন। "সাধুমঞ্জলিকর্ম্মণা।" (চাণক্যনীতি)

অঞ্জলিকা—(স্ত্রী) [অঞ্জলিরিব কায়তি প্রকাশতে কৈ-ক-টাপ্] বালমূষিকা। ২ লজ্জালুকা।

অঞ্জলিকারিকা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] লজ্জালুকা। (রাজনি°) ২ বরাহক্রান্তা, চলিত বরাক্রান্তা। (বৈদ্যকশব্দ°)

অঞ্জলিনী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] লজ্জালুকা।

অঞ্জলিপুট—(পুং, ক্লী) [কর্ম্মধা] অঞ্জলিরূপ আধার, অঞ্জলিভাজন।

অঞ্জলিবন্ধন—(ক্লী) করপুটে নমস্কার, অঞ্জলিকরণ।

অঞ্জলিমুদ্রা—ইহাকে সর্ব্বরাজেন্দ্রমুদ্রা বা সম্পুটাঞ্জলিও বলা হয়। ইহাতে দুই করতল যোড় করা হয়। অঞ্জলিমুদ্রা করিবার সময় হস্তাঙ্গুলীগুলি ঊর্দ্ধদিকে রক্ষিত হয়। অঙ্গুলীগুলি সোজা বা ঈষৎ বক্র থাকিতে পারে। বৌদ্ধতন্ত্রে মণিধর, নামসঙ্গীতি, ষড়ক্ষরী লোকেশ্বর ও সুধনকুমার দেবগণের হস্ত অঞ্জলিমুদ্রায় অবস্থিত।

অঞ্জলিকৃত—(ত্রি) করদ্বয় যুক্তিকৃত।

অঞ্জস্—(ক্লী) [অন্জ্ গতৌ মিশ্রণে চ—অসুন্। অনক্তি গচ্ছতি মিশ্রয়তি বা অনেন] বেগ। ২ বল। ৩ ঔচিত্য, সম্যক্। "অঞ্জঃ সমুদ্রমবজগ্মুরাপঃ" (ঋক্ ১.৩২.২) ৪ মুখ্য মহাসংগ্রাম। ৫ শত্রু। (ঋক্ ১.১৩২.২) 'স্বকীয়েঽঞ্জসি মুখ্যে মহতি সংগ্রামে। যদ্বা স্বস্মিন্নঞ্জসি শত্রৌ।' (সায়ণ) [বার্ত্তিককার কাত্যায়নের "অঞ্জস উপসংখ্যানং" (পা ৬.৩.৩ বার্ত্তিক ১.১) এই সূত্রানুসারে উত্তরপদ পরে অঞ্জস্ শব্দের তৃতীয়ার অলুক্ হয়। যথা—'অঞ্জসাকৃতং'।]

অঞ্জস—(ত্রি) [অন্জ-অসচ্] সরল, ঋজু, অবক্র।

অঞ্জসা—(অব্য) দ্রুত, শীঘ্র। ২ যথার্থ, প্রকৃত। "নাঞ্জসা নিগদিতুং বিভক্তিভিঃ।" (মাঘ ১৪.২৩) 'অথবা অঞ্জসা ইতি তৃতীয়ান্তপ্রতিরূপকমব্যয়ং তত্ত্বার্থে।' (মল্লিনাথ)

অঞ্জসায়ন—(ত্রি) সরল পথগামী। ২ সম্যক্ গমনের সাধন-স্বরূপ। "সা যথা শ্রুতিরঞ্জসায়নী।" (ঐতরেয়ব্রা° ৪.১৭)

অঞ্জসী—বৈদিকযুগে উত্তর ভারতে প্রবাহিত একটী নদী। (ঋক্ ১.১০৪.৪)

অঞ্জসীন—(ত্রি) সরল পথে গন্তব্য। "শ্রুতিং বিদন্ত্যঞ্জসীনাং" (ঋক্ ১০.৩২.৭)

অঞ্জস্পা—(ত্রি) সোমপায়ী। ২ যথার্থ রক্ষক। (ঋক্ ১০.৯২.২)

অঞ্জাম—(পা) বন্দোবস্ত। ২ নির্ব্বাহ। ৩ শেষ, সমাপ্তি।

অঞ্জার—বোম্বাই প্রদেশের কচ্ছ রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর ও অঞ্জার জেলার সদর। অক্ষা° ২৩°৬' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০°১০' পূঃ। কচ্ছোপসাগর হইতে ৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অধিকাংশ স্থানই বালুকাময়।

এই নগরের বহির্ভাগে একটী মন্দির দৃষ্ট হয়। মন্দির-টীর মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠারোহী একটী রাজকীয় মূর্ত্তি দেখা যায়। মূর্ত্তিটী অজমেরের চৌহানবংশীয় অজয়পালের মূর্ত্তি বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। কথিত আছে, অজয়পাল চৌহানবংশীয় এক নৃপতির ভ্রাতা ছিলেন। খৃষ্টীয় নবম শতকের প্রারম্ভে অজয়পাল অজমের হইতে বিতাড়িত হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং সন্ন্যাসীর বেশে অঞ্জারে আগমন করেন। ইঁহার নামানুসারেই এই স্থানের নাম অঞ্জার রাখা হয়।

নানা স্থান হইতে বহু সংখ্যক সন্ন্যাসী আসিয়া এখানে বাস করেন। এই সাধুদিগের প্রধানকে পীর বলা হইয়া থাকে। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে কচ্ছের রাও এই স্থানটী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দান করেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইহা কচ্ছের রাওকে প্রত্যর্পণ করেন। তদবধি এই স্থানটী কচ্ছরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

অঞ্জি,—(পুং) [অজ্যতে অনেন অন্‌জ করণে ইন্‌] প্রেষণিক, প্রেরক। ২ তিলক। "রোহিতাঞ্জিরনড্বান্‌"। (শুক্লযজুঃ) 'রোহিতঃ রক্তঃ অঞ্জিস্তিলকঃ'। (বেদদীপ) ৩ লিঙ্গ। (শুক্লযজুঃ ২৩.২১) (ত্রি) ৪ প্রকাশমান।

অঞ্জি₂—মধ্য ভারতের বর্দ্ধা জেলাস্থ একটী নগর। ধাম নদীর বামতীরে বর্দ্ধা নগরের ৯ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে মরাঠাদের একটী দুর্গ দেখা যায়। স্থানীয় অধিবাসিগণের অধিকাংশই মরাঠী এবং তাহাদের অনেকেই কৃষি ও বয়নকার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে।

অঞ্জি₃—বেরারের যবৎমাল জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানে হেমাদপন্থীদিগের এক দেবালয়ে নরসিংহদেবের মূর্ত্তি বিদ্যমান।

অঞ্জিক—(পুং) চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতির পৌত্র ও যদুপুত্রগণের অন্যতম। (পদ্মপুং, সৃষ্টিং, ১২ অং) ইনি 'অঞ্জক' নামেও অভিহিত হইতেন। (হরিবংশ)

অঞ্জিদ্বীপ—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত পর্ত্তুগীজ-অধিকৃত একটী দ্বীপ। অক্ষাং ১৪°৪৫′ উঃ এবং দ্রাঘিং ৭৪°১০′ পূঃ। ভূপরিমাণ অর্দ্ধ বর্গমাইল মাত্র। এখানকার জলবায়ু অতি অস্বাস্থ্যকর বলিয়া সামান্য দুই চারি জন কৃষিজীবী এবং ক্ষুদ্র একদল সৈন্য মাত্র এখানে অবস্থান করে।

অঞ্জিদ্বীপই সম্ভবতঃ টলেমীর ঐগিদিওই (Aigidioi)। ইবন্‌ বতুতাও এই দ্বীপের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে আরবীয়েরা এই বন্দর দিয়া যাতায়াত করিত। প্রবাদ, তাহারা বিজয়নগরের সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া এই বন্দর দখল করিয়াছিল। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামা এই স্থানে অবতরণ করেন। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ এখানে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করে।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগর যখন পর্ত্তুগীজদের অধিকার হইতে ইংরেজদের হস্তে আসে, তখন স্যর্‌ আব্রাহাম শিপ্‌মান ৫০০ সৈন্যসহ বোম্বাইয়ে প্রেরিত হন। কোন কারণবশতঃ তাঁহাকে সৈন্যসহ কএকদিন অঞ্জিদ্বীপে অবস্থান করিতে হয়। ফলে এখানে তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার ৩৮১ জন সৈন্য পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। অঞ্জিদ্বীপের বর্ত্তমান পর্ত্তুগীজ-দুর্গটী ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। মহারাষ্ট্রীয়েরা একবার এই দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু দখল করিতে পারে নাই। কিছুদিন এখানে গোয়ার অপরাধীদিগকে নির্ব্বাসন করা হইত।

অঞ্জিনদ—দাক্ষিণাত্যের ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যান্তর্গত একটী ভূখণ্ড। আয়তন ২৩১ বর্গমাইল। এখানে একটী গিরিমালা ও একটী উপত্যকা বর্ত্তমান। পাহাড়গুলি পলনি পর্ব্বতমালা হইতে বাহির হইয়া দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে; সমুদ্র হইতে এইগুলি গড়ে ৭৫০০ ফুট উচ্চ।

অঞ্জিমৎ—(ত্রি) রঞ্জিত, রঙ্‌ করা। ২ উজ্জ্বল। ৩ অলঙ্কৃত। (ঋক্‌ ৫.৫৭.৫)

অঞ্জিরো—জাপানের একজন খ্যাতনামা নাবিক। ইনিই জাপানীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। সেন্ট জেভিয়ার যে জাহাজে করিয়া জাপানে আসেন, ইনি তাহার চালক ছিলেন। ইনি পর্ত্তুগীজ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন। চীনের উপকূল আক্রমণ করিতে যাইয়া ইনি নিহত হন।

অঞ্জিব—(ত্রি) মসৃণ, পিচ্ছিল। ২ অভিব্যক্তিযুক্ত, অনাবৃত। "অক্তাঃ কমলমঞ্জিবম্‌।" (অথর্ব্বসং ৮.৬.৯)

অঞ্জিষ্ঠ—(পুং) [অন্‌জ্‌-ইষ্ঠচ্‌। * । অঞ্জেরিষ্ঠচ্‌। উণ্‌ ৪.২] সূর্য্য, ভানু। [কোন কোন বৈয়াকরণ অন্‌জ্‌ ধাতুর উত্তর ইষ্ণুচ্‌ প্রত্যয় বিধান করিতে ব্যবস্থা দেন]

অঞ্জিসক্থ—(ত্রি) রঞ্জিতোরু, যাহার উরু রঞ্জিত বা রঙ করা। (শুক্লযজুঃ ২৪.৪)

অঞ্জিহিষা—(স্ত্রী) জিগমিষা, গমনেচ্ছা। (ভট্টিং ৩.২৫)

অঞ্জী—(স্ত্রী) [অঞ্জি বিকল্পে ঙীপ্‌] পেষণযন্ত্র। ২ মঙ্গল।

অঞ্জীর,—(পুং, ক্লী) [অন্‌জ-ঈরন্‌] স্বনামখ্যাত ফলবৃক্ষবিশেষ, পেয়ারা। ইহার অপভ্রংশ—আঁজীর। পর্য্যায়—মঞ্জুল। কাকোডুম্বরিকা ফল। বৈদ্যকমতে, পেয়ারা শীতল, স্বাদু ও গুরু। ইহা খাইলে বায়ু, পিত্ত, রক্তদোষ, ক্রিমি, শূল, হৃৎপীড়া, কফ, মুখের বিস্বাদ প্রভৃতি নষ্ট হয়, ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

২ ডুমুরজাতীয় ফল (Ficus carica)। [হিন্দী—অঞ্জীর। পারসী—আঞ্জীর, আঁজির। তুর্কী—আঞ্জীর। আরবী—তীন্‌, এল-কের্‌মস্‌। তামিল—সিমাই-আট্টাই। মালয়—বুয়া-আর। ইংরেজী—Figs. ফরাসী—Figues. জর্ম্মন্‌—Feige.]

ইউরোপের বাণিজ্যক্ষেত্রে অঞ্জীর এক প্রকার প্রসিদ্ধ ফল। বঙ্গদেশে অনেকেই ইহার বিষয় আদৌ অবগত নহে। সংস্কৃত অঞ্জীর শব্দে পেয়ারা বুঝায়, কিন্তু যাহাকে অঞ্জীর বলে তাহা বাস্তবিক পেয়ারা কিংবা পেয়ারা জাতীয় অন্য কোন ফল নহে, ইহা স্বতন্ত্র জাতীয়। অশ্বথ, ডুমুর প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহার বৃক্ষ তুরুষ্ক, সিসিলি, গিনি, স্পেন, পর্ত্তুগাল, সাইপ্রাস্‌, মাল্টা, পারস্য প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, পশ্চিম হিমালয়, সিন্ধু, বেলুচিস্থান, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, বর্ম্মা, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও অঞ্জীর বৃক্ষ দেখা যায়।

অঞ্জীর গাছ প্রায় ৬।৭ হাত উচ্চ হয়। ইহার পাতা চেটাল, অসমান এবং অল্পেই ঝরিয়া পড়ে। ইহার পুং-পুষ্পগুলি প্রায়ই মুখের দিকে ও অল্প জন্মে। পাকিবার সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পকোষ বাড়িতে থাকে এবং তৎসঙ্গে একবীজপূর্ণ অনেকগুলি বীজকোষ হয়।

অঞ্জীর দুই তিন প্রকার দৃষ্ট হয়। ফিরোজপুর উদ্ভিদ্-উদ্যানে দুই প্রকার অঞ্জীর গাছ আছে। যথা—

১। একটী হইতে তুরুস্কদেশীয় ছোট অঞ্জীরের মত ফল হয়। তাহা খাইতে অত্যন্ত সুস্বাদু ও মুখপ্রিয়। গাছগুলি খুব সবলকায় এবং গুঁড়ী মোটা।

২। অন্য গাছটী কানপুর হইতে আনীত। ইহার ফলগুলি অত্যন্ত সুন্দর এবং এক একটী মুর্গীর ডিমের মত বড়। ইহা পাকিলে গাঢ় বেগুনে রঙ্ হয়।

শীতকালে উক্ত দুই প্রকার গাছেই পাতা থাকে না। ফাল্গুন মাসে পাতা গজাইতে আরম্ভ হয়, সেই সময় হইতে কুঁড়ি ধরিতে থাকে। গ্রীষ্ম ঋতুর মধ্যে ফল পরিপক্ব হয়। এই সময় অঞ্জীর গাছে নূতন ফল গজাইতে থাকে, কিন্তু সেগুলি আর পক্ব হয় না। ভারতবর্ষের মধ্যে পঞ্জাব অঞ্চলেই অঞ্জীর অধিক জন্মে এবং তাহা অপর শ্রেণীর অঞ্জীর অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। সেখানে অঞ্জীর দুই প্রকার—কৃষ্ণ ও শ্বেত। দাক্ষিণাত্যেও অঞ্জীর জন্মে। সেখানকার বাজারে রাশি রাশি অঞ্জীর বিক্রয় হইয়া থাকে।

যেখানে অঞ্জীর জন্মে সেখানে অপর কোন গাছ বেশী হয় না। এক একটী অঞ্জীর ফল প্রায় ওজনে ১ ছটাক পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই ফল বহুকাল হইতে মনুষ্যেরা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। হিব্রুদিগের প্রধান ধর্ম্মপুস্তকে অঞ্জীর শব্দ বারংবার উল্লিখিত হইয়াছে। হিরোদোতাসের পুস্তক পাঠে জানা যায় যে, কুরুসের সময় পারস্যদেশে অঞ্জীর প্রচলিত না থাকিলেও ইজিয়া এবং লিভান্টের নিকটস্থ প্রদেশসমূহে বহুকালপূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। গ্রীকরা প্রথমে কেরিয়া হইতে অঞ্জীর প্রাপ্ত হয়, তাই তাহারা অঞ্জীরকে 'কেরিয়া' বলে। প্রথমে হেলেনিকদের চাষে অঞ্জীর ফল উন্নতিপ্রাপ্ত হয়। সেই অঞ্জীর এসিয়ার সমস্ত ভূভাগে 'আটিক অঞ্জীর' নামে অভিহিত হইত। প্লিনি নানা প্রকার অঞ্জীরের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে রোমকবিলাসীগণ ইবুসাসের (অধুনা ইভিকার) অঞ্জীর ভাল বলিত। পূর্ব্বে ইতালী দেশের ক্রীতদাস ও চাষীরাই অধিক অঞ্জীর খাইত। রোমকদের পুরাণগ্রন্থে অঞ্জীর বড় শুদ্ধ ও পবিত্র ফল। ইহা রোমকদেবতা বেকাসের (Bucchus) পূজাতে দেওয়া হইত। প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি তুরুস্কদেশ অঞ্জীরের জন্য প্রসিদ্ধ। তুরুস্কের স্মার্ণা নগরে অঞ্জীরের বড় বড় দোকান আছে। বিদেশে অঞ্জীর পাঠাইবার জন্য স্মার্ণার লোকেরা অতিশয় পরিশ্রম ও সুন্দররূপে পেটিকা নির্ম্মাণ করে। তাহাদের অপর অপর কার্য্য অপেক্ষা এই কার্য্যে আড়ম্বর বেশী। তুরুস্কের ধনী লোকেরাও বড় বড় ভোজে অঞ্জীর ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিছুকাল পূর্ব্বে লণ্ডনের 'ঔপনিবেশিক ও ভারতবর্ষীয় প্রদর্শনীতে' অঞ্জীর ফলের একটী ব্যবহারদৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছিল।

এক্ষণে ভূমধ্যসাগরের উপকূলস্থ দেশ-সমূহে অঞ্জীরের চাষ হয়। এসিয়া-মাইনর, স্পেন, পর্ত্তুগাল ও দক্ষিণ ফ্রান্স হইতে রাশি রাশি অঞ্জীর নানা দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে এসিয়াস্থ তুরুস্কদেশের অঞ্জীরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

ইউরোপের সকল দেশের লোকেই অঞ্জীর খাইয়া থাকে। বিলাতে দরিদ্রেরা অঞ্জীরের সঙ্গে বাদাম মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করে। ঐ পিষ্টক বিলাতের রাস্তায় বিক্রীত হইতে দেখা যায়। পক্ব অঞ্জীর চোঁয়াইলে তাহা হইতে সুরাসার পাওয়া যায়। প্রাচীন রোমকেরা এই সুরাসার সাইসিটিস্ (sycites) নামে ব্যবহার করিত।

ইউরোপীয় ও তুরুস্কদেশীয় চিকিৎসকদের মতে, অঞ্জীরের গুণ ভেদক, কিন্তু কখন কখন পেটব্যথা ও রুক্ষ উৎপাদন করে। ইহার ক্বাথের সারভাগ শীতল ও মৃদু বিরেচক। তাঁহারা নিম্নলিখিত রোগে অঞ্জীর প্রয়োগ করেন—

১। স্বভাবতঃ অলসক (constipation) থাকিলে শুষ্ক অঞ্জীর বড় উপকারী।

২। স্ফোটক ও ব্রণ হইলে অঞ্জীর সিদ্ধ করিয়া সচরাচর ইহার পুল্‌টিস্ ব্যবহৃত হয়। অতি পুরাকালেও এই প্রণালী ছিল, বাইবেলে তাহার উল্লেখ আছে। (2 Kings, Chap. xx. 7.)

৩। ফুস্‌ফুস্, মূত্রাশয় ও মেটিয়া সম্বন্ধীয় পীড়ায় অঞ্জীরের ক্বাথ অতিশয় শীতল ও বিরেচক।

অঞ্জীর২—বেলুচিস্থানস্থ খেলাত হইতে সোনমিয়ানি যাইবার পথে একটী আড্ডা। অক্ষা° ২৮°১০´ উঃ, দ্রাঘি° ৬৬°১২ পূঃ; খেলাত হইতে ৩০ ক্রোশ দক্ষিণে প্রান্তরের মধ্যে এবং মূলানদীর একটী পয়ঃপ্রণালীর ধারে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থানে জীহ্রী জাতীয় বেলুচিরা বাস করিত। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে বৃটীশ সেনাপতি উইলশায়ার খেলাত অবরোধের পর এই স্থান অধিকার করিয়া গাণ্ডব নামক গিরিপথ দিয়া সিন্ধুদেশে অগ্রসর হন। অঞ্জীরে দুইটী পথ বিভক্ত

হইয়াছে, একটী পথ দক্ষিণে বরাবর সোনমিয়ানি অবধি, অপরটী পূর্ব্বদিকে মূলানদী ও গাণ্ডবপাসের মধ্য দিয়া গিয়াছে। অঞ্জীরের দক্ষিণে কিছু দূরে একটী বৃহৎ দুর্গপ্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখানে পৌষ ও মাঘ মাসে দারুণ শীতের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, এমন কি পাত্রস্থ জল অবধি জমাট বাঁধিয়া যায়।

অঞ্জু (আঞ্জু) (Anjou)—ফ্রান্সের অন্তর্গত একটী প্রাচীন রাজ্য। গলদিগের অধিকারে উহা অন্দেস্ এবং জুলিয়াস্ সীজারের গলরাজ্য বিজয়ের পর উহা অন্দেকবি (Andecavi) নামে অভিহিত ছিল। ফ্রাঙ্কজাতির অধিকারকালে উহা স্বতন্ত্র জেলারূপে গণ্য হয়। জুলিয়াস্ সীজারের গলজয়ের পর হইতে ইহা কিছুকাল রোমকদিগের অধিকারে থাকে। নান্টিসের কাউন্ট ও বৃটানীর ডিউক ৮৫১ খৃষ্টাব্দে এই স্থান লুণ্ঠন করিয়া পশ্চিমাংশে মায়েন্নি (Mayenni) পর্য্যন্ত অধিকার করেন। নর্মান্ জাতির দৃষ্টিও এই সময় অঞ্জুর উপর পতিত হয়। ৮৬৬ খৃষ্টাব্দে নর্মান্ জাতির সহিত যুদ্ধে রবার্ট দি ষ্ট্রং নিহত হইলে এবট্ হিউ এখানকার শাসনকর্ত্তা হন। ৮৮৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত রবার্টের জ্যেষ্ঠ পুত্র ফ্রান্সের রাজা হইয়া স্বীয় ভ্রাতার হস্তে এই প্রদেশের ভারার্পণ করেন। খৃষ্টীয় ৯ম শতকের শেষভাগে উহার শাসনভার ফুক্ দি রেড্ (৮৯৮ খৃঃ) নামক জনৈক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হয়।

খৃষ্টীয় ১০ম শতকের মধ্যভাগে ফুক্ কাউন্ট পদে অভিষিক্ত হইয়া এই স্থান শাসন করেন। প্রায় তিনশত বৎসর অঞ্জু ফুক-বংশের শাসনাধীন থাকে এবং ক্রমশঃ উহার পরিসর পরিবর্দ্ধিত হইয়া একটী বিস্তৃত খণ্ডরাজ্য মধ্যে পরিগণিত হয়। ১১৫১ খৃষ্টাব্দে জিওফ্রে দি হাণ্ড্সামের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র হেন্‌রী সিংহাসন লাভ করেন। একুইটেন রাজকন্যা ইলিয়ানরকে বিবাহ করিয়া পরবৎসরে তিনি যৌতুক স্বরূপ একুইটেন প্রাপ্ত হন। এই সময়ে রাজা ষ্টিফেনের মৃত্যু হওয়ায় হেন্‌রী ১১৫৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা বলিয়া বিঘোষিত হন। এই সুযোগে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঞ্জু অধিকারে অগ্রসর হন। হেন্‌রী এই সংবাদ অবগত হইয়া ১১৫৬ খৃষ্টাব্দে ভ্রাতাকে দণ্ডদান করেন এবং তাঁহার পিতৃদত্ত সম্পত্তিসমূহ কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে বৃত্তিমাত্র দিয়া ছাড়িয়া দেন।

১১৮৯ খৃষ্টাব্দে ২য় হেন্‌রীর মৃত্যুর পর অঞ্জু-রাজ্য তৎপুত্র ইংলণ্ডেশ্বর ১ম রিচার্ডের হস্তে যায়। রিচার্ডের মৃত্যু হইলে বৃটানীর অধীশ্বর আর্থার ও হেন্‌রীর কনিষ্ঠ পুত্র জন লাক্‌লণ্ড উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এই বিপ্লবের ফলে অবশেষে অঞ্জু-প্রদেশ ১২১৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের শাসনভুক্ত হয়।

১২৪৬ খৃষ্টাব্দে রাজা ৯ম লুই এই প্রদেশ তৎপুত্র ১ম চার্লস্‌কে দান করেন। চার্লস্ তৎকালে নেপলসের রাজা হইবার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকায় এই রাজ্য-শাসনে মনোযোগী হইতে পারেন নাই। তৎপুত্র ২য় চার্লস্ কন্যা মার্গারেটের বিবাহে এই প্রদেশ যৌতুকস্বরূপ দান করেন। ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জামাতা চার্লসের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র ফিলিপ (পরে ফ্রান্সের রাজা ৬ষ্ঠ ফিলিপ) ইহার অধিকার পান এবং উহা ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফিলিপ তৎপুত্র জনকে এবং জন তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ১ম লুইকে এই প্রদেশ দান করেন। লুই নেপল্‌সের রাজা হন। তৎপুত্র ২য় লুই নেপল্‌সের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া অঞ্জুর শাসনভার তাঁহার পত্নী যোলাদেঁর (Yolande) হস্তে দেন। তৎপুত্র ৩য় লুই অপুত্রক মৃত হইলে অঞ্জু ২য় লুইর ২য় পুত্র রেণীর (Rene') হস্তে ন্যস্ত হয়।

রেণী অঞ্জুর শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে এখানে স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকেন। এঙ্গার্স (Angers) নগরে তাঁহার রাজপাট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উত্তরোত্তর নগরের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে পুত্র জনের মৃত্যুতে মর্ম্মপীড়িত হইয়া তিনি স্বীয় সম্পত্তি পৌত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন। তাঁহার ভাগিনেয় ফ্রান্সের রাজা ১১শ লুই ইহাতে ভগ্নমনোরথ হইয়া অঞ্জু আক্রমণ করেন। অবশেষে রেণীর মৃত্যুর পর তিনি এই প্রদেশ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া লন (১৪৮০ খৃঃ)।

১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে রাজা ৪র্থ হেন্‌রী অঞ্জু, পইটু ও মিরেবলে প্রদেশ লইয়া একটী স্বতন্ত্র বিভাগ গঠন করেন এবং একজন সামরিক শাসনকর্ত্তা স্বাধীনভাবে উহা শাসন করিবার অধিকার পান। ফরাসী-বিদ্রোহের পর ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে কন্‌ষ্টিটিউএণ্ট এসেম্ব্লী (Constituent Assembly) ফ্রান্স রাজ্য ৫টী বিভাগে (Departments) বিভক্ত করেন এবং অঞ্জু ও সৌমুরোই লইয়া যে বিভাগ গঠিত হয়, তাহা মেইন্-এট্-লয়ার (Maine-et-Loire) নামে খ্যাত হয়। এখনও সেই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে।

অঞ্জুত্তান—মান্দ্রাজ অঞ্চল-বাসী পনানদের এক শাখার নাম। বেলনাদেরও অপর নাম অঞ্জুত্তান। Malabar Gazetteerএ বেলনাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত মন্নানাদের এক শাখারূপে অঞ্জুত্তান জাতিকে গণ্য করা হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরে তেঙ্কঞ্চি বেল্লালদিগকে অঞ্জত্তিলকর বলা হয়।

অঞ্জুনাল—মান্দ্রাজের পল্লিজাতির একটী শ্রেণী। ইহারা পাঁচদিন অশৌচ পালন করিয়া থাকে। 'অঞ্জুনাল' শব্দের অর্থ 'পাঁচ দিন'।

অঞ্জেঙ্গো—মান্দ্রাজ প্রদেশের মলবার জেলার একটী নগর। প্রকৃতপক্ষে অঞ্জেঙ্গো ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। নামান্তর অত্তিঙ্গ বা অঞ্জতেঙ্গ—অর্থ 'পাঁচটী নারিকেল বৃক্ষ'। অক্ষা° ৮°৪০′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬°৪৭′৫০″ পূঃ। অধিবাসিগণের অধিকাংশই খৃষ্টধর্ম্মী। নগরটী কুমারিকা অন্তরীপের ৭৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে আরবসাগরের উপকূলে অবস্থিত। পূর্ব্বে মৎস্যের জন্য অঞ্জেঙ্গো প্রসিদ্ধ ছিল। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে অত্তিঙ্গের রাণীর অনুমতি লইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই স্থান দখল করেন ও ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে একটী কারখানা স্থাপন করেন। ইহার পূর্ব্বে স্থানীয় উপকূলে পোতাদি সংরক্ষণ করা যাইত না; কারণ সমুদ্র হইতে প্রায় দেড় মাইল স্থান বালুকাময়। কর্ণাটক যুদ্ধের সময় অঞ্জেঙ্গো সামরিক কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। স্থানীয় প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়।

অট্—[ভ্বা° সক° সেট্, পর°] গতি, ভ্রমণ। "ভো বটো, ভিক্ষামট।" (সিদ্ধান্তকৌ°) [লট্—অটতি। লিট্—আট। লুঙ্—আটীৎ। সন্—অটিটিষতি। যঙ্—অটাট্যতে। ণিচ্—আটয়তি।] এই ধাতু উপসর্গযোগে বিশেষ বিশেষ অর্থের প্রকাশক। [তৎ তৎ শব্দ দ্র°]

অট—(অটি) [ইদিৎ; ভ্বা° সক° সেট্, আত্ম°] গমন। [লট্—আণ্টতে; বো°—অঠি, অণ্ঠতে।]

অট—(ত্রি) [অট-অচ্] ভ্রমণকারী। (ভট্টি° ২.৩০)

অট-অট, অট-অট্টো—(দেশজ) অত্যুচ্চ; অট্ট-অট্ট। "অট-অট হাসে, কটমট ভাষে"। (ভারতচন্দ্র)

অটক—(ত্রি) ভ্রমণকারী।

অটকপাণি সিংহ—ভবিষ্যপুরাণোক্ত চম্পারণ্যের জনৈক রাজা। ইনি রাজা খড়্গসিংহের পরে সিংহাসনারোহণ করিবেন—পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে। (ভবিষ্যপু°, ব্রহ্মখণ্ড, ৪০.৫২)

অটকপান—উত্তর আমেরিকার রেড্ ইণ্ডিয়ান্দের একটী শাখা। লুইসিয়ানা ও টেক্সাস্ বিভাগে ইহাদের বাস ছিল। কালক্রমে ও সভ্যতার বিস্তারে ইহাদের সংখ্যা লোপ পাইয়াছে এবং অপর শাখার সহিত সম্মিলিত হইয়া পড়িতেছে।

অটন—(ক্লী) [অট-ল্যুট্ ভাবে] গমন, ভ্রমণ। "নগরে ভিক্ষাটনং কৃত্বা।" (পঞ্চতন্ত্র)

অটনি, (-নী)—(স্ত্রী) [অটতি মৌর্ব্বীং অট-অনি; পক্ষে ঙীপ্] ধনুকের অগ্রভাগ, ধনুকের হুল। ধনুকের যে স্থানে গুণ অর্থাৎ ছিলে বাঁধিতে হয়। "ধ্বনদ্গুরুগুণাটনীকৃতকরালকোলাহলম্।" (উত্তররামচরিত, ৭ম অ°)

অটমান—(ত্রি) ভ্রমণ বা বিচরণকারী। (নলোপ্যাখান)

অটরূষ, -রূষ—(পুং) [অটে চলনে অরুষঃ সূর্য্য ইব দৃশ্যতে শুভ্রবর্ণত্বাৎ। অট-অরুষ শকন্ধ্বাদি] [বৈদ্যক] বাসক বৃক্ষ, বাসক গাছ (Justicia adhatoda)। [বাসক দ্র°]

অটরূষক—(পুং) [বৈদ্যক] বাসক। [বাসক দ্র°]

অটল—(ত্রি) স্থির, অচল, স্থায়ী। "দেখি পুষ্পশরে, ক্রোধ হইল হরে, অচল অটল টলে।" (ভারতচন্দ্র)

অটলকুমার—(পুং) কার্ত্তিকের নামান্তর।

"অশ্বের শিক্ষার নল বিপক্ষে অনল।
চলিল কুমার যেন কুমার অটল।" (ভারতচন্দ্র)

অটবি, (-বী)—(স্ত্রী) [অটন্তি চরমে বয়সি যত্র, অট-অবি, বা ঙীপ্] বার্দ্ধক্যে বা মৃগয়ার্থ যেখানে যাওয়া হয়; অরণ্য, বন। "কান্তারাণ্যটবীস্তথা।" (রামা°, ৪.৪৩.১৩)

অটবিক—(ত্রি) বনচারী, বনবাসী। "অটবিকশ্চ পরপক্ষে"। (পঞ্চতন্ত্র) ২ কাষ্ঠসংগ্রহকারী, কাঠুরিয়া। ৩ ব্যাধ। ৪ কাষ্ঠনির্ম্মিত।

অটবিশিখর—(পুং) জাতিবিশেষ। ২ দেশভেদ। (বিষ্ণুপু°)

অটবী—(স্ত্রী) শঙ্খদ্বীপস্থ বনবিশেষ। ইহার পার্শ্ব দিয়া কালীনদী প্রবাহিত হইয়াছে। (ব্রহ্মাণ্ডপু°)

অটবীদেবী—(স্ত্রী) ভবানীর নামান্তর। কথিত আছে, ভব মানবদিগকে ব্রহ্মচর্য্য শিখাইবার জন্য অরণ্যে গমন করেন। অম্বা (ভবানী) তাঁহাকে বনে গমন করিতে দেখিয়া অরণ্যদেবীর রূপ ধারণ করিলেন এবং গাছে গাছে খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার রূপজ্যোতিতে একটী সুন্দর দেবতার সৃষ্টি হইল। পরে দুইজনে অটবীবনে আসিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সেই বনে ভবানী অটবীদেবী বলিয়া অভিহিত হন। ঐ অটবীবন বেদে 'ভবাটবী' স্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রীকেরা ঐ ভবাটবীকে বাটই (Butoi) বলিয়া থাকে। উইলফোর্ড সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঐ অটবীবন আফ্রিকাস্থ নীলনদের নিকট। সেখানে পূর্ব্বে গ্রীক্‌দিগের অরণ্যদেবী ডায়নার মন্দির ছিল।*

অটবীলতা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] কুন্তাটবৃক্ষ, কুন্তাড়ুয়া। (রত্নাবলী)

অটা—(স্ত্রী) [অট-অঙ্] ভ্রমণ, পর্য্যটন।

অটাটা—(স্ত্রী) ইতস্ততঃ অতিশয় ভ্রমণশীলতা।

অটাট্যমান—(ত্রি) অতিশয় ভ্রমণকারী।

অটাট্যা—(স্ত্রী) [অট-যঙ্ ভাবে-অ; স্ত্রীত্বাৎ টাপ্] পরিভ্রমণ, পুনঃপুনঃ ভ্রমণ। ২ মিথ্যা ভ্রমণ। ৩ অতিশয় ভ্রমণ।

অটি—(পুং) শরারি পক্ষী। (হলায়ুধ)

* Asiatic Researches, Vol. iii. p. 387-88.

অটিলা, আটিলা (Attila)—প্রাচীন হূণজাতির একজন রাজা। ইনি স্বীয় পিতৃব্য রৌআ'র (Roua) মৃত্যুর পর ৪৩৩ খৃষ্টাব্দে হূণদিগের দলপতি হন। রাজ্যাধিকারের প্রথম আট বর্ষকাল তিনি মধ্য ইউরোপে বর্ব্বর জাতিসমূহকে দমনার্থ যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে তিনি বর্ত্তমান হাঙ্গেরী ও ট্রান্‌সিল্‌ভেনিয়া প্রদেশের একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করেন। বর্ত্তমান বুদাপেস্ত শহরের সন্নিকটে কোন স্থানে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতঃপর অষ্ট্রগথ, গেপিডী ও কতকগুলি টিউটন জাতি তাঁহার অধীনতা স্বীকার করায় তিনি প্রকৃতপক্ষে কাস্পীয় সাগরোপকূল হইতে রাইন্ নদীতীর পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত ভূভাগের অধীশ্বর হইয়াছিলেন।

সম্রাট্ ২য় থিওডোসিয়াসের নাতিনী হনোরিয়া রাজপুর-পরিদর্শকের (chamberlain) প্রেমে আসক্ত হইলে, সম্রাট্ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রহরী-পরিবেষ্টিত স্থানে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। স্বীয় মনোরথ ভঙ্গে বিরক্ত হইয়া হনোরিয়া অটিলার নিকট গুপ্তচর হস্তে স্বীয় অঙ্গুরীয়ক ও পত্র প্রেরণ করেন। ঐ পত্রে হনোরিয়া অটিলাকে স্বামীত্বে বরণের অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া স্বীয় উদ্ধারের প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। ইহাতে অটিলা রোমে দূত প্রেরণ করিতে বাধ্য হন এবং রোমক-সম্রাট্‌কে হীনবল জানিয়া পুনঃপুনঃ রোমের বিরুদ্ধে সেনাবল পাঠাইয়া সম্রাট্‌কে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন।

অটিলার কোপানল হইতে সাম্রাজ্য-সীমা রক্ষা করিবার জন্য রোমক-সম্রাট্ প্রতিভূস্বরূপ লোক পাঠাইতে বাধ্য হন। ৪৪৮ খৃষ্টাব্দে কন্‌স্তান্তিনোপল হইতে যে প্রতিনিধিদল প্রেরিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে প্রিস্কাস্ নামক একজন আলঙ্কারিক ছিলেন। ইঁহার লিখিত বিবরণীতে অটিলার সমৃদ্ধির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

৪৫০ খৃষ্টাব্দে দুর্ব্বল সম্রাট্ ২য় থিওডোসিয়াসের মৃত্যু ঘটিলে মার্শিয়ান্ পূর্ব্ব-রোম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। তিনি অটিলার কথায় কর্ণপাত করিলেন না দেখিয়া হূণরাজ পশ্চিম-রোমের সম্রাট্ ৩য় ভালেন্‌টিনিয়ানের নিকট দূত পাঠাইয়া হনোরিয়ার অত্যাচারের ক্ষতিপূরণার্থ তাঁহার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ বিবাহের যৌতুকস্বরূপ চাহিয়া বসেন। ফলে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠে এবং ৪৫১ খৃষ্টাব্দে ফাঙ্ক, ভান্দাল ও অন্যান্য নানাজাতীয় সেনা লইয়া অটিলা প্রথমে রাইন্ নদী অতিক্রম ও তৎপরে লয়ার নদী উত্তীর্ণ হইয়া অর্লিয়ান্স নগর অবরোধ করেন। ইহার পর কাটালোনিয়া প্রান্তরে ভিসিগথদিগের রাজা থিওডোরিক ও রোমক-সেনাপতি ঈটিয়াসের মিলিত বাহিনীর সহিত তাঁহার ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই ভীষণ সংগ্রামে ভিসিগথরাজ নিহত ও দ্বিলক্ষাধিক সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধজয় রোমের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। কারণ অটিলা দ্বিতীয় দিন যুদ্ধে আর বৃথা বলক্ষয় না করিয়া রাইন্ পার হইয়া পনোনিয়ায় ফিরিয়া আসেন। ৪৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় ইতালীর বিরুদ্ধে অভিযান করেন। বীরদর্পে ভিনিসিয়ার রাজধানী অকুইলেইয়া অধিকারপূর্ব্বক তিনি আদ্রিয়াতিক, কঙ্কর্ডিয়া, আল্‌তিনাম্ ও পাটাভিয়াম্ প্রদেশের যাবতীয় রাজধানী লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ দ্বারা বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন।

মিলান ও লম্বার্ডী প্রদেশে অটিলার বিজয়বাহিনী যে পদক্ষেপ না করিয়াছিল এমন নহে। তাঁহার এই ধ্বংসনীতিতে বিপর্য্যস্ত হইয়া পোপ ১ম লিও কএকজন রোমক সিনেটর সঙ্গে লইয়া অটিলার সমীপে উপনীত হন এবং বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে নিরস্ত হইতে বলেন। পোপের প্রার্থনায় প্রীত হইয়া অটিলা সদলবলে আল্পস্ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান। ৪৫৩ খৃষ্টাব্দে ইল্‌দিকো নাম্নী এক রমণীকে বিবাহ করিবার পররাত্রে তিনি অকস্মাৎ মৃত্যু-মুখে পতিত হন। অমিতাচারই তাঁহার মৃত্যুর অন্যতম কারণ বলিয়া অনেকে মনে করেন।

অটিলার বীরত্ব ও রণকুশলতার গল্প ইউরোপের নানা ভাষার গ্রন্থে অল্পবিস্তর বর্ণিত আছে।

অটিলিয়াস্, রেগুলাস মার্কাস্—একজন বিখ্যাত রোমক সেনাপতি ও দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা। দ্বিতীয়বার রোমকদিগের কন্সাল নিযুক্ত হইয়া বিখ্যাত কার্থেজ যুদ্ধে জয়ী হন। ২৫৬ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে ইনি রোমক নৌবাহিনী লইয়া এক্‌নোমাসের যুদ্ধে কার্থেজ-নৌ-বল সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। অতঃপর কার্থেজের সন্নিকটবর্ত্তী এডীস্ ময়দানে কার্থেজবাসীদের সহিত রোমক সৈন্যের ঘোরতর সংঘর্ষ ঘটে। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কার্থেজবাসীরা সন্ধি প্রার্থনা করে; কিন্তু রোমক-সেনাপতি অটি-লিয়াসের প্রদত্ত সর্ত্তগুলি মানিয়া চলা কঠিন বোধে তাহারা সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া পুনরায় যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। আপনাদিগকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও উপযুক্ত নায়কহীন দেখিয়া কার্থেজীয়গণ গ্রীসের স্পার্টাবাসী বিখ্যাত যোদ্ধা জান্থি-পাস্‌কে সেনাপতিপদে বরণ করে। ২৫৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে জান্থি-পাসের হস্তে অটিলিয়াস্ পরাজিত ও বন্দী হন। ২৫০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে পানর্মাসের যুদ্ধে কার্থেজীয়গণ পুনরায় পরাজিত হইলে রোমের সহিত সন্ধিস্থাপন ও সর্ত্তনির্দ্ধারণের জন্য অটিলিয়াস্‌কে মুক্তি দান করিয়া রোমে প্রেরণ করা হয়। সন্ধির চুক্তি মীমাংসিত

না হওয়ায় রোমক-সেনাপতি কার্থেজে পুনরাগমন করিলে কার্থেজীয়দিগের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। রোমের ইতিহাসে এই যুদ্ধ ১ম পিউনিক্ যুদ্ধ (Punic war) নামে বর্ণিত হইয়াছে। [কার্থেজ দ্র°]

অটুট—(দেশজ) দৃঢ়, মজবুত। ২ ভগ্ন নহে, সম্পূর্ণ।

অটো, (Otto)—একজন জর্মন্ বিশপ ও ঐতিহাসিক (১১১৪-১১৫৮ খৃঃ)। ইনি অষ্ট্রিয়ার মার্গ্রেভ ৩য় লিওপোল্ডের ৫ম পুত্র এবং ফ্রি্সিংএর অটো (Otto of Freising) নামে পরিচিত। ইনি পারি নগরে শিক্ষালাভ করেন এবং দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহা জর্মনীতে প্রচার করিতে সচেষ্ট হন। ১১৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বার্গাণ্ডীর অন্তর্গত মোরিমণ্ড মঠের (Cistercian monastery of Morimond) প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ (Abbot) হইয়াছিলেন।

১১৪৭ খৃষ্টাব্দে ৩য় কন্‌রাডের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধে যাত্রা করিয়া জেরুজালেমে উপনীত হন এবং ১১৪৯ খৃষ্টাব্দে বাভেরিয়ায় প্রত্যাগমন করেন। ১১৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বেসাঁশোঁর সভায় (Diet at Besançon) উপস্থিত থাকিয়া তাহার কার্য্যাবলী পরিদর্শন করিয়াছিলেন। পর বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে মোরিমণ্ডে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অটোর রচিত Chronicon বা De duabus civitatibus গ্রন্থখানি ঐতিহাসিক ও দার্শনিক তত্ত্বে পূর্ণ এবং ৮ খণ্ডে প্রকাশিত। Gesta Friderici imperatoris (৪ খণ্ড) ও Historia Austriaca নামক গ্রন্থদ্বয়ও তাঁহার রচিত।

অটো,₂ (Otto)—গ্রীসের একজন রাজা। বাভেরিয়ারাজ ১ম লুইর দ্বিতীয় পুত্র। ইনি ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং মিউনিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঁহার শিক্ষা সমাপন হয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন অধিবেশনের (Conference of London) নির্দ্দেশানুসারে তাঁহাকে গ্রীস-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করা হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজা বলিয়া বিঘোষিত হন এবং ১৮৩৭ খৃষ্দাব্দে জর্মনী পরিদর্শনে গমন করিয়া ওল্ডেনবার্গের রাজকুমারী এমেলীকে বিবাহ করেন। এদিকে গ্রীক্‌প্রজাবর্গ শাসকসভার করসংগ্রহের উৎপীড়নে এতই উত্যক্ত হইয়াছিল যে, অটোর প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি সত্ত্বেও তাহারা তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিল না। রাজ্যমধ্যে ঘোর অরাজকতা চলিতে লাগিল। এই সময় রাজারাণীর প্রাণনাশের চেষ্টাও হইয়াছিল। বিপদ বুঝিয়া রাজা ও রাণী ইংরেজ নৌ-বহরে যাইয়া আশ্রয় লইলেন এবং তথা হইতে বাভেরিয়া পলায়ন করেন। এখানে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে অটোর মৃত্যু হয়। [গ্রীস দ্র°]

অটো,₃ (Otto of Nordheim)—বাভেরিয়ার ডিউক এবং নর্ডহাইমের কাউণ্টবংশীয় এক প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ও রাজনীতিজ্ঞ। ইনি ১০৬১ খৃষ্টাব্দে বাভেরিয়ার ডিউক পদে প্রতিষ্ঠিত হন। জর্মন্‌রাজ ৪র্থ হেন্‌রীর নাবালক অবস্থায় ইনি রাজ্যশাসন কার্য্যে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। ১০৭০ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্রের অভিযোগে পদচ্যুত হন, কিন্তু অত্যল্পকাল পরেই পুনরায় ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ১০৭৩ এবং ১০৭৫ খৃষ্টাব্দে যে সাক্সন্ বিদ্রোহ হইয়াছিল, তৎসম্পর্কে ইনি দুইবার ডিউক পদ হইতে অপসৃত হন। কিন্তু দুইবারই পদচ্যুতির অল্পকাল মধ্যে স্বীয় পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিলেন। ১০৮৩ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি অতি দক্ষ, বুদ্ধিমান্ ও মহদন্তঃকরণ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন।

অটো (১ম)—একজন রোমক-সম্রাট্ (৯১২-৯৭৩ খৃঃ)। ইনি মহাত্মা অটো বলিয়াও পরিচিত। রাজা ১ম হেন্‌রীর ঔরসে তদীয় পত্নী মাটিলদার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয় (৯১২ খৃঃ)। ৯২৯ খৃষ্টাব্দে ইনি ইংলণ্ডের তৎকালীন রাজা ঈথেলষ্টানের (Æthelstan) ভগিনী এডিথকে বিবাহ করেন। ৯৩৬ খৃষ্টাব্দে জর্মন্‌রাজ কর্ত্তৃক উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত হইলে আর্কবিশপ হিল্‌ডেবার্ট তাঁহার মাথায় মুকুট পরাইয়া তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন।

৯৩৮ ও ৯৩৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র হয়। অটোর বীরত্বপ্রতিভা তাঁহাকে অদমনীয় নরপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। ঐ সময় হইতে ৯৪৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এল্‌ব ও ওদর নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানের অধিবাসিগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে এবং তিনি খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ এই সকল স্থানে গির্জ্জা স্থাপন ও ধর্ম্মাচার্য্য নিয়োগ করেন। তৎপরে ৯৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি বোহমীয়দিগকে পরাভূত করিয়া স্ববশে আনিতে সমর্থ হন। অতঃপর এই বৎসরেই ইতালীপতি লোদেয়ারের মৃত্যু ঘটিলে পরবৎসর অটো আল্‌প্‌স্ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া লম্বার্ডীর রাজারূপে ইতালীতে অবতীর্ণ হইলেন এবং বিধবা রাণী এডিলেড্‌কে বিবাহ করিয়া কিছুকাল পরে জর্মনীতে ফিরিয়া আসেন (৯৫২ খৃঃ)।

ইত্যবসরে রাণী এডিলেড্ একটী পুত্র প্রসব করেন এবং অটো তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করিলে রাজার প্রথম পুত্র লুডোল্‌ফ বিদ্রোহী হন এবং স্বাবিয়া, লোরেন্ ও মেঞ্জের রাজগণ তাঁহার সহিত যোগদান করেন। ৯৫৩ হইতে ৯৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কতকগুলি খণ্ড যুদ্ধে জয়পরাজয়ের পর রাজা রেগেন্সবার্গ অধিকার করিলে ইঁহারা পরাস্ত হন। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি শ্লাভ, মগীয়ার প্রভৃতি জাতিকে পরাস্ত করিয়া জর্মনী শত্রুনির্ম্মুক্ত করেন।

অতঃপর অটো খৃষ্টধর্ম্মের উন্নতিবিধানার্থ মনোযোগী হন। রাজাকে খৃষ্টধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক জানিয়া পোপ ১২শ জন তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। ৯৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি রোমে উপনীত হইলে তাঁহাকে রোমের সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত করা হয়।

ইহার পর তিনি গ্রীক্ এবং দক্ষিণ ইতালীবাসী সারাসেনদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু ৯৭২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ২য় রোমানাসের কন্যা থিয়োফানোর সহিত নিজপুত্রের বিবাহ দিয়া বিরোধের অবসান করেন। উক্ত বর্ষেই রোমরাজ্যে শান্তি স্থাপিত হয় এবং সম্রাট্ জর্ম্মনীতে প্রত্যাগমন করিলে পোলণ্ড, বোহেমিয়া, দেন্মার্ক প্রভৃতি দেশের রাজন্যগণ তাঁহাকে রাজসম্মান দান করেন। ৯৭৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মেম্লেবেন নগরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে এবং তাঁহার দেহ মাগ্‌দেবার্গে সমাহিত হয়।

অটো (২য়)—রোমক-সম্রাট্ মহাত্মা অটোর পুত্র (৯৫৫-৯৮৩ খৃঃ)। ইনি ১ম অটোর দ্বিতীয়া রাজ্ঞী এডিলেডের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ৯৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি জর্ম্মনীর ভাবী রাজা মনোনীত হন এবং ৯৬৭ খৃষ্টাব্দে পোপ ১৩শ জন তাঁহাকে জর্ম্মনী ও রোমের সম্রাট্‌রূপে ঘোষণা করেন। ৯৭২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ২য় রোমানাসের কন্যা থিওফানোর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পিতার মৃত্যুর পর এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন।

তাঁহার রাজ্যারোহণের অব্যবহিত পরেই রাজ্যের নানা স্থানে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। অধীনস্থ রাজগণের বিদ্রোহ দমন করিতে তাঁহাকে কতকগুলি খণ্ডযুদ্ধও করিতে হইয়াছিল। ৯৮১ খৃষ্টাব্দে সারাসেনদিগের ঔদ্ধত্য দমন করিতে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইতালীতে অভিযান করেন। কিন্তু ৯৮২ খৃষ্টাব্দে ষ্টিলো নামক স্থানে পরাজিত হইয়া একটী গ্রীক্ পোতে আরোহণপূর্ব্বক পলায়ন করিতে বাধ্য হন। ৯৮৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর রোমক রাজপ্রাসাদে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

অটো (৩য়)—রোমক-সম্রাট্ ২য় অটোর পুত্র এবং থিওফানোর গর্ভজাত (৯৮০-১০০২ খৃঃ)। সম্রাট্ ২য় অটো তাঁহার মৃত্যুকাল সন্নিকটবর্ত্তী বুঝিতে পারিয়া ৯৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে রাজাসনে অভিষিক্ত করিয়া যান। কিন্তু অটো নিতান্ত শিশু ছিলেন বলিয়া প্রথমে তাঁহার মাতা এবং তৎপরে ১ম অটোর বিধবা পত্নী এডিলেড্ ও মেঞ্জের আর্চবিশপ উইল্‌গিস্ শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন।

৯৯৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অটো বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। উক্ত বর্ষে বোহেমীয় ও বেন্দ জাতির বিরুদ্ধে তাঁহার সৈন্য পরিচালিত হয় এবং পরবৎসর আল্পস্ পর্ব্বত অতিক্রম করিলে লম্বার্ডীর রাজা বলিয়া অভিনন্দিত হন। এই বৎসরই তিনি ইতালীতে আগমন করিলে রোমের সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত হন। পোপ ৫ম গ্রেগরীর মৃত্যুর পর তিনি স্বীয় শিক্ষক গার্বার্টকে ২য় সীল্‌বেষ্টার নাম দিয়া পোপপদে বরণ করেন। খৃষ্টধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং নিজে সম্রাট্ হইয়াও দৈন্য দেখাইতে Servant of the Apostle ও Servant of Jesus Christ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১০০০ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে তাঁহার বিশ্বাস জন্মে যে, অচিরে জগৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি বন্ধুবান্ধবগণের সমাধি-মন্দির দর্শনে যাত্রা করেন। সম্রাট্ সার্লেমেনের কবর পরিদর্শনান্তে তিনি রোমে প্রত্যাগত হন এবং ১০০২ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী রোমকদিগকে দণ্ডবিধানার্থ অভিযানোদ্যোগকালে অকস্মাৎ পাটার্নো নগরে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অটো (৪র্থ)—একজন রোমক-সম্রাট্ (১১৮২-১২১৮ খৃঃ)। ইনি স্যাক্সনীর ডিউক্ হেনরী দি লায়নের পুত্র এবং ইংলণ্ডেশ্বর ২য় হেন্‌রীর কন্যা মাটিল্‌দার গর্ভজাত। শৈশবাবস্থায় ইঁহার পিতার মৃত্যু হইলে ইনি স্বীয় পিতৃব্য ইংলণ্ডেশ্বর ১ম রিচার্ডের নিকট থাকিয়া শিক্ষালাভ করেন।

স্বাবিয়ার ডিউক ফিলিপ জর্ম্মন্‌দিগের রাজা বলিয়া নির্ব্বাচিত হইলে প্রতিদ্বন্দ্বিদল অটোকে ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে কোলনে রাজা বলিয়া অভিষিক্ত করে। ইহাতে উভয় পক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং ক্রমে অটো ১২০১ খৃষ্টাব্দে পোপ ৩য় ইনোসেন্টের সহায়তা প্রাপ্ত হন। ফিলিপের সহিত কএকটী যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবার পর ১২০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি আহত হইয়া কোলনে আশ্রয় লাভ করেন। তৎপরে দেন্মার্কে ফিরিয়া রাজা ২য় ওয়ালদেমারের নিকট সেনাসাহায্য ও ইংলণ্ডের রাজা জনের নিকট অর্থসাহায্য পাইয়া ব্রান্‌সুইক নগরে প্রতিপত্তি-বিস্তারে যত্নবান্ হন। ১২০৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কফোর্টে সমাগত রাজন্যবর্গ তাঁহাকে জর্ম্মনীর রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহার পর ১২১২ খৃষ্টাব্দে ফিলিপের জ্যেষ্ঠা কন্যা বিয়েট্রিক্সের সহিত অটোর বিবাহ হয়।

১২০৯ খৃষ্টাব্দে অটো ইতালী গমন করেন এবং পোপে ইনোসেণ্ট কর্ত্তৃক রোমের সম্রাট্ বলিয়া বিঘোষিত হন; কিন্তু অটো ইতালী পরিত্যাগ না করায় অচিরেই ইনোসেণ্টের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটে। এই সূত্রে ১২১০ খৃষ্টাব্দে পোপ তাঁহাকে ধর্ম্মত্যাগী (excommunicate) বলিয়া ঘোষণা করেন। এদিকে পোপের চক্রান্তে জর্ম্মনীতে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং বিদ্রোহীরা ফরাসীরাজ ২য় ফ্রেডারিক্‌কে সিংহাসনের

দাবীদাররূপে খাড়া করে। অগত্যা অটোকে জর্মনীতে প্রত্যাগত হইয়া যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ইংলণ্ডেশ্বর জনের সাহায্যলাভ সত্ত্বেও ১২১৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদের হস্তে তাঁহার শোচনীয় পরাজয় ঘটে। পরাজিত হইয়া তিনি প্রথমে কোলনে ও তৎপরে ব্রান্সুইকে উপস্থিত হন। কিন্তু ঐ সময় ইংলণ্ডেশ্বর জনের মৃত্যু হওয়ায় এবং দিনেমারেরা হাম্বার্গ জয় করায় তিনি উপায়হীন হইয়া হার্জবার্গে আগমন করেন। এখানে ১২১৮ খৃষ্টাব্দে ভগ্নহৃদয়ে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ব্রান্সুইকের সেণ্ট ব্লাসিয়াস্ গির্জ্জায় তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করা হইয়াছিল।

অটোমান সাম্রাজ্য—তুরুষ্ক সাম্রাজ্যের অপর নাম। ইহার বৃহত্তর বিভাগগুলি এই—প্রাচ্য তুরুষ্ক (এসিয়ায়), ইউরোপীয় তুরুষ্ক (ইউরোপে), ত্রিপোলি ও বার্কা বা বেন্‌গাজি (উত্তর আফ্রিকায়)। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি সামন্তরাজ্যও এই সাম্রাজ্যের অন্তর্গত।

অটোমান ইহার অন্যতর নাম হইলেও তুরুষ্ক (বা তুর্কী) নামেই এই বৃহৎ সাম্রাজ্য সমধিক পরিচিত। সুতরাং ইহার বিস্তৃত বিবরণ তুরুষ্ক শব্দেই প্রদত্ত হইবে। এস্থলে কেবলমাত্র অটোমান নামের উৎপত্তির বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

মধ্য এসিয়ার সে বিস্তীর্ণ ভূভাগ তাতার ও তুর্কীস্থান বলিয়া পরিচিত, উহা অতি প্রাচীনকালে দুর্দ্ধর্ষ দস্যুবৃন্দ দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক পর্য্যন্ত এই সকল বিরাট্ দস্যুবাহিনী চীন, ইউরোপ ও ভারতের নানাস্থানে লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইত। চীনভাষায় এই সকল দস্যুকে 'হিয়াংনু' বলা হইত এবং ইহাদের আক্রমণ নিবারণার্থই খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতকে চীনের মহাপ্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। অতিপূর্ব্বকালে তুরাণী বা তুর্কীরা কিরূপ ধর্ম্মপালন করিত, তাহা সুস্পষ্ট জানা যায় না। তবে খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকেই পূর্ব্ব তুর্কীস্থানের অধিবাসীরা বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিল এবং খৃষ্টীয় অষ্টম শতক পর্য্যন্ত প্রধানতঃ ঐ ধর্ম্মই পালন করিয়াছিল। মুহম্মদের আবির্ভাবের পর ইহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে।

তুর্কীরা উত্তম সওয়ার ও যোদ্ধা ছিল। সেইজন্য বিস্তীর্ণ মোস্‌লেম সাম্রাজ্যের অধিপতিরা তাহাদিগকে সাদরে নিজ দেশে বসাইয়াছিলেন। ক্রমে রাজমহিষী ও রাজকন্যাদের অনুগ্রহ ইহাদের উপর বর্ষিত হয়। এইরূপে অনেক তুর্কী যোদ্ধা বা ক্রীতদাস কালে রাজ-জামাতা হইয়া ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠে। খলিফাদের ক্ষমতাহ্রাসের সঙ্গে উল্লিখিত তুর্কীদের যথেষ্ট প্রভাব বৃদ্ধি হয়। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে তাহারা এশিয়া খণ্ডস্থ মোস্‌লেম রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিল।

প্রবাদ, কারা খাঁ নামক জনৈক তুর্কী অধিপতির পুত্র অঘাজ (অঘুজ) অটোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ১২২৭ খৃষ্টাব্দে মঙ্গোলীয় আক্রমণের ফলে দেশভ্রষ্ট তুর্কীদের এক বৃহৎ বাহিনী সুলেমান শাহের অধিনায়কত্বে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছিল। ইউফ্রেতিস্ নদী অতিক্রম করিবার সময় দৈবচক্রে সুলেমান শাহ্ জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন সুলেমানের পুত্র এর্ত্তোগ্রাল চারিশত (মতান্তরে দুই হাজার) সৈন্যের নায়ক-রূপে আর্জেরুমের পূর্ব্বে জেসিন নামক স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। চেঙ্গিজ্ খাঁর সহিত তখন মোস্‌লেম সম্রাট্ আলাউদ্দীন্ কাইকোবাদের যুদ্ধ চলিতেছিল। এর্ত্তোগ্রাল কাইকোবাদের পক্ষ অবলম্বন করেন। যুদ্ধে কাইকোবাদ জয়লাভ করিলে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি এর্ত্তোগ্রালকে এশিয়া-মাইনরের অন্তর্গত আনাতোলিয়া রাজ্য দান করেন। ইহাই হইল তুরুষ্ক সাম্রাজ্যের ভিত্তি। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে আনা-তোলিয়ার সাগাদ নামক স্থানে এর্ত্তোগ্রালের স্বনামধন্য পুত্র ওস্‌মান জন্মগ্রহণ করেন। এই ওস্‌মানের বংশধরগণই তুরুষ্ক সাম্রাজ্যে বর্ত্তমান শতাব্দীর ১৯২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন। উক্ত বর্ষে অটোমান নাম পরিত্যক্ত হইয়া জাতীয় শাসন-তন্ত্র (Nationalist Government) প্রবর্ত্তিত হয়। আজ পর্য্যন্ত জাতীয় শাসন-পরিষদ কর্ত্তৃক তুরুষ্ক সাম্রাজ্য শাসিত হইতেছে। ওস্‌মান বা ওট্‌মান হইতেই তুরুষ্কের নাম অটোমান সাম্রাজ্য হইয়াছে।

ওস্‌মানের সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। তিনি অনেকবার গ্রীক্‌দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এইরূপ এক যুদ্ধে গ্রীক্‌গণকে পরাজিত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে য়ার্‌হিসার নামক স্থানে পণ্ডিত এদ্‌বালির সুন্দরী কন্যা কামায়ুয়া বা মাল্‌-খাতুনকে অবলোকন করিয়া ওস্‌মান তাঁহার রূপে মুগ্ধ হন। প্রথমে এদ্‌বালির নিকট তাঁহার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করিয়া ওস্‌মান প্রত্যাখ্যাত হন। পরে ওস্‌মান তাঁহার এক আশ্চর্য্য স্বপ্নবৃত্তান্ত এদ্‌বালিকে জানাইলেন। স্বপ্নটী এই—ওস্‌মান দেখিলেন, এদ্‌বালির ক্রোড় হইতে পূর্ণচন্দ্র আবির্ভূত হইয়া ওস্‌মানের বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ক্রমে তথায় এক বৃহৎ মহীরুহের উদ্ভব হইল। ঐ মহাতরু এরূপ বহুবিস্তীর্ণ শাখা প্রসারিত করিল যে, উত্তরে দানিয়ুব, দক্ষিণে তাইগ্রিস্ ও ইউ-ফ্রেতিস্ এবং পশ্চিমে নীল নদী তাহার মূলে জলসেচন করিতে লাগিল। স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এদ্‌বালি মাল্‌-খাতুনকে ওস্‌-মানের করে সমর্পণ করিলেন।

ওস্‌মান প্রসিদ্ধ বীর ছিলেন। তিনি এশিয়াখণ্ডস্থ সমস্ত গ্রীক্-প্রদেশ অধিকার করিয়া বস্ফোরাস্ সাগরের তীরে তুর্কীর বিজয়পতাকা রোপণ করেন। যদিও ওস্‌মানের রাজত্ব-

কালে বল্‌কান ও কন্‌স্তান্তিনোপল অধিকৃত হয় নাই, তথাপি ওস্‌মানই প্রথম তুরুষ্ক সুলতান বলিয়া প্রখ্যাত। তাঁহার তরবারি এখনও কন্‌স্তান্তিনোপলের রাজপ্রাসাদে রহিয়াছে; সুলতানগণ অভিষেককালে উহা স্পর্শ করেন।

ওস্‌মানের পুত্র উরখাঁ। উরখাঁ গ্রীক্‌কন্যা বিবাহ করেন। তিনি বল্‌কান প্রদেশের কতকাংশ এবং ব্রুসা অধিকার করেন। উরখাঁর পুত্র মুরাদ, তৎপুত্র বয়াজিদের হস্তে নিকোপোলির যুদ্ধে হাঙ্গেরীর রাজা পরাজিত হন। এই সময় হইতে ১৪৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুলতানদিগকে ক্রমাগতই উত্তর প্রদেশের খৃষ্টানদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে সুলতান ২য় মুহম্মদ কনস্তান্তিনোপল নগর অধিকার করেন। এই সময় হইতেই ইউরোপের নবযুগের সূচনা। ২য় মুহম্মদের পৌত্র সেলিম ১৫১৬-১৫১৭ খৃষ্টাব্দে মামেলুক রাজগণ কর্ত্তৃক শাসিত মিশর, সীরিয়া ও হেজাজ দেশ দখল করেন। ওস্‌মানের স্বপ্ন সফল হয়। [তুরুষ্ক দ্র°]

অটোয়া, (Ottawa)—উত্তর আমেরিকার অন্টেরিও প্রদেশের কার্লেটন উপবিভাগের একটী নগর এবং কানাডা রাজ্যের রাজধানী (the capital of the Dominions of Canada)। এই নগরের মহাসভাগৃহের অক্ষা° ৪৫°২৫'২৮" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৪৪'৫৩" পঃ। অটোয়া নদীর দক্ষিণকূলে মন্ট্রিল হইতে ১০১ মাইল পশ্চিমে ও টোরোন্টো হইতে ২১৭ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। জনসংখ্যা প্রায় একলক্ষ ছেষট্টি হাজার; তন্মধ্যে ইংরেজ ও ফরাসীর সংখ্যা অধিক। অটোয়া নদীর উভয় কূল দিয়া কানাডিয়ান্ পাসেফিক্ এবং নর্থ শোর ও শর্ট লাইন্ নামক দুইটী রেলপথ অটোয়া নগর হইতে মন্ট্রিল নগর পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহা ছাড়া গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রেলপথ, অটোয়া ও নিউইয়র্ক রেলপথ এবং বৈদ্যুতিক রেলপথগুলি এখানকার বাণিজ্য ও লোক যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছে।

রিড্‌ খাল অটোয়া নগরকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। যে ভাগে ইংরেজেরা বাস করে তাহা 'আপার টাউন' এবং উহার অপর দিকে ফরাসীদিগের অধ্যুষিত নগরাংশ 'লোয়ার টাউন' নামে খ্যাত। সাণ্ডী-হিল নামক উচ্চ ভূখণ্ডে প্রধানতঃ ইংরেজদিগের বাস। এখানকার অট্টালিকাসমূহ লক্ষ্মীশ্রীর পরিচায়ক। পার্লিয়ামেণ্টের বাড়ীগুলি, গবর্ণমেণ্টের অট্টালিকাসমূহ, রাজকীয় টাঁক্‌শাল, ভিক্টোরিয়া যাদুঘর, রাজকীয় মানমন্দির, জাতীয় চিত্রশালা, হাঁসপাতাল, গির্জ্জা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। চডিয়ার জলপ্রপাত (Chaudiere Falls) হইতে শহরের বিদ্যুৎ সরবরাহ হইয়া থাকে। সাধারণের সুবিধার্থ এখানে অনেকগুলি মনোহর উদ্যান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১৬১৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে সামুয়েল ডি চাঁপ্লেন অটোয়া নদীর গতি-নির্ণয়ে আসিয়া এইস্থানে উপনীত হন। তৎকালে ইহা চডিয়ার নামেই প্রসিদ্ধিলাভ করে। তখন এখানে অসভ্য আদিম অধিবাসী ছাড়া অপর কোন জাতির বাস ছিল না। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই ইউরোপীয়গণ এখানে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে এখানে একটী উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এখানকার কাষ্ঠের ব্যবসায় ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে নগরমধ্যে পরিগণিত হইয়া ইহার 'অটোয়া' নামকরণ হয়। তৎপরে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইহাকে কানাডার রাজধানীরূপে ঘোষণা করেন। ইহার পর কিছুকাল এখানকার শাসনরীতি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীন ছিল। পরে উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া Dominion Governmentএর শাসনাধীনে পরিচালিত হইতেছে। [কানাডা দ্র°]

বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পর অর্থকৃচ্ছ্রতায় পড়িয়া ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ যখন মহা টানাটানির মধ্যে পড়িলেন, তখন ধীরে ধীরে সমগ্র জগতে বাণিজ্যপণ্যের হ্রাস ও অর্থসঙ্কট ঘটিয়াছিল। কিসে এই অর্থনৈতিক সঙ্কট বিদূরিত করা যায় এবং বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি হইয়া দেশবাসী তথা রাজন্যবর্গের শ্রী বর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য অর্থনীতি-বিশারদগণ এতৎসম্পর্কে অধিবেশনের পর অধিবেশন করিয়া এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণলাভের আশায় পন্থানির্দ্দেশে সচেষ্টিত হইলেন। অবশেষে যাহাতে বাণিজ্যপণ্যের হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া পরস্পরের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য চলিতে পারে—এইরূপ উপায় স্থিরীকরণার্থ এই অটোয়া নগরে এক বৈঠক আহূত হয় (১৯৩২ খৃঃ)। বৃটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ এই সভায় যোগদান করেন। উক্ত সভা 'অটোয়া মহাসভা' (Ottawa Conference) নামে খ্যাত এবং পণ্যশুল্ক নির্দ্ধারণ করিয়া যে পত্রে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, উহা 'অটোয়া চুক্তি' (Ottawa Pact) নামে প্রসিদ্ধ। এই অধিবেশনে ভারতের পক্ষে বাঙ্গালার কৃতী সন্তান স্যর্ অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গমন করেন।

অটোয়া,—(Ottawa) উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ইলিওনইস্ উপবিভাগের একটী নগর। ইহা ইলিওনইস্ ও ফক্সনদীর সঙ্গমস্থলে চিকাগো হইতে ৮৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে চিকাগো-বার্লিংটন-কুইন্সী ও চিকাগো-রক আইলণ্ড-পাসিফিক্ রেলপথ এবং বৈদ্যুতিক রেলপথগুলি বিস্তৃত থাকায় নগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে।

১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশপর্য্যটক ফাদার হেনেপিন্ এখানে আসিয়া ফক্সনদীর মোহানার নিকটে কয়লাস্তর আছে পরীক্ষা দ্বারা

জানিতে পারেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্যের সমধিক উন্নতি দেখিয়া ইহাকে নগর পর্য্যায়ভুক্ত করা হয়।

অটোয়া$_3$—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব্ব-কান্সাস্ বিভাগে অবস্থিত একটী নগর। ইহা কান্সাস্ নগর হইতে ৫৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অসেজ নদীতীরে অবস্থিত। এখানকার কার্ণেগী পাঠাগার, রজার উইলিয়ম বিশ্ববিদ্যালয় ও অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে উৎপন্ন শস্যের ও পালিত পশ্বাদির বিস্তৃত বাণিজ্য আছে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ইহা নগর মধ্যে গণ্য হয়। চিত্রশিল্পের বিদ্যালয় ও ব্যবসা শিক্ষার জন্য কমার্শিয়াল কলেজ এখানকার গৌরবের পরিচায়ক।

অটোয়া$_4$—উত্তর আমেরিকার অল্গণকুই শাখাভুক্ত ইণ্ডিয়ান্ জাতি। ইহারা অতীত যুগের কোন এক সময়ে, কানাডার অন্তর্গত অটোয়া নদীর তীরভূমে আসিয়া বসবাস করে। পরে তথা হইতে মিচিগান্ উপদ্বীপের উত্তরকূলে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করে; কিন্তু ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে এখান হইতে ইরোকুই জাতি কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া মিশিশিপির অপর পারে যাইয়া বাস করিতে বাধ্য হয়। এখানকার অধিবাসী দাকোটা জাতি তাহাদের স্থান না দেওয়ায় তাহারা মনিতৌলিন্ দ্বীপ ও হিউরণ হ্রদের তীরবর্ত্তী প্রদেশে যাইয়া বাস করে। এখানে ইংরেজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিলে ইহারা ফরাসী পক্ষ লইয়া ইংরেজগণের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু যখন আমেরিকাবাসী স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ (War of Independence) ঘোষণা করে, তখন তাহারা ইংরেজের পক্ষ লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ইহাদের কতকাংশ ওক্লাহোমায় এবং অবশিষ্টাংশ মিচিগান্ ও অন্টেরিও প্রদেশে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া পরস্পরে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করিতেছে।

অটোয়া$_5$—উত্তর আমেরিকার কানাডা রাজ্যে প্রবাহিত একটী নদী। ইহা সেণ্ট লরেন্স নামক নদীর বৃহত্তম শাখা এবং প্রায় ৬৮৫ মাইল লম্বা। কানাডায় প্রবাহিত নদীমালার মধ্যে ইহা নবম। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে সামুয়েল ডি চাঁপ্লেন এই নদী আবিষ্কার করেন। তিনি পর্য্যটকরূপে ইহার তীরভূমি পরিভ্রমণ করিয়া ইহার বহু শাখা এবং চডিয়ার, রিড্, লংসল্ট প্রভৃতি প্রপাত পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

অটোয়ে, টমাস (Otway, Thomas)—একজন ইংরেজ নাট্যকার (১৬৫২-১৬৮৫ খৃঃ)। ইনি অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধিলাভ ইঁহার ভাগের ঘটে নাই। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম নাটক Alcibiades অভিনীত হয়; কিন্তু ইহা বিশেষ আদৃত হয় নাই। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিখ্যাত বিয়োগান্ত নাটক Don Carlos প্রকাশিত হয়। ইহার ঘটনাবলী ফরাসী উপন্যাস হইতে গৃহীত। এখানি সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করে। ইহার পর তিনি আরও কএকখানি নাটক রচনা করেন। তন্মধ্যে দুইখানি ফরাসী-নাট্যকার মলিয়ার ও রেকিনের গ্রন্থ হইতে অনূদিত। এই সময়ে মিসেস্ ব্যারীর প্রেমে হতাশ হইয়া অটোয়ে ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে সৈন্যদলে ভর্ত্তি হন এবং হলণ্ডে গমন করেন। পর বৎসর ঐ সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং অটোয়ে লণ্ডনে ফিরিয়া আসেন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার The Orphan বা The Unhappy Marriage নামক নাটক প্রকাশিত হয়। এখানি সেক্ষপীয়রের আদর্শে রচিত এবং নাট্যজগতে বিশেষ সমাদৃত। করুণরসাত্মক চরিত্রাঙ্কনে অটোয়ের অসামান্য ক্ষমতা এই নাটকে পরিস্ফুট। Caius Marius নাটকখানি সেক্ষপীয়রের 'রোমিও জুলিয়েট্' এবং প্লুটার্কের 'জীবনী' গ্রন্থ হইতে গৃহীত আখ্যানের সংমিশ্রণ। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে অটোয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক Venice Preserved প্রকাশিত হয়। ইহার আখ্যানবস্তুও ফরাসী গ্রন্থ হইতে গৃহীত; কিন্তু অটোয়ে মূল গল্পাংশটীকে বহুল পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। ইহার কএকটী চরিত্র অসামান্য দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। সমসাময়িক রাজনৈতিক ব্যাপারের ইঙ্গিতও এই নাটকে রহিয়াছে। প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা এরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করে যে, ইউরোপীয় প্রায় সকল ভাষাতেই ইহার অনুবাদ হয়। ইহার পর তিনি The Atheist প্রভৃতি আরও কএকখানি নাটক রচনা করেন।

অটোয়ের শেষজীবন বড়ই দুঃখপূর্ণ। শুনা যায়, তিনি একদিন কুটীর হইতে ভিক্ষায় বাহির হন। এক পথিক তাঁহাকে বিখ্যাত নাট্যকার বলিয়া চিনিতে পারেন এবং একটী গিনি তাঁহার হস্তে দেন। অটোয়ে ক্ষুধার জ্বালায় একখানি রুটী কিনিয়া তাড়াতাড়ি তাহা ভক্ষণ করিতে গিয়া গলায় আট্কাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অটোল—(দেশজ) যাহা কোনস্থানে টোল খায় নাই; মসৃণ।

অট্ট$_1$—[ভ্বা° সক° সেট্, আত্ম°] অতিক্রম। ২ হিংসা। [লট্—অট্টতে। লিট্—আনট্টে। লুঙ্—আট্টিষ্ট। লুট্—অট্টিতা। সন্—আটিট্টিষতে, অট্টিটিষতে। ণিচ্—অট্টয়তি, আট্টিটৎ।]

অট্ট$_2$—[চু° সক° সেট্, পর°] অনাদর। [লট্—অট্টয়তি।]

অট্ট$_3$—(পুং) [অট্টয়তি ন আদ্রিয়তে অন্তৎ যত্র, অট্ট-আধারে ঘঞ্] প্রাসাদের উপরিতন গৃহ। ২ প্রাচীরের উপরিস্থিত সৈন্যগৃহ। (কৌটিল্য) ৩ উচ্চ। ৪ অতিশয়। (ক্লী) ৫ শুষ্ক। ৬ অন্ন। "অট্টশূলা জনপদাঃ"। (মহাভারত)

'অট্টং অন্নং শূলং বিক্রেয়ং যেষাং'। (নীলকণ্ঠ) ৭ ক্ষৌমবস্ত্র। ৮ গৃহান্তর। (পুং) ৯ প্রাসাদ। "দ্রক্ষ্যামি নগরীং লঙ্কাং সাট্টপ্রাকারতোরণাং"। (রামা° ৫.৩.৩৩) ১০ পশুমাংসবিক্রয়ের হট্ট বা হাট। ১১ উচ্চের উপরি নির্ম্মিত ভূমিকা। "মৃষ্টচত্বররথ্যাট্টমার্গং চন্দনচর্চ্চিতম্।" (ভাগবত ৪.৯.৫৭) 'অট্ট উচ্চস্তোপরিনির্ম্মিতা ভূমিকা'। (শ্রীধর)

অট্ট-অট্ট—(দেশজ) অত্যুচ্চ। 'অট্ট-অট্ট মহাহাস্য।' (চৈতন্যভাগবত)

অট্টট্ট—(অব্য°) [অট্ট অনাদরে, অট্ট-অট্ট; শকন্ধাদি] [প্রকারে গুণবচনস্য। পা ৮.১.১২] অত্যুচ্চ। "অট্টট্ট হাসমশিবং শিবদূতী চকার হ।" (মার্ক° চণ্ডী)

অট্টন—(ক্লী) [অট্ট-করণে ল্যুট্, অট্ট্যতে অনাদ্রিয়তে রিপুরনেন] চক্রাকারফলকাস্ত্র, চাকার ন্যায় ফলকাস্ত্র। (ত্রিকাণ্ড°) চলিত ঢাল। (ক্লী) [ভাবে ল্যুট্] ২ অনাদর।

অট্টপতিভাগগৃহ—(পুং) রাজার বাজার-সরকারের গৃহ বা কার্য্যালয়। (রাজতরঙ্গিণী)

অট্টস্থলী—(স্ত্রী) [অট্টপ্রধানা স্থলী ; শাক°-তৎ] প্রাসাদপ্রধান দেশবিশেষ। [অট্টস্থলী শব্দ পাণিন্যুক্ত ধূমাদি গণমধ্যে পঠিত।]

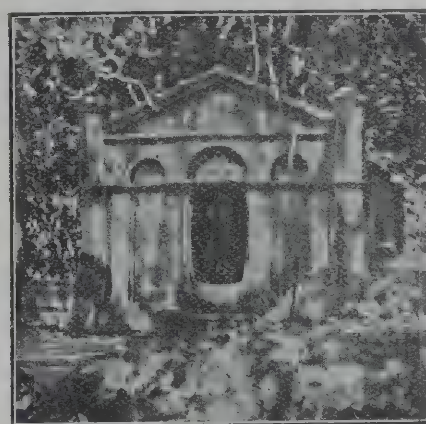
অট্টহাস,—(পুং) [অট্ট-হস-ঘঞ্, অট্টেন অতিশয়েন হাসঃ ; ৩-তৎ] উচ্চহাস। "সাট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ।" (চণ্ডী) 'সাট্টহাসং মহাহাসসহিতং যথাস্যাত্তথা।' (চণ্ডীটীকা—গোপালচক্রবর্ত্তী)

অট্টহাস$_2$—(পুং) বৈবস্বত মন্বন্তরের একোনবিংশ কলিযুগে অবতীর্ণ মহাদেবের অবতার। (কূর্ম্মপু°) ২ বরাহকল্পের বিংশতি দ্বাপরে মহাদেবের অবতাররূপে যোগাচার্য্য অট্টহাস ধরাধামে অবতীর্ণ হন। (লিঙ্গপু°) ৩ কলিযুগের প্রাক্কালে আবির্ভূত কতিপয় যোগিগণের অন্যতম। (স্কন্দপু°, মাহে°, কুমা°, ৪০.২১৪)

অট্টহাস$_3$—তীর্থভেদ। (পদ্মপু°, সৃষ্টি°, ১১.৫৮ ; মৎস্যপু°, ২২.৬৮)

অট্টহাস$_4$—বর্দ্ধমান জেলার কাঁটোয়া মহকুমার অন্তর্গত একটী অতি প্রাচীন পীঠস্থান। ইহা মরাঘাট হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত। তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবচরিত-মতে এইস্থানে ভগবতীর ওষ্ঠাংশ পতিত হয় এবং এখানকার শক্তি ফুল্লরা ও ভৈরব বিশ্বেশ বা বিশ্বনাথ। কিন্তু কুব্জিকাতন্ত্রের ৭ম পটলে এই পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চামুণ্ডা বলিয়া উল্লেখ আছে। স্কন্দপুরাণের মাহেশ্বরখণ্ডের অরুণাচলমাহাত্ম্যে (২.৩৭) লিখিত আছে, অট্টহাস মহাপীঠে অর্ক ঈশের পূজা করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়াছিলেন। আবার স্থানীয় আধুনিক লোকের বিশ্বাস, মরাঘাটের বহুলাক্ষী ও এখানকার ফুল্লরা এই উভয় লইয়া যুগ্মপীঠ। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, দুইটী ভিন্ন ভিন্ন দেবীমূর্ত্তি। [মরাঘাট দ্র°] আজিও অট্টহাস মহাজাগ্রৎ মহাপীঠ বলিয়া পরিচিত।

বর্ত্তমানে এখানকার পূর্ব্বসমৃদ্ধির কিছুই নাই। ভগবতীর মূর্ত্তিও নাই। সম্ভবতঃ মুসলমান বিপ্লবে সমস্তই নষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে মূল পীঠস্থানে একটী ক্ষুদ্র কুঠুরী ছিল। কিছুকাল পূর্ব্বে খেড়ুয়ার জমিদার দেবীদাস চক্রবর্ত্তী তাহারই উপর একটী



অট্টহাসের পাকাঘর।

পাকাঘর ও রান্নাঘর তৈয়ারী করাইয়া দিয়াছেন। ইহার কিছুদূরে একটী উচ্চ স্তূপ দেখা যায়। স্থানীয় লোকেরা এখানে পঞ্চমুণ্ডীর আসন দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু স্তূপটী দেখিয়া এখানকার পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ বলিয়াই মনে হয়। এই স্তূপের নিকট শিবানন্দের সিদ্ধিস্থান ও রটন্তীর ভগ্ন মন্দির রহিয়াছে।

এই পীঠে প্রত্যহই শিবাবলি হয়। দেবীর পূজার পর ভোগ লইয়া ডাকিলেই দলে দলে শিবা আসে। শনি ও মঙ্গলবারে এখানে বহুলোক পূজা দিতে আসেন। পীঠের পশ্চিমদিকে উত্তরবাহিনী 'কাঁদড়' বা স্রোতস্বতী রহিয়াছে। অট্টহাসের সেবার জন্য বর্দ্ধমানরাজ হইতে ২০ বিঘা চাষের জমি ও ১০ বিঘা বাগান দেওয়া আছে। এখানকার পীঠদেবী ফুল্লরার জয়দুর্গার ধ্যানে পূজা হইয়া থাকে। ধ্যানটী এইরূপ—

"কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং
সিদ্ধিকামৈঃ॥"

দেবালয়ের বামপার্শ্বে একটী অতি পুরাতন পুষ্করিণী আছে।

এই পুষ্করিণী হইতে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় একটী দেবীমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে' উপহার দিয়াছেন। অতীত শিল্পনৈপুণ্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন



অট্টহাসের সুপ্রাচীন চামুণ্ডা।

দেবীমূর্ত্তিটী খৃষ্টীয় ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতকের প্রাচীন এবং তাহা কুব্জিকাতন্ত্র-বর্ণিত চামুণ্ডা বলিয়াই মনে হয়। এ অবস্থায় এই স্থান অতি প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। জয়নাগের খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন হইতে মনে হয় যে, এক সময় এ অঞ্চল অগ্রহার ব্রাহ্মণগণের শাসনাধীন ছিল। এখানকার ব্রাহ্মণই সম্ভবতঃ 'ব্রহ্মরাক্ষস' বলিয়া বাণভট্টের বর্ণনায় পরিচিত হইয়াছেন এবং শ্রীহর্ষচরিতে বর্ণিত প্রসিদ্ধ তরবারিটী এই স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়াই তাহা 'অট্টহাস' নামে পরিচিত হইয়াছে। [অট্টহাস দ্র°] পরে বর্দ্ধনবংশের সৌভাগ্যোদয়ের সঙ্গে এই 'অট্টহাস'ও মহাশক্তিস্বরূপ পূজিত হইয়া থাকিবে।

বীরভূম জেলার লাভপুরের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত 'ফুল্লরা মহাপীঠ'কে কেহ কেহ 'অট্টহাস' আখ্যা প্রদান করেন। কিন্তু উহা তন্ত্র ও পুরাণবর্ণিত পীঠস্থান অট্টহাস কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সম্ভবতঃ বালবলভীভুজঙ্গ ভবদেব ভট্টের ভ্রাতা অট্টহাসের নামানুসারেই ঐ স্থান 'অট্টহাস' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া থাকিবে। [অট্টহাস, ও ফুল্লরা দ্র°]

অট্টহাস৫—এক প্রসিদ্ধ অসির নাম। থানেশ্বরের বর্দ্ধনবংশীয়-গণের উত্তরপুরুষ পুষ্পভূতি ভৈরবাচার্য্য নামক এক শৈব পরিব্রাজকের নিকট হইতে ইহা লাভ করেন। বাণভট্টকৃত শ্রীহর্ষচরিতের তৃতীয় উচ্ছ্বাস পাঠে জানা যায়, মহারাজ পুষ্প-ভূতি একনিষ্ঠ শৈব ছিলেন। একদা দাক্ষিণাত্য হইতে ভৈরবাচার্য্য নামক এক প্রধান শৈব পরিব্রাজক তিনজন শিষ্য সঙ্গে লইয়া থানেশ্বরে আগমন করেন এবং সরস্বতী নদীর নিকটবর্ত্তী এক অরণ্যে বাস করিতে থাকেন। ইত্যবসরে তাঁহার জনৈক শিষ্য একদিন রাজার নিকট যাইয়া ভৈরবা-চার্য্যের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করেন। পরদিন প্রত্যুষে মহারাজ অনুচরবর্গসহ তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ভৈরবাচার্য্য রাজার নিকট বহু উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'অট্টহাস' নামক মহা অসি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অসি ভৈরবাচার্য্যের বীর শিষ্য পাতালস্বামী এক ব্রহ্মরাক্ষসের নিকট হইতে অপহরণ করিয়াছিলেন। শ্রীহর্ষচরিতে এই অসির বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

অট্টহাস৬—শৈবশাস্ত্রোক্ত দুই শত চব্বিশটী ভুবনের একটী ভুবন। এই সকল ভুবন পশু অর্থাৎ সাত্মক সচল শরীরিগণের উপভোগের নিমিত্ত পরমশিব কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। অট্টহাস নামক ভুবন প্রতিষ্ঠাকলার অন্তর্গত বায়ুতত্ত্বের অধীন অষ্ট-ভুবনের অন্যতম।

অট্টহাস৭—রাঢ়ের সিদ্ধল গ্রামীণ সাবর্ণ গোত্রীয় ভবদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ভুবনেশ্বরের অনন্তবাসুদেব-মন্দিরে উৎকীর্ণ প্রশস্তিতে বালবলভীভুজঙ্গ ভবদেব ভট্টের বংশ-পরিচয় এইরূপ পাওয়া যায়—*

মহাদেব | ভবদেব | অট্টহাস

ভবদেব → রথাঙ্গ | অপর সাত পুত্র

রথাঙ্গ
|
অত্যঙ্গ
|
বুধ (স্ফুরিত)
|
আদিদেব
|
গোবর্দ্ধন
|
ভবদেব ভট্ট (বালবলভীভুজঙ্গ)

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাঢ়ীয়-ব্রাহ্মণ-বিবরণ, ৩০৪-৩১২ পৃ°।

শেষোক্ত ভবদেব ভট্ট রাজা হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রণাসচিব ও তৎপুত্রের দণ্ডনীতিদাতা ছিলেন।

বীরভূম জেলায় লাভপুর থানার মধ্যে সিদ্ধল গ্রাম বা সিধল গাঁ আজিও বর্ত্তমান আছে। রেনেলের মানচিত্রে এই স্থানের 'সিধল' নামই লিখিত হইয়াছে। এখন কেহ কেহ ইহাকে শীতল গ্রামও বলেন।

প্রবাদ, অট্টহাস সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে স্থানে সিদ্ধ হন, সেই স্থান সিধল গ্রাম হইতে সামান্য দূরে লাভপুরের পূর্ব্বাংশে অট্টহাস (ফুল্লরা) নামে প্রসিদ্ধ। ভবদেব ভট্টের শিলালিপি হইতে জানা যায়—তিনি "রাঢ়ের জনশূন্য জঙ্গল পথে, গ্রামের উপকণ্ঠে ও সীমাস্থানসমূহে শ্রান্ত পান্থগণের প্রাণতৃপ্তিকর এবং পর্য্যন্তভূভাগে একটী জলাশয় প্রস্তুত করাইয়াছিলেন—যে জলাশয়ে পদ্মবন পরিত্যাগপূর্ব্বক মধুকরগণ স্নানরতা কুলাঙ্গনাগণের মুখপদ্মের প্রতিবিম্বে বিমুগ্ধ হইত।" অনেকে মনে করেন, অট্টহাস যেখানে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারই স্মৃতিরক্ষার্থ ভবদেব সেইখানেই এই জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। লাভপুরের পূর্ব্বে ফুল্লরা পীঠের নিকটে দেবীদহ নামে যে বিস্তৃত জলাশয় মজিয়া ভরাট হইয়া গিয়াছে, তাহাই প্রাচীন ভবদেব ভট্টের প্রতিষ্ঠিত জলাশয় বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। ভবদেবের শিলালিপিতে আদি ভবদেবের জ্যেষ্ঠ মহাদেব বিরিঞ্চির সঙ্গে ও কনিষ্ঠ অট্টহাস হরের সঙ্গে তুলিত হইয়াছেন। হরের মহাযোগিত্ব অট্টহাসের সন্ন্যাসাশ্রমকেই ইঙ্গিত করে।*

অট্টহাস৮—(পুং) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে মাহেশ্বরাবতারযোগে ব্রহ্ম কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ভগবান্ রুদ্র কহিতেছেন—'বিংশতিতম পর্য্যায়ের সৃষ্টিবিস্তারে মহামতি বাচঃশ্রবা ব্যাস হইবেন। তখন আমি অট্টহাস নামে বিখ্যাত হইব। সেই হইতে লোক সকল অট্টহাসের অনুরাগী হইবে। সিদ্ধচারণসেবিত হিমালয়পৃষ্ঠে অট্টহাস নামক মহাপীঠে আমি বাস করিব। সেখানে তখন আমার সুমন্তু, বর্ব্বরি, সুবন্ধু ও কুশিকন্ধর নামে চারিজন মহাপ্রভব পুত্র উৎপন্ন হইবে। (ব্রহ্মাণ্ডপু°, ২৩.১৮৯-৯৩)

অট্টহাসক—(পুং) [অট্টহাস ইব কঃ প্রকাশো দীপ্তির্যস্য] [বৈদ্যক] কুন্দপুষ্পবৃক্ষ; কুঁদফুলের গাছ।

অট্টহাসিন্—(পুং) [অট্টং উচ্চৈঃ হসতি হস-ণিনি] শিব।

অট্টহাস্য—(ক্লী) উচ্চ হাস্য।

অট্টাট্ট—(পুং) [অট্ট অট্ট; এখানে অকারের লোপ হয় নাই] অত্যুচ্চ। ২ সর্ব্বোৎকর্ষ। ৩ অনাদরাধিক্য, অতি অযত্ন।

* বীরভূম-বিবরণ, ২য় খণ্ড, ২৬৪ পৃ°।

অট্টাট্টহাস—(পুং) অতি উচ্চ হাস্য।

অট্টাল—(পুং) [অট্টবৎ প্রাসাদগৃহবৎ অলতি ভবতি অল-অচ্] প্রাসাদের উপরিস্থিত গৃহ। "উচ্চাট্টালধ্বজবতীং (পুরীম্)।" (রামা° ১.৫.১১) ২ ভাগবত-টীকাকার শ্রীধর স্বামীর মতে, প্রাকারোপরিস্থ উন্নত স্থান। "ভজ্যমানপুরোদ্যানপ্রাকারাট্টালগোপুরম্।" (ভাগবত)

অট্টালক—(পুং) [অট্ট ইব প্রাসাদ ইব অলতি পর্য্যাপ্তো ভবতি। অল-অচ্ স্বার্থে কন্] প্রাসাদোপরিস্থ গৃহ। "অট্টালকশতাকীর্ণাং (লঙ্কাম্)।" (রামা°, ৫.২.১৭)

অট্টালয়া—(স্ত্রী) রাক্ষসীবিশেষ। স্কন্দপুরাণে (মাহে°, কুমা°, ৬৫.১০৯) লিখিত আছে—"কলিযুগে 'বৎসেশ্বরী' দেবীর প্রসাদে বৎস নামক রাজা এই রাক্ষসীকে নিহত করিবেন।" [অট্টালয়াজ দ্র°]

অট্টালয়াজ—গ্রামবিশেষ। স্কন্দপুরাণে (মাহে°, কুমা°, ৬৫.১০৮-১১২) লিখিত আছে—কলিযুগে বৎস নামক রাজা বৎসেশ্বরী দেবীর প্রসাদে অট্টালয়া নাম্নী রাক্ষসীকে নিহত করিয়া সেই বধস্থানে অট্টালয়াজ নামে একটী গ্রাম প্রতিষ্ঠা করিবেন। জনগণ কর্ত্তৃক উক্ত গ্রামে বৎসেশ্বরী দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। [বৎসেশ্বরী দ্র°]

অট্টালিকা,—(স্ত্রী) [অট্টালিক-টাপ্] ইষ্টকাদি নির্ম্মিত প্রাসাদ, রাজগৃহ। বৈদিক আর্য্যগণ স্মরণাতীত যুগ হইতে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে জানিতেন। ঋক্‌সংহিতায় 'সহস্রদ্বার' ও 'সহস্রস্তম্ভবিশিষ্ট' অট্টালিকার সন্ধান পাওয়া যায়। যথা—"সহস্রস্থূণ আসাতে।' (ঋক্ ২.৪১.৫) "বৃহংতং মানং বরুণ স্বধাবঃ সহস্রদ্বারং জগমা গৃহং তে।" (ঋক্ ৭.৮৮.৫) এতদ্ব্যতীত ঐ যুগে 'শতদ্বারবিশিষ্ট যন্ত্রগৃহ' (ঋক্ ১.৫১.৩) ও 'ইষ্টকনির্ম্মিত' গৃহাদিরও (বাজসনেয়স° ১৩.৩১) অস্তিত্ব ছিল। ঋগ্বেদের বহুস্থানে 'হর্ম্ম্য' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় (ঋক্ ৭.৫৫.৬; ১.১২১.১; ৯.৭১.৪; ৯.৭৮.৩; ৫.৩২.৫; ৮.৫.২৩; ১০.১১৪.১০; ৭.৭৬.২; ১০.৪৬.৩; ১০.৭৩.১০; ৭.৫৬.১৬)। সায়ন ইহার অর্থ করিয়াছেন 'প্রাসাদ' (ঋক্ ৭.৫৫.৬)। পৌরাণিক যুগেও রাজগণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা বা প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন, ইহা আমরা রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পাঠে জানিতে পারি। রামায়ণের বহুস্থানে সমুচ্চ অট্টালিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—"উচ্চাট্টালধ্বজবতীং শতঘ্নীশতসঙ্কুলাম্" (১.৫.১১) "সাট্টপ্রাকারতোরণাং (লঙ্কাম্)" (৫.৩.৩৩) "অট্টালকশতাকীর্ণাং (লঙ্কাম্)" (৫.২.১৭)। মহাভারতেও বহু স্থানে অট্টালিকার পরিচয় আছে (সভা°, ৮০.৩০; বন°, ১৭৩.৩; আশ্রমবাস°, ৫.১৬; মৌষল°, ৬.২৪)।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রধান প্রধান কাব্য ও নাটকে অট্টালিকার বর্ণনা আছে। বিশ্বকর্ম্মা-প্রকাশ, ময়মত বা ময়শিল্প ও মানসার নামক বাস্তুশাস্ত্রে নানাপ্রকার অট্টালিকা নির্ম্মাণের পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। যে মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের বিরাট্ সৌধ যবন-দূতগণকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করিয়াছিল; কিরূপে সেই সকল অট্টালিকা রক্ষিত হইত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। কৌটিল্য লিখিয়াছেন—"বিষ্কম্ভচতুরশ্রমট্টালকমুৎ-সেধসমাবক্ষেপসোপানং কারয়েৎ। ত্রিংশদ্দণ্ডান্তরঞ্চ দ্বয়োরট্টালকয়োর্মধ্যে সহর্ম্ম্যদ্বিতলাং দ্ব্যধ্যর্দ্ধায়ামাং প্রতোলীং কারয়েৎ। অট্টালকপ্রতোলীমধ্যে ত্রিধানুষ্কাধিষ্ঠানং সাপিধান-চ্ছিদ্রফলকসংহতমিতীন্দ্রকোশং কারয়েৎ।" (অর্থশাস্ত্র, ২.৩.২১) প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে অট্টালক শব্দে 'প্রাকারোপরিতন যুদ্ধস্থানং' (রামায়ণ—টীকা) অর্থাৎ প্রাকারের উপরে যে স্থান যুদ্ধোপযোগী করিয়া নির্ম্মিত হইত—সেই অংশও 'অট্টালক' নামে পরিচিত ছিল।

জগতের নানাস্থানে অট্টালিকার কিরূপে প্রসার হইয়াছে নিম্নে তাহা অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

মানবের আদিম অবস্থায় পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গুহা ও কন্দরের মধ্যেই অতিবাহিত হইয়াছিল। পার্ব্বত্য প্রস্তর-রাশির অন্তরালে কল্পিত নিভৃত বাসগৃহ নানা চিত্রাঙ্কনে ভূষিত হইত। সেকালের অসভ্য দলপতি ছিল বিশিষ্ট লোকচক্রের কর্ণধার; আর এসব গুহাই দলপতিদের ব্যবহারের পক্ষে পর্য্যাপ্ত ছিল।

আন্তর তাড়না ও বাহিরের বিপদের ভিতর দিয়া মানুষকে পত্র ও তৃণের কুটীর নির্ম্মাণ করিতে হইল। ক্রমশঃ সে সব



ভাটগাঁও অট্টালিকা—নেপাল।

ফেলিয়া মানুষ আপন জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে কাষ্ঠের বাসভবন নির্ম্মাণ করিল। আধুনিক বিরাট্ অট্টালিকা রচনার যুগেও পর্ণ-কুটীর ও কাষ্ঠভবন একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। জাপান, চীন, নেপাল এবং অন্যত্র কাষ্ঠের অট্টালিকাও দুর্ল্লভ নহে, কুটীরের ত কথাই নাই। ফ্রান্সের দোইনি (Doigny) প্রদেশে আদিম কাষ্ঠাবাসের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়; এসবকে luvards বলা হয়।

ক্রমশঃ কাঠের কুঁদো দিয়া কঠিনতর ও দৃঢ়তর দেওয়াল নির্ম্মিত হইল। এ প্রকারের নমুনাও মধ্যযুগে ইউরোপের বুকে



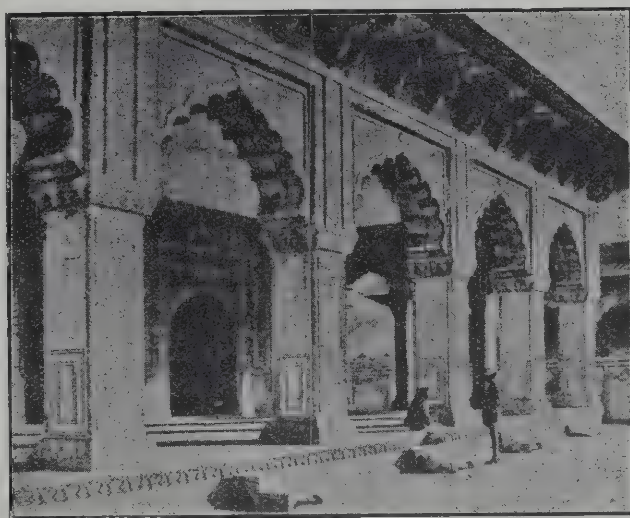
হানোভারের টাউন-হল (আধুনিক)।

ছিল। নরওয়ের হিটারডাল (Hitterdal) অঞ্চলের কাষ্ঠের গির্জ্জা সহজেই এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষন করে। ভারতবর্ষের খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০০০ অব্দের হর্ম্ম্যরচনাতেও দগ্ধ ইষ্টকের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়—যদিও তপোবনের পর্ণকুটীরের আকর্ষণ সামান্য ছিল না। সকল দেশেই অতি প্রাচীনকাল হইতে ইষ্টকের ও প্রস্তরের হর্ম্ম্যকীর্ত্তি মানব-সভ্যতাকে নানা রূপৈশ্বর্য্যে পরিপুষ্ট করিয়াছে। কারণ আসীরীয়া, পারস্য ও রোমক সাম্রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাসে ইষ্টকনির্ম্মিত প্রকাণ্ড অট্টালিকার সন্ধান বিরল নহে।

এ সকল হর্ম্ম্যের গঠনে দুইটী ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীনকালে সরল বা trabeated খিলানের প্রথা ছিল বলিয়াই এ শিল্প প্রথমে তত প্রসার লাভ করে নাই। ইহার পরবর্ত্তী যুগে বঙ্কিম বা arcuated বন্ধন সমগ্র স্থাপত্যকলাকে অসীম-ভাবে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। এই বঙ্কিম খিলান ও চাক্রিক রীতির প্রকৃষ্ট মর্ম্মগ্রহণে স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠতম হৃদয়োচ্ছাস অভূতপূর্ব্ব বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে এবং অশেষরূপে নব-প্রচেষ্টার সাফল্যে মণ্ডিত হইয়াছে।

ইদানীন্তন যুগে বিরাট্ সৌধরচনা অনেকটা সাধারণের করায়ত্ত। ধন-সঞ্চয়ের নব্য পদ্ধতিতে নানা শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে নূতন রাজাদের আবির্ভাব

ঘটিয়াছে। আমেরিকায় তাঁহাদিগকে ইস্পাতের রাজা (Steel king) বা কয়লার রাজা (Coal king) বলা হয়। এ দেশেও সে সকল নাম ক্রমে চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। এ সকল রাজাদের অট্টালিকাও এ যুগে জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। প্রাচীন যুগের সম্রাট্‌গণ মন্দির-রচনায় প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াছেন। এজন্য প্রাচীন মিশর, পারস্য, কাল্‌দীয়া, সীরিয়া, আসীরীয়া ও বাবিলনের হর্ম্ম্যচেষ্টা বহুল পরিমাণে ধর্ম্মগত রচনায় উৎসারিত হইয়াছে। [গুহামন্দির ও মন্দির শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্র°] কিন্তু তবুও রাজা-দিগের অট্টালিকা যে এ ক্ষেত্র হইতে একেবারে বাদ পড়িতেছে, তাহা নহে। রাজার পুরী ভোগবিলাসের উপকরণে সজ্জিত হওয়া স্বাভাবিক। যাহা ধর্ম্মমন্দিরে প্রকট করা সম্ভব হয় নাই, তাহা রাজগৃহে পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন মিশর ও পারস্যে স্থপতির হস্তকৌশলের লীলায়িত ভঙ্গীতে এইরূপেই রূপরসের বিচিত্র ডালি সজ্জিত হইয়াছে।



অক্‌বরের প্রাসাদ—আগ্রা।

বলা প্রয়োজন, স্থাপত্যশিল্প বহু কান্তকলার উৎসস্বরূপ। স্থাপত্যকে কেন্দ্র করিয়াই ভাস্কর্য্যাদি কলার রসবিভঙ্গ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিরাট্ মন্দিরের পূজামণ্ডপ বা নৃপতির বিশাল দরবারগৃহ এই প্রকার রূপালঙ্কারে ভূষিত হয়। সুতরাং ইহা এইভাবে মানুষের সৌন্দর্য্যরচনার কেন্দ্রস্থানীয় হইয়া পড়ে। এজন্য এ যুগের ইংরেজ শিল্প-রসিক বলিয়াছেন, স্থাপত্যকলাই সকল শিল্পের উৎপত্তিস্থল।*

বস্তুতঃ মানবচিত্তের সুকুমার ভাবোদ্দীপনার অমৃতফল হইতেছে সৌধশিল্প। পর্ব্বতশিখরে বা গুহায়, মরুভূমির বিশুষ্ক প্রান্তরে বা স্রোতস্বতীর পুলিনে—সর্ব্বস্থানেই মানবের মর্ম্মরস্বপ্ন সকল যুগের বার্ত্তা বহন করিয়া বিশ্বকে পুলকিত করিতেছে। সুপ্রাচীন অট্টালিকার নীরব ভাষা আধুনিক মানবকে একান্তভাবে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সুদূর-বর্ত্তী যুগের স্থাপত্যকীর্ত্তির পরিচয় প্রতিদিন লোক-চক্ষুর গোচরীভূত হইয়া জগৎকে আকৃষ্ট করিতেছে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে দেবমন্দিরের আলোচনা ছাড়িয়া তাহারই যুগ্মসহচর, রাজপ্রাসাদ সম্বন্ধেই মুখ্যভাবে আলোচনা করা যাইতেছে। বাস্তবিক পক্ষে এই দুই শ্রেণীর হর্ম্ম্যই অনেকটা অঙ্গাঙ্গী। শিল্প-সৃষ্টির বিচারে ইহার কোনটীই অন্যটীর পশ্চাতে নাই।

ইউফ্রেতিস্ ও তাইগ্রিস্ উপত্যকায় খৃষ্টপূর্ব্ব ৪০০০ বর্ষের প্রাচীন ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ত্রিকোণ খিলানের (arch) একাংশ পাওয়া গিয়াছে। তাইগ্রিস্ নদীর পূর্ব্বাঞ্চলে বর্ত্তমান মোসল শহরের নিকটে কুয়ুন্‌জিক্ (Kuyunjik) এবং নেবি-য়ুনুস্ (Nebi Yunus) স্তূপ খনন করিয়া বাবিলন ও আসীরীয়ার বহু বৎসরের ভগ্নাবশেষ (খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৫০০ বর্ষ হইতে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক পর্য্যন্ত) আবিষ্কৃত হইয়াছে। লণ্ডনের বৃটীশ মিউজিয়মে এখানকার প্রায় ১২০,০০০ নমুনা সংগৃহীত রহিয়াছে। এখানে আবিষ্কৃত দুইটী বিধ্বস্ত রাজাট্টালিকার মধ্যে একটী হইতেছে রাজা অসুরবনিপালের (খৃষ্টপূর্ব্ব ৬৬৮-৬২৬ অব্দ) এবং দ্বিতীয়টী রাজা ঈশারহদ্দনের (খৃষ্টপূর্ব্ব ৬৮১-৬৬৮ অব্দ) অট্টালিকা। এই সকল মহাসৌধের ঐশ্বর্য্য দেখিবার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইলেও আধুনিক জগৎ

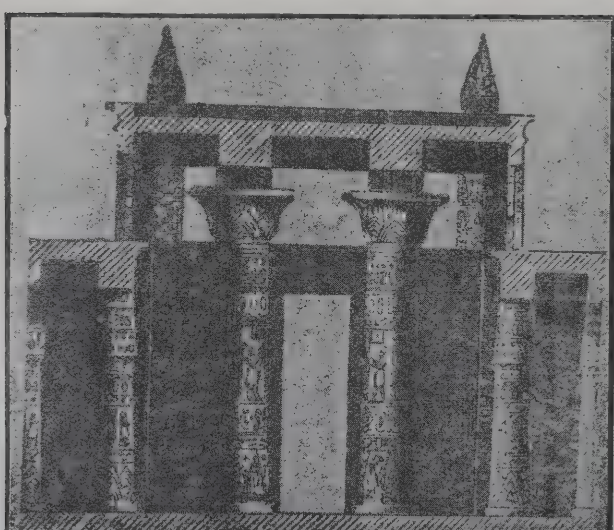


উইণ্ডসর অট্টালিকা—ইংলণ্ড।

ইহাদের বিরাটত্বের ধারণা করিতে অসমর্থ নয়। প্রাচীন আসীরীয়া ও বাবিলনের প্রাসাদগুলি সামান্য ছিল না। খোর্‌সা-বাদে সার্‌গণের যে অট্টালিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে প্রায় সাতশত প্রকোষ্ঠ ছিল ও তাহা প্রায় পঁচাত্তর বিঘা ভূমির উপর দণ্ডায়মান ছিল। কাল্‌দীয়ার উর্ (Ur) হইতে খৃষ্টপূর্ব্ব ২০০০ বর্ষের পুরাতন মনুষ্যের ব্যবহৃত হর্ম্ম্য বাহির হইয়াছে।

* "I believe architecture must be the beginning of arts." —'Modern Painters' by Ruskin.

বিলাতের যাদুঘর ও পেন্সিল্ভানিয়া যাদুঘর হইতে প্রত্ন-সম্পদ্ প্রাপ্তির আশায় যে যুক্তযাত্রা হয়, তাহারই অধিনায়ক মিঃ উলী (C. Leonard Wooley) তাঁহাদের আবিষ্কৃত একটী অট্টালিকার নাম দিয়াছেন "Paternoster Row"। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ যুগেও পোড়ান ইটের ব্যবহার ছিল। এ সমস্ত স্থানের জিগারৎ (Ziggurat)ও বিশ্ববিশ্রুত। বস্তুতঃ আধুনিক ইরাক্ রাজ্য নিনেভা, বাবিলন, উর্ ও সেনাকেরিবের সম্পদে ভরপুর। জর্মন্ প্রত্নতত্ত্ববিদ্রা ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাবিলনের নানাস্থান খনন করিয়া বিখ্যাত রাজা নেবুকাড্রেঝারের (Nebuchadrezzar) অট্টালিকা আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা খৃষ্টপূর্ব্ব ৬০৫-৫৬২ অব্দের রচনা। সেনাকেরিবের প্রাসাদ সম্বন্ধে কোনও লেখক লিখিয়াছেন,—আরব্য ও পারস্য উপন্যাসে যে সকল মেঘালিঙ্গিত প্রাসাদের উল্লেখ আছে, এই প্রাসাদও তাহাদের তুল্য ছিল। সেনাকেরিবের প্রাসাদের মধ্যস্থ প্রাচীন চিত্রসম্পদ্ ও মূর্ত্তিনিচয় খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতকের আসীরীয় সভ্যতার একটা প্রস্ফুট আলেখ্য ছিল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে হোর্মুজ্-রসমে (Hurmuzd Rassam) আবিষ্কৃত অসুরবনিপালের বিপুল প্রাসাদ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—



হিপোষ্টাইল (Hypostyle) প্রকোষ্ঠের সেক্সন্ (Section)—মিশর।

"If it did not surpass that of Sennacherib in sheer beauty of design, it assuredly far outstrips it in the universal interest which its contents have for the modern world ; it contained a portion of the famous library of Asurbanipal, the repository of those clay-tablets inscribed with cuneiform scripts which deal with every phase of Assyrian life and history"

খোর্সাবাদে দ্বিতীয় সার্গনের (Sargon) অট্টালিকার ঐশ্বর্য্যও এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ছিল। ফেলিক্স টমাস্ এ বিষয়ে যে নক্সা অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে প্রাচ্যচিত্তের ঐশ্বর্য্যময় কল্পনার উদ্ভ্রান্ত নাট্যলীলা দেখিতে পাওয়া যায়। এ সমস্ত প্রাচীন সৃষ্টির নিকট আধুনিক আকাশচুম্বী Skyscraper অতি নগ্ন, রিক্ত ও শ্রীহীন বলিয়া মনে হয়।

পরবর্ত্তী যুগে প্রচলিত প্রাসাদ-দুর্গের সূত্রপাতও এই সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, কারণ ২য় সার্গনের অট্টালিকা অনেকটা প্রাসাদ-দুর্গজাতীয়। এগুলি ঠিক দুর্গ নহে—এ সব আত্মরক্ষণের আয়ুধযুক্ত অট্টালিকা। এ জাতীয় ভবন সার্দ্দিনিয়াতে নুর্হাগ্ (Nurhags) নামে পরিচিত। দেখা যাইতেছে, প্রাচীন নিনেভা, নিম্রুদ্ এবং খোর্সাবাদের প্রাসাদগুলি অতিশয় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। মিঃ প্লেস্, মিঃ বট্টা এবং অন্যান্য খননবিদ্গণ এই সকল স্থান খনন দ্বারা যাহা উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে প্রাচীন আসীরীয় রাজাদের ভোগবিলাসের পারিপাট্য ও ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হয়। কাল্দীয়াতে প্রস্তর মিলিত না, এজন্য আসীরীয়দের নিকট এখানকার শিল্পিগণকে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইত; অন্যদিকে কাল্দীয়ার নিকট আসীরীয়া শুধু শিল্পকলা নয়, সাহিত্য, ধর্ম্ম প্রভৃতি বহুবিষয়ে ঋণী ছিল।

পারস্য-অট্টালিকার একটা বিশ্বব্যাপী যশঃ আছে। দরায়বুস (Darius) প্রভৃতি পারস্য সম্রাট্গণের ঐশ্বর্য্য কাব্যের ও কল্পনার বিষয়ীভূত হইয়াছে। টিরিন্স (Tiryns), মাইসেনী (Mycenae) ও থেরা প্রভৃতি স্থানে নানা অট্টালিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে Schliemann ও Dorpfeld এই সকল অট্টালিকার সর্ব্বত্রই রঙ্গীন আস্তরণ দেখিতে পান। এই সকল অট্টালিকার মেগারণ (megaron) বা প্রকাণ্ড অভ্যর্থনাগৃহ যেমন বর্ণগৌরবে সমৃদ্ধ, তেমনি অপ্রকাণ্ড ঘরগুলির দেওয়াল ও ছাদ রঙ্গীন নক্সায় পরিপূর্ণ ছিল। ১৯০০-১৯০২ খৃষ্টাব্দে যখন ডাঃ ইভান্স, ডাঃ মাকেঞ্জী ও মিঃ ফাইফ্ ক্রীট্ দ্বীপে নোসসের (Cnossos) অট্টালিকা খনন করেন, তৎকালে সেই স্থানেও এইরূপ রঙ্গীন আস্তরণ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

পারস্য-সম্রাট্ দরায়বুসের প্রাসাদ খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকের রচনা। সম্প্রতি কএকটী স্তম্ভ ও সরল খিলান ছাড়া ঐ বিরাট্ প্রাসাদের আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে হারকোর্ট

স্মিথ্ এই প্রাসাদ হইতে কএকটী চমৎকার মূর্ত্তির ছাঁচ লইয়া আসেন। এই মূর্ত্তিগুলিতে আসীরীয় প্রভাব প্রস্ফুট। অল্পদিন হইল ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ আর্ণেষ্ট্ হার্জ্জ্‌ফিল্ড্ পার্সিপোলিসে খননকার্য্য আরম্ভ করিয়া কএকটী প্রশস্ত সিঁড়ি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা প্রায় ২৫০০ বৎসরের

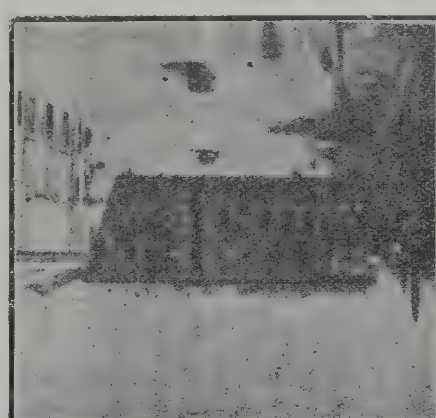


আগ্রার দুর্গপ্রাসাদ।

পুরাতন, কিন্তু তথাপি অট্টালিকার দেওয়ালে তক্ষণকলার নৈপুণ্য জীবন্তভাবে বর্ত্তমান। দরায়বুসের প্রাসাদ পরবর্ত্তী সম্রাট্‌গণ কর্ত্তৃক সমৃদ্ধ ও বৃহত্তর করা হয়। ক্ষয়ার্ষার (Xerxes) নির্ম্মিত সভাগৃহ ৩০০ ফুট লম্বা ছিল। একটীমাত্র প্রকোষ্ঠের এরূপ আয়তন সচরাচর দেখা যায় না। পার্সিপোলিসের সহস্রস্তম্ভযুক্ত বিরাট্ প্রকোষ্ঠ জগতের পক্ষে একটা বিস্ময়ের বস্তু। বস্তুতঃ বিরাটত্ব, ঐশ্বর্য্য ও বর্ণবিন্যাসের জন্য পারস্য-অট্টালিকা জগতে সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। সেকালের পারস্য-সম্রাট্‌গণ কিরূপ বিলাস-বিভবের মধ্যে বাস করিতেন, তাহা Book of Esther নামক পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। বিশাল অট্টালিকা ছিল এই সকল বিলাসচেষ্টার বাহন। ফিনীসীয়, মিশরী ও গ্রীক্ কারিগর-দিগকেই সাধারণতঃ এই সকল অট্টালিকা নির্ম্মাণের কার্য্যে নিযুক্ত করা হইত। এই সকল অট্টালিকার মঞ্চই প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ। ক্ষয়ার্ষার (Xerxes) সভাগৃহ (Hall) ইংলণ্ডের কাণ্টারবেরী গির্জ্জার আয়তন অপেক্ষাও বৃহত্তর ছিল। আড়াই হাজার বর্ষ পূর্ব্বের সম্রাটের পক্ষে এরূপ বিপুল ও বিরাট্ দরবারগৃহের নির্ম্মাতা হওয়ার স্পৃহা একটা সুমহান্ আদর্শ হইতেই জাগ্রত হইয়া থাকিবে।

মিশরের রাজাদের লক্ষ্য ছিল পরলোকের দিকে। এ জন্য পিরামিডের ভিতরে সুসজ্জিত নানা প্রকোষ্ঠে পরলোকের সহায়ভূত নানা দ্রব্যসম্ভার রক্ষিত হইত। ইহলোকের ঐশ্বর্য্যের প্রতিভূস্বরূপ মিশরের দেবমন্দিরগুলি বিখ্যাত। খৃষ্টপূর্ব্ব ১২৫০ অব্দে তিনজন সম্রাটের (Pharaoh) ক্রমিক সহায়তায় কার্ণাকের Hypostyle প্রকোষ্ঠ সম্পূর্ণ হয় (খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ ১৫৮০-১৩২২)। ইহার প্রত্যেকটী স্তম্ভ উচ্চতায় ৮০ ফুট এবং প্রকোষ্ঠটী দৈর্ঘ্যে ৩৩৮ ফুট ও বিস্তারে ১৭০ ফুট ছিল। দ্বিতীয় রামেসিস্ কর্ত্তৃক এই অট্টালিকা সম্পূর্ণ হয়। খৃষ্টপূর্ব্ব ১৬০০ হইতে ১১১০ অব্দ পর্য্যন্ত মিশরীয় সভ্যতা ও শীলতার মধ্যাহ্নকাল। এই সময়েই মিশরের গৌরব প্রখরভাবে দীপ্ত হইয়াছিল।

রাজপ্রাসাদ সম্বন্ধীয় আলোচনায় ভূমধ্যসাগরের মধ্যস্থিত ক্রীট্ দ্বীপেরও উল্লেখ করিতে হয়। কারণ কাহারও মতে পৃথিবীর বৃহত্তম ও প্রাচীনতম প্রাসাদের সৃষ্টি হইয়াছিল এই দ্বীপে। স্যর্ আর্থার ইভান্স্ ১৯০০ হইতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দ্বীপে খননকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এখানকার সভ্যতা জগতে মিনোয়ান (Minoan) সভ্যতা নামে পরিচিত হইয়াছে। নোসস্ অট্টালিকা এই দ্বীপের একটা প্রধান সম্পদ্। ক্রীট্ দ্বীপের সভ্যতার ধারা খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৪০০ অব্দ হইতে ১২০০ অব্দ পর্য্যন্ত। মিনসের (Minos) অট্টালিকাটী দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় ৪৫০ ফুট। এই অট্টালিকা সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব ১৬০০ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ইহার মধ্যে বারান্দা, বিশ্রামঘর, সিংহাসনপ্রকোষ্ঠ, তত্ত্বদর্শনগৃহ, প্রবাস্ত সোপান, উচ্চ মঞ্চ প্রভৃতি প্রচুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে। স্মিথ সাহেব (A. H. Smith) লিখিয়াছেন—"The Palace of Cnossos is a stupendous monument of a period



প্রাচীন রোমক রঙ্গমঞ্চ (বহির্ভাগ)।

long anterior to Greek history and to Greek literature. But if it stood merely as an architectural wonder, more than half its interest and

value would be lost. It is by a minute study of its pottery, its porcelain, its gems, inlays, alabastor, frescoes, inscribed tablets and religious emblems that the excavator has restored to the world a whole buried civilisation hitherto hardly guessed at or imagined.".*

এই প্রসঙ্গে মধ্য আমেরিকার মায়া বা ময় সভ্যতার উল্লেখ প্রয়োজন। ময় সভ্যতাকে খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৫ অব্দের ব্যাপার বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। এ অনুমান কতটা সত্য বলা যায় না। চিচেন ইজার সন্ন্যাসিনীদের অট্টালিকা দেখিলে এখনও মুগ্ধ হইতে হয়। চিচেঙ্কোব্ বা লোহিত প্রাসাদটীও অতি মনোহর। এই সকল অট্টালিকা দেখিলে ময় সভ্যতার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মে। এখনও ময়-লিপির ঠিক পাঠোদ্ধার হয় নাই। সুতরাং এখনও আমরা এই সভ্যতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই।

প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। অসংখ্য বিরাট্ সৌধাবলীতে পরিপূর্ণ পালাতাইন্ পাহাড়ের মধ্যস্থলে ছিল সম্রাট্ অগষ্টাসের প্রাসাদ। বর্ত্তমানে এই সকল প্রাসাদের ভিত্তিমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। তবে ডায়োক্লিসিয়ানের প্রাসাদটী এখনও অনেকটা ঠিক আছে। রোমের স্নানাগারগুলিও স্থাপত্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন। ডায়োক্লিসিয়ানের স্নানাগারটী ৩০৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। উহাতে প্রায় তিন হাজার লোকের স্থান সঙ্কুলান হইত। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ৩য় নেপোলিয়ন কর্ত্তৃক পালাতাইন্ পাহাড়ের খননকার্য্য আরব্ধ হয় এবং পরবর্ত্তী কালে ইতালীয় গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্যে আরও অগ্রসর হন।

বৈজন্তীয় শিল্পে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রণালীর সংমিশ্রণ হইয়াছে। বৈজন্তীয় স্থাপত্যের দুইটী যুগ—একটী খৃষ্টীয় ৪র্থ হইতে ৬ষ্ঠ শতকের, অপরটী ৮ম হইতে ১৩শ শতকের। বৈজন্তীয় স্থাপত্য অধিকাংশ স্থলেই ধর্ম্মচেষ্টার বাহনস্বরূপ। প্রাচ্য বৈচিত্র্য



উদয়পুরের রাজপ্রাসাদ।

পরবর্ত্তী যুগে পশ্চিমের রোমক সভ্যতা বিরাট্ সৌধ ও সৌধকল্পনা সৃষ্টি করিয়া প্রতীচ্য সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। রোমক শিল্পী প্রচুরভাবে বঙ্কিম খিলানের ব্যবহার করিয়াছেন। গ্রীক্ শিল্পী কিন্তু এই পথ অনুসরণ করেন নাই। রোমের বিরাট্ রঙ্গমঞ্চগুলি (amphitheatres) অনেকটা অট্টালিকা-স্থানীয়; এ গুলির সৌন্দর্য্য এ যুগেও সকলের চিত্তহরণ করিতেছে। রোমের কলোসিয়াম্ রঙ্গমঞ্চ ৭২—৮০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ৬১২ ফুট ও বিস্তারে ৫১৫ ফুট এবং উচ্চতায় ১৬০ হইতে ১৮০ ফুট পর্য্যন্ত। এই রঙ্গমঞ্চে রোমক বীরগণ মিলিত হইতেন। ভেরোনা, কাপুয়া, পোলা, পম্পিয়াই প্রভৃতি স্থানেও এই প্রকার মঞ্চ রচিত হইয়াছিল। রোমক সম্রাট্গণের বৃহৎ অট্টালিকাগুলির সামান্যই অবশিষ্ট আছে। নীরোর প্রায় এক মাইলব্যাপী স্বর্ণাট্টালিকার কথা তৎকালে বিশেষ

ও রসবত্তা পাশ্চাত্ত্য নীরস বিশ্লেষণ ব্যবস্থার দ্বারা সংহত হইয়াছে বলিয়া তাহা হৃদয়তত্ত্বকে গভীরভাবে প্রস্ফুট করিতে পারে নাই। যাহাকে গথিক্ শিল্প বলা হয়, তাহার মধ্যেও রহিয়াছে অস্থৈর্য্য।* অসংখ্য খিলানের চাঞ্চল্যময় প্রাচুর্য্যে গথিক্ শিল্পের মধ্যে প্রাচ্য ভক্তিবাদের সংযম ও প্রশান্তভাব রক্ষিত হয় নাই। অধ্যাপক লুডোভিসি গথিক্ স্থাপত্য প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,† "All this mass of stone are at loggerheads and at variance with each other and their strife never ceases." লুব্কেও বলেন, ‡ "...a positive

* "Wonders of the Past" by A. H. Smith.

* On the nature of the work of Art by Heppolyte Taine. pp. 131-33.

† A. M. Ludovici—Lectures, University College, London, 1910.

‡ Outlines of the History of Art by Dr. W Lubke, Vol. II, p. 14-15.

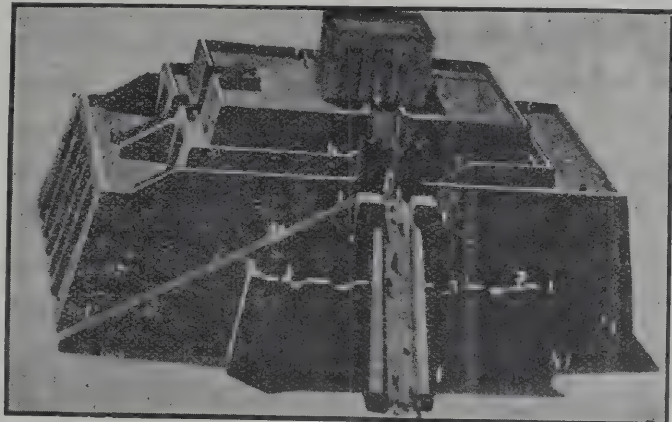
sense of disquiet and confusion is produced"—অর্থাৎ এই সমস্ত সৃষ্টি মনে একটা চঞ্চল ও বিশৃঙ্খল ভাব উদ্রিক্ত করে।

প্রাচ্য শান্তিবাদের সহিত এই বিরোধ বহুকাল যাবৎ ইউরোপীয় জগতে প্রকট হইয়াছিল। অবশেষে ইহা রেনেসাঁস্ (Renaissance) স্থাপত্যে একটা সঙ্কীর্ণ ঋজুতা ও উপকরণের স্থূল বিশালত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বিস্ময়ের বিষয়, ইহা লইয়া ইউরোপ গর্ব্ব করিতে ইতস্ততঃ করে না। প্রাচ্যের ভাগবত ঐশ্বর্য্য ও রসমূলক সাধনার সহিত পরিচয় না থাকায় ইউ-রোপের এই প্রকার মনোবৃত্তি সম্ভবপর হইয়াছে।

সম্প্রতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত-গণ ভারতীয় স্থাপত্যের গৌরব ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছেন। ডাঃ ফাগুর্সন্ প্রমুখ বহু প্রত্নতত্ত্ববিৎ ভারতের বিচিত্র ঐশ্বর্য্য দেখিয়া এ দেশের বিস্ময়কর দানের উল্লেখ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। চীন ও জাপানের সম্পদ্ও সামান্য নহে। ইস্লামীয় স্থাপত্যকীর্ত্তিও বিরাট্ সৃষ্টিগৌরবের অধিকারী। সে সৃষ্টির মধ্যে ভারতীয় শিল্পধারার অনুপম ঐশ্বর্য্য সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে।

যে সকল ইউরোপীয় পণ্ডিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয়বিধ রম্য শিল্পের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিগণও স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতের মর্ম্মবার্ত্তা উপলব্ধি করিবার অধিকার তাঁহাদের জন্মে নাই। বিখ্যাত মিশর-তত্ত্ববিৎ ফ্লিণ্ডার্স পেট্রি বলেন,—"Eastward it is difficult for us to enter into the fundamental feelings of the races to enable us to value their art." প্রাচ্যশিল্পসৃষ্টির একটী বিরাট্ স্তম্ভ হইতেছে ভারতের সৃষ্টি-পরম্পরা। অতি প্রাচীনকালের ভারতীয় সৌধমালা এখনও আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত রহিয়াছে; কারণ পৌরাণিক যুগের স্থাপত্যকেন্দ্রগুলি এখনও উপযুক্তরূপে খনিত হয় নাই।

সম্প্রতি হারাপ্পা ও মহেঞ্জো-দেরোর আবিষ্কারসমূহ ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের অবতারণা করিয়াছে। এইগুলি খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০০০ অব্দের বিপুল ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। সে সভ্যতার দান অসামান্য। উহা পরবর্ত্তী যুগের সভ্যতার সহিত পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়াছে কি না, মধ্যযুগের রহস্য উদ্ঘাটিত হইলেই তাহা নির্ণীত হইবে। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্যর্ জন্ মার্শাল অনেকটা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—"If therefore those scholars are right who consider the Sumerians to have been an intrusive element in Mesopotemia, then the possibility is clearly suggested of India proving ultimately to be the cradle of their civilisation which in its turn lay at the root of Babylonian, Assyrian and Western Asiatic culture generally." অর্থাৎ সুমেরীয়গণ যদি এখান হইতে মেসোপোটেমিয়ায় গিয়া থাকে, তাহা হইলে বাবিলন, আসীরীয়া এবং পশ্চিম এশিয়ার সভ্যতার জন্মস্থান হইতেছে ভারতবর্ষ।

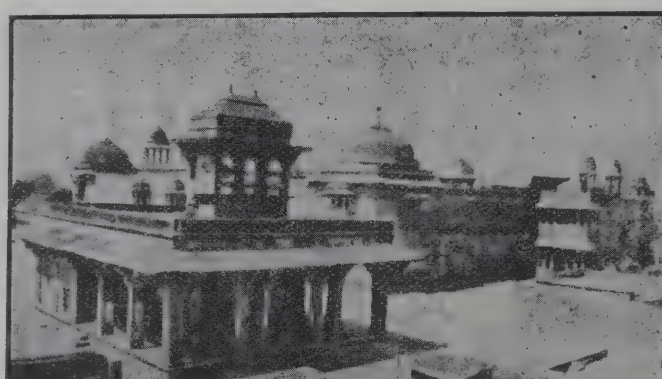


জিগারৎ—বাবিলন।

উপরোক্ত অনুমান যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস একটা স্বপ্নপ্রয়াণের মতই বোধ হইবে। মহেঞ্জো-দেরোতে পোড়ান ইট দিয়া অট্টালিকাদি রচিত হইয়াছিল। এখানকার স্নানাগারগুলিও এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি—রাস্তার ধারের দেওয়াল প্রায় ২০ ফুট উচ্চ। সম্ভবতঃ সকলেই স্নানাগার হইতে উপরে উঠিবার সিঁড়ি দিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠে গমন করিত। এই সমস্ত ধ্বংসাবশেষের ভিতরও নগরটীর প্রাচীন ঐশ্বর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়। নগরের পয়ঃপ্রণালী একান্ত অভিনব। মাকে সাহেব (Mr. Mackey) বলেন,—"The drainage system of the city is exceedingly elaborate—its like has not been found in any other city of the same date even outside India." জলনির্গমনের সুবিধার জন্য মধ্যে মধ্যে সেতুর ব্যবহারও দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ বৈজ্ঞানিক সুব্যবস্থা বিশেষ শিল্পোন্নতির পরিচায়ক। মহেঞ্জো-দেরোর যুগের সহিত পরবর্ত্তী যুগের শিল্পধারার যে সংযোগ নাই, এ কথা বলা চলে না। কারণ, অর্দ্ধনিমীলিত-নেত্রযুক্ত মূর্ত্তি মহেঞ্জো-দেরোতে আবিষ্কৃত হইয়াছে;—এই প্রকার মূর্ত্তি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ভারতের নানা দেবতা, অবতার ও

অতিমানবকে আশ্রয় করিয়া রচিত হইয়া আসিয়াছে। এই অতিপ্রাচীন যুগের মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয়, তৎকালেও ভারতবর্ষ গভীর চিন্তাশীল ছিল এবং সর্ব্বত্রই মনোজগতের সমুচ্চবিধানের চর্চ্চা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিত। ভারতীয় সভ্যতা ও শীলতা যে যুগ হইতে সৌধকলার মধ্য দিয়া আত্মপরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই যুগ হইতেই উহা নিজের গভীর আন্তর দীক্ষা ও ভাবপ্রবণতাকে উন্মুক্ত করিতে ইতস্ততঃ করে নাই। শুধু বিরাট্‌কে বা বিচিত্রকে কল্পনা করা নয়, শুধু অলঙ্করণের অন্ধ প্রাচুর্য্যকে মুখ্য করিয়া তোলা নয়—সমগ্র ভাবজগতের সর্ব্ববিধ রসের রূপদানই ভারতীয় শিল্পের আদর্শ ছিল। সৌধকলার বহিরবয়বের সহিত অন্তরবয়বের যে একটা সামঞ্জস্য প্রকাশের চেষ্টা রহিয়াছে, তাহা হইতেই এ কথা সুস্পষ্ট হইবে। একটী অন্তরঙ্গ ভাবকে প্রকৃষ্টভাবে রূপে ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া ভারতীয় স্থাপত্য জগতে অবিনশ্বর হইয়া আছে।

মানসার নামক বাস্তুশাস্ত্রে সমুচ্চ অট্টালিকার পরিস্থিতি ও দৃঢ়ত্বের জন্য যে শ্রেণীভেদ দৃষ্ট হয়, তাহাতেই হর্ম্ম্যসমূহের অন্তর্দিক্ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সাধারণতঃ এরূপ বিধান স্থাপত্য চেষ্টার পশ্চাতে নাই বলিলেই হয়। ইহাতে যে কয়টী বিচিত্র রূপের কথা আছে, তাহাতে রসসম্পুটের একটী পরিপূর্ণ প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্চতার সহিত প্রস্থের সামঞ্জস্য সাধনে পাঁচ প্রকার রসসঞ্চার কল্পনা করা হইয়াছে। যথা—(১) যে অট্টালিকার উচ্চতা ও প্রস্থ সমান, তাহাকে ‘শান্তিক’ বলে; উহা শান্তরসের প্রকাশক। (২) প্রস্থ অপেক্ষা উচ্চতা ১¼ বেশী হইলে তাহাকে ‘পৌষ্টিক’ রচনা বলে; ইহা সুদৃঢ় ও ঐশ্বর্য্যপূর্ণ। (৩) প্রস্থ অপেক্ষা উচ্চতা ১½ গুণ অধিক হইলে তাহাকে ‘জয়দা’ বলা হয়। (৪) উচ্চতা প্রস্থ অপেক্ষা ১¾ বেশী হইলে তাহাকে ‘সর্ব্বকামিকা’ বা ‘ধনদা’ পরিমাণ বলে। (৫) প্রস্থ অপেক্ষা উচ্চতা দ্বিগুণ হইলে তাহা ‘অদ্ভুত’ নামে অভিহিত হয়।* সুতরাং দেখা যাইতেছে, উচ্চতা ও প্রস্থের দিক্ হইতে অতি সুনিপুণ ভাবে হর্ম্ম্যের পরিমাণকে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে; এবং এ সমস্ত রচনাকে শান্ত, পুষ্ট, অদ্ভুত প্রভৃতি আখ্যা দ্বারা আমাদের মনোজগতের সহিত যেন মধুর সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা দেখা যাইতেছে। বস্তুতঃ এক একটা হর্ম্ম্য অনেকটা জীবন্ত বা প্রাণবান্ বস্তুরূপেই কল্পিত হইয়াছে। স্থপতির সৃষ্টি যেন জড়ত্বের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া মূর্ত্তির ভিতর দিয়া এক একটা কল্পনাকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। এজন্য হর্ম্ম্যশ্রেণীকে পুরুষ, নারী ও ক্লীব আখ্যাও দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষ সৌধসমূহে মানবত্ব আরোপ করিয়া জগতের ইতিহাসে শিল্পচেষ্টার এক নূতন কৃতিত্ব উদ্ঘাটন করিয়াছে। ভুবনপ্রদীপ নামক বাস্তুশাস্ত্রে একটী কথা আছে—“মেঘনাদ পুংসবিমান। এ প্রমাণে সবু প্রাসাদ হোই” অর্থাৎ যে পুরুষ বিমান আছে, তাহাকে মেঘনাদ বলিয়া জানিবে; সমস্ত প্রাসাদের বিষয়ে এই প্রমাণ সত্য। হর্ম্ম্যাদির অংশসমূহের যে সমস্ত পারিভাষিক নাম আছে, তাহাতেও মনে হয় হর্ম্ম্যাদিকে মনুষ্যরূপে পরিকল্পনা করা হইত। যেমন উড়িষ্যায় প্রাসাদের সর্ব্বনিম্ন অংশ ‘পাদভাগ’ এবং তদুপরি অংশ যথাক্রমে ‘জাংঘ’, ‘বেকি’ (গলা), ‘কপুরি’ প্রভৃতি নামে আখ্যাত হয়।

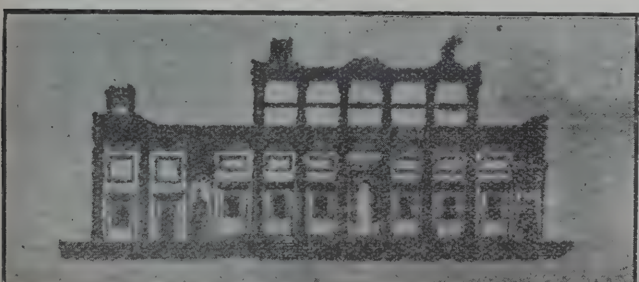


যোধাবাঈর অট্টালিকা—ফতেপুর সিক্‌রী।

মানুষকে যেমন নানা অলঙ্কারে সাজান হইয়া থাকে, সেইরূপ এক একটী প্রাসাদকেও ভূষিত করিবার ব্যবস্থা ছিল। ভুবনপ্রদীপের আর একটী বাক্য হইতে এই বিষয়টী অধিকতর পরিস্ফুট হয়—“শিখরহীন প্রাসাদং। ইতরজন যথা মহা।” অর্থাৎ ইতরজন যেমন মহান্ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া হাস্যাস্পদ হয়, তদ্রূপ শিখরহীন প্রাসাদও লোকের উপহাসের বস্তু। শিখরহীন মন্দিরকে কোন কোন গ্রন্থে নপুংসক আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। প্রাসাদ ও মন্দিরের এইরূপ বিবিধ নামকরণ রসজ্ঞানের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। ‘মেরু’, ‘মন্দর’, ‘কৈলাস’, ‘সর্ব্বাঙ্গসুন্দর’, ‘চিত্রকূট’, ‘হংস’, ‘গরুড়’, ‘মাধবী’, ‘বসন্ত’ প্রভৃতি নাম হর্ম্ম্যের এক একটী বৈশিষ্ট্য সূচিত করে। স্থানে স্থানে সৌধসমূহের জাতিভেদও লক্ষিত হয়। যেমন ত্রিরথ দেউলকে শূদ্রজাতীয়, পঞ্চরথকে বৈশ্যজাতীয়, সপ্তরথকে ক্ষত্রিয়জাতীয় এবং নবরথকে ব্রাহ্মণজাতীয় বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সকল বিভাগ ও নামকরণ খেয়াল মাত্র নহে, সূক্ষ্ম রসবোধই উহার ভিত্তি।

* মানসার, ৩৫.২২-২৭।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রাচীন হর্ম্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। রাজপ্রাসাদের সংখ্যা এদেশে সামান্য ছিল না। পেশোয়ার, পাটনা, নালন্দা প্রভৃতি স্থানে খননকার্য্য আরব্ধ হওয়ার ফলে মৌর্য্য, কুষণ ও গুপ্ত নৃপতিদের ঐশ্বর্য্যের কতকটা আভাস পাওয়া যাইতেছে। গ্রীক্‌গণ লিখিয়াছেন, চন্দ্রগুপ্তের রচিত অট্টালিকাসমূহ তৎকালে পারস্য-সৌধমালাকে হতপ্রভ করিয়াছিল। কালের প্রভাবে ঐ সকল ধূলিসাৎ হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালের রাজন্যবর্গ ভারতের সর্ব্বত্র মন্দির ও প্রাসাদ-শিল্পের গৌরববর্দ্ধন করিতে যত্নবান্ হন। গুজরাট্, উড়িষ্যা, বঙ্গ, দ্রাবিড় ও চালুক্য-পদ্ধতি এক একটা স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। ইহাদের এক একটী দৃষ্টান্ত হইতে সমসাময়িক সৃষ্টির একটী নিপুণ আলেখ্য পাওয়া যায়। হিন্দু-সভ্যতা কম্বোজ বা ইন্দো-চীনে নীত হইয়া এক বিরাট্ স্থাপত্যশিল্পে পরিণতি-লাভ করিয়াছিল। এখন সে সকল বিস্ময়কর কীর্ত্তি বিলুপ্ত। রাজা ইন্দ্রবর্ম্মার রাজত্বকালে (৮৭৭-৮৮৯ খৃষ্টাব্দ) এই সকল অট্টালিকার নির্ম্মাণকার্য্য আরব্ধ হইয়া রাজা যশোবর্ম্মার



ক্ষর্যার (Xerxes) প্রাসাদের সেক্‌সন (Section)—পারস্য।

সময় সমাপ্ত হয়। ইহাদের ভগ্নস্তূপকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ "The largest pile on earth" বলিয়াছেন। বিরাটত্বের দিক্ হইতে ইন্দোচীনের স্থাপত্য যেমন একটা অসাধারণ সম্পদ্ দান করিয়াছে, নিপুণত্বের দিক্ হইতেও তেমনি একটা অতুলনীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে। ইন্দোচীনের প্রাচীন রাজাট্টালিকাকে 'ফিমিআনকস্' বা 'বিমানাক্ষ' বলা হয়। এই প্রাসাদের চতুর্দ্দিক্ প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। অঙ্কোরবট শহরের শহরতলীই ছিল প্রায় ২০ মাইল দীর্ঘ; শহরের চারিদিকে যে পরিখা ছিল, তাহা জগতের মধ্যে বৃহত্তম পরিখা। এখানকার মন্দিরটী এরূপ বৃহদায়তন ছিল যে, ১৩০০০ লোক উহার মধ্যে বাস করিত এবং সহকারীসহ প্রায় ৫৫০০ পূজক মন্দিরের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। কারুকার্য্যের দিক্ দিয়াও অঙ্কোরের অট্টালিকাগুলি উচ্চ প্রশংসা পাইবার যোগ্য। ভেলভেটের মত মসৃণ পাথরের উপর ক্ষোদিত সূক্ষ্ম মূর্ত্তিগুলিকে শিলমোহরের ছাপ বলিয়া বোধ হয়। বৃহৎ ব্যাপারগুলিও পুষ্প বা অলঙ্কারের ন্যায় সূক্ষ্ম কারুকার্য্যশোভিত। এই প্রাচীন নগরের প্রাসাদ, সরোবর, মন্দির, প্রাচীর, পরিখা, তোরণ প্রভৃতি এরূপ একটী সৌন্দর্য্যের প্রকাশক, যাহা অন্যত্র দুর্ল্ভ। আধুনিক দিল্লী-নগরীর সৌধাবলীর রুগ্ন বিবর্ণতা ও শীর্ণ প্রাচুর্য্য দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, ভূমা বা মহানের ধারণা এ যুগে অসম্ভব।

প্রাচুর্য্য ও পূর্ণতা ভারতীয় হর্ম্যশিল্পের প্রাণধর্ম্ম। প্রাচীরের অন্তর্গাত্র ও বহির্গাত্র, স্তম্ভ, ছাদ—এ গুলি ভারতের প্রাসাদ ও মন্দিরসমূহে বিস্তৃতভাবে অলঙ্কৃত। পক্ষান্তরে, গ্রীক্ স্থাপত্য বহির্মুখী ও একদেশদর্শী (Selective)—উহাতে প্রাচীরের বহির্ভাগ নগ্ন ও শূন্য রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে; শুধু স্তম্ভগুলির ও উর্দ্ধস্থ চিত্রপর্য্যায়ের (Frieze) দিকেই উহার লক্ষ্য। ভারতীয় দৃষ্টি মনোজগৎকে যেমন নীরন্ধ্র, অবিচ্ছিন্ন ও শূন্যতাহীন দেখে তেমনি বহির্জগৎকে ঘটনা ও ছন্দে পরিপূর্ণ করে। বস্তুতঃ তাহাতে ফাঁকা কিছুই নাই—সমস্তই রসের উৎসে পূর্ণ। সর্ব্বত্রই সে জীবনের জাগ্রৎ সত্তা উপলব্ধি করিয়া আনন্দরসে আপ্লুত হয়। তাই স্বল্পমাত্র অবকাশকেও সে তাহার হৃদয়ের রূপরস-সম্ভার দিয়া সযত্নে পূর্ণ করিতে চাহে। অঙ্কোর মন্দিরে প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত অলঙ্করণ এবং ২৫০০০ ফুট বিস্তৃত ক্ষোদিত রূপসম্ভার আছে। যবদ্বীপস্থ বড়বুদরেও (৮৫০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত) এইরূপ রূপলীলার প্রাচুর্য্য বর্ত্তমান। সেখানে তিন মাইল ব্যাপিয়া একটীর পর আর একটী করিয়া বহুল নাটকীয় দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। [অঙ্কোরবট ও বড়বুদর দ্র°]

ভারতীয় স্থাপত্যের এই ধারাটী এ পর্য্যন্ত অব্যাহত ভাবেই চলিয়া আসিয়াছে। আধুনিক কালেও ভারতীয় প্রাসাদ এবং প্রাসাদদুর্গসমূহ এক বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যে শোভমান। উদয়পুরের প্রাসাদ-দুর্গের শ্রী অন্যত্র দুর্ল্ভ। শুধু বিরাটত্ব নহে, সকল আবেষ্টনের সহিত ঐক্যবদ্ধ এমন সহজ সৌকুমার্য্য অন্য কোন মর্ম্মরসৃষ্টিতে সম্ভবপর হয় নাই। ইউরোপের প্রাসাদ-দুর্গগুলি চারিদিকের আবেষ্টনীর এক একটী প্রতিবাদস্বরূপ—তাহাদের মধ্যে যেন একটা নিঃসঙ্গতার ও বিদ্রোহের ভাব পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের রাজপ্রাসাদসমূহেও এই প্রকার বিরোধ বা অসামঞ্জস্যের ভাব প্রতীয়মান। উইণ্ড্‌সর প্রাসাদদুর্গের শিরোভাগস্থ চাক্রিক, সরল ও ত্রিকোণ রেখাবলীর একটা প্রকৃষ্ট সমন্বয় নাই—একটী অংশ যেন অন্যটীর বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান। বস্তুতঃ গথিক্ ও রেনেসাঁস্ রীতি মিলিয়া পরবর্ত্তী ইউরোপীয় স্থাপত্যে একটা আত্মবিরোধী মিশ্র সৃষ্টি

করিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকেও অনুকরণ করা হইয়াছে। হানোভারের টাউন-হল সাঁচীর স্তূপের অনুরূপ। পারির ত্রোকাদিরোতে ভারতীয় গুহাস্থাপত্যের বহির্ভঙ্গীর আভাস দৃষ্ট হয়। দিল্লীর প্রাচীন অট্টালিকাসমূহে একটী মধুর সৌন্দর্য্য বিরাজমান ছিল। মুগল বাদশাহ্‌গণ নানা দিক্‌ দিয়া উহাকে প্রস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিলেন। মুগলযুগের প্রাসাদ-দুর্গগুলি মুসলমানশিল্পের স্পর্শ লাভ করিয়াও ভারতীয় শিল্পের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। আগ্রা ও দিল্লীতে তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান। আগ্রার স্থাপত্যে ও দিল্লীর দেওয়ানী-খাসে আছে অট্টালিকার আন্তর ঐশ্বর্য্য—মূর্ত্তিবিরোধী মুগল সেখানে অলঙ্করণের প্রাচুর্য্যে ভারতীয় রীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। ইস্‌লামীয় প্রতিভা ভারতীয় রচনা দ্বারা স্পেনের আলহম্‌ব্রা প্রাসাদের উন্মত্ত ঐশ্বর্য্যকেও মলিন করিয়া দিয়াছে। ফতেপুর সিক্‌রীতে যোধাবাঈর অট্টালিকার মধ্যে হিন্দু-স্থাপত্যের এক নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। এই ভবনের স্তম্ভগুলি বিভিন্ন ছাঁচে গঠিত। বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া ঐক্যকে প্রকাশ করিবার পক্ষে ইহা ইস্‌লামীয় শিল্পীদের এক প্রকার প্রাথমিক উদ্যম বলা যাইতে পারে। একই ছাঁদে সমস্ত স্তম্ভ ও দ্বার গঠন—ইহা গ্রীসীয় আদর্শ, ভারতীয় নহে। প্রাথমিক অবস্থায় ইস্‌লামীয় শিল্পচেষ্টা গ্রীসের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। কারণ ইস্‌লামীয় রচনায় পূর্ব্বোক্ত সামান্য-পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক দিল্লীতে ইংরেজ শিল্পী রচনা করিয়াছেন একটী গোলকধাঁধাঁ; ইহাতে ইউরোপের মজ্জাগত অস্থিরতাই প্রকাশ পাইয়াছে। গ্রীসের সরলরেখা, হিন্দুর কুণ্ডলিনী, মুগলের অর্দ্ধচন্দ্র প্রভৃতি মিলিয়া এক অদ্ভুত বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করিয়াছে। এই অবসরে আবার রোমের কলোসিয়াম্‌কেও ভুলিয়া যাওয়া হয় নাই। নূতন দিল্লী এক উদ্ভট প্রহেলিকা—ইহা না রোমক, না ইস্‌লামীয়, না হিন্দু। ইহা আধুনিক মিশ্র-চিন্তার প্রতীক।

জাপান ও চীনে স্থাপত্যশিল্প ততটা উন্নতিলাভ করে নাই। ভারতবর্ষ হইতে নেপালে পাগোদা রীতি প্রবর্ত্তিত হয়।* তথা হইতে চীন ও জাপানে এই রীতির প্রচলন হইয়াছে। এজন্য ঐ সকল স্থানের অধিকাংশ মন্দির ও অট্টালিকা এই শ্রেণীর। চীনদেশের জিহোল (Jehol) নামক স্থানের সুবিখ্যাত প্রাসাদ-টীর ছাদ তাম্রনির্ম্মিত এবং উপরিভাগ স্বর্ণের আস্তরণে মণ্ডিত। ইহার স্তম্ভাদিতে লাল রঙের মিনার কাজ করা। বলা বাহুল্য, আধুনিককালে নেপালেও এই রীতি বর্ত্তমান। সম্ভবতঃ নেপাল হইতেই চীনে এই প্রথার প্রবর্ত্তন হয়। কাব্‌লা খাঁর সময়ে আনিকো নামক এক নেপালী শিল্পী চীনের শিল্প-বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা হন। তাঁহার সাহায্যেই ভারতীয় রীতি পূর্ব্বাঞ্চলে প্রসারলাভ করিয়াছিল, সন্দেহ নাই।

এই প্রসঙ্গে তিব্বতের পোতালা নামক বিখ্যাত প্রাসাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন। পোতালা দলই-লামার প্রাসাদ। ইহার বহিরবয়ব অতি সরল। দেখিয়া মনে হয়, তিব্বতীয় চিত্তকে আমরা যতটা জটিল বলিয়া মনে করি, বাস্তবিক উহা তত জটিল নহে। রক্‌হিল্‌ সাহেব এই পোতালা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"The majestic castle of Buddha's vice-regent on earth far exceeds the highest expectation they had formed of it. From first to last,



দেওয়ানী খাস—দিল্লী।

from far and near, this imposing pile on Potala dominates the landscape and calls and holds the eye." পোতালায় একই অট্টালিকায় প্রাসাদ, দুর্গ ও মন্দির রচনা করা হইয়াছে। ইহার নির্ম্মাণের ইতিহাসও অপূর্ব্ব। [পোতালা দ্র°] ৩০০ ফুট উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই সুন্দর প্রাসাদ এখনও জগৎকে মুগ্ধ করিতেছে। পোতালার মধ্যস্থ লোহিত অট্টালিকা একটা স্বপ্নজগতের ন্যায়। ছাদের উপরে একটী সোনার গম্বুজ তাহা সৌন্দর্য্যের এক বিচিত্র সৃষ্টি। পোতালার সুদীর্ঘ অলিন্দও মনোমুগ্ধকর। সমগ্র প্রাসাদটী এক নিঃশব্দ ধ্যানস্থ গৌরবে বিরাজমান।

প্রাচীন শিল্পী তাঁহার শিল্পচেষ্টার মধ্যে যে রসের সন্ধান পাইয়াছিলেন, এ যুগে তাহার একান্তই অভাব। এই রস প্রাণবন্ত সৌন্দর্য্যের রস এবং ইহাই শিল্পের প্রাণ। আধুনিক যুগের হর্ম্ম্যকার সৌন্দর্য্যের দেখা পান নাই। তিনি মাত্র পাইয়াছেন সৌন্দর্য্যের কঙ্কাল। সৌন্দর্য্যের পরিবর্ত্তে

* সিলভ্যাঁ লেভির মতে পাগোদারীতির জন্মস্থান ভারতবর্ষ [Le Nepal দ্রষ্টব্য]। Sir Charles Elliot 'Hinduism & Buddhism' নামক গ্রন্থে এই মত পোষণ করিয়াছেন।

এ যুগে আছে শুষ্ক প্রয়োজন। গৌরবের স্থান অধিকার করিয়াছে গর্ব্ব। তাই যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতীক এবং সহায়ক-রূপে ইউরোপ ও আমেরিকায় যে সকল অতিকায় অট্টালিকা গড়িয়া উঠিতেছে, তাহা আমাদের অন্তরে আনন্দরস উদ্রিক্ত করিতে পারে না—কেবল তাহাদের আয়তন ও জটিলতা ক্ষণিকের জন্য আমাদের মনে বিস্ময় জাগাইয়া দেয়।

আধুনিক অট্টালিকার দুইটী প্রধান উপাদান হইতেছে লৌহপিঞ্জর এবং কংক্রীট (Concrete) বা পাথরের মশলা। ফেরোকংক্রীটের (Ferro-concrete) সহায়তায় ইংলণ্ডের রিজেণ্ট রাজপথ এবং আমেরিকার ব্রড্ওয়ে বিশাল সৌধমালায় পূর্ণ হইতেছে। একটীর উপর আর একটী করিয়া অসংখ্য তল সজ্জিত হইয়া নীল আকাশ স্পর্শ করিতে ধাবিত হইতেছে। cubic বা ঘনপন্থী নক্সাকে মুখ্য করিয়া এক আদর্শ সৃষ্ট হইয়াছে। তাহাতে সকল রূপের ভিতর দিয়া বোধগম্য রচনার প্রতিবাদ আছে। এই ধরণের রচনাকে পাশ্চাত্ত্য জগৎ abstract বা 'নিরুপাধিক' আখ্যা দিয়াছে। আমেরিকায় হর্ম্ম্যের কলেবরে শুধু সরলরেখার বিন্যাস দেখান হইয়াছে; তাহা যেন রশ্মিমুক্ত অশ্বের অন্ধগতি। জর্মনীতে হইয়াছে বঙ্কিম রেখার উদ্ভট সংমিশ্রণ। এ সমস্তই হর্ম্ম্যরচনাব্যপদেশে পুঞ্জীভূত প্রস্তর-পিণ্ডের নব্য বিদ্রূপ—নূতন রূপ নহে। তবে ঘনপন্থী আদর্শের দিন চলিয়া গিয়াছে। এ শ্রেণীর অট্টালিকা জর্মনীতে এখন আর অধিক নাই।

মহাযুদ্ধের পর হইতে পাশ্চাত্ত্য স্থাপত্যের ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কোনও শিল্পধারার বিবর্ত্তন বা পরিবর্ত্তনের পক্ষে



পোতালা প্রাসাদ—লাসা, তিব্বত।

লিফ্টের (lift) দ্বারা মুহূর্ত্তের মধ্যে ইহাদের যে কোনও তলে উপস্থিত হওয়া যায়। জাগতিক প্রয়োজন হিসাবে এই সকল অট্টালিকা পূর্ব্ববর্ত্তী সকল অট্টালিকাকে পরাজিত করিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু কারুশিল্পের আসল বস্তুটী—ভাব—ইহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এ স্থাপত্যে রাস্কিনের উল্লিখিত সর্ব্বরসকলার সমন্বয় নাই। জর্মনী ও রুষিয়ার নব্য চেষ্টা আবার এক নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছে। সেখানে দুই এক শতাব্দ কাল খুব বেশী নহে। তবে হর্ম্ম্যশিল্পের বিবর্ত্তনের আলোচনা করিতে গেলে দুইটী বিষয় প্রধানভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে—প্রথম, নূতন হর্ম্ম্যনির্ম্মাণে সময়ের অল্পতা বা আধিক্য; দ্বিতীয়, পুরাতন সৌধাবলীর ধ্বংস। ব্যবসায় বাণিজ্যের মূলে বৈজ্ঞানিক শক্তি নিয়োজিত করিয়া অট্টালিকা-নির্ম্মাণের উপাদান ও প্রণালীকে উন্নত করিয়া তোলা হইয়াছে। নির্ম্মাণকার্য্যও সহজ এবং অল্পসময়সাপেক্ষ

হইয়াছে। পূর্ব্বে যে অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতে ৫ বৎসর লাগিত, বর্ত্তমানে তাহা ১ বৎসরে সম্পূর্ণ হইতেছে। মহাযুদ্ধে



উল্‌ওয়ার্থ অট্টালিকা— নিউইয়র্ক।
(বর্ত্তমানযুগের সর্ব্বোচ্চ প্রাসাদগুলির অন্যতম।)

ইউরোপের অনেক গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে; যে গুলি তাহা হয় নাই, সে গুলিকে দৃঢ় ও আক্রমণসহ করিবার উদ্দেশ্যে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিবার চেষ্টা হইতেছে। ফলে অট্টালিকা-নির্ম্মাণের হার পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। নির্ম্মাণ-গতির এই দ্রুততাই অল্পকাল মধ্যে হর্ম্ম্যশিল্পে একটা পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছে। রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক ঘাতপ্রতিঘাতে মানবের জীবনযাত্রায় নূতন প্রণালীর আবির্ভাব হইয়াছে—তাহার দৃষ্টিই ভিন্নরূপ হইয়া গিয়াছে। প্রাচীনকালের সে উপলব্ধি ও অনুভূতি এখন নাই। তাই আধুনিক যান্ত্রিক ও ব্যবহারিক যুগের ভবনসমূহও এ কালের অনুরূপই হইতেছে। মানবের সৌন্দর্য্যবোধও এখন প্রয়োজন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাহার আহারে, বিহারে, কার্য্যে, আনন্দে—সর্ব্বত্রই প্রয়োজনের শৃঙ্খল দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থনীতির আবরণে তাহার দৃষ্টি আবৃত। আমেরিকার আকাশচুম্বী সৌধমালা এই উৎকট প্রয়োজনবাদেরই প্রতীক। পৃথিবীতে আর স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না, কাজেই ধরার ঊর্দ্ধে শূন্যেও মানব তাহার অধিকার বিস্তারে যত্নবান্। পূর্ব্বে অট্টালিকায় হৃদয়ের গভীরতম ভাবকে মূর্ত্তি দেওয়া হইত; এখন তাহা আরাম ও সুবিধার বাহনরূপেই নির্ম্মিত হইতেছে। এই মনোভাবকেই কেন্দ্র করিয়া কোথাও বা গৌণতঃ একটু সৌন্দর্য্যসৃষ্টির প্রয়াস হইয়াছে মাত্র।

[অন্যান্য বিবরণ প্রাসাদ, মন্দির, স্থাপত্য ও হর্ম্ম্য শব্দে দ্র°]

অট্টালিকা₂—(স্ত্রী) দেশবিশেষ। "অটিস্বাট্টালিকাদিভ্যো দেশেভ্যঃ।" (রাজতরঙ্গিণী)

অট্টালিকাকার—(পুং) [অট্টালিকাং করোতি রচয়তি যঃ স; কৃ-অণ্। উপ° স°] অট্টালিকাদির নির্ম্মাণকারী সঙ্কীর্ণ জাতিবিশেষ; রাজমিস্ত্রি। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, বেশ্যা কিংবা শূদ্রার গর্ভে এবং চিত্রকারের ঔরসে অট্টালিকাকারদের জন্ম। এই জাতি জারদোষহেতু পতিত। আবার অট্টালিকাকারের ঔরসে ও কুম্ভকার পত্নীর গর্ভে জাত পুত্র কোটক নামে খ্যাত। ইহারাও পতিত এবং গৃহনির্ম্মাণবিষয়ে বিশেষ নিপুণ।

"কুলটায়াঞ্চ শূদ্রায়াং চিত্রকারস্য বীর্য্যতঃ।
বভূবাট্টালিকাকারঃ পতিতো জারদোষতঃ ॥"
অট্টালিকাকারবীজাৎ কুম্ভকারস্য যোষিতি।
বভূব কোটকঃ সদ্যঃ পতিতো গৃহকারকঃ॥"
(ব্রহ্মবৈ°পু°, ১০.৯৬-৯৭)

এখন বাঙ্গালাদেশে মুসলমান, বাগ্‌দী, হাড়ী, ডোম, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি অনেক জাতি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে। কিন্তু পূর্ব্বে পৃথক্ এক জাতি অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করিত।

অট্টালিকাবন্ধ—(পুং) [স্থাপত্যশা°] গৃহাদিনির্ম্মাণ-বিষ্টায় মূলভিত্তিবিশেষ।

অট্টালী—(দেশজ) অট্টালিকা, প্রাসাদ। 'দুঃখিত কলিঙ্গরায়, হাতী ঘোড়া ভাসি যায়, অট্টালীতে উঠে বামাগণ।' (কবিকঙ্কণ—চণ্ডী)

অট্টিলিকা—(স্ত্রী) কাশ্মীরস্থ একটী নগরের নাম। (রাজতরঙ্গিণী)

অট্ঠকথা—একখানি বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহা ত্রিপিটক গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের টীকা। সিংহলীয় প্রবাদ হইতে জানা যায়, এই গ্রন্থ প্রথম ধর্ম্মসঙ্গীতির সময়ে রচিত হয় এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধর্ম্মসঙ্গীতিতে পুনরায় পঠিত হইয়াছিল। মহেন্দ্র অপরাপর ধর্ম্মগ্রন্থের সহিত এই গ্রন্থও সিংহলে লইয়া আসেন এবং সিংহলী ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ১ম শতকে অভয় বট্টগামনির রাজত্বকালে ইহা প্রথম লিপিবদ্ধ হয়। প্রায় ৪২০ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধঘোষ পুনরায় পালিভাষায় ইহার অনুবাদ করেন।

উক্ত প্রবাদের মধ্যে কিছু সন্দেহের কারণ রহিয়াছে। প্রায় ৩০০ খৃষ্টাব্দে দীপবংস রচিত হয়। ঐ সময়ে অট্ঠকথা নামে পরিচিত কতকগুলি টীকাগ্রন্থ প্রচলিত ছিল। কিন্তু

এই গ্রন্থের কোন্ অংশ কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল এবং ৩০০ খৃষ্টাব্দের পরে বুদ্ধঘোষ এবং অন্যান্য গ্রন্থকার ইহার কোন্ কোন্ অংশ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, তাহা কিছুই জানা যায় না। বুদ্ধঘোষ সমগ্র অট্ঠকথার অনুবাদ করিয়াছিলেন, মহাবংসের এই উক্তি কতকগুলি প্রমাণিত সত্যের বিরোধী। থেরগাথা ও থেরীগাথার পরমত্থদীপনী নামক টীকা এবং অপর কএকখানি টীকাগ্রন্থ কাঞ্চীপুরের ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক রচিত, বুদ্ধঘোষ কর্ত্তৃক নহে। অট্ঠকথা দীপবংসের পূর্ব্বে রচিত। কিন্তু বুদ্ধঘোষ সমন্তপসাদিকায় দীপবংসের নামোল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং অট্ঠকথা অংশতঃ দীপবংসের পরবর্ত্তী রচনা।

বুদ্ধঘোষ তাঁহার সমন্তপসাদিকা, অত্থসালিনী, সুমঙ্গলবিলাসিনী ও অন্যান্য ভাষ্যে যে সকল অট্ঠকথার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের নাম যথা—(১) মহা অট্ঠকথা ; (২) মহাপচ্চরিয় ; (৩) কুরুণ্ডী বা কুরুণ্ডীয় ; (৪) অন্ধ-অট্ঠকথা ; (৫) সংক্ষেপ অট্ঠকথা ; (৬) আগম অট্ঠকথা ; (৭) আচরিয়ানং সমানট্ঠকথা। সদ্ধর্ম্মসংগ্রহের মতে মহা, মহাপচ্চরিয় ও কুরুণ্ডী এই তিনখানি প্রাচীন সিংহলদেশীয় ভাষ্য। মহাট্ঠকথাকে ভিত্তি করিয়া বুদ্ধঘোষ চারিটী নিকায়ের ভাষ্য লিখিয়াছেন। নিম্নে উপরোক্ত অট্ঠকথাগুলির পরিচয় দেওয়া হইল—

(১) 'মহা অট্ঠকথা'ই হইতেছে মূল অট্ঠকথা। ইহাকে সংক্ষেপে অট্ঠকথাও বলা হয়। ইহা অনুরাধাপুরের মহাবিহার হইতে প্রকাশিত ত্রিপিটকের পুরাতন সিংহলী ভাষ্য। অনুরাধাপুরে এই বিহার ছাড়া উত্তর-বিহার নামে অপর একটী বিহার ছিল। এইস্থান হইতেও ভাষ্য বাহির হইয়াছিল। (২) 'মহাপচ্চরিয়' অর্থাৎ 'বৃহৎ ভেলা' নাম হইবার কারণ—ইহা সিংহলের বৃহৎ ভেলার উপর বসিয়া লিখিত হইয়াছিল। (সদ্ধর্ম্মসংগ্রহ) কিন্তু ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ মহাপচ্চরিয় সিংহলের একটী বিহার হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। (৩) কুরুণ্ডবেণুবিহারে রচিত হইয়াছিল বলিয়া 'কুরুণ্ডী' নামকরণ হইয়াছে। (সদ্ধর্ম্মসংগ্রহ) (৪) 'অন্ধ-অট্ঠকথা' (অন্ধ্র-অষ্টকথা) দক্ষিণ-ভারতের কাঞ্চিপুর হইতে আবিষ্কৃত হয়। ইহা দাক্ষিণাত্যে কোন প্রাকৃতভাষায় রচিত হইয়াছিল। (৫) 'সংক্ষেপ অট্ঠকথা'ও অন্ধ-অট্ঠকথার সহিত উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং দক্ষিণ-ভারতেই ইহা রচিত হইয়া থাকিবে। (৬) 'আগম অট্ঠকথা' বুদ্ধঘোষের অত্থসালিনীতে উল্লিখিত হইয়াছে। এখানি আগম বা নিকায়ের পুরাতন ভাষ্য। (৭) রীজডেভিড্-পত্নী 'আচরিয়ানং সমানট্ঠকথা' নামে আর একখানি পৃথক্ ভাষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা বুদ্ধঘোষের অত্থসালিনীর এক অংশ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। অংশটী এই—'এত্তিকা আচরিয়ানং সমানট্ঠকথা নাম।' বুদ্ধঘোষ ইহা দ্বারা বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, অর্থ সকল শ্রেণীর পক্ষেই প্রযোজ্য। অতএব ইহাকে পৃথক্ ভাষ্য বলা যাইতে পারে না।

অট্ঠকথা-মহাবংস—পালি মহাবংস। এই পুস্তকের প্রস্তাবনা হইতে জানিতে পারা যায়—

"মহাবংসং পবক্খামি নানানূনাধিকারিকং
পোরাণেহি কতোপেসো অতিবিত্থারিতো ক্বচি,
অতীব ক্বচি সংখিত্তো, অনেকপুনরুত্তকো।
বজ্জিতং তেহি দোসেহি সুখগ্গহণধারণং।"

(মহাবংস, ১ম অ°)

অর্থাৎ 'আমি মহাবংস বর্ণনা করিব, যাহাতে বহু বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, এবং যাহাতে কিছুই পরিত্যক্ত হয় নাই। যে মহাবংস প্রাচীন বিদ্বজ্জন কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা অতিবিস্তার ও পুনরুক্তিদোষদুষ্ট এবং অনেক স্থানে সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে এই মহাবংস অভিনিবেশসহকারে দেখিলেই বুঝা যাইবে, ইহাতে ঐ সকল দোষ পরিহার করা হইয়াছে।' ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, অট্ঠকথা-মহাবংস নামে পূর্ব্বে একখানি সংগ্রহ-পুস্তক ছিল। লেখক ইহাকে সংস্কৃত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব্বে ইহার যে সকল ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল, সেগুলি এক্ষণে সংশোধিত হইয়াছে।

অট্ঠকবগ্গ—বৌদ্ধশাস্ত্র সুত্তনিপাতের অন্তর্গত ৫টী বিভাগের ৪র্থ বিভাগ। ইহা মোট ১৬টী সূত্রে বিভক্ত এবং ইহার শ্লোকসংখ্যা ২১০টী। নিম্নে সূত্রগুলির নাম, তৎপার্শ্বেই বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকসংখ্যা এবং সারমর্ম্ম উদ্ধৃত হইল।

১। কামসুত্ত (৬)—যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করিবে সে ব্যক্তি দুঃখ পাইবে এবং পাপদ্বারা আক্রান্ত হইবে ও পাপ তাহাকে বশে আনিবে। এইজন্য কামজ সুখ সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।

২। গুহট্ঠকসুত্ত (৮)—যে ব্যক্তি শরীরের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ও ইন্দ্রিয়সুখে রত এবং মৃত্যু অবধারিত জানিয়াও বাঁচিতে না পারিবার জন্য দুঃখ করে, তাহার মত দুর্ভাগা আর কেহ নাই। এ ব্যক্তিকে কষ্টভোগ করিতেই হইবে। মুক্তিকামী কোন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য লালায়িত হইবার প্রয়োজন নাই।

৩। দুট্ঠট্ঠকসুত্ত (৮)—যে সকল ব্যক্তি আপনার গুণ-কীর্ত্তন এবং দর্শনের মনগড়া উক্তির উপর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ

করে, তাহারা ভর্ৎসনার পাত্র; কারণ প্রত্যেক মনুষ্যই দর্শনের বিভিন্ন উক্তি লইয়াই চলিয়া থাকে। কিন্তু মুনিকে তিরস্কার করিবার কোনরূপ হেতু নাই; কারণ তিনি শান্ত এবং আপনার গুণকীর্ত্তন করেন না। তিনি সকল প্রকার দর্শনের মতবাদকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি স্বাধীন।

৪। সুদ্ধট্‌ঠকসুত্ত (৮)—দার্শনিক মতবাদ মানুষকে পবিত্র করিতে পারে না, কারণ দর্শনের ভক্তেরা একমতবাদীর নিকট হইতে অন্য মতবাদীর নিকট শিক্ষা করিতে গমন করে এবং তাহারা শান্ত ও চিন্তাশীল নহে। কিন্তু যে জ্ঞানী ব্যক্তি ধর্ম্মকে বুঝিয়াছেন, তিনি রিপুকর্ত্তৃক চালিত হন না এবং জগতের কোন জিনিষকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আলিঙ্গন করেন না।

৫। পরমট্‌ঠকসুত্ত (৮)—কোন ব্যক্তিরই দার্শনিক বাদ-বিসম্বাদের ভিতর যাওয়া উচিত নয়। যে ব্রাহ্মণ কোন দার্শনিক মতবাদের উপর আস্থা-স্থাপন না করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সে ব্রাহ্মণ ধীর ও স্থিরমতি এবং নির্ব্বাণ-লাভের অধিকারী।

৬। জরাসুত্ত (১০)—স্বার্থপরতা হইতে দুঃখ ও লোভের উৎপত্তি হয়। যে ভিক্ষু সংসার ত্যাগ করিয়াছে এবং গৃহ-হারা হইয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় সে স্বাধীন। সে অন্যের সাহায্যে পবিত্র হইতে চাহে না।

৭। তিস্‌সমেত্তেয়সুত্ত (১০)—একদা তিস্‌সমেত্তেয় (তিষ্য মৈত্রেয়) ভগবান্ তথাগতের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, যে ব্যক্তি রমণ-রত সে ব্যক্তি কেন জীবনযাত্রায় পরাজিত হয়? বুদ্ধদেব উত্তরে বলিয়াছিলেন, সঙ্গমরত ব্যক্তিরা এই কার্য্যের সহিত নানাবিধ কুকর্ম্ম করিয়া থাকে। অতএব একার্য্য হইতে বিরত থাকাই কর্ত্তব্য।

৮। পসূরসুত্ত (১১)—বিবাদকারী ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই অপরকে মূর্খ বলিয়া থাকে। তাহারা চায় সুখ্যাতি; কিন্তু সুখ্যাতি না পাইয়া অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে। বুদ্ধদেব বলিয়া-ছিলেন—বিবাদের দ্বারা কেহ পবিত্র হয় না।

৯। মাগন্দিয়সুত্ত (১৩)—মাগন্দিয় ও বুদ্ধদেবের কথোপ-কথন। মাগন্দিয় বুদ্ধদেবের হস্তে আপনার কন্যাকে সম্প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু বুদ্ধদেব এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। মাগন্দিয়ের মত ছিল, দর্শনের দ্বারা মানব পবিত্র হয়। বুদ্ধদেব এ মতে আস্থা-স্থাপন না করিয়া বলেন, পবিত্রতা মনের শান্তি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। মুনিরাই আত্মদোষ স্বীকার করিয়া শান্তি পান, তাঁহারা বিবাদ করেন না।

১০। পুরাভেদসুত্ত (১৪)—ইহাতে বুদ্ধ শান্ত ও সমাহিত মুনির গুণব্যাখ্যা করেন। সমাহিত মুনি আকাঙ্ক্ষা, রাগ কামনা, রিপু এবং আসক্তিশূন্য; তিনি নির্ব্বিকার এবং চিন্তাশীল; তিনি গৃহশূন্য এবং জগতে এমন কোন দ্রব্য নাই যাহাকে তিনি আপনার বলিতে পারেন। তিনি শান্ত এবং সর্ব্বদাই ধর্ম্মের পথে বিচরণ করিয়া থাকেন।

১১। কলহবিবাদসুত্ত (১৬)—কলহ ও বিবাদের মূল কি ইহাতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। প্রিয় বস্তু হইতে কলহ ও বিবাদের সূত্রপাত হয়, বাসনা হইতে জগতের প্রিয়বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে। তৃপ্তি এবং অতৃপ্তি হইতে বাসনার উৎপত্তি হয়। স্পর্শ হইতে তৃপ্তি ও অতৃপ্তি জন্মে। এইরূপে বিবর্ত্তনের ধারা প্রবাহিত হইয়া থাকে।

১২। চুলবিয়ূহসুত্ত (১৭)—এই সূত্রে বিবাদপ্রিয় দার্শনিক-দের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রত্যেক দার্শনিকেরা অপর দার্শনিকের মত খণ্ডন করেন ও দার্শনিক মতগুলির ভিতর পার্থক্য দৃষ্ট হয়। প্রত্যেকেই বিভিন্ন প্রকার সত্যের উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু সত্য এক। জগতে যতক্ষণ মতান্তর বর্ত্তমান, ততক্ষণ বিবাদ ও কলহ থাকিবে।

১৩। মহাবিয়ূহসুত্ত (২০)—দার্শনিকেরা মানবকে পবিত্র করিতে পারে না; তাঁহারা কেবল আপনাদের গুণকীর্ত্তন ও অপরের নিন্দা করিতে জানেন। ব্রাহ্মণ কিন্তু এ সকল কিছুই করেন না, তিনি বিবাদ-বিসংবাদের ঊর্দ্ধে, কখন তিনি কলহের বশীভূত হন না এবং শিক্ষা-সম্বন্ধে উদাসীন। কারণ তিনি শান্ত এবং শান্তিপ্রিয়।

১৪। তুবটকসুত্ত (২০)—নির্ব্বাণকামী ভিক্ষু প্রপঞ্চের ও আকাঙ্ক্ষার মূল কাটিয়া ফেলিবেন। তিনি ধর্ম্ম শিক্ষা করিবেন এবং অন্য কোন উপায়ে শান্তিলাভের চেষ্টা করিবেন না। তিনি শান্ত, সমাহিত ও চিন্তাশীল হইবেন এবং ভিক্ষুর অপরাপর কর্ত্তব্য অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিবেন। তিনি গর্ব্ব করিবেন না, বেশী কথা বলিবেন না, অলস হইবেন না এবং মানবেরা যে সমুদায় পাপ কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহাও করিবেন না।

১৫। অত্তদণ্ডসুত্ত (২০)—এই সূত্রে সিদ্ধ মুনির গুণ-ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তিনি সত্যবাদী, অকুটিলমতি, স্থিরমতি, লোভ ও গ্লানিশূন্য হইবেন। তিনি অলস কিংবা সত্যের পথ হইতে বিচ্যুত হইবেন না বা নাম ও যশের প্রত্যাশী হইবেন না। তিনি চিন্তাশীল হইবেন এবং প্রজ্ঞা কি তাহা জানিবেন।

১৬। সারিপুত্তসুত্ত (২১)—একসময় সারিপুত্ত বুদ্ধ-দেবকে জিজ্ঞাসা করেন—ভিক্ষুর কাম্য কি? বুদ্ধদেব উত্তরে কএকটী মূল সত্যের কথা বলিয়াছিলেন যাহা প্রত্যেক

ভিক্ষুর জীবনে পালন করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক জ্ঞানী এবং চিন্তাশীল ভিক্ষু পাঁচটী বিপদ্‌কে ভয় করিবেন। তিনি শীত ও গ্রীষ্ম সহনশীল হইবেন। তিনি চুরি করিবেন না কিংবা মিথ্যা কথা বলিবেন না এবং রাগ ও অহঙ্কারের বশীভূত হইবেন না। তিনি জ্ঞানের দ্বারা চালিত হইবেন এবং জীবনে মিতাচারী হইবেন ইত্যাদি।

অট্ণার—(পুং) কোশলের জনৈক নরপতি। (শতপথব্রা°, ১৩.৫.৪.৪)

অট্যা—(স্ত্রী) [অটনং অট-ভাবে ক্যপ্; স্ত্রিয়াং টাপ্] পরিভ্রমণ; পর্য্যটন। "তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ।" (স্মৃতি)

অঠ১—[ভ্বা°, পর°, সক°, সেট্] গতি। [লট্—অঠতি]

অঠ২—(অঠি) [ইদিৎ। ভ্বা°, আত্ম°, সক°, সেট্] গতি। [লট্—অণ্ঠতে। লিট্—আনণ্ঠে। লুট্—অণ্ঠিতা। লুঙ্—আণ্ঠিষ্ট। ণিচ্—অণ্ঠয়তি। সন্—অণ্টিঠিষতে। ক্ত—অণ্ঠিত। "দাহপাকরুগণ্ঠিতে গুল্মে"। (সুশ্রুত ২.৪৫৫.১১)]

অঠিল্লা—(স্ত্রী) প্রাকৃত ছন্দোবিশেষ।

অঠেল—(দেশজ) অবজ্ঞাকরণীয়; যাহা ঠেলা বা অমান্য করা যায় না।

অঠেলকথা—(দেশজ) যে কথা ঠেলা যায় না।

অড১—[ভ্বা°, পর°, সক°, সেট্] উদ্যম। [লট্—অডতি। লিট্—আড। লুট্—অডিতা। লুঙ্—আডীৎ।]

অড২—[স্বা°, পর°, অক°, সেট্] ব্যাপ্তি। [লট্—অড্ণোতি। লুঙ্—আড়ীৎ। এই ধাতুর প্রয়োগ বেদেই দেখা যায়।]

অড১—(প্রা) চেষ্টা। ২ গমন।

অড়২—(দেশজ) গর্ত্ত।

অড়কবতী—(স্ত্রী) মেরুপরিস্থিত এক কল্পিত স্থান। ২ নগরীবিশেষ। (ললিতবিস্তর)

অড়গাঁও—বেরারের অকোলা জেলার অন্তর্গত অকোট তালুকের একটী গ্রাম। অক্ষা° ২১°৭' উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬°৫৯' পূঃ। লোকসংখ্যা প্রায় তিন হাজার। এই স্থানে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ২৯এ নবেম্বর জেনারেল ওয়েলেস্‌লী রঘুজী ভোন্‌স্লের ভ্রাতা বঙ্কোজীকে পরাজিত করেন।

অড়ঙ্গ—(পুং) [বৈদ্যক] গোধূম।

অড়র—(দেশজ) [অড়হর দ্র°]

অড়বিগোল—কর্ণাট প্রদেশে বিজাপুর জেলাবাসী গোল বা গোয়ালা জাতির এক শাখা। ইহারা তেলেগুগোল নামেও পরিচিত। ইহাদের মাতৃভাষা তেলেগু। যাহারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা মরাঠী বা হিন্দীও বলিতে পারে। ঔষধবিক্রয় ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। কেহ কেহ কৃষি, গো-পালনাদিও করে। যাদব, মোর, পবার, সিন্ধে প্রভৃতি উপাধি এবং আচার-ব্যবহার দেখিয়া মনে হয়, ইহারা মহারাষ্ট্রীয়গণেরই সমপর্য্যায়ভুক্ত। দেহের রঙ্ কাল, গঠন দৃঢ়, উচ্চতা মাঝারি, নাসিকা সরল, ওষ্ঠ পাত্‌লা এবং কেশ বিরল; চেহারা অনেকটা বন্য ধরণের। ইহারা সপ্তাহে রবি ও মঙ্গলবারে স্নান ও গৃহদেবতার পূজা করে। সম্প্রতি কেহ কেহ নিত্য পূজা ও স্নান করিতেছে। কেহ কেহ আবার হনুমান্‌জীর মন্দিরে গিয়াও পূজা দেয়। ইহাদের প্রকৃতি উদ্ধত ও শঠতাপূর্ণ এবং ইহারা অত্যন্ত কদর্য্য অবস্থায় থাকে। পুরুষেরা মস্তক মুণ্ডন করে, কেহ বা মাথার মাঝখানে এক গোছা চুল রাখে। ইহারা মাংস খায়; মদ, গাঁজা, তাড়ি, আফিম খাইয়া নেশায় মস্‌গুল হইয়া থাকে। বর্ষার পর দুই তিন মাস বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া ঔষধ সংগ্রহ করে। তাহার পর কাঁধের উপর লাঠীর দুই ধারে ঔষধে ভর্ত্তি দুইটী গেরুয়া রঙের থলিয়া ঝুলাইয়া ঔষধ ফেরী করিয়া বেড়ায়। চিকিৎসাও ইহারা করে; প্লীহা বা যকৃতের উপর গরম লোহার ছেঁকা দেয়, কাল ধুতুরার বীজ বাটিয়া শুকাইয়া শ্বাসকাসের রোগীকে সেই গুঁড়া কলিকায় সাজিয়া খাইতে বলে। ইহারা ব্রাহ্মণ, লিঙ্গায়ৎ, রাজপুত, মরাঠী ও সোনারের ছোঁয়া জিনিস খায়। কিন্তু ধাঙ্গর, বদর, ডোম্বারি, কোরবি ও জিঙ্গরদিগকে ঘৃণা করে। অড়বিগোলেরা প্রধান প্রধান হিন্দুপর্ব্বগুলি মানিয়া চলে। ইহাদের উপাস্যদেবতার নাম ব্যাঙ্কোব, তুলজা-ভবানী, মর্গাই, যল্লম (সৌন্দত্তিস্থিত) ও মীর সাহেব (মিরজস্থিত)। ইহারা তুলজা-ভবানীর উদ্দেশে ছাগবলি দেয়। ইহাদিগের গুরু বা পুরোহিত নাই। তবে বিবাহে ব্রাহ্মণের সাহায্য গ্রহণ করে। সামাজিক প্রথা প্রায় মরাঠীদের অনুরূপ।

অড়বিচিঞ্চর—কর্ণাট প্রদেশের ধারবার ও বিজাপুর জেলাবাসী এক জাতি। ইহারা সংখ্যায় অত্যল্প ও হিন্দুধর্ম্মী যাযাবর শ্রেণীর লোক। কোন কোন স্থানে ইহাদিগকে চিগ্‌রী-বৎকর অথবা ফাঁসেপার্দ্ধিও বলা হয়। অড়বিচিঞ্চরেরা প্রায়ই বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ায়, কখন কখন পশ্বাদি অপহরণার্থ লোকালয়ে আসে। সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'অটবী' এবং 'সঞ্চর' হইতে ইহাদের এই নাম হইয়াছে। ধাঙ্গড়, কবলিগার, রাজপুত প্রভৃতি শ্রেণীর লোক ইহাদের দলে দেখা যায়। এই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ বা আহারাদি প্রচলিত নাই। ইহারা গুজরাটী ভাষাভাষী, তবে কানাড়ী ও হিন্দী ভাষাতেও কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। ইহাদের গায়ের রঙ্ ততটা ময়লা না হইলেও সর্ব্বদা অপরিচ্ছন্ন থাকায় দেখিতে বড়ই কদাকার।

ইহাদের চুল লম্বা ও জটাবদ্ধ, পরিধানে ও স্কন্ধে দুইখানি মলিন বস্ত্র। অলঙ্কারের মধ্যে ইহারা সাধারণতঃ কাচের মালা ও বালা এবং কিছু পিতলের গহনা ব্যবহার করিয়া থাকে। যাযাবর বলিয়া ইহাদের স্থায়ী ঘরবাড়ী বা ভূসম্পত্তি নাই। ইহারা মাংস খাইয়া থাকে; তবে গোমাংস বা শূকরমাংস ইহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ। মদ্যাদিও ইহাদের প্রিয় সামগ্রী। শস্য পক্ক হইলে ইহারা গ্রামে আসিয়া প্রায়ই তাহা অপহরণ করে। সময়ে সময়ে ইহাদের দৌরাত্ম্য এত অধিক হয় যে, ভূম্যধিকারিগণ ইহাদিগকে শান্ত রাখিবার জন্য কিছু কিছু শস্য বা অর্থ প্রদান করিয়া থাকে। দিবাভাগেও ইহারা গ্রামবাসীদের শস্য বা গবাদি পশু চুরি করে। যল্লম, তুলজা-ভবানী, ব্যঙ্কটেশ প্রভৃতি দেবতার মূর্ত্তি ইহারা সঙ্গে রাখে ও পূজা করে। ধর্ম্মার্থ উপবাস, ভোজনোৎসব, তীর্থগমন প্রভৃতি ইহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। ইহারা ইন্দ্রজাল ও ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস-পরায়ণ। শিশুর জন্মের পঞ্চম দিনে ইহারা মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেয়। শিশুর সকলগুলি দাঁত উঠা পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে এইরূপ করে। তৎপরে আর সহজে তাহার চুল কাটা হয় না। ইহাদের মধ্যে বিবাহের বয়স নির্দ্দিষ্ট নাই, যে কোন বয়সে বিবাহ হইতে পারে। ইহাদের বিধবাদের বিবাহ ও পুরুষদের বহু বিবাহ হইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীগণ বহুভর্ত্তৃকা হইতে পারে না। বিবাহের সময় বরকন্যাকে অশ্বত্থপত্রে সাজান হয় এবং উভয়ের বস্ত্র সাতটী গাঁইট দ্বারা একত্র বন্ধন করা হয়। তৎপরে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ উভয়ের মস্তকের উপর দিয়া হরিদ্রারঞ্জিত তণ্ডুল নিক্ষেপ করে। এইরূপে বিবাহ নিষ্পন্ন হয়। ইহাদের মৃতদেহ কখন দাহ, আবার কখনও বা সমাহিত করিতে দেখা যায়। সামাজিক ব্যাপারের মীমাংসা সম্প্রদায়ের বৃদ্ধগণই করিয়া থাকে।

অড়স—নাগপুর হইতে ১৭ মাইল দূরে অবস্থিত একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানে ৫টী পুরাতন দেবমন্দির বর্ত্তমান। তন্মধ্যে গণপতি ও মহাদেবের মন্দিরই উল্লেখযোগ্য। এই গ্রামে বহু ব্রাহ্মণের বাস আছে।

অড়হর—(দেশজ) শমীধান্যবিশেষ। ইহার সংস্কৃত নাম আঢ়ক, আঢ়কিক, আঢ়কিকা, আঢ়কী, তুবর, তুবরক, তুবরিকা, তুবরী, তূবরী। 'আঢ়কী' হইতেই 'অড়হর' নাম হইয়াছে। হিন্দীতে রহর, টর্, টোর, তুবরী, টুমুর। যুক্তপ্রদেশে অঢ়র, থোর, টোর, থুর, থোহর্, রহন; বঙ্গে অড়হর, অড়র, অরল; গুজরাটে তুবীরো, তুর্দাল; তামিলে তুবরই বা থোবারে; তেলেগুতে কন্দলু; পারস্যে শকুল; আরবে শাজ্ এবং সিংহলে রত-তোর বলে। লাটিন্ নাম Cajanus Indicus. ইংরেজীতে ইহাকে Pigeon Pea ও Congo Pea বলে। ভারতবর্ষ, আফ্রিকা ও মলয় উপদ্বীপে অড়হর উৎপন্ন হয়।

খাদ্যশস্যরূপে এদেশে বিস্তর অড়হরের চাষ হইয়া থাকে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬০০০ ফুট উচ্চস্থানেও ইহার চাষ দেখা যায়। অড়হর দাইল এতদ্দেশীয় সাধারণ লোকের একটী প্রধান খাদ্য। বঙ্গদেশ অপেক্ষা পশ্চিমাঞ্চলেই ইহার ব্যবহার অধিক। বাঙ্গালীর যেমন মাছ ভাত, পশ্চিমাদের তেমন অড়র দাইল ও রুটী চল্‌তী খাদ্য। দাইল ছাড়া ইহার ছাতুও লোকে খাইয়া থাকে। অড়হরের ছাতু হইতে পিষ্টকাদি তৈয়ারী হয়।

অড়হর দাইল বলকারক, কিন্তু কিঞ্চিৎ কষায়াস্বাদ ও কোষ্ঠ-বদ্ধকর। যাহাদের অম্ল বা অজীর্ণ রোগ আছে, তাহাদের পক্ষে ইহা বিষবৎ পরিত্যজ্য। সুশ্রুতের মতে আঢ়কী কফপিত্তের শান্তিকর, এবং অতিশয় বায়ুপ্রকোপক নহে। "আঢ়কী কফপিত্তাঘ্নী নাতিবাতপ্রকোপিনী।" রাজ-নির্ঘণ্টুর মতে আঢ়কী তিন প্রকার—শ্বেত, রক্ত ও পীত। তন্মধ্যে প্রথমটী ত্রিদোষজনক; দ্বিতীয়টী রুচ্য ও বল্য এবং পিত্ত ও তাপাদিনাশক; তৃতীয়টী দীপক ও পিত্তদাহহারক। আধুনিক ডাক্তারগণ মত প্রকাশ করেন, অড়হর গুরুপাক এবং পাকস্থলীর উত্তেজনাকারক। রাসায়নিক পরীক্ষায় অড়হর দাইলে শতকরা ১৯·৮৩ হইতে ২০·৩৮ ভাগ নেত্রজনঘটিত দ্রব্য, ৬১·৯০ হইতে ৬৪·৩২ ভাগ শ্বেতসার ও ১·১০ হইতে ১·১২ ভাগ তৈলজাতীয় দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে।

অড়হরের চাষ দুই প্রকারে হইয়া থাকে—(১) পৃথক্‌ভাবে এবং (২) অন্য কোন শস্যের সহিত মিশ্রিতভাবে। যুক্তপ্রদেশে অধিকাংশ স্থলেই জোয়ার, বাজ্‌রা, তুলা প্রভৃতির সহিত একত্র অড়হরের চাষ হয়; অল্পস্থলেই পৃথক্‌ভাবে ইহার চাষ করা হইয়া থাকে। অড়হরের পক্ষে আর্দ্র ও দোঁয়াশ মাটীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তবে জোয়ার বা তুলার সহিত মিশ্রিতভাবে বপন করিলে মৃত্তিকা কিছু শক্ত হওয়া আবশ্যক। আবার বাজ্‌রার সহিত একত্র বপনে খুব হাল্কা মাটীর প্রয়োজন। পৃথক্‌ভাবে বপন করিলে প্রতি একর জমিতে ৬ সের বীজ লাগে; শস্য উৎপন্ন হয় প্রায় ৭ মণ। মিশ্রিত বপনে একর প্রতি ২ সের বীজ দরকার হয়; উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ১ হইতে ৫ মণ। অবশ্য স্থলবিশেষে উল্লিখিত পরিমাণের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। যুক্তপ্রদেশে বর্ষার প্রারম্ভে অড়হর বপন করা হয় এবং বসন্তকালে রবিশস্যের সঙ্গেই অড়হর কাটা হয়। প্রথমে কাটা গাছগুলি স্তূপাকারে কএকদিন রাখিয়া দেয়, পরে পত্র ও ফলগুলি ছিঁড়িয়া পৃথক্ করিয়া বলদ দিয়া মাড়ান হয়,

অথবা মুগুর দিয়া পিটিয়া দাইল সংগ্রহ করা হয়। শীতকালে তুষারপাত হইলে অড়হরের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশে অড়হরের জল্‌দী এবং নাবী দুইটী চাষ হইয়া থাকে। বঙ্গের অনেকস্থানে আশুধান্যের সহিত একসঙ্গে অড়হর বপন করিয়া পৌষ মাঘ মাসে কাটা হয়।

ওয়াট্ সাহেব তাঁহার Dictionary of the Economic Products of India গ্রন্থে নিম্নলিখিত দুই প্রকার অড়হরের উল্লেখ করিয়াছেন। (১) Cajanus flavus—ইহা মধ্য-প্রদেশে ও দাক্ষিণাত্যেই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ইহার দেশীয় নাম 'থূর'। ইহার গাছগুলি খর্ব্বাকৃতি। 'থূর' জল্‌দী জাতীয়। (২) Cajanus bicolor—যুক্তপ্রদেশে ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেই ইহার চাষ অধিক। ইহার দেশীয় নাম 'অড়হর'। 'থূর' অপেক্ষা ইহার গাছগুলি লম্বা। ইহা নাবী জন্মে। ইহার ফলন প্রথম প্রকার অপেক্ষা ৫।৬ গুণ বেশী। মিঃ জে. কামেরন্ লিখিয়াছেন যে, মহিসুর রাজ্যে তিন জাতীয় অড়হর জন্মে—এক জাতীয় বড়, ইহার স্থানীয় নাম তুরুক্-তোগরি; অপর দুই জাতীয় ছোট, তাহাদের স্থানীয় নাম বলদ-তোগরি ও সৌন-তোগরি।

খাদ্যবস্তু ব্যতীত অড়হর অন্য ভাবেও ব্যবহৃত হয়। ইহার শাখা ও পত্র গৃহপালিত পশুর খাদ্য। গাছ শুকাইয়া জ্বালানী কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার কাণ্ড দ্বারা ঝুড়ি প্রভৃতি তৈয়ারী করা হইয়া থাকে। অনেকস্থানে অড়হর গাছে লাক্ষাকীট পালন করা হয়। ঔষধার্থ অড়হরপত্রের ব্যবহার আছে। দাঁতের মাড়ির বেদনায় কচি অড়হর পাতা চিবাইলে অথবা অড়হরপাতা-সিদ্ধ জল দিয়া কুলকুচা করিলে বেদনার উপশম হয়। অড়হরের ফল এবং পত্র একত্র পেষণ ও গরম করিয়া স্তন্যে প্রলেপ দিলে স্তনের দুগ্ধক্ষরণ নিবারিত হয়। মান্দ্রাজ অঞ্চলের অধিবাসিগণ অড়হর বীজের প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া বেদনাস্থলে প্রয়োগ করে। আমাদের দেশে তুবড়ী প্রভৃতি বাজী প্রস্তুত করিতে অড়হরের ডাল পুড়াইয়া কাঠকয়লা রূপে ব্যবহৃত হয়।

অড়হু—(পুং) [বৈদ্যক] লকুচবৃক্ষ।

অড়াণ—বেরার প্রদেশস্থ যেওৎমাল জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৩০ মাইল ও বাসিম তালুক হইতে উৎপন্ন হইয়া পেনগঙ্গা নদীতে মিলিত হইয়াছে।

অড়িবি রাবুলপাড়ু—মান্দ্রাজের কৃষ্ণা জেলার নন্দীগ্রাম তালুকের অন্তর্গত একটী গ্রাম। এই গ্রামে ১১৬৪ শকাব্দে উৎকীর্ণ একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। স্থানীয় কোন ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক একটী মন্দিরের উদ্দেশ্যে এই তাম্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছে।

অড়িমিত্তম্—মারানজাতির একটী শাখা। ইহারা ত্রিবাঙ্কুরের মন্দির-প্রাঙ্গণসমূহ মার্জ্জন করে।

অড়ুত্তোন—মলয়ালম্ নাপিতদিগের একটী শাখা। ইহাদের নামান্তর 'কাবুতিয়ন্'।

অড়ুমায়—বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতায় বর্ণিত অল্পশ্বাস-মহাশ্বাস অবদানে উল্লিখিত একটী বন। এই বনসন্নিধানে ধৃতরাষ্ট্র, বিরূঢ়, বিরূপাক্ষ ও ধনাধিপ নামে ৪টী নাগ এবং কৈণকেয় নামধেয় একব্যক্তি ও তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র শৈল বাস করিত। ইহারা সকলে পূর্ব্বজন্মে কাশ্যপ বুদ্ধের উপদেশ মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ করিয়াছিল। ইহারা ছয়জন ভগবান্ জিনের অনুগ্রহলাভে সমর্থ হইয়াছিল।

অড়ুবীল—'আপস্তম্বসামান্যসূত্রবৃত্তি' গ্রন্থের রচয়িতা।

অড়ুসুমিল্লি রামনায়ডু—মান্দ্রাজের কৃষ্ণা জেলায় পলনাড় তালুকের অন্তর্গত কারেম্পূড়ী নামক স্থানে যে বিষ্ণুমন্দির আছে, তাহার প্রাচীরে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায়, অড়ুসুমিল্লি রামনায়ডু ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে পুরাতন ধ্বংসাবশেষের উপর এই মন্দির পুনর্নির্ম্মিত করেন। প্রবাদ এই যে, 'পলনাটি বীরালু' বা পলনাড়ের বীরগণ ১৪শ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মন্দিরের গর্ভালয় দেখিয়াও এই প্রবাদ সত্য বলিয়া বোধ হয়।

অড্ড—[ভ্বা°, পর°, সক°, সেট্] অভিযোগ। ২ নির্ব্বাহ। [লট্—অড্ডতি। লিট্—আনড্ড। লুট্—অড্ডিতা। লুঙ্—আড্ডীৎ। সন্—অড্ডিডিষতি, অডিড্ডিষতি। ণিচ্—অড্ডয়তি, আড্ডিডৎ।]

অড্ডক—রাজাধিরাজ মহীপালদেবের অধীন চাপের মহা-সামন্তাধিপতি। জুনাগড়ের চূড়াসমা-বংশীয় ধরণীবরাহের বড়ডালার দানপত্র বর্দ্ধমানে প্রদত্ত হয় (৮৩৬ শকাব্দে)। ধরণীবরাহ বর্দ্ধমানের (বঢ়বান) নৃপতি ছিলেন। বর্দ্ধমান পূর্ব্ব-কাথিয়াবাড়ে অবস্থিত। ধরণীবরাহের ভ্রাতার নাম ধ্রুবভট্ট, পিতা পুলকেশী ও পিতামহ অড্ডক।

অড্ডন—(ক্লী) চর্ম্ম; ঢাল।

অঢেল—(দেশজ) প্রচুর, যথেষ্ট।

অণ্১—পাণিনিগৃহীত প্রত্যয়বিশেষ। অণের ণ ইৎ যায়, অ থাকে। যথা, কুম্ভ-কৃ-অণ্ কুম্ভকার।

অণ্২—পাণিনিগৃহীত চতুর্দ্দশ বর্ণপ্রত্যাহারের মধ্যে একটী প্রত্যাহারের নাম। যথা—"ইতি মাহেশ্বরাণি সূত্রাণি অণাদি সংজ্ঞার্থানি।" কথিত আছে, পাণিনি মুনি অতিশয় স্থূলবুদ্ধি ছিলেন। উপবর্ষের কাছে বিদ্যা শিখিবার সময় তিনি শাস্ত্রার্থ ভালরূপ বুঝিতে পারিতেন না। তাই মনের খেদে

তিনি মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। মহেশ্বর পাণিনির প্রতি তুষ্ট হইয়া তাণ্ডব আরম্ভ করিলেন। নৃত্যের পর তিনি চৌদ্দবার ডমরু বাজাইয়া চতুর্দ্দশ সূত্রের উপদেশ দেন,—

"নৃত্যাবসানে নটরাজরাজো ননাদ ঢক্কাং নবপঞ্চবারান্।
উদ্ধর্ত্তু কামঃ সনকাদিসিদ্ধানেতদ্বিমর্শে শিবসূত্রজালম্॥"

অণাদি সূত্র হইতে একচল্লিশটী সংজ্ঞা পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে প্রযুক্ত হইয়াছে।

"একস্মান্ ঙজণবটা দ্বাভ্যাং ষস্ত্রিভ্য এব কণমাঃ স্যুঃ।
জ্ঞেয়ৌ চয়ৌ চতুর্ভ্যো রঃ পঞ্চভ্যঃ শলৌ ষড়্ভ্যঃ॥"
(কাশিকা)

যথা—অণ্ এঙ্ যঞ্ ছব্ অট্=৫। ঝষ্ ভষ্=২। অক্ ইক্ উক্=৩। অণ্ ইণ্ যণ্=৩। অম্ যম্ ঙম্=৩। অচ্ ইচ্ এচ্ ঐচ্=৪। যয়্ ময়্ ঝয়্ খয়্=৪। যর্ ঝর্ খর্ চর্ শর্=৫। অশ্ হশ্ বশ্ ঝশ্ জশ্ বশ্=৬। অল্ হল্ বল্ রল্ ঝল্ শল্=৬। মোট ৪১ (একচল্লিশটী) সংজ্ঞা।

অণ$_৩$—[ভ্বা°, পর°, অক°, সেট্] শব্দ। [লট্—অণতি। লিট্—আণ। লুট্—অণিতা। লুঙ্—আণীৎ। সন্—অণিণিষতি। ণিচ্—আণয়তি।]

অণ$_৪$—[দিবা°, আত্ম°, অক°, সেট্] জীবন; প্রাণ। [লট্—অণ্যতে। লিট্—আণে। লুট্—অণিতা। লুঙ্—আণিষ্ট। সন্-অণিণিষতে।]

অণইপট্টি—দক্ষিণভারতের শিন্ন কদিরপ্প নায়ক নামধেয় দুইজন নৃপতির দুইখানি তাম্রশাসনে এই গ্রামের নামোল্লেখ আছে। তাম্রশাসন দুইখানির তারিখ যথাক্রমে ১৫৬৩ ও ১৬৫১ শকাব্দ এবং ইহা স্থানীয় মন্দির ও পণ্ডিতগণের উদ্দেশে প্রদত্ত। দ্বিতীয় তাম্রশাসনে অণইপট্টির নামান্তর সৌন্দররাজপুরম্।

অণক—(ত্রি) [অণতি যথেচ্ছম্ নদতি। অণ্-অচ্, ততঃ কুৎসায়াং ক] অধম। ২ কুৎসিত। [অন্য সুবন্ত পদের সহিত সমাসে পাপ ও অণক শব্দের পূর্ব্বনিপাত হয়। যথা—অণককুলালঃ। (সিদ্ধান্তকৌ°)]

অণকীয়—(ত্রি) অধম বা নীচজনসম্বন্ধীয়। ২ কুৎসিত জনসম্বন্ধীয়।

অণব্য—(ক্লী) [অণোঃ সূক্ষ্মশস্যোৎপাদকং ক্ষেত্রম্; অণু-যৎ] চীনকাদি অণুধান্যোৎপাদক ক্ষেত্র (সুনাভূমি); যাহাতে কেবল ভাঁটুই জন্মে।

অণহিল$_১$—চাহমানবংশীয় রাজবিশেষ। চাহমানবংশীয় কীর্ত্তিপালের নদ্দূল-শিলালিপি হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়—শাকম্ভরী নগরস্থ চাহমানবংশীয় রাজা বাক্পতিরাজের পুত্র লক্ষ্মণ। ইনি নদ্দূলের রাজা ছিলেন। তৎপুত্র শোভিত। শোভিতের পর বলিরাজ রাজত্ব করেন। তৎপরে যথাক্রমে তাঁহার পিতৃব্য বিগ্রহপাল ও তৎপুত্র মহেন্দ্র রাজা হইয়াছিলেন। মহেন্দ্রসুত অণহিল, তৎপুত্র জেন্দ্ররাজ, জেন্দ্ররাজপুত্র আশারাজ, তৎপুত্র আহ্লণ সৌরাষ্ট্রিকগণকে জয় করিয়াছিলেন। আহ্লণ রাষ্ট্রৌড় নৃপতি অণহুলের কন্যা অন্নলদেবীকে বিবাহ করেন। আহ্লণের পুত্রই কীর্ত্তিপাল। শিলালিপিখানি ১২১৮ বিক্রমাব্দে উৎকীর্ণ।

অণহিল$_২$—অণহিলবাড়ের প্রতিষ্ঠাতা বনরাজের অনুচর। কথিত আছে, ইঁহারই নামানুসারে অণহিলবাড় নগরের নামকরণ হয়। [অণহিলবাড় দ্র°]

অণহিলবাড়—বোম্বাই প্রদেশান্তর্গত গুজরাট্‌বিভাগস্থ মধ্যযুগের একটী রাজধানী। নামান্তর অণহিলপত্তন, অণহিলপাটক, অণহিলপুর, অণহিল্লপাটক, অণহিল্লবাটক, অণহিলনগর। প্রাচীন আরবী গ্রন্থকারগণ এই স্থান আম্‌হল, ফাম্‌হল, কাম্‌হল, কামুহুল, মাম্‌হুল, নহলবার, নহরবাল প্রভৃতি নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে এই পুরাতন রাজধানী সরস্বতী নদীতটস্থিত পাটন নামে পরিচিত। [পাটন দ্র°] ইহা আহ্‌মদাবাদ হইতে ৬৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত।

'কুমারপালচরিতে' প্রাচীন অণহিলবাড়ের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালে এই নগরের বিস্তার প্রায় ১২ ক্রোশ ছিল। অল্ ইদ্রিসী (১১৫৩ খৃঃ) নামক এক প্রাচীন গ্রন্থকার এই স্থানকে 'নহখাল' নামে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত বিবরণীতে ইহার সমৃদ্ধির ও সুশাসনের ভূরি ভূরি প্রশংসা করা হইয়াছে। মুসলমান ঐতিহাসিক নূরউদ্দীন্ মুহম্মদ উফীকৃত 'জামী-উল্-হিকায়ান' নামক গ্রন্থ হইতেও প্রাচীন অণহিলবাড় সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়।

অণহিলবাড়ের প্রতিষ্ঠাতা বনরাজ উত্তর গুর্জ্জরদিগের রাজধানী শ্রীমাল বা ভিনমালের গুর্জ্জরজাতীয় চাবড়া বা চাপবংশীয়। বিখ্যাত জ্যোতিষী ব্রহ্মগুপ্তের লেখা হইতে জানা যায়, ৬২৮ খৃষ্টাব্দে যখন চাপগণ ভিনমালে রাজত্ব করিতেছিলেন, তৎকালে এই জাতির একটী শাখা পঞ্চাসরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। খৃষ্টীয় ৮ম শতকের মধ্যভাগে এই শহরটী লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইলে এই শাখা অণহিলবাড়ে আসিয়া তাঁহাদের নূতন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রাকৃত 'চোরট' শব্দের সহিত চাবড়া কথার সাদৃশ্য আছে দেখিয়া ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন, গুর্জ্জরজাতির এই শাখাটী লুটপাট করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতেন বলিয়া

লোকে ঘৃণা করিয়া তাঁহাদিগকে এই নামে ডাকিত। [চাবড়া দ্র°]

পঞ্চাসরের নিকটবর্ত্তী চান্দুর গ্রামে বনরাজের জন্ম হয়। * ইহারই নিকটবর্ত্তী বুনোদ নামক একটী ক্ষুদ্র নগরে তাঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। জৈন সন্ন্যাসী শীলগুণ-সূরি বনরাজের শিক্ষক ছিলেন। ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতৃব্য শূরপাল তাঁহাকে স্বীয় দস্যুদলে গ্রহণ করেন। অচির-কাল মধ্যেই অসমসাহসিকতা ও দানশীলতার জন্য বনরাজের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। এই সময় হইতেই তিনি মনে মনে একটী রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প পোষণ করিতে থাকেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে আরও কিছুকাল তাঁহাকে দস্যু-দলের নেতৃত্ব করিতে হয়। ইত্যবসরে কল্যাণ হইতে আগত রাজপ্রতিনিধিগণকে আক্রমণপূর্ব্বক তিনি প্রচুর ধনরত্ন লাভ করেন। অতঃপর কিছুকাল গুজরাটের বনে পর্ব্বতে পরি-ভ্রমণ করিবার পর অবশেষে অণহিলপুর বা অণহিলবাড় নির্ম্মাণে মনোযোগী হন। ৭৪৬ খৃষ্টাব্দে অণহিলবাড় স্থাপিত হয়।



অণহিলবাড়ের প্রতিষ্ঠাতা বনরাজের মূর্ত্তি।

তাঁহার অনুচর অণহিলের এখানকার যথেষ্ট ভৌগোলিক জ্ঞান থাকায় তাঁহারই নামে নগরের নামকরণ হইল। জ্যোতিষিগণ গণনা করিয়া বলিলেন, এই নগরটী ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে; কিন্তু তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অতিশয় সমৃদ্ধিশালী থাকিবে।

মহাসমারোহের সহিত বনরাজের অভিষেক হইল। দস্যু-জীবনে আতিথ্যদানে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া পূর্ব্বসঙ্কল্প মত বণিক্‌পত্নী শ্রীদেবী অভিষেককার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। দস্যু-জীবনের সাহসী অনুচর বণিক্‌জাতীয় চম্পা মন্ত্রিত্ব লাভ করিলেন। শিক্ষক শীলগুণসূরি পৌরোহিত্যে নিযুক্ত হইলেন। তিনি রাজধানীতে জৈনধর্ম্মানুযায়ী পূজাদির প্রবর্ত্তন করেন। বনরাজ সম্ভবতঃ তাঁহারই পরামর্শে পঞ্চাসর হইতে পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি আনয়নপূর্ব্বক অতি ধুমধামের সহিত নূতন রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে, পাটনের বর্ত্তমান উমামহেশ্বর ও গণেশমূর্ত্তি বনরাজেরই স্থাপিত সুতরাং ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার মত অতি উদার ছিল বলিয়াই মনে হয়।

৮০৬ খৃষ্টাব্দে বনরাজের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র যোগরাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। যোগরাজ এই নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যটীর পরিধি ক্রমশঃ বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তিনি পণ্ডিত এবং যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কথিত আছে, তিনি একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে একখানি বৈদেশিক জাহাজ সৌরাষ্ট্রস্থিত পত্তন বন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করিলে যুবরাজ ক্ষেমরাজ তাহা লুণ্ঠন করেন। এই সংবাদ যোগরাজের কর্ণগোচর হইলে তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হন। যোগরাজের মৃত্যু হইলে ক্ষেমরাজ রাজা হইলেন। ইনি অতিশয় ক্রোধপরায়ণ ছিলেন। যদিও তাঁহার অধীনস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ সুযোগ্য ছিল না এবং আত্মীয়-গণও তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন, তথাপি তাঁহার রাজত্বকালে অণহিলবাড়ের গৌরব ও সমৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। ক্ষেমরাজের মৃত্যুর পর যথাক্রমে পৃথু, বিজয়সিংহ, রাবৎসিংহ ও সামন্তসিংহ অণহিলবাড়ের রাজা হন।

কথিত আছে, কান্যকুব্জের রাজধানী কল্যাণ হইতে চালুক্য বা শোলাঙ্কীবংশীয় রাজা ভুবনাদিত্যের পুত্র স্বীয় অপর দুই ভ্রাতার সহিত তীর্থভ্রমণ উপলক্ষ্যে সোমনাথপত্তনে উপস্থিত হন। এখান হইতে তাঁহারা অণহিলবাড়ে আগমন করিয়া অশ্বারোহী সৈন্যের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন। সৈন্যদের কুচকাওয়াজে যথেষ্ট ত্রুটি দেখাইয়া স্বয়ং উত্তমরূপে সাধারণের সমক্ষে তাহা প্রদর্শন করিলেন। ইহাতে রাজা সামন্তসিংহ পরমপ্রীত হইয়া স্বীয় ভগিনী লীলাদেবীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় লীলাদেবীর মৃত্যু হইলে তাঁহার উদর বিদীর্ণ করিয়া জীবন্ত সন্তান বাহির করা হয়। এই পুত্রের নাম হইল মূলরাজ। সামন্তসিংহ ইঁহাকে দত্তক-পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মূলরাজ মাতুলের

* কথিত আছে, বনরাজের পিতার নাম বেণীরাজ এবং পিতামহের নাম বৎসরাজ।

অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। সামন্তসিংহ অনেক সময় মত্ত অবস্থায় তাঁহাকে সিংহাসন দান করিতেন এবং পুনরায় প্রকৃতস্থ হইলে সিংহাসন অধিকার করিয়া লইতেন। অবশেষে মূলরাজ সামন্তসিংহের হত্যাসাধনপূর্ব্বক অণহিলবাড়ের সিংহাসন অধিকার করেন (৯৬০ খৃঃ)।

চাবড়াবংশীয় নরপতিদিগের রাজত্বকালে আরবদেশীয় বণিক্ এবং দেশভ্রমণকারিগণ গুজরাটে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের লিখিত কাহিনীতে যথেষ্ট ভ্রম থাকিলেও তাঁহারা অণহিলপুর রাজ্যের সমৃদ্ধি এবং আচারব্যবহার সম্বন্ধে যে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তদানীন্তন কালের হিন্দু-সমাজের সহিত বর্ত্তমান কালের হিন্দু-সমাজের অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। তৎকালে মৃতদেহ দাহ করিবার প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। যাহারা কোন অপরাধে অভিযুক্ত হইত, তাহারা অগ্নি এবং জলপরীক্ষা দ্বারা আপন নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিত। সহমরণের প্রথা তৎকালে প্রচলিত ছিল। ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত সন্ন্যাসী সর্ব্বত্র দেখা যাইত। রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষমতার আধার রাজা। রাজপদ যেমন একটী বিশেষ বংশ এবং পরিবারে নিবদ্ধ ছিল, তদ্রূপ প্রত্যেক ব্যবসাও কুলগত ছিল; বিভিন্ন প্রকারের ব্যবসায়িগণের মধ্যে বৈবাহিক আদানপ্রদান হইতে পারিত না। বহু-বিবাহপ্রথা সর্ব্বত্র লক্ষিত হইত। হিন্দুগণ মনে করিতেন—কোন কার্য্য উপলক্ষ্যে ঠাকুর দেবতার প্রত্যাদেশ পাওয়া যায়। ভাতই প্রধান খাদ্য ছিল। ভোজনের পূর্ব্বে আচমন এবং স্নানের প্রথা সকল হিন্দুদিগের মধ্যেই দেখা যাইত। রাজার সৈন্যদিগের মধ্যে সকলেই বেতনভুক্ ছিল না—অনেকে নিজ খরচে সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত হইত। আবু জৈদল হাসান লিখিয়াছেন—'বৃদ্ধ হইলে কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ উভয়েই অগ্নিতে পড়িয়া কিংবা জলে ডুবিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিত। ভারতীয় সাধু, চিকিৎসক এবং কবি প্রায়ই ব্রাহ্মণজাতীয় ছিলেন। কবিরা রাজাদের উদ্দেশ্যে চাটুবাক্য সম্বলিত কবিতা রচনা করিতেন।' রাজারা কর্ণভূষণ পরিতেন। এই কর্ণভূষণ সুবর্ণমণ্ডিত বহুমূল্য মণি দ্বারা নির্ম্মিত হইত। এতদ্ব্যতীত ইঁহারা সুবর্ণ ও দুষ্প্রাপ্য প্রস্তরশোভিত কণ্ঠহারও পরিধান করিতেন। ইঁহাদের নিকট মুক্তার অতিশয় সমাদর ছিল। অপরাপর বহুমূল্য মণি-মাণিক্যের সহিত মুক্তাও অতি যত্নে রাজকোষাগারে রক্ষিত হইত।

চালুক্যবংশ সম্বন্ধে পূর্ব্বে মতদ্বৈধ ছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করিতেন, দাক্ষিণাত্য-চালুক্যবংশের একটী শাখা দ্বারা অণহিলবাড় অধিকৃত হয়। কিন্তু অবশেষে জর্জ্জ বৃহ্‌লার সাহেব প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন*—মেরুতুঙ্গ যে কল্যান রাজধানীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কান্যকুব্জের অন্তর্গত কোন একটী নগর হইবে। অণহিলবাড়ের চালুক্যগন সমস্ত দানপত্রেই নিজদিগকে চৌলুকিক বলিয়া অভিহিত করিতেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের চালুক্যগণ ঐরূপ আখ্যা কোথায়ও ব্যবহার করেন নাই। দক্ষিণের চালুক্যগণের কুলদেবতা বিষ্ণু, গুজরাটী চালুক্য-গণের কুলদেবতা শিব; একের পরিচয় বরাহে, অপরের পরিচয় বৃষে। দাক্ষিণাত্যের চালুক্যদিগের সহিত অণহিল-বাড়ের চালুক্যগণের বিশেষ বণিবনাও ছিল না। মূলরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই গুজরাটের অনেক স্থানে উত্তর হইতে আনাত বহু ব্রাহ্মণ-পরিবারের বসতি স্থাপন করেন। গুজরাটে তাঁহাদিগকে ঔদীচ্য বলা হয়।

মূলরাজের রাজ্যারোহণের অব্যবহিত পরে তেলিঙ্গ হইতে রাজা তৈলপ তাঁহার বিরুদ্ধে সেনাপতি বারপের অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। সেই সময়ে আবার শাকম্ভরীর রাজা সপাদলক্ষীয় তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। উভয়ের সম্মিলিত আক্রমণে বাধা প্রদান করিতে অক্ষম হইয়া মূলরাজ কচ্ছে অবস্থিত কন্থাদুর্গে পলায়ন-পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করেন। ক্রমে তিনি বলসঞ্চয় করিয়া অণহিলবাড় রাজ্যসীমার বিস্তারসাধনে বদ্ধপরিকর হন। কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্রের অধিপতি এবং অচলগড়ের পরমার-রাজ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁহার বিজয়পতাকা দাক্ষিণাত্যের নর্ম্মদা নদী অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রাদ্রি পর্ব্বত-মালায় উড্ডীন হইয়াছিল। মারবাড় এবং উত্তর ভারতের বহু রাজন্যবর্গ গুজ্জররাষ্ট্রের পতাকাতলে সম্মিলিত হইয়া-ছিলেন। ৯৮৬-৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া বামনস্থলী বা বনথলীর আভীর বা যাদবদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি তৎকালে একজন অতিপরাক্রান্ত নরপতিরূপে গণ্য হইলেন। কিন্তু সংসারের যাবতীয় সুখভোগ করিয়াও মূলরাজ তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। তিনি শেষজীবনে কৃতপাপের অনুশোচনায় বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। বহু তীর্থপর্য্যটন করিয়াও যখন তাঁহার মনে শান্তি ফিরিয়া আসিল না, তখন অবশেষে সরস্বতী নদীর তটে সিদ্ধপুর নামক স্থানে রুদ্রমহালয় নামে মহাদেবের একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অত্যল্পকালমধ্যে সিদ্ধপুর একটী প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্ররূপে গণ্য হইল। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট

* Indian Antiquary, Vol. VI.

করিতে না পারিলে তাঁহার পাপক্ষয় হইবে না। এজন্য তিনি উত্তর দেশ হইতে বহু সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাঁহাদিগকে রাজ্যদান করিতে চাহিলেন। কিন্তু তাঁহারা অসম্মত হইলে অগত্যা পুত্র চামুণ্ডের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সিদ্ধপুরে একটী রমণীয় বাসভবন নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেই স্থানেই ব্রাহ্মণগণের পরিচর্য্যায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। ৯৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

চামুণ্ড ত্রয়োদশ বর্ষ রাজত্ব করেন। ইঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দুইটী পুত্র বল্লভরাজ ও দুর্ল্লভরাজ পর্য্যায়ক্রমে রাজা হইয়াছিলেন। বল্লভরাজ বসন্তরোগে অকালে প্রাণত্যাগ করিলে ভ্রাতা দুর্ল্লভরাজ রাজা হইলেন। ইনি ১০২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। দুর্ল্লভরাজ 'দুর্ল্লভসরোবর' নামে একটী সুন্দর জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইনি স্বেচ্ছায় সিংহাসন পরিত্যাগ করিলে ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাগরাজের পুত্র ১ম ভীমদেব রাজা হন। মেরুতুঙ্গ-লিখিত বিবরণী হইতে জানা যায়, চামুণ্ড এবং দুর্ল্লভ উভয়েই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসী হইয়া দুর্ল্লভ বারাণসী যাইবার সময় মালব দেশে অপমানিত হন। ইহাতে উভয় রাজ্যের মধ্যে কলহের সূত্রপাত হয়।

১ম ভীমদেবের রাজত্বকালে সুলতান মাহ্‌মুদ অণহিলবাড় আক্রমণ করেন (১০২৪ খৃঃ)। যখন বিখ্যাত সোমনাথের মন্দির সুলতান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন ভীমদেব রাজধানী হইতে পলায়ন করিয়া পরিখাবেষ্টিত সুরক্ষিত কন্থকোট দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মাহ্‌মুদ এই সংবাদ শুনিয়া সসৈন্যে অশ্বপৃষ্ঠে নদী উত্তীর্ণ হইয়া দুর্গ আক্রমণ করিলেন। দুর্গ অধিকৃত হইল। ভীমদেব পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। [মাহ্‌মুদ দ্র°] কিন্তু সুলতান চলিয়া যাইবার পরই ভীমদেব পুনরায় অণহিলবাড় অধিকার করেন। ইহার পর তিনি প্রায় ৪০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ভীমদেবের পর তৎপুত্র ১ম কর্ণ ১০৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৯৩-৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অণহিলবাড়ে রাজত্ব করেন। ইনি 'ত্রৈলোক্যমল্ল' উপাধি দ্বারা ভূষিত হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র জয়সিংহ-সিদ্ধরাজ একজন পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি মালবেশ্বরকে এবং বর্ব্বরক নামক একজন ব্রাহ্মণদ্বেষী রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। কথিত আছে, জয়সিংহ পত্নী পিঙ্গলিকার অনুরোধেই কেবল বর্ব্বরকের প্রাণবিনাশ করেন নাই। বর্ব্বরক বিজয়ী নরপতিকে অনেক উপঢৌকন প্রদান করেন এবং তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া বিজয়ীর আশ্রয়ে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বর্ব্বরক সম্বন্ধে বূহ্‌লার সাহেব অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি সম্ভবতঃ ভীল কিংবা মেরজাতীয় কোন বীরপুরুষ ছিলেন। জয়সিংহের সময় রাজ্যের পরিধি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করে। [জয়সিংহ দ্র°]

জয়সিংহের মৃত্যুর পর কুমারপাল অণহিলবাড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। [কুমারপাল দ্র°] শাকম্ভরীর রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য ও বৈয়াকরণ হেমচন্দ্র কুমারপালের রাজসভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র ৮৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১১৭২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই বৎসর কুমারপাল জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কথিত আছে, ইনি প্রথমে একটী পার্শ্বনাথ দেবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু পরে স্বপ্নাদেশ পাইয়া একটী মহাদেবের মন্দির নির্ম্মাণে যত্নবান্ হন। ইঁহার মৃত্যুর পর ভ্রাতুষ্পুত্র অজয়পাল রাজা হইলেন। [অজয়পাল দ্র°] কুমারপাল জৈনদিগকে সমাদর করিতেন, কিন্তু অজয়পাল অতিশয় জৈনবিদ্বেষী ছিলেন; ইনি এরূপ জৈনদ্বেষী ছিলেন যে, কথিত আছে, ইঁহারই আদেশে প্রসিদ্ধ জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্রের শিষ্য রামচন্দ্র অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইনি অনেক জৈনমন্দির এবং জৈন-পুস্তকাদি ধ্বংস করেন। ইনিও শাকম্ভরীর রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কর আদায় করিয়াছিলেন। ১১৭৬ খৃষ্টাব্দে অজয়পাল স্বীয় দ্বারপালের হস্তে নিহত হন।

পরবর্ত্তী রাজা ২য় মূলরাজের সময়ে মুসলমান আক্রমণ আরম্ভ হয়। ইঁহার সময়কার উৎকীর্ণ-লিপি হইতে জানা যায় যে, ইনি গর্জ্জনকদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। 'গর্জ্জনক' শব্দ গজনবীদিগের পরিচয়সূচক। মেরুতুঙ্গ লিখিয়াছেন যে, ২য় মূলরাজ তুরুস্কাধিপতিকেও যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন।

২য় মূলরাজের পর ২য় ভীমদেব অণহিলবাড়ের রাজা হইলেন। ইনি চালুক্যবংশের শেষ পরাক্রান্ত রাজা। ইঁহার রাজ্য দক্ষিণ রাজপুতানার চন্দ্রাবতী এবং আবু হইতে প্রায় সমগ্র গুর্জ্জর দেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। কিন্তু ইনি বেশীদিন সুখে শান্তিতে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। জয়ন্তসিংহ নামক চালুক্যবংশীয় কোন এক সামন্ত-নৃপতি কর্ত্তৃক অণহিলবাড়ের সিংহাসন অধিকৃত হয়। কিন্তু ভীমদেব অত্যল্পকালের মধ্যে তাঁহার হৃতরাজ্য পুনরধিকার করেন। কিন্তু রাষ্ট্রবিপ্লবের কারণ তিনি সমগ্র রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন না। রাজ্যের দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ বাঘেলদিগের অধিকারভুক্ত হইল। ১২৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভীমদেব রাজত্ব করেন।

ইঁহারই রাজত্বকালে দাস-রাজ কুতবউদ্দীন্ রাজধানীর নিকট সেনাপতি জীবনরায়কে পরাস্ত করিয়া অণহিলবাড় লুণ্ঠন করেন।

ভীমদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই কিংবা তাঁহার জীবিত অবস্থায় বাঘেলবংশীয় লবণপ্রসাদ সমগ্র গুজরাটের অধীশ্বরপদে আসীন হইলেন। চালুক্যবংশীয় ত্রিভুবনপাল ভীমদেবের পরবর্ত্তী রাজা বলিয়া উল্লিখিত হন, কিন্তু সম্ভবতঃ তিনি নামেমাত্র রাজা ছিলেন। লবণপ্রসাদের মৃত্যু লইলে বীরধবল গুজরাটের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বীরধবলের পুত্র বিসলদেব ১২৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিরামদেবের পরিবর্ত্তে অণহিলবাড়ের রাজা হন। বীরধবলের মন্ত্রী বস্তুপাল বিসলদেবের সহায় ছিলেন। যখন বিরামদেব ন্যায্য দাবী হইতে বঞ্চিত হইয়া শ্বশুর জালোররাজ উদয়সিংহের সাহায্য লাভের আশায় তাঁহার রাজ্যে গমন করিলেন, তখন বস্তুপালের প্ররোচনায় বিষপ্রয়োগে বিরামের মৃত্যু সংঘটিত হয়।

বিসলদেবকে স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিতে অতিশয় বেগ পাইতে হইয়াছিল। দেবগিরির যাদবরাজকে তিনি যুদ্ধে পরাজিত করেন। মালবরাজ পূর্ণমল্ল কর্ত্তৃক সম্ভবতঃ অণহিলবাড় আক্রান্ত হইয়াছিল। মেরদিগের রাজাও ইঁহার সহিত শত্রুতাচরণ করেন। কর্ণাট-রাজকুমারী স্বয়ম্বর-সভায় অণহিলবাড়ের নৃপতি বিসলদেবের কণ্ঠে মাল্যদান করিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেন। বিসলদেবের রাজত্বকাল ১২৬১-২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। তৎপরে অণহিলবাড়ে পর্য্যায়ক্রমে বাঘেলবংশীয় নিম্নলিখিত তিনজন নৃপতি রাজত্ব করেন—অর্জ্জুনদেব (১২৬২-১২৭৪ খৃঃ), সারঙ্গদেব (১২৭৪-১২৯৬ খৃঃ) ও কর্ণ (১২৯৬-১৩০৪ খৃঃ)। অর্জ্জুনদেবের পর রামদেব অতি অল্পকাল মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। এজন্য অধিকাংশ স্থলেই তাঁহার নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সুলতান আলাউদ্দীন্ খিল্‌জির রাজত্বের তৃতীয় বৎসরের প্রথমভাগে তিনি উলুঘ খাঁ এবং নসরৎ খাঁ নামক তাঁহার দুই সেনাপতিকে বহু সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে গুজরাট্ জয় করিবার জন্য প্রেরণ করেন। মুসলমান সেনাপতিদ্বয় রাজধানী অণহিলবাড় অধিকার করিয়া সমগ্র গুজরাট্ লুণ্ঠন করিলেন। রাজা কর্ণদেব তাঁহার রাজধানী হইতে পলায়ন করিয়া দেবগিরির রাজা রামদেবের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহার রাণী ও রাজকন্যা এবং কোষাগারের সঞ্চিত অর্থরাশি ও হস্তী সমুদয়ই মুসলমানের হস্তগত হইল। গুজরাট্ মুসলমানের বশ্যতা স্বীকার করিল। বিখ্যাত সোমনাথ-মন্দিরের বিগ্রহ দিল্লীতে আনীত হইয়া যাহাতে পদদলিত হইতে পারে, তজ্জন্য রাজপথে নিক্ষিপ্ত হইল। কথিত আছে, কর্ণদেবের রাণী দেবলাদেবী সুলতান আলাউদ্দীনের অঙ্কশায়িনী হন এবং তাঁহার দুহিতা গুজরাট্-রাজকন্যা কমলা দেবীর সহিত সুলতানপুত্র খিজির খাঁর বিবাহ হয়। কমলা দেবীর পতিপ্রেম মুসলমান অন্তঃপুরে রাজপুত-মহিলার সতীত্বের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়া থাকে। নসরৎ খাঁ ইহার পরে সৈন্যসহ কাম্বের পথে অগ্রসর হইলেন এবং তথাকার বণিক্ সম্প্রদায়ের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক মণিমাণিক্য এবং বহুবিধ মূল্যবান্ দ্রব্য আদায় করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই ঘটনার পর হইতে অণহিলবাড়ের গৌরব হ্রাস হইতে আরম্ভ করিল এবং সমগ্র গুজরাট্ মুসলমান শাসনাধীন হইল। গুজরাটের ইতিহাসের সহিত এখানকার পরবর্ত্তী ইতিহাস জড়িত। [গুজরাট্ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্র°]

অণহিলবাড়-রাজগণের উৎকীর্ণ লিপির তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল—

(১) বিক্রমসংবৎ ১০৪৩—মহারাজাধিরাজ রাজির পুত্র চালুক্য মহারাজাধিরাজ প্রথম মূলরাজের দানপত্র (Ind. Ant., Vol. VI, p. 191) (২) বিক্রমসংবৎ ১০৮৬—চালুক্য মহারাজাধিরাজ প্রথম ভীমদেবের দানপত্র [Ind. Ant., Vol. VI, p. 193; Bhavanagar Inscriptions, p. 194]। (৩) বিক্রমসংবৎ ১১৪৮—চালুক্য মহারাজাধিরাজ কর্ণদেব ত্রৈলোক্যমল্ল কর্ত্তৃক প্রদত্ত দানপত্র [Ind. Ant., Vol. I, p. 317]। (৪) বিক্রমসংবৎ ১২৫৬—চালুক্য মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় ভীমদেবের প্রদত্ত দানপত্র। ইহাতে প্রথম মূলরাজ, দুর্ল্লভরাজ, প্রথম ভীম, কর্ণত্রৈলোক্যমল্ল, জয়সিংহ-সিদ্ধরাজচক্রবর্ত্তী, কুমারপাল, অজয়পাল, দ্বিতীয় মূলরাজ, দ্বিতীয় ভীম ও অভিনবসিদ্ধরাজের উল্লেখ আছে [Ind. Ant., Vol. II, p. 71]। (৫) বিক্রমসংবৎ ১২৬৩—চালুক্যরাজ দ্বিতীয় ভীমদেবের দানপত্র [Ind. Ant., Vol. VI, p. 194]। (৬) বিক্রমসংবৎ ১২৬৬—চালুক্যাধিপতি দ্বিতীয় ভীমদেবের রাজ্যকালে প্রদত্ত দানপত্র [Ind. Ant., Vol. XVIII, p. 112; Ind. Ins. No. 11]। (৭) বিক্রমসংবৎ ১২৮০—চালুক্য মহারাজাধিরাজ জয়ন্তসিংহদেবের দানপত্র। উহাতে প্রথম মূলরাজ, চামুণ্ডরাজ, বল্লভরাজ ও দুর্ল্লভরাজের উল্লেখ আছে। দুর্ল্লভরাজের পর দ্বিতীয় ভীমদেব এবং তৎপরে তাঁহার স্থান জয়ন্তসিংহ অভিনবসিদ্ধরাজ অধিকার করেন [Ind. Ant., Vol. VI, p. 196]। (৮) বিক্রমসংবৎ ১২৮৩—চালুক্য নৃপতি দ্বিতীয় ভীমদেবের দানপত্র। উহাতে প্রথম মূলরাজ, চামুণ্ডরাজ, বল্লভরাজ ও দুর্ল্লভরাজের

উল্লেখ আছে। দুর্ল্লভরাজের পরে দ্বিতীয় ভীমদেব [Ind. Ant., Vol. VI, p. 199]। (৯) বিক্রমসংবৎ ১২৮৭—চালুক্য মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় ভীমদেবের দানপত্র [Ind. Ant., Vol. VI, p. 201]। (১০) বিক্রমসংবৎ ১২৮৮—চালুক্যরাজ দ্বিতীয় ভীমদেবের দানপত্র [Ind. Ant., Vol. VI, p. 203]। (১১) বিক্রমসংবৎ ১২৯৫—চালুক্য মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় ভীমদেবের প্রদত্ত দানপত্র [Ind. Ant., Vol. VI, p. 205]। (১২) বিক্রমসংবৎ ১২৯৬—চালুক্য নৃপতি দ্বিতীয় ভীমদেবের দানপত্র [Ind. Ant., Vol. VI, p. 206]। (১৩) বিক্রমসংবৎ ১২৯৬—চালুক্যাধিপতি ত্রিভুবনপালদেব প্রদত্ত দানপত্র। উহাতে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় ভীমদেবের পর ত্রিভুবনপাল সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন [Ind. Ant., Vol. VI, p. 208]। (১৪) সিংহ-সংবৎ ৯৩—চালুক্য মহারাজাধিরাজ ভীমদেব (সম্ভবতঃ দ্বিতীয়) প্রদত্ত দানপত্র [Ind. Ant., Vol. XVIII, p. 109 ; Ind. Ins. No 17]। (১৫) রাষ্ট্রকূটবংশীয় লখনপালের রাজ্যকালে সোমেশ্বরের পৌত্র গঙ্গাধরের পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্কলিত শিলালিপিতে শৈবযোগী বর্ম্মশিবের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্ম্মশিব অণহিলপাটকে বাস করিতেন [Epigraphia Indica, Vol. I, p. 64]।

অণাল—(ক্লী) নগরভেদ। (ললিতবিস্তর)

অণি—(পুং-স্ত্রী) [অণতি নদতি অণ্-ইন্] রথচক্রাগ্রস্থিত কীলক, আরা। (অমর°) ২ অশ্রি, কোণ। ৩ সূচ্যাদির অগ্রভাগ। ৪ সীমা। ৫ কষাইখানা। [স্ত্রিয়াং বা ঙীপ্] অণী। আণি এ প্রকারও রূপ হয়। 'অণিরাণিবদক্ষাগ্রকীলাশ্রিসীমস্থ দ্বয়োঃ।' (মেদিনী)

অণিদ্বার, আণিদ্বার—[স্থাপত্যশা°] দ্বারবিশেষ। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (২.৩ ; ৩.৮) এই শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিত শ্যাম শাস্ত্রী ইহার সীমাদ্বার (boundary gate) ও সম্মুখদ্বার (front door) এবং মেয়ার সাহেব (Mr. Meyer) পার্শ্বদ্বার (side door) অর্থ করিয়াছেন। শ্যাম শাস্ত্রীর অর্থ সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। কারণ সাধারণতঃ প্রাচীন রিলিফ চিত্রে কোন গৃহের পার্শ্বদ্বার দেখিতে পাওয়া যায় না।

অণিমন্,—(পুং) [অণোর্ভাবঃ অণু-ইমনিচ্] সূক্ষ্ম পরিমাণ। "আরম্ভণতো বৈ বজ্রস্যাণিমাথো দণ্ডস্যাথো পরশোঃ।" (ঐতরেয়ব্রা°, ২.৩৫) ২ সূক্ষ্মতা। ৩ কৃশত্ব। "গ্রাম্যাঃ পশবো যে চারণ্যা অণিমাণমেব তৎপুরুষিমাণং নিয়ন্তি।" (ঐতরেয়ব্রা° ৪.২৬) ৪ অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ঐশ্বর্য্যবিশেষ। অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য যথা—

"অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা॥"

দেব, সিদ্ধ ও যোগিগণ এই ঐশ্বর্য্যবলে সূক্ষ্ম হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারেন। [অষ্টসিদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য দ্র°]

অণিমন্,—(ত্রি) অতিসূক্ষ্ম ; অণুতর। "কৃত্বাবস্থত্যাণিম।" শতপথব্রা°, ৩.৮.৩.১৮)

অণিমান—(পুং) মহাপরাক্রমশালী নাগরাজবিশেষ। (মহাভা°)

অণিষ্ঠ—(ত্রি) [অতিশয়েন অণুঃ, অণু-ইষ্ঠন্] অতিশয় সূক্ষ্ম। "অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎপুরীষং ভবতি যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ।" (ছান্দোগ্য° ৬.৫.১)

অণীমাণ্ডব্য—(পুং) [অণী শূলাগ্রং তদ্যুক্তো মাণ্ডব্যঃ। (মহাভারতটীকায় নীলকণ্ঠ)] মুনিবিশেষ। বিদুরের জন্মবৃত্তান্তে লিখিত আছে যে, মাণ্ডব্য নামে জনৈক মুনি একটী বৃক্ষতলে তপস্যা করিতেছিলেন। একদিন কএকজন চোর অপহৃত দ্রব্য লইয়া তাঁহার আশ্রমের ভিতর লুকাইয়া থাকিল। নগরের প্রহরিগণ সন্ধান করিতে করিতে সেইখানে আসিয়া মুনিকে জিজ্ঞাসিল, তপোধন! কএকজন দস্যু কোন্ পথে গেল, বলিতে পারেন? মুনি ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না। প্রহরীরা সন্ধান করিয়া দেখিতে পাইল, চোরেরা আশ্রম-কুটীরে লুকাইয়া আছে। তখন রক্ষকেরা অপহৃত ধন, চোর এবং সন্দেহক্রমে মুনিকেও তস্কর ভাবিয়া রাজসভায় লইয়া গেল। চোর আসিল, অমনি শূলে চড়াইবার আজ্ঞা হইল। চোরের সঙ্গে চোর হইয়া মাণ্ডব্যও শূলের উপর বসিলেন। চোর মরিল, মাণ্ডব্যের প্রাণ বাহির হইল না। শেষে রাজা অনেক অনুনয় বিনয় দ্বারা মুনিকে তুষ্ট করিয়া শূল খসাইতে গেলেন,—শূল খসে না ; মুনির শরীরে বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কাজেই শরীরের ভিতরে যাহা প্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহা থাকিল, বাহিরের অংশটুকু কাটিয়া দিলেন। মাণ্ডব্য তপস্বী ; তাঁহার কপালে এমন বিপদ্ কেন? ইহা জানিবার জন্য একদিন তিনি যমালয়ে যাইয়া ধর্ম্মরাজকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ধর্ম্মরাজ বলিলেন—'তুমি বালককালে পতঙ্গের শরীরে তৃণ বিঁধিয়া দিয়াছিলে, তাই তোমার এমন শাস্তি হইয়াছে।' মাণ্ডব্য ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—'তখন আমি অজ্ঞান শিশু ছিলাম। তুমি অল্প অপরাধে আমায় গুরুদণ্ড দিয়াছ, অতএব তুমি শূদ্রযোনিতে গিয়া জন্মগ্রহণ কর। আজ হইতে আমি এই নিয়ম করিতেছি যে, চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে বালকদের পাপ জন্মিবে না।' অণীমাণ্ডব্যের এইরূপ শাপেই ধর্ম্মরাজের বিদুর-রূপে শূদ্রযোনিতে জন্ম হইয়াছিল।

অণীয়স্—(ত্রি) [অতিশয়েন অণুঃ, অণু-ইয়সুন] অতিসূক্ষ্ম, অণুতর। "যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ।" (শ্বেতাশ্বতর-উপ° ৩.৯)

পরমাত্মার স্বরূপ-নিরূপণে উপনিষৎ, শ্রুতি, স্মৃতি সর্ব্বত্রই এই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। "অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান্।" (শ্বেতাশ্বতর-উপ° ৩.২০) "প্রশাসিতারং সর্ব্বেষামণীয়াংসমণোরপি।" (মনু ১২.১২২) "অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্যঃ।" (গীতা ৮.৯)

অণীয়স্ক—(ত্রি) অণুতর, অত্যল্প, অতিসূক্ষ্ম। (অথর্ব্ব° ১০.৮.২৫)

অণীয়স্ত্ব—(ক্লী) অতিসূক্ষ্মভাব। (যাস্ক, নিরুক্ত ১.২)

অণীব—পাণিনির শুভ্রাদিগণ-মধ্যে গৃহীত শব্দভেদ। (পা ৪.১.১২৩)

অণু$_1$—(ত্রি) [অণতি সূক্ষ্মত্বং গচ্ছতীতি অণ-উন্। অণশ্চ। উণ্ ১.৮] ক্ষুদ্র। ২ সূক্ষ্ম, অত্যল্প। "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।" (কঠোপনিষদ্ ২.২০ ; শ্বেতাশ্বতর-উপ° ৩.২০ ; মনু ৩.৫১) অণু শব্দে পরিমাণ বুঝায়। পরিমাণ চতুর্ব্বিধ—স্থূল, সূক্ষ্ম, দীর্ঘ ও হ্রস্বস্বরূপ। "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘং" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা ব্রহ্মে উক্ত চতুর্ব্বিধ পরিমাণের অভাবই বলা হইয়াছে। এইজন্যই শারীরিক ভাষ্য, বৈশেষিক সূত্র ও ন্যায়-কন্দলী প্রভৃতি গ্রন্থে চতুর্ব্বিধ পরিমাণের উল্লেখ দেখা যায়। (পুং) ৩ সূক্ষ্মপরিমাণযুক্ত দ্রব্য। ৪ লব। ৫ লেশ। ৬ কণা, কণ। "লবলেশ-কণাণবঃ।" (উজ্জ্বলদত্ত) ৭ মাত্রার চতুর্থাংশ। "ব্যঞ্জনমর্দ্ধমাত্রা তদর্দ্ধমণু"। (শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্য ১.৬০.৬১) ৮ মুহূর্ত্তের (৪৮ মিনিটের) ৫৪৬৭৫০০০ তম অংশ। (ভাগবত ও ব্রহ্মবৈ°পু°) ৯ ক্ষুদ্র ধান্যবিশেষ (Panicum miliaceum)। শ্যামাক, চীনক, কঙ্গু প্রভৃতি ; চলিত শ্যামা, চীনা, কাউনী। মতান্তরে সূক্ষ্মচীনক। (অমর-টীকা) ১০ শিব। ১১ চন্দ্রবংশীয় নৃপতি যযাতির জনৈক পুত্র। অধিকাংশ আভিধানিকের মতে এই শব্দের 'ন'কার দন্ত্য। [অনু দ্র°] ১২ গ্রাম্য ও আরণ্যক ঔষধিসমূহের একতম। ইহা যজ্ঞসাধক। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৮.৫১-৫২) (স্ত্রী) অণ্বী। [অণ্বী দ্র°]

সকল বস্তুই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইতে পারে। সেই সূক্ষ্ম অংশকে অণু বলা যায়। হিন্দুশাস্ত্র মতে, দুইটী পরমাণুতে এক অণু হয়। যথা—'পরমাণুদ্বয়েনাণুস্ত্রসরেণুস্তু তে ত্রয়ঃ।'

আমাদের নৈয়ায়িকেরা বলেন যে, পরমাণু নিত্য, উহা কাহারও কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয় নাই। বৈশেষিকের মতও ইহাই। যথা—"সদকারণমনিত্যম্। (বৈশেষিকদর্শন ৪.১.১) পরমাণু সৎস্বরূপ, নিত্যপদার্থ, তাহার কোন কারণ নাই। উক্ত নৈয়ায়িকেরা আরো বলেন যে, ঐ পরমাণু হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। এইটী মহর্ষি কণাদের মত।

নৈয়ায়িকদের মতে, জল, বায়ু, মৃত্তিকা, তেজঃ এই চারি প্রকার জড় পদার্থের পরমাণু নিত্য, আর পরমাণুর সমষ্টিস্বরূপ ঘট-পটাদি সাবয়ব পার্থিবদ্রব্য সমুদায় অনিত্য।

"নিত্যাঽনিত্যা সা চ দ্বেধা নিত্যা স্যাদণুলক্ষণা।
অনিত্যা তু তদন্যা স্যাৎ সৈবাবয়বযোগিনী॥"
(ভাষাপরিচ্ছেদ ৩৫-৩৬)

এই মত বেদান্তের বিরুদ্ধ। উপনিষদে কথিত আছে—"ইদম্ বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ। আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।" এই জগৎ সৃষ্টির অগ্রে আর কিছুই ছিল না, তখন একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম ছিলেন। অতএব যিনি ঈশ্বরকে সর্ব্বস্রষ্টা ও সর্ব্বনিয়ন্তা বলিতে চাহেন, তাঁহার মতে পরমাণু নিত্য হইতে পারে না। চার্ব্বাক ও বৌদ্ধমতাবলম্বীরাও পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু বৈদান্তিকেরা ঠিক পরমাণু মানেন না। জ্ঞানরূপ কোন পদার্থ আছে, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস। পাশুপত-দর্শন-শাস্ত্রবেত্তারা বলেন যে, পরমাণু নিত্য নহে। মহেশ্বর সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। পরমাণুকে নিত্য ও অজন্য বলিয়া মানিলে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বে দোষ দেওয়া হয়।

মহর্ষি কণাদ কল্পনা করিয়াছেন, 'বিশেষ বিশেষ প্রকার পরমাণুতে বিশেষ একটী পদার্থ আছে, তাহারই শক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বলিয়া নিশ্চিত হয়।' [বিশেষ দ্র°] তাঁহার মতে অদৃষ্ট বা অদৃষ্ট কারণ-বিশেষ অথবা কোন কোন গ্রন্থানুসারে ঈশ্বরেচ্ছা দ্বারা জড় পরমাণু সমুদায়ের সংযোগ হয়। দুই পার্থিব পরমাণু সংযুক্ত হইয়া এক দ্ব্যণুক এবং তিন দ্ব্যণুকে এক ত্রসরেণু হয়। এই প্রকারে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে স্থূলতর উৎপন্ন হইয়া অবশেষে পার্থিব বস্তু সমুদায় গঠিত হয়। এইরূপে জলীয় পরমাণুর যোগে জলের অবয়ব, তৈজস পরমাণুর যোগে তেজের অবয়ব এবং বায়বীয় পরমাণুর যোগে বায়ুর অবয়ব উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই প্রকারে সমস্ত জগতের সৃষ্টি সংসাধিত হইয়াছে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মতে, পদার্থের যে ক্ষুদ্রতম অংশ সাধারণ অবস্থায় স্বাধীনভাবে অবস্থান করিতে পারে, তাহাকে অণু (Molecule) কহে এবং মৌলিক পদার্থের অন্তিমতম ক্ষুদ্র অংশ, যাহা রাসায়নিক সংয়োজনার অংশ গ্রহণ করে, তাহাই পরমাণু (Atom) নামে অভিহিত হয়। [অণু, ও পরমাণু দ্র°]

অণু$_2$ **বা মলিকিউল** (Molecule)—পদার্থের যে ক্ষুদ্রতম অংশ সাধারণ অবস্থায় স্বাধীনভাবে অবস্থান করিতে পারে, তাহাকে অণু কহে। অণু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা জন্মিবার জন্য পরমাণু সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। মৌলিক পদার্থের অন্তিমতম ক্ষুদ্র অংশ, যাহা রাসায়নিক সংযোজনার

অংশ গ্রহণ করে, তাহাই পরমাণু (Atom) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই পরমাণুবাদের উৎপত্তি ও বিস্তৃতির কথা যথাস্থানে আলোচিত হইবে। [পরমাণু দ্র°] এস্থানে কেবল আনুষঙ্গিক তথ্য সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা গেল।

যদিও জন ডাল্টনই (John Dalton—1766-1844) পরমাণুর আধুনিক ধারণার ভিত্তি স্থাপন করেন, তথাপি ইহার পরিকল্পনা এবং এতদ্বিষয়ে জল্পনাকল্পনা আরও আগে হইতেই চলিয়া আসিতেছে। আনাক্সাগোরাস্ (Anaxagorus), লিউকিপস্ (Leukippos) এবং ডেমোক্রিটস্ (Demokritos) প্রভৃতি গ্রীক্ দার্শনিকগণের দৃষ্টি এই পরমাণুর প্রতি বহু পূর্ব্বেই আকৃষ্ট হয়। পরবর্ত্তীকালে ভান্ হেল্‌মণ্ট্ ও লেমারী (Van Helmont and Lemery—1675), বোয়ারহাভে (Boerhaave—1724), বয়েল (Boyle) ও নিউটন (Newton—1642-1727) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় ইহার যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছিলেন। নিউটন নিম্নোক্ত কল্পনা-সূত্রের (hypothesis) উপর ভিত্তি করিয়া বয়েল-প্রবর্ত্তিত সূত্রের* (Law) গণিতসম্মত (mathematical) ব্যাখ্যাও উপস্থিত করিয়াছিলেন :—

'বায়বীয় পদার্থগুলি বহুসংখ্যক পরমাণুর সমন্বয় মাত্র এবং এই পরমাণুগুলি পরস্পরকে বিকর্ষণ করিতে থাকে। এই বিকর্ষণের প্রাবল্য পরস্পরের দূরত্বের বেশী কমের সহিত কমে বাড়ে (inversely proportional)।' ভারতীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে পদার্থের অন্তিমতম ক্ষুদ্র অংশগুলি সম্বন্ধে ঠিক বিকর্ষণের ধারণা না থাকিলেও ইহাদের সতত-সঞ্চরণ-বৃত্তি বর্ত্তমান আছে বলিয়া বিশ্বাস ছিল।† এইস্থানে পণ্ডিতবর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়-কৃত ব্যাখ্যা আংশিক উদ্ধৃত করিয়া দিলে প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধে প্রতীতি জন্মিতে পারিবে :—

"The question as to the existence of a triad, a tetrad, a pentad, etc., of atoms is one of the moot points of the *Nyaya-Vais'eshika.* The orthodox view is that the primordial infinitesimal particles (atoms) start with an incessant vibratory motion and an inherent impulse that drives them to unite in pairs—a sort of "monovalency", as it were, exhausted with the form ation of a binary molecule." *

ইতালীয় গণিতজ্ঞ বস্কোভিচ্ (Boscovitch—1711-1780) এইরূপ মতবাদের বহুল প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। তবে এই সকল পরমাণু সম্বন্ধে তিনি ভিন্ন ধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহার মতে পরমাণুসকল বিন্দুবৎ মাত্র, অথবা বলকেন্দ্রও (centres of forces) বলা যাইতে পারে; তিনি ঐ গুলিকে জড়মান-সম্পন্ন (endowed with mass) বলিয়া অনুমান করেন। ব্রায়ান (Bryan—1777) ও উইলিয়ম হিগিন্স (William Higgins) নামক পণ্ডিতদ্বয় নিউটন-প্রবর্ত্তিত পরমাণু-বাদের (atomic theory) প্রয়োগ রসায়নের আলোচনায় করিয়াছিলেন। কিন্তু জন ডাল্টন (John Dalton—1766-1844) সর্ব্বপ্রথম পরমাণুবাদের বিস্তৃত ও বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া যে নবতর উন্নত মতবাদের প্রচার করেন, তাহার সাহায্যে রসায়নের বহু তথ্যের মীমাংসা সম্ভব হইয়াছে এবং উত্তরকালে তাহা সংশোধিত হইয়া বৈজ্ঞানিক প্রগতির সহিত নানাভাবে প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে। ডাল্টন নানা রাসায়নিক এবং প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত তাঁহারই প্রবর্ত্তিত পরমাণুবাদের প্রয়োগ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনিও অণু ও পরমাণুর মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য নির্দ্দেশ করেন নাই। সম্ভবতঃ ডাল্টন স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, একটী মাত্র পরমাণুই, যাহা মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ, স্বাধীনভাবে অবস্থান করিতে পারে। তাঁহার এই ধারণাই প্রকৃত অবস্থার ব্যাখ্যা করিবার পক্ষে প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়। ডাল্টনের ব্যাপক-ধারণার (generalisation) পক্ষে যে অন্তরায় উপস্থিত হয়, তাহা ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ইতালীয় পদার্থ-বিজ্ঞানবিৎ আভোগাড্রো (Avogadro) সর্ব্বপ্রথম যথার্থভাবে দূরীভূত করেন। কিন্তু তাঁহার প্রচারিত মত প্রথমতঃ অলক্ষিতই থাকিয়া যায়। পরে তাঁহার স্বদেশীয় বৈজ্ঞানিক-প্রবর কানিসারো (Cannizaro) ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তাহা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেন।

আভোগাড্রো-প্রবর্ত্তিত মতবাদেরও ইতিহাস রহিয়া গিয়াছে। ক্যাভেন্‌ডিশ্ (Cavendish) পরীক্ষা দ্বারা

* Boyle's Law (1662) :—"When the temperature is maintained constant, the volume of a given mass of gas is inversely proportional to the pressure ; $v \propto \frac{1}{p}$ i. e., vp= constant=c."

† "অনবরতপরিস্পন্দমানাপরিমিতপবনাদিপরমাণবঃ"—রঘুনাথ শিরোমণি। "গতিশীলত্বাৎ পতত্রব্যপদেশাঃ পতন্তীতি"—উদয়ন, কুসুমাঞ্জলী। [The Positive Sciences of the Ancient Hindus, by Brajendranath Seal ইইতে সংগৃহীত।]

* The Positive Sciences of the Ancient Hindus, by Brajendranath Seal, p. 100.

(১৭৮১ খৃঃ) প্রমাণ করেন যে, উদজন ও অম্লজনের মিশ্রণে যে জলের উৎপাদন হয়, তাহার প্রতি ঘনমানে (in volume) মিশ্রণের অনুপাত ২ : ১-এর এত কাছাকাছি যে উহাকে পূর্ণাঙ্কে (integer) প্রকাশ করিলেও খুব অন্যায় বা ভুল হইবে না। অনন্তর ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে আলেক্জান্দার ভন্ হাম্‌বোল্ট (Alexander von Humboldt) ও জোসেফ লুই গে-লুসাক্ (Joseph Louis Gay-Lussac) ক্যাভেন্‌ডিশের পরীক্ষিত ফল পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। গে-লুসাক্ কিন্তু ইহাতেই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি বায়বীয় পদার্থের আরও অন্যান্য রাসায়নিক পরিক্রিয়া (reaction) সম্বন্ধে গবেষণা করিতে থাকেন এবং ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষিত ফলাফল প্রকাশ করিয়া এক সূত্রের (law) প্রবর্ত্তন করেন :—'বায়বীয় পদার্থগুলির মধ্যে যখন কোন প্রকার রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে, পরস্পর ক্রিয়াশীল বায়ুর (gas) ঘনমানের মধ্যে সর্ব্বদাই তখন একটা সরল সাধারণ সম্বন্ধ (simple relation) বর্ত্তমান রহিয়াছে; এবং মিশ্রণের ফলে উৎপন্ন দ্রব্য যদি বায়বীয় হয়, তাহা হইলে সেই উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত পরিক্রিয়াশীল (reacting) বায়ুর সম্বন্ধও অনুরূপই থাকিবে।'* অবশ্য চাপ ও তাপমানের এক অবস্থায়ই মাত্র উক্ত বিবৃতি সত্য হইতে পারে। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে বার্ট (Burt), এড্‌গার (Edgar), গ্রে (Gray), গুয়ে (Guye) ও পিন্‌ট্‌সা (Pintza) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পাইলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সহিত উদজনের মিশ্রণের পরিমাণ কোন সময়েই পূর্ণাঙ্কে প্রকাশ করা যায় না। তৎপরে এই প্রকার বৈষম্যের ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত গে-লুসাক্, বার্‌জিলিয়স্ (Berzelius) এবং ডাল্টন পরপর নানা প্রকার মত প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলে আভোগাড্রো তাঁহার কল্পনা-সূত্র লইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন :—"In equal volumes of all gases, at the same temperature and pressure, there is an equal number of ultimate parts or molecules."*

বার্‌জিলিয়স্ ধরিয়া লইয়াছিলেন—বায়বীয় মৌলিক পদার্থের সমান ঘন-আয়তনে সমসংখ্যক পরমাণু রহিবে (equal volumes of elementary gases contain equal numbers of atoms)। কিন্তু আভোগাড্রো বলিলেন—না, পরমাণু নহে, সমসংখ্যক অণু থাকিবে। সর্ব্বপ্রথম ঐ অণুর কল্পনা প্রকাশ করায় অণু-পরমাণুর পার্থক্য বুঝাইয়া দিবার জন্য তাঁহাকে সংজ্ঞা-নির্দ্ধারণ করিতে হয়।

পদার্থের যে ক্ষুদ্রতম অংশ স্বাধীনভাবে অবস্থান করিতে পারে তাহাকেই তিনি অণু (molecule) নামে অভিহিত করেন। গে-লুসাক্ ও বার্‌জিলিয়স্ এ সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেন, তাহাও আভোগাড্রো দূরীভূত করিতে সমর্থ হন। তিনি বলেন, বায়বীয় মৌলিক পদার্থের অণু যে কেবল পরমাণুই হইবে এমন নহে, পরন্তু সাধারণতঃই অণুগুলি হয় কতকগুলি পরমাণুর সমন্বয়ে অথবা পরমাণুর গুচ্ছদ্বারা সংযুক্ত (usually consist of groups or clusters of atoms); এবং এইগুলি এক একটী কণার (particles) মতই ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকে (moving about as though they were single particles)। জন ডাল্টন উল্লিখিত অণু ও পরমাণু উভয়-জাতীয় কণাকেই এক পরমাণু বলিয়া অভিহিত করেন। ইহাতে যে গোলযোগের সৃষ্টি হয়, আভোগাড্রো-প্রবর্ত্তিত দুই প্রকারের কণার ধারণা হইতে তাহা দূরীভূত করা সম্ভব হইয়াছিল। ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থাদিতেও দুই প্রকার কণার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও স্পষ্টতঃ তাহার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ দেখা যায় না, তথাপি দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ হইতে এবং অন্যান্য নানা প্রকার মিশ্রণের যে সকল বিবৃতি আছে তাহা হইতে মনে হয় যে, তৎকালেও এতদ্দেশে বিভিন্ন পদার্থের কণাগুলির সংযোগের ধারণা বদ্ধমূল ছিল।*

আণবিক ওজন (molecular weight)।

আভোগাড্রো যে অণু বা আণবিক ধারণার পত্তন করেন, তাহা পদার্থগুলির সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য জানিবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে। পদার্থের নানা দিক্ বিশ্লেষণপূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিবার পক্ষে তাঁহার কল্পনাসূত্রটী বহুলভাবে প্রয়োজনে আসে। পদার্থের যে অণুর উল্লেখ তিনি করিলেন, তাহার ওজন, আয়তন, ইত্যাদি নিরূপণের উপায়ও ক্রমে উদ্ভাবিত হইল। এই আণবিক ওজনও আভোগাড্রোর কল্পনাসূত্রের সাহায্যে নির্দ্ধারণ করা যায়। অবশ্য ইহাতে

* "When chemical changes occur between gases, there is always a simple relation between the volumes of the interacting gases, and also of the products, if these are gaseous."

* (1) History of Hindu Chemistry, by P. C. Ray, Vol. II, pp. 103—119. (2) The Positive Sciences of the Ancient Hindus, by Brajendranath Seal—pp. 56-85, 98-121.

অণুর পরম (absolute) ওজন নির্দ্ধারণের কথা বলা হইতেছে না। উক্ত কল্পনাসূত্রের সাহায্যে কেবল মাত্র আপেক্ষিক ওজন (relative weight) নির্দ্ধারণ করা সম্ভব। আভোগাড্রো বলিলেন, বিভিন্ন বায়বীয় পদার্থের সমান ঘনমানে সমসংখ্যক অণু থাকিবে। অতএব পদার্থের সম-ঘনমানের আপেক্ষিক ওজন হইতে আমরা দুইটী পদার্থের দুইটী অণুর আপেক্ষিক ওজন অনায়াসেই নিরূপণ করিতে পারি। কিন্তু এতদর্থে একটী আদর্শ স্থির করিয়া লওয়া প্রয়োজন—যাহার সহিত তুলনা করিয়া অপর পদার্থগুলির ওজন নিরূপণ করা সম্ভব হয়। সুতরাং এমন একটী পদার্থ বাছিতে হইবে, যাহা পরিচিত পদার্থগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হাল্‌কা (light), অর্থাৎ যে পদার্থটীর ঘনত্ব (density) সর্ব্বাপেক্ষা কম। সাধারণতঃ উদজনকেই এরূপস্থলে নির্ব্বাচিত করা হয় এবং ইহার আণবিক ওজন (molecular weight) তখন ধরা হয় "২"। কিন্তু আবার বাতাসকেও এককরূপে ব্যবহার করিয়া অন্যান্য মৌলিক পদার্থের ঘনত্ব নিরূপিত হইয়া থাকে। এইরূপে নির্দ্ধারিত ঘনত্বকে অবশ্য পরে অনায়াসে উদজনের পরিমাপে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। বাতাসকে একক ধরিয়া উদজনের ঘনত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে ০·০৬৯২৬ (পরবর্ত্তী নির্দ্ধারণে দেখা যায় ০·০৬৯৬)। এখন দেখিতে হইবে কোন্ সংখ্যাকে গুণক হিসাবে ব্যবহার করিলে বাতাসের অনুপাতে নির্দ্ধারিত ওজনকে উদজনের তুলনায় প্রকাশ করিতে পারি। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে উদজনের আণবিক ওজন দুই। সুতরাং আণবিক ওজনকে উদজনের ঘনত্ব দিয়া ভাগ করিলেই অভীপ্সিত গুণকটী পাওয়া যাইতে পারে। (২ ÷ ০·০৬৯২৬ = ২৮·৮৮)। কাজেই বাতাসের তুলনায় নিরূপিত যে কোন পদার্থের ঘনত্বকে ২৮·৮৮ দিয়া গুণ করিলেই আমরা উহার আণবিক ওজন বাহির করিতে পারি। নিম্নে এইরূপে নির্দ্ধারিত কএকটী মৌলিক পদার্থের ওজনের একটী তালিকা প্রদত্ত হইল। তালিকাটীর 'ক' স্তম্ভে পদার্থের ঘনত্ব এবং 'খ' স্তম্ভে তাহার আণবিক ওজন সন্নিবেশিত হইয়াছে,—অবশ্য ঘনত্ব নিরূপিত হইয়াছে বাতাসের তুলনায়।

	'ক'	× ২৮·৮৮	'খ'
মৌলিক পদার্থ	ঘনত্ব		আণবিক ওজন
উদজন (Hydrogen), 0°c	০·০৬৯২৬	„	২
অম্লজন (Oxygen), 0°c	১·১০৫৬৩	„	৩১·৯৩
নেত্রজন (Nitrogen), 0°c	০·৯৭১৩	„	২৮·০৫
গন্ধক (Sulphur), ১৪০০°c	২·১৭	„	৬২·৬৭
কুল্‌হরিণ (Chlorine), ২০০°c	২·৪৫	× ২৮·৮৮	৭০·৭৫
বরমীণ (Bromine), ১০০°c	৫·৫৪	„	১৫৯·৯৯
পারদ (Mercury), ১৪০০°c	৬·৮১	„	১৯৬·৬৭
নীলীন (Iodine), ৯৪০°c	৮·৭২	„	২৫১·৮৩

যৌগিক পদার্থগুলিরও আণবিক ওজন উক্ত উপায়ে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত উদজনকে আদর্শ করিয়া অন্য উপায়ে যে আণবিক ওজন নির্দ্ধারণ যায় তাহারও পন্থা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

$$\text{আণবিক ওজন} = \frac{\text{এক অণু পরিমাণ পদার্থের ওজন}}{\text{এক পরমাণু পরিমাণ উদজনের ওজন}} \times \text{উদজন পরমাণুর ওজন}$$

$$= \text{আপেক্ষিক ঘনত্ব} \times \frac{\text{এক অণু পরিমাণ উদজনের ওজন}}{\text{এক পরমাণু পরিমাণ উদজনের ওজন}} \times \text{উদজন পরমাণুর ওজন।}$$

$$\text{কিন্তু,} \frac{\text{এক অণু পরিমাণ উদজনের ওজন}}{\text{এক পরমাণু পরিমাণ উদজনের ওজন}} \times \text{উদজন পরমাণুর ওজন}$$

$$= \text{উদজনের আণবিক ওজন।}$$

অতএব, আণবিক ওজন = আপেক্ষিক ঘনত্ব × উদজনের আণবিক ওজন। কিন্তু উদজন-মিশ্রিত বায়বীয় যৌগিক পদার্থ যখন বায়বীয় উদজন হইতে উৎপন্ন হয়, তখন দেখা যায় যে, উক্ত যৌগিক পদার্থের ঘনমান উদজন বায়ুর দ্বিগুণ হইতে পারে, কিন্তু দ্বিগুণের বেশী কোন সময়েই হয় না; অতএব অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে উদজনের প্রত্যেকটী অণু দুইটী পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। [পরমাণু দ্র°] অতএব,

উদজনের আণবিক ওজন = ২ × উদজন পরমাণুর ওজন = ২, যখন H = ১ অথবা ২·০১৬, যখন O = ১৬ এবং H = ১·০০৮

বাতাস অথবা উদজনকে আদর্শ করিয়া আণবিক ওজন নির্দ্ধারণ করার মধ্যে বাতাসের আদর্শে আণবিক ওজন নির্দ্ধারণে কিঞ্চিৎ অসুবিধা দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানবিশেষে বাতাসের সংযোজনার (composition) তারতম্য দেখা যায় এবং তদ্‌হেতু উহার ঘনত্বও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার হইবার সম্ভাবনা। অতএব আপেক্ষিক ঘনত্ব নির্দ্ধারণে বাতাসকে আদর্শরূপে ব্যবহার করিলে ফল সকল সময়ে সঠিক নাও হইতে পারে।

আণবিক ওজন নির্দ্ধারণের বিভিন্ন উপায়।

পূর্ব্বে আণবিক ওজন নির্দ্ধারণের যে প্রথার উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন আরও নানা উপায়ে বিভিন্ন প্রকার পদার্থের আণবিক ওজন নিরূপণ করা যাইতে পারে।

অমিশ্র তরল পদার্থের (pure liquid) আণবিক ওজন

নির্ণয়ের নিমিত্ত পৃষ্ঠ-বিততির (surface tension) সাহায্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। কোন পদার্থকে অপর এক পদার্থের মধ্যে গলাইয়া দ্রব পদার্থের আণবিক ওজন নিরূপণ করিবার বহুতর উৎকৃষ্ট উপায় রহিয়াছে; কিন্তু অমিশ্র সমধর্ম্মাঙ্গ (pure homogeneous) পদার্থের আণবিক ওজন নিরূপণের মাত্র একটী উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাও তেমন নিখুঁত নহে। হাঙ্গেরীয় পদার্থবিজ্ঞানবিদ্ এটোভস (Eötvös) প্রথম নির্দ্দেশ করেন যে তাপমানের সহিত পৃষ্ঠ-শক্তির পরিবর্ত্তনের হার সর্ব্বদাই অপরিবর্ত্তিত (constant) থাকে।

$$\frac{d\gamma s}{dt}=c\ :$$

যথায়, γ= পৃষ্ঠ-বিততি (surface tension)

s = পৃষ্ঠ (surface)

t = চরম তাপমান শূন্য ধরিয়া নির্দ্ধারিত তাপমান (temperature measured from the critical temperature as zero)।

উক্ত সাঙ্কেতিক সূত্র (Formula) যাহাতে বিভিন্ন তরল পদার্থের বেলায়ই প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তজ্জন্য 's'-কে আণবিক পৃষ্ঠ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। উক্ত সাঙ্কেতিক সূত্রকে $\gamma\ (Mv)^{\frac{2}{3}}=ct$ আকারেও প্রকাশ করা যায়, যদি আণবিক ঘনমান (molecular volume) ধরিয়া লওয়া হয় Mv, এবং ইহাকে একটী কিউব (cube) বিবেচনা করিলে ইহার এক পার্শ্ব $s=(Mv)^{\frac{2}{3}}$ হইবে। রাম্‌জে (Ramsay) ও শিল্‌ড্‌স্ (Shields) ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষা দ্বারা উক্ত সাঙ্কেতিক সূত্রের যথার্থতা কতিপয় তরল পদার্থের বেলায় সপ্রমাণ করিয়া দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা এমন পদার্থ তাঁহাদের পরীক্ষার সামগ্রীরূপে ব্যবহার করেন, যাহার আণবিক ঘনমান জানা আছে। উক্ত নির্দ্ধারণকার্য্যে সর্ব্বপ্রথম 'γ' নির্ণয় করা প্রয়োজন। এই পৃষ্ঠ-বিততি $\gamma=\frac{1}{2}rhg\ (\rho-\sigma)$—এই সমীকরণ হইতে নির্ণয় করা যায়। [r=কৈশিক নলের (capillary tube) ব্যাসার্দ্ধ, h=ব্যবহৃত তরল পদার্থ নলের যে পর্য্যন্ত উঠিয়াছে তাহার উচ্চতা, g=মাধ্যাকর্ষণজনিত গতি-বৃদ্ধি-হার (acceleration of gravity), ρ=যে তাপমানে পরীক্ষা করা হয় সেই তাপমানে ব্যবহৃত তরল পদার্থের ঘনত্ব (density), σ=ব্যবহৃত পদার্থের বাষ্পের ঘনত্ব (density of the vapour of the liquid)]। মোটামুটী ভাবে বলিতে গেলে আণবিক পৃষ্ঠ বিবেচনা করিয়া পৃষ্ঠ-বিততি নির্দ্ধারণের প্রয়োজনীয়তা এই প্রথায় আণবিক ওজন নিরূপণে প্রধান এবং সর্ব্বপ্রথম। কিন্তু উক্ত প্রথায় আণবিক ওজন নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া রাম্‌জে ও শিল্‌ড্‌স্ দেখিতে পান, এটোভসের সাঙ্কেতিক সূত্র বিভিন্ন তাপমানে সকল সময়ে যথার্থতাকে মানিয়া চলে না। তাঁহারা দেখিলেন, কেবল ইথার (ether), মিথাইল ফরমেট্ (methyl formate), ইথাইল এসিটেট্ (ethyl acetate), কার্ব্বন্ টেট্রাক্লোরাইড্ (carbon tetrachloride), বেঞ্জিন্ (benzene) ও ক্লোরোবেঞ্জিনের (chlorobenzene) বেলায় এটোভসের সূত্র কতকাংশে মানিয়া চলে, অবশ্য তাহাতেও সামান্য পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এই পদার্থগুলির বেলায় নিম্নলিখিত সমীকরণটী কার্য্যকরী দেখা যায়, যদিও সকল সময়েই চরম তাপমান হইতে কএক ডিগ্রী এদিক ওদিক হইয়া থাকে।

$\gamma\cdot(Mv)^{\frac{2}{3}}=c\ (t-d)$, 'd'-দ্বারা তাপমানের খুব সামান্য তারতম্য নির্দ্দেশ করা হইতেছে—গড়ে প্রায় পাঁচ ডিগ্রী। ঐ সকল পদার্থের বেলায় স্থির-সংখ্যাটী (constant) ২·০৪ ও ২·২২ মধ্যে কম বেশী হয়, অর্থাৎ এক্ষেত্রে মধ্যবর্ত্তী সংখ্যা ২·১২ স্থির-সংখ্যা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু মিথাইল এল্‌কোহল (methyl alcohol), ইথাইল এল্‌কোহল (ethyl alcohol) এবং এসিটিক্ এসিডের (acetic acid) বেলায় দেখা যায় 'c' যথার্থপক্ষে অপরিবর্ত্তনীয় নহে, পরন্তু তাপমানের উঠা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। নানাদিক্ বিচার করিয়া দেখা যায় যে, এই সকল পদার্থের অণুগুলি নিম্নতর তাপমানে অধিকতর জটিল অবস্থায় থাকে এবং এই জটিল অণুগুলি তাপবৃদ্ধির সহিত বিভক্ত হইয়া সরলতর অবস্থায় পরিণত হয়। যে সকল পদার্থ পরীক্ষা করিয়া উক্ত 'c'=২·১২১ পাওয়া যায়, সেই পদার্থগুলির তরল ও বাষ্পবীয় অবস্থায় একই আণবিক ওজন অনুমান করা যাইতে পারে। তাপমানের উঠা-পড়ায় যে সকল তরল পদার্থের 'c' অপরিবর্ত্তিত থাকে না সেইগুলি "সহযুক্ত বা associated" বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। সহযোগের পরিসীমা (degree of associates) 'x' অনায়াসে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। ২·১২১-কে 'c'-চলনকলন (differential-c) দিয়া ভাগ করিলেই আলোচ্য তাপগানে সহযুক্ত তরল পদার্থের 'x' বা ডিগ্রী অব্ এসোসিয়েট্‌স্-এর পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইতে পারে। যথা—

$$x^{\frac{2}{3}}=\frac{2\cdot121}{c}\quad\text{or}\quad x=\left(\frac{2\cdot121}{c}\right)^{\frac{3}{2}}$$

কিন্তু রাম্‌জে ও শিল্‌ড্‌স্‌ এসোসিয়েশন ফ্যাক্টর 'x' বাহির করিবার জন্য যে প্রথায় অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতে ইহার প্রামাণ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ করিবার রহিয়াছে। তবে পৃষ্ঠ-বিততি প্রথা দ্বারা আণবিক ওজন নিরূপণের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হউক আর না হউক, ইহা দ্বারা অন্ততঃ কোন পদার্থ সহযুক্ত কিনা তাহা নির্দ্ধারণের পক্ষে সহায়তা হওয়ার আশা করা যাইতে পারে; এবং মোটামুটীভাবে ডিগ্রী অব্‌ এসোসিয়েট্‌স্‌ বা যে সংখ্যক সরল অণুর সহযোগে পদার্থের উৎপত্তি হয়, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা যাইতে পারে।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে লঙ্গিনেস্কু (Longinescu) কতকগুলি তরল পদার্থের বেলায় নিম্নলিখিত প্রয়োগসিদ্ধ (empirical) সম্বন্ধটী সত্য বলিয়া দেখাইয়া দিলেন।

$\frac{T}{T'}=\frac{D}{D'}\sqrt{\frac{N}{N'}}$ ইহাতে T ও T′ পরম তাপমান (যে তাপমানে পদার্থ দুইটী ফুটিতে থাকে), D ও D′ পদার্থ দুইটীর ঘনত্ব (শূন্য ডিগ্রী তাপমানে) এবং N ও N′ পদার্থ দুইটীর অণুগুলিতে বর্ত্তমান পরমাণুর সংখ্যারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। লঙ্গিনেস্কু দেখিলেন পদার্থনির্ব্বিশেষে ইহা যথার্থ নহে। পৃষ্ঠ-বিততি প্রথায় যে সকল পদার্থকে প্রভূতাবয়বীভূত (polymerised) দেখা গিয়াছিল, সেইগুলিই আবার এই সূত্রকেও মানিয়া চলে না। তিনি তাই এই সকল পদার্থের প্রভূতাবয়বীভবনের পরিমাণ (amount of polymerisation) নির্দ্ধারণের নিমিত্ত ইহার ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। ঐ বৎসরেই তিনি তাঁহার সূত্রকে কঠিন পদার্থের আণবিক ওজন নির্দ্ধারণের নিমিত্ত প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করেন; কেবল T গলনের (fusion) তাপমান বলিয়া ধরেন, আর D ধরেন ঘনত্ব।

লঙ্গিনেস্কু আরও দেখান যে, বিবেচ্য তরল পদার্থের স্ফুটনসীমাকে যদি T বা পরম তাপমানে নির্দ্দেশ করা হয়, এবং M-দ্বারা আণবিক ওজন নির্দ্দেশিত হয়, তবে,

$\frac{T}{\sqrt{M}}+\frac{1000\sqrt{M}}{T} = 64$ এই সমীকরণ দ্বারা আণবিক ওজন বা M নিরূপণ করা যাইতে পারে। উক্ত সাঙ্কেতিক সূত্রটী হাইড্রোকার্ব্বন্‌, ইষ্টার প্রভৃতি অনেক পদার্থই মানিয়া চলে; এবং প্রভূতাবয়বীভূত পদার্থগুলির সময় দেখা যায় ঐ সম্বন্ধটী ৬৪ হইতে বেশী হইয়া থাকে। ঐ সমীকরণটী প্রধানতঃ অণুর বিচ্ছিন্ন হইবার পরিমাপ নির্দ্ধারণে প্রয়োগ করিবার পক্ষে সুবিধাজনক।

শিলাজায়ী উত্তাপ (freezing point) নির্দ্ধারণ প্রথায়ও আণবিক ওজন নিরূপণ করা যাইতে পারে। এই প্রথায় বিবেচ্য পদার্থটী কোন দ্রাবকে (solvent) গলাইয়া লইয়া শিলাজায়ী উত্তাপ কতটা নামিয়া যায়, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া নিম্নোক্তরূপে আণবিক ওজন নিরূপণ করা যাইতে পারে। দ্রাবকের পরিমাণ, গলান পদার্থের ওজন, শিলাজায়ী উত্তাপ যে পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে এবং দ্রাবকের শিলাজায়ী উত্তাপের স্থিরাঙ্ক (freezing point constant) ইত্যাদি জানা থাকিলে গলান পদার্থের (dissolved substance) আণবিক ওজন অতি সহজেই নিম্নোক্ত সাঙ্কেতিক সূত্রের সাহায্যে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে:

$M = \frac{c\, 100\, w}{\Delta\, W}$, ইহাতে M = অজ্ঞাত আণবিক ওজন, W = দ্রাবকের পরিমাণ (ওজন), w = দ্রাব্য পদার্থের (solute) ওজন, Δ = শিলাজায়ী উত্তাপ যে পরিমাণ কমিয়াছে দেখা যায়, c = দ্রাবকের শিলাজায়ী উত্তাপের স্থিরাঙ্ক। এখন প্রশ্ন হইল দ্রাবকের শিলাজায়ী উত্তাপের স্থিরাঙ্ক কিরূপে স্থির করা যাইতে পারে। সম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন (undissociated) কোন পদার্থের এক গ্রাম-মলিকিউলার (gram-molecular) ওজন* পরিমাণ ১০০০ গ্রাম জলে গলাইলে দেখা যায়, জলের শিলাজায়ী উত্তাপ ১·৮৬ ডিগ্রী কমিয়া যায়। এই ১·৮৬ ডিগ্রী সংখ্যাটীকে 'molecular lowering of water' নামে বৈজ্ঞানিকগণ অভিহিত করিয়া থাকেন। এইরূপ বিভিন্ন দ্রাবকের আণবিক নতিকরণ (molecular lowering) বিভিন্ন সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। এই আণবিক নতিকরণ সংখ্যার দশগুণ সংখ্যাকে শিলাজায়ী তাপের স্থির-সংখ্যা বলা হয়। নিম্নে কএকটী প্রচলিত দ্রাবকের বিভিন্ন শিলাজায়ী তাপের স্থির-সংখ্যা প্রদত্ত হইল :—

* কোন পদার্থের আণবিক ওজনকে 'গ্রামে' প্রকাশ করিলে সেই আণবিক ওজনকে 'গ্রাম-মলিকিউলার ওয়েট বা ওজন' বলা হয়—"The mloecular weight in grams of any substance is called the **gram-molecular weight,** or sometimes the **mol.**"

"In the cases of gases, Avogadro's hypothesis shows that, at a given temperature and pressure, the gram-molecular weight will occupy constant volume. At S. T. P. (0° and 760 mm.) this is called the **gram-molecular volume,** or sometimes the **molar volume.**"

	স্থির-সংখ্যা বা c		স্থির-সংখ্যা বা c
এসিটিক্ এসিড্ ...	৩৯·০	ফরমিক্ এসিড্	২১·৭
বেঞ্জিন্...	৫০·০	নাইট্রো-বেঞ্জিন্ ...	৭০·৭
ইথাইল ব্রোমাইড্...	১১৭·৯	জল	১৮·৬

এই স্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই শিলাজায়ী তাপ প্রথায় অমিশ্র পদার্থের আণবিক ওজন চূড়ান্তভাবে নির্দ্ধারণ করা যায় এমন কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।*

রাওল্ট্ (Raoult)-প্রবর্ত্তিত সূত্রের সাহায্যে দ্রাবকের বাষ্প-চাপ (vapour-tension) নতিকরণ হইতেও উক্ত দ্রাবকে গলান দ্রব পদার্থের আণবিক ওজন নিরূপণ করা যাইতে পারে। সমুদায় প্রথাটীকে নিম্নোক্ত সাঙ্কেতিক সূত্র দ্বারা প্রকাশ করা হইয়া থাকে :—

$$M = \frac{wf'}{f - f'}$$

[M = আণবিক ওজন ; w = যে পরিমাণ পদার্থ দ্রব করা হইয়াছে ; f = দ্রাবকের (solvent) বাষ্প-চাপ ; f' = দ্রাবণের (solution) বাষ্প-চাপ।]

বেক্‌মান্ (Beckman) প্রথমে বাষ্প-চাপ নতিকরণ প্রথায় আণবিক ওজন নির্দ্ধারণে হস্তক্ষেপ করেন, কিন্তু পরে উহা ত্যাগ করিয়া স্ফুটন-সীমা (boiling point) নির্দ্ধারণ দ্বারা আণবিক ওজন নিরূপণের পন্থা আবিষ্কার করেন। একই তাপমানে (at the same temperature) দ্রাবকের বাষ্প-চাপ দ্রাবণ অপেক্ষা বেশী। অতএব দ্রাবকের স্ফুটন-সীমা দ্রাবণের স্ফুটন-সীমা হইতে কম হইবে, কেন না স্ফুটন-সীমা সমান বাষ্প-চাপের তাপমান ব্যতীত আর কিছু নহে। বেক্‌মানের আণবিক ওজন নির্দ্ধারণ প্রথাকে নিম্নোক্ত সাঙ্কেতিক সূত্র দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে :—

$$M = \frac{c\ 100\ w}{R\ W}$$

[M = আণবিক ওজন, w = যে পদার্থের আণবিক ওজন বাহির করিতে হইবে তাহার পরিমাণ, W = দ্রাবকের পরিমাণ, R = দ্রাবকের স্ফুটন-সীমার পরিবৃদ্ধি (rise in boiling point), c = দ্রাবকের স্থির-সংখ্যা।]

এতদ্ব্যতীত আণবিক ওজন নির্দ্ধারণের আরও প্রথা রহিয়াছে।

আণবিক সঙ্কেত (Molecular formula)।

রাসায়নিকগণ সকল সময়েই সর্ব্বজন-গৃহীত সাঙ্কেতিক সংজ্ঞা দ্বারা রাসায়নিক পদার্থগুলি প্রকাশ করিয়া থাকেন। মৌলিক পদার্থের বেলায় অবশ্য এই সঙ্কেতের ব্যাপকতা তত উপলব্ধি করা যায় না ; কিন্তু যৌগিক পদার্থের বেলা এই সঙ্কেতের প্রভূত প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পাওয়া যায়। C_2H_2 দ্বারা এসিটিলিন্ বুঝান হইয়া থাকে। আমরা বিশ্লেষণ দ্বারা জানি এসিটিলিনে অঙ্গার ও উদজন রহিয়াছে। কিন্তু যদি CH এই সঙ্কেত দ্বারা এসিটিলিন্ নির্দ্দেশ করিতে যাই, তবে চলিবে না ; কেন না আণবিক সঙ্কেত দ্বারা যে কেবল বিভিন্ন মৌলিক পদার্থই নির্দ্দেশিত হয় তাহা নহে, ইহাতে সংযোজনার অংশেরও আভাস দেওয়া হইয়া থাকে। CH দ্বারা এমন পদার্থের প্রতি কটাক্ষ করা হয়, যাহার আণবিক ওজন হইবে ১৩ (১২ : ১), আর C_2H_2 দ্বারা বুঝান হইবে আণবিক ওজন ২৬ (২৪ : ২)। ইহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে আণবিক সঙ্কেত রাসায়নিক আলোচনায় কতটা প্রয়োজনীয় এবং পদার্থবিশেষকে সঙ্কেত দ্বারা প্রকাশ করিতে হইলে কতখানি সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। এসিটিক্ এসিডের সঙ্কেত হইল $C_2H_4O_2$ (C+H+O) ; কিন্তু তাই বলিয়া অঙ্গার, উদজন ও অম্লজন এই তিনটী মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন সংজ্ঞা দ্বারা ইহা যে কোন ভাবে প্রকাশ করিলেই চলিবে না, যেমন CH_2O (C+H+O) ; CH_2O—ফর্‌মাল্‌ডিহাইড্, $C_2H_4O_2$ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

মৌলিক পদার্থের বেলায় আণবিক সঙ্কেত দ্বারা বিভিন্ন পদার্থের অণু কয়টী পরমাণুর সমন্বয়ে সংগঠিত তাহাই নির্দ্দেশিত হয় ; যেমন, H_2, Cl_2 ইত্যাদি ; অর্থাৎ উদজন পরমাণুর দুইটী মিলিয়া একটী উদজন অণুর সৃষ্টি করে, দুইটী ক্লোরিন্ পরমাণুতে একটী ক্লোরিন্ অণু হয়।

অণুর গতি (motion of molecules)।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে ডাল্টন দুইটী বোতলের একটীকে উদজন ও অপরটী অঙ্গারাম্লজন দ্বারা পূর্ণ করিয়া দুইটীতে একটী রবারের নল যোগ করিয়া এক অভিনব পরীক্ষা সম্পাদন করেন। উদজনের বোতলটী উপুড় করিয়া রাখিলেন অঙ্গারাম্লজনপূর্ণ বোতলের উপরে। কএক ঘণ্টা পরে দেখা গেল উভয় বোতলেই দুইটী বায়বীয় পদার্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে। উপরের বোতলে ছিল পাৎলা পদার্থ উদজন আর নীচেকার

* এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত গ্রন্থাদি আলোচনা করা যাইতে পারে—

The Elements of Physical Chemistry— H. C. Jones ; Practical Methods for Determining Molecular Weights (Chem. Pub. Co.)—H. Biltz, translated by Jones & King ; Traube's Physikalisch-Chemische Methoden—Hardin's translation.

বোতলে অপেক্ষাকৃত ভারী অঙ্গারাম্লজন। একটীর গতি উর্দ্ধেই আশা করা যায় বেশী, আর অপরটীর গতি হওয়া উচিত নীচের দিকে; অথচ দুই বোতলেই উভয় বায়ু পরস্পর মিশ্রিত হইয়াছে। প্রথমতঃ কেমন বিচিত্রই মনে হয়—পরস্পরের বিরুদ্ধ গতির দ্বারা দুইটী পদার্থই স্থানচ্যুত হইয়া পরস্পরের নিমিত্ত স্থান করিয়া দিয়াছে। ইহার কারণ কি? বায়বীয় পদার্থ দুইটীর অণুগুলির স্বাভাবিক গতির ফলে উভয়ের অণুই ইতস্ততঃ বিচরণ করায় এতদুভয়ের এইরূপ মিশ্রণ সম্ভব হইয়াছে। তরল পদার্থের বেলায়ও অনুরূপ মিশ্রণ সম্ভব দেখা যায়, যদিও একটু বেশী সময়সাপেক্ষ। কোন একটী পাত্রে তুঁতে বা জলে গলিয়া যায় এমন অন্য কোন রঙ্গীন পদার্থ রাখিয়া উপরে খানিকটা জল ঢালিয়া দিলে পরে দেখা যাইবে, তলের কঠিন পদার্থ গলিয়া উপরের পরিষ্কার জলকে রঙ্গীন করিয়া তুলিয়াছে। পরিবাহন-স্রোত (convection current) যাহাতে কোন প্রকার ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে না পারে সেইজন্য অপরিবর্ত্তিত তাপমানবিশিষ্ট প্রকোষ্ঠে পাত্রটী রাখিয়া দিলেও ফলের কোন প্রকার ব্যতিক্রম হইবে না। এইরূপে অধিককাল রাখিয়া দিলে দেখা যাইবে দ্রাবণের বর্ণ সর্ব্বত্রই এক প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, বায়বীয় ও তরল পদার্থের অণুগুলি অবিশ্রান্তই ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে (the molecules of liquids and gases are in ceaseless motion)। অণুর এইরূপ যে গতির পরিকল্পনা করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাই গতি-সূত্র (kinetic theory) নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

এই গতি-সূত্র দ্বারা আমরা বায়বীয় পদার্থের চাপের হেতু নির্দ্ধারণ করিতে পারি। কোন পাত্রের গায়ে যে সমানভাবে চাপ পড়িতে থাকে তাহার কারণ আর কিছুই না—পাত্রস্থিত পদার্থের অণুগুলি আপনাদের অবিশ্রান্ত গতির ফলে পাত্রের গায়ে অনবরত আক্রমণ করিতে এবং ধাক্কা খাইতে থাকে; ধাক্কা খাইয়া অণুগুলি প্রত্যাহত হইয়া ফিরিয়া যায়। পাত্রের দেহের প্রত্যেক অংশে যে অনবরত আঘাত লাগিতেছে তাহাই এক কথায় বলিতে গেলে চাপ বলা যাইতে পারে। অণুর গতি হইতে এইরূপ চাপের পরিমাণও নির্ণয় করা যায়।

ধরিয়া লওয়া যাক্ M জড়মান (mass) পরিমাণের কোন বায়বীয় পদার্থ L পার্শ্বমাপের সমষড়্ফলক (cube) পাত্রে রাখা হইয়াছে। G অণুগুলির গতির বেগ (speed) এবং সমষড়্ফলকের প্রতি ক্ষেত্রাংশে n সংখ্যক কণা বর্ত্তমান রহিয়াছে। এখন সমষড়্ফলক পাত্রটীর বিপরীত পার্শ্বগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিলে অণুগুলির গতিকে তিনটী ধারায় বিভক্ত করিয়া লওয়া যায়; কেন না অণুগুলির গতি সোজা-সুজি, কাজেই এক পার্শ্বে আঘাত লাগিলে প্রত্যাহত হইয়া আবার অপর পার্শ্বে আঘাত না লাগা পর্য্যন্ত বরাবর বিপরীত দিকে চলিতে থাকিবে। সুতরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি, গড়ে একতৃতীয়াংশ কণা প্রত্যেকটী ধারায় বিচরণ করিতেছে; অর্থাৎ $\frac{n}{3}$-গুলি কণা কেবল বিপরীত দুই পার্শ্বের মধ্যে আনাগোনা করিতেছে। এখন প্রশ্ন হইল পাত্রের প্রতি পার্শ্বে একটী কণা প্রত্যেক সেকেণ্ডে কতবার আঘাত করিবে? এইস্থানে প্রথমতঃ বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার একস্থানে আঘাত করিয়া প্রত্যেকটী কণার দ্বিতীয় বার সেই স্থানেই আঘাত করিতে কতটা পথ অতিক্রম করিতে হয়। একবার আঘাত করিয়া কণাটী প্রত্যাহত হইয়া বিপরীত দিকে চলিয়া যাইবে, আবার ফিরিয়া আসিবে; অতএব 2L পরিমাপের পথ তাহাকে অতিক্রম করিতে হইল। সুতরাং প্রতি সেকেণ্ডে একটী কণা একই পার্শ্বে $\frac{G}{2L}$-বার আঘাত করিবে। এখন $\frac{n}{3}$-গুলি কণা বিবেচনা করিলে প্রতি সেকেণ্ডে একই পার্শ্বে $\frac{G}{2L} \times \left(\frac{n}{3}\right) = \frac{nG}{6L}$-গুলি সঙ্ঘাত ঘটিবে। m জড়-মানের অণুর আঘাতের পূর্ব্বে সমগ্র-বেগ (momentum) mG, আর আঘাতের পরে সমগ্র-বেগ $-mG$; অতএব প্রতি সেকেণ্ডে সমগ্র-বেগের পরিবর্ত্তন (Change of momentum) হয় 2mG। সুতরাং সমস্তকণাগুলির নিমিত্ত প্রতি ক্ষেত্রফলের উপর চাপ পড়িবে—$\left(\frac{nG}{6L} \times 2mG\right) \div L^2$, [$L^2$ = প্রতি পার্শ্বের ক্ষেত্রফল।] এখন p যদি চাপ হয়, তবে তাহার পরিমাণ হইবে,

$$p = \frac{1}{3}\frac{mnG^2}{L^3};$$

কিন্তু $mn = M$, $L^3 = V$ (সমষড়্ফলকের ঘনফল); অতএব পাত্রস্থ বায়ুর (gas) ঘনত্ব (density) $= D = \frac{M}{V}$; সুতরাং উক্ত সমীকরণকে সরল করিলে হইবে,

$$pV = \tfrac{1}{3}MG^2$$

ইহাই বায়বীয় পদার্থের গতি-সূত্রের মূল সমীকরণ (fundamental equation of the kinetic theory) নামে পরিজ্ঞাত।

আণবিক আকর্ষণ (Molecular attraction)।

যদিও বায়বীয় পদার্থের অণুগুলির মধ্যে পরস্পরের আকর্ষণ খুবই সামান্য, তথাপি এইরূপ আকর্ষণের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। বয়েলের সূত্র দ্বারা যতটা

আশা করা যায়, বায়বীয় পদার্থগুলি সাধারণতঃ তদপেক্ষা অধিকতর সঙ্কোচনসাধ্য (compressible), এবং ইহাই অণুগুলির পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণের অস্তিত্ব নির্দ্দেশ করে সন্দেহ নাই। অণুগুলি যতই নিকটতর হইতে থাকে এই আকর্ষণ ততই বৃদ্ধি পায় এবং তরলীকৃত অবস্থায় অণুগুলি অত্যন্ত সন্নিকট বলিয়া পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ এত বৃদ্ধি পায় যে, সাধারণ অবস্থায় একের অপর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার ক্ষমতা আর থাকে না। তরল পদার্থ কিন্তু বায়বীয় অপেক্ষা খুবই অল্প সঙ্কোচনসাধ্য। ইহার কারণ আর কিছুই না— আণবান্তর অবকাশ (intermolecular space) এত কম থাকে যে, চাপিয়া অধিকতর সংহত করা আর সম্ভবপর হয় না।

তরল ও কঠিন অবস্থায় অণুগুলির মধ্যে আকর্ষণ অত্যন্ত বেশী। তরল পদার্থের অণুগুলি পরস্পরের সহিত প্রায় সংলগ্ন থাকে এবং ইতস্ততঃ চলিয়া ফিরিবার মত কোন প্রকার নির্মুক্ত পথ (free path) আর থাকে না; বরং তখন অণুগুলি একে অপরের সহিত সংলগ্ন থাকিয়া নিজে-দের মধ্যে পরস্পরের দেহের উপর দিয়া মৃদুভাবে চলা ফেরা করে বলা যাইতে পারে।

পদার্থের অবস্থান্তর (Change of state)।

কঠিন পদার্থের বেলা অনুমান করা যাইতে পারে যে, অণুগুলি পরস্পরের সহিত দৃঢ়সংলগ্ন থাকে; এবং প্রতি অণুই সাম্যভাবাবস্থার (position of equilibrium) উভয়দিকে অতি সামান্য প্রসারের মধ্যে (small amplitude) আন্দোলিত হইতে থাকে। কোন কঠিন পদার্থে তাপ দিতে থাকিলে প্রথমে অণুগুলির আন্দোলনের প্রসার বাড়িতে থাকে, পরে কোন এক নির্দ্দিষ্ট তাপমানে অণুগুলি এত বেশী আন্দোলিত হইতে থাকে যে, প্রসার বাড়িয়া ক্রমে পরস্পরে পরস্পরের সহিত সংঘাতের সৃষ্টি করে, ফলে উহাদের বন্ধনী শিথিল হইয়া পড়ে। এই ভাবে অণুর পরস্পরের সংবদ্ধতা কমিয়া আসিলে কঠিন পদার্থ ক্রমে তরল অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে। তরল অবস্থা হইতে বায়বীয় অবস্থায় পরিবর্ত্তনেও একই পন্থা অনুসৃত হয়। তাপ দিতে দিতে অণুগুলির ব্যবধান এত অধিক হইয়া পড়ে যে, শেষে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক অবিরাম গতি প্রাপ্ত হয়।

অণুক—(ত্রি) [অণুপ্রকারঃ, স্থূলাদিত্বাৎ অণু-কন্ প্রকারার্থে] অণুপ্রকার। ২ চতুর। ৩ নিপুণ। ৪ অল্প। ৫ সূক্ষ্ম। ৬ স্তোক। (মেদিনী) ৭ [স্বার্থে কন্] (পুং) [বৈদ্যক] অণুশব্দার্থক চীনকাদি ধান্য। [অণু, দ্র°]

অণুজ্যোতিস্—(ক্লী) [বৈদ্যক] স্তোকদৃষ্টি। (বাভট, শারীর°, ৪ অ°)

অণুতা—(স্ত্রী) অণুর ভাব; সূক্ষ্মতা। "আয়ামো দারুণ্যমণুতা খস্তেতি।" (তৈত্তিরীয়-প্রাতি°, ২.১০)

অণুতৈল—(ক্লী) [বৈদ্যক] কেশগত রোগে প্রযোজ্য তৈলবিশেষ। (বাভট, সূত্র°, ২০ অ°)

অণুত্ব—(ক্লী) [অণোর্ভাবঃ] সূক্ষ্মত্ব, অণুপরিমাণ। "অণুত্বং ভার্গবো নতঃ।" (রামা°, সুন্দরকাণ্ড)

অণুধর্ম্ম—(পুং) [অণুঃ সূক্ষ্মো দুর্জ্ঞেয়ো ধর্ম্মঃ] দুর্ব্বোধ ধর্ম্ম।

অণুভা—(স্ত্রী) [অণ্বী সূক্ষ্মা ভা দীপ্তির্যস্যাঃ; বহুব্রী] বিদ্যুৎ।

অণুমধ্যবীজ—(ক্লী) স্তোত্রবিশেষের নাম।

অণুমস্তিষ্ক—মস্তিষ্কের পশ্চাদ্দিক্স্থ নিম্নতম ক্ষুদ্রাংশ (Cerebellum)। [মস্তিষ্ক দ্র°]

অণুমাত্র—(ত্রি) [অণুঃ পরিমাণমস্য অণু-মাত্রচ্] অল্পপরিমাণ।

অণুমাত্রিক—(ত্রি) অণুপরিমেয়। ২ এই শব্দ কখন কখন অণুমাত্রা বা ভূত-ইন্দ্রিয়-মনঃ-বুদ্ধি-বাসনা-কর্ম্ম-বায়ু-অবিদ্যা এই অষ্ট প্রকার শরীরের নিয়োজক অংশসমূহকে বুঝাইয়া থাকে।

"ভূতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবাসনাকর্ম্মবায়বঃ।
অবিদ্যা চাষ্টকম্প্রোক্তং পুর্য্যষ্টমৃষিসত্তমৈঃ।" (ব্রহ্মপু°)
"যদাণুমাত্রিকো ভূত্বা বীজং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
সমাবিশতি সংসৃষ্টস্তদা মূর্ত্তিং বিমুঞ্চতি॥" (মনু ১.৫৬)

অণুমুষ্টি—(পুং) [বৈদ্যক] বিষমুষ্টি, মহানিম্ব। (রাজনি°)

অণুরেণু—(স্ত্রী, পুং) সৌরকিরণে দৃশ্যমান ধূলিকণা।

অণুরেবতী—(ক্লী) [অণুঃ সূক্ষ্মা রেবতী তারা ইব] [বৈদ্যক] দন্তীবৃক্ষ (Croton polyandrum)।

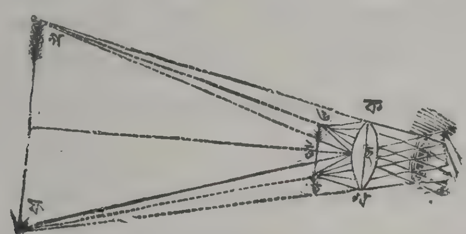
অণুবাদ—(ক্লী) অণুবিষয়ক দর্শন, ইহাতে পরমাণু যে নিত্য ইহাই স্বীকৃত হইয়াছে; বৈশেষিকদর্শন; ন্যায়শাস্ত্র। ২ বল্লভাচার্য্যের মত, ইহাতে ঈশ্বর ও জীবকে 'অণু' বলা হইয়াছে।

অণুবাদী—(পুং) নৈয়ায়িক, বৈশেষিক। ২ বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব।

অণুবীক্ষণ—(ক্লী) [অণুঃ সূক্ষ্মো বীক্ষতে দৃশ্যতে অনেন, অণু-বি-ঈক্ষ-ল্যুট্, করণে] কাচনির্ম্মিত এক প্রকার যন্ত্র। ইহা দ্বারা দেখিলে নিকটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু বড় দেখায়।

জগতে অনেক অত্যন্ত সূক্ষ্ম বস্তু আছে; চক্ষে কোন যন্ত্র না দিলে সেই সকল সূক্ষ্ম বস্তু কিছুই দেখা যায় না।

যে যন্ত্রদ্বারা নিকটের অত্যন্ত ছোট ছোট বস্তু বড় দেখায়, তাহার নাম অণুবীক্ষণ। দুইখানি সরা মুখে মুখে একত্র লাগাইলে যে প্রকার বাদামী আকার হয়, অণুবীক্ষণের কাচখানি দেখিতে ঠিক সেই রকম এবং ইহাকে বৈজ্ঞানিকের ভাষায় পরকলা (lens) কহে। ঐ পরকলাখানিই অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের প্রধান অংশ। ইংরেজীতে এই রকম আকারের পরকলাকে ডবল্ কন্ভেক্স্ লেন্স্ (double convex lens) কহে। এইরূপ একখানি পরকলা সূর্য্যের দিকে ঠিক সোজা করিয়া ধরিলে, তাহার ভিতর দিয়া সূর্য্যকিরণ বক্রভাবে বাহির হয়। বাহির হইয়া একত্র মিলিয়া যায়। পরকলার কিছু দূরে একখানি কাগজ রাখিলে তাহার উপর অতিশয় উজ্জ্বল একটী বিন্দু পড়ে। ঐ বিন্দুটীকে পরকলার মুখ্য অধিশ্রয় (principal focus) কহে। এক দিকে ঐ বিন্দু আর এক দিকে যবাকার পরকলা (double convex lens), তাহার মধ্যস্থলে একটী ছোট দ্রব্য রাখিয়া পরে পরকলাখানির ভিতর

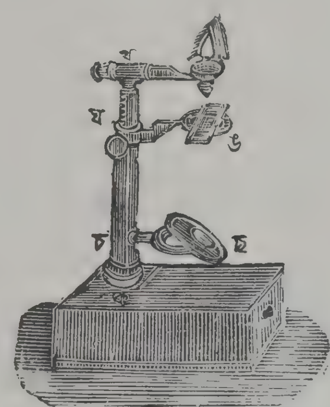


১নং চিত্র

দিয়া দেখিলে ঐ ছোট বস্তু বেশ বড় দেখায়। মনে করা যাউক, চ ঙ একটী দ্রব্য, ক খ যবাকার পরকলা, ট বিন্দু মুখ্যাধিশ্রয় (principal focus)। চ ঙ দ্রব্যটীকে ট বিন্দু এবং ক খ পরকলার মধ্যে কোন স্থানে রাখা চাই। তাহা হইলে চ এবং ঙ হইতে আলোকরশ্মি পরকলার ভিতর দিয়া বক্রভাবে প্রবেশ করিবে। প্রবেশ করিয়া ন দিকে বাহির হইবে। [আলোকরশ্মি বক্র হইবার কারণ আলোক শব্দে দ্র°] এখন ন হইতে চ ঙ দিকে চাহিলে পরকলার যে দিক্ দিয়া আলোক প্রবেশ করিয়াছে, ঠিক সেই সেই স্থান দেখা যাইবে। কারণ কোন বস্তু হইতে আলোকরশ্মি বাহির হইয়া চক্ষে লাগিবার পূর্ব্বে যতই কেন বক্র হইয়া আসুক না, কিন্তু আলোক যে দিক্ দিয়া আসিয়া চক্ষে পড়ে, ঠিক সেই দিক্ দিয়া সকল দ্রব্য দেখা যায়। [ইহার বৃত্তান্ত আলোক শব্দে দ্র°] ছ যদি পরকলার দৃষ্টিকেন্দ্র (optical centre) হয়, তাহা হইলে ছ ঙ এবং ছ চ যোগ করিয়া বাড়াইয়া দিলে, এবং ন ক আর ন খ রেখাও বাড়াইয়া দিলে যেখানে সমস্ত রেখাগুলি পরস্পর মিলিবে, সেইখানে চ ঙ দ্রব্যটীকে দেখা যাইবে। আর চ ঙ দ্রব্যটীকে গ ঘ মত বড় দেখাইবে। পরকলাখানির গঠন ও গুণানুসারে আলোকরশ্মি অধিক বা কম বক্র হয়। যত অধিক বক্র হইবে, ন কোণ তত বড় হইয়া আসিবে এবং দ্রব্যটীকেও তত অধিক বড় দেখাইবে। চ ঙ, ট বিন্দুর যত নিকটে থাকিবে, গ ঘ ততই বড় হইবে; কিন্তু তাহাতে দূরে দেখাইবে। অধিক দূরে গিয়া পড়িলে কোন দ্রব্য ভাল দেখা যায় না। যে আশ্চর্য্য যন্ত্রদ্বারা নির্ম্মল জলে এবং বায়ুর মধ্যে কোটি কোটি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রাণী দেখা যায় এবং যদ্দ্বারা সৃষ্টির অনেক অদ্ভুত বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা একখণ্ড পরকলা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

প্রথমে সহজ ও সরলভাবে প্রস্তুত ঐরূপ পরিবর্দ্ধক যন্ত্র লইয়াই আলোচনা আরম্ভ করা হইল। এই প্রকারের সাধারণ অণুবীক্ষণ-যন্ত্রকে পরিবর্দ্ধক কাচও (magnifying glasses) বলা যাইতে পারে।

তাহার মধ্যে একটীর আকার ও নির্ম্মাণকৌশল অতিশয় সহজ। তাই উহাকে সাধারণ অণুবীক্ষণ (Simple micro-

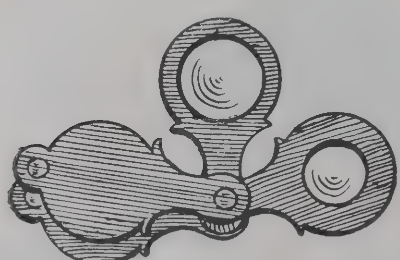


২নং চিত্র

scope) কহে (২নং চিত্র)। ক খ একটী লৌহ বা কাষ্ঠদণ্ড সোজাভাবে দাঁড় করান আছে। ইহার একটী বাহু খ গ ইচ্ছাক্রমে উঠান ও নামান যায়। গ প্রান্তে পূর্ব্বকথিত মত একখানি যবাকার পরকলা বসান আছে। ইহার ভিতর দিয়া দেখা যাইতে পারে। ইহাকে নেত্র-পরকলা (eye-lens) কহে। ঘ ঙ আর একটী বাহু। ইহার ঙ প্রান্তে খাঁজ কাটা। ঐ খাঁজের ভিতর দুইখানি কাচ বসান যাইতে পারে। যে দ্রব্যকে দেখিতে হইবে, তাহা ঐ কাচ দুখানির মধ্যে রাখিতে হয়। খ গ আবশ্যক মত উচ্চ বা নীচ করিয়া নেত্র-পরকলা দ্বারা দেখিলে ঐ দ্রব্য অনেক বড় বা সূক্ষ্ম দেখায়। যে দ্রব্য

দেখিতে হইবে, তাহার উপর যথেষ্ট আলো না পড়িলে ভাল দেখা যায় না। তজ্জন্য দ্রব্যটীর উপর যাহাতে যথেষ্ট আলো পড়ে, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চ ছ বাহুর ছ প্রান্তে একখানি পুটাকার কাচ (concave mirror) বসান আছে। এই দর্পণখানি এরূপ ভাবে বসান যে, তাহাকে ইচ্ছামত ঘুরান যায়। ঐ কাচখানি যে ভাবে রাখিলে পরীক্ষা করিবার দ্রব্যের উপর যথেষ্ট আলো গিয়া পড়িতে পারে, কাচখানি প্রথমে সেইরূপে বসাইয়া লইতে হইবে। তাহা হইলে আলো প্রতিফলিত হইয়া পরীক্ষার দ্রব্যের উপর পড়িবে। [দর্পণ দ্র°] তখন সেই আলোকে বস্তুটী বেশ স্পষ্ট দেখা যাইবে। চক্ষুর অতিশয় নিকটে কিংবা দূরে কোন বস্তু রাখিলে ভাল দেখা যায় না, এ কথা সুবিদিত। চক্ষু হইতে ১০।১২ ইঞ্চ দূরে কোন দ্রব্য রাখিলে বেশ দেখা যায়। কিন্তু সকলের দৃষ্টিশক্তি সমান নয়, তজ্জন্য চক্ষুর অবস্থা বুঝিয়া ঐ দূরত্ব কম বেশী করিয়া লইতে হয়। অর্থাৎ ক গ সরাইয়া কোথাও ঙ দিকে লইয়া যাওয়া চাই, কোথাও উপর দিকে তুলিয়া আনা চাই। সাধারণতঃ, গ এবং ঙ এমন দূরে রাখা আবশ্যক, যেন দ্রব্যটীর বর্দ্ধিত প্রতিবিম্ব চক্ষু হইতে ১০।১২ ইঞ্চ দূরে গিয়া পড়ে।

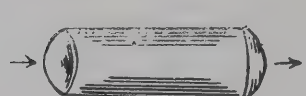
পূর্ব্ববর্ণিত যন্ত্রে সাধারণতঃ স্বল্প আধিশ্রয়িক দূরত্ববিশিষ্ট (short focal length) যব-পৃষ্ঠাকার পরকলা (convex lens) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকণা বড় করিয়া দেখিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু কেবলমাত্র একটী যব-পৃষ্ঠাকার পরকলা



'ক'—পকেট পরিবর্দ্ধক



'খ'—কডিংটন্ লেন্স্



'গ'—ষ্টান্‌হোপ লেন্স্

৩নং চিত্র

ব্যবহার করিলে বিভ্রম হইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট রহিয়াছে; এই বিভ্রম প্রধানতঃ বর্ণচ্যুতি (chromatic aberration) ও বর্ত্তুলচ্যুতির (sperical aberration) নিমিত্ত ঘটিয়া থাকে। উক্ত দুই কারণ-ঘটিত বিভ্রম দূর করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত আধিশ্রয়িক দূরত্ব-বিশিষ্ট দুইটী পরকলা ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই প্রকারের পরকলার সমন্বয়কে (system of lenses) পরিবর্দ্ধক কাচ বা সাধারণ অণুবীক্ষণ (a magnifying glass or a simple microscope) বলা হয় (৩নং চিত্র)। এই স্থানে বর্ণচ্যুতি ও বর্ত্তুলচ্যুতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন, নচেৎ গোলযোগ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিতে পারিবে না।

একটী মাত্র পরকলার অক্ষোপরস্থ শুভ্র আলোকের উৎস-বিন্দু কেবল একই স্থানে একটীমাত্র প্রতিবিম্ব (image) কোন সময়েই উৎপাদন করে না। প্রতিবিম্বগুলি সাধারণতঃ হয় রঙ্গীন বিন্দুবৎ ও সংখ্যায় বহু। এইগুলি অক্ষের উপরে প্রতিবিম্বিত হয় এবং নীলবর্ণের প্রতিবিম্ব লাল অপেক্ষা পরকলার নিকটতর হইয়া থাকে। অতএব সম্পূর্ণ প্রতিবিম্বটীকে অক্ষোপরি বিস্তৃত রেখাকার বর্ণচ্ছত্রের (spectrum) ন্যায় দেখা যায়। সাধারণ আলোকসূত্রগুলি (laws) হইতে এ ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমের সৃষ্টি হয়। এই ব্যতিক্রমকেই বর্ণচ্যুতি বলা হয়।

কোন পরদার উপরে প্রতিবিম্ব উৎপাদন করিবার নিমিত্ত যদি একটীমাত্র পরকলা ব্যবহৃত হয়, তবে বিভিন্ন প্রকারের রঙ্গীন প্রতিবিম্বগুলি সমস্ত একই সঙ্গে অধিশ্রয়ান্তর্গত করা সম্ভবপর হইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে নীল প্রতিবিম্বটী হইবে পরকলার নিকটতর, আর লালটী হইবে সর্ব্বাপেক্ষা দূরে এবং অন্যান্য কএকটী বর্ণের প্রতিবিম্ব যাইয়া পড়িবে এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে। এখন যদি লাল আলোক-রশ্মিগুলিকে পরদার উপরে নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা করা যায়, তবে যে লাল প্রতিবিম্ব গঠিত হইবে, তাহার উপরে নীল, সবুজ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার প্রতিবিম্বগুলি আসিয়া চাপিয়া বসিবে এবং ফলে ঐগুলি অধিশ্রয়ের কিঞ্চিদধিক বাহিরে যাইয়া পড়িবে। কাজেই সমস্তগুলি মিলিয়া আসলে যে অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যাইবে তাহার কেবল চারিদিক্‌টা রক্তিমাভ হইয়া প্রকাশ পাইবে। এই সকল তথ্য হইতে আলোকবিজ্ঞান-সূত্রের সাহায্যে বর্ণচ্যুতির পরিমাপ অনায়াসে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে।

কোন বিশিষ্ট আলোক-রশ্মির নিমিত্ত পরকলার বর্ত্তনাঙ্ক (Refractive Index) যদি হয় 'μ', আর ঐ আলোক-রশ্মি প্রতিবিম্বিত করিবার নিমিত্ত আধিশ্রায়ক দূরত্ব যদি 'f' হয়, তবে আলোক-সূত্র অনুসারে,—

$$\frac{1}{f_r} = \frac{\mu_r - 1}{\mu - 1} \cdot (\mu - 1)\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$

$$= \frac{\mu_r - 1}{\mu - 1} \cdot \frac{1}{f} \cdots \cdots \cdots$$ [লাল রশ্মির বেলা]

[উক্ত সমীকরণে f_r = লাল রশ্মি প্রতিবিম্বার্থ প্রয়োজনীয় আধিশ্রয়িক দূরত্ব, μ_r = লাল রশ্মির নিমিত্ত বর্ত্তনাঙ্ক, r_1 ও r_2 = পরকলার পার্শ্বদ্বয়ের বক্রতার (curvature) ব্যাসার্দ্ধ।]

সেইরূপ নীল রশ্মির বেলা সমীকরণ হইবে—

$$\frac{1}{f_b} = \frac{\mu_b - 1}{\mu - 1} \cdot (\mu - 1)\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) = \frac{\mu_b - 1}{\mu - 1} \cdot \frac{1}{f}.$$

[লাল রশ্মির বেলা যেমন 'r' ব্যবহৃত হইয়াছে, তেমনি 'b' দ্বারা নীল রশ্মি বুঝিতে হইবে।]

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, বর্ণচ্যুতিজনিত বিভিন্ন রশ্মির নিমিত্ত আধিশ্রয়িক দূরত্বের ব্যবধান হইবে। অতএব সমান্তরাল রশ্মির নিমিত্ত যে বর্ণচ্যুতি ঘটিবে তাহা $f_r - f_b$ দ্বারা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে, পরকলার নিকটতম প্রতিবিম্ব হইবে নীল আর দূরতম হইবে লাল, অর্থাৎ 'f_r' হইবে 'f' হইতে বড় আর 'f_b' হইবে তদপেক্ষা ছোট; আর মোটামুটিভাবে $f_r f_b = f^2$ ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলে—

$$\frac{1}{f_b} - \frac{1}{f_r} = \frac{f_r - f_b}{f_r f_b} = \frac{\mu_b - \mu_r}{\mu - 1} \cdot \frac{1}{f}.$$

$$\therefore f_r - f_b = \frac{\mu_b - \mu_r}{\mu - 1} \cdot f.$$

$$\left[\because \frac{f_r - f_b}{f_r f_b} = \frac{f_r - f_b}{f^2}\right]$$

অথবা পরকলার মধ্যম আধিশ্রয়িক দূরত্ব ও যে পদার্থ দ্বারা পরকলাটী নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার বর্ণবিশ্লেষণত্ব (dispersive power of the substance), এতদুভয়ের গুণফলকে সমান্তরাল আলোক-রশ্মির বর্ণচ্যুতি বলা যাইতে পারে।

এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, আলোকের এক প্রান্তবর্ত্তী লাল এবং অপর প্রান্তের বেগুনী রশ্মি বিচার করিয়া দেখিলেও উপরোক্ত সূত্রই মানিতে হয়।

পরকলার বর্ণাপসারিত্ব (Achromatism of lenses)।

পরকলাকে উপরি-উপরি সাজান কতকগুলি ত্রিশির কাচের (prism) কুচির সম্মিলন বলিয়া বিবেচনা করিলে ইহা হইতে বর্ণচ্যুতির হেতু অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ বিপরীত কার্য্যক্ষম পরকলার যোগাযোগেই বর্ণচ্যুতি হ্রাস করিবার চেষ্টা করা হয়। সাধারণতঃ ফ্লিন্ট্ কাচের (flint glass) একটী যব-পৃষ্ঠাকার পরকলার (convex lens) সহিত আর একটী ক্রাউন কাচ-নির্ম্মিত (crown glass) পুটাকার (concave) পরকলার একত্র সন্নিবেশ দ্বারা বর্ণচ্যুতি যথাসম্ভব কমাইয়া লওয়া হয়। দুইটী কাচের বর্ণ-বিশ্লেষণ-ধারার প্রতি লক্ষ্য করিলেই এইরূপ সন্নিবেশের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা যাইবে।

কোন পুটাকার পরকলার (concave lens) উপরে সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ (parallel pencil of rays) সোজা-সুজি আপতিত (directly incident) হইলে বেগুনী উপাদানগুলি লাল হইতে অধিকতর বক্রীভূত হইবে; অর্থাৎ অমূর্ত্ত (virtual) বেগুনী অধিশ্রয় লাল রশ্মির অপেক্ষা পরকলার বেশী নিকটে অবস্থিত দেখা যাইবে। অপরপক্ষে সমান্তরাল রশ্মি না হইয়া যদি অভিসারী (convergent) রশ্মিগুচ্ছকে ঐরূপ পরকলার উপরে আপতিত হইতে দেওয়া হয়, সেই ক্ষেত্রেও বেগুনীই বক্রীভূত হইবে বেশী। অতএব এক্ষেত্রে বেগুনী অধিশ্রয় হইবে লাল অপেক্ষা দূরে সরিয়া। এখন যদি যব-পৃষ্ঠাকার পরকলা অতিক্রম করিয়া অভিসারী রশ্মিগুচ্ছ অপর এক পুটাকার পরকলার উপরে নিপতিত হয়, তবে যব-পৃষ্ঠাকার পরকলাটীর নিমিত্ত বেগুনী অধিশ্রয়ের ঝোঁক হইবে লাল অপেক্ষা বেশী নিকটবর্ত্তী হওয়া, আর পুটাকার পরকলার ফলে হইবে ইহার বিপরীত এবং এতদুভয়ের যোগাযোগের ফলে—যদি পরকলা দুইটীর উপযুক্ত বাছাই হয়—তবে বেগুনী ও লাল অধিশ্রয়দ্বয়ের সন্নিপাতন (coincidence) আশা করা যাইতে পারে। বর্ণচ্যুতি যাহাতে যথাসম্ভব কম হয় বা একেবারেই না হয় তন্নিমিত্ত একাধিক পরকলার সন্নিবেশকেই বর্ণাপসারী যোজনা (achromatic combination) বলা হয়।

কিন্তু কোন যোজনা দুইটী বর্ণের পক্ষে বর্ণাপসারী হইলেই অন্যান্য সকল বর্ণের পক্ষেও তাহা বর্ণাপসারী হইবে এমন কথা বলা যায় না—কেন না, সকল প্রকার ত্রিশির কাচে বর্ণবিশ্লেষণ এক রকম হয় না। এই সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণচ্যুতির প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে। [বর্ণচ্যুতি দ্র°] তবে ইহা অন্ততঃ জানা থাকা দরকার যে, কোন পরকলা-সমন্বয় যাহাতে সম্পূর্ণ বর্ণাপসারী হইতে পারে তজ্জন্য লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যোজনার ফলে বর্ণের যে প্রতিবিম্ব প্রতিক্ষিপ্ত হইবে তাহার আকার যেন সমান এবং বিভিন্ন প্রতিবিম্ব যেন সন্নিপাতিত হয়।

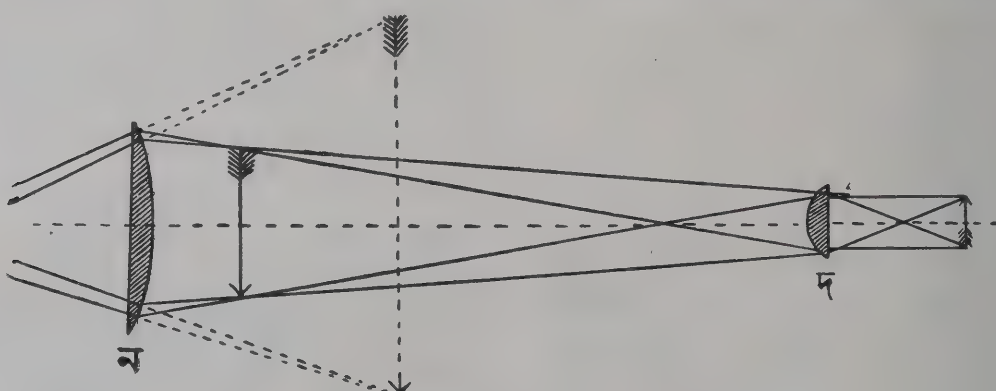
বর্ত্তুলচ্যুতি ও তজ্জনিত বিভ্রম দূরীকরণ।

আলোক-বিজ্ঞানের সূত্রগুলি নিরূপণের নিমিত্ত সাধারণতঃ রশ্মিগুচ্ছকে ক্ষীণাকার কল্পনা করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু

কার্য্যতঃ রশ্মিগুচ্ছকে কল্পিতানুরূপ ক্ষীণাকার করিয়া আপতিত করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না এবং অণুবীক্ষণাদি সূক্ষ্ম যন্ত্রে রশ্মিগুচ্ছের সেই সামান্য পরিসরও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা যায় না। এইরূপ আলোক-রশ্মির পরাবর্ত্তন (reflection) ও বক্রণের (refraction) পরে আবার উহার একই বিন্দুর মধ্য দিয়া অতিক্রম করা ঘটিয়া উঠে না এবং যথার্থপক্ষে একটী বক্রকে (curve) স্পর্শ করে; এই বক্রকে কস্তিক বক্র (caustic curve) বলা হয়। পরাবর্ত্তন ও বক্রণের পরে যে আলোক-রশ্মি এইরূপ বিভ্রান্তভাবে সম্প্রসারী কোণযুক্ত (wide angled) হইয়া প্রকাশ পায়, তাহাকেই বর্ত্তুলচ্যুতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পরাবর্ত্তিত ও বক্রীভূত রশ্মির এইরূপ কুণ্ঠগতির নিমিত্ত প্রতিবিম্বের রূপ সুস্পষ্ট এবং বস্তু-অনুরূপ হইতে পারে না। সুতরাং এই ব্যাঘাত দূরীকরণের চেষ্টা করা প্রয়োজন, এবং সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভবপর না হইলে যথাসম্ভব ইহা কমাইবার চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। একটীমাত্র পরকলার সাহায্যে বর্ত্তুলচ্যুতি হইতে যন্ত্রকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত করার কোন প্রকার চেষ্টাই সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না; তবে পরকলার পৃষ্ঠাবেষ্টনের বক্রতার যথাযোগ্য ব্যাসার্দ্ধ নির্ব্বাচনের ফলে বর্ত্তুলচ্যুতি বহুলাংশে হ্রাস হওয়া সম্ভব।

পরস্পর দূরে থাকিলে উহাদের মধ্য দিয়া অতিক্রমণজনিত বক্রীভূত রশ্মির বিচলন কি উপায়ে সমানভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া সম্ভব তাহাই এখন প্রধান বিবেচনার বিষয়। অবশ্য অক্ষরেখার সহিত সমান্তরাল রশ্মি-গুচ্ছ লইয়াই বর্ত্তমানে এ আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকিবে। উক্ত বিচলন দুইটী পরকলার মধ্যে সমানভাবে বিতরণ করিতে হইলে উভয়ের আধিশ্রয়িক দূরত্বের পরস্পরের ব্যবধানের সমান দূরে উহাদিগকে রাখা প্রয়োজন। যদি ঐ পরকলা দুইটী যবাকার (biconvex) হয় এবং উভয় পার্শ্বস্থ বক্রের ব্যাসার্দ্ধদ্বয়ের অনুপাত যদি হয় ১ : ৬ (ক্রাউন কাচ-নির্ম্মিত পরকলায় যাহার μ=১·৫), আর অধিকতর বক্র পার্শ্বের মুখ যদি সমান্তরাল আপতিত রশ্মির দিকে থাকে, তবে অপচার আরও বেশী কমান যাইতে পারে।

এই গেল বর্ণচ্যুতি ও বর্ত্তুলচ্যুতির মোটামুটী কথা। এখন অণুবীক্ষণের নির্ম্মাণকৌশল এবং ইহার কার্য্যকলাপ সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। সাধারণ অণুবীক্ষণের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এক্ষণে বৃহদণুবীক্ষণ (compound microscope) সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। ইহাও নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্রতম পদার্থ দেখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, তবে ইহা অনেক বেশী সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বলিয়া আভ্যন্তরীণ জটিলতা কিছু অধিক।



বৃহদণুবীক্ষণের দৃক্-যন্ত্রের ব্যবস্থা।

৪নং চিত্র

আলোকের গতিবিধি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রান্তবর্ত্তী আলোক-রশ্মির বিচলন (deviation) যত বেশী হইবে তত অধিক হইবে অপচার (aberration)। অতএব প্রান্তবর্ত্তী রশ্মি-গুচ্ছের বিচলন কমাইয়া বর্ত্তুলচ্যুতিজনিত ভ্রান্তি অনেকটা দূর করা যাইতে পারে। মোট যতখানি বিচলন হইতেছে, তাহা অনেকগুলি পরকলার মধ্যে সমানভাবে ভাগ করিয়া দিয়া অনায়াসে কার্য্যসিদ্ধি করা যায়। দুইটী পরকলা

এই যন্ত্রটী প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত (৪নং চিত্র)। ইহাদের একটীকে বলা হয় দৃশ্যাভিমুখী (দ)। এই দৃশ্যাভিমুখী পরকলার মুখ্যাধিশ্রয় (principal focus) হইতে কিঞ্চিৎ দূরে দর্শনীয় পদার্থটী রাখিতে হয়। তাহা হইলে এইরূপে রক্ষিত পদার্থের একটী বর্দ্ধিতাকার বিপরীতমুখী বা উল্টা (inverted) মূর্ত্ত (real) প্রতিবিম্ব উৎপাদিত হইবে। দ্বিতীয়টী (ন) নেত্র-পরকলা (eye lens) নামে অভিহিত

হইয়া থাকে ; ইহার সাহায্যে উক্ত মূর্ত্ত প্রতিবিম্ব দেখা যায়। যেহেতু দৃশ্যাভিমুখী পরকলা বর্দ্ধিতাকার প্রতিবিম্বের সৃষ্টি করে, অতএব প্রতিবিম্ব হইতে মূল পদার্থটী পরকলার অধিকতর নিকটে অবস্থিত থাকা প্রয়োজন। চক্ষুর সাহায্যে যে প্রতিবিম্বটী দেখা যাইবে তাহা অনন্ত দূরবর্ত্তী স্থানে (at infinity) গঠিত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং দৃশ্যাভিমুখী দ্বারা গঠিত মূর্ত্ত প্রতিবিম্ব নেত্র-পরকলার প্রথম মুখ্যাধিশ্রয়ের উপর উৎপাদিত হইতে হইবে ; এবং তাহা হইলে দ্রষ্টার চক্ষে আকর্ষণজনিত কোন প্রকার বেগ পাইতে হইবে না। অবশেষে যে প্রতিবিম্বটী গঠিত হইবে, তাহা অবশ্য দর্শনোপযোগী স্বল্পতম দূরত্বের (দর্শনোপযোগী স্বল্পতম দূরত্ব প্রায় ১০ ইঞ্চ বা ২৫ সেন্টিমিটার) বাহিরে নেত্র-পরকলা হইতে দূরে যে কোন স্থানে উৎপাদিত হইলেই চলিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে দৃশ্যাভিমুখী দ্বারা গঠিত প্রতিবিম্বটী নেত্র-পরকলা ও তাহার প্রথম মুখ্যাধিশ্রয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অপেক্ষাকৃত পরকলার নিকটে হওয়া প্রয়োজন।

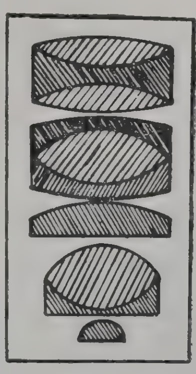
এই গেল মূল তথ্য সম্বন্ধে মোটামুটী কথা। এখন দেখিতে হইবে অণুবীক্ষণ সাহায্যে বস্তুটী কত বড় করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ উহার পরিবর্দ্ধন-ক্ষমতা কত। অণুবীক্ষণের দৃশ্যাভিমুখী হইতে 'চ'-দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত 'ক'-পরিমিত বস্তুর মূর্ত্ত প্রতিবিম্ব যদি দৃশ্যাভিমুখী হইতে 'ছ'-দূরে গঠিত হয়, তবে আলোক-বিজ্ঞানের সূত্র অনুসারে প্রতিবিম্বের আকার হইবে $\frac{ছক}{চ}$। এখন যদি দর্শনোপযোগী স্বল্পতম দূরত্ব হয় 'ড', তবে নেত্র-পরকলা দ্বারা বর্দ্ধিত প্রতিবিম্বের চরম পরিমাপ হইবে $১-\frac{ড}{ফ}$; 'ফ' এস্থানে আধিশ্রয়িক দূরত্ব (বিয়োগাত্মক)*। সুতরাং উভয় পরকলার যোগাযোগে চক্ষুর অতি সন্নিকটে যে শেষ প্রতিবিম্বটী গঠিত হইবে তাহা

$$\left\{\left(১-\frac{ড}{ফ}\right)\cdot\frac{ছক}{চ}\right\}\div ক=\left(১-\frac{ড}{ফ}\right)\frac{ছ}{চ}$$

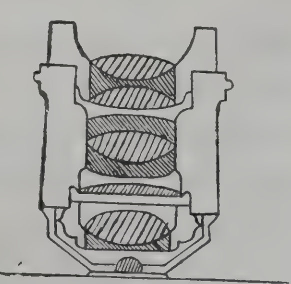
বড় দেখিতে পাওয়া যাইবে।

নেত্র-পরকলা (ন) ও দৃশ্যাভিমুখী (দ) এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান অধিক হইলে, অর্থাৎ 'ছ' যদি বেশী হয় তাহা হইলে প্রতিবিম্বের আকার আরও বড় করা যাইতে পারে। অবশ্য এতৎসঙ্গে দৃশ্যাভিমুখী হইতে দ্রষ্টব্য বস্তুর দূরত্বও কমাইয়া লওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ 'চ'ও কম হইবে। অণুবীক্ষণের দৈর্ঘ্য যদি খুব বেশী হয় (পরে বর্ণিত নির্ম্মাণ-কৌশল দ্রষ্টব্য) এবং যদি অতি-বর্দ্ধক দৃশ্যাভিমুখী (high power objective) ব্যবহার করা যায়, তবে 'চ' অর্থাৎ দৃশ্যাভিমুখী হইতে বস্তুর দূরত্ব কার্য্যতঃ প্রায় আধিশ্রয়িক দূরত্বের সমান হইবে। অবশ্য এক্ষেত্রে আধিশ্রয়িক দূরত্বের স্থিতি-চিহ্ন হইবে বিপরীত। পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা হইতে অনায়াসেই প্রণিধান করা যাইবে যে, বৃহদণু-বীক্ষণের দৃশ্যাভিমুখী ও নেত্র-পরকলা উভয়ই স্বল্পাধিশ্রয়িক হওয়া আবশ্যক।

পূর্ব্ববর্ণিতানুরূপ বীক্ষণোপযোগী ব্যবস্থা যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এমন কথা বলা যায় না ; ফলতঃ নেত্র-পরকলা ও দৃশ্যাভিমুখী উভয়ের নিমিত্তই কিঞ্চিদধিক ত্রুটি থাকিয়া যায়। এই ত্রুটি প্রধানতঃ বর্ণচ্যুতি ও বর্ত্তুলচ্যুতির নিমিত্ত ঘটিয়া থাকে। অতএব অণুবীক্ষণ যন্ত্রাদিতে ইহা হ্রাস করিবার নিমিত্ত কার্য্যতঃ যে উপায় অবলম্বিত হয়, তৎসম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। অণুবীক্ষণে ক্রাউন-কাচনির্ম্মিত অর্দ্ধ-যবাকার পরকলা (plano-convex lens) স্বল্পবর্দ্ধক দৃশ্যাভিমুখীরূপে (low power objective) ব্যবহৃত হয় ; এই অর্দ্ধ-যবাকার পরকলার সমতল পার্শ্ব বর্ত্তুলচ্যুতি হ্রাস করিবার নিমিত্ত মূল বস্তুর অভিমুখে রাখা হয় এবং ইহার পশ্চাৎ-সংলগ্ন ফ্লিন্ট্-কাচনির্ম্মিত অপসারী (divergent) পরকলাটী বর্ণচ্যুতি দূরীকরণোপযোগী করিয়া নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কিন্তু অতিবর্দ্ধক দৃশ্যাভিমুখীর গঠন-প্রণালী অত্যন্ত জটিল। এই প্রকারের দৃশ্যাভিমুখী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন।



ক—পরকলাগুলি যেভাবে সাজান থাকে।



খ—প্রকৃত যন্ত্রের খণ্ড-চিত্র।

আবে পরিকল্পিত দৃশ্যাভিমুখী।

৫নং চিত্র

উক্ত অতিবর্দ্ধক দৃশ্যাভিমুখী সাধারণতঃ কতকগুলি পরকলার

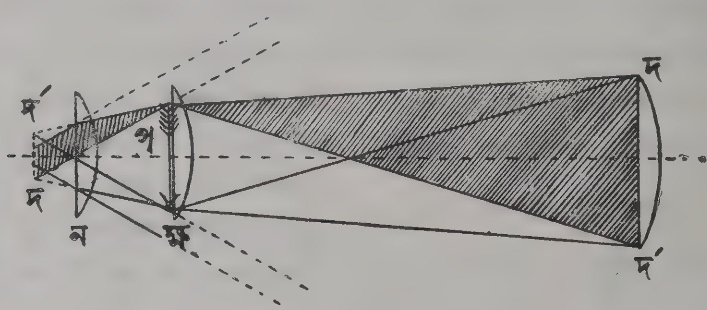
* পরকলা হইতে আপতিত রশ্মির গতির বিপরীত দিকে অর্থাৎ যে দিক্ হইতে আলোক-রশ্মি আসে সেই দিকে যে সকল রেখা টানা হয়, তাহা যোগাত্মক (positive), আর ইহার বিপরীত দিকে অর্থাৎ আলোক-রশ্মির গতি-অভিমুখী যে সকল রেখা পরকলা হইতে টানা হয়, তাহা বিয়োগাত্মক (negative) বলিয়া বিবেচনা করা হইয়া থাকে।

সংযোজনায় (সংখ্যায় দশটী) প্রস্তুত হইয়া থাকে (৫নং চিত্র)। এই পরকলাগুলি বিভিন্ন প্রকারের ফ্লিন্ট্ অথবা ক্রাউন কাচের দ্বারা নির্ম্মাণ করা হয়; কোন কোন ক্ষেত্রে জেনা কাচও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৫নং চিত্রটী অধ্যাপক আবের (Prof. Abbe) পরিকল্পিত একটী দৃশ্যাভিমুখী।

সর্ব্বনিম্নস্থ গোলার্দ্ধাকৃতি পরকলাটী ব্যতীত অন্যান্য পরকলাগুলির মধ্যে অপসারী কয়টী ফ্লিন্ট্ কাচে প্রস্তুত এবং অভিসারীগুলি ক্রাউন কাচে নির্ম্মিত। গোলার্দ্ধাকৃতি পরকলাটীর পরবর্ত্তী প্রত্যেকটী পরকলাই বর্ণচ্ছত্রের যথেষ্ট সন্নিপাতন করিয়া থাকে। আর সর্ব্বনিম্নস্থ পরকলার সমতল পার্শ্ব সিডার-উড্ তৈলে (cedar-wood-oil) ডুবান দ্রষ্টব্য পদার্থের দিকে থাকে; অবশ্য পরকলাটীও উক্ত সিডার-উড্ তৈলে নিমজ্জিত থাকা প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন হইল, এইরূপ ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্য কি? আমরা বর্ত্তুলচ্যুতি আলোচনার প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, পরকলার গঠনের নিমিত্তই আপতিত রশ্মি হইতে নানাপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হয়; অথচ সাধারণতঃ এত বেশী ব্যাসবিশিষ্ট পরকলা প্রস্তুত করা সম্ভব হয় না, যাহার ফলে আলোকের বিচলন বন্ধ করা যাইতে পারে। অতএব দেখিতে হইবে, এমন কোন উপায় অবলম্বন করা যায় কিনা যাহা দ্বারা এইরূপ গোলযোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়; এবং সেই উদ্দেশ্যেই উক্ত সর্ব্বনিম্নস্থ পরকলাটী ঐরূপে সিডার-উড্ তৈলে রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যদি এমনভাবে পরকলাটী প্রস্তুত করা হয় যে, উহার অক্ষোপরি অবস্থিত যে কোন বিন্দু হইতে উৎসারিত রশ্মিমালা পরকলার উপর পড়িয়া পরাবর্ত্তনের পরে আবার ফিরিয়া অক্ষোপরি অপর এক বিন্দুতে আসিয়া মিলিয়া যাইবে, তাহা হইলে সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এই কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্তই—সিডার-উড্ তৈলের বর্ত্তনাঙ্ক পরকলার কাচের বর্ত্তনাঙ্কের সমান বলিয়া—উক্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই প্রকার ব্যবস্থা সাধারণতঃ আবিষ্কর্ত্তার নামানুসারে 'আবের সমধর্ম্মক নিমজ্জন' (Abbe's homogeneous immersion) নামে পরিচিত। ইহার সুবিধা নানাবিধ। [ব্যাবর্ত্তন (diffraction) দ্র°]

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে দ্রষ্টব্য পদার্থটীও সিডার-উড্ তৈলে নিমজ্জিত থাকে। গোলার্দ্ধাকৃতি পরকলার এই প্রকারের ব্যবস্থা দ্বারা বর্ত্তুলচ্যুতি-দোষ বিদূরিত হয় বটে, কিন্তু আবার বর্ণচ্যুতিজনিত ত্রুটি ঘটিয়া থাকে। অপরাপর যে কয়টী পরকলা ব্যবহৃত হয়, সেইগুলিকে যথোপযুক্তভাবে সাজাইয়া এই বর্ণচ্যুতি দোষ দূর করা হয়। অধ্যাপক আবেই আবিষ্কার করেন যে, উহাদের মধ্যে দুই একটী পরকলা এদিক্ ওদিক্ করিয়া বসাইলে এই ত্রুটি সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভবপর হয়।

তৎপর যে নেত্র-পরকলা ব্যবহার করা হয়, তজ্জন্য যন্ত্রে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইয়া থাকে। এই ত্রুটিও প্রধানতঃ বর্ণচ্যুতি এবং বর্ত্তুলচ্যুতি-ঘটিত। এতদ্ব্যতীত সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে আর একটী খুঁত যন্ত্রটীর কার্য্যকারিতায় ব্যাঘাত ঘটায়। স্বভাবতঃ উজ্জ্বল বস্তুর প্রতি বিন্দু হইতে আলোকরশ্মি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে; কিন্তু বীক্ষণ-যন্ত্রের দৃশ্যাভিমুখীর সাহায্যে অপ্রশস্ত রশ্মিগুচ্ছ দ্বারা প্রতিবিম্ব উৎপাদিত হয়। সুতরাং বস্তুর প্রতি অংশই এই অপ্রশস্ত রশ্মিগুচ্ছ দ্বারা সম্পূর্ণ প্রতিভাত হওয়ার আশা করা যায় না। কোন একটী স্থানে চক্ষু রাখিলে তথা হইতে প্রতিবিম্বের সেই অংশই মাত্র দেখা যাইবে—যথা হইতে রশ্মিগুচ্ছ আসিয়া সোজাসুজি চক্ষুতে প্রবেশ করে। ৪নং চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে, প্রতিবিম্বের প্রান্তদ্বয় হইতে উৎক্ষিপ্ত রশ্মিগুচ্ছ নেত্র-পরকলার পরিধি প্রান্তভাগের মধ্য দিয়া বক্রীভূত হইয়া থাকে; এবং এমনভাবে বক্রীভূত হয় যে নিকটে স্থাপিত চক্ষু-তারকার ক্ষুদ্র পথে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করিতে পারে না। কাজেই প্রতিবিম্বের কেবল অক্ষের নিকটবর্ত্তী অংশই মাত্র দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। এই ত্রুটি কোনরূপেই উপেক্ষা করা যায় না;



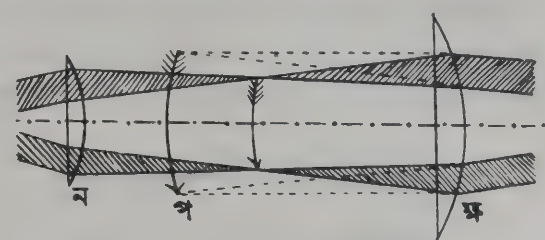
ক্ষেত্রবর্দ্ধক পরকলার কার্য্যকারিতা।

৬নং চিত্র

এবং ইহা সংশোধনের নিমিত্ত ক্ষেত্রবর্দ্ধক পরকলা (field lens) ব্যবহৃত হইয়া থাকে (৬নং চিত্র দ্র)। ক্ষেত্র-বর্দ্ধক পরকলাটী (ক্ষ) এমনভাবে সংরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন যে দৃশ্যাভিমুখী (দ) দ্বারা উৎপাদিত প্রতিবিম্ব (প) উক্ত ক্ষেত্রবর্দ্ধক পরকলার (ক্ষ) প্রধান ক্ষেত্রতলে (principal plane) থাকিবে। ইহাতে যে প্রতিবিম্বটী অবশেষে দেখা যাইবে তাহার আকারের কোনরূপ তারতম্য হইবে না, কেন না, প্রতিবিম্বের আকার ইহাতে বর্দ্ধিত হয় না। পরন্তু যে রশ্মিগুচ্ছের সাহায্যে 'প' দেখা যাইবে তাহা তাহাদের উৎস হইতে এরূপভাবে বিক্ষিপ্ত হয় যে, 'ক্ষ'র দ্বিতীয় মুখ্যাধিশ্রয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে অক্ষরেখাকে পরস্পর খণ্ডিত করে (cross); সুতরাং এই খণ্ডনস্থলের নিকটস্থ চক্ষু-তারকার মধ্যে 'প'র সর্ব্বাঙ্গ হইতে বিক্ষিপ্ত রশ্মিগুচ্ছ যুগপৎ প্রবেশ করিতে পারে। এখন যদি 'ক্ষ'র আধিশ্রয়িক দূরত্বের সমান আধিশ্রয়িক দূরত্ব-বিশিষ্ট নেত্র-পরকলা (ন) এমনভাবে রক্ষিত হয় যে ইহার প্রধান ক্ষেত্রতল 'ক্ষ'র দ্বিতীয় অধিশ্রয়ের মধ্য দিয়া অতিক্রম করে, তবে অনন্ত-দূরস্থ (at infinity) 'প'র সমুদয় অংশই দৃষ্টিপথে পতিত হইতে পারে। এই নেত্র ও ক্ষেত্রবর্দ্ধক পরকলাদ্বয়ের যোগাযোগকে একসঙ্গে উপনেত্র (eye-piece) বলা হয়। উপনেত্রের অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি (বর্ণচ্যুতি ইত্যাদি ঘটিত) অনায়াসে বিদূরিত হইতে পারে, যদি উপনেত্রের প্রস্তুত-প্রণালীর ব্যবস্থা এইরূপ হয় যে, লাল ও নীল প্রতিবিম্ব চক্ষুর সহিত সমকোণে অবস্থিত থাকিবে। বস্কোভিচ্ (Boscovtich) নির্দ্দেশ করেন যে, হাইজেনের উপনেত্র এই দিক্ দিয়া বর্ণাপসারী।

অতএব এখন উপনেত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা দরকার। অণুবীক্ষণে প্রধানতঃ হাইজেনের (Huyghen's) এবং রাম্‌স্‌ডেনের (Ramsden's) উপনেত্রের ব্যবহার বেশী প্রচলিত। উপনেত্রের উদ্দেশ্য এবং কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে; এখন কেবল ইহার নির্ম্মাণ-কৌশল বর্ণনা করিলেই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা যাইবে।

হাইজেনের পরিকল্পিত উপনেত্র:—পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, বক্রীভূত রশ্মিগুলি যদি কোন প্রকার ব্যবস্থার ফলে দুই পরকলা হইতে সমানভাবে বিচলিত হয়, তবে বর্ত্তুলচ্যুতি স্বল্প হইবে। এতদুদ্দেশ্যে পরকলা দুইটীর মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান উভয়ের আধিশ্রয়িক দূরত্বের বিয়োগফলের সমান হওয়া আবশ্যক ($d = f_2 - f_1$)। আবার বর্ণচ্যুতি হ্রাস করিতে হইলে পরকলাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান উহাদের গড় আধিশ্রয়িক দূরত্বের সমান হইবে { $d = \frac{1}{2}(f_2 + f_1)$ }। অতএব এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের নিমিত্ত একটী পরকলার আধিশ্রয়িক দূরত্ব অপরটীর আধিশ্রয়িক দূরত্বের তিনগুণ হওয়া প্রয়োজন ($f_1 = 3 f_2$)। হাইজেন এই সত্যকে ভিত্তি করিয়া এক উপনেত্রের পরিকল্পনা করেন এবং তাঁহার নামানুসারে তাঁহার পরিকল্পিত উপনেত্র হাইজেনের উপনেত্র নামে সুপরিচিত



হাইজেনকৃত উপনেত্রের দৃক্-যন্ত্রের ব্যবস্থা।

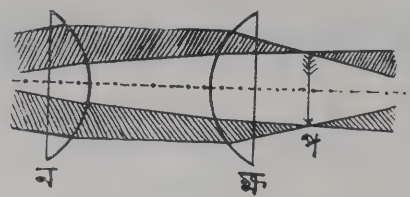
৭নং চিত্র

(৭নং চিত্র)। ইহাতে দুইটী অর্দ্ধযবাকার পরকলা ব্যবহৃত হইয়া থাকে; পরকলা দুইটীর মধ্যে ক্ষেত্রবর্দ্ধক পরকলার (ক্ষ) আধিশ্রয়িক দূরত্ব নেত্র-পরকলার (ন) আধিশ্রয়িক দূরত্বের তিনগুণ, আর পরকলা দুইটীর পরস্পরের দূরত্ব হইবে নেত্র-পরকলার আধিশ্রয়িক দূরত্বের দ্বিগুণ। [যেহেতু, $f_1 = 3f_2$, অতএব $d = 2f_2$, কেন না $d = \frac{1}{2}(f_2 + 3f_2)$]। আবার ক্ষেত্রবর্দ্ধক পরকলাটী দৃশ্যাভিমুখীর আধিশ্রয়িক ক্ষেত্রের (focal plane) সম্মুখে দৃশ্যাভিমুখী হইতে ক্ষেত্রবর্দ্ধকের আধিশ্রয়িক দূরত্বের অর্দ্ধেক দূরে অবস্থিত থাকে। দৃশ্যাভিমুখী দ্বারা গঠিত প্রতিবিম্ব সকল সময়েই উক্ত প্রকারে নির্ম্মিত উপনেত্রের ক্ষেত্রবর্দ্ধক পরকলার বিয়োগাত্মক পার্শ্বে যাইয়া পড়ে। এই জন্য হাইজেনের উপনেত্র বিয়োগাত্মক উপনেত্র (negative eye-piece) নামে অভিহিত হয়। হাইজেনের উপনেত্রে অনেক সময় ক্ষেত্রবর্দ্ধকের নিমিত্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকার (convexo-concave) এবং নেত্রপরকলার স্থলে অর্দ্ধ-যবাকার (convexo-plane) পরকলাও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রাম্‌স্‌ডেনের উপনেত্র:—ইহাতে দুইটী সমান আধিশ্রয়িক দূরত্ব-বিশিষ্ট অর্দ্ধ-যবাকার (plano-convex) পরকলা ব্যবহৃত হয়, এবং পরস্পরের মধ্যে আধিশ্রয়িক দূরত্বের দুই-তৃতীয়াংশ ($\frac{2}{3}$) ব্যবধান থাকে। ইহাতে পরকলা দুইটীর উন্নত পার্শ্ব পরস্পর মুখামুখী করিয়া রাখা হয় (৮নং চিত্র); আর ক্ষেত্রবর্দ্ধক পরকলাটী দৃশ্যাভিমুখীর আধিশ্রয়িক ক্ষেত্রের পশ্চাদ্ভাগে স্বীয় আধিশ্রয়িক দূরত্বের এক-চতুর্থাংশ ($\frac{1}{4}$) দূরে অবস্থিত থাকিবে। রাম্‌স্‌ডেনের উপনেত্র যোগাত্মক উপনেত্র (positive eye-piece) নামে পরিচিত।

অণুবীক্ষণের বিভিন্ন অংশের বৈজ্ঞানিক তথ্য, নির্ম্মাণ-কৌশল এবং কার্য্যকারিতা যথাসম্ভব আলোচিত হইয়াছে। এখন প্রকৃত পদার্থটীর নির্ম্মাণ এবং আকৃতি সম্বন্ধে সামান্য বর্ণনাই যন্ত্রের সকল দিক্ বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

বৃহদণুবীক্ষণের মুখ্য অংশ হইল একটী বড় নল (গ); আর তাহার মধ্যে আরও একটী নল এমনভাবে প্রবেশ করান থাকে যে উহা ইচ্ছানুরূপ উঠান নামান যাইতে পারে, ইহাকে চলৎ-নল

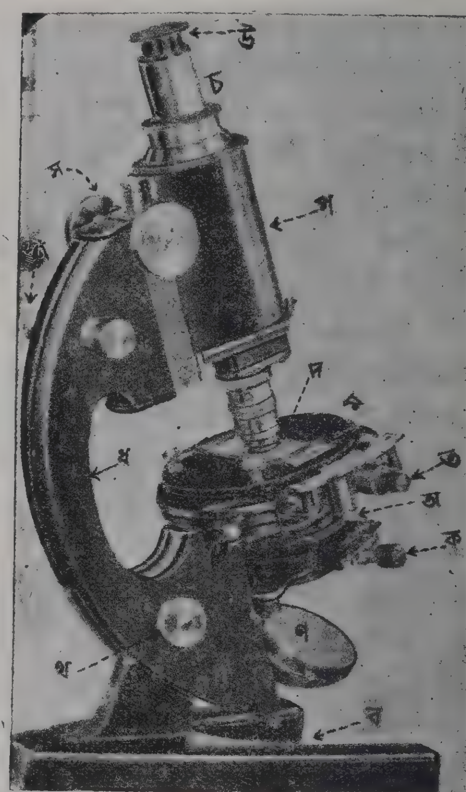


রাম্‌স্‌ডেনকৃত উপনেত্রের দৃক্-যন্ত্রের ব্যবস্থা।

৮নং চিত্র

(চ) বলা হয়। এই চলৎ-নলটী অপর একটী নলের মধ্যে বসান থাকে; সেই নলটীর গায়ে কাঁটা কাঁটা দাঁত আছে এবং বাহিরের একটী স্ক্রু ঘুরাইয়া চলৎ-নলটীসহ যন্ত্রটী উপরে নীচে উঠান নামান যায়। যে স্ক্রুর সাহায্যে এইরূপ চালনা করা হয়, তাহাকে উপস্তম্ভ-সন্নিবেশক (স) কহে। এই নলগুলির সর্ব্বোপরি চলৎ-নলের শীর্ষে উপনেত্র (উ) সংস্থাপিত হয়। দেহ-নলের নিম্নদেশে দৃশ্যাভিমুখী (দ) সংলগ্ন করিয়া রাখা হয়। যন্ত্রের উপনেত্র প্রভৃতি যথোপযুক্ত সংস্থাপনের নিমিত্ত এবং দ্রষ্টব্য পদার্থ প্রয়োজনানুসারে স্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য আরও একটী সন্নিবেশক স্ক্রু ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ইহা সূক্ষ্ম-সন্নিবেশক (শ) নামে অভিহিত। দৃশ্যাভিমুখীর নীচেই দ্রব্যাধার-মঞ্চ (ম) রহিয়াছে। ইহাকে দৃশ্যাভিমুখীর পথে প্রয়োজনমত রক্ষা করিবার নিমিত্ত এদিক্ ওদিক্ ঘুরান যাইতে পারে। দ্রব্যাধারমঞ্চের উপরে আর একটী অংশ আছে; এই অংশেই দ্রষ্টব্য পদার্থ সংরক্ষিত হয় এবং যাহাতে দ্রষ্টব্য পদার্থ আলোকের পথে উপযুক্তভাবে থাকিয়া স্পষ্ট প্রকাশ পাইতে পারে তন্নিমিত্ত এই অংশটী মঞ্চের উপরে আড়াআড়ি ভাবে পরিচালিত হইতে পারে। যাহার সাহায্যে এরূপ পরিচালন সম্ভবপর হয়, তাহাকে তির্য্যক্-পরিচালক (ত) নাম দেওয়া হইয়াছে। দ্রব্যাধারমঞ্চের নীচে অধোমঞ্চ (অ) নামে প্রয়োজনানুরূপ সন্নিবেশনোপযোগী অপর একটী মঞ্চ রহিয়াছে। এই মঞ্চ (ক) স্ক্রু দ্বারা উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া প্রয়োজনমত দ্রষ্টব্য পদার্থে আলো সরবরাহ করা যায়, কারণ এই অধোমঞ্চে আলো কেন্দ্রীভূত করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। সর্ব্বনিম্নস্থ দর্পণ (প) ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উপযুক্ত অবস্থায় ইহার সাহায্যে বাহিরের আলো দ্রষ্টব্য পদার্থের উপরে নিয়া ফেলিবার বন্দোবস্ত করা যায়। সমগ্র যন্ত্রটী একটী বৈঠকের (ব) উপরে বসান থাকে। বৈঠকের সহিত মূল যন্ত্রটী লৌহনির্ম্মিত ধারকাঙ্গ (ধ) দ্বারা সংরক্ষিত হইয়া থাকে। ধারকাঙ্গকে সংস্থাপকের (থ) উপরে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া যন্ত্রটীকে সোজা করিয়া বা যে কোন কোণে প্রয়োজনমত রক্ষা করা যায়।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রটী ব্যবহারের সময় এমন করিয়া বসান চাই এবং দৃশ্যাভিমুখীটী (objective) পরীক্ষার দ্রব্যের এতটুকু দূরে রাখা আবশ্যক যে, ঐ দৃশ্যাভিমুখীর ভিতর দিয়া দ্রব্যটীর যে প্রতিবিম্ব আসিবে, তাহা যেন নলগুলির ভিতরেই পড়ে। এ ভিন্ন আরও কিছু ব্যবস্থা আছে। দ্রব্যের ছায়াটী উপনেত্র



বৃহদণুবীক্ষণ-যন্ত্র।

৯নং চিত্র

(eye-piece) ও মুখ্যাধিশ্রয়ের (principal focus) মধ্যে এবং অধিশ্রয় হইতে যতদূরে থাকিলে বেশ স্পষ্ট ও বড় দেখাইবে তাহারও উপযুক্ত ব্যবস্থা করা চাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সাধারণতঃ প্রতিকৃতিটী উপনেত্র হইতে ১০।১২ ইঞ্চ দূরে পড়িলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। তবে সকলের চক্ষুর তেজ সমান নয়, তাই এই দূরত্বের কমবেশীও হইতে পারে। এই সমস্ত ঠিক করিয়া লইবার জন্য প্রথমে দৃশ্যাভি-

মুখীকে দ্রব্যের এমন দূরে রাখিতে হইবে যে, তাহার প্রতিকৃতি কতক পরিমাণে যেন স্পষ্ট দেখা যায়। পরে ধারকাঙ্গের দ্বারা সমস্ত যন্ত্রটী এদিক্ ওদিক্ ঘুরাইতে ফিরাইতে যখন দ্রব্যটী বেশ স্পষ্ট ও বড় দেখাইবে তখনি বুঝিতে পারা যাইবে যে, অণুবীক্ষণ ঠিক বসান হইয়াছে। তাহার পর যেন আবশ্যক-মত আলো পড়ে তজ্জন্য ণ-চিহ্নিত দর্পণ ঠিক করিয়া বসান প্রয়োজন। প্রচুর সূর্য্যের আলো না থাকিলে প্রদীপ জ্বালিয়া লইতে হয়। প্রদীপটী কোন্ স্থানে রাখিলে দর্পণে তাহার আলোক পড়িয়া প্রতিফলিত হইয়া পরীক্ষার দ্রব্যের উপর পড়িতে পারে, তাহা দেখিয়া লওয়া আবশ্যক। এই সমস্ত সুব্যবস্থা মত করিয়া লইবার জন্য বিশেষ কোন নিয়ম নাই। একবার অণুবীক্ষণের পরীক্ষা দেখিলে সকলেই অনায়াসে যন্ত্রটী সাজাইয়া লইতে পারেন।

এক চক্ষু বন্ধ করিয়া যদি কেবল এক চক্ষুর সাহায্যে কোন বস্তু দেখিতে হয়, তবে বস্তুটী যেমন তত সুস্পষ্ট দেখা যায় না, চক্ষুও তেমনি শ্রান্ত হইয়া পড়ে। এই কারণে আর এক প্রকারের অণুবীক্ষণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার অন্যান্য অংশে আর কোন প্রকার নূতনত্ব কিছু নাই; কেবলমাত্র পূর্ব্বোক্তরূপ আর একটী উপনেত্রবাহী নল পাশে বসান থাকে। ইহা দ্বিনেত্রিক অণুবীক্ষণ (binocular microscope) নামে পরিচিত। তাই বলিয়া যে ইহাতে দুইটী প্রতিবিম্ব দেখা যায় তাহা নহে। এককালে একই ভাবে দুই উপনেত্রের সাহায্যে দেখিতে হয় বলিয়া দুইটী প্রতিকৃতি দেখা যায় না, অধিকন্তু বস্তুটীর সকল দিক্ বেশ পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাওয়া যায়, চক্ষুরও শ্রান্তি হয় কম। সাধারণতঃ শুধু চোখে আমরা যখন কোন বস্তু দেখি, তখন দুই চোখে দুইটী প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইলেও মূল বস্তুটী একই দেখা যায়, কেবল বেশী সুস্পষ্ট হয়। দ্বিনেত্রিকের বেলায়ও অনুরূপ ব্যাপার ঘটে।

অণুবীক্ষণে প্রধানতঃ হাইজেনের উপনেত্রই ব্যবহৃত হয়; কিন্তু কোন বস্তুর আকার মাপিতে হইলে তখন স্কেল (scale) সহ রাম্‌স্‌ডেনের উপনেত্রের ব্যবহার হইয়া থাকে।

(ক্লী) [ভাবে ল্যুট্] ২ অল্পদর্শন।

অণুবেদান্ত—(ক্লী) বেদান্তসম্বন্ধীয় গ্রন্থবিশেষ।

অণুব্রত—(পুং) জৈনদিগের গার্হস্থ্যধর্ম্মের এক অঙ্গ। ইহাতে প্রাণাতিপাত, মৃষাবাদ, অদত্তদান, মৈথুন এবং পরিগ্রহ এই পঞ্চ বিরমণ বা যম বর্ত্তমান।

অণুব্রীহি—(পুং) [বৈদ্যক] সূক্ষ্ম ধান্য। (রাজনি°)

অণুশস্—(ত্রি) অণুক্রমে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রূপে।

অণুশ্রোত্র—(ক্লী) [অণু সূক্ষ্মশব্দ শ্রূয়তে অনেনেতি] মাইক্রোফোন (Microphone) নামক এক প্রকার যন্ত্র ইহা দ্বারা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শব্দ অনায়াসে শুনিতে পাওয়া যায়। [মাইক্রোফোন দ্র°]

অণুহ—(পুং) ভরতবংশীয় মহারাজ বিভ্রাজের পুত্র, শুকদেবের জামাতা ও কৃত্বীর স্বামী। ইঁহার ঔরসে ও পত্নী কৃত্বীর গর্ভে ব্রহ্মদত্ত জন্মগ্রহণ করেন। অণুহ পরম ধার্ম্মিক ও পিতৃভক্ত ছিলেন। রাজকার্য্য পরিচালনে উপযুক্ত হইয়াছেন বিবেচনা করিয়া ইঁহার পিতা ইঁহাকে রাজ্যভার অর্পণ করেন। ইনিও কৃতিত্বের সহিত বহু বৎসর রাজত্ব করিয়া পুত্র ব্রহ্মদত্তকে রাজ্যভার প্রদানপূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন। (হরিবংশ, ভাগবত) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কৃত্বীর স্থানে যথাক্রমে কীর্ত্তিমতী (৭৩.৩০) ও ঋচী (৯৯.১৭৯) পাঠ দৃষ্ট হয়।

অণূকা—(স্ত্রী) কশ্যপপত্নী প্রধার পঞ্চকন্যার অন্যতমা। (হরিবংশ)

অণূভূ—(ত্রি) পূর্ব্বে অণু না থাকিয়া পরে যে অণু হয়।

অণ্ঠ্—[অঠ্ দ্র°]

অণ্ড,—(পুং ক্লী) [অম্ গত্যাদিষু, অমন্তি সংপ্রয়োগং যান্তি অনেন, অম্-ড। ঞমন্তাড্ডঃ। উণ্ ১.১১১। (ঙম—ঙ ঞ ণ ন ম)] মুষ্ক; পুরুষজাতীয় জীবের অবয়ববিশেষ। "কাষ্ঠাভ্যাং চূর্ণিতাণ্ডদ্বয়ঃ" (হিতোপ° ৪৯.১৬)। ২ ডিম্বমাত্র; পক্ষী প্রভৃতির প্রাদুর্ভাবক কোষ। চলিত আণ্ডা, এণ্ডা, ডিম। [অণ্ডশব্দ পরে থাকিলে 'কুক্কুটী' প্রভৃতির পুংবদ্ভাব হয়। যথা, কুক্কুটীর অণ্ড—কুক্কুটাণ্ড ইত্যাদি। (পা ৬.৩.৩৫ বার্ত্তিক)।] পর্য্যায়—পেশী(শি), কোষ(শ), পেশীকোষ, ডিম্ব।

জীবোৎপত্তির প্রথমাবস্থায় মনুষ্য, গো, পশুপক্ষী, মৎস্য, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি সকল প্রাণীরই স্ত্রীজাতির গর্ভে ডিম্ব জন্মে। তাহার মধ্যে মনুষ্য, গো প্রভৃতি কোন কোন জন্তুর গর্ভের ভিতরেই ডিম্ব পরিপক হইয়া থাকে; পরে জরায়ুতে সন্তান জন্মে। কোন কোন জন্তুর গর্ভের ভিতর সন্তান হয় না। পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি কতকগুলি জন্তু ডিম পাড়ে। শেষে প্রসবের পর সেই ডিম পরিপক হইলে বাচ্ছা বাহির হয়।

সকল প্রকার জন্তুর উৎপত্তির নিয়ম সমান নয়। আমাদের শাস্ত্রকারেরা চারি প্রকার উৎপত্তির কথা লিখিয়াছেন। যথা—১ জরায়ুজ, যেমন মনুষ্য, গো, মহিষ প্রভৃতি। ২ অণ্ডজ, যেমন পক্ষী, মৎস্য ইত্যাদি। ৩ স্বেদজ, যেমন ক্রিমি ইত্যাদি। ৪ উদ্ভিদ্, যেমন বৃক্ষলতা প্রভৃতি।

কোন কোন প্রাণীর শরীর কাটিয়া দুই খানি করিয়া ফেলিলে তাহার এক এক খণ্ড হইতে পূর্ব্বের মত এক একটী জন্তু উৎপন্ন হয়। পুনর্ব্বার সেই এক একটী জন্তুকে দুই খণ্ড

করিলে আবার তাহার এক এক খণ্ড হইতে ঠিক তদ্রূপ জন্তু উদ্ভূত হইয়া থাকে। এইরূপ একটী জন্তুকে যত বার দুইখণ্ড করিয়া কাটিবে, তাহার প্রত্যেক খণ্ডে এক একটী প্রাণী উৎপন্ন হইবে। ইহাকে ব্যবচ্ছেদ (fission) দ্বারা জীবোৎপত্তি কহে।

জীবোৎপত্তির দ্বিতীয় নিয়ম পরাঙ্গোদ্ভেদ (gemmation)। নদীর ও সমুদ্রের জলে অনেক প্রকার কীট আছে, বাচ্ছা হইবার সময় তাহাদের শরীরের এক স্থানে ব্রণের মত একটু ফুলিয়া উঠে। ক্রমে ব্রণটী বড় হইতে থাকে এবং দিন দিন উহার আকার অবয়ব ঠিক পুরাতন কীটটীর মত হইয়া আসে। অবশেষে এই অংশ তাহার শরীর হইতে খসিয়া যায়। ইহাকেই পরাঙ্গোদ্ভেদ (gemmation) দ্বারা জীবোৎপত্তি কহে। পুরুভুজ নামে একপ্রকার জলকীট আছে, তাহারা এইরূপে উৎপন্ন হয়।

এই দুই শ্রেণী ভিন্ন বাকী অন্যান্য জন্তুর জীবনের সূত্রপাত অণ্ডের ভিতরে হয়। যে সকল প্রাণী ডিম পাড়ে এবং ডিম ফুটিলে যাহাদের জন্ম হয়, তাহাদিগকেই আমরা অণ্ডজ বলিয়া থাকি। কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে এ সিদ্ধান্ত সর্ব্বতোভাবে ঠিক নয়। মনুষ্য, গো, মেষ প্রভৃতিরও অণ্ডে উৎপত্তি; কাজেই ইহাদিগকেও অণ্ডজ বলা অসঙ্গত নহে। স্ত্রী এবং পুং-জননেন্দ্রিয়ের সংযোগ ভিন্ন এই শ্রেণীর জীবের উৎপত্তি হয় না। তাহার মধ্যে কোন জাতীয় জন্তুর স্ত্রীপুরুষ পৃথক্ নহে; বিধাতা তাহাদের এক শরীরেই এই দুই প্রকার ইন্দ্রিয় গড়িয়া দিয়াছেন। আবার কোন কোন জাতির স্ত্রী ও পুরুষ বিধাতা পৃথক্ করিয়া গড়িয়াছেন।

অণ্ডাধার হইতে অণ্ড পৃথক্ হইয়া অণ্ডপ্রণালীতে আসিলে স্ত্রীলোকদের ঋতুকাল উপস্থিত হয়; পশুপক্ষীর সেই সময়ে শরীরে সন্তাপ জন্মে বলিয়া তাহারা 'বাতাইয়া' উঠে। এই অবস্থায় পুরুষ-সংসর্গ ঘটিলে অণ্ডের ভিতর জীবের সঞ্চার হয়। পুরুষ-সঙ্গ না ঘটিলে ডিম শুকাইয়া যায়।

সকল প্রকার অণ্ডজ জন্তুদিগের ডিমের সংখ্যা সমান নয়। শামুক এক একবারে ন্যূনাধিক ৫০টী করিয়া ডিম পাড়ে। উই পোকা প্রতিদিন অন্যূন ৮০,০০০ ডিম পাড়িয়া থাকে। ইহারা একাদিক্রমে দুই বৎসর অণ্ড প্রসব করে; কাজেই এক একটী পোকার প্রায় ৫০,০০০,০০০ সন্তান জন্মে। কচ্ছপের এক একবারে ৫০ হইতে ২০০ ডিম হয়। সচরাচর পক্ষিজাতির একবারে দুই হইতে চারিটী পর্য্যন্ত অণ্ড হয়। হাঁসেরা ডিম পাড়িতে আরম্ভ করিলে একাদিক্রমে প্রায় ১৫।১৬ দিন অণ্ড প্রসব করে। অনেক ক্ষুদ্রজাতীয় পক্ষীর একেবারে আঠারটী ডিম হয়। উষ্ট্রক পক্ষীর ডিম সকলের চেয়ে বড়—সচরাচর প্রায় এক ফুট দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহার খোলা অত্যন্ত কঠিন। আফ্রিকার অসভ্য জাতিরা উহাতে জলপাত্র তৈয়ারী করে। সাধারণতঃ পক্ষীরা বসন্ত ও গ্রীষ্মকালের মধ্যে দুইবার ডিম পাড়ে। কেবল পায়রা, পাতীহাঁস, প্রভৃতি কোন কোন পক্ষী এই নিয়মের বহির্ভূত।

অণ্ডের আকার, সংখ্যা ও প্রকারভেদ।

অণ্ডের আকার নানা প্রকার। অধিকাংশ নিম্নস্তরস্থ প্রাণীর অণ্ড ক্ষুদ্র। আবার পশুগণের অণ্ডও ঐরূপ। পক্ষী ও সরীসৃপগণের ডিম সর্ব্বাপেক্ষা বড়। অণ্ডের আয়তনের এই তারতম্য অণ্ডমধ্যস্থ সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। যে সকল প্রাণীর অণ্ড খুব ক্ষুদ্র, তাহাতে অতি অল্প পরিমাণে খাদ্য সঞ্চিত থাকায় তাহা শীঘ্রই ফুটিয়া যায় এবং তাহা হইতে বিষম আকারের অতি ক্ষুদ্র শিশু বহির্গত হয়। এই সকল শিশুকে বিষমশিশু (larva) বলা হয়। ইহারা নিজেই খাদ্য গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হয় এবং ক্রমশঃ মাতৃরূপ ধারণ করে। মশা ও মাছির বাচ্ছা এইরূপ।

পশুগণের ডিম্বও এইরূপ ক্ষুদ্র এবং ইহাতেও অতি অল্প পরিমাণে খাদ্য সঞ্চিত থাকে। এই ডিম্ব মাতার গর্ভাশয়ে (uterus) সংলগ্ন হইয়া মাতার দেহ হইতে পুষ্ট হয়। বর্দ্ধিত হইলে ইহা শিশুরূপে মাতার দেহ হইতে নির্গত হয়। এই জন্য এই সকল প্রাণীকে জরায়ুজ বলা হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পক্ষী ও সরীসৃপগণের ডিম্ব খুব বড়; ইহার সারাংশের নিম্নদিকে বহু পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত থাকে। এই খাদ্যে পুষ্ট ডিম্বের সারাংশটী বর্দ্ধিত হইয়া শিশুতে পরিণত হয়। শিশুটী বর্দ্ধিত হইলে ডিম্বের কঠিন আবরণ ভগ্ন করিয়া ডিম্ব হইতে নির্গত হইয়া থাকে। এই সকল প্রাণীকে অণ্ডজ বলা হয়।

যে সকল অণ্ডে অতি অল্প খাদ্যদ্রব্য সমভাবে বিক্ষিপ্ত থাকে এবং যাহা হইতে শীঘ্রই বিষমশিশু বহির্গত হয়, তাহাদিগকে অল্পখাদ্যিক (alecithal, homolecithal or isolecithal) বলে। যাহার অধোভাগে খাদ্য সঞ্চিত থাকে, তাহাকে অধোখাদ্যিক (telolecithal) বলা হয়। যে ডিম্বের সারাংশ খাদ্যস্তর দ্বারা বেষ্টিত থাকে, তাহাকে পরিখাদ্যিক (centrolecithal) বলে।

কোন কোন প্রাণী এক সময়ে একটী বা অতি অল্প

সংখ্যায় ডিম্ব প্রসব করে, বৎসরে একবার বা দুই তিন বারও হইতে পারে। যে সকল ডিম্বের নষ্ট হইবার সম্ভাবনা বেশী, তাহারা বহু সংখ্যায় উৎপন্ন হয়। মৎস্যের ডিম্ব তাহার উদাহরণ।

নানাবিধ প্রাণীর ডিম্ব নানাপ্রকার। চক্রধারী (rotifera) এবং ডাফ্‌নিয়া (daphnia) প্রভৃতি কয়েক জাতীয় খোলকীর (crustacea) ডিম দুই প্রকার। একপ্রকার ডিম পুংজননকোষের সহিত মিলিত না হইয়াই শিশু উৎপাদন করে। ইহারা সচরাচর গ্রীষ্মকালে দৃষ্ট হয় বলিয়া ইহাদিগকে 'গ্রীষ্মডিম্ব' বলা হয়। প্রাণীটী এই ডিম্বগুলি পৃষ্ঠের উপর বহন করিয়া সাঁতার দেয়। আর একপ্রকার ডিম আয়তনে বড় এবং ইহার আবরণ কঠিন। এই ডিম পুংজননকোষের সহিত মিলিত হইয়া শিশু উৎপাদন করে। ইহারা শীতকালে জন্মে বলিয়া ইহাদিগকে 'শীতডিম্ব' বলে। এই শীতডিম্ব বহু বৎসর ধরিয়া শুষ্ক মাটীতে জীবিত থাকে এবং জল পাইলে ফুটিয়া উঠে।

যে সকল নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর ডিম জলে পতিত হয়, তাহারা অতি ক্ষুদ্র, অল্পখাদ্যিক এবং তাহা ফুটিয়া শীঘ্রই বিষমশিশু (larva) বহির্গত হয়। যে সকল ডিম স্থলে স্থাপিত হয়, সেগুলি প্রায়ই একটী কঠিন আবরণবিশিষ্ট কোষ বা গুটির (cocoon) ভিতরে রক্ষিত হইয়া থাকে। গুটির ভিতরে একপ্রকার শাদা পুষ্টিকর দ্রবপদার্থ থাকে, যাহা গ্রহণ করিয়া ভ্রূণগুলি গুটির ভিতর বর্দ্ধিত হয়; পরে গুটি ভাঙ্গিয়া বহির্গত হয়। কেঁচো, আরসুলা প্রভৃতি প্রাণীর ডিম্বগুলি এইরূপে গুটিবদ্ধ থাকে।

পতঙ্গজাতির ডিম্ব অতি ক্ষুদ্র এবং নানা আকারের। ডিম্বাবরণের গাত্র নানাপ্রকারে চিত্রিত। বহু ডিম্ব এক সঙ্গে যুক্ত থাকে। ডিম্বগুলি স্থলে, পাতার উপর অথবা জলে স্থাপিত হয়। মশার (culex) ডিমগুলি একসঙ্গে ভেলার ন্যায় জলে ভাসিতে থাকে। দণ্ডাকার ও পত্রাকার পতঙ্গের ডিম একসঙ্গে গুটির ভিতর থাকে।

উচ্চশ্রেণীর খোলকীর ডিম্বগুলি মাতার পায়ে সংলগ্ন থাকে। চিংড়িতে ইহা দেখা যায়। বিছাচিংড়িরা (squillas) গর্ত্তে ডিম প্রসব করে। সাধারণতঃ, খোলকীদের ডিম ছোট, তাহাতে অল্পই খাদ্যদ্রব্য থাকে; এই সকল ডিম হইতে নানা প্রকারের বিষমশিশু বহির্গত হয়। এই সকল বিষমশিশুর আকৃতি পিতামাতা হইতে অনেক ভিন্ন। উহারা যেমন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ক্রমশঃ ততই রূপান্তরিত হয় ও পিতামাতার আকার গ্রহণ করে। কতকগুলি স্বাদুজল ও গভীরসমুদ্রবাসী খোলকীর ডিম বড় হয়, তাহাতে অধিক খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত থাকে; তাহাদের শিশু যখন ডিম হইতে বাহির হয়, তখন দেখিতে প্রায়ই পিতামাতার মত হইয়া থাকে।

কোমলাঙ্গীদের (mollusca) ডিম্ব নানাবিধ। শিরঃপদী (cephalopoda) প্রাণীদিগের ডিমগুলি দীর্ঘাকার গুটিতে সঞ্চিত থাকে এবং বহুসংখ্যক গুটি একসঙ্গে অংশুর মত বদ্ধ থাকে; আবার কতকগুলির ডিমের গুটিগুলি পৃথক্ পৃথক্ স্থাপিত হয়; পুনশ্চ, কতকগুলি শিরঃপদীর ডিমগুলি স্থূল মালার মত বদ্ধ থাকে—গুটি হয় না। বক্ষঃপদীর (gastropoda) ডিমগুলিও নানারকমে সাজান থাকে। অনেকেরই গুটি হয় না। কতকগুলির ডিমে অধিক পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত থাকে। ডিমগুলি স্থলে বা জলে স্থাপিত হয়। আবার শঙ্খজাতীয় খোলকীগণের বহু ডিম্ব একসঙ্গে গুটির ভিতর থাকে। ঝিণুক বা শুক্তিজাতীয় কোমলাঙ্গীদের ডিম্ব একসঙ্গে বহুপরিমাণে নির্গত হয়। আমাদের সাধারণ ঝিণুকের অসংখ্য ডিম্ব শ্বাস-পটের মধ্যস্থ গহ্বরে কিছুদিন সঞ্চিত থাকে। পরে বিষমশিশু-গুলি বহির্গত হইয়া জলে সাঁতার দিতে থাকে। কতকগুলি কোমলাঙ্গীর ডিম পায়রার ডিমের মত বড় হয়।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদিগের মধ্যে মৎস্যশ্রেণীর ডিম্বের সংখ্যায় বহু তারতম্য দৃষ্ট হয়। আকারেও বহু প্রভেদ লক্ষিত হয়। পট্টশ্বাসী (elasmobranchii) অর্থাৎ হাঙ্গর ও শঙ্কর-জাতীয় মৎস্যগুলির মধ্যে কতকগুলি শিশুসন্তান প্রসব করে। তাহাদের ডিম মাতৃদেহের ভিতর ফুটিয়া শিশুটী একটু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহার পর বহির্গত হইয়া থাকে। অস্থিক মৎস্যগণের ডিম দেখিতে পোস্তদানা ও সাগুদানার মত; আয়তনে বড় বা ছোট হইতে পারে। বেলে জাতীয় মৎস্যের ডিম দেখিতে মাকুর মত। অস্থিক মৎস্যগুলির ডিম কখনও পৃথক্‌ভাবে, আবার কখনও একত্র সংলগ্ন থাকে। কোন মৎস্যের ডিম জলের তলায় মাটিতে পড়িয়া থাকে, আবার কোন কোন জাতির ডিম একসঙ্গে বদ্ধ হইয়া জলে ভাসিতে দেখা যায়। ভাকুটজাতীয় মৎস্যের ডিম জলজ গাছে সংলগ্ন থাকে। কাঁকিলা মাছের ডিমগুলি মালার মত পরস্পর সংলগ্ন দৃষ্ট হয়। বহু সামুদ্র মৎস্যের ডিম একসঙ্গে সংলগ্ন থাকিয়া জলের উপর ভাসিতে থাকে। Lophius piscatorius নামক মৎস্যের ডিমগুলি একখানি দুই তিন ফুট প্রশস্ত এবং ত্রিশ ফুট দীর্ঘ ফলকের ন্যায় ভাসিতে থাকে। কড মৎস্য এবং কুকুরজিহ্বা জাতীয় বহু মৎস্যের ডিমও এইরূপে ভাসিতে দেখা যায়।

মৎস্য একসঙ্গে বহুসংখ্যক ডিম প্রসব করে। ডিমগুলি জলে শুক্রকীটাণুর সহিত মিলিত হয়। নিষিক্ত ডিম্ব হইতে শিশুমৎস্য বাহির হয়।

চক্রতুণ্ডী (cyclostomata) শ্রেণীতে তুই রকম ডিম দেখা যায়—লাম্প্রের ডিম ছোট এবং নির্যাসের মত পদার্থমধ্যে এক সঙ্গে ধৃত থাকে। হ্যাগ মৎস্যের ডিমগুলি বড় এবং সমবর্ত্তুল, প্রান্তভাগে ছোট ছোট কণ্টক দ্বারা পরস্পরের সহিত সংলগ্ন থাকে।

উভচর প্রাণীদিগের (amphibia) ডিম্বেও নানাপ্রকার প্রভেদ লক্ষিত হয়। সপুচ্ছক হস্তপদবিহীন উভচর প্রাণীর মধ্যে কতকগুলির ডিম ডিম্বনালীর মধ্যে অথবা ডিম্বনালী হইতে বাহির হইবামাত্রই ফুটিয়া যায়। কতকগুলি প্রাণী আবার ডিম প্রসব করে। এই সকল ডিম নির্যাসের মত পদার্থের স্থূল স্তরে বেষ্টিত থাকে। এই আবরণের বহির্ভাগ দৃঢ় হইয়া কঠিন আবরণে পরিণত হয়। অনেক সময়ে ডিমগুলি একসঙ্গে বদ্ধ থাকে।

ভেকজাতীয় পুচ্ছহীন উভচর প্রাণীর ডিমও ঐরূপ নির্যাসের মত পদার্থে বেষ্টিত থাকে। ভেক একসঙ্গে অনেকগুলি ডিম প্রসব করে। ডিমগুলি একসঙ্গে বদ্ধ থাকে। প্রসবের সময় ডিমের উপর শুক্র নিক্ষিপ্ত হয় এবং ডিমগুলি নিষিক্ত হইয়া জলের ধারে গাছে সংলগ্ন থাকে। পরে ঐ ডিম ফুটিয়া বেঙাচি বাহির হয়। এই বেঙাচি ক্রমশঃ বড় হইয়া বেঙে পরিণত হয়। কএকজাতীয় বেঙের ডিমে এত প্রচুর খাদ্যদ্রব্য থাকে যে ডিম ফুটিতে বেশী সময় লাগে এবং ডিম ফুটিলে তাহা হইতে একেবারে বেঙ নির্গত হয়। শাবক বেঙাচি অবস্থায় ডিমের ভিতরেই থাকিয়া যায়। যদিও ডিমগুলি সাধারণতঃ জলে স্থাপিত হয়, কোন কোন বেঙ ডিমগুলি পৃষ্ঠের উপর (pipa-গণস্থ বেঙ) অথবা পিছনের পায়ের উপর (যেমন alytes-গণের বেঙ) বহন করে। একজাতীয় বেঙের ডিম রাখিবার জন্য পৃষ্ঠের উপর একটী থলী থাকে।

সরীসৃপ শ্রেণীর ডিমগুলি বড় হয় এবং তাহাতে প্রচুর খাদ্যসামগ্রী সঞ্চিত থাকে। সচরাচর ডিমগুলি পাখীর ডিমের মত গোলাভাস (oval)। ডিমের চারিদিকে একটী দৃঢ় আবরণ। কচ্ছপ ও কুমীরের ডিমে এই আবরণ চূর্ণময় হইয়া থাকে। ডিম ফুটিয়া যে শিশু বাহির হয় তাহা দেখিতে মাতার মত। ইহাদের বিষমশিশু জন্মে না।

সরীসৃপের ডিম্ব ডিম্বনালীর মধ্যেই শুক্রকীট দ্বারা নিষিক্ত হয়; তৎপরে ইহা আবরণে বেষ্টিত হয়; এই আবরণ বাহিরে আসিয়া দৃঢ় হয়।

ভিন্ন ভিন্ন বর্গের সরীসৃপ ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায় ডিম প্রসব করে। কচ্ছপেরা তুই চারিটী, আর জলকচ্ছপেরা একসঙ্গে ২০০ পর্য্যন্ত ডিম প্রসব করিতে পারে। কুমীর একসঙ্গে দশ পনরটী ডিম পাড়ে। সর্পেরা কুড়ি পঁচিশ এবং সরটেরা সাধারণতঃ দশ বারটী ডিম পাড়ে। কিন্তু ময়াল সাপ একসঙ্গে শতাধিক এবং বহুরূপী ত্রিশটী ডিম প্রসব করে।

সরীসৃপগণের মধ্যে যাহারা জলে বাস করে, তাহারা জলের ধারে বালির ভিতর ডিম পুঁতিয়া রাখে। কুমীর ও কচ্ছপের ডিম বালির ভিতর পাওয়া যায়। কোন কোন সাপ ও সরট ডিম পুঁতিয়া রাখে। কতকগুলি সরট গর্ত্তের ভিতর ডিম রাখিয়া দেয়। ময়ালজাতীয় কতকগুলি সর্প কুণ্ডলীর মধ্যে ডিম রক্ষা করে। সরীসৃপের ভিতর কএকজাতীয় সরট এবং সর্প শিশুসন্তান প্রসব করে। তাহাদের ডিমগুলি ডিম্বনালীর ভিতর শুক্রকীট কর্ত্তৃক নিষিক্ত হইয়া তাহার ভিতরেই ফুটিয়া যায়।

পক্ষীর ডিমে খাদ্যদ্রব্য নিম্নদিকে সঞ্চিত থাকে (অধোখাদ্যিক)। পক্ষীর ডিমের আবরণ চূর্ণময় ও কঠিন। সম্ভবতঃ মাতৃকর্ত্তৃক তাপ দিবার সময়ে ডিমের উপর যে চাপ পড়ে, তাহা হইতে ভিতরের বর্দ্ধনশীল ভ্রূণকে রক্ষা করিবার জন্য ডিম্বের আবরণ কঠিন হয়। ইহার আবরণে **carbonate of lime**, phosphate of lime ও magnesia নামক পদার্থ বর্ত্তমান থাকে। ইহাতে তিন চারিটী স্তর থাকে; এবং ভিতর দিয়া বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালী থাকায় ডিম্বের আবরণটী সচ্ছিদ্র, ভ্রূণের শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য ইহার ভিতর দিয়া বায়ু গমনাগমন করে। বাহিরের স্তরটী প্রায়ই চীনামাটীর মত চিক্কণ থাকে (যেমন উটপাখীর ডিম) অথবা ইহা কর্কশও থাকিতে পারে (যেমন কোকিল, কঙ্কপক্ষী, কানঠুঁটী ইত্যাদির ডিম)। অনেক ডিমে এই বহিঃস্থ স্তর থাকে না। কোন কোন ডিমের আবরণ পাত্‌লা, আবার কোনও ডিমের আবরণ অত্যন্ত স্থূল। লুপ্ত ঈপিয়োনিস পাখীর ডিমের খোলা খুব পুরু ছিল, এই ডিম অনেক পাওয়া গিয়াছে।

সাধারণতঃ পাখীর ডিম দেখিতে হাঁসের ডিমের মত, একদিক্ একটু সরু; কিন্তু ডিমের আকার পেয়ারার মত, গোল, সমবর্ত্তুল অথবা তুইদিকে সমসূক্ষ্ম হইতে পারে।

পাখীর ডিমের আবরণ চিত্রবিচিত্র। অনেক পাখীর ডিম সাদা। সর্বি সাহেবের মতে* রঞ্জিত ডিমগুলির বর্ণ সাত রকমের—পিঙ্গল, নীল, তুই প্রকারের পীত, লাল, ইষ্টকবর্ণ এবং পিঙ্গলাভ। কখন কখন ডিমগুলি সমভাগে রঞ্জিত থাকে, আবার কখনও রঞ্জিত রেখা বা বিন্দু

* Proc. Zool. Soc., 1875.

দ্বারা নানাপ্রকারে শোভিত থাকে। যদিও সাধারণতঃ একজাতীয় পাখীর ডিমের রঙ্ এক প্রকার, তথাপি অনেক সময়ে একই জাতীয় পাখীর ডিমের বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইতে পারে।

ডিমের বর্ণ পারিপার্শ্বিক স্থানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত; অর্থাৎ যে স্থানে ডিম প্রসব করান হয় এবং তাপ দেওয়া হয়, তাহার রঙের সহিত এমন সামঞ্জস্য থাকে, যাহাতে ডিমগুলি অন্য কোন প্রাণীদ্বারা ভক্ষিত না হয়। যে সকল ডিম গর্ত্তে অথবা অল্প আলোক-যুক্ত ঝোপ বা বৃক্ষের উপর বাসায় রক্ষিত হয় তাহা সাদা; পাখীটী ডিমগুলি স্পষ্ট দেখিতে পায়। যে সকল ডিম ভূমির উপর প্রসব করান হয়, তাহা এমনভাবে রক্ষিত থাকে যে হঠাৎ কেহ ডিমগুলি দেখিতে না পায়। অধিকাংশ পাখীর ডিম সুচারুরূপে প্রস্তুত বাসায় স্থাপিত হয়। এই সকল ডিমের বর্ণ এত উজ্জ্বল এবং গাঢ় যে উহা সহজেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই সকল পাখীর বাসা এরূপ স্থানে নির্ম্মিত হয়, যে তথায় অন্য প্রাণীর পক্ষে গমন করা কঠিন।

ডিম দেখিয়া সকল সময়ে পাখী চেনা যায় না, কারণ একজাতীয় পাখীর ডিমের বর্ণ নানাবিধ হইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কতকগুলি পাখীর ডিম চেনা যায়।

পাখীরা একসঙ্গে একটী হইতে কুড়ি পঁচিশটী ডিম পাড়ে। ভিন্ন ভিন্ন ডিমে দশ বার দিন হইতে সাত আট সপ্তাহ পর্য্যন্ত তাপ আবশ্যক হয়। যে সকল ডিম ক্ষুদ্রাকৃতি তাহা অল্পদিনেই ফুটিয়া যায় এবং শাবকটীও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল থাকে। বৃহদাকারের ডিম হইতে বড় ও সবল শিশু নির্গত হয়। এই সকল ডিমে অধিকদিন ধরিয়া তাপ দিতে হয়।

পশুদিগের অণ্ড প্রসব।

পশুদিগের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার একিড্না এবং হংসচঞ্চু ডিম প্রসব করে। ইহাদের ডিমে বহু খাদ্যসামগ্রী সঞ্চিত থাকে। একিড্না ডিম প্রসব করিয়াই পেটের নীচের থলীতে রাখিয়া দেয়। হংসচঞ্চু লম্বা গর্ত্তের শেষে ডিমগুলি জমা করিয়া রাখে। একিড্না দুইটী এবং হংসচঞ্চু দুই হইতে চারিটী ডিম প্রসব করে।

কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটান।

'তা' দিবার উদ্দেশ্য হইতেছে ডিমকে গরম রাখা। কৃত্রিম উপায়ে ডিমকে বরাবর সমান উত্তাপে রাখা যাইতে পারে। এইরূপ যন্ত্রের নাম ইন্‌কিউবেটর (Incubator)। হিয়ারসনের ইনকিউবেটর এবং আমেরিকান হট এয়ার মেশিন (hot air machine) ব্যবহার করা যাইতে পারে। হাঁসের ডিমের জন্য ইন্‌কিউবেটরের উত্তাপ কম হওয়া উচিত। যদি হিয়ারসনের ইন্‌কিউবেটর ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে ইহার উত্তাপ মুরগীর ডিম অপেক্ষা আরও দুই ডিগ্রী কম হইলে ভাল হয়। হট্ এয়ার মেশিনের উত্তাপ ½ হইতে ১ ডিগ্রী কম হওয়া ভাল। [ইন্‌কিউবেটর দ্র°]

অণ্ডমধ্যস্থ পদার্থ।

পক্ষীর অণ্ডে চারিটী দ্রব্য আছে। যথা—১ খোলা, ২ ঝিল্লীবৎ চর্ম্ম, ৩ শ্বেতলালা (শ্বেতাংশ) ও ৪ কুসুম।

(১) উপরের খোলার রাসায়নিক উপাদান শতকরা এইরূপ—

কার্বনেট অব লাইম	৮৯.৬
ফস্ফেট্ অব লাইম্ ও ম্যাগ্নেসিয়া ...	৫.৭
গন্ধক ও জান্তব পদার্থ	৪.৭

(২) খোলার অন্তর্বেষ্ট ঝিল্লীবৎ চর্ম্মের রাসায়নিক উপাদান শতকরা এই—

অঙ্গার	৫.৬
উদজন	৬.৬
যবক্ষারজন	১৬.৮
গন্ধক ও অম্লজন	২৬.০

সচরাচর কাঁচা ডিম্ব ওজনে প্রায় এক ছটাক।

(৩) শ্বেত-লালায় শতকরা এই কএকটী পদার্থ আছে—

জল	৮৪.৮
ছানাজাতীয় উপাদান	১২.০
তৈলজাতীয় উপাদান	২.০
লবণ	১.২

(৪) ডিম্বের কুসুমে এই কএকটী দ্রব্য আছে—

জল	৫১.৫
ছানাজাতীয় উপাদান	১৫.০
তৈলজাতীয় উপাদান ...	৩০.০
পিগ্‌মেন্ট ইত্যাদি	২.১
লবণ	১.৪

ডিমের ভিতরের হরিদ্রাবর্ণ কুসুমই বাচ্ছা, উহা শ্বেতলালা খাইয়া প্রাণধারণ করে এবং হৃষ্টপুষ্ট হয়।

খাদ্যরূপে ডিমের ব্যবহার

ডিমের শ্বেতাংশে শতকরা ২০ ভাগ ছানাজাতীয় উপাদান (প্রোটিন্) আছে। মাংসে গড়ে ছানাজাতীয় উপাদান শতকরা ২০.২৪ ভাগ এবং মাছে শতকরা ১৭.২ ভাগ। সুতরাং দেহের মাংসপেশীসমূহের পরিপুষ্টির জন্য ডিমের শ্বেতাংশ একটী উৎকৃষ্ট খাদ্য।

ডিমের কুসুমে শতকরা ১৫ ভাগ ছানাজাতীয় এবং ৩০ ভাগ তৈলজাতীয় উপাদান থাকে।

এক আউন্স পরিমাণ ডিমে খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ ও উহাদের তাপোৎপাদক শক্তি (calory) নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	শ্বেতসারজাতীয় উপাদান	ছানাজাতীয় উপাদান	তৈলজাতীয় উপাদান	তাপোৎপাদক শক্তি (Calories)
হাঁসের ডিম	০	৩.৮	৪.১	৫২.১
মুরগীর ডিম	০	৩.৮	৩.৩	৪৪.৯
শ্বেতাংশ	০	৩.৬	০.৭	১৫.৩
কুসুম	০	৪.৫	৮.৯	১০১.২

হাঁসের ডিমে তৈলজাতীয় উপাদান বেশী থাকায়, উহা মুরগীর ডিম অপেক্ষা একটু বেশী গুরুপাক। হাঁসের ডিমের গন্ধও একটু বেশী আঁসটে। হাঁসের ডিম খাইলে বাত হয় ও মুরগীর ডিম খাইলে হয় না, এই ধারণার মূলে কোন সত্য নাই। বাতরোগে সকলপ্রকার ডিমই নিষিদ্ধ। ডিমের কুসুমে খাদ্য-প্রাণের (vitamin) পরিমাণ খুব বেশী।

ডিম্বের খাদ্যপ্রাণ বা ভাইটামিন্।

ভাইটামিনের নাম	এ	বি	সি	ডি	ই
পরিমাণ	++	+++	—	+++	++

ইহাতে 'বি' ভাইটামিন্ (বেরিবেরি-নাশক) এবং 'ডি' ভাইটামিন্ (রিকেট-নাশক) অধিক পরিমাণে আছে। তাহার পরই ইহাতে 'এ' ভাইটামিন্ (ব্যাধিপ্রতিষেধক এবং চক্ষুরোগ-নাশক), 'ই' ভাইটামিন্ (বন্ধ্যাত্বনাশক) এবং 'সি' ভাইটামিন্ (স্কার্ভিনাশক) আছে। ডিমের কুসুমের ন্যায় ভাইটামিন্-প্রধান খাদ্য খুব কমই আছে। সুতরাং ডিম একটী অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য। ইহাতে—

(ক) শরীরের পেশীসমূহ পরিপুষ্ট ও দেহের ক্ষয় নিবারিত হয় ;

(খ) ব্যাধিপ্রতিষেধক-শক্তি জন্মায় ;

(গ) দৃষ্টিশক্তি ঠিক রাখে ;

(ঘ) প্রজননশক্তি বৃদ্ধি করে।

ডিম খুব বেশী সিদ্ধ না খাইয়া অর্দ্ধসিদ্ধ ও নরম অবস্থায় কিংবা কাঁচা খাইলে সহজে হজম হয়। ডিম কাঁচা খাইলে বেশী উপকার পাওয়া যায়।

কাঁচা ডিমের ব্যবহার-প্রণালী।

(১) ডিমের কুসুম—

(ক) একটী ডিমের কুসুম, এক পোয়া দুধ এবং অল্প চিনি একত্র মিশাইয়া প্রাতে সেবন করিলে শরীরের পুষ্টি হয়।

(খ) ডিম, দুধ ও ব্রাণ্ডি (Egg flip)—

একটী ডিমের কুসুম ও এক আউন্স দুধ মিশাইয়া ফেটাও ; উহার সহিত অর্দ্ধ আউন্স ব্রাণ্ডি (অথবা ২ আউন্স পোর্ট মদ্য), অল্প চিনি এবং সামান্য জায়ফলচূর্ণ (সুগন্ধ করিবার জন্য) মিশাইয়া লইবে। ইহা ইচ্ছামত শীতল অথবা ঈষদুষ্ণ খাওয়া যায় ; কিন্তু কদাচ ফুটাইবে না। দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে ইহা একাধারে ঔষধ ও পথ্য।

(২) ডিমের শ্বেতাংশের পানা (Albumin water)—

একটী ডিমের শ্বেতাংশ বেশ করিয়া ফেটাইয়া লও ; উহার সহিত অর্দ্ধ পাইণ্ট (১০ আউন্স) শীতল জল মিশাও। অল্প চিনি দিয়া ইচ্ছামত মিষ্ট কর এবং ছাঁকিয়া লও।

আলবুমিন্ ওয়াটার একটী উত্তম সহজপাচ্য পথ্য।

(৩) ডিমের প্রস্তুত পথ্য—

কাষ্টার্ড (Custard)।

পাঁচ আউন্স গরম দুধে এক ডেলা চিনি, একটু দারুচিনি এবং লেবুর খোসা দাও। একটী ডিম উত্তমরূপে ফেটাইয়া ইহার সঙ্গে মিশাও এবং একটী পাত্রে রাখ। আর একটী বড় পাত্রে জল ফুটাও এবং সেই ফুটন্ত জলের মধ্যে ডিম প্রভৃতি মিশ্রিত দুধের পাত্রটী রাখ। ফুটন্ত জলের উত্তাপে ডিম্বমিশ্রিত দুধ সিদ্ধ হইবে। একটী চামচ দিয়া একদিকে নাড়িতে থাক ; যতক্ষণ না ঘন হয় ততক্ষণ নাড়িবে। প্রায় ১৫ মিনিট লাগে। ইহা একটী পুষ্টিকর পথ্য।

ডিম দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য।

(১) মাম্‌লেট (Omelette) বা ডিমভাজা—

একটী এলুমিনিয়ম্ পাত্রে বা কড়াইয়ে অল্প ঘৃত বা তৈল দিয়া পাত্রটী মৃদুতাপে চড়াইবে। একটী ডিম ভাঙ্গিয়া সমস্ত কুসুম ও শ্বেতাংশ (লালা) একটী পাত্রে ঢালিয়া চামচ দিয়া উত্তমরূপে ফেটাইবে। তাহাতে পেঁয়াজ কুচি ও অল্প লবণ দিবে। কড়াইয়ের ঘৃত ফেনহীন হইলে ঐ ফেটানো ডিম উহাতে ঢালিয়া দিবে। অল্প ভাজা হইলে উহার উপর গোল-মরিচের গুঁড়া ছড়াইয়া দিবে। এক পিঠ ভাজা হইলে উল্টাইয়া দিয়া নামাইয়া লইবে। বেশী কড়া করিয়া ভাজা ভাল নয়।

অনেকে মাম্‌লেটে লঙ্কা দেন, কিন্তু এরূপ মাম্‌লেট খাওয়া উচিত নয়।

(২) ডিমের কালিয়া বা কারি।

হাঁসের ডিম দশটী, আলু (দ্বিখণ্ড) এক পোয়া, পেঁয়াজ কুচি আধ ছটাক, ঘৃত আধ পোয়া, তৈল আধ পোয়া, লবণ দেড় কাঁচ্চা, আদা বাটা আধ তোলা, ধনে বাটা আধ তোলা, হলুদ বাটা এক তোলা, লঙ্কা বাটা আধ তোলা, গরম মসলার গুঁড়া আধ ভরি, আস্ত লবঙ্গ সিকি ভরি, কিসমিস এক ছটাক, জল আবশ্যক পরিমাণে।

ডিমগুলিকে সিদ্ধ করিয়া খোলা ছাড়াইবে। তারপর একটী পাত্রে তৈল পাকাইয়া ঐ তৈলে ডিমগুলি ভাজিয়া লইবে; আলুগুলিও ঐরূপে ভাজিবে। অন্য একটী পাত্রে ঘৃত পাকাইয়া প্রথমে পেঁয়াজকুচিগুলি ভাজিয়া তুলিবে; তারপর যে ঘৃত থাকিবে, তাহাতে লবঙ্গ ফোড়ন দিয়া সমস্ত মসলা ও পেঁয়াজ দিবে এবং ভাজা ভাজা হইলে আলুভাজা, ডিমভাজা ও সমস্ত পেঁয়াজভাজা ঢালিয়া আস্তে আস্তে নাড়িতে থাকিবে। তারপর অল্প জল ঢালিয়া পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। যখন জল মরিয়া শুধু গা মাখা মতন অল্প ঝোল বাকী থাকিবে, তখন নামাইয়া গরম মসলার গুঁড়া দিবে।

(৩) ডিমের বড়া—রুই বা ইলিস মাছের ডিম আধ সের, বেশম আধ পোয়া, লবণ এক কাচ্চা, হলুদ বাটা এক ভরি, আদা বাটা আধ ভরি, ধনে বাটা আধ ভরি, গরম মসলা বাটা এক ভরি, তৈল আধ সের। প্রথমে ডিমগুলিকে উত্তমরূপে পরিষ্কার শীতল জলে ধুইয়া ডুমা ডুমা করিয়া কাটিবে। তারপর উহাতে লবণ, হলুদ ও লঙ্কাবাটা মাখাইবে।

সমস্ত বেশম অন্যান্য মশলা ও বাকী লবণ একত্র মাখিয়া অল্প জল দিয়া বেশ করিয়া ফেনাইবে। তারপর পাত্রে তৈল ঢালিয়া জ্বালে চাপাইবে। তৈল পাকিলে এক একটী ডিম বেশমে ডুবাইয়া তৈলে ফেলিবে এবং বাদামী মতন ভাজিবে।

(৪) ডিমের ডেভিল—

প্রথমে ডিমগুলি সিদ্ধ করিয়া খোলা ছাড়াইয়া লও। তৎপরে ডিমের হল্‌দে অংশ বাহির করিয়া লইবে। মাংস খুব থুড়িয়া সিদ্ধ কর; উহার সঙ্গে লঙ্কার গুঁড়া, হলুদ ও জিরে মরিচ মিশাইয়া ভাজিয়া লইবে। ইহার সঙ্গে ডিমের হল্‌দে অংশ ও চিনি মিশাইলে কিমা তৈয়ারী হইবে। এই কিমা সিদ্ধ ডিমের সাদা খোসার মধ্যে ভরিয়া ফেলিবে। তারপর ফেটানো ডিমের মধ্যে ডুবাইয়া নেড়া বিস্কুটের গুঁড়া মাখাইয়া ভাজিবে।

বর্ত্তমানে হাঁসের ও মুর্গীর ডিম বহুল পরিমাণে খাইতে দেখা যায়। আয়ুর্ব্বেদে অনেক প্রকার মাংসের গুণাগুণ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু চরক ও সুশ্রুত প্রভৃতি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থে কোন প্রকার ডিমেরই স্বতন্ত্রভাবে দোষগুণ বর্ণিত হয় নাই। চরক বাজীকরণাধিকারে কুমীরের ডিম ও মুর্গীর ডিম ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুশ্রুত বাজীকরণের জন্য ছাগলের অণ্ডকোষ খাইতে বলিয়াছেন এবং কাঁকড়ার, কাছিমের ও কুমীরের ডিমও খাইতে বলিয়াছেন। তদ্ভিন্ন কুমীর, ইন্দুর, বেঙ্ ও চড়াইপাখীর ডিম দিয়া ঘৃত প্রস্তুত করিয়া বাহ্য (পদতলে) প্রলেপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত পরবর্ত্তীকালে রাজনিঘণ্টু-কার মৎস্য, পক্ষী ও কূর্ম্মের ডিমের গুণাগুণ বর্ণন করিয়াছেন। মৎস্য, পক্ষী ও কূর্ম্মাদির অণ্ডগুণ—নাতিস্নিগ্ধ, স্বাদু, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, বাত-শ্লেষ্মনাশক ও গুরুপাক।

৩ কারণজলে আরোপিত অণ্ডাকার ব্রহ্মবীজ। শাস্ত্রকারেরা ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির প্রথমাবস্থায় একটী অণ্ডোৎপত্তির কল্পনা করেন। মনুসংহিতায় (১.৮-৯) লিখিত আছে,—

"সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভং।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥"

মনুর মতে পরমাত্মা বিবিধ প্রজাসৃষ্টির অভিপ্রায়ে প্রথমে জল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে নিজ শক্তিরূপ বীজ আরোপ করেন। ঐ বীজ অণ্ডাকারে পরিণত হয়। সেই অণ্ডে লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেন। অণ্ডমধ্যে তাঁহাকে ব্রহ্মমানের সংবৎসর বাস করিতে হয়। পরে তাঁহারই ইচ্ছায় অণ্ড দ্বিখণ্ডিত হয়। তিনি অণ্ডের উপরের খণ্ড দ্বারা স্বর্গলোক এবং নিম্ন খণ্ড দ্বারা ভূলোক নির্ম্মাণ করেন।

সাঁওতালেরা বলে, পূর্ব্বে এই জগৎ জলরাশিতে ডুবিয়া ছিল। সেই সময়ে একটী হংস ও হংসী জলের উপর পদ্মতলে বাস করিত। হংসী গর্ভবতী হইলে সাঁওতালদের দেবতা মারংবুরো সেই পক্ষীদিগকে বনে লইয়া গেলেন। হংসী তথায় অণ্ড প্রসব করে। সেই অণ্ড হইতে দুই জন মনুষ্যের উৎপত্তি হয়। তাহার মধ্যে একজন পুরুষ ও অন্য জন স্ত্রী। [সাঁওতাল দ্র°]

৪ বীর্য্য। (বিশ্বপ্র°) ৫ শিব। [বৈদ্যক] ৬ গন্ধমার্জ্জারাণ্ড; খাটাশী। ৭ বিষগর্ভতৈল। ৮ মৃগনাভি।

অণ্ড২—(পুং) [স্থাপত্যশা°] তোরণশীর্ষ। (বৃহৎসংহিতা ৫৬.২২,২৪,২৮)

অণ্ডক, (পুং) [অণ্ড-কন্, স্বার্থে] অণ্ডকোষ। (হেম°)

অণ্ডক২—(পুং) [স্থাপত্যশা°] তোরণশীর্ষ। "শোভনৈঃ পত্রবল্লীভিরণ্ডকৈশ্চ বিভূষিতঃ।" (মৎস্যপু°, ২৭৯.২০,৩৭)

অণ্ডকটাহ—(ক্লী) [অণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডং কটাহমিব] কটাহাকার ব্রহ্মাণ্ড। "তদ্‌ব্রহ্মাণ্ডকটাহসম্পুটতটে।" (সিদ্ধান্তশিরো°, গোলা°)

পৌরাণিক মতে ইহা ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—কপিত্থের বীজ যেমন চারিদিকে সম্পূর্ণ আবৃত, সেইরূপ চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক জগৎ তুই পার্শ্ব, ঊর্দ্ধ ও অধঃ এই চারিদিকেই অণ্ডকটাহ দ্বারা আবৃত। সেই অণ্ড দশগুণ অধিক জল দ্বারা আবৃত। এই সমস্ত জলাবরণ বহির্ভাগে অগ্নি দ্বারা, অগ্নি বায়ু দ্বারা এবং বায়ু আকাশ দ্বারা আবৃত। আকাশ তামস অহঙ্কার দ্বারা এবং তামস অহঙ্কারও মহত্তত্ত্ব দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই অসীম সপ্ত আবরণই উত্তরোত্তর দশগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত। (বিষ্ণুপু°, ২.৭.২২-২৭) সাম্বপুরাণে উক্ত আবরণ 'অণ্ডাবরণ' এবং অণ্ডকটাহ 'অণ্ডকপাল' নামে বর্ণিত হইয়াছে। সাম্বপুরাণমতে ভূর্লোক, ভুবলোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক এই সপ্ত লোকের আবরণ হইতেছে অণ্ডকপাল।

"ভূয়স্তান্ সংপ্রবক্ষ্যামি অণ্ডাবরণকারণাৎ॥
ভূর্লোকশ্চ ভুবশ্চৈব তৃতীয়ঃ স্বঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহর্জ্জনস্তপঃ সত্যং সপ্তলোকাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
ততস্ত্বণ্ডকপালঞ্চ তস্মাচ্চ পরতস্তমঃ।
ততোঽগ্নির্বায়ুরাকাশং ততো ভূতাদিরুচ্যতে॥
ততো মহান্ প্রধানং চ প্রকৃতিঃ পুরুষস্ততঃ।
পুরুষাদীশ্বরো জ্ঞেয় ঈশ্বরেণাবৃতং জগৎ॥"
(সাম্বপু°, ১৮.১০-১৩)

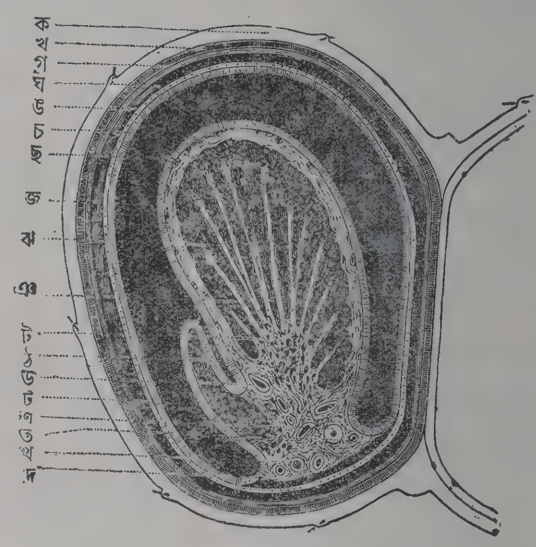
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ (৫০.৭৭-৭৯)-মতে ভূ, ভুব, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই সপ্তলোক ছত্রাকারে উপর্য্যুপরি সংস্থিত। তথায় জন্তুগণ অবস্থিতি করে। উক্ত সপ্তলোক লইয়াই অণ্ডকটাহ পরিসংখ্যাত হয়। এই অণ্ডকটাহমধ্যেই সপ্তদ্বীপা মেদিনী এবং উল্লিখিত সপ্তলোক।

অণ্ডকপাল—(ক্লী) [অণ্ডকটাহ দ্র°]

অণ্ডকোট(ঠ)রপুষ্প,—পুষ্পী (স্ত্রী) [অণ্ডমিব কোটরে পুষ্পং যস্যাঃ, জাতিত্বাৎ ঙীপ্] [বৈদ্যক] অজান্ত্রীবৃক্ষ, নীলরাম্না, চলিত নীলবুহ্না।

অণ্ডকোষ(শ)—(পুং) [অণ্ডস্য মুষ্কস্য কোষ ইব] চর্ম্মাবৃত দেহাবয়ববিশেষ। পর্য্যায়—মুষ্ক, বৃষণ, অণ্ড, পেল, অণ্ডক, বীজপেষিকা, সীমন্, ফলকোষক, ফল, °কুড়্মল।

অণ্ডকোষ (scrotum) একটী চর্ম্মনির্ম্মিত থলি ; ইহার মধ্যে অণ্ডগ্রন্থি (testes) এবং অণ্ডগ্রন্থি-রজ্জুর (spermatic cords) কিয়দংশ থাকে। অণ্ডকোষের উপরিভাগে অবস্থিত একটী উচ্চ রেখা (raphe) ইহাকে তুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। বামদিকের অংশ দক্ষিণভাগ অপেক্ষা একটু বেশী ঝুলিয়া থাকে। অণ্ডকোষের বহির্ভাগের আকার নানা কারণে বিভিন্ন হইয়া থাকে ; যথা, গ্রীষ্মকালে এবং বৃদ্ধ ও তুর্ব্বল লোকের অণ্ডকোষ লম্বা ও থল্‌থলে (flaccid) হয় ; কিন্তু শীতকালে এবং সবল যুবকের অণ্ডকোষ ক্ষুদ্রাকার ও কুঞ্চিত হয়।



অণ্ডকোষের বামদিকের কর্ত্তিত অর্দ্ধাংশ—

ক—বহিশ্চর্ম্ম (Skin)। খ—অণ্ডকোষাবরণ (Dartos tunic)। গ—তন্তুনির্ম্মিত ঝিল্লী (External Spermatic Fascia)। ঘ—ক্রিমেস্টারিক ফেসিয়া (Cremasteric fascia)। ঙ—মধ্যের স্পারমেটিক্ ফেসিয়া (Internal spermatic fascia)। চ—পেরিটাল্ টিউনিকা ভেজিনালিস্ (Parietal tunica vaginalis)। ছ—ভিসেরাল টিউনিকা ভেজিনালিস্ (Visceral tunica vaginalis)। জ—টিউনিকা এলবুজিনিয়া (Tunica albuginea)। ঝ—অণ্ডগ্রন্থির একটী লোবিউল (lobule)। ঞ—একটী সেপ্টাম্ (Septum)। ট—মিডিয়াষ্টাইনাম্ টেষ্টিস্ (Mediastinum testis)। ঠ—সাইনাস্ অব্ এপিডিডাইমিস্ (Sinus of Epididymis)। ড—স্পারমেটিক্ শিরা (Spermatic vein)। ঢ—এপিডিডাইমিস্ (Epididymis)। ণ—ডাক্টাস্ ডেফেরেন্স্ বা অণ্ডকোষস্থ বীর্য্যবাহী নলাংশ (Ductus deferens)। ত—ঐ নলাংশের ধমনী। থ—অণ্ডগ্রন্থি-ধমনী (Testicular artery)। দ—পৈশিক অন্তরাবরণ (Internal muscular tunic)।

অণ্ডকোষের তুইটী স্তর আছে—বহিশ্চর্ম্ম (integument) এবং অণ্ডকোষাবরণ (dartos tunic)।

(ক) বহিশ্চর্ম্ম (integument)—ইহা খুব পাতলা এবং ইহার মধ্যে অনেক খাঁজ আছে। ইহাতে ঘর্ম্মনিঃসারক গ্রন্থি (sebaceous follicles) আছে। এই গ্রন্থিগুলি হইতে নিঃসৃত রসের একপ্রকার বিশেষ গন্ধ আছে। চর্ম্মের উপর কেশ জন্মে।

(খ) অণ্ডকোষাবরণ (dartos tunic)—এই পাতলা

স্তরটী ডোরাবিহীন মাংসপেশী দ্বারা প্রস্তত। ইহা হইতে একটী অংশ অণ্ডকোষের ভিতর প্রবেশ করিয়া উহার মধ্যস্থ থলিকে দুইটী অণ্ডগ্রন্থির জন্য দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। অণ্ডকোষাবরণ বাহিরের চর্ম্মের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত; কিন্তু ভিতরদিকে ইহা সূক্ষ্মঝিল্লীর (areolar tissue) দ্বারা সংযুক্ত থাকায় ইহাকে সহজে সঞ্চালিত করা যায়।

রোগ—অণ্ডকোষের মধ্যে রস জন্মিলে তাহাকে কুরণ্ড বা কোশবৃদ্ধি (hydrocele) বলে। সাধারণতঃ অণ্ডগ্রন্থি-আবরণীর (tunica vaginalis) মধ্যে রস জন্মে; ইহার নাম vaginal hydrocele। অণ্ডগ্রন্থি-আবরণীর মধ্যস্থ থলি হইতে উপরের পেরিটোনিয়ামের থলি পর্য্যন্ত যে পথ (inguinal canal) আছে তাহা জন্মের পূর্ব্বে বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এই পথ বন্ধ না হওয়ায় অণ্ডগ্রন্থি-আবরণীমধ্যস্থ থলি ও উদরমধ্যস্থ পেরিটোনিয়ামের থলির মধ্যে সংযোগ থাকিয়া যায়; এরূপ ক্ষেত্রে রস জন্মিলে তাহাকে জন্মগত কুরণ্ড (congenital hydrocele) বলে। কোন কোন ক্ষেত্রে inguinal canal এর কিয়দংশ মাত্র বন্ধ থাকে এবং রস জমিলে অণ্ডকোষ হইতে এই পথ পর্য্যন্ত রসে পূর্ণ হওয়ায় একটী বিশেষ আকার ধারণ করে; ইহার নাম শৈশব কুরণ্ড (infantile hydrocele)।

বৈদ্যকশাস্ত্রে অণ্ডকোষের লক্ষণ ও অর্থ এই রূপ পাওয়া যায়। যৌনসম্পর্ককালে হর্ষাপ্লুত পুরুষের সর্ব্বাঙ্গব্যাপী শুক্র যে স্থানে আসিয়া একত্র হয় সেই স্থানকে শুক্রাধার বা অণ্ডকোষ বলা হয়। অণ্ডকোষ হইতে শুক্রস্রাবী ধমনীপথে শুক্র নির্গত হইয়া থাকে। উক্ত অণ্ডকোষ চর্ম্মাভ্যন্তরে স্থিত রেতঃ ও শুক্র সংমিশ্রিত স্থূল রক্তাভ গোলাকৃতি দুইটী পিণ্ড। দক্ষিণ পার্শ্বের অণ্ডকোষ স্থূলতর ও বাম পার্শ্বের অণ্ডকোষ নিম্নলম্বী হইলে সাধারণতঃ বাম অণ্ডকোষের শুক্রই রেতঃসেকের উপযুক্ত হয়। উপর্য্যুপরি দুইটী স্তরে অণ্ডদ্বয় অবস্থান করে। উহাদের অভ্যন্তর রক্তবর্ণ ও সঙ্কোচন-প্রসারণ-গুণান্বিত। বাহিরের অংশ চর্ম্মদ্বারা আবৃত ও রোমসংযুক্ত। (অত্রি)

[মুষ্ক শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্র°]

বৃহৎসংহিতায় অণ্ডকোষের শুভাশুভ লক্ষণের নির্দ্দেশ এইরূপ দেখা যায়—অণ্ডকোষ যাহার অতিমাত্র নিগূঢ়, সেই ব্যক্তি রাজা হয়। কোষ যাহার দীর্ঘ বা ভগ্ন, তাহাকে বিত্তহীন হইতে হয়। যাহার একটী মাত্র মুষ্ক থাকে, সেই ব্যক্তির জলে মৃত্যু নিশ্চিত। মুষ্ক যাহার বিষম বা অসমান, সেই ব্যক্তি স্ত্রীচঞ্চল হইয়া থাকে। সমানবৃষণ মানব নরপতির আসন অলঙ্কৃত করে। উর্দ্ধবৃষণ নর অল্পায়ু হয় এবং মুষ্ক যাহার লম্বমান, সেই ব্যক্তি দীর্ঘজীবন লাভ করে।

"কোষনিগূঢ়ৈর্ভূপা দীর্ঘৈর্ভগ্নৈশ্চ বিত্তপরিহীনাঃ।
জলমৃত্যুরেকবৃষণো বিষমৈঃ স্ত্রীচঞ্চলঃ সমৈঃ ক্ষিতিপঃ।
হ্রস্বায়ুশ্চোর্দ্ধজৈঃ প্রলম্ববৃষণস্য শতমায়ুঃ॥"

(বৃহৎসংহিতা ৬৮.৮-৯)

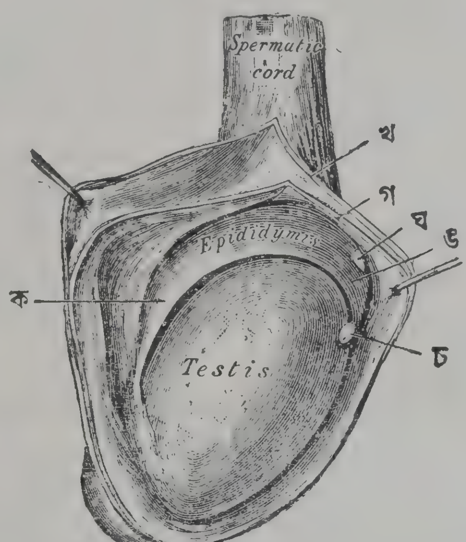
অণ্ডকোষক—(পুং) [অণ্ডকোষ-স্বার্থে কন্] অণ্ডকোষ।

অণ্ডগ—(পুং) [বৈদ্যক] গোধূম।

অণ্ডগজ—(পুং) [বৈদ্যক] চক্রমর্দ্দ ক্ষুপ। (রাজনি°)

অণ্ডগ্রন্থি (Testes)—অণ্ডগ্রন্থি পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের একটী প্রধান অংশ; ইহার মধ্যে বীর্য্য ও অন্তর্মুখী রস (internal secretion) নিঃসৃত হয়।

ভ্রূণাবস্থায় মাতার জরায়ুমধ্যে অবস্থানকালে অণ্ডগ্রন্থি দুইটী উদরগহ্বরমধ্যে পেরিটোনিয়ামের পিছনে থাকে। জন্মের পূর্ব্বে ইহারা inguinal canal পথে নামিয়া আসে এবং শেষে অণ্ডকোষমধ্যে উপনীত হয়।



দক্ষিণ অণ্ডগ্রন্থির চিত্র—

ক—এপিডিডাইমিসের প্রান্ত (Tail of Epididymis)।
খ—ক্রিমেস্টারিক ফেসিয়া (Cremasteric Fascia)।
গ—টিউনিকা ভেজিনালিস্ (Tunica vaginalis)।
ঘ—এপিডিডাইমিসের বর্দ্ধিতাংশ (Appendix of Epididymis)।
ঙ—এপিডিডাইমিসের মস্তক (Head of Epididymis)।
চ—অণ্ডগ্রন্থির বর্দ্ধিতাংশ (Hydatid of Morgagni)।

চিত্রস্থ উপরের মোটা শিরাটী অণ্ডগ্রন্থিরজ্জু (Spermatic cord); তাহার নিম্নে এপিডিডাইমিস্ (Epididymis); তন্নিম্নে ডিম্বাকৃতি অংশটী অণ্ডগ্রন্থি (Testis)।

অণ্ডগ্রন্থি অণ্ডকোষের মধ্যে রজ্জুবৎ পদার্থ (spermatic cords) দ্বারা ঝুলানো থাকে। বামদিকের অণ্ডগ্রন্থি অপরটী অপেক্ষা অল্প নিম্নে ঝুলিয়া থাকে। অণ্ডগ্রন্থি সাধারণতঃ

৪ হইতে ৫ সেন্টিমিটার লম্বা, ২.৫ সেন্টিমিটার চওড়া এবং ওজনে ১০.৫ হইতে ১৪ গ্রাম।

প্রত্যেক অণ্ডগ্রন্থি বাদামী আকারের এবং দুই পাশে চেপ্‌টা। অণ্ডকোষের মধ্যে ইহা অল্প বক্রভাবে থাকে; উপরিভাগ সম্মুখ ও ঈষৎ বাহিরের দিকে এবং নিম্নভাগ পশ্চাৎ ও ঈষৎ ভিতরদিকে হেলানো। ন্যুব্জ (convex) ধার সম্মুখে এবং যে ধার সোজা তাহা পশ্চাতে থাকে। পশ্চাতের ধারে অণ্ডগ্রন্থিরজ্জু (spermatic cord) সংলগ্ন আছে। অণ্ডগ্রন্থির পিছনের ধারের (border) বাহিরের কিনারায় একটী লম্বা, সরু ও চেপ্‌টা জিনিষ আছে। ইহার নাম epididymis (এপিডিডাইমিস্) অণ্ডগ্রন্থির উপরিভাগে এবং epididymis-এর মস্তকাংশের ঠিক নীচে একটী অত্যন্ত ক্ষুদ্র বাদামী জিনিষ সংলগ্ন আছে (hydatid of Morgagni); ইহা Mullerian duct এর উর্দ্ধপ্রান্তের অবশেষ (remnant)।

অণ্ডগ্রন্থির আবরণী—অণ্ডগ্রন্থি তিনটী আবরণীর মধ্যে রহিয়াছে; টিউনিকা ভেজিনালিস্ (tunica vaginalis,) টিউনিকা এল্‌বুজিনিয়া (tunica albuginea) এবং টিউনিকা ভাস্‌কুলোসা (tunica vasculosa)।

(ক) টিউনিকা ভেজিনালিস্ (Tunica vaginalis)—এই আবরণী অণ্ডগ্রন্থিকে আবৃত করিয়া, তাহার পর উল্টাইয়া অণ্ডকোষের ভিতর দিকেও আবৃত করিয়াছে। সুতরাং ইহার দুইটী অংশ—একটী অণ্ডকোষের অন্তরাবরণী আর একটী অণ্ডগ্রন্থির বহিরাবরণী।

(খ) টিউনিয়া এল্‌বুজিনিয়া (Tunica albuginea)—ইহা অণ্ডকোষের একটী তন্তুময় (fibrous) আবরণী।

টিউনিকা এলবুজিনিয়া পিছন দিকে গ্রন্থির অভ্যন্তরে ঘুরিয়া গিয়া একটী অসম্পূর্ণ প্রাচীর তৈয়ারী করিয়াছে; ইহার নাম মিডিয়াষ্টাইনাম্ টেষ্টিস্ (mediastinum testis বা corpus Highmori)। এই প্রাচীরের সম্মুখ ও পার্শ্ব হইতে অনেকগুলি শাখা (trabeculæ) বাহির হইয়া অণ্ডগ্রন্থির গাত্রের দিকে গিয়াছে এবং টিউনিকা এল্‌বুজিনিয়ার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ইহার ফলে অণ্ডগ্রন্থির অভ্যন্তরভাগ কতকগুলি অংশে বিভক্ত হইয়াছে। অণ্ডগ্রন্থির বীর্য্যনলী এবং শিরা ধমনী প্রভৃতি মিডিয়াষ্টাইনামের মধ্য দিয়া বাহির হইয়াছে বা প্রবেশ করিয়াছে।

(গ) টিউনিকা ভাস্‌কুলোসা (Tunica vasculosa) রক্তধর আবরণী—টিউনিকা এলবুজিনিয়ার নিম্নে যে আবরণী আছে তাহার মধ্যে রক্তের নলগুলি আছে।

গঠন—অণ্ডগ্রন্থি অসংখ্য লোবিউল (lobules) দ্বারা প্রস্তুত। ইহাদের সংখ্যা ২৫০ হইতে ৪০০। লোবিউলগুলির আকার শঙ্কুর (cone) ন্যায়। ইহাদের স্থূলভাগ (base) অণ্ডগ্রন্থির পরিধির দিকে এবং শীর্ষ (apex) মিডিয়াষ্টাইনামের দিকে থাকে। মিডিয়াষ্টাইনাম হইতে টিউনিকা এল্‌বুজিনিয়া পর্য্যন্ত যে সকল তন্তুনির্ম্মিত (fibrous) প্রাচীর আছে তাহাদের মধ্যস্থ এক একটী কক্ষে একটী লোবিউল থাকে। প্রত্যেক লোবিউল এক হইতে তিন বা তদধিক কুণ্ডলীকৃত নলের (tubuli seminiferi) সমষ্টি। বাল্যে এই নলগুলি ফ্যাকাসে মতন থাকে; কিন্তু বার্দ্ধক্যে গভীর হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে। লাউটের (Lautt) মতে এইরূপ নলের মোট সংখ্যা ৮৪০টী। এই নলগুলির নিম্নস্থ ঝিল্লীর মধ্যে পুরুষের শুক্রকীট জন্মে এবং এই সকল নলের মধ্যে বিভিন্ন অবস্থার শুক্রকীট দেখিতে পাওয়া যায়। শীর্ষের (apex) মধ্যে নলগুলি প্রায় সোজা হইয়া গিয়াছে এবং পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া ২০ হইতে ৩০টী বৃহত্তর নল (ducts) সৃষ্টি করিয়াছে; ইহাদের নাম tubuli recti। এই বৃহত্তর নলগুলি মিডিয়াষ্টাইনামের মধ্যে গিয়াছে এবং এইস্থানে বিভিন্ন নলের সম্মিলন হইয়াছে (rete testis)। শেষে মিডিয়াষ্টাইনামের উর্দ্ধভাগে ১২ হইতে ২০টী মাত্র নলে পরিণত হয়; এইগুলি ductuli efferentes বা বীর্য্যবাহী নল। ইহারা টিউনিকা এল্‌বুজিনিয়া ভেদ করিয়া গিয়াছে এবং অণ্ডগ্রন্থি হইতে এপিডিডাইমিসে বীর্য্যবহনের ইহাই পথ।

রোগ—(ক) জন্মগত রোগ—জননীর জরায়ুমধ্যে অবস্থানকালে জন্মের পূর্ব্বে অণ্ডগ্রন্থি অণ্ডকোষে নামিয়া আসে। যদি না নামে, তাহা হইলে নানারূপ রোগের সৃষ্টি হইতে পারে। উদরগহ্বরমধ্যে যদি ইহা থাকিয়া যায়, তাহা হইলে কোন লক্ষণ দেখা দিবে না; কেবলমাত্র অণ্ডকোষে অণ্ডগ্রন্থি থাকিবে না। তলপেটের নীচে দুইদিকে inguinal canal থাকে; অণ্ডগ্রন্থি যদি নামিবার সময় এই canal পর্য্যন্ত আসিয়া থাকিয়া যায়, তাহা হইলে প্রদাহ এবং যন্ত্রণা হইতে পারে। যাহাদের অণ্ডগ্রন্থি উদরমধ্যে বা canal-এর মধ্যে থাকিয়া যায় তাহারা সন্তানোৎপাদনে অক্ষম হয়; কিন্তু তাহাতে স্ত্রীসহবাসে কোন বাধা না হইতে পারে। অণ্ডগ্রন্থির এই প্রকার অস্বাভাবিক অবস্থানের সহিত অন্ত্রবৃদ্ধি (hernia) থাকিতে দেখা যায়।

(খ) অণ্ডগ্রন্থি-রজ্জু (spermatic cord) পাকাইয়া যাওয়ার ফলে strangulation of the testes হইতে পারে। ইহার লক্ষণ অনেকটা strangulated hernia-র ন্যায়।

(গ) অণ্ডগ্রন্থির প্রদাহ (orchitis)—প্রমেহ বা গণো-

রিয়া রোগের ফলে সাধারণতঃ অর্কাইটিস্ হয়। উপদংশ রোগেও অনেক সময় বহুদিনস্থায়ী এক প্রকার প্রদাহ হয় এবং অণ্ডকোষ শক্ত মতন হয়। Tabes dorsalis নামক স্নায়ুরোগে অণ্ডগ্রন্থি অসাড় হইয়া যায়।

অণ্ডগ্রন্থি বাদ দেওয়া (castration)।—প্রাচীনকালে 'খোজা' বা নপুংসক করিবার উদ্দেশ্যে অণ্ডকোষ ও লিঙ্গ কাটিয়া ফেলা হইত।

বর্ত্তমানে কোন কোন রোগে অণ্ডগ্রন্থি বাদ দেওয়া হয়।

যেখানে অণ্ডগ্রন্থি-রজ্জু (spermatic cord) inguinal canal হইতে অণ্ডকোষে প্রবেশ করিয়াছে অর্থাৎ যেখানে external abdominal ring আছে তাহার উপর ছুরি দ্বারা চর্ম্ম ও তাহার নিম্নস্থিত fascia কাটিতে হইবে। তারপর অণ্ডগ্রন্থি এই ক্ষতের দিকে ঠেলিয়া উঠাইবে এবং অণ্ডকোষের tissue বা তন্তুগুলি ইহা হইতে পৃথক্ করিবে। তারপর রজ্জুটী পৃথক্ করিয়া উত্তমরূপে বাঁধিয়া কাটিবে।

অণ্ডজ—(পুং) [অণ্ডাৎ জায়তে জন-ড] অণ্ডজাতপ্রাণী। [অণ্ড দ্র°] ২ ব্রহ্মা। ৩ পক্ষী। "মূকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারং" (কুমারস° ৩.৪২) ৪ সর্প। ৫ মৎস্য। ৬ নক্র। ৭ কচ্ছপ। ৮ কৃকলাস। ৯ শঙ্খ।

"অণ্ডজাঃ পক্ষিণঃ সর্পা নক্রা মৎস্যাশ্চ কচ্ছপাঃ।
যানি চৈবং প্রকারাণি স্থলজান্যৌদকানি চ॥"(মনু ১.৪৪)

মেধাতিথির মতে 'নক্রাঃ শিশুমারাদয়ঃ।' কুল্লূকের মতে 'নক্রাঃ কুম্ভীরাঃ।' 'স্থলজানি কৃকলাসাদীনি।' 'ঔদকানি শঙ্খাদীনি।'

পক্ষিপ্রভৃতি এই সকল অণ্ডজের উৎপত্তি-সম্বন্ধে পদার্থাদর্শে লিখিত আছে—শুক্র-শোণিতযুক্ত বর্ত্তুলাকার অণ্ড কালবশে ভিন্ন হইয়া যায়, পরে তাহা হইতে পূর্ণাঙ্গ জীব নির্গত হইবার উপক্রম করে। (ত্রি) ১০ অণ্ডজাতমাত্র।

অণ্ডজা—(স্ত্রী) পক্ষিণী প্রভৃতি। [বৈদ্যক] ২ মৃগনাভি, কস্তূরী।

অণ্ডজেশ্বর—(পুং) [অণ্ডজানাং পক্ষিণামীশ্বরঃ; ৬-তৎ] পক্ষিরাজ, গরুড়। "মহোরগং গৃহ্য ইবাণ্ডজেশ্বরঃ" (রামা°, ৫.৩৮.৩৫)

অণ্ডদ্রব—(পুং) ভয়ে মানসিক দৃঢ়তা হারান। ২ ভীরুতা, বিমূঢ়ভাব।

অণ্ডধর—(পুং) [অণ্ড-ধৃ-অচ্] শিব। "নমশ্চণ্ডায় কুণ্ডায় অণ্ডায়াণ্ডধরায় চ।" (মহাভা° শান্তি° ২৮৪.৮৪)

অণ্ডপর্ণ—(পুং) [বৈদ্যক] মলাণ্ডতরু।

অণ্ডপেশী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] কোষ, মুষ্ক। (হেম°)

অণ্ডপ্রণালী—(স্ত্রী) অণ্ডাধার হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত যে নালী আছে, তাহার নাম অণ্ডপ্রণালী (Fallopian tube)।

অণ্ডভূ, অণ্ডসূ—(ত্রি) [অণ্ডাৎ ভবতীতি অণ্ডভূ-ক্বিপ্; অণ্ডাৎ সূয়তে, অণ্ড-সূ-ক্বিপ্] ব্রহ্মা। ২ পক্ষী। ৩ সর্প। ৪ মৎস্য ইত্যাদি। ৫ যাহা অণ্ড হইতে জন্মগ্রহণ করে।

অণ্ডভূতজাতক—একখানি প্রাচীন বৌদ্ধজাতক। এই জাতকে লিখিত আছে— ব্রহ্মদত্তের রাজ্যকালে তাঁহার প্রিয়তমা মহিষীর পুত্ররূপে বোধিসত্ত্ব জন্মপরিগ্রহ করেন। কালে তিনি সর্ব্ববিদ্যা-পারদর্শী হইয়া উঠেন এবং পিতার মৃত্যু হইলে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ন্যায়পরায়ণ রাজা বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। রাজা প্রত্যহ এক ব্রাহ্মণের সহিত দ্যূতক্রীড়া-কালে স্ত্রী-চরিত্রের ক্ষণভঙ্গুরতা-সূচক শ্লোক পাঠ করিয়া অক্ষ নিক্ষেপ করিতেন এবং তাহাতেই তাঁহার খেলায় জয়লাভ হইত। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, সম্ভবতঃ এই শ্লোকের গূঢ় কোন ভাবার্থ-বলেই রাজার প্রতিবারই জয়লাভ হইতেছে এবং তিনি বার বার হারিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। তখন তিনি পর-পুরুষের প্রলোভনে বিমুগ্ধ হয় নাই এরূপ একটী বালিকার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ঐরূপ কন্যা পাওয়া কঠিন দেখিয়া তিনি এক সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে স্বগৃহে রাখিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যাহাতে তিনি ব্যতীত অপর কোন পুরুষ তাহার দৃষ্টিপথে পতিত না হয়, সেজন্য তিনি প্রথম হইতেই প্রখর দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। একজন দাসী মাত্র তাহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিল। এই শিশুকন্যা বাড়িতে লাগিল—একমাত্র তিনিই তাঁহার পালক ও রক্ষক। বালিকা যৌবনে পদার্পণ করিলে ব্রাহ্মণ রাজার সহিত পুনরায় খেলার প্রস্তাব করিলেন। রাজাও স্বীকৃত হইলেন। পুনরায় খেলা আরম্ভ হইল। রাজা পূর্ব্বকথিত গাথা পাঠ করিয়া যেমন অক্ষ নিক্ষেপ করিলেন অমনি গুরুদেব বলিয়া উঠিলেন—"কেবল আমার কন্যা বাদে।" তাহাতে রাজার হার হইল। তখন রাজা মনে করিলেন, নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণের গৃহে সতী কন্যা আছে, যাহার প্রভাবে এই বিপর্য্যয় ঘটিল। রাজা এতদ্বিষয়ে গোপনে অনুসন্ধান লইবার জন্য এক চতুর ধূর্ত্ত নিযুক্ত করিলেন এবং বলিলেন যেরূপেই হউক, ঐ কন্যাকে ছলে ভুলাইয়া আনিবে।

রাজনিযুক্ত ঐ চতুর ব্যক্তি ব্রাহ্মণের বাটীর সন্নিধানে একটী গন্ধ-পুষ্পের দোকান খুলিল এবং মাতৃ-সম্বোধনে দাসীকে বশীভূত করিল। দাসী ব্রাহ্মণের নিকট মূল্য গ্রহণ করিত, কিন্তু যুবকের নিকট হইতে বিনামূল্যে গন্ধমাল্য লইয়া যুবতীকে দিত। এক দিন যুবক পীড়ার ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিল; দাসী কারণ

জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, তোমার প্রভুপত্নীর রূপ দেখিয়াই আমার এই দশা হইয়াছে। দাসী তাহাকে প্রবোধ দিয়া ফিরিয়া গেল এবং যুবতীর সম্মতি লইয়া ফুলের ঝুড়ির মধ্যে যুবককে লুকাইয়া ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে উপস্থিত করিল। যুবক দুইদিন প্রেমালাপে যাপন করিয়া ফিরিতে চাহিলে যুবতী স্বামীর চক্ষু বাঁধিয়া তাহাকে সেতার বাজাইতে বলিল ও নিজে নাচিবার সময় উপপতিকে স্বামীর মাথায় চপেটাঘাত করিতে বলিল। যুবকের চপেটাঘাতে বৃদ্ধ মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলে যুবতী উপপতিকে বিদায় দিয়া তাহার চক্ষু খুলিয়া দিল ও শুশ্রূষা করিতে লাগিল। রাজা সেই সংবাদ পাইয়া ব্রাহ্মণকে খেলায় আহ্বান করিলেন। এবার ব্রাহ্মণ হারিয়া গেলেন। তখন রাজা ব্রাহ্মণকে সমস্ত কথা বলিলেন। ব্রাহ্মণ ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া যুবতীকে তিরস্কার করিলে যুবতী বলিল "আমি দ্বিতীয় পুরুষকে স্পর্শ করি নাই, সুতরাং অগ্নিপরীক্ষা দিব।" পরীক্ষার আয়োজন হইলে পূর্ব্ব-শিক্ষা মত ঐ যুবক ভিড়ের মধ্য হইতে যুবতীর হাত ধরিয়া ব্রাহ্মণকে বলিল, "মূর্খ! এমন রমণী-রত্নের আবার অগ্নিপরীক্ষা!" তখন যুবতী বলিল, "এতদিন একপুরুষ-স্পৃষ্টা ছিলাম, আজ দ্বিতীয় জন আমায় স্পর্শ করিল। অতঃপর আর কি পরীক্ষা দিব?"

ভরহুত স্তূপের স্থাপত্যশিল্পে সংক্ষেপে অণ্ডভূতজাতকের চিত্র ক্ষোদিত আছে।

অণ্ডবর্দ্ধন—(ক্লী) অণ্ডকোষের স্ফীততা, অণ্ডকোষ ফুলিয়া উঠা। (হেম)

অণ্ডবৃদ্ধি—(স্ত্রী) অণ্ডকোষের বৃদ্ধি।

অণ্ডস্কন্দ—(পুং) [অণ্ডেষু স্কন্দ ইব] অশ্বের অণ্ডরোগবিশেষ। এই রোগের লক্ষণ সম্বন্ধে অশ্ববৈদ্যক গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, বায়ু-পিত্তাদির প্রকোপে অশ্বদিগের এই রোগ জন্মে। —ইহা বাতাণ্ড, পূতাণ্ড, রক্তাণ্ড ও শ্লেষ্মাণ্ড প্রভৃতি নানা নামে নিরূপিত হইয়া থাকে। বায়ু শ্লেষ্মাযুক্ত হইয়া বৃষণদ্বয় দূষিত করে এবং একটী মুষ্ক মাত্র চলিতে থাকে, এই অবস্থায় রোগ বাতাণ্ড সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। যে অশ্বের পৃষ্ঠ স্তব্ধ হইয়া যায়, অণ্ড কাঁপিতে থাকে, যে অণ্ড কাঁপে, সেই দিকের পা খোঁড়া হইয়া যায়, উভয় মুষ্কেই বেদনা হয়, উভয়ই ফুলিয়া উঠিয়া রক্ত বা কৃষ্ণ-বর্ণ ধারণ করে; পিত্ত দুষ্ট হইয়া মুষ্কের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা জন্মায়। মুষ্কদ্বয় স্ফীত ও পক্ক হইয়া বেদনাযুক্ত হয়। এই অবস্থায় অণ্ডস্কন্দরোগকে পূতাণ্ড নামে অভিহিত করা হয়। যে অশ্বের বৃষণদ্বয় দেখিতে কোমল, কিন্তু স্পর্শে কঠিন এবং রুক্ষ, এই অবস্থায় তাহার রোগ রক্তাণ্ড নামে নির্দিষ্ট হয়। বৃষণদ্বয় স্ফীত, কঠিন ও রূক্ষ এবং অল্প অল্প বেদনাযুক্ত, এই অবস্থায় অতি কষ্টে মূত্র স্রাব হয় এবং মূত্রকোষ ফুলিয়া উঠে। এই অবস্থাপন্ন রোগ শ্লেষ্মাণ্ড নামে নিরূপিত হয়। এই রোগে কটুতৈল দ্বারা অঙ্গে স্বেদ প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

অণ্ডস্কন্দরোগে কিরূপ চিকিৎসা করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জয়দত্তকৃত অশ্ববৈদ্যক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

অণ্ডহস্তিন্—(পুং) [বৈদ্যক] চক্রমর্দ্দ ক্ষুপ। (রাজনি°)

অণ্ডালু—(পুং) [অণ্ডমস্তি অস্য আলুচ্] ডিম্ববিশিষ্ট মৎস্য।

অণ্ডিকা—(স্ত্রী) যবচতুষ্টয়পরিমাণ। (চরক)

অণ্ডিনী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] সান্নিপাতিক যোনিরোগবিশেষ।

"অতিকায়গৃহীতায়াস্তরুণ্যা অণ্ডিনী ভবেৎ।"

(সুশ্রুত, চিকিৎসা°)

অণ্ডীর—(পুং) [অণ্ড-ঈরন্ অণ্ডং পুমবয়বঃ অস্যাস্তীতি] বিশিষ্ট বলশালী ব্যক্তি। ২ শক্ত, সমর্থ। (মেদিনী)

অন্নয়াচার্য্য,—রামানুজবিজয়প্রণেতা। ইঁহার পূর্ব্বনাম সত্য-ধর্ম্মতীর্থ। ইনি ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে গতাসু হন।

অন্নয়াচার্য্য,—দাক্ষিণাত্যের একজন পণ্ডিত। ইনি নীতি-শতক-প্রণেতা শ্রীনিবাসাচার্য্যের ভ্রাতা ও গুরু। ইঁহার রচিত জিজ্ঞাসাদর্পণ ও বিরোধ-নিরোধ নামক দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

অন্নাজী দত্ত—শিবাজীর জনৈক সেনাপতি। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। মহারাষ্ট্রসাম্রাজ্য-গঠনকালে অন্নাজী দত্ত শিবাজীর অন্যতম প্রধান সহায় ছিলেন। প্রথমে ইঁহার রাজকীয় পদবী ছিল 'সুরনীস্'; পরে শিবাজী ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন সম্রাট্‌রূপে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যখন 'অষ্টপ্রধান' নামক অমাত্য-সংসদের সৃষ্টি করিলেন, তখন ইঁহার উপাধি হইল 'পন্তসচিব'।

মহারাষ্ট্র-ইতিহাস পাঠে জানা যায়, শিবাজী ইঁহাকে অনেকবার দুরূহ ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক বারই অন্নাজী বীরত্ব ও দক্ষতার সহিত স্বীয় প্রভুর কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে আফ্‌জল খাঁ শিবাজী কর্ত্তৃক নিহত হইলে পরে অন্নাজী দত্ত পন্হালা দুর্গ অধিকার করেন এবং বিজাপুরের সেনাপতিকে ঐ দুর্গ হইতে বিতাড়িত করেন। রঙ্গনা দুর্গ অধিকারকালেও ইনি বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শিবাজী ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ্ অরঙ্গজীবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দিল্লী-নগরীতে গমন করেন। তৎকালে অন্নাজী পন্ত সচিব, আবাজী শোনদেব এবং মোরো পন্ত পিংলে এই তিন ব্যক্তির উপর মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের শাসনভার অর্পিত ছিল। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর-সুলতান আলি আদিল শাহের মৃত্যু হইলে বিজাপুর-রাজ্যে গোলযোগ ঘটে। পর বৎসর শিবাজী পন্হালা দুর্গ পুনরধিকার করেন এবং অন্নাজী দত্তকে হুব্‌লী আক্রমণ করিতে

প্রেরণ করেন। হুব্‌লী একটী সমৃদ্ধিশালী শহর এবং বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। শুনা যায়, এই শহর লুণ্ঠন করিয়া অগ্নাজী যে পরিমাণ ধনসামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মরাঠাগণ তৎপূর্ব্বে অন্য কোনস্থান লুণ্ঠন করিয়া সেরূপ পান নাই।

১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে শিবাজী যখন হায়দরাবাদে কুতুব শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন, তখন পেশবা মোরো পন্ত তাঁহার প্রতিনিধিরূপে সাম্রাজ্য-শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তৎকালে কল্যাণ ও পোন্দার মধ্যবর্ত্তী দুর্গসমূহের রক্ষণভার অগ্নাজীর হস্তে ন্যস্ত ছিল এবং তিনি সাম্রাজ্যশাসন ব্যাপারেও পেশবাকে সাহায্য করিবার জন্য শিবাজী কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছিলেন।

দক্ষিণ কর্ণাটের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত থাকিবার সময় এবং অন্য সময়েও অগ্নাজী রাজ্যশাসনে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। তিনি মহারাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের সমস্ত জমি উর্ব্বরতা এবং উৎপন্ন শস্যের অবস্থা অনুসারে দ্বাদশ শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলেন।

১৬৮০ খৃষ্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যু হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া গোলযোগ ঘটে। শম্ভাজী সিংহাসনে আরোহণ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাজারামকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যও অনেকে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শম্ভাজী বড়ই নিষ্ঠুরপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি রাজারামের মাতা এবং স্বীয় বিমাতা সয়েরা বাইকে কারারুদ্ধ ও নিহত করেন। অগ্নাজী দত্তও রাজারামের পক্ষে ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া কারারুদ্ধ ও নিহত হন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, অগ্নাজীকে এই ভাবে হত্যা করা শম্ভাজীর পক্ষে অতিশয় গর্হিত কার্য্য হইয়াছিল। ইহাতে ব্রহ্মহত্যার পাতক হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত সাম্রাজ্য-সংস্থাপনে ও শাসনে তিনি যেরূপ দক্ষতার সহিত শিবাজীর সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহাতে এই হত্যাকার্য্য কোনক্রমেই সমর্থন করা যায় না। (Vide Grant Duff—History of the Marhattas, 5th edition, p. 137.)

অগ্নাদীক্ষিত—আপস্তম্বীয় চাতুর্ম্মাস্যপ্রয়োগ, হৌত্রপ্রয়োগ ও অগ্নাদীক্ষিতীয়দীধিতি নামক শ্রৌতগ্রন্থরচয়িতা।

অগ্নাসাহেব—তঞ্জোরাধিপতি তুকোজীর (১৭২৮-৩৫ খৃঃ) পঞ্চ পুত্রগণের অন্যতম।

অগ্নাস্বামী সেতুপতি—রামনাদের সেতুপতিবংশীয় জনৈক নৃপতি। ইনি রাণী মঙ্গলীশ্বরী নাচ্ছিয়ারের দত্তকপুত্র ছিলেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে রাণী মঙ্গলীশ্বরীর মৃত্যু হইলে ইনি রাজপদ প্রাপ্ত হন। তৎকালে ইনি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন বলিয়া রাজা পিল্লাই ইঁহার পক্ষে রাজ্যশাসন করেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে মুত্তু রামলিঙ্গের কন্যা এবং রাণী মঙ্গলীশ্বরীর ভ্রাতুষ্পুত্রী শিবকামী নাচ্ছিয়ার সিংহাসন দাবী করিয়া কোম্পানীর আদালতে এক মোকদ্দমা আনয়ন করেন। তাহার ফলে শিবকামী রাণী হইলেন এবং অগ্নাস্বামী সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইলেন। তৎপরে রাজ্যের তত্ত্বাবধানভার সদর আদালতের উপর পড়ে। এদিকে রাণী শিবকামী এবং অগ্নাস্বামীর মধ্যে সিংহাসন লইয়া মোকদ্দমা উচ্চ আদালতে চলিতে থাকে। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে উচ্চ আদালত অগ্নাস্বামীর পক্ষে ডিক্রী দেন। কিন্তু ইতিমধ্যে অগ্নাস্বামীর মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার দত্তকপুত্র রামস্বামী তীবর রাজা হন। অগ্নাস্বামী সেতুপতির অপর নাম মুত্তু বিজয় রঘুনাথ সেতুপতি।

অগ্নিগ—রাষ্ট্রকূটপতি ৩য় কৃষ্ণ অকালবর্ষের ৮৬২ শকাব্দের শিলালিপিতে উল্লিখিত জনৈক পল্লববংশীয় রাজা। অকালবর্ষ কৃষ্ণ ইঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন।

অনন্তপুর জেলার অন্তঃপাতী হেমাবতী নামক স্থানে আবিষ্কৃত ৮৬৪ শকাব্দে উৎকীর্ণ এক স্তম্ভলিপিতে নিম্নলিখিত বংশতালিকা* প্রদত্ত হইয়াছে—

ত্রিনয়ন পল্লব (ঈশ্বর-বংশীয়)
|
মঙ্গল-নম্বাধিরাজ
|
সিংহপোত
|
চারুপন্নের
|
পোলন্ চোড়নম্ব
|
মহেন্দ্র
|
অয্যপদেব নন্নিগ (৮৪১-৮৬০ শকাব্দ ?)
|
অগ্নিগ — দিলিপরস

অগ্নিগিরি—বোম্বাইয়ের ধারবার জেলার অন্তর্গত নবলগুন্দ তালুকের একটী শহর। অক্ষা° ১৫°২৫′ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫°২৬′ পূঃ। ধারবার হইতে মদগ হইয়া বেলারী পর্য্যন্ত যে রাজপথ গিয়াছে তাহার এবং সাদার্ণ্ মারহাটা রেলপথের ধারেই ইহা অবস্থিত। অগ্নিগিরি তুলার ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানকার অমৃতেশ্বর মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহা জখনাচার্য্যের নির্ম্মিত বলিয়া শুনা হয়। মন্দিরটী কৃষ্ণপ্রস্তরের, আকারে বৃহৎ এবং ৭৬টী স্তম্ভযুক্ত। প্রাচীরে অনেকগুলি পৌরাণিক

* Epigraphia Indica, Vol. V, p. 191 & Vol. X., pp. 58.]

ব্যাপার চিত্রিত আছে। এই মন্দিরে ৬ খানি প্রাচীন লিপি রহিয়াছে, সেগুলি ১১৫৭ হইতে ১২০৮ খৃষ্টাব্দ মধ্যে উৎকীর্ণ। বনদশঙ্করী, বসপ্প, গচ্চিন বসপ্প, হনুমন্ত, মৈলার, পুরদ্দপ্প প্রভৃতির মন্দিরেও ২।১ খানি করিয়া লিপি রহিয়াছে।

অগ্নিগিরি শহরের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক বিবরণ ১১৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে পাওয়া যায়। ঐ বৎসর কলচুরিরাজ বিজ্জল পশ্চিম-চালুক্যবংশীয় নৃপতিগণকে পরাজিত করিয়া এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। বিজ্জলপুত্র সোমেশ্বরের (১১৬৭-১১৭৫ খৃঃ) লিপিও এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে মনে হয়, অন্ততঃ ১১৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অগ্নিগিরি কলচুরি-রাজগণের অধীন ছিল। ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে চালুক্যরাজ ৪র্থ সোমেশ্বরের সামন্তনৃপতি দণ্ডনায়ক বর্ম্মরস অগ্নিগিরিতে রাজত্ব করিতে ছিলেন। ১১৮৯ খৃষ্টাব্দের একখানি লিপি হইতে জানা যায়, দেবগিরির যাদববংশীয় ৩য় ভিল্লমের করদনৃপতি মহামণ্ডলেশ্বর বাচিরাজ (বাচন) অগ্নিগিরি রাজধানীতে থাকিয়া বেলবোল দেশ শাসন করিতেছিলেন। (Fleet, Kanarese Dynasties, p. 55). তৎপর ১১৯২—১২১১ খৃষ্টাব্দের কএকখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, হোয়শল-নৃপতি বীর বল্লাল (২য় বল্লাল) অগ্নিগিরি সহ ধারবারের অধিকাংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। শিলালিপিতে অগ্নিগিরি বীর বল্লালের অন্যতম রাজধানী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভারতে বৃটিশ রাজত্বের আরম্ভে অগ্নিগিরি ও তদধীন গ্রামসমূহ নিপানি জায়গীরের অংশীভূত হইয়াছিল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে উহা বৃটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

অগ্নেয় আচার্য্য—লিঙ্গনির্ণয়ভূষণ নামক ব্যাকরণপ্রণেতা।

অগ্নেয়পণ্ডিত—ব্যাসতাৎপর্য্যনির্ণয় নামক বেদান্তব্যাখ্যা রচয়িতা।

অণ্ব—(ক্লী) সূক্ষ্মচ্ছিদ্র পবিত্র। (ঋক্ ৯.৯১.৩) ২ সূক্ষ্ম (লোম)। (ঋক্ ৭.৮৬.৪৭) ৩ অণু, সূক্ষ্ম। (ঋক্ ৯.১০৭ ১১) ৪ শব্দ। "সুরা অণ্বং বিতন্বতে।" (ঋক্ ৯.১০.৫) "অন্বং বিতন্বতে অভিষববেলায়ামুপরবেষু শব্দং কুর্ব্বন্তি' (সায়ণ)

অণ্বন্ত—(পুং) [অণু সূক্ষ্মবস্তু অন্তে যস্য] সূক্ষ্মবস্তুনির্ণয়-পর্য্যবসান; অর্থাৎ সূক্ষ্মবস্তুনির্ণয়ই হইয়াছে অবসানে যাহার। "তং হোবাচ (জনকো) যাজ্ঞবল্ক্য কিমর্থমচারীঃ পশূনিচ্ছন্নণ্বন্তানিতি" (বৃহদারণ্যক ৪.১.১) 'অণ্বন্তান্ সূক্ষ্মান্তান্ সূক্ষ্মবস্তুনির্ণয়ান্তান্ প্রশ্নান্' (শঙ্করভাষ্য)

অণ্বস্থি—(ক্লী) মণিবন্ধাদিতে স্থিত সূক্ষ্মাস্থি। (সুশ্রুত)

অণ্বী—(স্ত্রী) [অণু স্ত্রিয়াং ঙীপ্] অঙ্গুলি। "তমীমণ্বীঃ সমর্য আগৃভ্ণন্তি যোষণো দশ" (ঋক্ ৯.১.৭)

অৎ,—(অব্য) [অত-ক্বিপ্ পাণিন্যুক্ত উর্জ্জাদি গণীয়] অদ্ভুত, আশ্চর্য্য। ২ শীঘ্র। ৩ ব্যাকরণের নির্দ্দেশ—অকারের পর ত থাকিলে অকার বুঝাইবে। এইরূপ যে স্বরবর্ণের পর তকার থাকিবে, তদ্দ্বারা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরকে বুঝিতে হইবে। হ্রস্ব স্বরের পর তকার থাকিলে হ্রস্ব স্বর বুঝিতে হইবে। দীর্ঘ স্বরের পর তকার থাকিলে তদ্দ্বারা দীর্ঘস্বর বুঝিতে হইবে। যথা—অৎ=অকার। আৎ=আকার। ইৎ=ইকার। ঈৎ=ঈকার ইত্যাদি 'তপরস্তৎকালস্য'। (পা ১.১.৭০)

অৎ$_2$—[ভ্বা°, পর°, সক° সেট্] ভ্রমণ। ২ প্রাপণ। ৩ সাতত্য গমন। [লট্—অততি। লিট্—আত। লুট্—অতিতা। লৃট্—অতিষ্যতি। লুঙ্—আতীৎ। ক্ত—অতিতঃ। ইন্—অদয়তি।] "সমতসি কপোত ইব গর্ভংধিং" (ঋক্ ১.৩০.৪) "অতিথিরভ্যততি গৃহান্" (নিরুক্ত ৪.৫) ইত্যাদি

বৈদিক প্রয়োগে ইহার পরস্মৈপদিত্বই দৃষ্ট হয়। আত্মনেপদের প্রয়োগও দেখা যায়। "নূনমরীরমদতমানং চিদেতোঃ" (ঋক্ ২.৩৮.৩,৬.৯.২) এই ধাতু উপসর্গযোগে নানা অর্থ প্রকাশ করে। [তত্তৎ শব্দ দ্র°]

অৎ$_3$—বন্ধন। [ইদিৎ। ভ্বা° পর°, সক°, সেট্। লট্—অন্ততি। লুঙ্—আন্তীৎ। আত্মনেপদে 'অন্ত্যতে' এই প্রকার রূপও পাওয়া যায়।] বেদের স্থানে স্থানে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

অৎ$_4$—[ভ্বা°, পর°, সক°, সেট্] বন্ধন। [লট্—অততি। লুঙ্—আতীৎ।]

অত, অতো—(দেশজ) এত অধিক যথা—অত কথা ক'ল না। ইত্যাদি।

অতএ—(দেশজ) এই হেতুই, এই জন্যই। [অতএব দ্র°]

"অতএ বরণ কনু তোয়" (গোবিন্দদাস)

অতএব—(অব্য) [ইদম্-তসিল্+এব] এই কারণে, এই জন্য। অতঃ অর্থাৎ ইহা হইতে এব নিশ্চিত। 'এব' স্থানে বাঙ্গালায় 'ই' প্রযুক্ত হয়। যেমন, এই হেতুই।

"অতএব মহেশানি রলয়োঃ সমতাভবেৎ"

(সারদাতিলকটী° রাঘবভট্ট)

অতঃ—[অতস্ দ্র°]

অতঃপর—(অব্য) [অতঃপরম্] অনন্তর, ইহার পরে, তৎপরে, তারপর। "ভাগ্যায়ত্তমতঃপরম্" (শকুন্তলা ৪.১৭) "কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।" (মহাভা°, বন্°, ৩১৩.১৭)। বাঙ্গালা ভাষায়ও এই শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।

অতক—(পুং) [অততি সাতত্যেন গচ্ছতীতি অত-কন্] পথিক।

অতকামেন্যান্—দক্ষিণ পেরুদেশবাসী দক্ষিণ আমেরিকার একটী আদিম জাতি।

অতট—(ত্রি) [তট্যতে আহন্যতে জলেনেতি তট-ঘঞর্থে কঃ, তটং জলাঘাতস্থানং নাস্তি যস্য ; বহুব্রী] আলম্বনস্থান-শূন্য, তট বা তীরহীন। "মনোরথানামতটপ্রপাতাঃ" (শকুন্তলা ৬ অ°) ২ পর্ব্বতের উচ্চ স্থান ; পর্য্যায়—প্রপাত, ভৃগু। ৩ ভূমির অধোভাগ। ৪ অপার।

অতটা—(দেশজ) ঐ পরিমাণ। যথা—'অতটা দেওয়া উচিত নহে' অর্থাৎ ঐ পরিমাণ দেওয়া উচিত নহে।

অতথা—(ত্রি) অতদ্রূপ, সেরূপ নহে। "উষো ষু শৃণুহি গিরো মঘবন্মাতথা ইব।" (ঋক্ ১.৮২.১) 'তথেবাচরতি তথাতি। "সর্ব্বপ্রাতিপদিকেভ্য ইত্যেকে" ইতি ক্বিপ্। তথাতেরপ্রত্যয়ঃ। ন তথা ইব অতথা ইব'। (সায়ণ)

অতথোচিত—(ত্রি) [ন তথারূপমুচিতং যস্য বহুব্রী] যাহার যাহা উচিত, তাহার অন্যথারূপপ্রাপ্ত। অনভ্যস্ত। "অন্যায়মপি তে পুত্র ক্লেশানামতথোচিতঃ।" (রামা ২.১০৪.৭)

অতথ্য, —(ত্রি) মিথ্যা, অনৃত, অলীক। "অতথ্যস্তথ্যোবা হরতি মহিমানং জনরবঃ।" (পরাশরসংহিতা)

অতথ্য$_2$—(ত্রি) নৃপতিগণের শত্রুবশীকরণহেতু সাম, ভেদ, দান, দণ্ড (অমর) এই চতুষ্টয়ের অন্তর্গত সামনামক প্রয়োগের অংশবিশেষ। মৎস্যপুরাণ ২২২ অধ্যায়ে সপ্তপ্রকার প্রয়োগ উল্লিখিত আছে। যথা—সাম, ভেদ, দান, দণ্ড, উপেক্ষা, মায়া এবং ইন্দ্রজাল। সামপ্রয়োগের অর্থ শত্রুর সহিত সন্ধিস্থাপন করা। উক্ত সামপ্রয়োগ দ্বিবিধ—তথ্য ও অতথ্য। সাধু-গণের মতে অতথ্যসাম শত্রুগণের আক্রোশ উৎপাদন করে, সুতরাং অতথ্যসাম প্রয়োজ্য নহে। ২ মিথ্যাযুক্ত সন্ধিকেও অতথ্যসাম বলা হইয়া থাকে।

অতদ্গুণ—(পুং) অর্থালঙ্কারবিশেষ। সাহিত্যদর্পণের মতে, "তদ্রূপাননুহারস্তু হেতৌ সত্যপ্যতদ্গুণঃ"॥ অর্থাৎ গুণসম্পন্ন বস্তুর অত্যন্ত সন্নিধানে থাকিয়াও তাহার গুণ গ্রহণ না করিলে 'অতদ্গুণ' অলঙ্কার হয়। যথা—

"হন্ত সান্দ্রেণ রাগেণ ভৃতেঽপি হৃদয়ে মম।
গুণগৌরনিষণ্ণোঽপি কথং নাম ন রজ্যসি।"

এখানে রাগপূর্ণ হৃদয়ে বাস করিয়াও নায়ক রাগপ্রাপ্ত হয় নাই। এস্থলে দ্বিবিধ রাগের অভেদাধ্যবসায়মূলক 'অতদ্গুণ' হইয়াছে, এবং অত্যন্তহৃদয়-সম্পর্ক বশতঃ নায়ক রাগ-প্রাপ্তির যোগ্য হইলেও তাহা প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং 'গুণ-গৌর' সম্বোধন পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় উদাহরণ যথা—

"গাঙ্গমম্বু সিতমম্বু যামুনং কজ্জলাভমুভয়ত্র মজ্জতঃ।
রাজহংস তব সৈব শুভ্রতা চীয়তে ন চ ন চাপচীয়তে।"

হে রাজহংস! গঙ্গোদক শুভ্র এবং যমুনার জল কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু গঙ্গা ও যমুনা এই উভয় নদীতে নিমজ্জিত হইয়াও তোমার স্বভাবশুভ্রবর্ণ বর্দ্ধিতও হয় নাই অপিচ ম্লানও হয় নাই।

এই উদাহরণে 'অপ্রস্তুতপ্রশংসা' বিদ্যমান থাকিলেও প্রকৃত রাজহংস—গঙ্গা এবং যমুনার সমাগমেও তাহাদের রূপগ্রহণ করে নাই। এখানে অপরের গুণগ্রহণের অভাবরূপ পৃথক্ চমৎকারিতা উৎপন্ন হওয়ায় ইহা 'বিশেষোক্তি' হইতে ভিন্ন, এবং বিজাতীয় বর্ণের উৎপত্তির অভাববশতঃ ইহা বিষম অলঙ্কার হইতে পারেনা।

অলঙ্কার-কৌস্তুভ ও চন্দ্রালোকধৃত 'অতদ্গুণ' অলঙ্কারের লক্ষণ—"সঙ্গতানুগুণাসঙ্গীকার মাহুরতদ্গুণম্।"

সম্মিলিত ভাবে থাকিয়াও যে উৎকৃষ্টের সম্মিলন কামনা করে না। তাহার শ্রেষ্ঠ গুণাদিতে আকৃষ্ট হয় না, তাহাকে অতদ্গুণ বলা হয়। যথা—"চিরং রাগিনি মচ্চিত্তে নিহিতাপি ন রজ্যসি।"

কাব্যপ্রকাশে ইহার এইরূপ লক্ষণ লিখিত আছে—"তদ্রূপাননুহারশ্চেদস্য তৎ স্যাদতদ্গুণঃ।" তাহার সদৃশবর্ণ বা গুণ হইবার কারণ বিদ্যমান থাকিলেও যেখানে তাহা না ঘটে তাহাকে 'অতদ্গুণ' কহে।

অতদ্গুণসম্বিজ্ঞান—(পুং) [ন তস্য গুণীভূতস্য সম্যক্জ্ঞানং যত্র বহুব্রীবিশেষ] মুগ্ধবোধের টীকায় দুর্গাদাস লিখিয়াছেন,—"তদ্গুণসম্বিজ্ঞানোঽতদ্গুণসম্বিজ্ঞানশ্চ। যত্র সমস্যমানপদার্থঃ সমাসবাচ্যে বর্ত্ততে স তদ্গুণসম্বিজ্ঞানঃ।" যথা—ত্রিলোচন শিবঃ। তদন্যোঽতদ্গুণসম্বিজ্ঞানঃ—যথা হতকংসঃ কৃষ্ণ ইতি।" অর্থাৎ বহুব্রীহি সমাস করিলে সমস্যমান পদার্থ যেখানে সমাসবাচ্যে থাকে, তাহাকেও তদ্গুণসম্বিজ্ঞান বলা যায়। যেমন,—'ত্রীণি লোচনানি যস্য স ত্রিলোচনঃ শিবঃ।' এখানে সমাসবাচ্যে তিনটী লোচন রহিয়াছে বলিয়া ইহার নাম তদ্গুণ-সম্বিজ্ঞান। আবার হতঃ কংসঃ যেন হতকংসঃ কৃষ্ণ। এখানে সমস্যমান পদার্থ হত ও কংস, উহা সমাসবাচ্য কৃষ্ণে নাই, তজ্জন্য ইহার নাম অতদ্গুণসম্বিজ্ঞান।

অতন—(ক্লী) [অত-ল্যুট্] গমন, ভ্রমণ। [অত, নঃ] (ত্রি) ২ গমনকারী, ভ্রমণকারী।

অতনু, —(পুং) [নাস্তি তনুঃ অবয়বো যস্য ; বহুব্রী] অনঙ্গ, মদন, কাম। কাম হরকোপানলে ভস্ম হইয়াছিলেন এবং মন হইতেই ইহার জন্ম, এই দুই কারণে ইনি অতনু বা অনঙ্গ। [মদন দ্র°] [ন তনুঃ ; নঞ্-তৎ] (ত্রি) ২ তনুভিন্ন, অক্ষীণ অংশ। "তমতনুবনরাজিশ্যামিতোপত্যকান্তং" (মাঘ)

অতনু$_2$—(দেশজ) মনোহর, সুন্দর। "একে তনু গোরা কনককটোরা অতনু কাঁচলা উপাম।" (বিদ্যাপতি)

অতন্ত্র—(ত্রি) [ন তন্ত্রং কারণং তদধীনা বিবক্ষা বা যস্য বহুব্রী°] কারণশূন্য। ২ বিবক্ষারহিত। যথা,—"তস্যাদিত উদাত্তমর্দ্ধহ্রস্বম্। পা ১.২.৩২।" এই সূত্রের বৃত্তিতে ভট্টোজি-দীক্ষিত লিখিয়াছেন,—'হ্রস্বগ্রহণমতন্ত্রম্ ; অবিবক্ষিতম্।' অর্থাৎ গ্রন্থকারের বলিবার ইচ্ছার অবিষয়ীভূত। "ইতি জ্যেষ্ঠতা চাতন্ত্রম্।" (দায়ভাগ) (ক্লী) নিয়মবহির্ভূত ; অনধীন। (ত্রি) ৪ অসংযত অর্থাৎ যাহাকে কোন কিছু দ্বারা সংযত করা হয় নাই। ৫ তন্ত্রহীন, যাহাতে তার বা গুণ যোজনা করা হয় নাই (বাদ্যযন্ত্রাদি)।

অতন্ত্রী—(স্ত্রী) যাহাতে তার বা গুণ যোজনা করা হয় নাই। "নাতন্ত্রী বিদ্যতে বীণা" (রামা° ২.৩৯.২৯)

অতন্দ্র—(ত্রি) [ন তন্দ্রা নিদ্রা আলস্যং বা যস্য] নিদ্রারহিত। ২ অনলস। "অতন্দ্রো হব্যা বহসি" (ঋক্ ৮.৬০.১৫)

অতন্দ্রা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] 'কাফি'ফল, চলিত চা।

অতন্দ্রিত—(ত্রি) [ন তন্দ্রা জাতা অস্য, তারকাদিত্বাৎ ইতচ্] অজাতনিদ্র। ২ অনলস। "তাবতোঽতন্দ্রিতান্ দক্ষান্ প্রকুর্বীত বিচক্ষমানঃ।" (মনু) (স্ত্রী) অতন্দ্রিতা। "অতন্দ্রিতা সা স্বয়মেব বৃক্ষকান্ ঘটস্তনপ্রস্রবণৈর্ব্যবর্দ্ধয়ৎ। (কুমার ৫.১৪) (পুং) ৩ মহাদেব। (মহাভা° ১৩.১৭.৫১)

অতন্দ্রিন্—(ত্রি) অনলস, আলস্যহীন। "প্রাচীনাবীতিনা সম্যগপসব্যমতন্দ্রিণা।" (মনু ৩.২৭৯) ২ নিদ্রাহীন। "অতন্দ্রিভির্জ্যাতিভিরাত্তকার্ম্মুকৈঃ।" (রামা° ২.৮৭.২৪)

অতপ—(ত্রি) অনুষ্ণ, শীতল। ২ অনুত্তেজিত। ৩ আবেগহীন, ঔৎসুক্যহীন ; আগ্রহরহিত। ৪ অনিযুক্ত। (পুং) ৫ বৌদ্ধ-দেবগণভেদ।

অতপস্—(ত্রি) [নাস্তি তপো যস্য ; বহুব্রী] তপস্যাহীন, যাহার তপস্যা নাই। "অতপাস্ত্বনধীয়ানঃ" (মনু ৪.১৯০) ২ অধার্ম্মিক।

অতপস্ক—(ত্রি) [ন বিদ্যতে তপো যস্য, সমাসান্তে বা কঃ] তপোবর্জ্জিত ; তপস্যাহীন। ২ অযত্নশীল। "ইদং তে নাতপস্কায়।" (ভগবদ্গীতা ১৮.৬৭) 'অতপস্কায় তপ আলোচনং তদ্রহিতায় অযত্নশীলায়েত্যর্থঃ।' (নীলকণ্ঠ)

অতপাদি—বোম্বাই প্রদেশস্থ সাতারা জেলার ঔন্ধ রাজ্যের একটী নগর। অক্ষা° ১৭°২৫'২৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৫৯' পূঃ।

অতপ্ত—(ত্রি) উষ্ণ বা গরম নহে, শীতল। [অতপ দ্র°]

অতপ্ততনু(নূ)—(ত্রি) [তন্ তন্যতে কর্ম্মপাশোঽনয়া তনুঃ, ন তপ্তা পয়োব্রতাদিনা তনুরস্য] পয়োব্রতাদি দ্বারা অসন্তপ্তগাত্র ; ব্রতাদি দ্বারা যাহার শরীর তাপযুক্ত হয় নাই। "অতপ্ততনূর্ন তদামো অশ্নুতে" (ঋক্ ৯.৮৩.১) [ন তপ্তা তপ্তমুদ্রয়া তনুরস্য] ২ তপ্ত মুদ্রা দ্বারা অকৃতচিহ্ন। তপ্ত মুদ্রাদ্বারা যাহা চিহ্নিত নহে।

অতপ্যমান—(ত্রি) অনীশ্বর ; ঐশ্বর্য্যহীন। ২ অন্য দ্বারা অপীড্যমান। "অতপ্যমানে অবসাবন্তী" (ঋক্ ১.১৮৫.৪) 'অতপ্যমানে অনীশ্বরে। তপ ঐশ্বর্য্যকর্ম্মণ ইদং রূপং। অতপ্যমানে অন্যৈরপীড্যমানে।' (সায়ণ)

অতমিস্র—(ত্রি) অন্ধকারহীন। ২ রাত্রি দ্বারা অনাক্রান্ত।

অতমেরু—(ত্রি) [ন তমেরুঃ ; নঞ্-তৎ] দোষবর্জ্জিত, গ্লানিরহিত। "অতমেরুর্যজ্ঞোঽতমেরুর্যজমানস্য প্রজা ভূয়াৎ" (শুক্লযজুঃ ১.২৩)

অতয়ে—(হিন্দী) অতএব। (এই শব্দ হিন্দী কবিতাতেই প্রায় ব্যবহৃত হয়)

"মাধব হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময়
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা।" (বিদ্যাপতি)

অতরশুম্ব১,—বরোদা রাজ্যের অন্তর্গত কাদি বিভাগস্থ একটী উপবিভাগ। ইহার উত্তরে দেঘম তালুক ও মহীকান্থা, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে কপাটভঞ্জ মহকুমা, পশ্চিমে দেঘম মহকুমা।

অতরশুম্বের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। এই স্থান পাহাড় ও জঙ্গলে পূর্ণ। বাত্রক, মাগম, ধম্মি, বরাংশী ও মোহর নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এখানে হাল্কা বালুকাময় মৃত্তিকাই বেশী দেখা যায়, কচিৎ কৃষ্ণমৃত্তিকাও পাওয়া যায়।

অতরশুম্ব২,—বরোদা রাজ্যস্থ অতরশুম্ব উপবিভাগের একটী শহর। এখানে মহালকারীর আফিস, ডাকঘর স্কুল, ধর্ম্মশালা প্রভৃতি বর্ত্তমান। শহরটী বাত্রক নদীর তীরে অবস্থিত এবং এই নদীর তীরেই এখানকার প্রাচীন ভগ্নদুর্গের দ্বার বিদ্যমান। কতকগুলি গভীর খাদ শহরটী বেষ্টন করিয়া নদীতীর পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এই শহরে লৌহাস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত।

অতরুণ—(ত্রি) নূতন নহে, পুরাতন, বৃদ্ধ।

অতরুণবৃদ্ধদারক (-দারু)—(পুং) [বৈদ্যক] বৃদ্ধদারক ; চলিত বিজতাড়ক। হিন্দী বিধারা। "অতরুণদারুরাস্নাপুরাঃ" (ভাবপ্র°, মধ্য°)

অতর্ক—(পুং ত্রি) [তর্ক্যতেঽনেন তর্ক-ঘঞর্থে ক ; তর্কঃ তর্কহেতুঃ স নাস্তি যস্য। বহুব্রী।] নির্হেতুক, অহেতুক। ২ তর্কহীন, তর্কশূন্য। ৩ শুষ্কতর্কপর (মহাভা, দানধর্ম্ম)

অতর্কিত—(ত্রি) [ন তর্ক-ক্ত] ১ হেতুব্যাপাররহিত ; হঠাৎ আগত। ২ অবিবেচিত, অনান্দোলিত। ৩ অনুমিতভিন্ন, অননুমিত "গতোঽস্যাতর্কিতাং গতিম্" (কুমারস° ৪.২২)

অতর্কিতোপপন্ন—(ত্রি) [অতর্কিত উপপন্ন, সুপ্সুপাসমা°] অচিন্তিতভাবে উপগত। অবিচারিতভাবে আগত ; অত্যন্তা-সম্ভাবিত। "অতর্কিতোপপন্নং বো দর্শনং" (কুমারস° ৬.৫৪)

অতর্ক্য—(ত্রি) যাহা তর্ক দ্বারা সম্ভবপর নহে ; অসম্ভাব্য।

অতল্—কবি মীর আবদুল জলীল দেহলী তাঁহার কবিতায় নিজেকে 'অতল্' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত কবি বহু আরবী ও পার্‌সী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন যে তিনি তাঁহার গুরু জাফর জটল্লীর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কবিতা লিখিতেন।

অতল—(ক্লী) [অস্য ভূখণ্ডস্য তলম্ পৃষোদরাদিত্বাৎ ইদমোঽস্বং] সপ্তপাতালের মধ্যে এই পৃথিবীর নিম্নে প্রথম পাতালখণ্ড। সপ্তপাতালের নাম এই,—অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু°, ৭ম অঃ ; পদ্মপু° ; ভাগবত) এই সপ্ত পাতাল ক্রমান্বয়ে একটীর পরে আর একটী নিম্নে নিম্নে অবস্থিত। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের ৫০ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে—ইহার মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ। এখানে ভীমনাদী ইন্দ্রশত্রু অসুরেন্দ্র নমুচির বাসস্থান বিদ্যমান। এতদ্ভিন্ন শঙ্কুকর্ণ, কবন্ধ, নিষ্কুলাদ, ভীমাসুর, শূলদন্ত, লোহিতাক্ষ, শ্বাপদ, মহাত্মা ধনঞ্জয়, মাহেন্দ্র, কালিয় নাগ, কলস এবং অন্যান্য নাগ, দানব ও রাক্ষসদিগের বহু সহস্র পুরী এই প্রদেশে বিদ্যমান।

ইহাদের সংস্থান সিদ্ধান্তশিরোমণির গোলাধ্যায়ে "স্বাদুদ-কান্তর্বড়বানলোঽসৌ পাতাললোকাঃ পৃথিবীপুটানি" ইত্যাদি বাক্যে উক্ত হইয়াছে। [বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য]

মেদিনী প্রভৃতি অভিধানে নাগলোককেই পাতাল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা—"পাতালং নাগলোকে স্যাদ্ বিবরে বড়বানলে"। অমরকোষ-মতে নাগলোকই রসাতল।

আজকাল অনেকে অনুমান করেন যে আমেরিকা দেশকে আমাদের শাস্ত্রকারেরা পাতাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। [পাতাল শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্র°] ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে অতল ও তলা-তলের নাম নাই ; এই দুইটীর পরিবর্ত্তে শ্রীতল ও গভস্তল শব্দ আছে। স্কন্দপুরাণান্তর্গত কুমারিকাখণ্ডে (৩৯.১) আবার মহাতলের স্থানে নিতল শব্দ দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুপুরাণে (২.৫.২) ঐ সাত বিভাগের নাম অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমান্, মহাতল, সুতল ও পাতাল। এইরূপ বিভিন্ন পুরাণে সপ্তপাতালের নামে নানা পার্থক্য রহিয়াছে। এই অতল শব্দ ও গ্রীক্ 'অতলান্তিস্' (Atlantis) শব্দের খুব নিকট সম্বন্ধ।

[নাস্তি তলং যস্য] ২ শূন্য, যাহার তলা নাই। অত্যন্ত গভীর। [নাস্তি তলঃ প্রতিষ্ঠা যস্য] (ত্রি) ৩ অপ্রতিষ্ঠ, ৪ শিব। (হেম°)

অতলন্ত—(ত্রি) [অ-তল-অন্ত] অতল ও অনন্ত ; অগাধ অপার। "অতলন্তসিন্ধু" (হেমচন্দ্র)

অতলস্পর্শ—(ত্রি) [নাস্তি তলস্য অধোভাগস্য স্পর্শো যত্র, বহুব্রী] অগাধ, অতিগভীর।

অতলস্পর্শখাত—(ক্লী) যে গর্ত্তের তলদেশ স্পর্শ করা যায় না। নরক।

অতলস্পৃশ্—(ত্রি) [ন তলং গাধভাগঃ নঞ্-তৎ ; অতলং স্পৃশতি যঃ, অতল-স্পৃশ-কর্ত্তরি ক্বিন্ ; ততঃ কুঃ। ক্বিন্ প্রত্যয়স্য কুঃ। পা ৮.২.৬২] অতলস্পর্শকারী। (ক্লী) ২ জল। (হেম) ন তলে স্পৃশতে স্পৃশ-কর্ম্মণি ক্বিন্। স্পৃশোঽনুদকে ক্বিন্। পা ৩.২.৫৮। উদক ভিন্ন সুবন্ত উপপদের পর স্পৃশ ধাতুর উত্তর ক্বিন্ প্রত্যয় হয়] ৩ অতলস্পর্শ। পর্য্যায়—আস্থা, আস্থাগ, অস্থাঘ, অগাধ।

অতলান্তা, আটলাণ্টা (Atlanta),—উত্তর আমেরিকার জর্জ্জিয়া প্রদেশের একটী নগর এবং ফুল্‌টন্ কাউন্টির বিচার-সদর। চট্টহুচী নদীতীরে সমুদ্রতীর হইতে ১০০০—১১৭৫ ফিট উচ্চ পায়েড্‌মণ্ট অধিত্যকার একাংশে অবস্থিত। এখানকার আবহাওয়া সুখপ্রদ। দারুণ গ্রীষ্মে কখনও ৭৭ ডিগ্রীর অধিক তাপ হয় না।

বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নগরের শ্রীবৃদ্ধি ও লোকসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। দি সাউদারণ, দি সেণ্ট্রাল অব্ জর্জ্জিয়া, দি জর্জ্জিয়া, দি সী-বোর্ড এয়ার লাইন, দি ন্যাশ্‌ভিল্, চট্টনুগা ও সেণ্টলুই, দি লুইভিল ও ন্যাস্‌ভিল, দি আট্‌লাণ্টা, বার্মিংহাম ও আট্‌লাণ্টিক এবং দি আট্‌লাণ্টা ও ওয়েষ্ট পয়েণ্ট রেলপথ এই নগরে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। আট্‌লাণ্টা রেলরোডের স্থাপয়িতা এল্, পি, গ্রাণ্ট ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এখানে সাধারণের সুবিধার্থ "The Grant" উদ্যানস্থল দান করেন। পরে উহা নগর-ব্যবস্থাপকগণ কর্ত্তৃক দক্ষিণপূর্ব্বদিকে ফোর্ট ওয়াকার পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা হয়। এতদ্ভিন্ন পায়েড্‌মণ্ট পার্ক, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত Piedmont Exposition বা প্রদর্শনী, Cotton States and International Exposition প্রদর্শনীভূমি, নগরের ৬ মাইল দক্ষিণে লেকউড এবং পোঁস্ ডি লেঁও পার্ক দেখিবার জিনিস। শেষোক্ত উদ্যানটী ইলেক্‌ট্রিক রেল কোম্পানীর অধিকারে আছে। এখানে "কন্‌ফেডারেট" দিগের অনেকগুলি স্মৃতিস্তম্ভ আছে। তন্মধ্যে কেপিটোল ময়দানে বিখ্যাত সেনানী জন ব্রাউন গর্ডনের অশ্বারোহী মূর্ত্তি, ফিডারেল প্রিজন্, ওকলণ্ড সমাধিক্ষেত্রে "কন্‌ফেডারেট" সৈন্যবৃন্দের স্মরণার্থ স্তম্ভ এবং অজানিত "কন-

ফেডারেট" মৃতের স্মারকস্মৃতি বিখ্যাত। শেষোক্তটী Lion of Lucerne এর একটী অনুকরণ বলিয়া মনে হয়।

এই নগর একটী বিদ্যাকেন্দ্র। এখানকার Georgia School of Technology, Atlanta College of Physicians & Surgeons, The Southern Medical College, Atlanta School of Medicine, The Georgia College of Eclectic Medicine, Atlanta Theological Seminary, Atlanta Dental College, The Southern College of Pharmacy, Washington Seminary প্রধান। এতদ্ভিন্ন নিগ্রোদের জন্য Atlanta University, Clarke University, Atlanta Baptist College, Morris Brown College, Turner Theological Seminary, Spelman Seminary (পরে Atlanta Baptist Female Seminary) এবং ডেকাটুর উপকণ্ঠে Agnes Scott College শ্বেতললনাকুলের জন্য প্রতিষ্ঠিত। এখানে সঙ্গীত এবং নৃত্যকলার সহিত সাহিত্যাদি বিদ্যাদানের ও ব্যবস্থা আছে।

গ্রাডী মেমোরিয়াল হাস্পাতাল, প্রেস্‌বাইটিরিয়ান হাস্‌পাতাল, বাপ্টিষ্ট্ টেবার্ণেকল্ ইন্‌ফার্মারি, ওয়েস্‌লী মেমোরিয়াল হাসপাতাল, সেণ্ট জোসেফ ইনফার্মারি, মিউনিসিপাল হাসপাতাল, ফ্লোরেন্স্ ক্রিটেল্‌ডেন্ হোম, সোলজার্স হোম ও এসোসিয়েট চ্যারিটিজ অব্ আট্‌লাণ্টা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সেবাকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্টার্ণ্ এণ্ড্ আট্‌লাণ্টিক রেলপথ উত্তর জর্জ্জিয়া দিয়া গমন করে এবং অতলান্তা ইহার শেষ ষ্টেশন (terminus) স্থির হয়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় শাসনকর্ত্তা উইল্‌সন লাম্প্‌কিন্ স্বীয় কন্যার নামে এই নগর 'মার্থাস্ ভিলা' নামে অভিহিত করেন। কিন্তু ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ঐ নগর-দানপত্র (City Charter) পুনরায় অতলান্তা নামে পরিবর্ত্তিত হয়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এখানকার লোকসংখ্যা মাত্র ২৫৭২ ছিল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার রাষ্ট্রবিপ্লবে সেনাপতি উইলিয়ম্ টি শেরমান্ প্রথমে জর্জ্জিয়া আক্রমণ করেন। সামরিক ইতিবৃত্তে উহা Atlantic Campaign নামে আখ্যাত। উক্ত বর্ষের ৮ই ও ৯ই জুলাই শেরমান্ দলবলসহ চট্টহুচী নদী অতিক্রম করিয়া অতলান্তায় প্রবেশপূর্ব্বক ডেকাটুর রেলপথ অধিকার করিতে অগ্রসর হন। এখানে ফেডারেল ও কন্‌ফেডারেট দলের সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ সমবেত হইয়া পরস্পরকে বাধা প্রদান করে। ২২এ জুলাই অতলান্তায় যুদ্ধ হয়। ২৮এ জুলাই অতলান্তার ৪ মাইল পশ্চিমে এজ্‌রা চার্চ্চ নামক স্থানে উভয় দলে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ইহাই Battle of Ejra Church নামে পরিচিত। ইহার পর অতলান্তায় গোলাবর্ষণ করিয়া কোন ফল ফলিল না দেখিয়া তিনি ২৫এ আগষ্ট স্বীয় সেনাদল দক্ষিণে পরিচালিত করিয়া পশ্চাৎ হইতে আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। ১লা সেপ্টেম্বর জোন্স্‌বরোর যুদ্ধে পরাজিত হইলে ফেডারেল দল শত্রুহস্তে অতলান্তা সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। শেরমান্ এখানে সেনাদলের ছাউনী স্থাপন করিয়া শত্রুর অনুসরণ করেন। নগর শত্রুনির্ম্মুক্ত করিতে ১৫ই নবেম্বর উহার কতকাংশ জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। পরে জর্জ্জিয়ার রাজধানীরূপে পুনরায় অতলান্তা ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হইতে থাকে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে অতলন্তা যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ্জিয়া প্রদেশের রাজধানী বলিয়া গণ্য হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এখানে কার্পাস উৎপাদনকারীদিগের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী (International Cotton Exposition) খোলা হয়। উহার উদ্দেশ্য কার্পাসের চাষ ও কার্পাসশিল্পের প্রসার বৃদ্ধি। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় এখানে পায়েড্‌মণ্ট প্রদর্শনীর বৈঠক বসে। অতঃপর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে Cotton States and International Exposition বসে। উহাতে প্রায় ৫০টী বিভিন্ন রাজ্য যোগদান করিয়াছিল।

অতলান্তিক—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত আইওয়া (Iowa) বিভাগের অধীন কাস কাউন্টির একটী নগর ও বিচার-সদর। দে মৈনীর ৮০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে নিশ্‌নাবাট্‌না নদীর পূর্ব্বকূলে অবস্থিত। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ইহা নগর বলিয়া গণ্য হয়। এখানে নানাদ্রব্যের কারবার ও শিল্পোৎপাদনের কলকারখানা আছে।

অতলান্তিক মহাসাগর—(আট্‌লাণ্টিক—Atlantic Ocean), সাগরাম্বরা পৃথিবীর একটী বিস্তৃত জলভাগ। ইহার পূর্ব্বসীমায় ইউরোপ ও তন্নিম্নস্থ আফ্রিকা মহাদেশ এবং পশ্চিমে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা; উত্তরে উত্তরমেরুদেশীয় জলখাত ও দক্ষিণে দক্ষিণ মহাসাগর। এই বিস্তীর্ণ জলরাশির সঠিক পরিমাপ অসম্ভব। উত্তরে সুমেরু-বৃত্ত ও দক্ষিণে কুমেরু-বৃত্ত নির্দ্দেশ ব্যতীত সীমাবধারণের অন্যতম সরল উপায় নাই। তবে ভৌগোলিকগণ বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণ ধরিয়া ইহাকে উত্তর ও দক্ষিণ অতলান্তিক বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

উত্তর অতলান্তিক বিভাগ উত্তর গোলার্দ্ধে বিশেষ পরিচিত। সভ্যজগতের বাণিজ্য এখানেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। পশ্চিম উপকূলে কারিবিয়ান্ সাগর, মেক্সিকো উপসাগর, সেণ্ট্ লরেন্স্ উপসাগর ও হাড্‌সন্ উপসাগর লইয়া এবং পূর্ব্ব-উপকূলে উত্তর-সাগর, বলটিক্ সাগর, ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগর লইয়া ইহা সুদূর-বিস্তৃত এবং প্রত্যেক জলভাগের তীরবর্ত্তী দেশ সমৃদ্ধিশালী বন্দরে

সুসমৃদ্ধ। হাড্‌সন প্রণালী, ডেভিস প্রণালী, বেফিন্‌ বে ও নরওয়েজীয় সাগর সুমেরুস্থিত জলরাশির সহিত ইহার সংযোগ করিয়া দিয়াছে। দক্ষিণে আফ্রিকার উপকূল হইতে দক্ষিণ আমেরিকার তীরভূমির ব্যবধান সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। পামাস্‌ অন্তরীপ হইতে সেণ্ট রোক অন্তরীপ মাত্র ১৬০০ মাইল দূরবর্ত্তী। দক্ষিণদিকে দক্ষিণ অতলান্তিক বিভাগ যতই অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে ততই ইহার বিস্তার বাড়িয়া পড়িয়াছে। যেখানে দক্ষিণ মহাসাগরের সহিত ইহা মিলিত হইয়াছে সেখানে ইহার পরিসর ৩৭০০ মাইল। দক্ষিণ অতলান্তিকের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলে কোন বিস্তৃত উপসাগর নাই।

ভূতত্ত্ববিদ্‌ জি, কার্স্‌টনেসের মতে উত্তর অতলান্তিকের বিস্তৃতি ১০,৫৮৮,০০০ বর্গ মাইল। উপকূলবর্ত্তী উপসাগরগুলির পরিমাণ সংযোগ করিলে উহার বিস্তৃতি ১৩,২৬২,০০০ বর্গ মাইল হয়। দক্ষিণ অতলান্তিকের জলবিস্তার ১২,৬২৭,০০০ বর্গ মাইল। অন্যান্য মহাসাগরের তুলনায় ভূপরিমাণ অনেকাংশে অল্প হইলেও ইহাতে সেণ্ট লরেন্স্‌, মিসিসিপী, অরিনকো, আমাজন, লা-প্লাটার নদীসমূহ, কঙ্গো, নাইজার, লয়ার, রাইন, এল্‌ব্‌ এবং ভূমধ্যসাগর ও বল্‌টিকসাগরে নিপতিত নদীসমূহ যে প্রভূত জলরাশি বহন করিয়া আনিয়া ইহার বক্ষে ঢালিয়া থাকে, অন্যান্য সাগরে তাহা নাই। সার জেমস্‌ মারের মতে অববাহিকা-বিধৌত জলরাশির পরিমাণ অনুমান ১৩,৪৩২,০০০ বর্গ মাইল; সুতরাং অতলান্তিক মহাসাগরের জলস্থিতি কম বলিয়া গণ্য করা যায় না।

অতলান্তিক বক্ষে ৫০° উঃ অক্ষাংশ হইতে ৪০° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত একটী পর্ব্বতমালা বিরাজিত আছে। উহার ক্রমোচ্চনিম্নতা, মধ্যে মধ্যে আগ্নেয় পর্ব্বত ও দুইটী পর্ব্বতের মধ্যস্থিত সুগভীর উপত্যকাভূমিই ইহার বিশেষত্ব; কারণ ঐ খোলের ভিতর দিয়া সমুদ্রের জলতরঙ্গ বিভিন্ন পথে পরিচালিত হইয়া থাকে। উত্তর অতলান্তিকের মূল পর্ব্বতমালার উপরিস্থ জলের গভীরতা গড়ে প্রায় ১৭০০ ফাদম স্থির হইয়াছে। উত্তরমেরুর দিকে ইহাই ক্রমশঃ অগভীর হইয়াছে, কারণ ঐ দিকের পর্ব্বতমালা অধিত্যকায় পর্য্যবসিত হইয়া নরওয়েজীয় সাগরে গভীরতায় পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দিকের অধিত্যকা Plateau of Azores নামে অভিহিত। ইহা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া আয়র্লণ্ড হইতে নিউফাউণ্ড্‌লণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ইহা Telegraph Plateau বলিয়া উল্লিখিত। ৫০° উঃ অক্ষাংশের পর এই অধিত্যকা নিম্ন হইয়া উত্তরপূর্ব্ব হইতে আইসলণ্ডের দক্ষিণপশ্চিম ও ফেরো দ্বীপের আগ্নেয়গিরির উৎপাদনে উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে।

অতলান্তিক-গর্ভস্থ প্রধান পর্ব্বতশ্রেণীর উভয় পার্শ্বে গভীর উপত্যকাসমূহ টেলিগ্রাফ প্লেটো হইতে দক্ষিণাভিমুখে দক্ষিণ সমুদ্রে যাইয়া মিলিত হইয়াছে। ঐ সকল স্থানের গভীরতা কোথাও ৩০০০ ফাদমের কম পাওয়া যায় নাই। জেম্‌স্‌ মারে ইহাদিগকে 'Deep' শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে বিস্কে উপসাগরের দিকে ডীপ্‌, মোনাকো ডীপ্‌, আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের চূণ ডীপ্‌, লিবারিয়া-কূলের ক্রেক্‌ ডীপ্‌, কেপ ভার্ডের মোসেলী ডীপ্‌ ও কঙ্গোর বুকানন ডীপ্‌ উল্লেখযোগ্য। উত্তর আমেরিকার উপকূলভাগেও সিগ্‌সবি ডীপ্‌, লিবে ডীপ্‌, সুহ্‌ম ডীপ্‌ এবং বাহামার উত্তরপূর্ব্বস্থ নরেস ডীপ্‌, মাকারভ ডীপ্‌, তিজার্ড ডীপ্‌ ও হাবার্গল ডীপ্‌ আছে। নরেস ডীপের গভীরতা ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ৪৫৬১ ফাদম ছিল।

১৯০৩-১৯০৪ খৃষ্টাব্দে কুমেরু-অভিযানের (Antarctic Expedition) পূর্ব্বে অতলান্তিক মহাসাগর-গর্ভের ৪০° দক্ষিণ অক্ষাংশের যাহা কিছু পরিচয় আমরা জ্ঞাত হইয়াছি, তাহা রস্‌ সাহেবের Erebus ও Terror নামক জাহাজের অভিযান ও অভিজ্ঞতা হইতে। তৎপরে ডাঃ ডবলিউ, এস্‌, ব্রুস তাঁহার দক্ষিণসাগরাভিযানে (The Scottish Antarctic Expedition) সেই সেই স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার ভ্রমনিরসন করেন। ১৮৭৩-১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ জাহাজ H. M. S. Challenger, জর্ম্মন জাহাজ Gazelle (১৮৭৪-১৮৭৬ খৃঃ), ফরাশী জাহাজ Travailleur (১৮৮০), মার্কিন জাহাজ Blake প্রভৃতির কার্য্যাবলীদ্বারা অতলান্তিক-গর্ভের উচ্চতা-নিম্নতা-জ্ঞাপক মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছিল; পরে Valdivia নামক জাহাজে জর্ম্মন্‌ পণ্ডিত কুনের পরিচালিত অভিযান এবং টেলিগ্রাফের তার-স্থাপনকারী জাহাজগুলির অধ্যক্ষ এবং Antarctic Expedition কর্ত্তৃক পরিশোধিত হইয়া তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। জি, কার্স্‌টনেসের মতে উত্তর অতলান্তিকের মধ্যম গভীরতা ২০৪৭ ফাদম এবং দক্ষিণ অতলান্তিকের মধ্যম গভীরতা ২০৬৭ ফাদম।

এই মহাসাগরে দ্বীপাবলীর সংখ্যা অল্প। আইস্‌লণ্ড, বৃটিশ আইল্‌স্‌, নিউফাউণ্ড্‌লণ্ড, ওয়েষ্ট ইণ্ডীজ, ফক্‌লণ্ড, অজোর্স্‌, মেডেইরা, কেনেরী, কেপ ভার্ড দ্বীপপুঞ্জ, এসেন্‌সন, সেণ্ট-হেলেনা, ট্রিস্‌টান্‌ ডি কুনহা ও বুভেট প্রভৃতি দ্বীপ প্রধান। ভূমধ্যসাগরকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলে আরও কতকগুলি দ্বীপ পাওয়া যায়। [ভূমধ্যসাগর দ্র°]

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ আলোচনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে এই মহাসাগরস্থ পর্ব্বতমালা Globigerina ooze, Pteropod ooze ও Diatom ooze দ্বারা প্রধানতঃ গঠিত। দেশভাগের

নদীজলপ্রবাহিত বালুকণায় নীল ও লাল মৃত্তিকাস্তর গঠিত করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে প্রবাল ও আগ্নেয়গিরির উৎপাদিত পদার্থনিচয়েরও স্তর বিদ্যমান। অধ্যাপক E. Suess ও M. Neumayr স্থির করিয়াছেন যে প্রশান্ত-মহাসাগর-গর্ভ বহু প্রাচীন, অতলান্তিক-গর্ভ মাত্র Mesozoic যুগে সৃষ্ট হইয়াছে। Neumayr-এর মতে Jurassic যুগে আফ্রিকা ও আমেরিকার মধ্যে একটী মহাদেশ বিদ্যমান ছিল। F. Kossmat বলেন, Cretaceous যুগেও অতলান্তিক মহাসাগরের আকার অনেকাংশে বর্ত্তমানকালের ন্যায়ই ছিল।

এই বিস্তীর্ণ জলখণ্ড নিরক্ষবৃত্তের উভয় পার্শ্বে উত্তরে ও দক্ষিণে বহুদূর বিস্তৃত থাকিলেও উত্তর বা দক্ষিণ সম-অক্ষাংশ-রেখায় ইহার তাপের বিশেষ তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। উত্তরাংশে বহুল পরিমাণে উপসাগর থাকায় এবং এই বিশাল জলরাশির স্থানে স্থানে জলপ্রবাহেরও বিশেষ বৈষম্য বর্ত্তমান থাকায় ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ উত্তর-অতলান্তিক সমুদ্রভাগকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিয়াছেন। দক্ষিণ সমুদ্রভাগে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলভাগে তাদৃশ উপসাগরাদি বিদ্যমান না থাকায় এখানকার জলস্রোত সেরূপ খরপ্রবাহ নহে। বাত্যান্দোলনেও এখানকার জলগর্ভ তাদৃশ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে না।

বিষুববৃত্তের উভয় পার্শ্বে মকর ও কর্কটক্রান্তিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী উষ্ণপ্রধান স্থানে বায়ুর চাপের আধিক্যজন্য শীত ঋতুতেই সমুদ্রের দক্ষিণাংশে বিশেষ বিক্ষোভ উপলব্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু গ্রীষ্ম ঋতুতে এই চাপ অপেক্ষাকৃত কম অনুভূত হয় এবং ঐ সময়ে গিনি উপসাগরের সমসূত্রবর্ত্তী অক্ষরেখাস্থিত সমুদ্র-পৃষ্ঠে বৃত্তাভাস আকারের বিপরীতমুখী ঝটিকা-মণ্ডল (anti-cyclone zone) উৎপন্ন হয়। এই মণ্ডলের দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত প্রায় ৪০° দক্ষিণ অক্ষাংশব্যাপী সমুদ্রপৃষ্ঠ গ্রহনক্ষত্রের আকর্ষণপ্রভাবে উন্মুক্ত থাকায় নিরন্তর প্রবল পশ্চিমবায়ু বহে এবং জাহাজ ঐ প্রদেশে পড়িলে ঝড়-ঝাপটায় কষ্ট পায়। ৪০° দক্ষিণ অক্ষাংশে নিয়ত ঝড় হয় বলিয়া এখানকার সমুদ্রপৃষ্ঠ "Roaring forties" নামে অভিহিত।

উত্তর অতলান্তিক সমুদ্রভাগে স্থলের আধিক্য ও তুষার-সমুদ্র বিদ্যমান থাকায় বায়ুর চাপ ও তজ্জনিত বায়ুর প্রবাহ বহুল পরিমাণে শিথিল হইয়া পড়ে। আবার ক্রান্তিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী উষ্ণপ্রধান প্রদেশে গ্রীষ্মকালে বায়ুর চাপ অধিক থাকিলেও উত্তপ্ত দেশভাগসংস্পৃষ্ট বায়ু শুষ্ক হইয়া উর্দ্ধমুখে উঠিতে থাকায় উত্তর অতলান্তিক বিভাগস্থ স্থিরবায়ু নিম্ন দিকে আসিয়া উহার সহিত মিলিত হয় এবং উর্দ্ধগত বায়ুর স্থানে সম্মিলিত হইয়া শীত অপেক্ষা গ্রীষ্মের সময় বায়ুর প্রবাহ বৃদ্ধি করে। কিন্তু এই বায়ু-সঞ্চালন বহু দূরবিস্তারী দেশ ও সমুদ্র-পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া যায় বলিয়া তাদৃশ প্রবল বাত্যাবিক্ষোভ হয় না। এই জন্য এই স্থানকে "উত্তর অতলান্তিক নির্ঝটিকা-মণ্ডল" বলা হয়। আরও, উত্তর-আমেরিকা, ওয়েষ্টার্ণ ইউরোপিয়া ও সুমেরু ভূভাগে প্রখর শীতে বায়ুর চাপ বেশী হয় এবং ঐ বায়ু উপরিস্থ স্তর হইতে স্থল-পৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়া উন্মুক্ত সমুদ্র-বক্ষে প্রবাহিত হইয়া উর্দ্ধগ বায়ুর সহিত মিলিয়া বায়ুপ্রবাহে একটা সমতা আনয়ন করে; এই কারণে উত্তর অতলান্তিক ভূভাগে শীত ঋতুতে বায়ুর প্রবাহ কম হইয়া থাকে। বায়ুর এই ভিন্নমুখী গতিনিবন্ধন উত্তর-মেরুপ্রদেশে, বিশেষতঃ লাব্রাদোর হইতে আইস্‌লণ্ড ও জন মায়েন দ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে সমুদ্রস্রোতের ভিন্নমুখী গতি দৃষ্ট হয়। জলমধ্যে ঘূর্ণাবর্ত্ত দেখা দেয় এবং এই স্থানে পুনঃ পুনঃ প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহার ফলে এতদ্দেশে ঋতুর বৈলক্ষণ্য সাধিত হইলে মূলতঃ কোন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় না।

এই অসম বায়ু-প্রবাহ যেখানে স্থিরভাবে ও সমভাবে কার্য্য করে, সেই স্থানের বায়ুগতি প্রাকৃতিক ভূগোলে বাণিজ্য-বায়ু (trade wind) নামে কথিত। ইহা সমুদ্র-পৃষ্ঠে পশ্চিম-মুখী প্রবাহ উৎপাদন করে। ঐ প্রবাহ বিষুবীয় স্রোত (Equatorial current) নামে পরিচিত। এই স্রোতোগতি বিষুবরেখা হইতে উত্তরমুখে প্রধাবিত একটী গতি দ্বারা সংহত হইয়া ভিন্নপথগামী হইয়াছে। এই স্রোত-সংঘাত "বিষুবীয় প্রতিযোগী স্রোত" (Equatorial Counter Current) বলিয়া খ্যাত।

দক্ষিণমুখে সমাগত স্রোত দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে সেণ্ট্-রোক্ অন্তরীপ পর্য্যন্ত আসিয়া দ্বিধা বিভক্ত হইয়া একটী 'ব্রাজিল স্রোত' নামে প্লেট নদী পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং অপরটী উত্তর-পশ্চিম উপকূল বহিয়া ওয়েষ্ট-ইণ্ডীজ দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়া পুনরায় উত্তর বিষুবীয় স্রোতের সহিত মিলিত হইয়াছে। উক্ত দুইটী দ্বিধা বিভক্ত স্রোতোধারা <আকারের ভূখণ্ড দ্বারা সংহত হওয়ায় মেক্সিকো উপসাগর, কারিবিয়ান সাগর ও ওয়েষ্ট ইণ্ডীজ দ্বীপপুঞ্জের বহির্ভাগস্থ বিস্তীর্ণ জলরাশি উপকূলভাগের জলরাশি অপেক্ষা উচ্চ স্তরে উঠিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই জল-সমষ্টি প্রবল বেগে উত্তর আমেরিকার উপকূল দিয়া বহিয়া গিয়াছে। ইহা ভূগোলে "Gulf Stream" নামে অভিহিত। উপসাগরকূলের এই প্রবল স্রোত নিউফাউণ্ডলণ্ডের দক্ষিণপূর্ব্বে একটী স্বতন্ত্র

শীতল স্রোত দ্বারা মূল সমুদ্র হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে; এইজন্য ইহাকে 'শীতল প্রাচীর' (cold-wall) বলা হয়। এই 'গাল্‌ফ্ ষ্ট্রীম'-চালিত জলরাশি লাব্রাদোর হইতে সমাগত স্রোতের সহিত সম্মিলিত হইয়া একটী পূর্ব্বমুখী প্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছে। উহা পশ্চিমা বাতাসের জোরে প্রখর বেগসম্পন্ন ও উত্তালতরঙ্গ-সমাকুল হয়। এই তরঙ্গায়িত স্রোতোরেখা "Gulf Stream Drift" বলিয়া বিদিত।

এই স্রোতোরেখা অতলান্তিক মহাসাগরের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। একটী ক্রমান্বয়ে দক্ষিণাভিমুখে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে কেনেরী দ্বীপ পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। ইহা "Canaries Current" বলিয়া পরিচিত। এই স্রোতোজল এখানে ঘুরিয়া পুনরায় উত্তর বিষুবীয় স্রোতে মিলিত হইয়াছে এবং অপর স্রোতটী উত্তরমুখে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিম দিয়া উত্তরমুখে গিয়াছে। এই উত্তরমুখী স্রোতোবেগের গতি-নির্দ্দেশের জন্য নৌবিদ্যাবিদ্‌গণ যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছেন এবং ইংরেজ, জর্ম্মন্, দিনেমার প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন দেশবাসী নৌ-বিশারদেরা সমুদ্রপৃষ্ঠে বাণিজ্যপণ্য লইয়া পোতচালন যাহাতে সুকর হয় সেইজন্য স্ব স্ব দেশীয় জাহাজ লইয়া সমুদ্রগর্ভস্থ স্রোতোরেখা নির্দ্দেশ করিতে ব্যাপৃত আছেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের পর বিভিন্ন দিক্‌গামী এই স্রোতোমালার জটিল গতি-নির্ণয়ের জন্য একটী "International Council of Study of the Sea" নামক সমিতি স্থাপিত হয়।

এই সমিতির গবেষণার ফলে এবং বাণিজ্যপোতগুলির পরিদর্শনে অবধারিত হইয়াছে যে এই উত্তরমুখী স্রোত ত্রিধা বিভক্ত হইয়া একটী সরাসরি উত্তরদিকে ফেরো ও শেট্‌লণ্ড দ্বীপের মধ্য দিয়া নরওয়ের উপকূল বহিয়া উত্তরমেরু স্রোতে মিলিত হইয়াছে। দ্বিতীয়টী 'আরমিঞ্জার স্রোত' বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা আইস্‌লণ্ডের পশ্চিম দিয়া গিয়াছে এবং তৃতীয়টী ডেভিস্ প্রণালী ও বেফিন বে হইয়া গ্রীনলণ্ড উপকূল পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এই তিনটী শাখা পরস্পরে স্বতন্ত্র স্রোতোগতিতে পরিচালিত হইয়া পুনরায় দক্ষিণমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। প্রথমটী আইস্‌লণ্ড দ্বীপ ঘুরিয়া পূর্ব্বদিকের সমুদ্রজলে মিশিয়াছে, দ্বিতীয়টী গ্রীন্‌লণ্ডের পূর্ব্ব উপকূল ঘুরিয়া আসায় 'গ্রীন্‌লণ্ড স্রোত' নামে আখ্যাত এবং তৃতীয়টী পূর্ব্ব-বর্ণিত লাব্রাদোর স্রোতে মিলিত হইয়া ডেভিস্ প্রণালীর পশ্চিম দিকে আসিয়া মিশিয়াছে। যেখানে সমুদ্রের খাদ যত গভীর সেইস্থানের স্রোত তত প্রখর, কিন্তু যেখানে সমুদ্রগর্ভ স্বল্পগভীর সেখানে স্রোতোবেগ ততই মন্থর।

অতলান্তিক মহাসাগরের এই ভিন্নমুখী স্রোত এবং অনুকূল বাণিজ্য-বায়ু বাণিজ্য-পরিচালনায় বিশেষ উপযোগী হওয়ায় পাশ্চাত্ত্য বণিক্‌গণ বিভিন্নদেশে স্ব স্ব দেশীয় অর্ণবপোত পরিচালনে সমর্থ হইয়াছে এবং বাণিজ্য-ব্যাপারে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা সফলকাম হইয়াছে। উপরিবর্ণিত ঔপসাগরিক স্রোত উপকূলদেশে সংহত হইয়া সমুদ্রপৃষ্ঠের নিম্নদেশে আর একটী আভ্যন্তরিক স্রোত সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাতে স্থানবিশেষে জলের তাপমানের বিভিন্নতা এবং জলগর্ভে প্রভূত পরিমাণে আলোড়ন-বিলোড়ন অনুভূত হইয়া থাকে।

সকল মহাসাগর হইতে অতলান্তিক মহাসাগরের জল অধিক লবণময়। উত্তর অতলান্তিক ভূভাগে ২০° হইতে ৩০° ডিগ্রী উত্তর-অক্ষাংশ মধ্যে এবং দক্ষিণ অতলান্তিক ভূভাগে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল হইতে ১০° হইতে ২০° ডিগ্রী দক্ষিণ-অক্ষাংশে পূর্ব্বদিকে লবণত্ব বেশী অনুভূত হয়। এই বৃত্তদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী বিষুবপ্রদেশে এবং উহার উত্তর ও দক্ষিণ-প্রান্তস্থ সমুদ্রতলে জলের লবণতা অপেক্ষাকৃত কম। আবার ঋতুবিশেষে ও বৎসরবিশেষে জলের লবণতা কম হইতে দেখা যায়। মূলতঃ দক্ষিণ অতলান্তিক হইতে উত্তর অতলান্তিকের জল বেশী লবণাক্ত এবং পূর্ব্বাংশ অপেক্ষা সমুদ্রের পশ্চিমভাগ অত্যধিক লবণময় বলিয়া অনুমিত হয়। এই বিশাল সমুদ্রপৃষ্ঠে দক্ষিণাংশেই জোয়ারের প্রবাহ বেশী।

নানসেন্, এমাণ্ডসেন, স্কট প্রভৃতির মেরুপ্রদেশ পরিভ্রমণফলে অতলান্তিক মহাসাগর-পৃষ্ঠের অনেক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। [মেরু দ্র°]

অতলান্তিক সিটী (আট্‌লাণ্টিক সিটী)—যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জারসী বিভাগের একটী নগর। ফিলাডেলফিয়া নগরের ৫৮ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অতলান্তিক মহাসাগরকূলে অবস্থিত। ইহা মূল দেশভাগ হইতে ৪।৫ মাইল বিস্তৃত জলরেখার দ্বারা বিচ্ছিন্ন। অবসিকন্ বীচ্ নামক একটী বালুকাময় অনুচ্চ দ্বীপের উপর ইহা অবস্থিত। কাম্‌ডেন ও আটলাণ্টিক সিটী নামক রেলপথ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ইহাকে ফিলাডেলফিয়া নগরের সামুদ্রিক স্বাস্থ্যাবাসরূপে পরিগণিত করার কল্পনা হয়। তাহার পর হইতে এখানে সমুদ্রতীরে অনেকগুলি স্বাস্থ্যাবাস ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অতলাস্ (Atlas—আট্‌লাস্)—গ্রীক্ পুরাবৃত্তে বর্ণিত সহগুণের প্রতীক দেবমূর্ত্তি। ইনি টাইটাস্ আয়াপিটস্ ও ক্লাইমেনের পুত্র এবং প্রমিথিউসের ভ্রাতৃরূপে বর্ণিত। হোমারের 'ওডিসী' গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে ইনি সমুদ্রতলে বিরাজিত থাকিয়া স্তম্ভের

দ্বারা পৃথিবী ও স্বর্গকে ধারণ করিয়া আছেন। 'ঐ স্তম্ভদ্বয় পশ্চিম সমুদ্রের দিগ্বলয়ে বিরাজিত'—এই কল্পনা নিরাকৃত হওয়ায় পশ্চিম আফ্রিকার পর্ব্বতমালার অতলাস্ নাম প্রদত্ত হয়। পরে হেস্পারাইডিসের উদ্যান-অধিকারী একজন রাজাকে এবং সর্ব্বশেষে স্ব-র্গোলকের আবিষ্কর্ত্তা একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্‌কে এই নামে বিঘোষিত করা হয়। ইনি প্লিয়াডিস্ ও হাইয়াডিসের পিতা। হোমরের মতে ইঁহার পুত্রের নাম কালিপ্‌সো। ভাস্কর্য্যশিল্পে ইঁহার যে মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে এক বলিষ্ঠকায় পুরুষের গ্রীবাদেশে বা স্কন্ধে স্বর্গোলক বা ভূ-গোলক (Terrestrial globe) স্থাপিত; তিনি এই ভীষণ ভার বহন করিতেছেন। নেপল্‌সের যাদুঘরে একটী প্রাচীন অতলাস্-মূর্ত্তি সংরক্ষিত আছে।

স্থাপত্য-কলায় অতলাস্ মূর্ত্তিশিল্পের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। পম্পিয়াই নগরের সুপ্রসিদ্ধ স্নানাগারে এবং সিসিলী দ্বীপের অগ্রিগেণ্টাম্ মন্দিরে এই মূর্ত্তি সংরক্ষিত আছে।

অতলাস পর্ব্বত—(আট্‌লাস—**Atlas Mountains**)—আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সমুদ্রোপকূলস্থ একটী গিরিশ্রেণী, পশ্চিমদিকে নান অন্তরীপ হইতে পূর্ব্বে গেব্‌স্ উপসাগর পর্য্যন্ত প্রায় ১৫০০ মাইল বিস্তৃত। ইহা মরক্কো, আল্‌জিরিয়া ও টিউনিসিয়া রাজ্য অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ইহার দক্ষিণে বিখ্যাত সাহারা মরুভূমি।

অতলাস পর্ব্বত দুইটী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। একটী সমুদ্রোপকূলস্থ শাখা (Maritime Atlas) নামে প্রসিদ্ধ। ইহা ভূমধ্যসাগরতীরে কিউটা হইতে বন অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার পশ্চাদ্দিকের পর্ব্বতাংশ অপেক্ষাকৃত উচ্চ এবং অতলান্তিক মহাসাগরতীর হইতে সুসের অন্তর্গত ঘীর অন্তরীপ পর্য্যন্ত প্রধাবিত। উক্ত দুইটী শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে সুবিস্তৃত অধিত্যকা বিরাজিত। কিন্তু পশ্চিমাংশ হইতে পূর্ব্বাংশের প্রকৃতিগত পার্থক্য অনেক। এই কারণ পশ্চিমাংশের পর্ব্বতমালা মরক্কো গিরিমালা এবং আলজিরিয়া ও টিউনিসিয়ার পর্ব্বতমালা প্রাচ্যগিরিমালা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

মরক্কোর অধিবাসীরা তাহাদের বর্বর জাতীয় ভাষায় এই পর্ব্বতমালাকে "ইদ্রারেণ দ্রারেণ" অর্থাৎ 'পর্ব্বতের পর্ব্বত' বলিয়া অভিহিত করে। এই পর্ব্বতমালা ৫টী শ্রেণীতে বিভক্ত এবং প্রত্যেক শ্রেণী অপরটীর সমান্তরাল ভাবে উত্তরপূর্ব্ব হইতে দক্ষিণপশ্চিম অভিমুখে অল্প বক্র হইয়া সাহারার দিকে আসিয়া মিলিয়াছে। মরক্কোর এই পর্ব্বতমালার সাধারণ উচ্চতা ১১ হাজার ফিট্, আল্‌জিরিয়ায় ৮ হাজার ও টিউনিসিয়ায় ৬ হাজার ফিট্ উচ্চ। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে মরক্কো হইতে পর্ব্বতের উচ্চতা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া পূর্ব্বাঞ্চলে টিউনিসে সমতল ক্ষেত্রে মিশিয়াছে। মরক্কোর মধ্যশ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ শিখর তিজিন-তাঘারাৎ বা তিন্‌জার ১৫০০০ ফিট উচ্চ। কিন্তু উহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের উচ্চতা ১১৬০০ ফিট। এই পর্ব্বতমালার বিভিন্ন অংশ দিয়া দ্রাআ, সুস, উম্-এর-রাবিয়া, সেবু, মুলবিয়া, ঘীর প্রভৃতি নদী স্ব স্ব অববাহিকা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম, পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম, উত্তর, উত্তরপূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্বে প্রধাবিত হইয়াছে। সাহারার অভিমুখে যে সকল নদী নামিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একমাত্র দ্রাআ ভিন্ন অপর সকলগুলিই সাহারা-বক্ষে জলা বা হ্রদাকার স্বল্প জলবিশিষ্ট সুদীর্ঘ বিলে পরিণত হইয়াছে। নদীগুলির জল পর্ব্বত-গাত্রবাহী হওয়ায় খরস্রোতা। এই জন্য কোন নৌকাই নদীগর্ভে পণ্য লইয়া যাতায়াত করিতে পারে না।

মধ্যশ্রেণীর পর্ব্বতমালা খুব উচ্চ হইলেও উহা অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে যাইবার কোন গিরিপথ নাই। কেবলমাত্র তানসিফ্‌ট ও সুস্ নদীর অববাহিকা-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে গিন্দাফি ও বিবাবান্ নামক স্থানে দুইটী পথ আছে। তাঘারাৎ দিয়া দ্রাআ নদীর অববাহিকায় যাওয়া যায় বটে, কিন্তু পথটী দুরারোহ। তিজিন্-তিলঘেম্‌ট দিয়া তাফিলেট ও বাধ-ঘীর যাইবার পথটী সুগম। উহার উচ্চতা ৭২৫০ ফিট। পশ্চিমে অতলান্তিক উপকূলে এবং সুদূর পূর্ব্বাংশে বহুল পরিমাণে শিলাময় পথ বিদ্যমান থাকায় অনুমান হয় যে তুষার-যুগে (Ice age) এই সকল পথে হিমানী সহ শিলাখণ্ড পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া নিম্নে নামিয়া আসিয়াছিল।

এই মধ্য অতলাস পর্ব্বতের উত্তর অংশটী মধ্য অতলাস এবং দক্ষিণের শ্রেণী ছোট অতলাস বা জেবেল সাঘরু নামে কথিত। ঐ সকল পর্ব্বতের অধিকাংশ স্থানই এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। বনভাগে সিংহাদি পশুরও অভাব নাই। জেবেল সাঘরুর দক্ষিণে সমান্তরাল ভাবে জেবেলবনি এবং মধ্য অতলাস পর্ব্বতের উত্তরে ঘাইয়াট শৈলমালা অনুর্ব্বর ও জঙ্গলে পূর্ণ।

পূর্ব্বাংশের পর্ব্বতমালা এর-রীফ্ প্রদেশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার উত্তর শাখা ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ১৫০ মাইল বিস্তৃত। ফরাসীরা উহাকে Maritime Atlas বা রীফ্ পর্ব্বত বলিয়া থাকেন। আল্‌জিরিয়া রাজ্যে ইহা ৫টী শ্রেণীতে বিভক্ত; তন্মধ্যে জুরজুরা পর্ব্বতমালার লল্লা খদিজা ৭৫৪২ ফিট ও বাবর ৬৪৪৭ ফিট উচ্চ। এই পর্ব্বতমালার মাঝে মাঝে মর্ম্মর প্রস্তরের পাহাড় দেখা যায়। আলজিরিয়ার উপকূল হইতে প্রাচীন রোমকেরা জগদ্বিখ্যাত নিউমিডীয় মর্ম্মরপ্রস্তরের

খনি হইতে পাথর লইয়া রোমের স্থাপত্যশিল্পে সৌন্দর্য্য-সম্ভার সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ইহার পর সর্ব্বদক্ষিণ বা মূলশাখা (ফরাসীদিগের বিবরণীতে) সাহারীয় অতলাস নামে প্রসিদ্ধ। ইহা খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইলেও মূলতঃ এক। ইহা জেবেল কস্থর, জেবেল আমুর, জেবেল ঔরেস্, জাব, জেবেল শেল্লিয়া, মাজেরদা, সিদি আলী বু মুসিন্ প্রভৃতি স্বতন্ত্র নামে পরিচিত। পূর্ব্বদিকে বাট্‌নার নিকটে এবং পশ্চিমে আইন্-সেফ্‌রায় এই পর্ব্বতপৃষ্ঠে রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। ভূমধ্যসাগর-তীরবর্ত্তী বন্দরে নামিয়া এই রেলপথে ভ্রমণকারীরা সাহারায় আসিয়া থাকে।

ইউরোপীয় ভ্রমণকারিগণ গ্রীক্ দেবতা অতলাসের নামে এই পর্ব্বতের নামকরণ করিয়াছেন। [অতলাস্ দ্র°] অতিপ্রাচীনকাল হইতে এখানে বর্ব্বর জাতির বাস ছিল। উহাদের ভিন্ন ভিন্ন শাখার লোকেরা এই পর্ব্বতের যে যে অংশে বাস করিত, সেই সেই অংশের আপনাদের দেশীয় ভাষায় নামকরণ করিয়াছিল। রোমক জাতি সাধারণতঃ সমুদ্রোপকূলস্থ পর্ব্বতের কতক পরিচয় রাখিতেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ইউরোপীয় সেনাদল এল্ অঘোৎ অবরোধ করে। তাহার পর হইতেই অতলাস পর্ব্বতের অভ্যন্তরভাগ পরিদর্শনের প্রচেষ্টা হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট অতলাস পর্ব্বতের আভ্যন্তরিক বিষয় অবগত হইবার জন্য একটী অভিযান প্রেরণ করেন। তৎপূর্ব্বে কাবীলিয়ার পার্ব্বত্য প্রদেশের বিবরণী কোন ইউরোপীয় ভৌগোলিকের হস্তগত হয় নাই।

প্রাচীনকালে মৌরিটানিয়া হইতে পশ্চিম সুদানে মাল লইয়া বণিক্‌দল দক্ষিণ শাখার তিল্‌ঘেম্‌ট্-সঙ্কট দিয়া তফীলাল্‌ট্ মরূদ্যানে আসিত। সাধারণতঃ দাসক্রয়ের জন্যই এখানে তাহাদের আগমন হইত। উহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ইউরোপীয়গণ যে না আসিত এমত নহে। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রেণী কেলী তিম্বক্টু হইতে এই পথে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ১৮৬১-১৮৬২ খৃষ্টাব্দে জেরার্ড রোল্‌ফ্ (Gerhard Rohlfs) এই স্থান অনুসন্ধান করিয়া বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে একটী বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত হয়। ডাঃ জে. ডি. হুকার, মিঃ জন বল ও জি. ম (G. Maw) অতলাস পর্ব্বতের মধ্যভাগ পরিদর্শন করিয়া তথাকার বৃক্ষাদি ও ইউরোপের সহিত তাহাদের পার্থক্য-নির্ণয়ে অগ্রসর হন। তাঁহারা প্রথমে ঐৎ-মিজান উপত্যকা দিয়া উঠিয়া তাঘারাৎ গিরিসঙ্কটে (১১৪৮৪ ফুট) উপনীত হন এবং আমস্‌মিজ উপত্যকা হইতে জেবেল-তেজ শিখরে (১১৯৭২ ফুট) আসেন। অতঃপর ১৮৭৯-১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার অস্কার লেঞ্জ (Dr. Oscar Lenz) অতলাসের প্রধান অংশস্থ তারুদান্তের উত্তরস্থ পর্ব্বতসমূহ জরীপ করিয়া সাহারা হইতে তিম্বক্টু অতিক্রম করেন। তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ১৮৮৩-১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ভিকোঁৎ চ. ডি ফুকল্ড (Vicomte Cha. de Foucauld) বহু স্থান পরিদর্শন করেন। ইহার পর জোসেফ টমসন অতলাসের মধ্যভাগে ও পরে ওয়াল্‌টার বি. হারিস্ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণাংশে অভিযান করেন। ১৯০১ এবং ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মার্কুইস্ ডি সেগোন্‌জাক্ (Marquis de Segonzac) নামক একজন ফরাসী বিস্তৃতভাবে পর্ব্বতপৃষ্ঠ আবিষ্কারে মনোযোগী হন। তাঁহার সহকর্ম্মী ডি ফ্লোট রকবৈর (de Flotte Rocquevaire) প্রধান অতলাসের পশ্চিম অংশ পরিদর্শন করেন।

এই সকল অনুসন্ধান ও অভিযানের ফলে অতলাস পর্ব্বতের উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব ও ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা কতক পরিমাণে মরক্কো, আল্‌জিরিয়া, টিউনিসিয়া ও সাহারা শব্দে বিবৃত হইয়াছে। [তত্তৎ শব্দ দ্র°]

অতলি-ৎসলগী—উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ান্‌দিগের ইরোকোইয়ান্ শাখার অন্তর্ভুক্ত একটী জাতি। ইহারা গুহাবাসী বলিয়া দেশীয় ভাষায় 'ৎসলগী' নামে পরিচিত। ইহারা পূর্ব্বে যুক্তরাষ্ট্রের ওক্‌লাহোমা প্রদেশে বাস করিত এবং আলাবামা, জর্জ্জিয়া, মিসিসিপি, টেনাসি ও পশ্চিম ফ্লোরিডা পর্য্যন্ত ইহাদের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। সাভানা ও টেনাসি নদীদ্বয়ের অববাহিকায় ইহাদের প্রধানতঃ বাস; কিন্তু যাহারা সমতল ভূমিতে বাস করে তাহারা 'এলাতি-ৎসলগী' এবং যাহারা পর্ব্বতের উপরে বাস করে তাহারা অতলি-ৎসলগী বলিয়া পরিচিত। ইংরেজীতে উহা যথাক্রমে লোয়ার চেরোকী (Lower Cherokee) ও আপার চেরোকী (Upper Cherokee) নামে উক্ত হইয়াছে। [চেরোকী দ্র°]

অতব্যংস্—(ত্রি) অতিদুর্ব্বল। "ন নিদ্রায়েথা তবসে অতব্যান্" (ঋক্ ৫.৩৩.১) 'অতব্যানত্যন্তমিব দুর্ব্বলঃ' (সায়ণ)। ২ বৃদ্ধতর; অতিবৃদ্ধ। "ত্বং ত্বা গৃণামি তবসং অতব্যান্" (ঋক্ ৭.১০০.৫)

অতশত—(দেশজ) ঐরূপ নানা কার্য্য; যথা—আমি উহাদের জন্য অতশত করিয়াছি; অর্থাৎ অনেক কার্য্য করিয়াছি। ২ ঐরূপ নানা খুঁটিনাটি ব্যাপার। যথা—আমি অতশত বুঝি না।

অতস্,—(অব্য) [ইদম্ পঞ্চম্যর্থে তসিল্] এই জন্য, এই হেতু। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"। (জৈমিনিসূ°) 'অতঃ শব্দো হেত্বর্থ' (ইতি ভাষ্য)। ২ ইহা অপেক্ষা, ইহা হইতে। "নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।" (শ্বেতাশ্বতর-উপ° ১.১২) "ভাগ্যা-

ধীনমতঃপরম’ ; (শকুন্তলা) অভিধানকারেরা কারণের অপদেশ ও নির্দ্দেশ বিষয়েই ‘অতস্’ শব্দের অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন। (বিশ্বপ্র° পঞ্চম্যন্ত বিশেষ্যপদের ‘এই’ ইত্যাকার বিশেষণ-রূপেও ‘অত°’ শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে। (মনু ১১.৮ ; গীতা ১২.৮ ; রামা° ৩.৮.১৮ ইত্যাদি)।

অতস্২—[এতদ্-পঞ্চম্যর্থে তসিল্। পা ৫.৩.৫,৭] [অতস্, দ্র°]

অতস—(পুং) [অততি গচ্ছতি অত-গতৌ-অসচ্]। বায়ু। ২ আত্মা। ৩ বল্কলনির্ম্মিত বস্ত্র। ৪ অস্ত্র। ‘অতসঃ ক্ষৌমং প্রহরণং বায়ুশ্চেতি ধাতুবৃত্তৌ।’ (মাধব)

অতসায্য—(ত্রি) [অত সাতত্যগমনে ঔণাদিকঃ সায্যপ্রত্যয়ঃ। অড়াগমশ্চ।] যোদ্ধকর্ত্তৃক প্রাপ্তব্য। “অতসায্যা যোদ্ধৃভিঃ প্রাপ্তব্যা”। (ঋক্ ১.৬৩.৬ সায়ণ) ২ সমাশ্রয়ণীয়। “সন্তো যো নৃভ্যো অতসায্যো ভূৎপস্পৃধানেভ্যঃ”। (ঋক্ ২.১৯.৪) ৩ ভিক্ষাপ্রাপ্তি।

অতসী—(স্ত্রী) [অতস-ঙীষ্। অতস শব্দ গৌরাদিগণমধ্যে পঠিত। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্] তিসি, মসিনা। পর্য্যায়—চণকা, উমা, ক্ষৌমী, পার্ব্বতী, সুবর্চ্চলা, পিচ্ছিলা, দেবী, মদগন্ধা, মদোৎকটা, ক্ষুমা, হৈমবতী, সুনীলা, নীলপুষ্পিকা। বৈদ্যক গ্রন্থে ইহার এইরূপ গুণ লিখিত হইয়াছে—উষ্ণ, তিক্ত, বাতঘ্ন, শ্লেষ্মপিত্ত-বৃদ্ধিকর। ইহার তৈলের গুণ—মধুর, পিচ্ছিল, সদ্‌গন্ধ, কষায়। ইহাতে বায়ু ও কাস নষ্ট হয়। স্বাদু, উষ্ণ, ঈষদম্ল, পাকে কটু। [অন্যান্য বিবরণ তিসি শব্দে দ্র°] তিসি শব্দ অতসী শব্দের অপভ্রংশ ; হিন্দী—অলসী।

২ শণবৃক্ষ। [শণ দ্র°] শণের এবং তিসির সূত্রে যে বস্ত্র নির্ম্মিত হয় তাহার নাম ক্ষৌম। ৩ এক প্রকার হরিদ্রাবর্ণ পুষ্প, আতসী ফুল।

“অতসীকুসুম-শ্যামা স্মরি সকৌতুক।
দড় বড়ি চড়ি ঘোড়া অমনি চাবুক।”

কবিবর ভারতচন্দ্র রায় সুন্দরের বর্দ্ধমান-যাত্রাকালে ‘অতসীকুসুম-শ্যামা’—এই রূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। বিদ্যাসুন্দরের টীকাকারেরা বলেন যে, এস্থলে কবির আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ পাইতেছে। কারণ সুন্দর কালীভক্ত ছিলেন ; কিন্তু যাত্রাকালে দুর্গানাম স্মরণ করা চাই। অতএব ‘অতসী-কুসুম-শ্যামা’ বলাতে হরিদ্রাবর্ণ শ্যামা অর্থাৎ দুর্গাকে বুঝাইতেছে ; কাজেই সুন্দর যাত্রাকালে উভয়দিক্ রক্ষা করিয়াছেন।

এই ব্যাখ্যা আমাদের তত ভাল লাগে না। অতসী-কুসুম-শ্যামা অর্থাৎ অতসী ফুলের মত হরিদ্রাবর্ণ কালী বলিলে যেন ‘সোনার পাথর-বাটীর’ মত কথাটা বলা হয়। আমাদের বিবেচনায়, ‘অতসীকুসুম-শ্যামা’ এই বাক্যে মসিনাফুলের মত স্নিগ্ধশ্যামবর্ণ কালী এইরূপ বুঝাইতেছে। যথা “তস্যাতসী-সূনসমানভাসঃ।” (মাঘ ৩.১৭) ‘অতসীসূনেন ক্ষুমা-কুসুমেন সমানভাসঃ তুল্যকান্তেঃ স্নিগ্ধশ্যামস্য ইত্যর্থঃ।’ (মল্লিনাথ) শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনাস্থলে কবি অতসী অর্থাৎ মসিনা ফুলের তুল্য স্নিগ্ধশ্যামবর্ণের উল্লেখ করিয়াছেন। অতসীকুসুম-শ্যামা—এ স্থলেও স্নিগ্ধশ্যামমূর্ত্তি বলিলে অর্থ অধিক সঙ্গত হয়।

অতসীকুসুম কিংবা অতসীপুষ্প বলিলে হরিদ্রাবর্ণ বুঝাইবারও স্থল আছে, কিন্তু তাহাতে বিরোধও অনেক। দুর্গার ধ্যানে উক্ত আছে—“অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং।” এখানে দুর্গার রূপ শণপুষ্পের মত হরিদ্রাবর্ণ এরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু দুর্গার ধ্যানের এই স্থানে পাঠান্তর আছে। পুস্তকবিশেষে দেখা যায়—“তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং”; এইরূপ ‘অতসীপুষ্প’ স্থানে ‘তপ্তকাঞ্চন’ এই শব্দ আছে। আবার কোন কোন ব্যক্তির মত এই যে—‘অতসীপুষ্পবর্ণাভাং’—এটী নীলদুর্গার ধ্যানের বাক্য। জাহানাবাদ প্রভৃতি বাঙ্গালার স্থানবিশেষে এইরূপ রীতি আছে—যোল বৎসর বয়ঃক্রমে কোন বালিকা গর্ভবতী হইলে সেখানকার লোক যোড়শী নীলদুর্গার পূজা করেন। এই নীলদুর্গার ধ্যানে ‘অতসীপুষ্পসঙ্কাশাম’ বা ‘অতসীপুষ্পবর্ণাভাম্’ এইরূপ বিশেষণ আছে।

অতসী শব্দে শণ বুঝায় কি না, সে বিষয়েও অনেক বিরোধ। এই বিরোধের সূত্রপাত অমরকোষের টীকাকারদের জন্য ঘটিয়াছে। অমরে লিখিত আছে—‘অতসী স্যাদুমা ক্ষুমা’—এস্থলে কোন কোন টীকাকার কেবল মসিনা ব্যাখ্যা করেন, কেহ কেহ মসিনা ও শণ এই উভয় প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

বঙ্গদেশে অতসী শব্দে এক প্রকার হরিদ্রাবর্ণ ফুল ও তাহার গাছ বুঝায়। সাধারণে ইহাকে ‘আতসী ফুল’ বলিয়া থাকে। ইহা শণজাতীয় উদ্ভিদ্ এবং শণের ন্যায় ইহাকেও Crotalaria শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। Crotalaria শ্রেণীর ফল বা শুঁটী পাকিয়া গেলে উহা নাড়া দিলে ভিতরে ঝন্ ঝন্ করিয়া বীজগুলি বাজে।

উক্ত ‘আতসী ফুল’ দুই প্রকারের দৃষ্ট হয়। এক প্রকারের দেশীয় নাম ‘বিল-ঝন্‌ঝন্’ (বৈজ্ঞানিক নাম Crotalaria retusa) ; অপর প্রকারের দেশীয় নাম ‘পিপুল-ঝন্‌ঝন্’ (বৈজ্ঞানিক নাম Crotalaria sericea)।

বিল-ঝন্‌ঝন্ গাছ ৩।৪ ফুট উঁচু হয়। ইহার পাতা একটু লম্বাটে, ডগা ছুঁচাল—কতকটা শণ বা অড়হর পাতার মত। ইহা ভারতের সর্ব্বত্র এবং মলাক্কা ও সিংহলে জন্মে।

চীন, উত্তর অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকার গ্রীষ্মপ্রধান প্রদেশ এবং আফ্রিকার কোন কোন স্থানেও এই গাছ দেখা যায়। হাল্কা মাটীতেই ইহা ভাল জন্মে। মাঘ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ইহার ফুল হয়। ফুলগুলি ছোট, থোকা থোকা ও সুন্দর হলুদ রঙের। ভারতের কোন কোন স্থানে শণের ন্যায় ইহার আঁশ তোলা হয় এবং উহা বিক্রয় করা হইয়া থাকে।

পিপুল-ঝন্‌ঝন্ দেখিতে প্রায় বিল-ঝন্‌ঝনের মতই। বিল-ঝন্‌ঝন্ যে সকল স্থানে জন্মে, ইহাও সেই সকল স্থানেই হইয়া থাকে। পঞ্জাবে এবং বঙ্গদেশে ফুলের জন্যই বাগানে এই গাছ রাখা হয়। ইহারও আঁশ তোলা যাইতে পারে; কিন্তু সেজন্য ইহার চাষ কোথাও দেখা যায় না।

৪ রুদ্রপত্নী। ৫ সততগামিনী। (ঋক্ ৮.৩.১৩)

অতসীতৈল—(ক্লী) [বৈদ্যক] অতসীজাত তৈল; চলিত মসিনার তৈল। এই তৈলের গুণ—মধুর, পিচ্ছিল, বাতঘ্ন, কষায়, কফহর ও কাসনাশক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশের মতে এই তৈল—অগ্নিবর্দ্ধক, স্নিগ্ধোষ্ণ, কফপিত্তহর, কটুপাক, অচক্ষুষ্য, বলকর, বাতহর ও ত্বগ্‌দোষনাশক। বাতশান্তির জন্য ইহা বস্তি, পান, নস্য ও অভ্যঙ্গাদি কার্য্যে প্রযোজ্য।

"বস্তৌ পানে তথাভ্যঙ্গে নস্যে কর্ণস্য পূরণে।
অনুপানবিধৌ চাপি প্রযোজ্যং বাতশান্তয়ে।"
(ভাবপ্র°, পূ°)

অতাবক—শিক্ষক। ২ পারস্যের রাজবংশবিশেষ। এই বংশের রাজারা ১১৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সেখ সাদী এই বংশের জনৈক রাজার নামে তাঁহার জগদ্বিখ্যাত 'গুলিস্তান' পুস্তক উৎসর্গ করেন।

অতাবক আবুবকর্—পারস্যাধিপতি অতাবক আবুবকর্ ১১৫৪ হইতে ১১৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহার সময়ে পারস্য ও ভারতের (বিশেষতঃ কাম্বে উপসাগর) মধ্যে বিপুল বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। সেখ সাদী তাঁহার 'গুলিস্তান' কাব্যে অতাবককে স্বীয় রক্ষাকর্ত্তা বা পৃষ্ঠপোষকরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

অতারী—পঞ্জাবের একটী প্রাচীন নগরের নাম। সিকন্দর শা (Alexander) দিগ্বিজয় করিতে আসিয়া এই নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। এখন নগরের চিহ্ন নাই, স্থানে স্থানে কেবল বড় বড় ইট পড়িয়া আছে। সে ইটের গড়ন এখনকার মত নয়; হাজার বৎসরের ভিতর তেমন ইট দিয়া কেহ গৃহ নির্ম্মাণ করেন নাই। এই জন্য অনুমান, অতারী অনেক দিনের শহর। নগরের চতুর্দ্দিকে পরিখা কাটা কেল্লার ভিতরে বড় বড় অট্টালিকা ছিল;—সব ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অতারী কেল্লার এখনও যে ভগ্নাবশেষ আছে, তাহা ১২০০ হাত দীর্ঘ, ৮০০ হাত প্রশস্ত এবং ১২ হাত উচ্চ। কেল্লার মধ্যস্থলে ৩২ হাত উচ্চ একটী মন্দির। আলেক্‌সান্দারের সময়ে এই নগর মাল্লীরাজগণের অধিকারে ছিল। মাল্লীরাজগণ কে, কতকাল সেখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন, এ কথা কেহই বলিতে পারেন না। গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, আলেক্‌সান্দার ঐ স্থান আক্রমণ করিলে এখানকার সৈন্যগণ সেই মহাবীরের অস্ত্রবৃষ্টির সম্মুখে আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারা দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া সমস্ত ঘরগুলিতে আগুন লাগাইয়া দিল। বড় বড় অট্টালিকা ধু ধু শব্দে জ্বলিতে লাগিল, নগরবাসীরা তাহাতেই প্রাণত্যাগ করিল। অতারী মূলতানের সন্নিকটে তুলুম্ব হইতে ১০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। আলেক্‌সান্দার যে নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার নাম কি, কেহই বলিতে পারেন না। উক্ত ভগ্ন কেল্লার নিকটে অতারী নামে একটী পল্লী আছে। এই পল্লী অতারীবালা শিখদের প্রতিষ্ঠিত। উক্ত নাম হইতেই ভগ্ন কেল্লাটীকে লোকে অতারী বলিয়া থাকে।

অতাল মস্‌জিদ—যুক্তপ্রদেশে জৌনপুর নগরের একটী মস্‌জিদ। অতালদেবীর মন্দির ভাঙ্গিয়া ইব্রাহিম শাহ্ কর্ত্তৃক ১৪০৮ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। মুসলমান স্থাপত্যশিল্পের সহিত হিন্দু শিল্পধারার সংমিশ্রণ ইহাতে দৃষ্ট হয়। ইহার তোরণ এবং বৃহৎ হলগুলি খাঁটী মুসলমানী ধরণের—ছড়ান খিলান এবং গম্বুজযুক্ত। উপাসনাগৃহ এবং ভিতরের ঘেরা প্রকোষ্ঠ হিন্দুস্থাপত্যের অনুকরণে নির্ম্মিত। শেষোক্ত অংশগুলিতে চতুষ্কোণ স্তম্ভ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ইহাদের অনেকগুলি স্তম্ভ হিন্দুমন্দির হইতে গৃহীত। মস্‌জিদটী তোগলকের নির্ম্মিত সৌধসমূহের অনুরূপ, কিন্তু তদপেক্ষা মনোহর।

অতা সরাই—নামান্তর ইস্‌লাম্‌পুর। পাটনা জেলার একটী গ্রাম। ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ। অক্ষা° ২৫°৯' উঃ; দ্রাঘি° ৮৫°১৩' পূঃ। এখানকার প্রধান ব্যবসায় হইতেছে তামাক।

অতি—(অব্য) [অত-ই] ইহা ব্যাকরণোক্ত প্রাদি উপসর্গসমূহের অন্যতম। ইহার অর্থ প্রশংসা। ২ অধিক। ৩ প্রকর্ষ। ৪ লঙ্ঘন। ৫ অতিশয়। ৬ ক্রান্তি। ৭ পূজা। ৮ অসম্ভাবনা। ৯ অসম্প্রতি। ১০ নিন্দা, অযোগ্যতা। ১১ ভৃশ। ১২ নির্ভর। ১৩ স্তুতি। ১৪ অবুদ্ধি। ১৫ উৎকট। ১৬ শোভন। ১৭ সম্পূর্ণ, ঠিক। "নাতিকল্যং নাতিসায়ং নাতিমধ্যন্দিনে স্থিতে"। (মনু ৪.১৪০) যথা 'অতিগহনং বুদ্ধেরবিষয়ঃ' (বাচস্পতি) 'অতিশব্দঃ প্রশংসায়াং প্রকর্ষে লঙ্ঘনেঽপিচ নিতান্তাসম্প্রতিক্ষেপবাচকোঽপ্যেষ দর্শিতঃ।' (মেদিনী)

"স্বভাবোহত্যতিরিচ্যতে" (চণ্ডী)। গণরত্নে লিখিত আছে—বিক্রম, অতিক্রম, অবুদ্ধি, ভৃশ ও অতিশয়—এই সকল অর্থে অতি শব্দের প্রয়োগ হয়। "বিক্রমাতিক্রমাবুদ্ধিভৃশার্থাতিশয়েষ্বতি।" (গণরত্ন)

মুগ্ধবোধের টীকাকার লিখিয়াছেন—"অতিশয়ক্রান্তিপূজনাসম্ভাবনেষু।" অতিশয়, ক্রান্তি, পূজা ও অসম্ভাবনা, এই সকল অর্থে অতি শব্দের প্রয়োগ হইবে। কিন্তু অতিক্রম অর্থে ইহার উপসর্গসংজ্ঞা হয় না। যথা—'অতিসিক্তবতিশালীন্' এস্থলে 'অতি'র উপসর্গত্ব অভাবে তৎপরবর্ত্তী 'স'কারের ষত্ব হয় নাই। স্তুতি বা পূজাদি অর্থেও 'অতি'র উপসর্গসংজ্ঞা হয় না। তাই 'অতিস্তুত' প্রভৃতির ষত্বাভাব। কিন্তু কোথাও কোথাও এরূপ ক্ষেত্রেও অতির উপসর্গত্ব দেখা যায়।

অতিক্রম ও পূজার্থে 'অতি'র কর্ম্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়, তাই উহার যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা—'রাজানমতি'।

উপরিলিখিত নানাবিধ অর্থে 'অতি'র সহিত সমাস হয়। যথা—অসম্প্রতি—'সম্প্রতি নিদ্রা ন যুজ্যতে অতিনিদ্রং'। অতিশয়—'অতিশয়েন রাজা অতিরাজঃ'। ক্রান্ত প্রভৃতি অর্থে দ্বিতীয়ান্ত পদের সহিত অতি প্রভৃতি অব্যয়ের সমাস হয়। "অত্যাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থে দ্বিতীয়য়া"। (কাত্যায়ন) ['অতি'র সহিত যে যে শব্দে সমাস হইয়াছে, সেই সেই শব্দের অর্থ তত্তৎ শব্দে দ্র°]

ক্রিয়ার পূর্ব্বে, শব্দের পূর্ব্বে এবং সমাসবাক্যে যেমন 'অতি' শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়, পৃথক্‌ভাবে 'অতি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াও সেইরূপ নানা স্থানে নানা অর্থের প্রকাশকরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। "অতি যো মন্দ্রো যজথায় দেবঃ"। (ঋক্ ২.২৮.১)

বৈদিক প্রয়োগ ভিন্ন অন্যত্রও ইহার বহুল প্রয়োগের অভাব নাই। "তেষু হার্দ্দী তথাপ্যতি"। (মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী)

অতি$_২$—(দেশজ) পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষসূচক শব্দবিশেষ। বংশের পুরুষগণনাকালে বৃদ্ধপ্রপিতামহের ঊর্দ্ধতন পুরুষে অতি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ; অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ।

অতিকটু—(ত্রি) [বৈদ্যক] নিম্বাদি দ্রব্য।

অতিকণ্ট(-ক)—(পুং) [বৈদ্যক] লঘু গোক্ষুরক। ২ দুরালভা।

অতিকথ—(ত্রি) [অতিক্রান্তঃ কথাম্] কথনের অযোগ্য, ২ অশ্রদ্ধেয়। ৩ নষ্ট। ৪ নষ্টধর্ম্ম।

অতিকথা—(স্ত্রী) [অত্যুৎকটা কথা] অত্যুৎকট বর্ণন। ২ বৃথালাপ।

অতিকন্দ(-ক)—(পুং) [অতিরিক্তঃ কন্দো যস্য কপ্] হস্তিকন্দবৃক্ষ। বৈদ্যকমতে হস্তিকন্দনামক মহাকন্দশাক। (রাজনি°)

অতিকর্ষণ—(ত্রি) [অত্যন্তং কর্ষতি কৃষ্-ল্যুট্] অত্যন্ত তাপদায়ক। ২ অত্যন্ত আকর্ষক।

অতিকল্য—(ক্লী) দিনমুখ, উষাকাল, প্রত্যূষ। "নাতিকল্যং নাতিসায়ং"। (মনু ৪.১৪০)

অতিকশ—(ত্রি) [কশায়মতিক্রান্তঃ; প্রাদি-স°] কশা বা চাবুকের আঘাত অতিক্রমকারী; দুর্দ্দান্ত (অশ্ব)। 'অতিকশোঽশ্বঃ' (পা ১.২.১৯১)।

অতিকা—(পুং) (দেশজ) [অতিকায়$_২$ শব্দ দ্র°]। "রুষিল অতিকা বীর"। (কৃত্তিবাসী রামা°)

অতিকান্তা—(স্ত্রী) অতিপ্রিয়া স্ত্রী, যে স্ত্রী স্বামীর অতি প্রিয়া।

অতিকায়$_১$—(ত্রি) [অতিশয়িতঃ কায়ো যস্য; বহুব্রী] বিশাল দেহযুক্ত। ২ বৃহদাকার। (পুং) ৩ বিপুল কলেবর; বিশাল দেহ। "অতিকায় হস্তিকঙ্কাল" (চারুপাঠ) [অতিকায় জীব, বাদুড়, সর্প ও হস্তী দ্র°] ৪ অসাধারণ।

অতিকায়$_২$—(পুং) রাক্ষসরাজ রাবণের বীর্য্যশালী পুত্রগণের অন্যতম। বাল্মীকি-রামায়ণে বিভীষণের মুখে ইহার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—রাবণের ধান্যমালিনী নামে এক পত্নী ছিল, তাহারই গর্ভে অতিকায়ের জন্ম হয়। অতিকায়ের ভীষণ আকৃতি; বলবীর্য্যও অসাধারণ। অতিকায় তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করে। ব্রহ্মার বরে তাহার দেহ সুরাসুরের অবধ্য হইয়াছিল।

লঙ্কাযুদ্ধে মহাপার্শ্ব নিহত হইবার পর রাবণের এই বীর পুত্র অসংখ্য রাক্ষস সৈন্য লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। ইহার আকৃতি ও বিক্রম দেখিয়া বানর-সৈন্যের মনে ভয় হইল, বুঝি কুম্ভকর্ণই আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। মহাবীর লক্ষ্মণের সহিত ইহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। কুমুদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ ও নীল প্রভৃতি বানর-সেনানীরা এই যুদ্ধে লক্ষ্মণের সাহায্য করে। ঘোরতর যুদ্ধের পর লক্ষ্মণ অতিকায়ের শিরশ্ছেদ করেন। [এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ লঙ্কাকাণ্ডের ৭১ সর্গে দ্রষ্টব্য।]

অতিকায় জীব—প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীপৃষ্ঠে বিচরণকারী বৃহৎকায় জীবসকল। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, ১ কোটী ৪০ লক্ষ হইতে ৪০ লক্ষ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মেসোজোয়িক্ (Mesozoic) যুগ। এই যুগে পৃথিবীর বুকে বিশালদেহ সরীসৃপসমূহ বাস করিত। ইক্‌থিওসরাস্ (Ichthyosaurus) এই যুগের অদ্ভুতাকার জীব; ইহা দেখিতে তিমি মাছের মত এবং দৈর্ঘ্যে ৪০ ফুটেরও অধিক। প্লিসিওসরাস্ (Plesiosaurus) সামুদ্রিক সরীসৃপ—ঘাড় জিরাফের মত

লম্বা ; গাত্র কুম্ভীর, তিমি ও কচ্ছপের সংমিশ্রণে গঠিত ; পুচ্ছ ক্ষুদ্র ; পদচতুষ্টয় সন্তরণের উপযোগী (paddle-shaped)। ইহারা স্থলেও বেড়াইতে পারিত ; ঘোড়ার মত মুখ এবং অর্দ্ধেক গিরগিটীর আকারবিশিষ্ট। ডাইনোসরাস্ (Dinosaurus), ডিপ্লোডোকাস্ ও ব্রন্টোসরাস্ (Brontosaurus) বিপুলকায় সরীসৃপ। দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮০ ফুট এবং আনুমানিক ওজন প্রায় ৬০০ মণ। দেহের অনুপাতে ইহাদের মাথা অতি ক্ষুদ্র। ইহারা তৃণভোজী ছিল। উত্তর আমেরিকায় চলিত। এজন্য ইহাদিগকে অতিকায় কাঙ্গারু বলা যাইতে পারে। ইহারা সকলেই তৃণভোজী ও ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী।

ইহার পর কেইনোজোয়িক্ (Cainozoic) যুগ। ইহা মেসোজোয়িক্ যুগের দ্বিতীয় স্তর এবং পেলিওজোয়িক্ (Palæozoic) যুগের প্রথম। এই যুগে পৃথিবীতে স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব হয়।

ইহার পর ইওসিন্ (Eocene) যুগ। এই যুগে মর্কটাকৃতি



শিশুসহ Platurus Fasciatus নামক অতিকায় সামুদ্রিক সর্প। [পরপৃষ্ঠা দ্র°]

প্রাপ্ত ইহাদের অস্থি-সংস্থান হইতে মনে হয়, ইহারা তদ্দেশের কোন কোন অংশে বাস করিত। এতদ্ভিন্ন ইগুয়ানোডন্ (Iguanodon) ৬০।৭০ ফুট লম্বা, অতলান্তোসরাস্ (Atlantosaurus = ১০০ ফুট দীর্ঘ) প্রভৃতি কতকগুলি বৃহদাকার সরীসৃপ এই যুগে আবির্ভূত হয়। [সরীসৃপ দ্র°] ষ্টেগোসরাসের (Stegosaurus) বিশাল পৃষ্ঠ হইতে পুচ্ছদেশ পর্য্যন্ত ডানার ন্যায় কণ্টকশ্রেণী ছিল। কাম্টোসরাসের সম্মুখের পদদ্বয় কাঙ্গারুর ন্যায় ক্ষুদ্র হইত এবং তাহারা লাফাইয়া লাফাইয়া জীবদেহের বিকাশ হয়। ইহার পরবর্ত্তী মাইওসিন্ (Miocene) যুগে মনুষ্যাকৃতি বন্য বানর হইতে ক্রমবিকাশের বিভিন্ন ধারায় বিবর্ত্তিত হইয়া প্রকৃত মনুষ্য অভিব্যক্ত হইয়াছে। মাইওসিন্ যুগে প্রাগৈতিহাসিক গিবন (Gibbon) ও বিরাট্কায় বনমানুষের উৎপত্তি হইয়াছিল। [প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী দ্র°]

তৎপরবর্ত্তী যুগে অসংখ্য অতিকায় হস্তী (Mammoth) পৃথিবীর উত্তরাংশে বিচরণ করিত, তাহা আমরা ভূপঞ্জর হইতে আবিষ্কৃত কঙ্কাল, অস্থি ও তাহাদের সম্পূর্ণ দেহ দেখিয়া জানিতে

পারি। [অতিকায় হস্তী দ্র°] এতদ্ভিন্ন অতিকায় সামুদ্রিক সর্পেরও অভাব নাই। [অতিকায় সর্প দ্র°]

অতিকায় বাদুড়—প্রাগৈতিহাসিক মেসোজোয়িক্ (Mesozoic) যুগের পক্ষ ও চঞ্চুবিশিষ্ট এক প্রকার জীব। ইহারা টেরোডেক্‌টীল্ নামে অভিহিত। ইহাদের পক্ষদ্বয় অনেকটা বাদুড়ের মত বলিয়াই এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। ইহারা খুব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হইত। এমন কি, ইচ্ছা করিলে একজন পূর্ণবয়স্ক মনুষ্যকে ঠোঁটে করিয়া অক্লেশে উড়িতে পারিত। তবে ঐ যুগে সম্ভবতঃ মনুষ্যসৃষ্টি হয় নাই।

অতিকায় সর্প—সমুদ্রগর্ভস্থিত সর্পাকৃতি বৃহৎকায় জীববিশেষ। বর্ত্তমান যুগে নাবিকগণ সমুদ্রযাত্রাকালে সমুদ্রপৃষ্ঠে এইরূপ কএকটী অভাবনীয় জীবদেহ দেখিয়াছেন। তন্মধ্যে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ব্রেজিলের উপকূলে ২০টী বাচ্ছাসহ Platurus fasciatus নামক সামুদ্রিক সর্প, লক্‌নেজ্ হ্রদের কুঁজবিশিষ্ট অতিকায় জীব, উত্তর মহাসাগরের কারিরিয়া সাগরাংশে তদপেক্ষা ভীষণ সর্পাকৃতি দেহ উল্লেখযোগ্য। এই শেষোক্ত জীবটী ৬০ ফুট লম্বা এবং ৬ ফুট মোটা ছিল। উহারা সর্পের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট, কিন্তু ঠিক সর্পজাতীয় জীব কি না, তাহা এখনও মীমাংসিত হয় নাই। প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্লিসিওসরাস্ ভিক্টর (Plesiosaurus Victor) শ্রেণীর মধ্যে এই



প্রাগৈতিহাসিক সর্পাকার সামুদ্রিক জীব।

জাতীয় জীবের অস্তিত্ব ছিল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। উহাদের শ্রেণীবিশেষের ভীষণাকার মুখ, কশেরুকাস্থির উপর ডানার ন্যায় বিস্তৃত কন্টকশ্রেণী প্রভৃতির বর্ণনা হইতে অনুমান হয় যে, ঐ অতিকায় জীব বাইবেল বা পুরাণ-বর্ণিত Dragon বা মকরজাতীয় জলজন্তু বিশেষের অন্যতম। উত্তর মহাসাগরে কুম্ভীরের ন্যায় এক অতিকায় সরীসৃপের কথা U-২৮ নামক ডুবোজাহাজের অধ্যক্ষ ব্যারণ ভন্ ফষ্টনার উল্লেখ করিয়াছেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে একখানি বৃটিশ রণপোত টর্পেডো আঘাতে ডুবাইবার কালে ঐ জন্তুটী জলগর্ভ হইতে ৫০ ফুট উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। জন্তুটা মুহূর্ত্তমধ্যেই ভীষণ শব্দে জলে পড়িয়া অদৃশ্য হইলেও তাহার দেহ মোড়ামুড়ি দিয়া মোচড় খাইয়াছিল। অক্টোপাস্ (Octopus) নামক বৃহদাকার সামুদ্রিক জীবগুলিকেও (Mollusca Cephalopoda) অতিকায় কীটশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। জলগর্ভে ইহাদের শক্তিও অসীম—আকৃতি ভীষণ। [সর্পশব্দে অন্যান্য বিবরণ দ্র°]

অতিকায় হস্তী (Mammoth)—প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী হস্তীর ন্যায় আকারবিশিষ্ট জীববিশেষ (Elephas primigenius)। নিম্ন-এসিয়ার হস্তীর সহিত ইহাদের আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাদিগকে হস্তিজাতির 'Proboscidæ' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। দক্ষিণ এসিয়াখণ্ডে সাধারণতঃ যে সকল হস্তী (E. maximus) দেখা যায়, তাহা হইতে ইহাদের আকারসাদৃশ্য অনেকাংশে ভিন্ন; কিন্তু আমেরিকার দক্ষিণে E. columbi ও প্রাচীন গোলার্দ্ধের E. armeniacus জাতীয় যে হস্তীর নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাদের সহিত এই mammoth জাতীয় হস্তীর কতকাংশে মিল আছে।

উত্তর-সাইবেরিয়ার তুষারাবৃত তুন্দ্রা অঞ্চলে ভূগর্ভের স্তর মধ্যে এই mammoth জাতীয় অতিকায় হস্তীর খণ্ডাস্থি, সমগ্র কঙ্কাল, দন্ত কিংবা মাংসলোমযুক্ত সমগ্র শরীর ইতস্ততঃ নিহিত দেখা যায়। ইহা দেখিয়া মনে হয়, এক সময়ে এই উত্তরাঞ্চলে অসংখ্য অতিকায় হস্তী বিচরণ করিত। কোন আকস্মিক কারণে এতদঞ্চলের শীতাতপের অলঙ্ঘনীয় পরিবর্ত্তন হেতু এই অতিকায় হস্তিবংশ সমূলে নির্ম্মূল হইয়া যায়। লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে তাহারা যেমন ছিল, আবিষ্কৃত অবস্থায় ঠিক তেমনই রহিয়া গিয়াছে। লেলিনগ্রাড যাদুঘরে এই রকমের একটী সম্পূর্ণ হস্তীর দেহ সংরক্ষিত হইয়াছে। [পরপৃষ্ঠায় চিত্র দ্র°]

বর্ত্তমান হস্তী হইতে ইহাদের চর্ব্বণ ও কর্ত্তন-দন্তের পার্থক্য অনেক। পুরুষদের গজদন্ত উপর-মাঢ়ীর কর্ত্তনদন্ত হইতে মস্তকের বাহিরে আসিয়া নিম্নভাবে ক্রমশঃ অগ্রবর্ত্তী হইয়া পুনরায় উহার অগ্রভাগ গোলাকারে উপরদিকে ঘুরিয়া উঠিয়াছে। কোন হস্তীরই গজদন্ত এরূপভাবে গঠিত নহে। উহা প্রায় ৯।১০ ফুট লম্বা হয়। চর্ব্বণের সুবিধার্থ ইহাদের দন্তগুলির তল খাঁজ করা। শেষের কশের দাঁতে ঐরূপ খাঁজ ১৮ হইতে ২৭টী পর্য্যন্ত আছে।

ভারতীয় হস্তীর সহিত ইহাদের কঙ্কালের অনেক মিল আছে; কিন্তু চোয়াল ও কপালের অস্থি অনেকাংশে সরু। কর্ত্তনদন্তমূল গজদন্তসংরক্ষণের উপযোগী দৃঢ় অস্থিদ্বারা সংবদ্ধ। করোটীর উপরে একটী স্বতন্ত্র অস্থি পেশী-সংলগ্ন থাকিয়া দীর্ঘভার মুণ্ড, শুণ্ড ও গজদন্তকে সংযত রাখিয়াছে। শীতপ্রধান স্থানে বাসহেতু ইহাদের গাত্রচর্ম্ম অপেক্ষাকৃত পুরু এবং বহুল পরিমাণ লোমে আচ্ছাদিত।

ভূপৃষ্ঠের যে যে দেশের স্তরগর্ভে এই অতিকায় হস্তীর অস্থি পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, আদিযুগে পৃথিবীর উত্তর প্রদেশেই ইহাদের অধিক বাস ছিল। ইংলণ্ডের প্রায় সকল প্রদেশেই বালুকা ও কঙ্করময় স্তরে অথবা পর্ব্বতের গুহামধ্যে ইহাদের অস্থি-সংস্থান পরিদৃষ্ট হয়। উত্তর-সাগরের মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়া অনেক স্থানেই ইহাদের দন্ত পাওয়া গিয়াছে। আয়র্লণ্ড, স্কট্লণ্ড, স্কান্দিনেবিয়া, ফিন্লণ্ড প্রভৃতি মেরুসমীপবর্ত্তী দেশে আদৌ ইহাদের বাস ছিল না এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মধ্য ইউরোপের সর্ব্বত্র এবং দক্ষিণে ইতালী পর্য্যন্ত ভূভাগে এক সময়ে ইহারা দলবদ্ধভাবে বিচরণ করিত। প্রস্তরীভূত নিদর্শন আজ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

উত্তর-এসিয়ায় ও উত্তর-আমেরিকায় ইহাদের বাস ছিল। Post-Tertiary ও Pleistocene যুগে ইহারা পৃথিবী-বক্ষে বিচরণ করিত বলিয়া অনুমিত হয়। তুষার-যুগের (Glacial period) অগ্রে ও পরে যে ইংলণ্ডে এই অতিকায় জীবের অস্তিত্ব ছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। উত্তর-সাইবেরিয়ার ওবি নদীর মোহানা হইতে বেরিং-প্রণালী পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে এই অতিকায় হস্তী অধিক বাস করিত। তাহার প্রমাণ মৃদ্গর্ভ হইতে উত্তোলিত এবং বাণিজ্যার্থ চীন ও খিবানগরে প্রেরিত গজদন্তের সংখ্যা হইতে অনুমিত হয়।

নিউ-সাইবেরিয়া দ্বীপে, সাইবেরিয়ার উত্তর সাগরবাহী নদী-গুলির মোহানায় এবং তথাকার উত্তর উপকূলভাগে গ্রীষ্মকালে বরফ গলিয়া গেলে, এখনও ভূগর্ভখননে অতিকায় হস্তিদেহ মধ্যে মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। অনেক সময় দণ্ডায়মান অবস্থায় লোম-চর্ম্মাবৃত মামীর আকারে (mummies) হস্তিদেহ পাওয়া গিয়াছে।



লেনিন্‌গ্রাড যাদুঘরে রক্ষিত সাইবেরিয়ায় প্রাপ্ত অতিকায় হস্তীর সম্পূর্ণ দেহ।

অতিকায়াসুর—(পুং) দৈত্যপতি মহিষাসুরের সেনাপতিগণের অন্যতম। দেবাসুর যুদ্ধে আদিত্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইনি নিহত হন। (বরাহপুং)

অতিকারক—(ত্রি) [কারকমতিক্রান্ত ইতি সমাসঃ] শোভন-কারক। (পতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্য ৬.২.১৯১)

অতিকালক—(পুং) কাপালিকভেদ। (শাম্বরতন্ত্র)

অতিকুৎসিত—(ত্রি) অত্যন্ত কুৎসিত।

অতিকুল্ব—(ত্রি) রোমরহিত। "চাতিকুল্বং চাতিলোমশং চ" (শুক্লযজুঃ ৩০.২২)। 'অতিকুল্বং রোমরহিতং' (মহীধর)। ২ সম্পূর্ণরূপ অনাবৃত, মুণ্ডিত, অত্যন্ত নগ্ন, অত্যন্ত অসংস্কৃত, অর্থাৎ যাহার কিছুই সংস্কার করা হয় নাই।

অতিকৃচ্ছ্র—(ক্লী) [অতিক্রান্তং কৃচ্ছ্রং প্রাজাপত্যং তদধিক-কষ্টসাধ্যত্বাৎ। 'অত্যাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থে দ্বিতীয়য়া' ইতি তৎপুরুষ-সং] দ্বাদশরাত্রসাধ্য কঠিন প্রায়শ্চিত্তরূপ ব্রতবিশেষ। বিশেষ বিশেষ অপরাধে কৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র এবং কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রত আচরণের ব্যবস্থা স্মৃতিশাস্ত্রে নিবদ্ধ আছে। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় লিখিত হইয়াছে—ব্রাহ্মণের প্রতি দণ্ড-উত্তোলনে কৃচ্ছ্র, দণ্ডাঘাত করিলে অতিকৃচ্ছ্র এবং ব্রাহ্মণকে আহত করিয়া রুধির উৎপাদনে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রত আচরণীয়।

"বিপ্রদণ্ডোদ্যমে কৃচ্ছ্রস্ত্বতিকৃচ্ছ্রো নিপাতনে।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রোঽসৃক্‌পাতে কৃচ্ছ্রোঽভ্যন্তরশোণিতে॥"
(যাজ্ঞবল্ক্যস° ৩.২৯২)

গোবধকারীর পক্ষেও অতিকৃচ্ছ্র ব্রতাচরণের বিধি আছে। "কৃচ্ছ্রঞ্চৈবাতিকৃচ্ছ্রঞ্চ চরেদ্বাপি সমাহিতঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্যস° ৩.২৬৪)

মনুসংহিতায় অতিকৃচ্ছ্র ব্রত আচরণের এইরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে। যথা—

"একৈকং গ্রাসমশ্নীয়াৎ ত্র্যহাণি ত্রীণি পূর্ব্ববৎ।
ত্র্যহঞ্চোপবসেদন্ত্যমতিকৃচ্ছ্রং চরন্ দ্বিজঃ॥" (মনু ১১.২১৪)

অর্থাৎ প্রথম তিন দিন প্রাতে এক এক গ্রাস, পরে তিন দিন সায়ংসন্ধ্যার পর এক এক গ্রাস এবং তৎপরে তিন দিন অযাচিত আহার ও তৎপরবর্ত্তী তিন দিন উপবাস করিবে।

কুল্লূকভট্ট গ্রাসের সংখ্যা ও পরিমাণ সম্বন্ধে যে পরাশর-বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে জানা যায়—সায়ংকালে দ্বাবিংশতি গ্রাস, প্রাতে ষড়্‌বিংশতি গ্রাস এবং অযাচিত চতুর্ব্বিংশতি গ্রাস গ্রহণীয়। এই গ্রাসের পরিমাণ হইবে কুক্কুটাণ্ডের ন্যায়।

"সায়ং দ্বাবিংশতিগ্রাসাঃ প্রাতঃ ষড়্‌বিংশতিস্তথা।
অযাচিতে চতুর্ব্বিংশঃ পরঞ্চানশনং স্মৃতম্।
কুক্কুটাণ্ডপ্রমাণঞ্চ যাবাংশ্চ প্রবিশেন্মুখম্।" (মনু ১১.২১২, কুল্লূকধৃত পরাশর)

এই শব্দের পুংলিঙ্গে প্রয়োগও দেখা যায়। "অতিকৃচ্ছ্রঃ পর্ণকৃচ্ছ্রঃ"। (বাচস্পতি-ধৃত বিশ্বামিত্র)

[অতিশয়িতং কৃচ্ছ্রং, প্রাদি-স°] ২ অতিকষ্ট, অতি ক্লেশ। (ত্রি) ৩ অতিকৃচ্ছ্রযুক্ত, অতিকষ্টযুক্ত।

অতিকৃত—(ত্রি) [মর্য্যাদাতিক্রমেণ কৃতম্। অত্যাদয়-স°] মর্য্যাদাতিক্রমদ্বারা কৃত পদার্থ। "সর্ব্বত্রাতিকৃতং ভদ্রে ব্যসনায়োপকল্পতে।" (গো° রামা° ৫.২৫.২১)

অতিকৃতি—(স্ত্রী) [মর্য্যাদাতিক্রমেণ কৃতিঃ ; অতি-কৃ-ক্তিন্] মর্য্যাদাতিক্রমদ্বারা করণ। ২ পঞ্চবিংশতি অক্ষরযুক্ত বর্ণবৃত্তবিশেষ।

অতিকৃশ—(ত্রি) অতি ক্ষীণ, অতি দুর্ব্বল। (শুক্লযজুঃ ৩০.২২)

অতিকৃষ্ণ,—(ত্রি) অত্যধিক কৃষ্ণবর্ণ। (শুক্লযজুঃ ৩০.২২)

অতিকৃষ্ণ,—(পুং) বিন্ধ্যগিরির অনুচরভেদ। দেবাসুরযুদ্ধে সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যের জন্য বিন্ধ্য ইহাকে প্রেরণ করেন। (বামনপু°)

অতিকেশ—(ত্রি) যাহার কেশ প্রচুর ও অত্যন্ত দীর্ঘ ; অর্থাৎ অত্যন্ত দীর্ঘ প্রচুর কেশযুক্ত।

অতিকেশ(স)র—(পুং) [অতিরিক্তানি কেশরাণি যস্য ; বহুব্রী] [বৈদ্যক] কুব্জকবৃক্ষ। ২ কুব্জিকাপুষ্পবৃক্ষ। চলিত—কোঙ্কণ দেশীয় পুষ্প। হিন্দী কূজা। (রাজনি°)। ৩ কণ্টকসেবতী। চলিত—কাঁটা সেউতি। (বৈদ্যকশব্দসি°)

অতিক্রম—(পুং) [অতিক্রান্তঃ ক্রমঃ পাদবিক্ষেপঃ, অতি-ক্রম্-ঘঞ্] উল্লঙ্ঘন। পর্য্যায়—অতিপাত, উপাত্যয়, পর্য্যায়। 'পর্য্যায়োঽতিক্রমস্তস্মিন্নতিপাত উপাত্যয়ঃ।' (অমর) ২ ব্রাহ্মণাপূজন অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে পূজা না করা। "কুলান্যকুলতাং যান্তি ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ চ।" (মনু ৩.৬৩) ৩ অতিক্রম ; যুদ্ধে শত্রুর অভিমুখে নির্ভীকভাবে যোদ্ধৃবৃন্দের গমন। (অমর) (ত্রি) [অতিক্রান্তঃ ক্রমমিতি, অত্যাদয়-স°] ৪ লঙ্ঘিতক্রম ; যে ক্রম লঙ্ঘন করিয়াছে। ৫ ব্রতাদির নিয়মভঙ্গ ; অপালন। "অতিক্রমং ব্রতস্যাহুর্ধর্ম্মজ্ঞা ব্রহ্মবাদিনঃ।" (মনু ১১.১২১)

অতিক্রমণ—(ক্লী) [অতি-ক্রম্ পাদবিক্ষেপে ভাবে ল্যুট্] অতিক্রমণ করা, লঙ্ঘন করা। "কালাতিক্রমণং বৃত্তের্যো ন কুর্ব্বীত ভূপতিঃ।" (পঞ্চতন্ত্র) ২ অপহরণ। "ভার্য্যাতিক্রমণঞ্চৈব বিদ্যাৎ সপ্তাততায়িনঃ।" (বিষ্ণুস° ৫.১৯২)

অতিক্রমণীয়—(ত্রি) [অতি-ক্রম্-অনীয়র্] উল্লঙ্ঘনীয় ; অতিক্রমণের যোগ্য। "অনতিক্রমণীয়ং মে সুহৃদ্বাক্যম্" (শকু° ২.১৮)।

অতিক্রমিন্—(ত্রি) [অতি-ক্রম্-ইন্] অতিক্রমকারী, লঙ্ঘনকারী। "ধর্ম্মাতিক্রমিণাং ধর্ম্ম্যং"। (গো° রামা° ৪.১৭.১৪)

অতিক্রান্ত—(ত্রি) [অতি-ক্রম্-ক্ত (কর্ত্তরি)] কৃতাতিক্রম ; যে অতিক্রম করিয়াছে। ২ কৃতক্রমোল্লঙ্ঘন। ৩ অতীত। "অতিক্রান্তে দশাহে চ।" (মনু ৫.৭৬) ৪ কৃতোল্লঙ্ঘন ; ভ্রষ্ট, বিচ্যুত। "ত্বঞ্চ ধর্ম্মাদতিক্রান্তঃ কথং শক্য উপেক্ষিতুং"। (রামা° ৪.১৮.২০)

অতিক্রামক—(ত্রি) [অতি-ক্রম্-ণ্বুল্ (কর্ত্তরি)] অতিক্রমকর্ত্তা। ২ ক্রমোল্লঙ্ঘনকারী।

অতিক্রুদ্ধ—(পুং) [অতি-ক্রুধ্-ক্ত ; প্রাদি-স°] তন্ত্রোক্ত মন্ত্রবিশেষ। ঐ মন্ত্র ২৮ কিংবা ৩১ অক্ষরে গ্রথিত। "অষ্টাবিংশত্যক্ষরো য একত্রিংশদথাপি বা। অতিক্রুদ্ধঃ স বিজ্ঞেয়ো নিন্দিতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥" (বাচস্পতি-ধৃত তন্ত্রবচন) (ত্রি) ২ অতিশয় কোপান্বিত।

অতিক্রুষ্ট—(ক্লী) অসাধারণরোদন, বিলাপ। "অতিক্রুষ্টায় মাগধম্"। (শুক্লযজুঃ ৩০.৫)

অতিক্রূর—(পুং) [অতিশয়েন ক্রূরো বক্রঃ ; প্রাদি-স°] বক্রগতিপ্রাপ্ত মঙ্গল এবং শনিগ্রহরূপ তন্ত্রোক্ত ৩০ অথবা ৩৩ অক্ষরে গ্রথিত মন্ত্রবিশেষ। "ত্রিংশদক্ষরকো মন্ত্রস্ত্রয়স্ত্রিংশদথাপি বা। অতিক্রূরঃ স বিজ্ঞেয়ঃ নিন্দিতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥" (বাচস্পতি-ধৃত তন্ত্রবচন) (ত্রি) অত্যন্ত ক্রূর ; অতি কুটিল।

অতিক্ষিপ্তসন্ধি—(পুং) [বৈদ্যক] সন্ধির অতিশয় বিশ্লেষ। অস্থি

সন্ধিচ্যুত হইয়া উঁচু ভাবে থাকে। তাহাতে উভয় সন্ধির অস্থিরই অতিক্রম এবং উভয়স্থানেই বেদনা হয়। (সুশ্রুত, নিদান°)

অতিখট্ট—(ত্রি) পর্য্যঙ্ক ব্যতীত থাকা ; খাট ব্যতীতও অবস্থান করিতে সমর্থ।

অতিখর—(ত্রি) অত্যন্ত কর্কশ, অতিরূক্ষ। ২ অত্যন্ত ভেদকারক। ৩ প্রচুর ঘ্রাণযুক্ত। ৪ অত্যন্ত ঝাল। ৫ বিশেষ ক্লেশকর।

অতিগ—(ত্রি) [অতিক্রম্য গচ্ছতীতি, অতি-গম্-ড] অতিক্রম করিয়া গমনকারী ; ভেদ করিয়া বহির্গামী। "বাণৈর্দেহাতিগৈঃ"। (রঘু° ১২.৪৮) ২ অতিগামী, পারগামী।" তৈর্য্যগ্‌যোনান্ বয়োঽতিগান্"। (মনু ৭.১৪৯) ৩ অতিশায়ী, অতিপ্রধান। "সর্ব্বলোকাতিগস্যেব লক্ষ্যতে চিত্তবিক্রিয়া"। (রামা° ২.১৯.৩৩)

অতিগণ্ড১—(পুং) [অতিরিক্তঃ গণ্ডঃ ; অত্যাদয়-স°] জ্যোতিষোক্ত বিষ্কুম্ভ প্রভৃতি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত ষষ্ঠ যোগ। "গণ্ডাতিগণ্ডয়োর্নাড়ীপঞ্চকং বর্জ্জয়েৎ"। (জ্যোতিষ-পরিভাষা) অতিগণ্ড যোগে মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিলে বেদনিন্দক, ধূর্ত্ত, কৃতঘ্ন, গলরোগযুক্ত, লোমবান্ এবং দীর্ঘকায়বিশিষ্ট হয়। (কোষ্ঠীপ্র°) [যোগ দ্র°] [বৈদ্যক] ২ স্থূলগণ্ড। (ত্রি) [অতিরিক্তঃ গণ্ডঃ যস্য ; বহুব্রী] ৩ গলগণ্ডরোগযুক্ত।

অতিগণ্ড২—(পুং) এক হিন্দুদেবতার নাম। খুব সম্ভব ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত অতিগণ্ডযোগের অভিমানিনী দেবতা। শ্রীতত্ত্বনিধিতে যে ধ্যান পাওয়া যায়, তাহা এই—

"বাবূলান্বয়সম্ভূতং পঞ্চকোণোপরিস্থিতম্।
অতিগণ্ডাভিধং বন্দে জপস্তং প্রাঙ্মুখং সদা ॥ পাটলবর্ণঃ।"

অতিগণ্ড বাবূলবংশ হইতে সমুৎপন্ন এবং ইনি পাঁচটী কোণের উপর অবস্থান করেন। ইঁহার বর্ণ পাটল এবং ইঁহার জপ সর্ব্বদা পূর্ব্বমুখ হইয়া করিতে হয়।

শ্রীতত্ত্বনিধিতে উল্লিখিত ধ্যান হইতে ইঁহার স্বরূপ ভাল বুঝা যায় না, কিন্তু হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে বর্ণিত বিস্তৃত ধ্যান হইতে ইঁহার রূপকল্পনা বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তাহা নিম্নে বিবৃত হইল—

"অতিগণ্ডাভিধশ্চাথ ষষ্ঠো যোগঃ প্রতীয়তে।
গণ্ডারুণসিতঃ ক্রূরঃ কৃষ্ণবক্ত্রোঽর্কভূষণঃ ॥
স্থূলো বৃদ্ধশ্রুতিস্তুঙ্গনাসিকোঽরুণভূষণঃ।
পিঙ্গশ্মশ্রুজটামৌলি ষড়্ভুজঃ কটিসূত্রবান্ ॥
অক্ষসূত্রং যমাদিস্থে লোহজং করপল্লবে।
এণং মৃগং দ্বিতীয়ে চ তৃতীয়ে চৈব বারিজম্ ॥
পাত্রং বামাদিমে পাণৌ দ্বিতীয়ে শক্তিমেব চ।
পতাকান্তু তৃতীয়ে বৈ দধানঃ কৃষ্ণলোহিতৈঃ।
পূজনীয়ো মহাভক্ত্যা দুষ্টভীতি-নিবৃত্তয়ে ॥"

অতিগণ্ড নামক ষষ্ঠ যোগের নিম্নলিখিত স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। তাঁহার গণ্ডদেশ অরুণ ও সিতবর্ণমিশ্রিত এবং তিনি ক্রূরমূর্ত্তি, কৃষ্ণমুখ-বিশিষ্ট ও সূর্য্যদ্বারা অলঙ্কত। তাঁহার অঙ্গ স্থূল, কাণ লম্বা, নাসিকা উচ্চ এবং তিনি রক্তবর্ণ আভূষণে শোভিত। তাঁহার মাথার জটা এবং শ্মশ্রু পিঙ্গলবর্ণ। তাঁহার ছয়টী হাত এবং কোমরে কটিসূত্র। তিনি তিনটী দক্ষিণ হস্তে লৌহময় অক্ষসূত্র, এণমৃগ এবং কমল ধারণ করেন। তিনটী বামহস্তে পাত্র, শক্তি এবং পতাকা ধারণ করিয়া থাকেন। এই পতাকা কৃষ্ণ এবং লোহিতবর্ণ সংমিশ্রিত। দুষ্টফল নিবৃত্তির জন্য ইঁহাকে মহাভক্তিভাবে পূজা করিতে হয়।

অতিগন্ধ—(পুং) [অতিশয়িতো গন্ধো যস্য ; প্রাদি, বহুব্রী] [বৈদ্যক] চম্পকবৃক্ষ, চাঁপা গাছ। ২ ভূতৃণ ; চলিত গন্ধতৃণ। ৩ মুদ্গরবৃক্ষ। ৪ গন্ধক। (ত্রি) ৫ অতিশয় গন্ধযুক্ত।

অতিগন্ধক—(পুং) [বৈদ্যক] হস্তিকর্ণ পলাশবৃক্ষ। ২ চম্পকবৃক্ষ। (রাজনি°)

অতিগন্ধালু—(পুং) [অতিগন্ধ-আলুচ্ মত্বর্থে] [বৈদ্যক] পুত্রদাত্রীলতা।

অতিগন্ধিকা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] পুত্রদাত্রীলতা ; চলিত জিয়াপুতা। (রাজনি°)

অতিগম্ভীরা—(স্ত্রী) অপ্সরাভেদ। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের নিমিত্ত ইন্দ্র ইঁহাকে ও গম্ভীরা নাম্নী অপর এক অপ্সরাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের শাপে ইঁহারা নদীরূপ প্রাপ্ত হইয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হন। (ব্রহ্মপু°)

অতিগর্ব্বিত—(ত্রি) [অত্যন্তং গর্ব্বিতঃ। অতিগর্ব্ব-ইতচ্] অত্যন্ত অহঙ্কৃত ; অতিশয় গর্ব্বযুক্ত। পর্য্যায়—সমুন্নদ্ধ।

অতিগব—(ত্রি) [অতিক্রান্তোঃ গাং বুদ্ধ্যা। অতি-গো-টচ্] (পা ৫.৪.১২) অত্যন্ত মূর্খ। [অতিক্রান্তো গাং বাচম্ ইন্দ্রিয়ম্ বা] ২ বাক্‌পথাতীত, ব্যাখ্যাতীত। ৩ ইন্দ্রিয়ের অগোচর।

অতিগহন—(ত্রি) অতিদুর্ব্বোধ ; অত্যন্ত গভীর।

অতিগহ্বর—(ত্রি) [অতিক্রান্তো গহ্বরং দুর্ব্বোধত্বেন প্রবেশাযোগ্যত্বাৎ] অতিগহন ; যাহার ভিতর সহজে প্রবেশ করা যায় না।

অতিগুণ—(পুং) [অতিশয়িতো গুণঃ] দাক্ষিণ্য বিনয়াদি গুণ। ২ গুণাতিক্রমণ, গুণহীন। [অতিশয়িতো গুণো যস্য ; প্রাদি, বহুব্রী] উত্তম গুণযুক্ত ; সদ্‌গুণান্বিত।

অতিগুপ্ত—মধ্যভারতের এক বৌদ্ধশ্রমণ। ৬৫২ খৃষ্টাব্দে ইনি চীনদেশে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি একটী বৌদ্ধ-গ্রন্থের অনুবাদ করেন।*

* Bunyiu Nanjio's Catalogue (Chinese Translation of the Buddhist-Tripitaka. Oxford Ed. p. 437).

অতিগো—(স্ত্রী) উত্তম গো, উৎকৃষ্ট গাভী।

অতিগ্রহ—(ত্রি) [অতিক্রান্তো গ্রহং জ্ঞানম্ ; অতি-গ্রহ্-অপ্] অতিশয় দুর্ব্বোধ। [অতিশয়িতো গ্রহো স্বস্ববিষয়স্য জ্ঞানং স্বস্বকার্য্যস্য গ্রহণং বা যেষাং] ২ স্বস্ববিষয়গ্রাহক নেত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়। ৩ গ্রহণাদি স্বস্বকর্ম্মকারক বাগাদি ইন্দ্রিয়। [অতিশয়িতো গ্রহো জ্ঞানং] (পুং) ৪ সর্ব্বথা সম্যক্ জ্ঞান, উত্তম জ্ঞান।

অতিগ্রহণ—(ক্লী) [অতিগ্রহ দ্র°]

অতিগ্রাহ—(পুং) অপানাদি স্পর্শ পর্য্যন্ত আটটী। যথা—অপান, নাম, রস, রূপ, শব্দ, কাম, কর্ম্ম ও স্পর্শ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রাণ, বাক্, জিহ্বা, শ্রোত্র, মন, হস্তদ্বয় ও ত্বক্ এই আটটী গ্রহ এবং উল্লিখিত অপানাদি আটটী অতিগ্রাহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (বৃহদারণ্যক-উ° ৩.২.২-৯)

অতিগ্রাহ্য—(ত্রি) জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে বারত্রয় দেয় আহুতি-বিশেষ। (শতপথব্রা° ৪.৫.৪.২ ; কাত্যায়নশ্রৌত° ১২.৩.২ ; ৫.২.৪ ; ১৩.২.১১) ২ অতিশয় গ্রহণযোগ্য।

অতিগ্রাহ্যমন্ত্র—(পুং) তৈত্তিরীয়-সংহিতার ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য কতকগুলি মন্ত্রকে অতিগ্রাহ্যমন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'গবাময়ন' নামক সংবৎসরব্যাপী যজ্ঞে এই মন্ত্রসমূহ পঠিত হইত। এই সকল মন্ত্রদ্বারা সোমরস ও ঔষধি প্রভৃতি উৎপন্ন করা হইত। (কৃষ্ণযজুঃ ৩.৩.৭, সায়ণ)

অতিঘস—(পুং) বায়ুর অনুচরভেদ। দেবাসুরযুদ্ধে দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যের জন্য বায়ু ইঁহাকে পাঠাইয়া দেন। (বামনপু°)

অতিঘূর্ণতা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] অতিনিদ্রা। "তৃষ্ণাদাহাতিঘূর্ণতা" (ভাবপ্র°, মসূরিকানি°)

অতিঘ্ন—(ত্রি) অত্যন্ত বিনাশকারী।

অতিঘ্ন্য—(ত্রি) অভিভব বা পরাভবকারী। "বৃষা ভূম্যামতিঘ্ন্যঃ"। (অথর্ব্ব° ১১.৯.১৬)

অতিচণ্ডিকা—(স্ত্রী) নবদুর্গামূর্ত্তির অন্তর্গত দুর্গামূর্ত্তি। ইনি ষোড়শ-ভুজা, পীতবর্ণা ও পদ্মাকৃতি-রথারূঢ়া—স্কন্দযামলে এইরূপ লক্ষণ কথিত হইয়াছে। [নবদুর্গা দ্র°]

অতিচমূ—(ত্রি) [চমূমতিক্রান্তঃ] সেনাতিক্রমকারী, সৈন্য-বিজয়ী।

অতিচর₁—(ত্রি) চঞ্চল, ক্ষণভঙ্গুর, অনিত্য, পরিবর্ত্তনীয়।

অতিচর₂—(পুং) [বৈদ্যক] পক্ষিবিশেষ। (বৈদ্যকশব্দসি°)

অতিচরণ—(ক্লী) অতিশয় দক্ষতা ; অপরিমিতকার্য্য-সম্পাদন।

অতিচরণা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] শ্লেষ্মজ যোনিরোগবিশেষ। অনুপযুক্ত আহারবিহার, দুষ্টরজঃ ও বীজদোষ প্রভৃতি কারণে স্ত্রীলোক-দিগের যোনিব্যাপদ্ বা যোনিরোগ হইয়া থাকে। অতিচরণা উক্ত যোনিব্যাপদ্ রোগের অন্তর্গত একপ্রকার যোনিরোগ। অতিরিক্ত মৈথুনে বীজগ্রহণ-শক্তি বিনষ্ট হইলে তাহাকে 'অতিচরণা' যোনি বলে। এই রোগে যোনি পিচ্ছিল, কণ্ডুযুক্ত, অত্যন্ত শীতলস্পর্শ ও বেদনাবোধ হয়। "বহুশশ্চাতিচরণা তয়োর্-বীজং ন বিন্দতি। শ্লেষ্মলা পিচ্ছিলা যোনিঃ কণ্ডুগ্রস্তাতিশীতলা।" (মাধব-নিদান ৩২৯.৫-৬) "সৈবাতিচরণা শোফসংযুক্তাতিব্য-বায়তঃ"। (বাগ্‌ভট, ৩৩ অ°) এই রোগে বস্তিক্রিয়া, তৈলাদি মর্দ্দন, সেচন ও প্রলেপ প্রয়োগ করিবে এবং ঔষধলিপ্ত তূলা বা বস্ত্রখণ্ড যোনিতে ধারণ করিতে দিবে। পিপুল, মরিচ, মাষকলায়, শুল্ফা, কুড় ও সৈন্ধব—এই সকল দ্রব্য দ্বারা তর্জ্জনী অঙ্গুলীর ন্যায় বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া যোনিতে ধারণ করিলে যোনি বিশোধিত হয়। গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও দন্তী—প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া যোনিসেচন এবং তগরপাদুকা, বেগুন, কুড়, সৈন্ধবলবণ ও দেবদারু—এই সকল দ্রব্যদ্বারা তৈলপাক করিয়া উহাতে বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া যোনিতে ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার যোনিব্যাপদ্ই নষ্ট হয়। এই রোগে ফলকল্যাণঘৃত সেবন বিশেষ উপকারী। (ভৈষজ্য-রত্নাবলী, ৬০৭-৬৯০ পৃ° ; চক্রদত্ত, ২৯২-২৯৫ পৃ°)

অতিচরা(-লা)—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] স্থলপদ্ম। (Hibiscus mutabilis) [স্থলপদ্ম দ্র°] ২ ভূততৃণ, ভূতৃণ।

অতিচাপল্য—(ক্লী) অত্যন্ত অস্থিরভাব ; অসাধারণ চাঞ্চল্য।

অতিচার—(পুং) [অতিক্রম্য চরণং গমনম্, অতি-চর ভাবে ঘঞ্] [জ্যোতিষশা°] অতিগমনের অর্থাৎ শীঘ্রগমনের নাম অতিচার। মঙ্গলাদি পাঁচটী গ্রহ তাহাদের গতি দ্বারা যে সময়ে অপর রাশিতে যাইতে পারে, তাহার পূর্ব্বেই অপর রাশিতে গমন করিলে তাহাকে অতিচার বলে। যদি বক্রগতি দ্বারা পূর্ব্ব রাশিতে গমন করে, তাহাকে 'বক্রাতিচার' বলে। বুধ ও বৃহস্পতি যদি বক্রগতি বা অতিচারগতি দ্বারা অন্য রাশিতে গমন করে, তবে (কাহারও মতে) পূর্ব্ব রাশির (বক্রগতি বা অতিচারগতি আরম্ভ সময়ে যে রাশিতে অবস্থিত ছিল তাহার) ফল দান করে। অনেকে উদাহরণ দেখাইয়া বলেন, যদি কোন ব্যক্তি বিদেশে গমন করে, তাহা হইলেও যেমন তাহার স্বদেশের আচারব্যবহারাদি পরিত্যাগ করে না, বুধ ও বৃহস্পতি সেইরূপ তাহাদের পূর্ব্ব রাশির ফলদান করিতে বিরত হয় না। কেহ কেহ বলেন—কোন আলোককে গৃহান্তরে লইয়া গেলে যেমন সে আলোক পূর্ব্ব গৃহের অন্ধকার নষ্ট করে না, যে গৃহে অবস্থিত সেই গৃহের অন্ধকারই নষ্ট করে, সকল গ্রহই সেইরূপ যে গৃহে যখন

অবস্থিত থাকিবে সেই গৃহেরই ফলদান করিবে। অতিচারী গ্রহ কখন কখন পূর্ব্ব রাশিতে ফিরিয়া আসে ও কখন বা পররাশিতেই অবস্থান করিয়া থাকে। বৃহস্পতি অতিচারী হইয়া পররাশিতে গমন করিলে যদি পূর্ব্ব রাশিতে ফিরিয়া না আসে, তবে তাহাকে 'মহাতিচার' বলে। মহাতিচার হইলে সেই বৎসরকে 'লুপ্তসংবৎসর' বলে। লুপ্তসংবৎসরে এক বর্ষ অকাল। এই বর্ষ বার্হস্পত্য বর্ষ। বৃহস্পতি অতিচারগতি দ্বারা পররাশিতে গমন করিয়া পুনর্ব্বার যদি পূর্ব্ব রাশিতে আসে, তবে ৪৫ দিন অকাল হয়। যদি বক্রগতি দ্বারা পূর্ব্ব রাশিতে গমন করে, তবে ২৮ দিন অকাল। যদি বৃহস্পতি বক্রী বা অতিচারী হইয়া সেই রাশিতেই অবস্থান করে, অন্য রাশিতে গমন না করে, তবে অকাল হইবে না। অতিচারী হইয়া বৃষ, বৃশ্চিক বা কুম্ভ রাশিতে গমন করিলেও অকাল হইবে না। ২ শীঘ্রগমন। ৩ অতিক্রম করিয়া গমন।

অতিচারদণ্ড—ন্যায়কে অতিক্রম বা উল্লঙ্ঘন করিলে বিহিত দণ্ড। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'কণ্টক-শোধন' নামক চতুর্থ অধিকরণের একটী প্রকরণের নামই 'অতিচারদণ্ড'। এই প্রকরণে যে যে অপরাধে যে যে দণ্ড বিহিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

ব্রাহ্মণকে অপেয় পান বা অভক্ষ্য ভক্ষণ করাইলে উত্তমদণ্ড (৫০০—১০০০ পণ) হইবে। ক্ষত্রিয়কে ঐরূপ করাইলে মধ্যমদণ্ড (২০০—৫০০ পণ), বৈশ্যকে করাইলে পূর্ব্ব-সাহসদণ্ড (১২—৯৬ পণ) এবং শূদ্রকে করাইলে চতুঃপঞ্চাশৎপণ দণ্ড হইবে। কেহ স্বয়ং অভক্ষ্যভক্ষণ বা অপেয়পান করিলে সমাজচ্যুত ('নির্বিষয়') হইবে। পরগৃহে দিবাভাগে (বলপূর্ব্বক) প্রবেশ করিলে পূর্ব্ব-সাহসদণ্ড, রাত্রিকালে করিলে মধ্যমদণ্ড হইবে; দিবা বা রাত্রি যে কোন সময়ে সশস্ত্র বলপূর্ব্বক পরগৃহে প্রবেশে উত্তমদণ্ড হইবে। যদি বিশেষভাবে নিষিদ্ধ না হইয়া থাকে, তবে ভিক্ষুক, বৈদেহক (অর্থাৎ ফিরিওয়ালা) বিকৃতমস্তিষ্ক বা উন্মাদ ব্যক্তি যদি বলপূর্ব্বক কোন গৃহে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে অথবা প্রতিবেশিগণ যদি বিপৎকালে বলপূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করে, তবে তাহারা দণ্ডনীয় নহে। মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত হইলে স্বগৃহের পরিবার্য্যে (ছাতে) আরোহণে পূর্ব্ব-সাহসদণ্ড, পরগৃহের পরিবার্য্যে আরোহণে মধ্যমদণ্ড হইবে। গ্রাম-আরামোদ্যান এবং ক্ষেত্রের বেষ্টনী ভঙ্গ করিলে মধ্যমদণ্ড বিহিত।

সার্থবাহগণ তাহাদের পণ্যদ্রব্যের মূল্যাদি গ্রামস্বামীকে জানাইয়া গ্রামের একস্থানে অবস্থান করিবে। যে পণ্য রাত্রিকালে গ্রামের বাহিরে প্রেরিত হয় নাই, তাহা অদর্শন বা অপহৃত হইলে গ্রামস্বামী তাহার মূল্য প্রদান করিবে। দুই গ্রামের মধ্যবর্ত্তী স্থলে কোন পণ্যদ্রব্য অদর্শন বা অপহৃত হইলে বিবীতাধ্যক্ষ (গোচরভূমির অধ্যক্ষ) তাহার মূল্য প্রদান করিতে বাধ্য। এরূপ স্থলে যদি গোচরভূমি না থাকে, তবে চোররজ্জুক ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী। যে স্থলে চোররজ্জুক নাই, তথায় পণ্যদ্রব্য হৃত হইলে সীমান্তের (সন্নিহিত স্থলের) অধিবাসিগণ ক্ষতিপূরণ করিবে। সীমান্তে লোকজনের বাস না থাকিলে নিকটবর্ত্তী পঞ্চগ্রাম বা দশগ্রামের অধিবাসিগণ ক্ষতিপূরণ করিবে।

দুর্ব্বল গৃহ, আশ্রয়বিহীন বা নিকৃষ্টাশ্রয়যুক্ত শকট, ঊর্দ্ধে স্তম্ভ বা শস্ত্রযুক্ত শকট, অথবা আচ্ছাদনহীন শকট—এই সকল হইতে অনিষ্টপাতে দণ্ড হইবে। গর্ত্ত বা কূপের মধ্যে এবং উচ্চস্থান হইতে শকটের পতনও দণ্ডনীয় অপরাধ।

বৃক্ষচ্ছেদন, পালিত পশুর রজ্জু অপহরণ, বন্য চতুষ্পদ পশুকে কার্য্যে নিয়োগ, রথ বা হস্তীর উপরে কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, প্রস্তরখণ্ড, দণ্ড ও বাণ নিক্ষেপ, রথ এবং হস্তীর সম্মুখে বাহু-বিক্ষেপ—এই সকল অপরাধ দণ্ডনীয় বলিয়া গণ্য। (রথচালক পথিকের প্রতি) 'সরিয়া যাও' বাক্য উচ্চারণ করিলে, তাহার পর যদি সংঘর্ষ হয়, তবে তাহা দণ্ডনীয় নহে।

হস্তীর রোষ উদ্দীপ্ত করিয়া যদি কেহ তৎকর্ত্তৃক হত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি পূর্ণের এক দ্রোণ কম মদ্যকুম্ভ, মাল্য, অনুলেপন ও হস্তীর দন্তমার্জ্জনার্থ বস্ত্র প্রদান করিবে। কারণ হস্তিদ্বারা নিহত হইলে অশ্বমেধের অবভৃথস্নানতুল্য ফললাভ হয়। এইজন্য পূর্ব্বোক্ত দান 'পাদপ্রক্ষালন' নামে অভিহিত। উদাসীন ব্যক্তি হস্তিদ্বারা হত হইলে চালকের উত্তমদণ্ড বিধেয়। শৃঙ্গযুক্ত বা দংষ্ট্রাযুক্ত প্রাণীর অধিস্বামী যদি ঐ প্রাণিকর্ত্তৃক হন্যমান ব্যক্তিকে উদ্ধার না করে, তবে তাহার পূর্ব্ব-সাহসদণ্ড হইবে। যদি অনুরুদ্ধ হইয়াও উদ্ধারে বিরত হয়, তবে উহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। শৃঙ্গী বা দংষ্ট্রী পশুদিগকে পরস্পর হনন করিতে দিলে নিহত পশুর তুল্য মূল্য দণ্ড হইবে এবং ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত পশু, ঋষভ, উক্ষ এবং গোকুমারীতে আরোহণ করিলে পঞ্চশত পণ দণ্ড হইবে। ঐ সকল পশু চুরি করিলে উত্তমদণ্ড হইবে। লোম বা দুগ্ধপ্রদানকারী, ভারবাহী অথবা আরোহণযোগ্য ক্ষুদ্র পশু হরণ করিলে পশুসমমূল্য দণ্ড দিতে হইবে এবং হৃত পশুও প্রত্যর্পন করিতে হইবে। দেব-পিতৃকার্য্য ব্যতীত অপর উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্রপশু হরণেও ঐ প্রকার দণ্ড।

যে যানবাহী পশুর নাসারজ্জু ছিন্ন হইয়াছে কিংবা যে পশু

যানবাহনে ভালরূপ অভ্যস্ত হয় নাই, সেই পশু যদি কাহাকেও আঘাত করে; যদি কোন পশু শকটসহ সম্মুখ-দিক্ হইতে আক্রমণ করিয়া বা শকটসহ পশ্চাদ্দিকে গমন করিয়া আঘাত করে; অথবা মনুষ্য বা অপর প্রাণিগণের কোলাহলে চমকিত হইয়া যদি কোন পশু কোন অনিষ্ট করে; তাহা হইলে পশুস্বামীর দণ্ড হইবে না। অন্যভাবে পশুকর্ত্তৃক মনুষ্যের অনিষ্ট হইলে পূর্ব্বকথিত দণ্ড হইবে এবং কোন প্রাণী বিনষ্ট হইলে তজ্জন্য ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। যে যান বা শকটের চালনা দ্বারা অনিষ্ট হইয়াছে, তাহার চালক অপ্রাপ্ত-বয়স্ক থাকিলে যানাদির স্বামী দণ্ডনীয়। স্বামীর অবর্ত্তমানে যানারোহী এবং চালক প্রাপ্তবয়স্ক হইলে সে স্বয়ং দণ্ড পাইবে। বালাধিষ্ঠিত বা অনধিষ্ঠিত যান রাজা গ্রহণ করিবেন।

অভিচারদ্বারা অন্যের প্রতি যে ফল উৎপাদনের চেষ্টা করা হয়, তাহা অভিচারকর্ত্তার উপরেই প্রযোজ্য। প্রতিকূলা ভার্য্যার স্নেহলাভার্থ, অথবা পুরুষ যদি স্ত্রীর প্রেমলাভের জন্য অভিচার ক্রিয়া করে, তবে কোন দণ্ড হইবে না। অভিচার দ্বারা অপর লোকের অনিষ্ট হইলে অভিচারকর্ত্তার মধ্যম-সাহসদণ্ড হইবে।

মাতৃস্বসা, পিতৃস্বসা, মাতুলানী, আচার্য্যানী, স্নুষা, দুহিতা বা ভগিনীর প্রতি অভিচার প্রয়োগ করিলে কর্ত্তার লিঙ্গচ্ছেদ ও বধ-দণ্ড হইবে। ঐ কার্য্যে অভিলাষবতী স্ত্রীলোকেরও উক্ত দণ্ড হইবে। দাস, পরিচারক বা আহিত (ভাড়াটিয়া ভৃত্য) ব্যক্তির সঙ্গে ব্যভিচারিণী স্ত্রীরও ঐরূপ দণ্ড হইবে।

অনবরুদ্ধা ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিলে ক্ষত্রিয়ের উত্তমদণ্ড, বৈশ্যের সর্ব্বস্বদণ্ড এবং শূদ্রের কটাগ্নিদগ্ধ-দণ্ড হইবে। রাজভার্য্যাগমনে কুম্ভীপাক-দণ্ড (ভাণ্ডমধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থায় জীবন্ত দগ্ধ করা) হইবে। হীনজাতীয়া স্ত্রীগমনে পুরুষের ললাটে কবন্ধাঙ্ক দিয়া তাহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করা অথবা তাহাকে ঐ স্ত্রীর সহিত সমবর্ণীভূত করা বিধেয়। শূদ্র বা শ্বপাক হীনজাতীয়া স্ত্রীতে উপগত হইলে পুরুষের বধদণ্ড এবং স্ত্রীর নাসাকর্ণচ্ছেদন-দণ্ড কর্ত্তব্য। প্রব্রজিতাগমনে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই চতুর্ব্বিংশপণ দণ্ড হইবে। স্বৈরিণীগমনে পুরুষের দ্বাদশপণ দণ্ড হইবে। যদি একাধিক পুরুষ একই স্ত্রীলোকের প্রতি অভিচার প্রয়োগ করে, তাহা হইলে প্রত্যেক পুরুষেরই চতুর্ব্বিংশতিপণ দণ্ড হইবে। অস্বাভাবিকভাবে স্ত্রীতে উপগত হইলে পূর্ব্ব-সাহসদণ্ড; পুরুষ অপর পুরুষের সহিত সঙ্গত হইলেও পূর্ব্ব-সাহসদণ্ড বিধেয়। বুদ্ধিভ্রষ্ট ব্যক্তি পশুতে উপগত হইলে দ্বাদশপণ দণ্ড হইবে। দৈবত প্রতিমায় উপগত হইলে উহার দ্বিগুণ দণ্ড। রাজা অদণ্ডনীয়কে দণ্ডদান করিলে যে অর্থ দণ্ডস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ত্রিংশৎগুণ করিয়া বরুণকে উৎসর্গান্তে জলে নিক্ষেপ করিবেন; পরে ইহার সমপরিমাণ অর্থ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবেন। এতদ্দ্বারা রাজা অন্যায় দণ্ড গ্রহণের পাপ হইতে মুক্ত হইবেন। কারণ বরুণ নরগণের মধ্যে মিথ্যা-চারীর শাস্তা। (কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ৮৮ প্রকরণ)

বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের অতিচার।

যদি কোন স্ত্রী (ভর্ত্তার) নিষেধ সত্ত্বেও কামভাবোদ্দীপক ক্রীড়ায় রত হয়, কিংবা মদ্যপান করে, তবে তাহার ত্রিপণ দণ্ড হইবে। স্ত্রীর দিবাভাগে স্ত্রীপেক্ষাবিহারগমনে ষট্‌পণ এবং পুরুষপ্রেক্ষাবিহারগমনে দ্বাদশপণ দণ্ড হইবে। রাত্রিকালে উক্ত অপরাধে দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। ভর্ত্তা নিদ্রিত কিংবা পানোন্মত্ত থাকিলে যদি স্ত্রী গৃহের বহির্গত হয়; অথবা স্ত্রী যদি দ্বাররোধ করিয়া ভর্ত্তাকে গৃহপ্রবেশে বাধা দান করে, তাহা হইলে দ্বাদশপণ দণ্ড। রাত্রিতে ঐরূপ স্বামীকে গৃহের বাহিরে রাখিলে দ্বিগুণ দণ্ড। যদি কোন স্ত্রী অপর পুরুষের সহিত রতিক্রীড়ার উদ্দেশ্যে পরস্পর ইঙ্গিত বিনিময় করে বা গুপ্তভাবে আলাপ সম্ভাষণ করে, তাহা হইলে স্ত্রীর চতুর্ব্বিংশতিপণ এবং পুরুষের তাহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। কেশ, নীবী, দন্ত, নখ—এই সকল অবলম্বন করিলে (অর্থাৎ মেলিয়া দেখাইলে) স্ত্রীলোকের প্রথম-সাহসদণ্ড (১২—৯৬ পণ) এবং পুরুষের তাহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। সন্দেহজনক স্থানে সম্ভাষণ করিলে পণের পরিবর্ত্তে বেত্রদণ্ড (শিক্ষাদণ্ড) হইতে পারে। উক্ত অপরাধে অপরাধিনী স্ত্রীলোককে গ্রামমধ্যে চণ্ডালদ্বারা দেহের প্রতিপার্শ্বে (দক্ষিণে ও বামে) পঞ্চ বেত্রাঘাত করাইতে হইবে। শিক্ষাদণ্ডের পরিবর্ত্তে প্রতি আঘাতের জন্য পণপ্রদান করিলেও চলিবে। (কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ৫৯ প্রকরণ)

অতিচ্ছত্র—(পুং) উদ্ভিদ্‌বিশেষ। ইংরেজীতে ইহাকে toadstool ও mushroom বলে। বাঙ্গালায় সাধারণতঃ ইহাদিগকে 'বেঙের ছাতা' বলা হয়। সাধারণ লোকে ইহাকে 'ছাতু'ও বলে।

অতিচ্ছত্র ছত্রাক (Fungi) জাতীয় উদ্ভিদ্। ইহারা বর্ষাকালে ভিজা জায়গায়, পচা কাঠ, গোবর, গাছের উপর, এমন কি মাটীতেও জন্মে। উদ্ভিদ্ হইলেও বীজ দিয়া ইহারা বংশ রক্ষা বা বংশ বিস্তার করে না। বীজের পরিবর্ত্তে ইহারা একপ্রকার অপবীজ (spore) উৎপন্ন করে এবং তাহার দ্বারাই বংশ-রক্ষা হইয়া থাকে।

'বেঙের ছাতা' নিজেদের খাদ্য নিজেরা প্রস্তুত করিতে পারে না। যে সকল পচা জিনিষের উপর ইহারা জন্মে, তাহা

হইতেই খাদ্য সংগ্রহ করে। এইজন্য ইহাদিগকে সাপ্রোফাইট্ (Saprophytes) বলা হয়। ইহাদের শরীর জালের মত ও একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম তন্তু দ্বারা নির্ম্মিত। ইহাদের শরীরকে অণুসূত্র (mycelium) বলা যায়। এই প্রকার শরীর ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য।

আমরা যাহাকে 'বেঙের ছাতা' বলি সেগুলি ক্রমশঃ অণুসূত্র হইতে বংশবিস্তারের জন্য উৎপন্ন হয়। বেঙের ছাতা প্রথমাবস্থায় দেখিতে অনেকটা ডিম্বাকৃতি এবং একটী আবরণ দিয়া ঢাকা থাকে। এই আবরণকে প্রাবর (volva) কহে। ছাতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রাবরটী ছিঁড়িয়া যায় ও তাহার খানিকটা অংশ ছাতার ডাঁটার নিম্নদেশে একটী বাটীর আকার ধারণ করে।

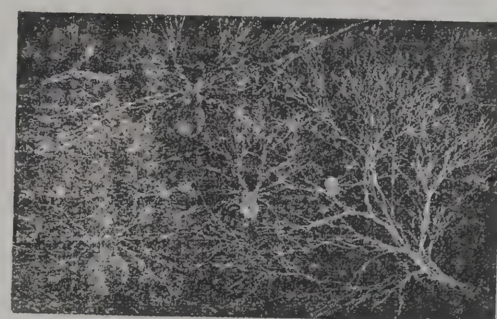
পরিণত ছাতার দুইটী অংশ নির্দ্দেশ করা যায়। একটী টুপির কিংবা ছাতার ন্যায় অংশ—যাহাকে শিরোবেষ্ট (cap or pileus) বলা যায়, এবং তাহার নীচের ডাঁটার ন্যায় অংশ—যাহাকে দণ্ড (stem) বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক শিরোবেষ্টের তলদেশ মাছের কাণকুয়ার ন্যায় অতি পাত্‌লা বহু ফলক পাশাপাশি সজ্জিত থাকে। এই ফলকগুলিকে 'গিল' (gill) বলা হয়। এই ফলকগুলির সহিত শিরোবেষ্টটী একটী আবরণ দ্বারা প্রথমাবস্থায় আবৃত থাকে। শিরোবেষ্টের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই আবরণটী ছিন্ন হইয়া যায়, তখন উহার খানিকটা দণ্ডের সহিত আংটীর মত লাগিয়া থাকে। শিরোবেষ্টের আবরণটীকে পরিধান (partial veil) এবং আংটীর ন্যায় পরিবেষ্টনীকে অঙ্গুরীয়ক (ring) বলা যায়। ফলকগুলির দুই পার্শ্ব হইতে অপবীজগুলি উৎপন্ন হইয়া ঝরিয়া বাতাসে মিশিয়া যায়। অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই উহা হইতে অণুসূত্রের সৃষ্টি হয়।



অতিচ্ছত্রের বিভিন্ন অংশ।

আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই বেঙের ছাতা খাদ্য ও ভেষজ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সুশ্রুত ইহার জন্মস্থান ও গুণের কথা লিখিয়া গিয়াছেন, যথা—

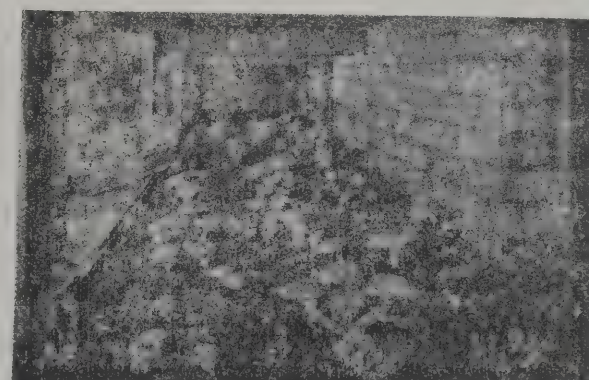
"উদ্ভিদানি পলালেক্ষুকরীষবেণুক্ষিতিজানি। তত্র পলালজাতং মধুরং মধুরবিপাকং রূক্ষং দোষপ্রশমনঞ্চ। ইক্ষুজং মধুরং কষায়ানুরসং কটুকং শীতলঞ্চ। তদ্বদেবোষ্ণগুণং করীষং কষায়ং বাতকোপনঞ্চ। বেণুজাতং কষায়ং বাতকোপনঞ্চ। ভূমিজং গুরু নাতিবাতলং ভূমিতশ্চান্তানুরসঃ॥" (সুশ্রুত) হিন্দুদের প্রাচীন কোষগ্রন্থেও অতিচ্ছত্রের উল্লেখ আছে।



অপবীজ হইতে অণুসূত্রের বিস্তার।

বর্ত্তমানে বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বত্র ইহা খাদ্যদ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত না হইলেও বাঁকুড়া, বীরভূম, সিংভূম, মানভূম, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি জেলার হাটবাজারে ইহা খাদ্যদ্রব্য হিসাবে বিক্রয় হয়।

ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি সভ্য জগতে বেঙের ছাতা একটী উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য। ফরাসী, চীনা ও জাপানীরা বেঙের ছাতার রীতিমত চাষ করে এবং পৃথিবীর নানা স্থানে চালান দেয়। ইহার চাষ অতিশয় লাভজনক ব্যবসা।



ইউরোপে ছাতুর চাষ।

ফ্রান্সদেশে ট্রাফল নামক একপ্রকার ছাতুজাতীয় উদ্ভিদ্ জন্মে; উহা মাটীর ভিতর হয়। উহার সকলগুলির আকার এক রকম হয় না। কোনটা গোল, কোনটা চৌকা, কোনটার বা একদিক্ বাড়িয়া গিয়াছে। এই ট্রাফলের দাম ছাতুর চেয়ে বেশী। আধসের ছাতু ক্রয় করিতে

প্রায় দুই টাকা লাগে; কিন্তু ট্রাফল কিনিতে হইলে আট টাকার কম হয় না। ট্রাফল মাটীর ভিতর কোন্‌খানে জন্মে তাহা মানুষে ভাল বুঝিতে পারে না। একপ্রকার শূকর আছে, তাহারাই জানিতে পারে। তাই ক্ষেত্রস্বামী শূকর লইয়া ক্ষেত্রে যান; ট্রাফল আছে জানিতে পারিলেই শূকরেরা সেই স্থানের মাটী খুঁড়িতে থাকে। ট্রাফল বাহির হইবামাত্র ক্ষেত্রস্বামী শূকরকে না লইতে দিয়া ঝাঁকায় তুলিয়া রাখেন। ছাতু ও ট্রাফল এক জাতীয়, তবে ছাতু ট্রাফল অপেক্ষা একটু উন্নত।

ছাতুর গুণ—সুমিষ্ট ও পুষ্টিকর। ইহার পোলাও রাঁধিলে মাছ ও মাংসের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয় না। যাঁহারা মাছ মাংস না খাইয়া উদ্ভিদ্‌ভোজী হইয়া জীবন ধারণ করেন, তাঁহারা পোলাও খাইতে ইচ্ছা করিলে ছাতুর পোলাও রাঁধিতে পারেন; তাহাতে কোন মতে ঠকিবেন না।

যে সকল ছাতুর বর্ণ কৃষ্ণ বা কৃষ্ণাভ তাহা নিশ্চয় বিষাক্ত জানিবে। যে ছাতুর এক অংশ ভাঙ্গিলে হরিদ্রাবর্ণ বাহির হয়, তাহাও বিষময় মনে করিবে। ছাতু জিহ্বাতে দিলে যদি চিন্‌ চিন্‌ করে, তবে তাহা খাওয়া উচিত নয়। রাঁধিবার সময় ছাতুকে জলে ফুটাইয়া সেই জল ফেলিয়া দিবে, পরে শীতল জলে ধুইয়া লইলে আর কোনরূপ বিষের ভয় থাকে না।

বেঙের ছাতা যেমন একদিকে অতি উপাদেয় খাদ্য, তেমনই ইহাদের কতকগুলি অত্যন্ত বিষাক্ত। সুতরাং বিষাক্ত ও আহার্য্য ছাতা চিনিবার উপায় মোটামুটীভাবে জানা উচিত। অধিকাংশ বিষাক্ত ছাতাই আমানিটা (Amanita) শ্রেণীভুক্ত। আমানিটা-কালয়াডিস্‌ ছাতা খাইয়া শতকরা ৯০ জনের মৃত্যু হইয়াছে এমন জানা গিয়াছে। বিষাক্ত ছাতার দণ্ডের নীচে প্রাবর (volva) থাকে। আহার্য্য ছাতার প্রাবর থাকে না। অধিকাংশ বিষাক্ত ছাতার দণ্ডের উপরিভাগে অঙ্গুরীয়ক (ring) থাকে; আহার্য্য ছাতার এটা নাও থাকিতে পারে। বিষাক্ত ছাতা আমানিটার কতকগুলি 'গিল্‌' শাদা, কিন্তু আহার্য্য ছাতা এগারিকাস্‌ (Agaricus), এন্টোলোমা (Entoloma) প্রভৃতির ফলক প্রথমে গোলাপী রঙের হয়। বিচিত্র বর্ণযুক্ত ও ক্ষীরের ন্যায় শাদা রস যেগুলি হইতে বাহির হয়, তাহা বিষাক্ত। সর্ব্বোপরি অজ্ঞাত ছাতা খাদ্যদ্রব্য হিসাবে একেবারেই পরিত্যজ্য। বিষাক্ত ছাতা উদরস্থ হইলে বমি, মাথা ঘোরা, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

অতিচ্ছত্র$_2$—(পুং) [বৈদ্যক] রক্তকোকিলাক্ষ, রক্তকুলেখাড়া, তালমাখনা। (পর্য্যায়-মুক্তাবলী)

অতিচ্ছত্রক—(পুং) [বৈদ্যক] ভূত-তৃণ, ভূতৃণ, চলিত গন্ধতৃণ। (রাজনি°) ২ বৃক্ষবিশেষ; যে বৃক্ষের মূল ও পত্র বচাকার এবং কটুরসযুক্ত। (রাজনি°) ৩ সপ্তপর্ণবৃক্ষ।

অতিচ্ছত্রা(-ত্রিকা)—(স্ত্রী) [ছত্রমতিক্রান্তঃ, অত্যাদয়-স°] [বৈদ্যক] শতপুষ্পী, অতিচ্ছত্রিকা, শুল্‌ফা, মৌরী। "ছত্রাতিচ্ছত্রে লাঙ্গলীং জটিলাং ব্রহ্মচারিণীং"। (সুশ্রুত) উন্মাদরোগে মহা-পৈশাচিক ঘৃতে উহার ব্যবহার আছে। ভৈষজ্যরত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে শুল্‌ফাকেই 'অতিচ্ছত্রা' বলিয়া ধরা হইয়াছে। "সাতিচ্ছত্রা পলঙ্কসা"। (ভৈষজ্যরত্না°, উ°চি°, ১৯৬ পৃ°) 'অতিচ্ছত্রা' ও 'অতি-চ্ছত্রিকা' রাসায়নিক ওষধিগণের মধ্যেও দেখা যায়। বস্তিক্রিয়ায় অর্থাৎ পিচকারী-কার্য্যে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহা আস্থাপনোপবর্গের অন্তর্গত। (সুশ্রুত) "করেণুস্তত্র কন্যা চ ছত্রাতিচ্ছত্রিকে তথা"। (সুশ্রুত, চি°, ৩০ অ°) ৪ ছত্রবৃক্ষ; ইহার মূলে ও পত্রে বচের ন্যায় ঝাল রস। ৫ ভূতৃণ। ৬ বিষাণিকা। (বাভট, সূ°, ২৯ অ°) ৭ তন্নামক মহৌষধি।

অতিচ্ছন্দস্‌—(ক্লী) [অতিক্রান্তঃ ছন্দঃ বৃত্তানুসারি-বর্ণবিন্যাস-ভেদঃ; অত্যাদয়-স°] উক্‌থ প্রভৃতি ছন্দঃ অতিক্রমপূর্ব্বক বিন্যস্ত অক্ষরবিন্যাসবিশেষ। "প্রাজাপত্যাস্বতিচ্ছন্দাঃ" (ঋক্‌প্রাতি-শাখ্য ১৭.৭) "অতিচ্ছন্দসঃ শংসতি" (ঐতরেয়ব্রা° ৪.৩; শতপথব্রা° ৩.৩.২.১১; ৪.৬.৯.১৩) ২ ছন্দোবিশেষ। ইহার ছয় অথবা সাতটী চরণ থাকিবে। (শাঙ্খায়নশ্রৌত° ৭.২৭) [ছন্দঃ বেদঃ অভিপ্রায়ো বা তদতিক্রান্তঃ] (ত্রি) ৩ বেদোক্ত ক্রিয়াহীন। ৪ অভিপ্রায় অতিক্রমকারী।

অতিজগতী$_1$—(স্ত্রী) [জগৎ-স্ত্রীত্বাৎ ঙীপ্‌; অতিক্রান্তা জগতীং দ্বাদশাক্ষরপাদমেকাক্ষরাধিক্যাৎ; অত্যাদয়-স°] ছন্দোবিশেষ। তেরটী অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দোবিশেষের নাম। "যথাতিজগত্যাং" (পিঙ্গল)। (ত্রি) ২ জগৎ অতিক্রমকারী; যে জগৎকে অর্থাৎ সংসারকে অতিক্রম করে। (পুং, ক্লী) ৩ জগৎ।

অতিজগতী$_2$—(স্ত্রী) দ্বিপঞ্চাশৎ অক্ষরযুক্ত বৈদিক ছন্দো-বিশেষ। "প্রথমাতিজগত্যাসাং (অতিচ্ছন্দসাং) সা দ্বিপঞ্চাশ-দক্ষরা"। (ঋক্‌প্রাতিশাখ্য ১৬.৫২)

অতিজন—(ত্রি) [জনমতিক্রান্তঃ] জনমানবহীন (দেশ)। [অত্যাধিকো জনঃ] ২ জনাকীর্ণ। (ছান্দোগ্যপ°, ৬.১৪.১)

অতিজর, অতিজরস্‌—(ত্রি) [জরামতিক্রান্তঃ; প্রাদি-স°] জরাতিক্রমকারী, বার্দ্ধক্য-বিরহিত। (পা ৭.২.১০১ কাশিকা) ২ অতিশয়বৃদ্ধ; অত্যন্ত জরাগ্রস্ত।

অতিজল—(ত্রি) অত্যধিক জলসম্পন্ন। ২ স্বচ্ছজলসম্পন্ন।

অতিজব—(ত্রি) [অতিশয়িতো জবো বেগো যস্য; বহুব্রী] অত্যন্ত বেগবান্‌, অতিশয় দ্রুতগামী। পর্য্যায়—জঙ্ঘাল, জঙ্ঘিল; অতিবল। (অমর-টীকা) [অতিশয়িতো জবঃ; প্রাদি-স°]

(পুং) ২ অতিবেগ। কালীঘাটের গঙ্গাদর্শনে জনৈক কবি একটী সুন্দর শ্লোক রচিয়াছিলেন—

"সগরসন্ততিসন্তরণেচ্ছয়া প্রচলিতাতিজবেন হিমালয়াৎ।
ইহ হি মন্দমুপৈতি সরস্বতীযমুনয়োর্বিরহেন হি জাহ্নবী॥" (উদ্ভট)

অতিজাগর—(পুং) [অতিশয়িতো জাগরো নিদ্রারাহিত্যং যস্য; বহুব্রী] নীল ক্রৌঞ্চ; নীলবর্ণ বকপক্ষী, কাল বক। নীল বককে সচরাচর কোয়াবক বলা যায়। ইহা দেখিতে প্রায় কোঁচবকের মত। পালক সম্পূর্ণ নীল নহে; কিঞ্চিৎ নীলের আভাযুক্ত। ইহারা রাত্রিকালে ডাকিতে ডাকিতে চরিয়া বেড়ায় তজ্জন্য ইহাদের নাম অতিজাগর। রাত্রিকালে অল্প শীতের পর ঘুস্ ঘুসে জ্বর আসিলে কেহ কেহ এই বকের নখ গলায় বাঁধিতে বলেন। (ত্রি) ২ যে অত্যন্ত জাগিয়া থাকে। [জাগরা সম্প্রতি ন যুজ্যতে অতিজাগরম্] (অব্য) ৩ জাগরণের অযোগ্য সময়; জাগর্য্যা।

অতিজাত—(ত্রি) গুণে অতিক্রম করিয়া গৃহীত জন্ম; গুণবত্তররূপে জাত। "অতিজাতোঽধিকস্তস্মাৎ"। (পঞ্চতন্ত্র)

অতিজীব—(ত্রি) [অতিশয়িতো জীবঃ] অতিশয় জীবনীশক্তিযুক্ত। "অমত্রির্ভবামৃতো অতিজীবঃ"। (অথর্ব্ব° ৮.২.২৬)

অতিজৃম্ভ—(পুং) [বৈদ্যক] বায়ুরোগবিশেষ। (বৈদ্যকনি°)

অতিডীন—(ক্লী) [ডীঙ্ ভাবে ক্ত তকারস্য নত্বং, অতিক্রান্তং ডীনং গতিভেদং; অত্যাদয়-স°] পক্ষীদের অতি উড্ডয়ন, প্রচণ্ড গমন; পক্ষীদের অতি দীর্ঘ গমন; নভোগমন। (মহাভা°, কর্ণ°, ৪১.২৭)

অতিতপস্বিনী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] গোরক্ষমুণ্ডী; চলিত গোরক্ষচাকুলিয়া। (ভাবপ্র°)

অতিতমাম্, অতিতরাম্—(অব্য) [অতি-তমপ্, অতি-তরপ্, আমু] অত্যন্ত। "অতিতরাং হ বৈ স ইতরস্মাদগ্নেস্তপতি" (শতপথব্রা° ১.৪.৩.১)

অতিতর্পণ—(ক্লী) অতিতৃপ্তি। (বাভট, সূ°, ৮ অ°)

অতিতার—(পুং) [অতিশয়িতস্তারঃ] মুক্তাদির অতিশয় শুদ্ধি। ২ অতিশয় উচ্চস্বর। (ত্রি) ৩ উচ্চস্বরযুক্ত। ৪ অতিশয় বিশুদ্ধ মুক্তাবিশিষ্ট। "অতিতারহার"। (কাদম্বরী)

অতিতারিন্—(ত্রি) অতিক্রমকারী। "ইরাবত্যতিতারিণী"। (ঐতরেয়ব্রা° ৭.১৩)

অতিতার্য্য—(ত্রি) অতিক্রম্য, অতিক্রমণযোগ্য; লঙ্ঘনীয়। "যে মৃত্যব একশতং যা নাষ্ট্রা অতিতার্য্যাঃ"। (অথর্ব্ব° ৮.২.২৭)

অতিতীক্ষ্ণ—(ত্রি) [তিজ-স্ন, ইকারস্য দীর্ঘত্বং তিজের্দীর্ঘশ্চ। উণ্ ৩.১৮। অতিশয়েন তীক্ষ্ণস্তীব্ররসো যস্য; বহুব্রী] অতিশয় তীব্র। [বৈদ্যক] (পুং) ২ মরিচাদি। ৩ শোভাঞ্জন বৃক্ষ, চলিত সজিনা। (ক্লী) ৪ অজমোদা। (বৈদ্যকশব্দসি°) ৫ অতিতিগ্ম।

অতিতীব্র—(ত্রি) অত্যন্ত তীক্ষ্ণ।

অতিতীব্রা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] গণ্ডদূর্ব্বা। (রাজনি°)

অতিতৃন্ন—(ক্লী) ভীষণভাবে আঘাত, অতিশয়বিদীর্ণ।

অতিতৃপ্ত—(ত্রি) অত্যন্ত দীপ্তিযুক্ত।

অতিতৃপ্তি—(পুং) [বৈদ্যক] পিত্তজন্য রোগবিশেষ। (স্ত্রী) ২ অত্যন্ত তৃপ্তি। (বৈদ্যকনি°) "ভুক্ত্বা নাতিতৃপ্তোঽথ সংবিশেৎ।" (যাজ্ঞবল্ক্যস° ১.১১৪)

অতিতৃষ্ণ—(ত্রি) অত্যন্ত তৃষ্ণাযুক্ত; অতিপিপাসু। "শুভ্রং যশোমূর্ত্তমিবাতিতৃষ্ণঃ।" (রঘু° ২.৬৯)

অতিতৃষ্ণা—(স্ত্রী) অতিশয় তৃষ্ণা, অতিপিপাসা। ২ অত্যধিক লিপ্সা, অতিলোভ। "অতিতৃষ্ণা ন কর্ত্তব্যা।" (পঞ্চতন্ত্র)

অতিতেজস্—(পুং) দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। চাক্ষুষ মন্বন্তরে কশ্যপের ঔরসে ও অদিতির গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। [অংশ ও আদিত্য শব্দ দ্র°]

অতিতেজিনী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] ত্রিপর্ণী; চলিত তেজবল, তেজবতী। (মদনপাল)

অতিত্বদ্—(ত্রি) [তামতিক্রান্তঃ] তাঁহাকে অতিক্রমকারী। ২ উহা হইতে শ্রেষ্ঠ।

অতিথ—(দেশজ) অতিথি। [অতিথি দ্র°]

অতিথ-অভ্যাগত—(দেশজ) অতিথি।

অতিথখানা, -শালা—(দেশজ) পান্থনিবাস, ধর্ম্মশালা।

অতিথি—(ত্রি) [অততি সাতত্যেন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি, অত-ইথিন্] পথানুসরণক্রমে গৃহাগত আগন্তুক। ২ অজ্ঞাতপূর্ব্ব গৃহাগতব্যক্তি। (শ্রীধর) চলিত—অতিথ্। পর্য্যায়—আগন্তু, আবেশিক, গৃহাগত, আগান্তু, প্রঘূর্ণ, অভ্যাগত, প্রাঘূর্ণিক, প্রাঘুনিক, প্রাঘুণ। অতিথির লক্ষণ পুরাণে এইরূপ কথিত হইয়াছে—যাহার নাম, গোত্র বা ভবন অজ্ঞাত এইরূপ ব্যক্তি সহসা গৃহে আগত হইলে বুধগণ তাহাকে অতিথি বলিয়া থাকেন। মনুর মতে, যে ব্রাহ্মণ একরাত্র মাত্র কাহারও ভবনে অবস্থান করেন, তিনিই অতিথি। যথা—"একরাত্রস্তু নিবসন্নতিথির্ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ। অনিত্যং হি স্থিতো যস্মাৎ তস্মাদতিথিরুচ্যতে॥" (মনু ৩.১০২)

প্রাচীন ভারতে অতিথিসেবা

অতিথিসৎকার বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। এমন কি, বৈদিকযুগেও অতিথিসৎকারের অতি সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। অতিথি সকলেরই পূজার্হ ছিলেন। এ বিষয়ে বেদ, উপনিষদ্ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে।

যজ্ঞসম্বন্ধে আলোচনা করিলে অবগত হওয়া যায় যে, উক্ত যজ্ঞপদ আতিথ্যশব্দেরই সমপর্য্যায়ভুক্ত। আতিথ্যপদে অতিথির সংকাররূপ কর্ম্ম বুঝায়। (কৃষ্ণযজুঃ ১.২.১০, সায়ণ)

অগ্নি ও সোম প্রভৃতি দেবতা যজ্ঞের অতিথি, তাহা বেদের বহু স্থানেই প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ যজ্ঞীয় হবিঃ প্রভৃতি প্রীতিজনক আহার্য্য ভোজনের নিমিত্ত তাঁহারা সতত স্বেচ্ছায় আগমন করিতেন। যজ্ঞীয় হবিঃকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে যে, হে হবিঃ! তুমি অতিথিরূপ অগ্নি ও সোম এবং সোমরাজার 'অতিথি' নামক অনুচরের সংকারস্বরূপ হইয়া তাঁহাদিগের তৃপ্তিসাধন কর। (কৃষ্ণযজুঃ ১.২.১০)

অগ্নিকে অতিথিরূপে বিশেষভাবেই আহ্বান করা হইয়াছে। তিনি দেবযজ্ঞেও দেবগণের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া পূজিত হইতেন। (ঋক্ ৭.৮.৪) অগ্নিরূপ অতিথি যে সকলেরই পূজনীয়, তাহা বেদ ও উপনিষদে সমস্বরে ধ্বনিত হইয়াছে। (শুক্লযজুঃ ১০.২৩-২৪, মহীধর। সাম° ১.২.৫ ; ২.২.৪ ; ৪.৪.৩ ; ১.১.৪ ; ১.৪.৫। কঠোপ° ১.৭.৯ ; ১.৫.২। মণ্ডুকোপ° ১.২.৩)

যজ্ঞে অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে যে, হে অগ্নি! যে সকল যজমান্ সুস্বাদু অন্নদ্বারা অতিথিদিগকে আপ্যায়িত করিয়া স্বগৃহে পশুবলিযুক্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা স্বর্গেরও উপমাস্থল হন। (ঋক্ ১.৩২.১৫, সায়ণ)

আতিথ্য সম্বন্ধে বেদের ব্রাহ্মণাদিতেও সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। হবিঃ যজ্ঞের মস্তক স্বরূপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং এই হবিঃ দেবগণের সংকারের নিমিত্ত প্রদান করিলে তাঁহারা পরম পরিতোষ লাভ করেন। (শতপথব্রা° ৩.২.৩.২০) অগ্নির উদ্দেশ্যে এই আতিথ্যদ্রব্য পত্নীর সহিত গৃহস্থ প্রদান করিবেন, ইহা যুগপৎ মীমাংসাদর্শন ও ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে সমর্থিত হইয়াছে। (জৈমিনি ১০.৭.৩৮-৪০ ; ঐতরেয়ব্রা° ৩.১৭) দেবগণকে অতিক্রম করিয়া অসুরেরাও যজ্ঞে আতিথ্যলাভের চেষ্টা করিয়া থাকে। (জৈমিনি ১০.৭.৩৯)

ঋগ্বেদে অগ্নির সহিত সূর্য্যকেও স্থলবিশেষে অতিথি বলিয়া উল্লেখ আছে। কারণ সূর্য্যও আকাশের অতিথিরূপে পরিকল্পিত হইয়াছেন। (ঋক্ ১০.১২৪.৩)

অতিথিকে দেবতার ন্যায় সতত অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাদের প্রীতি সম্পাদন করাই যুক্তিসঙ্গত। (কৃষ্ণযজুঃ ১.৪.১০)

বৈদিক যুগে নরপতিবৃন্দও অতিথিবাৎসল্যের জন্য দেবগণের নিকট হইতে বিপদ্ সময়ে বিশেষ সাহায্য পাইতেন। অতিথিবৎসল দিবোদাসকে ইন্দ্র শম্বর নামক অসুরের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। (ঋক্ ১.৫১.৬ ; ১.১৩০.৭ ; ২.১১২.১৪ প্রভৃতি)

অতিথিসংকার সম্পর্কে একটী প্রাচীন উপাখ্যান সায়ণভাষ্যে দেখিতে পাই। দর্ভের পুত্র রাজা রথবীতি অত্রিবংশীয় অর্চ্চনানাকে স্বীয় যজ্ঞে হোতৃকার্য্যে বরণ করিয়াছিলেন। অর্চ্চনানা পিতৃসমীপে রাজপুত্রীকে দর্শন করিয়া স্বীয় পুত্র শ্যাবাশ্বের সহিত তাহার বিবাহ দিবার নিমিত্ত রাজা ও রাজমহিষীর নিকট প্রস্তাব করেন। কিন্তু শ্যাবাশ্ব ঋষি নহেন বলিয়া তাঁহারা বিবাহে অসম্মত হন। শ্যাবাশ্ব ইহা শুনিয়া রাজপুত্রীলাভের নিমিত্ত কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়া ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতে করিতে একদা রাজা তরন্তের মহিষী শশীয়সীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। রাজা ও মহিষী আনন্দিত হইয়া সমুচিতভাবে তাঁহার সংকার করিয়া প্রচুর ধনদান করিলেন। (ঋক্ ৫.৬০.৮, সায়ণ)

অথর্ব্ববেদেও "যো বিদ্যাৎ" হইতে "যৎ ক্ষত্তারং" পর্য্যন্ত ছয়টী পর্য্যায়ে—অতিথির মাহাত্ম্য, অতিথিসেবাদ্বারা যজ্ঞফললাভ এবং আতিথ্যের সবিশেষ প্রশংসা করা হইয়াছে। অতিথিপতি বিষ্ণু যজ্ঞীয় হবির নিমিত্ত যজ্ঞস্থানে আগমন করিয়া আতিথ্য স্বীকার করেন। অতিথি যে স্থানে উপস্থিত হন, সেইস্থান স্বর্গের ন্যায় অতিশয় পবিত্র। গৃহস্থাশ্রমী সাগ্নিকগণের গৃহে অতিথিকে আহ্বান করিবার নিমিত্তই আহবনীয়াগ্নির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের অন্নাদি আতিথ্যদ্রব্য পচনের জন্য দক্ষিণাগ্নি সতত প্রজ্বলিত থাকেন। আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালনের নিমিত্ত গার্হপত্যাগ্নি-সমন্বিত গৃহিবৃন্দ অতিথিকে অভ্যর্থনা করেন। যাঁহারা অতিথিসেবারূপ যজ্ঞ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ঋত্বিক্গণের প্রিয়ই হউন আর অপ্রিয়ই হউন, স্বর্গগমনের অধিকার তাঁহাদের স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত গৃহী শ্রোত্রিয় অতিথিকে ভোজন না করাইয়া কদাচ নিজে ভোজন করিবেন না। কারণ হবিঃ প্রভৃতিতে অতিথিগণেরই অধিকার। সুতরাং যজ্ঞের অবিচ্ছিন্নতার জন্য সতত অতিথিসেবা কর্ত্তব্য। যিনি সন্তান-সন্ততি, কীর্ত্তি, যশঃ ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন, তিনি সর্ব্বদা অতিথিকে পরিতোষসহকারে ভোজন করাইবেন। অতিথিকে মাংস ও ক্ষীরাদি দ্রব্যদ্বারা পরিতৃপ্ত না করিয়া গৃহস্থ কখনও স্বীয় উদরপূর্ত্তির চেষ্টা করিবেন না। কারণ অতিথিসেবা দ্বারা মৃত্যুভীতি হইতেও নিষ্কৃতি লাভ হয়। (অথর্ব্ব° ৯.৩.২-৭ সূক্ত)

মনু-সংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রেও অতিথিসংকারের যথেষ্ট প্রশংসা দেখা যায়। অতিথি যে দেবতার ন্যায় সকলের পূজনীয়, তাহা মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায় পাঠ করিলেই সম্যক্‌ভাবে জানা যায়। গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিয়াও যে গৃহী পঞ্চ মহাযজ্ঞের পঞ্চম অঙ্গ অতিথিসেবা না করেন, তিনি

নিশ্চয়ই পতিত হন। এইজন্য মনু "নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্" অর্থাৎ অতিথিসেবাই নৃযজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (মনু ৩.৭০)

দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, পিতৃলোক ও আত্মাকে যে ব্যক্তি অন্নাদি দ্বারা পরিতুষ্ট না করে, সেই ব্যক্তি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসবিশিষ্ট হইলেও মৃতবৎ জগতে অবস্থান করিয়া থাকে। (মনু ৩.৭২) কারণ ঋষিগণ, পিতৃলোক, দেবগণ ও অতিথি সকল গৃহস্থ হইতে সর্ব্বদা আপন আপন প্রার্থয়িতব্য বস্তু প্রার্থনা করেন। (মনু ৩.৮০) প্রতিদিবস ভূতবলি প্রভৃতি প্রদানের পর পরিবার-বর্গের ভোজনের পূর্ব্বে গৃহী অতিথিকে পরিতৃপ্তিসহকারে ভোজন করাইবেন। (মনু ৩.৯৪)

কাহাকে অতিথি বলে এবং অতিথির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, মনুসংহিতায় তাহা বিশদভাবে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—স্বয়ং গৃহাগত অতিথিকে বিধানানুসারে সৎকার করিয়া আসন, পাদপ্রক্ষালনের নিমিত্ত জল ও যথাশক্তি অন্নব্যঞ্জন প্রদান করিতে হয়। গৃহস্থ যদি উঞ্ছবৃত্তি অর্থাৎ ক্ষেত্রে ত্যক্ত ও পতিত শস্যাদির দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করেন এবং পঞ্চাগ্নিতে নিত্য হোম করেন, তথাপি গৃহাগত ব্রাহ্মণ অতিথি অর্চ্চিত না হইয়া তাঁহার গৃহে বাস করিলে তদীয় সমুদয় পুণ্যই তিনি গ্রহণ করেন। শয়নের নিমিত্ত তৃণ, বিশ্রামভূমি, পাদপ্রক্ষালনার্থ জল ও প্রিয়বচন—অতিথিসেবার নিমিত্ত এই সকল সাধুদিগের গৃহে কখনও অভাব হইতে পারে না। সুতরাং অতিথিকে সর্ব্বাগ্রে প্রিয় বাক্যাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করা উচিত। একরাত্রিমাত্র পরগৃহে বাস করেন বলিয়া ব্রাহ্মণকে অতিথি বলা হয়। যেহেতু পরগৃহে তিনি এক তিথি ভিন্ন অপর তিথি অর্থাৎ দ্বিতীয় দিন অবস্থান করেন না, তাই তিনি অতিথি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তবে ভার্য্যা, অগ্নিরহিত প্রবাসী ব্যক্তি, এক গ্রামবাসী এবং চাটুকার ব্রাহ্মণকে অতিথি বলা যায় না। যে অবিবেকী গৃহস্থ পরান্ন ভোজনের দোষ না জানিয়া আতিথ্যলোভে গ্রামান্তরে গমন করিয়া পরান্ন ভোজন করে, সে মৃত হইয়া জন্মান্তরে সেই পাপে অন্নদাতার পশুরূপে জন্মে।

সূর্য্য অস্তমিত হইলেও গৃহীব্যক্তি গৃহাগত অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। অতিথি দ্বিতীয় বৈশ্বদেববলির সময়েই আসুন বা ভোজন সমাপন হইলেই আসুন, তিনি কখনও গৃহস্থ-ভবনে অনশনে থাকিতে পারেন না। অবশ্যই তাহাকে ভোজন করাইতে হইবে। ঘৃত দধি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট দ্রব্যসমূহ অতিথিকে প্রদান না করিয়া কদাচ স্বীয় উদর পূর্ণ করা উচিত নহে। কারণ অতিথিসেবা দ্বারা বিপুল সম্পত্তি, যশঃ, আয়ু ও স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। যে স্থলে এককালে বহু অতিথির সমাগম হয়, তথায় উত্তম, মধ্যম ও অধম বিবেচনা করিয়া সকলকেই বিশ্রামস্থান, খট্টাদি শয্যাদান ও স্থিতিকালীন পরিচর্য্যাদি করিতে হয়। বৈশ্বদেব-কার্য্য সমাপন হইলেও যদি অন্য কোন অতিথি গৃহে আগমন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও যথাশক্তি অন্নাদি পাক করিয়া প্রদান করা কর্ত্তব্য।

অতিথি ব্রাহ্মণ কদাপি ভোজনের নিমিত্ত স্বীয় কুল ও গোত্রাদির পরিচয় প্রদান করিবেন না। তাহা করিলে তিনি উদ্গীর্ণভোজী বা বান্তাশী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন।

ব্রাহ্মণের ভবনে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণকে অতিথি বলা যায় না। কিন্তু ক্ষত্রিয়াদিও যদি ব্রাহ্মণের ভবনে অতিথিরূপে উপস্থিত হন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণভোজনের পর তাঁহাদিগকেও পরিতোষসহকারে ভোজন করাইতে হয়। অতিথিসেবার পূর্ব্বে কেবলমাত্র নবোঢ়া স্ত্রী, বালিকা, রোগী ও গর্ভবতী রমণীকে বিচার না করিয়া ভোজন করাইতে পারা যায়। যে অজ্ঞ ব্যক্তি অতিথি ও ভৃত্য প্রভৃতিকে ভোজন না করাইয়া নিজে আহার করে, সে জানে না যে মৃত্যু হইলে শকুনি ও কুকুরেরা তাহার দেহ ভোজন করিবে। প্রথমে ব্রাহ্মণ অতিথিকে ভোজন করাইতে হয়। তৎপরে অন্যান্য সকলে ভোজন করিলে গৃহীব্যক্তি পত্নীর সহিত ভোজন করিতে পারেন। (মনু ৩.৯৯—১১৬)

অতিথিকে মনু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন। দৈব ও পৈত্রকার্য্যে বংশপরম্পরাশুদ্ধ বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে অতিথিসেবার ন্যায়ই ফল লাভ হয়। মনুর অন্যতম টীকাকার কুল্লূকভট্টের ব্যাখ্যা হইতে তাহা সম্যগ্রূপে অবগত হওয়া যায়। (মনু ৩.১৩০, কুল্লূক) যিনি অতিথির প্রতি অভ্যুত্থানাদি আচারবর্জ্জিত, তিনি সাধুদিগের নিকটও চিরনিন্দিত। এতাদৃশ ব্রাহ্মণকে হব্যকব্যে নিমন্ত্রণ করা সমীচীন নহে। (মনু ৩.১৬৫, মেধাতিথি)

অপর ধর্ম্মসংহিতা ও পুরাণেও মনুর মত অনেকাংশে সমর্থিত হইয়াছে। যথা—বিষ্ণুস° ৬৭.৩৪-৪৬; যাজ্ঞবল্ক্যস° ১.১০২-১১৩; কাত্যায়নস° ১৩.৩; পরাশরস° ১.৩৭-৩৮; ১.৪১-৪৩; ব্যাসস° ৩.৩৬-৪১; শঙ্খস° ৫.৪; ৫.৭-১৩; লিখিতস° ৫ম শ্লোক; দক্ষস° ২.৫০-৫১; ৩.৪; গৌতমস° ৫ অ°; বশিষ্ঠস° ৮-১১ অ°; শ্রীমদ্ভাগবত ৭.১৫.১৫; পদ্মপু°, ক্রিয়া°, ১৬ অ°; কূর্ম্মপু° ২.৪২; ঐ, উপরি°, ১৮.১১৩-১১৬; ঐ, উপরি°, ২২.৭৬; মহাভা°, বন°, ২ অ°; ঐ, শান্তি°, মোক্ষ°, ১৯১ অ°।

হারীতসংহিতায়ও আতিথ্যবিধি বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। গৃহী ব্রাহ্মণ বৈশ্বদেববলি প্রদান করিবার কালে

অতিথির নিমিত্ত গোদোহনকাল অর্থাৎ মুহূর্ত্তের অষ্টম ভাগ পর্য্যন্ত অথবা তদূর্দ্ধ সময় অপেক্ষা করিবেন। যিনি অজ্ঞাত-কুলশীল এবং যাঁহাকে পূর্ব্বে আর কখনও দেখিতে পাওয়া যায় নাই, এরূপ ব্যক্তিকে গৃহস্থ স্বাগত-সম্ভাষণ, আসনাদি প্রদান ও পাদপ্রক্ষালনার্থ জলদান করিয়া তাঁহার প্রত্যুত্থান করিবেন। কারণ অতিথিকে স্বাগত-সম্ভাষণ করিলে গৃহাধিষ্ঠিত অগ্নিগণ পরিতুষ্ট হন এবং তাঁহাকে আসনাদি প্রদান করিলে দেবরাজ বিশেষভাবে প্রীত হইয়া থাকেন। পাদপ্রক্ষালনার্থ জল প্রদানে গৃহীর প্রতি পিতৃলোক সন্তুষ্ট হন এবং অন্নদানে স্বয়ং প্রজাপতিই তৃপ্তিলাভ করেন। সুতরাং নিত্য ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চনার পর ভক্তিপূর্ব্বক শক্তি অনুযায়ী অতিথির পূজা করা গৃহস্থাশ্রম-স্থিত ব্যক্তির অবশ্যকর্ত্তব্য। অতিথিকে প্রমোদিত করিয়া ভোজন করাইতে হয়। কারণ ভিক্ষুক ও অতিথিরূপে স্বয়ং নারায়ণ গৃহে আগমন করেন। রাত্রিকালেও হোমাদির পর অতিথিকে ভোজন করাইয়া গৃহস্থ নিজে আহার করিবেন। অতিথিসেবা না হইলে ভোজন করা একান্ত অবিধেয়। (হারীতস° ৪ অ°)

অগ্নিহোত্র, তপঃ, সত্য, বেদাচারপালন, অতিথিসৎকার ও বৈশ্বদেববলি, এই কয়টীকে গৃহস্থের ইষ্টসাধক বলা হইয়া থাকে। (অত্রিস° ৪৩ শ্লোক) যিনি নিত্য ত্রিসন্ধ্যা, স্নান, জপ, দেবপূজা, বৈশ্বদেববলি ও অতিথিসেবা করেন, তিনি 'দেবব্রাহ্মণ' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। (অত্রিস° ৩৬৪ শ্লোক)

অতিথিসেবা নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলেরই যে অবশ্য পালনীয় তাহা মহর্ষি বিষ্ণুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রেও উল্লেখ আছে। প্রত্যহ শ্বশ্রূ, শ্বশুর, গুরু, দেবতা ও অতিথিপূজা ধর্ম্মানুচারিণী স্ত্রী নিশ্চয়ই করিবেন। (বিষ্ণুস° ২৫.৩) অতিথিসৎকারে এবং যজ্ঞ, পৈত্র ও দৈবকার্য্যে পশুবধের ব্যবস্থা আছে। অতিথিপূজাকে 'নৃযজ্ঞ' বলিয়া বিষ্ণুও মনুর সহিত একমতাবলম্বী হইয়াছেন। ব্রহ্মচারী, যতি, ভিক্ষুক ও অতিথিকে গৃহস্থ কদাপি অবমাননা করিবেন না। যেহেতু গৃহে অবস্থান করিয়া তিনি দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক, ভূতগণ ও অতিথির সেবা করেন বলিয়াই শ্রেষ্ঠত্ববাচক 'গৃহস্থাশ্রমী' নামের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন। সতত ত্রিবর্গসেবা, অতিথি ও প্রার্থীদিগকে অন্নদান, দেবার্চ্চনা ও পিতৃতর্পণাদি করিলে গৃহস্থ ইন্দ্রপদ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন। (বিষ্ণুস° ৫৯.২৫-৩০) অতিথিপূজা দ্বারা পরম ফললাভ হয়। সুতরাং তাঁহাকে তৃপ্তিসহকারে ভোজন না করাইয়া রাখা কখনও উচিত নহে। বর্ণসমূহের প্রভু ব্রাহ্মণ এবং স্ত্রীগণের গুরু ভর্ত্তা; কিন্তু অতিথি সকলেরই গুরু-স্থানীয়। অতিথিসেবা করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি অনায়াসেই সম্ভব হয়। যে গৃহস্থের গৃহ হইতে ভগ্নমনোরথ হইয়া অতিথি প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেই গৃহস্থ স্বকীয় সঞ্চিত যাবতীয় পুণ্য অতিথিকে দিয়া তাঁহার দুষ্কৃতিসমূহ গ্রহণ করেন। (বিষ্ণুস° ৬৭.২৮-৩৩)

শ্রাদ্ধাদিতেও অতিথিকে আপ্যায়িত করিয়া ভোজন করাইবার বিধি আছে। কারণ অতিথি হব্যকব্য প্রদানের তীর্থস্বরূপ, তাঁহাকে ভোজন না করাইলে শ্রাদ্ধের ফললাভ হয় না। (উশনঃস° ৪.২ ; ৫.২৯-৩০)

অতিথি প্রিয়, অপ্রিয়, দ্বেষ্য, মূর্খ ও পণ্ডিত যাহাই হউন না কেন, বৈশ্বদেববলির সময়ে গৃহে আসিলে, তিনি গৃহস্থ কর্ত্তৃক অর্চ্চনীয়। কারণ অতিথিসৎকারই গৃহস্থের স্বর্গপ্রাপ্তির হেতু। বহুদূর হইতে আগত, পথশ্রান্ত এবং বৈশ্বদেববলির কালে সমাগত ব্যক্তিই অতিথি। (পরাশরস° ১.৩৯-৪০) অতিথি যদি পাপী, চণ্ডাল, ব্রহ্মহত্যাকারী ও পিতৃঘাতক হন, তথাপি বৈশ্বদেববলির পূর্ব্বক্ষণে আগমন করিলে তাঁহাকে নিরাশ করা কিছুতেই সঙ্গত নহে। যেহেতু অতিথিসৎকারই পরমপদ লাভের হেতুস্বরূপ। অতিথি ভগ্নমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পিতৃগণ দশসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত সেই গৃহস্থের প্রদত্ত ভোজ্যবস্তু গ্রহণ করেন না। গো, বিপ্র ও অতিথিকে কখনও বলপূর্ব্বক অতিক্রম করা উচিত নহে। (পরাশরস° ১.৫১-৫৩)

অতিথি পোষ্য-পরিজনের ন্যায় সততই গৃহস্থের প্রতিপাল্য। দিবসের তৃতীয়ভাগে মাতাপিতা প্রভৃতি পোষ্যভরণের উপায় চিন্তনের ন্যায় অভ্যাগত অতিথিসেবার উপায়ও চিন্তা করিতে হয়। (দক্ষস° ২.৩০)

অতিথিসৎকার ও যজ্ঞাদিতে পশুবধের বিধান আছে। কারণ অতিথিসৎকার ও যজ্ঞনিমিত্ত পশুবধ শাস্ত্রাদিতে "যজ্ঞে বধোঽবধঃ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বৃষ ও ছাগ-মাংস প্রদান করিয়া অতিথির সেবা করা কর্ত্তব্য। "মহোক্ষং বা মহাজং বা' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যেই তাহা সম্যক্রূপে প্রতিপন্ন হয়। (বশিষ্ঠস° ৪ অ°)

তন্ত্রশাস্ত্রেও অতিথিসেবার ব্যবস্থা দেখা যায়। সদাশিব পার্ব্বতীকে কলিযুগের আশ্রমধর্ম্মসম্পর্কে বলিতেছেন যে, দেবি! গৃহস্থব্যক্তি সর্ব্বদা দেবতা ও অতিথিপূজায় নিযুক্ত থাকিবেন। (মহানির্ব্বাণ° ৮.২৪) যদি নিজের প্রাণ কণ্ঠাগত হয়, তাহা হইলেও গৃহী অতিথি ও মাতাপিতা প্রভৃতিকে আহার না করাইয়া ভোজন করিবেন না। (মহানির্ব্বাণ° ৮.৩৩) অতিথি ও উদাসীনগণের প্রতিপালন করা গৃহস্থের যথার্থ কর্ত্তব্য। (মহানির্ব্বাণ° ৮.৪৯)

পুরাণসমূহেও অতিথিসেবার মাহাত্ম্য বহুস্থলে বর্ণিত হইয়াছে। পৌরাণিক যুগের নৃপতিগণ বিশেষভাবে অতিথি-সৎকার করিতেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রভৃতি পুরাণে ইহার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আতিথ্যগ্রহণের নিমিত্ত একদা শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎ সমীপে আগমন করিলে মহারাজ যথোচিত-ভাবে তাঁহার সৎকার করিয়া বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ! অদ্য আমরা সাধুজনসংস্পর্শে আপ্যায়িত হইলাম। আপনি অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়া এ স্থানকে তীর্থক্ষেত্রের যোগ্য করিলেন। (শ্রীমদ্‌ভাগবত ১.১৯.২৪-৩৩)

পদ্মপুরাণ ক্রিয়াযোগসারেও অতিথিমাহাত্ম্য বিশেষভাবে কীর্তিত হইয়াছে। জ্ঞানভদ্র নামক কোনও ব্রাহ্মণ স্ত্রীপুত্রসহ দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত হইয়া অতিকষ্টে দিন যাপন করিতে-ছিলেন। একদা পুত্র-কন্যার নিদারুণ হাহাকার-দর্শন করিয়া তিনি ফলমূলার্থ পর্ব্বতোপত্যকায় গমন করিলেন এবং বহু-প্রয়াসে একটী কুষ্মাণ্ড সংগ্রহ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেই অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ইত্যবসরে অকস্মাৎ দ্বারদেশে আতিথ্যপ্রার্থ ঝটিকা-পীড়িত কোনও বনচরকে দর্শন করিয়া সেই ব্রাহ্মণ ভক্তিপূর্ব্বক তাহাকে প্রণাম জানাইয়া সৎকার করিলেন এবং স্ত্রীপুত্রসহ উপবাসী থাকিয়াও অতিথিকে সাধ্যানুযায়ী ভোজন করাইলেন। উপবাসক্লিষ্টদেহে ২১ দিন অতিক্রান্ত হইবার পর সস্ত্রীক ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইল এবং সেই অতিথিসেবার পুণ্যফলে তিনি যোগিগণেরও দুর্ল্লভ সাযুজ্যমুক্তি লাভ করিলেন। এমন কি অতিথিসেবাজনিত পুণ্যফলে সেই রাজ্যের দুর্ভিক্ষও প্রশমিত হইল। (পদ্মপু°, ক্রিয়া, ১৬ অ°)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে অতিথি ও তাহার সেবা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—যে ব্যক্তি অতিথি ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়াও উত্থানাদি না করে, সেই ব্যক্তির স্বীয় অহঙ্কারিতা দোষে সপ্তজন্ম মত্তমাতঙ্গ-যোনি লাভ হয়। যে ব্যক্তি গৃহাগত অতিথির সৎকার না করে, সেই ব্যক্তি স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, কৃতঘ্নতা এবং গুরুপত্নীহরণ প্রভৃতি পাপের সমান বা ততোধিক পাপভাগী হইয়া থাকে। (ব্রহ্ম-বৈ°পু°, প্রকৃতি°, ৫১.১-৩২)

স্বগৃহে আগত অতিথিকে প্রত্যহ মন, বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা পূজা করা কর্ত্তব্য। অতিথির নিমিত্ত বামহস্তকে অন্বারব্ধ করিয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা অতিথিদিগকে প্রত্যহ শক্তিঅনুসারে বক্ষ্যমাণ হন্তকার, অগ্র বা ভিক্ষা দান করিবে।* অতিথিকে পরমেশ্বর বলিয়াই মনে করা উচিত। (কূর্ম্মপু° ১৮.১১৩-১১[illegible]) যোগবিদ্ ব্যক্তিগণ কদাচ শ্রাদ্ধে বা যজ্ঞে আতিথ্য স্বীকার করিবেন না। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ১৬.৭)

রামায়ণেও অতিথিসেবার বহু দৃষ্টান্ত আছে। তৎকালে নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলেই অতিথির প্রতি ভক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। কার্য [illegible] একাকিনী থাকিয়াও সীতা তপস্বী ব্রাহ্মণবেশধারী রাবণকে অতিথিরূপে অর্চ্চনা করিতে কুণ্ঠা[illegible] করেন নাই। (রামা° ৩.৪৬.[illegible] ; ৪.৪৭.১-২)

ঋষিগণের আশ্রমে নৃপতিগণ উপস্থিত [illegible] তাঁহাদিগকেও বিশেষভাবে সৎকার করা হইত। ভরদ্বাজের আশ্রমে শ্রীরামচন্দ্রের যথোচিতভাবে সৎকার হইয়াছিল। মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহাকে সৎকার করিয়া বলিলেন—হে কাকুৎস্থ! তোমাকে অতিথিরূপে প্রাপ্ত হইয়া অদ্য আমার বহুকালের বাসনা পূর্ণ হইল। (রামা° ২.৫৪.১৬-৩৫) বশিষ্ঠের আশ্রমে রাজর্ষি বিশ্বামিত্রেরও বিশেষরূপে সৎকার হইয়াছিল। ([illegible])

নৈমিষেয় ঋষিগণ ঐড়রাজকে অতিথি-জনোচিত সৎকার করিয়াছিলেন এবং অতিথিবৎসল প্রীতিমান্ রাজাকে অসুর [illegible] হরণ করিয়া লইয়া গেলে ঋষিগণ অতিথিকে পুনর্ব্বার উদ্ধার করিয়া যজ্ঞস্থানে [illegible] করিয়াছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ১.১৮৭-১৮৮)

অতিথিসৎকার সম্পর্কে মহাভারতেও বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। স্বদেশ কি বিদেশ কুত্রাপি অতিথিকে উপবাসী রাখা বিধেয় নহে। (মহাভা°, শান্তি°, মোক্ষ°, ১৯৩ অ°) প্রতিদিন সন্ধ্যাবন্দন, স্নান, জপ, হোম, দেবপূজা ও অতিথিসৎকার—এই ষট্‌কর্ম্ম যাঁহারা করেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। (মহাভা°, শান্তি°, মোক্ষ°, ১৮৯ অ°)

এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির কপটদ্যূতে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনগমনকালে সমবেত ব্রাহ্মণগণের নিকট অতিথিসৎকারের মাহাত্ম্য বিশেষরূপে বর্ণনা করেন। তাহাতেও অনেকাংশে মনুর মতই সমর্থিত হইয়াছে। (মহাভা°, বন°, ২ অ°)

নাটক ও কাব্যাদিতেও অতিথিসৎকার বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মহাকবি কালিদাস প্রভৃতির গ্রন্থে ইহার বহুল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

মহারাজ দুষ্মন্ত মৃগয়া উপলক্ষে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে উপস্থিত হইলে, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার সহিত শকুন্তলা অতিথির বিশেষভাবে সৎকার করিয়াছিলেন। (শকু° ১.১২৫-১৩৩) তারপর অতিথি দুর্ব্বাসাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াও শকুন্তলা ব্রহ্মশাপগ্রস্তা হইয়াছিলেন। (শকু° ৪.১২-১৭)

* গ্রাস পরিমিত অন্নের নাম ভিক্ষা, তাহার চতুর্গুণ পরিমিত অন্নের নাম অগ্র এবং তাহার চতুর্গুণ পরিমিত পুষ্কল অন্নের নাম হন্তকার। (কূর্ম্মপু° ১৮.১১৫)

প্রাচীন যুগে ঋষিগণের আশ্রমে অতিথিসৎকার কিরূপ আদরণীয় ছিল, তাহা কালিদাসের বর্ণনা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। 'পবনপরিচালিত [illegible]রাশি আহুতি-গন্ধ বিস্তার করিয়া আশ্রমে গমনোন্মুখ অতিথিগণকে পবিত্র করিতেছেন।' (রঘু° ১.৫) এইরূপ বর্ণনা বহু স্থানেই রহিয়াছে। মহারাজ দিলীপকেও অতিথি বলিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ অন্যান্য মুনিগণসহ [illegible] আশ্রমে বিশেষভাবে [illegible]কার করিয়াছিলেন। ([illegible] ১.৫৮) মহাদেব পার্ব্বতীকে পরীক্ষার্থ ব্রহ্মচা[illegible] তপস্বিনী উমার সন্নিধানে গমন করিলে [illegible] তপস্যারতা থাকিয়াও অতিথির যথোচিত সৎ[illegible]র করিয়াছিলেন। (কুমারস° ৫.৩১)

'কিরাতার্জ্জুনীয়ম্' কাব্যের "ত্রিঃসপ্তকৃত্বোজগতী[illegible]তীনাং" ইত্যাদি (৩.১৮) শ্লোকের পৌরাণিকবার্ত্তায় লিখিত আছে যে, হৈহয়পতি কার্ত্তবীর্য্য তপস্যায় জীর্ণশীর্ণদেহ নিঃস্ব জমদগ্নির আশ্রমে গমন করিলে অতিথিপ্রিয় সেই মুনি স্বীয় কামধেনুর দুগ্ধের দ্বারা অতিথিকে বিশেষভাবে সৎকার করিয়াছিলেন। কিন্তু ধেনুলুব্ধ অতিথি মুনিকে নিহত করিয়া পরশুরামের মাতাকে ২১ বার প্রহারের পর ধেনু গ্রহণ করেন।*

প্রাচীন ভারতে নিতান্ত হীন জাতিরাও অতিথিকে কিরূপ-ভাবে সৎকার করিতে হয় তাহা [illegible] এবং অতিথিকে বিমুখ ক[illegible] [illegible] হয়, তাহাও তাহাদের অজ্ঞাত ছিল না। শ্রীরামচন্দ্রের গুহক-সম্ভাষণ হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। (রামা° ২.৫০.৩১-৪৮)

অতিথিসৎকার পূর্ব্বকালে সর্ব্বদেশেই প্রচলিত ছিল। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে 'উৎকলদেশীয় গৃহস্থগণের গৃহে অতিথিগণ গমন করিয়া ইচ্ছাধিক সৎকার পাইতেন।' (স্কন্দপু°, বিষ্ণু°, ৬.১২)

ভারতীয় বৌদ্ধ ও জৈন-সমাজ

বৌদ্ধসমাজ বৈদিক আর্য্যসমাজ হইতে উদ্ভূত। সেইজন্য বিনয়পিটকে যে অতিথিসৎকারের বিশদ নিয়মাবলী পাওয়া যায়, তাহা যে তৎকালীন বৈদিক-সমাজের অনুরূপ, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

দীঘনিকায় এবং জাতকের গল্পগুলি পড়িলে আমরা জানিতে পারি যে, অতিথিসেবা তখনকার দিনে প্রত্যেক গৃহীর অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল। তিনিই আদর্শরূপিণী ধর্ম্মপত্নী ছিলেন, যিনি স্বামীর পরিবারের সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেন। যে গৃহী অতিথিকে শ্রদ্ধা এবং সম্মানের সহিত সৎকার করিতেন, তিনিই সুগৃহী বলিয়া বিবেচিত হইতেন। যে যজ্ঞে উপবিষ্ট নিমন্ত্রিত ব্যক্তি অভুক্ত থাকিত, সে যজ্ঞই পণ্ড বলিয়া লোকে মনে করিত।

গৃহী কর্ত্তৃক পরিব্রাজক এবং সন্ন্যাসীদের সেবারূপ অতিথিসৎকার সম্বন্ধে বৌদ্ধশাস্ত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক ধর্ম্মপ্রচারকালে এই দেশে অনেক পরিব্রাজক সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। এই সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকগণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মমত প্রচার করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর লোকই ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই বৈদিক যাগযজ্ঞ মানিতেন না; অথচ সমাজে ইঁহাদিগের ভরণপোষণ সম্বন্ধে যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক গৃহীরই কর্ত্তব্য ছিল, ইঁহাদিগের আহার, বস্ত্র এবং বাসস্থান প্রদান করা। গৃহস্থদিগের মধ্যে অনেকেই কোনও কোনও বিশেষ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে অনুরক্ত ছিলেন, কিন্তু ভিন্ন সম্প্রদায়ের পরিব্রাজক তাঁহাদের দ্বারে উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগের প্রত্যেককে সমভাবে সৎকার করা সকলেরই কর্ত্তব্য ছিল। জৈনধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম [illegible]শ্রয় করিলে বুদ্ধদেব তাঁহাকে আদেশ করেন, তিনি যেন পূর্ব্বেকার মতনই জৈনধর্ম্মাবলম্বিদিগের [illegible]দি করেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে এইরূপ উদারতা ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায়। এই নীতি অনুসরণ করিয়া অশোক তাঁহার অনুশাসনে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মমতাবলম্বী কর্ত্তৃক অতিথিসৎকারবিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বৌদ্ধ শ্রমণদিগের মধ্যে অতিথিসৎকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কোন আগন্তুক বৌদ্ধভিক্ষু 'আরামে' প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ তাঁহার পাদুকাদ্বয় উন্মোচন করিয়া তাহা বিপরীতভাবে ধরিয়া তাহা হইতে ধূলা ঝাড়িয়া পুনরায় তাহা হাতে করিয়া ধরিবেন এবং পরে মস্তক হইতে ছত্র নামাইয়া পৃষ্ঠভাগের বস্ত্র উন্মোচন করিয়া মন্থর পদে আরামে প্রবেশ করিবেন। তৎপরে তিনি অনুসন্ধান করিবেন যে, আরামস্থ ভিক্ষুগণ কোথায় গিয়াছেন। তাঁহারা যেখানেই থাকুন না কেন, তিনি তাঁহাদের নিকট যাইবেন। তিনি তাঁহার কমণ্ডলু একদিকে এবং গাত্রাবাস অপরদিকে রাখিয়া একটী যথোপযুক্ত আসনে উপবেশন করিবেন। পানীয় কিংবা পদধৌত করিবার জলের প্রয়োজন হইলে তিনি প্রসন্ন মনে স্বহস্তে তাহা আনয়ন করিবেন। পান করিবার প্রয়োজন হইলে তিনি পান করিবেন এবং পদ প্রক্ষালন করিবার প্রয়োজন হইলে এক হস্ত হইতে জল ঢালিয়া অপর হস্তদ্বারা পদ প্রক্ষালন করিবেন। কদাচ একই হস্ত দ্বারা জল ঢালা এবং পদ প্রক্ষালন করিবেন না।

* এইজন্য পরশুরাম একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন।

তৎপরে তিনি পাদুকা পরিষ্কার করিবার জন্য বস্ত্র চাহিয়া লইবেন এবং স্বহস্তে সেই বস্ত্র দ্বারা পাদুকা পরিষ্কার করিবেন। পাদুকা পরিষ্কার করিবার সময়ে প্রথমতঃ তিনি শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা পাদুকা হইতে ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিয়া তারপর সিক্ত বস্ত্র দ্বারা তাহা মুছিয়া অবশেষে এই দুইটী বস্ত্রই স্বহস্তে ধৌত করিয়া একপার্শ্বে রাখিয়া দিবেন। ইহার পর জ্যেষ্ঠত্ব অনুসারে আগন্তুক ভিক্ষু এবং আরামস্থ ভিক্ষুদিগের সহিত অভিবাদনাদি সম্পন্ন করিতে হইবে; তৎপরে আগন্তুক ভিক্ষু তাঁহার জন্য কোন্ বাসস্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে প্রশ্নাদি করিবেন। পরে তিনি তাঁহাদিগের নিকট হইতে জানিয়া লইবেন যে, কোন্ কোন্ স্থান নিষিদ্ধ এবং কোন্ কোন্ স্থানে যাওয়ার অনুমতি আছে। এতদ্ভিন্ন কোন্ কোন্ গৃহী অভাবগ্রস্ত তাহাও তাঁহাকে জানিয়া লইতে হইবে। ইহা ছাড়া তিনি মলমূত্র ত্যাগ করিবার স্থান, পানীয় জল ও বস্ত্র-পরিষ্কার করিবার জন্য বিভিন্ন স্থানে কিরূপ জলের ব্যবস্থা, কোথায় সঙ্ঘের সভা বসে, কখন তাঁহাকে আরামে প্রবেশ করিতে হইবে এবং কখন ত্যাগ করিতে হইবে প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া লইবেন।

ভারতীয় জৈনদিগের অতিথিসেবাও নিতান্ত সামান্য নহে। বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই ইঁহারা অতিথির সমুচিত সৎকারসাধনে যত্নবান্। বর্ত্তমানেও ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত অতিথিশালা বা ধর্ম্মশালা দূরাগত অতিথির অভাব মোচনের আশ্রয়স্থল।

বর্ত্তমান ভারতে অতিথিসেবা

বর্ত্তমানে আমাদের দেশ হইতে অতিথিসৎকারপ্রথা ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে। পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতার অনুকরণ এবং অসংখ্য হোটেলের প্রতিষ্ঠাই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ ইউরোপীয়গণের নিকট অপরের গৃহে বিনামূল্যে আহার্য্য ও বাসস্থান সংগ্রহ মর্য্যাদাহানিকর বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বিদেশীয় আবহাওয়ার সংস্পর্শে দুষ্ট হইলেও অধুনা বাঙ্গালার অধিকাংশ প্রাচীন জমিদার-গৃহে অতিথিসেবার বন্দোবস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও বঙ্গদেশের কোন কোন ভূস্বামী গৃহাগত অতিথি অভুক্ত আছে কিনা সংবাদ লইয়া তবে আহারে প্রবৃত্ত হন। ইঁহাদের অতিথিশালায় অতিথিকে ত্রিরাত্র অবস্থান করিতে দেওয়া হয় এবং অতিথির আবশ্যকীয় আহার্য্যাদিও সরবরাহ করা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ স্থানসমূহেও সহৃদয় ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ-প্রতিষ্ঠিত অতিথি বা ধর্ম্মশালা সেই অতীত যুগের অতিথিসেবারূপ মহাপুণ্যব্রতের ক্ষীণ স্মৃতি বহন করিতেছে।

চীন

চীনদেশীয় লোকেরা অতিশয় অতিথিপরায়ণ। তাহারা পরস্পরের সহিত মিশিতে ও গল্প করিতে ভালবাসে। যদিও চীনদেশে জীবনযাত্রা অতিশয় দুর্ব্বহ, অতি কষ্টে এবং পরিশ্রমে সেখানে মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তথাপি তাহারা এই দুঃখের জীবন হইতে যতটুকু সুখ আদায় করিতে পারে, তাহা তাহারা করে। যাঁহারা বিদ্বান্ তাঁহারা মনে করেন যে, দূর হইতে তাঁহাদের বিদ্যাদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বন্ধুগণ আসিবে এবং আসিলে তাঁহারা মনের সুখে তাঁহাদের আদরযত্ন করিবেন। ইহা ছাড়া, আইন দ্বারা চীনদেশে অতিথিসৎকার বাধ্যতামূলক ছিল।

চীনদেশে অতিথিসেবা যেরূপ বিধি-ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল, তাহা হইতে অনেকেরই মনে হইতে পারে, আন্তরিকতা না থাকিলে এরূপ ব্যবস্থা সম্ভবপর নহে। চীনগণ অতিথিসেবায় এবং বন্ধুবান্ধবের সহিত মেলামেশায় আন্তরিকতার মূল্য জানিতেন। তাঁহাদের ধর্ম্মাচার্য্যগণ বারংবার শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন—দেখিও বন্ধুবান্ধবের সহিত মেলামেশায় এমন কথা বলিও না যাহা অন্তঃসারশূন্য। অতিশয় প্রাচীনকাল হইতে চীন-সাহিত্যে অতিথিসেবা সম্বন্ধে বিধি-ব্যবস্থার উপদেশ পাই। কন্‌ফুচি মনে করিতেন যে, 'কবিতার বই' (Book of Poetry) পড়িলে লোকের সহিত ভালভাবে মিশিবার বিষয় শিক্ষা করা যায়। কন্‌ফুচি প্রায় ৩৫০০ কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কবিতাগুলি হইতে ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশের লোকেরা কি করিয়া সামাজিক জীবন যাপন করিত, তাহা জানিতে পারি। ইহার মধ্যে অতিথিসেবা সম্বন্ধে অনেক কথাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

চীনগণ পৃথক্ পৃথক্ গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এইরূপ গোষ্ঠীবদ্ধ সামাজিক জীবন যে অতিথিপরায়ণতার বিশেষ অনুকূল, তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হয়। যদি কোন বিদেশী কোন একটী গোষ্ঠীর উপাধি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি যেখানেই যান না কেন, সর্ব্বত্রই আত্মীয়ের ন্যায় সমাদর লাভ করিবেন। যদি কোন এক গোষ্ঠীস্থ ব্যক্তির কাজকর্ম্ম না থাকে, তাহা হইলে তিনি সেই গোষ্ঠীর অপরাপর লোকদিগের নিকট আহার্য্য ও শয্যা লাভ করিতে পারেন। গোষ্ঠীর একজনের অভাবের সময় গোষ্ঠীস্থ অপর ব্যক্তিরা তাঁহার সাহায্য করিতে সদা সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকেন।

পূর্ব্বে চীনদেশীয় স্ত্রীলোকগণের সামাজিক মর্য্যাদা পুরুষ

অপেক্ষা অনেক হীন ছিল। তাঁহাদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা ত ছিলই না, এমন কি তাঁহারা পুরুষদিগের সহিত একত্র আহার কিংবা অন্য কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারিতেন না। কিন্তু এখন শনৈঃ শনৈঃ তাঁহারা পুরুষদিগের সহিত সমান অধিকার লাভ করিতেছেন এবং সেইজন্য এখন অতিথিসেবা ও বন্ধুত্ব পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মাধুর্য্য-মণ্ডিত হইয়া উঠিতেছে।

জাপান

জাপানীগণও অতিশয় অতিথিপরায়ণ জাতি। জাপানে অতি প্রাচীনকালের ধর্ম্মাখ্যায়িকাগুলিতে অতিথি-সৎকার সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। প্রত্যেকটী আখ্যায়িকাতেই অতিথিসৎকার সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত বিবরণ পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক যুগেও দেখা যায় যে, জাপান-দ্বীপপুঞ্জে যে কোন অপরিচিত অতিথি আসিতেন, তিনি পরমসমাদরে এতদ্দেশীয় লোকদিগের দ্বারা সমাদৃত হইতেন। পাছে এই অপরিচিত অতিথিগণ সঙ্গে দানব (অর্থাৎ ছোঁয়াচে রোগ) লইয়া আসেন, সেইজন্য তাঁহারা তাঁহাদের আগমনের দুই দিন পূর্ব্বে সাহে-নো-কামি নামক লিঙ্গরূপী দেবদেবীর নিকট পূজা মানত করিতেন। কিন্তু অতিথি আসিলে জাপানীগণ তাঁহাদিগের বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন এবং যাহাতে তাঁহাদের কোন প্রকার অযত্ন না হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। অতিথিসৎকার জাপানীদিগের মধ্যে কতদূর মজ্জাগত ছিল, তাহা তাঁহাদের দেবদেবীগণের অতিথি-পরায়ণতা হইতে বুঝিতে পারা যায়। ইঁহাদিগের দেবদেবীগণও অতিথিপরায়ণরূপে পরিকল্পিত হইয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বে কোরিয়া হইতে যদি কোন দেবদেবীর আবির্ভাব হইত, তাহা হইলে জাপানের দেবদেবীগণ বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লইতেন।

যখন ইউরোপীয়গণ এই দ্বীপপুঞ্জে আগমন করেন, তখনও জাপানীগণ তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। জেস্যুইট্-সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রবর্ত্তক ফ্রান্সিস্ জেভিয়ের ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে কাগোশিমায় পদার্পণ করিলে, সৎসুমার সামন্ত তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের অধিকারও প্রদান করেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি তাঁহার প্রজাবৃন্দকে তাহাদের ইচ্ছামত খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার অনুমতি পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছিলেন। প্রিন্স হিরাটোও ফ্রান্সিস্ জেভিয়েরকে সমান সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করেন। যামাগুচিতে যখন এই খৃষ্টান্ প্রচারক আগমন করিলেন, তখন সেখানকার সামন্ত রাজা তাঁহাকে রাজসভাতে তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে প্রশ্নাদি করেন এবং পরে একটী মঠ প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপে জাপানের সর্ব্বত্রই সেণ্ট ফ্রান্সিস্ জেভিয়ের পরমসমাদর লাভ করেন।

খৃষ্টান্ মিশনারীগণ প্রথম প্রথম জাপানের সামন্ত-বর্গের নিকট অতিশয় সমাদরলাভ করিলেও পরে ষড়্যন্ত্র-প্রিয়তার জন্য তাঁহাদের উপর অতিশয় অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইয়াছিল। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, ইহার জন্য জাপানীগণ দায়ী নহেন। কিন্তু ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে জাপান যখন অপরাপর জাতির সহিত সমব্যবহার লাভ করিল, তখন জাপানীদিগের মধ্যে বিদেশীদিগের প্রতি তাঁহাদিগের পূর্ব্ব আতিথেয়তা ফিরিয়া আসিল।

পারস্য

অবেস্তা এবং প্রাচীন পহ্লবী-সাহিত্য পাঠ করিলে জানা যায় যে, ইরাণীদিগের মধ্যে অতিথিসেবার প্রচলন ছিল। ইঁহারা অতিথিকে বিমুখ করিতেন না। অতিথিসৎকার ইঁহাদের মনে এতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, ইঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, যখন পুণ্যবানের আত্মা 'অনন্ত-জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গে' পৌছিতেন, তখন অহুরমজদা তাঁহার আহার এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা করিবার জন্য দেবদূতকে আদেশ দিতেন। পাপাত্মারা যখন নরকে আসিত, তখনও তাহার সৎকারের ব্যবস্থা হইত।

ফার্দৌসীর শাহ্‌নামা পাঠ করিলে জানা যায় যে, ইরাণ-জাতির অতিথিসৎকার-প্রথা সকল শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল।

আরব

অতিথিসেবা আরবজাতির একটী বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। অতিথিকে লইয়া আহার করিবার প্রথা আরবদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। এইরূপ আহারকারীকে তাহাদের ভাষায় 'দাফাফ' বলা হয়। এই কথা হইতে 'দিয়াফাঃ' শব্দ আতিথেয়তা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

যাঁহারা আরব দেশে গিয়াছেন, তাঁহারা উচ্চকণ্ঠে আরব-দিগের অতিথিসেবার প্রশংসা করিয়া থাকেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই আরবগণ অতিথিসেবা-পরায়ণ বলিয়া খ্যাত হইয়া আসিতেছেন। কবিগণের বর্ণনা হইতে জানিতে পারি, রাত্রিকালে তাঁহাদিগের শিবিরের প্রজ্বলিত অগ্নি দেখিয়া পথিকগণ আকৃষ্ট হইয়া শিবিরের নিকটে আসিলে সেই মরুবাসী শিবিরস্থ আরবগণের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায় যে, কে অতিথিকে সৎকার করিবে। এমন কি, অতিথি আগমন করিলে কুক্কুরগণ অভ্যর্থনাসূচক শব্দ করে। যদি অতিথি শত্রু হন, তথাপি শিবিরস্বামী তাঁহার সেবার জন্য

তৎক্ষণাৎ উষ্ট্রহত্যার আদেশ দেন এবং মাংস পাক করিবার ভার পড়ে অধীনস্থ স্ত্রীলোকদিগের উপর। অতিথিকে তাঁহারা পরিধেয় বস্ত্র দেন এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না অতিথি ঘুমাইয়া পড়েন, ততক্ষণ গৃহস্বামী তাঁহার সহিত বসিয়া গল্প করিতে থাকেন। গৃহস্বামী অতিথিকে রক্ষা করিবার জন্য নিজের জীবন পর্য্যন্ত পণ করেন।

অতিথি আসিলে 'আহ্লান, ওয়াসাহ্লান্' প্রভৃতি সাদর আহ্বানে গৃহস্বামী তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন।

অতিথিসেবার জন্য আরবগণের মধ্যে সাময়িকভাবে শান্তি স্থাপিত হয়। এইরূপ প্রথা আবহমান কাল হইতে বেদুইন্দিগের মধ্যে প্রচলিত থাকায় তাহাদের দ্বন্দ্বময় জীবন-যাত্রা কিঞ্চিৎ শান্তিপূর্ণ হইয়াছে।

কিন্তু যেখানে অতিথিসৎকারের প্রথা সমাজের সমস্ত স্তরে দেখা যায়, সেখানে যে এই অনুষ্ঠানটী কুট রাষ্ট্রনীতির সাহায্য করিবার জন্য ব্যবহৃত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ মিশরের পাশা মুহম্মদ আলী কায়রোর প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে তাঁহার দুর্গে আহ্বান করিয়া যখন তাঁহারা কফি পানে উদ্যত, তখন তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার আদেশ প্রদান করেন। এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতার উদাহরণ আরব-সাহিত্যে বিরল নহে। অনেক সময়ে দুষ্ট-লোকে অতিথিসেবার ভাণ করিয়া আমন্ত্রিত অতিথিদিগকে মিষ্টান্নের সহিত বিষ মিশাইয়া অজ্ঞানকরতঃ তাঁহাদিগের যাবতীয় দ্রব্যাদি লুণ্ঠনপূর্ব্বক পলায়ন করিত।

অটোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ওসমান বিবাহের নিমন্ত্রণের সুযোগ লইয়া তাঁহার দলবলকে স্ত্রীলোক সাজাইয়া দুর্গে প্রবেশ করেন এবং তাহা অধিকার করিতে সমর্থ হন। এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতার উদাহরণ এবং অতিথেয়তার অবমাননা মুসলমানদিগের ইতিহাসে এবং সাহিত্যে বিরল নহে।

গল

গলজাতির জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা অতিশয় প্রবল ছিল। অতিথির নিকট হইতে গলগণ প্রতিবাসী সম্বন্ধে তথ্য জানিতে পারিবে, এইজন্য তাহারা অতিথির সমাদর করিত। চারণগণ দূরদেশ হইতে আসিলে তাহারা সাদরে তাহাদের অভ্যর্থনা করিত। চারণগণের গান তাহারা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতে ভালবাসিত। কিন্তু তদপেক্ষা তাহাদের নিকট প্রিয় ছিল, তাহাদের মুখ হইতে দূরদেশবর্ত্তী জাতিদিগের আচার-ব্যবহারাদির বিষয় শ্রবণ করিয়া জ্ঞানলাভ করা।

আয়র্লণ্ড

আয়র্লণ্ডবাসী গলদিগেরই একটী শাখা। আইরিশ জাতি অতিথিপরায়ণতার জন্য জগদ্বিখ্যাত। অতি প্রাচীনকাল হইতেই পুণ্যকার্য্যজ্ঞানে ইহারা অতিথিসৎকার করিত।

বীড্ (Bede) এংগ্লো-সাক্সন জাতির প্রথম ঐতিহাসিক। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে যখন ইংলণ্ডে এক মহামারী দেখা দেয়, তখন উচ্চনীচ বহুশ্রেণীর লোক শিক্ষালাভ কিংবা সংযম অভ্যাসের জন্য আয়র্লণ্ডে চলিয়া যায়। আইরিশগণ ইহাদিগের সকলকেই সাদরে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের আহার, বাসস্থান এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল। ইহার জন্য তাহারা কিছুই গ্রহণ করে নাই।

কনটের রাজা গুয়ার (Guare, king of Connaught) খৃষ্টীয় ৭ম শতকে বর্ত্তমান ছিলেন। কথিত আছে, তিনি অতিথিবৎসল ছিলেন ও সর্ব্বদা মুক্তহস্তে দান করিতেন।

আইরিশদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে, গৃহস্বামী তিন দিন এবং তিন রাত্রির জন্য অতিথিসৎকার করিতে বাধ্য ছিলেন; তাহার পর তিনি দায়ী নহেন।

ঐতিহাসিক যুগেও আতিথেয়তার জন্য আইরিশগণ বিখ্যাত ছিল। তাহাদিগের রাজাকে দিবারাত্র রাজবাটীর ফটক অতিথির জন্য উন্মুক্ত রাখিতে হইত। যদি কখনও কোন অতিথি রাজা কিংবা কোন প্রজার গৃহে আসিয়া আহার করিত, তাহা হইলে গৃহস্বামী তৎপরে তাহার সহিত কখন শত্রুতা কিংবা অপর কোন দুর্ব্যবহার করিতে পারিতেন না। রাজগণ অতিথিকে বিনা প্রশ্নে আশ্রয় দিতে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু কৃষক-গৃহস্বামী অতিথিসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার অধিকারী ছিল। কারণ প্রয়োজন হইলে তাহাকে অতিথির সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে হইত।

শ্রেণীনির্ব্বিশেষে অতিথিসেবার বাধ্য-বাধকতা সকল লোকেরই ছিল। রাজা অতিথির জন্য সরকারী অতিথিসেবক নিযুক্ত করিতেন। ইনি আইরিশ ভাষায় bruighfer, brugaid, briuga শব্দে অভিহিত হইতেন। এই সরকারী অতিথিসেবার জন্য নানা প্রকারের সম্পত্তি এবং জমিজমা বরাদ্দ ছিল। এই দেশে দুই প্রকারের অতিথিসেবক ছিলেন—বড় এবং ছোট। ছোট অতিথিসেবককে সর্ব্বদা গোমেষাদি পশুর প্রত্যেকটী একশত হিসাবে এবং একশত শ্রমজীবী প্রস্তুত রাখিতে হইত। বড় অতিথিসেবককে ইহার দ্বিগুণ এবং একই সময়ে একশত অতিথিসৎকারের ব্যবস্থা রাখিতে হইত।

এই দুই শ্রেণীর অতিথিসেবক ছাড়া আরও উচ্চ

শ্রেণীর অতিথিসেবক সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন। তাঁহারা আগন্তুক রাজা এবং সম্ভ্রান্তবংশীয় লোক ও তাঁহাদের অনুচরবর্গের সৎকারের ভার লইতেন। এই শ্রেণীর অতিথিসেবকগণের (brugaid) মধ্যে স্ত্রীলোকও ছিলেন। রাজা এবং যোদ্ধারা যখন শিকারে বহির্গত হইতেন, তখন তাঁহাদিগকে আশ্রয়দান করার ভার ইঁহাদের উপর ন্যস্ত হইত।

ফিন (Finn) রাজার সময় আয়র্লণ্ডে এইরূপ কএকজন brugaid অর্থাৎ অতিথিসেবকের অস্তিত্ব ছিল।

অতিথিসেবকগণ অতিথিশালার রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতেন। অতিথিশালাকে আইরিশ ভাষাতে brudin অথবা bruden বলা হইত।

পুরাতন আইরিশ-সাহিত্যে অতিথিশালার বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রত্যেক অতিথি-নিবাসের সাতটী দরজা এবং এই সাতটী দরজার মধ্য দিয়া সাতটী পথ ছিল। প্রত্যেক অতিথি-শালায় সাতটী কটাহ সদাসর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। প্রত্যেকটী কটাহে একটী আস্ত যণ্ড এবং একটী লবণাক্ত শূকরকে সুসিদ্ধ অবস্থায় রাখা হইত। যে কোন লোক এই অতিথিশালায় প্রবেশ করিয়া কাঁটা দ্বারা ইহাদের মধ্যে যে কোন পশুর মাংস বিদ্ধ করিতে পারিত। কাঁটার সঙ্গে যতটা মাংস আসিত, তাহাই তাহাদের আহারের জন্য প্রাপ্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

খৃষ্টীয় যুগে মঠের সঙ্গে অতিথিশালা সংযুক্ত থাকিত। সন্ন্যাসিনীদিগের মঠে পুরুষ ভৃত্যের তত্ত্বাবধানে অতিথিদিগের জন্য পৃথক্ বাসস্থানের বন্দোবস্ত ছিল।

এংগ্লো-নর্ম্মান্ যুগে আয়র্লণ্ডে সরকারী অতিথিশালার সংখ্যা হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে। ৮ম হেন্‌রীর রাজত্বকালে যখন মঠগুলিকে তাঁহার আদেশে উঠাইয়া দেওয়া হয়, তখন হইতে অতিথিসেবার সাধারণ ব্যবস্থা এই দেশ হইতে অন্তর্হিত হয়।

ওয়েল্‌স্

ওয়েল্‌স্ দেশেও পূর্ব্বে অতিথিসেবার ব্যবস্থা যেরূপ ব্যয়-সাপেক্ষ ছিল, তাহা সত্যই প্রশংসার্হ। এখানকার অধিবাসি-দিগের গৃহ অতিথির জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। অতিথি যখন কোন গৃহে আগমন করিতেন, তখন তিনি তাঁহার অস্ত্রশস্ত্র গৃহস্বামীর হস্তে সমর্পণ করিতেন। এই ব্যবহারে অতিথি গৃহস্বামীর শান্তির আশ্রয় লইলেন, ইহাই সূচিত হইত। অতিথি তিন দিন এবং তিন রাত্রি গৃহস্বামী কর্ত্তৃক সেবার অধিকারী ছিলেন। দ্বিতীয় দিন গত হইলে তাঁহাকে গৃহ-স্বামীর পরিবারস্থ ব্যক্তি (agenhine) বলিয়া ধরা হইত। অতিথি গৃহে আসিলেই তাঁহাকে পদধৌত করিবার জন্য জল দেওয়ার বিধি ছিল; তিনি যদি পা না ধুইতেন, তাহা হইলে ইহাই সূচিত হইত যে, তিনি প্রভাতে আহারাদি করিয়া গৃহত্যাগ করিবেন—রাত্রিতে আশ্রয় চাহেন না।

ওয়েল্‌স্‌বাসীদিগের গৃহে কোন আসবাব অর্থাৎ টেবিলে চাদর কিংবা অপর কোন আস্তরণ থাকিত না। অতিথি আসিলে এক সঙ্গে তিনজন করিয়া বসিতেন এবং তাঁহাদের সম্মুখে ঘাসের উপরে প্লেটে করিয়া দুগ্ধ, পণির, মাখন ও মাংস ইত্যাদি সাজাইয়া রাখা হইত। যতক্ষণ না অতিথিদিগের খাওয়া হইত, ততক্ষণ গৃহস্বামী এবং তাঁহার স্ত্রী অভুক্ত থাকিতেন। তৃতীয় দিন এবং তৃতীয় রাত্রি পর্য্যন্ত আশ্রয়দাতা তাঁহার অতিথিদিগের জীবনের জন্য আইনতঃ দায়ী থাকিতেন।

যদি কোন অতিথি সুস্থশরীরে কোন গৃহস্বামীর আশ্রয় গ্রহণ করিবার পরদিবস প্রভাতে মৃত দেখা যাইত, তাহা হইলে আশ্রয়-দাতাকে তাহার মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হইত এবং তিনি ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতেন। অতিথি যেদিন হইতে আশ্রয়-দাতার গৃহে আগমন করিলেন, সেইদিন হইতে তৃতীয় রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার সমস্ত ভালমন্দের জন্য আইনতঃ দায়ী থাকিতেন। যদি অতিথি চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত হইতেন, তাহা হইলে আশ্রয়দাতার সাক্ষীতেই কেবল তিনি নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইতেন। যদি গৃহস্বামীর সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হইত, তাহা হইলে তিনিই ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী হইতেন।

টিউটন ও শ্লাভজাতি

টিউটন ও শ্লাভজাতির মধ্যেও অতিথিসৎকার-প্রথা প্রচলিত ছিল। লেটজাতিদিগের মধ্যে কেরোক্লিস নামে অতিথিসেবার দেবতা ছিলেন। টিউটন এবং শ্লাভজাতির মধ্যে অতিথি-বাচক যে কথাটী ব্যবহৃত হয়, তাহার উৎপত্তি একই শব্দ হইতে। এই দুই জাতির ভাষাতেই অতিথি কথাটী শত্রু শব্দ হইতে উদ্ভূত। শ্লাভভাষায় অতিথিকে গোস্‌পোডি (Gospodi) এবং লাটিন্ ভাষায় তাহাকে হোস্‌পেস্ (Hospes) বলা হয়। 'পোডি' কথাটী সংস্কৃত 'পতি' শব্দের অনুরূপ। অতিথি যখন কোন আশ্রয়দাতার গৃহে বাস করিতেন, তখন তিনি গৃহস্বামীর ন্যায় সমান অধিকারের দাবী করিতে পারিতেন। কেবল যে গৃহস্বামী অতিথির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বাধ্য থাকিবেন তাহা নহে, যে পর্য্যন্ত না অতিথি অন্যস্থানে আশ্রয়লাভ করিতেন, সেই পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার শুভাশুভের জন্য আইনতঃ দায়ী থাকিতেন।

টিউটন জাতি বৈর্হ্‌স্ (Wairdus) কথাটী অতিথি অর্থে ব্যবহার করিত। এই শব্দটীর ধাতুগত অর্থ ধরিলে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, টিউটন জাতির মধ্যে আশ্রয়দাতা গৃহস্বামী অতিথির শুভাশুভের জামিনস্বরূপ। ইহাদের মধ্যে গেষ্টা-হুস্ (Gesta-hus), গাষ্ট-হুস্ (Gust-hus) প্রভৃতি শব্দ অতিথিশালা অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

গ্রীক্ ও রোমক-সমাজ

হোমারের যুগে অপরিচিত লোকমাত্রই অতিথি বলিয়া গণ্য হইত। পূর্ব্বে অনেকে এই মত পোষণ করিতেন যে, অপরিচিত লোককে গ্রীক্‌গণ শত্রু বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু সম্ভবতঃ এই ধারণাটী ভুল। কোন অপরিচিত লোক আশ্রয় যাচ্‌ঞা করিলে তাহাকে নববস্ত্র পরাইয়া গ্রীক্‌গণ সাধ্যমত সংকার করিতেন। সে কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান তাঁহারা ভদ্রতা এবং শিষ্টাচার বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিতেন। অতিথির ফিরিবার সময় দক্ষিণাস্বরূপ তাহাকে কিছু দান করিবার প্রথাও ছিল। অতিথির আগমনে উভয় পরিবারের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, তাহার চিহ্নস্বরূপ একটী পাশা ভাঙ্গা হইত। উহার এক অংশ আশ্রয়দাতা এবং অপরাংশ অতিথির নিকট থাকিত। উহা উভয় পরিবারের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের স্মারকস্বরূপ ব্যবহৃত হইত। এইরূপ প্রথা প্রাচীন ইতালীয়দিগের মধ্যেও দেখা যাইত। রোমকজাতি সমস্ত বিষয়েই বিধিবদ্ধ নিয়মের বশীভূত ছিল। সেইজন্য অতিথি এবং তাহার আশ্রয়দাতার পরিবারের সঙ্গে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইত, তাহার মধ্যে তাহাদের আইনের কড়াকড়ি থাকিত। পরস্পরের সহিত হস্তালিঙ্গনের পর তাহারা পরস্পরে একটী লিখিত চুক্তিতে সহি করিত এবং সেই চুক্তি কুলগত হইত। এই চুক্তির ফলে অতিথি ভ্রমণ করিবার সময়ে আশ্রয়লাভ এবং তাহার বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা হইলে তাঁহার আশ্রয়দাতার নিকট হইতে পৃষ্ঠপোষক-স্বরূপ সাহায্যলাভের অধিকার থাকিত।

এই অতিথিসংকার পরিশেষে গ্রীক্‌দিগের মধ্যে রাষ্ট্রীয় অধিকারে পরিণত হইল। ইহার ফলে দেশস্থ কোন একজন নাগরিকের উপর ভিন্ন দেশ হইতে যাহারা বেড়াইতে কিংবা বাস করিতে আসিত, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত হইত। যাঁহার উপর এই ভার পড়িত, তাঁহাকে প্রোক্সেনাস্ (প্রেক্ষণক) বলা হইত। এই প্রোক্সেনাসের দায়িত্ব অনেকটা বর্ত্তমানকালের কন্সাল বা রাজদূতের সমান। ইনি কোন বেতন কিংবা পুরস্কার পাইতেন না, অথচ ইঁহার দায়িত্ব বড় কম ছিল না। কিন্তু এই কাজের জন্য তিনি যে সম্মানলাভ করিতেন, তাহাই তিনি যথেষ্ট পুরস্কার বলিয়া মনে করিতেন। এইরূপ রাষ্ট্রীয় আতিথ্য প্রাচীন ইতালীয়দিগের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল।

ধর্ম্মদ্বারা এই সম্বন্ধকে পবিত্র করা হইত। গ্রীক্‌দিগের মধ্যে যিনি প্রধান দেবতা, তাঁহাকে অতিথিপরায়ণ জিউস্ বলা হইত। ট্রয়ের রাজকুমার পারিস্ যখন হেলেনকে লইয়া পলায়ন করেন, তখন গ্রীক্‌গণের মনে এইজন্য বিশেষ আঘাত লাগে যে, তিনি পবিত্র আতিথ্যের অসদ্ব্যবহার করিয়া একটী বৃহৎ পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

রোমকদিগের মধ্যে আতিথ্য সম্পর্ক দুই প্রকারের ছিল। একদিকে ইহার মধ্যে রাজনৈতিক সংজ্ঞা ছিল, অপর দিকে ইহা ব্যক্তিগত সম্পর্ক বলিয়া আইনতঃ ইহার মধ্যে বাধ্য-বাধকতা ছিল। যখন রোমকগণ কাপুয়া অবরোধ করেন, তখন উভয় সৈন্যদলে দুইজন লোক ছিলেন, যাহাদের মধ্যে-আতিথ্যসম্বন্ধ ছিল। কাপুয়ার সেই সৈনিক রোমক-সৈন্যটীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলে রোমক সৈন্যটী প্রথমে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে অস্বীকার করেন। অবশেষে আতিথ্যবন্ধনকে উভয় পক্ষ হইতে অস্বীকার করিয়া পরস্পরে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।

গ্রীক্‌গণ অতিথিকে জেনোস্ এবং রোমকগণ হোস্‌পেস্ বলিত।

বর্ত্তমানকালে পাশ্চাত্ত্য-দেশসমূহে অতিথিসেবা

পাশ্চাত্ত্য-দেশসমূহে অতিথিসেবা হইতে বহু সংস্কার উদ্ভব হইয়াছে। ইউরোপে অতিথিসেবার ভার ছিল ধর্ম্মযাজক-দিগের উপর। ইঁহাদের চেষ্টায় রোগীদিগের সেবা ও চিকিৎসার জন্য হাঁসপাতাল এবং দরিদ্র ও আতুরের জন্য অনাথাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়।

বর্ত্তমানে পাশ্চাত্ত্য-দেশসমূহ হইতে অতিথিসেবা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ হোটেলের বৃদ্ধি এবং লোক-গণের মধ্যে নূতন প্রকার ব্যক্তিত্ববোধ। এই বোধের ফলে কোন মানুষ অপর কাহারও নিকট বিনামূল্যে কোন উপকার পাওয়াকে আত্মসম্মানহানিকর বলিয়া মনে করেন। এইজন্য ইউরোপে কোন ব্যক্তি অন্য কাহারও গলগ্রহ হইতে ইচ্ছা করেন না। সেইজন্য অতিথির আশ্রয়স্থল এখন হোটেল—যেখানে অর্থের বিনিময়ে আহার্য্য ও বাসস্থান সংগ্রহ করিতে হয়।

অতিথি,—(পুং) হিন্দুদিগের এক দেবতা। ইনি বিষ্ণু হইতে অভিন্ন নহেন। পদ্মপুরাণান্তর্গত পাতালখণ্ড (১১৩ অ°) হইতে জানা যায়, অতিথিদেবতা শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ

করেন। তাঁহার সমস্ত অঙ্গ পীতাম্বরে বিভূষিত এবং অতীব দীপ্তিশালী। ধ্যান যথা—

"অতিথিশ্চ প্রসন্নোঽভূৎ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
পীতাম্বরসমস্তাঙ্গভূষিতোঽতীবদীপ্তিমান্॥"

তাঁহার চতুর্থ হস্তে কি থাকে ধ্যান হইতে বুঝা যায় না; সম্ভবতঃ উহা রিক্ত।

অতিথি৩—(পুং) ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরের আপ্ত্যগণান্তর্গত অষ্টদেবতার তৃতীয় দেবতা। (ব্রহ্মাণ্ডপু°, ৬২ অ°)

অতিথি৪—(পুং) ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা কুশের পুত্র এবং শ্রীরামচন্দ্রের পৌত্র। ইঁহ'র পুত্র নিষধ। নিষধের তনয় পুণ্যশ্লোক নল। (মৎস্যপু° ১২.৫২; পদ্মপু°, সৃষ্টি°, ৮.১৫৭) কুশের চম্পিকা ও কুমুদ্বতী নামে দুই ভার্য্যা। দ্বিতীয়া পত্নী কুমুদ্বতীর গর্ভে অতিথি প্রভৃতি আট পুত্র জন্মে।

অতিথি৫—(পুং) চন্দ্রবংশীয় অক্রোধনের পুত্র। ইঁহার পুত্রের নাম ঋক্ষ। (বৃহদ্ধর্ম্মপু°)

অতিথি৬—(পুং) অত্রিবংশীয় ঋষিভেদ।

অতিথিক্রিয়া—(স্ত্রী) অতিথির প্রতি কর্ত্তব্য; অতিথিসৎকার, অতিথিজনোচিত সেবা। "তথৈব রাজপুত্রাভ্যামকুর্ব্বন্নতিথিক্রিয়াং" (রামা° ১.২৯.২৭)

অতিথিগ্ব—(পুং) [অতিথ্যর্থা গাবো যস্যাসৌ; বহুব্রী] অতিথির নিমিত্ত যাহার গো আছে; অর্থাৎ অতিথিসেবার নিমিত্ত যিনি গোপালন করেন। (অথর্ব্ব° ২০.২১.৮) ২ যাঁহার নিকট সৎকার পাইবার নিমিত্ত অতিথিগণ গমন করিয়া থাকেন। (অথর্ব্ব° ২০.৩৭.৮) ৩ 'অতিথিগ্ব' শব্দ অতিথিবৎসল এই অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা—অতিথিবৎসল দিবোদাসকে ইন্দ্র শম্বর নামক অসুরের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। (ঋক্ ১.১১২.১৪) ৪ কোন কোন স্থলে 'অতিথিগ্ব' শব্দ বিশেষভাবে দিবোদাসকেই বুঝাইয়াছে। কারণ দিবোদাসের পরিবর্ত্তে মূলে 'অতিথিগ্ব' লেখা আছে। সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন, "অতিথিগ্বায় অতিথিভির্গন্তব্যায় দিবোদাসায়" (ঋক্ ১.৫১.৬; ১.১৩০.৭; ১.৫৩.৮; ১০.৪৮.৮; ৬.১৮.১৩)। [অতিথি, দ্র°]

বেদে ইনি আয়ু, কুৎস, শ্বৈত্রেয় (কুৎসপুত্র), উসনস্, কাব্য, আর্জ্জুনেয়, শ্রুতর্য্য প্রভৃতি নামের সহিত উল্লিখিত হইয়াছেন। সুতরাং ঐ সকল ব্যক্তি ইঁহার সমসাময়িক বলিয়াই মনে হয়।

ঋগ্বেদে উল্লেখিত আছে যে, দিবোদাসের পুত্রের নাম সুদাস। সায়ণের মতে দিবোদাস পিজবনের নামান্তর মাত্র।

পুরাণোক্ত দিবোদাস উত্তর-পাঞ্চালাধিপতি। ইঁহার পিতার নাম ভদ্র্যশ্ব। কিন্তু ঋগ্বেদের ৬.৬১.১ মন্ত্রে ইঁহার পিতার নাম বধ্র্যশ্ব দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মপুরাণ হইতে জানা যায় (১২৩. অ°), দিবোদাস, প্রস্তোক ও অভ্যাবর্ত্তী সমকালীন ব্যক্তি। পুরাণ হইতে আরও জানা যায় যে, সুপ্রসিদ্ধা অহল্যা দিবোদাসের ভগিনী ছিলেন। [দিবোদাস দ্র°]

অতিথিত্ব—(ক্লী) অতিথির ভাব বা ধর্ম্ম। "অতিথিত্বেন বর্ণেভ্যো দেয়ং শক্ত্যানুপূর্ব্বশঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্যস° ১.১০৭)

অতিথিদেব—(ত্রি) [অতিথির্দেবো যস্য; বহুব্রী] অতিথিদেবতা; অতিথিকে দেবতার ন্যায় অর্চ্চনা। "আচার্য্যদেবো ভব অতিথিদেবো ভব।" (তৈত্তিরীয়োপ° ১.১১.২)

অতিথিধর্ম্ম—(পুং) [অতিথেধর্ম্মঃ; ৬-তৎ] অতিথিজনোচিত ধর্ম্ম। ভিন্ন গ্রাম হইতে আগমন, অতিথির আগমনযোগ্যকালে উপস্থিতি ইত্যাদি অতিথিধর্ম্ম। (মনু ৩.১১১)

অতিথিধর্ম্মিন্—(ত্রি) [অতিথিধর্ম্মোঽস্যাস্তীতি অতিথি-ধর্ম্ম-ইন্] অতিথিধর্ম্মশালী। "কুটুম্বেঽতিথিধর্ম্মিণৌ।" (মনু ৩.১১২)

অতিথিন্—(ত্রি) সতত গমনশীল। "সাধ্বর্য্যা অতিথিনীরিষিরাঃ স্পার্হাঃ"। (ঋক্ ১০.৬৮.৩) (পুং) ২ রাজভেদ। ইনি সুহোত্র ও অতিথি নামেও উক্ত হইয়াছেন। (মহাভা°)

অতিথিনী—(স্ত্রী) অতিথিতর্পকা। ২ অতনশীলা। (অথর্ব্ব° ২০.১৬.৩) সতত গমনশীলা, অতনশীলা। (ঋক্ ১০.৬৮.৩)

অতিথিপতি—(পুং) অতিথিকে যিনি সংবর্দ্ধনা করেন; গৃহস্বামী। "অতিথিপতিরতিথীন্ প্রতিপশ্যতি দেবযজনং প্রেক্ষতে।" (অথর্ব্ব° ৯.৬.৩) ২ বিষ্ণু।

অতিথিপরিচর্য্যা—(স্ত্রী) [পরি-চর্-যক্-শ 'য' নিপাতনে, পরিচর্য্যা। "পরিচর্য্যাপরিসর্য্যামৃগয়াটাট্যানামুপসংখ্যানম্।" (কাত্যায়ন) অতিথেঃ পরিচর্য্যা, ৬-তৎ] অতিথিসেবা।

অতিথিপরিভাবী—(ত্রি) অতিথির পরিভবকারী বা অতিথিকে অবজ্ঞা করে যে।

অতিথিপূজন—(ক্লী) [অতিথেঃ পূজনং; ৬-তৎ;] অতিথিসেবা, অতিথিসৎকার। মনু অতিথিসেবাকে পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্যতম নৃযজ্ঞ বা মনুষ্যযজ্ঞ নামে অভিহিত করিয়া পঞ্চসূনা-জনিত পাপক্ষয়ের জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনং।" (মনু ৩.৭০) [অতিথি, দ্র°]

অতিথিপূজা—(স্ত্রী) অতিথিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা। "করিষ্যেঽতিথিপূজাং বঃ সর্ব্বেষাম্।" (ঋক্ ১.৯.২৯)

অতিথিমৎ—(ত্রি) অতিথিশব্দোপেত, অতিথিশব্দযুক্ত (মন্ত্র)। (স্ত্রী—অতিথিমতী।) "সৈষাগ্নেয্যতিথিমতী ন সৌম্যাতিথিমত্যস্তি" (ঐতরেয়ব্রা° ১.১৭)।

অতিথিবৎ—(ত্রি) অতিথির ন্যায়।

অতিথিশালা—(স্ত্রী) অতিথির বাস করিবার নিমিত্ত গৃহ ; চলিত অতিথশালা, ধর্ম্মশালা, পান্থশালা। অতিথিসেবা অতি প্রাচীনকাল হইতে আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে। [অতিথি, দ্র°] পূর্ব্বে অতিথির নিমিত্ত ভোজ্য, পেয় এবং বাসস্থান প্রদান প্রত্যেক গৃহীর অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল। কোন্ সময় হইতে অতিথিশালার প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে বৌদ্ধ সঙ্ঘারামগুলি অতিথিশালার কাজ করিত, ইহা বৌদ্ধ-শাস্ত্রগ্রন্থ ও জাতকসমূহ পাঠে জানা যায়। সুতরাং সম্ভবতঃ তৎপূর্ব্বকাল হইতেই আমাদের দেশে অতিথির জন্য স্বতন্ত্র বাসগৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশের ভূস্বামি-গণের গৃহে অদ্যাপি অতিথিকে বিশেষভাবে সমাদর করা হয়। অতিথিশালায় তাহাদিগকে ত্রিরাত্র অবস্থান করিতে ও প্রয়োজনীয় আহার্য্যাদি দেওয়া হইয়া থাকে। কেবল বঙ্গদেশ বলিয়া নহে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থান-সমূহে বহু সহৃদয় ধনাঢ্যব্যক্তি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইমারত প্রস্তুত করাইয়া দূরাগত অতিথি বা পথিকগণের আহার ও বাসস্থানের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এই সকল গৃহ সাধারণতঃ ধর্ম্মশালা বা পান্থশালা নামে অভিহিত হয়।

পাশ্চাত্ত্য-দেশসমূহেও পূর্ব্বে অতিথিসেবার অতি সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীন টিউটন, আইরিশ প্রভৃতি জাতির ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়—অতিথিগণের বাসের নিমিত্ত তাঁহারা স্বতন্ত্র অতিথিশালা নির্ম্মাণ করিতেন। অতিথিগণ ঐ সকল গৃহে ত্রিরাত্র অবস্থান করিয়া সর্ব্বপ্রকার সুখসুবিধা লাভে সমর্থ হইতেন। [অতিথি, দ্র°]

অতিথিসৎকার—(পুং) অতিথির যথাযোগ্য সেবা, অতিথি-সেবা। "মূষিকস্তাপ্যতিথিসৎকারং চকার।" (হিতোপদেশ) [অতিথি, দ্র°]

অতিথিসেবা—(স্ত্রী) অতিথির শুশ্রূষা ; অতিথিকে আহার ও বাসস্থান প্রদানপূর্ব্বক সাধ্যানুরূপ সৎকার। [অতিথি, দ্র°]

অতিথিসংবিভাগব্রত—জৈন ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত চতুর্ব্বিধ শিক্ষাব্রতের অন্যতম। ইহার অপর নাম বৈয়াবৃত্ত। যোগ্যপাত্রে আহার-দান, ঔষধদান, অভয়দান, জ্ঞানদান এবং বস্ত্রতৈজসাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যদান করার নাম অতিথিসংবিভাগ। যদি ইহা দ্বারা গ্রহীতার আলস্য, প্রমাদ, উন্মত্ততা, রোগ, পাতক প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সে দান প্রকৃতদান নহে। এইজন্য দাতা বিশেষ বিবেচনাসহকারে দান করিবেন। অতিথিসংবিভাগের পঞ্চ অতিচার (সামান্য ত্রুটী) যথা—(১) সচিত্ত বা জীবযুক্ত পাত্রে ভোজনসামগ্রী রাখিয়া দান করা। (২) সচিত্ত পাত্র দ্বারা ঢাকিয়া দান করা। (৩) স্বয়ং দান না করিয়া অন্য ব্যক্তিকে আজ্ঞা দিয়া দান করান। (৪) মৎসরবুদ্ধিপূর্ব্বক (দেখাদেখি প্রতিযোগিতা-পূর্ব্বক) দান করা। (৫) দানের উপযুক্ত সময় অতিক্রম করিয়া দান করা।

অতিদগ্ধ--(ক্লী) [বৈদ্যক] অগ্নিদগ্ধরোগ। অতিশয় দগ্ধ হইলে গাত্রবিশেষ এবং শিরা, স্নায়ু, সন্ধি ও অস্থিসমূহের ভয়ানক যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। এই রোগে জ্বর, দাহ, পিপাসা, ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব এবং ব্রণ জন্মে। ব্রণ উৎপন্ন হইয়াই বিবর্ণ হয়। ইহার চিকিৎসা সুশ্রুত সূত্রস্থান দ্বাদশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। এই রোগে অগ্নির মৃদু উত্তাপ প্রভৃতি বিশেষ উপকারী। (ত্রি) ২ অতিশয় দগ্ধমাত্র।

অতিদত্ত—(পুং) সাত্বতবংশীয় দত্তের ভ্রাতা এবং রাজা অধি-দেবের পুত্র। (হরিবংশ)

অতিদর্প—(পুং) [দর্পমতিক্রান্তঃ] দর্পাতিক্রমণ। [অতি-শয়িতো দর্পঃ] ২ প্রবল অভিমান ; অত্যন্ত অহঙ্কার। "অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ কৌরবাঃ।" (চাণক্যনীতি)

অতিদর্শিন্—(পুং) অতিদূরদর্শনসমর্থ, সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন। "নয়নেনাতিদর্শিনা"। (রামা° ৩.৭৪.১৬)

অতিদান—(ক্লী) [অতিশয়িতং দানম্ ; প্রাদি-স°] অত্যন্ত দান, অপরিমিত দান। "অতিদানে বলির্ব্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্ত-গর্হিতম্।" (চাণক্যনীতি)

অতিদান্ত—(পুং) সাত্বতবংশীয় হৃদিকের পুত্রগণের অন্যতম। (হরিবংশ)

অতিদারুণ—(ত্রি) অতি কঠোর।

অতিদাহ—(পুং) [বৈদ্যক] অতিসন্তাপ। (বৈদ্যকনি°)

অতিদাহন—(পুং) সূর্য্যের অনুচরভেদ। দেবাসুরযুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যের জন্য সূর্য্য তাঁহার পঞ্চ অনুচরকে প্রেরণ করেন, অতিদাহন তাঁহাদের অন্যতম। (বামনপু°)

অতিদিষ্ট—(ত্রি) [অতি-দিশ-ক্ত] অতিদেশবিশিষ্ট। যেখানে অন্য ধর্ম্মের আরোপ করা হইয়াছে। যথা—'অমায়াং পিতৃভ্যো দদ্যাৎ।' অমাবস্যায় পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবে। 'প্রকৃতিবৎ বিকৃতিঃ কর্ত্তব্যা।' বিকৃতিকার্য্য প্রকৃতির ন্যায় করিবে। এখানে অমাবস্যা ভিন্ন অন্য শ্রাদ্ধগুলি অতিদিষ্ট হইল। যথা—প্রকৃতি-দর্শযাগাদির অঙ্গকার্য্য প্রযাজাদি, বিকৃতিতে পশ্বাদিযাগে অতিদিষ্ট হইল। "অতিদেশো নাম ইতরধর্ম্মস্য ইতরস্মিন্ প্রয়োগায় আদেশঃ।" (মীমাংসা)

অতিদীন—(পুং) অতিশয় দরিদ্র। ২ অতিদুঃখিত ; অতিকাতর।

অতিদীপ্ত—(পুং) মহাদেব। (মহাভা° ১৩.১৭.৬৯) (ত্রি) ২ অত্যুজ্জ্বল।

অতিদীপ্তি—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] শ্বেত সুরসা। চলিত শ্বেত বাবুইতুলসী।

অতিদীপ্য—(পুং) [অতিশয়েন দীপ্যতে অতি-দীপ-যৎ কর্ত্তরি] [বৈদ্যক] রক্তচিত্রক, লালচিতা, রাঙ্‌চিতা। [চিতা দ্র°]

অতিদীর্ঘ—(ত্রি) অতিশয় দীর্ঘ। "বিরূপানালভতেঽতিদীর্ঘং" (শুক্লযজুঃ ৩০.২২)। ২ অত্যধিক। (মহাভা° ৭৭.২০.১) ৩ অতিলম্ব ; খুব লম্বা। (সুশ্রুত ১.৭.১৫)

অতিদুর্লভ—(ত্রি) যাহা সহজে লভ্য নহে। ২ অতিদুঃখেও যাহা লাভ করা যায় না।

অতিদুষ্ট—(পুং) [বৈদ্যক] গোক্ষুরক। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ২ অতিশয় দুষ্ট, মন্দ।

অতিদূর—(ত্রি) অতিশয় দূরস্থ ; অতিবিপ্রকৃষ্ট। ২ অতিদূর-স্থান। "নাতিদূরনিরীক্ষিন্।" (রামা° ৫.৮৬.১২)

অতিদেব—(পুং) [অতিক্রান্তো দেবান্। অত্যাদয়-স°] সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ, রুদ্র। "রুদ্রো দেব ত্বং রুদনাদ্রাবণাচ্চরোভূয়মাণো দ্রাবণাচ্চাতিরুদ্রঃ।" (হরিবংশ)

অতিদেবা—(স্ত্রী) যদুবংশীয় দেবকের সপ্তকন্যার অন্যতমা। এই সপ্ত কন্যাকেই বসুদেব বিবাহ করেন। (লিঙ্গপু°) [দেবকী দ্র°]

অতিদেশ—(পুং) [অতিদিশ্যতে অসৌ অনেন বা ইতি কর্ম্মণি করণে বা অতি-দিশ-ঘঞ্। স্ববিষয়মতিক্রম্য উল্লঙ্ঘ্য, অন্যত্র দেশঃ উপদেশঃ। অত্যাদয়-স°] অন্য ধর্ম্মের অন্যত্র আরোপ।

"অন্যত্রৈব প্রণীতায়াঃ কৃৎস্নায়া ধর্ম্মসংহতেঃ।
অন্যত্র কার্য্যতঃ প্রাপ্তিরতিদেশঃ স উচ্যতে ॥"
(অধিকরণমালা)

এক স্থানের প্রণীত ধর্ম্মের কার্য্যদ্বারা অন্যত্র প্রাপ্তি হইলে, তাহাকে অতিদেশ বলা যায়। যেমন—'অক্ষয্যোদকদানন্তু অর্ঘ্যদানবদিষ্যতে।' শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের পর ঘৃত, মধু ও তিলযুক্ত যে জল দিতে হয়, তাহার নাম অক্ষয্যোদকদান। যেমন করিয়া অর্ঘ্যদান করিতে হয়, সেইরূপে অক্ষয্যোদকদানও করিবে। অর্থাৎ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে পিত্রাদি ষট্‌পুরুষকে যেমন ছয়টী অর্ঘ্য পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দিতে হয়, অক্ষয্যোদকও তদ্রূপ পৃথক্ করিয়া দেওয়া চাই। পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে অন্নদান প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্য পৃথক্ পৃথক্ রূপে না করিয়া এক পাত্রে (এক খোলায়) ও এক বাক্যেই উৎসর্গ করার বিধি আছে, এই হেতু অর্ঘ্যদানের ন্যায় অক্ষয্যোদকদানের পৃথক্ দানরূপ ধর্ম্মের অতিদেশ ঘটিল। পুনশ্চ, "মাতামহানামপ্যেবং শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।" বিচক্ষণ ব্যক্তি মাতামহাদির শ্রাদ্ধ পিত্রাদি শ্রাদ্ধের ন্যায় করিবেন। এখানে মাতামহাদির শ্রাদ্ধ পিত্রাদিশ্রাদ্ধের সদৃশ বিহিত হইল বলিয়া এটীও অতিদেশিক কার্য্য। ২ অন্যত্র প্রাপ্ত অন্যধর্ম্মের প্রাপক শাস্ত্রভেদ। তন্ত্ররত্নাকর বলেন—যে শাস্ত্র দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ ধর্ম্মের অতিদেশ দেওয়া যায়, তাহার নামও অতিদেশ। যথা—

"প্রকৃতাৎ কর্ম্মণো যস্মাত্তৎসমানেষু কর্ম্মসু।
ধর্ম্মোঽতিদিশ্যতে যেন সোঽতিদেশ ইতি স্মৃতঃ ॥"
(মলমাসতত্ত্ব)

'প্রকৃতিবদ্বিকৃতিঃ কর্ত্তব্যা।' বিকৃতিকার্য্যটী প্রকৃতির ন্যায় করিতে হয়। অমাবস্যা-শ্রাদ্ধ প্রকৃতি, তদ্ভিন্ন সমস্ত শ্রাদ্ধই বিকৃতি। এখানে প্রকৃতিবৎ এই শাস্ত্রটী দ্বারা অন্যত্র তাহার ধর্ম্ম অতিদিষ্ট হইল বলিয়া ঐ শাস্ত্রটীই অতিদেশ।

অতিদেশ পাঁচ প্রকার। যথা—শাস্ত্রাতিদেশ, কার্য্যাতিদেশ, নিমিত্তাতিদেশ, সংজ্ঞাতিদেশ এবং রূপাতিদেশ। সংস্কৃত ভাষায় ইব কিংবা বৎ এইরূপ সাদৃশ্যবাচক শব্দ দ্বারা অতিদেশ নির্ণীত হয়। শ্রাদ্ধবিবেকটীকায় শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার লিখিয়াছেন—বৈদিক কর্ম্মে—"নিত্যেন তুল্যং শেষং স্যাৎ" এখানে তুল্য শব্দে অতিদেশ। ইহা শাস্ত্রাতিদেশ। "অপ্রযাজাস্তাঃ" এখানে কার্য্যদ্বারা নিষেধে দর্শপৌর্ণমাস ধর্ম্মের অতিদেশ। এটী কার্য্যাতিদেশ। "বিকৃতৌ মৌদ্গচরুযাগে ব্রীহিকার্য্যাকারিণি ব্রীহিকার্য্যনিমিত্তত্বাৎ ধর্ম্মাঃ প্রোক্ষণাদয়ঃ কল্প্যন্তে" এখানে নিমিত্তাতিদেশ। "মাসমগ্নিহোত্রং জুহোতি" এখানে মাস-সাধ্য অয়নাখ্য যাগে অগ্নিহোত্র পদ ব্যপদেশহেতু অগ্নিহোত্র ধর্ম্মের অতিদেশ। ইহা ব্যপদেশ বা সংজ্ঞাতিদেশ। "যজমানাদ্‌ভিন্নো যূপঃ" এখানে যূপে যজমান হইতে পৃথক্‌রূপের অববোধহেতু যজমানধর্ম্মের তদীয় পরিমাণের অতিদেশ। ইহা হইল রূপাতিদেশ। "অত্র যূপে যজমানাদন্যত্বরূপাবগমাৎ যজমানধর্ম্মস্য তদীয়পরিমাণস্যাতিদেশঃ।"

বৈদিক কর্ম্মের ন্যায় ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে এবং লৌকিক ব্যবহারেও অতিদেশ আছে। পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রগুলি শাস্ত্রাতিদেশ। তৎপ্রতিপাদ্য কার্য্যগুলি বৈদিক কার্য্যাতিদেশ।

ব্যাকরণোক্ত 'ইণ্‌বদিক' এটী রূপাতিদেশ। 'কর্ম্মবৎ কর্ম্মণা তুল্যক্রিয়ঃ। (পা ৩.১.৮৭)' এবং 'পুম্বদিত্যাদি' কার্য্যাতিদেশ। 'ণিদ্বৎ' এটী নিমিত্তাতিদেশ। 'ব্যপদেশিবদ্ভাব' ইত্যাদি সংজ্ঞাতিদেশ। লৌকিক গোসদৃশ গবয়—এটী রূপাতিদেশ। অতএব সকল উপমাস্থলেই প্রায় অতিদেশ বাক্য ঘটিয়া থাকে। বৈয়াকরণেরা—'আতিদেশিকমনিত্যম্'—অতিদেশ-লব্ধ কার্য্য অনিত্য এই ন্যায়ানুসারে কোন কোন

স্থলে বাধা দেখাইয়া থাকেন। তাহার প্রমাণ—'ইণ্‌বদিকঃ' এই বলিয়া ইক্‌ ধাতুর কার্য্য সর্ব্বত্র ইণ্‌ ধাতুর ন্যায় হওয়া উচিত। কিন্তু "স সীতয়োরাঘবয়োরধীয়ন্‌।" (ভট্টি ৩.১৮) এই শ্লোকে ঐ ন্যায়ানুসারে শতৃপরে ইক ধাতু স্থানে য আদেশ হয় নাই, তাহা হইলে অধ্যন্‌ এই প্রকার রূপ হইত। কিন্তু শতৃপরে ইণ্‌ ধাতু স্থানে য হইয়া থাকে। যথা—"উদ্যদাদিত্য-সঙ্কাশম্" ইত্যাদি।

অতিদেশ,—(পুং) প্রকৃত বিষয়ের অনাগত দ্বারা সাধন। যথা—'অনেনাস্য বায়ুরূর্দ্ধমুপতিষ্ঠতে তেনোদাবর্ত্তঃ স্যাৎ।" (সুশ্রুত, উ°, ৬৫ অ°)

অতিদোহ—(পুং) অতিশয়িত দোহন; নিঃশেষে গবাদি দোহন। (অত্রিস° ২১৭)

অতিধন্বন্‌—(পুং) [অত্যুৎকৃষ্টং ধনুর্যস্য; প্রাদি, বহুব্রী। ধনুষশ্চ। পা ৫.৪.১৩২। অনঙ্‌ আদেশ] উত্তম ধনুর্দ্ধর, যোদ্ধা। [অতিক্রান্তঃ ধন্বানং তন্নাম মরুং] (ত্রি) ২ মরুস্থল অতিক্রমকারী।

অতিধন্বা—(পুং) মহর্ষি শুনকের পুত্র। ইনি একজন উদ্‌গীথ-বিদ্যাবিদ্‌ ঋষি ছিলেন। স্বীয় শিষ্য উদরশাণ্ডিল্যকে ইনি উদ্‌গীথ বিজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করেন। (ছান্দোগ্যোপ° ১.৯.৩)

অতিধূম্র—(পুং) মহাদেব। (মহাভা° ১৩.১৭.৮১)

অতিধৃতি—(স্ত্রী) [অতিক্রান্তা ধৃতিম্‌ ধৃতিনামধেয়ামষ্টাদশাক্ষর-পাদিকাং বৃত্তিমেকাক্ষরাধিক্যাৎ; অত্যাদয়-স°] উনবিংশ অক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ। ধৃতিচ্ছন্দে আঠারটী অক্ষর; অতিধৃতিচ্ছন্দে তদপেক্ষা একটী অক্ষর অধিক। (ত্রি) ২ ধৈর্য্য বা সন্তোষ অতিক্রমকারী; অধৈর্য্য, অসন্তুষ্ট।

অতিধেনু—(ত্রি) ধেনুসমূহের বিভিন্নতা সম্পাদন। [ধেনু-মতিক্রান্তঃ] ২ ধেনু অতিক্রমকারী। "অতিধেনবে ব্রাহ্মণায়" (পা ১.৪.৩ কাশিকা)।

অতিনামন্‌—(পুং) চাক্ষুষ মন্বন্তরে আবির্ভূত সপ্তর্ষিগণের অন্যতম। (বিষ্ণুপু°; হরিবংশ)

অতিনাষ্ট্র—(ত্রি) বিপদ্‌ অতিক্রান্ত; ভয়াতীত।

অতিনিদ্রতা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] কফবৃদ্ধিজন্য রোগবিশেষ।

অতিনিদ্রম্‌—(অব্য) [নিদ্রা সম্প্রতি ন যুজ্যতে; অব্যয়ীভাব] নিদ্রার অযোগ্য কাল। [অতিক্রান্তং নিদ্রাম্‌] (ত্রি) ২ নিদ্রাতিক্রমকারী; নিদ্রারহিত। [অতিশয়িতা নিদ্রা] (স্ত্রী) ৩ দীর্ঘনিদ্রা। [অতিশয়িতা নিদ্রা অস্য] ৪ (ত্রি) দীর্ঘনিদ্রাযুক্ত।

অতিনিদ্রা—(স্ত্রী) অত্যন্ত নিদ্রা, গাঢ় ঘুম।

অতিনির্হারিন্‌—(ত্রি) [অতিশয়েন নির্হরতি সমাকর্ষতি অবশ্যং মনঃ] অত্যন্ত সমাকর্ষী। ২ অতিদূরবিসর্পী, অতিদূরগামী। 'আমোদঃ সোঽতিনির্হারী।' (অমর)

অতিনিবৃৎ—(স্ত্রী) এক বৈদিক ত্রিপদীছন্দের নাম। এই ছন্দে যথাক্রমে সাত অক্ষরের পর ছয় অক্ষর এবং তৎপরে সাত অক্ষর থাকে। যথা—"পুরুতমং পুরূণাং স্তোতৄণাং বিবাচি বাজেভি-র্বাজয়তাম্‌।" (ঋক্‌ ৬.৪৫.২৯)

অতিনীচরত—কামকেলিভেদ। বাৎস্যায়ন ও কোক্কোক সাধন ও সম্বাধের প্রমাণভেদে নায়ক ও নায়িকার তিনটী করিয়া ভেদ করিয়াছেন—শশ, বৃষ ও অশ্ব এবং মৃগী, বড়বা ও হস্তিনী। অতিক্ষুদ্র সাধনশালী শশের সহিত অতিগভীর সম্বাধশালিনী হস্তিনীর রমণকে অতিনীচরত বলে। (কামসূত্র, ২.১.১,২,৮; রতিরহস্য ৩.৪-৫) [সম্প্রয়োগ, নীচতররত, শশ, হস্তিনী, লিঙ্গ ও ভগ দ্র°]

অতিনু—(ক্লী) [অতিক্রান্তং নাবং; অত্যাদয়-স°। অতীতা নৌর্যেন বা অত্যাদয়, বহুব্রী। ক্লীবে হ্রস্বং ঔস্থানে উঃ। (পা ১.১.৪৮)] নৌকাতিক্রমকারী। ২ অতীতনৌকা; নৌকা উত্তীর্ণ কিংবা নৌকা ব্যতিরেকে ভেলাদ্বারা অথবা সন্তরণদ্বারা পারগামী।

অতিনৌ—(পুং, স্ত্রী) [এখানে নৌ শব্দের ঔকার হ্রস্ব হইল না।] নৌকাতিক্রমকারী।

অতিপক্কক্ষীর—(ক্লী) [বৈদ্যক] অতিশৃত ঘন দুগ্ধ; ঘনাবর্ত্ত দুধ। এইরূপ দুগ্ধ অতি গুরুপাক। "ভবেদ্‌গরীয়োঽতিশৃতং।" (বাভটটীকা)

অতিপক্কমাংস—(ক্লী) [বৈদ্যক] পাকাধিক সিদ্ধ মাংস। অতিপক্কমাংস বিরস, বাতজনক ও গুরু। "অতিপক্কন্তু যন্মাংসং বিরসং বাতলং গুরু।" (বৈদ্যকনি°)

অতিপটীক্ষেপ—(পুং) ভ্রমে অপসারিত যবনিকা।

অতিপতন—(ক্লী) [অতি-পত ভাবে ল্যুট্‌] অত্যয়। ২ অতিক্রমণ।

অতিপত্তি—(স্ত্রী) [অতি-পত-ক্তিন্‌] অতিপাত, অতিক্রম। "দেশকালাতিপত্তৌ চ গৃহীত্বা স্বয়মর্পয়েৎ।" (যাজ্ঞবল্ক্যস° ২.১৭২) ২ অতিপতন। [অতি-পদ্‌-ক্তিন্‌] ২ অনিষ্পত্তি। (পা ৩.৩.১৩৯)

অতিপত্র—(পুং) [অতিশয়িতং বৃহৎপত্রমস্য; প্রাদি, বহুব্রী] [বৈদ্যক] হস্তিকন্দ নামক মহাকন্দবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ শাকবৃক্ষ। চলিত সেগুন গাছ।

অতিপত্রা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] বলা, চলিত বেলেড়া (Sida cordifolia)। হিন্দী—খরেলী।

অতিপথ—(পুং) [পন্থানমতিক্রান্তঃ; অত্যাদয়-স°। অতি-পথিন-অচ্‌] অতীতপথ।

অতিপথিন্—(পুং) [অতিশয়িতঃ শোভনঃ পন্থাঃ ; প্রাদি-স°। অতেঃ পূজার্থত্বাৎ ন সমাসান্ত] সৎপথ, সুন্দরপথ। 'অতিপন্থাঃ সুপন্থাশ্চ সৎপথশ্চার্চ্চিতেঽধ্বনি।' (অমর) [পত-ইনি পথিন্। পতস্থ চ। উন্ ৪.১২। পত ধাতুর তকার স্থানে থ আদেশ হয় এবং তাহার উত্তর ইনি প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে। পথঃ সংখ্যাব্যয়াদেঃ। (কাত্যায়ন)। সংখ্যা এবং অব্যয়ের পর কৃতসমাসান্ত পথশব্দ ক্লীবলিঙ্গ হয়। যেমন—ত্রিপথম্, বিপথম্। কিন্তু, সুপন্থাঃ, অতিপন্থাঃ, এস্থলে ক্লীবলিঙ্গ হইবে না। 'কৃতসমাসান্তনির্দ্দেশান্নেহ।' (ভট্টোজী)

অতিপদ—(ত্রি) [অতিক্রান্তং পদং চরণম্। অত্যাদয়-স°] বর্ণবৃত্তানুসারী ছন্দঃপাদ অতিক্রান্ত বা অতিক্রমকারী। "অতিপদা শক্বরী" (পতঞ্জলি) "অতিপদা গায়ত্রী, অতিপদা জগতী" (বাচস্পত্য)

অতিপন্ন—(ত্রি) [অতি-পদ্-ক্ত] অতিক্রান্ত। "তথাতিপন্ন-শিশুসংস্কারাশ্চেতি।" (মুহূর্ত্তচিন্তামণি)

অতিপরোক্ষ—(ত্রি) [অতিক্রান্তং পরোক্ষম্] প্রত্যক্ষ। ২ চাক্ষুষ বিষয়।

অতিপাত—(পুং) [অতি-পত-ঘঞ্ ভাবে] অতিক্রম, অপগম, উপাত্যয়, পর্য্যায়। ২ ক্ষতি, হানি। "নো চেদন্য-কার্য্যাতিপাতঃ।" (শকু°) ৩ নিরন্তর পাত, অজস্রবর্ষণ। ৪ আপাত, সংঘর্ষণ, উপাগম।

অতিপাতক—(ক্লী) [অতিক্রান্তমতিবিগর্হিতত্বাৎ অন্যৎ পাতকম্। অত্যাদয়-স°] নয় প্রকার পাপের মধ্যে গুরুতর পাতকভেদ। অতিপাতক পুরুষের পক্ষে ত্রিবিধ ; যথা—মাতৃগমন, কন্যাগমন এবং পুত্রবধূগমন। "মাতৃগমনং দুহিতৃ-গমনং স্নুষাগমনমিত্যতিপাতকানি" (বিষ্ণুস° ৩৪.১) স্ত্রীলোকের পক্ষে অতিপাতক—পিতৃগমন, ভ্রাতৃগমন, পুত্রগমন ও শ্বশুরগমন। শূলপাণি স্বকৃত প্রায়শ্চিত্তবিবেকে লিখিয়াছেন, অতিপাতক মহাপাতক অপেক্ষাও গুরুতর পাপ। তাহার কারণ এই, ঐ সকল গুরুতর পাপ করিয়া যাহারা প্রায়শ্চিত্ত করে না, সেই অতিপাতকীরা পর্য্যায়ক্রমে এক কল্প নরক ভোগ করে। মহাপাতকীরা ও অনুপাতকীরা এক মন্বন্তরকাল এবং উপপাত-কীরা চারি যুগ নরক ভোগ করে। এই কএকটী পাপের মধ্যে অতিপাতকের বিষয় প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহার ফলভোগও দীর্ঘকাল করিতে হয়, তজ্জন্য ইহা সকল পাপের মধ্যে গুরুতর। বিষ্ণু বলেন, জ্ঞানকৃতই হউক আর অজ্ঞানতাবশতঃই হউক, একবার হউক আর অনেকবার হউক, ঐ পাপ করিলে তৎক্ষণাৎ অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা মরণ ভিন্ন অন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই। প্রায়শ্চিত্তবিবেকের টীকাকার গোবিন্দানন্দ লিখিয়াছেন, "ন হ্যন্যা নিষ্কৃতিস্তেষাং।" মরণ ভিন্ন তাহাদের আর অন্য নিষ্কৃতি নাই। এতদ্দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মরণ ভিন্ন অন্য বিধি, যথা মরণ বৈকল্পিক চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক ব্রতাচরণেও সে পাপ ক্ষয় হয় না। অতিপাতকী সর্ব্ববিধ তির্য্যক্‌যোনি ভোগের পর মনুষ্য জন্মে পূর্ব্বজন্মকৃত অতিপাতকের ফলে গলৎকুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হয়। (বিষ্ণুস° ৩৪.১) এই রোগের দুইটী পরাকব্রত। তাহাতে অসমর্থ হইলে ৩০ কাহন কড়ী কিংবা সেই মূল্যের স্বর্ণ বা রৌপ্য উৎসর্গ করিবে। তদ্দ্বারা অতিপাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। (প্রায়শ্চিত্তবিবেক) (ত্রি) ২ পাতক অতিক্রমকারী, পুণ্যশীল।

অতিপাতিত—(ক্লী) [বৈদ্যক] নিঃশেষরূপে ছিন্ন বা ভিন্ন অস্থি। "অস্থিনিঃশেষতশ্ছিন্নমতিপাতিতম্।" (সুশ্রুত সূ°)

অতিপাতিন্—(ত্রি) অতিদ্রুত গমন ; অতিক্রম করিয়া বেগে গমন ; বেগগামী। "পবনাতিপাতিভির্দিশোহরিদ্ভিঃ"। (রঘু° ৩.৩০)

অতিপাত্য—(ত্রি) অতিক্রমণীয়। ২ উপেক্ষণীয়। "ধর্ম্ম-কার্য্যমনতিপাত্যং দেবস্য।" (শকু° ৫.৯)

অতিপাদনিবৃৎ—(স্ত্রী) বৈদিক ত্রিপদী ছন্দোবিশেষ ; এই ছন্দে যথাক্রমে ছয়, আট ও সাতটী অক্ষর থাকে, অর্থাৎ প্রথম পাদে ছয়টী, দ্বিতীয় পাদে আটটী এবং তৃতীয় পাদে সাতটী অক্ষর।

অতিপাপ—(পুং) সপ্তবিধ পাতকের অন্যতম।

"জাতিভ্রংশকরং তদ্বদুপপাতকসংজ্ঞকম্।
অতিপাপং মহাপাপং সপ্তধা পাতকং স্মৃতম্॥"
(স্কন্দপু°, বিষ্ণু°, কার্ত্তিক° ২৯.২৪)

অতিপিচ্ছ—(পুং) [বৈদ্যক] শ্বেত রক্তালুক। (বৈদ্যকনি°)

অতিপিচ্ছলা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] কুমারী, চলিত ঘৃতকুমারী।

অতিপিঞ্জর—(পুং) [বৈদ্যক] দুষ্টব্রণ। (চক্রদত্ত)

অতিপিতামহ—(ত্রি) পিতামহাতিক্রমী ; পিতামহকে যে অতিক্রম করে।

অতিপিতৃ—(ত্রি) পিত্রাতিক্রমকারী ; স্বীয় পিতাকে যে অতিক্রম করে।

অতিপীড়ক—(পুং) [বৈদ্যক] অতিপিঞ্জর। [অতিপিঞ্জর দ্র°]

অতিপুষ্পক—(ত্রি) [অতিক্রান্তং পুষ্পকাখ্য কুবেরবিমানম্ ; অত্যাদয়-স°] অতিসুন্দরবেগশালী। ২ (যে রথ) পুষ্পক-রথ অতিক্রম করিয়া গমন করিতে পারে। "আনন্দাদতি-পুষ্পকং রথমধিষ্ঠায় প্রিয়াযৌতুকপ্রাপ্তং।" (নৈষধ° উ° ১৯.৬৬)

অতিপূত—(ত্রি) [অতিশয়িতঃ পূতঃ] অত্যন্ত নির্ম্মল ; অতি পবিত্র। "সামাতিপূতঃ" ; (শতপথব্রা° ৫.৪.১১)

অতিপূরুষ—(পুং) বিশিষ্টতম ব্যক্তি। ২ বীর, শূর।

অতিপ্রকাশ—(ত্রি) অত্যন্ত স্পষ্ট ; অতিপ্রত্যক্ষ ; বিশেষভাবে প্রাদুর্ভূত। ২ প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত।

অতিপ্রগে—(অব্য) [অতিপ্রগ শব্দের সপ্তম্যন্ত রূপ। অতি-প্র-গৈ-ক] অত্যন্ত প্রাতঃকালে, সূর্য্যোদয়কালে। "নাতি প্রগে নাতিসায়ং ন সায়ম্প্রাতরাশিতঃ। (মনু ৪.৬২) [অতিশয়েন প্রগীয়তে বেদোঽস্মিন্‌কালে] পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণেরা নিশাশেষে বেদপাঠ করিতেন। (মনু ৪.৯৯)

অতিপ্রণয়—(পুং) অধিক স্নেহ, অতিশয় প্রেম। "ন চাতিপ্রণয়ঃ কার্য্যঃ কর্ত্তব্যোঽপ্রণয়শ্চ তে।" (রামা° ৪.২২.২৩)

অতিপ্রবন্ধ—(পুং) অতিনৈরন্তর্য্য ; অবিশ্রান্ততা। 'অতিপ্রবন্ধেন প্রহিতাস্ত্রবৃষ্টিভিঃ" (রঘু° ৩.৫৮)

অতিপ্রমাণ—(ত্রি) [অতিশয়িতং প্রমাণং যস্য। প্রাদি, বহুব্রী] অধিক প্রমাণযুক্ত। "অতিপ্রমাণা বহবো ভুজঙ্গমাঃ" (রামা°) [অতিশয়িতং প্রমাণং ; প্রাদি-স°] (ক্লী) ২ অত্যন্ত প্রমাণ, বৃহৎ প্রমাণ। [অতিক্রান্তঃ প্রমাণং ; অত্যাদয়-স°] ৩ প্রমাণাতিক্রান্ত ; যাহার যেটুকু প্রমাণ হওয়া উচিত তদপেক্ষা অধিক প্রমাণযুক্ত।

অতিপ্রবরণ—(ক্লী) অভিলাষের আধিক্য ; পছন্দের অতিরিক্ততা।

অতিপ্রবৃত্তি—(স্ত্রী) স্বেচ্ছায় নির্গমন ; অত্যন্তনিঃসরণ। "নাড়ীশোণিতাতিপ্রবৃত্তিযু"। (সুশ্রুত ১.৩৬.৯)

অতিপ্রবৃদ্ধ—(ত্রি) [বৃধ্‌-ক্ত বৃদ্ধঃ। অতিশয়েন প্রবৃদ্ধঃ] অত্যন্ত বৃদ্ধ। ২ প্রমাণাতিরিক্ত বৃদ্ধিযুক্ত। নদী নালা প্রভৃতির জল যখন তীর অতিক্রম করিয়া ছুটে, তখন তাহাকে এবং ক্ষত্রিয়জাতি যখন নিজের কর্ত্তব্যমূঢ়তায় বা বীর্য্যাধিক্যে মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মণজাতির অনাদর করে, তখন তাহাকে প্রবৃদ্ধ বলা হয়। "ক্ষত্রস্যাতিপ্রবৃদ্ধস্য ব্রাহ্মণান্ প্রতিসর্ব্বশঃ।" (মনু ৯.৩২০)

অতিপ্রশ্ন—(পুং) [অতিক্রম্য মর্য্যাদাং প্রশ্নঃ। প্রচ্ছ-নঞ্। পা ৩.৩.৯০] মর্য্যাদা অতিক্রমপূর্ব্বক প্রশ্ন ; প্রশ্নের সদুত্তর হইয়া গেলেও পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা। "অতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি।" (প্রশ্নোপ° ৩.৩) বৃহদারণ্যক উপনিষদে অতিপ্রশ্নসংক্রান্ত এইরূপ একটী বিবরণ পাওয়া যায়—যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট বালাকি অতি-প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এই অতিপ্রশ্নের ফল শেষটা ভয়ানক হইয়া দাঁড়ায়। কারণ বালাকি ব্রহ্মবিষয়ক প্রশ্ন করিলে যাজ্ঞবল্ক্য তাহার সুমীমাংসা করিয়া দেন। এই মীমাংসার পরও বালাকির প্রশ্ন বৃথা অতিপ্রশ্ন হইয়া পড়ে। ইহাতে বালাকির মুণ্ডপাত হয়। সূর্য্যদেবের বরে পুনরায় তাঁহার পতিতমুণ্ড সংযোজিত হইয়াছিল।

অতিপ্রশ্ন্য—(ত্রি) অতিপ্রশ্নের বিষয়ীভূত। "অনতিপ্রশ্ন্যাং বৈ দেবতামতিপৃচ্ছসি"। (বৃহদারণ্যক-উপ° ৩.৬)

অতিপ্রসক্তি—(স্ত্রী) অতি-প্র-সন্‌জ্‌-ক্তিন্] অত্যন্ত আসক্তি। "অতিপ্রসক্তিঞ্চৈতেষাং মনসা সন্নিবর্ত্তয়েৎ।" (মনু ৪.১৬) ২ প্রসঙ্গ অতিক্রম করিয়া অন্যত্র সম্বন্ধ। ৩ অতিপ্রসঙ্গ। লক্ষ্যে লক্ষণ সম্বন্ধকে প্রসঙ্গ বলা হয়। অলক্ষ্যে যে লক্ষণ সম্বন্ধ, তাহাই অতিপ্রসঙ্গ।

অতিপ্রসঙ্গ—(পুং) [অতি-প্র-সন্‌জ-ঘঞ্] অত্যাসক্তি। "নাতিপ্রসঙ্গঃ প্রমদাসু কার্য্যঃ।" (পঞ্চতন্ত্র) (ত্রি) ২ যাহা প্রসঙ্গ অতিক্রম করিয়াছে। ৩ বাহুল্য, অতিবিস্তর। "অলমতি-প্রসঙ্গেন" (মুদ্রারাক্ষস ১ অঙ্ক)। "স্ত্রীণামতি প্রসঙ্গেন" (সুশ্রুত)।

অতিপ্রসিদ্ধ—(ত্রি) [অতি-প্র-সিধ্‌-ক্ত] অত্যন্ত বিখ্যাত। ২ সুভূষিত।

অতিপ্রাণ—(ত্রি) প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। "অতিপ্রাণপ্রিয়া" (পঞ্চতন্ত্র)।

অতিপ্রৌঢ়া—(স্ত্রী) [অতিশয়িতা প্রৌঢ়া ; প্র-উঢ়া, উকারস্য বৃদ্ধিঃ ; প্রাদূহোঢোঢ্যেষৈষ্যেষু। (কাত্যায়ন)] অত্যন্ত বৃদ্ধিযুক্তা। ২ যে বালিকার দশবৎসর বয়ঃক্রম অতীত হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্র মতে, বালিকার অষ্টবর্ষ বয়ঃক্রম হইলে তাহাকে গৌরী বলা যায় ; নববর্ষ বয়ঃক্রম হইলে তাহার নাম রোহিণী ; দশ-বৎসর বয়ঃক্রম হইলে তাহার নাম কন্যকা। দশবৎসরের ঊর্দ্ধ হইলে তাহাকে রজস্বলা কহে। অতএব দশমবর্ষ অতীত হইলে অতিপ্রৌঢ়া বলা যায়। [প্রকর্ষেণ উহ্যতেঽত্র প্রৌঢ়ঃ ; বহুব্রী] ২ যে বালিকার বিবাহযোগ্যকাল উপস্থিত হইয়াছে। (ত্রি) ৩ অতিপ্রবৃদ্ধ।

অতিফলদায়ক—(পুং) উত্তমফলপ্রসূ, অত্যন্ত ফলজনক।

অতিবড়—(দেশজ) প্রকাণ্ড, বৃহৎ। "ভীষণ অতিবড়, আইসে গজঘোড়, সিন্দূরে মণ্ডিত মাথা।" (কবিকঙ্কণ)

অতিবড়ী—উপাসক সম্প্রদায়ভেদ। জগন্নাথ দাস এই সম্প্র-দায়ের প্রতিষ্ঠাতা। [জগন্নাথ দাস দ্র°]

অতিবর্চ্চস্—(পুং) বরুণের অনুচরদ্বয়ের অন্যতম। দেবাসুর-যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যের জন্য বরুণ ইঁহাকে প্রেরণ করেন। (বামনপু°)

অতিবল, —(ত্রি) [অতিশয়িতং বলমস্য] প্রবল। অতিশয় বলবান্। "জয়ত্যতিবলো রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।" (রামা°) [অতিশয়িতং বলং ; প্রাদি-স°] (ক্লী) ২ অত্যন্ত বল, সামর্থ্য। ৩ সৈন্য।

অতিবল২—(পুং) হিন্দুদিগের এক দেবতা।

হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে লিখিত একটী বিবরণ হইতে বুঝা যায়, ইনি মরুদ্‌গণের অন্যতম এবং চতুর্ভুজ। চারিটী হস্তে ধ্বজ, অঙ্কুশ, অক্ষসূত্র এবং ছিন্নমুণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন। ধ্যান যথা—"ধ্বজাঙ্কুশাক্ষমুণ্ডানি বিভ্রাণোঽতিবলো মতঃ।"

অতিবল৩—(পুং) প্রজাপতি কর্দ্দমের পৌত্র ও অনঙ্গের পুত্র। অনঙ্গের মৃত্যু হইলে ইনি রাজা হইয়া ইন্দ্রিয়সুখ-সাধনে রত থাকেন। ইঁহার পত্নী সুনীথার গর্ভে বেণরাজার জন্ম হয়। (মহাভা°) [বেণ দ্র°]

অতিবল৪—(পুং) রাজা ভরতের বংশীয় জনৈক নৃপতি। ইনি এবং আদিত্যযশাঃ প্রভৃতি সপ্ত নৃপতি ভারতক্ষেত্রের অর্দ্ধাংশ অধিকার করিয়া সুখে রাজত্ব করিয়াছিলেন। জিনেশ্বরের মুকুট আনয়ন করিয়া শক্র ইঁহাদের মস্তকে স্থাপন করিয়াছিলেন। (ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত্র, ৬.২৫১-২৫৪)

জৈন অরিষ্টনেমিপুরাণ (১২ অ°) মতে, বল, সুবল, অতিবল প্রভৃতি চতুর্দ্দশলক্ষ আদিত্যবংশীয়গণ রাজ্যত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণলাভ করেন।

অতিবলবতী—(স্ত্রী) অত্যন্ত প্রবলা; অতিশক্তিমতী।

"যশোলিপ্সা চিত্তে তব অতিবলবতী।
কর তৃপ্ত জয়ন্তেরে করিয়া আহুতি। (বৃত্রসংহার)

অতিবলা১—(স্ত্রী) [অতিশয়িতং বলং যস্যাঃ; পঞ্চম্যন্ত বহুব্রী] অত্যন্ত বলধায়ক পীতবর্ণ লতাবিশেষ। পীতবর্ণ বেলেড়া, চলিত পীতবাকুলি Sida rhombifolia। হিন্দী—ককহিয়া; মরাঠী—পিটারিনী। গুণ—তিক্ত, কটু, বাস্ত ও কৃমিঘ্ন এবং দাহ, তৃষ্ণা, বিষ, সর্দ্দি ও ক্লেদোপশমন। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশের মতে-বাতনাশক, মেহনাশক ও কৃচ্ছ্রহর।

২ শ্বেতবাট্যালক। ৩ গোরক্ষ-তণ্ডুলা; চলিত গোরক্ষ চাকুলিয়া, কালিয়া ঝিটকি। বিষ্ণু-নারায়ণতৈলে ও বল্লী-কেতক্যাদি তৈলে ইহার ব্যবহার আছে।

অতিবলা২—(স্ত্রী) বিদ্যাবিশেষ। রাক্ষস কর্ত্তৃক যজ্ঞভূমি উপদ্রুত হইলে ঋষিগণ রাক্ষসনিধনার্থ রামচন্দ্রকে আনয়ন করিতে বিশ্বামিত্র মুনিকে অযোধ্যায় প্রেরণ করেন। বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে সরযূতীরে উপনীত হইয়া দেখিলেন, বালকদ্বয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তখন তিনি কালবিলম্ব না করিয়া রামচন্দ্রকে সরযূর জলে আচমন করাইয়া বলা ও অতিবলা নামক দুইটী বিদ্যা ও অপরাপর কএকটী মন্ত্র প্রদান করেন। এই বিদ্যার প্রভাবে শরীর পরিশ্রমে কাতর হয় না, জ্বর ও রূপবিকার ঘটে না; প্রমত্ত অথবা প্রসুপ্ত অবস্থায় রাক্ষসেরা ধর্ষণ করিতে পারে না।

অনন্তর বিশ্বামিত্র কহিলেন—'রাম। এই বিদ্যা পাঠ করিলে পাঠকের ক্ষুৎপিপাসা থাকে না এবং তাঁহার ন্যায় বলশালী কেহ হয় না। পৃথিবীর মধ্যে তিনি জ্ঞানে, গুণে, সৌভাগ্যে, দাক্ষিণ্যে ও সদুত্তরদানে অদ্বিতীয় হইয়া থাকেন। এই তেজস্বিনী বিদ্যা দুইটী পিতামহ ব্রহ্মার কন্যা।' এই বিদ্যালাভের পর রাম ও লক্ষ্মণ সরযূর দক্ষিণতীরে পর্ণশয্যায় শয়ান থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন। এই অতিবলা বিদ্যা-প্রভাবে লক্ষ্মণ চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসকালে উপবাসে থাকিয়াও ইন্দ্রজিৎনিধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। (রামা° ১.২২.১৩-২০)

অতিবলা৩—(স্ত্রী) নদীবিশেষ। কথিত আছে, চাক্ষুষ মন্বন্তরে লোকপিতামহ ব্রহ্মা সহ্যাদ্রিশিখরে এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞে সরস্বতীদেবীর আসিতে বিলম্ব ঘটায় তদীয় সপত্নী গায়ত্রীদেবীকে ব্রহ্মার দক্ষিণভাগে বসাইয়া যজ্ঞকার্য্য সমাধা হয়। সরস্বতী যজ্ঞস্থলে আসিয়া সাপত্ন্য ঈর্ষায় ক্রোধান্বিত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণকে অভিশাপ প্রদান করিলেন—'আপনারা অপূজ্যের পূজা করিয়াছেন, সুতরাং আপনাদের সকলকেই জড়ীভূত হইয়া নদীরূপে পরিণত হইতে হইবে। আমরা দুই সপত্নীও স্ব স্ব অংশে নিম্নগা হইয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিতা হইব।' এই কথায় দেবগণ তৎক্ষণাৎ স্ব স্ব অংশে নদীরূপে পরিণত হইলেন। গায়ত্রী ও সরস্বতী পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিতা হইয়া মহাবলা ও অতিবলা নামে প্রখ্যাত হইলেন। (স্কন্দপু°, উত্তর°, ১১১ অ°)

অতিবলিকা—[বৈদ্যক] (স্ত্রী) বাট্যালক, বেড়েলা। (রাজনি°)

অতিবলী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] বাট্যালক, বেড়েলা।

অতিবাড়—(দেশজ) অতিশয় উচ্চ। ২ অত্যন্ত অহঙ্কারী।

"অতিনীচ হ'ওনা ছাগলে মুড়িয়ে খাবে।
অতিবাড় বেড়'না ঝড়ে পড়ে যাবে॥" (চলিত কথা)

অতিবাহু১—(পুং) [অতিশয়িতো বাহুর্যস্য; বহুব্রী] অতি-বিশালবাহুসম্পন্ন।

অতিবাহু২—(পুং) মহর্ষি কশ্যপের পুত্র। দক্ষকন্যা কপিলার গর্ভে ইঁহার জন্ম। (মহাভা°) ২ ভৌত্য (চতুর্দ্দশ) মন্বন্তরে সপ্তর্ষিগণের অন্যতম। ইনি ভৃগুর পুত্র। (হরিবংশ) ৩ স্বায়ম্ভুব মনুর দশ পুত্রের অন্যতম। ইনি একজন মহাতেজস্বী ঋষি ছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ডপু°) ৪ গন্ধর্ব্বভেদ। কশ্যপভার্য্যা প্রধার গর্ভে ইঁহার জন্ম। (কালিকাপু°)

অতিব্রহ্মন্—(পুং) রাজভেদ।

অতিব্রহ্মচর্য্য (পুং) [অতিক্রান্তো ব্রহ্মচর্য্যম্] ব্রহ্মচর্য্য-ত্যাগী; যিনি দারপরিগ্রহ করিয়াছেন।

অতিবালা—(স্ত্রী) [অতিক্রান্তা বালং বাল্যাবস্থাম্] দ্বিবর্ষ বয়স্কা ধেনু, দুই বর্ষ বয়সের বাছুর।

অতিবীভৎস—(পুং) প্রবল প্রতিকূলতা; অতিশয় বিরাগ; অত্যন্ত দ্বেষ। ২ প্রবল ত্রাস, অত্যন্ত ভয়।

অতিভক্ত,—(ত্রি) অতিশয় অনুগত; অতিবাধ্য।

অতিভক্ত,—(পুং) হিন্দুদিগের এক দেবতা, সম্ভবতঃ শৈব। শ্রীতত্ত্বনিধিতে লিখিত ধ্যান হইতে জানা যায়, অতিভক্ত ব্রাহ্মণ, জটামুকুটধারী, দুই হস্তে অঞ্জলি ধারণ করেন এবং তাঁহার কক্ষে ভৃঙ্গার থাকে।

অতিভক্তি (স্ত্রী) অতিশয় অনুরাগ; অত্যন্ত বিশ্বাস। "অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।" (চলিত কথা)

অতিভঙ্গ—[বাস্তুশা°] যে ভঙ্গীতে প্রতিমা দুই বা তিন স্থানে বক্রভাবে দৃষ্ট হয়।
"সর্ব্বেষাং দেবদেবীনাং ভঙ্গমানমিহোচ্যতে।
অভঙ্গং সমভঙ্গং চ অতিভঙ্গং ত্রিধা ভবেৎ।" (মানসার, ৬৭ অঃ)

অতিভদ্র—(ত্রি) অতিশয় শ্রেষ্ঠ, অত্যন্ত সাধু; অতি ভাল।

অতিভয়—(ক্লী) অতিশয় ত্রাস, অতিশঙ্কা।

অতিভানু—(পুং) সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের দশটী পুত্রের অন্যতম। (গর্গস°)

অতিভার—(পুং) [অত্যন্তো ভারঃ গুরুত্বং, স্বকার্য্যসাধনে ক্ষমতাবিশেষো বা] অত্যন্ত গৌরব, অতিশয় ভার। "কোঽতিভারঃ সমর্থানাং" (পঞ্চতন্ত্র) ২ অতিশয়। "সা মুক্তকণ্ঠং ব্যসনাতিভারাৎ" (রঘু° ১৪ স°) ৩ বেগ।

অতিভারগ—(পুং) [অতিভারেণ বেগেন অতিভারবহনেনাপি বা গচ্ছতি, অতিভার-গম-ড] খর, গর্দ্দভ। ২ অশ্বতর, গর্দ্দভ হইতে বড়বার গর্ভজাত অশ্বভেদ; খেসর, খস্। চলিত খচ্চর। (রাজনি°)

অতিভাব—(পুং) আধিক্য, জ্যেষ্ঠতা, উৎকর্ষ, প্রাবল্য; প্রাগ্‌ভাব। "ন কালস্যাতিভাবোঽস্তি কৃতান্তঃ খলু দুর্জ্জয়ঃ" (রামা° ৬.২৩.২২) ২ অতিশয় আলাপ বা বক্তৃতা।

অতিভিক্ষু—(ত্রি) নিতান্ত ভিক্ষোপজীবী; ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী।

অতিভী—(স্ত্রী) [অতি-ভী-ক্বিপ্, অতিশয়েন বিভেতি যস্যাঃ দর্শনাৎ] যাহার দর্শনে ভয় হয়। বজ্রজ্বালা, বজ্রাগ্নি, বজ্রাগ্নি দেখিলে লোকের অত্যন্ত ভয় জন্মে।

অতিভূমি—(স্ত্রী) [অতিশয়িতা ভূমির্ম্মর্য্যাদা, প্রাদিস°] অতিমর্য্যাদা। ২ আধিক্য। "প্রাপামন্মথমদাদতিভূমিং" (মাঘ ১৪ স°)

অতিভোজন—(ক্লী) [অতি-ভুজ-ল্যুট্ ভাবে] অত্যন্ত ভোজন, আহারের সময় উদরের অর্দ্ধেক খাদ্যদ্রব্য পূর্ণ করিবে। এক অংশ জলে, বাকি এক অংশ বায়ুর গতিবিধির জন্য শূন্য রাখিবে। ইহার অতিরিক্ত ভোজন হইলেই তাহাকে অতিভোজন বলা যায়। বৈদ্যকশাস্ত্রের মতে অতিভোজন সকল রোগের কারণ। [ভোজন দ্র°]

অতিভ্রম—(পুং) অত্যন্ত ভুল; অতিশয় মিথ্যাজ্ঞান।

অতিভ্রূ—(ত্রি) অতিশয় ভ্রূ; অপরিমিত ভ্রূলতা। "অতিভ্রুবে ব্রাহ্মণায়।" (পা ১.৪.৩ কাশিকা)

অতিভৃত—(ত্রি) [অতি-ভৃ-ক্ত] যত্নের সহিত পালিত।

অতিমঙ্গল্য—(পুং) [অতিমঙ্গল-যৎ, অতিমঙ্গলায় হিতম্। প্রাদি-নঞ্ বহুব্রী] [বৈদ্যক] বিল্ববৃক্ষ, বেলগাছ। (ত্রি) ২ অতিশয় মঙ্গলজনক।

অতিমঞ্জুলা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] কণ্টকসেবতীবৃক্ষ; চলিত-গোলাপ, রক্তগোলাপ। (ভাবপ্র° পূঃ)

অতিমণ্ডল—(পুং) [বৈদ্যক] ভূধামন্ বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

অতিমতি—(ত্রি) [মতিমতিক্রান্তঃ] অতিক্রান্ত-মনন; বিরুদ্ধমনস্ক। "নিধূনমাতিমতিং।" (ঋক্ ১.১২৯.৫)

অতিমধ্যন্দিন—(ক্লী) [অতিশয়িতং মধ্যন্দিনং] অত্যন্ত মধ্যাহ্ন, ঘোর দুপুরবেলা। "নাতিমধ্যন্দিনে স্থিতে" (মনু ৪.১৪০)

অতিমনোরম—(ত্রি) অত্যন্ত মনঃসুখদায়ক, মনোহর, সুন্দর। "জজ্ঞে বিরামে সুসমে পাদাবতিমনোরমৌ।" (বিষ্ণু°)

অতিমন্থ(ক)—(পুং) [বৈদ্যক] অগ্নিমন্থ ক্ষুপ।

অতিমন্যু—(পুং) চাক্ষুষ মনুর দশ পুত্রের অন্যতম। (শিবপু°)

অতিমর্ত্ত্য—(ত্রি) [মর্ত্ত্যমতিক্রান্তঃ, প্রাদিস°] অতিমানুষ। ২ দেব।

অতিমর্য্যাদ—(অব্য) মর্য্যাদাতিক্রম। অতিশয়। [অতিক্রান্তঃ মর্য্যাদাম্, প্রাদিস°] (ত্রি) ২ যে বস্তুর যে সীমা সেই সীমাতিক্রমকারী।

অতিমর্শ—(পুং) [সোঽয়মতিলঙ্ঘ্য মৃশ্যমানত্বাদতিমর্শঃ] লঙ্ঘনপূর্ব্বক যুক্ত; অতিক্রম করিয়া সম্মিলিত; অতিমৃশ্যাতিমৃশ্য। বালখিল্য ঋষি-সম্বন্ধীয় আটটী সূক্ত বেদের বালখিল্য নামক অংশে দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠ করিবার কালে সেই আটটী সূক্তের প্রথম দুইটী সূক্ত বাদ দিয়া অবশিষ্ট ষট্‌সূক্তের মধ্যে প্রথম সূক্তের প্রথম ঋকের প্রথম পাদের পর মধ্যস্থিত সমস্ত ঋক্ অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বিতীয় সূক্তের দ্বিতীয় পাদে যোজনা করিতে হয়। যথা—"অভি প্র বঃ সুরাধসমিন্দ্রমর্চ্চ যথাবিদে।" ইহা প্রথম সূক্তের প্রথম ঋকের প্রথমপাদ। ইহার পর দ্বিতীয় সূক্তের দ্বিতীয় পাদ যোজনা করিতে হইবে। যথা—"শতানীকা হেতয়ো অস্য দুষ্টরা ইন্দ্র মর্চ্চ যথা বিদোম্" (ঐতরেয়ব্রা° ৬.২৪) এই

প্রকার লঙ্ঘন করিয়া গাথা পাদান্তরের সহিত যুক্ত হইলে তাহাকে 'অতিমর্শ' বলা হইয়া থাকে। "তথা বৈ প্রগাথা কল্পন্তে; প্রগাথা বৈ বালখিল্যাস্তস্মাদতিমর্শমেব বিহরেস্তদেবাতিমর্শাঃ" ইতি। 'অতিমর্শম্' অতিমৃশ্যাতিমৃশ্য, প্রথমসূক্তস্য প্রথমায়ামৃচি প্রথমপাদমুক্ত্বা তদনন্তরভাবি সর্ব্বমতিলঙ্ঘ্য দ্বিতীয়সূক্তে দ্বিতীয়স্যামৃচি দ্বিতীয়পাদেন যোজয়েৎ; সোঽয়মতিলঙ্ঘ্য মৃশ্যমানত্বাদতিমর্শ ইত্যুচ্যতে।' (ঐতরেয়ব্রা° ৬.২৮, সায়ণ)

অতিমাত্র—(ত্রি) [মাত্রামল্পমতিক্রান্তঃ অত্যাদয় স°] অতিশয়িত। ২ মাত্রাতিক্রমকর্ত্তা, সীমাতিক্রমকারী। "স্ত্রিয়া গৃহীতো হৃদয়েঽতিমাত্রয়া" (রামা° ২,১২.১০৮) [অতিশয়িতা মাত্রা প্রমাণমস্য] ৩ ভৃশ, অধিক। "মুনিব্রতৈস্ত্বামতিমাত্রকর্ষিতাং" (কুমার- ৫ সর্গ) [অতিক্রান্তো মাত্রাং প্রমাণং] ৪ বৃহৎপ্রমাণ। [অতিক্রান্তং মাত্রাং](ক্লী) ৫ অতিশয়। "অতিমাত্রলোহিততলৌ" (শকু° ১ অ°)

অতিমাত্রশস্—(অব্য) [অতিমাত্র-শস্; বৃত্তিবীপ্সার্থে।] অতিপ্রমাণকারক।

অতিমান—(পুং) [অতিশয়িতো মানঃ] অত্যন্তমান, অনুচিত অভিমান। "পরাভবস্যৈতন্মুখং যদতিমানঃ" (শতপথব্রা° ৫.১.১.১) "অতিমানে চ কৌরবাঃ" (চাণক্য) [অতিক্রান্তো মানং প্রমাণম্ পরিমাণং বা। অত্যাদয়স°] (ত্রি) ২ প্রমাণাধিক। অপরিমিত; বিপুল। "অতিমানয়া কীর্ত্ত্যা" (দশকুমার)

অতিমানিতা—(স্ত্রী) [অতিমানিনো ভাবঃ] অতিশয় মানশালিতা। (গীতা ১৬.৩)

অতিমানিন্—(ত্রি) [অতি-মান-ণিনি] অধিক মানশালী, অতিমাত্র পূজ্যতাভিমান-বিশিষ্ট। "পশ্যতস্তেঽতিমানিনঃ" (রামা° ৩.১৮.১৬)

অতিমানুষ—(ত্রি) [অতিক্রান্তো মানুষং মানুষস্বভাবং; অত্যাদয়স°] মনুষ্যাযোগ্য বা লোকাতীত কর্ম্ম ও রূপাদি। "রূপং দৃষ্টাতিমানুষং" (মহাভা°, আদি°, ১৫৪.১)

অতিমায়₁—(ত্রি) [মায়ামতিক্রান্তঃ অত্যাদয়স°] মায়ামুক্ত, মায়াতীত। ২ মোহ, ভ্রম, অলীকদৃশ্য, ইন্দ্রজাল, অবিদ্যা।

অতিমায়₂—পৌরাণিক দৈত্যবিশেষ।

অতিমায়া—(স্ত্রী) সুভূতি নামক একজন শাক্যের কন্যা, সুভূতির সাত কন্যার মধ্যে মায়া এবং মহাপ্রজাবতী রাজা শুদ্ধোদনের পত্নী এবং অতিমায়া প্রভৃতি পাঁচ কন্যা শুদ্ধোদনের ভ্রাতৃগণের সহিত বিবাহিতা হইয়াছিল। [মহাবস্তবদান]

অতিমার—(পুং) এক রাজপুত্র। (বিষ্ণুপু°, ভাগবত)

অতিমারুত—(পুং) [অতিশয়িতো মারুতঃ; প্রাদি-স°] প্রবল বায়ু, প্রচণ্ড বায়ু। "ভুক্ত্বার্দ্রপাণিরম্ভোঽন্তরর্দ্ধরাত্রেঽতিমারুতে"। (যাজ্ঞবল্ক্যস° ১.১৪৯)

অতিমিত—(ত্রি) অপরিমিত, অপর্য্যাপ্ত। ২ ভিজা নয়, শুষ্ক।

অতিমিত্র—(ক্লী) [অত্যন্তং পরমং মিত্রং] অত্যন্তমিত্র; পরমসুহৃৎ। ২ পুরুষের জন্ম নক্ষত্র হইতে নবম, অষ্টাদশ ও সপ্তবিংশতি তারা, এই তিন তারাতে জ্যোতিষের এক গণ বা শ্রেণী বিভক্ত হইয়া থাকে। এই গণের নাম অতিমিত্র বা পরমমিত্র। "জন্মসম্পদ্ বিপৎক্ষেমং প্রত্যরিঃ সাধকোবধঃ। মিত্রাতিমিত্রশ্চেতি নবতারা প্রকীর্ত্তিতা।" (জ্যোতিষরত্নাকর)

অতিমির—(ত্রি) [নাস্তি তিমিরং অন্ধকারং যস্য] অন্ধকারশূন্য; তমিস্রাহীন।

অতিমিষ্ট—(ত্রি) অতিশয় সুস্বাদু।

অতিমুক্ত—(ত্রি) [মুচ্-কর্ত্তরি ক্ত, অতিশয়েন মুক্তঃ বিদেহকৈবল্যং গতঃ] নির্ব্বাণমুক্তিপ্রাপ্ত। "এতেনো হাস্য সর্ব্বে যজ্ঞক্রতব এতং মৃত্যুমতিমুক্তাঃ" (শতপথব্রা° ২.৩.৩.১০) ২ নিষ্ফল। ৩ নিঃসঙ্গ। (মেদিনী) [মুক্তামতিক্রান্তঃ শুভ্রত্বাৎ, অত্যাদয়-স°] [বৈদ্যক] ৪ মাধবীলতা। "ক ইদানীং সহকারমন্তরেণাতিমুক্তলতাং" (শকু° ৩ অ°) ৫ তিনিশবৃক্ষ।

অতিমুক্ত—(পুং) মুনিবিশেষ। দেবকী, বসুদেব ও কংসের অগ্রজ এই মুনির আশ্রমে গিয়া স্ব স্ব অবস্থা জ্ঞাপন করেন। (জৈন অরিষ্টনেমিপু° ৩৩-৩৪ অ°)

অতিমুক্তক—(ত্রি) [অতিমুক্ত-স্বার্থে কন্] নির্ব্বাণমুক্তিপ্রাপ্ত। ২ অতিশয় মুক্ত। [ভাবে ক্ত, অতিশয়েন মুক্তং বন্ধরাহিত্যং যস্য কন্] [বৈদ্যক] ৩ তিন্দুক বৃক্ষ। চলিত তেদ, গাব। (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু) ৪ তালবৃক্ষ। (বাচস্পতি) ৫ বসন্তকালীন পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। বৈদ্যক মতে নবমল্লিকাভেদ। পর্য্যায়—পুণ্ড্রক, মল্লিনী, ভ্রমরানন্দা, কামুককান্তা। ৬ মাধবীলতা। "অতিমুক্তকমিচ্ছন্তি বাসন্তী মাধবীলতাং" (হলায়ুধ) ইহার গুণ—কষায়, শীতল, শ্রমহর এবং পিত্ত, দাহ, জ্বর, উন্মাদ, হিক্কা ও ছর্দ্দিনাশক। ৭ হরিমন্থ। (হারাবলী) ৮ রথদ্রু, রথগতি। (শব্দরত্নসমন্বয়-কোষ) ৯ তিনিশবৃক্ষ।

অতিমুক্তকতৈল—(ক্লী) [বৈদ্যক] অতিমুক্তকবীজের তৈল। ইহার গুণ—বাতপিত্ত-হর, শ্লেষ্মল, গুরু ও শীতল। (বাভট)

অতিমুক্তকা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] [অতিমুক্তক দ্র°] মাধবীলতা। "মল্লিকা মালতী চৈব যূথিকা চাতিমুক্তকা।" (স্কন্দপু°, বিষ্ণু°, মার্গ°, ৭.৩)

অতিমুক্তা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] অতিমুক্তকা। (রাজনি°)

অতিমুক্তি—(স্ত্রী) [অত্যন্তা মুক্তিঃ প্রাদিস°] বিদেহ-কৈবল্য। তত্ত্বজ্ঞানের পর শ্রুতিদর্শিত দেহত্যাগ। (শতপথব্রা° ২.৩.৩.৯ ; বৃহদারণ্যক উপ° ৩.১.৩.৬)

অতিমূর্ত্তি—(স্ত্রী) অতি উচ্চমূর্ত্তি। ২ উৎসববিশেষ। (আশ্বলায়ন-শ্রৌত° ৯.৪)

অতিমৃত্যু—(পুং) [অতিক্রান্তো মৃত্যুং অত্যাদয়-স°] মোক্ষ। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে" (ছান্দোগ্য উ° ২.১০.১) [মোক্ষ দ্র°]

অতিমৃদু—(ত্রি) অত্যন্ত শান্ত ; অত্যন্ত নরম বা কোমল। "মধুর সুষমা অতিমৃদুতর সরস শিরীষ ছলে। মাধুরী লহরী অঙ্গেতে যেমন উছলি উছলি চলে॥" (হেমচন্দ্রবন্দ্যো)

অতিমৈথুন—(ক্লী) [মিথুনস্য ভাবঃ, মিথ-উনন্ কিৎ ; ক্ষুধি-পিশিমিথিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ৩.৫৫। অত্যন্তং মৈথুনম্ প্রাদি-স°] অত্যন্ত স্ত্রীসংসর্গ। ইহা আয়ুঃক্ষয়ের প্রধান কারণ এবং এই দোষে প্রায় সর্ব্বত্র যক্ষ্মারোগ উপস্থিত হয়। [মৈথুন দ্র°]

অতিমোক্ষ—(পুং) [অতিশয়িতো মোক্ষঃ] অত্যন্ত মুক্তি, বিদেহকৈবল্য। "সোঽসৌ চন্দ্রঃ স ব্রহ্মা সা মুক্তিঃ সাতিমুক্তিরিত্যতিমোক্ষাঃ"। (বৃহদারণ্যকোপ° ৩.১.৬) [অতিমুক্তি দ্র°]

অতিমোদনী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] নবমল্লিকা (রাজনি°)

অতিমোদা—(স্ত্রী) [অতিশয়িতো মোদঃ গন্ধঃ যস্যাঃ ; বহুব্রী] [বৈদ্যক] নবমল্লিকা। (ত্রি) অত্যন্ত গন্ধযুক্ত।

অতিযব—(পুং) [বৈদ্যক] নিঃশূক যব, কৃষ্ণবর্ণ যব। "নিঃশূকোঽতিযবঃ স্মৃতঃ। যবাদতিযবো ন্যূনঃ" (ভাবপ্র° পূ°)

অতিযশ—(ত্রি) অতিপ্রশংস্যমান ; মহাযশস্ক ; বিশ্রুত। "বৃহৎসেনামতিযশাং" (নলোপাখ্যান ৮.৪)

অতিযশস্—(ত্রি) [অতি অধিকং যশো যস্য] অধিক যশঃশালী, অতি যশস্বী। "তেষামতিযশা লোকে রামো রতিকরঃ পিতুঃ।" (রামা° ২.১.৬)

অতিযশোবল—নামান্তর যশোবল। গ্রহপতিবংশীয় কোক্কল-প্রদত্ত খাজুরাহের উৎকীর্ণ শিলালিপিতে (বিক্রম-সংবৎ ১০৫৮) অতিযশোবলের উল্লেখ আছে। অতিযশোবলের পুত্র মাহট, তাঁহার পুত্র জয়দেব, তাঁহার পুত্র সেক্কল বা সেকল্ল।

অতিযাজ—(পুং) ঋগ্বেদোক্ত জনৈক ঋষি। "ন হীয়তামতিযাজস্য যষ্টা।" (ঋক্ ৬.৫২.১)

অতিযুক্ত—(ত্রি) বারংবার প্রযুক্ত। "স্নেহাদ্যৈরতিযুক্তৈঃ" (ভাবপ্র° মধ্যম)

অতিযুবন্—(ত্রি) অত্যন্ত যুবক (অমর)

অতিযোগ—(পুং) অতিশয়িত প্রয়োগ। (বাভট ও সুশ্রুত)

অতিরক্ত—(ত্রি) [অত্যন্তরক্তঃ রক্তবর্ণঃ অনুরক্তো বা] অতিলোহিত বর্ণ। ২ অত্যন্ত অনুরক্ত। (পুং) ৩ হিঙ্গুল। (বৈদ্যকনি°)

অতিরক্তা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] জবাপুষ্পবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

অতিরণচণ্ড—মহাবলীপুরের নিকটস্থ অতিরণচণ্ডেশ্বর মন্দিরে আবিষ্কৃত কএকখানি শিলালিপিতে অতিরণচণ্ড নামক পল্লব-বংশীয় একজন রাজার নাম পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে তিনি রাজত্ব করিতেন। লিপিতে তাঁহার 'অত্যন্ত-কাম, রণঞ্জয়, শ্রীভর ও শ্রীনিধি' উপাধি পাওয়া যায়।

অতিরথ—(পুং) [অতিক্রান্তো রথং রথিনং অত্যাদয়স°] একাকী অসংখ্য যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ যোদ্ধবিশেষ। "অমিতান্ যোধয়েদ্যস্তু সংপ্রোক্তোঽতিরথস্তু সঃ" (গীতা ১.৬ শ্রীধর) কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবগণের মহাসমর আরম্ভ হইবার পূর্ব্বদিন দুর্য্যোধন স্বপক্ষের বলাবল বুঝিবার নিমিত্ত পিতামহ ভীষ্মের নিকট উভয় পক্ষীয় রথাতিরথ সংখ্যা জানিতে চাহেন। প্রত্যুত্তরে ভীষ্ম উভয় পক্ষের রথাতিরথসংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাদের নাম ও বীর্য্যবিক্রমের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, হে রাজন্! আচার্য্য দ্রোণ 'অতিরথ' ; তিনি রণস্থলে তোমার হিতজনক ভয়ানক কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন। পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত সতত যে তোমাকে প্রোৎসাহিত করিতেছে, যে তোমার প্রিয়সখা, মন্ত্রী ও নেতা, সেই পরনিন্দক নীচপ্রকৃতি, দিব্য কবচকুণ্ডলে রক্ষিত কর্ণ আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া রামকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছে, এইজন্য প্রবলপরাক্রান্ত হইয়াও রথী বা অতিরথ হইতে পারে নাই। ভীষ্মের এই প্রকার উক্তি শ্রবন করিয়া আচার্য্য দ্রোণ কহিলেন, আপনার বাক্য যথার্থ। কর্ণ অতিশয় অভিমানী ও অবধানশূন্য, এই নিমিত্ত সে অতিরথ হইতে পারে না, তাহাকে অর্দ্ধরথ বলা হয়। দ্রোণ ও ভীষ্মবাক্যে ক্রুদ্ধ কর্ণকে দুর্য্যোধন সান্ত্বনা প্রদান করিলে, পুনরায় পিতামহ বলিতে আরম্ভ করিলেন, দ্রোণশিষ্য মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবগণের সেনানী, কিন্তু আমি তাঁহাকে অতিরথ বলিয়াই বিবেচনা করিয়া থাকি। যেমন নিতান্ত ক্রুদ্ধ ভগবান্ ব্যোমকেশ প্রলয়কালে প্রজাগণকে বিনষ্ট করেন, তদ্রূপ তিনি যুদ্ধে একাকী অগণিত শত্রুকে বধ করিবেন। সমরপ্রিয় দ্রুপদনন্দন সত্যজিৎ মহাবল পরাক্রান্ত, যুবা ও অষ্টরথীর সমান ; তিনি এখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের ন্যায় 'অতিরথ' হইয়াছেন। পাণ্ডবগণের যশোভাজন শ্রেণিমান ও বসুদানকেও 'অতিরথ বলা হয়। ভীমসেনের মাতুল কুন্তিভোজ পুরুজিৎ অতিরথ ; যেমন দেবরাজ ইন্দ্র দানবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনিও বিক্রম

প্রকাশ করিয়া ভাগিনেয়ের হিতানুষ্ঠান করিবেন; তিনি অতিশয় যুদ্ধবিশারদ বলিয়া 'অতিরথ' হইয়াছেন। ইহা ছাড়া কৃতবর্ম্মা, মদ্ররাজ শল্য প্রভৃতিও আমার মতে 'অতিরথ' বলিয়া আখ্যা পাইতে পারেন। (মহাভা° উদ্‌যোগ° ১৬৫—১৭২ অ°)

ইহা ব্যতীত রামায়ণ প্রভৃতিতেও অতিরথ সম্বন্ধীয় বিবরণ পাওয়া যায়। যথা—"ইক্ষ্বাকূণামতিরথঃ' ইত্যাদি। (রামা° ১.৬.২)

অতিরস—(পুং) [বৈদ্যক] পৌণ্ড্রক। (শব্দমালা)

অতিরসা—(স্ত্রী) অতিশয়িতো রসো যস্যঃ ; বহুব্রী] [বৈদ্যক] রাস্না, মূর্ব্বালতা। মূর্ব্বামূল নহে। রাস্না আম্রাদি বৃক্ষে জন্মে, তুলিয়া রাখিলে অনেক দিন জীবিত থাকে। মূর্ব্বামূল অন্য রকম, দেখিতে ছোট কোঙ্গার মত। বৈদ্যকশব্দসিন্ধুতে মূর্ব্বা ও রাস্না দুইটী পৃথক্ বস্তু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ২ শতমূলী। (চক্রদত্ত)

অতিরহস্যযোগিনী—(স্ত্রী) তিনজন হিন্দুদেবতাকে অতিরহস্যযোগিনী বলা হইয়া থাকে। এই তিনজনের নাম কামেশী, বজ্রেশী ও ভগমালিনী, এই তিনজনই শক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। শ্রীতত্ত্বনিধিতে নিম্নলিখিত ধ্যান পাওয়া যায়—

"তিস্রস্ত্রিপীঠনিলয়া অষ্টবাহুসমন্বিতাঃ।
চাপবাণৌ পানপাত্রং মাতুলুঙ্গং কৃপাণকং।
ফলকং নাগপাশং চ ঘণ্টাং চৈব মহাধ্বনিং।
বিভ্রাণা মদিরোন্মত্তা অতিপূর্ব্বরহস্যকাঃ।"

তিনজন দেবতা তিনটী পীঠে অবস্থিতা, এবং তিনজনই অষ্টভুজবিশিষ্টা। আটটী হাতে ধনু, বাণ, পানপাত্র বা কপাল, মাতুলুঙ্গ ফল, অসি, ফলক, নাগপাশ এবং ঘোরনাদী ঘণ্টা থাকে। তাঁহারা সকলেই মদিরাপানবশতঃ উন্মত্ত থাকেন।

অতিরাজ—(ত্রি) [অতিক্রান্তঃ রাজানং সমা° টচ্। রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৪.৯.১) যে রাজাকে অতিক্রম করিয়াছে। (স্ত্রী) অতিরাজী।

অতিরাজকুমারী—(ত্রি) [রাজকুমারীং অতিক্রান্তঃ] রাজকুমারীকে অতিক্রমকারী। (পা ১.২.৪৮ কা°)

অতিরাজন্—(পুং) [অতিশয়িতঃ পূজিতো রাজা, টচ্ নিষেধঃ] অতিশয়পূজ্যনৃপতি। [অতিক্রান্তং রাজানং] ২ রাজাকে অতিক্রমকারী।

অতিরাত্র—(পুং) [অতিশয়িতা রাত্রিঃ ; অস্ত্যর্থে অচ।] একরাত্রসাধ্য যাগবিশেষ। এই যজ্ঞ একরাত্রিতেই করিতে পারা যায়। আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্রে (৬.১১.১) লিখিত আছে, "অগ্নিষ্টোমোঽত্যগ্নিষ্টোম উক্‌থ্যঃ ষোড়শী বাজপেয়োঽতিরাত্রাঽপ্তোর্যাম, ইতি সংস্থাঃ" অর্থাৎ অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্‌থ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও আপ্তোর্যাম এই সপ্তযোগকে সপ্ত 'সংস্থা' বলা হয়। উক্ত শ্রৌতসূত্রের ভাষ্যকারের মতে সমস্ত সোমযাগ সংখ্যায় সপ্ত প্রকার। 'অতিরাত্র' এই সপ্ত সংস্থার অন্তর্গত এক সংস্থা বা যাগ। (তৈত্তিরীয়স° ৩.৪.১০.৯) ঐতরেয়ব্রাহ্মণে উল্লিখিত আছে, কোন সময়ে দেবগণ দিন ও অসুরেরা রাত্রিকে আশ্রয় করিয়াছিল। দেবতা ও অসুরগণ তুল্য শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। এইজন্য পরস্পর পরাভব করিতে সমর্থ হইলেন না। অতঃপর ইন্দ্র দেবগণকে বলিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছেন যিনি তাঁহার সহিত যোগদান করিয়া অসুরদিগকে রাত্রির আশ্রয় হইতে দূর করিয়া দিবার নিমিত্ত সাহায্য করিতে পারেন। কিন্তু ইন্দ্র কাহারও নিকট হইতে কোন প্রকার সহানুভূতি লাভের প্রত্যাশা করিতে পারিলেন না, কারণ এই সকল ব্যক্তি রাত্রির অন্ধকারকে মৃত্যুর ন্যায় ভয় করিয়া থাকে। এইজন্য আজ পর্য্যন্তও লোক রাত্রিতে ঘরের বাহির হইতে ভীত হয়। রাত্রির অন্ধকার উহাদের নিকট মৃত্যুর তুল্য ভীষণ বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। শুধু ইন্দ্রের সহিত ছন্দঃ সাহায্য করিয়াছিলেন, সেই জন্য 'অতিরাত্র' যজ্ঞে রাত্রিকর্ম্মের নির্ব্বাহ ইন্দ্র ও ছন্দের দ্বারাই হইয়া থাকে। অন্যান্য 'নিবিৎ' বা পুরোরুক্ প্রভৃতি দেবগণের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রবচন পঠিত হয় না। কেবল ইন্দ্রই ছন্দোগণের সহিত রাত্রিকর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন।

'অতিরাত্র' যজ্ঞে বিহিত সকল পর্য্যায় (পরিক্রমণ) দ্বারা ইন্দ্র এবং ছন্দোগণ অসুরবৃন্দকে নিরাকরণ করিয়াছিলেন। প্রথম পর্য্যায় দ্বারা পূর্ব্বরাত্রিতে, মধ্যম পর্য্যায় দ্বারা মধ্যরাত্রে এবং শেষ পর্য্যায় দ্বারা শেষরাত্রিতে অসুরসমূহের নিরাকরণ হইয়াছিল। (ঐতরেয়ব্রাহ্মণের ৪র্থ পঞ্চিকান্তর্গত ১৬-১৭ অধ্যায়ে অতিরাত্র যাগের বিস্তৃত বিবরণ দ্র°)

বিষ্ণুপুরাণেও উল্লেখ আছে যে, অতিরাত্র যাগের উৎপত্তি ব্রহ্মার মুখ হইতে। যথা—

"সামানি জগতীচ্ছন্দঃ স্তোমং সপ্তদশং তথা।
বৈরূপমতিরাত্রঞ্চ পশ্চিমাদসৃজন্ মুখাৎ।" (১.৫.৫৪)

সামবেদ, জগতীচ্ছন্দঃ, সপ্তদশ স্তোম নামক সামগান, বৈরূপ নামক সামগান এবং অতিরাত্র যাগ ব্রহ্মার পশ্চিম মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ২ চাক্ষুষমুনির পুত্রের নাম। ৩ সোমযাগ। অতিরাত্র সোমযাগের কথা ঋগ্‌বেদেও উল্লেখ আছে। (ঋক্ ৭.১০৩.৭)

অতিরি—(ক্লী) [অতিক্রান্তং রায়ং ক্লীবত্বাৎ হ্রস্বঃ ; এচ্ স্থানে ইক। অত্র 'ঐ' স্থানে ইঃ, ন পুম্বদ্‌ভাবঃ। এচ্ ইগ্‌ঘ্রস্বাদেশে।

পা ১.১.৪৮। ধনাতিক্রান্ত কুলাদি। পুংসি স্ত্রিয়াঞ্চ—অতিরা অতিরায়াবিত্যাদি।

অতিরিক্ত—(ত্রি) [অতি-রিচ্-ক্ত] অধিক। অতিশয়িত। ২ শ্রেষ্ঠ। ৩ শূন্য। ৪ ভিন্ন। "অতিরিক্তমথাপি যদ্ ভবেদিতি" (ভাষা°) অতি-রিচ্-ভাবে ক্ত। (ক্লী) ৫ আধিক্য, অতিশয়। ৬ যাহার যে টুকু প্রমাণ হওয়া উচিত তদপেক্ষা অধিক। "হীনাঙ্গীমতিরিক্তাঙ্গীং" (স্মৃতি)

অতিরিক্ত—[অর্থনীতি বা বার্ত্তাশাস্ত্র] ধনোৎপাদন, ধনোপভোগ, ধনবণ্টন, শুল্ক-নির্দ্ধারণ প্রভৃতি নানা বিভাগের বহু ব্যাপারই 'অতিরিক্ত অংশের' উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

ধনোৎপাদন হয় ভূমি, শ্রমিক, মূলধন (পুঁজি) ও উদ্যোক্তার সমবেত প্রচেষ্টায়; পরে উৎপন্ন ধন ইহাদেরই মধ্যে যোগ্যতানুযায়ী বিভক্ত হয়। এই ধনবণ্টনে যে ভাগ ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য তাহাকে আমরা 'ভূমিকর' বা প্রচলিত ভাষায় 'খাজনা' বলি। অর্থনীতির মতে ভূমিকর অতিরিক্ত অংশ (surplus) ছাড়া আর কিছুই নহে।

কোন দেশেরই ভূখণ্ড কখনও সমান স্তরের হইতে পারে না। কোনটীর উৎপাদিকাশক্তি বেশী, কোনটীর বা কম। উৎপাদিকা-শক্তির তারতম্য অনুসারে সেগুলিকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা সম্ভব। কৃষিকার্য্যের আরম্ভে লোকে হয়তো প্রথম শ্রেণীর জমিগুলিই বাছিয়া লইয়াছিল, কিন্তু প্রজাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সকলে বুঝিতে পারিল, সমাজের প্রয়োজনের জন্য যে পরিমাণ ফসল আবশ্যক, কেবলমাত্র প্রথম শ্রেণীর জমি হইতে তাহার উৎপাদন অসম্ভব; কেননা প্রকৃতির নিয়মই এই যে, জমির পরিমাণ না বাড়াইয়া একই জমিতে অনবরত বেশী পরিমাণ পুঁজি-পরিশ্রম খাটাইতে থাকিলে, পুঁজি-পরিশ্রমের অনুপাতে উৎপন্ন ফসল ক্রমশঃই কমিতে থাকিবে। এ অবস্থায় বাধ্য হইয়াই চাষীকে দ্বিতীয় স্তরের জমিতে নামিতে হয়। প্রথম স্তরের জমি হইতে এ জমির উৎপাদিকাশক্তি কম, অর্থাৎ একই পরিমাণ পুঁজি-পরিশ্রম খাটাইয়া প্রথম স্তরের জমি হইতে লোকে যতটা শস্য উৎপাদন করিতে পারে, এ জমি হইতে ঠিক ততটা পারে না। এক কথায়, এ জমির পড়্তা (Cost of production) বেশী। ফসলের বাজার দর অন্ততঃ এ জমির পড়্তার সমান হওয়া আবশ্যক, নতুবা চাষীর পক্ষে এ জমি চাষ করা ক্ষতির কারণ হইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে বাজারদর প্রথম শ্রেণীর জমির পড়তা (Cost of production) অপেক্ষা বেশী; সে জমির মালিক ফসল বেচিয়া কিছু অতিরিক্ত অংশ লাভ করিবে। এই অতিরিক্ত অংশকেই অর্থনীতিশাস্ত্রে বলা হয় ভূমিকর। মালিক জমি নিজে ব্যবহার না করিয়া অপরকে ব্যবহারের অধিকার দিলে প্রজার নিকট হইতে ঠিক এই পরিমাণ খাজনা আদায় করিতে পারে। এ অবস্থায় দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি খাজনা বাবদ কিছুই পায় না—ধনবিজ্ঞানের ভাষায় তাহাকে বলে প্রান্তীয় জমি।

শস্যের চাহিদা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু দ্বিতীয় স্তরের জমিতেও কুলাইবে না, ক্রমে তৃতীয় শ্রেণীর জমিরও শরণ লইতে হইবে। তখন বাজারদর নির্দ্ধারিত হইবে তৃতীয় শ্রেণীর জমির পড়্তা দিয়া; ফলে দ্বিতীয় স্তরের জমি কিছু অতিরিক্ত অংশ বা 'খাজনা' পাইবে, প্রথম স্তরের খাজনা আরও বাড়িয়া যাইবে। এইভাবে প্রান্তীয় জমি ক্রমশঃ নামিতে থাকিলে তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ব স্তরের জমিও ক্রমশঃ খাজনা পাইতে আরম্ভ করে।

এখন, প্রশ্ন উঠিতে পারে—কোনরূপ ভূমিকর পাইতে অক্ষম এ ধরণের প্রান্তীয় জমি (marginal land) কি বাস্তব জগতে সম্ভব? এ কথার উত্তরে বলা যায়—নবাবিষ্কৃত দেশসমূহে এরূপ জমি এখনও আছে, যাহার মালিকেরা আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিয়া কেবলমাত্র তাহাদের পড়্তাই পাইয়া থাকে, তদতিরিক্ত কিছুই পায় না। পুরাতন দেশগুলিতেও কোন চাষী যখন কৃষিকর্ম্মের জন্য ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে জমি ইজারা লয়, তখন সেই জমির মধ্যে ভাল মন্দ দুই স্তরের জমিই মিশানো থাকে। চাষী বুঝিতে পারে না যে জমিদারের খাজনা যোগাইয়াছে উচ্চস্তরের জমিগুলিই, নিম্নস্তরের প্রান্তীয় জমি অতিরিক্ত অংশ বাবদ তাহাকে কিছুই দেয় নাই।

জমির ব্যবহার কেবলমাত্র কৃষিব্যবসায়েই আবদ্ধ নহে, অন্যান্য ব্যবসাতেও ভূমির প্রয়োজন, এবং সর্ব্বত্রই ভূম্যধিকারী ভূমিকর পাইয়া থাকেন। কৃষিকার্য্যের ন্যায় অন্যান্য ব্যবসাতে কিন্তু ভূমিকর 'অতিরিক্ত অংশ' অর্থাৎ ইহার ভিত্তি ভূমির উৎপাদিকাশক্তির (productivity) উপর। এ সমস্ত ক্ষেত্রে অবশ্য উৎপাদিকা-শক্তি অর্থে জমির অবস্থান প্রভৃতি অন্যান্য গুণাবলী বুঝিতে হইবে।

ভূমি ছাড়া ধনোৎপাদনের অন্যান্য সহায়কগুলির লভ্যাংশ বিশ্লেষণ করিলে তাহাদের প্রাপ্যাংশের মধ্যেও অনেকস্থলেই আমরা কিছু পরিমাণ 'অতিরিক্ত' অংশের সন্ধান পাই। উদাহরণস্বরূপ উদ্যোক্তার কথা বলা যাইতে পারে। সকল উদ্যোক্তাই যে একই রকম কর্ম্মকুশল একথা কেহই বলিবেন না—কেহ সাধারণ স্তরের, কেহবা বিশেষ

কর্ম্মপটু। সাধারণ উদ্যোক্তা অপেক্ষা কর্ম্মকুশল উদ্যোক্তার আয় অনেক বেশী, অর্থাৎ শেষোক্ত উদ্যোক্তার উপার্জ্জনের মধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত খানিকটা অংশ লুক্কায়িত আছে।

ধনোপযোগে অতিরিক্ত অংশ।—মানুষের ভোগের জন্য ধনের উৎপত্তি। দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানা প্রকারের জিনিষ ব্যবহার করি এবং সেই ব্যবহারজনিত সুখানুভূতির মূল্যও দিয়া থাকি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিন্তু দেখা যায়, আমাদের প্রদত্ত মূল্য সে জিনিষগুলির ব্যবহারজাত আনন্দের তুলনায় খুবই কম। প্রাতে উঠিয়া একখানি খবরের কাগজ পড়িবার যে তৃপ্তি, তাহার জন্য আমাদের খরচ করিতে হয় মাত্র চারিটী পয়সা। খবরের কাগজ পড়ার আকাঙ্ক্ষা আমাদের এত বেশী যে চারি পয়সায় খবরে কাগজ না পাইলে চারি আনা খরচ করিতেও আমরা কুণ্ঠিত হইতাম না। যে আনন্দের জন্য চারি আনা খরচ করিতে প্রস্তুত ছিলাম, আমাদের সামাজিক আবেষ্টনীর আনুকূল্যে মাত্র চারিটী পয়সাতে সে আনন্দ লাভ হইতেছে। ধনভোক্ত হিসাবে এখানে আমরা অনেক অতিরিক্ত অংশ বিনা মূল্যেই পাইতেছি।

ধনোৎপাদনে 'অতিরিক্ত'।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ধনোৎপাদনের একটী প্রধান সহায়ক মূলধন। এই মূলধনের উৎপত্তি সম্ভব হয় অতিরিক্ত অংশ হইতেই। প্রতিবৎসর দেশে যে ধন উৎপন্ন হইতেছে, তাহা সমস্তই আমরা ব্যবহার দ্বারা নিঃশেষ করিয়া দিতেছি না, খানিকটা তুলিয়া রাখিতেছি। উৎপন্ন ধনের এ অতিরিক্ত অংশ ধনবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পুনরায় নিয়োজিত হইতেছে। ধনবিজ্ঞানে ইহাকেই বলা হয় মূলধন।

শুল্কনির্দ্ধারণে অতিরিক্ত।—দেশের শাসনযন্ত্র সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা জন্য, এবং জাতির কল্যাণকর বিবিধ অনুষ্ঠানের জন্য অর্থের প্রয়োজন। রাষ্ট্র তাই জনসাধারণের উপর কর বা শুল্ক ধার্য্য করে। এই শুল্কনির্দ্ধারণ অতি গুরুতর কাজ। লোকের কাজ করিবার শক্তি বা প্রবৃত্তি না কমিয়া যায়, ধনোৎপাদনের কোনরূপ প্রতিবন্ধক না ঘটে, দেশ হইতে ব্যবসায় বা মূলধন অন্যত্র স্থানান্তরিত না হয় ইত্যাদি বহুদিকে দৃষ্টি রাখিয়া তবে রাজস্ব-সচিবকে এই ব্যাপারে অগ্রসর হইতে হয়। বলা বাহুল্য, যাহ প্রয়োজনীয় তাহা অপেক্ষা যাহা প্রয়োজনাতিরিক্ত তাহার প্রতিই রাজস্ব-সচিবের দৃষ্টি সচরাচর আকৃষ্ট হয়। ভূমিকর অতিরিক্ত অংশ শস্যের দাম ইহার উপর নির্ভর করে না, কাজেই রাজস্ব-সচিবের খরদৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ। নগরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক ভূম্যধিকারিগণ কোনরূপ পরিশ্রম না করিয়াই প্রচুর ভূমিকরের অধিকারী হইতেছেন, সেদিকেও রাষ্ট্রের শ্যেনদৃষ্টি। এই সকল ব্যাপারে অবশ্য মতভেদ অনিবার্য্য।

অতিরিক্ততা—(স্ত্রী) আয়তনবৃদ্ধি হওয়া; বৃদ্ধি, বিস্তীর্ণ হওয়া।

অতিরিক্তাঙ্গ—রুদ্রযামলোক্ত অষ্টবিধ সংহারভৈরব মূর্ত্তির অন্যতম। ইঁহার বর্ণ বিদ্যুতের ন্যায় এবং হস্তে কুণ্ড, খেটক, পরিঘ ও ভিন্দিপাল।

অতিরুচ্—(পুং) [রোচক ইতি রুচ্ ক্বিপ্, রুক্, অতি-ক্রান্তো রুচং অত্যাদয়স°] জানুদেশ, স্ত্রীলোকের উরুদেশ। (ত্রি) অতিক্রান্তপ্রভ, অতিশয় কান্তিযুক্ত (স্ত্রী) ২ অতি-শয়িত কান্তি।

অতিরুচির—(ত্রি) অতিশয় সুন্দর। [স্ত্রিয়াং টাপ্] (স্ত্রী) ২ অতিজগতী ছন্দের প্রকার ভেদ। ৩ চুড়িকা বা চুলিকা ছন্দের নামান্তর।

অতিরুষ্—(ত্রি) অতিশয় ক্রোধযুক্ত। "অতিরুষাং তিরশ্চাং" (পঞ্চতন্ত্র) [অতিশয়িতা রুট্ প্রাদিস°] (স্ত্রী) ২ অত্যন্ত ক্রোধ। "ভগ্নং শরাসনমিবাতিরুষা স্মরস্য" (শকু° ৫ অ°)

অতিরুহা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] মাংসরোহিণী। (রাজনি°)

অতিরূক্ষ—(ত্রি) [অতিশয়িতো রূক্ষঃ প্রাদি-স°] অত্যন্ত রূক্ষ। ২ নিঃস্নেহ, স্নেহশূন্য। (পুং) ৩ নিঃস্নেহ কঙ্গু, কোদ্রবাদি ধান্য। [অতিক্রান্তো রূক্ষং] (ত্রি) ৪ অতিশয় স্নিগ্ধ।

অতিরূপ—(পুং) [অতিক্রান্তো রূপং] রূপবর্জ্জিত ঈশ্বর। "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা ঈশ্বরের রূপহীনতা প্রতিপন্ন হওয়ায় অতিরূপ শব্দেও তাঁহাকেই বুঝায়। (ত্রি) ২ শুক্লাদি রূপরহিত বায়ু প্রভৃতি। [অতিশয়িতং রূপং প্রাদি-স°] (ক্লী) ৩ সুন্দর রূপ। যথা—অতিরূপবতী কন্যা। ৪ অসাধারণ সৌন্দর্য্য।

অতিরেক—(পুং) [অতি-রিচ্-ঘঞ্] অতিশয়। ২ ভেদ। ৩ প্রাধান্য। ৪ আধিক্য। "সম্পূর্ণমেতয়োর্জ্জ্যৈয়মতিরেকে পরেঽহনি" (তিথিতত্ত্ব)

অতিরেচক—(পুং) [বৈদ্যক] কাকোলী, চলিত কাঁফলা। (বৈদ্যকনি°)

অতিরৈ—(ত্রি) [অতিরি দ্র°]

অতিরোগ—(পুং) [অতি-রুজ্-ঘঞ্। অতিশয়িতো রোগঃ; প্রাদিস°] ক্ষয়রোগ। [প্রাদি বহুব্রী] (ত্রি) ২ অত্যন্ত রোগযুক্ত।

অতিরোধন—(ক্লী) [ন-তিরস্-ধা-ল্যুট্] তিরোধান নহে, প্রকাশ। ২ ব্যবধানাভাব।

অতিরোমশ, অতিলোমশ—(পুং) [অতি-রোমন্-অস্ত্যর্থে [শ] বন্য ছাগল। ২ বৃহৎ বানর। ৩ নীলবুহ্না, চলিত ছাগলবেঁটে। (ত্রি) ৪ অত্যন্ত লোম-যুক্ত।

অতিরোহিত—(ত্রি) [ন তিরোহিতঃ নঞ্ তৎ] প্রকাশিত, স্ফুট। ২ অব্যবহিত।

অতিরৌদ্র—(পুং) মুহূর্ত্তদেবতাদিগের অন্যতম দেবতা। ইনি প্রথম মুহূর্ত্তের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা। ইঁহাকে কখনও কখনও রাক্ষসও বলা হয়। হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে ইঁহার ধ্যান এইরূপ পাওয়া যায়—

"তত্রাদিমোঽতিরৌদ্রাখ্যঃ কৃষ্ণবর্ণোঽরুণাংশুকঃ।
চতুর্ভুজো মহাক্রূরঃ সাস্থিসজ্ঘটকেবলঃ॥
আদিমে দক্ষিণে বিভ্রৎ কৌশিকং চাতিভীষণং।
দ্বিতীয়ে তু করে সর্পং বামাঙ্গে ত্বথ বৈ করে॥
সন্দংশং তদধঃপাত্রং বিভ্রাণঃ সর্ব্ববিঘ্নহা।"

আদি অর্থাৎ প্রথম মুহূর্ত্তের অধিষ্ঠাতা অতিরৌদ্র নামক দেবতা কৃষ্ণবর্ণ এবং রক্তাম্বরে বিভূষিত। ইনি চতুর্ভুজ, মহাক্রুর এবং ইহার দেহ অস্থিসার। দুইটী দক্ষিণহস্তের প্রথমটীতে অতিভীষণ পেচক ও দ্বিতীয়টীতে সর্প ধারণ করেন, এবং ইহার দুইটী বামহস্তে সন্দংশ (চিমটা) এবং পাত্র থাকে।

অতিলম্পট—(ত্রি) অত্যন্ত কামুক।

অতিলঙ্ঘন—(ক্লী) [অতি-লঙ্ঘ-ল্যুট্] অতিক্রম।

অতিলঙ্ঘিত—(ক্লী) [বৈদ্যক] অতিলঙ্ঘন, অত্যন্ত উপবাস, অতিলঙ্ঘনের ফলে পর্ব্ব বা গ্রন্থিভেদ, অঙ্গমর্দ্দ, কাস, মুখ-শোষ, ক্ষুধানাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, কর্ণ ও নেত্রের দৌর্ব্বল্য, বারংবার মনের সম্ভ্রম, উর্দ্ধ বাত, এবং দেহাগ্নির বলহানি হয়। (চক্রদত্ত)

অতিলক্ষ্মী—(ত্রি) [অতিশয়িতা লক্ষ্মীর্যস্য বহুব্রী] অতিশয় লক্ষ্মীসম্পন্ন। [অতিশয়িতা লক্ষ্মীঃ ; প্রাদি-স°] (স্ত্রী) ২ অতিশয় লক্ষ্মী, শ্রীবৃদ্ধি।

অতিলম্বী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] শতাহ্বা। (ভাবপ্র°, পূ°)

অতিলেহা(হ)—ষোড়শ মাত্রাপাদক প্রাকৃত ছন্দোবিশেষ।

অতিলোভ—(পুং) [অতিশয়িতো লোভঃ ; প্রাদি-স°] অত্যন্ত লোভ। "অতিলোভাভিভূতস্য চক্রং ভ্রমতি মস্তকে।" (পঞ্চতন্ত্র) [অতিলোভো যস্য ; প্রাদি বহুব্রী] (ত্রি) ২ অতিশয় লোভযুক্ত, অতিলোভী।

অতিলোমন্—(ত্রি) [অতিলোমশ দ্র°]

অতিলোমশা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] নীলবুহ্না। চলিত ছাগল-বেঁটে। (পর্য্যায়মুক্তাবলী)

অতিলোহিতগন্ধ—(পুং) দমনক বৃক্ষ, চলিত দনা।

অতিলৌল্য—(ক্লী) প্রবল স্পৃহা ; অতিলোভ। "কর্পূর পুটিকামতিলৌল্যাদভক্ষয়ৎ" (পঞ্চতন্ত্র) ২ অতিচাপল্য।

অতিলোভতা—(স্ত্রী) অতিলোভের ভাব।

অতিলোম—(স্ত্রী) [অতিশয়িতং লোম যস্য প্রাদি বহুব্রী- অত্যন্ত লোমযুক্ত। মনু বলিয়াছেন, অতিলোমা কন্যা বিবাহ করিতে নাই।

"নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাম্।" (মনু ৩.৮)

অতিবক্তৃ—(ত্রি) [অতি-বচ্-তৃচ্] বাবদূক, বাগ্‌দক্ষ, বাচাল, বহুবক্তা। (স্ত্রী) অতিবক্ত্রী।

অতিবক্র—(পুং) [অতিশয়িতো বক্রঃ ; প্রাদি-স°] সূর্য্য সপ্তম এবং অষ্টম গৃহে অবস্থিতি করিলে পূর্ব্বগতির বিপরীতে পশ্চাদ্গামী মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনি এই পাঁচ গ্রহ। (ত্রি) ২ অত্যন্ত কুটিল।

অতিবয়স্—(ত্রি) [অতিক্রান্তঃ বয়ঃ কালকৃতাবস্থাং বয়সং পক্ষিণাং বা] বৃদ্ধ। ২ পক্ষি-অতিক্রমকারী।

অতিবর্ণাশ্রমিন্—(পুং) [অতিক্রান্তো বর্ণাশ্রমিনম্] ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ভিন্ন। ২ ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমভিন্ন অন্যাশ্রমী। ৩ পরমাত্মজ্ঞানী। যিনি কেবলমাত্র বেদান্তোক্ত মহাবাক্য শ্রবণ করিয়াই আত্মাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিয়া লয়েন, তিনিই অতিবর্ণাশ্রমী।

"যো বেদান্তমহাবাক্যশ্রবণেনৈব কেবলং।
আত্মানং ঈশ্বরং বেদ সোঽতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ।"
(বাচস্পত্যধৃত বেদান্তবাক্য)

অতিবর্ত্তন—(ক্লী) [অতি-বৃত-ল্যুট্] অতিরেক। ২ যান-চালক সারথি প্রভৃতির দণ্ডাভাবপ্রয়োজক ছিন্ননাস্যাদি দশ ব্যাপার। মনু বলিয়াছেন, বলীবর্দ্দ প্রভৃতির নাসারজ্জু ছিঁড়িয়া গেলে, রথাদির যুগকাষ্ঠ ভঞ্জন আদি, ভূমির উচ্চনীচতায় চক্র মধ্যস্থ কাষ্ঠচক্র ভঙ্গ হইলে, যানের চর্ম্মবন্ধন, পশুদিগের মুখবন্ধনরজ্জু ও বল্‌গা ছিন্ন হইলে এবং উচ্চৈঃস্বরে 'সরিয়া যাও' বলিয়া বারবার হাঁকিয়া বলিলেও যদি যানদ্বারা জীবহত্যাদি অপরাধ ঘটে, তবে তাহাতে যানচালক বা যানস্বামীর দণ্ড নাই।

"যানস্য চৈব যাতুশ্চ যানস্বামিন এব চ।
দশাতিবর্ত্তনান্যাহুঃ শেষে দণ্ডো বিধীয়তে।"
(মনু ৮.২৯০)

(ত্রি) ২ অতীত জীবনোপায়।

অতিবর্ত্তিন্—(ত্রি) [অতীত্য বর্ত্ততে অতি-বৃত-ণিনি।] অতিশায়ী। ২ অগ্রগামী।

অতিবর্ত্তুল—(পুং) [অতিশয়িতো বর্ত্তুলঃ। প্রাদিস°] বর্ত্তুলাকার কলায়, চলিত মটর, বাঁটুল কড়াই। (ত্রি) ২ অতিশয় বর্ত্তুল

অতিবল—ভরতবংশীয় নৃপতি। (হেম° ত্রিষষ্টিশ°)

অতিবাত—(পুং) অত্যন্ত বাতাস, ঝড়।

অতিবাদ—(পুং) [অতি-বদ-ঘঞ্] অত্যুক্তি। "অতিবাদং

শংসত্যতিবাদেন দেবাঃ" (ঐতরেয়ব্রা° ৬.৩৩) ২ পরুষ বা নিষ্ঠুর উক্তি। "অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত্রঃ" (মনু ৬.৪৭) 'অতিবাদান্ অতিক্রমবাদান্' (কুল্লূক)

অতিবাদন—(ক্লী) অধিক কথা, বাজে কথা। ২ অধিক বাজান।

অতিবাদিন্—(ত্রি) [সর্ব্বানতিক্রম্য বদতীতি অতি-বদ্-ণিনি] সকলকে অতিক্রম করিয়া কথনশীল ; যে সকলের উপর কথা কহে। ২ সকলের মত খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত-ব্যবস্থাপক ; যে সর্ব্বমত নিরাস করিয়া নিজ মত স্থাপন বা সমর্থন করিতে পারে। "বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী" (মন্তুকোপনি° ৩.১,৪) "এবং বিজানন্নতিবাদী ভবতি" (ছান্দোগ্য উ° ৭.১৫.৪)

অতিবাধ—(পুং) অত্যন্ত প্রতিরোধ।

অতিবাধিত—(ত্রি) অত্যন্ত উপকৃত। ২ অত্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত।

অতিবার—শাল্মলিমুনির গোত্রে উৎপন্ন একজন ভূপতি। (সহ্যাদ্রি° পূর্ব্বার্দ্ধ ৩৪.১৩)

অতিবাবদূক—(ত্রি) অত্যন্ত বাচাল।

অতিবাহ—(পুং) [দেহমতীত্য, দেহান্তরে বাহঃ প্রাপণং ৭-তৎ] ঐহিক ভোগসাধন অদৃষ্টের ক্ষয়ে সূক্ষ্ম ভূতমাত্রা সহ সূক্ষ্ম শরীরাবচ্ছিন্ন জীবের অন্য দেহ সংযোগের জন্য নয়ন। সূক্ষ্ম দেহবিশিষ্ট জীবাত্মার দেহান্তরপ্রাপ্তি। ২ অতিযাপন।

অতিবাহক—(পুং) [অতীত্যৈনং দেহং বাহয়তি দেহান্তরং প্রাপয়তি অতি-বহ-ণ্বুল্] ঈশ্বরনিয়োজিত অর্চ্চিরাদি অভিমানী দেববিশেষ। [অতি-বহ-ণিচ্-ণ্বুল্] (ত্রি) ২ অতিযাপক।

অতিবাহিক—(ত্রি) [অতিবাহী অন্ত্যাস্ত অতিবাহ-ঠন্।] অতিবাহযোগ্য। ২ সূক্ষ্ম শরীর। [অতিবাহ দ্র°]।

অতিবাহিত—(ত্রি) [অতি-বহ-ণিচ্-ক্ত] যাপিত ; অতিক্রমিত।

অতিবাহু—স্বায়ম্ভুব মনুর দশ পুত্রের অন্যতম।

অতিবাহ্য—(ত্রি) অতি-বহ-ণিচ্-যৎ ণ্যৎবা। অতিবাহের যোগ্য কাল প্রভৃতি।

অতিবিকট—(পুং) [অতিশয়েন বিকটঃ] দুষ্ট হস্তী। (ত্রি) ২ অতি ভয়ঙ্কর।

অতিবিচক্ষণ—(ত্রি) অত্যন্ত জ্ঞানী ; শাস্ত্রবিশারদ।

অতিবিচক্ষণতা—(স্ত্রী) অধিক পাণ্ডিত্য।

অতিবিদাহিন্—(ত্রি) [বৈদ্যক] রাজসর্ষপাদি।

অতিবিতরণ—(ক্লী) অত্যন্ত দান।

অতিবিদ্ধ—(ত্রি) অতিমাত্র বেধযুক্ত, আহত। "তথাতিবিদ্ধা মহিষীতি কুব্জয়া।" (রামা° ২.৯.৬২)

অতিবিদ্ধা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] প্রমাণাতিরিক্ত বিদ্ধা। (সুশ্রুত)

অতিবিদ্ধভেষজ—(ত্রি) [বৈদ্যক] গভীর ক্ষতনিরাময়কর (ঔষধ)। "পিপ্পলী ক্ষিপ্তভেষজ্যতিবিদ্ধভেষজী" (অথর্ব্ব° ৩.১০৯.১)

অতিবিপদ্গ্রস্ত—(ত্রি) অত্যন্ত বিপদে পতিত।

অতিবিপত্তি—(স্ত্রী) অত্যন্ত বিপদ্ ; অতিবিপদ্।

অতিবিভব—(পুং) অত্যন্ত ধন ; বিপুল সম্পত্তি।

অতিবিভূতি—বিষ্ণুপুরাণোক্ত (৪.১.১৬) নাভানেদিষ্টবংশীয় খনিনেত্রের পুত্র।

অতিবিভেদ—(পুং) অত্যন্ত ভেদক ; বিভিন্নতা।

অতিবিরলতা—(High Vacuum) অণুর অত্যন্ত সংখ্যাল্পতা। আমরা দেখিতে পাই যে বাতাস সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; সাধারণ অবস্থায় যে কোন স্থান বা পাত্রই বাতাসে পূর্ণ থাকে। যদি কোন উপায়ে উহাকে বহিষ্কৃত করিয়া না দেওয়া হয়, তাহা-হইলে সেইস্থান কোন ক্রমেই শূন্য থাকিতে পারে না। কোন স্থানে যেমন কোন পাত্র যদি অপর কোন পদার্থে—বায়বীয় বা অন্য যে কোনরকম—পূর্ণ করিয়া রাখা যায়, তবে তো কোন কথাই নাই ; কিন্তু যদি সাধারণ অবস্থায় অমনি রাখিয়া দেওয়া যায়, তবে তাহার শূন্য স্থান বাতাস যাইয়া পূর্ণ করিয়া রাখিবে।

অণু সম্বন্ধে আলোচনাকালে * দেখাইয়াছি বায়বীয় পদার্থের অণুগুলি নিয়ত সঞ্চরণ করিয়া থাকে এবং সঞ্চরণের ফলে পাত্রের দেহের উপরে আঘাত করে বলিয়াই চাপের সৃষ্টি হয়। এখন যদি কোন প্রক্রিয়া দ্বারা পাত্রস্থ বায়বীয় পদার্থ বাহির করিয়া দেওয়া যায়, তবে উক্ত পদার্থের অণুর বিরলতা হেতু চাপও কমিয়া আসিতে থাকে। অতএব কোন পাত্রের শূন্যতাসাধন অর্থেই বুঝা যায় পাত্রস্থ বায়বীয় পদার্থের অণুর সংখ্যা হ্রাস করা, তথা আভ্যন্তরীণ চাপ লঘু করা।

সুতরাং অতিবিরলতা সাধন করিতে হইলে পাত্রের বায়বীয় পদার্থের অণুর সংখ্যা যতদূর সম্ভব কমাইয়া ফেলিতে হইবে। অপর কথায় উক্ত পদার্থের পরিমাণ এতদূর কমাইতে হইবে, অর্থাৎ অণুর সংখ্যা এত অল্প করিতে হইবে যে তদপেক্ষা আর কমান যায় না। এরূপ যথাসম্ভব অণুর সংখ্যাল্পতাকেই অতিবিরলতা বলা হয়।

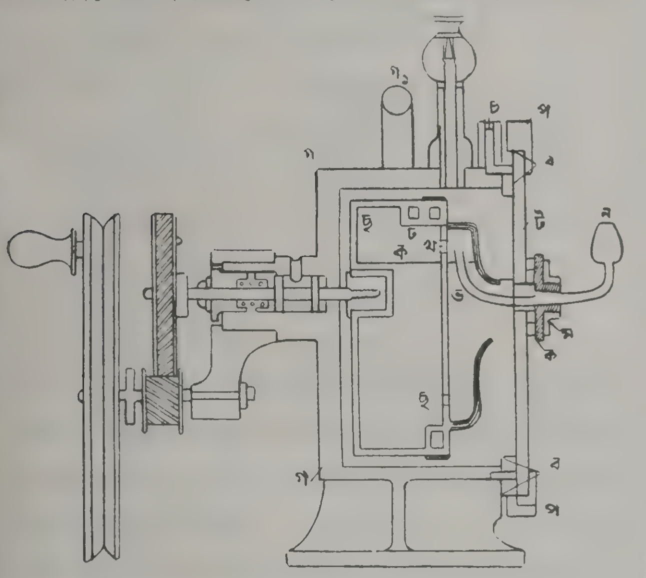
একথা এখন অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে যে, অতিবিরলতা সাধনের ফলে চাপের অত্যন্ত বেশী লঘুতা সম্পাদিত হয়। বর্ত্তমান কালে প্রকৃতপক্ষে অতিবিরলতা সাধনের যান্ত্রিক কৌশলের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল যথাসম্ভব লঘু চাপ উৎপাদন করা। অতিবিরলতা সম্পাদন করিয়া চাপের লঘুত্ব সাধন ব্যাপারে সম্প্রতি কএক বৎসরে বৈজ্ঞানিক যান্ত্রিক কৌশলের দ্রুত উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা

* বিশ্বকোষ, ২য় সংস্করণ, প্রথমভাগ, পৃ° ৫১২-৫১৮।

আবশ্যক যে, নিম্ন চাপের সৃষ্টি করিবার নিমিত্তই অতিবিরলতা-উৎপাদক বায়ুনিষ্কাশন পাম্পের (high vacuum pump) অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে, আর বাষ্প-প্রবাহের (vapour stream) দ্বারা এই পাম্পগুলির গতি-সঞ্চার করা হয়। এক্ষণে এই প্রকার অতিবিরলতা-উৎপাদক পাম্প সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা এস্থলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

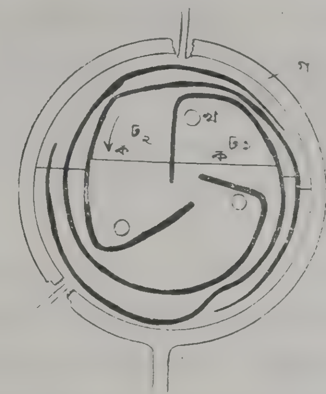
অতিবিরলতা-উৎপাদক পাম্প।—(High Vacuum Pumps)

বায়ুনিষ্কাশন পাম্প সম্বন্ধে বলিতে গেলে প্রথমেই গেডের পারদাবর্ত্ত পাম্পের (rotary mercury pump) নাম উল্লেখ করিতে হয়। গেডে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এই পাম্পের আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের ফলে অতিবিরলতা-উৎপাদনের যন্ত্র-কৌশলের যথেষ্ট বিবর্ত্তন ঘটে; পাম্পটীর



গেডের পারদাবর্ত্ত পাম্প [১(ক)নং চিত্রের সহিত একত্র বিচার করিতে হইবে]।
১নং চিত্র

অঙ্গের মধ্যে অন্যতম প্রধান হইল পর্সিলেন-নির্ম্মিত একটী ঢোল (drum)—‘ঢ’; ইহা অক্ষদণ্ডের উপরে ঘুরিতে পারে। ঢোলটী একটী খাড়া প্রাচীর দিয়া দুইটী প্রকোষ্ঠে ভাগ করা থাকে; এক প্রকোষ্ঠের সহিত একটী নল (ন) দ্বারা যেই পাত্রটী শূন্য করিতে হইবে তাহা সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। উক্ত নলের (ন) একপ্রান্ত পাম্পের ‘ভ’ অংশে ‘খ’ দ্বারপথ পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। ঢোলের অপর অংশ ১ (ক) নং চিত্রে প্রদর্শিত মত প্রাচীরের দ্বারা তিনটী ভাগে বিভক্ত করিয়া লওয়া হয়। ঢোলটী নির্দ্দিষ্ট গভীরতা (ক ক) অবধি পারদে পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। যে পাত্র শূন্য করিতে হইবে তাহার সহিত সংযুক্ত অংশ ‘ভ’র সহিত ঢোলের ‘ঢ$_১$’ অংশ ‘খ’-দ্বারপথ দ্বারা সংযুক্ত থাকে (১নং ও ১ (ক) নং চিত্র)। তারপর ঢোলটী যখন ঘুরিতে থাকে, তখন ‘ঢ$_১$’ অংশ আধার বা পাত্র হইতে আগত বায়ুতে পূর্ণ হইয়া যায়; আর তৎসহ



গেডের পারদাবর্ত্ত পাম্পের ঘূর্ণ্যমান ঢোলের খণ্ড-চিত্র [১নং চিত্রের সহিত একত্র বিচার করিতে হইবে]।
১(ক)নং চিত্র

‘ঢ$_২$’ অংশে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই আধার হইতে যে বায়ু টানিয়া লইয়াছে, তাহা পারদের দ্বারা অপসারিত হইয়া শেষে ঘূর্ণনশীল ঢোল ও বহিরাবরণের (গ) মধ্যবর্ত্তী স্থানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। এই ব্যাপার অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিতে থাকে। কিন্তু লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, ঢোল এবং বহিরাবরণের মধ্যবর্ত্তী স্থানের চাপ যেন অতি অল্প কএক মিলিমিটার পারদ অপেক্ষা বেশী না হয়। এতদুদ্দেশ্যে এই বায়ুনিষ্কাশন পাম্পটী অপর একটী নিষ্কাশন-যন্ত্রের (mechanical pump) সহিত যুক্ত থাকে। এই নিষ্কাশন-যন্ত্রের সাহায্যে প্রথমে ঢোল ও বহিরাবরণের মধ্যবর্ত্তী স্থলের চাপ কমাইয়া বাঞ্ছিতানুরূপ করিয়া লইয়া পরে পারদাবর্ত্ত পাম্পের কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। ঘূর্ণ্যমান বায়ুনিষ্কাশন পাম্প চলিবার সঙ্গে সঙ্গে অপর নিষ্কাশন-যন্ত্রটীও সচল রাখা আবশ্যক, যেন পারদাবর্ত্ত পাম্প হইতে অপসারিত বায়ু সরাইয়া লইয়া বহিরাবরণ ও ঢোলের মধ্যবর্ত্তী স্থলের চাপ প্রয়োজনমত সংরক্ষিত হইতে পারে।

এই ধরণের পারদ-পাম্পের সাহায্যে খুব বেশী নিম্ন চাপ পাওয়া যাইতে পারে; ম্যাক্লিয়ডের (McLeod) পরিমাপক (gauge) অনুযায়ী প্রায় ১০$^{-৬}$ মিলিমিটার পারদ-চাপ পর্য্যন্ত নামিয়া আসে। কিন্তু এখানে একটা সমস্যা আবার আসিয়া পড়ে। পরীক্ষাগার-কক্ষের তাপমানে পারদ খানিকটা বায়বীভূত হয়; এই বায়বীভূত পারদের বাষ্পচাপও প্রায় ·০০১ মিলিমিটার পারদের সমান। সুতরাং বায়ুনিষ্কাশক ও

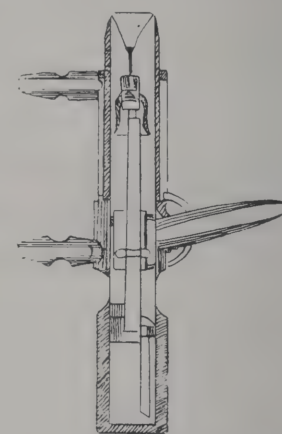
গ্রাহকের মধ্যবর্ত্তী স্থলে এই পারদ-বাষ্পের অবস্থান নিরোধ করিবার নিমিত্ত বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। অধিকন্তু সহজে যে সকল বাষ্প ঘনীভূত হয়, সেই সকল বাষ্প লইয়া এই পাম্পে কার্য্য করা সম্ভব হয় না। কারণ, বাষ্প বহিষ্করণের কালে প্রকোষ্ঠের আয়তন (volume of the chamber) কমিয়া যাওয়ার ফলে ঢোলের অভ্যন্তরস্থ পরিপৃক্ত বাষ্প (saturated vapour) ঘনীভূত (condensed) হইয়া পড়ে।

বায়ুনিষ্কাশন পাম্পের মধ্যে যে পারদ দেওয়া হয় তাহার পরিমাণ যথেষ্ট হওয়া আবশ্যক। এই ধরণের বায়ুনিষ্কাশন পাম্পের বিশেষত্ব হইল যে, প্রয়োজন মত একবার যতখানি বিরলতা সাধন করা হইয়াছে তাহা অব্যাহত রাখিয়াই যন্ত্র বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে,—অর্থাৎ পাম্প বন্ধ করিয়া দিলেও সমুৎপন্ন বিরলতার কোন প্রকার ব্যতিক্রম হয় না। এই প্রকারের বায়ুনিষ্কাশন পাম্প পরীক্ষাগারে বহুল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অতঃপর ১৯১২ খৃষ্টাব্দে গেডে অপর আর একটী বায়ু-নিষ্কাশন পাম্পের আবিষ্কার করেন ; ইহার কার্য্যকৌশল সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার। এই পাম্পই তথাকথিত আণবিক পাম্প (molecular pump) নামে পরিচিত। ইহাতে নুড্সেন (Knudsen) কর্ত্তৃক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপাদিত কতিপয় নিম্ন-চাপবিশিষ্ট বায়ুর বিশেষ বিশেষ গুণের সুযোগ ও সুবিধা গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এই পাম্প সম্বন্ধে যথাকালে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইবে। [পাম্প দ্র°] তবে এই স্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আণবিক পাম্পের সুবিধা এই, সহজে ঘনীভূত হয় এমন বাষ্পাদি (condensible vapours) দ্বারাও ইহার কাজ চলিতে পারে ; বিশেষ করিয়া জলীয় বাষ্পও ব্যবহৃত হইতে পারে, এবং অন্যান্য বায়ুতে (gas) যত সহজে ও দ্রুত কার্য্য সম্পন্ন হয়, জলীয় বাষ্পেও তদ্রূপই ঘটে। কিন্তু যান্ত্রিক গঠনের জটিলতার নিমিত্ত ইহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। ব্যয়াল্পতা ও পরিচালনার সরলতার দিক দিয়া পারদ-বাষ্প পাম্প (mercury vapour pump) অত্যন্ত সুবিধাজনক বলিয়া ইহার ব্যবহার অধিক প্রচলিত। বস্তুতঃ পারদ-বাষ্প পাম্পের আবির্ভাবে আণবিক পাম্পের ব্যবহার বিরল হইয়া পড়িয়াছে।

পারদ-বাষ্প পাম্পের কার্য্যকারিতা নির্ভর করে বাষ্প-প্রবাহের মধ্যে বায়ুর ব্যাপনের (diffusion of the gas into a stream of vapour) উপরে। ইহার আরও একটা দিক আছে—বাষ্প ঘনীভূত হইয়া যায় বলিয়া পাত্রাধারে যাইয়া প্রবেশ করিতে পারে না। ব্যাপন ও ঘনীভবনের উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয় বলিয়া এই ধরণের বায়ু-নিষ্কাশন পাম্পগুলি পারদ-ব্যাপন পাম্প বা ঘনীভবন পাম্প নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

এই ধরণের বায়ুনিষ্কাশন পাম্পও গেডেই সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন*। যে পাত্রের অভ্যন্তর শূন্য করিতে হইবে



গেডের পারদ-বাষ্প পাম্প বা অতিবিরলতা-
সম্পাদক পারদ-ব্যাপন পাম্প।
২নং চিত্র।

তাহার সহিত সংলগ্ন রন্ধ্রবিশিষ্ট একটী পটহের (porous diaphragm) মধ্য দিয়া পারদের প্রবাহ অতিক্রম করাইয়া লওয়াই হইল এই যন্ত্রের প্রধান কার্য্য। ইহাতে ব্যাপন (diffusion) ঘটে উভয় দিকেই। পারদ-বাষ্পের (mercury vapour) মধ্যে যাইয়া যে বায়ু ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহা টানিয়া লইয়া প্রথমে যে পাত্রে ঘনীভূত বাষ্প সংগৃহীত হয় (condensing vessel) তাহাতে ফেলা হয় ; তথা হইতে পরে অপর একটী সাধারণ নিষ্কাশন-যন্ত্র দ্বারা অপসারিত করিয়া লওয়া হয়। আর ভিন্ন পথে নির্গত পারদের বাষ্প প্রথমে বিশেষ একটী পথ অতিক্রম করিবার কালে ঘনীভূত হইয়া পরে ফিরিয়া আবার বয়লারে প্রবেশ করে। গেডে প্রথমে তাঁহার যন্ত্রে এই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন ; কিন্তু ব্যাপন বড় বেশী ধীরে ধীরে হয় দেখিয়া তিনি শেষে সেই রন্ধ্রবিশিষ্ট পটহের পরিবর্ত্তে এক মিলিমিটার প্রস্থ চির-কাটা পটহের ব্যবহার করেন।

কিন্তু ইহাতেও যন্ত্রটী নির্দ্দোষ হইল না। লাঙ্মুইর† (Langmuir) আসল ত্রুটি কোথায় ঘটিতেছে তাহা দেখাইয়া

* *British Patent—19,793 (1914)*

† *Journ. Frank. Inst, 182,719 (1916)*

দিয়া যন্ত্রের প্রয়োজনীয় সংস্কার করিয়া ইহার যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করেন।

সংস্কারের পরে অবশ্য উহা কার্য্যপরিচালনের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী হইল, কিন্তু পরে দেখা গেল যে অপেক্ষাকৃত অধিকতর সহজ ও সরল নির্ম্মাণ-কৌশলের দ্বারাও উৎকৃষ্ট ফললাভ করা যাইতে পারে। বাক্‌লে * (Buckley) শেষে অতিবিরলতা উৎপাদনের নিমিত্ত এক সাধারণ 'T' আকারের নল আবিষ্কার করেন। এই নলটী জলে ঠাণ্ডা রাখা হয়। দীর্ঘ নলের তলদেশে উৎপন্ন বাষ্প একটী পার্শ্ব-নলের (side-tube) মধ্য দিয়া নির্গত হইয়া যায়।

এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, যে কোন বায়ু স্বভাবতঃই এই সময়ে ব্যাপ্ত হইয়া (diffusing) অভ্যন্তরাভিমুখে ব্যাকিং পাম্পের (backing pump) দিকে যাইতে থাকে; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বাষ্প পার্শ্ব-নল দিয়া নিষ্ক্রমণকালে তাহাও ঠেলিয়া লইয়া যাইতে থাকে। বাক্‌লে আরও লক্ষ্য করেন যে রন্ধ্র-পথে (aperture) শীতলীকরণের কার্য্যও পরিহার করা যাইতে পারে, যদি যথেষ্ট পার্শ্ব-গতিসম্পন্ন অণুগুলিকে দূরীভূত করিবার নিমিত্ত নির্গমন-পথের ঠিক নীচেই পারদের বাষ্প-প্রবাহকে শীতলীভূত করিয়া লওয়া হয়।

পূর্ব্বোল্লিখিত বায়ুনিষ্কাশন পাম্পের সকলগুলিতেই এক অন্তরায় রহিয়া গিয়াছে। যেই পথে বাষ্প নির্গত হইতেছে সেই পথেই আবার ঘনীভূত পারদকেও ফিরিয়া আসিতে হয়, এবং উভয়ের গতি তাই বিপরীতমুখী। ইহাতে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

পারদ কাচের গায়ে বিন্দু বিন্দু আকারে সংলগ্ন হইতে থাকে। এই পারদ-বিন্দুর সহিত সংঘাতে বাষ্প বিপরীত দিকে প্রত্যাবৃত্ত হওয়া খুবই সম্ভব। তাহা ছাড়া পারদ-বিন্দু-গুলিরও নলের তপ্ত অংশের সংস্পর্শে আসিয়া অবাঞ্ছিত স্থলে আবার বাষ্পাকারে পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে। লাঙ্গমুইর† অবশ্য ক্রম-বিপর্য্যয়ের ব্যবস্থা (inverted construction) দ্বারা এই অন্তরায় দূরীভূত করিয়াছিলেন; ইহাতে ঘনীভূত পারদ-বাষ্পের নির্গমন-পথ হইতে দূর দিয়া ভিন্ন পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত অতিবিরলতা-সম্পাদনোপযোগী আরও অনেক প্রকার বায়ুনিষ্কাশন পাম্পের বর্ণনা পাওয়া যায়।‡

* U. S. Patent—1,433, 258 (1922)

† U. S. Patent—1,320, 874 (1919)

‡ Dushman, Saul, *Journ. Frank. Inst*, 211, 689 (1931) দ্রষ্টব্য।

সেইগুলি সম্বন্ধে যথাস্থানে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হইবে [পাম্প দ্র°]। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে যতটুকু প্রয়োজন কেবল তৎসম্বন্ধেই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল।†

অতিবিবাদিন্—(ত্রি) অত্যন্ত বিবাদকারী; অত্যন্ত বাক্‌-বিতণ্ডা বা কলহকারী।

অতিবিশ্ব—(ত্রি) [বিশ্বমতিক্রান্তঃ] জনৈক মুনি। (হরিবংশ)

অতিবিষ—(পুং) [বিষমতিক্রান্তঃ] যে বিষকে পরাজয় করে; মহৌষধ।

অতিবিষা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] স্বনামখ্যাত উপবিষজাতীয় পণ্যদ্রব্য। চলিত আতইচ। পর্য্যায়—বিশ্বা, বিষা, অতিবিষা, উপবিষা, অরুণা, শৃঙ্গী, মহৌষধ (অমর), কাশ্মীরা, শ্বেতা, (রত্নমালা) শ্বেতকন্দা, ভৃঙ্গী, ভঙ্গুরা, বিরূপা, শ্যামকান্দ, বিষরূপা বীরা, মাদ্রী, শ্বেতবচা, অমৃতা। (রাজনি°) (স্ত্রী) ইহার বাঙ্গালা নাম আতইচ ও হিন্দী নাম অতীস্; মরাঠীতে—অতিবিষ; গুজরাটীতে—অতলসনীকলী; কর্ণাটীতে—অতিবিষা; তেলুগু ভাষায়—অতিবাসা। ইহা Aconitum জাতীয় উদ্ভিদ্। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—অতিসারঘ্নী, শিশুভৈষজ্য।

অতিবিষা শব্দে একই জাতীয় দুই প্রকার উদ্ভিদ্ বুঝাইয়া থাকে—(১) কাঠবিষ ও (২) অতীষ বা আতইচ।

(১) কাঠবিষ (Aconitum ferrox)। ইহার গাছ ছোট, ২।৩ ফিট্ পর্য্যন্ত বড় হয়। হিমালয়ের উচ্চপ্রদেশে (১০০০০ হইতে ১৪০০০ ফুট), নেপালে ও গাড়োয়াল হইতে সিকিম পর্য্যন্ত সকল দেশে এই গাছ বিস্তর দেখা যায়। ইহার শুষ্ক মূল ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমপ্রদেশস্থ বাজারে বিষ বা বিখ নামে বিক্রীত হয়। উহাই একোনাইট্ (Acconite) নামে প্রসিদ্ধ। ইহা সদ্গন্ধহীন, প্রথমে মুখে দিলেই কটু বোধ হয় এবং জিহ্বা ও টাক্‌রা অসাড় মত হইয়া থাকে। ইহা বিষাক্ত!

এই জাতীয় একোনিটাম্ নেপেলাস্ (Aconitum Napelus) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে হিমালয়ের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে (১০০০০ ফুট পর্য্যন্ত), এসিয়া ও আমেরিকার শীতল এবং নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে জন্মে। ইহাও নানাপ্রকার ঔষধে ও রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার কোন কোন শ্রেণী বিষাক্ত। [একোনাইট্ ও বৎসনাভ দ্র°] ইহাতে টিঙ্কর

† এই বিষয়ে বিশদ জ্ঞান আহরণের নিমিত্ত নিম্নোক্ত গ্রন্থাদি আলোচনা করা যাইতে পারে:—

1. Dushman, *High Vacuum.*
2. Kaye, *High Vacua.*
3. Newman, *Recent Advances in Physics* (Non-Atomic), p. 67,

অব্ একোনাইট্ প্রস্তুত হয়। এক পাউণ্ড শিকড়ে ৫০ হইতে ৯০ গ্রেন পর্য্যন্ত একোনিটাইন্ থাকে; উহার এক গ্রেণের দশমাংশ জীবন-সংশয়কর। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে জ্বর, ওলাউঠা ও বাতরোগে কাঠবিষ প্রদত্ত হয়।

এই জাতীয় Aconitum luridum, A. palmatum প্রভৃতি আর কয়েকটীর গুণও কাঠবিষের ন্যায়।

(২) আতইচ, অতীষ বা আতীষ (Aconitum heterophyllum)। এই গাছ হিমালয়ের পশ্চিম প্রদেশে এবং সিন্ধুনদ হইতে কুমায়ুন পর্য্যন্ত জনপদসমূহে জন্মে। ৮০০০ হইতে ১৩০০০ ফুটের মধ্যে ইহা উৎপন্ন হয়। ইহা ২।৩ ফুট বড় হয়। ইহার শুষ্ক মূল ব্যবহার্য্য। ইহা গন্ধহীন, কটু এবং তীব্রতা-রহিত, জ্বরঘ্ন বলিয়া এদেশে আদর আছে। শিকড়ে বিষাক্ত গুণ আদৌ নাই। উল্লিখিত কয়প্রকার ব্যতীত A. lycoctonum এবং A. uncinatum নামে আরও দুইটী এই জাতীয় গাছ আছে। এ সকলই হিমালয়ের উপর ৮ হাজার হইতে ১৪।১৫ হাজার ফুট উঁচুতে জন্মে। বাজারে ইহাদের প্রায় সকলের শিকড়ই 'আতীষ' নামে বিক্রয় হয়। A. lycoctonum বিষাক্ত নহে। বাজারে নানাপ্রকার শিকড় 'আতীষ' নামে বিক্রয় হয়, কিন্তু যাহা স্বভাবতঃই কটু, তাহাই কেবল আতইচ বলিয়া চিনিতে হইবে।

সাধারণতঃ বাজারে কেবল এক প্রকার আতইচ বিক্রয় হয়, তাহার রং পিঙ্গলবর্ণ, ভাঙ্গিলে শাদা। ইহার স্বাদ অত্যন্ত তিক্ত।

দুই প্রকার আতইচ মধ্যে একটী কৃষ্ণবর্ণ ও অপরটী শ্বেতবর্ণ। বৈদ্যকশাস্ত্রে তিন প্রকার অতিবিষার উল্লেখ আছে, ১ শুক্ল, ২ কৃষ্ণ, ও ৩ রক্ত।

অতিবিষা, কটুকী প্রভৃতির শোধন উষ্ণ গোময়জল দ্বারাই করিতে হয়। "অতিবিষা-কটুকীপ্রভৃতিনামুষ্ণগোময়জলেন শুদ্ধির্জ্জাতব্যা" (সারকৌমুদী)

বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—পাচক, কটু, উষ্ণ; কফ, পিত্ত, জ্বর, আমাতিসার, কাশ, বিষদোষ ও ছর্দ্দিনাশক। (রাজনি°)

রাজনিঘণ্টুতে লিখিত আছে—"ত্রিবিধাতিবিষা জ্ঞেয়া শুক্ল-কৃষ্ণারুণা তথা" এবং মদনবিনোদের মতে "শ্যামাকন্দাচাপ-বিষা সা বিজ্ঞেয়া চতুর্বিধা। রক্তা শ্বেতা ভৃশং কৃষ্ণা পীতবর্ণা তথৈবচ।" মদনপালের মতে শ্বেত, রক্ত, কৃষ্ণ ও পীতবর্ণ ভেদে অতিবিষা চারি প্রকার। উহারা যথাপূর্ব্বক্রমে শ্রেষ্ঠতর গুণযুক্ত, সর্ব্বদোষহর, শোথ ও শ্লৈষ্মিক রোগ-নাশক এবং রসায়ন। (মদনপালনি°)

চরক বলিয়াছেন—(আমাতিসারে) "দদ্যাৎ সাতিবিষাং পেয়াং সামে সাম্লাং সনাগরাম্" (সূ° ২ অ°) অর্থাৎ ১ তোলা অতিবিষা ও ১ তোলা শুঁঠ /২ সের আন্দাজ জলে সিদ্ধ করিয়া /১ সের থাকিতে নামাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া সেই ক্বাথ দাড়িম্বরসযোগে অম্লাস্বাদ করিয়া যাহার আমাতিসার (dysentery) হইয়াছে তাহাকে পান করিতে দিবে।

চরক আরও বলিয়াছেন, "দীপনাহ্যর্থেষু অতিবিষা"। "অতিবিষা দীপনীয়পাচনীয়সংগ্রাহকসর্ব্বদোষহরাণাম্" (সূ° ২৫ অ°) অর্থাৎ অগ্নিবৃদ্ধিকর, পাচক, এবং সংগ্রাহক দ্রব্যের মধ্যে অতিবিষা শ্রেষ্ঠ।

বঙ্গসেন বলিয়াছেন—

"অঙ্কোঠস্য ত্রয়োভাগা ভাগশ্চৈকোঽরুণাভবঃ।
তণ্ডুলোদকসম্পীতঃ সর্ব্বকুক্ষ্যাময়াপহঃ।"

অর্থাৎ অঙ্কোঠমূলের ত্বক্ ৩ ভাগ ও অরুণাভব বা অতিবিষা ১ ভাগ তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে সর্ব্বকুক্ষ্যাময় বা গ্রহণী প্রশমিত হয়। আবার "কাসজ্বর-চ্ছর্দ্দিভিরর্দ্দিতানাং সমাক্ষিকাঞ্চাতিবিষাং তথৈকাম্" (বঙ্গসেনঃ) অর্থাৎ (শিশুর) সর্দ্দি, জ্বর এবং বমন প্রতিকারার্থ মধুর সহিত অতিবিষাচূর্ণ মাড়িয়া সেবন করাইতে হয়।

অতিবিষার গুণসম্বন্ধে অন্যান্য বৈদ্যকগ্রন্থেও এইরূপ লিখিত আছে—

"কটূষ্ণাঽতিবিষা তিক্তা কফপিত্তজ্বরাপহা।
আমাতিসারকাসঘ্নী বিষচ্ছর্দ্দিবিনাশিনী।"

(ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টু)

"পাবন্যতিবিষা তিক্তা গ্রাহিণীদোষনাশিনী"

(রাজবল্লভ)

"বিষা সোষ্ণা কটুস্তিক্তা পাচনী দীপনী হরেৎ।
কফ-পিত্তাতিসারামবিষকাসবমিক্রিমীন্।" (ভাবপ্রকাশ)

ইহা ব্যতীত মদনপাল বর্ণভেদে এক এক প্রকার অতিবিষার এক এক প্রকার গুণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইনি বলেন, অতিবিষা সকল প্রকার শ্লেষ্মরোগনাশিনী, এবং রসায়নী। সুশ্রুত ও চক্রদত্ত অতিসার, জ্বরাতিসার ও গ্রহণীতে অন্যান্য ঔষধের সহিত অতিবিষার ব্যবহারের কথা বলিয়াছেন। চরক এবং সুশ্রুত বিষমজ্বরে * অন্যান্য বস্তুর সহিত অতিবিষার প্রয়োগ করিয়াছেন।

সাধারণতঃ অতিবিষা তিক্ত, পাচক, বৃষ্য, বলকারক এবং জ্বরপ্রতিষেধক। জ্বরাদি রোগাবসানে দৌর্ব্বল্যদূরীকরণার্থ অতিবিষা ব্যবহৃত হয়। কাস, অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যে অতিবিষা

* "কলিঙ্গকস্তামৃতকী" (চরক° চি° ৩ অঃ)
"পিপ্পল্যাতিবিষাদ্রাক্ষাঃ" (সুশ্রুত° উ° ৩৯ অঃ)।

প্রয়োগ করা যায়। এই সকল রোগের উপসর্গীভূত অতিসারে সুগন্ধি, তিক্ত এবং কষায় দ্রব্যের সহিত অতিবিষা ব্যবহার করিবে। ম্যালেরিয়া জ্বরে জ্বরপ্রতিষেধকরূপে অতিবিষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে বেশ ফলও পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কুইনাইনের মত ফলপ্রদ নহে। অতিবিষা বিড়ঙ্গের সহিত সেবন করিলে অন্ত্রস্থ ক্রিমি নির্গত হইয়া যায়।

এখনকার চিকিৎসকদের মতে—ইহা পুষ্টিকর ও জ্বরনাশক। কাঠবিষ বা বিষাক্ত দ্রব্যের অভাবে ইহা অনায়াসে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। দুর্ব্বলকর রোগাদির উপশমাবস্থায় এবং পালা ও বিরামশীল জ্বরের আক্রমণাবস্থায় আতইচের মূল একটী অমোঘ ঔষধ।

ডাক্তার হেমিঙ্ ৪০০ রোগীর প্রতি প্রয়োগ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, অতিবিষা প্রকৃতই পালা-জ্বরাদির পক্ষে বিশেষ উপকারী। ফর্বেশ ওয়াটসন্ বলেন যে, ভারতবর্ষীয়দের পালাজ্বরের পক্ষে ইহা যেমন অব্যর্থ মহৌষধ এমন আর কোন স্থানের লোকের পক্ষে নয়। বাল্‌ফোর সাহেব দুই বৎসর ধরিয়া ইহা সর্ব্বদাই ব্যবহার করিতেন। অতিবিষা প্রয়োগ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন,—

"When I mention that for the first three months (from December 1st, 1857) I have not expended one grain of quinine as a febrifuge, and that my cases have been treated chiefly with Narcotine and Atis, it will, I trust, be allowed that these are valuable remedies; but they require fair play and judicious use and combination. (Indian Annals of Medical Science, 1858, Vol. V, p. 548)

মূর সাহেব লিখিয়াছেন যে, ইহা ম্যালেরিয়া জ্বরের ঔষধস্বরূপেও বাজারে বিক্রয় হয়। ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্তের মতে, ইহা সিন্‌কোনার মত উপকারী ও শক্তিশালী। ডাঃ ভোলানাথ বসুর মতে, ইহা সকল প্রকার পালাজ্বরে প্রয়োগ করা যায়।

মাত্রা।—টনিকের মত খাইতে হইলে প্রত্যহ তিনবার করিয়া ৫ হইতে ১০ গ্রেণ।

অতিবীজ—(পুং) [বৈদ্যক] বর্ব্বূলক বৃক্ষ। চলিত বাবলা-গাছ। (বৈদ্যকনি°)

অতিবীর—জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা। ইঁহার পিতার নাম বভ্রু ও পুত্রের নাম অভ্রমালী। (স্কন্দপু°, সহ্যাদ্রি° ৩৪.১৭)

অতিবীররামপাণ্ড্য—দক্ষিণভারতের পাণ্ড্যবংশের জনৈক নৃপতি। ইঁহার অপর নাম বল্লভদেব। ইঁহার পিতার নাম সম্ভবতঃ পরাক্রমপাণ্ড্য ছিল। কুট্টালম-শিলালিপির মতে ইনি ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে (তেঙ্কলী-শিলালিপি মতে ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে) সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, নিজেও বিদ্বান্ ও সুকবি ছিলেন। সুন্দরপাণ্ড্য নামে ইঁহার পুত্রের নাম একখানি শিলালিপিতে পাওয়া যায়।

অতিবৃত্ত—(ত্রি) [অতিক্রম্য বর্ত্তত ইতি। অতি-বৃত-কর্ত্তরি ক্ত] অতিক্রান্ত, "তদ্‌যুদ্ধমতিবৃত্তং"। (নাট্যোক্তি) ২ অতিশয়িত উদ্বৃত্ত।

অতিবৃত্তি—(স্ত্রী) [অতি-বৃত-ক্তিন্] অতিক্রম। [বৃত্তি-জীবিকা, তামতিক্রান্তঃ] (ত্রি) ২ জীবিকাতিক্রমী।

অতিবৃদ্ধ—(ত্রি) [অত্যন্তং বৃদ্ধঃ] অতিশয় বৃদ্ধিযুক্ত। ২ অত্যন্ত জরাগ্রস্ত। ৩ তৃণাদি চর্ব্বণে অসমর্থ (গবাদি)। "অতিবৃদ্ধাং তৃণচ্ছেদনাসমর্থাং" (স্মার্ত্ত রঘুনন্দন) (পুং) ৪ তন্ত্রোক্ত মন্ত্রবিশেষ।

"চতুঃশতং সমারভ্য যাবদ্বর্ষসহস্রকং।
অতিবৃদ্ধঃ স মন্ত্রস্তু সর্ব্বশাস্ত্রেষু বর্জ্জিতঃ।" (বাচস্পত্যধৃত তন্ত্র)

অতিবৃদ্ধি—(স্ত্রী) [অতি-বৃধ্-ক্তিন্] অত্যন্ত বৃদ্ধি। "বৃথৈব সঙ্কল্পশতৈরজস্রমনঙ্গনীতাসি ময়াতিবৃদ্ধিং।" (শকুন্তলা)

অতিবৃদ্ধি (বা অতিপুষ্টি—Hypertrophy)—দেহের কোন যন্ত্র বা কোন কলার আয়তনের বৃদ্ধিকে অতিবৃদ্ধি বা অতিপুষ্টি বলা হয়। এইরূপ অতিবৃদ্ধিতে যন্ত্র বা কলার কোষ বা তন্তুগুলির আয়তনের বৃদ্ধি কিংবা তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি অথবা দুই প্রকার পরিবর্ত্তনই দেখা যাইতে পারে। যে প্রকার অতিবৃদ্ধিতে গঠনকারী কোষ বা তন্তুগুলির কেবলমাত্র আয়তনই বর্দ্ধিত হয়, তাহাই প্রকৃত অতিবৃদ্ধি। আর যখন ঐ কোষ অথবা তন্তুগুলির কেবল সংখ্যাবৃদ্ধি হয়, তখন তাহাকে সাংখ্যিক অতিবৃদ্ধি বা অতিসংখ্যা (Hyperplasia ; numerical hyperplasia) বলা যাইতে পারে। অতিবৃদ্ধিতে যন্ত্র অথবা কোন কলার এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।

অতিবৃদ্ধিতে আয়তন এবং ভার দুইয়েরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আশয় অর্থাৎ শূন্যগর্ভ যন্ত্রের (যেমন পাকস্থলী, মূত্রাশয় ইত্যাদির) অতিবৃদ্ধিতে আশয়প্রাচীর স্থূল হয়। অনেক সময় ইহার গহ্বরও বর্দ্ধিত হয়। হৃৎপিণ্ডের অতিবৃদ্ধিতে কখন কখন প্রাচীরের স্থূলতার সহিত গহ্বরের আয়তন কমিয়া যায়। অণুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে প্রকৃত অতিবৃদ্ধি হইয়াছে কিনা বুঝিতে পারা যায়। কারণ এমন কএকপ্রকার রোগ আছে, যাহাতে মেদ সঞ্চিত হইয়া যন্ত্র বা কলার আয়তন এবং ভারের বৃদ্ধি দেখা যায়। অতিবৃদ্ধিতে প্রতি কোষ অথবা প্রতি তন্তুর আয়তনের বৃদ্ধি এবং কোষসারের রঞ্জিত হইবার ক্ষমতার বৃদ্ধি দেখা যায়। আবার ঐ সঙ্গে কোষ বা তন্তুর সংখ্যারও বৃদ্ধি থাকিতে পারে।

অতিবৃদ্ধির কারণ—রোগের কারণ অন্তর্জাত (intrinsic) অথবা বহির্জাত (extrinsic) হইতে পারে। অন্তর্জাত কারণে আজন্ম কোন কলা বা যন্ত্রের অতিবৃদ্ধির চেষ্টা লক্ষিত হয়। এই সম্বন্ধে অনেক রকম অভিবাদ গঠিত হইয়াছে। একমতে অতিবৃদ্ধির কোষ বা তন্তুগুলির এক অস্বাভাবিক বৃদ্ধির চেষ্টা হয় বলিয়া অনুমান করা হয়। অপর একমতে শরীরের ভিতর এমন এক শক্তি বর্ত্তমান থাকে, যাহাতে কোষ বা তন্তুগুলি অস্বাভাবিক রূপে বর্দ্ধিত হইতে পারে না ; ঐ শক্তির অভাবে অতিবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। অন্তর্জাত অতিবৃদ্ধিকে জন্মগত অতিবৃদ্ধিও বলা হয়।

বহির্জাত অতিবৃদ্ধি কএক কারণে ঘটিয়া থাকে। প্রধানতঃ পেশী, স্রাবক যন্ত্র (gland) বা অন্যান্য কলার অত্যধিক কার্য্যের জন্য উহাদের অতিবৃদ্ধি দেখা যায়। হৃদয়ের অতিরিক্ত কার্য্যের জন্য উহারও অতিবৃদ্ধি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। রক্তসঞ্চালনক্রিয়ার কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিলে হৃদয়ে যে অতিবৃদ্ধি দেখা যায়, তাহাকে ক্ষতিপূরক অতিবৃদ্ধি (compensatory hypertrophy) বলা যাইতে পারে। যকৃৎ, মূত্রযন্ত্র, পুরোবৃক্কক (adrenal), মুষ্ক (testis), গলগণ্ড (thyroid), স্তন, পার্শ্বগণ্ড (parathyroid) প্রভৃতি যন্ত্রের ঐরূপ ক্ষতিপূরক অতিবৃদ্ধি হইতে পারে। যে সকল যন্ত্র দুইদিকে বর্ত্তমান আছে তাহাদের একদিকের যন্ত্র কোনরূপ রোগাক্রান্ত হইলে সুস্থ যন্ত্রটী বর্দ্ধিত হইয়া উভয় যন্ত্রের কার্য্য করে। উণ্ডুকযন্ত্র (thymus) যৌবনকালে শুকাইয়া যায় ; কিন্তু কোন কোন স্থানে অতিবৃদ্ধির ফলে ইহা এই সময় পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিতে পারে।

অতিবৃষ্টি—(স্ত্রী) [অতি-বৃষ্-ক্তিন্] অত্যন্ত বর্ষণ, অতিশয় বৃষ্টি।

"নীরীতিভাবং গমিতেঽতিবৃষ্টয়ঃ" (নৈষধ)

অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি—

"অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ।
প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতে ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ॥" (পরাশর)

অর্থাৎ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পতঙ্গ (পঙ্গপাল), ইন্দুর, পাখী এবং সসৈন্য নৃপতির আগমন (যুদ্ধ অভিযান) এই ছয়টী ঈতি অর্থাৎ কৃষিকার্য্যের ব্যাঘাত সাধন করে।

শাস্ত্রোক্ত ছয়টী কারণের মধ্যে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি শস্যহানির দুইটী প্রধান কারণ।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের শতকরা নব্বই জন লোকের উপজীবিকা চাষবাস এবং ভারতের চাষ আবাদ প্রধানতঃ বৃষ্টির উপর নির্ভর করে। বৃষ্টির অভাব হইলে অথবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত বৃষ্টি হইলে শস্যাদি নষ্ট হইয়া যায় এবং জনসাধারণের অভাব ও কষ্টের সৃষ্টি করে। সুজন্মা অজন্মার সহিত ভারতবাসীর জীবন-মরণের সম্বন্ধ। তাই দেখিতে পাওয়া যায় কৃষিজীবী ভারতবাসী সভ্যতার আদিম যুগ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সুবর্ষণের জন্য চিরকালই কামনা করিয়া আসিতেছে। ঋগ্বেদের অনেক স্থানে ঋষিদের বর্ষণপ্রার্থনার মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণে অনেক প্রসঙ্গে অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি নিবারণের জন্য যাগ, যজ্ঞ, হোম এমন কি অভিযানের পর্য্যন্ত উল্লেখ দেখা যায়।

বাঙ্গলা দেশে এ সম্বন্ধে এক সময়ে বহুবিধ প্রক্রিয়া, পূজা ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। আজকাল অনেকে তাহাতে আর আস্থাস্থাপন করিবেন না। পূর্ব্বে অতিবৃষ্টি হইলে এদেশে বর্ষণ নিবারণের জন্য গ্রামের শিবকে শুধু ফুল-বিল্বপত্র দিয়াই পূজা করা হইত, পূজক তাঁহাকে আর স্নান করাইতেন না। পক্ষান্তরে অনাবৃষ্টি হইলে গ্রামের শিবকে জলে ডুবাইয়া রাখিতেন। ইহা ব্যতীত আরও অনেক বিধি-ব্যবস্থা ছিল।

প্রাচীনকালে প্রকৃতির এই খেয়ালের রহস্যভেদ করিবার এবং তাহা নিবারণের জন্য যেমন চেষ্টা করা হইত, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে এখনও তাহার শেষ হয় নাই। আজ পর্য্যন্ত মানব অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি নিবারণের উপায় খুঁজিয়া পায় নাই ; কিন্তু ইহার অনেক রহস্য বিজ্ঞানের কল্যাণে জানা যাইতেছে।

এই প্রবন্ধে আমরা সমগ্র ভারতে বর্ষণের কথা মোটামুটি আলোচনা করিয়া বঙ্গদেশে বৃষ্টিপাত সম্বন্ধে কিছু বিশেষ করিয়া বলিব।

ভারতে বৃষ্টিপাতসম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় আবহবিভাগের ব্লানফোর্ড ও ইলিয়ট সাহেব সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। আবহবিভাগের অনুসন্ধানের ফলে ভারতের কোথায় কোন সময় কি পরিমাণ বৃষ্টি হইয়া থাকে, এবং কোন বৎসর বর্ষায় কোন স্থানে কি প্রকার বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা ইত্যাদি জানিতে পারা যায়।

ভারতবর্ষে বর্ষণের প্রকৃতি ঋতুর উপর নির্ভর করে। গ্রীষ্মের পরই ঠিক বর্ষাকাল আসে। ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ইহার কারণ। পৃথিবীর দক্ষিণ-গোলার্দ্ধে বিষুবরেখার দক্ষিণে অগ্নিকোণ (South-east) হইতে একটা বায়ুর স্রোত চিরকাল একটানা বহিয়া থাকে। এই একমুখো বায়ু-স্রোতকে অগ্নিকোণ-বাণিজ্য-বায়ু (South-east Trade-Winds) বলা হয়। গ্রীষ্মের আরম্ভ হইলে এই বায়ু ক্রমশঃ বিষুবরেখা পার হইয়া উত্তরদিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে এবং মালয় উপদ্বীপ,

ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য ভারত-মহাসাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে হইতে উল্লিখিত দেশ-গুলির দিকে আকৃষ্ট হয়। এই বিশাল বায়ুস্রোত বিষুবরেখা পার হইয়া পৃথিবীর উত্তর-গোলার্দ্ধে আসিয়া উত্তরমুখে অগ্রসর হইবার সময় নৈঋর্ত দিক্ (South-west) হইতে বহিতে থাকে। সেই জন্য ইহাকে নৈঋর্ত-মৌসুমী বায়ু (South-west monsoon) বলা হয়। এই মৌসুমী বায়ু সমুদ্রের উপর দিয়া আসিবার সময় অনেক জলীয় বাষ্প বহিয়া আনে এবং ভারত-উপদ্বীপের দক্ষিণে মলবার উপকূলের অদূরে আমিনীদেবী দ্বীপের নিকট উপস্থিত হইয়া দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া যায়। এক শাখা আরব সাগরের ভিতর দিয়া ও অপর অংশ বঙ্গোপ-সাগরের ভিতর দিয়া ঈশান-মুখে (north-eastwards) অগ্রসর হইতে থাকে। এইরূপে দেখা যায় আষাঢ় মাস হইতে আমাদের দেশে বর্ষাকাল আরম্ভ হয় এবং ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত পূর্ণতেজে বারিবর্ষণ করিয়া ভারতের ভূমিকে সরস ও নদনদীকে পুষ্ট করে। আশ্বিন মাস হইতে নৈঋর্ত-মৌসুমী বায়ু ক্ষীণ হইতে থাকে এবং কার্ত্তিক মাসেই প্রায় সমগ্র ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করে।

নৈঋর্ত মৌসুমের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ঈশান (North-east) বায়ু প্রবাহ বহিতে আরম্ভ করে। এই বায়ু স্রোতকে বর্ত্তমান কালে ঈশান মৌসুমী বায়ু (North-east monsoon) বলা হয়। ঈশান বায়ুরাশি স্থলভাগের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভারতে প্রবেশ করে বলিয়া ইহাতে জলীয় অংশ কম থাকে এবং সেই কারণে এই প্রবাহে মাদ্রাজের উপকূল ব্যতীত অন্যত্র কদাচিৎ বর্ষণের অবতারণা হয়। অগ্র-হায়ণ মাস হইতে ফাল্গুনের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত এই ঈশান বায়ু-প্রবাহ ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া থাকে।

ফাল্গুন মাসের শেষার্দ্ধ হইতে গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইয়া জ্যৈষ্ঠ-মাস পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। এই কয়মাস বাতাসের উত্তাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চতুর্দ্দিকে মানবের মনকে বর্ষণলাভের জন্য তৃষিত করিয়া তুলে। উত্তরপশ্চিম ভারতের কয়েকটী প্রদেশে, যেমন সিন্ধু, রাজপুতনা, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে বাতাসের উষ্ণতা এত বাড়িয়া উঠে যে পৃথিবীর উষ্ণতম প্রদেশকেও ঐ সকল স্থান গ্রীষ্মের আতিশয্যে পরাজিত করে। এই সময়ে নানাস্থানে সাময়িক তড়িৎ-ঝঞ্কার সৃষ্টি হয়। গ্রীষ্মকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের "আঁধি" ও বাঙ্গালার "কাল-বৈশাখী" প্রসিদ্ধ। "আঁধি" অথবা ধুলিঝড়ে কদাচিৎ বৃষ্টি হয়, পরন্তু কালবৈশাখীতে বাঙ্গালার নানাস্থান অল্প সময়ের মধ্যে প্লাবিত হইয়া যাইতে পারে।

কালবৈশাখী বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পত্তি। বাঙ্গালী মাত্রই ইহার সহিত সুপরিচিত। এই আকস্মিক ঝঞ্ঝায় প্রতিবৎসর বাঙ্গালাদেশে কত জীবন কত ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। কি কারণে নিদাঘ-রৌদ্রতপ্ত অপরাহ্নে মেঘলেশ-হীন স্তব্ধ অবসন্ন বাঙ্গালার বুকের উপর চকিতে গগনমণ্ডল ঘোর ঘনঘটায় আচ্ছাদিত হইয়া নিমেষে প্রলয়ঝঞ্ঝার তাণ্ডবলীলা আরম্ভ হয়, আবার কিছুক্ষণ পরে তেমনি সহসা প্রকৃতির রুদ্র-মূর্ত্তির অবসান হইয়া স্নিগ্ধ তারকামণ্ডিত নভোমণ্ডলের পুন-র্বিকাশ সন্ত্রস্ত জীবমণ্ডলীকে অভয় দান করে, ইহার রহস্যভেদ করিবার জন্য সুধীগণ বহুকাল যাবৎ চিন্তা করিয়া আসিতেছেন। আলিপুর-মানমন্দিরের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ এই সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়া অনেক তথ্য বাহির করিয়াছেন।

বৎসরের বিভিন্ন সময়ে ভারতের নানাস্থানে মোটের উপর কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়, পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত তালিকা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। তালিকাটী ভারতীয় আবহবিভাগের রিপোর্ট হইতে গৃহীত হইয়াছে।

এই তালিকায় দেখিতে পাওয়া যায় যে ভারতবর্ষে সমস্ত বৎসরে যে বারি বর্ষণ হয় তাহার শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ বর্ষাকালে বর্ষিত হইয়া থাকে। তালিকায় আরও দেখা যায় যে শীতকালে শুষ্ক ঈশান মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের (north-east monsoon) সময়েও আমাদের দেশ একেবারে বৃষ্টিশূন্য থাকে না। যদি উপরি উক্ত তালিকানুরূপ বৃষ্টি বিভিন্ন স্থানে যথাযথভাবে বিতরিত হইয়া বর্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সুবর্ষা বলা হয়। সুবর্ষা হইলে ভারতের কৃষিসম্পদ্ সমগ্র জগৎকে চমৎকৃত করিতে পারে।

শীতকালে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে বহুদূরে বায়ুমণ্ডলে ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি হয় এবং উহা পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই আবর্ত্ত ক্রমে পারস্যের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া সীমান্ত-প্রদেশ অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করে। ইহাকে ভারত-বর্ষে পশ্চিমাবর্ত্ত (western disturbance) বলা হয়। পশ্চিমাবর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইলে তথায় বৃষ্টিপাত ঘটে। শীতকালের বৃষ্টিপাত উত্তর-পশ্চিম ভারতে রবিশস্যের জীবনস্বরূপ।

পূর্ণশীতের সময় পশ্চিমাবর্ত্ত ভারতের উত্তর-সীমার উপর দিয়া চলিয়া যায় এবং সীমান্ত-প্রদেশ, পঞ্জাব ও কাশ্মীর প্রদেশে বারিবর্ষণ করিয়া তত্তৎ স্থানের মঙ্গল সাধন করে। ইহা দ্বারা হিমালয়ের উপর প্রচুর তুষারপাত হয়, এবং প্রখর গ্রীষ্মের সময় উত্তর-পশ্চিম ভারতের নদনদীকে প্রবাহিত রাখিবার উপায় হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে প্রতিমাসে বিভিন্ন প্রদেশে গড়পড়তা বৃষ্টিপাতের পরিমাণ।

প্রদেশ	পৌষ মাঘ ইঞ্চি	মাঘ ফাল্গুন ইঞ্চি	ফাল্গুন চৈত্র ইঞ্চি	চৈত্র বৈশাখ ইঞ্চি	বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ইঞ্চি	জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় ইঞ্চি	আষাঢ় শ্রাবণ ইঞ্চি	শ্রাবণ ভাদ্র ইঞ্চি	ভাদ্র আশ্বিন ইঞ্চি	আশ্বিন কার্ত্তিক ইঞ্চি	কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ ইঞ্চি	অগ্রহায়ণ পৌষ ইঞ্চি
ব্রহ্মদেশ	০·২২	০·৩৯	০·৭৩	২·০০	১০·৭৬	২১·৯০	২৪·৪২	২২·৫৬	১৫·১৯	৭·৮৫	৩·০৫	০·৬২
আসাম	০·৭৪	১·৬০	৩·৯৮	৮·১৩	১১·১৯	১৫·৯৯	১৫·৯৮	১৪·৫১	১০·৮০	৪·৯৩	০·৮৬	০·৩০
বঙ্গ	০·৩৬	০·৯৭	১·৬৮	৩·৪৯	৮·৫৭	১৫·২৫	১৫·৫১	১৪·৩৭	১১·২২	৫·২২	০·৯১	০·২০
বিহার ও উড়িষ্যা	০·৫৩	০·৯১	০·৭৬	০·৭৫	২·৪৪	৮·৫১	১২·৬০	১৩·০৯	৮·৬৩	৩·০৬	০·৬৭	০·১৭
যুক্তপ্রদেশ	০·৯৪	০·৮৬	০·৫০	০·৩৩	০·৮১	৪·৭৯	১২·১৩	১২·৫১	৬·৭২	১·৪২	০·২৪	০·৩২
পঞ্জাব	১·০০	০·৮৯	০·৮৬	০·৬৫	০·৬৭	১·৭৭	৪·৯৮	৫·০৮	২·৪৯	০·৩০	০·১২	০·৪৩
সীমান্তপ্রদেশ	১·০৩	১·০০	১·৬৩	১·২৯	০·৬১	০·৫১	১·৭১	২·০৯	০·৬৮	০·১৩	০·২২	০·৩৯
সিন্ধু	০.৩৩	০·৩৩	•·২৭	০·১৪	০·১৪	০·৫০	২·২৩	১·৫৯	০·৪১	০·০২	০·০৬	০·১১
রাজপুতনা	০·২৮	০·২৪	০·১৯	০·২০	০·৬৮	২·৩১	৬·৩৪	৬·৩৯	৩·০৫	০·৪১	০·১১	০·১৯
বোম্বাই	০·১০	০·১০	০·১১	০·২৭	০·৮৭	৮·২৬	১২·০৫	৭·৩৫	৫·৪৭	২·০১	০·৫৯	০·১৪
মধ্যভারত	০·৫০	০·৪০	০·২৩	০·১৬	০·৫৩	৫·৫২	১১·৪৮	১০·৭৭	৬·০৩	১·২১	০·৩৩	০·২৯
মধ্যপ্রদেশ	০·৪৮	০·৬৯	০·৫৫	০·৪৯	০·৮২	৭·৫৬	১৩·৪০	১২·২০	৭·৬৫	২·০০	০·৫৮	০·৩৮
হায়দ্রাবাদ	০·২৭	০·২৯	০·৪৫	০·৭৫	০·৯০	৫·১১	৭·৪০	৬·৪৩	৭·৮৬	২·৪১	০·৯০	০·২৩
মহিসুর	০·২২	০·১৬	0·৩৬	১·৬৬	৪·৩২	৩·১৭	৩·৮৩	৩·৮১	৫·১৭	৫·৮৪	২·৭৯	০·৪৭
মাদ্রাজ	০·৭৫	০·৪৪	০·৪৮	১·৪০	৩·০৪	৬·৮২	৬·৯৭	৬·০০	৫·৭০	৭·৮৪	৬·৫৩	২·৪৮

[৫৯১ পৃষ্ঠার পর]

শীত ঋতুর যত অবসান হইতে থাকে, পশ্চিমাবর্ত্ত ততই দক্ষিণদিকে সরিয়া আসে এবং চৈত্র-বৈশাখ মাসে যুক্তপ্রদেশের ভিতর দিয়া গঙ্গার উপ ত্যকা বহিয়া বঙ্গদেশাভিমুখে অভিযান করিয়া থাকে। কলিকাতা আবহবিভাগের অধ্যক্ষ হিমালয়ের আবহাওয়া বর্ণনা প্রসঙ্গে এই বিষয় বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। * পশ্চিমাবর্ত্ত পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া বিহার ও বঙ্গের নিকট উপস্থিত হইলে তথায় সাধারণতঃ ভয়ঙ্কর কালবৈশাখীর সৃষ্টি করে। গ্রীষ্মকালে বঙ্গ-বিহারে বর্ষণ এই আবর্ত্তের কল্যাণেই ঘটিয়া থাকে। এই সময় বঙ্গের দক্ষিণ হইতে বঙ্গোপসাগরে উদ্ভূত জলীয় গরম দক্ষিণে-হাওয়া এবং

* Hugh Ruttledge সম্পাদিত Everest 1933 পুস্তকে "Himalayan Meteorology" by S. N. Sen & N. P. Chatterji দ্রষ্টব্য।

† "The Meteorological Aspects of the Recent Rains of Fishes in the Muzaffarpur District" by S. N. Sen, Journ. As. Soc. of Beng. (New Series), Vol. XXIX, 1933, No. 1, pp. 111-116.

পূর্ব্ব হিমালয়- জাত রক্ষ ঠাণ্ডা উত্তরে-হাওয়ার সংঘাতে † উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের (north-east India) নানাস্থানে বৃষ্টিপাত ও স্থানে স্থানে জলস্তম্ভ প্রভৃতি বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হয়।

বর্ষাকালে বঙ্গোপসাগরের উত্তর ভাগে বহু সামুদ্রিক ঝড়-তুফানের সৃষ্টি হয়। এই সব সাইক্লোন সাগর হইতে উত্তর-পশ্চিমমুখে ধাবিত হইয়া বঙ্গ ও উড়িষ্যার ভিতর প্রবেশ করে এবং ঐ দুই প্রদেশে প্রচুর বর্ষণ সাধন করে। ভারতীয় আবহ-বিভাগের ইলিয়ট সাহেব বঙ্গোপসাগরের ও বঙ্গের ঝড় সম্বন্ধে বহু গবেষণা রাখিয়া গিয়াছেন।* এই সকল ঝড়ের সময় বঙ্গের নানাস্থানে অত্যধিক বারিবর্ষণ হওয়ার জন্য বন্যা ঘটিয়া থাকে।

অতিবৃষ্টির জন্য সাধারণতঃ নদীতে বন্যা ঘটিরা থাকে সত্য, কিন্তু কতখানি বৃষ্টি হইলে বন্যা হইবে তাহার বাঁধাধরা নিয়ম বলিতে পারা যায় না। কোন স্থানের বন্যা সেই জায়গার ভূমি,

* (1) Handbook of Cyclonic Storms in the Bay of Bengal, by Sir J. Eliot.
(2) Cyclone Memoirs—ibid.
(3) Indian Meteorological Memoir—ibid.

নদনদী, চতুষ্পার্শ্বস্থ ঢাল, জলনিকাশের পথ এবং বর্ষণের সময়ের উপর নির্ভর করে। গ্রীষ্মকালে যখন মাঠ, ঘাট, নদীপ্রভৃতি শুকাইয়া আছে, তখন যদি কোন কারণে কয়েকদিন অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়া যায়, তাহাতে বন্যা হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ জল শীঘ্রই কতক শুষ্ক মাটীতে শুষিয়া যায় এবং কতক নদী প্রভৃতি দিয়া বাহির হইয়া যায়। কিন্তু বর্ষাকালে বঙ্গে যখন ভূমি সরস হইয়া থাকে ও খাল, বিল, নদী প্রভৃতি প্রায় পূর্ণ হইয়া থাকে, তখন যদি মাঝারি রকমেরও বৃষ্টি কয়েকদিন ধরিয়া হয়, তাহা হইলেও বন্যা হইবার সম্ভাবনা থাকে। আবার এমনও সময় সময় দেখা যায় যে কোন জায়গায় অত্যধিক বৃষ্টি না হইয়াও বন্যা হয়। যদি কোন জায়গায় জল-নিঃসরণের পথ পরিষ্কার না থাকে এবং চারিদিকের ঢালের জন্য বাহিরের জল তথায় আসিয়া ঢুকিতে পারে, তাহা হইলে দূরে প্রবল বৃষ্টিপাতের জন্য সেই সব জায়গায় বন্যা হওয়া সম্ভব। তাহার উপর যদি ঐ সব স্থানের ভিতর দিয়া বরাকর, শোণ, দামোদর প্রভৃতির ন্যায় অগভীর পার্ব্বত্য নদী প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে পর্ব্বতের উপর প্রবল বর্ষণের ফলেও বন্যা আসিয়া সেই সকল স্থান প্লাবিত করিয়া ফেলে।

এখন দেখা যাইতেছে যে, যদি মাঘ-ফাল্গুন মাসে পশ্চিমাবর্ত্ত বঙ্গাভিমুখে আসিয়া কিছু বর্ষণ দ্বারা বাঙ্গলার মাটী ভিজাইয়া দেয়, চৈত্র-বৈশাখ মাসে মাঝে মাঝে কালবৈশাখী হয় এবং বর্ষাকালে বঙ্গের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর হইতে উদ্ভূত ঝড়-তুফান মধ্যে মধ্যে হইয়া বঙ্গের বর্ষাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখে এবং বৎসরের বৃষ্টিপাত অত্যধিক না হয় অথবা কম সময়ের জন্য অল্পপরিসর স্থান ব্যাপিয়া না হয়, তাহা হইলেই সুবর্ষা হওয়ার জন্য বঙ্গভূমি 'সুখদা ফলদা' হইয়া থাকেন। আর যদি বঙ্গদেশে পশ্চিমাবর্ত্তের প্রকোপ অতিরিক্ত এবং নৈঋর্ত মৌসুমী বায়ুর তেজ বঙ্গোপসাগরের ঝড়-তুফানের আধিক্যের জন্য অত্যধিক হয়, তাহা হইলেই অতিবৃষ্টি হইয়া কৃষকের সকল শ্রম পণ্ড করিয়া দেয়। পক্ষান্তরে যদি পশ্চিমাবর্ত্তের প্রকোপ অত্যন্ত কম এবং বর্ষাকালে বঙ্গোপসাগরে ঝড়-তুফান বিরল ও মৌসুমী বায়ুর তেজ অত্যল্প হয়, তাহা হইলে অনাবৃষ্টি হইয়া বঙ্গবাসীর বৎসরের ধনধান্যের আশা নিষ্ফল করিয়া দেয়।

অতিবৃষ্টি হইলে বাঙ্গালীরা বর্ষণ নিবারণের জন্য নানাপ্রকার উপায় করিয়া থাকেন। আজকাল ইংরাজি পড়িয়া লোকের মত ও বিশ্বাস ফিরিয়া গিয়াছে। কাজেই পূর্ব্বেকার আচার ব্যবহারও অনেক উঠিয়া যাইতেছে। অতিবৃষ্টি হইলে সেকালের বাঙ্গালীরা গ্রামের শিবকে স্নান করাইতেন না, প্রতিদিন কেবল পুষ্পবিল্বপত্র দ্বারা পূজা করিতেন, সে কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। যে গ্রামের সঙ্গে 'পুর' আছে (যেমন কাশীপুর) তদ্রূপ একশত আট গ্রামের নাম আলতা দিয়া তালপত্রে লেখা হইত। পরে যে ব্যক্তি জননীর একমাত্র সন্তান, তিনি পিতলের বাটীর মধ্যে সেই নাম ও একটী জবাফুল রাখিয়া এক ডুবে পুষ্করিণীর জলের ভিতর পুতিয়া আসিতেন। লোকের বিশ্বাস, এই প্রক্রিয়া করিলে তিন দিনে অবশ্য বৃষ্টি বন্ধ হয়।

অতিবৃহৎফল—(পুং) [বৈদ্যক] পনসবৃক্ষ, চলিত কাঁটাল গাছ। (ভাবপ্র° পূ°)

অতিবেগিত—(ত্রি) [অতিবেগঃ জাতোঽস্য, তারকাদিত্বাৎ ইতচ্] অতিবেগজাত। "দৈবতৈরপকৃষ্যস্তে সুদূরমতিবেগিতাঃ।" (সূর্য্যসি°)

অতিবেধ—(পুং) [অত্যন্তো বেধঃ সম্পর্কঃ। একাদশীর দশমী-সম্পর্কবিশেষ। "অরুণোদয়বেধঃ স্যাৎ সার্দ্ধন্তু ঘটিকাত্রয়ং।
অতিবেধো দ্বিঘটিকা প্রভাসন্দর্শনাদ্রবেঃ।"
(বাচস্পত্য-ধৃত স্মৃতি)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের "জম্ভাসুরস্যাতিবেধঃ" এই বচনে একাদশীর এই দশমী-সম্পর্ক জম্ভাসুরের পক্ষেই ফলদায়ক হইয়াছিল, উপবাসকর্ত্তার নহে; এই নিন্দাশ্রুতি হেতু উক্ত একাদশী উপাস্য নহে।

অতিবেপথু—(ত্রি) [অতিশয়িতো বেপথুঃ প্রাদিস°।] অতিশয় কম্প। [অতিবেপথুর্যস্য প্রাদি বহুব্রীহি] (ত্রি) ২ অত্যন্ত কম্পযুক্ত। "সা বভূবাতিবেপথুঃ।" (ব্রহ্মপু°)

অতিবেল—(ত্রি) [অতিক্রান্তং বেলাং মর্য্যাদাং কূলং বা, অতিক্রা° তৎ অত্যাদয় স°] অতিশয়িত, অধিক। ২ নির্ম্মর্য্যাদ, মর্য্যাদাতিক্রান্ত। ২ সমুদ্রাদির কূলাতিক্রমকারক। (অব্যয়ী-ভাব) ৪ বেলাতিক্রম।

অতিবোঢ়্—(ত্রি) [অতি-বহ-তৃচ্] অতিবহনকর্ত্তা, প্রাপক।
"অগ্নির্বৈপথোঽতিবোঢ়া স এনানতিবহতি"
(শতপথব্রা° ১৩.৮.৪.৬)

অতিব্যগ্র—(ত্রি) অত্যন্ত ব্যাকুল। ২ অধিক আগ্রহ।

অতিব্যথন—(ক্লী) [অতি-ব্যথ-ণিচ্-ল্যুট্, ঘটাদিত্বাৎ হ্রস্বঃ] অত্যন্তপীড়ন। "সপত্রনিষ্পত্রাদতিব্যথনে" (পাণিনি)

অতিব্যথা—(স্ত্রী) [ব্যথ-ভাবে অঙ্, স্ত্রিয়াং টাপ্, অতি অত্যন্তা ব্যথা, কর্ম্মধা.] অত্যন্ত পীড়া, তীব্রবেদনা।

অতিব্যয়—(ত্রি) [অতিশয়িতো ব্যয়ঃ প্রাদিস°] অপরিমিতব্যয়।
"অতিব্যয়াৎ স্বল্পকালাৎ ক্লিশ্যেদর্থাপরিক্ষয়াৎ" (নীতিশাস্ত্র) শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, উপার্জ্জিত ধনের অর্দ্ধেক ভরণপোষণের ও নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের নিমিত্ত ব্যয় করিবে। এক সিকিতে পুণ্য সঞ্চয় করিবে। বাকি এক সিকি অংশদ্বারা

মূলধন বৃদ্ধি করিবে। এই নিয়মের অতিরিক্ত ব্যয় করিলেই তাহাকে অতিব্যয় বলা যায়। "পাদেন তস্য পারক্যমিত্যাদি" (মার্ক°পু°)

অতিব্যয়িতা—(স্ত্রী) অপরিমিত খরচ।

অতিব্যস্ত—(ত্রি) অত্যন্ত ব্যগ্র, ব্যাকুল।

অতিব্যাধিন্—(ত্রি) অতিমাত্র বেধকারী। "দ্বৌ বাণবন্তৌ সপত্নাবতিব্যাধিনৌ হস্তে কৃত্বা" (শতপথব্রা° ১৪.৬.৮.২)

অতিব্যামোহ—(পুং) অত্যন্ত পীড়া বা অসহনীয় রোগ।

অতিব্যাপ্তি—(স্ত্রী) [অতিশয়েন লক্ষ্যমলক্ষ্যঞ্চাবিশিষ্য ব্যাপ্তিঃ] অতিশয় ব্যাপন। অধিক ব্যাপ্তি। অলক্ষ্যে লক্ষণের গমন। (এইরূপে যাহাতে যাহা থাকা উচিত, তদ্ভিন্ন অন্যত্র যদি তাহার সম্বন্ধ-প্রসক্তি ঘটে, তবে অতিব্যাপ্তি হইয়া দাঁড়ায়। যেমন ক্ষিতির লক্ষণ গন্ধ। এখানে ক্ষিতিতেই গন্ধের স্থিতি উচিত, কিন্তু বায়ু প্রভৃতিতে উহার সত্তা-প্রসঙ্গে অতিব্যাপ্তি। অথবা যেমন ধূমেই বহ্নির ব্যাপকতা, জলে নহে; সেরূপ প্রসক্তি স্থলে অতিব্যাপ্তি। এইরূপে পৃথিবীর রূপাদিত্ব লক্ষণ জলাদিতে অতিব্যাপ্ত। "পরিগণনং কর্ত্তব্যমব্যাপ্ত্যতিব্যাপ্তিদোষবারণায়েতি" (সিদ্ধান্তকৌ°)

'অলক্ষ্যে লক্ষণগমনমতিব্যাপ্তিঃ।' লক্ষ্যপদার্থে লক্ষন যাইয় অলক্ষ্যপদার্থেও লক্ষণ যাওয়াকে অতিব্যাপ্তি কহে। ইহার তাৎপর্য্য এই—একটী বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া যদি তাহার লক্ষণাদি নির্দ্দেশ করা যায়, আবার সেই লক্ষণ যদি এমন বস্তুতে খাটে যাহাকে পূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়া সেই লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তবে ইহাকেই অতিব্যাপ্তি বলা যাইতে পারে। যেমন, 'শাখাপল্লববত্ত্বং বৃক্ষত্বম্।' যাহা শাখা ও পল্লববিশিষ্ট তাহাই বৃক্ষ। এখানে বৃক্ষকেই লক্ষ্য করিয়া এই লক্ষণ করা হইয়াছে যে, ডালপালা থাকিলে তাহাকে গাছ বলা যাইবে। কিন্তু এই লক্ষণ লতার প্রতিও খাটিতেছে, অথচ লক্ষণ করিবার সময় লতাকে লক্ষ্য করা হয় নাই। সুতরাং ইহাকে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বলা যায়।

অতিব্যায়াম—(পুং) ব্যায়ামাধিক্য, অতিশয় ব্যায়াম। অধিক কুস্তি করা। বৈদ্যকশাস্ত্রে অতিব্যায়াম দেহের অহিতকর বলিয়া নিষিদ্ধ। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, অতিব্যায়ামের ফলে কাস, জ্বর, ছর্দ্দি, শ্রম, ক্লম, তৃষ্ণা, ক্ষয়, অলসক ও রক্তপিত্ত হয়।

অতিশক্করী—(স্ত্রী) [অতিক্রান্তা শক্করীং তন্নামকবৃত্তং। একাক্ষরাধিক্যাৎ] পঞ্চদশ অক্ষরপাদক বৃত্তবিশেষ। "শক্করী সাতিপূর্ব্বাস্ত্যাদিতি" (বৃত্তরত্নাকর)

অতিশক্তি—(স্ত্রী) [অতিশয়িতা শক্তিঃ। প্রাদি-স°] অত্যন্ত সামর্থ্য। [অতিশয়িতা শক্তির্বলং যস্য, বহুব্রী] (ত্রি) ২ অত্যন্ত বলবান্। [অতিক্রান্তং শক্তিম্ অতিক্রান্ত-তৎ] (ত্রি) ৩ সামর্থ্য অতিক্রমকারী।

অতিশক্তিতা—(স্ত্রী) [অতিশক্তি-তল্] বিক্রমশালীর ধর্ম্ম, মহাবলশালিতা।

অতিশক্তিভাজ্—(পুং) [অতিশক্তি-ভজ্-ণ্বি] অতিশয় শক্তিবিশিষ্ট। অত্যন্ত ক্ষমতাশালী।

অতিশক্র—(ত্রি) [শক্রমতিক্রান্তঃ] ইন্দ্রাতিক্রমকারক। "অতিশক্রমিদং সর্ব্বং তব" (অর্জ্জুনসমাগম ৪.৪১)

অতিশঙ্কা—(স্ত্রী) [অতিশয়িতা শঙ্কা] অত্যন্ত আশঙ্কা, অতিশয় সন্দেহ। "ধর্ম্মদোষপ্রসঙ্গেন লোকস্যানতিশঙ্কয়া" (রামা° ২.২৩.৬)

অতিশয়—(পুং) [অতি-শীঙ্-অচ্] আধিক্য, প্রকর্ষ। "বিতীর্ণ-বীর্য্যাতিশয়ান্ হসত্যসৌ"। (মাঘ ১.৭১) ২ উৎকর্ষ, শ্রেষ্ঠত্ব। "যচ্চ সাতিশয়ং কিঞ্চিৎ" (মনু ৯.১১৪) ৩ অতিরেক, অতিরিক্ততা। ৪ দ্বার। ৫ ব্যাপার। "চিরধ্বস্তং ফলায়ালং ন কর্ম্মাতিশয়ং বিনা"। (বাচস্পত্যধৃত উদয়ন) ৬ জৈন অর্হৎদিগের অতিমানব গুণবিশেষ। ৭ বিশেষ। "তস্মিন্ বিধানাতিশয়ে বিধাতুঃ" (রঘু ৬.১১) 'বিধানাতিশয়ে সৃষ্টিবিশেষে' (মল্লিনাথ) [অতিক্রান্তঃ শয়ং হস্তং, অত্যাদয় স°] (ত্রি) ৮ হস্তাতিক্রম-কারক।

অতিশয় শব্দ বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হয়। সেরূপ স্থলে উহার বু পত্তি যথা—[অতিশয় অস্ত্যর্থে অচ্] (ত্রি) ৯ অতিশয় বিশিষ্ট। "প্রজাপতেরতি হ্যপ্যতিশয়া" (বৃহদারণ্যক উপ ১.৪.৬) অমরকোষে এবং হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণি গ্রন্থে নিম্নোক্ত শব্দগুলিকেও বিশেষণরূপী অতিশয় শব্দের পর্য্যায় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—ভর, অতিবেল, ভৃশ, অত্যর্থ, অতিমাত্র, উদ্গাঢ়, নির্ভর, তীব্র, একান্ত, নিতান্ত, গাঢ়, বাঢ়, দৃঢ়, অতিমর্য্যাদ, উৎকর্ষ, বলবৎ, সুষ্ঠু, কিমুত, সু, অতীব, অতি, অতিরিক্ত, সমধিক।

অতিশয়ন—(ক্লী) [অতি-শীঙ্ ভাবে ল্যুট্] অতিরেক। ২ অতিশয়। (ত্রি) ৩ অতিশয়যুক্ত। [অতিক্রান্তং শয়নং অত্যাদয়স°] ৪ শয়ন বা শয্যাতিক্রমকারক।

অতিশয়িত—(ত্রি) [অতি-শীঙ্-ক্ত] অধিক। ২ অতিক্রান্ত।

অতিশয়িন্—(ত্রি) [অতি-শী-ইন্] অতিশয়ান্বিত। "ইদমুত্তমমতিশয়িনি ব্যঙ্গে বাচ্যাদিতি" (কাব্যপ্র°) [স্ত্রিয়াং ঙীপ্ অতিশয়িনী।

অতিশয়োক্তি—(স্ত্রী) [অতিশয়েন উক্তির্নির্দ্দেশোঽস্মিন্ বর্ণনে] অলঙ্কার-বিশেষ।

সাহিত্যদর্পণ-প্রণেতা অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন—

"সিদ্ধত্বেঽধ্যবসায়স্যাতিশয়োক্তির্নিগদ্যতে।"

প্রকৃত বিষয়ের অপ্রাধান্য করিয়া তাহার উদ্দেশে অপ্রকৃত-বিষয় নিশ্চলভাবে স্থাপন করিলে তাহাকে অতিশয়োক্তি কহে। যথা,—মুখং দ্বিতীয়শ্চন্দ্রঃ। মুখখানি দ্বিতীয় চাঁদ। এখানে প্রকৃত বিষয়—মুখ। মুখকে চন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কাজেই এমন স্থলে একটীর প্রাধান্য এবং অপরটীর অপ্রাধান্য প্রতিপন্ন হইতেছে।

অধঃকরণ অর্থাৎ অপ্রাধান্য এবং নিগরণ অর্থাৎ বোধ সম্বন্ধে আলঙ্কারিকেরা একটী কারিকা করিয়াছেন। যথা—

"বিষয়স্যানুপাদানেঽপ্যুপাদানেঽপি সূরয়ঃ।
অধঃকরণমাত্রেণ নিগীর্ণত্বং প্রচক্ষতে॥"

প্রকৃত বিষয়ের নির্দ্দেশ করা হউক বা না হউক, অধঃকরণ অর্থাৎ অপ্রাধান্য বুঝাইলেই সেই বিষয়ের নিগরণ করা হয়।

অতিশয়োক্তি অলঙ্কার পাঁচ প্রকার—১ দুইটী বস্তুর মধ্যে ভেদ থাকিলেও যেখানে অভেদকল্পনা। ২ অভেদ বিষয়ের মধ্যে ভেদকল্পনা। ৩ সম্বন্ধ থাকিলেও যেখানে অসম্বন্ধকল্পনা। ৪ অসম্বন্ধে সম্বন্ধকল্পনা। ৫ কার্য্য ও হেতুর পৌর্ব্বাপর্য্যের অভাব অর্থাৎ বিপর্য্যয়।

"ভেদেঽপ্যভেদঃ সম্বন্ধেঽসম্বন্ধস্তদ্বিপর্য্যয়ৌ।
পৌর্ব্বাপর্য্যাত্যয়ঃ কার্য্যহেতোঃ সা পঞ্চধা ততঃ।"

১। ভেদে অভেদ—"কথমুপরি কলাপিনঃ কলাপো বিলসতি তস্য তলেঽষ্টমীন্দুখণ্ডম্।
কুবলয়যুগলং ততোবিলোলং তিলকুসুমং তদধঃ প্রবালমস্মাৎ॥"

কি আশ্চর্য্য! উপরে ময়ূরের পুচ্ছ শোভা পাইতেছে (কেশ); তাহার নিম্নে অষ্টমীর চন্দ্র (ললাট); তাহার পর দুটী চঞ্চল কমল (চক্ষু); তাহার নিম্নে তিলফুল (নাসিকা); তাহার নিম্নে প্রবাল (ওষ্ঠ)।

এখানে কেশাদির সঙ্গে ময়ূরপুচ্ছ প্রভৃতির সম্পূর্ণ ভেদ থাকিলেও অভেদ রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

২। অভেদে ভেদ—"অন্যদেবাঙ্গলাবণ্যমন্যাঃ সৌরভসম্পদঃ।
তস্যাঃ পদ্মপলাশাক্ষ্যাঃ সরসত্বমলৌকিকম্।"

সেই পদ্মপলাশাক্ষী কামিনীর যেরূপ দেহের লাবণ্য, তেমন আর কাহারও নাই। সেই সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য সকলি অলৌকিক।

জগতে যে রূপলাবণ্যাদি দেখা যায়, এখানে তাহা হইতে কোন বিভিন্নতা না থাকিলেও ভিন্নরূপে কল্পিত হইয়াছে।

৩। সম্বন্ধে অসম্বন্ধ—"অস্যাঃ সর্গবিধৌ প্রজাপতিরভূচ্চন্দ্রো নু কান্তিপ্রদঃ?
শৃঙ্গারৈকরসঃ স্বয়ং নু মদনো? মাসো নু পুষ্পাকরঃ?
বেদাভ্যাসজড়ঃ কথং নু বিষয়ব্যাবৃত্তকৌতূহলঃ।
নির্ম্মাতুং প্রভবেৎ মনোহরমিদং রূপং পুরাণো মুনিঃ?"

সৌন্দর্য্যদাতা চন্দ্র কি এই স্ত্রীরত্নের সৃষ্টিকর্ত্তা! না, শৃঙ্গাররসের একমাত্র আধার স্বয়ং কন্দর্প ইহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন! অথবা পুষ্পের আকর চৈত্রমাস এই কন্যাকে গড়িয়াছেন? কেন না, সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং ব্রহ্মা গাঢ়বেদাভ্যাসে যে প্রকার জড়বুদ্ধি এবং বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে তিনি যে আবার বিষয়ব্যাপারে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এমন মনোহর রূপ গড়িতে পারিবেন, তাহাত সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

এখানে প্রজাপতি ব্রহ্মাই প্রকৃত নির্ম্মাণকর্ত্তা হইলেও অপরের নির্ম্মাণকর্ত্তৃত্ব কল্পনা করা হইয়াছে।

৪। অসম্বন্ধে সম্বন্ধ—"যদি স্যান্মণ্ডলে সক্তমিন্দোরিন্দীবরদ্বয়ম্।
তদোপমীয়তে তস্যা বদনং চারুলোচনং।"

যদি চন্দ্রমণ্ডলে দুইটী নীলপদ্ম বসানো যায়, তবে সেই কামিনীর মনোহর নেত্রদ্বয়শোভিত মুখের সঙ্গে তুলনা হইতে পারে।

চন্দ্রে কখনও পদ্ম থাকিতে পারে না, কিন্তু এখানে তাহাই কল্পিত হইয়াছে।

"শরদিন্দু হয় যদি কলঙ্কবিহীন।
সে মুখ তুলনা তবে হয় একদিন॥"

কার্য্য ও কারণের পৌর্ব্বাপর্য্যের অভাব। প্রথমে কারণ বিদ্যমান থাকে, তাহার পর কার্য্যের উৎপত্তি হয়, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু ইহার বিপর্য্যয় ঘটিলে অর্থাৎ যেখানে প্রথমে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হয় এবং পরে তাহার কারণ উল্লিখিত হইয়া থাকে, সেই খানেই কার্য্য ও কারণের অন্যথা করা হয়। তদ্ভিন্ন কার্য্য ও কারণ উভয়ই ঠিক এক কালেই উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ বুঝাইলেও কখন কখন অতিশয়োক্তি হইয়া থাকে।

১।—"প্রাগেব হরিণাক্ষীণাং চিত্তমুৎকলিকাকুলং।
পশ্চাদুদ্ভিন্নবকুলরসালমুকুলশ্রিয়ঃ॥"

প্রথমেই মৃগনয়না রমণীদের চিত্ত আকুল হইয়া উঠিল, পরে বকুল ও আম্রের মুকুল প্রকাশিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।

বকুলাদির পুষ্পসৌন্দর্য্য দেখিয়াই কামিনীদের মন চঞ্চল হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এখানে অগ্রে তাহাদের মনের

ব্যাকুলতার কথা বলিয়া তাহার পর পুষ্পসৌন্দর্য্যের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এতদ্দ্বারা কার্য্য ও কারণের বিপরীত ভাব ঘটিয়াছে।

২।—"সমমেব সমাক্রান্তং দ্বয়ং দ্বিরদগামিনা।
তেন সিংহাসনং পিত্র্যং মণ্ডলঞ্চ মহীক্ষিতাম্।"

সেই হস্তীর তুল্য মন্দগামী রঘু পৈতৃক সিংহাসন এবং বিপক্ষ রাজমণ্ডলকে একই কালে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

প্রথমে সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া পরে শত্রুদিগকে জয় করাই সম্ভব; কিন্তু এখানে উভয় কার্য্যই এক সময়ে উল্লিখিত হইয়াছে।

অতিশয়োক্তি স্থলে ইব, বাঙ্গলায় "যেন" "যথা" ইত্যাদি থাকিলে তাহাকে উৎপ্রেক্ষালঙ্কার কহে।

অতিশর্ব্বর—(ত্রি) অন্ধকারবহুল মধ্যরাত্রিকাল। "রাত্রীণামতিশর্ব্বরে" (অথর্ব্ব ৪.৫.৪) 'অতিশর্ব্বরে অতিশয়িতা শর্ব্বরী যস্মিন্ কালে স কালঃ অতিশর্ব্বরঃ। তমোভূয়িষ্ঠে মধ্যরাত্রিকাল ইত্যর্থঃ।' (সায়ণ)

অতিশস্কুলী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] তিলকৃত রোটিকা, তিলচূর্ণ দ্বারা প্রস্তুত রুটী। ইহা চক্ষুর উপকারী নহে। এই প্রকার রুটী রূক্ষ, শ্লেষ্ম-পিত্তনাশক, গুরু ও বিষ্টম্ভী। (ভাবপ্র°)

অতিশস্ত্র—(ত্রি) [শস্ত্রমতিক্রান্তঃ অত্যাদয় স°] অতিক্রান্ত শস্ত্র, শস্ত্রাঘাত অতিক্রমকারক। "অতিশস্ত্রনখন্যাসঃ" (রঘু ১২.৭৩)

অতিশাক্কর—(ত্রি) অতিশকরী ছন্দে লিখিত বা উক্ত ছন্দঃসম্বন্ধীয়।

অতিশাঙ্করী—(স্ত্রী) ভগবতী মহাদেবী। ভগবতী কার্ত্তিকতীর্থে অতিশাঙ্করী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া বিরাজিতা।

"সিংহিকা কৃতশৌচেতু কার্ত্তিকেত্বতিশাঙ্করী।"
(দেবীভাগবত ৭.৩০.৭৫)

অতিশায়ন—(ক্লী) [অতি-শীঙ্-ভাবে-ল্যুট্, নিপাতনাদ্দীর্ঘঃ] আধিক্য। ২ প্রকর্ষ।

"ভূমনিন্দাপ্রশংসাসু নিত্যযোগেঽতিশায়নে।
সংসর্গেঽস্তি বিবক্ষায়াং ভবন্তি মতুবাদয়ঃ।"
(কারিকা)

অতিশায়িন্—(ত্রি) [অতি-শী-ণিনি] অতিশয়িত, আধিক্যযুক্ত।

"শব্দার্থয়োরস্থিরা যে ধর্ম্মাঃ শোভাতিশায়িনঃ।"
(সাহিত্যদ° ১০ প°)

অতিশারিক—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] অনন্তা, চলিত অনন্তমূল।

অতিশিথিল—(ত্রি) [অত্যন্তং শিথিলঃ প্রাদি-স°] অতিশয় তরল, অধিক পাতলা। (কাত্যায়ন ১৫.১৩) ২ অত্যন্ত শ্লথ, চলিত ঢিলে, কুঁড়ে, আল্‌সে।

অতিশীত—(ক্লী) [অতিশয়িতং শীতং প্রাদিস°] অত্যন্ত শীতল স্পর্শ। (ত্রি) ২ অতিশীতবিশিষ্ট।

অতিশুক্র—(ত্রি) অত্যুজ্জ্বল। (শুক্লযজুঃ ৩.২২)

অতিশুক—(পুং) [বৈদ্যক] যব। (পর্য্যায়মুক্তাবলী)

অতিশূকজ—(পুং) [বৈদ্যক] গোধূম। চলিত গম।

অতিশৃতক্ষার—(ক্লী) [বৈদ্যক] অতিকথিত হইয়া কবলভোজ্যের ন্যায় সংজাত ঘৃত। নির্জল দুগ্ধ আবর্ত্তন করিতে করিতে দ্বি, ত্রি, চারি বা আটভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এইরূপ কথিত দুগ্ধসার গুরুপাক, ইহা অত্যন্ত বলকর।

"তথা শৃততমং সারং গুরু বল্যতমং পয়ঃ" (বাভট সূ°)

অতিশেষ—(পুং) [অতিশিষ্যত ইতি অতি-শিষ-কর্ম্মণি ঘঞ্] স্বল্পাবশিষ্ট। "স হ খাদিত্বাতিশেষাঞ্জায়ায়া আজহার" (ছান্দোগ্য উ° ১.১০.৫)

অতিশোভন—(ত্রি) [অতি-শুভ-ল্যু] অত্যন্ত শোভাযুক্ত। ২ শ্রেষ্ঠ।

অতিশোষ—(পুং) [বৈদ্যক] ক্ষয়রোগ। [ক্ষয় দ্র°]

অতিশ্রী—(ত্রি) অত্যন্ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন।

অতিশ্রেষ্ঠ—(ত্রি) অতিশয় শ্রেষ্ঠ, প্রধান।

অতিশ্ব—(ত্রি) [অতিক্রান্তং শ্বানং টচ্ ' পা ৫.৪.৯৬] বরাহাদি। ২ বেগবান্। ৩ সেবক।

অতিশ্বন্—(পুং) [অতিশয়িতঃ সুন্দরঃ শ্বা] উত্তম কুক্কুর।

অতিশ্বী—(স্ত্রী) [অতিশ্ব-স্ত্রিয়াং ঙীপ্] সেবা। সেবায় কুক্কুরের ন্যায় পরাধীনতা আছে বলিয়াই অতিশ্বী অর্থে সেবা। ২ অতিনীচা।

অতিষ্কদ্বন—(ত্রি) অতিশয় লম্ফদানকারী। ২ উল্লঙ্ঘনকারী।

অতিষ্কদ্বরী—(স্ত্রী) [অতিস্কন্দতি স্রবতি ইত্যতিষ্কদ্বরী] উচ্ছৃঙ্খলস্বভাবসম্পন্না স্ত্রীলোক। ২ কুলটা। ৩ ভোগাসক্তা। "ইদ্বৎসরায়াতিষ্কদ্বরীং বৎসরায়" (শুক্লযজুঃ ৩০.১৫)

অতিষ্ঠৎ—(ত্রি) [সোঽয়মতিষ্ঠন্তং শীঘ্রং গচ্ছন্তম্] শীঘ্রগমনশীল। "অতিষ্ঠন্তমপস্তং ন সর্গম্" (ঋক্ ১০.৮৯.২) [অতিষ্ঠন্তীনাং স্থিতিরহিতানাং] ২ স্থিতিরহিত; বিশ্রামশূন্য। "অতিষ্ঠন্তীনামনিবেশনানাং কাষ্ঠানাং মধ্যে" (ঋক্ ১.৩২.১০)

অতিষ্ঠা—(ত্রি) [অতীত্য সর্ব্বান্ তিষ্ঠতীতি অতি-স্থা-ক্বিপ যদ্বং] সর্ব্বাতীত, সকলের অতীত। "অতিষ্ঠা বা এষা ছন্দ সাং যদতিচ্ছন্দা অতিষ্ঠা অশ্বমেধো যজ্ঞানাং" (শতপথব্রা° ১৩.৫.১.৯) "সর্ব্বেষাং রাজ্ঞাং শ্রৈষ্ঠ্যমতিষ্ঠাং পরমতাং গচ্ছেত" (ঐতরেয়ব্রা° ৮.১৫)

অতিষ্ঠাবৎ—(ত্রি) [অতিক্রম্য অবস্থানং প্রতিষ্ঠা তদ্বান্; অতি-স্থা-বানপ্] অতিক্রম করিয়া অবস্থান। "হস্তী মৃগাণাং সুষদামতিষ্ঠাবান্" (অথর্ব্ব ৩.২২.৬) ২ বলপূর্ব্বক অতিক্রম করিয়া অবস্থিতি। "অতিষ্ঠাবান্ বলাতিশয়েনাতিক্রম্য অবস্থাতা" (অথর্ব্ব ৩.২২.৬ মহীধরভাষ্য)

অতিষ্ঠাবন্—(ত্রি) অতিক্রম করিয়া স্থিত, শ্রেষ্ঠ। "তেষাং ত্রয়োঽকাময়ন্তাতিষ্ঠাবানঃ" (শতপথব্রা° ৪.৫.৪.১.)

অতিস—[অতীশ দ্র°]

অতিসঙ্গত—(ত্রি) অত্যন্ত যুক্তিসিদ্ধ।

অতিসঞ্চয়—(পুং) [অতীত্য আবশ্যককৃত্যং সঞ্চয়ঃ] অধিক উপার্জ্জন; আবশ্যকের অধিক সঞ্চয়; অত্যধিক জড়করণ। ২ মধুমক্ষিকার ন্যায় নিজকে ও পরকে বঞ্চনা করিয়া অতিমাত্র সঞ্চয়। "কর্ত্তব্যো নাতিসঞ্চয়ঃ" (হিতোপ°)

অতিসন্তুষ্ট—(ত্রি) অত্যন্ত আনন্দিত, অতিশয় আহ্লাদিত।

অতিসন্ধ—(ত্রি) [সন্ধাং সন্ধানং মর্য্যাদাং বা অতিক্রান্তঃ অত্যাদয়স°] সন্ধানবর্জ্জিত। ২ অতিক্রান্ত মর্য্যাদ। "অতিসন্ধং বা অয়ং চরতি" (শতপথব্রা° ১.৭.৪.৩)

অতিসন্ধান—(ত্রি) [অতিক্রান্ত সন্ধানং] সন্ধানবর্জ্জিত।

অতিসন্ধিত—(ত্রি) বঞ্চিত; প্রতারিত। "শুদ্ধভাবেন জানীষে তেনৈবমতিসন্ধিতা" (রামা° ২.৭.২৪) ২ অতিকষ্টে উপস্থিত।

অতিসন্ধেয়—(ত্রি) [অতিকষ্টেন সন্ধেয়োঽনুসন্ধেয়ঃ সংযোজ্যো বা] কষ্টানুসন্ধেয়। ২ কষ্টে যোজনীয়। "কথমতিসন্ধেয়ং তুমুলং" (মহাবীরচ°) ২ বঞ্চনীয়। "ব্রহ্মবন্ধুরতিসন্ধেয়ঃ" (বিক্রমো°)

অতিসন্ধ্যা—(স্ত্রী) [অতিশয়েন সন্ধ্যা প্রাদিস°] ঘোর সন্ধ্যা-বেলা, ঠিক সন্ধ্যাকাল। [অত্যাসন্না সন্ধ্যা যস্ত, বহুব্রী] ২ সন্ধ্যার আসন্ন কাল। পূর্ব্বদিনের রাত্রির শেষ দণ্ড ও পরদিনের সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত এবং সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব ও উত্তর দণ্ডাত্মক কাল হইল সন্ধ্যা। ইহার নিকটবর্ত্তী কাল অতিসন্ধ্যা। "নাতি-সন্ধ্যাসমীপতঃ" (বাচস্পত্যধৃত স্মৃতি)

অতিসয্যা (**শয্যা**)—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] লতা যষ্টিমধু। ২ অতিশাম্যাস্ত্রী।

অতিসর—(ত্রি) [স্বগতিমুল্লঙ্ঘ্য সরতি গচ্ছতীতি অতি-সৃ-অচ্] অতিচারী। ২ অগ্রসর। "অসাবতিসরাংশ্চকার" (অথর্ব্ব ৫.৮.৭)

অতিসরল—(ত্রি) অত্যন্ত উদার, মহান্। ২ সহজবুদ্ধিসম্পন্ন।

অতিসর্গ—(পুং) [অতি-সৃজ-ঘঞ্] দান। "স্রষ্টুর্বরাতি-সর্গাত্তু" (রঘু ১০.৪২) ২ উৎসর্গ, ত্যাগ। "স্ত্রীণাং দান-বিক্রয়াতিসর্গা বিদ্যন্তে ন পুংসঃ" (নিরুক্ত ৩.৪) [অতি-সৃজ্যতে যথেষ্টং কর্ম্ম ক্রিয়তেঽনেন] ৬ কামচারানুজ্ঞা; 'যথেচ্ছা কর' ইত্যাদিরূপ অভিলাপ। (পা ৩.৩.১৬৩) 'অতিসর্গঃ কামচারানুজ্ঞা' (বৃত্তিকার) [সর্গং সৃষ্টিমতিক্রান্তঃ] (ত্রি) ২ সৃষ্টি-অতিক্রমকারী। ৪ নিত্য। ৫ মুক্ত।

অতিসর্জ্জন—(ক্লী) [অতি-সৃজ-ল্যুট্] বিসর্জ্জন। ২ দান। উৎসর্গ, ত্যাগ। ৩ নিয়োগ। ৪ বধ। ৫ বিপ্রলম্ভ। ৬ অতিশয় দান। "বিধুরাং জ্বলনাতিসর্জ্জনাৎ" (কুমার ৪.৩২) [বৈদ্যক] ৭ বেধ। (বৈদ্যকশব্দসি°) ৮ অতিদান, প্রত্যর্পণ।

অতিসর্ব্ব—(ত্রি) [অতিক্রান্তঃ সর্ব্বান্ গৌণত্বাৎ ন সর্ব্বনামতা] সর্ব্বাতিগ। সকলের অতীত। "অতিসর্ব্বায় সর্ব্বায়" (মুগ্ধবোধ)

অতিসান্তপন—(ক্লী) [অতিক্রান্তং সান্তপনম্ অধিকদিন-সাধ্যত্বাৎ। অত্যাদয়স°] ব্রতবিশেষ। মনুসংহিতায় লিখিত আছে—জ্ঞানপূর্ব্বক জাতিভ্রংশকর পাপ করিলে সান্তপনব্রত করিবে, কিন্তু অনিচ্ছাক্রমে ঐ পাপ করিলে প্রাজাপত্য ব্রত করিবে।

"জাতিভ্রংশকরং কর্ম্ম কৃত্বান্যতমমিচ্ছয়া।
চরেৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্রং প্রাজাপত্যমনিচ্ছয়া।"(মনু ১১.১২৫)

বিষ্ণুসংহিতার মতে অতিসান্তপন ব্রত এইরূপ; প্রথম দিন গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত এবং কুশোদক খাইয়া থাকিবে। দ্বিতীয় দিনে উপবাস করিবে। ইহাকে সান্তপনব্রত কহে। এই সান্তপনব্রত ত্র্যহাভ্যস্ত হইলেই তাহাকে অতি-সান্তপন কহে। অর্থাৎ উল্লিখিত এক একটী দ্রব্য তিন দিন করিয়া আহার ও তিন দিন উপবাস করিবে। এইরূপ করিলেই অতিসন্তাপনব্রত আচরিত হইবে। (বিষ্ণুস°৪৬.১৯-২১)

অতিসান্দ্র—(পুং) [বৈদ্যক] রাজমাষ, চলিত বাঞ্জাসী; বরটী। ২ লতা যষ্টিমধু। (রত্না°)

অতিসামান্য—(ত্রি) অতিসাধারণ; তুচ্ছ।

অতিসাম্যা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] [অত্যন্তং সাম্যং মধুনা অস্যাঃ। বহুব্রী] যষ্টিমধুলতা। প্রাদিস°] (ক্লী) ২ অত্যন্ত সাদৃশ্য। ৩ কৃষ্ণমুখ গুঞ্জাবলী।

অতিসাম্বৎসর—(ত্রি) [সম্বৎসরমতিক্রান্তঃ] অতিক্রান্ত-বৎসর; যাহা সম্বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। "নাতিসাম্বৎসরীং বৃদ্ধিং ন চাদৃষ্টাং পুনর্হরেৎ।" (মনু ৮.১৫৩)

অতিসায়ম্—(অব্য) [অতিশয়িতং অত্যাসন্নং বা সায়ং প্রাদি-স°] ঘোর সন্ধ্যাকাল। (বিষ্ণুস° ৬৮.৪০) ২ সায়ংকালের সমীপকাল। "নাতিপ্রগে নাতিসায়ং" (মনু ৪.৬২)

অতিসার—(পুং) [মলরুধিরাদিকম্ অতিশয়েন সরতি নিঃ-সারয়তীতি অতির্ভাবিতণ্যর্থোঽত্র অতি-সৃ-ঘঞ্] রোগবিশেষ। স্বনামখ্যাত উদরাময় রোগ। পর্য্যায়—অন্নসন্ধি, উদরাময়।

অতি=অত্যন্ত+সার=মলত্যাগ যে রোগে হয় তাহার নাম অতিসার। সাধারণতঃ লোকে উদরাময় বা পেটের অসুখ বলিলে যাহা বুঝে। আয়ুর্ব্বেদের মতে পেটের অসুখ বা উদরাময় মাত্রেই অতিসার নহে। পেটের অসুখ অনেক প্রকারের আছে। সেই সকল প্রকারের নাম ভিন্ন এবং উহাদের কার্য্যাদিও ভিন্ন। যথা (১) অতিসার, (২) প্রবাহিকা বা আমাশা, (৩) গ্রহণী ও (৪) বিসূচিকা।

আয়ুর্ব্বেদে—রোগোৎপাদক হেতুর প্রকৃতি-অনুসারে অতিসার রোগ ছয়প্রকার। যথা—বাতাতিসার, পিত্তাতিসার, শ্লেষ্মাতিসার, সন্নিপাতাতিসার, শোকজাতিসার ও আমাতিসার। ইহা ভিন্ন আর এক প্রকার অতিসার আছে, যাহাতে মলের সহিত অথবা কেবল রক্ত প্রভূত পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে, উহাকে রক্তাতিসার বলে। রক্তাতিসারকে যদি পৃথক্ একটী অতিসারের প্রকার বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে অতিসার ছয় প্রকারের না হইয়া সাত প্রকারের হয়।—আর যদি, উহাকে পিত্তাতিসারের অন্তর্গত করা হয়, (কেননা পৈত্তিক অতিসার রোগের অবস্থায় পিত্ত বর্দ্ধক আহার বিহারের ফলেই রক্তাতিসার হয়) তাহা হইলে অতিসার ছয় প্রকারই হয়।

অতিসারের আর একটী প্রকারের নাম প্রবাহিকা বা আমাশা। ইহাতে বায়ুর প্রকোপ অত্যন্ত বেশী, যার জন্য একেবারে অধিক পরিমাণে মল নির্গত হয় না। কোঁথ দিতে দিতে অল্প অল্প পরিমাণে কফযুক্ত মল নির্গত হয়। ইহাকে বাতাতিসারের অন্তর্গত করায় অতিসার ছয়প্রকার নতুবা সাত প্রকার। এই প্রবাহিকা বা আমাশা রোগ যদি মলের সহিত নির্গত হইতে থাকে তাহা হইলে উহাকে সশোণিতা রক্তপ্রবাহিকা বা রক্তামাশয় বলা হয়।

যদিও অতিসার ছয়প্রকার ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য রক্তাতিসারকে পিত্তাতিসারের মধ্যে এবং প্রবাহিকাকে বাতাতিসারের মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে, তথাপি চিকিৎসাকালে উহাদিগকে পৃথক্‌রূপে গ্রহণ করিয়া রক্তাতিসার, প্রবাহিকা ও রক্তপ্রবাহিকা প্রভৃতি ভিন্নরূপে পরিচিত করা হইয়াছে।

যে অতিসার বা উদরাময় একবার আরোগ্য হওয়ার পর পরিপাকশক্তির দুর্ব্বলতাবশে আহারের অত্যাচারের ফলে পুনরায় দেখা দেয়, তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ অতিসারের মধ্যে পরিগণিত না করিয়া গ্রহণী নামে পৃথক্ রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ উৎকট প্রকৃতির কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত উদরাময় বা পেটের অসুখ আয়ুর্ব্বেদ-মতে অতিসারের অন্তর্গত না হইয়া বিসূচী বা বিসূচিকা নামে পৃথক্ রোগরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদে বাতাদি দোষের প্রকোপের জন্য যে ছয় প্রকার অতিসার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাদের হেতু অর্থাৎ যে সকল অনুচিত আহার-বিহারাদির দোষে অতিসার রোগ উৎপন্ন হয় সে সকল হেতু, যথা—

(১) পরিমাণে গুরু অর্থাৎ যতটুকু মাত্রায় ভোজন করিলে জীর্ণ হইত তাহার চেয়ে বেশী মাত্রায় ভোজন, স্বভাবতঃ গুরু যেমন মাটকলায় বা বরবটী প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য ভোজন কিংবা যে সকল পদার্থ গুণে গুরুপাক অর্থাৎ সংস্কারে গুরু, যেমন চাল ভাজা, ছোলা ভাজা প্রভৃতি গুরুদ্রব্য ভোজন। (২) অতিস্নিগ্ধ অর্থাৎ অতিরিক্ত তৈলঘৃতাদিসংযুক্ত খাদ্য। (৩) অতিরুক্ষ অর্থাৎ একেবারে তৈলঘৃতাদি বর্জ্জিত দ্রব্য। (৪) অতি উষ্ণ দ্রব্য, (৫) অতি তরল দ্রব্য পান, (৬) অতি কঠিন যেমন লড্ডুক প্রভৃতি, (৭) অতি শীতল দ্রব্য ভোজন, (৮) বিরুদ্ধ ভোজন, যেমন দুগ্ধের সহিত মৎস্য প্রভৃতি, (৯) অধ্যশন অর্থাৎ পূর্ব্বভুক্ত পদার্থ জীর্ণ না হইতে পুনরায় ভোজন, যেমন বাজী রাখিয়া খাওয়া, (১০) অপক্ব অন্নাদি ভোজন। (১১) সবদিন একই সময়ে না খাওয়া অথবা কখন বেশী কখন কম খাওয়া। (১২) আয়ুর্ব্বেদোক্ত পঞ্চকর্ম্ম অর্থাৎ বমন বিরেচনাদির অতিপ্রয়োগ বা অল্পপ্রয়োগ, (১৩) স্থাবরবিষ ভক্ষণ, (১৪) ভয়, (১৫) শোক বা অতিচিন্তা, (১৬) দূষিত জলপান, (১৭) দুষ্ট মদ্যপান, (১৮) সাত্ম্যবিপর্য্যয় অর্থাৎ যেরূপ আহার বিহারের অভ্যাস নাই তাদৃশ আহার বিহার করা, (১৯) শীত-গ্রীষ্মাদি ঋতুর ব্যতিক্রম, (২০) অত্যধিক সাঁতার দেওয়া প্রভৃতি জলক্রীড়া, (২১) মলমূত্রাদির বেগ ধারণ করা ও (২২) ক্রিমিদোষ এই সকল কারণে বাতাদি দোষ সকল কুপিত হইয়া অতিসার রোগ উৎপাদন করে।

যে সকল দোষ কুপিত হইয়া অতিসার রোগ জন্মায়, সেই সকল দোষের মধ্যে কখন একটী কখন বা সম্মিলিত ভাবে উহারা কুপিত হয়। দোষ সকল কুপিত হইলে রস, রক্ত, জল, স্বেদ, মেদঃ, মূত্র, কফ ও পিত্ত প্রভৃতি জলীয় ধাতু সকল প্রবৃদ্ধ হইয়া অগ্নিকে মন্দীভূত করিয়া ফেলে, তাহার ফলে বায়ু মলকে আশ্রয় করে ও পুনঃ পুনঃ মলনিঃসারণ করিতে থাকে। মাত্রায় অতি অর্থাৎ অধিক এবং পরিমাণে অধিক মল নিঃসারিত হয় বলিয়া এই রোগের নাম অতিসার।

অতিসার রোগে যেখানে বায়ুর কর্ত্তৃত্ব অধিক, সেখানে বাতজ অতিসার হয়। এইরূপ পিত্তের কর্ত্তৃত্বে পিত্তজ অতিসার, কফের কর্ত্তৃত্বে কফজ অতিসার এবং তিনটী দোষের কর্ত্তৃত্বে ত্রিদোষজ অতিসার হয়। তদ্ভিন্ন যেখানে আত্মীয় স্বজনের বিয়োগের জন্য অতিরিক্ত শোক করার ফলে আহারবিহারাদির

অনিয়মে অতিসার হয় সেখানে শোকজ অতিসার হয়। এই সকল ব্যতীত আর একপ্রকার অতিসার আছে উহার নাম আমাতিসার। যেখানে ভুক্ত পদার্থের রস পরিপাকশক্তির দুর্ব্বলতাবশতঃ অপক্ক অবস্থাতেই তরল মলরূপে নিঃসারিত হইতে থাকে, তাহাকে আমাতিসার বলা হয়। আমশব্দের অর্থ অপরিপক্ক বা কাঁচা।

আমরা যে অতিসারের নানা প্রকারের কথা বলিয়াছি, প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের মধ্যে কেহ কেহ সেই প্রকারভেদ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু কাশীরাজ তাহা স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন,—"অতিসারে দোষের অবস্থা অনেক প্রকার হয়, যাহার জন্য একই অতিসার কালে কালে নানাভাবে উদ্ভূত হয়, সেই সকল প্রকারভেদের হেতু রোগ নহে, দোষই উহার হেতু।"

কখনও কোন রোগ একেবারে সমস্ত লক্ষণের সহিত প্রকটিত হয় না। দোষ সকল যখন কুপিত হইয়া দেহকে বিকৃত করিতে আরম্ভ করে, তখন দেহের যে ভাবান্তর ঘটে, সেই ভাবান্তরের লক্ষণ সকল অল্পমাত্রায় ও অপরিস্ফুট ভাবে প্রকাশিত হইয়া যে রোগ হইবে তাহাকে সূচিত করে। এই রোগারম্ভের সূচনার নাম পূর্ব্বরূপ। যে পূর্ব্বরূপে কোন্ রোগ হইবে এইটুকু মাত্র জানিতে পারা যায়, তাহার নাম সামান্য পূর্ব্বরূপ এবং যে পূর্ব্বরূপে সেই রোগ বায়ুজনিত বা পিত্তজনিত কিনা তাহা বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়, তাহার নাম বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ।

অতিসারের পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ অতিসার হইবার আগে, বুকে, নাভির জায়গায়, গুহ্যদেশে, পেটে ও কুক্ষিতে ছুঁচ ফোটানর মত বেদনা হয় অর্থাৎ ঐ সকল স্থানে খোঁচাইতে থাকে। দাস্ত পরিষ্কার হয় না, বায়ু নিঃসরণ হয় না, পেট ফাঁপে, হজম ঠিক হয় না এবং শরীর অবসন্ন বলিয়া মনে হয় ইত্যাদি লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। এই সময়ে যদি এই সকল উপসর্গের প্রতীকার করিতে পারা যায় অর্থাৎ দাস্ত পরিষ্কার হয়, হজম হয় ও ক্ষুধাবৃদ্ধিজনক ঔষধাদি প্রয়োগ করা যায় এবং যে সকল অনুচিত আহার বিহারের দোষে অতিসার রোগ হয়, যে সকল পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে আর অতিসার রোগ হয় না।

অতিসারে যে মলভেদ হইতে থাকে, তাহা সকল ক্ষেত্রে এক রকম নহে এবং রোগের লক্ষণও এক রকম হয় না। রোগের লক্ষণ ও মলের প্রকৃতি দেখিয়া বুঝিতে হয়, সেই অতিসার বায়ুজন্য, পিত্তজন্য বা কফজন্য। যেখানে মলের বর্ণ অরুণ, মলে ফেনা ফেনা ও রুক্ষ ভাব এবং অপরিপক্ক মল, মলত্যাগ কালে সশব্দ বায়ুনিঃসরণ, গুহ্যদেশে বেদনা জন্মাইয়া অল্প অল্প মলনিঃসরণ, একেবারে পেট খোলসা করিয়া দাস্ত না হওয়ায় পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ যেখানে হইতে থাকে, সেখানে বাতজ অতিসার হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে। যেখানে মলের রঙ্ হলুদ বা লাল কিংবা নীল, পিপাসা, গায়ে জ্বালা, মলত্যাগকালে গুহ্যদেশ জ্বালা, মূর্চ্ছা এবং অতিরিক্ত মলত্যাগজন্য গুহ্যদেশে ক্ষত প্রভৃতি লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, সেই স্থলে পিত্ত জন্য অতিসার হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে। আর যেখানে মলের রঙ সাদা, মল ঘন অথচ তরল, এবং কফমিশ্রিত, অপরিপক্ক ভুক্ত পদার্থের মত মলের গন্ধ ও মলত্যাগকালে শরীর রোমাঞ্চিত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় সেখানে কফজন্য অতিসার হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে। তদ্ভিন্ন যেখানে তিনটী দোষই কুপিত হইয়া অতিসার রোগ জন্মায়, সেখানে পূর্ব্বোক্ত তিনটী দোষের লক্ষণ সকল, দোষের বলাবল অনুসারে অল্প বিস্তর ভাবে দেখা দেয়।

ত্রিদোষ জন্য অতিসার অতি দুরারোগ্য রোগ। ইহাকে অসাধ্য বলিলেও অতিশয়োক্তি হয় না। বাতাদি দোষ পৃথক্ ভাবে কুপিত হইয়া অতিসারে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ করে, ত্রিদোষ জন্য অতিসারে সে সকল তো হয়ই. অধিকন্তু মলে চর্ব্বির মত এক প্রকার চিক্কণ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, কখনও বা মলের অবস্থা এরূপ হয়—ঠিক যেন মাংস-ধোয়া জল। মলের অবস্থা এরূপ হইলে রোগের অবস্থা খুবই খারাপ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

যদিও শোকে বায়ু কুপিত হয়, সুতরাং শোকজ অতিসার বাতজ অতিসারের অন্তর্গত হওয়া উচিত, তথাপি শোকজ অতিসারকে পৃথক্রূপে নির্দ্দেশ করিবার হেতু শোকজ অতিসারের লক্ষণ বাতজ অতিসার হইতে ভিন্ন এবং উহার চিকিৎসা-প্রণালীও ভিন্ন।

যখন কোন ব্যক্তি ধনসম্পত্তির নাশ বা ইষ্টজন-বিয়োগে শোকে কাতর হয়, তখন তাহার শোকজ বাষ্প (নেত্রজল) ও দৈহিক উষ্মা কোষ্ঠে গমন করিয়া জাঠরাগ্নিকে মন্দীভূত করে। তাহার ফলে রক্ত স্বস্থান হইতে চালিত হয় ও মলের সহিত মিলিত হইয়া লালকুঁচের মত রক্তবর্ণ মলভেদ করিতে থাকে, সেজন্য মলে দুর্গন্ধ হয়, আর যদি মলের সহিত মিলিত না হইয়া কেবল রক্তভেদ হইতে থাকে, তাহা হইলে আর কোন গন্ধই থাকে না। এই শোকোৎপন্ন অতিসার অতীব দুশ্চিকিৎস্য এবং কষ্টপ্রদ। কেননা, যে কারণে রোগের উৎপত্তি, সে কারণের সমাধান প্রায়ই করিতে পারা যায় না, কাজেই রোগও আরোগ্য হয় না।

আমাতিসারে পরিপাকশক্তির দুর্ব্বলতা-বশতঃ ভুক্তদ্রব্য যথাযথভাবে জীর্ণ হয় না, সেজন্য অপরিপক্ব রসের দ্বারা দেহধাতু সকল পুষ্টিলাভ করে না এবং দেহধাতুসকল পুষ্ট না হওয়ায় দেহাশ্রিত বাতাদি শক্তিত্রয় কুপিত হইয়া দোষরূপে পরিণত হয় ও স্বমার্গ ত্যাগ করিয়া বিমার্গে প্রস্থিত হয় এবং মল ও রক্তাদি ধাতু সকলকে দূষিত করিয়া থাকে। তাহার ফলে—নানাবর্ণের মল বারংবার নিঃসারিত হয়, পেটের মধ্যে নানাপ্রকার যন্ত্রণা হইতে থাকে ও অঙ্গবেদনা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়।

অতিসারে মলের অবস্থা দেখিয়া রোগীর ভাবীফল বুঝিতে পারা যায়। যেখানে মলের বর্ণ পাকা কালজামের মত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বা যকৃতের মত রক্তাভ কৃষ্ণবর্ণ, সেখানে রোগ অসাধ্য। সাধারণতঃ অতিরিক্ত মলত্যাগের জন্য পেটের ভিতর অন্ত্রমধ্যে ক্ষত হওয়ায় যে রক্তস্রাব হয়, সেই রক্ত অন্ত্রমধ্যে সঞ্চিত হইয়া যখন নির্গত হয়, তখন উহা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বা রক্তাভ কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। এতদ্ভিন্ন যেখানে মলে তৈল, ঘৃত, চর্ব্বি বা মজ্জার মত পদার্থ সকল দেখা যায় বা ঐরূপ মলত্যাগ হয় কিংবা মাংস-ধোয়া জলের মত মলভেদ হয় অথবা অস্থিহীন মাংস পেষণ করিলে যেমন হয়, সেই প্রকারের মলত্যাগ হইতে থাকে, সেখানেও রোগীর বাঁচিবার আশা থাকে না। ইহা ভিন্ন যেখানে মলে ময়ূরপুচ্ছের মত বিচিত্রবর্ণ সকল দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানেও রোগীর বাঁচিবার আশা নাই। এই সকল ব্যতীত আরও অনেক প্রকার মলের অবস্থা অতিসারের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন সাদাদুগ্ধের মত তরল মলভেদ কিংবা পচামাংসাদির মত অতি দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ প্রভৃতি এ সকলও রোগের অসাধ্যতা জানাইয়া দেয়।

মলের অবস্থা ব্যতীত রোগীর ও রোগের অবস্থা দেখিয়াও অতিসারের ভাবীফল বুঝিতে পারা যায়। যেখানে অতিসার-গ্রস্ত রোগীর দেহ রোগে শীর্ণ, উঠিয়া বসিতে পারে না, চোকে অন্ধকার দেখে, প্রায়ই মূর্চ্ছা বা মাথা ঘুরিয়া উঠে, ইন্দ্রিয়সকলের শক্তি প্রায় বিলুপ্ত, আহারে রুচি নাই, সেখানে রোগী মৃত্যু-পথের যাত্রী বলিয়া বুঝিতে হইবে, তদ্ভিন্ন এই সকল লক্ষণ যেখানে বিদ্যমান, সেখানেও রোগীর পরিণাম অশুভ বলিয়া জানিতে হইবে। যথা—প্রলাপ, মোহ, চিত্তের অস্থিরতা, পিপাসা, অত্যন্ত গাত্রদাহ, অসাড়ে মলত্যাগ, হিক্কা এই সকল লক্ষণ বিসূচিকায় প্রায়ই দেখা যায়। গায়ে শোথ বা হাতে পায়ে শোথ, অনবরত মলত্যাগ করার জন্য গুহ্যদেশে অন্ত্র নির্গত হওয়া এবং উহা পাকিয়া যাওয়া ও জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ। রোগী যদি বৃদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহার যে অতিসার হয়, তাহা প্রায়ই ভাল হয় না। বিশেষ করিয়া বৃদ্ধব্যক্তির দীর্ঘকালস্থায়ী অতিসার মৃত্যুকে অবশ্য ডাকিয়া আনে। তদ্ভিন্ন অতিসারের যে সকল দুর্লক্ষণ উল্লিখিত হইল, সে সকল লক্ষণ বালকেরও জীবনের আশা নাই, জানাইয়া দেয়।

এতদ্ব্যতীত অতিসারের অন্যতম অবস্থা বা প্রকার, যাহা রক্তাতিসার নামে খ্যাত। তাহার হেতু পিত্তের অতিকোপ। যেখানে অতিসার রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে পিত্তপ্রকোপক আহার-বিহারের আতিশয্য থাকে, সেখানে প্রথম হইতেই রক্তাতিসার হইতে দেখা যায়, নতুবা পেটের অসুখের অবস্থায় পিত্তবর্দ্ধক আহার-বিহারের ফলে রক্তাতিসার জন্মিয়া থাকে।

অতিসার রোগ সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, সে সকল বর্ণিত হইল। এতদ্ভিন্ন অতিসারে অন্য প্রকার প্রবাহিকা বা আমাশা ও বিসূচিকা এবং অতিসার আরোগ্যের পর অগ্নির দুর্ব্বলতাবশতঃ পুনরায় যে অতিসার বা পেটের অসুখ দেখা যায়, তাহা গ্রহণী নামে পরিচিত,—সে সমস্ত ঐ সকল রোগ প্রসঙ্গে বর্ণিত হইবে।

অতিসারের আরও একটী অবস্থা আছে। তাহা প্রসবের পর হইয়া থাকে। তাদৃশ অতিসার সূতিকা রোগ বলিয়া পরিচিত। সে সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তাহা 'সূতিকা' শব্দে দ্রষ্টব্য।

আয়ুর্ব্বেদ-মতে অতিসারের চিকিৎসা।

জ্বরের যেমন নূতন পুরাতন দুইটী অবস্থা আছে এবং উভয় অবস্থার চিকিৎসা-প্রণালী এক রকম নয়, তেমনি অতিসারেরও দুইটী অবস্থা আছে এবং উভয় অবস্থার চিকিৎসা প্রণালী ভিন্ন।

অতিসারের অবস্থাদ্বয়ের নাম,—আম ও পক্কাবস্থা। এই আম ও পক্কাবস্থা মলের প্রকৃতি দেখিয়া নির্ণয় করিতে হয়।

অতিসারের আমাবস্থায় মল পিচ্ছিল হয়, মলে দুর্গন্ধ থাকে এবং উহা জলে নিক্ষেপ করিলে জলে ডুবিয়া যায়। আর যখন মলে পিচ্ছিলভাব বা দুর্গন্ধ থাকে না, জলে নিক্ষেপ করিলে ভাসিয়া উঠে, তখন উহাকে পক্কাবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। ফলকথা পরিপাক-শক্তির ব্যাঘাত হওয়ার জন্য যখন ভুক্তদ্রব্য সম্যক্ প্রকারে পাক প্রাপ্ত না হইয়া বিকৃত হয় তখনই উহার আমাবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। যখন লঘু পথ্যাদি প্রযুক্ত হইলে উহা পরিপাকপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু গ্রহণীশক্তির দুর্ব্বলতা বশতঃ মল কঠিন বা স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় অর্থাৎ ভুক্ত পদার্থ পরিপাক প্রাপ্ত হয়, কিন্তু উহা হইতে রস সংগৃহীত না হওয়ায় শিথিল বা তরল ভাব কাটে না, সেজন্য বাঁধা মলও হয় না।

আয়ুর্ব্বেদে অতিসারের চিকিৎসায় দেখিতে পাওয়া যায়, আমাবস্থায় যে সকল ঔষধ ও পথ্য প্রয়োগ করা হইয়াছে, সে সকল পাচক ও দীপক অর্থাৎ জাঠরাগ্নি বা পরিপাকশক্তিবর্দ্ধক এবং পক্বাবস্থায় যে সকল ঔষধ পথ্য প্রয়োগ করা হইয়াছে,—সে সকল ধারক অর্থাৎ যাহাতে পরিপক্ব ভুক্ত পদার্থ হইতে রস সংগৃহীত হওয়ায় বাঁধা মল হয়।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত অতিসার রোগে পরিপাকশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া ভুক্ত পদার্থকে সম্যক্ প্রকারে জীর্ণ করিতে না পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধারক ঔষধ দিয়া মল সংগ্রহ করা কখনই উচিত নহে। কেননা অপরিপক্ব মলকে ধারক ঔষধ দিয়া রোধ করিলে সেই অপরিপক্ব মলের সারাংশ রস হইতে এমন সব উপসর্গ উপস্থিত হয়, যাহার ফলে রোগীর উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই ঘটিয়া থাকে। সেজন্য আয়ুর্ব্বেদ বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন—"নামে সংকোচনং দদ্যাদতিসারে কদাচন"—অর্থাৎ অতিসারের প্রথম অবস্থায় পরিপাকশক্তির দুর্ব্বলতা বশতঃ যখন অপরিপক্ব মলভেদ হইতে থাকে, তখন কদাচ এমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে না, যাহাতে মলসংকোচ হয়। কিন্তু অতিসারের আমাবস্থায় প্রযোজ্য ঔষধ সকলের গুণাগুণ বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—যেখানে অতিরিক্ত মলত্যাগের জন্য রোগীর বলক্ষয় হওয়ায় অনিষ্টের সম্ভাবনা, সেখানে পাচক ও ধারক, অত্যন্ত আবশ্যক বোধে ধারক ঔষধ প্রযোজ্য। ফলকথা যদি ধারক ঔষধ দিয়া মলরোধের বিশেষ আবশ্যক না হয়, তাহা হইলে পাচক ঔষধ দেওয়াই কর্ত্তব্য।

অতিসারে এমন সব ক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়,—যেখানে পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ হইলেও পেটের অস্বস্তি কাটেনা, পেট হাল্কা হয় না, ক্ষুধা হয় না বা খাইতে ইচ্ছা হয় না,—সেরূপ ক্ষেত্রে এমন সব ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য, যাহাতে সঞ্চিত মল নির্গত হইয়া যায় ও অগ্নির দীপ্তি হয়।

অতঃপর অতিসারে অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা সকল লিখিত হইতেছে।

আমাতিসারের চিকিৎসা।

পথ্য ও পানীয়।

(১) যে কোন প্রকার দোষের প্রকোপ জন্য অতিসার হউক না কেন, সর্ব্বপ্রকার অতিসারেই রোগীকে লঙ্ঘন দিবে অর্থাৎ কিছুই খাইতে দিবে না।

(২) যদি অতিসারগ্রস্ত রোগীর অত্যন্ত পিপাসা হয়, তাহা হইলে তাহাকে, (ক) বালা ও শুঁঠ অথবা (খ) মুতা ও ক্ষেতপাপড়া কিংবা (গ) মুথা ও বালা ইহাদের মধ্যে যে কোন একটী যোগ প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ মুতা ১ তোলা ও বালা ১ তোলা ৪ সের জলে মাটির হাঁড়িতে মৃদু জ্বালে অর্থাৎ কাষ্ঠ প্রভৃতির অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া দুই সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া শীতল করিয়া পিপাসার সময় একটু একটু করিয়া পান করিতে দিবে। কখনও আকণ্ঠ পান করিতে দিবেনা। এই পানীয় সর্ব্বপ্রকার অতিসার এমন কি বিসূচিকায় পিপাসা পর্য্যন্ত নিবৃত্ত করে। অধিকন্তু মূল ব্যাধিও প্রশমিত হয়।

অতিসারগ্রস্ত রোগীকে যদি পথ্য দিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকার জল প্রস্তত করিয়া তাহাতে এক মুষ্টি টাট্‌কা খৈ দিয়া খানিক রাখিয়া দিবে। তারপর খৈগুলি চট্‌কাইয়া পাতলা পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া লইবে। উহা যেন ঘন জল অপেক্ষা ঘন না হয়। ইহার নাম পেয়া। এই পেয়াতে মিছরীচূর্ণ নেবুর রস মিশাইয়া একটু ২ করিয়া খাইতে দিবে। বর্ত্তমানে বার্লি বা এরারুট্ খাইতে দেওয়া হয়, তাহা অহিতকর নহে। কিন্তু যাহাই কিছু খাইতে দেওয়া হউক না কেন পথ্যদ্রব্য প্রথমে তরল দ্রব্য হওয়া দরকার; তারপর যেমন যেমন রোগ কমিতে থাকিবে, তদনুযায়ী পথ্য তরল ভাব ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত ঘন হইবে। রোগ প্রশমিত হইলেও ২।৩ দিন যাবৎ রোগীকে মণ্ড দেওয়ার পর পুরাতন মিহি চালের সুসিদ্ধ অন্ন দেওয়া যাইতে পারে। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে পথ্য বা পেয়া যতই ঘন হইবে ততই উহা গুরুপাক হইবে এবং যত তরল হইবে ততই লঘু হইবে।

(৩) যেখানে পিত্ত ও শ্লেষ্মা কোপের জন্য অতিসার হয় অর্থাৎ কফযুক্ত তরল মল অত্যধিক পরিমাণে হইতে থাকে, ক্ষুধা বা আহারে তেমন রুচি থাকে না,—তাদৃশ অবস্থায়—

স্বল্পশালপর্ণ্যাদি।—শালপাণি, চাকুলে, বেড়েলা ও বেলশুঁঠ প্রত্যেকে ॥০ তোলা, ৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া দুই সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং রোগীর পিপাসা হইলে এই জল একটু একটু পান করিতে দিবে এবং পথ্য দিবার আবশ্যক হইলে এই জলের দ্বারা খৈ, বার্লি বা এরারুটের পেয়া প্রস্তত করিয়া পান করিতে দিবে। যদি এতাদৃশ পেয়া রোগীর রুচিকর না হয়, তাহা হইলে এই পেয়ার সহিত অম্ল দাড়িমের রস কিঞ্চিৎ মিশাইয়া ঈশদম্লীকৃত করিয়া দিতে পারা যায় এবং অম্লদাড়িমের অভাবে পাতি বা কাগজীলেবুর রসও দিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন রোগীর রুচিকর করিবার জন্য মিছরিচূর্ণ বা সৈন্ধবলবণ অল্পপরিমাণে মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কদাচ উহার সহিত দুগ্ধ মিশাইবে না। অতিসারে দুগ্ধ পান নিষিদ্ধ।

(৪) ধান্যপঞ্চক ও ধান্যচতুষ্ক নামে দুইটি যোগ আছে, দুইটীই পিত্তশ্লেষ্মাধিকারে বিশেষ ফলপ্রদ। ইহাদের দুইটীই আমশূল ও মলের বিবন্ধ নাশ করে, দোষের পরিপাক করে ও

জাঠরাগ্নিকে প্রদীপ্ত করে। কিন্তু যেখানে আমাতিসারে শ্লেষ্মার প্রকোপ ব্যতীত কেবল পিত্তের প্রকোপ, সেখানে ধান্যচতুষ্ক প্রয়োগ করিতে হয়।

ধান্যচতুষ্ক।—ধনে, মুতা, বালা ও বেলশুঁঠ।

ধান্যপঞ্চক।—ধনে, মুতা, বালা, বেলশুঁঠ ও শুঁঠ।

(৫) অতিসারের প্রথম অবস্থায় পিপাসা ও পেটে বেদনা অর্থাৎ পেট কামড়ানি থাকিলে,—(ক) শুঁঠ, আতইচ ও মুথা অথবা (খ) ধনে ও শুঁঠ—ইহাদের ক্বাথ পান করিতে দিবে।

(৬) কফ ও পিত্তযুক্ত মল, পেটে বেদনা, সঞ্চিত মল একেবারে পরিষ্কাররূপে নির্গত না হওয়ায় পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ হইলে আকনাদি, ইন্দ্রযব, হরীতকী ও শুঁঠ—ইহাদের ক্বাথ পান করিতে দিবে। ইহাতে দোষের নিবৃত্তি হওয়ায় রোগ উপশমিত হয় ও মল ধরিয়া যায়।

(৭) আমাতিসারে যেখানে কেবলই কফযুক্ত মল পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে অর্থাৎ আমাশা দেখা দেয়,—সেখানে ২০টী মুতা ও তাহার ৮ গুণ ছাগদুগ্ধ এবং ছাগদুগ্ধের ৪ গুণ জল দিয়া পাক করিবে। জল শুষ্ক হইয়া যখন দুগ্ধমাত্র অবশেষ থাকিবে, তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া দুগ্ধপান করিতে দিবে। ইহা আমাশা'র পক্ষে বিশেষ হিতকর।

(৮) বৎসকাদি ক্বাথ,—ইন্দ্রযব, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, আতইচ, যব, মুতা ও চিতামূল ইহাদের ক্বাথে ১ রতি ভাজা হিং দিয়া পান করিলে আমাতিসার নিবৃত্ত হয়।

(৯) পথ্যাদি-ক্বাথ,—হরীতকী, দেবদারু, বচ, মুতা, শুঁঠ ও আতইচ—ইহাদের ক্বাথ আমাতিসার-নাশক।

(১০) শুণ্ঠ্যাদি-ক্বাথ,—শুঁঠ, মুতা, আতইচ, ইন্দ্রযব ও চিতামূল ইহাদের ক্বাথে ১ রতি ভাজা হিং প্রক্ষেপ দিয়া উষ্ণ জল সহ পান করিলে আমাতিসার দুর হয়।

(১১) হরীতক্যাদি চূর্ণ,—হরীতকী, বচ, সৈন্ধব-লবণ, সৌবর্চ্চল লবণ, ও আতইচ এবং ঘৃতে ভাজা হিং—প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া রাখিবে। এই চূর্ণ ৵০ আনা মাত্রায় গরম জলসহ পান করিলে আমাতিসার আরোগ্য হয়। যেখানে পেট ব্যথা, মলত্যাগের পরেও পুনরায় মলত্যাগের প্রবৃত্তি, সেখানে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

(১২) যেখানে অনেকবার মলত্যাগের পরেও পেট পরিষ্কার হয় না, ক্ষুধা হয় না, পেটে বেদনা থাকে, তথায়—

যমান্যাদি,—যমানী, শুঁঠ, বেণার মূল, ধনে, আতইচ, মুতা, কচি বেলশুঁঠ, শালপাণি ও চাকুলে,—ইহাদের ক্বাথ পান করিতে দিবে।

(১৩) আমাশার প্রথম অবস্থা,—পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ, পেটে অসহ্য যন্ত্রণা বা কামড়ানি, পেট স্তব্ধ অর্থাৎ ভার, একেবারে খোলসাভাবে মলত্যাগ না হওয়া, ক্ষুধার অভাব ইত্যাদি অবস্থায়—

কলিঙ্গাদি,—কুড়চিছাল, আতইচ, হরীতকী ও বচ—ইহাদের ক্বাথে ১ রতি ঘৃতে ভাজা হিং ও ৩ রতি সৌবর্চ্চল লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

(১৪) আমাতিসার,—আমযুক্ত ও রক্তমিশ্রিত মল, পেটে বেদনা, প্রভৃতিতে—

কুটজাদি,—ইন্দ্রযব, দাড়িমফলের খোসা, মুতা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, বালা লোধ, রক্তচন্দন ও আকনাদি, ইহাদের ক্বাথ পান করিতে দিবে। এই সমস্ত রক্তামাশায় বিশেষ ফলপ্রদ।

(১৫) সকল প্রকার অতিসারেই বিশেষ ফলপ্রদ —

বৃহৎশালপর্ণ্যাদি—শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কন্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর, বেলশুঁঠ, আকনাদি, শুঁঠ ও ধনে,—ইহাদের ক্বাথ পান করিতে দিবে।

এই ক্বাথ জলের সহিত পথ্য প্রস্তুত করিয়া দিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসারেই বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

(১৬) অতিসারে যেখানে অল্প অল্প দাস্ত হয় অথবা গুট্‌লে মল নির্গত হয়, পেটে কামড়ানি থাকে,—সেখানে হরীতকী ও পিপুল বাটিয়া গরম জলের সহিত পান করিতে দিলে সঞ্চিত মল নির্গত হওয়ায় রোগের উপশম হয়। মাত্রা হরীতকী ।০ আনা ও পিপুল ।০ আনা, আবশ্যক হইলে রোগ ও রোগীর অবস্থা বুঝিয়া মাত্রা বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। ইহা মৃদু বিরেচক।

(১৭) যেখানে প্রভূত পরিমাণে অনেকবার দাস্ত হয়, অতিরিক্ত দাস্ত হওয়ার জন্য রোগী দুর্ব্বল বা অবসন্ন হইয়া পড়ে, সেখানে,—

কঞ্চটাদি—কাঁচড়া পাতা, দাড়িম পাতা, জাম পাতা, পানিফলের পাতা, বালা, মুতা ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ পান করিতে দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

(১৮) অতিসারে যেখানে কিছুতেই দাস্ত বন্ধ হয় না, সেখানে আমলকী জলে বাটিয়া নাভির চারি পার্শ্বে ঘন করিয়া প্রলেপ দিবে ও নাভিটী আদার রসে পূর্ণ করিয়া দিবে। ইহাতে অচিরে মলরোধ হইবে অথচ সেজন্য কোন প্রকার উপদ্রব উপস্থিত হইবে না।

বাতাতিসারের চিকিৎসা।

নিম্নলিখিত পাচনগুলি বাতাতিসারে বিশেষ ফলপ্রদ।—

পূতিকাদি-কষায়।—করঞ্জ, পিপুল, শুঁঠ, বেড়েলা, ধনে ও হরীতকী,—ইহাদের ক্বাথ সায়ংকালে পান করিতে হয়।

পথ্যাদি-কষায়।—হরীতকী, দেবদারু, বচ, শুঁঠ, মুতা, আতইচ গুলঞ্চ,—ইহাদের ক্বাথ পান করিলে মলের বিবন্ধ নষ্ট হয়, এবং বায়ুজন্য অতিসার নিবৃত্ত হয়।

বচাদি-কষায়।—বচ, আতইচ, মুতা ও ইন্দ্রযব ইহারা বাতাতিসারের শ্রেষ্ঠ মহৌষধ।

দ্রষ্টব্য।—পূর্ব্বোক্ত পাচন সকল ব্যতীত,—শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, ধনে, উৎপল ও বেলশুঁঠ—ইহাদিগকে তক্র বা কাঁজি দ্বারা সিদ্ধ করিয়া সেই তক্র বা কাঁজি পান করাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

পিত্তাতিসারের চিকিৎসা।

মধুকাদি —যষ্টিমধু, কটছাল, লোধ, কচি দাড়িমফল ও দাড়িমের খোসা,—ইহাদের চূর্ণ চালধোয়া জলের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিত্তাতিসার অচিরে আরোগ্য হয়।

বিল্বাদি —বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, মুতা, বালা ও আতইচ—ইহাদের ক্বাথ আমপিত্তাতিসারে বিশেষ ফলপ্রদ।

কট্‌ফলাদি। কট্‌ছাল, আতইচ, মুতা, ইন্দ্রযব ও শুঁঠ,—ইহাদের ক্বাথে কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া পান করিলে পিত্তাতিসার দূর হয়।

কিরাত-তিক্তাদি।—চিরতা, মুতা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথে ৩ রতি রসাঞ্জন চূর্ণ ও মধুসহ পান করিলে পিত্তাতিসার ও রক্তাতিসার নিবৃত্ত হয়।

অতিবিষাদি।—আতইচ, কুড়চিছাল এবং ইন্দ্রযব, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগে মিশাইয়া রাখিবে ও উহা /০ আনা হইতে ৵০ আনা মাত্রায় চালধোয়া জলের সহিত দিনে ৩।৪ বার পান করিলে পিত্তাতিসার ভাল হয়।

রক্তাতিসারের চিকিৎসা।

পিত্তাতিসারে যে সকল পাচন বা ক্বাথের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সে সকল রক্তাতিসারেও প্রযোজ্য। তদ্ভিন্ন,—

কুটজদাড়িমকষায়।—কঁচি দাড়িম ফলের ছাল ও কুড়চি ছাল,—ইহাদের ক্বাথ মধু সহ পান করিলে দারুণ রক্তাতিসার অচিরে প্রশমিত হয়।

চন্দনকল্ক—রক্তচন্দন, চালধোয়া জলে ঘষিয়া তাহার সহিত চিনি ও মধু মিশাইয়া সরবতের মত একটু একটু পান করিতে দিলে রক্তাতিসার ও রক্তপিত্তের রক্তনির্গম প্রশমিত হয়, অধিকন্তু দাহ ও তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয়। তদ্ভিন্ন ইহা রক্তপ্রস্রাবেরও মহৌষধ।

জম্বাদি।—জাম, আম ও আমলকীর কচি পাতার রস মধু ও ছাগদুগ্ধের সহিত পান করিলে রক্তাতিসার প্রশমিত হয়।

বিল্বাদি।—বেলশুঁঠ, মোচরস, ইন্দ্রযব,—ইহাদের চূর্ণ মধুসহ চালধোয়া জলের সহিত পান করিলে রক্তাতিসার নিবৃত্ত হয়।

তণ্ডুলীয় কল্ক।—কাঁটানটের মূল বাটিয়া চালধোয়া জল, চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে রক্তাতিসার প্রশমিত হয়।

শতমূলীকল্ক।—শতমূলী ছাগদুগ্ধে বাটিয়া চিনি সহ পান করিয়া পরে দুগ্ধ পান করিবে।

কুটজলেহ —কুড়চি ছালের ক্বাথ করিয়া ছাঁকিয়া লইবে, পরে সেই ক্বাথ মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া ঘন করিয়া লইবে। তারপর উহার সহিত আতইচ চূর্ণ মিশাইয়া রাখিয়া দিবে। ইহা মধু সহ লেহন করিলে প্রবল রক্তাতিসার ও রক্তামাশা নিবৃত্ত হয়।

কুটজদাড়িম্ব।—কুড়চির ছাল ৮ তোলা এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। এইরূপ দাড়িম ফলের খোসা ৮ তোলা একসের জলে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে, পরে এই উভয় ক্বাথ এক করিয়া পুনরায় মৃদু জ্বালে পাক করিতে থাকিবে এবং যখন দেখিবে উহা মাৎগুড়ের মত হইয়াছে, তখন নামাইয়া শীতল হইলে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিবে। ইহার মাত্রা ॥০ তোলা হইতে একতোলা। কিঞ্চিৎ ঘোলের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে অতি দুর্নিবার রক্তাতিসার ও রক্তামাশা আরোগ্য হয়।

রসাঞ্জনাদিচূর্ণ।—শোধিত রসাঞ্জন আতইচ, ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, ধাইফুল ও শুঁঠ প্রত্যেক চূর্ণ সমান একত্র মিশাইয়া রাখিবে। মাত্রা ৵০ আনা, অনুপান চালধোয়া জল ও মধু। দিনে ২।৩ বার সেব্য। ইহা প্রবল রক্তাতিসার, পেটের বেদনা ও তৎসহ অগ্নিমান্দ্য নিবারিত করে।

নারায়ণচূর্ণ।—গুলঞ্চ, বৃদ্ধদারকবীজ, ইন্দ্রযব, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, আতইচ, ভৃঙ্গরাজ ও সিদ্ধি এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে সমান এবং সর্ব্বসমান কুরচির ছালচূর্ণ একত্র মিশাইয়া রাখিবে; মাত্রা ৵০ আনা। অনুপান গুড় কিংবা মধু। দিনে ৩ বার সেব্য। ইহাতে রক্তাতিসার এবং সেই সঙ্গে জ্বর ও শোথ প্রভৃতিতে বিশেষ ফলপ্রদ।

রক্তাতিসারে কতিপয় ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ।

১। দুই তোলা কিংবা একতোলা টাট্‌কা কুড়চির ছাল, উহার আটগুণ ছাগদুগ্ধ এবং দুগ্ধের চারিগুণ জল—একত্র পাক করিবে ও দুগ্ধমাত্র অবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই দুগ্ধ দুইবারে কিংবা ৩।৪ বারে পান করাইলে প্রবল রক্তাতিসার ও রক্তামাশা নিবারিত হয়।

২। বটের ঝুরি (নামাল) আধ তোলা। চালধোয়া জলে বাটিয়া ঘোলের সহিত পান করিলে রক্তাতিসার নিবৃত্ত হয়।

৩। আঁকড়মূল ॥০ তোলা চাল ধোয়া জলে বাটিয়া পান করিলে রক্তাতিসার নিবৃত্ত হয়।

৪। কচি বাবলার পাতা ও আতপচাল প্রত্যেকে ॥০ আনা বা একতোলা একটা পাথরে জল দিয়া ঘষিতে থাকিবে, যখন উহা ঘষিতে ঘষিতে জল গাঢ়বর্ণ ধারণ করিবে, তখন সেই জল একটা পাথরবাটীতে রাখিয়া দিবে এবং একটু চিনি মিশাইয়া মাঝে মাঝে পান করিতে দিবে, ইহাতে রক্তাতিসার, তৃষ্ণা, গাত্রদাহ প্রভৃতি নিবৃত্ত হয় ও রোগী অচিরে রোগমুক্ত হয়।

৫। আয়াপানের পাতার রস, চালধোয়া জল ও চিনিসহ মধ্যে মধ্যে পান করিলে রক্তাতিসার নিবৃত্ত হয়।

৬। কুকুরশোঁকার পাতার রস ও চিনি দিনের মধ্যে ৩।৪ বার পান করিলে রক্তাতিসার নিবৃত্ত হয়, মাত্রা ॥০ আনা।

৭। রক্তাতিসারে প্রবল পিপাসা ও গাত্রদাহ থাকিলে, খানিকটা রক্তচন্দন ঘষিয়া ও চিনি জলে গুলিয়া সরবৎ করিবে ও সেই সরবতে খানিকটা মধু মিশাইয়া একটা কাচ বা পাথরের গেলাসে ঢাকা দিয়া রাখিয়া দিবে এবং পিপাসার সময় একটু একটু করিয়া পান করিতে দিবে। ইহা পিপাসা ও গাত্রদাহ সমেত রক্তাতিসারে বিশেষ ফলপ্রদ।

রক্তাতিসারের উপসর্গ।—যেখানে রক্তাতিসারে পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ করার ফলে গুহ্যদেশে অত্যন্ত জ্বালা উপস্থিত হয় বা গুহ্যদেশে পাকা ফোড়ার মত হওয়ায় রোগী অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে, সেখানে পটোলপত্র ও যষ্টিমধু সিদ্ধ করিয়া সেই কাথের জল কিংবা ছাগদুগ্ধে একখণ্ড পরিষ্কৃত ন্যাকড়া ভিজাইয়া সেই সিক্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা গুহ্যদেশে পটী দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

শ্লেষ্মাতিসারের চিকিৎসা।

শ্লেষ্মজন্য অতিসারে মলের রঙ্ সাদা, গাঢ়, কফ-মিশ্রিত ও অপরিপক্ব ভুক্ত পদার্থের গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাতে সাধারণতঃ অগ্নির বল কম হয় অর্থাৎ যকৃতের ক্রিয়া ভাল রকম হয় না। সেইজন্য পাচক ও দীপক ঔষধ শ্লেষ্মজন্য অতিসারে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

১। পথ্যাদি-কষায়—হরীতকী, চিতামূল, কট্‌কী, বচ, মুতা, আকনাদি, ইন্দ্রযব ও শুঁঠ ইহাদের কাথ পান করিলে শ্লেষ্মজন্য অতিসার নিবৃত্ত হয়।

২। বিড়ঙ্গাদি-কষায়—বিড়ঙ্গ, বচ, বেলশুঁঠ, আকনাদি, ধনে ও কট্‌ছাল ইহাদের কাথ করিয়া পান করিতে হয়

৩। চব্যাদি-কষায়—চৈ, আতইচ, মুতা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ, ইন্দ্রযব ও কুড়চির ছাল এবং হরীতকী ইহাদের কাথ পান করিলে শ্লেষ্মজন্য অতিসার ও তৎসহ বমি নিবৃত্ত হয়।

সান্নিপাতিক অতিসারের চিকিৎসা।

বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটী দোষই কুপিত হইয়া যে অতিসার উৎপন্ন করে, তাহা বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাধি। ইহাতে প্রায়ই রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে চিকিৎসক, ঔষধ, পরিচারক যদি ভাল হয় এবং রোগী যদি চিকিৎসকের মতানুসারে বিশেষ সুপথ্যে থাকে, তাহা হইলে কোন কোন ক্ষেত্রে আরোগ্য হইতেও দেখা যায়।

ত্রিদোষজ অতিসারের চিকিৎসা।

সমঙ্গাদি-কষায়,—বরাহক্রান্তা, শুঁঠ, মুতা, আতইচ, বালা, ধাইফুল, ইন্দ্রযব এবং কুড়চিছাল,—ইহাদের কাথ পান করিলে ত্রিদোষজ অতিসার নিবৃত্ত হয়। ত্রিদোষজ অতিসারে পিত্তের আধিক্য থাকিলে,—

স্বল্পপঞ্চমূল,—শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ইহাদের কাথ হিতকর।

ত্রিদোষজঅতিসারে কফের আধিক্য থাকিলে,—

বৃহৎপঞ্চমূল,—বেলছাল, শোণাছাল, গামারছাল, পারুল ছাল, ও গণিয়ারী—ইহাদের কাথ হিতকর।

ত্রিদোষজ অতিসারে জ্বর ও বমি, পেটবেদনা, ও কাসশ্বাস প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে,—

বলাদিকষায়,—বেড়েলা, বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, শুঁঠ, আকনাদি, চিরতা, বালা, ইন্দ্রযব ও কুড়চির ছাল, ইহাদের কাথ বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

কুটজ পুটপাক,—টাট্‌কা, মোটা, কাঁচা কুড়চির ছালকে চা'ল ধোয়া জলের সহিত হলুদের মত বাটিয়া জামপাতা দিয়া আবৃত করিবে ও কুশ বা সুতা দ্বারা বাঁধিয়া কাপড়ে মাটীর লেপ দিবে। পরে উহাকে ঘুটের আগুনে (পুটপাক) পোড় দিবে। যখন উহার বহির্ভাগ লাল হইবে। তখন আগুন হইতে উঠাইয়া ভিতরের কুড়চিবাটা বাহির করিয়া উহার রস নিঙ্‌ড়াইয়া লইবে। সেই রস ১ তোলা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশাইয়া খাইলে সর্ব্ব প্রকার অতিসার ও রক্তামাশা প্রভৃতি অচিরে প্রশমিত হয়।

শ্যোণাক-পুটপাক,—কুড়চির ছালের মত শোণাবৃক্ষের ছাল বাটিয়া গাম্ভারী পাতার মধ্যে পুরিয়া পুটপাক করিবে এবং উহার রস একতোলা কিঞ্চিৎ মধু সহ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার নিবৃত্ত হয়।

কুটজলেহ,—কুড়চির ছাল /৩৶০ সের কুট্টিত করিয়া ১৬ সের জলে পাক করিবে। পাকাবশেষ জল /৪ সের

থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং উক্ত কাথকে পুনরায় পাক করিয়া লেহবৎ অর্থাৎ মাংগুড়ের মত করিবে ও উহাতে সচল, সৈন্ধব ও বিটলবণ, যবক্ষার, পিপুল, ইন্দ্রযব ও জীরাচুর্ণ প্রত্যেক দ্রব্য ৪ তোলা পরিমাণে মিশাইয়া রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ ॥০ তোলা মাত্রায় মধুর সহিত মিশাইয়া একবারে অথবা ৩।৪ বারে লেহন করিবে। ইহা সর্ব্ব প্রকার অতিসারে বিশেষ ফলপ্রদ।

কুটজাষ্টক—কুড়চির ছাল /৩৵০ সের, জল ১৬ সের, পাকাবশেষ /৪ সের। এই কাথ ছাঁকিয়া পুনরায় পাক করিয়া লেহবৎ করিবে ও উহাতে মোচরস, আকনাদি, বরাহক্রান্তা, আতইচ, মুতা, বেলশুঁঠ ও ধাইফুল—ইহাদের প্রত্যেকের চুর্ণ ২ তোলা পরিমাণে মিশাইয়া রাখিয়া দিবে। মাত্রা ॥০ তোলা। অনুপান ঈষদুষ্ণজল বা ছাগদুধ। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার অতিসার,—বিশেষ করিয়া রক্তাতিসার বা রক্তামাশা অচিরে নিবৃত্ত হয়।

দ্বিদোষজ অতিসারের চিকিৎসা।

পিত্তশ্লেষ্মজ অতিসার।

মুস্তাদি—মুতা, আতইচ, মূর্ব্বামূল, বচ ও কুড়চিছাল—ইহাদের কাথ পান করিলে পিত্ত ও শ্লেষ্মজন্য অতিসার নিবৃত্ত হয়।

কুটজাদি—কুড়চিছাল, মুতা, আতইচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে এবং শালপাণি—ইহাদের কাথ পান করিলে পিত্ত-শ্লেষ্মজ অতিসার নিবৃত্ত হয়।

সমঙ্গাদি—বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, আমের আঁটি ও পদ্মকেশর ইহাদের কাথ অথবা ঐ সকল দ্রব্য চালধোয়া জলের সহিত বাটিয়া পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজন্য অতিসার নিবৃত্ত হয়।

বাতশ্লেষ্মজ অতিসারের চিকিৎসা।

চিত্রকাদি—চিতামূল, আতইচ, মুতা, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, বেড়েলা, ইন্দ্রযব ও কুড়চিছাল—ইহাদের কাথ মধুসহ পান করিলে বাতপিত্তজন্য অতিসার নিবৃত্ত হয়।

বাতপিত্তাতিসারের চিকিৎসা।

কলিঙ্গাদি—ইন্দ্রযব, বচ, মুতা, দেবদারু ও আতইচ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৵০ আনা পরিমিত। চালধোয়া জলের সহিত বাটিয়া পান করিলে বায়ু ও পিত্তজন্য অতিসার নিবৃত্ত হয়।

পিপ্পল্যাদি-প্রমথ্যা—পিপুল, শুঁঠ, ধনে, যমানী, হরীতকী ও বচ—ইহাদের কাথ কফপ্রধান অতিসারে হিতকর।

হ্রীবেরাদি-প্রমথ্যা—বালা, মুতা, শুঁঠ, বেলশুঁঠ ও ধনে—ইহাদের কাথ পিত্তপ্রধান অতিসারে হিতকর।

পৃশ্নিপর্ণ্যাদি-প্রমথ্যা—চাকুলে, গোক্ষুর, বরাহক্রান্তা ও কণ্টকারী ইহাদের কাথ বায়ুপ্রধান অতিসারে হিতকর।

শোকজ অতিসারের চিকিৎসা।

ইষ্টজনবিয়োগ বা ধনক্ষয়াদি জন্য শোকে অত্যন্ত কাতর হওয়ায় যে অতিসার হয়, তাহার নাম শোকজ অতিসার। ইহা প্রায়ই দুঃসাধ্য। যেহেতু রোগের কারণ যাহা তাহা সহসা নিবৃত্ত হয়না—কাজেই রোগের নিদান ত্যাগ না করায় রোগও সহজে ছাড়িতে চাহে না। তাদৃশ ক্ষেত্রে মনকে বুঝাইয়া শান্ত করা সর্ব্বপ্রথম চিকিৎসা—তারপর যাহাতে বায়ু সাম্য হয় ও সর্ব্বদা মন প্রসন্ন থাকে এরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত।

পৃশ্নিপর্ণ্যাদিকষায়—চাকুলে, বেড়েলা, ধনে, বেলশুঁঠ, শুঁঠ, উৎপল, আতইচ, মুতা, দেবদারু, আকনাদি ও কুড়চিছাল—ইহাদের কাথ মরিচচুর্ণ সহ পান করিলে শোকজন্য অতিসার নিবৃত্ত হয়।

সাধারণ অতিসারে অবস্থাবিশেষে ব্যবস্থা—

(১) অতিসারের সহিত বমন উপদ্রব থাকিলে অর্থাৎ ভেদ-বমি হইতে থাকিলে—

বিল্বাদি—বেলশুঁঠ ও আমের আঁটির কশী সিদ্ধ করিয়া সেই কাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

পটোলাদি—পলতা, যব ও ধনে—ইহাদের কাথ চিনি ও মধু সহ পান করিলে ভেদ-বমি নিবৃত্ত হয়।

(২) অতিসার ও বমনের সহিত অত্যন্ত পিপাসা থাকিলে—

প্রিয়ঙ্গ্বাদি—প্রিয়ঙ্গু, মুতা ও রসাঞ্জন—ইহাদের চুর্ণ মধু ও চালধোয়া জলের সহিত পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

(৩) অতিসার ও বমনের সহিত জ্বর, মূর্চ্ছা ও দারুণ পিপাসা থাকিলে—

জম্ব্বাদি—জাম ও আমের কচি পাতা, বেণার মূল ও বটের ঝুরি—ইহাদের রস বা কাথ মধুর সহিত পান করিলে ঐ সকল উপসর্গযুক্ত অতিসার নিবৃত্ত হয়।

(৪) দীর্ঘকালের অতিসার বা আমাশা, পেটে বেদনা, মলের সঙ্গে আম বা রক্ত প্রভৃতি অবস্থায়—

বৎসকাদি—ইন্দ্রযব, আতইচ, বেলশুঁঠ, বালা ও মুতা—ইহাদের কাথ পান করিতে হয়।

(৫) দীর্ঘকালের অতিসার, মলের সহিত আম, পেটে বেদনা, রক্তস্রাব, জ্বর ও অরুচি প্রভৃতি অবস্থায়—

হ্রীবেরাদি—বালা, ধাইফুল, লোধ, আকনাদি, ইন্দ্রযব,

ধনে, আতইচ, মুতা, শুলঞ্চ, বেলশুঁঠ ও শুঁঠ—ইহাদের ক্বাথ পান করিতে হয়।

(৬) অতিসার, জ্বর, পায়ে শোথ ও পেটে বেদনা ইত্যাদি অবস্থায়—

দশমূলশুণ্ঠী—বেলছাল, শোণাছাল, গামারছাল, পারুলছাল, গনিয়ারী, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর ও শুঁঠ—ইহাদের ক্বাথ বিশেষ হিতকর।

অতিসারে রসপ্রয়োগ।

দ্রষ্টব্য—অতিসারের তরুণ অবস্থা কাটিয়া গেলে অনেক সময় ধারক ঔষধ দিয়া মলরোধ করা প্রয়োজন হয়। কিন্তু মলরোধ করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে রোগীর পেটে আধ্মান অর্থাৎ পেট ফাঁপা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়, সে জন্য বিশেষ বিবেচনা করিয়া ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। সাধারণতঃ পরিপাক শক্তির বৃদ্ধি করিবার জন্য ধারক ঔষধ একবার দিনের মধ্যে প্রয়োগ করিলে কোন প্রকার অপকারের সম্ভাবনা থাকে না। ধারক ঔষধের মধ্যে অহিফেন-ঘটিত ঔষধ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু উহার প্রয়োগকালে ঔষধের মাত্রার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত, নতুবা অহিফেনের বিষক্রিয়া-জন্য অনিষ্ট ঘটিতে পারে। এ ক্ষেত্রে ইহাও বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখা উচিত—শিশুগণের অতিসারে অহিফেনপ্রয়োগ বিশেষ অনিষ্টকর; উহার দ্বারা শিশুর মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

সর্ব্বপ্রকার অতিসারের ধারক ঔষধ।

অতিসারবারণরস।—শোধিত হিঙ্গুল, কর্পূর, মুতা ও ইন্দ্রযব প্রত্যেকে সমান। হিঙ্গুলের সমান মাত্রায় অহিফেন জলে ভিজাইয়া সেই জল দিয়া ঐ সকল দ্রব্য মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমিত বটী করিতে হয়। অনুপান জল। (রসেন্দ্রসার°)

অহিফেনবটিকা।—পিণ্ডখেজুর ও আফিম প্রত্যেকে সমান—পানের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমিত বটিকা। অনুপান জল। (রসেন্দ্রসার°)

জাতিফলাদিবটী।—জায়ফল, পিণ্ডখেজুর ও আফিম প্রত্যেকে সমান জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমিত বটী। অনুপান জল। (আ° সং)

কর্পূররস।—শোধিত হিঙ্গুল, মুতা, ইন্দ্রযব, জায়ফল, কর্পূর ও অহিফেন প্রত্যেকে সমান জলে মর্দ্দন করিয়া এক রতি পরিমিত বটী। অনুপান জল। (ভৈষজ্যর°)

অভয়নৃসিংহরস।—শোধিত হিঙ্গুল, শোধিত মিঠাবিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগার খৈ, শোধিত পারদ ও গন্ধক (কজ্জলী) এবং অভ্রভস্ম প্রত্যেকে সমান। সর্ব্বসমান শোধিত অহিফেন, লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি বটিকা অনুপান জীরাভাজা চূর্ণ ও মধু। (ভৈষজ্যর°)

অহিফেনাসব।—মৌলফুলের মদ্য ৫৬ তোলা, অহিফেন দুই তোলা, মুতা, জায়ফল, ইন্দ্রযব ও এলাচ প্রত্যেকে ॥০ আধতোলা একটী বোতলে পূরিয়া একমাস রাখিবে, পরে ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ১০-৩০ ফোঁটা, জলসহ সেব্য। (ভৈষজ্যর°)

অতিসারে অহিফেনবর্জ্জিত ঔষধ।

আনন্দভৈরবরস।—শোধিত হিঙ্গুল, ত্রিকটু, শোধিত মিঠাবিষ, সোহাগার খৈ ও গন্ধক প্রত্যেকে সমান—লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি বটী। ইহা অতিসার, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতিতে প্রযোজ্য। (রসেন্দ্রসার°)

আনন্দভৈরব।—শোধিত হিঙ্গুল, মরিচ, পিপুল, সোহাগার খৈ ও শোধিত মিঠাবিষ প্রত্যেকে সমান জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমিত বটী। ঔষধ সেবনান্তে কিঞ্চিৎ ইন্দ্রযব ও কুড়চিছালচূর্ণ মধু সহ লেহন করিতে হয়।

পথ্য—ছাগদুগ্ধ, ছাগতক্র, ছাগদধি ও অন্ন। ইহা সর্ব্বপ্রকার অতিসার ও রক্তাতিসার-প্রশমক। (ভৈষজ্যর°)

বৃহৎকনকসুন্দররস।—কজ্জলী ২ ভাগ এবং মরিচ, সোহাগার খৈ ও শোধিত কনক-ধুতুরার বীজ প্রত্যেকে একভাগ; বামুনহাটীর রসে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে এবং এই সময় একভাগ অভ্রভস্ম দিয়া পুনরায় মর্দ্দন করিবে। পরে ১ রতি পরিমিত বটী করিয়া শুকাইয়া রাখিবে। ইহা উগ্র পিত্তাতিসারে বিশেষ ফলপ্রদ। (রসেন্দ্রসার°)

পূর্ণচন্দ্ররস।—শোধিত হরিতাল, লৌহভস্ম, অভ্রভস্ম, প্রত্যেকে ৮ তোলা, কর্পূর ১ তোলা, কজ্জলী ২ তোলা, জায়ফল, মুরামাংসী, তেজপত্র, শটী, তালিশপত্র, নাগকেশর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, পিপুলমূল ও লবঙ্গ—প্রত্যেকে ২ তোলা। জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি বটিকা। (রসেন্দ্রসার°)

ইহা পুরাতন অতিসারের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। তদ্ভিন্ন ইহা দ্বারা গ্রহণী, শূল ও পরিণামশূল প্রভৃতিও নিবারিত হয়।

প্রাণেশ্বররস।—কজ্জলী ৮ তোলা, অভ্রভস্ম, সোহাগার খৈ, শুলফা, যমানী ও জীরা—প্রত্যেকে ৪ তোলা; যবক্ষার, শোধিত হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, ধূনা, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব ও চিতামূল—প্রত্যেকে ২ তোলা। জলে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার অতিসারে বিশেষ ফলপ্রদ। (রসেন্দ্রসার°)

অমৃতার্ণবরস।—কজ্জলী ২ তোলা, লৌহভস্ম, শটী, সোহাগার খৈ, বালা, মুতা, জীরা ও আকনাদি ও আতইচ—প্রত্যেকে ১ তোলা, ছাগদুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া ৬ রতি পরিমিত বটী করিবে।

অনুপান ছাগদুগ্ধ অথবা জল। শাস্ত্রে ইহার অনুপান সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—(১) ধনে, জীরা ও মুগ একত্র সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ, (২) শণের বীজচূর্ণ ও মধু, (৩) ছাগদুগ্ধ, (৪) শীতলজল, (৫) মণ্ড, (৬) মোচার রস, (৭) কাঁচড়ার রস। ইহা সর্ব্বপ্রকার অতিসার-প্রশমক। (রসেন্দ্রসার°)

করুণাসাগররস।—রসসিন্দূর ১, গন্ধক ২, ও অভ্রভস্ম ২ ভাগ, সর্ষপতৈলে একপ্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে বোতলের মধ্যে পুরিয়া পাক করিবে। পুনরায় ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। তারপর উহাকে বোতলের মধ্য হইতে বাহির করিয়া উহার সহিত যবক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগার খৈ, পঞ্চলবণ, শোধিত মিঠাবিষ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, চিতামূল, জীরা ও বিড়ঙ্গ, প্রত্যেকে রসসিন্দূরের সমান মাত্রায় মিশাইয়া জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। এই ঔষধে সজ্বর বা বিজ্বর অতিসার, শোথ, শূল ও গ্রহণী প্রভৃতি নিবৃত্ত হয়। (রসেন্দ্রসার°)

জাতীফলরস।—কজ্জলী ২, রসসিন্দূর ১, অভ্রভস্ম ১, জায়ফল ১, ইন্দ্রযব ১, ধুতুরা বীজ ১, সোহাগার খৈ, পিপুল ১, শুঁঠ ১, মরিচ ১, মুতা ১, হরীতকী ১, আমের কশী ১, বেলশুঁঠ ১, শালবীজ ১ ও দাড়িম ফলের খোসা ১ ভাগ। এই সকল দ্রব্য সিদ্ধিপাতা ভিজান জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমিত বটী করিবে। অনুপান কুড়চিছালের ক্বাথ বা বেলশুঁঠের ক্বাথ কিংবা ধনের ক্বাথ। ইহা আমাতিসার, রক্তাতিসার ও সর্ব্বপ্রকার অতিসারের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। (ভৈষজ্য°)

ভুবনেশ্বর।—সৈন্ধব লবণ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, যমানী, বেলশুঁঠ ও গৃহধূম (ঝুল) প্রত্যেকে সমান জলে মাড়িয়া কুলের মত বটিকা করিবে। অনুপান জল: ইহা প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে, অনেক ক্ষেত্রে ইহা সুফলপ্রদ নহে, গৃহধূমের জন্য পেটে আধ্মান প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। সে জন্য অনেকে গৃহধূম না দিয়াই ঔষধ প্রস্তুত করেন। তাহাতে ঔষধের ধারকতা থাকে না। অধিকন্তু সারকতা হয়। অতিসারে যেখানে মলের বিবদ্ধভাব থাকে বা বায়ুজন্য অতিসারে যেখানে পুনঃপুনঃ মলপ্রবৃত্তি থাকে, সেখানে গৃহধূমবর্জ্জিত এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। (আ° সং)

কুটজারিষ্ট।—কুড়চিমূলের ছাল ১২৷৷০ সের, দ্রাক্ষা /৬৷০ সের, গৌলফুল ১০ পল, গাম্ভারী ছাল ১০ পল, পাকার্থ জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। এই ক্বাথে ধাইফুল ২০ পল ও গুড় ১২৷৷০ সের দিয়া আবৃতমুখ পাত্রে এক মাস রাখিবে।

এই অরিষ্ট দীর্ঘ দিনের অতিসার, রক্তাতিসার ও গ্রহণী এবং উহাদের উপসর্গ সকল নিবৃত্ত করে।

বব্বূলাদ্যরিষ্ট।—বাবলার ছাল ২৫ সের, পাকার্থ জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের, গুড় ৩৭৷৷০ সের, ধাইফুল ১৬ পল, পিপুল ২ পল এবং জায়ফল, কাকোলী, দারুচিনি, এলাচ, তেজপাতা, নাগেশ্বর, লবঙ্গ ও মরিচ—ইহাদের প্রত্যেকে ১ পল। এই সকল দ্রব্য আবৃতমুখ পাত্রে এক মাস রাখিয়া দিয়া পরে ব্যবহার করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার অতিসার ও গ্রহণীর ঔষধ।

ষড়ঙ্গঘৃত।—ইন্দ্রযব, দারুহরিদ্রা, পিপুল, শুঁঠ, লাক্ষা ও কট্‌কী—ইহাদের সহিত যথা নিয়মে পরিপাচিত ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় পেয়া বা মণ্ডের সহিত সেবন করিলে অত্যুৎকট ত্রিদোষজ অতিসারও নিবৃত্ত হয়।

এতদ্ভিন্ন বিবিধ রসগ্রন্থে বিবিধ প্রকার অতিসারের ঔষধ ও পাচন সকল উল্লিখিত হইয়াছে। সে সকলের প্রস্তুত-প্রণালী ও প্রয়োগ-বিধি তত্তৎ প্রসঙ্গে বর্ণিত হইবে।

অতিসারে পথ্যাপথ্য।

অতিসারের প্রথম অবস্থায় লঙ্ঘন অর্থাৎ উপবাস দেওয়াই উচিত। তবে রোগী বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিণী বা উপবাসে অসমর্থ হইলে বার্লি, এরারুট, সাগু অথবা গরম জলে এক মুঠা খৈ ভিজাইয়া উহাকে চট্‌কাইয়া কাপড়ে ছাকিয়া লইতে হইবে এবং এই বার্লি, সাগু প্রভৃতি অত্যন্ত তরল করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে, ইহার নাম পেয়া অর্থাৎ পানের যোগ্য। এই পেয়ার সহিত লেবুর রস ও মিছরীচূর্ণ মিশাইয়া অল্প পরিমাণে অনেক বারে ক্ষুধা বা পিপাসার সময় পান করিতে দেওয়া উচিত। তারপর যখন রোগের বেগ কম হয় ও ক্ষুধার উদ্রেক অধিক হয়, তখন বার্লি, সাগু প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ঘন করিয়া বা মণ্ডের মত করিয়া খাইতে দেওয়া উচিত। এইরূপ ভাবে পথ্য দ্বারা রোগীর অবস্থাবিশেষে (অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত রোগী ক্ষুধায় কাতর না হয় এবং রোগও সম্পূর্ণ নিরাময় না হয়) ৩।৪ দিন বা সপ্তাহ যাবৎ রাখিয়া অন্নপথ্য দেওয়া চলিতে পারে।

অন্নের জন্য পুরাতন শালি-তণ্ডুল (দাদখানি চাল), মসূরের দাল এবং গব্যদধি, গব্যতক্র ও তরকারীর জন্য মোচা, কাঁচা কলা, পটোল, ডুমুর প্রভৃতি।

ফলের মধ্যে—দাড়িম, কমলালেবু, জাম, কয়েৎবেল ও গাব (ম্যাঙ্গেষ্টীন্)।

মৎস্যের মধ্যে—শিঙ্গি, কৈ, মাগুর, খলিসা ও মৌরলা প্রভৃতি সদ্যোধৃত ক্ষুদ্র মৎস্য।

মাংসের মধ্যে—শশক, লাব, হরিণ ও চাতক পক্ষীর মাংস

এতদ্ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার সহজপাচ্য অগ্নিবর্দ্ধক অন্ন ও পানীয় অতিসার রোগে হিতকর।

এই সকল ব্যতীত—শাস্ত্রে অরহর দাল, চালিদা, আম্র

আদা, শালুক, বৈঁচিফল, বকুলফল, বেল, তাল, কাঁচড়াদাম, আমরুল শাক, রক্তবর্ণ শাক, সিদ্ধি, শুঁঠ, ধনে, জীরা, বালা, কুড়চি ছাল, ঘোড়ানিম ও সর্ব্বপ্রকার কষায় দ্রব্য অতিসার রোগে হিতকর বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

অতিসারে অপথ্য।

স্বেদক্রিয়া, অঞ্জনপ্রয়োগ, রাত্রি-জাগরণ, রক্ত-মোক্ষণ, তৈলাদি অভ্যঙ্গ, স্নান, ধূমপান, মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, রুক্ষ ও অনভ্যস্ত দ্রব্য কিংবা সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্যাদি ভোজন ও অধিক জলপান। তদ্ভিন্ন নূতন তণ্ডুলের অন্ন, গোধূম, মাষ কলাই, বেতোশাক, কাকমাচী শাক, শিম, আলু, সজ্‌নের ডাঁটা, পুঁইশাক, কুমড়া, লাউ, কুল, পান, সুপারি, ইক্ষু, গুড়, মদ্য, দ্রাক্ষা, নারিকেল, সর্ব্বপ্রকার শাক, কাঁকুড়, থৈকল, লশুন, আমলকী, দধির মাত্‌, তৈল-ঘৃতাদি, কাঁজি, লবণ, ক্ষার, অম্ল ও সর্ব্বপ্রকার গুরু অন্ন-পানীয় অর্থাৎ সহজে যাহা জীর্ণ হয় না—এই সকল দ্রব্য অতিসার রোগে অপথ্য বলিয়া জানিবে।

এলোপ্যাথী মতে নিদান ও চিকিৎসা।

অতিসার অর্থে বারে বারে তরল মলত্যাগ বুঝায়। সাধারণতঃ কিছুদিন ধরিয়া দিনে ২ বারের অধিক অথবা দিনে ৩।৪ বার নরম এবং অধিক পরিমাণে মলত্যাগকে চিকিৎসকগণ অতিসার বলেন। কারণ—পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির অতিসার সাধারণতঃ এই সকল কারণে ঘটিয়া থাকে। (ক) প্রথমতঃ ক্রিয়াগত। আবহাওয়ার অতিরিক্ত উষ্ণতা বা শীতলতা, কোন রকমে ঠাণ্ডা লাগান, শীতল পানীয় সেবন, অধিক পরিমাণে বিরেচক ঔষধ সেবন, কোনরূপ ভীতি, শোক বা ঐরূপ অন্য কোন মানসিক বিচলতা, পাকরসের আতিশয্য, পাকরসের হ্রাসজন্য অন্ত্রমধ্যে অজীর্ণ খাদ্যের প্রবেশ এবং তথায় জীবাণু কর্ত্তৃক তাহাদের পচন; অতিরিক্ত ভোজন, অতিরিক্ত শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্য ভক্ষণ; অতিরিক্ত খাদ্যবস্তু (protein)-জাতীয় পদার্থ ভক্ষণজনিত অন্ত্রমধ্যে তাহাদের পচন; অতিরিক্ত শাক এবং ফল ভক্ষণ; অতিরিক্ত চর্ব্বিজাতীয় পদার্থ ভক্ষণ; পচা এবং বিষাক্ত খাদ্য, যেমন পচা মাছ, শামুক, গুগ্‌লি, বাসি দুধ, ছানা ইত্যাদি। অন্ত্রবৃদ্ধি এবং অন্ত্রপতন (enteroptosis), এমন কি নাসিকা ও চর্ম্মরোগেও অতিসার দেখা দিতে পারে। হৃদয়, যকৃৎ, ফুস্‌ফুস্ এবং বৃক্কের রোগের জন্য অন্ত্রের পুরাতন রক্তাধিক্যের দরুণ অতিসার হইতে পারে। ইউরিমিয়া রোগেও অতিসার দেখা দিতে পারে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বহু রোগেও অতিসার উপসর্গরূপে থাকিতে পারে। (খ) গঠনবিকৃতিজনিত কারণ (অর্থাৎ অন্ত্রপ্রাচীরের গঠনের কোনরূপ বিকৃতিভাবজন্য)। বহুবিধ রোগে এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। তন্মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য। জ্বরবিকার, গ্রহণী, বিসূচিকা, অন্ত্রের ভিতর ক্ষত, অন্ত্রমধ্যে ক্রিমি, হাম, বসন্ত ইত্যাদি। সেঁকো বিষ, পারদ, তাম্র, সীসক প্রভৃতি ধাতর বিষ কোন প্রকারে অন্ত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেও অতিসার হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্ত্রের মৃদু প্রদাহেও অতিসার দেখা দেয়।

চিকিৎসা।—তরুণ অতিসার। ইহাতে পেট ফাঁপা, বেদনা ও কখনও কখনও বমনেচ্ছা এবং বমন পর্য্যন্ত হইতে পারে। রোগী বিছানায় শুইয়া থাকিবে। অন্ত্র হইতে দূষিত পদার্থ নির্গত করিবার জন্য এরণ্ডতৈল সেবন করান আবশ্যক। অতিরিক্ত বেদনা থাকিলে টিংচার ওপিয়াই দেওয়া আবশ্যক অথবা অত্যল্প মাত্রায় ৪।৫ বার ক্যালোমেল সেবন করাইয়া তাহার পর সিড্‌লিজ্ পাউডার খাওয়ান দরকার। এইরূপ অতিসারে ক্লোরোডাইন্ সেবনে যথেষ্ট উপকার হয়। প্রত্যেক গৃহস্থেরই গৃহে ক্লোরোডাইন্ থাকা আবশ্যক। ৫ হইতে ১৫ ফোঁটা পর্য্যন্ত মাত্রায় (বয়সানুসারে) ৩ ঘণ্টা অন্তর ২।৩ বার জলের সঙ্গে খাইলেই যথেষ্ট উপকার হয়। এরূপ রোগীকে ২৪ ঘণ্টা কোন খাদ্য না দেওয়াই ভাল। কেবলমাত্র পাতলা জল বার্লি কিংবা জল এরারুট, ডাবের জল অথবা ছানার জল দেওয়া যাইতে পারে। তৎপরে ক্রমশঃ নরম ভাত এবং কৈ, মাগুর, সিঙ্গি প্রভৃতি মৎস্যের ঝোল (মশলা খুব কম দিয়া) দেওয়া যাইতে পারে। যদি অতিসার বন্ধ না হয় তাহা হইলে বিস্‌মাথ সব্ নাইট্রেট্ (১০-১৫ গ্রেণ) বা বিস্‌মাথ স্যালিসিলেট্ (ঐ মাত্রায়) প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ডোভার্স পাউডার (৫-১৫ গ্রেণ) এরূপ অবস্থায় উপকারী। সরল পুরাতন অতিসার (chronic simple diarrhœa) এইরূপ অতিসারে অনেকদিন হইতে পেট ফাঁপা এবং তাহার সহিত পেটে যন্ত্রণা থাকিতে পারে। এই পুরাতন অতিসারের কারণ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করা আবশ্যক। যদি অতিরিক্ত শাক অথবা ফল ভক্ষণে অতিসার জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ সব খাওয়া বন্ধ করা উচিত। যদি অতিরিক্ত শ্বেতসার-ঘটিত পদার্থ ভক্ষণজন্য অতিসার এবং পেটফাঁপা হয়, তাহা হইলে ঐরূপ পদার্থ কম খাওয়াই উচিত। অতিরিক্ত মৎস্য-মাংসাহার জনিত অতিসারে ঐ সকল কম পরিমাণে খাইতে হইবে। মল পরীক্ষা করিলে কি খাদ্য ভক্ষণ করায় অতিসার জন্মিয়াছে তাহা নির্ণয় করা যায়। অনেকের পাকস্থলীতে পাকরসের হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড্ কম থাকায় অতিসার উপস্থিত হয়। এক্ষেত্রে ১৫ হইতে ২০ ফোঁটা এসিড্ হাইড্রোক্লোরিক্ ডিল্ খাইবার আধ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা পর জল সহ সেবন করান উচিত। এতদ্ভিন্ন মস্তিষ্কের অতিরিক্ত পরিচালনাজনিত অথবা হিষ্টিরিয়া রোগে এক রকম

অতিসার হইয়া থাকে। এইরূপ রোগে ব্রোমাইড্ দেওয়া দরকার হয়। সাধারণতঃ অতিসার রোগে কোন প্রকার ধারক ঔষধ এবং অহিফেনঘটিত ঔষধ সেবন করা আবশ্যক।

শিশু এবং বালকের অতিসার।—শিশুদিগের অতিসার অনেক সময় মারাত্মক হইয়া উঠে, এ জন্য যাহাতে ঐ রোগ না জন্মে, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। শিশুদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। প্রত্যহ গরম জলে স্নান করান উচিত। দুগ্ধ এবং পানীয় জল ফুটান আবশ্যক। অতিরিক্ত খাওয়ান অতি অনুচিত। দুগ্ধ পাতলা করিয়া খাওয়াইতে হইবে। যে শিশু মাতার স্তন্য পায় না, তাহাদের খাওয়া সম্বন্ধে আরও বেশী সাবধান হওয়া উচিত। (ক) সামান্য পরিপাকের গোলযোগ হইয়া অথবা ঠাণ্ডা লাগিয়া অতিসার উপস্থিত হইতে পারে। দিবসে ৩।৪ বার অথবা অধিক বার মলত্যাগ হয়। মলে শ্লেষ্মা (আম) থাকে এবং প্রায়ই ছানা দেখা দেয় ও অম্লের গন্ধ পাওয়া যায়।

চিকিৎসা।—শিশুর খাদ্য কমাইয়া দেওয়া উচিত। দুগ্ধ খুব কম দেওয়া দরকার, এমন কি, ৩।৪ দিনের জন্য বন্ধ করিয়া দিলে ভাল হয়। সাধারণ চিনির বদলে 'সুগার অব মিল্ক' জলের সহিত দেওয়া উচিত। কয়েক দিন ছানার জল খাওয়াইয়া রাখা আবশ্যক হইতে পারে। মলে অতিরিক্ত আম অথবা ছানা থাকিলে শিশুকে বিশুদ্ধ এরণ্ডতৈল (শিশুর বয়স অনুসারে ॥০ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম অথবা অধিক পরিমাণে) সেবন করান উচিত। ২।১ ফোটা মধুর সহিত ঐ তৈল মিশাইয়া খাওয়ান খুব সুবিধাজনক। অল্প মাত্রায় চূণের জল খাওয়ানও দরকার হইতে পারে। রোগ কঠিন মনে হইলে ভাল চিকিৎসকের অধীনে দিতে হইবে। (খ) শিশুদিগের সংক্রামক অতিসার হঠাৎ দেখা দেয়। শরীরের উষ্ণতা অতিরিক্ত বর্দ্ধিত হয়, বমন থাকে, শিশু অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, বার বার শ্লেষ্মা ও রক্তমিশ্রিত তরল মল নির্গত হয়, এইরূপ অতিসারের কারণ গ্রহণী-জীবাণু (dysentery bacillus), মালা জীবাণু (streptococcus) প্রভৃতি কয়েক প্রকার জীবাণু দ্বারা ঘটিয়া থাকে। ইহার চিকিৎসা সুকঠিন। শিশুকে প্রথম ২৪ ঘণ্টা জল খাওয়াইয়া রাখিয়া পরে ছানার জল অথবা ডিম্বের শ্বেতাংশ তরল দুধের সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়ান উচিত। জলবার্লি অথবা দুধবার্লি ঐ সঙ্গে খাওয়ান যায়। দেহের অতিরিক্ত উত্তাপের দরুণ মাথায় বরফের থলী লাগান দরকার। তাহাতে জ্বর না কমিলে, শীতল জলে গা মোছান অথবা শীতল জলে ভিজান কাপড় গায়ে জড়াইয়া জ্বর কমান দরকার। নাড়ী দুর্ব্বল হইলে ব্রাণ্ডি এবং তৎসহ টিং ষ্টোরেন্থাস্ আবশ্যক হইতে পারে। দরকার মত ষ্ট্রিক্নিন্ বা ডিজিটেলিন্ ইঞ্জেক্শন্ দরকার হইতে পারে। অতিরিক্ত বাহ্য ও বমি হইতে এট্রোপিন্ ইঞ্জেক্শন্ দেওয়া দরকার। জ্বর কমিয়া গেলেও যদি তরল মল নির্গত হইতে থাকে, তবে বিস্‌মাথ সাব্ কার্ব্বনেট অথবা ট্যানিক্ এসিড্ সেবন করাইবে। যদি ঘন ঘন তরল জলবৎ মল নির্গত হইতে থাকে, তাহা হইলে অতি অল্প মাত্রায় ডোভার্স পাউডারে খুব উপকার পাওয়া যায়। যদি জ্বর থাকে এবং মলে দুর্গন্ধ থাকে, তবে কখনও ধারক ঔষধ দেওয়া উচিত নয়; এ ক্ষেত্রে মৃদু বিরেচকই সেবন করান আবশ্যক। অতিরিক্ত কুন্থন থাকিলে লবণজল, হেমামেলিস্, ট্যানিক্ এসিড্ অথবা সিল্‌ভার নাইট্রেড্ মিশ্রিত জল দ্বারা সরলান্ত্র (rectum) ধৌত করা উচিত। এইরূপ চিকিৎসা উপযুক্ত চিকিৎসকের অধীনেই করান উচিত। এতদ্ভিন্ন শিশুগণের রিকেট্‌স্ প্রভৃতি অনেক প্রকার রোগে অতিসার দেখা দেয়। এই সকল স্থলে মূল রোগের চিকিৎসা করাই আবশ্যক।

হোমিওপ্যাথী মতে অতিসারের চিকিৎসা।

আর্সেনিক—পাকাশয়ে উত্তাপ, মলত্যাগে জ্বালা, নিম্নোদরে বেদনা, রক্তাতিসার, এবং প্রাদাহিক অতিসারেই আর্সেনিক ফলপ্রদ। ক্রিয়া-বিকারজনিত অতিসারে ইহা ব্যবহৃত হয় না। রোগারম্ভে বা রোগের ভোগকালে বমন বা বিফল বমনচেষ্টা, অতিশয় দুর্ব্বলতা, শীর্ণতা, হস্তপদের শীতলতা প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত অতিসারেই আর্সেনিক বিশেষভাবে ব্যবস্থেয়। নরম মণ্ডের মত পীতবর্ণ, মলিনবর্ণ, রক্ত অথবা ঈষৎ হরিদ্বর্ণ কিম্বা সচরাচর ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ ও দুর্গন্ধময় মল; মলত্যাগকালে বমন ও উদরে অত্যন্ত বেদনা, সরলান্ত্রে জ্বালা ও কুন্থন, মলত্যাগের পরে গুহ্যদ্বারে জ্বালা, হৃৎকম্প, অঙ্গকম্প, অল্প পরিমাণে মলনির্গম, যে পরিমাণে মল নির্গত হয় তদপেক্ষা দুর্ব্বলতা অতিশয় বেশী ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

একোনাইট—কুন্থন সহকারে বারংবার অল্প অল্প তরল মলস্রাবে, শুভ্র বা লোহিত মূত্রসংযুক্ত গ্রীষ্মকালের উদরাময়ে, কাটা শাকের ন্যায়, কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধ আমরক্তময় মল, জলবৎ সবুজ মল, শ্বেতবর্ণ মল, কৃষ্ণবর্ণ মল, মলদ্বার হইতে উষ্ণ তরল-পদার্থ নির্গম অনুভব, অতিশয় জ্বর, তৃষ্ণা, কম্প, সমস্ত শরীরে ব্যথা, পেট ফোলা ও ফোড়ার মত ব্যথা হইলে একোনাইট দিতে হইবে। শিশুদিগের জলবৎ অতিসারে ক্রন্দন, অঙ্গুলি-দংশন, অনিদ্রাদি লক্ষণে এই ঔষধে সত্বর উপকার দর্শে।

মারকিউরিয়াস্ সলিউব্লিস্—অতিশয় ভেদ, মলিন হরিদ্বর্ণ, ফেনিল অথবা গন্ধকের ন্যায় পীতবর্ণ মল, মলত্যাগের পূর্ব্বে শীতবোধ, মলত্যাগকালে ও মলত্যাগের পরে অতিশয় কুন্থন, কুঙ্কুমের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ মল, অতিশয় মলপ্রবৃত্তি, কর্ত্তনবৎ উদরবেদনা, রক্ত-

মিশ্রিত আমস্রাববিশিষ্ট দাস্ত; মলিন হরিদ্বর্ণ আমসংযুক্ত মল, শ্বেতবর্ণ মল, লেহবৎ আমময় মল, ক্ষণে ক্ষণে নিষ্ফল মলবেগ ও তৎসহ সরলান্ত্রে কুন্থন, কোমল মলস্রাব সহ মলদ্বারে জ্বালা, অবিরত মলপ্রবৃত্তি সহকারে পেট কামড়ানি, কিন্তু বাহ্যে না হওয়া; সান্ধ্যবায়ুজনিত উদরবেদনা ও অতিশয় ভেদ এই সমস্ত লক্ষণে মারকিউরিয়াস্ সলিউব্লিস্ ব্যবহার করিতে হইবে।

মারকিউরিয়াস্ করোসিভস্—লেহবৎ, মলিন, হরিৎ, পৈত্তিক, কৃষ্ণাভ, দুর্গন্ধময় দাস্ত, বারংবার অল্প অল্প নিরবচ্ছিন্ন রক্তাক্ত আমনিঃসরণ, অতিশয় যন্ত্রণাপ্রদ, দুর্দ্দম কুন্থন ও কর্ত্তনবৎ উদরবেদনা; মলত্যাগে কুন্থনের অনিবৃত্তি, মলত্যাগের পর গুহ্যদ্বার, সরলান্ত্র ও মূত্রাশয়ের জ্বালা ও বেগ ইত্যাদি লক্ষণে মারকিউরিয়াস্ করোসিভস্ ব্যবহার করিতে হইবে।

নক্সভমিকা—অজীর্ণ, মুখে অম্ল বা তিক্তস্বাদ অনুভব, অরুচি, অক্ষুধা, বার বার মলত্যাগের চেষ্টা কিন্তু দাস্ত না হওয়া, রক্তমিশ্রিত আলকাতরার মত মল, কৃষ্ণবর্ণ মল, আমমিশ্রিত মল, অম্ল বা তিক্ত উদ্গার, হেঁচকি, পেট ফোলা, ন্যাকার, গা ন্যাকার ন্যাকার, পেটের উপর ব্যথা, প্রাতে বা রাত্রিতে কিম্বা আহারের পর ন্যাকার ও মাথাধরা, অম্ল ন্যাকার, মিষ্ট ন্যাকার বা রক্ত ন্যাকার, মলত্যাগের পর শীতবোধ ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে নক্সভমিকা দিতে হইবে। রোগের প্রথম অবস্থায় এই সমস্ত লক্ষণে এই ঔষধে বিশেষ ফল দর্শে।

কার্ব্বোভেজিটেবিলিস্—পাতলা পাণ্ডুবর্ণ আমময় মলবিশিষ্ট অতিসারে এই ঔষধ ব্যবহার হয়। মলিন রক্ত ও আমময় মল, অতি দুর্গন্ধ মল, অতিশয় বেগ সহকারে আমনিঃসরণ; সূত্রাকার পীতাভ আমাবৃত মল; সরলান্ত্রে দংশন, তুড়তুড়ি ও শূল; মলদ্বার হইতে রক্তস্রাব; কোমল মল কষ্টে নিঃসরণ; নিষ্ফল মলত্যাগ চেষ্টা, কেবল বায়ু নিঃসরণ—এই সমস্ত লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়।

ইপিকাকুয়ানহান্—পিচ্ছিলবৎ মল, তৃণের ন্যায় হরিদ্বর্ণ মল, তৎসহকারে বিবমিষা ও উদরবেদনা, কুন্থনবিশিষ্ট রক্তাতিসারের মল; গুহ্যদ্বারে কর্ত্তনবৎ বেদনা ও জ্বালাসংযুক্ত রক্তময় মল, পুনঃ পুনঃ হরিতাভ আম নিঃসরণ, নাভির চারি দিকে অতিশয় কামড়ান ইত্যাদি লক্ষণে ইপিকাকুয়ানহাতে বিশেষ উপকার দর্শে। এই ঔষধ উপরোক্ত লক্ষণযুক্ত শারদীয় অতিসারেও বিশেষ ফলপ্রদ।

বেলেডোনা—বেগ ও কুন্থন সহ অল্প মলনিঃসরণ; পাতলা হরিদ্বর্ণ আমময় মল ও তৎসহকারে পেট বেদনা, বিলম্বিত মল, গাঢ় সবুজবর্ণ আম, শেওলার মত ও রক্তাক্ত মল, পেট বেদনা এবং মলত্যাগ সময়ে ও মলত্যাগের পর কুন্থন, পাকাশয়ের ঊর্দ্ধপ্রদেশে বেদনা, নিশ্বাস বন্ধ করিয়া রাখিলে এই বেদনার উপশম; আমরক্তমিশ্রিত মলবিশিষ্ট রক্তাতিসার ইত্যাদি লক্ষণে বেলেডোনা ব্যবহৃত হয়।

ব্রাইয়োনিয়া—কপিশবর্ণ পাতলা বিষ্ঠাসংযুক্ত বা পাতলা রক্তময় মল, দুর্গন্ধময় লেহবৎ অথবা পৈত্তিক ও বিদাহী মল, মলে পুরাতন পনিরের ন্যায় গন্ধ, প্রাতঃকালে ও সঞ্চালনে রোগের বৃদ্ধি; মলত্যাগের পূর্ব্বে কর্ত্তনবৎ উদরবেদনা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন কৃষ্ণবর্ণ মল, মলত্যাগের পর মলদ্বার জ্বালা; মলমূত্র ত্যাগকালে সরলান্ত্রে জ্বালা, মস্তকের জড়তা সহ অতিসার, উত্তপ্ত শরীরে শীতল জলপানবশতঃ অতিসার; বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালের অতিসারে উপরোক্ত লক্ষণ থাকিলে ব্রাইওনিয়া বিশেষ ফলপ্রদ।

চায়না—আহারান্তে, রাত্রিতে বা প্রত্যুষে অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্য সংযুক্ত, উদরবেদনাবিশিষ্ট বা বেদনাশূন্য অতিশয় ভেদ জলবৎ পীতবর্ণ বা ঈষৎ কপিশবর্ণ মল, দুর্ব্বলতা, রাত্রিতে বা আহারান্তে রোগের বৃদ্ধি, পিপাসা ও ক্ষুধামান্দ্য থাকিলে চায়না ব্যবহার্য্য। অম্লভক্ষণজনিত গ্রীষ্মকালীন দুর্গন্ধময় অতিসারে এবং ম্যালেরিয়াজনিত রক্তাতিসারেও চায়না ব্যবহৃত হয়।

পলসেটিলা—তৈলাক্ত কিংবা গুরুপাক দ্রব্য ভোজনবশতঃ রোগের উৎপত্তি, মুখে তিক্ত আস্বাদ, বিবমিষা, বমন, উদ্গার ও অল্প উদরবেদনা লক্ষণযুক্ত রাত্রিকালীন অতিসারে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। রাত্রিকালীন হরিৎ বর্ণ আমাতিসারে পলসেটিলার মত ডলকেমেরাও উপযোগী। কিন্তু ডলকেমেরার অতিসার আর্দ্রতা হইতে জন্মে ও উহাতে আমবাতিক বেদনা অনুভব হয়। পলসেটিলার মল বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে—কখনও সবুজ বর্ণ, কখনও হরিদ্রাবর্ণ, কখনও শাদা কখনও জলবৎ, কখনও ছেবড়া ছেবড়া মল নির্গত হয়। সাধারণতঃ মধ্যরাত্রির পরে অতিসার বৃদ্ধি পাইলে পলসেটিলা; রক্তমিশ্রিত আমময় মল ও মলদ্বারে জ্বালাদি লক্ষণযুক্ত রক্তাতিসারেও কখন কখন এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। শিশুদিগের আমাতিসারে ইহা বিশেষ উপযোগী।

ফসফরাস্—পুরাতন অগ্নিমান্দ্যে, স্নায়ু-প্রধান ব্যক্তি ও পীড়িত শিশুদিগের পুরাতন অতিসারে এবং ওলাউঠার পরবর্ত্তী কপিশবর্ণ অতিসারে ফসফরাস বিশেষ উপকারী। বায়ু-প্রধান, দুর্ব্বল, যক্ষ্মারোগগ্রস্ত যুবক ব্যক্তিদিগের অতিসারেও এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। অজ্ঞাতসারে মলস্রাব লক্ষণযুক্ত আম ও রক্তাতিসারে ইহা বিশেষ উপযোগী।

কলোসিন্থ—উদরে ও নাভির চারি পার্শ্বে ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তনবৎ কিম্বা জ্বালাকর বেদনা, আহার করিলে এই বেদনার বৃদ্ধি ও অন্ত্রের উপদাহ হওয়া এবং অধিক পরিমাণে ভেদ

হওয়া, প্রথমতঃ জলবৎ ও আমমিশ্রিত, তৎপরে পিত্তমিশ্রিত, তৎপর রক্তময় মল ও অত্যন্ত উদরবেদনাবিশিষ্ট রক্তামাশয়জনিত ভেদ হওয়া; অন্ত্রসকল যেন প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে পেষিত হইতেছে মনে হয় এবং অবনত হইয়া থাকিলে পেট বেদনার উপশম হয়—এই প্রকার অতিসারে কলোসিন্থ উপযোগী। রক্তাতিসারে যদি অতিশয় উদরবেদনা, উদরস্ফীততা, শুভ্র জিহ্বা, পিচ্ছিল মলস্রাব, নিস্ফল বমনচেষ্টা, ও ত্রিকদেশে জ্বালা থাকে তবে এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে।

কোলিনসোনিয়া,—শুধু রক্তাতিসারে কোলিনসোনিয়া ব্যবহৃত হয়।

ইরিজিরন্ কেনাডেন্স্—অতিশয় রক্ত পড়া, বার বার রক্তভেদ, শুলুনি এবং অতি কষ্টে প্রস্রাব হইলে ইরিজিরন কেনাডেন্স্ ব্যবহার করিতে হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে হেমামেলিস মূল অরিষ্ট প্রত্যেক ভেদের পর দিলে রক্ত শীঘ্র বন্ধ হইবে। পুরাতন রক্তাতিসারে (blood-dysentery) কাল ও দুর্গন্ধ ভেদ হইলে লেপ্টেণ্ড্রা দিতে হইবে।

ইউফরবিয়া অফিসিনেলিস্ - অক্ষুধা বা অতিক্ষুধা, জ্বর, কাশি, বুকে ব্যথা ও সাংঘাতিক রক্তাতিসার হইলে ইউফরবিয়া অফিসিনেলিস্ ব্যবহার করিতে হইবে।

অতিসারের প্রায়শ্চিত্ত।

শাতাতপীয় কর্ম্মবিপাকে লিখিত আছে—

"মহাপাতকজং চিহ্নং সপ্তজন্মসু জায়তে।
উপপাপোদ্ভবং পঞ্চ ত্রীণি পাপসমুদ্ভবং।...
কুষ্ঠঞ্চ রাজযক্ষ্মা চ প্রমেহো গ্রহণী তথা।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীকাসা অতিসারভগন্দরৌ।
দুষ্টব্রণং গণ্ডমালা পক্ষাঘাতোঽক্ষিনাশনং।
ইত্যেবমাদয়ো রোগা মহাপাপোদ্ভবাঃ স্মৃতাঃ।" ইত্যাদি।

এবং "মহাপাপে ভবেৎ সর্ব্বং তদর্দ্ধন্তূপপাতকে। দদ্যাৎ পাপেষু ষষ্ঠাংশং জ্ঞাত্বা ব্যাধিবলাবলং। সর্ব্বং পরাকরূপং।"

উক্ত বচন অনুসারে মহাপাতকজনিত চিহ্ন স্বল্পকুষ্ঠাদি রোগ মানুষের সাত জন্ম পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। উপপাতকের চিহ্ন, যথা জলোদরাদি পঞ্চ জন্ম পর্য্যন্ত জন্মে এবং সামান্য পাপজনিত চিহ্ন দণ্ডাবতানকাদি তিন জন্ম পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কুষ্ঠ, রাজযক্ষ্মা, প্রমেহ, গ্রহণী, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, জ্বরযুক্ত কাস, অতিসার, ভগন্দর, দুষ্টব্রণ, গণ্ডমালা, পক্ষাঘাত, চক্ষুর নাশ ইত্যাদি রোগ মহাপাপোদ্ভব।

মহাপাপে সকল স্থলে পরাকব্রত প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা আছে। পরাকব্রত করিতে অসমর্থ হইলে—"পরাকে পঞ্চধেনবঃ"—পরাকের অনুকল্পে পাঁচটী ধেনু দেয়, এই বচনানুসারে পাঁচটী গরু উৎসর্গ করিয়া দান করিবে। অথবা পাঁচটী গরুর মূল্য পনর কাহন কড়ী কিম্বা সেই মূল্যে যতটুকু সোনা বা রূপা পাওয়া যায়, তাহা উৎসর্গ করিয়া দান করিবে। [পরাকশব্দে পরাকব্রত এবং ধেনুশব্দে ধেনুর মূল্য দ্র°]

এইরূপে প্রায়শ্চিত্তের পত্রিকা লিখিবে—

'অতিসাররোগসংসূচিতপাপক্ষয়ায় ব্রতাদ্যশক্তৌ ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়াদিনা বা যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণকপঞ্চদশকার্ষাপণীদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদুষাম্পরামর্শঃ।'

প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিয়ম—অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে নাই। তদ্ভিন্ন যে তিথিতে প্রায়শ্চিত্ত করিবে তাহার পূর্ব্বদিনে রোগী মস্তকাদি মুণ্ডন করিয়া সায়ংকালে কেবল কিঞ্চিৎ ঘৃত খাইয়া থাকিবে। পর দিবসে যথানিয়মে নিত্যক্রিয়াদি সম্পন্ন করিবে। তাহার পর, উপরে যে পত্রিকা খানি কথিত হইয়াছে, তাহা তালপত্রাদিতে লিখিয়া কড়ী কিম্বা স্বর্ণাদি যাহা উৎসর্গ করিতে হইবে, তাহার উপরে রাখিয়া দিবে। এইরূপ আয়োজনের পর উৎসর্গের মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। যথা,—'অদ্যেত্যাদি (মাস, পক্ষ ও তিথির নাম করিবে) অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অতিসাররোগ-সংসূচিত-পাপক্ষয়-কামোঽর্চ্চিতাং ইমাং পঞ্চদশকার্ষাপণীং তন্মূল্যলব্ধমিদং সুবর্ণং রৌপ্যং বা বিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে।'

অবশেষে দক্ষিণাদির পর পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে। তাহাতে অসমর্থ হইলে একটী ভোজ্য উৎসর্গ করা আবশ্যক।

এই প্রায়শ্চিত্ত-বিধি সঞ্চিতগ্রহণী বা অতিসারের পক্ষে খাটিবে। অল্পকালস্থায়ী ওলাউঠা কিম্বা সামান্য উদরাময়ের জন্য নহে।

অতিসারকিন্—(ত্রি) [অতিসারোরোগোঽস্ত্যস্য অতিসার-ইনি কুক্ চ] অতিসাররোগগ্রস্ত। উদরাময়রোগী।

অতিসারঘ্ন—(পুং) [বৈদ্যক] ক্ষেত্রপর্পটক, চলিত ক্ষেৎ-পাপড়া। (বৈদ্যকনি°)

অতিসারঘ্নী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] অতিবিষা। (বৈদ্যকনি°)

অতিসারভেষজ—(ক্লী) [বৈদ্যক] লোধ্র। ২ অতিসার-রোগনাশক ঔষধ।

অতিসারবারণরস—(পুং) [বৈদ্যক] অতিসারনিবারক রস (ঔষধ)। [অতিসার দ্র°] ২ কৃতকর্পূর, পক্ককর্পূর। ৩ খাখসীক্ষীর, অহিফেন। (রসেন্দ্রসা°)

অতিসারস্থা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] রাস্না। (বৈদ্যকনি°)

অতিসারিন্—(পুং) [অতিশয়েন সারয়তি রক্তাদিকম্ অতি-সৃ-ণিনি] অতিসাররোগ। উদরাময়।

অতিসিদ্ধি—(স্ত্রী) সর্ব্বাঙ্গসুন্দরতা, সর্ব্বোৎকৃষ্টতা, অত্যুত্তমতা;

গুণ বা বিদ্যাবিষয়ে অতিশয় উৎকর্ষ। ২ অতিশয় ব্যুৎপত্তি, অত্যন্ত অভিজ্ঞতা। "সর্ব্বপাপাতিসিদ্ধিনা" (রামা° ৪.৫৭.১০)

অতিসুগন্ধি—(ত্রি) অত্যন্ত মনোহর সদ্গন্ধযুক্ত।

অতিসুগম—(ত্রি) অতিসহজ, যেখানে যাইতে কোন কষ্ট হয় না।

অতিসুগম্য—(ত্রি) [অতি-সু-গম্-যৎ] অনায়াসলভ্য ; যাহা অনায়াসে যাওয়া যায় বা পাওয়া যায়।

অতিসুগ্রাহ্য—(ত্রি) [অতি-সু-গ্রহ-যৎ] গ্রহণ করিবার অত্যন্ত উপযুক্ত, অতিশয় গ্রহণীয়।

অতিসুজ্ঞেয়—(ত্রি) সহজেই জানিবার উপযুক্ত।

অতিসুন্দর—(ত্রি) অতিশয় সুন্দর, অতি মনোহর। [স্ত্রিয়াং ঙীপ্] অতিসুন্দরী। "সৌম্যা সৌম্যতরাশেষ-সৌম্যেভ্যস্বতি-সুন্দরী" (মার্ক° পু° চণ্ডী)

অতিসুন্দরা—(স্ত্রী) ষোড়শাক্ষরপাদক বৃত্তবিশেষ।

অতিসূক্ষ্ম—(ত্রি) অতিশয় সূক্ষ্ম।

অতিসৃজ্য—(ত্রি) [অতি-সৃজ-ক্যপ্] ত্যাজ্য। ২ সর্জ্জনীয়। ত্যাগ করিবার যোগ্য।

অতিসৃষ্ট—(ত্রি) [অতি-সৃজ-ক্ত] দত্ত। ২ প্রেরিত।

অতিসৃষ্টি—(স্ত্রী) উৎকৃষ্ট সৃষ্টি, উত্তম সৃষ্টি। "সৈষা ব্রহ্মণোঽতি-সৃষ্টিঃ।" (বৃহদারণ্যক উপ° ১.৪.৬)

অতিসেন—(পুং) জনৈক রাজপুত্র। ইনি শম্বরের আত্মজ। (হরিবংশ)

অতিসেবন—(ক্লী) [বৈদ্যক] অধিকমাত্রায় সেবন ; অতিরিক্ত উপভোগ। যথা—অতিরিক্ত স্ত্রীসেবনে শুক্রতারল্য, ধ্বজভঙ্গ, মেদোবৃদ্ধি, অজীর্ণ, অর্শ, বহুমূত্র, ধাতুজ্বর প্রভৃতি হইয়া থাকে। (সুশ্রুত)

অতিসেবা—(স্ত্রী) অতিমাত্র সেবা। অতি আসক্তি। (সুশ্রুত ২.১৪৬.১)

অতিসৌপর্ণ—(ত্রি) [সুপর্ণমতিক্রান্তঃ প্রাদিস°] গরুড়াতি-ক্রমকারী। "অস্মাকমতিসৌপর্ণং দিব্যং চক্ষুর্বলং মহৎ" (রামা° ৪.৫৮.৩১)

অতিসৌম্য—(ত্রি) অতিসুন্দর, অতিমনোরম। [স্ত্রিয়াং টাপ্ অতিসৌম্যা।] "অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ" (মার্ক° পু° চণ্ডী) [বৈদ্যক] ২ বল্লীযষ্টিমধুক। (রাজনি°)

অতিসৌরভ—(পুং) [অতিশয়িতং সৌরভমস্য। প্রাদি বহুব্রী] সুগন্ধি আম। ২ আম্রবৃক্ষ। (ভাবপ্র°) (ত্রি) ৩ সদ্গন্ধযুক্ত দ্রব্য মাত্র। (ক্লী) ৪ অত্যন্ত সুরভি গন্ধ।

অতিসৌহিত্য—(ক্লী) [অতিশয়িতং সৌহিত্যম্] অত্যন্ত তৃপ্তি। "নাতিসৌহিত্যমাচরেৎ" (মনু ৪.৬২)

অতিস্কন্ধা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] রক্তকুলত্থ। (বৈদ্যকনি°)

অতিস্তুতি—(স্ত্রী) [অতি-স্তু-ক্তিন্] অবিদ্যমান গুণের কীর্ত্তন।

অতিস্ত্রি—(পুং) [স্ত্রিয়মতিক্রান্তঃ অত্যা° তৎ] স্ত্রীত্যাগী। যে ব্যক্তি আপনার স্ত্রীকে অতিক্রম করিয়াছে। ২ পরস্ত্রীতে আসক্ত।

অতিস্ত্রী—(স্ত্রী) [অতিশয়িতা সুন্দরী স্ত্রী। প্রাদিস°] অতিশয় সুন্দরী স্ত্রী।

অতিস্ত্রীক—(পুং) [অতিশয়িতা সুন্দরী যস্য প্রাদি বহুব্রী। অতি সুন্দরী স্ত্রী আছে যাহার, রূপবতী স্ত্রীর পতি।

অতিস্থির—(ত্রি) অতিশয় নিশ্চল ; অত্যন্ত অচল। ২ অতিদৃঢ়। ৩ অতিস্থাবর।

অতিস্থূল—(ত্রি) অতিশয় স্থূল ; অত্যন্ত মোটা। ২ অচতুর ; অদক্ষ, অকুশল। "চাতিহ্রস্বং চাতিস্থূলং" (শুক্লযজুঃ ৩০.২২)

অতিস্থূলবর্ত্ম—(পুং) [বৈদ্যক] দুষ্টব্রণবিশেষ। (চক্রদত্ত)

অতিস্নিগ্ধ—(পুং) [বৈদ্যক] অত্যন্ত স্নিগ্ধ। কফপ্রসেক, মস্তকের গুরুতা বা ভারবোধ, ও ইন্দ্রিয়-বিভ্রম, এই সকল অতি-স্নিগ্ধের লক্ষণ। "কফপ্রসেকঃ শিরসো গুরুতেন্দ্রিয়বিভ্রমঃ। লক্ষণং তদতিস্নিগ্ধে রূক্ষং তত্র প্রদাপয়েৎ।" (বৈদ্যকনি°)

অতিস্নেহ—(পুং) [অতিশয়িতঃ স্নেহঃ প্রাদিস°] অতিশয় বাৎসল্য। ২ অতিপ্রণয়, অত্যন্ত ভালবাসা।

অতিস্পর্শ—(ত্রি) [অতিক্রান্তং স্পর্শং বর্ণোচ্চারণপ্রযত্নভেদং দানং বা] ক হইতে ম পর্য্যন্ত পঁচিশটী স্পর্শবর্ণের অতিক্রান্ত স্বরবর্ণ ও য-ব-র-লাত্মক বর্ণ। য ব র ল ঈষৎস্পৃষ্ট বর্ণ এবং স্বরবর্ণগুলি অস্পৃষ্ট বর্ণ। পূর্ব্বোক্ত অন্তস্থঃবর্ণগুলির জিহ্বার সহিত অল্প স্পর্শ হয় বলিয়া উহাদের নাম ঈষৎস্পৃষ্ট। পরোক্ত স্বরবর্ণগুলির সহিত জিহ্বার স্পর্শ হয় না বলিয়া উহারা অস্পৃষ্ট। ঐ উভয়বিধ বর্ণের জিহ্বার সহিত সম্পূর্ণ স্পর্শ নাই বলিয়া উহাদের নাম অতিস্পর্শ। [অচ্ দ্র°]। ২ স্বরবর্ণ। ৩ দান-হীন, কৃপণ। ৪ অধম। [অতিশয়িতঃ স্পর্শঃ, প্রাদিস°।] (পুং) ৫ অত্যন্ত স্পর্শ।

অতিস্ফির—(ত্রি) [অতিশয়িতঃ স্ফিরঃ। প্রাদিস°] অত্যন্ত স্ফূর্ত্তিশালী। ২ অতিবৃদ্ধ।

অতিস্রবা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] ময়ূরবল্লী, চলিত মুগ্‌বা। (বৈদ্যকনি°)

অতিস্বপ্ন—(পুং) [অতিশয়িতঃ স্বপ্নঃ] অতিশয় নিদ্রা। (ষড়্‌বিংশব্রা° ৬.৪) ২ অতিমাত্র স্বপ্নদর্শন।

অতিহসিত—(ক্লী) [অতিশয়িতং হসিতম্ অতি-হস-ক্ত। প্রাদিস°] অতিশয় হাস্য, উচ্চ হাস্য। [অতি-হস-ঘঞ্ অতিহাস] (পুং) ২ সশব্দহাস্য।

অতিহস্তি—(নামধাতু) [হস্তিনাতিক্রামতি হস্তৌ নিরস্যতি বা

অতিহস্তয়তি ণিচ্ কল্যাদেঃ] হস্তিদ্বারা অতিক্রমকারী। ২ হস্তদ্বয় বিক্ষেপকারী।

অতিহাস—(পুং) অত্যধিক হাস্য; অতিশয় শব্দযুক্ত হাস্য।

অতিহ্রস্ব—(ত্রি) অতিক্ষুদ্র, অতিশয় ছোট। "চাতিহ্রস্বং চাতিস্থূলং" (শুক্লযজুঃ ৩০.২২)

অতীক্ষ্ণ—(ত্রি) [ন তীক্ষ্ণঃ নঞ্-তৎ] তীক্ষ্ণত্ব-বিরোধী, মৃদুত্ব-বিশিষ্ট। "গর্ত্তস্থানূ্যপোঽতীক্ষ্ণাগ্রো ভবতি" (শতপথব্রা° ৫.২.১.৭)

অতীক্ষ্ণতা—(স্ত্রী) তীক্ষ্ণতার অভাব অর্থাৎ মৃদুভাব-সম্পন্না।

অতীচ্ছু—(ত্রি) অত্যন্ত অভিলাষী।

অতীত—(ত্রি) [অতি-ইন্-ক্ত] গত। ২ অতিক্রান্ত। ৩ সঙ্গীত-শাস্ত্রমতে মানবিশেষ। ৪ ভূত। ৫ ভূত কাল। যথা—"বর্ত্তমান-ধ্বংস-প্রতিযোগিত্বমতীতত্বম্"। বর্ত্তমান ধ্বংস প্রতিযোগীকে অতীতকাল বলা যায়। অতীত কালে এই কয়েকটী প্রয়োগ আছে—"লঙ্লুঙোরতীতত্বম্। লিট্কসোর্ব্বক্তুঃ পরোক্ষত্বম অতীতত্বঞ্চ। লুঙোঽতীতত্বং ক্রিয়াতিক্রমশ্চ। কুতশ্চিদ্বৈগুণ্যাৎ ক্রিয়ানিষ্পত্তিঃ ক্রিয়াতিক্রমঃ। ক্ত ক্তবত্বোরতীতত্বম্।" (ইতি সারমঞ্জরী)। লঙ্ এবং লুঙ্ বিভক্তি অতীতকালে বিহিত হয়। বক্তার পরোক্ষ অতীতকালে লিট্ ও কসু প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে। অতীতকালে এবং ক্রিয়ার অতিক্রম বুঝাইলে লুঙ্ বিভক্তির প্রয়োগ হয়। কোন বৈগুণ্য হেতু ক্রিয়ার অনিষ্পত্তিকে ক্রিয়াতিক্রম কহে। ক্ত এবং ক্তবতু প্রত্যয় অতীত কালে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 'স্ম' যোগে লটেরও অতীতত্ব হয়। "অতীতঃ কালঃ ক্ষমায়া আসন্নশ্চ কালবিক্রমস্থ" (ধনঞ্জয়বিজয়) "সন্ধ্যা হইলে অতীত; এখানেই তাহাদের—শমন-কিঙ্করৰূপে,—পাব দরশন।" (রঙ্গমতী) ৪ মৃত। ৫ সংসার হইতে মুক্ত। "অতীতঃ পন্থানং তব চ মহিমা বাঙ্মনসয়োঃ" (মহিম্নস্তব) (ত্রি) ৬ ভূতকালবৃত্তির আরব্ধ পরিসমাপ্ত পদার্থমাত্র।

অতীত$_{২}$—ভারতীয় সাধু-সন্ন্যাসীদের একটী সম্প্রদায়। ইহারা 'পার্থিব ভোগবাসনার অতীত' এই অর্থে অতীত বলিয়া অভিহিত হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহাদের প্রকৃত নাম 'অতিথ'—জগতে অতিথিবৎ অল্পকালমাত্র অবস্থান অর্থে উক্ত নামে সূচিত হইতেছে। অতীতদের সাম্প্রদায়িক কোন প্রকার সীমা বিশেষ-ভাবে নির্দ্দেশ করা যায় না। ইহাদের দলে শৈব এবং বৈষ্ণব উভয় মতাবলম্বীকেই দেখা যায়।

অতীত এবং সন্ন্যাসী অনেকস্থলে একার্থসূচক হইলেও উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বহু প্রদেশে (যথা বিহার, কচ্ছ প্রভৃতি স্থানে) অতীতদিগকে দুইটী শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা ঘরবাড়ী অতীত ও সন্ন্যাসী (বা মঠধারী) অতীত। ঘরবাড়ী অতীতেরা প্রকৃত গৃহস্থের ন্যায় বিবাহ ও ঘর-সংসার করিতে পারে। সন্ন্যাসী অতীতেরা তাহা পারে না, ইহারা গৃহত্যাগী ও আকুমার ব্রহ্মচারী। সন্ন্যাসী অতীতের মৃত্যু হইলে তাহার যাহা কিছু সম্পত্তি থাকে উহা শিষ্যের অধিকারে আসে। ঘরবাড়ী অতীতেরা বোধ হয় সন্ন্যাসী অতীত হইতেই বাহির হইয়াছে; সন্ন্যাসীদের মধ্যে যাহারা বিবাহ করিয়া সংসারী হইল তাহারাই এই নূতন শ্রেণী গঠন করিল। অতীতদের দশটী শাখা আছে, যথা গিরি, পর্ব্বত, সাগর, পুরী, ভারতী, বন, অরণ্য, সরস্বতী, তীর্থ ও আশ্রম। তাহারা নামের শেষে এই সকল উপাধি ব্যবহার করে, যেমন হীরা পুরী, কল্যাণ ভারতী ইত্যাদি। ইহারা গেরুয়া কাপড় ও রুদ্রাক্ষের কণ্ঠী ব্যবহার করে। ঘরবাড়ী অতীতেরা স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপে বাস করে; তাহাদের মধ্যে হিন্দুর উত্তরাধিকার-প্রথা ও শ্রাদ্ধক্রিয়া আছে। কেহ কেহ নিষ্কর জায়গীর ভোগ ও চাষবাস করিয়া থাকে।

অতীত$_{৩}$—সাতারা জেলার একটী গ্রাম। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রী রামচন্দ্র পণ্ডিত এই স্থানকে 'মৌজে অতীত' (তালুক তারগাঁও, তরফ হরচেরী) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১৬১৮ শকের কার্ত্তিক মাসে সেনাপতি ধনাজী যাদব এই স্থানের সরদেশমুখী আদায়ের ভার মহাদজী জগদলের উপর অর্পণ করেন।

অতীত$_{৪}$—তালের প্রকারভেদ। তাল দশভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে গ্রহ একটী। এই গ্রহ চারি প্রকার—সম, অতীত, অনাগত ও বিষম। গীতারম্ভের পর যে কোন সময় হইতে তাল দিতে আরম্ভ করিলে তাহাকে অতিগ্রহ কহে।

অতীতানন্দ—যোগবাসিষ্ঠ নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ইঁহার গ্রন্থ হইতে ইঁহার গুরু ব্রহ্মানন্দ কি স্বানন্দানন্দ বা শিবানন্দ ইহা নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া যায় না। ভাণ্ডারকরের মতে শিবানন্দই ইঁহার গুরু।

অতীন্দ্র—(পুং) [অতিক্রান্ত ইন্দ্রং শক্ত্যা।] বিষ্ণু। (মহাভা° ১৩.১৪৯.৩০)। ২ ইন্দ্রাতিক্রমকারী মাত্র।

অতীন্দ্রিয়—(ত্রি) [অতিক্রান্তমিন্দ্রিয়ং তদবিষয়ত্বাৎ, প্রাদিতৎ স°] ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত, অগোচর। নেত্র, শ্রোত্র, নাসিকা, রসনা, ত্বক্, চিত্ত এই সকল ইন্দ্রিয় যাহা জানিতে পারে না, তাদৃশ বিষয়কেই অতীন্দ্রিয় বলা হয়। "অতীন্দ্রিয়েষ্ব-প্যুপপন্নদর্শনঃ" (রঘু ৩.৪১) যাহা জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহকে অতিক্রম করিয়াছে, অর্থাৎ লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য। পর্য্যায়—অপ্রত্যক্ষ, অনধ্যক্ষ। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে দ্রব্যের মধ্যে পরমাণু, দ্ব্যণুক, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, পরমাত্মা (ঈশ্বর),

ও মন। জীবাত্মার মানস প্রত্যক্ষ হয়, (১) সুতরাং তাহা অতীন্দ্রিয় নহে। গুণের মধ্যে—অনুদ্‌ভূত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, "জীবনযোনি" নামক যত্ন, (২) গুরুত্ব, "ভাবনা' নামক সংস্কার, (৩) 'স্থিতিস্থাপক' নামক সংস্কার, অদৃষ্ট ও নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানবিশেষ (৪) এবং অতীন্দ্রিয় পদার্থের অভাব এই সকল পদার্থ অতীন্দ্রিয়, আর অতীন্দ্রিয় দ্রব্যগত—গুণ, কর্ম্ম, জাতি, সমবায় ইহারাও অতীন্দ্রিয়, কিন্তু অতীন্দ্রিয় দ্রব্যগত হইলেও শব্দ, স্পর্শ, রস ও গন্ধ এই চারটী গুণের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। জ্ঞানেন্দ্রিয়বর্গ এবং মুক্তি সকল দর্শনের মতেই অতীন্দ্রিয়। বেদান্ত ও পূর্ব্বমীমাংসায় পদার্থ অনিয়ত, সুতরাং উল্লিখিত প্রকারেই সে মতে অতীন্দ্রিয় স্থির করিতে হইবে। কেবল মন অতীন্দ্রিয় নহে। (৫) সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল দর্শন পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ববাদী, পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব যথা—পুরুষ, প্রকৃতি, মহান্ বা বুদ্ধি-তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চ মহাভূত ইহার মধ্যে পুরুষ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত সকলই অতীন্দ্রিয়, আর মন এবং মহাভূতের অন্তর্গত আকাশ ও পরমাণুপুঞ্জ অতীন্দ্রিয়।

বৌদ্ধমতে—সাধারণতঃ দ্বাদশ আয়তন, যথা—চক্ষুরাদি পাঁচটী ইন্দ্রিয়, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটী বিষয়, মন এবং শরীর। (৬) ইহার মধ্যে ইন্দ্রিয়পঞ্চক এবং মন অতীন্দ্রিয়। [বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, মাধ্যমিক ও যোগাচার এইরূপ চারটী সম্প্রদায়ভেদে বৌদ্ধমতের মধ্যে যে অবান্তরভেদ আছে তাহা বৌদ্ধ শব্দে বিবৃত হইবে।]

জৈনমতে—নয়টী তত্ত্ব, যথা—জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, আস্রব, সংবর, বন্ধ, বিনির্জরা এবং মোক্ষ। (৭) ইহার মধ্যে জীব চৈতন্য, প্রত্যক্ষসিদ্ধ। (৮) অজীবের মধ্যে স্থূলদেহরূপ পুদ্‌গল প্রত্যক্ষ। আস্রব, দেহ, বাক্য ও মনের ব্যাপার প্রত্যক্ষ। অপর সকল তত্ত্বই অতীন্দ্রিয়।

২ নির্ব্বিকল্পাখ্য জ্ঞান। (পুং) ৩ পরমাত্মা। ৪ বিষ্ণু। (মহাভা° ১৩.১৪৯.৩১) (ক্লী) ৫ মন। "যোঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ" (মনু ১.৭) 'ইন্দ্রিয়মতীত্য বর্ত্তত ইতি অতীন্দ্রিয়ং মনস্তদ্‌গ্রাহ্য ইত্যর্থঃ' (কুল্লূক) ৬ প্রধান, প্রকৃতি।

অতীন্দ্রিয়গুণ—(ক্লী) অদৃষ্ট ভাবনা। "অতীন্দ্রিয়গুণাশ্চ গুরুত্বমদৃষ্টভাবনাস্থিতিস্থাপকশ্চেতি" (ভাষাপ°) ২ লৌকিক সাক্ষাৎকার-বিষয়ক গুণরূপ বৃত্তি-সংস্কারবিশেষ। "লৌকিক-সাক্ষাৎকারবিষয়গুণত্বন্যূনবৃত্তিসংস্কারত্বান্যধর্ম্মসমবাট্যন্যগুণত্বম্।" (দিনকরী)

অতীন্দ্রিয়ত্ব—(ক্লী) ইন্দ্রিয়জন্য পরোক্ষ বিষয়।

অতীয়ত্তা—(স্ত্রী) [অতি-ইয়ত্তা] বহুত্ব। ২ অত্যুৎকর্ষ।

অতীয়া—পশ্চিম আরবের হেজাজ প্রদেশবাসী একটী জাতি। সাধারণতঃ বেণী অতীয়া নামে খ্যাত। মদিনার উত্তরে ইহা-দের বাস।

অতীরেক—(পুং) উদ্‌বৃত্ত বা উদ্ধৃত অংশ বা ভাগ। "নেক্তে্বা-তীরেকোঽস্তি" (শতপথব্রা° ৪.৫.১০.৮)

অতীর্ণ—(ত্রি) অকৃততরণ, যাহাকে তরণ করা হয় নাই। "প্রেমায়ুস্তারীদতীর্ণং" (ঋক্ ৮.৭৯.৬)

অতীব—(অব্য°) [অতি-এব-ইব ; প্রাদিস°] অবধারিত অতিশয়। ২ অত্যন্ত, অতিশয়। "উচ্চৈঃ শিরসামতীব" (কুমার ১.১২)। "জয়ত্যতীব হি পিতৃলোকঃ" (বৃহদারণ্যকউ° ৩.১.৮)

অতীব্র—(ত্রি) তীব্র যাহা নয় ; অতীক্ষ্ণ।

অতীশ—(অতিশা) বাঙ্গলার লোকবিশ্রুত বৌদ্ধ আচার্য্য, ইঁহার প্রকৃত নাম 'অতিশা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান'। বাঙ্গলার পালবংশীয় সুবিখ্যাত মহারাজ মহীপালের রাজত্বকালে, ৯৮২ খৃষ্টাব্দে বিক্রমশিলা মহাবিহারের দক্ষিণস্থ এক সামন্তরাজ্যে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।* বিক্রমশিলার অবস্থান অদ্যাবধি নিশ্চয়রূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। এ সম্বন্ধে তিব্বতীয় বিবরণ হইতে যেটুকু নির্দ্দেশ পাওয়া যায়—তাহাতে জানিতে পারা যায় যে উহা গঙ্গার অব্যবহিত দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল। অনেকের মত যে প্রাচীন চম্পা ও বর্ত্তমান ভাগলপুরের নিকটস্থ বর্ত্তমান সুল্তান-

(১) "ধর্ম্মাধর্ম্মাশ্রয়োঽধ্যক্ষো বিশেষগুণযোগতঃ।" (ভাষাপ° ৪৯)

(২) "যত্নো জীবনযোনিস্ত সর্ব্বদাতীন্দ্রিয়ো ভবেৎ।" (ঐ ১৫১)

(৩) "গুরুত্বাদৃষ্টভাবনা অতীন্দ্রিয়াঃ।" (ঐ ৯৩)
"স্থিতিস্থাপকসংস্কারঃ ক্ষিতৌ কেচিচ্চতুর্ষ্বপি।
অতীন্দ্রিয়োঽসৌ বিজ্ঞেয়ঃ।" (ঐ ১৫৮)

(৪) "জ্ঞানং যন্নির্ব্বিকল্পাখ্যং তদতীন্দ্রিয়মিষ্যতে।" (ভাষাপ° ৫৮)

(৫) "নন্বন্তঃকরণস্যেন্দ্রিয়ত্বায়াঽতীন্দ্রিয়ত্বাৎ কথং প্রত্যক্ষবিষয়তা? উচ্যতে—নতাবদন্তঃকরণমিন্দ্রিয়মিত্যত্র মানমস্তি।" (বেদান্তপরি°)

(৬) "পঞ্চেন্দ্রিয়াণি শব্দাদ্যা বিষয়াঃ পঞ্চ মানসম্।
ধর্ম্মায়তনমেতানি দ্বাদশায়তনানি চ॥"
(ষড়্‌দর্শন-সমুচ্চয়ে বৌদ্ধমতে ৮ম শ্লোক)

(৭) "জীবাজীবৌ তথা পুণ্যং পাপমাস্রবসংবরৌ।
বন্ধো বিনির্জরামোক্ষৌ নবতত্ত্বানি তন্মতে।"
(ষড়্‌দর্শন সমুচ্চয়ে— জৈনমতে ৪৭ শ্লোক)।

(৮) "সচ জীব এবেতি সিদ্ধঃ......প্রত্যক্ষলক্ষ্য আত্মা"
[পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের তর্করহস্যদীপিকাটীকা দ্র°]

* তিব্বতীয় বর্ষ—'অগ্নিবর্ষ', 'অশ্ববর্ষ', ইত্যাদি—বার্হস্পত্য সংবৎসর (Jupiter's Cycle) হইতে গণিত হয়। এই বর্ষচক্র ৬০ বৎসরের। এই অনুসারে দীপঙ্করের সংশোধিত কাল হইতেছে ৯৮২-১০৫৪ খৃষ্টাব্দ, ১০৪২-১১০২ খৃষ্টাব্দ নহে।

গঙ্গাই প্রাচীন বিক্রমশিলার অবস্থান নির্দ্দেশ করিতেছে। এই এই স্থানে গঙ্গাবক্ষে দুইটী শিলাময় দ্বীপ ছিল। কথিত আছে, সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে তৎপুত্র দেবগুপ্ত (পরে যিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য নামে খ্যাত হন) যখন চম্পার শাসকপদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি ঐ শৈলদ্বীপ দুইটীর উপরে মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করেন ও শৈলপৃষ্ঠে দেবদেবীর মূর্ত্তি ক্ষোদিত করান। আজও তাহার শিল্প-নিদর্শন বর্ত্তমান। পরে দেবগুপ্ত সম্রাট্ বিক্রমাদিত্য নামে খ্যাত হইলে এই স্থানটী তাঁহারই নামানুসারে বিক্রমশিলা নামে খ্যাত হয়। বহুকাল পরে বাঙ্গলার পালবংশীয় দ্বিতীয় নরপতি সুবিখ্যাত মহারাজ ধর্ম্মপাল (৭৮০-৮১৫) এই সুরম্য স্থানে একটী সুবিশাল ও সুন্দর বিহার রচনা করেন। ইহাই বিক্রমশিলা মহাবিহার বা সঙ্ঘারাম বলিয়া ইতিহাসে খ্যাত হয়। [বিক্রমশিলা দ্র°] ইহারই দক্ষিণে, অনতিদূরবর্ত্তী এক পাল-সামন্তরাজ্যে অতিশা শ্রীজ্ঞানের জন্ম হয়।* তাঁহার পিতার নাম কমলশ্রী ও মাতার নাম প্রভাবতী।

কথিত আছে, অতিশা প্রথমে জেতারি নামক এক ব্যক্তির নিকট, পরে আচার্য্য রাহুলগুপ্তের নিকট শিক্ষালাভ করেন। এই জেতারি সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার বিবরণ শুনা যায়। পগ্-সম্-জোন্-জঙ্-এ উল্লিখিত হইয়াছে, জেতারি বরেন্দ্রপতি সনাতনের জারজ পুত্র। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতে† জেতারি পালনরপতিগণের সামন্তরাজ সনাতনের ব্রাহ্মণ-সভাসদ্ গর্ভপাদের পুত্র। আবার কর্ডিয়ার সাহেব জেতারির স্বপ্রণীত একখানি তন্ত্রগ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন; উহাতে লিখিত আছে যে জেতারি গগনঘোষ নামক জনৈক আচার্য্যের পুত্র। ‡ এই সকল পরস্পরবিরোধী বিবরণ হইতে মনে হয়, জেতারির নিকট অতিশার শিক্ষালাভের কথা সন্দেহপূর্ণ। জেতারির নিকট শিক্ষালাভ করিয়া অতিশা কৃষ্ণগিরি-বিহারের আচার্য্য রাহুলগুপ্তের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন, এবং তাঁহারই নিকট হইতে সাধনমার্গে দীক্ষিত হন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। উনবিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমে অতিশা ওদন্তপুরী বিহারের আচার্য্য শীলরক্ষিত কর্ত্তৃক ভিক্ষুব্রতে দীক্ষিত হইলে তাঁহার নাম হয় 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান'।

ভারতীয় সাহিত্য হইতে দীপঙ্করের কথা বিশেষ কিছু জানা যায় না—এমন কি, 'অতীশা' বা 'অতিশা' নামেরও মূল কোথায় তাহাও পাওয়া যায় না। তাঁহার নাম "দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান" ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি তিব্বতে 'অতিশা' নামেই সমধিক পরিচিত। বৌদ্ধশাস্ত্রে ও তিব্বতীয় সাহিত্যে অনন্যসাধারণ পণ্ডিত সুবিখ্যাত বৌদ্ধভিক্ষু স্বামী ত্রিপিটকাচার্য্য রাহুল সংকৃত্যায়ন বিদ্যালঙ্কার * বলেন, তিব্বতীয়গণের মতে 'অতিশা' তিব্বতীয় নাম নহে, দীপঙ্করের ভারতীয় নাম-সমূহেরই অন্যতম। তিব্বতে যে বানান শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইতেছে 'অতিশা'। ভারতীয় সাহিত্যে যদি এই নামের মূল পাওয়া যাইত তাহা হইলে কোন গোলযোগ ছিল না। কিন্তু যতদিন তাহা না পাওয়া যাইবে, ততদিন এই নামের তিব্বতীয় রূপই একমাত্র গ্রাহ্য। 'অতীশ' নাম এতদ্দেশে প্রচলিত হইয়াছে বলিয়াই এস্থলে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে উক্ত নামেই অভিহিত করা হইল। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, এই নাম একান্ত অপ্রামাণ্য—দেশীয় পণ্ডিতগণের স্বকপোল-কল্পিত।

অতিশা নালন্দা, রাজগৃহ, বিক্রমশিলা, বজ্রাসন (বোধগয়া) ও এমন কি সুদূর সুবর্ণদ্বীপে (সুমাত্রা)† পর্য্যন্ত গিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করেন। অধুনা ইহা বিস্ময়কর বোধ হইলেও পালরাজগণের সময়ে ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই ছিল না। ধর্ম্মপাল ও দেবপালের (এবং আংশিক ভাবে মহীপালেরও) রাজত্ব হিমালয় হইতে বিন্ধ্যপর্ব্বত ও কামরূপ হইতে আরব-সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; নালন্দায় প্রাপ্ত দেবপালের তাম্রফলক হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে সুবর্ণদ্বীপের রাজা তাঁহাকে আপন অধীশ্বর বলিয়া মানিতেন। অতিশা দ্বাদশবর্ষ সুবর্ণদ্বীপে অবস্থান করিয়া তৎকালীন সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধ পণ্ডিত ধর্ম্মকীর্ত্তির নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করেন। অনন্তর তাম্রদ্বীপ বা সিংহলের পথে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নানা বৌদ্ধবিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া অবশেষে তিনি বিক্রমশিলার আটজন মহাপণ্ডিতের এক মহাপণ্ডিতরূপে তথায় অধ্যাপনাকার্য্য আরম্ভ করেন। তখন মহীপালের পরবর্ত্তী নরপতি নয়পালের রাজত্বকাল। অল্প সময়ের মধ্যে মহাযান-বৌদ্ধজগতে অতিশার অসাধারণ জ্ঞান, ধীশক্তি ও প্রতিভার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে।

খৃষ্টীয় একাদশ শতকের প্রারম্ভেই তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের নানা-

* তিব্বতীয় গ্রন্থ পগ্-সম্-জোন্-জঙ্-এর মতে অতিশা ৯৮০ খৃষ্টাব্দে গৌড়-দেশের বিক্রমণিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। এই বিক্রমণিপুর মগধের পূর্ব্বে অবস্থিত।

† M. M. Satishchandra Vidyabhusana—'History of Mediæval School of Indian Logic', p. 136.

‡ P. Cordier—Catalogue du fonds Tibétain de la Bibliothéque Nationale, Vol. III, p. 327.

* বর্ত্তমান প্রবন্ধে স্বামী ত্রিপিটকাচার্য্য 'রাহুল সংকৃত্যায়ন-লিখিত "তিব্বতমে বৌদ্ধধর্ম্ম" (আলাহাবাদের "হিন্দুস্থান একাডেমীর" ত্রৈমাসিক পত্রিকা "হিন্দুস্থানী"র ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত) প্রবন্ধ হইতে প্রভূত সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

† Dr. Bijan Raj Chatterjee—"India and Java" (Greater India Society Publication'), part I, pp. 22-28.

প্রকার অবনতি ঘটে। ভিক্ষুগণ কষ্টকর ও বাহুল্য বোধে ধর্ম্মচর্য্যা ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ প্রায় পরিত্যাগ করেন। মাত্র বর্ষাকালের তিনমাস কাল শ্রমণোচিত আচার কোন প্রকারে মানিয়া বৎসরের বাকীকাল স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে কাটাইতেন। তান্ত্রিকেরা মদ্যপান ও ব্যভিচারকেই ধর্ম্মচর্য্যার পরাকাষ্ঠা মনে করিতেন। মঠধারিগণ বেশভূষা ও আহার-বিহারের পূর্ণ বিলাসিতার মধ্যে আপনাদিগকে স্থবির বলিয়া ঘোষণা করিয়া তদুচিত পূজার দাবী করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। এই সময়ে তিব্বতের রাজবংশে একটী বিশেষ প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয়। ভিক্ষুগণ যেমন একদিকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়া বিলাসিতায় ও ব্যভিচারে লিপ্ত—অন্যদিকে বিলাসব্যসনে যাহাদের চিরকাল অধিকার সেই রাজবংশীয়গণের মধ্যে এই সময়ে ধর্ম্মচর্য্যা, ত্যাগ ও জ্ঞানপিপাসার একটা গভীর প্রেরণা দেখা দিয়াছিল। তিব্বত-রাজশক্তির প্রতিষ্ঠাতা রাজচক্রবর্ত্তী মহাবীর স্রোঙ্-রন্-স্ম-পো (৫৫৭-৬৭৮ খৃঃ)-বংশ প্রায় তিনশত বর্ষকাল উচ্চ সম্মান ও অপ্রতিহত প্রভাবের সহিত চক্রবর্ত্তিত্ব ভোগ করিয়া ৮৪১ খৃষ্টাব্দ হইতে অধোগামী হন। বৌদ্ধধর্ম্মও সেই সঙ্গে হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ভ্রাতৃহন্তা গ্লং-দরমার একবর্ষব্যাপী পৈশাচিক শাসনে এই অধঃপতনের পূর্ণ পরিণতি দেখা দেয়। তিব্বত রাজ্য ক্রমশঃ খণ্ডবিখণ্ড হইল। রাজগণ অযোগ্য কাপুরুষ, ভিক্ষুগণ অধঃপতিত। খোর-ব-চন্ পর্য্যন্ত যাহা কিছু বাঁচিয়াছিল তাহাও যাইতে বসিল। তিব্বত-রাজ্যে বিদ্রোহের কারণ ইঁহার অন্যতম পুত্র খ্রি-স্-কিদ্-(ল্)দে-ঞি-স-(ম্)গোন্ একশত অনুচরসহ লাসা ত্যাগ করিয়া পশ্চিম-তিব্বতে (ম)ঙ'-রিস্ নামক স্থানে আপন শক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজত্ব আরম্ভ করেন এবং বিবাহসূত্রে শক্তিবৃদ্ধি করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি কাশ্মীরের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত-সন্নিহিত স্থানগুলি অধিকার করিয়া রাজ্য-বিস্তার করেন এবং পরিণামে আপনার তিন পুত্রের মধ্যে রাজ্য ভাগ করিয়া পরলোকগমন করেন। তৃতীয় পুত্র (ল্)দে-গচুগ্-ম্গোনের জ্যেষ্ঠ পুত্র 'খোর-ল্দে স্বীয় রাজ্য আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্রোঙ্-ল্দেকে সমর্পণ করিয়া আপনার দুই পুত্র নাগরাজ ও দেবরাজের সহিত ভিক্ষুত্ব বরণ করিলেন। এই সময় হইতে তিব্বতে একটা নূতন যুগের সূচনা দেখা দিল।

ভিক্ষুত্ববরণ করিয়া খোর-ল্দে "য়ে-শেস-ডোদ" বা "জ্ঞানপ্রভ" নামে পরিচিত হইলেন। তিনি স্বয়ং বহু ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া ও আপনার পরিণত বিচারশক্তির ফলে বুঝিয়াছিলেন, তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের একটী অক্ষয়কীর্ত্তি এবং সে কীর্ত্তি যদি রক্ষা করিতে হয় তবে বৌদ্ধধর্ম্মকে তদানীন্তন অধঃপতিত অবস্থা হইতে উদ্ধার করা প্রয়োজন। কিন্তু এই অসাধ্যসাধন করিতে হইলে বৌদ্ধ (মহাযান) ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান ও তিব্বতে তাহার বিস্তৃত প্রচার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য জ্ঞানপ্রভ ২১ জন সুচরিত্র বুদ্ধিমান্ ও ধর্ম্মপ্রবণ তিব্বতীয় যুবককে কাশ্মীরে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য প্রেরণ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিব্বতীয়দিগের পক্ষে কাশ্মীরের উত্তাপ অসহ্যপ্রায় হওয়ায় ইঁহাদের মধ্যে তিনজন ব্যতীত আর সকলেই নানারূপ রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই ঘটনায় জ্ঞানপ্রভ অন্তরে অত্যন্ত আঘাত পাইলেন ও ক্ষণকালের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। পরে তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে ভারতের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গমন ও বাস করা তিব্বতীয়দিগের পক্ষে দুরূহ হইলেও ভারতবাসীদিগের পক্ষে তিব্বতে আগমন ও বাস তাদৃশ কষ্টকর ও মারাত্মক হইবে না। সুতরাং ভারতের সুবিখ্যাত কোন বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জনৈক মহাপণ্ডিতকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তিব্বতের অধঃপতিত বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরুদ্ধারসাধন অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য, এই ভাবিয়া অনেক বিচারের পর জ্ঞানপ্রভ বিক্রমশিলাবিহারের বৌদ্ধ-জগৎ-বিশ্রুত জ্ঞানী ও মহাপণ্ডিত অতিশা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নিকট লোকসহ এক আমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু অতিশা আসিলেন না। দ্বিতীয় বার লোকপ্রেরণের প্রচেষ্টা চলিতে লাগিল ও জ্ঞানপ্রভ দীপঙ্করকে আনিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় সঙ্কুলনার্থ সুবর্ণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে জ্ঞানপ্রভ একদা তিব্বতরাজ্যের সীমান্তে উপনীত হইলে প্রত্যন্তবাসী জনৈক রাজা তাঁহাকে বন্দী করেন। জ্ঞানপ্রভের উত্তরাধিকারী ব্যঙ্-ছু-প্-য়োদ্ অর্থ দ্বারা তাঁহার উদ্ধারসাধনে প্রবৃত্ত হইলে জ্ঞান-প্রভ প্রস্তাব করেন যে ঐ অর্থ তাঁহার জন্য ব্যয় না করিয়া ভারতীয় কোন মহাপণ্ডিতকে তিব্বতে আনিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কারকার্য্যে নিয়োজিত করা হউক। তদনুসারে রাজা বোধিপ্রভ দীপঙ্করকে তিব্বতে আমন্ত্রণ করিয়া পুনরায় দূত প্রেরণ করিলেন।

এবার দীপঙ্কর আর তিব্বত-গমনে অস্বীকার করিলেন না। জ্ঞানপ্রভের রাজ্যত্যাগ, সংসারত্যাগ প্রভৃতি মহান্ ত্যাগের কথা দীপঙ্করের কাণে পৌঁছিয়াছিল। ১০৪২ খৃষ্টাব্দে দীপঙ্কর তিব্বত যাত্রা করিয়া মঙ্-য়-রিস পৌঁছিলেন। ভোটদেশবাসীরা তাঁহার প্রভূত সম্বর্দ্ধনা করিল। নেপালের রাজা অনন্তকীর্ত্তিও তাঁহাকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করেন। নেপাল হইতে তিনি নয়পালকে একখানি ধর্ম্মোপদেশসংবলিত লিপি প্রেরণ করেন। ঐ লিপি 'বিমল-রত্নলেখ' নামে প্রসিদ্ধ। তৎপর কিছুদিন তিনি মানস-সরোবরের পশ্চিম প্রান্তে

অবস্থিত থো-লিং মঠে কালযাপন করিলেন। এইখানেই তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "বোধিপথপ্রদীপ" রচনা করেন। ১০৪৪ খৃষ্টাব্দে দীপঙ্কর স্পু-রঙ্‌স্‌ গমন করিলেন। এইখানেই তাঁহার সহিত তাঁহার ভাবী প্রধান শিষ্য ব্রোম-স্তোন বনাম গ্যাল্‌-বয়ি-য়ব্যুঙ্‌ গ্‌নসের (১০০৩—১০৬৪ খৃঃ) সহিত সাক্ষাৎ হয়। এই সময় হইতে ব্রোম-স্তোন দীপঙ্করকে তাঁহার গুরু বলিয়া মানিয়া লন ও শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকেন। দীপঙ্করের অনুগামী শিষ্যপরম্পরা তিব্বতে ব্‌ক'-দম-প সম্প্রদায় নামে খ্যাত হন। পরবর্ত্তী কালের তিব্বতীয় আচার্য্য চোঙ্‌-খ-পও (১৩৫৭—১৪১৯ খৃঃ) প্রথমে দীপঙ্কর-পন্থী ছিলেন এবং পরে পৃথক্ সম্প্রদায় গঠন করিলে উহা নবীন ব্‌ক'-দম-প বা নব-দীপঙ্কর সম্প্রদায় নামে পরিচিত হয়।



অতিশা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান [পাটনা মিউজিয়মে রক্ষিত মূর্ত্তি হইতে]

দীপঙ্কর আপন জীবনের শেষ ১৩ বৎসর তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার ও তিব্বতীয় ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থানুবাদ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেন। কিছুকাল পরে তিনি মুঙ্‌-য়-রিস হইতে গচঙ্‌ ও দবুস্ প্রদেশে গমন করেন। ১০৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্‌সময়সে উপনীত হন। তৎকালে ঐ স্থানের পুস্তকাগারের গ্রন্থসম্পদ্ দর্শন করিয়া দীপঙ্কর চমৎকৃত হন। ঐ পুস্তকাগারে তিনি এমন বহু গ্রন্থ দেখিতে পান যাহা ভারতের সুবিখ্যাত বৌদ্ধবিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থশালায়ও তৎকালে দুর্ল্লভ ছিল। ১০৫০ খৃষ্টাব্দে দীপঙ্কর য়ের-প গমন করেন ও ১০৫৪ খৃষ্টাব্দে 'কালচক্রে'র উপর তাঁহার সুবিখ্যাত টীকা রচনা করেন। ১০৫৪ খৃষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে লাসা হইতে অর্দ্ধদিনের পথে স্ঞে-থঙ্‌ নামক স্থানে বৌদ্ধজ্ঞানের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক বাঙ্গালী মহাপণ্ডিত অতিশা দেহরক্ষা করেন।

অতিশা যে কালচক্রের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা বজ্রযান নামেও পরিচিত। কালচক্রতন্ত্রে এই কালচক্রের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। কালচক্রতন্ত্রে তথাকথিত শম্ভল বা জম্ভল দেশের বৌদ্ধগণের কিছু পরিচয় আছে। সম্ভবতঃ শম্ভল বা জম্ভল দেশ মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত ছিল। এই দেশের নৃপতিদিগকে 'কৌলিক' বলা হইত। তিব্বতীয়গণ বলিয়া থাকেন যে, অতিশা এই সম্প্রদায় হইতে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা কালচক্রকে তুরস্কের দ্বাদশ পশুবিশিষ্ট চক্রের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। এই চক্র কাল বা সময় প্রদর্শনে ব্যবহৃত হইত।

Csoma de Körös এর মতে ১০২৫ খৃষ্টাব্দে কালচক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অতিশার ভক্ত লো-ইদান্-সেস্-রব্ কালচক্র লিপিবদ্ধ করেন। তিনি ১০৫৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় একাদশ শতকে বহু তন্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ ও টীকা রচিত হইয়াছিল। সে সমস্ত গ্রন্থ কেঙ্গুর ও তেঙ্গুর গ্রন্থপঞ্জীতে গৃহীত হইয়াছে। তেঙ্গুর গ্রন্থপঞ্জীতে অতিশারচিত ২০ খানি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আরও বহু তন্ত্রগ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

অতিশার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনার্থ কর্ত্তব্যানুরোধে তাঁহার শিষ্য ও ভক্তগণ কর্ত্তৃক একটী স্মৃতিস্তূপ নির্ম্মিত হয়। স্তূপটী এখনও রা-দেং নামক স্থানে অবস্থিত। রা-দেং তিব্বতীয় বৌদ্ধগণের একটী প্রধান তীর্থ। অতিশার প্রিয় শিষ্য দোম্-তোন্-পা ১০৫৬ খৃষ্টাব্দে রা-দেং-এর বিহার নির্ম্মাণ করেন। এই বিহার সেঙ্গে-তাগ পাহাড়ের নিকটে একটী উপত্যকায় অবস্থিত। বিহারটী শিল্পকার্য্যে ও গঠননৈপুণ্যে অপূর্ব্ব। বিহারের মধ্যে একটী সুবৃহৎ রৌপ্যনির্ম্মিত স্তূপে অতিশার চিতাভস্ম রক্ষিত। রা-দেং-এর সমুদয় দ্রব্যসম্ভারের মধ্যে ইহাই প্রধান।

বিহারের মধ্যবর্ত্তী গৃহে বহু তান্ত্রিক মূর্ত্তি আছে। উহাতে ভগবান্ বুদ্ধ বৌদ্ধদের তিনটী প্রতিশ্রুতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন; মৈত্রেয়ী সংসারাবর্ত্তনের পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন ও অন্য চারিজন দেবতা জীবনের চারিটী পর্য্যায় লক্ষ্য করিতেছেন। কথিত আছে, বিহারের মূর্ত্তিগুলি যখন শেষ করা হয় তখন দোম্-তোন্-পা তুষিতের দৈববাণী প্রাপ্ত হন। তাহাতে বিহারটী অতিশার নামে উৎসর্গ করিবার জন্য আদেশ করা হয়। ইহার পর তুষিত মৈত্রেয়ের পদতলে উপবিষ্ট অতিশার উপর পুষ্পবৃষ্টি করেন। দোম্-তোন্-পা প্রায় আট বৎসর কাল এই বিহারে অধ্যক্ষতা করেন।

তিব্বতীয় ভাষায় ভারতীয় বৌদ্ধগ্রন্থের অনুবাদকার্য্যে তাঁহার প্রধান সহায়ক ছিলেন [ছুল্-খি্রম্‌স্-গ্যাল্-ব, রিন্-ছিন্-ব্‌স-ঙ-পো, দ্গে-বয়ি-ব্‌লো-গ্রোস্ ও শাক্য-ব্‌লো গ্রোস্।] দীপঙ্কর শত শত গ্রন্থ অনুবাদ ও সংশোধন করিয়া তিব্বতে বিশুদ্ধ বৌদ্ধ (মহাযান) জ্ঞানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। সুবিখ্যাত দার্শনিক ভাব্যের (ভাববিবেক) দর্শনগ্রন্থ "মধ্যমকরত্নপ্রদীপ" ও উহার ব্যাখ্যা [চোন্-সেঙ্ ও নগ্-ছোর] দৌভাষিকতার সাহায্যে দীপঙ্করই তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। তিব্বতের গুজে প্রদেশস্থ 'নিরাভোগ' মহাবিহারে অবস্থানকালে অতিশা তাঁহার 'লোকাতীতসপ্তাঙ্গবিধি' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

সিদ্ধমহাপণ্ডিত অবধূতিপা (অদ্বয়বজ্র বা মৈত্রীপা) দীপঙ্করের বিদ্যাগুরু ছিলেন। ইনি তিব্বতে ভারতীয় চৌরাশী সিদ্ধের অন্যতম। এই চৌরাশী সিদ্ধদিগের মধ্যে আদি সিদ্ধদিগের বিরচিত বৌদ্ধ দোঁহা প্রভৃতিই প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার আদিম নিদর্শন বলিয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে অনেকে ইঁহাদিগকে মাগধী বলিয়া হিন্দী ভাষার আদিরচয়িতারূপে দাবী করিলেও ইতিহাস তাহা সম্পূর্ণ সমর্থন করে না। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে বাঙ্গালী ঐতিহাসিক "আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প"-রচয়িতার বিবৃতি ও বিশ্লেষণ অনুসারে নিঃসন্দেহরূপে জানা যায় যে ভাষা, সভ্যতা, ভব্যতা ও রাষ্ট্রতন্ত্রের দিক্ হইতে তথাকথিত মগধ গৌড়েরই অঙ্গবিশেষ ছিল। পূর্ব্বদক্ষিণে মগধ ও গয়ার উপর এবং উত্তর-পূর্ব্বে ত্রিহুত বা তীরভুক্তির উপর অন্ততঃ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক পর্য্যন্ত বঙ্গরাষ্ট্র ও বঙ্গীয় সভ্যতার অবিসংবাদী প্রভাবের নিদর্শনে ইহাই সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বর্ত্তমানে বিচ্ছিন্নীকৃত এই প্রাদেশিক খণ্ডগুলি চিরকালই বাঙ্গলার সভ্যতা ও রাষ্ট্রতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল; অন্ততঃ খৃষ্টীয় অষ্টম শতক হইতে এ বিষয়ে সংশয়ের কিছুমাত্র অবকাশ নাই। এই জন্য "মঞ্জুশ্রীমূলকল্প"-রচয়িতা বরাবর মগধ ও মিথিলাকে "গৌড়তন্ত্রের" অন্তর্ভুক্ত অঙ্গরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। পরন্তু এই গ্রন্থকার গুপ্তযুগের আরম্ভ হইতেই মগধাদিকে গৌড়তন্ত্রভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার বিবৃতি হইতে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে গুপ্তরাজবংশ বঙ্গদেশজ। বলা বাহুল্য, চম্পা বা ভাগলপুর জিলা ও মুদ্গগিরি বা মুঙ্গের জিলা চিরকালই বাঙ্গালার অন্তর্গত এবং ত্রিহুতে দ্বারবঙ্গ আজও প্রাচীন বাঙ্গলার উত্তর-পূর্ব্ব সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে।

[গ্রন্থপঞ্জী—C. F. Köeppen—Lamaisch Hierarchie und Kirche (Berlin, 1857—59); L. A. Waddell—Buddhism of Tibet (1895) also Lhasa (1905); J. A. S. B.—LX, pt. I; Pag-Sam Jon Zang—Ed. Sarat Chandra Das; Rockhill—Life of the Buddha; Bibliothica Buddhica; J. A. S. B., V, p. 108.]

অতীসার—(পুং) [অতি-স্ব-ঘঞ] রোগভেদ। [অতিসার দ্র°]

অতুঙ্গ—(ত্রি) বামন, ছোট। ২ নীচ, ক্ষুদ্র।

অতুন্দ—(ত্রি) [ন-তুণ অদনে অন্দাদি নি°] কৃশ, ক্ষীণ, পাতলা।

অতুন্দিল—(ত্রি) [ন-তুন্দ্-ইলচ্] অস্থূলোদর, অর্থাৎ যাহার স্থূলোদর নাই।

অতুর—(ত্রি) অত্বরমাণ। অক্ষক্রীড়ায় অক্ষপ্রক্ষেপের দ্বারা প্রতিবাদীকে জয় করিবার নিমিত্ত যিনি ত্বরান্বিত হয়েন না। ২ বিমৃশ্যকারী। "তুরাণামতুরাণাং বিশাং ভগঃ" (অথর্ব ৭.৫২.২)

অতুর২—(দেশজ) সংস্কৃতভাষায় আতুর। কাতর, বিহ্বল। ২ রোগগ্রস্ত পীড়িত। [আতুর দ্র°]

অতুল—(ত্রি) [নাস্তি তুলা তুলনা অস্য] তুলনারহিত।

"কন্যা পাবে কুতূহল, তুমি পাবে দানফল,
লোকে পাবে অতুল সম্মান।" (কবিকঙ্কণ)

২ শুভ্রবর্ণের সহিত যাহার উপমা হয় না।

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী—কলিকাতা সিতুলিয়া নিবাসী নিত্যানন্দের বংশোদ্ভব প্রভুপাদ স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী মহাশয়ের মধ্যম পুত্র। জন্ম ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ। সংস্কৃত, ভক্তিশাস্ত্র ও রসশাস্ত্রে ইঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। ইনি বাল্যকাল হইতে স্বর্গত তারকনাথ প্রামাণিক মহাশয়ের পৌত্র আশুতোষের সহাধ্যায়ী ছিলেন। ছয় বৎসর বয়স হইতে প্রামাণিকদের বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। উভয়ে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। বাল্যকাল হইতে সংস্কৃতানুরাগী। ইঁহাদের বাড়ীতে প্রতিদিন সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা শ্যামলাল গোস্বামী, দার্শনিক পণ্ডিত উপেন্দ্র মোহন গোস্বামী প্রভু ও প্রভুপাদ মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন। বড় বড় কথকেরা কথকতা করিতেন ও প্রথিতযশা কীর্ত্তনীয়ারা কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহাদের সাহচর্য্যে বালক অতুলকৃষ্ণের মনে ভক্তির বীজ উপ্ত হয়। কালে শাস্ত্রানুশীলনে উহা মহীরুহে পরিণত হইয়া বাঙ্গালা দেশের জনসাধারণকে তৃপ্তি দান করিতেছে। সংগীতশাস্ত্রেও ইঁহার যথেষ্ট জ্ঞান। সে বৎসর অখিল ভারত-সংগীত-সম্মেলনের অধিবেশন যখন কলিকাতায় হইয়াছিল, তখন পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন ও সংগীতশাস্ত্রের যে অভিভাষণ দিয়াছিলেন তাহাতে ইনি সংগীত-শাস্ত্র-বিশারদ একথা শ্রোতৃবর্গেরা একবাক্যে স্বীকার করেন। ইনি একজন সুগায়ক ও বাদক। ইঁহার মত বাগ্মীও বড় কম দেখা যায়। বৈষ্ণব-সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় ইঁহার প্রকাশিত প্রামাণ্য বৈষ্ণব গ্রন্থের টীকা হইতে বুঝিতে পারা যায়। বাঙ্গালা ভাষায় ইঁহার টীকাগুলি অমূল্য, বিশেষতঃ চৈতন্যভাগবতের ভৌগোলিক টীকা। নিম্নলিখিত বৈষ্ণব গ্রন্থের মূল ও তাহার উপাদেয় টীকা সহ প্রকাশিত হইয়াছে—

শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীলঘুভাগবত, ও শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত। টীকা ছাড়া ইনি রাসপঞ্চাধ্যায়ের পদ্যানুবাদ, শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর জীবনী এবং ভক্তের জয় গ্রন্থ ৪ খণ্ডে চারি উল্লাস প্রকাশ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন্নগর মন্দিরবাটীর মিত্রবংশীয় রাজকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতা ঠনঠনিয়ায় বাস করিতেন। তথায় তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান অতুলকৃষ্ণ মিত্র ১২৬৪ সনের ৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। অতুলকৃষ্ণের আরও চারি ভ্রাতা ও ছয় ভগিনী ছিল। অতুলকৃষ্ণ যখন মাত্র দশ মাসের শিশু, তখন সিপাহীবিদ্রোহের সূচনা হয়। এই নিমিত্ত রাজকৃষ্ণ সেই সময় কলিকাতার বাস পরিত্যাগ করিয়া, সপরিবারে স্বগ্রাম কোন্নগরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। অতুলকৃষ্ণের মাত্র চারি বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতা পরলোক গমন করেন।

অতুলকৃষ্ণ স্বগ্রামের পাঠশালায় ও বাঙ্গলা-বিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতার নর্ম্মাল-স্কুলে ভর্ত্তি হন। এখান হইতে ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হেয়ার-স্কুলে প্রবেশ করেন। এখানে তিন বৎসর কাল অধ্যয়নের পর তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর তিনি এক বৎসর কাল কলিকাতা আর্ট স্কুলে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু চিত্রকলার অনুশীলন তাঁহার মনঃপূত হইল না। তিনি আর্ট স্কুল পরিত্যাগ করিয়া অনন্যমনে ইংরাজী সাহিত্য, বিশেষতঃ কাব্য ও ইতিহাস আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এই সময় তিনি কবিতা রচনা করিয়া তদানীন্তন 'সুলভ সমাচার' 'সাহিত্যমুকুর' ও 'দূত' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে তৎসমুদয় প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন।

অতুলকৃষ্ণ পাঠ্যাবস্থায় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদে 'মালতী-মাধব', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে 'নবনাটক' এবং জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যাল মহাশয়ের বাটীতে ন্যাশানাল থিয়েটার কর্ত্তৃক (১২৭৯ সালে) 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ফলে, তাঁহার তরুণ চিত্ত নাটক অভিনয় করিয়া যশস্বী হইবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ও চঞ্চল হইয়া উঠে এবং তিনি নানাবিধ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া একটী অবৈতনিক নাট্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই নবপ্রতিষ্ঠিত নাট্য-সমাজে অভিনয় করিবার জন্য তিনি স্বয়ং অচিরেই 'পাগলিনী' নামে একখানি নাটক রচনা করিয়া প্রথম অভিনয় করেন। এই নাট্যসমাজ ক্রমে আরও অনেক

নাটক ও গীতি-নাট্য অভিনয় করিয়া দর্শক ও নাট্যামোদিগণের চিত্ত-বিনোদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

তদানীন্তন ন্যাশনাল থিয়েটার, মতবিরোধ বশতঃ—গ্রেট ন্যাশনাল ও ন্যাশনাল থিয়েটার—এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া প্রথম দল, এখন যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার অবস্থিত আছে সেইখানে এবং দ্বিতীয় দল মফঃস্বলের বিভিন্ন সহরে দর্শনী লইয়া অভিনয় করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় কলিকাতার ছাতুবাবুর দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও তাঁহাদের বাটীর সম্মুখে বেঙ্গল থিয়েটার নামে এক নাট্যশালা নির্ম্মাণ করেন। ফলতঃ এই সময় রঙ্গালয়ে অভিনয় প্রদর্শন করাইবার জন্য একটা প্রবল সাড়া পড়িয়া যায় এবং বারাঙ্গনা ও বালকগণ লইয়া অভিনয় করিবার প্রথা অবলম্বিত হয়। বিভিন্ন নাট্যসম্প্রদায় নিত্য নূতন নাট্যাভিনয় দ্বারা দর্শকগণের চিত্তবিনোদন করিতে অতিমাত্র আগ্রহান্বিত হইয়া পড়ে। এই সময় অতুলকৃষ্ণ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য 'আদর্শসতী' নামক নাটক রচনা করেন। নাট্যপরিকল্পনায় এবং ম্যানেজার রসরাজ অমৃতলাল বসু মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে অভিনয় নৈপুণ্যে ও ইহার দৃশ্যপটাদির নূতনত্বে, আদর্শসতী রঙ্গামোদী ব্যক্তি মাত্রেরই চিত্তবিনোদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বলিতে কি, এই নাটকখানি পূর্ণ এক বৎসর কাল প্রতি সপ্তাহে অভিনীত হইয়াছিল। তথাপি ইহার প্রতি অভিনয়-রজনীতে জন-সমাগমের ন্যূনতা পরিলক্ষিত হয় নাই।

ইহার পর অতুলকৃষ্ণ প্রতাপচন্দ্র জহুরীর কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত ন্যাশনাল থিয়েটারের নিজস্ব নাট্যকাররূপে নিযুক্ত হইয়া (১৮৮৭ খৃঃ) 'রত্নবেদী বা অপ্সরা-কানন' নামক গীতিনাট্য এবং 'পিশাচিনী' ও 'ভীষ্মের শরসজ্জা' প্রভৃতি নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই নাট্যশালা কিছু দিন পরে উঠিয়া গেলে তিনি 'আন্দোলন' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা পরিচালন করেন। অতঃপর তিনি 'ধর্ম্মবীর মহম্মদ' নামে একখানি নাটক রচনা করিয়া ঢাকা-থিয়েটারে অভিনয় করান। কিন্তু আপত্তিজনক বলিয়া অচিরেই এই নাটকখানির অভিনয় বন্ধ হইয়া যায়।

অতঃপর বীডন ষ্ট্রীটের পুরাতন ষ্টার থিয়েটারের স্থলে গোপাল লাল শীল কর্তৃক এমারেল্ড থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইলে, অতুলকৃষ্ণ সহকারী ম্যানেজার ও নাট্যকাররূপে ইহার পরিচালন-ভার গ্রহণপূর্ব্বক 'তুলসীলীলা' ও 'নন্দকুমারের ফাঁসী' নামক নাটক প্রণয়ন করেন। এই সময় অতুলকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতিনাটক 'নন্দবিদায়' রচিত হয়। অতঃপর ক্রমে ক্রমে তাঁহার—'নন্দোৎসব' 'নিত্যলীলা' 'আমোদ প্রমোদ', 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না', 'গাধা ও তুমি', 'মা (ফুল্লরা)', 'বক্কেশ্বর' ও 'বিধবা কলেজ' প্রভৃতি গীতিনাট্য, পঞ্চরং ও প্রহসন প্রভৃতি রচনা করেন। 'বক্কেশ্বর' ও 'বিধবা কলেজ' দুই রাত্রি অভিনীত হইবার পর পুলীশ কর্তৃপক্ষের আদেশে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। অপর কোন অভিনেতা সম্মত না হওয়ায়, অতুলকৃষ্ণ স্বয়ং বক্কেশ্বর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া অতি দক্ষতার সহিত অভিনয় করেন।

গোপাললাল শীল মহাশয় 'এমারেল্ড' থিয়েটারের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিলে, প্রথমে মতিলাল সুর প্রভৃতি এবং পরে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ও তিনি নিজে এই থিয়েটারের লীজ্ গ্রহণ করেন। অতুলকৃষ্ণ ইহার ম্যানেজার নিযুক্ত হন। ইহার কিছু দিন পর এই রঙ্গমঞ্চ ভাড়া লইয়া নীলমাধব চক্রবর্ত্তী 'সিটি' থিয়েটার খুলিলে, ইহাতে অভিনয়ের জন্য অতুলকৃষ্ণ বঙ্কিম চন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী', ও 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রভৃতি নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত করেন। এই সময় তিনি কলিকাতা কম্বুলিয়াটোলার এক যাত্রার দলের জন্য 'বালিবধ' নামে একখানি নাটক রচনা করিয়া দেন। এই দলে তিনি স্বয়ং বালির ভূমিকায় দুই একবার অভিনয়ও করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক যখন সর্ব্ব-প্রথম সাপ্তাহিক "বসুমতী" প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময় অতুলকৃষ্ণ কিছুদিন ইহা সম্পাদন করিয়াছিলেন। "বসুমতীর" প্রথম বর্ষের উপহার রূপে অতুলকৃষ্ণের গ্রন্থাবলী বিনামূল্যে গ্রাহকগণ মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল।

ইহার পর তিনি গুরুপ্রসাদ মৈত্রের প্রতিষ্ঠিত 'অরোরা' থিয়েটারের নাট্যকাররূপে নিযুক্ত হন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া ইহাতে অভিনয় করান। কিছু দিন গত হইলে, তিনি গোপাললাল শীল মহাশয়ের ষ্টেটে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বিপুল উদ্যমে 'ক্লাসিক' থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করিলে অতুলকৃষ্ণ ইহার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের—'মৃণালিনী' এবং পরে 'যুগলাঙ্গুরীয়' অবলম্বনে 'হিরণ্ময়ী-গীতিনাট্য' প্রণয়ন করেন। এই দুইখানি নাটক তখন নাট্যামোদীদিগের নিকট যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। ইহার পর তিনি রামপুর-বোয়ালিয়ার জমীদার ললিতমোহন মৈত্রের ষ্টেটে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন। এই স্থানে অবস্থানকালে তিনি অমরেন্দ্রনাথের নবপ্রতিষ্ঠিত 'গ্র্যাণ্ড' থিয়েটারে অভিনীত হইবার জন্য 'বাপ্পা রাও' নামক নাটক রচনা করেন। রামপুর-বোয়ালিয়ার অবস্থানকালেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়।

অতঃপর তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া 'শিরী-ফরহাদ'

নামক গীতি-নাট্য প্রণয়ন করেন। ইহা শ্রীমনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় কর্ত্তৃক অদম্য উৎসাহে পরিচালিত মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইয়া দর্শকবৃন্দের যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। পরে তিনি মনোমোহন বাবু কর্ত্তৃক মিনার্ভা-থিয়েটারের নিজস্ব গীতিনাট্যকার রূপে নিযুক্ত হইয়া এই থিয়েটারের জন্য ক্রমে ক্রমে—'লুলিয়া', 'তুফানী', 'হিন্দাহাফেজ', 'ঠিকে ভুল', 'পাষাণে প্রেম', 'রংরাজ' ও 'শাহাজাদী' প্রভৃতি গীতি-নাট্য রচনা করিয়া প্রভূত যশোলাভ করেন।

এতদ্ব্যতীত তিনি বিভিন্ন সময়ে—'গোপীগোষ্ঠ', 'প্রণয়কানন' বা 'প্রভাস', 'বুড়োবাঁদর', 'বিজয়া', 'প্রেমকল্পতরু', 'আয়েষা' 'দমবাজ', 'আসল ও নকল', 'জেনোবিয়া', 'প্রাণের টান', 'কলির হাট', 'যুগলমিলন' ও 'সপত্নী' (ঐতিহাসিক নাটক) প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন এবং 'দুলালচাঁদ', 'হতভাগিনী' ও 'মায়া' নামে গল্প রচনা করিয়া গিয়াছেন। অতুলকৃষ্ণের এইরূপ অজস্র দানের ফলে, বঙ্গের নাট্য-সাহিত্য যথেষ্ট পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

অতুলকৃষ্ণ এতগুলি নাটক রচনা করিয়াও অর্থসঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি নিঃসন্তান পত্নীকে রাখিয়া ১৩১৫ সালের ১লা আশ্বিন কলিকাতা ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীটে দেহত্যাগ করেন।

অতুলনা—(স্ত্রী) উপমার অভাব ; নিরুপমা।

অতুলনীয়—(ত্রি) অনুপম ; তুলনারহিত।

অতুলপ্রসাদ সেন—একজন প্রসিদ্ধ কবি ও রাজনীতিবিৎ। তাঁহার পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মাদারীপুর সবডিভিজনের অধীন মগর বা মাইগার গ্রাম। তাঁহার পিতা রামপ্রসাদ সেন মহাশয় ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরে ডাক্তারি করিতেন। অতুলপ্রসাদ ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা স্কুলে পাঠ সমাপন করিয়া কলিকাতায় কলেজে অধ্যয়নপূর্ব্বক ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য বিলাত-যাত্রা করেন। যথাসময়ে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে কয়েক বৎসর কাজ করিবার পর, লক্ষ্ণৌ সহরে চিফকোর্টে স্থায়িভাবে ব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হন। অত্যল্পকাল মধ্যেই অতুলপ্রসাদ এখানে বিপুল প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং ব্যবহারজীবিগণের মধ্যে অগ্রণী বলিয়া পরিগণিত হন। কালক্রমে তিনি প্রধান আইনজ্ঞ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে, তথাকার বার-এসোসিয়েসনের সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হন। লক্ষ্ণৌতেই তিনি বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া স্থায়িভাবে বাস করিতেছিলেন। যে রাস্তার উপর তিনি বাড়ী নির্ম্মাণ করেন, লক্ষ্ণৌ মিউনিসিপালিটি তাঁহার সম্মানার্থ তাহার নাম রাখেন—'অতুলপ্রসাদ রোড'।

অতুলপ্রসাদ বহু অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তদনুরূপ অর্থ সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি অজস্র দান করিতেন। কোন সৎকর্ম্মে সাহায্যের জন্য আবেদন বা কোন বিপন্নের কাতর প্রার্থনা তিনি উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে ১৯৩১ সালের ৩রা মে তারিখে তিনি যে চরম নির্দ্দেশপত্র লিপিবদ্ধ করেন, তাহা হইতে তাঁহার দানের পরিমাণ কতকটা বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার নির্দ্দেশমত—(১) তাঁহার পত্নী মাসিক একশত টাকা, এবং উইলে নির্দ্দিষ্ট অন্যান্য দাতব্য কার্য্যে ঐ অর্থ আনুমানিক হারে ব্যয় করা হইবে, (২) একমাত্র পুত্র—শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার সেন আজীবন মাসিক একশত টাকা ও তাঁহার দেয় জীবনবীমার প্রিমিয়ম, এবং পূর্ব্বোক্তরূপে বা অন্যান্য দাতব্য কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে—(ক) রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম, (খ) কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, (গ) ঢাকা ঐ, (ঘ) পৈতৃক বাস মাইগার গ্রাম বা উহার নিকটবর্ত্তী পল্লীস্থ গুরুগ্রাম-হাই-স্কুল এবং (ঙ) ব্রাহ্ম প্রচারকের সাহায্য—এই সকল অনুষ্ঠান প্রত্যেকে মাসিক ২৫৲ টাকা হিসাবে ; (চ) লক্ষ্ণৌ বেঙ্গলী গার্লস্ হাই স্কুল মাসিক ১৫৲, (ছ) বেঙ্গলী ক্লাব মাসিক ১০৲, (জ) মুসলমান এতিমখানা মাসিক ৫৲ এবং (ঝ) হিন্দু বা আর্য্য-সমাজের কোন অনাথাশ্রমের জন্য মাসিক ৫৲ হিসাবে প্রদত্ত হইবে। এতদ্ব্যতীত ট্রাষ্টিগণ তাঁহাদের বিবেচনামত অন্যান্য দাতব্যকর্ম্মেও অর্থসাহায্য করিতে পারিবেন।

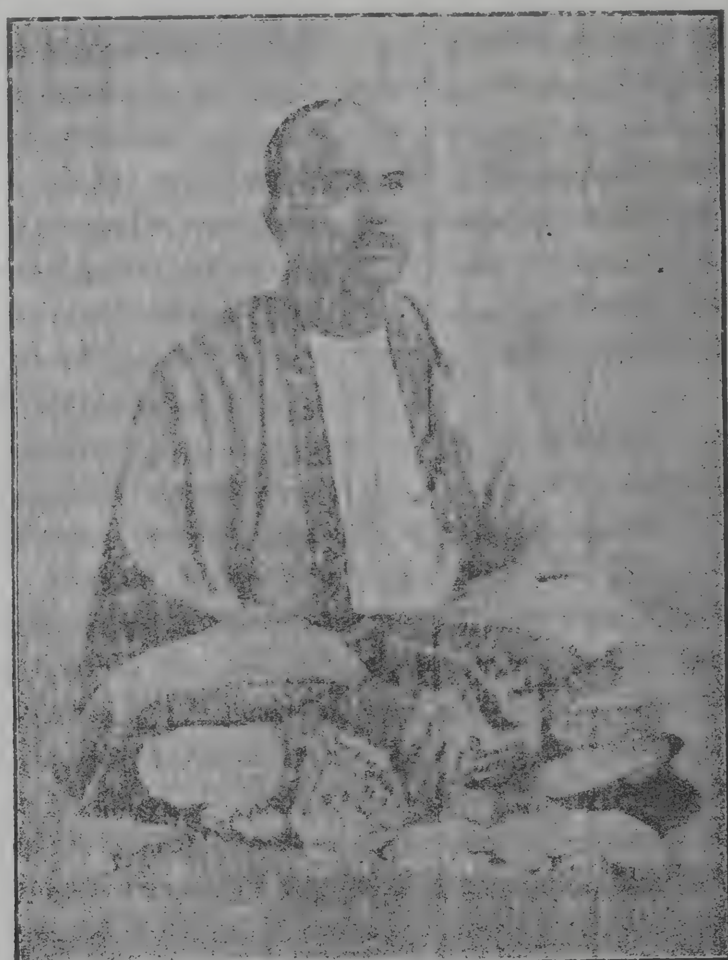
অসাধারন আইনজ্ঞ ও প্রচুর ধনশালী ছিলেন বলিয়াই যে তিনি লক্ষ্ণৌ সহরে যথেষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হইতেন, তাহা নহে। তিনি অতি অমায়িক সজ্জন, বিদ্বান্ এবং সর্ব্ববিধ জনহিতকর প্রচেষ্টা ও সদনুষ্ঠানের সহায়ক ও সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন ছিলেন। এই সকল গুণের জন্য তিনি লক্ষ্ণৌ সহরে প্রধান নাগরিকের (First Citizen) সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার ও বিস্তারের জন্য চিরসচেষ্ট ছিলেন।

অতুলপ্রসাদ যেমন আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশকে নিজের বাস-ভূমি করিয়াছিলেন, এই প্রদেশের জনসাধারণও তেমনি তাঁহাকে নিতান্ত আপনার জন বলিয়া সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই প্রদেশের প্রবাসী বাঙ্গালীদের নেতা বলিয়া তিনি স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তথাকার বহুবিধ সামাজিক ও সংস্কৃতিমূলক ব্যাপারে, বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ ও শিক্ষাবিস্তার কার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। ফলতঃ বাঙ্গালার বাহিরে যাঁহারা বাঙ্গালীর সম্ভ্রমরক্ষা বা মর্য্যাদাবৃদ্ধি করিয়াছেন অতুলপ্রসাদ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ব্যক্তি।

অতুলপ্রসাদ রাজনীতিক্ষেত্রে উদারনীতিক ছিলেন। তিনি সমগ্র ভারতীয় উদারনৈতিক সঙ্ঘের একটী অধিবেশনের সভাপতি. আগ্রা-অযোধ্যা-প্রাদেশিক উদারনৈতিক সভার সভাপতি ও এই প্রদেশের উদারনৈতিক কন্‌ফারেন্সের দুইটী অধিবেশনের সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি পাঁচ বৎসরকাল লক্ষ্ণৌ মিউনিসিপাল বোর্ডের ভাইস্‌-চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

যুক্তপ্রদেশের শিক্ষাবিস্তারকার্য্যে তিনি চির-অবহিত ছিলেন। তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকরী সভার সদস্য ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্‌সেলার-পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই প্রভূত সম্মানজনক পদ নিজে গ্রহণ না করিয়া, অপরকে দিবার অনুরোধ করেন। তিনি 'বাঙ্গালী তরুণ সমিতির', 'অযোধ্যা সেবাসমিতির' ও 'বয়েজ স্কাউট্‌ এসোসিয়েসনের' সভাপতি হইয়াছিলেন।

মহাত্মা অতুলপ্রসাদ বঙ্গবাসীর নিকট একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সঙ্গীত-রচয়িতা ও কবি বলিয়াই ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত। তিনি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রথম প্রথম প্রেমগীতি রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি প্রেমাত্মক গীত রচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি সুগায়ক ছিলেন—তিনি প্রাণের গভীর আবেগে যে সকল গান ও কবিতা রচনা করিতেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরের প্রকৃত মর্ম্মবেদনা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিত। তাঁহার—(ক) "হও ধরমেতে বীর, হও করমেতে ধীর, হও উন্নতশির, নাহি ভয়" ইত্যাদি, (খ) "বল বল বল সবে, শত বীণা বেণু রবে, ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে" ইত্যাদি, (গ) "উঠগো ভারতলক্ষ্মী জগতজনপূজ্যা, দুঃখ দৈন্য: সব নাশি কর দূরিত ভারতলজ্জা" —প্রভৃতি জাতীয় সঙ্গীতগুলি বঙ্গীয় জনসমাজে যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তিনি বহু ব্রাহ্ম-সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। তাঁহার বাউল সুরে রচিত—"নীচুর কাছে নীচু হতে শিখলি নারে মন" গানটীতে দীন-দরিদ্রের প্রতি তাঁহার হৃদয়ের স্নেহ সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।



অতুলপ্রসাদ সেন

অতুলপ্রসাদের কতকগুলি গান ও কবিতা—'কাকলী', 'কয়েকটী গান' ও 'গীতিকুঞ্জ' নামক পুস্তকত্রয়ে মুদ্রিত হইয়াছে। কবিতা ও জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতারূপে তাঁহার খ্যাতি বঙ্গভাষাভাষী বৃহত্তর বঙ্গের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।

জন্মভূমি হইতে বহুদূরে রহিয়াও তিনি মাতৃভাষা ও সাহিত্যের কথা ক্ষণকালের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে যাহাতে মাতৃভাষায় ও সাহিত্যের চর্চ্চা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য তিনি নিয়ত সচেষ্ট থাকিতেন। তাহারই ঐকান্তিক চেষ্টা ও উদ্যোগে—'প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন' অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। এই প্রবাসী সম্মিলনের কাণপুর ও লক্ষ্ণৌর অধিবেশনে তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি কএকবর্ষ ধরিয়া প্রবাসী বাঙ্গালীর "উত্তরা" নামক প্রসিদ্ধ মাসিক-পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন।

অতুলপ্রসাদের পত্নী শ্রীযুক্তা হেমকুসুম সেন স্যর্ কে. জি. গুপ্ত মহাশয়ের কন্যা। তাঁহার দুই ভগিনীর মধ্যে শ্রীমতী কিরণ বসু National Council of Women for Indiaর সেক্রেটারী এবং অপর ভগিনী মিসেস্ হিরণ আয়েঙ্গার মাদ্রাজবাসিনী।

অতুলপ্রসাদ কএক বৎসর ধরিয়া 'ব্লাডপ্রেসার' রোগে ভুগিতেছিলেন। তিনি মাত্র ৬৩ বৎসর বয়সে গত ৮ই ভাদ্র ১৩৪১ সাল (১৫ই আগষ্ট ১৯৩৪) রাত্রি ৯-৪৫ সময় পক্ষাঘাত রোগে লক্ষ্ণৌ সহরে পরলোক গমন করেন। তাঁহার লোকান্তর-গমনের পর সমগ্র দেশবাসী বহু সভাসমিতি করিয়াই তাঁহাদের জনপ্রিয় কবি অতুলপ্রসাদের বিয়োগে শোকপ্রকাশ করিয়াছেন।

অতুলমূর্ত্তি—(স্ত্রী) [অতুল-মূর্চ্ছ-ক্তিন্] যে আকৃতির তুলনা করা যায় না।

অতুলিত—(ত্রি) উপমারহিত। "পরব্রহ্ম রূপ নিরুপম!—অতুলিত শোভাপূর্ণ কৈলাসভুবন মাঝে।" (বৃত্রস°)

অতুল্য—(ত্রি) [তুলয়া সম্মিতং তুলা-যৎ, তুল্যং। (পা ৪.৪.৯১) ততো নঞ্-তৎ] অসদৃশ, অসমান; অনুপম। "খুলে ব্রহ্মলোক অতুল্য তোরণ আজি ব্রহ্মলোকবাসী।" (হেমচন্দ্র বন্দ্যো°)

অতুষ—(ত্রি) [নাস্তি তুষো যস্য বহুব্রী] অবঘাতাদি দ্বারা নিস্তুষীকৃত ধান্যাদি, অর্থাৎ যে সকল শস্যের খোসা তুলিয়া দেওয়া হয়। "অতুষানিব যবান্ কৃত্বা" (শতপথব্রা° ২.৫.২.১৪)

অতুষ্টি—(স্ত্রী) [ন-তুষ-ক্তিন্] অসন্তোষ, বিরক্তি। ২ বৈরাগ্য।

অতুষ্টিকর—(ত্রি) [ন-তুষ্টি-কৃ-ট, (পা ৩.২.১০)] অসন্তোষ-কর। অপ্রীতিকর। অরুচিকর।

"মৃয্যন্তি যে চোপপতিং স্ত্রীজিতানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
অনির্দশঞ্চ প্রেতান্নমতুষ্টিকরমেব চ।" (মনু ৪.২১৭)

অতুহিনরশ্মি—(পুং) [ন তুহিনো ন শীতল উষ্ণো রশ্মিঃ কিরণোঽস্য] যাহার কিরণ শীতল নহে; সূর্য্য। [অতুহিনঃ ন তুহিনো ন শীতল উষ্ণো রশ্মিঃ কিরণঃ। কর্ম্মধা°] উষ্ণ কিরণ।

অতূর্ত্তুজ—(ত্রি) অদাতা, অযজমান। (ঋক্ ৭.২৮.৩) 'অতূর্ত্তুজমদাতারমযজমানং' (সায়ণ) ২ অসুন্দর। ৩ অক্ষিপ্র-গামী; মন্দগামী।

অতূর,—মাদ্রাজের সালেম জেলার একটী তালুক। অক্ষা° ১১° ১৯' হইতে ১১°৫২' উ°; দ্রা° ৭৭°৪৪' হইতে ৭৮°৫৫' পূ°। পরিমাণ—৭৮০ বর্গ-মাইল। অধিবাসীর অধিকাংশই হিন্দু। বর্ত্তমানে অধিক সংখ্যক অধিবাসীই কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। গ্রামসংখ্যা ১৯৫।

অতূর তালুক সালেম জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। উহার তিন দিক গিরিশ্রেণী দ্বারা পরিবেষ্টিত। পয়থূর মলয় গিরিশ্রেণী অতূরের মধ্য দিয়া প্রসারিত। উহাদের মধ্যে বেল্লর বা বশিষ্ঠনাথী নদী ও স্বাথনাথী নদী প্রবাহিত। পয়থূর গিরিশ্রেণীতে প্রচুর লৌহ সংগৃহীত হয়। এই সমুদয় স্থান পূর্ব্বে ছোট ছোট রাজাদের অধীনে ছিল।

পেরিয়া পাহাড়ের করি রামন প্যাগোডা একটী বিশেষ তীর্থস্থান। সালেম হইতে কুঙ্গলোর পর্য্যন্ত বড় রাস্তা এই তালুকের মধ্য দিয়া গিয়াছে। প্রধানতঃ এই রাস্তা দিয়াই যাতায়াত হইয়া থাকে। প্রধান নগরসমূহ—অতূর, থমমপত্তি, ও বীরগবূর। এতদ্ভিন্ন আরও চারিটী উল্লেখযোগ্য নগর বর্ত্তমান। প্রধান উৎপন্ন শস্য ছোলা ও যব। ইহা ছাড়া চাউলও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বালপাদির চন্দন প্রসিদ্ধ। তথায় বহুল চন্দনবৃক্ষ জন্মে।

অতূর,—নামান্তর 'অত্তিনূর' বা 'অতূর'। 'অত্তিনূর' অর্থে নদী-তীরস্থ গ্রাম। অক্ষা° ১১°৩৫'৫০" উ°; দ্রা° ৭৪°৩৯' পূ°। কুঙ্গলোর হইতে সালেম পর্য্যন্ত রাস্তার উপর অবস্থিত। ইহা বশিষ্ঠনাথী নদীর তীরে বর্ত্তমান। শকট প্রস্তুত, লৌহদ্রব্য ও নীলের জন্য বিশেষতঃ উল্লেখযোগ্য। শস্যাদির ব্যবসা ভিন্ন বিশেষ কিছু ব্যবসা হয় না। স্থানীয় নদীর জল অস্বাস্থ্য-কর; নদীর উত্তর তীরে সুবৃহৎ দুর্গ বর্ত্তমান; উহার প্রাচীর প্রস্তরনির্ম্মিত। হাইদার আলির যুদ্ধের জন্য এই দুর্গ প্রসিদ্ধ। তাঁহার সালেম হইতে শঙ্করীদুর্গে গমনকালে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে ইংরেজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। হাইদারের পুত্র টিপুর সহিত যুদ্ধকালেও ইহা ইংরেজ কর্ত্তৃক পুনরধিকৃত হইয়াছিল।

অতূর৩—মাদ্রাজের তিন্নেবেলী জেলার একটী গ্রাম। অক্ষা° ৮°৩৭'৩০" উ°; দ্রা° ৭৮°৬'৩০" পূ°। তাম্রপর্ণী নদীর মোহানার নিকট অবস্থিত।

অতূর৪—মাদ্রাজ প্রদেশস্থ মদুরা জেলার একটী নগর। অক্ষা° ১০°১৬' উ°; দ্রা° ৭৭°৫৩' পূ°। দিন্দিগুলের ১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

অতূর্ণ—(ত্রি) [ন-ত্বর-ক্ত জঠ্] ত্বরা বা শীঘ্র নহে; মৃদু।

অতূর্ত্ত—(ত্রি) [ন তূর্য্যতে তুরী হিংসায়াং ক্ত, ঈদিত্বান্নেট্] অহিংসিত। (ঋক্ ৮.৯৯.৭)

অতূর্ত্তদক্ষ—(ত্রি) অভিলাষপ্রদ। ২ অহিংসমতিবিশিষ্ট। ৩ বৈদিক সম্বোধনান্ত পদবিশেষ। সায়ণাচার্য্য "হে অতূর্ত্তদক্ষা' এইরূপ সম্বোধনান্ত পদ ভাষ্যে প্রয়োগ করিয়াছেন। "অতূর্ত্তদক্ষা বৃষণা বৃষণ্বসূ" (ঋক্ ৮.২৬.১)

অতূর্ত্তপথিন্—(ত্রি) [অতূর্ত্তস্ত্বরারহিতঃ পন্থা যস্য সঃ] যিনি নিয়তগতিহেতু ত্বরমাণ হইয়াও অনিয়ত গতিবিশিষ্ট হইয়া থাকেন। ২ সূর্য্য বৃহৎ রথে আরোহণ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ গমন করেন বলিয়া তাঁহাকে 'অতূর্ত্তপন্থাঃ বলা হইয়া থাকে। "অতূর্ত্তপন্থাঃ পুরুরথো অর্য্যমা সপ্তহোতা বিষুরূপেষু জন্মসু" (ঋক্ ১০.৬৪.৫) ৩ অপ্রতিহত গতি; অহিংসিত গতি। ৪ বায়ু; বায়ুর গতি অপ্রতিহত বলিয়া বায়ুকেও 'অতূর্ত্তপন্থা' বলা হইয়াছে। "শৃণোত্বতূর্ত্তপন্থা অসুরো ময়োভুঃ" (ঋক্ ৫.৪২.১)

অতৃণাদ—(ত্রি) [ন তৃণং শষ্পাদিকমত্তীতি তৃণ্-অদ-অণ্। নঞ্ উপপদ] যে তৃণ খায় না। দুগ্ধপোষ্যমাত্র গবাদি বৎস। "অথ বৎসং জাতমাহুরতৃণাদ ইতি" (শতপথব্রা° ১৪.৪.৩.৫)

অতৃদিল—(পুং) তৃদ্-(তৃদির হিংসায়াম্)-কিলচ্। [ন তৃদ্যতে বধ্যতে। নঞ্-তৎ] বধ করিবার যোগ্য নহে। পর্ব্বত। "তৃদিলা অতৃদিলাসঃ" (ঋক্ ১০.৯৪.১১)

অতৃপ—(ত্রি) অসন্তুষ্ট, অতৃপ্ত। "ক্ষুধুনাতৃপাসঃ" (ঋক্ ৪.৫.১৪)

অতৃপ্ত—(ত্রি) অসন্তুষ্ট, বিরক্ত; তৃপ্তিহীন। "অতৃপ্তোযৌবন-স্যাহম্।" (মহাভা°)

অতৃপ্তি—(স্ত্রী) [ন তৃপ্তিঃ সন্তোষঃ। অভাবার্থে নঞ্-তৎ।] তৃপ্তির অভাব, অপরিতোষ। [নাস্তি তৃপ্তির্যস্য; বহুব্রী] (ত্রি) ২ তৃপ্তিরহিত। ৩ অসন্তোষযুক্ত। ৪ লোলুপ।

অতৃষ—(ত্রি) তৃষ্ণাশূন্য।

অতৃষিত—(ত্রি) অতৃষান্বিত, পিপাসার্ত্ত নহে, তৃষ্ণারহিত। "সুপীবসো অতৃষিতা অতৃষ্ণজঃ" (ঋক্ ১০.৯৪.১১)

অতৃষ্ণজ্—(ত্রি) নিস্পৃহ, স্পৃহাশূন্য; আকাঙ্ক্ষাহীন। "সুপীবসো অতৃষিতা অতৃষ্ণজঃ।" (ঋক্ ১০.৯৪.১১)

অতৃষ্ণুবন্ত—(ত্রি) ভোগে অতৃপ্ত, ভোগবিলাসে যে তৃপ্ত হয় না। "অতৃষ্ণুবন্তং বিয়তমবুধ্যম্" (ঋক্ ৪.১৯.৩)

অতৃষ্য—(ত্রি) [তৃষং পিপাসাং অর্হতীতি ন তৃষ্যঃ] তৃষ্ণা-বর্জ্জিত, পিপাসা যাহাকে পীড়িত করেনা।

"অক্ষুধ্যা অতৃষ্যা স্ত গৃহা মাস্মদ্ বিভীতন" (অথর্ব্ব° ৭.৬২.৪)

অতৃষ্যন্ত—(ত্রি) তৃষ্ণারহিত। ২ বিষয়ান্তরে তৃষ্ণাশূন্য, অর্থাৎ যিনি বিষয়াভিলাষ ত্যাগ করিয়াছেন। "অতৃষ্যন্তীর-পসোঃ" (ঋক্ ১.৭২.৩ সায়ণ)

অতেক—রুসীয় তুর্কীস্তানের একটী প্রদেশ; খোরাসানের সীমান্ত পর্ব্বতসমূহের উত্তরসানুদেশে গজোরস্ এবং দুশাক নামক আধুনিক দুইটী রেলষ্টেশনের মধ্যে অবস্থিত। 'অতেক' নামটী তুরুষ্ক ভাষায় 'এতেক' (প্রান্তসীমা) হইতে উৎপন্ন। পারস্যভাষায় এই স্থানের নাম 'দামন্-ই-কোহ' (পর্ব্বতের পাদ-দেশ) ছিল, কিন্তু সাধারণতঃ পারসীকগণ 'আতক' নামেই ইহাকে অভিহিত করেন। মধ্যযুগে এইস্থান খোরাসানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে খ্বারিজ্মের খানেরা ইহা অধিকার করেন; তৎপরে ইহা তুর্কীদের হস্তে যায়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইহার কিয়দংশ পারস্য সাম্রাজ্যের অধীন কলাত প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রুস সাম্রাজ্যের অধীনে এখন ইহা তেৎজেন বিভাগের অন্তর্গত।

অতেজস্—(ক্লী) [ন তেজঃ, বিরোধার্থে নঞ্-তৎ।] [নাস্তি তেজোঽস্য; বহুব্রী] (ত্রি) ২ তেজোরহিত। এখানে কপ্ প্রত্যয় দ্বারা 'অতেজস্ক' এই প্রকার রূপও হয়।

অতেজস্ক—(ত্রি) [ন-তেজস্-কপ্] দীপ্তিহীন। [অতেজস্ দ্র°]

অতেজস্বী—(ত্রি) যাহাতে তেজ বা প্রভা নাই, তেজস্বিতাহীন।

অতেবা—পশ্চিম আরবের হেজাজ প্রদেশবাসী একটী জাতি। মক্কাসরিফের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তে ইহাদের বাস। মক্কায় হজ্জ যাত্রার সময়ে পাছে যাত্রীদিগের উপর অত্যাচার হয়, এইজন্য তুর্ক-গবমেণ্ট ইহাদের অর্থ দিয়া বাধ্য রাখিতে চেষ্টা করেন। ইহারা তুর্ক সম্রাটের অধীন নহেন, সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই বিচরণ করিয়া থাকেন।

অতেশ—(আতস্) পারসীদের পবিত্র অগ্নি। ইহা তিন প্রকারের যথা, (১) অতেশ দাদঘান, (২) অতেশ অদেরান এবং (৩) অতেশ বেহ্রাম। এই তিন প্রকার অগ্নি উত্তরোত্তর পবিত্রতর। পারসীদের অগ্নিমন্দিরের 'অগিয়ারী' অর্থাৎ অগ্নিস্থানে এই অগ্নি রক্ষিত হয়।

অতেশ দাদঘান প্রতি গৃহের অগ্নিশালায় রক্ষিত থাকে।

ইহা কখনও নির্ব্বাপিত হইতে দেওয়া হয় না। গৃহস্থ বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিলে নব বাসস্থানে এই অগ্নি লইয়া থাকে; গ্রাম বা নগর ছাড়িয়া যাইতে হইলে নিজ অগ্নিশালার অগ্নি প্রতিবেশীদের অগ্নির সঙ্গে মিলিত করিয়া দিয়া যায়।

অতেশ-অদেরান উপরি-উক্ত অগ্নি অপেক্ষা পবিত্রতর। 'অতেশ-অদেরান্' অর্থ 'অগ্নিসমূহের অগ্নি'। এই অগ্নি কএকপ্রকারের অগ্নির সংমিশ্রণ। পুরোহিত, যোদ্ধা, কৃষক ও শিল্পী—পারসীদের এই চারি শ্রেণীর গৃহ হইতে অগ্নি গ্রহণ করিয়া এই অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়। এই চারি অগ্নির প্রত্যেক অগ্নিকে তিনবার এই প্রকারে সংশোধিত করিতে হয়; যথা—অগ্নির উপরে লোহার চালুনিতে চন্দনকাষ্ঠ রাখা হয়। চন্দনকাষ্ঠে অগ্নিশিখা উৎপন্ন হইলে দ্বিতীয় বার লোহার চালুনীতে চন্দনকাষ্ঠ রাখিয়া ঐ শিখায় স্থাপন করা হয়। এইসঙ্গে মন্ত্রপাঠ করা হইয়া থাকে। তিনবার উক্ত-রূপে পরিশুদ্ধ হইলে চতুর্বিধ অগ্নিকে একটী পাত্রে একত্র রাখা হয়। অনন্তর তৃতীয় দিবসে পুরোহিতগণ বাদ্যভাণ্ড ও শোভাযাত্রা সহকারে উহা বহন করিয়া অগ্নিমন্দিরের অগ্নিশালাস্থ প্রস্তর-বেদীতে স্থাপিত করে। এই উপলক্ষে নানাবিধ মন্ত্রপাঠ, উৎসব ও আমোদ অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময়ে মধ্যে মধ্যে পুরোহিত শিকল সাহায্যে মন্দিরে সংলগ্ন পিত্তলের ঘণ্টা বাজাইয়া থাকে।

অতেশ-বহরাম্ সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র অগ্নি। ইহা বহরামের (পারসীদের ত্রাণকারী দেবদূত) উদ্দেশে পূজিত হয়। কেবল মাত্র বড় বড় কএকটী মন্দিরেই এই অগ্নি রক্ষিত ও অর্চ্চিত হইয়া থাকে। গুজরাটে মাত্র চারিটী অতেশ-বহরাম অগ্নি-মন্দির আছে—তন্মধ্যে সুরাটে ২টী, নবসারীতে ১টী ও উদ্‌বাদে ১টী। এই অগ্নিপ্রণয়নের নিয়ম অতি কৃচ্ছ্রসাধ্য। ইহাতে ১৬ প্রকার অগ্নির প্রয়োজন। যথা—

(১) চিতাগ্নি (৯১ বার সংশোধিত), (২) রজকের চুল্লীর অগ্নি (৮০ বার সংশোধিত), (৩) তীর্থ অর্থাৎ স্নান-ঘাটের অগ্নি (৭০ বার সংশোধিত), (৪) কুম্ভকার চুল্লীর অগ্নি (৬১ বার সংশোধিত), (৫) ইষ্টকাগ্নি (৭৫ বার সংশোধিত), (৬) সন্ন্যাসীর কিংবা তাম্রকারের অগ্নি (৫০ বার শোধিত), (৭) স্বর্ণকারের অগ্নি (৬০ বার শোধিত), (৮) টাঁকশালের অগ্নি (৫৫ বার শোধিত), (৯) লোহকারের অগ্নি (৬১ বার শোধিত), (১০) অস্ত্রনির্ম্মাতার অগ্নি (৬১ বার শোধিত), (১১) রুটিনির্ম্মাতার অগ্নি (৬১ বার শোধিত), (১২) শৌণ্ডিকের চোলাইখানা অথবা প্রতিমামন্দিরের অগ্নি (৬১ বার শোধিত), (১৩) শিবির কিংবা বিশ্রামাগারের অগ্নি (৩৫ বার শোধিত), (১৪) গো-গৃহাগ্নি (৩০ বার শোধিত), (১৫) বিদ্যুতগ্নি (৯০ বাব শোধিত) (১৬) প্রস্তর এবং কাষ্ঠঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্নি, ও পারসী গৃহস্থের গৃহাগ্নির মিশ্রণে উৎপন্ন অগ্নি (প্রথমোক্ত অগ্নি ১৪৪ বার শোধিত, শেষোক্ত অগ্নি ৪০ বার শোধিত)। প্রত্যেক প্রকারের অগ্নি হইতে চন্দনকাষ্ঠে অগ্নিসংযোগ এবং তৎসহ মন্ত্রপাঠ দ্বারা অগ্নি শোধিত করা হয়। উক্ত ষোড়শ প্রকার অগ্নিকে যথাক্রমে শোধিত করিয়া এক এক করিয়া মন্ত্রপাঠ সহ অগ্নিগৃহে আনিয়া এক একটী পৃথক্ পাত্রে রাখা হয়। বর্ষশেষে পুরোহিতগণ পঞ্চ-গাথাদিবসের প্রথম দিবসে পূর্ব্বরক্ষিত উক্ত ষোড়শ অগ্নিকে উল্লিখিত ক্রমানুসারে অপর একটী পাত্রে একত্র করিয়া রাখে। পরবর্ত্তী এক মাস ধরিয়া তাহারা প্রত্যহ ঐ অগ্নিপাত্র সমীপে মন্ত্রপাঠ করে। তখন ঐ অগ্নির 'অতেশ বহ্‌রাম' নাম হয়। অনন্তর শুভদিনে শোভাযাত্রা ও উৎসব সহকারে উহা মন্দিরের কেন্দ্রস্থ অগ্নিগৃহে লইয়া বেদীতে স্থাপন করা হয়। পারসীগণ অতেশকে বিশেষ ভক্তি করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রায় প্রত্যহই, বিশেষতঃ পর্ব্বদিনে অগ্নিশালায় গমনপূর্ব্বক অগ্নির অর্চ্চনা করেন। [পারসী দ্র°]

অতেশ কেদ্—এখানি পারস্য কবিদিগের জীবনী। ইস্পাহান-নিবাসী হাজী লতিফ আলী বেগ এই পুস্তকের রচয়িতা। গ্রন্থখানি ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলিত হইয়াছিল। 'অতেশ কেদ্'—ইহার প্রকৃত অর্থ আগুনের মন্দির।

অতেহ—অযোধ্যার প্রতাবগড় জেলান্তর্গত পরগণা। ভূপরিমাণ—৭৯ বর্গ মাইল, তন্মধ্যে অধিকাংশ কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। অধিবাসীর অধিকাংশই হিন্দু। উত্তরাংশে কতকগুলি দুর্ভেদ্য দুর্গ অবস্থিত। উহাদের মধ্যে অতেহ দুর্গ উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে অতেহ দুর্গ শত্রুর আক্রমণে প্রকৃষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়াছিল।

অতৈলাক্ত—(ত্রি) যাহা তৈলাক্ত নহে।

অতোক—(ত্রি) নিঃসন্তান।

অতোনিমিত্ত—(ক্রি° বি°) এইজন্য, এইকারণে। (নিরুক্ত ৯.৩৪)

অতোষ—(স্ত্রী) অসন্তোষ।

অতোষণীয়—(ত্রি) অতুষ্টিকর; তোষণীয় নহে।

অৎক,—(পুং) [অততি গচ্ছতি অত-কন্। ১ পথিক। ২ শরীরের অবয়ব। 'অৎকঃ পথিকঃ শরীরাবয়বশ্চ।' (উজ্জ্বলদত্ত) ৩ কবচ। (ঋক্ ৫.৫৫.৬; ৫.৭৪.৫) ৪ বসন, আচ্ছাদন। (ঋক্ ১.১২২.২)

অৎক,—(পুং) ঋগ্বেদোক্ত এক অসুর। ভৃগুর পুত্র কবির উপকারার্থ ইন্দ্র ইঁহাকে নিহত করেন। (ঋক্ ১০.৪৯.৩)

অৎকীল—(পুং) বিশ্বামিত্রের বংশোৎপন্ন ঋষিবিশেষ। ইনি অনেকগুলি বৈদিক স্তোত্র রচনা করিয়াছেন।

অৎগ খাঁ, সামসুদ্দান্ মুহম্মদ—অক্‌বর বাদ্‌শাহের পালক পিতা। গজনী-নিবাসী মীর য়ার মহম্মদ নামক একজন কৃষকের পুত্র। কথিত আছে, যখন সাম্‌সুদ্দীনের ২০ বৎসর বয়স, সেই সময় তিনি একদিন স্বপ্ন দেখিলেন যেন স্বহস্তে জ্যোতিষ্মান্ চন্দ্রকে ধরিলেন। এই সুস্বপ্ন তাঁহার ভবিষ্যতের উন্নতির পথস্বরূপ হইয়াছিল। তিনি প্রথমে রাজকুমার কাম্‌রাণের অধীনে একজন সামান্য সৈনিক নিযুক্ত হন। পরে কনোজের ভীষণ যুদ্ধে (হিজরা ৯৪৭, ১২ই মহরম) যোগদান করিয়াছিলেন। হুমায়ুন যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হস্তি-পৃষ্ঠে নদী-পারে আসিয়া নামিলে যে সৈনিক সাহায্যের জন্য নদীর প্রবল স্রোত প্রতিহত করিয়া সন্তরণ দ্বারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহারই নাম সামসুদ্দীন্। তৎপরে হুমায়ুন তাঁহাকে আপন কার্য্যে নিযুক্ত রাখেন। অমরকোটে অক্‌বর ভুমিষ্ঠ হইলে তাঁহার পত্নী অক্‌বরের 'অনগহ' (ধাত্রীবিশেষ) রূপে নিযুক্ত হন। তৎকালে তাঁহার পত্নী হুমায়ুন-কর্ত্তৃক 'জীজী অনগহ' এই উপাধি পাইয়াছিলেন। হুমায়ুনের পারস্যে অবস্থান-কালে সামসুদ্দীন্ সর্ব্বদাই অক্‌বরের নিকট থাকিতেন। তাই অক্‌বর সম্রাট্ হইলে তাঁহাকে 'অৎগ (পালকপিতা) খাঁ' এই উপাধি দিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্রগণ বাদশাহের 'কোক' বা 'কোকলতস্' হইলেন। এই বংশ অৎকখৈল নামেও পরিচিত।

৯৪৯ হিজরায় মীরজা ইয়াদ্‌গার নাসীরের বিদ্রোহকালে হুমায়ুন যখন মল্লদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন অৎগ খাঁ বাদশাহের দূতরূপে যোধপুরে মল্লদেবের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। অক্‌বর-কর্ত্তৃক যখন মানকোট দুর্গে সিকন্দর আফগান বন্দী হইয়াছিলেন, তৎকালে ইনি দৌত্যকার্য্য করিয়াছিলেন। [সিকন্দর আফগান দ্র°]

অক্‌বর সিংহাসন প্রাপ্ত হইলে, বদখ্শানের শাসনকর্ত্তা মির্জা সুলেমানকে দমন করিবার জন্য এবং সম্রাজ্ঞী ও অপরাপর বেগমদিগকে ভারতবর্ষে আনিবার জন্য অৎগ খাঁ প্রমুখ কতিপয় কর্ম্মচারী কাবুলে প্রেরিত হন।

অৎগ খাঁ পঞ্জাবের খুসাব নামক স্থান জায়গীর পান। বৈরাম খাঁর মৃত্যু হইলে তিনি তৎপদ প্রাপ্ত হন। পরে তিনি পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তার পদও লাভ করিয়াছিলেন। ৯৬৭ হিজরায় জালন্ধরে বৈরাম খাঁকে পরাস্ত করায় অক্‌বর তাহাকে 'আজম্ খা' উপাধি প্রদান করেন। অক্‌বরের রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসরে অৎগ খা লাহোর হইতে দিল্লীতে আসেন এবং মুনিম্ খাঁ ও অক্‌বরের মধ্যে যে বিবাদ চলিতেছিল, তাহাতে কাহার দোষ এই স্থির করিবার জন্য উকিল নিযুক্ত হন। [মুনিম্ খাঁ ও অক্‌বর দ্র° ।] মুনিম্ খাঁ ও সিহাব খাঁ ইহাতে ভীত হইয়া অৎগ খাঁকে বিনাশ করিবার জন্য অধম নামক একজনকে উত্তেজিত করেন। (আইন্-ই-আক্‌বরী) এই অধম খাঁ অৎগ খাঁরই পুত্র।

বদাওনি লিখিয়াছেন, "তিনি অৎগকে হত্যা করিবেন বলিয়া ভয় দেখান এবং উজবেক জাতীয় কুসুমবেগ নামক একজন ভৃত্যকে তাঁহাকে হত্যা করিতে অনুমতি দেন।"

অপর ইতিহাসের মতে, ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে অধমের হস্তেই অৎগ খাঁ বিনষ্ট হন। [অধম খা দ্র°] [Elphinstone—History of India এবং Elliot—History of India, Vol. V]

অত্তরন (অতরন)—ব্রহ্মদেশের আমহার্ষ্ট জেলার এক নদী। জমি ও উইন্-য় নদীর মিলনে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ইহা মৌলমিন নামক স্থানে সালুইন নদীতে পতিত হইয়াছে। শীর্ণকলেবরা হইলেও নদীটী গভীর এবং মধ্যে মধ্যে উষ্ণ প্রস্রবণ আছে; প্রায় সমস্ত স্থানেই নৌকাদি চালনা করা যাইতে পারে।

অত্তবে—(অব্য) [অদ্ তবেঙ্ তুমর্থে] খাইবার জন্য, ভোজনের নিমিত্ত। "হবিষে অত্তবে" (শুক্লযজুঃ) 'অত্তবে হবির্ভক্ষিতুং' (সায়ণ)

অত্তব্য—(ত্রি) [অদ্ তব্য] ভক্ষণীয়, ভোজনের যোগ্য। "অভোজ্যমন্নং নাত্তব্যমাত্মনাশুদ্ধিমিচ্ছতা" (মনু ১১.৯৫)

অত্তা—(স্ত্রী) [অততি সততং সংবধ্নাতি অত-তক্ ইড়ভাবঃ] মাতা। ২ জ্যেষ্ঠা ভগিনী (অমর) ৩ স্ত্রীজাতির শ্বশ্রূ, শাশুড়ী। সাহিত্যদর্পণের টীকাকার অত্তার 'শ্বশ্রূ' অর্থ প্রাকৃত ভাষাতেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অত্তারি—পঞ্জাবের অমৃতসর জেলার একটী গ্রাম। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর অবস্থিত। সিন্ধু-বংশীয় জাঠ গৌর সিংহ ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। অত্তারির বর্ত্তমান সর্দ্দারগণ গৌর সিংহের বংশধর। এই সর্দ্দারগণ রণজিৎ সিংহের অধীনে বিশেষ উন্নতি-লাভ করিয়াছিলেন।

অত্তি—(স্ত্রী) [অত্যতে সততং সম্বধ্যতে অত কর্ম্মণি ক্তিন্] মাতা। ২ নাট্যোক্ত জ্যেষ্ঠা ভগিনী। (শব্দরত্নাবলী)

(ত্রি) ৩ ভক্ষণকারী। "বাগেবাত্রির্বাচা হ্যন্নমত্তে অত্তির্হ বৈ নামৈতদ্ যদত্রিরিতি" (শতপথব্রা° ১৪.৫.২.৫)

অত্তিকঙ্কণ—দক্ষিণভারতের কুরুবজাতির একটী শাখা। বিবাহকালে হরিদ্রারঞ্জিত 'অত্তিকঙ্কণ' বা কার্পাসনির্ম্মিত সূত্র হস্তে বন্ধন করে বলিয়া ইহারা অত্তিকঙ্কণ নামে অভিহিত।

অত্তিকা—(স্ত্রী) [অত্তা স্বার্থে কাপি অত ইত্বং] মাতা। ২ জ্যেষ্ঠা ভগিনী। (অমরটী° মহেশ্বর) ৩ স্ত্রীজাতির শ্বশ্রূ। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত এবং দ্বিরূপকোষের মতে নাট্যোক্তিতেই 'অত্তিকা' জ্যেষ্ঠা ভগিনী অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

অত্তিকুপ্পা,—মহিসুরের হাসান জেলার এক তালুক। পরিমাণ ৩৭১ বর্গমাইল। স্থানীয় জমি উর্ব্বর এবং উহাতে প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি উৎপন্ন হয়। তুলাজাত কাপড়ও যথেষ্ট প্রস্তুত হয়।

অত্তিকুপ্পা২—মহিসুরের হাসান জেলার একটী গ্রাম। অত্তিকুপ্প তালুকের প্রধান নগর। অক্ষা° ১২°৪১´ উঃ; দ্রা° ৭৬°৩৩' পূ°।

অত্তিলি—নামান্তর অত্রি। মান্দ্রাজের গোদাবরী জেলার একটী নগর। অক্ষা° ১৬°৪১'১০" উ°; দ্রা° ৮১°৩৮'৩৬" পূ°।

অত্তিবর্ম্মা—দাক্ষিণাত্যের একজন রাজা। মান্দ্রাজের গুণ্টুর জেলায় আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপিতে ইঁহার নাম পাওয়া যায়। অনেকের মতে এই লিপিখানি পল্লবরাজ প্রদত্ত; কিন্তু শিলালিপিতে অত্তিবর্ম্মা রাজা কন্দরের বংশজাত ও হিরণ্যগর্ভবংশীয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আবার রাজা কন্দর বাকেশ্বরস্থ শিবের ভক্ত মহাতাপস আনন্দের বংশজাত। পল্লব এবং চালুক্যরাজগণ অনেকেই হিরণ্যগর্ভ হইতে উদ্ভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

অত্তিস্ (আটিস্)—এশিয়া মাইনর এবং রোমক সাম্রাজ্যে পূজিত এক দেবতা। ইনি দেবমাতা কাইবিলের পুত্র। কাইবিল বা অগ্‌দিস্‌তিস্ অতি প্রাচীন কাল হইতেই ফ্রিজিয়া রাজ্যে পূজিতা ছিলেন। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বোপকূলস্থ দেশসমূহে তিনি কাইবিল, গী বা রীয়া নামে অভিহিত হইতেন। ২০৪ খৃষ্টাব্দে যৎকালে কার্থেজ রাজ্যের সেনাপতি বীরবর হানিবল রোমের সাধারণতন্ত্রকে বিলুপ্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন প্রসিদ্ধ ডেল্‌ফির দৈববাণী অনুসারে রোমনগর হইতে পাব্লিয়াস্ কর্ণেলিয়াস্ সিপিও নাসিকা "দেবমাতা"র প্রস্তরমূর্ত্তি আনিবার জন্য ফ্রিজিয়ায় প্রেরিত হন। তিনি ফ্রিজিয়া-রাজ অত্তলসের নিকট হইতে কাইবিলের মূর্ত্তি রোমে লইয়া আসেন। তৎপরে দেবমাতার বরে সিপিও জামার যুদ্ধে হানিবলকে পরাজিত করিয়া রোমরাষ্ট্রকে রক্ষা করেন। [কাইবিল দ্র°] কাইবিলের সহিত অত্তিসের পূজা এবং উৎসবও রোমে প্রচলিত হয়।

অত্তিসের জীবনবৃত্তান্ত এইরূপ:—কাইবিল একাধারে নারী ও পুরুষ ছিলেন। দেবগণ তাঁহার পুরুষত্ব হরণ করিয়া একটী আমণ্ড্ বা বাদাম গাছকে উহা দ্বারা সঞ্জীবিত করেন। সঙ্গোরিও নদীর কুমারী-কন্যা ঐ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়া গর্ভবতী হন এবং অত্তিস্‌কে প্রসব করেন। অত্তিস্ পরম রূপবান্ ছিলেন। জন্মকালে অত্তিস্ গলোস্ নদীর তীরে এক শরবনে শায়িত ছিলেন। পরে তিনি ছাগপালকরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়া পেসিনাস্ নগরে প্রেরিত হন এবং তথাকার রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। কাইবিল অত্তিস্‌কে দেখিবার জন্য অতিমাত্রায় উৎসুক হইয়া নগরপ্রাচীর ভগ্ন করিয়া উক্ত বিবাহসভায় উপস্থিত হন। তাহাতে অত্তিস্ ভয়ার্ত্ত হইয়া একটী দেবদারু বৃক্ষের তলে প্রাণত্যাগ করেন। পরে কাইবিলের কাতর প্রার্থনায় দয়াপরবশ হইয়া দেবরাজ জিয়ুস্ তাঁহার প্রাণদান করেন। তখন অত্তিস্ দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া কাইবিলের রথচালক হইলেন।*

রোমরাজ্যে আনীত হইবার পর হইতে রাজ্যের পতনের পূর্ব্বপর্য্যন্ত তথায় কাইবিল এবং অত্তিসের উদ্দেশে বিস্তৃত ভাবে উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। ১৫ই মার্চ্চ হইতে "শরোৎসব" দ্বারা উহা আরব্ধ হইত। এই "শরোৎসব" (Canna Intrat) অত্তিসের শরবনে অবস্থানের স্মারক। ২২এ মার্চ্চ তারিখে উৎসবান্তকালে একটী নূতন দেবদারু বৃক্ষ ছেদন করিয়া উহা বস্ত্রাচ্ছাদিত এবং ভায়োলেট পুষ্পে সজ্জিত করিয়া শোভাযাত্রা সহকারে রাজপথে পরিভ্রমণ করা হইত; ইহা অত্তিসের মৃতদেহের প্রতীক। এই সময়ে শোভাযাত্রাকারিগণ "অত্তিস্! অত্তিস্!" রবে চীৎকার করিয়া শোক প্রকাশ করিত। ইহার ২ দিন পরে পূজকগণ বেত্র ও শস্ত্র দ্বারা স্বীয় শরীরে আঘাত করিয়া উল্লিখিত দেবদারুবৃক্ষে রক্ত সেচন করিত। রাত্রিকালে মহাসমারোহে বৃক্ষকে মন্দিরমধ্যে সমাহিত করা হইত।

পরদিবস "আনন্দোৎসব" (Hilaria) অনুষ্ঠিত হইত। এই দিন মধ্যরাত্রে মন্দিরাভ্যন্তরে একটী মাত্র আলোক প্রজ্বলিত থাকিত। তৎপরে অত্তিসের নৃমূর্ত্তিকে বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া হস্তিদন্তের পালঙ্কে স্থাপন করা হইত। দর্শনাভিলাষিগণ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া স্তবস্তুতি পাঠ করিতেন এবং তৎপরদিন প্রাতঃকালে রৌপ্যরথে বিরাট্ শোভাযাত্রা করিয়া উৎসব সম্পন্ন হইত।

হিপোলাইটাস্ (খৃষ্টীয় ৩য় শতক) তাঁহার Philosophumena গ্রন্থে অত্তিস্‌কে পর্য্যায়ক্রমে জিউস্, এডোনিস্, ওসিরিস্, মীন্, অদম (অদম), প্যান্, বেকাস্, হার্মিস্ প্রভৃতি দেবতার সহিত অভিন্ন কল্পনা করিয়াছেন।

অত্তৃ—(পুং) [অদ-তৃচ্] পরমেশ্বর। "সর্ব্বস্যৈতস্যাত্তা ভবতি"

* Pausanias, vii, c. 17; Arnobius, *adv. Gentes,* v, CC, 5 sqq; Diodorus Siculus.

(শতপথব্রা° ১৪.৫.২.৫) (ত্রি) ২ ভিক্ষুকমাত্র। "নাভা দুষ্যত্যদন্নাত্থান্" (মনু ৫.৩০) স্ত্রিয়াং ঙীপ্-অত্রী।

অত্থদস্সি—(পালি সংস্কৃত অর্থদর্শী), চতুর্দ্দশ বুদ্ধ। শোভন নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতার নাম সাগর, মাতার নাম সুদর্শনা। পত্নীর নাম বিশাখা, পুত্রের নাম সেন।

অত্থসালিনী—বুদ্ধঘোষ কৃত ধর্ম্মসঙ্গণীর একখানি ভাষ্য। 'পমপরমত্থপকাসিনী' নামে ইহার একখানি টিপ্পনী আছে। অত্থসালিনী-ভাষ্যে কেবল শব্দের অর্থ বা প্রতিশব্দ এবং শব্দার্থবাচক ব্যাখ্যা আছে। অনেক সময় ইহা পাঠ করিতে ভাল লাগে না, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয় জানিতে হইলে এই ভাষ্যের সাহায্য লওয়া অত্যাবশ্যক। বৌদ্ধ-দর্শনের অনেক পরিভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে পাওয়া যায়। ইতিহাস ও ভৌগোলিক বৃত্তান্তও ইহাতে অনেক আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নলিখিত কএকটী নদীর নাম উল্লেখ করা যায়—অচিরবতী, গঙ্গা, গোদাবরী, নেরঞ্জরা, মহী, সরভূ এবং অনোমা। ইহাতে অনেক সহর, দ্বীপ ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিরও উল্লেখ আছে, যথা—অজিত, অঞ্চকোদঞ্ঞ, অভয়থের, অস্‌সগুত্ত, আনন্দ, আড়ারকালাম, উত্তিয়, উদায়ি, উদ্দক, উপক, কস্‌সপ, চন্ন, দুট্ঠগামনি, অভয়, দাসক, দীপঙ্কর, নাগসেন, বুদ্ধঘোষ, মেত্তেয্য, পিঙ্গল, বুদ্ধরক্ষিত, চক্কন উপাসক। ভূমিকার শ্লোকে বুদ্ধঘোষ লিখিয়াছেন যে বিশুদ্ধিমগ্‌গে আমি পূর্ব্বে কিছু কিছু এ বিষয়ে লিখিয়াছি, এক্ষণে ঐগুলিকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য 'ধম্ম-সঙ্গণী'র ভাষ্য লিখিলাম। যদিও অত্থশালিনী ধম্মসঙ্গণীর ভাষ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এই দুইখানি পুস্তকের বিষয়বস্তুর বিন্যাসে ও প্রণালীতে কিছু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। মূলে কএকটী অধ্যায় আছে যাহা ভাষ্যে নাই, এবং ভাষ্যে কএকটী নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে। ধম্মসঙ্গণীর অধ্যায়গুলি অপেক্ষা অত্থসালিনীর অধ্যায়গুলি বেশ স্পষ্টভাবে বর্ণিত এবং ইহাতে যে প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে তাহা মূল অপেক্ষা প্রকৃষ্ট ভাবে লিখিত হইয়াছে। বুদ্ধঘোষ প্রথমেই এক অধ্যায় ভূমিকা স্বরূপে লিখিয়াছেন। ইহাতে তিনি সাহিত্য ও দর্শনের অনেক কথাই আলোচনা করিয়াছেন। সাহিত্যের আলোচিত বিষয় হইতে পরম্পরাগত সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্মের কালনির্ণয় করা সহজ হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, অভিধম্মভাষ্য প্রথম সংগীতিতে পঠিত হইয়াছিল এবং পরের সংগীতিতেও পঠিত হয়। মহেন্দ্র কর্ত্তৃক ইহা সিংহলে নীত হইয়াছিল। পরে তথায় সিংহলী ভাষায় অনূদিত হয়।*

অত্থসদ্দারজাতক—বুদ্ধের পূর্ব্বজন্মের বিবরণমূলক একখানি জাতক। লিখিত আছে, প্রাচীনকালে ব্রহ্মদত্ত যখন বারাণসীর রাজতক্তে সমাসীন, তখন বোধিসত্ত্ব কোষাধ্যক্ষের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগী সপ্তম বর্ষীয় এক পুত্র ছিল। একদিন ঐ বালক পিতার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, পিতঃ! আধ্যাত্মিক উন্নতির পন্থা কি কি? তখন পিতা উত্তর করিলেন, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রথম ও পরম মঙ্গলকর। তৎপরে ধর্ম্ম পরায়ণ হওয়া, বর্ষীয়ান্‌দিগের উপদেশ শ্রবণ, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, সত্যানুসন্ধিৎসা এবং মায়াজাল ছিন্ন করাই মানবের ছয়টী প্রধান কর্ম্ম বা পন্থা। বালক তদবধি সেই ছয়টী নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিল এবং বোধিসত্ত্বও দান-ধ্যানাদি সৎকর্ম্মে কাল অতিবাহন করিয়া স্বীয় অভিলষিত লোকে প্রস্থান করিলেন। (বৌদ্ধজাতক)

অত্ন—(পুং) [অততি সততমাকাশে ভ্রমতি অত-ন। উণ্ ৩.৬] আদিত্য। 'অত্ন আদিত্যঃ' (উজ্জ্বলদত্তঃ)। [অততি জয়পরাজয়ৌ অত্র] (ক্লী) ২ যুদ্ধ। (বাচস্পতি)

অত্নু—(পুং) [অততি সততং গচ্ছতি অত-নু পক্ষে নু বা] সূর্য্য। ২ বায়ু। (ত্রি) ৩ সদা গমনশীল। ৪ পথিক।

অৎফীহ্—মিশরের এক সহর, নীলনদের পূর্ব্বতীরে ফইয়ুম্ নামক উচ্চ ভূভাগে অবস্থিত। প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় শহরের নাম ছিল 'তেপ্-য়েহ্' বা 'পের্ হথোর নেব্‌ৎ তেপ্-য়েহ্' (অর্থাৎ 'তেপ য়েহের রমণী হথোরের গৃহ')। কোপ্‌তেরা ইহাকে 'পেত্‌পেহ্' এবং আরবীয়গণ 'অত্‌ফীহ্' নাম প্রদান করিয়াছেন। গ্রীক্‌গণ 'হথোর'কে আফ্রোদিতী (Aphrodite) মনে করিয়া এই শহরের নাম দিয়াছিলেন 'আফ্রোদিতো-পোলিস্'। সংক্ষেপে তাহারা ইহাকে 'আফ্রোদিতো' বলিত। খৃষ্টীয় যুগেও এই শহরের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল।

অত্‌ফীহ্ নগরের বিশেষ বিবরণ জানিবার উপায় নাই। মাম্‌লুক্‌দের অভ্যুদয়ে ইহার প্রাধান্য নষ্ট হইয়াছিল। বেদুইন্ ও মামলুক্‌দের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য খেদিবেরা এখানকার খালগুলি সংস্কার করাইয়া পুনরায় এই নগরে পুনরুন্নতিসাধন করেন। বর্ত্তমানে ইহা একটী বন্দররূপে গণ্য।

অৎবা পিপারিয়া—অযোধ্যার অন্তর্গত খেরি জেলার একটী পরগণা। ইহা মহমদী তহসীলের অন্তর্ভুক্ত এবং কাঠনা ও গোমতী নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৬৪ বর্গমাইল, ২৩ বর্গমাইলে কেবল কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে। এই পরগণার স্থানে স্থানে বন।

১১৯০ খৃঃ অব্দে মহমদীর রাজা মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বন্দী

* History of Pali Literature by Dr, Bimala Charan Law, pp, 473 ff,

হন। সেই সময় তাঁহার রাজ্য ধ্বংস হয় এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষণের ভার তুলিয়া লওয়া হয়। ক্ষত্রিয়েরা গোমতী নদীর উপকূলসমূহে ২৮২ খানি গ্রাম পাইয়াছিলেন। তাঁহাদেরই বংশে ভগবন্ত সিংহের পিতা জন্মগ্রহণ করেন। ভগবন্ত সিংহ অৎবা-পিপারিয়া ও মুগ্ধপুরের অধিকার পান, কিন্তু ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে কর্ম্মচারীদিগের সঙ্গে বিবাদ হওয়ায় তিনি আপনার রাজ্য হারাইলেন ও বনে গিয়া বাস করিলেন। এই সময় তিনি নিকটস্থ গ্রাম হইতে বলপূর্ব্বক পশ্বাদি অপহরণপূর্ব্বক তাহা বিক্রয় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। স্লীমান সাহেব ইঁহাকে একজন প্রসিদ্ধ দস্যু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। [*Sleeman's* Tour in Oudh, Vol. ii. এবং ভগবন্ত সিংহ, খেরী ও মহমদী শব্দ দ্র°]

পঞ্চমসিং কর্ত্তৃক ভগবন্ত সিংহ নিহত হইলে অৎবা-পিপারিয়া কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত কৃষকদের হস্তে অর্পিত হয়। ১৮৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট অযোধ্যারাজের অধীন ফিদাহোসেন খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে অৎবার তালুকদারী সনন্দ প্রদান করেন। সেই সনন্দে লিখিত হয় যে, ফিদা-হোসেন খাঁ অৎবা পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী ভোগ করিতে পারিবেন।

অত্য—(পুং) [অততি শীঘ্রং গচ্ছতি অত-কর্ত্তরি যৎ] দ্রুত গমনশীল। ২ অশ্ব। (বৈদ্যকনি°) (ঋক্ ১.১৩৫.৫) ৩ যে সকলকে অতিক্রম করে। (ঋক্ ৩.৭.৯) ৪ সতত গমনশীল। (ঋক্ ১.৬৫.৬ ; শুক্লযজুঃ ২২.১৯)

অত্যগ্নি—(পুং) অতিতীব্র জঠরানল। (সুশ্রুত ১.১২৮.৮) (ত্রি) ২ অগ্নিকে অতিক্রম করিয়া স্থিত।

অত্যগ্নিষ্টোম—(পুং) [অতিক্রান্তোঽগ্নিষ্টোমমধিকফলদত্বাৎ অতিক্রা °তৎ] যজ্ঞবিশেষ। ইহা জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের অংশ—কৃতীর ইচ্ছাধীন। "অগ্নিষ্টোমোঽত্যগ্নিষ্টোম উক্থঃ ষোড়শো বাজপেয়ো অতিরাত্রোঽপ্তোর্যাম ইতি সংস্থাঃ" (আশ্বলায়নশ্রৌত° ৬.১১ ; কাত্যায়নশ্রৌত° ১০.৯.২৭) [জ্যোতিষ্টোম দ্র°]

অত্যগ্নিসীমার্ক—(ত্রি) অগ্নি, চন্দ্র এবং সূর্য্য হইতেও যে অধিক দেদীপ্যমান।

অত্যঙ্কুশ—(ত্রি) [অতিক্রান্তোঽঙ্কুশং অঙ্কুশাঘাতম্] যে অঙ্কুশাঘাত অগ্রাহ্য করিয়া ইচ্ছামত ছুটিয়া বেড়ায়, দুর্দ্দান্ত। ২ হস্তী।

"অত্যঙ্কুশমিবোদ্দামং গজং মদজলোদ্ধতং" (রামা° ২.২৩.২১)

অত্যঙ্গুল—(ত্রি) [অতিক্রান্তোঽঙ্গুলিং তৎপরিমাণম্। অতিক্রা° অচ্ সমাস] অঙ্গুলিপরিমাণের অধিক।

অত্যজনীয়—(ত্রি) ত্যাগাযোগ্য ; যাহা ত্যাগ করিবার নহে।

অত্যদ্ভুত—(ত্রি) অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক।

অত্যধ্ব—(ত্রি) [অতিক্রান্তোঽধ্বানম্। ক্রান্তাদি অচ্ সমা° (পা ৫.৪.৮৫)] অতিক্রান্তপথ। পথ অতিক্রমকারী।

অত্যধ্বন্—(পুং) [অতিক্রান্তোঽধ্বানং পূজার্থত্বান্ন সমাসান্তঃ] সুপথ, সুগম বা সুন্দর পথ।

অত্যনিল—(পুং) পবনের দ্বারা চালিত দ্রব্য।

অত্যন্ত—(ত্রি) [অতিক্রান্তোঽন্তং সীমাং অত্যাদয়স°] অধিক, অতিশয়। ২ অতিরিক্ত, সকল পরিচ্ছেদ অতিক্রান্ত। ৩ [অব্যয়ীভাবে] অতিক্রম। পরিচ্ছেদাতিক্রম, নাশাতিক্রম। "সুখমত্যন্তমশ্নুতে" (গীতা)

অত্যন্তকামপল্লব—জনৈক পল্লবনৃপতি। মহাবলীপুরের ২টী রথের (মন্দিরের) ক্ষোদিত লিপিতে "অত্যন্তকামপল্লব" (রণঞ্জয়) এই নাম দৃষ্ট হয়। ডা° হুল্‌জ বলেন, ধর্ম্মরাজরথের লিপিতে উক্ত নাম ১ম নরসিংহবর্ম্মাকে বুঝাইতেছে। অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মনে করেন 'অত্যন্তকাম' (রণঞ্জয়) ২য় নরসিংহবর্ম্মার (রাজসিংহ) বিরুদ সূচিত করিতেছে।

অত্যন্তকোপন—(ত্রি) [অত্যন্তং ভৃশং কুপ্যতি অতি-কুপ-ল্যুট্] অতিক্রোধী, অত্যন্ত কোপান্বিত, প্রচণ্ড।

অত্যন্তগ—(ত্রি) অতিশয় গমনশীল ; শীঘ্রগামী।

অত্যন্তগত—(ত্রি) অত্যন্ত যোগ্য। ২ সর্ব্বদা প্রযোজ্য। ৩ অতিশয় সঙ্গত, অত্যন্ত সম্বন্ধ।

অত্যন্তগতি—(স্ত্রী) অতিশয় পূর্ণতা। ২ তীব্র গমন।

অত্যন্তগামিন্—(ত্রি) [অত্যন্তং অতিশয়ং গচ্ছতি গম-কর্ত্তরি ণিনি] অতিশয় গমনশীল। ২ আত্যন্তিক। 'স্ত্রিয়ামত্যন্তগামিনী' (হেমচন্দ্র)

অত্যন্তগুণিন্—(ত্রি) অতিশয় গুণী ; অসাধারণ গুণসম্পন্ন।

অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যধ্বনি—(পুং) অলঙ্কারশাস্ত্রে রূপকবিশেষ। কাব্যাত্মস্বরূপ ধ্বনি দ্বিবিধ, যথা অভিধামূলক ধ্বনি ও লক্ষণামূলক ধ্বনি। লক্ষণামূলক ধ্বনিকে অবিবক্ষিতবাচ্য এবং অভিধামূলক ধ্বনিকে বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য বলে। উক্ত অবিবক্ষিত বাচ্য ধ্বনির দুইটী ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে বাচ্যার্থ অত্যন্ততিরস্কৃত হইলে অর্থাৎ বাচ্যার্থ বোধ না হইয়া অপরার্থ প্রতীত হইলে অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যধ্বনি হইয়া থাকে।

"অর্থান্তরং সংক্রমিতে বাচ্যেঽত্যন্তং তিরস্কৃতে।
অবিবক্ষিতবাচ্যোঽপি ধ্বনির্দ্বৈবিধ্যমৃচ্ছতি॥"
(সাহিত্যদর্পণ ৪.১৬৫.৪)

যে স্থলে একান্তভাবে স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া শব্দ অর্থান্তরে পরিণত হয়, সেই স্থলে মুখ্যার্থ অত্যন্ততিরস্কৃত হয় বলিয়া উহা অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য। যথা "নিশ্বাসান্ধ ইবাদর্শশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে" (সাহিত্যদ° ৪.১৬৬.৪) এ স্থলে অন্ধ শব্দ মুখ্যার্থে

বাধিত, কারণ আদর্শের (দর্পণের) চক্ষুর্গোলকশূন্যতাবশতঃ অন্ধতা অসম্ভব, অন্ধ শব্দের অর্থ চক্ষুর্গোলকযুক্ত চক্ষুরিন্দ্রিয়শূন্য, সুতরাং এই স্থলে অন্ধ শব্দের অপ্রকাশরূপ অর্থ অপ্রকাশাতিশয় ব্যঙ্গ্য।

আশ্রমস্থিতা কোন কুলটা গোদাবরীতীরস্থিত স্বীয় সঙ্কেতস্থানে যথেচ্ছভাবে গমনাগমনের বিঘ্নস্বরূপ প্রত্যহ পুষ্পচয়নব্যস্ত ধার্ম্মিকের প্রতি স্বপ্রেরিত কুকুরের উৎপাত নিষ্ফল হইয়াছে দেখিয়া দিনান্তরে বলিল, "ভম ধম্মিঅ বীসত্থো সো সুণহো অজ্জ মারিঅো দেন। গোলাণঈকচ্ছকুডঙ্গবাসিনা দরোঅসীহেন"॥ (সাহিত্যদ° ৪.১৬৭.৪) হে ধার্ম্মিক, তুমি ভ্রমণ কর। আমার সেই বিশ্বস্ত কুকুর গোদাবরীতীরকুঞ্জস্থিত দৃপ্তসিংহ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। এই স্থলে বিধি অর্থ নিষেধার্থে পর্য্যবসিত হওয়ায় বিপরীতলক্ষণার প্রতীতিহেতু ইহা অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যের উদাহরণ হইতে পারে, কিন্তু "ভম ধম্মিঅ" ইত্যাদি কবিতায় ভ্রমণের বিধি প্রকৃতস্থলে অনুপযুক্ত হওয়ায় ভ্রমণ নিষেধে পর্য্যবসিত হইতেছে বলিয়া বিপরীতলক্ষণার আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। কারণ যে স্থলে বিধি ও নিষেধ শ্রুতিমাত্রেই নিষেধ ও বিধি অর্থে পর্য্যবসিত হয়, তাদৃশ স্থলেই বিপরীতলক্ষণা হইবে। কিন্তু যে স্থলে প্রকরণাদি পর্য্যালোচনে বিধি ও নিষেধ হইতে নিষেধ ও বিধি প্রতীত হয়, সে স্থলে অভিধামূলক ধ্বনি হইয়া থাকে; অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যরূপ বিপরীতলক্ষণা হয় না।

অত্যন্ততিরস্কৃত-বাচ্যস্থলে মুখ্যার্থ 'অত্যন্ততিরস্কৃত' অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়ে অনন্বিত বলিয়া জহৎস্বার্থা। [জহৎস্বার্থা দ্র°]

অত্যন্তনিবৃত্তি—(স্ত্রী) [অতিক্রান্তা অন্তং নাশং অত্যন্তা, সা চাসৌ নিবৃত্তিশ্চেতি অতিক্রা° সমা°] মোক্ষাবস্থা। যে অবস্থায় দুঃখবোধ থাকে না। 'যস্যাভাবঃ স এব প্রতিযোগী'। যে বস্তুর অভাব সেই বস্তুটীই সেই অভাবের প্রতিযোগী। যেমন, 'ঘটের অভাব' এমন কথা বলিলে ঘটটীও সেই অভাবের প্রতিযোগী হয়। প্রকৃত স্থলে যে নিবৃত্তি থাকিলে স্বপ্রতিযোগিজাতীয় অন্য কোন বস্তুরই পুনর্ব্বার উৎপত্তি হয় না, তাহাই অত্যন্তনিবৃত্তি। 'অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ' ইতি। (সাংখ্যসূ°) আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক এই তিন প্রকার দুঃখের নিবৃত্তিই পুরুষের অত্যন্ত প্রয়োজন। আর সেই দুঃখের নিবৃত্তিই মোক্ষাবস্থাতে ঘটিয়া থাকে। কারণ মোক্ষাবস্থায় বিবেক দ্বারা মায়ার নিবৃত্তি হইলে তাহার কার্য্য দুঃখাদির সমূলোচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী তজ্জন্য সে সময়ে পুনর্ব্বার দুঃখোৎপত্তি হয় না বলিয়া দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি হইয়া থাকে। [নিবৃত্তি দ্র°]

অত্যন্তপদ্মা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] কমলিনী। (বৈদ্যকনি°)

অত্যন্তপীড়ন—(ক্লী) অতিশয় ক্লেশকর কার্য্য।

অত্যন্তভাব—(পুং) যে ভাবের কখনও বিনাশ হয় না; চিরস্থায়ী ভাব।

অত্যন্তবাসী—(পুং) [অত্যন্ত-বস্-ণিনি অস্ত্যর্থে] যোগী; ব্রহ্মচারী। ২ সর্ব্বদা গুরুর নিকট অবস্থানকারী ব্রাহ্মণ ছাত্র।

অত্যন্তশোণিত—(ত্রি) [বৈদ্যক] অতিরক্ত। ২ (ক্লী) স্বর্ণগৈরিক। (বৈদ্যকনি°)

অত্যন্তসম্পর্ক—(পুং) অতিশয় সহবাস।

অত্যন্তসংযোগ—(পুং) [অত্যন্তেন সাকল্যেন সংযোগঃ সম্বন্ধঃ। অন্তমবসানমতিক্রান্তঃ সংযোগো বা] নিরবচ্ছিন্ন-সম্বন্ধ। ব্যাপ্তি।

অত্যন্তসুকুমার—(পুং) কঙ্গুনীবৃক্ষ। কাঙ্‌নী গাছ।

অত্যন্তাভাব—(পুং) অত্যন্ত শব্দের সহিত অভাব শব্দের কর্ম্মধারয় সমাস করিলে অত্যন্তাভাব শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে। ঐ অত্যন্ত শব্দের অর্থ আলোচনা করিলে দেখা যায়;—[অন্তং বিনাশং অতিক্রান্তঃ অত্যন্তঃ] অর্থাৎ যাহার বিনাশ নাই এইরূপ অভাবই অত্যন্তাভাব। ইহাতে আপাততঃ লক্ষণ এইরূপ দাঁড়ায় যে 'ধ্বংসাপ্রতিযোগ্যভাবত্বং অত্যন্তাভাবত্বম্'। কিন্তু কেবল ঐরূপ লক্ষণ করিলে অন্যোন্যাভাব বা ভেদরূপ অভাবে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইয়া পড়ে, কারণ অত্যন্তাভাবের যেরূপ ধ্বংস নাই অন্যোন্যাভাবেরও ঐরূপ ধ্বংস নাই। ঘটপটাদির ভেদরূপ অন্যোন্যাভাব গগনাদি পদার্থে চিরকালই থাকে, সুতরাং ঐ ঘটাদি পদার্থের ভেদ যখন ধ্বংসের প্রতিযোগী হয় না, তখন ধ্বংসের অপ্রতিযোগী অভাব হইতে অন্যোন্যাভাবও হয়, অতএব ঐ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি অন্যোন্যাভাবে অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। ঐরূপ লক্ষণ করিলে অন্যোন্যাভাবে যেরূপ অত্যন্তাভাবলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়, সেইরূপ প্রধ্বংসাভাব বা বিনাশরূপ অভাবেও ঐ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইয়া পড়ে; কারণ ধ্বংসরূপ অভাবের আর ধ্বংস হয় না। একবার যে ঘটের ধ্বংস হয়, সেই ঘটের আর পুনরাবৃত্তি নাই; ধ্বংসের আবার ধ্বংস স্বীকার করিলে পুনরায় ঐ ধ্বংসপ্রতিযোগী ঘটাদির উদ্ভব হইতে পারে। উহাতে মূলতঃ অবিনশ্বর মোক্ষাদি অনুপপন্ন হইয়া ওঠে। কাজেই ধ্বংসাভাবের আর ধ্বংস স্বীকার করা চলে না। এই অবস্থায় 'ধ্বংসাপ্রতিযোগ্যভাবত্বম্ অত্যন্তাভাবত্বম্' এইরূপ যোগানুগত লক্ষণ করিলে অতিব্যাপ্তি দোষ হইয়া পড়ে। অতিব্যাপ্তিদোষাক্রান্ত ধর্ম্মলক্ষণ হইতে পারে না। কারণ সজাতীয় ও বিজাতীয় উভয় প্রকার বস্তু হইতে লক্ষ্যকে ব্যাবৃত্ত করিয়া লওয়ার জন্য লক্ষণের প্রয়োজন, অতিব্যাপ্তি দোষাক্রান্ত ধর্ম্ম দ্বারা উক্ত প্রয়োজন সাধিত হইতে

পারে না। এই জন্য লক্ষণের লক্ষণ বলিবার প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট প্রভৃতি গ্রন্থকার "অসাধারণো ধর্ম্মো লক্ষণম্। লক্ষ্যতাবচ্ছেদক-সমনিয়তত্বং অসাধারণ্যম্।" এইরূপ বলিয়া অব্যাপ্তি অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব এই ত্রিবিধ দোষশূন্য ধর্ম্মই লক্ষণ এই কথা বলিয়াছেন। অতএব এস্থলে 'অত্যন্ত' শব্দের মুখ্য যৌগিক অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অন্য প্রকার অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। যথা অন্ত শব্দের যথাশ্রুত বিনাশরূপ অর্থ হইলেও অন্ত শব্দ উৎপত্তিরূপ অর্থেরও উপলক্ষণ বলিতে হইবে এবং অভাব শব্দের অর্থ সংসর্গাভাব ধরিতে হইবে। তাহা হইলে অত্যন্ত শব্দের অর্থ উৎপত্তি ও বিনাশরহিত বা নিত্য এইরূপ অর্থ হয়, তাহাতে উৎপত্তি-বিনাশরহিত সংসর্গাভাব অত্যন্তাভাব এইরূপ লক্ষণ করা যায়। কেহ কেহ আবার 'অত্যন্ত' শব্দের অর্থ বিবরণ প্রসঙ্গে বলেন যে অন্ত শব্দের অর্থ অবধি বা সীমা, ঐ অন্ত অর্থাৎ সীমাকে যে অতিক্রম করিয়াছে অর্থাৎ যাহার আদি বা অন্তে সীমা নাই উহাই অত্যন্ত। উৎপন্ন ও বিনশ্বর বস্তুরই আদি ও অন্তে সীমা আছে যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই তাহারই আদি ও অন্তে সীমা নাই; অত্যন্তাভাবের উৎপত্তি ও বিনাশ না থাকায় উহা উক্তরূপে অত্যন্ত ফলে নিত্য সংসর্গাভাবই অত্যন্তাভাব এইরূপ লক্ষণ পর্য্যবসিত হয়।

নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক প্রভৃতি দার্শনিকগণ ভাব ও অভাব এই দ্বিবিধ পদার্থের মধ্যে অভাবকে প্রথমতঃ সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব-ভেদে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া সংসর্গাভাবকে আবার প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব এই তিন ভাগে বিভাগ করিয়া লইয়াছেন; যথা—"অভাবস্তু দ্বিধা সংসর্গান্যোন্যাভাবভেদতঃ। প্রাগভাবস্তথা ধ্বংসোঽপ্যত্যন্তাভাব এব চ। এবং ত্রৈবিধ্যমাপন্নঃ সংসর্গাভাব ইষ্যতে॥" (ভাষাপরি°) প্রাগভাবের আদি বা উৎপত্তি নাই, কিন্তু অন্ত আছে, উহা অনাদি সান্ত, প্রধ্বংসাভাবের উৎপত্তি আছে, ধ্বংস নাই, কাজেই অন্নংভট্ট প্রভৃতি গ্রন্থকার উহার স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া উহাকে 'সাদি অথচ অনন্ত' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কাজেই প্রাগভাব সংসর্গাভাব হইলেও উহা বিনাশরহিত নহে, প্রধ্বংসাভাব ও সংসর্গাভাবের অন্তর্গত হইলেও উহা উৎপত্তি-রহিত নহে, তিনটী সংসর্গাভাবের মধ্যে ঐ দুইটী অভাব ছাড়িয়া দিলে একমাত্র অত্যন্তাভাবই অবশিষ্ট থাকে। উহার উৎপত্তি ও বিনাশ না থাকায় উহাতে লক্ষণসঙ্গতি হইতে পারিল, অন্যোন্যাভাব উৎপত্তি ও বিনাশশূন্য হইলেও উহা সংসর্গাভাব নহে। কারণ অন্যোন্যাভাবভিন্ন অভাবকেই সংসর্গাভাব বলা হইয়া থাকে। "সংসর্গাভাবত্বমন্যোন্যাভাব-ভিন্নাভাবত্বম্, অন্যোন্যাভাবত্বং তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতি-যোগিতাকাভাবত্বম্।" [অন্যোন্যাভাব দ্র°]

কেহ কেহ ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াই অত্যন্তাভাবকে নিত্য সংসর্গাভাব সদাতন সংসর্গাভাব বা ত্রৈকালিক সংসর্গা-ভাব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। "নিত্যসংসর্গাভাবত্বমত্যন্তা-ভাবত্বম্" (ভাষাপরি° মুক্তা°) "ত্রৈকালিকসংসর্গাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকোঽত্যন্তাভাবঃ" যথা ভূতলে ঘটো নাস্তি ইতি।" (তর্কসংগ্রহঃ) অত্যন্তাভাবকে ত্রৈকালিক বলিবার তাৎপর্য্য একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যায়, সংসর্গা-ভাব বলিয়া যে তিনটী অভাবকে গ্রহণ করা হইয়াছে তন্মধ্যে প্রাগভাব কেবল প্রতিযোগীর (যাহার অভাব তাহাকে প্রতিযোগী কহে) উৎপত্তির পূর্ব্বেই থাকে, পরে থাকে না। প্রধ্বংসাভাব প্রতিযোগীর উৎপত্তির পূর্ব্বে বা প্রতিযোগীর স্থিতি দশায় থাকে না। উহা বিনাশ দশায় থাকে। কাজেই ঐ দুইটী সংসর্গাভাব প্রতিযোগীর পূর্ব্ব-কাল, উত্তরকাল ও স্থিতিকাল বা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই ত্রিকালে থাকে না। অত্যন্তাভাব ত্রিকালেই বর্ত্তমান থাকে। ঘট যখন উৎপন্ন হয় নাই বা উৎপন্ন হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে তখনও যেরূপ 'ঘটো নাস্তি' এইরূপ অত্যন্তাভাব আছে, সেইরূপ ঘটের স্থিতিদশাতেও যে ভূতলাদি অধি-করণে ঘট আছে, তদ্ভিন্ন স্থানে উক্তরূপ অভাব রহিয়াছে। কাজেই অত্যন্তাভাব ত্রৈকালিক বা সদাতন। অন্যোন্যাভাব ত্রৈকালিক বা সদাতন হইলেও সংসর্গাভাব নহে বলিয়াই সংসর্গাভাব পদদ্বারা উহা ব্যাবৃত্ত হইয়াছে। অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে উহাই সংক্ষেপে বলিয়াছেন "অনাদিঃ সান্তঃ প্রাগভাবঃ উৎপত্তেঃ পূর্ব্বং কার্য্যস্য। সাদিবনন্তঃ প্রধ্বংস উৎপত্ত্য-নন্তরং কার্য্যস্য।"

প্রশস্তপাদভাষ্যের টীকা 'ন্যায়কন্দলী'গ্রন্থে শ্রীধরাচার্য্য বলিয়াছেন, "অত্যন্তাভাবো যদসতঃ প্রতিষেধ ইতি...... অত্যন্তাভাবেতু সর্ব্বথা অসদ্ভূতস্যৈব বুদ্ধ্যারোপিতস্য দেশকালানবচ্ছিন্নঃ প্রতিষেধঃ, যথা ষট্পদার্থেভ্যো নান্যৎ প্রমেয়মস্তীতি।" যে যে অভাবের প্রতিযোগী একান্ত অসৎ সেই অভাবই অত্যন্তাভাব তাহার উদাহরণ দেখাইতে গিয়া তিনি দেখাইয়াছেন—"ষট্পদার্থেভ্যোঽতিরিক্তঃ পদার্থো নাস্তি"। বৈশেষিকমতে পদার্থ ছয় প্রকার, তন্মতে ছয় পদার্থ হইতে অতিরিক্ত কোনও বস্তু নাই। উক্তরূপ অভাবের প্রতিযোগী অতিরিক্ত পদার্থ একান্ত অসৎ বা অলীক। সুতরাং উক্তরূপ অভাবই তন্মতে অত্যন্তাভাব। ঐ মতে 'শশশৃঙ্গং নাস্তি' 'আকাশকুসুমং নাস্তি' ইত্যাদি প্রতীতিসিদ্ধ

সমস্ত অভাবই অত্যন্তাভাব। যাহার প্রতিযোগী একান্ত অসৎ নহে, তাহা অত্যন্তাভাব নহে। এই মত সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিলে 'ঘটে ঘটো নাস্তি' 'ঘটত্বে ঘটত্বং নাস্তি' ইত্যাদি প্রতীতিসিদ্ধ অন্য প্রকার একটী অভাব মানিয়া লইতে হয়, ফলে চারি প্রকার অভাবের স্থানে পাঁচ প্রকার অভাব মানিয়া লইতে হয়। তাৎপর্য্য এই যে প্রাচীন ও নব্য সম্প্রদায় সকলেই প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব এই চারি প্রকার অভাব স্বীকার করিয়াছেন, তন্মধ্যে যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার উৎপত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী অভাবই প্রাগভাব এবং যাহার বিনাশ আছে, তাহার ঐ বিনাশ-রূপ অভাবই প্রধ্বংসাভাব। স্বভিন্ন বস্তুতেই নিজের ভেদ বা অন্যোন্যাভাব থাকে। প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাবের আবার বিশেষ এই যে উহা প্রতিযোগীর সমবায়িদেশেই থাকে, সুতরাং 'ঘটে ঘটো নাস্তি' এই প্রতীতিসিদ্ধ অভাবকে প্রাগ-ভাব বা প্রধ্বংসাভাব বলা চলিবে না, কারণ ঘট ঘটের সম-বায়িদেশ নহে, ঘটের অবয়বই ঘটের সমবায়িদেশ; কাজেই উক্ত প্রতীতিসিদ্ধ অভাব, প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাবের অতিরিক্ত বলিতে হইবে। তাদাত্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধে ঘটে ঘট থাকায় উহাতে তাদাত্ম্য বা অভেদসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতা অভাবরূপ ঘটের অন্যোন্যাভাব থাকিতে পারে না। 'ঘটত্বে ঘটত্বং নাস্তি' এই প্রতীতিসিদ্ধ অভাবের প্রতিযোগী ঘটত্ব উহা নিত্য, কাজেই উহার প্রাগভাব কিংবা প্রধ্বংসাভাব অসম্ভব, ঘটত্বে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ঘটত্ব থাকায় উক্ত অভাবকে ভেদস্বরূপও বলা যাইবে না। এই অবস্থায় যদি অলীকপ্রতিযোগিক অভাবকেই অত্যন্তাভাব বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তবে উক্ত প্রতীতিসিদ্ধ অভাব অলীকপ্রতিযোগিক না হওয়ায় অত্য-ন্তাভাব বলিয়াও স্বীকার করা যাইবে না; সুতরাং পঞ্চম প্রকার অতিরিক্ত অভাব স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ইহার কিন্তু কেহই কোনও স্থলে সূচনা দিয়াছেন বলিয়া দেখা যায় না, কাজেই উক্ত মত সমীচীন বলিয়া ধরা যায় না।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব আলোচনার ফলে এই সিদ্ধান্তই স্থির করা যায় যে, নিত্য বা ত্রৈকালিক সংসর্গাভাবই অত্যন্তাভাব।

এখন ঐ মতে আপত্তি হইতেছে এই যে অত্যন্তাভাব যখন ত্রৈকালিক সংসর্গাভাব তখন যে অবস্থায় ভূতলে ঘট ছিল না, তখনও যেরূপ ভূতলে ঘটের অত্যন্তাভাব আছে, যখন সেই ভূতলে ঘট আনা হইল তখনও সেইরূপ অত্যন্তাভাব আছে মানিতে হইবে, তাহা না হইলে উহা ত্রৈকালিক কিরূপে হইতে পারে; তাহা হইলে ঘটের অসত্ত্ব দশাতে যেরূপ ভূতলে ঘটাভাবের প্রতীতি হইয়াছিল, ঘটের সত্ত্ব দশাতে সেইরূপ ঐ ভূতলে ঘটাভাবের প্রতীতি হইতে বাধা কি? তাহার উত্তরে মুক্তাবলীকার প্রভৃতি বলেন যে "যত্র তু ভূতলাদৌ ঘটাদিকমপসারিতং পুনরানীতঞ্চ তত্র ঘটকালস্য সম্বন্ধাঘটকত্বাদত্যন্তাভাবস্য নিত্যত্বেঽপি ন ঘটকালে ঘটাত্যন্তাভাববুদ্ধিঃ"। (ভাষাপরি. মুক্তা) অর্থাৎ অত্যন্তাভাব নিত্য হইলেও ঘটের যৎকালে ভূতলাদিতে সত্তা নাই, তাদৃশ কালবিশেষবিশিষ্ট স্বরূপসম্বন্ধকেই উহার সংসর্গ বলিয়া স্বীকার করায় ঘটের সত্ত্বদশায় সেই কাল না থাকায় বিশিষ্ট স্বরূপ-সম্বন্ধের অভাব প্রযুক্তই ঘটসত্ত্বকালে উক্তরূপ আপত্তি বারিত হইতে পারে।

কেহ কেহ আবার এইরূপও সমাধানের চিন্তা করিয়া থাকেন যে অভাব জ্ঞানের প্রতি প্রতিযোগিজ্ঞান-প্রতিবন্ধক কাজেই উক্ত স্থলে ঘটাত্যন্তাভাব থাকিলেও ঘটবত্তাবুদ্ধিরূপ প্রতিবন্ধক থাকায় ঘটাত্যন্তাভাববুদ্ধি হইতে পারে না, উক্ত সমাধান সূক্ষ্মবুদ্ধিপ্রসূত নহে, কারণ অভাববুদ্ধির প্রতি যেমন প্রতিযোগিজ্ঞান-প্রতিবন্ধক সেইরূপ অভাববুদ্ধিও আবার প্রতিযোগিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, অতএব ঐ স্থলে অভাববুদ্ধির কারণ থাকিলে অভাববুদ্ধি দ্বারা প্রতিযোগিজ্ঞানই বা প্রতিরুদ্ধ হইবে না কেন? অতএব কালবিশেষবিশিষ্ট স্বরূপসম্বন্ধকে সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া যে প্রাচীনগণ সমাধান করিয়াছেন উহাই সমীচীন।

কেহ কেহ আবার উক্তস্থানীয় অত্যন্তাভাবকে নিত্য না বলিয়া উৎপত্তিবিনাশশালী চতুর্থ সংসর্গাভাব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে ভূতলাদি হইতে যখন ঘটাদি অপসারিত হইল তখন তথায় ঘটাদিরূপ প্রতিযোগীর অত্যন্তাভাব উৎপন্ন হইল, আবার যখন তথায় ঘটাদি আনীত হইল, তখন ঐ অত্যন্তাভাব বিনাশ প্রাপ্ত হইল, আবার ঘটাদি অপসারিত হইলে অন্য আর একটী অত্যন্তাভাব তথায় উৎপন্ন হইল। সূক্ষ্মধী নব্যনৈয়ায়িকগণ উক্ত মত গৌরব-গ্রস্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন! ঐ মতে বহু অত্যন্তাভাব ব্যক্তি তাহার প্রাগভাব ও ধ্বংস এইরূপ নানা বস্তু মানিয়া লইতে হয়, তাহা মানিয়া কালবিশেষবিশিষ্ট স্বরূপসম্বন্ধকে সম্বন্ধরূপে স্বীকার করিলেই যখন উপপত্তি করা যায়, তখন আর ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ গৌরব স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? এই কারণেই উক্ত মত পরিত্যাগ করিয়া নব্য নৈয়ায়িকগণ অত্যন্তাভাবকে নিত্য সংসর্গাভাব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। "তত্রোৎপাদবিনাশশালী চতুর্থোঽয়মভাব ইতি কেচিৎ।" (ভাষাপরি° মুক্তা°) প্রাচীনগণ বলেন যে ধ্বংস ও প্রাগভাবের

অধিকরণে অত্যন্তাভাব থাকে না। অর্থাৎ ঘটের প্রাগভাব ও ধ্বংস ঘটের সমবায়িদেশে থাকে। ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটের সমবায়িদেশ, ঘটের অবয়বে ঘটের প্রাগভাব এবং বিনাশের পর ঐ দেশে ঘটের ধ্বংস থাকে, ঘটের স্থিতিদশায় ঘটরূপ প্রতিযোগী থাকে, ঐ তিনটী পদার্থই ঘটাত্যন্তাভাবের বিরোধী, কাজেই কোনও কালেই ঘটের সমবায়িদেশে ঘটের অত্যন্তাভাব থাকে না, উহা অন্যত্রই থাকে।

প্রতিযোগীর প্রাগভাগ ও ধ্বংস এবং প্রতিযোগী এই তিনটী পদার্থের সহিতই অত্যন্তাভাবের বিরোধিতা স্বীকার করিয়া অত্যন্তাভাবকে প্রাচীনগণ ত্রিতয়প্রতিযোগিক অভাব বলিয়া থাকেন।

ঘটাদিতে প্রথম অবস্থায় শ্যামরূপ থাকে, পরে অগ্নিপাক বশতঃ তাহাতে রক্তরূপ উৎপন্ন হয়। শ্যামরূপ দশায় ঘটে রক্তরূপের প্রাগভাব এবং রক্তরূপ দশায় শ্যামরূপের ধ্বংস বর্ত্তমান থাকে। ঐ শ্যামরূপ দশাতে 'রক্তো নাস্তি' এবং রক্তরূপ দশাতে যে 'শ্যামো নাস্তি' এই অভাবের প্রতীতি হয়, উহা তন্মতে অত্যন্তাভাব নহে, কারণ রক্তরূপ দশায় অবস্থিত শ্যামরূপের ধ্বংসরূপ বিরোধী থাকায় 'শ্যামো নাস্তি' এই অত্যন্তাভাব ঘটাদিতে থাকিতে পারে না। অতএব তাহারা স্বীকার করেন এই যে শ্যামরূপ দশায় যে, 'রক্তো নাস্তি' এই অভাবের প্রতীতি হয়, উহা রক্তরূপের প্রাগভাব আর রক্তরূপদশাতে যে 'শ্যামো নাস্তি' এইরূপ অভাবের প্রতীতি হয়, উহা শ্যামরূপের ধ্বংস ব্যতীত আর কিছুই নহে। অপর মতে কিন্তু ঐ স্থলীয় 'শ্যামো নাস্তি' ও 'রক্তো নাস্তি' ইত্যাদি প্রতীতিসিদ্ধ অভাব অত্যন্তাভাব, কারণ অপর কোনও মতে প্রাগভাব ও ধ্বংসের সহিত অত্যন্তাভাবের বিরোধ স্বীকৃত হয় নাই। "অত্র ধ্বংস প্রাগভাবাধিকরণে নাত্যন্তাভাব ইতি প্রাচাং মতম্, শ্যামঘটে রক্তো নাস্তি রক্তঘটে শ্যামো নাস্তীতি ধীশ্চ প্রাগভাবং ধ্বংসঞ্চাবগাহতে, নতু তদত্যন্তাভাবং তয়োর্বিরোধাৎ। নব্যাস্তু তত্র বিরোধে মানাভাবাৎ ধ্বংসাদিকালাবচ্ছেদেনাপ্যত্যন্তাভাবো বর্ত্তত ইত্যাহুঃ।" [ভাষা-পরি° মুক্তা°]

অপর মতে প্রতিযোগীর অধিকরণতার সহিত অত্যন্তাভাবের বিরোধিতা কল্পনা করা হয়। কেবল প্রতিযোগীর সহিত বিরোধিতা কল্পনা করিলেও স্থলবিশেষে দোষ উপস্থিত হয়। উক্ত প্রতিযোগীর অধিকরণতাও আবার 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধিকরণতা' বলিতে হইবে। অভাবের প্রতীতির মধ্যে প্রতিযোগীর অংশে বিশেষণরূপে ভাসমান ধর্ম্মকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক কহে, যেমন 'ঘটোনাস্তি' এই প্রতীতিতে ঘটের অংশে বিশেষণরূপে ঘটত্ব ধর্ম্ম ভাসিতেছে; কাজেই উক্তস্থলে ঘটত্ব ধর্ম্মই ঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক। ঐ ঘটত্ব বিশিষ্ট ঘটের অধিকরণ মাত্রেই ঘটত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণতা থাকে, সুতরাং তথায় আর ঘটত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে না। যে স্থলে ঐ ঘটত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণতা নাই সেই স্থলেই 'ঘটো নাস্তি' ইত্যাকার ঘটত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অত্যন্তাভাব থাকিবে। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধিকরণতার সহিত অত্যন্তাভাবের বিরোধিতা কল্পনা না করিয়া কেবল সাধারণতঃ প্রতিযোগ্যধিকরণতার সহিত বা প্রতিযোগীর সহিত অত্যন্তাভাবের বিরোধিতা কল্পনা করিলে গুণাদিতে 'গুণান্যত্ববিশিষ্টসত্তা নাস্তি' ইত্যাদিরূপ অভাব থাকিতে পারেনা। কারণ একই সত্তারূপ জাতি দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম এই তিন পদার্থে থাকে, গুণান্যত্ববিশিষ্ট সত্তা ও সত্তা পৃথক্ বস্তু নহে, সুতরাং গুণে যখন সত্তাজাতি আছে তখন গুণান্যত্ববিশিষ্ট সত্তাও আছে। 'গুণান্যত্ববিশিষ্ট-সত্তা নাস্তি' এই প্রতীতিসিদ্ধ অভাবের প্রতিযোগী সত্তা বা উক্ত সত্তার অধিকরণতা গুণে থাকায় গুণে বিরোধী বস্তু রহিয়াছে বলিয়া ঐ অভাব গুণে থাকিতে পারে না। সিদ্ধান্তকল্পে অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধিকরণতার সহিত অত্যন্তাভাবের বিরোধিতাকল্পে গুণে সামান্যতঃ সত্তাধিকরণতা এবং সত্তারূপ জাতি থাকিলেও বিশিষ্টসত্তাত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণতা নাই, কারণ পদার্থ যে অধিকরণ অন্তর্ভাবে বিশেষণবিশিষ্ট হয়, সেই অধিকরণেই বিশিষ্টধর্ম্মাবচ্ছিন্নাধিকরণতা মানা হইয়াছে, সত্তারূপ জাতি গুণভিন্ন দ্রব্য ও কর্ম্ম অন্তর্ভাবেই গুণান্যত্ববিশিষ্ট হইয়াছে, কাজেই গুণান্যত্ববিশিষ্টসত্তাত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণতা দ্রব্যে ও কর্ম্মেই রহিয়াছে, গুণে গুণান্যত্ব না থাকায় গুণান্তর্ভাবে সত্তা উক্ত বিশেষণবিশিষ্ট হয় নাই বলিয়া উক্ত বিশিষ্ট ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাধিকরণতা গুণে নাই; কাজেই গুণে গুণান্যত্ববিশিষ্ট সত্তা নাস্তি এই অভাব থাকিতে কোনও বাধা নাই। এইরূপ অন্যান্য স্থলেও বুঝিতে হইবে।

ঐ অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবকে উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি বহু গ্রন্থকার প্রতিযোগিস্বরূপ মানিয়া লইয়াছেন। ঐ বিষয়ে তাহাদের যুক্তি এই যে যে স্থানে ঘটের প্রতীতি হয় সেইস্থানে ঘটাভাবের প্রতীতি হয় না, কিন্তু ঘটাভাবো নাস্তি এইরূপ অভাবেরই প্রতীতি হয়; কাজেই ঘট ও ঘটভাবাভাব বিভিন্ন বস্তু স্বীকার করার লাভ নাই, ঐ উভয় বস্তুই এক। "অভাবাভাবো ভাব এব নাতিরিক্তঃ। অনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ" (তর্কসংগ্রহদীপিকা) "অভাববিরহাত্মত্বং বস্তুনঃ প্রতিযোগিতা।" (কুসুমাঞ্জলি) এ বিষয়ে বিশেষ বিবরণ ব্যাপ্তিপঞ্চক গ্রন্থের মাধুরী টীকা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহে দ্রষ্টব্য।

অত্যন্তিক—(ত্রি) [অত্যন্তং অতিশয়ং গচ্ছতীতি অত্যন্ত-ঠন্] অতিশয় ভ্রমণকারী, অত্যন্তগামী। [অতিশয়িতং অন্তিকং নিকটং, (ক্লী) প্রাদি-স°] ২ অত্যন্ত নিকট। (ত্রি) ৩ নিকটস্থ। [অতিক্রান্তং অন্তিকং নিকটং অতিক্রা°-তৎ] ৪ অতিক্রান্ত সামীপ্য, দূর। [অতিক্রান্তমন্তিকং যেন বহুব্রী] (ত্রি) ৫ দূরবর্ত্তী। ৬ অতি অধিক।

অত্যন্তীন—(ত্রি) [অত্যন্তমত্যয়ঃ অত্যন্তং অত্যয়ে অব্যয়ী°। অত্যন্তং গামী অত্যন্ত-খ] অত্যন্তগমনশীল। 'অত্যন্তীন-স্তথাভৃশম্' (অমর)

অত্যমর্ষিন্—(ত্রি) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ।

অত্যম্বুপানম্—(ক্লী) [বৈদ্যক] মাত্রাতিরিক্ত জলপান। অতিরিক্ত মাত্রায় জলপান করিলে অন্নাদি জীর্ণ হয় না এবং অল্প জলপানেও সেই দোষ হয়, সুতরাং বহ্নিবিবর্দ্ধনার্থ মুহুর্মুহু জলপান করা কর্ত্তব্য। ইহাই জলপানের লক্ষণ। (বৈদ্যকনি°)

অত্যম্ল (ম্লা)—(ত্রি) [অত্যন্তমতিশয়িতোঽম্লরসো যস্য ফলাদৌ, বহুব্রী] বৃক্ষাম্ল, তেঁতুল গাছ। (ত্রি) অত্যন্ত অম্লরসবিশিষ্ট।

অত্যম্লা—(স্ত্রী) মাতুলুঙ্গবৃক্ষ ; বনবীজপূর। চলিত মধুর লেবু, মধুটাবা বা মধুলেবু। (রাজনি°) ২ মহাকাঁকড়ী। ৩ তিন্তিড়ী।

অত্যম্লপর্ণ—(ত্রি) অতিশয় অম্লরসযুক্ত পত্রবিশেষ।

অত্যম্লপর্ণী—(স্ত্রী) [অত্যম্লানি পর্ণানি পত্রাণি যস্যাঃ, বহুব্রী] লতাবিশেষ। ইহার পত্রসমূহ অতিশয় অম্লরসযুক্ত। পর্য্যায়—তীক্ষ্ণা, কণ্ডুরা, বল্লিশূরণ, করবড়বল্লী, বয়স্থা, অরণ্যবাসিনী। ইহার গুণ তীক্ষ্ণাম্ল, প্লীহা ও বাতনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক ও রুচিকর, গুল্ম ও শ্লেষ্মরোগহারক।

অত্যয়—(পুং) [অতি-ইন্-অচ্] অতিক্রম। ২ অভাব। ৩ বিনাশ, ধ্বংস, মৃত্যু। ৪ দোষ। ৫ কৃচ্ছ, দুঃখ, কষ্ট, বিপদ্। ৬ দণ্ড, শাস্তিপ্রদান। ৭ অতিক্রমযোগ্য গমন। ৮ কার্য্যের অবশ্যম্ভাবাভাব। ৯ ক্ষুৎপিপাসায় কাতর। ১০ দারিদ্র্য। ১১ সময় অতিবাহিতকরণ। "কালাত্যয়ঃ" (মনু ৮.১৪৫) "হিমাত্যয়ঃ" (মনু ১.১১.২৪) "জীবিতাত্যয়-মাপন্নঃ°" (মনু ১০.১০৪) "প্রাণাত্যয়ে" (যাজ্ঞবল্ক্যস° ১.১৭৯)।

অত্যয়িক—(ত্রি) ক্ষণকালস্থায়ী, যাহা চিরস্থায়ী নহে। ২ অবসর সম্বন্ধীয়।

অত্যয়িত—(ত্রি) [অতি-ইণ্-ক্ত] অতিক্রান্ত। ২ দুষ্প্রবৃত্ত।

অত্যয়িন্—(ত্রি) গমনকারী। ২ অতিক্রমকারী। ৩ যে আগে বাহির হইয়া যায়।

অত্যরাতি—(পুং) অনন্তপের এক পুত্রের নাম। ঐতরের ব্রাহ্মণের ২৩ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে যে, যদিও অত্যরাতি রাজা ছিলেন না তথাপি বসিষ্ঠপুত্র সত্যহব্য ইঁহাকে রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষা দিয়াছিলেন, যাহা দ্বারা ইনি সমগ্র পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন বসিষ্ঠ-পুত্র ইঁহাকে তৎকৃত কৃতজ্ঞতার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন ও এক বৃহৎ পুরস্কার প্রার্থনা করিলেন, তখন ইনি বলিলেন যে, তাঁহার উত্তরকুরুবিজয়ের ইচ্ছা বিশেষভাবেই ছিল। তখন বসিষ্ঠ তাঁহাকে বলিলেন, উত্তরকুরু বিজিত না হইলে তিনি নিশ্চয়ই তাহাকে ফাঁকি দিবেন এবং ফলেও তাহাই হইয়াছিল, ইহাতে বাসিষ্ঠ অমিত্রতপন শুষ্মিন্ শৈব্যের দ্বারা ইহাকে হরণ করাইয়া ছিলেন এবং ঐ ভাবে উহার মৃত্যু হইয়াছিল।

অত্যর্ক—(পুং) [বৈদ্যক] শুক্লার্কবৃক্ষ ; শ্বেত আকন্দ।

অত্যর্থ—(ক্লী) [অতিক্রান্তমর্থং অনুরূপস্বরূপং। অতিক্রা°-তৎ] অতিশয়, অধিক। "প্রবৃদ্ধলিঙ্গং পুরুষং যাত্যর্থমুপসেবতে" (সুশ্রুত ২.৩৯৬.৩) (ত্রি) সাতিশয়। অত্যয়ে (অব্য)—অর্থাভাব। "লক্ষ্মণো রামোঽত্যর্থমুবাচ" (রামা°)

অত্যল্প—(ত্রি) [অতিশয়িতমল্পম্ প্রাদি-তৎ] যৎ-কিঞ্চিৎ।

অত্যবি—(পুং) [অতি-অবি (মেষরোমনির্ম্মিত পরিস্রাবণ বস্ত্র)] যাহা অবি অর্থাৎ পরিস্রাবণবস্ত্রকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান ; উক্ত বস্ত্র দ্বারা পরিস্রুত সোমরস।

অত্যশন—(ক্লী) [অতিশয়িতমশনং ভোজনম্। প্রাদি-তৎ] অধিক ভোজন, অতিভোজন। "নচৈবাত্যশনং কুর্য্যান্নচোচ্ছিষ্টঃ কচিদ্ব্রজেৎ।" (মনু ২.৫৬)

অত্যষ্টি—(স্ত্রী) [অতিক্রান্তা অষ্টিং ষোড়শাক্ষরপাদিকাং বৃত্তিম্। অতিক্রা°-তৎ] সতর অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দোবিশেষ। অষ্টিবৃত্তিতে ষোল অক্ষর আছে, অত্যষ্টি বৃত্তিতে তাহার চেয়ে এক অক্ষর বেশী। নিম্নলিখিত ছন্দোগুলির কোন একটী ছন্দ ইহার অন্তর্গত; মন্দাক্রান্তা, ভারাক্রান্তা, মালাধর, পৃথ্বী, শিখরিণী এবং হরিণী ইত্যাদি। "ততোঽষ্টাবষ্টিরত্যষ্টিঃ" (ঋক্‌প্রতিশাখ্য° ১৬.৫৪)

অত্যষ্টিসামগ্রী—(স্ত্রী) কোন বিশিষ্ট গ্রন্থের নাম।

অত্যস্ত—(ত্রি) [অতি-অস্-ক্ত] অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান ; শরনিক্ষেপে জয়ী বা অতিক্রমকারী।

অত্যহম্—(ত্রি) [মামতিক্রান্তঃ] আমাকে অতিক্রম করে যে। (পা ৭.২.৯৭ কাশিকা)

অত্যহ্ন—(ত্রি) দিবসাতিক্রমী।

অত্যাকরাল—কেতুমাল বর্ষের অন্তর্গত একটী জনপদ। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৪৪.১২)

অত্যাকার—(পুং) [অতিশয়েন আকারঃ অতি-আ-কৃ-ঘঞ্] তিরস্কার, হুঙ্কার, অপযশ। [অতিশয়িত আকারঃ শরীরম্, প্রাদি° তৎ] (পুং) প্রকাণ্ড শরীর। অতিশয়িত আকারঃ শরীরং যস্য] (ত্রি) বহুব্রী। দীর্ঘাকার, বৃহৎ কলেবরবিশিষ্ট।

অত্যাগ—(পুং) [ন ত্যাগ ত্যজ-ঘঞ্ অভাবার্থে নঞ্-তৎ] ত্যাগাভাব, রাখা, গ্রহণ। "উপেত্যাতিক্রমে দোষশ্রুতেরত্যাগদর্শনাদিতি" (স্মৃতি)

অত্যাগিন্—(ত্রি) [ন ত্যজ-ঘিণুন্] কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া যে কর্ম্মানুষ্ঠান করে। ২ ত্যাগিভিন্ন।

অত্যাচার—(পুং) [নিয়মাতিক্রান্ত আচারঃ, প্রাদিস°] নিয়মাতিক্রান্ত আচার, আচার উল্লঙ্ঘন। ২ অসঙ্গত আচরণ, অত্যুৎকট আচার। ৩ অন্যায়। ৪ যথেচ্ছাচরণ। "অতিক্রমে অব্যয়ীভাবে" আচারাতিক্রম।

অত্যাচারী—(ত্রি) অসঙ্গত আচারবান্। ২ যথেচ্ছচারী। ৩ পাষণ্ড।

অত্যাজ্য—(ত্রি) [ন ত্যজ অর্থে ণ্যৎ ন কুত্বম্] অত্যক্তব্য, অত্যজনীয়, ত্যাগ করিবার অযোগ্য, যাহা ত্যাগ করা যায় না।

অত্যাদর—(পুং) অতিশয় আদর ; অত্যন্ত যত্ন।

অত্যাদান—(ত্রি) [অতিক্রান্তং আদানম্, অতিক্রা°-তৎ] আদান-অতিক্রান্ত। [অতিশয়িতমাদানম্ প্রাদিস°] অত্যন্ত আদান, অতিশয় গ্রহণ করা, পুনঃ পুনঃ গ্রহণ।

অত্যাদিত্য—(ত্রি) সূর্য্য হইতেও অধিক। ২ সূর্য্যাতিক্রমী ; সূর্য্যমণ্ডলকেও যিনি অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন এরূপ যোগীপুরুষ বা যোগীশ্বর।

অত্যাধান—(ক্লী) [অতি-আ-ধা-ল্যুট্ অতিশয়িতমাধানম্] উপরে স্থাপন। ২ অতিক্রমণ। ৩ সম্বন্ধমাত্র। [অত্যয়ে অব্যয়ী°] (অব্য) ৪ অগ্ন্যাধান অতিক্রম। [জ্যেষ্ঠমতিক্রম্য আধানং, অতিক্রা° তৎ] (ক্লী) ৫ জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া অগ্ন্যাধান ; জ্যেষ্ঠের অগ্ন্যাধান না হইতে কনিষ্ঠের অগ্ন্যাধান। এ প্রকার ব্যবহার অত্যন্ত শাস্ত্রগর্হিত।

> "অগ্রজোঽস্য যদানগ্নিরধিকার্য্যোঽনুজঃ কথম্।
> অগ্রজানুমতঃ কুর্য্যাদগ্নিহোত্রং যথাবিধি।"

অত্যানন্দা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] কফজ যোনিরোগবিশেষ। অনুপযুক্ত আহারবিহার, দুষ্টরজঃ ও বীজদোষ হইতে এই রোগের উৎপত্তি হয়। এই রোগে আক্রান্ত হইলে রোগিণী অতিরিক্ত মৈথুনেও তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। (মাধবনি°:) ['অতিচরণা' দ্র°]

অত্যাপ্তি—(স্ত্রী) [অতিক্রান্তা আপ্তিঃ] ভূতি ; সমৃদ্ধি। (অথর্ব ১১.৯.২২) ২ পূর্ণবিজ্ঞপ্তি।

অত্যায়—(পুং) [অতি-ইণ্-ণ] অতিক্রম। "প্রজাহ তিস্রো অত্যায়মীয়ুঃ" (ঋক্ ৮.৯০.১৪) [অতিক্রান্তং আয়ং] (ত্রি) লাভ অতিক্রান্ত। [অতিশয়িত আয়ঃ] (পুং) ২ অত্যন্ত লাভ

অত্যায়ু—(ক্লী) [অতি-আ-যা-কু] যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ।

অত্যারক্তা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] জবাপুষ্প-বৃক্ষ ; জবাফুলের গাছ।

অত্যারূঢ়ি—(স্ত্রী) [অতি-আ-রুহ-ক্তিন্] অতিশয় আরোহণ। অতিশয় বিখ্যাত। "অত্যারূঢ়ির্ভবতি মহতামপ্যপভ্রংশহেতুঃ।" (শকু°)

অত্যাল—(পুং) [অতি-আ-অল্ অচ্-অতিশয়েন অলতি অচিরেণ সমন্তাৎ পর্য্যাপ্নোতি] রক্তচিত্রক, রাঙ্চিতা। উহা কুষ্ঠরোগেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে দাক্ষিণাত্যেই বিশেষ ভাবে ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

অত্যাশা—(স্ত্রী) [অতিশয়িতা আশা, প্রাদিস°] অতিশয় আশা। ২ অত্যন্ত স্পৃহা, ধনাদির লালসা পূরণ করা যায় না। (ত্রি) আশা অতিক্রান্ত।

অত্যাশ্রম—(ত্রি) [অতিক্রান্তং সর্ব্বাশ্রমান্, অতিক্রা° তৎ] সকল আশ্রমত্যাগী, সন্ন্যাসী। [অতিশয়িতঃ শ্রেষ্ঠ আশ্রমঃ। প্রাদিস°] উৎকৃষ্ট আশ্রম। ২ সন্ন্যাস।

অত্যাশ্রমিন্—(ত্রি) আশ্রমাতিক্রমী। ২ চতুরাশ্রমের পূজ্য। ২ সমস্ত আশ্রম হইতে শ্রেষ্ঠ।

অত্যাস—(অব্য) [অতি-অস্-ণমুল্] অনন্তর, এই সময়ের পর। এই শব্দ কেবল অপর শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়। "দ্ব্যহমত্যাসং গাঃ পায়য়তি" (পা ৩.৪.৫৭ কাশিকা) 'দ্ব্যহমত্যাসম্' অর্থাৎ দুই দিনের পর।

অত্যাহার—(পুং) অতিভোজন ; অতিরিক্ত আহার।

অত্যাহারিন্—(ত্রি) [অতি-আ-হৃ-ণিনি কর্ত্তরি] অতিভোজী, যে অপরিমিত আহার করে। ডাকপুরুষের একটী বচন আছে যে,—"আঁতে তেতো দাঁতে নুন। পেটের পুরিবে তিন কোণ"। পেটের তিন কোণ অর্থাৎ তিন ভাগ খাদ্যদ্রব্যে পরিপূরণ করিবে। যে তাহার অতিক্রম করিয়া ভোজন করে তাহাকেই অত্যাহারী বলা যায়।

অত্যাহিত—(ক্লী) [অতি-আ-ধা-ক্ত আধারে অতিশয়েন আধীয়তে তন্নিবারণার্থং মনঃ প্রযুজ্যতেঽস্মিন্নিতি] অতিশয় ভয়। ২ মহাভীতি। (অমর) "অত্যাহিতং কিমপি রাক্ষসকর্ম্ম কুর্য্যাৎ" (মহাবীরচরিত) প্রাকৃতভাষায় 'অচ্চাহিদ'। "অজ্জ ণক্খু কিং বি অচ্চাহিদং" (শকু° ১ম অঙ্ক) ৩ জীবনাশারহিত সাহসিক কর্ম্ম।

অত্যুক্ত—(ত্রি) অতিশয় বর্ণিত ; অত্যধিক বলা।

অত্যুক্তি—(স্ত্রী) [অতি-বচ (ব্রু) ক্তিন্; অতিশয়েন অনৌচিত্যেন

বা উক্তিঃ] অসম্ভব উক্তি। ২ অন্যায় কথা। ৩ অতিশয় উক্তি। ৪ আরোপিত কথন। ৫ কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ, ইহাতে অদ্ভুত, মিথ্যা-শৌর্য্য ও ঔদার্য্যাদি বর্ণনা থাকে। যথা হে মহারাজ! আপনি দানকার্য্যে নিরত থাকিলে যাচকগণ কল্পবৃক্ষ হইয়া উঠে। "অত্যুক্তিরদ্ভুতাতথ্যশৌর্য্যৌদার্য্যাদিবর্ণনং।" "ত্বয়ি দাতরি রাজেন্দ্র যাচকাঃ কল্পশাখিনঃ" (চন্দ্রালোক)

অত্যুক্তা, অত্যুক্থা—(স্ত্রী) [অতিক্রান্তা উক্তান্ একাক্ষর-পাদিকাং বৃত্তিম্, অতিক্রা° তৎ] দুই অক্ষরগ্রথিত ছন্দো-বিশেষ। উক্থ শব্দে সামবিশেষকে বুঝায়, তাহাকে অতিক্রমকারী।

অত্যুক্থা, অত্যুক্তা—(স্ত্রী) [অতিক্রান্তা উক্থাং একাক্ষর-পাদিকাং বৃত্তিং] ছন্দোবিশেষ ; এই ছন্দে 'স্ত্রী' নামক একটী মাত্র বৃত্তি আছে। বৃত্তির লক্ষণ যথা, 'গৌস্ত্রী' অর্থাৎ যাহার প্রতি চরণে কেবল দুইটীমাত্র গুরুবর্ণ থাকে তাহাকে 'স্ত্রী' বৃত্তি বলে। "গোপস্ত্রীভিঃ কৃষ্ণোরেমে" (ছন্দোমঞ্জরী) বৃত্তরত্নাকর-মতে অত্যুক্তা।

অত্যুগ্র—(ত্রি) অতিশয় উগ্র, অতি উষ্ণ। অতিশয় তীব্র। "অত্যুগ্রক্রকচপ্রচণ্ডঃ" (মহাবীরচরিত) ২ অতিনির্দ্দয়। "স্বভাবরৌদ্রমত্যুগ্রম্" (পঞ্চতন্ত্র) ৩ অতিদারুণ। (ক্লী) [বৈদ্যক] ৪ হিঙ্গু ; চলিত হিং। (মদ° ব°)

অত্যুগ্রগন্ধা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] কৃষ্ণগোকর্ণী। ২ কৃষ্ণ অপ-রাজিতা। ৩ অজমোদা, যমানী।

অত্যুগ্রপুর—উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জেলার অন্তর্গত অগ্রোর উপত্যকা। রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে অত্যুগ্রপুর নামে উল্লিখিত হইয়াছে। [অগ্রোর দ্র°]

অত্যুচ্চরত—অশ্বজাতীয় পুরুষের সহিত মৃগীজাতীয়া নারীর যে রতি তাহাকে অত্যুচ্চরত বলে।

(—কামসূত্রম্ ২.১.৬ ; রতিরহস্যম্ ৩.৪-৫)

[সম্প্রয়োগ, উচ্চতররত, অশ্ব, মৃগী, লিঙ্গ ও ভগ দ্র°]

অত্যুচ্চৈঃ—(অব্য) অত্যন্ত উচ্চস্বরে ; অতিজোরে চীৎকার।

অত্যুচ্চৈর্ধ্বনি—(পুং) অত্যন্ত উচ্চস্বর।

অত্যুচ্ছ্রিত—(ত্রি) [অতিশয়িতমুচ্ছ্রিতং উন্নতম্] অত্যন্ত উন্নত।

অত্যুৎকট—(ত্রি) [অতিশয়েন উৎকটম্] অতিশয় উগ্র। ২ অতি অধিক। "অত্যুৎকটৈর্পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে" (হিতোপ°) ৩ অতিবিষম। ৪ অতিকঠিন বা কষ্টকর।

অত্যুৎকণ্ঠা—(স্ত্রী) অতিশয় ভাবনা, অতিচিন্তা।

অত্যুৎকৃষ্ট—(ত্রি) অত্যুত্তম, মহামূল্য।

অত্যুত্তর—(ক্লী) সিদ্ধান্ত, মীমাংসা।

অত্যুৎসাহ—(পুং) অত্যন্ত পরাক্রম, অতিশয় কর্তৃত্ব।

অত্যুদার—(ত্রি) অত্যন্ত মুক্তহস্ত, দাতা।

অত্যুদীর্ণা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] দুষ্টব্রণবিশেষ। ২ তীক্ষ্ণাস্ত্র দ্বারা ক্ষত অঙ্গ। (সুশ্রুত, শারীর° ৮ অ°)

অত্যুপধ—(ত্রি) পরীক্ষিত। ২ বিশ্বাসযোগ্য।

অত্যুমশা, অত্যুমসা—(অব্য) হিংসাদ্যোতক অব্যয়। গণ-পাঠে উর্য্যাদিগণের মধ্যে এই শব্দ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু কাশিকা ও গণরত্নে ইহা গৃহীত হয় নাই।

অত্যুল্বণ—(ত্রি) অতিশয় প্রকট, অত্যধিক। ২ ভয়ঙ্কর। "তেষামত্যুল্বণোনাদঃ" (রামা ৩.৩০.২৯)

অত্যুষ্ণ—(ত্রি) অত্যন্ত উত্তপ্ত, অতি গরম। "অত্যুষ্ণং সর্ব্বমন্নং স্যাৎ" (মনু)

অত্যূর্ম্মি—(ত্রি) [অতিক্রান্তা উর্ম্ময়ো যস্মাৎ সঃ] অতিশয় তরঙ্গ, অত্যন্ত ঢেউ। ২ অতি প্রবৃদ্ধ। "অত্যূর্ম্মির্মৎসরোমদঃ" (ঋক্ ৯.১৭.৩)

অত্যূহ—(পুং) [অতিশয়েন উহতে শব্দায়তে অতি-উহ বিতর্কে অচ্] কালকণ্ঠ পক্ষী, দাত্যূহ পক্ষী, ডাহুকপাখী। ২ অতিশয় বিতর্ক। [উহং তর্কমতিক্রম্য] (অব্য) তর্কাভাব, তর্ক অতিক্রম।

অত্যূহা—(স্ত্রী) [অতি-উহ-অচ্ স্ত্রীত্বাৎ টাপ্] নীলিকা, নীল গাছ। ২ শেফালিকা। 'অত্যূহা নীলিকায়াং স্ত্রী কলকণ্ঠে খগে পুমান্' (মেদিনী)

অত্যংহস্—(ত্রি) [পাপমতীত্য বর্ত্তত ইত্যংহাঃ] পাপ অতি-ক্রম করিয়া বিদ্যমান ; পাপাতিক্রমী ; পাপহীন। "শুক্রশ্চ ঋতপাশ্চাত্যংহাঃ।" (শুক্লযজুঃ ১৭.৮০)।

অত্যংহস আরুণি—বৈদিক যুগের একজন আচার্য্য। তৈত্তিরীয় উপনিষদে উল্লিখিত আছে যে, ইনি স্বীয় শিষ্যকে প্লক্ষদয্যা-ম্পতির নিকট অগ্নিসম্বন্ধীয় সাবিত্র বিষয়ে প্রশ্ন করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই ধৃষ্টতার জন্য ইঁহার শিষ্য বহু কষ্ট পাইয়াছেন।

অত্র—(অব্য) [অস্মিন্ এতস্মিন্ বা ইদম্ এতদ্ বা সপ্তম্যান্তল] এখানে, এই স্থানে, ইহাতে। ২ বিশেষ্যপদের সহিত মিলিত হইলে 'এখানে' এই অর্থেই উহার ব্যবহার হইয়া থাকে। অত্র দেশে, এই দেশে, এই নগরে, অত্রাধিষ্ঠানে, অত্র প্রকরণে, অত্র সূত্রে ইত্যাদি। "অত্রবা অন্নং প্রতিতিষ্ঠতি" (শতপথব্রা° ৩.৩.৪.২৮) এ স্থলেও অত্র শব্দ 'এখানে' এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত নিম্নোক্ত উদাহরণগুলিতেও অনুরূপ অর্থে অত্র শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। "ত্রীনি শ্রাদ্ধে পবিত্রাণি...চাত্র প্রশংসন্তি" (মনু° ৩.২৩৫) "নাত্র সংশয়ঃ" (মনু ২.৮৭)

"অত্রান্তরে" (শকু°) "কৃত্রিমাণি ফলান্যত্র" (রামা° ১.৯.৫) "দেবো নো অত্র সবিতা ন্বর্থং প্রাসাবীৎ" (ঋক্ ১.১২৪.১) (পুং) ৩ ভক্ষক, রাক্ষস। "যা ন উপেষে অত্রৈঃ" (ঋক্ ১.১২৯.৮)। ৪ নিরানন্দ। "দেবজনা গুদা মনুষ্যা আন্ত্রাণ্যত্রা উদরম্" (অথর্ব্ব ৯.১২.১৬) (ক্লীং) ৫ যজ্ঞীয় হবিঃ, আহার্য্য। "অত্রাণ্যস্মৈ পড্ভিঃ সংভরন্তি" (ঋক্ ১০.৭৯.২) (ত্রি) ৬ অরক্ষিত। ৭ অস্ত্র। ৮ রক্ষাকারী নহে। ৯ [ন ত্রায়তে কমপি ন-ত্রৈ-ক কর্ত্তরি] অন্যকে রক্ষা করিবার অযোগ্য ক্ষত্রিয়। (বৃহদারণ্যকউপ° ৫.১৩.৪)

অত্রক—(ত্রি) এই স্থানের। ২ সাংসারিক।

অত্রঞ্জী খেরা—যুক্তপ্রদেশান্তর্গত এটা জেলাস্থ প্রাচীন স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ। সোরোনের ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭°৪০'উ°, দ্রা° ৭৮°৪৫'১৫" পূঃ। স্তূপের গাত্রদেশে বহু প্রস্তরমূর্ত্তি ও বৃহদাকার ভগ্ন ইষ্টকসমূহ লক্ষ্য করিবার বিষয়। অনেক সময়ে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাচীন মুদ্রাও পাওয়া যায়। ইহাতে একটী মহাদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। পাঁচটী লিঙ্গও অধিষ্ঠিত। সমুদয় স্থাপত্যকলায় ব্রাহ্মণ-প্রভাবের নিদর্শন। জেনারেল কানিংহামের মতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে যুয়ন্-চুয়ঙ্ এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। যুয়ন্-চুয়ঙ্ উহাকে পি-লো-চন-ন বলিয়াছেন। স্থানীয় প্রবাদানুসারে জানা যায় এই স্থান রাজা বেণের রাজধানীর অংশ ছিল। রাজা বেণ ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে শাহাবুদ্দীন ঘোরী কর্ত্তৃক পরাজিত হন। ঘোরী বেণের দুর্গ ও রাজধানী ধ্বংস করিয়াছিলেন।

অত্রত্য—(ত্রি) এই স্থানের ; এখানকার।

অত্রদঘ্ন—(ত্রি) এতটুকু উপরে যে উঠিয়াছে, এই পরিমাণ উচ্চতাবিশিষ্ট।

অত্রপ—(ত্রি) [নাস্তি ত্রপা লজ্জা যস্য] নির্লজ্জ, লজ্জারহিত, যাহার লজ্জা নাই।

অত্রবস্—(অব্য) গতপূর্ব্ববৎসর।

অত্রভবৎ—(ত্রি) [অয়মিত্যর্থে অত্র প্রথমার্থে ত্রল্ ; কর্ম্মধা] পূজ্য। "জয়মত্রভবান্ নমরাতিম্বভিলাষুকঃ" (কিরাতার্জ্জুনীয়ম্) ২ শ্লাঘ্য। ৩ মান্য। নাটকে ইহার ভূরি ভূরি প্রয়োগ দেখা যায়। "এবমত্র ভবন্তঃ" "অস্তি তত্রভবান্" ইত্যাদি।

অত্রয়স্—(পুং) অত্রিবংশজাত।

অত্রস্ত—(ত্রি) [ন ত্রস্তং ত্রস্-ক্ত] ভয়রহিত, ব্যস্ততারহিত। "জুগোপাত্মানমত্রস্তঃ" (রঘু)

অত্রস্থ—(ত্রি) এইস্থানে স্থিত ; যে এখানেই রহিয়াছে।

অত্রাস—(পুং) [ন ত্রাসঃ—অভাবার্থে নঞ্-তৎ] ভয়ের অভাব। [নাস্তি ত্রাসো যস্য—নঞর্থে বহুব্রী] (ত্রি) যাহার ভয় নাই, নির্ভয়।

অত্রি—(পুং) অদ্+ত্রিপ্ =অত্রি >অত্রি। আক্ষরিক অর্থ 'অদনশীল'। এই অর্থে শব্দটী একবার ঋগ্বেদে অগ্নির বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, যথা "অত্রিমনু স্বরাজ্য-মগ্নিমুক্থানি বাবৃধুঃ" (ঋক্ ২.৮.৫) 'উক্থসকল অদনশীল অগ্নির ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়াছে'। গেল্ডনার (Geldner) কিন্তু মনে করেন যে এখানে ঋগ্বেদের পাঠ দুষ্ট ; তাঁহার মতে প্রকৃত পাঠ সম্ভবতঃ ছিল "অত্রিমনুস্বদাজ্যম্" (Rgveda Uebersetzung, p. 257)। কিন্তু ঋগ্বেদের এই বাক্যটীর উপর নির্ভর করিয়াই বার্গাঁই (Bergaigne) লিখিয়াছেন যে অত্রি বস্তুতঃ অগ্নি হইতে অভিন্ন। (Religion Vedique, II, p. 467)

২ ঋগ্বেদে প্রখ্যাত মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের মধ্যে অত্রি সর্ব্বপ্রধান। বহুবিধ আখ্যান তাঁহার নামের সহিত সংশ্লিষ্ট। স্বর্ভানু নামক অসুরের কবল হইতে তিনি কিরূপে সূর্য্যকে উদ্ধার করিয়া-ছিলেন সে কাহিনী সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে বার বার কথিত হইয়াছে। "স্বর্ভানোরধ যদিন্দ্র মায়া অবো দিবো বর্ত্তমানা অবাহন্। গূঢ়ং সূর্য্যং তমসাপব্রতেন তুরীয়েণ ব্রহ্মণাবিন্দদত্রিঃ ॥" (ঋক্ ৫.৪০.৬) (শতপথব্রা° ৪.৩.৪.২১)

বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ঋগ্বেদে অত্রিগণ কাল্পনিক পুরুষমাত্র নহেন। তাঁহারা যে বাস্তবিক ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সমাম্নায়ানুযায়ী অত্রিগণ ঋগ্বেদে পঞ্চম মণ্ডলের দ্রষ্টা এবং এই মণ্ডলে অত্রিগণের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া দ্রষ্টব্য Oldenberg, Die Verfaesser des Rgveda (Zeitschrift der deutschen Morgenlaendischen Gesellschaft, Vo . 42). দশম মণ্ডলে স্পষ্টই এক স্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে যে অত্রিবংশীয় সপ্তবধ্রি নামক ঋষিকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন যথা—"যুব-মৃবীসমুত তপ্তমত্রয় ওমন্বন্তং চক্রথুঃ সপ্তবধ্রয়ে" (ঋক্ ১০.৩৯.৯) এই সপ্তবধ্রি যে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না, ঋগ্বেদের অন্যত্রও তাঁহার উল্লেখ আছে। (ঋক্ ৮.৭৩.৯)

অথর্ব্ববেদেও মহর্ষি অত্রির বিশেষ প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। অথর্ব্ববেদের একটী মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে যে, কণ্ব, কক্ষীবান্, পুরুমীঢ়, অগস্ত্য, শ্যাবাশ্ব, সোভরী, অর্চ্চনানা, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, কশ্যপ, বামদেব ও অত্রি প্রভৃতি ঋষিগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। সায়ণভাষ্যে অত্রি শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, 'আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিক-ভেদভিন্নাস্ত্রিবিধা দুঃখানুভবা যস্য ন বিদ্যতে সঃ' এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা অত্রির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। যাস্ক বলেন, "অত্রির্নত্রয়

ইতি" (নিরুক্ত ৩.১৭)। অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তিসম্পন্ন। বিশ্বামিত্র ও অত্রি প্রভৃতি ঋষিগণ আমাদিগকে সুখদান করুন এবং অতিবলকর্ম্মান্বিত অত্রিসংজ্ঞক ঋষি আমাদিগকে আত্মীয়রূপে গ্রহণ করুন। এইরূপ উক্তি পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হয়। (অথর্ব্ব ১৮.৩.১৫-১৬ সায়ণ)

'হে অত্রিবংশোৎপন্ন পিতৃগণ! তোমরা এই যজ্ঞের আস্তীর্ণ দর্ভে উপবেশন করিয়া হবিঃ দ্বারা তৃপ্ত হও।' (অথর্ব্ব ১৮.৩.২০) সায়ণ অত্রি শব্দের বিভিন্ন প্রকার ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, 'অত্রিঃ মাতৃপিত্রাত্মসম্বন্ধিনস্ত্রিবিধা দোষা ন সন্তি অস্মিন্' অর্থাৎ মাতৃ, পিতৃ এবং আত্মসম্বন্ধীয় ত্রিবিধ দোষহীন যিনি।

'হে মিত্রাবরুণি! তোমরা মাতা পিতা ও আত্মদোষবর্জ্জিত অত্রি মুনিকে রক্ষা কর।' (অথর্ব্ব ৪.২৯.৩-৪)

একটী মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে যে, হে ক্রিমিগণ! অত্রি, কণ্ব ও জমদগ্নি মন্ত্রসামর্থ্যে যে প্রকার তোমাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, আমরাও সেইপ্রকার তোমাদিগকে হত্যা করিব।

অত্রিপত্নী অনসূয়া সোম, দুর্ব্বাসা ও যোগী দত্তাত্রেয় নামক তিনটী অকল্মষ পুত্র প্রসব করেন। (বিষ্ণুপু° ১ম° ১০.৮.৯) পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডেও অত্রি সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ দেখা যায়। শিবশর্ম্মাকে লক্ষ্য করিয়া দুর্ব্বাসা বলিতেছেন, আমি অত্রির পুত্র, আমার প্রসবিত্রী অনসূয়া, মানুষ হইলেও আমি শিবাংশে জন্মিয়াছি। (পদ্মপু° উত্তর° ২০৫.২০) মহর্ষি অত্রি সপ্তক নামক তীর্থে তপস্যা দ্বারা দেবগণের সন্তোষ সাধন করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে সোম, দুর্ব্বাসা ও দত্তাত্রেয় এই তনয়ত্রয় লাভ করেন। (পদ্ম° উত্তর° ২২২.৬০-৬২)

পিতামহ ব্রহ্মা প্রজাবৃদ্ধির অভাব দর্শন করিয়া ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বসিষ্ঠ এই নয়জন মানসপুত্র সৃষ্টি করেন, ইহারা "নবব্রহ্মা" বলিয়া পুরাণে বিখ্যাত। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৯.৬৮-৭১, পদ্মপু° সৃষ্টি° ৩.১৬৬-১৬৮)।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে অত্রির জন্ম ব্রহ্মার কর্ণ হইতে। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৯.৯৯-১০০) কিন্তু কূর্ম্মপুরাণে আছে যে ব্রহ্মা স্বীয় নেত্র হইতে অত্রিকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। (কূর্ম্মপু° পূর্ব্ব° ৭.৩৬) অত্রি অনসূয়াকে বিবাহ করেন। (কূর্ম্মপু° পূর্ব্ব° ৮.১৯—২০) ইনি দক্ষের কন্যা। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ১০.৩১)

স্কন্দপুরাণে উল্লেখ আছে, কলিযুগ প্রবৃত্ত হইলে কতিপয় যোগী প্রাদুর্ভূত হন, শ্বেতকল্পীয় কলিযুগের আদিতে রুদ্র, তৎপর অত্রি প্রভৃতি ঋষিগণ ক্রমশঃ প্রাদুর্ভূত হইবেন এবং ইহারা কলিযুগে সংক্ষিপ্তভাবে শিবধর্ম্মের উপদেশ দিবেন। (স্কন্দপু° মাহে°কুমা° ৪০.২১৩)।

অত্রি সপ্তর্ষিমণ্ডলের বিশিষ্ট ঋষি; ইহা বেদ ও পুরাণাদিতে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। সপ্তর্ষি যথা—১ মরীচি, ২ অত্রি, ৩ অঙ্গিরাঃ, ৪ পুলস্ত্য, ৫ পুলহ, ৬ ক্রতু, ও ৭ বসিষ্ঠ। মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার দেহকে দুই ভাগ করিয়া অর্দ্ধাংশে একজন পুরুষ ও অপর অর্দ্ধাংশে একজন নারী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই বিরাট্ পুরুষ বহুকাল তপস্যা করিয়া মনুকে সৃষ্টি করিলেন অতঃপর মনু হইতে দশজন প্রজাপতি উৎপন্ন হন। অত্রি তাঁহাদের মধ্যে একজন। (মনু ১.৩৫) কিন্তু মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব এবং অন্যান্য স্থলে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা প্রথমে সপ্তর্ষিগণকে সৃষ্টি করেন, অত্রি তাঁহাদের মধ্যে একজন। ঋগ্বেদের বহুস্থানে অত্রিঋষির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—'হে নেতৃদ্বয়! (অশ্বিনীকুমারদ্বয়!) হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়! তোমরা শত্রুগণকে হিংসা করিয়া এবং সেই ক্লেশদায়ী দস্যুর মায়া আনুপূর্ব্বিক নিবারণ করিয়া পঞ্চজন * দ্বারা পূজিত অত্রি ঋষিকে পাপতুষানল হইতে সন্তানাদির সহিত মুক্ত করিয়াছিলে। (ঋক্ ১.১১৭.৩) সম্ভবতঃ অত্রি ঋষি এই পঞ্চজনের পৌরোহিত্য করিতেন বলিয়া তাঁহাকে পঞ্চজাতির ঋষি বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদের কোন কোন স্থানে অগ্নি, ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং বিশ্বদেবগণের নাম অত্রির নামান্তররূপে উল্লিখিত হইয়াছে। কোন কোন স্থলের বর্ণনায় অগ্নি ও অত্রিতে অনেক প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। যথা, 'হে—অশ্বিদ্বয়! যে সকল উপায় দ্বারা শুচন্তিকে ধনবান্ ও শোভনীয় গৃহসম্পন্ন করিয়াছিলে; যে সকল উপায় দ্বারা অত্রির জন্য গাত্রদাহকারী উত্তাপও সুখকর করিয়াছিলে; যে সকল উপায় দ্বারা পৃশ্নিগু ও পুরুকুৎসকে রক্ষা করিয়াছিলে, তোমরা সেই সকল উপায়ের সহিত আগমন কর'।

অসুরগণ অত্রি ঋষিকে শতদ্বার-যন্ত্রগৃহে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে পীড়া দিবার জন্য অগ্নি জ্বালাইয়া ছিল, অশ্বিদ্বয় শীতল জল দ্বারা সেই অগ্নি নিবাইয়া ছিলেন। (ঋক্ ১.১১২.৭ সায়ণ) যাস্ক এই উপাখ্যানটীকে একটী উপমা মাত্র মনে করেন। অত্রি অর্থ অগ্নি 'অদধাতু ভক্ষণে হব্যভুক্।'

ঋগ্বেদের স্থানবিশেষে অত্রিকে স্বতন্ত্র ঋষি বলিয়াও স্বীকার করা হইয়াছে। পরুচ্ছেপ ঋষি বলিতেছেন—প্রাচীন দধীচি, অঙ্গিরা, প্রিয়মেধ, কণ্ব, অত্রি এবং মনু আমার জন্মকথা জানেন, এই পূর্ব্বকালীন ঋষিগণ আমার পূর্ব্বপুরুষগণকেও অবগত আছেন। কারণ মহর্ষিগণের মধ্যে তাঁহারা দীর্ঘায়ু

* "নিষাদপঞ্চমাশ্চত্বারঃ বর্ণাঃ পঞ্চজনাঃ" পঞ্চজাতি বা পঞ্চজন একই কথা।

এবং আমার জীবনের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ আছে। (ঋক্ ১.১৩৯.৯)

অত্রি কিরূপ প্রভাবসম্পন্ন ঋষি ছিলেন তাহা নিম্নোক্ত ঋক্‌গুলি পাঠ করিলে বিশেষভাবে বুঝিতে পারা যায়—

'হে ইন্দ্র! যখন তুমি সূর্য্যের অধঃস্থিত স্বর্ভানুর সেই সকল মায়া দূরে অপসারিত করিয়াছিলে, তখন অত্রি চারিটী ঋকের দ্বারা কার্য্যবিঘাতক অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন সূর্য্যকে প্রকাশিত করিলেন। সূর্য্য বলিতেছেন, হে অত্রি! আমি তোমার আত্মীয়, দ্রোহকারী যেন ক্ষুধাবশতঃ ভীষণ অন্ধকার দ্বারা আমাকে গ্রাস না করে। তুমি মিত্র ও সত্যপরায়ণ, তুমি ও রাজা বরুণ উভয়ে আমাকে রক্ষা কর। তখন সেই ঋত্বিক্ অত্রি সূর্য্যকে উপদেশ দিয়া প্রস্তরখণ্ডের ঘর্ষণ করিয়া এবং স্তোত্রের দ্বারা দেবগণকে পূজা করিয়া মন্ত্র প্রভাবে অন্তরীক্ষে সূর্য্যের চক্ষু সংস্থাপিত করিলেন এবং স্বর্ভানুর সমস্ত মায়াও অপসারিত করিয়া ফেলিলেন।' অসুর স্বর্ভানু অন্ধকার দ্বারা সূর্য্যকে আবৃত করিলে অত্রিপুত্রগণ অবশেষে তাহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন, অন্য কেহই সমর্থ হন নাই। (ঋক্ ৫.৪০.৬-৯) অথর্ববেদেও অত্রি কর্ত্তৃক সূর্য্যের অন্ধকার হইতে মুক্তি এবং সূর্য্যকে আকাশে সুরক্ষিত করিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। (অথর্ব ১৩.২.৪ ; ১৩.২.১২) অত্রি ঋষি স্বপ্রভাবে যেরূপ নিজের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন সেইরূপ তাঁহার পুত্রকন্যাগণও বিশেষরূপে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলে অত্রি ও তদ্বংশীয়গণ নানাসূক্তের ঋষি হইতেছেন। কিন্তু ৮ম মণ্ডলের ৯১ সূক্তে অত্রিকন্যা 'অপালা'কে মন্ত্রদ্রষ্টা (সূক্তের ঋষি) রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সূক্তের ইন্দ্র দেবতা এবং অপালা ঋষি। সায়ণভাষ্যে অত্রিকন্যা অপালা সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মবাদিনী অপালা কোন কারণে ত্বক্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ায় স্বামীকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া পিতার (অত্রি) আশ্রমে তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। সোম ইন্দ্রের প্রিয় এই কথা ভাবিয়া তিনি ইন্দ্রকে সোম দানার্থ একদা নদীতীরে গমন করিলেন। কিন্তু পথে গমন করিতে করিতে তিনি নিজেই সেই সোম পান করিয়া ফেলিলেন। পান করিবার সময়ে তাঁহার দন্তঘর্ষণ-জাত যে শব্দ হইয়াছিল ইন্দ্র সেই শব্দকে 'অভিষব' প্রস্তরের ধ্বনি মনে করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। তখন ব্রহ্মবাদিনী অপালা বলিলেন, আপনি গৃহে গৃহে গমন করিয়া সোমপান করেন, সুতরাং আপনি ফিরিয়া যাইবেন না, আপনি আমার দ্রংষ্ট্রা হইতে সোমপান করুন। ইন্দ্র তাঁহাকে কামনা করিয়া তাঁহার মুখ হইতে সোম পান করিলেন এবং সোম পানান্তে বলিলেন, আমি প্রসন্ন হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর! তখন অপালা বলিলেন, আমার পিতার মস্তকে কেশ নাই, তাঁহার ক্ষেত্রে ফল উৎপন্ন হয় না এবং আমি রোগযুক্তা, অতএব আপনি এই সকল দোষ নষ্ট করুন। এইরূপ তিনটী বর প্রার্থনা করিলে ইন্দ্র যথাযথ ভাবে বর প্রদান করিলেন। তখন ব্রহ্মবাদিনীর রোগ আরোগ্য হইয়া বর্ণ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইল। (ঋক্ ৮.৯১.১ সায়ণ)

প্রতিবৎসর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মধ্যে আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা একশত-অশীতি মণ্ডলব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে, তাহাতে যে রথ গমন করে সেই রথে প্রতিমাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য, দেবগণ ও ঋষিগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। সেই সূর্য্যরথে যাঁহারা জ্যৈষ্ঠ মাসে অধিষ্ঠান করেন, তাঁহাদের নাম মিত্র, অত্রি ও তক্ষক প্রভৃতি। (বিষ্ণুপু° ২য়° ১০.১-১০)

অত্রি ঋষির জন্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন মত, তবে কূর্ম্মপুরাণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অনেক স্থলে মিল দেখা যায়, ব্রহ্মার নেত্র হইতে অত্রির জন্ম এ কথা ভাগবতেও উল্লিখিত আছে এবং ইনি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে একজন প্রজাপতিও ছিলেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ৩.১২.২২-২৪)

পিতামহ ব্রহ্মা দক্ষ, মরীচি ও অত্রি প্রভৃতি আত্মসদৃশ নয়টী পুত্র উৎপাদন করেন। ইঁহারা অদ্ভুতকর্ম্মা ও মহর্ষি বলিয়া বিদিত। এই সকল মহর্ষি হইতে ত্রয়োদশ প্রকার গুণের আরম্ভ এবং ইঁহারাই মহর্ষিবংশের মূল বীজ। (পদ্মপু° সৃষ্টি° ৪০.৭০-৭২)

বিষ্ণুর নাভি হইতে ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মা হইতে অত্রি উৎপন্ন হইয়াছেন। (অগ্নিপু° ২৭৩.১) ব্রহ্মা যে সকল মানস পুত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মরীচি সর্ব্বপ্রথম এবং তৎপরই মহর্ষি অত্রির জন্ম হইয়াছে। (মৎস্যপু° ৩.৬, হরিবংশ ২৫ অ°)

শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে যে, মহর্ষি অত্রির সোম, দুর্ব্বাসা ও দত্তাত্রেয় এই পুত্র-ত্রয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের অংশসম্ভূত। ব্রহ্মার পুত্র অত্রি মহাতেজস্বী ঋষি ছিলেন। ইনি বিধাতার নিকট হইতে সৃষ্টিকার্য্যের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া পত্নীর সহিত ঋক্ষ নামক কুলাচলে তপস্যা করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। কি উপায়ে সৃষ্টি করিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার সাধনা করিতে হইয়াছিল। তারপর সেই মনোহর পর্ব্বতে অত্রি শতবর্ষ পর্য্যন্ত তপস্যায় নিরত রহিলেন। তিনি প্রাণায়াম দ্বারা মনঃসংযোগ ও রাগাদি রিপু হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া অবশেষে একমাত্র বায়ুভক্ষণ করিয়া একপদে তপস্যা করিতে লাগিলেন। অত্রি এই প্রকার কঠোর তপস্যা করিতে করিতে ভগবান্‌কে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, হে

জগদীশ্বর! আমি কায়মনোবাক্যে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও এবং আমাকে সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুত্র প্রদান কর। ভগবান্ অত্রি এইরূপে তপোবলের দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া একপদে অবস্থান করিয়া দেখিতে পাইলেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত আকাশমার্গে আগমন করিয়াছেন। ভগবান্ অত্রি দর্শনমাত্র তাঁহাদের স্তব করিতে লাগিলেন। অত্রির আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর মধুর বাক্যে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি যদিও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়াছ, তথাপি আমরা তিনজনই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমরা গুণভেদে তিনমূর্ত্তি মাত্র, কিন্তু মূলতঃ একই ঈশ্বর। তোমার সাধু সঙ্কল্প পূর্ণ করিবার নিমিত্তই আমরা আগমন করিয়াছি। হে সাধো! আমাদের এই তিনজনেরই অংশে তোমার তিনটী পুত্র উৎপন্ন হইবে এবং এই পুত্রত্রয়ের দ্বারা তোমার কীর্ত্তি ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত হইবে।

তারপর বরপ্রাপ্ত অত্রি ব্রহ্মার অংশ হইতে চন্দ্র, বিষ্ণুর অংশ হইতে দত্তাত্রেয় এবং শিবের অংশ হইতে দুর্ব্বাসা মুনিকে উৎপাদন করিলেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ৮ম স্ক° ৭ অ°)

হরিবংশে সোমদেবের উৎপত্তি নিম্নোক্তরূপ লিখিত আছে। মহর্ষি অত্রি ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধরেতা ও নিমেষশূন্য হইয়া অবস্থান করায় তাঁহার দেহ হইতে তেজোরাশি বাহির হইতে লাগিল। এই তেজ তাঁহার সমস্ত দেহকে রঞ্জিত করিয়া আকাশমার্গে উত্থিত হইল এবং তাঁহার নেত্র হইতে বারি নির্গত হওয়ায় তাহাদ্বারা দশ দিক্ উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। ইহাতে দশ দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ সমবেত হইয়া ঐ তেজ স্ব স্ব গর্ভে ধারণ করিলেন। কিন্তু কেহই সেই তেজ সহ্য করিতে পারিলেন না। অতঃপর তেজোময় সর্ব্বলোক-প্রীতিকর শীতাংশু সহসা দিগ্দেবীগণের সহিত ধরাতলে নিপতিত হইলেন। চন্দ্র ও দিগ্দেবীগণের পতনকালে সমগ্র জগৎ আলোকময় হইয়া উঠিল। পরে লোকপিতামহ ব্রহ্মা চন্দ্রকে ভূতলে দেখিয়া জগতের মঙ্গলের জন্য তাঁহাকে রথে স্থাপন করিলেন। এইরূপে অত্রির তেজ হইতে চন্দ্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞ করেন, এই যজ্ঞে অত্রি হোতা ছিলেন। (হরিবংশ ২৫ অ° ; মৎস্যপু° ২৩ অ°) ইহা ব্যতীত হরিবংশে নিম্নলিখিত অত্রিপুত্রগণের উল্লেখ দেখা যায়, ১ সত্যনেত্র, ২ দীপ্তিমান্, ৩ আপোমূর্ত্তি, ৪ তরুণ; ৫ নিষ্প্রকম্প, ৬ যুক্ত প্রভৃতি।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ইঁহার অত্রি নামের কারণ বিশদভাবে বর্ণিত আছে—

"অহং তৃতীয় ইত্যর্থস্তস্মাদত্রিঃ স কীর্ত্ত্যতে।" (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৪.৪৫)

ব্রহ্মা হইতে যে সকল প্রজাপতি উৎপন্ন হইয়াছিলেন, অত্রি তাঁহাদের মধ্যে তৃতীয় ছিলেন। এই তৃতীয়ার্থ হইতে 'অত্রি' নাম হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে অত্রির দশটী পত্নী ছিলেন—১ ভদ্রা, ২ শূদ্রা, ৩ মদ্রা, ৪ শলদা, ৫ মলদা, ৬ বেলা, ৭ খলা, ৮ গোচপলা, ৯ মানরসা ও ১০ রত্নকূটা। ভদ্রা হইতে সোমের জন্ম। এই পুরাণে দত্তাত্রেয় ও দুর্ব্বাসা ব্যতীত অকল্মষ নামে অপর এক পুত্রের নামও পাওয়া যায়। পুরাণে অত্রির কন্যার নাম 'অবলা"। বেদে তাঁহার নাম 'অপালা'। অনসূয়া অত্রি হইতে পাঁচটী নিষ্পাপ পুত্র ও একটী কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। ঐ কন্যার নাম শ্রুতি, ইনি শঙ্খপদের মাতা ও কর্দ্দমঋষির পত্নী। অনসূয়ার পুত্রগণের নাম ১ সত্যনেত্র, ২ হব্য, ৩ আপোমূর্ত্তি, ৪ শনৈশ্চর ও ৫ সোম। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ২৮.১৯-২১) কর্দ্দমের পত্নী অত্রিনন্দিনী শ্রুতি শঙ্খপদ নামে এক পুত্র ও কাম্যা নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ২৮.২১) অত্রিকন্যাগণের নাম ঋগ্বেদের বহুস্থানে দেখা যায়। ঋগ্বেদে যতগুলি ঋক্ নারীগণের দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে তন্মধ্যে অত্রিকন্যাদৃষ্ট ঋক্ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পুরাণান্তরে অত্রি সম্বন্ধে এই প্রকার বিবরণ পাওয়া যায়। ব্রহ্মা মানসপুত্র অত্রিকে প্রজাসৃষ্টি এবং বেদরক্ষণের ভার প্রদান করেন। ইনি সর্ব্বপ্রথম পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করেন, তথায় ইঁহার 'তুহিনরশ্মি' নাম্নী এক কন্যা জন্মে। অতঃপর মহর্ষি শঙ্খনাগানদীর উপকূলস্থ দেশ হইতে শঙ্খপর্ব্বতের উপর যাইয়া পৌঁছিলেন এবং শ্বেতগিরিতে ব্রহ্মার তপস্যায় নিমগ্ন হন। সে স্থানের লোকসকল অত্রির আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া স্ত্রীপুত্র-কন্যাসহ তাঁহার পূজা করিতে আসিলেন।

অত্রির প্রথম পুত্র শাঙ্কায়ন দেখিতে অতিসুন্দর ও বলিষ্ঠ, কিন্তু অত্যন্ত অধার্ম্মিক ও উগ্রস্বভাব-সম্পন্ন ছিলেন, অভক্ষ্য মাংস ভক্ষণ করিয়া গিরিগুহায় বাস করিতেন। ইঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতাও জ্যেষ্ঠের অনুরূপ ভাব অবলম্বন করেন। এই সময়ে মহর্ষি অত্রি পুত্রগণের আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং বহুবিধ ভর্ৎসনা-বাক্য প্রয়োগ করেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফলই হইল না দেখিয়া তিনি নিজে নিজেই শান্ত হইয়া বিশেষভাবে তাহাদিগকে বুঝাইলেন এবং অবশেষে এই পর্ব্বতে তাহারা কিরূপে বাস করিবে, কিরূপ ভাবে গ্রামসন্নিবেশ হইবে এবং গবাদির জন্য কিরূপ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে তাহাও বলিলেন। অতঃপর কহিলেন, তাহাদের বাসের নিমিত্ত যে সকল স্থান নির্দ্ধারিত হইল এই সকল স্থানের প্রতি জন্মভূমির মত যত্ন রাখিবার জন্য এখন হইতে যেন "অত্রি" নামে এই সকল স্থানকে সম্বোধন করা হয়। তারপর অত্রি পুত্রগণকে

পরিত্যাগ করিয়া সিন্ধুদেশে গমন করিলেন। তথায় দেবনিকা পর্ব্বতে কিছু কাল অবস্থান করিয়া ধর্ম্মজ্ঞান-সম্পন্ন অনেক প্রজা সৃষ্টি করেন। ইঁহার বাসের নিমিত্ত তাঁহারা "দেবনগর" স্থাপন করেন।

কোন কোন পুরাণের মতে অত্রি মানবসমাজে বেদ প্রচার করিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার সন্তানরূপে ত্রিমূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠের নাম সোম, অর্থাৎ মানবদেহ-ধারী চন্দ্র। মার্কণ্ডেয়পুরাণের মতে যখন অত্রি অনসূয়ার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন, তখন সোমের জন্ম হয়।

রামচন্দ্র বনবাসকালে মহর্ষি অত্রির আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন। মহর্ষি অত্রি তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং স্বীয় পত্নী অনসূয়াকে কহিলেন, "তুমি বৈদেহীকে (সীতা) তোমার নিকট লইয়া যাও!" অনসূয়া সীতার অঙ্গরচনা করিয়াছিলেন। (রামা° অযোধ্যা° ১১৭ সর্গ) রামচন্দ্র অত্রি প্রভৃতি ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া গোদাবরীতটে গমন করিয়াছিলেন। (অগ্নিপু° ৭.২)

মহাভারতে উল্লেখ আছে যে, মহর্ষি অত্রি বেণনন্দন পৃথুরাজের অশ্বমেধ যজ্ঞে অর্থ প্রার্থনার নিমিত্ত গমন করিতে অস্বীকৃত হইয়া স্ত্রীপুত্র সহ তপস্যার্থ বনে যাইতে উদ্যত হন। কিন্তু অবশেষে অনসূয়ার অনুরোধে পৃথুরাজের যজ্ঞে যাইতে বাধ্য হন। তিনি অর্থ প্রার্থনা করিয়া রাজাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, "তুমি ধন্য; তুমি ঈশ্বরস্বরূপ!" ইহাতে গৌতমমুনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, মনুষ্যকে ঈশ্বর বলিয়া প্রশংসা করা অনুচিত। অবশেষে সনৎকুমার এই বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া বলিলেন যে, রাজাকে এই প্রকার স্তব করা অনুচিত নহে। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বেণপুত্র পৃথু অত্রিকে অলঙ্কার-ভূষিতা সহস্র দাসী, দশভার স্বর্ণ এবং দশকোটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেন। অত্রি ঐ সকল ধন পুত্রাদিকে প্রদান করিয়া নিজে তপস্যার্থ বনগমন করিলেন। ঋগ্বেদে বলা হইয়াছে যে, অত্রিদেব ইন্দ্রের আরাধনা করিতেন, কিন্তু ভাগবতে লেখা আছে, মহর্ষি অত্রি পৃথুরাজের যজ্ঞে ইন্দ্রকে দেবাধম এবং যজ্ঞবিঘ্নকারী বলিয়া ভর্ৎসনা করেন এবং বধ করিতে আজ্ঞা দেন। (শ্রীমদ্ভাগ° ৪.১৯.১৩-১৫)

ভারতের পশ্চিম পার্শ্বস্থ দেশসমূহের লোকসকল অত্রি ঋষিকে 'অত্রিস্' বা 'ইদ্রিস্' এই নামে সম্বোধন করেন।

অত্রি চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ ছিলেন। চন্দ্রবংশোদ্ভব দেবনহুষ রাজা একবার মেরুপর্ব্বতের নিম্নদেশে অত্রির সহিত দেখা করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তথায় কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে এক নগরী প্রস্তুত করিবার অনুমতি করেন। সেই নগরীর নাম "দেবনহুষ" রাখা হইয়াছিল। অনেকে অনুমান করেন যে, 'দেবনহুষ' ও 'দেবনহুষনগরী' এই শব্দ দুইটী ইউনানী দিওন্যসিউস্ (Dionysius) এবং 'দিওন্যসিওপলিস্' (Dionysiopolis) এর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। এরূপ অনুমান হয় যে, অত্রিদেব যে প্রকার ভারতবর্ষ এবং উহার নিকটস্থ দেশসমূহের সম্প্রদায়বিশেষের আদিপুরুষ ছিলেন, সেই প্রকার ইউনানী রাজা ও পূজনীয় ব্যক্তিবর্গেরও আদিপুরুষ।

অত্রিগোত্র আজও হিন্দুসমাজে প্রচলিত আছে। বস্তি জেলার 'সবরিয়া' জাতি এবং বঙ্গদেশের কায়স্থসমাজে বহু অত্রিগোত্রাবলম্বী ব্যক্তি আছেন।

বৃহৎসংহিতার টীকায় ভট্টোৎপল লিখিয়াছেন, সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে চারি বৎসর অবস্থান করেন। এই প্রকার হিসাবে সপ্তর্ষির অবস্থানকাল পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হয়। ঐ সময়ে অত্রির আবির্ভাব কাল অবগত হওয়া যায়। [সপ্তর্ষি দ্র°]

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও এইরূপ স্বীকার করেন যে, অত্রি ঋষির সহিত প্রাচীন ইউরোপেরও অতি নিকট সম্বন্ধ ছিল। এ সম্বন্ধে বিলফোর্ড সাহেব লিখিয়াছেন—

"The most celebrated amongst these Parnasas was that of the famous Atri, whose history is closely connected with that of the British Islands and the western regions." (Asiatic Researches, Vol. VI, p. 469)। 'ভলসুঙ্গে'র (Volsung) গল্পে 'অৎলি' এবং 'নিবেলুঙ্গ' (Nibelung) সম্বন্ধীয় গানে 'এৎজেল' নামক যে দেবতার নাম দেখা যায়, উহার সহিত অত্রির অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। (Cox, 'Mythology of the Aryan Nations,' Vol. 1, p. 342)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় উল্লিখিত আছে, অত্রি একজন বিশিষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্রকার ছিলেন। তৎপ্রণীত 'অত্রিসংহিতা' নামক একখানা গ্রন্থ আছে। [অত্রিসংহিতা দ্র°]

অত্রি২—এক দেবতা। ইহার দুই প্রকারের ধ্যান পাওয়া যায়। (১) একটী ধ্যানে অত্রিকে দকারাক্ষরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলা হইয়াছে। শ্রীতত্ত্বনিধিতে তাঁহার প্রথমোক্ত ধ্যান পাওয়া যায়। যথা—

"অরুণপ্রভো জটাবান্ আসীনঃ দক্ষিণে জ্ঞানমুদ্রাং বামে পুস্তকং চ দধানঃ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতঃ।"

অত্রি অরুণের ন্যায় রক্তবর্ণ, জটাধারী, আসনে সমাসীন,

ইঁহার দক্ষিণ হস্তে জ্ঞানমুদ্রা এবং বাম হস্তে পুস্তক, ইনি সকল আভরণে ভূষিত।

(২) অত্রিকে দ্বিতীয় ধ্যানে বিরিঞ্চিতনয় এবং অনসূয়ার পতি বলা হইয়াছে। তৃতীয় ধ্যানে অত্রিকে মরীচির পুত্রনামে অভিহিত করা হইয়াছে। শ্রীতত্ত্বনিধিতে উল্লিখিত ধ্যান অনুসারে তিনি অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলু ধারণ করেন। তিনি শান্তমূর্ত্তি, পাপহীন, জটামণ্ডিত, শ্মশ্রুধারী ও শ্যামলাঙ্গ।

অধ্যাপক সিলভেন্ লেভির সহযোগিতায় প্রকাশিত Hobogirin গ্রন্থের ১ম ভাগে 'অতেইরি' নামক জাপান দেশীয় দেবতার উল্লেখ আছে। উহাতে লিখিত হইয়াছে যে 'অতেইরি' অত্রিরই নামান্তর। তথায় ইঁহার বর্ণনা এই প্রকার—ইনি জনৈক দ্রষ্টা বা ঋষি। মাতৃকামণ্ডলের শিখরভাগে বহিরঙ্গনের দক্ষিণে অগ্নিসহচরগণের মধ্যে স্থাপিত। ইনি বামহস্তে জলভাণ্ড ধারণ করিয়া আছেন; দক্ষিণে ইঁহার শরীর আবৃত। ......ইঁহার ধ্যান এইরূপ "আত্রেয় মহর্ষিম্ স্বাহা"।

অত্রি৩—গয়া জেলার গ্রামবিশেষ। অক্ষা° ২৪°৫৫'৫" উ°; দ্রা° ৮৫°১৭'৪০" পূ°। বিহার হইতে দূরত্ব ২৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম।

অত্রিগুণ—(ত্রি) ত্রিগুণে সম্বন্ধহীন, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণ হইতে পৃথক্। ২ (ক্লী) ত্রিগুণভিন্ন অন্যবস্তু।

অত্রিচতুরহ—(পুং) যজ্ঞবিশেষ। (কাত্যায়নশ্রৌত° ২৩.২.১২)

অত্রিজ—(পুং) অত্রিপুত্র দুর্ব্বাসা। "ইত্যুক্ত্বা স যদা তাত চলিতো মুনিরত্রিজঃ" (পদ্ম° উত্তরখণ্ড° ২০৫.২৮)
২ আত্রেয়ের নামান্তর। (চরক ১.৩)

অত্রিজাত—(পুং) [অত্রের্নেত্রাৎ জাতঃ জন-ক্ত, ৫-তৎ] চন্দ্র। ইনি প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত মহর্ষি অত্রির চক্ষু হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।

অত্রিদৃগ্‌জ—(পুং) [অত্রের্দৃশো নেত্রাৎ জায়তে জন-ড] চন্দ্র।

অত্রিন্—(পুং) [অদেস্ত্রিনিচেতি ত্রিণিপ্রত্যয়ঃ] অদনশীল, ভক্ষক, রাক্ষসাদি। 'অত্রিণোঽত্তারঃ রাক্ষসাদয়ঃ' (ঋক্ ১.৯৪.৯ সায়ণ)

অত্রিনেত্রজ—(পুং) [অত্রের্নেত্রাৎ জায়তে] অত্রিনেত্র-জল হইতে জাত, চন্দ্র।

অত্রিনেত্রপ্রসূত—(পুং) [অত্রের্নেত্রাৎ প্রসূয়তে, প্র-সূ-ক্ত] অত্রির নেত্র হইতে সম্ভূত, চন্দ্র।

অত্রিনেত্রভূ—(পুং) [অত্রের্নেত্রাৎ ভবতি, ভূ-ক্বিপ্] চন্দ্র।

অত্রিপ্রিয়া—(স্ত্রী) অত্রির স্ত্রী, অনসূয়া।

অত্রিভারদ্বাজকা—(স্ত্রী) [অত্রিভারদ্বাজবংশয়োঃ মৈথুনম্] অত্রি এবং ভরদ্বাজবংশজাত স্ত্রীপুরুষের মিলন, অত্রিভারদ্বাজী বিবাহ।

অত্রিবৎ—(ক্রিয়াবিশেষ) অত্রির ন্যায়, অত্রির তুল্য, অত্রির যজ্ঞে যেরূপ সেইরূপ। "স্বাহগ্নে অত্রিবৎস্নুতে রণ" (ঋক্ ৫.৫১.৮)

অত্রিসংহিতা—(স্ত্রী) [অত্রিণা প্রণীতা সংহিতা স্মৃতিঃ] অত্রি ঋষি-প্রণীত সংহিতাবিশেষ। এই সংহিতার প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের কর্ম্মবৃত্তি, রাজধর্ম্ম, শোধন এবং স্নানবিধি, শৌচাদি-লক্ষণ, ইষ্টাপূর্ত্তবর্ণন, যমনিয়মাদি, প্রায়শ্চিত্তবিধি, অশৌচনির্ণয়, চান্দ্রায়ণাদি বিধি, বজ্রব্রতবিধি, ষড়্‌ভিক্ষুকনির্ণয়, মহাপাতকাদিনিরূপণ, নাড়ীশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, প্রাণায়ামলক্ষণ, দানবিধি, শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণনিরূপণ ও শ্রাদ্ধফল ইত্যাদি। এই সংহিতায় শঙ্খ, আপস্তম্ব, শাতাতপ, যম এবং মনুসংহিতার উল্লেখ দেখা যায়। উপর্য্যুক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র-সমূহ রচিত হওয়ার পর এই সংহিতা রচিত হইয়াছে কি না তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। কারণ মন্বাদি অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ 'গৃহ্যসূত্রে'ও আত্রেয়সংহিতার নাম বিদ্যমান রহিয়াছে। মহর্ষি মনুও এক স্থলে বলিয়াছেন যে, 'অত্রি এবং উতথ্যপুত্রের মতে যে ব্যক্তি শূদ্রাকে বিবাহ করে সে ব্যক্তি পতিত হয়'। (মনু ৩.১৬) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ও অগ্নি-পুরাণে অত্রিকে ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তারূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। "মনুর্বিষ্ণুর্যাজ্ঞবল্ক্যো হারীতোঽত্রির্যমোঽঙ্গিরাঃ" (অগ্নিপু° ১৬২.১) কিন্তু আজকাল যে অত্রিসংহিতা প্রচলিত আছে, সেই সংহিতা সর্ব্বাংশে মন্বাদি অপেক্ষা প্রাচীন কিনা তাহা বলা যায় না, তবে ইহার কোন কোন অংশকে প্রাচীন বলিয়া মনে হয়।

প্রথমতঃ মনুর বচনে অত্রির যে মতের উল্লেখ দেখা যায় তাহা বর্ত্তমানাকারে প্রকাশিত অত্রিসংহিতায় দৃষ্ট হয় না। দ্বিতীয়তঃ প্রচলিত অত্রিসংহিতায় মন্বাদির মত উদ্ধৃত হইয়াছে এবং অনেক অপ্রাচীন বচনও পরিলক্ষিত হয়।

"বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণোভবন্তি ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি॥"

এই শ্লোকে পুরাণের উল্লেখ থাকায় প্রমাণিত হয় যে, অত্রি-সংহিতা পুরাণ-রচনার অনেক পরে রচিত হইয়াছে। এই সংহিতার অনেক স্থলে "ভগবানত্রিরব্রবীৎ" অর্থাৎ ভগবান্ অত্রি বলিয়াছেন, এইরূপ উক্তি দেখা যায়। ইহাতে মনে হয় যে এই গ্রন্থের প্রণেতা স্বয়ং অত্রি নহেন, কারণ মহর্ষি অত্রি-কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ রচিত হইলে 'ভগবান্ অত্রি বলিয়াছেন' এইরূপ

বাক্যের সন্নিবেশ দেখা যাইত না। সুতরাং প্রচলিত অত্রি-সংহিতা যে অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, ইহাতে অত্রির মতই অধিক পরিমাণে উল্লিখিত হইয়াছে।

অত্রিস্থান—শ্বেতগিরিস্থ জনপদবিশেষ। এখানকার লোকসকল অত্রিদেবের পূজা করিয়া থাকেন।

অত্রিস্মৃতি—[অত্রিসংহিতা দ্র°]

অত্রীশ্বর—(পুং) কোটিতীর্থস্থিত শিবলিঙ্গভেদ। মহর্ষি অত্রি এই তীর্থে তপস্যা করেন। তিনি উক্ত তীর্থের দক্ষিণ দিকে অত্রীশ্বর নামে একটী উত্তম লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐ লিঙ্গ মহাপাপনাশক। ঐ লিঙ্গের অগ্রভাগে তিনি একটী সরোবর নির্ম্মাণ করেন। যে ব্যক্তি উহাতে স্নান করিয়া অত্রীশ্বরের অর্চ্চনান্তে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি চিরকাল রুদ্রলোকে বাস করিতে সমর্থ হয়।

অত্রৈগুণ্য—(ক্লী) সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণের বিনাশ। সাংখ্যবাদী এই স্থিতিকে মোক্ষ বলেন।

অত্রৈব—(অব্য) এইস্থানে, এই জায়গায়।

অত্রৌলি,—উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের আলিগড় জেলান্তর্গত একটী তহশীল। গঙ্গানদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। পরিমাণ ২২৬৩৭১ একর; তন্মধ্যে অধিকাংশ কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। গ্রামসংখ্যা—২৯৪।

অত্রৌলি₂—উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ আলিগড় জেলার একটী নগর। অক্ষা° ২৮°১′৫০″ উ°; দ্রা° ৭৮°১৯′৪০″ পূ°। পরিমাণ—১৬৩ একর। অধিবাসীর বেশীর ভাগই হিন্দু। আলিগড় নগর হইতে ১৬ মাইল দূরে আলিগড় ও রামঘাটের মধ্যস্থ পথের উপর বর্ত্তমান। নগরটী সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর। প্রায় খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়।

অত্রৌলি₃—অযোধ্যার হরদোই জেলার এক নগর। শাণ্ডিলের ১১ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। অধিবাসীর মধ্যে বৈস্ খত্রি প্রধান।

অত্বচ—(ত্রি) চর্ম্মরহিত, যাহাতে চামড়া নাই।

অত্বরা—(স্ত্রী) [ন ত্বরা শীঘ্রং অভাবার্থে নঞ্‌-তৎ] ত্বরার অভাব; ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা। "ত্রীণি চাত্র প্রশংসন্তি শৌচমক্রোধমত্বরাম্" (মনু ৩.২৩৫)

অৎসন্ত—মান্দ্রাজ প্রদেশস্থ গোদাবরী জেলার এক নগরী।

অৎসরুক—(পুং) [নাস্তি ৎসরুরিব মুষ্টিবন্ধনস্থানং যস্য] খড়্গের মত যাহার বাঁট নাই। ২ যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ। ৩

অৎসিজ,—মালিক সাহেবের অধীন জনৈক তুর্কী আমীর এবং খ্বারিজমের সুলতান। ইনি ১০৭১ খৃষ্টাব্দে রম্‌লা, জেরুসালেম এবং আস্কালোন্ ব্যতীত সমগ্র পালেস্তাইন্ দেশ ফতিমা বংশীয়দের হস্ত হইতে অধিকার করেন। পরে কিছুদিন দামস্কস্‌নগর অবরোধ করিয়া উহা অধিকার করেন। ইহার অত্যল্পকাল পরেই তিনি মিশর অভিযানের সংকল্প করেন, কিন্তু দামস্কসের ফতিমা-বংশীয়গণের দ্বারা অবরুদ্ধ হন। অলপ্ অর্সলানের পুত্র সিরীয়ার শাসনকর্ত্তা তুতুশ বা তুর্‌তুশ ১০৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। সিরীয়গণ অৎসিজকে আকসিজ বলিত। [অর্সলান দ্র°]

অৎসিজ₂—খ্বারিজ্‌মের শাসনকর্ত্তা মহম্মদের পুত্র এবং অনুশ্‌তাকীনের পৌত্র। ১১২৭ খৃষ্টাব্দে ইনি সেল্‌জুক্ সুলতান সান্‌জরের সামন্তরূপে খ্বারিজমের শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করেন। পরে জান্দ প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া তুর্কীস্থানের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত সসৈন্য অভিযান করেন। অতঃপর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু ১১৩৭ খৃষ্টাব্দে হজারাস্পের নিকটে সান্‌জর কর্ত্তৃক পরাভূত ও বিতাড়িত হন। প্রজাদের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ইনি পুনরায় স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইনি আরও তিনবার সুল্‌তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। কিন্তু প্রতিবারই সুলতান কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া নিজের দোষ স্বীকার করেন এবং সুলতানের ক্ষমা লাভ করিতে সমর্থ হন। ১১৫৬ খৃষ্টাব্দে ৫৯ বর্ষ বয়সে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইঁহার পুত্র অলপ্ অর্সলান পিতৃপদের উত্তরাধিকারী হন। ১১৭২ খৃষ্টাব্দে অলপ্ অর্সালানের মৃত্যু হয়। ইনি অলপ্ অর্সলান নামেও পরিচিত।

অৎসিজ₃—ঘোরের সুলতান আলাউদ্দীন্ হসান জালালের পুত্র। বাহাউদ্দীন্ সামের পরে ইনি সুলতান হন। ১২১১ খৃষ্টাব্দে গজনীর তাজ্-উদ্দীন্ এলদুজের সহিত যুদ্ধে ইনি পরাজিত ও নিহত হন। ঘোরের সুলতানবংশের এই শাখার ইনিই শেষ সুলতান।

অৎসী—ব্রহ্মদেশান্তর্গত আমহার্ষ্ট জেলার রাজস্বকেন্দ্র। নামান্তর অতসেন। রি নদীর মোহানার দক্ষিণ দিকে সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত। সুগন্ধ অতসী বৃক্ষের প্রাচুর্য্যের জন্য অত্‌সী নাম হইয়াছে। অধিবাসীর অধিকাংশই তলইং জাতীয়।

অথ, অথো—(অব্য) [অর্থ চু° অদন্ত-ড পৃষোদরাদিত্বাৎ রলোপঃ]

"ওঁকারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা।
কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্যাতৌ তেন মাঙ্গলিকাবুভৌ॥" (দুর্গাদাস)

পূর্ব্বকালে কোন সময়ে ওঁকার ও অথ শব্দ ব্রহ্মার কণ্ঠ

হইতে বিনির্গত হইয়াছিল, এই জন্য শব্দ দুইটী মাঙ্গলিক বলিয়া গণ্য হয়। কাতন্ত্রব্যাকরণ-প্রণেতা সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য আখ্যাত-বৃত্তির প্রথম সূত্র অথ শব্দের দ্বারা আরম্ভ করিয়াছেন। "অথ পরস্মৈপদানি" (কলাপ) ১অনন্তর। ২ আরম্ভ। ৩ প্রশ্ন। ৪ কার্ৎস্ন্য। ৫ অধিকার। ৬ সংশয়। ৭ পক্ষান্তর। ৮ বিকল্প। ৯ সমুচ্চয়। ১০ মঙ্গল। ১১ বাক্যালঙ্কার। 'মঙ্গলানন্তরারম্ভ-প্রশ্নকার্ৎস্ন্যেষ্বথো অথ'। (অমর)

অনন্তর—"যিযক্ষুমাণেনাহূতঃ পার্থেনাথ দ্বিষন্মুরম্"। তাহার পর (ইন্দ্রসন্দেশ শ্রবণানন্তর) যজ্ঞাভিলাষী যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত মুরারি ইত্যাদি। "স্নানং কৃত্বাঽথ ভুঞ্জীত"। স্নান করিয়া অনন্তর ভোজন কর।

আরম্ভ—"অথ লিঙ্গানুশাসনং লিখ্যতে" লিঙ্গানুশাসন লিখিতে আরম্ভ করা যাইতেছে।

কোন প্রস্তাবের প্রথমে এইরূপ লিখিত থাকিলে সেই বিষয়ের আরম্ভ হইতেছে, ইহাই বুঝায়। "অথ সন্ধিঃ", "অথ সমাসঃ" ইত্যাদি। এ স্থলে অধিকার করিয়াও বুঝাইতেছে। 'অথ সন্ধিঃ' অর্থাৎ সন্ধিকে অধিকার করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে।

প্রশ্ন—"অথ কিমিদং তাবৎ?" "অথ গৃহ্ণাতি" (শকু° ৭ অঙ্ক); প্রথমা তাপসীর বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ দুষ্মন্ত প্রশ্ন করিলেন, 'যদি গ্রহণ করে' এইজন্য এখানে অথ শব্দে প্রশ্ন বোধ হইল।

এ সকল আবার কি? "অথ বক্তুং সমর্থোঽসি?"—তুমি বলিতে পারিবে কি?

সংশয়—"শব্দো নিত্যঃ, অথানিত্যঃ?"

শব্দ নিত্য না অনিত্য?

কার্ৎস্ন্য—"অথ ধাতূন্ ক্রমঃ"। সমস্ত ধাতুর বিষয় বলিব।

পক্ষান্তর—"অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি"।

আর যদি তুমি এই ধর্ম্মযুদ্ধ না কর ইত্যাদি।

সমুচ্চয়—ভীমোঽথার্জ্জুনঃ। ভীম এবং অর্জ্জুন। ২ "শ্বশ্রূরথ পিতৃষ্বসা" (মনু ২.১৩১) এখানে সমুচ্চয় অর্থে অথ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

মঙ্গল—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"। মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক ব্রহ্ম-বিষয়ক প্রশ্ন।

বেদ, উপনিষদ্ ও পুরাণাদিতে অথ শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়, "অথা ন ইন্দ্র সোমপা" (ঋক্ ১.১০.৩)—অনন্তর হে সোমপায়ী ইন্দ্র! আমাদিগের স্তুতি শ্রবণের নিমিত্ত নিকটে আগমন কর। এখানে অনন্তর অর্থে অথশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। (ঐতরেয়ব্রা° ২.২৫) যখন ইহার শরীর উত্তমরূপে পক্ব করিবে তখনই পিতৃলোকদিগের নিকট ইঁহাকে লইবে। (ঋক্ ১০.১৬.২) এখানে 'তখনই' এই অর্থে 'অথ' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। "অথ দক্ষিণাং দদাতি"। (বৃহদারণ্যক উপ° ৩.৯.২১) এইস্থানে অনন্তর অর্থে অথ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। "অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্"। (গীতা ১২.৯) এই প্রকার অসংখ্য প্রয়োগ আছে।

অথই—[দেশজ] গভীর। [অথাই দ্র°]

অথউ (পুং) সন্ধ্যার পূর্ব্বের ভোজন, অর্থাৎ সন্ধ্যা হওয়ার পূর্ব্বে যে ভোজন করা হয়।

অথক—(ত্রি) পরিশ্রমী।

অথকিম্—(অব্য) [অথ কায়তেঃ কবতের্ব্বা ডিমি প্রত্যয়ঃ] এইটী স্বীকারসূচক শব্দ, হাঁ তাই বটে। ২ ঠিক বটে। ৩ ঠিক বুঝা গিয়াছে। যেমন, "রাজা—পুরস্তাদ্গম্যত এব সর্ব্বথা অপ্সরঃ সম্ভবৈষা।" (শকু° ১.১৫৮) পরের ব্যাপারটী বুঝাই গিয়াছে, ইনি অপ্সরার গর্ভে জন্মিয়াছেন। অনসূয়া—'অথ ইং (শকু°) (অথকিং) হাঁ হাঁ তাই বটে, আপনি সব বুঝিতে পারিয়াছেন।

অথকিমু—(অব্য) এই পরিমাণে। ২ এরূপ অনেক মাত্রায়। ৩ কত অধিক পরিমাণে?

অথচ—(অব্য) [অস্-অথচ্] পক্ষান্তরে, অন্যপক্ষে। "মলিনেন কলঙ্কিনা, অথচ পাপিনা" (কাব্যাদর্শ ২.১৭৮ টীকা) ২ (বাঙ্গলায়) কিন্তু, তৎসত্ত্বেও, তাহা হইলেও। "সেই উদাসীন, নয়ন, তাহার নহে লক্ষ্যহীন আর; অথচ সে লক্ষ্য, চাহে লুকাইতে, অন্তরে অন্তরে তার" (নবীনচন্দ্র)

অথচ,—(অব্য) কিন্তু।

অথনসিউস্ নিকিটিন্—একজন রুস ভ্রমণকারী। ইনি ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতে আসিয়া সাত বৎসর-কাল দক্ষিণ ভারতে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইঁহার লিখিত বিবরণ হইতে যাহা জানা যায়, তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

অথনসিউস্ প্রথমে বোম্বাইয়ের ১৫ ক্রোশ দক্ষিণস্থ চেউল নামক স্থানে উপস্থিত হন। এখানে কিছু কাল অবস্থান করিয়া তিনি 'পিলি' (অর্থাৎ থানা জেলায় অবস্থিত পুলুসোণালু) গমন করেন। তথা হইতে 'উমরি' এবং 'উমরি' হইতে 'জুনীর' (অর্থাৎ জুনার) নামক স্থানে উপস্থিত হন। জুনারের পথে তিনি 'সরাইয়ে' অবস্থান করিতেন, সরাইয়ের কর্ত্রী প্রথানুযায়ী আগন্তুকের সহিত এক শয্যায় শয়ন করিত। জুনার শহর এক শৈলময় দ্বীপের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ সহর মনুষ্য-নির্ম্মিত নহে, স্বয়ং ভগবানের নির্ম্মিত। তৎকালে জুনারে আসাৎ খাঁ

নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দৌলতাবাদের শাসনকর্ত্তা 'মলিক্‌তুচারের' (অর্থাৎ মালিক-উল্‌-তুজার) একজন সামন্ত ছিলেন। আসাৎ খাঁ মলিক্‌তুচারের সাতাইশটী থানার মধ্যে সাতটী থানার অধিনায়ক ছিলেন। তিনি অথন-সিউস্‌কে ইস্‌লাম-ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য করিবার জন্য তাঁহার পণ্য ঘোটক আটক করেন, পরে খোজা ইওচা মহম্মদ নামক জনৈক খোরাসানী মুসলমানের মধ্যস্থতায় ঘোড়া ছাড়িয়া দেন।

অথবেথে—ব্যথে (ক্রিয়া বিশেষ) ২ অস্তব্যস্তভাবে, সত্বর, শীঘ্র। ৩ দ্রুতগতিতে।

অথবনা—(দেশজ) অস্ত হওয়া, ডুবিয়া যাওয়া, বসা।

অথরি,-অথরা,—(স্ত্রী) অগ্নিশিখা। ২ অঙ্গুলি। (ঋক্‌ ৪.৬.৮) এই শব্দের প্রয়োগ ঋগ্বেদে আছে, কিন্তু ইহার অর্থ সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে। সায়ণ ভাষ্যে "স্বসারঃ" শব্দের অর্থ ভগিনী বা অঙ্গুলি করিয়াছেন, এবং "অথর্য্যঃ" শব্দের অর্থ 'নারীসমূহ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতেও বিশেষ সন্দেহ হয়। 'Worterbuch'এ "অথর্য্যঃ" শব্দের অর্থ অঙ্গুলি ধরা হইয়াছে।

অথর্য্য—(ত্রি) সতত গমনশীল, (সর্ব্বব্যাপী)। (শুক্লযজুঃ ৩.৩৭ মহীধর) ২ পথিক, যে ক্রমাগত ভ্রমণ করে।

অথর্ব—(বৈদিক অথর্বন্‌, অবেস্তা অথৌরুন='পৌরোহিত্য'; অথৌর্বন্‌, আথ্রবন্‌='পুরোহিত', পৌরোহিত্য-কার্য্যক্ষম ব্যক্তি। শব্দটীর আদি অর্থ ছিল 'অগ্নিপুরোহিত'। ইহার ধাত্বংশ 'অথর্‌' সংস্কৃত ভাষায় কোথাও পৃথক্‌ ভাবে পাওয়া যায় না; তবে 'অথর্বন্‌' ভিন্ন 'অথর্য্যু' (ঋক্‌ ৭.১.১) কথাটী হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে বৈদিক ভাষায় এক সময়ে এই বিশেষ্য-বাচক ধাতুটীর প্রচলন ছিল। ইহাতেই বন্‌ ও যু প্রত্যয়ের ফলে যথাক্রমে 'অথর্বন্‌' ও 'অথর্য্যু' এই দুইটী পদের উৎপত্তি হইয়াছে। 'অথর্য্যু' কথাটী ঋগ্বেদে অগ্নি সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বৈদিক 'অথর্‌' অবেস্তা 'আতর্‌' শব্দের সহিত সংযুক্ত; কিন্তু Bartholomae (Indo-germanische forschungen, V. p. 221) ও Zubaty (Kuhn, Zeitschrift, 1 p. 2) ইহাদের পরস্পর কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

বেদে উল্লিখিত পিতৃপুরুষদিগের (আদি বংশ-প্রতিষ্ঠাতা) মধ্যে—অথর্বদিগের নাম পাওয়া যায়। অধিকাংশ স্থলে বিশেষ করিয়া অথর্ববেদে অথর্বগণ অঙ্গিরাগণের সহিত একত্র উল্লিখিত হইয়াছেন। যথা, "অথর্বাণো অবধ্রতাথর্বণা অবধ্রত দৈবর্যিনো অঙ্গিরসো দস্যূনাং বিভিদ্ভিঃ পুরস্তেন ত্বং বিষতো জহি" (অথর্ব ১০.৬.২০)। "আথর্বণীরাঙ্গিরসীর্দৈবীর্মনুষ্যজা উত। ওষধয়ঃ প্র জায়ন্তে যদা ত্বং প্রাণ জিন্বসি।" (অথর্ব ১১.৬.১৬)। ঠিক ঐরূপে—ভৃগুগণ ও অঙ্গিরাগণ একত্র উল্লিখিত হইয়াছেন এবং 'অথর্বাঙ্গিরসে'র মত 'ভৃগ্বঙ্গিরস'ও একটী বহুব্যবহৃত সমাস। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে 'ভৃগ্বথর্বন্‌' বলিয়া কোন সমাস দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা হইতে Hillebrandt (Vedische Mythologie, Vol. II, p. 174) অনুমান করিয়াছেন যে ভৃগু ও অথর্ব একার্থবাচক না হইলেও তুল্যার্থবাচক শব্দ। অবেস্তার 'অথৌর্বন্‌' শব্দ হইতে কিন্তু অনুমান হয় যে বৈদিক 'অথর্বন্‌' প্রথমে পুরোহিতবাচক একটী সাধারণ সংজ্ঞামাত্র ছিল, কোন ব্যক্তিবাচক বিশেষ সংজ্ঞা ছিল না। "যোঽথর্বাণং পিতরং দেববন্ধুং বৃহস্পতিং নমসাব চ গচ্ছাৎ"। (অথর্ব ৪.১.৭) "অথর্বাণং পিতরং দেববন্ধুং মাতুর্গর্ভং পিতরমসুং যুবানম্‌।" (অথর্ব ৭.২.১) ঋগ্বেদে 'অথর্বন্‌' সাধারণতঃ পুরোহিতার্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। মন্ত্রে ঋষি বৃহদ্দিবকে অথর্বাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে—"এবা মহান্‌ বৃহদ্দিবো অথর্বাবোচৎ স্বাং তন্ব মিন্দ্রমেব।" (ঋক্‌ ১০.১২০.৯) অগ্নি দেবগণের পুরোহিত, সেই জন্য অগ্নিকেও 'অথর্বন্‌' বলা হইয়াছে। "আ সোমম্‌ মধুমন্তমং ঘর্মং সিঞ্চাদথর্বণি" (ঋক্‌ ৮.৯.৭)। অথর্বন্‌ যেখানে ব্যক্তি-বিশেষের সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে সেখানেও বুঝিতে হইবে যে মূলতঃ সাধারণ সংজ্ঞাবাচক শব্দটী পরবর্ত্তী যুগে কোন এক প্রাচীন কাল্পনিক পুরুষকে নির্দ্দেশ করিবার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। (Ludwig, Vol. III, p. 193).

বহুবচনে অথর্বাণ শব্দ অঙ্গিরস্‌, নবগ্ব ও ভৃগুগণের সহিত পিতৃপুরুষরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। "অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবগ্বা অথর্বাণো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ"। (ঋক্‌ ১০.১৪.৬) মন্ত্রানুযায়ী অথর্বগণ দেবপদবাচ্য ও স্বর্গবাসী। "আদিত্যা রুদ্রা বসবো দিবি দেবা অথর্বাণঃ। অঙ্গিরসো মনীষিণস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ।" (অথর্ব ১১.৮.১৩)

ঋগ্বেদে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে অগ্নীন্ধনবিষয়ে অথর্বন্‌ ছিলেন পথপ্রদর্শক; "ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্বা নিরমন্থত" (ঋক্‌ ৬.১৬.১৩) "অথর্বদগ্নিং মন্থতি" (৬.১৫.১৭) "অগ্নির্জাতো অথর্বণা।" (১০.২১.৫) দ্বিতীয়তঃ, বহুবার বলা হইয়াছে যে অথর্বন্‌ ছিলেন প্রথম যজ্ঞকর্ত্তা: "যজ্ঞৈরথর্বা প্রথমঃ পথস্ততে।" (ঋক্‌ ১.৮৩.৫) "যজ্ঞৈরথর্বা প্রথমো বি ধারয়ৎ", (১০.৯২.১০) "যামাহুতিং প্রথমামথর্বা যা জাতা যা হব্যম-কৃণোজ্জাতবেদাঃ।" (অথর্ব ১৯.৪.১) উপরন্তু দেখা যায় যে ইন্দ্র স্বয়ং ছিলেন অথর্বনের রক্ষাকর্ত্তা, "অহমিন্দ্রো রোধো বক্ষো অথর্বণঃ।" (ঋক্‌ ১০.৪৮.২) বৃহদ্দিব অথর্বন বিশেষ করিয়া ইন্দ্রকেই আহ্বান করিয়াছেন-"এবা মহান্‌ বৃহদ্দিবো অথর্বাবোচৎ স্বাং

ত্বমিন্দ্রমেব" (ঋক্ ১০.১২০.৯)। চতুর্থতঃ, বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে অথর্বনের সহিত বরুণের একটা বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। অথর্ববেদে উল্লিখিত হইয়াছে যে বরুণ অথর্বনকে একটা পৃশ্নি গাভী দান করিয়াছিলেন। "কঃ পৃশ্নিং ধেনুং বরুণেন দত্তামথর্বণে সুদুঘাং নিত্যবৎসাম্।" (৭.১০.৪) অথর্ববেদেরই অন্যত্র আবার বলা হইয়াছে যে বরুণ অথর্বনের পিতা;—"অজীজনো হি বরুণঃ স্বধাবন্নথর্বাণং পিতরং দেববন্ধুম্"। (৫.১১.১১)

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে একবচনান্ত অথর্বন্ শব্দ দ্বারা সাধারণতঃ এক কাল্পনিক পূর্ব্বপুরুষকে অভিহিত করা হইয়াছে; কিন্তু শব্দটী সাধারণতঃ বাস্তব ব্যক্তিসমূহের আখ্যারূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অথর্বগণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে তাঁহারা যজ্ঞে মধু ব্যবহার করিতেন ;—"অভিতে মধুনা পয়ো অথর্বাণো অশিশ্রয়ুঃ"। (ঋক্ ৯.১১.২)। অথর্বপুত্র দধ্যঙ্ অশ্বিনী-কুমারদিগকে 'মধুবিদ্যা' শিখাইয়াছিলেন। (ঋক্ ১.১১৭.২২), পরবর্ত্তী যুগে এই ঘটনাটাকে আশ্রয় করিয়া 'মধুব্রাহ্মণ' সৃষ্ট হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ দেখা যায় যে তাঁহারা সবিতার উপাসক ছিলেন ; যথা "দোষো গায় বৃহদ্গায় দ্যুমদ্ধেহিআথর্বণস্তুহি দেবং সবিতাবরম্"। (অথর্ব ৬.১.১) একটী দানস্তুতিতে বলা হইয়াছে যে অথর্বগণ রাজা অশ্বথের নিকট হইতে অশ্বযুক্ত রথ ও গোধন লাভ করিয়াছিলেন।·"দশ রথান্ প্রষ্টিমতঃ শতং গা অথর্বভ্যঃ"। (ঋক্ ৬.৪৭.২৪) এখানে অথর্বগণ যে কাল্পনিক জীবমাত্র নহেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। পরবর্ত্তী যুগে তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে (৩.৪.১.১১) গর্ভস্রাবিণী নারীকে অথর্বশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে ব্রাহ্মণযুগেই অথর্বগণ কোন কোন স্থলে তাঁহাদের প্রাচীন মর্য্যাদা হইতে বঞ্চিত হইতেছিলেন।

প্রাচীন সাহিত্য হইতে অথর্বগণ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না, কাজেই কোন স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার উপায় নাই। তবে ভৃগুবংশীয়দিগের সহিত অথর্বগণের যে একটী বিশেষ সম্বন্ধ ছিল তাহা 'অথর্বাঙ্গিরস' ও 'ভৃগ্বাঙ্গিরস' এই দুইটী সমাস হইতে অনুমান করা স্বাভাবিক। ইঁহারা যে একই বংশীয় ছিলেন না তাহাও সুনিশ্চিত, কারণ পিতৃপুরুষদিগের মধ্যে অঙ্গিরস্ ও ভৃগুগণের সহিত অথর্বগণেরও নাম আছে। Hillebrandt অনুমান করেন যে ভৃগুগোত্রীয় পুরোহিতগণেরই নাম ছিল অথর্বন্। (Ved. Mythologie, Vol. II, p. 177) অবশ্য ইহা একটী অনুমান মাত্র। [অথর্বন্ দ্র°]

বাঙ্গলা ভাষায় বৈদিক 'অথর্ব' শব্দ 'অথর্ব্ব' রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অথর্বজ্যোতিষ—বেদাঙ্গজ্যোতিষের এক অংশ। পিতামহ কাশ্যপকে অথর্বজ্যোতিষ বলিয়া ছিলেন। এই জ্যোতিঃশাস্ত্রে ১৪ প্রকরণ ও ১৬২ শ্লোক আছে।

এই জ্যোতিষ মতে এইরূপ কালমান পাওয়া যায়—

১২ নিমেষ = লব   ৩০ ত্রুটি = মুহূর্ত্ত
৩০ লব = কলা
৩০ কলা = ত্রুটি   ৩০ মুহূর্ত্ত = অহোরাত্র

মুহূর্ত্তের নামভেদে ভাগ আছে। যথা—

মুহূর্ত্ত	ছায়া অঙ্গুল	মুহূর্ত্ত	ছায়া অঙ্গুল
১ রৌদ্র	৯৬ (পরম)	৫ সাবিত্র	৭
২ শ্বেত	৬০	৬ বৈরাজ	৪
৩ মৈত্র	১২	৭ বিশ্বাবসু	৩
৪ সারভট	৬	৮ অভিজিৎ	

রৌদ্র মুহূর্ত্তে রৌদ্র কর্ম্ম, এইরূপ মৈত্র মুহূর্ত্তে মৈত্র কর্ম্ম করিতে হয়। [বেদাঙ্গ ও জ্যোতিষ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্র°]

অথর্বণ (পুং) [অথর্বা মুনিবিশেষস্তদুক্তবিদ্যাঽস্ত্যস্য। অথর্বন্-অচ্] শিব। ২ যিনি অথর্ব্বমুনি-প্রোক্ত বিদ্যা জ্ঞাত আছেন। ৩ অগ্নিভেদ। ইনি লৌকিকাগ্নি। পুষ্করোদধিমন্থনে অমৃতোৎ-পত্তির পর অথর্বণ অগ্নির উৎপত্তি ; ইহার পুত্র দধ্যঙ্গ। অথর্বা ভৃগু বলিয়া বিদিত। অথর্বার পুত্র অঙ্গিরাই লৌকিকাগ্নি দধ্যঙ্গ বলিয়া অভিহিত। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ২৯.৯) ৪ পুরোহিত।

অথর্বণি—(পুং) [অথর্বা তদুক্তশাস্ত্রাদৌ কুশলঃ।] অথর্ব-বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পুরোহিত।

অথর্বদ্বয়—মেরুসাবর্ণি নামক ভবিষ্য মনুর দুই পুত্র। ইঁহারা মরীচিগণভুক্ত। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ১০০.৬৩)

অথর্বন্—(পুং) [অথ-ঋ-বনিপ্ শক°] অথব নামক ঋষিবিশেষ। মুণ্ডক উপনিষদের আরম্ভে লিখিত আছে যে অথর্বা ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন—

"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূবে বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ।
অথর্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাথার্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্।"

দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি এই বিশ্বের কর্ত্তা এবং জগতের রক্ষক। তিনি আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্বকে সকল বিদ্যার মূলস্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যায় উপদেশ দেন। ব্রহ্মা অথর্বকে যাহা শিখাইয়াছিলেন, অথর্ব আবার সেই ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গিরার কাছে প্রকাশ করেন। অঙ্গিরা আবার ভরদ্বাজ বংশোদ্ভব সত্যবাহকে তাহা বলেন। সত্যবাহ সেই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা অঙ্গিরসকে শিখাইয়াছিলেন।

ঋগ্বেদ প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তক দেখিয়া এইরূপ প্রতীতি জন্মে যে, অথর্ব্বা প্রথমে অগ্নির সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং আর্য্যদের মধ্যে তিনি সর্ব্বাগ্রে যজ্ঞাদি ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত করেন।

"অগ্নির্জাতো অথর্বণা বিদদ্বিশ্বানি কাব্যা।
ভুবদ্দূতো বিবস্বতো।" (ঋক্ ১০.২১.৫)

অথর্ব্বা অগ্নিকে উৎপাদন করেন। সেই অগ্নি সকল বিস্তা জানিতেন। তিনি বিবস্বতের দূত হইয়াছিলেন।

"অথর্বা ত্বা প্রথমো নিরমন্থদগ্নে।" (শুক্লযজুঃ ১১.৩২)

হে অগ্নি! অথর্ব্বা তোমাকে প্রথম উৎপাদন করিয়াছেন।

শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে দধ্যঞ্চ নামে জনৈক ঋষি অথর্ব্বার পুত্র ছিলেন। "তমু ত্বা দধ্যঙ্ঙৃষিঃ পুত্র ইধে অথর্বণঃ।" অথর্ব্বার পুত্র দধ্যঞ্চ ঋষি তোমাকে (অগ্নিকে) প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন।

অথর্ববেদে অথর্ব্বা এবং বরুণ সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান আছে। বরুণ অথর্বকে একটী বিচিত্র নিত্যবৎসা ধেনু দিয়াছিলেন। "কঃ পৃশ্নিং ধেনুং বরুণেন দত্তা মথর্ব্বণে সুদুঘাং নিত্যবৎসাম্"। কিছু দিন পরে বরুণ সেই ধেনু আবার কাড়িয়া লইবার জন্য যত্ন করেন। (অথর্ব ৭.১০.৯১)। উপাখ্যানটীর শেষে অথর্ব্বা বরুণদেবকে কহিলেন,—'আমরা পরস্পর বন্ধু এবং এক বংশে জন্ম লইয়াছি।' এই উপাখ্যানটী দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বসিষ্ঠ ও অথর্ব ঋষি একই ব্যক্তি এবং বরুণ ও বিশ্বামিত্র এ দুই জন পৃথক্ ব্যক্তি নহেন। এমন অনুমান করিবার কারণ এই, মহাভারতের ও রামায়ণের একটী গল্পে লিখিত আছে যে, বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠধেনু বলপূর্ব্বক লইতে আসিয়াছিলেন, তজ্জন্য মহাবিরোধ উপস্থিত হয়। তদ্ভিন্ন কুল-বিবরণ দেখিলেও উভয়ে এক বংশোদ্ভব বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, উভয় উপাখ্যানে সাদৃশ্য আছে বলিয়া অথর্ব্বা ও বসিষ্ঠ এক ব্যক্তি হইতে পারেন না। এ কথার কোন বিশিষ্ট প্রমাণও নাই।

বেদের অনেকস্থলে এই শব্দের অর্থ—

১। সোম-যাজক ঋষি। যথা—

"অতি তে মধুনা পয়োঽথর্বাণো অশিশ্রয়ুঃ"।
(ঋক্ ৯.১১.২)

২। অথর্ব্বা ঋষি, অতি পূর্ব্বকালে ইনি অগ্নিমন্থন করেন।

"আ সোমং মধুমত্তমং ঘর্মং সিঞ্চাদথর্বণি।" (ঋক্ ৮.৯.৭)

৩। সোম=অথর্ব।

"অথর্বৌপাবহ্রিয়মাণঃ" (শুক্লযজুঃ ৮.৫৬)

৪। বরুণের নামান্তররূপে—

"অজীজনো হি বরুণ স্বধাবন্নাথর্বাণং পিতরং দেববন্ধুম্।
তস্মা উ রাধঃ কৃণুহি সপ্রশস্তং সখা নো অসি পরমং চ বন্ধু॥" (অথর্ব ৫.১১.১১)

৫। বসিষ্ঠের নামান্তররূপে—

"কঃ পৃশ্নিং ধেনুং বরুণেন দত্তামথর্বণে সুদুঘাং নিত্যবৎসাম্।
বৃহস্পতিনা সখ্যং জুষাণো যথাবশং তন্বঃ কল্পয়াতি॥"
(অথর্ব ৭.১০.৪)

৬। পুরুষ—

"তদ্বা অথর্বণঃ শিরো দেবকোশঃ সমুব্জিতঃ।
তৎপ্রাণো অভিরক্ষতি শিরো অন্নমথো মনঃ॥"
(অথর্ব ১০.২.২৭)

ভৃগু ও আঙ্গিরসের নামান্তররূপেও ব্যবহৃত হইয়াছে।

এছাড়া 'প্রাণো বা অথর্বা' ইতি শ্রুতি। বেদে অথর্বার এই কএকটী পুত্রের নাম পাওয়া যায়— ১ অগ্নি, ২ দধ্যঞ্চ, ৩ ভিষজ্, ৪ বৃহদ্দিব, ৫ কবন্ধ।

অথর্বা—[অথর্ব দ্র°]

অথর্বনিধি—(পুং) অথর্ববেদের নিধি (আধার); অথর্ব-বেদনিপুণ, পৌরোহিত্যকর্ম্মাভিজ্ঞ। (রঘু ১.৫৯)

অথর্বভূত—(পুং) দ্বাদশজন মহর্ষির উপাধি। তাঁহাদের নাম যথা—১ ধর্ম্ম, ২ দক্ষ, ৩ মরীচি, ৪ অত্রি, ৫ পুলস্ত্য, ৬ মনু, ৭ পুলহ, ৮ ক্রতু, ৯ বসিষ্ঠ, ১০ গৌতম, ১১ ভৃগু, ১২ অঙ্গিরস্। (হরিবংশ)

অথর্ববৎ—(অব্য) অথর্বন্ অথবা তাঁহার বংশজগণের তুল্য। "অথর্বদগ্নিং মন্থতি" (ঋক্ ৬.১৫.৭) অথর্ব নামক ঋষির ন্যায় তুমি সত্যধ্বংসকারী নির্ব্বোধকে দিব্য তেজের দ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেল। (ঋক্ ১০.৮৭.১২)

অথর্ববান্—(দেশজ) উত্থানশক্তিহীন, পঙ্গু।

অথর্ববিদ্—(পুং) অথর্ববেদং তদুক্তং কর্ম্ম বা বেত্তি, বিদ্-ক্বিপ্] অথর্ববেদের "শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে" ইত্যাদি মন্ত্রের বিহিত আভিচারিক কর্ম্ম যাঁহারা অবগত আছেন, অর্থাৎ বসিষ্ঠাদি মুনি। "গুরুণাঽথর্ববিদা কৃতক্রিয় ইতি" (রঘু)

অথর্ববেদ— চতুর্থবেদ, প্রবাদ আছে ঋক, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদের কোন কোন অংশ লইয়া ও কতক নববিষয় সংলগ্ন করিয়া অথর্ব ঋষি এই বেদখানি প্রচার করেন। ভাগবতমতে ব্রহ্মার দক্ষিণমুখ এবং বিষ্ণুপুরাণমতে ব্রহ্মার উত্তরমুখ হইতে অথর্ববেদ প্রকাশ হইয়াছে। (ভাগবত ৩.১২.৩৭, বিষ্ণুপুরাণ ১.৫.৫৫.)

বিষ্ণুপুরাণের একস্থলে লিখিত আছে;—

"এক আসীদ্যজুর্বেদস্তং চতুর্দ্ধা ব্যকল্পয়ৎ।
চাতুর্হোত্রমভূদ্‌যস্মিংস্তেন যজ্ঞমথাকরোৎ॥১১

আধ্বর্য্যবং যজুর্ভিস্তু ঋগ্‌ভির্হোত্রং তথা মুনিঃ।
ঔদ্গাত্রং সামভিশ্চক্রে ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্বভিঃ॥১২
ততঃ স ঋচমুদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ মুনিঃ।
যজুংষি চ যজুর্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ॥১৩
রাজ্ঞস্ত্বথর্ববেদেন সর্ব্বকর্ম্মাণি স প্রভুঃ।
কারয়ামাস মৈত্রেয়! ব্রহ্মত্বঞ্চ যথাস্থিতি॥১৪

(বিষ্ণুপুরাণ ৩ অংশ ৪ অধ্যায়।)

পূর্ব্বে যজুর্বেদ অর্থাৎ আধ্বর্য্যব-ক্রিয়া-প্রধান বেদ এক প্রকার ছিল। বেদব্যাস ঐ যজুঃপ্রধান বেদকে চারিভাগ করেন। তাহাতে চাতুর্হোত্র হইল। তিনি তদ্দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধি করিলেন। এই চাতুর্হোত্রের মধ্যে তিনি যজুর্বেদ দ্বারা আধ্বর্য্যব, ঋগ্বেদ দ্বারা হোত্র, সামবেদ দ্বারা ঔদ্গাত্র এবং অথর্ববেদ দ্বারা ব্রহ্মত্ব-স্থাপন করিলেন। মৈত্রেয়! তিনি অথর্ববেদ দ্বারা যথাবিধানে ব্রহ্মত্বস্থাপন করেন এবং ক্ষত্রিয়দিগের শান্তি-পুষ্টি প্রভৃতি সমুদায় দৈব কর্ম্ম ঐ অথর্ববেদ দ্বারাই করাইলেন।

যে বেদকে বিষ্ণুপুরাণ এত মাননীয় জ্ঞান করেন, যে বেদে ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, এ দেশীয় বেদজ্ঞানবিহীন পণ্ডিতগণ সেই অথর্ববেদকে ম্লেচ্ছ বেদ মনে করিতেন, ইহা বড় আক্ষেপের বিষয়! তাঁহারা এই বেদকে যত আধুনিক মনে করেন, বাস্তবিক তত আধুনিক নয়। সত্য বটে কোন কোন পুরাণে—এমন কি অমরকোষে পর্য্যন্ত তিনখানি বেদ ভিন্ন চতুর্থ উল্লেখ নাই। (অমরকোষ ১.১.৪.৪) [ইহার কারণ 'বেদ' শব্দে দ্র°।] কিন্তু প্রাচীন উপনিষৎ, স্মৃতি, রামায়ণ, মহাভারত এবং অনেক পুরাণাদিতেও অথর্বাঙ্গিরস বা অথর্ববেদ উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৩.৪.১-২; তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২.৩; বৃহদারণ্যক° ২.৪.১৪, ২.৪.১.৩; শতপথব্রাহ্মণ ১১.৫.৬.৭, ১৪.৬.১০.৬; ১৩.৪.৩.৭।

"শ্রুতিরথর্বাঙ্গিরসীঃ কুর্য্যাদিত্যবিচারয়ন্।
বাক্‌শস্ত্রং বৈ ব্রাহ্মণস্য তেন হন্যাদরীন্ দ্বিজঃ॥"

(মনুসংহিতা১১.৩৩।)

"অথর্ববেদমন্ত্রৈশ্চ দেবেন্দ্রং সমপূজয়েৎ"

(অঙ্গিরাঃ)॥

"ততস্ত ভগবানিন্দ্রঃ প্রহৃষ্টঃ সমপদ্যত।
বরঞ্চ প্রদদৌ তস্মৈ অথর্বাঙ্গিরসে তদা॥
অথর্বাঙ্গিরসোনামবেদেঽস্মিন্ বৈ ভবিষ্যতি
উদাহরণমেতদ্ধি যজ্ঞভাগঞ্চ লপ্স্যসে॥"

(মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব ১৭ অ.)।

(অঙ্গিরা ঋষি) অথর্ববেদোক্ত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক দেবেন্দ্রকে পূজা করিলেন। তদ্দর্শনে ভগবান ইন্দ্র সন্তুষ্ট ও হৃষ্ট হইয়া বর প্রদান করিলেন যে, তোমার অথর্বাঙ্গিরস নাম অথর্ববেদে প্রসিদ্ধ হইবে এবং তুমি সর্ব্বত্র যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইবে।

"মেদসা তর্পয়েদ্দেবানথর্বাঙ্গিরসঃ পঠন্।
পিতৃংশ্চ মধুসর্পিভ্যামন্বহং শক্তিতো দ্বিজঃ॥

(যাজ্ঞবল্ক্য ১.৪৪)।

"দৈববলপ্রবৃত্তা যে দেবদ্রোহাদভিশস্তকা
অথর্বকৃতা উপসর্গকৃতাশ্চ (ব্যাধয়ঃ)" (সুশ্রুত, সূত্র)

এতদ্ভিন্ন—'আথর্ব্বণিকস্যেকলোপশ্চ'' (৪.৩.১৩৩;) "কপিবোধাদাঙ্গিরসে" (৪.১.১০৭); "দাণ্ডিনায়নাথর্বণিক" (৬.৪.১৭৪); ইত্যাদি পাণিনিসূত্রের দ্বারা কি বোধ হইতে পারে না যে, পাণিনির পূর্ব্বেও অথর্ববেদ বিদ্যমান ছিল? এই সকল প্রমাণ দ্বারা অথর্ববেদ যে অতি প্রাচীন, তাহা আমরা স্বীকার করি।

অথর্ববেদের শাখাদি বিভাগ ও মন্ত্রাদি নিরূপণে নানা মুনির নানা মত লক্ষিত হয়।

১। "দ্বাদশানাং সহস্রাণি মন্ত্রাণাং ত্রিশতানি চ।
গোপথং ব্রাহ্মণং বেদেঽথর্বণে শতপাঠম্॥" (চরণব্যূহ)।

চরণব্যূহের মতে, অথর্ববেদের ১২৩০০ মন্ত্র; ১০০ প্রপাঠক, আর গোপথ নামক ব্রাহ্মণ।

২। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (৬০অ) লিখিত আছে—

"অথর্বাণং দ্বিধা কৃত্বা সুমন্তুরদদদ্দ্বিজা।
কবন্ধায় পুনঃ কৃৎস্নং স চ বিদ্যাস্তথাক্রমং॥৪৯
কবন্ধস্তু দ্বিধা কৃত্বা পথ্যায়ৈকম্পুনর্দদৌ।
দ্বিতীয়ং বেদস্পর্শায় স চতুর্ধাঽকরোৎ পুনঃ॥৫০
মোদো ব্রহ্মবলশ্চৈব পিপ্পলাদস্তথৈব চ।
শৌক্কায়নিশ্চ ধর্ম্মজ্ঞশ্চতুর্থস্তপনঃ স্মৃতঃ॥
বেদস্পর্শস্য চত্বারঃ শিষ্যাস্ত্বেতে দৃঢ়ব্রতাঃ॥৫১॥
পুনশ্চ ত্রিবিধং বিদ্ধি পথ্যানাং ভেদমুত্তমং।
জাজলিঃ কুমুদাদিশ্চ তৃতীয়ঃ শৌনকঃ স্মৃতঃ॥৫২
শৌনকস্তু দ্বিধা কৃত্বা দদাবেকান্তু বভ্রবে।
দ্বিতীয়াং সংহিতাং ধীমান্ সৈন্ধবায়নসংজ্ঞিতে॥৫৩
সৈন্ধবো মুঞ্জকেশায় ভিন্না সাচ দ্বিধা পুনঃ।
নক্ষত্রকল্পো বৈতানস্তৃতীয়ঃ সংহিতাবিধিঃ।
চতুর্থোঽঙ্গিরসঃ কল্পো শান্তি
শ্রেষ্ঠস্ত্বথর্বণো হেত সংহিতানাং বিকল্পনাং।
ষট্‌শঃ কৃত্বা ময়াপ্যুক্তং পুরাণমৃষিসত্তমাঃ॥৫৫
ঋচামথর্বণাৎ পঞ্চসহস্রাণি বিনিশ্চয়ঃ।
সহস্রমন্যদ্বিজ্ঞেয়মৃষিভির্বিংশতিং বিনা॥৭২

এতদাঙ্গিরসা প্রোক্তস্তেষামারণ্যকম্পুনঃ।
ইতি সংখ্যা প্রসংখ্যাতা শাখাভেদাস্তথৈব চ ॥৭৩"
(ব্রহ্মাণ্ডপু° ৬০ অঃ)

৩। বিষ্ণুপুরাণে—

"অথর্বাণামথো বক্ষ্যে সংহিতানাং সমুচ্চয়ম্।
অথর্ব্ববেদং স মুনিঃ সুমন্তুরমিতদ্যুতিঃ ॥৯॥
শিষ্যমধ্যাপয়ামাস কবন্ধং সোঽপি তদ্ দ্বিধা।
কৃত্বা তু দেবদর্শায় তথা পথ্যায় দত্তবান্ ॥১০॥
দেবদর্শস্য শিষ্যাস্তু মৌদ্গো ব্রহ্মবলিস্তথা।
শৌক্কায়নিঃ পিপ্পলাদস্তথান্যো মুনিসত্তম ॥১১॥
পথ্যস্যাপি ত্রয়ঃ শিষ্যাঃ কৃতা যৈর্দ্বিজ সংহিতাঃ।
জাজলিঃ কুমুদাদিশ্চ তৃতীয়ঃ শৌনকো দ্বিজঃ ॥১২॥
শৌনকস্তু দ্বিধা কৃত্বা দদাবেকাস্তু বভ্রবে।
দ্বিতীয়াং সংহিতাং প্রাদাৎ সৈন্ধবায়নসংজ্ঞিনে ॥১৩॥
সৈন্ধবা মুঞ্জকেশাশ্চ ভিন্না বেদা দ্বিধা পুনঃ।
নক্ষত্রকল্পো বেদানাং সংহিতানাং তথৈবচ ॥১৪॥
চতুর্থঃ স্যাদাঙ্গিরসঃ শান্তিকল্পশ্চ পঞ্চমঃ।
শ্রেষ্ঠাস্ত্বথর্বণামেতে সংহিতানাং বিকল্পকাঃ ॥১৫॥"
(বিষ্ণুপু° ৩ অংশ ৬ অঃ।)

৪। অগ্নিপুরাণে—

"সুমন্তুর্জাজলিশ্চৈব শ্লোকায়নিরথর্বকে ॥৮॥
শৌনকঃ পিপ্পলাদশ্চ মুঞ্জকেশাদয়োঽপরে।
মন্ত্রাণামযুতং ষষ্ঠি শতঞ্চোপনিষচ্ছতং ॥৯॥"
(অগ্নিপুরাণ ২৭০ অধ্যায়।)

উক্ত পুরাণ সকলের ভাবার্থ এই—মহর্ষি সুমন্তু অথর্ব্ববেদ দুইভাগ করিয়া কবন্ধ নামক শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইলেন। কবন্ধ অথর্ব্ববেদকে দুইভাগ করিয়া পথ্য ও বেদস্পর্শ বা দেবদর্শ নামক দুইজন শিষ্যকে দিলেন। বেদস্পর্শ আবার চারিভাগ করিয়া মৌদ্গ, ব্রহ্মবল বা ব্রহ্মবলি, পিপ্পলাদ এবং শৌক্কায়নি বা শৌক্তায়নি বা শ্লোকায়নিকে দান করেন। পথ্য আবার তিনভাগ করিয়া জাজলি, কুমুদাদি ও শৌনককে সংহিতা দান করেন। শৌনক আপনার অধীত সংহিতা দুইভাগ করিয়া একটী শাখা বভ্রুকে ও একটী শাখা সৈন্ধবায়নকে অধ্যয়ন করাইলেন। সৈন্ধব অর্থাৎ সৈন্ধবায়নশিষ্য, মুঞ্জকেশ অর্থাৎ বভ্রুর শিষ্য, ইহারা স্ব স্ব সংহিতা দুই দুই শাখায় বিভক্ত করিলেন। নক্ষত্রকল্প, বৈতান বা বেদকল্প, সংহিতাকল্প, আঙ্গিরঃ বা আঙ্গিরসকল্প ও শান্তিকল্প এই পাঁচ অংশ সংহিতা-সমুদায়ের বিকল্পক ও অথর্ববেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মাণ্ডমতে অথর্ববেদে ৫০০০ঋক্, ঋষি ২০, এখানি অঙ্গিরসপ্রোক্ত। অগ্নিমতে—ইহার ষট্ সহস্রাধিক অযুত মন্ত্র ও এক শতখানি উপনিষৎ।

কোলব্রুক সাহেবের মতে, অথর্ববেদসংহিতায় ২০টী কাণ্ড আছে। এই কাণ্ডগুলি অনুবাক্, সূক্ত এবং ঋক্ এই ভাগত্রয়ে বিভক্ত। অনুবাকের সংখ্যা একশতের অধিক, সূত্র সাত শত পঞ্চাশের অধিক এবং মন্ত্রের সংখ্যা ৬০১৫ মাত্র। ইহাতে প্রায় ৪০টী প্রপাঠক আছে [Asiatic Researches Vol. viii]

শাস্ত্রদর্শী উইলসন্ সাহেবের মতে, 'অথর্ব' বেদমধ্যে গণ্য নয়, বরং এখানি বেদের ক্রোড়পত্রস্বরূপ। [Wilson's Rigveda, introduction, p. viii.] কিন্তু উপনিষদাদি ছাড়া অথর্ববেদ মধ্যেই ইহা যে চতুর্থ বেদ তাহা লিখিত হইয়াছে। যথা—

"যস্মাদৃচো অপাতক্ষন্যজুর্যস্মাদপাকষন্।
সামানি যস্য লোমান্যথর্বাঙ্গিরসো মুখম্।
স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥" (অথর্ব্ব ১০.৭.২০।)

যাঁহা হইতে তাঁহারা ঋক্ মন্ত্র পৃথক্ করিয়াছে, যজুষ্ কষিয়া লইয়াছে; সাম যাঁহার লোম এবং অথর্বাঙ্গিরস্ যাঁহার মুখ, সেই স্কম্ভ কে? আমাদিগকে বল।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে, অথর্ববেদের কোন কোন অংশ অতি প্রাচীন ও কোন কোন অংশ আধুনিক। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল রচিত হইবার সময় বা পরে রচিত হইয়াছে। [Mr. Whitney's papers on the Journal of the American Oriental Society. Vol. iii. p. 305ff; iv. 154ff ; Max Muller's Anc. Sans. Lit. p. 38, 446ff. দ্র।]

রোথ্ ও হুইট্নী সাহেবের মুদ্রিত পুস্তকে অথর্ববেদের প্রথম মন্ত্র এই—

"যে ত্রিষপ্তাঃ পরিযন্তি বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতঃ।
বাচস্পতির্বলা তেষাং তন্বো অদ্য দধাতু মে" ॥ ১১

কিন্তু ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বপ্রণেতা হলায়ুধ নিজ গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "অথর্ববেদাদি মন্ত্রস্য দধ্যঙঙথর্বণ ঋষিরাপোদেবতা গায়ত্রী-চ্ছন্দঃ শান্তিকরণে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্রো যথা—শন্নো দেবীরভীষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শংযোরভিস্রবন্তুনঃ ॥ ১।"

অর্থাৎ তাঁহার মতে এই স্থান হইতে অথর্ববেদ আরম্ভ হইয়াছে এবং এইটী প্রথম মন্ত্র। রোথ সাহেবের মুদ্রিত পুস্তকে এটী ষষ্ঠ সূক্তের প্রথম মন্ত্র। ফল কথা, কোন কোন প্রাচীন পুস্তকে 'যে ত্রিষপ্তা' এই মন্ত্র হইতে অথর্ববেদ আরম্ভ হইয়াছে। আবার কোন কোন পুস্তকে—'শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে' এখান হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

প্রচলিত অথর্ববেদ ৭৩০টী সূক্তের সমষ্টি। ইহা বিংশতি খণ্ডে বিভক্ত। এই সংহিতার প্রায় একষষ্ঠাংশ গদ্যে রচিত। এই অংশের ভাষার সহিত পরবর্ত্তী যুগের ব্রাহ্মণের ভাষার বিশেষ কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। অবশিষ্ট পদ্যাংশ বৈদিক ছন্দেই রচিত। তবে ঋগ্বেদের ছন্দের সহিত তুলনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে অথর্ববেদ রচনায় ছন্দের শুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয় নাই।

অথর্ববেদের রচয়িতা সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য কোন কথাই বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদের মন্ত্রমধ্যেই মাঝে মাঝে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির নাম পাওয়া যায়; কিন্তু অথর্ববেদের মন্ত্র হইতে ঐরূপ কোন তথ্য সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। অথর্ববেদের সর্ব্বানুক্রমণিকায় রচয়িতা সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণই কাল্পনিক।

ঋক্, সাম ও যজুর্বেদের নাম হইতেই এই সকল বেদের প্রয়োগ ও ব্যবহার সম্বন্ধে নির্দেশ পাওয়া যায়, কিন্তু অথর্ববেদের নাম হইতে সেরূপ কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগে অথর্ববেদ 'ব্রহ্মবেদ' নামে পরিচিত হইয়াছিল*— অনুরূপ অর্থে অথর্ববেদকে পরবর্ত্তী যুগে—'ভেষজ', 'যাতু' ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। অতি প্রাচীন যুগেই কিন্তু অথর্বন্ নামক অগ্নিপুরোহিতদের সহিত অথর্ববেদের একটী অতি নিকটতম সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। [অথর্ব দ্র°] অথর্বন্ ও অঙ্গিরস্‌গণের নাম অথর্ববেদের মধ্যেই পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে অথর্ববেদের প্রকৃত নামই 'অথর্বাঙ্গিরসঃ' (অথ° ১০.৭.২০)। মহাভারতেও অথর্ববেদের বচন উদ্ধারকালে বলা হইয়াছে "অথর্বাঙ্গিরসি শ্রুতম্।" মুখ্য স্মৃতিগুলির মধ্যেও এই নামই পরিদৃষ্ট হয়, যথা "অথর্বাঙ্গিরসীঃ শ্রুতীঃ" (মনু ১১.৩৩) বৌধায়নধর্ম্মসূত্রে "অথর্বাঙ্গিরসাম্ তর্পয়ামি" (২.৫.৯.১৪)।

বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেই ক্রমশঃ 'অথর্বন্' এই নামটীই মুখ্য হইয়া উঠে। একক অঙ্গিরস্ শব্দ বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে কেবল একবার ব্যবহৃত হইয়াছে "অঙ্গিরোভ্য স্বাহা" (তৈত্তি.সং ৭.৫.১১.২)।

'অথর্বাঙ্গিরস্' এই সংজ্ঞা হইতেই অনুমান হয় যে অথর্ববেদের মধ্যে দুই প্রকার বিভিন্ন সাহিত্যের সমন্বয় হইয়াছে। অথর্ববেদের এই দুই অংশকে স্পষ্টই যথাক্রমে 'শান্ত' ও 'ঘোর' বলা হইয়াছে (গোপথ-ব্রাহ্মণ ১.২„২১ ; ৫.১০)। এই ব্রাহ্মণেই অথর্ববেদের এই দুই বিভিন্ন অংশের জন্য দুই বিভিন্ন ব্যাহৃতির উল্লেখ আছে; 'শান্ত অথর্বণের' ব্যাহৃতি 'ওং', কিন্তু 'ঘোর অঙ্গিরসে'র ব্যাহৃতি 'জনৎ'। যজ্ঞে আচারের মধ্যেও বহুস্থলে 'আথর্বণ' (অথবা 'শান্ত') ও 'আঙ্গিরসের' প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়; এক শ্রেণীর ওষধিকে 'আথর্বণ' বা 'শান্ত' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে এবং তাহার বিপরীত শ্রেণীর ওষধিকে বলা হইয়া থাকে 'আঙ্গিরস'।

আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে 'আথর্বণ বেদ' ও 'আঙ্গিরস বেদের' পার্থক্য আথর্বণেতর বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়, এবং সেখানেও এই দুই অংশ যথাক্রমে 'শান্ত' ও 'ঘোর' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। (শতপথব্রাহ্মণ ১৩.৪.৩, আশ্ব. শ্রৌ. সূ. ১০.৭, ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)।

অথর্ববেদের মধ্যেও দুই অংশের এই পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট; সেখানেও প্রত্যক্ষভাবে না হউক, অন্ততঃ পরোক্ষভাবে অথর্বনের সহিত 'ভেষজের' এবং অঙ্গিরসের সহিত 'যাতু'র বিশেষ সম্বন্ধের আভাষ পাওয়া যায়।

অথর্ববেদের নয়টী বিভিন্ন শাখার উল্লেখ পাওয়া যায় :—

১। পৈপ্পলাদ—ঋষি পিপ্পলাদের প্রবর্তিত। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে শৌনকীয় শাখার তিনটী সূক্ত (১৯,৫৬-৫৮) 'পৈপ্পলাদ-মন্ত্রাঃ' বলিয়া পরিচিত। আধুনিক যুগে প্রচলিত শৌনকীয় শাখা ভিন্ন কেবলমাত্র এই পৈপ্পলাদ শাখারই পরিচয় পাওয়া যায়, অপর সমস্ত শাখা লুপ্ত হইয়াছে। কালান্দ(Caland)অনুমান করেন যে পৈপ্পলাদ শাখা শৌনকীয় শাখা অপেক্ষা প্রাচীনতর।

২। তৌদ বা তৌদায়ন শাখার নাম কেবল অথর্বপরিশিষ্টে (২৩.৩) পাওয়া যায়।

২। মৌদ্গ বা মৌদায়ন শাখা অথর্বপরিশিষ্টে কয়েকবার উল্লিখিত হইয়াছে। উহাতেই একস্থলে বলা হইয়াছে যে শৌনকীয় ও পৈপ্পলাদ পুরোহিতেরাই পূজার্হ; [illegible] বংশীয় পুরোহিতদের হস্তে পৌরোহিত্য ন্যস্ত হইলে রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

৪। শৌনকীয় শাখার সংহিতাই সাধারণতঃ অথর্ববেদ বলিয়া পরিচিত। অথর্ববেদের প্রাতিশাখ্যের নাম 'শৌনকীয়া চতুরধ্যায়িকা', এবং অথর্ববেদের সূত্র 'বৈতান সূত্র' কখন কখন শৌনকীয়সূত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

৫। জাজল শাখার নাম অথর্বপরিশিষ্টে (২৩.২) উল্লিখিত হইয়াছে। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি এই শাখার প্রতিষ্ঠাতা জজলির উল্লেখ করিয়াছেন।

৬। জলদশাখার নাম কেবল মাত্র অথর্বপরিশিষ্টে পাওয়া যায়।

* কেহ কেহ ব্রহ্মবেদঅর্থে যাতুমন্ত্র মনে করেন।

৭। ব্রহ্মবদ শাখার নাম কেবলমাত্র চরণব্যূহে উল্লিখিত হইয়াছে।

৮। দেবদ নামক আথর্বণ শাখার উল্লেখ কৌশিকসূত্রে (৮৫.৭) পাওয়া যায়।

৯। কৌশিকসূত্রের টীকায় কেশব চারণবৈদ্য নামক আথর্বণ শাখার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

বস্তুতঃ আধুনিক যুগে অথর্ববেদের দুইটীমাত্র শাখা পাওয়া যায়। সাধারণতঃ অথর্ববেদ বলিতে শৌনকীয় শাখার অথর্বসংহিতাই বুঝায় এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই সংহিতারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইতেছে। এতদ্ভিন্ন পৈপ্পলাদ শাখার অথর্বসংহিতার একখানি মাত্র শারদালিপিতে লিখিত প্রাচীন পুঁথি কাশ্মীর হইতে পাওয়া গিয়াছে। পৈপ্পলাদ শাখার সংহিতার এই এক মাত্র পুঁথি, তাহাও এতই ভ্রমপ্রমাদে পূর্ণ যে এই সংহিতা ছাপান সম্ভবপর হয় নাই। বারেট (Barret) ইহার কিয়দংশের মাত্র সংস্কার করিয়াই নিরস্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আথর্বণিক সাহিত্যের সমস্ত প্রধান গ্রন্থই শৌনকীয় শাখার অন্তর্গত,—যথা, কৌশিকসূত্র, বৈতান-সূত্র, গোপথব্রাহ্মণ। অথর্ববেদের প্রাতিশাখ্যেরও নাম "শৌনকীয় চতুরধ্যায়িকা", এবং তাহাতে কেবল শৌনকীয় শাখার পদপাঠই আলোচিত হইয়াছে। এ স্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে পৈপ্পলাদ শাখার যে একখানি মাত্র অসম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও পদপাঠের চিহ্ন মাত্র নাই। বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় এইযে কৌশিকসূত্রে ও বৈতান সূত্রে শৌনকীয় শাখার মন্ত্রের প্রতীকমাত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু পৈপ্পলাদ শাখার মন্ত্র তাহাতে পূর্ণভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতেও প্রমাণিত হয় যে এই দুই সূত্র শৌনকীয় শাখারই অন্তর্গত। শৌনকীয় সংহিতা পদপাঠ ও সায়ণভাষ্য সহ শঙ্কর পণ্ডিত কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অথর্ববেদের পদপাঠ বা সায়ণভাষ্য সম্পূর্ণাকারে পাওয়া যায় না। অথর্ববেদের তথাকথিত কুন্তাপসূক্তগুলির (নিম্নে দ্রষ্টব্য) কোন পদপাঠ পাওয়া যায় নাই। ইহার অপরাপর অংশের পদপাঠ পাওয়া যায়, কিন্তু অথর্ববেদের এই পদপাঠে বহু ভ্রমপ্রমাদ পরিলক্ষিত হয়—ঋগ্বেদের পদপাঠে যাহা খুব বিরল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে সংহিতার "স্তবন্নেমি" পদপাঠে "স্তবন্ নেমি" করা হইয়াছে, যদিও হওয়া উচিত ছিল "স্তবন্ন্ এমি"। অথর্ববেদের কোন কোন অংশ গদ্যে রচিত। সংস্কৃত ভাষার ইহাই সর্ব্বপ্রাচীন গদ্য। অপরাপর বৈদিক শাখায় সংহিতার পরেই ব্রাহ্মণ ও তাহার পর সূত্রের স্থান; কিন্তু অথর্ববেদে এই নিয়মের ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়, কারণ নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে—যে গোপথব্রাহ্মণ অপেক্ষা কৌশিকসূত্র প্রাচীন।

একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে ঋক্‌সংহিতাদির তুলনায় বৈদিক সাহিত্যে অথর্ববেদের স্থান খুব উচ্চে নহে। আজ পর্য্যন্ত অনেকে অথর্ববেদের শ্রুতিত্ব অস্বীকার করিয়া থাকেন। তদুপরি অথর্ববেদের ভাষাও যে ঋগ্বেদের ভাষা অপেক্ষা অর্ব্বাচীন তাহাও নির্দ্ধারিত। কিন্তু তথাপি বলিবার উপায় নাই যে অথর্ববেদের সারবস্তু ঋগ্বেদের সারবস্তু অপেক্ষা পরবর্ত্তী যুগের। একথা সকল সময়েই স্মরণ রাখিতে হইবে ঋগ্বেদের যুগেই ভারতীয় সমাজে ব্যাধিদুর্দৈবাদি প্রশমনের জন্য নানা প্রকার মন্ত্রতন্ত্র ব্যবহৃত হইত যেগুলি ঋক্‌সংহিতার মধ্যে স্থান পায় নাই, কারণ ঋক্‌সংহিতায় কেবলমাত্র অতিপবিত্র শ্রৌতযাগে (স্বল্পপরিমাণে গৃহ্যাচারেও বটে) যে সমস্ত মন্ত্র ব্যবহৃত হইত তাহাই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু জনসাধারণের প্রচলিত লৌকিক আচারেও যে সকল মন্ত্র ব্যবহার হইত তাহা সংগৃহীত হইয়াছে এই অথর্ববেদের মধ্যে। কাজেই ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদ প্রকৃতপক্ষে সমভাবে প্রাচীন, যদিও ইহা খুবই সম্ভব, এমন কি সুনিশ্চিত, যে আথর্বণ মন্ত্রাবলি ঋগ্বেদ অপেক্ষা পরবর্ত্তী যুগে সংহিতাকারে গ্রথিত হইয়াছিল।

আথর্বণিক সাহিত্যে বারবার প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হইয়াছে যে অথর্ববেদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদ। বলা হইয়াছে ঋঙ্‌মন্ত্রোচ্চারক হোতা, সামগায়ক উদ্গাতা এবং যজুর্বেদীয় মন্ত্রের প্রযোক্তা অধ্বর্য্যু, কিন্তু আথর্বণ মন্ত্রপ্রয়োগক্ষম ব্রহ্মা সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত। যথা "এষ হ বৈ বিদ্বান সর্ববিদ্ ব্রহ্মা যদ্ভৃগ্বঙ্গিরোবিদ্।" (গো.ব্রা. ১.২.১৮) কিন্তু এরূপ বচন হইতে বিশ্বাস করিবার কোনই কারণ নাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত ব্রহ্মা বিশেষ করিয়া অথর্ববেদে পারদর্শী ছিলেন। এরূপ বচন হইতে এইমাত্র প্রমাণিত হয় যে, যে অথর্ববেদকে শ্রৌতযাগের মধ্যে বিশেষ স্থান দেওয়া হয় নাই তাহারই পবিত্রতা কোন প্রকারে প্রতিপন্ন করিবার একটা উগ্র চেষ্টা আথর্বণিকেরা সকল সময়েই করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই চেষ্টা কোন দিন সফল হয় নাই। অপরদিকে কিন্তু বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই পুরোহিত অথর্ববেদে পারদর্শী ছিলেন। এ সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না, কিন্তু ঋগ্বেদের মধ্যেই দেখা যায় যে পুরোহিত আথর্বণ সদৃশ ক্রিয়াকলাপে নিয়োজিত।

অথর্ব সংহিতা বিংশতি কাণ্ডে বিভক্ত; কিন্তু কাণ্ডসংখ্যা

যে প্রথমে বিংশতি ছিল না এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, যদিও মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিও পরোক্ষভাবে অথর্ববেদের বিংশতি কাণ্ডের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বিংশ কাণ্ডের অধিকাংশ মন্ত্র ঋগ্বেদ হইতে সংগৃহীত। একোনবিংশ কাণ্ডের শেষেই গ্রন্থ-সমাপ্তিসূচক একটী প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু একোনবিংশ কাণ্ডও নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগে সংহিতাভুক্ত হইয়াছিল, কারণ ইহার ভাষা অতীব দুষ্ট এবং প্রথম অষ্টাদশ কাণ্ড যে প্রণালীতে সজ্জিত এই কাণ্ডে সেই প্রণালী পরিরক্ষিত হয় নাই। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে পৈপ্পলাদ সংহিতায় উনবিংশ কাণ্ডের অধিকাংশ সূক্ত অন্যান্য কাণ্ড মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। এই কাণ্ডেরই দুইটী মন্ত্র নক্ষত্রকল্পে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে; এই সূক্ত আদি সংহিতার অন্তর্ভুক্ত হইলে নক্ষত্রকল্পে তাহাদের প্রতীক মাত্র উদ্ধৃত হইত। কৌশিকসূত্রে উনবিংশ কাণ্ডের কএকটী মন্ত্র সম্পূর্ণ এবং কএকটীর প্রতীক মাত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতেও প্রমাণিত হয় যে ঐ সূত্ররচনাকালে উনবিংশ কাণ্ডের সমুদয় মন্ত্র সংহিতাভুক্ত হয় নাই, কারণ সংহিতাভুক্ত মন্ত্রের প্রতীক মাত্রই সূত্র ও ব্রাহ্মণে উদ্ধৃত হইয়া থাকে। পরিশেষে ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে অথর্ববেদের প্রাতিশাখ্যেও শেষ দুই কাণ্ডের মন্ত্র আলোচিত হয় নাই।

অথর্ববেদের শেষ দুই কাণ্ড বাদ দিলে অবশিষ্ট অষ্টাদশ কাণ্ডের সূক্ত পারম্পর্য্য প্রধানতঃ সূক্তের দৈর্ঘ্য অনুযায়ীই নির্দ্ধারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। প্রথম সপ্ত কাণ্ডের সূক্ত সংখ্যা যথাক্রমে ৩৫, ৩৬, ৩১, ৪০, ৩১১, ৪২ এবং ১১৮, এবং এই সকল সূক্তের শ্লোকসংখ্যার মধ্যে একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। প্রথম পাঁচটী কাণ্ডের সূক্তের শ্লোকসংখ্যা যথাক্রমে অন্ততঃ ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮। ষষ্ঠ কাণ্ডে সূক্তসংখ্যা হঠাৎ বাড়িয়া ১৪২ হইয়া উঠিল এবং ইহার কোন সূক্তই তিনটী শ্লোকের কম নহে। সপ্তমকাণ্ডে সূক্তসংখ্যা ১১৮, কিন্তু সূক্তের শ্লোকসংখ্যা অত্যন্ত অল্প,—অনেক সময় একটী শ্লোকেই একটী সূক্ত সমাপ্ত। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে এই সকল লঘিষ্ট সংখ্যাই প্রথমে এই কাণ্ডগুলির প্রকৃত শ্লোকসংখ্যা ছিল, অর্থাৎ প্রথম কাণ্ডের প্রত্যেক সূক্তেরই শ্লোকসংখ্যা প্রথমে ছিল ৪, দ্বিতীয় কাণ্ডের প্রত্যেক সূক্তেরই শ্লোকসংখ্যা প্রথমে ছিল ৫, ইত্যাদি। আরও মনে করা হয় যে প্রথম পাঁচটী কাণ্ডের মধ্যে যেখানেই সূক্তের শ্লোকসংখ্যা এই লঘিষ্ট নিয়ম অতিক্রম করিয়াছে সেখানেই অতিরিক্ত শ্লোকগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। অর্থাৎ যদি প্রথম কাণ্ডের কোন সূক্তে ৫টী শ্লোক দেখা যায় তবে ঐ সূক্তের শেষ শ্লোকটীকে প্রক্ষিপ্ত মনে করিতে হইবে; যদি তাহাতে ৬টী শ্লোক থাকে তবে শেষ দুইটীকেই প্রক্ষিপ্ত মনে করিতে হইবে, ইত্যাদি। সর্ব্বত্রই এই নিয়মের অনুবর্ত্তন সম্ভব কি না সে বিষয়ে কিন্তু যথেষ্টই সন্দেহের অবকাশ আছে। যাহাই হউক, মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে প্রথম সপ্তকাণ্ডে সূক্তসজ্জা সূক্তের শ্লোকসংখ্যা অনুযায়ীই হইয়াছে। প্রথম পাঁচটী কাণ্ডে সূক্তের শ্লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ষষ্ঠ ও সপ্তমকাণ্ডে সূক্তের শ্লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর হ্রাস পাইয়াছে।

পঞ্চদশ ও ষোড়শকাণ্ড বাদ দিলে, অষ্টম হইতে অষ্টাদশ কাণ্ড পর্য্যন্ত সূক্তগুলি তুলনায় যথেষ্ট দীর্ঘতর। ইহার মধ্যে ক্ষুদ্রতম সূক্তও পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তকাণ্ডের যে কোন সূক্ত অপেক্ষা দীর্ঘ। অষ্টম হইতে একাদশ কাণ্ড পর্য্যন্ত প্রতি কাণ্ডে দশটী করিয়া সূক্ত আছে। ইহার পর প্রতি কাণ্ডে সূক্তসংখ্যা কমিয়া আসিয়াছে। দ্বাদশ কাণ্ডে ৫টী, ত্রয়োদশ কাণ্ডে ৪টী, চতুর্দ্দশ কাণ্ডে ২টী ও সপ্তদশ কাণ্ডে ১টী মাত্র সূক্ত।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে সংহিতার মধ্যে কাণ্ড-বিন্যাস প্রধানতঃ কাণ্ডের সূক্তসংখ্যা অনুযায়ী নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। কাণ্ডের সূক্ত পারম্পর্য্যের মধ্যেও কএকটী নির্দ্দিষ্ট নিয়ম পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তাহার আলোচনা এক্ষণে সম্ভব হইবে না।

অথর্ববেদের ছন্দোবিচার অতি দুরূহ ব্যাপার, কিন্তু তাহারও কিঞ্চিৎ আলোচনা এ স্থলে না করিলে প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। অথর্ববেদের প্রাচীনাংশে সাধারণ শুদ্ধ বৈদিক ছন্দই দেখিতে পাওয়া যায়, যথা গায়ত্রী, অনুষ্টুভ্, ত্রিষ্টুভ্, জগতী ইত্যাদি। কিন্তু গদ্যে রচিত পঞ্চদশ (সম্পূর্ণ) ও ষোড়শ (আংশিক) কাণ্ডের মধ্যে এমন সমস্ত বিকৃত ছন্দের আভাষ পাওয়া যায়—যাহাকে অনেক সময় গদ্য হইতে পৃথক্ করাই কঠিন হইয়া পড়ে। বৃহৎসর্ব্বানুক্রমণীতে এই সকল নূতন ছন্দের নাম দেওয়া হইয়াছে নিচৃৎ, ভুরিজ্, আর্ষী ইত্যাদি। একই সূক্তের মধ্যে অপরূপ ছন্দোবৈচিত্র্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে এবং এই বৈচিত্র্য যে সূক্তকারের অনভিপ্রেত ছিল তাহাও মনে করিবার কারণ নাই। অনেক সময় মনে হয় কবি যেন ইচ্ছা করিয়াই লঘু অনুষ্টুভ্ ছন্দে সূক্ত আরম্ভ করিয়া পরে ভাবের গুরুত্ব অনুযায়ী ত্রিষ্টুভাদি গুরু ছন্দ গ্রহণ করিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে বিবাহের মন্ত্রে প্রধানতঃ লঘু অনুষ্টুভ্ এবং শ্রাদ্ধের মন্ত্রে প্রধানতঃ ত্রিষ্টুভ্ ছন্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঋগ্বেদের অনুষ্টভ ও অথর্ববেদের অনুষ্টভের মধ্যে পার্থক্য

সুস্পষ্ট,—কিন্তু ঋগ্বেদের ছন্দই যে সর্ব্বত্র প্রাচীনতর তাহা মনে করিবার কারণ নাই, বিশেষ যখন দেখা যায় যে অবেস্তার সমজাতীয় ছন্দের সহিত অথর্ববেদের ছন্দেরই সাদৃশ্য অধিক। বরঞ্চ ইহাই মনে রাখা উচিত যে অবেস্তা ও অথর্ববেদেই প্রাচীন, সাধারণ ও জনপ্রিয় (সেই জন্যই অনেক সময় ব্যতিক্রমশীল) ছন্দঃ পরিরক্ষিত হইয়াছে,—কিন্তু পুরোহিতদিগের মধ্যে আবদ্ধ ঋগ্বেদের ছন্দগুলি পুনঃ পুনঃ পরিমার্জিত ও পরিশোধিত হইয়া তাহাদের আদিরূপ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

তথাপি এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ আসিতে পারে না যে ঋগ্বেদের তুলনায় অথর্ববেদের ছন্দঃ অতীব দুষ্ট। অনেক সময় স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় কিরূপে ছন্দোদুষ্টি ঘটিয়াছে। ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ বোধ হয় :—

"আয়ুরস্মভ্যং দধৎ প্রজাং চ।

রায়শ্চ পৌষৈরভি নঃ সচতাম্॥" (অথর্ব ৯.৪.২২ মন্ত্রে)

এরূপ দুষ্ট ছন্দঃ অথর্ববেদেও খুব বেশী নাই। কিন্তু এই ছন্দোদুষ্টি ঘটিল কিরূপে? এ প্রশ্নের সদুত্তরের জন্য তুলনীয়

"আয়ুরস্মভ্যং দধতঃ প্রজাং চ।

রায়শ্চ পৌষৈরভি নঃ সচধ্বম্॥" (অথর্ব ১৮.৪.৬২)

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এই শ্লোকেরই বহুবচনান্ত শব্দগুলির স্থলে একবচনান্ত শব্দ প্রয়োগের ফলে (অথর্ব ৯.৪.২২ মন্ত্রে) দুষ্টছন্দের উদ্ভব হইয়াছে। অর্থাৎ যে মন্ত্র প্রথমে দেবসমূহকে আহ্বান করিবার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল তাহাই পরে একটী মাত্র দেবতার প্রতি প্রযুক্ত হওয়ায় অর্থ-সঙ্গতির অনুরোধে ছন্দোভঙ্গ স্বীকার করিতে হইয়াছে। ইহা ভিন্নও আরও বহু স্থলে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে শ্লোকের মধ্যে এক বা একাধিক শব্দ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। অনেক সময় ঋগ্বেদের শুদ্ধতর ছন্দের সাহায্যে অথর্বসংহিতাভুক্ত অনুরূপ শ্লোকের আদিরূপ নির্ণয় সম্ভবপর হয়।

কেবল ভাষার আলোচনা করিলেও ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের ভাষার মধ্যে যথেষ্ট বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই বৈষম্যানুযায়ী সাধারণতঃ ধরিয়া লওয়া হয় যে ঋগ্বেদের ভাষা প্রাচীন এবং অথর্ববেদের ভাষা অর্বাচীন। কিন্তু এইরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ভাষা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে দ্বিবচনে -ঔ এবং তৃতীয়ার বহুবচনে -ঐঃ, সাধারণতঃ বৈদিক ভাষায় অর্বাচীনত্বের লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে অন্যান্য আর্য্যভাষার মধ্যেও এই সকল বিভক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই স্বীকার করিতেই হইবে যে বৈদিক যুগে বিবিধ ভাষা বা বিভাষার সঙ্কর ঘটিয়াছিল। অথর্ববেদের ভাষা অর্বাচীন হইলেও তাহাতে প্রাচীনত্বের লক্ষণ বহুল পরিমাণে বিদ্যমান এবং ঋগ্বেদের ভাষা প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন হইলেও তাহার মধ্যে বহু অর্বাচীন শব্দাদি প্রবেশলাভ করিয়াছে। ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের মধ্যে যে সব সূক্ত বা সূক্তাংশ সমভাবে বর্তমান সেইগুলির ভাষার তারতম্যের পর্য্যালোচনা করিলে সেই জন্য অনেক সময়ে বিস্মিত হইতে হয়। ঋগ্বেদে দেখি 'কৃণু' কিন্তু অথর্ববেদে পাই 'কৃধি', উভয়ের মধ্যে 'কৃধি'ই যে প্রাচীনতর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আবার সেই একই সূক্তের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে ঋগ্বেদে রহিয়াছে প্রাচীন শব্দ 'তূর্ব' তৎস্থলে অথর্ববেদে পরবর্তী যুগে প্রচলিত শব্দ 'ভূর্ব' ব্যবহার করা হইয়াছে। এই সব ক্ষেত্রে একথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে ঋগ্বেদের কবি যেন মাঝে মাঝে আপনার রচনার পবিত্রতার কথা বিস্মৃত হইয়া জনসাধারণের ভাষা হইতে দুই একটী শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাও মোটেই অস্বাভাবিক নহে যে এই জনসাধারণের ভাষাতেই, যাহাতে ঋগ্বেদের মন্ত্র রচিত হয় নাই কিন্তু অথর্ববেদের মন্ত্র রচিত হইয়াছিল—আদি আর্য্যভাষার বহু বৈচিত্র্য সজ্জিত ছিল। কাজেই কেবল ভাষার সাহায্যে ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের কালনির্ণয় সম্ভব নয়। একথা নিশ্চিত যে উভয় সংহিতারই মূল গিয়া পৌঁছিয়াছে সেই সুদূর অতীতে, যেখানে অপর সমস্ত আর্য্য জাতিরও ভাষা ও কৃষ্টির আদি উৎস, কিন্তু হয়তো অথর্ববেদ-সংহিতা হইয়াছিল ঋগ্বেদ অপেক্ষা পরবর্ত্তী যুগে। উপরন্তু ইহাও নিশ্চিত যে ঋগ্বেদের পাঠের শুদ্ধি যেরূপ যত্নের সহিত পরিরক্ষিত হইয়াছে, অথর্ববেদের পাঠ কোন দিনই সেরূপ যত্নের সহিত পরিরক্ষিত হয় নাই। সেই জন্যই অথর্ববেদে প্রক্ষিপ্ত শব্দাদির সংখ্যা এত অধিক। যজুর্বেদের সহিত তুলনা করিলেও অথর্ববেদ সম্বন্ধে এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, কারণ সে ক্ষেত্রেও উভয় সংহিতার সাধারণ মন্ত্রের তুলনা করিলে যজুর্বেদের পাঠই অধিকাংশ স্থলে শুদ্ধতর বলিয়া মনে হয়, যদিও ইহাও নিশ্চিত যে অনেকস্থলে অথর্বসংহিতাতেই শুদ্ধতর পাঠ রক্ষিত হইয়াছে।

অথর্বসংহিতার মধ্যে এত প্রকারের সূক্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহাদের তথ্যবস্তু অনুযায়ী সেগুলির শ্রেণীবিভাগ করা এক প্রকার অসম্ভব। তথাপি ব্লুমফিল্ড (Bloomfield) মোটামুটি ১৪ প্রকারের অথর্বসূক্তের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন :—

১। ভৈষজ্যসূক্ত, অর্থাৎ রোগী অথবা ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির চিকিৎসার্থ ব্যবহৃত মন্ত্র। সহজ ভাষায় এইগুলিকে ওঝার মন্ত্র বলা যাইতে পারে, কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে ভারতীয়

চিকিৎসাশাস্ত্রের ইহাই সূত্রপাত। পৃথিবীর আর কোথাও রোগচিকিৎসার বিধান সমন্বিত এত প্রাচীন মন্ত্রতন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। ভৈষজ্যসূক্ত যে কেবল মাত্র অথর্ববেদের মধ্যেই আবদ্ধ তাহা নহে, ঋগ্বেদেও এই প্রকারের মন্ত্র কএকটী পাওয়া যায়। এই সকল ভৈষজ্যমন্ত্র যে অতি প্রাচীন তৎ-সম্বন্ধে আরও প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে:—অবেস্তার মধ্যেও এই ধরণের মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় এবং 'ভৈষজ্য' কথাটীও তথায় ঠিক এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাচীন জর্মন্ জাতির মধ্যেও এই প্রকারের রোগনাশক মন্ত্রতন্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

পরবর্ত্তী যুগের আয়ুর্বেদের সহিত এই সকল ভৈষজ্যসূক্তের সম্বন্ধ অতি সুস্পষ্ট (আয়ুর্বেদ অথর্ববেদেরই একটী উপবেদ বলিয়া পরিচিত)। অথর্ববেদের 'তক্মন্' আয়ুর্বেদোক্ত 'জ্বর' ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ অথর্ববেদোক্ত 'আস্রাব' ও 'অপচিৎ' যথাক্রমে পরবর্ত্তী যুগের 'অতিসার' ও 'অপচী' হইতে অভিন্ন। চিকিৎসার জন্য সর্ব্বত্রই যে কেবল মন্ত্রের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে তাহা নহে, মন্ত্রের মধ্যেই দেখা যায় যে রোগনিরসনের জন্য নানা প্রকার ওষধিও ব্যবহৃত হইত। জ্বর-রোগে কুষ্ঠ নামক ওষধির ব্যবহার বার বার বর্ণিত হইয়াছে। ভৈষজ্যসূক্তে কএকটী রোগের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণও দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা হইতে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে বৈদিক যুগের 'তক্মন্' আধুনিক যুগের ম্যালেরিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। তিনটী সূক্তে জলোদর রোগ বর্ণিত হইয়াছে; সূক্তকার অবশ্য বলিয়াছেন যে বরুণের অভিশাপেই জলোদর রোগ হইয়া থাকে। নানা প্রকারের যক্ষ্মারোগ অথর্ববেদের যুগেই ভারতে পরিচিত ছিল; পক্ষাঘাত ও নানা প্রকারের 'ক্ষেত্রিয়' রোগেরও চিকিৎসার বিধান অথর্ববেদেই দেখিতে পাওয়া যায়। চর্ম্মরোগের মধ্যে 'কিলাস' (কুষ্ঠ) ও 'বিদ্রধ' (বিস্ফোটক) বিশেষ করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তিনটী সূক্তে বিশেষ করিয়া কেশবৃদ্ধির মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। মস্তিষ্কবিকৃতি অথর্ববেদের মতে গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণের দুরভি-সন্ধিতেই ঘটিয়া থাকে, সেই জন্য তদ্বিষয়ক মন্ত্র গন্ধর্ব ও অপ্সরা-গণের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হইত। বীর্য্যবিধায়ক (শেপাহর্ষণ) মন্ত্রও অথর্ববেদে দেখিতে পাওয়া যায়।

২। আয়ুষ্যসূক্ত, অর্থাৎ আয়ু ও স্বাস্থ্যদায়ক মন্ত্র। এই শ্রেণীর সূক্তগুলিকে সকল সময়ে ভৈষজ্যসূক্ত হইতে পৃথক্ করা যায় না। এই সকল মন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য দীর্ঘ পরমায়ু, রোগ-মুক্তি নহে। এই জন্যই চূড়াকরণ, উপনয়ন ইত্যাদি গৃহ-সংস্কারের সময় বিশেষ করিয়া এই সব আয়ুষ্যসূক্ত ব্যবহৃত হইত। আয়ুষ্যসূক্তের মধ্যে অগ্নিকেই বিশেষ করিয়া আহ্বান করা হইয়াছে, তাহার কারণ অগ্নিই আয়ু,—তিনি আয়ু দান করিয়া থাকেন; তাই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিয়াছেন—"আয়ুর্নো বিশ্বতো দধদয়মগ্নির্বরেণ্যঃ" (অথর্ব. ৭.৫৫.৬)। দীর্ঘায়ুলাভের জন্য নানাপ্রকার কবচ, অঞ্জন ও মেখলার ব্যবস্থাও এই সকল আয়ুষ্য মন্ত্রে দেখা যায়।

৩। আভিচারিক সূক্ত। এই সকল সূক্তের মন্ত্রদ্বারা ভূত, প্রেত ও শত্রুনিধন সম্পন্ন হইত, যাহাদের সংহিতামধ্যে 'ভ্রাতৃব্য' 'সপত্ন', 'অরায়', 'পিশাচ' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই প্রকারের আভিচারিক মন্ত্রের প্রথম উন্মেষ ঋগ্বেদের মধ্যেই দেখা যায়; যজুর্বেদের মধ্যে ইহার ক্রমবিকাশ ও তন্ত্রশাস্ত্রে ইহার শেষ পরিণতি। 'যো অস্মান্ দ্বেষ্টি, যং চ বয়ং দ্বিষ্মঃ' তাহার প্রতিই এই সকল মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। 'অথর্বাঙ্গিরস' সংহিতার এই অংশই আঙ্গিরসের শ্রেষ্ঠত্ব পরি-চায়ক। এই সকল মন্ত্রের একটী বৈশিষ্ট্য এই যে তন্মধ্যে সীসককে প্রেতাদির বিরুদ্ধে প্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। অথর্ববেদের বিখ্যাত বরুণসূক্ত (৪.১৬) এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই বরুণসূক্তের উদাত্ত গম্ভীর ধ্বনি সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে অতুলনীয়—"সবং তদ্রাজা বরুণো বি চষ্টে যদন্তরা রোদসী যৎ পরস্তাৎ। সংখ্যাতা অস্য নিমিষো জনানামক্ষানিব শ্বঘ্নী নিমিনোতি তানি॥" সমভাবে প্রখ্যাত বিহব্যসূক্তও (৫.৩, যদ্দ্বারা দেবতাকে অন্যান্য যজ্ঞ হইতে স্বযজ্ঞাভিমুখে আহ্বান করা হইত) একটী আভিচারিক সূক্ত এবং ইহার আরম্ভ এইরূপ—"মমাগ্নে বর্চো বিহবেষ্বস্তু বয়ং ত্বেন্ধানাস্তন্বং পুষেম। মহ্যং নমন্তাং প্রদিশশ্চতস্রস্ত্বয়াধ্যক্ষেণ পৃতনা জয়েম॥"

আভিচারিক মন্ত্রেরই বিরুদ্ধ মন্ত্র 'কৃত্যাপ্রতিহরণ', এতদ্দ্বারা আভিচারিক মন্ত্রের বাধন হইত। কৃত্যাপ্রতিহরণের মন্ত্র প্রধানতঃ 'কৃত্যাকৃৎ' (যাদুমন্ত্রকার), 'বল্‌গিন্' (যাদুমন্ত্রার্থে যে খনন করিয়া থাকে), 'মূলিন্' (ওষধিমূল-সংগ্রাহক), 'শপথেয্য' অভিশপ্তা প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইত। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর কৃত্যাপ্রতিহরণিক মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় অথর্বের ২.২৪ সূক্তে। ইহার মধ্যে চারিজন 'কিমীদিন্' ও চারিজন 'কিমীদিনীর' উল্লেখ করা হইয়াছে। সূক্তার্থ খুব স্পষ্ট নহে।

৪। স্ত্রীকর্ম্ম। এই শ্রেণীর অধিকাংশ মন্ত্র স্ত্রী-পুরুষের বাদ সাদৃশ্যক। ঋগ্বেদেই এক মন্ত্রদ্রষ্টা বলিয়াছেন:—"ন হি স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি। সালাবৃকাণাং হৃদয়ান্যেতা"॥ তাই নারীর চিত্ত অধিকারের জন্য ঋষিগণ এত উদ্যম সহকারে এই সকল স্ত্রীকর্ম্মবিষয়ক মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। তন্ত্রাদি প্রোক্ত বশীকরণ মন্ত্রের ইহাই প্রারম্ভ। মন্ত্রের উদ্দেশ্য সর্ব্বত্রই অতীব সুস্পষ্ট; যথা—"যথা মম ক্রতাবসো, মম চিত্তমুপায়সি,

যথা মাং কামিন্যসো, যথা মন্নাপগা অসঃ" ইত্যাদি। সর্ব্বত্রই যে কেবল স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক সম্বন্ধের কথা আলোচিত হইয়াছে তাহা নহে, বৈদিক বিবাহের পবিত্র মন্ত্রও ইহারই মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় (৭.৩৬);—"অক্ষ্যৌ নৌ মধুসংকাশে অনীকং নৌ সমঞ্জনম্। অন্তঃ কৃণুষ্ব মাং হৃদি মন ইন্নো সহাসতি"। আমাদের চক্ষু মধুবৎ উজ্জ্বল হউক, আমাদের ললাট অঞ্জনের ন্যায় দীপ্তিশালী। আমাকে তোমার হৃদয়ে স্থান দাও, আমাদের মন অভিন্ন হউক।

৫। সাংমনস্য। সভাদিতে যাহাতে শৃঙ্খলা ও ঐকমত্য বিরাজ করে তদুদ্দেশ্যে এই সকল মন্ত্র প্রযুক্ত হইত। পারিবারিক শান্তির জন্য যে এই মন্ত্র ব্যবহৃত হইত, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এই শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সূক্ত (অ.বে ৩.৩০)

"সহৃদয়ং সাংমনস্যমবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ।
অন্যো অন্যমভি হর্যত বৎসং জাতমিবাঘ্ন্যা॥
অনুব্রতঃ পিতুঃ পুত্রো মাত্রা ভবতু সংমনাঃ।
জায় পত্যে মধুমতীং বাচং বদতু শান্তিবাম্॥
মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষন্মা স্বসারমুত স্বসা।
সম্যঞ্চঃ সব্রতা ভূত্বা বাচং বদত ভদ্রয়া॥
সমানী প্রপা সহ বোঽন্নভাগঃ সমানে যোক্ত্রে
সহ বো যুনজ্মি
সম্যঞ্চোঽগ্নিং সপর্য্যতারা নাভিমিবাভিতঃ॥" ইত্যাদি

৬। রাজকর্ম্ম। অথর্ববেদের বিশেষত্ব এই যে ইহাতে সমাজের সকল স্তরের লোকের সমভাবে মঙ্গল কামনা করা হইয়াছে। অধিকাংশ মন্ত্র জনসাধারণের মধ্যেই ব্যবহৃত হইত, কিন্তু রাজার স্বার্থসিদ্ধির মন্ত্রও এই অথর্ববেদেই পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর মন্ত্রের সাধারণ নাম রাজকর্ম্ম। এতৎ সম্পর্কে সর্ব্বপ্রধান সূক্ত (৪.৮)

"ভূতো ভূতেষু পয় আ দধাতি স ভূতানামধিপতির্বভূব।
তস্য মৃত্যুশ্চরতি রাজসূয়ং স রাজা রাজ্যমনু মন্যতামিদম্॥
অভি প্রেহি মাপ বেন উগ্রশ্চেত্তা সপত্নহা।
আ তিষ্ঠ মিত্রবর্ধন তুভ্যং দেবা অধি ব্রুবন্॥"

প্রাচীন ভারতের আদর্শ রাজার ইহাই আদর্শ চিত্র। যুদ্ধবিষয়ক সূক্তগুলিও অবশ্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তাহার উদাহরণস্বরূপ (অথর্ব ৮.৮ সূক্তের) উল্লেখ করা যাইতে পারে,—

"ইন্দ্রো মন্থতু মন্থিতা শক্রঃ শূরঃ পুরন্দরঃ।
যথা হনাম সেনা অমিত্রাণাং সহস্রশঃ॥
পূতিরজ্জুরুপধ্মানী পূতিং সেনাং কৃণোত্বমূম্।
ধূমমগ্নিং পরাদৃশ্যামিত্রা হৃৎস্বা দধতাং ভয়ম্॥"

পঞ্চম কাণ্ডের দুইটী সূক্ত (২০ ও ২১) রণ-দুন্দুভির উদ্দেশ্যে রচিত। রণদুন্দুভি শব্দে মাতা পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় কিরূপ ভীত হইয়া পড়েন তাহা এই দুইটীর প্রথমটীতে সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে;—

"দুন্দুভের্বাচং প্রযতাং বদন্তীমাশৃণ্বতী নাথিতা ঘোষবুদ্ধা!
নারী পুত্রং ধাবতু হস্তগৃহ্যামিত্রী ভীতা সমরে বধানাম্॥"

৭। দক্ষিণা সূক্ত। এস্থলে দক্ষিণাশব্দ বিস্তৃত অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ ব্রাহ্মণের মঙ্গলবিষয়ক যত কিছু সূক্ত সমস্তই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত,—প্রধান মঙ্গল অবশ্য অর্থলাভ। এই সকল সূক্ত ব্রাহ্মণের গুণগানে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মণ যে অবধ্য এবং ব্রাহ্মণের সম্পত্তিতে হাত দেওয়া যে মহাপাপ এই কথাই বার বার এই সকল মন্ত্রে বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের পত্নীহরণ যে অতীব গর্হিত কর্ম্ম একথাও বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে। রাজা সোম সকল নারীর প্রথম স্বামী; কিন্তু তিনিও ব্রাহ্মণ-পত্নীর উপর আপন অধিকার স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন;—"সোমো রাজা প্রথমো ব্রহ্মজায়াং পুনঃ প্রায়চ্ছদহৃণীয়মানঃ" ৫.১০.১। প্রাকৃতিক নিয়মের কোথাও কোন ব্যতিক্রম দেখিলেই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে ব্রাহ্মণকে কিছু দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গাভীর একসঙ্গে দুইটী বৎস জন্মিলে ব্রাহ্মণকে গোদান করিতে হইবে। উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে গাভী বন্ধ্যা হইয়া পড়িলে তাহাকে যত শীঘ্র সম্ভব ব্রাহ্মণকে দান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা অধিস্বামীর সমূহ বিপদ্। ব্রাহ্মণেতর জাতিরা যে অতি প্রসন্ন অন্তঃকরণে ব্রাহ্মণকে ধনাদি দান করিত না তাহার প্রমাণ বোধ হয় (অ.বে ৯.৩ সূক্তে) পাওয়া যায়। এখানে ব্রাহ্মণকে গৃহদানের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু একেবারে নহে; গৃহের প্রতি অংশ পৃথক্ পৃথক ভাবে দেওয়া হইবে।

৮। পৌষ্টিকসূক্ত। ইহা ধনলাভের মন্ত্র, এইরূপ শ্রেণীর মন্ত্রই বৈদিক সাহিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল সূক্তে উল্লিখিত কাম্যবস্তুর সংখ্যা প্রায় অনন্ত। গৃহ, ভূমি, নদী, গিরি, শস্য, বৃষ্টি, গো, অশ্ব সমস্তই দেবতার নিকট প্রার্থিত হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কাম্যবস্তু সন্ততি (প্রজা)। বৈদিক সাহিত্যের সর্ব্বত্র ঋষিদের প্রজাকামনা অতীব প্রকট। ধনলাভের মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গেই বিপদবারণের মন্ত্র সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর সূক্তের মধ্যে তথাকথিত মৃগারসূক্তগুলি সর্ব্বপ্রধান (অথ.বে. ৪.২৩-২৯)। এই সকল সূক্তমধ্যে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে 'স মাং (অথবা 'স নো') মুঞ্চত্বংহসঃ'। বিপদ্ হইতে উদ্ধারলাভই মৃগার সূক্তগুলির প্রার্থনীয় বিষয়।

৯। প্রায়শ্চিত্তসূক্ত। প্রায়শ্চিত্তসূক্তগুলি বুঝিতে হইলে

পূর্ব্বে বোঝা প্রয়োজন বৈদিকযুগে পাপ বলিতে ভারতীয়গণ কি বুঝিতেন। আধুনিক যুগে সৎপথ হইতে চ্যুতির নামই পাপ। কিন্তু বৈদিক যুগে ধারণা ছিল কোন প্রকার অসদাচরণ করিলে পাপ নামক একটী বাহ্য বস্তু মানবের আত্মা অধিকার করিয়া বসিত। এই বাহ্যবস্তুর বিতাড়নই প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্য। প্রায়শ্চিত্তের মন্ত্রাদির মধ্যে পাপের এই অদ্ভুত ধারণা স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই জন্যই বেদে পাপীকে বলা হইয়াছে পাপ্মগৃহীত। পাপ্মগৃহীত ব্যক্তি এক প্রকার ভূতগ্রস্ত,—উভয়ের সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা সেই জন্য অনুরূপ। ক্ষেত্রিয় ব্যাধির মত পাপ পিতা হইতে পুত্রে সংক্রামিত হইতে পারে। সেই জন্যই বেদের পাপ ও নির্ঋতির (দুর্ভাগ্য) মধ্যে প্রায় কোনই পার্থক্য দেখা যায় না। উভয়ের প্রতিই একই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে।

১০। দার্শনিক সূক্ত। অথর্ববেদের মধ্যে উচ্চাঙ্গের দার্শনিক সূক্তের আবির্ভাব বাস্তবিকই বিস্ময়ের বস্তু। কিন্তু সেই জন্যই এই সংহিতার অন্তর্গত দার্শনিক সূক্তগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। এই শ্রেণীর অধিকাংশ সূক্ত সৃষ্টিতত্ত্ববিষয়ক, যথা—

"অসদ্ভূম্যাঃ সমভবৎ তদ্যামেতি মহদ্ব্যচঃ।
তদ্বৈ ততো বিধূপায়ৎ প্রত্যক্ কর্তারমৃচ্ছতু॥"

(৪.১৯.৬)

'সেই অনস্তিত্বরূপ বস্তু পৃথিবী হইতে উদ্ভূত হইয়া বিরাট্ বিস্তৃতি সহকারে স্বর্গাভিমুখে গমন করিয়া থাকে। অতএব বিস্তারশীল বাষ্প (অমঙ্গল) কর্তার প্রতি ধাবিত হউক।' ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে অথর্ববেদের দার্শনিক সূক্তের মধ্যে কোন প্রকার সুসংবদ্ধ অর্থের সন্ধান ব্যর্থ হইতে বাধ্য। ঋগ্বেদের বিখ্যাত পুরুষসূক্ত ও হিরণ্যগর্ভসূক্তও কিছু পরিবর্ত্তিতাকারে অথর্বসংহিতার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় কাণ্ডের প্রারম্ভে বেণসূক্ত—"বেণস্তৎ পশ্যৎ পরমং গুহা যদ্ যত্র বিশ্বং ভবত্যেকরূপম্" ইত্যাদি। এই সূক্তও ঋগ্বেদের মন্ত্রের অনুকরণে রচিত।

১১। শ্রৌতকর্ম্মবিষয়ক সূক্ত। শ্রৌতকর্ম্ম-সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায় শ্রৌতসূত্র হইতে। কিন্তু অথর্ববেদের শ্রৌতসূত্র বৈতানসূত্র এতই অর্বাচীন ও এতই ভ্রম-প্রমাদে পরিপূর্ণ যে তাহা হইতে আথর্বণ শ্রৌতকর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বুঝিতে পারার উপায় নাই। তদুপরি স্মরণ রাখিতে হইবে যে অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগে সূত্রমধ্যে যে সব মন্ত্রের যে সব ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় খুব সম্ভব যে সূক্তরচনাকালে ঋষিদের সেরূপ কোন প্রয়োগের কথা মনেই আসে নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অথর্বসংহিতা হইতে মনে হয় যে সেই সময় সকল প্রকার শ্রৌতকর্ম্মই প্রায় অনুষ্ঠিত হইত। শ্রৌতকর্ম্মের প্রধান প্রধান অঙ্গের প্রায় সবগুলিই সংহিতা মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা, অগ্নিষ্টোম, ত্রিসবন, ইত্যাদি। পশুবন্ধ প্রযুক্ত আপ্রিসূক্তও সংহিতা মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। যজ্ঞের আনুষঙ্গিক বেদি, বর্হি প্রভৃতি প্রতিনিয়তই অথর্ববেদে উল্লিখিত হইয়াছে।

১২। বিবিধ। অথর্বসংহিতায় এমন অনেক সূক্ত রহিয়াছে যে গুলিকে পূর্ব্বানুসৃত পদ্ধতিতে কোন নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ কাণ্ডের সূক্তগুলি এই প্রকারের। ত্রয়োদশ কাণ্ডে রোহিত নামক সৌরদেবতার প্রতি উদ্দিষ্ট চারিটী দীর্ঘ সূক্ত। এই সূক্তগুলির সর্ব্বত্রই যে এই সৌরদেবতার সহিত সম্বন্ধ সুস্পষ্ট তাহা অবশ্য নহে। চতুর্দ্দশ কাণ্ডে আথর্বণগণের বিবাহমন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা অবশ্যই ঋগ্বেদের সূর্য্যাসূক্তের অনুকরণেই রচিত। পঞ্চদশকাণ্ড গদ্যে রচিত; ইহার মধ্যে ব্রাত্যগণের স্তুতি করা হইয়াছে। অধ্যাপক হাউর (Hauer) তাঁহার প্রাচ্য সম্বন্ধীয় গ্রন্থে এই সকল সূক্তের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। ব্রাত্যগণ যে কাহারা ছিলেন তৎসম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট মতদ্বৈধ রহিয়াছে। সম্ভবতঃ অনার্য্যগণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলে ব্রাত্যনামে অভিহিত হইত। সামবেদীয় তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে ও লাট্যায়নশ্রৌতসূত্রেও ব্রাত্যদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই কাণ্ডে বহু সামমন্ত্রের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে সামবেদের সহিত ব্রাত্যগণের কোন এক বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ব্রাত্যসম্বন্ধীয় এই পঞ্চদশকাণ্ডের কোন চিহ্নই পৈপ্পলাদসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা হইতে অনুমান হয় এই সকল গদ্যে রচিত ব্রাত্য-স্তোত্র আদি আথর্বণিক সমাম্নায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

ষোড়শকাণ্ড দুইটী অনুবাকে বিভক্ত। প্রথমানুবাক গদ্যপ্রধান। এই অনুবাকের মন্ত্রগুলিকে অথর্বপরিশিষ্টে অভিষেকমন্ত্র বলা হইয়াছে, যদিও মন্ত্র হইতে বুঝিবার উপায় নাই কেন তাহা অভিষেকে ব্যবহৃত হইত। দ্বিতীয়ানুবাকের মন্ত্রের উদ্দেশ্য দুঃস্বপ্ন দূর করা। ষোড়শ কাণ্ডের মধ্যে পরস্পর কোনই সম্বন্ধ নাই; কেন যে এই সকল মন্ত্র একই কাণ্ডে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল তাহাও বুঝিবার কোন উপায় নাই।

সমগ্র সপ্তদশকাণ্ডে একটী মাত্র সূক্ত। ত্রিংশ শ্লোকী এই একটী সূক্তেই যে কেন একটী বিশেষ কাণ্ড রচনা হইয়াছিল তাহা বুঝিয়া উঠা দুরূহ। সমগ্র সংহিতার মধ্যে এইটী প্রধান আয়ুষ্যসূক্ত, নানাপ্রকার গৃহকর্ম্মে ইহা বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইত।

অষ্টাদশ কাণ্ড চারিটী দীর্ঘ সূক্তে সমাপ্ত; প্রতি সূক্তে একটী অনুবাক। প্রথমটী প্রধানতঃ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দশম হইতে দ্বাদশ সূক্তের পুনর্বিন্যাস। অপর তিনটী সূক্তও প্রায় সম্পূর্ণভাবে ঋগ্বেদেরই দশম মণ্ডলের মন্ত্রসংযোগে গঠিত হইয়াছে। এই সূক্তগুলি হইতে বৈদিক যুগের শ্রাদ্ধাদির একটী সম্পূর্ণ চিত্র লাভ করা যায়।

১৩। বিংশকাণ্ড। এই কাণ্ডের ১৪৩টী সূক্তের মধ্যে মাত্র ১৩টী নূতন, অপরগুলি প্রধানতঃ ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডল হইতে সংগৃহীত। এই নূতন ১৩টীর মধ্যে ১০টী কুন্তাপসূক্ত। সমগ্র বিংশকাণ্ডটী শস্ত্রকাণ্ড নামে অভিহিত। সোমযাগে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিন্ প্রধানতঃ এই বিংশকাণ্ডের মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন।

১৪। কুন্তাপসূক্ত। বিংশকাণ্ডের দশটী সূক্ত (১২৭—১৩৬) কুন্তাপসূক্ত বলিয়া পরিচিত। কুন্তাপসূক্তের পদপাঠ নাই, পৈপ্পলাদ-সংহিতায় ইহাদের চিহ্ন মাত্র নাই এবং প্রাতি-শাখ্যেও এই সূক্তগুলি আলোচিত হয় নাই। কাজেই বুঝা যায় যে কুন্তাপসূক্তগুলি অথর্ববেদের খিলসূক্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঋগ্বেদের খিলসূক্তগুলি বালখিল্য বা বাস্কল শাখার মন্ত্র। কুন্তাপসূক্তগুলিও সেইরূপ অথর্ববেদের অপর কোন শাখার মন্ত্র কি না তাহা কিন্তু জানা যায় না। নানা ব্রাহ্মণে ও সূত্রে কুন্তাপসূক্তের মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে; এই সকল উদ্ধৃতাংশ হইতে বুঝা যায় যে সূক্তগুলির পারম্পর্য্য পূর্ব্বে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল এবং এই উদ্ধৃতাংশের পাঠেও যথেষ্ট তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। কুন্তাপসূক্ত যে শ্রৌতকর্ম্মে বাস্তবিকই ব্যবহৃত হইত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এগুলি অনেক সময় এমনই জঘন্য রুচির পরিচায়ক যে সেগুলি যজ্ঞে ব্যবহৃত হইতে দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। ঋগ্বেদের দানস্তুতি ও নারাশংসীর সহিত এই কুন্তাপসূক্তগুলির একটা সুদূর সাদৃশ্য আছে বলা যাইতে পারে।

প্রচলিত অথর্ববেদের মন্ত্র-পরিচয়।

আমরা প্রচলিত সমস্ত বেদখানির মন্ত্রাদি সাবধানে গণিয়া নিম্নে তাহাদের তালিকা দিতেছি—

১ কাণ্ডে	৩৫ সূক্ত।	৬ অনুবাক।	২ প্রপাঠক।	ঋক্ ১৫৩
২ „	৩৬ „ ।	৬ „ ।	৪ „ ।	২০৭
৩ „	৩১ „ ।	৬ „ ।	৬ „ ।	২৩১
৪ „	৪০ „ ।	৮ „ ।	৯ „ ।	৩২৪
৫ „	৩০ „ ।	৬ „ ।	১২ „ ।	৩৭৬
৬ „	১৪২ „ ।	১৩ „ ।	১৫ „ ।	৪৫৪
৭ „	১১৮ „ ।	১০ „ ।	১৭ „ ।	২৮৬
৮ কাণ্ডে	১০ সূক্ত।	৫ অনুবাক।	২১ প্রপাঠক।	ঋক্ ২৫৯
৯ „	১০ „ ।	৫ „ ।	২১ „ ।	৩০২
১০ „	১০ „ ।	৫ „ ।	২৩ „ ।	৩৫০
১১ „	১০ „ ।	৫ „ ।	২৫ „ ।	৩১৩
১২ „	৫ „ ।	৫ „ ।	২৭ „ ।	৩০৪
১৩ „	৪ „ ।	৪ „ ।	২৮ „ ।	১৮৮
১৪ „	২ „ ।	২ „ ।	২৯ „ ।	১৩৯
১৫ „	১৮ „ ।	২ „ ।	৩০ „ ।	১৪১
১৬ „	৯ „ ।	২ „ ।	৩১ „ ।	৯৩
১৭ „	১ „ ।	১ „ ।	৩২ „ ।	৩০
১৮ „	৪ „ ।	৪ „ ।	৩৪ „ ।	২৮৩
১৯ „	৭২ „ ।	৭ „ ।	„ „ ।	৪৫৬
২০ „	১৪৩ „ ।	৯ „ ।	„ „ ।	৯৪১

অতএব দেখা যাইতেছে, এখন সমস্ত অথর্ববেদের মন্ত্র ৫৮৩০ টীর অধিক নহে। ঐ সকল মন্ত্র গদ্যপদ্যে রচিত। তন্মধ্যে পদ্যই অধিক।

নিম্নে অথর্ববেদের ১৯ কাণ্ডের ২৩ ও ২৪ সূক্ত উদ্ধৃত করা হইল। উহা পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, পূর্ব্বে অথর্ব ও অঙ্গিরা-বংশীয়দের অনেক মন্ত্র ছিল, সেই সকল মন্ত্র একত্র সংকলনে অথর্ববেদের উৎপত্তি হইয়াছে। তাহার মধ্যে অথর্বণেরা যে প্রণালীতে মন্ত্র সাজাইতেন বেদে তাহাই আছে। কেবল আঙ্গিরসগণের মন্ত্র যোগ করিয়া দিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে অন্য প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

“আথর্বণানাং চতুর্ঋচেভ্যঃ স্বাহা। ১। পঞ্চর্চেভ্যঃ স্বাহা। ২। ষড়ৃচেভ্যঃ স্বাহা। ৩। সপ্তর্চেভ্যঃ স্বাহা। ৪। অষ্টর্চেভ্যঃ স্বাহা। ৫। নবর্চেভ্যঃ স্বাহা। ৬। দশর্চেভ্যঃ স্বাহা। ৭। একাদশর্চেভ্যঃ স্বাহা। ৮। দ্বাদশর্চেভ্যঃ স্বাহা। ৯। ত্রয়োদশ-র্চেভ্যঃ স্বাহা। ১০। চতুর্দ্দশর্চেভ্যঃ স্বাহা। ১১। পঞ্চদশ-র্চেভ্যঃ স্বাহা। ১২। ষোড়শর্চেভ্যঃ স্বাহা। ১৩। সপ্তদশর্চেভ্যঃ স্বাহা। ১৪। অষ্টাদশর্চেভ্যঃ স্বাহা। ১৫। একোনবিংশতিঃ স্বাহা। ১৬। বিংশতিঃ স্বাহা। ১৭। মহৎকাণ্ডায় স্বাহা। ১৮। তৃচেভ্যঃ স্বাহা। ১৯। একর্চেভ্যঃ স্বাহা। ২০। ক্ষুদ্রেভ্যঃ স্বাহা। ২১। একদৃচেভ্যঃ স্বাহা। ২২। রোহিতেভ্যঃ স্বাহা। ২৩। সূর্য্যাভ্যাং স্বাহা। ২৪। ব্রাত্যাভ্যাং স্বাহা। ২৫। প্রজা-পত্যাভ্যাং স্বাহা। ২৬। বিষাসহ্যৈ স্বাহা। ২৭। মঙ্গলিকেভ্যঃ স্বাহা। ২৮। ব্রহ্মণে স্বাহা। ২৯।”

অথর্ববেদেও দেখা যায় ১ম কাণ্ডের প্রায় সকল সূক্তই চারিটী ঋকে গ্রথিত। ২য় কাণ্ডের প্রায় সকল সূক্তই পাঁচটী

ঋকে গ্রথিত। সুতরাং অথর্ববংশীয়গণের মন্ত্র লইয়াই অথর্ব-বেদ। (২২ সূক্ত)

"আঙ্গিরসানামাদ্যৈঃ পঞ্চানুবাকৈঃ স্বাহা। ১। ষষ্ঠায় স্বাহা। ২। সপ্তমাষ্টমাভ্যাং স্বাহা। ৩। নীলনখেভ্যঃ স্বাহা। ৪। হরিতেভ্যঃ স্বাহা। ৫। ক্ষুদ্রেভ্যঃ স্বাহা। ৬। পর্যায়িকেভ্যঃ স্বাহা। ৭। প্রথমেভ্যঃ শঙ্খেভ্যঃ স্বাহা। ৮। দ্বিতীয়েভ্যঃ শঙ্খেভ্যঃ স্বাহা। ৯। তৃতীয়েভ্যঃ শঙ্খেভ্যঃ স্বাহা। ১০। উপোত্তমেভ্যঃ স্বাহা। ১১। উত্তমেভ্যঃ স্বাহা। ১২। উত্তরেভ্যঃ স্বাহা। ১৩। ঋষিভ্যঃ স্বাহা। ১৪। শিখিভ্যঃ স্বাহা। ১৫। গণেভ্যঃ স্বাহা। ১৬। মহাগণেভ্যঃ স্বাহা। ১৭। সর্ব্বেভ্যঃ অঙ্গিরোভ্যো বিদগণেভ্যঃ স্বাহা। ১৮। পৃথক্‌সহস্রাভ্যাং স্বাহা। ব্রহ্মণে স্বাহা ১৯।"

অথর্ববেদের অনেক স্থলে মন্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা রোগশান্তি, দীর্ঘায়ু লাভ, শত্রুবিনাশ ও উৎপাত নিবারণ প্রভৃতি বহুতর ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে একস্থল উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"আবতস্ত আবতঃ পরাবতস্ত আবতঃ।
ইহৈব ভব মা নু গা মা পূর্ব্বাননু গাঃ
পিতৄনসুং বধ্নামি তে দৃঢ়ম্ ॥ ১ ॥
যত্ত্বাভিচেরুঃ পুরুষঃ স্বো যদরণো জনঃ।
উন্মোচনপ্রমোচনে উভে বাচা বদামি তে ॥ ২ ॥
যদ্দুদ্রোহিথ শেপিষে স্ত্রিয়ৈ পুংসে অচিত্ত্যা।
উন্মোচনপ্রমোচনে°—(ইত্যাদি) ॥ ৩ ॥
যদেনসো মাতৃকৃতাচ্ছেষে পিতৃকৃতাচ্চ যৎ।
উন্মোচনপ্রমোচনে°—॥ ৪ ॥
যত্তে মাতা যত্তে পিতা জামির্ভ্রাতা চ সর্জতঃ।
প্রত্যক্‌সেবস্ব ভেষজং জরদষ্টিং কৃণোমি ত্বা ॥ ৫ ॥
ইহৈধি পুরুষ সর্বেণ মনসা সহ।
দূতৌ যমস্য মানু গা অধিজীব পুরা ইহি ॥ ৬ ॥
অনুহূতঃ পুনরেহি বিদ্বানুদয়নং পথঃ।
আরোহণমাক্রমণং জীবতোজীবতোঽয়নম্ ॥ ৭ ॥
মা বিভের্ন মরিষ্যসি জরদষ্টিং কৃণোমি ত্বা।
নিরবোচমহং যক্ষ্মমঙ্গেভ্যো অঙ্গজ্বরং তব ॥ ৮ ॥
অঙ্গভেদো অঙ্গজ্বরো যশ্চ তে হৃদয়াময়ঃ।
যক্ষ্মঃ শ্যেন ইব প্রাপপ্তদ্বাচা সাঢ়ঃ পরস্তরাম্ ॥ ৯
ঋষী বোধপ্রতীবোধাবস্বপ্নো যশ্চ জাগৃবিঃ।
তৌ তে প্রাণস্য গোপ্তারৌ দিবানক্তং চ জাগৃতাম্ ॥১০॥
অয়মগ্নিরুপসদ্য ইহ সূর্য্য উদেতু তে।
উদেহি মৃত্যোর্গম্ভীরাৎ কৃষ্ণাচ্চিত্তমসস্পরি ॥ ১১ ॥
নমো যমায় নম অস্তু মৃত্যবে নমঃ পিতৃভ্য উত যে নয়ন্তি।
উৎপারণস্য যো বেদ তমগ্নিং
পুরো দধেঽস্মা অরিষ্টাতাতয়ে ॥ ১২ ;
ঐতু প্রাণ ঐতু মন ঐতু চক্ষুরথো বলম্।
শরীরমস্য সং বিদাং তৎপদ্ভ্যাম্ প্রতি তিষ্ঠতু ॥১৩
প্রাণেনাগ্নে চক্ষুষা সং সৃজেমং সমীরয় তন্বা সংবলেন।
বেথামৃতস্য মা নু গান্মা নু ভূমিগৃহোভুবৎ। ১৪
মা তে প্রাণ উপদসন্মো অপানোঽপি ধায়ি তে।
সূর্য্যস্ত্বাধিপতির্মৃত্যোরুদায়চ্ছতু রশ্মিভিঃ ॥১৫॥
ইয়মন্তর্বদতি জিহ্বা বদ্ধা পনিষ্পদা।
ত্বয়া যক্ষ্মং নিরবোচং শতং রোপীশ্চ তক্মনঃ।
অয়ং লোকঃ প্রিয়তমো দেবানামপরাজিতঃ।
যস্মৈ ত্বমিহ মৃত্যবে দিষ্টঃ পুরুষ জজ্ঞিষে।
স চ ত্বানু হ্বয়ামসি মাপুরা জরসো মৃথাঃ ॥১৭"

(অথর্ববেদ ৫.৩০. সূক্ত)

তোমার নিকট হইতে, তোমার নিকট হইতে; তোমার দূর হইতে, তোমার নিকট হইতে (আমি তোমাকে ডাকিতেছি)। এই খানে থাক। যেও না, তোমার পূর্ব্বপিতৃপুরুষদের কাছে যেও না। আমি তোমাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিতেছি। তোমার আত্মীয় ব্যক্তি কিম্বা অন্যে যদি কোন অভিচার করিয়া থাকে, আমি মন্ত্র পড়িয়া তাহা কাটাইয়া দিতেছি। যদি তুমি না বুঝিতে পারিয়া কোন স্ত্রীলোককে কিম্বা পুরুষকে কষ্ট অথবা শাপ দিয়া থাক, আমি তাহা মোচন করিয়া দিতেছি। যদি তোমার পিতামাতার পাপে এই পীড়া হইয়া থাকে, আমি মন্ত্র পড়িয়া তাহা ঝাড়াইতেছি। তোমার পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী যে ঔষধ দিতেছেন, তাহা সেবন কর। আমি তোমাকে দীর্ঘজীবী করিতেছি। হে পুরুষ! তোমার সমস্ত মনের সহিত এই খানে থাক। দুই জন যমদূতের সঙ্গে যেও না। এই জীবিত মনুষ্যদের পুরীতে থাক। জীবিতদের পথের উদয়ন, আরোহণ, অবতরণ প্রভৃতি মনে করিয়া তোমাকে ডাকিলে পর ফিরিয়া আইস। ভয় নাই, তুমি মরিবে না; আমি তোমাকে দীর্ঘজীবী করিয়া দিতেছি। যক্ষ্মারোগে তোমার শরীর ক্ষয় হইতেছিল, আমি তাহা ঝাড়াইতেছি।

অবেস্তার কোন কোন ভাগে ঐরূপ মন্ত্রসমূহ সন্নিবেশিত আছে। এমন কি, এই বেদের সঙ্গে অবেস্তার অন্তর্গত যস্‌ৎ ও বেন্দিদাদ্ বিভাগের ঐক্য করিয়া দেখিলে, অনেক কথার সাদৃশ্য দৃষ্ট হইতে পারে।

অথর্ববেদের অন্য একটী নাম অথর্বাঙ্গিরস বেদ, স্থানে

স্থানে কেবল আঙ্গিরস বেদ অর্থাৎ অঙ্গিরা ও আঙ্গিরসবংশীয় ঋষিদিগের বেদ বলিয়া লিখিত আছে। যে অগ্নিযাজক অঙ্গিরা ও আঙ্গিরস ঋষিগণ হিন্দু ও পারসীক উভয় জাতিরই পরম শ্রদ্ধেয় ও ভক্তিভাজন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন, ঐ আঙ্গিরস আখ্যা দ্বারা ঐ বেদ তাঁহাদেরই হইতে উৎপন্ন বলিয়া সূচিত হইতেছে। পুরাণে এই বেদ অঙ্গিরা ঋষির অপত্য বলিয়া বর্ণিত আছে। (ভাগবত ৬.৬.১৬।) এই বেদের আর একটী নাম অথর্বণবেদ অর্থাৎ অথর্বন্‌দিগের বেদ। আবেস্তিক আথ্রব ও বৈদিক অথর্বন্‌ শব্দ যথাক্রমে যাজক ও অগ্নিযাজক প্রতিপাদক। [অথর্ব দ্র°] এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে প্রকরণ-বিশেষে আবেস্তিক ধর্ম্মের সহিত আথর্বণধর্ম্মের বিশেষ কিছু সম্বন্ধ অবশ্যই লক্ষিত বা সম্ভাবিত হইয়া থাকে। (ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায় ১ম ভাগ উপক্রমণিকা, ৩৭ পৃঃ।)

ত্রয়োদশ কাণ্ডে রোহিত নামক দেবতার বিবরণ। তিনিই নাকি সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার পত্নীর নাম রোহিণী। চতুর্দ্দশ কাণ্ডে বিবাহের কথা। পঞ্চদশ কাণ্ডে ব্রাত্যের বৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ কাণ্ডে বিবিধ বিষয় সঙ্কলিত হইয়াছে। বিংশ কাণ্ডের অধিকাংশ স্থলে ইন্দ্রদেবের স্তুতি দেখা যায়। অথর্ব্ববেদের অন্যূন ছয় ভাগের এক ভাগ ঋগ্বেদের মন্ত্র, আবার সেই সকল মন্ত্র প্রথম ও দশম মণ্ডলেরই অধিক। অথর্ববেদেও পুরুষসূক্ত আছে, কিন্তু ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের সঙ্গে ইহার পাঠের অনেক প্রভেদ। যথা

"সহস্রবাহুঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্‌ ॥ ১ ॥
ত্রিভিঃ পদ্ভির্দ্যামরোহৎ পাদস্যেহা ভবৎ পুনঃ।
তথা ব্যক্রামদ্বিষ্বঙ্‌ঙশনানশনে অনু ॥ ২
তাবন্তোঅস্য মহিমানস্ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ৩ ॥
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্‌।
উতামৃতত্বস্যেশ্বরো বদান্যেনাভবৎ সহ ॥ ৪
যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্‌।
মুখং কিমস্য কিং বাহূকিমূরুপাদা উচ্যেতে ॥ ৫ ॥
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঽ ভবৎ।
মধ্যা তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥ ৬ ॥
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত ॥ ৭ ॥
নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দ্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্‌ ॥ ৮ ॥
বিরাড়গ্রে সমভবদ্বিরাজো অধিপুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥ ৯ ॥
যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ১০ ॥
তং যজ্ঞং প্রাবৃষা প্রৌক্ষন্‌ পুরুষং জাতমগ্রশঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা বসবশ্চ যে ॥ ১১ ॥
তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥ ১২ ॥
তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ১৩ ॥
তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যং।
পশূস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে ॥ ১৪ ॥
সপ্তাস্যাসন্‌পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্‌ পুরুষং পশুং ॥ ১৫ ॥
মূর্ধ্নো দেবস্য বৃহতো অংশব সপ্তসপ্ততীঃ।
রাততঃ সোমস্যাজায়ন্ত জাতস্য পুরুষাদধি ॥ ১৬
(অথর্ব্ব° পুরুষ° ১৯.৬)

পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু এবং সহস্র পদ। তিনি সকল দিক্‌ হইতে এই ভূমি ব্যাপিয়া দশাঙ্গুল স্থান যুড়িয়া অধিষ্ঠান করিতেছেন। ১। যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়াছে, যাহা কিছু উৎপন্ন হইবে, পুরুষ নিজেই সেই সমস্ত। তিনি অমৃতত্বের ঈশ্বর, তিনি অন্ন হইতে পরিপুষ্ট হন। ২। এত তাঁহার মহিমা! তাহা হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। জগতের যাবতীয় প্রাণী তাঁহার একপাদাংশ (সিকি ভাগ) এবং দ্যুলোকের অমৃত তাঁহার ত্রিপাদাংশ (তিন সিকি)। ৩। ত্রিপাদ লইয়া পুরুষ উর্দ্ধে উঠিয়া থাকেন। পুনঃ, তাঁহার একপাদ মর্ত্ত্যে (ইহলাকে) থাকে। তাহা হইলে তিনি কি সজীব কি নির্জীব সকল বস্তুতেই ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। ৪। তাঁহা হইতে বিরাট্‌ জন্ম লইলেন এবং বিরাট্‌ হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। তিনি জন্ম লইয়া পশ্চাদ্‌ ভূমিতে এবং অগ্রবর্ত্তীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেন। ৫। দেবতারা যখন পুরুষের দ্বারা যজ্ঞ করিলেন, তখন বসন্ত ঘৃত খাইয়াছিল; গ্রীষ্ম যজ্ঞকাঠ, শরৎ হবিঃ হইয়াছিল। ৬। সেই যজ্ঞে অগ্রজাত পুরুষকে কুশের উপর বলি দিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে দেবতারা সাধ্য এবং ঋষিদিগকে বলি দিয়াছিলেন। ৭। সেই সর্ব্বজন অনুষ্ঠিত যজ্ঞ হইতে সদধি ঘৃত এবং ঘৃত উৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি শূন্যের জন্তু এবং বন্য ও গ্রাম্য পশুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ৮। সেই সর্ব্বজন অনুষ্ঠিত যজ্ঞ হইতে ঋক্‌, সাম ছন্দঃ উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহা হইতে যজুঃ উৎপন্ন হইয়াছিল। (এখানে ঋক্‌, সাম, যজুঃ তিন খানি বেদের নাম নহে)। ৯। তাহা হইতে অশ্ব উৎপন্ন

হইয়াছিল এবং যে সকল জন্তুর দুই পাটী দাঁত। তাহা হইতে গোরু জন্ম লইয়াছিল ; তাহা হইতে ছাগ মেষ উৎপন্ন হইয়াছিল। ১০। যখন তাঁহারা সেই পুরুষকে বিভাগ করিলেন, তখন কত ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন? তাঁহার মুখ কি? বাহুযুগল কি? কাহাকে উরুদ্বয় ও পা বলা যাইবে? ১১। ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখ ছিলেন ; রাজন্য তাঁহার বাহু হইয়াছিলেন। বৈশ্য তাঁহার উরু, শূদ্র তাঁহার পা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ১২। তাঁহার মন হইতে চন্দ্র উৎপন্ন হইয়াছিল, চক্ষু হইতে সূর্য্য জন্ম লইয়াছিল, মুখ হইতে ইন্দ্র এবং অগ্নি, প্রাণ (প্রাণ বায়ু) হইতে বায়ু উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৩। নাভি হইতে অন্তরীক্ষ, মস্তক হইতে দ্যুলোক উৎপন্ন হইয়াছিল। পাদদ্বয় হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক্, এই রূপে তাঁহারা জগতের সৃষ্টি করিলেন। ১৪। দেবতারা যখন বলি দিবার নিমিত্ত পুরুষকে পশুস্বরূপ করিয়া বাঁধিয়াছিলেন, তাঁহার জন্য অগ্নিকে বেষ্টন করিয়া সাতখানি সমিৎ রাখা হইয়াছিল এবং একুশ খানি সমিৎ দিয়া যজ্ঞ করা হইয়াছিল। ১৫। সোম দ্বিবিধ-লতা ও দেবতা। লতারূপ সোম প্রকৃতি-বিকৃতি ভেদে নানাপ্রকার। (প্রকৃতিরূপা) অগ্নিষ্টোমাদি সপ্তসংস্থা ও (বিকৃতিভেদে) যজ্ঞসমূহ এবং কলারূপ সোম দ্যুলোকে সপ্তগুণিত সপ্ততি সংখ্যক কিরণসম্পন্ন হইয়া সেই পুরুষের মস্তক হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন।

অথর্ববেদের বিশেষত্ব।

অথর্ববেদে সর্বশুদ্ধ তেত্রিশটী দেবতা। [অথর্বসংহিতা ১০.৭.১৩,১০.৭.২৩,১০.৭.২৭] অবেস্তায়ও তেত্রিশ জন রতু অর্থাৎ অধ্যক্ষ অহুরমজ্‌দের স্থাপিত ও জরথুস্ত্রের প্রচারিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট তত্ত্ব সমুদায় প্রচলিত রাখিবার জন্য নিয়োজিত। (যস্ন ১.১০ দ্র°।)

অথর্ববেদে কেবল শূদ্র ও আর্য্য এই দুই শ্রেণীর লোকের বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (অথর্বসংহিতা ৪.২০.৩, ১৯.৬২.১।)

অথর্ববেদের সময় ঋষিগণ হিমালয় পর্বতের নিকট বাস করিতেন। (অথর্ব ১২.১.১১, ৫.৪.৮।) এই বেদে বিধবাবিবাহ এবং এক পতিসত্ত্বে অন্য পতিগ্রহণ উল্লেখ আছে। (৯.৫.২৭-২৮।)

এই বেদে হিন্দুদিগের যে সময়কার কথা লিখিত আছে, তাহাতে বোধ হয়, তাঁহারা ইন্দ্রিয়সুখের স্বাদ গ্রহণেই অধিকতর সমর্থ ছিলেন। তদনুসারে মরণোত্তর নিবাস স্বর্গধাম ইন্দ্রিয়সুখের আস্পদ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। (অথর্ব ৪.৩৪.২-৪।) তাই পুনঃ পুনঃ ঋষিগণ বলিয়াছেন—

"স্বর্গং লোকমভি নো নয়াসি
সং জায়য়া সহ পুত্রৈঃ স্যাম।" (অথর্বসংহিতা ১২.৩.১৭)।

অর্থাৎ আমাদিগকে স্বর্গলোকে লইয়া যাও, আমরা যেন স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে একত্র বাস করিতে পারি।—একদিকে যেমন স্বর্গলাভে সকলেই অভিলাষী, তেমনি অন্য দিকে এই বেদের ঋষিগণ মৃত্যুভয়ে সশঙ্কিত। তাই এই বেদে কালই সকলের শ্রেষ্ঠরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"কালো অশ্বো বহতি সপ্তরশ্মিঃ
সহস্রাক্ষো অজরো ভূরিরেতাঃ।
তমা রোহন্তি কবয়ো বিপশ্চিত
স্তস্য চক্রা ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১ ॥
কালো ভূমিমসৃজত কালে তপতি সূর্যঃ
কালে হ বিশ্বা ভূতানি কালে চক্ষুর্বি পশ্যতি ॥ ৬
কালে মনঃ কালে প্রাণঃ কালে নামসমাহিতম্।
কালেন সর্ব্বা নন্দন্ত্যাগতেন প্রজা ইমাঃ ॥ ৭ ॥
(অথর্ব° ১৯.৬৩)
কালে যজ্ঞং সমৈরয়দ্দেবেভ্যো ভাগমক্ষিতম্।
কালে গন্ধর্বাপ্সরসঃ কালে লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৪ ॥
কালে যমঙ্গিরা দিবোঽথর্বা চাধিতিষ্ঠতঃ ॥
ইমং চ লোকং পরমং চ লোকং
পুণ্যাংশ্চ লোকান্বিধৃতীশ্চ পুণ্যাঃ ॥ ৫ ॥
সর্বাংল্লোকানভিজিত্য ব্রহ্মণা কালঃ স
ঈয়তেপ রমো নু দেবঃ ॥ ৬ ॥"
(১৯ কাণ্ড, ৫৪ সূক্ত।)

ঋগ্বেদে নরকশব্দের উল্লেখ নাই, কিন্তু এই বেদে উহা নারক লোক বলিয়া উল্লিখিত আছে। (অথর্ব্ব ১২.৪.৩৫.) এই বেদে গোবধ নিষিদ্ধ হইয়াছে। (৫.১৮.৩.)

অথর্ববেদীরা ঋক্, সাম, যজুঃ, এই বেদত্রয়ীর ভিন্ন ভিন্ন ঋত্বিক্‌দিগের যার পর নাই নিন্দা করিয়া স্বসম্প্রদায়ীদিগকেই অদ্বিতীয় উপযুক্ত ঋত্বিক্ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। [অথর্বপরিশিষ্ট ১১২ অধ্যায় দ্র°।]

বায়ুপুরাণে অথর্ববেদের প্রাধান্য প্রতিপাদিত হইয়াছে।
"বহ্বৃচো হন্তি বৈ রাষ্ট্রমধ্বর্য্যুর্নাশয়েৎ সুতম্।
ছন্দোগো ধনং নাশয়েৎ তস্মাদাথর্বণো গুরুঃ।"
"অথর্বা সৃজতে ঘোরমদ্ভুতং শময়েৎ তথা।
অথর্বা রক্ষতে যজ্ঞং যজ্ঞস্য পতিরঙ্গিরাঃ।
দিব্যান্তরিক্ষভৌমানামুৎপাতানামনেকধা।
শময়িতা ব্রহ্মবেদজ্ঞস্তস্মাদ্দক্ষিণাতো ভৃগুঃ।
ব্রহ্মা শময়েন্নাধ্বর্য্যুর্ন ছন্দোগো ন বহ্বৃচঃ।
রক্ষাংসি রক্ষতি ব্রহ্মা ব্রহ্মা তস্মাদথর্ববিৎ।"

বহ্বৃচ (ঋগ্বেদের পুরোহিত) রাজ্য নষ্ট করেন ; অধ্বর্য্যু

(যজুর্বেদের পুরোহিত) সন্তান নষ্ট করেন ; ছন্দোগ (সামবেদের পুরোহিত) ধন নষ্ট করেন ; তজ্জন্য আথবর্ণই সকলের শ্রেষ্ঠ।

অথর্ববেদী পুরোহিত উৎপাতের সৃষ্টি করেন এবং উপদ্রবের শান্তিও করেন। অথর্ববেদী পুরোহিত যজ্ঞ রক্ষা করেন; অঙ্গিরা যজ্ঞের পতি। ব্রহ্মবেদজ্ঞ (অথর্ববেদজ্ঞ) ব্যক্তি দ্যুলোকের, অন্তরীক্ষের এবং পৃথিবীর নানা প্রকার উৎপাতের শান্তি করেন। তজ্জন্য ভৃগুকে দক্ষিণদিকে রাখা আবশ্যক। ব্রহ্মাই (অথর্ববেদী) অনিষ্টের শান্তি করিতে পারেন, অধ্বর্যু, ছন্দোগ কিংবা বহ্বৃচরা পারেন না। ব্রহ্মা রাক্ষসদের নিকট হইতে রক্ষা করিতে পারেন, তজ্জন্য অথর্ববেদজ্ঞ ব্যক্তিই ব্রহ্মা।

অথর্ববেদের একখানি প্রাতিশাখ্য মুদ্রিত হইয়াছে। উহাতে অন্যান্য সকল কাণ্ডের ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই, ঊনবিংশ কাণ্ডের একটী ভিন্ন উদাহরণ নাই এবং বিংশকাণ্ডের আদৌ একটীও উদাহরণ দেওয়া হয় নাই। তাই, কেহ কেহ অনুমান করেন যে প্রাতিশাখ্যখানি লেখা হইবার পরে আধুনিক ঊনবিংশ ও বিংশ কাণ্ডঅথর্ববেদের সঙ্গে যুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ঋগ্বেদের প্রায় সমস্ত ছন্দই অথর্ববেদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। ইহার চতুর্থ-কাণ্ডের ২১ একুশ সূক্তে, অঙ্গিরা, অগস্তি, জমদগ্নি, অত্রি, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, শ্যাবাশ্ব, বধ্র্যশ্ব, পুরুমীঢ়, বিমদ, সপ্তবধ্রি, ভরদ্বাজ, গবিষ্ঠির, বিশ্বামিত্র, কুৎস, কক্ষিবান্, কণ্ব, ত্রিশোক, কাব্য, উশনা, গোতম ও মুদ্গল এই সকল ঋষির নাম পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই ঋগ্বেদের ঋষি। অথর্ববেদ ভিন্ন আর কতকগুলি মন্ত্র আছে, তাহার নাম অথর্বণ। কিন্তু সেই অথর্বণগুলি অথর্ববেদ হইতে বিভিন্ন কি না, তাহা ঠিক বলা যায় না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সম্প্রতি অথর্ববেদের কেবল শৌনক শাখা পাওয়া যায়। কিন্তু পৈপ্পলাদ শাখাও নষ্ট হয় নাই। অথর্ববেদের সঙ্কলনকালে ব্রাহ্মণদের অতিশয় প্রতিপত্তি ছিল। নিম্নলিখিত মন্ত্র তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ; অথর্ববেদে ৫ কাণ্ডে ১৭ সূক্তে,—

"উত যৎপতয়ো দশ স্ত্রিয়াঃ পূর্ব্বে অব্রাহ্মণাঃ।
ব্রহ্মা চেদ্ধস্তমগ্রহীৎ স এব পতিরেকধা।৮।
ব্রাহ্মণ এব পতির্ন রাজন্যো২ ন বৈশ্যঃ।
তৎসূর্য্যঃ প্রব্রুবন্নেতি পঞ্চভ্যো মানবেভ্যঃ।৯॥"

আবার অন্যত্র দেখা যায়,

"ন ব্রাহ্মণো হিংসিতব্যো২গ্নিঃ প্রিয়তনোরিব।
সোমো হ্যস্য দায়াদ ইন্দ্রো অস্যাভিশস্তিপাঃ। ৬।
যে সহস্রমরাজন্নাসন্দশশতা উত।
তে ব্রাহ্মণস্য গাং জগ্ধ্বা বৈতহব্যাঃ পরাভবন্।১০।
গৌরেব তান্ হন্যমানা বৈতহব্যা অবাতিরৎ।
যে কেসরপ্রাবন্ধায়াশ্চরমাজামপেচিরন্।" ১১। (৫.১৮ সূ°।)

ঋগ্বেদে ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবতাদের স্তুতি, ও অর্চ্চনা আছে। কিন্তু অথর্ববেদে কাল, কাম, যম, মৃত্যু, দেব, দানব প্রভৃতি সকলেরই স্তব করা হইয়াছে। জগতে যাহা আছে তাহার স্তব ; জগতে যাহা নাই, কেবল মনে মনে নূতন গড়িয়া লইতে হয় তাহারও স্তব।

"নমো দেববধেভ্যো নমো রাজবধেভ্যঃ।
অথো যে বিশ্যানাং বধাস্তেভ্যো মৃত্যো নমো২স্তু তে।
নমস্তে অধিবাকায় পরাবাকায় তে নমঃ।
সুমত্যৈ মৃত্যো তে নমো দুর্ম্মত্যৈ ত ইদং নমঃ।
নমস্তে যাতুধানেভ্যো নমস্তে ভেষজেভ্যঃ।
নমস্তে মৃত্যো মূলেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্য ইদং নমঃ।"
(অথর্ববেদ ৬.১৩.১-৩।)

ঋগ্বেদের ঋষিরা কোথাও যাতুধান, দুর্ম্মতি প্রভৃতিকে নমস্কার করেন নাই। অথর্ববেদে রোগাদি ঝাড়াইবার মন্ত্র অধিক দেখা যায়। অন্য বেদে এত নাই। স্বামীকে বশীভূত করিবার মন্ত্র, বিষ ঝাড়াইবার মন্ত্র, শত্রুবধের মন্ত্র, বন্ধ্যা নারীর সন্তানোৎপত্তির মন্ত্র,—এ সকলিই আছে। তখনকার যে সকল ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়দের পৌরোহিত্য করিতেন, তাঁহাদিগকে অথর্ববেদখানি ভাল করিয়া পড়িতে হইত। রঘুবংশে কালিদাস বশিষ্ঠকে 'অথর্বনিধি' এই বিশেষণ দিয়া তাঁহার গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন। "অথাথর্বনিধেস্তস্য বিজিতারিপুরঃ পুরঃ।" বশিষ্ঠ ঋষির মন্ত্রবল কেমন, তাহাও উত্তমরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। "তব মন্ত্রকৃতো মন্ত্রৈঃ দূরাৎ প্রশমিতারিভিঃ।"

মৃত্যুর প্রতি—

"অন্তকায় মৃত্যবে নমঃ প্রাণা অপানা ইহ তে রমন্তাম্।
ইহায়মস্তু পুরুষঃ সহাসুনা সূর্য্যস্য ভাগে অমৃতস্য লোকে ॥১॥'
(অথর্ব ৮.১ সূ°)

অন্তক মৃত্যুকে নমস্কার। তোমার প্রাণ এবং অপান বায়ু এইখানে থাকুক। এই সূর্য্যপুরে এবং অমৃতলোকে আত্মার সঙ্গে এই পুরুষ থাকুক।

সভাসমিতির প্রতি—

"সভা চ মা সমিতিশ্চাবতাং প্রজাপতের্দুহিতরৌ সম্বিদানে।
যেনা স গচ্ছা উপ মা স শিক্ষাচ্চারু বদানি পিতরঃ সঙ্গতেষু ॥১॥
বিদ্ম তে সভে নাম নরিষ্টা নাম বা অসি।
যে তে কে চ সভাসদস্তে মে সন্তু সবাচসঃ ॥ ২ ॥
এষামহং সমাসীনানাং বর্চ্চো বিজ্ঞানমাদদে।
অস্যাঃ সর্ব্বস্যাঃ সংসদো মামিন্দ্র ভগিনং কৃণু ॥ ৩ ॥

যদ্বো মনঃ পরাগতং যদ্বদ্ধমিহ বেহ বা।
তদ্ব আবর্ত্তয়ামসি ময়ি বো রমতাং মনঃ ॥ ৪ ॥”
(৭.১২ সূ°)

সভা এবং সমিতি প্রজাপতির দুইটী কন্যা। তাঁহারা আমাকে রক্ষা করুন। যাঁহাদের সঙ্গে আমার মিলন হয়, তাঁহারা আমার কাছে আসুন। হে পিতৃগণ! সেই লোক-সমাগমের মধ্যে আমি যেন সৎকথা বলি। হে সভে! আমরা তোমার নাম জানি; তোমার নাম সদালাপ। সভাসদেরা আমার সঙ্গে কথা কহিতে থাকুন। এখানে যাঁহারা বসিয়া আছেন, তাঁহাদের আমি তেজঃ ও জ্ঞান গ্রহণ করি। হে ইন্দ্র! এই সভার সকলের চেয়ে আমাকে প্রসিদ্ধ কর। যদি তোমার মন অন্য কোথায় গিয়া পড়িয়া থাকে, কিংবা তাহা এখানে বদ্ধ হইয়া থাকুক্ বা অন্যত্র থাকুক্, তাহা ফিরিয়া আসুক এবং আমাতে রমণ করিতে থাকুক্।

পূর্ব্বে লিখিয়াছি, অথর্ববেদে ব্রাত্যের বড়ই প্রশংসা আছে। সমস্ত পঞ্চদশ কাণ্ডটী ব্রাত্যের প্রশংসায় পরিপূর্ণ। ঐ কাণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে,—‘যে পৃথিবীর সকল পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয়, তাহার গৃহে ব্রাত্য অতিথি হইয়া এক রাত্রি বাস করেন। যে অন্তরীক্ষের সকল পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয়, তাহার গৃহে ব্রাত্য অতিথি হইয়া দুই রাত্রি বাস করেন। যে দ্যুলোকের সকল পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয়, তাহার গৃহে ব্রাত্য অতিথি হইয়া তিন রাত্রি বাস করেন। যে পুণ্যের পুণ্য-(সর্ব্বাপেক্ষা পুণ্য) লোক লাভ করে, তাহার গৃহে ব্রাত্য চারি রাত্রি বাস করেন। যে অপরিমিত সকল পুণ্য লোক প্রাপ্ত হয়, তাহার গৃহে ব্রাত্য অপরিমিত রাত্রি বাস করেন।’ (১৫.১২.১-৫)।

“তদ্যস্যৈবং বিদ্বান ব্রাত্য একাং রাত্রিমতিথির্গৃহে বসতি।
যে পৃথিব্যাং পুণ্যা লোকাস্তানেব তেনাবরুন্ধে। ১
তদ্যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যো দ্বিতীয়াং রাত্রিমতিথির্গৃহে বসতি।
যে অন্তরিক্ষে পুণ্যা লোকাস্তানেব তেনাবরুন্ধে। ২” ইত্যাদি।

অগ্নি, আদিত্য, পবমান, অপ, পশু ও প্রজা ব্রাত্যের এই সপ্ত প্রাণ। “তস্য ব্রাত্যস্য ॥ ১ ॥ সপ্তপ্রাণাঃ সপ্তাপানাঃ সপ্তব্যানাঃ। ২ ॥ যোঽস্য প্রথমঃ প্রাণ উর্দ্ধো নামায়ং সো অগ্নিঃ। ৩ ॥ যোঽস্য দ্বিতীয়ঃ প্রাণঃ প্রৌঢ়ো নামাসৌ স আদিত্যঃ ॥ ৪ ॥ যোঽস্য তৃতীয়ঃ প্রাণো পু ভ্যূঢ়া নামাসৌ স চন্দ্রমাঃ ॥ ৫ ॥ যোঽস্য চতুর্থঃ প্রাণো বিভূর্নামায়ং স পবমানঃ ॥ ৬ ॥ যোঽস্য পঞ্চমঃ প্রাণোঃ যোনির্নাম তা ইমা আপঃ ॥ ৭ ॥ যোঽস্য ষষ্ঠঃ প্রাণঃ প্রিয়ো নাম ত ইমে পশবঃ ॥ ৮ ॥ যোঽস্য সপ্তমঃ প্রাণোঽপরিমিতো নাম তা ইমাঃ প্রজাঃ ॥”৯ ॥ (১৫।১৫)।

এই ত গেল ব্রাত্যের পরিচয়। তাহার পর আর এক কথা আছে। অথর্ববেদের মন্ত্র কখন কোন যজ্ঞে লাগিত কি না, তাহা নিশ্চিত করা কঠিন। শতপথব্রাহ্মণে আছে—“ত্রয়ী বৈ বিদ্যা ঋকো যজুংষি সামানি”। (শতপথ-ব্রাহ্মণ ৪.৬.৭.১) ঋক্, যজুঃ এবং সাম এই তিনটী বিদ্যা। “প্রজাপতির্লোকান্ অভ্যাতপৎ তেষাং তপ্য-মানানাং রসান্ প্রাবৃহদগ্নিং পৃথিব্যাঃ বায়ুমন্তরীক্ষাদ্ আদিত্যং দিবঃ। স এতাস্তিস্রো দেবতা অভ্যাতপৎ। তাসাং তপ্যমানানাং রসাং প্রাবৃহদগ্নেঋর্চো বায়োর্যজুংষি সাম আদিত্যাৎ। স এতান্ ত্রয়ীং বিদ্যামভ্যাতপৎ। তস্যাস্তপ্যমানায়া রসান্ প্রাবৃহদ্ ভূরিত্যৃগ্ভ্যো ভুবরিতি যজুর্ভ্যঃ স্বরিতি সামভ্যঃ” (ছান্দোগ্যোপ° ৪.১৭.১)

প্রজাপতি ত্রিলোক উত্তপ্ত করিলেন। সেই তপ্যমান ত্রিলোক হইতে তিনি সার ভাগ বাহির করিয়া আনিলেন। পৃথিবী হইতে অগ্নি, অন্তরীক্ষ হইতে বায়ু এবং দ্যুলোক হইতে আদিত্য উদ্ধৃত করা হইল। পরে তিনি এই তিনটী দেবতাতে আবার তাপ লাগাইলেন। এই তিনটী দেবতা উত্তপ্ত হইলে তাহাদের সারাংশ উদ্ধৃত করা হইল। অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ এবং আদিত্য হইতে সামবেদ উপলব্ধ হইল। প্রজাপতি এই তিনটী বিদ্যাতে পুনরায় তাপ দিলেন। ঐ বেদত্রয় উত্তপ্ত হইলে ঋক্ হইতে ভূ, যজুঃ হইতে ভুর্ এবং সামবেদ হইতে স্বর্ উৎপন্ন হইল।

এইরূপ অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, আগে ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ ব্রাহ্মণেরা অধ্যয়ন করিতেন।

মধুসূদন সরস্বতী লিখিয়াছেন,—“স চ প্রয়োগত্রয়েণ যজ্ঞনির্ব্বাহার্থং ঋগ্যজুঃসামবেদেন ভিন্নঃ। + + + অথর্ব-বেদস্তু যজ্ঞানুপযুক্তঃ শান্তিপৌষ্টিকাভিচারাদি-কর্ম্মপ্রতিপাদকত্বেন অত্যন্তবিলক্ষণ এব”।

যজ্ঞাদি সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত বেদকে ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন প্রকার বিভাগ করা হইয়াছে। + + কিন্তু অথর্ববেদ যাগাদির অনুপযুক্ত। ইহাতে কেবল শান্তি, পৌষ্টিক ও অভিচারাদির প্রকরণ আছে। ইহাও এক খানি অদ্ভুত বেদশাস্ত্র। কিন্তু অথর্ব-বেদের শাখা প্রশাখার বিধানানুসারে যাগাদি হইত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দশরথের পুত্রেষ্টিযাগ অথর্ববেদের বিধান অনুসারে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, রামায়ণে সে কথা লিখিত আছে। অথর্ববেদীরা বলেন যে, এখানি ব্রহ্মবেদ। যজ্ঞ করিতে হইলে চারি জন প্রধান ঋত্বিক্ ও বার জন সহকারী আবশ্যক। প্রধান ঋত্বিক্‌দের মধ্যে যিনি সামবেদ উচ্চারণ করেন, তাঁহার নাম উদ্গাতা। যিনি যজুর্ব্বেদ পাঠ করেন, তাঁহার নাম হোতা। যিনি ঋঙ্মন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহার নাম অধ্বর্য্যু। আর যিনি সকলের উপর

কর্ত্তৃত্ব করেন, তাঁহার নাম ব্রহ্মা। ব্রহ্মার স্বতন্ত্র বেদ নাই, কিন্তু তাঁহাকে সকল বেদ জানা চাই। অথর্ববেদীরা বলেন যে, যজ্ঞস্থলে 'ব্রহ্ম' নামক ঋত্বিকের বেদের নাম অথর্ববেদ।

অথর্ববেদে শ্রীসূক্ত।

প্রথমে সকল বেদেই শ্রীসূক্ত ছিল। কিন্তু এখন অনেকের বিশ্বাস যে অথর্ববেদের শ্রীসূক্ত লোপ পাইয়াছি। গোবিন্দশাস্ত্রী অথর্ব্বরহস্তের ৪৫ শ্লোকের টীকায় উক্ত বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। যথা—

"কাশী-খণ্ডে লক্ষ্মী-স্তবে আথর্ব্বণলক্ষ্মী-সূক্তশ্রুতমন্ত্রবর্ণা উপবৃংহিতাঃ। অস্ত—

ত্বং শ্রীরুপেন্দ্রসদনে মদনৈকমাতর্
জ্যোৎস্নাঽসি চন্দ্রমসি চন্দ্রমনোহরাস্থে।
সূর্য্যে প্রভা সিতজগত্রিতয়ে প্রভাসি
লক্ষ্মী প্রসীদ সততং নমতাং শরণ্যে॥
ত্বং জাতবেদসি সদা দহনাত্মশক্তির্-
বেধাস্ত্বয়া জগদিদং বিবিধং বিদধ্যাৎ।
বিশ্বম্ভরোঽপি বিভৃয়াদখিলং ভবত্যা
লক্ষ্মী প্রসীদ সততং নমতাং শরণ্যে॥

ইত্যাদিনা শব্দসারূপ্যাদর্থাবিরোধাচ্চ কাশী-খণ্ড উপবৃংহণং দ্রষ্টব্যম্। নব্যথর্ব্বসংহিতায়াং শ্রীসূক্তাদর্শনাচ্ছ্রীসূক্তমথর্ব্বণো-নাস্তীতি।"

অথর্ববেদের সহিত পারসিক ও মুসলমান সংস্রব।

মহাত্মা হোগের মতে এই বেদ প্রায় ২০০০ বৎসরের প্রাচীন। কিন্তু আমাদের মতে উহা অপেক্ষাও অধিক প্রাচীন হওয়া সম্ভব; কারণ পাণিনিমুনি এবং তাঁহার অপেক্ষা প্রাচীন যাস্ক মুনিও (নিরুক্ত নৈঘণ্টুক কাণ্ডে ৫.৫) সঙ্কেতে এই বেদের উল্লেখ করিয়াছেন।

হোগ সাহেব এই বেদের সঙ্গে অবেস্তাশাস্ত্রের সাদৃশ্য নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। অথর্ববেদের ন্যায় অবেস্তাশাস্ত্রেও মারণ, উচ্চাটন, স্তম্ভন ও ভৈষজ্যাদি লিখিত হইয়াছে। [অবেস্তা—হোম যষ্‌ৎ ৯.১-৩২।] হোম-যষতে (৯.২৪) 'অপাম্ ঐবিষ্‌টিষ্' অর্থাৎ জলের আগমন উল্লেখ আছে। হোগ বলেন ঐ কএকটী সাঙ্কেতিক শব্দ অথর্ববেদ হইতে উদ্ধৃত; উহা অথর্ববেদের প্রথমেই ভিন্নাকারে লিখিত আছে। [মুদ্রিত অথর্ববেদ ১.৬.১ এবং Haug's Essays on the Parsis, 3rd.ed. p. 182.] এতদ্ভিন্ন অবেস্তার অনেক বিষয় অথর্ববেদের সঙ্গে ঐক্য। [অবেস্তা শব্দে সমস্ত বিবরণ দ্র°।]

অবেস্তা প্রাচীন পার্সীদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র, বোধ হয় ঐ শাস্ত্রের সঙ্গে অথর্ব্ববেদের ঐক্য থাকাতে অনেকে এই বেদকে বেদ বলিয়া গণ্য করেন না। কিন্তু ইহার কোন প্রকৃত কারণ দেখা যায় না। 'বৈদিক গবেষণা' নামক পুস্তকে (১১ পৃঃ) লিখিত আছে, অথর্ববেদকে কোরাণের এক অংশ বলিবার কারণও আছে। অথর্ববেদের যে যে অংশে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব লিখিত আছে, তাহা সিন্ধুনদ ও কাস্পিয়ান সাগর-পারবাসী যাবনিক জাতিগণ শিক্ষা করিয়াছিল। সাগর-পারস্থিত অনেক উদ্ভিদ্ ও ফলমূলের কথা অথর্ববেদে আছে, এইজন্য ইহা যাবনিক বলিয়া অশ্রদ্ধেয়। কিন্তু বাস্তবিক অথর্ববেদ কোরাণের অংশ নহে, যখন কোরাণ সৃষ্ট হয় নাই, তখন অথর্ববেদের সৃষ্টি।

বোধ হয় অথর্ববেদকে কোরাণের অংশ বলিবার অপর কোন কারণ থাকিতে পারে; যে হেতু বদায়নী নামক একজন মুসলমান্ ইতিহাসলেখক তাঁহার 'মুন্তখব্' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, এই বৎসর (৯৮৩ হিজিরা বা ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ) দক্ষিণদেশ হইতে শেখ ভাবন নামে একজন শিক্ষিত ব্রাহ্মণ আগমন করেন এবং মুসল্‌মান্ ধর্ম্মে দীক্ষিত হন্। সেই সময় সম্রাট্ (অক্‌বর) আমাকে 'অথর্বন্' অনুবাদ করিতে আদেশ করেন। এই গ্রন্থের কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ ইস্‌লাম-ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত ঐক্য। অনুবাদকালে এমন অনেক কঠিন অংশ দেখিলাম, যাহা শেখ ভাবন অবধি তাহার ভাবপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইল না। আমি এই বিষয় সম্রাট্‌কে জানাইলাম, তিনি শেখ ফৈজী ও হাজী ইব্রাহীম্‌কে অনুবাদ করিতে অনুমতি করিলেন। হাজী ইব্রাহীম্ ইচ্ছা-সত্বেও কিছু লেখেন নাই। অথর্বণের উপদেশগুলির মধ্যে একটীতে লেখা আছে যে, এই পুস্তকের কোন অংশ পাঠ না করিলে কেহই রক্ষা পাইবে না। এই অংশে পুনঃ পুনঃ 'লা' লিখিত আছে এবং তাহা আমাদের (কোরাণোক্ত) 'অল্লা ইল্লহ্' ইত্যাদির মত। শেখ ঐ সকল অংশ লইয়া ব্রাহ্মণদিগকে তর্কে পরাস্ত করিয়াছিলেন এবং তাহারা ইস্‌লাম্ ধর্ম্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। (মুন্তখব-উল-তবারিখ, ২ খঃ, ২১২ পৃষ্ঠা।) এক্ষণে জানা যাইতেছে যে অক্‌বর বাদশাহের সময় অথর্ববেদ-কল্পিত 'অল্লা ইল্লা' ইত্যাদি নাম শুনিয়া অনেক হিন্দু উহা কোরাণের অংশ মনে করিতেন। আবার ঐ নামে অনেকে মুগ্ধ হইয়া কোরাণকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেন। এই নিমিত্ত সেই সময় হইতে অথর্ববেদ হিন্দুদের অশ্রদ্ধার পাত্র হইল। কিন্তু যথার্থ এই সকল শব্দ অথর্ববেদে আছে কি না, তাহা অনেকেই হয় ত বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই। আমরা এখনকার [রোথ ও হুিট্নে প্রকাশিত সমস্ত

অথর্ববেদ পাঠ করিয়া কোথায়ও ঐ সকল শব্দ দেখিতে পাইলাম না। (তবে যদি অপর কোন শাখায় থাকে?) কেবল দুইটী মন্ত্রে উহাদের আভাসমাত্র দৃষ্ট হইল, কিন্তু তাহাদের অর্থ অন্য প্রকার। যথা—

"আদলাবুকমেককম্। অলাবুকং নিখাতকম্।"

(অথর্ববেদ ২০.১৩২ সূ)

সত্য বটে এক্ষণে 'অল্ল' নামে একখানি উপনিষৎ প্রচলিত আছে, কেহ কেহ উহাকে আথর্বণসূক্ত বলিয়া থাকেন। [প্রত্নকম্রনন্দিনী ৫ম ভাগ ১ সংখ্যা ও শব্দকল্পদ্রুমে 'অল্ল' শব্দ দ্র°।] এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে 'অল্লা ইল্লে' প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। তবে যদি এইখানি সেই সময়কার অথর্ববেদের অংশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই সময়কার হিন্দুদের ভ্রম বলিতে হইবে। কারণ এই গ্রন্থখানিতে যে সকল কোরাণের কথা পাওয়া যায়, তাহা বেদ, নিরুক্ত ও পাণিনি প্রভৃতি কোন প্রাচীন গ্রন্থে, এমন কি অথর্বপ্রাতিশাখ্যে পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ এই গ্রন্থে সঙ্কেতে অকবর বাদ্শাহের নাম পর্য্যন্ত পাওয়া যায়; [যদিও ঐ শব্দের অর্থ অন্যপ্রকার।] এই সকল প্রমাণ দ্বারা এই স্বীকার করা যায় যে, এ খানি অক্‌বর বাদ্শাহের কোন সভাপণ্ডিত কর্ত্তৃক রচিত এবং অথর্ববেদ মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়া আথর্বণসূক্ত অথবা অল্লোপনিষৎ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। মুসলমান্ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য সময়ে সময়ে সকল মুসলমান্ রাজাই এই প্রকার নানা উপায় অবলম্বন করিতেন, তাহার প্রমাণ অনাবশ্যক। এই প্রকার কার্য্য দ্বারাই কি অকবর হিন্দুদের প্রিয়পাত্র ছিলেন? বোধ হয় তাঁহার আপনার সুবিধার জন্যই তিনি সংস্কৃতের সাহিত্যভাণ্ডার আপন মাতৃভাষায় গচ্ছিত রাখিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে সর্হিন্দ-নিবাসী হাজী ইব্রাহীম্ কর্ত্তৃক ব্রহ্মবেদ অথর্ব পারস্য ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। [Blochmann's Ain-i-Akbari, p. 105 দ্র°।] বোধ হয় অকবর বাদ্শাহের পূর্ব্বে অথর্ব্ববেদকে কোরাণের অংশ বলিয়া কেহ অশ্রদ্ধা করিত না। যদি অথর্ববেদের কোন কোন অংশ কোন পাশ্চাত্য ধর্ম্মশাস্ত্রের সঙ্গে ঐক্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে তাহা প্রাচীন পারসীকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র অবেস্তা ভিন্ন অপর কোন গ্রন্থ নহে। [অবেস্তা শব্দ দ্র°।]

অথর্ববেদের সঙ্কলনকাল।

কৃষ্ণশাস্ত্রী জ্যোতিষস্ত্রের দ্বারা গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন, অথর্ব্ববেদের সঙ্কলন সময় ১৫১৬ খৃঃ পূর্ব্ব অব্দ অর্থাৎ এখনকার সময় হইতে গণনা করিলে ৩৪৫১ বৎসরের পূর্ব্বে হইয়া পড়ে। [Theosophist, September, 1881, Vol. ii. no. 12 দেখ।]

অথর্ববেদের উপনিষদ্।

অথর্ব্ববেদের অনেকগুলি উপনিষদ্ আছে। পণ্ডিতবর বেবের বলেন, অথর্ব্বোপনিষৎগুলি প্রধানতঃ ছন্দে লিখিত এবং ঐ গুলিকে আবার তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণীর যে সকল সে গুলি আত্মতত্ত্ব বা পরমব্রহ্মবিষয়ক। দ্বিতীয় শ্রেণীর গুলি যোগবিষয়ক এবং তৃতীয় শ্রেণীর যে সকল সেগুলি শিব ও বিষ্ণুর উপাসনাবিষয়ক। [Weber's Hist. of Ind. Lit. p. 156.]

এই গুলি অথর্ব্বোপনিষৎ—১ অথর্ব্বশিরঃ, ২ অথর্ব্বশিখা, ৩ মুণ্ডক, ৪ প্রশ্ন, ৫ মাণ্ডুক্য ৬ গর্ভ, ৭ নাদবিন্দু, ৮ ব্রহ্মবিন্দু, ৯ অমৃতবিন্দু, ১০ ধ্যানবিন্দু, ১১ তেজোবিন্দু, ১২ যোগশিক্ষা, ১৩ যোগতত্ত্ব, ১৪ সন্ন্যাস, ১৫ আরুণিক, ১৬ ব্রহ্মবিদ্যা, ১৭ ক্ষুরিকা, ১৮ চুলিকা, ১৯ ব্রহ্ম, ২০ প্রাণাগ্নিহোত্র, ২১ নীলরুদ্র, ২২ কণ্ঠশ্রুতি, ২৩ পিণ্ড, ২৪ আত্মা, ২৫ রামপূর্ব্বতাপনীয়, ২৬ রামোত্তরতাপনীয়, ২৭ রাম, ২৮ সর্ব্বোপনিষৎসার, ২৯ হংস, ৩০ পরমহংস, ৩১ জাবাল, ৩২ কৈবল্য, ৩৩ গরুড়, ৩৪ মহা, ৩৫ রুদ্রাক্ষ, ৩৬ নৃসিংহতাপনীয়, ৩৭ নারায়ণ, ৩৮ বৃহন্নারায়ণ, ৩৯ আনন্দবল্লী, ৪০ ভৃগুবল্লী, ৪১ আশ্রম, ৪২ নিরালম্ব, ৪৩ আর্ষিক, ৪৪ তারক, ৪৫ শাকল্য, ৪৬ বল্লভী, ৪৭ শ্রীমদ্দত্ত, ৪৮ প্রাত্মপ্রবোধ, ৪৯ গোপাল-তাপনীয়, ৫০ গোপীচন্দন, ৫১ মৃত্যুলঙ্ঘন, ৫২ কালাগ্নিরুদ্র, ৫৩ ত্রিপুর, ৫৪ স্কন্দ, ৫৫ সুন্দরী-তাপনীয়, ৫৬ দেবী, ৫৭ কৌল, ৫৮ দর্শন, ৫৯ কঠ (২), ৬০ শ্বেতাশ্বতর, ৬১ মৈত্রায়ণ। এতদ্ভিন্ন বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে অপরাপর সকল উপনিষৎই অথর্ব্ববেদান্তর্গত। [Burnell's Catalogue, p. 28.] [উপনিষদ্ দেখ।]

অথর্ববেদ—হিন্দুদিগের একজন দেবতা। যেমন গ্রহ, নক্ষত্র বার, তিথি, ইত্যাদির মূর্ত্তি হিন্দু মূর্ত্তিশাস্ত্রে কল্পনা করা হইয়াছিল, সেইরূপ চারিখানি বেদেরও মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছিল। বৌদ্ধদিগের "প্রজ্ঞাপারমিতা" মহাযানের একখানি বড় পুস্তক কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে ইহাই প্রজ্ঞাপারমিতা দেবীরূপে কল্পিত হইয়াছিল। অথর্ববেদের ধ্যান দুই স্থানে পাওয়া গিয়াছে। শ্রীতত্ত্বনিধির (প. ৯৬) ধ্যান এইরূপ—

"অথর্বাভিধো দেবো ধবলো মর্কটাননঃ।

অক্ষমালান্বিতো বামে দক্ষে কুম্ভধরঃ স্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ অথর্ব নামক দেবতার অঙ্গের বর্ণ শ্বেত, তাঁহার মুখ মর্কটের ন্যায়, এবং তাঁহার দক্ষিণ হস্তে কুম্ভ ও বাম হস্তে অক্ষমালা থাকে।

এই দেবতার ধ্যান হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডেও (১০৫ পৃ°) পাওয়া যায়। তাহাতে মূর্ত্তির সামান্য একটু তফাৎ লক্ষিত হয়; এখানে কুম্ভের বদলে দক্ষিণ হস্তে খট্বাঙ্গ থাকে। হেমাদ্রি অথর্বণদেবকে "জনপ্রিয়" বিশেষণ দিয়াছেন।

অথর্ব শিখা—(স্ত্রী) [অথর্বণঃ অথর্ববেদস্য শিখা শির ইব ৬-তৎ] অথর্বশিখা নামক অথর্ববেদের অন্তর্গত উপনিষদ্‌বিশেষ। এই উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে অথর্ববেদের শিখাস্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে।

অথর্ব শির—(পুং) যজ্ঞে বেদী প্রস্তুতের ইষ্টকবিশেষ।

অথর্ব শিরস্—(ক্লী) [অথর্বণঃ শিরো মস্তকমিব।] অথর্ববেদের অন্তর্গত অথর্ব শিরঃ বা অথর্বশিরস্ নামক ব্রহ্মবিদ্যা-প্রতিপাদক উপনিষদ্‌বিশেষ। "অথর্বশিরসি প্রোক্তৈর্মন্ত্রৈঃ" (রামা° ১.১৪.২)

অথর্বশিরা—(স্ত্রী) অথর্ববেদের ঋগ্‌বিশেষ।

অথর্ব হৃদয়—(ক্লী) অথর্বপরিশিষ্টের ৬৯ অধ্যায়ের নাম।

অথর্বা—[অথর্বন্ দ্র°]

অথর্বাঙ্গিরস,—(পুং) অথর্ববেদের কএকটী মন্ত্রে অথর্বা ও অঙ্গিরসের উল্লেখ বিশেষভাবে দেখা যায়—'পুরাতন মহর্ষি অঙ্গিরস, অথর্বা ও ভৃগুবংশীয় আমাদের পিতৃগণ সোমার্হ অর্থাৎ সোমসম্পাদনকারী। ইঁহাদের বংশ অন্যান্য ঋষিগণমধ্যে প্রাধান্য লাভ করুন এবং বংশবৃদ্ধি হেতু ইঁহারা গোত্রের পিতৃত্ব প্রাপ্ত ও আমাদের প্রতি সেই যজ্ঞার্হদিগের সুমতি হউক।'

'হে যম! এই সম্মুখস্থিত আস্তীর্ণ দর্ভের উপর 'অঙ্গিরস' নামক পিতৃগণ সহ আগমন করিয়া আমাদের প্রদত্ত হবিঃ দ্বারা তৃপ্ত হও। জয়শীল অঙ্গিরাগণ যে পথে দ্যুলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই পথে স্বর্গে আরোহণ করিবে।' (অথর্ব ১৮.১.৫৮—৬১)

"ঋষীণাং চরিতং সত্যং অথর্বাঙ্গিরসামপি" (প্রশ্নোপ° ২.৮.১)

অথর্বাঙ্গিরস₂—(পুং) অথর্বাঙ্গিরসবংশীয় ব্যক্তি।

অথর্বাঙ্গিরস₃—(পুং) অঙ্গিরা দক্ষের ষষ্টি কন্যার মধ্যে স্বধা ও সতীকে বিবাহ করেন। সতী 'অথর্বাঙ্গিরস' নামক এক দেবতাকে পুত্ররূপে স্বীকার করিয়াছিলেন। (ভাগবত)

অথর্বাঙ্গিরস₄—(পুং) [অথর্বা চাঙ্গিরাশ্চ অচ্ নিপাতনাৎ সাধুঃ।] অথর্বা ও অঙ্গিরস ঋষি। অথর্বা ও অঙ্গিরস যে সাম দেখিয়াছেন। অথর্ববেদকেও অথর্বাঙ্গিরস কহে। যথা, —"যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরসশ্চতুর্ব্বিধম্ মন্ত্রজাতম্।" যেমন ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্বাঙ্গিরস। চারি প্রকার মন্ত্রজাত হউক।

অথর্বাঙ্গিরস₅—(পুং) অথর্ববেদী ব্রাহ্মণশ্রেণী ভেদ। [আঙ্গিরস দ্র°]

অথর্বাণ (ক্লী) অথর্ববেদের বিধি-বিশেষ।

অথর্বাধিপ—(পুং) [অথর্বণঃ বেদস্যাধিপঃ, ৬-তৎ] বুধ। "সামবেদাধিপো ভৌমঃ শশিজোঽথর্ববেদরাট্।" মঙ্গল সামবেদের অধিপতি এবং অথর্ববেদের অধিপতি চন্দ্রের পুত্র বুধ।

অথর্বাণবিদ্—(পুং) অথর্ববেদের বিধি যিনি জানেন; যিনি উক্ত বেদের বিধি জ্ঞাত। (মহাভারত ১২ পর্ব্ব)

অথর্বী—(স্ত্রী) [ন থর্ব-অচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ উলোপঃ। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্] যে হিংসা করে না। "যাভির্বিপশলাং ধনসামথর্ব্যমিতি" (ঋক্ ১.১২২.১০)

অথল (দেশজ) [অ-থল পক্ষে] যাহার স্থল (তল) নাই; অতল, গভীর, অথাই।

অথবা—(অব্য) পক্ষান্তরে; কিংবা, এ যদি না হয় তবে উহা হইবে। "অথবা অবশ্যমেব মাধবসেনো ময়া পূজ্যেন মোচয়িতব্যঃ" (মালবিকাগ্নিমিত্র) এখানে পক্ষান্তর অর্থ বুঝাইতেছে, পক্ষান্তরে নিশ্চয়ই মাধবসেন পূজনীয় আমাকর্তৃক মোচিত হইবে।

অথব্ব—(দেশজ) অথর্ব্ব। ২ উত্থানশক্তিরহিত, গতিশক্তিবিহীন, পঙ্গু। ৩ অবশ, নিস্পন্দ, জড়। ৪ অতিবৃদ্ধ, স্থবির। ৫ পৌরুষহীন, অধম, অক্ষম।

অথা,—(দেশজ অব্য) ওখানে, ওদিকে, অপরপক্ষে, পক্ষান্তরে। [অথাতে—ওখানে, ওদিকে]।

অথা₂—(দেশজ অব্য) অনন্তর।

অথাই₁—(দেশজ) গভীর, অগাধ, অথই।

অথাই₂—(দেশজ) দাঁড়াইতে অশক্ত, অবশাঙ্গ, মূর্চ্ছাপন্ন।

অথাতঃ—(অব্য) এখন, এই সময়ে। ইহার পর।

অথানন্তর—(অব্য) ইহার পর, এখন হইতে, এই সময়ে।

অথান্তর—(দেশজ) দুরবস্থা, দুর্গতি, অনর্থ, বিপদ। ২ অমঙ্গল।

অথাপি—(অব্য) এই জন্য; এই প্রকার, ইহার পর।

অথাহ—(দেশজ) অতল, গভীর।

অথির—(দেশজ) অস্থির; লক্ষ্যহীন। ২ ব্যাকুল; বিহ্বল, অশান্তি। ৩ তরল, চঞ্চল। ৪ ভাবাবেগে আবিষ্ট বা অভিভূত। ৫ কম্পমান।

অথিরাল—মাদ্রাজের কড়াপা জেলার অন্তর্গত চেয়র নদীতীরস্থ এক তীর্থ। স্থানীয় মন্দির-সংলগ্ন একটী পুষ্করিণী (কুণ্ড) সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, ইহার জলে পাপক্ষয় হয়। বিষ্ণুর অবতার পরশুরাম নাকি উহা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি বৎসর শিবরাত্রির দিন অনুষ্ঠিত শিবরাত্রি উৎসব উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে সহস্র সহস্র ভক্তের এখানে সমাগম হয়।

অথুট,—ব্রহ্মদেশের বেসিন জেলাস্থিত এক রাজস্বকেন্দ্র। আয়তন

৮৪ বর্গ মাইল। উত্তর-ভাগের ভূখণ্ড বন্ধুর। উহার জঙ্গলের কাষ্ঠ উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়। নিম্নদেশস্থ ভূভাগ বন্যায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অধিবাসীরা অধিকাংশই মৎস্য-জীবী।

অথুট,—ব্রহ্মদেশের বেসিন জেলার নদীবিশেষ। এই নদী ক্যুন্‌লহ হ্রদ হইতে উত্থিত হইয়া দক্ষিণপশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। বর্ষাকালে মোহানা হইতে ২৫ মাইল ভিতরে নৌকাদি যাতায়াত করিতে পারে। অন্যান্য সময়ে নদীতে প্রচুর মৎস্য শীকার করিতে পারা যায়।

অথেগ্যী——ব্রহ্মদেশস্থ বেসিননগরের অংশবিশেষ। বেসিন নগরের কিয়দংশ অথেগ্যী-ভূভাগ লইয়া গঠিত। ইহার ভূখণ্ড বন্ধুর ও উচ্চনীচ। অধিবাসীর অধিকাংশই কৃষিজীবী। তাহারা প্রধানতঃ বর্ম্মন্ ও করেন জাতীয়। [বেসিন দ্র°]

অথোজী—কচ্ছদেশের জাড়েজা রাজবংশীয় এক নৃপতি। ইনি ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম রায়ধেণ। ভোজের উত্তরে অজাপুরে ইনি রাজত্ব করিতেন।

অথোর—গুজরাটের কড়ী জেলার সিদ্ধপুর মহকুমায় অবস্থিত এক প্রাচীন স্থান। ইহা সিদ্ধপুর হইতে ৭॥০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে গণপতির একটী প্রসিদ্ধ মন্দির ও ধর্ম্মশালা আছে।

অথ্‌নি (অন্তনি)—বোম্বাই প্রদেশে বেলগাঁও জেলায় উত্তর-পূর্ব্বস্থ তালুক। অক্ষা° ১৬°২৭′ হইতে ১৬°৫৮′ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪°৪০′ হইতে ৭৫°২৫′ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৮১৬ বর্গ মাইল। অথ্‌নি এই তালুকের সদর ও একমাত্র শহর। এই তালুকে ৮২টী গ্রাম আছে, তন্মধ্যে কুড়্‌চি প্রধান। অথ্‌নি তালুকের অধিকাংশ স্থান বৃক্ষলতাশূন্য এক সারি পাহাড় ইহাকে দুইটী সমান অংশে বিভক্ত করিয়াছে। জলবায়ু শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৩ ইঞ্চ। তালুকের দক্ষিণাংশ কৃষ্ণানদীর জলে উর্ব্বর। লোকসংখ্যা প্রায় একলক্ষ পনর হাজার।

অথ্‌নি, (অন্তনি)—বোম্বাই প্রদেশস্থ বেলগাঁও জেলার অন্তর্গত অথ্‌নি তালুকের সদর ও একমাত্র শহর। ইহা স্থানীয় বাণিজ্যের একটী প্রসিদ্ধ কেন্দ্রস্থল। এখানকার গাড়ীর চাকা সর্ব্বত্র আদৃত। কার্পাস-বস্ত্র, কম্বল, সোরা প্রভৃতি এখানে তৈয়ারী হয়। তদ্ব্যতীত তুলা পরিষ্কার ও গাঁইটবন্ধী করা হইয়া থাকে। এখান হইতে তুলা এবং খাদ্যশস্য ১২ ক্রোশ পশ্চিমস্থ মিরাজ শহরে প্রেরিত হয়। মিরাজ হইতে চাউল, নারিকেল ও শুক্‌না মাছ আমদানী হয়। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ভ্রমণকারী মাঁদল্‌স্লো এবং ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ ভৌগোলিক অগিল্‌বি 'অন্তনির' বাণিজ্য-সম্পদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে মোগল সেনাপতি দেলোয়ার খাঁ শিবাজীর নিকট হইতে এই শহর অধিকার ও ধ্বংস করেন। তখন শিবাজীর পুত্র শম্ভাজী বিদ্রোহী হইয়া মোগল পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। দেলোয়ার খাঁ শহরের অধিবাসিগণকে দাস-স্বরূপ বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে শম্ভাজী তাহাতে আপত্তি করেন। দেলোয়ার তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন শম্ভাজী পিতার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইলেন।

১৭১০ খৃষ্টাব্দে নিজাম অথ্‌নি অধিকার করিয়া কোল্‌হাপুরের অধিপতিকে প্রদান করেন। কোল্‌হাপুর-রাজ ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে উহা সাতারার রাজা সাহুকে প্রদান করেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে নিপানিরাজের মৃত্যু হইলে অথ্‌নি ইংরেজের হস্তে যায়। শহরে জজ আদালত, হাঁসপাতাল, মিউনিসিপ্যাল স্কুল ও অন্যান্য কতিপয় বিদ্যালয় আছে।

অথ্‌বা—তাপ্তী নদীর বামকূলে নদীমুখ হইতে ৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত একটী গ্রাম ও দুর্গ। সুরাটের জনৈক ধনী ব্যবসায়ী মোল্লা মুহম্মদ আলি ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। মোল্লা মুহম্মদ প্রথমে কাম্বে উপসাগরস্থ পেরিম্ দ্বীপে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। পরে ঐ স্থান অসুবিধাজনক বিবেচনা করিয়া অথ্‌বা গ্রামে আসিয়া দুর্গনির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। সুরাটের শাসনকর্ত্তা দুর্গনির্ম্মাণ কার্য্য বন্ধ করিতে আদেশ দেন, কারণ সুরাট নগর হইতে অথ্‌বা মাত্র ১॥০ ক্রোশ দূরে। মোল্লা মুহম্মদ উক্ত আদেশ অমান্য করেন। তিনি সুরাটের দুর্গাধ্যক্ষ বেগলার বেগ খাঁকে কৌশলে নিজের পক্ষে আনয়ন করেন এবং তাঁহার সহায়তায় দুর্গনির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হয়।

অথমল্লিক—(অঠমল্লিক) উড়িষ্যার একটী করদ ও সামন্ত রাজ্য। অক্ষা° ২০°৩৭′ হইতে ২১°৫′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪°১৬′ হইতে ৮৪°৪৮′ পূঃ। ভূপরিমাণ ৭৩০ বর্গমাইল। ইহার উত্তর সীমায় রায়রাখোল রাজ্য, পূর্ব্বে অঙ্গুল জেলা, দক্ষিণে মহানদী বউদ হইতে এই রাজ্য পৃথক্ করিয়াছে এবং পশ্চিমে শোণপুর ও রায়রাখোল রাজ্য। এই স্থান অধিকাংশ গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং মহানদীর দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত, বিস্তৃত বন-গিরি-সমাচ্ছন্ন। কিরূপে এই রাজ্যের সৃষ্টি হইল তাহা বলা দুষ্কর। কেহ কেহ বলেন এখানকার সামন্তবংশের পূর্ব্বপুরুষ প্রতাপদেব পুরীতে আগমন করেন এবং এখানকার রাজার সহিত বিবাদ করেন। তাহাতে রাজা তাঁহার সপ্ত ভ্রাতার মধ্যে দুইজনকে মারিয়া ফেলেন। অপর সকলেই বোনাই রাজ্যে

গিয়া আত্মরক্ষা করেন। তথা হইতে প্রতাপদেব প্রথমে বউদ, তৎপরে অঠমল্লিকে আগমন করেন। এখানে তিনি ডোম-সর্দ্দারের প্রাণবধ করিয়া অঠমল্লিক অধিকার করেন। এরূপ প্রবাদ প্রচলিত থাকিলেও রাজকীয় কাগজ পত্র হইতে ও ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্র হইতে জানা যায় এই স্থান বউদের করদ ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এখানকার সামন্তকে যে প্রথম সনদ দেওয়া হয় তাহাতে অঠমল্লিক পৃথক্ রাজ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। এই রাজ্যের রাজস্ব ৭১ হাজার টাকা, তন্মধ্যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে ৪৮০৲ টাকা কর দিতে হয়। এখানকার লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িতেছে। এক্ষণে ৫০ হাজারের কাছাকাছি। সকলেই হিন্দু তন্মধ্যে চাষা ও গোঁড়ের সংখ্যাই বেশী। এই রাজ্যমধ্যে ৪০৭ খানি গ্রাম; তন্মধ্যে কৈন্তিরা নামক স্থানে সামন্তের রাজধানী। বর্ত্তমান সামন্তের নাম রাজা কিশোরচন্দ্র দেব।

এখানে সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ, চাউল ও তৈলবীজের বাণিজ্য প্রচলিত। গো-শকট বা নৌকাযোগে বাণিজ্য-পণ্য নানাস্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে। জঙ্গলে উৎকৃষ্ট কড়ি বরগার উপযোগী কাঠ পাওয়া যায়। সামন্তরাজের ব্যয়ে এখানে দাতব্য ঔষধালয়, একটী মধ্য ইংরাজী স্কুল ও একটী আপার প্রাইমারী ও ৩৬টী লোয়ার প্রাইমারী স্কুল আছে।

অথর খাঁ—একজন কবি। ইহার পিতার নাম আমীর নিজামুদ্দীন রাজ্‌বী। ইনি বুখারায় বাস করিতেন। আলমগীর বাদশাহের সময়ে ইনি ভারতবর্ষে আগমন করেন।

অদ, অদক—(ত্রি) ভক্ষণশীল। সাধারণতঃ শব্দের সংযোগে ব্যবহৃত হয়। যেমন মৎস্যাদ, পুরুষাদক।

অদক্ষ—(পুং) দক্ষ নহে, অচতুর।

অদক্ষিণ—(ক্লী) অদক্ষতা, অনুকূলতাহীন। ২ গ্রাম্যতা। ৩ দক্ষিণার প্রদান না করা। [দক্ষিণোঽনুকূলঃ কুশলশ্চ, ন দক্ষিণং বিরোধার্থে নঞ্-তৎ]। অনুকূল নহে, কার্য্যকুশল নহে। ৪ বামদিক্। ৫ বামাঙ্গ। ৬ [নাস্তি দক্ষিণা ক্রিয়াসমাপ্তৌ যত্র] যে যজ্ঞাদি ক্রিয়ায় দক্ষিণা হয় নাই। "অদক্ষিণাসো অচ্যুতা দুদুক্ষন্" (ঋক্ ১০. ১৬. ১০)

অদক্ষিণীয়, অদক্ষিণ্য—(ত্রি) দক্ষিণার অযোগ্য।

অদগ—(দেশজ) অপযশবিহীন। ২ নিরপরাধ।

অদগ্ধ—(ত্রি) [ন দহ-ক্ত বিধিপূর্ব্বকমগ্নিনা ন দগ্ধং সংস্কৃতম্] শাস্ত্রবিধানানুসারে যাহার অগ্নিসংস্কার করা হয় নাই। (ত্রি) যাহা দগ্ধ নহে, দগ্ধভিন্ন। "যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম" (শ্রাদ্ধমন্ত্র)।

অদজিগ্—অন্দামান দ্বীপের অধিবাসিগণ বাসস্থান অনুসারে নিজদিগকে কএকটী ভাগে ভাগ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে অদজিগ একটী শ্রেণী। ইহার অর্থ 'খাড়ি বা প্রণালীতে যাহারা বাস করে' অর্থাৎ সমুদ্রোপকূলে যে সকল স্থানে সাগরশাখা ভূমিভাগের মধ্যে অনেকটা প্রবেশ করিয়াছে সেই স্থানের বাসিন্দাগণ অদ্জিগ্ নামে অভিহিত হয়।

অদণ্ড—(ত্রি) দণ্ডহীন, দণ্ডের অযোগ্য; দণ্ডরহি । ২ (ক্লী) দণ্ডরাহিত্য।

অদণ্ডনীয়—(ত্রি) দণ্ডের অযোগ্য, অদণ্ড্য। (মনু ৮. ২০২)

অদণ্ড্য—(ত্রি) [দণ্ডং শাস্তিং নার্হতি ন-দণ্ড-যৎ] দণ্ডের অযোগ্য, যাহাকে দণ্ড দেওয়া যায় না।

"অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়নরাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্।
অযশো মহদাপ্নোতি নরকঞ্চৈব গচ্ছতি॥" (মনু ৮.১২৮)

যে দণ্ডনীয় নয় তাহাকে যদি রাজা দণ্ডদান করেন তাহা হইলে তাঁহার অযশ ও অকীর্ত্তি লোকসমাজে ঘোষিত হয় এবং তিনি মরণান্তে নরকে গমন করেন।

"অদণ্ড্যোমুচ্যতে রাজ্ঞা" (মনু ৮.২০২) [দণ্ড দ্রং] পিতা, আচার্য্য, সুহৃদ্, মাতা, ভার্য্যা, পুত্র, পুরোহিত ইহারা যদি স্বধর্ম্মে অবস্থান না করেন তাহা হইলে রাজা দণ্ড দিবেন। অদণ্ড্য বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না। (মনু ৮.৩৩৫)

অদৎ—(ত্রি) দন্তরহিত, দন্তহীন।

অদৎক—(ত্রি) দন্তহীন। ২ ভক্ষক।

অদত্ত (ত্রি) [ন দা-ক্ত, নঞ্-তৎ যৎপুনরন্যায়েন দত্তং তদদত্তম] দত্তভিন্ন, অনর্পিত।

"যানশয্যাসনান্যস্ত কূপোদ্যানগৃহাণি চ।
অদত্তান্যুপযুঞ্জান এনসঃ স্যাৎ তুরীয়ভাক্।" (মনু ৪.২০২.)

যান, শয্যা, আসন, কূপ, উদ্যান ও গৃহসমূহ অপ্রদত্ত অবস্থায় ভোগ করিলে উক্ত দ্রব্যাদির কর্ত্তার একচতুর্থাংশ পাপ গ্রহণ করিতে হয়। "অদত্তানামুপাদানমিত্যাদি" (মনু ১২.৭) অর্থাৎ অন্যায়পূর্ব্বক পরস্বগ্রহণ ত্রিবিধ শারীরিক কর্ম্মের অন্তর্গত। "যোঽদত্তাদায়িনো হস্তাৎ" (মনু ৮.৩৪০) অর্থাৎ অপ্রদত্ত পরধন যদি যজন-যাজনাদি কর্ম্ম নিরত কোন ব্রাহ্মণও চোরের নিকট হইতে গ্রহণ করেন তাহা হইলে তিনি রাজা কর্ত্তৃক দণ্ডনীয় হইবেন।

২ অন্যায় করিয়া যাহা দেওয়া যায়। অন্যায় দান। শাস্ত্রকারেরা ষোড়শ প্রকার দানকে অদত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা,—১ ভয়প্রযুক্ত দান। ২ ক্রোধবশতঃ দান। ৩ শোকের সময় দান। ৪ উৎকোচ (ঘুস্)। ৫ পরিহাস করিয়া দান। ৬ একজন কোন দ্রব্য অন্যকে দিল, অন্য ব্যক্তি আবার সেই দ্রব্য তাহাকে দিল, ইহা ব্যত্যাস দান। ৭ ছলপূর্ব্বক দান। ৮ বালক কর্ত্তৃক দান। ষোল বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে কাহারও

পৈতৃক ধনে অধিকার জন্মে না। অতএব ষোলবৎসরের চেয়ে যে বালকের বয়স অল্প, তাহার দান সিদ্ধ নহে। ৯ মূঢ়ব্যক্তি কর্ত্তৃক দান। ১০ যে ব্যক্তি স্বাধীন নয়, তাহার দান অসিদ্ধ। ১১ পীড়িত ব্যক্তির দান। ১২ মাদক দ্রব্য সেবনে মত্ত ব্যক্তির দান। ১৩ বাতিকাদি রোগে উন্মত্ত ব্যক্তির দান। ১৪ প্রতিশোধ পাইবার ইচ্ছায় যে দান করা যায় তাহা অসিদ্ধ। ১৫ যে ব্যক্তি বেদজ্ঞ নহে অথচ সে যদি বলে আমি বেদজ্ঞ, তাহাকে দান করিলে সে দানকে অদত্ত বলা যায়। ১৬ যাগাদির নিমিত্ত ধন লইয়া তাহা দ্যূতাদি ক্রিয়ায় সমর্পণ করিলে, তাহাকে অদত্ত কহে। যে ব্যক্তি এই প্রকার অবৈধ দান করে কিংবা যে কোন লোক সেই অবৈধ দান গ্রহণ করে, শাস্ত্রকারেরা তাহাদের দণ্ডবিধান করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

"গৃহ্ণাত্যদত্তং যো লোভাদ্ যশ্চাদেয়ং প্রযচ্ছতি।
অদেয়দায়কো দণ্ড্যস্তথাদত্তপ্রতীচ্ছুকঃ॥" (মিতাক্ষরা)

যে অন্যায় দান করে আর লোভপরতন্ত্র হইয়া যে সেই অন্যায় দান গ্রহণ করে, সেই অদেয়দানকর্ত্তা এবং সেই দানের গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি দণ্ডনীয় হয়।

অদত্তদান—(ক্লী) যে দান প্রদান করা হয় নাই। ২ জোর করিয়া অথবা চুরি করিয়া যে দ্রব্য গ্রহণ করা হয়। ৩ জৈনশাস্ত্রাচার্য্যগণ ইহার তিন তিন প্রকার ভেদ উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—১ দ্রব্যাদত্ত, ২ ভাবাদত্ত ও ৩ দ্রব্যভাবাদত্ত এবং ১ স্বামী অদত্ত, ২ জীব অদত্ত ও ৩ গুরু অদত্তদান।

অদত্তা—(স্ত্রী) অবিবাহিতা। যে কন্যাকে দান করা হয় নাই।

অদত্তাদায়িন্ (ত্রি) [অদত্ত-আ-দা-ণিনি অদত্তমাদত্তে ৬-তৎ] অদত্ত সম্পত্তির গ্রাহক। ২ চৌর।

অদত্র (ত্রি) [অদ-অত্রন্ বাহুল°] অদনীয়, খাদ্য। "অদত্রয়াদয়তে বার্য্যাণীতি" (ঋক্ ৫.৪৯.৩)

অদত্বা—(অব্য) না দিয়া অর্থাৎ প্রদান না করিয়া।

অদদ—(পুং) সংখ্যা। ২ অঙ্কন, সংখ্যা লিখিবার চিহ্ন।

অদদ্রঞ্চ্—(ত্রি) [গত্যয়োঃ স্ত্রী অদদ্রীচী] যে তাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে।

অদন—(ক্লী) [অদ-ল্যুট্ ভাবে] ভক্ষণ, ভোজন। "অশ্বাসপ্তী ইবাদনে" (ঋক্ ৬.৫৯.৩) ২ [কর্ম্মণি ল্যুট্] ভক্ষণীয় দ্রব্য। "নিন্দিতান্নাদনং তথা।" (মনু)

অদনা—(দেশজ) ক্ষুদ্র। ২ তুচ্ছ। ৩ নীচ। ৪ সাধারণ।

অদনীয়—(ত্রি) [অদ-অনীয়র্] আহার্য্য।

অদন্ত১—(ত্রি) ১ দন্তহীন, অজাতদন্ত। ২ জোঁক।

অদন্ত২—(পুং) দন্তহীন ও শৃঙ্গাদিবিশিষ্ট পশু। "তথা নোঽস্মানদতেঽদন্তকায় শৃঙ্গাদিভির্ঘাতিনে মাবসৃজঃ" (ঋক্ ১.১৮৯.৫ সায়ণ) আমাদিগকে দন্তরহিতের অর্থাৎ শৃঙ্গাদিবিশিষ্ট পশুর হাতে সমর্পণ করিও না।

অদন্তক—(পুং) [ন সন্তি দন্তা অস্য অদন্তক—অদন্ত-কপ্] পূষারূপ আদিত্যবিশেষ। পূষার অদন্তক নাম হইবার কারণ এই, যে সময়ে দক্ষরাজ সতীর কাছে মহাদেবের নিন্দা করেন, পূষা তখন দাঁত বাহির করিয়া মনের আহ্লাদে হাসিতেছিলেন। তাই যজ্ঞনাশের সময়ে শিবদূত বীরভদ্র তাঁহার সেই সাধের দাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া দিলেন। যথা ভাগবতে—

"পূষ্ণোহ্যপাতয়দ্দন্তান্ কলিঙ্গস্য যথা বলঃ।
শপ্যমানে গরিমণি যোঽহসদ্দর্শয়ন্দতঃ॥" (৪.৫.১৯)

অনিরুদ্ধের বিবাহকালে বলরাম যেমন কলিঙ্গরাজ দন্তবক্রের দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন ; শিবনিন্দা শুনিয়া পূষাও দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়াছিলেন বলিয়া শিবদূত সেইরূপে তাঁহার দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল।

শ্রীধরস্বামী পূষাশব্দের এইরূপ টীকা করিয়াছেন—"তথাহি পূষা পিষ্টভাগোঽদন্তকো হি তং দেবা অস্তবন্নিতি বিহিতস্য পোষণস্য দ্বিদৈবত্যাভাবাৎ তত্র তস্য দন্তাঃ সন্তীতি বক্তব্যং স্যাৎ।"

অদন্ত্য—(ত্রি) দাঁতের অযোগ্য। ২ দাঁতের হানিজনক। ৩ দাঁত সম্বন্ধীয় নহে। ৪ (ক্লী) দাঁতের অভাব।

অদব্ধ—(ত্রি) [ন দন্ভ-ক্ত,] অহিংসিত। "অদব্ধৈরপ্রযুক্তভিঃ" (ঋক্ ৬.৪৮.১০) ২ বিভ্রমরহিত। "অদব্ধে নস্থা চক্ষুষাবপশ্যামি" (শুক্লযজুঃ ১.৩০)

অদব্ধধীতি—(ত্রি) যাঁহার কার্য্য অপ্রতিহত। "অদব্ধধীতীনচ্ছা" (ঋক্ ৬.৫১.৩)

অদব্ধব্রত—(পুং) যাঁহার ব্রত বা পূজা প্রভৃতি অভঙ্গ অর্থাৎ ধর্ম্মকার্য্য যিনি নিয়মিতভাবে করেন। [অদব্ধব্রতপ্রমতি দ্র°]

অদব্ধব্রতপ্রমতি—(পুং) [দব্ধ-বধে অদব্ধং অনুপহতং ব্রতং কর্ম্ম যস্য সোঽদব্ধব্রতঃ, প্রকৃষ্টা মতির্বুদ্ধির্যস্য স] অহিংসিত ব্রতে মতিবিশিষ্ট। যিনি অত্যন্ত জ্ঞানী অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন এবং স্বীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে কিছুতেই ভ্রষ্ট হয়েন না। "অদব্ধব্রতপ্রমতির্বসিষ্ঠঃ" (ঋক্ ২.৯.১) অহিংসিত ব্রতে যাঁহার মতি রহিয়াছে এবং যাঁহার কর্ম্ম বিঘ্নরহিত। (শুক্লযজুঃ ১১.৩৬)

অদব্ধায়ু—(পুং) [অদব্ধেন অহিংসনেন আয়াতি আ-যা-কু, ৩-তৎ] অহিংসাযুক্ত। ২ অর্চ্চনাকারীদিগের মঙ্গলদাতা অর্থাৎ হিংসা-নিবারক অগ্নি। "অগ্নেঽদব্ধায়োঽশীতম্" (শুক্লযজুঃ ২.২০)

অদব্ধাসু—(ত্রি) পবিত্র জীবনবিশিষ্ট, অর্থাৎ যাঁহার জীবন অতিশয় পবিত্রতাপূর্ণ। "অদব্ধাসুর্ভ্রাজমানো হেব ত্রি তো" (অথর্ব ৫.১.১)

অদভ—(ত্রি) [ন দভ্যাতে দম্ভ-অচ্ ; বাহুলকাৎ ক] হিংসার অযোগ্য। "ছর্দ্দির্যন্তমদাভ্যম্" (ঋক্ ৭.৮৬.৫)।

অদভ্র—(ত্রি) [ন দন্ভ-রক] প্রচুর। বহু। "দেবা অদভ্রমাশ বঃ" (ঋক্ ৮.৪৭.৬) "অদভ্রদর্ভামবিশয্য স স্থলীং" (কিরাতার্জ্জুনীয়ম্)।

অদম-জো-তাণ্ডা—নামান্তর তাণ্ডা অদম। সিন্ধুদেশের হায়দ্রাবাদ জেলান্তর্গত নগরীবিশেষ। অক্ষা° ২৫°২৬′ উ°; দ্রাঘি° ৬৮°৪১′১৫″ পূ°। প্রায় ১৮০০ খৃষ্টাব্দে এই নগরী স্থাপিত হয়। অধিবাসীর অধিকাংশই হিন্দু। ইহারা বিশেষতঃ লোহানো ও পঞ্জাবী। মুসলমান অধিবাসিগণের মধ্যে খস্‌কেলি, সুম্রা ও মেমন শাখার লোকই বেশী। তুলা ও রেশমের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ।

অদমপুর—বেহারের বৈশ্য বাণিয়াগণের অরিয়ার শাখান্তর্গত একটী থাক।

অদমপুর—পঞ্জাবের জালন্ধর জেলান্তর্গত সুবৃহৎ গ্রামবিশেষ। অক্ষা° ৩১°২৬′ উ°, দ্রাঘি° ৭৫°৪৫′১৫″ পূ°। শগ্রন গ্রাম এই গ্রামের অন্তর্ভুক্ত।

অদন্ত—(পুং) [ন দন্তঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ] দন্তের অভাব। ২ শিব। "তমদন্তেন অক্রবম্" (রামা° ২.৮৬.২)। ৩ [নাস্তি দন্তো যস্য] (ত্রি) দন্তরহিত। ছদ্মহীন, অকৈতব, অব্যাজ।

অদম্য—(ত্রি) [ন দম্যতেঽসৌ] অদমনীয়, যাহা দমন করা যায় না। ২ যে বাছুরের তিন বৎসরের অধিক বয়স হয় নাই। অপালন নিমিত্ত অদম্য বাছুর নষ্ট হইলে তাহার স্বামী প্রাজাপত্যের পাদপ্রায়শ্চিত্ত করিবে। এ স্থলে কেহ কেহ তন্তৎস্বামিক গোবধের পাদপ্রায়শ্চিত্ত কহেন। "পাদশ্চাপ্রাপ্তকে দেয়ো বৎসে স্বামিন্যরক্ষিতে।" (স্মৃতি)। "অপ্রাপ্তকে অপ্রাপ্তদম্যাবস্থে ত্রিহায়ণপর্য্যন্তমিতি যাবৎ।" (স্মার্ত্ত)। কেহ কেহ বলেন যে, উক্ত বচনে বৎস শব্দ আছে বলিয়া দুই বৎসর পর্য্যন্ত অদম্য-অবস্থা ধরিতে হইবে এবং ঐ দুই বৎসরের মধ্যেই প্রাজাপত্যের পাদপ্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে তাঁহারা এই বচনটী দেখাইয়া থাকেন—

"বর্ষমাত্রা তু বালা স্যাদতিবালা দ্বিবার্ষিকী।
অতঃপরন্ত সা গৌঃ স্যাত্তরুণী দন্তজন্মনি ॥"

এক বৎসরের বাছুরকে বালা কহে। দুই বৎসরের বাছুরকে অতিবালা বলা যায়। তৎপরে তরুণী অবস্থায় দন্ত জন্মাইলে তাহাকে গো বলা হয়।

অদয়—(ত্রি) [ন দয়া যস্য স] যাহার দয়া নাই, নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর। "অদয়ো বীরোশতমন্যুরিন্দ্রঃ" (ঋক্ ১০.১০৩.৭) ২ (গৌণার্থে) নিবিড়, গাঢ় (আলিঙ্গন)।

অদয়ালু—(ত্রি) করুণাশূন্য।

অদর—(ত্রি) অধিক, অল্প নহে। ২ ভয়হীন।

অদর—পেগুদেশের সপ্তদশ রাজা।

অদরক—গর্গাদিগণের এক ব্যক্তির নাম।

অদরকি—বেহারস্থ বাণিয়াদের একটী বিভাগ। ইহাদের অধিকাংশই শাকসবজি বিক্রয় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে। কেহ কেহ শস্য বিক্রয় বা চাষবাস করে। ইহারা মদ্যপান করে না; কিন্তু ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ এবং মাংসভক্ষণ প্রচলিত আছে। এ জন্য অপর বৈশ্যগণ ইহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। ইহারা হিন্দুরীতিনীতি মানিয়া চলে।

অদরগুঞ্চি—বোম্বাইয়ের ধারবাড় জেলার একটী স্থান। পশ্চিম-গঙ্গবংশীয় পরমাড়ি-মারসিংহ প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাম্রশাসনখানি শকসংবৎ ৮৯৩ অব্দে (৯৭১ খৃষ্টাব্দে) প্রদত্ত।

অদরনী—পার্শীদের মধ্যে প্রচলিত বিবাহের অঙ্গীভূত উৎসব-বিশেষ। বিবাহের পূর্ব্বে অথবা বিবাহের দিন বরের মাতা আত্মীয়-বান্ধবসহ কন্যাগৃহে উপস্থিত হইয়া কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করেন। কন্যার মাতা তাঁহাদিগকে মিষ্টান্ন দ্বারা অভ্যর্থনা করেন এবং বরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়গণকে বস্ত্রাদি দ্বারা সম্মানিত করেন; ইহাই অদরনী নামে প্রসিদ্ধ।

অদরিদ্র—(ত্রি) যাহাতে দরিদ্র নাই; দরিদ্রহীন।

অদর্শ—(পুং) যিনি দেখা দেন না। ২ অমাবস্যা। ৩ দর্পণ, আর্‌সী।

অদর্শন—(ক্লী) [ন দর্শনম্ দৃশ-ল্যুট্ নঞ্-তৎ] দর্শনাভাব। "বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ" (মনু ১০.৪৩) (ঋক্ প্রাতিশাখ্য ১৪.২৬) ২ লোপ। *। "অদর্শনং লোপঃ।" (পা ১.১.৬০) [নাস্তি দর্শনং যস্য বহুব্রী] (ত্রি) ৩ দৃষ্টিশূন্য। ৪ দর্শনের অবিষয়ীভূত। ৫ অসাবধানতা। ৬ অন্তর্হিত। ৭ তিরোভাব। "অদর্শনং গতঃ" (মহাভা° ৩.১১৫.৩৭)। ৮ মৃত্যু (বাঙ্‌লায়)।

অদর্শনপথ—(ক্লী) যে পথ দৃষ্টির বাহিরে, অপ্রত্যক্ষপথ, দৃষ্টির বহির্ভূত পথ।

অদর্শনীয়—(ত্রি) অগোচর, অদৃশ্য, যাহা দৃষ্টি দ্বারা দেখা যায় না। "জগন্তুরদর্শনীয়ম্" (পঞ্চতন্ত্র)

অদল—(পুং) [দল্যাতে ভিদ্যতে ইতি দলং পত্রং কর্ম্মণি ঘঞ্] দলশূন্য, (কথিত) হিজল গাছ (ত্রি) পত্রশূন্যবৃক্ষ। (ত্রি) ২ "দলঃ খণ্ডস্তচ্ছূন্যে" দল অর্থাৎ খণ্ড, তৎশূন্য। (স্ত্রী) ঘৃতকুমারী। ৩ ঘৃত।

অদল (আদল)—পূর্ব্ব আফ্রিকার একটী মুসলমান রাজ্য। এখানকার ইস্‌লাম এবং আবিসিনিয়ার খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে

যে যুদ্ধ হয় তাহাতে অদল রাজ্য বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল। বর্ত্তমানে "Cote Francaise des Somalic" নামে যে প্রদেশ পরিচিত উহাকেই মোটামুটি প্রাচীন অদল-রাজ্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। অধিবাসীরা কতক সোমালি, কতক আফর (দনাকিল)। আবিসিনিয়ার রাজা আম্দ সেয়ন (১৩১৪—১৩৪৪) এবং মুসলমানদের মধ্যে যে যুদ্ধ হইয়াছিল সেই প্রসঙ্গেই অদলের নাম প্রথম শুনা যায়। ১৩৩২ খৃষ্টাব্দে আম্দ সেয়নের সহিত অদল রাজ্যের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে অদলরাজ পরাজিত ও নিহত হন। জারা য়াকুব (খৃঃ ১৪৩৪—১৪৬৮) এবং বয়েদা মারিয়ামের (খৃঃ ১৪৬৮—১৪৭৮) রাজত্বকালে আবিসিনিয়া এবং অদলের মধ্যে সন্ধি হয়। এই সন্ধির পরেও অনেকবার উভয় রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল।

অদলপুর—সিন্ধুদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী সিকারপুরের এক নগর। অক্ষা°- ২৭°৫৬′ উ°, দ্রাঘি° ৬৯°২১′১৫″ পূ°। প্রায় ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপিত হয়। অধিবাসীর অধিকাংশই মুসলমান। এই মুসলমানগণ সাধারণ কলরার নামে পরিচিত। অধিবাসী হিন্দুদের মধ্যে অধিকাংশই বেণিয়া জাতি।

অদলবদল—(দেশজ) তুল্যদ্রব্যের বিনিময়, পরিবর্ত্তন, হেরফের।

অদলা—(স্ত্রী) ঘৃতকুমারী। (রাজনি°)

অদবিয়র (অড়বিয়র)—তাঞ্জোর ও তিন্নেবেল্লী জেলার তামিল ভাষাভাষী তন্তুবায়সম্প্রদায়।

অদশন্—(ত্রি) দশ নয়, অর্থাৎ দশ সংখ্যা নহে। "তং বৈ দশভিরেব ক্রীণীয়ান্নাদশভিঃ" (শতপথব্রা° ৩.৩.৩.১৮)

অদশমাস্য—(ত্রি) দশমাসের অধিক নহে।

অদস্—(ত্রি—সর্ব্বনাম) [ন দস্-ক্বিপ্ ন দস্যতে নির্দ্দেশায় উৎক্ষিপ্যতেঽঙ্গুলির্যত্র, অপুরোবর্ত্তিত্বাৎ]। সেই। যে বস্তু সম্মুখের নহে তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য এই সর্ব্বনাম প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যে বস্তু বক্তার সম্মুখবর্ত্তী নহে অর্থাৎ বক্তা যাহা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতে পারেন না, তেমন স্থলে এই সর্ব্বনামের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

নিকটের বস্তু বুঝাইতে হইলে এতদ্ এই সর্ব্বনামের মত ইদম্ সর্ব্বনামের প্রয়োগ হয়। আর দর্শনাতীত বস্তু বুঝাইতে হইলে তদ্ সর্ব্বনামের মত অদস্ শব্দের প্রয়োগ হয়।

'অয়ং বৃক্ষঃ' এই গাছটী। এ কথা বলিলে এই বুঝাইল যে, বৃক্ষটী বক্তার নিকটেই রহিয়াছে, তিনি অঙ্গুলি দিয়া তাহা দেখাইতে পারিতেছেন। আবার, যদি বলা যায়, 'অসৌ বৃক্ষঃ' সেই গাছটী; তাহা হইলে বুঝাইবে যে, বৃক্ষটী বক্তার সম্মুখে নাই। এখানে ইদম্ শব্দের স্থানে এতদ্, আর অদস্ শব্দের স্থানে তদ্ প্রয়োগ করিলে ঠিক ঐ রূপ অর্থ থাকে। যেমন, 'অয়ং বৃক্ষঃ বা এষ বৃক্ষঃ' এই গাছ। 'অসৌ বৃক্ষঃ বা স বৃক্ষঃ' সেই গাছ। কিন্তু অদস্ শব্দে পুরোবর্ত্তী বস্তুকেও বুঝায়। যেমন—"অমূং পুরঃ পশ্যসি দেবদারুম্'। (রঘু ২.৩৬) ঐ যে সম্মুখবর্ত্তী দেবদারু গাছটী দেখিতেছ। কোন বস্তু সম্মুখে থাকিলেও যদি অত্যন্ত দূরবর্ত্তী বলিয়া কষ্টে দেখিতে হয়, তাহা হইলেও সেখানে অদস্ শব্দ প্রযুক্ত হয়। বাঙ্গালায় 'সেই' সর্ব্বনামটী সংস্কৃত সঃ কিংবা অসৌ শব্দের অপভ্রংশ। হিন্দী ও ব্রজবুলীতে 'সেই' সর্ব্বনামের স্থানে 'সো' ব্যবহৃত হয়—

"মাধব! সো অব সুন্দরী বালা,
অবিরত নয়নে, বারি ঝরু ঝর করে
যেন ঘন শাওণ মালা।" (বিদ্যাপতি)

অদস্ শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। পরার্থ প্রয়োগের নাম উপদেশ। অদঃকৃত্য। অদঃকৃতম্ ইত্যাদি। অদস্ শব্দের প্রয়োগ বেদাদিতে ভূরি ভূরি দেখা যায়। বস্তুনির্দ্দেশই এই শব্দের মূল অর্থ। যথা,—এখানে লোকসমাজে ধন্যবাদার্হ হইয়া পরে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। "ততে মুঞ্চামুঞ্চ লোকং প্রাপ্নোত্যনিন্দিতঃ" (মনু ১০.১২৮) "প্রাণোঽসৌ লোকঃ" (বৃহদারণ্যক উপ° ১.৫.৪; তৈত্তিরীয়ব্রা° ৩.১.১.৮) আশ্রমবাসিগণ এই শ্রৌতবিধি (বেদবিধি) দ্বারা সংকার করিয়া ইত্যাদি। "অমুনাশ্রম-বাসিনা শ্রৌতেন বিধিনা সৎকৃত্য" (শকুন্তলা)

এই মৃগ কাক কর্ত্তৃক রক্ষিত। "অসৌ মৃগঃ কাকেন রক্ষিতঃ" (হিতোপ° ১.৪৮)। এই দশরথপুত্র রাম মহাযশাঃ। "পুত্রো দশরথস্যাসৌ রামো নাম মহাযশাঃ" (রামাঃ ৩.১৮.১০) "যদদো বাত তে গৃহেঽমৃতস্য নিধির্হিতঃ"। (ঋক্ ১০.১৮৬.৩)। হে বায়ো! তোমার গৃহে এই যে অমৃতের নিধি স্থাপিত দেখা যাইতেছে" "যদদোঽদোঽভ্যগচ্ছম্" (অথর্ব ১৬.৭.৯)। ইহা ব্যতীত উপনিষদ্ প্রভৃতিতে অনেক উদাহরণ দৃষ্ট হয়। সাহিত্যদর্পণের দোষ-পরিচ্ছেদে যদ্ ও তদ্ শব্দের পরিবর্ত্তে এতদ্ ও অদস্ শব্দের প্রয়োগ স্বীকৃত হইয়াছে। কাব্যপ্রকাশ-কার লিখিয়াছেন, "ইদং শব্দবদদঃশব্দস্তচ্ছব্দার্থমভিধত্তে"

অদস্ (বা অড়স্)—বোম্বাইয়ের খেড়া জেলার এক সমতল ভূখণ্ড। আনন্দ তালুক ও মহী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থলে অবস্থিত। অক্ষা° ২২°২৯′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬·২′ পূঃ। আধুনিক কালে এখানে তিনটী যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে। ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে সুরাটের শাসনকর্ত্তা রুস্তম আলী এবং নিজাম-উল-মুলকের সেনাপতি হামিদ খাঁর মধ্যে এখানে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে রুস্তম আলী পিলাজী গায়কবাড়ের বিশ্বাসঘাতকতায় নিহত হন। ১৭৭৫

খৃষ্টাব্দে মরাঠাগণ সম্মিলিত হইয়া এখানে রঘুনাথ রাও পেশবাকে পরাজিত করেন। তাহার ৪ মাস পরেই এই স্থলে মরাঠা সৈন্যদল কর্ণেল কিটিং কর্ত্তৃক পরিচালিত বৃটিশ সৈন্য-দলের নিকট পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল।

অদাতৃ—(ত্রি) [ন দা-তৃচ্ নঞ্-তৎ] কৃপণ, যে দাতা নহে। "আদাননিত্যাচ্চাদাতুরাহরেদপ্রযচ্ছতঃ" (মনু ১১.১৫) "কালেঽদাতা পিতা" (মনু ৯.৪)। (স্ত্রী) ঙীপ্-অদাত্রী।

অদান—(ক্লী) [ন দানম্ অভাবার্থে নঞ্-তৎ] ১ দানাভাব। [নাস্তি দানং ত্যাগো মদজলং বা যস্য]। (ত্রি) ২ দানশূন্য।

"সদা দানপরিক্ষীণঃ শস্ত এব করীশ্বরঃ।
অদানঃ পীনকায়স্তু নিন্দ্যত এব গর্দ্দভঃ॥" (পঞ্চতন্ত্র ১১.৭৩)

"যে বশায়া অদানায় বদন্তি পরিরাপিণঃ" (অথর্ব ১২.৪৫.১)। (পুং) ৩ মদজলশূন্য হস্তী; ৪ যে দানপ্রতিভূ নহে অর্থাৎ টাকা দেওয়ার জন্য জামীন নহে।

অদানব—(ত্রি) [ন দানবা যত্র নঞ্-বহুব্রী] দানবশূন্য।

অদান্ত—(ত্রি) [ন দান্তং দম-ণিচ্-ক্ত কর্ম্মণি] অবিনীত। ২ যাহার ইন্দ্রিয় দমন হয় নাই।

অদান্য—(ত্রি) কার্পণ্যহেতু দান করিতে অনিচ্ছুক। অজ্ঞত্ব আরোপের দ্বারা দানের অযোগ্য বলিয়া যিনি মনে করেন। "পণ্ডিতানপি অদান্যান্ অজ্ঞত্বারোপেণ দানানর্হান মন্যমানাঃ।" (সায়ণ)। "অদান্যান্তসোমপান্ মন্যমানো যজ্ঞস্য" (অথর্ব ২.৩৫.৩)

অদাভ্য—(ত্রি) [ন দম্ভ-ণ্যৎ; নঞ্-তৎ] অহিংস্য। "যত্তে সোমাদাভ্যং নাম জাগৃবি" (শুক্লযজুঃ ৭.২) "ইন্দ্রং দিপ্সন্তি দিপ্সবোঽদাভ্যম্" (ঋক্ ৭.১০৪.২০) যাহারা জিঘাংসু হইয়া অহিংসনীয় ইন্দ্রকে হিংসা করিতে ইচ্ছা করে। এই শব্দ ঋগ্বেদের বহুস্থানে রহিয়াছে। (ঋক্ ১০.৫৪.৪; ৯.৩.২)

অদামন্—(ত্রি) অনুদার, কৃপণ। ২ যজ্ঞীয় হবির অদাতা। "মা ত্বাদামান আদভন্মঘোনঃ" (ঋক্ ৬.৪৪.১২) ৩ অন্যজন কর্ত্তৃক অবদ্ধ বা অনিরুদ্ধ। "ইন্দ্র দামন্বন্তো অদামানঃ সুদামন্" (ঋক্ ৬.২৪.৪)

অদায়—(ত্রি) [নাস্তি দায়ো যস্য] যে দায়াদ পৈতৃক বিষয়ের অংশ পাইবার যোগ্য নহে, পতিত জ্ঞাতি প্রভৃতি।

অদায়াদ—(ত্রি) [ন দায়াদঃ। দায়ং বিভজনীয়ধনমাদত্তে ইতি দায় আ-দা-ক, অথবা দায়মত্তীতি দায়-অদ-অণ্ উপপদস°] ১ অসপিণ্ড। ২ পতিত জ্ঞাতি। ৩ যে পিত্রাদি ধনের অধিকারী নহে। ৪ সপিণ্ড ভিন্ন। যথা মানবধর্ম্মশাস্ত্রে,

"পুত্রান্ দ্বাদশ যানাহ নৃণাং স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
তেষাং ষড়্ বন্ধুদায়াদাঃ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ॥
ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ।
গূঢোৎপন্নোঽপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবাশ্চ ষট্॥" (মনু ৯.১৫৮-১৫৯)

অদায়িন্—(ত্রি) অদাতা, যে দান করে না

অদার—(ত্রি) যাহার দার নাই, স্ত্রীহীন, বিপত্নীক। ২ অকৃত-দার, অবিবাহিত। "(বানরাঃ) অদারাশ্চ সদারাশ্চ" (রামা° ৪.১৮.১৫)

অদারসৃৎ—(ত্রি) স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হওয়া।

অদারিকা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] বৃক্ষকমল, বৃক্ষোৎপল, ওলট কম্বল। (বৈদ্যকনি°)

অদালজ—গুজরাটের আহ্মদাবাদের নিকটবর্ত্তী একটী স্থান। এখানে ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে (মোগলসম্রাট্ মহম্মদ শাহের শাসন-কালে) মুবারিজ-উল্-মুল্ক এবং মহারাজ অভয়সিংহের মধ্যে এক যুদ্ধ হয়। মহারাজ অভয়সিংহ যখন মোগল সম্রাটের প্রতি-নিধি নিযুক্ত হইয়া আহ্মদনগর অভিমুখে অগ্রসর হন, তখন পূর্ব্ব-তন প্রতিনিধি সম্রাট্ মুবারিক-উল্-মুলক তাঁহাকে বাধা প্রদান করেন। অভয়সিংহ বিংশসহস্র সৈন্য ও আপন ভ্রাতা ভকত-সিংহকে সঙ্গে দিয়া সরদার মহম্মদ ঘোরণীকে মুবারিক-উল্-মুল্কের বিপক্ষে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সরদার মহম্মদ আক্রমণে সাহসী না হইয়া স্বয়ং মহারাজের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। এদিকে মহারাজ সফ্দার খাঁ বাবি ও জবান্ মরদ্ খাঁ বাবিকে লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। অদালজে উভয় পক্ষে যে যুদ্ধ হইল তাহাতে অভয়সিংহ পরাজিত হই-লেন। পরে অভয় সিংহ ও মুবারিক-উল্-মুল্কের মধ্যে সন্ধি হইল। তদনুসারে মুবারিক মহারাজের নিকট হইতে একলক্ষ টাকা লইয়া তাঁহাকে আহ্মদনগর ছাড়িয়া দেন ও আগ্রায় প্রস্থান করেন।

অদাবদ্ (অদাবড় ?)—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর খান্দেশ জেলার একটী ক্ষুদ্র সহর, চোপড়া হইতে ৬ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। পূর্ব্বে মহকুমার প্রধান শহর থাকায় এ স্থান অধিকতর প্রসিদ্ধ ছিল। শহরের মধ্যস্থলে একটী প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। শ্যামদাস গুজরাটী নামক জনৈক ধনিব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত লালবাগ উদ্যান ও তন্মধ্যস্থ বাঁধান একটী জলাশয় আছে। শহরের উত্তর দিকে প্রস্তরভিত্তির উপর নির্ম্মিত এক মস্জিদ আছে। উহার সিঁড়িতে উৎকীর্ণ পারসী লিপি হইতে জানা যায়, উহা ১০৮৯ হিজরা বা ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। শহরের দেড় ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে উনাব-দেবের উষ্ণ প্রস্রবণ বিদ্যমান। এখানকার অধিকাংশ অধি-বাসীই ভীল জাতীয়।

অদাশুরি—(ত্রি) অদানশীল। "যস্তে রেবাঁ অদাশুরিঃ প্রমমর্ষ" (ঋক্ ৮.৪৫.১৫)

অদাশুস্—(ত্রি) অযজমান বা হব্যরহিত। "যঃ শশ্বতো অদাশুষো গয়স্য" (ঋক্ ৭.১৯.১) ২ হবির অদাতা, যে হবি প্রদান করে না। "অদাশুষাং তেষাং নো বেদঃ" (ঋক্ ১.৮১.৯)

অদাশূ—(ত্রি) দানরহিত, যে ব্যক্তি দান করে না। "হরিবো অদাশূন্" (ঋক্ ১.১৭৪.৬)

অদাস—(পুং) দাসভিন্ন। "প্রসাধনোপচারজ্ঞমদাসং দাস-জীবনম্" (মনু ১০.৩২) টীকাকার কুল্লুক অদাস শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'উচ্ছিষ্ট ভক্ষণাদি দাস-কর্ম্মরহিত ব্যক্তি'। ২ দাসত্ব-মুক্তজন, স্বাধীন। "অদাসো গচ্ছ মুক্তোঽসি" (মহাভা' ৩.২৭১.২১)

অদাহক—(ত্রি) যে জ্বলে না। ২ যাহাকে জ্বালাইবার শক্তি নাই।

অদাহন—(ক্লী) যেখানে দাহন (অর্থাৎ শবসৎকার) হয় নাই, শবদাহশূন্য স্থান।

অদাহ্য—(ত্রি) [ন দগ্ধুমর্হ্যং দহ অর্হে ণ্যৎ, নঞ্-তৎ] যে মৃত ব্যক্তি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অযোগ্য ; যাহাকে দাহ করিতে নাই। শাস্ত্রকারেরা এই কয়েক ব্যক্তির মৃত দেহ দাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন,—

যে সকল পশুর শিং দাঁত কিংবা নখ আছে (যেমন গণ্ডার, সিংহ, ব্যাঘ্র এবং ভল্লুক), সর্পবিষ, অগ্নি, স্ত্রীলোক, জল এই সকলের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে করিতে যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তবে সে মৃতদেহ দাহ করিবে না। মৃত্যু হউক বলিয়া কেহ যদি সাপকে রাগাইয়া দেয় কিংবা বিদ্যুতে পুড়িয়া মরে, তবে শাস্ত্রানুসারে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নাই। চুরি করার অপরাধে যদ্যপি রাজা কাহারও প্রাণদণ্ড করেন, অথবা পরের স্ত্রীতে আসক্ত দেখিয়া যদ্যপি তাহার স্বামী সেই দুরাচারের প্রাণবধ করে, তাহা হইলে তেমন সকল ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিষিদ্ধ। উৎকৃষ্ট বর্ণের কোন ব্যক্তি নীচ চণ্ডালাদির সঙ্গে কলহ করিয়া বিনষ্ট হইলে তাহাকে দাহ করা শাস্ত্রসম্মত নহে। যে পাষণ্ড ব্যক্তি কাহাকেও যদি বিষ ঔষধ খাওয়ায়, কিংবা ঘরে আগুন দেয় অথবা কোন লোককে বিষ দিয়া মারে, তবে তাহার মৃত-দেহ অদাহ্য। রাগের বশে কেহ যদি বিষ খাইয়া, আগুনে কিংবা জলে ঝাঁপ দিয়া অথবা কোন অস্ত্রাঘাতে বা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে কিংবা নির্ঝরে বা পর্ব্বত অথবা বৃক্ষ হইতে পড়িয়া মরে ; সে নরাধমের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে নাই। চর্ম্ম-পাদুকা নির্ম্মাণ প্রভৃতি কুশিল্প দ্বারা যাঁহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে কিংবা যাহারা বধ্যভূমির অধিকারী জল্লাদ প্রভৃতি, যাহাদের মুখে ভগাঙ্গের মত চিহ্ন হয় ; যাহারা নপুংসক কিংবা ক্লীবপ্রায় এবং ব্রাহ্মণকে দণ্ড করার জন্য যাহারা রাজা কর্ত্তৃক নিহত হয় এইরূপ মহাপাতকীরা পতিত। পতিত ব্যক্তি মরিলে শাস্ত্রে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা নাই। তাহার আত্মীয়-স্বজনকে চক্ষের জলও ফেলিতে নাই। যদি কেহ ভ্রমবশতঃ তেমন ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কিংবা শ্রাদ্ধাদি করে, তাহা হইলে দুইটী তপ্তকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হওয়া চাই।

অদাহ্য (uninflamable)—যাহা দহন করা বা পোড়ান যায় না তাহাকে অদাহ্য কহে। বিজ্ঞানের হিসাবে নিছক অদাহ্য পদার্থ বলিয়া কিছু নির্দ্দেশ করা কঠিন ; অদাহ্য ও দাহ্য উভয়ই পরস্পরের সহিত আপেক্ষিক সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ। আমরা বলি অম্লজন অদাহ্য, কিন্তু দহন কার্য্যের সহায়তা করে, আর উদজন দাহ্য বায়ু। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে পরস্পরের সহায়তায় উভয়ই দাহ্য। মোটামুটিভাবে একটী অতি সাধারণ পরীক্ষা দ্বারা ইহার যথার্থতা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

বাতাসে অম্লজন আছে ইহা প্রমাণিত সত্য, যদি উদজন নির্গত হইতেছে এমন একটী সরু নলের মুখে আগুন লাগাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে নির্গত উদজন বেশ জ্বলিতেছে দেখা যাইবে ; আবার ঐরূপ সরু নলের মুখ দিয়া নির্গত অম্লজন যদি উদজন বায়ুর মধ্যে রাখিয়া আগুন ধরাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যায় নলের মুখে অম্লজন জ্বলিতেছে। এই রূপে প্রায় সকল পদার্থের বেলাই দেখিতে পাওয়া যায়—উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থাকিলে যাহা আমরা সাধারণতঃ অদাহ্য বলিয়া জানি তাহাও দহনীয় হইয়া পড়ে। একটী মাত্র পদার্থকে সম্পূর্ণ অদাহ্য দেখিতে পাওয়া যায়—ইহা এস্‌বেস্টস্ (asbestos)।

অদিকল—(—দাস, ভৃত্য) মাদ্রাজ অঞ্চলে অম্বলবাসী নামক যে জাতি মন্দিরে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকে, অদিকলেরা তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই উপাখ্যানটী শুনা যায় যথা—ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মানুরক্তি পরীক্ষা মানসে শঙ্করাচার্য্য একদা এক শৌণ্ডিকের দোকানে উপস্থিত হইয়া মদ্যপান করিলেন। তাঁহার অনুকরণে সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণ-গণও শাস্ত্রশাসন বিস্মৃত হইয়া মদ্যপান করিতে লাগিলেন। অতঃপর শঙ্করাচার্য্য এক কর্ম্মকারের গৃহে উপস্থিত হইয়া এক পাত্র দ্রবীভূত ধাতু পান করিয়া ফেলিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকেও এক এক পাত্র পান করিতে আদেশ করিলেন ; কারণ ব্রাহ্মণগণ সর্ব্ববিষয়ে আচার্য্যের অনুগামী হইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। তখন উক্ত মদ্যপ ব্রাহ্মণগণ অনুতপ্ত হইয়া 'অতিয়াল' বা দাসানুদাস-রূপে শঙ্করাচার্য্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ও আত্মকৃত পাপের জন্য দাস-শ্রেণীতে পরিগণিত হইলেন। অধুনা

ভদ্রকালী প্রভৃতি যে সকল দেবদেবীকে সুরা দ্বারা পূজা করা হইয়া থাকে, সেই সকল দেবদেবীর মন্দিরে অদিকলগণ সেবাইত নিযুক্ত হয়। ইহারা ভেল্কি দেখায় এবং ঝাড়া পোঁছাও করে। ইহাদের মধ্যে উপনয়নসংস্কার, গায়ত্রীপাঠ, ত্রয়োদশাহ অশৌচ পালন প্রভৃতি প্রচলিত আছে। সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে ইহাদের নিজ-সম্প্রদায়ের লোকেই পৌরোহিত্য করে।

অদিক—(ত্রি) আকাশে যাহার অংশ নাই। ২ আকাশের নিম্ন হইতে নির্ব্বাসিত।

অদিচ্চন—দক্ষিণ ভারতীয় নায়ার জাতির শাখাবিশেষ।

অদিতি—(স্ত্রী) [দো অবখণ্ডনে ক্তিচ্ ন দীয়তে খণ্ড্যতে বৃহত্ত্বাৎ ; ন দিতিঃ অদিতিঃ, বিরোধার্থে নঞ্-তৎ] দিতি, দৈত্যগণের মাতা, অদিতি যিনি দৈত্যগণের মাতা নহেন। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদিতে কথিত আছে যে, অদিতি দক্ষের কন্যা, মহর্ষি কশ্যপের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। নিরুক্তের সঙ্গে যে নিঘণ্টু আছে, তাহাতে অদিতি শব্দের কএকটী পর্য্যায় দেওয়া হইয়াছে, যথা—১ পৃথ্বী, ২ বাচ, ৩ গো, ৪ দ্যাবাপৃথিব্যৌ (দ্যুলোক ও পৃথিবী) (নিঘণ্টু ১.১.,২.১১,৩.৩০) নিরুক্তে অদিতিকে দেবমাতা ও স্ত্রীলোকের মধ্যে 'প্রথম গামিনী' বলা হইয়াছে। (নিরুক্ত ৪.৩২.;১১.২২) ঋগ্বেদে দেবতাদিগের জন্ম বিবরণে অদিতি সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধতরূপ তথ্য দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

'আমরা সংকীর্ত্তন করিয়া দেবতাদের জন্মবৃত্তান্ত বলিতেছি। আমাদের এই উক্থ-গায়কদের মধ্যে যে কেহ হউক্ উত্তর যুগে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইবেন।

ব্রহ্মণস্পতি, কর্ম্মকারের মত এই সমস্ত ফুকিয়া (কামারের যাঁতা ফুকার মত) নির্ম্মাণ করিলেন।

দেবতাদিগের প্রথম যুগে অসৎ হইতে সৎ সকল উৎপন্ন হইল। তাহার পর উত্তানপদ্ হইতে পৃথিবীর জন্ম, পৃথিবী হইতে দিক্ (আশা) সকল এবং অদিতি হইতে দক্ষ, আবার দক্ষ হইতে অদিতি জন্মিলেন। অতএব হে দক্ষ! যে অদিতি জন্মিয়াছেন, তিনি তোমার কন্যা। এই অদিতি হইতে ভদ্র ও অমৃতবন্ধু দেবতারা জন্মগ্রহণ করেন। যখন ঐ সকল দেবগণকে জলের উপর তুমি আন্দোলিত করিয়াছিলে, তখন নর্ত্তকীদের মত তোমার নিকট হইতে তীব্র ধুলা উড়িয়াছিল। যখন দেবতারা যতিদের মত ভুবন পরিপূর্ণ করিতেছিলেন, তখন তুমি সমুদ্রের ভিতর হইতে গুপ্তসূর্য্যকে উদ্ধার করিয়াছিলে। অদিতির যে আটটী সন্তান জন্মিয়াছিল তাহার মধ্যে তিনি সাতটী পুত্রকে লইয়া দেবলোকে গিয়াছিলেন, শুধু মার্ত্তণ্ডকে ফেলিয়া যান। পূর্ব্বকালে অদিতি সপ্তপুত্রসহ চলিয়া গেলেন আর মার্ত্তণ্ডকে জন্মের জন্য এবং মৃত্যুর জন্য প্রসব করিলেন।' (ঋক্ ১০.৭২.১৯) আদিত্যগণ অদিতির সন্তান। ঋগ্বেদের ২য় মণ্ডলের ২৭ সূক্তে কেবলমাত্র ছয়জন আদিত্য এইরূপ লেখা আছে, যথা, ১ মিত্র, ২ অর্য্যমা, ৩ ভগ, ৪ বরুণ, ৫ দক্ষ এবং ৬ অংশ। ৯ম মণ্ডলের ১১৪ সূক্তে সাতজন আদিত্যের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাদের নাম নাই। ১০ম মণ্ডলের ৭২ সূক্তে অদিতির আটটী পুত্রের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে অদিতি মার্ত্তণ্ডকে ত্যাগ করিয়া ৭ জনকে লইয়া দেবলোকে চলিয়া যান। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে অষ্টাদিত্য স্বীকৃত হইয়াছে, যথা,—১ ধাতা, ২ অর্য্যমা, ৩ মিত্র, ৪ বরুণ, ৫ অংশ, ৬ ভগ, ৭ ইন্দ্র ও ৮ বিবস্বান্। শতপথব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্যের উল্লেখ দেখা যায় এবং এই দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ মাসের সূর্য্য-রূপে কীর্ত্তিত "কতমে আদিত্যা ইতি। দ্বাদশমাসাঃ সম্বৎসরস্য এতে আদিত্যাঃ।" (শতপথব্রা° ১১.৬.৩.৮) মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণে দ্বাদশ আদিত্যের কথা শতপথের অনুরূপ দেখা যায়। (মহাভা° আদিপ° ১২১ অঃ ; বিষ্ণুপু° ১.১৬.৯০)

অদিতি শব্দের অর্থও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। দিত ধাতু বন্ধনে বা খণ্ডনে বা ছেদনে, যাহা অখণ্ড, অচ্ছিন্ন, অসীম, তাই অদিতি, অতএব অদিতি অর্থে অনন্ত আকাশ বা অনন্ত প্রকৃতি, সুতরাং অদিতি সকল দেবের জনয়িত্রী এবং যাস্ক তাঁহাকে "অদীনা দেবমাতা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অসীমতার প্রথম আর্য্য নাম 'অদিতি' ; ইহা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও স্বীকার করেন, সে বিষয়ে তাঁহাদের দুইটী মত নিম্নে উল্লিখিত হইল—

"Aditi, an ancient god or goddess, is in reality the earliest name invented to express the Infinite ; not the Infinite as the result of a long process of abstract reasoning, but the visible by the naked eye, the endless expanse beyond the earth, beyond the clouds, beyond the sky." (Max Muller's Rig-Veda [Translation], Vol. I [1869], p. 230.)

"Aditi, eternity or the eternal, is the element which sustains, and is sustained by the Adityas. ....This eternal and inviolable principal......is the celestial light."—(Roth, translated by Muir, Sanskrit Texts, Vol. V [1864], p. 237.)

১০ম মণ্ডল ৭২ সূক্তের চতুর্থ ঋকে বলা হইয়াছে যে, 'অদিতি হইতে দক্ষ জন্ম লইয়াছেন, আবার দক্ষ হইতে অদিতি জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন।' এই প্রকার ঘটনা একেবারে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। তজ্জন্য যাস্ক নিরুক্তে লিখিয়াছেন—"আদিত্যো-

দক্ষ ইত্যাহুরাদিত্যমধ্যে চ স্তুতঃ। অদিতির্দাক্ষায়ণী অদিতের্দক্ষাঽজায়ত, দক্ষাদদিতিঃ পরি ইতি চ তৎ কথমুপপদ্যেত। সমানজন্মানৌ স্যাতামিতি। অপি বা দেবধর্ম্মেণ ইতরেতরজন্মানৌ স্যাতামিতরেতরপ্রকৃতী।” (নিরুক্ত ১১.২৩) দক্ষকে আদিত্য অর্থাৎ অদিতির পুত্র বলা হইয়াছে এবং আদিত্যদের মধ্যেও তাঁহার স্তুতি করা হয়। কিন্তু অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিয়াছেন এবং দক্ষ হইতে অদিতি জন্মিয়াছেন—এই ঋক্ অনুসারে অদিতিকে দাক্ষায়ণী অর্থাৎ দক্ষের কন্যা বলা হইয়াছে। তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তাঁহাদিগের সমান জন্ম বলা যাইতে পারে কিংবা দেবধর্ম্মানুসারে তাঁহারা উভয়ে পরস্পর হইতে জন্মিয়াছেন এবং পরস্পরের প্রকৃতিও পাইয়াছেন। ঋগ্বেদের অনেক স্থানে অদিতিকে শাপ নিবারণ করিবার নিমিত্ত আবাহন করা হইয়াছে এবং স্থলবিশেষে রাজমাতা বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে—‘রাজমাতা অদিতি শত্রুগণকে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে অন্যদেশে লইয়া যাউন।’ (ঋক্ ২.২৭.৭) ‘হে অদিতি! হে মিত্র! হে বরুণ! আমরা যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি তাহা হইলে সদয় হইয়া মার্জ্জনা কর।’ (ঋক্ ২.২৭.১৪) অদিতিকে পৃথিবী বলিয়া নিম্নোক্ত ঋকে উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা—‘হে যুবতম অগ্নি! যদ্যপি তোমার পরিচারকগণের মধ্যে আমরা অজ্ঞানবশতঃ কোন পাপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তুমি আমাদিগকে অদিতির নিকট (অর্থাৎ পৃথিবীর নিকট) সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ করিয়া দাও।’ (ঋক্ ৪.১২.৪) নিম্নোদ্ধৃত ঋকে অদিতিকে তেজস্বী অশ্ব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সায়ণ ভাষ্যে লিখিয়াছেন, “নোঽস্মানদিতিরদীনোঽশ্বোঽনাগাস্ত্বং কৃণোতু। সর্ব্বতো নিষ্পাপত্বং করোতু।” অর্থাৎ তেজস্বী অশ্ব আমাদিগকে পাপ হইতে বিরত করুক। (ঋক্ ১.১৬২.২২)

‘আমরা যেন দেব সবিতার আজ্ঞাক্রমে অদিতির নিকট নিরপরাধ হই’ এইরূপ প্রার্থনাও ঋগ্বেদের বহুস্থানে দৃষ্ট হয়। (ঋক্ ৫.৮৬.৬;৭.৮৭.৭;৭.৯৩.৭;১০.১২.৮) অদিতিকে পুত্রকন্যা এবং গবাদি পশুর হিতকারিণী বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে। সায়ণ “অদিতি অর্থে ভূমিঃ” করিয়াছেন। (ঋক্ ১.৪৩.২ সায়ণ দ্র°)। অনেক স্থলে অদিতিকে দেবী নামে সম্বোধন করা হইয়াছে। যথা অদিতি দেবী দেবগণের সহিত আমাদিগকে পালন করুন। (ঋক্ ৪.৫৫.৭ ; ৪.৫৫.৩) ইহা ব্যতীত নিম্নোল্লিখিত ঋক্‌সমূহেও অদিতি দেবীরূপে স্তুত হইয়াছেন, (ঋক্ ৫.৫১.১১ ; ৩.৫০.১ ; ৭.৩৮.৪ ; ৭.৪৬.২ ; ৮.২৫.১০ ; ৮.২৭.৫ ; ৮.৫৬.১০)

‘দ্যুতিমতী শত্রুরহিতা (অপ্রতিকূলা) অদিতি দেবী আমাদিগকে রক্ষা করুন’ (ঋক্ ২.৪০.৬) এইরূপ ভাবেও অদিতিকে বহু স্থানে স্তব করা হইয়াছে। (ঋক্ ৭.৪০.৪ ; ১০.৯২.১৪) ক্ষিতিধারিণী জ্যোতিষ্মতী (ঋক্ ১.১৩৬.৩), রাজপুত্রা (ঋক্ ২.২৭.৭), উগ্রপুত্রা (ঋক্ ৮.৫৬.১১), সুপুত্রা (ঋক্ ৩.৪.১১), শূরপুত্রা অর্থাৎ বীরপ্রসবিনী (অথর্ব ৩.৮.২;১১.১.১০) পঞ্চজনা বিশ্বজন্যা (ঋক্ ৭.১০.৪) ‘উরুব্যচাঃ’ অর্থাৎ বহুবিস্তীর্ণা (ঋক্ ৫.৪৬.৬) পস্ত্যা অর্থাৎ সর্ব্বগন্তব্যা (ঋক্ ৪.৫৫.৩) এইরূপ ভাবে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে অদিতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

অনেক স্থলে অদিতি অর্থে পৃথিবী হইতেছে। (ঋক্ ১.২৪.১;১.৪৩.১;১০.৬৫.১;১০.১৩২.৬ ; অথর্ব ১৩.১.৩৮) ঋগ্বেদের আবার অনেক মন্ত্র পাঠ করিলে জানা যায় যে, অদিতি পৃথিবী হইতে ভিন্ন ছিলেন।—‘হে হিংসকগণের ক্ষেপণকারী, সাধুগণের পালক, অপ্রতিহতপ্রভাব শক্তিমান, অধীশ্বর, শোভন গৃহপ্রদাতা, নিত্য তরুণ, নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী, স্বর্গের নেতা অদিতিপুত্রগণ! আমি অদিতির শরণ লইতেছি, কারণ তিনি মদীয় পরিচর্য্যা কামনা করেন! হে দ্যুলোকপিতঃ! হে উপকারিণী পৃথিবী! হে অগ্নি ও বসুগণ! তোমরা আমাদের প্রতি কৃপা কর। হে অদিতিপুত্রগণ ও অদিতি! তোমরা সমবেত হইয়া আমাদিগকে সমধিক সুখ প্রদান কর।’ (ঋক্ ৬.৫১.৪-৫) ‘ইন্দ্র, পৃথিবী, পূষা, ভগ, অদিতি এই পঞ্চজন আমাদিগের বাসভূমি বর্দ্ধিত করুন। তাঁহারা যেন আমাদিগের সুখদাতা, অন্নদাতা, সৎপথপ্রদর্শক, শোভনরক্ষাকারী ও আশ্রয়দাতা হন।’ (ঋক্ ৬.৫১.১১) অনুরূপ উল্লেখ ঋগ্বেদের অন্যান্য স্থলেও দেখিতে পাওয়া যায় যথা—(ঋক্ ৩.৫৪.১৮-১০ ; ৫.৪৬.৩ ; ৯.৯৭.৫৮ ; ১০.৩৬.১-৩ ; ১০.৬৩.১০ ; ১০.৬২.১১)। যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদেও স্থানে স্থানে অদিতি হইতে পৃথিবী ভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। “পৃথিবী চ মেঽদিতিশ্চ মে দ্যৌশ্চ মে......যজ্ঞেন কল্পন্তাম্” (শুক্লযজুঃ ১৮.২২) “ভূমির্ম্মাতা অদিতির্নো জনিত্রং ভ্রাতান্তরিক্ষমভিশস্ত্যা নঃ।” (অথর্ব্ব ৬.১২০.২)

ঋগ্বেদে অদিতি ও দিতি শব্দের একই স্থানে প্রয়োগ দেখা যায়—‘হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা প্রত্যূষে সূর্য্যোদয় হইলে লৌহ-কীলক-সমন্বিত স্বর্ণখচিত রথে আরোহণ কর এবং তথা হইতে অদিতি ও দিতিকে অবলোকন কর’। (ঋক্ ৫.৬২.৮) মূলে ‘অদিতিং দিতিঞ্চ’ এইরূপ দৃষ্ট হয়। এই অদিতি ও দিতি শব্দের নানারূপ অর্থ করা হইয়াছে। সায়ণ অদিতি অর্থে অখণ্ডনীয়া পৃথিবী এবং দিতি অর্থে খণ্ডিতা প্রজাদি করিয়াছেন। মহীধর (শুক্লযজুঃ ১০.১৬) অদিতি অর্থে অদীনা বিহিতানুষ্ঠাতা

অর্থাৎ পুণ্যাত্মা এবং দিতি অর্থে দীন নাস্তিকাদি পাপাত্মা করিয়াছেন। সত্যব্রত সামশ্রমী অদিতি অর্থে অখণ্ডিতা স্বীয় সেনা, অথবা পুণ্যাত্মা এবং দিতি অর্থে খণ্ডিতা পরসেনা, অথবা পাপী এই অর্থ করিয়াছেন। অদিতি শব্দের (দো ধাতু হইতে) প্রকৃত অর্থ অখণ্ডিত, অসীম, অনন্ত, বিশ্ব, জগৎ। সুতরাং দিতি শব্দের প্রকৃত অর্থ জগতের খণ্ড বা সীমাবদ্ধ জগৎ। এই ঋকের অনুবাদ এইরূপ হইতে পারে যথা, 'হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা ......তথা হইতে অসীম বিশ্ব জগৎ এবং সীমাবদ্ধ জগৎও অবলোকন কর।' ইহার ফলে 'অদিতিং' অর্থও যাহা 'অদিতিং' 'দিতিং' অর্থও তাহাই দাঁড়ায়। "অদিতিমখণ্ডনীয়াং ভূমিম্" "দিতিং খণ্ডিতাং প্রজাদিকাম্" (ঋক্ ১.৮৯.১০ সায়ণ)

বাস্তবিক পক্ষে 'অদিতি' শব্দের উৎপত্তির পর ঐ শব্দের দেখা দেখি 'দিতি' শব্দটী উৎপন্ন হইয়াছে। ঋগ্বেদে 'দিতি' শব্দ তিনবার মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে (ঋক্ ৪.২.১১ ; ৫.৬১.৮, এবং ৭.১৫.১২) একবার উহার অর্থ 'অদিতি' আর দুইবার 'অদিতি ও দিতি' একত্র ব্যবহার হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম অদিতি অর্থাৎ বিশ্বজগৎ। ঋগ্বেদে শব্দ দুইটী এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে ভাষ্য, টীকা এবং উপাখ্যান ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। পুরাণে উপাখ্যানের চরম অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। পৌরাণিক 'অদিতি' ব্রহ্মার পৌত্রী এবং দেবগণের মাতা, দিতিও ব্রহ্মার পৌত্রী, তিনি দৈত্যগণের মাতা, কিন্তু ঋগ্বেদে দৈত্য শব্দের কোন উল্লেখ নাই।

পুরাণে অদিতিকে সুরমাতা এবং দিতিকে দৈত্যমাতা বলা হইয়াছে। মহীধরের মতে শুক্লযজুর্বেদের (১০.১৬) মন্ত্র হইতেই উহার সূত্রপাত হইয়াছে। কারণ পুরাণে সুরগণকে যজ্ঞানুষ্ঠাতা ও ধার্ম্মিক এবং অসুরগণকে যজ্ঞবিঘ্নকারী ও নাস্তিক বলিয়া ধরা হইয়াছে।

ঋগ্বেদের অনেক স্থলে অদিতিকে আদিত্যগণের মাতা বলা হইয়াছে (ঋক্ ৮.১৫.৩;৮.৪৭.৯;১০.৩৬.৩;১০.১৩.১৬ ; অথর্ব ৫.২.৯) কিন্তু কোনও স্থানে ইঁহাকে দ্বাদশ আদিত্যের মাতা বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। অথর্ববেদে 'অষ্টযোনি' ও 'অষ্টপুত্রা' নামের উল্লেখ আছে। (অথর্ব ৮.৯.২১) [অষ্টপুত্র দ্র°] অদিতি দেবী যে সকলের প্রিয় ছিলেন এবং তিনি রক্ষা করিলে কেহই হিংসা করিতে পারে না তাহা নিম্নোক্ত ঋক্-গুলি হইতে সম্যক্রূপে বুঝিতে পারা যায়—

'হে দেবি! বহু লোকের প্রিয় অদিতি! তুমি প্রতিপালন করিলে কেহই হিংসা করিতে পারে না। তুমি প্রজাবিশিষ্ট ও সুখপ্রদ দেবগণের সহিত সুন্দরভাবে আগমন কর। অদিতির পুত্রগণ দ্বেষ্টাগণকে পৃথক্ করিতে জানেন, বিস্তীর্ণ কর্ম্মকর্ত্তা রক্ষকগণ পাপ হইতে আমাদিগকে পৃথক্ করিতে জানেন। অদিতি আমাদিগের পশুগণকে দিবাভাগে রক্ষা করুন এবং সেই অদিতি রাত্রিকালেও রক্ষা করুন। সর্ব্বদা বর্দ্ধনশীল রক্ষা দ্বারা আমাদিগকে পাপ হইতে উদ্ধার করুন। স্তুতিযোগ্য অদিতি দিবাভাগে আমাদের নিকট আগমন করুন, সেই অদিতি শান্তিকর সুখ বিধান করিয়া শত্রুগণকে দূরীভূত করুন।' (ঋক্ ৮.১৮.৪.৭) ঋগ্বেদের কোন কোন স্থানে অদিতিকে বসুগণের দুহিতা, আদিত্যগণের ভগিনী এবং রুদ্রগণের মাতা বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা—

"মাতা রুদ্রানাং দুহিতা বসূনাং স্বসাऽদিত্যানাং অমৃতস্য নাভিঃ।
প্রনু বোচং চিকিতুষে জনায় মা গা মনাগামদিতিং বধিষ্ট॥"
(ঋক্ ৮.১০১.১৫)

মুইর সাহেব লিখিয়াছেন যে সামবেদ এবং অথর্ব্ববেদে অদিতির পুত্র ও ভ্রাতা দুইএরই প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে।

"ত্বষ্টা মে দৈব্যং বচঃ পর্জন্যো ব্রহ্মণস্পতিঃ।
পুত্রৈর্ভ্রাতৃভিরদিতির্নু পাতু নো দুষ্টরং ত্রায়মাণং সহঃ।"
(সাম ১.২৯৯ ; অথর্ব ৬.৪.১)

ত্বষ্টা দেব পর্জ্জন্য ও ব্রহ্মণস্পতি মদীয় দেবার্হ স্তুতিবচন শ্রবণ করুন এবং অদিতি পুত্রগণ ও ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত আমাদিগের বল রক্ষা করুন।

"May Tvastri, Parjanya and Brahmauaspati (preserve) our divine utterance. May Aditi with (her) sons and brothers preserve our invincible protecting utterance.' (Muir, O. S. Texts, Vol. V. p. 38)

কিন্তু উপরি উক্ত মন্ত্রে যে পুত্র ও ভ্রাতা শব্দের উল্লেখ আছে উহা অদিতির পুত্র ও ভ্রাতা সম্বন্ধে না হইয়া যদি স্তবকারীর পুত্র ও ভ্রাতা হয় তাহা হইলে যথার্থ অর্থসঙ্গতি হয়। এই সন্দেহের নিরাকরণ করিবার জন্য নিম্নে অপর একজন ইউরোপীয় পণ্ডিতের অনুবাদ দেওয়া গেল।

"Let the divine Artist preserve to us the divine gift of speech and Brahmanaspati give us rain and Aditi save us, and our sons and grandsons from the malicious violence and reproach of our enemies." (Stevenson'e Translation of Sama-Veda, p. 56)

ঋগ্বেদে প্রথমাংশে অদিতিকে দেবগণের জন্মভূমিরূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। যথা—'কে আমাকে এই মহতী পৃথিবীতে আবার ছাড়িয়া দিবেন। যাহাতে আমি পুনরায় পিতামাতাকে দর্শন করিতে পারি।' মূলে 'অদিতয়ে' আছে

সায়ণ অদিতি শব্দের পৃথিবী অর্থ করিয়াছেন। (ঋক্ ১.২৪।১০ সায়ণ)

পুরাণের মতে অদিতি দক্ষের কন্যা (মহাভা° ১.৯৬ অ° ; হরিবংশ ৩ অ° ; বিষ্ণুপু° ১.১৫.১৩১-১৩২) এবং কশ্যপের পত্নী ছিলেন। ইঁহার ১ বিবস্বান্, ২ অর্য্যমা, ৩ পূষা, ৪ ত্বষ্টা, ৫ সবিতা, ৬ ভগ, ৭ ধাতা, ৮ বিধাতা, ৯ বরুণ, ১০ মিত্র, ১১ শুক্র, ১২ অংশ এবং ১৩ উপক্রম এই ত্রয়োদশ পুত্র ছিলেন (শ্রীমদ্ভাগ°, বিষ্ণুপু° ; বামনপু° ৪৬ অ°) সমুদ্রমন্থন হইতে কর্ণাভরণ উৎপন্ন হইলে ইন্দ্র অদিতিকে প্রদান করিয়াছিলেন। (মৎস্যপু° ; হরিবংশ ১৬০ অ°) বিষ্ণু বামন অবতারে কশ্যপের ঔরসে ও অদিতির গর্ভে জন্ম লইয়াছিলেন। (শ্রীমদ্ভাগ° ; বিষ্ণুপু° বামনপু: ৪৬ অ:)

হরিবংশে লিখিত আছে যে, কশ্যপ বরুণের কামধেনুকে অপহরণ করিয়াছিলেন, এইজন্য ব্রহ্মা কশ্যপকে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, যে অংশের দ্বারা তিনি ধেনু অপহরণ করিয়াছেন, ঐ অংশে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া গোপত্ব লাভ করিবেন এবং উহার দুই ভার্য্যা অদিতি এবং সুরভি ইঁহার অনুগামিনী হইবেন। এইজন্য অদিতি পৃথিবীতে বসুদেবপত্নীরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং উহার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মিয়াছিলেন (হরিবংশ ৫৫ অ:)। তৈত্তিরীয়-সংহিতা ও বাজসনেয়-সংহিতায় অদিতি বিষ্ণুর পত্নী ছিলেন এইরূপ লিখিত আছে। (শুক্লযজু: ২৯.৩০ ; কৃষ্ণযজু: ৭.৫.১৪) অধ্যাপক উইলসনের মতে অদিতিকে দক্ষকন্যারূপে উল্লেখ করায় এরূপ অনুমান হয় যে উহা জ্যোতিষিক রূপক মাত্র।

জ্যোতিষ গ্রন্থে অদিতি নক্ষত্রাধিপতি পুনর্ব্বসুর নামান্তর। "দহনকমজশশিশূলভৃৎ অদিতি জীব" (জ্যোতিঃসার) অধ্যাপক রোথ বলেন যে, অদিতি অসীম এবং অনন্ত। মোক্ষমূলারের মতও প্রায় এই প্রকার। তিনি বলেন যে, অদিতির অর্থ অনন্ত, অক্ষয়, অমর, অসীম, এবং দিতির অর্থ সসীম।* রেগনিয়র সাহেব বলিয়াছেন যে "Aditi is the name of a divinity, a personification of the all, the mother of the gods." (E'tude sur l'idiome des Vedas. p.28)

বাস্তবিক পক্ষে অদিতির ইতিহাস আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, কারণ ইনি কে তাহা নির্ণয় করা এবং বিরোধ ভঞ্জন করা দুর্ঘট ব্যাপার সন্দেহ নাই। বোধ হয় অদিতি শব্দ একটী রূপক প্রয়োগ মাত্র, ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে। প্রথমে ঋষিরা উহা আকাশ বা অন্তরীক্ষের স্থানে প্রয়োগ করিতেন, তাহার পর ক্রমে অদিতি শব্দে দেবী বা ঋষিপত্নী বুঝাইতে লাগিল। ঋগ্বেদে দেবগণের আবাহনমন্ত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে, যথা—'হে দেবগণ! তোমাদিগকে নমস্কার করি, বন্দনা করি, পূজা করি, তোমরা অদিতি হইতে জন্ম লইয়াছ, অপ হইতে জন্মিয়াছ, পৃথিবী হইতে জন্মিয়াছ, তোমরা আমার আবাহন শ্রবণ কর।' (ঋক্ ১০.৬৩.২)

কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে, বৈদিক ঋষিগণ অসীম অনন্তময়ী প্রকৃতিকে নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া অদিতি শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। এই জন্য বেদে মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি সব নামেই অদিতির স্তব দেখা যায়। (ঋক্ ১.৮৯.১০ ; শুক্লযজু: ২৫.২৩ ; নিরুক্ত ৪.৪.২ ; ঐতরেয়ব্রা° ৩.৩.৭)

দেবরাজ নিরুক্তটীকায় অদিতির এইরূপ অর্থ করিয়াছেন যথা—"অদিতি এব দেবমাতা 'দ্যৌঃ', 'অদিতি' অদিতিরেব চ "অন্তরীক্ষম্' অদিতি এব 'মাতা' সর্ব্বভূত-নির্ম্মাত্রী, 'স' এব পিতা পালকঃ, 'স' এব হি 'পুত্রঃ' সৈব হি পরিতুষ্টা সতী স্তোতার পুরুণো বহুনঃ পাপাৎ ত্রায়তে ; অথবা সৈব নিপৃণাতি, সর্ব্বভূতানাং যন্নির্বর্ত্তব্যং দাতব্যমিত্যর্থঃ। যেঽপি চৈতে 'বিশ্বেদেবাঃ' সর্ব্বে দেবাঃ, এতেঽপি 'অদিতি' এব। 'পঞ্চজনাঃ' অদিতি এব সর্ব্বথাপি কিং বহুনা, যাবদেতৎ কিঞ্চিৎ 'জাতং' চ 'জনিত্বঞ্চ' 'জনিষ্যমানঞ্চ' সর্ব্বমপ্যেতদ্ 'অদিতিঃ' এব। এবমনেন মন্ত্রেণ মন্ত্রদৃক্ "অদিতের্ব্বিভূতিমাচষ্টে" দেবমাতুস্তৎ সর্ব্বমপ্যুপপদ্যত এব ; মহাভাগ্যাদ্দেবতায়াঃ। তদ্ভুত্তরত্র (দৈবতকাণ্ড ৭.১.৪) বক্ষ্যামঃ। এবমৈতিহাসিকপক্ষেন ; নৈরুক্তপক্ষেণ পুনঃ 'এতানি' দ্যুলোকাদীনি সর্ব্বাণি 'অদীনানি' অনুপক্ষীণানি ইতি যোজ্যং, ন হ্যেষাং ক্ষয়োঽস্তীতি।"

উক্ত মন্ত্র দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মাণ হইতেছে যে, অদিতি সামান্য নহেন ; সর্ব্বভূতাধিষ্ঠাত্রী, মূলপ্রকৃতি, দেবমাতা অর্থাৎ দ্যোতনাত্মক শক্তি এবং মধ্যস্থান-দেবতা অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণরূপা দেবী। এরূপ স্থলে কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে অদিতিকে দক্ষকন্যা বলা হয় কেন ? এবং সেই দক্ষই বা কে? সায়ণ ঋগ্বেদে স্বীয় ভাষ্যে ইহার যথাযথ আভাস প্রদান করিয়াছেন—"অদিতিমখণ্ডনীয়াং অদীনাং বা দেবমাতরম্, দক্ষং সর্ব্বস্য জগতঃ নির্ম্মাণে সমর্থং প্রজাপতিম্। যদ্বা প্রাণরূপেণ সর্ব্বেষু প্রাণিষু ব্যাপ্য বর্ত্তমানং হিরণ্যগর্ভম্। প্রাণো বৈ দক্ষ ইতি শ্রুতেঃ।" (ঋক্ ১.৮৯.৩ সায়ণ) সুতরাং জানা যাইতেছে যে দক্ষ স্বয়ং হিরণ্যগর্ভের প্রাণস্বরূপ। অতএব দ্যোতনাত্মক শক্তি—মূল প্রকৃতি 'অদিতি' প্রাণের দুহিতাস্বরূপা। এইরূপ হইলে প্রাণ প্রকৃতির পুত্রও হইতে পারে।

* Muir's O. S. Texts, Vol. V. p. 37. Max Muller's Origin and Growth of Religion, p. 227—232. Hillebrand's uber die Gotten Aditi, 1876.

এইপ্রকার ব্যাখ্যা দ্বারা কশ্যপকে পুরুষ এবং মূলপ্রকৃতি অদিতিকে তাঁহার পত্নীরূপে অভিহিত করা যায়। স্বয়ং ভগবান্ বামন অদিতির পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছেন, অথবা সম্বোধিত হইয়াছেন, ইহাও রূপক বলিয়া বোধ হয়। কারণ বামনপুরাণে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন, যথা—

"অহং ত্বাঞ্চ রহিষ্যামি আত্মানঞ্চৈব নন্দিনি !
ন চ পীড়াং করিষ্যামি স্বস্তি তেস্তু ব্রজাম্যহম্।"
(বামনপু° ২৮.১৩)

বামন আত্মাস্বরূপ; সুতরাং বামনরূপী আত্মা অদিতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইপ্রকার উক্তিতে বামন অবতারের অনেক কথাকেই রূপক বলিয়া প্রমাণিত করা যায়। [বামন দ্র°] অনেক স্থানে দেবতাদিগকে দিব্য, পার্থিব এবং অপ্য বলা হইয়াছে। "শং নো দিব্যাঃ পার্থিবাঃ শং নো অপ্যাঃ" (ঋক্ ৭.৩৫.১১) এখানে দিব্য, পার্থিব এবং অপ্য শব্দে ইহাই বুঝাইতেছে যে, তাঁহারা দ্যুলোকে, পৃথিবীতে এবং অপ্ অর্থাৎ অন্তরীক্ষে জন্ম লইয়াছেন। অপ্ শব্দে জলকে বুঝায়, কিন্তু সায়ণাচার্য্য অপ্য শব্দের ব্যাখ্যা স্থলে অন্তরীক্ষ অর্থ করিয়াছেন। "অপ্সু অন্তরীক্ষে ভবাঃ" এইরূপ অনেক গুলি ঋঙ্মন্ত্রে এবং অথর্ববেদের স্থানে স্থানে উল্লেখ আছে। দেবতারা দ্যুলোক, অন্তরীক্ষ এবং পৃথিবী হইতে জন্ম লইয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে—'তোমরা (দেবগণ) অদিতি হইতে, অপ্ হইতে এবং পৃথিবী হইতে জন্ম লইয়াছ' এরূপ বলিলে দেবতাদের তিনটী জন্মস্থানের কথাই জানা যায়। অতএব অদিতি শব্দ লইয়া যে সন্দেহ করা যাইতেছে তাহাতে অদিতি শব্দে আকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই বলা যাইতে পারে না। ঋষিগণ প্রথমে অদিতি শব্দ দ্যুলোকের স্থানে প্রয়োগ করিতেন, কারণ একটী ঋঙ্মন্ত্রে তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। যথা—

"যেভ্যো মাতা মধুমৎ পিন্বতে পয়ঃ পীযূষং দ্যৌরদিতিরদ্রিবর্হাঃ।
উকথশুষ্মান্ বৃষভরান্‌ৎস্বপ্নসস্তাঁ। আদিত্যাঁ অনুমদাস্বস্তয়ে।"
(ঋক্ ১০.৬৩.৩)

যে আদিত্যগণের মাতা 'দ্যৌ অদিতি', তিনি উচ্চে আকাশে থাকিয়া মধুর পীযূষ দান করিতেছেন। সেই সকল আদিত্য আমাদের সংকীর্ত্তনে উৎসাহান্বিত হইয়াছেন। তাঁহারা বলদায়ক, উগ্র, আমাদের সুখবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত আনন্দিত হইয়াছেন। এখানে 'দ্যৌঃ অদিতি' বলায় স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, প্রথমে অদিতি শব্দে অন্তরীক্ষ বুঝাইত। কালক্রমে উহার রূপক অর্থ যখন সকলে পরিত্যাগ করিলেন, তখন অদিতি শব্দে দেবতা বা ঋষিপত্নী বুঝাইতে লাগিল। উপনিষদে অদিতি শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা আছে, "যদ্যদেবাসৃজত তত্তদত্তুমধ্রিয়ত সর্ব্বং বা অত্তীতি তদদিতেরদিতিত্বং সর্ব্বস্যৈতস্যাত্তা ভবতি সর্ব্বমস্যান্নং ভবতি য এবমেতদদিতেরদিতিত্বং বেদ" (বৃহদারণ্য° ১.২.৫) অদিতি যে সমস্ত ঋক্, যজুঃ, ছন্দঃ, যজ্ঞ, প্রজা, পশু প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই তিনি ভক্ষণ করিতে চাহিলেন, কারণ অদিতি সর্বভুক্ এই জন্যই লোক সকল তাহাকে অদিতি বলে। তিনি ভক্ষক, সমগ্র বিশ্ব তাঁহার আহার্য্য। যে ব্যক্তি এই অদিতি-প্রকৃতিকে অবগত হন তিনি সমস্ত বেদজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। ইহাতে অবগত হওয়া যায় যে, অদিতি মৃত্যুকাল ও আত্মা। পুরাণশাস্ত্রে অদিতিকে দক্ষের কন্যা ও দেবমাতারূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। কোন সময়ে অসুরগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দেবগণ তির্য্যগ্ যোনি ধারণ করিয়া স্বর্গধাম পরিত্যাগপূর্ব্বক পবিত্র কশ্যপাশ্রমে উপনীত হইলেন এবং মাতা অদিতির নিকট সকলেই দৈত্যগণের দৌরাত্ম্য ব্যক্ত করিলেন। পুত্রবৎসলা অদিতি সেই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া কশ্যপের নিকট সুরগণের বিপদের কথা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, হে মহর্ষে! আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, আপনি তাহাই করুন! এই সকল দৈত্য-পরাজিত দেবগণ অমরাবতী পরিত্যাগ করিয়া ভবদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছে। হে প্রজাপতে! আপনি ইহাদিগকে রক্ষা করুন। অদিতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কশ্যপ কহিলেন, হে তন্বি! মহৎ তপস্যাবলে অসুরেরা অজেয় হইয়াছে। স্বয়ং ভৃগু তাহাদিগের অজেয়ত্ব অনুমোদন করিয়াছেন। সুতরাং অসুরগণের তপোবল অপেক্ষা অধিক তপোবল সঞ্চয় করিতে পারিলেই দেবগণের জয়লাভ হইতে পারে। অতএব হে মহাভাগে! দেবগণের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত তুমি সত্বর এই সদুপদিষ্ট ব্রতাচরণ কর। যথোক্ত বিধি অনুসারে অতি যত্নের সহিত এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে। এই ব্রতের অনুষ্ঠান-প্রণালী নিম্নোক্তরূপ যথা—ভাদ্রমাস, দশমী তিথি, এই দিবস শুচি ও মনঃসংযম করিয়া বিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত একাহার করিতে হয়। হে সুভগে! অনন্তর বক্ষ্যমান মন্ত্রে সর্ব্বকামাধিপতি হরির নিকট হরিভক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি প্রার্থনা করিবে যে, হে প্রভো! আমি আপনার ভক্ত, দশমী হইতে তিন দিন যাবৎ আমি আপনার ব্রতাচরণ করিব। হে বিষ্ণো! আপনি আমাকে অনুমতি প্রদান করুন।

আহার সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ বিধি প্রতিপালন করিতে হয়, যথা—কদলীপত্রে অলবণ অন্ন ভোজন, একাদশীতে উপবাস ও রাত্রিজাগরণ এবং দ্বাদশীতে পারণ করিতে হইবে, ঐ দিবস জ্ঞাতি ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। এইরূপে দ্বাদশ মাস

পর্য্যন্ত ব্রতানুষ্ঠান করিবে, ভাদ্রমাসের একাদশী দিবস কলসোপরি সাধ্যানুসারে সৌবর্ণ রাজত বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে হয়। এই শ্রবণা দ্বাদশী ব্রতাচরণ করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। অদিতি কশ্যপোক্ত এবম্বিধ ব্রতবিধি শ্রবণ করিয়া সম্বৎসর যাবৎ নিয়মপূর্ব্বক ব্রতানুষ্ঠান করিলেন। অনন্তর বর্ষশেষে জনার্দ্দন ব্রতাচরণে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশী তিথিতে প্রাদুর্ভূত হইলেন। অদিতি পূজাকালে তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর কমললোচনা অদিতি কশ্যপ সমভিব্যাহারে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। দেবী অদিতি নানাভাবে ভগবানের স্তব করিলে দেবপতি ভগবান্ অচ্যুত হাস্যপূর্ব্বক দেবমাতা অদিতিকে কহিলেন, হে অনঘে! তোমার পরম তপস্যায় আমি পরিতোষ লাভ করিয়াছি, আমি যে দ্বিভুজধর বটুরূপে (বামন) আত্মপ্রকাশ করিয়াছি। এই দেহেই দেবগণের কার্য্যসাধন করিব। অদিতি ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! বলবান্ অসুরগণ দেবগণকে পরাজিত করিয়াছে। আপনি সেই অসুরগণ কর্ত্তৃক পরাজিত দেবতাদিগকে রক্ষা করুন। বৈকুণ্ঠাধিপতি বিষ্ণু অদিতির বাক্য শ্রবণ করিয়া সুরগণের ও বলির সমস্ত কার্য্য ও কার্য্যাভিপ্রায় অবগত হইলেন এবং তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া ভাবিলেন, আমি একাকী অদ্য এমন কি কার্য্য করিব যদ্দ্বারা দেবগণ জয়লাভ করিবে এবং দৈত্যগণ পরাজিত হইবে। (স্কন্দপু° মাহে°—কেদা° ১৮ অ° ১-৩০) পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডে লিখিত আছে যে, মহর্ষি কশ্যপের ১ অদিতি, ২ দিতি, ৩ দনু, ৪ অরিষ্টা, ৫ সুরসা, ৬ সুরভি, ৭ বিনতা, ৮ তাম্রা, ৯ ক্রোধবশা, ১০ ইভা, ১১ কদ্রু, ১২ খসা ও ১৩ মুনি প্রভৃতি ত্রয়োদশটী পত্নী ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে মরীচিনন্দন কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হয়। তাঁহাদের নাম যথা—১ ইন্দ্র, ২ ধাতা, ৩ ভগ, ৪ ত্বষ্টা, ৫ মিত্র, ৬ বরুণ, ৭ অর্য্যমা, ৮ বিবস্বান্, ৯ সবিতা, ১০ পূষা, ১১ অংশুমান্ এবং ১২ বিষ্ণু। চাক্ষুষ মন্বন্তরে ইঁহারা 'তুষিত' নামক দেবগণ ছিলেন, বৈবস্বত মন্বন্তরে ইহারাই দ্বাদশ আদিত্য নামে কথিত হইয়াছেন। (পদ্ম°, সৃষ্টি° ৬. ৩৪-৩৭ ; কূর্ম্মপু° পূর্ব্ব° ১৬.১-২০ ; অগ্নিপু° ১৯.১-২ ; শিবপু° ধর্ম্মস° ৫৪.৩৯-৪০ ; নারসিংহপু° ৫, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° ব্রহ্মখণ্ড ৯.১৩-২২)

রামায়ণে লিখিত আছে, বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের নিকট বিশালা নগরীর পূর্ব্বতন কাহিনী বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, এ নগরী সন্নিবেশের পূর্ব্বে এই প্রদেশে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা আমি ইন্দ্রের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। পূর্ব্বে সত্যযুগে অদিতি ও দিতির অনেক মহাবলসম্পন্ন, সৌভাগ্যশালী, অতিধার্ম্মিক ও বীর্য্যবান্ পুত্র জন্মিয়াছিলেন, এই অদিতির পুত্র আদিত্য বা দেবগণ এবং দিতির পুত্র দৈত্যগণ সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত উত্তোলন করেন। তারপর উভয় পক্ষে অমৃত বণ্টন ব্যাপারে তুমুল যুদ্ধ হয়। অবশেষে ভগবান্ নারায়ণ মোহিনীবেশে দেবগণকে অমৃত দান করিয়া দৈত্যগণকে ছলনা করেন। (রামা° আদি° ৫৪ অ°)

দেবী-ভাগবতে—দিতি কর্ত্তৃক ইন্দ্রজননী স্বীয়া ভগিনী অদিতিকে অভিশাপ প্রদান করিবার এক সুন্দর কাহিনী বর্ণিত আছে। দিতি ও অদিতি নামে প্রজাপতি দক্ষের দুইটী তনয়া ছিলেন। এই সুব্রতা কামিনী দুইটী মহর্ষি কশ্যপের ভার্য্যা হন। অদিতির গর্ভে অতিশয় বীর্য্যবান্ দেবরাজ ইন্দ্র উৎপন্ন হইলে, দিতিও আপনার সেইরূপ তেজস্বী ও বীর্য্যবান্ পুত্র কামনা করেন। সেই অসিতাপাঙ্গী দিতি পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে স্বামিন্! আপনি সকলের মান দান করেন, অতএব প্রার্থনা করি, আমাকে ইন্দ্রতুল্য বলশালী, বীর, ধীর, ধর্ম্মিষ্ঠ ও বীর্য্যবান পুত্র প্রদান করুন। মহর্ষি কহিলেন, হে কান্তে! তুমি মৎকথিত ব্রতাচরণ কর; তাহা হইলেই ইন্দ্রতুল্য পুত্র লাভ করিতে পারিবে। দিতি কশ্যপ-বর্ণিত ব্রতাচরণ করিলে মহর্ষি কশ্যপ তাঁহার উদরে গর্ভনিষেক করিলেন। দিতি তেজঃসম্পন্ন গর্ভধারণ করিলে অদিতি দিতিকে শ্বেতবর্ণা ও দীপ্তাঙ্গী দর্শন করিয়া দুঃখিত চিত্তে চিন্তা করিলেন যে, যখন দিতির ইন্দ্রতুল্য মহাবল পুত্র হইবে তখন আমার পুত্র তেজোহীন হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। অভিমানিনী অদিতি এইরূপ চিন্তান্বিতা হইয়া আপন পুত্র অমররাজকে কহিলেন, বৎস! অতিশয় বীর্য্যবান তোমার এক শত্রু এক্ষণে দিতির গর্ভে অবস্থান করিতেছে, তুমি এখন হইতেই শত্রুবিনাশের নিমিত্ত উপায় চিন্তা কর। সপত্নীভাবে গর্ব্বিতা সেই অসিতাপাঙ্গী দিতিকে দর্শন করিয়া সুখনাশিনী ও মর্ম্মঘাতিনী চিন্তা আমার হৃদয়কে একান্ত পীড়িত করিতেছে। দেখ শক্র, রাজযক্ষ্মার ন্যায় বদ্ধমূল হইলে আর তাহাকে বিনাশ করা যায় না, অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শত্রুকে অঙ্কুরিত অবস্থায়ই বিনাশ করিবেন। দিতির গর্ভ লৌহাগ্রের ন্যায় আমার হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, তুমি যে কোন উপায়েই হৌক্ উহার নিপাত সাধন কর। যদি তুমি আমার প্রিয় কামনা করিয়া থাক, তবে সামদানাদি অথবা বল দ্বারা দিতির গর্ভ বিনাশ করিয়া আমার সন্তাপিত চিত্তকে সুশীতল কর। অমররাজ ইন্দ্র মাতার (অদিতির) বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে বহুবিধ চিন্তা করিয়া বিমাতার নিকট গমন করিলেন। তিনি দিতির পাদবন্দনপূর্ব্বক বিষগর্ভ মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, মাতঃ! আপনি ব্রতাচরণে

ক্ষীণদেহ ও অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছেন, আমি আপনার সেবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, এক্ষণে কি করিব বলুন। গুরুসেবা দ্বারা অক্ষয় কীর্ত্তি ও পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। মাতঃ! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার অন্তঃকরণে অদিতি ও আপনাতে বিন্দুমাত্র ভেদবুদ্ধি নাই। এই বলিয়া ইন্দ্র তাঁহার চরণস্পর্শ করিয়া পাদ সংবাহন করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রত-পরিশ্রান্তা কৃশা সুলোচনা দিতি পাদচর্য্যার সুখ প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রবচনে বিশ্বাস করিয়া গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। বজ্রপাণি দিতিকে নিদ্রিতা দেখিয়া সূক্ষ্মরূপ ধারণ-পূর্ব্বক অতি সাবধানে যোগবলে তাঁহার উদরে প্রবেশ করিলেন এবং বজ্রদ্বারা ছেদন করিয়া সেই গর্ভ সপ্তধা বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। উদরস্থ বালক বজ্রদ্বারা আহত হইয়া রোদন করিতে থাকিলে ইন্দ্র 'কাঁদিও না' 'কাঁদিও না' বলিয়া বারম্বার সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। কিন্তু বালক নিবৃত্ত হইল না দেখিয়া সেই সপ্তখণ্ডের প্রত্যেককে পুনর্ব্বার সপ্ত সপ্ত ভাগে বিভক্ত করিলেন, ইহারা পরে 'উনপঞ্চাশৎ বায়ু' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। সুমতি দিতি তখন জাগরিতা হইয়া জানিতে পারিলেন যে, কপটচারী ইন্দ্র তাঁহার গর্ভচ্ছেদ করিয়াছে, তাহাতে তিনি অতিশয় দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন, পরে এই সকল কার্য্য তাহার ভগিনী অদিতির চক্রান্তে হইয়াছে জানিয়া সত্যবাদিনী, ব্রতপরায়ণা দিতি অদিতি ও ইন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, ইন্দ্র যেমনি ছলপূর্ব্বক আমার গর্ভ কর্ত্তন করিয়াছে, তেমনি তাহার ত্রিভুবন রাজ্য বিনষ্ট হউক। আর পাপাচারিণী অদিতি যেমন গোপনে আমার গর্ভনিপাত করাইয়াছে, তেমনই তাহার পুত্রগণও পুনঃ পুনঃ জন্মিয়াই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে; পুত্রশোকে কাতরা হইয়া কারাগারে বসতি করিবে এবং জন্মান্তরেও মৃতবৎসা হইবে। মরীচিনন্দন কশ্যপ অভিশাপ-বচন শ্রবণ করিয়া প্রণয় বচনে তাঁহার কোপশান্তি করিয়া কহিলেন, কল্যাণি! তুমি কোপ পরিত্যাগ কর। তোমার পুত্রসকল অতিশয় বলবান্ এবং 'মরুৎ' নামক দেবগণ হইয়া ইন্দ্রের সখা হইবে। হে প্রিয়ে! তোমার এই অভিশাপ বিফল হইবে না। অষ্টাবিংশ মন্বন্তরে দ্বাপরযুগান্তে ইহার ফল ফলিবে। তখন ঈর্ষা-কলুষিতা অদিতি অংশ দ্বারা মানুষ জন্ম প্রাপ্ত হইয়া ইহার ফলভোগ করিবে। বরুণও সন্তাপিত হইয়া ইহাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন, সুতরাং তোমাদের উভয়ের অভিশাপে এই অদিতি মানুষী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। তখন বরবর্ণিনী দেবী দিতি পতি কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া সন্তোষ লাভ করিলেন। এই অভিশাপের ফলে অদিতি আপন অংশ দ্বারা 'দেবকী' হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার সাতটী পুত্র বিনষ্ট হয়। (দেবীভাগ° ৪ স্ক° ৩য় অ°)

সূর্য্য সম্বন্ধে কালিকাপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সূর্য্য কশ্যপপত্নী অদিতি কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া কশ্যপের ঔরসে ও অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (কালিকাপু° ২৬.২৮)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে দক্ষের চতুর্দ্দশ কন্যার বিবরণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অদিতি শ্রেষ্ঠা, ইহাঁরা কশ্যপপত্নী। 'চরিষ্ণু' মন্বন্তরে 'বৈকুণ্ঠ' নামে যে দেবতা ছিলেন, তাঁহারাই চাক্ষুষ মন্বন্তরে অদিতি কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া পরস্পর পরামর্শপূর্ব্বক স্থির করিলেন যে, তাঁহারা এই বৈবস্বত মন্বন্তরে যোগবলে অর্দ্ধ-তেজোদ্বারা মহাভাগা অদিতির গর্ভে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পুত্র হইবেন এবং ভাবিলেন যে, ইহাতে তাঁহাদের অশেষ মঙ্গলও হইবে এবং অদিতিগর্ভে জন্মিলে 'আদিত্যত্ব'ও ঘটিবে। আদিত্যগণ এইরূপ পরামর্শ করিয়া 'চাক্ষুষ' মন্বন্তরে মরীচিনন্দন কশ্যপের পুত্ররূপে দ্বাদশভাগে জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৬৬.৬০-৬৭)

অদিতির কতকগুলি পর্য্যায়শব্দ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। 'অদ্ ইতিচ্ অত্তি প্রাণিজাতম্।' ২ মৃত্যু, ৩ পুনর্ব্বসু নক্ষত্র, ৪ পৃথিবী, ৫ বাক্, ৬ গো, ৭ দ্যাবাপৃথিবী, ৮ দ্যুলোক, ৯ প্রকৃতি, ১০ অন্তরীক্ষ, ১১ মাতা, ১২ পিতা, ১৩ পুত্র, ১৪ প্রজাপতি, ১৫ বিশ্বেদেবা, ১৬ পঞ্চজন, ১৭ স্বতন্ত্রতা, ১৮ রক্ষা, ১৯ অসীমত্ব, ২০ পূর্ণত্ব, ২১ পত্নী, ২২ দুগ্ধ (ত্রি) ২৩ স্বতন্ত্র, ২৪ অসীম, ২৫ অভঙ্গ, ২৬ প্রসন্ন, ২৭ পবিত্র।

অদিতি৹—জ্যোতিষের মতে সমগ্র রাশিচক্র ২৭টী নক্ষত্রে বিভক্ত। অভিজিৎ নক্ষত্র ধরিলে ২৮টী হয়। চন্দ্র প্রতিদিন একটী নক্ষত্রে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া তাঁহার সাতাশটী স্ত্রী কল্পনা করা হয়। এই প্রত্যেক নক্ষত্রের এক একটী অধিদেবতা বহু পুরাকাল হইতেই কল্পনা করা হইয়াছে। বেদাঙ্গজ্যোতিষে এই দেবতাগুলিকে নক্ষত্রদেবতা বলা হইয়াছে। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে এবং অপরাপর পুস্তকেও নক্ষত্রদেবতার নাম পাওয়া যায়।

অদিতি এই সাতাশ নক্ষত্রদেবতাদের অন্যতম; ইনি পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের অধিদেবতা। ইঁহার ধ্যান শ্রীতত্ত্বনিধিতে (প. ১৮৮) পাওয়া যায়। যথা—

"অদিতিঃ পীতবর্ণা চ স্রুক্স্রুবাক্ষকমণ্ডলূ।
দধানা শুভদা মে স্যাৎ পুনর্ব্বসু-কৃতাহ্বয়া॥"

অদিতি স্ত্রীদেবতা; ইনি পীতবর্ণা এবং চারিটী হস্তে স্রুক্, স্রুবা নামক যজ্ঞীয় পাত্র, অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া থাকেন। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অদিতি সকলের মঙ্গল বিধান করুন।

অদিতিজ—(পুং) [অদিতেৰ্জায়তে জন-ড, ৫-তৎ] দেবগণ। ২ অদিতির পুত্র।

অদিতিতনয়—সূর্য্যের নামান্তর, আদিত্য।

অদিতিনন্দন—(পুং) [অদিতের্নন্দনঃ নন্দ-ল্যু, ৬-তৎ] দেবগণ। ২ অদিতির পুত্র। ৩ সূর্য্য।

অদিতিসুত—(পুং) দেবগণ, অদিতির পুত্র।

অদিৎসৎ—(ত্রি) দান করিতে অনিচ্ছুক। "অদিৎসন্তং দাপয়তি" (শুক্লযজুঃ ৯.২৪)

অদিৎসু—(ত্রি) [অদিৎসন্ত দ্র°।] "পতিতাঃ স্যুরদিৎসবঃ" (মনু ৯.১১৮)

অদিন—(দেশজ) অপ্রশস্ত দিন, অশুভ দিন। ২ অদিনে অসময়ে, বিপৎকালে।

অদিনপুসো—দার্জ্জিলিঙ্গবাসী লেপ্‌চাদিগের শ্রেণীভেদ।

অদিনা-মস্‌জিদ্—বাঙ্গালার মালদহ জেলার পাণ্ডুয়া নগরে অবস্থিত এক প্রাচীন মস্‌জিদ্ মুসলমান যুগের একটী স্থাপত্য নিদর্শন্। ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে সুলতান ইল্‌য়াস্ শাহ্ গৌড়রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডুয়ায় রাজপাট স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহ্ (১৩৫৮—১৩৮৯ খৃঃ) স্বীয় রাজত্বকালে ১৩৬৯ হইতে ১৩৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই গৌরবজ্ঞাপক স্মৃতিশৌধ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা বিখ্যাত মুসলমান সাধু জালালউদ্দীন্ তাব্রিজীর সুবিখ্যাত বিশ-হাজারী অট্টালিকা ও সোণা মস্‌জিদ্ হইতে প্রায় ১ মাইল উত্তরে অবস্থিত। কিংবদন্তী এই যে, বাদশাহ্ সিকন্দর শাহ্ দামাস্কাসের সুবিখ্যাত জুম্মা মস্‌জিদের অনুকরণে এই শিল্পসম্ভারপূর্ণ ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ করান।

এখন ইহার অধিকাংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইলেও ইহা এককালে পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৫০০ ফিট লম্বা ও ২৮৫ ফিট চওড়া এবং ভিতরের প্রাঙ্গণ ৪০০ ফিট × ১৫৪ ফিট ছিল। এই প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর। ঐ প্রাচীরে ৮৯টী খিলানযুক্ত ফটক এবং পশ্চিমদিকের সুবৃহৎ ফটকটী সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং স্থাপত্যশিল্পের কীর্ত্তিস্তম্ভ।

মস্‌জিদ্ চত্বরের ছাদ ২৬৬টী প্রস্তর-স্তম্ভের উপর সংস্থাপিত। প্রাচীরের তিন দিকেই দুই সারি স্তম্ভের মধ্যে বিরাজিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ধর্ম্মপিপাসু ও ফকিরদিগের বাসগৃহরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। পশ্চিমাংশে মূল মসজিদ এবং প্রাচীরগাত্রে চারি সারি স্তম্ভের মধ্যবর্ত্তী ৩৫টী মিহ্‌রাব্। এই স্তম্ভ তলদেশ ২ বর্গ ফুট এবং উচ্চতা ১০'৫", মধ্য মিহ্‌রাবের উত্তর দিকে পাদশাহকা তক্ৎ বা মুলুকখানা। এখানে রাজমহিষী ও তাহাদের সহচরীবর্গের বসিবার স্বতন্ত্র জেনানা-মহল ছিল। এই স্থানটী ২১টী ছোট ও মোটা স্তম্ভে সংরক্ষিত। ইহার বাহিরে আরও কতকগুলি সরু সরু থাম। ইহাতে বিশেষ কোন প্রকার শিল্পনৈপুণ্য না থাকিলেও ইহার গঠন-চাতুর্য্য প্রশংসার যোগ্য।

এই মসজিদের ছাদে সর্ব্বসমেত ৩৭৮টী গম্বুজ ছিল। সকল গুলির আকৃতি ও গঠন শিল্প একই রকমের। গম্বুজের অভ্যন্তর ভাগে যে সকল শিল্পচিত্র আছে তাহাতে মনে হয় যে এই মসজিদ নির্ম্মাণে বহু হিন্দু স্থপতি গঠনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল এবং এই সময় হইতে হিন্দু ও মুসলমান স্থপতিগণের সহযোগিতায় একটী অভিনব মুসলমান স্থাপত্যশিল্প গঠিয়া উঠিতেছিল। [পাণ্ডুয়া শব্দে চিত্রাদি দ্র°]

অদি মগ—(আদি মগ ? অদ্রি মগ ?) তুঙ্গথা। চট্টগ্রামের পর্ব্বতের অসভ্য লোক। চট্টগ্রামের পর্ব্বতে অনেক প্রকার অসভ্য লোক বাস করে। ইতিহাস নাই, তাই ঐ সকল লোক কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছে, কতদিন তাহারা ঐ সকল পাহাড়ে ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছে, তাহা ঠিক বলা যায় না। থিয়ঙ্গথা একজাতির নাম। এখানকার চাকমারা এই জাতির অন্তর্গত। কেহ কেহ অনুমান করেন, থিয়ঙ্গথা ও চাকমাদের আদি বাস আরাকানে ছিল। থিয়ঙ্গ বা থিয়ঙ্ শব্দের অর্থ—নদী। থ বা থা অথবা ট্সা শব্দে পুত্রকে বুঝায়। কাজেই যাহারা নদীকূলে ঘর বাঁধিয়া থাকিত, সেই নদীপুত্রেরা এখনকার থিয়ঙ্গথা জাতি। ইহাদের ভাষা প্রাচীন আরাকানী, আচার ব্যবহার অনেকটা বৌদ্ধদের মত। [থিয়ঙ্গথা দ্র°] কিন্তু আদি মগ বা তুঙ্গথা কাহারা? তুঙ্গ বা তুঙ্ শব্দের অর্থ পর্ব্বত। তাই অনুমান হয়, পূর্ব্বে যে জাতিরা কেবল পর্ব্বতে বাস করিত, তাহাদিগকেই লোকে এখন তুঙ্গথা বলে। কিন্তু অদি শব্দের অর্থ কি? বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও একথার কিছুই ঠিক করা গেল না। অনেক দিনের পুরাণ এসিয়াটিক্ রিসার্চ্চ ও এসিয়াটিক জর্ন্যাল খুঁজিলাম, তাহাতে এ নাম নাই, কর্ণাল ডাল্টন্ সাহেবের পুস্তকে এ নাম নাই। কাপ্তেন লিয়ন সাহেব তুঙ্গথা নামের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু অদি মগ—এ নাম তাঁহার পুস্তকেও নাই। তাই বুঝা গেল, এ নাম ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। পাহাড়ীরা নিজে আপনাদের কথা কিছুই জানে না। কে কোন জাতি, কে কোন সম্প্রদায়ের লোক, এ সকল গোলের কথা তাহারা বুঝে না। পরিচয়ের মধ্যে তাহাদের বাসস্থানের নামটী বলিতে পারে। ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে, থিয়ঙ্গথা, চাকমা, তুঙ্গথা, লুসাই, কুকী প্রভৃতি নাম উহাদের নিজের দেওয়া নয়। বাঙ্গালী, ব্রহ্মদেশবাসী,

চীনবাসী প্রভৃতি লোকেরাই অসভ্য পাহাড়ীদের এক একটী নাম দিয়া থাকিবেন। 'অদিমগ' এই শব্দ আদি মগ কিংবা অদ্রিমগ শব্দের অপভ্রংশ, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তুঙ্গথা (অর্থাৎ পর্ব্বতপুত্র) এই শব্দটী দেখিয়া প্রকৃত কথাটী অদ্রিমগ বলিয়া বোধ হইতেছে।

তুঙ্গথাদের পূর্ব্ব ইতিহাস কিছুই ঠিক হয় নাই। কাহারও মতে, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ব্রহ্মদেশের লোক। সেখানে চুরি ও লুঠ পাট করিয়া খাইত, শেষে রাজার ভয়ে ভারতবর্ষে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, ইহারা ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী, অন্য দেশ হইতে এখানে আসে নাই। কিন্তু ব্রহ্মদেশ হইতে দস্যুরা আসিয়া ভারতবর্ষে আশ্রয় লইত, এ কথার দুই একটী আধুনিক প্রমাণ পাওয়া যায়। কর্ণওয়ালিসের সময়ে ব্রহ্মরাজ চট্টগ্রামের সর্দ্দারের কাছে একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে দস্যুদের কথা লেখা ছিল। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে আরাকানের রাজাও চট্টগ্রামের সর্দ্দারকে একখানি পত্র লেখেন, তাহাতেও দস্যুদের বিষয় উল্লিখিত আছে। পত্র দুইখানি পড়িলে তখনকার অনেক কথা জানা যায়, তাই এখানে তাহাদের মর্ম্ম লিখিয়া দেওয়া হইল।

ব্রহ্মরাজ তুর্ব্বুমার পত্র। (রাজার আজ্ঞায় আরাকানের সর্দ্দার ঐ পত্র চট্টগ্রামে পাঠাইয়া দেন।)

"আমি মহারাজচক্রবর্ত্তী। একশত একখানি গ্রাম আমার শাসনে আছে। লোকে আমাকে রাজচ্ছত্রধারী বলিয়া ডাকে। আমি সূর্য্যকুলোদ্ভব; সোণার চন্দ্রাতপ সর্ব্বদাই আমার মাথার উপরে শোভা পাইতেছে। অসংখ্য অসংখ্য রাজা আমার পূজা করিয়া থাকেন। আমার রাজ্যে সোণা, রূপা এবং কত শত রত্ন জন্মে। আমার কাছে বজ্রের মত অস্ত্র শস্ত্র আছে, শত্রুরা তাহা দেখিলেই আমার শরণাগত হয়। যে সকল সৈন্য সামন্ত আমার কাছে আছে, তাহাদিগকে কোন কথাই বলিতে হয় না। এই রাজসংসারে হাতী ঘোড়ার সংখ্যা নাই। আমার সভায় দশ জন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং একশত চারি জন পুরোহিত আছেন। তাঁহাদের পরামর্শ লইয়া আমি রাজ্য শাসন করি। বরং বিদ্যুতের বেগ ফিরে তবু আমার আজ্ঞা ফিরে না। আমার প্রজারা ধার্ম্মিক ও ন্যায়পরায়ণ। দুষ্কর্ম্ম কি তাহা জানে না। আমি সূর্য্যের সমান, অন্ধকারেও আমার জ্ঞানের আলোক পড়িতেছে। লোকের দুরভিসন্ধি আমি সহজে বুঝিতে পারি। দয়া এবং ন্যায়পরতাই রাজার ধর্ম্ম। এই রাজ্যে চোর এবং অসৎ ব্যক্তিরা উচিত শাস্তি পাইতেছে। এখন আমার নাম শুনিলে দুষ্ট লোকের প্রাণ কাঁপিয়া উঠে।

আমি দুই হাজার নদী এবং অসংখ্য নালার মধ্যে যেন সাগরের মত হইয়া আছি। চল্লিশটী পর্ব্বতের মধ্যে আমি সুমেরু সমান। ইহাদের মত একশত এক জন রাজার উপর আমার আধিপত্য বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। তদ্ভিন্ন প্রত্যহ দশ হাজার রাজা আমার সভায় যাতায়াত করিয়া থাকেন। এ রাজ্যের কথা কি বলিব?—জগতে এমন ঠাঁই আর কোথাও মিলিবে না। অমরাবতীর ন্যায় আমার রাজসভা; অমূল্য মণিমাণিক্যে ভূষিত, ত্রিসংসারে এমন আদর কিছুরই নাই। দেবতার ন্যায় আমার সকল কাজগুলি পবিত্র। আরাকানের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে আমি ঘোষণা করাইয়াছি, যেন চট্টগ্রামে এই পত্রখানি নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছে। ঐ দেশ পূর্ব্বে মোগল রাজার অধিকারে ছিল। সেই রাজা চট্টগ্রামে প্রজাপত্তন করিয়া তাহাদের দ্বারা আবাদ করাইয়াছিলেন। সেখানে মোঙ্গলরাজ এবং অমরপুরের রাজা তুমার প্রতিষ্ঠিত ২৪০০টী দেবালয় এবং ২৪টী সরোবর আছে। মোঙ্গলদের আসিবার পূর্ব্বে চট্টগ্রাম অন্য রাজাদের অধিকারে ছিল। লোকে তাঁহাদিগকে ছত্রধর বলিত। তাঁহারা দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং অনেক পুরোহিত নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রজাদের মধ্যে যাহার যেমন ধর্ম্ম ছিল, সেই পুরোহিতেরা তাহাদের তদনুরূপ যাজনাদি ক্রিয়া করাইতেন। কিন্তু শ্রীতুমা চাকমা রাজা হইবার পূর্ব্বে, রতনপুর, দুর্গাবতী, আরাকান, দুর্গপতি, রামপতি, চয়দোণ, মহাদাইন, মলঙ্গ প্রভৃতি স্থানে কোন সুশৃঙ্খলা ছিল না। শ্রীতুমা রাজা হইলে পর, তাঁহার শাসনগুণে প্রজারা সুখী হইয়া উঠিল। সে সময়ের ধার্ম্মিক লোকেরা তাঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিত। বিশেষতঃ, বুদ্ধ তাঁহার সভায় অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। রাজা ধর্ম্মোপদেশ পাইবার জন্য তাঁহার কাছে এক জন সদ্‌গুরু চাহিলেন, তাই তন্ধারি রাজার ধর্ম্মোপদেষ্টা হন।

তখন পুণ্যবলে আকাশ হইতে সোণা, রূপা এবং রত্ন পড়িতে লাগিল; রাজা সেই সকল অমূল্য রত্ন মাটিতে পুতিয়া রাখিয়া তন্ধারিকে তাহার অধ্যক্ষ করিলেন। এই গুরুর অট্টালিকাও স্বর্ণ-রৌপ্যে মণ্ডিত ছিল। প্রজারা প্রতিদিন সেখানে গিয়া দেবার্চ্চনা করিয়া আসিত। দেবালয়ে রাত্রিদিন অসংখ্য দাসদাসী ছিল, কাজেই অতিথি আসিলে তাহাদের পরিচর্য্যার কোন ত্রুটী হইত না। নৃপতি সর্ব্বদাই পাঁচখানি ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িতেন। শাস্ত্রে যে কাজ করিতে নিষেধ আছে, নৃপতি কখন তেমন কর্ম্মে হাত দিতেন না। হাঁস, শূকর, পায়রা, ছাগল এবং মুর্গীর মাংস অভক্ষ্য। পুরোহিতেরা তাহা স্পর্শও করিতেন না। দুঃশীলতা, চৌর্য্য, পরদার এবং প্রবঞ্চনা রাজ্য হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছিল।

আমার চরিত্র এবং ধর্ম্মনীতি ঠিক সেই রাজার মত। কিন্তু

আরাকান রাজ্য যখন আমার হাতে আসে নাই, সে সময়ে তথাকার লোক যেন সাপের মত ছিল, সর্ব্বদাই কেবল বিবাদ বিসম্বাদ করিত। মগধ, মৈনবঙ্গ, দ্বারাবতী, চগদাগ ও রঙ্গবতী প্রভৃতি দেশের লোক মানুষ খাইত এবং সকলেই অতিশয় দুষ্ট ও নিষ্ঠুর ছিল, কেহ কাহারে বিশ্বাস করিত না। তৎকালে বুদ্ধদত্ত, তাঁহার আর একটী নাম শ্রীবৎ ঠাকুর, আরাকানে আসিলেন। কি মনুষ্য, কি বনের পশু, সকলকেই তিনি ধর্ম্ম-জ্ঞান দিয়াছিলেন, তাই পাঁচ হাজার বৎসর রাজ্যে কোন বিশৃঙ্খলা ছিল না।

আমার শাসননীতি ঠিক সেই রকম। আর এখানকার কোন স্থানের মাটীতে বেশ এক প্রকার সুগন্ধ তৈল হয়। আমার ক্ষমতাও সেইরূপ অন্যান্য রাজার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। জাফর নামে আমার প্রধান পুরোহিত আর আর ধর্ম্মযাজকদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ১৫ প্রযো (পৌষ?) ১১৪৮ সালে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি শ্রীবৎ ঠাকুরের মতে চলেন? বাস্তবিক আমি শ্রীবৎ ঠাকুরের মতানুসারেই চলিয়া আসিতেছি। বিশেষতঃ, আমি রাজ্যের ভিতর অনেক দেবালয় নির্ম্মাণ করাইয়াছি এবং শ্রীতুমা চাক্‌মার আইনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দয়াদাক্ষিণ্য সহকারে প্রজাপালন করি।

আরাকান রাজ্য চট্টগ্রামের সন্নিকটে। বাণিজ্যের নিমিত্ত ইংরেজেরা আমার সঙ্গে যদি সন্ধি করিতে চাহেন, তাহা হইলে সকল বিষয়েই একতা ও হৃদ্যতা থাকা আবশ্যক। তাই আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, চট্টগ্রামের বণিকেরা এখানে আসিয়া মুক্তা, হাতীর দাঁত এবং মোম ক্রয় করিতে পারিবে এবং এখানকার লোকেও চট্টগ্রামে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে যাইবে। কিন্তু চট্টগ্রামের মগেরা ধর্ম্মভয়, ধর্ম্ম জ্ঞান সকলি ছাড়িয়াছে। তজ্জন্য তাহাদের চরিত্র সংশোধন করা আবশ্যক। আমি ত্রিশ জন লোকের সঙ্গে চারিটী হাতীর দাঁত পাঠাই। ঐ সকল লোক এই পত্রের প্রত্যুত্তর লইয়া আসিবে।"

১৭৮৭ খৃঃ ২৪ জুন আরাকানের রাজা, চট্টগ্রামের সর্দ্দারকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। ফিউতী নামে জনৈক দস্যু আরাকান হইতে পলাইয়া চট্টগ্রামে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। রাজা সেই দস্যুকে ধরিয়া দিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন।

উপরের পত্রখানিতে অনেক কথা রহিয়াছে। তখনকার ইতিহাস একটু পাওয়া গেল; তখনকার আচার-ব্যবহার অনেকটা বুঝা গেল। রাজা নিজমুখে আত্মগৌরব গাইয়াছেন, সে কথা ছাড়িয়া দিই। কিন্তু ছত্রে ছত্রে তিনি রাজাদের যে গুণগুলি বলিয়াছেন, তেমন কথা অসভ্য কি অশিক্ষিত লোকের মুখে আসে না, তাহা অবশ্য স্বীকার করিব। রাজা নিজে বৌদ্ধ ছিলেন, তবু তাঁহার অন্য ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা ছিল না। আগে মগেরা মানুষ খাইত। আর এই 'কেরোসিন তেল' তখনও ছিল। তাহার পর চট্টগ্রামের পাহাড়ী তুঙ্গথা জাতি বোধ হয় আরাকানেরই অসভ্য লোক। ইহারা লুসাই, কুকী প্রভৃতি অন্যান্য জাতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, এখন তাই তাহাদের আদি ধরিতে পারা যায় না।

ত্রিপুরার মুরুঙ্গ, কুমী বা কিউমী, মুরুষ, খেইঙ্গ, বুঙ্গী, পাঙ্খস, লুসাই বা কুকী, সিন্ধু বা লখের প্রভৃতি জাতির সঙ্গে তুঙ্গথাদের অনেক সাদৃশ্য। [তৎ তৎ শব্দ দ্র°] কেহ কেহ এমনও অনুমান করেন যে, কতকগুলি পাহাড়ী পূর্ব্বে আদিবুদ্ধের সেবক ছিল বলিয়া লোকে তাহাদিগকে আদিমগ বলিত। এখন ক্রমে তাহারা অন্য জাতির সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে।

তুঙ্গথারা সুশ্রী নয়। গায়ের রঙ্ মেটে মেটে, তাহাতে একটু তামার বর্ণ মিশানো। শরীরের গড়নও ভাল নয়। নাকটী খাঁদা, মধ্যস্থলের ডগা নাই বলিলেও চলে। অঙ্গে রূপ ত ধরে না, অথচ তাহারই আবার শ্লাঘা কত? স্ত্রী-লোকেরা রাত্রি দিন কেবল আপনাদের রূপের গরিমাতেই ভারী হইয়া থাকে। পর্ব্বতের উচ্চ দুরারোহ স্থানে ইহাদের ঘর। পাহাড়ে উঠিতে বিশেষ অভ্যাস না থাকিলে তেমন স্থানে কেহই সহজে যাইতে পারে না। পুরুষেরা প্রায় সকলেই বিবস্ত্র। কাপড় পরা—সে কেবল ইচ্ছার কাজ। কখন মনে হইল ত একবার একখানি কৌপীন পরিল। মন হইল না,—তাহাতেই সুখী। স্বভাব যেমন গড়িয়াছেন তেমনি বিবস্ত্র হইয়া থাকিল। কিন্তু স্ত্রীলোকদের গায়ে একটী করিয়া জামা থাকে, জামাটী ছোট তাহাতে হাঁটু পর্য্যন্তও ঢাকা পড়ে না। সন্তান জন্মিলে পর তাহারা বক্ষঃস্থল খুলিয়া স্তন বাহির করিয়া রাখে। ইহারা ততটা অলঙ্কারপ্রিয় নহে, তবু ছোট ছোট কড়ী, পাথর প্রভৃতি অযত্নসুলভ ভুষণ দিয়া অঙ্গের সাজ করে। তুঙ্গথাদের যাবতীয় গৃহকর্ম্মের ভার স্ত্রীলোকের হাতে। তুঙ্গথারা একটীর অধিক বিবাহ করে না। অসভ্য হউক, পাহাড়ে বিবস্ত্র হইয়া থাকুক, সে কথা ধরি না, কিন্তু প্রেম হৃদয়ের একটী হাল্কা সামগ্রী নয়, মনে মনে গাঢ়রূপে প্রাণে প্রাণে মিশিয়া থাকিতে হয়, সে সুখের দাম্পত্যভাব তাহারা বেশ বুঝে। পতি পত্নীর, পত্নী—পতির; এক জনের বাঁচনে দুজনে বাঁচে, এক জনের মরণে দুজনে মরে, এই পবিত্র ভালবাসাটুকু তাহারা বেশ জানে। তেমন পশুর মত হৃদয়ে এমন স্বর্গীয় সুখ কোথা হইতে আসে? আসিবার অনেক কথা আছে। তাহাদের প্রেম সামান্য গাঁইট্-ছড়া বাঁধা হইতে হয় না; সে সাত পাকের বন্ধন নয়। তুঙ্গথা-কন্যাদের গর্ভাষ্টমে বিবাহ নাই, তাহারা অনেক

দিন আইবুড় থাকে। পনর ষোল বৎসর বয়ঃক্রম হয়; তখন সেই কুৎসিত অঙ্গেই যৌবনোচিত কেমন একটু লাবণ্য-প্রভা ফুটিয়া উঠে। এই বয়সে আমাদের সভ্যসমাজের অভাগিনী বালিকারা দৈবাৎ যে কাজ করিলে কুলে কালি পড়িয়া জন্মের মত কলঙ্কের পসরা মাথায় করেন, দুষ্কর্ম্ম হউক আর সুকর্ম্ম হউক, তুঙ্গথাদের উত্তরকালের এত দাম্পত্যসুখ সেই কাজ হইতে। যৌবন দেখা দিলেই বালিকারা যুবাপুরুষের সঙ্গে থাকে; বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়। ফুল তুলে মালা গাঁথে, আপনি পরে, সঙ্গের বন্ধুর গলায় পরাইয়া দেয়। যে কথা বলিয়াছি, তত সুখের প্রেম-সঞ্চার এখানে। একবার দেখি, দুবার দেখি, চক্ষু ভরিয়া সারাদিন দেখি; আবার যাহারে ভালবাসি, তাহাকে অন্তরে বাহিরে জাগ্রত স্বপ্নে দেখিতে পাই। সারাবেলা যাহার সঙ্গে থাকি, আমি জানি সে কেমন, সে জানে আমি কেমন; আমি তারে চাই, সে আমায় চায়, এমন করিয়া মনের সঙ্গে মন যোড়া দিবার ঘটক উভয়ের মন। পিতামাতার কথায় হাতে হাত যোড়া দিলে সে মন টুকু মিলে না।

তুঙ্গথারা হউক না কেন বনবাসী, কিন্তু আমাদের সমাজে যে প্রথা নাই তাহারই নিন্দা যে করিতে হইবে, এ কথার অর্থ কিছু বুঝি না। ভ্রূণহত্যা যথার্থ ব্যভিচার বনবাসীদের ঘরে নাই। প্রণয় আর জীবিকার জন্য পুরুষ-সাক্ষাৎ, এ দুটা কথার ভেদ তাহারা বেশ বুঝিয়াছে। আমাদের সভ্যদেশের ভিতর জীবিকা লাভের জন্য দুশ্চরিত্রা বালিকারা বাস করিতে ঠাঁই পায়, এ কথা শুনিলে তাহাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়, অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠে।

তুঙ্গথাদের বিবাহে ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে কিছুই বাঁধা বাঁধি নাই। পাত্রকন্যার মন হইলেই বিবাহ হয়। বিবাহের পর স্ত্রীলোকেরা জগতে পতি বৈ আর কিছুই জানে না। তখন পাতিব্রত্য কেমন, ভালবাসা কাহাকে বলে, সতী সাবিত্রীকেও একবার আসিয়া জানিয়া যাইতে হয়। বিবাহিতা বালিকারা পরপুরুষের সঙ্গে থাকে না, উপপতি উপপত্নী—এ সকল কথায় তাহাদের নরকের চেয়েও অধিক ঘৃণা। দৈবাৎ কেহ পরস্ত্রীকে আক্রমণ করিলে তখনি তাহার প্রাণদণ্ড করা হয়। এই জাতির মধ্যে এমন সুখের দাম্পত্যভাব থাকিলেও তাহারা কেনা দাসীর মত স্বামীর কাছে বাঁধা থাকে না। স্ত্রীলোকেরা স্বামীর কাছে কষ্ট পাইলে আপনাদের পতিকে ত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু পতি পত্নীকে ত্যাগ করিতে হইলে, কিংবা পত্নী আপনার স্বামীকে ছাড়িতে হইলে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তির কাছে অর্থদণ্ড দিতে হয়। অর্থদণ্ড না দিলে দম্পতীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয় না।

চট্টগ্রামাদির অনেক অসভ্য পাহাড়ীদের মধ্যে দাসত্বপ্রথা চলিত আছে। কাহারও ঋণ করা আবশ্যক হইলে সে আপনার একটা সন্তান কিংবা পরিবারের মধ্যে যে কোন ব্যক্তিকে মহাজনের কাছে বাঁধা রাখে। খাতকের সুদ লাগে না, সেই বন্ধকী মনুষ্যের কায়িক পরিশ্রমই সুদের তুল্য গণ্য হয়। ঋণ পরিশোধ করিলে বন্ধকী ব্যক্তি আপনার বাটীতে ফিরিয়া আসে। কোন লোকের আত্মীয় স্বজন না থাকিলেও সে আপনাকে আপনি বাঁধা দিতে পারে। মহাজনেরা এই সকল দাসদাসীকে অত্যন্ত ভাল বাসেন। আপনার পুত্র কন্যা পরিবারদিগকে যে প্রকারে লালনপালন করিতে হয়, তাঁহারা বন্ধকী দাসদাসীকে ঠিক সেই রূপ স্নেহ মমতা করেন। আমরা বলি ক্রীতদাস, তাহারা মহাজনের ঘরে আপনাকে বেচিয়া রাখিয়াছে। সেটী আমাদের বুঝিবার ভুল। তেমন দাসত্ব-দশার সুখ দেখিলে সকলেরই জন্ম জন্ম দাস হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। প্রভু দাসদাসীকে পুত্র কন্যা বলিয়া জানেন, দাসদাসীও প্রভুকে পিতার মত পূজনীয় বলিয়া ভাবে। এইরূপ এক এক গৃহস্থে পুরুষানুক্রমে কত দাসদাসী থাকিতেছে। দাসের ঔরসে দাসীর গর্ভে পুত্র কন্যা জন্মাইতেছে। গৃহস্থের মধ্যে কোন দাসের কন্যার বিবাহের কাল উপস্থিত হইলে, প্রভু নিজে যত্ন করিয়া বিবাহ দেন। বিবাহের সমস্ত ব্যয় প্রভু নিজেই করিয়া থাকেন। ঘরে অবিবাহিতা যুবতী দাসী থাকিলে পাহাড়ীদের মধ্যে এমন কুলাঙ্গার কেহই নাই যে, তাহার সতীত্ব নষ্ট করিবে। কিন্তু প্রভুর স্ত্রী মরিয়া গেলে, যদি দুজনের মন মিলে, তবে তিনি কোন দাসীকে বিবাহ করিতে পারেন। তখন কালি যে দাসী ছিল, আজ তিনি গৃহলক্ষ্মী,—প্রভুর অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইয়া সুখে সংসারধর্ম্ম করিতে থাকেন। কোন মহাজন নির্ধন হইয়া পড়িলে তিনি আপনার দাসদাসীকে অন্য ব্যক্তির কাছে বেচিতে পারেন। মানুষ বন্ধক রাখার প্রথা খিয়ঙ্গথা জাতির মধ্যেই অধিক। [খিয়ঙ্গথা দ্র°] তুঙ্গথাদের মধ্যে এরূপ মানুষ বাঁধা রাখার প্রথা কদাচিৎ শুনিতে পাওয়া যায়। অনেকে এ কথাও বলিয়া থাকেন যে, যুদ্ধের পর পরাজিত জাতির যে সকল স্ত্রীপুরুষকে ইহারা ধরিয়া আনে, তাহাদিগকেই বাটীর দাসদাসী করিয়া রাখে, কিন্তু ঋণ লইয়া ইহারা মানুষ বন্ধক রাখে না। লিউইন সাহেবও আপনার পুস্তকে এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু আরও একটা গল্প আছে, সত্য কি লোকের মন-গড়া, সে কথা বলিতে পারি না। পূর্ব্বে অসভ্য পাহাড়ীরা নাকি গ্রামের মধ্যে আসিয়া লোকের ছেলে চুরি করিত। ছেলের মাংস, জালী পাঁঠার চেয়েও কোমল। যাহারা খায়, সে সকল নর-পিশাচ রাক্ষসের মুখে ভালও লাগিতে পারে।

পাহাড়ীরা নাকি ছেলে লইয়া গিয়া কাহারও মাংস খাইত কাহাকেও দাস করিয়া রাখিত। পূর্ব্বকালের আরাকান প্রভৃতি স্থানের অসভ্য লোকেরা মানুষ খাইত, ব্রহ্মদেশের রাজা যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে সে কথার অনেকটা আভাস পাওয়া গিয়াছে। আরও একটী প্রমাণ আছে। আরাকান প্রভৃতি পাহাড়ী লোকেরা স্নান করিবার সময় মাথা ভিজায় না। মাথা ভিজাইলে নিবিড় লম্বা লম্বা চুল শুকাইতে বড়ই কষ্ট হয়, তাই কেবল গা ডুবাইয়া তাহারা জল হইতে উঠিয়া আসে। আরও এক ভয়,—ভিজা মাথায় নাকি অত্যন্ত উকুণ জন্মে। একটা গল্প আছে যে, আগে থিয়ঙ্গথা, তুঙ্গথা প্রভৃতি পাহাড়ীদের মাথায় উকুণ ছিল না। তাহার পর হঠাৎ একদিন আরাকানের রাজার মাথা অত্যন্ত চুলকাইতে লাগিল। রাণী চুলগুলি তুলিয়া বাছিয়া বাছিয়া দেখেন যে, মাথার ভিভর এক রকম কাল কাল কীট হইয়াছে। চক্ষে দেখিবে কি তেমন পোকার নামও কেহ কখন শুনে নাই। পোকাগুলি বাছিয়া স্বর্ণপিঞ্জরের ভিতর রাখা হইল; পিঁজরাটী রাজবাটীর সিংহদরজায় ঝুলিতে লাগিল। কত লোক দেখিতে আসে, কত লোক দেখিয়া শুনিয়া চলিয়া যায়। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লোকের ভিড় ঘুচে না। যে আসে, সেই গালে হাত দিয়া ভাবে,—ব্রহ্মার সৃষ্টির ভিতর এ আবার কি! রাজা নগরে নগরে ঘোষণা দেওয়াইলেন। ঘোষণায় বলা থাকিল,—যিনি পোকার নাম ও উৎপত্তি ঠিক করিয়া দিতে পারিবেন, আর বেশী কথা কি?—তাঁহাকে রাজ-কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেওয়া যাইবে। দৈবজ্ঞ ও পুরোহিতেরা পাঁজি পুথী খুলিয়া বসিলেন; কত গণিলেন, অঙ্কপাত করিলেন, পোকার নাম এক হইল না। দেশ দেশান্তর হইতে কত লোক আসিল, পোকার নাম বলিতে পারিল না। শেষে একটা রাক্ষস মানুষের রূপ ধরিয়া রাজসভায় আসিল। সেই গণনা করিয়া বলিল যে,—এই পোকার নাম উকুণ। আবদুল খাঁ নামক একজন বাঙ্গালী সওদাগরের চুল হইতে রাজার মাথায় আসিয়াছে'। তখনই সেই সওদাগরকে ধরিয়া আনা হইল। চাকরেরা তাহার চুল খুলিয়া দেখে, সকল কথা সত্য, একটী মিথ্যা নয়,—আবদুল খাঁর মাথা ভরা কেবলি উকুণ। অপরাধ সপ্রমাণ হইল, এখন উচিত শাস্তি দেওয়া চাই; সে জন্য তৎক্ষণাৎ গর্ত্তের ভিতর বড় বড় গোখুরা ও কেউটিয়া সাপ রাখিয়া তাহাতে আবদুলখাঁকে ফেলিয়া দিয়া তাহার প্রাণবধ করা হইল।

রাজা জানিতেন না যে, তাঁহার সভায় রাক্ষস আসিয়াছে তিনি আদর করিয়া তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। রাক্ষস দেখিল, অষ্টপ্রহর মানুষের কাছে থাকিতে হয়; যে দিকে বসি যে দিকে দাঁড়াই কেবল মানুষের গন্ধ ভর ভর করিতেছে। লোভ কদিন সম্বরণ করা যায়? কি জানি কোন দিন কাহাকে খাইয়া ফেলিব; অতএব এমন স্থান হইতে বিদায় লওয়াই ভাল। এই ভাবিয়া সে শ্বশুরের কাছে বিদায় চাহিল। রাজা অনেক দাসদাসী সঙ্গে দিয়া কন্যা ও জামাইকে বিদায় করিলেন। পথের মধ্যে গিয়া মনুষ্যমাংস খাইবার জন্য রাক্ষসটা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সঙ্গে রাজকন্যা রহিয়াছে, সে কিছুই জানে না। পাছে মানুষ খাওয়া দেখিলে ভয় পায়, তাই একস্থানে ছাউনী করিয়া সে স্ত্রীকে বলিল,—'তুমি এই শিবিরে থাক, আমি দুই এক জন অনুচর সঙ্গে লইয়া মৃগয়া করিয়া আসি'। রাক্ষস এই রূপে প্রত্যহ শীকার করিতে গিয়া অরণ্যের ভিতর সঙ্গের অনুচরদিগকে মারিয়া খাইত। রাজকন্যা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিত যে,—'বন্য পশুতে তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিয়াছে।' রাক্ষস দুই একটী করিয়া ক্রমে সকলকেই খাইতে লাগিল,—শেষে বাকি একজন ভৃত্য। তাহাকেও সঙ্গে লইয়া মৃগয়া করিতে গেল। রাজকন্যা গোপনে সঙ্গে সঙ্গে গিয়া সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিলেন। কিন্তু দৈবের অনুগ্রহে তিনি নিজে প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। [Captain P. H. Lewin's Wild Races of S. E. India.]

এই গল্পটীতেও বেশ জানা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে আরাকান প্রভৃতি স্থানের অসভ্য লোকেরা মানুষ খাইত।

তুঙ্গথাদের প্রত্যেক গ্রামে এক এক জন করিয়া সর্দ্দার আছে। রাজার মান সম্ভ্রম অধিক কিছুই নাই; প্রজারা তাঁহাকে কেবল এক ঝুড়ী শস্য ও এক কলসী পচাই মদ দেয়,—ইহাই তাঁহার রাজস্ব। আরও একটী মানের কাজ আছে। যুদ্ধ হইলে সর্দ্দারকে লুঠের অংশ বেশী করিয়া দিতে হয়। প্রজাদের ইচ্ছা হইলে তাহারা এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে গিয়া বাস করিতে পারে। তাই সর্দ্দারেরা লোকের কাছে আদর পাইবার নিমিত্ত সকলকেই ভাল বাসেন এবং সুখে রাখিবার জন্য চেষ্টা করেন। যিনি মহাবীর এবং অসমসাহসী শত্রু আসিলে যুদ্ধ করিতে গিয়া হটিয়া আসেন না; বিবাদ মিটাইবার সময় পক্ষপাত করেন না, তিনিই সর্দ্দারের যোগ্য পাত্র। তুঙ্গথারা তাঁহাকেই প্রধান বলিয়া মানে।

তুঙ্গথাদের পাহাড়ে অধিক পীড়াদি নাই; সেখানে সচরাচর আশী নব্বই বৎসরের বৃদ্ধ লোক দেখিতে পাওয়া যায়। কদাচিৎ সংক্রামক ওলাউঠা বসন্ত উপস্থিত হয়, কিন্তু সেটী নীচের বাঙ্গালীদের দোষে। বাঙ্গালীদের মধ্যে সংক্রামক রোগ হইলেও পাহাড়ীরা তাহাদের কাছে দ্রব্য-সামগ্রী লইতে আসে,

কাজেই পাহাড়ের উপরেও শেষে ওলাউঠা বসন্ত প্রভৃতি হয়। পাহাড়ীরা আরবার (চন্দ্রদ্বয়ে) মালা করিয়া গলায় পরে। তাহাদের বিশ্বাস, ঐ মালা পরিলে শরীরে কোন প্রকার রোগ থাকে না। দৈবাৎ পীড়া হইলে ইহাদের অন্য ঔষধ কিছুই নাই; যে কোন রোগ হৌক না তাহারা পাহাড়ী ঘোড়ার পিত্ত ও বিষ্ঠা খায়। ইহারা মনে করে রোগ ও শোক কেবল বনদেবতাদের কোপেই ঘটে। তাঁহাদের একটু তুষ্ট করিয়া রাখিতে পারিলে অমঙ্গলের ভয় থাকে না। তাই পরিবারের মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে পাহাড়ীরা আগে বনদেবতার পূজা করে। কিন্তু মহামারী নিবারণের ঘটা আরও বেশী রকম। ইহারা স্ত্রীপুরুষ, বালক বালিকা সকলে মিলিয়া নৃত্যগীত করে। সঙ্গ: সঙ্গঃ কাপাসের সূতা কাটিয়া তাহাতে গ্রাম বেড়িয়া গণ্ডী দেওয়া হয়। পল্লীবাসীরা দেবতার কাছে মুর্গী, শূকর প্রভৃতি নানাপ্রকার পশু বলি দিয়া তাহাদের রক্ত সেই সূতায় লাগাইতে থাকে। গৃহিণীরা ঘর দ্বার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দ্বারে দ্বারে নবীন পল্লব পত্রের রচনা ঝুলাইয়া দেয়। এই সময়ে এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে কেহ যাইতে পায় না। দৈবাৎ বলপূর্ব্বক কেহ গ্রামে প্রবেশ করিতে আসিলে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। তুঙ্গথারা এই নিয়মকে থাঙ্গ কহে। তিন দিনের পর থাঙ্গ ভাঙ্গিয়া যায়।

তুঙ্গথারা অসভ্য, সে কথা মানি। তাহারা লেখা পড়া জানে না, তাহাও সত্য। কিন্তু প্রতিজ্ঞা পালন করিতে জগতে এমন জাতি আর দ্বিতীয় নাই। একবার যাহা মুখে আনিবে, ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে গেলেও তাহার অন্যথা হইবে না। সত্য করিবার সময়ে তাহারা শঙ্খ, কার্পাস, দা, জল প্রভৃতি দ্রব্য ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা করে। ইহাদের গঙ্গাজল তুলসীপত্র নাই। নিত্য যাহা চাই, যাহা না হইলে প্রাণ বাঁচে না, সেই সকল দ্রব্যই হাতে লইয়া ইহারা সত্য করে।

তুঙ্গথারা আফিঙ, গুলি, গাঁজা, ভাঙ্গ খায় না। নেশার মধ্যে তাহারা মদ খাইতে ভালবাসে। মদ্যপানটা তাহাদের নিত্যাভ্যাসের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে। একপাত্র সুধা পেটে না পড়িলে, তাহাদের অন্ন জলে রুচি হয় না। তাহার পর পূজা পার্ব্বণ বিবাহ প্রভৃতি যত রকম ঘটা আছে, সে সকল তো কেবল মদেরই কাজ। ইহারা তিন প্রকার মদ খায়। এক প্রকার মদের নাম খুঙ্, ইহা চাউলের পচাই মদ, কিন্তু খাইতে নাকি বেশ মিষ্ট। 'সীপা' আর এক রকম পচাই মদ, ইহা বীরণীদানা হইতে প্রস্তুত হয়। তৃতীয় প্রকার মদের নাম 'আরক' ইহা চাউল হইতে চোলাই করা।

অদিয়ম (ইড়িয়ম)—দাক্ষিণাত্যের চোলরাজবংশের অধীনস্থ একজন সামন্তরাজ। ইনি ১১১৭ খৃষ্টাব্দে গঙ্গরাজ কর্ত্তৃক তলকাড় রণক্ষেত্রে পরাস্ত হন এবং তাহার রাজ্য হোয়শাল-রাজ বিষ্ণুবর্দ্ধনের রাজ্যভুক্ত হয়।

অদিয়ল—মধ্যপ্রদেশের ভাণ্ডারা জেলার একটী শহর। ইহা শকোলি তহশীলের অন্তর্গত।

অদিয়ান—দক্ষিণ ভারতের এক শ্রেণী। এই শব্দের অর্থ হইতেছে দাস বা ভৃত্য (অদি=পদ)। তম্বিরন বা অপর কোন প্রতাপশালী ব্যক্তির অধীনে যাহারা কার্য্য করিত তাহারাই অদিয়ান নামে পরিচিত হইত। প্রত্যেক অদিয়ান তাহার প্রভুকে বার্ষিক একটা নজর দিত এবং আবশ্যক হইলে প্রভুর সহায়তা করিতে বাধ্য থাকিত। এই বার্ষিক নজরের নাম ছিল 'অদিম-পণম্'।

অদিয়োদি (বা অতিয়োতি)—দক্ষিণভারতের একটী জাতি। ইহারা আপনাদিগকে সামন্তন জাতির শাখা বলিয়া থাকে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের মান্দ্রাজ সেন্সাস্ রিপোর্টে এইচ্. এ ষ্টুয়ার্ট সাহেব লিখিয়াছেন—ইহারা উত্তর মলবারের কডারনাড় রাজার বংশ। প্রবাদ আছে, জামোরিন কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া উক্ত রাজা কালিকট পরিত্যাগ করেন এবং চিরক্কলের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। চিরক্কলরাজ তাঁহাকে স্বীয় সামন্তরূপে কড়ারনাড় প্রদেশ শাসনার্থ দান করেন।

অদিব্—মিশরবাসী জনৈক দার্শনিক। ইনি আবু-হসন্ আলী-বিন্ নসর নামেও পরিচিত। ইনি ফাটিমিতের খিলাফতের অধীনে মিশরের বিচারপতি ছিলেন।

অদিত্র—কোঙ্কন প্রদেশস্থ রত্নগিরি জেলায় একটী গ্রাম। ইহা রাজাপুর মহকুমার অন্তর্গত এবং রাজাপুর শহরের ৬ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে মহাকালী দেবীর একটী প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে উক্ত দেবীর উদ্দেশে এখানে একটী মেলা বসে। গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় এক-সহস্র।

অদিষ্ট—(দেশজ) অদৃষ্ট, ভাগ্য।

অদীক্ষিত—(ত্রি) যে ব্যক্তি সোমযাগে দীক্ষিত হয় নাই। ২ যিনি সোমযজ্ঞে স্থান প্রাপ্ত হন নাই। ৩ যিনি গুরুমন্ত্র প্রাপ্ত হয়েন নাই। ৪ যাহার উপনয়ন সংস্কার হয় নাই অর্থাৎ যিনি যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন নাই। (কাত্যায়নশ্রৌত° ৮.৯.২৮)

অদীন—(ত্রি) [ন দীনং দী-ক্ত; নঞ্-তৎ] অকাতর। ২ অদুঃখিত। ৩ পুরূরবার বংশোদ্ভব অদীন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি সহদেবের পুত্র। অদীনের সন্তানের নাম জয়সেন। (বিষ্ণুপুরাণ ৪.৯ অধ্যায়)

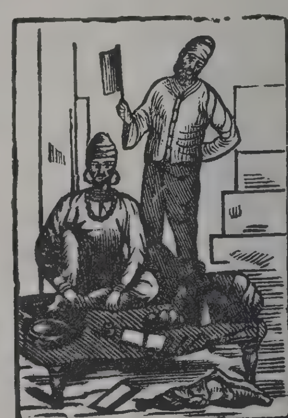
অদীননগর—(ক্লী) পঞ্জাবের মধ্যে অদীননগর নামে একটী মনোহর পুরী ছিল। গ্রীষ্মকাল আসিলে মহারাজ রণজিৎ সিংহ এই নগরে আসিয়া বাস করিতেন। তখন এখানকার উদ্যানের এমন শোভা ছিল যে, ইন্দ্রদেব তাহা দেখিলে নন্দন-কাননের সুখ ভুলিয়া যাইতেন। বাগানের মধ্যস্থল দিয়া প্রশস্ত খাল চলিয়া গিয়াছে। ধারে ধারে কেয়ারী করা সবুজ পুষ্প-বন,—নিথর কাল জলে তাহাদের ছায়া পড়িয়া শোভার উপর আরও বেশী শোভা ধরিয়াছে। উদ্যানের স্থানে স্থানে অপূর্ব্ব অট্টালিকা। বাগানের পাশে সিপাহীদের পেরেড করিবার ময়দান। সেই পেরেড ভূমি এবং বাগানের ফটকের মধ্যস্থলে সোণার কাজকরা শালের তাম্বু খাটানা থাকিত। রাত্রিকালে মহারাজ সেই তাম্বুর ভিতর শুইয়া ঘুমাইতেন।



অদীন-নগর

১৮৩৮ সালে লর্ড অক্‌লাণ্ড, ম্যাক্‌নটেন, অসবরন্ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ইংরেজকে মহারাজ রণজিৎ সিংহের নিকট প্রেরণ করেন। শাহসুজাকে কাবুলের সিংহাসনে বসাইবার জন্যই তাঁহারা পঞ্জাবাধিপতির সঙ্গে একটা দৃঢ় সন্ধি করিতে আসিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত ইংরাজদূত এই অদীননগরে আসিয়া মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই সময়ে এখানে আর একটী প্রসিদ্ধ ঘটনা সংঘটিত হয়। হরিদাস সাধু নামে জনৈক সমাধিসিদ্ধ যোগীকে পূর্ব্বে রণজিৎ সিংহ মাটীর ভিতর পুতিয়া রাখিয়া তাঁহার যোগ-বল পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তৎকালে ডাক্তার ম্যাকগ্রেগর প্রভৃতি অনেক ইংরাজ সেখানে উপস্থিত থাকেন। রণজিৎ সিংহ এই যোগীকে আদর করিয়া লাহোরে রাখিয়াছিলেন।

অনেক দিন হইল, মেকনটেন্ সাহেব পুষ্করে একবার হরিদাসের যোগবলের পরীক্ষা লইয়াছিলেন। লোকে গল্প করিয়া বেড়ায়, সন্ন্যাসী শ্বাস বন্ধ করিয়া অনাহারে মাটীর ভিতর থাকিতে পারেন। স্বচক্ষে না দেখিলে, এ কথাটা ঠিক বলা যায় না। এই ভাবিয়া তিনি যোগীকে একটা সিন্দুকের ভিতর পুরিয়া তের দিন পর্য্যন্ত তাঁহার ঘরের কড়ীকাঠে ঝুলাইয়া রাখিলেন। তের দিন পরে সিন্দুক খুলিয়া দেখেন, সন্ন্যাসীর নিশ্বাস নাই, হৃৎস্পন্দন নাই, জড়বৎ মৃতদেহের ন্যায় হইয়া আছেন। কিছুক্ষণ পরে সেই শরীরে জীবন সঞ্চার হইল। "But another officer (Mcnatghten, Assistant to the Agent to the Governor General in Rajputana) put his abstenance to the test at Puskar by suspending him for thirteen days, shut up iu a wooden chest." (See Lieut. Baileau's Tour to Rajwar.) অন্যান্য সাহেবেরা পূর্ব্ব হইতেই হরিদাসের অনেক গল্প শুনিয়াছিলেন। কিন্তু কাজটা কেমন অসম্ভব বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন না। এখন সকলে পঞ্জাবে আসিয়াছেন; এক যাত্রায় যদি পৃথক্ ফল হইয়া যায়, তবে তাহার চেয়ে সুখের কথা আর কি আছে? এই ভাবিয়া সন্ন্যাসীকে আনাইবার জন্য তাঁহারা মহারাজকে অনুরোধ করিলেন। হরিদাস তখন অমৃতসরে। মহারাজের সংবাদ পাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ অদীন-নগরে যাত্রা করিলেন। ৬ই জুন সন্ন্যাসী পৌঁছিলেন, সাহেবদের আহ্লাদ উথলিয়া উঠিল। তাঁহারা যোগীর কাছে গিয়া দেখেন, তিনি একটী প্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকায় পালঙ্কের উপর বসিয়া আছেন। ঘরের মেজে গালিচা দুলিচা ও মকমলে মোড়া। খাটের উপর রেশমের শয্যা। হরিদাসের সম্মুখে দুইটী পানপাত্র এবং একখানি গ্রন্থ। বামভাগে একটী জলপাত্র, দুইটী ঝুলী এবং একখানি গেরুয়া বস্ত্র। মেজের উপর আর একখানি পুস্তক এবং রণজিৎ সিংহের দত্ত কাশ্মীরী শাল। পালঙ্কের একপার্শ্বে



হরিদাস সাধু

জনৈক শিখ, যোগীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তালবৃন্ত দ্বারা ধীরে ধীরে বাতাস করিতেছে। পূর্ব্বে সমাধি অবস্থা হইতে উঠিলে মহারাজ সন্ন্যাসীকে যে সকল অলঙ্কার দিয়া সাজাইয়াছিলেন, আজ তিনি সেই কনকহার ও রত্নকুণ্ডল পরিয়া আছেন। সাহেবেরা সেখানে গিয়া সাধুর সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তার পর একবার তাঁহার যোগবল পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী এবার চাতুরী করিলেন, সাহেবদিগকে যোগবল দেখাইলেন না। [হরিদাস সাধু দ্র°]

অদীনসত্ত্ব—(ত্রি) অক্ষীণসত্ত্বগুণ, সত্ত্বগুণসম্পন্ন। (মহাভা° ১.২৩.১৯) ২ অখেদবীর্য্য, মহাবল। "দানবান্ জয়ুরদীনসত্ত্বাঃ" (মহাভা° ৩.১০৫.৭) ৩ উদারচরিত, মহান্‌হৃদয়, মনস্বী। ৪ দৃঢ়ব্যবসায়, সত্যসন্ধ, সত্যপ্রতিজ্ঞ। "ভজস্ব সামর্থ্যমদীনসত্ত্ব" (রামা. ৪.১৯.২৫.)

অদীনাভ—অদীনাভ গণেশ দেবতার অন্যতম নাম ; যেহেতু ধ্যানে নিম্নোক্ত প্রকারের গণেশের অদীনাভ নাম দেওয়া হইয়াছে, সেইজন্য এখানেও সেই নাম রাখা হইল। প্রাণতোষিণী (প. ৬০২) নামক তন্ত্রপুস্তকে যে ধ্যান পাওয়া যায় তাহা নিম্নে দেওয়া হইল। যথা—

"পাশাঙ্কুশ-বরাভীতং হিমকুন্দেন্দুসন্নিভম্।
অনবদ্যমদীনাভং স্ফুরন্মাণিক্যমণ্ডনম্॥"

অর্থাৎ অদীনাভ গণপতি চারি হস্তবিশিষ্ট এবং চারিটী হাতে পাশ, অঙ্কুশ, বরদমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা প্রদর্শন করেন। তাঁহার বর্ণ তুষার, কুন্দপুষ্প অথবা চন্দ্রের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ নির্ম্মল এবং মণি মাণিক্যের আভরণে তাঁহার অঙ্গ উদ্‌ভাসিত।

অদীয়মান—(ত্রি) যাহা দেওয়া হয় নাই বা প্রদত্ত হয় নাই।

অদীর্ঘ—(ত্রি) লম্বা নহে, ছোট।

অদীর্ঘসূত্র—(ত্রি) যে দীর্ঘসূত্র নহে, অর্থাৎ কর্ত্তব্য কর্ম্মের আরম্ভ ও সমাপনে আলস্যহীন, অচিরক্রিয় ; উদ্যোগী। "অদীর্ঘসূত্রঃ স্মৃতিমানক্ষুদ্রোঽপরুষস্তথা" (যাজ্ঞ° স° ১.৩১০)

অদুঃখ—(ত্রি) দুঃখহীন, বিপন্মুক্ত। "অদুঃখমকৃত্বা বচনং মম" (রামা° ৪.২২.২)

অদুঃখনবমী—(স্ত্রী) ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা নবমী। এই তিথি অত্যন্ত শুভ। এই তিথিতে স্ত্রীলোকেরা বৎসরের অমঙ্গল দূর করিবার নিমিত্ত দেবীপূজা করিয়া থাকেন।

অদুগ্ধ—(ত্রি) যে দুগ্ধ দোহন করা হয় নাই। ২ যাহার দুগ্ধ গ্রহণ করা হয় নাই। "অদুগ্ধা ইব ধেনবঃ" (ঋক্ ৭.৩২.২২)

অদুচ্ছুন—(ত্রি) রক্ষোবর্জ্জিত। ২ বিপদ্‌শূন্য, শুভ।

অদুর—কর্ণাটের ধারবার জেলার অন্তর্গত হাঙ্গল সব্‌ডিভিসনের একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম, হাঙ্গল হইতে ১০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। ১২শ শতকের একখানি শিলালিপিতে ইহার নাম পান্তিপুর দেখা যায়। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই গ্রাম একটী ক্ষুদ্র বিভাগীয় সদর ছিল। গ্রামের পূর্ব্বদিকে কল্লেশ্বর শিবের মন্দির, তথায় ১০৪৪ খৃষ্টাব্দের একখানি শিলালিপি আছে। এই গ্রামের অপর একখানি শিলালিপিও উল্লেখযোগ্য। ইহার দাতার নাম উল্লিখিত হয় নাই। ৩'৭"×২'৩½" আয়তনের এক প্রস্তরফলকের উপর ২০ ছত্রে লিপিখানি উৎকীর্ণ। প্রথম ১৪ ছত্র সংস্কৃত, শেষ ৫ ছত্র প্রাচীন কনাড়ী। সংস্কৃত অংশে কোন জৈন মন্দিরের দানশালা নির্ম্মাণার্থ ভূমিদানের বিষয় উল্লিখিত আছে। শেষ ৫ ছত্র হইতে জানা যায়, ৫৬০ খৃষ্টাব্দে সিন্দ নামক এক ব্যক্তি নৃপতি কীর্ত্তিবর্ম্মার অধীনে পান্তিপুর নগরের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। যদিও লিপির দানাব্দ প্রদত্ত হয় নাই, তথাপি অক্ষর এবং পাঠ দেখিয়া মনে হয় যে, উল্লিখিত কীর্ত্তিবর্ম্মা প্রাচীন চালুক্য নৃপতি ৬ষ্ঠ কীর্ত্তিবর্ম্মা (৫৬৭ খৃঃ)। কদম্বরাজ্যের মধ্যস্থান হইতে আবিষ্কৃত এই শিলালিপি অইহোলে আবিষ্কৃত ২য় পুলকেশীর লিপির উক্তিকে সমর্থন করিতেছে। অইহোল লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে কীর্ত্তিবর্ম্মা কদম্বরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ৯০৪ খৃষ্টাব্দের একখানি লিপি এখানে পাওয়া গিয়াছে ; উহাতে রাষ্ট্রকূটরাজ ২য় কৃষ্ণ অকালবর্ষের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে আরও লিখিত আছে যে অকালবর্ষ কৃষ্ণের মহাসামন্ত (চেল্লকেতন-বংশীয়) বনবাসী দ্বাদশ সহস্রের শাসক ছিলেন। কল্লেশ্বরের মন্দিরে আবিষ্কৃত ১০৪৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বোক্ত লিপিখানি পশ্চিম-চালুক্য নৃপতি ১ম সোমেশ্বরের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ।

অদুর$_{2}$—কোঙ্কনের রত্নগিরি জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী চিপলুন মহকুমার একটী বন্দর। বোরিয়া ইহার নামান্তর। ইহা বাশিষ্ঠী ও শাস্ত্রী নদীদ্বয়ের মোহনার মধ্যস্থলে অবস্থিত। ৩৬০ ফুট উচ্চ অদুর অন্তরীপের আড়ালে অবস্থানজন্য উত্তরাগত ঝটিকার সময় পোতসমূহ এখানে নিরাপদে থাকিতে পারে। বন্দরের সমীপস্থ পাহাড়ের উপর সরকারী জরীপের ঘাটী আছে। পূর্ব্বে সমুদ্রোপকূলগামী পোতসকল এখানে থামিত।

অদুর$_{3}$—মাদ্রাজ প্রদেশের নেল্লোর জেলান্তর্গত ভূসম্পত্তিবিশেষ। এই স্থানের 'কাবলগর'গণ স্থানীয় শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন। এই কাবলগরগণ পূর্ব্বে ডাকাতির ব্যবসা করিত। এই প্রসিদ্ধ দস্যু-সম্প্রদায় তৎকালে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী ছিল।

অদুর্ধ্র্য্য—(ত্রি) [ন-দুর-ধৃষ-ণিচ্ য] যে সহজে প্রাপ্ত হয়।

অদুর্ম্মখ—(ত্রি) অদুষ্টযজ্ঞ, বিঘ্নহীন যাগ। "অদুর্মখস্য বা" (ঋক্ ৮.৭৫.১৪)

অদুর্ম্মঙ্গল—(ত্রি) অশুভ নহে, অমঙ্গলহীন, অকল্যাণশূন্য। (স্ত্রী) যে নারী মঙ্গলাচারকে নষ্ট করে তাহাকে দুর্ম্মঙ্গলী বলা হয়, যে দুর্ম্মঙ্গলী নয়, তাহাকেই অদুর্ম্মঙ্গলী বলা হইয়াছে, এতাদৃশী নারী পতিলোক প্রাপ্ত হয়। "অদুর্ম্মঙ্গলীঃ পতিলোকমাবিশ" (ঋক্ ৮.৮৫.৪৩)

অদুর্ব্বৃত্ত—(ত্রি) সচ্চরিত্র, যাহার চালচলন উৎকৃষ্ট। ২ প্রসন্নহৃদয়।

অতুল—দাক্ষিণাত্যের আহ্‌মদনগর জেলার একটী নদী। ইহা অকোলা শহরের উত্তরে পট্টি ও মহাকালীর ঢালু প্রদেশে উৎপন্ন হইয়া সমসেরপুর উপত্যকার উভয় পার্শ্বস্থ দুইটী শৈলশ্রেণীর মধ্য দিয়া পূর্ব্বদিকে প্রায় ১৫ মাইল প্রবাহিত হইয়াছে। তৎপর প্রায় দেড়শত ফুট গভীর এক শৈলগহ্বরে পতিত হইয়া চড়াই ও বন্ধুর পাহাড়ের মধ্য দিয়া কিছু দূর বক্রভাবে গমন করিয়াছে। পরে সঙ্গমনের সমভূমিতে পড়িয়া ইহা দক্ষিণমুখী হইয়াছে এবং সঙ্গমনের শহরের ৩ মাইল পশ্চিমে প্রবর নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। অতুল নদী দৈর্ঘ্যে মাত্র ২৫ মাইল, কিন্তু বর্ষাকালে ইহাতে ভীষণ প্লাবন হইয়া থাকে। নিম্নদেশে নদীর তীরদ্বয় অনেকটা ঢালু, কিন্তু অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা উভয় দিকে প্রবাহিত থাকায় নদীপথে গমন কিছু কষ্টসাধ্য। সম্‌সেরপুরের নিকট নদীর গর্ভ প্রস্তরময় ও সমতল এবং তথায় বারমাস নদী প্রবাহিত থাকে। নদী হইতে এই সহরের নিকটস্থ ভূভাগে জলসেচন করা হয়।

অদুষ্ট—(ত্রি) [ন দুষ্টম্ নঞ্-তৎ] দুরদৃষ্টসাধনতারূপ দোষ-রহিত, দুষ্ট নহে। "দুষ্টং চাদুষ্টঞ্চ......সর্ব্বং পশ্যতি" (প্রশ্নোপ° ৪.৫) [দুষ্ট দ্র°]

অদুষ্টত্ব—(পুং) দুষ্টতাহীন, দোষরাহিত্য।

অদু—(ত্রি) পরিচরণহীন অর্থাৎ পরিচর্য্যারহিত। "মাপ্সবঃ পরিষদাম মাদুবঃ" (ঋক্ ৭.৪.৬.) ২ শিথিল, সুস্থ। ৩ হৃদয়শূন্য। ৪ অপূজক।

অদূন—(ত্রি) অপরিতৃপ্ত। "দূনা অদূনা অরসা অভূবন্" (অথর্ব্ব ২.৩১.৩) ২ আঘাতশূন্য। ৩ অকাতর।

অদূর—(ক্লী) [ন দূরং নঞ্-তৎ] দূর নহে, সামীপ্য। "তস্থাবদূরতোভ্রাতুরিন্দ্রস্যেব" (রামা° ৬.৭১.৪) (ত্রি) অদূরবর্ত্তী।

অদূর₂—ব্রহ্মমেরু সাবর্ণির দশপুত্রের মধ্যে একজন, (হরিবংশ)

অদূরতস্, অদূরাৎ, অদূরে—(অব্য) দূরে নহে। ২ শীঘ্র।

অদূরদর্শী—(ত্রি) বিচার রহিত, যে কোন বাক্যেরই অন্ত দর্শন করে না, অবিমৃষ্যকারী, অপরিণামদর্শী, অবিবেক।

অদূরভব—(ত্রি) যে অধিক দূরে অবস্থিত নহে, অর্থাৎ নিকটেই অবস্থিত।

অদূরবর্ত্তী—(ত্রি) অদূরস্থিত, শীঘ্রভাবী (রঘু ১.৮৭)

অদুর্গ—(ত্রি) গমন সাধ্য। ২ দুর্গরহিত।

অদুর্গবিষয়—(পুং) দুর্গ রহিত দেশ।

অদূষণ—(ত্রি) যাহাতে 'দূষণ' নাই। ২ নির্দ্দোষ, স্বচ্ছ।

অদূষিত—(ত্রি) [ন দূষিতম্ নঞ্-তৎ] যাহা দূষিত নহে। দোষের অযোগ্য দ্রব্যাদি, নির্দ্দোষ।

অদূষিতধী—(পুং) বিশুদ্ধ হৃদয় পুরুষ।

অদূষ্য—(ত্রি) যাহা দূষিত হইবার যোগ্য নহে।

অদৃঢ়—(ত্রি) দৃঢ় নহে। ২ বিচাররহিত, অস্থির। (ক্লী) ৩ [বৈদ্যক] তৃণবিশেষ।

অদৃপিত—(ত্রি) অপরিভূত, যাহার সহিত কঠোর ব্যবহার করা যায় না। "অদৃপিতেভিরেষ্টৈংনিমিষদ্ভিঃ" (ঋক্ ১.১৪৩.৮) ২ বিচারবান্।

অদৃপ্ত—(ত্রি) দর্পরহিত, অভিমানরহিত, নিরভিমান। "বেধা অদৃপ্তো অগ্নির্বিজানন্" (ঋক্ ১.৬৮.৩.)

অদৃপ্তক্রতু—(ত্রি) দর্পরহিত কর্ম্মা, অমূঢ়প্রজ্ঞ, যিনি অভিমানের বিচার করেন না। "অদৃপ্তক্রতুমরতিং যুবত্যোঃ" (ঋক্ ৬.৪৯.২) ২ গম্ভীর।

অদৃপ্যন্ত—(ত্রি) অভিমানরহিত, দর্পশূন্য। "অদৃপ্যতামনসা" (ঋক্ ১.১৫১.৮)

অদৃশ—(ত্রি) [নাস্তি দৃক্ দৃষ্টির্যস্য দৃশ্-ক্বিপ্] অন্ধ, যাহার চক্ষু নাই। [ন পশ্যতীতি দৃশ-কর্ত্তরি ক্বিপ্ নঞ্-তৎ] (ত্রি) অদর্শক, যে দেখে না।

অদৃশ্য—(ত্রি) [ন দৃশ্যম্ নঞ্-তৎ] দৃশ্য ভিন্ন, যাহা দৃষ্টিশক্তির অগোচর। ২ পরমেশ্বর।

অদৃশ্যন্তী—(স্ত্রী) বশিষ্ঠের তনয় শক্ত্রি, শক্ত্রির পত্নী অদৃশ্যন্তী। মহর্ষি শক্ত্রি কল্মাষপাদ রাক্ষস কর্ত্তৃক নিহত হইলে অদৃশ্যন্তী পরাশরকে প্রসব করেন। (মহাভা°) লিঙ্গপুরাণের মতে, রুধির নামক রাক্ষস শক্ত্রিকে ভক্ষণ করে। [কল্মাষপাদ দ্র°]

অদৃষ্ট—(ত্রি) [নঞ্-তৎ] যাহা দৃষ্ট নহে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নহে এই অর্থে অদৃষ্ট শব্দটি সর্ব্বত্র বিশেষণবোধক। ২ জীবের শুভাশুভ কর্ম্ম জন্য যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বা পুণ্য ও পাপ, তাহাও অদৃষ্ট নামে কথিত হইয়াছে। এই অর্থে "অদৃষ্ট" শব্দটী সর্ব্বত্র বিশেষ্য ও ক্লীবলিঙ্গ। যথাক্রমে উক্ত দ্বিবিধ অর্থে দুইটী অদৃষ্ট শব্দের প্রয়োগ করিয়া দার্শনিক কবি শ্রীহর্ষ "নৈষধচরিত" কাব্যের প্রথম সর্গে বলিয়াছেন,—

"অদৃষ্টমপ্যর্থমদৃষ্টবৈভবাৎ করোতি সুপ্তির্জনদর্শনাতিথিম্।"

অর্থাৎ যে পদার্থ পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই, তাহাও অদৃষ্টবিশেষবশতঃ স্বপ্নে দর্শন করা যায়, তাই দময়ন্তী তাঁহার অদৃষ্ট নল রাজাকেও অদৃষ্টবশতঃ স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। উক্ত স্থলে শেষোক্ত অদৃষ্ট শব্দের অর্থ কর্ম্মজন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামক গুণ। 'ভাষা-পরিচ্ছেদ'-কার মহানৈয়ায়িক বিশ্বনাথও চতুর্ব্বিংশতি গুণ পদার্থের উল্লেখ করিতে 'অদৃষ্ট' নামক গুণের উল্লেখ করিয়া পরে উহার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,—"ধর্ম্মাধর্ম্মাবদৃষ্টং স্যাৎ"—অর্থাৎ জীবাত্মার কর্ম্মজন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামক যে গুণ, তাহারই সাধারণ নাম

'অদৃষ্ট'। বৈশেষিক দর্শনে (৫ম-৬ষ্ঠ অঃ) মহর্ষি কণাদ উক্ত অর্থে "অদৃষ্ট" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। অনেকের মতে উহা জীবের অন্তঃকরণের গুণ। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের ন্যায় পূর্ব্বমীমাংসক সম্প্রদায়ের মতেও—শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মজন্য ধর্ম্ম এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম জন্য অধর্ম্ম জীবাত্মারই বাস্তব গুণ। তাই কোন মীমাংসাচার্য্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের লক্ষণ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,—

"বিহিতক্রিয়য়া সাধ্যো ধর্ম্মঃ পুংসাং গুণো মতঃ।
প্রতিষিদ্ধক্রিয়াসাধ্যঃ স গুণোঽধর্ম্ম উচ্যতে॥"

উক্ত ধর্ম্মজনক কর্ম্ম এবং অধর্ম্মজনক কর্ম্মও যথাক্রমে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামে কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে মহর্ষি জৈমিনিও তাহা বলিয়াছেন। কিন্তু সেই কর্ম্মরূপ ধর্ম্ম উহার ফলোৎপত্তির পূর্ব্বেই বিনষ্ট হওয়ায় উহাকে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ফল-জনক বলা যায় না—যেমন স্বর্গজনক বলিয়া বেদবোধিত যে কর্ম্ম, তাহা স্বর্গের অব্যবহিত পূর্ব্বে না থাকায় এবং নরকজনক বলিয়া বেদবোধিত যে কর্ম্ম, তাহা নরক লাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে না থাকায় উহা স্বর্গ ও নরকের সাক্ষাৎকারণ হইতে পারে না। সুতরাং স্বর্গজনক যাগাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তজ্জন্য উহার পরেই ধর্ম্ম নামক 'অদৃষ্ট' জন্মে এবং নরকজনক নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তজ্জন্য উহার পরেই অধর্ম্ম নামক অদৃষ্ট জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে সেই স্বর্গজনক যে ধর্ম্ম বা পুণ্য নামক অদৃষ্ট, তাহা মৃত্যুর পরেও বিদ্যমান থাকায় তদ্দ্বারা সেই যাগাদি কর্ম্ম যথাকালে স্বর্গের কারণ হইতে পারে এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম জন্য দুরদৃষ্ট বা পাপও মৃত্যুর পরে বিদ্যমান থাকায় তদ্দ্বারা সেই কর্ম্মও যথাকালে নরকের কারণ হইতে পারে। স্বর্গভোগের দ্বারাই স্বর্গজনক পুণ্যের ক্ষয় হইলে আবার অদৃষ্ট-বিশেষ-বশতঃ মর্ত্ত্যলোকে পুনর্জ্জন্ম হইয়া থাকে। তাই শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন,—"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" (গীতা ৯.২১) এখানে "পুণ্য" শব্দ দ্বারা স্বর্গজনক কর্ম্মজন্য ধর্ম্ম নামক অদৃষ্টবিশেষই বুঝিতে হইবে। সেই পুণ্যকর্ম্মকেই পুণ্য শব্দ দ্বারা বুঝিলে "ক্ষীণে পুণ্যে" এই রূপ উক্তির উপপত্তি হয় না। কারণ সেই পুণ্যকর্ম্ম সেই কর্ম্মীর জীবন কালেই বিনষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ মুণ্ডকোপনিষদে (২.২.৮) "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" এই শ্রুতিবাক্যে এবং ভগবদ্‌গীতায় "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন" ইত্যাদি শ্লোকে 'কর্ম্মন্' শব্দ দ্বারা কর্ম্মজন্য ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টই বুঝিতে হইবে। কারণ কর্ম্মানুষ্ঠানের পরে আর সেই কর্ম্মের সত্তা না থাকায় তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা কর্ম্মক্ষয় হয়, ইহা বলা যায় না। কিন্তু কর্ম্মজন্য ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট স্বীকার করিলে পরেও তাহা বিদ্যমান থাকায় উহাকে তত্ত্বজ্ঞাননাশ্য বলা যাইতে পারে। সুতরাং বুঝা যায় যে, শাস্ত্রে কর্ম্মজন্য অদৃষ্ট অর্থেও "কর্ম্মন্" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সেই সমস্ত শাস্ত্রবাক্যও ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টের অস্তিত্বে প্রমাণ। পরন্তু শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শেষেও উক্তরূপ বচন দেখা যায়। উক্ত বচন দ্বারা বলা হইয়াছে যে—ভোগব্যতীত কোন কর্ম্মের কোন কালেই ক্ষয় হইতে পারে না, জীবের কৃত সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্ম অবশ্য ভোগ্য। কিন্তু ভগবান্ বলিয়াছেন, "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন!" (গীতা ৪.৩৭) অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইলে সর্ব্বকর্ম্মের ক্ষয় হয়। সুতরাং ভোগব্যতীতও তত্ত্বজ্ঞানীর কর্ম্মক্ষয় হয়,—ইহা উক্ত ভগবদ্‌বাক্য দ্বারা বুঝা যায়। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্মুক্ত পুরুষও শরীর ধারণ করিয়া কর্ম্মজন্য সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছেন, অতএব ভোগব্যতীত প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয় না,—ইহাই সিদ্ধান্ত বলিতে হইবে। তাই শাস্ত্রেও প্রারব্ধ কর্ম্ম, সঞ্চিত কর্ম্ম ও ক্রিয়মাণ কর্ম্ম এই ত্রিবিধ কর্ম্ম কথিত হইয়াছে। যে কর্ম্মের ফলারম্ভ হইয়াছে, তাহার নাম প্রারব্ধ কর্ম্ম, যেমন জীবের অভিনব শরীর-সৃষ্টিজনক কর্ম্ম। শরীরসৃষ্টির সময় হইতেই উহার ফলারম্ভ হওয়ায় উহা প্রারব্ধ কর্ম্ম। ভোগব্যতীত ঐ অদৃষ্টের নাশ হইতে পারে না, তাই তত্ত্বজ্ঞানও উহাকে নষ্ট করিতে পারে না। তাই তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্মুক্ত পুরুষও ঐ প্রারব্ধ কর্ম্মরূপ অদৃষ্টের স্থিতি-কাল পর্য্যন্ত ঐ অদৃষ্টের ফলভোগ করেন; তাই বেদান্তদর্শনে বাদরায়ণও বলিয়াছেন—

"ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে।" (৪.১.১৯)

ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"ইতরে তু আরব্ধ-কার্য্যে পুণ্যপাপে উপভোগেন ক্ষপয়িত্বা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে।" অর্থাৎ যাহার ফলারম্ভ হইয়াছে, তাদৃশ পুণ্য এবং পাপ, ভোগদ্বারাই ক্ষয় করিয়া তত্ত্বজ্ঞানী পরমমুক্তি লাভ করেন। আর যে সমস্ত পুণ্য ও পাপের ফলারম্ভ হয় নাই, সেই সমস্ত (সঞ্চিত ও ক্রিয়-মাণ) পুণ্য ও পাপ, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই নষ্ট হইয়া যায়। তাই বেদান্তদর্শনে বাদরায়ণ ইহার পূর্ব্বে বলিয়াছেন—"অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ।" (৪.১.১৮)

পূর্ব্বোক্ত "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন" ইত্যাদি ভগবদ্‌গীতাবাক্যের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যও ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন—"যেন কর্ম্মণা শরীরমারব্ধং তৎ প্রবৃত্তফলত্বাৎ উপভোগে-নৈব ক্ষীয়তে, অতো যানি অপ্রবৃত্তফলানি জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্-কৃতানি জ্ঞানসহভাবীনি চাতীতানেকজন্মকৃতানি চ তান্যেব

সর্ব্বাণি ভস্মসাৎ কুরুতে।" অর্থাৎ জীবের শরীরোৎপাদক কর্ম্ম প্রভৃতি যে সমস্ত কর্ম্মের ফলারম্ভ হইয়াছে, তদ্‌ভিন্ন সমস্ত কর্ম্মই উক্ত শ্লোকে "সর্ব্ব কর্ম্মাণি" এই পদ দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। সেই সমস্ত কর্ম্মই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ক্ষীণ হইয়া যায়।

মূল কথা মানবের অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্মজন্য ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম রূপ অদৃষ্টপদার্থ অবশ্য স্বীকার্য্য, তন্মধ্যে ধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট শুভাদৃষ্ট নামে এবং অধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট দুরদৃষ্ট নামে কথিত হইয়াছে। এইরূপ ঐ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট যথাক্রমে পুণ্য ও পাপ নামে, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য নামে, সুদৈব ও দুর্দৈব নামে এবং আরও অনেক নামে কথিত হইয়াছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

"দৈবে পুরুষকারে চ কর্ম্মসিদ্ধির্ব্যবস্থিতা।
তত্র দৈবমভিব্যক্তং পৌরুষং পৌর্ব্বদেহিকম্॥
যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ।
তথা পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য ১.৩৪৯,৩৫১ শ্লোক)

যাজ্ঞবল্ক্যের কথায় বুঝা যায়, মানবের পূর্ব্বজন্মকৃত শুভাশুভ কর্ম্মরূপ পুরুষকার 'অভিব্যক্ত' অর্থাৎ ফলোন্মুখ হইলে তাহাকেই বলে 'দৈব'।

মীমাংসকসম্প্রদায় উক্ত কর্ম্মজন্য জীবাত্মার অদৃষ্টরূপ গুণ স্বীকার করিয়া উহাকে 'অপূর্ব্ব' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। গুরু প্রভাকর প্রভৃতি মীমাংসাচার্য্যগণের মতে শাস্ত্রোক্ত বিধি-লিঙ্ প্রভৃতি প্রত্যয় ঐ অপূর্ব্বের বাচক। যেমন 'যজেত' এই বৈদিক বিধি-বাক্যে 'ইত' প্রত্যয় দ্বারা কার্য্যস্বরূপে অপূর্ব্ব বুঝা যায়। সুতরাং অপূর্ব্ববিষয়ে ঐ বৈদিক বিধিবাক্যই প্রমাণ। কিন্তু ন্যায়বৈশেষিকাদি সম্প্রদায় বিধিপ্রত্যয়ের অপূর্ব্ব অর্থ স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে 'স্বর্গকামো যজেত' ইত্যাদি বিধিবাক্যমূলক অনুমান প্রমাণ দ্বারাই যাগাদিকর্ম্মজন্য অদৃষ্ট পদার্থ সিদ্ধ হয়। কারণ উক্ত বিধিবাক্যের দ্বারা যাগ যে স্বর্গের কারণ, ইহা কথিত হইয়াছে। কিন্তু যে যাগাদি কর্ম্ম স্বর্গভোগের বহুপূর্ব্বে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই যাগাদিকর্ম্ম তজ্জন্য কোন ব্যাপার ব্যতীত স্বর্গের কারণ হইতে পারে না। অতএব ঐ যাগজন্য অদৃষ্ট নামক কোন ব্যাপার জন্মে এবং তদ্দ্বারাই ঐ যাগ স্বর্গের কারণ হইয়া থাকে, ইহাই অনুমান-প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য উক্ত স্থলে অদৃষ্ট বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত অনুমানরূপ যুক্তি প্রকাশ করিতে 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলির' প্রথম স্তবকে বলিয়াছেন, "চিরধ্বস্তং ফলায়ালং ন কর্ম্মাতিশয়ং বিনা" ইত্যাদি। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মীমাংসক মতাবলম্বী হইলেও 'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে' কর্ম্মজন্য অদৃষ্ট সমর্থন করিতে কুসুমাঞ্জলিকার উদয়নাচার্য্যের ঐ কথারও উল্লেখ করিয়াছেন।

'মীমাংসাপরিভাষা'কারও নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের ন্যায় উক্তরূপ যুক্তি দ্বারাই কর্ম্মজন্য অদৃষ্ট বা অপূর্ব্ব সমর্থন করিবার জন্য লিখিয়াছেন—

"বিহিতনিষিদ্ধকর্ম্মণাং তত্তদ্‌বাক্যৈস্তত্তৎফলসাধনত্বেঽবগতে আশুতরবিনাশিনাং কালান্তরভাবিফলসাধনত্বোপপত্ত্যর্থমন্তরা পুণ্যপাপরূপমপূর্ব্বং কল্প্যতে"।

পূর্ব্বমীমাংসাচার্য্য মহর্ষি জৈমিনি 'জীবের পূর্ব্বকৃতকর্ম্মজন্য পুণ্য ও পাপরূপ অদৃষ্টেরই প্রাধান্যবিবক্ষাবশতঃ উহাই সৃষ্টির মুখ্য কারণ এবং উহাই জীবের সমস্ত সুখ-দুঃখের কারণ' ইহাই সমর্থন করিয়াছেন। কর্ম্মবাদী জৈমিনির মতে জীবের শুভাশুভ অদৃষ্ট ঈশ্বরকে বা ঐরূপ কোন নিত্য কর্ত্তাকে অপেক্ষা না করিয়াই নিজেই সৃষ্ট্যাদি কার্য্য ও জীবের সুখ-দুঃখবিধানে সমর্থ। তাই বেদান্তদর্শনে মহর্ষি বাদরায়ণ জৈমিনির উক্ত মত প্রকাশ করিতে সূত্র বলিয়াছেন—"ধর্ম্মং জৈমিনি রত এব" (৩.২.৪০)। পরে নিজমত সমর্থনে বলিয়াছেন—"পূর্ব্বন্তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ" (৩.২.৪১)। অর্থাৎ বেদান্তসূত্রকার বাদরায়ণের মতে—কেবল জীবের কর্ম্ম বা অদৃষ্টই সমস্ত ফলের হেতু নহে, কিন্তু জীবের ঐ সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মসাপেক্ষ পরমেশ্বরই সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা এবং সর্ব্বজীবের সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা। বস্তুতঃ শ্রুতি স্পষ্ট বলিয়াছেন—

(১) "এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে, এষ হ্যেবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং য মধো নিনীষতে।" (কৌষিতকী-উপনিষৎ ৩.৮)

(২) "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন॥"

(বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৩.২.১৩)

(৩) "কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ"

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬.১১)

"স বা এষ মহানজ আত্মান্নাদো বসুদানঃ॥"

(বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪.৪.২৪)

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা স্পষ্ট কথিত হইয়াছে যে, সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরই জীবকে সাধু ও অসাধু কর্ম্ম করাইতেছেন। জীব কর্ম্মের কর্ত্তা, পরমেশ্বর কারয়িতা অর্থাৎ হেতুকর্ত্তা বা প্রযোজককর্ত্তা। আর তিনি জীবের সর্ব্বকর্ম্মাধ্যক্ষ অর্থাৎ সমস্ত অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা এবং তিনিই জীবের 'বসুদান' অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতা। উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যানুসারে ইহাই বুঝা যায় যে, "পরমেশ্বর সর্ব্বজীবের ধর্ম্মাধর্ম্মসাপেক্ষ কর্ত্তা, অর্থাৎ জীবের বিচিত্র ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টানুসারেই সময় বিশেষে জগতের সৃষ্টি ও সংহার করেন, সুতরাং বিষমসৃষ্টির জন্য তাঁহার বৈষম্য অর্থাৎ পক্ষপাত-দোষ নাই এবং সংহারের জন্য নৈর্ঘৃণ্য অর্থাৎ নির্দ্দয়তাদোষও

নাই। তাই উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যানুসারেই বেদান্তদর্শনে ভগবান্ বাদরায়ণ পূর্ব্বেই বলিয়াছেন—

"বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাত্তথাহি দর্শয়তি।" (২.১.৩৪) তাৎপর্য্য এই যে, যেহেতু পরমেশ্বর সাপেক্ষকর্ত্তা, অতএব সৃষ্টি-সংহার কার্য্যে তাঁহার পক্ষপাতও নির্দ্দয়তাদোষ নাই—শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন। উক্ত সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"সাপেক্ষো হীশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমীতে, 'কিমপেক্ষতে'—ইতি চেৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাবপেক্ষত ইতি বদামঃ।" অর্থাৎ সমস্ত জীবের ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়াই পরমেশ্বর বিষম সৃষ্টি করেন, সুতরাং তিনি সর্ব্বকর্ত্তা ও সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও কেবল স্বেচ্ছানুসারেই কোন কার্য্য করেন না। কিন্তু জীবের পূর্ব্বজন্মকৃতকর্ম্মজন্য অদৃষ্টানুসারেই সমস্ত কার্য্য অর্থাৎ যেখানে যে সময়ে যাহা সমুচিত কর্ত্তব্য, তাহাই করেন; সুতরাং তাহাতে পক্ষপাতাদি দোষের কোন সম্ভাবনা নাই।

ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের উক্ত সন্দর্ভে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম শব্দ দ্বারা জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মরূপ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে গ্রহণ করিলে তাঁহার মতে পরমেশ্বর জীবের সেই সমস্ত অতীত কর্ম্মানুসারেই সৃষ্ট্যাদি কর্ম্ম করেন সুতরাং সেই সমস্ত। কর্ম্মজন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামক অপূর্ব্ব স্বীকার অনাবশ্যক ইহা একমত। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই মতও স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু কর্ম্মজন্য অপূর্ব্ববাদেও যে তাঁহার আপত্তি নাই, তাহাও তাঁহার কথা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। কারণ তিনি বেদান্তসূত্রকার বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিতে পরে স্পষ্ট বলিয়াছেন—"কর্ম্মাপেক্ষাদপূর্ব্বাপেক্ষাদ্বা যথা তথা অস্তু, ঈশ্বরাৎ ফলমিতি সিদ্ধান্তঃ।" (শারীরকভাষ্য ৩.২.৪১)

কেহ কেহ বলেন যে, ন্যায়সূত্রকার গৌতমের মতেও সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর জীবের অতীত শুভাশুভ কর্ম্মানুসারেই জগতের কর্ত্তা এবং জীবের সুখদুঃখবিধাতা। অর্থাৎ গৌতম জীবের শুভাশুভ-কর্ম্মজন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামক আত্মগুণ স্বীকার করেন নাই। কিন্তু ন্যায়দর্শনে গৌতম স্পষ্ট বলিয়াছেন—"পূর্ব্বকৃত-ফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ।" (৩.২.৬০) উক্ত সূত্রে গৌতম 'পূর্ব্বকৃত' শব্দের পরে 'ফল' শব্দ প্রয়োগ করায় তিনি যে পূর্ব্বকৃত শুভাশুভ-কর্ম্মজন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামক ফলও স্বীকার করিতেন, ইহা বুঝা যায়। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও উক্ত সূত্রে 'পূর্ব্বকৃত' শব্দ ও 'ফল' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"পূর্ব্বশরীরে যা প্রবৃত্তির্বাগ্‌বুদ্ধিশরীরারম্ভলক্ষণা, তৎ পূর্ব্বকৃতং কর্ম্মোক্তম্, তস্য ফলং তজ্জনিতৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ।" গৌতম ন্যায়দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেও "শরীরদাহে পাতকাভাবাৎ" (৩.১.৪) এই সূত্রে "পাতক" শব্দ দ্বারা অধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন। পরে তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের ৪১ সূত্রেও জীবের প্রাক্তন সংস্কারের উদ্বোধকসমূহের উল্লেখ করিতে সর্ব্বশেষে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মেরও উল্লেখ করিয়াছেন, ("প্রণিধান-নিবন্ধাভ্যাস...... ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তেভ্যঃ" (৩.২.৪১)। সুতরাং নৈয়ায়িকসম্প্রদায় গৌতমের সূত্রানুসারেই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ অদৃষ্টকে জীবাত্মার গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদও "অদৃষ্ট" শব্দের প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছেন—'অদৃষ্টাচ্চ'। (৬.২.১২) অর্থাৎ জীবের অদৃষ্ট-বিশেষজন্যই কোন কোন প্রাক্তন সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে। পরন্তু কণাদ পূর্ব্বেও বলিয়াছেন—

"অপসর্পণমুপসর্পণমশিত-পীত-সংযোগাঃ কার্য্যান্তর-সংযোগাশ্চেত্যদৃষ্টকারিতানি।" (৫.২.৭)

অর্থাৎ 'অপসর্পণ' (মরণকালে প্রাণ ও মনের দেহত্যাগ করিয়া উদ্‌গমন), 'উপসর্পণ' (দেহান্তরের উৎপত্তি হইলে তাহাতে প্রাণ ও মনের প্রবেশ) ইত্যাদি কর্ম্ম অদৃষ্টের কার্য্য। উক্ত সূত্রে কণাদ যে অদৃষ্ট শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা শুভাশুভ-কর্ম্মজন্য পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টই উপনিষদ অনুসারে তাঁহার অভিপ্রেত বুঝা যায়। ছান্দোগ্যোপনিষৎ (৫.১০.৭) এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদে (৬.২ ব্রাহ্মণে) জীবের পূর্ব্বজন্মকৃত শুভাশুভ কর্ম্মানুসারেই জন্মান্তর গ্রহণের কথা আছে।

বেদমন্ত্রেও ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টের কথা অনেক স্থানেই শ্রুত হয়—বৈদিক সন্ধ্যার আচমনমন্ত্রে 'দুরদৃষ্ট' পদার্থ 'পাপ' 'দুরিত'ও 'দুশ্চরিত' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা উক্ত হইয়াছে—(১) "মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্। (২) যৎ পাপমকার্ষম্'। (৩) যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি। (৪) যদ্বা দুশ্চরিতং মম" ইত্যাদি। এই সব মন্ত্র কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় নারায়ণোপনিষদের ২য় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। ঐ সকল মন্ত্রে সাধকের পক্ষে এইরূপ ভাবনা উপদিষ্ট হইয়াছে যে—"আমি দিবারাত্রিতে দেহ ও ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সমস্ত পাপ অর্থাৎ দুরিতদুশ্চরিতরূপ দুরদৃষ্ট অর্জ্জন করিয়াছি, তাহা পরমাত্মপ্রতীক সূর্য্য ও অগ্নিরূপ জ্যোতিঃপদার্থে আহুতি দান করিলাম।" ঋগ্বেদ-সংহিতাতেও 'অঘ' শব্দ দ্বারা "দুরদৃষ্ট" পদার্থের উল্লেখ দেখা যায় যথা—

"নার্য্যমণং পুষ্যতি ন সখায়ম্।
কেবলা ঘো ভবতি কেবলাদী॥" (ঋক্ ১০.১১৭.৬.)

[নিরুক্তে দৈবতকাণ্ডে মন্ত্রবিভাগ প্রকরণ দ্রষ্টব্য]

উক্ত মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে যে ব্যক্তি দেব পিতৃমনুষ্যকে দান না করিয়া নিজেই সকল উপভোগ করে, সে 'অঘ' (পাপরূপদুরদৃষ্ট) প্রাপ্ত হয়—"আত্মনৈব কেবলং যোঽন্নমত্তি ন দেবপিতৃমনুষ্যেভ্যো দদাতি স কেবলমঘমেব প্রাপ্নোতি" (দুর্গাচার্য্যকৃত নিরুক্তভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

এইরূপ কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে পূর্ব্বকৃত শুভ ও অশুভ কর্ম্মানুসারেই জীবের মনুষ্যস্থাবরাদি নানাবিধ জন্ম হইয়া থাকে।

"যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথা কর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥"
(কঠোপনিষৎ ২.২.৭)

"যৈ র্যাদৃশং কর্ম্ম ইহ জন্মনি কৃতং তদ্বশেন ইত্যেতৎ। 'যথা-শ্রুতম্'—যদ্‌াশঞ্চ বিজ্ঞানমুপার্জ্জিতং তদনুরূপং শরীরং প্রতিপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ।" (শাঙ্কর ভাষ্য।)

সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদেও উক্ত হইয়াছে যে,—"জীব শুভ কর্ম্ম বশতঃই ব্রাহ্মণাদি উচ্চ যোনিতে এবং অশুভ কর্ম্ম বশতঃই কুকুরাদি নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

"তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনি-মাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা। অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা।"
(ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৫.১০.৭)

সুতরাং জীবের উচ্চনীচাদি বিবিধ বিচিত্র জন্মের প্রতি তথা-কথিত অদৃষ্টও কারণ। এই অদৃষ্ট পদার্থ স্বীকার না করিলে এই সৃষ্টিবৈচিত্র্যের কোনপ্রকারেই মীমাংসা হয় না। অনাদিকাল হইতে এই বিচিত্র অদৃষ্টবশতঃই বিচিত্র সৃষ্টি হইতেছে ইহা প্রণিধান করিলেই বুঝা যায়। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় গর্ভোপনিষদে আছে যে, "নবমে মাসি পূর্ব্বজাতিং স্মরতি, শুভাশুভঞ্চ কর্ম্ম বিন্দতি"। অর্থাৎ গর্ভস্থ জীব নবম মাসে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম স্মরণ এবং পূর্ব্বজন্মকৃত শুভাশুভ কর্ম্ম স্মরণ করে। সেই কর্ম্মজন্য ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টবশতঃই জীবের বিচিত্র জন্ম ও বিচিত্র সুখ-দুঃখাদির ভোগ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে অনেক স্থানে 'কর্ম্মন্' শব্দের দ্বারা সেই অদৃষ্টই কর্ম্মজন্য অদৃষ্টই লক্ষিত হইয়াছে। এই অদৃষ্টবাদ অনাদিকাল হইতে ভারতের আর্য্যগণের পরিজ্ঞাত বেদমূলক সিদ্ধান্ত।

অদৃষ্ট২—প্রাচীন গ্রীকগণ বিশ্বাস করিতেন যে কোনও দেবতা অদৃষ্টের নিয়ন্তা। তিনিই ভাগ্যবিধাতা। তিনিই মানবের অদৃষ্ট নিরূপিত করিয়া দেন। প্রাচীন গ্রীক-কবি হোমারের গ্রন্থেও এই বিশ্বাস পরিস্ফুট। ক্রমশঃ বিশ্বাস দাঁড়াইয়া যায় যে, তিনজন দেবতা অদৃষ্ট নিরূপিত করেন। তাঁহারা জন্মকালেই অদৃষ্ট নির্দ্ধারণ করিয়া দেন।

রোমকগণ অদৃষ্ট বা ভাগ্য অর্থে বুঝিতেন যে দেবতাগণের উচ্চারিত আদেশ, অথবা স্বয়ং পরমেশ্বরের প্রদত্ত আদেশ যাহা কখনই খণ্ডন হইতে পারে না। ভারতবাসী হিন্দুর বিশ্বাস: এই যে ললাটে বিধি-লিপি লিখিত হইয়া থাকে এবং তাহা খণ্ডন হইবার নহে,—"লিখিতমপি ললাটে প্রোজ্ঝিতুং কঃ সমর্থঃ"। প্রাচীন রোমকগণও বিশ্বাস করিতেন, অদৃষ্ট খণ্ডিত হইবার নহে। তবে তাঁহারা ভাবিতেন, অদৃষ্ট লিখিত লিপি নহে, ইহা ভগবদুচ্চারিত আদেশবিশেষ।

[ভাগ্য ও অদৃষ্টবাদ দ্র°]

গ্রীস ও রোমে অদৃষ্ট-দেবতা বা ভাগ্যলক্ষ্মীপূজার যে বহুল প্রচার ছিল, তাহা ভাস্কর-শিল্পমণ্ডিত অদৃষ্ট-দেবতার মূর্ত্তি স্থাপনা হইতেই বুঝা যায়। গ্রীসের পার্থেননের ত্রিকোণাকার কুলঙ্গীমধ্যে অদৃষ্টদেবীর পূর্ব্বোক্তরূপ তিনটী মূর্ত্তি খোদিত আছে। রোম-রাজ্যেও ভাগ্যদেবীর পূজার বহুল প্রসার ছিল। রোমকদিগের পূর্ব্বতন বীরাচারসমূহ বিলুপ্তপ্রায় দেখিয়া সম্রাট্ অগাষ্টস্ পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত পূজা ও উৎসবাদি পুনঃ প্রবর্ত্তন করিতে সচেষ্ট হন। তাঁহার রাজ্যকালে টাইবার নদীকূলস্থ পার্কীর মন্দিরে মেষবলি দেওয়া হইত। ঐ সময়ে শতবর্ষ পরমায়ু লাভ করিলে ইতালীর প্রায় সকল স্থানেই ভাগ্যদেবীর শান্তির জন্য পূজা ও বলি দেওয়া হইত।

আথেন্সবাসীরা থর্‌গেলিয়া (Thargalia) উৎসবে অদৃষ্ট-দেবতার তৃপ্তিবিধান-জন্য পূজা ও বলি দিত। ঐ সময়ে পোলিসে ডিমিটার-ক্লোই (Demeter Chloe) দেবতাকে ঐ ছাগ ও অদৃষ্ট দেবতাকে (Fates) শূকর বলি দেওয়া হইত। কৃষিকর্ম্মে, উদ্যানে ফল-প্রাচুর্য্যে এবং যুদ্ধযাত্রায় অথবা শত্রু নিধনে সাফল্য লাভার্থ তাহারা সকল সময়েই অদৃষ্টদেবতার তুষ্টির জন্য পূজাদির আয়োজন করিত।

অদৃষ্টকর্ম্মন্—(ত্রি) যিনি কার্য্য দেখেন নাই, অনুভবরহিত।

অদৃষ্টকর্ম্মা—(ত্রি) যে কার্য্য দেখে নাই, অর্থাৎ কার্য্যে অনভ্যস্ত, কার্য্যানুষ্ঠানহীন। "কার্য্যেষদৃষ্ট-কর্ম্মা যঃ শাস্ত্রজ্ঞোঽপি বিমুহ্যতি।" (হিতোপ° ৩.৫৭)

অদৃষ্টকাম—(পুং) অদৃষ্টবস্তুর কামনা।

অদৃষ্টচর—(দেশজ) যাহা পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই, অদৃষ্টপূর্ব্ব।

অদৃষ্টনর, অদৃষ্টপুরুষ—(পুং) সন্ধিবিশেষ, এই সন্ধি কোন ব্যক্তিকে মধ্যস্থব্যতীত ও নিশ্চয়তা ভিন্ন সম্পন্ন হয়।

অদৃষ্টপরসামর্থ্য—(পুং) শত্রুশক্তির অননুভব, অজ্ঞাতশত্রু-শক্তি, যে ব্যক্তি শত্রুর বলবীর্য্য অনুভব করিতে অসমর্থ।

অদৃষ্টপূর্ব্ব—(ত্রি) [ন পূর্ব্বং দৃষ্টম্ সুপ্‌সুপেতি সমাসাৎ পরনিপাতঃ] যাহা দৃষ্টপূর্ব্ব নহে। পূর্ব্বে অদৃষ্ট। "অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্টা" (গীতা ১১.৪৫) পূর্ব্বে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

অদৃষ্টরূপ—(ত্রি) যিনি রূপদর্শন করেন নাই। ২ অদৃষ্ট।

অদৃষ্টবৎ—(ত্রি) [অদৃষ্ট মতুপ্ অস্ত্যর্থে] ভাগ্যবান্, যাহার প্রশস্ত অদৃষ্ট। (স্ত্রী) প্রতিকূলদৃষ্টি। ২ কুৎসিৎ দৃষ্টি। ৩ সক্রোধ বক্রদৃষ্টি। ৪ কুটিলচক্ষু। ৫ অসৌম্য চক্ষু। ৬ বক্রদৃষ্টি-যুক্তাক্ষি।

অদৃষ্টবাদ—(পুং) ভাগ্যের উপর বিশ্বাস। ২ বিনা বিচারে শাস্ত্রানুসার প্রারব্ধ স্বীকার।

মানব সভ্যতার যুগে ভাগ্য সম্বন্ধে একটী দার্শনিক মতবাদের কল্পনা করিয়াছেন। যে অবস্থায় মানুষের ক্রিয়া কলাপ ভবিষ্যৎ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সেই অবস্থায় মানুষের মন যখন কর্ম্মক্লান্ত এবং প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত কিংবা ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে, তখন তাহার অবসন্ন মন অন্ধ-নিয়তির উপর তাহার সমস্ত দায়িত্ব চাপাইয়া নিশ্চিন্ত প্রসন্নতা লাভ করে। ইহাই অদৃষ্টবাদ নামে খ্যাত।

অদৃষ্টবাদ সেই অবস্থায় উদ্ভূত হয়, যখন মানুষ বাস্তব-জীবনকে একটী অখণ্ড শেষ ঐক্যের নিয়মাধীন বলিয়া জানিতে পারে। অদৃষ্টই তাহার অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনানুসারে মানব-জীবনের কার্য্যধারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া লয়। ইহা একটী অদৃশ্য চরম শক্তি। কখন ইহা শরীর-ধারী, কখনও বা নিরবয়ব বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকে। যাহারা জগৎসংসার এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে কারণ-পারম্পর্য্যের অধীন বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে না, কিংবা যাহারা মঙ্গলময় ভগবচ্ছক্তিতে বিশ্বাসহীন, অথবা যাহারা একটী অখণ্ড ঐক্যের প্রাধান্য মানে, কেবল তাহারাই অদৃষ্ট-বাদের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকে।

যাহারা সভ্যতার অনেক নিম্নস্তরে আছে, তাহাদের মধ্যে অদৃষ্টবাদ দেখা যায় না। জীবনের নানা ঘটনাকে তাহারা নানা প্রকারের দেবদেবী কিংবা দানবীয় শক্তির ইচ্ছাধীন বলিয়া মনে করে। তাহাদের মধ্যে ঐ শক্তিসমূহের কোনরূপ সামঞ্জস্য দেখা যায় না। এই কারণ তাহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে অদৃষ্টবাদী বলা যায় না। আমেরিকার ইণ্ডিয়ানগণ তাহাদের বৈচিত্র্যময় জীবনকে নানা প্রকার অসংস্কৃত মতের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। তাহাদের "জীবন-স্বপ্নে" মৃত্যুদেবতার একটী প্রকাণ্ড স্থান আছে, কিন্তু ইহাকে তাহারা নিয়তি বলিয়া কল্পনা করিতে শিখে নাই। কারণ তাহাদের মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধারণা কিংবা প্রকৃতি যে কোন বিশেষ নিয়মাধীন তাহার ধারণা তাহাদের মনে স্থান পায় নাই।

রেডইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে অপর দুইটী শাখার নাম করা যাইতে পারে ; যাহাদিগকে অদৃষ্টবাদী বলা যাইতে পারে। এই শাখা দুইটীর নাম কুইচুয়া এবং অজ্‌তেক্। তাহারা জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর প্রভাব মানুষের কার্য্যাবলীকে প্রভাবান্বিত করে, এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করে। এই জ্যোতিষিক বিশ্বাস তাহাদের মধ্যে অদৃষ্টবাদ সূচনা করিয়া দেয়। তাহাদিগের ধারণা যে, দেবতা-দিগের ইচ্ছা কিংবা আদেশ নিয়তির দ্বারা ধরাতে ব্যক্ত হয়, যাহাতে দেবদেবী তাহাদিগের উপর সন্তুষ্ট থাকে সেইজন্য নানা প্রকার মন্ত্রতন্ত্রের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

প্রাচীন বাবিলনীয় জাতি মনে করিত যে নানা আকারের নক্ষত্রাবলী মনুষ্য-জীবনের ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করে। ইহাদের মধ্যে ভূত তাড়ানো, যাদুবিদ্যা এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রচলন দেখা যায়। চীনদেশ-বাসীরাও এইরূপ বিশ্বাসের অধীন। চীনগণ অদৃষ্টকে "মিঙ্" বলে। এইদেশে জ্যোতিষী গণকদিগের বিশেষ সমাদর। ইহাদিগের মধ্যে বিশ্বাস এই যে, মানুষ পারিবারিক এবং রাজনৈতিক ধর্ম্ম মানিতে বাধ্য, কারণ এই ধর্ম্ম প্রাকৃতিক ধর্ম্মের অঙ্গীভূত। এই প্রাকৃতিক ধর্ম্মই নিরবয়ব লোক-সম্পর্ক-বিরহিত "অদৃষ্ট" দেবতা। কন্‌ফুচির ধর্ম্মেও নিয়তির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। টিউটনদিগের ধর্ম্মেও অদৃষ্টবাদের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। ইহারা দেবতাদিগকেও নিয়তির অধীন বলিয়া মনে করিত। দেবতারাও স্বয়ং পাপ করিয়া অব্যাহতি পান না। তাহারাও নশ্বরতার অধীন। প্রকৃতির ধ্বংসকারী শক্তিই সর্ব্বশেষে কর্ত্তৃত্ব লাভ করে এবং পরিণামে মহাপ্রলয়ের সৃষ্টি হয়। দেবতাদিগের অধীশ্বর স্বয়ং ওডিনও পৃথিবীর ধ্বংসাবশেষে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

সকল শ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে কর্ম্মবাদের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়, এই কর্ম্মবাদই তাহাদিগের ধর্ম্মবোধের শ্রেষ্ঠ ভিত্তি। তাঁহারা মনে করেন মানুষ যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে তাহারই ফলভোগ করিতে হয়। উত্তর-ভারতে হিন্দুদিগের মধ্যে এই মত সার্ব্বজনীন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। দক্ষিণ-ভারতে সাধারণ লোকের মধ্যে ভূততত্ত্বে বিশেষ আস্থা দেখা যায়। এইখানেই লোকে কলেরা এবং বসন্তের দেবী মারিয়াম্মাকে পূজা করে এবং কাহারও কোনো দুর্ঘটনা ঘটিলে তাহাতে ভূতপ্রেতের প্রভাব জন্য ঘটিয়াছে তাহা বিশ্বাস করে এবং পূজা দিয়া তাহাদিগের সন্তোষ-বিধানের চেষ্টা পায়। বাঙ্গলাদেশের অধিবাসীরাও অদৃষ্টবাদে ঘোর বিশ্বাসী। তাহারা সকল মহামারীর অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীর কল্পনা করিয়া জনসাধারণের মধ্যে অদ্যাবধি অদৃষ্ট-দেবতার প্রবল প্রভাব সূচনা করিয়া দিতেছে। ওলাউঠার সময়ে ওলাইচণ্ডী বা ওলাবিবি এবং বসন্তের সময়ে শীতলা দেবী তাহার জলন্ত প্রমাণ।

সুপ্রাচীন উপনিষদের যুগ হইতে অদৃষ্টবাদ হিন্দুসমাজকে ওতঃপ্রোত ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছে। এই অদৃষ্টশক্তি দ্বৈতভাবাপন্ন ভাল ও মন্দ ; সমস্ত পাপ ও পুণ্য এবং ইহলোক

ও পরলোকের যাবতীয় সৎকার্য্য কিংবা ত্রুটি-বিচ্যুতি সকলের সমষ্টিগত ফলস্বরূপ। ইহা ইহলোক এবং পরলোকের যাবতীয় অবস্থার নিয়ন্ত্রণকর্ত্তা।

এই অদৃষ্টবাদ কিংবা কর্ম্মফলের কথা প্রথমতঃ ব্রাহ্মণে ও পরে উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়। [অদৃষ্ট, দ্র°] এই দার্শনিক মতবাদকে ইউরোপীয় দর্শনে determinism বলে। যে সকল আত্মা ব্রহ্মতে বিলীন হইয়া যায়, কেবল তাঁহারাই অদৃষ্টের প্রভাব হইতে চিরমুক্ত।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে, বৌদ্ধধর্ম্মে এবং জৈনধর্ম্মেও কর্ম্মবাদের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। [কর্ম্মবাদ দ্র°] ভারতবর্ষের নবধর্ম্ম-সমূহের মধ্যে শিখধর্ম্মে সর্ব্বাপেক্ষা অদৃষ্টবাদের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। শিখেরা অদৃষ্টের লেখায় (চলিত কপালের লিখন) সবিশেষ আস্থাবান্। ইহ-জগতের যাবতীয় সামাজিক পার্থক্য, দুঃখ দারিদ্র্য সকল অবস্থাতেই মানুষ অদৃষ্টাধীন। শিখধর্ম্মে স্বর্গ-লোকই শ্রেষ্ঠ কাম্য নহে ; এই জগতে পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহই মানুষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ক্লেশদায়ক ঘটনা, সেইজন্য নির্ব্বাণই কাম্য। তাঁহারা পুনর্জন্মে আস্থাবান্। [শিখ দ্র°]

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে অদৃষ্টবাদের সহিত পুরুষকারের প্রাধান্যও স্বীকৃত হইয়াছে। (অনুশাসনপর্ব্ব) বনপর্ব্বে ও বলা হইয়াছে যে, যাহারা ক্লীব তাহারাই দৈবে বিশ্বাস করে। গীতায় কর্ম্মবাদের সহিত পুরুষকারের সামঞ্জস্য বিহিত হইয়াছে। অদৃষ্টবাদ কিংবা দৈবশক্তি হিন্দুর আইনেও স্থান পাইয়াছে। যদি দৈবহেতু কিংবা রাজকার্য্যের জন্য গচ্ছিত দ্রব্যের কোন ক্ষতি হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি সেই গচ্ছিত দ্রব্য রাখিয়াছে, সে ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী হইতে পারে না। [দৈব দ্র°]

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও দৈববল স্বীকৃত হইয়াছে। ইরাণীয় ধর্ম্মে অদৃষ্টবাদের স্থান অতিশয় সামান্য। জরথুস্ত্র পাপ-পুণ্যের সংঘাত স্বীকার করিয়াছেন। এই ধর্ম্মে যদিও অহুর-মজ্‌দের স্থান সর্ব্বোচ্চে, তথাপি তাঁহাকে অঙ্গ্র মইন্যুর সহিত পুণ্যের জন্য সর্ব্বদাই সংগ্রাম করিতে হয়। এই সৃষ্ট জগতে পাপ পুণ্য উভয়ই বিদ্যমান। ইরাণীয়গণ বিশ্বাস করেন যে সর্ব্বশেষে পুণ্যই জয়লাভ করিবে। এই সংঘর্ষে মানুষের কর্ত্তব্য অহুর-মজ্‌দের পক্ষাবলম্বন করা ; কিন্তু পাপ-জগতে জড়িত হইয়া পড়ার ভয়ে মানুষকে সর্ব্বদাই সাবধানে আত্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য ; কারণ দুষ্ট প্রেতাত্মাসমূহ সর্ব্বদাই মানুষকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। এই ভূতপ্রেতগণ অন্ধ প্রাকৃতিক নিয়মাধীন এবং দুঃখ, প্রলোভন, ঘৃণা ও দ্বেষ দ্বারা এই জগৎকে অন্ধকারময় করিয়া রাখিয়াছে। কেবলমাত্র জরথুস্ত্রের ধর্ম্মের বলে মানুষ এই সকল পাপশক্তির হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে। এইরূপ বিশ্বাসে যদিও দৈবশক্তির সম্পূর্ণ প্রভাব অস্বীকৃত হয় নাই, তথাপি অন্যান্য জাতির তুলনায়, ইরাণীয়গণ অদৃষ্টবাদের প্রভাব হইতে কতকটা মুক্ত বলিয়া মনে হয়।

গ্রীকগণ অদৃষ্টকে "ময়রা" (Moira) বলিয়া অভিহিত করিতেন। জেউস গ্রীকদিগের সর্ব্বপ্রধান দেবতা, কিন্তু গ্রীকদিগের মধ্যে অনেক দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল, তাঁহারা সকলেই "ময়রার" প্রভাব মানিয়া চলিতেন। গ্রীকগণ যদিও বিশ্বাস করিতেন যে "ময়রা" (নিয়তি) জেউসের কথিত বাণীস্বরূপ, তথাপি ময়রা সম্পূর্ণ স্বাধীন দেবতা বলিয়া তাঁহারা কল্পনা করিতেন। গ্রীক-নাটকে "ময়রা" বিশেষ শক্তিসম্পন্নরূপে বর্ণিত। বিশেষতঃ সোফোক্লেসের সহিত মিলিত হইয়া তিনি পাপী-দিগের দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন। অদৃষ্টবাদের প্রভাব গ্রীকদের মধ্যে বহুকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিলেও পরে তাঁহারা একেশ্বরে বিশ্বাসী হইতে শিখিয়াছিলেন।

রোমকগণ অদৃষ্টবাদী ছিলেন। এই মতবাদে তাঁহারা অদৃষ্টকে সম্পূর্ণ কার্য্যকরী শক্তিস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিতেন। ইহাদের মধ্যে নানা অনুষ্ঠানের দ্বারা ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট-গণনার প্রথা প্রচলিত হয়। তাঁহারা অদৃষ্টকে 'ফাটুম' (fa·e) নাম দিয়াছিলেন। [অদৃষ্ট ও রোম দ্র°]

রোমকগণ অদৃষ্টমূলক বিধিলিপিকে স্বতন্ত্র দেবশক্তি বলিয়া কল্পনা করিতেন এবং তাহার অর্চনা করিতেন। প্রসিদ্ধ রোমক রাজনৈতিক বক্তা কিকেরো (Cicero) মানুষের জীবনে অদৃষ্টের প্রভাব স্বীকার করিতেন না। তিনি প্রকৃতি এবং আকস্মিক-তাকে জাগতিক ঘটনার কারণ বলিয়া মনে করিতেন।

গ্রীক দর্শনশাস্ত্রে অদৃষ্টবাদের উল্লেখ আছে। গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাস্ (৬ষ্ঠ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ) বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অদৃষ্টের দ্বারা পরিচালিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে অদৃষ্ট কার্য্যকারণের অদৃশ্য শক্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। প্লেটো অদৃষ্টবাদী, তিনি মনে করিতেন, যে মানুষের সকল প্রকার ঘটনাচক্র অদৃষ্টের অধীন। জেনোর মতে অদৃষ্ট যাহা তাহাই বিধাতা এবং তাহাই প্রকৃতি। আন্টিপেটার অদৃষ্ট এবং বিধাতা একই বলিয়া মনে করিতেন। এপিক্‌টেটাস্ প্রচার করিয়াছিলেন ভগবানের ইচ্ছাই পৃথিবীতে জয়ী হইবে, তাঁহার ইচ্ছাকে স্বীকার করিয়া নিলে আমরা সুখী হইতে পারি, না নিলে আমাদের দুঃখ অবশ্যম্ভাবী।

ইউরোপের কেল্‌টিক জাতি অদৃষ্টবাদে সম্পূর্ণ বিশ্বাসপরায়ণ ছিল। তাহারা মনে করিত সমগ্র জীবনই অদৃষ্টের অধীন। এই জাতির মধ্যে যাহারা দলপতি ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের জীবনের অত্যন্ত শঙ্কটজনক সময়ে নিজ নিজ কোষ্ঠী প্রস্তুত

করাইতেন। ভবিষ্যতে কি হইবে না হইবে তাহার জন্য তাঁহাদিগের পুরোহিত ও দ্রুয়িডগণ নানারূপ অনুষ্ঠান করিতেন।

মুসলমান ধর্ম্মে অদৃষ্টের স্থান বহু উর্দ্ধে। ইঁহাদের মধ্যে 'কিস্মেৎ' শব্দ অদৃষ্টের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন মানুষের কোন স্বতন্ত্র সত্তা এবং স্বাধীন ইচ্ছা নাই, ভগবান্ এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই সৃষ্টি করিতেছেন। তাঁহার সর্ব্বশক্তিময় ইচ্ছাকে (কিস্মেৎ) সকলেই মানিয়া চলিতে বাধ্য। প্রত্যেককেই আল্লার আদেশ পালন করিতে হইবে। তাহার কিস্মেতে যদি দুঃখ থাকে, তাহা হইলে ইহজগতে তাহাকে দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। মুসলমানগণ মনে করেন তাঁহারা একটা চরম প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনতায় বাধ্য, এই প্রাকৃতিক নিয়ম সর্ব্বশক্তিময় আল্লার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা কোনরূপ কার্য্যকারণসম্বন্ধযুক্ত নহে এবং প্রাকৃতিক নিয়মও একটা অর্দ্ধ-শক্তি মাত্র, এই দুইয়ের দ্বারা মানুষ পরিচালিত হয়।

খৃষ্টানধর্ম্মে অদৃষ্টবাদের কোন স্থান নাই। এই ধর্ম্মে প্রচার করা হয় যে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ খামখেয়ালি ইচ্ছার বশবর্ত্তী নহেন; তাঁহার ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে যুক্তিযুক্ত (Rational)। তাঁহার দ্বারা তিনি তাঁহার বিশ্বরাজ্যের নৈতিক উদ্দেশ্যকে সফল করিয়া তোলেন। প্রাকৃতিক শক্তি ভগবৎশক্তির সহিত এক হইয়া মানুষের স্বাধীন কার্য্যে নৈতিক প্রেরণার উৎস স্বরূপ হইয়া থাকে। তবে খৃষ্টধর্ম্মে অদৃষ্ট কিংবা ভাগ্যের যে একবারে স্থান নাই, তাহা নহে। যে করিয়া হোক অদৃষ্টবাদ খৃষ্টান-ধর্ম্মে এবং অনুষ্ঠানে স্থান লাভ করিয়াছে। খৃষ্টান-ধর্ম্মের প্রাচীন যুগের মতবাদ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, যখন দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন আত্মাদিগের পতনের সময় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন ভগবানের দয়ায় এই পৃথিবী পুনরায় আদিম অবস্থায় উন্নীত হইবে। কিন্তু এই পতন ও উত্থান একবার মাত্র সংঘটিত হইবে না; এই ধারা বারংবার চলিবে। ইহা অদৃষ্টবাদ ব্যতিরেকে আর কিছু নহে। কখনও কখনও মনে হয় উপনিষদ্‌মতে মানবাত্মা ব্রহ্মে বিলীন হইতে পারে, কিন্তু খৃষ্টান দার্শনিকগণ এইরূপ মতবাদ পোষণ করিতেন না। তাঁহাদের মতে, মানুষ কখনও ভগবানের ন্যায় সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, সেইজন্য অনন্তকালের জন্য মানবাত্মা উত্থান ও পতনরূপ বিবর্ত্তনের মধ্যে অদৃষ্টের দ্বারা চালিত হয়। ইহাই খৃষ্টান ধর্ম্মমতে অদৃষ্টবাদের কথা। অগস্টিনের খৃষ্টান-ধর্ম্ম ব্যাখ্যায়ও আমরা অদৃষ্টবাদের চিহ্ন দেখিতে পাই।

আকুইনাস মধ্যযুগের খৃষ্টান জ্ঞানীদিগের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি 'fate' (অদৃষ্ট) কথার ব্যবহার না করিলেও তাহার উক্তি হইতে দৈবশক্তির আভাস পাওয়া যায়। ইহাও অদৃষ্ট ছাড়া আর কিছু নহে।

প্রোটেস্টান্টগণ প্রচলিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মের পুনঃ সংস্কার করেন। ইঁহাদের মধ্যে কালভিনের ধর্ম্মমতে আমরা অদৃষ্টবাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাব দেখিতে পাই। তিনি প্রচার করেন যে পৃথিবীতে দুইশ্রেণীর লোক আছে। একশ্রেণীর লোক ভগবানের দ্বারা নির্ব্বাচিত, অপর শ্রেণীকে ভগবান্ অযোগ্য বলিয়া পাপগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহারা চিরকাল পাপকার্য্যে নিরত থাকিবে। এই মতে পরম কারুণিক ভগবানের যুক্তিসঙ্গত ইচ্ছাশক্তিকে অস্বীকার করা হইয়াছে, এবং তাঁহার খামখেয়ালিও স্বীকৃত হইয়াছে। এই খামখেয়ালি শক্তিই অদৃষ্টের নামান্তর। কারণ ইহা হইতে পাপিগ্রস্তদের পরিত্রাণের উপায় নাই।

বর্ত্তমানকালে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই কোন না কোনরূপে অদৃষ্টবাদ সর্ব্ব শ্রেণীর মনুষ্যের মধ্যে প্রচলিত আছে। অনেকগুলি কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রচলিত অনুষ্ঠান সভ্যতার উচ্চ শিখরে সমুন্নত ইউরোপবাসী নানা জাতির মধ্যে দেখা যায়। এই সকল অনুষ্ঠান হইতে উপলব্ধি হয় যে, সভ্যতার অন্তরালে বহুযুগ হইতে সঞ্চিত অজ্ঞতা এখনও পর্য্যন্ত অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিতেছে। অদৃষ্টবাদীরা মনে করে যে দুঃখভোগ অনিবার্য্য; কারণ এই দুঃখ এমন একটা খামখেয়ালি সর্ব্বশক্তিমান্ অদৃশ্যশক্তির দ্বারা বিহিত হইয়াছে, যাহার পরিবর্ত্তন কোন ক্রমেই সম্ভবপর নয়। সুখভোগ সম্বন্ধে এইরূপ বিধানে লোকে আস্থাবান্ বলিয়া জুয়া, ঘোড়-দৌড় প্রভৃতি নানাপ্রকার গোপনীয় এবং প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের আয়োজনে ব্যাপৃত থাকে। লোকে বরাতে টাকা করে, এইরূপ কথার প্রচলন হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে অত্যন্ত সভ্যদেশেও মানুষ কার্য্যকারণ সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা পোষণ করে।

আদিম অবস্থায় মানুষ যে আবেষ্টনের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, তাহার সম্বন্ধে সে কোন ধারণাই করিতে পারিত না। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের দ্বারা ক্লিষ্ট হইলে সে মনে করিত যে কোন দুষ্ট অপদেবতা কিংবা ভূতের উপদ্রবে এইরূপ ঘটিতেছে, অসুখ, মৃত্যু প্রভৃতি সকলই তাহার নিকট অপদেবতার কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। আদিম অজ্ঞতার যুগ হইতে মানুষ যখন অগ্রসর হইয়া উন্নততর সভ্যতায় পহুঁছিল, তখন তাহার মধ্যে যে ঐক্যবোধ দেখা দিল তাহারই জন্য বিশ্বের যাবতীয় ঘটনা এবং মনুষ্যজীবনের জন্মমৃত্যু প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারের অবস্থাকে একটী অন্ধ শক্তির বশবর্ত্তী বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। এখন সর্ব্বপ্রকারের প্রাকৃতিক ঘটনা

প্রাকৃতিক নিয়মাধীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। মানুষের আধিভৌতিক যাবতীয় দুঃখেরও কারণ নির্ণীত হইয়াছে এবং তাহাদেরও আরোগ্যের বিধানও বৈজ্ঞানিকগণ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। বিজ্ঞান যে আলোক জ্বালাইয়াছে তাহারই দ্বারা মানুষ সর্ব্বপ্রকারের প্রাকৃতিক ঘটনাকে কার্য্যকারণের নিয়মাধীন বলিয়া জানিতে পারিয়াছে। তথাপি ইহার সঠিক কোন মীমাংসায় আমরা উপনীত হইতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। প্রাকৃতিক নিয়ম যাহা অজ্ঞেয়, তাহা অদৃষ্ট; আমাদিগের প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাস মনুষ্য-সমাজ নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, ইহা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুক্তির পরিপন্থী। প্রাকৃতিক ঘটনায় অনেক সময়ে সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহে বিজ্ঞানের স্থানকে অস্বীকার করা হয়। সামাজিক পরিবেষ্টনই মানুষের ভাব ও চিন্তাধারা গঠন করে। এই চিন্তাধারার মূল উৎসই অবৈজ্ঞানিক, মানুষের বিশ্বাসাদিতে অবৈজ্ঞানিক প্রভাবই প্রবল। সেইজন্য বর্ত্তমান যুগে অদৃষ্টবাদের যুক্তির অনৈক্য এবং অত্যাচারকে পরিত্যাগ করিয়া সাধারণে অদৃষ্টবাদ স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে।

[অদৃষ্ট শব্দে প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক মত দ্র°]

অদৃষ্টহন—(ত্রি) বিষবিশেষের হন্তা অথবা বিষধরদিগের নাশকারী। ২ অজ্ঞান-ধ্বংসকারী, অন্ধকারনাশক। "অদৃষ্টা বিষবিশেষা বিষধরবিশেষা বা। তেষাং হন্তা। যদ্বা অদৃষ্টমদর্শনং অজ্ঞানমন্ধকারঃ। তস্য হন্তা" (ঋক্ ১.১৯১.৮ সায়ণ)

অদৃষ্টাক্ষর—(পুং) যে অক্ষর দৃষ্ট হয় নাই।

অদৃষ্টার্থ—(ত্রি) ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞাত বিষয়ের উপর যিনি বিশ্বাস স্থাপন করেন, ইন্দ্রিয়াজ্ঞাতবিষয়বিশ্বাসী।

অদৃষ্টায়ত্ত—(দেশজ) ভাগ্যাধীন, দৈবায়ত্ত।

অদৃষ্টাশ্রুতপূর্ব্বত্ব—(ক্লী) অসংখ্য গুণ, যে গুণ কখনও প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই।

অদৃষ্টি (অদৃষ্টিকা)—(স্ত্রী) [ন দৃষ্টিঃ নঞ্-তৎ বিরোধার্থে] দর্শনাভাব। ২ ক্রূরদৃষ্টি, কোপদৃষ্টি। (ত্রি) ৩ দৃষ্টিশূন্য।

অদেগাঁও১—মধ্যপ্রদেশের সিউনী জেলার একটী তালুক। অক্ষা° ২২°৩৭′ উ°, দ্রাঘি° ৭৯°১৬′ পূঃ। পূর্ব্বে ইহা হরাই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নাগপুর ভোন্‌স্লেদের অধীন শাসনকর্ত্তার বংশধর ভারতী গোঁসাইগণ এক সময় অদেগাঁওয়ের মালিক ছিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইহা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের হাতে আইসে। এই স্থান শৈলময় ও জঙ্গলপূর্ণ, গোঁড়জাতিই এখানকার প্রধান অধিবাসী। স্থানে স্থানে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। এই তালুকে ৯০টী গ্রাম আছে।

অদেগাঁও২—অদেগাঁও তালুকের প্রধান শহর। লোকসংখ্যা দুই সহস্রাধিক। ইহার পশ্চিমে পাহাড়ের উপর একটী প্রাচীন ভগ্ন দুর্গ আছে। এখানে পুলিশ ফাঁড়ি, স্কুল প্রভৃতি আছে।

অদেয়দান—(ক্লী) অন্যায় দান।

অদেয়ার—মাদ্রাজের উদয়েন্দিবরমে আবিষ্কৃত পল্লবনৃপতি নন্দিবর্ম্মার তাম্রশাসনে উল্লিখিত একটী রাষ্ট্র। [পল্লব ও নন্দিবর্ম্মা দ্র°]

অদেব১—(ত্রি) যাহার সম্বন্ধে দেবতা নাই, দেব-সম্বন্ধহীন, অদৈব। ২ দেবভক্তিহীন, অধার্ম্মিক, পামর। (পুং) ৩ অসুর। "যা অদেবোবরতে নদেবঃ" (ঋক্ ৬.২২.১১) ৪ দেবভিন্ন, মনুষ্যাদি। "দেবান্ কুর্য্যুরদেবান্" (মনু ৯.৩১৫)

অদেব২—পশ্চিমবঙ্গনিবাসী সাঁওতালদের একটী শাখা।

অদেবক—(ত্রি) যিনি দেবতার সহিত সম্বন্ধ রাখেন না। ২ দেবতার জন্য নহে অথবা দেববিষয়ক নহে।

অদেবতা—(স্ত্রী) যিনি দেবতা নহেন। "অদেবতা দেবতাবৎ স্তূয়ন্তে" (নিরুক্ত ৭.৪) ২ নিশাচরী।

অদেবত্র—(ত্রি) [ন দেবান্ ত্রায়তে প্রীণাতি অনেন ত্রৈ-ক করণে] দেবতার অসন্তোষকর দ্রব্যাদি। "অদেবত্রাদরাধসঃ" (ঋক্ ৫.৬১.৬)

অদেবমাতৃক—(পুং) [ন দেবমাতৃকঃ; নঞ্-তৎ] দেবমাতৃক ভিন্ন দেশ। ২ নদীমাতৃক দেশ। (কিরাতার্জ্জুনীয়ম্ ১.১১) যে দেশে শস্যাদি নদীর জলে প্রতিপালিত হয়।

অদেবয়ন্ত্—(ত্রি) দেবতাকে অশ্রদ্ধাকারী, দেবতার প্রতি অশ্রদ্ধাপ্রদর্শনকারী, ধর্ম্মহীন। "দেবয়ন্নিদদেবয়ন্তমভ্যসৎ" (ঋক্ ২.২৬.১)

অদেবয়ু—(ত্রি) [ন দেবং যাতি প্রাপ্নোতি দেব-যা-কু] দেবতাকে অপ্রাপক। "কদাচন প্রজিগতো অদেবয়োঃ" (ঋক্ ১.১৫০.২) ২ দেবয়ু শব্দ মৃগয়ু গণমধ্যে পঠিত। [মৃগয়ু দ্র°]। ৩ দেবয়ুঃ ধার্ম্মিকঃ (ইতি উজ্জ্বলদত্তঃ)। অতএব অদেবয়ু—অধার্ম্মিক।

অদেবী অবুলপল্লী—মাদ্রাজের কড়াপা জেলান্তর্গত পর্ব্বতবিশেষ। অক্ষা° ১৩°২৮′২৭″ উ°; দ্রাঘি° ৭৮°২৬′৩৫″ পূ°।

অদেবৃঘ্নী—(স্ত্রী) যে স্ত্রী নিজের দেবরকে বিনষ্ট করে না। দেবরের অনিষ্টকারিণী। "অদেবৃঘ্ন্যপতিঘ্নীহৈধি" (অথর্ব ১৪.২.১৮)

অদেশ—(পুং) [ন দেশঃ, নঞ্-তৎ] গর্হিতদেশ, মন্দদেশ, অযোগ্য স্থান। ২ ম্লেচ্ছদেশ। অদেশে শ্রাদ্ধতর্পণাদি দৈবক্রিয়া করিতে নাই। "নাদেশে তর্পণং কুর্য্যাৎ ন সন্ধ্যাং নাপি পূজনমিতি।" (স্মৃতি) অদেশ বা গর্হিতদেশ সম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্রে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, আর্য্যাবর্ত্তের পর যে দেশে চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা নাই সেই সকল দেশকে অদেশ বা ম্লেচ্ছদেশ বলে।

আনর্ত্ত, অঙ্গ, মগধ, সুরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, সিন্ধু প্রভৃতি দেশস্থিত ব্যক্তিগণ অদেশজাত বলিয়া হীন। (বৌধায়ন) অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশে তীর্থযাত্রা ব্যতীত গমন করিলে ব্রাহ্মণের পাতিত্য দোষ হয়। প্রায়শ্চিত্ত না করিলে দেহ শুদ্ধ হয় না। (শুদ্ধিতত্ত্ব) ইষ্টকার্য্য ও শ্রাদ্ধতর্পণাদি ব্যাপারে কতকগুলি স্থানকে অদেশ বলে। যথা—রূক্ষ, কৃমিযুক্ত, ক্লেদপূর্ণ, সঙ্কীর্ণ, অনিষ্ট গন্ধযুক্ত এই সকল স্থান অদেশ অর্থাৎ অস্থান বলিয়া শ্রাদ্ধাদিতে পরিত্যাগ করিতে হয়। (শঙ্খ ও লিখিতস°) স্ত্রীলোকের স্তনজঘনাদি ও পুরুষের উপস্থ-বৃষণাদি স্থান স্পর্শনা-যোগ্য। (মনু ৮.৫৫৮)।

অদেশকাল—(ক্লী) অযোগ্য দেশ ও সময়। "অদেশকাল-সম্প্রাপ্তঃ।" (রামা° ৫.৯০.২৯.)।

অদেশজ—(ত্রি) যাহা কুৎসিৎ দেশে উৎপন্ন হইয়াছে। গর্হিত দেশে যে জন্মিয়াছে।

অদেশস্থ—(ত্রি) গর্হিতদেশে অবস্থানকারী। মন্দস্থানে বাসকারী।

অদেশ্য—(ত্রি) উপদেশ, আদেশ এবং মন্ত্রণা দিতে অথবা কোন কিছু বুঝাইতে যে অযোগ্য। "অদেশ্যং যশ্চ দিশতি" (মনু ৮.৫৩)। ২ অনুপস্থিত।

অদেহ—(ত্রি) শরীররহিত। ২ কামদেব, পঞ্চবাণ।

অদৈব—(ক্লী) [ন দৈবং বৈশ্বদেবিকশ্রাদ্ধম্ অভাবার্থে নঞ্-তৎ] বৈশ্বদেবিক শ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্য শ্রাদ্ধ। ২ নিত্য শ্রাদ্ধ। [নাস্তি দৈবং বৈশ্বদেবিকশ্রাদ্ধমত্র বহুব্রী] (ত্রি) বৈশ্বদেবিক শ্রাদ্ধশূন্য। দৈব শব্দে ভাগ্যকে বুঝায়, অতএব অদৈব, দুর্ভাগ্যযুক্ত।

অদোগ্ধৃ—(ত্রি) দুগ্ধ অপ্রদানকারী। (স্ত্রী) দুগ্ধদাত্রী নহে।

অদোণ্ডই—মহারাজ কুলোত্তুঙ্গের অবৈধ পুত্র। ইনি যুদ্ধবিদ্যা বিশারদ এবং প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন। উত্তরে পেন্নার নদীতট হইতে দক্ষিণে পালর নদী, পূর্ব্বে সমুদ্র ও পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত ইঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। তিনি কাঞ্চীপুর ও তিরুপতি নগরে থাকিয়া রাজ্যশাসন করিতেন! তিনি তেলিঙ্গানার অন্তর্গত শ্রীশৈল হইতে ব্রাহ্মণ, তুপুর বা উত্তর কানাড়া হইতে বেল্লালর (শূদ্র) এবং অর্দ্ধসভ্য কুরুম্বরদিগকে জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া স্বীয় রাজ্যে বাস করাইয়াছিলেন। তাঁহার বাহুবলে অর্জ্জিত রাজ্যখণ্ড তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

অদোনি,—মাদ্রাজ প্রদেশের বেল্লরি জেলার একটী তালুক। অক্ষা° ১৫°৩০′ হইতে ১৫°৫৮′ উ°; দ্রাঘি° ৭৬°৫৬′ হইতে ৭৭°৩৮′ পূ°। আয়তন পরিমাণ ৮৩৯ বর্গমাইল। অধিবাসিগণ তেলেগু ও কণাড়ী মিশ্রিত ভাষায় কথা বলে। স্থানীয় মুসলমান-গণ হিন্দিভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকে। তুঙ্গভদ্রা নদী এই স্থানে প্রবাহিতা। উক্ত নদীজলে এবং বৃষ্টিপাতে এখানকার চাষের সামান্য সাহায্য হয়। এতদ্ব্যতীত চিক্কা, তুম্বলম্ ও হলহের্ব্বির দীর্ঘিকার জলও চাষের উপযোগী। এইস্থান কৃষি-কার্য্য প্রধান। যাহারা কৃষিকার্য্য করে না, তাহারা প্রায়ই সূতা কাটা ও তাঁতে কাপড় বোনার কাজ করিয়া থাকে। রেশম ও তুলার কার্য্য এই স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে হয়। প্রধান নগরগুলির নাম—অদোনি, কোসিগি, ও যেম্মিগনুর। অন্যান্য নগরগুলির নাম হলহের্ব্বি, কোটকল ও মানদেবেরম্। বেল্লরি জেলার মধ্যে এই তালুকের মত বড় তালুক আর নাই।

অদোনি,২—মাদ্রাজের বেল্লরি জেলার অন্তর্গত অদোনি তালুকের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৫°৩৭′৩০″ উ; দ্রাঘি° ৭৭°১৯′১০″ পূ°। অধিবাসীর অধিকাংশই হিন্দু; উহারা বেল্লালর জাতীয়। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে তুলাজাত ও রেশমজাত বস্ত্র প্রভৃতিই প্রধান। কার্পেটও এই স্থানের একটী প্রসিদ্ধ উৎপন্ন দ্রব্য। মাদ্রাজ হইতে ইহা ৩০৭ মাইল ও বেল্লরি হইতে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত।

কলেরা রোগ অদোনিতে প্রায়ই দেখা দেয়। বর্ত্তমানে স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর চেষ্টায় উহা অনেক কমিয়াছে। অদোনি দুর্গ অদোনির পাঁচটী 'গ্রানাইট' পাহাড়ের উপর অবস্থিত। বর্ত্তমানে উহার ধ্বংসাবশেষ মাত্র পতিত আছে। উক্ত পাঁচটী পাহাড়ের মধ্যে দুইটী পাহাড়ের উচ্চতা প্রায় ৮০০ ফুট! এই পাহাড়ে উঠিবার অর্দ্ধপথে একটী সুন্দর পুষ্করিণী বা দীর্ঘিকা পরিদৃষ্ট হয়।

কিংবদন্তী হইতে জানিতে পারা যায় যে, বিদর অধিপতি চন্দ্রসিংহ এই নগর স্থাপিত করেন। পরে ইহা বিজয়নগর অধিপতিদেরও হস্তগত হইয়াছিল। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে যখন বিজয়-নগরাধিপতি তালিকোটের যুদ্ধে মুসলমানদের নিকট পরাজিত হন, তখন মুসলমানগণ অদোনির শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। এ সময়ে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার আদিলশাহী বংশীয়গণ অদোনির অধিকারী হইয়াছিলেন। এই বংশীয় অধিপতিগণ এই স্থানে দুর্গ ও প্রাচীরাদি নির্ম্মাণ করেন। তৎকালে বেল্লরি জেলার রাজস্ব ৭৫,৯০০ পাগোডা ছিল। রাজ্যপরিচালনের জন্য চারি সহস্র অশ্বারোহী ও আট সহস্র পদাতিক সৈন্য নিযুক্ত ছিল। ফেরিস্তার বিবরণী হইতে এই স্থানের ঐশ্বর্য্য ও স্বভাবশোভা সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়।

১৬৯০ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেবের সেনাপতিগণ কর্ত্তৃক বিজাপুর অধিকৃত হয়। ঐ সঙ্গে অদোনিও অরঙ্গজেবের অধীনে আসে। অতঃপর অদোনিকে নিজাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইহার

পর অদোনি দিল্লীর রাজবংশীয়গণের সামরিক জায়গীরে পরিণত হয়। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে মুজাফর জঙ্গ ইহার কর্তৃত্বভার পান। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে মুজাফরের মৃত্যু হয়। অতঃপর দাক্ষিণাত্যের সুবাদারের ভ্রাতা বসালত জঙ্গ অদোনিতে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়া আপনাকে স্বাধীন অধিপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। হায়দার আলি দুইবার অদোনির দুর্গ আক্রমণ করেন, কিন্তু দুইবারই বিফল-মনোরথ হন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে বসালত জঙ্গের মৃত্যু হয় এবং ইহার অব্যবহিত পরেই হায়দার আলিও মৃত্যুমুখে পতিত হন। হায়দারের মৃত্যুর পর তৎপুত্র টিপু সুলতান ১৭৮৬ খৃঃ মাসাবধি যুদ্ধের পর অদোনি দুর্গ করতলগত করেন। ইহার পর অদোনি তাঁহার অধীনে আসে। শান্তিস্থাপনের পর ১৭৯২ খৃঃ অদোনি আবার নিজামকে প্রত্যর্পণ করা হয়। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে অদোনি ইংরেজের অধীনে আসে।

অদোমদ—(ত্রি) ক্লেশ অপ্রদানকারী, অর্থাৎ যে কষ্ট দেয় না। অথর্ববেদের সায়ণভাষ্যে 'অদোমদ' শব্দের নিম্নোক্তরূপ অর্থ দৃষ্ট হয় যথা, "অদঃ-বিপ্রকৃষ্টকালব্যাপি 'মদং' মদকরং তৃপ্তিকরং" (অন্নং)। ২ বিপ্রকৃষ্টকালব্যাপিতৃপ্তিকর। "অদোমদমন্নমৃদ্ধি" (অথর্ব ৬.৬৩.১)

অদোমধ—(ত্রি) উপযোগানন্তর মধুর। (অথর্ব ৮.২.১৮)

অদোষ—(পুং) [ন দোষঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ] দুরদৃষ্ট সাধন দোষের অভাব। [নাস্তি দোষো যস্য যত্র বা বহুব্রী] (ত্রি) দোষশূন্য।

অদোহ—(পুং) দুগ্ধ অনির্গম সময়, অর্থাৎ যে সময়ে দুগ্ধ দোহন করা হয় না।

অদ্গ—(পুং) [অন্ততে দেবৈঃ অদ-গম্ কর্ম্মণি]. পুরোডাশ। (উজ্জ্বলদত্ত) হোমের উপযুক্ত কঠিন বস্তু চরু প্রভৃতি। "হৌমং যৎ কঠিনং দ্রব্যং পুরোডাশঃ স উচ্যতে।"

অদ্গ$_2$—(পুং) [বৈদ্যক] ঘৃত।

অদ্দঙ্কী—নামান্তর আত্তুঙ্কি। মাদ্রাজের নেল্লোর জেলার অন্তর্গত অঙ্গোল তালুকের একটী নগর। অক্ষা° ১৫°৪৮´৪২´´উ° ; দ্রাঘি° ৮০°৫২´ পূ°। এই নগর গুণ্ডুলাকম্মা নদীতীরে অবস্থিত। ইহার পার্শ্ব দিয়া নেল্লোর হইতে হায়দ্রাবাদ যাইবার পথ। এখানে প্রচুর পরিমাণে ডাল ও ছোলা উৎপন্ন হয়। স্থানীয় ভগ্নদুর্গ রাজা প্রতাপরুদ্রের পুত্র হরিপালক (হরিপালুড়ু) কর্ত্তৃক স্থাপিত। সিঙ্গবকণ্ডু মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহার স্থাপত্যকলাও চমৎকার।

অদ্দপুসিঙ্গুলু—মাদ্রাজের বিজাগাপটম্ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসী এক নিম্ন জাতি। ইহারা সাধুসন্ন্যাসীর বেশে ভিক্ষাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

অদ্দাকু—মাদ্রাজের খোন্দজাতির জাতপু শাখার একটী থাক। অদ্দাকু (Bauhimia racemosa) বৃক্ষের পত্র ইহারা ভোজনপাত্ররূপে ব্যবহার করে। এইজন্য ইহাদের এই নাম হইয়াছে।

অদ্ধা—(অব্য) [অত্যতে অৎ তং সন্ততং গমনং জ্ঞানং দধাতি (বাচস্পতি)। অৎ-ধা-ক্বিপ্] যথার্থ। (ঋক্ ৩.৫.৪৫) ২ সাক্ষাৎকার। ৩ স্ফুট। ৪ অবধারণ। ৫ অতিশয়। ৬ তত্ত্ব।

অদ্ধাতমাম্—(অব্য) অবশ্যমেব, অবশ্যই।

অদ্ধাতি—(পুং) বুদ্ধিমান্ পুরুষ, মেধাবী। "অথৈকং চক্রং যদ্গুহা তদদ্ধাতয়ঃ" (ঋক্ ১০.৮৫.১৬) ['অদ্ধা প্রত্যক্ষং অততি সততং ধ্যানেন প্রাপ্নোতীতি অদ্ধাতিঃ। ২ অদ্ধাতি নামক মহর্ষি, যিনি সতত ধ্যানের দ্বারা ইষ্টদর্শন করেন। (অথর্ব ৬.৭৬.২)

অদ্ধাপুরুষ—(পুং) সদ্ব্যক্তি, খাঁটীমানুষ। "যদি না হরেদনদ্ধা পুরুষঃ কোঽনদ্ধা পুরুষ ইতি ন দেবান্নপিতৃন্ন মনুষ্যা ইতি।" (ঐতরেয়ব্রা° ৭.৯)

অদ্ধাবোধেয়—(পুং) শুক্লযজুর্বেদের শাখা বিশেষানুযায়ী, অর্থাৎ যে ব্যক্তি শুক্লযজুর্বেদের যে কোন এক শাখার মতানুসারে চলেন।

অদ্ধামিশ্রিতবচন—(পুং) জৈনদিগের বিশ্বাস্য সময় সম্বন্ধে অসত্য কথন, অর্থাৎ জৈনগণের নিকট তাহাদের বিশ্বাসযোগ্য সময়ের কথা বলিবার কালে যে মিথ্যা বাক্য বলা হয়।

অদ্ধ্যালোহকর্ণ—(ত্রি) রক্তবর্ণ কর্ণ। "শুণ্ঠাকর্ণোঽদ্ধ্যালোহকর্ণস্তে" (শুক্লযজুঃ ২৫.৩)

অদ্ভুত—(ত্রি) [অদ্-ভূ-ডুতচ্] যাহা অকস্মাৎ ঘটিয়াছে। ২ বিস্ময়কর। "কস্তদ্বেদ যদদ্ভুতম্" (ঋক্ ১.১৭০.১) ২ (পুং) আশ্চর্য্য। "অদ্ভুতমাশ্চর্য্যম্" (উজ্জ্বলদত্ত) (স্ত্রী) ৩ অতি বিস্ময়কর। "অত্যদ্ভুতমিদং বলম্" (নলোপাখ্যান ২০.১৯) ৪ (পুং) অলঙ্কারোক্ত অষ্টবিধ রসের অন্তর্গত রস-বিশেষ। এই রসাত্মক কবিতা পাঠ করিলে পাঠকের বিস্ময় উপস্থিত হয়। রস—যথা শৃঙ্গার, ২ হাস্য, ৩ করুণ, ৪ রৌদ্র, ৫ বীর, ৬ ভয়ানক, ৭ বীভৎস, ও ৮ অদ্ভুত। (কাব্যপ্রকাশ) উদাহরণ যথা—

"মানুষীভ্যঃ কথং নু স্যাদস্য রূপস্য সম্ভবঃ।
ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ॥" (শকুন্তলা)

'মহারাজ দুষ্মন্ত কণ্বাশ্রমে প্রবেশ করিয়া অত্যাশ্চর্য্যরূপা শকুন্তলাকে দেখিয়া এবং তাহার অপ্সরী গর্ভে জন্ম হইয়াছে শুনিয়া কহিলেন, "মানুষী হইতে কিরূপে এই রূপের সম্ভব

হয়, কারণ প্রভাতরল বিদ্যুৎ কখনই ভূমি হইতে উৎপন্ন হয় না।' অদ্ভুত রসের স্থায়িভাব বিস্ময়।

"রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সাবিস্ময়শ্চেব স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (মম্মটভট্ট)

রতি, হাস্য, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময় ইহাদিগকে রসসমূহের স্থায়িভাব বলা হইয়া থাকে। যথা—শৃঙ্গার রসে যেরূপ রতি স্থায়িভাব, সেইরূপ অদ্ভুতরসেও বিস্ময়কে স্থায়িভাব বলা হয়। এই রসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা গন্ধর্ব্ব, কারণ গন্ধর্ব্বগণ গান ও কুহকাদি দ্বারা বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকেন। অদ্ভুত রসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা গন্ধর্ব্বগণ পীতবর্ণ বলিয়া উক্ত রস পীতবর্ণ। লোকাতীত ঐন্দ্রজালিক বস্তুসমূহ আলম্বনবিভাব, উক্ত আলম্বনরূপ অলৌকিক বস্তুর গুণমহিমা উদ্দীপনবিভাব; স্তম্ভ (হাঁ করিয়া থাকে ইত্যাদি), স্বেদ, রোমাঞ্চ, গদ্গদস্বর, সম্ভ্রম অর্থাৎ ত্বরা, নেত্রবিকাশ এবং নির্নিমেষ নিরীক্ষণ প্রভৃতি অনুভাব। বিতর্ক, আবেগ, সম্ভ্রান্তি অর্থাৎ জড়তা, হর্ষ এবং ঔৎসুক্য প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব।

"অদ্ভুতো বিস্ময়স্থায়িভাবো গন্ধর্ব্বদৈবতঃ।
পীতবর্ণো বস্তু লোকাতিগমালম্বনং মতম্।
গুণানাং তস্য মহিমা ভবেদুদ্দীপনং পুনঃ।
স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চ গদ্‌গদস্বরসম্ভ্রমাঃ॥
তথা নেত্রবিকাশাদ্যা অনুভাবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বিতর্কাবেগসম্ভ্রান্তি-হর্ষাদ্যা ব্যভিচারিণঃ॥"

উদাহরণ যথা—"দোর্দ্দণ্ডাঞ্চিতচন্দ্রশেখরধনুর্দ্দণ্ডাবভঙ্গোদ্যত-টঙ্কারধ্বনিরার্য্যবালচরিতপ্রস্তাবনাডিণ্ডিমঃ। দ্রাক্‌পর্য্যস্ত কপাল-সম্পুটমিলদ্‌ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদর ভ্রাম্যৎপিণ্ডিত-চণ্ডিমা কথমহো-নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি॥" (সাহিত্যদর্পণ ৩.২৩৭) দীর্ঘকালস্থায়ী হরধনুষ্টঙ্কারে লক্ষ্মণ বিস্মিত হইয়া বলিতেছেন যে বাহুদ্বারা আকৃষ্ট মহাদেব প্রদত্ত কার্ম্মুকের ভঙ্গ হেতু উৎপন্ন শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যচরিতগানের ডিণ্ডিমনামক বাদ্যস্বরূপ, উক্ত টঙ্কার ধ্বনি—ঊর্দ্ধ এবং অধঃ কটাহ দ্বারা সংযুক্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপ ভাণ্ডের উদরে থাকিয়া বোধহয় অত্যন্ত প্রখরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। নতুবা সেই শব্দ আজ পর্য্যন্তও কেন বিশ্রান্ত হইতেছে না।"

এইস্থানে লক্ষ্মণের বিস্ময় স্থায়িভাব। ধনুষ্টঙ্কার আলম্বন-বিভাব। টঙ্কারের বিশালতা অর্থাৎ অতিদীর্ঘত্ব উদ্দীপনবিভাব। লক্ষ্মণের এই প্রকার বচন প্রয়োগ অনুভাব এবং হর্ষাদি সমুদয় ব্যভিচারী ভাব। ভরতমুনির মতে, অদ্ভুতরসের অভিনয়কালে মুখভাব প্রসন্ন ও মলিন, চক্ষুতারকা বহির্গামী, পক্ষ্মাগ্র ঈষৎ কুঞ্চিত এবং চক্ষু নিমীলিত থাকিবে।

"প্রসন্না শুদ্ধাভুক্তাঙ্গী বহির্গামী সুতারকা।
ঈষৎকুঞ্চিতপক্ষ্মাগ্রাদ্ভুতাপাঙ্গবিকাসিনী।"

অদ্ভুতরসের নৃত্য বহুরূপ। গান ত্রিপুট, যবনিকা কৃষ্ণবর্ণ। ভারতচন্দ্র তৎকৃত কবিতাগ্রন্থে অদ্ভুতরসের বহু কবিতা রচনা করিয়াছেন; যথা—

"একি লো একি লো একি দেখিলো, এ চাহে উহার পানে।
দেব কি দানব, নর কি মানব কেমনে এল এখানে?"
(ভারতচন্দ্র)

শাস্ত্রকারদের মতে সংসারে শুভাশুভ ঘটিবার পূর্ব্বে অনেক নিমিত্ত (কারণ) উপস্থিত হয়। তাহার মধ্যে কতকগুলি সুলক্ষণ আর কতকগুলি কুলক্ষণ। ঋষিরা ঐ নিমিত্তকে অদ্ভুত বলিয়া থাকেন। পূর্ব্বকাল হইতে এই সকল লক্ষণসমূহকে দুর্নিমিত্ত বলা হইয়া থাকে। দেবগণ আপদ্ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে স্বভাববিরুদ্ধ অদ্ভুত সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

"প্রকৃতিবিরুদ্ধমদ্ভুতমাপদঃ
প্রাক্‌প্রবোধায় দেবাঃ সৃজন্তি।" (অদ্ভুতসাগর)

ইহার কারণ যথা—মনুষ্যদিগের অতিলোভ, অসত্য, নাস্তিকতা ও অধর্ম্ম দোষে নানা উপসর্গ জন্মে। সেই দোষে দেবগণ তাহাদের সমস্ত নাশ করেন এবং তাঁহারা দিব্য, নাভস ও ভূমিজ এই তিন প্রকার অদ্ভুত বিনাশের নিমিত্তও বিচরণ করেন। (গর্গসংহিতা) জ্যোতিষদীপিকায় এই সকল অদ্ভুতের বেলা, মণ্ডল ও নক্ষত্রনিরূপণ দেখিতে পাওয়া যায়।

দিবা ও রাত্রির সর্ব্বপ্রকার অদ্ভুতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থভাগে বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র ও যম শুভাশুভ ও মণ্ডলাধিপতি থাকেন।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে অদ্ভুত সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আছে। যথা—গ্রহাদির বিকৃতভাব, সূর্য্যমণ্ডলে কলঙ্ক চিহ্ন প্রভৃতি, ইহাকে দিব্য উৎপাত বলে। সূর্য্যমণ্ডলে কলঙ্কচিহ্ন সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতও অনুরূপ, তাহারাও বলেন যে, সূর্য্যে কলঙ্ক কালিমা পড়িলে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ হয়। দক্ষিণ দিকে ধূমকেতুর উদয়। বক্রমঙ্গলগ্রহে কৃত্তিকা নক্ষত্রের ঘোর দর্শন। উল্কাপাত প্রভৃতি নাভস উৎপাত। ভূকম্পাদি ভৌম-উৎপাত। শীত-গ্রীষ্মাদির বিপরীত ভাব অর্থাৎ শীতকালে গ্রীষ্ম-বোধ এবং গ্রীষ্মকালে শীতবোধ হইলে শত্রুভয় সূচনা করে। পুষ্প বা ফলের বিপর্য্যয় ঘটিলে রাজার মৃত্যু সম্ভাবনা। নারী যদি অকালে বা নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে প্রসব করে, কি বিকৃত প্রসব করে, অথবা এককালে দুই তিনটী, কিম্বা পশুপক্ষী সরীসৃপ প্রসব করে, তাহা হইলে তাহার নিজের ও বংশের বিনাশ সম্ভাবনা। সন্ধ্যাকালে কুক্কুটের রব, হেমন্ত-

কালে কোকিলের (কূজন) স্বর, অথবা সূর্য্যোদয় সময়ে সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া কুকুরের অদ্ভুত ডাক এবং সূর্য্য উঠিলে শৃগালের যদি পূর্ব্বদিক্ পানে চাহিয়া চীৎকার করে তাহা হইলে রাজার কার্য্যে বিঘ্ন ও ভয় ঘটায়। যদি গৃহস্থের গৃহের উপর কাল-পেচক বসে বা পতিত হয়, তাহা হইলে গৃহস্বামীর নাশ বা ধনক্ষয় হইবার সম্ভাবনা। শকুনি, হাড়গিলা, বন-কপোত, উলুক, শ্যেনপক্ষী, চিল, গাঙ্‌চিল এবং শ্বেত-বন্যকুক্কুট গৃহের উপর পড়িলে গৃহের বিপদ্ সম্ভাবনা। ইহাতে একপক্ষ, একমাস অথবা একবৎসরের মধ্যে গৃহস্বামী বা তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। এই অদ্ভুতের শান্তি করিতে হইলে, ব্রাহ্মণকে ঐ গৃহ বা গৃহের মূল্য দান করিবে। শকুনি, কাক, কুকুর বা শৃগাল যদি শ্মশান হইতে মাংস অথবা অস্থি লইয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহাদিতে নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে সেই নগর শ্মশানে পরিণত হইবে এবং শীঘ্রই তত্রত্য লোকসকল চোরের উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িবে। অন্য রাজা কর্ত্তৃক রাজ্য আক্রান্ত হইবে এবং ঘোরযুদ্ধ উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা হয়। ইহা হইতে মড়ক ও দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয় এবং দেশ উচ্ছেদের জন্য ঐ স্থানে অকালে ফলপুষ্প উৎপন্ন হইতে থাকে।

মৎস্যপুরাণের মতে, বিনা মেঘে অথবা রাত্রিকালে যদি দক্ষিণোত্তর কোণে ইন্দ্রধনু উল্কাপাত, দিগ্‌দাহ, চন্দ্রসূর্য্যের বেষ্টন এবং আকাশে নগরাকৃতি দৃশ্য দর্শন হয় তাহা হইলে অন্য রাজা কর্ত্তৃক রাজ্য আক্রান্ত হয়।

কৃত্যচিন্তামণিমতে, বৃহস্পতি ও রাহুর যোগ হইলে, পৃথিবীতে প্রলয় উপস্থিত হয়। রক্তবর্ষণে যুদ্ধ; মাংস, অস্থি কিম্বা বসাবর্ষণে মড়ক এবং ধান্য, হিরণ্য, ত্বক্, ফল বা কুসুমাদি-বর্ষণে ভয় সূচনা করে। অঙ্গার অথবা পাংশুবর্ষণ হইলে সেই নগর ধ্বংস হয়। বিনামেঘে শিলাবৃষ্টি হইলে শস্যনাশ ও দেশ শস্যহীন হয়।

বুধকৌশিকসংবাদে লিখিত আছে যে, দেহে গৃহগোধিকা উঠিলে বা জ্যেষ্ঠী (টিকটিকি) পড়িলে তাহার শুভাশুভ ফল হয়; যথা :—মস্তকে রাজ্যশ্রী লাভ, কপালে ঐশ্বর্য্য, দুইকর্ণে অলঙ্কারলাভ, দুই নেত্রে বন্ধু-দর্শন, নাসিকায় সুগন্ধ সম্ভোগ, মুখে মিষ্টান্ন ভোজন, কণ্ঠে লক্ষ্মীলাভ, বাহুযুগলে বৈভব, দুই বাহুমূলে ধনলাভ, দুই হস্তে ধনবৃদ্ধি, দুই স্তনমূলে সৌভাগ্য, হৃদয়ে সুখবৃদ্ধি, পৃষ্ঠে ভূমিলাভ, দুই পার্শ্বে বন্ধুদর্শন, কটীদ্বয়ে বস্ত্রলাভ, গুহ্যে মৃত্যু, জঙ্ঘাদ্বয়ে ধনক্ষয়, মার্গদেশে রোগভয়, দুই উরুতে বাহন লাভ, দুই জানুতে অর্থক্ষয়, দুই পদে ভ্রমণ, গৃহগোধিকার পতন ও আরোহণেও ঐ ফল। ব্যাধি পীড়িত স্থানে রাত্রিতে জ্যেষ্ঠী বা গৃহগোধিকার আরোহন কিংবা পতনে মৃত্যু নিশ্চয়। পতিত হইয়াই যদি উঠে, তবে পতনের ফল শুভ। আরোহণের ফল অন্যবিধ অর্থাৎ ভাল স্থলে ভাল এবং মন্দ স্থলে মন্দ। অধোমুখে পতন এবং উর্দ্ধমুখে আরোহণের ফল শুভ এবং সে ফল নিশ্চয়ই ফলে; যদি ঐ ব্যক্তি অঙ্গস্পর্শ হইবার পরক্ষণেই সবস্ত্রে অবগাহন করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণপূর্ব্বক সূর্য্য দর্শন করে এবং একটী সুবর্ণগোধিকা নির্ম্মাণ করিয়া রক্তবস্ত্রে আচ্ছাদন পূর্ব্বক সম্মুখভাগে পূর্ণকুম্ভ স্থাপনান্তর বিধানানুসারে পূজা করে, তাহা হইলে সমস্ত অশুভ নষ্ট হইয়া শুভ হয়। পল্লী গৃহ-গোধিকার দুর্নিমিত্ত নিবারণের জন্য মৃত্যুঞ্জয়মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। (বিদ্যাকর) মৎস্যপুরাণে উক্ত আছে যে, অদ্ভুত কার্য্যের শান্তির নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ শান্তি করাইতে হয়।

[অদ্ভুতশান্তি দ্র°]

অদ্ভুত২—(পুং) নবম মন্বন্তরে দক্ষসাবর্ণির সময়ের ইন্দ্র। (বিষ্ণুপু°) ২ দেবরাজ ইন্দ্রের এক দ্বারবান্। (হরিবংশ) ৩ সবল নামক অগ্নির তনয়, অদ্ভুতের পুত্র বিবিচি। (বায়ুপু°) ৪ চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবতাদের অন্তর্গত একজন। (বায়ুপু°) ৫ অগ্নির অন্যনাম। (ঋক্)

অদ্ভুত৩—উচ্চতার পাঁচ প্রকার মানের অন্যতম মান। এস্থলে উচ্চতা দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ। [উৎসেধ দ্র°]

অদ্ভুতকর্ম্মন্—(ত্রি) আশ্চর্য্যজনক কর্ম্মকারী। ২ বিলক্ষণ কলা-কৌশল প্রদর্শনকারী।

অদ্ভুতকৃষ্ণরাজ—রাজপুতানার একজন রাজা। সিরোহী-রাজ্যস্থিত বসন্তগড় নামক স্থানে প্রাপ্ত একখানি শিলালিপিতে ইহার নামোল্লেখ আছে। ১০৯৯ বিক্রমাব্দে (=১০৪২ খৃষ্টাব্দে) রাজা পূর্ণপাল কর্ত্তৃক ইহা প্রদত্ত হয়। ইহাতে রাজা প্রমার বা পরমার হইতে অধস্তন পুরুষগণের নাম প্রদত্ত হইয়াছে। প্রমারের পৌত্র আরণ্যরাজ, তৎপুত্র অদ্ভুতকৃষ্ণরাজ। অদ্ভুতকৃষ্ণরাজের পুত্র (অথবা পৌত্র ?) মহীপাল।

অদ্ভুতক্রতু—(ত্রি) আশ্চর্য্য কর্ম্মকারী, "মা কস্যাদ্ভুতক্রতু যক্ষম্" (ঋক্ ৫.৭০.৪) ২ অপূর্ব্ববুদ্ধিধারী অর্থাৎ অসাধারণ ধীসম্পন্ন।

অদ্ভুতগন্ধ—(ত্রি) অলৌকিক গন্ধ।

অদ্ভুততম—(ক্লী) অসাধারণ আশ্চর্য্য।

অদ্ভুততা—(স্ত্রী) বিচিত্রতা।

অদ্ভুতদর্পণ, অদ্ভুতসংগ্রহ—জ্যোতিগ্রন্থ বিশেষ। বুধবান বংশীয় মাধব শর্ম্মা এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মাধবশর্ম্মা রঘুনাথের পুত্র ও গোবিন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। অদ্ভুতদর্পণ—বল্লালসেনের 'অদ্ভুত-সাগর' গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত। ইহাতে দিব্য, নাভস ও ভৌম সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে 'ময়ুরচিত্রে'র অংশও উদ্ধৃত আছে।

অদ্ভুতদর্শন—(ত্রি) বিচিত্ররূপী।

অদ্ভুতধর্ম্ম—(পুং) আশ্চর্য্য কর্ম্মের নিয়ম।

অদ্ভুতব্রাহ্মণ—(পুং) ছন্দোগ ব্রাহ্মণের একটী বিভাগ। ইহা ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ নামে বিদিত। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, অদ্ভুত-ব্রাহ্মণ আধুনিক।

অদ্ভুতভীমকর্ম্মন্—(ত্রি) অপূর্ব্ব এবং ভয়ানক কার্য্যকারী।

অদ্ভুতমীঢ়ুষ—মৎস্যপুরাণে (৪৬.১-৪) উল্লিখিত আছে—ইক্ষ্বাকুবংশীয় ইক্ষ্বাকীর শূর নামে এক পুত্র ছিলেন। এই শূরের অপর নাম অদ্ভুতমীঢ়ুষ। অদ্ভুতমীঢ়ুষের পত্নী পৌরুষা ভোজা। ভোজার গর্ভে বহু দেবাদির জন্ম হয়। ভাগবতে পাওয়া যায় (১০.২৪.২৭-২৮), শূরের পত্নীর নাম মারিষা। ইঁহার পুত্র বসুদেব। সম্ভবতঃ পৌরুষা ও মারিষা একই নাম।

অদ্ভুতরস—(পুং) অলঙ্কারশাস্ত্রীয় অষ্টবিধ রসান্তর্গত একপ্রকার রস। [অদ্ভুত দ্র°]

অদ্ভুতরামায়ণ—কাব্যবিশেষ। এইগ্রন্থ বাল্মীকি কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। অন্য নাম 'অদ্ভুতোত্তরকাণ্ড'। ইহা ২৭টী সর্গে পূর্ণ। সহস্রস্কন্ধ রাবন-বধই এই গ্রন্থের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। দশস্কন্ধ রাবণবধের পরে রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সিংহাসন পুনরায় গ্রহণ করিলে পর, একদিন শ্রীরামচন্দ্র সীতার সহিত সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে সভাস্থ কোন মুনি লঙ্কা-বিজয় উপলক্ষ করিয়া শ্রীরামের বলবীর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সীতাদেবী শ্রীরামের প্রশংসা শ্রবণ করিতে করিতে নতমস্তকে মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন, ইহাতে বক্তা মুনি এবং রামচন্দ্র বিশেষ ক্ষুব্ধ ও ঈষৎ ক্রুদ্ধ হন। পরে হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সীতা নম্রভাবে আনতমস্তকে কহিলেন যে, বালিকা বয়সে যখন আমি পিতৃগৃহে ছিলাম, তখন পিতা আমাকে এক ব্রাহ্মণের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ কিয়দ্দিবস পিতার ভবনে আতিথ্য স্বীকার করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন, আমিও বিশেষ সাবধান হইয়া ঐ বিপ্রের সেবা শুশ্রূষা করিতেছিলাম। ব্রাহ্মণ পরিতুষ্ট হইয়া একদা আমাকে গল্পচ্ছলে সহস্রস্কন্ধ রাবণের বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন, ঐ রাবণ দশাননের ভ্রাতা, ত্রিভুবনে তাহার তুল্য দ্বিতীয় বীর নাই। সুতরাং আমি দশস্কন্ধ রাবণকে বীর বলিয়াই গ্রাহ্য করি না। আর্য্যপুত্র যতদিন সহস্রস্কন্ধ রাবণকে বধ না করিবেন ততদিন তাঁহার বীরত্ব অসম্পূর্ণই থাকিবে। আর সহস্রস্কন্ধ জীবিত থাকিতে আর্য্যপুত্রের বীরত্বের প্রশংসা বড় অশোভন বলিয়া মনে হয়, এই জন্যই আমি হাসিয়াছি।

সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষণ, বিভীষণাদি রাক্ষস, হনুমান প্রভৃতি বানর এবং চতুরঙ্গ সেনাসহ সমুদ্রপারে সহস্রস্কন্ধ রাবণবধের নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। সীতাও তাঁহাদের সহিত গমন করিলেন। প্রথম সৈন্যগণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। অতঃপর সহস্রস্কন্ধ স্বয়ং যুদ্ধস্থলে আগমন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিগণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক একবাণে হস্তী, অশ্ব ও রথাদির সহিত রাম সীতা ব্যতীত অপর সকলকে সবলে অযোধ্যায় নিক্ষেপ করিল। যুদ্ধে রামচন্দ্র অজ্ঞান হইয়া রথে পড়িয়া গেলে সীতা কালিকামূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া সহস্রস্কন্ধকে যুদ্ধে নিহত করেন।

অদ্ভুতরামায়ণে অদ্ভুতপ্রকারে রামসীতার জন্ম এবং অন্যান্য বিবিধ অদ্ভুতবিষয় বর্ণিত আছে। যদিও কেহ কেহ এই গ্রন্থ বাল্মীকির রচনা বলিয়া উল্লেখ করেন, তথাপি ইহার রচনা ও ভাষা দেখিয়া মনে হয় যে, ইহা বাল্মীকি-রচিত নহে, পরন্তু কোন আধুনিক কবি এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

অদ্ভুতরূপ—(ত্রি) অপূর্ব্ব রূপবিশিষ্ট, আশ্চর্য্যরূপশালী।

অদ্ভুতবিবেক—গ্রন্থবিশেষ। মহীধর এই গ্রন্থ রচনা করেন।

অদ্ভুতসঙ্কাশ—(ত্রি) আশ্চর্য্যবৎ।

অদ্ভুতসাগর—বিজয়সেনের পুত্র রাজা বল্লালসেন-রচিত একখানি সংস্কৃত জ্যোতিষ গ্রন্থ। ১০৯০ শকাব্দে (১০৬৮ খৃষ্টাব্দে) বল্লালসেন উহা লিখিতে আরম্ভ করেন ও তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন তাহা সমাপ্ত করেন। রঘুনন্দন, নীলকণ্ঠ, কমলাকর, অনন্তদেব প্রভৃতি অদ্ভুতসাগরের উল্লেখ করিয়াছেন।

অদ্ভুতসাগরসার১—চতুর্ভুজ প্রণীত জ্যোতিষ গ্রন্থবিশেষ।

অদ্ভুতসাগরসার২—শ্রীপতি রচিত জ্যোতিগ্রন্থবিশেষ

অদ্ভুতসার—(পুং) [বৈদ্যক] খদিরসার (রাজনি°)

অদ্ভুতসিন্ধু—একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। নারায়ণ কর্ত্তৃক তদীয় শান্তিতত্ত্বামৃতে এই গ্রন্থ উদ্ধৃত হইয়াছে।

অদ্ভুতস্বন—(পুং) [অদ্ভুতঃ স্বনঃ শব্দোঽস্য ; বহুব্রী কর্ম্মধা°।] মহাদেব। ২ আশ্চর্য্য শব্দ। [অদ্ভুতঃ স্বনো নাদো যস্য বহুব্রী] (ত্রি) আশ্চর্য্য শব্দবান্, যাহার আশ্চর্য্য শব্দ আছে।

অদ্ভুতাচার্য্য—বাঙ্গলা কবিতাছন্দে রামায়ণ-রচয়িতা।

মিঃ মন্টগোমারি মার্টিন সম্পাদিত ১৮৩৮ খৃঃ প্রকাশিত ডক্টর ফ্রান্সিস বুকাননের রিপোর্টে (Eastern India, 111. p-503) অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের উল্লেখ আছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ৫ম ভাগে স্বর্গগত আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই কবির উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধের পাদটীকায় প্রবীণ সাহিত্যিক রসিকচন্দ্র বসু মহাশয়ের একখানি পত্রে অদ্ভুতাচার্য্য ও তাঁহার রামায়ণের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৩১৩ সনের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় পণ্ডিত রজনীকান্ত

চক্রবর্ত্তীর লিখিত প্রবন্ধে এবং ১৩১৫ সনের রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের লিখিত প্রাচীন পুথির বর্ণনায় অদ্ভুতের ও তাঁহার রামায়ণের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। ১৩৪১ সনের মাঘ সংখ্যা ভারতবর্ষ পত্রিকায় ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় অদ্ভুতের বিস্তৃত ও প্রামাণ্য পরিচয় প্রকাশ পূর্ব্বক বাঙ্গালা সাহিত্যের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। আমরা সংক্ষেপে অদ্ভুতাচার্য্য ও তৎপ্রণীত রামায়ণের পরিচয় প্রদান করিতেছি। ১১৪৩ সনের একখানি পুথি হইতে বিশ্বাস মহাশয় অদ্ভুতাচার্য্যের পরিচয় দিয়াছেন—

"সের্‌শাবাদ সরকার সোনাবাজু গ্রাম।
অমৃতকুণ্ড নাম সে অতি অনুপাম ॥
আত্রাইর তীর সেহি কুরুক্ষেত্র সম।
করতোয়ার পশ্চিমভাগ জাহ্নবীর সম ॥
করতোয়ার পশ্চিমে আত্রাইর কূলে।
মহাপুণ্য স্থান সেই পুরাণেতে বলে ॥
অমৃতকুণ্ডা নাম গ্রাম অধিকারী তার।
(শ্রীনিবাস আচার্য্য সাধুর আচার)
তার ঘরে জনমিল এ চারি কুমার।
মেনকা উদরে চারি ব্যাস অবতার ॥
জ্যেষ্ঠ তিনজন তার অতি বিচক্ষণ।
অতি মূর্খ আছিল কনিষ্ঠ নিত্যানন্দ ॥"

অদ্ভুতের প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ। পিতার নাম শ্রীনিবাস, মাতার নাম মেনকা। পিতামহের নাম মার্ত্তণ্ড বা মার্কণ্ড। (কোন কোন পুথিতে প্রচণ্ড)। কবির নিবাস ছিল সোনাবাজু পরগণায় আত্রাই নদীর উত্তরে, করতোয়ার পশ্চিমে অমৃতকুণ্ডা গ্রামে। বর্ত্তমান পাবনা জেলায় পাবনা সহর হইতে পনের মাইল উত্তরে সিরাজগঞ্জ-ঈশ্বরদি রেলপথের চাটমোহর ষ্টেশনের দক্ষিণে এই গ্রাম অবস্থিত।

কবির বয়স যখন পাঁচ বৎসর—সেই সময়েই তিনি শিক্ষিত হন।

"করতোয়া কুলেবাড়ী অমৃতকুণ্ডা গ্রাম।
শুভক্ষণে হইল বটু নিত্যানন্দ নাম ॥
মহাপুরুষ নিত্যানন্দ জন্মিলা সংসারে।
যত শাস্ত্র পাঠ করে পাঁচ বৎসরে ॥
যজ্ঞোপবীত না হইবেক সপ্তবৎসরে।
গোরক্ষ হইয়া ফিরে বনের ভিতরে ॥
মাঘমাসে শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী তিথি।
ব্রাহ্মণ বেশে পরিচয় দিলা রঘুপতি ॥
রাম আজ্ঞা করিল রচিতে রামায়ণ।
অদ্ভুত আচার্য্য নাম তাহার কারণ ॥"

শ্রীরামচন্দ্র ব্রাহ্মণের বেশে দেখা দিয়া নিত্যানন্দকে রামায়ণ রচনার আদেশ দেন এবং তূণ হইতে বাণ গ্রহণপূর্ব্বক সেই দিব্য শরে নিত্যানন্দের জিহ্বার উপর রামনাম মহামন্ত্র লিখিয়া দেন। রঘুনাথ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া মাথায় হস্ত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। এই আশীর্ব্বাদের ফলে নিত্যানন্দ কবিত্ব-শক্তির অধিকারী হন এবং সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা করেন। এই জন্যই তাহার নাম হয় অদ্ভুতাচার্য্য।

ঐতিহাসিক ভট্টশালী মহাশয় অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ ও কুলগ্রন্থ মিলাইয়া কবির বংশতালিকা রচনা করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

আতাইর পুত্র মার্কণ্ডেশ্বর, তৎপুত্র (১) অনিরুদ্ধ, (২) চন্দ্রজিৎ, (৩) শ্রীবাস, (৪) বৃহস্পতি, ও (৫) উদ্ধব। শ্রীবাস-পুত্র (১) যাদবানন্দ, (২) মাধবানন্দ, (৩) নিত্যানন্দ, ও (৪) অচ্যুতানন্দ,

নিত্যানন্দ-পুত্র জয়, বিজয়, ও শিবানন্দ। শিবানন্দ-পুত্র গায়ন-বল্লভ। বল্লভ বোধ হয় পিতামহ রচিত রামায়ণ গান করিয়া গায়ন-বল্লভ নামে আখ্যাত হন। কবি ব্রাহ্মণবংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নিত্যানন্দের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহোদরের পৌত্র রঘুনাথ রায়। রঘুনাথের কন্যা শর্ব্বাণীর সঙ্গে সাঁতৈলের মহারাজ রাম-কৃষ্ণের বিবাহ হয়। রাণী শর্ব্বাণী নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিলে ১৭১১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ শাহ আলাম বাহাদুর সাঁতৈল রাজ্য রাজা রামজীবনের সহিত বন্দোবস্ত করেন। সুতরাং অনুমান হয় ১৭১০ খৃষ্টাব্দে রাণীর মৃত্যু হইয়াছিল। এই হিসাবে ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নিত্যানন্দের জন্ম-সময় নির্দ্দিষ্ট করিতে পারা যায়। ভট্টশালী মহাশয়ের মতে নিত্যানন্দ সম্রাট্ অকবরের সম-সাময়িক। অকবর ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কবি কৃত্তিবাস খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ বলিয়া যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কবির নিজস্ব রচনার পরিমাণ আজিও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণের মধ্যে অদ্ভুতাচার্য্যের রচনাও স্থান পাই-য়াছে। গায়কগণ ইচ্ছামত উহা পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছেন। আমরা কৃত্তিবাসের সঙ্গে তুলনা না করিয়া অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে অদ্ভুতাচার্য্যের কৃতিত্ব কৃত্তিবাসের সঙ্গে প্রায় সমান।

মিথিলায় নবাগত শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া সীতাদেবীর কথায় কবি বলিয়াছেন—(১)

(১) পণ্ডিত শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ ২৩০-২৩১ পৃষ্ঠা।

"ঘরত থাকিয়া সীতা জনক-নন্দিনী।
গবাক্ষের দ্বারে দেখে রাম চক্রপাণি ॥
রাম দেখি সীতাদেবীর দড়াইল মন।
আর বর নাহি মোক এ তিন ভুবন ॥
মনত ধরিল সীতা রামের চরণ।
মনে মনে কহিতেছে কোমল কথন ॥
× × ×
কমঠ কঠিন অতি মহাদেবের ধনু।
নবীন বয়স রাম কোমল অতি তনু ॥
যদি বা না পারে রাম ধনু নাড়িবার।
বাপে সত্য করিছেন না দিবেন আর ॥
কি মতে সহিব আমি এত দুখভার।
রাম রাম বুলি প্রাণ ত্যজিমু আপনার ॥
এহি মন্ত্র জপি মুঞি ত্যজিমু জীবন।
জন্মান্তরে পাঙ যেন রামের চরণ ॥
যেহি যাহা মনে ভাবে পায় সে সর্ব্বথা।
দেবমুনি মুখে শুনি এহি সব কথা ॥
এহি সব কথা সীতা ভাবে মনে মন।
সীতা বোলে আমি গৌরী করিব আরাধন ॥"

অদ্ভুতামৃত—দিব্য, অন্তরীক্ষ ও ভৌম সম্বন্ধীয় তিনটী উৎপাত-বিষয়ক একখানি জ্যোতিষ গ্রন্থ।

অদ্ভুতালয়—(পুং) অদ্ভুত পদার্থের স্থান।

অদ্ভুতৈনস—(ত্রি) নির্দ্দোষ। ২ নিষ্পাপ, অপাপ, "অদ্ভুতৈনসামপাপানাং" (ঋক্ ৫.৮৭.৭ সায়ণ)

অদ্ভুতোৎপাতশান্তি—শৌনক রচিত জ্যোতিঃগ্রন্থবিশেষ।

অদ্মন্—(ক্লী) ভোজন। "আ স্বমদ্মযুবমানঃ" (ঋক্ ১.৫৮.২) ২ গৃহ।

অদ্মনি—(পুং) [সর্ব্বান্ অত্তীতি অদ-নি-মুট্ চ] অগ্নি। (উজ্জ্বলদত্ত)

অদ্মসদ্—(ত্রি) নিমন্ত্রণে উপস্থিত ব্যক্তি। ২ পাচক-যোষিৎ। ৩ জননী। ৪ রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত ব্যক্তি। "অদ্মসন্ন সসতো বোধয়ন্তী"। (ঋক্ ১.১২৪.৪ সায়ণ)

অদ্মসদ্য—(ক্লী) অদ্মসদের স্থিতি, নিমন্ত্রণে উপস্থিত অতিথির অবস্থা। "অদ্মসদ্যায় হিন্বিরে" (ঋক্ ৮.৪৩.১৯)

অদ্মসদ্বন্—(ত্রি) অদ্মস্বদনীয়। ২ একত্র ভোজনে উপবেশনের যোগ্য। "বদ্মাহিস্থনো অদ্মসদ্বা" (ঋক্ ৬.৪.৪)

অদ্মান্—(পুং) [সর্ব্বান্ অত্তীতি, অদ্-নি-মুট্চ] অগ্নি।

অদ্‌মেতস্—(Admetus) গ্রীক্‌পুরাণোক্ত এক রাজপুত্র। সেসেলীর অন্তর্গত ফেরী নামক স্থানের রাজা ফেরেশ ইঁহার পিতা। অদ্‌মেতস্ আপোলো দেবের সহায়তায় রাজা লেনিয়াসের কন্যা সুন্দরী আল্‌সেষ্টিসের পাণিগ্রহণ করেন। অদ্‌মেতস্ এক সময়ে নিদারুণ পীড়ায় আক্রান্ত হন এবং তাঁহার জীবনসংশয় উপস্থিত হয়। আপোলো ভাগ্য-দেবীগণের নিকট তাঁহার জীবনরক্ষার্থ প্রার্থনা করেন। ভাগ্যদেবীগণ বলেন, যদি অদ্‌মেতসের স্থলে অপর কেহ স্বীয় জীবন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়, তবে তাঁহার জীবন রক্ষা হইবে। আল্‌সেষ্টিস্ নিজ জীবন দান করিয়া পতিকে রক্ষা করেন। দৈবযোগে হিরাক্লিস যমহস্ত হইতে আল্‌সেষ্টিস্‌কে উদ্ধার করেন।

অদ্য—(অব্য) [ইদমোঽশ্ ভাবো দ্যশ্চ প্রত্যয়োঽহনি] অস্মিন্নহনি, অদ্য। (ইতি বামনঃ)। ইদম্ শব্দের সপ্তম্যর্থে নিপাত। আজি, এই দিন। ২ বর্ত্তমান দিন। "তদদ্যং ভূতিমিচ্ছতা" (পঞ্চতন্ত্র) "অদ্যাদ্য শ্বঃ শ্ব ইন্দ্র ত্রাস্ব পরে চ নঃ" (ঋক্ ৪.৫০.১১) ৩ (ক্লী) [বৈদ্যক] ধান্য।

অদ্যব—(অব্য) অদ্যদিবস। ২ এই সময়।

অদ্যতন—(ত্রি) [অদ্য ভবঃ অদ্য-ট্যু তুড়াগমশ্চ] অদ্যভব। (পুং) কালবিশেষ। মহাভাষ্যের এবং কাতন্ত্রের মতে, পূর্ব্বরাত্রির শেষ চারি দণ্ড হইতে পররাত্রির দেড় প্রহর পর্য্যন্ত; কিংবা পূর্ব্বরাত্রির শেষ অর্দ্ধ হইতে পর রাত্রির প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্তকে অদ্যতন বলা যায়। ভর্ত্তৃহরি এবং ক্রমদীশ্বরের মতে, পূর্ব্বরাত্রির শেষ প্রহর হইতে পররাত্রি প্রথম প্রহর পর্য্যন্ত অদ্যতন কাল। (স্ত্রী) অদ্যতনী। "অদ্যতনেঽতীতে মাত্রেঽদ্যতনী। অদ্যভাবোঽদ্যতনঃ। আন্যায্যাদুত্থানাদান্যায্যাচ্চ সংবেশনাদহঃ। উভয়তোঽর্দ্ধরাত্রং বা লোকতঃ সিদ্ধম্।" (দুর্গসিংহ)

অদ্যতনভূত—(পুং) ভূতকালবিশেষ, বর্ত্তমান দিবসের অতিক্রান্ত কাল।

অদ্যতনীয়—(ত্রি) অদ্যকার। ২ যাহা আজকাল যাইতেছে।

অদ্যত্ব—(ক্লী) [অদ্য-ত্ব অদ্য তদ্বৃত্তের্ভাবঃ] বর্ত্তমানত্ব।

অদ্যদিন, অদ্যদিবস—(পুং ক্লী) আজিকার দিন। "অদ্যদিবসাদারভ্য" (পঞ্চতন্ত্র)

অদ্যপূর্ব্বম্—(অব্য) অদ্য হইতে পূর্ব্বে।

অদ্যপ্রভৃতি—(অব্য) আজ হইতে। ২ এই সময় হইতে।

অদ্যপ্রসূত—(ত্রি) অদ্যভূমিত, সদ্যোজাত।

অদ্যভক্ষ্য—[দেশজ] আজিকার খাদ্য, এক দিনের খাদ্য, অত্যল্প খাদ্য।

অদ্যভক্ষ্যধনুর্গুণ—(পুং) হিতোপদেশের মিত্রলাভ প্রসঙ্গে ক্ষুধার্থ শৃগাল মৃত ব্যাধ, সর্প, শূকর ও ধনু দেখিয়া বলিয়াছিল "অদ্যভক্ষ্যোধনুর্গুণঃ।" (গৌণার্থে) উহা খাদ্যের অভাব বা দারিদ্র-ব্যঞ্জক বাক্য। যথা "ওদিকে অদ্যভক্ষ্যধনুর্গুণ (অর্থাৎ গৃহে অন্নহীন) আর এদিকে বেটার নবাবী চাল দেখ।"

অদ্যশ্বীন—(ক্লী) [অদ্য-শ্বস্-খ টিলোপঃ অদ্য শ্বো বা ভবতীতি] মরণ। (ক্রমদীশ্বর) আজি বা কালি নিশ্চয় ইহা ঘটিবে এই শব্দে অবশ্য মৃত্যুকে বুঝাইতেছে।

অদ্যশ্বীনা—(স্ত্রী) [অদ্য-শ্বস্-খ টিলোপঃ অদ্যঃ শ্বো বা সূতে প্রসবিষ্যতে বা] কঠোরগর্ভা, আসন্নপ্রসবা। (ক্রমদীশ্বর) যাহা আজি কালি প্রসব হইবে এইরূপ হইয়া আছে।

"অদ্য শ্বো বা বিজায়তে। + + আসন্নপ্রসবেত্যর্থঃ। কেচিত্তু বিজায়ত ইতি নানুবর্ত্তয়ন্তি। অদ্যশ্বীনং মরণম্ আসন্নমিত্যর্থঃ।" (ভট্টোজি)। অদ্যশ্বীন শব্দ (পুং ক্লী) আসন্ন অর্থাৎ আসন্নমৃত্যু অর্থে প্রযুক্ত হয়।

অদ্যাপি—(অব্য) আজপর্য্যন্ত। ২ বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত।

অদ্যাবধি—(ক্লী) [অদ্য অবধিঃ সীমা যস্য, বহুব্রী] (ক্রি° বি°) আজি পর্য্যন্ত। ২ আজি লাগাইত।

অদ্যু—(ত্রি) অদীপ্তি, দীপ্তিহীন। "অদ্যুং কৃণোতশংসং" (ঋক্ ৭.৩৪.১২)

অদ্যুৎ—(ত্রি) চমৎকাররহিত। অদ্যোতমান, 'অয়ং দ্যোতয়দদ্যুতো ব্যক্তূন্" (ঋক্ ৬.৩৯.৩)

অদ্যুত্য—(ক্লী) [দ্যুতে ভবং দ্যুত্যং ন দ্যুত্যং অদ্যুত্যং] সন্মার্গাগত। "অদ্যুত্যেঽবসে নিহ্বয়ে" (শুক্লযজুঃ ৩৪.২৯)। ২ হতভাগ্যদ্যুত। ৩ জুয়া খেলায় জয় লব্ধ বস্তুর অপ্রাপ্তি। ৪ যাহা দ্যুত্য নহে অর্থাৎ নীতি অনুসারে প্রাপ্ত।

অদ্রব—(পুং) [ন দ্রবঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ] দ্রবের অভাব। [নাস্তি দ্রবো যত্র যস্য বা, বহুব্রী] (ত্রি) দ্রবশূন্য।

অদ্রব্য—(ক্লী) [ন দ্রব্যম্ অপ্রাশস্ত্যে নঞ্-তৎ] অপ্রশস্ত দ্রব্য। ২ অযোগ্য পাত্র।

অদ্রব্য—(ক্লী) [ন দ্রব্যম্, অপ্রাশস্ত্যে নঞ্-তৎ] অপ্রশস্ত দ্রব্য, অযোগ্য পাত্র। "না দ্রব্যে নিহিতা কাচিৎ" (হিতোপ°)

অদুরা—ছোট নাগ পুরবাসী গোরাইত জাতির একটী শ্রেণী।

অদ্রাখিয়া—বিহারবাসী কালওয়ার জাতির বনোধিয়া শাখার একটী থাক।

অদ্রামপেৎ—তামিল ভাষায় অদ্রামপতনম্ বা আদিরামপত্তনম্, অর্থাৎ মহাবীর রামচন্দ্রের শহর। মাদ্রাজের তাঞ্জোর জেলান্তর্গত পেত্তুকোট্টই তালুকের এক বন্দর ও সহর। অক্ষা° ১০° ২০′ উ; দ্রাঘি° ৭৯°২৩′ পূ°। স্থানীয় অধিবাসীর অধিকাংশই মৎস্যজীবী। সমুদ্রপথে সিংহলের সহিত ইহার আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ত্রিচিনপল্লী পর্য্যন্ত ইহারা মৎস্যাদি বিক্রয়ার্থ লইয়া যায়। লবণের কারখানার জন্য অদ্রামপেৎ প্রসিদ্ধ। অদ্রামপেৎ নগর হইতে বহুদুর পর্য্যন্ত লবণের জলাভূমি বিস্তৃত। লব্বই মুসলমানেরা এখানকার প্রধান ব্যবসায়ী। এখানে একটী প্রাচীন শিবমন্দির আছে।

অদ্রাব্য (insoluble)—যাহা দ্রব করা বা গলান যায় না তাহাকে অদ্রাব্য কহে। এমন কোন পদার্থ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই যাহা সম্পূর্ণ অদ্রাব্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। কোন পদার্থ হয় ত জলে গলে না, কিন্তু অম্লে তাহা গলিয়া যায়; আবার যাহা জলে বা অম্লে গলে না, তাহাও অন্য কোন উপযুক্ত দ্রাবকে (solvent) বিগলিত হইয়া থাকে।

অদ্রি—(পুং) [অদ-ক্রিন্]। পর্ব্বত। ২ প্রস্তর। ৩ বৃক্ষ। ৪ সূর্য্য। ৫ মেঘ। ৬ পরিমাণ বিশেষ। [ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত পর্ব্বত শব্দে দ্র°]

অদ্রি—(পুং) দেবাসুরসংগ্রামে স্কন্দদেব সেনাপতিপদে বৃত হইলে তমসা নদী তাঁহার সাহায্যার্থে স্বীয় অনুচর অদ্রি ও কম্পককে প্রদান করিয়াছিলেন। (বামনপু°) অদ্রিতনয় বলাক নামক রাক্ষস অতিরাত্রের কন্যা ও সুশর্ম্মার স্ত্রীকে হরণ করিয়াছিল। (মার্কণ্ডপু°)

অদ্রিকর্ণী—(স্ত্রী) [অদ্রিঃ অদ্রিনামিকা গিরিবালমূষিকা তস্যাঃ কর্ণঃ কর্ণতুল্যং পুষ্পাস্তঃস্থং পত্রং যস্যাঃ। (বাচস্পতি)। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্] অপরাজিতা। অপরাজিতা ফুলের ভিতরের পত্র অদ্রি অর্থাৎ বালমূষিকার কাণের মত দেখিতে, তাই উহার নাম অদ্রিকর্ণী হইয়াছে।

অদ্রিকা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] ধান্যক, ধান। ২ মহানিম্ব।

অদ্রিকা—অপ্সরা অদ্রিকা ব্রহ্মশাপে যমুনার জলে অবস্থান করিতেছিলেন। রাজা উপরিচরের ঔরসে অদ্রিকা মৎস্যরাজ নামে পুত্র ও সত্যবতী নাম্নী এককন্যা প্রসব করেন। এই সত্যবতীই বেদব্যাসের জননী। (মহাভা°) বসু-নরপতির পত্নী অদ্রিকা হইতে ব্যাসজননী সত্যবতী জন্মগ্রহণ করেন। (হরিবংশ)। [উপরিচর দ্র°] ২ অদ্রিকা বানরপতি কেশরীর অন্যতমা পত্নী। অদ্রিকা হইতে নির্ঋতি বায়ুর ঔরসে অদ্রি নামে এক পিশাচ জন্মগ্রহণ করে। এই অদ্রি হনুমানের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

অদ্রিকীলা—(স্ত্রী) [অদ্রয়ঃ কুলাচলাঃ পর্ব্বতাঃ কীলাঃ শঙ্কব ইব যস্যাঃ, বহুব্রী] ভূমি। ২ পৃথিবী। [অদ্রেঃ সুমেরোর্কীল ইব বা] (পুং) বিকুম্ভপর্ব্বত।

অদ্রিকৃতস্থলী—(স্ত্রী) অপ্সরাবিশেষ।

অদ্রিচ্ছিদ্—(পুং) বজ্র।

অদ্রিজ—(ক্লী) [অদ্রৌ পর্ব্বতে জায়তে জন-ড] শিলাজতু। ২ গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ৩ গেরিমাটী। (ত্রি) ৪ পর্ব্বতজাত দ্রব্যমাত্র। (স্ত্রী) ৫ অদ্রিজা—গিরিরাজকন্যা। ৬ দুর্গা।

৭ সৈংহলী বৃক্ষ। (রাজনি°)। (পুং) ৮ পর্ব্বতজাত দাবানল। ৯ সূর্য্যজাত হংস। ১০ রূপ। ১১ আত্মা।

অদ্রিজতু—(ক্লী) [বৈদ্যক] শিলাজতু।

অদ্রিজূত—(ত্রি) স্তোতৃগণ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট। "অদ্রিজূতঃ পরিদ্যাবা পৃথিবী" (ঋক্ ৩.৫৮.৮)

অদ্রিতনয়া—(স্ত্রী) [অদ্রেস্তনয়া ৬-তৎ] পার্ব্বতী।

অদ্রিদ্রোণী—(স্ত্রী) [অদ্রের্দ্রোণিরিব] পর্ব্বতসম্ভব নদী।

অদ্রিদ্বিষ্—(পুং) [অদ্রিভ্যঃ দ্বেষ্টি, দ্বিষ্-ক্বিপ্] ইন্দ্র।

অদ্রিনন্দিনী—(স্ত্রী) পর্ব্বতের কন্যা, পার্ব্বতী।

অদ্রিনাথ—(পুং) পর্ব্বতরাজ ; হিমালয়। ২ শিব।

অদ্রিপতি—(পুং) [অদ্রীণাং পতিঃ ৬-তৎ] হিমালয়।

অদ্রিবর্হস্—(ত্রি) [অদ্রের্বর্হ ইব বর্হোঽস্য] অতিসার। ২ অতি কঠিন। ৩ পরিবৃদ্ধ মেঘ বা মেঘ সমাকীর্ণ। "অদিতিরদ্রিবর্হাঃ" (ঋক্ ১০.৬৩.৩)

অদ্রিবুধ্ন—(পুং) [অদ্রের্বুধ্ন ইব বুধ্নোঽস্য] অতি কঠিন। "অয়ং নিধিঃ সরমে অদ্রিবুধ্নঃ" (ঋক্ ১০.১০৮.৭) ২ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন।

অদ্রিভিদ্—(পুং) [অদ্রিং ভিনত্তি ভিদ্-ক্বিপ্, ৬-তৎ] ইন্দ্র।

অদ্রিভূ—(পুং স্ত্রী) [অদ্রৌ ভবতীতি ভূ-ক্বিপ্, ৭-তৎ] অপরাজিতা লতা। ২ আখুকর্ণীলতা। ৩ পার্ব্বতী। (ত্রি) ৪ অদ্রিজাত।

অদ্রিমাতৃ—(পুং) [অদ্রিমেঘস্তজ্জলং মিমীতে মা-তৃচ্] মেঘ-জলনির্ম্মাতা। "দিবো অদ্রিমাতরম্।" (ঋক্ ৯.৮৬.৩)

অদ্রিমাষা—(স্ত্রী) বনমাষ, মাষাণী। (বৈদ্যকনি°)

অদ্রিমূর্দ্ধন্—(পুং) পর্ব্বতশিখর।

অদ্রিয়ার—বেহারস্থ শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণদের একটী শাখা।

অদ্রিরাজ—(পুং) [অদ্রীণাং রাজা টচ্ সমা°] হিমালয়। [অদ্রিরাজ্—অদ্রি-রাজ-ক্বিপ্ অদ্রিষু রাজতে] হিমালয়।

অদ্রিবৎ, অদ্রিবস্—(ত্রি) পর্ব্বতোপলক্ষিতবজ্রযুক্ত ইন্দ্র। "কৃণুধ্বরাধো অদ্রিবঃ"। (ঋক্ ১.১০.৭)

অদ্রিবহ্নি—(পুং) পর্ব্বতীয় অগ্নি। ২ আগ্নেয় গিরি।

অদ্রিশয্য—(পুং) মহাদেব। ২ যিনি পর্ব্বতের উপর শয়ন করেন।

অদ্রিশৃঙ্গ—(ক্লী) পর্ব্বতশিখর।

অদ্রিসানু—(ক্লী) পর্ব্বতের শিখর, পর্ব্বতচূড়া। ২ (ত্রি) সানুপ্রিয়। উষা দেবীকে সানুপ্রিয় বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে (ঋক্ ৬.৬৫.৫)

অদ্রিসানুজা—(স্ত্রী) ত্রায়মাণা, [চলিত] বলাডুমুর (বৈদ্যকনি°)

অদ্রিসার—(পুং) [অদ্রেঃ সার ইব] লৌহ। [অদ্রেরিব সারোঽস্য বহুব্রী] ত্রি) ২ অতি কঠিন। ৩ শিলাজতু।

অদ্রিসারময়—(ত্রি) অদ্রিসারাত্মক। ২ অত্যন্ত কঠিন।

অদ্রিসুতা—[অদ্রিসুতা] পার্ব্বতীর আর একটী নাম। ইনি হিন্দু-দিগের একজন দেবতা। পার্ব্বতী হিমালয়ের কন্যা বলিয়া তাঁহার নাম অদ্রিসুতা এবং ইনি দেবাদিদেব মহাদেবের পত্নী। মন্ত্রমহার্ণব (৮১৩ প) ও মন্ত্রমহোদধি (৭৮ প) এই দুই পুস্তকে অদ্রিসুতার ধ্যান পাওয়া যায়। দুইটী ধ্যানই এক ; যথা—

"শম্ভুং জগন্মোহনরূপপূর্ণং বিলোক্য লজ্জাকুলিতাং স্মিতাঢ্যাং।
মধূকমালাং স্বসখীকরাভ্যাং সন্বিভ্রতীমদ্রিসুতাং ভজেয়ং॥"

অদ্রিসুতা তাঁহার পতি জগন্মোহনরূপধারী শম্ভুকে দেখিয়া লজ্জাকুলিত হইয়া মৃদুহাস্যে উদ্ভাসিতা ; দেবীর হস্তে মধূক-মালা এবং তাঁহার অপর হস্ত পার্শ্ববর্ত্তী সখীর উপর ন্যস্ত,—এইরূপে তাঁহাকে চিন্তা করিতে হয়।

অদ্রিসোপান—[সোপান দ্রষ্টব্য] পর্ব্বতে উঠিবার অবতরণিকা।

"অদ্রি-সোপানপার্শ্বে তু ন কুর্য্যেৎ পার্শ্বয়োরজ্ঘ্রিকম্"
(মানসার ৩৩.১০৮)

"অদ্রি-সোপানাৎ দেশে তু দীর্ঘমানম্ যথেষ্টকম্"
(মানসার ৩৩.১১৮)

"অদ্রি-দেশে সমারোহে যত্র তত্রৈব কারয়েৎ" (—ঐ ১১৮)

অদ্রিসংহত—(পুং) [অদ্রিভিঃ গ্রাবভিঃ সংহতঃ অভিযুতঃ ৩-তৎ] সোম। [অদ্রিরিব সংহতং কঠিনং] (ত্রি) ২ অদ্রিবৎ কঠিন। অতিশয় শক্ত।

অদ্রী—গয়া জেলার একটী ক্ষুদ্র নদী। ইহা ছোট-নাগপুরের পর্ব্বতময় ভূভাগে উৎপন্ন হইয়া উত্তরমুখে প্রবাহিত হইয়া ওরা শহরের নিকট পুন্‌পুন্ নদীতে পড়িয়াছে। ঔরঙ্গাবাদ শহর এই নদীর তীরে অবস্থিত।

অদ্রীন্দ্র—(পুং) [অদ্রীণাং ইন্দ্রঃ ৬ষ্ঠী-তৎ] হিমালয়।

অদ্রীশ—(পুং) [অদ্রীণাং ঈশঃ প্রধানঃ, ৬-তৎ] হিমালয়। [অদ্রেরীশঃ পতিঃ] ২ শিব।

অদ্রুহ—(ত্রি) ঈর্ষা বা ছলনারহিত, দ্রোহহীন। "উত মন্যে পিতুরদ্রুহো মনঃ" (ঋক্ ১.১৫৯.২)

অদ্রুহ্বন্—(ত্রি) [ন দ্রুহ্ ক্বনিপ্ নঞ্-তৎ] অদ্রোহকারক। "তা দাং সম্যগদ্রুহ্বাণে পশ্যাম ধায়সে" (ঋক্ ৫.৭০.২)

অদ্রেষ্টই—বিতস্তা নদীর নিকটে অবস্থিত একটী ভারতীয় রাজ্য। গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ উহার রাজধানীকে পিম্‌প্রম নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই অদ্রেষ্টই রাজ্যকে অরট্ট দেশের প্রাচীন নাম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিলে 'অরট্ট' নাম হইতে 'অদ্রেষ্টই' হওয়া সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয়, পাণিনির 'অরিষ্ট' দেশই এই অদ্রেষ্টই। (পাণিনি ৬.২.১০০)

অদ্রোঘ—(ত্রি) [দ্রুহ্-ঘঞ্ ঘত্বম, নাস্তি দ্রোঘো যস্য] দ্রোহ-রহিত। "অদ্রোঘেন বচসা" (ঋক্ ৩.১৪.৬) [ন দ্রোঘঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ] (পুং) দ্রোহের অভাব।

অদ্রোঘবাচ্—(ত্রি) অহিংস বাক্যযুক্ত, শোভন বাক্যযুক্ত (সবিতা) "সত্যস্য যুবানমদ্রোঘবাচং" (অথর্ব ৬.১.২) [অদ্রোঘব্যা প্রশস্তা স্তুতিরূপা বাক্ যস্মিন্] ২ প্রশস্ত বাক্যযুক্ত, অগ্নি। (ঋক্ ৬.৫.১) [অদ্রোগ্ধব্যা অনতিক্রমনীয়া বাক্ আজ্ঞারূপা যস্য] ৩ অনতিক্রমনীয় বাক্, অলঙ্ঘ্য বাক্‌ণ ইন্দ্র, (ঋক্ ৬.২২.২)

অদ্রোঘাবিত—(ত্রি) [অদ্রোঘঃ অবিতো রক্ষিতো যেন] অদ্রোহরক্ষক। "অদ্রোঘাবিতাবাচমচ্ছ" (অথর্ব ১১.১.২)

অদ্রোহ—(পুং) [ন দ্রোহঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ] দ্রোহের অভাব। "অদ্রোহেণৈব ভূতানামল্পদ্রোহেণ বা পুনঃ।" (মনু ৪.২)

অদ্রোহক—(পুং) একজন পরমজ্ঞানী মুনি। ইনি এক-শয্যাগতা রমণীকে ক্ষমাগুণে উপেক্ষা করিয়া সর্ব্বলোকজয়ী হইয়াছিলেন। (পদ্মপু° সৃষ্টি° ৫৪.১)

অদ্রোহিন্—(ত্রি) [ন-দ্রুহ-ণিনি] দ্রোহী নহে, নম্র।

অদ্বয়১—(ক্লী) [ন দ্বয়ম্] দুইয়ের অভাব। [নাস্তি দ্বয়ং দ্বিত্বং তজ্জ্ঞানং বা যস্য] ২ অভেদ। ৩ ব্রহ্মজ্ঞ। (পুং) ৪ বুদ্ধ। ৫ জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়বিশেষ ; ইঁহারা বলেন পদার্থ জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। ৬ ব্রহ্ম।

"যাবন্ন জায়তে ব্রহ্ম সর্ব্বাধিষ্ঠানমদ্বয়ম্।" (আত্মবোধ) উপনিষদে অদ্বয় শব্দের প্রচুর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ইহা তখন ক্লীবলিঙ্গ। ব্রহ্ম বা আত্মা অর্থে উপনিষদে যে সকল প্রয়োগ দৃষ্ট হয় তাহা এই—

"তদ্‌ব্রহ্মাদ্বয়মন্যহম্" (কৈবল্যোপনিষৎ ১৯) "অদ্বয়োঽয়ম্ আত্মৈকলত্রয়" (নৃসিংহোত্তর তাপনীয় উঃ ৮) "এতদদ্বয়ং স্বপ্রকাশম ...আত্মৈব"—ঐ।৮ "অদ্বয় এবায়মাত্মা"—ঐ।৮ "বিভুরদ্বয় আত্মানন্দঃ"—ঐ।৯ "অবিক্রিয়ে অদ্বয়ে"—ঐ।৯ "অসুখ দুঃখোঽদ্বয়ঃ...অভিন্নোঽদ্বয়ঃ"—ঐ।৯ "কিমদ্বয়েন দ্বিতীয়মেব ন" —ঐ।৯ "অব্যবহার্য্যমদ্বয়ম্"—ঐ।৯ "তদ্ বা এতদ্ ব্রহ্ম অদ্বয়ং বৃহত্ত্বাৎ"—ঐ।৯ "সত্যং সূক্ষ্মং পরিপূর্ণম্ অদ্বয়ম্"—ঐ।৯ "সুবিভাতম্ অদ্বয়ং পশ্যত"—ঐ।৯ "অনুজ্ঞানং অদ্বয়ং লব্ধা"—ঐ।৯ "তং শান্তম্ অচলম্ অদ্বয়ম্ আনন্দম্"—(পরমহংসো-পনিষৎ ২) "মহানারায়ণাদ্বয়ম্"—(মুক্তিকোপনিষৎ ১.৩৪) "অলেপকং সর্ব্বগতং যদ্ অদ্বয়ম্"—ঐ ২.৭৩

উপনিষদের ন্যায় মান্য গৌড়পাদীয় কারিকায় ইহার বহু প্রয়োগ আছে, যথা—

"অদ্বয়েন চ কল্পিতঃ" (মাণ্ডূক্যকারিকা ২.৩৩) "ভাবা অপি অদ্বয়েনৈব"—ঐ ২.৩৩ "প্রপঞ্চোপশমোঽদ্বয়ঃ"—ঐ ২.৩৫ "অদ্বয়ং চ দ্বয়াভাসম্"—ঐ ৩.৩০, ৪.৬২ "বিবদন্তোঽদ্বয়ঃ"—ঐ ৪.৪ "বিজ্ঞানং শান্তম্ অদ্বয়ম্"—ঐ ৪.৪৫ "যানুৎপত্তিঃ সমাদ্বয়া" —ঐ ৪.৭৭ "তৎসাম্যমজমদ্বয়ম্"—ঐ ৪.৮০ ব্রাহ্মণ্যং পদমদ্বয়ম্"—ঐ ৪.৮৫

পুরাণ ও মহাভারত প্রভৃতি পরবর্ত্তী গ্রন্থে আত্মা বা ব্রহ্ম অর্থে অদ্বয় শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে। বৌদ্ধশাস্ত্রে অদ্বয় শব্দের শূন্য অর্থে যথেষ্ট ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধদিগের বোধি-চিত্তবিবরণ গ্রন্থে শূন্যতাকে "অদ্বয়লক্ষণা" বলা হইয়াছে। যথা—

"গম্ভীরোত্তানভেদেন ক্বচিচ্চোভয়লক্ষণা।
ভিন্নাপি দেশনাঽভিন্না শূন্যতাদ্বয়লক্ষণা॥"

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে "ভিন্নাপি" স্থলে "ভিন্না হি" পাঠ এবং ভামতীমধ্যেও "ভিন্নাহি" পাঠ আছে। দুই যাহার অবয়ব নহে এই অর্থে সুতরাং অদ্বয়শব্দে ব্রহ্ম বা আত্মা বুঝায়, আর বৌদ্ধশাস্ত্রে ক্ষণিক শুদ্ধ বিজ্ঞান বা শূন্য বুঝায়। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন অর্থে অদ্বয়শব্দের প্রকৃত অর্থ হয় না, কারণ দ্বিতবস্তু হইলেই তাহা পরিচ্ছিন্ন হইবে এবং পরিচ্ছিন্ন হইলে তাহার অবয়বও থাকিবে। লক্ষণা দ্বারা ইহার অর্থ অতুলনীয় প্রভৃতি হইতে পারে। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ অদ্বৈতবাদীর অদ্বৈতব্রহ্ম। অধিক কি, বৌদ্ধ-মতে ক্ষণিক বিজ্ঞান বা শূন্য অর্থেও ইহার সার্থকতা থাকে না। [অদ্বয়বাদ দ্র°]

(ত্রি) ৭ অভেদ, অদ্বিতীয়।

"অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্, তিন তাঁর রূপ।" (চৈতন্যচরিতামৃত)

অদ্বয়২—[ন দ্বয়ঃ] যাহা দ্বিভাব সম্পন্ন নয়, মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধ বজ্রযান-সম্প্রদায়ের মতে যোগের অবস্থাভেদ। জলে ক্ষীরে মিশিয়া যে অবস্থা হয়, জ্ঞানমার্গাশ্রয়ী সাধুর চিত্ত তদ্বৎ অবস্থা পাইলে তাহাকে অদ্বয়যোগী বলা হয়।

প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়-সিদ্ধি গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে :—

"উভয়োর্ম্মেলনং যচ্চ সলিলক্ষীরয়োরিব।
অদ্বয়াকারযোগেন প্রজ্ঞোপায়ঃ স উচ্যতে ॥১৭
প্রক্ষেপ্তুং চাপনেতুং চ শক্যতে যত্র নৈব হি।
প্রক্ষেপায় চ যদ্যুক্তং ধর্ম্মতত্ত্বং তদুচ্যতে ॥
গ্রাহ্য-গ্রাহকসন্ত্যক্তং সদসৎ পক্ষবর্জ্জিতম্।
লক্ষ্য-লক্ষণনির্ম্মুক্তং শুদ্ধং প্রকৃতিনির্ম্মলম্ ॥
ন দ্বয়ং নাদ্বয়ং শান্তং শিবং সর্ব্বত্র সংস্থিতম্।
প্রত্যাত্মবেদ্যমতলং প্রজ্ঞোপায়মনাকুলম্ ॥" (১.১৭-২০)

উক্ত গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে যোগী অদ্বয়যোগে যে অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহা বিবৃত হইয়াছে।

অদ্বয়৩—বৌদ্ধ তন্ত্রোক্ত যুগনদ্ধ নামক দেববিশেষের মূর্ত্তি,

বোধি-চিত্তশূন্য বা নৈরাত্মার আলিঙ্গনে যুগনদ্ধ অদ্বয়মূর্ত্তি হইয়াছে। যেমন লবণ জল হইতে বিভিন্ন করা যায় না, তেমনই বোধিচিত্ত হইতে নৈরাত্মাকে বিভিন্ন করা যায় না। এই জন্য ইঁহার নাম অদ্বয় হইয়াছে। যখন বিভিন্ন থাকেন তখন ইঁহাকে হেরুক বলা হয়।



অদ্বয় বা যুগনদ্ধ মূর্ত্তি।

অদ্বয়জ্ঞান—দ্বৈতভাবহীন প্রজ্ঞাবিশেষ। অদ্বয়যোগে যোগ-সিদ্ধ পুরুষের এই জ্ঞানলাভ অবস্থাবিশেষে সমুপস্থিত হইয়া থাকে। সাধনমালাতন্ত্রে দ্বিভুজহেরুকসাধন প্রসঙ্গে অদ্বয়-জ্ঞানের প্রকৃত তাৎপর্য্য অভিব্যক্ত হইয়াছে :—

"ততো ধর্ম্মপুদ্গালাদিবিকল্পকলঙ্কবর্জ্জিতরূপাং শরন্নির্ম্মল-মধ্যাহ্নভোনিভাং অদ্বয়জ্ঞানৈকরূপাং শূন্যতাং বিভাব্য ওঁ শূন্যতাজ্ঞানাজ্ঞানবজ্রস্বভাবাত্মকোঽহমিত্যধিতিষ্ঠেৎ।"

বজ্রযান-সম্প্রদায়ের জ্ঞানসিদ্ধি নামক গ্রন্থের বজ্রযানাভিষেক বিধি নামক ১৭শ অধ্যায়ে অদ্বয়জ্ঞানের প্রকার নির্ণীত আছে। যথা—

"সম্যগ্জ্ঞানসমুৎপন্নো যোগী প্রার্থয়তে যদা।
অভিষেকঃ প্রদাতব্যস্ত্রৈধাতুকং নমস্কৃতঃ ॥১
সর্ব্বোপকরণৈর্যুক্তঃ সর্ব্বপূজাসু সংবৃতঃ
আধারয়েদ্বরং বজ্রগুরুং সর্ব্বগুণার্ণবম্ ॥২
ভক্ষ্যভোজ্যাদিযুক্তেন পুষ্পগন্ধাদিকেন চ।
সম্পূজ্য মণ্ডলং কৃত্বা কৃতাঞ্জলিপুটো গদেৎ ॥৩
"সম্যগ্জ্ঞানবরং প্রাপ্তুং প্রসাদাৎ করুণাত্মক।
স্বসংবেদ্য স্বভাবং চ আদত্তমপি নিশ্চয়ম্ ॥৪
ইদমেবাদ্বয়ং জ্ঞানং নান্যজ্জগতি বিদ্যতে।
প্রীতং ধর্ম্মামৃতং প্রাপ্য প্রার্থয়েত মহাগুরুম্ ॥৫"

(জ্ঞানসিদ্ধি ১৭.১-৫)

অভিষেক হইতে অদ্বয়জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়া তান্ত্রিক বিশিষ্ট সংজ্ঞায় অভিহিত। উহা এতই জটিল যে, কর্ম্মপথগামী যোগী ভিন্ন অপরে উহার প্রকৃত অর্থ উদ্ঘাটনে অসমর্থ। [অদ্বয় দ্র°]

অদ্বয়যোগ—দ্বৈতভাবহীন জ্ঞান, যাহা কেবল মাত্র অদ্বয়যোগ-সাধনার নিরূপিত ক্রমানুসারে যোগীর হৃদয়ে আসিয়া সমুপস্থিত হয়। উহা জ্ঞানমার্গের একটী বিশিষ্ট স্তর। [অদ্বয় দ্র°] সাধনমালা তন্ত্রে বুদ্ধকপালসাধনায় অদ্বয়যোগজ্ঞানের বিশিষ্টতা উল্লিখিত হইয়াছে।

"ওঁ মহাবজ্রো হেরুকবজ্রো ধরতু ধরতু মহাজ্ঞান-
স্ফেটনে শীঘ্রং সাধয় স্তম্ভয় কীলয় হুঁ ফট স্বাহা।
উৎপত্তিক্রমং কথিতং উৎপন্নং গুরুগোচরম্।
ভূত-ভৌতিক-সম্বরং যোগিনীনাং প্রকল্পিতম্ ॥
অদ্বয়-যোগজ্ঞানং তু প্রজ্ঞালিঙ্গিতহেরুকম্।
ক্লেশানাং বশীকারার্থং যাবন্মুদ্রঃ প্রকল্পিতঃ।
ধীরো বিনীতো মতিমান্ সর্ব্বাকুশলবর্জ্জিতঃ ॥
শুচিশ্চ গুরুভক্তশ্চ বুদ্ধকপালযোগতঃ।
সিধ্যন্তি ষণ্মাসেনৈব যোগিনো নাত্র সংশয়ঃ ॥"

অদ্বয়রাজ—বৌদ্ধ তন্ত্রাচার্য্যবিশেষ। ইনি খৃষ্টীয় একাদশ শতকে জীবিত ছিলেন। ইঁহার গ্রন্থ—অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ। [অদ্বয়বজ্র দ্র°]

অদ্বয়বজ্র পাদ—একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তান্ত্রিক। ইনি বজ্রযানমতের একজন প্রধান আচার্য্য ছিলেন। পূর্ণনাম—পণ্ডিতাবধূত শ্রীমদদ্বয়বজ্রপাদ। মহাযান মতবাদের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানবাদী সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হয়। এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ের আলোচনার ফলে মন্ত্রাত্মক মন্ত্রযান বা বজ্রযানমতের প্রবর্ত্তন হয় এবং পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ অদ্বয়বজ্র ইহার সমর্থক। ইনি খৃষ্টীয় ১১শ শতকের শেষার্দ্ধে অথবা ১২শ শতকের প্রথমে জীবিত ছিলেন। সাধনমালা নামক তন্ত্রগ্রন্থ বজ্রযানমতপোষক একখানি অদ্বিতীয় গ্রন্থ। ইহার অন্তর্ভুক্ত সিংহনাদ-সাধন ও সপ্তাক্ষর-সাধন ইঁহার বিরচিত। [বজ্রযান দ্র°]

তারাসাধন প্রসঙ্গে শুক্লৈকজটা-সাধন-রচয়িতা ললিত গুপ্ত ইহার শিষ্য ছিলেন। তিনি সাধনমালায় নিম্নোক্ত শ্লোকে স্বীয় গুরুর পরিচয় দিয়াছেন :—

"শ্রীমদদ্বয়বজ্রস্য গুরোর্নত্বা পদাম্বুজম্।
শ্রীমল্ললিতগুপ্তেন তারাসাধনমুচ্যতে ॥"

ইহা ভিন্ন পণ্ডিতাবধূত বিরচিত বজ্রযানমতের আরও কএকখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ঐ গুলি অতি

সংক্ষিপ্তাকারে লিখিত এবং গুহ্যাতিগুহ্য মন্ত্র ও প্রক্রিয়া সম্বলিত। যথা—

১ কুদৃষ্টিনির্ঘাতনম্। ২ মূলাপত্তি ও স্থূলাপত্তি। ৩ তত্ত্বরত্নাবলী। ৪ পঞ্চতথাগতমুদ্রাবিবরণম্। ৫ সেকনির্ণয় বা সেকনির্দ্দেশ। ৬ চতুর্মুদ্রা। ৭ সেকতাম্বয়সংগ্রহ। ৮ পঞ্চাকারঃ। ৯ মায়ানিরুক্তি। ১০ স্বপ্ননিরুক্তি। ১১ তত্ত্বপ্রকাশ। ১২ অপ্রতিষ্ঠানপ্রকাশ। ১৩ অপ্রসহপ্রকাশ। ১৪ যুগনদ্ধপ্রকাশ। ১৫ মহাসুখপ্রকাশ। ১৬ তত্ত্ববিংশক বা তত্ত্বমহাবনবিংশতি। ১৭ মহাযানবিংশিকা। ১৮ নির্বেধপঞ্চক। ১৯ মধ্যকষট্ক। ২০ প্রেমপঞ্চক। ২১ তত্ত্বদশক। ২২ অমলসিকারাধার।

(সাধনমালা ও অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ)

অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ—একখানি তন্ত্রগ্রন্থ। [অদ্বয়রাজ দ্র°]

অদ্বয়বাদ—দ্বি অর্থ দুই। দ্বি শব্দের উত্তর অবয়বার্থে ডয়ট্ প্রত্যয় করিলে দ্বয় হয়। ইহার অর্থ—দুই যাহার অবয়ব। যাহা তাদৃশ নহে তাহা অদ্বয়। (ন+দ্বয়) নঞ্-তৎপুরুষ সমাস। এই অদ্বয়ের বাদ অদ্বয়বাদ (৬ষ্ঠী-তৎ)—যে মতে সকলের মূল কারণ তাদৃশ এক অদ্বয় বস্তু বলা হয় তাহাই অদ্বয়বাদ। এই অদ্বয়বাদ ও অদ্বৈতবাদ ফলতঃ প্রায় একার্থক, কিন্তু তাহা হইলেও অদ্বয়বাদটী বৌদ্ধমতবাদ বলিয়াই প্রসিদ্ধ এবং অদ্বৈতবাদটী বেদান্তের মত বলিয়া প্রসিদ্ধ। অবশ্য এই প্রসিদ্ধির যে ব্যতিক্রম নাই, তাহা নহে। [অদ্বৈতবাদের অর্থ অদ্বৈতবাদ শব্দে দ্র°।]

অদ্বয়বাদ শব্দের অর্থ বৌদ্ধমতবাদ, তাহার কারণ একটী এই যে, অমরকোষ গ্রন্থে বুদ্ধকে অদ্বয়বাদী বলা হইয়াছে। যথা—

'সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ।
সমন্তভদ্রো ভগবান্ মারজিল্লোকজিজ্জিনঃ॥
ষড়ভিজ্ঞো দশবলোঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ।
মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্তা মুনিঃ শাক্যমুনিস্তু যঃ॥
স শাক্যসিংহঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ শৌদ্ধদনিশ্চ সঃ।
গৌতমশ্চার্কবন্ধুশ্চ মায়াদেবীসুতশ্চ সঃ॥"

এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে, বর্ত্তমানে যাঁহাকে গৌতমবুদ্ধ বলা হয়, অমরকোষের মতে তাঁহার নাম বুদ্ধ নহে। কারণ, "শাক্যমুনিস্তু যঃ" এই স্থলের "তু" শব্দ দ্বারা গৌতম বুদ্ধকে সুগত বুদ্ধ হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে। অতএব অদ্বয়বাদী যে সুগত বুদ্ধ, তাঁহার মতবাদের নাম অদ্বয়বাদ। গৌতমবুদ্ধের যে মতবাদ, অমরকোষের মতে তাহাকে ঠিক অদ্বয়বাদ বলা যায় না। তবে গৌতমবুদ্ধ তাঁহার পূর্ব্বতন বুদ্ধের মতই গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া সাধারণতঃ গৌতমবুদ্ধের মতকেও অদ্বয়বাদ বলা হয়। বস্তুতঃ গৌতমবুদ্ধের মতবাদ আজকাল—মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাসিক, অথবা মহাযান ও হীনযানপ্রভৃতি নামে অধিক পরিচিত।

অমরকোষের উক্ত কথা অপ্রামাণ্য বলিয়া শঙ্কা করা উচিত নহে; কারণ ইহা বৌদ্ধ অমরসিংহের রচিত। বস্তুতঃ ইহার মঙ্গলাচরণে প্রথমে সুগত বুদ্ধকেই নমস্কার করা হইয়াছে। যথা—

"যস্য জ্ঞানদয়াসিন্ধোরগাধস্যানঘা গুণাঃ।
সেব্যতামক্ষয়ো ধীরাঃ স শ্রিয়ে চামৃতায় চ॥"

(অমরকোষ)

এস্থলে "স সেব্যতাম্" পদের অর্থে টীকামধ্যে "স বুদ্ধঃ সেব্যতাম্" এইরূপ বলা হইয়াছে এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নামের পূর্ব্বে বুদ্ধ নামের বর্ণনা থাকায় বুদ্ধের প্রতি সম্মানাধিক্য প্রদর্শন করা হইয়াছে। সুতরাং গৌতমবুদ্ধের মত প্রাচীন বুদ্ধেরই মত বলিয়া এই অমরকোষের নির্দ্দেশ অনুসারে বৌদ্ধমতবাদকে অদ্বয়বাদ স্বীকার করাও অসঙ্গত হয় না। এতদ্ব্যতীত বহু বৌদ্ধাচার্য্যের মতে অধিকারিভেদে, অর্থাৎ প্রথমে নিম্নাধিকারীর জন্য সর্ব্বাস্তিত্ববাদ অর্থাৎ সৌত্রান্তিক ও বৈভাসিকবাদ, তৎপরে মধ্যমাধিকারীর পক্ষে যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ এবং সর্ব্বশেষে বা উত্তম অধিকারীর জন্য শূন্যবাদ বা মাধ্যমিক মতবাদকে স্থাপন করা হয়, আর সেই সর্ব্বাস্তিত্ববাদ ও বিজ্ঞানবাদকে অদ্বয়বাদ না বলিলেও শূন্যবাদ বলিতে অদ্বয়বাদ বুঝিতে বিশেষ বাধা হয় না। অধিকারিভেদে শূন্যবাদের শ্রেষ্ঠতা বোধিচর্য্যা-বিবরণ গ্রন্থে যেরূপ বলা হইয়াছে, তাহা এই—

"দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগাঃ।
ভিদ্যন্তে বহুধা লোকে উপায়ৈর্বহুধা পুনঃ॥
গম্ভীরোত্তানভেদেন কচিচ্চোভয়লক্ষণা।
ভিন্না হি দেশনাঽভিন্না শূন্যতাঽদ্বয়লক্ষণা॥"

অতএব অদ্বয়বাদ বলিতে গেলে গৌতম বুদ্ধের মতবাদই বুঝিলে দোষ হয় না, আর তজ্জন্য সাধারণতঃ তাহাই করা হয়।

অবশ্য বৌদ্ধসম্প্রদায়মধ্যে সকল বৌদ্ধাচার্য্যই, এই অধিকারিভেদে উৎকর্ষাপকর্ষ স্বীকার করেন না, কিন্তু তাঁহারা স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক মতের উৎকর্ষ স্বীকার করিয়া অপর সাম্প্রদায়িক মতের অপকর্ষ বা ভ্রান্তিই স্বীকার করেন। এইরূপ মাধ্যমিক কারিকায় মহামতি নাগার্জ্জুন সর্ব্বাস্তিত্ববাদ ও বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদী আবার সর্ব্বাস্তিত্ববাদ ও শূন্যবাদ খণ্ডন করেন এবং সর্ব্বাস্তিত্ববাদী আবার অন্য বাদদ্বয় খণ্ডন করিয় থাকেন। এইরূপে পরস্পরে পরস্পরের মত খণ্ডন করায়, কোন বৌদ্ধকেই অদ্বয়বাদী বলা চলে না, এইরূপ মনে হয়।

কিন্তু তথাপি বিজ্ঞানবাদী অন্য কোন বস্তু স্বীকার না করিয়া এক বিজ্ঞানমাত্র স্বীকার করায় তাঁহাকে অদ্বয়বাদী বলা যায়। অবশ্য সেই বিজ্ঞান অনাদিকাল হইতে ধারাকারে প্রবাহিত, স্বভাবতঃ ক্ষণিক এবং বিষয় বা আকারভেদে বিভিন্ন স্বীকার করা হয় বলিয়া বিজ্ঞানভিন্ন বস্তুর স্বীকার আবশ্যক হয় বটে, পরন্তু বিজ্ঞানবাদী তদুত্তরে বলেন যে, বিজ্ঞানই স্বভাবতঃ তাদৃশ হয় বলিয়া বিজ্ঞানাতিরিক্ত কিছুই স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। কারণ বিজ্ঞানভিন্ন কোন বস্তুরই সত্তা স্বীকার অসম্ভব। বিজ্ঞানের সাহায্যেই অন্য বস্তুর সত্তাদি স্বীকার করা হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বাস্তিত্ববাদ অসঙ্গত; অধিক কি শূন্যবাদীর শূন্যও সেই বিজ্ঞান-সাহায্যে স্বীকৃত হয় বলিয়া তাহাও অসঙ্গত। অতএব ক্ষণিক বিজ্ঞানই একমাত্র পদার্থ। ইহাই যাবদ্ বস্তুর পরমার্থ সত্যরূপ। অতএব এমতও অদ্বয়বাদই হইয়া থাকে। [বিজ্ঞানবাদ দ্র°।]

শূন্যবাদী বলেন—বিচার করিলে কোন বস্তুরই স্বরূপ নির্ণয় হয় না। সকল বস্তুই তজ্জন্য স্বলক্ষণ বলা হয়; বুদ্ধদেবও তাহাই বলিয়াছেন। অতএব—কি বিজ্ঞান, কি বিষয়, কোন কিছুরই স্বরূপ নির্ব্বাচন হয় না বলিয়া সকল বস্তুই স্বরূপতঃ শূন্য বা অনির্ব্বচনীয়। বিজ্ঞানদ্বারা যেমন বিষয়নির্ণয় হয়, তদ্রূপ বিষয়দ্বারাও বিজ্ঞাননির্ণয় হয়, অথচ উভয়ই বিভিন্ন, এরূপ স্থলে সকল বস্তুকে বিজ্ঞান বলা সঙ্গত হয় না। ইহাতে কার্য্যকারণ, সম্বন্ধ ও দেশকাল কিছুই নির্ণয় হয় না—সকলই অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ শূন্য। অতএব এই শূন্য-সৎ নহে, অসৎ নহে, সদসৎও নহে এবং সদসদ্ভিন্নও নহে। অর্থাৎ তাহাকে চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্ত অনিরূপাখ্য অবস্তু বলাই সঙ্গত। এইরূপ বহু যুক্তির দ্বারা মহামতি নাগার্জ্জুন সকলই পরমার্থতঃ অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ শূন্য বলিয়াছেন। এজন্য নাগার্জ্জুনের মাধ্যমিককারিকা সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। আর শূন্য এইরূপ স্বীকৃত হওয়ায় অদ্বয়বাদ বলিতে এই শূন্যবাদই বলা উচিত। [শূন্যবাদ দ্র°]

সর্ব্বাস্তিত্ববাদী অর্থাৎ বৈভাসিক ও সৌত্রান্তিককে অদ্বয়বাদী আদৌ বলা যায় না; কারণ বৈভাসিকমতে ধর্ম্ম বা পদার্থ প্রথমতঃ দুই প্রকার, যথা—সংস্কৃত ও অসংস্কৃত। তন্মধ্যে সংস্কৃত আবার দ্বিবিধ, যথা—সাশ্রব ও মার্গ। সাশ্রব আবার ৫ স্কন্ধ ১২ আয়তন এবং ১৮ ধাতুতে বিভক্ত। স্কন্ধ পাঁচটী যথা—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। রূপস্কন্ধ আবার ইন্দ্রিয়, আলম্বন ও বিজ্ঞানভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয় ৫টী যথা—চক্ষুঃ শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা ও কায়া। আলম্বনও ৫টী, যথা—রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্ষ্টব্য এবং বিজ্ঞানও ৫টী যথা—চক্ষুর্বিজ্ঞান, শ্রোত্রবিজ্ঞান, ঘ্রাণবিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান ও কায়বিজ্ঞান। বেদনাস্কন্ধ ত্রিবিধ যথা—সুখ দুঃখ এবং অনুভবরূপ। সংজ্ঞাস্কন্ধ অসংখ্য। সংস্কারস্কন্ধ ত্রিবিধ, যথা—ধর্ম্মায়তন, অবিজ্ঞপ্তি এবং অসংস্কৃতি। বিজ্ঞানস্কন্ধ অসংখ্য। তাহার পর উক্ত ১২টী আয়তন বলিতে চক্ষু, রূপ, শ্রোত্র, শব্দ, ঘ্রাণ, গন্ধ, জিহ্বা, রস, কায়, স্পর্ষ্টব্য, মনঃ ও ধর্ম্ম। আর ১৮টী ধাতু যথা—চক্ষু, রূপ ও চক্ষুর্বিজ্ঞান, শ্রোত্র,শব্দ ও শ্রোত্রবিজ্ঞান, ঘ্রাণ গন্ধ ও ঘ্রাণবিজ্ঞান, জিহ্বা, রস জিহ্বাবিজ্ঞান, কায়, স্পর্ষ্টব্য ও কায়বিজ্ঞান, মনঃ, ধর্ম্ম ও মনোবিজ্ঞান। অসংস্কৃতধর্ম্ম দ্বিবিধ যথা—আকাশ ও নিরোধ। সেই নিরোধ আবার দ্বিবিধ, যথা—প্রতিসংখ্যা এবং অপ্রতিসংখ্যা। এ বিষয়ে বহু জ্ঞাতব্য আছে। [বসুবন্ধু কৃত অভিধর্ম্মকোষ দ্র°]

সৌত্রান্তিকমতেও এই বিষয়গুলি প্রায় এইরূপ। প্রভেদ এই যে বৈভাসিকগণ বাহ্য পদার্থের প্রত্যক্ষতাবাদী এবং সৌত্রান্তিকগণ বাহ্যপদার্থের অনুমেয়তাবাদী। ফলতঃ এই মতদ্বয় বহু পদার্থ স্বীকার করায় ইহাদিগকে অদ্বয়বাদী বলা চলে না। তবে যদি বলা হয় যে, শূন্যবাদই সকল মতের লক্ষ্য, তাহা হইলে ইহাদিগকেও অদ্বয়বাদী বলা চলে। [বৈভাসিক শব্দ দ্র°]

সৌত্রান্তিকমতে পদার্থ বাহ্য ও আভ্যন্তরভেদে দ্বিবিধ। বাহ্য আবার ভূত ও ভৌতিকাভেদে দ্বিবিধ এবং আভ্যন্তরটী চিত্ত ও চৈত্তভেদে দ্বিবিধ। ইহাদের মধ্যে পৃথিবী প্রভৃতি ভূত এবং রূপাদি বিষয় ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল ভৌতিক। আর পৃথিবী প্রভৃতি পরমাণুচতুষ্টয় অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুতের পরমাণুগুলি খর, স্নেহ, উষ্ণ ও ঈরণস্বভাব। ইহারাই পৃথিবী ইত্যাদিভাবে মিলিত হয়। চিত্ত ও চৈত্তমধ্যে রূপস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধ এই পাঁচটী—স্কন্ধ আছে। ইহারা মিলিত হইয়া আভ্যন্তরিক ব্যবহার সম্পন্ন করে। এ মতেও বহু বস্তু স্বীকার করায় ইহাকেও অদ্বয়বাদ নামে অভিহিত করা যায় না। তবে শূন্যবাদ লক্ষ্য থাকিলে ইহাকে বৈভাসিকের ন্যায় অদ্বয়বাদী বলা চলে। [সৌত্রান্তিক শব্দ দ্র°]

অথবা এই উভয় মতে অবয়বসমূহ মিলিত হইয়া ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, অবয়বী বলিয়া কিছু স্বীকার করা হয় না বলিয়া ইহাদের মতেও ব্যবহারাস্পদ কিছুই স্বীকার করা হইল না। অমিলিত অবয়ব মাত্রদ্বারা কখনও ব্যবহার নিষ্পন্ন হয় না। অতএব যাহার দ্বারা দ্বৈতাপত্তি হইবে, তাহাই ব্যবহারাস্পদ অবয়বী বলিয়া, আর সেই অবয়বী অস্বীকার করা হয় বলিয়া দ্বৈতসত্তার সম্ভাবনা থাকিল না। সুতরাং অদ্বয়তাই সিদ্ধ হইল। আর তাহা হইলে এই অর্থে সৌত্রান্তিক ও বৈভাসিককেও অদ্বয়বাদী বলা চলে।

বস্তুতঃ সকল বৌদ্ধবাদেরই উদ্দেশ্য নির্ব্বাণলাভ। আর তজ্জন্য বাসনাত্যাগই মুখ্য উপায়। এই বাসনা ত্যাগের জন্য

দৃশ্য পদার্থকে যদি শূন্য বলিয়া বা বিজ্ঞান বলিয়া বা অবয়ব সংঘাত মাত্র বলিয়া স্বীকার করা যায়, অর্থাৎ দৃশ্য পদার্থের সত্তা অস্বীকার করা হয়, তাহা হইলে আর বাসনার উদয় হওয়া সম্ভবপর হয় না। এইজন্য ক্রমে ক্রমে শূন্যভাবনায় অভ্যস্ত হইলে বাসনা যথাকালে একেবারে নিঃশেষিত হয়, আর তখনই সেই প্রপঞ্চোপশম শিবস্বরূপ নির্ব্বাণ ঘটিয়া থাকে। এই কারণে সকল বৌদ্ধ মতবাদই অদ্বয়বাদ হয়।

এই অদ্বয়বাদের বা বৌদ্ধবাদের মূল কিন্তু উপনিষৎ। এই উপনিষৎ যে বৌদ্ধমতের পূর্ব্বতন, তাহাতে সন্দেহ নাই, কতিপয় পাশ্চাত্ত্য ও পাশ্চাত্ত্য-ভাবাপন্ন ভারতীয় পণ্ডিত ভিন্ন সকল ভারতীয় বৈদিক পণ্ডিতই একথা স্বীকার করেন। বস্তুতঃ বৌদ্ধগণও একথা অস্বীকার করেন না। বেদান্তসারগ্রন্থে শূন্যবাদী বৌদ্ধমতের মূল প্রদর্শন করিবার জন্য গ্রন্থকার সদানন্দযোগীন্দ্র "অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ" এই ছান্দোগ্য (৬.২.১) শ্রুতি উদ্ধার করিয়াছেন। তদ্রূপ বিজ্ঞানবাদের মূল প্রদর্শনার্থ "অন্যঃ অন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়" এই তৈত্তিরীয় (২.৪.১) শ্রুতি উদ্ধার করিয়াছেন দেখা যায়। মীমাংসাদর্শনের শবরভাষ্যে গৌতমবুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী পাণিনির গুরু উপবর্ষাচার্য্যের যে বৃত্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় বৌদ্ধগণ বৃহদারণ্যক উপনিষদের সাহায্যে ক্ষণিক বিজ্ঞান বাদের প্রামাণ্য স্থাপন করিতেছেন। শান্তরক্ষিত তত্ত্বসংগ্রহ গ্রন্থে বৈদিকগণকে বুদ্ধের সর্ব্বজ্ঞত্ব স্বীকার করাইবার জন্য বেদের নিমিত্তশাখায় বুদ্ধের জন্মকথা আছে বলিতেছেন। (৩৫১১-৩৫১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। নৃসিংহ-উত্তরতাপনীয় উপনিষদে শূন্যকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। যথা—"তে দেবা...অদ্বৈতম্ অচিন্ত্যম্ অলিঙ্গং স্বপ্রকাশম্ আনন্দঘনং শূন্যম্ অভবৎ এবংবিৎ স্বপ্রকাশং পরমেব ব্রহ্ম ভবতি (৬.২) ইত্যাদি। অবশ্য বেদমধ্যে এই বৌদ্ধমতবাদ পূর্ব্বপক্ষরূপেই কথিত হইয়াছে। ইহা মৈত্রায়ন্যুপনিষদের—

"নৈরাত্মবাদকুহকৈর্মিথ্যাদৃষ্টান্তহেতুভিঃ।
ভ্রাম্যল্লোকো ন জানাতি বেদবিদ্যান্তরং তু যৎ ॥" (৭.৮)

এই বাক্য হইতে জানা যায়। বস্তুতঃ বৌদ্ধমতবাদ যে নৈরাত্মবাদের জন্য প্রসিদ্ধ তাহা অতি প্রসিদ্ধ কথা। এইজন্য বৌদ্ধমতবাদ বেদ হইতে উৎপন্ন এবং তাহা বেদে পূর্ব্বপক্ষস্থানীয়রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদের যে কথা উদ্ধৃত হইল তাহাও পূর্ব্বপক্ষীয় কথা। বিষ্ণুদেহসমুৎপন্ন মায়ামোহ বুদ্ধ ও অর্হতরূপে এই জাতীয় পূর্ব্বপক্ষীয় কথাগুলি দুর্যুক্তিপুষ্ট করিয়া, বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদিসাহায্যে প্রভূত বলশালী অত্যাচারী অসুরগণকে মোহিত করিয়া, বেদমার্গচ্যুত করিয়া হীনবল করিয়াছিলেন। এইকথা অগ্নি বায়ু ও বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে। এই বৌদ্ধমত পরে দর্শনকার ঋষিগণ খণ্ডন করিলে গৌতম বুদ্ধ তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য মধ্যপথ অবলম্বন করেন। আর তাহাই আবার তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত নাগার্জ্জুন ও বসুবন্ধু আসিয়া এবং দিঙ্নাগ ধর্ম্মকীর্ত্তি চন্দ্রকীর্ত্তি প্রভৃতি বৈদিক ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ বৌদ্ধ হইয়া পরিপুষ্ট করিয়া তুলেন। এইরূপ দেখা যায়—প্রাচীন বৌদ্ধমতও গৌতম বুদ্ধের মত ঠিক্ অভিন্ন নহে। ইহা বেদান্তদর্শনের ২য় অধ্যায় ২য় পাদের "আকাশে বা বিশেষাৎ" সূত্রে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য—সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। এস্থলে ব্যাসদেব বৌদ্ধসম্মত আকাশের অবস্তুত্বখণ্ডন করিতেছেন। ভাষ্যকার তাহারই বিবৃতি করিতে গিয়া প্রথমে শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা খণ্ডন প্রদর্শন করেন, পরে যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করেন এবং তৎপরে সুগত গৌতম বুদ্ধের বাক্যদ্বারা খণ্ডন করেন। অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধ আকাশকে অবস্তু বলেন না—ইহাই দেখান হইল। সুতরাং বুঝা গেল, প্রাচীন বৌদ্ধমতে আকাশ অবস্তু বলা হইত, ব্যাসাদি ঋষিগণের খণ্ডন দেখিয়া গৌতম বুদ্ধ তাহাকে আর অবস্তু বলেন না। এইরূপে প্রমাণিত হয় যে, গৌতমবুদ্ধ প্রাচীন বৌদ্ধমতের সংস্কার করিয়া স্বমত প্রচার করিয়াছেন মাত্র। আর তজ্জন্য মূলতঃ সকল বৌদ্ধমতই বেদমূলক মত। তবে বিশেষ এই যে গৌতম বুদ্ধ বেদ অমান্য করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধগণ তাহা করেন নাই। আর এই জন্যই গৌতম বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সহিত বৈদিক সম্প্রদায়ের বিরোধ অত্যধিক হইয়াছিল। বৌদ্ধগণ একাধিক বার হিন্দুশাস্ত্র ধ্বংস করিয়াছিলেন, আর তাহারই ফলে আজ অসংখ্যশাখাযুক্ত বেদের ২১১টী খণ্ডিত শাখামাত্র পাওয়া যাইতেছে। বৌদ্ধগণকর্ত্তৃক কাশ্মীরে বেদাদিধ্বংসের কথা বৌদ্ধপণ্ডিত তিব্বতীয় তারানাথই বলিয়াছেন এবং ভোজ রাজ্যে শাস্ত্রধ্বংসের আভাস কামধেনু নামক গ্রন্থ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

যাহা হউক প্রাচীন বৌদ্ধগণের অদ্বয়বাদ যখন সাধারণের নিকট বৈদিক অদ্বৈতবাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া যাইতেছিল, তখন ব্যাসপুত্র শুকের শিষ্য গৌড়পাদাচার্য্য মাণ্ডূক্যকারিকার দ্বারা তাহাদের প্রভেদ প্রদর্শন করেন, যথা—"নৈতদ্ বুদ্ধেন ভাষিতম্" ইত্যাদি। তৎপরে ভগবান্ গৌতম বুদ্ধ, ঋষিগণকর্ত্তৃক খণ্ডিত অংশ বাদে বৌদ্ধ অদ্বয়বাদ স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলে আবার বৌদ্ধাদ্বয়বাদের সহিত বৈদিক অদ্বৈতবাদের সংমিশ্রণ হইতে থাকে। এই মিশ্রণ বহুপরে কুমারিল ভট্ট এবং শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হয়। এই জন্য শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বৌদ্ধগ্রন্থে অদ্বৈতবাদের খণ্ডন নাই। শঙ্করাচার্য্যের অব্যবহিত পরে বৌদ্ধ শান্তরক্ষিতের তত্ত্বসংগ্রহ গ্রন্থে অদ্বৈতবাদের খণ্ডন দেখা যায় এবং জৈন পণ্ডিত বিদ্যানন্দের গ্রন্থে শঙ্করশিষ্য সুরেশ্বরা-

চার্য্যের বৃহদারণ্যক ভাষ্যবার্ত্তিক খণ্ডনাভিপ্রায়ে উদ্ধৃত হইতে দেখা যায়। বস্তুতঃ এইজন্য বলিতে হয়, বৌদ্ধাদ্বয়বাদটী যতদিন অদ্বৈতবাদের মধ্যে মিশিয়া আত্মগোপন করিতেছিল, ততদিন তাহার স্থিতিতে ব্যাঘাত হয় নাই।

সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বৌদ্ধ অদ্বয়বাদ ও বৈদিক অদ্বৈতবাদের মধ্যে প্রধান প্রভেদ—প্রাচীন বৌদ্ধ অদ্বয়বাদী বেদকেও প্রমাণ বলিতেন, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে অদ্বয়বাদী গৌতম বুদ্ধ বেদকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, আর বৈদিক অদ্বৈতবাদী বেদকেই প্রমাণ বলিতেন, অনুমানাদি তাহার সহকারী মাত্র বলিতেন। বস্তুতঃ দ্বিবিধ বৌদ্ধাদ্বয়বাদীই অনুমানাদিকে সহকারী বলেন না, কিন্তু মুখ্য প্রমাণই বলেন।

শূন্যবাদীর অদ্বয়বাদে অবস্তুস্বরূপ শূন্যে প্রপঞ্চভ্রম হয়। সুতরাং তন্মতে "নিরধিষ্ঠান ভ্রম" বলা হয়। বৈদিক অদ্বৈতবাদে সদ্ ব্রহ্মে জগদ্ভ্রম হইয়া থাকে। উভয় মতই এই ভ্রমের হেতু অনাদি সংস্কার। ইহারই অপর নাম মায়া বা অবিদ্যা। শূন্য অবস্তু অনিরূপাখ্য বলিয়া প্রপঞ্চভ্রমের মূল শূন্যবাদীর মতে মায়া, আর তজ্জন্য মূলকারণানুসারে এই মতবাদের নাম করিতে হইলে ইহাকে মায়াবাদ বলিতে হয়। আর বৈদিক অদ্বৈতবাদীর মতে মূল কারণ ব্রহ্ম এবং সহকারী কারণ মিথ্যা মায়া বলিয়া তাদৃশ দৃষ্টিতে ইহাদের মতবাদের নাম ব্রহ্মবাদ বলিতে হয়। আর এজন্য ব্রহ্মবাদীকে যখন মায়াবাদী বলা হয়, তখন গৌণকারণদৃষ্টিতেই বলা হয়। কারণ এই মায়ারূপ নিমিত্তবশেই ব্রহ্মে প্রপঞ্চভ্রম হয়।

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীর মতও মায়াবাদ। কারণ, তন্মতে বিজ্ঞানগুলি সুপ্ত বিজ্ঞানরূপ সংস্কারের অভিব্যক্তি। এই সংস্কারই মায়া। সুতরাং এ মতেরও মূল কারণ মায়াই হইল। অদ্বৈতবাদীর মতে এক স্থির বিজ্ঞানই ব্রহ্ম, ভ্রমহেতু মায়ারূপ নিমিত্তবশতঃ তাহাতে নানা আকার উদিত হয়, আর তাহাই এই জগৎ প্রপঞ্চ। অতএব বিজ্ঞানবাদীও মায়াবাদী-আর অদ্বৈতবাদী মুখ্যকারণতা-দৃষ্টিতে ব্রহ্মবাদী, এবং নিমিত্ত বা গৌণকারণতাদৃষ্টিতে মায়াবাদী হইয়া থাকেন।

বাহ্যাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধমতকে গৌণকারণতাদৃষ্টিতে মায়াবাদ বলা চলে; কারণ, তন্মতেও অনাদি সংস্কারবশে ভূত ও ভৌতিক পদার্থের সংঘাত হয়। এইরূপে দেখা যাইবে—অদ্বয়বাদ ও অদ্বৈতবাদে যদিও অর্থগত কোন বিশেষ পার্থক্য হয় না, তথাপি সিদ্ধান্তগত ভেদ যথেষ্ট। এই বৌদ্ধাদ্বয়বাদ পরবর্ত্তী বৈদিক দর্শনাচার্য্যগন অখণ্ডনীয় ভাবেই খণ্ডন করিয়াছেন। যেহেতু বেদ মান্য করিলে এই বৌদ্ধবাদ যেমন কখনই সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ যুক্তি বা অনুভবের দিক্ দিয়াও ইহা সিদ্ধ হয় না—ইহা তাঁহারা প্রদর্শন করিয়াছেন।

যুক্তির দিক্ দিয়া এই মতবাদ যে সিদ্ধ হয় না, তাহার বহু প্রমাণ আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান দুই একটী এই যে,—

শূন্যবাদী নিরধিষ্ঠান যে ভ্রম স্বীকার করেন, তাহা বুদ্ধির অগোচর পদার্থ। রজ্জু নাই, সর্প নাই, অথচ রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় ইহা বুদ্ধির অগোচর বিষয়। আর দ্বিতীয়, যদি কিছুই সিদ্ধ না হয় তাহা হইলে তাহাকে শূন্যও বলা যায় না। কিন্তু কিছু সিদ্ধ হয় না এই ভাবটী ও শূন্যপদার্থ অভিন্ন বস্তু নহে। শূন্য বলিলে একটা কিছুই বুঝায়। আর যে বক্তা বলে কিছু সিদ্ধ হয় না, সেই বক্তা যে সিদ্ধ, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহার পর শূন্যকে প্রাচীনমতে অসৎ বলিলে সেই অসৎ হইতে সতের আবির্ভাব, অসঙ্গত কথা হয়। অসৎ কখনও কাহারও কারণ হয় না। আর নবীনমতে শূন্যকে অনিরূপাখ্য ও চতুষ্কোটীবিনির্মুক্ত বলিলেও তাহা হইতে সৎ-স্বরূপে প্রতিভাত বিশ্বের আবির্ভাব হইতে পারে না। আর শূন্যকে পরমার্থ সত্য এবং বিশ্বকে সাংবৃতিক বা ব্যবহারিক সত্য বলিলেও যাহাকে ব্যবহারিক সত্য বলা যায়, তাহার পরমার্থ সত্যস্বরূপ শূন্য হওয়া সম্ভবপর হয় না। শূন্যের ব্যবহারিক সত্যে পরিণত হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। কিন্তু সেই শূন্যকে সৎ অর্থাৎ বেদান্তীর ব্রহ্মস্থানীয় বলিলে সেরূপ সম্ভাবনা থাকিতে পারে—এইরূপ বহু যুক্তির দ্বারা শূন্যবাদ খণ্ডিত হয়।

অনুভবের দিক্ দিয়াও শূন্যবাদ অসঙ্গত। কারণ তন্মতে বলা হয়, শূন্যধ্যানে ক্রমে কর্ম্ম ও বাসনা ক্ষয় হইয়া নির্ব্বাণলাভ হয়। কিন্তু অসৎ বা অনিরূপাখ্যের ধ্যান হয় না। ধ্যানের ধ্যেয় বস্তুতে সদ্বুদ্ধি অর্থাৎ একটা কিছু যুক্তি অবশ্যম্ভাবী। অতএব শূন্যের ধ্যান অনুভববিরুদ্ধ কথা।

তদ্রূপ ক্ষণিকবিজ্ঞানের ধারাও সিদ্ধ হয় না। কারণ তাহা হইলে একসঙ্গে সকল ধারা প্রবাহিত হয় না কেন? ইহার নিয়ম থাকায় সেই নিয়মের আশ্রয় একটা অক্ষণিক বস্তু স্বীকার্য্য হয়। আর এই সদ্বিজ্ঞানের ধারা অনাদি হইলে অনন্তও হইবে। সান্ত হইলে এই অনন্তকালে সেই ধারা এতদিনে শেষ হয় নাই কেন? বিজ্ঞানধারাই ভ্রম বলিলে বেদান্তমতে প্রবেশ হয়। আরও সেই সদ্বিজ্ঞানধারা অনন্ত বলিলে নির্ব্বাণ অসম্ভব হইবে। নির্ব্বাণে নির্ব্বিষয় বা নিরাকার ধারা বহিবে বলিলে, আকার বা বিষয়টী বিজ্ঞানে আসিল কেন? অনাদি বলিলে আবার অনন্ত হইবে। তাহার পর বিজ্ঞানটী আন্তর বস্তু, তাহাতে বাহ্যজ্ঞান হয় কেন? বাহ্যত্বকে ভ্রম বলিলে ভ্রমের অধিষ্ঠান অক্ষণিক হয়। আর অনুভবদ্বারাও বিজ্ঞানের ধারা সিদ্ধ হয় না। কিন্তু অনুভবকর্ত্তার নিত্যত্বই অনুভূত হয়। এইরূপ বহু যুক্তির দ্বারা বিজ্ঞানবাদও অসিদ্ধ হয়।

এইরূপ সর্ব্বাস্তিত্ববাদও সিদ্ধ হয় না। কারণ তন্মতে অবয়বী নাই। অবয়বী না থাকিলে ব্যবহার অসিদ্ধ হয়। আর এই মতবাদটীকে শূন্যবাদী ও বিজ্ঞানবাদী উত্তমরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং ইহাও অসিদ্ধ। বস্তুতঃ এইরূপ খণ্ডনের ফলে অদ্বয়বাদের বিলয়ও যে অদ্বৈতবাদে তাহাই বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ অদ্বয়বাদের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়—সকল অদ্বৈতবাদে ইহাই বুঝিতে হয়।

যদি ইহা বলা হয় তবে কি সিদ্ধ হয়? তজ্জন্য বেদান্তী বলেন—যাহা সিদ্ধ হয়, তাহা দৃশ্য প্রপঞ্চের অনির্ব্বচনীয়তা মাত্র; আর সেই অনির্ব্বচনীয়ের অধিষ্ঠান একটী সদ্‌বস্তু মাত্র। এইজন্য পঞ্চদশী গ্রন্থে বলা হইয়াছে—শূন্যবাদী যদি শূন্যকে সৎ বলেন তবে বেদান্তীর সহিত শূন্যবাদীর কোন বিরোধ নাই এবং বিজ্ঞানবাদী যদি বিজ্ঞানকে নিত্য স্থির বলেন, তবে তাঁহাদের সঙ্গেও বেদান্তীর কোন বিরোধ নাই। যাহা হউক, এইরূপে দেখা যাইবে, "বেদা অবেদা ভবন্তি" এই শ্রুতির লক্ষ্যের সহিত ঐক্য রক্ষা করিয়া বৌদ্ধগণ বেদ নিন্দা করিয়াও বৈদিক অদ্বৈতবাদীর সঙ্গে মধ্যে মধ্যে মিশিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ঋষিগণ ও পরে শাঙ্কর সম্প্রদায়, বহুযত্নে তাহাদের প্রভেদ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তবে এইজন্য বৈদিক দর্শনকারদিগের সহিত বৌদ্ধগণের যে সংঘর্ষ হইয়াছিল, তাহার ফলে বৈদিক দার্শনিক-গণ যে সব নূতন যুক্তিশস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন এবং বৌদ্ধ-গণও যে সব সূক্ষ্ম বিচারাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার আর তুলনা নাই। যাহা হউক, এইরূপে অদ্বয়বাদের উৎপত্তি যে বৈদিক অদ্বৈতবাদ হইতে হইয়াছিল, বহুদিন সংগ্রামের পর তাহার বিলয় সেই বৈদিক অদ্বৈতবাদেই হইয়াছে। কুমারিল প্রভৃতির সময় বৌদ্ধগণ বৈদিক অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া নিজেরাই খণ্ডিত হইয়া গেলেন। যেহেতু বেদ বা ঈশ্বরের ন্যায় অনাদি সর্ব্বজ্ঞ একটী না মানিলে বুদ্ধের সর্ব্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হয় না। আর বুদ্ধের অনাদিসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞত্ব না মানিলে তাঁহার বাক্যও প্রমাণ হয় না, কিন্তু যাঁহার বাক্যানুসারে বুদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ হন, তাহার বাক্যই প্রামাণ্য হয়। ফলতঃ বৌদ্ধসংঘর্ষে যে বৌদ্ধ ও বৈদিক—এই উভয় মতের পরিপুষ্টি, তাহা সূক্ষ্মতায় ও চিন্তাশীলতায় জগতে অতুলনীয়। ফলতঃ অদ্বয়বাদ বলিতে যখন বৌদ্ধমতবাদ বুঝায়, তখন তাহা বৈদিক অদ্বৈতবাদের বিকৃতি।

এই বৌদ্ধমতের জন্য—অভিধর্ম্মকোষ, চন্দ্রকীর্ত্তির টীকাসহ মাধ্যমিককারিকা, লঙ্কাবতারসূত্র, বোধিচর্য্যাবতারপঞ্জিকা, তত্ত্ব-সংগ্রহ, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের বৌদ্ধমত ও ভামতীয় বৌদ্ধমত-বর্ণন প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। আর ইহাদের খণ্ডনের জন্য শাঙ্করভাষ্য, ভামতী, আত্মতত্ত্ববিবেক, ইষ্টসিদ্ধি, ন্যায়মঞ্জরী, ন্যায়বার্ত্তিক ও তাহার তাৎপর্য্য টীকা, প্রভাকরের শবরভাষ্য বৃহতী টীকা, মণ্ডন-মিশ্রের বিধিবিবেক সটীক শ্লোক ও তন্ত্রবার্ত্তিক প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

অদ্বয়বাদিন্—(পুং) [অদ্বয়-বদ্-ণিনি, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ইতি বদতি] বৈদান্তিক, অদ্বৈতবাদী। সকল বস্তুই বাহ্যার্থরহিত জ্ঞানাত্মক এই মতবাদী। বুদ্ধ।

অদ্বয়স্—(ত্রি) [ন দ্বি-অসিচ্, নাস্তি দ্বয়ং যস্য] দ্বয়রহিত। (ঋক্ ১.১৮৭.৩)

অদ্বয়সমতাবিজয়—একখানি বজ্রযানী তন্ত্রের গ্রন্থ। ইন্দ্রভূতি বিরচিত জ্ঞানসিদ্ধি তন্ত্রে এই গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত আছে।

অদ্বয়ানন্দ—(পুং) [অদ্বয়াৎ ব্রহ্মজ্ঞানাৎ লব্ধঃ আনন্দঃ] ব্রহ্মা-নন্দ। ২ ব্রহ্মজ্ঞানোদিত আনন্দ। (ত্রি) ৩ ব্রহ্মানন্দবিশিষ্ট।

অদ্বয়ানন্দ—একজন প্রাচীন পণ্ডিত। তত্ত্বার্ণব প্রণেতা রাঘবানন্দ সরস্বতীর গুরু এবং বিশ্বেশ্বরের শিষ্য। ২ আত্মবোধ-টীকা-রচয়িতা।

অদ্বয়ানন্দনাথ—কালরাত্রি-পদ্ধতি নামক-তন্ত্র গ্রন্থ প্রণেতা। কৃষ্ণের পুত্র।

অদ্বয়ারণ্য যোগিন্—জনৈক বৈদান্তিক। ইনি প্রমাণমঞ্জরী টিপ্পনী ও প্রমাণমঞ্জরী ব্যাখ্যা নামক বেদান্ত গ্রন্থ প্রণেতা। পরে তিনি নরহরির পুত্র কৃষ্ণের বাসনাক্রমে বারাণসীতে থাকিয়া বাশিষ্ঠ রামায়ণ-চান্দ্রিকা প্রণয়ন করেন।

অদ্বয়াবিন্—(ত্রি) [অদ্বয়-বিনি অস্ত্যর্থে ছন্দসি দীর্ঘঃ] দেব-পিতৃযানরূপ মার্গদ্বয়রহিত। "পদমদ্বয়াবিনঃ" (ঋক্ ১.১৮৭.৩)

অদ্বয়াশ্রমপূজ্যপাদশিষ্য—ইনি প্রসিদ্ধ সাধু অদ্বয়াশ্রমের শিষ্য। ইহাঁর রচিত বেদান্ত-কৌমুদী চতুর্থাধ্যায় নামক একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

অদ্বয়ু—(ত্রি) [ন দ্বয়ং দ্বিপ্রকারোঽস্ত্যস্য বাহুলকাৎ উ, বহুব্রী] দ্বিপ্রকার কপটতাশূন্য, মনে ও বাহিরে এক ভাবযুক্ত। "উপদ্বয়ুং চাদ্বয়ুং চ বসবঃ॥ (ঋক্ ৮.১৮.১৫)

অদ্বার—(ক্লী) [ন দ্বারন্ নিন্দার্থে নঞ্-তৎ] গুপ্তদ্বার। "অদ্বা-রেণ সদোহবিঃ" (কাত্যা° শ্রৌত° ৮.৪.২৩)। ২ প্রবেশের অযোগ্যদ্বার। [নাস্তি দ্বারমস্য বহুব্রী] (ত্রি) ৩ দ্বারশূন্য। ৪ দুষ্প্রবেশ। ৫ অনুপায়।

"অদ্বারেণ চ নাতীয়দ্‌গ্রামং বা বেশ্ম বাবৃতম্।
রাত্রৌ চ বৃক্ষমূলানি দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥"
(মনু ৪.৭৩)

প্রাচীরাদি বেষ্টিত গ্রামে কিংবা গৃহে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রবেশ করিবে না। রাত্রিকালে বৃক্ষের মূলে বাস দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে।

কুল্লূকভট্ট এইরূপ টীকা করিয়াছেন—"প্রাচীরাস্থাবৃতং গ্রামং গৃহঞ্চ, দ্বারব্যতিরিক্তপ্রদেশেন প্রাকারাদিলঙ্ঘনং কৃত্বা ন বিশেৎ।"

অদ্বিজ—(ত্রি) অব্রাহ্মণ। ২ দ্বিজশূন্য। যে রাজ্য দ্বিজশূন্য এবং শূদ্রবহুল, সেই রাজ্য দুর্ভিক্ষ ও রোগ পীড়া প্রভৃতিতে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। (মনু ৮.২২ কুল্লূক)

অদ্বিতীয়—(ত্রি) [দ্বিধা ইতং ভেদং গতম্ দ্বীতং তস্য ভাবঃ দ্বৈতং তন্নাস্তি যস্য ; বহুব্রী (বাচস্পতি)] পরমাত্মা। ২ দ্বিতীয় রহিত, অতুল, কেবল, ব্রহ্ম। "চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।" তত্ত্বমসি বাক্যার্থনির্ণয়োদ্ধৃত শ্রুতিবচন। [অদ্বৈত দ্র°]

অদ্বিষেণ—ঊনবিংশ মন্ত্রবেদী ঋষির অন্যতম। [ব্রহ্মাণ্ডপু° ৫৯.৯৭]

অদ্বিষেণ্য—(ত্রি) [ন দ্বেষ্টুং শীলমস্য, দ্বিষ-এণ্যন্ কিম্বা নঞ্-তৎ] অমন্য, দ্বেষরহিত। "অতিথিমদ্বিষেণ্যম্" (ঋক্ ১০.১২২.১) প্রিয়রূপ, ২ প্রিয়রস। ৩ অদ্বেষ্যরস।

অদ্বেষ—(পুং) [ন দ্বেষঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ] দ্বেষাভাব। [নাস্তি দেষোঽস্য বহুব্রী] (ত্রি) দ্বেষশূন্য, দ্বেষরহিত।

অদ্বেষরাগিন্—(ত্রি) রাগদ্বেষহীন ; রাগদ্বেষ হইতে যিনি পৃথক্ থাকেন। "বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।" (মনু ২,১)

অদ্বেষস্—(ত্রি) [ন-দ্বিষ-অসুন্ নঞ্-তৎ] অদ্বেষ, দ্বেষহীন। "অদ্বেষো নো মরুতো গাতুমেতন" (ঋক্ ৫.৮৭.৮)

অদ্বৈত—(ক্লী) [দ্বিধা ইতং দ্বীতং তস্য ভাবঃ দ্বৈতং ভেদঃ, ন দ্বৈতম্ অভাবার্থে নঞ্-তৎ] ১ অভেদ। [নাস্তি দ্বৈতং ভেদো যত্র বহুব্রী] ২ ভেদরহিত, ব্রহ্ম। [অদ্বৈতবাদ দ্র°]

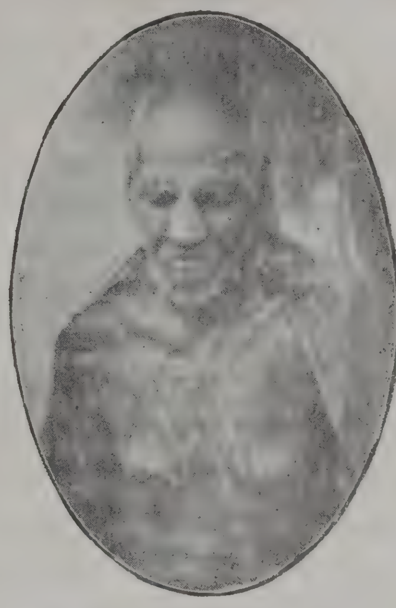
অদ্বৈতচরণ আঢ্য—একজন প্রাচীন সাংবাদিক। বঙ্গভাষায় প্রাচীন পাক্ষিক সংবাদপত্র 'সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয়'কে ইনি দৈনিক পত্রে পরিবর্ত্তিত করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সম্পাদকতা করেন।

'সর্ব্বার্থ-পূর্ণচন্দ্র' নামক সাময়িকপত্রও ইনি প্রকাশিত করেন। [সংবাদপত্র দ্র°]

ইনি মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও আনন্দচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সাহায্যে সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবতের (প্রত্যেক শ্লোকের) বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

অদ্বৈতচিন্তাকৌস্তুভ—'ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধান' গ্রন্থের ব্যাখ্যাবিশেষ। ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানের রচয়িতা আচার্য্য মহাদেবানন্দ এই ব্যাখ্যা রচনা করেন। অদ্বৈতচিন্তাকৌস্তুভ সহ 'তত্ত্বানুসন্ধান' গ্রন্থ কলিকাতা-এসিয়াটিক-সোসাইটী হইতে মাত্র ৩ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

অদ্বৈতদাস পণ্ডিতবাবাজী—(১৮৩৭—১৯৩০ খৃঃ অঃ)—মনোহরসাহী কীর্ত্তনের অন্যতম গায়ক। বৈষ্ণবশাস্ত্রের সুপণ্ডিত ও অধ্যাপক,—"পণ্ডিত-বাবাজী" নামে খ্যাত।



অদ্বৈতদাস পণ্ডিতবাবাজী

ইঁহার পিতৃদত্ত নাম ব্রজকিশোর রক্ষিত। পিতার নাম ভীমকিশোর রক্ষিত, জাতি বারেন্দ্র কায়স্থ, জন্মস্থান পাবনা জেলার উল্লাপাড়া ষ্টেসনের নিকট। ইনি শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হইয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে অনেক দুঃখ কষ্ট পাইয়া ইনি তৎকালোচিত বাঙ্গালা ও ফার্সী ভাষায় শিক্ষালাভ করেন। জমীদারী সেরেস্তায় কিছুদিন কাজ করিবার পর ব্রজসুন্দরী দেবীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। বহরমপুরে যখন সিপাহীবিদ্রোহের প্রথম সূচনা হয়, তখন ব্রজকিশোর সরকারী জরীপ-বিভাগের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ বিভাগের কর্ম্মচারীরা প্রজাদের উপর উৎপীড়ন করিয়া উৎকোচ গ্রহণ করিত দেখিয়া কর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মে। গৌড়ীয়-প্রেমধর্ম্মের আস্বাদ পাইবার জন্য উৎসুক হইয়া ব্রজকিশোর "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" পাঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কবিরাজ-গোস্বামীর উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকসমূহ ও দার্শনিক তত্ত্বরাজি বুঝিতে না পারিয়া তিনি সংস্কৃতভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" তাঁহাকে ভজনে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। শিক্ষা ও ভজনের মধ্যে তিনি নিজেকে বিলুপ্ত করিয়া দিলেন। কর্ম্মত্যাগ করিয়া সংসারের কথা ভুলিয়া তিনি দেশে দেশে বৈষ্ণবপণ্ডিতদের নিকট পাঠ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। "হরিনামামৃতব্যাকরণ" পড়িলে শিক্ষা ও ভজন দুইই হইবে ভাবিয়া তিনি কাঁটোয়ায় ঐ ব্যাকরণের শ্রেষ্ঠ

বৈষ্ণব-পণ্ডিতের দ্বারে শিক্ষার্থিরূপে উপস্থিত হইলেন। তিনি অবৈষ্ণব কাহাকেও শিক্ষা দেন না বলিলেন। পাঠের প্রতি প্রবল অনুরাগবশে ব্রজকিশোর বৈষ্ণব মতে দীক্ষা লইলেন; তাঁহার নূতন নাম হইল অদ্বৈতদাস। কাঁটোয়াতে ব্যাকরণপাঠ সমাপন করিয়া অদ্বৈতদাস শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করিলেন।

ভজননিষ্ঠ ভক্তিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অনেক বৈষ্ণব শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করিতেন বলিয়া অদ্বৈতদাস শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীরাধাকুণ্ডে যাইয়া বাস করেন। তিনি কয়েক বৎসর তথায় বাস করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত তিনি ভজন করিতেন, মধ্যাহ্নে মাধুকরী করিতে বাহির হইতেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর অধ্যয়নে বসিয়া প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পাঠ করিতেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে শ্রীগোবর্দ্ধন-পরিক্রমায় বাহির হইতেন। রাত্রি এক প্রহর অতীত হইলে কুটীরে আসিয়া পাতা জ্বালিয়া তাহার আলোতে পুনরায় পড়িতে বসিতেন। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পড়িয়া মধ্যাহ্নের অবশিষ্ট রুটী জলে ভিজাইয়া লবণ সহযোগে আহার করিতেন।

কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে তিনি পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে আসেন। একদিন শ্রীগোবিন্দের মন্দিরে কীর্ত্তন গান হইতেছিল। কীর্ত্তনগানে কোনরূপ শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও তিনি কীর্ত্তনে এমন সুন্দর দোহারকি করিলেন যে শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণবসমাজ তাঁহাকে কীর্ত্তন শিখিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনে কীর্ত্তনগানের ভাল শিক্ষক না থাকায় তিনি বঙ্গদেশে আসিতে মনস্থ করেন।

কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি পাঁচথুপী, কান্দী, ময়নাডাল, শ্রীখণ্ড প্রভৃতি কীর্ত্তনগানের কেন্দ্রসমূহে শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষার সময়ে একবার তিনি পদব্রজে শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করেন। তিনি তখনও নিষ্কিঞ্চন। একটী আধ্‌লা দিলে শীতের রাত্রে চটীতে আশ্রয় পাওয়া যাইত, কিন্তু তাঁহার সে সম্বলও না থাকায় রাস্তায় ও গাছের তলায় শুক্‌না গোবর প্রভৃতি জ্বালাইয়া রাত্রি যাপন করিতেন। কীর্ত্তনশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তথায় বৈষ্ণবগণ তাঁহার কীর্ত্তন শুনিয়া পরমপ্রীতি লাভ করেন। তাঁহাদের আদেশে তিনি কীর্ত্তনগান প্রচার করিতে বাহির হয়েন। তখন "পণ্ডিত-বাবাজী" নামে তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

তিনি কীর্ত্তন করিতে করিতে কাঁটোয়ায় উপস্থিত হন। এদিকে তাঁহার ধর্ম্মপত্নী বয়ঃপ্রাপ্তা হইবার পর হইতে নিজের মাতা ও ভ্রাতা রামলাল গুপ্ত মহাশয়ের সহিত নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতেছিলেন। কাটোয়ায় ব্রজসুন্দরীর সহিত পণ্ডিত-বাবাজীর সাক্ষাৎলাভ হয়। ব্রজসুন্দরী পণ্ডিত বাবাজীর পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁটোয়ার গোস্বামী ও বৈষ্ণবগণের অনুরোধে অদ্বৈতদাস ধর্ম্মপত্নীকে পুনরায় গ্রহণ করিলেন। কাঁটোয়া হইতে নবদ্বীপে আসিয়া তিনি গোরাচাঁদের আখড়ায় বাস করিতে লাগিলেন। সেখানেও তিনি নিষ্কিঞ্চনভাবে বাস করেন। এইরূপে ২।৩ বছর যাইতে ব্রজসুন্দরীর সন্তান সম্ভাবনা হইল। তখন পণ্ডিতবাবাজীর গুণমুগ্ধ ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া একখানি বাড়ী গ্রহণ করিতে স্বীকার করাইলেন। ঐ বাড়ী তাহারা খরচ দিয়া কিনিয়া দিলেন। অদ্বৈতদাস স্ত্রী ও নবজাতা কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়াসহ ঐ বাড়ীতে উঠিয়া আসিলেন। ইহার পর দেশ-বিদেশে কীর্ত্তন করিতে গেলে কেহ কিছু স্বেচ্ছায় দিলে তিনি প্রত্যাখ্যান করিতেন না। কন্যাটী নয় বৎসরে পা দিলে নদীয়া জেলার ওস্‌মানপুরনিবাসী ৺রামগতি মজুমদারের পুত্র সাহিত্যিক শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া সাংসারিক দায়িত্ব হইতে যেন মুক্তি পাইলেন। অতঃপর কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় কীর্ত্তন শিখাইবার একটী টোল স্থাপন করিলে অদ্বৈতদাস তথাকার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর কাশিমবাজারে শিক্ষাদান করিবার পর তাড়াশের জমীদার রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুরের একান্ত আগ্রহে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে গেলেন। যতদিন রাজর্ষি বাহাদুর শ্রীবৃন্দাবনে দেহরক্ষা না করিয়াছিলেন, ততদিন পণ্ডিত বাবাজী মহাশয় তথায় থাকিয়া কীর্ত্তনাদি করিতেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ৭৮ বৎসর বয়সে তাঁহার মনে হইল যে, ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলে ভক্তিগ্রন্থ ভাল বুঝা যায় না। এজন্য তিনি নবদ্বীপে আসিয়া মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট পাঠ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সকালে তিনি নিজে ছাত্র-দিগকে ভক্তিশাস্ত্র পড়াইতেন ও বৈকালে ন্যায়শাস্ত্র পড়িতেন। তিনি সংস্কৃত এ্যাসোশিয়েসনের "হরিনামামৃত ব্যাকরণের" প্রশ্নকর্ত্তা ও পরীক্ষক হইয়াছিলেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়াদেবীর মৃত্যু হয়। ইহার ৮ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছিল। কন্যার মৃত্যুর পরে তিনি বৃন্দাবনে ফিরিয়া যান। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি তখন নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু স্মৃতিশক্তি এতই প্রবল ছিল যে গ্রন্থ না দেখিয়াই তিনি ছাত্রদিগকে পড়াইতেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে শ্রীজীবগোস্বামীর তরোভাব তিথিতে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে

দেহরক্ষা করেন। তিনি একাধিক্রমে বৃদ্ধবয়সেও দশ বার ঘণ্টা গান করিতে পারিতেন।

অদ্বৈতদীপিকা—নৃসিংহাশ্রম রচিত একখানি গ্রন্থ। নৃসিংহের শিষ্য নারায়ণাশ্রম ইহার টীকা রচনা করেন। অদ্বৈতদীপিকাক্ষি নামে ইহার আর একখানি টীকা আছে।

অদ্বৈতপ্রভু—অদ্বৈতগোস্বামী ও অদ্বৈতাচার্য্য নামেও পরিচিত। পূর্ব্ববঙ্গের শ্রীহট্ট জেলার লাউড় পরগণায় নবগ্রাম নামে এক গ্রাম ছিল। রাজা দিব্যসিংহ সমগ্র লাউড় পরগণার অধিপতি ছিলেন। ভরদ্বাজ-গোত্রীয় বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ কুবেরাচার্য্য রাজা দিব্যসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে, ইহার পূর্ব্বপুরুষ ভরদ্বাজ গোত্রীয় মেধাতিথি কান্যকুব্জ হইতে গৌড়ে আগমন করেন এবং রাজার নিকট হইতে কঙ্ক নামক গ্রাম দান-গ্রহণপূর্ব্বক তথায় বাস করেন। এই বংশের নরসিংহ নাড়িয়াল রাজা গণেশের মন্ত্রী হইয়া শান্তিপুরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই নরসিংহ নাড়িয়ালের কন্যার বিবাহেই বারেন্দ্র-সমাজে "কাপের" উৎপত্তি হয়। নরসিংহ নাড়িয়ালের সময় হইতেই এই বংশীয়গণ শ্রীহট্টের লাউড় পরগণায় নবগ্রামে বাস করিতেন এবং গৌড়ে গঙ্গাতীরে বৈষয়িক ও অন্যান্য প্রয়োজনে শান্তিপুরেও একটী বাসগৃহ রাখিতেন। কুবেরাচার্য্য এই সুপ্রসিদ্ধ নরসিংহ নাড়িয়ালের প্রপৌত্র।

কুবেরাচার্য্য নবগ্রামের মহানন্দ নামক একজন সদাচারী ব্রাহ্মণের পরমাসুন্দরী কন্যা নাভাদেবীকে বিবাহ করেন। নাভাদেবীর গর্ভে প্রথমে ছয়টী পুত্র ও একটী কন্যার জন্ম হয়। জন্মের পরেই কন্যাটী পরলোক গমন করেন। শ্রীকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত, হরিহরানন্দ, সদাশিব, কুশলদাস ও কীর্ত্তিচন্দ্র এই ছয়টী পুত্র কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াই তীর্থযাত্রায় গমন করিয়াছিলেন। তীর্থ-পরিক্রম কালেই চারিটী পুত্রের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটে এবং অন্য দুইটী পুত্র পিতামাতা বাঁচিয়া থাকিতে তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করেন নাই। ফলতঃ ছয় পুত্রের জনক কুবেরাচার্য্য ও জননী নাভাদেবী একরূপ নিঃসন্তানের ন্যায় কালযাপন করিতেন। অতঃপর ইহারা শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে আসিয়া সুপুত্রলাভ-কামনায় প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা গঙ্গাস্নান-পূর্ব্বক নিয়মস্থ হইয়া দেবার্চ্চনা করিতে লাগিলেন। কালক্রমে শান্তিপুরেই নাভাদেবী পুনরায় গর্ভবতী হইলেন। এই অবস্থায় কুবেরাচার্য্য (নাভাদেবীসহ) রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীহট্টের নবগ্রামে ফিরিয়া যান। এই নবগ্রামেই আনুমানিক ১৩৫৫ শকে মাঘীশুক্লা সপ্তমী তিথিতে অদ্বৈতাচার্য্য বা কমলাক্ষ (কোনও মতে কমলাকান্ত) ভূমিষ্ঠ হন।

বাল্যকালেই অদ্বৈতাচার্য্য নানারূপ অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কথিত আছে শৈশব হইতেই অদ্বৈত কৃষ্ণ বা হরিনাম শুনিলে আনন্দে বিভোর হইতেন, হরিনাম গানে নৃত্য করিতেন। রাজা দিব্যসিংহের পুত্র অদ্বৈতের শৈশবসঙ্গী ছিলেন। রাজপুত্রের কিন্তু অদ্বৈতের এই ব্যবহার ভাল লাগিত না। অদ্বৈতের হরিনাম গানে নৃত্য দেখিয়া তিনি তাঁহাকে উপহাস করিতেন। একদিন এইরূপ উপহাস করিলে অদ্বৈত ক্রুদ্ধ হইয়া হুঙ্কার করেন এবং রাজপুত্র তাহাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে বালক অদ্বৈত অন্যত্র পলাইয়া যান। এদিকে রাজপুত্রকে অচেতন দেখিয়া পরিচারকগণ নানা উপায়ে তাঁহার চৈতন্য-সঞ্চারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজপুত্রের দেহে জীবনের কোন লক্ষণই পরিদৃষ্ট হইল না। রাজা ও রাজসভাসদ্‌গণ শোকে কাতর হইয়া পড়িলেন। কুবেরাচার্য্য পুত্রের ব্যবহারেই এইরূপ ঘটিয়াছে জানিয়া অনুসন্ধানপূর্ব্বক অদ্বৈতকে ঐ স্থানে ধরিয়া লইয়া আসিলেন এবং তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য তখন শান্তভাবে বলিলেন "রাজপুত্র মরে নাই শালগ্রামের চরণোদক খাওয়াইলেই উহার জ্ঞানসঞ্চার হইবে।" এই কথায় রাজপুত্রকে শালগ্রামের চরণামৃত খাওয়াইতেই তাঁহার চৈতন্যলাভ হইল। তখন বালক অদ্বৈতের প্রভাব দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন।

অদ্বৈতাচার্য্য যখন জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের সে সময় অন্তিম অবস্থা। বৌদ্ধধর্ম্ম বহুস্থানে তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিল এবং ব্রাহ্মণগণও কলিতে আগমাচারই শাস্ত্রসম্মত, ইহা প্রচারপূর্ব্বক বাঙ্গালী বৌদ্ধাচারাবলম্বীদিগকে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতেছিলেন।

বিশুদ্ধ বেদমূলক বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচারের জন্যই বঙ্গদেশে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই অদ্বৈতাচার্য্য অবতীর্ণ হইয়া বঙ্গদেশে আগমাচারের প্রাবল্য দেখিয়া হৃদয়ে দারুণ ব্যথা অনুভব করিতেছিলেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ অদ্বৈতাচার্য্যকে সদাশিবের অবতার বলেন এবং ইঁহার ঐকান্তিক প্রার্থনার ফলেই যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহাও বিশ্বাস করেন। ফলতঃ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সহচর ও সহকর্ম্মীরূপে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীনিত্যানন্দই বঙ্গদেশে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

সকল মহাপুরুষের ন্যায় অদ্বৈতাচার্য্যও বাল্যকাল হইতেই নানারূপ অলৌকিক ব্যবহারে জনসাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠেন। শৈশবেই তাঁহার জীবনে প্রবল বিদ্যানুরাগ পরিদৃষ্ট হয়। তৎকালে পূর্ব্ববঙ্গের শ্রীহট্টাদি জেলায় সংস্কৃত-চর্চ্চার তাদৃশ প্রসার ছিল না। এই জন্যই অদ্বৈতাচার্য্য বাল্যকালে

ব্যাকরণপাঠ শেষ করিয়া শান্তিপুরের বাটীতে সংস্কৃত-শিক্ষার জন্য চলিয়া আসেন। শান্তিপুরে আসিয়া তিনি সাহিত্য, অলঙ্কার ও দর্শনাদি শাস্ত্র উপযুক্ত অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়নপূর্ব্বক প্রভূত পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন। ঐ সময়ে শান্তিপুরের সন্নিকটে ফুল্লবাটী বা ফুলবাটী নামক স্থানে শান্তাচার্য্য নামে একজন নিষ্ঠাবান্ সাধক পণ্ডিত বাস করিতেন। সুপণ্ডিত অদ্বৈত তাঁহার নিকট শ্রীমদ্ভাগবত, বেদ ও যোগবাশিষ্ঠাদি অদ্বৈতবেদান্ত-শাস্ত্র এবং যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

কথিত আছে, যোগশাস্ত্র অধ্যয়নের সময় অদ্বৈতাচার্য্য এক-দিন অপূর্ব্ব যোগৈশ্বর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। যখন অদ্বৈতা-চার্য্য ফুলবাটীতে শান্তাচার্য্যের নিকট যোগশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতেন ঐ সময়ে গঙ্গার সংলগ্ন একটী বিলে অসংখ্য সুগন্ধি পদ্মপুষ্প প্রস্ফুটিত হইত। কিন্তু ঐ বিল নানাজাতীয় সর্প-সমাকুল ও কণ্টকদামে পরিবেষ্টিত থাকায় সেই পদ্মপুষ্পসমূহ সংগ্রহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। অধ্যাপক শান্তাচার্য্য সুন্দর পদ্মগুলি দেখিয়া তদ্দ্বারা ইষ্টদেব-পূজার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। গুরুর মনোঽভীষ্ট পূর্ণ করিবার জন্য অদ্বৈতাচার্য্য ঐ কমলরাজি সংগ্রহ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি নির্ভয়ে বিনায়াসে বিলের জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া পদ্মপুষ্পগুলি তুলিয়া আনেন। সাধারণ মানুষ ভূমিতলে যেরূপ পাদচারে ভ্রমণ করিয়া থাকে, জলের উপরে সেইরূপে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া শান্তাচার্য্য আচার্য্য-অদ্বৈতকে মহাপুরুষ মনে না করিয়া পারিলেন না।

শান্তাচার্য্যের নিকট অধ্যয়ন শেষ হইবার অল্পদিন মধ্যেই অদ্বৈতাচার্য্যের জনক-জননীর পরলোক-প্রাপ্তি ঘটে। আচার্য্য যথারীতি শ্রাদ্ধাদি কার্য্য শেষ করিলেন এবং বৎসরান্তে শ্রীবিষ্ণু-পাদপদ্মে পিণ্ডদানের জন্য শ্রীধাম গয়াক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। পিণ্ডদান কার্য্য শেষপূর্ব্বক আচার্য্য তথা হইতে তীর্থ দর্শনে যাত্রা করেন। দক্ষিণ-দেশে তীর্থ-ভ্রমণের সময়ে পরম ভক্ত শ্রীমন্মাধ-বেন্দ্র পুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই মাধবেন্দ্র পুরীই বঙ্গদেশে ভক্তিধর্ম্ম বিস্তারের মূল। ইনিই গোবর্দ্ধনকন্দরা হইতে শ্রীগোপাল বিগ্রহকে আবিষ্কার করিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বতোপরি স্থাপন করেন। পরবর্ত্তী কালে শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য গোবর্দ্ধনে শ্রীগোপালদেবের জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং তৎপুত্র বিঠ্ঠলেশ বা বিঠ্ঠল্‌নাথ শ্রীবৃন্দাবনস্থ গোস্বামীদিগের আদেশে এই গোপাল দেবের সেবার ভার গ্রহণ করেন। ১৫৯২ শকে যখন অরঙ্গজেব বৃন্দাবনের দেবমন্দিরসমূহ ধ্বংস করিতে উদ্যত হন তখন শ্রীগোপাল দেবকে উদয়পুরের সিহাড় গ্রামে লইয়া যাওয়া হয়। তদবধি এইস্থানে শ্রীশ্রীগোপালদেব নাথজী নামে বল্লভ-সম্প্রদায়ের দ্বারা রাজোচিত উপচারে পূজিত হইতেছেন, এবং সিহাড় গ্রাম এখন নাথদ্বার নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। শ্রীগোপালদেব বা শ্রীনাথজীর মূল আবিষ্কর্ত্তা শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর প্রিয়শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু। পুরী উপাধি দেখিয়া ইঁহারা যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। কিন্তু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর গুরু শ্রীলক্ষ্মীপতি পুরী দশনামী-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হইলেও সুপ্রসিদ্ধ "ন্যায়ামৃত" গ্রন্থকার শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ের শ্রীব্যাসতীর্থ বা শ্রীব্যাসরাজ স্বামীর নিকট শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য বিশেষ হৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সম্ভবতঃ ইহার কিছু পরেই অদ্বৈত কাশীধামে আগমন করিয়া মাধবেন্দ্রপুরীর সতীর্থ শ্রীবিজয়পুরীর সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন। ইহার পরে শ্রীবৃন্দাবনধামে আসিয়া তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া যমুনার তীরবর্ত্তী এক কুঞ্জমধ্যস্থ মৃত্তিকাস্তূপ হইতে শ্রীশ্রীমদনমোহনবিগ্রহ উদ্ধার করেন। ইহার কিছু পরেই পুনরায় স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইলে তিনি এই বিগ্রহ মথুরার এক চৌবে ব্রাহ্মণের গৃহে রাখিয়া শ্রীমন্মদনগোপালের চিত্রপট লইয়া শান্তিপুরে ফিরিয়া আসেন। পরবর্ত্তী কালে এই চিত্রপটের অনুরূপ বিগ্রহ শান্তিপুরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীশ্রীরাধামদনগোপাল নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। আচার্য্য অদ্বৈত মথুরার চৌবে ব্রাহ্মণের গৃহে যে বিগ্রহ রাখিয়া আসিয়াছিলেন, শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহাকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই বিগ্রহ শ্রীশ্রীমদনমোহন নামে প্রসিদ্ধ, অরঙ্গজেবের বৃন্দাবন ধ্বংসের সময় এই বিগ্রহকে প্রথম জয়পুরে পরে তথা হইতে করৌলিতে লইয়া যাওয়া হয়। এই বিগ্রহ এখন করৌলিতেই সেবিত হইতেছেন।

তীর্থভ্রমণকালে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য মিথিলায় গেলে তথায় কবি বিদ্যাপতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটে। ঈশান নাগর অদ্বৈতপ্রকাশে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—মিথিলার কোন স্থানে বটবৃক্ষমূলে এক ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণলীলা গান করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণের সুরের মাধুর্য্য এবং পদের ভাষা ভাব ও অলঙ্কার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আচার্য্য তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কবি উত্তর করেন :—

"বিপ্র কহে মোর নাম দ্বিজ বিদ্যাপতি।
রাজান্ন ভোজনে মোর বিষয়েতে মতি॥
বাতুলতা করি মুঞি রচিনু এ গীত।
সাধু ভাবগ্রাহী তুঁহু তেঁই ইথে প্রীত॥

তোমা আকর্ষিতে শক্তি ধরে কোন জনে।
নিজগুণে হৈল মোর উদ্ধার সাধনে॥"

আচার্য্য প্রভু প্রতি উত্তর দিলেন :—

"অদ্‌ভুত তোমার রচিত গীতামৃত।
জীব কোন্ ছার কৃষ্ণ হয় আকর্ষিত॥
ভাগ্যে মোর প্রতি কৃষ্ণ দয়া প্রকাশিল।
তেঁই পদকর্ত্তা বিদ্যাপতির সঙ্গ হইল॥" (অদ্বৈতপ্রকাশ)

অদ্বৈত-আচার্য্য শান্তিপুরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণোচিত অধ্যাপনা বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। ঐ সময়ে নবদ্বীপ নগর বঙ্গদেশের পাণ্ডিত্যের কেন্দ্রস্থলরূপে পরিগণিত হইত। সর্ব্ব-শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য তখন নবদ্বীপে অসংখ্য বিদ্যার্থী ও বহু অধ্যাপক সমাগত হইতেন। অদ্বৈত-আচার্য্য শান্তিপুরে চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। যাতায়াতের ও অবস্থানের জন্য নবদ্বীপেও একটী বাসস্থানের ব্যবস্থা হইল। নবদ্বীপে ঐ সময়ে ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা এক-রূপ ছিল না বলিলেই হয়। দেবানন্দ পণ্ডিত প্রমুখ যাঁহারা শ্রীভাগবতের ব্যাখ্যা করিতেন, তাঁহারাও ভক্তিশাস্ত্রের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিতেন না; এইজন্য নবদ্বীপের ভক্তেরা ঐ সময়ে অদ্বৈতাচার্য্যকেই আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অবসর সময়ে আচার্য্যের নিকটে উপস্থিত হইয়া ভক্তি-শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতেন।

অদ্বৈতাচার্য্য শান্তিপুরে চিত্রপটে অঙ্কিত শ্রীশ্রীরাধা মদনগোপালের সেবা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরী নীলাচলে যাইবার পথে শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। আচার্য্য এইবার মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর নিকট শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। মাধবেন্দ্র কিছুকাল শান্তিপুরে অবস্থান করিয়া পরে নীলাচলে গমন করিলেন।

আচার্য্য অদ্বৈতের অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও ভক্তি-প্রভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বহুশিষ্য আচার্য্যের নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আগমন করিলেন—বহুভক্ত আচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। শিষ্যবর্গের মধ্যে লাউড়ের রাজা দিব্য সিংহের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি জন্মাবধি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও নবগ্রামের রাজ্যভার পুত্রের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক শান্তি-পুরে আগমন করিয়া শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যের নিকট শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। আচার্য্য ইঁহার নাম কৃষ্ণদাস রাখিলেন। ইনি আচার্য্যের বাল্যলীলাবর্ণন করিয়া সংস্কৃতে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আচার্য্যের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন-পূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া ইনি কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী নামে খ্যাতিলাভ করেন। সনাতন গোস্বামী যখন শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন, তাহার পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকাশীশ্বর গোস্বামী, শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী তৎকৃত শ্রীভাগবতের "তোষণী" টীকার প্রারম্ভে—

"বৃন্দাবনপ্রিয়ান্ বন্দে শ্রীগোবিন্দ-পদাশ্রিতান্।
শ্রীমৎকাশীশ্বরং লোকনাথং শ্রীকৃষ্ণদাসকম্॥"

বলিয়া ইঁহাদিগের বন্দনা করিয়াছেন।

ঐ সময়ে শ্রীল যদুনন্দন আচার্য্য শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। ইনিই সুপ্রসিদ্ধ রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহাশয়ের দীক্ষাগুরু। কথিত আছে, ইনি প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। একদিন হরিদাস ঠাকুরের সহিত বিচারে পরাভূত হইয়াও ভক্তিপথের শ্রেষ্ঠতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি আচার্য্য প্রভুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন।

শ্রীচৈতন্যশাখায় শ্রীভাগবতের "চৈতন্যমতমঞ্জুষা" টীকার প্রণয়নকর্ত্তা শ্রীনাথ পণ্ডিত বা শ্রীনাথ আচার্য্যের নাম আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লিখিত আছে, তিনি আচার্য্যপ্রভুর অনুগত হইয়া তাঁহার নিকট শ্রীভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ যবন হরিদাস বা শ্রীহরিদাস ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের নিকট শান্তিপুরে উপস্থিত হন। হরিদাস ঠাকুরকে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া ইনি উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া তাঁহাকে সুব্রাহ্মণের ভোগ্য শ্রাদ্ধপাত্র ভোজন করাইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। নিষ্ঠাবান্ অদ্বৈত আচার্য্যের এই মহজ্জনোচিত উদারভাব তাৎকালিক সমাজে প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহার ফলে শান্তিপুরের ব্রাহ্মণসমাজও নানারূপে পরীক্ষা করিয়া শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত বুঝিয়া তাঁহার গুণমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। শান্তিপুর হইতে হরিদাস ঠাকুর ফুলিয়ায় যাইয়া কিয়ৎকাল বাস করেন। তথা হইতে কুলিয়া ও কুলীনগ্রামে হরিনাম প্রচার করিয়া ইনি পুনরায় শান্তিপুরে আসিয়া শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের নিকট বাস করিতে থাকেন। যখন শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন, তখন আচার্য্য প্রভুর ন্যায় ইনিও সেই প্রেমময় বিগ্রহের আকর্ষণে নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা সহর যেরূপ বাণিজ্যাদি ব্যাপারে সমৃদ্ধ বলিয়া পরিচিত, ঐ সময়ে সপ্তগ্রামও ঐরূপ সমৃদ্ধ সহর ছিল। সপ্তগ্রামে তখন হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস নামক দুই ভ্রাতা বাস করিতেন। ইঁহাদের উপরই সপ্তগ্রামের রাজস্ব আদায়ের ভার ন্যস্ত ছিল এবং ইঁহারা ঐজন্য রাজদত্ত মজুমদার উপাধিতে বিভূষিত ছিলেন। হিরণ্য দাস জ্যেষ্ঠ ও পুত্রহীন। কনিষ্ঠ গোবর্দ্ধনের পুত্র কায়স্থকুলভাস্কর সুবিখ্যাত রঘুনাথদাস গোস্বামী। অদ্বৈত আচার্য্যের শিষ্য

শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য ইঁহাদিগের কুলগুরু ছিলেন। মহাধনী হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস বহু ব্রাহ্মণকে সাহায্য করিতেন। ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষেও তাঁহারা ইঁহাদের নিকট হইতে প্রভুত অর্থ প্রাপ্ত হইতেন।

ঐ সময়ে অদ্বৈত আচার্য্যের প্রিয়শিষ্য বড়শ্যামদাস অদ্বৈত আচার্য্যের বিবাহ দিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। আচার্য্যের বয়স কিছু অধিক হইলেও শিষ্যের আগ্রহে তিনি বিবাহে সম্মত হন।

সপ্তগ্রামের সন্নিকটে নারায়ণপুর নামক গ্রামে ঐ সময়ে বহু ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। নৃসিংহ ভাদুড়ী নামক বারেন্দ্র কাপ-বংশীয় একজন ব্রাহ্মণের ঐ স্থানে বাস ছিল। তাঁহার সীতা ও শ্রী নামে দুইটী বয়স্কা কন্যা ছিলেন। কন্যা দুইটী শৈশব হইতেই মাতৃহীনা হওয়ায় পিতার স্নেহে লালিতা ও সুশিক্ষিতা হইয়া উঠেন। অদ্বৈতশিষ্য সুপণ্ডিত বড়শ্যামদাস এই দুইটী কন্যার সহিতই অদ্বৈত আচার্য্যের বিবাহ দিবার সংকল্প করেন। বোধ হয়, অদ্বৈতের কুলমর্য্যাদা, বিদ্যাবত্তা ও তাঁহার অনুপম চরিত্র দেখিয়া নৃসিংহ ভাদুড়ী এই বিবাহে সম্মত হন। এদিকে যদুনন্দন আচার্য্যও গুরুদেবের বিবাহে উদ্যোগী হওয়ায় ধনাঢ্য সদ্ব্যয়ী হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস এই বিবাহের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করেন। সুশিক্ষিত ভগিনীদ্বয়ও উপযুক্ত পতিলাভে বিশেষ সুখী হইয়াছিলেন। সীতাঠাকুরাণী ও শ্রী ঠাকুরাণী পতিদেবতার যথার্থ সহধর্ম্মিণী ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই অদ্বৈত প্রভুর সাহচর্য্যে শ্রীকৃষ্ণভজনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সীতা ঠাকুরাণীর গর্ভে চারিটী ও শ্রীঠাকুরাণীর গর্ভে একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। অদ্বৈতাচার্য্যের পুত্রগণের নাম যথা-ক্রমে (১) অচ্যুতানন্দ (২) কৃষ্ণ মিশ্র (৩) গোপাল (৪) বলরাম (৫) জগদীশ। কাহারও কাহারও মতে স্বরূপ নামে আচার্য্যের আর একটী পুত্র ছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মগ্রহণের বহু পূর্ব্ব হইতেই অদ্বৈত আচার্য্য নবদ্বীপে ভক্তিশাস্ত্র আলোচনার প্রবর্ত্তন করেন। চৈতন্যদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ অধ্যয়নার্থ অদ্বৈত আচার্য্যের নিকট যাতায়াত করিতেন। তিনি শিশুকাল হইতেই ভক্তি-শাস্ত্রের চর্চ্চায় সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া যৌবনের প্রারম্ভে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। চৈতন্যদেবের মাতার এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে অদ্বৈতাচার্য্যের শিক্ষাতেই তাঁহার পুত্র বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব মাতার এই ভ্রম দূর করিয়া মাতাকে অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাইয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অদ্বৈতাচার্য্য দেশে শ্রীকৃষ্ণভক্তির অভাব দেখিয়া বিশেষ ব্যথিত হইয়াছিলেন। দেশের এই দুরবস্থা দূর করিয়া বৈদিক সর্ব্বধর্ম্মসার শ্রীকৃষ্ণভক্তি প্রচার করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য তিনি প্রত্যহ গঙ্গাজল ও তুলসীপত্র দিয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতেন। পরিশেষে নবদ্বীপে হরিদাস ঠাকুর প্রমুখ ভক্তগণের সমাগমে এই ভক্তিচর্চ্চা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকে। শ্রীচৈতন্যদেব যখন নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন, তখনই অপূর্ব্ব আনন্দপ্রবাহে অদ্বৈত-প্রমুখ ভক্তগণের হৃদয় প্লাবিত হইয়াছিল বলিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বর্ণনা করিয়াছেন। অদ্বৈতাচার্য্য শিশু নিমাইকে দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন এবং পরিণামে এই নিমাই যে ভক্তিধর্ম্মের প্রচার করিয়া দেশে নবজীবনের ও নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিবেন একথাও ইঙ্গিতে ভক্তগণের নিকট প্রচার করিতেন। পাণ্ডিত্যপ্রতিভামণ্ডিত নবীন যুবক নিমাই যখন শিষ্যগণের সঙ্গে নগর ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, আচার্য্য অদ্বৈত সে সময় তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন যে নিমাই যেন অবিলম্বে ভক্তিপথ অবলম্বন করেন।

অচিরে অদ্বৈতের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। পরমোদ্ধত পাণ্ডিত্যগর্ব্বী নিমাই পণ্ডিত গয়াধাম হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ভক্তিরসে মত্ত হইলেন। নবদ্বীপের শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রমুখ ভক্তগণ পরমানন্দে এ সংবাদ অদ্বৈতের গোচর করিলেন। ইতি মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া একদিন অদ্বৈতভবনে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন। আচার্য্যকে দেখিয়াই চৈতন্যদেব মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং আচার্য্যদেব সেই অবস্থায় তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া পূজা করিলেন। কিন্তু চেতনালাভ করিয়াই চৈতন্যদেব অদ্বৈত আচার্য্যের পদধূলি লইয়া বিনীতবচনে দীনভাবে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করেন। এই ব্যাপার দেখিয়া আচার্য্যের হৃদয়ে আবার সন্দেহের সঞ্চার হইল এবং তিনি নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন; মনে মনে স্থির করিলেন যে, "শ্রীভগবান্ যদি অবতীর্ণ হইয়া থাকেন তবে অবশ্যই তিনি এই দাসকে স্মরণ করিবেন।"

এদিকে শ্রীচৈতন্যদেব আচার্য্যের এই মনোভাব বুঝিতে পারিয়া ভগবদ্ভাবাবেশে তাঁহাকে শান্তিপুর হইতে আনয়ন করি-বার জন্য শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা শ্রীরাম পণ্ডিতকে প্রেরণ করিলেন। আচার্য্য শ্রীরাম পণ্ডিতের সহিত নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীরামকে মহাপ্রভুর নিকট তাঁহার আগমনবার্ত্তা গোপন রাখিতে বলিয়া নন্দনাচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য-দেব ভগবদ্ভাবের প্রকাশকালে ভক্তমণ্ডলী মধ্যে আচার্য্যের আগমনসংবাদ প্রকাশ করিলেন এবং আচার্য্য যে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা ইত্যাদি ঐশ্বর্য্য দেখিতে চাহেন সে কথা জানাইয়া অবিলম্বে

নন্দনাচার্য্যের গৃহ হইতে তাঁহাকে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে আনয়ন করিতে বলিলেন। তখন অদ্বৈত আচার্য্য শ্রীবাসভবনে আসিয়া নিমাই পণ্ডিতকে শ্রীভগবদবতাররূপে প্রকাশিত দেখিলেন।

শ্রীচৈতন্য দেবের মধ্যে দুইটী ভাব বিরাজ করিত। সাধারণতঃ তিনি বৈষ্ণবভাবে অতি দীন হইয়া বৈষ্ণব মাত্রেরই কৃপা ভিক্ষা করিতেন। আবার যখন তাঁহার মধ্যে ঐশ্বর্য্যময় শ্রীভগবানের প্রকাশ হইত তখন তিনি সর্ব্বজ্ঞতা, বরদাতৃত্ব, ভক্তগণকে নিজাভীষ্ট দেবের রূপ প্রদর্শন ও অভয় প্রদর্শনাদি ভগবদ্ভাবের পরিচয় প্রদান করিতেন।

মহাপ্রকাশের দিনে মহাপ্রভু অন্যান্য ভক্তগণের মত অদ্বৈতকেও আহ্বান করিয়া এইরূপ ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। মহাপ্রভু অদ্বৈতকে বলিয়াছিলেন—"আমি যখন অবতার গ্রহণ করি নাই, তুমি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা করিতে। যে শ্লোকে ভক্তিযোগের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতে না, সেই শ্লোকের ব্যাখ্যা বুঝিবার জন্য উপবাস করিয়া থাকিতে। আমি স্বপ্নে তোমাকে ঐ শ্লোকের ভক্তিমূলক মর্ম্মার্থ বুঝাইয়া দিতাম।" ইত্যাদি।

আচার্য্য অদ্বৈতের প্রার্থনায় মহাপ্রভু তাঁহাকে একদিন বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। চৈতন্য-ভাগবতে বর্ণিত আছে—অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীবাসমন্দিরে গোপীভাবে নৃত্য করিতেছিলেন। আচার্য্যকে কথঞ্চিৎ সুস্থির দেখিয়া শ্রীবাস ও রামাই আদি স্নান করিতে গেলেন, আচার্য্য পুনরায় উঠিয়া শ্রীবাস অঙ্গনে গড়াগড়ি দিয়া আর্ত্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে লইয়া নিভৃতে বিষ্ণুমন্দিরে বসিয়া তাঁহার প্রার্থনার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অদ্বৈত বলিলেন আমি "সর্ব্বদেবসার তোমাকেই চাই"। মহাপ্রভু উত্তর দিলেন—"এই তো আমি তোমার সাক্ষাতে। এখন অপর কি প্রার্থনা আছে বল।" অদ্বৈত বলিলেন "কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলে সেই বিশ্বরূপ আমাকে দেখাও।" মহাপ্রভু তদ্দণ্ডেই তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া মনে হয়, আচার্য্য দেব যেমন বারবার মহাপ্রভুকে পরীক্ষা করিয়া সন্দেহ মিটাইয়াছিলেন তেমনই পরিপূর্ণ বিশ্বাসে পূজা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন।

অনেকে বলেন যে, অদ্বৈত আচার্য্য তাঁহাতে পরমৈশ্বর্য্যময় ভগবদ্ভাব সর্ব্বদা প্রকাশ থাকুক বলিয়া ইচ্ছা করিতেন এবং তাঁহার বাহ্য ভক্তভাব দূর করিবার জন্যই তিনি পুনরায় নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুরে গমন করিয়া তথায় জ্ঞানপ্রধান যোগবাশিষ্ঠাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। যে কারণেই হউক, শ্রীঅদ্বৈত এক সময়ে শান্তিপুরের চতুষ্পাঠীতে যে আড়ম্বরের সহিত জ্ঞানবাদ প্রচার করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই জ্ঞানবাদ ভক্তিবিরোধী জ্ঞানবাদ না হইলেও উহা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে কোনরূপে অতিক্রম করিয়া শুদ্ধা ভক্তির সীমা স্পর্শ করিতে পারে নাই।

শুনিতে পাওয়া যায়, আচার্য্যের শিষ্যগণের মধ্যে অসমীয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারক শঙ্করদেব একজন। পরবর্ত্তী কালে অদ্বৈত আচার্য্য যখন শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশে শুদ্ধ ভক্তিমূলক ধর্ম্মের প্রচারে প্রবৃত্ত হন, তখন আচার্য্যের শিষ্য শঙ্করদেব আচার্য্যের নিকট হইতে আসামে চলিয়া যাইয়া জ্ঞান-প্রধান ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিধর্ম্মপ্রচার করিয়া আসামে একটী ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন। এই শঙ্করদেব সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। পরবর্ত্তী কালে রচিত "ভক্তিরত্নাকর" ও "প্রেমবিলাস" গ্রন্থে অদ্বৈত আচার্য্যের শিষ্য এক শঙ্করের উল্লেখ আছে।

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে বর্ণিত আছে যে শ্রীচৈতন্যদেব অদ্বৈতাচার্য্যের এইরূপ জ্ঞানবাদ প্রচারে বিশেষরূপে ক্রুদ্ধ হন এবং নবদ্বীপ হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে গমন করিয়া তাঁহাকে নিজহস্তে শাস্তি দিয়া স্বমহিমা দেখাইয়া পুনরায় ভক্তিবাদ প্রচারে নিযুক্ত করেন। আচার্য্যের মনে পূর্ব্বে আরও একবার এইরূপ বিরোধের ভাব উপস্থিত হইয়াছিল। কোন এক রাত্রিতে মহাপ্রভু নিজমন্দিরে সংকীর্ত্তন কালে পূর্ব্বের মত আনন্দ না পাইয়া বলিলেন আজ কীর্ত্তনে প্রেমোদ্রেক হইতেছে না কেন? শুনিয়া অদ্বৈত বলিলেন—

"মহাপাত্র অদ্বৈত ভ্রূকুটী করি নাচে।
কেমতে হইবে প্রেম নাড়া শুষিয়াছে॥
মুঞি নাহি পাও প্রেম না পায় শ্রীবাস।
তিলিমালি সনে কর প্রেমের বিলাস॥
অবধূত তোমার প্রেমের হইল দাস।
আমি সে বাহির আর পণ্ডিত শ্রীবাস॥
আমি সব লহিলাম প্রেম অধিকারী।
অবধূত আজি আসি হইল ভাণ্ডারী॥
যদি মোর প্রেমযোগ না দেহ গোসাঞী।
শুষিব সকল প্রেম মোর দোষ নাঞি॥"

মহাপ্রভু এই কথা শুনিয়া গঙ্গায় গিয়া ঝাঁপ দেন। নিত্যানন্দ প্রভৃতি তাঁহাকে তুলিয়া আনিলে তিনি সে রাত্রি নন্দন আচার্য্যের গৃহে অবস্থিতি করেন। প্রভাতে শ্রীবাস পণ্ডিতকে সংবাদ দিলে তিনি আসিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। মহাপ্রভু অদ্বৈতের কথা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীবাস

বলিলেন, তিনি কল্য হইতে উপবাসী আছেন। আচার্য্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইয়াছেন জানিয়া মহাপ্রভু অদ্বৈতমন্দিরে উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভুকে দেখিয়া অদ্বৈত বলিলেন—

"মোরে তুমি নিরন্তর লওয়াও কুমতি।
অহঙ্কার দিয়া মোরে করাহ দুর্গতি ॥
সবাকারে উত্তম দিয়াছ দাস্যভাব।
আমারে দিয়াছ প্রভু যত কিছু রাগ ॥"

মহাপ্রভু বলিলেন, তোমার অপরাধ অনুরূপ দণ্ড হইয়াছে।

"অপরাধ দেখি কৃষ্ণ যার শাস্তি করে।
জন্মে জন্মে দাস সেই বলিল তোমারে ॥
উঠিয়া করহ স্নান কর আরাধন।
নাহিক তোমার চিন্তা করহ ভোজন ॥"

(চৈতন্যভাগবত, মধ্য ১৭ অধ্যায়)

মহাপ্রভুর আদেশে হরিদাস ও নিত্যানন্দ যেমন নবদ্বীপের ঘরে ঘরে শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন পরম পণ্ডিত শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যও তেমনই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহে পণ্ডিত ও বিদ্বান্ গৃহস্থগণকে শ্রীকৃষ্ণভজনের উপদেশ দিতে লাগিলেন। এইরূপে সর্ব্বশাস্ত্রের প্রচারপীঠ নবদ্বীপে ভক্তি-তরলময়ী হরিসঙ্কীর্ত্তনের বন্যা প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তিনি সমগ্র ভারতে প্রেমধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশ্যে ১৪৩১ শকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিন দিন রাঢ় দেশে ভ্রমণ করেন। অতঃপর নিত্যানন্দ তাঁহাকে শ্রীপাদ অদ্বৈতের গৃহে শান্তিপুরে লইয়া আসেন। গার্হস্থ্যাশ্রমে যেমন শ্রীবাস অঙ্গনে নাম-সংকীর্ত্তনের সূত্রপাত হয়। তেমনই সন্ন্যাসাশ্রমে আচার্য্যমন্দিরেই প্রেমধর্ম্ম প্রচারের নান্দীপাঠ হয়। জননী শচীদেবী এবং সমাগত ভক্তমণ্ডলী লইয়া আচার্য্যদেব কএকদিবস ব্যাপী মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অদ্বৈতমন্দির হইতেই মহাপ্রভু নীলাচল যাত্রা করেন।

শ্রীচৈতন্যদেব পুরীধাম হইতে প্রথমে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে গমন করেন। ঐ স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি পুরী-ধামেই অবস্থান করিতে থাকেন। পুরীধামে অবস্থান করিবার কালে প্রতি বৎসরই রথযাত্রার সময়ে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর নেতৃত্বে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ নীলাচলে গমনপূর্ব্বক প্রায় চারি মাস তথায় অবস্থান করিয়া বাঙ্গলায় ফিরিতেন। কাঁচড়াপাড়ার শ্রীল শিবানন্দ সেন অসমর্থ ভক্তগণের যাতায়াতের পথে ঘাটি সমাধানের ও ভোজনাদির সমগ্র ব্যয় বহন করিতেন। আমরা পূর্ব্বেই শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিষ্য শ্রীনাথ পণ্ডিত বা শ্রীনাথ আচার্য্যের উল্লেখ করিয়াছি। এই শ্রীনাথ আচার্য্যই শিবানন্দ সেনের ও তৎপুত্র শ্রীচৈতন্যদাস, রামদাস ও কবিকর্ণপুরের গুরু ছিলেন। অন্যদিকে বাসুদেব দত্ত প্রমুখ ভক্তবর্গ আচার্য্যের অন্যতম শিষ্য যদুনন্দন আচার্য্যের অনুগত ছিলেন। সুতরাং এইরূপ শ্রীপুরী-ধামে যাতায়াত ও অবস্থানের ভার একরূপ অদ্বৈতাচার্য্যের নির্দ্দেশ ও অভিপ্রায় অনুসারে সম্পন্ন হইত। এক বৎসর পুরী-ধামে গুণ্ডিচামার্জ্জন দিনে হরিসঙ্কীর্ত্তনকালে মহাপ্রভু আচার্য্যের পুত্র গোপালকে নৃত্য করিতে আদেশ করেন। নৃত্য করিতে করিতে গোপাল প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। গোপালকে অচেতন দেখিয়া আচার্য্য তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। কিন্তু কোনরূপে তাঁহার চেতনা হইল না দেখিয়া আচার্য্য ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন মহাপ্রভু গোপালের বুকে হাত দিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করেন। আচার্য্য প্রভু সস্ত্রীক নীলাচলে অবস্থান করিয়া ইচ্ছামত ভক্ষ্যদ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক ভোজন করাইতেন। পুরীধামে পরমানন্দ পুরী প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ মহাপ্রভুর নিত্যসঙ্গী ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবকে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে ইঁহাদিগকেও নিমন্ত্রণ করিতে হইবে এইরূপ রীতি তখন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু সন্ন্যাসিগণ সঙ্গে থাকায় অদ্বৈতাচার্য্য ও সীতাদেবী মহাপ্রভুকে মনের মত আদর যত্ন করিতে পারিতেন না বলিয়া বড় দুঃখ অনুভব করিতেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত আছে যে এইরূপ এক নিমন্ত্রণের দিনে প্রবলবেগে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়। বৃষ্টি আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্যদেব অদ্বৈতাচার্য্যের বাসায় গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু সঙ্গী সন্ন্যাসিগণ বৃষ্টির জন্য আসিতে পারেন নাই। এই ব্যাপারে আচার্য্য অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া ইন্দ্রের স্তব করিতে লাগিলেন। কারণ বৃষ্টিপাতের কর্ত্তা ইন্দ্রদেবের অনুগ্রহেই একাকী মহাপ্রভুকে পাইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল। ঐ দিন অদ্বৈত আচার্য্য ও সীতাদেবী তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া আদর যত্ন করিয়া আহার করাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ফলতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের উপর অদ্বৈতাচার্য্যের অনুরক্তির তুলনা নাই; মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-দেব বাহিরে তাঁহাকে যেরূপ শ্রদ্ধা দেখাইতেন অন্তরেও তেমনি স্নেহ করিতেন। মহাপ্রভু শ্রীবাসপণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন—

"অদ্বৈতেরে তোমার আমার এই বর।
জরাগ্রস্ত নহিবে দোঁহার কলেবর ॥"

(চৈ.ভা অন্ত্যখণ্ড ৫অ)

পুরীধামে অবস্থিতিকালে মহাপ্রভু একদিন শ্রীনিবাসকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ—

"প্রভু বলে শ্রীনিবাস কহত আমারে।
কিরূপ বৈষ্ণব তুমি বাস অদ্বৈতেরে ॥

মনে ভাবি বলিলা শ্রীবাস মহাশয়।
শুক বা প্রহ্লাদ যেন মোর মনে লয় ॥
অদ্বৈতের মহিমা প্রহ্লাদ শুক যেন।
শুনি প্রভু ক্রোধে শ্রীবাসেরে মারিলেন ॥"

(চৈ.ভা. অন্ত ৯অ°)

মহাপ্রভু বলিলেন অদ্বৈতের নিকট শুক ও প্রহ্লাদ বালক মাত্র। তিনি শ্রীবাসকে খেদাইয়া যাইতে আচার্য্য অদ্বৈত প্রভুকে ধরিয়া সান্ত্বনা করিলেন।

১৪৩৬ শকে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার নাম করিয়া পুরী হইতে যাত্রা করেন এবং রামকেলি পর্য্যন্ত যাইয়া তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করেন। ঐস্থানে বালক রঘুনাথ দাসের সহিত চৈতন্য-দেবের সাক্ষাৎ হয়। অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার গুরুদেব মাধবেন্দ্র পুরীর নির্য্যাণ মহোৎসব করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বঙ্গদেশের ইতিহাসের একটী যুগান্তকর ব্যাপার। এই ব্যাপারে বঙ্গদেশে যে শক্তির বিকাশ হইয়াছিল, বিচার করিয়া দেখিতে গেলে অদ্বৈত আচার্য্যকেই তাহার মূল বলিয়া মনে হয়। দেশ-বিদেশের বহু পণ্ডিত ও শক্তিশালী ব্যক্তি মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মমতের অনুপম সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার ভক্ত হইয়াছিলেন। আচার্য্যের প্রভাব তাহার একতম কারণ বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। ভারত-গগনে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য যেন প্রথম প্রদোষের উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন বঙ্গদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের ধর্ম্মকথা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন নাই, তখন অদ্বৈতপ্রভু গৃহস্থরূপে বিরাজমান থাকিয়াও শ্রীভাগবতধর্ম্ম প্রচারের কেন্দ্রস্থলরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

অদ্বৈতাচার্য্যের জ্যেষ্ঠপুত্র অচ্যুতানন্দের শৈশব হইতেই শ্রীচৈতন্যদেবের উপর প্রবল আকর্ষণ ছিল। একটু বয়স হইলেই তিনি পুরীধামে শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট অবস্থান করিতে থাকেন। মহাপ্রভুর লীলাবসানের পর ইনি শান্তিপুরে আসিয়া বাস করেন। ইনি বিবাহ করেন নাই। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃ-গণ বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করেন এবং মদন-গোপাল দেবের সেবার ভার গ্রহণ করেন। অদ্বৈত আচার্য্য শেষবারে আর পুরীধামে যান নাই। তিনি শান্তিপুরে অবস্থান করিয়াই বঙ্গদেশে ভক্তিধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত থাকেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও ঐ সময়ে রাঢ়দেশের প্রায় সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া ভক্তিপ্রেম প্রদানে দেশের মধ্যে এক নবজীবনের সঞ্চার করেন। অদ্বৈতাচার্য্য প্রথম হইতেই গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করায় এবং নিত্যানন্দপ্রভুও বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রম প্রতিপালন করায় দেশের ভক্তিমান্ জনগণ বুঝিতে পারিল যে সংসারে থাকিয়াই ভগবদ্ভজন কর্ত্তব্য। জনসাধারণ ইঁহাদের আদেশে অনুপ্রাণিত হইয়াই স্ত্রীপুত্র ও পরিজনবর্গে পরিবৃত হইয়া আশ্রমোচিত কর্ত্তব্য পালনকেই হরি সেবারূপে বরণ করিয়া লইল। অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ ও শ্রীবাস পণ্ডিতের আদর্শই বঙ্গদেশের গৃহস্থ জন-সাধারণের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি জগদানন্দ পণ্ডিতকে নবদ্বীপে নিজের মাতার নিকট প্রেরণ করেন। জগদানন্দ পণ্ডিত যখন নবদ্বীপ হইতে প্রত্যাগমন করেন, তখন তিনি অদ্বৈত আচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসেন। আসিবার সময় আচার্য্য শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট একটী তর্জ্জার দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করেন। সেই তর্জ্জাটী এই :—

"বাউলকে কহিও—লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিও—হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিও—কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও—ইহা কহিয়াছে বাউল ॥"

শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ শ্রীস্বরূপ-দামোদর তাঁহার নিকট এই তর্জ্জার অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। মহাপ্রভু বলিলেন :— "আচার্য্য আগমবিধানে অভিজ্ঞ, আগমমতানুসারে উপাসক উপাস্য দেবতাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার পূজা করেন, পূজা করিয়া তাহার পর মন্ত্রদ্বারা দেবতার বিসর্জ্জন করেন। আচার্য্যও বোধ হয় তাহাই করিতেছেন।" আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন যে, অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর প্রার্থনা অনুসারে শ্রীচৈতন্যদেব অবতার হইয়াছিলেন। অবতারের কার্য্য শেষ হইলে আচার্য্য-প্রভুই এই তর্জ্জার দ্বারা আর তাঁহার থাকিবার প্রয়োজন নাই ইহা জ্ঞাপন করেন। আচার্য্যপ্রভুর এই তর্জ্জায় ইঙ্গিতের ফল ফলিল। এই তর্জ্জা পাঠাইবার অল্পকাল পরেই ১৪৫৫ শকে শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাব হয়।

কাহারো কাহারো মতে শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গবিষয়ক পদরচনার প্রবর্ত্তক। সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা বাসুঘোষ তাঁহারই অনুসরণ করেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য ভাগবতের মতে শ্রীপাদ অদ্বৈতাচার্য্যই গৌর গীতের আদি রচয়িতা। পুরীধামে—

"আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি।
বলিয়া নাচন প্রভু জগৎ নিস্তারি ॥
শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণা সাগর।
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর ॥

অদ্বৈত সিংহের শ্রীমুখের এই পদ।
ইহার কীর্ত্তনে বাড়ে সকল সম্পদ॥" (অন্তখণ্ড ৯ম অধ্যায়)

কথিত আছে, শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাবের কিছু পরেই নিত্যানন্দ প্রভু অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে অদ্বৈতাচার্য্য খড়দহে নিত্যানন্দ-প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। দুইজনে কএকদিন ধরিয়া নির্জ্জনে পরামর্শ করেন। অবশেষে সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর তিরোভাব ঘটে।

ইহার কিছুদিন পরে, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শান্তিপুরে আগমন করেন। শান্তিপুরে আগমনের কিছুদিন পরেই অদ্বৈতাচার্য্যের তিরোভাব হয়। কেহ কেহ বলেন, অদ্বৈতপ্রভু একশত পঁচিশ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং ১৪৭৯ শকে ইহলোক ত্যাগ করেন। কিন্তু প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থে একথার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরে নিত্যানন্দপ্রভু ও তাহার কিছুকাল পরে অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু অপ্রকট হন, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই।

মহাপ্রভুর প্রকটকালেই তাঁহাকে লইয়া বৈষ্ণবগণের মধ্যে কএকটী দল গঠিত হইয়াছিল। একদল অদ্বৈত ও গৌরাঙ্গের উপাসনা করিতেন। আর একদল নিতাই-গৌরকে উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করেন। অন্যদল গৌর-গদাধরের উপাসক হন। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থেই তাহার উল্লেখ পাই। অদ্বৈতাচার্য্যের ভক্তগণের মধ্যেই আবার দুইটী পৃথক দলের সৃষ্টি হয়। একদল শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান বলিয়া পূজা করিতেন। অন্যদল আচার্য্যকেই ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত আছে—

"প্রথমেতে একমত আচার্য্যের গণ।
পাছে দুই মত হৈল দৈবের কারণ।
কেহ আচার্য্যের মত কেহ ত স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র॥"

চৈতন্যভাগবত বলিতেছেন—

"অদ্বৈতেরে ভজে গৌরচন্দ্রে করে হেলা।
পুত্র হউ অদ্বৈতের তবু তেঁহ গেলা॥"

অদ্বৈতের পুত্র অচ্যুত, গোপাল এবং কৃষ্ণমিশ্র চৈতন্যানুগত ছিলেন, বলরাম ও জগদীশ বিরুদ্ধমত পোষণ করিতেন।

আচার্য্যের এক শিষ্য কমলাকান্ত মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে একখানি পত্র লেখেন। ঐ পত্রে অদ্বৈতাচার্য্যকে ঈশ্বর বলিয়া তাঁহার তিনশত মুদ্রা ঋণ পরিশোধের প্রার্থনা জানানো হইয়াছে। পত্রখানি মহাপ্রভুর হস্তগত হওয়ায় তিনি কমলাকান্তকে তিরস্কার করেন।

মহাপ্রভু গোবিন্দকে বলিলেন—

"আচার্য্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর।
ইথে দোষ নাহি আচার্য্য দৈবেত ঈশ্বর॥
ঈশ্বরের দৈন্য করি করিয়াছে ভিক্ষা।
অতএব দণ্ড করি করাইব শিক্ষা॥"

আজ হইতে কমলাকান্তকে আমার এখানে আসিতে দিও না। দণ্ডের কথায় কমলাকান্ত দুঃখিত হইলেন। অতঃপর আচার্য্যদেব মহাপ্রভুকে অনুরোধ করায় তিনি কমলাকান্তকে ক্ষমা করেন এবং উপদেশ দেন—

"প্রভু কহে বাউলিয়া ঐছে কাহে কর।
আচার্য্যের লজ্জাধর্ম্ম হানি সে আচার॥
প্রতিগ্রহ না করিয়ে কভু রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥
মন দুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণস্মৃতি বিনা হয় নিষ্ফল জীবন॥
লোকলজ্জা হয় ধর্ম্ম কীর্ত্তি হয় হানি।
ঐছে কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি॥"

আচার্য্যের পবিত্র জীবন-কথা আলোচনা করিলে মনে হয়, তিনি এই দল-গত দ্বন্দ্ব-কলহের মধ্যে ঐহিক-প্রতিষ্ঠার বহু উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি বর্ণাশ্রমের মধ্যে থাকিয়াও মহাপ্রভুকে ভগবান বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয়। এই পরিচয়েই তিনি বাঙ্গালার সমাজে ও ধর্ম্মান্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

যে যে প্রাচীন গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশদ পরিচয় আছে, সেই সেই প্রাচীন গ্রন্থেই অদ্বৈত প্রভুর অল্প বিস্তর পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তবে তাঁহার জীবনী বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য ঈশান-নাগর 'অদ্বৈত-প্রকাশ' এবং হরিচরণ দাস 'অদ্বৈত মঙ্গল' রচনা করিয়া খ্যাত হইয়াছেন।

অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি [অদ্বৈতসিদ্ধি]—মধুসূদন সরস্বতী রচিত একখানি বৈদান্তিক গ্রন্থ। ইহার অদ্বৈতসিদ্ধ্যুপন্যাস, বৃহট্টীকা ও ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী কর্ত্তৃক রচিত অদ্বৈতচন্দ্রিকা নামে তিন খানি টীকা আছে। ২ সারদানন্দ কাশ্মীর রচিত এক খানি বেদান্ত গ্রন্থ।

অদ্বৈতব্রহ্মসুধা—একখানি বৈদান্তিক গ্রন্থ।

অদ্বৈতভূষণ—একখানি বেদান্তগ্রন্থ।

অদ্বৈতমকরন্দ—লক্ষ্মীধর কবি কর্ত্তৃক রচিত একখানি বৈদান্তিক গ্রন্থ। লক্ষ্মীধর স্বয়ং ইহার রসাভিব্যঞ্জিকা নাম্নী টীকা রচনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন পূর্ণানন্দ তীর্থ, বাসুদেব ও স্বয়ংপ্রকাশ জ্যোতিঃ কৃত ইহার টীকা পাওয়া যায়।

অদ্বৈতমকরন্দসংগ্রহ—একখানি বৈদান্তিকগ্রন্থ।

অদ্বৈতমঙ্গল—মধুসূদন বাচস্পতি কর্তৃক রচিত একখানি বৈদান্তিক গ্রন্থ।

অদ্বৈতমঞ্জরী—একখানি বেদান্তগ্রন্থ। "অদ্বৈতমঞ্জরী-সংস্করণ নামে অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি বহু বেদান্ত-গ্রন্থ কুম্ভকোণম্ (মান্দ্রাজ) হইতে একসময় প্রকাশিত হইয়াছিল।

অদ্বৈতমতসার—একখানি বৈদান্তিক গ্রন্থ।

অদ্বৈতমুক্তাসার—লোকনাথ বিরচিত একখানি বৈদান্তিকগ্রন্থ।

অদ্বৈতমুখর—রঙ্গরাজ রচিত একখানি বেদান্তগ্রন্থ।

অদ্বৈতরত্ন—একখানি বৈদান্তিকগ্রন্থ।

অদ্বৈতরত্নকুলিশ—একখানি বৈদান্তিক বিচারগ্রন্থ।

অদ্বৈতরত্নকোষ—একখানি বৈদান্তিকগ্রন্থ। নৃসিংহাশ্রম ইহার প্রণেতা।

অদ্বৈতরত্নকোষপূরণী—নৃসিংহাশ্রম বিরচিত তত্ত্ববিবেক নামক বৈদান্তিকগ্রন্থের একখানি টীকা।

অদ্বৈতরত্নকোষবিবরণ—একখানি বৈদান্তিকগ্রন্থ।

অদ্বৈতরত্নতত্ত্বদীপিকা—একখানি বৈদান্তিকগ্রন্থ।

অদ্বৈতরত্নরক্ষণ—একখানি বৈদান্তিকগ্রন্থ। আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী ইহা প্রণয়ন করেন। ইহাতে শঙ্কর মিশ্র বিরচিত ভেদ-রত্ন খণ্ডনপূর্ব্বক দ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

অদ্বৈতরসমঞ্জরী—একখানি বৈদান্তিকগ্রন্থ। আচার্য্য সদাশিবেন্দ্র সরস্বতী ইহা প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে অদ্বৈত মতের অবতারণা করা হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ৪৫টী শ্লোকে গ্রন্থটী পূর্ণ। কেহ কেহ বলেন, এই গ্রন্থ সদাশিবের শিষ্য নল্লাপণ্ডিত বিরচিত।

অদ্বৈতরহস্য—রামানন্দতীর্থ বিরচিত একখানি বেদান্ত গ্রন্থ।

অদ্বৈতরীতি—নরসিংহ পদ্মাশ্রমী রচিত একখানি গ্রন্থ।

অদ্বৈতবাদ—ন দ্বৈত অদ্বৈত। দ্বি+ই ধাতু কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ত=দ্বীত। ইহার অর্থ যাহা দুইকে প্রাপ্ত। দ্বীত+ভাবার্থে ষ্ণ=দ্বৈত। ইহার অর্থ দ্বিতীয়ত্ব বা দুই পদার্থের অস্তিত্ব। দ্বীত+স্বার্থে ষ্ণ প্রত্যয় করিয়াও দ্বৈত পদ হয়। তখন অর্থ হইবে যাহা দুইকে প্রাপ্ত তাহা। সুতরাং অদ্বৈত পদের অর্থ—দুই পদার্থের অস্তিত্বের অভাব বা দ্বিতীয়ত্বের অভাব। অথবা যাহা দুইকে প্রাপ্ত হয় নাই তাহা। বদ্ ধাতু ভাবার্থে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া বাদ পদ হয়। ইহার অর্থ যথার্থবিচার। অদ্বৈতের বাদ= অদ্বৈতবাদ, ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস। সুতরাং অর্থ হইল দুই পদার্থের অস্তিত্বের অভাব-সংক্রান্ত যথার্থবিচার বা দ্বিতীয়ত্বের অভাব-সংক্রান্ত যথার্থবিচার, অথবা যাহা দুইকে প্রাপ্ত হয় না বা তৎসংক্রান্ত যথার্থবিচার। এখন যে বস্তুটী দুইকে প্রাপ্ত হয় না, বা যাহার দ্বিতীয়ত্বের অভাব হয়, সেই বস্তুটী জগতের কারণ হয়, তাহা জগৎ বা জগতের অন্তর্গত কোন পদার্থ নহে, যে হেতু জগৎ বা তদন্তর্গত কোন পদার্থের অদ্বৈতভাব সম্ভবপর হয় না। অতএব যে মতে বলা হয়—জগতের যাহা মূল কারণ তাহা দুই নহে, কিন্তু একমাত্র, সেই মতবাদের নাম অদ্বৈতবাদ।

অদ্বৈতবাদের মূল বেদ।

এই অদ্বৈতবাদের মূল সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে বেদ; কারণ, বেদ—বর্ণাত্মক ভাষা, যাবদ্ মনুষ্যোচিত ব্যবহার এবং যাবদ্জ্ঞানের আকর হইলেও অলৌকিক তত্ত্বের সাক্ষাৎভাবে জ্ঞাপক বা উপদেষ্টা। যথা—

"অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বা প্রবৃত্তয়ঃ॥
নামরূপঞ্চ ভূতানাং কর্ম্মণাঞ্চ প্রবর্ত্তনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বরঃ॥
সর্ব্বেষাঞ্চৈব নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥"

(মহাভারত)

এই বেদ মনুষ্যরচিত নহে, নিত্য ঈশ্বরে নিত্যকাল ইহা বর্ত্তমান। বর্ণাত্মক ভাষা মনুষ্যের আবিষ্কৃত নহে। ইহা সর্ব্বজ্ঞের দ্বারা উপদিষ্টা আর মনুষ্য স্বয়ং কখনও অলৌকিক-তত্ত্বের উপদেষ্টা হইতে পারে না। এইরূপ বহু যুক্তি আছে যেজন্য বেদকে মনুষ্যরচিত বলা যায় না। এই বেদই বলিয়া থাকে—জগতের মূলকারণ অদ্বৈতবস্তু। তাই লোকে জগৎ-কারণকে অদ্বৈতবস্তু বলিয়া জানিতে পারিয়াছে। অপৌরুষেয় বেদ—ইহা না বলিলে মানব ইহা জানিতে বা কল্পনা করিতে পারিত না। ইহার কারণ, কোথাও কেবলমাত্র একটী বস্তু দেখা যায় না, এবং যেখানে কোন কিছু উৎপন্ন হয় বা কোন বস্তুতে যখন কোনরূপ ক্রিয়া হয়, তখন তাহা কেবলই নিজে নিজে হয় না। অপর বস্তুর যোগ বা সহকারিতা ভিন্ন হয় না। এই জন্য মানব স্বয়ং জগতের মূলতত্ত্ব অদ্বৈত বলিয়া কল্পনাও করিতে পারে না। না পারিবার আরও কারণ এই যে—দৃষ্টানুরূপই কল্পনা হয়, দৃষ্ট-বিষয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত বস্তুর কল্পনা কেহই করিতে পারে না। এইজন্য বেদমধ্যে জগৎকারণকে অদ্বৈত বলায় মানব তাহা জানিতে পারিয়াছে এবং তাহার সম্ভাবনা ও অসম্ভাবনা বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই বিচারই অদ্বৈত-বাদে বর্ণিত হয়। এইরূপে অদ্বৈতবাদের উৎপত্তি বেদ হইতেই হইয়াছে।

তত্ত্ববিষয়ে উপনিষৎই প্রমাণ।

বেদ হইতে এই বিষয়ে প্রমাণ-প্রদর্শনার্থ আচার্য্যগণ বেদান্ত

বা উপনিষৎ বাক্যকেই উদ্ধৃত করেন। এ জন্য এ স্থলেও নিম্নে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। ইহার কারণ, এই বেদের দুইটী ভাগ—একটী মন্ত্র, অপরটী ব্রাহ্মণ। মন্ত্রেরই অর্থ ও প্রয়োগ ব্রাহ্মণ মধ্যে থাকে। এই উভয় ভাগের মধ্যে তিনটী বিষয় আছে, যথা—কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান। এইজন্য বেদকে কর্ম্মকাণ্ডে, উপাসনাকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডে আবার বিভক্ত করা হয়। কর্ম্মকাণ্ডে যাগযজ্ঞাদির কথা আছে। উপাসনাকাণ্ডে পূজা ও উপাসনার কথা আছে। আর জ্ঞানকাণ্ডে তত্ত্বকথা আছে। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের শেষাংশই জ্ঞানকাণ্ড। এই জন্য ইহাকে "বেদান্ত" বলা হয়। ইহারই অপর নাম "উপনিষৎ"। উপনিষৎ অর্থ রহস্যশাস্ত্র। বস্তুতঃ ইহাতে জীব, জগৎ ও জগৎকারণ ব্রহ্মবিষয়ক রহস্যই বর্ণিত আছে। এজন্য জগতের মূল-কারণের কথা এই বেদান্ত বা উপনিষৎ বা বেদের জ্ঞানকাণ্ড হইতে লব্ধ হয়। তজ্জন্য আচার্য্যগণ বেদের অন্যাংশের প্রমাণ না দিয়া, অদ্বৈতবিষয়ে উপনিষৎপ্রমাণই দিয়া থাকেন। এজন্য এ বিষয়ে উপনিষৎ প্রমাণই এ স্থলে প্রদর্শিত হইল।

অদ্বৈতসম্বন্ধে উপনিষৎপ্রমাণ।

অদ্বৈত ব্রহ্মই জগৎকারণ এই বিষয়টি উপনিষৎদ্বারা প্রমাণিত করিবার জন্য মহর্ষি বেদব্যাস তৈত্তিরীয়-উপনিষৎকে সর্ব্বপ্রথমে গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীর ১ম বাক্যে বলা হইয়াছে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" অর্থাৎ ব্রহ্ম—সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ। এই স্থলে ব্রহ্মকে সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ বলায় অদ্বৈতই বলা হইল। যেহেতু অনন্ত অথচ সত্য ও জ্ঞান-স্বরূপ বস্তু কখনও একাধিক হইতে পারে না। দুইটি সত্যবস্তু থাকিলে তাহাদের সীমা থাকিবে। আর সীমা থাকিলে অনন্ত হইতে পারে না। অন্ত শব্দের অর্থই সীমা। জ্ঞান সম্বন্ধেও সেই কথা। অর্থাৎ বিষয় নানা না থাকিলে জ্ঞানভেদ হয় না, আর বিষয় নানা হইতে গেলে জ্ঞান আর অনন্ত হয় না। এজন্য অদ্বৈত বস্তুর সম্ভাবনা সম্বন্ধে ইহাকেই প্রথম প্রমাণরূপে মহর্ষি বেদব্যাস গ্রহণ করিয়াছেন।

অদ্বৈতব্রহ্মের জগৎকারণতা বিষয়ে উপনিষৎপ্রমাণ।

এখন এই অদ্বৈত ব্রহ্মই জগৎকারণ—ইহা প্রমাণিত করিবার জন্য মহর্ষি বেদব্যাস উক্ত তৈত্তিরীয়-উপনিষদের ভৃগুবল্লীর প্রথম বাক্যটী গ্রহণ করিয়াছেন। সেই বাক্যটী "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম ইতি।" অর্থাৎ যাহা হইতে এই ভূত সকল জন্মিয়াছে, যাহার দ্বারা এই জাত বস্তু সকল জীবিত রহিয়াছে ও যাহাতে প্রয়াণ করিয়া প্রবেশ করে, তাহাই জিজ্ঞাসা কর, তাহাই ব্রহ্ম। এস্থলে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" বাক্যে অদ্বৈত ব্রহ্মের কথা বলিয়া "যতো বা ইমানি" বাক্যে তাহাকেই জগৎকারণ বলায় জগৎকারণকেই অদ্বৈতবস্তু বলা হইল। মহর্ষি বেদব্যাস এই কথাটী তাঁহার ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থের প্রথমেই ব্রহ্ম কি বলিতে গিয়া "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই দ্বিতীয় সূত্রেই এই শ্রুতিটীকে লক্ষ্য করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই কথা অন্য সকল উপনিষদেই আছে। অবশ্য সকল উপনিষৎ আজ আর পাওয়া যায় না। বৌদ্ধগণের স্বধর্ম্মানুরাগের ফলে অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সহস্রা-ধিক বেদশাখায় এক একখানি করিয়া উপনিষৎ ছিল। আজ মাত্র ১০৮ খানিই সুলভ। ইহাদের আবার সকলের মূল শাখাও আজ আর নাই। এজন্য পাশ্চাত্যভাবাপন্ন মনীষিবৃন্দ শাখাহীন উপনিষৎকুসুমগুলিকে আজ আর প্রামাণিক বলিয়া গণ্য করেন না। প্রাচীন বৈদিক পণ্ডিতগণ কিন্তু তাহাদিগকে অপ্রামাণিক বলেন না। তবে তাঁহারা—যাহাদের শাখা তখনও ছিল এবং যাহাতে তত্ত্বকথা অধিক আছে, তাহাদিগকে প্রধান বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। এই দৃষ্টিতে ১০৮ উপনিষদের মধ্যে ৩২ খানি প্রধান বলা হয় এবং সেই ৩২ খানির মধ্যে ১০ খানি অপেক্ষাকৃত প্রধান। আর সেই ১০ খানির মধ্যে একমাত্র মাণ্ডূক্য উপনিষৎকে সর্ব্বপ্রধান বলা হয়। যথা মুক্তিকোপনিষদেঃ—

> "মাণ্ডূক্যমেকমেবালং মুমুক্ষূনাং বিমুক্তয়ে॥ ২৬॥
> তথাপ্যসিদ্ধং চেজ্ জ্ঞানং দশোপনিষদং পঠ।
> জ্ঞানং লব্ধা চিরাদেব মামকং ধাম যাস্যসি॥ ২৭॥
> তথাপি দৃঢ়তা নো চেদ্ বিজ্ঞানস্যাঞ্জনাসুত।
> দ্বাত্রিংশাখ্যোপনিষদং সমভ্যস্য নিবর্ত্তয়॥ ২৮॥
> বিদেহমুক্তাবিচ্ছা চেদষ্টোত্তরশতং পঠ॥ ২৯॥
> সর্ব্বোপনিষদাং মধ্যে সারমষ্টোত্তরং শতম্।
> সকৃৎ শ্রবণমাত্রেণ সর্ব্বাঘৌঘনিকৃন্তনম্" ॥ ৪৪॥

নিম্নে এইরূপ প্রধান কয়েকখানি উপনিষৎ হইতে অদ্বৈতবস্তু যে সম্ভব এবং জগৎকারণই যে সেই অদ্বৈতবস্তু, তদ্বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।

অদ্বৈততত্ত্বের শ্রুতিপ্রমাণ।

(১) ঈশোপনিষৎ—(ক) "অনেজদেকং মনসো জবীয়ঃ॥ ৪॥" এই স্থলে "নিশ্চল ও এক" বস্তুর কথায় সেই অদ্বৈতবস্তুর বিষয়ই কথিত হইল। (খ) "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনু-পশ্যতঃ॥" ৭॥ এই স্থলে "একত্বের অনুদর্শন" বাক্যে সেই অদ্বৈতবস্তুর কথাই বলা হইল।

(২) কেনোপনিষৎ।—(ক) "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি" (১.৩)। এই স্থলে জ্ঞান ও অজ্ঞানের অতীত বলায় সেই অদ্বৈতবস্তুর কথাই বলা হইল। (খ) "যন্মনসা

ন মন্থতে যেনাহুর্মনো মতম্। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ (১.৫) ॥ এস্থলে "মন যাহাকে চিন্তা করিতে পারে না, কিন্তু মন যাহার জ্ঞাত—বলায় সেই অদ্বৈত ব্রহ্মের কথাই বলা হইল। (গ) "যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্" ॥ (২.৩) এই স্থলে অমত ও অবিজ্ঞাত পদ দ্বারা সেই অদ্বৈতবস্তুর কথাই বলা হইল।

(৩) কঠোপনিষৎ—(ক) "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্। তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং, নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে" ॥ (১.৩.১৫) এই স্থলে--অব্যয়, নিত্য, অনাদি, অনন্ত এবং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধহীন ও মহতের পর—বলায় সেই অদ্বৈতবস্তুর কথাই বলা হইল। (খ) "যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥" (২.১.১০) "মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" ॥ (২.১.১১) এই স্থলে—যাহা এখানে, তাহা সেখানে এবং ইহাতে নানা নাই—এই বাক্যে অদ্বৈতের কথাই বলা হইল। (গ) "একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" (২.২.৯.১০.১১)। "একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি"। (২.২.১২) এই স্থলে—"এক সর্ব্বভূতের আত্মা" এবং "এক যিনি বহু হন" বলায় অদ্বৈতের কথাই বলা হইল। (ঘ) "তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখম্। কথং নু তদ্ বিজানীয়াং কিমুভাতি বিভাতি বা ॥" (২.২.১৪) এই স্থলে—সেই বস্তুকে "অনির্দ্দেশ্য" বলায় এবং তাহা "প্রকাশ বা অপ্রকাশ—ইহা জানি না" বলায় সেই অদ্বৈতবস্তুর কথাই বলা হইল।

(৪) প্রশ্নোপনিষৎ—"পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্।" (১.৮) এই স্থলে—"একং" এই পদদ্বারা সেই অদ্বৈতবস্তুকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

(৫) মুণ্ডকোপনিষৎ—(ক) "যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপানিপাদং নিত্যম্। বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥" (১.৬) এই স্থলে—অদ্রেশ্য, অগ্রাহ্য, বিভু, অব্যয়, ভূতযোনি প্রভৃতি শব্দে জগৎকারণকে অদ্বৈতবস্তুই বলা হইল। (খ) "এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" (২.১.৪)। "পুরুষ এবেদং বিশ্বম্" (২.১.১০)। "ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্" (২.২.১১)। "বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপম্" (৩.১.৭) এই স্থলে—সবই সেই ব্রহ্ম বলায় সেই অদ্বৈতবস্তুর কথাই বলা হইল। অচিন্ত্য বলায় অদ্বৈতই বলা হইল।

(৬) মাণ্ডূক্যোপনিষৎ—(ক) "সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম অয়মাত্মা ব্রহ্ম ॥" ২ এই স্থলে—"ব্রহ্মভিন্ন কিছু নাই" বলায় অদ্বৈতব্রহ্মের কথাই বলা হইল। (খ) "অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্ ॥" ৭ "অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈতঃ ॥" ১২ এইস্থলে সেই—ব্রহ্ম বস্তু যে অদ্বৈত, ইহা 'অদ্বৈত' শব্দ দ্বারাই কথিত হইল।

(৭) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ—(ক) "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (২.১) এ স্থলে--"অনন্ত" পদ দ্বারা অদ্বৈত ব্রহ্মের কথাই বলা হইল। (খ) "স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ"। (২.৮, ৩.৪), এস্থলে—"এক" শব্দ দ্বারা সেই ব্রহ্ম অদ্বৈত ইহা বলা হইল। (গ) "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম ॥" (৩.১) এস্থলে—ব্রহ্মে একবচন প্রয়োগ দ্বারা এবং ব্রহ্মকে জন্মস্থিতিলয়ের হেতু বলায় সেই অদ্বৈততত্ত্বেরই উপদেশ করা হইল।

(৮) ঐতরেয়োপনিষৎ—"আত্মা বা ইদমেক একাগ্র আসীৎ (১.১)। "যৎ কিঞ্চ ইদং প্রাণি জঙ্গমঞ্চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরং সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং, প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" ॥ (৫.৩) এ স্থলে—'অগ্রে এক আত্মাই ছিল' বলায় এবং 'প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম' বলায় সেই অদ্বৈত বস্তুর কথাই বলা হইল।

(৯) ছান্দোগ্যোপনিষৎ—(ক) "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাঽদ্বিতীয়ম্" ॥ (৬.২.১) এ স্থলে—"সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় বস্তু ছিল" ইহা অদ্বৈত শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বকই বলা হইল। (খ) "স এব অধস্তাৎ"...(৭.১) "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" (৭.২) এই বাক্যেও সেই অদ্বৈত তত্ত্বের কথাই বলা হইল।

(১০) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—(ক) "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ" (১.৪.১৭) "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ এক এব" (১.৪.১১) "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" (২.৪.৬) এতদ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বৈত আত্মবস্তু বা ব্রহ্ম ছিলেন ইহাই বলা হইল, তৎপরে (খ) "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি,তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, ইতর ইতরং পশ্যতি, ইতর ইতরং শৃণোতি ইতর ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং বিজানাতি যত্র বা অস্য সর্ব্বং আত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ, কেন কং শৃণুয়াৎ,তৎ কেন কমভিবদেৎ, তৎ কেন কং মন্বীত, কেন কং বিজানীয়াৎ। যেন ইদং সর্ব্বং বিজানাতি, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ। বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ ॥" (২.৪.১৪) এতদ্বারা সেই অদ্বৈত বস্তুরই সন্ধান পাওয়া গেল। তাহার পর (গ) "তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যম্ অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ ইত্যনুশাসনম্" ॥ (২.৫.১৯) এই স্থলেও অদ্বৈততত্ত্বের কথাই বলা হইল। আবার (ঘ) অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ।" (৪.৩.১৫, ১৬)। "নতু তদ্দ্বিতীয়মস্তি"। দ্"ততোঽন্য

বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ (৪.৩.২৩-৩০), "যত্র বা অন্যদিব স্যাৎ তত্র অন্যোঽন্যৎ পশ্যেৎ...অন্যোঽন্যৎ বিজানীয়াৎ।" (৪.৩.৩১)। "সলিল একো দ্রষ্টা অদ্বৈতো ভবতি।" (৪.৩.৩২) এই সকল স্থলে অদ্বৈতের কথাই অতি স্পষ্টভাবে এবং শব্দদ্বারাই বলা হইল। এই উপনিষদে এইরূপ কথা বহু স্থলেই আছে।

(১১) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষীচেতা কেবলো
নির্গুণশ্চ" ॥ (৩.১১)

এ স্থলে "এক" "কেবল" ও "নির্গুণ" পদদ্বারা সেই অদ্বৈত-বস্তুরই কথা বলা হইল। এইরূপ যদি অন্যান্য উপনিষৎ হইতে "কেবল" "অদ্বয়" "অদ্বৈত" "অদ্বিতীয়" এই শব্দগুলি সংগ্রহ করা যায় তাহা হইলে বহু বাক্যই লব্ধ হয়। তথাপি তন্মধ্যে কতিপয় যথা—

(১২) কৈবল্যোপনিষৎ—"তদ্ ব্রহ্মাদ্বয়মস্মি অহম্।" ১৯ "গুহাশয়ং নিষ্কলম্ অদ্বিতীয়ম্"। (২.৩) "তমাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং বিভুচিদানন্দমরূপমদ্ভুতম্॥" ৬ এস্থলেও সেই অদ্বৈতবস্তুরই সন্ধান পাওয়া গেল।

(১৩) ব্রহ্মোপনিষৎ—"একমেব পরং ব্রহ্ম বিভাতি ১৮। যস্মিন্নিদং সর্ব্বমোতং প্রোতম্। ১৯। একো দেব সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষীচেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" ॥ ৩৫ ॥ এই স্থলেও সেই এক অদ্বৈততত্ত্বের কথাই বলা হইল।

(১৪) নৃসিংহপূর্ব্বতাপনীয়োপনিষৎ—"শিবমদ্বৈতং চতুর্থম্ (৪.১) এখানেও সেই অদ্বৈততত্ত্বের সন্ধানই পাওয়া গেল।

(১৫) নৃসিংহোত্তরতাপনীয়োপনিষৎ—'সর্ব্বদা দ্বৈতরহিতঃ'। ২ "অদ্বয়ো হ্যয়মাত্মা একল এব"। ৮। "এতদদ্বয়ং স্বপ্রকাশম্...আত্মা এব" ৮॥ "অদ্বয় এব অয়মাত্মা"। ৯ "বিভুরদ্বয় আত্মানন্দঃ"। ৯ "অবিক্রিয়ে অদ্বয়ে" ।৯। "অস্থুখদুঃখোঽদ্বয়ঃ...অভিন্নোঽদ্বয়ঃ"। ৯ "কিমদ্বয়েন দ্বিতীয়মেব ন" ।৯ অব্যবহার্য্যমদ্বয়ম্" ৯। "তদ্ বা এতদ্ব্রহ্ম অদ্বয়ং বৃহত্ত্বাৎ। ৯ "সতঃ সূক্ষ্মং পরিপূর্ণমদ্বয়ম্"। ৯ "সুবিভাতম্ অদ্বয়ং পশ্যত" ।৯ "অনুষ্ঠমদ্বয়ং লব্ধ্বা" ।৯ "নহ্যস্তি দ্বৈতসিদ্ধিঃ"। ৯ "অব্যবহার্য্য কেনচনাদ্বিতীয়ঃ"। ৮ "আত্মৈব সিদ্ধোঽদ্বিতীয়ঃ"। ৯ "অবিকল্পো হ্যয়মাত্মা অদ্বিতীয়ত্বাৎ"। ৮ "অদ্বৈতমচিন্ত্যমলিঙ্গম্" ।৬ "শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্" ।১, "প্রপঞ্চো-পশমঃ শিবোঽদ্বৈতঃ"। ২ এস্থলে সেই অদ্বৈততত্ত্বের কথা এত স্পষ্ট, যে তদধিক স্পষ্ট আর ভাষার দ্বারা অসম্ভব।

(১৬) রামোত্তরতাপনীয়োৎপনিষৎ—"শিবমদ্বৈতং চতুর্থম্" ।৩, "অদ্বৈতপরমানন্দাত্মা"(৫.১), যঃ সচ্চিদানন্দাদ্বৈতৈকরসাত্মা" ।৪৭, "সর্ব্বদা দ্বৈতরহিতঃ"। ৩ এস্থলেও সেই অদ্বৈতেরই কথা বলা হইল।

(১৭) রামপূর্ব্বতাপনীয়োপনিষৎ—"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য" ।৭ এস্থলেও সেই অদ্বৈততত্ত্বেরই কথা।

(১৮) মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ—"ব্রহ্ম হ বা ইদমগ্র আসীৎ একোঽনন্তঃ।" (৬.১৭) "এষ পরমাত্মা অপরিমিতোঽজঃ অতর্ক্যঃ অচিন্ত্যঃ, এষ আকাশাত্মা এবৈষ কৃৎস্নক্ষয়ে একো জাগর্ত্তি" (৬.১৭) "যত্র অদ্বৈতীভূতং বিজ্ঞানং কার্য্যকারণকর্ম্মনির্ম্মুক্তং নির্ব্বচনমনৌপম্যং নিরূপাখ্যং কিং তদবাচ্যম্" (৬.৭) এই স্থলেও সেই অদ্বৈতের কথাই বলা হইল।

এইরূপে অবশিষ্ট সমুদয় উপনিষৎ হইতেই সেই এক অদ্বৈততত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। উপনিষৎ এইভাবে সেই অদ্বৈততত্ত্বের কথা না বলিলে মানব কখনও কল্পনাতেও অদ্বৈতবস্তুর কথা ভাবিতে পারিত না। এইরূপ অদ্বৈততত্ত্বে সন্ধান মানব এই উপনিষৎ হইতেই প্রথমে পায়। অবশ্য দ্বৈতাদি মতবাদে এই সকল শ্রুতির অন্যরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে, কিন্তু ইহাদের স্পষ্টার্থ যে অদ্বৈতবাদে, তাহা ত দেখাই গেল। এস্থলে "অদ্বৈত অদ্বয়" শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে।

আর যে সব দ্বৈতাদি-বোধকশ্রুতি বাক্য আছে, তাহা লৌকিক তত্ত্বের উপদেশক বলিয়া তাহাতে অলৌকিকতত্ত্বোপদেশ হেতু প্রামাণিক বেদের তাৎপর্য্য থাকিতে পারে না বুঝিতে হইবে। অবশ্য উপনিষদ্‌ভিন্ন বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের অবশিষ্ট অংশেও অদ্বৈতব্রহ্ম-বোধক বহু বেদবাক্য আছে। কিন্তু তাহারা তত্ত্বনির্ণয়োদ্দেশে কথিত নহে, পরন্তু কর্ম্ম বা উপাসনার অঙ্গরূপে কথিত। বলা হয় কারণ, বেদের তত্তৎ অংশ বেদান্ত মতে কর্ম্ম ও কর্ম্মাঙ্গ উপাসনার জন্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। এজন্য তাহাদিগকে এস্থলে আর উদ্ধৃত করা গেল না। ফলতঃ দেখা গেল অদ্বৈতবাদের মূল বেদ ইহাতে সংশয় নাই।

অদ্বৈততত্ত্বের অন্য প্রমাণ।

বেদ হইতে অদ্বৈততত্ত্বের সন্ধান পাইবার পর, যুক্তির দ্বারা অদ্বৈততত্ত্বের সম্ভাবনা সিদ্ধির জন্য ঋষি ও আচার্য্যগণ অনুমানাদি প্রমাণের উপন্যাস করিয়াছেন, কিন্তু সেই অনুমানাদি প্রমাণ দ্বৈতের মিথ্যাত্বসিদ্ধির জন্য। যেহেতু দ্বৈতকে মিথ্যা বলিয়া যদি সিদ্ধ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে অদ্বৈত সিদ্ধ হইতে পারে না। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় তাঁহার "অদ্বৈতসিদ্ধি"নামক গ্রন্থে এই জন্য বলিয়াছেন—"তত্র অদ্বৈতসিদ্ধেঃ দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধিপূর্ব্বকত্বাৎ" ইত্যাদি। যাহা হউক, দ্বৈতমিথ্যাত্বের জন্য যে অনুমান প্রদর্শন করা হয়, তাহা এই—

প্রপঞ্চ মিথ্যা.........প্রতিজ্ঞা।

যেহেতু তাহা দৃশ্য জড় পরিচ্ছিন্ন ও অংশ......হেতু।

যেমন শুক্তিরজত.........উদাহরণ।

এই অনুমানটী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য ও 'আত্মতত্ত্বজ্ঞানোপদেশ-বিধি' প্রভৃতি গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছেন। অতঃপর অপরাপর আচার্য্যগণের অনুসরণ করিয়া আচার্য্য শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'অদ্বৈতসিদ্ধি' নামক গ্রন্থে ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি এই অনুমানটীকে অবলম্বন করিয়া যাবদ্ বিরুদ্ধবাদীর আক্রমণ খণ্ডন করিয়া অদ্বৈত সিদ্ধ করিয়া "অদ্বৈত-সিদ্ধি" নামক গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন।

মিথ্যাত্বের লক্ষণ।

এখন প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিতে গেলে মিথ্যাত্ব কাহাকে বলে তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা হয়। এজন্য উক্ত গ্রন্থে মিথ্যাত্বের পাঁচটী লক্ষণ প্রদর্শন করা হইয়াছে, যথা—

২। সৎ ও অসৎ হইতে যাহা অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ ভিন্ন তাহা মিথ্যা।

২। প্রতিপন্ন উপাধিতে ত্রৈকালিক নিষেধের যাহা প্রতি-যোগী তাহাই মিথ্যা।

৩। যাহা জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় তাহাই মিথ্যা।

৪। যাহা স্বাশ্রয়নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী তাহাই মিথ্যা।

৫। যাহা সদ্‌বিবিক্ত তাহাই মিথ্যা।

ইহাদের তাৎপর্য্য এই যে, যাহার সত্তা নাই অথচ যাহা দৃশ্য হয়, অর্থাৎ জ্ঞেয় হয়, তাহাই মিথ্যা। যেমন রজ্জুতে সর্প কোন কালেই থাকে না, কিন্তু ভ্রমকালে রজ্জুকে সর্প বলিয়া দেখা যায়। এজন্য রজ্জুসর্পকে মিথ্যা বলা হয়। মিথ্যা শব্দের এইরূপ অর্থে উপরি উক্ত অনুমানদ্বারা যাবদ্ দৃশ্য অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ বস্তুতঃ নাই, কিন্তু দৃশ্য হয় বলিয়া মিথ্যা বলা হয়।

অসৎ শব্দের অর্থ।

বন্ধ্যার পুত্র, আকাশকুসুম প্রভৃতি দেখা যায় না এবং তাহাদের সত্তাও নাই। এজন্য তাহারা মিথ্যা নহে। পরন্তু তাহাদিগকে অসদ্ বলা হয়।

ব্রহ্ম মিথ্যাও নহে অসৎও নহে।

আর "অদৃশ্যে অনিরুক্তে" "সূক্ষ্মোঽগ্রাহ্যঃ অদৃশ্যঃ" "যত্তদদ্রেশ্যম্ অদৃষ্টম্ অব্যবহার্য্যম্" "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যবলে ব্রহ্মও দৃশ্য হন না, অথচ "অনাদ্যনন্তম্" "অজোঽনিত্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবলে তিনি অনাদি, অনন্ত ও নিত্য বলা হয়। এজন্য তাঁহাকে মিথ্যা বলা হয় না, কিন্তু তাঁহাকে সৎস্বরূপ বলা হয়। সুতরাং মিথ্যার অর্থ ইল—যাহা নাই অথচ জ্ঞানগোচর হয়, তাহাই মিথ্যা।

জগন্মিথ্যাত্বানুমানদ্বারা ব্রহ্মসিদ্ধি।

এইরূপ উপরি উক্ত অনুমান দ্বারা জগতের বা দ্বৈতের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয় বলিয়া অদ্বৈততত্ত্ব সিদ্ধ হয়। দ্বৈত মিথ্যা হইলে অদ্বৈতসিদ্ধ হইবার কারণ—মিথ্যার আশ্রয় সৎই হয়। যেমন রজ্জু-সর্পের আশ্রয় যে রজ্জু, তাহা রজ্জুসর্প অপেক্ষা সৎই হয়। আর তজ্জন্য দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধির দ্বারা সেই মিথ্যা দ্বৈতের আশ্রয় একটী অদ্বৈততত্ত্ব সিদ্ধ হয়। ইহাই হইল অদ্বৈতসিদ্ধির পক্ষে অনুমান প্রমাণ। [এ সম্বন্ধে অধিক জানিতে হইলে অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থ দ্র°।]

অদ্বৈতবাদের স্বরূপ।

অদ্বৈতবাদের স্বরূপ—"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"। অর্থাৎ ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মই, তদ্ভিন্ন নহে। ইহা ভগবন্ শঙ্করাচার্য্যের উক্তি। অদ্বৈতবাদের ইহাই সার কথা।

ব্রহ্ম শব্দের অর্থ।

এই ব্রহ্ম শব্দের অর্থ—যাহা বৃহৎ তাহা। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে (৩৩৬.২) শ্লোকে আছে।

"বৃহদ্ ব্রহ্মমহচ্চেতি শব্দাঃ পর্য্যায়বাচকাঃ।"

ভামতীমধ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে।—

"বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাদ্ বাত্মৈব ব্রহ্মেতি গীয়তে"। ফলতঃ যাহা অপেক্ষা বৃহৎ আর নাই, যাহা সকলের পুষ্টির হেতু তাহাই ব্রহ্ম।

ব্রহ্মের স্বরূপ উপনিষদ্‌বেদ্য।

কিন্তু ব্রহ্ম শব্দে যথার্থ কি বুঝিতে হইবে, তাহা উপনিষৎ হইতে জানিতে হইবে। কারণ, এই কথা উপনিষদেই বলা হইয়াছে, যথা—

(ক) "তদ্ ব্রহ্ম উপনিষৎপরম্" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ১.১৬) (ব্রহ্মোপনিষৎ ৪৫) অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম উপনিষৎ হইতে জ্ঞাতব্য।

(খ) "তং তু ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৩.৯.২৬) অর্থাৎ উপনিষদ্‌বেদ্য পুরুষের কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

(গ) "অমায়মপি ঔপনিষদম্" (নৃসিংহোত্তরতাপনীয়ো-পনিষৎ ৯.২০) অর্থাৎ মায়াবর্জ্জিত ব্রহ্ম উপনিষদ্‌বেদ্য, ইত্যাদি। অতএব ব্রহ্ম কি, তাহা উপনিষৎ হইতেই জানিতে হইবে।

ব্রহ্মের উপনিষদ্‌বেদ্যত্বে হেতু।

অবশ্য সকলের মূল এক অলৌকিক বস্তুকে জানিতে হইলে যে, সর্ব্বজ্ঞের নিত্য অভ্রান্ত বাক্যদ্বারা জানিতে হইবে, তাহার প্রতি যুক্তিও আছে। কারণ, তাদৃশ বস্তুকে যদি যুক্তিদ্বারা নির্ণয় করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন ব্যক্তির অনুভব অনুসারে তাহা বিভিন্ন রূপই হইয়া যাইবে। তখন আর সকলের নিঃসংশয় হইবার সম্ভাবনাও থাকিতে পারিবে না। কিন্তু যাহা

সর্ব্বজ্ঞের নিত্য অভ্রান্ত বাক্য বলিয়া স্বীকৃত হয়, তদবলম্বনে তাহা জানিতে চেষ্টা করিলে সকলের নিঃসংশয় হইবার সম্ভাবনা থাকে। বস্তুতঃ এই জন্যও সেই সর্ব্বকারণকারণ ব্রহ্মবস্তুকে উপনিষৎ দ্বারাই জানিবার চেষ্টা করা আবশ্যক।

স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ।

উপনিষদ্ মধ্যে এই ব্রহ্মের যে লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা স্বরূপ ও তটস্থ ভেদে দ্বিবিধ বলা হয়। যে লক্ষণদ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বস্তুর জ্ঞান হয়, তাহা স্বরূপলক্ষণ, এবং যে লক্ষণদ্বারা অন্য বস্তুর সাহায্যে কোন বস্তুর জ্ঞান হয়, তাহাকে তটস্থলক্ষণ বলে। যেমন 'ঐ উজ্জল বস্তুটী চন্দ্র' বলিলে চন্দ্রের স্বরূপলক্ষণ বলা হয়। কিন্তু "আকাশস্থ যে উপগ্রহের জন্য সমুদ্রে জোয়ার ভাটা হয়" বলিয়া চন্দ্রের যখন জ্ঞান হয়, তখন উক্ত জোয়ার ভাটার সম্পাদকত্ব ধর্ম্মটীকে চন্দ্রের তটস্থলক্ষণ বলা হয়।

ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ।

এ স্থলে ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ, উপনিষদে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অধিক নহে, যথা—(ক) "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ উঃ ২.১) অর্থাৎ যাহা সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত তাহা ব্রহ্ম। তাহার পর (খ) "সচ্চিদানন্দময়ং পরং ব্রহ্ম" (নৃঃ পূঃ তঃ উঃ ১.৬) অর্থাৎ যাহা সৎ চিৎ ও আনন্দ তাহাই পরম ব্রহ্ম। তাহার পর (গ) "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং সচ্চিদানন্দরূপম্" (নৃসিংহ উঃ তাঃ উঃ ৭.৫) (ঘ) "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম", (ঐতরেয়োপনিষৎ ৫.৩) (ঙ) "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃঃ আঃ উঃ ৩.২) (চ) "বিভুং চিদানন্দমরূপমদ্ভুতম্" (কৈবল্যোপনিষৎ ১.৬) ইত্যাদি স্থলে আনন্দ, জ্ঞান, বিজ্ঞান ইত্যাদি শব্দদ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই ব্রহ্মবস্তুকে বুঝান হইল। এজন্য ইহাদিগকে ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ বলা যায়।

ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ।

ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ বহুই আছে। তন্মধ্যে ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্র-গ্রন্থে যাহা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা এই—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি,
যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ ব্রহ্ম" (তৈঃ উঃ ২.১)

অর্থাৎ যাহা হইতে এই ভূতসকলের জন্ম, স্থিতি ও লয় হয়, তাহাই ব্রহ্ম। তদ্রূপ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্" (ছাঃ উঃ ৩.১৪.১) অর্থাৎ এই সকলই ব্রহ্ম, তাহাকে তজ্জ, তল্ল, ও তদন বলিয়া উপাসনা করিবে। এই স্থলে ব্রহ্মভিন্ন বস্তুর দ্বারা ব্রহ্মের পরিচয় দেওয়ায় ইহাকে ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ বলা হয়।

সগুণনির্গুণভেদে ব্রহ্ম দ্বিবিধ।

এই ব্রহ্মকে সগুণ ও নির্গুণভেদে আবার দ্বিবিধ বলা হয়। সগুণ ব্রহ্মকে সাকার, নিরাকার এবং উভয়রূপও বলা হয়। ইহারই নাম ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট্ প্রভৃতি। ইহাকে কার্য্য-ব্রহ্ম, কারণব্রহ্ম, পরমেশ্বর, মহেশ্বর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও বিধাতা প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। নির্গুণ ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষে নিরাকার শুদ্ধব্রহ্ম কেবলব্রহ্ম, পরব্রহ্ম বলা হয়। নির্গুণব্রহ্ম জ্ঞেয় বা উপাস্য হন না। সগুণব্রহ্মই জ্ঞেয় বা উপাস্য হন। সগুণব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধ হয়। নির্গুণব্রহ্ম অসঙ্গ, তাহার সহিত সম্বন্ধও সম্ভব হয় না। এজন্য তাঁহাকে অদ্বৈতবস্তু বলা হয়। নির্গুণব্রহ্মই সত্য; সগুণব্রহ্ম জীবজগতের ন্যায়ই মিথ্যা। শ্রুতিমধ্যে সগুণ ও নির্গুণ উভয়বিধ ব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে। তবে তাহা কখন বা পৃথক্‌ভাবে, কখন বা মিশ্রিতভাবে বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে নির্গুণ-ব্রহ্মবোধক কতিপয় শ্রুতি যথা—

নির্গুণবোধক শ্রুতি।

(১) ঈশোপনিষৎ—

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ" ॥৫

অর্থাৎ তাহা চলেন, তাহা চলেন না, তাহা দূরে, তাহা নিকটে, তাহা সকলের অন্তর, তাহা সকলের বাহ্য। বস্তুতঃ এতাদৃশ বিরুদ্ধ কথন দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইল।

(২) কেনোপনিষৎ—

"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনো।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ ॥ ৩

অর্থাৎ সেখানে চক্ষু যায় না, বাক্ বা মনও যায় না, আমরা তাঁহাকে জানি না, তাঁহার বিষয় কিরূপ উপদেশ দিতে হয় তাহাও জানি না। ইহাও নির্গুণ ব্রহ্মে সুসঙ্গত হয়। নির্গুণই বাক্যমনের যথার্থ অগোচর।

"অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথোঽবিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে ন স্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে ॥" ৩

অর্থাৎ তিনি জ্ঞাত হইতে অন্য, তিনি অবিদিত হইতে অতীত, পূর্ব্বাচার্য্যগণের নিকট এইরূপ শুনিয়াছি, যাঁহারা আমাদের নিকট তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। নির্গুণই জ্ঞানের অতীত হয়, এজন্য ইহা নির্গুণবোধক শ্রুতি।

(৩) কঠোপনিষৎ—

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং, নিচায্য তৎ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে" ॥
(১.৩.১৫)

অর্থাৎ তিনি—অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, নিত্য এবং অগন্ধ, তিনি অনাদি, অনন্ত, মহতের পর, ধ্রুব, তাহাকে জানিয়া মৃত্যুর মুখ হইতে মুক্ত হয়। অশব্দাদি বলায় নির্গুণই বলা হইল।

"তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখম্।
কথং নু তদ্ বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা" ॥ (২.২.১৪)

এই স্থলে অনির্দ্দেশ্য ও অজ্ঞেয় বলায় নির্গুণ ব্রহ্মের কথাই বলা হইল।

"অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
যজ্ জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি" ॥ (২.৩.৮)

এস্থলে অব্যক্তের পর, ব্যাপক ও অলিঙ্গ বলায় সেই নির্গুণ ব্রহ্মই বলা হইল।

"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে" ॥ (২.৩.১২)

এস্থলে বাক্য, মন প্রভৃতির অগোচর ও সত্তামাত্র বলায় সেই নির্গুণ ব্রহ্মেরই পরিচয় প্রদত্ত হইল।

(৪) প্রশ্নোপনিষৎ—

"তদচ্ছায়মশরীরম্ অলোহিতং শুভ্রম্ অক্ষরম্ ॥" (৪.১০)

অর্থাৎ তিনি অজ্ঞানরহিত, শরীররহিত, গুণরহিত, শুদ্ধ এবং অক্ষর। ইহাও নির্গুণব্রহ্মেই সঙ্গত।

"শান্তম্ অজরম্ অমৃতম্ অভয়ং পরঞ্চ ইতি"। (৫.৭)

অর্থাৎ তিনি সর্ব্ব-প্রপঞ্চবর্জ্জিত, অজর, অমৃত্যু, অভয় ও নিরতিশয়। অতএব ইহাও সেই নির্গুণ ব্রহ্মেরই কথা।

(৫) মুণ্ডকোপনিষৎ—

"দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥" (২.১.২)

অর্থাৎ সেই পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিঃ, অমূর্ত্ত, বাহ্য ও অভ্যন্তরে বর্ত্তমান, জন্মরহিত, অপ্রাণ, অমনাঃ, শুদ্ধ, পর ও অক্ষর হইতেও পর। অতএব ইহাও নির্গুণ ব্রহ্মবোধক।

"বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্" ॥ (৩.১.৭)

অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম বৃহৎ, স্বয়ম্প্রভ, অচিন্ত্য, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতররূপে প্রকাশমান। দূর হইতে সুদূরে, তাহাই আবার এখানে নিকটে, জ্ঞানিজনের হৃদয়ে নিহিত। অতএব ইহাও নির্গুণ ব্রহ্মবোধক।

(৬) মাণ্ডূক্যোপনিষৎ—

"অদৃষ্টম্ অব্যবহার্য্যম্ অগ্রাহ্যম্ অলক্ষণম্ অচিন্ত্যম্ অব্যপদেশ্যম্ একাত্মপ্রত্যয়সারম্ প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্"। এতদ্দ্বারাও নির্গুণ ব্রহ্মেরই কথা বলা হইল।

(৭) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" (১.২)

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" (২.৪)

এসব কথাও নির্গুণ ব্রহ্মেই সঙ্গত হয়।

(৯) ছান্দোগ্যোপনিষৎ—

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যৎ শৃণোতি, নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমা" (৭.২৪.১)

"অশরীরং বাবসন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" (৮.১২.১)

অর্থাৎ যেখানে অন্য দেখে না, অন্য শ্রবণ করে না, অন্য জানে না, তাহাই ভূমা। অশরীর আত্মাকে প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করে না। এসব কথাও নির্গুণ ব্রহ্মেই সঙ্গত হয়।

(১০) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—(ক) "তদেতদ্ব্রহ্ম অপূর্ব্বম্ অনপরম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্ অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ ইতি অনুশাসনম্"। (২.৫.৮) (খ) "অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্ অলোহিতম্ অস্নেহম্ অচ্ছায়ম্ অতমঃ অবায়ু অনাকাশম্ অসঙ্গম্ অরসম্ অগন্ধম্ অচক্ষুষ্কম্ অশ্রোত্রম্ অবাক্ অমনঃ অতেজস্কম্ অপ্রাণম্ অমুখম্ অমাত্রম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্, ন তদশ্নাতি কিঞ্চন" (৩.৮.৮) (গ) "স এষ নেতি নেতি আত্মা", "অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে" "অশীর্য্যো ন হি শীর্য্যতে" "অসঙ্গো ন হি সজ্যতে" (২.২.৪)। (ঘ) অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" (৪.৩.১৫)। এ সকল নির্গুণ ব্রহ্মেই সুসঙ্গত হয়।

(১১) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—

"সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ"। (৬.১১)
নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" ॥ (৬.১৯)

এস্থলে নির্গুণ শব্দ দ্বারাই সেই ব্রহ্মের বর্ণন করা হইয়াছে।

(১২) নারায়ণোপনিষৎ—

"নারায়ণ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্। নিষ্কলঙ্কো নিরঞ্জনো নির্ব্বিকল্পো নিরাখ্যাতঃ শুদ্ধো দেব একো নারায়ণো ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চিৎ।" ২। এস্থলেও সেই নির্গুণ বস্তুই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

এইরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম বিষয়ে বহু শ্রুতিই আছে।

সগুণ ব্রহ্মবোধক শ্রুতি।

(১) ঈশোপনিষৎ—

"অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি" ॥৪
"সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যথাতথ্যতোঽর্থান্,
ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ" ॥৮।

(২) কেনোপনিষৎ—

"ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে... তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনম্ ইত্যুপাসিতব্যম্" (৩য় ৪র্থ খণ্ড)

(৩) কঠোপনিষৎ—

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" (১.২.২০)

"আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।" (১.২.২১)

I

"অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থিতেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ (১.২.২২)
যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ॥ (১.২.২৫)
পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ। (২.১.১)
যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈতৎ।(২.১.৩)
য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈতৎ।(২.১.৫)
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্যেতি কশ্চন"। এতদ্বৈতৎ (২.২.৮)

(৪) প্রশ্নোপনিষৎ—

"অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা"॥ (৬.৬)

(৫) মুণ্ডকোপনিষৎ—

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ, যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥ (১.৭) যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাৎ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ। তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি"। (২.১.১)

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি" ; (২.২.৭)
"স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।" (৩.২.১)

(৬) মাণ্ডুক্যোপনিষৎ—

"এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্য্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্॥" ৬।

(৭) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ—

"সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, স তপোঽতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বম্ অসৃজত যদিদং কিঞ্চ, তৎ সৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ॥ (২.৬)

"ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে, ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ" (২.৮)
"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"। (৩.১)

(৮) ঐতরেয়োপনিষৎ—

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ, স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি" ॥ (১.১)

(৯) ছান্দোগ্যোপনিষৎ—

"সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" (৩.১৪.৪)। "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" (৬.২.৩) "য আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুঃ বিশোকঃ অবিজিঘৎসঃ অপিপাসঃ, সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, স সর্ব্বাংশ্চ লোকান্ আপ্নোতি, সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানং অনুবিদ্য বিজানাতীতি"। (৮.৭.১)

(১০) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—

"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ"(১.৪.১)"অয়মাত্মা বাঙ্ময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ"।(১.৫.৩ "স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি। তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যমিতি। প্রাণা বৈ সত্যম্, তেষামেষ সত্যম্" (২.১.২০) "স বা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ অধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা" (২.৫.১৫) "এষ তে আত্মা অন্তর্য্যাম্যমৃতঃ"। (৩.৭—৩.২৩)

(১১) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—

"মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ" ॥ (৪.১০)

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। (৬.৮) স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদ্যাত্মযোনির্জ্ঞঃ কালকালো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ। প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ॥ (৬.১৬) জ্ঞঃ সর্ব্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা" ॥ (৬.১৭)

এইরূপ সগুণ ব্রহ্ম বিষয়েও বহু শ্রুতিই আছে। এস্থলে এই সগুণ শ্রুতি দেখিয়া কেহ নির্গুণ শ্রুতিকে সগুণ অর্থে ব্যাখ্যা করেন, কেহ সগুণকে নির্গুণ অর্থে ব্যাখ্যা করেন, কেহ বা ব্রহ্মকে সগুণ নির্গুণ উভয়ই এক কালে সত্য বলেন। আর আধুনিক ক্রমোন্নতিবাদিগণ ক্রমোন্নতির চিন্তাধারার স্তরভেদ বলিয়া বেদের অভ্রান্ততাই অস্বীকার করেন, অর্থাৎ সকল মতই অভ্রান্ত নহে—বলেন। অদ্বৈতবাদী নির্গুণকেই সত্য বলেন এবং সগুণকে উপাসনাদির নিমিত্ত আবশ্যক, কিন্তু বস্তুতঃ মিথ্যা বলেন। ইহার প্রধান কারণ তাঁহারা এই নির্দ্দেশ করেন যে, বেদের প্রামাণ্য অলৌকিক তত্ত্বজ্ঞাপনে। লৌকিকতত্ত্বজ্ঞাপন করিলে বেদ অনুবাদক হয়। অনুবাদক শব্দ প্রমাণ হয় না। বাস্তবিক যাহা প্রত্যক্ষ করা যায় বা অনুমিত হয়, তাহার জন্য অপরের কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির হয় না।

নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ে অনুমানপ্রমাণ।

শ্রুতি হইতে নির্গুণ ব্রহ্মের সম্ভাবনা জানিবার পর যদি অনুমানাদি প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা এইরূপ—অদ্বৈততত্ত্ব প্রমাণ করিবার জন্য যেমন দ্বৈতমিথ্যাত্বে অনুমান প্রদর্শিত হয়, এস্থলেও তদ্রূপ নির্গুণতত্ত্ব বুঝিতে হইলে সগুণতত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হয়। যথা—সগুণ বলিতে গুণবিশিষ্ট বুঝায়,

অতএব যাহা গুণবিশিষ্ট, তাহা গুণ হইতে পৃথক হইয়া থাকে। তাহারই অপর নাম বিশেষ্য এবং গুণকে অন্য কথায় বিশেষণ বলা হয়। বিশেষ্য ও বিশেষণ কখনই অভিন্ন হয় না। অভিন্ন হইলে বিশেষ্যবিশেষণসম্বন্ধ হইতে পারে না। যেমন "দণ্ডী পুরুষ" বলিলে দণ্ডরূপ বিশেষণটী বিশেষ্য পুরুষ হইতে পৃথক্ই হয়, অভিন্ন হয় না। তদ্রূপ ঘট নিজে নিজ হইতে অভিন্ন বলিয়া সে তাহার বিশেষণ হয় না। ঘট নিজে কখনও ঘটবিশিষ্ট হয় না। অবশ্য "নীল ঘট" বলিলে, নীলবিশিষ্ট ঘট বুঝাইয়াও নীল ও ঘটকে একেবারে পৃথক্ বুঝায় না। এজন্য মীমাংসকমতে নীলগুণের সহিত ঘটদ্রব্যের ভেদাভেদ সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়। কিন্তু তাহা হইলেও নৈয়ায়িকমতে ভেদ সম্বন্ধই স্বীকার করা হয়। বেদান্তমতে কিন্তু ভেদাভেদ সম্বন্ধই মান্য করা হয়, কিন্তু সেই সম্বন্ধ পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া ভেদকে মিথ্যা বলা হয়। আর তাহার ফলে বিশেষণ 'গুণ'ই মিথ্যা হয়, আর বিশেষ্য 'ব্রহ্ম'ই সত্য হয়।

এখন শ্রুতি ও যুক্তি উভয়বিধ প্রমাণদ্বারা সমানভাবে সগুণ ব্রহ্ম জানা যায় বলিয়া, সেই সগুণের গুণটী ন্যায়মতে ভিন্ন হওয়ায় মীমাংসকমতে অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন হওয়ায় এবং বেদান্তমতে মিথ্যা হওয়ায়, সেই গুণভিন্ন একটী সত্য বস্তু অনুমান করিতে কোন বাধা হয় না। অতএব "সগুণ" এই ভাবদ্বারা নির্গুণের নিষেধমুখে একটা জ্ঞান হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ সগুণ বুঝিতে গেলে নির্গুণকে অগ্রেই বুঝিতে হইবে। যেমন "দণ্ডী পুরুষ" বুঝিতে গেলে দণ্ড ও পুরুষকে পৃথক্‌ভাবে না জানিয়া বুঝা যায় না। তদ্রূপ নীলঘটকে বুঝিতে গেলে, নীল ও ঘটকে পৃথক্‌ভাবে না জানিয়া বুঝা যায় না। তদ্রূপ সগুণ ব্রহ্ম বুঝিতে গেলে গুণ ও ব্রহ্মকে পৃথগ্‌ভাবে না বুঝিয়া জানা যায় না। মীমাংসকমতে যে বিশেষ্য-বিশেষণে ভেদাভেদ সম্বন্ধ বলা হয়, সেই ভেদাভেদ সম্বন্ধমধ্যে ভেদকে মিথ্যা না বলায়, অথচ তাহারা পরস্পরবিরুদ্ধ হইয়া 'একটী' সম্বন্ধ হওয়ায় উহাকে ফলতঃ অনির্ব্বচনীয়ই বলা হইল। কারণ, দুইটী পরস্পরবিরুদ্ধ মিলিয়া 'একটী' হইলে, সেই 'একটী' সেই পরস্পরবিরুদ্ধ হইতে অতিরিক্ত হইবে। তদ্দ্বারা উভয়ের কার্য্য হইবে, কিন্তু সে উভয়রূপ নহে। ইহাই ত অনির্ব্বচনীয়তা। কারণ, যাহার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ কথা বলা যায়, তাহার সম্বন্ধে শ্রোতার কোন নিশ্চয়ই হয় না। আর ভেদাভেদকে দুইটী সম্বন্ধ বলিলে মীমাংসক ভেদবাদীই হইবেন। কারণ, ভেদ আর তখন অভেদের বিরোধী হইবে না। কেহ কেহ আবার বলেন—সৎ ও অসৎ মিলিয়া বস্তুর স্বরূপ হয়। যেমন "ক" ও "ক-নয়" মিলিয়া "ক" হইয়া থাকে। "ক"কে বুঝিতে গেলে "ক-নয়"কে বুঝিতেই হইবে, ইত্যাদি। সুতরাং ভেদাভেদ বিরুদ্ধ হইলেও 'একটী' স্বলিয়া স্বীকার্য্য। কিন্তু ইহাতেও অনির্ব্বচনীয়ই বলা হয়। "ক-নয়" দ্বারা "ক"কে বুঝিলেও "ক-নয়" কখন "ক" হয় না। অথচ উহা আবশ্যক বলিয়া "ক" এর স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়ই হয়। আর "ক-নয়"কে বুঝিতে গেলে "ক"কে বুঝাও আবশ্যক হয়। আবার 'ক'কে বুঝিতে গেলে "ক-নয়"কে বুঝা আবশ্যক হয়। এইরূপে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। এই দোষ হইতে কোন বস্তু সিদ্ধ হয় না, সুতরাং অনির্ব্বচনীয়ই বলিতে হয়। আর তজ্জন্য সৎ ও অসৎ মিলিয়া বস্তুর স্বরূপ হয় না। বিরুদ্ধ কখনও বুদ্ধিগোচর হয় না। এজন্য তাহার সত্তার স্বীকার অসঙ্গত। ফলতঃ সগুণ বুঝিতে গেলে নির্গুণকে অগ্রেই বুঝিতে হয়। কিন্তু নির্গুণকে বুঝিতে গেলে সগুণকে বুঝা আবশ্যক নহে। অতএব "সগুণ" এই ভাবদ্বারা নির্গুণের সম্ভাবনা সিদ্ধ হয়।

এস্থলে মীমাংসক-মতের অনুসরণ করিয়া কেহ কেহ বলেন—নীলঘটের নীল ও ঘটকে পৃথক্ করিয়া বুঝিবার পর "নীলঘট" এই বিশিষ্টবোধ হইলেও নীলবস্তু ও ঘটবস্তু ভিন্নাভিন্নই থাকে। বুঝিবার জন্য প্রথমে পৃথক্ করিয়া পরে বিশিষ্টাকার হয় মাত্র। বস্তুতঃ বস্তু সর্ব্বদা স্বভাবতঃ ভিন্নাভিন্নই থাকে। নচেৎ অভিন্নবোধ হয় কেন? এই যুক্তিতে ব্রহ্ম সগুণই সর্ব্বদা, তাঁহাকে নির্গুণরূপে বুঝাটা কল্পনামাত্র। দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদের ইহা একটী মূল সূত্র।

অদ্বৈতবাদী বলেন—নীলঘট যদি স্বভাবতঃই নীলবিশিষ্ট হয়, তবে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিবার পর তাহাকে লালঘট বলা হয় কেন? ঘটের ভেদ না করিয়াই বর্ণভেদ করা হয় কেন? এস্থলে গুণ ও গুণীর সম্বন্ধ নিত্য নহে, আর নিত্য না হওয়ায় বস্তুকে নির্গুণ বলা অসঙ্গত নহে।

যদি বলা হয়—নীলঘটই লালঘট হয়, বর্ণহীন ঘট একক্ষণও থাকে না, অতএব নির্গুণকল্পনা ব্যর্থ। কিন্তু তাহাও সঙ্গত নহে। একটী বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য বর্ণ হইলে, মধ্যস্থলে বর্ণহীনতা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ নীল ও লালের মধ্যে ভেদস্বীকার ব্যর্থ। নৈয়ায়িকেরা উৎপত্তিকালীন ঘটকে নির্গুণই বলেন। অতএব যাহাকেই সগুণ বলা হয়, তাহার নির্গুণ অবস্থা স্বীকার্য্য হয়।

যদি বলা হয়, সেই নীলঘট লালবর্ণ প্রাপ্ত হইবার সময় সেই ঘট একেবারে বর্ণহীন হয় না, কিন্তু নীল ও লালের মধ্যবর্ত্তী বর্ণসমূহের মধ্য দিয়া লালরূপতা প্রাপ্ত হয় মাত্র। সেই মধ্যবর্ত্তী বর্ণসমূহ চক্ষু গ্রহণ করিতে পারে না। অতএব এ সময় এবং উৎপত্তিকালেও ঘটাদি নির্গুণ নহে। কিন্তু তাহা হইলে বলিতে হইবে—নীল ও লালের মধ্যে যে ভেদ, তাহা ভেদও বটে অভেদও বটে, অর্থাৎ তাহা অনির্ব্বচনীয়। কারণ, নীল শব্দে

তাহা হইলে কখনই ঠিক্ নীল বুঝায় না। অতএব নির্ব্বচনীয় ঘটের নীল অনির্ব্বচনীয় হওয়ায় নীলহীন ঘটের জ্ঞান আর ভ্রম হয় না। অর্থাৎ বর্ণহীন ঘট অবশ্য স্বীকার্য্য।

আর যদি বলা হয়—উৎপত্তিকালে ঘট যথার্থ নির্গুণ হইলে তাহাতে বর্ণোৎপত্তি হইতে পারে না। ঘটে কপালগত বর্ণের সজাতীয় বর্ণোৎপত্তির যোগ্যতাই তাহার নিজ বর্ণের উৎপত্তির হেতু। এই যোগ্যতাই তাহার অব্যক্ত বর্ণসত্তা ইত্যাদি। তাহা হইলে বলিব—যাহা থাকিয়াও এবং দর্শনযোগ্য হইয়াও দৃশ্য হয় না, তাহাই ত অনির্ব্বচনীয়। অথবা যাহা যথার্থ অদৃশ্য হইয়া পরে দৃশ্য হয় তাহাই অনির্ব্বচনীয়। আর যাহা অনির্ব্বচনীয় হয় তাহার মূলে যে সদ্ বস্তু থাকে, তাহার সহিত সেই অনির্ব্বচনীয় বস্তুর সম্বন্ধও কল্পিত হয়। এইরূপে অনির্ব্বচনীয়স্বভাব সগুণ-বস্তুর দ্বারা তাহার মূল নির্গুণবস্তুর সত্তা সিদ্ধ হয়। নির্গুণের জ্ঞান ভিন্ন সগুণের জ্ঞান হয় না, আর নির্গুণের জ্ঞানের জন্য সগুণের জ্ঞান অনাবশ্যক বলিয়া, যেহেতু বস্তু দেখিবামাত্র 'একটা কিছু' বলিয়াই জ্ঞান হয়, তাহার গুণ বা প্রকার পরে উদিত হয়। ইহাতে সগুণের দ্বারা নির্গুণেরই লাভ হয়।

এই বিষয়ে উভয় পক্ষে বহু বিচার আছে। পরিশেষে কিন্তু অদ্বৈতবাদীই এস্থলে জয়ী হন। যাহা হউক, এজন্য সগুণ ব্রহ্ম শ্রুতি এবং যুক্তিদ্বারা সমানভাবেই বুঝা যায় বলিয়া সগুণ এই ভাবমাত্রদ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মের সম্ভাবনা বুঝা যাইতে বাধা হয় না। অবশ্য এই সম্ভাবনার কথা কাহারও মনে উদিতই হইত না, যদি শ্রুতি সেই নির্গুণ ব্রহ্মের কথা বলিয়া না দিতেন। এইরূপে শ্রুতি দ্বারা নির্গুণের কথা জানিবার পর, শ্রুতিভিন্ন প্রমাণ যে অনুমানাদি, তাহার দ্বারাও নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান সম্ভব হয়। অবশ্য ইহা নিষেধমুখে এবং পরোক্ষ জ্ঞান। নির্গুণের অপরোক্ষ জ্ঞান হইতে গেলে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়-ভাব থাকে না। এই জন্যই বলা হয় "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মই হন।

সগুণ ব্রহ্মবিষয়ে অন্য প্রমাণ।

শ্রুতি হইতে সগুণ ব্রহ্মের কথা জানিয়াই অনুমানাদি প্রমাণ দ্বারা সগুণ ব্রহ্মের জ্ঞান হওয়া সম্ভব। অবশ্য কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের জ্ঞানলাভ হইলে জগদ্রূপ কার্য্যের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত ব্যক্তির 'সগুণ একটী কারণের' জ্ঞানলাভ হইতে পারে। কারণ, একটী বীজ হইতে বৃক্ষ হইয়া নানা ফুল ফল ও বীজ প্রদান করে—দেখা যায়। একটী মৃৎপিণ্ড হইতে মৃন্ময় বহু বস্তু হয়—দেখা যায়। এইরূপে "বহুর কারণ এক হয়" ইহা বুঝা যায়। আবার ঘটাদি কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কারণরূপ যে মৃৎপিণ্ড থাকে, ঘটাদি কার্য্যনাশে সেই কারণরূপ মৃৎপিণ্ডই পরিদৃষ্ট হয়। এইরূপে কার্য্যকারণভাব পর্য্যালোচনা করিলে কারণের একত্ব বা অল্পত্ব, নিত্যত্ব বা স্থায়িত্ব প্রভৃতি এবং কার্য্যের বহুত্ব ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি বুঝিতে পারা যায়। সেই যুক্তি জগদ্রূপ কার্য্যে প্রয়োগ করিলে সর্ব্বকারণের কারণ এক নিত্য সগুণতত্ত্বে উপনীত হইতে হয়। অবশ্য শ্রুতি হইতে একের সন্ধান না পাইলে ইহা সম্ভব হয় না। তথাপি এইরূপ সিদ্ধান্তে অনেক আপত্তি উঠিতে পারে, কিন্তু তাহার মীমাংসারও পথ আছে। এই বিচারপদ্ধতি বেদান্ত ও ন্যায়শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। ন্যায়শাস্ত্র-মধ্যে ইহাকে কার্য্য দেখিয়া কারণানুমান বলা হয়। জগৎকারণ বিষয়ে সেই অনুমানের আকার যথা—

(১) ক্ষিতিঃ সকর্ত্তৃকা,......(প্রতিজ্ঞা)
কার্য্যত্বাৎ............(হেতু)
ঘটবৎ...............(উদাহরণ)

এতদ্দ্বারা লাঘবতর্কসাহায্যে নৈয়ায়িক জগতের কর্ত্তা একটী চেতনের অনুমান করেন। ন্যায়মতে ইনিই ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম। অবশ্য এই অনুমানকে বিপক্ষের আক্রমণ হইতে মুক্ত করিবার জন্য বহু কথা উঠিয়াছে। তাহা ন্যায়কুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি বহু গ্রন্থমধ্যে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বেদান্তদর্শনমধ্যে ২য় অধ্যায় প্রথমপাদে সাংখ্যমত খণ্ডনপ্রসঙ্গে জগতের চেতন-কর্ত্তৃকত্ব সিদ্ধ করা হইয়াছে। এই চেতনসমষ্টিকে বেদান্তে ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। নৈয়ায়িকের ঈশ্বরসিদ্ধিতে বেদান্তীর বিরোধ থাকিলেও জগতের চেতনকর্ত্তৃকত্বে বিরোধ নাই। আর সেই চেতনসমষ্টিকে ঈশ্বর বলিতেও বাধা নাই। নৈয়ায়িকের ঈশ্বর ও জীব বিভিন্ন বস্তু এবং ঈশ্বর নিমিত্তকারণ। বেদান্তে তাহাদের সমষ্টিব্যষ্টি সম্বন্ধ এবং ঈশ্বর অভিন্ননিমিত্তোপা-দান কারণ। নৈয়ায়িক যে লাঘবতর্ক-সাহায্যে জগৎকর্ত্তা চেতনকে "এক" বলেন, বেদান্তীও তদবলম্বনেই বলেন—চেতনের একত্ব স্বীকারেই গৌরব হয়। এজন্য বেদান্তমতে ঈশ্বরসিদ্ধিতে শ্রুতিই মুখ্য প্রমাণ। তর্কযুক্তি তাহার সহায়মাত্র বলা হয়। বৌদ্ধ, সাংখ্য ও জৈনগণ জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর স্বীকার করিলেও তাহারা মুক্ত জীবের যে সর্ব্বজ্ঞত্ব স্বীকার করেন, তাহার দ্বারা সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা আবশ্যকই হয়। সাংখ্যসূত্রে "ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা" (৩.৫৭) "সহি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা" (৩.৫৬) স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈন সর্ব্বজ্ঞত্ব মানিয়াও সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব মানেন না, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞত্ব হইলে সর্ব্বকর্ত্তৃত্বশক্তি অবশ্যম্ভাবী। যাহা হউক, অনুমান-প্রমাণদ্বারা সগুণ ব্রহ্ম যেরূপ সিদ্ধ হয়, তাহা এতদ্দ্বারা বুঝা যায়। মহামতি উদয়না-চার্য্য তাহার কুসুমাঞ্জলিগ্রন্থে আরও ৮টী অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা—

"কার্য্যায়োজনধৃত্যাদেঃ পদাৎ প্রত্যয়তঃ শ্রুতেঃ।
বাক্যাৎ সংখ্যাবিশেষাচ্চ সাধ্যো বিশ্বজিদব্যয়ঃ॥"

(২) সর্গাদ্যকালীনদ্ব্যণুকপ্রযোজকম্ কর্ম্ম প্রযত্নজন্যম্...(প্রতিজ্ঞা)
কর্ম্মত্বাৎ (হেতু)
যথা ঘটঃ (উদাহরণ)

(৩) গুরুত্ববতাং পতনাভাবঃ পতনপ্রতিবন্ধকপ্রযত্নপ্রযুক্তঃ (প্রতিজ্ঞা)
ধৃতিত্বাৎ (হেতু)
পক্ষিপতনাভাববৎ (উদাহরণ)

(৪) ব্রহ্মাণ্ডনাশঃ প্রযত্নজন্যঃ (প্রতিজ্ঞা)
নাশত্বাৎ (হেতু)
ঘটনাশবৎ (উদাহরণ)

(৫) ঘটাদিব্যবহারঃ স্বতন্ত্রপুরুষপ্রযোজ্যঃ (প্রতিজ্ঞা)
ব্যবহারত্বাৎ (হেতু)
আধুনিককল্পিতলিপ্যাদিবৎ (উদাহরণ)

(৬) বেদজন্যপ্রমা বক্তৃযথার্থবাক্যার্থজ্ঞানজন্যা (প্রতিজ্ঞা)
শাব্দপ্রমাত্বাৎ (হেতু)
চৈত্রবাক্যজন্যপ্রমাবৎ (উদাহরণ)

(৭) বেদঃ অসংসারিপুরুষপ্রণীতঃ (প্রতিজ্ঞা)
বেদত্বাৎ (হেতু)
যন্নৈবং তন্নৈবং যথা মহাভারতাদিকাব্যম্
(ব্যতিরেকদৃষ্টান্ত) (উদাহরণ)

(৮) বেদঃ পৌরুষেয়ঃ (প্রতিজ্ঞা)
বাক্যত্বাৎ (হেতু)
যন্নৈবং তন্নৈবং যথা ভারতাদিকাব্যম্ (ব্যঃ দৃঃ) (উদাহরণ)

(৯) দ্ব্যণুকপরিমাণজনিকা সংখ্যা অপেক্ষাবুদ্ধিজন্যা (প্রতিজ্ঞা)
একত্বান্যসংখ্যাত্বাৎ (হেতু)
যথা দ্বিত্বাদয়ঃ (উদাহরণ)

এস্থলে প্রথম অনুমানে অর্থাৎ—

"ক্ষিতিঃ সকর্ত্তৃকা, কার্য্যত্বাৎ, যথা ঘটঃ"

এই অনুমানে ঈশ্বরনাস্তিত্ববাদী "শরীরজন্যত্ব"কে উপাধি বলেন এবং সেই উপাধিদ্বারা একটী সৎপ্রতিপক্ষের অনুমান করেন, যথা—

"ক্ষিতিঃ কর্ত্তৃজন্যত্বাভাববতী, শরীরজন্যত্বাভাবাৎ, যথা ব্যোম"

আর তাহার ফলে ঈশ্বরাস্তিত্ববাদীর ঈশ্বরানুমানটী দুষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু ইহার প্রতিবিধানার্থ ঈশ্বরাস্তিত্ববাদী, আবার ঈশ্বরনাস্তিত্ববাদীর অনুমানে উপাধি প্রদর্শন করেন। সেই উপাধিটী এস্থলে "প্রাগভাবাপ্রতিযোগিত্ব"। এখন এতদ্দ্বারা ঈশ্বরনাস্তিত্ববাদীর অনুমানে ব্যভিচার বা সৎপ্রতিপক্ষ আবার প্রদর্শিত হয়। সুতরাং ঈশ্বরনাস্তিত্ববাদীর অনুমান দুর্ব্বল হইতেছে। এতদ্ব্যতীত ঈশ্বরাস্তিত্ববাদীর অনুমানে কার্য্যকারণসম্বন্ধরূপ অনুকূলতর্ক থাকায় তাহাই প্রামাণিক হয়, আর ঈশ্বরনাস্তিত্ববাদীর অনুমানে তাহা না থাকায় তাহা অপ্রযোজক হইয়া যায়। এইরূপ বহু বিচারদ্বারা নাস্তিক পক্ষের আস্তিকগণ কর্ত্তৃক খণ্ডন করা হইয়াছে।

তথাপি এই সকল অনুমানদ্বারা ঈশ্বরবিষয়ে সম্ভাবনা মাত্র সিদ্ধ হয়, শ্রুতির দ্বারা তাহার নিশ্চয় হয়—ইহাই বেদান্তের মত। যাহা হউক এইরূপে "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈবনাপরঃ" এই অদ্বৈতবাদের স্বরূপপ্রসঙ্গে ব্রহ্মের পরিচয় কথিত হইল, এক্ষণে "সত্য" পদের অর্থ কিরূপ তাহা দেখা যাউক।

সত্য শব্দের অর্থ।

সত্য শব্দের অর্থ—যাহা তিনকালে একরূপ থাকে, কোনরূপ পরিবর্ত্তিত হয় না এবং যাহা "সৎ" এই বুদ্ধির জনক। "ঘট আছে" "পট আছে" ইত্যাদিস্থলে যে "আছে" পদ, ইহাই সেই সদ্বস্তুর পরিচায়ক। সুতরাং যাবদ্ জ্ঞানের বিষয়মধ্যে যে "সৎ" বা "অস্তি" বলিয়া বোধ হয়, সেই সদ্ বা অস্তিবোধের উপাধি সেই যাবদ্ বিষয়কে ত্যাগ করিলে যে নিরুপাধিক অস্তিত্বরূপ বস্তুটী থাকে, তাহাকেই সদ্ বা সত্য বলা হয়, এই সত্য বস্তুটী দৃশ্য হয় না, অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় হয় না। আর জ্ঞানের বিষয় হয় না, অথচ সৎস্বরূপ বলিয়া ইহা জ্ঞানস্বরূপই বলিতে হইবে। কারণ, আমরা নিরুপাধিক সৎচিন্তা করিতে গেলে জ্ঞানস্বরূপ একটা ভাব-বস্তুতে অবশিষ্ট হইয়া যাই। নিরুপাধি সদ্বস্তু এবং নির্বিষয় জ্ঞান ও সৎও জ্ঞানস্বরূপই হয়। আর এইরূপে ইহা অভাবরূপ নহে বলিয়া ইহাকে আনন্দ বা সুখস্বরূপও বলা হয়। শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি এই বিষয়টীর প্রতি ধ্যান করিলে এই বিষয়ের কতকটা আভাস পাইয়া থাকেন। এইরূপে সেই সত্যবস্তু যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ বস্তু, তাহাও বুঝিতে পারেন। ইহারই চরম ফল বা অনুভূতি, শ্রুতিমধ্যে "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদি বহুবিধ বাক্যে বলা হইয়াছে।

"ব্রহ্ম সত্য" বাক্যের অর্থ।

এইরূপে "ব্রহ্ম সত্য" এই বাক্যদ্বারা যাহা বলা হইল, তাহাতে ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলা হইল। আর তদ্দ্বারাই "জগৎ মিথ্যা" ও "জীব ব্রহ্ম ভিন্ন নহে" ইহাও বলা হইল। "জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম ভিন্ন নহে" এই অংশটী ব্রহ্ম সত্য বাক্যেরই বিবৃতি মাত্র।

জগৎ শব্দের অর্থ।

"ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা, জীব ব্রহ্মভিন্ন নহে" এই বাক্যের অন্তর্গত "ব্রহ্ম সত্য" বাক্যের অর্থ আলোচিত হইল। এইবার "জগন্মিথ্যা" বাক্যের অন্তর্গত "জগৎ" পদের অর্থ কি, তাহাই

আলোচ্য। জগৎ পদের অর্থ ব্রহ্ম বা জীব এবং বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতি অসদ্বস্তুভিন্ন যাবদ্ বস্তুকে বুঝায়। অন্য কথায়, যাহা জ্ঞানের বিষয় হয় বা দৃশ্য হয়, তাহাই জগৎ। জগৎ শব্দের অর্থ—গমনশীল অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল। এই পরিবর্ত্তনশীলই জ্ঞানের বিষয় হয়। যাহা অপরিবর্ত্তনশীল, তাহাই নিত্য সদ্বস্তু, কেবল তাহা কখনই জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ দৃশ্য হয় না। তদ্রূপ যাহা অসৎ, যেমন বন্ধ্যার পুত্র, তাহাও জ্ঞানের বিষয় হয় না। এই জন্য জগৎশব্দে সৎ ও অসৎ ভিন্ন যাহা; তাহাই বুঝায়। অসদ্বস্তু নাই বলিয়া জ্ঞানের বিষয় হয় না। আর সদ্বস্তু নিত্য, একরূপ ও অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া জ্ঞানের বিষয় হয় না। অতএব এই দুই ভিন্ন যাহা, তাহাই জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাই অনিত্য, তাহাই নিত্যপরিবর্ত্তনশীল, তাহাই জগৎ। সুতরাং এই পঞ্চভূত, এই পাঞ্চভৌতিক পদার্থ, এই দেহ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, অজ্ঞান বা প্রকৃতি এবং দেব, ঋষি যত কিছু সকলই জগৎপদবাচ্য।

মিথ্যা শব্দের অর্থ।

"জগৎ মিথ্যা" এই বাক্যের অন্তর্গত মিথ্যা শব্দের অর্থ এইবার আলোচ্য। কিন্তু ইহার অর্থ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ যাহা নাই অথচ দেখা যায় তাহাই মিথ্যা অথবা যাহা সদসদ্ভিন্ন তাহাই মিথ্যা, অর্থাৎ যাহা অনির্ব্বচনীয় তাহাই মিথ্যা। যেমন রজ্জুতে সর্প নাই, তবুও কখন কখন দেখা যায়। এই রজ্জুসর্পই মিথ্যাপদবাচ্য।

জগন্মিথ্যা বাক্যের অর্থ।

এইরূপে জগন্মিথ্যা এই বাক্যের অর্থ এই যে, যাবৎ দৃশ্যপ্রপঞ্চ সৎও নহে, অসৎও নহে, কিন্তু সদসদ্ভিন্ন অর্থাৎ দেখা যায়, কিন্তু নাই। সুতরাং জগৎ আছে বলিয়া দেখা যায়—এরূপ নহে, কিন্তু দেখা যায় বলিয়া 'আছে' বলা হয় মাত্র। যেমন রজ্জুসর্পকে দেখা যায় বলিয়া 'আছে' বলা হয়, কিন্তু রজ্জুসর্প থাকায় 'আছে' বলা হয় না। এই সত্তাকে প্রাতিভাসিক সত্তা বলা হয়, জগতের সত্তাও এইরূপই বটে। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিশেষ থাকায় জগতের সত্তাকে ব্যাবহারিক সত্তা বলা হয়।

প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক সত্তার পরিচয়।

এই 'বিশেষ' এস্থলে এই যে রজ্জুসর্পের অধিষ্ঠানজ্ঞান সহজেই হয়; যেমন আলোক আনিলেই রজ্জুদর্শন হয় এবং তাহার ফলে সর্প, সর্পজ্ঞান এবং তজ্জন্য ব্যবহার বিনষ্ট হয়, কিন্তু জগতের অধিষ্ঠান যে ব্রহ্ম, তাহার জ্ঞান সহজেই হয় না। সুতরাং রজ্জুদর্শনে যেমন সত্তঃসত্তই সর্প, সর্পজ্ঞান ও সর্পব্যবহার অন্তর্হিত হয়, জগদ্দর্শন সেরূপ সহজে অন্তর্হিত হয় না। শাস্ত্রসাহায্যে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিলেও সহজে জগদ্দর্শন রহিত হয় না এবং জগদ্ব্যবহারও নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু শুদ্ধচিত্তে নিরন্তর নিদিধ্যাসনের ফলে অধিষ্ঠান ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইলে তাহা হইয়া থাকে। এই প্রভেদের জন্যই জগতের সত্তা ব্যাবহারিক সত্তা এবং রজ্জুসর্পের সত্তা প্রাতিভাসিক সত্তা বলা হয়। বস্তুতঃ উভয়ই মিথ্যা অর্থাৎ অধিষ্ঠানজ্ঞাননাশ্য। প্রত্যক্ষ ভ্রমে অধিষ্ঠান-প্রত্যক্ষই ভ্রমনাশক হয়। পরোক্ষ ভ্রমে অধিষ্ঠানপরোক্ষই ভ্রমনাশক হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষভ্রমে অধিষ্ঠানপরোক্ষ ভ্রমনাশক হয় না। বাধক সমবল বা অধিকবল হওয়া আবশ্যক।

পারমার্থিক সত্তার পরিচয়।

এই প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক সত্তা ভিন্ন আর একটী সত্তা স্বীকার করা হয়। তাহা পারমার্থিক সত্তা নামে অভিহিত হয়। ইহাই ব্রহ্মের সত্তা বা ব্রহ্ম স্বয়ম্। কারণ, ব্রহ্ম ও সত্তা ভিন্ন নহে। ব্রহ্মে ধর্ম্মধর্ম্মিভাব নাই বলিয়া এই সত্তা ব্রহ্মের ধর্ম্ম বলা হয় না। কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপই বলা হয়। জগন্মিথ্যা বলায় এই পারমার্থিক সত্তাস্বরূপ ব্রহ্মের কথাই প্রকারান্তরে বলা হইল। প্রাতিভাসিকসত্তা হইতে ব্যাবহারিক সত্তা অধিক, এবং ব্যাবহারিক সত্তা অপেক্ষা পারমার্থিক সত্তাই অধিক। এজন্য প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক সত্তাই মিথ্যা। আর পারমার্থিক সত্তাই সত্য বলা হয়।

জগন্মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে অনুমানপ্রমাণ।

"জগন্মিথ্যা" ইহার শ্রুতি প্রমাণ এবং অনুমান প্রমাণ উভয়ই প্রদর্শন করা হয়। তন্মধ্যে একটী অনুমান প্রমাণ ইহার পূর্ব্বেই অদ্বৈততত্ত্বসিদ্ধির প্রসঙ্গে প্রদর্শন করা হইয়াছে, যথা—

(১) প্রপঞ্চ মিথ্যা	(প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু তাহা দৃশ্য বা জড় বা পরিচ্ছিন্ন বা অংশ	(হেতু)
যেমন রজ্জুসর্পপ্রভৃতি	(উদাহরণ)

এস্থলে এজন্য ইহার অপর কতিপয় অনুমানপ্রমাণ মাত্র প্রদর্শিত হইতেছে। এই সব অনুমানদ্বারা শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় মাধ্বসম্প্রদায়ের ব্যাসাচার্য্যকৃত ন্যায়ামৃত নামক গ্রন্থোক্ত জগৎসত্যত্বানুমান খণ্ডন করিয়া জগৎমিথ্যাত্বকে আরও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

(১) ব্রহ্মজ্ঞানেতরাবাধ্যব্রহ্মান্যসত্ত্বানধিকরণত্বং পারমার্থিকসত্তাধিকরণবৃত্তি	(প্রতিজ্ঞা)
ব্রহ্মাবৃত্তিত্বাৎ	(হেতু)
শুক্তিরূপ্যত্ববৎ পরমার্থসদ্ভেদাচ্চ	(উদাহরণ)
(২) প্রপঞ্চঃ মিথ্যা	(প্রতিজ্ঞা)
ব্রহ্মান্যত্বাৎ	(হেতু)
শুক্তিরূপ্যবৎ	(উদাহরণ)
(৩) পরমার্থসত্ত্বং স্বসমানাধিকরণান্যোন্যাভাব-প্রতিযোগ্যবৃত্তি	(প্রতিজ্ঞা)

সদিতরাবৃত্তিত্বাৎ (হেতু)
ব্রহ্মত্ববৎ (উদাহরণ)

(৪) ব্রহ্মত্বম্ একত্বং বা সত্ত্বব্যাপকম্ (প্রতিজ্ঞা)
সত্ত্বসমানাধিকরণত্বাৎ (হেতু)
অসদ্‌বৈলক্ষণ্যবৎ (উদাহরণ)

(৫) ব্যাপ্যবৃত্তিঘটাদিজন্যাভাবাতিরিক্ত-
স্বসমানাধিকরণাভাবমাত্রপ্রতিযোগী (প্রতিজ্ঞা)
অভাবপ্রতিযোগিত্বাৎ (হেতু)
অভিধেয়ত্ববৎ (উদাহরণ)

(৬) অত্যন্তাভাবঃ প্রতিযোগ্যবচ্ছিন্নবৃত্তিঃ (প্রতিজ্ঞা)
নিত্যাভাবত্বাৎ (হেতু)
অন্যোন্যাভাববৎ (উদাহরণ)

(৭) অত্যন্তাভাবত্বং প্রতিযোগ্যশেষাধিকরণ-
বৃত্তিমাত্রবৃত্তিপ্রতিযোগ্যবচ্ছিন্নবৃত্তিমাত্রবৃত্তি বা (প্রতিজ্ঞা)
নিত্যাভাবমাত্রবৃত্তিত্বাৎ (হেতু)
অন্যোন্যাভাবত্ববৎ (উদাহরণ)

(৮) ঘটাত্যন্তাভাববত্ত্বং স্বপ্রতিযোগিজনকাভাব-
সমানাধিকরণবৃত্তি এতৎকপালসমানকালীনৈতদ্‌ঘট (প্রতিজ্ঞা)
প্রতিযোগিকাভাব বৃত্তিত্বাৎ (হেতু)
প্রমেয়ত্ববৎ (উদাহরণ)

(৯) এতৎকপালম্ এতদ্‌ঘটাত্যন্তাভাবাধিকরণম্ (প্রতিজ্ঞা)
আধারত্বাৎ (হেতু)
পটাদিবৎ (উদাহরণ)

(১০) ব্রহ্মত্বং ন পরমার্থসন্নিষ্ঠান্যোন্যাভাব-
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকম্ (প্রতিজ্ঞা)
ব্রহ্মবৃত্তিত্বাৎ (হেতু)
অসদ্‌বৈলক্ষণ্যবৎ (উদাহরণ)

এইরূপে জগন্মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে আরও ১৭টী অনুমান অদ্বৈত-সিদ্ধি গ্রন্থের "মিথ্যাত্বে বিশেষানুমান" পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধির প্রতিবাদ, ন্যায়ামৃতের টীকা তরঙ্গিণী নামক গ্রন্থে করা হইয়াছে, কিন্তু এই ২৭টী অনুমান সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই—দেখা যায়। অবশ্য এই অনুমান করিবার প্রবৃত্তি, শ্রুতি হইতে জগন্মিথ্যাত্ব জানিবার পর হইয়াছে। শ্রুতি জগন্মিথ্যাত্ব না বলিয়া দিলে এরূপ অনুমানের প্রবৃত্তি আমাদের হইত না।

জগন্মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণ।

জগন্মিথ্যা সম্বন্ধে যে সব শ্রুতিপ্রমাণ পাওয়া যায় তাহার মধ্যে কতিপয় এই—

(১) ঈশোপনিষৎ—

"তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ" ॥৫

অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই সকলের অন্তর ও সকলের বাহ্য। এতদ্দ্বারা 'সকল' পদবাচ্য দৃশ্য পদার্থকে মিথ্যাই বলা হইল। কারণ, কোন কিছুর ভিতর বাহির ব্যতীত তাহার আর কিছুই থাকে না। এখন সবই যদি ব্রহ্ম হন, তবে তাঁহাতে জগৎ দেখিলে জগৎকে মিথ্যাই বলা হইল।

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে" ॥ ৬

এই স্থলে সর্ব্বভূতকে আত্মার এবং আত্মাকে সর্ব্বভূতে দেখায় আত্মা ও সর্ব্বভূতের আধারাধেয়ভাব আর থাকিল না। ভিন্ন বস্তুতেই আধারাধেয়ভাব থাকে। অতএব এক আত্মাই সিদ্ধ হইল; আর তজ্জন্য আত্মভিন্ন সর্ব্ব ভূত মিথ্যাই হইল।

"যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ ॥" ৭

এস্থলে 'যে সময় সমুদায় ভূত আত্মাই হয়' এইরূপ বলায় এবং জ্ঞানের ফলেই শোক মোহ নাশ প্রাপ্ত হয় বলায়, এক আত্মাই সত্য, আর অন্য সব অজ্ঞান অর্থাৎ মিথ্যা—ইহাই বলা হইল। এব-কারের দ্বারা আত্মভিন্ন বস্তুর নিরাস করা হইল। সর্ব্বভূত আত্মভিন্ন সত্য বস্তু হইলে, তাহা আর আত্মা হইতে পারিত না। এজন্য আত্মভিন্ন বস্তু মিথ্যা।

(২) কঠোপনিষৎ—

"যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" ॥ (২.১,১০)

"মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" ॥ (২.১.১১)

এস্থলে ব্রহ্মে নানার মত দেখার নিন্দা এবং ব্রহ্মে নানা নাই বলায় ব্রহ্মভিন্ন সব মিথ্যাই বলা হইল। যাহা নাই তাহাকে দেখিলে তাহা মিথ্যাই হয়।

"যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্ব্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম" ॥ (২.১.১৫)

এস্থলে জীবমুক্তিতে ব্রহ্মই হইয়া যায় বলায় জীবত্বের মিথ্যাত্বই কথিত হইল। ভিন্ন বস্তুদ্বয় কখনও অভিন্ন একবস্তু হয় না। আর হইলে ভিন্নতাই মিথ্যা বলিতে হইবে।

(৩) প্রশ্নোপনিষৎ—

"স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যতে তাসাং নামরূপে, সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে, এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুঃ ইমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে, স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি।"

এস্থলে জীব ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন হয় বলায় জীবত্বকে মিথ্যাই বলা হইল। জীব যদি সত্য হইত, তবে তাহার নামরূপ নষ্ট হইয়া তাহা ব্রহ্ম হইতে পারিত না।

(৪) মুণ্ডকোপনিষৎ—

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্" ॥

এস্থলেও ঠিক্ প্রশ্নোপনিষদের মত (৩.২.৮) জগন্মিথ্যা বলা হইল।

(৫) মাণ্ডূক্যোপনিষৎ—

"সংবিশতি আত্মনা আত্মানং য এবং বেদ" এস্থলে জানার ফলে আত্মার দ্বারা আত্মাতে প্রবেশ করে বলায়, না জানায় প্রবেশ করা হয় না, ইহাও বলা হইল। অর্থাৎ অজ্ঞাননাশই প্রবেশ বলা হইল। সুতরাং আত্মভিন্নকে মিথ্যাই বলা হইল।

(৬) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ—

"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ, নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ নিলয়ঞ্চানিলয়ঞ্চ বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ, সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ যদিদং কিঞ্চ তৎ সত্যমাচক্ষতে।" (২.৬)

এই স্থলে 'ব্রহ্মই সব হইলেন' বলায় এবং ব্রহ্মকেই সত্য বলা হয় বলিয়া ব্রহ্মভিন্নকে মিথ্যাই বলা হইল, কারণ, ব্রহ্ম সত্য সত্য এই সব হইলে তিনি আর স্ব-স্বরূপে নাই বলিতে হয়।

(৭) ঐতরেয়োপনিষৎ—

"সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" ॥ (৫.৩)

এস্থলে সমুদায় প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত এবং সেই প্রজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলায় ব্রহ্মভিন্নকে মিথ্যাই বলা হইল।

(৮) ছান্দোগ্যোপনিষৎ—

"যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" (৬.১.৪)

এস্থলে মৃত্তিকাই সত্য বলায় অন্য সব মিথ্যা বলা হইল।

(৯) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—

(ক) "আত্মনো বারে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্ব্বং বিদিতম্"। (২.৪.৫)

এখানে আত্মাকে জানায় সব জানা যায় বলায় সকল বস্তু আত্মাতেই কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা বলিতে হইবে। এই সব আত্মভিন্ন হইলে আত্মার জ্ঞানে আর ইহাদের জ্ঞান হইত না।

(খ) "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি—যত্র বা অস্য সর্ব্বম্ আত্মা এবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ...বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" (২.৫.১৪)

এস্থলে 'দ্বৈতের ন্যায় হইলে ব্যবহার হয়, আর আত্মা হইলে ব্যবহার হয় না এবং বিজ্ঞাতাকে কি দিয়া জানিবে'—বলায় 'আত্মভিন্ন আর সত্য কিছুই নাই' ইহাই বলা হইল।

(গ) "যত্র বা অন্যদিব স্যাৎ তত্রান্যঃ অন্যৎ পশ্যেৎ" (৪.৩.৩৬) এস্থলে অন্যের ন্যায় হইলে অন্য অন্যকে দেখে বলায় অন্যকে মিথ্যা বলা হইল।

(ঘ) "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি"। (৪.৪.১৯)

ইহা কঠোপনিষদেও আছে। ব্রহ্মে নানা নাই বলায় নানাকে মিথ্যাই বলা হইল।

(১০) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—

(ক) "অন্তে বিশ্বমায়া নিবৃত্তিঃ"। (১.১০)

বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি বলায়, বিশ্বকে মায়া অর্থাৎ মিথ্যাই বলা হইল।

(খ) "জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ" (১.১১) "জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ" (২.১৫,৪.১৬,৬.১৩) "জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি" (৪.১৫) এস্থলে জ্ঞানের পরই সর্ব্ব পাশ নষ্ট হয় বলায়, জগৎরূপ সর্ব্বপাশকে মিথ্যাই বলা হইল।

(১১) মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ—

(ক) "ইন্দ্রজালমিব মায়াময়ং স্বপ্ন ইব মিথ্যাদর্শনম্, কদলীগর্ভ ইব অসারম্, নট ইব ক্ষণবেষম্, চিত্রভিত্তিরিব মিথ্যামনোরথম্" (৪.২) এস্থলে জগৎকে স্পষ্টভাবে শব্দদ্বারাই মিথ্যা বলা হইল।

(খ) "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ। অথ যন্মূর্ত্তং তদসত্যম্ যদমূর্ত্তং তৎ সত্যং তদ্ ব্রহ্ম" ॥ (৬.৩)

এস্থলে ব্রহ্মভিন্নকে অতি স্পষ্ট কথায় অসত্যই বলা হইল। এইরূপ অপর বহু শ্রুতিতেই জগতের মিথ্যাত্ব স্পষ্টভাবেই ঘোষিত হইয়াছে। অতএব কি অনুমান, কি শ্রুতি—সকল প্রমাণ বলেই জগৎ মিথ্যা ইহা সিদ্ধ হইল।

জীব শব্দের অর্থ।

অদ্বৈতবাদের স্বরূপনির্ণয়প্রসঙ্গে 'ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা' এই বাক্যদ্বয়ের অর্থ ও প্রমাণ প্রদর্শিত হইল। এইবার, "জীব—ব্রহ্মই তদ্ভিন্ন নহে" এই অংশের বিষয় আলোচ্য। এতদনুসারে জীবশব্দের অর্থ প্রথম আলোচ্য। জীবশব্দের অর্থটী—প্রতিবিম্ববাদ, আভাসবাদ, অবচ্ছেদবাদ এবং এক-জীববাদ বা দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ অনুসারে চারি প্রকারে বুঝান হয়।

ব্রহ্ম হইতে জীব ও জগতের আবির্ভাব॥

পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকারের মতবাদমধ্যে সাধারণভাবে জীবতত্ত্বটী বুঝিতে হইলে ব্রহ্ম হইতে জীবজগতের আবির্ভাবটী বুঝা আবশ্যক হয়। তাহা এইরূপ—ব্রহ্ম সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক মায়া বা প্রকৃতিরূপ উপাধিবশে জীব, ঈশ্বর ও জগদ্রূপ

হইয়াছেন। এই মায়া বা প্রকৃতি অবিদ্যা বা অজ্ঞানের সমষ্টি। তন্মধ্যে সমষ্টিরূপা মায়া শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা এবং ব্যষ্টিরূপা অবিদ্যা মলিনসত্ত্বপ্রধানা বলা হয়। প্রতিবিম্ববাদ অনুসারে মায়াপ্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই ঈশ্বর এবং অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই প্রাজ্ঞজীব, আর মায়া বা অজ্ঞানের পরিণতি এই স্থূল সূক্ষ্ম জগৎ। তন্মধ্যে সমষ্টি সূক্ষ্মজগতে প্রতিবিম্বিত ঈশ্বর বা ব্রহ্মই হিরণ্যগর্ভ বা বিধাতা। আর ব্যষ্টি সূক্ষ্মজগতে প্রতিবিম্বিত প্রাজ্ঞজীব বা ব্রহ্মই তৈজসজীব এবং সমষ্টি স্থূলজগতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভই বিরাট্ ঈশ্বর। আর ব্যষ্টি স্থূলজগতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্ম বা তৈজসজীবই বিশ্ব নামক জীব।

পঞ্চকোষ ও শরীরত্রয়রূপ উপাধি।

ঈশ্বরের উপাধি মায়াই তাহার কারণ-শরীর বা আনন্দময়কোষ, আর প্রাজ্ঞজীবের উপাধি অজ্ঞান বা অবিদ্যাই তাহার কারণ-শরীর বা আনন্দময়কোষ। হিরণ্যগর্ভের উপাধিসমষ্টি সূক্ষ্মজগৎ বা সমষ্টি বিজ্ঞানময়কোষ, মনোময়কোষ ও প্রাণময়কোষ, আর তৈজসজীবের উপাধি ব্যষ্টি সূক্ষ্মজগৎ বা ব্যষ্টি বিজ্ঞানময়কোষ, মনোময়কোষ ও প্রাণময়কোষ। বিরাটের উপাধি এই সমষ্টি স্থূলজগদ্ বা সমষ্টি অন্নময়কোষ। আর বিশ্বজীবের উপাধি এই ব্যষ্টি স্থূলদেহ বা ব্যষ্টি অন্নময়কোষ। সুতরাং জীব ও ঈশ্বরের কারণ-শরীরই আনন্দময়কোষ। সূক্ষ্মশরীরই বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময়কোষ এবং স্থূলশরীরকেই অন্নময়কোষ বলা যায়। স্থূলশরীরে অবস্থান-কালে জাগ্রদবস্থা, সূক্ষ্মশরীরে অবস্থানকালে স্বপ্নাবস্থা এবং কারণ-শরীরে অবস্থানকালে সুষুপ্তি অবস্থা বলা হয়। এই তিন অবস্থার অতীত অবস্থাকে তুরীয় বা উপাধিশূন্য শুদ্ধ-ব্রহ্মাবস্থা বলা হয়।

সূক্ষ্মশরীর ও সূক্ষ্মজগতের উৎপত্তি।

উক্ত মায়া বা অজ্ঞান হইতে যে ভাবে সূক্ষ্মজগৎ উৎপন্ন হয়, তাহা এই—উক্ত মায়া বা অজ্ঞান হইতে সূক্ষ্ম আকাশ বায়ু তেজ জল ও ক্ষিতিক্রমে সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়। মায়াটী সমষ্টি ও অজ্ঞানটী ব্যষ্টি বলিয়া এবং উভয়ই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক বলিয়া তদুৎপন্ন সূক্ষ্ম আকাশাদি ভূতপঞ্চকও সমষ্টিব্যষ্টিভাবাপন্ন এবং ত্রিগুণাত্মক হয়। এইরূপে—সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের সমষ্টিসত্ত্বগুণ হইতে মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কারাত্মক অন্তঃকরণ জন্মে। সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের সমষ্টিরজোগুণ হইতে প্রাণাপানসমানোদানব্যানাত্মক প্রাণ জন্মে এবং তাহাদের সমষ্টি-তমোগুণ হইতে এই শব্দস্পর্শরূপরসাত্মক সূক্ষ্মজগতের ভোগ্যবিষয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। আর ব্যষ্টি-আকাশের সত্ত্বাংশে শ্রবণেন্দ্রিয়, রজোহংশে বাগিন্দ্রিয়, ব্যষ্টিবায়ুর সত্ত্বাংশে ত্বগিন্দ্রিয়, রজোহংশে হস্তেন্দ্রিয়, ব্যষ্টিতেজের সত্ত্বাংশে চক্ষুরিন্দ্রিয়, রজোহংশে পাদেন্দ্রিয়, ব্যষ্টিজলের সত্ত্বাংশে রসনেন্দ্রিয়, রজোহংশে উপস্থেন্দ্রিয় এবং ব্যষ্টিক্ষিতির সত্ত্বাংশে ঘ্রাণেন্দ্রিয় রজোহংশে পায়ু ইন্দ্রিয় জন্মে।

এই অন্তঃকরণ, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধের সমষ্টিই সূক্ষ্মজগৎ, তাহাই হিরণ্যগর্ভের দেহ বা উপাধি হয়। আবার ইহারা ব্যষ্টিভাবে তৈজসজীবের দেহ বা উপাধি হয়। ইহাদের মধ্যে অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সহিত চৈতন্যের প্রতিবিম্বরূপ সম্বন্ধবশতঃ তাহাদের নিয়ামক অধিষ্ঠাতৃদেবতার জন্ম হইয়াছে। সেই দেবতাগণ যথা—

চিত্তের	অধিষ্ঠাতৃ	দেবতা	বিষ্ণু।
বুদ্ধির	"	"	ব্রহ্মা।
অহঙ্কারের	"	"	রুদ্র।
মনের	"	"	চন্দ্র।
শ্রবণেন্দ্রিয়ের	"	"	দিক্।
ত্বগিন্দ্রিয়ের	"	"	বায়ু।
চক্ষুরিন্দ্রিয়ের	"	"	সূর্য্য।
রসনেন্দ্রিয়ের	"	"	বরুণ।
ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের	"	"	অশ্বিনীকুমারদ্বয়।
বাগিন্দ্রিয়ের	"	"	বহ্নি।
হস্তেন্দ্রিয়ের	"	"	ইন্দ্র।
পায়ু-ইন্দ্রিয়ের	"	"	যম।
পাদেন্দ্রিয়ের	"	"	উপেন্দ্র।
উপস্থেন্দ্রিয়ের	"	"	প্রজাপতি।
পঞ্চ প্রাণের	"	"	প্রাণ।

এই সকল দেবতাও হিরণ্যগর্ভের দেহের অন্তর্গত। ইনিই কার্য্যব্রহ্ম নামে অভিহিত হন। এই হিরণ্যগর্ভের ইচ্ছায় এই সূক্ষ্মপঞ্চভূত পঞ্চীকৃত হইয়া চতুর্ব্বিধশরীরী জীবের ভোগস্থান তাহার স্থূলদেহ ও এই চতুর্দ্দশভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভ ও তাহার ব্যষ্টি তৈজসের এই দেহকে সূক্ষ্মশরীর বলা হয়।

পঞ্চীকরণ-প্রক্রিয়া ও স্থূলজগতের উৎপত্তি।

সূক্ষ্ম আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকের অর্দ্ধ এবং অপর ভূত-চতুষ্টয়ের প্রত্যেকের অষ্টম ভাগ একত্র করিয়া স্থূল আকাশাদি পঞ্চভূত জন্মে। ইহাতে প্রত্যেক স্থূল বা পঞ্চীকৃতভূতে অপর চারিটী ভূত থাকে। কোন ভূতই শুদ্ধ কোন ভূতরূপে থাকে না, আর এই সময় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রত্যেকই প্রত্যেক ভূতে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু পঞ্চীকরণের পূর্ব্বে আকাশের গুণ—শব্দ ; বায়ুর গুণ—শব্দ ও স্পর্শ; তেজের গুণ—শব্দ স্পর্শ ও রূপ, জলের গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, ক্ষিতির গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ছিল। এক্ষণে আকাশে শব্দ প্রধান এবং স্পর্শাদি অপর

চারিটী অপ্রধান হইল। তদ্রূপ বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ প্রধান এবং অপর তিনটী অপ্রধান হইল। তেজের শব্দ, স্পর্শ ও রূপ প্রধান এবং রস ও গন্ধ অপ্রধান হইল। জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস প্রধান, কিন্তু গন্ধটী অপ্রধান হইল এবং ক্ষিতিতে পাঁচটীই প্রধান হইল। এই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে ভূলোকাদি চতুর্দ্দশ ভুবন এবং জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ জীবদেহ জন্মগ্রহণ করে।

প্রতিবিম্ববাদ।

প্রতিবিম্ববাদানুসারে এই সব জীবদেহে এবং এই ব্রহ্মাণ্ডে চৈতন্যের যে সম্বন্ধ হয়, তাহা দর্পণে মুখের ন্যায় বা বহু জলপাত্রে চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় হয়। দর্পণে মুখ প্রবিষ্ট না হইলেও এবং জলমধ্যে চন্দ্রসূর্য্য প্রবিষ্ট না হইলেও যেমন তন্মধ্যে মুখ এবং চন্দ্রসূর্য্য দৃষ্ট হয়, এই ত্রিবিধ দেহরূপ উপাধিমধ্যে চৈতন্য প্রবিষ্ট না হইলেও তদ্রূপ এই উপাধিগুলিকে চেতন দেখায়। আবার দর্পণ ও জলের শুদ্ধি বা মালিন্যবশতঃ যেমন দর্পণস্থ মুখ ও জলমধ্যগত চন্দ্রসূর্য্য অবিকল বা মলিন দেখায়, কিন্তু প্রকৃত মুখ বা চন্দ্রসূর্য্য যেমন তেমনই থাকে, তদ্রূপ এই উপাধিরূপ দেহ শুদ্ধ বা মলিন থাকিলে তন্মধ্যগত চৈতন্যও অবিকল বা মলিন দেখায়, কিন্তু চৈতন্য স্বরূপতঃ যেমন তেমনই থাকে। মুখ, চন্দ্র ও সূর্য্যকে বিম্ব বলা হয় এবং দর্পণ ও জলপাত্র মধ্যে যে মুখ, চন্দ্র ও সূর্য্য দেখা যায়, তাহাকে প্রতিবিম্ব বলা হয়। মুখের ছায়া প্রতিবিম্ব নহে। এই মতে বিম্ব ও প্রতিবিম্বের মধ্যে ভেদ নাই। সুতরাং প্রতিবিম্ব বিম্বেরই ন্যায় সত্য। আর তজ্জন্য জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্মে কোন ভেদই নাই। অর্থাৎ কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূলশরীরে যে শুদ্ধ ব্রহ্মরূপ বিম্ব-চৈতন্যের প্রতিবিম্বরূপ জীবভাব বা সেই জীবাপেক্ষায় শুদ্ধ ব্রহ্মেরই ঈশ্বরভাব, তাহাদের সহিত শুদ্ধব্রহ্মের কোন ভেদ নাই। সুতরাং এই বাদে জীব মুক্তিতে ঈশ্বরত্ব-প্রাপ্ত হইতে পারে। অর্থাৎ সাক্ষী বা কূটস্থ চৈতন্যের সহিত মুক্তিতে মুখ্যসামানাধিকরণ্য হয়। ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা, জীবের অল্পজ্ঞতাকেই অপেক্ষা করিয়া হয়। 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যে গঙ্গাতে ঘোষবাসের ন্যায় জহৎ-লক্ষণা এই মতে স্বীকার্য্য। তদ্রূপ এমতে দৃষ্টান্ত-স্থলে প্রতিবিম্বের অধিষ্ঠানরূপ উপাধিটী বিম্ব, পরিণামী উপাদানটী মুখাদি বিম্বের অজ্ঞান, এবং নিমিত্ত-কারণটী দর্পণ এবং বিম্বের সান্নিধ্য বলা হয়। আর দার্ষ্টান্তিক স্থলে একই অজ্ঞানহেতু শুদ্ধ ব্রহ্মরূপ বিম্বে জীবরূপ প্রতিবিম্বভাব প্রতীত হয়। সুতরাং তাহার অধিষ্ঠানরূপ উপাদানটী শুদ্ধ ব্রহ্ম, পরিণামী উপাদানটী অজ্ঞান এবং নিমিত্ত-কারণ অদৃষ্ট বলা হয়। এস্থলে বিম্ব-প্রতিবিম্বের অভেদ জ্ঞানে প্রতিবিম্বভাবের নিবৃত্তি হয়। কিন্তু যতদিন বিম্ব ও দর্পণের সান্নিধ্যরূপ উপাধি নিমিত্ত থাকে, ততদিন তাহার মিথ্যাজ্ঞান হয়। অর্থাৎ প্রতিবিম্বভাবরহিত প্রতিবিম্বস্বরূপের জ্ঞান হয়। দর্পণের অপসারণে প্রতিবিম্বের প্রতীতির অভাব হয়। প্রকৃত-স্থলে জীবরূপ প্রতিবিম্বের সহিত নিজ ব্রহ্মরূপ বিম্বের অভেদ প্রতীতি হয়। তখন প্রতিবিম্বভাবরূপ জীবভাবের নিবৃত্তি হয়। কিন্তু যতদিন প্রারব্ধরূপ উপাধিটী নিমিত্ত হয়, ততদিন বাধিত জগতের সহিত এই জীবের জীবভাবরহিত স্বরূপের প্রতীতি হয়। আর যখন প্রারব্ধ শেষ হয়, তখন প্রতীতির অভাব হইয়া কেবল শুদ্ধ ব্রহ্ম অবশেষ হয়। তখনই বিদেহ মুক্তি হইয়া থাকে। এইমতে স্বপ্নের মত মুখ্য একটী জীবই অঙ্গীকার করা হয়। নানাজীবের যে প্রতীতি, তাহা জীবাভাস মাত্র। ইহাতে তিনটী সত্তা স্বীকার করা হয়। এজন্য ইহাকেও ব্যবহারিক পক্ষ বলা হয়। এমতে দর্পণে যে মুখ দেখা যায়, তাহা চক্ষুরশ্মি দর্পণে সংলগ্ন হইয়া প্রতিহত হইয়া নিজ মুখকেই দেখিয়া থাকে, এই জন্য পূর্ব্বমুখে দণ্ডায়মান ব্যক্তি যখন দর্পণে নিজমুখ দেখে, তখন দক্ষিণ কর্ণ দক্ষিণ দিকেই থাকে, বাম কর্ণ বাম দিকেই থাকে, অথচ মুখটী পশ্চিমাভিমুখী বোধ হয়। বস্তুতঃ পূর্ব্বাভি-মুখী মুখ পশ্চিমাভিমুখী হইলে বামকর্ণ দক্ষিণ দিকে আসে এবং দক্ষিণকর্ণ বাম দিকে আসে, কিন্তু সেই পূর্ব্বাভিমুখী মুখের মুখই দর্পণে দেখা যায় বলিয়া মুখের দর্পণস্থত্বই মিথ্যাংশ। এজন্য এইমতে বিম্ব ও প্রতিবিম্ব সত্য ও অভিন্ন বলা হয়। এই মতবাদ পদ্মপাদাচার্য্য-সম্মত মতবাদ বলা হয়। বিবরণাচার্য্যেরও এই মত।

আভাসবাদ।

আভাসবাদে প্রতিবিম্বটীকে—ছায়া বা আভাস অর্থাৎ মিথ্যা বলা হয়। এমতে কেবল চিদাভাস জীব বা ঈশ্বর নহেন, কিন্তু মায়ার অধিষ্ঠান চেতন এবং মায়া সহিত আভাসই ঈশ্বর বলা হয়। তদ্রূপ মায়ার ব্যষ্টি যে অবিদ্যা, সেই অবিদ্যাংশের অধিষ্ঠান চেতন, আর সেই অবিদ্যার অংশ সহিত আভাসই জীব বলা হয়। সুতরাং জীব ব্যষ্টি ও ঈশ্বর সমষ্টি হইল। ঈশ্বরের উপাধিতে সত্ত্বগুণ থাকে, এজন্য ঈশ্বরে সর্ব্বশক্তিত্ব ও সর্ব্বজ্ঞতাদি ধর্ম্ম থাকে। আর জীবের উপাধি মলিন সত্ত্বগুণ বলিয়া জীবে অল্পশক্তিত্ব ও অল্পজ্ঞতাদি ধর্ম্ম থাকে। প্রতিবিম্ববাদী বিবরণ-মতে যদিও জীব ও ঈশ্বর উভয়েরই উপাধি অজ্ঞান সেজন্য উভয়েরই অল্পজ্ঞত্ব ধর্ম্ম থাকা উচিত, তথাপি যে উপাধিতে প্রতিবিম্ব বা আভাস পতিত হয়, তাহার স্বভাবই এই যে, উপাধির দোষ প্রতিবিম্বে সংক্রমিত হয়, কিন্তু বিম্বে হয় না। এজন্য প্রতিবিম্ববাদে বিম্বস্বরূপ ঈশ্বরে কোন দোষ ঘটে না। কিন্তু জীবে সে দোষ হয়। এই আভাসবাদে ব্যষ্টি প্রতিবিম্ব বা ব্যষ্টি আভাস জীব এবং সমষ্টি প্রতিবিম্ব বা সমষ্টি আভাস

ঈশ্বর প্রতিবিম্ববাদে বিম্বশুদ্ধ চৈতন্যকেই ঈশ্বর বলা হয়। এই আভাসবাদে যে জীবের উপাধির অভাব হয়, তাহার ব্রহ্মের সহিত উপচারিক অভেদ হয়। এজন্য জীব ব্রহ্মের একতা-বোধক শ্রুতির ভাগত্যাগ-লক্ষণা স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ 'সেই দেবদত্ত এই' এস্থলে যেরূপ হয়, সেইরূপ হয়। এই একতার নাম বাধসামানাধিকরণ্য বলা হয়, অর্থাৎ জীব-ভাবকে বাধিত করিয়া চৈতন্যাংশে অভেদ বলা হয়। প্রতিবিম্ব-বাদে জীবভাবের বাধ হয়—বলা হয় না। কারণ, তন্মতে জীবরূপ প্রতিবিম্ব ও বিম্বরূপ শুদ্ধচৈতন্য অভিন্ন। তাহার পর, এই আভাসবাদে, দৃষ্টান্তস্থলে, আকাশ কিম্বা মুখের প্রতিবিম্বের অধি-ষ্ঠানরূপ উপাদান ঘটাকাশ এবং দর্পণাদি হয়, আর পরিণামী উপাদান জল এবং অবিদ্যাদি হয়, নিমিত্ত-কারণ মহাকাশ, মুখাদি বিম্ব এবং উপাধির সন্নিধি হইয়া থাকে, তদ্রূপ দার্ষ্টান্তিক স্থলে চিদাভাসরূপ জীবের অধিষ্ঠানরূপ উপাদান কূটস্থ, পরিণামী উপাদান নানা বুদ্ধি, কিংবা অজ্ঞান অংশ, এবং নিমিত্ত-কারণ প্রারব্ধ হইয়া থাকে।

এস্থলে প্রতিবিম্বের বাধ করিয়া নিজ বিম্ব মুখাদির সহিত অভেদ হয়, তাহা হইলেও যতদিন জল দর্পণাদি এবং বিম্বের সন্নিধিরূপ নিমিত্ত থাকে, ততদিন বাধিত প্রতিবিম্বের অনুবৃত্তি, অর্থাৎ প্রতীতি হয়। ইহাকে বাধিতানুবৃত্তি বলে। দার্ষ্টান্তিক স্থলে যে চিদাভাস বা বুদ্ধি বা অজ্ঞানাংশরূপ উপাধির সহিত নিজ স্বরূপের বাধ করিয়া অহমাদি জীববাচক পদের লক্ষ্য অর্থ —কূটস্থ অধিষ্ঠানরূপ নিজের নিজরূপ, তাহাকে 'আমি' জ্ঞান করিয়া সেই কূটস্থের সহিত বিম্বরূপ ব্রহ্মের যে পূর্ব্ব-সিদ্ধ একতা অনুভব করে, সেই জীবই মুক্ত হয়। অপরে বদ্ধই থাকে। এ স্থলে, যদিও "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই জ্ঞানের সময়ই অবিদ্যারূপ উপাদানের নাশ করিয়া তাহার কার্য্য জগতের সহিত চিদা-ভাসের বাধ হয়, তথাপি যতদিন প্রারব্ধরূপ নিমিত্ত থাকে, ততদিন বাধ হইলেও অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান হইলেও দেহাদি জগতের সহিত চিদাভাসের অনুবৃত্তি অর্থাৎ প্রতীতি হয়। প্রারব্ধের শেষ হইলে প্রতীতির অভাব হয়। ইহাই বিদেহ মোক্ষ বলা হয়। ইহা বিদ্যারণ্য স্বামীর মত।

অবচ্ছেদবাদ।

অবচ্ছেদবাদে সমষ্টি মায়া ও ব্যষ্টি অবিদ্যাতে প্রতিবিম্ব বা আভাসকে ঈশ্বর ও জীব বলা হয় না। কিন্তু মায়াবিশিষ্ট শুদ্ধ চেতন এবং অবিদ্যাবিশিষ্ট শুদ্ধ চেতনকেই ঈশ্বর ও জীব বলা হয়। আর উক্ত মায়া ও অবিদ্যা উপহিত সেই চেতনকেই ঈশ্বরসাক্ষী ও জীবসাক্ষী বলা হয়। মায়া ও অবিদ্যা বিশেষণ হইলে শুদ্ধ চেতনকে বিশিষ্ট বলা হয় এবং উপাধি হইলে উপহিত বলা হয়। স্বরূপমধ্যে যাহার প্রবেশ হয় এতাদৃশ ব্যাবর্ত্তক বস্তুকে বিশেষণ বলা হয় এবং স্বরূপমধ্যে যাহার প্রবেশ না হইয়া তাহা ব্যাবর্ত্তক হয় তাহাকে উপাধি বলা হয়। তদ্রূপ সমষ্টি মায়া হইতে উৎপন্ন সমষ্টি অন্তঃকরণ এবং ব্যষ্টি অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন ব্যষ্টি অন্তঃকরণ যখন বিশেষণ হয়, তখন হিরণ্যগর্ভাখ্য ঈশ্বর ও তৈজস নামক "প্রমাতা" জীব হয়। আর উহারা যখন উপাধি হয়, তখন সেই চেতনকে ঈশ্বরসাক্ষী ও জীবসাক্ষী বলা হয়, অর্থাৎ উপহিত চেতন হয়—সাক্ষী এবং বিশিষ্ট চেতন হয়—জীব বা ঈশ্বর। অবচ্ছেদ-বাদে অন্তকরণ জীবের বিশেষণ হয় এবং আভাসবাদে সাভাস-অন্তঃকরণ জীবের বিশেষণ হয়, ইহাই প্রভেদ। অবচ্ছেদবাদে বাচস্পতি মিশ্রের মত। মুক্তিসম্বন্ধে ইহা আভাসবাদেরই অনুরূপ। এ স্থলে বিশেষ্য ও বিশেষণের যে সম্বন্ধ, তাহা আধ্যাসিক বা অবিবেককৃত সম্বন্ধ বলা হয়। এই অবচ্ছেদবাদে আত্মার প্রতি-বিম্ব বা আভাস কিছুই স্বীকার করিতে হয় না। ইহাতেও জীব—ঈশ্বর হয় না, কিন্তু জীব ব্রহ্ম হইয়া যায়। প্রতিবিম্ববাদের ন্যায় ইহাতেও মুখ্যসামানাধিকরণ্য হয়, বাধসামানাধিকরণ্য হয় না। এমতে তত্ত্বমসিবাক্যে আভাসবাদের ন্যায় ভাগত্যাগ-লক্ষণা স্বীকার্য্য। ঘট যেমন আকাশের অবচ্ছেদক হয়, এস্থলে তদ্রূপ অজ্ঞান ও বুদ্ধিপ্রভৃতিও আত্মার অবচ্ছেদক হয়। এই অবচ্ছেদক বিশেষণ ও উপাধিভেদে দ্বিবিধ হয় বলিয়া জীব ঈশ্বর ও তাহাদের সাক্ষীর ভেদ হইয়া থাকে। এইরূপে এইমতে জীব-ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান যত পরিস্ফুট হয়, এত আর অন্যমতে হয় না। কারণ, আকাশাদির সহিত ঘটাকাশাদির যেরূপ স্পষ্টতঃ অসংস্পৃষ্ট সম্বন্ধ, জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধও তদ্রূপ বলায়, জীবের ব্রহ্ম-স্বরূপতাবোধের পক্ষে এই মত বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ।

দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ বা একজীববাদ। ইহাতে একই আত্মচৈতন্য অবিদ্যাবশে নানা জীব, জগৎ ও ঈশ্বররূপ হইয়া থাকেন। ইহাতে বিষয়ের অজ্ঞাতসত্তা নাই। শুক্তিরজত এবং তাহার জ্ঞান যেমন একই অজ্ঞানবশে উৎপন্ন হয়, এইমতে জীব, জগৎ ও তাহার জ্ঞান, তদ্রূপ এক সঙ্গেই অজ্ঞানবশে উৎপন্ন হয়। স্বপ্ন-কালে যেমন স্বপ্নের পদার্থ আমার পূর্ব্বে ও পরে বর্ত্তমানযোগ্য বলিয়া বোধ হয় এবং সেই যোগ্যতার জ্ঞানও যেমন তৎকালে উৎপন্ন হয়; তদ্রূপ জাগ্রৎকালেও সমুদয় পদার্থ আমার পূর্ব্বে ছিল ও পরেও থাকিবে বলিয়া বোধ হয় এবং তাহাও তাহার জ্ঞান-কালেই উৎপন্ন হয়। এইরূপ কার্য্যকারণসম্বন্ধের জ্ঞানও সেই সেই পদার্থের জ্ঞানকালেই উৎপন্ন হয়।

শ্রুতিমধ্যে যে সৃষ্টিক্রমাদি বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ক্রমবর্ণনার জন্য নহে, পরন্তু অদ্বৈততত্ত্ব বুঝাইবারই জন্য। এই মতে সত্তা

দ্বিবিধ। যথা—পারমার্থিক ও প্রাতিভাসিক। ব্যবহারিক সত্তা এই মতে প্রাতিভাসিকেরই অন্তর্গত। এই মতে সমুদায় অনাত্ম পদার্থ সাক্ষীর ভাষ্য বলা হয়। প্রমাতা ও প্রমাণের বিষয় কিছুই নাই। যেহেতু স্বপ্নের জ্ঞান-সমকালীনই ত্রিপুটী উৎপন্ন হয়। ত্রিপুটী জন্য জ্ঞান কোনই নাই। তথাপি জ্ঞানমধ্যে স্বপ্নের ন্যায় ত্রিপুটী-জন্যতা প্রতীত হয়। এজন্য জাগ্রতের পদার্থ সাক্ষীর ভাষ্যই হয়, অর্থাৎ স্বপ্নসম মিথ্যা। ইহাই অদ্বৈতবাদের গূঢ় রহস্য। অধিক জানিতে হইলে বৃহদারণ্যকভাষ্য, তাহার বার্ত্তিক, বেদান্তসিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী, আত্মপুরাণ এবং অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

যাহা হউক, জীবস্বরূপ বুঝাইবার জন্য অদ্বৈতমতে এই চারিটী মতবাদ প্রচলিত আছে। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কিছু কিছু ভেদ থাকিলেও উদ্দেশ্য সকলেরই এক। সকলেই জীবের স্বরূপটী "শুদ্ধ ব্রহ্ম" ইহা বুঝাইবার জন্য প্রবৃত্ত। জীবভাবটী ভ্রম, সুতরাং মিথ্যা—ইহা বলাই সকলের লক্ষ্য। ইহাই হইল জীবশব্দের অর্থ। এইবার দেখা যাউক "জীব ব্রহ্মই—তদ্ভিন্ন নহে" ইহার অর্থ কি?

জীব ব্রহ্মই তদ্ভিন্ন নহে—ইহার অর্থ।

এই "জীব ব্রহ্মই তদ্ভিন্ন নহে" ইহার অর্থ—জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদই নাই। অংশাংশী সম্বন্ধ হইলে বা ভেদাভেদ সম্বন্ধ হইলে অথবা শক্তিশক্তিমৎ সম্বন্ধ হইলে, পাছে কোনরূপ ভেদগন্ধ থাকে, অথবা পাছে সেই ব্রহ্মকে কেহ নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতভিন্ন অন্য কোনরূপ বলিয়া ভ্রম করিয়া বসে, তজ্জন্য "জীব ব্রহ্মই" বলিয়াও "তদ্ভিন্ন নহে" এইরূপ আবার বলা হইল।

জীব ব্রহ্মভিন্ন নহে—ইহাতে শ্রুতিপ্রমাণ।

জীব ও ব্রহ্ম সম্পূর্ণ অভিন্ন—এবিষয়ে শ্রুতিভিন্ন যে কোনই প্রমাণ প্রদর্শিত হইবে, তাহাতে সন্দেহের অবসর দূর হয় না। কারণ, ব্রহ্মতাপ্রাপ্ত বক্তার কথায় যে কোন ভ্রমই নাই, তাহার প্রমাণ নাই। যেহেতু এতাদৃশব্যক্তির বহু কথা অভ্রান্ত হইলেও সকল কথা যে অভ্রান্ত হইবে, তাহার পরীক্ষা করিবার উপায় নাই। এজন্য এবিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণই প্রধান, অনুমানাদি অপর প্রমাণ, তাহার অনুকূলতা করিয়া থাকে মাত্র। এজন্য প্রথম শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) ঈশোপনিষৎ—

"যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" ॥ ৭।

এখানে 'একত্বের অনুদর্শনকারী বিদ্বানের সর্ব্বভূত যখন আত্মাই হয়' বলায় জীবব্রহ্মের অভেদই কথিত হইল। এব-কারের দ্বারা অন্য সম্বন্ধের সম্ভাবনা নিরাস করা হইল।

"যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি" ॥ ১৬।

এস্থলে সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী পুরুষকে উপাস্য বলিয়া তাহাকেই 'আমি' বলায় জীবব্রহ্মের অভেদই ইঙ্গিত করা হইল।

(২) কেনোপনিষৎ—

"যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে" ॥৪

এইরূপ পরবর্ত্তী আরও তিনটী বাক্যে—বাক্য মন চক্ষু শ্রোত্র ও প্রাণের কথা এই ভাবেই কথিত হইয়াছে। এখানে বাক্য তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু বাক্য তৎকর্তৃক প্রকাশিত হয়—বলায় এই প্রকাশকর্ত্তা জীবই হয়, এবং সেই জীবকে ব্রহ্মই বলা হইল।

(৩) কঠোপনিষৎ—

(ক) "যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্ব্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম" ॥ (২.১.১৫)

এস্থলে শুদ্ধজলে শুদ্ধজল মিশ্রণের ন্যায় আত্মা হয়—বলায় জীবব্রহ্মের অভেদই উক্ত হইল।

(খ) "একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" (২.২.৯-১২)

এস্থলে ব্রহ্মকে এক ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা বলায় জীবব্রহ্মের অভেদই কথিত হইল। জীব ব্রহ্মভিন্ন হইলে জীবের অন্তরাত্মা জীবই হইবার কথা, কিন্তু তাহাকে ব্রহ্ম বলায় সে শঙ্কা আর থাকিল না।

(৪) প্রশ্নোপনিষৎ—

"স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ...স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি" (৬.৫)

এই বাক্যে নদী নামরূপ ত্যাগ করিয়া যেমন সমুদ্র হইয়া যায়, তদ্রূপ জীব ও নামরূপ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম হইয়া যায়—বলায় জীব ও ব্রহ্ম অভিন্নই বলা হইল। 'অকল' বলায় জীব ব্রহ্মের অংশীভূত এইরূপ বলিবার সম্ভাবনা রহিল না।

(৫) মুণ্ডকোপনিষৎ—

(ক) "সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" (২.১.৪-৯) বলিয়া "পুরুষ এবেদং বিশ্বম্" (২.১.১০) বলায় এবং (খ) "দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ" (২.১.২) বলিয়া

(গ) "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।" (২.১.৩)

বলায় জীবব্রহ্ম অভিন্নই বলা হইল।

(ঘ) "যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাঽক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥"
(২.১.১)

এস্থলে অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ উঠিয়া অগ্নিতে পতিত হইলে যেরূপ হয়—বলায় জীবব্রহ্মের অভেদই কথিত হইল। কারণ, জীবরূপ অগ্নিকণা অগ্নিরূপ ব্রহ্মে পড়িলে অভিন্নই হয়।

(ঙ) "ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্" ॥ (২.২.১১)

ইহাতে "চারিদিকে ব্রহ্ম" এবং "সমুদয় ব্রহ্ম" বলায় জীবকেও ব্রহ্মই বলা হইল।

(চ) "তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ॥ (৩.১.৩)

এস্থলে নিরঞ্জন ও পাপশূন্য হইয়া পরম সাম্য প্রাপ্ত হয় বলায় অভেদই বলা হইল। কারণ, কিঞ্চিৎ ভেদ থাকিলে আর পরম সাম্য হয় না।

(ছ) "এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বান্ তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম" ॥ (৩.২.৪)

এখানে ব্রহ্মধামরূপ ব্রহ্মে আত্মা প্রবেশ করায় জীবব্রহ্মের অভেদই বলা হইল। ধাম অর্থ ব্রহ্মস্বরূপতার বোধক, ধাম ও ব্রহ্ম পৃথক্ নহে।

(জ) "তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরাঃ যুক্তাত্মনঃ সর্ব্বমেবাবিশতি ॥" (৩.২.৫)

এস্থলে সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্মমধ্যে প্রবেশের কথা বলায় জীবব্রহ্মের সেই অভেদই কথিত হইল।

(ঝ) "গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু। কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি" ॥ (৩.২.৭)

এস্থলে কলাহীন পর অব্যয় আত্মার সহিত একই হয়—বলায় সেই অভেদই কথিত হইল।

(ঞ) "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্" ॥ (৩.২.৮)

এস্থলে নদীর নামরূপ ত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রে মিশ্রণের দৃষ্টান্ত দ্বারা পরাৎপর পুরুষ লাভ হয় বলায় জীবব্রহ্মের সম্পূর্ণ অভেদেরই কথা বলা হইল।

(ট) "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (৩.২.৯)

এস্থলে ব্রহ্ম জানিলে ব্রহ্ম হয় বলায় জীব অজ্ঞানবশতঃ জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল বলা হইল, আর তজ্জন্য তাহার ব্রহ্ম হওয়ায় সম্পূর্ণ অভেদভাব প্রাপ্তিই বুঝাইল।

(৬) মাণ্ডূক্যোপনিষৎ—

"অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই বাক্যে জীব ব্রহ্মের অভেদ উপক্রম করিয়া শেষে দ্বাদশ বাক্যে "সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ" বলায় জীব ও ব্রহ্মের সম্পূর্ণ অভেদই কথিত হইল। জ্ঞানের ফলে জীবের ব্রহ্মে প্রবেশ কথনে ভেদটা অজ্ঞানজন্য—ইহাই বলা হইল।

(৭) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ—

(ক) "স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বং অসৃজত যদিদং কিঞ্চ, তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"। (২.৬)

এই বাক্যে ব্রহ্মই জীব হইয়াছেন—বলায় এবং

(খ) "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (২.১)

এই বাক্যে সেই ব্রহ্মকে অর্থতঃ অবিকারী বলায় জীব ও ব্রহ্মের অভেদই কথিত হইল।

(গ) "এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি।" (২.৮) "আনন্দং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি" (৩.৬)।

"স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ" (১০.৪)

ইত্যাদি বাক্যেও জীব ও ব্রহ্মের সম্পূর্ণ অভেদই বুঝা যায়।

(৮) ঐতরেয়োপনিষৎ—

"কোঽয়মাত্মা ইতি" (৫.১) এই বাক্যে প্রশ্ন করিয়া উত্তরে "সর্ব্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি" (৫.২) এই বাক্যে উত্তর দিয়া "এষ ব্রহ্ম এষ ইন্দ্রঃ" (৫.৩) এই বাক্যে তাহার পরিচয় দিয়া "যৎ কিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরং সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রম্ প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতম্ প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" (৫.৩) এই বাক্যে এবং শেষে "স এতেন প্রজ্ঞেন আত্মনা অস্মাৎ লোকাদুৎক্রম্য অমুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বা অমৃতঃ সমভবৎ" (৫.৪) বলায় জীব ও ব্রহ্মের অভেদই কথিত হইল।

(৯) ছান্দোগ্যোপনিষৎ—

(ক) "স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" (৬.৮—৬.১৬) নয় বার এই বাক্যটী বলিয়া জীব ও ব্রহ্মের অভেদ উপদেশ করা হইয়াছে। (খ) "স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এব ইদং সর্ব্বং" এই বাক্যে ভূমা ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া "অহমেব অধস্তাৎ অহমুপরিষ্টাৎ অহং পশ্চাৎ অহং পুরস্তাৎ অহং দক্ষিণতঃ অহমুত্তরতঃ অহমেব ইদং সর্ব্বম্" (৭.২৫.১) বলায় জীব ও ব্রহ্মের অভেদই বলা হইল। এই কথাই আবার পর বাক্যে "আত্মার" দ্বারা বলা হইয়াছে, যথা—

"আত্মা এবাধস্তাৎ আত্মা উপরিষ্টাৎ আত্মা পশ্চাৎ আত্মা পুরস্তাৎ আত্মা দক্ষিণতঃ আত্মা উত্তরতঃ আত্মা এব ইদং সর্ব্বমিতি"(৭.২৫.২)

অতএব ভূমা ব্রহ্ম, জীব ও আত্মা এই তিনটীকে এস্থলে অভিন্নই বলা হইল।

"অথ য এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে এষ আত্মা ইতি হোবাচ এতদমৃতম্ অভয়ম্ এতদ্ ব্রহ্ম ইতি তস্য হ এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি" (৮.৩.৪) এই বাক্যেও জীব ও ব্রহ্মের অভেদই কথিত হইল।

"তদ্ ব্রহ্ম তদমৃতম্ স আত্মা" (৮.১৪.১) এতদ্দ্বারাও জীব-ব্রহ্মের অভেদই কথিত হইল।

(১০) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—

(ক) "আত্মা ইত্যেবোপাসীত অত্র হ্যেতে সর্ব্বে একং ভবন্তি" (১.৪.৭) (খ) "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেব অবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি...য এবং বেদ অহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি" (১.৪.১০) (গ) "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং বিজানাতি ...যত্র বাস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ" (২.৪.১৪) এবং (৪.৫.১৫) (ঘ) "তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, অয়মেব সঃ যোঽয়মাত্মা ইদমমৃতম্ ইদং ব্রহ্ম ইদং সর্ব্বম্" (২.৫.১-১৪) (চতুর্দ্দশ বার উক্ত) (ঙ) "স বায়মাত্মা ব্রহ্ম" (৪.৩.৫) (চ) "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (৪.৩.৬) (ছ) "অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে (৪.৩.৭)

(জ) "আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াৎ অয়মস্মীতি পুরুষঃ।

কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্জরেৎ" ॥ (৪.৪.১২)

(ঝ) "অভয়ং বৈ ব্রহ্ম অভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ" (১.৪.২৫)

(ঞ) "ইমানি ভূতানি ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" (৪.৫.৭)

(ট) "যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি" (৫.১৫.৩) এই সকল বাক্যেই অতি স্পষ্টভাবে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ কথিত হইয়াছে।

(১১) ব্রহ্মোপনিষৎ—

"য এবং বেদ স পরং ব্রহ্ম ধাম ক্ষেত্রজ্ঞমুপৈতি" ১৪। এতদ্দ্বারাও জীব ও ব্রহ্মের সম্পূর্ণ ঐক্যই কথিত হইল।

(১২) কৈবল্যোপনিষৎ—

"তদ্ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে" ১৭।

"যৎ পরং ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মা বিশ্বস্যায়তনং মহৎ।

সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যং তত্ত্বমেব ত্বমেব তৎ" ॥ ১৩।

"চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ" ১৮।

"ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।

ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি তদ্ ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্" ॥ ১৯।

"শিবরূপমস্মি" ২০। "ন চাস্তি বেত্তা মম চিৎ সদাহম্"। ২১।

"এবং বিদিত্বা পরমাত্মরূপং গুহাশয়ং নিষ্কলমদ্বিতীয়ম্।

সমস্তসাক্ষীং সদসদ্বিহীনং প্রয়াতি শুদ্ধং পরমাত্মরূপম্" ॥ ২৪। এতদপেক্ষা স্পষ্টভাবে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ আর বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

(১৩) জাবালোপনিষৎ—

"সোঽবিমুক্ত উপাস্যো য এষোঽনন্তোঽব্যক্ত আত্মা, সোঽবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিতঃ" (২.১)

এতদ্দ্বারাও জীব ও ব্রহ্মের অভেদ কথিত হইল।

(১৪) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—

"অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ" ৭। এতদ্দ্বারাও জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য কথিত হইল।

(১৫) নারায়ণোপনিষৎ—

"য এবং বেদ স বিষ্ণুরেব ভবতি"। ২।

"নারায়ণসাযুজ্যমবাপ্নোতি শ্রীমন্নারায়ণসাযুজ্যমবাপ্নোতি য এবং বেদ"। ৫।

"যোঽহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি"। ১৫।

এতদ্দ্বারাও জীব ও ব্রহ্মের সম্পূর্ণ অভেদ কথিত হইল।

(১৬) পরমহংসোপনিষৎ—

"সর্ব্বান্ কামান্ পরিত্যজ্য অদ্বৈতে পরমে স্থিতিঃ" ॥ ৩।

এতদ্দ্বারাও জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যই কথিত হইল।

(১৭) অমৃতবিন্দূপনিষৎ—

"তদ্ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে ধ্রুবম্"। ৩।

"নিষ্কলং নির্ম্মলং শান্তং তদ্ব্রহ্মাহমিতি স্মৃতম্" ॥ ৬।

"তদস্ম্যহং বাসুদেবঃ তদস্ম্যহং বাসুদেব ইতি" ৭।

ইহাও জীব ও ব্রহ্মের সম্পূর্ণ অভেদবোধক।

(১৮) মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ—

"আত্মন্যেব সাযুজ্যমুপৈতি"। ৪।

"এষ আত্মা অপহত-পাপ্মা...অচ্যুতো বিষ্ণুর্নারায়ণঃ" ॥ (৭.৭)

এস্থলেও জীব ও ব্রহ্মের সম্পূর্ণ ঐক্য কথিত হইল।

(১৯) কৌষীতক্যুপনিষৎ—

"প্রজ্ঞাত্মা আনন্দঃ অজরোঽমৃতঃ"। (৩.৮)

"এষ লোকপাল এষ লোকাধিপতিঃ এষ সর্ব্বেশঃ।

সমে আত্মা ইতি বিদ্যাৎ, স মে আত্মা ইতি বিদ্যাৎ" ॥ (৩.৮)

"স যো হৈতমেবমুপাস্তে এতেষাং সর্ব্বেষামাত্মা ভবতি" ॥ (৪.১৭)

এতদ্দ্বারাও জীব ও ব্রহ্মের সম্পূর্ণ অভেদ কথিত হইল।

(২০) নৃসিংহতাপনীয়োপনিষৎ—

"প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতং

চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা সবিজ্ঞেয়ঃ"। (১.১)

"ন হ্যস্তি দ্বৈতসিদ্ধিঃ, আত্মৈব সিদ্ধঃ অদ্বিতীয়ঃ মায়য়া অন্যদিব, স বা এষ আত্মা পর এবৈষৈব সর্ব্বম্" ॥ (৯.১)

ইহাতে দ্বৈতই অসিদ্ধ এবং জীব ও ব্রহ্মের একতা উভয়ই অতি স্পষ্টভাবে কথিত হইল।

এইরূপে ১০৮ খানি উপনিষদেই দেখা যাইবে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন ভেদই নাই। সুতরাং অদ্বৈতবাদের যাহা স্বরূপ, যাহা—

"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ" ॥

এই শ্লোকে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যাহা প্রচার করিয়াছেন, তাহা শ্রুতির দ্বারা সম্পূর্ণভাবেই প্রমাণিত হয়।

অবশ্য দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী প্রভৃতি সকলেই এই উপনিষৎ হইতে নিজ নিজ মত প্রমাণিত করিবার জন্য অন্য উপনিষদ্বাক্য উদ্ধৃত করেন। কিন্তু সে সকল বাক্যেরই তাৎপর্য্য অদ্বৈতে। ইহা অদ্বৈত-বাদের আচার্য্যগণ ভাষ্য ও টীকাদিমধ্যে অখণ্ডনীয়ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।

"জীব ব্রহ্মভিন্ন নহে" ইহাতে অনুমান প্রমাণ।

এইরূপে বেদ হইতে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন—ইহা জানিবার পর এ বিষয়ে অনুমানাদি প্রমাণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি সম্ভাবিত হয়। যেমন অদ্বৈত ব্রহ্মের সম্ভাবনা শ্রুতিভিন্ন জানা যায় না; তদ্রূপ জীব যে ব্রহ্মই ইহাও শ্রুতিভিন্ন জানা যায় না। জীবের নিজে নিজে এরূপ কল্পনা করিবার অধিকার নাই। এমন কি যোগবলে অসামান্য শক্তিলাভ করিয়াও যদি কেহ এরূপ কথা বলিতে ইচ্ছা করে, তাহাও সম্ভব হয় না। কারণ, জীব ব্রহ্ম হইয়া গেলে তাহার জীবভাবে ফিরিয়া আসিবার, সুতরাং সেই অভেদাবস্থার কথা বলিবার উপায় থাকে না। তথাপি যদি অর্দ্ধপথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া গ্রামের পরিচয় দানের ন্যায় সেই সম্ভাবনা কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে সেই গ্রামের পরিচয় যেমন অভ্রান্ত হয় না, তদ্রূপ সেই যোগীর জ্ঞান যে অভ্রান্ত এবং শক্তি যে সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ এবং তিনি যে সর্ব্বরূপ অসাধ্যসাধনে সমর্থ তাহাতে প্রমাণ থাকে না। একজন সহস্র প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিলেও যে তৎপরের প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিবে, তাহাতে নিশ্চয়তা নাই। অতএব বেদ হইতে ইহা জানিবার পর ইহার সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনুমানাদি প্রমাণের প্রয়োগ হইতে পারে—অন্যথায় নহে। সেই অনুমান এই—

(১) জীব ব্রহ্মই ... (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু সচ্চিদানন্দরূপ ... (হেতু)
যেমন ঈশ্বর চেতন; যাহা সচ্চিদানন্দ নহে, তাহা ব্রহ্ম হইতে অভিন্নও নহে, যেমন ঘট। যে হেতু এই জীব এই-রূপ নহে, সেই হেতু ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও নহে।...(উদাহরণ)

(২) জীব ও ব্রহ্মের ভেদ মিথ্যা ... (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু তাহা ঔপাধিক ... (হেতু)
যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশের ভেদ ... (উদাহরণ)

বস্তুতঃ, জীবের জ্ঞান ও সত্তা আছে, সেই জন্যই জীবভিন্ন অপর পদার্থের সত্তা ও জ্ঞানাদি সিদ্ধ হয়। ঈশ্বর, জগৎ, শক্তি এবং অপর জীব প্রভৃতি, যাহা কিছু সবই, জীবের সত্তা ও জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। জীব না থাকিলে এসব বস্তু স্বীকার করিবে কে? জীব যে বস্তু জানে না, কিন্তু পরে জানে, তাহাও জীবাশ্রিত অজ্ঞানাবৃতই থাকে। অতএব দৃশ্যপদার্থের আশ্রয়, জ্ঞাতৃরূপে বা অজ্ঞাতৃরূপে জীবই হইয়া থাকে। জীবে যে আমিত্ব বা অজ্ঞান থাকে, ইহাই যাবদ্দৃশ্যবস্তুর জীবাশ্রিততত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধকরূপে অনুভূত হয় বলিয়া, আর সেই আমিত্ব বা অজ্ঞান, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রভৃতি সকল সময় একরূপ থাকে না বলিয়া, ইহারা সেই জীবের উপাধিবিশেষই হয়। এই উপাধিবাদে যে শুদ্ধসত্তা ও জ্ঞান থাকে, তাহাই সেই ব্রহ্মবস্তু বলা হয়। মিথ্যা আমিত্ব ও অজ্ঞান-রূপ উপাধি, সেই ব্রহ্মবস্তুকে যেন বিভিন্নস্বরূপ করিয়া রাখিয়াছে। অতএব জীব ও ব্রহ্ম যে স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়।

অন্যজীবসত্তার মিথ্যাত্ব।

যদি বলা যায়—অপর জীব যখন অন্য এক জীবের মতই অনুভব করে, তখন অন্য জীবের পৃথক্ সত্তা থাকিবে না কেন? তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে, অন্য জীবের অনুভব, অপর জীব অনুমান করে, কিন্তু প্রত্যক্ষ করে না। ঘট পট যেমন প্রত্যক্ষ হয়, অপরের আমিত্ব বা অনুভব তদ্রূপ অন্যের প্রত্যক্ষ হয় না। নিজের নিজত্বই কেবল প্রত্যক্ষ হয়, অতএব অপরের অনুভব প্রত্যক্ষের যোগ্য হইয়াও প্রত্যক্ষের অযোগ্য অনুমানরূপ বলিয়া তাহার সত্তা কল্পিত বলিয়াই বিবেচিত হয়। যেমন প্রত্যক্ষ-যোগ্য বহ্নি পর্ব্বতে অনুমান করিবার পর, যদি সেই বহ্নি কখনই প্রত্যক্ষ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে সেই বহ্নির অনুমান আর অনুমান-পদবাচ্য হয় না, কিন্তু সেই বহ্নির জ্ঞানটী কল্পিতই হয়। আর তজ্জন্য বহ্নিও মিথ্যাই হয়।

জীবাণুত্ববাদীর ভেদাভেদখণ্ডন।

এস্থলে জীবাণুত্ববাদি-সম্প্রদায় জীব ও ব্রহ্মকে একই চিদ্বস্তু বলিয়া অভিন্ন এবং জীব 'অণু' ও ব্রহ্ম 'বৃহৎ' বলিয়া উভয়কে ভিন্নও বলেন। কিন্তু ইহা যুক্তিসঙ্গত হয় না। কারণ, জীব ও ব্রহ্ম এক চিদ্বস্তু হইয়াও যাহা সেই চিদ্বস্তুকে বৃহৎ ও অণুরূপ করে, তাহা সেই চিদ্বস্তুভিন্ন হয়, আর তজ্জন্য তাহা জীবেরই সত্তা ও জ্ঞানের অধীন হয়। সুতরাং তাহাও উপাধি হয়। আর যাহার সত্তা অন্যের সত্তাধীন হয়, তাহা মিথ্যাই হইয়া থাকে। অধীনসত্তা কখনও আশ্রয়সত্তার সমান হইতে পারে না। আশ্রিত ব্যতীত ও আশ্রয় থাকে বলিয়া আশ্রিতকে অধীনসত্তাক বলা হয়। এজন্য উপাধি প্রভৃতি সবই মিথ্যা। আর উপাধি মিথ্যা হওয়ায় উপাধিযুক্ত সত্তা ও জ্ঞানস্বরূপ জীবরূপ ব্রহ্মবস্তুই সত্য হয়, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম অভিন্নই হয়।

বিভুবহুজীববাদীর ভেদাভেদখণ্ডন।

তদ্রূপ যে সব সম্প্রদায় জীবের বিভুত্ববাদী জীব ও ব্রহ্মে ভেদস্বীকার করেন, তাঁহারাও অসঙ্গত কথা বলেন। কারণ, বিভুবস্তু একাধিক হয় না। আর বিভু অর্থ 'সর্ব্বব্যাপী' বলিয়া সর্ব্ববস্তু থাকা আবশ্যক—একথাও সঙ্গত নহে; কারণ, সাকার বা পরিচ্ছিন্ন বস্তুর ব্যাপক হইতে গেলে তাহার অভ্যন্তর আর বর্জ্জন করা চলে না। বস্তুতঃ সর্ব্বব্যাপক বস্তু স্বীকার করিতে গেলে সর্ব্বকে কল্পিত বলা ভিন্ন আর উপায় নাই। সর্ব্বকে সত্য স্বীকার করিয়া সর্ব্বব্যাপক বলিলে সর্ব্বব্যাপকত্বই অসিদ্ধ হয়। অতএব জীববিভুত্ববাদীর জীবভেদ স্বীকার করা সঙ্গত হয় না। এজন্য জীব ও ব্রহ্ম অভিন্নই হয়।

ব্রহ্ম সত্য অর্থ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

ইহাই হইল "ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা, জীব ব্রহ্মই, তদ্ভিন্ন নহে" এই বাক্যের অর্থ। 'ব্রহ্ম সত্য' এইমাত্র বলায় 'জগন্মিথ্যা' এবং 'জীব ব্রহ্মই তদ্ভিন্ন নহে' এই দুইটী বিষয়ও অর্থবলেই বুঝা যায়, তথাপি স্পষ্টতার জন্য পৃথগ্ভাবে কথিত হইয়াছে। আর তদনুসারে এস্থলেও সেই বিষয় দুইটার শ্রুতি ও অনুমান প্রমাণ প্রভৃতি প্রদর্শিত হইল।

অবশ্য এখানে ব্রহ্মকে সত্য বলায় ব্রহ্ম যে সত্বধর্ম্মবিশিষ্ট নহে, কিন্তু সৎস্বরূপ, তাহাও বুঝিতে হইবে। কারণ, বেদেরই অনুসরণ করিয়া এইমতে শুদ্ধ ব্রহ্মে ধর্ম্মধর্ম্মিভাব স্বীকার করা হয় না। ইহার কারণও যে নাই, তাহাও নহে। তাহা এই যে, ধর্ম্মধর্ম্মিভাব মায়ার কার্য্য। সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বরে এই ধর্ম্মধর্ম্মিভাব থাকে, শুদ্ধব্রহ্মে ইহা নাই—ইহাই অদ্বৈতবাদে স্বীকার করা হয়। বস্তুতঃ ধর্ম্মধর্ম্মিভাব না থাকিলে জ্ঞেয়ত্ব সিদ্ধ হয় না। আর জ্ঞেয়ত্ব সিদ্ধ হইতে গেলে জ্ঞাতা ও জ্ঞান উভয়ই আবশ্যক হয়। এই জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞাতৃত্বভাবই মায়ার কার্য্য। এজন্য ধর্ম্মধর্ম্মিভাবটী মায়ার কার্য্য, শুদ্ধব্রহ্ম জ্ঞেয় হয় না। এজন্য তাহাতে ধর্ম্মধর্ম্মিভাব নাই বলা হয়। অতএব 'ব্রহ্ম সত্য' অর্থ—ব্রহ্ম সত্বধর্ম্মবিশিষ্ট নহে, কিন্তু ব্রহ্ম সৎস্বরূপ।

ব্রহ্ম সৎ বলিয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও অদ্বৈত।

আর ব্রহ্মকে সৎস্বরূপ বলায় ব্রহ্ম যে চিৎ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ, কিন্তু জ্ঞানধর্ম্মযুক্ত বা আনন্দধর্ম্মযুক্ত নহে, তাহাও বুঝিতে হইবে; কারণ, যাহা সৎস্বরূপ তাহা জ্ঞানস্বরূপ বা আনন্দস্বরূপ হইতে বিভিন্ন হইতে পারে না। এই তিনটী শব্দে একই বস্তুকে লক্ষ্য করা হয়। এজন্য ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ পদের বাচ্যও নহেন, কিন্তু লক্ষ্য বলা হয়। বাচ্য হইলে ধর্ম্মধর্ম্মিভাব থাকে এবং তাহা এক অদ্বৈত বস্তুও হইতে পারে না। কিন্তু লক্ষ্য বলিলে 'তদ্রূপ' হইতে বাধা হয় না। তথাপি 'লক্ষ্য' বলিলে পরম্পরায় সম্বন্ধ সম্ভব হয়। এজন্য যেমন গঙ্গাপদে গঙ্গাতীর অর্থ করিলেও গঙ্গাপদের বাচ্যার্থ গঙ্গাজলপ্রবাহের সঙ্গে তীরের সম্বন্ধ বুঝায়, এস্থলে তাহাও নিবারণ করিবার মানসে ব্রহ্মকে "দ্বৈতভাবোপলক্ষিত" বলা হয়। উপলক্ষিত হইলে সম্বন্ধের অনিত্যতাই বুঝায়। আর অনিত্য হইলে তাহা আধ্যাসিক বা ভ্রম বা মিথ্যা সম্বন্ধেই পরিণত হয়। এইরূপে সচ্চিদানন্দ-পদদ্বারা অসঙ্গ ব্রহ্মকে বুঝান হয়। অর্থাৎ একই ব্রহ্ম—সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ বলা হয়। একই ব্রহ্ম সত্ত্ব, চিত্ত্ব ও আনন্দত্বরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া বিচিত্র বা সবিশেষ নহে। দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি মতবাদিগণ, কিন্তু তাহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য সততঃ সচেষ্ট। কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ উপনিষৎপ্রমাণবলে পরব্রহ্মকে "নির্গুণ নির্ব্বিশেষ" বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহারা মিথ্যামায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মকে—সগুণ সবিশেষ দ্বৈত দ্বৈতাদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি বলিয়া থাকেন।

অদ্বৈতবাদে অপর বাদের স্থান।

অদ্বৈতমতে নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম মিথ্যা মায়াযোগে দ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত-ভাবাপন্ন হন বলিয়া অদ্বৈতমতে এই সব মতবাদের স্থান আছে। কিন্তু এই সব মতবাদে অদ্বৈতবাদের স্থান নাই। এই সব মতবাদে অদ্বৈতবাদকে ব্যাবহারিক দৃষ্টিতেও অসঙ্গত বা ভ্রম বলা ভিন্ন আর উপায় নাই। কিন্তু অদ্বৈতমতে ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে এই সব মতবাদকে ভ্রম বলা হয় না, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতেই ভ্রম বলা হয়। ইহাদিগকে অদ্বৈততত্ত্বের সোপান বলা হয়। এইজন্য যদি কোনও সার্ব্বভৌমক সার্ব্বজনীন মত থাকে, তাহা হইলে তাহা এই অদ্বৈতবাদই। ইহাই হইল সংক্ষেপ অদ্বৈতবাদের স্বরূপ।

অদ্বৈতবাদের সহিত অপরাপর মতবাদের সম্বন্ধ।

কোন মতবাদের স্থাপন করিতে হইলে স্বপক্ষস্থাপন যেমন প্রয়োজন, পরপক্ষের আপত্তিখণ্ডনাদিদ্বারা অপরাপর মতবাদের সহিত তাহার সম্বন্ধ প্রদর্শন করাও তদ্রূপ প্রয়োজন। কারণ, পরপক্ষের আপত্তি খণ্ডিত না হইলে বা অপর মতের সহিত তাহার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিবেচিত না হইলে, স্বপক্ষে অনেকেরই সন্দেহ থাকিয়া যায়। এজন্য স্বপক্ষস্থাপনের একটা অঙ্গবিশেষ পরপক্ষের আপত্তিখণ্ডন বা পরমতের সহিত স্বমতের তুলনাদি। "বাদ" কথাতে এস্থলে পরের আক্রমণের সদুত্তর প্রদানমাত্র বুঝায়। "জল্প" কথাতে অবশ্য পরকে আক্রমণ করাও বুঝায়। আর "বিতণ্ডা" কথাতে স্বপক্ষস্থাপন না করিয়াই পরপক্ষের খণ্ডন করাই বুঝায়। এজন্য বিতণ্ডা, পণ্ডিতগণ আদর করেন না। "বাদ" কথায় সত্যনির্ণয় হয় বলিয়া, তাহাই তাঁহারা আদর করেন। এমন কি "জল্প" কথাতেও পরমতের

আক্রমণ থাকে বলিয়া জল্প কথাতেও তাঁহারা তত আদর করেন না। এস্থলে সেই "বাদ" কথানুসারে পরপক্ষের আক্রমণের উত্তরমাত্র প্রদত্ত হইতেছে। আর তদ্দ্বারা অপর মতের সহিত ইহার সম্বন্ধনির্ণয় করা হইতেছে।

অদ্বৈতবাদের বিরোধী চারিটী মতবাদ।

এস্থলে অদ্বৈতবাদের সঙ্গে যাহাদের বিবাদ হয়, তাহা প্রধানতঃ চারিটী মতবাদ বলিয়া দেখা যায়, যথা—

১ দ্বৈতবাদ। ২ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। ৩ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ৪ শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। [তত্তৎশব্দ দ্র°]

দ্বৈতবাদের পরিচয়।

১। দ্বৈতবাদীর মতে জগৎকারণ বহু বস্তু বলা হয়। যথা— জীবাত্মা, পরমাত্মা, পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্ ও মন প্রভৃতি। এই দ্বৈতবাদীর মধ্যে আবার অনেক অবান্তর ভেদ আছে, যথা—নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মাধ্ব, বৈষ্ণব প্রভৃতি। ইহাদের মতে এই পদার্থবিভাগও বিভিন্ন। এজন্য তাহাদের আকর গ্রন্থ, যথা তর্কভাষা, তর্কসংগ্রহ, সাংখ্য-কারিকা, পাতঞ্জলসূত্র ও সৎতত্ত্বরত্নমালা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের পরিচয়।

২। বিশিষ্টাদ্বৈতমতে জগৎকারণটী জীবাত্মা বা চিৎ এবং সূক্ষ্মজগৎ বা অচিৎএতদুভয়বিশিষ্ট ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। ইহারই অপর নাম চিদচিদ্‌বিশিষ্ট ঈশ্বর এবং এই জীবাত্মা ও সূক্ষ্মজগৎ ব্রহ্মের বা পরমাত্মার বা ঈশ্বরের বিশেষণস্বরূপ। সুতরাং এক অদ্বৈত ব্রহ্মই জগৎকারণ হইলেও তাহা 'কেবল' অদ্বৈত নহে। কিন্তু তাহা বিশেষ প্রকারের অদ্বৈত অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈত। আর জীব ও জগদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্ম হওয়ায় ব্রহ্মের এক অংশ বিকারী এবং অপর অংশ অবিকারী—ইহাও বলা হইল। এইরূপে উভয় মিলিয়া এক ব্রহ্মই জগৎকারণ হন, বলা হয়; ইহা রামানুজাচার্য্যের মত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের মতে পদার্থবিভাগ দ্বৈতবাদীর অনুরূপ হইলেও যথেষ্ট প্রভেদ আছে। এজন্য যতীন্দ্রমতদীপিকা, তত্ত্বমুক্তাকলাপ প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদের পরিচয়।

৩। দ্বৈতাদ্বৈতবাদটী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেরই অনুরূপ, কিন্তু জীব ও জগৎকে ব্রহ্মের বিশেষণ বলা হয় না। ইহাদের পদার্থ-বিভাগও দ্বৈতবাদীরই কতকটা অনুরূপ। ইহা ভাস্করাচার্য্য ও নিম্বার্কস্বামীর মত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা বস্তুতঃ দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মধ্যবর্ত্তী মতবাদ, এজন্য ব্রহ্মসূত্রের ভাস্করভাষ্য ও নিম্বার্কভাষ্য প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদের পরিচয়।

৪। শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমতটী অদ্বৈতবাদেরই অনুরূপ। কেবল এই মতে শক্তি নিত্য বলা হয়। এমতে এক অচিন্ত্য ব্রহ্মে অচিন্ত্য নিত্য শক্তিবশতঃ এই জগদ্‌বৈচিত্র্য হইয়াছে—বলা হয়। আর সেই জগৎ মিথ্যা নহে। ইহা কতিপয় শাক্ত, অধিকাংশ শৈব এবং কতিপয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মত। এজন্য শ্রীকণ্ঠভাষ্য, শ্রীকরভাষ্য, তন্ত্র, কাশ্মীর শৈবশাস্ত্র এবং শ্রীজীব ও বলদেব গোস্বামী প্রভৃতির গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

শ্রুতির স্পষ্টার্থ অদ্বৈতবাদে।

জগৎকারণ সম্বন্ধে যাবতীয় বৈদিক মতবাদ এই চারিটী মতবাদের অন্তর্ভুক্ত। যাহা হউক, এই সমস্ত মতবাদিগণ শ্রুতি ও যুক্তি উভয় পথেই অদ্বৈতবাদকে আক্রমণ করিয়া থাকেন, এবং অদ্বৈতবাদীও তাহার সমুচিত উত্তর দিয়া থাকেন। তন্মধ্যে শ্রুতি অবলম্বনে তাঁহাদের যে আক্রমণ, তাহার উত্তর অতি বিস্তৃত হইবে বলিয়া, এস্থলে তাহার আলোচনা করা গেল না। কেবল যুক্তি অনুসারে তাহাদের আক্রমণের উত্তর দেওয়া হইল। আগ্রহ বর্জ্জন করিয়া এবং কোন মতের ব্যাখ্যা অবলম্বন না করিয়া মীমাংসার সাহায্যে শ্রুতির পাঠমাত্র করিলেই সহজ বুদ্ধিতে সেই সকল শ্রুতির যে অর্থ প্রতিভাত হয়, তাহা অদ্বৈত-বাদেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে—দেখা যাইবে। অতএব এস্থলে শ্রুত্যর্থবিচারদ্বারা অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণের উত্তর না দিয়া যুক্তিসাহায্যে ইঁহারা অদ্বৈতবাদের উপর যে আক্রমণ করেন, তাহারই উত্তর প্রদান করা হইতেছে।

দ্বৈতবাদিকর্তৃক অদ্বৈতবাদখণ্ডন।

দ্বৈতবাদী বলেন—একমাত্র অদ্বৈতবস্তু হইতে কখন দ্বৈত-বস্তুর উৎপত্তি হইতে দেখা যায় না। বীজ হইতে অঙ্কুরোৎ-পত্তিতে মৃত্তিকা জল ও আলোক প্রভৃতি আবশ্যক। মৃত্তিকা হইতে ঘটোৎপত্তিতে মৃত্তিকা, সলিল, সূত্র, চণ্ড, চক্র ও কুম্ভকার প্রয়োজন হয়। বিশুদ্ধ জল কাঁচের পাত্রে সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ রাখিলে তাহাতে কীট শৈবালাদির আবির্ভাব হয় না। অন্য পদার্থ-মিশ্রিত জলেই তাদৃশ বস্তুর জন্ম হইতে দেখা যায়। অতএব এক অদ্বৈত নির্গুণ নিঃশক্তি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইতে পারে না।

আর জগৎ মিথ্যা বলিলেও এই মিথ্যার উৎপত্তি ও তাদৃশ অদ্বৈতবস্তু হইতে সম্ভবপর হয় না। সেই অদ্বৈতবস্তুভিন্ন মিথ্যার মূল কিছু না কিছু মানিতেই হইবে। অতএব "ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা, জীব ব্রহ্মভিন্ন নহে" এমত সঙ্গত হয় না।

আর জগৎ যখন সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ হইতেছে, আর তদনুসারে ব্যবহারও নিষ্পন্ন হইতেছে, এবং সেই ব্যবহার অনুসারেই জগতের সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বের বিচার করিতে করিতে কেহ কেহ জগন্মিথ্যাত্ববাদী হইয়া থাকেন, তখন

জগৎকে মিথ্যা বলা ত সঙ্গত হয় না। অতএব এই জগৎ সত্য, ইহা মিথ্যা নহে, তবে ইহা অনিত্য, ইহা বলা যাইতে পারে।

তাহার পর কোন একটা কিছু মিথ্যা বলিতে গেলে তাহার সত্তা অন্যত্র স্বীকারই করা হয়। যেমন রজ্জুতে সর্প মিথ্যা বলিলে অরণ্যাদিতে তাহার সত্তা স্বীকারই করা হয়। সর্প বলিয়া একটা কিছু না থাকিলে আর তজ্জন্য সর্পজ্ঞান না থাকিলে রজ্জুতে সর্পভ্রম কখনই হইতে পারিত না। অতএব ব্রহ্মে জগন্মিথ্যা বলিলে জগতের সত্তা অন্যত্র স্বীকারই করা হয়, তাহা হইতে জগতের জ্ঞান হয়, তৎপরে জগতের ভ্রম হয় বলিতে হইবে।

আর বেদবলে ইহাকে মিথ্যা বলিলে, সেই বেদকে সত্য বলিতে হইবে। বেদ যদি সত্য না হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা জগন্মিথ্যা কি করিয়া বলা যায়। 'আমি নাই' যে ব্যক্তি বলে, সে ব্যক্তি না থাকিলে "সে নাই" ইহা বলে কি করিয়া? অতএব জগৎ সত্য, কিন্তু অনিত্য, তবে মিথ্যা নহে। আর তজ্জন্য ব্রহ্মভিন্ন দেশ, কাল, জীবাত্মা, মন, পরমাণু, আকাশ প্রভৃতি নানা মূল বস্তু স্বীকার করা প্রয়োজন হয়।

আর—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরি ষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভি চাকশীতি" ॥ঋক্ ১।১৬৪.২০)

অর্থাৎ দুইটী পরস্পরসংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন পক্ষী একই বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে একটী স্বাদু ফল ভক্ষণ করে। আর অন্যটী না খাইয়া কেবল দর্শন করে। এইরূপ বহু দ্বৈত-বোধক অতি স্পষ্ট শ্রুতিই আছে। সুতরাং এতদ্দ্বারা দ্বৈতবাদই সিদ্ধ হয়।

ঋক্‌সংহিতামধ্যে "বিশ্বং সত্যং" বলা হইয়াছে, অতএব জগৎ মিথ্যা বলা অসঙ্গত। এজন্য শ্রুতিতে যে অদ্বৈত-বোধক বাক্যাবলী আছে, তাহার তাৎপর্য্য দ্বৈতে।

আর তাৎপর্য্যানুরোধে যেমন লৌকিক স্পষ্ট বাক্যের অর্থ অন্যথা করা হয়। এই সকল অদ্বৈত-বোধক শ্রুতি-বাক্যেরও অর্থ তদ্রূপ অন্যথা করা আবশ্যক। "গঙ্গায় ঘোষ বাস করে" ইহার অর্থ যেরূপ গঙ্গা-তীরে বাস করে বুঝায়, অর্থাৎ তাৎপর্য্যানুরোধে স্পষ্টার্থের অন্যথা করা হয়, তদ্রূপ এই সব অলোকিক অদ্বৈততত্ত্ব-বোধক বাক্যেরও অর্থ অন্যথা করিতে হইবে। অতএব দ্বৈতবাদই সমীচীন মত। অদ্বৈতবাদ সমীচীন মত নহে।

দ্বৈতবাদিগণ অদ্বৈতমতখণ্ডনে বহু গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের জয়তীর্থকৃত এবং ব্যাসাচার্য্যকৃত গ্রন্থাবলী এবং নৈয়ায়িকগণের ভেদরত্ন, ভেদসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিকর্ত্তৃক দ্বৈতবাদখণ্ডন।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ বলেন—দ্বৈতবাদীর একথা সঙ্গত হয় না। অদ্বৈতবাদ ভ্রম বটে, আর দ্বৈতবাদী তাহার যে খণ্ডন করেন, তাহাও আমাদের অভীষ্ট বটে, কিন্তু জগৎকারণ দ্বৈতবস্তু নহে। পরন্তু বিশিষ্টাদ্বৈত বস্তু। আর অদ্বৈত শ্রুতিকে যে ভাবে লক্ষণার দ্বারা দ্বৈতপর করা হয় তাহাও আমাদের অভীষ্ট নহে। এজন্য একই অদ্বৈত ব্রহ্মে কিছু 'বিশেষ' আছে বলিয়া স্বীকার করিলে সকল দিক্ সামঞ্জস্য হয়। সেই 'বিশেষ' বলে একই ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপে থাকিলেও, অর্থাৎ অবিকৃত থাকিলেও, তাহা হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়। এজন্য ব্রহ্মের একাংশ বিকারী এবং অপরাংশ অবিকারী —এইরূপ স্বীকার করাই সঙ্গত। আর এই বিকারী ও অবিকারী —উভয়াংশ বিশেষণ ও বিশেষ্যরূপে মিলিয়া এক অদ্বৈত ব্রহ্ম হইয়াছে। এই ব্রহ্মের বিকারী বা বিশেষণ অংশ জগৎ হয়। আর অবিকারী বা বিশেষ্য অংশ ব্রহ্মই থাকে। আর এইরূপে ঠিক্ দ্বৈতবস্তু স্বীকার না করায় "দ্বৈত হইলে বিনশ্বর হইবে" এই যে আপত্তি, তাহা আর প্রবৃক্ত হইতে পারিবে না। বস্তুতঃ শ্রুতিই এইরূপ বিভাগ করিয়া দিয়াছেন, যথা—

"পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"

অর্থাৎ এই ব্রহ্মের একপাদ এই বিশ্বজগৎ আর ইহার তিন পাদ অমৃত। তাহার পর—

"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরম্, যঃ পৃথিব্যাং অন্তরো যময়তি এষ ত আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ॥" (বৃঃ উঃ—৩.৭.৩)

এই শ্রুতিতেও ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে শরীরশরীরিভাব পরিস্ফুট। ইহাও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেরই অনুকূল।

আর "দ্বা সুপর্ণা সযুজা" শ্রুতিতে সযুজা পদের অর্থ যে পরস্পর সংযুক্ত, তাহাও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অনুকূল। কারণ, যাহারা নিত্য-সংযুক্ত তাহারা পরস্পরে পৃথক্ হইয়া একপদ বাচ্য হয়। বস্তুতঃ ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। অতএব দ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে।

তাহার পর এ ভাবের দৃষ্টান্তও আছে, যেমন মহাবৃক্ষের প্রতিবৎসর ফল, ফুল প্রভৃতি হইতেছে, এবং তাহা নষ্টও হইতেছে, অথচ 'সেই বৃক্ষ' বলিয়া সকলেই তাহাকে ব্যবহারও করিতেছে। এস্থলে একই বৃক্ষের বিকারী ও অবিকারী অংশ স্বীকার করিয়াই এই ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। তদ্রূপ ব্রহ্মের বিকারী অংশ হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইতেছে, কিন্তু অবিকারী অংশ যেমন তেমনই থাকিতেছে।

আর অঙ্গের সহিত অঙ্গীর ভেদাভেদ সম্বন্ধই স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং যখন সৃষ্টি হয়, তখন ব্রহ্মের বিকার

হয়—যেমন বলা যায়, তদ্রূপ ব্রহ্মের বিকার হয় না—ইহাও বলা যায়। এইরূপে ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ হইয়াও নিমিত্তকারণও হইয়া থাকেন। আর এইরূপে দ্বৈতশ্রুতি ও অদ্বৈতশ্রুতি সকল শ্রুতিরই সামঞ্জস্য হয়। আর এজন্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই যে সঙ্গত এবং দ্বৈতবাদ যে অসঙ্গত, তাহা বলাই বাহুল্য।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিকর্ত্তৃক অদ্বৈতবাদখণ্ডন।

আর এজন্য অদ্বৈতবাদ যে অসঙ্গত, তাহাতে কোন আপত্তিই হইতে পারে না। যেহেতু "একই কারণ হইতে যে কার্য্য হয় না" দ্বৈতবাদীর এই কথাটি আমরাও সত্য বলিয়া জ্ঞান করি। আর "জগৎ যদি মিথ্যাই হয়, তাহা হইলে সেই মিথ্যা জগৎই বা কেন প্রতীয়মান হয়? সেই মিথ্যার হেতু নিশ্চয়ই কিছু সেই ব্রহ্মভিন্ন আছে, বলিতে হইবে"—ইত্যাদি দ্বৈতবাদীর কথাও আমরা সত্য বলিয়া বিবেচনা করি।

অধিক কি, সর্পের সত্তা না থাকিলে রজ্জুতে সর্পভ্রমও হয় না—ইহাও আমরা সমর্থন করি। সর্পসত্তাই সর্পজ্ঞানের জনক। অতএব জগৎ ব্রহ্মে নাই, কিন্তু মিথ্যা—এ কথা অদ্বৈতবাদীর অসঙ্গত।

তাহার পর অদ্বৈতবাদী নির্গুণ ব্রহ্মে মিথ্যা মায়া স্বীকার করিয়া জগদুৎপত্তির উপপত্তি করেন। কিন্তু তাহাও অসঙ্গত; কারণ, মিথ্যা বস্তুর সত্তা নাই, সুতরাং অসৎ। অসতের ক্রিয়া সম্ভব নহে। আর তাহা প্রতীতিগোচরও হয় না। বন্ধ্যাপুত্র অসৎ বলিয়া তাহার জ্ঞানও হয় না, ক্রিয়াও হয় না। অতএব এই মায়ার জ্ঞান হওয়ায় ও ক্রিয়া থাকায় এই মায়া অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা হইতে পারে না। প্রত্যুত এই মায়া ব্রহ্মের শক্তি বলিয়াই সত্য।

আর ব্রহ্মের স্বরূপ বা শরীর হইতে তাঁহার শক্তি পৃথক্ থাকিতে পারে না বলিয়া বিবিধ শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মের অংশ স্বীকার করা আবশ্যক।

আর যাবৎ অদ্বৈতশ্রুতি আমাদের বিশিষ্টাদ্বৈতমতে ব্যাখ্যা করা যায়। যথা "নির্গুণ" শব্দের অর্থ—হেয়গুণবর্জ্জিত। "অদ্বৈত" শব্দের অর্থ—ব্রহ্মের ন্যায় অন্য ব্রহ্ম নাই। "অখণ্ড" ও "অব্যয়" শব্দ ব্রহ্মের অবিকারী অংশে প্রযোজ্য। অতএব শ্রুতি ও যুক্তিবলে এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই সমর্থিত হয়, কিন্তু অদ্বৈতমত কোনরূপেই সঙ্গত হয় না।

যাহা হউক, দ্বৈতবাদিকর্ত্তৃক অদ্বৈতখণ্ডন সঙ্গত হইলেও দ্বৈতবাদীর নিজ মতটী সঙ্গত হয় না। এ সম্বন্ধে অধিক জানিতে হইলে শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য, মহাচার্য্যের যতীন্দ্রমতদীপিকা, বেদান্তমহাদেশিকের তত্ত্বমুক্তাকলাপ, শতদূষণী প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

দ্বৈতবাদিকর্ত্তৃক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদখণ্ডন।

দ্বৈতবাদী বলেন—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর এ কথা অসঙ্গত, আমরা যে ভাবে দ্বৈততত্ত্ব স্বীকার করি, এবং যে ভাবে অদ্বৈতমত খণ্ডন করি, তাহাই সঙ্গত। কারণ, বিশিষ্টাদ্বৈতমতে একই ব্রহ্মের বিকারী ও অবিকারী অংশ স্বীকার করা হয়, কিন্তু একই বস্তুতে বিরুদ্ধাংশ থাকিতে পারে না। থাকিলে তাহাকে 'এক' বলিয়া যে ব্যবহার করা হয়, তাহা ভ্রান্ত ব্যবহারই হয়। যেমন সমুদ্রের ভিতর নানা জীবজন্তু পর্ব্বতাদিসত্ত্বেও তাহাকে একটী বস্তু সমুদ্র বলিয়া ব্যবহার করা হয়। তদ্রূপ অসংখ্য দ্বৈতবস্তুপূর্ণ ব্রহ্মবস্তুকে 'এক' বলিয়া ব্যবহার করা হয় মাত্র। বস্তুতঃ, তাহা 'এক' নহে।

আর বৃক্ষের দৃষ্টান্তও সঙ্গত নহে। উহাতেও শাখা পুষ্প পত্র রস প্রভৃতি নানা বস্তু থাকে, কেবল 'এক' বলিয়া ব্যবহার হয় মাত্র। দীর্ঘকাল পরে সেই বৃক্ষকে আর চিনিতেই পারা যাইবে না। অতএব অদ্বৈত বস্তুতে 'বিশেষ' স্বীকার করিয়া 'এক' হইতে জগদুৎপত্তি উপপন্ন করিবার চেষ্টা ব্যর্থ।

আর বৃক্ষের ফল ফুল শাখাপত্র প্রভৃতির ভেদ, বৃক্ষ ভিন্ন আকাশ থাকায় সম্ভব হয়। এই আকাশ বৃক্ষের পক্ষে বিজাতীয় বস্তু। অতএব বৃক্ষের শাখাপত্রাদির ভেদরূপ স্বগতভেদস্থলে বিজাতীয়ভেদও থাকে। এইরূপ যেখানেই স্বগতভেদ স্বীকার করা হইবে, সেই স্থলেই বিজাতীয় ভেদ থাকে। সুতরাং অদ্বৈত ব্রহ্মে স্বগতভেদ স্বীকার করিলে ব্রহ্মভিন্ন বস্তু স্বীকার্য্য হইবে। আর তাহা হইলে বিজাতীয় ভেদবশতঃ দ্বৈতই সিদ্ধ হইবে।

তাহার পর অদ্বৈতে যে 'বিশেষ' স্বীকার করা হয়, সেই 'বিশেষ'ও সেই অদ্বৈত বস্তু হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন? ভিন্ন হইলে দ্বৈতবাদ হইল। আর অভিন্ন হইলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হইল না। যেহেতু বিশেষ্যবিশেষণ সম্বন্ধ অভিন্নস্থলে হয় না। অতএব 'বিশেষ' স্বীকার করায় প্রকারান্তরে দ্বৈতবাদই স্বীকার করা হয়।

আর ভেদাভেদ সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া 'বিশেষ' সহিত সেই অদ্বৈত বস্তুর সম্বন্ধ স্বীকার করিব—ইহাও বলা যায় না। কারণ, এই ভেদাভেদ সম্বন্ধ পরস্পরবিরুদ্ধ। তাহারা কখনই একত্র থাকিতে পারে না। একই দৃষ্টিতে ভেদ এবং একই দৃষ্টিতে অভেদ কোথাও দেখা যায় না। একই দৃষ্টিতে ভেদাভেদ স্বীকার করিলে কিছুই স্বীকার করা হইল না।

আর যদি শ্রুতিবলে ইহা সিদ্ধ করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে বলিব শ্রুতি যদি একেবারে অলৌকিক বস্তু উপদেশ করেন, তাহা হইলে তাহা বোধগম্যই হইবে না। অতএব শ্রুতির অর্থ লৌকিক ন্যায়সঙ্গতভাবেও করা উচিত। আর তজ্জন্য অদ্বৈতবোধক শ্রুতির অর্থ—"গঙ্গায় ঘোষ বাস করে" এই বাক্যের অর্থের ন্যায় লক্ষণাদ্বারা করিয়া দ্বৈতপর করাই আবশ্যক।

তাহার পর দ্বৈতবস্তু মাত্রই নশ্বর হইবে কেন? আকাশ ও আত্মা প্রভৃতি ত দ্বৈতবস্তু, কিন্তু তাহারা ত নশ্বর নহে। কারণ,—নাশক্রিয়ার জন্যও ত আকাশ থাকা আবশ্যক। আকাশ না থাকিলে কোনও সাবয়ব বস্তুর নাশ সম্ভবপর নহে। আর আকাশ সাবয়ব বস্তুও নহে। আকাশ ব্রহ্মের ন্যায় নিরবয়ব বলিয়া শ্রুতি আকাশকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন।

আর "দ্বা সুপর্ণা সযুজা" শ্রুতিতে সযুজা পদের অর্থ—বিশিষ্টাদ্বৈতের অনুকূল কেন হইবে? দুগ্ধ ও ভাণ্ড পরস্পর সংযুক্ত হইলেও তাহারা পৃথক্‌ই হয়। শরীরশরীরিভাববোধক শ্রুতিও দ্বৈতের বোধক; কারণ, শরীর ও আত্মা পৃথক্‌ই হয়। শরীর ত আত্মার অংশও নহে।

আর "পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি" এই শ্রুতি ও আধারাধেয়ভাবের বোধক; তাহাও অংশাংশিভাবের বোধক নহে; অতএব শ্রুতি ও যুক্তি—সকল রূপেই দ্বৈতবাদই সঙ্গত, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সঙ্গত নহে।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদিকর্ত্তৃক দ্বৈতবাদখণ্ডন।

দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর বিবাদে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বলেন—দ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী কেহই সঙ্গত কথা বলিতেছেন না। প্রথমতঃ দেখা যায়—দ্বৈতবাদীর কথা সঙ্গত নহে। কারণ, সকল দ্বৈতমধ্যেই একটা না একটা অদ্বৈতভাব দৃষ্ট হয়। ঘট, শরাব, কলস বিভিন্ন হইলেও তন্মধ্যে মৃত্তিকারূপ একটী অদ্বৈত বস্তু দেখা যায়। এইরূপ সকল কার্য্য বস্তুমধ্যে কারণরূপে একটী বস্তুকে দেখা যায়। সুতরাং সকল কার্য্য বস্তুমধ্যে দ্বৈতাদ্বৈতভাবই বর্ত্তমান। যেমন ঘটজ্ঞান হইলেই ঘটাকার ও মৃত্তিকা উভয়েরই জ্ঞান হয়। কেবল ঘটাকার বা কেবল মৃত্তিকার জ্ঞান হয় না। অতএব শুদ্ধ দ্বৈতবাদ সিদ্ধ হয় না। কিন্তু দ্বৈতাদ্বৈতই সিদ্ধ হয়। আর তজ্জন্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদই সমীচীন। আর যাবৎ দ্বৈতশ্রুতিই এই দ্বৈতাদ্বৈত মতে অবাধে ব্যাখ্যা করা যায়। অতএব দ্বৈতবাদ সঙ্গত মত নহে। তবে তাঁহারা যে অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করেন, তদংশে আমাদের আপত্তি নাই।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদিকর্ত্তৃক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদখণ্ডন।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বলেন—বিশিষ্টাদ্বৈতমতও সিদ্ধ হয় না। কারণ, মৃন্ময় ঘটস্থলে ঘটাকারবিশিষ্ট মৃত্তিকা যেমন বলা যায়, তদ্রূপ মৃত্তিকাবিশিষ্ট ঘটাকারও বলা যায়। মাটীর ঘট বা ঘটের মাটী উভয়ই ব্যবহার হয়। এখানে কে বিশেষ্য, কে বিশেষণ—এরূপ নির্ণয় করিবার কোন নিয়ম নাই। বিশিষ্টাদ্বৈতমতে কিন্তু ঘটাকারবিশিষ্ট মৃত্তিকাই বলিতে হইবে। কারণ, তন্মতে অদ্বৈতকেই বিশিষ্ট অর্থাৎ বিশেষযুক্ত বলায়, তাহাই বিশেষ্য হইতেছে। অতএব বিশিষ্টাদ্বৈতমত সঙ্গত হইতে পারে না।

তাহার পর বিশেষ স্বীকার করায় দ্বৈতই স্বীকার করা হইল। এ বিষয়ে দ্বৈতবাদী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদখণ্ডনের জন্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদেরও অভীষ্ট। এইরূপ দ্বৈতের সঙ্গে অদ্বৈতের বিশেষ্যবিশেষণসম্বন্ধ স্বীকার করা অন্যায়। আর তজ্জন্য বিশিষ্টাদ্বৈতমত সঙ্গত নহে। কিন্তু দ্বৈতাদ্বৈতমতই সঙ্গত। সর্ব্বত্রই দ্বৈত এবং অদ্বৈত দেখা যায়, কিন্তু তাহাদিগকেও ত বিশিষ্টরূপে দেখা যায় না। ঘটও দেখা যায়, মৃত্তিকাও দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধের জ্ঞান ত সেই সঙ্গেই হয় না। অদ্বৈতের জ্ঞান হয়, তাহাতে বিশেষেরও জ্ঞান হয়, কিন্তু সেই বিশেষের সহিত অদ্বৈতের সম্বন্ধের জ্ঞান তখনই কোথায় হয়? সম্বন্ধের জ্ঞানটী পরবর্ত্তী ও কল্পনামাত্র। যাহা দেখা যায় তদ্রূপই ত বলা উচিত। কল্পনাবলে তাহাদিগকে বিশিষ্ট করিবার প্রয়োজন কি? এই কারণে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সঙ্গত নহে, কিন্তু দ্বৈতাদ্বৈতবাদই সঙ্গত। শরীরশরীরিভাব মধ্যে অংশাংশী সম্বন্ধ এবং এক ব্রহ্মের বিকারী ও অবিকারী অংশদ্বয় স্বীকার সম্বন্ধে দ্বৈতবাদী যে ভাবে খণ্ডন করেন, তাহা আমাদেরও গ্রাহ্য, অর্থাৎ শরীর আর আত্মার অংশ নহে এবং এক ব্রহ্মে বিরোধী অংশদ্বয়ও নাই। অতএব দ্বৈতাদ্বৈতবাদই সঙ্গত।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদিকর্ত্তৃক অদ্বৈতবাদখণ্ডন।

আর অদ্বৈতবাদ যে অসঙ্গত, তাহা বলাই বাহুল্য। এ বিষয়ে দ্বৈতবাদী বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী যাহা বলিয়া থাকেন, তাহা আমরাও বলি। তত্ত্ব যদি অদ্বৈতই হয়, তবে তাহার মধ্যে জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভাব অসম্ভব। অথচ আমরা জ্ঞাতা, আর এই জগৎ জ্ঞেয়। জ্ঞানস্বরূপ আত্মবস্তুটী জ্ঞাতৃরূপে থাকিয়া নিয়ত জ্ঞেয়াকারে পরিণত হইতেছে, এবং তৎপরেই সেই জ্ঞেয়কে নিজ জ্ঞাতৃরূপ হইতে পৃথক্ করিয়া, সেই পৃথক্‌কৃত জ্ঞেয়রূপের জ্ঞাতা হইতেছে। এইরূপে একই জ্ঞানরূপ অদ্বৈত বস্তুটী দ্বৈত জ্ঞেয়রূপে মূলতঃ বর্ত্তমান রহিয়াছে, এজন্য দ্বৈতাদ্বৈতভাবই আত্মবস্তুর স্বভাব। বিশুদ্ধ অদ্বৈত বস্তু হইলে, এই জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভাব বর্ত্তমান থাকিত না।

তাহার পর মায়া যদি মিথ্যা হয়, তবে তাহার কার্য্য কখনও সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতে পারিত না। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও অনুমানপ্রমাণবিরুদ্ধ হওয়ায় অদ্বৈতবাদ অসঙ্গত।

শ্রুতিমধ্যেও দ্বৈতাদ্বৈতমতবাদের যথেষ্ট সমর্থন আছে। যাবৎ অদ্বৈত, দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবোধক শ্রুতিই এই মতের পরিপোষক, "অরা ইব রথনাভৌ" "যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ" "একোঽহং বহুস্যাং" "তদাত্মানমকুরুত" ইত্যাদি বহু শ্রুতিই এই মতের অনুকূল। অতএব দ্বৈতাদ্বৈতবাদই সঙ্গত। এ সম্বন্ধে ভাস্করভাষ্য, নিম্বার্কভাষ্যাদি, কেশব কাশ্মীরীর গ্রন্থ এবং পরপক্ষগিরিবজ্র প্রভৃতি গ্রন্থ প্রধান বলা যাইতে পারে।

দ্বৈতবাদিকর্তৃক দ্বৈতাদ্বৈতবাদখণ্ডন।

দ্বৈতবাদী বলেন—অদ্বৈতখণ্ডনে আমরা সকলে একমত বটে। কিন্তু দ্বৈতাদ্বৈতবাদী যে দ্বৈতবাদে দোষ প্রদর্শন করেন, তাহা সঙ্গত নহে। সকল দ্বৈতমধ্যে একটা অদ্বৈত থাকিলেও অদ্বৈতদ্বারা ব্যবহার হয় না। কেহ মৃত্তিকা চাহিলে একজন একটা ঘট আনিয়া দেয় না, প্রত্যুত চূর্ণ বা পিণ্ডই আনিয়া দেয়। তদ্রূপ ঘট চাহিলেও কেহ মৃত্তিকা আনিয়া দেয় না। সুতরাং মৃত্তিকারূপে ঘট ও শরাবাদি এক হইলেও প্রসিদ্ধ মৃত্তিকারূপে মৃত্তিকাটী ঘট বা শরাবাদি হয় না। এজন্য এই একত্বদৃষ্টি কল্পিত বা অভ্যস্ত দৃষ্টি।

তাহার পর মৃত্তিকা এবং ঘট শরাবাদিদ্বারা দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধও হয় না। কারণ, যে মৃত্তিকা যৎকালে ঘট হয়, সেই মৃত্তিকাই তৎকালে শরাব হয় না। সুতরাং ঘট ও শরাবে একই মৃত্তিকা কোথায় থাকে? ঘটাকার মৃত্তিকা ও শরাবাকার মৃত্তিকা সুতরাং পৃথক্ হইয়া যায়। আর নিরাকার মৃত্তিকাই নাই যে, একই মৃত্তিকা উভয়াকার ধারণ করে, বলা যাইবে। 'পিণ্ড বা চূর্ণাকার মৃত্তিকাই ঘট হয়' বলিলে পিণ্ড বা চূর্ণও শরাবাদির ন্যায় আকারবিশিষ্টই হয়। অতএব ঘট ও মৃত্তিকার মধ্যে, হয়—ভেদ স্বীকার কর, না হয়—অভেদ স্বীকার কর।

আর সেই ঘট ও মৃত্তিকার মধ্যে ভেদাভেদ স্বীকার করাও যায় না। যেহেতু সাগর ও তরঙ্গ মধ্যেও সেই কথা। যে তরঙ্গের সহিত সাগরের ভেদ স্বীকার করা হয়, তাহারই সহিত আর অভেদ স্বীকার করা হয় না। কারণ, ভেদক্ষণের পরই তাহার নাশ হইয়া যায়। অতএব যাহার সঙ্গে ভেদ, তাহার সঙ্গে আর অভেদ হয় না।

আর যদি বলা হয়, ঘটাকারটী মৃত্তিকাভিন্নতেও থাকে এবং মৃত্তিকাও ঘটাকারভিন্নতেও থাকে, সুতরাং ঘট ও মৃত্তিকা ভিন্নাভিন্নই বটে, তাহাও হয় না। কারণ, এই ঘটাকার এবং মৃত্তিকা উভয়ই তখন কল্পিত বস্তু হয়। যেহেতু ঘটাকার তখন আকারভিন্ন এইরূপে বুঝিতে হয়। কিন্তু উহারা কেহই সেইরূপ নহে। অতএব ঘটাকার ও মৃত্তিকা ভিন্নাভিন্ন নহে। ভিন্নাভিন্নসম্বন্ধ কল্পিত বস্তুমধ্যেই হয়। তাহা যথার্থ বস্তুমধ্যে নাই। আর তজ্জন্য তাহারা ভিন্নই হয়, কিন্তু অভিন্ন হয় না। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সঙ্গত নহে, দ্বৈতবাদই সঙ্গত।

বস্তুতঃ ভেদাভেদ পরস্পর-বিরুদ্ধ। তাহারা একত্র থাকে বলিলে সেই ভেদাভেদ সম্বন্ধমধ্যে ভেদও থাকে না, অভেদও থাকে না বলিতে হয়।

তাহা তখন অদ্বৈতবাদীর অনির্ব্বচনীয় বস্তুতে পরিণত হয়। এজন্য ভেদাভেদসম্বন্ধ স্বীকার করিবার প্রয়াস অসঙ্গত।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিকর্তৃক দ্বৈতাদ্বৈতবাদখণ্ডন।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন—দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর কথা সঙ্গত নহে। কারণ, ঘট ও মৃত্তিকামধ্যে বিশেষ্য-বিশেষণভাব বেশ পরিস্ফুট। যেহেতু মৃত্তিকা যে নানা আকারে থাকে, ঘট তাহাদের মধ্যে একটা আকার। অতএব ঘটাকারই মৃত্তিকার বিশেষণ হইবে। মৃত্তিকা ঘটের বিশেষণ হয় না। ঘটাকারই মৃত্তিকাকে আশ্রয় করে। মৃত্তিকা কিন্তু তাদৃশ আকারকে আশ্রয় করে না। মৃত্তিকাকে জল, বায়ু প্রভৃতির দ্রব্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আকারকে ত দ্রব্য বলিয়া বোধ হয় না। যদি মৃত্তিকা ঘটের বিশেষণ হইত বা আশ্রিত হইত, তাহা হইলে মৃত্তিকাবিশিষ্ট ঘট হয় বলিয়া বিশেষ্য-বিশেষণের বিনিগমনাবিরহ প্রদর্শন করিয়া মৃত্তিকা ও ঘটের মধ্যে বিশেষ্য-বিশেষণভাব খণ্ডন সঙ্গত হইত। কিন্তু তাহা ত হয় না। আর যদি বিশেষ্য-বিশেষণের বিনিগমনাবিরহই হয়, তাহা হইলে ত বিশেষ্য-বিশেষণ সম্বন্ধের কোন হানি হয় না। সম্বন্ধ ত ঠিক্‌ই থাকে। অতএব বিনিগমনাবিরহপ্রযুক্ত সম্বন্ধ অস্বীকার সঙ্গত নহে।

আর যে বলিয়া ছিলে, ঘট ও মৃত্তিকার জ্ঞানমধ্যে সম্বন্ধের ভান হয় না। তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ, সূক্ষ্মদর্শীর নিকটে তাহার ভান হয়।

তাহার পর শরীরশরীরিভাবমধ্যে অংশাংশিভাব অবশ্য স্বীকার্য্য। যেহেতু শরীরভিন্ন ত শরীরী থাকে না। উভয়ই যখন নিত্য ও একত্র থাকে, তখন অংশাংশিভাবে বাধা কোথায়?

আর দ্বৈতাদ্বৈত বলিলে মূলবস্তু অদ্বৈত কি দ্বৈত, তাহা স্পষ্ট প্রকাশিত হয় না। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈত বলিলে, মূলবস্তুর একত্ব পরিস্ফুট হয়। আর তজ্জন্য একত্ববোধক শ্রুতিও অনুকূলই হয়। এইরূপে দেখা যায়—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই সঙ্গত মতবাদ, কিন্তু দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সঙ্গত নহে।

শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদিকর্তৃক দ্বৈতবাদখণ্ডন।

শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদী এই অবস্থান বলেন—দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদী কেহই সম্পূর্ণভাবে সত্য কথা বলিতে পারিতেছেন না। সকলের মধ্যেই কতক সত্য ও কতক অসত্য থাকিয়া যাইতেছে।

প্রথমতঃ দেখা যায়—দ্বৈতবাদী যেভাবে অদ্বৈত প্রভৃতি মতগুলি খণ্ডন করিতেছেন তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, দ্বৈতবস্তু স্বীকারে কেহই নিত্য হইতে পারে না। সসীম বা পরিচ্ছিন্ন বস্তুমাত্রই অনিত্য। দ্বৈত স্বীকার করিলে কোন বস্তুই অসীম বা অপরিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। বাহিরে অসীম বলিয়া স্বীকার করিলেও তদভ্যন্তরে দ্বৈতবস্তুস্বীকারে তাহা অন্তরে পরিচ্ছিন্নই হইয়া যাইবে। আর যাহার অন্তর পরিচ্ছিন্ন হয়, তাহার বহির্দেশ

যে অসীম হইবে, ইহার কোনই প্রমাণ নাই। এরূপ বস্তু আকাশের ন্যায় হইলেও তাহা পরিচ্ছিন্নই বলিতে হইবে। কারণ, শ্রুতিতে আকাশেরও উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। উৎপত্তিমদ্ বস্তু পরিচ্ছিন্ন ও সসীম হইয়াই থাকে। সুতরাং যাবদ্ দ্বৈতের ব্যাপক বিভু নিত্য বস্তু স্বীকার সঙ্গত হয় না। অতএব এতাদৃশ অসীম বস্তুর দৃষ্টান্তই নাই। সুতরাং তাহার কল্পনাই অসঙ্গত।

তাহার পর শ্রুতিতে স্পষ্টই আছে "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" অর্থাৎ এই অদ্বৈত ব্রহ্মের পরা শক্তি বিবিধ বলিয়া শ্রুত হয়। তাহার জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া স্বাভাবিকী, এই শক্তিবশতঃ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তু হইতে এই বিচিত্র দ্বৈত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। আর লোকমধ্যেও দেখা যায়—এক ব্যক্তি বিবিধ শক্তিবশতঃ নানারূপ কার্য্য করিয়া থাকে। অন্যত্রও আছে "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" অর্থাৎ তিনি এই সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অতএব শ্রুতি ও যুক্তি উভয়বলেই এক অদ্বৈততত্ত্বের শক্তিবশতঃ এই বৈচিত্র্যময় জগৎ হইয়াছে—ইহা সিদ্ধ হয়।

তাহার পর দ্বৈতবাদে জীবজগৎ ও ব্রহ্ম বিভিন্ন হওয়ায় ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণমাত্রায় হইতে পারেন না। কারণ, একটী বস্তু হইতে অন্য বস্তুটী ভিন্ন হইলে, সে তাহার অভ্যন্তরের অবস্থাটী অবগত হইতে পারে না। আমি আমার মনের কথা যতদূর জানি, আমা হইতে ভিন্নব্যক্তি আমার মনের কথা ততদূর কখনই জানিতে পারে না। এজন্য জীব ও জগৎ হইতে ব্রহ্ম ভিন্ন হইলে ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ হন না, আর তজ্জন্য সর্ব্বশক্তিমান্ও হন না। ইহাতে ব্রহ্মের মহিমাহানিই হয়।

পক্ষান্তরে একই অদ্বৈত ব্রহ্ম অচিন্ত্য সর্ব্বশক্তিবশতঃ সর্ব্বস্বরূপ হইলে তিনি সর্ব্বজ্ঞ হন, সুতরাং সর্ব্বশক্তিমান্ও হন। এইরূপে শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমতে—দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এমন কি অদ্বৈত মতের উদ্দেশ্যও কতকটা সিদ্ধ হয়। অদ্বৈতবাদখণ্ডনে দ্বৈতবাদী যাহা বলেন—তাহা আমাদেরও অভিমত। অতএব দ্বৈতবাদ অসঙ্গত। আমাদের শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমতই সঙ্গত মতবাদ।

শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদিকর্ত্তৃক বিশিষ্টাদ্বৈতমতখণ্ডন॥

তাহার পর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও সঙ্গত হয় না। কারণ, একই ব্রহ্মের বিকারী ও অবিকারী অংশ স্বীকার করিয়া জগতের উৎপত্তি প্রভৃতি সঙ্গত করিতে পারা যায় না। এ সম্বন্ধে দ্বৈতবাদী যে ভাবে বিশিষ্টাদ্বৈতমত খণ্ডন করেন, তাহা আমাদেরও সম্মত। দুইটী বিরুদ্ধ অংশদ্বারা একটী বস্তু গঠিত হইতে পারে না। ইহা আমরাও বলি। তবে দ্বৈতবাদী যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ অস্বীকার করেন, তাহা সঙ্গত হয় না। কারণ, নীলঘটস্থলে ভেদ ও অভেদ উভয়ই ব্যবহার হয়। নীলের সঙ্গে ঘটের যে সম্বন্ধ, তাহা ভেদ সম্বন্ধ হইলে দ্বৈতবাদী "নীল ঘট" বলিতেই পারেন না। আমরা বুঝিতে পারি না, বা বলিতে পারিনা বলিয়া বস্তুর অন্যথাসাধন উচিত নহে। সুতরাং ভেদাভেদসম্বন্ধ অসঙ্গত নহে।

তবে বিশিষ্টাদ্বৈতমতে যে ভেদাভেদসম্বন্ধ স্বীকার করা হইয়া থাকে, তাহা আমাদের শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমতে আরও সূক্ষ্মতর, সুতরাং উত্তম। বিশিষ্টাদ্বৈতমতে বৃক্ষের সহিত তাহার শাখা-পল্লবের যেরূপ ভেদাভেদ সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, তদ্রূপ ভেদাভেদ-সম্বন্ধ ব্রহ্ম ও জীবজগতের সহিতও স্বীকার করা হয়। কিন্তু শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমতে অগ্নির সহিত তাহার দাহিকাশক্তির অথবা জলের সহিত তাহার আর্দ্রীকরণশক্তির ভেদাভেদসম্বন্ধ স্বীকার করা হয়। এই ভেদাভেদসম্বন্ধ বৃক্ষের সহিত তাহার শাখা-পল্লবের ভেদাভেদ সম্বন্ধ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর। কারণ, বৃক্ষ ও তাহার শাখা-পল্লবের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু অগ্নির সহিত অগ্নির দাহিকাশক্তির, জলের সহিত জলের আর্দ্রীকরণশক্তির অভেদই প্রত্যক্ষ হয়, ভেদ প্রত্যক্ষ হয় না। তাহার কার্য্য দেখিয়া সেই ভেদ অনুমান করিয়া তাহার সহিত অগ্নি ও জলের ভেদ-কল্পনা করিতে হয়। অতএব শক্তি-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ভেদাভেদসম্বন্ধমধ্যে যে বিরোধ, তাহা নিতান্ত অস্পষ্ট বিরোধ। পক্ষান্তরে বিশিষ্টাদ্বৈতমতে ভেদাভেদ-সম্বন্ধের যে বিরোধ, তাহা বেশ স্পষ্ট বিরোধ।

তাহার পর এই মতে শক্তিবশতঃ শক্তিমানের বিকার হইলেও শক্তিমান্ অবিকৃত থাকে—এইরূপই স্বীকার করা হয়। কারণ, প্রলয়কালে শক্তিমান্ ব্রহ্মবস্তু স্বস্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করে। যেমন লীলা, ক্রীড়া, নটাভিনয় এবং স্বপ্নে লীলাকর্ত্তা, ক্রীড়াকারী, নট ও স্বপ্নদ্রষ্টা অবিকৃত থাকিয়াও লীলাক্রীড়াদি সম্পন্ন করে, তদ্রূপ এক অদ্বৈততত্ত্ব তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবলে জীব-জগদ্রূপে থাকিয়াও স্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করে। সুতরাং দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও অদ্বৈত সকল শ্রুতিই সার্থক হয়। জগৎকেও মিথ্যা বলিতে হয় না।

তাহার পর বিশিষ্টাদ্বৈতমতে ব্রহ্মের বিকারী অংশ, প্রলয়ে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হয় মাত্র এইরূপই বলা হয়। অবিকারী অংশের মত তাহা অবিকারী হয় না। অতএব বিশিষ্টা-দ্বৈতমতে যে অদ্বৈতভাব, তদপেক্ষা এমতে অদ্বৈতভাব আরও পূর্ণতাপ্রাপ্ত। ইহাতে ভগবানের মহিমা আরও মহত্তর হইয়া থাকে। বিশিষ্টাদ্বৈতমতে ভগবানের মহিমা অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। বিশিষ্টাদ্বৈতমতে ব্রহ্মের বিকারী অংশকে অবিকারী অংশের সহিত মিলিত করিবার প্রয়াস নিতান্ত অসঙ্গত।

বস্তুতঃ বিকারী অংশের পূর্ব্বাবস্থাপ্রাপ্তি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিতেই পারা যায় না। করিলে বিকারী অংশের স্থূলতা প্রাপ্তিকে মিথ্যাই বলিতে হয়। অথবা আমাদের মতের ন্যায় অচিন্ত্যশক্তি স্বীকার করিয়া তাহার স্বরূপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়।

আর পরবর্ত্তী সৃষ্টি পূর্ব্বকল্পানুরূপ হইলেও প্রভেদ অনিবার্য্য। ইহাও শাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত। অতএব ব্রহ্মের বিকারী অংশ স্বীকার করা সঙ্গত হয় না। আর তজ্জন্য ব্রহ্ম ও জগতাদির অঙ্গাঙ্গিভাবদ্বারা বিশিষ্টাদ্বৈতমত স্বীকার অপেক্ষা শক্তিশক্তিমানের বিশিষ্টাদ্বৈতভাবই সঙ্গত এবং উত্তম মতবাদ বলিতে হয়।

শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদিকর্ত্তৃক দ্বৈতাদ্বৈতবাদখণ্ডন।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন—দ্বৈতাদ্বৈতবাদটী দ্বৈতবাদেরই প্রায় নামান্তর। কারণ, উৎপন্ন যাবৎ দ্বৈতবস্তুর মধ্যে অদ্বৈতভাব একটী থাকেই থাকে। দ্বৈতবাদী এরূপ অদ্বৈতভাব অস্বীকার করেন না। ঘট-কলসের মধ্যে দ্বৈতভাব আছে সত্য, তদ্রূপ মৃত্তিকারূপে অদ্বৈতভাবও আছে। ইহা দ্বৈতবাদীও স্বীকার করেন। এজন্য এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদী দ্বৈতবাদিবিশেষ, আর তজ্জন্য দ্বৈতবাদখণ্ডনে যে যুক্তিপ্রয়োগ করা হয়, তাহা এস্থলেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ দ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈত স্বীকার করিলে কোন বস্তুই অপরিচ্ছিন্ন বা অনন্ত হয় না। আর তজ্জন্য নিত্যও হয় না। অতএব ব্রহ্মও এমতে অনিত্য হইতে বাধ্য। যে হেতু ব্রহ্ম বহির্দ্দেশে অসীম হইলেও অভ্যন্তরে সসীম বা পরিচ্ছিন্ন হইয়া যান।

তাহার পর দ্বৈতাদ্বৈতমতে দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়ই প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া তাহা শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমত অপেক্ষা স্থূলতম। কারণ, শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমতে, শক্তিটী অনুমেয় বলিয়া অভেদই প্রত্যক্ষ এবং ভেদ অপ্রত্যক্ষ হয়। অতএব আমাদের শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদের নিকট দ্বৈতাদ্বৈতমতটী আদরণীয় হইতে পারে না। বস্তুতঃ একই অদ্বৈততত্ত্বের অচিন্ত্যশক্তিবশতঃ এই সত্য জগদ্বৈচিত্র্য স্বীকার করা হয় বলিয়া শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমতটী শ্রুতি, যুক্তি ও অপর মতের সহিত সামঞ্জস্যসাধনে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মতই বলিতে হয়।

শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদিকর্ত্তৃক অদ্বৈতমতখণ্ডন।

অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন—এক অদ্বৈত জগৎ কারণ ব্রহ্ম সিদ্ধ করিবার জন্য অদ্বৈতবাদী অনির্ব্বচনীয় মিথ্যা মায়াশক্তি স্বীকার করেন। মায়া মিথ্যা বলিয়া তাহা অনাদি হইলেও তাহার অধিষ্ঠান ব্রহ্মের জ্ঞানদ্বারা তাহা অনন্তকালের জন্য বিনষ্ট হইয়া যায়—ইহাও বলেন। এইরূপে সেই মায়াদ্বারা তাঁহারা অদ্বৈত অবিকারী ব্রহ্মের জগৎকারণতা সিদ্ধ করেন। কিন্তু ইহা অসঙ্গত। কারণ যাহা অনাদিভাব বস্তু, তাহার আত্যন্তিক বিনাশ সম্ভবপর হয় না।

তাহার পর শক্তিই যখন স্বীকার করিতে হইল, তখন তাহার মিথ্যাত্ব স্বীকারের আবশ্যকতা কোথায়? ব্রহ্ম যদি নিত্য হন, তবে তাঁহার শক্তি অনিত্য হইবে কেন? তাহা নিত্যই হইবে। সেই শক্তিবশতঃ যখন জগৎ হইয়াছে, তখন তাহা জ্ঞানে নাশ প্রাপ্ত হইবে কেন? এই প্রত্যক্ষ জগৎ ত আর অজ্ঞান নহে, যে জ্ঞানে নাশ প্রাপ্ত হইবে? অজ্ঞান জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া থাকে। জগৎ ত দেখাই যাইতেছে যে, আমাদের জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া নাই। অতএব অদ্বৈতবাদ কোন ক্রমেই সঙ্গত মতবাদ হইতে পারে না।

বস্তুতঃ শক্তি ও শক্তিমান্ যখন ভিন্নভাবে অবস্থিতিই করে না, বা করিতেই পারে না, তখন নিত্য শক্তি মানিয়াও অদ্বৈততত্ত্বের সিদ্ধিতে কোন বাধা নাই। এই নিত্য শক্তির সাহায্যে নিত্যলীলাই এই জীব জগৎ ও ঈশ্বরভাব। অতএব শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্বীকারে ভগবানের সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব, মহত্ত্ব, অদ্বৈতত্ব—সকলই সিদ্ধ হয় এবং শ্রুতিরও মর্য্যাদা সর্ব্বাপেক্ষা রক্ষিত হয়।

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" এই শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মের স্বাভাবিক অতএব নিত্যশক্তির কথাই জানা যায়। অতএব তাহার অনিত্যতা স্বীকার করা সঙ্গত হয় না। অতএব দ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ—সকল মতবাদ অপেক্ষা এই শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদই সঙ্গত, এ সম্বন্ধে অধিক জানিতে হইলে ব্রহ্মসূত্রের শ্রীকণ্ঠভাষ্য, শ্রীকরভাষ্য, কাশ্মীর শৈব তন্ত্রাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দ্বৈতবাদিকর্ত্তৃক শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদখণ্ডন।

শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর এই কথা শুনিয়া দ্বৈতবাদী বলেন—শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বস্তুতঃ দ্বৈতবাদীই হন। কারণ, একবস্তু যখন বিবিধশক্তিবলে বিবিধ কার্য্য করে, তখন সেই একবস্তু ভিন্ন অন্য বস্তু থাকে কি না? ভিন্নবস্তু না থাকিলে ত ক্রিয়াই সম্ভবপর হয় না। বহ্নির দাহিকাশক্তি বহ্নিভিন্ন তৃণের সত্তাবশতঃ সিদ্ধ হয়। এই ভিন্ন বস্তু থাকিলে তাহাতে ক্রিয়া দেখিয়া বহ্নির দাহিকাশক্তির অনুমান হয়। এইরূপ আকাশ না থাকিলে কোন বস্তুতে কি কোন ক্রিয়াই সম্ভবপর হয়? অতএব বিবিধ শক্তি স্বীকার করিলেও সেই শক্তিমান্ হইতে ভিন্নবস্তুর সত্তা স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈত স্বীকারে প্রকারান্তরে দ্বৈতবাদই স্বীকার করা হইল।

তাহার পরে ভেদাভেদসম্বন্ধই অসম্ভব। কারণ, একই ধর্ম্মে একই সম্বন্ধে এবং একই অবচ্ছেদে ভেদাভেদ হয়ই না। বিভিন্ন

ধর্ম্মে বিভিন্ন সম্বন্ধে এবং বিভিন্ন অবচ্ছেদে যে ভেদাভেদ, তাহা ভেদেরই নামান্তর। অতএব ভেদাভেদবাদ অসঙ্গতই হয়।

তাহার পর শক্তি বলিয়া কোন পদার্থই স্বীকারের আবশ্যকতা নাই। উহাকে কারণতা বা প্রতিবন্ধকাভাব বলিলেই চলে। কারণের ধর্ম্মই কারণতা। যখন যাহা কোন কার্য্যের কারণ হয়, তখন তাহাতে কারণতা ধর্ম্ম থাকে, ইহা তাদৃশ শক্তিভিন্ন আর কিছুই নহে। আর কারণ ও কারণতা-ধর্ম্ম অভিন্নই হয়। সুতরাং শক্তি শক্তিমানের স্বরূপই, পৃথক্ পদার্থ নহে, অথবা এই শক্তি বলিতে প্রতিবন্ধকাভাবও বুঝা যায়, অর্থাৎ যাহার সত্তাবশতঃ কার্য্য উৎপন্ন হইতে বাধা হয়, তাহার অভাবই শক্তি, এ ক্ষেত্রে শক্তিটী অভাব পদার্থের অন্তর্গত হয়। আর এই অভাবই অন্যদিক্ দিয়া সেই করণতা ধর্ম্মই হয়। অতএব শক্তি বলিয়া একটা পদার্থ স্বীকার করাই ব্যর্থ। আর তাহা হইলে শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদও অসঙ্গত মতবাদ।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিকর্ত্তৃক শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদখণ্ডন।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন—আচ্ছা, শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর এই শক্তি নিত্য কি অনিত্য? যদি নিত্য হয়, তবে নিয়তই কার্য্য হউক, আর যদি অনিত্য হয়, তবে সেই অনিত্য শক্তির আবির্ভাব ও তিরোভাবের কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে। আবার সেই কারণকেও শক্তিই বলিতে হইবে, এবং তাহারও নিত্যতা ও অনিত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা হইবে, তাহার মূল আবার শক্তি স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে অনবস্থাদোষই উপস্থিত হইবে। অতএব শক্তিই স্বীকার না করিয়া শক্তিমানের স্বরূপই তাদৃশ বিচিত্রতাময় বলাই সঙ্গত, অর্থাৎ বৃক্ষের শাখা-পত্রের ন্যায় সেই অদ্বৈত ব্রহ্মবস্তুর অঙ্গই এই দ্বৈত প্রপঞ্চ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

শক্তি স্বীকার করা ও স্বগত ভেদ স্বীকার করা একই কথা। কারণ, শক্তি কখন শক্তিমান্ ব্যতীত থাকে না। শক্তিবশতঃ যাহা ঘটে, তাহা শক্তিমানের শরীরেই ঘটে। অতএব শক্তিবশতঃ যে বৈচিত্র্য, তাহা শক্তিমানেরই বৈচিত্র্য। শক্তিবশতঃ যে বৈচিত্র্য, তাহা শক্তিমানের না হইলে সেই বৈচিত্র্য মিথ্যাই হইয়া যায়। কিন্তু শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর মতে জগৎ ত মিথ্যা বলা হয় না। অতএব শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মধ্যে এবিষয়ে প্রভেদ না থাকায়, শক্তিবশতঃ যে শক্তিমানের বৈচিত্র্য তাহা শক্তিমানের স্বরূপজাত বৈচিত্র্যই বলিতে হইবে। অর্থাৎ শক্তিমানের স্বগতভেদই স্বীকার করিতে হইবে।

আর শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে ভেদাভেদসম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, আমাদের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর মতে অঙ্গের সহিত অঙ্গীর ভেদাভেদসম্বন্ধ হইতে কোনরূপ ভিন্ন সম্বন্ধ নহে, অর্থাৎ বৃক্ষ ও শাখাদির মধ্যে যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ, তাহার ভেদ ও অভেদ উভয়ই প্রত্যক্ষ হয়। আর শক্তি ও শক্তিমানের যে ভেদাভেদ তাহার অভেদই প্রত্যক্ষ এবং ভেদটী অনুমেয় হয়। সুতরাং শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদসম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গীর ভেদাভেদ সম্বন্ধ হইতে সূক্ষ্ম হইতে পারে না। কারণ, প্রত্যক্ষও প্রমাণ, অনুমানও প্রমাণ; অতএব এই সূক্ষ্মতার কোন মূল নাই। আর বিশিষ্টাদ্বৈতমতে বিশেষটীও প্রত্যক্ষ নহে। বৃক্ষ ও শাখাপল্লবে ভেদ ও অভেদ উভয়ই প্রত্যক্ষ হইলেও অদ্বৈতব্রহ্মে বিশেষটী ত অনুমেয়, সুতরাং শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমতের ভেদাভেদ আমাদের বিশিষ্টাদ্বৈতমতের ভেদাভেদসম্বন্ধ কোনরূপ সূক্ষ্ম হইল না।

তাহার পর শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদী যেরূপ যুক্তিদ্বারা দ্বৈতবাদ খণ্ডন করেন, তাহা আমাদেরও অভীষ্ট। অতএব কি দ্বৈতবাদ কি দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, কি শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কেহই বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদের ন্যায় যুক্তিসহ নহে।

আর শক্তিবশতঃ শক্তিমানের সৃষ্টিতে শক্তিমানের বিকার হয় কি—হয় না? যদি বলা হয়—বিকার হয় না, তবে দৃশ্য ও অনুমেয় শক্তির কার্য্য দৃশ্য হয় কিরূপে? আর বিকার না হইলে সৃষ্টি মিথ্যাই হইয়া যায়। অতএব শক্তিমানের বিকার অবশ্য স্বীকার্য্য। আর বিকার হইলেও শক্তিমান্ পুনরায় নিজ স্বভাব প্রাপ্ত হয়; সুতরাং সৃষ্টি মিথ্যা নহে—এইরূপ বলিলেও শক্তি-মানের বিকার স্বীকার করা ভিন্ন উপায় নাই। কারণ, যৎকালে সত্য সৃষ্টি থাকে, তৎকালে শক্তিমান্ বিকৃতই থাকে, বলিতে হইবে। লীলা, ক্রীড়া, নটাভিনয়, বা স্বপ্নের দৃষ্টান্তদ্বারাও সেই কেবল অদ্বৈত অবিকারী ব্রহ্ম জগদ্ব্যাপার নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন বলা যায় না। কারণ লীলাপ্রভৃতির মধ্যেও কিছু না কিছু বিকৃতি ঘটে। একেবারে অবিকার স্বীকার করিলে লীলাদিকে মিথ্যা বলিতে হয়; কিন্তু জগৎও মিথ্যা নহে, অতএব শক্তিমানের এক অংশ বিকারী ও অপরাংশ অবিকারী, অথচ উভয় মিলিয়া একই ব্রহ্ম বস্তু হয়—এইরূপ বলাই সঙ্গত।

আর শক্তির স্বীকারসম্বন্ধে দ্বৈতবাদী যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরাও ও বলিতে পারি। অর্থাৎ শক্তিকে একটী পৃথক্ পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। এইরূপে দেখা যাইবে শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদী যে আমাদের বিশিষ্টাদ্বৈত মত খণ্ডন করেন তাহা অসঙ্গত, আমাদের বিশিষ্টাদ্বৈতমতই সমীচীন মত।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদিকর্ত্তৃক শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ খণ্ডন॥

দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বলেন—নিত্য শক্তি স্বীকার করায় দ্বৈতই স্বীকার করা হইয়াছে। আর তজ্জন্য দ্বৈতাদ্বৈতই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদখণ্ডনে দ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী যাহা বলেন, তাহা আমরাও বলি; তবে আমরা দ্বৈত ও অদ্বৈতমধ্যে বিশেষ্য-বিশেষণসম্বন্ধ স্বীকার করি না। বিশিষ্টা-দ্বৈতখণ্ডনে আমাদের যুক্তি পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। কারণে শক্তি স্বীকার করিয়া দ্বৈতোৎপত্তির উপপত্তি করিলেও সেই শক্তি ও কারণের মধ্যে দ্বৈতাদ্বৈতভাব বা ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকে। তদ্রূপ কারণে 'বিশেষ' স্বীকার করিয়া দ্বৈতোৎপত্তির উপপত্তি করিলেও সেই 'বিশেষ' ও কারণের মধ্যে দ্বৈতাদ্বৈতভাব বা ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকে, এবং কার্য্যসকলের মধ্যে ভেদ বা দ্বৈতভাব প্রত্যক্ষ হইলেও সেই কার্য্য ও তাহার কারণমধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ বা দ্বৈতাদ্বৈতভাবই থাকে। অতএব সকল অবস্থাতেই যখন ভেদাভেদ সম্বন্ধ বা দ্বৈতাদ্বৈতভাব থাকে, তখন দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত বা শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈত এই সকলমতবাদ সাধারণ দ্বৈতা-দ্বৈতভাব স্বীকার করিলেই লাঘব হয়। শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈত, কোন সম্বন্ধই দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদ সম্বন্ধকে অতিক্রম করিতে পারে না। আর শক্তির স্বীকার সম্বন্ধে শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদীকে দ্বৈতবাদী যাহা বলেন, তাহা আমরাও বলিতে পারি। শক্তিপদার্থকে কারণতাধর্ম্ম বা প্রতিবন্ধ-কাভাব বলিলেই চলিতে পারে। এইরূপে দেখা যাইবে—দ্বৈতাদ্বৈতবাদই সমীচীন, শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সমীচীন নহে।

অদ্বৈতবাদীর স্বসিদ্ধান্তসূত্র।

এই সকল মতবাদীর কথা শুনিয়া অদ্বৈতবাদী বলেন—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত এবং শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদী যাহা বলেন তাহার কোনটীই সঙ্গত নহে। তাঁহারা সকলেই কতক সত্য এবং কতক অসত্য বলিয়া থাকেন। কেহই যথার্থ সত্য সম্পূর্ণভাবে বলিতে পারেন নাই। কারণ, লৌকিক দৃষ্টিতে—

(ক) এক অদ্বৈতবস্তু হইতে কোন কার্য্যই হয় না। ইহা যেমন সঙ্গত, তদ্রূপ দ্বৈতবস্তুমাত্রই অনিত্য— ইহাও তদনুরূপ সঙ্গত।

(খ) আবার এক বস্তুর বিকারী ও অবিকারী অংশদ্বয় স্বীকার-ভিন্ন একের দ্বারা কোন কার্য্য হয় না—ইহাও যেমন সঙ্গত, তদ্রূপ একবস্তুর বিরোধী অংশদ্বয় থাকিতে পারে না—ইহাও তদনুরূপ সঙ্গত।

(গ) আবার নানা বস্তু দেখিয়া তাহাদিগকে দ্বৈত বলা যেমন সঙ্গত, তদ্রূপ সেই নানা বস্তুর মধ্যে এক তত্ত্ব দেখিয়া তাহাদিগকে অদ্বৈত বলাও তদনুরূপ সঙ্গত।

(ঘ) ব্রহ্মে শক্তি স্বীকার করিলে সেই শক্তির নিত্যতা স্বীকার যেমন সঙ্গত, তদ্রূপ তাহার কার্য্যের অনুরোধে তাহার প্রাগভাব ও ধ্বংস স্বীকার করাও তদনুরূপ সঙ্গত।

(ঙ) পরিশেষে শ্রুতির দ্বারা যদি কোন স্থলে অলৌকিক কিছু মানিতেই হয়, তবে একের অলৌকিক শক্তি স্বীকার দ্বারাই তাহা মানিতে আপত্তি হইতে পারে না। নানার সেই অলৌকিক শক্তি স্বীকারের আবশ্যকতা কোথায়? ইহাতে গৌরবই হয়।

এইরূপে দেখা যাইবে—শ্রুতিবলে এক নির্গুণ ব্রহ্ম মানিয়া তাহার অনির্ব্বচনীয় শক্তি স্বীকার করিলে যখন সর্ব্ববিরোধের উপপত্তি হয়, তখন কতক লৌকিক, কতক অলৌকিক মানিয়া উপপত্তি করিবার আবশ্যকতা কি? সুতরাং এক অদ্বৈতবাদ বা অনির্ব্বচনীয় বাদই সর্ব্বাপেক্ষা নির্দ্দোষ এবং শ্রুত্যনুসারী মতবাদ। এইবার দেখা যাউক অদ্বৈতবাদী, তাঁহার প্রতিপক্ষ মতবাদগুলির প্রতিবাদের কি উত্তর দিতে পারেন?

অদ্বৈতবাদিকর্ত্তৃক দ্বৈতবাদখণ্ডন।

দ্বৈতবাদীর আপত্তি শুনিয়া অদ্বৈতবাদী তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—আচ্ছা, দ্বৈতবস্তু কি সিদ্ধ হয় যে, তাহার উৎ-পত্তিতে এককারণস্বীকার অসঙ্গত হইবে? দ্বৈত সত্য না হওয়ায়, তাহার উৎপত্তির সত্যতাও সিদ্ধ হয় না। অতএব এককারণতা-বাদের আপত্তিসাহায্যে অদ্বৈতমতের খণ্ডনপ্রয়াস ব্যর্থ নহে কি। অদ্বৈতবাদী দ্বৈতকে মিথ্যা বলেন। অর্থাৎ তাহার সত্তা নাই, কিন্তু তথাপি তাহার প্রতীতি হয়—বলেন। অতএব সেই দ্বৈতের উৎপত্তি হয় নাই, তাহা কেবল স্বীকার করা হয় মাত্র; তাহার জ্ঞান ভ্রম, আর তাহা সেই ভ্রমের বিষয়। যেমন রজ্জুতে সর্প যথার্থই নাই, কিন্তু তথাপি তাহার প্রতীতি হয়; তদ্রূপ ব্রহ্মে জগৎ নাই, হয়ও নাই, তথাপি তাহার প্রতীতি হইতেছে মাত্র। অতএব এককরণতাবাদের আপত্তি-সাহায্যে দ্বৈতবাদিকর্ত্তৃক অদ্বৈতমতখণ্ডন-প্রয়াস ব্যর্থই বলিতে হইবে।

তাহার পর কার্য্যকারণের সম্বন্ধই একটা অনির্ব্বচনীয় বিষয়। এজন্য এই কার্য্যকারণসম্বন্ধদ্বারা অদ্বৈতসিদ্ধান্তে দোষ প্রদর্শিত হইতে পারে না। ইহা যে অনির্ব্বচনীয়, তাহার কারণ—কারণের সমুদায় ধর্ম্ম যেমন কার্য্যে আসে না, তদ্রূপ কারণের অতিরিক্ত ধর্ম্মও কার্য্যে আসিয়া থাকে—ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ। বস্তুতঃ, কারণই কার্য্য হইলে কারণের সব ধর্ম্ম কার্য্যে আসা উচিত, এবং কার্য্যেও কারণধর্ম্মাতিরিক্ত কোন ধর্ম্ম আসা উচিত নহে, কিন্তু তথাপি তাহা হয় বলিয়া ইহাকে অনির্ব্বচ-নীয় ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? কারণের ধর্ম্ম কার্য্যে না আসায় সতের অভাব হইল এবং কারণাতিরিক্ত ধর্ম্ম কার্য্যে আসায় অসতের উৎপত্তি হইল। এজন্য কার্য্য—সদসদ্‌ভিন্ন বা মিথ্যা বা অনির্ব্বচনীয় বলা হয়। অতএব অদ্বৈত হইতে কার্য্যোৎপত্তির আপত্তি ব্যর্থ।

তাহার পর এই যে দ্বৈতরাজ্য, ইহাকে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম প্রভৃতি পদার্থে বিভক্ত করা হইয়া থাকে; কিন্তু এই বিভাগই অসঙ্গত।

কারণ, বিচার করিলে দেখা যায়—গুণভিন্ন দ্রব্য কিছুই উপলব্ধ হয় না। আবার গুণও দ্রব্যভিন্ন থাকিতে পারে না। যেখানে যাহার পাঁচটী গুণই উপলব্ধ হয়, তাহার প্রথম একটী গুণ, অপর চারিটী গুণের সমষ্টির তুলনায় গুণনামে খ্যাত হয়, এবং সেই অপর চারিটীর সমষ্টিকে দ্রব্য বলা হয়; তদ্রূপ তাহার দ্বিতীয় একটী গুণের তুলনায় সেই প্রথম গুণটী এবং অপর তিনটী গুণের সমষ্টিকে দ্রব্য বলা হয়। এইরূপে তৃতীয় চতুর্থ গুণও দ্রব্যরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। পৃথগ্‌ভাবে গৃহীত হইলে গুণরূপে গৃহীত হয় মাত্র। আর এইরূপে দেখা যায়—গুণকেই দ্রব্য বলা হয়, এব দ্রব্যকেই গুণ বলা হয়, অথচ তাহাদের ভেদ বা আশ্রয়াশ্রয়িভাবও কল্পনা করা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে এই দ্রব্যগুণবিভাগকে অনির্ব্বচনীয় ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না।

তাহার পর যাবৎ দ্বৈতমধ্যে একটা-না-একটা অভেদও দৃষ্ট হয়। অভেদভিন্ন দ্বৈত ত দেখাই যায় না। অতএব বিশুদ্ধ দ্বৈত কোথায় যে, দ্বৈতবাদ একটী সঙ্গত মতবাদ বলিতে হইবে? নৃসিংহতাপনীয় উপনিষদে "ন হ্যস্তি দ্বৈতসিদ্ধিঃ" (৯) এই বলিয়া দ্বৈত সিদ্ধই হয় না—ইহাই বলা হইয়াছে।

"দ্বা সুপর্ণা" বা "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" ইত্যাদি যে দ্বৈতবোধক শ্রুতিসকল, অথবা "বিশ্বং সত্যং" এই যে ঋকসংহিতার বাক্য, তাহারা অদ্বৈতশ্রুতির বিরোধী হইতে পারে না। কারণ, দ্বৈত প্রত্যক্ষবিষয় বলিয়া এই শ্রুতি সকল অনুবাদ হয়। অনুবাদ কখনই প্রমাণ হয় না। আর তত্ত্ববিষয়ে উপনিষদ্ ভাগেরই প্রামাণ্য, এজন্য উক্ত ঋক্‌সংহিতায় বাক্যও দুর্ব্বল। যাহা অন্যপ্রামাণ্য তাহা শ্রুতির তাৎপর্য্য হইলে শ্রুতির প্রামাণ্য থাকে না। শ্রুতি হইতে জানিয়া অন্য প্রমাণের আনুকূল্য লইলে শ্রুতির প্রামাণ্যহানি হয় না, অন্যথা হইলেই শ্রুতির প্রামাণ্যহানি অনিবার্য্য। এই কারণে দ্বৈতবাদীদিগের শ্রুতিপ্রমাণপ্রদর্শনের কোন মূল্যই নাই।

তাহার পর এই দ্বৈত ও অদ্বৈত পরস্পরবিরোধী। সুতরাং যখনই দ্বৈতবোধ হইবে, তখনই অদ্বৈতবোধ তাহার বিরোধিতা করিবে। কিন্তু দ্বৈতবোধও অবশ্যম্ভাবী এবং অদ্বৈতবোধও অবশ্যম্ভাবী—এরূপই সর্ব্বত্র। এজন্য অদ্বৈতবাদী দ্বৈতকে অনির্ব্বচনীয় বলেন। দ্বৈতবাদীর যে অদ্বৈত, তাহা অদ্বৈতবাদীর অদ্বৈত নহে। কারণ, অদ্বৈতবাদীর অদ্বৈত দৃশ্য হয় না, দ্বৈতবাদীর অদ্বৈত দৃশ্য হয়। এজন্য অদ্বৈতবাদকে অদ্বৈতবাদী অনির্ব্বচনীয়বাদও বলেন।

যদি বলা যায়—ঘট ও শরাবের মধ্যে দ্বৈতবোধ হয়, আর ঘট ও মৃত্তিকার মধ্যে অদ্বৈতবোধ হয়, সুতরাং ঘটশরাবরূপে দ্বৈতবোধের বিরোধিতা অদ্বৈতবোধ করিবে কেন? অতএব দ্বৈতকে অনির্ব্বচনীয় বলিবার আবশ্যকতা কোথায়? তাহা হইলে বলিতে হইবে—ঘটকে যেমন ঘট বলা হয়, তদ্রূপ মৃত্তিকাও বলা হয়। ঘটকে ঘট বলিবার কালে মৃত্তিকাবোধ উদিত হয় না। তদ্রূপ ঘটকে মৃত্তিকা বলিবার কালে ঘটবোধ উদিত হয় না। এস্থলে উভয়বোধের উদয়ে কিছু-না-কিছু ক্ষণভেদ থাকে। কিন্তু উভয়বোধ একত্র না হইলেও উহারা একত্রই থাকে, আর অভিন্ন থাকিয়া ও ঘট ও মৃত্তিকার একসঙ্গে বোধ হয় না বলিয়া উহাদিগকে অনির্ব্বচনীয় ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? যে বস্তু যেরূপ তাহার যদি তদ্রূপ বোধ না হয়, অথচ অন্যরূপ বোধকালে তাহাদের যদি তদ্রূপতার বোধ হয়, তাহা হইলে তাহার স্বরূপও আর নির্ব্বচনীয় হইতে পারিল না। যাহা অভিন্ন থাকিয়া ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, এবং ভিন্ন বলিয়া প্রতীতিকালে যাহার অভেদ স্বীকার আবশ্যক হয়, তাহার স্বরূপও অনির্ব্বচনীয়ই হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, যাহা একরূপ হইয়াও অন্যরূপ দেখায়, তাহাই ত ভ্রম, তাহাই ত অনির্ব্বচনীয়।

আর যেমন রজ্জুতে সর্প মিথ্যা বলিলেও অন্যত্র সর্পসত্তা স্বীকার্য্য, তদ্রূপ ব্রহ্ম ও জগৎ এই উভয়ই সৎ—এরূপ বলাও সঙ্গত হয় না। কারণ, সর্পভ্রমে সর্পসত্তাহেতু নহে, সর্পজ্ঞানই সর্পভ্রমের হেতু হয়, সর্পসত্তা সর্পভ্রমে অন্যথাসিদ্ধ বলা হয়। ঘটের কারণ কুম্ভকার বলা হয়, কিন্তু কুম্ভকারের পিতাকে ঘটের কারণ বলা হয় না। তাহাকে ঘটের পক্ষে অন্যথাসিদ্ধ বলা হয়। এস্থলে তদ্রূপ সর্পভ্রমে সর্পজ্ঞান কারণ, সর্পজ্ঞানের কারণ যে সর্পসত্তা, তাহাকে সর্পভ্রমের প্রতি কারণ বলা হয় না, কিন্তু তাহাকে অন্যথাসিদ্ধ বলা হয়। সুতরাং রজ্জুতে যে সর্প দেখা যায়, তাহা মিথ্যা হইলেও অন্যত্র সর্পসত্তা যে সিদ্ধ হইয়া যাইবে, তাহা নহে; সর্প না থাকিয়াও সপর্জ্ঞান থাকিলেই সর্পভ্রম সিদ্ধ হইতে পারে।

এই কথাটী একটী কল্পিত বস্তুর দৃষ্টান্তদ্বারা সহজে বুঝিতে পারা যায়। যেমন যে বস্তু কখনও কেহ দেখে নাই, যেমন পক্ষবিশিষ্ট কল্পিত মনুষ্য, এইরূপ বস্তুর বর্ণনা শুনিয়া সেই বস্তুর যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানদ্বারা তৎসদৃশ কোন জীবে যদি সেই পক্ষবিশিষ্ট মনুষ্যের কখন ভ্রম হয়, তাহা হইলে তাহা অসম্ভব কথা হয় না; অথবা তাদৃশ পক্ষবিশিষ্ট একটী পুত্তলিকা দেখিয়া তাহাকে তাদৃশ জীবিত বলিয়া যে ভ্রম হইতে পারে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। অর্থাৎ বস্তুর জ্ঞানই ভ্রমের হেতু হয়. বস্তুটী কল্পিত হউক বা যথার্থ হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না।

যদি বলা হয়, যে ব্যক্তি মনুষ্য ও পক্ষী দেখিয়াছে সেই ব্যক্তিরই স্থলবিশেষে পক্ষবিশিষ্ট মনুষ্যের ভ্রম হয়। অতএব দৃষ্ট

সত্তাই দৃষ্টান্তরূপ ভ্রমের হেতুও বটে, আর তজ্জন্য সর্পসত্তাও সর্প-ভ্রমের প্রতি হেতু হয়, উহাকে অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ, তাহা হইলে, অবয়ব-অবয়বীর অভেদ স্বীকার করিতে হয়। আর অভেদ স্বীকার করিলে ঘটকপালে জলরক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে, অথবা কপালকেও ঘট বলা চলিতে পারিবে। কিন্তু তাহা ত হয় না।

তাহার পর সকল বস্তুতে সকল বস্তুর ভ্রমের সম্ভাবনা হইতে পারিবে। অট্টালিকায় ঘটভ্রম হইতে পারিবে, কারণ, ঘট ও অট্টালিকা উভয়েরই অবয়ব মৃৎপিণ্ডাদি বস্তু।

তৎপরে জীবের সর্ব্বজ্ঞত্ব স্বীকার্য্য হইবে। কারণ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধরূপ অবয়বের দ্বারাই যাবৎ দৃশ্য পদার্থ রচিত। তাহারাই যাবদ্ বস্তুর অবয়ব। একটী শব্দস্পর্শাদির জ্ঞানে সকল শব্দস্পর্শাদিরই জ্ঞান হইবার কথা হয়। অর্থাৎ জীবও সর্ব্বজ্ঞ হয়।

আর অবয়ববিষয়ক জ্ঞানের সংস্কার না থাকিলেও অবয়ব জ্ঞান হইতেও তাহা হইতে পারিবে। যাহার বিষয়সংসর্গে জ্ঞান পূর্ব্বে কখনও হইয়াছে, অর্থাৎ জ্ঞানের সংস্কার আছে, তাহারই জ্ঞান হয়, অপরের হয় না। এই জন্যই জড়বস্তুর জ্ঞান হয় না। এখন তাহা হইবে।

তাহার পর ঈশ্বরেরও জন্য-জ্ঞানত্বাপত্তি হইবে। কারণ, অবয়ব ও অবয়বী অভিন্ন হওয়ায় অবয়বের জ্ঞানে অবয়বীর জ্ঞান হয়, অবয়বরূপ বিষয়ের জ্ঞান না থাকিলে অবয়বীর জ্ঞান হয় না—ইহাই বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য, তাহা বিষয়নিরপেক্ষ না হইলে আর নিত্য হইতে পারে না।

আর জীবেরও হৃদয়ে কল্পিত বস্তুর গাঢ় চিন্তা হইলে সেই বস্তু তাহার ঘট-পটাদির মতই প্রত্যক্ষই হয়। ইন্দ্র-জালে মানসিক শক্তির সৃষ্টিবিষয়ই লোকে দেখিয়া থাকে। স্বপ্নে দৃষ্ট কল্পিত পুরুষের উপদেশ জাগ্রতে সত্যরূপে পরিণত হয়। যোগী ইচ্ছাদ্বারা বিষয় সৃষ্টি করিতে পারেন। মুক্তপুরুষ সঙ্কল্পমাত্র পিতৃপুরুষগণ দর্শন করেন, ইত্যাদি।

অতএব যথার্থ বিষয় না থাকিলেও কল্পিতবিষয়ের দ্বারা আমাদের জ্ঞান হইতে পারে। আর সেই জ্ঞানজন্য ভ্রমও হইতে পারে। যে ব্যক্তি পক্ষী দেখিয়াছে সে যদি পক্ষবিশিষ্ট মনুষ্যের কথা না শ্রবণ করে, অথবা নিজে কল্পনাও না করে, তাহা হইলে সে স্থলে সে যে পক্ষবিশিষ্ট মনুষ্যই কল্পনা করিবে—এমন ত নিয়ম কিছু নাই। সে ত পক্ষী দেখিয়াছে, গো অশ্ব হরিণও দেখিয়াছে, সে কেন পক্ষবিশিষ্ট গো অশ্বের ভ্রম করিবে না? অথবা এ স্থলে সে একেবারেই ভ্রম করিবে না।

অতএব পক্ষবিশিষ্ট মনুষ্যাকার পুত্তলিকা দেখিয়া তাহাকে সত্যমনুষ্য বলিয়া ভ্রম করিবার পক্ষে, তাহারই কল্পিত বা শ্রুত পক্ষবিশিষ্ট মনুষ্যের জ্ঞানই কারণ হয়। অতএব কল্পিত বস্তুর জ্ঞান হইতেও ভ্রম হয়। এস্থলে পক্ষ সত্য, মনুষ্যও সত্য বটে, কিন্তু পক্ষবিশিষ্ট মনুষ্য সত্য নহে, কিন্তু কল্পিত। অতএব ভ্রমহেতু জ্ঞানের সত্যমূলকতা নিষ্প্রয়োজন।

যদি বলা যায়, তবে বন্ধ্যাপুত্রের ভ্রমজ্ঞান হয় না কেন? অর্থাৎ যাহা নাই, যাহা অসৎ, তাহার জ্ঞান হয় না, সুতরাং ভ্রমও হয় না; এই জন্য সর্পসত্তা সর্পভ্রমের হেতুবলিতে হইবে? কিন্তু এ কথাও অসঙ্গত; কারণ, বন্ধ্যাপুত্র অসৎ, ইহা কল্পিত বস্তুই নহে। যথার্থ এবং কল্পিত বস্তুরই জ্ঞান হয়। অসতের জ্ঞান হয় না। বন্ধ্যাপুত্রের জ্ঞান থাকিলে কোনও অধিষ্ঠানে তাহার ভ্রম হইতে পারিত। তাহার জ্ঞান নাই বলিয়াই সেরূপ ভ্রম হয় না। বস্তুতঃ—যাঁহারা বলেন—যে ব্যক্তি পক্ষী দেখিয়াছে এবং মনুষ্য দেখিয়াছে, তাহারই পক্ষবিশিষ্ট মনুষ্যভ্রম হয়; অত-এব ভ্রমে দৃষ্টবিষয়টী সত্যবিষয়ক জ্ঞানমূলক ইত্যাদি, তাঁহাদের মতে বন্ধ্যাপুত্রেরও ভ্রম হওয়া উচিত। কারণ, বন্ধ্যাও সত্য এবং পুত্রও সত্য? কিন্তু তাহা হয় না। অতএব এ আপত্তি নিতান্ত অসঙ্গত। সত্য অবয়বমূলক সত্য-অবয়বীর জ্ঞান হইতে যেমন ভ্রম হয়, তদ্রূপ সত্য অবয়বমূলক, মিথ্যা বা কল্পিত অবয়বীর জ্ঞান হইতেও ভ্রম হয়। আর তজ্জন্য সত্যবিষয়-মূলক জ্ঞানই ভ্রমের হেতু—এ কথা বলা সঙ্গত নহে।

যদি বলা যায়—কল্পিত বস্তুর জ্ঞান হইতে ভ্রম হয় হউক, সত্য বস্তুর জ্ঞান হইতেও ত ভ্রম হয়? বস্তুতঃ রজ্জুসর্পভ্রমে সর্প ত অরণ্যাদিতেই থাকে? এ স্থলে ব্রহ্মে যে জগদ্ ভ্রম হইয়াছে, তাহা যে অরণ্যাদির সর্পের জ্ঞানের ন্যায় সত্যবিষয়মূলক জ্ঞানজন্য নহে, তাহার প্রমাণ কি? অতএব রজ্জুসর্প দৃষ্টান্তদ্বারা জগ-ন্মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু একথাও অসঙ্গত। কারণ, এস্থলে সর্প ও তাহার জ্ঞান বস্তুতঃ অনির্ব্বচনীয়। কারণ, যাহার সর্পজ্ঞানের সংস্কার থাকে, তাহারই সর্পজ্ঞান হয়, সংস্কার না থাকিলে সর্পজ্ঞান হয় না। যেমন শিশুর অগ্নিজ্ঞানের সংস্কার অনুদ্বুদ্ধ বলিয়া সে অগ্নি দেখিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে যায় ইত্যাদি। অতএব সর্প-সংস্কার সর্পজ্ঞানের হেতু। সেই সংস্কার-জন্য সর্পজ্ঞান বলিয়া এই সর্পজ্ঞান ও সর্প উভয়ই অনির্ব্বচনীয়। যে হেতু সর্পরূপ বিষয় না থাকিলে সর্পজ্ঞান হয় কি করিয়া? এবং সর্পজ্ঞানের সংস্কার না থাকিলেই বা সর্পজ্ঞান হয় কি করিয়া অতএব উভয়ই সদসদ্ভিন্ন বা অনির্ব্বচনীয়ই বলিতে হয়।

যদি বলা যায়—অনুভবজন্যই সংস্কার হয়, সুতরাং সর্পসত্তা সর্পজ্ঞান সংস্কারের মূল হেতু। অতএব সর্পজ্ঞানসংস্কার সর্পজ্ঞানের হেতু নহে। তাহা হইলে বলিতে হইবে—সংস্কার এবং বিষয় উভয়ই অনাদি অন্যোন্যাশ্রিত। বীজ ও বৃক্ষের

ন্যায় তাহারা পরস্পর পরস্পরের জনক হয় বলিয়া তাহারা স্বরূপতঃ অনির্ব্বচনীয়ই হয়।

পক্ষান্তরে ঈশ্বরের জ্ঞান, জগৎ দেখিয়া জগতের জ্ঞান নহে বলিয়া অর্থাৎ নিত্য বলিয়া, এবং তিনিই সঙ্কল্পদ্বারা জগৎ হইয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া, যথা "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" "স ঐক্ষত বহুস্যাম্" ইত্যাদি শ্রুতি, এবং এই সমুদায় সংস্কারসমষ্টিই অজ্ঞান বা প্রকৃতি বলিয়া সংস্কার হইতেই বিষয় হয়—এই পক্ষই বলবত্তর হয়। যেমন যোগীর কায়ব্যূহাদির সৃষ্টি, স্বপ্নে বা ইন্দ্রজালে সৃষ্ট বিষয়, মানসিক বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নহে, এস্থলেও তদ্রূপ। বস্তুতঃ ঈশ্বর সর্ব্বসংস্কারসমষ্টিরূপ এই প্রকৃতি হইতেই জগৎ সৃষ্টি করেন।

আর এস্থলে অর্থাৎ রজ্জুসর্পস্থলে সর্প আমাদেরই সৃষ্ট সর্প, দৃষ্ট সর্প নহে। দৃষ্ট সর্পের জাতি তাহাতে দেখা যায় বটে, কিন্তু দৃষ্ট সর্পব্যক্তি কখনই দৃষ্ট হয় না। সর্পদর্শন সর্পজ্ঞানাকার সংস্কারের উদ্বোধক মাত্র। আর এই উদ্বোধক যেমন সর্প হয়, তদ্রূপ হস্তিশুণ্ডপ্রভৃতি অসর্পও হয়। অতএব সর্পসংস্কারই সর্পবিষয়ক স্মৃতিজ্ঞানের মুখ্য হেতু। সেই সংস্কারই, আমাদের অজ্ঞাত আমাদেরই ঈশ্বররূপের দ্বারা, আমাদের অজ্ঞাতসারে অরণ্যে সর্প সৃষ্টি করিয়া রাখে, এবং সেই সর্পের অজ্ঞাত সত্তা আমাদিগকে স্বীকার করায়। সর্পসত্তাবশতঃ অনুভব হয়, তজ্জন্য সংস্কার হয়—এরূপ নহে। সর্পজ্ঞানসংস্কার না থাকিলে সর্পসত্তা সর্পজ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না। আর তাহা হয় বলিয়া ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রমের হেতুটী সত্যজগদ্‌বিষয়কজ্ঞানজন্য নহে, কিন্তু মিথ্যা অনাদি ভ্রমরূপ সংস্কারজন্য। যাবদ্ দৃশ্য, যাবদ্ বিষয়—সবই কল্পিত, সবই মিথ্যা। সেই কল্পিত বা মিথ্যার উপর আবার ভ্রম হইতেছে এইমাত্র। অতএব দ্বৈতবাদীর মিথ্যা সংক্রান্ত এই আপত্তি সূক্ষ্মদর্শীর আপত্তিই নহে।

তাহার পর এই যে দ্বৈতের সত্তা, তাহা ত জ্ঞাতার সত্তার উপর নির্ভর করে। জ্ঞাতার জ্ঞান, জ্ঞেয়াকার না হইয়া কখনই কোন জ্ঞেয়বস্তু জ্ঞাত হয় না। জ্ঞাত হওয়ার অর্থই এই যে, জ্ঞানে আকারের উৎপত্তি। এই আকারও আর স্বতন্ত্রবস্তু নহে, অতএব জ্ঞানভিন্ন আর বস্তু কোথায় যে দ্বৈতের সত্তা সিদ্ধ হইবে?

যদি বলা হয়—নূতন বস্তুর বা অজ্ঞাতবস্তুর যখন জ্ঞান হয়, তখন জ্ঞানভিন্ন বস্তুর সত্তা কেন স্বীকার্য্য হইবে না? আমি না জানিলেও এ সময় কাশীতে কি লোক বাস করিতেছে না? অতএব বস্তুর অজ্ঞাতসত্তা অবশ্য স্বীকার্য্য? কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ, এ স্থলেও দ্রষ্টার জ্ঞানের বিষয় অজ্ঞান হইয়া থাকে। এই অজ্ঞানের উপর কাশীবাসীর সত্তা নির্ভর করিতেছে। অর্থাৎ কাশীবাসী এখানে অজ্ঞানের আকারে আমারই জ্ঞানে ভাসমান হইয়া রহিয়াছে। "আমি এখন যাহাকে জানিতেছি না তাহা আছে, তাহা পরে আমার জ্ঞানের গোচর হইবে"—এই ভাবে আমার অজ্ঞাতবিষয় আমার জ্ঞানের আকার হইতেছে; অথবা "আমার কোন অজ্ঞাত বিষয় যে আছে, তাহাও আমি জানি না" এস্থলে তাদৃশ অজ্ঞাত বিষয় অজ্ঞানই হয়। আর তাহাও আমার জ্ঞানের আকারবিশেষ হইতেছে। আর তজ্জন্য এই উভয় ভাবই আমার জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেছে। এইরূপে অজ্ঞাতবিষয়ের সত্তা ও অসত্তা—উভয়ই আমার জ্ঞানের আকার মাত্র। জ্ঞাত বিষয়ের সত্তা ও অসত্তা যেমন আমার জ্ঞানের আকার, তদ্রূপ অজ্ঞাতবিষয়ের সত্তা ও অসত্তা—উভয়ই আমারই জ্ঞানের আকারমাত্র—উভয়ই আমার জ্ঞানের সত্তার অধীন। জ্ঞান ভিন্ন তাহাদের সত্তা নাই। অতএব দ্বৈতবস্তু কোথায় যে, তাহার জ্ঞান হইবে? সকলই বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নাই।

যদি বলা হয়—এই যে আকার, ইহা তাহা হইলে জ্ঞানভিন্ন বলিতে হইবে। যাহা জ্ঞানের আকার, তাহা জ্ঞানভিন্ন না হইলে চলিবে কেন? অতএব দ্বৈত সত্তা সিদ্ধই হইল। কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে; কারণ, আকার ও জ্ঞান বিভিন্ন থাকে না। তাহার সত্তা জ্ঞানসত্তার অধীন বলিয়া তাহা জ্ঞান হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে, কিন্তু ভেদাভেদ একই কালে একই বিষয়ে বিরুদ্ধ বস্তু হওয়ায় এই আকারকে অনির্ব্বচনীয়ই বলিতে হইবে। আর আকার অনির্ব্বচনীয় হওয়ায় যাবদ্ জ্ঞেয় বস্তুই অনির্ব্বচনীয় হইতেছে। কিন্তু এই আকাররহিত জ্ঞানবস্তুটী আর অনির্ব্বচনীয় হয় না। আর তাহাতে তখন আকার না থাকায় সেই আকারশূন্য জ্ঞানবস্তুটী অদ্বৈতবস্তুই হইতেছে।

যদি বলা হয়—আকারশূন্য জ্ঞান সম্ভব হয় কিরূপে? তাহার উত্তর এই যে, আকারের সত্তা যখন জ্ঞানসত্তার অধীন, তখন তাহা না থাকিলেও জ্ঞান থাকে—ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে, নচেৎ অধীনসত্তা বলিয়া আর লাভ কি? বস্তুতঃ, জাগ্রৎ ও সুষুপ্তিতে এই আকারের আবির্ভাব ও তিরোভাব দেখাই যায়। জাগ্রতে আকারের উদয় এবং সুষুপ্তিতে বিলয়—ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করে। অতএব আকারশূন্য জ্ঞান অসম্ভব হইবে কেন?

যদি বলা হয়—সুষুপ্তিকালের যে অজ্ঞান, তাহাকেও জ্ঞানের আকার বলা হইয়াছে, আর তাহা হইলে আকারশূন্য জ্ঞান আর কোথায় সম্ভবপর হইবে? এ কথাও অসঙ্গত; কারণ, জাগ্রতকালে সুষুপ্তির অজ্ঞানকে জ্ঞানের আকার বলা হইয়াছে মাত্র। সুষুপ্তিকালের অজ্ঞান সুষুপ্তিকালে কোন আকারবিশিষ্ট থাকে না এবং সেই অজ্ঞান, যে জ্ঞানের উপর আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহারও তজ্জন্য কোন আকার থাকে না।

তাহার পর জ্ঞান যে স্বয়ং নিরাকার, তাহার অন্য যুক্তিও আছে। যথা—যাহা নানা আকারে থাকে, তাহা নিজে যে নিরাকার, তাহা বেশ বুঝা যায়।

যদি বলা যায়, তবে নিরাকার বস্তু দৃষ্ট হয় না কেন? তাহা হইলে বলিতে হইবে—আকারশূন্য বস্তু লৌকিক বস্তু নহে, প্রত্যুত অলৌকিক; আর তজ্জন্য এ বিষয়ে শ্রুতিই শরণীয়। এই শ্রুতি যে সর্ব্বমূলকারণকে নিরাকার বলেন, তাহা "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" এই বাক্যে উক্ত হইয়াছে। অনন্ত অর্থই নিরাকার। অতএব জ্ঞান আকার-রহিতরূপে থাকে, ইহাতে কোন আপত্তি হইতে পারে না।

তাহার পর, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিভিন্ন বস্তু। একই কালে একই জ্ঞাতা—জ্ঞেয় হয় না। পঞ্চভূত যেমন পরস্পরে বিভিন্ন, ইহারাও তদ্রূপ বিভিন্ন। ইহাদের যে ভেদ, তাহা বিজাতীয় ভেদ। এ ক্ষেত্রে অগ্নি যেমন জলকে জানে না, জলও যেমন অন্যকে জানে না, তদ্রূপ জ্ঞাতার জ্ঞেয়কে না জানাই উচিত। কিন্তু তথাপি জ্ঞাতা জ্ঞেয়কে জানে, পরক্ষণে নিজেই জ্ঞেয় হইয়া নিজ হইতে পৃথক্ হইয়া যায়, অথচ তাহার জ্ঞাতৃভাবের ক্ষয় হয় না। তাহার জ্ঞেয়ভাবও আর জ্ঞাতৃভাবে পরিণত হয় না। এই ক্ষয়াক্ষয় ভাবটী পরস্পর-বিরুদ্ধ-ভাব বলিয়া ইহার অনির্ব্বচনীয়ভাবই পরিস্ফুট হইবে। সর্ব্বপ্রকাশক স্বয়ংপ্রকাশ এক জ্ঞানবস্তুই জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপে প্রকাশ পাইতেছে! অথচ তাহা যাহা, তাহাই থাকিতেছে—ইহাই অনির্ব্বচনীয়তা। অতএব দ্বৈতসত্তা সিদ্ধই হয় না। যাহা সিদ্ধ হয়, তাহা একটী সদধিষ্ঠানে এই সদসদ্ভিন্ন অনির্ব্বচনীয় বা মিথ্যাভাবের অনির্ব্বচনীয় বা মিথ্যা খেলা মাত্র।

এই যুক্তি কতকটা বৌদ্ধও গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ভ্রমকে নিরধিষ্ঠান বলিলেন, এবং বিজ্ঞানকেও ক্ষণিক বলিলেন। এজন্য তাঁহারা অসঙ্গত কথাই বলিলেন। বিজ্ঞান ক্ষণিক হইলে জাতি-বিষয়ে তাঁহারা অদ্বৈতবাদী হইলেও ব্যক্তিবিষয়ে তাঁহারা দ্বৈতবাদীই হন। এজন্য তাঁহাদের খণ্ডন দ্বৈতবাদখণ্ডনের দ্বারাই সম্পন্ন হয়।

যদি বলা যায়—জগৎ যদি মিথ্যা হয়, তবে তাহারও মূল 'একটা কিছু' আছে বলিতে হইবে, নচেৎ মিথ্যাই বা দৃশ্য হয় কেন? বন্ধ্যাপুত্র ত দৃশ্য হয় না। অতএব মিথ্যা জগতের মূল একটা সত্য বস্তুই হইবে? ইহার উত্তর এই যে, মিথ্যার মধ্যে একটা সদংশ এবং একটা অসদংশ অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে। এই সদংশটী মিথ্যার অধিষ্ঠানের সদ্ভাবের প্রকাশ। আর মিথ্যামধ্যে যে অসদংশ ভাসমান হয়, তাহা সেই সদংশভিন্ন একটী অনির্ব্বচনীয় ভাববিশেষের কার্য্য। এই অনির্ব্বচনীয় ভাববিশেষই অবিদ্যা বা অজ্ঞান। ইহাই রজ্জুর দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যের উপরে সর্পাকারে পরিণত হইয়া রজ্জুতে সর্প ও সর্পজ্ঞান উৎপাদন করে। মিথ্যার এই মূলটী অধিষ্ঠানজ্ঞানে নষ্ট হয়। অজ্ঞানটী সত্য হইলে নষ্ট হইত না, আর অসত্য হইলে সর্প ও তাহার জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারিত না। এজন্য অজ্ঞান সদসদ্ভিন্ন অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় বলা হয়। ইহা অনাদি; কারণ, যে ব্যক্তি রজ্জুতে সর্পভ্রম করিবে, তাহার এই ভ্রম করিবার যোগ্যতা কবে হইতে উৎপন্ন, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না। মন্দ অন্ধকার, রজ্জুতে সর্পসাদৃশ্য প্রভৃতি এই ভ্রমের নিমিত্তমাত্র, অতএব মিথ্যার মূল অজ্ঞানরূপ 'একটা কিছু' আছে বলিতে কোন আপত্তি নাই; কিন্তু তজ্জন্য সেই অজ্ঞানকে সত্য বলা যাইতে পারে না।

আর বেদবলে জগৎ মিথ্যা যদি বলা যায়, তাহা হইলে বেদের সত্যতার প্রয়োজন হয় না। মিথ্যা স্বপ্নের মিথ্যা দণ্ডদ্বারা সেই স্বপ্ন কি ভাঙ্গিয়া যায় না? বেদ নিজকে মিথ্যা বলে বলিয়াই সে তাহার উপদেশের সত্যতার জ্ঞাপক হয়। সত্য বস্তুই সত্য উপদেশ দিতে পারে—এমন কোন নিয়ম নাই। যে ব্যক্তি আজ বর্ত্তমান, সে কি অনুমানদ্বারা তাহার জন্ম হইয়াছিল, অর্থাৎ সে এককালে ছিল না—এরূপ বুঝিতে পারে না? বেদ নিজেই বলিয়াছেন—

"তত্র পিতা অপিতা ভবতি...বেদা অবেদা"...(বৃ ৪.৩.২২)

এজন্য বেদ সত্য না হইয়াও অর্থাৎ মিথ্যা হইয়াও সত্যবাদী। অতএব বেদের উপদেশের সত্যতার দ্বারা তাহার সত্যতা এবং তজ্জন্য দ্বৈতসত্যতা সিদ্ধ হয় না।

বলা হইয়াছিল—যে বলে "আমি নাই" সে নিজে না থাকিলে আমি নাই বলে কি করিয়া? অতএব জীবভাব ও জগৎকে মিথ্যা বলা সঙ্গত হয় না, ইত্যাদি। কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ, সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছা এবং এই জাগ্রদবস্থা দেখিয়া আমাদের অজ্ঞান এবং আমাদের আমিভাবকে অনিত্য বলিতে পারা যায়। কারণ, জাগ্রতে আমিভাব থাকে, সুষুপ্তিতে তাহা থাকে না, সুষুপ্তিতে অজ্ঞান থাকে, জাগ্রতে তাহা থাকে না। অতএব এই জাগ্রৎ ও সুষুপ্তিকে প্রকাশিত যিনি করেন, তিনি নিশ্চয়ই একটী নিত্যবস্তু, ইহা অনুমান করা যায়। সেই নিত্যবস্তুবশতঃই লোকে বলিয়া থাকে, "আমার অজ্ঞান" "আমার আমিভাব" ইত্যাদি। কিন্তু নিত্যবস্তুর নিত্যতায় যদি আবার সন্দেহ হয়, তাহা হইলে সেই সন্দেহ-নিবারণের উপায় আর নাই। সেই সন্দেহ-নিবারণ করিয়া নিশ্চয়জ্ঞান উৎপাদন করে—এই বেদ। অতএব যে 'আমি' জগতের সত্যত্বমিথ্যাত্ব বিচার করে, সে 'আমি' মিথ্যা হয় না—এ কথাও অসঙ্গত।

এই আমিকে অথবা জগৎকে অসৎ বলিলে এই আশঙ্কা হইত, কিন্তু ইহাকে অসৎ বলা হয় না ইহাকে মিথ্যা বলা

হয় বলিয়া এইরূপ ব্যবহার সম্ভব হইয়াছে। যাহা অসৎ হইয়াও প্রতীত হয়, তাহাই মিথ্যা। মিথ্যা ও অসৎ এই প্রতীতি অংশে বিভিন্ন পদার্থ। রজ্জুসর্পীয় অসৎ ও বন্ধ্যাপুত্রীয় অসৎ বিভিন্ন। রজ্জুসর্পীয় অসৎই মিথ্যা। বন্ধ্যাপুত্রীয় অসৎ মিথ্যা নহে।

আর প্রত্যক্ষ যাহা হয়, তাহা যে সর্ব্বদা অভ্রান্ত তাহাও বলা যায় না। দিগ্‌ভ্রম, দ্বিচন্দ্রদর্শন প্রত্যক্ষ হয়, তথাপি তাহা ভ্রম। অতএব জগৎ প্রত্যক্ষ হইতেছে বলিয়া তাহা যে সত্য, তাহা বলা যায় না! ভ্রমের সময় ভ্রমের বিষয় সত্যই বোধ হয়, আর ভ্রমভঙ্গে তাহা অসৎ বোধ হয়, ইহা কে না প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে? এই-রূপে জগদ্দর্শন যদি প্রত্যক্ষপদবাচ্য হয়, তাহা হইলেও তাহার সত্যতা সিদ্ধ হয় না!

জগদ্দর্শন যে ভ্রম, সত্য নহে, তাহা বেদ বলিয়া দেয়; যুক্তিও তাহার সহায়তা করে। যুক্তির দ্বারা এ বিষয়ে সম্ভাবনা পর্য্যন্ত হয়, কিন্তু নিশ্চয়তা হয় না। এই নিশ্চয়তা বেদদ্বারা হইয়া থাকে, অথবা বেদ যখন জগন্মিথ্যা বলিয়া দেয়, তখন তাহার সম্ভাবনায় সন্দেহ হইলে যুক্তি সেই সন্দেহ নিরাস করিয়া তাহার সম্ভাবনা সিদ্ধ করিয়া দেয়। এইরূপে জগতের প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া তাহার সত্যতা সিদ্ধ হয় না।

পক্ষান্তরে বৌদ্ধগণ এই বেদ না মানায় শূন্যবাদী হইয়াছেন; কারণ, বিচারদ্বারা সংশয় যায় না, অতএব কিছুই সিদ্ধ হয় না—ইহাই তাঁহাদিগকে বলিতে হইয়াছে। ইহাই তাঁহাদের শূন্যতাসাধনের হেতু। 'কিছুই সিদ্ধ হয় না বলিয়া কিছু নাই বলিলে' 'কিছুই' সিদ্ধ হইয়া যায়। এজন্য শূন্যবাদও অসঙ্গত।

আর "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়াঃ" শ্রুতি, জীব ও সাক্ষীর কার্য্যের বা অবস্থার কথা বলিতেছে। ইহাতে জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপের পরিচয় দেওয়া হইতেছে না। কারণ, এখানে পক্ষী দুইটীর এক বৃক্ষে অবস্থান ও তাহাদের ভোগাদির কথাই বলা হইতেছে। অতএব এতদ্দ্বারা জীব ও ব্রহ্ম যে স্বরূপতঃ ভিন্ন—তাহা বলা এই শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে।

আর তাৎপর্য্যানুরোধেই লক্ষণা করিতে হয়, অতএব তাহা দোষাবহ নহে। অতএব এ আপত্তিও ব্যর্থ। এ সম্বন্ধে অধিক জানিতে হইলে অদ্বৈতসিদ্ধি, অদ্বৈতদীপিকা, খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, চিৎসুখী ও পরিমল প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

অদ্বৈতবাদিকর্ত্তৃক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদখণ্ডন।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদী বলেন—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী যে অদ্বৈততত্ত্বে 'বিশেষ' স্বীকার করেন, সেই 'বিশেষ' তাঁহাদের মতে সত্য বলিয়া তাঁহারাও দ্বৈতবাদী হইতেছেন। আর দ্বৈতবাদী হইলে, তাঁহাদের মতবাদের খণ্ডন দ্বৈতবাদের খণ্ডনের অনুরূপই হইবে। যে সকল যুক্তির দ্বারা দ্বৈতবাদ খণ্ডিত হয়, তাহাদের দ্বারাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও খণ্ডিত হইবে। অন্য কথায় তাঁহাদের অদ্বৈত কোন এক 'বিশেষ প্রকারের' অদ্বৈত বলিলে—তাঁহাদের স্বীকৃত অদ্বৈতের ন্যায় আর কোন অদ্বৈততত্ত্ব নাই বলিলে—অন্য বস্তুই স্বীকার করা হইল। সেই অন্যবস্তু আর সেই অদ্বৈততত্ত্বের অঙ্গস্বরূপ হইতে পারিবে না। অতএব ইহাও পরিশেষে দ্বৈতবাদই হইয়া পড়িল। আর দ্বৈত হইলে পরিচ্ছিন্ন হইল, এবং পরিচ্ছিন্ন হইলে নশ্বরই হইবে। এইরূপ বহু যুক্তিদ্বারা এই মত আর স্থির থাকিতে পারিবে না।

যদি বলা যায়—এই 'বিশেষ'বশতঃ সেই অন্যবস্তুগুলি সেই অদ্বৈততত্ত্ব হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। সুতরাং দ্বৈতবাদ-খণ্ডনের যুক্তি এস্থলে প্রযোজ্য হইতে পারিবে না? তাহা হইলে বলিব—একই বিষয়ে একই দৃষ্টিতে কোন বস্তু অন্যবস্তুর সহিত সমানভাবে ভিন্নাভিন্ন—ইহা বলিতে পারা যায় না। সমান-ভাবে বস্তুদ্বয়কে ভিন্নাভিন্ন বলিলে, তদ্বিষয়ে কিছুই বলা হইল না। অথবা তাহাকে অনির্ব্বচনীয়ই বলা হইল; অর্থাৎ—হয় সেই অন্যবস্তুগুলি অনির্ব্বচনীয় হইবে, না হয়—সেই অদ্বৈততত্ত্বটী অনির্ব্বচনীয় হইবে। আর অনির্ব্বচনীয় অর্থ—সৎও নহে অসৎও নহে, অর্থাৎ মিথ্যা। অবশ্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীও এস্থলে অদ্বৈত-তত্ত্বকে অনির্ব্বচনীয় না বলিয়া সেই অন্যবস্তুগুলিকেই অনির্ব্বচনীয় বলিতে বাধ্য হইবেন। সুতরাং ব্রহ্মভিন্ন বস্তুকে মিথ্যাই বলা হইল। অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈতমতটী অনির্ব্বচনীয়বাদে বা অদ্বৈতবাদে পরিণত হইল।

যদি বলা যায়—যাহাকে অনির্ব্বচনীয় বলা হইবে, তাহাকে সদসদ্ভিন্ন কেন বলিতে হইবে? তাহাকে সৎই বলিব? কিন্তু তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ, দুইটী বস্তুর মধ্যে যে কোন একটী অনির্ব্বচনীয় হইলে, তাহার ধর্ম্মও তাহা হইলে অনির্ব্বচ-নীয় হইবে; সুতরাং তাহার ভিন্নতাধর্ম্মও অনির্ব্বচনীয় হইবে। আর ভিন্নতা বা ভেদ অনির্ব্বচনীয় হইলে তাহার সত্তাও অনির্ব্বচনীয় হইবে; কারণ, সত্তা না থাকিলে ভেদই সিদ্ধ হইবে না। এজন্য তাহার সত্তাও সিদ্ধ হইবে না। অথচ তাহা অসৎও নহে; কারণ, অসৎ হইলে তাহা প্রতীতই হইত না। এই হেতু যাহা অনির্ব্বচনীয় হয়, তাহা সদসদ্ভিন্নই হয়। অর্থাৎ তাহাকে ঠিক্ আছে—এরূপ বলা যায় না।

তাহার পর বৃক্ষের সহিত তাহার শাখাপত্রের ভেদের ন্যায় ব্রহ্মে বিকারী ও অবিকারী অংশ স্বীকার করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বগতভেদদ্বারা জগদুৎপত্তির উপপত্তি হইতে পারে না। কারণ, স্বগতভেদ বিজাতীয়ভেদভিন্ন সম্ভবপর হয় না। বৃক্ষের সহিত আকাশের বিজাতীয় ভেদ আছে বলিয়াই শাখাপত্রজন্য বৃক্ষের স্বগতভেদ সম্ভব হইয়াছে। অতএব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদটী দ্বৈতবাদই

হইতেছে। এ বিষয়ে দ্বৈতবাদী যাহা বলেন, তাহা আমরাও বলি। আর দ্বৈত হওয়ায় ব্রহ্মের নশ্বরত্বাপত্তি অনিবার্য্য হইবে।

আর ব্রহ্মে যে মিথ্যা মায়া স্বীকার করিয়া জগদুৎপত্তির উপপত্তি, অদ্বৈতবাদে করা হয়, সে মায়াকে অসৎ বলা হয় বলিয়া তাহার ক্রিয়া সম্ভবপর হয় না—ইত্যাদি যাহা বলা হইয়াছিল, তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, অদ্বৈতমতে মায়াকে বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অসৎ বলা হয় না। কিন্তু রজ্জুসর্পের ন্যায় অসৎই বলা হয়। রজ্জুসর্পের ন্যায় অসৎকে মিথ্যা বলা হয়, আর বন্ধ্যা-পুত্রের ন্যায় অসৎকে অসৎই বলা হয়। যে অসৎ প্রতীত হয়, তাহাই মিথ্যা, মায়া এই জাতীয় অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা।

যদি বলা হয়—অসতের মধ্যে এরূপ ভেদ করা হয় কেন? যাহা নাই, তাহা নাই-ই; তাহার আবার ভেদ করা কেন? যাহা নাই, তাহা প্রতীত হয় না; যাহা প্রতীত হয়, তাহা আর অসৎ নহে—এইরূপ বলাই ত ভাল? অতএব মায়া আছেই বলিব? কিন্তু একথাও সঙ্গত নহে। মতবাদের সুবিধার জন্য বস্তুর স্বরূপ অন্যথাবর্ণন উচিত নহে। রজ্জুতে সর্প, সর্পদর্শন কালেও থাকে না। সুতরাং রজ্জুসর্পীয় অসৎ প্রতীত হয় বলিতেই হইবে। পক্ষান্তরে বন্ধ্যাপুত্র অসৎ, এবং কখনও প্রতীত হয় না। অতএব বস্তুর স্বরূপানুরোধেই দ্বিবিধ অসৎ স্বীকার্য্য। মায়াকে সৎ বলিলে, তাহার নিবৃত্তি কেন হইবে? যাহা একক্ষণও থাকে, আর সেই থাকা যদি সত্য সত্য থাকা হয়, তাহা হইলে তাহার বিনাশ কখনই সম্ভবপর হয় না। এই জন্য দ্বিবিধ অসৎ স্বীকার করা হয়।

তাহার পর আরও বলা হইয়াছিল, অনাদি ভাববস্তুর নাশ নাই—ইত্যাদি। তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ, অবিদ্যা বা অজ্ঞান অনাদি ভাববস্তু। ইহার উৎপত্তির জ্ঞান হইতে গেলে আর ইহার উৎপত্তিই হয় না। এই অবিদ্যা বা অজ্ঞানের বিনাশ, সকলেরই প্রত্যক্ষ বিষয়। অতএব অনাদি ভাববস্তুরও বিনাশ স্বীকার্য্য।

তাহার পর পার্থিব পরমাণুর যে 'রূপ', তাহা অনাদি ভাববস্তু, কিন্তু পাকে তাহার নাশ হয়। অতএব কোনও অনাদি ভাব বস্তুর নাশ নাই—এ নিয়ম অব্যভিচারী নিয়ম নহে। সুতরাং মায়া অনাদিভাব বস্তু বলিয়া তাহার সত্তা স্বীকারে কোন আবশ্যকতা নাই।

তাহার পর মায়া নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া তাহাকে যে নিত্য বা সত্য বলিতে হইবে—তাহারও কোনও আবশ্যকতা দেখা যায় না। যেহেতু নিত্যের শক্তিকে অনিত্য বা মিথ্যা বলিলে তাহার নিত্যতার কোন ব্যাঘাত হয় না। কার্য্য দেখিয়া শক্তির অনুমান হয়। সে কার্য্য নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং মিথ্যা। আর তজ্জন্য সেই কার্য্যের জননী যে শক্তি, তাহাও তদ্রূপ হইতে বাধ্য, নচেৎ কার্য্যই সম্ভবপর হয় না। আর কার্য্য না থাকিলে যে, সে কার্য্যের কারণবস্তুটী থাকিতে পারিবে না, এরূপ বলা যায় না। অতএব ব্রহ্ম নিত্য বলিয়া তাঁহার শক্তিকে যে নিত্য বলিতে হইবে—তাহার কোন কারণ দেখা যায় না।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী একব্রহ্মের বিকারী ও অবিকারী এই বিরুদ্ধ অংশদ্বয় যদি বেদবলে মানিতে পারেন, তাহা হইলে অদ্বৈতবাদীও একব্রহ্মের উক্তরূপ অনির্ব্বচনীয় শক্তি, সেই বেদবলেই মানিতে পারেন। আর তাহাতে বিশিষ্টাদ্বৈতমত অপেক্ষা অনেক কল্পনা-লাঘবই হইবে। আর তজ্জন্য অসঙ্গতির মাত্রাও অল্প হইবে। কারণ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ব্রহ্মের বিকারী অংশে যাবদ্ বৈচিত্র্যবীজ স্বীকার করেন, আর অবিকারী অংশে জীবরূপ অণুচিদ্‌বস্তু, এবং চিদচিদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বর স্বীকার করেন, সুতরাং কত অধিক বিষয় তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল।

তাহার পর একই চিদ্‌বস্তুর অণুত্ব ও বৃহত্ত্ব-সাধকবস্তুটী আর জগৎ হইতে পারে না। বৃহৎচিদ্ যদি চিদচিদ্‌বিশিষ্ট হয়, তবে অণুচিৎও চিদচিদ্‌বিশিষ্ট হইবে না কেন? আর তাহাহইলে অণুচিৎ ও বৃহৎচিতের মধ্যে ভেদ কেন থাকিবে? অণুচিৎও জগতের সমষ্টিকে—চিদচিদ্‌বিশিষ্ট বৃহৎচিৎ বলা যায় না। কারণ, সেই সমষ্টি ত আর কেবল চিৎ নহে যে, সে চিদচিদ্-বিশিষ্ট হইবে? আর এই সমষ্টি হইতে গেলে, এই সমষ্টিভিন্ন বস্তু স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ একটী অনির্ব্বচনীয় মতবাদে পরিণত হইল। অর্থাৎ উহাই মায়া বা মিথ্যা হইয়া গেল। অন্য কথায় বিশিষ্টবস্তুটীর বিশেষ্যটী সত্য হইল এবং বিশেষণটীই মিথ্যা হইল। এইরূপে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদটী প্রকারান্তরে অদ্বৈতবাদেই পরিণত হইল।

তাহার পর ইহাও বলিতে পারা যায়—শ্রুতিতে যে নির্গুণ, নিষ্কল, অখণ্ড, একরস ও অব্যয় প্রভৃতি শব্দ আছে, তাহাদের অর্থসংকোচ না করিলে আর কিছুতেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হয় না। কিন্তু অদ্বৈতবাদে এই অর্থসংকোচ করিতে হয় না। আর লৌকিক যুক্তির অনুরোধে বেদের তাদৃশ ব্রহ্ম ও অনির্ব্বচনীয় শক্তির অর্থসংকোচ করিলে বেদের প্রামাণ্যই থাকিবে না। কারণ, বেদ তখন অনুবাদ হইয়া যাইবে। যাহা বেদভিন্নও সিদ্ধ হয়, তাহার জন্য লোকে কখনই শ্রুতির শরণ গ্রহণ করিতে যাইবে না। এজন্য অদ্বৈতবাদই বেদানুগত মতবাদ।

তাহার পর শ্রুতিবাক্যে অদ্বৈতমতে যেখানে লক্ষণা করিতে হয়, বিশিষ্টাদ্বৈতমতে দ্বিবিধ ব্রহ্ম স্বীকার করায় সেখানে লক্ষণা করিতে হয় না বটে, কিন্তু এই লক্ষণা অস্বীকারের জন্য তদপেক্ষা

অধিক অসঙ্গতি, যথা—ব্রহ্মের শরীরশরীরিভাব ও একে বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের সমাবেশ—প্রভৃতি বহু প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ বিষয় স্বীকার করিতে হয়। অতএব এদিক্ দিয়াও অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠতাই সিদ্ধ হয়। যদি দ্বৈতমিথ্যাত্বরূপ একটী প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ বিষয় স্বীকার করিয়া সকল বিরোধের উপপত্তি হয়, তবে বহু প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ বিষয় স্বীকার করা নিশ্চয়ই ব্যর্থ বলিতে হইবে। শ্রুতিই যখন ব্রহ্মকে "অপ্রমেয়" "অগ্রাহ্য" প্রভৃতি বলিয়াছেন, তখন তাহার জন্য প্রত্যক্ষ-সঙ্গতি করিবার চেষ্টা শ্রুতিবিরুদ্ধ চেষ্টা। বস্তুতঃ অদ্বৈত-বাদী শ্রুতিকে প্রত্যক্ষ অপেক্ষাও প্রবল বলেন।

তাহার পর অন্তর্যামী-শ্রুতিতে যে শরীরশরীরিভাবের কথা আছে, তাহার বলে যে জীবজগৎকে ব্রহ্মের শরীর বলা হইয়াছিল, তাহাও সঙ্গত হয় নাই। কারণ, তদ্দ্বারা ব্রহ্মের সহিত অংশাংশিভাব সিদ্ধ হয় না। বিরুদ্ধবস্তুদ্বয়ের অংশাংশিভাব অসম্ভব। "অকায়ম্" (ঈশ ৮) "অশরীরম্" (ছা. ৮.১২) এরূপ বহু শ্রুতির দ্বারা এই শরীরের, মিথ্যা মায়াজন্য শরীর হইতে কোন বাধা ত শ্রুতিতে উক্ত হয় নাই। অতএব এই শ্রুতির দ্বারাও বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধ হয় না। আর "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি" শ্রুতি মায়াবিশিষ্ট সগুণব্রহ্মের বিরাট্স্বরূপের বর্ণনা বলিয়া উপপত্তি করা যায়। অতএব এতদ্দ্বারাও বিশিষ্টাদ্বৈতমত সিদ্ধ হয় না।

পরিশেষে সগুণভাব নির্গুণভাবকে অপেক্ষা করে। কিন্তু নির্গুণভাব সগুণভাবকে অপেক্ষা করে না। এই কারণে নির্গুণ শ্রুতিই প্রবল হয়। সগুণ শ্রুতি প্রবল হয় না। আর, অদ্বৈতমতে বিশিষ্টাদ্বৈতভাবের স্থান আছে। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈত-মতে অদ্বৈতের স্থান নাই। কারণ, সাধকের যাবৎ অদ্বৈতস্বরূপে স্থিতি না হয়, তাবৎ বিশিষ্টাদ্বৈত অদ্বৈতবাদীও স্বীকার করেন, বিশিষ্টাদ্বৈতকে মিথ্যা বলিয়াও তদনুযায়ী ব্যবহার করেন। অধিক কি, কর্ম্ম ও উপাসনারও উপযোগিতা স্বীকার করেন। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী সকল অবস্থাতেই অদ্বৈতবাদকে ভ্রম বলিতে বাধ্য হন। তন্মতে অদ্বৈতবাদীর ভবিষ্যতে নরক অনিবার্য্য। কিন্তু অদ্বৈতবাদী বিশিষ্টাদ্বৈতকে ব্যবহারকালে স্বীকার করিয়া ভগবৎকৃপাদিলাভের সুযোগ প্রাপ্ত হন। এইরূপে অদ্বৈতবাদটী সার্ব্বভৌম মতবাদ হইতে পারে। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈত সেরূপ হইতে পারে না। অতএব শ্রুতি যুক্তি ও অপরমতের সহিত সামঞ্জস্যবিধানে অদ্বৈতমত যত উপযোগী, যত নির্দ্দোষ, এত আর বিশিষ্টাদ্বৈত নহে।

অদ্বৈতবাদিকর্তৃক দ্বৈতাদ্বৈতমতখণ্ডন।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর কথা শুনিয়া অদ্বৈতবাদী বলেন—দ্বৈতাদ্বৈত-বাদটী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অপেক্ষা আরও স্পষ্টতঃ দ্বৈতবাদের সমীপ-বর্ত্তী। কারণ, তাঁহারা দ্বৈত ও অদ্বৈতমধ্যে বিশেষ্য ও বিশেষণ-সম্বন্ধ স্বীকার করেন না। বিশিষ্টাদ্বৈত স্বীকার না করিলে দ্বৈতবাদে ঘট ও শরাবের মধ্যে যেমন ঘট ও শরাবরূপে ভেদ, এবং মৃত্তিকারূপে তাহাদের অভেদ স্বীকার করা হয়, দ্বৈতাদ্বৈতমতেও তাহাই স্বীকার করা যায়। সুতরাং ইহাতে যে অসঙ্গতি, তাহা দ্বৈতবাদেরই অনুরূপ। আর যে যুক্তিবলে দ্বৈতবাদ খণ্ডিত হয়, সেই যুক্তিবলে দ্বৈতাদ্বৈতবাদও খণ্ডিত হয়।

আর যদি বলা যায়—দ্বৈতমধ্যে দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত-মধ্যেও দ্বৈতাদ্বৈত এবং শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমধ্যেও দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধ থাকায় এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদই সর্ব্বসাধারণ, সুতরাং ইহাই সমীচীন মত ? তাহা হইলে বলিব—তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, এই সকল মতবাদ যখন প্রত্যেকে খণ্ডিত হইয়া থাকে, তখন উক্ত সর্ব্বমত সাধারণ দ্বৈতাদ্বৈতমতও আর অখণ্ডিত থাকে না। দ্বৈতাদ্বৈত সর্ব্বসাধারণ হইলেও তাহারা দ্বৈতাদ্বৈতের বিরোধ ত অতিক্রম করে না। আর সেই বিরোধ যদি সমবল দ্বৈত ও অদ্বৈতমধ্যে হয়, তাহা হইলে তাহা অনির্ব্বচনীয়বাদে পরিণত হইল। আর যদি সেই বিরোধ বিষমবল দ্বৈত ও অদ্বৈতমধ্যে থাকে, তাহা হইলে তাহা, হয়—দ্বৈতবাদে পরিণত, না হয়—অদ্বৈতবাদে পর্য্যবসিত হয়। দ্বৈতবাদে পরিণত হইলে তাহার খণ্ডন দ্বৈতবাদে দৃষ্ট হইবে, আর অদ্বৈতবাদে পরিণত হইলে, অদ্বৈতবাদের সত্যতাই সুদৃঢ় হইবে। অতএব এই দ্বৈতাদ্বৈতমত-বাদও সঙ্গত মতবাদ নহে। ফলতঃ এ প্রসঙ্গে দ্বৈতবাদী দ্বৈতাদ্বৈত-খণ্ডনে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরাও বলিতে পারি, অর্থাৎ ঘট ও মৃত্তিকামধ্যে দ্বৈতাদ্বৈত নহে। তবে তাঁহারা দ্বৈতাদ্বৈত নহে বলিয়া দ্বৈত বলিতে চাহেন, আমরা সেখানে দ্বৈত মিথ্যা এবং অদ্বৈত সত্য বলি—এইমাত্র প্রভেদ। কারণ, মৃদ্ঘট এই প্রতীতিতে দ্বৈতাদ্বৈত স্বীকার্য্যই হয়। অতএব দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর সমবল দ্বৈতাদ্বৈত অসিদ্ধ, কিন্তু মিথ্যা দ্বৈত ও সত্য অদ্বৈত এতাদৃশ দ্বৈতাদ্বৈতই সিদ্ধ হয়।

আর আত্মরূপ জ্ঞানবস্তুটী নিয়তই জ্ঞাতৃরূপ হইতেছে, এবং সেই জ্ঞাতা নিজেই আবার জ্ঞেয়রূপ ধারণ করিয়া সেই জ্ঞেয় হইতে নিজকে পৃথক্ করিয়া নিজকে জ্ঞেয়রূপ জানিতেছে। অতএব জ্ঞানরূপ আত্মবস্তুটী স্বভাবতঃই দ্বৈতাদ্বৈতাত্মক বস্তু-ইত্যাদি, যাহা বলা হইয়াছিল, তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, জ্ঞানবস্তুটী যে জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়রূপ ধারণ করে, তাহাতে সে তাহার নিজরূপ কখনই ত্যাগ করে না। ত্যাগ করিলে জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়-ভাবের পুনরুদয় হইত না। আর জ্ঞাতৃভাবের প্রত্যভিজ্ঞাও হইত না। কিন্তু 'সেই আমি' বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞাই হয়। এজন্য জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয়ভাবের মূলে যে জ্ঞানস্বরূপ আত্মবস্তুটী আছে, তাহার উপর এই জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয়ভাবটী ভাসমান হয়।

অর্থাৎ সেই মূলভূত জ্ঞানস্বরূপ আত্মবস্তুটীই জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়াকার ধারণ করে। আর তজ্জন্য এই জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভাবটী তাহার উপাধিবিশেষই হয়।

এই জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভাব তাহার অবিচ্ছেদ্যরূপ নহে। কারণ, সুষুপ্তিকালে তাহাদের অভাব হয়। অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে তাহারা জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভাবের মূল অজ্ঞানাকারে পরিণত হয়; যেহেতু তখন 'আমি আমাকেও জানিতে পারি নাই'—এই বোধ হয়। জাগ্রতে সেই অজ্ঞান আর অজ্ঞানাকারে থাকে না। এজন্য এ অজ্ঞান এবং তজ্জন্য জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভাব সবই সেই জ্ঞানস্বরূপ আত্মবস্তুর উপর আরোপিত আকারবিশেষ বা উপাধিস্বরূপ। আর তজ্জন্য নিত্যজ্ঞানস্বরূপ বস্তুটী আকার বা উপাধিশূন্যরূপে থাকিতে কোন বাধা হয় না। অতএব আত্মরূপ জ্ঞানস্বরূপবস্তুটী অদ্বৈতই হয়, দ্বৈতাদ্বৈতভাবাপন্ন নহে।

যদি বলা হয়—এই অজ্ঞান ও তজ্জন্য জ্ঞাতৃজ্ঞেয়জ্ঞানভাবরূপ-উপাধিশূন্যরূপে আত্মবস্তু যে থাকিবে, তাহার প্রমাণ কি? তাহার উত্তর এই যে অজ্ঞান, জানিলে থাকে না, না জানিলেই থাকে। অথচ যাহা থাকে, তাহাকে না জানিতে পারিলে, তাহার থাকাও সিদ্ধ হয় না। এজন্য এই অজ্ঞানকে সদসদ্‌ভিন্ন বা অনির্ব্বচনীয় বলা হয়।

আর এইভাবে এই অজ্ঞানকে স্বীকার করা হয় বলিয়া ইহার প্রকাশক একটী স্বপ্রকাশবস্তু স্বীকার করা আবশ্যক হয়। অথচ এই স্বপ্রকাশবস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধও স্বীকার করা যায় না। কারণ, স্বপ্রকাশ নিত্যসিদ্ধ, ইহা তাহার বিপরীত। বিরুদ্ধস্বভাব বস্তুদ্বয়ের সম্বন্ধ সম্ভবপর হয় না। অতএব এই অজ্ঞানশূন্য অবস্থা সেই আত্মবস্তুর সম্ভব হয়। দ্বৈতাদ্বৈতমতে এই অজ্ঞানকে সত্য বলা হয়। এজন্য এ মতে অসঙ্গতি অনিবার্য্য।

যদি বলা হয়, যুক্তিবলে এই অজ্ঞানের নাশ সম্ভাবিত বলিয়া বিবেচিত হইলেও ইহার আত্যন্তিকনাশের প্রতি যুক্তিপ্রমাণ হইতে পারে না। কারণ, যুক্তিবিচার এই অজ্ঞানসমুৎপন্ন বুদ্ধিরই কার্য্য? তাহা হইলে বলিব শ্রুতিবলে ইহার আত্যন্তিক বিনাশ সিদ্ধ হইতে পারিবে। যথা—"অন্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ" (শ্বেঃ উঃ ১.১০) অতএব জ্ঞানস্বরূপ আত্মবস্তুটী জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়-ভাবাপন্ন একটী দ্বৈতাদ্বৈতাত্মক পদার্থ নহে। আর তজ্জন্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সঙ্গত মতবাদ নহে, কিন্তু অদ্বৈতবাদই সঙ্গত।

অদ্বৈতবাদিকর্ত্তৃক শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদখণ্ডন।

শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর কথা শুনিয়া অদ্বৈতবাদী বলেন—শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদটী অদ্বৈতবাদীর খুব নিকটবর্ত্তী মতবাদ; কারণ, এ মতে এক ব্রহ্মবস্তু ও তাহার শক্তিদ্বারা সমুদায় উপপন্ন করা হয়। কিন্তু যদি এই শক্তিকে নিত্য বলা হয়, তাহা হইলে অপরমতবাদিগণ, এই শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদের যে খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার আর উদ্ধার হয় না। বস্তুতঃ, এক অদ্বৈত বস্তু অবিকৃত থাকিয়া সক্রিয় থাকিতে পারে—ইহার দৃষ্টান্ত নাই। লীলা, ক্রীড়া, নটাভিনয় বা স্বপ্নের দৃষ্টান্তদ্বারা তাদৃশ অদ্বৈতবস্তুর অবিকারিভাব, অথচ তাহার ক্রিয়া প্রদর্শন করিতে পারা যায় না। লীলা ও ক্রীড়াদি সকল স্থলেই কর্ত্তার অভাববোধ ও পরিবর্ত্তন অবশ্যই থাকে, তবে তাহা অতি অল্প—এইমাত্র প্রভেদ। এই লীলাদির অর্থ অদ্বৈতমতে মিথ্যাই বলা হয়। বস্তুতঃ, বিকার ও দ্বৈতবস্তুর স্বীকারভিন্ন ক্রিয়া সম্ভবপরই হয় না। হইলে তাহাকে মিথ্যাই বলিতে হয়। আর মিথ্যা বলিলে, অর্থাৎ 'নাই তবু দৃশ্য হয়' বলিলে অদ্বৈতবাদেই আসিতে হয়।

তাহার পর নিত্যশক্তির ক্রিয়া অনিত্য হইবে কেন? অনিত্য ও মিথ্যা যদি পৃথক্‌ও বলা যায়, তাহা হইলেও নিত্যের ক্রিয়া নিত্যই হউক। কিন্তু ক্রিয়া ত কখনই নিত্য হয় না। অবশ্য অনিত্য ও মিথ্যা যে অভিন্ন, তাহার কারণ—অনিত্য নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল হয়, আর যাহা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, তাহা অনির্ব্বচনীয়ই হয়। অনির্ব্বচনীয়ই মিথ্যা। শ্রুতিও অনিত্য জগতের মিথ্যাত্ব "বাচারম্ভণ" প্রভৃতি বাক্যে অতি স্পষ্টভাবে উপদেশ দিয়া থাকেন। অতএব নিত্যশক্তিস্বীকার অসঙ্গত।

তাহার পর প্রত্যেক ক্রিয়াব্যক্তি অনিত্য হউক, কিন্তু ক্রিয়ার ধারা বা জাতিবিশেষটী অনিত্য হইবে না—ইহাও বলা যায় না। কারণ, যে ধারার ব্যক্তি অনিত্য হয়, সে ধারাও অনিত্য হয়। অতএব শক্তি নিত্য নহে, কিন্তু অনিত্য, অর্থাৎ মিথ্যা। আর সেই মিথ্যার আশ্রয় সত্য হয় বলিয়া, এক অদ্বৈত ব্রহ্মই সত্য, অন্য সব মিথ্যা—এই অদ্বৈতসিদ্ধান্তই সিদ্ধ হয়।

তাহার পর নিত্য শক্তিস্বীকারে অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গদোষ হয়। কারণ, যে শক্তিবশতঃ যে কার্য্য হয়, সেই কার্য্য নাশপ্রাপ্ত হইতে গেলে, তাহার মূল শক্তিও নাশ প্রাপ্ত হয়। শক্তি থাকিতে আর তাহার কার্য্য নাশপ্রাপ্ত হয় না। এজন্য যে শক্তিবশতঃ জীবের বন্ধন হইয়াছে, সেই বন্ধননাশের অনুরোধে সেই বন্ধনের মূল শক্তিরও নাশ অবশ্য স্বীকার্য্য। আর তাহা হইলে মোক্ষের নিত্যতার অনুরোধে শক্তি আর নিত্য হইতে পারিল না।

যদি বলা হয়, যাহা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, তাহা অনির্ব্বচনীয় কেন হইবে? তাহার উত্তর এই যে, যাহা নিয়ত পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাকে অনিত্য বলা হয় বলিয়া তাহার কোন অবস্থাই স্থির থাকে না। যেমন বৃক্ষ বলিলে ফুল, ফল, বীজ, অঙ্কুর ও বৃক্ষ এইক্রমে একটী চক্রের একদেশ মাত্র নির্দ্দেশ করা হয়। সমগ্র-চক্রের নির্দ্দেশ করা হয় না। আর তজ্জন্য সেই নির্দ্দেশ যথার্থ নির্দ্দেশ বলা হয় না। কারণ, ফুলপ্রভৃতি প্রত্যেক অবস্থাতেই

ফলাদি অপর অবস্থার সহিত বৃক্ষের সম্বন্ধ থাকে ; অথচ সেই নির্দ্দেশদ্বারা সেই সম্বদ্ধ অবস্থাগুলিকে লক্ষ্য করা হয় না। তদ্রূপ নিত্য পরিবর্ত্তনশীলের কোন অবস্থাই শুদ্ধ একটী অসম্বদ্ধ অবস্থা না হওয়ায়, ত্যহার কোনরূপ নির্দ্দেশ, যথার্থ নির্দ্দেশ হয় না। যেমন ১০ টা বাজিয়া ৫ মিনিট বলিলে সেই সময়টীকে যথার্থ নির্দ্দেশ করা হয় না। যেহেতু ৫ মিনিটরূপ কালাংশে চক্ষুঃ-সংযুক্ত হইয়া জ্ঞান উৎপন্ন হইতে হইতেই ৫ মিনিট অতীত হইয়া যায়। এস্থলেও তদ্রূপ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীলের যথার্থ নির্দ্দেশ হয় না। এজন্য তাহাকে অনির্ব্বচনীয় ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। আর অনির্ব্বচনীয়ই মিথ্যা হয়, তাহার কারণ, সেই ৫ মিনিটের জ্ঞানকালে ৫ মিনিট থাকে না, অর্থাৎ যাহা না থাকে, তাহারই জ্ঞান "এই" বলিয়া হয়। অতএব অনিত্য ও মিথ্যা একার্থক। অদ্বৈতবিরোধিগণ অনিত্য ও মিথ্যামধ্যে যে ভেদ কল্পনা করেন, তাহা ব্যর্থ। অতএব নিত্যশক্তি স্বীকার করিয়া শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমত স্বীকার করা সঙ্গত হয় না।

শ্রুতিতে যে ব্রহ্মের বিবিধ পরাশক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা মিথ্যা সগুণ ব্রহ্মের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ, এক অদ্বৈত ব্রহ্মের বিবিধ পরাশক্তি স্বীকার করিলে, সেই শক্তিকে অনির্ব্বচনীয়ই বলা হয়। কারণ জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া এই তিনরূপেই বিবিধ বলিলে বিবিধ বলাই নিরর্থক হয়। বিবিধ পদের অর্থের অনুরোধে জ্ঞান, বল ও ক্রিয়ার অতিরিক্তরূপতাও সেই শক্তির স্বীকার্য্য। আর তাহা হইলে সেই শক্তিকে নিজে নিজের নাশসমর্থাও বলিতে হইবে। এইরূপে তখন ইহা অনির্ব্বচনীয় ভিন্ন আর কি বলা যাইবে?

যদি বলা যায়—নিজে নিজের নাশে সমর্থা, এরূপ কল্পনা অসঙ্গত। তাহা হইলে বলিব—জীবের মুক্তিও তবে অসম্ভব। বন্ধনজননী শক্তির নাশ না হইলে মুক্তি কি করিয়া হইবে? অতএব শক্তিকে নিত্য বলা যায় না। আর তজ্জন্য শক্তিবিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ সঙ্গত মতবাদ নহে।

শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদিকর্ত্তৃক স্বপক্ষসমর্থন ও অদ্বৈতবাদখণ্ডন।

অদ্বৈতবাদিকর্ত্তৃক শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদখণ্ডনে এবং দ্বৈতবাদি-প্রভৃতির উত্তরে শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন—এক অদ্বৈততত্ত্বের বিচিত্র শক্তিবশতঃ জগদ্‌বৈচিত্র্যের উপপত্তি হয়, অথচ সেই অদ্বৈততত্ত্ব অবিকারী থাকেন—এই আমাদের মতে প্রতিপক্ষগণ যে দোষ প্রদর্শন করেন, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, সসীম ও অপরিচ্ছিন্ন বস্তুতে শক্তিস্বীকারে যে সব আপত্তি সম্ভাবিত হয়, তাহাই তাঁহারা প্রদর্শন করিয়াছেন। অসীম অপরিচ্ছিন্ন বস্তুতে এই সব দোষ স্পর্শ করে না। আর এই অসীম ও অপরিচ্ছিন্ন বস্তু যেমন শ্রুতিসিদ্ধ, তদ্রূপই যুক্তিসিদ্ধও হইয়া থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহই নাই। শ্রুতিতে জগৎকারণকে যে অখণ্ড অব্যয় অবিনাশী ইত্যাদি বার বার বলা হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। অপরমতবাদিগণ এ সব শব্দের অর্থসঙ্কোচ করিয়া স্বমতের পুষ্টিসাধন করেন। আমাদের মতে তাহা করিতে হয় না।

আর এ সম্বন্ধে যুক্তি এই যে, যাহা সকলের মূলকারণ, তাহার কোনরূপ সীমা বা খণ্ড স্বীকার করা চলে না। কারণ, সীমা ও খণ্ডসাধক অন্যবস্তুর সত্তা পৃথগ্‌ভাবে না থাকিলে সেই সর্ব্বমূলকারণের সীমা বা খণ্ড সম্ভবপর হয় না। আর অন্যবস্তু থাকিলে সেই কারণকে আর সর্ব্বমূলকারণ বলাও যায় না। অতএব সর্ব্বমূল যে কারণ, তাহা অসীম অখণ্ড ও অপরিচ্ছিন্নই বলিতে হইবে। অতএব এ মতে যুক্তি শ্রুতি উভয়ই প্রবল হইল।

শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদিকর্ত্তৃক দ্বৈতবাদের আক্রমণের উত্তর।

দ্বৈতবাদিকর্ত্তৃক সসীম পরিচ্ছিন্ন বস্তুর স্বীকারে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হয়। যদি শ্রুতিবলে এই বিনাশসম্ভাবনার নিবারণ করা যায়, তবে সেই শ্রুতিবলে অদ্বৈত অখণ্ড অসীম অপরিচ্ছিন্ন বস্তু ও তাহার শক্তিমাত্র স্বীকারে দোষ কি? অলৌকিক তত্ত্বের জন্য শ্রুতি প্রয়োজন। শ্রুতিবলে যদি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ব বিষয়ে অলৌকিকত্ব সিদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে তাহা লোকের বোধগম্য হইতে পারে না। এজন্য অলৌকিকত্ব যত অল্প স্বীকার করা যায় ততই ভাল, এবং লৌকিক যুক্তির দ্বারা যত দূর অগ্রসর হইতে পারা যায়, ততই বিষয় সহজ-বোধ্য হয়। এক অদ্বৈত অখণ্ড অপরিচ্ছিন্নের এক শক্তির দ্বারা সর্ব্ববিরোধের সমাধান হইলে অতি অল্পই অলৌকিক স্বীকার করা হয়। কিন্তু পরমাণু আকাশ দিক্ কাল ও অসংখ্য জীবাত্মা প্রভৃতি বহু বস্তুর নশ্বরত্ব নিবারণের জন্য শ্রুতির শরণ গ্রহণ করিলে বহু অলৌকিক শ্রুতিবলে তাহা সিদ্ধ করিতে হয়। এজন্য দ্বৈত-বাদিগণ শ্রুতির সাহায্যে যে স্বমতস্থাপন করেন, তাহা সম্যক্ পন্থা নহে। বস্তুতঃ সসীমের নশ্বরত্ব, যুক্তি ও শ্রুতিবলে কিছুতেই অপলাপ করা যায় না। সসীমের নশ্বরত্ব শ্রুতিই প্রতিপাদন করে, এবং তাহাতেই তাহার তাৎপর্য্য। বহু নিত্যস্বীকারে তাহার তাৎ-পর্য্য নহে। অতএব দ্বৈতবাদী যে বলিয়াছিলেন যে, শক্তিস্বীকারে দ্বৈতবস্তুর স্বীকার প্রয়োজন, অদ্বৈততত্ত্বের সম্বন্ধে তাহার কোন মূল্যই নাই। আর শক্তিকে কারণতা বা প্রতিবন্ধকাভাব বলিলেও ইহাকে প্রকারান্তরে পৃথক্ পদার্থরূপেই স্বীকার করা হইল। কারণ, কারণতাধর্ম্মটী যখনই কার্য্য হয়, তখনই স্বীকার্য্য। নচেৎ তাহার স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কোথায়? বটবীজ ভ্রষ্ট করিলে কারণতাধর্ম্মটী নষ্ট হয়, কিন্তু তাহা বটবীজই থাকে। আর প্রতিবন্ধকাভাব বলিলে যাহার প্রতিবন্ধক তাহা স্বীকার করায়, প্রতিবন্ধকের অভাবটী সেই পদার্থ ই হইল। কারণগুলি মিলিত

হইয়া যখন কার্য্য হইতেছিল, তখন সেই কার্য্যের মূল শক্তি স্বীকার করা হইয়াছিল। এখন প্রতিবন্ধক সেই শক্তিকে কার্য্য করিতে দিল না। প্রতিবন্ধকাভাব হইলে আবার কার্য্য হইল। সুতরাং প্রতিবন্ধকাভাব শক্তিরই নামান্তর হইল। ইহা দ্রব্যাদি সকল পদার্থেই থাকিতে পারে বলিয়া ইহাকে অতিরিক্ত পদার্থ বলাই সঙ্গত। অতএব দ্বৈতবাদীর এই আপত্তি অসঙ্গত।

শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদিকর্ত্তৃক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর আক্রমণের উত্তর।

আর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী যে বলিয়াছিলেন—শক্তি নিত্য হইলে এবং সেই শক্তির বিকারদ্বারা জগদুৎপত্তির উপপত্তি করিতে গেলে শক্তিমানেরও সেই বিকার অবশ্য স্বীকার্য্য, ইত্যাদি; তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ, শক্তিমান্ অবিকৃত থাকিয়া শক্তিবশতঃ শক্তিমান্ নানা কার্য্য করেন—ইহা দেখা যায়। যেহেতু লীলা, ক্রীড়া, নটাভিনয় এবং স্বপ্নস্থলে কার্য্য হয়, কিন্তু শক্তিমানের বিকার স্বীকার করা হয় না। লীলাদিস্থলে যে বিকার স্বীকার করা হয়, তাহা ব্যর্থ; কারণ, সেই বিকার সেই সকল লীলাকর্ত্তা অনুভবই করে না। অতএব এ দৃষ্টান্ত দুষ্ট নহে।

আর শক্তি স্বীকার না করিলে ক্রিয়া সম্ভবপর হয় না, অতএব শক্তি অস্বীকার করাও চলে না। কিন্তু এই শক্তি নিত্য হইলে ক্রিয়া নিত্য হউক—এই আপত্তি ব্যর্থ; কারণ, নিত্য শক্তির প্রকৃতিই এই যে, তাহার ক্রিয়া অনিত্য হইবে। এরূপ বলিলে দোষ কি হইতে পারে? আর শক্তি অনিত্য বলিলে অন্যশক্তি স্বীকার করিতে হইবে বলিয়া অনবস্থাশঙ্কাবারণার্থ শক্তিমানের মধ্যে বিকারী অবিকারী অংশ স্বীকার করাও ব্যর্থ। কারণ, অনবস্থাভয়ে শক্তিকেই নিত্য বলিব, শক্তিমানের বিকারী অংশ স্বীকারের আবশ্যকতা কি?

আর শক্তিমান্ অবিকৃত থাকিয়া শক্তির বিকার হয় বলিলে, সেই বিকার মিথ্যা হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা কেন? সেই বিকার লইয়া যখন ব্যবহার করা হয়, তখন তাহা সত্যই বলিব। রজ্জুসর্প লইয়া ব্যবহার হয় না, এজন্য তাহাকেই মিথ্যা বলিব, জগৎকে মিথ্যা বলিব কেন?

তাহার পর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর মতে দ্রব্যগত ভেদাভেদ স্বীকার্য্য, যেমন বৃক্ষ ও তাহার শাখাপল্লবে ভেদাভেদ; কিন্তু আমাদের মতে শক্তি শক্তিমদ্‌গত ভেদাভেদ স্বীকার করা হয়; যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তিতে ভেদাভেদ। এ জন্য আমাদের সহিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর সম্পূর্ণ ঐক্য হয় না। বিশিষ্টাদ্বৈতমতের ভেদাভেদ উভয়ই প্রত্যক্ষ, কিন্তু আমাদের ভেদাভেদের ভেদ অপ্রত্যক্ষ এবং অভেদই প্রত্যক্ষ। অতএব আমাদের মতের সূক্ষ্মতা অবশ্য স্বীকার্য্য।

বলা হইয়াছিল—প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়ই প্রমাণ; তাহাদের বস্তুসত্তাসিদ্ধিতে কোন বিশেষ নাই; সুতরাং তাহাদের ভেদাভেদ ও আমাদের ভেদাভেদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই—ইত্যাদি। তাহা সত্য বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ ও অনুমানজন্য স্থূল-সূক্ষ্মগত 'বিশেষ' অস্বীকৃত হইবে কেন? আমাদের মতে ভেদ অপ্রত্যক্ষ হয় এবং অভেদ প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া ভেদাভেদ-উভয়-প্রত্যক্ষতাবাদী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর মত অপেক্ষা আমাদের মতই সূক্ষ্মতর বলিতেই হইবে।

আর প্রলয়ে অদ্বৈততত্ত্বে অনুমেয় 'বিশেষ' স্বীকারদ্বারা বিশিষ্টাদ্বৈতমতকে আমাদের শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতের সমান বলা যায় না। কারণ, বিশিষ্টাদ্বৈতমতে সেই বিশেষবশতঃ অদ্বৈত-বস্তুর দ্রব্যগতবিশেষ এবং শক্তিগতবিশেষ উভয়ই স্বীকার্য্য হয়, কিন্তু আমাদের শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমতে কেবল শক্তিগতবিশেষই স্বীকার্য্য হয়। আমাদের মতে দ্রব্যগতবিশেষ স্বীকার করা আবশ্যক হয় না। এই কারণে শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমতেই লাঘব হয়; অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈতমতে দ্রব্যসংক্রান্ত শরীরশরীরিগত বিশেষ্যবিশেষণসম্বন্ধ থাকে, আর আমাদের শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমতে শক্তিশক্তিমদ্‌গত বিশেষ্যবিশেষণসম্বন্ধ থাকে। অতএব আমাদের মতই সূক্ষ্মতর মত।

পরিশেষে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী যদি শ্রুতিবলে ব্রহ্মে বিকারী ও অবিকারী অংশদ্বয় স্বীকার করিয়াও 'এক ব্রহ্ম' বলেন, তবে সেই শ্রুতিবলে এক অদ্বৈত অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের শক্তিবলেই সকল সম্পন্ন হয়—বলিতে আপত্তি করা কেন? ইহাতে অতি অল্প অলৌকিক বিষয়ের জন্য শ্রুতির সাহায্য গ্রহণ করা হয়। অতএব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আমাদের শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমতের মত সুন্দর নহে।

শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদিকর্ত্তৃক দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর আক্রমণের উত্তর।

আর দ্বৈতাদ্বৈতবাদী যে বলেন—তাঁহাদের দ্বৈতাদ্বৈতভাবটী দ্বৈতমধ্যে যেমন থাকে, তদ্রূপ বিশিষ্টাদ্বৈতমধ্যেও থাকে এবং আমাদের শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমধ্যেও থাকে; সুতরাং তাঁহাদের দ্বৈতাদ্বৈতমতই সর্ব্বাবগাহী সর্ব্বসাধারণ মত। আর তজ্জন্য তাঁহাদের মতই সূক্ষ্মতম এবং উত্তম—ইত্যাদি। কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ, এরূপ বলিলে তাঁহাদের মতে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈত সকলই স্বীকার করা হইল। অর্থাৎ দ্বৈতবাদসম্মত সম্পূর্ণ বিভিন্ন দ্রব্য, বিশিষ্টাদ্বৈতসম্মত মৃত্তিকা ও ঘটের ন্যায় ভিন্নাভিন্নভাবাপন্ন দ্রব্য, এবং আমাদের শক্তি ও শক্তিমদ্ দ্রব্য—সকলই স্বীকৃত হইল। অতএব ইহা দ্বৈতবাদেই পরিণত হইল। সুতরাং দ্বৈতমতখণ্ডনে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হয়, এ মতখণ্ডনে সেই সকল যুক্তিই উপযোগী হইতে পারিবে।

আর মৃদ্‌ঘট যখন প্রতীত হয়, তখন, মৃত্তিকা ঘটের বিশেষণই হয় এবং ঘট বিশেষ্যই হয়। এই বিশেষ্যবিশেষণের দ্বারা যে দ্বৈতাদ্বৈত প্রতীত হয়, তাহা দ্বৈতাদ্বৈতবাদের অবিশিষ্ট দ্বৈতাদ্বৈত নহে, কিন্তু আমাদের স্বীকৃত বিশিষ্টাদ্বৈতই। আর দ্বৈতাদ্বৈতবাদী কার্য্যকারণের মধ্যে অংশাংশী সম্বন্ধ স্বীকার করিলে শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমতেই প্রবেশ করেন। কারণ, মৃত্তিকাই শক্তিবিশেষবশে ঘট হয়। শক্তিও তখন এ মতে অংশই হইয়া যায়। অতএব দ্বৈতাদ্বৈতমতবাদ অপেক্ষা আমাদের শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমতই সঙ্গত এবং উত্তম।

আর দ্বৈতাদ্বৈতবাদী—ভেদাভেদ, সগুণনির্গুণ, বিকার-অবিকার ইত্যাদি বিরুদ্ধভাবের উপপত্তির জন্য শ্রুতি প্রদর্শন করেন; কিন্তু এরূপ করিলে লৌকিক যুক্তির কোন স্থান থাকিল না। বহু স্থলেই অলৌকিক শ্রুতির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল। পক্ষান্তরে আমাদের মতে মাত্র একটী অলৌকিক স্থলে শ্রুতির সাহায্য গ্রহণ করা হইল। এইরূপে দেখা যাইবে—দ্বৈতবাদে মূলকারণের সঙ্গে কার্য্যের ভেদসম্বন্ধদ্বারা নিয়ম্য-নিয়ামকসম্বন্ধ স্বীকার করা হয়। বিশিষ্টাদ্বৈতমতে তাহাদের মধ্যে শরীরশরীরিভাবদ্বারা বিশেষ্যবিশেষণসম্বন্ধ স্বীকার করা হয়। দ্বৈতাদ্বৈতমতে তাহাদের মধ্যে অংশাংশী সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, এবং শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমতে তাহাদের মধ্যে শক্তিশক্তিমদ্‌গত বিশেষ্যবিশেষণসম্বন্ধ স্বীকার করা হয়। অতএব এই সকল মতবাদ হইতেই আমাদের শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমতবাদই সূক্ষ্ম ও উত্তম হইতেছে।

শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদিকর্তৃক অদ্বৈতবাদীর আক্রমণের উত্তর।

তাহার পর অদ্বৈতবাদী যাহা বলেন—তাহা প্রায়ই আমাদের সম্মত, কিন্তু আমরা কার্য্যকে মিথ্যা বলি না। জীব ব্রহ্মে মিশিয়া গেলেও যতদিন জীবভাব থাকে, ততদিন জীব ও জগৎ—সবই সত্য, অদ্বৈতবাদীর ন্যায় আমরা মিথ্যা বলি না।

লীলা ও ক্রীড়াদি স্থলেও তাঁহারা "কারণ অবিকারী থাকিয়াও কার্য্য হয়" ইহা স্বীকার করেন না। আমরা কিন্তু তাহা স্বীকার করি। এক কথায় বিশিষ্টাদ্বৈতমতখণ্ডনে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এ স্থলেও আমরা বলি। যথা—লীলাকর্ত্তা লীলাকালে নিজে নিজের বিকার অনুভব করেন না। অতএব কর্ত্তা অবিকারী থাকিয়াও কার্য্য হয় বলা যায়। সুতরাং এ বিষয়ে অদ্বৈতবাদীর আপত্তি ব্যর্থ।

আর দ্বৈত না থাকিলে ক্রিয়াই সম্ভবপর হয় না—এ কথাও ব্যর্থ। কারণ, অচিন্ত্যশক্তিবলে তাহাও সম্ভবপর হয় বলিব। অতএব দ্বৈতবাদের অনুসরণ করিয়া অদ্বৈতবাদীর এ আপত্তিও ব্যর্থ বলিতে হইবে।

আর নিত্য শক্তির ক্রিয়া নিত্য হইবে—এ আপত্তি অসঙ্গত। কারণ, সেই অচিন্ত্যশক্তিবলেই ইহার উপপত্তি হইবে। সেই শক্তির প্রভাবই এই যে, সে অক্ষুণ্ণ থাকিয়া অনিত্য কার্য্য উৎপন্ন করে। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" এই শ্রুতির দ্বারা শক্তিকে অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ মিথ্যা না বলিয়া অচিন্ত্য বলিলেই সকল সামঞ্জস্য হয়। ব্রহ্মও অচিন্ত্য, শক্তিও অচিন্ত্য, উভয়ই নিত্য, কেবল শক্তির কার্য্য অনিত্য, কিন্তু সত্য, মিথ্যা নহে। অদ্বৈতবাদীর ব্যবহার মিথ্যা বলায় যে রূপ অসঙ্গতি হয়, আমাদের মতে তাহা হয় না।

তাহার পর ক্রিয়ার নাশ হইলেই তজ্জনক শক্তিরও নাশ স্বীকার্য্য কেন হইবে? যাহার গান গাইবার শক্তি আছে, সে একবার গান গাইলেই কি তাহার গান গাইবার শক্তি নষ্ট হইয়া যায়? না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়? নষ্ট হইলে সে আর গান গাইতে পারিত না। কিন্তু সে আরও ভালই গাইতে পারে। ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ। অতএব এ আপত্তিও ব্যর্থ।

তাহার পর শক্তি নিত্য হইলে অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ হইবে কেন? অচিন্ত্যশক্তির সামর্থ্যবশতঃ জীবকে ভগবান্ মোক্ষ দিতে পারিবেন না কেন? না পারিলে অচিন্ত্যশক্তিই সিদ্ধ হইল না। অতএব এ আপত্তিও নিষ্ফল।

আর শক্তিকে অনির্ব্বচনীয় বলিয়া স্বীকার করিলে তাহার সত্তাস্বীকারে আপত্তি করা কেন? "সত্তা নাই, অসত্তা নাই" এ ভাবে অনির্ব্বচনীয় বলিয়া লাভ কি? আমরা অচিন্ত্য বলিয়াও অনির্ব্বচনীয়তার ফলপ্রাপ্ত হইতে পারি। অতএব জগৎকারণ সেই অদ্বৈতবস্তুর নিত্য অচিন্ত্য শক্তিবশতঃই সকল সম্ভব হয়; এক অদ্বৈতবস্তুর নিত্য অচিন্ত্য শক্তিবশতঃ জীব ও জগৎ—সবই সেই লীলাময়ের লীলাবিশেষ। এই লীলায় লীলাময়ের বিকারও নাই, অভাববোধও নাই।

আর শ্রুতিতে বিবিধ পরাশক্তিকে "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" বলায় স্পষ্টভাবেই শক্তিকে নিত্য বলা হইল। বস্তুতঃ ব্রহ্ম নিঃশক্তি এরূপ শ্রুতিই ত নাই। সুতরাং শক্তি নিজে নিজের নাশ করিয়া জীবকে মোক্ষদান করেন—এরূপ কল্পনা অদ্বৈতবাদীর অসঙ্গত। অর্থাৎ শক্তি নিজে নিজের নাশ না করিয়াই জীবকে মোক্ষ দেন বলিয়া তিনি অচিন্ত্য। আর যাহা অনির্ব্বচনীয় তাহা অচিন্ত্যই হয়। কিন্তু যাহা অচিন্ত্য তাহা অনির্ব্বচনীয় নাও হইতে পারে। অচিন্ত্য ব্যাপক, অনির্ব্বচনীয় ব্যাপ্য। অদ্বৈতবাদীর অনির্ব্বচনীয় সদসদ্‌ভিন্ন বলা হয়। ইহা তাহাদের একটী পরিভাষা মাত্র। এই পরিভাষা স্বীকার এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। অতএব এই নিত্য অচিন্ত্য শক্তিবশতঃই সমস্ত যখন সামঞ্জস্য হয়, তখন আমাদের শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমতই সঙ্গত।

অদ্বৈতবাদিকর্তৃক শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমতখণ্ডন।

শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর এই কথায় অদ্বৈতবাদী বলেন—শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদী যেমন জীব ও জগদ্‌ব্যবস্থার উপপত্তি করেন, আমরাও তাহাই করি। কেবল প্রভেদ এই যে, আমরা শক্তিকে নিত্য বলি না, কিন্তু তাঁহারা তাহা বলেনা। আমরা এই শক্তিকে সৎ নহে, অসৎ নহে সদসৎ নহে, কিন্তু, সদসদ্‌ভিন্ন, অর্থাৎ মিথ্যা বলি, কিন্তু তাঁহারা সৎ বলেন।

আর ব্রহ্মাতিরিক্ত শক্তিকে অচিন্ত্য বলিলেও আমাদের স্বীকৃত অনির্ব্বচনীয়তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না; কারণ, ব্রহ্মাতিরিক্ত নিত্যশক্তি আর অচিন্ত্য হয় না, কিন্তু চিন্তনীয়ই হয়। তাহার ব্রহ্মভিন্নতা ও নিত্যতাই তাহার চিন্তনীয়তা বা নির্ব্বচনীয়তা, যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—বিজ্ঞাতাকেই জানা যায় না। শক্তি এই বিজ্ঞাতৃব্রহ্মভিন্ন হওয়ায় চিন্তনীয়ই হইবে। সুতরাং শক্তিকে অচিন্ত্য বলা যায় না। আর তজ্জন্য তাহাকে অনির্ব্বচনীয় বলার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয় না। বস্তুতঃ-শক্তি না থাকিলে কার্য্য হয় না। এজন্য তাহা অসৎ নহে। আর তাহা উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয় বলিয়া তাহা সৎও নহে। আর সৎ ও অসৎ পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়া তাহা সদসৎও নহে। অগত্যা তাহাকে সদসদ্‌ভিন্নাই বলা হয়। ইহাই তাহার অনির্ব্বচনীয়তা।

তাহার পর সেই শক্তি যে অচিন্ত্য নহে, তাহার অন্য কারণও আছে। অর্থাৎ সেই শক্তি যদি অচিন্ত্য হয়, তাহা হইলে তাহা নিজে নিজের বিনাশসাধনে সমর্থা কি না? যদি সমর্থা হয়, তবে তাহার নিত্যতা আর কোথায়? যদি অসমর্থা হয়, তবে তাহার অচিন্ত্যতা কোথায়? অতএব অচিন্ত্য বলার অনুরোধে তাহাকে আর নিত্য বলা গেল না।

পক্ষান্তরে অদ্বৈতমতে সেই শক্তিকে নিজে নিজের বিনাশসাধনে সমর্থাই বলা হয়। যহেতু—জীবকে মোক্ষদান করিবার জন্য শক্তি নিজে নিজকে বিনষ্টই করেন। যে শক্তি জীবকে বদ্ধ করিয়াছে, তাহা বিনষ্ট না হইলে বন্ধননাশরূপ মুক্তি অসম্ভব। জীব শুদ্ধ ব্রহ্মমাত্রে অবশিষ্ট না হইলেও আর মোক্ষ হয় না।

আর শক্তি এক জীবাত্মাকে ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেও পুনরায় আসিবেন না কেন? আর বহু আত্মা স্বীকারে আত্মা পরিচ্ছিন্ন হয়, সুতরাং নশ্বরই হয়। এজন্য শক্তিই অনিত্য বলিয়া স্বীকার করা হয়।

যদি বলা হয়—এক আত্মা স্বীকারে একের মুক্তিতে সকলের মুক্তি হওয়া উচিত; এজন্য এ পর্য্যন্ত কাহারও মুক্তিই হয় নাই ইত্যাদি? কিন্তু এ আশঙ্কাও অসঙ্গত। স্বপ্নে বহু জীবদর্শনের ন্যায়ই এই জাগ্রদবস্থার জগৎ। অতএব একের মুক্তিতে সকলের মুক্তিপ্রসঙ্গরূপ আপত্তি ব্যর্থ। অথবা—যে ব্যক্তি মুক্ত তাহার নিকট ত আর অপর কেহই থাকে না যে, তাহার অমুক্তি আশঙ্কা উঠিবে। যে ব্যক্তি এরূপ শঙ্কা করে, তাহার ত মুক্তি হয় নাই। অতএব একের মুক্তিতে অপর থাকে, কি না থাকে, সে ব্যক্তি কি করিয়া বুঝিবে? অতএব এ আপত্তিও ব্যর্থ।

তাহার পর শক্তি নিত্য হইতে পারে না—ইহার অন্য হেতুও আছে; যথা—যখন পাঁচটী বস্তু মিলিত হইলে একটী কার্য্য হয়, একটী কম হইলে হয় না, তখন সেই পাঁচটী পদার্থে শক্তি জন্মে বলিতে হইবে। শক্তি জন্মে না—যদি বলা যায়, তাহা হইলে একটীর অভাবে চারিটীর দ্বারা সেই কার্য্য কতকটাও হইবে না কেন?

যদি বলা হয়—পঞ্চম বস্তুর আগমনে শক্তির অভিব্যক্তি হয়, তৎপূর্ব্বে শক্তি সুপ্ত থাকে। তাহা হইলে বলিব—অনভিব্যক্ত অবস্থায় শক্তি স্বীকারের কোন উপায় নাই। কারণ, যে পঞ্চম বস্তুটীর আনয়নে শক্তির অভিব্যক্তি হয়, সেই পঞ্চম বস্তুর অবস্থাবিশেষে তাহার দ্বারা সেই অভিব্যক্তিকার্য্যও হয় না, অন্য চারিটীর সহিত মিলিলে সেই অভিব্যক্তিকার্য্য হয়, নচেৎ নহে। এই কারণে শক্তিকে অনিত্যাই বলিতে হয়। আর তাহার ফলে তাহাকে অনির্ব্বচনীয়ও বলিতে হয়।

তাহার পর সেই শক্তির অভিব্যক্তি মানিতে গেলে আবার অন্য শক্তির সত্তাস্বীকার আবশ্যক হয়। আর তাহার ফলে অনবস্থাই হয়, অনবস্থা দোষ ঘটিলে বস্তু সিদ্ধ হয় না। এজন্য উৎপত্তিনাশশীল শক্তি স্বীকারই আবশ্যক। অর্থাৎ শক্তি তাহা হইলে অনিত্য ও অনির্ব্বচনীয়ই হইল।

তাহার পর লীলা, ক্রীড়া, নাট্য ও স্বপ্নস্থলে কর্ত্তা অবিকারী থাকিয়া ক্রিয়া হয়, যে হেতু লীলাকর্ত্তার অভাববোধ বা বিকার সেই লীলাকর্ত্তা অনুভব করিতে পারে না, ইত্যাদি—যাহা বলা হইয়াছিল—তাহাও সঙ্গত হয় না। কারণ, অভাববোধ না হইলে লীলাক্রীড়াদির পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হয় না। একটা লীলা বা ক্রীড়া হইতে অন্য লীলা বা ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্তি ইচ্ছাভিন্ন হয় না। সেই ইচ্ছা অভাববোধ হইতে হয়, না হয়—অধিক আনন্দ লাভার্থ হয়। এই অধিক আনন্দ লাভেচ্ছা অভাববোধেরই রূপান্তর। লীলানন্দে মগ্ন ব্যক্তিরও লীলান্তর গ্রহণেও এই প্রকার অভাববোধই থাকে।

আর বিকার না হইলে লীলাদির পর ক্লান্তিবোধ হয় কেন? লোকে দিনরাত লীলাক্রীড়ারত হয় না কেন? লীলাক্রীড়াদি হইবে, অথচ কর্ত্তার বিকার বা কোন ক্ষয় বা পরিবর্ত্তন হইবে না—ইহা অসম্ভব কথা। ইহা মিথ্যা সগুণব্রহ্মের মহত্ত্বপ্রকাশক স্তুতিমাত্র। "স লেলায়তীব" এই শ্রুতিও আত্মার লীলাকে

মিথ্যা বলিয়াই ঘোষণা করিয়া থাকে। অতএব লীলা-ক্রীড়াদির দৃষ্টান্তদ্বারা কর্ত্তার অবিকারী ভাব সিদ্ধ হয় না।

তাহার পর অচিন্ত্যশক্তিবশতঃ যদি ভগবান্ জীবকে নিত্য মোক্ষ দিতে পারেন, তবে তাহাকে পুনর্ব্বার বদ্ধও করিতে পারিবেন না কেন? না পারিলে তাহার শক্তির অল্পতা সূচিত হইল। শক্তির কার্য্য যদি কোন নিয়মাধীন হয়, তবে তাহার অচিন্ত্য-সামর্থ্য কোথায়? নিয়মাধীনতা ও স্বাধীনতা এক বিষয়ে একসঙ্গে স্বীকার করিলে তাহা কি অনির্ব্বচনীয় হইয়া পড়িল না? আর ভগবান্ মুক্তিদান করিলেও যে শক্তিবশতঃ জীবের বন্ধ হইয়াছিল, তাহার নাশ না হইলে জীবের মুক্তি কিরূপে হইবে? অতএব শক্তির নাশ অবশ্য স্বীকার্য্য।

যদি বলা হয়, জীবের অজ্ঞানশক্তির নাশ হয়, কিন্তু ভগবানের চিৎশক্তি থাকে, তাহার নাশ হয় না। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইবে, সেই চিৎশক্তি অজ্ঞানশক্তির নিয়ামক কিনা? নিয়ামক হইলে সেই বন্ধহেতু চিৎশক্তির নাশ না হইলে মুক্তি হইবে না—বলিতে হইবে। আর নিয়ামক না হইলে সেই চিৎশক্তি স্বীকারের আবশ্যকতা কি? শক্তিকে ত প্রত্যক্ষ করা যায় না। কার্য্য দেখিয়া তাহার অনুমান হয়। নিয়মনকার্য্যবশতঃই তাহার অনুমান। সেই নিয়মনকার্য্য না থাকিলে তাহার স্বীকারের আবশ্যকতা কি? যে চিৎশক্তিবশতঃ জীবের অজ্ঞান-শক্তি জীবকে বদ্ধ করে, সেই চিৎশক্তি নিত্য হইলে জীবকে আবার বদ্ধ করিবে না কেন? অথবা জীবের মুক্তিই হইতে পারিবে না—ইহাই বলিতে হয়।

তাহার পর এই অজ্ঞানশক্তির আশ্রয় জীব বলিলে জীব আর ব্রহ্মের শক্তি হইল না। আর এক ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তি-বশতঃ জীবজগৎরূপ লীলা হয়—ইহাও সিদ্ধ হইল না। শক্তির শক্তি কল্পনা করিলে শক্তি ও দ্রব্যমধ্যে কোনও ভেদই থাকিল না। আর তাহার ফলে আবার অনির্ব্বচনীয়ত্ব স্বীকার্য্য হইল।

আর এই অজ্ঞানশক্তির আশ্রয় যদি ব্রহ্ম বলা হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইবে—এই অজ্ঞানশক্তি ব্রহ্মের সর্ব্বদেশে থাকে, কি কোনও দেশবিশেষে থাকে? যদি সর্ব্বদেশে থাকে, তবে ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন হইল, এবং চিৎশক্তি থাকিবার স্থানাভাব হইবে। আর একই স্থানে অজ্ঞানশক্তি ও চিৎশক্তি পরস্পর-বিরুদ্ধ বলিয়া থাকিতে পারিবে না। অতএব এ পথেও সেই অনির্ব্বচনীয়ত্বে পর্য্যবসান হয়। আর যদি সেই অজ্ঞানশক্তি ব্রহ্মের দেশবিশেষে থাকে বলা হয়। তাহা হইলে ব্রহ্মের স্বগত-ভেদ স্বীকার্য্য হইবে। আর তাহা হইলে ব্রহ্মের সেই স্বগতভেদ-সাধক বিজাতীয় বস্তু স্বীকার করিতে হইবে। আর তখন ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্নই হইবেন। আর তাহার ফলে তাহার নশ্বরত্ব অনিবার্য্য হইবে।

আর এই মোক্ষ তাহা হইলে ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানস্বরূপও হইতে পারে না। কারণ, জীবের ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানলাভ ভ্রমনাশভিন্ন সম্ভবপর হয় না। যদি জীব অনাদি নিত্যশক্তি-স্বরূপ বস্তু হয়, তাহা হইলে তাহার পূর্ণ ব্রহ্মরূপে অবস্থান কি করিয়া হইবে? শক্তি ও ব্রহ্ম ত অভিন্ন নহে।

যদি বলা যায়—শক্তি ও ব্রহ্মে ভেদাভেদ সম্বন্ধ বলিয়া তাহা সম্ভবপর হইবে? তাহা হইলে বলিব—তাহাও সম্ভবপর নহে। কারণ, একই বিষয়ে একই দৃষ্টিতে ভেদাভেদ হইতে পারে না। এরূপ ভেদাভেদ অনির্ব্বচনীয় বস্তু। একথা পূর্ব্বেও আলোচিত হইয়াছে।

যদি বলা যায়—অনির্ব্বচনীয় বস্তুর দ্বারা ব্যবহার হইবে কি করিয়া? বস্তুনির্ণয় না হইলে ত ব্যবহার হয় না? তাহা হইলে বলিব রজ্জুসর্পদ্বারা ভয়কম্পপলায়নাদি ব্যবহারের ন্যায় অনির্ব্বচনীয় ভেদাভেদদ্বারা ব্যবহার হইবে। রজ্জুসর্পে ইদং অংশটী সত্য, এবং সর্প অংশটী মিথ্যা। তদ্রূপ ভেদাভেদের ভেদ অংশ মিথ্যা এবং অভেদ অংশ সত্য। মৃৎপিণ্ড হইতে ঘট শরাব প্রভৃতি যত বস্তুই হউক না কেন, পরিণামে তাহারা মৃৎপিণ্ডেই পরিণত হয়। সাগরে তরঙ্গাদি যতই হউক না কেন, সকলই আবার সেই সাগরেই মিলাইয়া যায়। মৃৎপিণ্ড ও সাগর কিন্তু বিলুপ্ত হয় না। অতএব ঘট শরাব ও তরঙ্গাদিই মিথ্যা। মৃৎ-পিণ্ড ও সাগরই সত্য। তদ্রূপ ভেদাভেদের ভেদ মিথ্যা, অভেদই সত্য। অর্থাৎ ব্রহ্ম বস্তুই সত্য, এবং তাহাতে যতকিছু প্রতীত হয়, সে সকল মিথ্যা। সংসারে যে ব্যক্তি, বাল্যে বা যৌবনে জগৎ সত্য বলিয়া আগ্রহ করে, বার্দ্ধক্যে আত্মীয়স্বজনের বিয়োগে সকলই মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। অতএব মিথ্যা অনির্ব্বচনীয় বস্তুর দ্বারা ব্যবহার হইতে কোন বাধা হয় না।

তাহার পর প্রতিপক্ষের মতে জগৎ সত্য বলিয়া, এই মোক্ষ উৎপাদ্যই বলিতে হইবে। আর তাহা হইলে মোক্ষের নিত্য-তাই অসিদ্ধ হইবে। উৎপাদ্য বস্তু নিত্য হয় না। নিত্যকে কখনও উৎপাদ্য বলা যায় না।

যদি বলা যায়—মোক্ষরূপটী বন্ধনধ্বংসস্বরূপ, সুতরাং নিত্য হইবে না কেন? তাহা হইলে বলিব—তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, বন্ধনটী সত্যবস্তুস্বরূপ বলিয়া জীবও সত্যবস্তু হইবে। সুতরাং জীব মুক্ত হইলেও তাহার জীবত্ব থাকিবে বলিয়া তাহার দুঃখ দূর হইবে না। অতএব এই মোক্ষ যথার্থ মোক্ষপদবাচ্যই হইল না।

যদি বলা হয়—জীব ঈশ্বরের নিত্যদাস, তাহার অনাদি অজ্ঞানবশতঃ বন্ধ হইয়াছিল। সেই অজ্ঞাননাশে তাহার স্বরূপে স্থিতি হইবে। আর তাহা নিত্যই হইবে। তাহা হইলে বলিব—ঈশ্বরের শক্তি তবে সেই মুক্তির হেতু কি করিয়া হইবে? ঈশ্বরের নিত্যশক্তি সেই অনাদি অজ্ঞানের নাশক পূর্ব্বেই কেন হয় নাই? অতএব মোক্ষ উৎপাদ্য হইয়াও নিত্য হইল না।

তাহার পর জীব যদি শক্তি হয়, তবে নিত্যদাস্য কি করিয়া সঙ্গত হয়? প্রভু, দাস উভয়ই দ্রব্য, শক্তি ত দাস হয় না। আর প্রভুদাস উভয়ই চিদ্‌বস্তু বলিলে বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈত-বাদই হইবে। শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ত আর হইবে না। আর যদি জীবকে শক্তিই বলা হয়, তবে সেই শক্তি ব্রহ্মের দেশবিশেষে, না সর্ব্বাংশে? দেশবিশেষে হইলে ব্রহ্মের অখণ্ডত্ব থাকিল না। আর সর্ব্বদেশ হইলে ব্রহ্মের জীবত্বই হইয়া গেল। আর এই বিরোধ যদি অগ্রাহ্য করা হয়, তাহা হইলে এই জীবকে—অনির্ব্বচনীয়ই বলিতে হয়।

আর যদি বলা হয়—জীব, ব্রহ্মের তটস্থা শক্তি, জগদ্ ব্রহ্মের বহিরঙ্গা শক্তি, আর ব্রহ্মের অন্তরে চিৎশক্তি বা স্বরূপশক্তি বর্ত্তমান—এইরূপ বিভাগদ্বারা বিরোধ মীমাংসিত হইবে? তাহা হইলে বলিব—ইহাও সঙ্গত নহে। কারণ, তাহা হইলে ব্রহ্মবস্তুকে একটা পিণ্ডবিশেষ বলিতে হইল। ইহাতে ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নত্ব সখণ্ডত্ব সসীমত্ব প্রভৃতি যাবৎ শ্রুতি-বিরুদ্ধ ধর্ম্ম আসিয়া উপস্থিত হইল।

যদি বলা হয়—এই শক্তির বিভাগ বিষ্ণুপুরাণেই আছে। পুরাণই বেদের অর্থ। অতএব এতদনুসারে তাদৃশ পরিচ্ছিন্নত্বাদি ধর্ম্ম কোনরূপ দোষাবহ নহে? কিন্তু তাহাও অসঙ্গত; কারণ, শ্রুতিতেই মিথ্যা মায়াশক্তি স্বীকার করা হইয়াছে, যথা—

"মায়ামেতাং শক্তিং বিদ্যাৎ" (নৃঃ পূঃ উঃ ৩।১)

"মায়াময়ং স্বপ্ন ইব মিথ্যাদর্শনম্" (মৈত্রায়ণী উঃ ৪।২)

সেই মিথ্যামায়াবশতঃ জগৎজীবোৎপত্তি বলিয়া এই শক্তির বিভাগ মিথ্যা সগুণ ব্রহ্মের পক্ষে বুঝিতে হইবে। অতএব জীবকে শক্তি বলা উপাসনার জন্য, তত্ত্বর্ণনোদ্দেশ্যে নহে।

তাহার পর নিত্য শক্তিবশতঃ সৃষ্টিস্থিতিলয় যথাক্রমে হয়—বলিলে সৃষ্টিকর্ত্তার অভিসন্ধি স্বীকার্য্য হইবে। আর অভিসন্ধি স্বীকারে, অভিসন্ধিমূলকশক্তি স্বীকার্য্য হইবে। সুতরাং সৃষ্টি-কারিণী শক্তির অনিত্যতাই সিদ্ধ হইবে। আর অভিসন্ধিশূন্য সৃষ্টি হইলে; জীবের মোক্ষের সম্ভাবনা কোথায়?

আর শক্তির ক্রিয়া শেষ হইয়া গেলে, সেই শক্তি নাশ পায় না; যেমন—একবার গান গাইলে, সে গান গাইবার শক্তি নষ্ট হয় না, নষ্ট হইলে সে পুনরায় গান গাইতে পারিত না, ইত্যাদি—যাহা বলা হইয়াছিল, তাহাও অসঙ্গত। কারণ, একবার গান গাইবার পর পূর্ব্বশক্তির নাশ না হইলে তাহার গাইবার শক্তি বৃদ্ধি পায় কি করিয়া? বৃদ্ধি হইতে গেলে পূর্ব্বাবস্থার নাশ অবশ্য স্বীকার্য্য।

আর বিভিন্নাবস্থার বস্তু বিভিন্নই হয়, তাহাকে যে "সেই" বলিয়া ব্যবহার, তাহা ভ্রান্তব্যবহার। এজন্য শক্তি অনিত্যই বলিতে হইবে।

যদি বলা হয়—বিভিন্নাবস্থায় বস্তু বিভিন্ন হয় না। বিভিন্ন বস্তু স্বীকার করিলে ব্যবহারবিরুদ্ধ কথা বলা হয়, তাহা হইলে বলিব—গান গাইবার এই যে শক্তি ইহা ঠিক শক্তি নহে; ইহা গান গাইবার সংস্কার বা বিদ্যা। ইহাকে শক্তি বলিলেও ইহা থাকিলেই গান গাওয়া হয় না। গান গাওয়ার ইচ্ছা হইলে তবে গান গাওয়া হয়। এই ইচ্ছাশক্তি গান শেষ হইলেই শেষ হয়, ইচ্ছা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ গান শেষ হয় না। বস্তুতঃ, কর্ত্তার অধীন ক্রিয়ার হেতু ইচ্ছাশক্তি, অতএব সকল ক্রিয়ার নাশেই, তাহার কারণ শক্তি নাশ প্রাপ্ত হয়—এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। আর তজ্জন্য কার্য্যের নাশ হয় বলিয়া, তাহার জননী শক্তিরও নাশ হয়, অর্থাৎ শক্তি অনিত্য ইহাই সিদ্ধ হয়।

যদি বলা হয়—শাস্ত্রমধ্যে শক্তিকে নিত্য বলা হইয়াছে, অতএব শক্তি অনিত্য বলা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা। তাহার উত্তর এই যে—নিত্যের কোন ক্রিয়া সম্ভব হয় না। অবস্থান্তর না হইলে ক্রিয়া হয় না। নিত্যের অবস্থান্তর অসম্ভব। শাস্ত্রে যেখানে নিত্য শক্তি বলা হইয়াছে, সেখানে শক্তিকে শক্তিমান্ ব্রহ্মদৃষ্টিতে নিত্য বলা হইয়াছে, এই দৃষ্টিতে নিত্যের নিত্যশক্তি, অনিত্যের অনিত্যশক্তি—এইরূপ কথা শ্রুত হওয়া যায়। হংসোপনিষদের শেষে দেখা যায়—

"সদাশিবঃ শক্ত্যাত্মা সর্ব্বত্রাবস্থিতঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ শুদ্ধো বুদ্ধো নিত্যো নিরঞ্জনঃ শান্তঃ প্রকাশতে ইতি"

এই বাক্যে শক্তির স্বরূপই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। অতএব যে শক্তিকে নিত্য বলা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্ম, তিনি নিষ্ক্রিয়। আর যাহাকে ব্রহ্ম ভিন্ন বলা হইয়াছে, তাহা মিথ্যা তাহাই অনিত্য। অতএব শাস্ত্রবিরোধ নাই।

আর জীবকে যদি শক্তি বলা হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বের ন্যায় সেই জীবের ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতিও স্বীকার্য্য হইবে। আর তাহার ফলে শক্তির শক্তি স্বীকার করা হইল। এইরূপে শক্তির শক্তি স্বীকারে শক্তিকে দ্রব্যরূপ বলিতে হইল। একই বস্তুর দ্রব্যরূপতা ও শক্তিরূপতা স্বীকার করা আর তাহাকে অনির্ব্বচনীয় বলা একই কথা। এইরূপে শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদটী অনির্ব্বচনীয়বাদেই পরিণত হইল।

আর শ্রুতি ব্রহ্মকে নিঃশক্তি বলেন নাই—বলা হইয়াছিল। ইহাও ব্যর্থ আশঙ্কা। কারণ, নৃসিংহপূর্ব্বতাপনীয় উপনিষৎ (৩.১) বাক্যে বলা হইয়াছে—

"মায়ামেতাং শক্তিং বিদ্যাৎ, য এতাং মায়াং শক্তিং বেদ"

এই বাক্যে মায়াকে শক্তি বলা হইয়াছে। আর নৃসিংহ উত্তর-তাপনীয় শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—

"অমায়মপি ঔপপনিষদমেব"

এই বাক্যে ব্রহ্মকে "অমায়" বলা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মকে নিঃশক্তিই বলা হইল।

তাহার পর স্বরূপশক্তি বলিয়া ব্রহ্মের কোন পরাশক্তি কল্পনা করিলে, তাহা শক্তিমান্ ব্রহ্মকেই বুঝাইবে। সে শক্তিবশতঃ জগদুৎপত্ত্যাদি হয় না। এখন তাঁহার পরা শক্তিকে বিবিধ বলায় তাঁহার সেই পরাশক্তির অনির্ব্বচনীয়ত্বই সিদ্ধ হয়, সুতরাং তাহা আর সেই পরাশক্তি হয় না।

আর "অচিন্ত্য" অর্থ—অনির্ব্বচনীয়ার্থের ব্যাপক নহে; কারণ, অচিন্ত্য ব্রহ্ম সদ্বস্তু, তাহা অনির্ব্বচনীয় নহে। অনির্ব্বচনীয় বস্তু সদসদ্ভিন্ন হয়। অচিন্ত্য বস্তু সদসদ্ভিন্ন হয় না। অতএব অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয়ের ব্যাপক নহে।

তাহার পর অনির্ব্বচনীয় অর্থ—সদসদ্ভিন্ন বলায় ইহা পারিভাষিক হয় বটে, কিন্তু অর্থানুরোধেই পরিভাষা হয় বলিয়া, তাহা দোষের হয় না। অতএব এই আপত্তিও ব্যর্থ।

যদি বলা হয়—অনির্ব্বচনীয় বলিলে জগৎতত্ত্ব ত কিছুই বলা হয় না। কিছু বলা যায় না—এই কথাটী বলিবার জন্য এত বিরাট্ যুক্তিতর্কের অবতরণা কেন? অতএব শক্তি-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই ভাল, তাহাতে তবু একটা কিছু বলা হয় বা বুঝান হয়। এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন—যাহা যেরূপ, তাহাকে তদ্রূপ বলাই সত্যবাদিতা। যাহা বলা যায় না, তাহাকে 'একটা বিশেষ কিছু' বলিয়া পরিচয়দানের চেষ্টাই বিফল। তাহাই মিথ্যাবাদিতা। অদ্বৈতবাদী এরূপ মিথ্যা 'একটা বিশেষ কিছু' বলিতে চাহেন না।

তবে যদি বলা হয়—ইহার ফল কি? তাহা হইলে বলিব যে—অন্য সকলমত যাহা বলিতে চাহে, তাহা ঠিক্ নহে—এরূপ নিশ্চয়ই ইহার ফল। এতদ্দ্বারা সর্ব্ববিধ ভ্রমসম্ভাবনার নিবৃত্তি হয়। আর তাহার পর সেই অনির্ব্বচনীয়ের যে একটী অধিষ্ঠানের জ্ঞান হয়, তাহাকে সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ বলিয়াও বুঝিতে হয়। "তাহাই আমি" ইহাও সেই সঙ্গে বুঝা যায়।

এইরূপে "শোকমোহজরাব্যাধিপরিশূন্য আমি" এই জ্ঞানে জীবের চরমাভীষ্ট লাভ হয়, পক্ষান্তরে জগৎ সত্য ও অনিত্য বলিলে, তাহার প্রতি আসক্তি অনিবার্য্য। সুতরাং আসক্তির ফলে যে দুঃখ তাহা দূর হয় না। কিন্তু জগৎকে মিথ্যা বলিলে সে আসক্তি থাকে না। ইহাতেই ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তৎপরে ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ হয়। অতএব অদ্বৈতবাদের মত মহাফল-প্রদ মত আর নাই।

পরিশেষে এইমতে অপরের প্রতি প্রেম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়; কারণ, এই মতাবলম্বী ব্যক্তি প্রায়ই ভাবেন—"আমিই সব হইয়াছি", "যাবৎ জীব জন্তু সকলই আমার রূপ"। এজন্য জগৎসত্যতাবাদী বা দ্বৈতবাদী ইহাদের ন্যায় অপরকে আলিঙ্গন কখনই করিতে পারেন না। কারণ, লোকে নিজে নিজকে যত ভালবাসে এত আর অপরকে ভালবাসে না। ইহাই সর্ব্বসাধারণভাব।

কেহ হয় ত বলিবেন—যিনি জগন্মিথ্যা ভাবেন, তিনি আর অপরকে ভালবাসিতে পারেন না। কিন্তু এ কথা ভ্রম। কারণ, জগন্মিথ্যা—জ্ঞানের সময় ভালবাসা অসম্ভব হয় বটে, কিন্তু যখন "সব আমারই রূপ" বলিয়া মনে হয়, তখন ত তাহা সম্ভব হয়। অদ্বৈতমতে সাধনার ক্ষেত্রে সময়বিশেষে উভয়-ভাবেরই উদয় হয়। এজন্য যখন "সব আমার রূপ" জ্ঞান হয়, তখনই এই ভালবাসা হইয়া থাকে। অতএব অদ্বৈতমতে পরের প্রতি প্রেমও সর্ব্বাপেক্ষা অধিকই হয়।

এইরূপে দেখা যাইবে—দ্বৈতপ্রভৃতি সকল মতবাদ অপেক্ষা শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদই শ্রুতি ও যুক্তিসম্মত, সুতরাং উৎকৃষ্ট, এবং অদ্বৈতবাদ আবার সেই শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অপেক্ষাও শ্রুতি ও যুক্তিসম্মত, সুতরাং সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এ বিষয়ে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়েই আছে। এস্থলে দিঙ্‌নির্দেশ মাত্র করা হইল।

অদ্বৈতবাদের বিভিন্ননামের সার্থকতা।

এই অদ্বৈতবাদটী বিশেষ বিশেষ অর্থে নানা নামে অভিহিত হয়, যথা—অনির্ব্বচনীয়বাদ, ব্রহ্মবাদ, বিবর্ত্তবাদ, সৎকারণতা-বাদ, মায়াবাদ, কেবলাদ্বৈতবাদ, ইত্যাদি। ইহারা সকলেই অদ্বৈতবাদের কোন না কোন একটা দিক্ বিশেষভাবে প্রকাশিত করে। ফলতঃ লক্ষ্য সকলেরই একই হইয়া থাকে।

অদ্বৈতবাদ বলিলে দ্বৈতনিষেধের দ্বারা উপস্থাপিত এক-মাত্র অচিন্ত্য ব্রহ্মবস্তুর প্রতি লক্ষ্য অধিক পতিত হয়, তখন অনির্ব্বচনীয়বাদ, ব্রহ্মবাদ, বিবর্ত্তবাদ, সৎকরণবাদ প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ অর্থগুলি গৌণ বা অপ্রধানরূপে লক্ষিত হয়।

অনির্ব্বচনীয়বাদ যখন বলা হয়, তখন ব্রহ্মবিবর্ত্ত জগতের নিমিত্তকারণ মায়ার এবং তাহার কার্য্য সদসদ্ভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য অধিক করা হয়। আর অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি নামগুলির অর্থের প্রতি ততদূর লক্ষ্য করা হয় না।

ব্রহ্মবাদ যখন বলা হয়, তখন জগতের বিবর্ত্তোপাদান

অনন্ত একটী বস্তুর প্রতি লক্ষ্য অধিক করা হয়, এবং সেই ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব আর জগৎ ও তৎকারণ মায়ার অনির্ব্বচনীয়ত্ব প্রভৃতি ভাবগুলির প্রতি লক্ষ্য তত করা হয় না।

বিবর্ত্তবাদ যখন বলা হয়—রজ্জুসর্পের ন্যায় অবিকারী ব্রহ্ম হইতে কি করিয়া জগতের আবির্ভাব হয়, সেই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য অধিক করা হয়। অদ্বৈতত্ব প্রভৃতির অর্থের প্রতি দৃষ্টি তখন অল্প প্রদান করা হয়।

সৎকারণবাদ যখন বলা হয়, তখন জগৎ ও তাহার কারণের বিষয়ে কোনরূপ ভাবপ্রকাশে ঔদাসীন্য প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ তাহাদিগকে প্রকারান্তরে অনির্ব্বচনীয়ই বলা হয়। আর অদ্বৈতত্ব প্রভৃতির অর্থও তখন গৌণরূপে গৃহীত হয়।

কেবলাদ্বৈতবাদ যখন বলা হয়, তখন অদ্বৈতবাদকে বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈতপ্রভৃতি মতবাদ হইতে পৃথক্ করিয়া বলিবার প্রতি লক্ষ্য অধিক করা হয়। অদ্বৈতবাদ প্রভৃতির অর্থ তখন গৌণভাবে গৃহীত হয়।

মায়াবাদ যখন বলা হয়, তখন ব্রহ্মবিবর্ত্ত জগতের নিমিত্ত-কারণ যে মায়া, তাহার অলৌকিক সামর্থ্যের প্রতি অধিক লক্ষ্য করা হয়। মিথ্যামায়ার আশ্রয় অদ্বৈতব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই, অথচ সেই মায়ার পরিণাম এই জগৎ অনাদি, অনন্ত ও সত্য বলিয়া বোধ হয়। এই অলৌকিক তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য মায়াবাদ শব্দ ব্যবহৃত হয়। এজন্য অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি শব্দের প্রতি লক্ষ্য অল্প পতিত হয়।

ব্রহ্মবাদে মায়াবাদ-শব্দের অপব্যবহার।

অদ্বৈতবাদের বিরোধী কতিপয় পণ্ডিত, বৌদ্ধমায়াবাদকে অদ্বৈতবাদীর মায়াবাদ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং পদ্মপুরাণের—

"দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা।
বৌদ্ধশাস্ত্রমসৎপ্রোক্তং নগ্ননীলপটাদিকম্॥
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব কথিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা॥"

এই সকল শ্লোকের ব্যাখ্যায় ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত-মতবাদে বৌদ্ধমায়াবাদ আরোপিত করিয়াছেন—দেখা যায়; কিন্তু ইহা ভ্রম। কারণ, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদটী মুখ্যকারণতার দৃষ্টিতে ব্রহ্মবাদ। সেই ব্রহ্ম সদ্‌বস্তু, অসদ্‌বস্তু নহে। তন্মতে মায়া মিথ্যা, অসৎ নহে। যে অসৎ প্রতীত হয় সেই অসতের নাম মিথ্যা। আর সেই মিথ্যা মায়া, জগতের বিবর্ত্তোপাদান ব্রহ্মের পক্ষে পরিণামী উপাদান-কারণ এবং নিমিত্ত-কারণও বলা হয়। বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন বৌদ্ধমতে সদ্ ব্রহ্ম স্থলে অসৎ শূন্য স্বীকার করা হয়, এবং স্বরূপতঃ অসৎ-মায়ার পরিণাম জগৎ বলা হয়। অতএব তন্মতের মায়াবাদ অসৎশাস্ত্র বা অসৎকারণবাদ হয়, কিন্তু অদ্বৈতমতের মায়াবাদে মায়া মিথ্যা এবং ব্রহ্ম সৎ হওয়ায় এই মায়াবাদ ও বৌদ্ধমায়াবাদ বিভিন্নই হয়।

তাহার পর উক্ত শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকে "কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্বং" "পরেশজীবয়োরৈক্যং" "ব্রহ্মণোঽস্য স্বয়ং রূপং নির্গুণং" ইত্যাদি সেই মায়াবাদের পরিচয়মুখে বলায় সেই মায়াবাদ বর্ত্তমানে প্রচলিত কতিপয় বৈষ্ণবমত ও সাংখ্যমতকে বুঝাইতে পারে, কিন্তু অদ্বৈতমতকে বুঝায় না। কারণ, অদ্বৈতমতে উপাধিশূন্য জীবচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্যের অভেদ কথিত হইয়াছে। জীবেশ্বরের ঐক্য কথিত হয় নাই। কিন্তু সাংখ্যমতে সিদ্ধ মুক্ত জীবকে সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা সুতরাং ঈশ্বরই বলা যাইতে পারে। আর সেই সব বৈষ্ণবমতে জীব চিদণু ও ঈশ্বর বৃহৎ চিৎ—বলা হয়। কর্ম্মত্যাজ্যত্ব ও ব্রহ্মের নির্গুণত্ব, সাংখ্যমতেও স্বীকৃত হয়। আর তাদৃশ বৈষ্ণবমতে হেয় গুণ নাই বলিয়া ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হয়, ইত্যাদি। অতএব এই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমায়াবাদটী অদ্বৈতমতে আরোপ করা যায় না, কিন্তু তাদৃশ সাংখ্য ও কতিপয় বৈষ্ণবমতে প্রযুক্ত হইতে পারে। গৌতমবুদ্ধের পরবর্ত্তী বৌদ্ধমত, ব্যাস ও জৈমিনিপ্রভৃতি ঋষিগণের আক্রমণের ফলে কোথাও বা প্রচ্ছন্নভাবে বিকৃত ব্রহ্মবাদেই পরিণত হইয়াছে, কোথাও বা বিকৃত বৈশেষিক মতবাদে পরিণত হইয়াছে এবং কোথাও বা বিকৃত তান্ত্রিক উপাসনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

যাহা হউক, ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস অদ্বৈতবিরোধী যাবৎ মতবাদ খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতবেদান্তমতস্থাপন করিয়াছেন। ইহাই অদ্বৈত-বেদান্তিগণের মত। অবশ্য দ্বৈতবাদী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী প্রভৃতি মতবাদিগণ বলেন—বেদব্যাস তাঁহাদের মতবাদই স্থাপন করিয়াছেন। ফলতঃ শাঙ্করভাষ্যে দেখা যায়—ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থে পরমতখণ্ডনপাদে সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, বৈভাষিক বৌদ্ধ, সৌত্রান্তিক বৌদ্ধ, যোগাচার বৌদ্ধ, শূন্যবাদী বৌদ্ধ, জৈন, পাশুপত, ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রপ্রমুখ মতগুলি খণ্ডিত হইয়াছে। অবশ্য এ সকল মতের সকল অংশই যে খণ্ডনীয় তাহাও নহে। ইহাও ভাষ্যমধ্যে কথিত হইয়াছে। নিম্বার্কাচার্য্যমতে ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র মতের পরিবর্ত্তে শাক্ত মত খণ্ডিত হইয়াছে, এবং রামানুজাচার্য্যের মতে ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র মতটীই স্থাপিত হইয়াছে বলা হয়।

কিন্তু সকল দিক্ বিবেচনা করিলে ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর ব্যাখ্যাই ব্যাসসম্মত, যুক্তিসঙ্গত ও শ্রুতিসম্মত, সুতরাং সমীচীন। কারণ, প্রথম—শাঙ্কর সম্প্রদায়টী ব্যাসপুত্র শুকের সম্প্রদায়, অপর সম্প্রদায়ের সহিত ব্যাসদেবের এতাদৃশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। দ্বিতীয়—

শাঙ্করব্যাখ্যা উপনিষদ্‌প্রধান ব্যাখ্যা। অন্য ব্যাখ্যায় পুরাণাদির প্রাধান্য দৃষ্ট হয়; এবং তৃতীয়—সূত্ররচনার যে নিয়ম, সেই নিয়মানুসারিতা এই শাঙ্কর ব্যাখ্যাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখা যায়।

সমাধিলব্ধ ব্যাসমতও শ্রৌতমত নহে

কেহ কেহ বলেন—যাহা মহর্ষি বেদব্যাস বলিয়াছেন, তাহা ঠিক্ অদ্বৈতবাদ নহে, উহা সগুণ ঈশ্বরবাদ, সুতরাং এক প্রকার ভেদাভেদবাদ; সূত্র হইতে পূর্ণ অদ্বৈতবাদ বা বিবর্ত্তবাদ পাওয়া যায় না; কিন্তু শ্রুতিমধ্যে নির্গুণ অদ্বৈতবাদ উক্ত হইয়াছে, ইহাও সত্য,—ইত্যাদি। কিন্তু এ কথা অসঙ্গত। ব্যাসদেব শ্রুতির মতই প্রকাশে প্রবৃত্ত, তাঁহার নিজমত প্রকাশে তিনি প্রবৃত্ত নহেন। তাঁহার ব্যক্তিগত মতপ্রচার তাঁহার উদ্দেশ্য হইলে ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থ মধ্যে (২.১.১) সূত্রে কপিলের মতে শ্রুতিব্যাখ্যায় তিনি আপত্তি করিতেন না। শ্রুতির মত নির্দ্ধারণের যে কৌশল মীমাংসামধ্যে আছে, তাহার দ্বারাই শ্রুতিমত নির্ণেয়। কোন মহর্ষির সমাধিলব্ধজ্ঞান বা কোনরূপ প্রাতিভ-জ্ঞানদ্বারা তাহা নির্ণেয় নহে। ভাগবত মতটী বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ সত্য, এবং ভক্তিপথটী শাণ্ডিল্য মুনিকর্ত্তৃক 'বেদে প্রাপ্ত হয় নাই' বলা হইয়াছে বলিয়া তাহাকে অবৈদিক বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তত্ত্ববিষয়ে শ্রুতির মতই গ্রাহ্য, কিন্তু তাঁহার নিজ মত গ্রাহ্য নহে—ইহাই বেদব্যাসের মত। অবশ্য কর্ম্মকাণ্ডে তাঁহার মতের মূল্য আছে।

আর বেদোক্ত সত্য সমাধিবলে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রচার করায় ব্যাসদেবের মতই বেদের মত বলিলেও নিস্তার নাই; কারণ, প্রত্যক্ষ করায় যদি অতিরিক্ত কিছু লাভ হয়, তাহা, তাহা হইলে অধিকারিভেদে বিভিন্ন হইবে এবং তাহাই অবৈদিকত্বের আবার হেতুই হইবে। অতএব ভাগবতাদির মত মীমাংসাসম্মত কৌশলে বেদানুকূলেই ব্যাখ্যেয়। ভাগবতে যে ভক্তিপ্রভৃতির বেদাতিরিক্তত্বের কথা আছে, তাহা ভক্তির স্তুতিমাত্র, তত্ত্বকথন নহে। বস্তুতঃ, এই পথেই ভট্টকুমারিল বৌদ্ধগণের সহিত বিচারে বুদ্ধের সর্ব্বজ্ঞত্ব খণ্ডনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। আর এ ভাবে ব্যাসমত গ্রাহ্য হইলে কপিলের মতেও কোন দোষ সম্ভব হয় না। বিধিবিষয়ে ব্যাসমতের যে মূল্য থাকে, তাহা তত্ত্ববিষয়ে থাকিতে পারে না। এই সকল কারণে ভাগবতমত শ্রুতি-নিরপেক্ষরূপে প্রমাণ নহে—বলিতে হইবে।

যাহা হউক, ইহাই হইল অদ্বৈতবাদের সহিত অপরাপর মতবাদের সম্বন্ধের কিঞ্চিৎ পরিচয় এবং তদুপলক্ষে অপরাপর মতবাদিকর্ত্তৃক অদ্বৈতমতের উপর কতিপয় প্রধান প্রধান আক্রমণের উত্তর। বস্তুতঃ অদ্বৈতমতবিরোধিগণ অদ্বৈতমতের উপর এত অধিক আক্রমণ করিয়াছেন যে, তাহার ইয়ত্তা করা সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু সে সকলেরই উত্তর, খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, চিৎসুখী, অদ্বৈতদীপিকা এবং অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থমধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে আবার সটীক অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থই বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান।

যদি বলা হয়—বেদ হইতে পরোক্ষ জ্ঞান হয়, কিন্তু সমাধিতে সাক্ষাৎকার হয়, অতএব ব্যাসদেবের সমাধিতে যে অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, তাহাই ভাগবতমত, তাহা বেদাতিরিক্তও বটে—বৈদিকও বটে, ইত্যাদি। কিন্তু তাহাও অসঙ্গত। কারণ, শব্দ হইতেও শুদ্ধচিত্তব্যক্তির অপরোক্ষ জ্ঞানই হয়—ইহা অদ্বৈতবাদী স্বীকার করেন। আর এরূপে বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ জ্ঞানের উৎকর্ষ স্বীকার করিলে বেদব্যাসকে ভগবদবতার বলিয়া কোন ফল নাই। অতএব ভাগবতমত বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ মত বলিয়া কোন লাভ নাই।

অদ্বৈতমতে পদার্থ ও তাহার বিভাগ

ন্যায় ও বৈশেষিক মতের ন্যায় বেদান্তমতে কোন পদার্থ নির্ণয় করা হয় না। তবে সাধারণতঃ মীমাংসার পদার্থ ই তাঁহারা স্বীকার করেন। অতি অল্পস্থলেই তাঁহারা তাহার কিঞ্চিৎ অন্যথা করিয়া থাকেন। এতদনুসারে যদি বেদান্তমতে পদার্থ-বিভাগাদি নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা যেরূপ হইবে, তাহা এই—

পদার্থ দ্বিবিধ

অদ্বৈতমতে পদার্থ দুইটী বলা যাইতে পারে। যথা—

১। দৃক্ বা আত্মা অথবা চিৎ। ২। দৃশ্য বা অনাত্মা অথবা অচিৎ।

এই পদার্থ দুইটীর মধ্যে দৃক্ পদার্থটী নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, অজ্ঞেয়, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ, নেতি নেতি শ্রুতিগম্য, অর্থাৎ দ্বৈতাভাবের দ্বারা উপলক্ষিত বস্তুবিশেষ। আর দৃশ্য পদার্থটী ব্রহ্মাশ্রিত, মিথ্যা বা সদসদ্‌ভিন্ন বা অনির্ব্বচনীয় মায়া মাত্র। ব্রহ্ম এই মায়াযোগে সগুণ হন; অর্থাৎ জীব ঈশ্বর ও জগদ্রূপে প্রতিভাত হন। এই দৃশ্য বা অচিৎ পদার্থকেই সাত ভাগে বিভক্ত করা হয়। দৃক্ বা চিৎপদার্থের বিভাগাদি নাই।

দৃশ্য পদার্থ সপ্তবিধ

উক্ত দৃক্ ও দৃশ্য পদার্থের মধ্যে দৃশ্য বা অচিৎপদার্থটী সপ্তবিধ, যথা—১। দ্রব্য, ২। গুণ, ৩। কর্ম্ম, ৪। সামান্য, ৫। সাদৃশ্য, ৬। শক্তি ও ৭। অভাব।

কিন্তু ন্যায় মতে ইহারা—১। দ্রব্য, ২। গুণ, ৩। কর্ম্ম, ৪। সামান্য, ৫। বিশেষ, ৬। সমবায়, ৭। অভাব, এবং—

মীমাংসকভট্টমতে—১। দ্রব্য, ২। জাতি, ৩। গুণ, ৪। ক্রিয়া এবং ৫। অভাব, আর—

মীমাংসক প্রাভাকরমতে—১। দ্রব্য, ২। গুণ, ৩। কর্ম্ম, ৪। সামান্য, ৫। সমবায়, ৬। শক্তি, ৭ সংখ্যা ও ৮। সাদৃশ্য।

বেদান্তমতে এই সকল পদার্থের যে লক্ষণাদি প্রদর্শিত হয়, তাহা ব্যবহারসম্পাদনার্থ মাত্র। বস্তুতঃ তাহারা অনির্ব্বচনীয়। খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, চিৎসুখী ও বেদান্ততর্কসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রব্যাদি বিভাগের খণ্ডন করা হইয়াছে দেখা যাইবে। প্রাভাকরমতের সংখ্যাটী অন্যমতে গুণের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়। বেদান্ত ও ভাট্টমতে সমবায়ের পরিবর্ত্তে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় বলিয়া তাহাকে আর পৃথক্‌পদার্থ বলা হয় না।

(১) দ্রব্য নয় প্রকার

উক্ত দ্রব্য পদার্থের লক্ষণ সংক্ষেপে এই যে—যাহা গুণের আশ্রয় বা পরিমাণগুণের আশ্রয় তাহাই দ্রব্য। এই লক্ষণ সম্বন্ধে উক্ত তিন মতেই বহু বিচার আছে। তজ্জন্য তত্তন্মতের আকরগ্রন্থ দ্রষ্টব্য। এই সব লক্ষণ আলোচনা করিলেও ইহা অনির্ব্বচনীয়ই বলিতে হয়।

এই দ্রব্য আবার নয় প্রকার। যথা—১। ক্ষিতি, ২। অপ্, ৩। তেজ, ৪। মরুৎ, ৫। ব্যোম, ৬। প্রকৃতি, ৭। তমঃ, ৮। বর্ণাত্মক শব্দ এবং ৯। মনঃ, কিন্তু—

ন্যায়মতে—১। ক্ষিতি, ২। অপ্, ৩। তেজ, ৪। মরুৎ, ৫। ব্যোম, ৬। কাল, ৭। দিক্, ৮। আত্মা ও ৯। মনঃ, এবং—

ভট্টমীমাংসকমতে—১। ক্ষিতি, ২। অপ্, ৩। তেজ, ৪। মরুৎ, ৫। ব্যোম, ৬। তমঃ, ৭। কাল, । ৮ দিক্, ৯। আত্মা, ১০। মন ও ১১। শব্দ। আর—

প্রাভাকর মীমাংসকমতে—১ ক্ষিতি। ২ অপ্। ৩ তেজ। ৪ মরুৎ। ৫ ব্যোম। ৬ কাল। ৭ দিক্। ৮ আত্মা ও ৯। মন।

(২) গুণ সপ্তদশ প্রকার

গুণপদার্থের লক্ষণ—যাহা কর্ম্ম হইতেও অতিরিক্ত হইয়া অবান্তর জাতিবিশিষ্ট হয়, যাহাতে উপাদানত্বধর্ম্ম নাই তাহাই গুণ। ইহার লক্ষণ আলোচনা করিলে ইহাও দ্রব্যাদির ন্যায় অনির্ব্বচনীয়ই হয়।

ইহা কিন্তু বেদান্তমতে সপ্তদশ প্রকার, অন্যমতে কিন্তু অল্প বা অধিক বলা হয়। যথা বেদান্তমতে—১। গন্ধ, ২। রস, ৩। রূপ, ৪। স্পর্শ, ৫। ধ্বন্যাত্মক শব্দ, ৬। সংখ্যা, ৭। পরিমিতি, ৮। সংযোগ, ৯। বিভাগ, ১০। পরত্ব, ১১। অপরত্ব, ১২। গুরুত্ব, ১৩। দ্রবত্ব, ১৪। ধর্ম্ম, ১৫। অধর্ম্ম, ১৬। স্নেহ ও ১৭ সংস্কার।

ভট্টমীমাংসকমতে—১। রূপ, ২। রস, ৩। গন্ধ, ৪। স্পর্শ, ৫। সংখ্যা, ৬। পরিমাণ, ৭। পৃথক্ত্ব, ৮। সংযোগ, ৯। বিভাগ, ১০। পরত্ব, ১১। অপরত্ব, ১২। গুরুত্ব, ১৩। দ্রবত্ব, ১৪। স্নেহ, ১৫। বুদ্ধি, ১৬। সুখ, ১৭। দুঃখ, ১৮। ইচ্ছা, ১৯। দ্বেষ, ২০। প্রযত্ন, ২১। সংস্কার, ২২। ধ্বনি, ২৩। প্রাকট্য ও ২৪। শক্তি।

ন্যায়মতে—১। রূপ, ২। রস ৩। গন্ধ, ৪। স্পর্শ, ৫। সংখ্যা, ৬। পরিমাণ, ৭। পৃথক্ত্ব, ৮। সংযোগ, ৯। বিভাগ, ১০। পরত্ব, ১১। অপরত্ব, ১২। গুরুত্ব, ১৩। দ্রবত্ব, ১৪। স্নেহ, ১৫। শব্দ, ১৬। বুদ্ধি, ১৭। সুখ, ১৮। দুঃখ, ১৯। ইচ্ছা, ২০। দ্বেষ, ২১। প্রযত্ন, ২২। ধর্ম্ম, ২৩। অধর্ম্ম, ২৪। সংস্কার।

প্রাভাকরমীমাংসকমতে— ন্যায়মতবৎ, কেবল শব্দ ও ধর্ম্ম গ্রহণ করা হয় নাই। সুতরাং ২২টী মাত্র। তথাপি তন্ত্ররহস্যে তাঁহারা গুণসংখ্যা কণাদের মত বলিয়াছেন। এস্থলে মীমাংসাদ্বয় ও ন্যায়মত প্রায় একরূপ, পার্থক্য খুব অল্প।

বেদান্তমতে বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন—এই ছয়টীকে গুণ না বলিয়া অন্তঃকরণের বৃত্তি অর্থাৎ পরিণতি বলায় ন্যায় বা অন্যমতের সহিত পার্থক্য কিছু অধিক হইয়াছে। উপনিষদে "কামঃ সঙ্কল্প" ইত্যাদি "সর্ব্বং মন এব", বলিয়া নির্দ্দেশ থাকায় বেদান্ত ন্যায় বা অন্যমতের অনুসরণ করেন নাই। অন্যমতভেদ অতিসূক্ষ্ম বিচারমূলক। এজন্য আকরগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(৩) কর্ম্ম পাঁচ প্রকার

যাহা চলনাত্মক বিভুদ্রব্যমাত্রবৃত্তি হয় এবং সংযোগ ও বিয়োগের মূল, তাহাই কর্ম্ম, ইহা সকল মতেই পাঁচ প্রকার। যথা—১ উৎক্ষেপণ, ২ অবক্ষেপণ, ৩ আকুঞ্চন, ৪ প্রসারণ ও ৫ গমন। ইহার প্রত্যক্ষত্ব ও অপ্রত্যক্ষত্ব লইয়া সূক্ষ্ম বিচার আছে। এজন্য মানমেয়োদয়, তন্ত্ররহস্য ও ন্যায়গ্রন্থাদি দ্রষ্টব্য।

(৪) সামান্য তিন প্রকার

যাহা অনেকানুগত ধর্ম্মবিশেষ তাহাই সামান্য।

ন্যায়মতে নিত্য হইয়া অনেকে সমবেত ধর্ম্মই জাতি। ইহা ব্যক্তি হইতে ভিন্ন।

ভাট্টমতে জাতি সর্ব্বগত নিত্য ও প্রত্যক্ষজ্ঞানগোচর এবং ব্যক্তি হইতে ইহা ভিন্ন এবং অভিন্ন।

প্রাভাকরমতে ইহা ব্যক্তি হইতে ভিন্ন এবং প্রত্যক্ষ দ্রব্যমাত্রে থাকে।

ইহা পরা, অপরা এবং পরাপরাভেদে ত্রিবিধ। পরা অধিক দেশবৃত্তি, অপরা অল্পদেশবৃত্তি, এবং পরাপরা উভয়াত্মিকা।

(৫) সাদৃশ্য-বিভাগ

সাদৃশ্যস্বীকারে বেদান্ত ও প্রভাকর একমত। নৈয়ায়িক ও ভট্ট ইহাকে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না। নৈয়ায়িক ইহা "তদ্ভিন্ন হইয়া তদ্গত ভূয়োধর্ম্মবত্ত্ব" বলেন। "ইহা ইহার সদৃশ" এইরূপ প্রতীতিবশতঃ সাদৃশ্যকে প্রতিযোগিসহিত প্রতীতি বলা হয়। দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যাদিতে বৃত্তি হয় বলিয়া

অতিরিক্ত পদার্থ বলা হয়। ইহা এক, কিন্তু প্রতিযোগিভেদে অসংখ্য হয়।

(৬) শক্তি বিভাগ।

সকল ভাবপদার্থে অতীন্দ্রিয় শক্তি, কার্য্যদ্বারা অনুমেয়। যেমন অগ্নির দাহকার্য্য দেখিয়া তাহার দাহিকাশক্তির অনুমান।

প্রভাকর ও বেদান্ত এ বিষয়ে একমত।

ন্যায়মতে ইহা—কারণতা বা প্রতিবন্ধকাভাব।

ভট্টমতে ইহা একটী গুণ, ইহা অনিত্য ও অসংখ্য।

(৭) অভাববিভাগ।

যাহা ভাবভিন্ন তাহাই অভাব। ইহা প্রথমতঃ দ্বিবিধ যথা—সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব বা ভেদ। সংসর্গাভাব আবার ত্রিবিধ। যথা—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব। "হইবে" বলিলে প্রাগভাব বুঝায়। ইহা অনাদি সান্ত। নষ্ট বলিলে ধ্বংসাভাব বুঝায়। ইহা সাদি অনন্ত, এবং 'নাই' বলিলে—অত্যন্তাভাব বুঝায়। ইহা নিত্য। আর 'নয়' বলিলে অন্যোন্যাভাব বুঝায়। ইহাও নিত্য। এতদ্ব্যতীত কেহ কেহ সাময়িকাভাব স্বীকার করেন (ইহা—সাদি সান্ত), এবং প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অন্যোন্যভাব অস্বীকার করেন। মতান্তরে একমাত্র অত্যন্তাভাব দ্বারাই সকল অভাবের উপপত্তি করা হয়।

প্রভাকর মতে অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলা হয় বলিয়া তাহাকে অতিরিক্ত পদার্থ বলা হয় না।

অনাদি ছয় প্রকার।

বেদান্তমতে কিন্তু প্রাগভাব সাদি সান্ত, কিন্তু ন্যায়মতের ন্যায় অনাদি সান্ত নহে। কারণ, প্রাগভাবাধিকরণ, কপাল ও প্রতিযোগী ঘট—উভয়ই সাদি ও সান্ত। তদ্রূপ ধ্বংসও সাদি সান্ত, অনন্ত নহে। কারণ, তাহার অধিকরণ কপাল ও প্রতিযোগী ঘট—উভয়ই সাদি ও সান্ত।

অন্যোন্যাভাবটী অনাদিপদার্থে অনাদি এবং সাদিপদার্থে সাদি। উভয় স্থলেই সান্ত।

অনাদি ছয় প্রকার।

বেদান্তমতে অনাদি ছয়টী পদার্থ। যথা—শুদ্ধচিৎ, অবিদ্যা, জীব, ঈশ্বর, জীবেশ্বরভেদ, অবিদ্যা ও চিতের যোগ। ইহারা অনাদি বলিয়া ইহাদের ভেদও অনাদি।

কিন্তু মায়ানাশে তাহা থাকে না বলিয়া তাহা সান্ত। আর অত্যন্তাভাবটীও সাদি এবং সান্ত। এইরূপে বেদান্তমতে সকল অভাবই সান্ত, অনন্ত নহে।

(১) ক্ষিতির পরিচয়।

ক্ষিতি জল হইতে উৎপন্ন। ইহা পঞ্চীকৃত ও অপঞ্চীকৃতভেদে দ্বিবিধ। পঞ্চীকৃত ক্ষিতিমধ্যে অর্দ্ধেক অপঞ্চীকৃত ক্ষিতি এবং জল, তেজ, বায়ু ও আকাশের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ করিয়া বিদ্যমান, থাকে। ক্ষিতির নিজগুণ গন্ধ। কারণগুণ—রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ। প্রকৃতির গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোভেদে ইহাও তদ্রূপ। ইহা অনিত্য। ন্যায়মতে ইহার পরমাণু নিত্য, পরমাণুজন্য গুলি অনিত্য।

(২) জল-পরিচয়।

জল তেজ হইতে উৎপন্ন। ইহা পঞ্চীকৃত ও অপঞ্চীকৃতভেদে দ্বিবিধ। পঞ্চীকৃত জলমধ্যে অর্দ্ধেক অপঞ্চীকৃত জল, এবং ক্ষিতি তেজ বায়ু ও আকাশের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ করিয়া বিদ্যমান থাকে। ইহার নিজগুণ রস। কারণগুণ—রূপ, স্পর্শ ও শব্দ। প্রকৃতির গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোভেদে ইহাও ত্রিবিধ। ইহা অনিত্য। ন্যায়মতে ইহার পরমাণু নিত্য, পরমাণুজন্য গুলি অনিত্য।

(৩) তেজঃ-পরিচয়।

তেজ বায়ু হইতে উৎপন্ন। ইহা পঞ্চীকৃত ও অপঞ্চীকৃতভেদে দ্বিবিধ। পঞ্চীকৃত তেজমধ্যে অর্দ্ধেক অপঞ্চীকৃত তেজ, এবং অপর ভূতচতুষ্টয়ের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ করিয়া থাকে। ইহার নিজগুণ—রূপ। কারণগুণ—স্পর্শ ও শব্দ। প্রকৃতির গুণ—সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণভেদে ইহাও ত্রিবিধ। ইহা অনিত্য। ন্যায়মতে ইহার পরমাণু নিত্য, পরমাণুজন্য গুলি অনিত্য।

(৪) বায়ুর পরিচয়

বায়ু আকাশ হইতে উৎপন্ন। ইহা পঞ্চীকৃত ও অপঞ্চীকৃত ভেদে দ্বিবিধ। পঞ্চীকৃত বায়ুমধ্যে অর্দ্ধেক অপঞ্চীকৃত বায়ু, এবং অপর ভূতচতুষ্টয়ের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ করিয়া থাকে। ইহার নিজগুণ স্পর্শ। করণগুণ—শব্দ। প্রকৃতির গুণ সত্ত্ব—রজঃ ও তমোগুণ-ভেদে ইহাও ত্রিবিধ। ইহা অনিত্য। ন্যায়মতে ইহার পরমাণু নিত্য, পয়মাণুজন্য গুলি অনিত্য।

(৫) আকাশের পরিচয়।

আকাশ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। ইহাও পঞ্চীকৃত ও অপঞ্চীকৃতভেদে দ্বিবিধ। পঞ্চীকৃত আকাশমধ্যে অর্দ্ধেক অপঞ্চীকৃত আকাশ, এবং অপর ভূতচতুষ্টয়ের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ করিয়া বিদ্যমান থাকে। ইহার নিজগুণ—শব্দ। প্রকৃতির গুণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোভেদে ইহাও ত্রিবিধ। ইহাও অনিত্য। ন্যায়মতে ইহা নিত্য। এই ক্ষিত্যাদি পঞ্চ ভূত হইতে ইন্দ্রিয়াদি কি ভাবে উৎপন্ন, তাহা জগতের পরিচয়স্থলে প্রদত্ত হইয়াছে। ভূতগুলি আকাশাদি ক্রমে উৎপন্ন হইলে ভূত হইতে উৎপন্ন ইন্দ্রিয় ও প্রাণগুলিকে পৃথক্ দ্রব্য বলা হয় না। এ বিষয়ে বহু জ্ঞাতব্য আছে। এজন্য আকরগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(৬) প্রকৃতিপরিচয়।

ইহার অপর নাম—মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞান, প্রধান ইত্যাদি। ইহা অজ্ঞের নিকটে অনাদি অনন্ত। শাস্ত্রজ্ঞের নিকটে অনাদি সান্ত ও সদসদ্‌ভিন্ন। অধিষ্ঠান ব্রহ্মের জ্ঞানে ইহার নাশ হয়। ইহা ব্রহ্মসহ মিশ্রিত হইলে ব্রহ্ম সগুণ হন। তখন তাঁহার নাম ঈশ্বর হয়। ইহাকে অতিসূক্ষ্ম যাবৎ সংস্কারের সমষ্টিস্বরূপও বলা হয়।

বেদান্তসংজ্ঞাবলীগ্রন্থে পণ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় প্রকৃতির সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ পৃথক্‌ভাবে গ্রহণ করিয়া বেদান্তমতে দ্রব্য ১১ প্রকার বলিয়াছেন। ন্যায়মতে দ্রব্যমধ্যে ইহার স্থান হয় নাই। সাংখ্যমতে ইহা নিত্য।

(৭) তমঃপরিচয়।

ইহার অপর নাম অন্ধকার। ন্যায়মতে ইহা আলোকাভাব; এ মতে ইহা পঞ্চভূতাতিরিক্ত বস্তু। ইহার গুণ ও ক্রিয়া থাকায় ইহাকে দ্রব্য বলা হয়। কোন মতে ইহাকে গুণও বলা হয়। ইহাও অনিত্য।

(৮) বর্ণাত্মক শব্দপরিচয়।

ইহা আকাশের গুণ নহে, কিন্তু দ্রব্যবিশেষ; কারণ, ইহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা যখন গ্রাহ্য হয়, তখন রূপাদিগুণ যেমন কোনও দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া গৃহীত হয়, ইহা তদ্রূপে গৃহীত হয় না। ধ্বন্যাত্মকশব্দকে আকাশের গুণ বলা হয়, ইহাও অনিত্য। মীমাংসকমতে ইহা নিত্য।

(৯) মনঃ বা অন্তঃকরণপরিচয়।

ইহা অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের সমষ্টি সত্ত্বাংশ হইতে উৎপন্ন। ইহা বৃত্তিভেদে অর্থাৎ মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারভেদে চতুর্ব্বিধ। সঙ্কল্প বিকল্প—মনের কার্য্য। নিশ্চয়—বুদ্ধির কার্য্য। অনুসন্ধান—চিত্তের কার্য্য, এবং অভিমান বা 'আমি আমি' বোধ—অহঙ্কারের কার্য্য বলা হয়।

ন্যায়মতে বুদ্ধি অর্থ—জ্ঞান। তাহা আত্মার গুণ বলা হয়। আর মনকে নিত্য অণুপরিমাণ দ্রব্য বলা হয়।

মীমাংসকমতে ইহা বিভু ও নিত্য বলা হয়। বুদ্ধি বা জ্ঞান ঈশ্বরাত্মার নিত্য। জীবাত্মার উহা 'জন্য'।

বেদান্তমতে নির্ব্বিষয় জ্ঞান বা জ্ঞানস্বরূপ বস্তুই আত্মা। উপাধিযোগে এই জ্ঞানকে বৃত্তিজ্ঞান বলা হয়। এই বৃত্তিজ্ঞানকেই ন্যায়মতে জীবের "জন্য জ্ঞান" বলা হয়।

কাল, দিক্ ও আত্মাকে বেদান্তমতে দ্রব্যমধ্যে গণনা করা হয় নাই। তন্মতে কালকে মায়া বা প্রকৃতিমধ্যে ও দিক্‌কে আকাশদ্রব্যমধ্যে গণ্য করা হয়। আর আত্মা দ্রব্য নহে। কারণ, দ্রব্য অচিৎপদার্থ-মধ্যে পরিগণিত।

এই অন্তঃকরণের বৃত্তি সুখদুঃখাদি বহুবিধ হইলেও ইহার বুদ্ধি বা জ্ঞানবৃত্তিই সকল ব্যবহারের মূল বলা হয়। এ বিষয়ে বহু জ্ঞাতব্য আছে। প্রমা, অপ্রমা, প্রমাণ, অপ্রমাণ ইত্যাদি ব্যবহার সকলই ইহার অন্তর্ভুক্ত। এজন্য এই বুদ্ধির কথাই এস্থলে সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে।

বুদ্ধি বা জ্ঞানপরিচয়।

বুদ্ধি বা জ্ঞান প্রথমতঃ দুই প্রকার, যথা—অনুভব ও স্মৃতি, সেই অনুভব আবার দুই প্রকার। ঈশ্বরীয় অনুভব ও জৈব অনুভব। তন্মধ্যে জৈব অনুভব দ্বিবিধ, যথা—প্রমা এবং অপ্রমা। সেই প্রমা আবার ছয় প্রকার, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি, শব্দ, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি। সেই অপ্রমা জৈব অনুভব আবার দুই প্রকার। যথা—যথার্থ ও অযথার্থ। আর স্মৃতিও দুই প্রকার। যথা—যথার্থ এবং অযথার্থ। প্রমা অর্থ—প্রমাণজন্য। অপ্রমা অর্থ—যাহা প্রমা নহে। ইহা যথার্থ ও অযথার্থও হয়। ইহাদের পরিচয় এইরূপ—

১। ঈশ্বরীয় অনুভব বা জ্ঞান—যথার্থ এবং অপ্রমাপদবাচ্য।

২। প্রত্যক্ষাদি ষড়্‌বিধ অনুভব—জৈব এবং যথার্থ, এবং প্রমাপদবাচ্য।

৩। সুখদুঃখাদির অনুভব—জৈব। ইহা অপ্রমা এবং যথার্থ পদবাচ্য।

৪। ভ্রম অনুভব—জৈব। ইহা অপ্রমা এবং অযথার্থ পদবাচ্য। যেমন শুক্তিরজতাদির জ্ঞান।

৫। স্মৃতি—যথার্থ জৈব। ইহা জীবের যথার্থ অনুভব-জন্য সংস্কারসমুদ্ভূত।

৬। স্মৃতি—অযথার্থ জৈব। ইহা জীবের অযথার্থ অনুভবজন্য সংস্কারসমুদ্ভূত।

(১) ঈশ্বরীয় জ্ঞান।

ঈশ্বরীয় জ্ঞান ঈশ্বরভাবের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান থাকে। ইহার উৎপত্তি ও নাশ নাই। মায়াবিশিষ্টচৈতন্যই ঈশ্বর। সেই মায়া ও চৈতন্য অনাদি, সুতরাং ঈশ্বরও অনাদি। জীবের অজ্ঞাননাশে মায়ার নাশ হয়। সুতরাং ঈশ্বরভাবও শুদ্ধচৈতন্যে পর্য্যবসান হয়। সুতরাং ইহা অনাদি হইলেও অনন্ত নহে। ইহার উৎপত্তি নাই বলিয়া ইহা প্রমাণজন্য নহে। প্রমাণজন্য হইলে প্রমাপদবাচ্য হয়, এজন্য ইহা অপ্রমা, কিন্তু যথার্থ; যেহেতু ঈশ্বরের ভ্রম হয় না।

(২) প্রত্যক্ষাদি ষড়্‌বিধ প্রমা ও তাহার নাম।

প্রত্যক্ষাদি ষড়্‌বিধ প্রমা জীবের ইন্দ্রিয়াদি প্রমাণজন্য হয়। সেই জ্ঞান ছয়টী—(ক) প্রত্যক্ষ, (খ) অনুমিতি, (গ) উপমিতি, (ঘ) শব্দ, (ঙ) অর্থাপত্তি ও (চ) অনুপলব্ধি। ইহারা

প্রমাণজন্য বলিয়া প্রমাপদবাচ্য হয়। আর প্রমা বলিয়া ইহারা যথার্থও বটে। প্রমা কখনও অযথার্থ হয় না। ইহাদের যে কারণ, তাহারা (ক) প্রত্যক্ষ, (খ) অনুমান, (গ) উপমান, (ঘ) শব্দ, (ঙ) অর্থাপত্তি এবং (চ) অনুপলব্ধি।

(ক) প্রত্যক্ষপরিচয়।

প্রত্যক্ষ শব্দটী—জ্ঞান, কারণ ও বিষয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যক্ষ বিষয়ের যে জ্ঞান, তাহাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে। বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য যখন প্রমাত্রবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সহিত অভিন্ন হয়, অর্থাৎ বিষয়টী যখন প্রমাত্রবচ্ছিন্ন চৈতন্যে অধ্যস্ত হয়, তখন বিষয়টী প্রত্যক্ষ পদবাচ্য হয়। প্রমাত্রবচ্ছিন্ন চৈতন্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা সংযোগ সংযুক্ততাদাত্ম্য এবং সংযুক্ততাদাত্ম্যবৎতাদাত্ম্য নামক সন্নিকর্ষসাহায্যে বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সহিত মিলিত হয়। এজন্য ইন্দ্রিয়াদিকে প্রত্যক্ষের কারণ নামে অভিহিত করা হয়। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, ইন্দ্রিয় বিষয়াকার অন্তঃকরণবৃত্তির কারণ, আর অন্তঃকরণবৃত্তি প্রত্যক্ষ প্রমার কারণ, এইমাত্র।

প্রণালীর মধ্য দিয়া জল গিয়া যেমন ক্ষেত্রে পতিত হইয়া ক্ষেত্রাকার ধারণ করে, তদ্রূপ অন্তঃকরণবৃত্তি ইন্দ্রিয়দ্বারা নির্গত হইয়া বিষয়াকার ধারণ করে। ইহারই নাম বৃত্তিব্যাপ্যত্ব। তৎপরে সেই বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যটী বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য-নিষ্ঠ অজ্ঞানের নাশ করে, অর্থাৎ বিষয়টীকে প্রকাশিত করে। ইহার নাম ফলব্যাপ্যত্ব বলা হয়। ঘটপটাদির জ্ঞানে বৃত্তিব্যাপ্যত্ব ও ফলব্যাপ্যত্ব উভয়ই থাকে। কেবল ব্রহ্মজ্ঞানে বৃত্তিব্যাপ্যত্বমাত্র থাকে, ফল ব্যাপ্যত্ব থাকে না। কারণ, ব্রহ্ম অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যেরও প্রকাশক। অগ্নিকণা যেমন বৃহদগ্নিকে প্রকাশিত করে না, ইহাও তদ্রূপ।

ন্যায়মতে—প্রত্যক্ষ লৌকিক ও অলৌকিক ভেদে দ্বিবিধ। সামান্যভাবে বলিতে গেলে, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইলে যে জ্ঞান হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ। এই সম্বন্ধ ছয় প্রকার, যথা—সংযোগ, সংযুক্ত-সমবায়, সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়, সমবায়, বিশেষণতা-বিশেষ, সমবেত-সমবায়। বেদান্তমতে জ্ঞানই ব্রহ্মস্বরূপ, তাহার জন্ম নাই। এজন্য তন্মতে প্রত্যক্ষলক্ষণ অন্যরূপ, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অলৌকিক প্রত্যক্ষের জন্য সন্নিকর্ষ ত্রিবিধ, যথা—সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ। বেদান্তমতে এই সন্নিকর্ষত্রয় স্বীকার করা হয় না।

এই প্রত্যক্ষ আবার দ্বিবিধ—সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। যে জ্ঞানে প্রকারতা, বিশেষ্যতা ও সংসর্গতার ভান হয়, তাহা সবিকল্পক জ্ঞান। আর সে সকলের যে স্থলে ভান হয় না, তাহাই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান। ন্যায়মতে সবিকল্পক জ্ঞানের পূর্ব্বে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান হয়। যেমন "দণ্ডী" এই সবিকল্পক জ্ঞানে পূর্ব্বে বিশেষণ "দণ্ড" এবং বিশেষ্য "পুরুষের" নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান হয়, পরে দণ্ড ও পুরুষ মিলিত হইয়া দণ্ডী জ্ঞান হয়। দণ্ডী—এই জ্ঞানে দণ্ড হয় প্রকার, পুরুষ হয় বিশেষ্য এবং দণ্ড ও পুরুষের সম্বন্ধ হয় সংসর্গ। এই সময় প্রকারতা, বিশেষ্যতা ও সংসর্গতার জ্ঞান হয়। দণ্ড ও পুরুষের নির্ব্বিকল্পক অর্থাৎ অসম্বন্ধজ্ঞানে ইহারা উদিত হয় না। বেদান্তমতে সবিকল্পকজ্ঞান বাধিত হইলে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান হয়, অর্থাৎ পরে হয়। কারণ, ন্যায়মতে দণ্ড ও পুরুষের সম্বন্ধের জ্ঞান না হইলেও তাহাদের সম্বন্ধ থাকে। তাহার জ্ঞানই কেবল পরে হয় মাত্র। এই প্রত্যক্ষ বিষয়ে বহু জ্ঞাতব্য আছে। এজন্য "বিবরণ" "বেদান্তপরিভাষা" প্রভৃতি আকরগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

অনুমিতি-পরিচয়।

অনুমিতি সম্বন্ধে বেদান্তমত প্রায় ন্যায়শাস্ত্রেরই অনুরূপ। যেমন, ধূম দেখিয়া বহ্নির জ্ঞান—একটী অনুমিতি। উভয়মতে ইহার করণ ব্যাপ্তিজ্ঞান। সাধ্যকে ত্যাগ করিয়া হেতুর না থাকাই ব্যাপ্তি। যেমন ধূম যেখানে থাকে, সেই স্থানেই বহ্নি থাকে। এই জ্ঞানকে ব্যাপ্তিজ্ঞান বলে। এই ব্যাপ্তি আবার অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভেদে দ্বিবিধ। যাহার অনুমান করা হয়, তাহাই সাধ্য, এবং যাহার দ্বারা অনুমান করা হয় তাহা হেতু, আর যেখানে সাধ্যের অনুমান করা হয়, তাহা পক্ষ। যাহা দেখিয়া ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্মে, তাহা দৃষ্টান্ত। যেমন পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া বহ্নি অনুমান করিবার কালে, যখন রন্ধনশালার ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধ স্মরণ করা হয়, তখন পর্ব্বত—পক্ষ, বহ্নি—সাধ্য, ধূম—হেতু, এবং রন্ধনশালা—দৃষ্টান্ত বলা হয়। করণাতিরিক্ত কারণ—ন্যায়মতে ব্যাপার, পক্ষতা এবং পক্ষধর্ম্মতা। বেদান্তমতে ব্যাপারকে কারণ বলা হয় না। বেদান্তমতে ব্যতিরেক ব্যাপ্তির স্থলে, অর্থাপত্তি প্রমাণ স্বীকার করা হয়। নিজের জ্ঞানের জন্য যে অনুমান করা হয়, তাহাকে স্বার্থানুমান এবং পরকে বুঝাইবার জন্য যে অনুমান করা হয়, তাহাকে পরার্থানুমান বলা হয়। এই বিভাগ ন্যায় ও বেদান্ত উভয়বাদিসম্মত। [অনুমান দ্র°]

ন্যায়মতে—অনুমানের জন্য পরামর্শকে ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করা হয়। এই পরামর্শের পরই অনুমিতি বলা হয়। সাধ্যব্যাপ্য হেতুমানাপক্ষের জ্ঞানই পরামর্শ।

বেদান্তমতে—পরামর্শ স্বীকার করা হয় না। তন্মতে ব্যাপ্তিস্মরণের পর বা ব্যাপ্তিজ্ঞানের সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইবার পরই অনুমিতি হয়—বলা হয়। ন্যায়মতে স্বার্থানুমানের ক্রম—১। ভূয়োদর্শন, ২। ব্যাপ্তিজ্ঞান, ৩। পক্ষে হেতুদর্শন, ৪। পক্ষে সাধ্যসন্দেহ, ৫। হেতু ও সাধ্যে ব্যাপ্তির স্মরণ, ৬। পরামর্শ,

৭। পক্ষসাধ্যবান্ জ্ঞানরূপ এই অনুমিতি। কিন্তু বেদান্তমতে ৬ষ্ঠ অবস্থা পরামর্শ অনাবশ্যক বলা হয়।

ন্যায়মতে পরার্থানুমানের ক্রম—১। প্রতিজ্ঞাবাক্য, ২। হেতুবাক্য, ৩ উদাহরণবাক্য, ৪। উপনয়বাক্য ও ৫। নিগমন-বাক্য। বেদান্তমতে প্রথম তিনটী অথবা শেষ তিনটীমাত্র স্বীকার করা হয়। সেই বাক্যগুলির আকার যথা—

পর্ব্বত বহ্নিমান্... প্রতিজ্ঞা।
যেহেতু ধূম রহিয়াছে... হেতু।
যাহা যাহা ধূমবান্ তাহা বহ্নিমান্, যথা রন্ধনশালা...উদাহরণ।
এই পর্ব্বতটী বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্... উপনয়।
অতএব পর্ব্বতটী বহ্নিমান্... নিগমন।

পক্ষতা অর্থ—পক্ষে সাধ্যসন্দেহ, অথবা সাধন করিবার ইচ্ছাশূন্য সিদ্ধির অভাব বলা হয়। পক্ষধর্ম্মতা অর্থ—পক্ষে হেতু থাকা বুঝায়।

ন্যায়মতে এই উভয় প্রকার অনুমানকে ১ কেবলান্বয়ী, ২ কেবলব্যতিরেকী এবং ৩ অন্বয়ব্যতিরেকী বলা হয়। কিন্তু বেদান্তমতে অনুমানকে কেবলমাত্র অন্বয়ীই বলা হয়।

কেবলান্বয়ীর দৃষ্টান্ত, যথা—ঘট অভিধেয়, যেহেতু তাহা প্রমেয়, যেমন পট।

কেবলব্যতিরেকীর দৃষ্টান্ত, যথা—পৃথিবী ইতরভিন্না, যেহেতু গন্ধ রহিয়াছে, ব্যতিরেকদৃষ্টান্ত জল।

অন্বয়ব্যতিরেকীর দৃষ্টান্ত, যথা—পর্ব্বত বহ্নিমান্, যেহেতু ধূম রহিয়াছে, যেমন রন্ধনশালা অন্বয়দৃষ্টান্ত, এবং জলহ্রদ ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত, ইত্যাদি।

হেত্বাভাসপরিচয়।

এই অনুমান শুদ্ধভাবে করিতে পারা যাইবে বলিয়া অনুমানের কত প্রকার দোষ হয়, তাহার আলোচনাও ন্যায়শাস্ত্রে আছে। ইহার নাম হেত্বাভাস বলা হয়। ন্যায়মতে ইহাকে প্রধানভাবে পাঁচ প্রকার বলা হয়, যথা—

১। সব্যভিচার, ২। বিরুদ্ধ, ৩। সৎপ্রতিপক্ষ, ৪। অসিদ্ধ, ৫। বাধিত।

ইহাদের মধ্যে ১ম সব্যভিচার ও ৪র্থ অসিদ্ধ আবার বহুবিধ। স্থূলভাবে সেই সকল অবান্তর বিভাগসহ হেত্বাভাস ন্যায়মতে প্রায় ১৬ প্রকার। ইহাদের পরিচয় ন্যায়শাস্ত্রমধ্যে দ্রষ্টব্য। এজন্য তর্কসংগ্রহ বা মুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থই সুগম।

মীমাংসকমতে ইহা প্রধানতঃ তিন প্রকার যথা—১। অসিদ্ধ, ২। অনৈকান্ত, ৩। বাধ। কিন্তু ইহাদের অবান্তর বিভাগ লইলে হেত্বাভাস তন্মতে নয় প্রকারে হয়। এজন্য পার্থসারথী মিশ্রের শাস্ত্রদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

মীমাংসক সচ্চিদানন্দের মতে আবার ইহা অন্য প্রকার। তথায় প্রতিজ্ঞাদোষ, হেতুদোষ ও দৃষ্টান্তদোষ—এই তিনটীর অন্তর্গতরূপে বহু প্রকার হেত্বাভাসের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এজন্য মানমেয়োদয় গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ষোড়শপদার্থপরিচয়।

হেত্বাভাসের ন্যায় অপরের সঙ্গে বিচারের জন্য গোতমীয় ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত তর্ক, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের জ্ঞানও বিশেষভাবে প্রয়োজন। এজন্য ইহাদের বিষয়ও কিছু বলা আবশ্যক। তন্মধ্যে ছল তিন প্রকার। জাতি ২৪ প্রকার এবং নিগ্রহস্থান ২২ প্রকার, ইহার মধ্যে ২২শই হেত্বাভাস। এ সব বিষয়ে বেদান্ত ও ন্যায় প্রায়ই একমত। বিচারের জন্য ইহাদের জ্ঞান অত্যাবশ্যক। এজন্য তার্কিকরক্ষা, ন্যায়সূত্রভাষ্যাদি ও ন্যায়সাহস্রা প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

বেদান্তমতে অনুমানের প্রয়োজন।

বেদান্তদ্বারা অদ্বৈতব্রহ্মের নিশ্চয় হইলে মননদ্বারা তাহার সম্ভাবনামাত্রের হেতু অনুমানপ্রমাণ আবশ্যক হয়। তাহা ব্রহ্ম-নিশ্চয়ের স্বতন্ত্র হেতু নহে। চার্ব্বাকগণ অনুমানকে প্রমাণ বলেন না।

জীবব্রহ্মের অভেদানুমান।

জীবব্রহ্মের অভেদে অনুমান, যথা—

জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ... প্রতিজ্ঞা।
যেহেতু তাহা সচ্চিদানন্দরূপ ... হেতু।
যেমন ঈশ্বর চেতন ... উদাহরণ।

ইত্যাদি।

উপমিতিপরিচয়।

বেদান্ত ও ন্যায়মতে উপমিতি একরূপ নহে। বেদান্তমতে ইহার স্বরূপ এই—কোন ব্যক্তি গ্রামমধ্যে গো দেখিয়া বনে গিয়া গবয় নামক পশু দর্শন করিলে মনে করে—এই পশুটী গোসদৃশ। তৎপরে তাহার মনে হয়—সেই গ্রামে দৃষ্ট গোটী এই পশুটীর সদৃশ। গবয়ে গোসাদৃশ্য দেখিয়া গোতে যে গবয়সাদৃশ্য জ্ঞান হয়, তাহাই উপমিতি। আর গবয়ে গোসাদৃশ্যজ্ঞান উপমান বলা হয়। এই গোসাদৃশ্য জ্ঞানটী উপমিতির করণ বলা হয়। সুতরাং উপমিতির করণ 'উপমান' বলা হয়। অনুপলব্ধি ও অর্থাপত্তির ন্যায় ইহারও ব্যাপার থাকে না।

ন্যায়মতে কিন্তু "গোসদৃশ গবয়" এই বাক্যশ্রবণের পর অরণ্যে গবয় পশু দর্শন করিলে সেই গবয় পশুর নাম নির্ণয়ের ইচ্ছা হয়, তৎপরে 'গোসদৃশ এই পশু' এই জ্ঞান হয়। তৎপরে "গোসদৃশ গবয়" এই বাক্যের স্মরণ হয়। তৎপরে "এই পশু গবয়পদবাচ্য" এই জ্ঞান হয়। এজন্য সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীর যে সম্বন্ধের জ্ঞান, তাহাই উপমিতি বলা হয়।

নৈয়ায়িক বলেন—'গোসদৃশ গবয়' এই জ্ঞান হইলেই গবয়-সদৃশ গবয় এই জ্ঞান হয় ; কারণ, একসম্বন্ধীর জ্ঞান হইলে অপর সম্বন্ধীর জ্ঞান হয়, এজন্য বেদান্তমত ব্যর্থ। অতিদেশ বাক্যের স্মরণই ব্যাপার।

বেদান্তী বলেন—তাহা হইলে "গোসদৃশ গবয়" এই জ্ঞান হইতেই "গবয়সদৃশ গো" এই জ্ঞান হয়। অতএব উপমান নিষ্প্রয়োজন। এজন্য সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীর সম্বন্ধজ্ঞানে কোন ফল নাই, কিন্তু "গবয়সদৃশ গো" এই জ্ঞান হইলে গো সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানাধিক্য হয়। আর তাহার ফলে "আত্মা আকাশসদৃশ বিভু" ইত্যাদি বাক্য হইতে ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব হয়। এজন্য উপমান প্রমাণ ব্রহ্মজ্ঞানেও প্রয়োজন হয়।

ন্যায়মতে উপমানের যে লক্ষণ, তদ্দারা ব্যবহারমাত্রে সুবিধা হয়। তদ্দারা ব্রহ্ম-জ্ঞানলাভে তত সুবিধা হয় না। সাংখ্য, বৌদ্ধ ও বৈশেষিকের মতে—ইহাকে পৃথক্ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হয় না। অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞানে ইহার প্রয়োগ, যথা—

যেমন ঘটাকাশ, জলাকাশ, মহাকাশ, মেঘাকাশের মধ্যে জলাকাশ ও মেঘাকাশ অভিন্ন না হইলেও ঘটাকাশ ও মহাকাশের ভেদটী নামমাত্র বা মিথ্যা, তদ্রূপ কূটস্থ জীব ব্রহ্ম ও ঈশ্বরমধ্যে জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন হইলেও জীবের অধিষ্ঠান লক্ষ্যার্থরূপ কূটস্থ ও ব্রহ্মের ভেদ নামমাত্র বা মিথ্যা, ইত্যাদি।

শাব্দপরিচয়।

শব্দদ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহাকে শাব্দজ্ঞান বলে। এই শাব্দ-জ্ঞান প্রথমতঃ দ্বিবিধ। যথা—ব্যাবহারিক এবং পারমার্থিক। ব্যাবহারিক আবার দ্বিবিধ, যথা—লৌকিকবাক্যজন্য এবং বৈদিকবাক্যজন্য। আর পারমার্থিক শাব্দজ্ঞান কেবলমাত্র বৈদিক বাক্য-জন্যই হয়। তাহাও আবার দ্বিবিধ, যথা—জীব-ব্রহ্মের ঐক্যবোধক এবং জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপবোধক। লৌকিক বাক্যজন্য ব্যাবহারিক শাব্দজ্ঞান যেমন—"নীলো ঘটঃ"। বৈদিকবাক্যজন্য ব্যাবহারিক শাব্দজ্ঞান—যেমন "বজ্রহস্তঃ পুরন্দরঃ"। জীবব্রহ্মের ঐক্যবোধক বৈদিক পারমার্থিক শাব্দ জ্ঞান—যেমন "তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি ; এবং জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপবোধক বৈদিক পারমার্থিক শাব্দজ্ঞান যেমন—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি।

পদ ও বাক্যপরিচয়।

শব্দ হইতে পদ হয়, পদ-সমষ্টি বাক্য হয়। বাক্যমধ্যে এক অংশ উদ্দেশ্য, অপর অংশ বিধেয়। যাহার বিষয় বলা হয়, তাহা উদ্দেশ্য এবং যাহা বলা হয় তাহা বিধেয়।

ন্যায়মতে সর্ব্বত্র বাক্যার্থটী এই উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে সম্বন্ধ। কিন্তু বেদান্তমতে তাহা এই সম্বন্ধভিন্ন স্বরূপেরও বোধক হয়। যেমন "সেই এই দেবদত্ত" বা "তত্ত্বমসি" বাক্য স্বরূপের বোধক হয় সম্বন্ধের বোধক হয় না।

শাব্দবোধের প্রক্রিয়া।

পদের সহিত তাহার অর্থের পরিচয় হইবার পর, পদ শ্রবণ করিলে তাহার অর্থের উপস্থিতি বা স্মরণ হয়। বাক্যান্তর্গত উত্তরপদার্থের স্মরণকালে তাহা উদ্বোধক হইয়া পূর্ব্বপদার্থের সংস্কার হইতে পূর্ব্বপদার্থের আবার স্মরণ হয়। তখন সকল পদার্থের একসঙ্গে জ্ঞান হয়, আর তখন উদ্দেশ্য-বিধেয়ের অন্বয়-জ্ঞান হয়। অন্বয়জ্ঞান না হইলে বাক্যার্থ বোধ হয় না।

শাব্দবোধের কারণ।

শাব্দবোধের কারণ—পদজ্ঞান, এবং করণভিন্ন কারণমধ্যে ব্যাপাররূপ কারণটী—পদজন্য পদার্থোপস্থিতি, এবং সহকারি-কারণটী—পদ ও তাহার বৃত্তিজ্ঞান, এবং অবান্তর কারণ চারিটী, যথা—আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতাজ্ঞান, আসত্তিজ্ঞান এবং তাৎপর্য্যজ্ঞান।

পদ চারি প্রকার।

তন্মধ্যে পদ চারি প্রকার, যথা—যৌগিক, রূঢ়, যোগরূঢ়, এবং যৌগিকরূঢ়। ইহাদের পরিচয় আকর গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

বৃত্তি দ্বিবিধ।

উক্ত বৃত্তি আবার দ্বিবিধ। যথা—শক্তি ও লক্ষণা। এই শক্তি মূলতঃ ঈশ্বরেচ্ছারূপ বা অনাদি।

শক্তিজ্ঞানোপায়।

এই শক্তির জ্ঞান ৮টী উপায়ে হয়। সেই উপায় ৮টী যথা—১। ব্যাকরণ, ২। উপমান, ৩। কোষ, ৪। আপ্তবাক্য, ৫। ব্যবহার, ৬। বাক্যশেষ, ৭। বিবরণ, ৮। প্রসিদ্ধপদ-সান্নিধ্য। ইহাদের বিবরণ আকর গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

লক্ষণাবৃত্তির পরিচয়।

তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি হইলে শক্যার্থের সম্বন্ধই লক্ষণা। লক্ষণাটী আবার দ্বিবিধ, যথা—সাক্ষাৎসম্বন্ধে এবং পরম্পরা-সম্বন্ধে বা লক্ষিতলক্ষণা। এই উভয়ই আবার ৩ প্রকার, যথা—১ জহতি, ২ অজহতি এবং ৩ জহত্যজহতি। ইহাদের বিবরণ আকর গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

শক্তিবিষয়ে মতভেদ।

মীমাংসকমতে জাতিতে শক্তি, নৈয়ায়িকমতে ব্যক্তিতে অথবা জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করা হয়।

বেদান্তমতে কুব্জাশক্তি স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ জাতিতে শক্তির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, এবং ব্যক্তিতে তাহা স্বরূপতঃ থাকা প্রয়োজন হয়। ইহার বিবরণ বেদান্তপরিভাষা প্রভৃতি আকর গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

শাব্দাপরোক্ষবাদ।

শব্দ হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহা অধিকাংশের মতে পরোক্ষ-

জ্ঞান ; কিন্তু বিষয় সন্নিকৃষ্ট থাকিলে, শব্দ হইতে অপরোক্ষজ্ঞানও হয়। ইহা পদ্মপাদাচার্য্যের মত। ইহাদিগকে শাব্দাপরোক্ষবাদী বলা হয়। ইহার ফলে 'তত্ত্বমসি'বাক্য হইতে শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে।

শাব্দাপরোক্ষবাদ।

বাচস্পতি মিশ্রের মতে শব্দ হইতে পরোক্ষজ্ঞানই হয়। পরে নিদিধ্যাসনের ফলে অপরোক্ষজ্ঞান হয়। ফল কিন্তু উভয় মতেই সমান।

শব্দপ্রমাণের উপযোগিতা।

বস্তুতঃ, শব্দ যদি প্রমাণ না হইত, তাহা হইলে অদ্বৈতব্রহ্মের জ্ঞান অসম্ভব হইত, এবং কার্য্যমাত্রের প্রতি যে অলৌকিক কারণ আছে, তাহার নিয়মনও অসম্ভব হইত ; অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড বা ধর্ম্ম বলিয়া কিছুই থাকিত না।

তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গ।

বৈদিক বাক্যের তাৎপর্য্যনির্ণয় করিবার জন্য ছয়টী উপায় আছে। যথা—১ উপক্রমোপসংহারের ঐক্য, ২ অভ্যাস অর্থাৎ পুনরুক্তি, ৩ অপূর্ব্বতা অর্থাৎ নূতনত্ব, ৪ ফল অর্থাৎ প্রয়োজন, ৫ অর্থবাদ অর্থাৎ স্তুতি বা নিন্দা, ৬ উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তি। ইহাদিগকে ষড়্‌বিধ তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গ বলা হয়। এতদ্দ্বারা বেদার্থনির্ণয় করা হয়।

এই শাব্দজ্ঞান সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য আছে। এজন্য ন্যায়, মীমাংসা ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের জ্ঞান বিশেষভাবে প্রয়োজন। বৈশেষিক, বৌদ্ধ ও চার্ব্বাকগণ শব্দকে পৃথক্ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। কিন্তু বিচারে ইহার আবশ্যকতাই প্রমাণিত হয়।

অর্থাপত্তি-পরিচয়।

অর্থাপত্তি বলিতে অর্থাপত্তি প্রমাণ ও অর্থাপত্তি প্রমা উভয়ই বুঝায়। উপপাদ্য অর্থাৎ সম্পাদ্য জ্ঞানদ্বারা যে উপপাদক অর্থাৎ সম্পাদকের কল্পনা, তাহারই নাম অর্থাপত্তি প্রমাণ। 'অর্থ' পদের অর্থ—উপপাদক বস্তু, 'আপত্তি' পদের অর্থ—কল্পনা। উপপাদ্যজ্ঞানটী করণ, এবং উপপাদকজ্ঞানটী অর্থাপত্তি প্রমা। যাহা বিনা কোন একটী সম্ভব হয় না, তাহার সেইটী উপপাদ্য বলা হয়। আর যাহার অভাবে যাহার অভাব হয়, সে তাহার উপপাদক হয়, যথা—

স্থূলকায় দেবদত্ত রাত্রিভোজী ... ... প্রতিজ্ঞা

যেহেতু দিবাভোজনহীনের রাত্রিভোজনব্যতীত স্থূলত্ব অনুপপন্ন ... ... হেতু।

অতএব দেবদত্ত রাত্রিভোজী ... ... সিদ্ধান্ত।

এখানে রাত্রিভোজনের স্থূলতা উপপাদ্য, এবং স্থূলতার প্রতি রাত্রিভোজন উপপাদক বলা হয়। এইরূপে স্থূলতারূপ উপপাদ্যের অনুপপত্তিজ্ঞান হইতে রাত্রিভোজনরূপ উপপাদকের কল্পনা করা হইল। অনুপপত্তি জ্ঞান ইহার করণ। এই করণ—ব্যাপারশূন্য বলা হয়।

ন্যায়মতে ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞানটী করণ, এবং অনুপপত্তিজ্ঞান সহকারিকারণ। কিন্তু ন্যায়মতে অর্থাপত্তিকে অন্য প্রমাণ বলা হয় না। তন্মতে ব্যতিরেক ব্যাপ্তির দ্বারা ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হয়। সেই ব্যতিরেক ব্যাপ্তি—সাধ্যাভাবব্যাপকীভূত অভাবপ্রতিযোগিত্ব বলা হয়। কিন্তু এতদ্দ্বারা অনুপপত্তির জ্ঞান হয় মাত্র। ইহার দ্বারা অন্বয়ব্যাপ্তির সাহায্যে 'পক্ষে' পুনরায় সাধ্যানুমান আবশ্যক হয়। এজন্য বেদান্তী অর্থাপত্তি প্রমাণ পৃথক্ বলিয়া স্বীকার করেন।

অর্থাপত্তি বিভাগ।

এই অর্থাপত্তি দ্বিবিধ, যথা—দৃষ্টার্থাপত্তি ও শ্রুতার্থাপত্তি। এই শ্রুতার্থাপত্তি আবার দ্বিবিধ। যথা—লৌকিক ও বৈদিক। ইহার অন্যরূপ বিভাগ, যথা—অভিধানানুপপত্তি এবং অভিহিতানুপপত্তি।

যেখানে দৃষ্ট উপপাদ্যের অনুপপত্তিজ্ঞানবশতঃ উপপাদক কল্পনা করা হয়, সেখানে দৃষ্টার্থাপত্তি হয়। যেমন স্থূলকায় দেবদত্তের রাত্রিভোজন।

যেখানে শ্রুত উপপাদ্যের অনুপপত্তিজ্ঞানবশতঃ উপপাদকের কল্পনা হয়, সেখানে শ্রুতার্থাপত্তি হয়। যেমন 'জীবিত দেবদত্ত গৃহে নাই' শুনিলে তাহার বহির্দেশে অবস্থিতির কল্পনা। অথবা যেখানে বাক্যের এক অংশ শ্রবণের পর অন্য অংশের কল্পনা ভিন্ন অর্থবোধ হয় না। যেমন "দ্বার বন্ধ কর" স্থলে "দ্বার" মাত্র শ্রবণের "বন্ধ কর" পদের বা অর্থের অধ্যাহার করা আবশ্যক হয় বলিয়া এখানে অভিধানানুপপত্তি বলা হয়।

যেখানে সমুদায় বাক্যের অর্থ, অন্য অর্থ কল্পনা ভিন্ন উপপন্ন হয় না। যেমন "স্বর্গকাম যাগ করিবে" স্থলে অপূর্ব্বের কল্পনা। সেখানে অভিহিতানুপপত্তি বলা হয়।

এইরূপ "আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোক হইতে উত্তীর্ণ হন" এই বেদবাক্য হইতে বন্ধের মিথ্যাত্ব কল্পনা, অর্থাপত্তির দ্বারা সাধিত হয়। অথবা "তত্ত্বমসি" বাক্যদ্বারা জীব ও ব্রহ্মের যে অভেদকল্পনা তাহা অর্থাপত্তি প্রমাণদ্বারা হয়। তদ্রূপ "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই বাক্য হইতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ সিদ্ধ হয়। কারণ, এই বাক্যে যে নিষেধ করা হইল, তাহা জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব অভেদ হইলেই সম্ভব হয়, নচেৎ নহে। এখানে ভেদের নিষেধের অনুপপত্তিজ্ঞানরূপ অর্থাপত্তি প্রমাণদ্বারা জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞানরূপ অর্থাপত্তি প্রমা হয়।

অনুপলব্ধি-পরিচয়।

বেদান্তী ও ভট্টমীমাংসক ইহাকে পৃথক্ প্রমাণ বলেন। কিন্তু সাংখ্য, বৌদ্ধ, বৈশেষিক, প্রাভাকর ও নৈয়ায়িক ইহাকে পৃথক্ প্রমাণ বলেন না। তৎতন্মতে ইহা প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়। অভাববিষয়ক যে প্রমা, তাহার যে অসাধারণ কারণ, তাহাই অনুপলব্ধি প্রমাণ। ইহা যাহার অভাব, তাহার অনুপলম্ভস্বরূপ। উপলম্ভ অর্থ—জ্ঞান। উপমান ও অর্থাপত্তির ন্যায় ইহার ব্যাপার নাই। এজন্য এ মতে করণের লক্ষণ—ব্যাপারভিন্ন যাহা অসাধারণ কারণ, তাহাই করণ।

অভাবাধিকরণে ইন্দ্রিয়সংযোগের পর "যদি থাকিত তাহা হইলে উপলব্ধ হইত"—এইরূপ যোগ্যানুপলব্ধিজ্ঞান হইলে অভাবের প্রমা জ্ঞান হয়। এজন্য যোগ্যানুপলব্ধি অভাবজ্ঞানে করণ, এবং ইন্দ্রিয় সহকারিকারণ। ন্যায়মতে কিন্তু ইন্দ্রিয়ই করণ এবং যোগ্যানুপলব্ধিকে সহকারিকারণ বলা হয়। ধর্ম্মরাজ অধ্বরিন্দ্র প্রভৃতি কোন কোন বেদান্তী অনুপলব্ধিকে প্রমাণ বলিয়াও অভাবের প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন। কিন্তু সাধারণতঃ অভাবের জ্ঞানকেই অনুপলব্ধিজ্ঞান এবং উহাকে পরোক্ষ বলা হয়। তবে সকলেই অনুপলব্ধির করণকে যোগ্যানুপলব্ধি বলিয়াছেন।

ইহার ফলে জীব ও ব্রহ্মের পারমার্থিক ভেদের অভাবনিশ্চয় হয়। কারণ, জাগ্রৎ ও স্বপ্নমধ্যে উপাধিবশতঃ জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ভাসমান হয়, এবং সুষুপ্তিমধ্যে উপাধির অভাববশতঃ সেই ভেদ ভাসমান হয় না। এজন্য জীব ও ব্রহ্ম পরমার্থতঃ অভিন্ন, ইত্যাদি বলা হয়।

ইহাই হইল অন্তঃকরণের ছয় প্রকার প্রমাবৃত্তির পরিচয়। কিন্তু এতদ্ব্যতীত ঈশ্বরজ্ঞান এবং সুখদুঃখাদির জ্ঞান ও যথার্থ অনুভবকে প্রমা বলিলে প্রমা সর্ব্ব শুদ্ধ আট প্রকার বলা হয়। ইহাদের মধ্যে অসন্নিকৃষ্টবিষয়ক শাব্দী প্রমা, অনুমিতি, উপমিতি, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি প্রমাকে পরোক্ষ বলা হয়, এবং প্রত্যক্ষ ও সন্নিকৃষ্টবিষয়ক শাব্দী প্রমাকে প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ বলা হয়।

ঈশ্বরীয় জ্ঞানের উপাদানকারণ মায়া এবং নিমিত্তকারণ জীবাদৃষ্ট, উহা সৃষ্টি হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। শাস্ত্রজ্ঞের নিকট উহা অনাদি সান্ত অর্থাৎ মায়াসমকালস্থায়ী অথবা না থাকিয়াও প্রতীত হয়। কিন্তু অজ্ঞের নিকট অনাদি অনন্ত। আর ব্রহ্মজ্ঞের নিকট উহা নাই এবং প্রতীতও হয় না।

সুখদুঃখ-পরিচয়।

সুখ-দুঃখদ্বয় ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্ত অনুকূল ও প্রতিকূল পদার্থের সম্বন্ধবশতঃ অন্তঃকরণের সত্ত্বগুণ ও রজোগুণের পরিণামবিশেষ। আর সেই অন্তঃকরণের সত্ত্বগুণ হইতেই সেই সুখ-দুঃখবিষয়ক অন্তঃকরণের বৃত্তিও হয়। সেই বৃত্তিতে আরূঢ় সাক্ষী সুখদুঃখকে প্রকাশ করিলে জীবেরও সুখদুঃখের জ্ঞান হয়।

অপ্রমাপরিচয়।

স্মৃতি, ভ্রম, সংশয়, তর্ক, স্বপ্ন, অনধ্যবসায়—ইহারা অপ্রমা; কারণ, প্রমাণজন্য নহে। স্মৃতি কিন্তু যথার্থ ও অযথার্থ হয়। অনুভবজন্য সংস্কার হইতে উদ্বোধকের সাহায্যে স্মৃতি উৎপন্ন হয়। যথার্থানুভবজন্য হইলে যথার্থ স্মৃতি এবং অযথার্থ অনুভবজন্য হইলে অযথার্থ স্মৃতি বলা হয়। ইহারা প্রত্যেকে আবার দুই প্রকার। যথা—আত্মস্মৃতি ও অনাত্মস্মৃতি।

ভ্রম বা বিপর্য্যয়, সংশয়, তর্ক, স্বপ্ন ও অনধ্যবসায়—ইহারা অপ্রমা ও অযথার্থই হয়। তন্মধ্যে ভ্রমজ্ঞান অবিদ্যার পরিণাম। এজন্য ভ্রমজ্ঞানের উপাদানকারণ—অবিদ্যা ও নিমিত্তকারণ, যথা—সজাতীয় বস্তুর জ্ঞানজন্য সংস্কার, প্রমাতৃদোষ, প্রমাণদোষ, প্রমেয়দোষ, অধিষ্ঠানের সমানাজ্ঞান এবং তিমিরাদি দোষ—এই ছয় প্রকার বলা হয়।

এই ভ্রমসম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে, যথা—

"আত্মখ্যাতিরসৎখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরন্যথা।
তথা নির্ব্বচনখ্যাতিরিত্যেবং খ্যাতিপঞ্চকম্॥"

অর্থাৎ আত্মখ্যাতি, অসৎখ্যাতি, অখ্যাতি, অন্যথাখ্যাতি এবং অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি—এই পাঁচ প্রকার খ্যাতি অর্থাৎ ভ্রমবিষয়ক মতভেদ আছে। তন্মধ্যে আত্মখ্যাতিটী বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের, অসৎখ্যাতিটী শূন্যবাদী বৌদ্ধের, অখ্যাতিটী প্রাভাকর মীমাংসকের, অন্যথাখ্যাতিটী নৈয়ায়িকের এবং অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিটী বেদান্তীর মত। কিন্তু এতদতিরিক্ত সৎখ্যাতি ও সদসৎখ্যাতিও আছে; ইহারা পরবর্ত্তী কালে প্রচলিত হইয়াছে। সৎখ্যাতি রামানুজসম্প্রদায়ের মত, এবং সদসৎখ্যাতি বিজ্ঞানভিক্ষুপ্রভৃতি সাংখ্যসম্প্রদায়ের মত বলা হয়।

আত্মখ্যাতি।

এই মতে যাহা কিছু জ্ঞানের বিষয় হয়, সকলই বিজ্ঞান অর্থাৎ এক একটা জ্ঞান। এই বিজ্ঞানভিন্ন আর কোন পদার্থই নাই। এই যে বিরাট্ জড় জগৎ, ইহাও বিজ্ঞানই, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ আকারবিশিষ্ট বিজ্ঞানই। মনোরাজ্য ও বহিঃরাজ্য এই যে প্রভেদ, ইহা ভ্রম। এই বিজ্ঞান, নদীর স্রোতের ন্যায় চলিয়াছে। নানা জলকণা মিলিয়া যেমন নদীস্রোত হয়, বিভিন্ন ক্ষণিক বিজ্ঞানের ধারাই তদ্রূপ ঘট, পট, মঠ, আমি, তুমি, তিনি হইয়াছে। আমিরূপ বিজ্ঞানধারাই জীবের আত্মাপদবাচ্য, অর্থাৎ ক্ষণিকবিজ্ঞানরূপ বুদ্ধিকেই বিজ্ঞানবাদী আত্মা বলেন। 'আমি' এই জ্ঞানধারার অপর নাম আলয়বিজ্ঞান।

আর ঘট-পট-মঠরূপ বিজ্ঞানকে প্রতীত্যসমুৎপাদ বলা হয়। শুক্তিতে রজতভ্রমস্থলে আন্তর রজতজ্ঞানের বিষয় জ্ঞানাকার রজত সত্য, কিন্তু তাহার বাহ্যদেশস্থত্ব অংশই ভ্রম।

অদ্বৈতবাদী ইহা অসঙ্গত বিবেচনা করেন। কারণ, "রজতটী আন্তর, বাহ্য নহে" এরূপ জ্ঞান কাহারও হয় না, "আমি আমি" রূপ আলয়বিজ্ঞানধারার প্রত্যেক "আমি" ব্যক্তি বিভিন্ন বলিয়া সেই "আমি" ব্যক্তি তদ্ভিন্ন বিষয়াকার বিজ্ঞানধারার কোন ব্যক্তিকে বিষয় করিতে পারে না বলিয়া এরূপ জ্ঞান কাহারো সম্ভব হয় না। রজতাকার বিজ্ঞান ও আমি-আকার বিজ্ঞান, একসঙ্গে জন্মিয়াই নষ্ট হয় বলিয়া আমি-বিজ্ঞান, রজতবিজ্ঞানকে জানিতে পারে না। জানিতে গেলে উভয়েরই উৎপত্তিক্ষণের পর এক্ষণ থাকা আবশ্যক হয়। আর যদি "আমি রজতকে জানিতেছি" এই আকারেই একটী আলয়বিজ্ঞানব্যক্তির জন্ম স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে 'আন্তরে বাহ্য ভ্রম' আর হইল না। সুতরাং ভ্রমই সিদ্ধ হইল না, এবং বিজ্ঞানের ক্ষণিকত্বও সিদ্ধ হইল না। এইরূপ বহু কারণে আত্মখ্যাতিবাদ সঙ্গত নহে। এ মতেও উভয়পক্ষে বহু বিচার আছে। এজন্য ভামতী প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

অসৎখ্যাতি।

অসৎখ্যাতি-মতে ভ্রমের অধিষ্ঠানও শূন্য, এবং আরোপও শূন্য, অর্থাৎ শুক্তিরজতভ্রমে শুক্তিও নাই, রজতও নাই, অথচ শুক্তিতে রজতভ্রম হইতেছে—বলা হয়।

কিন্তু ইহা সম্ভব নহে। কারণ, শুক্তিতে একটা 'এই' বলিয়া জ্ঞান না হইলে "এই রজত" এই জ্ঞান হয় কি করিয়া ? শুক্তি ও রজত যদি উভয়ই অসৎ হয়, তাহা হইলে তাহাদের কোনরূপই প্রতীতি হওয়া উচিত নহে। কেবল অসতের প্রতীতি হয় না। বন্ধ্যাপুত্রের কোথাও প্রতীতি হয় না। রজ্জুসর্প অসৎ হইলেও যে প্রতীত হয়, তাহার কারণ, সেখানে, রজ্জু বা রজ্জু অবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ সদ্‌বস্তু একটী থাকে। এইরূপ প্রতিপক্ষের বহু যুক্তি থাকিলেও অসৎখ্যাতিপক্ষ সিদ্ধ হয় না। এই অসৎখ্যাতি মতটী যে সকল বৌদ্ধ শূন্যকে অসৎ বলেন, তাঁহাদের। কিন্তু নাগার্জ্জুনপ্রভৃতি শূন্যবাদিগণ শূন্যকে সৎ নহে, অসৎ নহে, সদসৎ নহে, এবং সদসদ্‌ভিন্ন নহে, অর্থাৎ চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্ত বলেন। শূন্যটী অসৎ, এইরূপ অসদ্‌বাদী বৌদ্ধ গৌতমবুদ্ধের পূর্ব্বে ছিলেন, অধিক কি, ঋষি গৌতম, ব্যাস এবং জৈমিনিরও পূর্ব্বে ছিলেন। গৌতমবুদ্ধের পরবর্ত্তী শূন্যবাদীর মতে চতুষ্কোটি-বিনির্ম্মুক্তশূন্যে যে জগদ্‌ভ্রম হয়, তাহা সাংবৃতিক সৎ, তাহা অনাদি বাসনা ও বিজ্ঞানজন্য বলা হয়। কিন্তু তাহা হইলে সাংবৃতিক সদ্‌ভিন্ন পরমার্থতঃ চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্ত শূন্যস্বীকারের প্রয়োজন থাকে না। আর সেই শূন্যের সহিত এই সাংবৃতিক সতের সম্বন্ধ এবং স্বরূপও নির্ণয় হয় না। এজন্য ইহাকে তাদৃশ শূন্য বলিবার কোন হেতুই নাই। উহাকে কোটিত্রয়বিনির্ম্মুক্ত সদধিষ্ঠানক অনির্ব্বচনীয় বলাই সঙ্গত হয়। এইরূপে অসৎ-খ্যাতিবাদটী কোনরূপেই যুক্তিসহ হয় না।

অখ্যাতিবাদ।

ইহা প্রাভাকর মীমাংসক ও কোন কোন সাংখ্যচার্য্যের মত বলা হয়। এ মতে ভ্রমজ্ঞান বলিয়া একটা কিছু নাই। কিন্তু শুক্তিকাতে ইদংএর প্রত্যক্ষ এবং সাদৃশ্যাদি দোষনিবন্ধন রজতের স্মরণ হয়। কিন্তু "সেই রজত" এই ভাবে সেই স্মরণ হয় না। কিন্তু রজতমাত্রের স্মরণ হয়। তৎপরে ইদং জ্ঞানের সহিত সেই রজতস্মরণের কোনরূপ প্রভেদের জ্ঞান লোভাদিবশতঃ উদিত হয় না, এজন্য লোকে রজতগ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। অতএব একটা বিশিষ্ট-জ্ঞানরূপ ভ্রমজ্ঞান এ মতে নাই। কিন্তু জ্ঞানদ্বয়ের ভেদের জ্ঞানের অভাব হয়, আর এই ভেদাগ্রহনিবন্ধন একটা ব্যবহার হয় মাত্র। বস্তুতঃ, যথার্থ জ্ঞানস্থলেও এই ভেদের জ্ঞানের অভাববশতঃ সেই জ্ঞানজন্য ব্যবহার হয়। অতএব ভ্রমজ্ঞানস্বীকার ব্যর্থ।

কিন্তু এমতও সঙ্গত নহে। কারণ, "এই রজত" এইরূপ একটা বিশিষ্টজ্ঞান না হইলে কেহ রজতগ্রহণে প্রবৃত্ত হয় না। "এই"-জ্ঞান ও "রজত"-জ্ঞান এই দুইটী পাশাপাশি হইয়া তাহাদের ভেদের জ্ঞানাভাব হইলেও "ইহা রজত" এইরূপ একটী বিশিষ্ট জ্ঞান আবশ্যক হয়। ভেদাগ্রহ ও 'ইহা রজত'—ইহারা এক প্রকার জ্ঞান নহে। আর ভেদজ্ঞানও হয় ; কারণ, "এই" জ্ঞান ও রজতজ্ঞান—এই দুই জ্ঞান ক্ষণভেদে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং ভ্রমস্থলে ভেদজ্ঞানও বর্ত্তমান বলিতে হইবে। আর জ্ঞানাভাব ব্যবহারের হেতু হইলে সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাতেও ব্যবহার হউক। তবে অভাব এ মতে অধিকরণস্বরূপ বলিয়া এ মতের সমর্থন করিলে ইহা অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিতেই পরিণত হয়। এজন্য এ মতও অসঙ্গত বলিতে হইবে।

অন্যথাখ্যাতি।

ইহা ভট্ট-মীমাংসক ও নৈয়ায়িকের মত, এ মতে যখন নেত্র-সংযুক্ত রজ্জু হয়, তখন প্রথমতঃ রজ্জুকে "এই" বলিয়া একটা সামান্যজ্ঞান হয়, অতঃপর দৃষ্টিদোষ ঘটিলে রজ্জুসমবেত রজ্জুত্ব-ধর্ম্মের জ্ঞান হয় না। কিন্তু সাদৃশ্যবশতঃ এবং ভয়াদি হেতু থাকিলে জ্ঞানলক্ষণ অলৌকিক সন্নিকর্ষপ্রযুক্ত সর্পত্বের অলৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। তখন বিশেষজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষানিবৃত্তির জন্য এই সর্পত্বজাতিটী সেই "এই"-জ্ঞানের বিষয় রজ্জুতে প্রাকাররূপে ভাসমান হয়। অর্থাৎ সর্পত্বপ্রকারক "এই" বস্তু—এইরূপ জ্ঞান হয়। যেহেতু জাতি দৃষ্টাদৃষ্ট উভয়বিধ ব্যক্তিনিষ্ঠ হয়। তৎপরে ভয় ও কম্পাদি কার্য্য প্রকাশ পায়। এজন্য এ মতে রজ্জু ও সর্প উভয়ই সত্য বলিতে হয়।

কিন্তু এ মতটীও সঙ্গত নহে। কারণ, জ্ঞানলক্ষণাবশতঃ অরণ্যস্থ সর্পত্বের প্রত্যক্ষ হইলে সেই সর্পত্ব রজ্জুতে আসিতে পারে না। যেহেতু সেই সর্পত্বের সঙ্গে কোন সর্পব্যক্তিও দেশান্তরের প্রত্যক্ষ হওয়াই উচিত। ব্যক্তিহীন জাতির ভান হয় না। অতএব "এই" বলিয়া জ্ঞাত রজ্জুতে সর্পত্ব প্রকারটী ভাসমান হইতে পারে না। সাদৃশ্যরূপ দোষবশতঃ রজ্জুত্ব সর্পত্ব দণ্ডত্ব মালাত্ব প্রভৃতি নানা বস্তুরই জ্ঞান হওয়া উচিত। কিন্তু রজ্জুত্বের সহিত রজ্জুর সম্বন্ধ সত্ত্বেও কেন অপর প্রকারের জ্ঞান হইবে? এজন্য রজ্জুতে সর্প কল্পনা করিয়া, তাহাতে সর্পত্ব দর্শন হয় বলিতে হইবে। আর তাহা হইলে অনির্ব্বচনীয় খ্যাতিই স্বীকৃত হইবে।

সৎখ্যাতি।

ইহা রামানুজ সম্প্রদায়ের মত। এ মতে রজ্জুর উপাদান ও সর্পের উপাদান একই পৃথ্বীতত্ত্ব বলিয়া রজ্জুতে যে সর্পের জ্ঞান, তাহা সর্পাবয়বেই সর্পের জ্ঞান হইল। অতএব যাহা যেখানে নাই, তাহার জ্ঞান সেখানে হইল না। আর তজ্জন্য তাহা ভ্রম নহে। কিন্তু যথার্থ জ্ঞান। লোকে তাহাকে সর্প বলিয়া ব্যবহার করে না—এইমাত্র প্রভেদ।

কিন্তু এ মতও সঙ্গত নহে। কারণ, রজ্জুসর্প দেখিয়া পলায়নপর ব্যক্তি আলোকসাহায্যে দেখিলে 'সর্প নয়' বলিয়া পলায়নে বিরত হয় কেন? এইরূপ বহু কারণে এ মতও অসঙ্গত।

সদসৎখ্যাতি।

ইহাতে রজ্জু দেখিয়া "এই" বলিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা সদ্‌বস্তুরই জ্ঞান বলিতে হইবে। আর তথায় অসৎ অর্থাৎ নাই যে রজ্জু, তাহার যে জ্ঞান, তাহা অসতের জ্ঞান বলিতেই হইবে। অতএব "এই সর্প" এই জ্ঞানে সৎ ও অসৎ উভয়েরই জ্ঞান হয় বলিয়া, ইহাকে সদসৎখ্যাতি বলা হয়। ইহাতে সর্পের স্মরণ, "সেই" এই অংশের অপলাপ বা সর্পত্বের অলৌকিক চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ স্বীকার করায় দেশান্তরের অজ্ঞান কল্পনা করিতে হয় না।

কিন্তু এ মতও সঙ্গত নহে। কারণ, ইহাতে অসতের জ্ঞান স্বীকার করিতে হয়। অসতের প্রতীতি স্বীকার করিলে বন্ধ্যাপুত্রেরও প্রতীতি স্বীকার করিতে হয়। অতএব এ মতও অসঙ্গত।

অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি।

ইহাই বেদান্তীর মত। এমতে "এই" বলিয়া রজ্জুর সামান্য জ্ঞান হইলে তাহার বিশেষ জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির ইচ্ছা হইলে সাদৃশ্যাদি দোষনিবন্ধন সেই রজ্জু যে চৈতন্যের উপর অধিষ্ঠিত হয়, সেই চৈতন্যের আশ্রিত যে অবিদ্যা, সেই অবিদ্যার তমোহংশ হইতে একটী সর্প উৎপন্ন হয় এবং তখন তাহার সহিত সম্বন্ধ যে সর্পত্বজাতি, সেই সর্পত্বেরও প্রত্যক্ষ হয়। এই প্রত্যক্ষজ্ঞান সর্প-উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই হয়। এই জ্ঞান, সাক্ষিচেতনে স্থিত যে অবিদ্যা, তাহার সত্ত্বগুণের পরিণাম। রজ্জুচেতনাশ্রিত অবিদ্যার ক্ষোভের যাহা নিমিত্ত হয়, তাহাই সাক্ষীর আশ্রিত অবিদ্যার ক্ষোভের নিমিত্ত হয়। এজন্য একই সময় সর্প ও সর্পজ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং রজ্জুপ্রভৃতি অধিষ্ঠানের জ্ঞানে একই সময় সর্প ও সর্পজ্ঞান লীন হয়।

এস্থলে রজ্জুসর্প ও স্বপ্নমধ্যে—এই উভয় স্থলে অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি হইলেও প্রভেদ এই যে, সর্পাদি ভ্রমমধ্যে বাহ্য অবিদ্যাংশ সর্পাদি বিষয়ের উপাদানকারণ এবং সাক্ষিচেতনাশ্রিত আন্তর অবিদ্যাংশই তাহার সর্পাদি জ্ঞানরূপ বৃত্তির উপাদানকারণ বলা হয়। আর স্বপ্নভ্রমমধ্যে সাক্ষীর আশ্রিত অবিদ্যারই তমোগুণাংশ বিষয়রূপ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, এবং সেই অবিদ্যার সত্ত্বগুণাংশ সেই সকল বিষয়ের জ্ঞানরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হয়। এজন্য স্বপ্নমধ্যে আন্তর অবিদ্যাই বিষয় ও জ্ঞান—উভয়ের উপাদান কারণ হয়।

আর এইরূপে বাহ্য রজ্জুসর্পাদি এবং আন্তর স্বাপ্ন পদার্থ সকলই সাক্ষীর ভাষ্য বলা হয়। এই ভ্রম অবিদ্যার পরিণাম, এবং চেতনের বিবর্ত্ত। এই ভ্রমের উপাদানকারণ অবিদ্যা, এবং ভ্রমজ্ঞান উভয়ই অনির্ব্বচনীয়। অর্থাৎ সদসদ্‌ভিন্ন। রজ্জুসর্প ও তাহার জ্ঞান বাধিত হয় বলিয়া তাহা সৎ নহে, এবং প্রতীত হয় বলিয়া তাহা অসৎ নহে। অপর মতবাদী ইহা খণ্ডন করিলেও অদ্বৈতবাদী ইহার মণ্ডন করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে বহু জ্ঞাতব্য আছে। এস্থলে দিঙ্‌মাত্র ইঙ্গিত করা হইল। অধিক জানিতে হইলে ভামতী, বিবরণ এবং অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ফলতঃ অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি বেদান্তীর মত। এই ভ্রমতত্ত্ব স্বীকার না করিলে অদ্বৈত ব্রহ্মবস্তু সিদ্ধ হইত না। এই জন্যই ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে প্রথমেই এই ভ্রমতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অপ্রমার অন্তর্গত সংশয়, তর্ক ও অনধ্যবসায়প্রভৃতির জন্য ভট্ট মীমাংসার মানমেয়োদয়, প্রাভাকর মীমাংসার তন্ত্ররহস্য এবং ন্যায়ের তার্কিকরক্ষাপ্রভৃতি গ্রন্থ দেখা যাইতে পারে। ইহাই হইল সংক্ষেপে দ্রব্য পরিচয়।

গুণপ্রভৃতি পদার্থ পরিচয়।

গুণপ্রভৃতি অপরাপর পদার্থের পরিচয়ও উক্ত গ্রন্থ সমূহে দ্রষ্টব্য। এ বিষয় অধিক জানিতে হইলে অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি প্রকরণ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। ভাষান্তরিত গ্রন্থের মধ্যে বেদান্তভাষাপরিচ্ছেদ, বিচারসাগর, বৃত্তিপ্রভাকর, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ তর্কতীর্থ কর্তৃক

অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থের ভূমিকা, শ্রীযুক্ত করালপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়কৃত তত্ত্বজ্ঞানামৃত, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ কর্তৃক অনূদিত বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ এবং ভামতী চতুঃসূত্রী প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

বেদান্তের অধিকারী।

বৈদিক অদ্বৈতবাদের অধিকারী সকলে নয়। ইহার মুখ্য অধিকারীর লক্ষণ বেদান্তসার গ্রন্থে সংক্ষেপে উত্তমরূপে কথিত হইয়াছে, যথা—

১। যিনি বেদ ও বেদাঙ্গ বিধিবৎ অধ্যয়ন করিয়াছেন।

২। যিনি স্থূলভাবে সমুদয় বেদার্থ জানিয়াছেন।

৩। যিনি ইহজন্মে বা পূর্ব্বজন্মে কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনার অনুষ্ঠান করিয়া নিষ্পাপ ও শুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন, এবং—

৪। যিনি চারিটী সাধনসম্পন্ন হইয়াছেন, তিনিই অদ্বৈতবাদের মুখ্য অধিকারী। কিন্তু এই চতুর্থ সাধনমধ্যে আবার চারিটী সাধন আছে, যথা—

(ক) নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিবেক অর্থাৎ পার্থক্য জ্ঞান।

(খ) ইহ ও পরলোকের ভোগে বৈরাগ্য।

(গ) শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান—এই ছয়টী সাধন।

(ঘ) মুমুক্ষা অর্থাৎ মুক্তির ইচ্ছা।

ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটীর দ্বারা দোষের স্খলন হয় এবং শেষ দুইটীর দ্বারা গুণাধান হয় বুঝিতে হইবে। ইহাদের বিশেষ বিবরণ বেদান্তসার ও সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থমধ্যে দ্রষ্টব্য।

অদ্বৈতবাদের গৌণাধিকারী অনেকেই হইতে পারেন। যিনি শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, যাঁহার শাস্ত্রে শ্রদ্ধা এবং গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস আছে, তিনিই ইহার গৌণাধিকারী হইতে পারেন। কিন্তু যাঁহার দেহাত্মবোধ প্রবল, দৈহিক সুখভোগে আকাঙ্ক্ষা অধিক, এবং জগতের সত্যতাবোধে আগ্রহ থাকে, তাঁহারা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। এ বিষয়ে অধিক জানিতে হইলে শঙ্করাচার্য্য প্রণীত উপদেশ গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য।

অদ্বৈতবাদের মুক্তি।

অদ্বৈতবাদের মুক্তি ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ বা ব্রহ্মনির্ব্বাণ। ইহার অপর নাম বিদেহমুক্তি। শিবলোক, ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, কৈলাস ও গোলক প্রভৃতি লোকে ভগবৎ সারূপ্য, সামীপ্য প্রভৃতি এ মতে স্বর্গবিশেষ। ইহারা যথার্থ মুক্তিপদবাচ্য নহে। এই সকল গৌণমুক্তি পাঁচ প্রকার যথা—সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য ও সার্ষ্টি অর্থাৎ সমান ঐশ্বর্য্য। সাযুজ্য মুক্তিটী দ্বৈতাদি মতে ভগবৎশরীরে বসনভূষণাদির ন্যায় সংলগ্ন হইয়া থাকা বুঝায় এবং অদ্বৈতমতে ব্রহ্মনির্ব্বাণ বুঝায়।

অদ্বৈতবাদমতে সাধন।

অদ্বৈতমতে সাধন—গৌণ ও মুখ্যভেদে দ্বিবিধ। মুখ্যসাধন ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানাভ্যাস। এজন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন প্রয়োজন। শ্রবণ বলিতে গুরুমুখ হইতে বেদান্তবাক্য ও তদর্থ শ্রবণ। মনন বলিতে উক্তরূপে শ্রুতিবিষয়ে ভ্রম ও সংশয়, বিচার দ্বারা নিরাকরণ, এবং নিদিধ্যাসন বলিতে মননদ্বারা নিশ্চিত বিষয়ের নিরন্তর ধ্যান। শঙ্করাচার্য্যবিরচিত অপরোক্ষানুভূতি-গ্রন্থমধ্যে এই সাধনতত্ত্ব বিশেষভাবে কথিত হইয়াছে। গৌণ সাধন বলিতে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রবিহিত আচরণ বুঝায়। ইহা স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রাদি মধ্যে বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। উপাসনার জন্য যোগশাস্ত্র এবং ভক্তিশাস্ত্র মুখ্যভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাই হইল অদ্বৈতবাদের নিতান্ত সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

অদ্বৈতবাদী গ্রন্থকার ও তদ্রচিত গ্রন্থের ধারাবাহিক তালিকা।

১। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস (৩১০১ পূঃ খৃঃ)—মহাভারত, পুরাণ ও ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি।

২। শুকদেব (ব্যাসপুত্র) শুকাষ্টক, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি।

৩। গৌড়পাদ—মাণ্ডূক্যকারিকা, সাংখ্যকারিকাভাষ্য, শ্রীবিদ্যাতন্ত্র, উত্তরগীতাভাষ্য প্রভৃতি।

৪। গোবিন্দপাদ (খৃঃ ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতক)—রসার্ণব নামক রসশাস্ত্রের একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

৫। শঙ্করাচার্য্য (৬৮৬-৭২০ খৃঃ)—ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ঈশাদি দশোপনিষদ্‌ভাষ্য (শ্বেতাশ্বতর ও নৃসিংহপূর্ব্বতাপনীয় ভাষ্য ?) গীতাভাষ্য, সনৎসুজাতীয়ভাষ্য, বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য, ললিতাত্রিশতী-ভাষ্য, গায়ত্রীভাষ্য, আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রাংশভাষ্য, হস্তামলকভাষ্য, সাংখ্যকারিকাভাষ্য (?) গৌড়পাদকারিকাভাষ্য প্রভৃতি ভাষ্যগ্রন্থ; উপদেশ-সাহস্রী, প্রপঞ্চসারতন্ত্র, সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসংগ্রহ, সর্ব্ব-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ, বিবেকচূড়ামণি, অপরোক্ষানুভূতি, আত্মবোধ, তত্ত্ববোধ, আত্মজ্ঞানোপদেশবিধি, অজ্ঞানবোধিনী, নির্ব্বাণদশক, মোহমুদ্গর, মঠাম্নায়, শঙ্করস্মৃতি (?) অমরুশতক (?) কৌপীনপঞ্চক, মনীষাপঞ্চক, বাক্যসুধা, বাক্যবৃত্তি, নির্ব্বাণাষ্টক, পঞ্চীকরণ ইত্যাদি উপদেশগ্রন্থ; এবং দেবদেবীর স্তবস্তুতি প্রায় শতাধিক।

৬। পদ্মপাদাচার্য্য (শঙ্করশিষ্য)—পঞ্চপাদিকা, প্রপঞ্চ-সারতন্ত্রভাষ্য, নমঃ শিবায় মন্ত্রভাষ্য, প্রাচীন শঙ্করবিজয়।

৭। সুরেশ্বরাচার্য্য (ঐ ৬৭৫-৭৭৩)—ব্রহ্মসিদ্ধি, নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি, স্বারাজ্যসিদ্ধি, বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিক, তৈত্তিরীয়ভাষ্য বার্ত্তিক, পঞ্চীকরণবার্ত্তিক, দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রটীকা, মানসোল্লাস, ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি, বিধিবিবেক, ভাবনাবিবেক, বিভ্রমবিবেক, স্ফোট-সিদ্ধি প্রভৃতি।

৮। তোটকাচার্য্য (ঐ খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দী) গুরুস্তুতি।

৯। হস্তামলকাচার্য্য (ঐ)...হস্তামলকস্তোত্র (?)

১০। সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি (সুরেশ্বরশিষ্য ৭১০-৮১০ খৃঃ)—সংক্ষেপ শারীরক।

এই সময় বৌদ্ধ শান্তরক্ষিত এবং তৎশিষ্য কমলশীল তত্ত্বসংগ্রহগ্রন্থে, জৈন বিদ্যানন্দ অষ্টসাহস্রী গ্রন্থে, এবং মাণিক্যনন্দী পরীক্ষামুখ প্রভৃতি গ্রন্থে, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ভাস্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভাস্করভাষ্যে, এবং নৈয়ায়িক শিবাদিত্য সপ্তপদার্থীগ্রন্থে, ব্যোমশিবাচার্য্য প্রশস্তপাদভাষ্যের ব্যোমবতী টীকায়, জয়ন্তভট্ট ন্যায়মঞ্জরী ও ন্যায়কলিকা গ্রন্থে, মীমাংসক সুচরিত মিশ্র ও পার্থসারথী মিশ্র শ্লোকবার্ত্তিকটীকায় অদ্বৈতমতের খণ্ডন করেন। ইহাদের আক্রমণের উত্তর পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ প্রদান করেন—

১১। বোধঘনাচার্য্য (সুরেশ্বরের শিষ্য ৭৫৮-৯৫৮ খৃঃ)—তত্ত্বসিদ্ধি প্রভৃতি।

১২। অবিমুক্তাত্মভগবান্ (অব্যয়াত্মভগবানের শিষ্য)—ইষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি।

১৩। বাচস্পতিমিশ্র (ত্রিলোচনশিষ্য ৮০১-৯৮১ খৃঃ) ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যটীকা ভামতী, ব্রহ্মসিদ্ধিটীকা ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষা, বিধিবিবেকটীকা ন্যায়কণিকা, সাংখ্যকারিকার টীকা, পাতঞ্জলব্যাসভাষ্যটীকা, ন্যায়ভাষ্যবার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা ও ন্যায়সূচীনিবন্ধ।

১৪। প্রকাশাত্মযতি (অনন্যানুভবশিষ্য খৃঃ ৯ম শতাব্দী)—পঞ্চপাদিকাবিবরণ প্রভৃতি।

এই সময়ে নৈয়ায়িক শ্রীধরাচার্য্য ১০ম শতাব্দীতে প্রশস্তপাদভাষ্যটীকা ন্যায়কন্দলী, তত্ত্বপ্রবোধ ও তত্ত্বসম্বাদিনী গ্রন্থে দ্বৈতবাদ প্রকটিত করেন, কিন্তু অদ্বয়সিদ্ধিগ্রন্থে অদ্বৈতবাদ বিবৃত করেন। উদয়নাচার্য্য (৯৪৪-১০৪৪ খৃষ্টাব্দে) ন্যায়তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি, আত্মতত্ত্ববিবেক, লক্ষণাবলী, কিরণাবলী, কুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি গ্রন্থে এবং বল্লভাচার্য্য—(৯৮৪-১১৭৮ খৃষ্টাব্দে) ন্যায়লীলাবতী গ্রন্থে এবং ভাসর্ব্বজ্ঞ ন্যায়সার গ্রন্থে ন্যায়মত প্রকটিত করেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী যামুনাচার্য্য (৯১৬-১০৪২ খৃষ্টাব্দে) সিদ্ধিত্রয়, আগমপ্রামাণ্য, গীতাতাৎপর্য্যনির্ণয় ও স্তোত্ররত্ন গ্রন্থে অদ্বৈতমত খণ্ডন করেন। যাদবপ্রকাশ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে অদ্বৈতমতের প্রকারান্তর প্রদর্শন করেন। রামানুজাচার্য্য (১০১৯-১১৩৯ খৃষ্টাব্দে) বিশিষ্টাদ্বৈতমতে ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য, বেদান্তদীপ, বেদান্তসার, বেদার্থসারসংগ্রহ, গীতাভাষ্য, ভগবদারাধন ও গদ্যত্রয় প্রভৃতি গ্রন্থে অদ্বৈতমতের খণ্ডন করেন। কাশ্মীরী শৈব অভিনবগুপ্ত (৯৫০-১০১৫ খৃষ্টাব্দে) প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতরূপ অদ্বৈতবাদের প্রকারান্তর প্রদর্শন করেন। শ্রীকরাচার্য্য বেদান্তভাষ্যদ্বারা এবং শ্রীকণ্ঠাচার্য্য অন্য বেদান্তভাষ্যদ্বারা শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রকটিত করেন। দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নিম্বার্কাচার্য্য (খৃঃ ১২ শতকে) ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিরূপ বেদান্তপারিজাতসৌরভগ্রন্থ ও তৎশিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য উক্ত বৃত্তির ব্যাখ্যারূপ বেদান্ত-কৌস্তুভ নামে ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনা করিয়া এবং রূপাচার্য্যশিষ্য দেবাচার্য্য (১১৯০ খৃঃ) বেদান্তজাহ্নবী রচনা করিয়া অদ্বৈতমত খণ্ডন করেন। এই সকল অদ্বৈতবিরোধী মতের প্রতিকারকল্পে যাঁহারা আবির্ভূত হন তাঁহারা এই—

১৫। শ্রীহর্ষাচার্য্য (১১৫০ খৃষ্টাব্দ) খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, শিবশক্তিসিদ্ধি, ঈশ্বরাভিসন্ধি এবং নৈষধচরিত প্রভৃতি।

১৬। শ্রীকৃষ্ণমিশ্র যতি (খৃঃ ১২শ শতকে) প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি।

১৭। চিদ্বিলাস বা অদ্বৈতানন্দ (১১৬৭-১১৯১ খৃঃ) শাঙ্করভাষ্যটীকা ব্রহ্মবিদ্যাভরণ।

এই সময় নৈয়ায়িক গঙ্গেশোপাধ্যায় (১১৫৮-১২৩৮ খৃঃ) তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থে, তৎপুত্র বর্দ্ধমানোপাধ্যায় (১১৯৮—১২৫৮খৃঃ) চিন্তামণিটীকা, কুসুমাঞ্জলিটীকা প্রভৃতি গ্রন্থে, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী পুরুষোত্তমাচার্য্য বেদান্তরত্নমঞ্জুষা গ্রন্থে, সুন্দরভট্ট সিদ্ধান্তসেতুক গ্রন্থে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী দেবরাজাচার্য্য বিম্বতত্ত্বপ্রকাশিকা গ্রন্থে, বরদাচার্য্য তত্ত্বনির্ণয় গ্রন্থে অদ্বৈতমতখণ্ডনে প্রবৃত্ত হন। ইহার উত্তর যাঁহারা দেন তাঁহারা এই—

১৮। বাদীন্দ্র বা বাগীশ্বরাচার্য্য বা সর্ব্বজ্ঞ...বা মহাদেব (১২১০-১২৪৭ খৃঃ) মহাবিদ্যাবিড়ম্বন, কিরণাবলীটীকা, রসসার প্রভৃতি।

১৯। আনন্দবোধেন্দ্র (১২২৮?)...ন্যায়মকরন্দ, প্রমাণমালা বা ন্যায়দীপাবলী প্রভৃতি।

২০। আনন্দপূর্ণবিদ্যাসাগর (অভয়ানন্দশিষ্য) (১২৫২-১৩০০ খৃঃ) খণ্ডনখণ্ডখাদ্যটীকা, মহাবিদ্যাবিড়ম্বনটীকা, পঞ্চপাদিকাটীকা, ব্রহ্মসিদ্ধিটীকা, বিবরণটীকা, মোক্ষধর্ম্মটীকা, বৃহদারণ্যকবার্ত্তিক টীকা, ন্যায়চন্দ্রিকা প্রভৃতি।

২১। জ্ঞানোত্তমাচার্য্য বা গৌড়েশ্বরাচার্য্য—(খৃঃ ১২শ-১৩শ শতক) নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধিটীকা, ব্রহ্মসিদ্ধিটীকা, জ্ঞানসিদ্ধি ও ন্যায়সুধা প্রভৃতি।

এই সময় দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য্য (১১৯৯-১৩০৪ খৃঃ) ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, দশোপনিষদ্ভাষ্য, গীতাভাষ্য, মিথ্যাত্বানুমানখণ্ডন, মায়াবাদখণ্ডন, উপাধিখণ্ডন, ঋগ্ভাষ্য প্রভৃতি ৩৭ খানি গ্রন্থে,—বিক্রমাচার্য্য পদার্থদীপিকা গ্রন্থে, পদ্মনাভাচার্য্য পদার্থ-সংগ্রহ এবং তট্টীকা মধ্বসিদ্ধান্তসার গ্রন্থে; বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বরদাচার্য্য নড়াডুম্মল-তত্ত্বসার ও সারার্থচতুষ্টয় গ্রন্থে, বীররাঘবাচার্য্য তত্ত্বসারটীকা গ্রন্থে, সুদর্শনাচার্য্য শ্রীভাষ্যটীকা শ্রুতপ্রকাশিকা গ্রন্থে,

নৈয়ায়িক গৌড়পূর্ণানন্দ কবিচক্রবর্ত্তী তত্ত্বমুক্তাবলী গ্রন্থে অদ্বৈত মতের বিরোধিতা করেন। ইঁহাদের প্রতিকারার্থ—যাঁহারা লেখনী ধারণ করেন, তাঁহাদের নাম—

২২। চিৎসুখাচার্য্য (জ্ঞানোত্তমশিষ্য খৃঃ ১৩-১৪ শতক) প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা বা চিৎসুখী, ন্যায়মকরন্দটীকা, বিষ্ণুপুরাণ-টীকা, ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যটীকা, খণ্ডনখণ্ডখাদ্যটীকা, বিবরণ-তাৎপর্য্যদীপিকা, ব্রহ্মসিদ্ধিটীকা, প্রমাণমালাটীকা, অধিকরণ-মঞ্জরীসঙ্গতি, শঙ্করচরিত প্রভৃতি।

২৩। শঙ্করানন্দ বা বিদ্যাশঙ্কর (১২২৮-১৩৩৩ খৃঃ)—১০৮ উপনিষৎটীকা, বেদান্তসূত্রবৃত্তি, গীতার টীকা, আত্মপুরাণ।

২৪। বিষ্ণুস্বামী বা সর্ব্বজ্ঞ (১৪শ শতক)—সর্ব্বজ্ঞসংহিতা।

২৫। প্রত্যক্‌স্বরূপভগবান (খৃঃ ১৪শ শতক প্রত্যক্ প্রকাশ-শিষ্য)—চিৎসুখীর টীকা প্রভৃতি।

২৬। অমলানন্দ যতি (অনুভবানন্দ ও সুখপ্রকাশশিষ্য ১২৬০-১৩৪০খৃঃ)—ভামতীর টীকা কল্পতরু, শাস্ত্রদর্পণ, পঞ্চ-পাদিকাদর্পণ প্রভৃতি।

২৭। প্রগল্‌ভাচার্য্য (খৃঃ ১৪শ শতক)—খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের টীকা প্রভৃতি।

২৮। ভারতীতীর্থ (১৩২৮-১৩৮০ খৃঃ) বেদান্তদর্শনের অধিকরণমালা প্রভৃতি।

২৯। সায়নাচার্য্য (প্রায় ঐ সময়)—চতুর্ব্বেদভাষ্য, সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ প্রভৃতি।

৩০। বিদ্যারণ্য (১৩৩১-১৩৮৬ খৃঃ)—পঞ্চদশী, বিবরণ-প্রমেয়সংগ্রহ, অনুভূতিপ্রকাশ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ।

৩১। শ্রীধরস্বামী (খৃঃ ১৪শ শতক)—ভাগবতের টীকা, গীতার টীকা, বিষ্ণুপুরাণের টীকা প্রভৃতি।

এই সময়ে দ্বৈতবাদী অক্ষোভ্যমুনি—(১৩১৭-১৩৮০ খৃষ্টাব্দে) কতিপয় গ্রন্থে, তচ্ছিষ্য জয়তীর্থাচার্য্য ন্যায়সুধা ও তত্ত্বপ্রকাশিকা প্রভৃতি বহু গ্রন্থে মধ্বাচার্য্যের প্রায় যাবতীয় গ্রন্থের টীকা করিয়া, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ২য় রামানুজাচার্য্য এই সময় ন্যায়কুলিশগ্রন্থাদিতে, বরদবিষ্ণু আচার্য্য শ্রুতপ্রকাশিকার টীকা ভাবপ্রকাশিকা গ্রন্থে, বেঙ্কটনাথাচার্য্য (১২৬৮-১২৭৬ খৃষ্টাব্দে) তত্ত্বমুক্তাকলাপ, শতদূষণী, অধিকরণসারাবলীপ্রভৃতি বহু গ্রন্থে, বরদগুরু আচার্য্য বা প্রতিবাদী ভয়ঙ্কর এই সময় সপ্ততিরত্নমালিকা, অধিকরণসারাবলী টীকা গ্রন্থে, লোকাচার্য্য (খৃঃ ১৪শ শতকে) তত্ত্বনির্ণয়, তত্ত্বশেখর প্রভৃতি গ্রন্থে, রঙ্গরামানুজাচার্য্য এই সময় দশোপনিষৎভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থে, অনন্তাচার্য্য এই সময় সিদ্ধান্তসিদ্ধাঞ্জনপ্রভৃতি বহু গ্রন্থে অদ্বৈতমত খণ্ডনে প্রবৃত্ত হন। ইঁহাদের প্রতিকারকল্পে যাঁহারা উদিত হন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জনের নাম এই—

৩২। অনুভূতিস্বরূপাচার্য্য (১৩-১৪ খৃঃ শতাব্দী) গৌড়-পাদকারিকাটীকা, ন্যায়মকরন্দটীকা, ন্যায়দীপাবলীটীকা, প্রমাণমালা-টীকা ইত্যাদি।

৩৩। আনন্দজ্ঞান বা আনন্দগিরি (শুদ্ধানন্দও অনুভূতি-স্বরূপাচার্য্য শিষ্য খৃঃ ১৪শ শতকে) তত্ত্বসংগ্রহ ও শাঙ্করগ্রন্থাবলীর টীকা, সুরেশ্বরের গ্রন্থের টীকা প্রভৃতি ৩২ খানি গ্রন্থ।

৩৪। নরেন্দ্র গিরি (অনুভূতিস্বরূপের শিষ্য খৃঃ ১৪শ শতক) ঈশাভাষ্য টিপ্পন, পঞ্চপাদিকাবিবরণ।

৩৫। প্রজ্ঞানানন্দ (ঐ ঐ) আনন্দজ্ঞানের তত্ত্বালোকের উপর তত্ত্বপ্রকাশিকাটীকা।

৩৬। অখণ্ডানন্দ (খৃঃ ১৪শ শতক, অখণ্ডানুভূতি ও আনন্দজ্ঞানশিষ্য)—পঞ্চপাদিকাবিবরণ, তত্ত্বদীপন।

৩৭। প্রকাশানন্দ সরস্বতী (খৃঃ ১৫শ শতক জ্ঞানানন্দ-শিষ্য) বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলী।

৩৮। নানা দীক্ষিত (খৃঃ ১৫-১৬শ শতক প্রকাশানন্দ শিষ্য) বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলীটীকা সিদ্ধান্তদীপিকা।

৩৯। রঙ্গরাজাধ্বরীন্দ্র বা বক্ষঃস্থলাচার্য্য (খৃঃ ১৫শ শতক আচার্য্য দীক্ষিতের পুত্র) অবিদ্যামুকুর, পঞ্চপাদিকাবিবরণদর্পণ

৪০। রঘুনাথ শিরোমণি (খৃঃ ১৫শ শতক) খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের টীকা। এতদ্দ্বারা ইনি অন্তরে বৈদান্তিক ছিলেন বলা হয়।

এই সময়ে উক্ত রঘুনাথ শিরোমণি, মহেশ ঠাকুর, শঙ্কর মিশ্র, (১৫১৮-১৬৪২ খৃঃ), বাচস্পতি মিশ্র ২য়, বাসুদেব-সার্ব্বভৌম, নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কেশব কাশ্মীরী, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভাচার্য্য (১৪৭৯-১৫৮৭ খৃঃ) বিঠ্‌ঠলনাথ এবং সাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষু, শৈব নীলকণ্ঠ শিবাচার্য্য প্রভৃতি অদ্বৈতমত খণ্ডনে প্রবৃত্ত হন। ইঁহাদের যাঁহারা প্রতিকার করেন, তাঁহাদের কতিপয়ের নাম এই—

৪১। মল্লনারাধাচার্য্য (১৫-১৬শ খৃঃ শতাব্দী) শঙ্কর মিশ্রের ভেদরত্নখণ্ডন স্বরূপ অদ্বৈতরত্ন বা অভেদরত্ন।

৪২। নৃসিংহাশ্রম (জগন্নাথমিশ্রের শিষ্য ১৫২৫-১৬০০ খৃঃ) অভেদরত্নটীকা তত্ত্বদীপন, পঞ্চপাদিকাবিবরণের টীকা ভাব-প্রকাশিকা, সংক্ষেপশারীরকটীকা, তত্ত্ববোধিনী, ভেদধিক্কার, বৈদিকসিদ্ধান্তসংগ্রহ, অদ্বৈতদীপিকা, বেদান্ততত্ত্ববিবেক ইত্যাদি।

৪৩। অগ্নিহোত্রী (জ্ঞানেন্দ্রসরস্বতীশিষ্য খৃঃ ১৬শ শতক) বেদান্ততত্ত্ববিবেকটীকা তত্ত্ববিবেচনী।

৪৪। নারায়ণাশ্রম (নৃসিংহ আশ্রমশিষ্য খৃঃ ১৬শ শতক) অদ্বৈতদীপিকাটীকা বিবরণ, ভেদধিকারটীকা সৎক্রিয়া।

৪৫। অপ্পয় দীক্ষিত (রঙ্গরাজাধ্বরীর পুত্র ও শিষ্য, ১৫২০-১৫৯৩ খৃঃ) ১০৮ খানি গ্রন্থরচয়িতা, তন্মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ

কল্পতরু পরিমল, সিদ্ধান্তলেশ, ন্যায়রক্ষামণি এবং চতুর্ম্মতসংগ্রহ ইত্যাদি।

৪৬। সদানন্দ যোগীন্দ্র (অদ্বয়ানন্দসরস্বতীশিষ্য খৃঃ ১৬শ শতক) বেদান্তসার।

৪৭। রামতীর্থ (শ্রীকৃষ্ণতীর্থশিষ্য ১৪৭৫-১৫৭৫ খৃঃ) বেদান্তসারটীকা বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী. সংক্ষেপশারীরকটীকা, উপদেশসাহস্রীটীকা, পঞ্চীকরণটীকার টীকা।

৪৮। ভট্টোজী দীক্ষিত (অপ্পয় দীক্ষিতশিষ্য ১৫৫০-১৬৫০ খৃঃ) বেদান্ততত্ত্ববিবেকবিবরণ, বেদান্তকৌস্তভ ইত্যাদি।

৪৯। রঙ্গোজী ভট্ট (নৃসিংহ আশ্রম শিষ্য ১৬৫০ খৃঃ) অদ্বৈতচিন্তামণি প্রভৃতি।

৫০। নীলকণ্ঠ স্থরি (খৃঃ ১৬—১৭ শতক) মহাভারতটীকা, বেদান্তকতক, শিবতাণ্ডবতন্ত্রের টীকা, দেবীভাগবতটীকা।

৫১। সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র (ঐ সময়) অদ্বৈতবিদ্যাবিলাস, বোধার্য্যাত্মনির্ব্বেদ, গুরুরত্নমালিকা, ব্রহ্মকীর্ত্তনতরঙ্গিণী।

এই সময় শুদ্ধাদ্বৈতবাদী গিরিধর রায়জী, বালকৃষ্ণজী, ব্রজনাথজী পুরুষোত্তমজী এবং দ্বৈতবাদী ব্যাসরাজাচার্য্য, (১৫৪৮-১৫৯৮ খৃঃ) ব্যাসরামাচার্য্য, শ্রীনিবাসতীর্থ, বেদেশ তীর্থ, এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতাবলম্বী অনুপনারায়ণ, শ্রীজীব গোস্বামী এবং নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, জগদীশ, গদাধর, মথুরানাথ প্রভৃতি এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী দোদ্দয় মহাচার্য্য, সুদর্শন গুরু, বরদনায়ক স্থরি প্রভৃতি অদ্বৈতমতের বিরোধিতা করেন। ইহার প্রতিকার কল্পে যাঁহারা অবতীর্ণ হন, তাঁহাদের কতিপয়ের নাম—

৫২। মধুস্থদন সরস্বতী (বিশ্বেশ্বর রাম ও মাধব সরস্বতীর শিষ্য ১৫২৫-১৬৩২ খৃঃ) অদ্বৈতসিদ্ধি, গীতার টীকা, সংক্ষেপশারীরক টীকা, অদ্বৈতরত্নরক্ষণ, বেদান্তকল্পলতিকা, ভক্তিরসায়ন, রাসপঞ্চাধ্যায়টীকা, ভাগবতের টীকা, সিদ্ধান্তবিন্দু, প্রস্থানভেদ, ঈশ্বরপ্রতিপত্তিপ্রকাশ ইত্যাদি।

৫৩। বলভদ্র (মধুস্থদনশিষ্য খৃঃ ১৭শ শতক) অদ্বৈতসিদ্ধিটীকা সিদ্ধিব্যাখ্যা।

৫৪। পুরুষোত্তম সরস্বতী (ঐ ঐ) সিদ্ধান্তবিন্দুটীকা।

৫৫। নারায়ণ তীর্থ (ঐ ঐ) সিদ্ধান্তবিন্দুটীকা, ১০৮ উপনিষৎটীকা, শব্দশক্তিপ্রকাশিকা টীকা ইত্যাদি বহু।

৫৬। শেষ গোবিন্দ (ঐ ঐ) সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহটীকা।

৫৭। বেঙ্কটনাথ (নৃসিংহাশ্রমশিষ্য খৃঃ ১৭ শতক) গীতার ব্রহ্মানন্দগিরি টীকা অদ্বৈতরত্নপঞ্জর, মন্ত্রসারসুধানিধি তৈত্তিরীয়ভাষ্য প্রভৃতি

৫৮। সদানন্দ ব্যাস (খৃঃ ১৭শ শতক) অদ্বৈতসিদ্ধিসিদ্ধান্তসার, শঙ্করমন্দারসৌরভ প্রভৃতি।

৫৯। নারায়ণ সরস্বতী—ব্রহ্মস্থত্রভাষ্য বার্ত্তিক।

৬০। ধর্ম্মরাজধ্বরীন্দ্র (বেঙ্কটনাথশিষ্য খৃঃ ১৭শ শতক) বেদান্তপরিভাষা, চিন্তামণিটীকা বিদ্বন্মনোরমা প্রভৃতি।

৬১। নৃসিংহসরস্বতী (কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী শিষ্য খৃঃ১৬শ শতক) বেদান্তসারের সুবোধিনী টীকা।

৬২। রাঘবেন্দ্র সরস্বতী (খৃঃ ১৬শ শতক) সংক্ষেপ শারীরকটীকা, বিদ্যামৃতবর্ষিণী, ন্যায়াবলীদীধিতি, মীমাংসাস্তবক ইত্যাদি।

এই সময় রামানুজ সম্প্রদায়ের যতীন্দ্রমতদীপিকাকার শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনিবাস ভাতাচার্য্য ভাতাচার্য্যপুত্র শ্রীনিবাস, বুচ্চি বেঙ্কটাচার্য্য এবং মাধ্বমতাবলম্বী রাঘবেন্দ্র স্বামী, বনমালী মিশ্র, গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ, রাধারমণ গোস্বামী প্রভৃতি অদ্বৈতবাদের খণ্ডনে প্রবৃত্ত হন। আর ইহার প্রতিকার যাঁহারা করেন তাঁহাদের কতিপয়—

৬৩। রামকৃষ্ণাধ্বরী (ধর্ম্মরাজপুত্র খৃঃ ১৭শ শতক) বেদান্তপরিভাষাটীকা শিখামণি।

৬৪। পেড্ডাদীক্ষিত (ধর্ম্মরাজশিষ্য) বেদান্তপরিভাষাটীকা।

৬৫। ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী (নারায়ণতীর্থ, শিবরাম ও পরমানন্দসরস্বতীশিষ্য)—অদ্বৈতসিদ্ধিটীকা, বৃহৎ ও লঘু চন্দ্রিকা, সিদ্ধান্তবিন্দুটীকা, বেদান্তস্থত্রবৃত্তি, অদ্বৈতচন্দ্রিকা, অদ্বৈতসিদ্ধান্তবিদ্যোতন, মীমাংসাচন্দ্রিকা ইত্যাদি।

৬৬। শিবরাম আশ্রম (মধুসুদনশিষ্য ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে) অদ্বৈতসিদ্ধিটীকা ?।

৬৭। জগদীশ তর্কালঙ্কার (১৫৬০-১৬৬০খৃঃ)—গীতার উপর টীকা প্রভৃতি।

৬৮। অচ্যুত কৃষ্ণানন্দতীর্থ (স্বয়ংজ্যোতিশিষ্য খৃঃ ১৭শ শতক)—সিদ্ধান্তলেশটীকা, তৈত্তিরীয়ভাষ্যটীকা বনমালা।

৬৯। আপোদেব (অনন্তদেবপুত্র খৃঃ ১৭শ শতক)—বেদান্তসারের উপর বালবোধিনীটীকা প্রভৃতি।

৭০। রামানন্দ সরস্বতী (গোবিন্দানন্দশিষ্য ১৬৫৭ খৃঃ ?)—ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী, বিবরণোপন্যাস প্রভৃতি।

৭১। কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী (খৃঃ ১৭শ শতক, বাসুদেব যতীন্দ্রশিষ্য)—সিদ্ধান্তসিদ্ধাঞ্জন, রত্নপ্রভার টীকা প্রভৃতি।

৭২। কাশ্মীরী সদানন্দ স্বামী (খৃঃ ১৭শ শতক)—অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি প্রভৃতি।

৭৩। রঙ্গনাথাচার্য্য (ঐ সময়)—ব্রহ্মস্থত্রবৃত্তি প্রভৃতি।

৭৪। নরহরি (ঐ সময়)—বোধসার প্রভৃতি।

৭৫। দিবাকর (ঐ সময় নরহরিশিষ্য)—বোধসারটীকা।

এই সময়ে মাধ্বমতে বনমালী মিশ্র, গৌড়ীয় মতে বলদেব বিদ্যাভূষণ, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, রাধামোহন গোস্বামী প্রভৃতি

পণ্ডিতগণ অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তাহার প্রতিকার যাঁহারা করেন, তাঁহাদের কতিপয়—

৭৬। বিট্‌ঠলেশোপাধ্যায় (খৃঃ ১৭শ-১৮শ শতক)—অদ্বৈতসিদ্ধির লঘুচন্দ্রিকার উপর টীকা।

৭৭। উদাসীন অমরদাস (ঐ সময়)—বেদান্তপরিভাষার শিখামণির উপর মণিপ্রভা টীকা।

৭৮। মহাদেবেন্দ্র সরস্বতী (ঐ সময়, স্বয়ংপ্রকাশানন্দ-শিষ্য) —অদ্বৈতচিন্তাকৌস্তভ।

৭৯। ধনপতি সূরি (ঐ সময়, বালগোপাল তীর্থ-শিষ্য) —শঙ্করবিজয়টীকা, গীতাভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা।

৮০। শিবদাস আচার্য্য (খৃঃ ১৮শ-১৯শ শতক, ধনপতি সূরির পুত্র)—বেদান্তপরিভাষার পদার্থদীপিকা টীকা।

৮১। সদাশিবেন্দ্র সরস্বতী (১৬৬৫-১৭৭৫ খৃঃ, পরম শিবেন্দ্র সরস্বতী-শিষ্য)—ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিকা, আত্মবিদ্যাবিলাস, ১২ উপনিষৎটীকা, সিদ্ধান্তকল্পবল্লী, অদ্বৈতরসমঞ্জরী, যোগসুধাগ্রার প্রভৃতি।

৮২। ভাস্কর দীক্ষিত (১৬৮৪-১৭১১ খৃঃ, কৃষ্ণানন্দ সরস্বতীশিষ্য) সিদ্ধান্তসিদ্ধাঞ্জনটীকা, রত্নতুলিকা।

৮৩। আয়ন্ন দীক্ষিত (খৃঃ ১৮শ শতক)—ব্যাসতাৎপর্য্যনির্ণয়।

৮৪। হরি দীক্ষিত (১৭৩৬ খৃঃ)—ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি।

এই সময় রামানুজ-সম্প্রদায়ের মহিসুরনিবাসী অনন্তাচার্য্য, কাশীর রামমিশ্র শাস্ত্রী, কাঞ্চীর প্রতিবাদী-ভয়ঙ্কর অনন্তাচার্য্য এবং মাধ্বমতে সত্যধ্যানতীর্থ, গৌড়গিরি বেঙ্কটরমণাচার্য্য, নৈয়ায়িক মঃ মঃ রাখালদাস ন্যায়রত্ন, আর্য্যসমাজী দয়ানন্দ সরস্বতী, শাক্ত নৈয়ায়িক মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্ন প্রভৃতি অদ্বৈতমতের বিরোধিতা করেন। আর ইঁহাদের প্রতীকার করেন ইঁহারা—

৮৫। রামসুব্বাশাস্ত্রী (খৃঃ ১৯শ-২০শ শতক)—ন্যায়ভাস্করখণ্ডন, মধ্বচন্দ্রিকাখণ্ডন।

৮৬। রাজুশাস্ত্রী বা ত্যাগরাজ মণিরাজ (খৃঃ ১৯শ-২০শ শতক)—ন্যায়েন্দুশেখর।

৮৭। তারানাথ তর্কবাচস্পতি (ঐ)—দয়ানন্দ-মতখণ্ডন।

৮৮। মঃ মঃ কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন (ঐ)—বেদান্তপরিভাষা-টীকা।

৮৯। তারাচরণ তর্করত্ন (ঐ)—মুক্তিমীমাংসা, ঈশোপনিষৎভাষ্য ও খণ্ডনপরিশিষ্ট ইত্যাদি।

৯০। রঘুনাথ শাস্ত্রী (ঐ)—শঙ্করপাদভূষণ।

৯১। দক্ষিণামূর্ত্তি স্বামী (ঐ)—অদ্বৈতসিদ্ধাঞ্জন।

৯২। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী (ঐ, নীলদেওপন্থ-শিষ্য)—পূর্ব্বোত্তরমীমাংসাসম্বন্ধ, অধ্যাসবাদ, ব্রহ্মবিদ্যাধিকারবিচার।

৯৩। মঃ মঃ লক্ষ্মণ শাস্ত্রী (ঐ, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর শিষ্য)—অদ্বৈতসিদ্ধিসিদ্ধান্তসারভূমিকা, খণ্ডনখণ্ডখাদ্যবিদ্যাসাগরী ভূমিকা।

৯৪। মঃ মঃ অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (ঐ, পঞ্চাবগেশ শাস্ত্রিশিষ্য)—অদ্বৈতদীপিকা, অদ্বৈতসিদ্ধিচতুর্ম্মতসংগ্রহ, বেদান্তপরিভাষাটীকা, ব্রহ্মসূত্রচতুঃসূত্রীটীকা, মীমাংসাশাস্ত্রসার প্রভৃতি।

৯৫। কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী (খৃঃ ২০শ শতক)—ব্রহ্মবিচার, ধর্ম্মবিচার, নীতিবিচার।

৯৬। শান্ত্যানন্দ সরস্বতী (ঐ)—পঞ্চীকরণটীকা, বেদান্তপরিভাষাটীকা।

৯৭। পঞ্চাবগেশ শাস্ত্রী (ঐ, রাজুশাস্ত্রীর শিষ্য)—শতকোটীন্যায়ভাস্করখণ্ডন প্রভৃতি।

৯৮। কাকারাম শাস্ত্রী (ঐ)—আত্মপুরাণটীকা প্রভৃতি।

৯৯। ধর্ম্মদত্ত ঝা (ঐ)—গীতার মধুসূদনীর উপর টীকা প্রভৃতি।

১০০। চন্দ্রধর বেদান্ততীর্থ (ঐ, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারশিষ্য) —মায়াবাদখণ্ডন, অদ্বৈতবাদনিরাসখণ্ডন প্রভৃতি।

১০১। রমেশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ (ঐ)—দ্বৈতোক্তিরত্নমালাখণ্ডন।

১০২। কেশবানন্দ ভারতী (ঐ)—বিবেকচূড়ামণিটীকা।

১০৩। মঃ মঃ যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ (ঐ, লক্ষ্মণ শাস্ত্রিশিষ্য)—অদ্বৈতসিদ্ধিটীকা।

১০৪। শঙ্করচৈতন্য ভারতী (ঐ, শ্রীজয়েন্দ্র পুরী-শিষ্য)—সপ্তখ্যাতিবাদ, খণ্ডনখণ্ডখাদ্যটীকা প্রভৃতি।

১০৫। চারুকৃষ্ণ তর্কবেদান্ততীর্থ (ঐ, সীতারাম শাস্ত্রীর শিষ্য)—ভামতীর টীকা ভামতীপ্রভা।

অদ্বৈতবাদিন্—(ত্রি) [অদ্বৈতং অভেদং বদতীতি বদ-ণিনি] ব্রহ্মবাদী। ২ একাত্মবাদী।

অদ্বৈতবিদ্যাবিচার—বেঙ্কটাচার্য্য-বিরচিত একখানি মীমাংসা গ্রন্থ।

অদ্বৈতবিদ্যাবিজয়—মহাচার্য্য রামানুজ দাস-রচিত একখানি গ্রন্থ। গ্রন্থকার ইহাতে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের মতসমূহ খণ্ডন করিয়াছেন। ইহাতে তিনটী পরিচ্ছেদ আছে। তাহা যথাক্রমে প্রপঞ্চমিথ্যাত্বভঙ্গ, জীবেশ্বরৈক্যভঙ্গ ও অখণ্ডার্থভঙ্গ।

অদ্বৈতবিদ্যাবিনোদ—অদ্বৈতবিদ্যাবিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

অদ্বৈতবিবেক—আশাধর ভট্ট-বিরচিত একখানি গ্রন্থ। ২ রামকৃষ্ণ রচিত অপর একখানি গ্রন্থ।

অদ্বৈতবেদান্তপরিভাষা—একখানি বেদান্ত-বিষয়ক গ্রন্থ। ইহা অদ্বৈতপরিভাষা বা বেদান্তপরিভাষা নামেও খ্যাত। [অদ্বৈতপরিভাষা দ্রঃ]

অদ্বৈতবেদান্তসার—একখানি বেদান্তবিষয়ক গ্রন্থ।

অদ্বৈতবৈদিকসিদ্ধান্তসংগ্রহ—পণ্ডিত নরসিংহ-রচিত একখানি গ্রন্থ।

অদ্বৈতশাস্ত্রসারোদ্ধার—রঙ্গোজী ভট্ট-বিরচিত একখানি বেদান্তবিষয়ক গ্রন্থ।

অদ্বৈতসার—একখানি অদ্বৈতবিষয়ক গ্রন্থ।

অদ্বৈতসারস্বতসূত্রে—রঘুবংশের একখানি টীকা।

অদ্বৈতসিদ্ধান্ত—একখানি অদ্বৈতবিষয়ক গ্রন্থ।

অদ্বৈতসিদ্ধান্তবিদ্যোতন—ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী-বিরচিত একখানি গ্রন্থ। ২ বিদ্যানন্দ সরস্বতী-রচিত অপর একখানি গ্রন্থ।

অদ্বৈতসিদ্ধি—(পুং) [অদ্বৈতস্য বিশ্বস্য ব্রহ্মাভেদস্য সিদ্ধির্যত্র] একখানি অদ্বৈতমতের গ্রন্থ। ইহার রচয়িতা পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতী। ইঁহার জীবিত-কাল ১৫২৫।৩০ হইতে ১৬৩২।৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। সুতরাং এই সময়ের মধ্যবর্ত্তী কালে অর্থাৎ প্রায় ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে এই অদ্বৈত-সিদ্ধি গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। ইহার রচনাস্থান বারাণসী। কিন্তু রচয়িতা মধুসূদনের জন্মস্থান বাঙ্গালা দেশের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড় গ্রাম। [মধুসূদন সরস্বতী দ্র°]

ইহার রচনা উপলক্ষে অদ্বৈতবেদান্ত-মতের একটী ইতিহাস লুক্কায়িত আছে। তাহা এইরূপ—বেদ হইতে অদ্বৈতচিন্তা-স্রোত উৎপন্ন হইলে অসুরগণের উৎপাত নিবারণোদ্দেশ্যে বিষ্ণু-দেহোৎপন্ন মায়ামোহের অবতার বুদ্ধদেব এই অদ্বৈতমতের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া অসুরগণকে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের পুণ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া দুর্ব্বল করেন। দ্বাপর হইতে কলির প্রারম্ভ মধ্যে বশিষ্ঠ, ব্যাস, শুক, গৌড় প্রভৃতি অদ্বৈতমতাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক এই বৌদ্ধাদ্বৈতবাদ খণ্ডিত হইলে, বৈদিক অদ্বৈতবাদ আবার সমুজ্জ্বল আকার ধারণ করে। ক্রমে কলির প্রায় ২৫০০ বৎসর অতীত হইলে এই বৈদিক অদ্বৈতবাদ আবার গৌতম বুদ্ধদেবের কবলে কবলিত হয়। ইহার ফলে প্রায় ১২০০ শত বৎসর সাধারণ লোকে বৈদিক অদ্বৈতবাদ ও বৌদ্ধাদ্বৈতবাদের মধ্যে বড় বেশী প্রভেদ বুঝিতে পারিত না। খৃষ্টীয় ৮ম শতকের প্রারম্ভে শঙ্করাচার্য্য (৬৮৬-৭২০ খৃঃ মধ্যে) মহর্ষি বেদব্যাসের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য, প্রধান প্রধান উপনিষদ্ভাষ্য এবং গীতাভাষ্য প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া এবং দিগ্বিজয় করিয়া উক্ত বৌদ্ধা-দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবিরোধী যাবতীয় বিকৃত পৌরাণিক মতবাদ খণ্ডন করিয়া সমগ্র ভারতে বৈদিক অদ্বৈতবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। [অদ্বৈতবাদ দ্র°]

ইহার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অথবা কিছু পরেই ভাস্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক প্রভৃতি বৈদান্তিকগণের মধ্য দিয়া বিদ্যানন্দ প্রভৃতি জৈন এবং শান্তরক্ষিত প্রভৃতি বৌদ্ধগণের মধ্য দিয়া এবং ব্যোমশিব, জয়ন্ত, উদয়ন, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি মহা নৈয়ায়িকগণের মধ্য দিয়া উক্ত খণ্ডিত মতবাদগুলি পুনরায় মস্তকোত্তলন করিতে থাকে। ইহার প্রতীকারোদ্দেশ্যে সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি, প্রকাশাত্মযতি, বাচস্পতি-মিশ্র, অবিমুক্তাত্মভগবান্ এবং বাদীন্দ্র প্রভৃতি বহু অদ্বৈতবাদের আচার্য্য বহু গ্রন্থাদি রচনা করিতে থাকেন।

কিন্তু এই প্রতীকার কার্য্য, ইঁহাদের কিছু পরেই মহামতি শ্রীহর্ষাচার্য্য খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে খণ্ডনখণ্ডখাদ্য নামক গ্রন্থ মধ্যে যেরূপ দক্ষতার সহিত করেন, এরূপ আর কেহই করিতে পারেন নাই। ইনিও শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় যাবতীয় বিরুদ্ধ মতবাদ খণ্ডন করিয়া অনির্ব্বচনীয়বাদরূপ অদ্বৈতবাদই প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পর তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায় ও তৎপুত্র বর্দ্ধমানোপাধ্যায় প্রভৃতি মহানৈয়ায়িকগণ শ্রীহর্ষকে খণ্ডন করেন। নৈয়ায়িকগণের এই খণ্ডন অদ্বৈত-চিন্তাস্রোতে একটা বাধার সৃষ্টি করিল। ইহাতে অদ্বৈতবাদী নৈয়ায়িক আনন্দ-বোধেন্দ্র ভট্টারক এবং চিৎসুখাচার্য্য ন্যায়মকরন্দ এবং প্রত্যক্তত্ত্ব-প্রদীপিকা বা চিৎসুখী প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া উক্ত ন্যায়মতের খণ্ডন করেন। ওদিকে অখণ্ডানন্দ স্বামী ভামতীটীকাকল্পতরু প্রভৃতি নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া এবং চিদ্বিলাসযতি ভাষ্যটীকা ব্রহ্মবিদ্যাভরণাদি গ্রন্থ লিখিয়া অদ্বৈতমতের সমুজ্জ্বলতা বিধান করেন। ফলতঃ এই সময় চিৎসুখ প্রভৃতির প্রচেষ্টায় ন্যায়মতের আক্রমণ ব্যর্থ হইয়া যায়।

ইহারই অব্যবহিত পরে দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য্য (খৃঃ ১৩শ শতকে) নিজ গুরু-সম্প্রদায়ভুক্ত শৃঙ্গেরীর শঙ্করানন্দস্বামীর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া ন্যায়-মতানুসারে ভাগবত-মতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন, এবং অদ্বৈতবাদখণ্ডনে প্রাণপণ যত্ন করিয়া বহু গ্রন্থাদি রচনা করেন। অতঃপর মধ্বাচার্য্যের প্রশিষ্য মহা-প্রতিভাসম্পন্ন শ্রীমদ্ জয়তীর্থাচার্য্য মাধ্ব-ভাষ্যাদি গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈতমত-খণ্ডনে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন। এই সময় মাধ্ব-দ্বৈতবাদের এতই প্রাধান্য হয় যে, বিদ্যারণ্যস্বামী তাঁহার সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ গ্রন্থে ইহার স্থান দিতে আপত্তি করেন নাই। সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে নিম্বার্কমতের স্থান হয় নাই, কিন্তু মাধ্বমতের স্থান, এই জয়তীর্থের পাণ্ডিত্যের অনুরোধে হইল।

এদিকে অদ্বৈতকেশরী নৃসিংহাশ্রম অদ্বৈতদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে, মহামনীষী অপ্পয় দীক্ষিত কল্পতরুপরিমল প্রভৃতি গ্রন্থে এবং ভট্টোজী দীক্ষিত তত্ত্বকৌস্তভাদি গ্রন্থে ইহার প্রতিবাদ করিলেন।

এদিকে মাধ্বসম্প্রদায়ের ব্যাসতীর্থস্বামী ন্যায়শাস্ত্রে অতি নিপুণ হইয়া ন্যায়ামৃত নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া চিৎসুখী ও বিবরণ প্রভৃতি গ্রন্থকে আক্রমণ করিয়া অদ্বৈতমতের এরূপভাবে খণ্ডন করিলেন যে, তাহার আর উত্তর হইবে না—এইরূপই

পণ্ডিতসমাজ মনে করিলেন। অদ্বৈতমতের প্রতিপক্ষগণের অদ্বৈত-মতখণ্ডন এই গ্রন্থে চরম অবস্থায় উপনীত হইল। এই সময় কাশীধামের শ্রীরামতীর্থ, শ্রীবিশ্বেশ্বরসরস্বতীপ্রমুখ সন্ন্যাসীবিদ্বদ্বৃন্দের অনুরোধে মহানৈয়ায়িক বাঙ্গালী শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় অদ্বৈতসিদ্ধি নামক গ্রন্থখানি রচনা করিয়া সমুদায় প্রাচীন অদ্বৈতাচার্য্যগণের মতের সমর্থন এবং উক্ত ন্যায়ামৃত গ্রন্থের প্রতি অক্ষর এমনভাবে খণ্ডন করিলেন যে, তাহার আর তুলনা হয় না, বলা চলে।

ইহা দেখিয়া ব্যাসতীর্থের শিষ্য ব্যাসরাম তীর্থ, শুনা যায়, কাশীধামে আসিয়া শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতী মহাশয়ের নিকটে ছদ্মবেশে অদ্বৈতসিদ্ধি পাঠ করিয়া ন্যায়ামৃত তরঙ্গিণী নামক একটী টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির খণ্ডন করেন। শুনা যায়—তিনি একসঙ্গে এই টীকার দুইখানি প্রতীক লিখিয়াছিলেন এবং পাঠ সমাপ্ত করিয়া গুরুদক্ষিণাস্বরূপ একখানি প্রতীক শ্রীমন্ মধুসূদনকে দিয়া যান। মধুসূদন ব্যাসরামের অভিসন্ধি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন এবং ঈষদ্ হাস্য করিয়া বলেন, "তোমার উত্তর আমি আর কি দিব, আমার কোন শিষ্যই দিবে" ইহা শুনিয়া মধুসূদনের শিষ্য বলভদ্র অদ্বৈতসিদ্ধির উপর সিদ্ধিব্যাখ্যা নামক একখানি টীকা রচনা করিয়া উক্ত ন্যায়ামৃত-তরঙ্গিণী খণ্ডন করেন। এই টীকাটী সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। বোধ হয় বলভদ্র তাঁহার টীকা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

ওদিকে ব্যাসতীর্থের শিষ্যসম্প্রদায় নিশ্চিন্ত থাকিলেন না। শ্রীনিবাস তীর্থ "ন্যায়ামৃত-প্রকাশ" নামক এক টীকা লিখিয়া ন্যায়ামৃতের অতি উত্তম ব্যাখ্যা করিলেন। বিজয়ীন্দ্র স্বামী বা আনন্দভট্টারক ন্যায়ামৃতকণ্টকোদ্ধার বা ন্যায়ামৃতখণ্ডনোদ্ধার নামক এক গ্রন্থ লিখিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির খণ্ডন করিলেন এবং স্থলে স্থলে তরঙ্গিণীরও ন্যূনতা দূর করিলেন।

এদিকে শ্রীমন্ মধুসূদনের প্রশিষ্যস্থানীয় শ্রীমদ্ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী (গৌড়) নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এবং কাশীধামে উভয় মীমাংসার পারঙ্গত হইয়া অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন এবং অদ্বৈতসিদ্ধির উপর বৃহচ্চন্দ্রিকা এবং লঘুচন্দ্রিকা নামক দুইখানি টীকা প্রণয়ন করেন। ইহাতে তিনি ন্যায়ামৃততরঙ্গিণী প্রভৃতির আক্রমণ অতি অকাট্যভাবে খণ্ডন করেন এবং অদ্বৈত-মতের সম্যক্ পরিষ্কার সাধন করেন। লঘুচন্দ্রিকায় গ্রন্থব্যাখ্যা ভাগ অধিক, বৃহচ্চন্দ্রিকায় খণ্ডনভাগ অধিক।

ইহার পর বনমালী মিশ্র ন্যায়ামৃত-সৌরভ বা সৌগন্ধনামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া ন্যায়ামৃত, অদ্বৈতসিদ্ধি-তরঙ্গিণী এবং ব্রহ্মানন্দের চন্দ্রিকাটীকার সার সংগ্রহ করিয়া ব্রহ্মানন্দের লঘু-চন্দ্রিকা-টীকা খণ্ডন করেন। বনমালীর এই গ্রন্থকে বনমালা বা পঞ্চগ্রন্থীও বলে।

ইহা দেখিয়া রত্নগিরিনিবাসী শ্রীবিট্ঠলেশোপাধ্যায় (খৃঃ ১৮শ শতকে) চন্দ্রিকার উপর এক অতি বিস্তৃত টীকা রচনা করিয়া মাধ্ব-সম্প্রদায়ের এই সকল আচার্য্যের আক্রমণের উত্তর প্রদান করিলেন। তিনি লঘুচন্দ্রিকাকে সমর্থন করিয়া বনমালা-তরঙ্গিণী, ন্যায়ামৃতসৌরভ, ন্যায়ামৃতকণ্টকোদ্ধার প্রভৃতি গ্রন্থেরই অতি অকাট্য খণ্ডন করেন। ইহার পর ন্যায়ামৃতের মণ্ডন ও অদ্বৈতসিদ্ধির খণ্ডন করিয়া কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ মাধ্ব-সম্প্রদায় মধ্যে আর হয় নাই। বিট্ঠলেশীও আজ আর সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না।

অদ্বৈতসিদ্ধি অবলম্বনে যখন মাধ্ব-সম্প্রদায়মধ্যে এইরূপ বিচার-সংগ্রাম চরমে উঠিয়াছে, তখন রামানুজ-সম্প্রদায়ভুক্ত অসাধারণ পণ্ডিত মহিসুরের অনন্তাচার্য্য লঘুচন্দ্রিকার উপর আক্রমণ করিয়া ন্যায়ভাস্কর নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিলেন।

ইহাতে কুম্ভকোনমের রামসুব্বা শাস্ত্রী, মাদ্রাজের পঞ্চাবকেশ শাস্ত্রী, চম্পকারণ্যের রাজু শাস্ত্রী প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থ রচনা করিয়া ন্যায়ভাস্কর খণ্ডন করিলেন। পরিশেষে মহামহোপাধ্যায় শ্রীঅনন্তকৃষ্ণশাস্ত্রী মহাশয় এই সকল মতের সার সংক্ষেপ করিয়া সৌগন্ধবিমর্শ নামক এক গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধি এবং লঘুচন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থের কথাই সমর্থন করেন। এই সময় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয় বালবোধিনী নামক একখানি টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির সহজ অর্থ প্রদর্শন করিলেন। এইরূপে দেখা যাইবে—অদ্বৈত-সিদ্ধি গ্রন্থের সম্পর্কে অদ্বৈতমতের একটী ইতিহাস নিহিত আছে। সূত্রভাষ্য-ভামতী-কল্পতরু প্রভৃতির মধ্যেও এই ইতিহাস যেমন নিহিত, এই অদ্বৈতসিদ্ধির মধ্যেও তাহা কোন অংশে ন্যূন নহে। আজকাল অদ্বৈতবাদের পণ্ডিতোচিত খণ্ডনমণ্ডন করিতে হইলে পণ্ডিতগণ এই অদ্বৈতসিদ্ধি-সম্পর্কিত গ্রন্থাবলীরই করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ন্যায়ামৃত গ্রন্থের পরিচ্ছেদবিভাগ, বিচার্য্যবিষয়বিন্যাস, এমন কি অধিকাংশস্থলে ভাষা পর্য্যন্তও অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে, এজন্য অদ্বৈতসিদ্ধি রচনা-চাতুর্য্যের যশঃসৌরভ ন্যায়ামৃতকারেরই প্রাপ্য, কিন্তু সেই ন্যায়ামৃতের অচিন্তিতপূর্ব্ব অতি ভীষণ আক্রমণের অপরিহার্য্য আমূলবিধ্বংসের যশঃগৌরব অদ্বৈতসিদ্ধিকারেরই প্রাপ্য। বস্তুতঃ এই অদ্বৈতসিদ্ধিমধ্যে অদ্বৈতবাদের সমগ্র ইতিহাসই নিহিত রহিয়াছে।

কেহ কেহ ইহাকে অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি অন্য গ্রন্থ, উহা সদানন্দ ব্যাস বিরচিত। গ্রন্থকার এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে—

"অদ্বৈতসিদ্ধিরিয়মস্তু মুদে বুধানাম্"

এই অদ্বৈতসিদ্ধি নাম স্বয়ংই উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ এই অদ্বৈতসিদ্ধি পণ্ডিতগণের আনন্দের নিমিত্ত হউক, ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে অধিক জানিতে হইলে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

এই অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থ মধ্যে—১ম অধ্যায়ে ৬৪ পরিচ্ছেদে প্রপঞ্চমিথ্যাত্বনিরূপণ, ২য় অধ্যায়ে ৬৪ পরিচ্ছেদে আত্মনিরূপণ, ৩য় অধ্যায়ে ৮ পরিচ্ছেদে শ্রবণাদিসাধননিরূপণ এবং ৪র্থ অধ্যায়ে ৬ পরিচ্ছেদে মুক্তিনিরূপণ বর্ণিত হইয়াছে।

অদ্বৈতসিদ্ধিখণ্ডন—বনমালী-বিরচিত একখানি গ্রন্থ।

অদ্বৈতসিদ্ধিসিদ্ধান্তসার—সদানন্দ ব্যাসরচিত মধুসূদন সরস্বতীর অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থের সার।

অদ্বৈতসূত্রভাষ্য—শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত একখানি গ্রন্থ। [ব্রহ্মসূত্র দ্র°]

অদ্বৈতাচার্য্য—প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য। [অদ্বৈতপ্রভু দ্র°]

অদ্বৈতাদিত্য—গোবিন্দবৎস্ত-বিরচিত একখানি গ্রন্থ।

অদ্বৈতাধিকরণচিন্তামণি—একখানি বেদান্তবিষয়ক গ্রন্থ।

অদ্বৈতানন্দ—জৈন-সাহিত্যের এক গ্রন্থকার। গ্রন্থের নাম 'জাতকসিদ্ধান্তমঞ্জরী'। ইনি বালকৃষ্ণের গুরু] ২ ব্রহ্মানন্দ-বিরচিত একখানি গ্রন্থ ও তাহার টীকা।

অদ্বৈতানন্দ আচার্য্য—একজন প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী ও দার্শনিক পণ্ডিত। ইঁহার জন্মস্থান দক্ষিণভারতে কাবেরী নদীর তীরে। পিতার নাম প্রেমনাথ ও মাতার নাম পার্ব্বতীদেবী। প্রেমনাথও একজন ভক্ত ও পণ্ডিত ছিলেন। সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে অদ্বৈতানন্দ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। তৎপূর্ব্বেই তিনি ন্যায় ও মীমাংসাদর্শনে ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন।

অদ্বৈতানন্দের গুরু ভূমানন্দ সরস্বতী বা চন্দ্রশেখরেন্দ্র সরস্বতী। তিনি কাঞ্চীর শারদামঠ বা কামকোটীপীঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। ভূমানন্দ সরস্বতী যখন বারাণসীতে গমন করেন, তখন তিনি অদ্বৈতানন্দকে মঠাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া যান। ৪২৬৮ কল্যব্দ বা ১১৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৩০১ কল্যব্দ বা ১১৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি এই মঠের অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। অতঃপর অদ্বৈতানন্দ অদ্বৈতবিদ্যা অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং শীঘ্রই রামানন্দ সরস্বতীর শিক্ষকতায় তাহাতে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। অদ্বৈতানন্দ রামানন্দের নিকট শারীরকভাষ্য শিখিয়াছিলেন।

অদ্বৈতানন্দের অন্য নাম চিদ্‌বিলাস ও আনন্দবোধাচার্য্য। খণ্ডনখণ্ডখাদ্যকার শ্রীহর্ষের তিনি সমসাময়িক। তিনি যে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন ও অনেক পণ্ডিতকে বিচারযুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীহর্ষের বিবরণ হইতে পাওয়া যায়। শ্রীহর্ষমিশ্র নিজেও তাঁহার কাছে পরাস্ত হইয়াছিলেন। অদ্বৈতানন্দের রচিত গ্রন্থ—(১) শান্তিবিবরণ, (২) ব্রহ্মবিদ্যাভরণ ও (৩) গুরুপ্রদীপ। ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অদ্বৈতানন্দের মতবাদ শাঙ্কর মতের অনুরূপ। তিনি শঙ্করমতের ব্যাখ্যাকর্ত্তামাত্র।

অদ্বৈতানন্দযতি—একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ইনি পুরুষোত্তমানন্দ যতির গুরু ছিলেন।

অদ্বৈতানন্দলহরী—বেঙ্কটশাস্ত্রি-বিরচিত একখানি গ্রন্থ।

অদ্বৈতানন্দসরস্বতী—বেদান্তসার-প্রণেতা সদানন্দের গুরু। ২ বেদান্তনয়নভূষণ-প্রণেতা স্বয়ংপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর গুরু।

অদ্বৈতানন্দসাগর—নৃসিংহতীর্থের রচিত একখানি গ্রন্থ।

অদ্বৈতামৃত—জগন্নাথ সরস্বতী-রচিত একখানি গ্রন্থ। ইনি বিবেকাশ্রমের জন্য এই গ্রন্থ রচনা করেন।

অদ্বৈতার্কোপনিষৎ—একখানি উপনিষৎ।

অদ্বৈতাষ্টক—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য-বিরচিত একখানি গ্রন্থ।

অদ্বৈতেশ্বরবাদ—রঘুনাথ-বিরচিত একখানি ন্যায়-বিষয়ক গ্রন্থ।

অদ্বৈতোপনিষৎ—আত্মতত্ত্ববিষয়ক একখানি উপনিষৎ। ইহাতে জীবাত্মা এবং পরমাত্মার অভেদ বর্ণিত আছে। ২ মাণ্ডূক্যোপনিষদের তৃতীয় প্রপাটক।

অদ্বৈধ—(ত্রি) দ্বৈধ যাহাতে নাই, দ্বৈধরহিত, নিঃসংশয়। ২ প্রকারদ্বয়রহিত, একাগ্র। "অদ্বৈধমত্র বক্তব্যম্" (রামা° ২.১১৮.৩)

প্রথম ভাগ সমাপ্ত

বঙ্গভাষার বিশ্ববিশ্রুত বৃহদভিধান

বিশ্বকোষ

ENCYCLOPÆDIA INDICA

ইহাতে ব্যুৎপত্তি সমেত সমস্ত বৈদিক ও সংস্কৃত শব্দ, প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসম্প্রদায় এবং তাহাদের মত ও বিশ্বাস, আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বিবরণ, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, জ্যোতিষতত্ত্ব, বিজ্ঞানতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, গণিততত্ত্ব, চিকিৎসাতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব এবং ইন্দ্রজাল, পাকবিদ্যা প্রভৃতির সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমে বর্ণিত আছে।

দ্বিতীয় সংস্করণ

বঙ্গের প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দের সহযোগিতায়

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি, তত্ত্বচিন্তামণি শব্দরত্নাকর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

ও

৯নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার—বিশ্বকোষ-কার্য্যালয় হইতে

প্রকাশিত

৯নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

বিশ্বকোষ প্রেসে

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সেন দ্বারা মুদ্রিত।

১৩৪২

সচিত্র]　　　　# বিশ্বকোষ　　　　[মানচিত্র সহ

বঙ্গভাষার আদি ও প্রধান জ্ঞানকোষ (Encyclopædia)
সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে
দ্বিতীয় সংস্করণ

বঙ্গের তথা ভারতের বিভিন্ন স্থানের প্রখ্যাতনামা সাহিত্যসেবিগণের সহায়তায় সঙ্কলিত হইতেছে।

যাঁহারা "এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকার" সহিত পরিচিত, তাঁহারা সহজেই এই মহাকোষের উদ্দেশ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয়াদি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। উক্ত "এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকায়" যেরূপ পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার সারসংগ্রহ দেওয়া হইয়াছে, সেরূপ বিশদভাবে ভারতীয় দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, শিল্প, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি স্থানলাভ করে নাই। বিশ্বকোষের ১ম সংস্করণে ভারতবাসীর সেই অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় বিশদভাবে লিপিবদ্ধ হইলেও ২৫ বর্ষ মধ্যে নূতন নূতন আবিষ্কার ও গবেষণার সঙ্গে যে যে বিষয় পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, এই ২য় সংস্করণে সেই সকল বিষয় বিশদ্‌ভাবে আলোচিত হইতেছে, ইহাতে এই ২য় সংস্করণ একখানি সম্পূর্ণ নূতন জ্ঞানকোষ বলিয়া গণ্য হইবে। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থে এসিয়ার অপরাপর দেশ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা থাকিতেছে। পৃথিবীর সকল স্থানের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী ও নানা জ্ঞাতব্য বিষয় এবং বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শব্দ সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় লিখিত হইতেছে।

১ম সংস্করণের প্রথম ফর্ম্মা ও দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম সংখ্যা মিলাইলে সকলে বুঝিতে পারিবেন, এই দ্বিতীয় সংস্করণ কিরূপ বিশদ ও বিশালভাবে সঙ্কলিত হইতেছে। বলিতে কি, ১ম সংস্করণের এক ফর্ম্মা স্থলে ২য় সংস্করণে ৪ ফর্ম্মা লিখিতে হইয়াছে। এ অবস্থায় যাঁহাদের নিকট ১ম সংস্করণ আছে, তাঁহাদের সকলেরই এই দ্বিতীয় সংস্করণ গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

৮ ফর্ম্মায় এক সংখ্যা এবং ২৫ সংখ্যায় বা ২০০ ফর্ম্মায় এক ভাগ ধরা হইল। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৷৷০ আনা, ডাক এক আনা ; ১২ সংখ্যার অগ্রিম মূল্য ৫৲, ডাক ৷৵০ আনা, এবং ২৫ সংখ্যা বা এক এক ভাগের অগ্রিম মূল্য ১০৲ টাকা ও ডাকব্যয় ১৷৷/০ আনা। প্রতি ভিঃ পিঃ প্যাকেটে ৵০ আনা অতিরিক্ত রেজেষ্টরী খরচা পড়ে ; এজন্য পূর্ব্বে টাকা পাঠাইলে আর রেজেষ্টরী খরচা লাগিবে না। আপাততঃ প্রতি মাসে দুই সংখ্যা এবং ৺মহাপূজার পরে যাহাতে ৩।৪ সংখ্যা বাহির হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা হইতেছে। আমার ঐকান্তিক আশা ও ভরসা আছে—৮ বর্ষের মধ্যে ২৫ ভাগে বিশ্বকোষের ২য় সংস্করণ সম্পূর্ণ করিতে পারিব।

☞ সম্প্রতি বিশ্বকোষ ২৫ সংখ্যায় প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠায় ২য় সংস্করণের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি ভাগের মূল্য ১২৷৷০ টাকা, স্বর্ণাক্ষরে নামযুক্ত কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ১৩৲ টাকা, ডাক ১৷৵০ আনা। ২য় ভাগ যন্ত্রস্থ।

এবার নির্দ্দিষ্টসংখ্যক পুস্তক ছাপা হইতেছে। পূর্ব্বে দুইটী সংস্করণের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছি—এই মূল্যবান্ বৃহৎ গ্রন্থ অধিক সেট্ গুদামে রক্ষা করা অতি কঠিন ব্যাপার। এ কারণ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাহকদিগের নিকট পুস্তক পাঠাইতে থাকিব, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হইলে তৎপরে আর পুস্তক দিতে পারিব না। এজন্য সর্ব্বসাধারণকে সত্বর গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ সানুনয় অনুরোধ জানাইতেছি।

বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়
৮ বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার,
কলিকাতা। ২০শে শ্রাবণ ১৩৩২ সাল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক

নব সংস্করণ বিশ্বকোষ সম্বন্ধে অভিমত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচানসেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র

From
THE VICE-CHANCELLOR,
Calcutta University

Senate House
6th May, 1935

Dear Mr. Basu

May I congratulate you most sincerely on your decision to bring out a second edition of the Visvakosh ? You will thereby serve the truest interests of Bengali literature. That you have undertaken to carry their work into execution inspite of a terrible domestic sorrow testifies to your single-minded devotion to the cause of Bengali literature. May your efforts be crowned with success !

Yours sincerely
Shyma Prasad Mookerji

বিজ্ঞানাচার্য্য স্যর্ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পত্র

Very great service has been rendered to Bengali literature by the numerous contributions of Prachyavidya-Maharnava Nagendra Nath Bose.

One of his important endeavours was the editing of a Bengali Encyclopaedia so far as half a century ago. It is to be hoped that the second illustrated edition of this Visvakosha which is now being brought out, will prove to be even more successful than its predecessor. 30th August, 1934.

J. C. Bose.

আচার্য্য স্যর্ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের পত্র

আপনার নবপ্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ বিশ্বকোষের দশম খণ্ড পর্য্যন্ত আমার হস্তগত হইয়াছে। যতদূর দেখিলাম, প্রবন্ধ, কাগজ, ছাপা, ছবি প্রভৃতি সকল দিক্ দিয়াই ইহা অতি সুন্দর হইতেছে। আপনাকে আমি আমার যৌবনকাল হইতেই জানি। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আপনি যখন বাঙ্গালা ভাষায় বিরাট্ অভিধান বিশ্বকোষ সঙ্কলনে হস্তক্ষেপ করেন, তখন আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, আপনার মত সহায়-সম্পদ্‌হীন বাঙ্গালী যুবকের পক্ষে এরূপ অভিধান-সম্পাদনের দায়িত্বভার গ্রহণ হয়ত সময়োচিত হয় নাই। কিন্তু আপনি অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছিলেন। পর পর বাঙ্গালা ও হিন্দী বিশ্বকোষ সম্পূর্ণ করিয়া আপনি আমাদের তথা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। আজ তাই বাঙ্গালা বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে এই রোগজীর্ণ প্রৌঢ় বয়সে আপনার উদ্যম দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, আনন্দিত হইয়াছি। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার সাফল্য কামনা করিতেছি। ভরসা করি, শ্রীভগবানের কৃপায় বিশ্বকোষের নবসংস্করণের সঙ্কলনকার্য্য সমাপ্ত করিয়া আপনি দেশের সম্মুখে একটী মহৎ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইবেন। ইতি সায়ান্স কলেজ, কলিকাতা ১৫ই ভাদ্র, ১৩৪১ সাল

আপনার—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

৪। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন রায় বাহাদুরের পত্র

বেহালা ২১।১০।৩৪

এবার আপনার বিশ্বকোষ পড়িয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। পূর্ব্বতন-সংস্করণের সঙ্গে নূতন-সংস্করণের পার্থক্য পাঠক মাত্রই বুঝিতে পারিবেন। লেখার উন্নতি, বিষয় বুঝাইবার রীতি ও সংক্ষেপে বহুতত্ত্বের সন্নিবেশ, এ সমস্তই প্রথম শ্রেণীর কোষগ্রন্থের উপযোগী হইয়াছে। লেখার পাণ্ডিত্য এবং একান্তরূপ বাহুল্য-বর্জ্জিত সারাংশ সঙ্কলন—ভাবোচ্ছ্বাসবর্জ্জন প্রভৃতি গুণে এই বৃহৎগ্রন্থ গ্রাম্যতার হাত হইতে মুক্ত হইয়া "এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকার" প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার যোগ্য হইয়াছে। প্রাচ্যদেশ সম্বন্ধে ইহাতে এত সুলিখিত, সদ্য আবিষ্কৃত তত্ত্ববহুল সন্দর্ভ আছে যে, বিলাতী মহাকোষ এ বিষয়ে ইহার সমকক্ষতা করিতে পারিবে না। আপনার ছবিগুলি এবার চমৎকার হইয়াছে। রোগশয্যায় চলচ্ছক্তিহীন হইয়া আপনি এই দেশের জন্য যাহা করিতেছেন, তাহাতে যাঁহার কৃপায় "পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্" তাঁহারই অনুকম্পা যে আপনার উপর বর্ষিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। * * * *

৫। ডাঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত

৭ই পৌষ ১৩৪১

"বিশ্বকোষ" বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব, বাঙ্গালীর পাণ্ডিত্যের ও বিদ্যাবত্তার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই গ্রন্থ ২৭ বৎসর পরিশ্রম করিয়া শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় সম্পূর্ণ করিয়াছেন—যে কোনও দেশের সাহিত্যিক ও বিদ্যালোচনা-সংক্রান্ত প্রচেষ্টায় ইহা এক শ্রেষ্ঠ অবদান বলিয়া বিবেচিত হইবে। সম্প্রতি অনন্যসাধারণ উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি লইয়া ভগ্নস্বাস্থ্য অবস্থায়ও শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় "বিশ্বকোষ"-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে ব্রতী হইয়াছেন। ইনি এবার এই কার্য্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে দেশের বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট হইতে সহায়তা ও সহযোগিতা প্রাপ্ত হইয়াছেন ও হইবেন। "বিশ্বকোষ"-এর দ্বিতীয় সংস্করণ পূর্ব্বাপেক্ষা যে আরও বেশী উপযোগী হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় এই কার্য্য যথাকালে সমাধা করিয়া তুলিতে পারিবেন, সে বিষয়েও আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে। এখন দেশবাসী বিদ্যোৎসাহী ভাগ্যবান্‌গণের সহানুভূতির উপরে এই দ্বিতীয়-সংস্করণের শীঘ্র প্রকাশন নির্ভর করিতেছে। বাঙ্গালাদেশে ও বাঙ্গালার বাহিরে যতগুলি পাঠাগার আছে, সেগুলির মধ্যে যদি "বিশ্বকোষ"-এর প্রচার হয়, অন্ততঃ যদি অর্দ্ধেক সংখ্যক পাঠাগারের জন্য "বিশ্বকোষ" লওয়া হয়, তাহা হইলে সহজেই এই মহাগ্রন্থের প্রকাশ বিষয়ে দেশবাসীর আনুকূল্য প্রদর্শন ঘটিতে পারে।

৬। **উদয়ন**, শ্রাবণ, ১৩৪১ সাল—

* * আমরা আশা করি, বাঙ্গালার ধনী এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকলেই বিশ্বকোষের গ্রাহক হইয়া নগেন্দ্রনাথের উদ্যমকে জয়যুক্ত করিবেন। লাইব্রেরীতে বিশ্বকোষ না থাকা লজ্জার কথা। ইহার উপকারিতা কত তাহা বোধ হয় বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। * * *

৭। **দৈনিক বসুমতী**, ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০—

* * * বাঙ্গালা বিশ্বকোষের সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষার তথা বাঙ্গালী জাতির গৌরব এই মহাগ্রন্থ সকলেরই সুবিদিত। * * * এই গ্রন্থ প্রত্যেকেরই বিশেষতঃ প্রতি পুস্তকালয় ও পাঠাগারের পক্ষে অত্যাবশ্যক। * * *

৮। **বঙ্গবাসী**, ২০শে মাঘ, ১৩৪০—

বঙ্গভাষার বিশ্ববিশ্রুত বৃহদভিধান বিশ্বকোষের পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইতেছে এবং ইহার সুবিখ্যাত কৃতী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু নিজেই বঙ্গের প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দের সহযোগিতায় এই নূতন সংস্করণের সম্পাদন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি। * * * প্রত্যেক পাঠাগারে এবং প্রত্যেক ধনীর গৃহেই এই জ্ঞানকোষ—'বিশ্বকোষ'—বিরাজ করিতে দেখিলে আমরা আনন্দিত হইব।

৯। **গৌড়ীয়**, ১লা পৌষ, ১৩৪০, শনিবার—

* * * বসু মহাশয় বাঙ্গালা-ভাষার সার্ব্বভৌম কোষ-গ্রন্থের সেবায় জীবনের পূর্ব্বাহ্ণ হইতে অপরাহ্ণকাল পর্য্যন্ত বহুবর্ষ ব্যাপিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বীয় মহাব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। সম্প্রতি সেই বর্ষীয়ান্ মনীষী মহোদয় জীবনের সায়াহ্নকালেও পুনরায় ঐ বিরাট্ কোষগ্রন্থের দ্বিতীয়-সংস্করণ প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন জানিয়া আমাদের হৃদয়ে বিশেষ আশা ও আনন্দের সঞ্চার হইতেছে। * * * এবারে বহু চিত্রসৌষ্ঠব ও পারিপাট্যসমন্বিত হইয়া বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়া আমরা অতীব সুখী ও আশান্বিত হইলাম।

১০। **বিচিত্রা**, ফাল্গুন, ১৩৪০—

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত বিশ্বকোষের নাম জানেন না এমন শিক্ষিত বাঙালী নেই বলিলেও বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। ইংরাজী ভাষার পক্ষে **Enoyclopædia Britannica** যেমন অপরিহার্য্য এবং মূল্যবান্ গ্রন্থ, বাঙলা ভাষার পক্ষে বিশ্বকোষও ঠিক তাই। * * *

১১। **মেদিনীপুর-[illegible]তৈষী**, ৩রা পৌষ, ১৩৪০—

* * * আমরা এই প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি। ইহা যে কি বিরাট্ কার্য্য তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিরও ধারণার অতীত। যদিও প্রথম সংস্করণ ছাপা হইয়াছে তাহা

হইলেও দ্বিতীয় সংস্করণের বিরাটত্ব অসাধারণ। অভিজ্ঞ ব্যক্তি-গণের সমবায়ে ইহার সম্পাদন একমাত্র প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পক্ষেই সম্ভব। ইহা সুশৃঙ্খলে সম্পাদিত হইলে বাঙ্গালী জাতি জগৎপর্য্যায়ে বহু সমুন্নতি লাভ করিবে, এবং ইহা বাঙ্গালী জাতির অতি বড় গৌরবের বস্তু হইবে। ইহাতে বাঙ্গালীর জ্ঞান, বিদ্যা ও মনীষার পরিচয়ও পাওয়া যাইবে।

১২। দুন্দুভি, ৬ই মাঘ, ১৩৪০—

* * * আমাদের এ-দেশে বঙ্গ ভাষার এরূপ Encyclopædia বা জ্ঞানকোষ প্রকাশের ব্যবস্থা কোন গ্রন্থপ্রকাশকই করেন নাই। শ্রদ্ধেয় নগেন বাবুই এ ব্যাপারে একমাত্র অগ্রগামী। * * * প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির উচিত—এইরূপ মূল্যবান গ্রন্থখানি সদা-সর্ব্বদা ঘরে বা অফিসে রক্ষা করা। * * *

১৩। প্রবর্ত্তক, পৌষ, ১৩৪১

*** কিন্তু যিনি একটী জীবনের মধ্যে "বিশ্বকোষে"র ন্যায় মহাগ্রন্থের একটী বাঙালা এবং একটী হিন্দী সংস্করণের প্রকাশের পর, এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধ বয়সেও তাহার ২য় সংস্করণ-প্রকাশে উদ্যোগী হইতে পারেন, সেই অদ্ভুত-কর্ম্মা পুরুষের কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত সমকণ্ঠে বলিতে ইচ্ছা হয়—"Enough for us to know that nations are made of such giants"

১৪। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১লা শ্রাবণ ১৩৪২

২১-২২-২৩ তিন সংখ্যা একত্রে পাইলাম। এই বিশ্ববিশ্রুত বিরাট অভিধানখানি প্রতি মাসে দুই খণ্ড হিসাবে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় এই বৃদ্ধ বয়সে অতি নিদারুণ শোকের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর আঘাত সহ্য করিয়াও বিশ্বকোষের প্রকাশ-কার্য্য নিয়মিত এবং অব্যাহত রাখিয়াছেন। বিশ্বকোষের প্রত্যেকটী শব্দ সুলিখিত, বিস্তৃত ও প্রয়োজনীয় তথ্যে পরিপূর্ণ। আলোচ্য সংখ্যা কয়টীতে ডাঃ শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ ঘোষ লিখিত অথর্ব্ব ও অথর্ব্ববেদ শব্দ, সম্পাদকের নিজের লিখিত অদিতি শব্দ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ তর্কবাগীশ ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরৎকমল ন্যায়স্মৃতিতীর্থ লিখিত অদৃষ্ট শব্দ, শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল রুদ্র কবিরত্ন এম এ, লিখিত অদৃষ্টবাদ শব্দ, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বেদান্তভূষণ লিখিত অদ্বয় ও অদ্বয়বাদ শব্দ, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন লিখিত অদ্ভুতাচার্য্য শব্দ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল ও শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন লিখিত অদ্বৈতপ্রভু (অদ্বৈতাচার্য্য) শব্দ এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বেদান্তভূষণ লিখিত অদ্বৈতবাদ শব্দ স্থান পাইয়াছে। আমরা ভরসা করি এইরূপ সুসম্পাদিত অভিধান বাঙ্গলার স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরীতে এবং অর্থশালী ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি-গণের গৃহে গৃহে রক্ষিত হইবে।

১৫। দেশ—৪ঠা শ্রাবণ ১৩৪২

এই প্রসিদ্ধ অভিধানখানির দুই সংখ্যা প্রতিমাসে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে। এ পর্য্যন্ত ২৩শ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। বিশ্বকোষের প্রথম সংস্করণে যে যে শব্দ নামে মাত্র তালিকাভুক্ত ছিল, অথবা সংক্ষেপে লিখিত ছিল, এই দ্বিতীয় সংস্করণে সেই সেই শব্দ বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের দ্বারা বেশ বিস্তৃতরূপে লিখাইয়া লওয়া হইতেছে। অথচ অভিধানখানি মাসিক পত্রে পরিণত না হয়, অনাবশ্যক আকার বাড়াইয়া এই অর্থসঙ্কটের দিনে গ্রাহকগণকে আর্থিক ব্যয়বাহুল্যে বিব্রত করিতে না হয়, সেদিকে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি আছে, প্রবীণ সম্পাদক মহাশয়ের ইহাই উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বাস্তবিক সম্পাদক মহাশয় দীর্ঘকালাবধি অভিধান সম্পাদন করিয়া যেমন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তেমনই কৃতিত্বও প্রদর্শন করিতেছেন। বিশ্বকোষ যেরূপ পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্যের সহিত সম্পাদিত হইতেছে, তাহাতে একথা অসঙ্কোচে বলা যায় যে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইলে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কোষ-গ্রন্থরূপে বিশ্বসাহিত্যে একটী স্থায়ী আসন লাভ করিবে।

১৬। প্রবাসী—শ্রাবণ ১৩৪২।

প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর "বিশ্বকোষের" দ্বিতীয়-সংস্করণ নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা ইহার ২৩শ সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। এই সংস্করণের ১৮শ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইবার পর তাঁহার একমাত্র কৃতী পুত্র বিশ্বনাথ বসু পরলোকগত হন। এই দুর্বিষহ শোক সত্ত্বেও নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অসাধারণ ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় এবং অক্ষুণ্ণ দক্ষতার সহিত, বৃহৎ গ্রন্থখানির উৎকর্ষ বজায় রাখিয়া, বিশ্বকোষের তিন-সংখ্যা মাসে বাহির করিতেছেন। বস্তুতঃ এই দ্বিতীয়-সংস্করণটী তাঁহার পুত্রের স্মৃতির সহিত চিরকাল জড়িত হইয়া থাকিবে। প্রথম সংস্করণ শেষ হইবার অব্যবহিত পরে পুত্রটী জন্মগ্রহণ করে বলিয়া পিতা তাহার নাম রাখিয়া-ছিলেন বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথের আগ্রহে, বিদ্যাবত্তায় ও কর্ম্ম-কুশলতায় দ্বিতীয়-সংস্করণের প্রকাশ আরব্ধ হয়। বিশ্বকোষ পড়িলে এত বিষয়ে এত জ্ঞানলাভ করা যায়, যে, ইহার অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর-শ্রেণীতে শিক্ষালাভের সমান মনে হয়।

---

17. AMRITA BAZAR PATRIKA,

Sunday, 31st December, 1933.

** It is about two years that the Hindi Visvakosha was completed in 25 volumes. The world of letters was, as it were, taken by surprise. Mahatma Gandhi, appreciating the stupendous labour and high worth of the book,

saw the author himself and wrote in his 'Young India' of the tenth January, 1929, a long article on his visit and the Viswakosha.

To-day we feel even more astonished than did Mahatma Gandhi 5 years ago. Just think of a man, confined in a single room for 17 years, suffering heavily under ill-health and in this state presenting to the world 10 Volumes of the 'Banger Jatiya Itihasa' (History of the Castes and Sects of Bengal), The Mayurbhanj Archæological Survey Reports, 3 volumes of the 'Social History of Kamrupa' (in English) and 25 Volumes of Hindi Visvaoksha—each of them a work of rare achievement. It is simply amazing and reflects real glory on Bengal and the Bengalees.

The Visvakosha is the pride of every Bengali irrespective of caste or creed. Indeed, the work promises fair to be a valuable asset to the nation. Our mother-tongue can now claim an equal rank with any other language of the East or the West.

The 1st edition of the Bengali Visvakosha being sold out, and the work needing revision in the light of the latest evolution of knowledge the author, now in the sunset of his life and the decline of his health, has taken on hand the publication of the 2nd edition; and in this, eminent scholars in all parts of the land have volunteered to assist him. It is desirable that the work should be completed under the direct supervision of the author, who has proved himself pre-eminently fitted for such undertakings by his 50 years ceaseless labours on the 2 Viswakoshas.

We can not enumerate the manifold features of this vast work. Let the reader find them out for himself. We can simply say that it is our national glory—our victory.

18. MODERN REVIEW, February, 1934.

This Bengali Encyclopædia was completed and published twenty-two years ago. A second edition had long been called for, but could not be undertaken owing to reasons of Mr. Basu's health. But having secured the collaboration of trustworthy scholars he has at length begun to publish the works in parts. The new edition is a greatly improved and enlarged work brought up-to-date. It must not be supposed that because the work is in the Bengali language and has been named Encyclopœdia **Indica** in English it therefore relates only to Bengal or India. It is really a universal Encyclopœdia in the same sense as the Encyclopædia **Britannica** is one, though it is not so elaborate.

Of course, just as British Encyclopædia give more space to persons, places and other topics in which Britishers take interest, than to others, so this Indian Encyclopœdia gives more space to Indian subjects than to others. But non-Indian persons, places and things are also treated of. For example, in the first 32 pages of the first volume, forming No. 1 of the second edition there are 21 non-Indian items dealt with such as those relating to Achaemenes, Achilles, Akkad etc.

19. INDUSTRY, February, 1934

Visvakosha is a unique contribution to the literature of Bengal. Its wealth of information about religions, puranas, philosophy, ancient and modern sciences, rhetoric and prosody brought it into prominence as an Encyclopædia Indica. * *

20. AMRITA BAZAR PATRIKA 14-7-35

It is a great pleasure for us to accord a hearty welcome to the three parts of this Encyclopædia (21—23rd parts) published in one month. While noticing the 20th part in May last we refered to the terrible bereavement suffered by the editor in the lamentable death of his only son who had been a valuable coadjutor to him in this undertaking. But this has not chilled his spirit, five parts of the book have come out within two months. This is undoubtedly a unique achievement.

The numbers under survey have many interesting words dealt with by experts. Dr. Batakrishna Ghosh, M.A. writes on 'Atharva' and 'Atharva Veda.' The word 'Adrista' has been treated by the well-known Pandit M. M. Phani Bhusan Tarkabagis and Prof. Saratkamal Smriti-Nayatirtha. Pandit Rajendra Nath Ghosh Vedanta-bhusan wrote on 'Advaya', 'Advayvad' and 'Advaitavad', while the life-sketch of Advaitacharya has come out from the pen of Pandit Hare Krisna Sahityaratna and Sj. Satyendranath Basu, M.A., B.L. Besides, the editor himself has written on a number of important words.

We doubt not these numbers will prove highly useful as their predecessors.

WORKS BY

NAGENDRANATH VASU

1. ARCHÆOLOGICAL SURVEY REPORT OF MAYURBHANJA.

Dr. Kern, Dr. Fleet, Dr. Oldenburg, Sir Grierson, Dr. Sylvain Levi, M. Emile Senart, Mr. Vincent Smith, Dr. Thomas of India Office, Dr. L. D. Burnett of the British Museum, Dr. E. Hultzch and other European scholars has enthusiastically received the book and lavished high-flown praises upon it. Price Rs. 15/-

2. THE SOCIAL HISTORY OF KAMRUPA

Vols. 1, 2 & **3**. Price Rs. **5**/- per Vol. For students half price,

From Mr. Hem Chandra Goswami. Extra Assistant Commissioner. Jorhat, Assam. 18-3-23.

"As you know, I have devoted my whole life in the Research work in Assam and I say without the least exaggeration that the spirit of Research shown by you in this book (Kamrupa) simply amazes me. I can assert withont any fear of contradiction that no writers in the past have brought to light so much matter about the ancient history of this ancient country of "hallowed memory" as you say. I am sincerely of opinion that by writing this book you have added a new feather to the crown of glory, which already adorns your head.

3. MODERN BUDDHISM

It has been conclusively proved in this book that Buddhism is neither dead nor driven out of India, but its pulse still beats with all the energy of life in Orissa.

The book contains more than 250 pages. It is nicely printed and beautifully bound. Price—Rs. 3/-

Dr. L. Burnett of the British Museum writes—

"A more fascinating and erudite work I have not read for many years and I shall find it most valuabie both in the study and in the lecture-room."

Dr. H. Kern, the great Buddhist scholar writes—

'I need hardly to tell you that the subject matter is one that interests me highly, so that it will be a pleasure for me to read the Book which contains so much th t is little known or not at all in Europe."

4. A SHORT HISTORY OF INDIAN KAYASTHAS

(specially written for All India Kayastha Conference) Price ans. -/6/- only.

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস

১। **ব্রাহ্মণকাণ্ড—১মাংশ** (রাঢ়ীয়) (২য় সংস্করণ)—বহুতর কুলগ্রন্থ, ইতিহাস, শিলালিপি ও তাম্রশাসনসাহায্যে লিখিত হইয়াছে, যাহা ইতিপূর্ব্বে কোন গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই। সুপ্রসিদ্ধ পদ্ধতিকার ভবদেবভট্টের কুলপ্রশস্তি ও তন্মূলক শিলা-ফলকের ফটোগ্রাফ ও তাহার অনুবাদ, কবিকঙ্কণ ও মুকুন্দরামের স্বহস্তলিখিত পুথির চিত্র ও তৎপুত্র শিবরামের দানপত্রের ফটো এবং কুলীন, বংশজ ও শ্রোত্রিয়গণের বংশাবলি ও ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

২। **ব্রাহ্মণকাণ্ড—২য় অংশ**—প্রথমাংশের ন্যায় প্রাচীন শিলালিপি, ইতিহাস, কুলগ্রন্থ প্রভৃতির সাহায্যে এই দ্বিতীয়াংশে বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ সমাজের বিস্তৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূল্য ২॥০, কাপড়ে বাঁধাই ৩৲।

৩। **ব্রাহ্মণকাণ্ড—৩য় হইতে ৫মঅংশ**—এই খণ্ডের ৩য় অংশে পাশ্চাত্ত্য বৈদিক, দাক্ষিণাত্য ও বৈদিক, শ্রীহট্ট বৈদিক সমাজের বিস্তৃত ইতিহাস, ৪র্থ অংশে শাকদ্বীপী বা আচার্য্য ব্রাহ্মণগণের বিস্তৃত সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ এবং ৫ম অংশে বঙ্গের তিয়োতিয়া ব্রাহ্মণ-সমাজের ইতিবৃত্ত সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। (যন্ত্রস্থ)।

৪। **ব্রাহ্মণকাণ্ড—ষষ্ঠ অংশ**—(পীরালি-ব্রাহ্মণ বিবরণ) ১ম ভাগ—এই অংশে পীরালি ব্রাহ্মণ-সমাজের বিস্তৃত ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা।

৫। **রাজন্যকাণ্ড বা কায়স্থকাণ্ডের প্রথমাংশ**—এই অংশে গৌড়ীয় রাজন্যবর্গের তথা কায়স্থ-সমাজের ২০০০ বর্ষের প্রাচীন ধারাবাহিক ইতিহাস প্রমাণ প্রয়োগসহ বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ২।০ টাকা।

৬। **কায়স্থকাণ্ডের দ্বিতীয়াংশ**—এই অংশে বারেন্দ্র কায়স্থসমাজের দেড় হাজার বর্ষের বিস্তৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা, কাপড়ে বাঁধাই ৩৲।

৭-৯। **কায়স্থকাণ্ডের ৩য়,৪র্থ ও ৫মঅংশ**—উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের হাজার বর্ষের ইতিহাস—প্রাচীন কুলগ্রন্থ ও ইতিহাস সাহায্যে লিখিত হইয়াছে। প্রতিঅংশ ২॥০, কাপড়ে বাঁধাই ৩৲।

১০। **কায়স্থ কাণ্ডের ষষ্ঠ অংশ**—দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের সুপ্রাচীন ইতিহাস, (দেড়হাজার বর্ষের প্রাচীন তাম্রশাসন এবং প্রাচীন ও পরবর্ত্তী শতাধিক কুলগ্রন্থের প্রমাণ সহ) মূল্য ২॥০, কাপড়ে বাঁধাই ৩৲।

১১। **বৈশ্যকাণ্ড—১মাংশ**—ভারতীয় বণিক্‌সমাজের ৫ হাজার বর্ষের ইতিহাস। বৈদিক, পৌরাণিক ও সামাজিক ইতিবৃত্ত ও বণিক্‌সমাজের পুরাবৃত্ত ঐতিহাসিক প্রমাণাদি এবং শিলালিপি, তাম্রশাসন ও প্রাচীন কুলগ্রন্থসমূহ সাহায্যে বঙ্গীয় বৈশ্যবণিক্‌সমাজের ইতিহাস। মূল্য ২৲ টাকা।

১২। **কায়স্থের বর্ণনির্ণয় (২য় সংস্করণ)**—এই গ্রন্থে ভারতীয় যাবতীয় কায়স্থ-সমাজের বিভিন্নশাখা ও শ্রেণীর উৎপত্তি, বিস্তৃতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস এবং বর্ণনির্ণয়; বেদাদি প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র, শিলালিপি, তাম্রশাসন, ইতিহাস ও কুলগ্রন্থ সাহায্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূল্য ১০।

১৩। **মহাবংশ**—রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের সর্ব্বপ্রধান ও প্রামাণিক কুলগ্রন্থ, মূল্য ১৲ টাকা।